নীতিক বন্দী মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা তেমন কিছু ঘটে নাই। মন্ত্রীরা ইহাও জানেন যে, দেশের জনমত অনর্থক রাজনীতিক বন্দীর আটক রাখিবার বিরোধী; কিন্তু সব জানিয়া শুনিয়াই, সে পথে যেভাবে যাওয়া উচিত তাঁহারা তাহা যাইবেন না বা খোলসা কথায় তাঁহারা সে পথে যাইতে পারিতেছেন না, পাছে সাহেবলোক চটে এই ভয়ে। সুতরাং মন্ত্রীদের উদারতায় এই সমস্যা মিটিবে এমন আশা কম। সময় যখন কিছু পাওয়া গিয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে জন-আন্দোলনকে সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সেই জন-আন্দোলনকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইলে যে আন্তরিকতা বা গরজ অথবা প্রাণের টান জাগান উচিত, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বন্দীদিগকে পীড়িত দেখিয়া সেই টান যতটা আন্তরিক হইয়া উঠিতেছিল, সেই আন্তরিকতাকে এখন কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; নীতির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নেতৃত্বের শক্তির উপর সেই ভারটি অক্ষুণ্ণ রাখা নির্ভর করিতেছে। নতুবা বন্দীরা অনশন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে আন্তরিক আবেগ বা টানটা ঢিলা হইয়া পড়ে, তবে কাজ বিশেষ কিছু হইবে না। স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিতে হইলে জনমতকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়—রাষ্ট্রনীতির ইহাই সার কথা। রাজনীতিক বন্দিগণ অনশন ব্রত ত্যাগ করার দ্বারা দেশবাসীর উপর যে কর্ত্তব্য চাপাইয়াছেন, দেশবাসী যেন তাহা বিস্মৃত না হন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উত্তরোত্তর এইদিকে সজাগ এবং সংকল্পশীল করিয়া তোলেন, আমরা ইহাই চাই।

কথা নহে কাজ—

শ্রীরামপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-সভায় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে কয়েকটি চোখা চোখা কথা বলিয়াছেন। তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পাপ-প্রভাব আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, এজন্য আমাদের দায়িত্ব কম নহে। আমরা যথোচিতভাবে এ সিদ্ধান্তে বাধা দেই নাই। কথা আংশিকভাবে সত্য; কিন্তু এই সব কথা লইয়া এখন কোন লাভ নাই। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত যদি আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে, তবে তাহাকে উৎখাত আমাদেরই করিতে হইবে। জাতির কল্যাণ এবং দেশের কল্যাণের প্রেরণা যদি আমাদের মধ্যে জীবন্তভাবে থাকে, অর্থাৎ ঐগুলি শুধু কথার অভিব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে সেই প্রেরণা কাজেও মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিবে। কথা হইতেছে এই যে, অন্তরের সেই অনুভূতিকে কর্ম্ম-রূপ দিবার মত ত্যাগ, সাহস এবং অকুতোভয়তা আমাদের মধ্যে আছে কি না—আমরা তুচ্ছ স্বার্থের বশে মনে একরূপ অনুভব করিয়া কাজে মিথ্যাচার করি কি না। দুঃখের বিষয়, এদেশে এমন লোকের অভাব নাই, যাঁহারা কথায় বলেন অনেক কিছুই, কিন্তু কাজের বেলায় তুচ্ছ স্বার্থই তাঁহাদের দৃষ্টিতে বড় হইয়া উঠে, তাঁহারা তখন গুড়্‌সুড় করিয়া পিছাইয়া পড়েন। বাঙলাদেশের হোমরা চোমরা, যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নাই, কিন্তু বাঙলা দেশে এমন লোক এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে যাহারা দেশের স্বার্থকে বাস্তবিকভাবে অনুভব করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোটা কম্বলের বিবেচনাকে তুচ্ছ করিয়া দেশের সেই বৃহত্তর স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া আসিতে দ্বিধা বোধ করে না। সব দেশেই বড় কাজ হয়, এই সব লোকদের দ্বারাই। অতি বুদ্ধিমান হিসাবী লোকের দ্বারা জগতে কোন বড় কাজ হয় না। বাঙলা দেশে এমন বুকের বড় পাটাওয়ালা লোক এখনও আছে এবং যখন দরকার হইবে আগাইয়া আসিবে তাহারাই। অদৃষ্টে যাহা আছে বলিয়া গা ছাড়িয়া বসিয়া থাকা সম্ভব হয়, তাহাদেরই পক্ষে যাহাদের অন্তরে সত্যকার বেদনা জাগে নাই। দেশের জন্য সত্যকার বেদনার অনুভূতি যাহাদের মধ্যে আছে, সংগ্রামের মুখে দাঁড়াইবে তাহারাই। তাহাদের ধন-সম্পদের জোর না থাকিতে পারে, তাহারা জনে জনে বিদ্যাদিগ্‌গজ না হইতে পারে, আইন-কানুন গড়িয়া কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় তাহারা না দিতে পারে, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন আছে তাহাদের মধ্যেই এবং তাহাদের সেই মৃত্যুহীন প্রাণের মহিমাতেই জাতি প্রাণবান হইয়া উঠিয়া থাকে; ত্যাগের ভিতর দিয়া জাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঙলা দেশে সেই প্রাণের সাড়া আবার জাগিবে। আঘাত যখন আসিয়াছে, প্রতিক্রিয়া তাহার উঠিবেই। বাঙালী এখনও মরিয়া যায় নাই যে, মিউনিসিপ্যাল আইনের মত একটা স্বেচ্ছাচারকে সে একান্তভাবে হজম করিয়া লইবে এবং যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে এই ধরণের স্বেচ্ছাচার-অনাচার সম্ভব হইতেছে, সেই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে সে স্বীকার করিয়া লইবে। স্যার নৃপেন্দ্রনাথের উক্তির মূলে যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ধরণের যুক্তিতে অনিষ্ট ছাড়া জাতির ইষ্ট কিছু ঘটে না। মানুষের চিত্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ঐ ধরণের যুক্তি-বুদ্ধি অতিক্রম করিতে পারে বাঙলা দেশে এমন মানুষের অভাব ঘটে নাই এবং সেই সব মানুষের আত্মাবদানের ফলে বর্ত্তমানের বাঙালী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহারাই। বিষয়-বিচারের দৃষ্টিতে যে জিনিষ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, তাহারাই অকুতোভয় কর্ম্মসাধনায় তাহা সম্ভব করিয়া তুলিবে। বাঙলা দেশে একদিন তেমন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল এবং এখনও সে শক্তি বাঙালী হারায় নাই।

কু-কীর্ত্তির কৈফিয়ৎ—

সেতাংশদের সঙ্গে যোগ দিয়া কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পক্ষে নূতন নয়। কুখ্যাত রুণী প্যাক্টই সে পক্ষে নজীর হইয়া থাকিবে। পাঠক বর্গ অবগত আছেন, গত ১লা আগষ্ট এই ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন কংগ্রেসী কাউন্সিলার ইউরোপীয়ান এবং সরকারের মনোনীত সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া কংগ্রে

মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের নির্দ্দেশকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন এবং সেদিন দেখিলাম, শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ রায়পন্থী ছয়জন সদস্যও একটি বিবৃতি বাহির করিয়া তাঁহাদের কু-কীর্ত্তির কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের ঘোরান-পাকান কথার কারসাজীর মধ্যে আমরা যাইতে চাই না। আমরা তাঁহাদিগকে শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, তাঁহারা যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসী দলের সঙ্গে একদিকে বিরোধিতা এবং অপরদিকে শ্বেতাঙ্গ দলের সমর্থনসূচক হইয়াছিল কি না। শ্বেতাঙ্গ দল বরাবরই কর্পোরেশনে এদেশের লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং মুখ্যভাবে তাঁহাদের সেই চেষ্টারই ফলে, মন্ত্রীদের হাত দিয়া নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন বাহির হইয়া আসিয়াছে। বাঙলার মন্ত্রীরা হইলেন নিমিত্তমাত্র, কর্ণধার হইলেন শ্বেতাঙ্গ দল। ডাক্তার রায়ের নেতৃত্বে ইঁহারা নিজেদের দলের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এবং এমন কাজ করিয়াছেন, যে কাজ প্রকৃত কংগ্রেসকর্ম্মীরা সমর্থন করিতে পারেন না; অথচ কংগ্রেসের কর্পোরেশনে অতন্দ্রিতভাবে উৎসাহসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ দল যে কাজকে লুফিয়া লইয়াছেন। তেমনি কাজকে কংগ্রেসের নীতির সহায়ক এবং কলিকাতার নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার শুভ উদ্দেশ্য-মূলক এমন ব্যাখ্যা করিবার স্পর্দ্ধা যাঁহারা করেন তাঁহাদের নির্লজ্জতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সুরেন্দ্র-নাথের দীর্ঘ সাধনার ফলে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভিতর দিয়া দেশের লোক যেটুকু অধিকার পাইয়াছিল, আজ তাহা ধ্বংস হইতে বসিয়াছে এবং সেই যে ধ্বংসের চেষ্টা, তাহার মূলে প্রধানভাবে রহিয়াছে শ্বেতাঙ্গ দলের উস্কানী। সেই শ্বেতাঙ্গ দলের সঙ্গে ভিড়িয়া যাঁহারা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা-নিয়ামক কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘশক্তি এই সঙ্কট কালে বিনষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারা দেশের লোকের সম্মুখে কৈফিয়ৎ দিতে আসেন কোন মুখে আমরা ইহাই ভাবিতেছি। সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা আমরা শুনিতে চাই না। কলিকাতার পৌর-স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে আজ সকলের আগে দরকার সঙ্ঘশক্তির। দেশের স্বার্থের দিককার সেই সঙ্ঘ-শক্তিকেই যাঁহারা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে না। বিশেষ নীতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কিত ব্যাপারের কথা তুলিবার কোন যুক্তিই আজ নাই। পৌর-স্বার্থ রক্ষার জন্য আজ সঙ্কট-মুহূর্ত্ত উপস্থিত, এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে যাঁহারা সঙ্ঘের আদর্শকে শিথিল করিতে পারেন, তাঁহাদের অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই গোছের কৈফিয়ৎ দিতে পারে সকলেই। দলত্যাগী সদস্যেরা তেমন কৈফিয়ৎই দিয়াছেন, তাঁহাদের গোটা কৈফিয়তের মূলে বাস্তব প্রমাণ কিছুই নাই, আছে কতকগুলি নিজেদের মন-কল্পিত অনুমান মাত্র। এমন কৈফিয়তে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইবে না। জয়চাঁদ হইতে মীরজাফর, উমিচাঁদ পর্য্যন্ত ইঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতারও একটা না একটা কৈফিয়ৎ চেষ্টা করিলে খাড়া করা যায়; কিন্তু আদর্শ ধ্বংসের যে গ্লানি ইঁহাদের কার্য্যে দেশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ইতিহাস তাহা অপসারণ করিতে পারে নাই। দলত্যাগী কাউন্সিলারের যে ছেঁদো কৈফিয়ৎ খাড়া করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের কলঙ্ক ক্ষালন করিতে পারিবে না; দেশের লোকে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন, তাহার মূলে আদর্শ কিছুই নাই, আছে ব্যক্তিগত রেষারেষি। দেশ-সেবায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাঁহারা ব্যক্তিগত রেষারেষিকে টানিয়া আনেন, দেশের লোক কিছুতেই তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। কলিকাতার পৌর-স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামকাল আজ উপস্থিত, আজ দৃঢ়ভাবে বজায় রাখিতে হইবে আদর্শ-নিষ্ঠাকে। যাঁহারা এই নিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন, তাঁহাদের কাজের কোন কৈফিয়ৎ দেশের লোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবে না।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ—

আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই আসামের শ্বেতাঙ্গ দল সেই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। করিবে যে ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই কারণ, আসামের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্ক শুধু স্বার্থ শোষণ-গত। আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই অন্যায় শোষণ হইতে আসামকে, বিশেষভাবে আসামের শ্রমিকদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং শোষণে ব্যাঘাত ঘটিলেই শ্বেতাঙ্গ দল চটিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশের কতকগুলি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং স্বার্থপর লোক, শ্বেতাঙ্গদের এই শোষণপর প্রবৃত্তিকে আগাগোড়া প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে এবং এই সব ষড়যন্ত্র-কারীদের চেষ্টার ফলে আসামের ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার কর্ত্তৃক উত্থাপিত কৃষি আয়-কর বিলটি গৃহীত হইলে, ব্যবস্থাপক সভায় তাহা নাকচ হইয়া যায়। প্রতিপক্ষের দল উদ্দেশ্য তাহারা মন্ত্রীদের এই পরাজয়ে পুলকিত হইয়া বরদলৈ মন্ত্রিমণ্ডলের বিতাড়নের সুখ স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন; কিন্তু সুখের বিষয় তাহাদের মনের সাধ মিটে নাই। আসামের ব্যবস্থা-পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভার যুক্ত অধিবেশনে সেদিন এই বিলটি ভোটাধিক্যে পাশ হইয়া গিয়াছে। বরদলৈ মন্ত্রিমণ্ডলের এই বিজয়ে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। আমরা বুঝিয়াছি যে, অন্ততঃ আসামে সংকীর্ণচেতা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বুজরুকী আর চলিতেছে না। সাহেব শোষকদের দল অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। কারণ আসাম সরকারের এই সব নীতির ফলে, তাহাদের স্বার্থে ঘা লাগিয়াছে। চা-বাগানের কুলীদের গায়ের রক্ত জল করিয়া তাহারা যে মোটা লাভ উঠাইতেছে, কৃষি আয়-কর বিল প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সেই আয়ের উপর তাহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হইবে। দেশের দরিদ্রের স্বার্থ দেখিতে হইলে, ইহা ভিন্ন উপায় নাই। দেশদ্রোহীদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া দরিদ্রের স্বার্থরক্ষামূলক নীতি ধরিয়া আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষায় পূর্ণভাবে যেরূপ অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে দেশ-প্রেমিক সমাজের দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হইবেন।

সদুপদেশ—

পাইটের পয়সা খরচ না হয়, অথচ মাতব্বরী চলে, উপদেশের এমন মহিমা অনেকেরই জানা আছে। বাঙলার মণ্ডলীও বাঙলার পাটের চাষীদিগকে উদ্দেশ করিয়া গ্রন্থ উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন। এবার পাটের াদ কম হইয়াছিল, মিলওয়ালাদের হাতেও মজুত মাল সব বৎসরের চেয়ে কম আছে, যুদ্ধ-ভীতির জন্য থলিয়ার শ্যাকতায় বাহিরেও পাটের চাহিদা খুব বেশী, এ সব সত্ত্বেও টের দর চড়িতেছে না বরং দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। ণ ইহার কি? কারণটা দেশের লোকের যে একেবারে জানা আছে এমন নয়। ধনী কলওয়ালা ও পাটের দালালেরা এক ট হইয়া কৃত্রিম উপায়ে পাটের দাম নামাইয়া দেয় এবং সেই াদরে মাল কিনিয়া পরে তাহা চড়া দামে বেচিয়া লক্ষ লক্ষ া লাভ করে। বাঙলা সরকার এই তথ্যটি না অবগত আছেন া নয়; কিন্তু এই ফাটকাবাজী যাহাতে সম্ভব না হয়, তাঁহারা া করিতে রাজী নহেন; কারণ, পিছনে কলওয়ালাদের টের জোর কমিবার আশঙ্কা তাহাতে আছে; সুতরাং তাঁহারা পদেশ দেওয়ার পথ ধরিয়া লোক-প্রিয়তা খুঁজিয়া লইবেন, মতলব। বাঙলা সরকার তাঁহাদের বিবৃতিতে কৃষকদিগকে গূঢ় তথ্যটি জানাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন যে, পাটের দাম বেই, অতএব তোমরা পাট ছাড়িও না। বাঙলা দেশের কদের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যাঁহারা তাঁহারা সকলেই বেন, এই যে সদুপদেশ ইহার মূল্যবত্তা কতখানি। পাটের আগে চড়ুক, পরে পাট বেচিব, এতটা অপেক্ষা করিবার মত র অবস্থা যে বাঙলার কৃষকদের নাই, মন্ত্রী মহোদয়ের দের সেটুকু অনুভূতির অভাব দেখিয়া আমরা বুঝিতে র, কৃষকদের প্রতি তাঁহাদের অন্তরের দরদ কতখানি। ওয়ালাদের ফন্দীই হইল এইখানে, তাহারা জানে যে, লার কৃষকদের যে অবস্থা, তাহাতে পেটের দায়ে কিছুতেই তারা পাট রাখিতে পারিবে না। তাহারা যদি খরচা [illegible] পারে, তাহা হইলে কৃষকেরা যে কোন দামেই পাট চিতে বাধ্য হইবে। কেমন ব্যবস্থা হইলে চাষীরা এই [illegible]বাজী হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, মন্ত্রীরা সে দিক া যাইবেন না। তাঁহারা এই সঙ্কটকালে কৃষকদিগকে অল্প দ ঋণ দিয়া রক্ষা করিতে পারেন, পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ তে পারেন, নিজেরা মাল মজুত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া; ন সব কিছু না করিয়া একমুষ্টি অন্ন সংস্থানের জন্য আজই াই যাহাদের দুইটি পয়সা, তাহাকে পেটে কাপড় বাঁধিয়া পাট মজুত রাখিবার যুক্তি দেখান, অথচ কাজের বেলায় পাট-নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কলওয়ালা সাহেবদেরই স্বার্থসিদ্ধি করেন, কেরামতি তাঁহাদের এমনই! সরকারী এই [illegible]ণীর সদুপদেশ অন্নক্লিষ্ট বাঙলার কৃষকদের কাছে নিষ্ঠুর [illegible]হাসের ন্যায়ই প্রতীত হইবে।

প্রগতি সাহিত্যের লক্ষ্য—

গত ৬ই আগষ্ট কটকের নবযুগ সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে আহূত একটি সম্বর্দ্ধনা সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাহিত্যে সমষ্টিবোধক নীতির প্রবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সাহিত্যে সমষ্টিগত প্রেরণার উপযোগী; কারণ বর্ত্তমানে জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা বিপ্লবের ভাব দেখা দিয়াছে যাহা দমন করিয়া রাখিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দল-সমূহ একযোগে চেষ্টা করিতেছে। অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিপুল জনসাধারণ অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে এবং সাহিত্যের প্রভাবও তাই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ আমরা স্বাধীনতা লাভের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি এবং জনসাধারণের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং আমাদের সাহিত্যও ধনী দরিদ্র উভয় শ্রেণীকে লইয়াই গড়িয়া উঠিবে। জনসাধারণের জীবনই সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।' এ সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, উপদেশ বা আদেশের নিরিখ ধরিয়া সাহিত্য কোন দিন গড়িয়া উঠে না, অন্তরের ভাব-উৎস হইতেই রসের ধারা স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে এবং অনহঙ্কৃত এই স্বতঃ উৎসারিত রস ধারার সঙ্গে সমষ্টির রসানুভূতির যোগ হওয়া সম্ভব এবং সেই ভাবগত যোগের ভাবরূপই হইল সাহিত্য। সমষ্টির স্বার্থের সুতীব্র বেদনা এদেশের সমগ্র সাধনার ভিতর দিয়া যখন প্রকাশ পাইতে উদগ্র হইয়া উঠিবে তখনই তদুপযোগী সাহিত্যও সৃষ্টি হইবে। জাতির মধ্যে দরকার সেই সব ভাবের মানুষের। বিদেশীর মক্স করিয়া এদেশে প্রকৃত প্রগতি সাহিত্য গড়িয়া তোলা যাইবে না, সে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন তাঁহারাই যাঁহারা সমষ্টির সুখ দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে নিরহঙ্কৃতভাবে নিজেকে যুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন। প্রকৃত সাহিত্য গড়িতে হইলে মান, যশ বা প্রতিষ্ঠার গরজে বিদেশীর নকলনবিশী করিলে চলিবে না, এদেশের জনসাধারণের ভাবের ভাবুক হইতে হইবে। দেশের লোককে সমগ্র অন্তর দিয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে; এবং সকল পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধাকে বিকাইয়া দিয়া জনসাধারণকে ভালবাসিতে হইবে। যেখানে ভালবাসা নাই সেখানে যোগ নাই, যেখানে যোগ নাই সেখানে সাহিত্য সম্ভব নহে।

কৃপালনী কৃত গান্ধী ভাষ্য—

মহাত্মা গান্ধীর নিজের কথা আমাদের পক্ষে বুঝা বরং সহজ হয়; কিন্তু তাঁহার নীতির ভাষ্যকারদের কথা, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গান্ধীবাদের সমন্বয় এই নাম দিয়া শ্রীযুত কৃপালনী সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে গান্ধী-ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গান্ধীবাদ এদেশে

...নূতন নহে, একথা সত্য; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সেই যে অহিংসা তাহা সাধনার স্তরবিশেষের স্বাভাবিক পরিণতি; কাহারও কথায় বা নিয়োগে অথবা নির্দ্দেশ মাত্রে এই অহিংসা বা অদ্রোহের ভাবকে নিজের করিয়া লওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে যেমন আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং পরভাব একেবারে দূর হইয়া যায়, শুধু তখনই এই যে শুদ্ধ অহিংসা ইহা আচরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যত-কাল পর্য্যন্ত সেই স্তরে না উঠা যায়, ততকাল পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে মনে উহার উপলব্ধি ঘটিলেও আচরণে দাঁড়ায় অন্যরূপ। যাঁহারা এই অহিংসাব্রতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা অন্যের উপর নির্ভর করার চেয়ে নিজের উপর নির্ভর করিয়াই কাজ করেন বেশী। অপর কেহ তাহার সঙ্গে যোগ দিক বা না দিক তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করেন না; কারণ আত্মনিবেদনেই তাঁহারা পরম সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কায়মনো-বাক্যে তেমন অহিংস স্তরে দেশের বেশীর ভাগ লোকে উঠিবে কিনা, এ ভরসা তাঁহাদের মধ্যে বড় নহে। লোকের গণতি তাঁহারা ধরেন না। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে আমরা একদিন সেই প্রেরণাই পাইয়াছিলাম, সেদিন তিনি দেশের চারিদিকে কতটা হিংসার ভাব আছে না আছে এ হিসাব করিতে বসেন নাই, তাঁহার অনুগামী দলও এই হিসাব খতাইতে চেষ্টা করেন নাই। আত্মনিবেদনের ঐকান্তিক শক্তির উপরই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। আজ সেই জিনিসেরই অভাব দেখিতেছি। আজ মহাত্মা গান্ধীর যাঁহারা অনুগামী, তাঁহারা চারিদিকে কেবল হিংসারই বিভীষিকা দেখিতেছেন এবং প্রেতের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছেন। আত্ম-দানের মধ্যে যে অমোঘ-শক্তি আছে তাহা যে সংখ্যার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে না এবং সেই শক্তি আত্মদানের ভিতর দিয়াই সমষ্টির মধ্যে শুধু সম্প্রসারিত হইয়া থাকে তাঁহারা এই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। অহিংসা-ব্রতের এই যে কার্য্যকর দিক, অর্থাৎ আত্মদানের ভিতর দিয়া শক্তির সম্প্রসারণ, সেই কার্য্যকর দিকটাকে খাটাইয়া রাখিলে কার্পণ্যই অন্তরকে অধিকার করে এবং তেমন কার্পণ্য অহিংসার উচ্ছেদ করিয়া থাকে। গান্ধীবাদের যে সব ভাষ্য-কার হিংসার ভয়ে ত্যাগ এবং বীর্য্যপূর্ণ কর্ম্মপদ্ধতি অব-লম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থনের জন্য অহিংসার উচ্চ স্তরের কথা আওড়াইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই কয়েকটি কথা ভাবিয়া দেখিতে বলি। অহিংসনীতি কার্য্যকর হইতে পারে, হয় যে, আমরাও একথা অস্বীকার করি না; কিন্তু সংখ্যার উপর আগে যেখানে নজর সেখানে তাহার সার্থকতা সুদূর পরাহত। আত্মদানের ভিতর দিয়াই অহিংসা আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

ভারতের সামরিক ব্যয়—

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্প্রতি এই ঘোষণা করিয়া-ছেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল ভারতের সামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের উপর চাপ দিবেন এবং সেই-ভাবে সামরিক ব্যয় কমাইয়া যে টাকা বাঁচিবে, তাহার দ্বারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ গঠনমূলক কাজ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সে প্রস্তাবে রাজী না হন, তাহা হইলে শাসন-সংকট সৃষ্টি করা হইবে। মাদ্রাজের স্যার পরশুরাম পাত্র সর্দ্দারজীর এই প্রস্তাব শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধ আসন্ন, এখন সামরিক ব্যয় না কমাইয়া আরও বাড়ানই উচিত। নহিলে আমরা যে বিদেশী শত্রুদের আক্রমণে মারা পড়িব। প্রশ্নটা শুধু স্যার পরশুরামের নিজস্ব নহে, অনেকেরও আছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আমাদের স্বার্থের জন্য যে ব্যয় হওয়া উচিত, তাহা করিতে কোন দিন গররাজী নহি; কিন্তু অপরের স্বার্থের জন্য সামরিক ব্যয়ের বোঝা বহিয়া নিজেদের অসহায়ত্ব বাড়াইতে আর আমরা প্রস্তুত নহি। ভারতবাসী-দিগকে যদি সমর বিভাগে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অর্থাৎ ভারতবাসীদের আত্মরক্ষার শক্তি সত্যই বাড়ান হয়, তবেই সামরিক ব্যয়ের সার্থকতা, আমাদের আত্মরক্ষার দিক হইতে আছে এবং সে পথ ধরিলে ব্যয় সংক্ষেপও ভাবে সম্ভব ব্যবস্থা হয়, কিন্তু কর্তারা উল্টা হইয়া, এদিকে ভারতবাসীকে অসহায় করিয়া নিজেদের সুবিধামত সৈন্য রাখিবার জন্য ভারতের ঘাড়ে সামরিক ব্যয় চাপাইয়া আসিতেছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এ ধাপ্পাবাজী এখানে আর কতদিন চলিবে?

বাংলার বন্যার আতংক—

বাংলার সমস্ত অঞ্চল হইতে অতিবৃষ্টির ফলে শস্য-হানি এবং নরনারীর দুঃখদুর্দশার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মেঘনা নদীর জল বাড়িয়া নোয়াখালির বহু অঞ্চল জল-প্লাবিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের অবস্থাও কম শোচনীয় নহে। অতিবৃষ্টির ফলে [illegible] বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বহু ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বহু লোক নানাভাবে কষ্ট পাইতেছে। [illegible] মহকুমার প্রায় ৫০খানি গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়াছে, পাঁচ-ছয় হাজার অধিবাসী গৃহ-হীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় পড়িয়া। হাওড়ার গ্রাম অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয়। দামোদরের জল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক লোক দামোদরের বাঁধের উপর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার তিন জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া প্লাবন ঘটিয়াছে, লোকের দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। নদীয়া হইতেও প্লাবন-পীড়নের খবর পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসরের বন্যার ফলে বাংলা দেশে ১৭টি জেলায় লোকের দুঃখ-কষ্টের অবধি ছিল না, এবার আবার কত জেলার লোকের দুঃখ-কষ্ট বাড়িবে কে বলিবে? মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া দিতে মানব সমাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং যে সব গবর্ণমেণ্ট সভ্য, সেই দিকেই তাহাদের প্রথম দৃষ্টি, এই সব কথা কেবল আমরা শুনিয়াই আসিতেছি—দুঃখের বিষয় বাঙলা দেশ সে বিচারে জগৎ ছাড়া বলিয়াই মনে হয়।

চীনের লড়াই ও ইংরেজ

জাপানের সঙ্গে লড়াই বাধিবার পূর্ব্বে ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে কুলিংয়ে চীনা সামরিকদের এক সভায় বক্তৃতা-কালে জেনারেল চিয়াং-কাইসেক বলিয়াছিলেন,—"জাপান যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নাবে, তবে তাহাকে কম মুস্কিলে পড়িতে হইবে না। আমেরিকাকে পিছনে, সোভিয়েট রুশিয়াকে দক্ষিণে এবং ইংরেজকে বাম দিকে রাখিয়া জাপান চীন জয় করিতে পারিবে না। ঐ সব শক্তির সঙ্গে তাহার শত্রুতা বাধিয়া যাইবে। দক্ষিণ সমুদ্রে জাপানের যে-সব শক্তিশালী শত্রু আছে, তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার মধ্যে জাপান দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং এই আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার সম্বন্ধে যখন আমরা বিবেচনা করি, তখন আমাদের মনে বাধা দিবার জন্য সাহস এবং উৎসাহ স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।"

চীনের নারীবাহিনী

লড়াই বাধিবার পরও চীনাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, যদি তাহারা কিছুদিন সংকল্পশীলতার সঙ্গে জাপানের সঙ্গে লড়াই চালাইতে পারে, তাহা হইলে অন্যান্য শক্তি আসিয়া নানাভাবে তাহাকে সাহায্য করিবে। চীনা গবর্ণমেণ্ট আগাগোড়া জগতের অন্যান্য শক্তিবর্গকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহারা শুধু চীনের স্বাধীনতার জনাই লড়াই করিতেছেন না, আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি এবং সৌজন্যের মর্য্যাদা রক্ষা করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ বাধিবার পর জেনারেল চিয়াং-কাইসেক একটি বক্তৃতায় বলেন, "আমাদিগকে যদি একাকী লড়াই চালাইতেই হয়, আমরা তাহাতে ভীত হইব না, কিন্তু অন্যান্য শক্তিও ন্যায় এবং নীতির দিক হইতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমরা এমন আশা করিতে পারি। এ ত গেল ন্যায় এবং ধর্ম্মের দিক, অন্য দিক হইতেও চীনা গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত সকলকেই ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চীনে জাপানীরা যদি জয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিদেশীর সমস্ত স্বার্থের ক্ষতি তাহাতে হইবে।

যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চীনা সরকারের এই যুক্তির সারবত্তা শক্তিবর্গ উপলব্ধি করিতে থাকেন। হাঙ্কাউ শহরের পতনের পর জেনারেল চিয়াং-কাইসেক জগতের বিভিন্ন শক্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটি বিবৃতিপত্রে বলেন, অতঃপর জাপান চীনে যে নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, বৈদেশিক শক্তিবর্গের স্বার্থের পক্ষে তাহা প্রতিকূলই হইবে। জাপান চীনে নিজেদের কর্ত্তৃত্বকে পাকা যদি করিতে চায়, তাহা হইলে চীনস্থ বৈদেশিক অধিকৃত স্থানগুলির শাসন-কর্ত্তৃত্ব তাহাকে ক্ষুন্ন করিতেই হইবে। সাংহাই এবং অন্যান্য বৈদেশিক উপনিবেশগুলির সম্বন্ধে জাপানকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। চীনা সরকার স্বার্থসূত্রে জাপানের সহিত বৈদেশিক শক্তিবর্গের এই সংঘাত হইতে নিজেদের বিশেষ সাহায্য পাইবেন, এই আশা করিতেছিলেন।

দুই বৎসর লড়াইয়ের পর আন্তর্জ্জাতিক দিক হইতে চীনের অবস্থা কেমন দাঁড়াইয়াছে, ইহা ভাবিবার বিষয়।

সামরিক তোড়জোড় সরবরাহের সম্বন্ধে চীনাদের সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। দুই বৎসরের লড়াইতে চীনাদের সামরিক তোড়জোড় কম নষ্ট হয় নাই, বাহির হইতে সামরিক তোড়-জোড় আমদানী করাও তাহার পক্ষে কঠিন। চীনাদের অনেক গুলি বড় বড় আস্তানা জাপানীদের হাতে পড়িয়াছে। লড়াই বাধিবার পর বন্দরগুলিকে জাপান দখল করিয়া লইবে, চীনের সেনানায়কগণ ইহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা তদুপযোগী সতর্কতাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে জেনারেল চিয়াং-কাইসেক একটি বক্তৃতাতে বলেন,—"শত্রুপক্ষে আক্রমণকারী-বাহিনী সজ্জিত হইতেছে এবং চীনের সমুদ্রোপকূল এবং নদীর তীরবর্ত্তী সামরিক

পিকিঙে জাপানীরা নিজ প্রয়োজন মত রাস্তা নির্ম্মাণ সুরু করিয়া দিয়াছে

হিসাবে প্রয়োজনীয় স্থানগুলির উপর শত্রুদের রণতরীসমূহ তাগ্ করিয়া আছে। সেগুলি তাহারা যে কোন সময় দখল করিয়া লইতে পারে।"

নিজেদের নৌ-শক্তির দিক হইতে এই দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া চীনা সামরিকগণ চীনের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়া বহির্জ্জগতের সঙ্গে চীনের যোগসূত্র সুদৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বড় বড় রাজপথ প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন। এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু সামরিক তোড়-জোড় মজুত করিতেও থাকেন। বর্ত্তমানে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রপথে জগতের সঙ্গে চীনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে বলা চলে। চীন সরকারের বর্ত্তমান প্রধান কেন্দ্রস্থল চীনের পশ্চিম অঞ্চল, এই পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গে বহির্জ্জগতের তিনটি সূত্রে যোগ রহিয়াছে বলা যায়। চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চুংকিং হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে কাংসু প্রদেশের ভিতর দিয়া সিঙ্কিয়াং হইয়া সোভিয়েট রুশিয়ার তুর্কো-সাইবেরিয়ান রেল লাইন পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে। প্রকৃতপক্ষে এইটিই বহির্জ্জগতের সঙ্গে চীনা সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান যোগসূত্র। একটি ছোট রাস্তা রাজধানী চুংকিং হইতে কুনমিং হইয়া দক্ষিণ দিকে ফরাসী হিন্দু চীনের হাইফং শহরের সঙ্গে রেলপথে যোগ রহিয়াছে। তৃতীয় সংযোগসূত্র হইল ভারত সীমান্তের সঙ্গে। রাজধানী চুংকিং হইতে মোটর যাতায়াতের উপযোগী ছোট একটি রাস্তা কুনমিং পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং তথা হইতে পশ্চিম দিক ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম দেশের লাসিও পর্য্যন্ত আসিয়াছে। লাসিও হইতে দক্ষিণ দিকে মান্দালয় হইয়া একটি রেল লাইন রেঙ্গুন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই তিনটি প্রধান যোগসূত্র। লড়াই বাধিবার পর চীনা সরকার এইগুলি মজবুত করিবার জন্য কিছু টাকা খরচ করিয়াছেন এবং কয়েকটি শাখা-পথও প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমরোপকরণ সরবরাহ করিবার পক্ষে চীনের সমস্যার যে সমাধান হইয়াছে, এরূপ কথা বলা যায় না। চীন সীমান্ত হইতে রুশিয়ার অভ্যন্তরভাগ পর্য্যন্ত যে রাজপথ, তাহা অত্যন্ত সুদীর্ঘ এবং দুর্গমও কম নয়। মাত্র আনা-নেওয়াতে

খরচও পড়ে অত্যন্ত বেশী। হিন্দু-চীন পর্য্যন্ত যে রেল লাইনটি গিয়াছে, সেটি মিটার গেজ লাইন মাত্র, খাড়াইয়ের উপর দিয়া রেল লাইন, তাহা ছাড়া গাড়ীও বেশী নাই। দিনের বেলা ছাড়া রাত্রিতে গাড়ী চালান যায় না। ইহা ছাড়া জাপানীরা ফরাসীদের উপর এমন চাপ দিয়াছে যে, ইতিমধ্যেই তাহারা চীনকে সামরিক উপকরণ সরবরাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। রাজধানী চুংকিং হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আসিয়াছে, তাহার দূরত্ব খুবই বেশী; তাহা ছাড়া জাপানীদের বিমান আক্রমণের পথে তাহা উন্মুক্ত। তাহা ছাড়া খুব কম মালপত্রই এই পথে আনা-নেওয়া সম্ভব হইতে পারে; বর্ষাকালে ত লাইন একেবারেই বন্ধ রাখিতে হয়। পাশাপাশি আর একটি

জাপুকুয়োর যুদ্ধরত অশ্বারোহী সৈন্যদল

রেল লাইন তৈয়ার করা হইতেছে বটে; কিন্তু এই লাইন পাকা করিতে এখনও কয়েক মাস সময় কাটিয়া যাইবে।

চীন যেমন আশা করিয়াছিল, জাপানের সঙ্গে বৈদেশিক শক্তিবর্গের তেমন সঙ্ঘর্ষ এখনও প্রত্যক্ষভাবে বাধিয়া যায় নাই। ইংরেজ কিল খাইয়া কিল চুরির পথই ধরিতেছে। শুধু তাহাই নহে, জাপানীদের সামরিক ব্যবস্থাসমূহকে স্বীকার করিয়াই লইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনের অনুরোধে জাপানীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বা চীনস্থ ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, ব্রিটিশ কর্ত্তারা সেগুলি নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইবেন, এ পর্য্যন্তও তাঁহারা মানিয়া আসিয়াছেন। ইহার কারণ বুঝিতে হইলে ইউরোপের সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার; স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠা এবং হিটলার মুসোলিনীর যুক্তশক্তির কূট-কৌশলের গূঢ়কথা কিছু বুঝা প্রয়োজন। সেদিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ইংরেজের এই সংকট সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব নিতান্ত অসহায়ের মত বলিয়াছেন, চীনে ব্রিটিশ প্রজাদের উপর জাপানীরা যে সব অত্যাচার করিতেছে, তাহাতে আমাদের রক্ত গরম হইয়া উঠে; কিন্তু এগুলিই শেষ নহে, আরও অপমান হয়ত ভবিষ্যতে অদৃষ্টে আছে; কারণ বর্ত্তমানে সুদূর প্রাচীতে ইংরেজের যে রণতরী আছে, তাহা জাপানের সঙ্গে পাল্লা দিবার মত শক্তিশালী নয়। ইউরোপে আমাদের সেরূপ রণতরী আছে বটে, এবং প্রয়োজন হইলে আমরা সেগুলি এশিয়াতে পাঠাইতেও পারি, কিন্তু আপাতত সে কথা না তোলাই ভাল; নিজেদের মৌলিক নীতি রক্ষা করিয়া জাপানের সঙ্গে যদি আপোষ করা যায়, তবেই ভাল।

ইংরেজের এই অহিংস আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব রহিয়াছে ইউরোপে। হিটলারী গর্জ্জনে আমরা তাহার আভাষ পাইতেছি। সেদিন কিন্তু মার্শাল গোয়েরিং দেসোসারে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, ইংরেজ জার্ম্মানীর উপর ১৯১৪ সালের মত সন্ধি-সর্ত্ত চাপাইবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে। পোল্যান্ড এবং রুশিয়াকে উস্কাইতেছে, কিন্তু তাহারা যেন সাবধান থাকে। আমরা কিছুতেই ভার্সেলিসের পুনরভিনয় ঘটিতে দিব না। জার্ম্মানীকে ঘরবন্দী করিয়া

অনশনে মারিবার যে চেষ্টা ইংরেজ আরম্ভ করিয়াছে আমরা তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া ছাড়িব।

জার্ম্মানী রণবেশে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। ইংরেজ আজ চারিদিক হইতে সঙ্কটাপন্ন। আমেরিকা ইংরেজের সঙ্গে ভিড়িতে চাহিতেছে না; কারণ ইউরোপের ব্যাপারে তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, ওদিকে ইংরেজও ইউরোপের স্বার্থে

মাদাম চিয়াং-কাইশেক

নিরপেক্ষভাবে চীনের উপর একটা ঝোঁক দিতে সাহস পাইতেছে না, যাহাতে আমেরিকার সঙ্গে তাহার জোট ঘটিতে পারে। অবস্থা এইরূপ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং চীন প্রত্যক্ষভাবে অন্য শক্তির সাহায্য অদূর ভবিষ্যতে যে পাইবে, এমন আশা করা যাইতেছে না। যদি তেমন সাহায্য চীন না পায়, তাহা হইলে চীনের লড়াইয়ের গতি কেমন দাঁড়াইবে? চীনের হাতে বর্ত্তমানে যে সেনাবাহিনী আছে, বেতনভুক সেনা এবং গরিলাদিগকে লইয়া তাহাদের সংখ্যা ২০ লক্ষের কিছু উপর হইবে। এই বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সম্মুখ সমরে ব্যাপৃত আছে, অপর এক-তৃতীয়াংশ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া দেশময় জাপানের বিরুদ্ধে গরিলা লড়াই বা চোরা-গোপ্তা সংগ্রাম চালাইতেছে। চীনকে অপর শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সেনা দলকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালাইতে হইবে। এ কাজে তাহারা সুবিধা পাইবে, যদি আর্থিক সঙ্কট বশত জাপানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এলাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয়; কিন্তু জাপানীরা সুসংবদ্ধ জাতি, সেদিক হইতে তাহারা নিজদিগকে এ পর্য্যন্ত বেশ ভাল ভাবেই গুছাইয়া লইয়া চলিতেছে। পক্ষান্তরে জাপানকে যদি চীনে জয়লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে চীনাদের সামরিক শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিলেই চলিবে না, চীনাদের সহযোগিতাও তাহাদিগকে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু তেমন সম্ভাবনাও অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইতেছে না। জাপান যদি সামরিক শক্তির জোরে শেষেকটা যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহা হইলেও চীনাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না, সাময়িক-ভাবে কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হইলেও যুদ্ধ নূতন আকারে দেখা দিবে এবং অন্য শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ হারাইবার আশঙ্কায় চীনের সাহায্যের জন্য আগাইয়া না আসিলেও একদিন জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্কে সঙ্ঘর্ষ তাহাদের বাধিবেই। জাপান চীন দখল করিয়া যদি শক্তিশালী কিছু পরিমাণেও হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের সেই দিক হইতে অসুবিধা। এই অসুবিধার ফল ইংরেজকে হয়ত সব চেয়ে বেশী ভোগ করিতে হইবে, কারণ সাম্রাজ্য স্বার্থের দিক হইতে সে বিশেষভাবে এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের সঙ্গে জড়িত। জাপান এবং ইংরেজ দুইয়েই এই দিকটা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতেছে। ইংরেজ যে অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে, তাহাতে জাপানের বিরুদ্ধতা করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেও সে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে জাপান ইংরেজের এই দুর্ব্বলতাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব কাজে লাগাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজ স্বার্থের দায়ে চীনকে সমর্থন করিতে পারিতেছে না, অধিকন্তু নির্লজ্জভাবে জাপানীদের দাবীর নিকট উত্তরোত্তর আত্মসমর্পণ করিয়া চীনকে চটাইতেছে, ওদিকে জাপানও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে ইংরেজ তাহাদের উপর মনে মনে কিরূপ ভাব পোষণ করে—সে জিনিষ, সেই অদ্ভুত অবস্থার ফলে আমরা চীনা এবং জাপানী উভয়ের তরফ হইতেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রসারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

চাই ডিসিপ্লিন

I must be impatient for Hindu-Muslim unity because I am impatient for Swaraj.

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য আমি ব্যাকুল, কারণ স্বরাজের জন্য আমার মনে রয়েছে ব্যাকুলতা।

উপরের কথাগুলি গান্ধীজীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে এ্যাবটাবাদের বক্তৃতায়। গান্ধীজী তাহ'লে গঠনমূলক কাজের উপরে যে জোর দিচ্ছেন তার মূলে রয়েছে স্বরাজের জন্য ব্যাকুলতা। হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই কেন? কারণ হিন্দু-মুসলমানের মিলন না হ'লে ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হবে না। স্বরাজ তো আপনা থেকে আসবে না। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পথে সব চেয়ে বড়ো অন্তরায় বিদেশী শাসনের জগদ্দল পাথর। সে পাথরকে যতক্ষণ অপসারিত করতে না পারছি—ততক্ষণ স্বরাজের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে তৃতীয় দলকে অপসারিত করবার পথে সব চেয়ে বড়ো বাধা কি? আত্মকলহ। আমাদের নিজেদের মধ্যে একতার একান্ত অভাব। এই ঐক্যের অভাবের জন্যই আমাদের ললাট থেকে দাসত্বের কালিমা আজও মুছলো না। গান্ধীজী যখন বলছেন দক্ষিণে যেতে, জিন্না বলেছেন বামে যেতে আর জিন্নার সুরের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন আমেদকর। প্রেমের পথ ছাড়া স্বাধীনতা লাভের আর কোনো পথ নেই। একজনের জন্য যেখানে হাজার লোক মরতে পারে—সেখানে আগুনে যেমন ফুলের পাঁপড়ি ছাই হ'য়ে যায় তেমনি ক'রে পরাধীনতার শৃংখল নিমেষে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। গান্ধীজীর কথায় হাজার হাজার মানুষ যখন স্বাধীনতার জন্য অবর্ণনীয় দুঃখকে বরণ করতে ছুটেছে—তখন জিন্না আর আমেদকরের দল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছে আর সমালোচনা করেছে। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে সংঘর্ষ বেধেছে আজ, সে সংঘর্ষে আমাদের পক্ষে লাঠিসোটা না থাকলেও এটা যে সশস্ত্র লড়ায়ের মতোই একটা লড়াই—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লড়ায়ের সময়ে যারা যুদ্ধ করে তাদের পিছনে সারা দেশের সমর্থন থাকা চাই—নইলে পরাজয় অনিবার্য। রণক্ষেত্রে সৈনিকেরা লড়াই করতে নেমেছে আর পিছনে যারা আছে তারা নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি সুরু ক'রে দিয়েছে—এই যেখানে অবস্থা সেখান থেকে জয়লক্ষ্মী শতযোজন দূরে অবস্থান করেন। ইংরেজে-জার্ম্মানে যখন লড়াই বাধলো তখন পার্লামেন্টে আর দলাদলি নেই। সারা দেশ লয়েড জর্জ্জ আর এ্যাসকুইথের নির্দ্দেশ নিঃশব্দে পালন ক'রে চলেছে। এই শৃংখলা, এই ঐক্য না থাকলে কোনো জাতি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। আমরাও স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবো না যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ মেটাতে না পারি। হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের নির্দ্দেশে মৃত্যু বরণ করতে চলেছে আর পিছনে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি লাগিয়ে দিয়েছে—এ অবস্থায় স্বাধীনতার লড়াই কখনো বেশী দিন চলতে পারে না।

Civil disobedience of the purest type, as I have often repeated, can be effective even if it is confined to a few. But then these few must represent in their persons the united will and strength of the whole nation.

মানুষের মত মানুষ যদি সংখ্যায় খুব অল্পও হয়, তাদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রের পতন ঘটাতে সক্ষম—। কিন্তু মানুষগুলির পিছনে থাকা চাই সমগ্র জাতির সংকল্প এবং শক্তি।

স্বরাজ কেবল হিন্দুদের চেষ্টায় আসতে পারে না—সংখ্যায় তারা যতই বিশাল হোক। স্বরাজ কেবল মুসলমানদের চেষ্টাতেও আসতে পারে না—তারা যতই নির্ভীক হোক। স্বরাজের জন্য যে সংগ্রাম—সে সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা। স্বাধীনতার জন্য যে সাধনা—সে সাধনা সারা জাতির সাধনা হওয়া চাই।

কেমন ক'রে তা হবে? মুসলমানদের জমায়েত করতে হবে এমন একটা প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে যার গায়ে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাপ নেই—যে প্রতিষ্ঠান কেবল হিন্দুরও নয়, কেবল মুসলমানেরও নয়, কেবল বাঙালীর নয়, কেবল মাদ্রাজীরও নয়, কেবল বড়লোকেরও নয়, কেবল গরীবেরও নয়, কেবল পুরুষের নয়—কেবল নারীরও নয়, কেবল ব্রাহ্মণের নয়, কেবল অ-ব্রাহ্মণেরও নয়—যার দরজা সকলের জন্য খোলা—যার বক্ষে সকলেরই স্থান। এই প্রতিষ্ঠান হোলো কংগ্রেস। হিন্দু মহাসভার নির্দ্দেশও নয়, মুসলিম লীগের নির্দ্দেশও নয়—কংগ্রেসের নির্দ্দেশ হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অ-বাঙালী, ব্রাহ্মণ-অ-ব্রাহ্মণ, সবাইকে অবনত শিরে মেনে চলতে হবে। কেন? কারণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ কোনো সম্প্রদায়বিশেষের বা কোনো দলবিশেষের নির্দ্দেশ নয়—সে নির্দ্দেশ হোলো সমগ্র জাতির নির্দ্দেশ। তার পিছনে রয়েছে সমস্ত জাতের কল্যাণ কামনা। কংগ্রেস যে আজ এতখানি শক্তি সঞ্চয় করেছে তার মূলে কি? মূলে হচ্ছে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের আপামর-জনসাধারণের সহানুভূতি। মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে কেবল মুসলমানেরা—হিন্দুরা জানে, লীগের উন্নতি মানে তাদের অকল্যাণ পক্ষান্তরে মুসলমান হিন্দুমহাসভার দিকে বক্রনয়নে চায়। সম্প্রদায়বিশেষের সহানুভূতি লাভ ক'রে এবং বাকী সম্প্রদায়গুলির শ্রদ্ধা হারিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানই ব্যাপকভাবে মর্য্যাদ লাভ করতে পারে না। কংগ্রেসের শত্রু আছে বটে—কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস কোনো সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থকে একান্তভাবে বড়ো ক'রে দেখেনি, জাতির কল্যাণকে বড়ো ক'রে দেখেছে সেই হেতু কংগ্রেস সকল প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের নির্ভীক, মুক্তিপিপাসু, উদারচেতা মানুষগুলির সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। কংগ্রেস যেদিন সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক না হ'য়ে দলবিশেষের স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়বে, সেদিন থেকে সুরু হবে তার অবনতির পালা।

সমস্ত জাত একটা কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ আজ মেনে চলতে শিখুক। শৃঙ্খলাকে আশ্রয় ক'রেই ইংরেজ জাতটা দুনিয়ায় এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

সাগরপার থেকে ভারতসচিব যে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন—বড়োলাট, ছোটলাট, ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, চৌকীদার—সবাই তাকে মেনে চলেছে। উপরওয়ালার নির্দ্দেশকে এই যে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে চলবার অদ্ভুত ক্ষমতা—এই ক্ষমতার জোরেই ইংরেজ ভারতবর্ষে আপনার প্রভুত্বকে কায়েম রেখেছে। কথায় কথায় তারা স্বাধীনতার আর গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে শৃঙ্খলার গলায় ছুরি চালায় না। তারা হোলো সৈনিকের জাত। আদেশ দিতেও জানে, আদেশ মানতেও জানে। স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা যারা—তারা যদি কথায় কথায় উপরওয়ালাদের আদেশের সমালোচনা করে তবে কোনো কাজই চলতে পারে না। গণতন্ত্রের নামে ভূতের নৃত্য সুরু হয়। এইজন্যই ইংলণ্ডের মতো গণতান্ত্রিক দেশে কর্ম্মকর্ত্তারা যখন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের সঙ্গে সুর মেলাতে পারে না তখন হয় তারা চুপ করে থাকে, নয় তো পদত্যাগ করে। লর্ড লিনলিথগো বড়োলাটের পদে অধিষ্ঠিত থেকে চেম্বারলেনের সমালোচনা করছেন—এমন একটা অবস্থার কথা কোনো ইংরেজ কল্পনাই করতে পারে না। ইডেন যতক্ষণ ক্যাবিনেটের একজন মন্ত্রী ও যখন চেম্বারলেনের সঙ্গে তাঁর মতের আকাশপাতাল তফাৎ তখনও ইডেন একটি শব্দটি করেন না। মতের অনৈক্য যখন হলো ইস্তফা দিলেন তিনি। তখন তাঁর কণ্ঠে আর বাধা নাই। ইডেন এখন চেম্বারলেনের প্রকাণ্ড সমালোচক। কর্ম্মকর্ত্তাও থাকবো আবার উপরওয়ালার সমালোচনাও করবো—গাছের উপরের ফল খাবো এবং নীচের ফলও কুড়াবো—মুনাফা খাবো এবং আমানত বর্জ্জন করবো না—এসব জিনিষ কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই একসঙ্গে চলে না। চলে কোন্ দেশে? ষোল কলায় ডেমোক্রেসীর দেশে যেখানে শৃঙ্খলার নামগন্ধ নেই, কোনোমতে নাম সই করতে পারলেই প্রত্যেকটী রামাশ্যামা আপনাকে মনে করে একজন কেষ্ট অথবা বিষ্টু, যেখানে বারোয়ারি পূজো এপাড়ায় হবে কি ওপাড়ায় হবে—এই নিয়ে বাধে লাঠালাঠি, যেখানে যতগুলো মানুষ ততগুলো দল, যতগুলো দল ততগুলো নেতা এবং যতগুলো নেতা ততগুলো কাগজ। স্পেংলার (Spengler) বড় দুঃখেই তাঁর "The Hour of Decision" নামক গ্রন্থখানিতে লিখেছেন,—

"It is the period in which everybody can read and write and therefore must have his say and always knows better."

এই ঠোঁটে-পাকা সবজান্তার যুগে রাস্তার যে-কোনো লোক—কলেজের যে-কোনো যুবক ইস্কুলের যে-কোনো অজাতশ্মশ্রু বালক আর কিছুতে পাকা হোক না হোক সমালোচনায় রীতিমত পক্কতা লাভ করেছে। দিকে দিকে শ্রদ্ধাহীনতার তাই এত প্রাদুর্ভাব। আজাদ পড়ে এরা নিজেদের মত গঠন করে, এদের রাজনৈতিক শিক্ষা গোলদীঘির জনসভার হট্টমন্দিরে।

হায় দুর্ভাগা দেশ, এই উদ্ধত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই শ্রদ্ধাহীনতার একান্ত অভাব, এই না লড়ে বীর এবং না পড়ে পণ্ডিত সাজবার উৎকট আত্মাভিমান, গণতন্ত্রের নামে বিয়ন্ত-গরুর মতো সবাইকে শিঙের গুঁতো মারবার এই অশোভন প্রবৃত্তি, স্বাধীনতার নামে বিশৃঙ্খলার এই জয়গান—এ নিয়ে তো তুমি স্বাধীনতার মন্দিরে উপনীত হ'তে পারবে না। আমরা একের নির্দ্দেশকে কখনো মেনে নিতে পারিনি, সমষ্টির দিকে চেয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে কখনো বলি দিইনি—নিজের নিজের কোটরকে কখনো পরিত্যাগ করিনি—তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমরা হিন্দু ছিলাম, মুসলমান ছিলাম, মাদ্রাজী ছিলাম, উড়িয়া ছিলাম মারাঠী ছিলাম, গুজরাটী ছিলাম, ছিলাম না কেবল ভারতবাসী। আমরা আমাদের নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই এতকাল মনের মধ্যে পোষণ ক'রে আস্‌ছিলাম। আমাদের হৃদয়কে এতদিন অধিকার ক'রেছিলো আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলি—আমাদের মন্দির, আমাদের মসজিদ, আমাদের টিকি, আমাদের দাড়ি, আমাদের বেদ, আমাদের কোরাণ, আমাদের লুঙি, আমাদের ধুতি, আমাদের উর্দ্দু, আমাদের বাঙলা, আমাদের মক্কা, আমাদের কাশী। আমরা যে একই সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, একই শত্রুর কবলে কবলিত এবং আমাদের সকলেরই কল্যাণ যে একই স্বাধীনতার মধ্যে—এ অনুভূতি যে দিন থেকে আমাদের হৃদয়কে শাসন করতে আরম্ভ করেছে—সে দিন থেকে আমাদের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই ঐক্যের অনুভূতি থেকেই কংগ্রেসের জন্ম। যেখানে আমরা একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র সেখানে আমরা হিন্দু অথবা মুসলমান, পার্শি অথবা জৈন, জমিদার অথবা কৃষক, বাঙালী অথবা বিহারী। কিন্তু যেখানে আমরা সাম্রাজ্যবাদীর একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস এবং সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য স্বাধীনতার পূজারী—সেখানে আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই—সেখানে আমরা কংগ্রেসের সৈনিক। আজকে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে একেবারেই বড়ো ক'রে দেখবো না। আজকে বড়ো ক'রে দেখবো আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণকে আর সেই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হবার উপায়কে। দুর্ভাগ্যের কারণ রাজনৈতিক পরাধীনতা। দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধারের উপায় স্বাধীনতা। কেমন ক'রে শিকল ভেঙে মুক্ত হ'তে পারিবো? যদি ঐক্যের অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের ভারতবাসী ব'লে মনে করতে পারি এবং একই পতাকাতলে দাঁড়িয়ে একই সেনাপতির নির্দ্দেশে একই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য দণ্ডায়মান হই। কংগ্রেসের পতাকা হোলো সেই পতাকা যা দুলে দুলে আমাদের সবাইকে আহ্বান করছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য তার ছায়ায় সার বেঁধে দাঁড়াতে।

স্বাধীনতা যদি চাই—এক আমাদের আজ হ'তেই হবে। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যাই হোক রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে একেবারেই প্রাধান্য দেবো না। সেখানে হিন্দু মহাসভার নির্দ্দেশকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবো—মুসলিম লীগের নির্দ্দেশকে স্থান দেবো রাস্তার ডাস্টবিনে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি স্বাধীনতার সৈনিক—সেখানে আমি ভারতবর্ষের সন্তান। সৈনিক হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হবে কংগ্রেসের নির্দ্দেশকে অবনতশিরে মেনে চলা। সেই নির্দ্দেশ যদি আমাকে ভুল পথেও নিয়ে যায়, তবুও সেই পথেই আমাদের যেতে হবে। আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে সাবধানী, অতিরিক্ত

(শেষাংশ ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হ্যাভলক এলিস

সুবিখ্যাত ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সুলেখক হ্যাভলক্ এলিস্ গত ১০ই জুলাই তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে যে কয়জন লেখকের রচনায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, হ্যাভলক্ এলিস্ তাঁহাদের অন্যতম। গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি মানব জীবনের যে সমস্ত নিগূঢ় সমস্যার বিষয় প্রকাশ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহার প্রাচীনপন্থী স্বদেশবাসিগণ তাহা প্রথমতঃ আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। মানুষের যৌন-জীবন ঘিরিয়া যে অনাবিষ্কৃত রহস্য রহিয়াছে, তাহাই উদ্ঘাটন করিয়া হ্যাভলক্ এলিস্ মানুষের জীবনযাত্রার পথকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু এ সমস্ত রহস্যের প্রকাশ্য আলোচনা অশ্লীল বিবেচিত হওয়ায় তখনকার ব্রিটিশ আদালতে এলিসের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি

পর্যন্ত আপত্তিকর বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ও তাঁহাকে বিশেষ নিগৃহীত হইতে হয়। এমন কি, এলিসের উক্ত পুস্তকের প্রকাশক মিঃ জর্জ বেডবোরোকে অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের অজুহাতে কারাগারে পর্যন্ত প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মানব-জীবনের যে অনাবিষ্কৃত দিকটার পরিচয় হ্যাভলক্ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি জগতকে জানাইয়া যাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইংলণ্ডে উক্ত পুস্তক প্রকাশের সুবিধা না দেখিয়া তিনি তাঁহার পরবর্তী কতকগুলি গ্রন্থ আমেরিকা হইতে প্রকাশ করেন। যৌন-জীবনের বহু রহস্য তাঁহার রচনায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রাচীনপন্থী রুচিবাগীশদের বিচারে এরূপ রচনা অশ্লীল বিবেচিত হইলেও মানুষের যৌন-জীবনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যৌন সম্পর্কিত বহু সমস্যার সমাধানের উপর মানব-জীবনের সুখ দুঃখ কম নির্ভর করে না! এ বিষয়ে মানুষকে অজ্ঞ রাখিয়া তাহার জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ারই অনুরূপ! হ্যাভলক্ এলিস্ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া মানব-জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করিয়াছেন। ফলে, রুচিবাগীশদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ জগদ্ব্যাপী তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিজের জন্মভূমিতে তিনি প্রথম জীবনে অনাদর লাভ করিলেও, পরবর্তী জীবনে তিনি দেশের সর্বত্র যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন তাহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে!

হেনরি হ্যাভলক্ এলিস্ ১৮৫৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ক্রয়ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কোনও এক সওদাগরী জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। হ্যাভলক্ প্রথমত সেণ্ট টমাস্ হাসপাতালে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার পাঠ সমাপন হইবার পূর্বেই ষোল বৎসর বয়সে তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ তাঁহার পিতার সহিত অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি প্রায় চারিবৎসর কাল (১৮৭৫-৭৯) অতিবাহিত করেন এবং শিক্ষকতা করিয়া জীবিকার্জন করেন। তৎপরে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনাতেই এই সময় তাঁহার মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হয়। ১৮৮৯ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত "কনটেমপোরারি সায়েন্স সিরিজের" সম্পাদনা করেন। এই সময়ে তিনি নিজেও বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার প্রথম জীবনের রচিত 'দি নিউ স্পিরিট এ্যাণ্ড ক্রিমিন্যাল' (১৮৯০) প্রভৃতি বহু গ্রন্থেই তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে বহু পুরাতন বিষয়ের আলোচনাতেও তিনি নূতন আলোক সম্পাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার রচনার সতেজ ও সাবলীল ভঙ্গি সহজেই পাঠকের মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। ১৮৯৭ সালে 'য়্যাফার্মেসানস্' নামক তাঁহার যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির ও মনোজ্ঞ রচনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

হ্যাভলক্ এলিস্ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া প্রথমাবধি যৌন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হন এবং রোগ-নিদান-তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া মানুষের যৌন-জীবন সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যগুলি উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পান। এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এ সমস্ত আলোচনায় তিনি কোন প্রকার কুসংস্কার বা পূর্বধারণার দ্বারা নিজেকে পরিচালিত হইতে দেন নাই। প্রত্যেকটি তথ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিয়া তবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে তিনি জগদ্বাসীকে যে নূতন জ্ঞান পরিবেশন করিতে সমর্থ হন, তাহার মূল্য বড় কম নহে! তাঁহার এ বিষয়ে বিবিধ গবেষণামূলক তথ্যই তিনি "Studies in the Psychology of Sex" নামক গ্রন্থে ১৮৯৭ হইতে ১৯২৮ সাল মধ্যে ক্রমান্বয়ে সাতখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯৭ সালে তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইলে তাহা কিরূপ রাজরোষে পতিত হয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তথ্যের অভিনবত্বে এই গ্রন্থ যে সাহিত্য জগতে শুধু নূতন পর্বেরই

সূচনা করিয়াছে তাহা নহে। যে কথা সত্য অথচ অহেতুক লজ্জায় মানুষ চিরদিন চাপিয়া গিয়াছে, তাহাই নির্ভীকভাবে হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস্‌ জগৎসমক্ষে প্রথম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে প্রাচীনের দল ক্ষেপিয়া উঠিল, রুচি-বাগীশেরা 'সব উচ্ছন্নে গেল' বলিয়া হৈ চৈ তুলিল। অশ্লীল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া মানুষকে রসাতলে দিবার এ অপচেষ্টা তাঁহারা রোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলে হ্যাভ্‌লক্‌ এলিসের পুস্তক প্রকাশক জর্জ বেড্‌বোরোকে বহু দুর্ভোগ ভুগিতে হইল। এলিসকেও নানাভাবে নিগৃহীত হইতে হইল।

পুস্তকখানির প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু এলিস দমিবার পাত্র ছিলেন না। সত্য প্রচারে ইংলণ্ডের প্রাচীনপন্থীদের এরূপ বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করিয়া তিনি ঐ পুস্তকের শেষ খণ্ডগুলি পরে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত করেন। সত্যকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং মানুষের জীবনের যে কঠোরনির্মম সত্যকে কেন্দ্র করিয়া হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস্‌ গ্রন্থ রচনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহা সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং হ্যাভ্‌লক্‌ এলিসের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

শক্তিশালী লেখকের হাতে সব কিছুই মনোজ্ঞ হইয়া ফুটিয়া উঠে। এলিসের রচনার বিচিত্র ভঙ্গি ও লেখনী পরিচালনার অদ্ভুত শক্তি তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাঁহার দৃষ্টি কোথাও ম্লান হয় নাই। উদার হৃদয়ে খোলা মন লইয়া তিনি যে বিষয়েই লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতেই সোনা ফলিয়াছে। তাঁহার রচিত 'দি নাইনটিন্থ্‌ সেঞ্চুরি' (১৯০০), 'দি ওয়ার্লড্‌ অব ড্রিমস্‌' বা স্বপ্নজগৎ (১৯১১) প্রভৃতি গ্রন্থ ভাবসম্পদে অতুলনীয়। মহাযুদ্ধের পূর্বে ও পরে তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহরূপ অমানুষিক ব্যাপারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কিরূপ নির্ভীক, মার্জিত রুচি ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার এ সময়ের রচিত 'এসেস্‌-ইন্‌ ওয়ার-টাইম' (১৯১৬), 'দি ফিলোসোফি অব কন্‌ফ্লিক্ট্‌' (১৯১৯), 'লিট্‌ল্‌ এসেস্‌ অব লভ্‌ এ্যান্ড্‌ ভার্চু' (১৯২২) প্রভৃতি গ্রন্থে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক জীবনে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন—কিন্তু তাই বলিয়া কোনটিতে ভাষা বা ভাবসম্পদের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার পরবর্তীকালের বিবিধ রচনার মধ্যে 'দি ড্যান্স্‌ অব লাইফ' জীবন-নৃত্য (১৯২৩) গ্রন্থে তিনি জীবনে যে আদর্শ আঁকিয়াছেন তাহা হইতে আমরা তাঁহার বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি ও কবিমনের পরিচয় লাভ করি। জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি যে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই যে মানুষের পরম শান্তির পথ তাহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

যৌন-জীবন সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়াই অবশ্য এলিস্‌ জগৎবরেণ্য হইয়াছেন। যাহা কেহ কোনদিন বলিতে সাহস করে নাই, তাহাই তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। যেখানে ছিল অন্ধকার, সেখানে তিনি আলোক জ্বালিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানবিস্তারে তাঁহার দান তাই উপেক্ষণীয় নহে। মানুষ সব কিছু আলোচনা করিবে, অথচ যাহা তাহার জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত তৎসম্পর্কে কোন আলোচনা চলিতে পারিবে না—সেখানে অজ্ঞতার অন্ধকার চিরদিন বিরাজ করিবে এ মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস্‌ মানুষের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সুরুচি ও সভ্যতার বাহ্যিক আবরণ দিয়া সত্যকে চাপিতে গিয়াই আমরা জগতে বহু সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু যেখানে ছোটখাট দুষ্কার্যগুলি আমরা প্রতিরোধ করিতে পারি না, সেখানে মহৎ কার্য সাধন করিতে চাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আধুনিক যুগে বহু আবিষ্কার এবং বহু গবেষণা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার দ্বারা জগতের জনসাধারণ যে শান্তির পথ আজও তেমনভাবে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের স্তরে স্তরে বহু বিষয়ে এখনও পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিরাজ করিতেছে সত্যের আলোক সেখানে যেটুকু কায়ক্লেশে গিয়া পৌঁছে তাহাও নানাভাবে বিকৃত হইয়া যায়। জীবনের সকল প্রকার সমস্যাকে মানুষ যদি সমভাবে বিচার করিয়া তাহা সমাধান করিতে ও তাহার ফলাফল গ্রহণ করিতে পারে তবেই মানুষের জীবনে পরম শান্তির সম্ভাবনা। হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস্‌ সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, 'জ্ঞানের জন্যই শুধু জ্ঞানানুসন্ধান' তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; সর্বপ্রকার পীড়া হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া তাহার জীবনে শান্তি আনয়ন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য তিনি কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। মৃত্যুর পূর্বে তাই তিনি এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যেন তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এই লিপি লিখিত হয় যে, 'এইস্থানে এমন একজন ব্যক্তি শায়িত আছেন, যিনি জগতের মাধুর্য এতটুকুও অন্ততঃ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহার অন্ধকারে এতটুকুও আলোক জ্বালিতে সমর্থ হইয়াছেন' ("Who has added a little to the sweetness of the world and a little to its light.")

হ্যাভ্‌লক্‌ এলিসের এই সর্বশেষ দাবীর মধ্যে যে এতটুকুও বেশী চাওয়া হয় নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। আমরা এই নির্ভীক ও তেজস্বী লেখকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

ঝরা বসন্ত

(গল্প)

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

সাড়ে আটটার সময় তারা শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

বড় রাস্তাটা শুকনো। এপ্রিলের সকাল, সূর্য্যের স্নিগ্ধ উত্তাপ আর আলো ছড়ান চারিদিকে। কিন্তু গাছপালা আর ছোট ছোট গর্ত্তগুলি তখনও বরফে ঢাকা। শীতের আড়ষ্ট জমাটভাব সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই বসন্ত এসে পড়েছে অতর্কিতে। সবুজ বনানীর বুকে স্বচ্ছ উচ্ছতা, হ্রদের মত একটানা জমাট জলের ওপর পাখীগুলোর কালো ডানার ঝট্‌পটানি আর সীমাহীন নীল আকাশের বুকে ফুটে ওঠা মুক্তির আবেদন,—গাড়ীতে বসে মারিয়া ভাসিলেইভ্‌নার চোখে সব কিছুই বৈচিত্র্যহীন আর নিরর্থক মনে হচ্ছিল। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে দীর্ঘ তেরটি বছরের কর্ম্মজীবনে অসংখ্যবার ঠিক এই পথ ধরেই সে শহরে গেছে মাইনে আনতে আর ফিরেও এসেছে ঠিক এই পথেই। শীত, বসন্ত, শরৎ যাই হোক, সমস্তটা পথ ভারা সারা মন শুধু উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে তার দীর্ঘপথের সমাপ্তি। এই একটা চিন্তা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার।

এ যেন তার একান্ত পরিচিত জগত। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেন সে এখানেই আছে। এ পথের প্রতিটি পাথর, প্রতিটি গাছ যেন তার চেনা। এখানেই তার অতীত, এখানেই তার বর্ত্তমান আর স্কুল ছাড়া অন্য কোন ভবিষ্যৎ তার নেই। সেই একটানা পথ গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে.........

স্কুলে কাজ নেবার আগেকার কোন কথাই তার মনে নেই। অতীতের চিন্তা অনেকদিনই সে ছেড়ে দিয়েছে। মস্কোর রেড্ গেটের কাছে বড় ফ্ল্যাটটিতে তার বাবা, মা...... বেয়াড়ে স্বপ্নের মত সে দিনগুলির অস্পষ্ট ছায়া তার মনের কোণায় আবছাভাবে ভেসে আসে। দশ বছর বয়সে মারা গেল তার বাবা, আর তারই কিছুদিন পরে তার মা।

হ্যাঁ, একটা ভাইও ছিল, এখন সে বড় কাজ করে। কিছুদিন তারা চিঠিপত্র লিখেছিল বেশ, কিন্তু চিঠি লেখার অভ্যেসটা ভাইয়ের ক্রমেই কমে আসছিল, শেষপর্য্যন্ত সেটা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

পুরোন দিনের সম্পত্তির মধ্যে শুধু একটা জিনিষ তার আজও আছে,—তার মায়ের ফটোখানা। তাও ঠাণ্ডা আর স্কুলের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। চুল আর ভুরুর রেখাদুটো শুধু নজরে পড়ে। আর কোন কিছু চেনবার উপায় নেই।

মাইল কয়েক পেরিয়ে এসে হঠাৎ বৃদ্ধ সেমিঅন মুখ ফিরিয়ে বলে,—"শহরে আজ একটা লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, কোন্ সরকারী আপীসের কেরাণী। ক'ব্যাটা জার্ম্মানের সাথে মিলে মস্কোর মেয়র আলেক্‌স এইভকে খুন করেছে ওরাই।"

"কে বললে?"

"কাগজে পড়ছিল ওরা, আইভান আয়োনোভের দোকানে বসে।"

দীর্ঘ সময় আবার তারা চুপ করে কাটায়। মারিয়া ভাসিলেইভ্‌না বসে বসে ভাবে তার স্কুলের কথা, আর আসছে পরীক্ষার জন্য যে মেয়েটি আর ছেলে চারটিকে সে তৈরী করেছে তাদের কথা। তার অসমাপ্ত চিন্তার মাঝপথে হানোভের চারঘোড়ার গাড়ীটা ওদের গাড়ীর পাশে এসে পড়ে। প্রতিবেশী জমিদার হানোভ, হানোভ-ই গেল বছরের পরীক্ষায় পরীক্ষক হয়ে এসেছিল। হানোভ তাকে চেনবামাত্র মাথা নুইয়ে বলে,—"সুপ্রভাত! বাড়ীর দিকে বুঝি?"

বছর চল্লিশেক বয়স হবে লোকটার, সারা দেহে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ। বার্দ্ধক্যের প্রথম ছায়া এসেছে তার শরীরে, মুখে ফুটে উঠেছে তারই ইঙ্গিত, তবু আজও মেয়েরা তার সুন্দর দেহের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন, বড় বাড়ীটিতে একলা তার দিন কাটে। সবাই বলে, বাড়ীতেও তার কোন কাজ নেই, ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে শুধু শীষ দিয়ে বেড়ায়, নয়ত পুরোন চাকরটাকে ডেকে দাবার ছক্ পেতে বসে। ওরাই বলে, লোকটা মদ খায় প্রচুর।

মারিয়া ভাসিলেইভ্‌নার মনে পড়ে, গেল বছর পরীক্ষার সময় যে কাগজপত্রগুলো সে সঙ্গে এনেছিল সেগুলোতে বাস্তবিকই মদের গন্ধ ছিল। মারিয়ার চোখে নতুন পোষাকে সেদিন কিন্তু চমৎকার মনে হয়েছিল তাকে। সর্ব্বক্ষণের জন্য আড়ষ্ট জড়তায় আচ্ছন্নের মত মারিয়া তার পাশে বসে ছিল। পরীক্ষক হিসাবে শুকনো ও গম্ভীর ধরণের লোক ছাড়া ও-ধরণের লোক মারিয়া তার আগে কখনও দেখেনি। প্রার্থনার একটা কথাও তার মনে ছিল না, কি বিষয়ে কি প্রশ্ন করতে হবে তা পর্যন্ত জানত না, অথচ নম্বর দিত সবচেয়ে বেশী বেশী। সৌজন্য বা শিষ্টতার বিন্দুমাত্র ত্রুটি তার ব্যবহারে ছিল না।

"ব্যাকভিস্‌টের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।" মারিয়া ভাসিলেইভ্‌নাকে লক্ষ্য করে হানোভ বলে,—"শুনলুম সে নাকি আবার বাড়ী নেই।"

বড় রাস্তা ছেড়ে এবার তারা পাশের ছোট পথটা ধরে এগোয়, হানোভের গাড়ীটা যায় আগে আগে, পেছনে সেমিঅন। কাদার ওপর ভারী গাড়ীখানা টেনে নিতে ঘোড়া চারটের কষ্ট হচ্ছিল প্রচুর, মন্থর গতিতে ধীরে ধীরে তারা চলে। সেমিঅনের গাড়ী চলছিল রাস্তার পাশ ঘেঁসে, এদিক ওদিক করতে করতে, বরফের স্তূপ আর খানাডোবার ওপর দিয়ে। প্রায়ই সেমিঅনকে গাড়ী থেকে নাবতে হচ্ছিল ঘোড়াটাকে সাহায্য করতে। ভাসিলেইভ্‌নার মনে তখনও স্কুলের কথাই ভেসে বেড়ায়। পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্ন সোজা হবে না কঠিন হবে, সেই চিন্তাই তার কল্পনাকে আশ্রয় করে থাকে। জেমস্‌ট্‌ভো (Zemstvo) বোর্ডের মিটিং হবার কথা ছিল, অথচ সেখানে গিয়ে গেল-কাল সে কাউকেই খুঁজে পায়নি। কথাটা মনে পড়ায়

মারিয়া ভাসিলেইভ্না মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। আচ্ছা অভদ্র লোকগুলি ত! গেল দু'বছর ধরে ক্রমাগত সে বলে আসছে দারওয়ানটাকে ছাড়িয়ে দিতে, অপদার্থের একশেষ, রূক্ষ ব্যবহার, ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে মারে, অথচ আজ পর্যন্ত সে কথায় কেউ কান দেয়নি। অফিস খুঁজলে প্রেসিডেন্টের দেখা পাওয়া যায় না, আর দেখা হলেই হাতজোড় করে কাঁদ কাঁদ হয়ে তিনি জানান, কোনদিকে মনোযোগ দেবার মত এক মুহূর্ত্ত সময় তাঁর নেই। ইন্‌সপেক্টার তিন বছরে একবারও আসেন কিনা সন্দেহ। নিজের কাজ সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই নেই। আগে ছিলেন আবগারী বিভাগে, তারপর খোসামোদ আর প্রাধান্যের জোরে হয়েছেন স্কুল ইন্‌সপেক্টর। কচিৎ কখনও স্কুল কাউন্সিলের বৈঠক বসে, তাও কোথায় বসে তার ঠিক নেই। স্কুল গার্ডিয়ান ত নিরক্ষর চাষা, কি একটা চামড়ার কারবারের মালিক দারওয়ানের বিশিষ্ট বন্ধু। লোকটার বুদ্ধি ও ভদ্রতা জ্ঞান দুটোই কম। ঠিক কাকে যে তার অভিযোগ জানান উচিত কে যে তার কথা শুনবে, মারিয়া ভাসিলেইভ্না ভেবে পায় না।

"বাস্তবিকই চমৎকার চেহারা!" হানোভের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলে।

রাস্তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে ওঠে......

গাছপালাগুলোর ভেতর দিয়ে গাড়ী চলে, ফেরার উপায় নেই। গাড়ীর চাকা শক্তভাবে কাদার ভেতর আটকে যায়, জল ছিটিয়ে পড়ে চারপাশে আর দুধারের ডালপালাগুলি এসে মুখের ওপর দাগ কেটে যায়।

"কি রাস্তা!" হানোভ হেসে ওঠে।

মারিয়া ভাসিলেইভ্না তাকায় তার দিকে। অদ্ভুত লোকটা যে এত জায়গা থাকতে এখানেই কেন পড়ে থাকে মারিয়া তা ভেবে পায় না। এই কাদাভরা বিশ্রী জায়গায় তার অর্থের প্রাচুর্য, সৌন্দর্য, সৌজন্য কোনটারই যথাযোগ্য উপভোগের সুযোগ নেই। সাধারণের চেয়ে তার যে বাড়তি, তার কোন মূল্য নেই এখানে, বৃদ্ধ সেমিঅনের মত সমান কষ্ট, সমান অসুবিধা ভোগ করে চলেছে। পিটার্সবার্গ বা বিদেশে থাকার মত সংগতি থাকা সত্ত্বেও এখানে থাকার কোন অর্থই ভাসিলেইভ্না বুঝতে পারে না। তা ছাড়া এ রাস্তাটাকে তার মত লোক যখন খুশী ভাল করে দিতে পারে, তার নিজের কোচম্যান, সেমিঅন সবার কষ্টই কম হয় তাতে। অথচ সেদিকে লোকটার এতটুকু খেয়াল নেই। ভাল থাকাটা যেন তার ইচ্ছেই নয় শুধু হাসতে জানে!

লোকটার দয়ামায়া আছে, কপটতা নেই। পরীক্ষার সময় যেমন কোন প্রার্থনাই তার জানা ছিল না, জীবনের রূক্ষ কর্কশ পথটাও তার তেমনি অজানা। গ্লোব ছাড়া স্কুলে অন্য উপহার সে কোনদিন পাঠায়নি। অথচ তার ধারণা জনসাধারণের শিক্ষাবিষয়ে তার মত উৎসাহী সভ্য আর পৃষ্ঠপোষক আর নেই। গ্লোবগুলো দিয়ে এখানে কি কাজই বা হয়!

"ভাসিলেইভ্না হুঁসিয়ার!" সেমিঅন সাবধান করে দেয়।

সমস্ত গাড়ীটা অকস্মাৎ কাত হয়ে পড়ে, আর একটু হলেই উল্টে যেত। মারিয়া ভাসিলেইভ্নার পায়ের ওপর একটা ভারী জিনিষ গড়িয়ে পড়ে, শহর থেকে কিনে আনা জিনিষপত্রের পার্শেলটা। কাদার নীচে কঠিন পাথরে গাড়ীটা ধাক্কা খেয়েছে। চারপাশে আঁকাবাঁকা শীর্ণ জলস্রোতের সশব্দ প্রবাহ, সমস্ত রাস্তাটার ওপর যেন তীক্ষ্ন দাঁত বসিয়ে দাগ কেটে গেছে, ওপর দিয়ে যাওয়া তত সোজা নয়। ঘোড়াগুলো জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে।

লম্বা ওভারকোট্‌টা গায়ে চাপিয়ে হানোভ গাড়ী থেকে নাবে। রাস্তার পাশ ধরে হাঁটতে সুরু করে। সারা মুখ তার উত্তেজনায় উত্তপ্ত। "কি রাস্তা!" হানোভ হেসে ওঠে আবার, "গাড়ী চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে।" "কে বলেছে তোমায় এ সময় বাড়ীর বার হতে।" অসন্তুষ্ট সেমিঅন বিরক্তি-ভরা সুরে বলে ওঠে, "বাড়ীতে থাকলেই পারতে!"

"বাড়ীতে থাকা যে আমার পোষায় না, খুড়ো, অসহ্য মনে হয়।"

বৃদ্ধ সেমিঅনের পাশে তাকে আরও বলিষ্ঠ আরও সুন্দর দেখায়। তবু, তার চলার ভঙ্গীতে যেন দুর্ব্বলতা আর জীর্ণ বার্দ্ধক্যের সামান্য ইঙ্গিত, তার অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণতির মৃদু আভাষ! হঠাৎ দমকা বাতাসে সারাটা বন সচকিত হয়ে ওঠে। একান্ত অকারণে স্বেচ্ছায় এ লোকটির মৃত্যুবরণের ভয়ে, আশঙ্কায় মারিয়া ভাসিলেইভ্নার বুকটা তোলপাড় হয়ে ওঠে। অকারণে তার মনে হয়, তার বোন বা স্ত্রী হলে হয়ত সে আজীবনের সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে তাকে রক্ষা করত নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে, এমনভাবে ছেড়ে দিত না কখনও।

তার স্ত্রী।

জীবনের এমন সুনির্দ্দিষ্ট গতি যে তার এতটুকু এদিক ওদিক হবার জো নেই। প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ীটাতে হানোভের যেমন নিঃসঙ্গ একক জীবন, পরিত্যক্ত গ্রামটায় তার নিজের দিনগুলিও তেমনি নির্জ্জন, একক। অথচ অদৃশ্য বিধানকে অস্বীকার করে সমভাবে তাদের একত্রে থাকার সামান্যতম কল্পনাও শুধু অসম্ভব নয় অবাস্তব! মানুষের জীবন যেন কোন দুর্জ্ঞেয় নিয়মে ছন্দোবদ্ধ, পরিচয় আর আত্মীয়তার সূত্র সেখানে এত জটিল যে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অর্থহীন আর আশ্চর্য্যকর বলেই তা মনে হয়, সারাটা মন অবসাদ আর অতৃপ্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে।

"সবচেয়ে ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে ভগবানের অদ্ভুত বিচারবুদ্ধি" মারিয়া ভাসিলেইভ্না ভাবে, "যাদের দিয়ে কোন আশা নেই, কোন প্রয়োজন নেই, তেমনি দুর্ব্বল আর হতভাগাদেরই তিনি দিয়েছেন সৌন্দর্য্য, সৌজন্য, তৃপ্তিভরা চোখের চাউনি। আশ্চর্য্য রকমের চমৎকার ওরা!"

"এই ডান দিকের রাস্তাটা ধরে এবার যাব আমরা" গাড়ীতে উঠে হানোভ বলে, "আচ্ছা তাহলে—আশা করি, কোন অসুবিধে হবে না আপনার।"

স্কুল, পরীক্ষা, দারওয়ান, স্কুল কাউন্সিল, মারিয়া ভাসিলেইভ্নার চিন্তাধারা ফিরে আসে নিজের পথে। একটা দমকা হাওয়ায় দূরের গাড়ীটার চাকার শব্দ ভেসে আসে তার কানে, সমস্ত চিন্তা আবার তালগোল পাকিয়ে ওঠে। মনের

কোণে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে স্বপ্ন দেখার; সুন্দর দুটি চোখের, প্রেমের......অনাস্বাদিত তৃপ্তিকর জীবনের অবাস্তব সুখস্বপ্নের.........

হানোভের স্ত্রী!.........

........রোজ সকালে ঠাণ্ডার ভেতর স্টোভ ধরাবার মত কেউ থাকে না। দারওয়ানটা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে আগে থেকেই। আলো ফোটবার সাথে সাথে ছেলেগুলি ঘরে ঢোকে কাদা আর বরফে পাগুলো ভর্ত্তি করে। বিশ্রী আর অস্বাস্থ্যকর! তার বাড়ী বলতে একখানা মাত্র ছোট ঘর আর রান্নাঘর। দিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে রোজই তার মাথা ধরে, খাওয়া-দাওয়ার পর বুকটা যেন জ্বলে যায়। ছেলেদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে হয় তাকেই, দারওয়ান আর কাঠের দাম জোগাতে। সে টাকা স্কুল গার্ডিয়ানের হাতে দিয়ে বারে বারে তাকে খোসামোদ করতে হয় কাঠ কিনে দেবার জন্য। পেটুক চাষার বাহাদুরীর অন্ত নেই! রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে; স্কুল, পরীক্ষা, ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে আসা বরফের কুচি.........

এই রুক্ষ জীবনই যেন তাকে ধীরে ধীরে ঠেলে দিচ্ছে অকাল বার্দ্ধক্যের মুখে, তাকে করে তুলছে কুৎসিত আর অসুন্দর, জমাট সীসের মত কঠিন। অজানা ভয়ে বুক তার সর্ব্বদাই দুরু দুরু করে। জেমস্টভো কাউন্সিলের কোন সদস্য বা স্কুল গার্ডিয়ানের আসনে বসে থাকার মত সাহস তার নেই, সব সময় দাঁড়িয়ে কাটায়। তাদের বিষয়ে কোন কথা বলতে হলেই উপযুক্ত সম্মান বাঁচিয়ে সে কথা বলে। তাদের চোখেও তার কোন আকর্ষণ নেই। একটানা লক্ষ্যহীন জীবন, নীরস, রুক্ষ, তাতে না আছে স্নেহের পরশ, না আছে সহানুভূতি...... প্রেমের কল্পনা সেখানে দুঃস্বপ্নের মতই অসম্ভব।

"ভাসিলেইভ্না, হুঁশিয়ার!"

আবার একটা উঁচু পাথর.........

নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই এ-জীবন তাকে বেছে নিতে হয়েছে, কোন মহৎ প্রেরণা বা সদিচ্ছার বশে নয়। জাতীয় উন্নতির চেয়ে পরীক্ষার কথাই তার বেশী চিন্তার বিষয়। ও সব বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও তার নেই।

ডাক্তার, মাষ্টার, অস্বচ্ছল আর্থিক কষ্টে যাদের জীবন কাটে অখণ্ড পরিশ্রমের মাঝে, চিন্তার অবকাশ তাদের নেই। দৈনিক আহার্য্যের সংস্থান চিন্তা ছাড়িয়ে মহৎ প্রেরণার কথা তাদের মাথায় ঢোকে না। তাদের চিন্তা,—দিনের শেষে এক টুকরো রুটী, আগুন জ্বালাবার কাঠ, রোগ শোক, আর রাস্তার জঘন্যতা। আনন্দের সুযোগ নেই সেখানে, পরিশ্রমটাই মুখ্য। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মতো নির্জ্জীব, নিস্তেজ, আর প্রাণহীন যারা, ভাসিলেইভ্নার মতো তারাই শুধু এ জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে দিনের পর দিন। উচ্ছল প্রাণের স্পন্দন নিয়ে যারা আসে মহত্তর প্রেরণার উদ্দেশ্যে, অল্পদিনেই তাদের হাঁপ ধরে যায়, দুদিনের বেশী টিঁকতে পারে না কখনো।—

সোজা পথে মাঠের ওপর দিয়ে, গ্রামের ছোট ছোট বাড়ীগুলির পেছন দিয়ে সেমিঅন গাড়ী হাঁকায় তাড়াতাড়ি করার উদ্দেশ্যে। চাষারা একটা জায়গা তাদের পার হতে দেয়নি, আটক করেছিল। গির্জ্জার জমীটাও তারা পার হতে পারেনি। তাছাড়া আইভান্ আয়োনোভের নতুন কেনা জমীর চার পাশে গর্ত্ত খোঁড়া, ওখান থেকেও তাদের ঘুরে আসতে হয়েছে।

নিঝনেই গরোডিস্চ-এ (Nizhneye Gorodistche) এসে তারা পৌঁছাল। মদের দোকানের সামনেটায় গোবর ছড়ান জমীর ওপর তখনো বরফ জমা, তারই ওপর সাল্‌ফিউরিক এসিড্ বোতলে বোঝাই গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে। দোকানে গাড়োয়ানগুলোর ভীড়। ভোড্কা (vodka), টোবাকো আর ভেড়ার চামড়ার গন্ধে জায়গাটা ভরা। বারে বারে দরজা খোলার আর বন্ধ হবার শব্দ, লোকগুলোর চীৎকার—সব মিলে রীতিমত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। ভেতর হতে কন্‌সার্টিনার একটানা আওয়াজ ভেসে আসছিল—দেওয়াল ভেদ করে। চায়ের খোঁজে ভাসিলেইভ্না গিয়ে বসল দোকানে। পাশের টেবিলে ভোড্কা আর বিয়ার নিয়ে বসে লোকগুলো দোকানের ঘর ছাপানো ধোঁয়ায় আর সদ্য-খাওয়া চায়ের গরমে ঘেমে উঠেছে।

এলোমেলো গোলমালের মাঝে টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছিলঃ—"কুজমা, আমি বলি"—"ওকি?" "ভগবান রক্ষা করুন" "আইভান্ ডেমেটিচ্, আমি বাজী রেখে বলতে পারি—" "বুড়ো, সাবধান—"

হঠাৎ একটা মাতাল কুৎসিত ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে কোনো কিছুতে বিস্মিত হয়ে। লোকটার মুখে বসন্তের দাগ আর কালো দাড়ি।

"কি হল, এই—" কিছুদূরে হতে সেমিঅন রাগত স্বরে তাকে প্রশ্ন করে, "মেয়েমানুষ বসে রয়েছে দোকানে, খেয়াল নেই?"

"মেয়েমানুষ!" সেমিঅনকে ঠাণ্ডা করে অন্য কোণ থেকে অন্য আর একটা লোক।

"না, না, খারাপ কিছু মনে করে বলি নি তো"—হতবুদ্ধি বেঁটে লোকটা জবাব দেয়, "ক্ষমা করবেন, আমার পয়সায় আমি খাচ্ছি, উনি খাচ্ছেন ওঁর পয়সায়। সুপ্রভাত!"

"সুপ্রভাত!" ভাসিলেইভ্না জবাব দেয়।

"আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ!"

মারিয়া ভাসিলেইভ্না খুশী মনে তার চায়ের কাপে চুমুক দেয়। ও লোকগুলোর মতো ধীরে ধীরে সেও লাল হতে সুরু করে, বসে বসে ভাবে জ্বালানীকাঠ আর দারওয়ানের কথা। "থাম্, বুড়ো," পাশের টেবিলের কথা ভাসিলেইভ্নার কানে আসে, "উনি হলেন ভায়াজোভি স্কুলের 'মেয়েমাষ্টার'... আমরা চিনি, বেশ ভালো মানুষ!"

"হ্যাঁ, খুব ভালো!"

দরজাটাতে ক্রমাগত খোলবার আর বন্ধ হবার শব্দ হয়, কেউ বেরিয়ে যাচ্ছে আর কেউ ঢুকছে। মারিয়া ভাসিলেইভ্না বসে বসে পুরোনো কথাই ভাবে। কন্‌সার্টিনার একটানা আওয়াজের বিরাম নেই, বেজেই চলেছে। মেঝের ওপর রোদের ছোট ছোট টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দেওয়ালের ওপর

দিয়ে মিলিয়ে গেল। তার মানে, দুপুর পার হয়ে গেছে। পাশের টেবিলে লোকগুলি ওঠবার জন্য তৈরী হতে সুরু করে। বেঁটে লোকটা খানিকটা এদিক ওদিক করে ধীরে ধীরে মারিয়া ভাসিলেইভনার কাছে এগিয়ে এসে হাতটা বের করে দিলে আর তার দেখাদেখি প্রত্যেকেই এসে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গেল। দরজাটায় শব্দ হল নবার—

"ভাসিলইভ্না, তৈরী হয়ে নাও," সেমিঅন ডেকে বলে।

আবার তাদের যাত্রা সুরু হয়। তেমনি মন্থরগতিতে ধীরে ধীরে তারা এগোয়—

"কিছুদিন আগে ওরা একটা স্কুল তৈরী করছিল এখানে," তার দিকে ফিরে সেমিঅন বলে, "যত সব বদমায়েসী!"

"কেন কি হল?"

"প্রেসিডেন্ট নাকি তার এক হাজার নিজের পকেটে রাখলেন এক হাজার গার্ডিয়ান আর মাষ্টারটি পাঁচ'শ!"

"স্কুল কপালে সব মিলিয়ে তো হাজারের বেশী লাগে না। এভাবে লোকের সর্বনাশ করা উচিত নয়, খুড়ো! বড় খারাপ!"

"আমি কি জানি.........ওরা যা বললে তাই বললাম!"

কিন্তু কথার সুরেই বোঝা যায় ভাসিলেইভ্নার কথা সে বিশ্বাস করে নি। কোন চাষাই ভাসিলেইভ্নাকে বিশ্বাস করে না। ওদের সকলেরই ধারণা ভাসিলেইভ্না মাইনে পায় প্রচুর মাসিক একশ রুবেল (যার পাঁচটা হলেই যথেষ্ট)। আর জন্মলানী কাঠ ও দারওয়ানের জন্য তোলা চাঁদার বেশীর ভাগই নাকি সে রেখে দেয়। গার্ডিয়ানের ধারণাও ছিল তাই, নিজেও সে বেশ কিছুটা রেখে দিত। তাছাড়া স্কুল গার্ডিয়ান হিসাবেও লোকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করত কর্তৃপক্ষের অগোচরে।

যাক্, বাঁচা গেল! বনটা তারা পার হয়ে এসেছে। ভায়াজোভি পর্যন্ত এখন সাদা একটানা পথ, তাছাড়া রাস্তাও আর বেশী নেই। নদী আর রেলপথটা পার হলেই ভায়াজোভি তাদের নজরে পড়বে।

"চললে কোথায়?" ভাসিলেইভ্না প্রশ্ন করে, "ডাইনে পুলের রাস্তায় চল।"

"কেন? এদিক দিয়ে বেশ যাওয়া যাবে, জল তেমন গভীর হবে না।"

"দেখ, ঘোড়াটাকে শেষ পর্যন্ত ডুবিয়ে মের না।"

"কি?"

"ওই দেখ, হানোভের গাড়ী চলেছে পুলের দিকে।" দূরে চার-ঘোড়ার গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে ভাসিলেইভ্না বলে, "হানোভ বলেই তো মনে হচ্ছে।"

নদীর পারে এসে তারা পৌঁছোয়। গ্রীষ্মকালে নদীটা শুকিয়ে প্রায় ছোট নালার মত হয়, তখন স্বচ্ছন্দে পার হওয়া চলে। আগাস্টে প্রায়ই শুকিয়ে যায়। কিন্তু বসন্তের বরফগলা জলে নদীটা এখন প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া, ময়লা আর ঠান্ডা জল, স্রোতও বেশ। ডানদিকে গাড়ীর চাকার দাগ বেশ স্পষ্ট, কেউ পার হয়ে গেছে।

"চল না"—রাশ দুটোকে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষিপ্তের মত সেমিঅন চেঁচিয়ে ওঠে ঝাঁজাল স্বরে। দুপাশে পাখীর ডানার মত কনুই দুটো নড়তে থাকে, "চল্ না"—

"চল, তাড়াতাড়ি হাঁকাও" দাঁড়িয়ে উঠে ভাসিলেইভ্নাও চেঁচায়।

জুতো জুতোর আচ্ছাদন, পোষাকের নীচের দিকটা, কোট তার জামার হাতা সব কিছু ভিজে গেছে জলে একেবারে। আর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে চিনি আর ময়দা ভিজে যাওয়ায়। হাত দুটোকে চাপ দিয়ে হতাশায় ভাসিলেইভ্না শুধু বলে, "ও সেমিঅন তুমি সত্যি একটা অপদার্থ!........"

ট্রেন পার হবে, গেট তাই বন্ধ, মারিয়া ভাসিলেইভ্না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। ঠান্ডায় তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। ভায়াজোভি দেখা যায় এখান থেকে। স্কুলের সবুজ ছাদ, গির্জার ক্রুশগুলি অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝকমক করে, আর ষ্টেশনের জানালাগুলি। ইঞ্জিনের মুখে পাটকিলে রঙের ধোঁয়া........ভাসিলেইভ্নার মনে হয়, সব কিছুই শীতে কাঁপছে।........

ট্রেনটা এগিয়ে আসে। জানালার কাচগুলি আলোয় চকচক করে, গির্জার ক্রুশের মত। সেদিকে তাকিয়ে ভাসিলেইভ্নার চোখ ব্যথা করে। দুটো প্রথম শ্রেণীর কামরার মাঝখানে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ভাসিলেইভ্না তাকায় তার দিকে।

তার মা!

কি আশ্চর্য মিল!

মায়েরও ছিল অমনি একরাশ চুল, অমনি ভুরু আর অমনি ধরণের মাথা। দীর্ঘ তের বৎসর পর, একান্ত স্পষ্ট আর স্বচ্ছভাবে আজ প্রথম তার চোখের সামনে ফুটে উঠল: তার মা, বাবা, ভাই, মস্কোর ফ্ল্যাট, কাচের চৌবাচ্চায় ছোট ছোট মাছ, খুটিনাটি সব কিছু। স্পষ্ট তার কানে ভেসে এল, পিয়ানোর শব্দ, তার বাবার গলার স্বর। সে যেন হঠাৎ ছোট হয়ে গেছে, সুন্দর হয়ে উঠেছে, চকচকে পোষাক পরে সবার সাথে সেও যেন তাদের গরম ঘরটাতে বসে আছে। একটা তীব্র আনন্দের অনুভূতি যেন তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলে। হাত দুটো চোখের উপর চাপা অনুনয়ভরা মৃদু কণ্ঠে ডাকে, "মা!"

সম্পূর্ণ অকারণে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হানোভের চার ঘোড়ার গাড়ীখানা এসে হাজির হয় তার সামনে। হানোভের দিকে তাকিয়ে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি ও সুখ-সৌভাগ্যের কল্পনায় তার মন ভরে ওঠে। মৃদু হাসে। ভাসিলেইভ্না মাথা নোয়ায়, ঠিক বন্ধুর মত। আকাশে, বাতাসে, তার চারপাশে, জানালায়, গাছের বুকে যেন তারই বিজয়বার্তার প্রতিচ্ছবি। তার মা, বাবা, কখনো তারা মরেনি, বেঁচে আছে। তার কদর্য জীবনযাত্রা, সব কিছু,—দীর্ঘ,

(শেষাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা কলংকময় ইতিহাস হইতেছে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস। আর এই সাম্প্রদায়িকতা প্রকটিত হয় অতি নগ্ন মূর্তিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়। যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা আজ আলোকোদ্ভাসিত যুগে বাস করিয়া সুসভ্য হইয়াছি, শিষ্টতা শিখিয়াছি, মানুষের মহিমার মর্যাদা করিতে শিখিয়াছি, তাহার প্রাণের মূল্যের কদর করিতে শিখিয়াছি, ধর্মের সারমর্ম বুঝিতে পারিয়াছি—তবে তাঁহাকে একবার কোন পর্বোপলক্ষে সমাগত উন্মত্ত জনতার সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে বলি। দেখিবেন, একপথে প্রমত্ত জনতা শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছে, আর অন্যদিকে একদল জনতা প্রাণপণে তাহাতে বাধা দিতেছে! অধ্যাত্মসাধনা, পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ, খোদার তৃপ্তি-সাধন, ধর্মের মহিমা কীর্তন—এই সব উচ্চ আদর্শ ও ভাবের মূর্তপ্রকাশ এই প্রকার জনতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। তখন আপনি দেখিবেন ক্ষমাটা ধর্ম নয়, প্রতিহিংসাই ধর্ম; লোকের প্রাণরক্ষা ধর্ম নয়, নির্মমভাবে নর-হত্যাই হইতেছে ধর্ম! ধর্মে দয়ার স্থান নাই, মনুষ্যত্বের স্থান নাই, ভালবাসার স্থান নাই। সেখানে আদর আছে নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, হিংসা ও ঘৃণার। তাহাই যদি না হইবে তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর হাঙ্গামাকারীদিগকে দলের লোক "হিরো" বলিয়া "শহীদ" বলিয়া কেন অভিনন্দন করিবে এবং তাহারা আদালতে অভিযুক্ত হইলে তাহাদের পক্ষ হইয়া মোকদ্দমা লড়িবার জন্য নেতৃত্বস্থানীয় ব্যবহারজীবিগণ বিনা পারিশ্রমিকে কেন কাজ করিবে, আর কেনই বা সমাজ চাঁদা করিয়া তাহাদেরকে সাহায্য করিবে? বস্তুত সমাজ ও সমাজের কতকগুলি নেতাদের উস্‌কানী ও প্রশ্রয় পাইয়াই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া থাকে। মধ্যযুগের ইতিহাসকে যে উৎকট বর্বরতা, অন্ধ মানসিকতা, চির কলংকময় করিয়া রাখিয়াছে, এই বিংশ-শতাব্দীতে ভারতে তাহারই পুনরভিনয় হইতেছে। সে যুগে দেখিয়াছি, ক্ষিপ্ত রোমান ক্যাথলিক নিরপরাধ প্রোটেসটাণ্টকে বধ করিয়াছে, আবার উন্মত্ত প্রোটেস্টাণ্ট নিরীহ রোমান ক্যাথলিককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। একে অপরের ধর্মমন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মধ্যযুগে ইসলামের গৌরবময় যুগেও এইরূপ সাম্প্রদায়িক কলহের অন্ত ছিল না। আজ যে সিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভারতকে কাঁপাইয়া দিয়াছে, তাহার সূত্রপাত সেই মধ্যযুগে। হায়, সে যুগ হইতে আমরা কি এতটুকুও উন্নতি লাভ করিতে পারিলাম না! মনের সংকীর্ণতা হইতে আমরা কোনদিনই রক্ষা পাইলাম না। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত সংকীর্ণ, অনুদার ও অস্পষ্ট! "ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা," ইসলামের মর্যাদা রক্ষা, মন্দির ও মসজিদের অস্তিত্ব রক্ষা—ইহাই হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল ও আদি কারণ! হায়! হাজার হাজার যুগ হইতে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও যে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব [illegible] নাই, আজ একটি গো-বধে তাহার অবস্থা কাহিল! ইসলামকে গলা টিপিয়া মারিতে পারে নাই, আজ সামান্য একটা বাজনার শব্দে সেই ইসলাম ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে!

আজকাল দেশের চারিদিকে যে একটি ঘটনা অতি সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পরধর্মনিপীড়ন, পরমত অসহিষ্ণুতা, পরের কার্যে হস্তক্ষেপ ইত্যাকার অসৎ মনোবৃত্তি হইতে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎপত্তি। কিন্তু ইহার উৎপত্তি স্থল যাহাই হউক, যখনই এই ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন ইহাকে উস্‌কাইয়া দিবার জন্য ইহার পিছনে থাকেন নেতৃস্থানীয় একদল লোক, যাহাদের প্রধান কাজ হইল, অপরের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করিয়া নিজেদের স্বার্থকে ষোল আনায় আদায় করা। এই শ্রেণীর নেতারা উন্নত ও মহৎ মতবাদ দ্বারা রাজনৈতিক বিপ্লব আনিতে পারেন না, গণ-জাগরণ আনিতে পারেন না, দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়া সংগ্রাম করিতে পারেন না,—কিন্তু তাই বলিয়া কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন? নেতৃত্বের সাধ কি ইহাদের মনে জাগিতে পারে না? প্রতিভা সত্ত্বেও ইঁহারা কি লোক-লোচনের অগোচরে শুকাইয়া শুকাইয়া মরিতে থাকিবেন? জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার বাণী লইয়া ইউরোপ কাঁপাইয়া তুলিবেন, বজ্রনাদে ভারতে জাতীয়তার প্রতিধ্বনি তুলিবেন, আর ইঁহারা অনাদৃত ও অবহেলিত হইয়া নগণ্যভাবে দিন যাপন করিতে থাকিবেন! না, তাহা হইতে পারে না, ইঁহাদেরও যে প্রতিভা আছে, ইঁহারাও যে নেতা, তাহা সারা ভারতে জানাইয়া দিতে হইবে। তাই বিনা ত্যাগে, বিনা সাধনায় নেতৃত্ব করিবার মোহই এই শ্রেণীর নেতাদিগকে নূতন পথে লইয়া গেল। সে-পথ হইল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া দেশের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা, যাহার জন্য অনেকে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয় এবং তজ্জন্য ইঁহাদের গুরুত্বটাও অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এদেশে যতগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ হইয়াছে, তথাকথিত নেতাদের উস্‌কানিতে। আর এই উস্‌কানির ব্যাপারে লীগের নেতারা সকলেই টেক্কা দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গোড়ার কথাটা কি? এক কথায় বলা যাইতে পারে, অপরের ন্যায়সংগত অধিকারে অন্যায়ভাবে, গায়ের জোরে হস্তক্ষেপ করাটাই হইল ইহার গোড়ার কথা এবং মূল ও আদি কারণ! এই অন্যায় হস্তক্ষেপে বাধা দিবার জন্য পশুশক্তির প্রয়োগ করিয়া অপরকে জব্দ করিবার প্রবৃত্তি প্রত্যেক দাঙ্গাকারীকে সর্বদাই উত্তেজিত করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতার সমস্যা নহে, ইহা সমান অধিকারের সমস্যা নহে, ইহা কালচারের সমস্যা নহে, ডাল-ভাতের সমস্যা নহে, সত্য, ন্যায় ও নীতির সমস্যা নহে, অন্যায়, পাপ, দুরাচারকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ইহা মানবের পাশবিক শক্তির উলংগ ও মত্ত বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বাধীনতা-প্রিয়, সুস্থচিত্ত ও সম্মানিত নাগরিকের

নিজে যে অধিকার চায়, অপরকেও সেই অধিকার দিতে কাতর হয় না, কেহ কাহারও অধিকার নষ্ট করিতে আসিলে সে জীবন দিয়া তাহাকে সাহায্য করে এবং সর্বপ্রযত্নে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমার নিজের অধিকার ব্যতীত আর কাহারও অধিকার স্বীকার করিব না, কাহাকেও কোনরূপ অধিকার দিব না এবং কেহ তাহার অধিকার আদায় করিতে আসিলে, তাহাকে বাধা দিয়া সেই অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিব। অন্যায় জিদ, পাশবিক শক্তি প্রয়োগ ও দুর্দমনীয় লালসা হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎপত্তি হয়। গো-বধ ও গান-বাজনার বিবাদ নিতান্ত বাজে কথা, একটা খেলো উপলক্ষ্য মাত্র। দাঙ্গা করিবার যখন দরকার হয় তখনই ঐ সব বাজে বিষয়কে সামনে তুলিয়া ধরা হয়, কিন্তু উহাদের অন্তরালে থাকে অন্য কারণ। কিন্তু যখন দাঙ্গা বাধাইবার দরকার হয় না, তখন গো-বধ ও গান-বাজনার জেদ কাহাকেও পাইয়া বসে না। কিন্তু আবশ্যকবোধে উহাই প্রবল হয়। বৎসরে সারা ভারতে হাজার হাজার গো-বধ হয় এবং হাজার হাজার মসজিদের সম্মুখে হাজার হাজার বার গীতবাদ্য হয় কয়জনে তাহার সংবাদ রাখে? সেজন্য কয়টি স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়? গো-বধ অথবা গান-বাজনায় কেহ বাধা দেয় না, আবার বাধা দিলে কেহ শুনে না—কিন্তু সেজন্য দাঙ্গা হয় না। কলিকাতা, লাহোর, বেনারস, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে কত শত গো-বধ হয় এবং কত শত মসজিদের সামনে বাদ্যভান্ড হয়। আবার দূর পল্লীগ্রামের বহুস্থানে যুগ যুগ হইতে গো-বধ হইতে পায় না বা গান-বাজনা হইতে পায় না। ইহাতে ইসলাম বা হিন্দুত্বের অস্তিত্ব নাশের কোন আশঙ্কা কেহ কখনও দেখে নাই। ঠিক এইভাবেই শত শত বৎসর হইতে আমাদের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। যদি বরাবরই এইভাবে চলিত, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কি কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইত? আমাদের মধুর সম্বন্ধ কি কখনও তিক্ত হইত? কিন্তু আত্মস্বার্থ-সাধনের জন্য আমাদের ভুঁইফোঁড় নেতারা দরকার বোধ করিলেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার জন্য। অমনি আসিল ইসলাম বিপন্ন বা হিন্দু বিপন্নের কথা! মন্দির, মসজিদ, গরু, গানবাজনা এই সব প্রধান হইয়া উঠিল—আর ইহাদেরই সম্মানের জন্য বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব মানবের উপর উলঙ্গ কৃপাণ নাচিয়া উঠিল—ধরাবক্ষ নর-শোণিতে প্লাবিত হইতে লাগিল! আসলকে বাদ দিয়া নকলকে পূজা করিবার এমন নির্লজ্জ প্রয়াস খুব কম দেশেই দেখা যায়। হায় একথা কেহই জোর গলায় বলিতে পারে না, গোল্লায় যাক দু'দশটা মসজিদ, নিপাত যাউক দু'দশটা গরু—কিন্তু তার বিনিময়ে বাঁচিয়া থাকুক আমার মানুষ ভাইগণ! এই শুভবুদ্ধি যতদিন আমাদের না আসিবে ততদিন আমরা কায়াকে ভুলিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া মরিব।

মানুষ তাহার ধর্মের মহিমা ও গরিমার কথা যতই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার আচরণ হইতে দেখা যায় যে, আমাদের অধিকাংশ লোক ধর্মের মর্ম কথা কিছুই বুঝেনা। ধর্ম হইতে ন্যায়নীতি আর প্রেমকে পৃথক করিয়া দেখিতে ভালবাসে। তাহাদের বিবেচনায় ধর্ম ন্যায়নীতির ধার ধারে না। পলিসি, সুবিধা, স্বার্থ ইহাই যেন আজকাল ধর্মের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্মের মুখোস পরিয়া ভন্ড ও প্রতারকগণ সাধারণের নিকট ধর্মের বেসাতি করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে। আর এক দল রাজনৈতিক নেতা তাহাদিগকে নিজেদের কবলে রাখিয়া সমাজের উপর বিনা ত্যাগে প্রভুত্ব করিতেছে। বস্তুত মুসলীম লীগের আজকাল ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; অন্য কোন কর্মপদ্ধতি নাই। নর রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত করাই যেন আজকাল ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। তরবারির বলই যেন ধর্মের প্রধান বল। যখন খৃষ্টান প্রচারকগণ অভিযোগ করেন ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন তারস্বরে তাহার প্রতিবাদ হইতে শুনি! কিন্তু লীগপন্থীদের বর্তমান আচরণ কি উক্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত করিতে সহায়তা করে না? যদি কোন হিন্দু গো-বধ করিতে বাধা দেয় অথবা জোর করিয়া গান-বাজনা করে, তবে তজ্জন্য প্রাণ বধ করিবার নীতি কোন দেশীয় ইসলাম? ঠিক সেইরূপ মুসলমানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করাটা কোন দেশীয় হিন্দুত্ব? মাটি ও পাথরে নির্মিত এক মসজিদ পড়িয়া আছে রাস্তার একধারে। তাহার আবার মর্যাদা কি? তাহার আবার নিরাপত্তা কি? আর যদি কিছু থাকে, তবে তাহা কি মানুষের মর্যাদা ও প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান? সেইরূপ একজন মানুষ অপেক্ষা কি গরুর মর্যাদা এতই অধিক যে, মানুষ বধ করিয়া গোরক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু এই সামান্য বিষয়টি আমাদের ধর্মপ্রাণ নেতারা বুঝিয়াও বুঝে না। ইহাতে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করা হয় না, ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। সুখের বিষয় যে আজকাল গো-বধ লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুব কম হয়। কিন্তু বাদ্যভান্ডের কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আজও কমে নাই। যদি দেখিতাম মুসলমানগণ বিবাহ, মহরম ও অন্যান্য শোভাযাত্রা উপলক্ষে কোনওরূপ বাদ্যভান্ড ব্যবহার করে না, তাহা হইলে অপরকে বাধা দিবার হয়ত একটা লোক দেখান কারণ উপস্থিত করিতে পারিতেন কিন্তু তাহাদের প্রয়োজনে যখন তাহারা সময় অসময় সর্বক্ষণ বাজনা বাজায় তখন অপরের সেইপ্রকার অধিকারে বাধা দিবার তাহাদের কোনওরূপ ন্যায়সংগত কারণ নাই। ইহাকেই বলে গায়ের জোরে অন্যায় আব্দারের দাবী! ইহাকেই বলে ধর্মের নামে বেসাতি। মুসলমান আজ লীগপন্থীদের কুহকে ভুলিয়া ইসলামের সর্বজনীন আদর্শকে এইভাবে বিস্মৃত হইতেছে।

ইসলাম একজনের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে,—ইসলামকে অনুদারভাবে ব্যাখ্যা করিবার যাহার তাহার কোন অধিকার নাই। মসজিদের সম্মুখে বাদ্যভান্ড বন্ধের দাবী ইসলাম অনুমোদিত নহে। ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ফন্দিবাজ নেতাদের নূতন দাবী। এই দাবীর সহিত ইসলামের মান-মর্যাদার কোন [illegible] নাই। [illegible]

নীচতা হইতে অনেক উর্দ্ধে। এই দাবী যদি ইসলামের দাবী হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও ইসলাম একদন্ড টিকিতে পারে না, ইসলাম বিশ্বধর্ম হইতে পারে না। চিরকাল নূতন নূতন মসজিদ হইতে থাকিবে কিন্তু গানবাজনা বন্ধের দাবী করিলে সে পথ বন্ধ হইবে। মুসলমানের বিভিন্ন দেশে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। লীগনেতাদের এই জিদ মানুষের নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপের জিদ—এই জিদে কর্ণপাত করিলে তাহার শেষ পরিণতি কাহারও পক্ষে ভাল হইবে না। ইহাতে ধর্মান্ধতা অন্যায়ভাবে বাড়িয়া যাইবে। এই সব বাজে কাজে সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। মুসলমানের করিবার কাজ যথেষ্ট আছে। আজ নেতাদিগকে অনুরোধ করি সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। যে সব সামান্য কারণে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হয় দাংগা-হাংগামা হয়, দেখিতেছি মুসলমানের বিভিন্ন দলের মধ্যেও সেই প্রকার দাংগা হইতেছে। বর্তমান সিয়া-সুন্নী হাংগামার মূলে আছে সেই প্রকার অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি যাহা সর্বদাই দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ বাধাইতে সাহায্য করে। এই সিয়া-সুন্নী দাংগা হইতে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক বিবাদের আসল কোন কারণ নাই, মূলগত কোন হেতু নাই। উস্‌কানী আর অনুদারতা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। যতদিন হৃদয় উদার না হইবে ততদিন এই সব হইতে থাকিবে। নেতৃস্থানীয় লোকেদের নিকট একটিমাত্র অনুরোধ তাঁহারা যেন সামান্য কারণে আগুন লইয়া খেলা না করেন। মন্দির-মসজিদের চেয়েও বড় জিনিষ আছে—তাহা হইতেছে মানুষ। এই মানুষের চাই মুক্তি—ইহাদের জন্য চাই আনন্দ ও প্রেম। সাম্প্রদায়িক দাংগা বাধাইয়া ইহাদের অকল্যাণ করিও না,—ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষকে একই সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা কর। ইহাই প্রকৃত ইসলাম—ইহাই প্রকৃত হিন্দুত্ব। অন্য কিছু নহে।

ঝরা বসন্ত

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কুৎসিত দুঃস্বপ্নের মত তার ঘাড়ে চেপেছিল এতদিন, আজ যেন সে হঠাৎ জেগে উঠেছে, মুক্তি পেয়েছে দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে………

"গাড়ীতে ওঠ ভাসিলেইভ্‌না।"

"মুহূর্তে সব কিছু মিলিয়ে যায় তার চোখের সামনে হতে। ধীরে ধীরে তাদের পথ খুলে দেওয়া হয়। শীতে অবসন্নের মত কাঁপতে কাঁপতে ভাসিলেইভ্‌না গাড়ীতে উঠে বসে। চার-ঘোড়ার গাড়ীটা লাইন পার হয়ে গেল, সেমিঅন তার পিছু পিছু এগোয়।

সিগন্যালম্যান তার টুপীটা তুলে ধরে।

"এসে গেছি আমরা, ঐ তো ভায়াজোভি!"………..*

* শেহভ্‌ লিখিত 'দি স্কুল মিসট্রেস্‌'।

'মে' মাসের গান

সমীর ঘোষ

উর্দ্ধে আকাশে রক্ত-সূর্য জাগে;
নীচে কাঁপে কালো ধোঁয়ায় মলিন মুখ:
শত শতাব্দী মুক্তি ভিক্ষা মাগে ঃ
জাগর কামনা ডাগর করেছে বুক!
দীনতার বাঁধ ভেঙেছে দীপ্রমন ঃ
সূর্যের জ্যোতি চাঁদের আলোক নয়;
দ্বন্দ্বের জয়ে উঠেছে রণন-ঝন—
ইস্পাতে আজ নেইকো নতুন ভয়!

জোয়ার নেচেছে শিরায় শিরায় আজ,
সত্য হেসেছে প্রভাতীর প্রান্তরে ঃ
ছিঁড়েছে পালক—মুক্ত হয়েছে বাজ
—ইথারের সুর নাড়া দেছে অন্তরে!

শীতের কুয়াশা ধোঁয়ায় ধূসর হল—
উজ্জ্বল দিন—ভাঙনের নেশা হোক;
প্রাথমিক 'মে'তে রক্ত-পতাকা তোল
—চিমনীর চাপে মরে কি কখনো লোক!

আজিকে আকাশে সূর্য রক্তিমায়
চিমনী যাদের—কলঙ্ক হল বার,
শত শতাব্দী দাঁড়ালো লক্ষ পায়
বাধা পথে করে তেপান্তরের পার।
মুক্তি এসেছে যুক্তির দাবী দিয়ে
শ্রমিক মিছিলে মিথ্যার প্রতিবাদ-
ধোঁয়া কালো মুখ সূর্যের শিখা নিয়ে
জানাক উঠেছে সূর্য নয় সে চাঁদ।

ক্রন্দসী

(উপন্যাস)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

(১)

পাশের ঘরে পিতা এবং মাতা কথা বলিতেছিলেন। তখন **রাত্রি একটার কম হইবে না।** ইভার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। **এবং হয়ত** শুনিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কথাবার্তা কানে **আসিতে** লাগিল। ইভার মা বলিতেছেন, "না, আমার আই-এ **পাশ** মেয়ে আমি পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দেব না।"

বাবা নিশানাথ বলিলেন, "না দেবে তো বসে থাক। আমিও আর কিছু জানিনে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে পাত্র দেখ একথা আমার কাছে আর বলতে এলে আমিও শুনব না। উনিশ, কুড়ি, **একুশ**, বাইশ যত খুশী বয়স বেড়ে যাক, তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েও আর কাজ নেই। না হয় শেষে মাষ্টারি করে খাবে। বিয়ে নাই বা হ'ল।"

মাতা প্রমীলা দেবী রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন ঐ একটি ছাড়া দুনিয়াতে আর পাত্র নেই নাকি?"

নিশানাথ জবাব দিলেন, "আছে হয়ত, কিন্তু আর আমি খুঁজতে পারব না। আজ দু'বছর ধরে ক্রমাগত খুঁজছি, কোনটাই সব দিক দিয়ে মনোমত হয় না। যদি বা ভাগ্যগুণে এই একটি হ'ল, অন্য সব দিকেও এক রকম ঠিক হ'ল, পাড়াগাঁয়ে বাড়ী বলে তুমি বাতিল করে দিতে চাও। কেন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী দোষের কি হ'ল শুনি? ছেলেটি ল' পড়ছে, অবস্থা ভাল, দেখতে সুশ্রী স্বাস্থ্যবান, আবার চাও কি?"

প্রমীলা নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তাহলেও বিয়ের পরেই কোথায় কোন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে মেয়েটাকে যেয়ে ঘর করতে হবে। কতদিনের জন্যে তারই বা ঠিক কি, আজকাল ওকালতির যা দুরবস্থা। নিজে উপার্জন করে স্বাধীন ভাবে থাকতে না পারলে তো আর গ্রামের শ্বশুর বাড়ী ছাড়বার উপায় নেই।"

পিতা কহিলেন, "তা যাই হোক, ছেলেটির বাবা কুমুদ-বাবুর অবস্থা সত্যিই বিশেষ ভাল। আর তিনি আজীবন বাইরে বড় চাকরি করেছেন। এই শেষ বয়সেই না পেন্সন নিয়ে ঘরে বসেছেন। তিনি যদি আজকালকার শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত উদারপন্থী না হতেন, তাহ'লে আই-এ পাশ মেয়েকে কোন পছন্দে বৌ করতে চাইতেন বল?"

মা সব জানিয়া বুঝিয়াও অনুযোগ করিতে লাগিলেন, "তা যতই বল পাড়াগাঁয়ে বাড়ী শুনে অবধি আমার মন তেমন সরছেনা। আমরা এই ক'লকাতায় বারোমাস থাকব, আমোদ করব, আনন্দ করব, পাঁচটা জায়গা যাব, সিনেমা দেখব, রেডিও শুনব, আর মেয়েটা কোন এক জঙ্গলে পড়ে থাকবে।"

নিশানাথবাবু কহিলেন, "ও সব বাজে চিন্তা রেখে দাও। পাড়াগাঁয়ের নাম শুনলেই তোমরা যেন ভয়ে কাঁটা হয়ে যাও। জাননা বলেই বোধ করি দূরে থেকে ও বস্তুকে এত ভয়াবহ মনে কর। কিন্তু আজ আর সে ভয়ের দিন নেই। এ নিয়ে তোমাকে একটি ছোট খাট লেকচার শোনাতে পারি। কিন্তু এই মাঝরাত্রিতে তার আর দরকার নেই। তবে এইটুকু মাত্র জেনে রাখ, পাড়াগাঁকে লোকে আজ মাথার মণি করছে। কাগজে পড়নি এবার থেকে কংগ্রেসের অধিবেশন অবধি পাড়াগাঁয়ে হচ্ছে? এর ওপরে আর বাকী কি!" এ-সব যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেও মাতার মন ঠিক উঠিতেছিল না। একটু খুঁত খুঁত করিতেছিল। কিন্তু আর কথাবার্তা কিছু শোনা গেল না। রাত্রি গভীর। সারা বিশ্ব সুষুপ্তিমগ্ন। কিন্তু ইভার আর ঘুম আসিল না। তাহার মনে ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। মনে একটা ভয়ের মত হইতে লাগিল। বিবাহের কথা শুনিয়া তরুণ মনে যে কল্পনার মাধুরী মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্ধকার রাত্রিতে নিস্তব্ধ শয্যায় এই সব চিন্তায় কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(২)

পরের দিন অনেকটা বেলা হইতে ইভার ঘুম ভাঙ্গিল। নবোদিত সূর্যের দিকে চাহিয়া অন্য দিনের মত আশায়-আনন্দে মনটা ভরিয়া উঠিল না। তখনও মনে লাগিয়া আছে কি এক অস্পষ্ট ভয়.........ভাবনা। বিবাহের কথা উঠিতেই কলেজ যাওয়া বন্ধ হইয়া গেছে। সারাদিন ঘর-সংসারের কাজ করিয়া, সেলাই করিয়া, বই পড়িয়া কিছুতেই আর কাটে না। বিকালের দিকে অনেকদিনের বন্ধু শোভনা আর রুবি বেড়াইতে আসিল। তাহারা একটা সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। রুবি কহিল, ভাই ফার্স্ট এম্পায়ারে নতুন ছবি হচ্ছে। ভয়ানক ভাল। তোকে যেতেই হবে। আমরা নিতে আসব যথা সময়ে তখন কিন্তু না বলতে পারবিনে। ইভা কহিল, আচ্ছা তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া তাহার আর পা উঠিতে চায় না। হঠাৎ একটা বিরস ভাবে সমস্ত মন সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এই আলো, হাসিগান, এই বন্ধু-সমাগম, এই নিত্য নূতন [illegible] জলসা, থিয়েটার দেখা সমস্তই কোথায় থাকিবে আর দু'দিন পরে। বিয়ের পরেই কোথায় কোন একটা সুদূর অন্ধকার পল্লীতে যাইয়া দিনযাপন করিতে হইবে তাহাকে।

ইভার মা তখন ঠাকুরকে রাত্রির রন্ধনের ব্যাপার বুঝাইতেছিলেন। ইভা কাছে দাঁড়াইল। একটু ইতস্তত করিয়া ডাকিল, মা।

কি বলছিস রে?

রুবি আর শোভনা এসেছে, ওরা ভারি জেদ করছে ফার্স্ট এম্পায়ারে যাবার জন্যে। রুবিদের মোটরেই আবার পৌঁছে দেবে বলছে। মা একটুখানি ইতস্তত করিয়া বলিলেন, অন্য সময় হ'লে আমার আপত্তি কিছুই ছিল না। এমনতো কতবার কত জায়গায় গেছিস। কিন্তু কাল সকালের ট্রেনেই ওঁরা যে তোমাকে পাকা দেখতে আসছেন। একেবারে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। দশটার মধ্যেই ভাল সময়। আজ কি বেশী রাত জাগা উচিত তোমার? না আজ আর নাই বা গেলে। ওদের বরঞ্চ আমার সঙ্গে দেখা করে তবে যেতে ব'ল। আমি সব বুঝিয়ে বলব'খন। তাহলেই বুঝবে, আর জেদ করবে না।

মায়ের কথার প্রত্যুত্তরে ইভা কি একটা বলিতে গিয়াও

বলিল না। অভিমানে তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহারই মধ্যে জীবনে অন্ধকারের যবনিকা পড়িয়া গেল। এখন হইতেই সুরু হইল শাসন বাঁধনের বজ্র আঁটন। নিজের সহিত তুলনায় রুবিকে, শোভনাকে, ইরাকে, পৃথিবীর সকলকেই অত্যন্ত সুখী বলিয়া বোধ হইল। আর কোন কথা না বলিয়া সে ঝড়ের মত বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সঙ্গিনীরা উৎসুকচিত্তে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। ইভা আসিয়া অন্ধকার মুখে কহিল, না ভাই আমার যাওয়া হবে না। তোমরা মিথ্যে আর আমার জন্যে অপেক্ষা কর না। —বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

রুবি অবাক হইয়া বলিল, কেন যাবি নে? তোর আজ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, লুকোচ্ছিস। বলনা ভাই।

ইভা বলিল, হয়নি কিছু। কাল আমাকে বরপক্ষীয়েরা আশীর্বাদ করতে আসবেন। আজ আর তাই আমার কোথাও যাওয়ার হুকুম নেই।

রুবি এতক্ষণে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও, তাই বল। তা এটা আর এমন কি ফাঁসীর হুকুম যে, চোখ ছলছল, মুখ ভার। এমন সুসংবাদটা বরঞ্চ এতক্ষণ চেপে রেখেছিলি বলে তোর বেণী ধরে একটান দিতে ইচ্ছে করছে। তা ভালই হ'ল। এখন আর কি তোর সিনেমায় ছবি দেখতে ভালই লাগে না মন বসে। মনের মধ্যেই তোর আনাগোনা করছে কত ছবি।

ইভা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, যা মনে করছিস মোটেই তা নয়। যেখানে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেটি একটি অশিক্ষিত অসভ্য পাড়াগাঁ।

শোভনা কহিল, কেন এসব কথা ঠিক হবার আগে তোর মত নেওয়া হয়নি?

না—ইভা আর কিছু বলিতে পারিল না। অভিমানে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঝড়ের মত বেগে তথা হইতে চলিয়া গেল। ইভার মা জলখাবারের রেকাবি হাতে ঘরে ঢুকিলেন এবং ইভার বান্ধবীদের মিষ্টান্নের সহিত মিষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, সে আজ কেন যাইতে পারিবে না, তাহারা যেন মনে কিছু না করে।

(৩)

ঘড়ীতে প্রায় দশটা বাজে। বরের পিতা কুমুদনাথবাবু প্রচুর জলযোগের পর একটা এলাচ মুখে লইয়া পাত্রীকে দেখিবার আশায় ঘন ঘন দুয়ারের দিকে চাহিতেছিলেন। কিন্তু সময় প্রায় বহিয়া যায় তবু ইভার দেখা নাই। ইভার বাবা নিশানাথবাবু এতক্ষণ তাঁহার নিকট বসিয়া মিষ্ট এবং বিনীত আলাপে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। দেরী দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়ের খোঁজে ভিতরে চলিয়া আসিলেন। সামনের ঘরটায় তখন মা মেয়েকে বুঝাইতেছিলেন; "তোমার বাবা কথা দিয়েছেন, এখন কি ও-সব বলে মা। ছি, লক্ষ্মী মেয়ের মত বাইরে যাও, আজকের মত শুভদিনে চোখের জল ফেলতে নেই। শান্ত মনে গুরুজনের আশীর্বাদ নিয়ে এস। ভয় কিছু নেই। আমিও তোমার বাবার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। কিন্তু শেষে বুঝতে পেরেছি, অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি তোমার জন্য যা করছেন ভালই করছেন।"

ইভা সহসা মনে মনে কি একটা ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিল এবং চোখের জল মুছিয়া অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দ্বারের নিকটে আসিল। নিশানাথ বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিলেন, "এত দেরী কেন? ও কি, এখন তৈরী হয়ে নাও নাই?" ইভা একখানা লাল পাড়ের আটপৌরে শাদা শাড়ী পরিয়াছিল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এতেই হবে। আমি তৈরী হয়েই রয়েছি।" নিশানাথ আর কিছু বলিলেন না। ঘরে ঢুকিতেই কুমুদবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার রুচি এবং বিবেচনা শক্তিকে আমি আন্তরিক প্রশংসা করি নিশাবাবু। এই সুন্দর সোনার প্রতিমাকে যে আপনি কতকগুলো বাজে বিলিতী জর্জেট এবং ক্রেপ সিল্কে না মুড়ে একটি শাদাসিধে বঙ্গলক্ষ্মী লাল পাড়ের শাড়ীতে সাজিয়েছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

ইভা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সেকালের আমলের নীরেট মস্ত ভারি এক জোড়া সোনার বালা তাহার দুই হাতে পরাইয়া দিয়া তিনি ইভাকে আশীর্বাদ করিলেন।

সহাস্যে কহিলেন, এবার তো আমার বাড়ী শীগ্‌গির যাচ্ছ মা লক্ষ্মী, কিন্তু ভয় পাচ্ছ নাতো?

ইভা ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। সত্যই তো সে মনে মনে ভয় পাইয়াছে। তাহার অন্তরের কথা কেমন করিয়া ব্যক্ত হইল? ধীর স্বরে কহিল, "না ভয় কিসের? মেয়েদের সমস্ত রকম অবস্থান্তরের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত।"

কুমুদবাবু আদরের স্বরে কহিলেন, "তুমি যে শুধু কলেজে পাশ নও, তাছাড়াও বিশেষ বুদ্ধিমতী তা তোমার কথাতেই প্রমাণ। হ্যাঁ, মেয়েদের একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে, যার বলে তারা বিভিন্ন জীবনের সকল রকম অবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গেই নিজেদের চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তার কারণ তারা সভ্যতার শতদলের মর্মস্থানে ফুটে রয়েছে। পুরুষেরা তাদের তুলনায় বর্বর। আর সভ্যতার সংজ্ঞাই হচ্ছে নানারকম উল্টো-পাল্টা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শক্তি। কিন্তু তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করলেও তোমাকে জানিয়ে রাখছি মা, তোমার ভয় পাবার কোনই হেতু নেই। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মনে মাঝে মাঝে একটা ভয় হচ্ছে, না জানি কোথায় কোন পাড়াগাঁয়ে, অশিক্ষিত অনুদার সঙ্গের মাঝে যেয়ে পড়তে হবে। কিন্তু আসলে তা নয়। পাড়াগাঁয়ে থাকাটা আমি ইচ্ছা করে বেছে নিলেও, আমার মতামত অন্যরকম। সে বোধ হয় তুমি টের পাচ্ছ এবং ভবিষ্যতেও ক্রমশ টের পাবে। আমার ছেলে বিয়ের পরে শীগ্‌গির বিলেত যাবে। আচ্ছা, আজ তাহলে এস। একদিনে বেশী বকবনা। তুমি এই বুড়োকে হয়তো বাচাল ভাববে। যখন আমার বাড়ীর লক্ষ্মী হতে চললে তখন ক্রমশ সমস্তই টের পাবে।

ইভা আর একবার তাহার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনের উপর

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মাঝির গান

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পল্লীবাসীর অন্তর-কন্দরে ভাবের যে স্রোতধারা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইতেছে তাহার সন্ধান কয়জন রাখে! শিক্ষিত জনসাধারণ সেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে নাই, তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখে নাই। কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রাণ-প্রবাহ রুদ্ধ হয় নাই, যুগের পর যুগ তাহা সহজ গতিতে চলিয়া আসিয়া কাব্য-রসের উপাদান যোগাইতেছে।

বাঙলার আকাশ প্রান্তর সবুজের রঙে রঙীন্, পবনে পবনে গীতালী সুর ভাসিয়া বেড়ায়। কোলাহলময় শহরের মোহ এড়াইয়া পল্লীর নিভৃত প্রান্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অন্তরের সহজতম আন্তরিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণের উচ্ছল আবেগ সেস্থানে প্রকৃতভাবে বাসা বাঁধে।

নদীর পথে, মাঠে বাটে, উদাস সুরে যে গান হয়, তাহা ভাবসম্পদে উপভোগ্য। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাহা বিভিন্ন নামে পরিচিত—ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, মাঠ-কবি, চরের গান ইত্যাদি বিভিন্ন নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হয়।

এ সমস্ত গানের মধ্যে নদীর মাঝে মাঝিরা যে গান করে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৌকা লইয়া ভিন্ন দেশে যাইবার কালে মাঝিরা উদাস-সুরে গান করে; পবনের সোহাগ পরশনে জলের উপর ঢেউ খেলিয়া যায়, তাহারই সঙ্গে তাল রাখিয়া গান চলিতে থাকে। তরঙ্গের গতিবেগ তীরে প্রহত হইয়া দুলিয়া বেড়ায়, গানের সুর-লহরও তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া তীরের তরু-লতা-গুল্মের সঙ্গে যেন মিতালী বাঁধিতে ছুটিয়া যায়। উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া মাঝির মনে কখনও আশঙ্কার সঞ্চার হয়। তখন সে প্রাণের আবেগে গান গাহিতে থাকে।

ও নদী দেখিয়া মন মোর উড়িয়া যায় রে—
এ হেন সোনার যৈবন জলে ভেসে যায় রে।

... ...

আর যেমত নদীর ভুলকি উঠে,
দুই হাতে দুইটা বৈঠা ধরে,
মনের সঙ্গে খেওয়া দেয়
কথায় না শুনে রে—
একখানা নায়ে তিনজন মাঝি
মন শালাটা বড়ই পাজি—
মনের সঙ্গে খেওয়া দেয় নবীন বাবাজী॥

মনের সঙ্গে সে কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারে না; মনের গতি-বেগ রোধ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। জীবন যৌবন কালের সঙ্গে মনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলিতেছে—উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে মন কেমন করিয়া আপন পথ খুঁজিয়া লইবে।

মাঝি যেন সদাগরি লইয়া ভিন্ন দেশে চলিয়াছে। ঘরের রমণীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার স্ত্রী যেন তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া কাতর মিনতি জানাইতেছে। মাঠের মধ্যে "কোড়া পাখী" ডাকিয়া ফিরিতেছে; সে ডাক তাহার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। মাঝি চলিয়া গেলে তাহার ভাবনার অন্ত থাকিবে না—তাহার কেমন করিয়া সময় কাটিবে। তাই, সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছে এবং মাঝির ঘাড়ের গামছাখানি মাগিয়া লইতেছে। তাহাই তাহার সময়ের সুহৃদ—তাহাকে সে বুকের সম্বল করিবে।.

... ...

ও প্রাণ সাধুরে—
তোমরা যায়ছেন দূরে দ্যাশ,
হামার লাগছে ধাঁধা।
তোমার ঘাড়ের শ্যামলাই গামছা
রাখিয়া যান বোল বাঁধা॥
তোমার ঘাড়ের শ্যামলাই গামছা,
মুই খাব না বিলাব।
যখন আমার পড়বে মনে,
হিন্দে তুলে নিব॥

মাঝি দূর-পথে চলিয়াছে; কতদিনে ফিরে তাহার ঠিক নাই। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাই আজ মাঝিকে পথ চলিবার উপায় বলিয়া দিতে উন্মুখ করিয়াছে। দূরান্তরের পথে মাঝির আপনজন কেহ নাই—সকলের সঙ্গে সে যেন সাধু ব্যবহার করে। কে জানে, বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ!

ও প্রাণ সাধুরে—
ভারি মাঝি যোল জন,
না বলে সাধু দূর-বচন
মুখের পেমে নিগান নৌকা বরারে—
ও প্রাণ সাধুরে—
পড়িয়া পাছিয়া বাও,
ঘোপা চাঅা বান্দেন নাও,
বুঝিয়া সুজিয়া করেন বেচা কিনা রে—

মাঝি নৌকা লইয়া ভিন্ন দেশে পৌঁছিয়াছে। সে স্থানে নৌকা ভিড়াইয়া কিছুদিন থাকিবার মানস করিয়াছে। ঘাটের পথে এক দিন যেন সে কোন রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। রমণী যেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতেছে। আকাশে মেঘ করিয়াছে, দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। সে সাঁতার জানে না; এরকম অবস্থায় কেমন করিয়া সে নদী পার হইবে, তাহাই একমাত্র চিন্তা। তাই পার করাইয়া দিবার জন্য মাঝিকে অনুরোধ করিতেছে।

ওরে ও পর দ্যাশের ঘাটিয়া,
সকালে করাও রে পার—
দেওয়ায় কইরাছে অন্ধিহার।
আজি, এলুয়া কাশিয়ার ফুল,
নদী হইল রে একাকুল,
কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে—
নাই জানোঁ মুই পহর দিতে,
নাই জানোঁ মুই সাতার দিতে,
নাই জানোঁ মুই গন্ধবানিয়ার বেটী রে।

মাঝি যদি তাহাকে পার করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার জীবন যৌবন জাতিকুল সব তাহাকে বিলাইয়া দিবে—তাহার যথা-সর্ব্বস্ব তাহাকে অর্পণ করিবে।

যে নাইয়ায় করাইবে পার,
তাক্ দিম মুই গলার হার,
পার হআ দিব জাতি-কুল রে।

মাঝিকে দেখিয়া তাহার মনে হইতেছে যেন সে তাহার অত্যন্ত আপনার—তাহার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় আছে।

নদীর কিরাণি ত নাইয়ার বাড়ী
রাখিতে রাখা না যায় পুরাণো কাছারি
ভাইয়ার দ্যাশের নাইয়া রে তুই
বাবার দ্যাশের নাও
পার করাও রে মাঝি ভাইয়া
দ্যাশে চইলা যাওঁ॥

মাঝি তাহাকে পার করিয়া দিয়াছে। পার হইবার সময় রমণী যেন তাহার আপনার হইয়া গিয়াছে। তাহাকে লইয়া সে যেন কত সুখ স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু রমণী তাহার নিজের দেশে চলিয়া গেল, যাইবার কালে মাঝিকে মোহিত করিয়া গেল। মাঝে মাঝে সে মাঝির সহিত দেখা করিবে। আর মাঝি যেদিন ভিন্ন দেশের পথে নৌকা ছাড়িবে, সেদিন যেন সে জানিতে পারে।

ও কি ও-
সারেঙ্গা নায়ের মাঝি
যেদিন ভাইটাইবেন নৌকা,
তাক্ যেন মুই জানি॥

উপরি-উক্ত গীতাবলী উত্তর বঙ্গের "ভাওয়াইয়া গান" হইতে উদ্ধৃত হইল। উত্তর বঙ্গে তিস্তা করতোয়া প্রভৃতি নদীর মাঝিরা এরূপ গান বহু করে। এই সমস্ত গানের মধ্যে কৃষ্ণ ধামালী (?) গানের সন্ধান মিলে। পল্লী-গীতিকার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গান অনেক আছে। কোথাও কৃষ্ণ মাঝি হইয়াছে রাধা দুধের পসরা লইয়া পার হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে কোথাও জল ভরিবার জন্য রাধাকে ঘাটের পথে দেখা যাইতেছে সেখানে নাগর কৃষ্ণের সহিত আলাপন চলিতেছে। দেশকালের গণ্ডী পার হইয়া এরকম গান বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে পাওয়া যায়—

জল ভর সুন্দর কইনা,
জলে দিয়া ঢেউ।
একেলা ঘাটে এইসাছ কইনা
সঙ্গে নাই তোর কেউ॥
ইত্যাদি।

দক্ষিণ বঙ্গের গানের মধ্যে আছে-

জল পোরো রাই বিনোদিনী,
জলে দিয়া ঢেউ।
নয়ন মেলে কও কথা
ঘাটে নাইকো কেউ॥
—দেখিয়া যমুনার ঢেউ
ও নাগর, প্রাণ কাঁপে রে থরে,
আজ আমি কব না কথা,
যা ফিরে তোর ঘরে॥ ইত্যাদি।

রাধা যেস্থানে পার হইবার জন্য মাঝিরূপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট মিনতি জানাইতেছে সেস্থানে বলা হইয়াছে—

পার কর পার কর কানাই,
বেলার দিকে চায়ে।
দধি দুগ্ধ নষ্ট হ'ল,
দিবা গেল বয়ে॥
—সকল সখি পার করিতে
লব আনা আনা।
রাধিকাকে পার করিতে
নিব কানের সোনা॥
—তুমিও যে সুন্দর কানাই,
ভাঙ্গা তোমার নাও।
কোথায় থোব দুধের পসর, কানাই
কোথায় থোব পাও॥
... .
অর্দ্ধেক গাঙে যায়ে কানাই
নৌকায় দিলে লাচা।
উড়িল রাধিকার প্রাণ
কানাইর নাওর ভাঙ্গিল পাছা॥
বাহ বাহ বাহ রে কানাই
বাহে ধর কূল
এ ধন যৌবন দিব,
গঙ্গায় দিব ফুল॥

দক্ষিণ বঙ্গের "মাঝির গান" হইতে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা গেল। মাঝির গানের অধিকাংশকে দেহ-তত্ত্বমূলক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে তাহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিতেছি।—

দাঁড়ি মাঝি ঠিক না করে
মন কিসে যাবি পারে।
ঠিকের ঘরে বেঠিক হ'লে
নিতাই পার করে না তারে॥
মন মাঝি কর মনের মত,
পারের বন্ধু মিলবে কত,
নিতাই হাত ধরে পার করে॥
নদীর এমনি ধারা,
অধরায় না দিবে ধরা,
সে ঘাটে ব্রহ্মা বিষ্ণু হারে
মন, কিসে যাবি পারে॥

পূর্ব্ব বঙ্গের মাঝিরা নৌকা-পথে যে গান করে, তাহার মধ্যে গভীর তত্ত্বমূলক কথা অনেক আছে। সংসারের কল-কোলাহল হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিবার জন্য জীবের আকুতির অন্ত নাই। এ সংসার একটি নদীর মত, তাহা পার হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। সংসারের পাকে পড়িয়া মানুষ তাহার জীবনকে ঠিক পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় না।

(শেষাংশ ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহির্জগত

(গল্প)

শ্রীমনোমোহন দে

রাজনৈতিক বন্দী প্রমথেশ পাঁচ বছর জেল ভোগের পর আজ দমদম জেল থেকে মুক্তি পাইয়াছে।

প্রমথেশের বাড়ী পূর্ববঙ্গের এক পল্লীতে। প্রমথেশ কলিকাতায় মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। তাহার মামা সৌরেনবাবু ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে 'লণ্ডন ষ্টোরের' কেরাণী। দশটা-পাঁচটা কলম পিষিয়া ও বড় সাহেবদের মন জোগাইয়া মাসান্তে যাহা 'জলপানি' পাইতেন তাহা দ্বারা কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইতেন। সংসার ছোট্ট। সৌরেন-বাবু ও তাহার স্ত্রী, মা ষষ্ঠী বিমুখ হওয়ায় ছেলে মেয়ের বালাই নাই। দু'টি প্রাণীর একখানা ঘরেই চলিয়া যাইত কিন্তু ভাগিনেয় প্রমথেশের জন্য দু'খানা ঘর এক সঙ্গে ভাড়া করিতে হইয়াছে। বি-এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বেই প্রমথেশ শ্রীঘরের বাসিন্দা হইয়াছিল। আজ সে মুক্তি পাইয়াছে। প্রমথেশ মনস্থ করিল কলিকাতায় একবার মামার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ী যাইবে।

বেলা তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশে জমাট-বাঁধা মেঘ, রৌদ্রের প্রখরতা নাই বলিলেই চলে। আজ সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তাহার ভাগ্যদেবতার অনুকূলে। বহু পরিচিত বাড়ীটার দরজার কাছে আসিয়া প্রমথেশের বুকখানা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বন্ধ দরজার কড়া নাড়িল।

একটি যুবক দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কাকে চান?

—সৌরেনবাবুকে, আমি তার ভাগ্নে!

যুবক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—সৌরেনবাবু! সৌরেনবাবু নামে এ বাড়ীতে কেউ নাই ত!

প্রমথেশের শরীরটা যেন অবশ হইয়া গেল। অবশ্য এরূপ আশঙ্কা তাহার মনে অনেকবার হইয়াছিল; তথাপি নিরাশ না হইয়া কহিল—সৌরেন ভৌমিক যিনি ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের 'লণ্ডন ষ্টোরে' চাকুরী করেন। পাঁচ বছর আগে তিনি এ বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেন।

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল—ও! আপনি পাঁচ বছর আগের কথা বলছেন?—তা হ'তে পারে কিন্তু আমরা এ বাড়ীতে বছরখানেক যাবত আছি—এর আগে এখানে কে ছিলেন তা আমরা কি ক'রে জানব?—আপনি বরং আফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন।

প্রমথেশ ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের দিকে পা চালাইল। 'লণ্ডন ষ্টোরের' সাইন্ বোর্ডটা দেখিয়া তাহার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। আফিসে ঢুকিয়া একজন কেরাণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল, প্রায় বছর দুই পূর্বে ষ্টুয়ার্ট সাহেব সৌরেনবাবুর চাকুরী খতম করিয়া দিয়াছে; বর্তমানে তিনি কোথায় আছেন তাঁহারা বলিতে পারেন না।

মামা-মামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার আশা ত্যাগ করিয়া বাড়ী যাওয়া ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না, সরকারের কৃপায় গাড়ী ভাড়ার টাকা তাহার পকেটে আছে, সুতরাং মাভৈঃ!

যথাসময়ে টিকেট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী ছুটিতেছে দ্রুতগতিতে। বহু দিনের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। প্রমথেশ হিসাব করিয়া দেখিল, প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পূর্বে সে মা-বাবাকে নমস্কার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। বাবা বারবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, পরীক্ষা নিকটবর্তী, কাজেই পড়াশুনায় যেন অবহেলা না হয়। পাশ করা চাই। পরীক্ষায় ফেল করিলে দুঃখের সীমা থাকিবে না। তাহারা গরীব। আরও কত কি!

মা বলিয়াছিল—পরীক্ষার আগে আর একবার বাড়ী আসতে ভুল করিস্ না। বাড়ী এলে পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে না। দশদিন অন্তর চিঠি দিস্। চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়েছে, মাঝে মাঝে একটু দুধটুধ খাস্—বেশী রাত জাগিস্ না—ইত্যাদি।

প্রমথেশের এক ভাই আর এক বোন। বোন প্রতিমার বয়স তখন মাত্র বার, অনেক দিন পূর্বেই ইজার ছাড়িয়া শাড়ী ধরিয়াছে। এখন আর স্কুলে যায় না, বাড়ীতে বসিয়া পড়া-শুনা করে। প্রতিমা ভারী চঞ্চল আর অভিমানী। এখন সে মার ডান হাত। নানা কাজকর্মে মাকে সাহায্য করে। কলিকাতা আসিবার সময় প্রমথেশকে আড়ালে ডাকিয়া ঠোঁটের দুই কোণে সাপের ফণার মত হাতের তালু দু'টি ঈষৎ বাঁকাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিয়াছিল—দাদা, তুমি বাড়ী আসার সময় কল্‌কাতা থেকে আমার জন্য লাল রংয়ের একখানা শাড়ী আনবে—ঠিক ও-বাড়ীর ঝরণার শাড়ীর মতন —ভুলে যেওনা আবার। টাকা যদি না থাকে মামার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিও। আনা চাই-ই কিন্তু। প্রতিমার চোখেমুখে দুষ্টামীর চাপা হাসি।

ছোট ভাই প্রদ্যোতের বয়স তখন আট। এত বড় ছেলে হইয়াছে তথাপি ওর দাপটে বাড়ীশুদ্ধ লোক অস্থির। রোজ স্কুল থেকে বাড়ীতে আসিয়া কোথায় যে বই ফেলিয়া রাখে তা সে নিজেই জানে না! কোন রকমে যা-হোক কিছু উদরস্থ করিয়া মাঠের দিকে দৌড়াইয়া যায়। সন্ধ্যার পরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর সে মন্থরগতিতে যেন একান্ত অনিচ্ছার সহিত বন্ধুবান্ধবের দল ছাড়িয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে। তারপর পড়ার সময় সমস্ত বাড়ীখানা খানাতল্লাসী করিয়া তাহার বই বাহির করিতে হয়। প্রদ্যোতের পড়িবার ঢং দেখিয়া প্রমথেশের মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি হয়। প্রমথেশ অনেকদিন প্রদ্যোতের পিঠে উত্তম-মধ্যম বর্ষণ করিত। এজন্য মা প্রমথেশকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সে যেন আর কদাপি প্রদ্যোতের গায়ে হাত না তোলে। প্রদ্যোৎ যে নেহাৎ ছেলে মানুষ তাহা তাহার বুঝা উচিত।

প্রদ্যোৎ আর যাই হোক, তাহাকে দিয়া অনেক সময় অনেক কাজ হাসিল করা যায়। হঠাৎ কোন জিনিষ বাজার হইতে আনিবার দরকার হইলে প্রদ্যোৎ বিনা আপত্তিতে একাই পোয়া মাইল পথ হাঁটিয়া বাজার করিয়া আসে। প্রমথেশের আর

ভাই নাই—এ একটি মাত্র ভাই। প্রমথেশের একটু অসুখ করিলে প্রদ্যোতের মুখখানা শুকাইয়া যায়, দুষ্ট হইলেও প্রদ্যোৎ স্নেহপ্রবণ। কলিকাতা আসিবার সময় প্রদ্যোৎ মা'র গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল,—"দাদা, কলকাতা থেকে আমার জন্য একটা ফুটবল নিয়ে আসবে।" প্রমথেশ মুখ বিকৃত করিয়া কহিয়াছিল—"কেবল খেলা দিনরাত কেবল খেলা —পড়াশুনা করতে হবে না? পড়ার কথা বললে মুখখানা যেন চুন হয়ে যায়।" প্রদ্যোৎ আর কিছু বলে নাই। মুখ-কাঁচুমাচু করিয়া মা'র পিছনে মুখ লুকাইয়াছিল।

প্রদ্যোৎ ছেলে মানুষ। প্রমথেশ হঠাৎ চমকিয়া উঠে। প্রদ্যোৎ এখন নিশ্চয়ই বড় হইয়াছে। তাহার চোখমুখের বালকসুলভ সরলতা হয়তো লুপ্ত হইয়াছে। আজ তার কত দুঃখ! পাড়ার ছেলেরা হয়তো তাকে বিনা দোষেই দু'ঘা লাগাইয়া দিয়াছে—চোখের জল মুছিয়া প্রদ্যোৎ বাড়ীতে আসিয়াছে। সে আজ একা। তার পিছনে দাঁড়াইবার কেহ নাই। প্রমথেশের বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসে। ট্রেন অবিশ্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে। আনন্দে, দুঃখে, আতঙ্কে প্রমথেশ একাকার হইয়া গেল। বহুদিনের পুরাণ স্মৃতি তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। উচ্ছ্বসিত চোখের জল স্থানাভাবে গড়াইয়া পড়িল গণ্ডস্থল বাহিয়া। প্রমথেশ কাপড় দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলে। ছিঃ তার মন এত দুর্বল! সে পুরুষ। চারিদিকের শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহাকে চলিতে হইবে সম্মুখে। সে যুবক কঠোরতাই তার জীবনের ব্রত। দুঃখ দৈন্যকে পদদলিত করিয়া হইবে তাহার প্রতিষ্ঠা।

প্রমথেশ ট্রেনের জানালার কাছে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দেখিল—চারিদিকে অন্ধকার আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট ছড়ান তারার মালা। আর লোহার গড়া ট্রেন আগাইয়া চলিয়াছে অন্ধকারকে অবহেলা করিয়া।

পরের দিন প্রমথেশ যখন স্বগ্রামে পৌঁছিল তখন সূর্য দেব পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়াছেন। রাস্তায় কোথাও লোকজন নাই। চারিদিকে যেন একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করিতেছে। ধীরে ধীরে পা চালাইয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া বারান্দায় উঠিল। লোকজনের সাড়া শব্দ নাই। কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিল একটা কুকুর। কুকুরটা প্রমথেশকে দেখিয়া বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া ঘরের মধ্য হইতে এক তরুণী দরজা খুলিয়া মুখ বাহির করিয়া বারান্দার দিকে তাকাইয়া আবার অদৃশ্য হইল। একটু পরেই বাহির হইলেন এক বৃদ্ধ যাহার মাথার চুল প্রায় সমস্তই পাকিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ কহিলেন,—কে?

প্রমথেশ পক্ককেশধারী বৃদ্ধকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল—ইনিই তাহার বাবা। প্রমথেশ নিঃশব্দে বৃদ্ধের কাছে গিয়া তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া কহিল,—"বাবা, আমি ফিরে এসেছি; কাল দমদম জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি।" বৃদ্ধ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অস্পষ্ট স্বরে মাত্র কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিলেন,—'প্রমথেশ বাবা ফিরে এসেছিস!' মুহূর্তে মধ্যে ঘর হইতে আরও দুইজন লোক বাহির হইলেন।

একজন প্রমথেশের মা, আর একজন পূর্বোক্ত তরুণী প্রমথেশের বোন প্রতিমা—যা প্রমথেশ প্রথম কল্পনাও করিতে পারে নাই। তারপর সুরু হইল কান্নার পালা। খবর পাইয়া পাশের বাড়ীর লোকজন দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাদের বাড়ীতে জড় হইল। প্রমথেশের চোখ দিয়া কখন যে জলের ধারা বহিয়াছিল এবং কখন যে তার গলার কাছে জামাটা খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে তাহা সে নিজেও টের পায় নাই। প্রমথেশের প্রত্যাগমন বার্তা বাতাসের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে একটি তের চৌদ্দ বছরের যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে ঢুকিয়া প্রমথেশকে নমস্কার করিল। যুবকের গায় একটা ছেঁড়া জামা, বগলে কয়েকখানা বই ও খাতা এবং হাতে একটা পেন্সিল। ছেলেটিকে দেখিয়াই প্রমথেশ বুঝিতে পারিল সে-ই তাহার একমাত্র ভাই প্রদ্যোৎকুমারের পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ। প্রদ্যোৎ মুখে কোন কথা বলিতে পারিল না। দাদার আকস্মিক আগমনবার্তা শুনিয়া স্কুল হইতে দৌড়াইয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। এতক্ষণে চোখের জল গণ্ডস্থল বাহিয়া মনের গোপন আবেগ ব্যক্ত করিতেছিল

প্রমথেশের সুখের দিনগুলি গড়াইয়া চলিল। বৃদ্ধ বাপ-মা তাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল সন্তানটিকে বহুদিন পরে কোলের কাছে পাইয়া আবার নিভে-যাওয়া আশার দীপ জ্বালিয়া শেষ জীবনের সুখময় স্বপ্ন দেখিলেন।

প্রমথেশের বাবা পবিত্রবাবু জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন; তাছাড়া পৈতৃক বিষয়-আশয় ছিল

পবিত্রবাবু নিকটবর্তী শহরে এক কোটিপতি মারোয়াড়ীর পাটের আফিসে চাকুরী করিতেন। এদিক সেদিক করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় হইত। উৎসব অনুষ্ঠানে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন। এদিকে পাটের বাজার মন্দা হওয়ায় সময় থাকিতে চতুর ব্যবসায়ী মারোয়াড়ী পাটের কারবার গুটাইয়া তার পরিবর্তে চাউলের কারবার দিয়াছেন। কিন্তু সেখানে পবিত্রবাবুর স্থান হয় নাই। আজ তিন বছর পবিত্রবাবু বেকার।

পবিত্রবাবু বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চাকুরীর জীবনে যত আয় তত ব্যয় ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন প্রমথেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইলেই তিনি চাকুরীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি হইতে অবসর লইবেন। ঘটনাচক্রে তাহার আশা দুরাশায় পরিসমাপ্তি পাইয়াছে।

বর্তমানে সংসার একপ্রকার অচল। তার উপর প্রতিমাকে বিবাহ দিতে হইবে। প্রতিমার দিকে চাহিলেই যেন পবিত্রবাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। বর্তমান সভ্যজগতের মানদণ্ড অর্থাৎ টাকা পয়সার অভাবে প্রদ্যোতের পড়াশুনাও বন্ধ হইয়া যাইত কিন্তু সহৃদয় [illegible]মাষ্টার মহাশয়ের দয়ায় প্রদ্যোৎ এখনও স্কুলে যায়।

বাড়ী-ঘরের চেহারা দেখিলে বুক ফাটিয়া কান্না আসে।

পবিত্রবাবু পৈতৃক ঘরখানা কোনরকমে জোড়াতালি দিয়া খাড়া রাখিয়াছেন। ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকে চট ঝুলিয়াছে এবং কাঠের খুঁটির স্থান বাঁশের খুঁটি দখল করিয়াছে। যাহাতে দারিদ্র্যের নগ্নরূপ প্রতি মুহূর্তে লজ্জাহীনের মতন সকলের চোখের সামনে হাজির হয়।

বাপ-মা প্রমথেশের মুখের দিকে চাহিয়া সাময়িকভাবে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। দুঃখকে অনাদর করিলেও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন সে কখনও ভুলিয়া যায় না। পাঁচ বছর জেল ভোগের পর মাত্র এক মাস বাড়ীতে থাকিয়াই প্রমথেশ সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। পবিত্রবাবু একদিন প্রমথেশকে কাছে ডাকিয়া জলভরা চোখে তাহাদের আর্থিক অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। কিছুক্ষণ চোখের জল মুছিয়া কহিলেন,—"প্রতিমার কথা মনে পড়লে মাটীর সঙ্গে যেন মিশে যাই। এখন যেন-তেন প্রকারে বিয়ে না দিলেই নয়। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে পল্লীগ্রামেও অনেক সভা-সমিতি হয়েছে, অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা হয়েছে, সমাজ-কর্তারা চমৎকার বুলি আওড়াতে ত্রুটি করেন নাই। খবরের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পণ-প্রথার কুফল সুস্পষ্ট-ভাবে লেখা হয়েছে কিন্তু দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে। আসল কথা ধ্বংসের যূপকাষ্ঠে মাথা রেখেও সমাজের চোখ ফোটেনি। আজ ঘরে ঘরে কুমারীদের ও হতভাগ্য মা-বাপের দীর্ঘনিশ্বাসে বাতাস দূষিত হয়েছে, কিন্তু এই অবিচারের বিরুদ্ধে, এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এ প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে কে সাহস করে দাঁড়ায়? যাঁরা সভা-সমিতিতে উত্তেজনার বশে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে জোর গলায় বক্তৃতা করেন, তাঁরাই আবার ছেলে বিয়ে দিবার সময় কন্যার বাপের শেষরক্তবিন্দুটুকু শুষে নিতে কার্পণ্য করেন না।"

পবিত্রবাবু হঠাৎ অন্যমনস্ক হইলেন। প্রমথেশ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ও ঘরে প্রতিমা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের একটা দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। দৃশ্যে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও মনভুলান মাদকতা আছে—যার নেশায় অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মানসিক দুঃখ-কষ্ট দূরে সরিয়া যায়। পাঁচ সাত বছরের দুইটি ছেলের সঙ্গে পথের মাঝে দেখা, পূর্বের মনোমালিন্যের জের টানিয়া প্রথমে বচসা ও পরে শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় ঐ পথে যাইতেছিলেন। তিনি উহাদের অজ্ঞাতসারে বীরযুগলের কান টানিয়া ধরিলেন। অকস্মাৎ বাঘের কবলে পড়িয়া শৃগাল শিশুদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। দৃশ্যটা দুঃখপূর্ণ হইলেও প্রতিমা একাকী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময় প্রমথেশও ঘরে ঢুকিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল। প্রমথেশকে হাসিতে দেখিয়া প্রতিমা বলিল—তুমি হাসছ কেন দাদা?

প্রমথেশ কহিল—যে যুগে উদার জাপান বিরাট চীন জাতির অজ্ঞতা দূর করার জন্য তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার গোলা-বারুদ, বিষাক্ত গ্যাস, বিমান প্রভৃতি অকাতরে খরচা করলে, সে যুগে আমি তোর হাসিতে সায় দিয়েও একটু সহানুভূতি প্রকাশ না করলে সভ্য-জগতে স্থান হবে কেন? আসল কথা, প্রমথেশের হাসিতে সহানুভূতি ছিল না, মোহও ছিল না—ছিল শুধু সামাজিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার অবজ্ঞা। বাবার কথার শেষের শব্দগুলি তাহার প্রাণে বার বার আঘাত করিতেছিল। স্বার্থের সংঘাতে মানুষের ছদ্মবেশটুকু আলগোছে খসিয়া পড়ে। তখনই হয় তার সত্যিকারের পরিচয়, প্রমথেশের মুখে অবজ্ঞার হাসি।

দুইমাস অবাধে কাটিয়া গেল। অভাবের তাড়নায় বাপ-মা, ভাই-বোনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রমথেশ বাহির হইল অর্থের অন্বেষণে। ভাড়ার টাকা ছাড়া সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু অমরের মেসে আস্তানা গাড়িল।

প্রায় মাসখানেক যাবৎ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নানা ছোট-বড় অফিসের দরোয়ান হইতে বড় সাহেবের খোসামোদ করিয়া এবং গাদা-গাদা দরখাস্ত লিখিয়াও যখন কোথাও চাকুরী জুটিল না, তখন প্রমথেশ নিরাশ হইয়া পড়িল।

সে দৈনিক খবরের কাগজগুলির কর্মখালির পাতাটা রোজই অন্ততঃ তিন চারবার পড়িয়া একপ্রকার মুখস্থ করিয়া ফেলে কিন্তু সর্বত্রই নিষ্ফল। প্রমথেশ আজ খবরের কাগজে দেখিল, এক বীমা কোম্পানীতে একজন কেরাণীর পদ খালি আছে—মাহিনা যোগ্যতা অনুসারে ত্রিশ হইতে চল্লিশ মুদ্রা; মাহিনা যাই হোক, তাহার একটা চাকুরী চাই-ই। তাড়াতাড়ি স্নান-আহার করিয়া একখানা দরখাস্ত লিখিয়া, দরখাস্তখানা নিজে কয়েকবার পড়িয়া ও পরে অমরকে দেখাইয়া নির্ভুল সম্বন্ধে দ্বিধাহীন হইয়া বেলা এগারটার পূর্বেই ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল, তাহার মতন আরও প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন বেকার সেখানে ইতিমধ্যেই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সংবাদ লইয়া জানিল, কোম্পানীর ম্যানেজার এখনও আসেন নাই; তিনি আসিয়া নিজে লোক মনোনীত করিবেন।

একথা-সেকথায় প্রমথেশ জানিতে পারিল, এই দুর্ভাগাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী সন্তানও আছে। তাহার অজ্ঞাতসারে একটা উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। হায়রে দুর্ভাগা দেশ। আজ রত্নগর্ভা বাঙলার সন্তানগুলি দুমুঠো ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, আবার এরাই কোন স্বাধীন দেশে জন্মিলে হয়তো এদের কর্মকুশলতায় সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইত। না, দেশ বা দশের অবস্থার কথা প্রমথেশ আর চিন্তা করিবে না, তাহার চিন্তাধারা শুধু তার নিজস্ব ষোল আনা স্বার্থের গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ থাকিবে। নিজের স্বার্থের জন্য সে ভুলিয়া যাইবে অপরের দুঃখ।

কোম্পানীর গেটের কাছে একখানা গাড়ী থামিল। গাড়ী হইতে নামিলেন দুইজন লোক। সাহেবী পোষাক পরিহিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আর একজন বাঙালী পোষাকে

ফিট্-ফাট যুবক। যুবকটিকে দেখিয়া প্রমথেশের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যুবকটি তাহার সহপাঠী মিহির, একসঙ্গে কলেজে পড়িয়াছে। বহুদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা, প্রমথেশ মিহিরের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। দারোয়ানের অভিজ্ঞ হাতের এক ধাক্কায় প্রমথেশ দেওয়ালের সঙ্গে আলিঙ্গন করিল। দারোয়ান দুই হাত দিয়া ভীড় ঠেলিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। মিহির ও প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরে উঠিয়া গেলেন।

দারোয়ান স্বেচ্ছায় উপস্থিত জনতাকে জানাইয়া দিল যে, ঐ যুবকটির কাকা সাহেবী পোষাকধারী ভদ্রলোক এই কোম্পানীর ম্যানেজার; এখন তিনি কর্মপ্রার্থী সকলকেই একে একে তলব করিবেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রমথেশের শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। সুপ্ত আত্মসম্মান রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। হঠাৎ কে যেন এক ফুৎকারে নিভাইয়া দিল তাহার মনের কোণের ক্ষণিকের জ্বালা আলোটুকু।

প্রমথেশ রুদ্ধশ্বাসে রাস্তার দিকে রওনা হইল এবং পিচের রাস্তায় পা দিতেই এক পাঞ্জাবীর ট্যাক্সিতে ধাক্কা খাইয়া প্রমথেশ নীচে পড়িয়া গেল।

তারপর কি হইয়াছে, তাহা প্রমথেশ বলিতে পারে না। পরের দিন হাসপাতালে জ্ঞান ফিরিলে নার্সের মুখে শুনিল তাহার বুকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, বর্তমানে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

প্রমথেশ ভাবিতেছিল, বাঁচিয়া থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করার চেয়ে মরিয়া গেলেই ভাল হইত। মৃত্যুর এমন সুযোগ জীবনে কদিন হয়, না—না, তাহাকে বাঁচিতেই হইবে, বাপ-মা, ভাই-বোনের আশার প্রদীপটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এখনও মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

নার্স আসিয়া কহিল—'আপনার যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রমথেশ মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না।'

'তবে কাঁদিছেন কেন?'

প্রমথেশ অবশ-প্রায় ডান হাতখানা তুলিয়া কাপড় টানিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—'কিছু না।'

মাঝির গান

(১৫১ পৃষ্ঠার পর)

মন ভাইয়া কেমনে যাবিরে তুই,
ভব নদী বাইয়া
আগার মাঝ পাছায় গেইলে,
গলই পড়্বে খইয়া॥
দীক্ষা শিক্ষা না কইর্যা
আগে কর্লি এক বিয়া
বিনা খতে নফর হইলি,
পাইঠের টাকা দিয়া রে॥

সংসারের মায়ায় পড়িয়া মানুষ মনে মনে অনুশোচনা করে। এতদিন সে যাহাকে আপন ভাবিয়াছিল, সে তাহার আপন নয়—সকলে নিজের স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়।

অবোধ মন,
কার বা জন্যে বাঁধলাম রে এই বাড়ী ঘর।
যারে ভাবি আপন আপন,
সে আমারে ভাবে পর॥

ঘর পাইয়া ঘুমাইয়া রইলি,
না হইলি হুসিয়ার।
যেদিন সাধের এ দেহ পইড়্যা রবে,
শৃগালে কর্বে মাংস আহার॥

এ সংসারে কেহ কাহারও নয়। মিছা মায়ার মোহে ভুলিয়া আমরা স্বার্থ খুঁজিয়া ফিরি। শেষের পরিণতির দিকে চাহি না। আমাদের বড় সাধের টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী সব পড়িয়া থাকিবে। শেষের সাথী একমাত্র শ্রীভগবান।

সাধের জাগা জমি ঘর বাড়ী,
ভাই বন্ধু টাকা কড়ি,
সবই শেষে পইড়্যা র'বে,
সঙ্গে যাবে হরি বা হর—
অবোধ মন, কার বা জন্যে বাঁধলাম রে
এই বাড়ী ঘর॥

আসামের রূপ

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পাঁচ বৎসর পরে আবার আসামের পথে রওয়ানা হইলাম, তবে সেদিনকার আসাম যাত্রায় আর আজকের যাত্রায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তখন গিয়াছিলাম ভাগ্যান্বেষণে, আর আজ যাইতেছি নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। সেদিন যে গুরুভার মনের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম আজ আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সত্যই বিদায়ের পূর্বে এক অভূতপূর্ব মুক্ত আনন্দে মন আমার ভরপুর হইয়া উঠিল। সেদিন কর্মচেষ্টা আর ভাগ্যচিন্তার অবকাশে আসামের যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার মোহ এতদিনেও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, তাই যে অতৃপ্ত দর্শন পিপাসা লইয়া সেদিন ফিরিয়াছিলাম, আজ তাহা পূর্ণ হইতে বসিয়াছে বলিয়াই যেন প্রাণ আরও আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছিল।

শীতকালটাই আসাম বেড়াইবার উপযুক্ত সময়, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও শীতে বাহির হইতে পারিলাম না, ফাল্গুনের শেষে (১৩৪৪ সাল) একদিন গভীর রাত্রে আসাম বেঙ্গল রেল লাইনের সুরমা মেলে চাপিয়া আসামের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করিলাম। কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া যখন ভোর হইল, তখন শ্রীহট্ট অতিক্রম করিয়াছি, কাছাড় জেলাও প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, গাড়ী পার্বত্য অঞ্চলের (hill section) মাহুর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া। কামরার যাত্রী সকলেই আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু আমার ঠিক পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন যুবককে লক্ষ্য করিলাম, তিনি সারা-রাত ঠায় বসিয়া আছেন, বেঞ্চে যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও একটি বারের জন্যও নিদ্রা যান নাই। আমি তাঁহার দিকে চাহিলে তিনিও তাঁহার গোল গোল ছোট চক্ষুদুটি দ্বারা নিঃশব্দে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। গাড়ী মাহুর ষ্টেশনে থামিলে সম্মুখের জানালাটি খুলিয়া দিলাম, প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কামরার বস্ত্রাবৃত যাত্রীদের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

রাত্রির বাতির আলোতে পাশাপাশি বসিয়াও যাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় নাই, দেখিলাম দিনের আলো তাহাকে অপরিচিত রাখিতে রাজি নয়, হাসিমুখে উভয়েই উভয়ের মামুলী পরিচয় লইতে লাগিলাম, দেখিলাম আমার আন্দাজ মিথ্যা নয়—পার্শ্বস্থিত বন্ধু বাঙালী নহেন, কাছাড়ী। তিনি শিলং মিশনারী স্কুলের ছাত্র, সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ঘরে ফিরিতেছেন। মধ্যে আর একটি ষ্টেশন, তাহার পরই মাইবং-এ নামিবেন, ষ্টেশনের কাছেই বাড়ী। তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হইতে বেশী সময় লাগিল না। আমি বেড়াইতে যাইতেছি এবং পাহাড়ী জাতিগুলির তথ্য অনুসন্ধানে উৎসাহী জানিয়া তাঁহার নিজের জাতি সম্বন্ধে অনেক কথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অধিকাংশই তাঁহার স্বজাতির অভাব-অভিযোগ এবং তাহাদের প্রতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের ঘৃণা ও অবহেলার কথা। কথা প্রসঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, পাহাড়ের অধিবাসী হইলেও মহাভারতের যুগ হইতেই তাহারা সুসভ্য বলিয়া জগতে পরিচিত। প্রাচীনকালের দুই-একজন কাছাড়ী রাজার কীর্তি-কাহিনীও শুনাইতে ছাড়িলেন না। শেষে দুঃখ করিয়া বলিলেন,—অদূর ভবিষ্যতে এ জাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে কি না সন্দেহ, অধিকাংশই নাকি এখন মিশনরীদের প্রলোভনে ভুলিয়া খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছে। বন্ধু মিশনরী স্কুলে পড়িলেও এখন পর্যন্ত হিন্দুই আছেন বুঝিলাম। বলিলাম, "সমাজে আপনাদের মত শিক্ষিত লোকেরা থাকিতে ওদেরে খৃষ্টান হতে দেন কেন?" উত্তরে বন্ধু বলিলেন,—"জাতটা বড় গরীব হয়ে পড়েছে, পেটভরে সকলে খেতে পায় না, তাই সহজেই প্রলোভনে পড়ে, তবে চেষ্টা চলছে ভিতরে

আসাম ট্রাংক রোডের একাংশ— ...
পার্শ্বস্থ বন-বনানী ও ঢিবি-টিলা লক্ষ্য করিবার বিষয়

ভিতরে, প্রকাশ্যে কিছু ত করবার উপায় নাই, পলিটিকেল এজেন্টের রাজত্ব।"

মাহুর ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িলে বন্ধু জানালার-কাছে আগাইয়া গিয়া তাঁহার দেশের ছবি দেখিতে লাগিলেন। সে কি আনন্দ! বোধ হয় দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশের রূপ তাঁহার প্রাণে আনন্দের বন্যা বহাইয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলা অতিক্রম করিয়া কাছাড় সুরু হইতেই গাড়ী অনবরত পর্বতের উপর উঠিয়া চলিয়াছিল। এখন কখনও

ঠিয়া কখনও নামিয়া পাহাড়ের গায়ে সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে, রাস্তা এত আঁকা-বাঁকা যে এ-পথের অসংখ্য লোহ সেতু পর্যন্ত কোথাও কোথাও বক্রাকারেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিলাস পর্বতের দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথে গাড়ী প্রবেশ করিয়া অমাবস্যার রজনীর কথা মনে করাইয়া দিতে লাগিল।

রাস্তার দুই পাশে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির মধ্য দিয়া যে ছোট ছোট পার্বত্য নদীগুলি আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে তাহাদের দুইতীরে কাছাড়ীদের ধানের জমি প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ নাকি এরূপ চাষের প্রচলন হইয়াছে, আগে জুম কৃষিই কাছাড়ীদের একমাত্র চাষ ছিল। নদীগুলিতে জল নাই, ছোট বড় অসংখ্য প্রস্তর আর সমূল বৃহৎ বৃক্ষসকল ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বন্ধু বলিলেন, পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে এই নদীগুলিতে কিছু সময়ের

চা-বাগানে কুলি-রমণীরা পাতা তুলিতেছে

ন্য প্রলয়কাণ্ড সুরু হয়, কিন্তু বর্ষণ বন্ধ হওয়ার তিনঘণ্টা রেই আবার জলশূন্য নিতান্ত নিরীহ মূর্তি ধারণ করে

বর্ষার শেষভাগে এসব জমি চাষ করিয়া বীজ বপন করা য়। বীজ বপনের পর পাহাড়ে বর্ষণ হইলে যে ফসলের অবস্থা ক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বপনের পর আবার এসব ালিময় জমিতে জল-সেচন না করিলে ফসলের আশা বৃথা, এজন্য কাছাড়ী কৃষকেরা প্রত্যেক জমির পার্শ্বে নদীতে বাঁধ দয়া জল আটকাইয়া রাখে।

মাহুর হইতে মাইবং মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা, এ সময়টুকু দখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, কাছাড়ী বন্ধুর সহিত বেশী ময় কথাবার্তা হইল না, এজন্য বড়ই আপশোষ হইতে াগিল। বন্ধু বিছানাপত্র বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন, এর মধ্যেও গছাড়ী রাজার সময়ের দুই একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকা বাড়ী ও রল লাইনের অদূরে মাইবং-এ শেষ কাছাড়ী রাজপ্রাসাদের গ্নপ্রাপ্ত সিংহদ্বার অঙ্গুলী নির্দেশে দেখাইলেন।

বন্ধু গাড়ী হইতে নামিবার পূর্বে হাত জোড় করিয়া নমস্কার রিলেন এবং ফিরিবার পথে তাহার বাড়ীতে [illegible] তথ্য গ্রহণ রিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। আমার নোট বই-এ নিজেই তাহার নাম ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিলেন, ফিরিবার পথে মাইবং-এ পৌঁছিবার দুই একদিন আগে যেন একখানা কার্ড লিখি, তবেই তিনি পলিটিকেল অফিসারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি-পত্র লইয়া রাখিবেন এবং নিজে আসিয়া আমাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবেন।

বন্ধুকে বিদায় দিতে গাড়ীর দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম। ক্ষিপ্রতার সহিত মালকোঁচা মারিয়া বন্ধু নিজেই ছোট বিছানা ও ট্রাঙ্কটি একটি চামড়ার বেল্ট দ্বারা পিঠে বাঁধিয়া লেণ্টার্ণ ও টিফিনকেরিয়ারটি দুইহাতে ঝুলাইয়া লইলেন, তারপর আমার দিকে আর একবার হাসিমুখে চাহিয়া আস্তে আস্তে পা চালাইলেন, আমাদের গাড়ীও তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বন্ধু আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"মনে রাখিব, ফিরিবার সময় আমার ঘর যাব।" আমিও মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম, আর যতক্ষণ দেখা গেল দরজায়

তেজপুরে সীমান্তে রমণীয় দৃশ্য—
পশ্চাতে পাহাড়ের পটভূমি—দক্ষিণে-বামেও উচ্চ পর্বত—
মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক হ্রদ

দাঁড়াইয়া আমার একঘণ্টার বন্ধুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু তখন প্রিয়জনদের সহিত মিলনাশায় ব্যাকুল হইয়া দ্রুত-গতিতে ঘরের দিকে চলিয়াছেন।

ক্রমে প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্যালোকে পর্বত-চূড়াগুলি হাসিয়া উঠিল, চারিপার্শ্বের নব-পল্লবিত সবুজ-বনানী প্রভাতের নবীন আলোকে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এক একটি অগ্নিতে ভস্মীভূত পাহাড় অতীতের চিহ্ন-স্বরূপ কঙ্কালের মত কয়েকটি অর্দ্ধদগ্ধ বৃহৎ বৃক্ষ বুকে লইয়া দেখা দিতে লাগিল। মনে হয় চারিদিকে নব-বসন্তের উৎসব পানে চাহিয়া যেন ইহারা ব্যর্থতায় হাহাকার করিতেছে। কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ফলে, শস্যে ভরিয়া উঠিবে ইহাদের বুক, হাসিয়া উঠিবে ইহাদেরও সারা দেহ পূর্ণ সফলতায়, এজন্যই কাছাড়ীরা তাহাদের এই জুম ক্ষেত্রগুলিকে এখন এমন নির্মমভাবে কাটিয়া পুড়াইয়া নব-বসন্তের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

আঁকা-বাঁকা পথে আরও কয়েকটি সুড়ঙ্গ অতিক্রম

করিয়া আরও কতকগুলি প্রস্তরময় পার্বত্য নদী পার হইয়া বেলা প্রায় নয়টায় লামডিং-এ পৌঁছিলাম।

নিতান্ত অনিচ্ছা এবং অস্বস্তিতে তিনটি ঘণ্টা লামডিং-এ কাটাইয়া বেলা বারটায় আবার আসাম মেলে চাপিয়া উপর আসামের পথে রওয়ানা হইলাম। আবার সেই পাহাড়, জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ীদের জুম। এবার নাগা পাহাড়ের পাশ দিয়া চলিয়াছি, ইহাই আসামের প্রসিদ্ধ গুইদালো রাণীর দেশ। কোথাও জুমে বা জংলী রাস্তা হইতে দুই একটি অর্দ্ধ উলঙ্গ নাগা স্ত্রী-পুরুষ কৌতূহলী দৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া আছে, কোথাও গাছের ফাঁকে ফাঁকে নাগা বালক-বালিকা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, আবার কোথাও বিভীষিকাময় গভীর জঙ্গল মানব বসতির অসম্ভাব্যতার কথাই মনে করাইয়া দিতেছে। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে এসব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম আর সভ্য সমাজের ঘৃণ্য এই জংলী নাগা জাতির কথা ভাবিতে লাগিলাম, ইহাই সেই তেজস্বিনী তরুণী গুইদালো রাণীর জন্মভূমি, যাঁহার মুক্তিমন্ত্রে সমগ্র নাগা পাহাড়ে একদিন তুমুল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। জানি না কারাপ্রাচীরের কোন্ অন্ধকার কক্ষে বসিয়া আজ গুইদালোর ব্যর্থ যৌবন কৃতকর্মের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। নাগা পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া চলিতে চলিতে গুইদালোর কথা মনে করিয়া নিজের অজ্ঞাতেই এই অসভ্য জংলী মানব সমাজটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল।

এখানে ষ্টেশনগুলি বেশ দূরে দূরে, তাহাও আবার মেল গাড়ী বলিয়া সব ষ্টেশনে আমাদের ট্রেন ধরিতেছিল না। কয়েকটি ষ্টেশন পরে পরে দুই-এক মিনিটের জন্য কোথাও কোথাও দাঁড়াইতেছিল মাত্র। কাজেই মনে হইতেছিল অনবরত শুধু চলিয়াছিই, এ-চলার বুঝি শেষ নাই। বেলা প্রায় চারটায় মণিপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, এখান হইতে মোটরযোগে মণিপুর যাইতে হয়। ষ্টেশনের কাছেই ডিমাপুর বাজার, এই ডিমাপুরেই মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-প্রসিদ্ধ ভীমনন্দন ঘটোৎকচের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত আছে।

সূর্য ডুবু ডুবু হইলে গাড়ী পাহাড়-জঙ্গল ছাড়িয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল একটানা চা-বাগান। গাড়ীর যাত্রিগণ যেন এতক্ষণ ক্লান্তিতে গা এলাইয়া দিয়াছিলেন এখন বৈকালিক স্নিগ্ধ হাওয়ায় আবার দেহ সজীব হইয়া উঠিয়াছে, প্রায় সকলেই জানালার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধরণীর সান্ধ্যরূপ দেখিতে লাগিলেন।

রাস্তার দুইপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে বিশাল প্রান্তরময় সারি সারি চা-গাছ, সবগুলি গাছের মাথা এক সমান করিয়া ছাঁটা, চলন্ত গাড়ী হইতে মনে হয় যেন পৃথিবী জোড়া একখানা বিরাট সবুজ গালিচা পাতিয়া রাখা হইয়াছে। কোথাও কুলী-রমণীরা পাতা তুলিতেছে, কোথাও বা কোদাল মারিতেছে; সকলেই ব্যস্ত, যে যত তাড়াতাড়ি পারিতেছে হাত চালাইয়াছে, সারাদিনের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি এই বেলা সারিয়া লইতে হইবে, নতুবা পেটভরা আহার জুটিবে না।

ক্রমে দিগন্ত প্রসারিত চা বাগানের উপর রাত্রির অন্ধকার প্রভাব বিস্তার করিয়া বাহিরের দৃশ্য চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিল, তবু মধ্যে মধ্যে বাগানের ম্যানেজার সাহেবদের বাঙলোর উজ্জ্বল আলো, আর কুলীবস্তীর সারাদিনের কর্মক্লান্ত শ্রমিকদের আনন্দ-কোলাহল ও বন্য নৃত্য-সঙ্গীতে জানাইয়া দিতেছিল চা-বাগান এখনও শেষ হয় নাই।

রাত্রি প্রায় দশটায় তিনসুকিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে ডিব্রুসদিয়া রেল-লাইনের গাড়ীতে চড়িয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জেলায় পৌঁছিতে হইবে, কিন্তু সে রাত্রিতে এ লাইনে আর গাড়ী নাই, কাজেই রাত্রিটির জন্য তিনসুকিয়াতেই আস্তানা গাড়িতে হইল।

আমার গন্তব্যস্থানের আর ২৫।২৬ মাইল মাত্র বাকী, এত কাছে আসিয়া বসিয়া থাকা বড়ই অসহ্য বোধ হইতেছিল। ভোরেই শয্যা ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিন্তু তখনও দুই ঘণ্টা বাকী, বেলা ৭টায় গাড়ী পাইব, এই দুইটি ঘণ্টা কাটান আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতে করিতে বারবার ঘড়ি আর আমার গাড়ীর পথের পানে চাহিতে লাগিলাম, অবশেষে যখন ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল তখন ঘোর কালো ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া সত্যই আমার সেদিনকার প্রিয়তম আসিয়া হাজির হইলেন।

আসামের চা-প্রধান জেলাগুলির মধ্যে লক্ষ্মীমপুর জেলা অন্যতম, আমাদের গাড়ী এখন লক্ষ্মীমপুর জেলার মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। কাজেই বলা বাহুল্য যে, আমরা এখনও চা-সমুদ্র পাড়ি দিতেছি। মাঝে মাঝে দুই-একটি বাজার ও বাগানের কুলীদের বস্তী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অল্প দূরে দূরে এক একটি ষ্টেশন, প্রতি ষ্টেশনেই চেকার উঠিয়া যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কোন কোন স্থানে দুইবারও টিকিট দেখা হইতেছে, আর শুধু কি দেখা! কেহ ত্রিকোণ কেহ চতুষ্কোণ কেহবা হরতন এরূপ নানা আকৃতির এক এক টুকরা প্রত্যেকেই কাটিয়া লইয়া যাইতেছেন। আমার তিন দিনের যত্নে রক্ষিত টিকিটখানির এই দুরবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল। শেষে যখন লাইনের শেষ ষ্টেশন সৈখোয়া ঘাটে পৌঁছিলাম তখন টিকিটের শুধু চারিদিকের বেড়াটিই অবশিষ্ট রহিয়াছে, মধ্যের জমি শূন্য। বোধ হয় আর দুই একটি ষ্টেশন থাকিলে টিকিটের এই অবশিষ্ট অংশটুকুও চেকারদের হস্তে দিয়া আমাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইত।

সৈখোয়া ঘাট হইতে সদিয়া মাত্র ছয়-সাত মাইল দূরে কিন্তু মধ্যকার প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদ সদিয়াকে এ-জগৎ হইতে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে দ্বীপান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষ্টেশন হইতে মোটরবাসে ব্রহ্মপুত্রের বালিচড়ার উপর দিয়া প্রায় পাঁচ মাইল গিয়া খেয়াঘাটে পৌঁছিলাম। অপর তীরে বৃটিশ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজধানী সদিয়া শহর দেখা যাইতে লাগিল, দূরত্বও বোধ হয় এক মাইল দেড় মাইলের বেশী

হইবে না, কিন্তু গাছ খোদাই করা সরু নৌকায় চাঁড়রা যখন পাড়ি দিতে বসিলাম তখন দেখিলাম রাস্তা আর ফুরাইতে চাহে না। অগভীর ব্রহ্মপুত্রের ভীষণ স্রোত ঠেলিয়া আর অসংখ্য বালুচড়ার ব্যূহ ভেদ করিয়া যখন সদিয়ায় পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। সদিয়া আমার অগ্রজ আর ভগিনীপতির কর্ম্মস্থল, কাজেই এখানে আমি অপরিচিত হইলেও নিতান্ত নগণ্য নহি, সগর্বে গিয়া ভগিনীপতির গৃহে উঠিলাম, কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম মূলে—আগে কোন খবর দিয়া আসি নাই, শুনিলাম এস্থানে নাকি কেহ পূর্বে হইতে খবর না দিয়া আসে না, কারণ পলিটিকেল অফিসারের অনুমতি ভিন্ন এ-জেলায় প্রবেশ নিষেধ, সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়া ভুল সংশোধন করিয়া আসিতে হইল।

পলিটিকেল এজেন্টের কয়েকটি প্রয়োজনীয় অফিস ও একটি সৈন্যনিবাস লইয়াই সদিয়া শহর, শহরের লোকসংখ্যা অতি অল্প কিন্তু প্রকাণ্ড তার কলেবর, একটি বৃহৎ সমতল ক্ষেত্রের উপর শহরটি অবস্থিত। দক্ষিণপ্রান্ত দিয়া প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদ বহিয়া যাইতেছে আর বাকী তিনটি দিক বেড়িয়া চলিয়াছে তিনটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী। শহরের চারিদিকে যেমন সবুজ খোলা মাঠের ছড়াছড়ি তেমনি মুক্তবায়ুর অবাধ চলাফেরা সারা শহরময়, আবার এ-শহর এবং শহর সীমান্তের প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্বদা আকর্ষণ করে দর্শক হৃদয়।

তিব্বত, চীন ও ব্রহ্ম হইতে স্থলপথে ভারতে প্রবেশের একটি সহজ এবং প্রধান দ্বার এই সীমান্ত জেলা, তাই এখানে এক হাজার গুর্খা সৈন্য মোতায়েন আছে। কয়েকজন বাঙালী কর্মচারীও এখানে আছেন, বাঙালীদের একটি ক্লাব আছে। প্রতি সন্ধ্যায় একবার সকলে এখানে মিলিত হইয়া থাকেন। ভারতের এই বিজন সীমান্তে বসিয়া জগতের সহিত নিজেদের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য ক্লাবে একটি রেডিও সেটও রাখা হইয়াছে দেখিলাম।

সদিয়া সীমান্ত জেলার চারিপার্শ্ব ঘিরিয়া আবর, মিরি, মিশমি প্রভৃতি কতকগুলি পাহাড়ী জাতি স্থায়ীভাবে বাস করে। শুধু আসামে যতগুলি পাহাড়ী জাতি আছে বোধ হয় সমগ্র ভারতের আর বাকী কয়টি প্রদেশ মিলিয়াও এত নাই। আসামের মধ্যেও সদিয়াই বোধ হয় একটি মাত্র জেলা যেখানে পাশাপাশি এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন আচার-নীতি বিশিষ্ট পার্বত্য জাতি বাস করে। প্রতি বৎসর শীতকালে সদিয়া শহরে পাহাড়ীদের ভিড় লাগিয়া যায়, তখনই তাহারা পাহাড়ের উৎপন্ন কস্তুরী, মোম, পশুর শিং চর্ম প্রভৃতি বিক্রী করিতে এবং তাহাদের সারা বৎসরের সওদা লইতে সদিয়ায় নামিয়া আসে। মারোয়াড়ীদের সঙ্গেই তাহাদের মেলামেশা বেশী, কারণ এখানকার আমদানী-রপ্তানির মালিক মারোয়াড়ীরাই।

সদিয়া হইতে কতকগুলি স্থায়ী ও শুধু শীতকালের জন্য নির্মিত অস্থায়ী রাস্তা পাহাড়ীদের আবাস পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিশমি পাহাড়ের ভিতর দিয়া তিব্বতের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সত্তর মাইল দীর্ঘ "লোহিতভেলী রোড্" নামক রাস্তাই প্রধান।

সদিয়ায় আমাকে তিনদিন বিশ্রাম লইতে হইল। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সমতল ভূমিতে অবস্থিত এই জনবিরল শহরটি আমার বড়ই ভাল লাগিল, বিশেষভাবে প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের সহৃদয়তা সহজেই আমাকে তাহাদের স্নেহপাশে বাঁধিয়া লইয়াছিল। (ক্রমশ)

ক্রন্দসী

(১৬৯ পৃষ্ঠার পর)
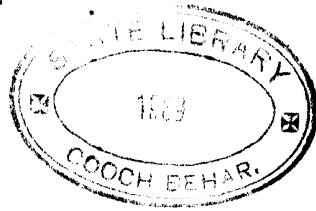
হইতে বিরক্তির মেঘখানা কোথায় সরিয়া গেল। আবার মনে হইতে লাগিল, আকাশ ঘন নীল, বাতাসে যেন কি এক মাদকতা। কাল সঙ্গিনীদের কঠোর ব্যবহারে এবং নীরব তাচ্ছিল্যে বিদায় করিয়া দিয়াছে এতক্ষণে মনে পড়ায় মনটা অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে ঠিক করিল, আজই তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া সে ব্যবহারের গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া লইতে হইবে। কি এক মন্ত্রবলে মনটা এমন হাল্কা, এমন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার সকলকেই মিষ্ট কথা বলিতে সকলকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করিতেছে। দরজার পাশে মা দাঁড়াইয়াছিলেন। হাসিমুখে কহিলেন, রাগ ভাঙ্গল?

যাঃ, কি যে বল'—সলজ্জ হাসিমুখে ইভা তথা হইতে ছুটিয়া পালাইল। মা একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কার্যান্তরে গেলেন। (ক্রমশ)

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

দেবেনবাবু গভীর মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। টেবিলের একপাশে বরফজলের একটা টামব্লার, বাঁধারে প্লেটে কতকগুলি খড়কের কাঠি।

উৎসাহের বন্যা যখন তাঁর সাহিত্যিক হৃদয়ের দুইকূল ছাপাইয়া উঠে তখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখিয়া যান; কলম চলিতে থাকে গণেশের লেখনীর মতন দ্রুতগতিতে।

বরফজল ও খড়কের কাঠি দেবেনবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান দুইটি উপকরণ। লিখিতে লিখিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক একবার টামব্লার ধরিয়া চুমুক দেন আর ভাব-ধারায় বাধা পাইলেই কাঠি দিয়া দাঁত খুঁচিতে আরম্ভ করেন।

তাঁর দাঁতের শিরার সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ কতটা তাহা অবশ্য বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য, কিন্তু ইহা সত্য যে দাঁতের গোড়ায় খোঁচা লাগিলেই দেবেনবাবুর রুদ্ধ ভাবধারা কলমের অগ্রভাগ দিয়া মুক্তির সন্ধান পায়।

তাঁর লেখার সময় কাহারও এমন-কি প্রতিমারও সে ঘরে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু দাক্ষায়ণীর সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিতে তিনি কখনও সাহসী হন নাই।

তবে সেদিক হইতে আশঙ্কাও বিশেষ কিছু ছিল না। স্বামীর সাহিত্যসেবার সঙ্গে দাক্ষায়ণী বরাবরই অসহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছেন।

কয়েকবার দাঁত খুঁচিয়া এবং জল খাইয়া দেবেনবাবু সবেমাত্র চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠা লিখিতে সুরু করিয়াছেন এমন সময় দরজার কাছে শোনা গেল, দাক্ষায়ণীর কণ্ঠস্বর—

'কী আস্পর্দ্ধা, কত বড় সাহস।

দেবেনবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, মানুষের সব জিনিষেরই একটা সীমা থাকা উচিত।

দেবেনবাবু আজ সবেমাত্র লিখিয়াছেন তের পৃষ্ঠা। পূর্ব্বে কতবার এক সঙ্গে কুড়িপাতা লিখিয়াছেন, তখন ত সীমার কথা ওঠে নাই.

দাক্ষায়ণী বলিলেন, কী নির্লজ্জ।

দেবেনবাবু ব্যস্ত সমস্তভাবে বলিলেন, এ্যাঁ, তুমি ডাকছিলে বুঝি?

দাক্ষায়ণী কহিলেন, অতনু একটা নচ্ছার প্রকৃতির লোক।

দেবেনবাবুর যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। তিনি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়।

দাক্ষায়ণী বলিলেন অতনু একটা ধাপ্পাবাজ।

সোৎসাহে দেবেনবাবু বলিলেন, স্কাউণ্ড্রেল আমি তোমার সঙ্গে একমত, দক্ষ।

দাক্ষায়ণী স্বামীকে ধমক দিলেন, 'আবার দক্ষ।'

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনের আনন্দে প্রৌঢ়া স্ত্রীকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া পূর্ব্বেই জিভ কাটিয়াছিলেন। ধমক খাইয়া বলিলেন, না, না ওটা ভুল হ'য়ে গেছে। অতনু অত্যন্ত খেলো ধরণের লোক।

খেলো বললে তাকে সম্মান করা হয়। সে একটা ছুঁচো।

দেবেনবাবু সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়া আপন মনে বলিলেন, না হলে আর লোকের গোঁফ পোড়ায়।

দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি ক'রেছে, জান?

জানিনা বললে বিপদ, জানি বলাও চলে না। এই বিষয়ে জ্ঞানের আশায় তাই তিনি সহধর্ম্মিণীর মুখের দিকে চাহিলেন।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, কোন খবরই তুমি রাখবে না। যাকে জামাই করবে বলে স্থির হয়েছে, তার সম্বন্ধে মেয়ের বাবার খবর নেওয়া উচিত।

দেবেনবাবু নীরব।

দাক্ষায়ণী পুনরায় কহিলেন, অতনু দীপাকে নিমন্ত্রণ খাইয়েছে অথচ প্রতিমাকে বলেনি। কী অকৃতজ্ঞ।

দেবেনবাবু মন্তব্য করিলেন, অকৃতজ্ঞতা ওর মজ্জাগত।

শুধু কি খাওয়ান? আজকাল উভয়ের একত্রে মোটর-বিহার চলছে।

এতদূর?

হ্যাঁ।

তুমি জানলে কি করে?

গুপ্তচরগিরি ক'রে জেনেছি। মেয়ের মা হলে অনেক খবরই তাকে রাখতে হয়। এ-ত আর সাহিত্য করা নয় যে, সব জিনিষের দিকে চোখ বুজে থাকলেই চলবে।

দেবেনবাবু কোন উত্তর করিলেন না।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, বুঝলে কালি-কলম দিয়ে কাগজের ওপর আঁচড় কাটার কুফল?

দেবেনবাবু কলমের আঁচড়ের অধিকতর কুফল জানিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য রেহাই পাইল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, সেদিন দেখি অতনু, ক্ষিতীশ ও দীপা মোটরে বেরিয়েছে। তারপরদিন অতনুর ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব জানলাম।

দেবেনবাবু বলিলেন, অতনুর ভারী অন্যায়।

অন্যায় শুধু কি তার? দীপার কথাও একবার ভেবে দেখ। কী বেহায়াপনা? আলাপ হ'ল যার বাড়ীতে তাকে বাদ দিয়ে তুই কিনা গেলি মোটর চড়তে?

দেবেনবাবু অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিলেন, মেয়েদের ধরণই ওই।

কী বুদ্ধি তোমার? আমি কি স্ত্রীলোক নই—আমরা কী অকৃতজ্ঞ না বেহায়া?

না না সে রকম কিছু বলছি না।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, ওটা শিক্ষার দোষ। এর জন্য দায়ী দীপার মা। করুক দেখি আমার মেয়ে এরূপ একটা অন্যায় কাজ।

দেবেনবাবু বলিলেন, প্রতিমা কখনও অন্যায় করতে পারে না।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, কেন পারে না শুনি?

দেবেনবাবু এবার মহাসঙ্কটে পড়িলেন, মেয়ের প্রশংসা করিয়াও রক্ষা নাই।

দাক্ষায়ণী হাসিয়া বলিলেন, জানত' খনার বচন, মা ভাল ত' মেয়ে ভাল।

ওটা খুব সত্য কথা।

অনেকদিন অতনু এদিকে না আসায় আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তার যে পেটে পেটে এত বিদ্যে তা কল্পনাও করিনি।

তার এই না-আসার কারণ দেবেনবাবু ভাল করিয়াই জানতেন।

একদিন দাক্ষায়ণী তাঁর সামনেই অতনুকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার আয় কত?

অতনু বলে, Average two thousand month.

তুমি ত' বছরে মাত্র দু'হাজার টাকার ইনকমট্যাক্স দেও।

অতনু উত্তর করে, ইউনিভার্স্যাল।

দাক্ষায়ণী বলেন, সবাই ঠকায় বলে তুমিও ঠকাবে? না তোমার আয়ই কম?

অতনু মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া বসিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী ঠিক ইহার পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবা দেউলে হয়েছিলেন না?

তিনি তার আয়ের কথা অবিশ্বাস করাতেই অতনু বেশ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবার ধৈর্য্য হারাইয়া সে বলিয়া ফেলিল, Defamatory, father, coalprince.

দাক্ষায়ণী আরও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন জানি তোমার বাবা কয়লার রাজা। কিন্তু তিনি যে দেউলে হ'য়েছিলেন এও বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি।

Most damaging বলিয়া টুপিটা লইয়া অতনু উঠিয়া পড়িল। দেবেনবাবু স্ত্রীর ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, থাক ও-সব কথা, তুমি বস, অতনু।

তাঁহার দিকে চাহিয়া থ্যাঙ্কস বলিয়া সেই যে অতনু উঠিয়া পড়িল তারপর সে আর এ বাড়ী-মুখো হয় নাই।

আজ দেবেনবাবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, তার না আসার ত' কারণ আছে।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, তার বাবা যে দেউলে ছিলেন তা আমি ভালভাবেই জানি। সত্যের দিকে চোখ তুলে চাওয়ার মতন যার সাহস নেই সে আবার মানুষ!

অতনু হয়ত জানে না।

আলবৎ জানে।

কথাটা যে বলা উচিত হয় নাই দাক্ষায়ণী ইহা বুঝিতেন না। নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে বরাবরই তিনি অন্ধ ছিলেন, অন্য কেহ ত্রুটি দেখাইতেও সাহস করিত না।

প্রতিমার অনেকগুলি ভাল ভাল বিবাহ সম্বন্ধ এইভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দাক্ষায়ণীর মনোনীত অনেক পাত্রই তাঁর কথার ঝাঁজ সহ্য করিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

অতনু হাতছাড়া হওয়ায় দেবেনবাবু অবশ্য মনে মনে খুশী হইয়াছিলেন তবুও বলিলেন, তোমার শেষ পাত্রও হাত-ছাড়া হ'য়ে গেল।

দাক্ষায়ণী কোন উত্তর করিলেন না।

একটু পরে ইতস্তত করিতে করিতে দেবেনবাবু কহিলেন, আমি বলছিলাম—

কি বলছিলে?

প্রকাশ।

তোমার সেই স্কুল মাস্টার?

প্রফেসর.

বেশ প্রফেসর ত' কি হয়েছে?

প্রতিমার সঙ্গে—

জামাই করতে চাও প্রকাশকে? হেঃ হেঃ বলিয়া দাক্ষায়ণী তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন।

প্রকাশ ভাল ছেলে, পণ্ডিত লোক।

দাক্ষায়ণী শ্লেষের সুরে বলিলেন, উপরন্তু সাহিত্য-রসিক অর্থাৎ অকেজো—এবং অলস।

দেবেনবাবুর মুখে একটা বিরক্তির ছাপ পড়িল।

দাক্ষায়ণী আবার বলিলেন, একটা প্রফেসর কি ক'রে প্রতিমার খরচা চালাবে বল দেখি? আমার মেয়ে যে ষ্টাইলে মানুষ তাতে মোটর টেলিফোন না হলে ত' ওর চলবে না।

প্রকাশের সবই আছে। সে রায় বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায় I. S. O.-র একমাত্র দৌহিত্র।

এই হলধরটি কে?

রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর। কলকাতায় পাঁচখানা বাড়ীর মালিক

দাক্ষায়ণী এবার একটু নরম সুরে বলিলেন, তা'হলে ওকে বিলেত পাঠাননি কেন?

দেবেনবাবু এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারিলেন না, তবে অনুমান করিয়া বলিলেন, একমাত্র নাতি তাই বোধ হয় চোখের আড়াল করতে চাননি।

প্রকাশের অবস্থা ভাল বটে কিন্তু দাক্ষায়ণী যাহা চান তাহা ত' সে পূরণ করিতে পারিবে না। তিনি চান এমন জামাই যার এক সময় জজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বামী দ্বারা যে উচ্চ অভিলাষ পূরণ হয় নাই ভাবী জামাতার মধ্যে অন্তত তার সম্ভাবনা থাকলেও কথা ছিল না।

আরও একটা বাধা ছিল এবং এই মহিলার চক্ষে তার গুরুত্বও কম নয়। তিনি বলিলেন অমন টিকিধারী ছেলেকে জামাই করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

প্রকাশকে স্নেহ করিলেও তার টিকিতে দেবেনবাবুরও আপত্তি ছিল। তবে তিনি মনে করিতেন তার অসংখ্য গুণ ঐ একটা ত্রুটিকে ঢাকিয়া রাখিবে।

তিনি যেন কি বলিতে যাইবেন এমন সময় একটি চাকর একখানা কার্ড লইয়া ভিতরে ঢুকিল। চাকরের হাত হইতে কার্ডখানা লইয়া একবার তার উপর চোখ বুলাইয়াই দাক্ষায়ণী পড়িতে লাগিলেন,—

তরুণ চৌধুরী,

গবেষক, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক,

সম্পাদক 'জঙ্গলদর্চ্চি'; ইত্যাদি।

পাঠ শেষ হইলে বলিলেন, কাজের লোক বটে রাত নটায় এসেছেন সাহিত্যচর্চ্চা করতে। এর আগে সময় পাননি

দেবেনবাবু বলিলেন, আমি ত ওঁকে চিনি না।

তবে বোধ হয় আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন। বিনয় বাবুকে বলে দাও যে, আজ আমার সময় নেই।

একটানা অনেকক্ষণ লিখিয়া দেবেনবাবুও শ্রান্ত হইয়াছিলেন, তার উপর ক্ষুধাও পাইয়াছিল। অপরিচিত ব্যক্তিটির আগমনে তিনিও তাই বিশেষ আনন্দলাভ করেন নাই, কিন্তু একজন সাহিত্যিক এইভাবে দরজা হইতে ফিরিয়া যাইবেন ভাবিয়াই তাঁর সাহিত্যানুরাগী মনে বাজিল। তিনি বলিলেন, অন্তত দশ মিনিটের জন্যও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

যত সব অকেজোর আড্ডা। যাক্ দশ মিনিট পরেই আমি খাবার দিতে বল্‌ব বলিয়া দাক্ষায়ণী বাহির হইয়া গেলেন।

দেবেনবাবু ঘড়িটা একবার দেখিয়া লইলেন।

সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁর নিকট যে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন তরুণের ভাগ্যে তাহা জুটিল না।

তরুণ ঘরে ঢুকিলে তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, নমস্কার, বসুন।

তরুণ বলিল, নমস্কার, আপনার সঙ্গে আমার পবিত্র সম্পর্ক, হোলি ব্রাদারহুড্।

দেবেনবাবু বিস্মিতভাবে তার দিকে চাহিলেন।

তরুণ বলিল, সাহিত্যিক ব্রাদারহুডের কথা বলছিলাম।

ওঃ

তরুণ বলিল, আপনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক!

দেবেনবাবু মনে মনে খুশী হইয়া বলিলেন, খ্যাতি আর কোথায়?

গোলাপ তার গন্ধের খবর রাখে না।

পর্দ্দার আড়াল হইতে হাসি চাপিতে গিয়া দাক্ষায়ণী কাসিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবেনবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, আপনার পরিচয়?

আমি গবেষক।

কাডেই দেখেছি।

প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক—

কার্ডে তরুণের এইসব গুণাবলীর উল্লেখ থাকিলেও স্বয়ং এই গুণরাশির অধিকারীর মুখ হইতে ঐ বিশেষণগুলি শুনিয়া দেবেনবাবুর তার প্রতি একটু শ্রদ্ধা হইল।

তরুণ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, সাহিত্য-রসিক রাজা-মহারাজারা—কাশিমবাজার, নাটোর, সুসঙ্গ সকলেই আমায় চিনতেন।

দেবেনবাবুর শ্রদ্ধা আরও একটু বৃদ্ধি পাইল।

কবিগুরু, বীরবল এঁরা আমায় স্নেহ করেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন আমার শরৎ-দা, তার ভেলু কুকুর—যাক্ সে কথা। আমি এসেছি আপনার পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করতে।

কবিগুরুর স্নেহাধিকারী, শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠতুল্য একজন রসিক সুজন সাহিত্যিক হিসাবে এতরাতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া দেবেনবাবু অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। গম্ভীর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙিয়া গেল। দেবেনবাবু বলিলেন, একটু চা এনে দিক্।

না, আমি আজকাল ক্রুসেন্‌সল্ট ও ভাস্কর লবণ খাই।

দেবেনবাবু বলিলেন, বড় দুঃখের কথা ত'।

হ্যাঁ, সাহিত্যের শাস্তি—সাহিত্যিক এক হয় হবে দরিদ্র না হয় পেটুক নতুবা অজীর্ণের রোগী।

দেবেনবাবু বলিলেন, আপনার অসীম অনুগ্রহ যে অসুস্থ শরীরেও আপনি আমার এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

কিছুমাত্র নয়, এই নিন্ বলিয়া তরুণ তাঁকে একটি চুরুট দিল।

দেবেনবাবু বলিবেন, অফার (offer) করা উচিত ছিল আমার—

তরুণ বলিল, সাহিত্যের পবিত্র বন্ধন যেখানে সেখানে সৌজন্যের পর্দ্দা দিয়ে সৌভ্রাত্রকে আড়াল করা উচিত নয়।

দেবেনবাবু বলিলেন, তা' বটে।

তিনি চুরুট ধরাইতে আরম্ভ করিলে তরুণ বলিল, আপনার লেখাগুলো হিস্ট্রো-সাইকো-এনালিটিক্যাল এক একখানা ডকুমেণ্ট।

দেবেনবাবু প্রশংসাকারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবামাত্র তাঁর নাক দিয়া খানিকটা বাতাস বাহির হইয়া দেশলাইর কাঠিটা নিভিয়া গেল।

তিনি বলিলেন, আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি একাধারে চিন্তাশীল ও কবি।

তরুণ উত্তর করিল, আপনি 'জিনিয়স্' কিনা, ধরেছেন ঠিক।

না, না আমি ঠিক জিনিয়াস্ নই, বলিয়া দেবেনবাবু একটু হাসিলেন।

জিনিয়স্ তাই ধরেছেন যে আমি কবি—সঙ্গে সঙ্গেই জলদর্চ্চি সম্পাদক মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, শুনুন আমার একটা কবিতা—

"হিটলার—
মূর্ত্তি তুমি জাতীয়তার-
প্রতীক তুমি স্পর্দ্ধার
রুদ্ররূপে বাজাও বিষাণ
মুক্তি আন প্রাণ্যার
ভীতি তুমি সাম্যবাদের
ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশ্যার।"

জলদর্চ্চিতে বেরিয়েছে, মাইকেলী তেজোবীর্য্য, বঙ্কিম-নিন্দে গাম্ভীর্য্য সম্বলিত, এই পিস্, ছন্দ ও শব্দের দ্বারা হিটলারের দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা করছে—শব্দ সমাবেশ যাকে বলে, 'Onomatopoetic.'

এই সময় পর্দ্দার আড়াল হইতে দশ মিনিট শেষ হওয়ার বিজ্ঞপ্তিজ্ঞাপক কাশি শুনিয়া দেবেনবাবু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তরুণের কবিতার সুখ্যাতি করিবার আর সুযোগ হইল না।

তরুণ বলিল, থাক্ আত্মপ্রশংসা, আপনার লেখার আমি একজন ভক্ত।

আমার কি কি রচনা পড়েছেন?

অন্য কেহ হইলে হয়ত একটু অসুবিধায় পড়িত। কিন্তু দেবেনবাবুর লেখার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও তরুণ সপ্রতিভভাবে কহিল, আপনার চিন্তাধারা আমার মনের তারে ঝঙ্কার তোলে।

দেবেনবাবু বলিলেন, আপনি কবি, কবিজনোচিত ভাষায় যা বল্লেন সেভাবে আমার ভাবগাম্ভীর্য্য যুক্ত লেখায় কেউ সুখ্যাতি করেন নি। কিন্তু এমনি প্রশংসা করেছে অনেকে, ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট এম-এ-রা—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তাগণ।

তরুণ কহিল, করবেনই-ত। রামেন্দ্রসুন্দর ভিন্ন এমন সারগর্ভ সন্দর্ভ বাঙলায় কেউ লেখেন নি।

দেবেনবাবু বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের আমি একজন ভক্ত।

হবেনই—Soul-এর এত affinity যাঁর সঙ্গে মানুষ তাঁকে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা করে। তাঁর আর আপনার লেখায় খুব সাদৃশ্য আছে।

দেবেনবাবু উল্লসিতভাবে বলিলেন, আছে সাদৃশ্য?

এক-শ'বার আছে। কেউ বলুক যে নেই, আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

দেবেনবাবুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তরুণ বলিল, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের আপনি একজন বিশেষজ্ঞ যাকে বলে 'অথরিটি'।

ঐটিই আমার গবেষণার বিষয়।

আপনার নিশ্চয়ই অনেক পুঁথি ও প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ আছে?

সামান্য করেছি বটে।

তরুণ বলিল, সংগ্রহ আমারও আছে।

বড় আনন্দের বিষয়, যোগাং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

সে কি কথা? আপনার যোগ্য হব আমি?

দেবেনবাবু বলিলেন, আপনি অযথা বিনয় করছেন।

বিনয় নয় তবে নিজে গুণী না হ'লেও আমি একজন মহাগুণবানের বংশধর।

কার?

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সূর্য্য হংসেশ্বর আমার পূর্ব্বপুরুষ। আমি তাঁর অকৃতী প্রপৌত্র।

আপনি হংসেশ্বরের প্রপৌত্র? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালীমাত্রেই গর্ব্ববোধ করবেন।

তরুণ একটু হাসিল।

দেবেনবাবু বলিলেন, আপনি হংসেশ্বরের উপযুক্ত বংশধর।

নিতান্ত অযোগ্য। তিনি ছিলেন পণ্ডিতকুলচূড়া, বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রপারগ। তেলেগু পণ্ডিত দুর্দ্দান্ত ভেংকটাপা তাঁর কাছে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হ'য়েছিলেন।

দেবেনবাবু বলিলেন, তাঁর বইতে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র বলতেন, হংসেশ্বরের বংশধর হ'য়ে তুমি কিছু করলে না। তোমার প্রতিভা ছিল।

দেবেনবাবু বলিলেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

তরুণ কহিল, আমার প্রতিভার বিকাশ হ'য়েছে হংসেশ্বরের বই পড়ে। আমি তাঁর জমিদারীর অংশ ছেড়ে দিয়ে পুঁথিগুলি নিয়েছি।

খুব ভাল করেছেন। আপনার কাছে তাঁর পুঁথি আছে?

তাঁর ত' আছেই আর অনেকের পাণ্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করেছি।

কি কি বই আছে?

সাহিত্য পরিষদে দু'খানা উপহার দিয়েছি। অভাবের তাড়নায় কতকগুলি বেচতে হয়েছে।

তবু?

এখনও আছে 'রসপ্রদীপ', 'ত্রৈলোক্য তারিণীর সংসার' হ য ব র ল প্রভৃতি।

দেবেনবাবু বলিলেন, কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি যদি দেখতে দেন।

সানন্দে।

সুবিধে হ'লে দু'একখানা কিনতেও পারি।

অনেকেই কিনেছেন, যেমন ধরুন রায় বাহাদুর হলধর চাটুয্যে।

মুহূর্ত্তেই দেবেনবাবুর মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হলধর চাটুয্যে, তাঁকে চেনেন আপনি?

তরুণ বলিল, কিছু কিছু পরিচয় আছে।

আপনি তাঁকে বই দেন? হংসেশ্বরের বই?

হ্যাঁ।

আজ রাত হ'য়ে গেছে।

তরুণ বলিল, বেশ আর একদিন আসব। বই নিয়ে।

না, না কষ্ট করে আসবেন না। দরকার হলে আমিই জানাব।

তরুণ বাহির হইয়া গেল দেবেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন (ক্রমশ)

ধর্ম্মরাজ পূজা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কথাটা নূতন করিয়া উঠাইতে হইল। বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামাঞ্চলে ধর্ম্মরাজ পূজার ধূমে লাগিয়া যায়। অনেক গ্রামে আবার পূর্ণিমারও দরকার হয় না। গ্রামের লোক অবসর বুঝিয়া একটা ভাল দিন দেখিয়া পূজার ব্যবস্থা করে। মোটের উপর ভাদ্র—কোন কোন গ্রামে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজের পূজা চলে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য কথাটা নূতন করিয়া তুলিলাম। দেশের পাঠকগণ যদি ধর্ম্মরাজ পূজার আচার অনুষ্ঠান এবং স্থানীয় ইতিবৃত্ত আদি "দেশে" লিখিয়া পাঠান এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি "দেশে" মুদ্রিত হয়, ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণের উপাদান সংগ্রহে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, ধর্ম্মরাজের পূজা বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই রূপান্তর। এই মত প্রায় সর্ব্বসম্মতরূপেই গৃহীত হইয়াছে। এক সময় শিক্ষার্থীরূপে শাস্ত্রী মহাশয়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই সময় ধর্ম্মরাজ পূজা সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বহু প্রশ্নেরই সদুত্তর দিয়াছিলেন। সন্দেহ কিন্তু তখনও ছিল, এখনও আছে। সাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

আমার মনে হয়, ধর্ম্মরাজ পূজা বৌদ্ধধর্ম্মেরই রূপান্তর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে আরও কিছু আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সারা বাঙলায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজ পূজা পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুর্শিদাবাদের দুই-একটি স্থানে কিম্বা মানভূম, মেদিনীপুরের কোন গ্রামে হয়ত ধর্ম্মপূজার অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। এই জন্যই সন্দেহ হয়, কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে দক্ষিণ রাঢ়ের সীমাবদ্ধ স্থানে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে আর ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মরাজপূজা পূর্ব্ব বা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত নাই।

আমার দৃঢ় ধারণা খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমভাগে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে রাঢ় বঙ্গে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তির রাজা (মেদিনীপুর দাঁতনের) ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ের (গড় মান্দারণের) অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া এবং উত্তর রাঢ়ে মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং এই যুদ্ধে রাঢ়দেশই বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। "অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপাল গৌড় হারাইয়া উত্তর রাঢ়ের বনময় প্রদেশে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। চোল আক্রমণে তিনি নূতন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইলেন। এদিকে দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল নিহত এবং দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূরে পরাজিত হওয়ায় উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান অজয়তীরস্থিত ঢেকুরের রাজা কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া ইছাই ঘোষ ঢেকুড় গড় বা শ্যামারূপার গড় দখল করিয়া লইলেন। ইছাইএর পিতা সোম ঘোষ হয়ত দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালের কিম্বা গৌড়েশ্বর মহীপালের প্রতিনিধি ছিলেন। ঢেকুড় বোধ হয় দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়ের সীমান্ত ছিল। অথবা কর্ণসেন ধর্ম্মপাল বা মহীপালের সামন্ত ছিলেন। যাহা হউক কর্ণসেন বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরে পলাইয়া গেলেন এবং কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক কিছুদিন পরে ইছাইকে বধ ও পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেন। আমার মনে হয় রামাই পণ্ডিত লাউসেনকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্য ধর্ম্মরাজ পূজার প্রবর্ত্তন। বিশেষ করিয়া যাহারা রাঢ়ের যোদ্ধজাতি—সেই ডোম হাড়ি প্রভৃতি জাতিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্যই ধর্ম্মরাজ পূজার প্রয়োজন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম মিলাইয়া সৎশূদ্র ও তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মিলন-কেন্দ্ররূপেই ধর্ম্মরাজ পূজার সৃষ্টি হয়। শিবের গাজনের অনুকরণে ধর্ম্মের গাজন ও শালগ্রাম শিলার অনুকরণে ধর্ম্মশিলার কল্পনা হইয়াছিল। পুরাণকথিত শংখচূড় পত্নী তুলসীর শাপে বিষ্ণুর শিলারূপ প্রাপ্তির উপাখ্যানের মত সাবিত্রীর শাপে বিষ্ণুই যে ধর্ম্মশিলায় পরিণত হইয়াছেন, ময়ূর-ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলে এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটি এইরূপ—একদিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা ব্রহ্মযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া মুনি ঋষি ও দেবতাগণ উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন খুব সমারোহের পর পূর্ণাহুতির সময় সাবিত্রীদেবীর খোঁজ পড়িল। কারণ সহধর্ম্মিণী ভিন্ন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না। সাবিত্রীর কি কারণে অভিমান হইয়াছিল। বিষ্ণু প্রভৃতির অনেক অনুরোধেও তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন না। বিধি বিষাদমগ্ন। কিন্তু বিষ্ণুর গুণের সীমা নাই। তিনি এক গোয়ালার মেয়েকে আনিয়া ব্রহ্মার বামে বসাইয়া দিলেন। তিনিই গায়ত্রী (বোধ হয় গোপ-কন্যার ছদ্মবেশে কোথায় বসিয়াছিলেন, বিষ্ণু চিনিয়া ধরিয়া আনেন।) বিষ্ণু ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহার কর মেখলাবদ্ধ করিয়া দিলে সৃষ্টিপতি তাঁহার করে কর দিয়া ঘৃতাহুতি দিতেছেন, এমন সময় সাবিত্রী আসিয়া উপস্থিত। তিনি তো রাগিয়াই অস্থির, সাবিত্রী বলিলেন যিনিই এই কাণ্ড করিয়া থাকুন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে মর্ত্ত্যে পাথর (শিলামূর্ত্তি) হইয়া থাকিতে হইবে। সতীর মান রাখিবার জন্য নারায়ণ তথাস্তু বলিয়া এই অভিশাপ মাথা পাতিয়া লইলেন। এদিকে গোপগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। বিধির অবিধি দেখিয়া বাঁকবাড়ি ঘাড়ে করিয়া লড়াই দিতে আগাইয়া আসিল। বেগতিক দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, বাপু তোমাদের এত রাগের কারণ কি? তোমাদের বাড়ীর মেয়ে ব্রাহ্মণী হইয়া গেল। দেখিলে তো মেখলা বাঁধিয়া ব্রহ্ম-যজ্ঞাসনে বসিয়া যজ্ঞ করিল। এখন হইতে ব্রাহ্মণেও তাহাকে পূজা করিবে। ইহা হইতে আর কি সৌভাগ্য কামনা কর। এখন রাগ-রোষ ছাড়িয়া আমার কাছে বর লও। গোপদের দলপতি অগ্রসর হইয়া বলিল, ঐ কন্যাকে পুনরায় গোপকুলেই জন্ম লইতে হইবে এবং তুমিও আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে। এই বর আমরা চাই।

বিষ্ণু বলিলেন তাহাই হইবে। বিষ্ণু-বরে ঐ গায়ত্রীই রাধা হইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং নারায়ণও কৃষ্ণরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সাবিত্রীশাপে বিষ্ণু বল্লুকা নদীর তীরে পাষাণ হইলেন। আর বজ্রকীটে কাটিয়া কাটিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মশিলায় পরিণত করিতে লাগিল। ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণে ধর্ম্মশিলার বিবিধ লক্ষণ ও নামের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা শালগ্রাম শিলার লক্ষণ ও নাম-বর্ণনার অনুরূপ।

ধর্ম্মপূজার বিধান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতার মধ্যে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি রহিয়াছেন। ধর্ম্মপূজার সময় প্রায় অধিকাংশ স্থানেই বৈদিক হোম করিতে হয়। সুতরাং ইহাকে একেবারে নিৰ্জ্জলা বুদ্ধপূজার বিকৃত রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের মধ্যে ধর্ম্মপূজার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। আজিও এই তিনটি জেলার মধ্যেই ধর্ম্মপূজার আধিক্য দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুর গ্রামে লাউসেনের রাজধানী ছিল। রামাই পন্ডিতের জন্মভূমি হুগলী জেলার যাজপুরে হইলেও রামাই ময়নাপুরেই বাস করিয়াছিলেন। ময়নাপুরে রামাই পন্ডিতের বংশধর এবং তাঁহার পূজিত যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম্মরাজ এখনও বর্ত্তমান আছেন। বল্লুকা নদী বর্দ্ধমান জেলায়। বর্দ্ধমানের নিকট দামোদর নদ হইতে বাহির হইয়া এই নদী মুজাপুরের খালে পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে বড়োযানে ধর্ম্মঠাকুরের প্রকান্ড মন্দির ছিল। মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মঠাকুর এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল শ্যামারূপার গড়। এই গড় বীরভূম জেলার জয়দেব কেন্দুলীর নিকট অজয়ের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। শ্যামারূপারগড় পূর্ব্বে বীরভূমের অন্তর্গত ছিল, এখন বর্দ্ধমান জেলায় পড়িয়াছে। শ্যামারূপার গড়ের পূর্ব্বে গড়ের সীমানার মধ্যেই বাঙলার অন্যতম দর্শনীয় সুপ্রসিদ্ধ ইছাই ঘোষের দেউল। শ্যামারূপার গড়েই ইছাইএর সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইছাইকে বধ করিয়া লাউসেন শ্যামারূপার গড় অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গল বর্ণিত তারাদীঘি, জলন্দার গড় বাক ঘামকলের মাঠ প্রভৃতি বীরভূমেই অবস্থিত।

বীরভূম, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের রাজারা সেকালে হাড়ি, ডোম, বাগদী, মল্ল, ভল্ল, লোয়ার, খয়রা প্রভৃতি জাতিকেই সৈন্যদলে গ্রহণ করিতেন। ইহারাই অন্তঃপুরের রক্ষক ছিল, ইহারাই রাজার দেহরক্ষীর কার্য্য করিত। ধর্ম্মের দেবাংশী বা দেয়াশীদের মধ্যে আজিও এই সমস্ত জাতিরই প্রাধান্য দেখিতে পাই। সৈন্যদলে গোয়ালা, সৎগোপ, সুঁড়ি, আগুড়ি প্রভৃতি জাতির সংখ্যাও প্রচুর ছিল। তথাপি অনেক সময় হাড়ি, ডোম বাগদী প্রভৃতি জাতির লোকেরাই সেনাপতির কার্য্য করিত। এই সমস্ত জাতিকে একতার বন্ধনে বাঁধিবার জন্যই ধর্ম্মপূজার প্রয়োজন হইয়াছিল। আজিও ধর্ম্মপূজায় জাতিবিচার নাই। ভক্ত হইলেই পূজার কয়দিন সকলেই যেন এক জাতি হইয়া যায়।

প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে একটা দল ছিল, যাহারা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। ইহাদের গোত্রই ছিল যাযাবর। মনসার স্বামী জরৎকারু মুনি যাযাবর গোত্রের লোক। ইহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেন। তজ্জন্য সময় সময় একটি যজ্ঞ করিয়া ইহাদের শুদ্ধির প্রয়োজন হইত। ইহাদের দলের নাম ছিল ব্রাত। ইহা হইতেই ব্রাত্য অর্থে পতিত কথাটা চলিয়া আসিতেছে। হাজারো বৎসরের পর শিবের গাজনে চৈত্র সংক্রান্তিতে এই শুদ্ধির শেষ চিহ্ন আজিও বাঁচিয়া আছে। যাযাবরেরা প্রায়ই শৈব ছিলেন। শৈবযজ্ঞেই তাঁহাদের শুদ্ধি হইত। শিবভক্তের উত্তরী গলায় দিয়া ব্রতাচারী শুদ্ধ হইয়া কয়দিনের জন্য শিবের গাজনে আজিও সেই শুদ্ধিরই অনুষ্ঠান করে। শুদ্ধি কার্য্য বৈদিক আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পদ্ধতিটা বেদেরই পদ্ধতি। অথর্ব্ব বেদে ইহার পরিচয় আছে। ধর্ম্মরাজ পূজাতেও ছত্রিশ জাতিকে গলায় উত্তরী দিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। সংযমের দিনেই উত্তরী লওয়া সাময়িক উপবীত গ্রহণেরই রূপান্তর। ধর্ম্মরাজ পূজার দিনে-হোম শুদ্ধিযজ্ঞের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যজ্ঞশেষ তিলক সকল ভক্তকেই গ্রহণ করিতে হয়। গাজনের শেষে শিবের ভক্তগণের যেমন, ধর্ম্মরাজের ভক্তগণেরও তেমনই—বাঁক কাঁধে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। ভিক্ষালব্ধ চাউল কলাই আদি রাঁধিয়া সকলে মিলিয়া খাইয়া থাকে। ইহাও সেই পূর্ব্বেকার যাযাবর সম্প্রদায়ের রীতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জন্য বলিতেছিলাম—ধর্ম্মরাজ পূজা নিছক বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর নহে। আমার মনে হয়, ধর্ম্মরাজ পূজার মধ্য দিয়া রামাই পণ্ডিত একটি যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাম্র ইহাদের ঐক্যের প্রতীক ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহার প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে ইহা আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। পরে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজ পূজার একটা নূতন আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই বহু কবি ময়ূরভট্টের অনুকরণে নূতন করিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি রচনা করেন। তাহার কারণও ছিল।

বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলন ও রসকীর্ত্তনের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর কবিগণ কাব্য রচনার নূতন বিষয়-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে কেহ চন্ডীমঙ্গল, কেহ মনসামঙ্গল, কেহ শিবায়ন, কেহ ধর্ম্মমঙ্গল, কেহবা যাত্রা এবং কবিগান রচনায় মনোনিবেশ করেন। চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের সমকক্ষ না হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যেও কবিকঙ্কণ, রায়গুণাকর, রামধনু, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, দাসুরায়ের মত কবির উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া এই সময়টিতে মঙ্গলকাব্য রচনার আরও একটি কারণ ছিল। এই সময়েও পশ্চিম বঙ্গে গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। মগ এবং ফিরিঙ্গীর দল অজয় এবং ময়ূরাক্ষী বাহিয়া বীরভূম, বর্দ্ধমানেও অত্যাচার

(শেষাংশ ১৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পলাতক

(গল্প)

শ্রীতারাপদ রাহা।

একুশ বছর আগেকার কথা। সুইজারল্যাণ্ডের **ভিলিনিউব** শহরের কাছে জেনেভা হ্রদে এক জেলে রাত্তিরে **মাছ ধরছিল।** সে নিজের নৌকায় চড়ে আপন মনে মাছ ধরে চলেছে এমন সময় দেখতে পেল জলের উপর অদ্ভুত কি একটা যেন ভাসছে। জেলেটা নৌকা চালিয়ে কাছে গিয়ে দেখলে—একটা লোক—একেবারে উলঙ্গ—কয়েকখানা কাঠ জোগাড় করে কোন রকমে একটা ভেলা তৈরী করেছে, আর ছোট একখানা তক্তা দিয়ে তাই বেয়ে বেয়ে কূলের দিকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। লোকটাকে দেখেই বুঝা যায়—অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া শীতে সে একেবারে জমে গেছে। জেলেটার কেমন মায়া করতে লাগলো, সে লোকটাকে ডিঙ্গিতে উঠিয়ে একটা জাল দিয়ে তার গা ঢেকে দিল। জেলেটা তার সঙ্গে একটু আলাপ করবে ইচ্ছা করে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই লোকটা জালের মধ্যে লুকোতে আরম্ভ করলে; নিতান্ত দায়ে পড়ে যে দু একটা কথা উচ্চারণ করলে তা শুনতে এমন অদ্ভুত যে জেলেটা তার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারলে না। শেষে উপায়ান্তর না দেখে জোরে নৌকা বেয়ে তাকে তীরের দিকে নিয়ে চললো।

ক্রমে রাত ভোর হয়ে এল, হ্রদের তীরে ডাঙ্গা দেখা যেতে লোকটার মনটা যেন একটু খুশী হয়ে উঠল। বড় বড় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ীতে ঢাকা মস্ত মুখখানাতে যেন বিদ্যুতের হাসি খেলে গেল। তীরের দিকে আঙুল দিয়ে সে আনন্দে এক অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে সে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগলো,—জেলের কানে তা শোনাতে লাগলো—রোসিয়া? নৌকাখানা যতই ডাঙ্গার কাছে আসতে লাগলো লোকটার কণ্ঠস্বর যেন ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। নৌকা ডাঙ্গায় লাগলে জেলের বাড়ীর মেয়েরা সব ছুটে এল, জেলে সারা রাত ধরে যে মাছ ধরেছে তা নাবাতে সাহায্য করবে বলে, কিন্তু মাছের বদলে ডিঙ্গীতে যখন তারা এক উলঙ্গ ইউলিসিসের মূর্ত্তি দেখতে পেল, ভয়ে লজ্জায় তারা এদিক ওদিক সরে যেতে পথ পায় না। খবরটা ছড়িয়ে পড়লে চারিদিক থেকে লোক আসতে লাগলো। খবরটা প্রধান নাগরিকের কানে গিয়েও পৌঁছিল, তাই তিনিও তাঁর সুবুদ্ধিবিবেচনার ভাব নিয়ে এসে হাজির হ'লেন। যুদ্ধের চার বছর ধরে এ ধরণের অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়েছে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, হ্রদের যে তীরটা ফরাসীদেশের দিকে পড়েছে লোকটা সেখান থেকেই কোন রকমে ছিটকে এসে পড়েছে! তাই আড়ম্বর করে তিনি জেরা করতে সুরু করলেন। কিন্তু তাতেও বড় সুবিধা হ'ল না; এই আগন্তুকের একটি কথাও তাঁর বোধগম্য হ'ল না, তিনি যা বললেন, তার একটিও ঐ লোকটি বুঝতে পারল বলে মনে হ'ল না। সব কথার উত্তরেই লোকটি কেবল মিনতির সুরে জিজ্ঞাসা করে—রোসিয়া? রোসিয়া?

একটি লোক বাড়ী থেকে এক জোড়া পুরানো পায়জামা ও কোট এনে লোকটাকে পরতে দিলে। প্রধান নাগরিক আরও খানিকটা চেষ্টা করলেন তার কথা বুঝতে, কিন্তু লোকটা তার কথার উত্তরে এক 'রোসিয়া' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলে না। প্রধান নাগরিক বিরক্ত হয়ে আদালতের দিকে চললেন, আর লোকটাকে ইঙ্গিতে তাঁর অনুসরণ করতে হুকুম করলেন। লোকটা বিনা ওজরে তাঁর পিছু পিছু চললো। খালি পায়ে—অপরের জামাকাপড় পরে লোকটা যখন এগিয়ে চললো, পাড়ার ছেলেরা তার অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখে তার চারিদিকে ভিড় করে টিট্‌কারি দিতে দিতে চললো। অবশেষে আদালতে এনে তাকে সরকারী লোকের হেপাজতে রাখা হ'ল, লোকটা তাতে একটুও উচ্চবাচ্য করলো না, শুধু তার মুখখানা আবার নিরাশায় ব্যথিত হয়ে উঠলো। তাকে দেখে মনে হতে লাগলো, সে আশঙ্কা করছে—এখনই তাকে কোন শাস্তি পেতে হ'বে।

আশে পাশে যে সব হোটেল ছিল জেলের এ অদ্ভুত ক্ষেপের কথা সে সব জায়গায় গিয়েও পৌঁছিল। সেখান থেকে দলে দলে লোক সব দেখতে আসতে লাগলেন, খানিকটা সময় তবু কাটবে ভালো। একজন মহিলা কিছু মিঠাই নিয়ে লোকটাকে দিতে গেলেন কিন্তু বানর যেমন অনেক সময় মানুষের দেওয়া খাবারকে বিশ্বাস করতে চায় না, লোকটাও তেমনি ঐ খাবার শুকে-টুকে তা স্পর্শ করলে না। এক ভদ্রলোক এসে ক্যামেরায় লোকটার একটা ছবি তুলে নিলেন। অবশেষে ওখানকার সব চেয়ে বড় হোটেলের ম্যানেজার এসে হাজির হলেন। নানা দেশের অনেক অন্ন-জল তাঁর পেটে পড়েছে, তিনি অনেক ভাষা জানেন। জার্ম্মানী, ইতালী, ইংরেজী, ফরাসী—একের পর আরেকটিতে ম্যানেজার এই নবাগত লোকটিকে প্রশ্ন করে চললেন,—লোকটা এই হরেক রকমের কথা শুনে একেবারে ভড়কে গেল। অবশেষে ম্যানেজার রুশীয় ভাষায় কথা আরম্ভ করলেন। রুশীয় ভাষার প্রথম কথাটা শুনবা মাত্র লোকটার মুখে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা গেল, তার দেহে যেন প্রাণ এল—সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। এইবার সে একটা সমজদার লোক পেয়েছে জেনে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলে। তার সুদীর্ঘ কাহিনী এলোমেলো কথায় সে বলতে লাগলো, ম্যানেজার তার কিছুটা বুঝলেন, কিছুটা বুঝলেন না। সবটা শুনে মোটামুটি যেটুকু জানা গেল, তা সংক্ষেপে এই—

সে একজন রুশীয় সৈনিক। একদিন হাজার হাজার সৈন্যের সঙ্গে রেলগাড়ীতে করে তাকে কোথায় পাঠানো হ'ল। অনেক পথ ট্রেনে চলবার পর তাদের জাহাজে চাপতে হ'ল সমুদ্রে এত গরম যে, দেহের হাড় পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়ে যায়। যা' হ'ক, তারা ডাঙ্গায় নাবলে, তারপর আবার ট্রেনে চাপল। অবশেষে ট্রেন থেকে নেবে তাদের লড়াই করতে হ'ল। লড়াইটা হ'ল একটা পাহাড়ের উপরে। লড়াইয়ের কথা অবশ্য লোকটা বেশী কিছু বলতে পারলো না, কারণ লড়াই সুরু হ'তেই পায়ে একটা গুলী লেগে লোকটা আহত হয়ে পড়ে।

হোটেলের ম্যানেজার লোকটার কাছে যা' শুনেছিলেন

তা তখনই তর্জ্জমা করে সমবেত লোকদিগকে শুনাচ্ছিলেন। তর্জ্জমা শুনে তাঁরা বুঝে নিলেন, এ রুশীয় সৈন্যদলের লোক সাইবেরিয়া থেকে এদের পাঠানো হয়েছে। জাহাজে ফরাসী-দেশে আসবে বলে ব্লাডিভাষ্টক থেকে এরা যাত্রা করেছে। কিন্তু লোকটা জেনেভা হ্রদে এসে কি করে জুটলো জানবার জন্যে সবারই কৌতূহল হ'ল।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলে—লোকটা তাও বল্লে। নিজের চাতুর্য্যের কথা বলতে গিয়ে মুখখানা তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বল্লে, আহত হয়ে সে যখন হাসপাতালে শুয়ে, তখন লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে রুশিয়া কোন দিকে তা জেনে নিয়েছিল, তাই পা'টা সারতে না সারতেই সে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে দেশের দিকে হাঁটতে সুরু করেছে। রাতের তারা আর দিনের সূর্য্য দেখে সে বাড়ীর দিক ঠিক করে নিয়েছে। সারা রাত সে পথ চলে আর দিনের আলোতে পাছে কেউ তাকে ধরে ফেলে তাই খড়ের গাদার নীচে লুকিয়ে থাকে। ক্ষিদে পেলে সে বনের ফল খায়—কখনও বা কোন গেরস্থ বাড়ীতে এক আধ টুক্‌রো রুটী চেয়ে খায়। এমনি করে দশ রাত্রি চলে সে এই হ্রদের কিনারায় এসে হাজির হয়েছে।

এই পর্য্যন্ত বলে সে তার কথার খেই হারিয়ে ফেল্‌লে। সে বল্লে, সাইবেরিয়ার এক কৃষক সে; বৈকাল হ্রদের তীরে তার বাড়ী।

বুঝা গেল, হ্রদ দেখেই তার সব গোলমাল হয়ে গেছে। জেনেভা হ্রদ দেখে সে মনে করেছে, এই হচ্ছে বৈকাল হ্রদ—এর অপর তীরেই তার ঘর। সে রুশিয়াতেই এসেছে।

কোথা থেকে দু'খানা বড় বড় কাঠ চুরি করে তার উপর শুয়ে একখানা তক্তা দিয়ে সে বেয়ে চলেছিল—এমন সময় জেলেটা তাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে।

তার যা বলবার ছিল তা শেষ করে সে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কাল কি আমি বাড়ী পৌঁছিতে পারব?

তার এই শেষ কথাটা যখন তর্জ্জমা করে জনতাকে শোনানো হ'ল, তখন তাদের হাসি আর থামে না: কি বোকা রে, বাপ! কিন্তু পরক্ষণেই তারা সকলেই একে কৃপার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করলো। সকলের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে বেচারার জন্য কিছু চাঁদা তোলা হ'ল।

এর মধ্যেই টেলিফোনে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে একজন কর্ম্মচারী এসে হাজির হ'লেন। অনেক কষ্টে একটা রিপোর্ট গড়ে তোলা হ'ল। সে রিপোর্টে লোকটির সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা গেল না: দোভাষী রুশীয় ভাষা যতটা জানতেন তাতে হয়ত একরকম কাজ চলে যেত, কিন্তু সাইবেরিয়ান লোকটার নিজের বর্ব্বরতাই তাকে জানবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সে নিজের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতেই পারলে না। সে মাত্র এইটুকু জানে যে, তার নাম বরিস,—বৈকাল হ্রদ থেকে প্রায় মাইল ত্রিশেক দূরে তার ঘর,—বাড়ীতে আছে তার স্ত্রী আর তিনটি ছেলে-মেয়ে। দাস প্রথা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীরও বেশী রাশিয়া থেকে উঠে গেছে, তবু সে নিজেকে পিস মেটচাকীর দাস বলে পরিচয়

একে এখন কি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো, লোকটা মাথা নীচু করে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ বল্লেন, বার্ণে যে রুশীয় সরকারী রাজদূত আছেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক। কিন্তু তাতে আবার কেউ কেউ আপত্তি করলেন, এতে করে লোকটাকে আবার ফরাসী দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে মাত্র। পুলিশ কর্ম্মচারী বল্লেন, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না একে কি পর্য্যায় ফেলা যায়। সোজাসুজি একে পলাতক বলেই ধরে নেওয়া হবে অথবা একজন অখ্যাত অজ্ঞাত বিদেশী যে নিজেকে সনাক্ত করবার কোন কাগজপত্র দেখাতে পারছে না। জেলার যে সরকারী কর্ম্মচারী এসেছিলেন, তিনি অম্লান বদনে বল্লেন, যা'ই হ'ক, এই অচেনা বিদেশীর জন্য সরকার থেকে কোন আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে না। একজন ফরাসী ভদ্রলোক এ কথার মাঝেই এক রকম বলে উঠলেন, আহার বাসস্থানের কথা আবার কি বল্‌ছেন মশাই বুঝাই ত যাচ্ছে এ ব্যাটা পালিয়ে এসেছে, একে কোন কাজে লাগিয়ে দিন। কাছেই দুইজন স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁরা প্রতিবাদ করতে লাগলেন, আপনারা কি বলতে চান এই লোকটা এর এই দুর্দ্দশার জন্য নিজে দায়ী, লোকদের বাড়ী-ঘর থেকে ছিনিয়ে এমনি করে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? এরপর খানিকটা রাজনৈতিক বাদানুবাদ চলতে লাগ্‌লো। একজন দিনেমার ভদ্রলোক বল্লেন, সামনের হপ্তার জন্য লোকটার সকল খরচ তিনি বহন করতে রাজী আছেন, এর মাঝে সরকার রুশীয় রাজদূতের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে একটা আলোচনা করে নিতে পারবেন। সরকারী কর্ম্ম-চারী যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যেন কথাটা শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, তাঁরা অন্ততঃ সাময়িকভাবে একটা সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেলেন।

যখন বাদানুবাদ করতে গিয়ে সমাগত ভদ্রলোক সব উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছিলেন, বরিস তখন কাতর হয়ে হোটেলের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়েছিল—সে বুঝতে পেরেছিল তাকে নিয়েই যত সব তর্ক চলেছে, আর ম্যানেজারই ইচ্ছা করলে তার ভাগ্যের কথা জানিয়ে দিতে পারেন। বাদানুবাদ যখন থেমে গেল তখন লোকটা হাতজোড় করে ম্যানেজারের দিকে এমন করে তাকিয়ে রইল যে, দেখে মনে হয় যেন কোন ভক্তি-মতী নারী দেবমূর্ত্তির কাছে প্রার্থনা করছে। যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁদের সকলের মনই আর্দ্র হয়ে উঠ্‌লো। ম্যানেজার তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, তার কোন ভয়ের কারণ নেই, —কিছুকাল নিশ্চিন্তে সে এখানে থাকতে পারে। কেউ তার কোন ক্ষতি করবে না, গ্রামের সরাইখানা থেকে সে তার খাবার ও অন্যান্য দরকারী জিনিস পাবে। কৃতজ্ঞতা জানাতে লোকটা ম্যানেজারের হস্ত চুম্বন করতে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু ম্যানেজার এই অপরিচিতের অদ্ভুত ধন্যবাদ প্রণালী মেনে নিতে রাজী হলেন না। যা'হক ম্যানেজার তাকে সঙ্গে করে সরাইখানায় পৌঁছে দিয়ে তার থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে, অনেক রকমে আশ্বাস দিয়ে নিজের হোটেলের দিকে রওয়ানা হ'লেন।

ম্যানেজারকে চলে যেতে দেখে লোকটার মুখচোখ আবার

কেমন হয়ে গেল। সে একদৃষ্টে ম্যানেজারের চলার পথের দিকে চেয়ে রইলঃ এই অজানা বিদেশে একটিমাত্র তার বন্ধু জুটেছিল যে তার কথা বুঝতো। পাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা এর রকম-সকম দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলেন, কিন্তু লোকটার সে দিকে খেয়াল নেই, যতক্ষণ ম্যানেজারকে দেখা গেল, এক মুহূর্ত্তের জন্য সে তার গমনপথ থেকে চোখ ফিরালে না। ম্যানেজারকে যখন আর দেখা গেল না তখন দর্শকদের মাঝে একজন সস্নেহ স্পর্শে লোকটার কাঁধ ধরে সরাইখানার দরজা দেখিয়ে দিলেন। সে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সরাইখানার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে তাকে একটা ঘর দেওয়া হ'ল। ঘরে প্রবেশ করবামাত্র একজন পরিচারিকা এসে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য টেবিলে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি রেখে গেল। সে মনমরা হয়ে বাকী সকালটা একরকম করে কাটিয়ে দিল। ছেলেরা এসে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে লাগল। সরাইখানাতে অন্যান্য খদ্দের এসে তাকিয়ে দেখতে লাগ্‌লো, কিন্তু তার কোন দিকেই খেয়াল নেই; সে তার লজ্জানত চোখ দুটি টেবিলের দিকে রেখে বোবার মত বসে রইল। ক্রমে খাবার সময় হ'ল—লোক-জনে ঘর ভর্ত্তি হয়ে গেল। তাদের কত হাসি কত কথা, সমস্ত ঘরখানা যেন গুলজার হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু এই রুশীয় লোকটা তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলে না। অজানা-অচেনা এত লোকের মাঝে বসে তার দম আটকে আসছিল। ঝোলটা মুখে তুলে ধরবার সময় তার হাতটা এমনি করে কাঁপছিল—যে তার খাওয়াই হ'ল না; দু'চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে টেবিলের উপর পড়তে লাগল। তার কান্না কেউ দেখতে পেয়েছে কি না—জানবার জন্য সে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে। হাঁ—সবাই দেখেছে। তার দুর্দ্দশা দেখে সবার কথাবার্ত্তা থেমে গেছে। লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়ঃ তার মাথাটা ক্রমেই কালো কাঠের টেবিলের দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

সন্ধ্যা অবধি সে সেই সরাইখানাতে কাটাল। কত লোক এল গেল, কিন্তু সে তার কিছুই টের পেল না, তারাও শেষে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল। চুল্লীর পাশে—আড়ালে—টেবিলের উপর হাত দু'খানি রেখে সে চুপ করে বসে রইল। কেউ তার দিকে আর ফিরেও চাইল না। চারিদিকে যখন আঁধার ঘনিয়ে এল—সে তখন উঠে সরাইখানা ছেড়ে—আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল; কেউ তাকে লক্ষ্যই করলে না। পাহাড়ের উপরে যে হোটেলে সেই ম্যানেজার থাকেন একটা মূক পশুর মত বরিস সেই দিকে এগিয়ে চল্‌লো। হোটেলের দরজার সামনে এসে সে টুপী হাতে ঝাড়া এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও চাইল না। হোটেলের প্রবেশ দ্বার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত,—সেখানে একটা কালো গাছের গুঁড়ির মত ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পা ধরে গেল। অবশেষে একজন ভৃত্য তাকে অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ম্যানেজারকে ডাকতে গেল। ম্যানেজারকে দেখবামাত্র তার মুখে আবার আনন্দের রেখা ফুটে উঠ্‌ল। ম্যানেজার এসে বেশ স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—

কি খবর, বরিস?

বরিস একটু আমতা আমতা করে বল্‌লে,—আজ্ঞে ক্ষমা করবেন, আমি বাড়ী যেতে পারব কি না—অনুগ্রহ করে যদি বলতেন।

হাঁ, বরিস, তুমি বাড়ী যেতে পারবে বই কি?—ম্যানেজার হেসে উত্তর দিলেন।

কবে,—কা'ল?

কথাটা শুনে ম্যানেজারের মুখের থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। বরিসের মুখের কাতর আবেদন দেখে তাকে আঘাত দিতেও কষ্ট হচ্ছিল,—তবু তাকে বলতে হ'ল, না, বরিস কা'ল নয়,—যুদ্ধটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি বাড়ী যেতে পাবে না।

যুদ্ধটা কবে শেষ হচ্ছে, শীগ্‌গিরই হবে ত?

সেকথা শুধু ভগবানই জানেন,—মানুষ কিছু বলতে পারে না, বরিস।

আমাকে শেষ অবধিই থাকতে হবে,—একটু আগে যেতে পারি না আমি?

না, বরিস।

আমার বাড়ী কি অনেক দূরে?

হাঁ।

অনেক দিনের পথ?

বহু দিনের।

কিন্তু আমি ত বেশ সুস্থ-সবল আছি,—আমি অনায়াসে সেখানে হেঁটে যেতে পারব, একটুও ক্লান্ত হব না আমি।

না, তা' তুমি পার না, বরিস। তোমার দেশে যাবার আগে তোমাকে আর একটা সীমান্ত পেরুতে হবে।

সীমান্ত!—সে আবার কি? বরিস কথাটা বুঝতেই পারলে না। কিন্তু তবুও যাবার জিদ সে ছাড়বে না, সে বলে যেতে লাগল, কেন আমি সাঁতরে পার হয়ে যাব!

বরিসের কথা শুনে ম্যানেজার না হেসে পারলেন না, তবু ওর অবস্থাটা বুঝে তিনি ব্যথিত হয়েও উঠলেন। স্নিগ্ধস্বরে তিনি বল্‌লেন, তা' তুমি পার না বরিস সীমান্ত মানে হচ্ছে অপরের দেশ। সেখানকার লোকেরা তোমাকে তাদের দেশের ভিতর দিয়ে যেতে দেবে না।

কিন্তু আমি ত তাদের কোন ক্ষতি করব না। আমার রাইফেল আমি ফেলে দিয়েছি; আমি আমার স্ত্রী পুত্রের কাছে ফিরে যেতে চাই। খৃষ্টের নাম করে যদি আমি তাদের কাছে সেই কথা জানাই—তবে তারা আমায় যেতে দেবে না কেন?

না, বরিস, দেবে না। খৃষ্টের নাম করলেও দেবে না। লোকে আজকাল যিশুখৃষ্টের কথা মানে না।

আমি তা হ'লে কি করব বলুন ত! এখানে ত আমি থাকতে পারি না। এখানকার কারো কথা কিছুই বুঝি না আমি, আমার কথাও কেউ বোঝে না।

থাকতে থাকতে তুমি ক্রমে সব বুঝতে পারবে। সব জানবে।

বরিস মাথা নাড়তে লাগল, না মশায়, আমি কোন দিন...

য করতে, আর কিছু না। এখানে থেকে আমি কি করব? মি বাড়ী যাব,—অনুগ্রহ করে আমায় পথটা বলে দিন।

পথ ত কোন নেই, বরিস।

কেন, তারা আমায় আমার স্ত্রী-পুত্রের কাছেও যেতে বে না—না কি? এখন ত আর আমি সৈনিক নই।

তাই, বরিস, তারা তোমায় যেতে দেবে না।

কিন্তু জার?—জার ত আছেন; তিনি ত আমায় সাহায্য রতে পারেন!

জারের কথাটা মনে পড়বা মাত্রই—বরিসের মনে যেন কটা আশার হিন্দোল খেলে গেল; জারের নাম উচ্চারণ রতেই তার মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠ্‌ল।

এখন আর জারের রাজত্ব নেই, বরিস, তিনি সিংহাসন-ত হয়েছেন।

জার নেই!—বরিস কথাটা যেন ভাল করে বুঝতে না রে ম্যানেজারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার নের কোণে আশার যে ক্ষীণ আলোটা জ্বলে উঠেছিল,—কটা দমকা হাওয়ায় তাও যেন নিভে গেল। নিতান্ত জীবের মত বরিস বলে উঠিল, তা'লে আমি বাড়ী যেতে াব না?

না, বরিস, তোমাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

খুব বেশি দিন কি?

আমি ঠিক বলতে পারছি না।

কথাটা শুনে বরিসের মুখে সেই আঁধারের মাঝেও যেন নরাশ্যের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল! সে বলে উঠল, অনেক দিন অপেক্ষা করেছি আমি, আর পারি না, অনুগ্রহ করে আমাকে একবার পথটা দেখিয়ে দিন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

কোনও পথ নেই, বরিস। অন্য রাজ্যের সীমায় গলেই তারা তোমায় পাকড়াও করবে। এখানেই থাক তুমি; তোমার জন্য আমরা কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এরা আমার কথা বোঝে না,—আমি এদের কথা বুঝি না, —আমি এখানে কি করে বাঁচব?—অনুগ্রহ করে আমায় যাবার উপায়টা বলে দিন।

সে আমি পারি না, বরিস।

খৃষ্টের দোহাই,—আপনি আমায় সাহায্য করুন। আপনি ছাড়া অন্য কোন ভরসা নাই আমার।

আমি যে পারি না, বরিস। আজকাল লোকে আর কেউ কারও সাহায্য করতে পারে না।

এর পর তারা দু'জন কেবল পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল। বরিস দু'টি আঙুল দিয়ে তার টুপিটা মোচড়াতে লাগল।

ওরা আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে এল কেন? ওরা বল্‌লে রাশিয়া আর জারের পক্ষ হয়ে আমাকে লড়াই করতে হ'বে।

কিন্তু রাশিয়া ত এখান থেকে অনেকদিনের পথ,—আর জার।

......জারকে ওরা কি করেছে বললেন যেন?

সিংহাসনচ্যুত।

সিংহাসনচ্যুত?—কথাটা সে ভাল করে উচ্চারণ করতে পারলে না। সে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আবার বলে যেতে লাগল, কি করি বলুন ত! বাড়ী আমায় যেতেই হবে। আমার ছেলে-পিলে আমার জন্য কাঁদছে, তাদের ছেড়ে আমি এখানে থাকতে পারব না। অনুগ্রহ করে আমায় একটু সাহায্য করুন।

আমি তা পারি না, বরিস।

আমায় সাহায্য কি কেউ করতে পারে না।

এখন কেউই নয়।

বরিসের মাথাটা নীচু হয়ে গেল, সে আরও মুসড়ে পড়ল।—তারপর ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে সেখান থেকে ধীরে ধীরে ফিরে চল্‌লো।

ধীরে ধীরে সে পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে চল্‌লো, ম্যানেজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ম্যানেজার দেখলেন—বরিস আর সরাইখানাতে ঢুকল না,—যে পথ সিধে হ্রদের দিকে চ'লে গেছে,—সেই পথে সে চলেছে। ম্যানেজারের বুক থেকে আপনা-আপনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল, তারপর তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

কিন্তু কি ব্যাপার হল দেখুনঃ যে জেলেটা আগের দিন ভোরে—জীবন্ত লোকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল, সেই জেলেই পরের দিন ভোরে—তারই নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার করলে। বিদেশীর দেওয়া জামা কাপড় টুপী সে সবই তীরে রেখে জলে নেবেছিল। যেমন রিক্ত-বসনে সে জলথেকে উঠে এসেছিল ঠিক তেমনি করেই সে নেবে গিয়েছিল।

এই বিদেশীর পুরো নামটা কেউ জানতে পারে নি, তাই তার কবরের উপর একটা কাঠের ক্রুশ ছাড়া আর কিছু খাড়া করা গেল না।*

---

* অস্ট্রিয়ার প্রসিদ্ধ লিখিয়ে স্টেফান জিউইক্‌-এর The Run away নামক গল্পের অনুবাদ।

সময়োচিত বাণীর প্রভাব

কথায় আছে, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'; কিন্তু বর্তমান প্রগতির যুগে অনেক প্রাচীন কিম্বদন্তী ও প্রবাদ-বাক্যই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে, সেই সঙ্গে উপরি-উক্ত প্রবাদটিও দেখিতেছি, উহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহা না হইলে গীর্জার যে প্রার্থনা-বাণী (Sermon) বর্তমানে শূন্য চেয়ারের নিকট নিবেদন করিবার রেওয়াজ দেশে দেশে নন্দিত হইতেছে, তাহার অপহৃব ঘটাইয়া এবং চোরার হাজার হাজার বৎসরের ধর্ম-কাহিনী না শোনার সুনামকে মহাশূন্যে বিলীন করিয়া সেণ্ট লুই গীর্জার রেভারেণ্ড র‍্যাণ্ডেল একেবারে সত্যযুগের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ফেলিলেন কি করিয়া। রেভারেণ্ড মহোদয় "অস্বীকৃত পাপ"-এর বিষময় অকল্যাণ এমনভাবেই প্রচার করিলেন সেদিন যে, পরদিনই তাঁহাকে দ্বিতীয় বক্তৃতা দিতে হইল 'স্বীকৃত পাপে'র উপর—তাহার শ্রোতা অবশ্য সেদিন শূন্য চেয়ার ছিল না—ছিল পুলিশের লোক।

তিনি গর্বের সঙ্গে বলিলেন—লোকটির নাম বলিব না, কিন্তু সে আপন পাপ স্বীকার করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, কিছুদিন পূর্বে গীর্জার অভ্যন্তর হইতে যে টাইপ-রাইটিং মেশিনটি চুরি গিয়াছিল এবং যাহা থানায় ডায়েরী করান হইয়াছিল, আশ্চর্যের বিষয় সেই মেশিনটি অদ্য যথাস্থানে আসিয়া হাজির হইয়াছে। লোকটি স্বীকার করিয়াছে, সে এই মেশিনটি অন্যত্র লইয়া গিয়াছিল। এখন মেশিনটি যখন অটুট অবস্থায় এবং বিনা খরচে গীর্জায় যথাস্থানে পুনরায় আগমন করিয়াছে, তখন আর যে ব্যক্তি ইহার জন্য দায়ী, তাহাকে ক্ষমা না করিয়া লাভ কি হইবে! লোকটি বলিয়াছে—যদি সেই চোরকে বেকসুর মাফ করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে চোর আর কোনপ্রকার 'পাপ' করিবে না।

এই স্বীকৃত পাপের সার্মন্ অর্থাৎ ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পরিশেষে রেভারেণ্ড পুলিশকে এই অনুরোধ জানান যে, তাহারা যেন আর এই চোরের সন্ধানে না লাগে এবং তাঁহার নিকট উহার নাম জানিতে না চাহে।

প্রগতির দিনে যে ঐ অঞ্চলে 'সত্যযুগ' ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই!

আদর্শ পত্নীর নিদর্শন

ওয়েস্টমিনস্টার কলেজে ছাত্রদের প্রেসিডেণ্ট বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, এই কলেজের ২০০ ছাত্রের ভিতর ১৯৮ জনের মত—আদর্শ পত্নীর পরিচ্ছদ যেমন থাকিবে হাল-ফ্যাশানের ও পরিপাটি, তেমনই তাহাদের থাকা চাই উচ্চ স্তরের প্রচলিত বুদ্ধিমত্তা।

কোন্ প্রকারের পত্নী একেবারেই মনোমত নয়—এই বিষয়ে শতকরা ৯৪জন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, উত্তম প্রতিভাসম্পন্না স্ত্রী—বিদ্যা-শিক্ষাতেই হউক, আর উচ্চ চাকুরী দ্বারাই হউক—তাহাদের একেবারেই পছন্দ নয়। তথাপি সাতজনের ভিতর ছয়জনই চাহে যে, পত্নী এই প্রকার উপার্জনক্ষম হইবে, যেন সে তাহার নিজ খরচ চালাইতে পারে!

পরিচ্ছদ ও বুদ্ধিমত্তার পরেই পত্নীর আর যে সকল গুণ থাকা চাই, তাহা হইল—ঘরকন্নার কাজে নিপুণতা, মস্করা সমঝিয়া চলিবার নমনীয়তা এবং খেলাধুলায় আকর্ষণ থাকা চাই—বিশেষ করিয়া টেনিস অথবা গলফ্। শতকরা ১৫ জন মাত্র চাহে সুন্দরী পত্নী। বিদায় অদ্বিতীয়াকে অপছন্দ করিলেও কিন্তু শতকরা ৩৯জন চাহিয়াছে, যেন তাহাদের পত্নী কলেজ গ্র্যাজুয়েট হয়। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র সুন্দরী পত্নী চাহিলেও শতকরা ৯৫ জনের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের স্ত্রী যেন কুৎসিত না হয়!

ইহার পর যে সকল মন্তব্য বিশেষ জনপ্রিয়, তাহার স্বরূপ এই—

পড়াশোনা করা স্ত্রী চাই, আর একেবারে মেধাহীন না হয়।

স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবী থাকা চাই এবং বান্ধবীদের শ্রদ্ধার পাত্রী হওয়া দরকার।

স্বাস্থ্যবতী, ভালবাসার যোগ্য, স্বামী-অনুরক্ত এবং অচঞ্চল হইতে হইবে।

নাচ-গান জানা চাই, হাসি-মস্করার মূল্য বোঝা চাই, ব্যবসায় মাথা থাকা চাই।

ছেলেমেয়ে পালনের শিক্ষা থাকা দরকার, শিশুকে স্বভাবের হওয়া উচিত।

গৃহকার্য পরিচালনে অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় এবং হাত-খরচের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষিণী হইবে না।

কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের প্রশ্ন করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহাদের ভিতর শতকরা ১৯ জন কোন না কোন তরুণীর প্রেমমুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু সেই তরুণীরা তাহাদের প্রেম-নিবেদন গ্রাহ্য করিবে কিনা, সে বিষয়ে কেহই নিশ্চিত নয়।

নূতন স্বর্ণ উত্তোলন-যন্ত্র

সাধারণত যেভাবে মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণরেণু এবং স্বর্ণ-মিশ্র ড্যালা উত্তোলিত হয়, তাহাতে নিঃশেষে স্বর্ণ বাছিয়া তোলা সম্ভব হয় না; এবং পরে ঐ জমিকে চাষের উপযুক্ত করিতে বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় দরকার হয়—যে সকল অঞ্চলে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত সোনা রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে। নূতন এক যন্ত্র (ড্রেজ্) আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা দ্বারা স্বর্ণ উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমি পাট হইয়া যাইবে। বড় বড় ড্যালাগুলি থাকিবে নীচের স্তরে, উপরে ঝুরা মাটি পড়িবে। অথচ স্বর্ণরেণুও নিঃশেষে উত্তোলিত হইবে। অরিগন্ প্রদেশের পোর্টল্যাণ্ড শহরের হ্যারি ইংল্যাণ্ড এই যন্ত্রের আবিষ্কারক!

সন্তরণপটু শিশু

শিশুটির বয়স মাত্র নয় মাস। সে এখনও হাঁটিতে শিখে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, সে নির্দিষ্ট সময়ে হামাগুড়ি দিয়া সাঁতার-পুকুরে চলিয়া যায় এবং কাহারও সাহায্য ব্যতীত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করে এবং ক্লান্ত হইলে উঠাইয়া নিবার জন্য কাঁদিয়া উঠে। তখন উহাকে উঠাইয়া আনা হয়। এমন কি কাছে অন্য লোক না

থাকিলেও শিশু কিছুমাত্র ভয় পায় না। একাই যাইয়া জলে ঝম্পপ্রদান করে। নয় মাসের শিশুর এই প্রকার আশ্চর্যজনক নিপুণতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুকুর প্রভৃতি পশুগণ যেমন অতি শিশুকাল হইতে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জলে পড়িয়া সাঁতার কাটে, তেমনই একটি সহজাত প্রবৃত্তি যে এক্ষেত্রে কার্যকর হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

হুমুহুমুনুকুনুকুয়াপুয়া

নামের বহরে এইটি যতই বিদঘুটে ও রহস্যজনক মনে হউক না কেন, উহা মাছের একটি জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সামোয়া এবং হাওয়াই দ্বীপে এক অভিযান প্রেরিত হয় চিকাগোর শেড্ অ্যাকুয়ারিয়ামের তরফ হইতে। উহারা ১৩০ প্রকারের মাছ এবং আলাদা আলাদা ১০০ জাতীয় কাঁকড়া সংগ্রহ করিয়া চিকাগো শহরে ফিরিয়া আসে। উহারা দুইটি অক্টোপাস ধরিয়াও সঙ্গে আনিয়াছিল; কিন্তু মাছেরা ঐ দুইটি অক্টোপাসেরই দাঁড়াগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে। এই দাঁড়া মাছেদের অতি প্রিয় খাদ্য। তথাপি কতকগুলি মাছ রাস্তায় মরিয়া যায়।

হুমুহুমু নামে একজাতীয় মাছ সামোয়া অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ; উহাদের পাঁচটি বিভিন্ন জাতি রহিয়াছে, যেমন আমাদের দেশে পোনা মাছের ভিতর রুই, কাৎলা, মৃগেল প্রভৃতি রহিয়াছে। এই পাঁচটি শাখাজাতির ভিতর একটির নাম হইল যাহা শিরোনামায় লিখিত। মাছটি যে দেশের, সে তল্লাটের লোকেদের বিশ্বাস—নামটি একেবারে চমৎকার খাপ খাইয়াছে, কারণ এতগুলি উকারান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে ঠোঁট দুটিকে যে প্রকারে সঞ্চালিত করিতে হয়, তাহা হুবহু মাছেদের খাবি খাইবার কায়দার অনুরূপ। সুতরাং এই অদ্ভুত—হুমুহুমুনুকুনুকুয়াপুয়া যে সার্থকনামা জীব, একথা অস্বীকার করিতে পারে সাধ্য কার!

দুই মুণ্ড বিশিষ্ট কাঠ-ঠোকরো

পরস্পর সংলগ্ন যমজ, যাহাকে আজকাল শ্যামযমজ (Siamese Twins) বলা হয়, মানবের ভিতর তাহা বিরল হইলেও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বিকলাঙ্গ যমজও দেখিতে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও—তেমনি অঙ্গ-বিশেষে যমজও জন্মিয়া থাকে। এই কাঠ-ঠোকরাটিরও তেমনই ভাবেই দুইটি মুণ্ড গজাইয়াছে, নতুবা ইহা উহার জাতীয়

বৈশিষ্ট্য নয়; অবশ্য দুই মুণ্ড বিশিষ্ট কাঠ-ঠোকরাদের কোন শ্রেণী দুনিয়ার কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দুই মুণ্ড থাকার দরুন স্বাভাবিক পরিণতি হইয়াছে এই যে, অন্যান্য কাঠ-ঠোকরা যখন গাছের গায় ঠোকর মারিয়া পোকা বাহির করিতে চেষ্টা পায়, তখন উহাদের ঠোঁটে মাত্র শব্দ হয়, দুইজোড়া ঠোঁটের আঘাতে শব্দ হয় দ্বিগুণ। অনুরূপ, আবার গাছের ছালের ভিতর হইতে পোকা বাহির করিয়া আহার পাইতে পারে বহুগুণে বেশী।

সিনেমা-অভিনেত্রীর অদ্ভুত নেশা

যুদ্ধকালে গুপ্তচরের গোপন প্রয়াসের মত সিনেমা অভিনেত্রীর আমেরিকা হইতে বে-আইনী মাদকদ্রব্য আনয়নের কাহিনী মারলেবোন পুলিশ কোর্টে উদ্ঘাটিত হয়।

মিস্ মার্গারেট বার্টন (২৮) অপরাধ স্বীকার করে। পুলিশের তরফ হইতে বলা হয়—

হলিউডে থাকাকালীন মিস্ বার্টন নেশার কবলে পতিত হয়—এই মাদকদ্রব্যটি হেরোইন্ (heroin)। প্রায় এক বৎসর পূর্বে সে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসে। সেই সময় হইতে সে আমেরিকা হইতে প্যাকেট প্যাকেট হেরোইন্ আনাইতে থাকে। এই জাতীয় মাদকদ্রব্য আমদানী বা ব্যবহার নিষিদ্ধ,

সেইজন্য উহা এমন কৌশলে গোপনে আনা হইতে থাকে—যে উপায় শুধু যুদ্ধকালে গুপ্তচরগণই অবলম্বন করে।

আমেরিকান সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা—যাহা বাহ্য-দৃষ্টিতে নিতান্তই সন্দেহাতীত তাহারই ভিতর কাগজের ফালি দ্বারা আবদ্ধ হেরোইন্ প্যাকেট প্রথমত মাসে একবার পরে প্রতি সপ্তাহে মিস্ বার্টনের নামে ডাকে আসিয়া পৌঁছায়। সংবাদপত্রের প্যাকেটটির দুই মুখ থাকিত খোলা—সন্দেহ উদ্রেক করিবার লক্ষণ কিছুই ছিল না।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এক গোপন সংবাদ পাওয়া যায়। ফলে ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট মিলার তক্কে তক্কে থাকে। একদিন যেমন ডাকপিয়ন একখানি সাময়িক পত্র মিস্ বার্টনের নিকট ডেলিভারি দিল, অমনি মিলার তরুণীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে—এ সংবাদপত্র কি আপনার নামে আসে?

—হাঁ, 'আমেরিকান্ উইকলি' পত্র ইহা।

—আপনি কি জানেন ইহার ভিতরে কি রয়েছে?

—নিশ্চয়ই। এই যে দেখুন প্যাকেট, যা আপনি খুঁজছেন।

বলিয়া ১০নং পৃষ্ঠা হইতে হেরোইন্ প্যাকেট বাহির করিয়া দেখাইল।

প্যাকেটের মাদকদ্রব্য বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় উহার চারিভাগের তিনভাগ হেরোইন্, বাকি এক ভাগ চিনি। সমুদয়ে ২২৫ গ্রেন মাদক রহিয়াছে। ডিটেক্টিভ তরুণীর কক্ষের চারি কোণে তল্লাস করিতে উদ্যত হইলে মিস্ বার্টন বলে—আপনার শ্রম লাঘব করবার জন্যে বলছি, আমেরিকান উইকলি পত্রের ১০নং পৃষ্ঠা দেখুন। অন্য কাগজে কিছু নেই। ঐ প্রকার মাদকদ্রব্য সম্বলিত ৫ কাপি সাময়িকপত্র পাওয়া যায়। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জও সেই কক্ষে পাওয়া যায়। মিস্ বার্টন স্বীকার করে যে, তাহার হেরোইন্ দ্বারা নেশা করিবার অভ্যাস জন্মিয়াছে। প্রায় বৎসর দেড়েক পূর্বে এক অস্ত্রোপচার করা হয়, উহার পর হইতে সে অতিশয় দুর্বলতা অনুভব করে। এই নেশা তাহার বিশেষ উপকার করিয়াছে।

পুলিশ তখন বলে যে, সাধারণ একজন নেশাখোর এই পদার্থের ৭।৮ গ্রেন্ মাত্র গ্রহণ করে। মিস্ বার্টন এত বেশী পরিমাণ কেন আনায়, তাহার কারণ বুঝা যায় না। অথচ সে যে কাহারও নিকট বিক্রয় করে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না।

মিস্ বার্টন বলে, সে সঞ্চয়ের জন্যই বেশী পরিমাণ আনায়; বিশেষত তাহার সন্দেহ হয়, বেশী দিন এইভাবে এই জিনিষ পাওয়া সম্ভব হইবে না, সেজন্যও সে বেশী পরিমাণ জমায়েত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেন—মিস্ বার্টন যাহাতে সুচিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া এই অভ্যাস ছাড়িবার চিকিৎসা করাইতে পারে, তাহার জন্য ২৫ পাউন্ড জামিনে ছয় মাসের জন্য তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। কিন্তু উক্ত ছয় মাস পরে যদি জানা যায় যে, সে চিকিৎসা করাইতেছে না, তবে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে এবং আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হইবে না।

৩০০০ উত্তরাধিকারীর দাবী

ফরাসী দেশের কোনও রাজার সেক্রেটারী পাঁচটি পৃথক উইল দ্বারা ৩৫৫৫ স্বর্ণমুদ্রা লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। উইল পাঁচখানাই ছিল তাঁহার সুন্দরী কন্যা য়্যানের নামে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর য়্যানের বিবাহ হয় রাজার উপস্থিতিতে। কিন্তু উক্ত সম্পত্তির কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। বিখ্যাত সুন্দরী য়্যানের এই প্রকার হতাশ হইবার সংবাদ পাইয়া রাজা স্বয়ং তাহাকে বহু অর্থ ও সম্পদ দান করেন। বর্তমানে সেই স্বর্ণমুদ্রা ৩৫৫৫ টি পাওয়া গিয়াছে এবং ঐগুলি ১৭২৬ সালের বলিয়া উহার বর্তমান মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক। কিন্তু সম্পদের সন্ধান হইবার পর ৩০০০ উত্তরাধিকারী উহার অংশের দাবী করিয়াছে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই সম্পদের বিলি-ব্যবস্থায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই গবর্ণমেন্টের ১৮০০ ফ্রাঙ্ক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। উহা বাদে সকল উত্তরাধিকারীকে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া দিলে প্রতিজনের অংশে একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পড়িবার কথা। গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছে স্বর্ণমুদ্রাগুলি নীলামে বিক্রয় করা হইবে। ইতিমধ্যে উত্তরাধিকারের আদালত-সংগ্রাম চলিতে থাকুক।

ধর্ম্মরাজ পূজা

(১৬৫ পৃষ্ঠার পর)

করিতেছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে শোভা সিংহ ও রহিমসার বিদ্রোহ এবং এবং তাহারই কিছু দিনের মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামা দেশকে প্রায় শ্মশান করিয়া তুলিয়াছিল। এই দারুণ দুঃসময়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহাদের জনাই বিশেষ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের প্রয়োজন হইয়াছিল। সমাজের নিম্ন শ্রেণীগুলিকে একতার বন্ধনে বাঁধিবার জন্য, পুরাতন সৈনিকের জাতিদের মধ্যে যুদ্ধের স্মৃতি জাগাইবার জন্য ডোম, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতি জাতির হৃদয়ে কালুডোম, (লাহাটা) বজ্রের বীরত্ব ও মহত্বের নূতন প্রেরণার জন্য ধর্ম্মমঙ্গলেরই সে দিন প্রয়োজন ছিল। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা শিবায়নে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। কারণ বাঙালীর যুদ্ধের কাহিনী আর কোন মঙ্গলকাব্যেই লিখিত হয় নাই। যদিও ঐ সমস্ত মঙ্গল-কাব্যেও নায়ক নায়িকারা সমাজের নিম্নস্তরের লোক, তাহারাও চরিত্র মাহাত্ম্যে পূজা পাইবার যোগ্য এবং তাহাদের প্রভাবেও জাতিগঠনে সমাজ কম সাহায্য পায় নাই, তথাপি ধর্ম্মমঙ্গলের সঙ্গে ঐগুলির পার্থক্য সুস্পষ্ট। সাহিত্যের দিক দিয়া মূল্য যাহাই হউক, জাতীয়তার দিক দিয়া মঙ্গল-কাব্যগুলির মূল্য নিতান্ত কম হইবে না। আমরা আগামী-বারে ধর্ম্মরাজ পূজার আনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

ক্ষণিকা

(কথিকা)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুহুকোনশায়িনীর দুর্যোগেই জীবনের অর্দ্ধেক পথ ও অতিক্রম করেছে, তাই আঁধার অভিযানই ওর অভ্যাস। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকাই ওর বিলাস। এক নিবিড় ব্যথাকে কেন্দ্র করে পঁচিশটি শিশির বসন্তকে ও পুনঃপুন ঘুরে আসতে দেখেছে।

সংসার সমুদ্রে অজস্র মানব বুদ্বুদের মত সহজ সাবলীল ছন্দে ভেসে বেড়াবার মত হাল্কা মন ওর কোনদিনই হল না। অব্যক্ত ব্যথার নেশায় ও ভরপুর। এ নেশার ঘোর কাটাতে ও চায় না, তাহলে বাঁচবে কোন উত্তেজনায়—ও করেছে আত্ম সম্মোহন।

আষাঢ়ের বর্ষণরত বৈকাল—পাংশু, পাণ্ডুর। ভিজতে ভিজতে ও চলতে সুরু করল উদাস, মন্থর ওর বাড়ীর পাশের সরু পায়ে-চলা পথটা দিয়ে। ঐ পথের জন্ম রহস্য ও জানে না—কতদূর থেকে ঐ পথ আসছে ও তাও জানে না। শুধু জানে এই পথ কত গ্রাম, কত প্রান্তর ঘুরে বয়ে আনছে এক করুণ বার্তা। সহস্র পথিকের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এই পথের পাঁজরের স্তরে স্তরে। মর্মখানি যখন করুণ কান্নায় ভরে ওঠে, পথ একটু থেমে যায় ঐ জবা ফুল গাছটার তলায়। ফেলে যায় দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু। ও বসে পড়ল ভিজে মাটিতে ঠিক রক্ত জবা দুটির পাশে, কণ্ঠে গুমরে উঠল একটি বিরহী সুর,

"এমনি দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরেঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।"

একটি ক্ষুব্ধ ব্যথিত আত্মা যেন ওর চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে

"সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখেদুখী—
আকাশে জল ঝরে অনিবার
জগতে কেহ যেন নাহি আর।"

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘোলাটে পাঁশু আলো কম্পিত রশ্মির সাথে মহাশূন্য হতে বয়ে আনছিল গ্রহ-নক্ষত্রর বুকের টনটনানি। তখনও ও তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছে,

"সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।"

গানে পড়ল আকস্মিক বাধা। একেবারে ওর সামনেই একটি ছোট্ট ঝকঝকে ছেলে, আর তার সঙ্গে একটি মেয়ে—তকতকে তরুণী। ওর চির তমসাময় জীবনে প্রথম জ্যোৎস্নার আভাস—ও বিহ্বল নয়নে তাকিয়ে রইল সেই স্নিগ্ধ মুখখানির দিকে। মেয়েটিও অবাক বিস্ময়ে আয়ত আঁখিদুটি মেলে ধরেছিল ওর মুখের পানে। মুহূর্তে ওদের যেন হয়ে গেল পরম পরিচয়। নিজেকে সামলে ও উঠে দাঁড়াল জবা ফুল দুটি কুড়িয়ে নিয়ে ছোট ছেলেটিকে বললে "ফুল নেবে খোকা? লাল ফুল!" বলে তার প্রসারিত হাতে ফুল দুটি দিয়ে দিলে। সে ফুল দুটি নিয়ে দিদির হাতে দিয়েই পালাল ছুটে। দিদিও গেল তার পিছনে, জবা দুটি খোঁপায় গুঁজে। পিছন থেকে দেখা গেল একটি রেশমী চুলের রহস্যময় গোলক নিটোল সুঠাম গ্রীবার পরে বিপুল পুলকে দুলে দুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, আর লাল টকটকে জবাদুটি অবাধ্য কুন্তলের পশম পরশে পাচ্ছে অপূর্ব শিহরণ। পাশের বাগান বাড়ীটাতে তো কেউ থাকত না! এরা এল কোথা থেকে? খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় মেয়েটি ওর দিকে ফিরে চাইতেই আবার হল চারি চক্ষুর মিলন—খোঁপা থেকে জবা দুটি নিয়ে অঞ্জলি করে মেয়েটি হাত দুটি একবার কপালে ঠেকাল, তার চোখে ছিল বিদ্যুৎ—যার পরশে হৃদয়ের স্পন্দন থেমে যায়, কিন্তু দূর থেকে যা দেয় জ্যোতি, যা দেয় চলার শক্তি।

পশ্চিম গগনে তখন সন্ধ্যারাণী দিনের কপালে এঁকে দিচ্ছিল বিদায়ের রক্ত টিকা, আর দিনমণি তার শিথিল কবরীতে পরিয়ে দিচ্ছিল রক্ত জবা।

আজ ওর মহাস্মরণীয় দিন। চির আঁধারের জীব পেয়েছে আলোর উৎসের সন্ধান। ওর জীবনের আজ প্রথম প্রতিপদ—অমাবস্যার যখন অবসান হয়েছে, জ্যোতির এই ক্ষীণ রেখা একদিন ওর জীবনে এনে দেবে পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা। ওর ডায়েরীতে লিখে রাখল বিদ্যাপতির এই কয়টি লাইন,
"আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু, পেখনু পিয়ামুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু, দশদিশ ভেল নিরন্দ্বন্দা
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানলু, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল, টুটল সবহু সন্দেহা।"

পরদিন সকালে আবার বসল ডায়েরী নিয়ে,

"ওগো ব্যথার রাজা! তোমার সামন্তদের নজরবন্দী তো চিরদিন ছিলাম—বিদ্রোহ কোন দিনই করিনি—তবে ক্ষণিকের মুক্তির সর্বনেশে স্বাদ দিয়ে এই পরিহাস কেন?

"ওগো নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা! আলোর আভাস যদি আমায় দিলে, সেই আলোর তরঙ্গে আমায় ভাসতে দাও।"

আর লেখা হল না, সেই ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটি আর একটি ছেলেকে নিয়ে ওর কাছেই এসেছে—ওদের চাই ফুল। ও নিজেই অনেক রকমের ফুল তুলে দিল ঐ ছেলেটির কাছে—যেন কারও উদ্দেশে অর্ঘ। ফিরে এসে দেখে ডায়েরীও নেই আর দ্বিতীয় ছেলেটিও উধাও। ভারী দুষ্টু তো!

দুপুরেই ফেরত পেল সেই ডায়েরীটি—মুদু সুরভিত। কিন্তু ডায়েরীর সেই পাতা দুটি কৈ? যাতে ছিল ক্ষণিকার নৈবেদ্য—দেবী কি নিজেই গ্রহণ করেছেন? পরের পাতাটায় একপিঠে কালকের জবা দুটির একটি পিন দিয়ে আঁটা, আর

(শেষাংশ ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাশ্চাত্যের প্রচলিত কুসংস্কার

শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী

অন্ধ-সংস্কারের নানা অভিযোগ প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রচার করা হইলেও এবং প্রাচ্যের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সুসভ্য পাশ্চাত্যের নিন্দার লক্ষ্য হইলেও, পাশ্চাত্য কিন্তু অন্ধ-সংস্কার-বর্জিত নয়। বরং সেই অঞ্চলের মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত অপর সকলেই ব্যাপকভাবে নানা উদ্ভট অন্ধ-সংস্কারের দাস।

জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী কাহার অন্তরে না স্নিগ্ধতা আনয়ন করে? চাঁদকে লইয়া ছেলে-ভুলান ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান, রূপকথা প্রভৃতি কত শত রহস্যময় কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত। চন্দ্রালোক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের চিত্তেই পুলক সঞ্চার করে। চাঁদনী রাতের যাদু কত ক্লিষ্ট ক্লান্ত হৃদয়কে ব্যথা-বেদনা মুক্ত করে। কিন্তু এই চন্দ্রালোক লইয়াই পাশ্চাত্যে আজও এক অন্ধ-সংস্কার প্রচলিত, যাহা বোধ হয় অন্য কোন অঞ্চলের নর-নারীর নিকটই অপরিজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য। কাজেই বিশেষ করিয়া পল্লীবাসী নর-নারী ভয়ে আতঙ্কে চন্দ্রালোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কারণ উঁহাদের বিশ্বাস, অধিক সময় চন্দ্রালোকে উন্মুক্ত আকাশতলে বিচরণ করিলে, কিম্বা অনাবৃত স্থানে চন্দ্রালোকে শয়ন করিলে মস্তিষ্ক বিকৃতি অনিবার্য। অবশ্য পাশ্চাত্যের মত শীত-প্রধান দেশে মুক্ত চন্দ্রালোক বেশী পাওয়া যায় না—তুষারপাত ও মেঘ-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির দাপটে; আবার এমন হিম, শীতল আবহাওয়ায় উন্মুক্ত স্থানে চন্দ্রালোক উপভোগ করাও বিপজ্জনক। যেহেতু একটুতেই ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িবার আশংকা যথেষ্টই রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও চন্দ্রালোক যে ঐ দেশের নর-নারীর চিত্তেও অপূর্ব আনন্দ সঞ্চার করে, অভূতপূর্ব স্নিগ্ধতায় তৃপ্ত করে তাপিত হৃদয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। চন্দ্রালোকের প্রতি ঐ দেশে যে কাহারও কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই, এমন কথাই কি বলা যায়! কিন্তু জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে মুক্ত অট্টালিকা-শিরে, কিম্বা কক্ষ মধ্যে যেখানে অবারিত চন্দ্র-রশ্মি প্রচুর প্রবেশ করে—এমন স্থানে কখনই কেহ শয়ন করে না; ভয়, ঐ চন্দ্র-রশ্মির প্রতি-ক্রিয়ায় পাগল হইয়া যাইতে হইবে। আশ্চর্য অন্ধ-সংস্কার বলিতেই হইবে!

বিজ্ঞান নির্দেশ দেয় যে, গাছ-গাছড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং বিশেষ করিয়া অক্সিজেন মোচন করে। এদেশে পাতাবাহার (ক্রোটন) জাতীয় গাছ শয়ন-কক্ষের অতি নিকটে পোঁতা নিষেধ। কিন্তু পাশ্চাত্যে প্রবল সংস্কার রহিয়াছে, উপস্ (upas) বৃক্ষের তলায় রাত্রিতে শয়ন শুধু নয়, দিবাভাগেও বেশী সময় বিশ্রাম করিলে বা গা এলাইয়া দিলে মৃত্যু নিশ্চিত। অজ্ঞ পল্লীবাসীর এই প্রকার আতঙ্ক হইবার কারণ বুঝিতে পারা যায়—কারণ, তাহারা দেখিতে পায় অনেক বৃক্ষের পাতার রস কিম্বা ফল বিষ-ক্রিয়া উৎপাদন করে। বিশেষ করিয়া ঐ দেশে 'আইভি' যে লতা রহিয়াছে উহার একটি বিশেষ শ্রেণী রহিয়াছে যাহা প্রকৃতই বিষাক্ত। কিছুদিন পূর্বেও স্কটল্যাণ্ডে একটি বালক প্রাচীরের উপর বসিয়া ছুরি দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া আপেল খাইয়াছিল। খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই সে চেতনা হারায়। হাসপাতালে নেওয়া হইলে কোনও প্রকার বিষ প্রয়োগের সন্দেহ করা হয়। পরীক্ষাতেও জানা যায়, প্রকৃতই বিষ-পদার্থ ছিল তাহার পাক-স্থলীতে—ঐ বিষ আইভি লতা হইতে সঞ্চারিত হইতে পারে। তখন অনুসন্ধানে জানা যায় বালকটি আপেল খাইবার পূর্বে হাতের ছুরিখানি দ্বারা আইভি লতা কাটিয়াছিল। সেই ছুরি দ্বারা আপেল খাওয়ায় উহার বিষ সংক্রামিত হইয়াছে।

এই প্রকারে গাছ-গাছড়া হইতে উৎকট বিষ সঞ্চারিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ লোকের যদি বিশ্বাস জন্মে, কোনও বিশেষ বৃক্ষের তলায় শয়ন করাও অনিষ্টকারক, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু শুধু অজ্ঞ সাধারণ নয়, অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই অন্ধ সংস্কারের উপর আস্থাবান। যেমন সকল স্থলেই দেখা যায়—নারীই এই প্রকার কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয় সর্বাগ্রে, পাশ্চাত্যের এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে অপধারণায়ও নারীই অগ্রবর্তিনী। তাহাদের পুনঃ পুনঃ প্রচারে বালক-বালিকারাও সেই আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং এই প্রকারে পরিবার হইতে পরিবারে প্রচার লাভ করে।

আমাদের দেশে অমাবস্যার প্রতি একটা ঘোর বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া অমা-রজনী। ঠিক এই প্রকারই একটা সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে পাশ্চাত্যবাসীর—দুইটি দিনের প্রতি, যে দিনে দিন ও রাত্রি সমান দৈর্ঘ প্রাপ্ত হয়। আনুমানিক প্রতি বর্ষে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুইটি দিনে রাত আর দিন সমান লম্বা হয়। পাশ্চাত্যবাসীর বিশ্বাস ঐ দিনে ঝড়-বৃষ্টি অথবা বজ্রপাত কিম্বা ভূমিকম্প—এই প্রকারের দৈব-দুর্বিপাক একটা হইবেই। তাহারই ভয়ে উঁহারা পূর্ব হইতে নানা প্রকারে ব্যবস্থা করে, যাহাতে ঐ দিবস বাহিরে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে দীর্ঘকাল কাটাইতে না হয়।

বজ্রপাত সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য নরনারীর একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যেস্থানে একবার বজ্রপাত হইয়াছে, সেখানে আর কোন-দিন ভবিষ্যতেও বজ্রপাত হইবে না দ্বিতীয় বার। মেঘাড়ম্বর-সহ বজ্রপাত হইলে পরে নিরাপত্তার জন্য অনেকে, যেস্থানে বজ্রপাত হইয়াছে সেই স্থানে যাইয়া দাঁড়ায়, সেই দিন দ্বিতীয় বার ত ঐ স্থানে বজ্রপাত হইতেই পারে না। আবার অন্য দিনেও বজ্রপাত আশঙ্কায় ঐ প্রকার বজ্রাহত স্থানেই যাইয়া সকলে আশ্রয় লয়, এই নিশ্চিত ধারণায় যে—একস্থানে দুইবার বজ্রপাত হইতে পারে না।

আমাদের দেশে আমরা দেখিতে পাই কোনও নর-নারীর জোড়াভুরু সু ও কু উভয় প্রকার কর্মফলেরই প্রতীক। বরং

সৌন্দর্যের দিক হইতে জোড়াভুরুর প্রশংসা একেবারে ব্যাপক। জোড়াভুরুর যে একটা আভিজাত্য এদেশে স্বীকার করা হয়, তাহার কোনই স্থান নাই পাশ্চাত্যে, বরং তাহাদের ধারণা বিপরীত। একে ত জোড়াভুরু কদর্য বলিয়া উহাদের চোখে ঠেকে, তাহার উপর দৃঢ়সংস্কার তাহাদের যে, যে ব্যক্তির ঐ প্রকার ভুরু জোড়া থাকে একটানা সে নিতান্তই ক্রুর ও নির্মম হয় নেকড়ে বাঘের মত। এইজন্য তাহাদের নাম দেওয়া হয় Were-wolves; সকলেই এই প্রকার ব্যক্তিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহার আগমনে কোনও অনুষ্ঠান পণ্ড হইবে, কোনও পরিবারে বিপদ ঘনাইয়া আসিবে, এই প্রকার নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এমন ব্যক্তিকে অমঙ্গলের অগ্রদূত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। কোনও তরুণী এই প্রকার জোড়াভুরু বিশিষ্ট তরুণকে জীবন-সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, তরুণেরা জোড়াভুরুর বিপদ ও আতঙ্ক সৃষ্টি হইতে রেহাই পাইবার আশায় দুই ভ্রূর মধ্যস্থল কামাইয়া ফেলে, অথবা রোমনাশক উপাদান সাহায্যে দুই ভ্রূর সংযোগ স্থল কেশহীন করিয়া রাখে। কিন্তু কোন প্রকারে ঐ কৃত্রিমতা ধরা পড়িলে তাহার লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। ঠিক যেমন কোনও তরুণীর যদি অতি সূক্ষ্ম গোঁফ রেখাও দেখা যায়, তবুও কেহ সহসা তাহাকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হয় না, তেমনি জোড়াভুরুর প্রতিও সকলের বিদ্বেষ।

এইবার আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃঢ়-সংস্কার পাশ্চাত্যে প্রচলিত থাকিলেও এইগুলিকে মোটামুটি প্রধান আখ্যা দেওয়া হয়। আর একটি ধারণাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাহা হইল আব বা বড় রকমের তিল চিহ্ন সহ জন্মপ্রাপ্ত শিশু। ইহার প্রতি আতঙ্ক দৃষ্টি সেদেশে নাই। বরং সৌভাগ্যের প্রতীক বলিয়া এমন শিশুর জন্ম তাহাদের নিকট আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। আমাদের দেশে যেমন দেখা যায়—রাজটীকা সহ জন্মপ্রাপ্ত শিশু, কিম্বা যে শিশুর জন্ম হইতেই হস্তে চক্র বা পদ্ম চিহ্ন থাকে, তাহার সৌভাগ্য নিশ্চিত বলিয়াই ধরা হয়—কতকটা সেই প্রকার সৌভাগ্যশালী বলিয়া আব সহ আবির্ভূত শিশুকে পরম সমাদরে লালন-পালন করা হয়।

অন্ধ-সংস্কার সকল দেশেই অজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া প্রসারলাভ করে। উহার কারণ নির্দেশ অবশ্য সকল সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু কতকগুলি বিশ্বাস এমনই অদ্ভুত যে, সামান্য মাত্র যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করিলেই উহার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করা যায়। তথাপি জনসাধারণ প্রচলিত বিশ্বাসকে অস্বীকার করিতে সহজে প্রবৃত্ত হয় না। অনেকখানি প্রচার কার্যও পদে পদে যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ক্রমশ উহাকে নর-নারীর মন হইতে দূর করা সম্ভব হয়। তথাপি এমন কতকগুলি বিশ্বাস আছে, যাহাকে কিছুতেই দূর করা যায় না—নরনারী, বিবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। পাশ্চাত্যের এই কুসংস্কারগুলিও তাই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থান পাইয়াছে।

ক্ষণিকা

(১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

নীচে লেখা "যদিও ঠিক আমাকে দেওয়া হয়নি, তবুও একটির বেশী ফেরত দিতে মন সরছে না, ক্ষমা করবেন।" পাতাটার অন্য পিঠে লেখা এই দুইটি ছত্র,

"নিকুঞ্জে রহিল এই আমার হিয়ার হেম হার
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥"

ডায়েরীটি ফুলের মালা দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছে দিদি। মেয়েটি আরও বললে যে, তার বাবা একমাস ছুটি নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, কিন্তু আজ টেলিগ্রাম আসায় তারা সকলেই এই দুপুরের গাড়ীতে চলে যাবে।

আঁধারে ও ছিল আঁধারেই রইল নিঃসঙ্গ, একক। কিন্তু এখনকার রুদ্ধ অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে দেখা দেয়, স্মৃতি-সৌদামিনী—ওর চোখ যায় ঝলসে, আর হৃদয়ে জাগে তীব্র জ্বালা।

সংবাদপত্রে ছবি

শ্রীগুণময় আচার্য্য

সংবাদপত্রে দেশবিখ্যাত ব্যক্তিগণের ফটোচিত্র প্রকাশে বর্ত্তমানে প্রতিযোগিতা একেবারে চরমে দাঁড়াইয়াছে। কোন সংবাদপত্র যাহাতে অন্য সহযোগীদের আগে প্রসিদ্ধ লোকদের যে কোন অবস্থার ফটোচিত্র সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহার জন্য সংবাদ-পত্র সংশ্লিষ্ট ফটোগ্রাফারগণ একেবারে গোয়েন্দাদিগকেও হারাইয়া দিয়াছে। প্রসিদ্ধ লোকদের নূতন স্থানে আগমন ও প্রস্থান এজন্য প্রেস ফটোগ্রাফারদিগের নিকট জপমালা হইয়া উঠিয়াছে। আবার যদি কোনও অনুষ্ঠানের সহিত এই প্রকার যাতায়াতের সংশ্রব থাকে তবে ত কথাই নাই

আমেরিকায় প্রসিদ্ধ লিণ্ডবার্গ দম্পতির বিবাহের পর মধুচন্দ্র যাপনের কালে তাঁহাদের নূতন নূতন পারিপার্শ্বিকের ফটো তোলায় যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়, সেই সময় হইতে যে কোন নামজাদা ব্যক্তির আর প্রেস-ফটোগ্রাফারদের আক্রমণ হইতে গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার উপায় রহিত হইয়া গিয়াছে। তাই কয়েক বৎসর আগে আহার নিরত গবর্ণর ল্যাণ্ডনের ফটোচিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী নেহাৎ বে-সরকারী পর্যটনে এবং দেশ-নেতাগণ নিতান্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ভ্রমণকালেও ঐ সকল প্রেস ফটোগ্রাফারদের শ্যেনদৃষ্টি প্রতিহত করিতে পারেন না। এমন কি নিজ নিজ আবাসেও আপন গার্হস্থ্যবিধির ন্যায্য গোপনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, লিণ্ডবার্গ দম্পতি যে আমেরিকা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, তাহার প্রকৃত কারণ হইল—ঐ দেশে ব্যক্তিগত গোপনতা রক্ষার অসুযোগ। প্রেস ফটোগ্রাফারগণ তাঁহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল গোপনে তাহাদের যে কোন অবস্থার ফটোচিত্র গ্রহণ করিয়া এবং তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া। এইভাবে আপন আপন পত্রে স্কুপ (Scoop) ফটো প্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদকগণ ফটোগ্রাফারদিগকে উচ্চহারে পারিতোষিক প্রদানে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

লরেন্স ডি লাইম্যান নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রে এই প্রকার 'স্কুপ' ফটো সংগ্রহের এক বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বেশীদিন পূর্ব্বের কথা নয় ছোট্ট জন্ (লিণ্ডবার্গ পুত্র) স্কুল হইতে মোটরযোগে নিজ গৃহে প্রেরিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জনের গাড়ী স্কুল ত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গেই মস্ত বড় একটা মোটর উহার অনুসরণ করিতে থাকে। বড় মোটরটায় কতকগুলি লোক রহিয়াছে দেখা যায়। মোড়ের মাথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বড় মোটরটা অতি ক্ষিপ্রগতিতে জনের গাড়ীকে পেছনে ফেলিয়া আগাইয়া যায়। কিন্তু ঠিক মোড়ের উপর জনের মোটরের সম্মুখে এমনভাবে সহসা বড় মোটরটা থামিয়া পড়ে রাস্তা বন্ধ করিয়া যে বাধ্য হইয়া জনের মোটরকেও থামিতে হয়। বড় মোটর থামা মাত্র তাহা হইতে কয়েকজন অতি চট্‌পট্ লাফাইয়া পড়ে রাস্তায়.

অবস্থা সঙীন দেখিয়া এবং পুনরায় জনকে চুরি করিবার প্রয়াস হয়ত চলিতেছে ভাবিয়া জনের সঙ্গে যে শিক্ষকটি ছিল, সে জনকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল নিবিড়ভাবে। পর-মুহূর্ত্তেই ক্যামেরা একটা ছেলেটির নাকের ডগায় ধরা হইল—ক্লিক্ শব্দ হইল—প্রেস ফটোগ্রাফার কেল্লা ফতে করিয়া চলিয়া গেল চট্‌পট্। শিক্ষক আর ছাত্র চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তের এমন নাটকীয় পরিণতি দেখিয়া আরামের শ্বাস ছাড়িল।"

এই ফটোচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল, নিউ ইয়র্ক মিরার পত্রের তরফ হইতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়, এই 'স্কুপ' ফটোর জন্য ফটোগ্রাফারকে ১০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এই ফটোচিত্র যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

হালে আবার এই প্রকারে ব্যক্তিগত জীবনের উপর চড়াও হওয়া বিশেষ করিয়া প্রেস ফটোগ্রাফারদের দ্বারা একেবারে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে—ফটো-ফ্লাশ বাল্‌বের প্রচলনে। অন্য কোন তীব্র আলোকের ব্যবস্থায় ভারাক্রান্ত হইতে হয় না—বিস্তৃত তোড়-জোড়ও দরকার হয় না। সাধারণে এখন স্বচ্ছন্দচিত্তেই দেখিতে পায় যে, যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় মুহূর্ত্তের ভিতর ফটো তুলিয়া লইবার সকল সজ্জায় সজ্জিত প্রেস ফটোগ্রাফার ব্যক্তিগত গোপনতাকে হত্যা করিতে এমন অমোঘ অস্ত্র পাইয়াছে, যাহার প্রতিরোধ আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার তারযোগে ফটো (wire photo) প্রেরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ায় আরও জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে।

সংবাদপত্রসমূহের পক্ষে নূতন বাল্‌ব-ব্যবস্থায় ক্যামেরা একটা শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। সকল সময়েই এবং সকল সম্পাদকই যে উহার সঙ্গত ব্যবহার করিয়া থাকে, এমন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, সম্মানিত নাম-করা ব্যক্তিদের যোগ্য এবং যথার্থ পারিপার্শ্বিকের ফটো না তুলিয়া কোন কোন সম্পাদক বদ্ধপরিকর কোন সুযোগে ঐ সকল ব্যক্তির অনবধান মুহূর্ত্তের অসঙ্গত বা সঙ্কটাপন্ন ফটো-চিত্র গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করা যায় কিম্বা তাঁহাদিগের স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত ভাব ফুটাইয়া তোলা যায়। ইহা দ্বারা সুবিধা এই যে, কোনও মানহানির মামলায় পড়িবার আশঙ্কা থাকে না—অথচ ছবি প্রকাশ না করিয়া ঐ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে বা বিরূপ মন্তব্য মুদ্রিত করিলে আইনের কবলে পড়িতে হয়। কাজেই এই নিরাপদ পথ অনেক সম্পাদক বাছিয়া নেন—বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক কোনও নির্ব্বাচন প্রার্থীর বিরূপ সমালোচনা প্রকাশে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ওয়াশিংটনের কোনও প্রসিদ্ধ সিণ্ডিকেট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই প্রকার একখানি ফটো গ্রহণ করে। ফটোতে দেখা যায়, প্রেসিডেণ্ট যেন ক্লান্ত ও হতাশ অতি বিরক্তির সহিত হাতখানি চোখের উপরে কপালে যেন বুলাইতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু ব্যাপার এই যে, অতর্কিতে ক্যামেরার বাল্‌বের সন্ধানী আলো মুখে আসিয়া পড়িলে, প্রেসিডেণ্ট চোখের উপর হাত দিয়া আড়াল করেন। ছবিখানি প্রকাশিত হয় যখন সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার A A A মেজার বাতিল করিয়া দেয়; সুতরাং, জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হয় এই ছবি দ্বারা যে, প্রেসিডেণ্ট ঐ পরাজয়ের আশা ভঙ্গে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যদি

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে "রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতায়" নাম দিবার শেষ তারিখ ২০শে আগষ্ট রবিবার। নিখিল বঙ্গ স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।

রচনা—বিষয়ঃ—"বর্ত্তমানে দেশের দুরবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমানে ছাত্রদের সহিত কি সম্বন্ধ ও তাহাদের কি কর্ত্তব্য"—১ম ও ২য়কে দুইটি রৌপ্যপদক। (ফুলস্কেপ সাইজের ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া আবশ্যক)। কালি দিয়া লিখিতে হইবে।

চিত্র ঃ—"সমুদ্র বক্ষে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য", শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য একটি রৌপ্যপদক।

অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট পাঠাইতে হইবে। যাঁহার লেখা প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাঁহার লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। রচনার নিম্নে প্রত্যেকের পুরা নাম ও ঠিকানা দেওয়া চাই। সমগ্র রচনা ও চিত্র নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সম্পাদক। খোড়-হাট, আন্দুল মৌড়ী পোষ্ট, হাওড়া।

অথবা

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ-সম্পাদক। ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্প ও প্রবন্ধাদি প্রতিযোগিতা

কোন্নগর নবীন সঙ্ঘের উদ্যোগে সাধারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে ঃ—

বিষয় ঃ—(১) প্রবন্ধ—বঙ্গদেশের নিরক্ষরতা ও তাহার প্রতীকার। ফুলস্কেপ ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে। (২) ছোট গল্প—যে কোনও বিষয়—ফুলস্কেপ ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে। (৩) কবিতা—যে কোনও বিষয়—ফুলস্কেপ ২ পৃষ্ঠার মধ্যে। (৪) চিত্রাঙ্কন—যে কোনও বিষয়—সাইজ ৬×৪ ইঞ্চি।

উপরোক্ত প্রত্যেক প্রতিযোগিতার জন্য একটি করিয়া রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। ২০শে ভাদ্র ১৩৪৬ সালের মধ্যে উপরোক্ত প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ফলাফল যথাসময়ে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মনোনীত এবং পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সঙ্ঘের বিচারই একমাত্র চরম নির্দ্দেশ বলিয়া ধার্য্য হইবে।

ঠিকানা ঃ—সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার মিত্র, অতুল মিত্র লেন, কোন্নগর (হুগলী)।

হিমাংশুকুমার সাবুদ, উলুবেড়িয়া (হাওড়া)।

রেখা ও লেখা প্রতিযোগিতা

আগামী ৩০শে আগষ্ট ট্রান্স গ্যাঞ্জেটিক ক্লাবের ২য় প্রতিযোগিতা হইবে। ঐ প্রতিযোগিতায় গল্পের ও চিত্রের জন্য দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। চিত্রের বিষয়, "ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে যায়, ছোট্ট নদী কোন সুদূরে ধায়; সবুজ বনের শীতল কোলের কাছে একটি খোলার ঘর লাঙ্গল কাঁধে মাঠের পানে চল্ল চাষীবর।" গল্পও এই চিত্রটি লইয়া হইবে। ২৫শে আগষ্টের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট চিত্র প্রতিযোগিতায় 'রেখা প্রতিযোগিতা' ও গল্প প্রতিযোগিতা, 'লেখা প্রতিযোগিতা' লিখিয়া পাঠাইতে হইবে নচেৎ বাতিল হইবে। অনাদিকৃষ্ণ ঘোষ। উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

চাই ডিসিপ্লিন

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

পরিমাণে বর্দ্ধিষ্ণমান হ'তে দিয়েই মরেছি। ইংরেজ সৈনিকেরা কি যুদ্ধক্ষেত্রে তর্ক করে? জার্ম্মান জাত কি কথায় কথায় হিটলারকে সন্দেহ আর প্রশ্ন করেছে? তা যদি করতো ভার্সাই সন্ধিপত্রের খাঁড়া জার্ম্মান জাতির মাথার উপরে আজও দুলতো! একটা জাত একসঙ্গে ভুল করবার শক্তিকেও যদি অর্জ্জন করতে পারতো!

যে কথা বলছিলাম। মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের পতাকা-তলে সমবেত করাতেই হবে। জিন্নার কবল থেকে তাদের মুক্ত করা চাই। যারা অস্পৃশ্য হ'য়ে আছে তাদেরও কংগ্রেসের মধ্যে নিয়ে আসা চাই। তারা না এলে কংগ্রেস শক্তিশালী হবে না। গান্ধী যখন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের অথবা অস্পৃশ্যতা নিবারণের উপরে জোর দেন তখন আমরা কেউ কেউ ভাবি—জাতটাকে লড়ায়ের পথ থেকে টেনে নিয়ে এসে গান্ধী আমাদের কৌপীন-পরা কতকগুলো নিরীহ সমাজ-সেবকে পরিণত করতে চান। গান্ধী কি সত্য সত্যই যুদ্ধের আরবী ঘোড়াকে ধোপার গাধায় রূপান্তরিত করতে উৎসুক? আমরা তা মনে করিনে। বামপন্থীরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যতখানি উৎসুক—তিনি ততখানিই উৎসুক। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপরে, খদ্দরের উপরে, অস্পৃশ্যতার নিবারণের উপরে অথবা মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের উপরে তিনি যে এত জোর দিয়ে থাকেন তার কারণ, এই কর্ম্মপন্থাকে অনুসরণ করলে আমরা তাড়াতাড়ি স্বরাজ পাবো—এই তাঁর বিশ্বাস। তাঁর বিশ্বাস জনসাধারণকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করতে না পারলে কোনো কালে আমরা স্বরাজ পাবো না। তাদের সংঘবদ্ধ করবার উপায় সহরের জনসভায় উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা নয়—খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লেখাও নয়। সে উপায় হ'চ্ছে নিঃশব্দে জনসাধারণের সেবা। এই সেবার মধ্য দিয়েই কংগ্রেস জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হবে। জনসাধারণ কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত হয়ে তার নির্দ্দেশকে যদি মেনে চলতে বদ্ধপরিকর হয়—স্বরাজ পেতে কয়দিন? গণ-ঐরাবতের পদতলে শক্তির সমস্ত আড়ম্বর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। জনগণের মনের মধ্যে যে শৌর্য্য আজ সুপ্ত হ'য়ে আছে তাকে জাগানোই হচ্ছে আজকের দিনে সব চেয়ে বড়ো কাজ। তাকে জাগানোর উপায় হ'চ্ছে তাদের অজ্ঞতাকে দূর ক'রে আত্মশক্তিতে তাদের বিশ্বাসী ক'রে তোলা। তারপর আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী নির্ভীক জনগণকে সংঘবদ্ধ ক'রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তাদের সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করা। এ কাজ তো সহজ নয়। নীরব সেবার পথ ব্যতীত অন্য পথে অদৃষ্টবাদী, শতধাবিভক্ত, ভীরু জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা যদি সম্ভব হয়—সে পথের অনুসরণ করবার অধিকার সকল কংগ্রেসকর্ম্মীরই আছে।

আগামী ১২ই আগষ্ট শনিবার হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি 'রজতজয়ন্তী' আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায়—শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, মেনকা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাস, সত্য মুখার্জ্জি, শোর প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। আমাদের জানানো হইয়াছে যে এই ছবিখানি গতানুগতিক ছবি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা এক নূতন ধরণের প্রেম, হাস্যরসপূর্ণ ছবি। এই ছবি সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বলিতে পারি না। কেন না, ছবিখানি এখনও আমরা দেখি নাই। তবে শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়ার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে এবং সেই জন্যই আমরা আশা করিতে পারি যে ছবিখানি ভালই হইবে।

* * * *

গত ৫ই আগষ্ট শনিবার হইতে উত্তরায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের নূতন সামাজিক ছবি "পরশমণি" দেখান হইতেছে। ছবিখানির কাহিনী লিখিয়াছেন শ্রীযামিনী মিত্র এবং উহার চিত্ররূপ দিয়াছেন সুবিখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত। শ্রীপ্রফুল্ল রায় চিত্রটির পরিচালক এবং গান রচনা করিয়াছেন শ্রীশৈলেন রায়। "পরশমণির" আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীবিভূতি দাস এবং শব্দগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীমান্নালাল লাড়িয়া এবং মিঃ চার্লস ক্রীড়। সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীহিমাংশু দত্ত (সুর সাগর) এবং নৃত্য-পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীসমর ঘোষ। প্রধান ভূমিকালিপি নিম্নে দেওয়া হইলঃ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহিত রায়; তুলসী লাহিড়ী—হারু ঘোষ; ধীরাজ ভট্টাচার্য্য—ভবতোষ; রবি রায়—পরেশ ঘোষ; সন্তোষ সিংহ—মিঃ সেন; সত্য মুখার্জ্জি—ভৈরব; কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়—ইনস্পেক্টার; জ্যোৎস্না—সীতা; রাণীবালা—এলা; বীণা বাগচি—সতী; অরুণা—হাসি; প্রভা—মিসেস সেন; দেবযানী—পিসিমা; রাজলক্ষ্মী—লেডী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইত্যাদি।

আমরা "পরশমণি" দেখিয়া আসিয়াছি। ছবিখানি আমাদের খুব ভাল না লাগিলেও খারাপ লাগে নাই। আগামী সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত সমালোচনা করিব।

* * * * * *

ফিল্ম কর্পোরেশনের "রিক্তা" চিত্র তোলার একটী দৃশ্য। পরিচালক শ্রীযুত সুশীল মজুমদারকে ক্যামেরার নীচে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে

আগামী ১৯শে আগষ্ট হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম বাঙলা ছবি "রিক্তা" মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীসুশীল মজুমদার ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন এবং ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল মজুমদার, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী

লাহিড়ী মোহন ঘোষাল, রঞ্জিত রায়, সত্য মুখার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ, ছায়া, রমলা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি।

* * * * * *

সরমা পিকচার্সের "মায়ামৃগ" ছবি ২৬শে আগষ্ট তারিখে উত্তর কলিকাতার 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবি তোলা হইয়াছে। প্রযোজনা করিয়াছেন গণেশরঞ্জন এবং পরিচালনা করিয়াছেন কালীভূষণ। বিভিন্ন ভূমিকায়—ললিত মিত্র, কমলা, ইন্দ্রনাথ, মমতা, নট-রাজ, মণিমালা, তারাপদ ঘোষ, সরযূ, বেচু দাস প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীযুত মিহির চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

* * * * * *

শ্রীমতী মণিকা দেশাই ফিল্ম কর্পোরেশনের হইয়া একখানি ছবিতে অভিনয় করিবেন বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। ইনি শ্রীমতী লীলা দেশাই-এর ভগ্নী।

* * * * * *

রঙ্মহলে নূতন নাটক "মাটির ঘর"-এর শীঘ্রই উদ্বোধন হইবে। নবীন নাট্যকার শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহা দ্বিতীয় নাটক। এই নাটক প্রযোজনা করিবেন শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ ও পরিচালনা করিবেন শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। "মাটির ঘরে" দুর্গাদাস, ভূমেন, মনোরঞ্জন, প্রভাত, শান্তি, পদ্মাবতী, ঊষা, বেলারাণী প্রভৃতি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। রঙ্মহলে "মাকড়সার জাল" ও "ডাঃ মিস কুমুদ" বিশেষ প্রশংসিতভাবে অভিনীত হইতেছে।

* * * * * *

এসোসিয়েটেড প্রোডাকসনের ছবি "আলো-ছায়া" এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স পরিবেশন করিবেন, সে সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। শ্রীমতী উমা এই ছবিতে অভিনয় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

* * * * * *

আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে ভূতপূর্ব্ব রঙ্মহল সম্প্রদায় 'নাট্যভারতী' নাম দিয়া গত ৫ই আগষ্ট হইতে অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "তটিনীর বিচার" রঙ্মহল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হওয়ার পরেই অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সম্প্রদায়কে রঙ্মহল ছাড়িয়া দিতে হয়। 'তটিনীর বিচার' অতি প্রশংসিতভাবে অভিনীত হইতেছিল। সেইজন্যই 'নাট্যভারতী' সম্প্রদায় 'তটিনীর বিচার' দিয়া আলফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা 'তটিনীর বিচার' নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদের মধ্যে কিছু অদলবদল হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তটিনীর বিচারের সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই। ডাঃ ভোসের ভূমিকায় পূর্ব্বে শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করিতেন; বর্ত্তমানে সেই ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন শ্রীযুত সন্তোষ সিংহ। শৈলেশের ভূমিকায় একজন নূতন অভিনেতা অভিনয় করিতেছেন। ললিতার ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মাবতীর স্থলে শ্রীমতী নিরুপমা অভিনয় করিতেছেন।

নিউ থিয়েটার্সের 'রজত জয়ন্তী' চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়া, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। ছবিখানি আগামী শনিবার হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় দেখান হইবে।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। পুলিশ এ্যাথলেটিক ক্লাব ফাইনালে কাষ্টমস দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে। পুলিশ দলের এই সাফল্য সত্যই প্রশংসনীয়। লীগ প্রতিযোগিতার নিম্নভাগে স্থান অধিকারী পুলিশ দল শীল্ড বিজয়ী হইবে ইহা সকলেরই কল্পনাতীত ছিল। এমন কি ফাইনালে কাষ্টমস দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব পর্যান্ত সকলেই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন পুলিশ দল ১৯৩৭ সালের ন্যায় পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবে। কিন্তু সকলকে চমৎকৃত করিয়া পুলিশ দল শীল্ড বিজয়ী হইল। এই দিনে পুলিশ দলের খেলোয়াড়গণ এতই উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে দর্শকমণ্ডলীর সকলকেই বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যে পুলিশ দলের জয়লাভ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। তীব্র আক্রমণ ধারায় বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া কাষ্টমস দলকে এইদিন পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে।

১৯৩৭ সালে শীল্ড ফাইনালে নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করায় পুলিশ দল যে অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল ১৯৩৯ সালে শীল্ড বিজয়ী হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। দলের সম্মান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। নিম্নে শীল্ড বিজয়ী পুলিশ দলের নাম প্রদত্ত হইল :—

জে মিলস; ওয়েক ও ওয়াট; জে, ফলস, রবিনসন ও জে, ডিমেলো; টেম্পলটন, জোন্স, পি, ডিমেলো, মার্সাল ও এলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী আই এফ এ শীল্ড বিজয়ীগণ :—১৮৯৩ সাল রয়াল আইরিশ, ১৮৯৪ রয়াল আইরিশ, ১৮৯৫ রয়াল ওয়েলস ফুসিলিয়ার্স, ১৮৯৬ ক্যালকাটা এফ সি, ১৮৯৭ ডালহৌসী এ সি, ১৮৯৮ গ্লষ্টার রেজিমেন্ট, ১৮৯৯ সাউথ ল্যাঙ্কাসায়ার রেজিমেন্ট, ১৯০০ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০১ রয়াল আইরিশ, ১৯০২ ৯৩নং হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯০৩-৪ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০৫ ডালহৌসী এ সি, ১৯০৬ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯০৭ এইচ এল আই, ১৯০৮-১০ গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯১১ মোহনবাগান দল, ১৯১২-১৩ রয়াল আইরিশ রাইফেল, ১৯১৪ কিংস ওন রেজিমেন্ট, ১৯১৫ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯১৬ নর্থ ষ্ট্যাফোর্ডস, ১৯১৭ মিডলসেক্স, ১৯১৮ ট্রেনিং রিসার্ভ, ১৯১৯ ব্রেকনকসায়ার, ১৯২০ ব্ল্যাকওয়াচ, ১৯২১ উরসেষ্টার রেজিমেন্ট, ১৯২২-২৪ ক্যালকাটা এফ সি, ১৯২৫ রয়াল স্কট ফুসিলিয়ার্স, ১৯২৬-২৮ সেরউড ফরেষ্টার, ১৯২৯ রয়াল আলষ্টার ১৯৩০ সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স, ১৯৩১ এইচ এল আই ১৯৩২ এসেক্স রেজিমেণ্ট, ১৯৩৩ ডি সি এল আই, ১৯৩৪ (খেলা হয় নাই), ১৯৩৫ ইষ্ট ইয়র্ক, ১৯৩৬ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৭ ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড, ১৯৩৮ ইষ্ট ইয়র্ক।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ইতিহাস

১৮৯৩ সালে সর্ব্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ইহা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু কি ভাবে এই প্রতিযোগিতার উৎপত্তি হইল তাহা অনেকেরই জানা নাই। সেইজন্য নিম্নে উক্ত প্রতিযোগিতা প্রচলনের পূর্ব্ব ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইল।

১৮০২ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ফুটবল খেলা প্রচলিত ছিল কি না সে বিষয় সঠিক কোন ইতিহাস নাই। এই সময় বোম্বাইতে কতকগুলি ইউরোপীয়ান ও সৈনিক কর্ম্মচারীদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি ফুটবল দল গঠিত হয়। এই সকল দল নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিত। তবে এই সকল প্রতিযোগিতা কোন বিশেষ পুরস্কারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইত না। ঠিক এই সময়েই কলিকাতাস্থ কতকগুলি ইংরেজ বণিক একত্র হইয়া স্থানীয় ইংরেজ সৈনিকদলের সহিত ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করেন। ইহাদের খেলার কথা ভারতের বিভিন্ন স্থানের ইংরেজ সৈনিক ঘাঁটিতে পৌঁছিলে তাঁহারাও উক্ত খেলার জন্য ব্যস্ত হন। এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বত্র সৈনিক ঘাঁটিতে ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। ইংরেজ সৈনিক ও ব্যবসায়িগণের ফুটবল খেলার উৎসাহ ভারতীয়গণকে ফুটবল খেলার প্রতি আকৃষ্ট করে। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইতেই দেখা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়গণ ইংরেজ সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া ফুটবল খেলিতেছেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়গণ ফুটবল দল গঠন করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় এই বিষয়ে উৎসাহী বাঙালীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। এইরূপে দীর্ঘ ৬০ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর কলিকাতায় ১৮৬৮ সালে একটি ফুটবল খেলা হয় যে খেলার ফলে কলিকাতায় ফুটবল খেলার হুজুগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই খেলায় ইটোনিয়ান্স দলের সহিত আই সি এস দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইটোনিয়ান্স দল ২-০ গোলে বিজয়ী হয়। ১৮৭৮ সালে শোভাবাজার, হাওড়া ইউনাইটেড, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, নিমেশ কলেজ, লা মার্টিনেয়ারী কলেজ, শিবপুর কলেজ প্রভৃতি বহু ফুটবল দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল দল নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করে।

কলিকাতার ইংরেজ বণিকগণ এই সকল দলের উৎসাহ দেখিয়া ১৮৮০ সালে ট্রেডস ক্লাব নামে একটি ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের নামই পরে ডালহৌসী ক্লাব হয়। এই ক্লাবে সকল শ্রেণীর ইংরেজ খেলিতেন। উচ্চ পদস্থ ও ধনী ইংরেজগণ এই দলে সকল শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়া খেলিতে অসুবিধা ভোগ করিতে থাকেন। ফলে ১৮৮৪ সালে ঐ সকল ধনী ও উচ্চপদস্থ ইংরেজগণ মিলিত হইয়া ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় বহু ক্লাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের

প্রতিষ্ঠিত ফুটবল দলসমূহ কলিকাতায় খেলিবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিতে থাকেন। এই উৎসাহের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রদেশের ফুটবল দল কলিকাতা ফুটবল দলসমূহের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়। ১৮৮৮ সালে ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসরে ডালহৌসী ক্লাব বাফস্ সৈনিক দলকে ফাইনালে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হয়। ইহার পর ভারতের সকল স্থানের ফুটবল দল একটি এসোসিয়েশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

১৮৯৩ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইংরেজ সামরিক ও বে-সামরিক ফুটবল দল মিলিত হইয়া আই এফ এ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বৎসরই কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরেজ মহোদয়ের সাহায্যের বলে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এই সময় আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা একই সময় লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইত। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের সকল ফুটবল দল লক্ষ্ণৌতে প্রতিযোগিতা করিতেন ও দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলের সকল দল কলিকাতায় প্রতিযোগিতা করিতেন। এই দুই স্থানের বিজয়ী দল ফাইনালে কলিকাতায় আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন।

১৯৩৯ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী পুলিশ এ্যাথলেটিক ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

এই ব্যবস্থায় বিশেষ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় তিন চারি বৎসর পরে কলিকাতায় সকল খেলার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর হইতে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের সকল অঞ্চলের ফুটবল দল আসিয়া ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১লা আগষ্ট—

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো অদ্য সর্বপ্রথম উড়িষ্যায় গমন করেন।

কমন্স সভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ করিতে গিয়া সরকার-বিরোধী উদার নৈতিক দলের নেতা স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের তোষণ নীতির প্রতি কটাক্ষ করেন। স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের একটি বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, লর্ড হ্যালিফাক্স উক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে, পররাষ্ট্র আক্রমণ প্রতিরোধ কর।" অতঃপর আর্চিবল্ড বলেন যে, সরকার-বিরোধী দল দুইটির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তা সহকারে পররাষ্ট্র সচিবের উক্ত বক্তৃতা সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন এখনও পর্যন্ত উহা সমর্থন করেন নাই।

আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে অনুমান পাঁচ হাজার ভারতীয় সৈন্য সুয়েজে পৌঁছিবে। উহাদিগকে সন্নিহিত অঞ্চলে মোতায়েন করা হইবে। শীঘ্রই ভারত হইতে কয়েক দল সৈন্য বৃটেনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মালয়ে প্রেরিত হইবে।

গতকল্য কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী ব্লকের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ব্লকের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

গত কয়েকদিন ধরিয়া অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বাঙলার ও আসামের নানাস্থানে প্রবল বন্যার আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। ফসলের বিষম ক্ষতি হইতেছে এবং নানারূপ উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জামালপুরের খবরে প্রকাশ যে, ব্রহ্মপুত্র ও ঝিনাই নদীর সংগমে এক নৌকাডুবির ফলে ২১ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

স্যার নীলরতন সরকারের পত্নী লেডী নির্ম্মলা সরকার পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যশীলা মহিলা ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন গত ১২ই মে তারিখে উহার যে সমস্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, ডাঃ বিধান রায়ের দল ইউরোপীয়ান দল ও মনোনীত দলের সদস্যগণ সম্মিলিত চেষ্টার ফলে অদ্য কর্পোরেশনের এক জরুরী সভায় সেই কমিটিগুলি ভাঙিয়া দিয়া নূতন করিয়া কমিটিগুলি গঠন করেন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের নির্দেশে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে কর্পোরেশনের উক্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলি গঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে মাদক-বর্জ্জন আরম্ভ হয়। ৩১শে জুলাই রাত্রি ১২টার পর ১লা আগষ্ট আরম্ভ হওয়া মাত্র বোম্বাই ও উহার শহরতলীতে সর্ব্বত্র মদ্যপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হয়। মাদক-বর্জ্জন বিরোধিগণ উহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মাদক-বর্জ্জনের ফলে রাজস্বের যে ঘাটতি হইবে তাহা পূরণ করার জন্য বোম্বাই সরকার যে সম্পত্তি-কর ধার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে স্যার ইব্রাহিম করিমভাইয়ের নেতৃত্বে মুসলমানদের এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। মিছিলকারীরা পুলিশের উপর ইষ্টক বর্ষণ করিলে পুলিশ লাঠি-চালনা ও গুলী বর্ষণ করে। গুলীর আঘাতে নয়জন এবং ইষ্টক বর্ষণের ফলে অনুমান কুড়িজন পুলিশ কর্ম্মচারী আহত হয়। শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তিনজন মুসলমান এবং দুইজন পাশী সংবাদপত্র সম্পাদকের উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া তাঁহাদিগকে ১লা আগষ্ট তারিখের বোম্বাইয়ের দাঙ্গা সম্পর্কিত কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

টাটা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের বিরোধের মীমাংসার জন্য জামসেদপুরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে লইয়া গঠিত সালিশ বোর্ডের অধিবেশন হয়। বোর্ড টাটা শ্রমিক ইউনিয়নের মেমোরেণ্ডাম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জার্ম্মানী ও ইতালীতে একযোগে বিরাট সামরিক কুচকাওয়াজ আরম্ভ হইয়াছে।

চীনে জাপ অধিকৃত কাউচেঙ শহরে দুইজন বৃটিশ মিসনারী মহিলাকে একদল পুরুষের সম্মুখে উলঙ্গ করা হয়।

২রা আগষ্ট-

বাঙলা গবর্ণর কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলে সম্মতি দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আলিপুর ও দমদম জেলে অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। বসু ভ্রাতৃদ্বয় বাঙলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দীনের সহিতও বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

বন্দীদিগকে অনশন ত্যাগ করিতে পুনরায় অনুরোধ জানাইয়া মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "তাঁহাদের দাবী পূরণের জন্য সমস্ত শক্তি দ্বারা চেষ্টা করার ক্ষমতা কেবল আমার আছে। কিন্তু অনশন চালাইয়া তাঁহারা আমাকে চেষ্টা করার কোন সুযোগই দিতেছেন না।"

চুয়াডাঙ্গার মহকুমা হাকিম মাজদিয়া ট্রেন সংঘর্ষ মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ও রেল আইনের কতিপয় ধারানুসারে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। গত ১৬ই এপ্রিল শেষ রাত্রিতে মাজদিয়া ষ্টেশনে দণ্ডায়মান ১৬নং ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনের পশ্চাৎভাগে ৮নং ডাউন ঢাকা মেলের সংঘর্ষ ঘটাইয়া ৩৫ জন যাত্রীর মৃত্যু ঘটাইবার ও ৫৫ জনকে জখম করার অভিযোগে ৮নং ডাউন ঢাকা মেলের গার্ড মিঃ নেমী, ড্রাইভার মিঃ ডব্লিউ পিয়ার্সন এবং ফায়ারম্যান মিঃ গুইদার ও মুকেদামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

৩রা আগষ্ট—

আলীপুর ও দমদম জেলের অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দিগণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে দুই মাসের জন্য

অনশন স্থগিত রাখিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গ্রহণ করার ফলেই অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দিগণ অনশন স্থগিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল অনশন ধর্ম্মঘট এমন সময় আরম্ভ হইল যখন বন্দি-মুক্তি পরামর্শদাতা কমিটি তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং সব সুপারিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিতে পারেন নাই নাই। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন, দুই মাসের মধ্যেই কমিটি তাঁহাদের কাজ শেষ করিতে পারিবেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের মতে, দুই মাস অনশন ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখার ফলে গবর্ণমেণ্ট বন্দীদের বিষয় বিবেচনা করিবার সময় ও সুযোগ পাইবেন। পক্ষান্তরে, দুই মাস পরে প্রয়োজন হইলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিবার অবকাশও আমরা পাইব। সুভাষচন্দ্র বসু জনসাধারণকে অনুরোধ জানান যে, তাঁহারা যেন সত্যাগ্রহের আয়োজন পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে থাকেন।

সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। সিন্ধুর মন্ত্রী মিঃ নিচলদাস ভাজিরাণী গতকল্য বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎকালে সিন্ধুর কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা লইয়া সাধারণভাবে আলোচনা করেন।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশন ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

তিয়েনসিনে বৃটিশ এলাকা অবরোধে জাপানীরা আরও কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছে।

৪ঠা আগষ্ট—

জরুরী প্রেস আইন অনুসারে জাতীয়তাবাদী দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের" মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের এবং "আনন্দবাজার প্রেসের" কীপার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের প্রত্যেকের নিকট তিন হাজার টাকা হিসাবে মোট ছয় হাজার টাকা জামানত তলব করিয়া কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের উপর নোটিশ জারী করিয়াছেন। প্রকাশ, গত ২৬শে জুলাই তারিখের "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাউলং' (আর কত কাল) শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে উক্ত নোটিশ জারী হইয়াছে। অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের উত্থাপিত কৃষি আয়কর বিল ৬১-৫৬ ভোটে গৃহীত হয়। স্যার সাদুল্লা, শ্রীযুত রোহিণী চৌধুরী এবং মিঃ হকেনহালের দল বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

নোয়াখালির এক সংবাদে প্রকাশ যে, হাতিয়া হইতে সন্দ্বীপগামী একখানি সাম্পান নৌকা গত রবিবার ৪০ জন [illegible] ডুবিয়া গিয়াছে। আরোহীদের বা মাঝিদের কাহারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

পাটনার এক খবরে প্রকাশ যে, দ্বারভাঙ্গার ছোট হাড়িঘাটে এক নৌকাডুবির ফলে ৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও বঙ্গীয় হিন্দুসভা এই দুইটি প্রতিষ্ঠান মিলিয়া একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হইবে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছেন।

সীমান্তের উপজাতীয়দের নেতা ইপির ফকিরের 'জেনারেল' মুস্কি আলম খাঁ বান্নুতে এক সংঘর্ষের সময় গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে মন্দির প্রবেশ বিল গৃহীত হইয়াছে।

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর এ বাটলার বলেন যে অধুনা কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ডানজিগে সামরিক তোড়জোড় ও সেনেটের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি ইহাও বলেন যে, বৃটিশ সরকার পরিস্থিতির প্রতি সতর্কতা সহকারে লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং পোলিশ সরকার বৃটিশ সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

ওয়ারসর সংবাদে প্রকাশ যে, ডানজিগ সেনেটের নিকট শীঘ্রই একটি সতর্কবাণী প্রেরণ করিয়া জানান হইবে যে, কোন তৃতীয় শক্তির জন্য স্বয়ং শাসিত ডানজিগ নগরীর সীমান্ত উন্মুক্ত করিয়া দিলে পোলিশ সরকার তাহা অতিশয় গুরুতর বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

তিয়েনসিনের প্রাক্তন বেলজিয়ান এলাকায় একটা গুরুতর বৃটিশ-বিরোধী দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে।

হ্যাঙ্কাও হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ-বিরোধী জাপগণ উত্তর হোনানের কাইফেং শহর অধিকার করিয়াছে।

৫ই আগষ্ট—

দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীযুত যোগেন্দ্র ব্যানার্জ্জি এবং হরিপদ বসু, এই দুইজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের মুখপত্র "ফরোয়ার্ড ব্লক" সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কটকে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি সেখানে নিখিল উড়িষ্যা যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

বাঙলার চটকলসমূহে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ প্রবর্ত্তন করার এবং ৩০০০ তাঁত বন্ধ করার প্রতিবাদে কলিকাতা

মহম্মদ আলি পার্কে কলিকাতার ছাত্র ও শ্রমিকদের এক বিরাট সমাবেশ হয়।

সিংহলে এপর্য্যন্ত প্রায় সাতশত ভারতীয় কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। কর্ম্মচ্যুত ভারতীয়দের প্রথম দল স্বদেশ যাত্রা করিয়াছে।

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরকালে কর্ণেল মুইরহেড ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিবর্গকে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্পর্কে কোনরূপ চাপ দিবেন না।

পোল্যাণ্ডের সীমান্তে জার্ম্মানী ব্যাপক সামরিক তোড়জোড় ও সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিয়াছে।

৬ই আগষ্ট—

গত ১লা আগষ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় যে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলি গঠিত হয়, তাহাতে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের কতিপয় সদস্যকে তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন কমিটিতে লওয়া হইয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, কাউন্সিলার শ্রীযুত নটবর দত্ত প্রমুখ দশজন সেই সব-কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছেন।

এলাহাবাদে রামলীলা উৎসবের আয়োজন উপলক্ষে রামলীলা মাঠ ঘিরিবার সময় হিন্দু-মুসলমানে পুনরায় দাঙ্গা হয়। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডের ফিল্ড মার্শাল স্মিগলিরীজ ক্র্যাকাও-এ পিলসুদস্কি বাহিনীর ২৫৩তম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষণা করেন, "পররাজ্য আক্রমণের কোন আশঙ্কা আমরা পোষণ করি না, তবে আমাদের রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা-বিঘ্ন দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব।" বেতার ঘাটিসমূহ হইতে পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র এই বাণী প্রচারিত হয়।

জার্ম্মানীর কাসাউ-এ একটি বক্তৃতা করিতে গিয়া ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং বলেন, "কোন প্রকার হুমকী বা মনভুলানো কথায় জার্ম্মানী বিচলিত হইবে না।" বৃটেনের উপর দোষারোপ করিয়া মার্শাল গোয়েরিং বলেন, "বৃটেন জার্ম্মানীকে ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালের পুনরাভিনয় করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা হইতে দিবনা।"

কমন্স সভায় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির বিতর্ক সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন প্রধানত সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি বিশেষভাবে বৃটেনের পক্ষে জটিল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে।

৭ই আগষ্ট—

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী এবং আবদুল কাদের চৌধুরী এই তিনজন রাজনৈতিক বন্দীকে অদ্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক বন্দিগণ অনশন ত্যাগ করার পর এই দ্বিতীয় দল মুক্তি লাভ করিল।

গত ১১ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দিবার অভিযোগে সমাজতন্ত্রী নেতা সামসুল হুদাকে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

জাতীয় সপ্তাহ পালন উপলক্ষে কলিকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে এক রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত দয়ারাম বেরীকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ এস বাটলীওয়ালা ৫ই এপ্রিল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জনসভায় "ভারত ও আসন্ন সংগ্রাম" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করায় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে এই মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে।

সাংহাইয়ের খবরে প্রকাশ যে, গতকল্য ইচাং-এর উপর জাপ বিমানবাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে দুইটি বৃটিশ জাহাজ সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়। ফলে পাঁচজন চীনা নিহত ও দুইজন আহত হইয়াছে। চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ সম্পর্কে আরও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে জাপ-কর্ত্তৃপক্ষ ৮ই আগষ্টের মধ্যে বিদেশীদিগকে এবং বিদেশী জাহাজসমূহকে হাইমেন বন্দর ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। হাইমেনের বৃটিশ অধিবাসীরা এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইবে।

জাপানের সমর-সচিব ও নৌ-সচিবগণ ইউরোপের নূতন পরিস্থিতিতে জাপান কি নীতি অবলম্বন করিবে, তৎসম্বন্ধে আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। জাপানের "সোশ্যাল মাস্ পার্টির" প্রতিনিধিগণ জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত অবিলম্বে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রধান মন্ত্রী ব্যারন হিরানুমার নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ Saturday, 5th August, 1939 [৩৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনীতিক বন্দীদের সমস্যা—

রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং বাঙলা দেশের অপর কয়েকজন নেতা দমদম এবং সেণ্ট্রাল জেলে গিয়া অনশন ব্রতী রাজনীতিক বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অনশন ব্রত ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশও দেন; কিন্তু বন্দীরা নিজেদের সঙ্কল্পেই দৃঢ় আছেন। তাঁহারা কথার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না, এখন চাহিতেছেন কাজ। কাজটা কি করা যাইতে পারে, এখন তাহাই হইতেছে বিবেচ্য। সুভাষচন্দ্র সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, ভারতের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটিকে নিখিল ভারতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়া যে পদত্যাগ করিবেন, এমন কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তো লঙ্কা দ্বীপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সেদিন বলিয়াই দিয়াছেন যে, রাজনীতিক বন্দীদের এই সমস্যাটি কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কিত একটি মৌলিক অর্থাৎ প্রধান সমস্যাই নয়। তাহা ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক দিক হইতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে এই সমস্যা লইয়া পদত্যাগ করা কর্ত্তব্যও হইবে না। মন্ত্রীদের কার্য্যে গবর্ণরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন এবং করিবার ব্রত লইয়াছেন, যে গণতান্ত্রিক নীতি-নিষ্ঠ কংগ্রেস, সে কংগ্রেস কিরূপে মন্ত্রীদের কার্য্যে গবর্ণরকে হস্তক্ষেপ করাইবার জন্য পদত্যাগ করিয়া বড়লাটকে টলাইতে পারেন? পূর্ণ স্বাধীনতার একনিষ্ঠ আদর্শবাদীস্বরূপে একদিন দেখিয়াছিলাম যে জওহরলালজীকে, তাঁহার মুখে এই ধরণের পাকান-ঘোরান যুক্তি এবং নিয়মতান্ত্রিকতার দোহাইয়ের উত্তর কি দিব, ভাষা আমাদের আসে না। বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের প্রশ্নটি কংগ্রেসের মৌলিক নীতিগত যদি না হয়, তবে সেই নীতিটা কোন্ আধ্যাত্মিকতার ঊর্দ্ধ স্তরে রহিয়াছে, আমরা তাহাই শুনিতে চাই। কংগ্রেস কি রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি আদায় করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নহে, এবং সেই প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে তাহা প্রদেশ ব্যতিরিক্ত কোন ক্ষেত্রে গিয়া হইবে ইহার উত্তর কি আছে? সেই প্রতিশ্রুতির সার্থকতা কি ফুটিয়া উঠিবে স্বর্গ রাজ্যে—ভারতের কোন প্রদেশ-বিচারগত বুদ্ধির যে দেশ বাহিরে? আর নিয়মতান্ত্রিকতার দোহাই, পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী কংগ্রেসীদের মুখে—এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেও আমাদের বিরক্তি বোধ হয়। বাঙলার আইন-সভা যেভাবে গঠিত পণ্ডিত জওহরলালজী কি তাহা গণতন্ত্রসম্মত বলিয়া মনে করেন? বাঙলার আইন-সভাকে গণতান্ত্রিক মর্য্যাদা দান করিবার মত মতিবুদ্ধি যাঁহার, তাঁহার সঙ্গে কোন বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই আমরা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। বাঙলার মন্ত্রিসভার যাঁহারা সমর্থক, তাঁহারা বাঙলার আইন-সভাকে কিংবা মন্ত্রীদের অবলম্বিত নীতিকে গণতান্ত্রিক মর্য্যাদা দান করেন নাই। সেদিনও শ্রীহট্টের মুসলিম লীগের সভাতে মৌলবী আব্দুল রহমান সিদ্দিকী নিজে মন্ত্রীদের একজন ধ্বজাধারী হইয়াও বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা বাঙলার মন্ত্রীদের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত জওহরলালের এ সব যুক্তিই ছেঁদো। তীব্র সহানুভূতিসঞ্জাত বেদনার অভাব বীর্য্যোদ্দপ্ত পথ অবলম্বন করিতে মনে যে দ্বিধার সৃষ্টি করে, পণ্ডিতজীর যুক্তির ভিতর আজ আমরা তাহারই আভাষ পাইতেছি। নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাদিগকে এ কথা বলিতে হইতেছে। বড়লাটের উপর চাপ দিয়া গবর্ণরকে বাধ্য করিবার নিয়মতান্ত্রিকতার বিরোধিতার উপর পণ্ডিতজী জোর দিতে চাহিয়াছেন কেন, আমরা বুঝি না। বড়লাটের নিকট আবেদন-নিবেদন করিবেন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আমরাও ইহা চাহি না; সকল রকম আবেদন-নিবেদনেরই আমরা বিরোধী। আমরা বলি, যে শাসনতন্ত্রে দেশের জনমতের বিরুদ্ধে এমন নির্ম্মম এবং নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখান সম্ভব হয়, তাঁহারা সেই শাসন-

তন্ত্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পদত্যাগ করুন, তারপর কাজ কোথায়, কেমন করিয়া কিভাবে হয়, দেখা যাইবে। যদি এই ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া এমন শাসনতন্ত্র নষ্ট হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কংগ্রেস কি বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প লইয়াই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই? মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মধ্যে মজা লুটিবার মোহ আজ যদি ইঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াই থাকে, তবে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রভৃতি বড় বড় কথা মুখ দিয়া না আওড়ানাই ভাল। স্বাধীনতার সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প এবং তেমন অনুপ্রেরণা অন্তরে উগ্র থাকা দরকার।

বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য—

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করুন আর—নাই করুন, বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি কংগ্রেসের দক্ষিণীদলের নেতাদের দৃষ্টিতে তেমন গুরুতর বলিয়া প্রতীত হউক বা না হউক, আমরা তাহা লইয়া তর্কিকতার অবতারণা করা অনাবশ্যক মনে করি। এখন সে সময় নয়। বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীরা আজ জীবন-মরণ সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত। বাঙালীকে একটা কিছু করিতেই হইবে; কারণ, এখানে প্রাণে প্রাণে বাঁধন রহিয়াছে, টান রহিয়াছে। প্রাণের টান যেখানে যুক্তির লড়াই সেখানে চলে না। বাঙালী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সুভাষচন্দ্র এই কর্ম্মের পথে দেশকে আহ্বান করিয়াছেন, আমাদের খুবই বিশ্বাস আছে, শুধু বাঙলার কর্ম্মিগণই নহেন, বাঙলার বাহিরের সহস্র সহস্র যুবক তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিবে। দেশ জোড়া শত শত সভা-সমিতি করা—যাহার উপর সেদিন পণ্ডিত জওহরলাল এলাহাবাদের সভায় জোর দিয়াছেন তাহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সভা-সমিতি শত শত করিলেও বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের ঔদাসীন্য অটলই থাকিবে, থাকিবে চাকুরীর দায়ে, মোটা মাহিয়ানা ও মন্ত্রিগিরির আরাম-আয়াসের মোহে—এবং শ্বেতাঙ্গ মুরুব্বীদের অসমর্থনের আতঙ্কে। সুতরাং কার্য্যত চাপ কিছু দিতে হইবে, দেশকে সেজন্য প্রস্তুত করা দরকার এবং সেজন্য বেশী বিলম্ব করিলেও চলিবে না। সুভাষচন্দ্র এজন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছেন, যদি বাঙলার মন্ত্রীরা ইহার মধ্যেও ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন; তাঁহারা দেখিতেছেন যে, শুধু কংগ্রেসওয়ালারাই নয়, বাঙলা দেশের যে 'ইসলামের স্বার্থ' ভাঙ্গাইয়া যাঁহারা ব্যবসা করিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত বন্দীদের মুক্তি দাবী করিতেছেন। মনুষ্যত্ব যাঁহাদের আছে বা মানবতার অনুভূতি যাঁহাদের মধ্যে আছে, তাঁহারাই মুমূর্ষু বন্দীদের জীবন রক্ষার জন্য বিচলিত হইবেন ইহা স্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িকতার বিচার এ ক্ষেত্রে নয়, ইহা হইল মানবতার প্রশ্ন। দেশের সর্ব্বত্র মুসলমান-সমাজের মধ্যেও এই মানবতার বিক্ষোভের পরিচয় পাইয়া যদি মন্ত্রীদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়, এবং তাঁহারা ইতিমধ্যে যদি রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করেন, তবেই ভাল; কিন্তু যদি তাঁহাদের সে শুভবুদ্ধি না জাগে, তবে বাঙলা দেশে বীর-ব্রতের উদ্বোধন করিতে হইবে। বন্দি-মুক্তির এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া দুঃখ-কষ্ট বরণের দীপমালা জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে, যদি তাহাতে দেশের অন্ধকার দূর হয়।

কঃ পন্থা—

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিরাশ-হৃদয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। বন্দীরাও সঙ্কল্প ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন, স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দীনেরও গোঁ বজায় রাখিবার জিদ সমভাবেই আছে। এক্ষেত্রে উপায় কি? রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বরাত দিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ এবং মহাত্মা গান্ধী কি মত প্রকাশ করিবেন জানি না; তবে যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই প্রশ্নটিকে নিখিল ভারতীয় সমস্যায় পরিণত করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের ঝুঁকি লওয়া পর্য্যন্ত যাইতে তাঁহাদের মন সরিবে বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিত জওহরলাল এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ উভয়েই অবশেষে প্রস্তাবটি যে নিখিল ভারতীয় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কথায় বলিলে তো হইবে না, কাজ চাই। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বানুরাগী দলের মতিগতি অন্য রকম দেখা যাইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একদিন পাকা মন্ত্রিত্ববিরোধী ছিলেন। এখন মন্ত্রিত্বের মূলীভূত নিয়মতান্ত্রিকতাই তাঁহার দৃষ্টিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং এই নিয়মতান্ত্রিকতার পথের শক্তিতেই তিনি দেশের শক্তিকে বিচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইতে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"আমরা যদি শক্ত হইতাম, তাহা হইলে এমন ব্যাপার কিছুতেই ঘটিতে পারিত না, বিশেষভাবে বাঙলা দেশে এবং সাধারণভাবে দেশের সর্ব্বত্র আমাদের দুর্ব্বলতা থাকাতেই এমন ঘটা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিয়া যে পথ দেখান হইতেছে, তাহার অর্থ হইতেছে নিজেরা কিছু করিব না, অন্যে কিছু করুক।" পণ্ডিত জওহরলাল বিশেষ হুঁশিয়ারীর সঙ্গে কথাটা বলিলেও বাঙলার উপর ইহাতে যে কটাক্ষ আছে, তাহা ধরা পড়ে। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এই যে, বাঙলার আইন-সভায় কংগ্রেস দুর্ব্বল, বাঙলার কংগ্রেসীদের সেই দুর্ব্বলতার জন্য এই সমস্যা—এখন অপরের দ্বারা তাঁহারা এই সমস্যা সমাধান করাইতে চাহিতেছেন। বাঙলার দুর্ব্বলতা—নিয়মতান্ত্রিক সুবিধার দিক হইতে ইহা সত্য; কিন্তু এই যে দুর্ব্বলতা, ইহার জন্য দায়ী কে? নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসী নীতির সঙ্গে এই দায়িত্বের কি যোগ নাই? ম্যাকডোনাল্ডী বাঁটোয়ারা কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছিল বলিয়াই বাঙালীকে এই দুর্ব্বলতার ভোগ পোহাইতে হইতেছে। তখন নেতারা বলিয়াছিলেন, বাঁটোয়ারার ব্যবস্থার জন্য চিন্তা কি, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া গোটা শাসনতন্ত্রই যখন আমরা উড়াইয়া দিতেছি, তখন ঐ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থাও তো উড়িয়া যাইবে! কিন্তু এখন সেই

কাটোয়ারায় বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র হইতে লব্ধ নিয়মতান্ত্রিকতাকেই তাঁহারা একমাত্র সম্বল করিয়া দেখিতেছেন এবং সকল দুর্ব্বলতা-সবলতার বিচার হইতেছে সেই দিক দিয়া—বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? সত্যমূর্ত্তি মহাশয়ের উক্তিতে বাঙলার উপর বক্রোক্তিটা আরও সুস্পষ্ট। তিনি সেদিন মাদ্রাজের এক বক্তৃতাতে বলিয়াছেন—'মহাত্মা গান্ধীর বিরোধীরা জোট বাঁধিয়াছে দেখা যাইতেছে। পাঞ্জাবে এবং বাঙলাতে এবং তাঁহারা হক-না-হক কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে অপমানিত করিতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কারণ হইল কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল দ্বারা শাসিত প্রদেশসমূহ যে সব সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে, সেগুলি তাহাদের অদৃষ্টে জুটিতেছে না।' শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির উক্তির নির্গলিতার্থ হইল এই যে, বাঙলা এবং পাঞ্জাবের লোকদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়াই তাহারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছে। মন্ত্রিত্বের মজাটা কতটা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, গান্ধী-ভক্তির নবরাগানুরক্ত শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিগিরি ত্যাগের ঝুঁকি লইতে ওয়ার্কিং কমিটির কর্ত্তারা যে রাজী হইবেন, এমন মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে। ওয়ার্কিং কমিটি যদি কার্য্যতঃ বাঙলার বন্দি-মুক্তির এই প্রশ্নটি লইয়া রাষ্ট্রীয় সংকট সৃষ্টি করিবার সংকল্প গ্রহণ না করেন, তবে ওয়ার্কিং কমিটির বাঙলা দেশের সদস্যদের কর্ত্তব্য হইবে তৎপ্রতিবাদে পদত্যাগ করা। সমস্যাটি নিখিল ভারতীয়—মুখে একথা বলিলে চলিবে না, কাজেও তদনুযায়ী করিতে হইবে।

জনশিক্ষার কথা—

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ২৯শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব-উপলক্ষে দেশের শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। 'আমাদের মতে এদেশের গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, তুরস্ক অথবা রুষিয়ার তুলনা করিতে যাওয়া একেবারেই ভুল। ঐ সব দেশ স্বাধীন, পরকীয় শোষণ-চক্র ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে নাই। আর এ দেশ পরাধীন। শ্রীযুক্তা নাইডু বলিয়াছেন,—বাঙলা দেশের সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই; কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থাও এইরূপ। গ্রাজুয়েট কয়েকটি টাকা পাইলেই যে-কোন কাজ করিতে প্রস্তুত।" ভারতের সর্ব্বত্রই অবস্থা সমান হইবারই কথা; কারণ সর্ব্বত্রই একই সাম্রাজ্যবাদমূলক শোষণ-নীতির প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু বাঙলা দেশে এই সমস্যা বিশেষভাবে প্রবল, আমরা এই কথাটা বলিবই। অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা বাঙলাদেশে উপজীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্র অধিক আছে, রস আছে এখানকার মাটিতে নানারকমে বেশী; কিন্তু সে রসের ছিটে ফোঁটাও এ দেশের লোকের ভাগ্যে জুটিতেছে না, অপরেই সব চুষিয়া লইয়া যাইতেছে। বাঙলা সরকারের অবস্থা এমন যে এই শোষণকে বন্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। বিদেশী স্বার্থসেবীদের দ্বারা তাঁহারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছেন। ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে এই বাঙলাদেশে বিদেশীদের শোষণ বেশী, এবং সেই শোষণ-দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার জন্য আটঘাটও শাসনতন্ত্রের ভিতর দিয়া এখানে বিশেষ রকমে বাঁধা। এই শোষণ-নীতিকে ব্যর্থ করিতে হইলে বাঙলাদেশের রাজনীতিক ধারার মোড় ফিরাইয়া দেওয়ার দরকার এবং সুদৃঢ় জনমতানুকূল মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা কিছু কাজ এখানে হইতে পারে। বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা নাইডু ইহা ছাড়া জনসাধারণের শিক্ষার সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। আমাদের ইংরেজ মালিকেরা যত গর্ব্বই করুন, এই দিক হইতে তাঁহাদের মুরুব্বিয়ানা দেশের কোন তো মঙ্গল কিছু করেই নাই, বরং অমঙ্গলই সাধন করিয়াছে বলা যায়। শতাধিক বৎসর ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের তথাকথিত সুসভ্য এবং সুদক্ষ শাসনের পর দেশ ইংরেজ অভিভাবকদের অভিপ্রেত প্রকারে সায়েস্তা হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত হয় নাই; এখনও ভারতের শতকরা ৯২ জন লোকই নিরক্ষর। শ্রীযুক্তা নাইডু দেখাইয়াছেন যে, একশ বৎসর পূর্ব্বে নিরক্ষরতার হার এত বেশী ছিল না, এখন যেমন। স্বর্গীয়া এনি বেসাণ্টও এইরূপ মত পোষণ করিতেন, এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সবন্ধে আমরাও এইরূপ মতই পোষণ করিয়া থাকি। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল অবস্থার সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্য দেখা যাইতেছে; কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় পৌঁছিতে এখনও অনেক দেরী। শ্রীযুক্তা নাইডু বাঙলার যুবক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারকল্পে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল বাঙলাদেশে এইরূপে লোক-শিক্ষা প্রচারের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এজন্য আগে দরকার, দেশের যুবকদের অন্তরে স্বদেশ-প্রেমের আদর্শকে উগ্র রকমের একটা আবেগ দিয়া উদ্দীপ্ত করিয়া ধরা। শুধু নৈতিক উপদেশ দ্বারা এই কাজটিকে সফল করিবার মত আবেগ জাগান যায় না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। স্বদেশ-প্রেমমূলক রাষ্ট্রীয় নৈতিক আন্দোলনের উপরই পরোক্ষভাবে যুবকদের দ্বারা জনশিক্ষার প্রচারব্রতের প্রসার এবং সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। দরকার ভাবাদর্শকে দেশের বুকে জাগাইয়া তোলা, নইলে ত্যাগ বা সেবার সব কথাই শুধু কথা-সৃষ্টি মাত্র।

লোক-শিক্ষা সংসদ—

লোক-শিক্ষার বিস্তারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের লোক-শিক্ষার পরিকল্পনার কথা আমাদের মনে পড়ে এবং মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কবি বিপুল বেদনা লইয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন সেই কথা কয়েকটি—বাস্তবিকপক্ষে উচ্চশিক্ষা এবং

সংস্কৃতির যে বড়াই আমরা করিতেছি, এই উচ্চশিক্ষা এবং সংস্কৃতি দেশের বুকে পরগাছার মতই হইয়া পড়িয়াছে। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইহার রস-সূত্রের যোগ নাই। সে দিককার অপরিমিত দৈন্যের ভারে এই শিক্ষা দেশকে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে লইয়া আসিতেছে। এই অবস্থাটি আগে এদেশে ছিল না। দেশের সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-সাধনার ধারা সুদূরে গ্রাম্য জীবনের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িত কত আকারে, রস-সংযোগের সূত্রে। কিন্তু এখন বিদেশী আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছি, প্রসারিত করিবার কোন ব্যবস্থাই করি নাই। এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে না পারিলে জাতি কোন দিন উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ যে সেই শুভ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, কারণ, এক্ষেত্রে তাঁহার তুল্য যোগ্য পুরুষ আর কে থাকিতে পারেন? বিশ্বভারতীর কর্ম্ম সচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি সংবাদ পত্রের মারফতে এ সম্বন্ধে দেশবাসীর নিকট যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন,—"দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব, সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। যথেষ্ট মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কিনা এই প্রদেশব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণ হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন এবং পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন, তাঁহারা আপন অভিমত সহ পত্র লিখিয়া জানাইলে উপকৃত হইব। ১৩৫১ সালের পরীক্ষা আগামী ফাল্গুন মাসের শেষার্দ্ধে হইবে। পরীক্ষার নিয়মাবলী এবং পাঠ্য পুস্তকের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরীক্ষার্থীগণ বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন,—সম্পাদক, লোক শিক্ষা সংসদ, শান্তিনিকেতন, পোঃ সুরুল, জেলা বীরভূম।"

আমরা এই বিবৃতির প্রতি লোক-শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহশীল দেশ প্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরলোকে তরুণ রাম ফুকন—

আসামের দেশনায়ক তরুণরাম ফুকন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু আসামই নয়, সমগ্র ভারত একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশপ্রেমিক এবং ত্যাগী নেতাকে হারাইল। তরুণরাম নিজের দেশাত্ম-প্রেরণা-প্রণোদিত ত্যাগের প্রভাবে এক সময়ে আসামের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আসামের রাষ্ট্র-আন্দোলন অদ্ভুত ক্ষমতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। বিগত গৌহাটী কংগ্রেসের সময় তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। তাঁহার চিত্তের স্বভাবসুলভ উদারতা এবং অমায়িকতা তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তরুণরামের ত্যাগ ও সাধনা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। শুধু আসাম নয়, সমগ্র ভারত তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের স্মৃতিতে গৌরবলাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি—

মহাপুরুষদের স্মৃতি-পূজা হইতে মহদাদর্শের অনুভূতি জাতির অন্তরে কতটা জাগিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিবার্ষিকী প্রতিপালনের ভিতর দিয়া আমরা জাতির প্রাণশক্তির সেই পরিচয় পাইয়া উৎসাহান্বিত হইয়াছি। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-পূজার অর্থ হইল, স্বাধীনচিত্ততা, স্বজাত্য-মর্য্যাদাবোধ, বলিষ্ঠ চরিত্রবত্তা এবং মানবমৈত্রী—মানবের এই সব মহত্ত্বের পূজা করা, এই গুণগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করা। অমর ঈশ্বরচন্দ্র এই মানব-মহিমাতেই এখনও জাতির মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এদেশের তরুণদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি বাঙলার এই তেজস্বী পুরুষের প্রতি প্রগাঢ়তর হইতেছে, ইহা আশার কথা বলিতে হইবে। বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-পূজা হইতে তাহারা মনুষ্যত্বের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠুক। পরিপূর্ণ মানব-মর্য্যাদার বিগ্রহ মূর্ত্তি ছিলেন বিদ্যাসাগর। বলিষ্ঠ চরিত্র-শক্তির ভিত্তিতে বিকশিত তাঁহার উদার জীবনের অমোঘ বীর্য্য এবং বলবত্তা যদি তরুণদের চিত্ত হইতে সংকীর্ণ স্বার্থ বিচারের বুদ্ধিকে দূরীভূত করিতে পারে এবং জাতির সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিবার আনন্দকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে তবেই এই স্মৃতি-পূজা সার্থক হইবে। বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-পূজার ভিতর দিয়া এদেশের তরুণেরা আত্মপ্রত্যয়বান্ হউক এবং ঘৃণ্য পরানুকরণ-স্পৃহাকে পরিত্যাগ করুক, দাস মনোবৃত্তিকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষালাভ করুক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। সর্ব্বোপরি, তাহারা শিখুক দেশের নরনারীর দুঃখে কষ্টে বেদনা অনুভব করিতে এবং দেশব্যাপী নরনারীর বিষম দুঃখকষ্টের সুতীব্র সেই অনুভূতি তাহাদের অন্তরে আত্মদানের অনলশিখাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক। বাঙলার অন্তর-বেদনার বহ্নি-দীপ্তিতে প্রদীপ্ত সেই বরেণ্য ব্রাহ্মণের স্মৃতিতে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করিতেছি।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক—

গত ১লা আগষ্ট লোকমান্য তিলকের স্মৃতিবার্ষিকী ভারতের সর্ব্বত্র উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার—এই মহতী বাণী যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত দুশ্চর কর্ম্মসাধনা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান বাঙলা ভারতের সেই বীর্য্যবান্ সাধককে আজ অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে ইঁহারই কর্ম্ম-জীবনের প্রেরণা বঙ্গ-মারাঠাকে এক করিয়া দিয়া ভারতে নবশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিল। লোকমান্য তিলক রাষ্ট্রবীর ছিলেন। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণোচিত কূট রাজনীতিক বুদ্ধি তাঁহার ছিল, কিন্তু সেই বুদ্ধি যুক্ত ছিল লোক-সংগ্রহে এবং লোকহিতের সঙ্গে। ব্যক্তিগত মান যশ বা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নয়। এবং এই হিসাবে তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী। লোক-সেবার ভিতর দিয়া

আত্মার উদার আনন্দকে তিনি আস্বাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই দুঃখ-কষ্ট এবং দুর্দ্দৈবের মধ্যেও তিনি অচঞ্চল স্থৈর্য্য রক্ষা করিতেন। রাষ্ট্রবীর লোকমান্য তিলককে বুঝিতে হইলে এই জন্য গীতাভাষ্যকার তিলককে আগে বুঝা দরকার। হিংসা এবং অহিংসা এতদুভয়ের ঊর্দ্ধস্তরে কঠোর সাধনার সূত্র বিদ্ধৃত রহিয়াছে যে সেবার আত্মান্তিক আনন্দের ভিতরে, লোকমান্য তিলক আধ্যাত্মিক দিক হইতে সেখানে উঠিয়াছিলেন এবং সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার দেশসেবা, বাহির হইতে ধার করিয়া লওয়া কোন নীতি বা উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সে জিনিষটি ছিল তাঁহার অন্তরে অনুভবের মধ্যে। নিজের অহঙ্কারকে সেবার মধ্যে একেবারে বিলীন করিয়া দিতে পারিলে তবে এই অনুভব-শক্তি আসে এবং আত্মার মধ্যে এই অনুভবের আনন্দ কর্ম্মীকে বিঘ্ন-বিপদের মধ্যে অচঞ্চল রাখে। আজ দরকার শক্ত মানুষের। লোকমান্য তিলকের আদর্শ সেই শক্ত মানুষেরই আদর্শ। লোকসেবার মধ্যে একান্ত আত্মনিবেদনের শক্তির উপলব্ধিতে শক্তিমান ভারতের এই সাধক মহা-পুরুষের আদর্শ জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিমুখে উন্নীত করুক। বলহীন যে সে আনন্দের অধিকারী নয়, জাতি এই ঋষি নির্দ্দেশিত মহান্ সত্যকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া স্বাধিকার অর্জ্জন করুক।

জিন্না সাহেবের দুশ্চিন্তা—

কংগ্রেস পাছে যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী গ্রহণ করে, মিঃ জিন্না এই দুশ্চিন্তায় পতিত হইয়াছেন। ইহা অস্বাভাবিক নয়, কংগ্রেস বেয়াড়া, সুতরাং আমাদিগকে কিছু সুবিধা দাও, সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে আমরা কাজ চালাইতে প্রস্তুত আছি, সাম্প্রদায়িক সুবিধা লুফিবার এই মনোবৃত্তিই হইল জিন্না সাহেবের বিশেষত্ব। জিন্না সাহেবের এমন দুশ্চিন্তার কারণ কি ঘটিয়াছে আমরা জানি না। জিন্না সাহেবকে আমরা এই আশ্বাস দিতেছি যে, ভারতের জাতীয়তাবাদীরা যুক্ত-রাষ্ট্র প্রণালী কিছুতেই গ্রহণ করিবে না; কিন্তু তাহাদের সেই গ্রহণ না করা আর জিন্না সাহেবের গ্রহণ না করার বায়না এক বস্তু নয়। জাতীয়তাবাদীরা চাহেন ভারতের মুক্তি, রাষ্ট্র পরি-চালনে অবাধ অধিকার; কিন্তু জিন্না সাহেবের কাম্য তা নয়। যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর বিরুদ্ধে যত যুক্তিই তিনি এ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার নাম গন্ধও কোথাও নাই। আছে সাম্প্রদায়িকতারই বিকার এবং সেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থদুষ্ট দৃষ্টিই আজও তাঁহার যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর বিরুদ্ধতার মধ্যে রহিয়াছে। মোস্লেম লীগের অন্য-তম চাঁই স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খানের পরিকল্পিত প্রণালীই এ পক্ষে প্রমাণ। এই প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে—হিন্দু ভারত এবং মুসলমান ভারত, এই স্থায়ী বিরোধের ভাবের ভিত্তিতে হইতেছে স্যার সেকেন্দরী পরিকল্পনা। এই জাতীয়তার যোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিরোধ ও বৈষম্যের উদ্ভট পথে যে যুক্ত ভারত হইবে, সে যুক্ত ভারতের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই রাখিতে হইবে, তৃতীয় পক্ষের হাতে অর্থাৎ ইংরেজের হাতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের তৃপ্তি এবং পুষ্টির উপর এই যে সম্প্রদায়-স্বার্থসিদ্ধি, ইহার কার্য্যতঃ মূল্য কি দাঁড়াইবে, মাতব্বরদের তাহা তলাইয়া দেখিবার ফুরসুৎ নাই। ভারতের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকেও তাঁহারা বড় করিয়া দেখেন না, নিজেদের মোড়লী হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট; কিন্তু এই সব মোড়লদের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হউক বা না হউক, ইহারা অবিরত এইভাবে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ভেদ-বিভেদের উপর যেরূপ জোর দিতেছেন যে, তাহার অনিষ্ট-কারিতা উত্তরোত্তর আমাদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে এবং এই বাঙলা দেশে থাকিয়া সেই অনিষ্টকারিতার ফল যে মাত্রায় আমরা উপভোগ করিতেছি, তাহাতে সত্যই মনে হয় যে নিছক আমলাতন্ত্রী আমলও ইহার চেয়ে অনেক ভাল ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্বের বেদনা উপলব্ধি করিবার মত মর্য্যাদাবুদ্ধি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জাগিয়া না উঠিবে ততদিন এই ব্যবসার বিরতি ঘটিবে না।

বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান—

বাঙালী ও বাঙলা ভাষা, এই দুইয়ের উপর বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কুনজরের কথা সকলেই জানেন, যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও দেখিতেছি সেই ধারা ধরিতেছেন। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষাকে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে এবং ছাত্রদের পরীক্ষাও দিতে হইবে ঐ দুই ভাষারই সাহায্যে। যুক্ত প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে। কিন্তু শিক্ষার বাহন স্বরূপে মাতৃ-ভাষাকে ব্যবহার করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে বাঙালীর ছেলেরা, কোন যুক্তি হইতে ইহা সমীচীন আমরা বুঝি না। সব জায়গাতেই বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যেসব স্থানে বাঙালী বেশী কিংবা বাঙালীর ছেলে যেসব স্কুলে বেশী, সেখানে তাহাদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ না দেওয়ার অর্থ, মাতৃ ভাষার সাহায্যে যাহারা শিক্ষা পাইবে তাহাদের নীচে বাঙালী ছেলেদের অন্যায়ভাবে দাবাইয়া রাখা। তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষার সম্বন্ধে উপেক্ষার একটা ভাব জাগানোর ফলের কথা আমরা ছাড়িয়াই দিলাম। যুক্ত প্রদেশের সরকার পূর্ব্বে এই আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, বাঙালীদের সম্বন্ধে শিক্ষা সম্পর্কে যাহাতে কোন অবিচার না হয়, তাঁহারা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবারই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, এখন তাঁহাদের মতিগতি ঘুরিয়া যাইবার কারণ কি? বাঙালীদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি মর্য্যাদাবুদ্ধি কিরূপ প্রবল এবং বাঙলার সংস্কৃতির দিক হইতে সে বুদ্ধি পোষণ করা বাঙালীর পক্ষে কতটা স্বাভাবিক, এই বিবেচনা যদি যুক্তপ্রদেশের কর্ত্তাদের থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি

করিতেন যে, তাঁহাদের এমন ব্যবস্থা অবলম্বনের অবশ্যম্ভাবী ফলে আসিবে বাঙালীদের মনোবৃত্তির উপর আঘাত। বাঙালীদের মনোবৃত্তিতে আঘাত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, আমরা এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু এই নীতির ফল কার্য্যতঃ যাহা হইবে তাহাই বলিতেছি। ভেদ-বিভেদের ভাব এমনভাবে বাড়িবে যে নীতিতে যুক্ত প্রদেশের মত খাঁটি কংগ্রেসের নীতিনিষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের তেমন নীতি পরিবর্ত্তন করা উচিত। আমরা আপাততঃ এইটুকু তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতেছি।

বোম্বাইয়ে সুরা-বর্জ্জন আন্দোলন—

মাদ্রাজের সালেম প্রভৃতি কয়েকটি ছোট খাট শহরের ন্যায় জায়গায় এ পর্য্যন্ত সুরা-বর্জ্জন নীতির প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু বোম্বাইয়ের মত বড় শহরে সুরা-বর্জ্জন নীতির প্রয়োগ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। গত ১লা জুলাই হইতে বোম্বাই শহরে সুরা-বর্জ্জন বিধি বলবৎ হইয়াছে। ইহার ফলে বোম্বাই শহরের মোট ৮২৫টি মদের দোকানের মধ্যে ৮ শতটি মদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের ন্যায় জনবহুল বাণিজ্যপ্রধান এবং বৈদেশিকদের সম্পর্কযুক্ত শহরে এ ঝুঁকি কম নয় এবং বলিতে গেলে ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। আমেরিকায় মদ্য বর্জ্জন আন্দোলন বিফল হওয়ার পর জগতের অন্যত্রও এমন পরীক্ষা হয় নাই। সুতরাং বোম্বাইয়ের এই মদ্য বর্জ্জন নীতির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। বাধা বিঘ্ন অনেক আছে এমন একটি বিপুল রকমের সংস্কারমূলক নীতি ধরিয়া অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে। প্রথম দিনেই হাঙ্গামা বাধে, এবং পুলিশকে শান্তি রক্ষার জন্য গুলী চালাইতে হয়, সেই সঙ্গে সান্ধ্য আইনও জারী করা হয়। আমরা আশা করি, এই উত্তেজনার ভাব স্থায়ী হইবে না। আমেরিকায় সুরা-বর্জ্জন আইন সফল হয় নাই বলিয়া ভারতেও যে তাহা হইবে না, এমন কোন কারণ নাই। আমেরিকার সুরা-বর্জ্জন আন্দোলনের স্বর্গীয় স্বনামধন্য নেতা পুসিফুট জনসন এদেশে আসিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীদিগকে এ সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই; কারণ ভারতের আদর্শেই আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া চলিয়াছি। ভারতে মদ্য বিরোধী আন্দোলন এই নূতন নয়। এই কু-প্রথাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বোম্বাইয়ের জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে সাহায্য করিবেন বলিয়াই আমরা মনে করি। যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা সমাজের নেতৃস্থানীয়, এজন্য তাঁহাদিগকে যদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেও হয় দেশ, জাতি, সমাজ এবং মানবতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নহে।

বঙ্গব্যাপী দুর্য্যোগ—

কলিকাতার ১৩০৭ সালের বাদলার কথা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। শহরের রাস্তা সহজেই জলে ভাসিয়া যায়, সুতরাং সেদিকে নূতনত্ব কিছুই নাই, কিন্তু সপ্তাহাধিক কাল একটানা এমন বৃষ্টি কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় দেখা যায় নাই। শুধু শহরে নহে, বাঙলার মফঃস্বলের নানা স্থান হইতেও অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ এবং ঝড়ের খবর আমরা পাইতেছি। অনেক জায়গার ফসল ইতিমধ্যেই অতি বৃষ্টির ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বৃষ্টি-বাদলা যদি আরও কিছুদিন এইভাবে চলে, তবে বাঙলার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। সমুদ্রে যাহাদের শয্যা তাহাদের আর শিশিরে ভয় কি— দুর্ভিক্ষ বাঙলাদেশে এখন যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন এজন্য আর চিন্তা করিয়া ফল কি? দৈব ব্যাপারে মানুষের হাত নাই; কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে মানুষের হাত আছে সেই সব বিপদ হইতেই বা জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কি হইতেছে?

শিল্পে সরকারী কর্ত্তৃত্ব—

ভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি প্রধান প্রধান শিল্পগুলিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং যে স্থলে তাহা সম্ভব না হইবে, সে স্থলে যথাসম্ভব ঐগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিতে চাহিতেছেন। স্বার্থবাদী ধনিক মহলে ইহাতে প্রতিবাদ উঠিবে ইহা স্বাভাবিক। সেদিন ভারতীয় সাবান নির্ম্মাতা সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে পরিকল্পনা কমিটির অন্যতম সদস্য ডাক্তার মেঘনাথ সাহা এ সম্বন্ধে বলেন যে, খরিদ্দারদের এবং ছোট ছোট শিল্পগুলির স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐরূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ একান্তভাবে আবশ্যক। সূতা, কয়লা, লোহা, বিদ্যুৎ, সালফিউরিক এসিড নাইট্রিক এসিড, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য, এগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা যায় যে, এই সব জিনিষের ব্যবসায় কেহ মূলধনের শতকরা দশ টাকার বেশী লাভ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ঐ সব জিনিষের দর অনেক সস্তা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সব শিল্পে এই সব জিনিষগুলি উপকরণসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সব শিল্প মাথা তুলিয়া উঠিবার সুবিধা লাভ করিবে। ডাক্তার সাহা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার সারবত্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না। এই সব দিকে সরকারী প্রচেষ্টার অভাব আমাদের আর্থিক পরাধীনতার মূলে যে অনেকখানি রহিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(১৯)

কেন্দ্রীকরণ ও সমরূপতার দিকে অভিযান-বৈদেশিক ব্যাপারের নির্বাহ ও নিয়ন্ত্রণ মানবজাতির ঐক্যে অধিজাতি-ইউনিটের (nation units) স্থান

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, অধিজাতিসমূহের স্বাভাবিক সম্পর্ক, মনোভাব, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধার অনুভূতি অনুসারে তাহাদের স্বাধীন মণ্ডলীবদ্ধতাই হইতেছে সুদৃঢ় জগৎ ঐক্যের চরম ভিত্তি, তাহা হইলে পরের প্রশ্নটি হইতেছে মানবজাতির বৃহত্তর ও অধিকতর জটিল ঐক্যের মধ্যে এই সকল অধিজাতির ঠিক পদমর্যাদা কি হইবে। তাহারা কি ইহার মধ্যে নামমাত্র পার্থক্য বজায় রাখিবে এবং একটা যন্ত্রের অংশ হইয়া পড়িবে, না, প্রকৃত এবং জীবন্ত ব্যষ্টিসত্তা এবং কার্যকরী স্বাধীনতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ জীবন বজায় রাখিবে? কার্যত প্রশ্নটি এইরূপে দাঁড়ায়—মানবজাতির ঐক্যের আদর্শ বলিতে কি ইহাই বুঝায় যে, মানবজাতিকে বলপূর্বক সংমিশ্রিত ও একত্রিত করিয়া একটি মাত্র বিরাট অধিজাতি এবং কেন্দ্রীভূত বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে না, অধিকতর বিমিশ্র, শিথিল এবং নমনীয় ব্যবস্থার অধীনে ইহাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া স্বাধীন অধিজাতিবৃন্দের বিশ্ব-সম্মিলনে পরিণত করা হইবে? যদি প্রথম অধিকতর কড়াকড়িপূর্ণ পরিকল্পনা বা প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনটিই জয়ী হয় তাহা হইলে ইউরোপে অধিজাতি গঠনের ইতিহাসে যে তিনটি স্তর হইয়াছিল তাহার দ্বিতীয়টির ন্যায় আমরা জাতিগত ও ব্যষ্টিগত স্বাধীনতার দমন সংকোচন ও অপলাপের একটি যুগ পাইব। যদি এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হয় তাহার শেষ পরিণতি হইবে একটি কেন্দ্রীভূত বিশ্ব-গবর্ণমেণ্ট, তাহা তাহার সমরূপ আইন-কানুন, সমরূপ শাসন পদ্ধতি, সমরূপ অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক ব্যবস্থা, এক সংস্কৃতি, এক সামাজিক ধারা, এক সভ্যতা, এমন কি সম্ভবত এক ভাষা এবং এক ধর্ম সমগ্র মানবজাতির উপর চাপাইয়া দিবে। কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহা তাহার কিছু কিছু শক্তি আধিজাতিক কর্তৃপক্ষ ও পরিষদগুলির হস্তে ন্যস্ত করিবে, কিন্তু কেবল সেই ভাবে যেমন কেন্দ্রীভূত ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও আমলাতন্ত্র তাহাদের কিছু কিছু শক্তি বিভাগীয় প্রিফেক্ট ও পরিষদগুলির হস্তে এবং তাহদের অধস্তন কর্মচারী ও কমিউনগুলির হস্তে অর্পণ করে।

এইরূপ একটা পরিস্থিতি খুবই দূরবর্তী স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়, আর কঠোর নীতিবাগীশ ভিন্ন আর কাহারও নিকট ইহা একটি সুন্দর স্বপ্নও নহে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এইটি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে অনেক সময় লাগিবে এবং ইহার পূর্বে মধ্যযুগীয় ইউরোপে, ফ্রান্স বা জার্মানীর ফিউডাল ঐক্যের অনুরূপ একটা শিথিল সংগঠনের যুগ আসিবে। তথাপি জগৎ যেরূপ নিত্য-বর্ধমান গতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মধারায় যে বিরাট বিপ্লবের আশা দেখা যাইতেছে তাহাতে এইটিকে যে কেবল একটি চরম সম্ভাবনা বলিয়াই ধরিতে হইবে তাহা নহে পরন্তু ইহা অতি দূরবর্তী না-ও হইতে পারে। যদি ঘটনাবলী নিরবচ্ছিন্নভাবে, জয়যুক্তভাবে একই দিকে চলিতে থাকে এবং দূরত্ব ও ভৌগোলিক ও মানসিক যে-সব বিভেদ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে সে-সবকে নাকচ করিয়া দিতে বিজ্ঞান আরও অগ্রসর হয় এবং তাহার বিশাল ও ঘনিষ্ঠ অর্গানিজেশনের উপায় ও শক্তিগুলিকে বাড়াইয়া তোলে, তাহা হইলে ইহা দুই এক শতাব্দীর মধ্যে, বড় জোর তিন বা চার শতাব্দীর মধ্যেই সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। এইটিই হইবে যথাসংগত পরিণতি যদি এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয় যাহাতে বলপ্রয়োগ ও পীড়ন অথবা কয়েকটি বৃহৎ অধিজাতির প্রাধান্য অথবা একটি রাজ-রাষ্ট্রের, জলে ও স্থলে প্রভুত্বকারী একটি প্রাধান্যশীল সাম্রাজ্যের আবির্ভাবই ঐক্য সাধনের প্রধান যন্ত্র হয়। ফরাসী বিপ্লবের ইউনিটেরিয়ান জাকোবিনদের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক নীতিবাগীশের রাজনৈতিক মতবাদ যদি সমগ্র জগতে জয়ী হয় এবং তাহারাই যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে ইহা সংঘটিত হইতে পারে, যদি ইতিপূর্বেই একটা অপেক্ষাকৃত শিথিল ঐক্য স্থাপিত হইয়া থাকে; অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার উপর অথবা কোনরূপ মণ্ডলীগত বিশিষ্টতার উপর তাহাদের কোনরূপ দয়া মায়া থাকিবে না। যাহা কিছু এই সবকে সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হয় সে-সবকেই তাহারা নিঃশেষে বিলুপ্ত করিতে চাহিবে যেন তাহাদের ধারণা অনুযায়ী মানবজাতির পূর্ণতম সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমরূপতার দ্বারা পূর্ণ ঐক্য সিদ্ধি—সমরূপতা পরিকল্পনার শক্তি

এইরূপ একটা ব্যবস্থা যেভাবে যে-শক্তির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহা আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হউক অথবা শুধুই এমন রাষ্ট্রবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হউক যাহা সমাজতান্ত্রিক হইলেও অ-গণতান্ত্রিক বা গণতন্ত্র-বিরোধী,—সে-ব্যবস্থা এই নীতির উপর দণ্ডায়মান হইবে যে, পূর্ণ ঐক্য কেবল সমরূপতার দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। যে-কোন চিন্তাধারা যান্ত্রিক বা বাহ্য উপায়ের দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায় তাহা স্বভাবতই সমরূপতার দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহার প্রস্তাবটি ইতিহাসের দ্বারা এবং অতীতের শিক্ষার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়; কারণ আধিজাতিক ঐক্যের গঠনে কেন্দ্রীকরণ ও সমরূপতার দিকে প্রবৃত্তিটিই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির শক্তি হইয়াছে। একটা সমরূপতার অবস্থাই হইয়াছে চরম পরিণতি, আর বিভিন্ন এবং অনেক সময়ে বিরোধী প্রকৃতির লোক সকলকে লইয়া একটা আধিজাতিক রাষ্ট্র গঠনের যে দৃষ্টান্ত, পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দকে মানুষ সকলকে লইয়া একটি বিশ্ব-জাতি ও বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনে সেই দৃষ্টান্তই অনুসৃত হইবে ইহা স্বাভাবিক। আধুনিক যুগে

সমরূপতার দিকে এই প্রবৃত্তিটির শক্তির শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে এবং সভ্যতার প্রগতির সহিত এই প্রবৃত্তিটিও বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক তুর্ক আন্দোলনটি আরম্ভ হইয়াছিল ভগ্নাবস্থ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিসদৃশ সকলপ্রকার অংশের প্রতি সহনশীলতার আদর্শ লইয়া, কিন্তু অনিবার্যভাবেই ইয়ং টার্করা কার্যপ্রয়োগেই একটা সমরূপ অটোমান সংস্কৃতি ও অটোমান জাতীয়তা স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রায় সমসংখ্যক টিউটনিক্ ফ্লেমিং এবং গালিক্ ওয়ালুনের লইয়া গঠিত বেলজিয়াম্ ফ্রাঙ্কো—বেলজিয়ান্ সংস্কৃতির অধীনে ফরাসীকেই প্রধান ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া একটি জাতীয়তায় গড়িয়া উঠিয়াছিল; ফ্লেমিং আন্দোলনটি যদি দুইটি ভাষার জন্যই সমান অধিকার দাবী করিত তাহা হইলে সেইটিই হইত যুক্তিসংগত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার লক্ষ্য ছিল সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই উল্টাইয়া দেওয়া এবং কেবল ফ্লেমিশ্ ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা নহে পরন্তু ফ্লেমিশ্ ভাষা এবং একটি খাঁটি ফ্লেমিশ্ সংস্কৃতিরই প্রাধান্য স্থাপন করা। জার্মানী তাহার প্রাচীন অংশগুলি একত্র মিলিত করিয়া তাহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে আপন আপন গবর্ণমেণ্ট ও শাসনব্যবস্থা লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে দিয়াছিল, কিন্তু এইভাবে যে বহুল বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইয়াছিল, বার্লিনে জাতীয় জীবন কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ায় তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; নামমাত্র পার্থক্য এখনও রহিয়াছে, কিন্তু বাস্তব ও প্রবল সমরূপতার দ্বারা তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।* সেই সমরূপতা দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক ও মানবধর্মমূলক প্রবৃত্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থাকা সত্ত্বেও জার্মানীকে প্রায় এক বৃহত্তর প্রুশিয়ার প্রতিরূপে পরিণত করিয়াছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত মুক্ত ধরণের ফেডারেশনের বাহিরক দৃষ্টান্তও রহিয়াছে, সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিন্তু এমন কি এখানেও খুঁটিনাটিতে বিভিন্নতা এবং ছোট ছোট ব্যাপারগুলিতে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনভাবে আইন করিবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও সমরূপতার নীতিটিই বলবৎ রহিয়াছে, অথবা বলবৎ হইতে চাহিতেছে। মনে হয় সকল স্থানেই ঐক্য তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে অল্পাধিক সমরূপতার প্রয়োজন বোধ করিতেছে এবং তাহা সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

সমরূপতার জন্য কেন্দ্রীভূত গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা—অধিজাতির দৃষ্টান্ত

প্রথম সমরূপতা, যেটি হইতে আর সব কিছুর আরম্ভ হয়, সেইটি হইতেছে একটি কেন্দ্রীভূত গবর্ণমেণ্টের সমরূপতা, তাহার স্বাভাবিক কর্ম হইতেছে সমরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত করা এবং রক্ষা করা। যে-কোন সমূচ্চয় নিজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যে উপনীত হইতে চায়, তাহারই পক্ষে একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক। যদিও নামত অথবা প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টটি বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির দ্বারা সৃষ্ট কেবল একটি যন্ত্র মাত্র হইতে পারে এবং রাষ্ট্রগুলি তখনও নিজেদের সীমানার মধ্যে সার্বভৌম হইয়া থাকিবার দাবী করে, সুবিধার খাতিরে সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঐ যন্ত্রটিকে তাহাদের কিছু কিছু শক্তি প্রদান করে, তথাপি ঐটির প্রবৃত্তি সকল সময়েই হইতেছে নিজেই সার্বভৌম শক্তি হইয়া উঠিবার দিকে, সে নিজের হস্তেই বেশী বেশী শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার এবং স্থানিক ব্যবস্থাপক সভা ও কর্তৃপক্ষের নিকট কেবলমাত্র ন্যস্ত শক্তি রাখিয়া দিবার ইচ্ছা করে। শিথিলতর ব্যবস্থার ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি এই প্রবৃত্তিটিকে বলবৎ করে এবং ইহার আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থিত রক্ষা-কবচগুলিকে দুর্বল করিয়া দেয়, ঐ আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর বলিয়াই উত্তরোত্তর বিবেচিত হয় এবং সাধারণ উপযোগিতার যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়। এমন কি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রেও তাহার প্রথম শাসনতন্ত্রের প্রতি প্রবল আসক্তি এবং স্থানিক ধারা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক কোনরূপ নূতন রীতি প্রবর্তনে অবিশ্বাস সত্ত্বেও ঐ প্রবৃত্তিটি মাথা তুলিতেছে, আর ইহা নিশ্চয় যে উহার ফলে এতদিন বৃহৎ ও মূলগত পরিবর্তন-সমূহ সাধিত হইত, যদি না এমন একটি উচ্চতম আদালত (supreme court) থাকিত, যাহার কার্য হইতেছে আইনের দ্বারা মূল শাসনতন্ত্রটির উপর সকলপ্রকার হস্তক্ষেপ নাকচ করিয়া দেওয়া অথবা যদি না বিদেশীয় ব্যাপার ও হাঙ্গামায় জড়িত না হইবার আমেরিকান নীতিটি সেই সকল প্রয়োজনের চাপ দূর করিয়া দিত, যেগুলি অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সকল আসল ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইতে এবং নিজেকেই জাতীয় কর্মরাজির উৎস এবং সেই সঙ্গেই মস্তক ও কেন্দ্রে পরিণত হইতে সাহায্য করিয়াছে। আমেরিকার চিরাচরিত নীতি হইতেছে তাহার শান্তিপ্রিয়তা, তাহার যুদ্ধ-বিরোধিতা, ইউরোপীয় গোলমালে জড়িত হওয়া অথবা ইউরোপীয় রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার প্রতি তাহার বিদ্বেষ, আমেরিকার ব্যাপারে ইউরোপীয় শক্তিগণের (যদিও পশ্চিম গোলার্ধে তাহাদের স্বার্থ এবং উপনিবেশ রহিয়াছে) হস্তক্ষেপে তাহার অসহিষ্ণুতা—এ-সবেরই মূলে হইতেছে প্রধানত তাহার এই সহজবোধ যে, তাহার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাহার জাতীয় জীবনের বিশেষ রূপ বজায় রাখিতে হইলে এই স্বাতন্ত্র্যই হইতেছে একমাত্র নিরাপদ পন্থা। একবার সামরিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে, একবার বিশ্ব-রাজনীতির আবর্তে পড়িলে রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্রীকরণের দিকে গুরুতর পরিবর্তনের প্রয়োজন হইতে কিছুই বেশীদিন রক্ষা করিতে পারিবে না এবং ফেডারেল নীতিটি দুর্বল হইয়া পড়িবেই।* ঐরূপ স্ব-নিষ্ঠ

---

* গ্রীক অংশটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এবং সাম্রাজ্যটি ধ্বংস হওয়ার পর আজিকার ক্ষুদ্র খাঁটি তুর্করাষ্ট্রে এই প্রবৃত্তিটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু কোতুকের বিষয়, ইউরোপীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতির অনুকূল সাহায্যের ভিতর দিয়া আধিজাতিক সমরূপতা আন্তর্জাতিক সমরূপতার দ্বারা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

* এই নামমাত্র পার্থক্যও এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; নাজী দলের জবরদস্তি সর্বত্রই কড়াকাড়ির সহিত সমরূপতা চাপাইয়া দিয়াছে।

* যুক্তরাষ্ট্রে এই দুইটি বিরোধী নীতির শক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইতেছে রুজভেল্টের নীতি এবং সেইটিকে যে-সব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইতেছে; তবে ফেডারাল কেন্দ্রটিকে প্রবল করিবার দিকে প্রবৃত্তিটি সুস্পষ্ট।

নিরপেক্ষতার কল্যাণেই সুইজারল্যান্ড তাহার ফেডারেল শাসনতন্ত্র নিরাপদ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

আধিজাতিক কেন্দ্রীকরণের কারণস্বরূপ দুইটি প্রয়োজন—সামরিক ও রাজনৈতিক সামর্থ্য এবং সামাজিক দক্ষতা

কারণ আধিজাতিক কেন্দ্রীয়তার বিকাশ দুইটি মূল প্রয়োজনের জন্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক প্রবল প্রয়োজনটি হইতেছে সংহতত্ব, একনিষ্ঠা, বাহির হইতে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যই হউক অথবা জাতীয় স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুসরণে অপরকে আক্রমণ করিবার জন্যই হউক অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে একাগ্র এবং কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার আবশ্যকতা। যুদ্ধ ও সামরিকতার ফল স্বরূপ কেন্দ্রীকরণ, শক্তি সকলকে সংহত করিবার জন্য ইহার দাবী প্রাচীনতমকাল হইতে ইতিহাসের সাধারণ ঘটনা। কেন্দ্রীয় ও স্বৈর রাজতন্ত্রের বিকাশে, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী অভিজাতবর্গের সংরক্ষণে, বিসদৃশ অংশসমূহের সংমিশ্রণে এবং কেন্দ্র-বিমুখ (centrifugal) শক্তিসমূহের দমনে এইটিই প্রধান কারণরূপে কার্য করিয়াছে। এই প্রয়োজনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে-সব জাতি শক্তিসমূহের সংহতত্ব বিকাশ করিতে বা রক্ষা করিতে পারে নাই, জীবন-সংগ্রামে তাহাদের গতি সর্বদাই হইয়াছে বিভ্রাটের দিকে, যদিও ইউরোপে বহুদিন ইটালী ও পোল্যান্ডের ন্যায় অথবা এশিয়ায় ভারতের ন্যায় দুর্ভাগ্য সকলেরই হয় নাই। আজও কেন্দ্রীভূত জাপানের শক্তি এবং কেন্দ্রীভূত চীনের দুর্বলতা প্রমাণ করিতেছে যে, আধুনিক পরিস্থিতিতেও সেই প্রাচীন নীতিই বলবৎ রহিয়াছে।* আজ আমরা দেখিতেছি, প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত এবং সামরিক আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ একটি জাতির সুসংহত শক্তির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য পশ্চিম ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি তাহাদের বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাগুলিকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করিতে এবং প্রাচীন রোমানদের ন্যায় দায়িত্বহীন সেনেটের প্রথা অবলম্বন করিতে, এমন কি প্রকারান্তরে স্বৈরনেতৃত্বই (dictatorship) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। যদি এই প্রয়োজনটির অনুভূতি যুদ্ধকালের পরও বর্তিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহ যে, গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা এমন সর্বাধিক বিপজ্জনক, সম্ভবত সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইবে, যাহা আধুনিক যুগে তাহাদের প্রতিষ্ঠার পর তাহাদিগকে আর কখনও সহ্য করিতে হয় নাই।*

প্রুশিয়া যে জার্মানীর জীবনকে নিজ মুষ্টির মধ্যে লইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারও কারণ প্রধানত ছিল দুইটি প্রবল

* সমসাময়িক ঘটনা হইতে মনে হইতেছে যে, জাপানের চাপই অসংশোধনীয় কেন্দ্রবিমুখ প্রবৃত্তিটিকে ধ্বংস করিয়া দিবে এবং চীনকে একটি সঙ্ঘবদ্ধ অধিজাতিতে গড়িয়া তুলিবে।

* এখনই অবস্থা যেরূপ, তাহাতে গণতন্ত্র হইতে দূরে উত্তরোত্তর কঠোর রাষ্ট্রশাসন ও প্রণালীবদ্ধতার দিকেই হইতেছে শক্তিসমূহের সুস্পষ্ট গতি।

ও শত্রুভাবাপন্ন জাতির মাঝখানে সঙ্কটময় অবস্থার উপলব্ধি এবং ইউরোপে তাহার ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্বের জন্য নূতন সাম্রাজ্যটির আত্ম-বিস্তারে বাধা এবং চারিদিকে তাহাকে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এই অনুভূতি। ঐ একই প্রবৃত্তির আর একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে, যুদ্ধের ফলে ইংলন্ড ও তাহার উপনিবেশগুলির মধ্যে কনফেডারেশনের পরিকল্পনাটির শক্তি বৃদ্ধি। যতদিন উপনিবেশগুলি ইংলন্ডের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বৈদেশিক নীতি হইতে পৃথক ও অসংস্পৃষ্ট থাকিতে পারিত, ততদিন এই পরিকল্পনা কার্যত সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল; যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং ইহার অনর্থসমূহ এবং কেন্দ্রীয়তার প্রায় সম্পূর্ণ অভাবের জন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে সংহত করিবার সুস্পষ্ট অক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিথিল ও সহজ গঠনের দৃঢ়তা সাধন অপরিহার্য করিয়াছে বলিয়াই মনে হয় এবং একবার এই নীতিটি গৃহীত হইলে এবং কার্যত ইহার প্রয়োগ সুরু হইলে ইহা অনেক দূর পর্যন্তই অগ্রসর হইতে পারে*। কোন না কোন রকমের শিথিল ফেডারেশনের দ্বারা বেশ কাজ চলিতে পারে যখন শান্তিই হয় সাধারণ নিয়ম; যেখানে শান্তির নিশ্চয়তা নাই, অথবা যেখানে জীবন-সংগ্রাম কষ্টকর ও বিপজ্জনক সেখানেই শিথিলতা অসুবিধাজনক হইয়া উঠে, এমন কি মারাত্মক ত্রুটিতে ধ্বংসের জন্য নিয়তির সুযোগেই পরিণত হইতে পারে।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং শাসনকার্য নির্বাহ সমরূপতা

বাহির হইতে বিপদের আশঙ্কা এবং আত্ম-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা কেবল প্রবল রাজনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রীকরণের দিকে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দেয়; সমরূপতার বিকাশ হয় ঘন আভ্যন্তরীণ অর্গানিজেশনের প্রয়োজন হইতে এবং ঐরূপে সৃষ্ট কেন্দ্রটি হয় তাহার যন্ত্র। যে-সব প্রয়োজনের দ্বারা যন্ত্রটি সৃষ্ট হয় অংশত সেই সবের জন্য এই অর্গানিজেশনটিও আবশ্যক হয়, কিন্তু ইহা আরও বেশী আবশ্যক হয় সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে সমরূপতার সুবিধাগুলির জন্য; এইরূপ জীবনের ভিত্তি হইতেছে সুস্পষ্ট, সরল এবং জীবনের জটিলতায় যতটা সম্ভব সুসাধ্য সুশৃঙ্খলা; জীবন এই সুবিধা সম্বন্ধে উদাসীন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সর্বদা এইটি চাহিয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি যখনই নিজ রীতি অনুসারে জীবনকে সুশৃঙ্খল করিতে আরম্ভ করে পরন্তু সজীব সুশৃঙ্খলার যে অধিকতর স্বাভাবিকভাবে কোমল ও নমনীয় নীতি জীবনে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তদনুসারে নহে, তখন অপরিহার্যভাবেই তাহার লক্ষ্য হয় জড় প্রকৃতির অনুকরণে বিন্যাসের কয়েকটি সমরূপ মূলগত ধারা নির্দ্দিষ্ট করা, কিন্তু তাহার আরও লক্ষ্য হয় যতদূর সম্ভব সেগুলিকে

* এখন পর্যন্ত কেবল এতদূর হইয়াছে, পদমর্যাদায় সাম্য, বৈদেশিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ পরামর্শ, ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়াস, কিন্তু আর একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধিলে তাহার ভাগ্য অনুযায়ী তাহা হয় ত' এখনও অতি-শিথিল ব্যবস্থাটিকে ভাঙ্গিয়া দিবে, অথবা ইহাকে অধিকতর সুসংহত ব্যবস্থায় পরিণত হইতে বাধ্য করিবে।

একইভাবে প্রয়োজন করে। সে সকল প্রকার গুরুত্ববিশিষ্ট বৈচিত্র্যকে দমন করিতে অগ্রসর হয়। কেবল যখন সে নিজেকে প্রসারিত করিয়াছে। এবং প্রাকৃতিক জটিলতা-সমূহ বুঝিতে এবং তাহাদের সহিত ঠিকমত ব্যবহার করিতে নিজেকে অধিকতর যোগ্য বলিয়া উপলব্ধি করে তখনই সে জীবনের নীতি সকল সময়েই যাহা দাবী করে সমরূপ নীতি সকলের অবাধ প্রকারভেদ এবং তাহাদের প্রয়োগে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য—সেইটির ব্যবস্থা করিতে আদৌ সোয়াস্তি অনুভব করে। একটি আধিজাতিক সমাজের ব্যবস্থা করিতে সর্বপ্রথমেই সে ইহার রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মধারার সমরূপতা স্থাপন করিতে যায়; শৃঙ্খলার জন্য যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহার বিশিষ্ট প্রয়োজনের সহিত ইহাদেরই রহিয়াছে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। যে শাসনকার্য নির্বাহে প্রথমে যথেষ্ট এবং পরে পূর্ণতম সমরূপতাকে লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করে।

দৃষ্টান্ত :—

যে সকল রাজতন্ত্র সংহতত্বের প্রয়োজন মিটাইতে আবির্ভূত হইয়াছিল সেগুলি প্রথমেই একটা প্রাথমিক সংহতির দিকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাসনকার্য নির্বাহের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি সংগ্রহ করার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা সর্বত্রই ইহা দেখিতে পাই, কিন্তু এই পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরগুলি ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে অতি স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইয়াছে। কারণ সেখানে ফিউডাল্ (feudal) স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি এবং ফিউডাল্ অধিকারসমূহ অতি গুরুতর বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল অথচ নিরন্তর কেন্দ্রীকরণের দিকে সুদৃঢ় প্রয়াসের দ্বারা এবং তাহাদের অবশিষ্ট পরিণামগুলি হইতে একটা শেষ প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেখানেই সেগুলি সর্বাপেক্ষা সাফল্যের সহিত বিচ্ছিন্ন ও অপসারিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীকরণে ব্রতী রাজতন্ত্রটি পুনঃপুন ইংরেজ কর্তৃক আক্রমণের শিক্ষা, স্পেনের চাপ এবং অন্তর্যুদ্ধের দ্বারা উচ্চতম শক্তি লাভ করিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপেই সেই স্বৈরতা বিকাশ করিয়াছিল যাহার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চতুর্দশ লুইয়ের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁহার বিখ্যাত বচন, "আমিই রাষ্ট্র" বস্তুতপক্ষে দেশের প্রয়োজনকেই ব্যক্ত করিয়াছিল, দেশ এমন একটি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম শক্তি বিকাশের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল যাহা ফিউডাল্ ফ্রান্সের শিথিল এবং প্রায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অর্গানিজেশনের পরিবর্তে নিজের মধ্যে সকল সামরিক, ব্যবস্থাপক ও শাসননির্বাহক শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবে। বুরবোঁগণের ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল প্রথমত শাসন-কার্য নির্বাহে কেন্দ্রীয়তা ও ঐকিকতা, দ্বিতীয়ত, শাসনকার্য নির্বাহে কতকটা সমরূপতা। এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটিকে তাহা সম্পূর্ণ সাফল্যময় পরিণতিতে লইয়া যাইতে পারে নাই কারণ তাহাকে অভিজাতবর্গের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, তাহা এই বর্গের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের হস্তে ফিউডাল্ বিশেষ অধিকারগুলির ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লব দ্রুত এই অভিজাত-বর্গের শেষ করিয়া প্রাচীন সংস্থিতির এই অবশেষগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। কড়াকড়ি সমরূপতা স্থাপন করিয়া ইহা রাজতন্ত্রের কার্যটি নাকচ করে নাই, পরন্তু সেইটিকে সম্পূর্ণই করিয়াছিল। ফরাসী স্বৈরতা, তাহা রাজতান্ত্রিকই হউক অথবা গণতান্ত্রিকই হউক, তাহার প্রথম প্রেরণার দ্বারাই যে লক্ষ্যের দিকে চালিত হইয়াছিল তাহা হইতেছে আইন সম্বন্ধীয়, ধনসম্বন্ধীয়, বিচার সম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ ঐকিকতা ও সমরূপতা। ফিউডাল্ ফ্রান্সের বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্য হইতে রাজতন্ত্রের অধীনে যে জিনিসটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিতেছিল সেইটিকেই জ্যাকোবিনদের আধিপত্য এবং নেপোলিয়নের শাসনপ্রণালী কেবল দ্রুত সিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

অন্যান্য দেশে এই প্রবৃত্তিটির ক্রিয়া তত প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বের পূর্বতন প্রয়োজনীয়তা দূর হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সেগুলি অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বাঁচিয়া ছিল; কিন্তু ইউরোপে সর্বত্র, এমন কি জার্মানী ও রুশিয়াতেও ঐ একই প্রবৃত্তি কাজ করিয়াছে এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফল অনিবার্য।* এই বিবর্তনটির আলোচনা ভবিষ্যতের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়; কারণ ঐটিকে যে-সব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সেগুলি বাহ্যরূপে ও আয়তনে যতই বিভিন্ন হউক, মূলত সেই সব বাধা-বিঘ্নের সহিতই এক যেগুলি আধুনিক সভ্য জগতের শিথিল এবং এখনও বিশৃঙ্খল সংবিধান হইতে একটি বিশ্ব-রাষ্ট্রের বিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে।*

(ক্রমশ)

---

* জার্মানীতে হিটলারের অধীনে ন্যাশনাল্ সোস্যালিষ্ট শাসনতন্ত্রের অদ্ভুতপূর্ব কেন্দ্রীয়তা, কড়াকড়ি প্রণালীবদ্ধতা এবং সমরূপতায় এই প্রবৃত্তিটা যে চরম পরিণতি হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

—The Ideal of Human Unity হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত।

যুদ্ধের আবহাওয়া

ফরাসী সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ

গত সপ্তাহে 'প্রাচ্যে মিডানক ?' নিবন্ধে এই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, হয়ত বা টোকিওতে যে ইঙ্গ-জাপান আলোচনা সুরু হইয়াছে, তাহা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত চীনেরও বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এখন যেরূপ শোনা যাইতেছে বা সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় এই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত না-ও বা হইতে পারে। জাপানের ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী, যাহারা তাহার চীন অভিযান পরিচালনা করিতেছে, সেই সৈন্যতন্ত্র আজ চীনের উপর শুধু বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহিতেছে না, চীনকে তাহারা একেবারেই লুঠিয়া লইতে চায়, অন্য কোন ভাগীদারকে তাহারা প্রশ্রয় দিতে স্বীকৃত নয়। তাহাদের কার্য্যকলাপ এই খাতেই চলিয়াছে বহু দিন যাবৎ। বিদেশীরা প্রথমে তাহাদের নানাভাবে খুশী করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল, সৈন্যতন্ত্র চীনকে সম্পূর্ণভাবে হস্তগত করিতে প্রয়াসী তখন হইতেই তাহারা চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু গত মাসাধিককাল যাবৎ ব্রিটেনের প্রাচ্যনীতি আবার যেন রহস্যজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। জাপানী সৈন্যতন্ত্র ব্রিটিশদের অকথ্য অপমান লাঞ্ছনা করিলেও ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কার্য্যত কোনরূপ বিরোধিতা করে নাই, বরং জাপানের সঙ্গে আপোষ-রফা করিতেই উদ্যত হইয়াছে। ব্রিটেনের পক্ষে স্বাভাবিক হইত যদি টিয়েনসিনের অপমানের প্রতিশোধ ও প্রতিরোধকল্পে চীন সরকারকে অধিকতর সাহায্য করিতে অগ্রণী হইত, এবং জাপানের বিরুদ্ধে কার্য্যকর কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করিত। সাধারণের নিকটও ইহা সহজেই বোধগম্য হইত। কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা না করিয়া উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন কাজেই তাঁহাদের কর্ম্ম-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনাও যথেষ্টই হইয়াছে। বিশেষত ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির প্রকৃতি কেহ সহজে ভুলিতে পারিবে না। সাম্রাজ্য রক্ষা করা যে উপায়ে সহজসাধ্য হইবে, ব্রিটিশ বরাবর তাহাই অবলম্বন করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। যদি জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করিলে তাহার মূল উদ্দেশ্য বজায় থাকে তাহা হইলে অর্ব্বাচীনদের লাথি-ঝাঁটা খাইয়াও সে তাহা নিরাপত্তিতে করিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে টোকিওর ইঙ্গ-জাপানী আলোচনার মূলে এই মনোভাবই কার্য্য করিতেছে। তবে যদি সে দেখে যে, তাহার স্বার্থ এইরূপ আলোচনায় সুরক্ষিত হইতেছে না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাঁকিয়া বসিবে। টোকিও হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কোন কোন বিষয়ে উভয় দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার মূলে এই কারণই হয়ত রহিয়াছে।

ইঙ্গ-জাপান আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে গত সপ্তাহের প্রথম। কিন্তু ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই আর একটি গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতঃপর ছিন্ন করা হইবে। তবে এই ঘোষণা পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে কার্য্যকরী হইবে দুই বৎসর পর হইতে। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই বিষয়ক চুক্তি সম্পন্ন হয় গত ১৯১১ সালে। উভয়ের মধ্যে ঐ সময় হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব চালু হইতে থাকে। আমেরিকার তৈল, তুলো,

লোহা প্রভৃতি কাঁচামাল জাপানের শক্তিমূলে ঢের রসদ জোগাইয়াছে। মার্কিনের জাহাজেরও সুযোগ-সুবিধা জাপান পাইয়াছে। অতঃপর এ সকল হইতে জাপানকে বঞ্চিত হইতে হইবে। রুজভেল্টের এই ঘোষণায় বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইলেও আমেরিকাবাসীরা দলাদলি ভুলিয়া গিয়া একযোগভাবে ইহার সমর্থন করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। কেহ কেহ বলিতেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্রও আর জাপানীদের নিকট বিক্রয় করিবে না। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, জাপানীরা বর্ত্তমানে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে, তাহার একটা মোটা অংশ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করা। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে জাপানে অস্ত্র রপ্তানি বিষয়ে, তাহার পরেই স্থান ব্রিটেনের। কি চীন কি জাপান সকলের নিকটই ইহাদের দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু জাপানীদের টাকা থাকায় এই সুবিধা তাহারাই ষোলআনা ভোগ করিতে পারিয়াছে। চীনাদের টাকা নাই, বা [illegible] যে, তাহাদের পক্ষে এ সুযোগ গ্রহণ প্রায়

ডানজিগের নাজী দলের শ্রমিকবাহিনীর কুচকাওয়াজ

অসম্ভবই হইয়াছে। তাহাদের নিজস্ব জাহাজ না থাকায়ও চালানি কার্য্যে অসুবিধা ঘটিয়াছে প্রচুর। বিশেষজ্ঞরা বহু দিন যাবৎ বলিতেছেন যে, জাপানের চীন বিজয়ের জন্য আমেরিকা ও ব্রিটেনই মুখ্যতঃ দায়ী হইবে। বস্তুত জাপান চীনে যতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ঐ দুইটি রাষ্ট্র তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিয়াই অনেকাংশে ইহা সম্ভব করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন জাপানীরা চীনে প্রবলতম, তখন এই অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়কারীদের উপরই তাহাদের আক্রোশ পড়িয়াছে। তাহারা, পরে হইলেও, জাপানী মতলব বুঝিতে পারিয়া জাপান বিরোধী চীনাদেরই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। টিয়েনসিনে জাপানী হস্তে ব্রিটিশদের লাঞ্ছনা এই কারণেই সুরু হইয়াছে আগে বলিয়াছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে তাহার স্বার্থহানি মোটেই সহ্য করিতে রাজি নয়। নবশক্তি চুক্তি অনুসারে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে। জাপানীরা বিজয়োন্মত্ত হইয়া এই অধিকার, কথায় না হউক, কার্য্যত অস্বীকার করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। রুজভেল্ট এই সব কারণেই জাতির মুখপাত্ররূপে ঐরূপ গুরুতর নীতি অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন—মার্কিন মহলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে। আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, টোকিওতে ইঙ্গ-জাপান আলোচনার বহু পূর্ব্ব হইতেই ত এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তবে কেন ঐ আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ করা হইল না। ইহারও জবাব পাওয়া গিয়াছে। আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঐ ঘোষণা প্রকাশিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রে এই বলিয়া প্রতিবাদ করা হইত যে, ব্রিটিশের চাপে পড়িয়াই তাহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে! এ কথার মধ্যে বেশ খানিকটা অর্থ নিহিত আছে। সাধারণভাবে মার্কিনীরা ইংরেজের পররাষ্ট্র-নীতিতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। রুজভেল্ট মহোদয় ইউরোপের গণতন্ত্রগুলিকে আপৎকালে সাহায্য করিবার জন্য নিউট্রালিটি এ্যাক্ট বা নিরপেক্ষতা আইন কতকটা সংশোধন করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সেনেট সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। ইহার বহু কারণ থাকিতে পারে, এমনকি আছেও। কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, ব্রিটেন প্রমুখ তথাকথিত গণতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইহারা ক্রমশ আস্থা হারাইতে বসিয়াছে। ইংরেজ রাজ ষষ্ঠ জর্জের আমেরিকা পরিক্রমাতেও এই বিতৃষ্ণা বিদূরিত হয় নাই। তাই প্রকাশ, রুজভেল্ট দেশবাসীর মনোভাব বুঝিয়াই ইঙ্গ-জাপান আলোচনা সুরু হইবার পর ঐরূপ ঘোষণা করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র আশাতীতরূপ সমর্থনও পাইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই কার্য্যে আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। টোকিওতে ইংরেজ স্বমতে দৃঢ় থাকিবার

ভরসা পাইয়াছে। ওদিকে যে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট আলোচনা বহু দিন যাবৎ অলিগলি ঘুরিয়া একটা এঁদো জলার নিকট আসিয়া পৌঁছিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাও যেন আজ সদর রাস্তার সন্ধান পাইয়াছে। প্রকাশ, মূল বিষয়গুলিতে ইংরেজ, ফরাসী ও রুশদের মধ্যে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে, এখন কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় মীমাংসা হইলেই মৈত্রী স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমান সপ্তাহের মাঝামাঝি ফরাসী ও ব্রিটিশ রণ-নায়কগণ সোভিয়েটের সঙ্গে সমর ব্যবস্থা আলোচনার জন্য মস্কো রওনা হইয়া যাইবেন। ফরাসীদের তরফে যিনি নেতৃত্ব করিবেন তাঁহার নাম আগেই প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রিটিশের তরফেও নাম প্রকাশিত হইয়াছে আজ। একদিকে রুজভেল্টের জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য নাকচ ঘোষণা, অন্য দিকে ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আলোচনার দ্রুত অগ্রগতি—এই সব আঁচ পাইয়াই বোধ হয় নাৎসী ধুরন্ধরগণ ছুটির সুখ ত্যাগ করিয়া বার্লিনে আসিয়া জড় হইয়াছেন। হিটলার ও পররাষ্ট্র-সচিব রিবেণ্ট্রপের মধ্যে আলোচনার কথা আমরা আগে জানিতে পারিয়াছি। রুশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইঁহারা ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আলোচনার পথে বিঘ্ন জন্মাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ঐ আলোচনার অগ্রগতি দেখিয়া সে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই জার্ম্মানী ও জাপানের মধ্যে একটা বাণিজ্য-চুক্তিও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হিটলার নাকি গোপনে গোপনে পশ্চিম সীমান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সার প্রদেশেও অকস্মাৎ গিয়াছিলেন। ডানজিগ জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবেই এরূপ আভাসও পাওয়া যাইতেছে। ওদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সেও নানারূপ কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। এই সময় হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রায় তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকিবার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় এতদিন পার্লামেণ্ট বন্ধ রাখিতে বহু সদস্য রাজি নন্। শেষে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন আশ্বাস দিয়াছেন যে, প্রয়োজন বোধ করিলেই ছুটির মধ্যেও স্বল্প সময়ের নোটিশে পার্লামেণ্ট তিনি আহ্বান করিবেন। তবে পার্লামেণ্ট আহ্বান করা প্রয়োজন কি-না, তাহা গবর্ণমেণ্টই নির্দ্ধারণ করিবেন। ফরাসীরাও স্থির করিয়াছে যে, আগামী বৎসর যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার কথা, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় তাহা দুই বৎসর কাল পিছাইয়া দেওয়া হইল। দেশরক্ষার সঙ্গে প্রচার ব্যবস্থা ও বেতার বিভাগও পুরাপুরি গবর্ণমেণ্ট হাতে লইয়াছেন। মুসোলিনী উত্তর ইটালীর টিরল প্রদেশ হইতে সমস্ত বিদেশীকে সরাইয়া দিয়াছেন। প্রকাশ, এখান হইতে গোপনে জার্ম্মান ও ইটালীয় সেনানী প্রয়োজন মত স্থানান্তরিত করা

সাটাও বন্দরে ইংরেজ ডেষ্ট্রয়ারের জাপ চরমপত্র অগ্রাহ্য করিয়া অবস্থিতি

হইতেছে। বিদেশে বিদেশীর মারফৎ এই সকল কথা প্রকাশ হইয়া না পড়ে সেই জন্যই ব্যবস্থা! ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে যে নূতন একটা সন্ধি হইয়াছে তাহা আগে প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্রান্সের অধীন সিরিয়ার সঞ্জাক প্রদেশ তুরস্ককে দিয়া দেওয়া হইয়াছে। তুরস্ক এখন নিজ নিরাপত্তার জন্য ইটালীর ডোডেক্যানিপ দ্বীপগুলি দাবী করিতেছে।

যে-সব স্বাধীন শক্তিমান রাষ্ট্রের কথা বলিলাম, তাহাদের অধীনে বহু দেশ আছে এবং অধীনস্থ দেশগুলির প্রতি ব্যবহারে কোনরূপ তারতম্য করা হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রভু রাষ্ট্রগুলি যে পন্থা অবলম্বন করিবে, অধীন দেশগুলি তাহাই মানিয়া লইবে, প্রভু জাতিদের ইহাই ধারণা। তাঁহাদের এই ধারণা যে ঠিক নয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার সার্থক চেষ্টা কোথাও হইতেছে বলিয়া অবগত নহি। এই

প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। কেননা, আমরা এখানকারই অধিবাসী এবং এখানকার কার্য্যাকার্য্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ। আমরা বহুবার এই পত্রে বলিয়াছি যে, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতি তাহার সাম্রাজ্য রক্ষা নীতিরই রূপান্তর। এই দুইটি জিনিষকে একটি টাকার এপিঠ ওপিঠ

রুজভেল্ট

বলা চলে। সাম্রাজ্যের দিকে নজর রাখিয়াই ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতি নিয়মিত হইতেছে। ন্যায়, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি কথা এতদিন যে অর্থে আমরা বুঝিয়া আসিয়াছি অন্যান্যের মত ব্রিটিশদের কার্য্যেও তাহার বিপরীত আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। যে যে উপায়ে সাম্রাজ্য-স্বার্থ ষোল আনা বজায় থাকিতে পারে তথাকথিত ন্যায়-নীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

করিয়াই বা ইহার কদর্থ করিয়াই তাহা করা হইতেছে। কাজেই অনেকেই (তাহাদের মধ্যে আমেরিকাবাসীরাও) ইহাদের উপর বিরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণ আজ আত্মচৈতন্য লাভ করিয়াছে। সাম্রাজ্যরক্ষায়, বিশেষত তাহার নিজেদের জন্যই যে আজ বহু দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে ভারতবাসীরা আজ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই তাহারা সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয় না দিতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা নিজের মুক্তি চাহে এবং অন্যের মুক্তিও মনে প্রাণে কামনা করে। তাহারা বুঝিয়াছে চীনের স্বাধীনতা রক্ষায়ই তাহাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার হইবে। আজ যদি চীন জাপানের অধীন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাধীনতা লাভের ও রক্ষার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় দেখা দিবে। যেমন আর একটা প্রধান অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে আবিসিনিয়া ইটালীর অধীন হওয়ায়। এ কারণে তাহাদের আশঙ্কা, ইঙ্গ-জাপান চুক্তির মূলে যদি

হের হিটলার

চীনের স্বাধীনতা বিলোপের সূত্র স্বীকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা তাহার মধ্যে নিজেদের বিপদই খুঁজিয়া পাইবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্ভাবনা যে উপস্থিত হইবে না, একথা এখনও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে আন্তর্জাতিক মহলে বিষম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য বিদেশে চালান দেওয়া হইতেছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব-দেশগামী মাল ও ডাকবাহী বড় জাহাজগুলি ছাড়িতে দেওয়া হইতেছে না। এই জাহাজগুলি ভারত সরকারের প্রয়োজন—এই ওজুহাতে ঐ সব বন্দরে আটক রাখা হইতেছে। মিশরে কয়েক সহস্র সৈন্য পাঠান হইতেছে। এই জাহাজগুলি কোথায় পাঠান হইবে? এ সকল বিষয় সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। তবে কি ভারতবাসীদের অগোচরেই তাহাদিগকে কোন সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরে লিপ্ত করাইবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে? চারিদিকে আজ যুদ্ধের হাওয়াই বহিতেছে। ভারতবাসীর মূল লক্ষ্য যে পরাধীনতার নাগপাশ ছেদন তাহা ভুলিলে চলিবে না।

ইতিহাসের বাণী

আমাদের দৃষ্টি যেখানে অনুদার—সেখানে যথার্থ জ্ঞানী হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যেমন ক'রে দেখা উচিত তেমন ক'রে দেখিনে, আর এই দেখার অসম্পূর্ণতার জন্যই সত্য আমাদের চোখে বিকৃত হ'য়ে দেখা দেয়। আমরা কতকগুলো ঘটনাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দান করি এবং কতকগুলি ঘটনাকে মোটেই কোন মূল্য দান করিনে। কেন আমরা কতকগুলো ঘটনাকে গণনার মধ্যে আনিনে এবং কেনই বা আমরা আর কতকগুলি ঘটনাকে অতিরিক্ত মর্যাদা দান ক'রে থাকি? আমাদের রুচির বৈশিষ্ট্যের জন্য। আমাদের খুসী মতো আমরা ঘটনাস্রোতের মধ্য থেকে কতকগুলো ঘটনাকে বেছে নিই—সেগুলোকে আমাদের মনের মতো ক'রে সাজাই এবং যে সত্যে বিশ্বাস করতে চাই সেই সত্যে উপনীত হই। আমাদের খুসী মতো যেমন ঘটনাকে বেছে নিই আমাদের মনগড়া সত্যকে প্রতিপন্ন করবার জন্য—তেমনি আমাদের খুসী মতোই যা আমরা বিশ্বাস করতে চাইনে তাকে অপ্রমাণ করবার জন্য কতকগুলো ঘটনাকে একেবারে বর্জ্জন করি। একই মানুষ সম্পর্কে আমরা যে বিভিন্ন ধারণা পোষণ ক'রে থাকি, সে আমাদের দৃষ্টির আবিলতার জন্য। কোনো ঐতিহাসিক নেপোলিয়ানকে এঁকেছে নর-রাক্ষসরূপে—আবার কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে বসিয়েছে প্রায় দেবতার আসনে। একই মানুষ দু'জন ঐতিহাসিকের চোখে দু'রকম হয়ে দেখা দিলেন কেমন ক'রে? কারণ যিনি তাঁকে দেবতা ক'রে এঁকেছেন, তিনি নেপোলিয়নের জীবনের কতকগুলো ঘটনাকে দিয়েছেন প্রাধান্য, আবার যিনি তাঁকে পিশাচ ক'রে এঁকেছেন তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন নেপোলিয়নের জীবনের আর কতকগুলো ঘটনাকে। যেখানে পক্ষপাতিত্ববশত আমরা সত্যের একটা দিকের উপরে অত্যন্ত বেশী জোর দিতে যাই, সেখানে সত্যকে আমরা হত্যা করি। এমিল লুড্উইগও নেপোলিয়নের জীবন এঁকেছেন—কিন্তু তাঁর লিখিত জীবন-চরিতে নেপোলিয়ন দেবতারূপে প্রতিভাত হননি, পিশাচরূপেও প্রতিভাত হননি। লুড্উইগের লেখার মধ্যে আমরা পেয়েছি মানুষ-নেপোলিয়নকে; নেপোলিয়নের জীবনের ঘটনাগুলিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লেই সত্যকে তিনি বিকৃত করেন নি।

গান্ধীজীকে আমরা একদিন দেবতা বানিয়েছিলাম। তিনি যে কোনো ভুল করতে পারেন—এমন কথা আমরা বিশ্বাস করতাম না। সে ছিলো হুজুগের দিন। আজ আবার হুজুগের দিন ফিরে এসেছে। এই হুজুগে মেতে অনেক লোক আজ বলতে আরম্ভ করেছে—গান্ধীটা কিছুই নয়। বিপ্লবের আগুন নাকি তাঁর মধ্যে কিছুই নেই। বল্লভাচারী দলের মুঠোর মধ্যে গিয়ে দেশটাকে তিনি নাকি জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। একই মানুষ সম্পর্কে এমন বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা কেমন ক'রে সম্ভব? রোমা রল্যাঁর মতো মানুষ যীশুখৃষ্টের সঙ্গে যাঁকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করেছেন—যাঁকে শৌর্য্যের অবতার বলেছেন—তাঁকেই আর একদল লোক বলছে, "ওয়াদ্ধার শয়তান।" যে সব অন্ধভক্ত গান্ধীজীকে প্রায় ভগবান ক'রে তুলেছেন তাঁদের মূঢ়তা এবং যে সব নিন্দুক গান্ধীজীকে শয়তানের পর্য্যায়ে ফেলেছেন—এ'দের মূঢ়তা সমানই। আসলে গান্ধী ভগবানও নন, শয়তানও নন—তিনি মানুষ—রামা-শ্যামার চেয়ে অবশ্য অনেক অনেক উঁচু-দরের মানুষ। গান্ধীর চরিত্রে যে অনেক দুর্ব্বলতা আছে একথা গান্ধী নিজেই অকপটে বহুবার স্বীকার করেছেন। তাঁর Himalayan blunder-গুলির কথা কোথাও তো তিনি গোপন করেননি। কেউ যদি তাঁর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের ভুলগুলিকে একত্র সাজিয়ে প্রমাণ করতে চায়—গান্ধী নেতৃত্ব করবার একেবারেই উপযুক্ত নন, তিনি সত্যকে বিকৃত করবেন। যে সব ঘটনার মধ্যে গান্ধীজীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে—সেগুলির উপরে অতিরিক্ত জোর দিতে গেলে সত্যের বিকৃতি অনিবার্য। নেপোলিয়নের জীবনে যেমন ওয়াটার্লুর পরাজয়ের সঙ্গে অস্টারলিজের জয় মিশিয়ে আছে—গান্ধীজীর জীবনেও তাই। যুদ্ধ করতে নেমেছে যারা তাদের জীবনে জয় যেমন আছে—পরাজয়ও তেমনি আছে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক প্রতিভার বিচার করবো কি কেবল রাজকোটের পরাজয়ের কষ্টি পাথরে? তিনি কি দেশকে পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই দান করেন নি? সুপ্ত শৌর্য্যকে তিনি কি আপামর জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করে তোলেননি? তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে গরিমায় সমুজ্জ্বল ক'রে কি নেই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ, চম্পারণের অভিযান, ডাণ্ডীর অভিযান? মাদকদ্রব্যের উচ্ছেদসাধন, অস্পৃশ্যতার মুণ্ডপাত, কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার, ওয়ার্দ্ধা শিক্ষার পরিকল্পনা, অবরোধপ্রথার শিরচ্ছেদ এসব ঘটনাকে বর্জ্জন ক'রে কি আমরা গান্ধীর জীবনকে ভাবতে পারি? তিনি সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতির সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন, আর রাজকোটের বীরবলের কাছে হার স্বীকার করেছেন—এই দুটো ঘটনাই কি তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড়ো ঘটনা হ'য়ে দাঁড়ালো, আর এই দুটো ঘটনার কষ্টিপাথরেই কি আমরা গান্ধীর প্রতিভার বিচার করবো? তাঁর জীবনের বাকী ঘটনাগুলো এমন কি অপরাধ করলো যে, তাদের বর্জ্জন না ক'রে কোনো উপায় নেই? গান্ধীকে যারা অপদার্থ প্রমাণ করতে উৎসুক তাদের আসল গলদ হচ্ছে দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতার মধ্যে। গান্ধীর ছবি আঁকবার বেলায় নিজের খুসী মতো ঘটনাগুলিকে বেছে নিয়ে বাকীগুলোকে বর্জ্জন করবো—এই রকমের গোঁড়ামি সত্যকে কেবল অস্পষ্ট করে।

তাহ'লে সত্যের দেখা পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? দৃষ্টিকে অনাবিল করতে হবে। কারও মূল্য বিচারের বেলায় যে সব ঘটনাকে আমরা বর্জ্জন করেছিলাম—সেগুলোকে গ্রহণ করতে এবং যেগুলোকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েছিলাম—নিজের মনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—সেগুলির মূল্য কমিয়ে দিতে হবে। যে মন দিয়ে মূল্য নিরূপণ করি আমরা—সে মনও তো বিচার-বিবেচনার ঊর্দ্ধে নয়। সেই মনের মধ্যে আমাদের কত গোপন কামনা যে লুকিয়ে থাকে আর সেই কামনাগুলির জন্যই তো আমরা অপ্রিয় লোকের সোজা

চলনকেও বাঁকা ক'রে দেখে থাকি এবং কানা ছেলের চোখে পদ্মের সৌন্দর্য্যকে অবলোকন করি। ভূত যেখানে সর্ষের মধ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে ভূতকে বিতাড়িত করা রোজার অসাধ্য। যে মন দিয়ে আমরা কোনো কিছুর মূল্য বিচার করতে যাবো সেই মনের মধ্যেই যেখানে ভ্রান্তির ভূত ঢুকে ব'সে আছে—সেখানে সত্য কেমন ক'রে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হবে?

যা আমাদের কাছে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে সত্য ব'লে প্রতীয়মান হয়—তাতো সব সময়ে সত্য নয়। বর্ব্বর যুগের মানুষেরা মনে করতো পৃথিবী টেবিলের মতো সমতল—কমলালেবুর মতো গোলাকার নয়। তাদের সেই দেখার মধ্যে কত যে ভুল ছিলো—সে কথা তারা জানতো না। দুপুর বেলায় আকাশের দিকে আমরা যখন তাকাই তখন চোখে পড়ে কেবল জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য আর উলঙ্গ নীলাকাশ। সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তকে ক্ষণিকের জন্য বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দিয়ে কখন অদৃশ্য হ'য়ে যায়। অন্ধকার আকাশকে ছেয়ে ফেলে। সেই অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দল। দুপুর বেলা আকাশের যে রূপ দেখেছিলাম—সে রূপ তো আকাশের সমগ্ররূপ নয়। আলোকের তীব্রতা যেমন গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বতকে দৃষ্টির সামনে জাগিয়ে তুলেছিলো, তেমনি অগণ্য নক্ষত্রের দীপ্তিকেও চক্ষের আড়ালে রেখে দিয়েছিলো। আমরা যাকে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা মনে করি তার মধ্যেই জ্ঞানের সম্পূর্ণতা নয়। আকাশে সূর্য্য ছাড়া আরও অনেক জ্যোতিষ্ক আছে। সেই জ্যোতিষ্ক-সভার সৌন্দর্য্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে রাত্রির নিবিড় অন্ধকার।

সত্যকে আমরা যতটুকু জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দেখি—ঠিক ততটুকু জায়গার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। আকাশের অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে দেখবার জন্য যেমন রাত্রির প্রয়োজন আছে—সত্যের বিপুলতাকে উপলব্ধি করবার জন্যও তেমনি উদার দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান আমাদিগকে সত্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে ব'লে যদি গর্ব্ব করে—সে গর্ব্বের মধ্যে ফাঁকি আছে ষোল আনা। বিজ্ঞান যাকে বলছে সত্য তা সত্যের চরম নয়—বৈজ্ঞানিক সত্যের বাইরেও সত্য আছে। সত্যকে আমরা একটা বিশেষ মতবাদের মধ্যে বেঁধে রাখতে গিয়েই তো সত্য থেকে এত দূরে চলে যাই।

যুগে যুগে কত বৈজ্ঞানিকের, কত দার্শনিকের আবির্ভাব হোলো। তাঁরা কত নূতন নূতন মতবাদের জয়ধ্বজাকে উড্ডীন করলেন। সেই সব জয়ধ্বজা ক্ষণকালের জন্য সগর্ব্বে উড়ে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সহস্র সহস্র মানুষ এক-একটা নূতন মতবাদকে নিয়ে পাগলের মতো মাতামাতি আরম্ভ করেছে, সেই নূতন মতবাদের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দিকে দিকে তারা সুরু করেছে দুর্জ্জয় অভিযান। তারপর এসেছে আর একদিন। নূতন মতবাদ পুরাতন হ'য়ে গেছে মহাকালের নিঃশ্বাস তার গরিমাকে ক'রেছে ম্লান। আমরা বিজয়া দশমীর প্রতিমার মতো জীর্ণ মতবাদকে দিয়েছি বিসর্জ্জন। নূতন মতবাদ এসেছে তার বোধন-শঙ্খ বাজিয়ে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এমনি কত আদর্শের অভ্যুদয় এবং তাদের তিরোভাব ঘটলো! এই যে এক-একটা মতবাদ—এই মতবাদগুলির মধ্যে আমাদের জ্ঞানের মাত্র আংশিক প্রকাশ। খণ্ড সত্যকে নিয়ে মানুষের প্রাণ তো তৃপ্ত থাকতে পারে না। আমাদের চিত্ত চায় সত্যের সমগ্র রূপকে দর্শন করতে। নতুন মানুষ আসে মানুষের দৃষ্টির সামনে অভিনব সত্যের তোরণ-দ্বারকে উদ্ঘাটিত ক'রে। হাজার হাজার নরনারী নতুন সত্যের প্রচারককে ঋষি ব'লে অভিনন্দিত করে। চৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জয়দেব গোঁসায়ের প্রেমময় কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে যখন হারিয়ে ফেললো তার প্রাণশক্তি তখন বঙ্কিম এলেন বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতনতর ব্যাখ্যা নিয়ে। মহাভারতের সুদর্শনধারী শক্তিময় কৃষ্ণকে তরুণ ভারতের হৃদয়ে করলেন তিনি প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের তাৎপর্য্য সম্পর্কে বঙ্কিমের নূতন মতবাদ আমাদের জাতীয় জীবনে করলো নূতন অধ্যায়ের সূচনা। এমনি করেই পুরাতন মতবাদের ভগ্ন প্রতিমাকে সরিয়ে ফেলে মহাকালের চণ্ডীমণ্ডপে নূতন মতবাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পালা চলেছে যুগে যুগে। মানুষের চিত্ত এই যে যুগে যুগে নূতন আলোকের সন্ধান পাচ্ছে এই আলোকপ্রাপ্তির মূলে রয়েছে মানুষের গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বঙ্কিম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। অন্তরের সহজ অনুভূতির দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, ভারতবর্ষের নূতন ইতিহাসের গতি নির্ভর করে সাধারণ মানুষের ধর্ম্মমতের উপরে। মানুষের জীবনের উপরে ধর্ম্মের প্রভাব যে কতখানি—তা হৃদয়ঙ্গম করবার মতো দৃষ্টিশক্তি তাঁর ছিলো। তিনি দেখলেন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যাই দেশবাসীর ক্লৈব্যের জন্য দায়ী। মোহনমুরলীধারী বাঁকা কালাচাঁদকে ভজনা করতে করতেই দেশের মেরুদণ্ড বাঁকা হ'য়ে গেছে। চৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম কল্যাণের পরিবর্ত্তে জাতীয় জীবনে এনেছে অকল্যাণের ছায়া। জাতির মেরুদণ্ডকে সোজা করতে হ'লে চাই ধর্ম্মের নতুন ব্যাখ্যা। কদমতলার ত্রিভঙ্গ মুরারীকে দিয়ে ক্ষাত্রতেজে দীপ্তিমান নতুন জাতির সৃষ্টি অসম্ভব। চাই militant God. তাঁর হাতে থাকবে তূর্য্য। তিনি সারথী হ'য়ে জাতিকে পরিচালিত করবেন সংগ্রামের মধ্যে—সেনাপতি হ'য়ে দেশকে চালনা করবেন অত্যাচারীর ঔদ্ধত্যকে বাধা দেবার জন্য। বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জন্য কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করলেন নব্য ভারতের সম্মুখে। বঙ্কিমের মতো ঋষির আবির্ভাব যদি না ঘটতো বুদ্ধির আলোয় ধর্ম্মকে নূতন রূপে প্রতিভাত করবার জন্য—তবে ধর্ম্মের নামে এখনও চলতো কেবল ন্যাড়ানেড়ীর কীর্ত্তন, আর পাঁঠাবলির ধূম। বৈষ্ণবধর্ম্ম হ'য়ে থাকতো কতকগুলি কু-সংস্কারের আবর্জ্জনা-স্তূপ—ভাব নিয়ে বিলাস করবার ক্ষেত্র। যুগের পর যুগের তোরণদ্বারকে অতিক্রম ক'রে চলেছে জ্ঞানের অভিযান। এই অভিযানের কোথাও কি শেষ আছে? কোথাও গিয়ে কি শেষ হয়েছে সত্যের রাজ্যসীমা? শেষ নেই—জ্ঞানের অভিযানের শেষ নেই। জ্ঞানকে পূর্ণ

(শেষাংশ ১১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুখ

(গল্প)

শ্রীঅমিয়া সেন

দারিদ্র্যেরই কন্যা সে।

তবু দারিদ্র্য যে এত অসহ, একান্নবর্তী পরিবারের আবহাওয়ায় দারিদ্র্য যে এত বীভৎস, সংসারের প্রত্যেকটি মনের সংকীর্ণতায় দারিদ্র্য যে এত কুৎসিত, এ জ্ঞান মৃণালিনীর সত্যই ছিল না। সতের বছর বয়সে শ্বশুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মৃণালিনী প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খাইতে খাইতে দেহ-মন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল।

স্বামী বিনোদ রায় ছোট ভাইকে নিয়া কলিকাতায় মস্ত বড় বিজনেস্‌ওয়ালা ধনী কাকার বাড়ীতে দুইবেলা দুইটি অন্নের বিনিময়ে উদয়াস্ত ফাস্নাস খাটে, গালাগালি খায়, আর অবসর সময়ে চাকুরী খোঁজে।

তবু এ হেন লোকেও বিয়ে করে!

রায় পরিবারের ছেলেরা অলিখিত অতীত কাল হইতে এই অবস্থার মধ্য দিয়াই বিবাহ করিয়া চলিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পিছনে ক্রমাগত মাথা হেলাইয়া দারিদ্র্যের ঝাপটা উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তারপর কেহ কালে, কেহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তবু অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে পারে নাই। দারিদ্র্যের পোকা ওদের মস্তিষ্কটাকে জন্ম হইতেই কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিকে প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

তবু বহুজন সমৃদ্ধ রায় পরিবার বহুদিন হইতে বাঁচিয়া আছে। আশ্চর্য এই, মনোমালিন্য যতই থাক, এরা কেহ পৃথগন্ন হইবার কথা ভাবে না। এমন পরিবারের মধ্য হইতেও দুই একজন ছেলে সত্য সত্যই মানুষ হইয়া ওঠে। বিদেশে গিয়াও তারা পরিবারকে সাহায্য করে সর্ব্বদা। যেমন বিনোদ রায়ের কলিকাতার তৃতীয় খুড়ামশাই।

কিন্তু এ সাহায্যে বিশেষ কিছু লাভ হয় না, অভাব যেখানে সমুদ্র প্রমাণ, সেখানে এ সাহায্য শিশির বিন্দু তুল্য। তবু অনেকটা ইহার উপরই রায় পরিবারের জীবন নির্ভর করে।

প্রথম প্রথম মৃণালিনী বড় কাঁদিত। তারপর ধীরে ধীরে আবহাওয়া সহিয়া গেল। একান্নবর্তী পরিবারের খারাপ মনোবৃত্তিগুলি সে ক্রমে ক্রমে রপ্ত করিয়া নিল।

আবহাওয়া বা পরিবেশ তাহাকে আর পীড়া দেয় না। এক দুঃখ, স্বামীর বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ মৃণালিনীর সকল দুঃখ ছাপাইয়া উঠিত। বসিয়া আকুল আবেগে ভাবিত, যদি তার কাছে যাইতে পারিতাম, জীবনে কোন দুঃখ থাকিত না।

(২)

বিনোদ রায়ের বিদ্যা, বুদ্ধির যতই অল্পতা দোষ থাকুক, তার মস্তিষ্কের এক কোণে বিধাতা একটুখানি পরিষ্কার ব্যবসা বুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। বিজনেসওয়ালা খুড়োর সংস্পর্শে আসিয়া তার সেই একটুখানি ব্যবসা বুদ্ধি, ফোর্থ ক্লাস পড়া মাথার এক কোণ হইতে মনের মধ্যে কেবলই উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

হাজার কষ্ট সহিয়া, অনেক গালাগালি খাইয়াও সে তাই খুড়োর বাসা ছাড়িতে পারিতেছিল না। এ বিষয়ে তার ছোট ভাই বিমানের উৎসাহও ছিল প্রচুর। সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল।

চাকুরীর জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া সে বিনোদকে কহিল, আর কেন দাদা, অনেক চেষ্টা ত দেখলাম, কিছুই ত হ'ল না, এবার চল যা হয় একটু ব্যবসা ফাঁদবার চেষ্টা করি। আমাদের এই বিদ্যায় কি কলকাতায় চাকুরী পাওয়া যায়।

বিনোদ রায় চিন্তিত মুখে কহিল, "আমারও ত তাই ইচ্ছে, তবে টাকা কই?"

বিমান বলিল, খুড়োর কাছ থেকে ধার নাও।

বিনোদ রায় লোকটি একটু ভীরু প্রকৃতির, সভয়ে কহিল, 'ওরে, বাপ্‌রে, খুড়ো দেবে আমাদের টাকা ধার? হাঁকিয়ে দেবে না!'

বিমান জোর দিয়া কহিল, চেয়েই দেখ না।

—না, না। সে আমি পারব না, তুই দেখ্।

—আচ্ছা, আমিই দেখব।

—তারপর, যদি টাকা শোধ দিতে না পারি?

—তার মানেই ব্যবসা ফেল। তা', অত ভাবতে গেলে চলবে কেন! একবার মাভৈঃ বলে ঝাঁপিয়ে ত পড়ি, তারপর যা থাকে অদৃষ্টে।

বহু কষ্টে খুড়োর নিকট হইতে দুইশত টাকা ধার করিয়া দুই ভাই কাঠের ব্যবসা খুলিয়া বসিল।

(৩)

বিনোদ রায়ের ব্যবসা খোলার এক বৎসর পরে সকন্যা মৃণালিনী কলিকাতায় আসিল।

বিমান গিয়া নিয়া আসিল। হাত পুড়াইয়া রান্না করিয়া খাওয়া আর ব্যবসা করা, দুটি এক সঙ্গে চলে না।

ব্যবসার অবস্থা আশাপ্রদ। হয়ত দাঁড়াইয়া যাইবে। দুই ভাই জীবন পণ করিয়া খাটিয়া চলিতেছে। এখনও ধার শোধ হয় নাই। বিনোদ হিসাবী মানুষ, যথাসাধ্য কষ্ট করিয়াই সে চলে।

মৃণালিনী তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বামী-সান্নিধ্য লাভ করিল।

যদিও এখানেও সেই অর্থকৃচ্ছ্রতা। ডালের উপর ভাজাটুকু পড়ে না। আদরের প্রথম মেয়েটির জন্যও বিনোদ রায় এক পোয়ার বেশী দুধ বরাদ্দ করে নাই। সাবু মিশাইয়া তাহাই মৃণালিনী চারবার মেয়েকে খাওয়ায়।

সন্ধ্যার পর আর দোকান ছাড়া বাসার মধ্যে কোথাও আলো জ্বালিবার জো নাই। বিনোদ রায়ের হুকুম। কেরোসিন তেল বেশী খরচ হইবে।

সন্ধ্যার আগে ভাত খাইয়া দু'ভাই দোকানে চলিয়া যায়। নিজে খাইয়া মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া অন্ধকার ঘরে মৃণালিনী শুইয়া শুইয়া ঘুমপাড়ানী গান গায়।

এত অস্বচ্ছলতা। তবু মৃণালিনী আজ সুখী, অত্যন্ত সুখী। তার যে আর কিছু চাহিবার থাকিতে পারে, তা সে ভাবিতে পারে না।

* * * * * *

কিন্তু স্বামী-সান্নিধ্যে সুখের মোহও মৃণালিনীর ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল।

আগের মত সে আর এইভাবে জীবন যাপনে সুখ খুঁজিয়া পায় না।

এ জীবন তার কাছে অত্যন্ত হীন মনে হইতে লাগিল। কলিকাতার ঐশ্বর্য একটু একটু করিয়া তার চোখে পড়িতেছিল।

রাস্তা দিয়া তার মত কত ভদ্র মেয়েরা যখন সাজিয়া-গুজিয়া হাঁটিয়া যায়, তাহাদের বেশভূষার উজ্জ্বলতা ও মনোহারিত্ব বিদ্যুতের মত মৃণালিনী চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। মনের মধ্যে সে অত্যন্ত অতৃপ্তি অনুভব করিতে থাকে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই যখন চারিপাশের বাড়ীতে বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোর সমারোহ লাগিয়া যায়, নিজের ঘরের অন্ধকার গৃহতল তখন মৃণালিনীর নিকট প্রেত লোকের বীভৎসতার মত কুৎসিত লাগিতে থাকে।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে তাহাদের দোকান হইতে না আসা পর্যন্ত ঘরে একটি হ্যারিকেন জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিল। এবং ভাত খাওয়ার সময় চয়াটা হইতে নরটায় পরিবর্তিত করিয়া ফেলিল। মনের অতৃপ্তি কিন্তু এইটুকুতেই ঘুচিল না।

(২)

পর পর চার কন্যার পর মৃণালিনী যখন প্রথম পুত্র রতনের মা হইল, বিনোদ রায়ের সৌভাগ্য-সূর্য্য তখন মধ্য-গগনে।

ভবানীপুরের সেই ছোট দুখানি ঘরওয়ালা বাসা তারা কবে ছাড়িয়া আসিয়াছে। তারপর আরও দু'বার বাসা বদল করিয়া তারা এখন কলেজ ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা ভাড়া করিয়া আছে।

বিমানের ইতিমধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

দুইটি ছেলেও হইয়াছে।

সংসারে এখন মৃণালিনীই সর্ব্বেসর্ব্বা। মাত্র অফিসিয়াল ক্যাশ ছাড়া লাভের সমস্ত টাকা তার হাতে আসিয়া পড়ে।

টাকার বিলি-ব্যবস্থাও হয় তার ইচ্ছানুযায়ী।

চারি মেয়ের নামে বিবাহ-বীমা, বিনোদ রায়ের নামে জীবন-বীমা, তার নিজের নামে মেয়াদী-বীমা, সবই মৃণালিনীর নির্দ্দেশ অনুসারে হইয়াছে।

তা ছাড়া ব্যাঙ্কেও মোটা টাকা জমিয়াছে। কিন্তু বিমানের, তার স্ত্রীর অথবা তার ছেলেদের কাহারও নামে একটি টাকা কোথাও মৃণালিনী ফেলিয়া রাখে নাই। একখানা পোষ্টকার্ডের দরকার হইলেও বিমান আসিয়া মৃণালিনীর নিকট হাত পাতে।

বিমানের স্ত্রী অনীতার কিন্তু এতটা সহ্য হয় না, মাঝে মাঝে সে স্বামীকে কিছু বলিতেও চায় কিন্তু বিমান তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করাইয়া দেয়। বৌদির কপাল জোরেই যে তাহাদের এতটা উন্নতি, সে কথা সে অনীতাকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। অনীতা গরীবের ঘরের মেয়ে, রূপ দেখিয়া বিনোদ তাহাকে পছন্দ করিয়া আনিয়াছে। মৃণালিনীর কিন্তু ইহাতে একটুও মত ছিল না। রূপে এ সংসারে তাহাকে কেহ ছাড়াইয়া যায়, এ ইচ্ছা তার ছিল না; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এই একটি জায়গায় তার ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়াছে। সে ব্যর্থতার জ্বালা অনীতার প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহারে মাঝে মাঝে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করে।

রতনের অন্নারম্ভের পূর্ব্বদিন মৃণালিনী ছেলে কোলে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটি মায়ের মতই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু সেই সঙ্গে মায়ের চেহারার লালিত্য ও মনোহারিত্বটুকুও পাইয়াছে।

বিনোদ রায় খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া একবার ছেলের, একবার ছেলের মায়ের দিকে চাহিল।

অর্থের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে ওদের যৌবনও ফিরিয়া আসিয়াছে।

মৃণালিনী ঘাড় হেলাইয়া একটু মধুর হাসিল। তারপরে কহিল, তারপর, কাল রতনের ভাতে রতনকে তুমি কি দিচ্ছ?

বিনোদ রায় একটু বিব্রত হইল, এ সব সামাজিক ব্যাপারে সে একেবারে আনাড়ী।

মৃণালিনীই বোঝে ভাল। তার নির্দ্দেশ অনুসারেই সংসার চলে।

মাথা চুলকাইয়া কহিল, তা তুমি বল—

মৃণালিনী একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল।

বিনোদ রায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাস্যময়ীর মুখের প্রতি চাহিল।

মৃণালিনী কহিল, আমি বলে দেব, তবে তুমি দেবে! বেশ কথা। তা হলে আমি কি বলি শোন—

একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া মৃণালিনী স্বামীর কাছে বসিল।

বসিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দগতিতে বলিল, বিজনেসটা রতনের নামে রেজেষ্ট্রী কর।

বিনোদ রায় খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া তার মুখের পানে চাহিয়াই রহিল।

মৃণালিনী মুচকি হাসিয়া কহিল, ওকি কথা কইছ না যে?

বিনোদ রায় থতমত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, কি যে বল তুমি, তা কি কখনো হয়।

বিজনেস আমাদের দু'ভাইয়ের নামে, তা আমি কি করে রতনের নামে—

অপরূপ ভঙ্গীতে চোখ নাচাইয়া মৃণালিনী কহিল, কেন পারবে না, নিশ্চয় পারবে। ঠাকুরপো কখনো তোমার উপর কথা কইবে না।

বিনোদ রায় চুপ করিয়া রহিল। বিমান যে তার উপর কোন কথা কহিবে না, তা তার চেয়ে ভাল কে জানে! কিন্তু তার সেই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সুযোগ লইয়া সে বড় ভাই হইয়া তাহাকে এত বড় বঞ্চনা করিবে?

কিন্তু মৃণালিনীর ইচ্ছার জয় সর্ব্বত্র। তবু তার তৃপ্তি নাই. সেই অতৃপ্তি ঘুচাইবার জন্য বিনোদ রায়ের অকরণীয়ও কিছু থাকে না।

মৃণালিনীর এক বছরের শিশু পুত্রের নামে কারবার যথারীতি রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল।

বিমান মুখে সত্যই কিছু বলিল না, মনে কিছু ভাবিল কি না কে জানে!

(৫)

টাকা হাতে অনেক জমিয়াছে।

মৃণালিনী বলিল, এবার একখানা বাড়ী না করলে চলে না।

কলিকাতার সমাজে বাড়ী না করিলে প্রতিষ্ঠা নাই, একথা মৃণালিনীও বোঝে।

বালীগঞ্জে বিস্তীর্ণ জমি কেনা হইল। প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা উঠিতে লাগিল।

বিনোদ রায় বিমানকে ডাকিয়া বলিলেন, বাড়ী রেজেষ্ট্রীর কি হবে?

বিমান বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে?

—এই মানে, কার নামে,—তা তোর নামেই করি কেমন?

বিমান কহিল, আমার নামে! তা কেন, তুমি থাকতে আমার নামে—

বিনোদ রায় কহিল, তা অত হ্যাঙ্গামে কি কাজ, তোর বৌদির নামে করে ফেলি, কি বলিস?

বিমান মিনিট কয়েক নিঃশব্দে তার মুখপানে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। তারপর মাথাটিকে সম্মতির ইঙ্গিতে ঈষৎ হেলাইয়া নিঃশব্দেই সেখান হইতে চলিয়া গেল। বাড়ী উঠিল।

মৃণালিনী রাজেন্দ্রাণীর মত গর্ব্বিত ভঙ্গিমায় নূতন গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল।

সুন্দর বাড়ী—সুন্দর এর প্রত্যেকটি কক্ষ, প্রত্যেকটি বারান্দা।

সামনে নাতিপ্রশস্ত খালি জমি, চারিপাশে রেলিং দিয়া ঘেরা। সেখানে বিমান টবে করিয়া কৃত্রিম বাগান তৈরী করাইয়াছে। একপাশে কৃত্রিম ছোট পাহাড়।

বাড়ীর প্ল্যান বিমানের। বাড়ীর পিছনে সে প্রাণপণে খাটিয়াছে। বাড়ীর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিষটুকুর সৌন্দর্য্য বিধানের দিকেও তার সজাগ দৃষ্টি সর্ব্বদা পাহারা দিয়াছে।

চারিদিক দেখিয়া মৃণালিনীর বুক যখন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তখন বাড়ীর সৌন্দর্য্যের জন্য তার মনে বিমানের কথাটা এইভাবে জাগিল, কেন খাটিবে না! খাটাই ত তার উচিত। ঘরে বেগার লোক থাকিতে এজন্য ত আর কেহ পয়সা খরচ করিয়া লোক রাখে না।

কারবারে বর্ত্তমানে বিমানের খাটুনী যে বিনোদ রায়ের চেয়ে বহুগুণে বেশী, বেগার যে সে সত্যই নয়, সে কথাটা মৃণালিনীও জানে। বাড়ী দেখিয়া আনন্দে সে হয়ত কথাটা ভুলিয়া যাইয়া থাকিবে। যদিও এরকম ভুলই তার আজকাল বেশী হয়।

(৬)

বাড়ী আসার দুমাস পরেই মৃণালিনী মোটর কিনিল। রেডিও ফিট করার আয়োজনও চলিতেছিল।

মৃণালিনীর মন আজকাল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলে না। আকাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়।

এক এক সময়ে সে রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবে, বিধাতা এত সুখও তার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়।

এ সমস্তই যে তার অদৃষ্টের প্রাপ্য ছিল। এ প্রাপ্য তাহাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে হইবে, এই কথাটিই তার মনে প্রবল হইয়া জাগিয়া ওঠে।

বিশাল বাড়ীর এককোণে ছেলে দুটিকে নিয়া অনীতা পড়িয়া থাকে চোরের মত। বাড়ীর উৎসবাদির সঙ্গে তার যোগ নাই। মৃণালিনী তাহাকে সযত্নে এড়াইয়া চলে।

তার গল্পের মজলিস, (মৃণালিনী এখন অভিজাত সমাজের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নারী। তার অবিদ্যার দোষ তার অর্থগৌরবে ঢাকিয়া গিয়াছে)। তার নিমন্ত্রণ পার্টি—তার আনন্দ সভায় অনীতার স্থান নাই। দৈবাৎ যদি দু'একজন সহৃদয় কেহ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তার অপরূপ রূপরাশির জন্য সহসা তার প্রতি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মৃণালিনী তৎক্ষণাৎ অনীতার এমন পরিচয় দেয়, যা শুনিয়া আগ্রহান্বিতার মনে আর রূপবতীর জন্য একতিল আগ্রহও অবশিষ্ট থাকে না। মনে মনে ভাবে, ওমা, এমন!

মৃণালিনী মজলিস জাঁকাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে বলে, একেই বলে অদৃষ্ট! জগৎ শুদ্ধ লোকের ভালবাসা পেলাম, পেলাম না আপন জা'র। মার পেটের বোনের চেয়ে যাকে কম দেখি না। আপনারা কতদূর থেকে ছুটে আসেন এখানে, আর ও আমার ঘরের লোক হয়ে আমার ছায়া মাড়ায় না, এক রূপের গর্ব্বেই ও ধরাকে সরাজ্ঞান করে। তবুও ত আমি হেন লোক দেখে আজো ওকে ঠেলতে পারিনে। আশা করে আছি, দিদি যে ওকে কত ভালবাসে, একদিন বুঝবেই।

একটি টিকটিকি ঘরের কোন কোণে যেন টিক্ টিক্ শব্দ করিল। মৃণালিনী হাসিয়া হাসিয়া প্রতিধ্বনি করিল, একদিন বুঝবেই।

মৃণালিনীর অন্তরঙ্গ জনৈকা বলেন, আজকাল শুধু রূপ থাকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না, তাই রূপা চাই—মোটা রকম রূপো।

মৃণালিনী পরম আনন্দে হাসিয়া বলে, সে কথা আপনারাই বলুন, এ কথা ত আর আমি বলতে পারিনে।

অনীতা সব শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়। বিমানকে রাত্রে জিজ্ঞাসা করে, এসব কি শুনি, তুমি কারবারের অংশীদার নও?

বিমান চমকিয়া বলে, নিশ্চয়ই, কেন বল ত?

অনীতা সব খুলিয়া বলে। এতদিন পরে বিমানের অবিচল বিশ্বাস সহসা শিথিল হইয়া আসে। সন্দেহের

নিরপেক্ষ সমালোচকই স্বীকার করিবেন। অবস্থা যদি এইরূপই হয়, তবে জনসাধারণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ অহিংসা আশা করা যাইতে পারে না এবং মহাত্মাজী ও কংগ্রেস যদি চান জনসাধারণ সম্পূর্ণ অহিংস না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ গণ-আন্দোলন আরম্ভ করাই সম্ভব হইবে না, তাহা হইলে স্বভাবতই জাতীয় আন্দোলন এখন যেরূপ অচল অবস্থায় আছে সেইরূপই তাহাকে চিরকাল জড়বৎ বসিয়া থাকিতে হইবে। দেশবাসী তাহা সমর্থন করিবে কি না তাহাই বিবেচ্য।

যদি সমর্থন করে তাহা হইলে কংগ্রেসকর্ম্মীদের অতীতের সমস্ত স্বার্থত্যাগ ও নির্যাতনভোগ বিফল হইয়া যায় এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আশাও পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা কখনই সমীচীন নহে। অতএব, কংগ্রেস অহিংস নীতিকে মহাত্মাজী যে উচ্চ আদর্শবাদের উপর এখন স্থাপন করিয়াছেন —যাহা মহাত্মাজী স্বয়ং এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বাঙ্গোপাঙ্গরা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না—তাহা জনসাধারণের সহজলভ্যরূপে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন, যাহার অনুসরণ জনসাধারণের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। কেন-না, যে-আদর্শ এত উচ্চ যে জনসাধারণ কোনদিনই তাহা গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে পারে না, সেই আদর্শের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য জনসাধারণ বড় বেশী দেয় না। তাহা ছাড়া, কংগ্রেস সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—যাহার উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা মাত্র, কোন ধর্ম্মনীতির জন্য তাহার এতটা বাড়াবাড়ি করিবারও কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি কংগ্রেস কোন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান হইত, তবে সেই বিশেষ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নীতি ও লক্ষ্য হিসাবে অহিংসার একটা যথাযোগ্য স্থান থাকিতে পারিত। বিশেষ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান এই জন্য বলিতেছি যে, ভারতে বর্ত্তমানে যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে আমাদের জ্ঞানানুসারে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই অহিংসার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেয় না। তাহা ভাল কি মন্দ তাহা বলিতেছি না, যাহা প্রচলিত আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। সুতরাং কংগ্রেস যখন অহিংসাম্‌অবলম্বী কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত নহে, তখন অহিংসা ধর্ম্মের উপর তাহার এতটা অনুরাগের যুক্তিযুক্ততাও স্বীকার করা যায় না। স্বাভাবিক মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধি ইহাই বলে যে, নিরস্ত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অহিংসাকে নীতি বা 'পলিসি' (Policy) রূপে অবলম্বন করিবার বর্ত্তমানে কতকটা প্রয়োজনীয়তা হয়ত থাকিলেও কোন কংগ্রেস সভ্যের পক্ষে মনে-প্রাণে অহিংসাসেবী হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা বিশেষ নাই। মনে রাখিতে হইবে অহিংসা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কোন বিশেষ সাধনপথ অবলম্বনে যে যতটা উন্নত সে ততটা অহিংস, অহিংসার শেষ পরিণতি বক্ষোপলব্ধিতে বা ব্রহ্মোপলব্ধিতেই ইহার চরম উৎকর্ষ। সেই অবস্থার দিকে সাধক যতই অগ্রসর হয় ততই তাহার সংগ্রামস্পৃহা কমিয়া যায় এবং যখন শেষ ধাপে উপনীত হয়, তখন সাধকের সমস্ত কর্ম্মশীলতাই চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। সুতরাং যে ধর্ম্মনীতির স্বাভাবিক ক্রমপরিণতি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার দিকে তাহা কখনই কংগ্রেসের মত কোন সংগ্রামশীল রাজনৈতিক দলের ক্রীড (creed) হইতে পারে না। হইলে—জাতীয় আন্দোলন ব্যর্থ হইবে এবং স্বাধীনতা লাভের আশাও অতি দূরে সরিয়া যাইবে।

মহাত্মাজী যে অহিংসা নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সাধনমার্গরূপে তাহার নির্দ্দেশ প্রাচীন যোগশাস্ত্র এবং বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে আছে। কিরূপে ইহা আচরিত হইবে এবং ইহার পরিণতিও কোথায় দাঁড়াইবে তাহাও ঐ সকল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত সাধনমার্গের ক্রমোন্নত সাধকদের লক্ষণসমূহের সহিত মিলাইয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় মহাত্মাজী ধীরে ধীরে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অহিংসার সূক্ষ্ম ও উচ্চতর সোপানের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়কে অধিকারী বিচার না করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া তিনি ইহাকে যেরূপ দুর্ব্বোধ্য ও সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য করিয়া ফেলিতেছেন এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের দিক দিয়া তাহার পরিণতিও কোন্ দিকে যাইতেছে—ভারতীয় যোগ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রের দিক দিয়া তাহা ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(১৫)

পরদিন হলধরবাবুর ঘুম ভাঙিল একেবারে বেলা দশটায়।

তিনি মাথায় চিনচিনে বেদনা বোধ করিতেছিলেন, চোখ দুটো লাল, মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ।

প্রকাশের ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে রায় বাহাদুর ডাকিলেন, উদ্ধাম একটা বড় পেগ। রাত্রের খোঁয়ারি ভাঙিবার জন্য আজকাল রোজই সকালে তাঁর দরকার হয় একটা বড় পেগ হুইস্কির।

প্রকাশ খবরের কাগজ পড়িতেছিল, হলধর তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গিছলে সেই চোরের কাছে?

প্রকাশ বলিল, ঘটকর্পর মশাইর কথা বলছ? তিনি ত চোর নন।

অলরাইট, তুমি এনকোয়ারী করতে গিয়ে বুঝি এই আবিষ্কার করলে

প্রকাশ কহিল, ঘটকর্পর যে চোর নন একথা জোর করে বলতে পারি।

হেঃ হেঃ বই চোরকে তুমি সাধু মনে করতে পার। পেন্যাল-কোড কিন্তু অন্য কথা বলে।

এই সময় উদ্ধাম বোতল ও গেলাস লইয়া ঘরে ঢুকিল।

প্রকাশ বলিল, তিনি তোমার পাণ্ডুলিপি সরল বিশ্বাসেই কিনেছেন।

অল বস্। সরল বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে কোন ডিফেন্সই হতে পারে না।

ঘটকর্পর এর জন্য বিশেষ দুঃখিত।

হলধর শ্লেষপূর্ণ স্বরে কহিলেন, অতএব আমিও বাধিত হয়েছি।

একটু পরে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, এ সম্বন্ধে তুমি কি করতে চাও।

মামলা করতে চাই, আমার বিশ্বাস শুধু এই চুরি নয়, পরের লেখাও চুরি করে সে নিজের নামে চালায়।

প্রকাশ কহিল, তুমি তার উপর অবিচার করছ দাদু। সরল বিশ্বাসে কখানা বই কিনেছেন বলে।

হলধর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, কখানা বই? তার মানে? তিনিই বুঝি এখান থেকে সমস্ত পুঁথি সরিয়েছেন? যা অনুমান করেছিলাম তাই দেখছি ঠিক। ঘটকর্পর ইজ এ ডাইনরাইট রোগ।

উদয়রাম দেখিল প্রেমিকার পিতার সম্বন্ধে মাতামহের এই অপমানজনক উক্তি শুনিয়া প্রকাশ রাগে ফুলিয়া উঠিতেছে।

সে প্রকাশকে সংযত হইতে ইঙ্গিত করিল।

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূস্বামীর ভাগ্য-বিপর্যয়ও কি তার কাছে আছে?

প্রকাশ বলিল, হ্যাঁ সেখানাও কে যেন তার কাছে বেচেছে।

হলধর বলিয়া উঠিলেন, মাই জুয়েল অব ঘটকর্পর। তারপর একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তার জন্য এত ওকালতী করছ কেন, প্রকাশ?

তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

তোমার যখন তার উপর এত শ্রদ্ধা তখন এ-ভার আজ থেকে আমিই নিলাম।

ক্ষমা কর দাদু, আমার উপর সব ছেড়ে দাও, যা হয় আমিই করব।

তোমার দ্বারা অসম্ভব।

জীবনে আর কোন অনুরোধ তোমায় করব না, কিন্তু একটা -

ঘটকর্পর দেখছি তোমার বিশেষ অন্তরঙ্গ। বেশ, তোমার উপরই ভার দিলাম, কিন্তু আমি যা' চাই তাকে দিয়ে তাই করাতে হবে। বলিয়াই তিনি আঙুলের কর গুনিতে আরম্ভ করিলেন, নম্বর ওয়ান আমার পুঁথিগুলি সব ফেরত দিতে হবে, নম্বর টু কাগজে স্বীকারোক্তি করতে হবে যে সমাজ-দর্পণ প্রবন্ধ আমার সৌজন্যে প্রকাশিত। নম্বর থ্রী কাগজে কাগজে সে ত্রুটি স্বীকার করবে। আর লাষ্ট যার কাছ থেকে পুঁথিগুলি কিনেছে তাকে ধরিয়ে দেবে।

প্রকাশ বলিল, দুই নম্বর অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে ত্রুটি স্বীকারের কি আর কোন প্রয়োজন আছে? তারপর যার কাছ থেকে ঘটকর্পর কিনেছেন—

রায় বাহাদুর কহিলেন, এই-ই আমার শেষ কথা। তুমি ভিতরে না থাকলে আমি তাকে জেলে দিতাম। যেটুকু অনুগ্রহ করেছি সে শুধু তোমার খাতিরে।

প্রকাশ তার অনুগ্রহের গভীরতা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না।

রায় বাহাদুর ডাকিলেন, উদ্ধাম, বারগান্ডি।

(১৬)

ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, বাহুমূলে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, দোদুল্যমান শিখায় বাঁধা অপরাজিতা ফুল, পরিধানে শাদা গরদ, গায়ে ভৃগুলাঞ্ছিত নামাবলী—এ-হেন বেশে রানবাঞ্চা ভৃগুলাঞ্ছন রায় হলধর চট্টোপাধ্যায়ের মোটর হইতে অবতরণ করিলেন।

প্রকাশ আগাইয়া আসিয়া ভক্তিভরে তাঁর পদধূলি লইল।

জ্যোতির্বীর ওষ্ঠপ্রান্তে সেই শাশ্বত হাসি। তিনি কহিলেন, কল্যাণমস্তু, ব্যাপার কি প্রকাশবাবু?

ব্যাপার গুরুতর।

ভৃগুলাঞ্ছন প্রকাশের মুখের দিকে চাহিলেন।

ঝড় উঠেছে, ঠাকুর মশাই।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার পিতা ত আপনাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন।

তা দেখেন বটে, তিনি খুব মহাশয় লোক।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, শ্রদ্ধেয়া দাক্ষায়ণী দেবীর মত পরিবর্তনের জন্যে পরাশর মতে পুরশ্চারণ করছি। সুফল সুনিশ্চিত। আর সেই ব্যারিষ্টার পুঙ্গবের নাম ত অতনু রায়?

হ্যাঁ।

পুরশ্চরণে অতনুর নামও প্রয়োজন হয়েছে কিনা।

প্রকাশ বলিল, এবার ঝড় উঠেছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

আমার মাতামহের দিক থেকে।

তিনি ত' খুব স্নেহপ্রবণ।

স্নেহপ্রবণ নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি মনে করেন দেবেনবাবু একজন—

কি মনে করেন? ইতস্তত করছেন কেন?

মনে করেন দেবেনবাবু অসাধু, এক এক কথায় বলতে গেলে চোর।

দেবেনবাবু তস্কর? কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার বাবা তস্কর? অসম্ভব।

হ্যাঁ, অসম্ভব তা' আমি জানি। কিন্তু দাদাবাবু ভীষণ রেগে গেছে—বলিয়া প্রকাশ জ্যোতিষীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিল।

সব কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া রামবাঞ্ছা কহিলেন, এই কথা! এ ত জলবত্তরলং।

আপনি এটা সহজ মনে করলেন?

কেন নয়? রায় বাহাদুরকে সব কথা খুলে বললেই তিনি শান্ত হবেন।

কি খুলে বলব?

দেবেনবাবু না জেনে পুঁথি কিনেছেন।

তা' বলেছি এবং জানিয়েছি যে দেবেনবাবু এর জন্য আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু তাতেও আমার মাতামহ খুশী হননি। তিনি চান প্রকাশিত প্রবন্ধটির জন্য দেবেনবাবু খবরের কাগজের মারফৎ তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন, অপরাধীর নাম বলবেন, বইগুলি ফিরিয়ে দেবেন।

দেবেনবাবু কি বলেন?

বই ফিরিয়ে দিতে রাজী আছেন কিন্তু ক্ষমা চাইতে এবং উদয়ের নাম প্রকাশ করতে তিনি অসম্মত।

নাম প্রকাশ করতে অসম্মত কেন?

উদয়রাম আমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে, তাই আমিও তার নাম জানাতে নিষেধ করেছি। তা' ছাড়া তিনি একজন লোকের অন্ন মারতে প্রস্তুত নন।

ভৃগুলোচন একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা হলে একটি মাত্র পন্থা আছে। আপনার মাতামহকে বলুন যে প্রতিমাকে আপনি ভালবাসেন।

আপনি দাদাবাবুকে চেনেন না। দেবেনবাবুর মেয়েকে ভালবাসি শুনলে তিনি আমায়ও ক্ষমা করবেন না।

ভৃগুলোচন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, তা' হলে দেখছি লামাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এখানে লামা পাবেন কোথায়?

তিব্বতী শাস্ত্র অর্থে আমি লামা শব্দ ব্যবহার করেছি।

সে শাস্ত্রে কি বলে?

বলে খট্টাশী ধারণের কথা।

খাটাশ ধারণ?

কস্তুরীর মতন একটা পদার্থ। আপনার মাতামহের গলায় সোনার মাদুলীতে ভরে খট্টাশী পরিয়ে দিলে তিনি মত পরিবর্ত্তন করবেন।

চৌর্য্যে চ খট্টাশী। প্রেমের অনুকূল পদার্থ।

আমার মাতামহকে মাদুলীধারণ করান ত দূরের কথা কবচ তাবিজের নাম শুনলেই তিনি রেগে যান।

তা হলে আর মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের মূল্য কি?

কিন্তু ধারণ করাতে পারলে তবেত' দ্রব্যগুণ।

গভীর রাত্রে আপনি তাঁর কণ্ঠদেশে পরিয়ে দেবেন। পাঁচ মিনিট থাকলেই কার্যসিদ্ধি।

বেশ তা' নয় করলাম। কিন্তু প্রতিমার মতটা একবার জানতে চেষ্টা করলে হয় না?

শ্রীমতীর মনোভাব, সে ত' নিহিতং গুহায়াং।

কি নিহিত?

স্ত্রীণাং চরিত্রং। তবে হোড়া দর্পণ মতে খটিকাপাত করলে স্ত্রী-চরিত্রও জ্যোতিষীর কাছে সুগম হয়ে যায়।

বেশ খটিকাপাত করুন।

ভৃগুলোচন খট্টাশীর মাদুলী প্রস্তুত ও খটিকাপাতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তারপর বলিলেন, এখন চরের প্রয়োজন।

চর কিসের জন্য?

চরশ্চর্য্যেং বন্ধু কৃতাং। কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমা ও তার গর্ভধারিণীর মত জানবার জন্য।

প্রতিমার মত জানতে পারে আমার বন্ধু ক্ষিতীশের বোন দীপা। তার সঙ্গে প্রতিমার খুব ভাব। কিন্তু তার মার মতামত—সে অসম্ভব।

জানি সে কঠিন ঠাঁই। আচ্ছা দেবেনবাবুর মতামত দ্বারা তাঁর স্ত্রীর মতামত কি মোটেই গঠিত হয় না?

হয়। দেবেনবাবু যাকে শাদা বলেন, দাক্ষায়ণী ধরে নেন সেটা কালো। দেবেনবাবু যেহেতু আমাকে পছন্দ করেন, সেই কারণেই দাক্ষায়ণী আমাকে অপছন্দ করবেন।

তা হলে ত' সুখী দম্পতি বলতে হবে।

ভৃগুলোচনের সহিত নিজের ভাগ্যালোচনায় প্রকাশ এতই নিবিষ্টচিত্ত ছিল যে, দেবেনবাবু যে দরজায় দাঁড়াইয়া তাহা পর্যন্ত লক্ষ্য করে নাই।

তিনি ডাকিলেন, প্রকাশ।

প্রকাশ শশব্যস্তে তাঁর দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিল,— আসুন, আপনি এখানে?

তুমি বোধ হয় আমাকে দেখে বিস্মিত হচ্ছ?

না, না—

হবারই কথা, হলধরবাবু আমার উপর যে ধারণা পোষণ করেন তাতে—

প্রকাশ বলিল, আপনি বসুন, আপনার পায়ের ধুলো পড়ায়—

দেবেনবাবু বলিলেন, এলাম রায় বাহাদুরের সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা করতে।

প্রকাশ মনে মনে ভাবিল, ভাগ্যিস তিনি অনুপস্থিত। সে কহিল, তিনি ত' গেছেন ডায়মণ্ডহারবার। অল রায় বাহাদুর ডে'র উৎসবে।

স্বাধীনতা ডে, জালিনওয়ালাবাগ ডে, এই সব ত' জানতাম। রায় বাহাদুর ডেটা আবার কি জিনিস?

রায় বাহাদুরদের উৎসবের দিন। সঙ্গে সঙ্গে ঐদিনে তাঁরা কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করেন, যেমন ধরুন তাঁদের মতন সরকারের অনুগত সেবকদের পুত্র-পৌত্রাদির চাকুরীর ব্যবস্থা করা হোক, রায় বাহাদুরদের মর্য্যাদা হোক সি-আই-ইর সমান।

দেবেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, মানুষের পাগলামীর আর অন্ত নেই।

প্রকাশ তাঁর সঙ্গে ভৃগুলাঞ্ছনের আলাপ করাইয়া দিল, ইনি হচ্ছেন পণ্ডিত রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন আর ইনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল; সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক।

দেবেনবাবু পাদপূরণ করিলেন, এবং গবেষক।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, একটু আগেই প্রকাশবাবু আপনার কথা বলছিলেন।

দেবেনবাবু বলিলেন, বয়সের পার্থক্য থাকলেও আমাদের বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ়।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, উনি আপনার রচনার খুব পক্ষপাতী।

দেবেনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, প্রকাশ চিন্তাশীল লোক।

প্রকাশ বলিল, ভৃগুলাঞ্ছন মশাইর জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়। ইনি তিব্বতী, নেপালী, কাবুলী, ভৃগু সকল মতেই পারদর্শী।

ওঃ, তাই উনি ভৃগুলাঞ্ছন! সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আপনার কোন বিষয়ে অধিকার বেশী—গণিত না ফলিত?

আমি ভগবান ভৃগুকে স্মরণ করে তিব্বতী মতে বিচার করি।

বাঃ বেশ। কাবুলী দাওয়াইর কথা শুনেছি, কাবুলী জ্যোতিষটা কি রকম?

আখরোটের উপর অঙ্ক পাত করতে হয়।

আপনি করবেখা বিচার করেন?

হাঁ।

দেবেনবাবু তার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন দয়া করে দেখুন।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, কি করব, আয়ু না ধন বিচার: আপনি দীর্ঘায়ু।

আয়ু আমি চাই না।

আপনি ধনিক।

নিজে আমি বিত্তশালী নই।

আপনাকে ত' ভাগ্যধরই মনে হচ্ছে।

ভাগ্যের কথা ছেড়ে দিন, দেখুন স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা বিচারের জন্য এক আধখানা হাত দেখে কিছু বলা যায় না। তবে গান্ধীজী, দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয়ের মত স্বদেশগত প্রাণ লোকের হাত দেখলে হয়ত বলা চলে আমাদের হতভাগিনী মাতৃভূমির স্বাধীনতা আসতে বিলম্ব কত।

যাহা বলিতে চানু তাহা প্রকাশ করিতে দেবেনবাবুর সঙ্কোচবোধ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, আমি বলছিলাম ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা।

রামবাঞ্ছা বলিলেন, ওটা একটা ভুয়া জিনিষ, পত্রিকায় দেখেছি স্বাধীনদেশেও সাধারণের কোন স্বাধীনতা নেই।

আমি বলছিলাম পারিবারিক স্বাধীনতার কথা।

ভৃগুলাঞ্ছন দেবেনবাবুর হাত একত্র করিয়া একবার খুলিলেন, একবার ভাঁজ করিলেন তিন চারবার এইরূপ প্রক্রিয়ার পর কহিলেন, আপনি প্রেম নিগড়ে বন্ধ গভীর ভাবে।

চিরসংযমী দেবেনবাবুর মুখ দিয়াও বাহির হইল, ড্যাম, ইট, পর মুহূর্ত্তেই তিনি ক্ষমা চাহিলেন, বড় অশোভন হয়েছে। আমার বন্ধনটা খুব কঠোর কিনা।

কর্তৃপক্ষের নিকট ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বরাজ প্রাপ্তির তারিখ যেমন কিছুতেই আদায় করা যায় না, ভৃগুলাঞ্ছনের নিকটও দেবেনবাবু নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না।

হাত দেখা শেষ হইলে দেবেনবাবু বলিলেন আপনি যখন প্রকাশের বন্ধু তখন নিশ্চয়ই সাহিত্যের প্রতি আপনার প্রীতি আছে।

ভৃগুলাঞ্ছনের সব চেয়ে অভাব ছিল ঐ বস্তুটির; কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, বাঙালী মাত্রেই বাঙলা ভাষাকে ভালবাসে, এটা তার গৌরবের বস্তু, কবি বলেছেন,

আমরি বাঙলা ভাষা
মোদের গরব, মোদের আশা

দেবেনবাবু বলিলেন, দয়া করে তা' হলে একটা লেখা শুনুন।

ভৃগুলাঞ্ছন কহিলেন, সানন্দে।

আধঘন্টা ধরিয়া দেবেনবাবু ইংরেজী, বাঙলা কোটেশন বহুল একটা রচনা পাঠ করিলে ভৃগুলাঞ্ছন মত প্রকাশ করিলেন, অতি প্রাঞ্জল আপনার রচনা, যেমন মধুর উদাত্ত কণ্ঠস্বর তেমনি নটজনোচিত আবৃত্তি। মনে হয় গো-মুখী থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্ছেন।

দেবেনবাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, তা হ'লে আর একটা পড়ি! তোমার কেমন লাগল, প্রকাশ?

প্রকাশ বলিল, বেশ।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি সে মোটেই আনন্দলাভ করিতে পারে না। প্রবন্ধটা হংসেশ্বরের সাহিত্য প্রতিভা অবলম্বনে রচিত। প্রকাশের মনে হইল ইহা লইয়াই আবার একটা নূতন গোলমালের সৃষ্টি হইবে।

দেবেনবাবু বলিলেন, শোন তবে আমার একটা বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা। এটা হচ্ছে চিন্তাধারা নম্বর সাত।

আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে না ত, ঠাকুর মশাই?

রামবাঞ্ছা একটু হাসিয়া বলিলেন, কিঞ্চিদপি ন।

দেবেনবাবু ভূমিকা করিলেন, মাঝে মাঝে আমি চুপ করে বসে ভাবি আর যা মনে আসে লিখে যাই। এইগুলির নাম-

(শেষাংশ ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চাকমা জাতির একটি কবিতা

শ্রীবিপুলেশ্বর দেওয়ান

উপরিলিখিত নাম দেখিয়া হয়ত অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ইহা কোন্ দেশীয় কবিতা। এইজন্য ইহার সামান্য পরিচয় দেওয়ার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই কবিতাটি যদিও 'বাঙালী জাতির একটি কবিতা' না হইয়া একটা ভিন্ন জাতির নামের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বস্তুতঃ ইহা বঙ্গদেশের এক নিভৃত শ্যাম বনানীর অধিবাসীদেরই ভাষা, যাহাদের মাতৃভাষাও বাঙলাই। বঙ্গদেশে বিভিন্ন জিলায় বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত কবিতাটি চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের শ্যাম বনানীর নিভৃত নিকুঞ্জের অধিবাসী চাক্মা জাতির প্রচলিত লোক-সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। এই অঞ্চলে যে সমস্ত পাহাড়িয়া জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে চাক্মা জাতিই শিক্ষা ও সভ্যতায় অগ্রগণ্য। ইহাদের মাতৃভাষা যদিও পুরোপুরি বাঙলা নয়, তথাপি ইহাকে অপভ্রংশ বাঙলা বলা যাইতে পারে। ইহাদের লিখিবার বা পড়িবার ভাষা পরিপূর্ণ বাঙলা। অনেকে ইহাদিগকে বার্ম্মিজ বা মগ বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু যদিও তথাকথিত মগ বা বার্ম্মিজদের সাথে ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তথাপি আচার, কৃষ্টি ও সামাজিক প্রথাগত কোন সাদৃশ্যই নাই, বরং পুরোপুরি বাঙালীদের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অধিকদূরে লেখা এখানে সম্ভবপর নয়। যাঁহারা ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিতে চাহেন, তাঁহারা Hutchinson সাহেবের 'Chittagong Hill Tracts and dwellers therein', সতীশচন্দ্র ঘোষ কৃত 'চাক্মা জাতি', Lewis সাহেব প্রণীত 'Fly on the wheels' এবং Imperial gazetteers of India পাঠ করিবেন। অধুনা ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠন সমস্যা লইয়া অনেক আলোচনা দেখিতেছি। এইজন্য এই বৃহত্তর বঙ্গেরই দ্বার উদ্ঘাটনকল্পে এই কবিতাটির সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ বহু কবিতা, পালা-গান, বার-মাসী, ছড়া ও কথা-সাহিত্য ইত্যাদি এই জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। এইগুলির মধ্যে এমন আচার, কৃষ্টি ও সভ্যতার আভাস পাওয়া যায় যে, তাহা বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইতে পারে।

কুজি রাণ্যা ভুরা বন,
চিকণভুনদুর ভরে মন।
ইজেবোমাথান্ কাজি রেত্,
স্বপনে দেগং পাজি রেত।
পানি খেয়া পানভুনে,
নিত্য ন যায় মনভুন।

অনুবাদঃ—

নিতি আশৈশব অনুরাগ নব
বাড়িয়াছে পূর্ণ চিত্ত মম
নব বনতলে বনস্পতি মূলে
খুঁজে মন মত্ত মৃগ সম
যায় গড়াগড়ি বারান্দা উপরি
জলাধার আমার লাগিয়া
হেরিয়া স্বপনে ও চাঁদ বদনে
প্রতি রাতে, কাঁদে মোর হিয়া
(হেরি) স্বচ্ছ নীরবিন্দু বাড়ে তৃষা-সিন্ধু
দুঃখ অনলে দহিলে প্রাণ
নিত্য তব কথা দেয় মোরে ব্যথা
যাতনার নাহি অবসান।

ভাব-পরিচয়ঃ—কবির মানসদেবতার জন্য আকুল আহ্বান। যেন মানসদেবতার প্রতি আসক্ত হইয়া কবি-মন আশৈশব বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে এই ভরা যৌবনে হারাইয়া কবি-চিত্ত যেন ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাই তিনি সেই মানসদেবতাকে নূতন কাননকুঞ্জে, বৃক্ষতলে উন্মত্ত শিশুর ন্যায় হরিণীর ন্যায় খুঁজিতেছেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিতেছে না। তাই তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দেখেন যে, ঘরের আসবাবপত্রও যেন ব্যথায় মুহ্যমান অবস্থায় যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। কুটীরের ভিতরের জলপাত্রটিও বারান্দায় আবর্জ্জনা স্তূপে পড়িয়া রহিয়াছে। উহা যেন কবির বিরহী চিত্তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এদিকে কবি দিবসের সারাক্ষণ মানসদেবতার অন্বেষণ করিতে করিতে দিনাবসানে যখন ঘুমাইয়া পড়েন তখনও স্বপ্নে সেই চন্দ্রবদনখানি দর্শন করিয়া মনে করেন, তিনি বুঝি প্রকৃতই আসিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রাপ্তির তৃষ্ণা আরও বর্দ্ধিত হয়। দ্বিপ্রহরে দারুণ রৌদ্র হইতে আসিয়া যেমন পরিষ্কার জলবিন্দু তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়াইতে থাকে, সেইরূপ কবির আকাঙ্ক্ষাও যেন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া বাড়িতেছে। যতই ভুলিতে চেষ্টা করা যায়, ততই যেন ইহা বাড়িতে থাকে। প্রকৃতির শ্যামল শোভাও যেন কবি চিত্তকে ভুলাইতে পারিতেছে না। তিনি নব মুকুলিত সবুজ পল্লবতলে, বনস্পতির স্নিগ্ধ ছায়াতলে, গৃহে সুশীতল শয্যা উপরি নিজের চিত্তকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন কিন্তু হায়, তবুও যেন দুরন্ত মন কোথায় ছুটিয়া যায়। এই যে আকুল আকাঙ্ক্ষা যাহা সারাক্ষণ কবির চিত্তকে বেদনা দিতেছে তাহার কি অবসান হইবে না? কবি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পান না। একবার মনে হয় বুঝি অবসান হইবে। আবার অন্যক্ষণে ভাব পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে মনে হয়, ইহার অবসান নাই। সংসারের দুঃখ-দৈন্যের বুঝি অবসান নাই। পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন উঠে, 'থাকিবে না কেন?' ইত্যাদি নানা তর্ক-বিতর্ক তাঁহাকে বৈরাগ্যভাবের প্রথম সোপানে আরোহণ করাইয়া দেয়। কবি বুঝি ত্যাগের পথে নিশান উড়াইয়া জয়যাত্রা করিতেছেন।

বীরভূমের শিবরতন মিত্র

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রায় সাত মাস পূর্ব্বে পরলোক-গমন করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক পত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত আর কোন পরিচয়ই প্রকাশিত হয় নাই। ইহা আমাদের পক্ষে মোটেই প্রশংসার কথা নহে। কেরাণীগিরি করিয়া তাঁহাকে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত। কেরাণী-জীবনের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও তিনি কি করিয়া যে সাহিত্য-সেবায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। সাহিত্য লইয়াই তিনি দারিদ্র্য ভুলিতে পারিয়া-

ছিলেন। আমরণ তিনি সাহিত্যেরই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার জীবন-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

জন্ম—বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার অধীন বড়রা গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে ১২৭৮ সালের ১লা চৈত্র শিবরতনবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র সিউড়ীর কালেক্টরীতে সেরেস্তাদার ছিলেন। অধ্যয়ন-স্পৃহা তাঁহার অতিশয় বলবতী ছিল। ইহাই পুত্র শিবরতনে সংক্রমিত হয়।

শিবরতনের ৫ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি হয়। তিনি প্রথমে সিউড়ীর পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন, পরে সেখানকার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েকদিন মাত্র অধ্যয়ন করিয়া সিউড়ী জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখান হইতে ১৮৯১ খৃঃ দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ, পড়েন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পরই ১২৯৭ সালের ১৯শে ফাল্গুন (১৮৯১ খৃঃ) তাঁহার বিবাহ হয়।

উক্ত কলেজ হইতে এফ-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেম্ব্লিতে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) বি-এ, অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি Licentiate in Law class-এ দুই বৎসরকাল আইন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন। বি-এ, পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'রামরতন দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হন। ফলে বি-এ, পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, সংস্কৃত সাহিত্যে মাত্র ৩ নম্বর কম পাওয়ায় উত্তীর্ণ হইলেন না। এই সময় তাঁহার উক্ত ভ্রাতার মৃত্যু হয়। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে কাছছাড়া হইতে না দিয়া নিজ কর্ম্ম হইতে অবসর লন এবং তাঁহাকে অফিসের কেরাণী পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

শিবরতনবাবু আজীবন অধ্যয়ন করিয়াছেন। কলেজে পড়িবার সময় মাদ্রাজের 'Progress' নামক ইংরেজী মাসিকে কলিকাতার অধুনা-লুপ্ত 'Hope' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে এবং নব্য-ভারতে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং প্রায়ই ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে কলেজের যাবতীয় ছাত্রগণের মধ্যে ইংরেজী প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতায় ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যয়ন কালে তাঁহার কবি বন্ধু মহম্মদ আজীজ উস্ সোভানের সহিত একত্রে বহুবিধ ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা করিতেন। ফলে তাঁহার সুন্দর স্বাস্থ্য ও অমানুষিক ক্ষমতা লাভ হয়।

চাকুরী গ্রহণ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে। যোগ্যতার সহিত Birbhum Dt এর Hd. Asst-এর পদ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ।

ভ্রাতৃ বিয়োগের পর তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই কবিতাগুলি তাঁহার 'দূর্ব্বা' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। মোসলেম ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনেও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

১৩০৬ সালে কীর্ণাহার হইতে 'নীলরতন বাবুর সম্পাদকতায় 'বীরভূমি' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে তাহাতে 'বীরভূমের ইতিবৃত্ত', 'বীরভূমের প্রাচীন পুঁথি', 'বীরভূমের ঐতিহাসিক ছড়া' নামক তিনটি বড় বড় প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। বীরভূমি বন্ধ হইয়া গেলে আরব্ধ কার্য্যও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

১৩১০ সালে আবাল্য বন্ধু শ্রীচারুচন্দ্র সিংহের অর্থানুকূল্যে 'সোপান' নামক সচিত্র সুবৃহৎ মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। সোপান প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর দুর্ব্বিপাক বশতঃ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতেও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতেই বহু পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহ এবং পাঠ বিষয়ে মনোযোগী হন। পূর্ব্বেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ক্রমে বাঙলা সাহিত্যে কত সেবক আজি পর্য্যন্ত আত্মনিয়োগ করিয়া ইহার সৌষ্ঠব সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার তালিকা করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তজ্জন্য দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রথমে মাত্র ৭০০ গ্রন্থকারের নাম তালিকাভুক্ত করেন। ফলে বঙ্গীয় সাহিত্য

সেবক নামক সুবৃহৎ চরিতাভিধান গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মাত্র ১৬ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রায় ৫০০০ গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩১১ সালে বীরভূমি পুনঃ প্রকাশিত হইলে তাহাতে তাঁহার বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু বীরভূমি পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপে মাত্র দুই খণ্ড সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হয়। পরে হেতমপুরের পরলোকগত মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর অর্থানুকূল্যে ৩য় হইতে ১১শ খণ্ড সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হয়। ইহার পর তাঁহার সিউড়ী নিবাসী বন্ধু পরলোকগত রায় বাহাদুর সারদাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজের অর্থানুকূল্যে ১২-১৬ খণ্ড সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাভাবে পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

১৩১৫ সালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ও তাঁহার অব্যবহিত পরই পুত্র বিয়োগ হইলে তিনি ১ বৎসর কাল অবসর গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস প্রেসের স্বত্বাধিকারী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার শব্দাভিধান সঙ্কলনের জন্য অন্যতম সঙ্কলয়িতারূপে কলিকাতায় নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হইতে শব্দ ও উদাহরণ সঙ্কলন করেন। ইহা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তিনি 'মানসী পত্রিকার' সম্পাদক চতুষ্টয়ের অন্যতম ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালীন 'হস্তলিপি লিখন প্রণালী' নামক বালকগণের হস্তলিপি লিখিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্মত উপদেশমূলক সচিত্র পুস্তক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত শকুন্তলা ও সীতার বনবাস গ্রন্থদ্বয়ের সটীক ও সচিত্র সংস্করণ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন।

ছুটি ফুরাইলে তিনি পুনরায় সিউড়ী আসিয়া সরকারী কর্ম্মে যোগদান করেন।

এই সময় তাঁহার প্রতিবেশী বন্ধু পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের সহযোগিতায় "বীরভূম সাহিত্য পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন ও সম্পাদক মনোনীত হন। এই সাহিত্য পরিষদ হইতে মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদকতায় বীরভূমি পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বীরভূমিতে তিনি প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

তাঁহার রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত পুস্তক তালিকা এই স্থলে প্রদত্ত হইল,—দুর্ব্বা, বর্ণমালা, হস্তলিপি লিখন প্রণালী, শকুন্তলা, সীতার বনবাস," বিদ্যাসাগর, প্রবন্ধরত্ন, রত্নহার, রত্নপাঠ, সচিত্র আরব্য উপন্যাস, গোপীচন্দ্র, চিন্ময়ী, প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, সাঁজের কথা, নিশির কথা, কল্প-কথা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, রত্নকণা, ভারতকণা, সাগরকণা, সাগর সুধা, মোহন সুধা, অক্ষয় সুধা, Types of Early Bengali Prose, Easy Poems, উজ্জ্বল চন্দ্রিকা, গোপরহস্য লীলা, বনের কথা, সাঁওতালী উপকথা, প্রসঙ্গ কোরক, প্রসঙ্গ মালিকা, প্রসঙ্গ চন্দ্রিকা, প্রসঙ্গ কুসুম, প্রসঙ্গ মুকুল, ভারত কথা, এতদ্ব্যতীত তাঁহার লাউসেন, বিদ্যাপতি, বনের কথা বঙ্গসাহিত্য পুস্তকগুলি অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সোপান, বীরভূমি, নবাভারত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, বঙ্গবাণী, মানসী, শিশু, শিশুসাথী, খোকাখুকু, বার্ষিক শিশুসাথী, ছোটদের বার্ষিকী, যমুনা, গল্পলহরী, নবযুগ, প্রবাহিনী, বসন্তী, সচিত্র শিশির, শক্তি, বঙ্গলক্ষ্মী, বীরভূম হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

১৩২৩ সালে হেতমপুর কলেজে বীরভূম সাহিত্য সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে এবং হেথিয়া গ্রামে বীরভূম সাহিত্য সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল।

তিনি বীরভূম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ১৭শ অধিবেশনের (১৩৩২ সাল চৈত্র) সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরী বীরভূম তথা বঙ্গের গৌরবের বস্তু। ঐ গ্রন্থাগারে বহু বাঙ্গলা, হিন্দী, উড়িয়া হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ও ইংরেজী বাঙ্গলা মুদ্রিত পুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থাগারে সূর্য্য মূর্ত্তি, বাসুদেব মূর্ত্তি, অষ্টভুজা গণেশ মূর্ত্তি, প্রাচীন চিত্র প্রভৃতিও সংরক্ষিত হইয়াছে।

সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চ ইংরেজী স্কুলের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সিউড়ী সাধারণ জুবিলি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি ছিলেন।

শিবরতনবাবুর পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এল পিতার সাহিত্য সেবার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছেন। গত ১৩৪২ সালের ২০শে পৌষ এই একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধক সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন।

হত্যা

(গল্প)

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উমা একদিন হাতে হাতে ধরা পড়িল।

কি আশ্চর্য্য! কি নোংরা! কোনদিন কেউ কখনও শুনিয়াছে বাড়ীর বউ ব্যর্থ প্রেমের কবিতা রচনা করে? এ বাড়ীর কেহ তো জীবনে এমন কথা শুনে নাই। উমার বিধবা ননদ সুখদা একটু একটু আঁচ করিয়াছিল যে, ছোট বউ মাঝে মাঝে অতি সংগোপনে কাহাকেও বোধ হয় চিঠি লেখে। তা লিখুক, চিঠি তো সকলেই লেখে। মা-বোন, বাপ-ভাই প্রত্যেকেরই আছে। তাই ব্যাপারটা লইয়া সুখদা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন মনে করে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাহার মাথায় একটা কথা আসিল—ছোট বউ চিঠি তো লেখে, কিন্তু ডাকে পাঠায় না তো একদিনও। তবে কি উমা হিসাব লেখে? সে রকম তো মনে হয় না। আরে তাই তো! সুখদা নিজের ভুল ধরিতে পারে—উমার হিসাব লিখিবার একটা মোটা কালো খাতা আছে, সে খাতা সুখদা ভাল করিয়াই চিনে। তবে কি লিখে অত উমা? সুখদা কিছুই ভাবিয়া পায় না। এই জন্যই একটা অস্পষ্ট সন্দেহের কাঁটা বিঁধিয়া রহিল তাহার মনে। আর, উমাকে সে চোখে-চোখে রাখিতে লাগিল এর পর হইতেই।

কিন্তু আজকাল উমা বড় একটা খাতা কলম লইয়া বসে না, তাই সুখদাও কিছু জানিতে পারে না। উমা আগের চেয়ে এখন একটু বেশী গম্ভীর হইয়া থাকে সব সময়। কখনও কখনও তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়, সে কাঁদিতেছিল। সুখদা বাড়ীর আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপে চুপে একলাই রহস্য ভেদ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

সেদিন সুখদা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। আজ আবার উমা লিখিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতেছে সে, তারপর লিখিয়া যাইতেছে একমনে। সুখদা দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতে লাগিল। বার কয়েক সে উঁকি-ঝুঁকি মারিল তারপর হঠাৎ এক সময় ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া উমার কাছ হইতে খাতাখানি সবলে চিলের মত ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল। উমা ভীষণভাবে চমকাইয়া উঠিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না প্রথমে। অবশেষে ননদকে সামনে দেখিয়া তাহার দীপ্ত মুখ নিমেষে অকূল অন্ধকারের মত কালো হইয়া গেল।

'কি হে ভালমানুষের মেয়ে এ সব কি?' সুখদা খাতাটির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল।

উমা পায়ে পড়িল প্রায়, 'দিদি ফিরিয়ে দাও আমার খাতা আমি নিজে ছিঁড়ে ফেলছি প্রত্যেকটি পাতা—

তীব্র তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া সুখদা বলিল, 'তোমার এ খাতা আমি ফেরৎ তো দেবই কিন্তু তোমার হাতে নয়, তোমার বর বিনয়ের হাতে।'

উমা শিহরিয়া উঠিল, 'আর কখনও একাজ হবে না, আমাকেই ফিরিয়ে দাও দিদি দয়া করে—'

'না,' সুখদা সে-ঘর ছাড়িয়া গেল।

উমা যেন কত বড় একটা অপরাধ করিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে আজ। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সহিত সুখদা কক্ষে কক্ষে এ সংবাদ প্রচারিত করিল।

ছোট ননদ মানদা বলিল, 'তুমি কেমন করে ধরলে দিদি?'

'আরে বাপু', সুখদা গর্ব্বের সঙ্গে বলিল, 'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমার চোখে ধুলো দেবে ওই পুঁচকে মেয়ে! অনেক আগেই আমি সব বুঝেছিলাম আজ ধরলাম একেবারে হাতে হাতে।'

বড় বউ গালে হাত দিল, 'মাগো, কি নোংরা কাণ্ড!'

'এমন কেলেঙ্কারির কথা তো জন্মে শুনিনি', মেজ বউ বিস্ময়ের আতিশয্যে আর কিছু বলিতে পারিল না। সকলে অধীর আগ্রহে বিনয়ের পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল।

উমা বুঝিল বিনয় ফিরিলে তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে আর আজ সে সহজে নিস্তার পাইবে না। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না কি এমন অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্যে বাড়ীশুদ্ধ সকলে অমন করিয়া বলিতেছে। সুখদা ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ উমা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি করিবে সে ভাবিয়া পাইল না। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া উমা অবশেষে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। কি হইবে ভাবিয়া, উমা মনে করিল, যাহা হইবার তাহা হইবেই। কিন্তু এই ঘটনার পর তাহার একে একে অনেক কথাই যে মনে পড়িতেছে আজ!

* * *

খুব ছেলেবেলা হইতেই উমা কবি হইবার স্বপ্ন দেখিত। তাহার সে স্বপ্ন সফলও হইয়াছিল। আপনাদের মধ্যে যাহাদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আছে তাহাদের কাছে উমা দেবীর নাম অপরিচিত নয়। আগে অনেক কাগজে তাহার কবিতা ছাপা হইত আর সে প্রচুর প্রশংসাও পাইয়াছিল। সম্পাদকরা উমাকে কবিতার জন্য তাগাদা দিয়া চিঠি লিখিত। তখন কিন্তু উমার বিবাহ হয় নাই। বয়সের তুলনায় উমা যে খুব ভাল কবিতা লিখিয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছে সে-কথা সকলেই বার বার বলিতেন। অল্প বয়সে বেশী নাম হইয়াছিল তাহার।

উমার বাবা সরলবাবু বলিতেন, 'জানিস উমি, তুই এত নাম করেছিস যে, আজকাল তোর বাবা বলে আমি অনেক যায়গায় খাতির পাই আর সত্যিই তো আমি আধুনিক যুগের দীপ্ত লেখিকার বাবা, কি বলিস?'

উমা হাসিয়া বাবার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িত। সরলবাবুর তিন ছেলে এক মেয়ে। এই মেয়ের জন্ম হইবার সময় তাহার স্ত্রী মারা যান। তাই সরলবাবু উমাকে একটু বেশী স্নেহ দিয়াছিলেন। বাপের আদরে সে বুঝিতেই পারিত না যে তাহার মা নাই। সরলবাবুর ছেলেরাও তাহাদের এক-মাত্র বোনকে বড় ভালবাসিত।

তাহারা প্রায়ই বলিত, 'শোন উমা, তোর সঙ্গে কথা বলতে আমাদের ভয় লাগে। যে রকম সেণ্টিমেণ্টাল কবিরা তার ওপর তুই আবার মেয়ে কবি, কাজেই সেণ্টিমেণ্টের জাহাজ।'

উমা টিপিয়া হাসিত, 'কোথায় দেখলে তোমরা অত সেণ্টি-মেণ্ট আমার? আর পাকা কবিরা সেণ্টিমেণ্ট চেপে যেতে পারে চীপ্ সেণ্টিমেণ্ট তো তাদের থাকে না, সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।'

মেজদা বলিত, 'কথায় তোর সঙ্গে কে পারবে বল? বাঙলার

প্রদীপ্ত প্রতিভা আর আমরা সামান্য সাধারণ মানুষ, তা ছাড়া কথাবার্ত্তা ঠিক তোর কবির মত।'

'কবির কথা কবির মত হবে না?' উমা মুচকি হাসিয়া মেজদার কোলে মুখ লুকোইত। মেজদা পরম স্নেহে আদরের বোনটির মাথায় হাত বুলাইয়া দিত।

এমনি করিয়া আদরে, আব্দারে, স্নেহে, যত্নে, বাৎসল্যে, সোহাগে উমা বড় হইতে লাগিল। পড়াশুনা করিতে সে খুব ভালবাসিত। বয়সের সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে হইল তাহার পরিচয়। বড় বড় বিদেশী কবির কবিতা পড়িতে পড়িতে তাহার অঙ্গে অঙ্গে আসিত শিহরণ, সে একেবারে তন্ময় হইয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইত। কতদিন দাদারা তাহাকে খাওয়াইয়াছে, কত রাত্রে বাবা তাহাকে জোর করিয়া বিছানায় পাঠাইয়াছেন!

একদিন সকালে সরলবাবু উমাকে বলিলেন, 'উমি, মা আমার, তোমার এবার বিয়ে দিই কেমন?'

'না না না', লাফাইয়া উঠিয়া উমা বলিল, 'আমি এখন বিয়ে করব না, আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকি বাবা।'

'বিয়ের পর লেখাপড়া ছাড়তে কে তোমায় বলছে মা?'

'কে জানে শ্বশুর বাড়ী কেমন হবে!'

'ভয় নেই, শ্বশুর-শাশুড়ী থাকবে না তোমার, আমি যার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি মা বাবা তার অনেকদিন হল মারা গেছেন, আর তোমার বিয়ের আগে দাদারা কেউ বিয়ে করবে না সে-কথা জান তো?'

'জানি।'

'তবে? বিয়ে যে তোমাকে করতেই হবে মা', সরলবাবু আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বিবাহ করিবার ইচ্ছা যে উমার একেবারেই ছিল না এমন নয়। একটি সুখের সংসারের স্বপ্ন সে দেখিত, মাঝে মাঝে অব্যক্ত শিহরণে তাহার সারা অঙ্গ অবশ হইয়া যাইত। উমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, বিবাহের পর তাহার কবিতা আরও পরিণত হইবে।

যাহা হউক, একদিন বিবাহ হইল উমার কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বরের নাম বিনয়। উমা খুশীই হইল। শ্বশুরবাড়ী আসিতে হইল তাহাকে। এখানে অনেক লোকজন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে উমা বুঝিল তাহার মনের মত কেহ এ বাড়ীতে একটিও নাই। এখানকার আবহাওয়া তাহার বাপের বাড়ীর মত মোটেই নয়।

বিবাহের দিন কয়েক পর বিনয় উমাকে বলিল, 'দেখ, বাজে বই অত পড় না, এ বাড়ীর কেউ ওসব পছন্দ করে না।'

উমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বই না পড়িয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া! এ কি অন্যায় আদেশ!

সে বলিল, 'বই না পড়ে যে আমি একদিনও থাকতে পারি না।'

'থাকতে হবে', কঠিন কণ্ঠে বিনয় বলিল, 'এ বাড়ীর কেউ যখন চায় না তখন কিছুতেই ও ছাই পাশ পড়তে পারবে না' একটু থামিয়া আবার সে বলিল, 'ওসব না করে সে সময় সংসারের সাহায্য করলে ভাল হয় না কি? তোমার চেয়ে যারা বয়সে বড় তারা একাই কি শুধু খেটে মরবে, আর বই মুখে গুঁজে তুমি বসে থাকবে?'

এমন কথা শোনা তো উমার অভ্যাস নাই। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। একি হইল! তাহার জীবনের এমন শোচনীয় পরিণামের কথা কি উমা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! কিন্তু এই তো সবে সুরু, আরও অনেক বাকি আছে।

একদা অকস্মাৎ উমা বুঝিল তাহার স্বামী বিনয় কবিতা লেখা পছন্দ করে না, তাহার উপর সে আবার লেখে প্রেমের এবং দেশী বার্থ-প্রেমের কবিতা।

আর বিনয় একদিন স্পষ্টই বলিল, 'দেখ, কবিতা লিখ না আর—'

'কেন?' আশ্চর্য্য হইয়া উমা জিজ্ঞাসা করিল।

'কেন আবার কি?' চশমাটা ঠিক করিয়া লইয়া বিনয় বলিল, 'আমি ওসব ন্যাকামি পছন্দ করি না, আর লোকে অনেক কথা বলে।'

উমাকে কে যেন খুন করিল। কি বলিতেছে তাহার স্বামী! তা কবিতা কি ন্যাকামি হয়! সে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না। হঠাৎ উমা তার বাপের বাড়ীর কথা মনে করিল আর নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল কয়েক ফোঁটা জল। এর পর সে কবিতা লেখা একেবারে ছাড়িল না; কিন্তু অনেক কমাইয়া দিল। দিন একের পর এক যাইতে লাগিল।

একদিন উমা নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না। নিজের একটা পুরানো প্রকাশিত কবিতা তার নূতন করিয়া খুব ভাল লাগিল সহসা। বিনয় কোনকালে ওসব দেখিত না। তবু উমা বলিল, 'দেখ গো, এ কবিতাটা একবার পড় না—'

'দেখি', হাত বাড়াইয়া বিনয় পত্রিকাটা লইল। তারপর সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিল, 'আর কোন দিন যদি শুনি যে, তুমি আবার ও ছাইপাঁশ লিখেছ তাহলে ফল ভাল হবে না বলে দিলাম!'

উমার মুখে সপাং করিয়া কে যেন হান্টার চালাইল। পত্রিকাটি তুলিয়া আনিবার শক্তিও তাহার রহিল না। এরপর আর কোনদিন সে কবিতা রচনা করে নাই।

* * *

আজ অনেকদিন পর উমার কি যেন হইয়াছিল!

শ্রাবণ বর্ষা নামিয়াছে। মেঘ-মাখান আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মন কেমন এক রকম হইয়া যায়। ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধে অনেক কথাই মনে পড়ে।

অতীতে ঠিক এমনই সময় কত কবিতা কে যেন উমাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়াছে। আজ একটু আগে সেই অদৃশ্য মানুষের মায়া উমার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল আর এক মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হইয়া উঠিল। পৃথিবীকে তাহার মনে হইল নূতন! অসহ্য ভাবাবেগে উমার সারা অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল আস্তে আস্তে। পুলকের অব্যক্ত শিহরণে সে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল বার বার। তার মনে হইল কেউ কোথাও নাই, শুধু সে আর তার ভাবাবেগ। ভুলিয়া গেল উমা সব কিছু। বাহির করিল সে লুকান পুরোনো কবিতার খাতা। নূতন দৃষ্টি শক্তি লইয়া, নূতন অনুপ্রেরণা লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছিল আজ। কে তাকে থামাইবে! উমা লিখিয়া চলিল। একটা হইল, দুইটা হইল। তৃপ্ত, আত্মবিস্মৃত উমা

লিখিয়া যাইতে লাগিল তৃতীয় কবিতা। এমন সময় সুখদার আবির্ভাব। উমার মন ফিরিয়া আসিল দেওয়াল-ঘেরা ছোট ঘরে আর সেই দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ইচ্ছা হইল তার। উমা নিজেও মরিয়া যাইতে চাহিল সেই মুহূর্তে।

* * *

সুখদা আর বিনয় প্রবেশ করিল। বিনয়ের হাতে সেই কবিতার খাতা। উমা খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল তাড়াতাড়ি বড় বউ, মেজ বউ এবং বাড়ীর আরও অনেকে রগড় দেখিবার জন্যে উঁকি মারিতে লাগিল।

'তুমি আবার ন্যাকামি করেছ', কর্কশ কণ্ঠস্বর বিনয়ের, 'আমি বারণ করেছিলাম তোমায় ওসব করতে তবু তুমি শোননি', বিনয় একটু থামিয়া বলিল, 'কিন্তু এবারও আমি তোমায় ক্ষমা করলাম কারণ তুমি বাড়ীর নতুন বউ। মনে রেখ এই শেষবার, আর আমার সামনে দিদির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর জীবনে কখনও আর অমন কাজ করবে না, কর—'

*

উমা তাই করিল। এবার হইতে বোধ হয় সত্যই কোন দিনও আর সে কবিতা রচনা করিবে না।

বিনয়ের হাত হইতে উমা টান মারিয়া নিজের কবিতার খাতাটা কাড়িয়া নিল। কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল প্রত্যেকটি পাতা। তারপর একটা ভারী কান্নায় বিছানার উপর ও একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

টিকি বনাম প্রেম

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

করণ করেছি বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা। এগুলো সব ফিলজফিক্যাল। এখনু যেটা পড়ব তার নাম গর্দ্দভ।

দেবেনবাবু পড়িতে লাগিলেন গর্দ্দভ হচ্ছে বিশ্বের ভারবাহীদের প্রতীক। ভারবাহীর একটা দল যুগ যুগ থেকে চলে আসছে এরাই হচ্ছে দুনিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কুলী, কামিন, মুটে মজুর—কবিগুরু যাদের উদ্দেশে বলেছেন—এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা তারাই শুধু ভারবাহী নয়। আরও আছে, একদল আজীবন লিখল, কিন্তু লেখক হতে পারল না, একদল চেঁচাল সা রে গা মা বলে কিন্তু সুর তাদের কাছে ধরা দিল না; একদল প্রেমে পড়ে সব বিসর্জ্জন দিলে, কিন্তু পেল না প্রেমিকার একটু করুণা। এইরকম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ভারবাহী আছে। তারা শুধু সংখ্যা গরিষ্ঠ নয় তারাই শতকরা নিরানব্বইজন।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, আপনার চিন্তা শক্তি অতি উঁচুদরের।

দেবেনবাবু একটু হাসিলেন।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন আপনি দার্শনিক।

দেবেনবাবুর হাস্যধ্বনি উচ্চগ্রামে উঠিল।

তিনি বলিলেন, গুণী গুণং বেত্তি। আপনি পণ্ডিত লোক।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন আমি এবং প্রকাশবাবু প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে আলোচনা করি।

করেন? উত্তম। প্রকাশ কি বলে?

উনি বলেন আপনি একজন মনীষী। শুধু আপনার নন প্রকাশবাবু আপনার পরিবারের সকলেরই গুণগ্রাহী আপনার স্ত্রীর কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার।

দেবেনবাবু প্রকাশের দিকে চাহিলে সে মাথা নীচু করিল।

ভৃগুলাঞ্ছন কহিলেন প্রকাশবাবু বলেন প্রতিমা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, সুশিক্ষিতা নৃত্যকুশলা, সঙ্গীত পটীয়সী।

সবই সত্য। প্রকাশের মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি বলিয়া দেবেনবাবু একটু হাসিলেন।

প্রকাশ ভাবিল বৃদ্ধ বলে কি? শুধু উদয়রাম নয়, ঐ সাদাসিদে মানুষটির কাছে পর্যন্ত সে ধরা পড়িয়াছে? কি লজ্জার বিষয়।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, লক্ষ্য করবেনই ত'। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

দেবেনবাবু বলিলেন, আমরাও ওকে অন্তরের সহিত ভালবাসি আমি এবং প্রতিমা।

কথাটা প্রকাশের কানে যেন মধু বর্ষণ করিল।

এই সময় উদয়রাম ঘরে ঢুকিয়া প্রায় মেজে পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইয়া দেবেনবাবুর পদধূলি লইল।

তিনি বলিলেন, এই যে হাতীরাম ভাল আছ ত,

হ্যাঁ, আপনার দয়ায় ভালই আছি। আমার নাম হাতীরাম নয় উদয়রাম।

ও উদয়রাম; মাপ কর আমার ভুল হয়ে গেছে। প্রতিমার মা বলছিলেন, উদয়রাম অনেকদিন আসে না, একবার যেও তুমি।

হ্যাঁ যাব দু'একদিনের মধ্যেই।

দেবেনবাবু বলিলেন, বাপের বাড়ীর দেশের লোক কিনা তাই উনি তোমায় খুব স্নেহ করেন। মেয়েদের এই দুর্ব্বলতা চিরন্তন।

একটু পরে ভৃগুলাঞ্ছন বিদায় লইলেন, যাইবার সময় প্রকাশকে একান্তে বলিলেন, দেবেনবাবু বড় খাসা মানুষ, এর মেয়ে নিশ্চয়ই খুব ভাল হবেন।

প্রকাশ বলিল, নিশ্চয়, Brighter than sunshine.

সেটা কি পদার্থ?

ও কিছু না। **(ক্রমশ)**

দন্তবৈশিষ্ট্যে সনাক্তকরণ

শ্রীসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও দুই ব্যক্তির দন্ত-গঠন এক প্রকার নহে—আকার-আকৃতি প্রতি ব্যক্তিবিশেষেই একেবারে স্বতন্ত্র। এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বের বলে বর্তমানে শুধু দন্তের গঠন-প্রকৃতি হইতেই ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ সহজ হইয়াছে। যেমন টিপসহি বা আঙুলের ছাপ হইতে কোনও ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়, সেই প্রকার দন্তছাপ গ্রহণের সাধারণ একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়া উচিত।

সনাক্তকরণ সম্ভব হয় নাই বলিয়া আর্লিংটন ন্যাশনাল সিমেটরী (সমাধি স্থান) ৫০০০ অজানিত পরিচয় সৈনিকের মৃতদেহের সমাধি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিগ্রহে নিহত সেনাদের ভিতর হইতেই এই অজ্ঞাত যোদ্ধৃগণের শব সংগৃহীত। মহাসমরের পরিণতিতে সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন কবরখানায় সমাহিত রহিয়াছে ৯৬০০ শব— যাহাদের সমাধির উপর ক্রুশ স্থাপিত বটে, কিন্তু নাম-ধাম বা পরিচয় সন্নিবেশিত হইতে পারে নাই সনাক্তকরণের নিদর্শনের অভাবে। এই সকল সৈনিকের শব অধিকাংশই উহাদের আত্মীয়স্বজনের হস্তে প্রদান করা সম্ভব হইত সমাধিস্থ করিবার জন্য, যদি দন্ত-গঠন দ্বারা সনাক্তকরণের প্রণালী পূর্ব হইতে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যাইত।

প্রতি বর্ষে বে-সামরিক দুর্ঘটনায়ও বহু অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি প্রাণ হারায়; একটা বিমান রাত্রির অন্ধকারে পথ হারাইয়া পর্বতগাত্রে আছাড় খাইয়া পড়ে; বিদ্যালয় একটা অগ্নির কবলে পতিত হয়; একটা কারখানায় বিস্ফোরণ হয়; রেলট্রেনে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—ফলে মৃতদেহ এমনভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে যে দেহগঠন হইতে সনাক্ত করিবার সম্ভাবনা থাকে না, শুধু দাঁতের পাটিই হয়ত অক্ষত থাকে, সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর, চিনিয়া লইবার উপযুক্ত।

শুধু দন্তের আকার-আকৃতিই প্রতি মুখগহ্বরে আলাদা আলাদা নয়, উহার সংস্থানও পৃথক; এই জন্য সকলগুলি দন্ত চোয়াল হইতে উৎপাটিত হইলেও চোয়ালাস্থিতে এমন রঞ্জন-রশ্মি-কর্তৃক উদ্ঘাটিত হইবার উপযুক্ত বিশেষ বিশেষ নিদর্শন বর্তমান থাকে যাহা চার্টের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়; আবার স্বাভাবিক দন্ত-সংস্থানের সহিত উহার বৈষম্য ও গঠনের সূক্ষ্ম পরিবর্তনও উক্ত চার্টে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দন্ত-গঠনে যেমন ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র, তেমনই এক পঙক্তির বিভিন্ন দন্তে যে সম অথবা অসম সম্পর্ক তাহাও এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার। এই যে সম্পর্কের হেরফের ইহা চোয়াল এবং তালুর বেলা যেমন সহজ-লক্ষ্য দন্তের বেলা তেমন সহজে নির্ণয়যোগ্য নয় সকল ক্ষেত্রে, তথাপি ভেদ বা সাদৃশ্যের যে একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। নির্দিষ্ট আকারের চোয়াল ও তালুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কতকটা নির্দিষ্ট আকারের দন্তই উহাদের সংশ্লিষ্ট

কাগজে কালির সাহায্যে দাঁতের ছাপ গ্রহণ—দাঁতের প্লাস্টার প্রস্তুত নকল সেট হইতে তোলা; নীচে—দাঁতের উপরে দাঁত আসিয়া পড়িলে যে অবস্থা হয়, তাহার ছাপ; যে যে স্থানে ফাঁক রহিয়াছে, সেখানে দাঁত নাই।

দন্ত গঠনের বৈশিষ্ট্যের আদর্শ চার্ট

থাকে। ইহার পর উপর ও নীচ পঙক্তির দাঁতগুলির গঠনে সাধারণ সংজ্ঞার ব্যতিক্রম না হইলেও শুধু পঙক্তি দুইটির তুলনামূলক আকার দ্বারাই অনেক সময় বদনমণ্ডলের নিম্নাংশের বিশেষ আকারের সন্ধান পাওয়া যায় এবং শুধু উহা দ্বারাই হয়ত সনাক্তকরণ সম্ভব হইতে পারে। সাধারণত তিন আকারের দাঁত সুস্পষ্ট বিভেদ প্রতিপন্ন করে—চৌকা, বাদামী ও ছুঁচোল। চৌকা আকারের দাঁত সচরাচর 'চৌকা' আকারের বদনেই স্থান পায়। এই প্রকারে পঙক্তিটির নির্দিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার, উপর পঙক্তির কেন্দ্রস্থ দাঁত দুইটির নির্দিষ্ট আকার এবং সমগ্র মুখখানির আকার—এই তিনে একটা সাধারণ সাদৃশ্য রহিয়াছে সম-জাতিত্ব বা টাইপ হিসাবে—তাহাও ঐ চৌকা, বাদামী (ovoid) এবং ছুঁচোল। কাজেই দন্ত-সংশ্লিষ্ট টিস্যু-সমূহের শ্রেণী বিভাগ সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ

এই মাথার খুলি হইতে যদি দন্ত গঠনের দ্বারা সনাক্তকরণের চেষ্টা করা হইত, তাহা হইলে পরিচয় উদ্ঘাটন কঠিন হইত না

করিলে উহাই আবার আমাদের সনাক্তকরণ চার্টের উপাদান সরবরাহ করিতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের দাঁতের আকার, বর্ণ ও বিশেষ সংস্থান; পঙক্তির বক্রতার নির্দিষ্ট আকার ও জাতি (টাইপ), উভয় পঙক্তির তুলনামূলক বিশেষত্ব ও সাধারণ স্বাভাবিক আকার হইতে প্রভেদ, পরিশেষে বদনমণ্ডলের টাইপ—চোয়াল, দন্ত ও তালুর তুলনায় যাহা হওয়া উচিত এবং বাস্তবে তাহা হইতে কি কি বিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। চার্টের এই তুলনামূলক লক্ষণগুলি হইতে কোনও ব্যক্তির বদনমণ্ডলের নিম্নাংশ দুর্ঘটনায় বিকৃত হইয়া গেলেও, কেবল দন্ত-গঠন ও আকার হইতে তাহা উদ্ধার করা সম্ভব হইবে কিম্বা কৃত্রিম উপায়ে পুনর্গঠনও করা যাইবে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক লক্ষণগুলি এমনই সুস্পষ্ট পাওয়া গিয়াছে যে, শুধু দন্তের দ্বারাই ব্যক্তিটির বদনের আকার নিখুঁতভাবেই উদ্ধার করা গিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহার পরিচয়ও জানিতে পারা গিয়াছে—শুধু অপরাধ-ঘটিত জরুরী প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই নয়, মৃতদেহটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান সফল করিবার দিক হইতেও।

কেণ্টাকি অঞ্চলে কয়েকজন চাষী লিখিতে জানে না বলিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট জমিখণ্ডের জন্য লিখিত দাবী পেশ করিল—এক টুকরা কাগজকে সম্পূর্ণ দন্ত পঙক্তি দ্বারা কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ঐ কর্তিত খণ্ড দুইটি স্বাক্ষরের স্থানে জুড়িয়া দিয়া। নাম স্বাক্ষর অপেক্ষা ঐ নিদর্শন কম কার্যকর হইবে না, কারণ কাগজের ঐ কর্তিত খণ্ড দুইটি একত্র মিলাইয়া চাষীর দন্ত পঙক্তি পরীক্ষা করিয়া যে চার্ট-লক্ষণ পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত তুলনা করিলে ব্যক্তিটিকে সনাক্তকরণে আর কোন ভুল হইবে না—সন্দেহও উপস্থিত হইবে না।

১৯৩৫ সালের জুন মাসে একটি হত্যার ঘটনা বিবৃত হয়। বিবরণে প্রকাশ, মিস্ ইডা মে হ্যান্সনকে ক্লেয়ারেন্স নিল হত্যা করিয়া কলোরেডোর পর্বতমালার এক নিরালা স্থানে ভূপ্রোথিত করে। ভাগ্যান্বেষী দুই ব্যক্তি স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কারের আশায় সেই অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাইবার কালে একদিন মাটিতে মোজাপরা একখানি পা উঁচু হইয়া আছে দেখিতে পায়। সেই মৃতদেহ সনাক্ত করিবার সকল চেষ্টাই বিফল হয়। তখন সে অঞ্চলের শেরিফ্ শবের মুখগহ্বরের রঞ্জন-রশ্মি ফটো গ্রহণ করিতে এক ডেণ্টিষ্টকে নিয়োগ করেন। ডেণ্টিষ্ট ঐ রঞ্জন-রশ্মি ফটো হইতে দন্ত গঠন, চোয়াল ও তালুর আকার আকৃতি ও তুলনামূলক লক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। কলোরেডোর ষ্টেট্ ডেণ্টাল এসোসিয়েশনের পূর্ণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া প্রত্যেক ডেণ্টিষ্ট-সভ্যের নিকট ঐ লক্ষণ বিবরণ বিতরণ করা হয়। একখানি ডেণ্টাল সাময়িক পত্রে এই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত করা হয়। নেব্রাস্কার কোনও এক ডেণ্টিষ্ট মৃতের এই সকল দন্ত-লক্ষণ পাঠ করিয়া মনে করেন যে, এইরূপ দন্ত-লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার অতি পরিচিত। তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসিত রোগীর তালিকা ও লক্ষণাদি সম্বলিত খাতাপত্র খুঁজিয়া অনুরূপ এক রোগীর দন্তপঙক্তির প্লাষ্টার ছাঁচ বাহির করেন—যাহা তিনি তিন বৎসর পূর্বে ঐ ব্যক্তির মুখ হইতে উঠাইয়াছিলেন। ফলে মৃতের পঙক্তির সহিত ঐ ছাঁচের হুবহু মিল হইয়া গেল। তখন মৃতদেহের সনাক্তকরণ একেবারে নিখুঁত হইল এবং পুলিশ সেই খেই অনুসরণ করিয়া অপরাধীকে অগোণে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।

ঐ অঞ্চলেই একটি রেঞ্চার (Rancher) হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। বহুদিন পর্যন্ত অনুসন্ধান চলিলেও তাহার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে চার বৎসর অতীত হইলে একদিন সেই রেঞ্চারের বন মধ্যস্থ ব্যবসায়-কুটীরের নিকটে একটি নর-মুণ্ডের কঙ্কাল পাওয়া যায়। খুলিসহ দন্তগুলি অক্ষত অবস্থায় ছিল বলিয়া মৃতের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। পরে ইহাও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এই রেঞ্চার মিঃ ডবলিউ. কে. ডাউলিং আত্মহত্যা করিয়াছে।

১৯৩৫ সালের ১৫ই মে তারিখে ভারমণ্ট অঞ্চলের মিডলবেরির নিকটস্থ বন মধ্যে তিনব্যক্তির অর্ধ গলিত মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটির মাথার খুলিতে একটি করিয়া ছিদ্র দেখা যায় গুলীবিদ্ধ হইবার অনুরূপ। তিনটি শবের ভিতর একটি নিশ্চয় মাতা—তাহার বয়স ৪০ হইবে। অপর দুইটি তাহার সন্তান আনুমানিক ১১ ও ১৩ বৎসর বয়স্ক। মৃতদেহগুলি মৃত্তিকায় আংশিক প্রোথিত অবস্থায় ছিল—এবং এই অবস্থায় মৃত্যুর পর দুই কি তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুসন্ধানকারীদের বিশ্বাস। খুব সম্ভবত ইহারা সমৃদ্ধিশালী পরিবারের লোক, কারণ বড় সন্তানটির মুখের

ভিতর যে দন্ত নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র-ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর গঠন-কৌশলের। এইপ্রকার উৎকৃষ্ট কৃত্রিম দন্ত-ব্যবস্থার আভিজাত্য হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, এই জাতীয় সম্পদ-প্রভাবান্বিত ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইলে তাহাদের পরিবার ও আত্মজন নিশ্চয়ই তাহাদের সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া থাকিবে। বোষ্টন পুলিশ, গোয়েন্দা এবং গ্লোব, ওয়াল হাইজিন প্রভৃতি সাময়িকপত্র চেষ্টা করিয়াও কেহই এই তিনটি শবের সনাক্তকরণ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে নাই। দন্ত পঙ্ক্তির রঞ্জনরশ্মি ফটো দীর্ঘকাল প্রচারের ফলে কৃত্রিম দন্ত-নির্মাতা কোম্পানী হইতে নামধাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঘটনা আত্মহত্যা কিম্বা হত্যা তাহার সঠিক সিদ্ধান্ত হয় নাই। কারণ রমণীর স্বামীও নিখোঁজ। বসতবাটী বিক্রয় করিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান কেহই দিতে পারে না।

এরিজোনার সনকুরেন হোটেল-মালিক ডন ফ্রান্সের মৃতদেহ বলিয়া একটি শব পুলিশের হেফাজতে থাকে। সেই সময়ে আর একটি শবও আনা হয়, যাহার সনাক্তকরণে কেহই আগাইয়া আসে না। একটি শবের মুখে ছিল কৃত্রিম দন্ত। সেই দন্ত হইতেই শবের নামধাম পাওয়া যায়। তখন পুলিশ তদন্তে সাব্যস্ত হয় কৃত্রিম দন্তওয়ালা শব হোটেল মালিকের হত্যাকারীর।

আলফন্সো পাওলিলো নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহার দূরসম্পর্কিত মামাত ভগ্নীদের বাড়ীতে। এই ঘটনা ঘটে পূর্ব আমেরিকার সাগরতীরের কোনও শহরে। মৃতদেহ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে শবের স্কন্ধে দন্তচিহ্ন পাওয়া যায় গভীর। মামাত ভগ্নীরা বলে, তাহারা মৃত্যুর বিষয়ে কিছুই জানে না, কেহ উহাকে হত্যা করিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ উদ্যানের রাস্তায় রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বাড়ীর সকল লোকের দাঁতের ছাপ গ্রহণ করিবার পর দেখা যায়—জেনো মামাত ভগ্নীর দাঁতের ছাপের সহিত মৃতের স্কন্ধের কামড়ের দাগ একেবারে মিলিয়া যায়।

স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরের বি এইচ হ্যাম্পল আইন-ঘটিত ভেষজতত্ত্ব ও অপরাধ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি। তিনি বলেন, উগ্র যৌনলালসায় অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি-দ্বারা নানা প্রকার নিষ্ঠুর হত্যা সাধিত হয়। এই সকল পশু প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রায়ই এমন কঠোর দংশন করে যাহার ফলে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এই দংশন ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকে, ফলে পরিশেষে এত গভীর চিহ্নে পরিণত হয় যে, মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল তাহা স্থায়ী হয়।

উপরি উক্ত দংশন দ্বারা হত্যা এই জাতীয় যৌন-লালসার অপপ্রয়োগ বলিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের ধারণা। আর একটি বিবরণ জার্মানীর আসেনডর্ফ হইতে প্রচারিত। সেখানে কোনও এক ব্যক্তি এক রমণীর স্তনে এমনভাবে দংশন করে যে রমণী ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দংশনের চিহ্নে উপর পঙ্ক্তির সকলগুলি দাঁতেরই গভীর ছাপ পড়ে। ঐ চিহ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায়, দংশনকারী ব্যক্তির উপর পাটির ঠিক মধ্যস্থলের দাঁত দুইটি অস্বাভাবিক আকারে গঠিত ও সংস্থানও একেবারে সচরাচর দৃষ্ট অবস্থা হইতে পৃথক অর্থাৎ মানুষে যাহা সম্ভব নয়, এমনই ভাবে চোয়ালাস্থির সহিত সংযুক্ত। এই সুস্পষ্ট অদ্ভুত লক্ষণ দ্বারা সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ভিতর হইতে হত্যাকারীকে বাছিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় নাই।

দাঁত দ্বারা সনাক্তকরণ প্রথাকে নির্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীবদ্ধ করিবার জন্য সোরাপ নামে একজন অভিজ্ঞ ইউরোপীয়ান দাঁতের ছাপ গ্রহণের একটা প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, ঠিক যেভাবে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রণালী ততটা কার্যকরী হয় নাই, কারণ এমন কালি পাওয়া যায় না, যাহার সাহায্যে দাঁতের ছাপ তোলা যায় কাগজে। কাজেই কালির ছাপ তোলার উপযুক্ত কোন উপাদান দ্বারা নকল দাঁত তৈরী করিয়া তাহা দ্বারা কাগজে ছাপ তোলার চেষ্টা হয়।

পূর্ব বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহে যে দাঁতের সাহায্যে সনাক্তকরণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কোনও বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বজনীন আদর্শগত প্রণালী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় নাই, অথবা পূর্বোক্ত প্রকার চার্ট তৈরীরও প্রয়াস হয় নাই। কিন্তু যদি দন্ত-লক্ষণ সমন্বিত চার্ট তৈরী করিয়া ব্যাপক একটা আদর্শ প্রণালীর প্রবর্তনের প্রয়াস হইত, তাহা হইলে বহু শবের সনাক্তকরণ সম্ভব হইত।

সকল ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের উপযোগী একটা চার্ট তৈরী করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ের সঠিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ রাখা উচিত :—

১। দাঁতের ডৌল ও আকার নিখুঁতরূপে এবং বাস্তব পরিমাপসহ অঙ্কিত রাখিতে হইবে। ২। যে পাঁচটি দাঁত সচরাচর লুপ্ত থাকে, তাহা প্রদর্শিত থাকিবে চার্টে। ৩। কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডের উপর শাদা রঙে দাঁত আঁকিতে হইবে, যেন যেখানে দাঁত না থাকে, সেখানে হাল্কা কালো রঙ দ্বারা শূন্যতার ইঙ্গিত দেওয়া যায় (যেমন কোনও পেন্সিল দ্বারা)। ৪। এমন কাগজে চার্ট অঙ্কিত করা হইবে, যাহাতে অনায়াসে সোনালী বা রূপালী রঙিন করা যায়, ঐ প্রকার কৃত্রিম দাঁতের বেলা। ৫। চার্ট এমন সহজ প্রণালীতে রাখা হইবে যাহাতে যে কোন আনাড়ী (ডেণ্টিষ্ট নহে এমন) লোকও তাহা পূর্ণ করিতে পারে অথবা লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারে। ৬। চার্টের নির্মাণে বাহুল্য না হয়।

এই প্রকার চার্টই (ছবি দেখুন) মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রবর্তিত এবং অন্ততঃ এক লক্ষ লোক এই প্রথায় নিজ নিজ দাঁতের চার্ট করিয়া লইয়াছে। যাহার দাঁতের যে অংশ যে প্রকার রঙিন হইয়াছে, তাহার অবিকল নকল চার্টে রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিও প্রদর্শিত :—

১। পোর্সিলেন দ্বারা সম্পূর্ণ বা অংশত পূরিত (পেন্সিল দ্বারা বর্ডার অঙ্কিত)। ২। দন্তের উপরিভাগ বা দুই দাঁতের ফাঁকের অংশে পোর্সিলেন আবরণ (পেন্সিল দ্বারা কাটাকাটি করা রেখায় প্রদর্শিত)।

(শেষাংশ ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(২ ..

অমর সবেমাত্র প্রভাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সবেমাত্র সেইদিন হইতে যেদিন প্রভার অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া সে লীলাকে লইয়া রুগ্না প্রভার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুদ্ধ সেইদিন হইতে যেদিন প্রভার উদ্ধত-কণ্ঠ হইতেও আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, যেদিন সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিজেই এক নূতন চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল আর বুঝিয়াছিল, জোর করিয়া স্বামীর হৃদয় জয় করা যায় না। ঈর্ষায় শুধু নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে হয়, স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করা চলে না যেমন চলে নিজকে বিলাইয়া দিয়া—ভালবাসা না পাইয়াও নিজে ভালবাসিয়া। অমরও এতদিন প্রভার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। সেই কোন্ শৈশবে খেলার ঘরে কি খেলা সে খেলিয়াছিল, সেই খেলার স্মৃতিই রহিল তাহার গোপনঅন্তর জুড়িয়া। কৈশোরের স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিল, স্বপ্নের প্রতিমা অদৃশ্য হইল—পূজারতি থামিয়া গেল, কিন্তু শূন্য বেদীর পানে একদিন চাহিয়া দেখিল—কে এক অপরিচিত অপ্রিয় মূর্ত্তি তাহার দেবীপূজার শূন্য বেদী জোর করিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। শুধু যোড়শোপচারে সে দেবী সন্তুষ্ট হইবে না—পূজার আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি সবই তাহাকে দিতে হইবে। তার অনিচ্ছাকৃত কর্ত্তব্যের পূজা চলিল চক্ষু মুদিয়া। অন্তরের মন্ত্রে নিবেদিত পুষ্প কোন্ দেবতার চরণে অঞ্জলি পড়িল কে জানে। একদিন এই নবাগত মূর্ত্তির মুখে কথা ফুটিল। পূজক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, কে এ দেবী! এতদিন কি সে প্রাণময়ী দেবীকেই অশ্রদ্ধাবশে জড় পুত্তলিকা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। অথবা তাহার একান্ত পূজার সিদ্ধমন্ত্রে জড়দেহে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ তাহার হইল না,—চিনিয়া লইবার সুযোগ তাহার মিলিল না, বাহিরে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পূজার ফুল হাতেই রহিয়া গেল। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া হাতের ফুল জলে ফেলিয়া ব্যর্থপূজারী শূন্য দৃষ্টিতে মন্দিরের পানে চাহিয়া রহিল। যে স্মৃতির পূজা ভুলিয়া সে বাস্তবের পূজার আয়োজন করিয়াছিল—সে স্মৃতিও সে হারাইল—বাস্তবও শূন্যে মিলাইয়া গেল। রিক্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। সবহারানোর অসহ্য শূন্যতার সে খুঁজিয়া পাইল না—তার জন্য কোন্ পথ!

প্রভার মৃত্যুর মাস দুই পরে অমর একদিন ব্যথিত চিত্ত লইয়া লীলার গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রুক্ষ কেশ, শুষ্ক মুখ, যেন অল্প কয়দিনেই বয়স অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে।

লীলা নিকটে আসিয়া কহিল, এমন হয়ে গেছ কেন অমরদা, চিঠি লিখলেও তার জবাব দাও না। আমি ভেবেছি বুঝি উধাও হয়ে কোথায় চলে গিয়েছ! তোমার নারাণকে দেখবে? দাঁড়াও নিয়ে আসছি। যা দুষ্টু হয়েছে!

ভিতর হইতে শিশুকে বুকে জড়াইয়া লীলা ফিরিয়া আসিল। পরে অমরের কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল, বাবার কোলে উঠেছ খোকা—বাবা! শিশু কতক্ষণ অমরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া লীলার ক্রোড়ে যাইবার জন্য হাত বাড়াইল।

লীলা সস্নেহে শিশুকে চুম্বন করিয়া কহিল, ওকে নিয়েই আমার সারাদিন কাটে অমরদা। আছি বেশ! সব-কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে—ওই এক ফোঁটা ছেলে! ক'দিন ধরে তোমার কথাই ভাবছি। তুমি কেমন মানুষ অমরদা, ছেলেকেও দেখতে ইচ্ছে করে না তোমার?

বলিয়াই লীলা শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল সে তার বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া অমরের দিকে চাহিয়া আছে। যেন কোথায় দেখিয়াছে—মনে করিতে পারিতেছে না। লীলা আবার শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "বাবা, বাবার কোলে যাবে?" হাসিয়া উঠিয়া অস্ফুটকণ্ঠে শিশু ডাকিল, 'বা, বা', লীলা একবার শিশুকে বুকে জড়াইয়া, একবার নাচাইয়া, একবার শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া মাতৃস্নেহের উৎসধারায় অভিষিক্ত করিয়া কহিল, "এমন ছেলে রেখে অভাগী ম'ল কি করে! আমি হলে ত মরতে পারতেম না অমরদা!"

অমর দেখিল মাতৃত্বের পরম তৃপ্তিতে লীলার দৃষ্টি মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। শিশুকে লইয়া সে নিজের মধ্যে এক নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে। সেখানে তার স্থান নাই। নরেন্দ্রের আসনও নড়িয়া উঠিয়াছে কি না বলা যায় না। অমর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বহুদিনের চাপান জগদ্দল পাষাণ যেন বুকের উপর হইতে নামিয়া গেল। তার এই বিরাট বঞ্চনার মধ্যে নিজের হাত যত কমই থাকুক—কম বলিয়া নিজেকে সে ক্ষমা করিতে পারে নাই। নিজে বঞ্চিত হইবার চেয়েও বড় দুঃখ তার এই অনিচ্ছাকৃত বঞ্চনার মধ্যে ছিল। আজ তবুও এইটুকু সান্ত্বনা সে পাইল যে, যে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নারী জাতির মজ্জাগত, যে মাতৃত্বের সাধনা লইয়া তাহার পুতুল খেলার আরম্ভ—সেই মাতৃত্বের আরোপিত গর্ব্বেই লীলা আজ তৃপ্ত। আজ শুধু পত্নীপ্রেমে নয়, প্রভার উপর গভীর কৃতজ্ঞতায় অমরের অন্তর ভরিয়া উঠিল। কি করিয়া সে বুঝিয়াছিল—লীলার চেয়ে বড় আপন তার ছেলের আর কেহ হইতে পারে না!

অমরকে নীরবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া লীলা কহিল, "দেখ না অমরদা কেমন সুন্দর দুটি চোখ তোমার নারাণের! চোখ দুটি ঠিক তোমার মত—মুখখানা কিন্তু বৌদির মত হয়েছে! কেমন করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে! তুমি যদি দেখতে—ঠিক যেন আমার খেলার সাথী। কাঁদে না এতটুকুও। আমি যেন ওর সত্যিকারের মা।"

তারপর শিশুকে লইয়া আরও কতক্ষণ খেলা করিয়া লীলা বলিল, "ওকে রেখে আসছি—যা দুষ্টু হয়েছে, কিছুতেই কথা কইতে দেবে না।"

শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া লীলা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ভিতর নিজের সংসার গ'ড়ে তোলে, কি তার অপরাধ, ব'লে দিতে পারিস? পরের জন্য কারা বেশী কাজ করে রে, যারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বেড়াজালে পড়ে আছে তারা—না যারা সে বন্ধন থেকে মুক্ত?"

"বে'-থা না ক'রে সবাই যদি বিশ্ব-পরিবারের ভেতর নিজের সংসার গ'ড়ে তোলে, তবে এই বিশ্ব-পরিবারটি কি দিয়ে সৃষ্টি হবে অমরদা?"

লীলার কথা শুনিয়া অমর একটু হাসিল। পরে বলিল, "সবাই ত আর এক পথে চলবে না যে, সৃষ্টি লোপ পাবে। আর তোর কথাই যদি মেনে নিই, তবে সে উদ্দেশ্য ত আমার জীবনে সফল হয়েছে। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ত আমার মিটেছে। আমার অস্তিত্ব—আমার অমূর্ত্ত—আমার ঐ শিশু পুত্রের মধ্যে রেখে যদি সংসার থেকে বিদেয় নিই—আমার তাতে বড় অধর্ম হবে না লীলা!"

"সৃষ্টি ছাড়া কি বে'র আর কোনই প্রয়োজন নেই অমরদা?"

"তা হয়ত বা আছে। কিন্তু আমার জীবনে তার একটুকু প্রয়োজন নেই লীলা!"

অন্য কোন যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া লীলা কহিল, "বৌদির শেষ অনুরোধ তুমি রাখলে না তা হ'লে অমরদা?"

"আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি লীলা! শুধু বলেছিলাম তাকে,—বিয়ে যদি করি আর কোন, চারুকেই নেব।"

একটু সাহস পাইয়া লীলা বলিল, "বৌদির ইচ্ছা চারু হয়ত জানে। বিশেষত সেও তোমার এক ভক্ত। সে তোমায় যদি ভালবেসে থাকে অমরদা!"

"চারু, জানে লীলা, দিদির বয়কে ভালবাসতে নেই। যে এও জানে বে'র পূর্ব্বে কোন মেয়ের কোন ছেলেকে ভালবাসা উচিত নয়। ভালবাসা যেখানে বে'র পরবর্ত্তী সাধনায় না জন্মে, সে অনুরাগের পরিণাম হয় ঘোর অশান্তিতে। চারু হয়ত আমাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, ভালবেসে ফেলেনি। আর যদি ভালবেসেই থাকে—তাকে আমি ভালবাসা বলব না—সেও তার এক খেয়াল—চোখের নেশা।"

তর্ক করিবার কিছুই ছিল না। এ তত্ত্ব লীলাও ভাল জানিত। অমরের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কাতরকণ্ঠে লীলা ডাকিল, "অমরদা"।

বহুদিনের বিস্মৃত সে স্বর অমরের হৃদয়তন্ত্রীতে আসিয়া আঘাত করিল; অমরও বিচলিত হইয়া কহিল, "কিরে লীলা?"

"তুমি বে' করলে যে আমি সুখী হব অমর-দা।"

বহুক্ষণ অমরনাথ ইহার উত্তরে কোন কথা কহিতে পারিল না। লীলা আবার ডাকিল, "অমরদা!"

অমর এবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, "সংসারে তোকে অদেয় হয়ত আমার কিছু নেই। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিনেরে লীলা আমার বে'তে তোর এত আগ্রহ কেন!"

পরে খানিক নীরব থাকিয়া কহিল, "কি জানি মেয়েদের মন হয়ত আজও আমার বোঝ্‌বার সুযোগ হয়নি!"

এইবার লীলা কহিল, "সুযোগ হয়নি বলে তোমার অগৌরব নয় অমরদা। ঐ কম জানা লোকগুলোই সংসারে শ্রদ্ধার পাত্র। বেশী জানবার দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে তারা নিজেরাও সুখী হতে পারেনি—সমাজের শ্রদ্ধাও হারিয়েছে! আমার সুখের হেতু না হয় খুঁজে নাই পেলে, কিন্তু আদর্শটুকু বাদ দিয়ে তোমারই বা কি হেতু আছে বে' না করবার? যেদিন তুমি তা আমায় বলবে—আমিও জানিয়ে দেব আমার এত মাথাব্যথা কেন?"

অমর আবার একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, "আমার এসব সয়না, সয়না লীলা, আমি পারব না তোর কথা রাখতে। এই ভাঙা, আবার গড়া—আবার ভাঙা—এ দৃশ্য আমি সইতে পারিনে। আমি চাই মুক্তি—চাই আনন্দ। জানতে চাই বিশ্বের বিরাট রহস্য। কেন চাই—কেন পাই না। কেন পাই—কেন হারাই!—আমি যাব তার সন্ধানে। এখনই এই মুহূর্ত্তে। যদি শান্তি পাই, ফিরে আসব—নইলে—"

কথা কাড়িয়া লইয়া লীলা কহিল, "নইলে ফিরবে না—এইত! যেতে চাচ্ছ যাও, বাধা দেব না। কিন্তু ফিরে তোমায় আসতে হবে। যাচ্ছ বোধ হয় আমার ওপর অভিমান ক'রে—আমি তোমায় কি করব? বে' করতে বলছি, করবে না; শান্তি পেতে চাও সংসারের বাইরে যেয়ে। আমি জানি—এ তোমার ক্ষণিক উন্মাদনা। আমাকে কাঁদাতে চাও—আমি ত আর কাঁদব না। মহাপ্রলয়ের পর নবসৃষ্টিতে আমি নূতন জীবন পেয়েছি। কিন্তু আমি বলছি, আবার তুমি ফিরে আসবে—যতদিন পরে হোক্ আসবে! আবার আমারি কাছে এসে দাঁড়াবে—সেদিন তোমার ভুল ভেঙে দেব—আজকে নয়। মনে রেখ অমরদা, স্নেহের ওপর অত্যাচারেরও একটা সীমা আছে।"

অমর নীরবে বসিয়া শুনিতে লাগিল। লীলা ডাকিল, "অমরদা"

অমরনাথ মুখ তুলিয়া চাহিল। লীলা কহিল, "বৌদিকে তুমি সত্যি ভালবাসতে অমরদা?"

অমর তবুও কথা কহিল না।

"ভাল যদি নাই বাসতে তবে তাঁর স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন কাটাবে, তবে এ মিথ্যা বলবার কি প্রয়োজন ছিল, সে কিন্তু তোমায় প্রাণভরে ভালবাসত। তোমাকে ভালবাসবা আনন্দে তাঁর মৃত্যুমলিন মুখও উজ্জ্বল দেখাত! আমি স্বচক্ষে দেখেছি অমরদা, স্বামীপ্রেমের পরম তৃপ্তিতে তাঁর শে মুহূর্ত্ত কত মধুর হয়ে উঠেছিল। সে ভাগ্যবতী তাই তা ভাল না বাসবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তোমায় রে গেল!"

অমর নীরবে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। লী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আবার কহিল, "আর তাঁকে যদি ভা বেসে থাক, তবে কি তাঁর স্মৃতির পূজা করতে চাও—তাঁর অন্তিম ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে!"

তারপর লীলা বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। পরে ধী ধীরে কহিল, "সত্যি করে বল ত অমরদা, স্মৃতির পূজা তু করতে চাও?"

মৌনতা ভঙ্গ করিয়া অমর তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিল,—"লীল

লীলা দমিল না, বলিতে লাগিল, প্রলয়ের পরে নূতন জী পেয়েছে লীলা, তোমার ঐ কৃত্রিম রোষে ভয় পাবে না। কি

প্রলয় ত তার জীবনে শুধু একার নয়—তোমার জীবনেও যে দু'দু'বার হ'ল! তুমি নূতন জীবন পেলে না—অমরদা, আমাকে ভুলে যেয়ে তাকে ভালবাসতে পারলে না। আমাকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে দিলে না।"

লীলার স্বর ক্রমশ করুণ হইয়া উঠিল, স্নেহ-কোমল কণ্ঠে অমর আবার ডাকিল, "লীলা, এসব কি বলছিস?"

লীলা কহিল, "কি বলছি। যা সত্যি তাই বলছি। তুমি পুরুষ, তুমি বুঝবে না। নারীর প্রাণের গহন তলের গোপন ব্যথা তোমরা বোঝ না। মেয়েদের দিকে ফিরে চেয়ে দেখবার চোখ তোমাদের নেই। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে মিশে যেতে চাইব, আর তুমি পেছন থেকে আমায় টানবে! না, আমি তা টানতে দেব না!"

সহসা লীলার বাক্‌রোধ হইয়া যাইতেছিল। চোখ মুছিয়া একটু থামিয়া লীলা কহিল, "মুক্তি—আনন্দ—বন্ধন ছেদ ও-সব বড় বড় কথা রেখে দাও অমরদা, ও-সব আমি বেশ বুঝি। জানবার জন্য সংসার ছেড়ে পালাতে হয় না। বে' না ক'রে স্ব-পরিবারের ভিতর সংসার গড়ে তুলতেও সন্ন্যাসী হবার প্রয়োজন করে না। মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করবার ইচ্ছে যার আছে, সে মানুষের মধ্যেই থাকে। একটি মানুষের বুকের ব্যথা মুছিয়ে দিতে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে সে পারে না—সে যাবে বিশ্বের ভাল করতে। ও-সব ভাণ অন্য যেখানে খাটে ঠিক, লীলার কাছে আর খাটবে না জেনো!"

লীলার স্বর সহসা ঝাঁঝাল হইয়া উঠিল। লীলা বলিতে গেল, "পালাচ্ছ ত শুধু আমারই জন্য। বেশ, এস না আর আমার সামনে। প্রবৃত্তি যদি তোমার স্নেহকেও ডিঙিয়ে যেতে সাহস পেয়ে থাকে, তবে বলব তুমি নীচ, ভণ্ড, অতি সাধারণ মানুষ;—আমার অমরদা তুমি নও। এতদিন তবে আমি ভুল ভুলে অপদেবতার পূজো করে এসেছি।"

বলিতে বলিতে লীলার চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। বিস্ময়ে অমর লীলার মুখপানে চাহিয়া রহিল, একটি কথাও কহিতে পারিল না।

চোখের জল মুছিয়া লীলা কহিল, "ভেবেছিলাম দু'দিন পরেই বলব তুমি ফিরে এলে! না আজই শুনে যাও। কেন তুমি বে' করতে চাও না তার কারণ আমার কাছে এতটুকু গোপন নেই। ভেবেছিলে—আমার স্মৃতির পূজোয় বাকী জীবন কাটাবে। জন্মান্তরে বা পরলোকে আমায় তুমি ফিরে চাও। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে তোমার পূজো। আমাকে পাওয়ার তপস্যায় কোনদিন তোমার সিদ্ধিলাভ হবে না। না! আমি তোমার নই। জন্মান্তরেও তুমি আমায় পাবে না। জানি না পূর্বজন্মের কোন কর্মফলে তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল, সে কর্মফল অনেকদিন কেটে গেছে ...। আমি আমার স্বামীর। কায়মনোবাক্যে শুধু তাঁরই। জন্মান্তরে শুধু তাঁকে পাওয়ার সাধনা নিয়েই মরব। যাও তুমি আমার সম্মুখ থেকে, চাইনে তোমার মুখ দেখতে।"

উত্তরে অমর কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লীলা কহিল, "তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। আমার একটা কথা রাখতে পার না তবুও আমায় বড় ভালবাস, না? যাও তুমি—যেথা তোমার প্রাণ চায়। যেদিন ফিরে এসে আবার আমার পাশে দাঁড়াবে—একটু ছায়ার আশায়—একটু সান্ত্বনার জন্য, সেদিন মুখ তুলে চেয়েও দেখব না!"

বলিতে বলিতে চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া উন্মাদ-পাদক্ষেপে লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ অধোমুখে মৌন হইয়া কতক্ষণ কি ভাবিল। নিতান্ত অবোধের মত চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল। অমর বাধা দিল না। তারপর আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "হায়রে লীলা, তুইও তোর অমরদাকে ভুল বুঝে অবিচার করলি!—বোনের স্নেহাঞ্চল কি ভায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতেও ভয় পায়। তাই তুই আমায় দূরে ক'রে দিলি! বেশ আমি যাচ্ছি—আশীর্বাদ করি লীলা,—যেন সত্যি সত্যি আমায় ভুলতে পারিস্—প্রলয়ের পরে যে নবীন সৃষ্টিতে তোর জীবন সার্থক হয়েছে—সে সার্থকতার স্বর্গেই তুই থাকিস্।"

নয়নের অশ্রুরেখা মুছিয়া ফেলিয়া অমর নীচে নামিয়া আসিল।

অভিমান দমন করিয়া লীলা যখন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল, দেখিল গৃহ শূন্য—অমর চলিয়া গিয়াছে। উন্মাদিনীর মত দৌড়িয়া লীলা সিঁড়ির মুখে গেল, অমরকে দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল—অতি ধীর পদক্ষেপে অমর চলিয়াছে—অধোবদনে।

মুহূর্তে লীলার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "অমরদা, ফের, যেও না অমরদা।"

অমর তখন অনেকখানি চলিয়া আসিয়াছে। লীলার ডাক শুনিল কি শুনিতে পাইল না—পশ্চাৎ ফিরিয়া একবার চাহিল, কিন্তু ফিরিল না।

"অমরদা, অমন ক'রে চলে যেওনা অমরদা, আমি যে—"

লীলার চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। যতক্ষণ দেখা গেল লীলা অশ্রুচোখে চাহিয়া রহিল। অমর অদৃশ্য হইয়া গেলে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "অমরদা কেন তুমি চলে গেলে, কেন আমায় ভুল বুঝে বিদায় নিলে অমরদা। আমার মুখের কথাই কি তোমার কাছে বড় হ'ল—আমার অন্তরের কথা কি তুমি শুনতে পেলে না অমরদা! ফিরে এস অমরদা, আমি তোমায় আর বে' করতে বলব না অমরদা!"

ক্রন্দন থামাইয়া লীলা কতক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর সহসা চীৎকার করিয়া—অনেকদিন পরে আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

—শেষ—

জোলা-ইজম

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এমিলি জোলার মতবাদকে টেনিসন নাম দিয়েছেন—"জোলা-ইজম্"। জোলার লেখা প'ড়লে এক নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। বস্তু-তান্ত্রিক বিজ্ঞানের প্রাচীন মতবাদকে বদ্‌লিয়ে তিনি দিয়েছিলেন,—যাতে মানুষ সত্য ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে লড়াই করতে পারে। বিখ্যাত আমেরিকান লেখক আপটন্ সিনক্লেয়ারের মতে এমিলি জোলা ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে ডিমোক্র্যাসির ভাববাদী বলে পরিচিত হবার সম্পূর্ণ যোগ্য

বাল্যকালে বাপ-মা ম'রে যাওয়ার পর এমিলি জোলাকে দারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচতে হয়েছিল। কোন এক পুস্তক প্রকাশকের দোকানে বইয়ের বাণ্ডিল বাঁধতেন তিনি তাঁর প্রথম জীবনে, এবং নিজেকে লেখকরূপে গ'ড়ে তুল্‌বার জন্যে সারারাত লেখাপড়া ক'রতেন। অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় জীবন কাটালে কেমন লাগে, তা তিনি ভাল ক'রেই জানতেন। শীতের রাত্রে ঘরে আগুন জ্বালানো নাই—পয়সার অভাবে, বিছানাতে শুয়ে লিখতে লিখতে তাঁর হাতের আঙুল প্রচণ্ড শীতে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে;—তাঁর জীবনে এঘটনা এককালে অতি সাধারণ ছিল। জীবনে সফলকাম হ'তে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না, এবং খ্যাতি-লাভের জন্যে তাঁর উদ্যমও অনেক দিন ধ'রে ছিল। নিজের উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল এবং সেই অটল আত্ম-বিশ্বাসের বলে নিজেকে তিনি উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

তাঁর প্রথম বই (l' Assommoir) সম্বন্ধে তিনি ব'লেছিলেন: "নিজেকে আমি সমর্থন ক'রতে চাই না, আমার লেখাই আমাকে সমর্থন ক'রবে।" তাঁর প্রথম বই জনসাধারণের সম্বন্ধে লেখা এবং তাতে অসত্যের চিহ্নমাত্রও নাই। যে জীবনের সঙ্গে তাঁর নিত্য পরিচয় তার সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা তিনি দিয়ে গেছেন; ঠিক যেমন সে জীবন, তেম্‌নি তার ছবি এঁকেছেন—তার জন্যে ভয় বা লজ্জা করেন নি এবং সত্য ঘটনা, তা যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, ব'লতে তিনি পিছিয়ে আসেন নি।

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের আমলের সাধারণ পারিবারিক জীবন নিয়ে তিনি লিখতে চেয়েছিলেন কয়েক খণ্ড বই, সেই 'ছোট' নেপোলিয়নের রাজত্ব কালের কাহিনী নিয়ে;—যে কালে ভিক্‌তর হিউগোকে নির্ব্বাসনে পাঠানো হয়েছিল এবং শক্তিমান ফরাসী অভিজাতবর্গ তাদের হাতের পুতুল সম্রাট নেপোলিয়নকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। দুজন লোককে তিনি দেখিয়েছিলেন, যাদের বংশধরদের মধ্যে সঙ্গতিসম্পন্ন দলটি অন্যের পয়সা লুঠে নিয়ে স্ফূর্ত্তি ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছিল এবং যারা দরিদ্র, তারা মদ খেয়ে ক্রমান্বয়ে নেমে যাচ্ছিল—সমাজ ও মনুষ্যত্বের ক্রম-নিম্নস্তরে।

কয়েক বছর ধ'রে সমালোচকদের কুদৃষ্টিতে প'ড়ার জন্যে এই বইগুলি সাধারণের অনাদর পেয়েছিল। তারপর প্রকাশ পেল—উক্ত বইখানি—যার মানে বাঙলাতে 'কসাইখানা' (l' Assommoir)। এই বইয়ে তৎকালীন প্যারিসের শ্রমজীবীদের একটি পাড়ার কাহিনী বলা হ'য়েছে,—যেখানকার বাসিন্দাদের প্রতি-নিয়ত তাদের অধঃপতনের দিকে লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একটি দরিদ্রা রমণী—যে পেটের দায়ে ধোবিখানাতে ক্রীতদাসীর মত খাটে, তার স্বামী—একজন রংএর কারিগর এবং তাদের একপাল হতভাগ্য সন্তান—এই গল্পের পাত্র-পাত্রী। বাড়ী রং ক'রতে গিয়ে উঁচু থেকে পা ফস্‌কে নীচে প'ড়ে স্বামীর অপমৃত্যু হ'ল,—ঘটনাটির বর্ণনা কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। তাদের ছোট্ট মেয়ে 'নানা'—তার বাপ-মায়ের হেয় জীবনযাত্রা দেখে এসেছে জন্মাবধি এবং তাই তাকে জীবনের অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে।

জোলার বই-এ ষ্টাইলের বাড়াবাড়ি নাই। বর্ত্তমান জগতের দৈন্যের ইতিহাস ব'লে তাঁর রচনা পাঠককে উদ্বিগ্ন করে। তাঁর রচনার মধ্যে এমনি সব ঘটনার উল্লেখ আছে—যা প্রাণস্পর্শ করে এবং কোনমতেই উপন্যাস ব'লে এ সমস্ত কাহিনীকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জোলার বই-য়ে প্রধান চরিত্রের বাড়াবাড়ি নাই, প্রধান চরিত্র বল্‌তে সেখানে যাকে পাওয়া যায়—সে যেন আমাদেরই মত লক্ষ কোটি উৎপীড়িত মানবের একজন। তাঁর 'নানা' (Nana) বইয়ে পতিতা বৃত্তি তিনি দেখিয়েছেন—কসাইখানার সেই ছোট্ট মেয়েটিকে এখানে আমরা দেখি বীভৎস অথচ করুণ মূর্ত্তিতে। শ্রমজীবীর মেয়ে ধনীদের কৃপায় পরিণামে কি অবস্থায় এসে পৌঁছায়—এই বই-য়ে তা আমরা দেখতে পাই। সে জীবনে সব পায়, খাদ্য, বস্ত্র, মণিমুক্তা সব কিছু; জীবন কাটায়—এক বিরাট উৎসবের মধ্যে। কিন্তু মৃত্যু হয় তার—নিতান্ত করুণভাবে। ঘরে 'নানা' বসন্ত হ'য়ে মারা যাচ্ছে,—আর পথে উন্মত্ত জনতা চীৎকার ক'রছে, 'বার্লিনে চল, বার্লিনে চল'—ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ তখন লেগে গিয়েছে।......যুদ্ধ সম্বন্ধে জোলা এই সময় একখানি বই লেখেন নাম তার—"দি ডাউন ফল"। যুদ্ধের বিভীষিকা তাতে স্পষ্ট ক'রে তিনি দেখিয়ে গেছেন।

মনুষ্যত্বের আদর্শ তিনি মান্‌তেন্। তাঁর রচনা প'ড়লে সেটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তিনখানি বড় উপন্যাস—'লাউর্‌ডেস', 'রোম' ও 'প্যারি'তে তিনি দেখিয়েছেন—গীর্জ্জাকে বংশানুক্রমিক সুবিধার বনিয়াদ রূপে। তাই জোলা-ইজম বা জোলার মতবাদ মূলতঃ সাম্যবাদের পূর্ব্বরূপ।

তারপরে এল কুখ্যাত 'দ্রেইফু' মোকদ্দমা। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, কিন্তু সৈন্যদল তখন রাজতন্ত্রবাদী ও চার্চ্চের কর্তৃত্বাধীনে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ধার্ম্মিক অভিজাত, অর্থের বিশেষ অনটন বশত সৈন্যদলের গোপন সংবাদ জার্ম্মানীকে অর্থের বিনিময়ে দিতে লাগলেন এবং এই ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হ'য়ে গেল। নিজেদের বাঁচাতে তাঁরা সব দোষ অশ্বারোহী সৈন্যদলের এক অফিসারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রলেন। ক্যাপ্টেন দ্রেইফুর শাস্তি হ'য়ে গেল 'ডেভিলস্ আইল্যাণ্ডে' তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'ল। আর একজন অফিসার, যে সত্য ঘটনা প্রকাশ ক'রে দ্রেইফুকে বাঁচাতে চেষ্টা ক'রেছিল—তাকে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশে কর্ত্তব্যের অজুহাতে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

এই ঘটনার দেড়শ' বছর আগে আর একজন ফ

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য অমর একটি গাছের পাশে লুকাইল। দেখিল, তাহারা আস্তে আস্তে সন্তর্পণে আসিয়া গোলাবাড়ীর প্রাচীরটা টপ্‌কাইবার চেষ্টা করিতেছে। অমরের দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রহিল না- ছুটিয়া গেল তাহাদের দিকে, একটু গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, হ্যাঁ, আমারই বাবা। শরীর তাহার কাঁপিতে থাকে।

একবার ভাবে, ফিরিয়া যাইবে সে। নাঃ তার কর্ত্তব্য, এরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে কি করিয়া......লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরে, আগাইয়া যায়--তাহাদের সম্মুখে পথ আটকাইয়া দাঁড়ায়।

বাপ-ছেলের দৃষ্টি মাঝ পথে মিশিয়া এক হইয়া যায় ক্ষণিকের জন্য......দু'জনের চোখেই জল! সকলেই মৌন হইয়া যায়!

অমরের বাবা সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন, জড়াইয়া ধরেন অমরকে তাঁহার কম্পমান হাতখানি দিয়া! সেই জ্যোৎস্না-রাত্রিতেও দেখা গেল তাহাদের গণ্ডদেশে তাহাদের চোখ থেকে ঝরে-পড়া ক'ফোঁটা জল!

......"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আমি—আমিই চুরি করতে এসেছি—জোগাড় করতে নিজের মুখের খাবার......ধরা পড়েছি নিজের ছেলেরই কাছে......অপমানের চেয়ে আনন্দ বেশী পেলাম আজ তোকে ফিরে পেয়ে......যাক্ নিয়ে চ' আমাদের। জমিদারের কাছে, চোর ব'লে চালান দে......পাপের প্রায়শ্চিত্তির হবে জেলে গিয়ে......খেতে পাব দু'মুঠো দু'বেলা, তোরও কর্ত্তব্য শেষ হবে সেখানে......"আর বলিতে পারেন না, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়েন মাটিতে। অমরের লাঠিখণ্ড কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যায় তাহার পার্শ্বে।

অমর হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। চোখ বুজিয়া দেখে—অতীত জীবনের ঘটনাবলী আর একবার!

ভাবে, এই তো সংসার! তার কর্ত্তব্য? *

---

* কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

গান

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মাটির প্রতিমা জেনে
চাহিনি তোরে,
পূজার দুয়ার হ'তে
গিয়াছি স'রে।

আবার দেবতা ব'লে
এসেছি চরণতলে
নিয়েছি প্রসাদ তব
তিমির ঘোরে।

পূজারী গেয়েছে যবে
বরণ-গীতি,
নীরবে হেসেছি আমি
একেলা নিতি।

আমার বীণার তানে
ছুটেছি মা তোর পানে,
পূজেছি আঁখির জলে
রজনী ভ'রে॥

আমাদের দুরন্ত ছেলেমেয়ে

শ্রীরঞ্জন গুপ্ত

ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ!

ঘরবাড়ী চোখে পড়ে না কোথাও একটি। সারা শহর জুড়ে মশা-মাছি পোকা-মাকড়ের রাজত্ব। জাপানীদের হমলার খবর রটে যেতেই যে যার লোটা-কম্বল নিয়ে দিয়েছে চম্পট। বাকি যারা ছিল, তাদের বেশীর ভাগই বিষম জাপানী-বোমার দাপট সমঝে নিয়েছে পুরোপুরি। নিতান্ত নির্লাজের মত তবু যারা রইল সচল মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী দাঁড়াবার পরও, জাপানীদের নিপীড়নের ভয়ে তারাও শেষটায় পালিয়ে গেল মুলুক ছেড়ে, পাহাড়ের গুহায় আর বনে বাদাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবার আশায়। জাপানীরা ঢুকলো এসে যেন চিতাভস্মপুঞ্জের এক শ্মশানে।

শহরটার কঙ্কালের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে দু'একজন নেহাৎ অচল বৃদ্ধ—যেমন ঘুরে বেড়ায় ভীরুপদে পথের কুকুরগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ম্রিয়মাণ হয়ে। অনাহারেই প্রায় কাটাতে হয় বৃদ্ধদের—যা কিছু পয়সা-কড়ি ওদের ছিল, জাপানীরা নিয়ে গেছে কেড়ে। দোকানীর পণ্য-পশরা সব কিছুই ভাঙা-বাড়ীর ইট-পাটকেল পুঞ্জের সঙ্গে মিশে আছে। আর মিশে আছে তারই রেণুতে রেণুতে গলিত শবের বিকৃত সত্তা। ক্ষেতে এবার আর বীজ বোনবার ফুসরৎ মিলে নি। তার বদলে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বোনা হয়ে আছে দুষমনদের অফুরন্ত বোমা।

বিদীর্ণ হোনিয়াংটনের নগ্ন পঞ্জরের উপর দিয়ে যখন জাপানী সেনার সদম্ভ পদক্ষেপ মুখরিত করছে চার পাশের ধ্বংসস্তূপ—দলের সেরা যোদ্ধারা যখন আবরণ অবরোধহীন সে জীর্ণস্তূপের কাননে বিজয়োল্লাসে নিমগ্ন, তখনই কোথা হতে অকস্মাৎ পঙ্গপালের মত চড়াও হল এসে চীনা-ফৌজ। অজানিত আচমকা সে পাল্টা আক্রমণের তোড়ে জাপানী দল হল ছত্রভঙ্গ; এলো-মেলোভাবেই পালিয়ে তারা প্রাণ বাঁচালো তারপর আগলে বসলো চীনা-সেনা হোনিয়াংটনে।

শহর বলে ওটাকে চিনবার আর উপায় নেই। সে তল্লাটে জন-মনিষ্যির চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত। বাড়ীঘর নিঃশেষে পরিণত ধূলিমুষ্টিতে আর রাবিশ ঢিবিতে। আশ্রয় পাবে কোথা তারা মাথা গুঁজবার—উন্মুক্ত আকাশের তলে রাস্তার পাশে পাশে, ঢিবির ধারে ধারে আস্তানা গেড়েই তৃপ্ত থাকতে হয় চীনা-ফৌজের।

অনশন-শীর্ণ বৃদ্ধ দু'-একটি ঘুরে বেড়ায়......

তের বছরের বালক থেকে পঁয়তাল্লিশের জোয়ান অবধি পুরুষ যাকে বলা চলে—সে-ই যাত্রা করেছে দেশ রক্ষায়; দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে তারা দেবে না বিকিয়ে স্বাধীনতা—বিদেশী দুষমনের পায়ে। তাই আজ ডাক পড়েছে দেশের মেয়েদের।

নারী জাতি আমরা—আমরা না পারি কি? জাতির আহার যোগাবার ফসল উৎপন্ন করবো আমরা—শ্রমিকের কাজ করবো আমরা; আবার পুরুষদের উৎসাহ দান, সে কাজটিও আমাদেরই। সময় নেই ভাববার—অবকাশ নেই হা-হুতাশ করবার—নিমেষও সেখানে হেলার নয়, জাতির অস্তিত্বই যেখানে সংকটের কালো ছায়ায় ঢাকা। উঠে পড়ে লেগে গেলাম আমরা আমাদের কঠোর সে কর্তব্যে। সমুখে রয়েছে তখন দুটো মস্ত বড় কাজ আর সবার আগে। প্রথমটি হ'ল—আমাদের সৈনিকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা রাখতে হবে অটুট। আর অন্যটি হ'ল—জাপানীদের নির্মম অত্যাচারে ঘরবাড়ী ছেড়ে পলাতক হয়েছে যারা তাদের ভরসা দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই আমরা শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। চীনা-ফৌজের সে অনাবৃত ডেরা-ডাণ্ডা খুঁজে বার করতে দেরি হয় না মোটেই। সাধারণ সেনা থেকে সেনাধ্যক্ষ পর্যন্ত সবাইকে আহ্বান জানাই আমাদের সভায়। প্রথম দিনের সভায়ই তাদের শেখান হয়—দুটি জাতীয় সংগীত। সেদিন থেকে মৃত হোনিয়াংটনের নির্জীব পথ-ঘাট নবজন্মের সার্থকতায় মুখরিত হয়ে উঠলো—সজীব চঞ্চল হয়ে উঠলো চীনা-ফৌজের একতান জাতীয় সংগীতে।

রাস্তায় রাস্তায় ভাঙা দেওয়ালের গায়ে প্রচার বিভাগের মেয়েদের তুলির টানে ফুটে উঠলো আশার বাণী নিয়ে সব অপরূপ ছবি—ওরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত দলে দলে তা-ই তাকিয়ে দেখতে।

পুরানো দিনের পুঞ্জ পুঞ্জ স্মৃতি-লেখা বুকে আঁকড়ে ধরে 'কোয়ান্তি' দেবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে অবিচলভাবে গাছের সারিতে ঘেরাও হয়ে। আমাদের সভার অধিবেশন হ'ত এই মন্দিরেরই প্রাঙ্গণে। অতীত যুগের আদর-সোহাগ মাখা এ যুদ্ধ দেবতাটি শতেক বছরের ভিতরও এত লোক একসঙ্গে জমায়েত দেখেনি তার দ্বারে।

সে ছিল প্রথম দিনের সমবেত জনতা। মন্দিরের চত্বরে—উঠানে চীনা-ফৌজে ভর্তি হয়ে গেল সভা আরম্ভ হবার ঢের আগেই। দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু অবধি আর না পেয়ে কেউ উঠলো গিয়ে গাছে, কেউ বা পাঁচীলের ওপরে। চীনের জাতীয়ত্ব সেদিন মূর্তি ধরে জেগে উঠলো বক্তার বাণীকে কেন্দ্র করে। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হল উষ্ণ রক্তস্রোত—মুখে মুখে ঝংকৃত হ'ল চীনের জাতীয় সংগীত।

এই মন্দিরেই আমাদের প্রচার বিভাগের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত করা হ'ল।—যাতে ফৌজের সবাই এসে আমাদের সাপ্তাহিক মাসিক পত্রগুলি পড়তে পায়—দু'দণ্ড যাতে বসে গল্প-গুজব করে প্রাণটা হাল্কা করবার, চাঙা করে তোলবার সুযোগ পায়।

এমনি করে সারাদিনটাই কোথা দিয়ে কেটে গেল। এল সন্ধ্যা। ওরা আবার ফিরে এসে হাজির মন্দিরে দেশের খবর জানাবার জন্য আকুল আগ্রহে—আর প্রাণ ভরে শুনতে সে কাহিনী, চীনের আজ যে দিকে দিকে এসেছে অপূর্ব জাগরণ, তারই। সেদিনকার পালা সাঙ্গ করে ঘুমাতে যখন গেলাম, ভোর হতে তখন আর বেশি দেরি ছিল না।

পরের দিন ভোর বেলা। আজ আর আমাদের ফৌজ নিয়ে কাজ নয়। ঘরহারা পলাতকদের খোঁজ করতে হবে, তাদের অন্তরে আস্থা স্থাপন করতে হবে, তবে না তারা নির্ভয়ে ফিরে আসতে চাইবে। জাপানীদের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব রেখে গেছে যে বিভীষিকার নিদারুণ ছাপ ওদের মনের দেওয়ালে, দরদের স্নিগ্ধ হস্তে তা মুছে ফেলতে হবে হাসি দিয়ে—গান দিয়ে—আশার বাণী দিয়ে। সে

...ষের কাজ! কত আশ্বাস—কত অনুনয়—কত প্রশংসার ...তে প্রলেপ, তবু কি তারা রাজি হয়। পর পর কদিন ধরে আমাদের সমগ্র দলের প্রাণপাত প্রচার—অবশেষে তারা সম্মত হল সভায় যোগদান করতে। এল বটে তারা কিন্তু অতি ভয়ে ভয়ে, আবার না জানি কোন্ তাণ্ডবের দোলায় হাবুডুবু খেতে হয়। সভায় সেদিন যে উত্তেজনা দেখা গেল, তাতে আর বিফলতার ছায়া রইল না আমাদের বুকে। বিরাট সে সভা জাঁকিয়ে তুলেছিল এ অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাওয়া যত চাষীর দল জুটে। আমাদের অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করলো—দুঘণ্টার এ মিলন-মায়া। সেই পুরাতন পড়শী—সেই পুরাতন মিত্র বন্ধু—সেই চির আত্মজন, কতদিনের নিষ্করুণ বিচ্ছেদের পর প্রথম সাক্ষাৎ! মিলিত জয়োল্লাসের ভিতর স্থির হয়ে গেল—আর তারা থাকবে না ঠাঁই ঠাঁই—আর তারা থাকবে না গা-ঢাকা দিয়ে। হৃদয়ে হৃদয়ে—আবেগে আবেগে সে মিলন এক অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য!

সারা হোনিয়াংটন জুড়ে চলেছে চঞ্চলতার সাড়া—নতুন করে ঘরবাড়ী বাঁধা—নতুন করে আস্তানা পাতা। চারিদিকে বিপুল উৎসাহ। চাষী আর চুপ করে বসে নেই, লেগে গেছে ক্ষেতের কাজে, মুদী তার নিরলস হস্তে সাজাচ্ছে তার নতুন আমদানী করা পশরা। যে জীবন-স্রোত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল একদিন জাপানীদের নিষ্ঠুর অভিযানে, পলায়নের ছেদের পর আবার সে লাভ করলো নতুন করে গতানুগতিক সহজ ধারাটি।

ভেবেছিলাম এতকালের পর হয় তো কঠোর কর্তব্য খতম করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পাব। কিন্তু তা হ'ল না। গ্রামে ফিরে আসবার প্রস্তাবের সূচনাতেই ওরা জানতে চেয়েছিল, ওদের ছেলেমেয়েদের ভার আমরা মাথা পেতে নেব কি না। এ প্রশ্নের জন্য তখন অবশ্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এ সকল ৯।১০ বছরের ছেলেদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সমিতি খোলবার কথা ভেবে দেখিনি তো কোন দিন। হঠাৎ মনে ইচ্ছে হয়েছিল বলে ফেলি—'পারবো না ভাই! এতটা সময় আমাদের কই!' কিন্তু মুহূর্তে মাথায় এল—তাই তো! প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ তো নয়। এদের নিয়ে দল একটা গড়তে যদি সুরু করি—আমাদের মনের মত শিক্ষায় যদি মানুষের মত মানুষে পরিণত করতে পারি, তা হলে সে-ই যে বড় কাজ। এরাই তো চীনের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা!

এই যে দুরন্ত বেপরোয়া খুদে-বীরের দল—তাদের রম দুর্গতির বুকভাঙা অভিজ্ঞতা—আমাদের দলে ভর্তি বার তরে তাদের অদম্য ডান্‌পিটেপনার ইতিহাস দিনের আলোয় মুক্ত হবে সেদিন, যেদিন চীন জাতি এ অপার-সংকটে ...ল পেয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে। সেদিন সারা বিশ্ব বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে দেখতে পাবে চীনের এ খুদে ছন্নছাড়া দলের নিজস্ব মূর্তি!

একদিন সকালে একটি ১১।১২ বছরের ছেলে মন্দিরের ...ঠানে এসে ঢুকলো। তারপর সামরিক কায়দায় অভিবাদন ...রে দাঁড়িয়েই রইলো। আমরা অবাক। চেন্-ইউয়েন মিন্ ...ন্তু ওকে চিনতে পারলে—এই ছেলেটি না কাল সভায় চমৎকার গান গেয়েছিল! জাপানীরা এ জায়গা দখল করার আগে ও পঞ্চম মানে পড়ত। জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি যে এসেছ তোমার বাবা জানেন?" এ কথার উত্তর দেওয়াও ও দরকার মনে করলে না। শুধু নির্বাকে তাকিয়ে রইল। এমন বাক্‌হত প্রতিরোধ জীবনে আর দেখিনি এর আগে। ওকে নিতে হল দলে। চেন ওকে রোজ গান শেখাতে লাগলো। এমনি করে কিছু দিন বাদে নিজের দলে জুটিয়ে নিল ওরই মত সব ছন্নছাড়াদের। দল তৈরী করে নিয়ে কাছাকাছি গ্রামে গিয়ে গান গেয়ে জানিয়ে দিয়ে আসত অভয়-বাণী গ্রামবাসীদের।

ছোটদের দলের দ্বিতীয় নেতাও অনেকটা সেই-ভাবেই এসে দলে ভর্তি হ'ল। বিকেলের দিকে একলা বসে আছি, হঠাৎ দেখি আমাদের খুদে দলের নেতা ছেলেটি ঢুকছে সঙ্গে আর একটি তের বছরের ছেলে। জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে তার নাম চ্যাং পাই-সুন আর আমাদের দলে ঢুকবে বলেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে।

ছোটদের দলের প্রথম নেতা অল্প কথায় ওর পরিচয় দিলে। চ্যাং দুবার বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে আর এবার আমাদের দলে ভর্তি হবে বলে তিশ মাইল হেঁটে এসেছে। আমরা দলে না নিলে ও আবার পালিয়ে যাবে, ওর বাবা কিছুতেই আটকাতে পারবে না। কিন্তু বাপ-মার অমতে আমরা যে ওদের দলে নিতে পারি না, একথা বলা সত্ত্বেও ও দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চলভাবে। শেষে ওকে থাকতে অনুমতি দিতে হল। চেন ওকে প্রচার বিভাগে ভর্তি করে নিলে।

... ...

কয়েকদিন বাদে হোনিয়াংটনের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ওর পরিচয় পাওয়া গেল। জাপানীদের উড়ো-জাহাজ বোমা ফেলতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। তার কিছুদিন বাদেই জাপানীরা এসে দখল করলে এ জায়গা। চ্যাং চীৎকার করতে লাগল "জাপানীরা ধ্বংস হোক", মার চোখের জল ও তার বাবার আদেশ দুটোই ব্যর্থ হল, তারপর সে পালিয়ে যায় সৈন্যদলে ভর্তি হবে বলে। বয়স কম বলে তাকে নেয়নি—তাই এসেছে আমাদের এখানে। "আমাদের মনে হয়" মাষ্টার মশাই বললেন, "আপনারা দলে নিলে ওর বাপ-মা আপত্তি তো করবেই না, বরং ভবঘুরে না হয়ে যে দেশের কাজে লেগে যাবে, তাতে খুশীই হবে।"

... ...

শ্যাং নামে আর একটি ছেলে—তার কাণ্ড-কারখানাও এদের চেয়ে চমকপ্রদ কম নয়। আমাদের দলে না ঢোকা অবধি স্বস্তি ওর নেই। আর সেকথা ওর বাবাকে এমন করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ওর সঙ্গে ওর বাবাও এসে হাজির, নিজ চোখে দেখে যাবার জন্যে কেমন ধরণের কাজ আমরা করছি, আর আমাদের উদ্দেশ্যটাই বা কি। ওরা দুইজনে হেঁটে হেঁটে পেরিয়ে এসেছে কি সোজা পথ—একেবারে পাকা পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা।

ছেলেটির চোখে-মুখে ছিল এমন একটা লাজুক

কোমলতার ছাপ, যার জন্যে মনে হ'ল আমাদের—একটি মেয়েই বুঝি হাজির হয়েছে এসে আমাদের সমুখে।

শ্যাংয়ের বাবা নমস্কার করে বললে, "আজ সেদিন আর নেই, এখনকার ছেলেরা ঘরে থাকতে ভালবাসে না—ভালবাসে না বাপ-মার আদর যত্নের বন্ধকারায় বেঁচে থাকা। গত বছর লালফৌজ দলে ভর্তি হবার ভয় দেখাল। কয়েকদিন কি সাবধানেই কাটাতে হল—রাখতে হ'ল চোখে চোখে।

৩।৪ মাস আগে পাঁচ ডলার চুরি করে সিয়ানফু যাবে বলে পালাল। ওর কাকা হঠাৎ ষ্টেশনে দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কাল ও খবর পেয়েছে যে, আপনারা এখানে এসেছেন। আবার ও পালাবার চেষ্টা করে। প্রথমে ভেবেছিলাম দুষ্ট ছেলেটাকে তালা বন্ধ করে রেখে দেব। পরে পাড়া-পড়শীর মুখে আপনাদের রকম-সকম শুনে নিজেই নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। আমার শুধু একটি প্রার্থনা যেন মাঝে মাঝে চিঠি লিখে ও খবর দেয় কেমন আছে।"

শ্যাংয়ের মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলাম এই ভেবে যে, ওদের কচি প্রাণে বাইরের ডাকের সাড়া এমন করে জাগলো কি করে! তারপর ওর বাবা আমাদের ছোটদের দল দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল বাড়ীতে। আর সেই ছোট শ্যাং তার পরের দিনই দেওয়ালের গায়ে বড় বড় পোষ্টার এঁটে দেবার কাজে লেগে গেল বেজায় উৎসাহে।

এর পরে যে এসে আমাদের দলে যোগদান করল তার নাম লি-চ্যাং লিন। দেখতে ছোট হলেও এর জন্যই আমাদের সব চেয়ে বেশী ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ল। লিকেও নিয়ে এল তার বাবা; কিন্তু ছেলেকে রেখে বাড়ী ফিরে যেতে তার মন সরে না, আজ না কাল করে রয়ে গেল দুদিন। পরদিন রওনা হ'ল কিন্তু দুপা এগিয়েই আবার ফিরে এসে উপস্থিত, তার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে। লি কিন্তু কিছুতেই যাবে না—বাপ তাকে যাবার কথা বলতেই হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। ওর বাবা এই দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লো; চুপ করে একটু দূরে সরে গিয়ে নিরালায় বসে কাঁদতে লাগলো।............

আমাদের মধ্যে দু'একজন গিয়ে ওঁর কাছে বসে চীনের উপস্থিত সংকট ও ছোটদের সামনেও যে বিরাট দেশের কাজ পড়ে রয়েছে সে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝাতে লাগলে। লিকেও অনেক বোঝান গেল। তা হলে হবে কি ও শুধু বলে বাড়ী ফেরার চেয়ে এখানে কাজ করতে করতে মরে যাবে সেও ভাল, তবু বাড়ী ও ফিরবে না। আর কিছু করবার ছিল না—লিয়ের বাপকে যখন ইচ্ছে এসে দেখা করতে পারবে বললাম। উপায়ান্তর না পেয়ে বৃদ্ধ উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হল, কিন্তু বেশ মালুম হ'ল—প্রাণটি এখানে রেখে শূন্য দেহ বয়েই সে চললো ঘরমুখো। যায় আর ফিরে ফিরে তাকায়। আমাদের ভয় হল—এই বুঝি বৃদ্ধ আসে ফিরে।

দিন সাতেকের মধ্যেই কিন্তু লিয়ের বাবা আবার ফিরে এল। আর আমাদের সামনে নিরুপায় শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। লিয়ের বাবা—ওরা চার ভাই; কিন্তু লিই বংশের একমাত্র ছেলে; সুতরাং বংশরক্ষার ভরসা একমাত্র তারই উপর। তাই জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পাছে ও একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে এই ভয়ে বাপ-খুড়োরা ছেলের অমতে চলতে পারে না। ব্যাপার সঙিন্—এমন ছেলের প্রাণে আঘাত দেওয়া বাপ-মার কলজেয় সইবে কি করে!

আবার বলি সবাই লিকে ওর বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে। কিন্তু আমাদের সমস্ত অনুরোধ উপরোধের উত্তরে ও শুধু বলে, "কেন আমাদের অসহায় পশুর মত জাপানীদের হাতে জবাই হতে তাড়িয়ে দিচ্ছেন বলুন তো? মুখ বুজে কাপুরুষের মত মরি—তাই কি আপনারা চান,—না, মানুষের মত, বীরের মত আমরা যুদ্ধ করে মরব এটাই আপনাদের কাম্য?"

এর উত্তরে বলবার মত আমাদের কিছু ছিল না। তাই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে আবারও একলাই ফিরতে হল।

এর পর প্রায় ৬।৭ সপ্তাহ কেটে গেছে। এর ভেতর লিয়ের বাবা আর আসেনি। জরুরী খবর এসেছে ইউয়ানচেন শহর আমাদের দখলে এসেছে। আমাদের আগেভাগে সেখানে যেতে হবে। ভোরে গাড়ী ছাড়বে রাত্তিরেই পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে তৈরী হয়ে নিতে হল।

ষ্টেশনে এসে দেখি লিয়ের বাবা দাঁড়িয়ে। আমরা চলে যাচ্ছি খবর পেয়ে ছেলেকে বিদায় দিতে এসেছে, গার্ড বাঁশী বাজাতেই গাড়ীর কাছে এসে বললে, "লি! তুমিই ঠিক বুঝেছ! তবে যাও, যাও, আর তোমায় বাধা দেব না। আমি বুড়ো হয়েছি, শরীরও দুর্বল। জাপানীরা হয়তো এসে আবার এ জায়গা দখল করবে। আর হয়তো এ মাঠে ফসল ফলবে না। আমরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেব। জাপানী-দের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। আর সব সময়েই মনে রেখ তোমার ঠাকুর্দার তুমিই একমাত্র বংশধর। আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ তোমার উপরই নির্ভর করে।

বৃদ্ধের চোখে জল আসে অথবা হয়তো আমারি চোখের ভুল—চারদিকে হয়তো কুয়াশা। আমাদের ট্রেন চলতে সুরু করে। লিয়ের বাবা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে থাকে শহরের দিকে। হোনিয়াংটনের সব কিছুর ওপর ধীরে ধীরে আবছা কুয়াশার ঝিলমিলি নেমে আসে।

নিবিড় কুয়াশা চারিদিকে। যেদিকে তাকাই দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। সারা চীন যেন কুয়াশায় কুয়াশায় ছয়লাপ! কিন্তু এ কুয়াশার আঁধারে যে নিয়ে চলেছি এত-গুলি কচি বীর-প্রাণ—ওদের এই যে অতিরিক্ত দায়িত্ব অনিচ্ছায়ও বইতে হচ্ছে আমাদের ঘাড়ে—পরিণাম তার কি এমনই ঘোর ঘন-কুয়াশায় ঢাকা! কেমন একটা হতাশার সঙ্গেই তাকাই এই খুদে বীরদের দিকে—তাদের সপ্রভ উজ্জ্বল মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ, চোখে রয়েছে শত আশার অনির্বাণ দীপ! মুহূর্তে আমাদের মনের ময়লা কেটে যায়—আমরাও ঘোর আশাবাদী হয়ে পড়ি। না—এমন দেবশিশু-দের সরল প্রাণের আকিঞ্চন কোনদিন ব্যর্থ হবার নয়।

* বিখ্যাত চীনা কথা-সাহিত্যিক তিং লিং-য়ের 'Our Children'য়ের চিঠিও মারফত ইংরেজী অনুবাদ হইতে।

পেটিকোট নিংড়াইয়া সোনা প্রাপ্তি

মেক্‌সিকোর জাকাটেকা স্টেট পুরাতন খনি-বহুল কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। উহার সুম্বরেরিট্ অঞ্চলে একটি অগভীর স্রোতস্বতী রহিয়াছে, যাহা গর্দভ-পৃষ্ঠে অতিক্রম করা যায়। মেরিয়া হারনাণ্ডেজ নাম্নী এক কুঞ্চিত-চর্মা, ধূমপানকারিণী, ভাগ্যান্বেষিণী মহিলা একদিন ঐ স্রোতস্বতী পার হইবার সময় গর্দভ-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হয়। উপরে উঠিয়া আসিয়া সে দেখিতে পাইল তাহার পরিচ্ছদে ও সর্বাঙ্গে স্বর্ণরেণু আচ্ছাদিত।

তাহার এই আবিষ্কারে ৫০০০ নরনারী ঐ স্থানে ছুটিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রতিদিন ঐ স্থান হইতে প্রচুর স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করিতেছে। নারীগণ পর্যন্ত নদীতীরের ও স্রোতস্বতী-তলের বালুকা খালি হাতে ঘাঁটিয়া প্রতিদিন ৭ পাউন্ড করিয়া স্বর্ণরেণু উত্তোলন করিতে পারে

ফলে সে স্থানের সকল জিনিষের দর চড়িয়া গিয়াছে—হোটেলের শয্যার ভাড়া এক রাত্রির জন্য ১ পাউণ্ড ; রুটির দাম—দেড় শিলিং প্রতিখানা ; এক কাপ চা বা কাফি—অর্ধ-ক্রাউন ; শূকের মাংস ও ডিমের জন্য পড়ে ১২ শিলিং ; দাড়ি কামান—৩ শিলিং, চুল ছাটাই—৮ শিলিং।

এক তরুণী ঐ নদীতে যাইয়া অনায়াস লভ্য স্বর্ণদ্বারা ধনী হইতে এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, অতি দ্রুত নদীতল হইতে বালু আঁজলা আঁজলা তুলিতে যাইয়া জলেই পড়িয়া যায়। তাহাকে তুলিয়া আনা হইলে তাহার হস্তপদ সোনালী হইয়া গিয়াছে দেখা যায়। তাহার স্কার্ট এবং পেটিকোট ধুইয়া যে স্বর্ণরেণু পায়, তাহা ১০ পাউন্ড মূল্যে বিক্রয় হয়।

ইংলণ্ডরাজের পতাকা-রক্ষক

রাজা যখন লণ্ডনে পদার্পণ করেন, হাজার হাজার লোক রাজপথে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া যায় রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে—কিন্তু একটি লোক সে কার্যে যোগদান করিতে পারে না—সে থাকে বাকিংহাম প্রাসাদের ছাদে—নিরালা পাহারায়। দুর্যোগে আর সকলেই হয়ত মাথা গুঁজিতে যায় কক্ষ মধ্যে ; কিন্তু ঐ একাকী প্রহরী তাহার ঐ সু-উচ্চ কর্মস্থল ছাড়িয়া নড়িতে পায় না এক পা-ও। সে আর কেহ নহে, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের পতাকা-রক্ষক। রাজা যখন প্রাসাদ তোরণে প্রবেশ করিবেন, তখন প্রাসাদ-শিরের ঐ রাজকীয় পতাকা নমিত করিয়া ধরা ঐ প্রহরীর কর্তব্য কার্য।

ওয়েলস্ গার্ডের ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট মেজর জি এইচ জোনস্ এই পদে নিযুক্ত। তুষার বৃষ্টিতে অন্ধপ্রায় হইয়া, ঘন কুয়াশায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া, কিম্বা ঝটিকার প্রাবল্যে প্রায় শূন্যে ভাসমান হইয়া তাহাকে পাহারায় থাকিতে হয়। প্রবল ঝড়ের ভিতর ৭৫ ফুট উচ্চ স্তম্ভে জড়াইয়া যাওয়া নিশানটিকে খুলিয়া বিস্তৃত করিয়া রাখিতে হয় তাহার। ইহাই শেষ নয়, রাজকীয় পরিবারের প্রত্যেকের সম্মানার্থই একটি করিয়া পতাকা রহিয়াছে। একুনে ৪০টি পতাকার তত্ত্বাবধান করিতে হয় এই পতাকা-রক্ষককে। ঝড়ের প্রকোপে পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন হয় বলিয়া প্রতিটি পতাকা এক বৎসরে ২০ বার পরিবর্তিত করিতে হয়।

হিন্দু-হোটেলে হরিজনের প্রবেশাধিকার

করাচী করপোরেশনে এক প্রস্তাব এই মর্মে গৃহীত হইয়াছে যে, করাচীর যে কোনও হিন্দু হোটেলে হরিজন-দিগের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকিবে। কোনও হোটেলওয়ালাই হরিজন বলিয়া কোনও ব্যক্তিকে হিন্দু হোটেলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতে অথবা বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা কালে প্রকাশ পায় যে, একজন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরকে সম্প্রতি কোনও হিন্দু হোটেলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। সুখের বিষয় বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত প্রবেশাধিকারের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রবেশাধিকারের নিয়মাবলী গঠনের জন্য চীফ অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সুন্দরী তরুণীর চশমা কাড়িবার বাতিকগ্রস্ত দুষমন্

নিউইয়র্কের চল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি কিছুতেই সুন্দরী তরুণীর চোখে চশমা পরিধান বরদাস্ত করিতে পারে না। যখনই সে দেখিতে পায় কোনও তরুণী অপেক্ষাকৃত আঁধার বা স্বল্পালোকিত রাস্তায় যাইতেছে এবং উহার নাকে রহিয়াছে চশমা, অমনি সে ছুটিয়া গিয়া তরুণীর নাক হইতে চশমা কাড়িয়া লয় এবং অগোণে দৌড়িয়া পালায়। দুই বৎসর ব্যাপিয়া ঐ ব্যক্তির এই অদ্ভুত আচরণ চলিতে থাকে। অবশেষে পুলিশ উহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু এমন চতুরতায় ঐ ব্যক্তি পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহার অভিযান—সুন্দরী তরুণীকে চশমা হইতে বঞ্চিত করা—চালাইয়াছিল যে, পুলিশ বিভাগ এই মর্মে এক সতর্কতার বাণী প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে,—তরুণীরা যেন রাত্রি-কালে রাজপথে চশমা পরিয়া বাহির না হয়।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে এই পর্যন্ত ১৭টি কেস্ ডায়েরীভুক্ত হইয়াছে উপরোক্তভাবে চশমা ছিনাইয়া নিবার। ইহা ছাড়াও আরও বহু ঘটনা হইয়া থাকিবে—যাহারা আর পুলিশের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে নাই।

এই ব্যক্তির গ্রেপ্তারের পর সে চশমা কাড়িয়া লইবার অভিযোগগুলি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছে। সে বলিয়াছে, তরুণীদের চোখে চশমা দেখিলেই অন্তর হইতে একটা অপ্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রেরণা আপনি স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে সে চশমাই কাড়িয়া লইয়াছে, তরুণীদের টাকাকড়ি নেয় নাই বা তাহাদের উপর অত্যাচার করে নাই। তখন বিচারক জিজ্ঞাসা করেন, তবে চশমা কাড়িয়া লইয়া সে ঐগুলি কি করিয়াছে।

উত্তরে সে বলে—সবগুলি চশমাই আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। হয় পদদলিত করিয়া বিচূর্ণ করিয়াছি, অথবা ট্রাম লাইনের উপর রাখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়াছি,

কি ভাবে প্রকান্ড গাড়ীগুলি ছুটিয়া আসিয়া সজোরে চুরমার করে চশমাগুলোকে।

ঐ ব্যক্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

সারাবিশ্বের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি

মালাক্কা দ্বীপের প্রধান শহর মালাক্কার ১৩ মাইল দূরে সকল সভ্যতার স্পর্শের বাহিরে বাস করে জাকুন জাতি,

মেয়েদের সংগে সমান অংশ গ্রহণ করে। উহাদের প্রিয় মাংস মর্কটের, কেন না, মর্কট শিকারই সদাসর্বদা উহাদের জোটে। সেই মর্কটের ছাল ছাড়াইয়া আগুনে পোড়াইয়া লওয়া পরিবারের পুরুষদের কর্তব্য; আর 'তাপিয়োকা'-মূল রান্না করে মেয়েরা।

ইহাদের বস্তি হইতে ৮ মাইল দূরে রহিয়াছে উহাদের

পরিবারের গিন্নি 'তাপিয়োকা'-মূলে সিদ্ধ করিয়া নিত্যকার প্রধান আহার্য প্রস্তুত করিতেছে

তাহাদের আদিম জীবন প্রণালী অনুসরণ করিয়া, সংখ্যায় তাহারা বেশী নয়। তবে মুদয়ে কত পরিবার হইবে, তাহা উহারা বলিতে পারে না, কারণ তিনের বেশী সংখ্যার ধারণা উহাদের নাই। উহাদের 'সম্পিতান্' অর্থাৎ ব্লোপাইপ দ্বারা উহারা জীবজন্তু শিকার করে। জাতির নারীগণ বন-জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করে 'তাপিয়োকা'-মূল—উহা হইতে যে কাই তৈরী হয় সিদ্ধ করিয়া, তাহাই উহাদের নিত্যকার খাদ্য, যেমন আমাদের দেশে ভাত বা রুটি ব্যবহৃত হয়।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উহারা কখনও এই বন হইতে বাহিরে যায় না। মালাক্কা শহর যে ১৩।১৪ মাইল দূরে এই নিবিড় কানন হইতে, সেই শহরেও উহাদের কেহ জীবনে পদার্পণ করে নাই। উহাদের পৃথিবী এই বন—যাহার পৃথক দুই অঞ্চলে উহাদের জাতির মুষ্টিমেয় নরনারী বাস করে। স্মরণাতীত কাল হইতে বংশপরম্পরা এই বনে উহারা বাস করিতেছে। মলয় জাতির সহিত মিশ্রণ উহাদের কোন কালে সম্ভব হয় নাই। মলয় ভাষারই কতকটা পৃথকভাবে উচ্চারিত বাক্যে উহারা কথা বলে, তথাপি মলয় জাতির সহিত সামাজিক বন্ধন উহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। উহারা হামেশা বলে,—'তোয়ান্ (অর্থাৎ হুজুর), আমি এখানেই জন্মেছি, মরিবও এখানে। আমার বাবা, আমার ঠাকুর্দা—তারাও তাই।'

তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রার উন্নতি করিতে কখনও প্রয়াসী হয় নাই। জীবজন্তু শিকার পুরুষের কাজ, সবজি বা ফল সংগ্রহ মেয়েদের কাজ; কিন্তু রান্নার ব্যাপারে পুরুষও

পরিবারের পুরুষটি মর্কট শিকার করিয়া উহার ছাল ছাড়াইয়া বড় বড় টুকরায় বিভক্ত করিয়াছে। এখন আগুন কুন্ডের উপরে ধরিয়া ঐ মাংস খণ্ডগুলি ঝলসাইয়া লইতেছে আহারের জন্য

জাতির অপর দলটির আস্তানা। তাহাদের সহিত ইহাদের বিবাহ সম্বন্ধাদি চলে। বিপদে আপদে এক দল অপর দলকে করে সকল প্রকার সাহায্য দান।

ব্রিটেনের দানবীর লর্ড নাফিল্ড

মোটর নির্মাতা মরিস ফ্যাক্টরীর দশ লক্ষতম মোটর গাড়ী নির্মাণ সমাধার উৎসব-ভোজে লর্ড নাফিল্ড জীবনে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক দান করিবার তালিকা প্রদান করেন। ঐ উপলক্ষে নিজের যে অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেন, তাহা এইপ্রকারঃ—

১৬ বৎসর বয়সে—তাঁহার সর্বপ্রথম বাইসিকেল প্রস্তুত করেন দেশবাসীর জন্য।

২৬ বৎসর বয়সে—তাঁহার প্রথম মোটর-সাইকেল নির্মাণ করেন, পৌনে তিন অশ্বশক্তির ইঞ্জিনযুক্ত।

২৭ বৎসর বয়সে—অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্ট চার্চের জনৈক ব্যক্তির সহযোগে কারখানা স্থাপন করেন। সে ব্যক্তির লোকসান হয় ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড এবং নাফিল্ড সর্বস্বান্ত হন।

সে বৎসরই ব্যাঙ্ক হইতে ৫০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কারখানা আরম্ভ করেন।

৩৩ বৎসর বয়সে—মরিস্ অক্সফোর্ড মোটর গাড়ী তৈরী আরম্ভ করেন।

৩৮ বৎসর বয়সে—গবর্ণমেণ্টের জন্য 'মাইন্-সিঙ্কার' প্রস্তুত করিতে সুরু করেন; প্রতি সপ্তাহে ১৭০০ করিয়া ঐ যন্ত্র নির্মিত হইতে থাকে।

৪৩ বৎসর বয়সে—তাঁহার প্রস্তুত মোটর গাড়ীর দাম প্রতিটি ১০০ পাউণ্ড করিয়া কমাইয়া দেন, ফলে নয় মাস মধ্যে সারা ব্রিটেনের মোটর-ব্যবসায়ীর ভিতর তাঁহার মোটর গাড়ীই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বিক্রয় হইতে থাকে।

বর্তমানে তাঁহার বয়স ৬২। তাঁহার আধুনিক কৃতিত্ব লৌহ-ফুসফুস নির্মাণ।

লর্ড নাফিল্ড তাঁহার পূর্বোক্ত দশ-লক্ষতম মরিস গাড়ীখানি গাইস্ হাসপাতালে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন; উক্ত প্রতিযোগিতায় যে ব্যক্তি প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাহাকেই পুরস্কারস্বরূপ ঐ মরিস 'কার' প্রদান করা হইবে।

প্রস্তর-তরুণীর আরোগ্য লাভ

কয়েক বৎসর পূর্বে নোনা ক্লোরেস্ নাম্নী এক তরুণী অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার দেহ প্রস্তরবৎ হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য stone-girl (প্রস্তর বালিকা) বলিয়া নোনার নাম দেশ বিখ্যাত হইয়া যায়। তাহার গাত্রচর্ম শক্ত ও শুষ্ক পশুচর্মের ন্যায় অসাড় হইতে থাকে আর তাহাতে এমন আড়ষ্টতা ক্রমে যে নোনা নড়িতেও অপারগ হয়। চার বৎসর ব্যাপিয়া শত শত চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছে, কেহই কোন প্রকার উপশম করিতেও পারে নাই। রোগটির নাম নাকি scleroderma; এই অতিশয় দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার আশায় নোনা মিনেসোটার রচেষ্টার অঞ্চলের মেয়ো ক্লিনিকে পর্যন্ত গিয়াছিল; কিন্তু সেখানেও কোন ফলোদয় হয় নাই।

বর্তমানে সে রহিয়াছে ওয়াশিংটনের টাকোমা অঞ্চলের ডাঃ এইচ জি উইলার্ডের চিকিৎসাধীন। এখন সে এতটা আরোগ্য লাভ করিয়াছে যে অবাধে চলাফেরা করিতে পারে। এখন সে বিবাহের আশাও পোষণ করে। ব্যাধির কবলে পড়িয়া এবং বহু চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে জীবনের আশাই ছাড়িয়া দিয়াছিল—এমন স্বাস্থ্যহীনের বিবাহ হওয়া তো তখন আশাতীতই ছিল। সেই কালে নোনার অনূন অর্ধশত বন্ধু-বান্ধবী তাহাকে একটা 'পার্টি' দ্বারা অভ্যর্থিত করিয়াছিল, কিন্তু নোনা তখন স্থির জানিত উহাই তাহার জীবনের শেষ নিমন্ত্রণ পার্টি।

মাউণ্ট রেইণ্টারের পাদদেশে তাহার পিতার যে গোলা-বাড়ী রহিয়াছে, সেখানেই সে বাস করে ডাঃ উইলার্ডের ব্যবস্থা মত। ডাঃ উইলার্ড কিন্তু দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন যে, প্রকৃতি (nature) নোনাকে আরোগ্য করিয়াছে, কারণ তিনি তাঁহার রোগিণীকে ঐ ব্যাধি উপশমের কোনও ঔষধ দেন নাই, শুধু ঔষধ দিয়াছেন যাহাতে তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়; আর নির্ভর করিয়াছেন সতর্ক মনোনীত পথ্যাপথ্য বিচারের উপর। তাঁহার নিজ চিকিৎসা প্রণালীর কৃতিত্ব তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, নেচারই তরুণীকে আরোগ্য করিয়াছে। বুক, পিঠ, বাহু, উরু প্রভৃতি হইতে এই নিদারুণ রোগ লক্ষণ দূর হইয়াছে; কেবল সামান্য একটা প্যাচ মাত্র রহিয়াছে পিঠের এক কোণে। ডাক্তার আশা করেন তাহাও শীঘ্রই লোপ পাইবে।

নিরাময়ে উল্লসিত হইয়া নোনা তাহার দ্বাবিংশতিতম জন্মতিথি উৎসবে পূর্বোক্ত অর্ধশত বন্ধু-বান্ধবীদের ভোজ-দানে আপ্যায়িত করিয়াছে।

বৈঠা বিক্রির লাভে পড়াশুনা

আইওয়া ষ্টেট টিচার্স কলেজের ছাত্রদ্বয় নরিস ও জেমস্—দুই সহোদর! ইহারা কোনও ধর্মযাজকের পুত্র। পুস্তক ও খোরাক-পোষাকের ব্যয় সঙ্কুলান জন্য উহারা আর অন্য উপায় ঠাওরাইতে না পারিয়া—এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিকট অনুরোধ জানায় তাহাদের ছোট নৌকা চালাইবার বৈঠা (paddle) উহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য। এই প্রকারে বৈঠা সরবরাহ করিয়া উহারা যে লাভ স্বরূপ টাকা পায়, তাহা দ্বারা কষ্টে সৃষ্টে খরচ চালাইয়া কলেজে পড়িতেছে তিন বৎসর যাবৎ। ফলে এখন ছাত্রীরা এই প্রকার পণ করিয়াছে যে, ঐ দুই ভ্রাতার মারফতই তাহারা প্যাড্ল্ কিনিবে। কিন্তু আগামী বৎসরে নরিস এই কলেজের পড়া সমাধা করিয়া গ্রাজুয়েট হইবে—তখন সে যাইবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের উচ্চশিক্ষার জন্য। সেই সময় হইতে জেমসকে একাই প্যাড্ল্ বিক্রয় কারবার চালাইতে হইবে।

ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসারে অভিনব প্রতিষ্ঠান

"নিজ দেশের জাতীয় পতাকার পরেই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির পতাকা বহন করা অপেক্ষা অন্য কোন গৌরবজনক কাজের কথা আমি জানি না", সুপ্রসিদ্ধ মেরু অভিযাত্রী রিয়াল এ্যাড্‌মিরাল্‌ বয়ার্ডের এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, উপরোক্ত সমিতি ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তারকল্পে যে কাজ করিয়াছে, তাহার প্রতি তিনি কিরূপ শ্রদ্ধান্বিত। বায়ার্ডের মত বহু দুঃসাহসিক পর্যটক ও বৈজ্ঞানিকের সন্ধানে বিগত একান্ন বৎসরে সমিতি বায়ান্নটিরও অধিক অভিযান দিকে দিকে পরিচালিত করিয়াছে। তন্মধ্যে শুধু মেরু প্রদেশেই সাতটি অভিযান পরিচালিত হয়।

এই সমস্ত মেরু অভিযানে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্‌ সোসাইটি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কুমেরু অভিযানে এ্যাড্‌মিরাল্‌ বায়ার্ডকে প্রথমবার সোসাইটি পঁচাত্তর হাজার ডলার সাহায্য করেন; বায়ার্ডের দ্বিতীয় অভিযানেও এই

হুবার্ড স্বর্ণপদক

কমান্ডার পিয়ারি

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অভিযানে ডাঃ উইলিয়াম বিব্‌ (দক্ষিণে) এবং ওটিস্‌ বার্টন্‌ সমুদ্রতলে ৩০২৮ ফুট পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। অভিযান শেষে জাহাজের ডেকের উপর গৃহীত ছবি। উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা শোভা পাইতেছে।

চেষ্টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা (নীল—আকাশের প্রতীক, গাঢ় নীল—সমুদ্রের প্রতীক ও বাদামী—পৃথিবীর প্রতীক) পৃথিবীর বহুস্থানে উড্ডীন হইয়াছে। সুদূর সুমেরু ও কুমেরু প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র-সমতল হইতে উর্দ্ধে ৭২,৩৯৫ ফুট পর্য্যন্ত সমতাপমণ্ডলে, ৩০২৮ ফুট পর্য্যন্ত গভীর সমুদ্রতলে সর্বত্র সোসাইটির উদ্যোগে অভিযান চলিয়াছে। ভৌগোলিক জ্ঞানের সমিতি হইতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করা হয়। ১৯০৯ সালের যে অভিযানে এ্যাড্‌মিরাল্‌ পিয়ারি সুমেরু আবিষ্কার করেন, তাহাতেও সোসাইটি বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তারকল্পে বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ কিংবা অভিযানে সাহায্য দান করিয়াই সমিতি ক্ষান্ত থাকেন নাই। যাঁহারা [illegible]

জগতের অজানা প্রদেশে অভিযান করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শন করিতেও সমিতি কোনদিন কুণ্ঠিত হন নাই। সমিতির প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রেসিডেণ্ট হুবার্ডের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে সমিতি তাঁহার নামানুসারে একটি স্বর্ণ-পদক প্রস্তুত করিয়া এইরূপ দুঃসাহসিক পর্যটকদের উপহার দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমবার এ্যাড্‌মিরাল্ পিয়ারি যখন উত্তর মেরুর অতি নিকট পর্যন্ত উপস্থিত হইতে সমর্থ হন, তখন তাহার পুরস্কার স্বরূপ ১৯০৬ সালে পিয়ারিকে হুবার্ড পদক দানে সম্মানিত করা হয়। আমুণ্ডসেনকেও তেমনি চুম্বকীয় মেরুর অবস্থান নির্ণয় করার নিমিত্ত পুরস্কার স্বরূপ পর বৎসর হুবার্ড পদক প্রদত্ত হয়। এই উভয় পর্যটকই পরবর্তীকালে আরও বৃহত্তর আবিষ্কার করিয়া জগৎবরেণ্য হইয়াছেন। এ্যাড্‌মিরাল্ পিয়ারির সুমেরু সন্ধান এবং আমুণ্ডসেনের কুমেরু আবিষ্কার তাঁহাদিগকে পৃথিবীর ইতিহাসে আজ অমর করিয়া রাখিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রথম জীবনের সাফল্য যদি এভাবে উৎসাহ লাভ না করিত, তবে তাঁহাদের দ্বারা পরবর্তী জীবনে এরূপ অসাধ্য সাধন সম্ভবপর হইত কি না তাহা বলা সুকঠিন! হুবার্ড স্বর্ণ-পদক বহু ব্যক্তিকে এইভাবে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করিয়াছে। ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসারকল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত কমাণ্ডার বায়ার্ড, কর্নেল্ লিণ্ডবার্গ ও তদীয় পত্নীকে এই পদক দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মহিলা বৈমানিক এমিলিয়া ইয়ারহার্টকেও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়। ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তার সাধনে ইঁহাদের প্রত্যেকের দানই যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সমিতির পরিচালিত মুখপত্রখানির জনপ্রিয়তার কারণ খুঁজিতেও আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অভিজ্ঞ পর্যটকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনীই এই পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়া থাকে। থিওডোর রুজভেল্ট, পিয়ারি, আমুণ্ডসেন, বায়ার্ড, একুনার, ষ্টেফানসন, এমিলিয়া ইয়ারহার্ট, কর্নেল্ লিণ্ডবার্গ ও মিসেস্ লিণ্ডবার্গের মত পর্যটকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা এই পত্রিকার মারফতে প্রচার করিয়াছেন; ইহার লেখকগণের অধিকাংশই হয় বৈজ্ঞানিক, না হয় বৈমানিক বা ভূপর্যটক। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট করাই ইঁহাদের লক্ষ্য। ইঁহাদের তথ্যকে সাজাইয়া-গুছাইয়া নানা চিত্রে সুশোভিত করিয়া পত্রিকার সম্পাদকগণ যে ভাবে উহা প্রকাশিত করেন, তাহাতে সহজেই পাঠকগণের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আজ জগৎব্যাপী ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আমরা যখন আরাম কেদারায় হেলান দিয়া দেশ-বিদেশের ভূগোল বৃত্তান্ত পাঠ করি, তখন একবারও অবশ্য মনে হয় না এই সব কাহিনীর পশ্চাতে কত পর্যটকের অসীম সাহস, ধৈর্য ও আত্মদান রহিয়াছে এবং কি এক বিরাট প্রতিষ্ঠান উহার পিছনে প্রেরণা জোগাইতেছে! ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির গত অর্ধ শতাব্দীর সাধনার ইতিহাস জ্ঞানের প্রসার সাধনে মানুষের উদ্যোগ-আয়োজনের এক বিরাট পর্ব। যাঁহাদের প্রচেষ্টায় ও সংগঠন শক্তির বলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আপনা হইতেই মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে।

ক্যাপ্টেন আমুণ্ডসেন

কর্নেল লিণ্ডবার্গ

এ্যাড্‌মিরাল বায়ার্ড

সমিতির বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ গ্রোস্‌ভেনর একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করাইবেন। বস্তুত তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন। যে ভাবে বিগত কয়েক বৎসর সমিতি বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহাদের তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর বহু দেশের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে।

এইরূপ পরিচয় দিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় কোন দিন কোন দেশ বা জাতির প্রতি অবিচার করেন নাই। 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্ সোসাইটি'র কর্মকর্তাগণ পত্রিকা পরিচালনায়

প্রথম হইতেই এমন কয়েকটি নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতে-ছেন, যাহা সমিতিকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধন। যাহাতে কোন ভুল তথ্য তাহাদের মুখপত্রে স্থান না পায় সম্পাদকগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি রহিয়াছে। বস্তুত এ পর্যন্ত 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনে' এমন কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নাই, ভবিষ্যতে যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

নানা রঙের ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে দেশ বিদেশের বৃত্তান্তগুলিকে ইহাতে যেমন মনোজ্ঞভাবে প্রকাশ করা হয়, তেমনই এমন কোন বিষয় ইহাতে স্থান পায় না যাহা কয়েক বৎসর পরেই মূল্যহীন বা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই নীতি গ্রহণের ফলে পত্রিকার আদর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলিও বিভিন্ন পাঠাগারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া থাকে।

কোন প্রকার বিতর্কমূলক বিষয় সমিতির মুখপত্রে প্রকাশ করা হয় না। কোন দেশের ভৌগোলিক তথ্য প্রকাশ করিতে গিয়া যাহাতে সেই দেশ ও দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে কোন-রূপ অবান্তর বা অবাঞ্ছনীয় মন্তব্য কিংবা কাহারও পক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ প্রচারমূলক বিষয় প্রকাশিত না হয়, তৎপ্রতি সম্পাদক মহাশয়ের সযত্ন দৃষ্টি রহিয়াছে। জ্ঞানের রাজ্যে বিদ্বেষের স্থান নাই। সকল দলাদলি ও বাদানুবাদের উর্ধ্বে থাকিয়া দেশ বিদেশের ভূগোল বৃত্তান্ত প্রচারের এই প্রচেষ্টা এ কারণেই আরও বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোনও দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে কিংবা ভূকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপস্থিত হইলে স্বভাবতই জনসাধারণের সেই দেশের কথা জানিবার আগ্রহ হইয়া থাকে। বিষয় নির্বাচন কালে এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষ অবহিত হইতে দেখা যায় এবং 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনে'র পরবর্তী সংখ্যাতেই গ্রাহকগণ সেই দেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও আর্থিক প্রভৃতি সকল প্রকার বিবরণ পত্রিকায় দেখিতে পাইবার আশা করিতে পারেন।

দেশ বিদেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির যে সমস্ত বিচিত্র সৌন্দর্য ও সৃষ্টি অহরহ আমাদের সম্মুখে থাকিলেও আমরা লক্ষ্য করি না, সম্পাদক মহাশয় পত্রিকা মারফৎ তাহাদের সহিতও আমাদের পরিচয় করাইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন অধি-বাসী, নানাপ্রকার পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সম্পর্কে এই পত্রিকায় যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে কম সমৃদ্ধ করে নাই! সমিতির উদ্যোগে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, চিরতুষারাবৃত মেরুমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া রমণীয় প্রান্তরের যে সমস্ত আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অতুলনীয়। সমিতির কর্মী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের প্রচেষ্টায় আলোকচিত্র-বিজ্ঞানে বস্তুতই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের একান্ন বৎসরের সমুদয় কার্যাবলী সামান্য নিবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। দিকে দিকে অভি-যাত্রীদল প্রেরণ করিয়া 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি' যেমন ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার সাধন করিতেছেন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, বৈমানিক ও পর্যটকের সাধনালব্ধ ফল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া তেমনই তাঁহারা জগৎ-বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

'Of all sciences geography finds its origin in action, and, what is more, in adventurous action.'

'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হইতে ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসারে ইহা যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে আমরা ইহার উদ্যোক্তা-গণের দুঃসাহসিক কার্যক্ষমতারই পরিচয় পাইয়া থাকি।

ছেলেদের শ্যামাচরণ

(গল্প)

শ্রীরত্না দেবী

আমার বছর পাঁচেকের ছেলে খোকন, হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, বাবা, বাবা, দেখ, দুটো ঘুড়িতে কেমন কাটাকাটি হচ্ছে। বোধ হয় আমাদের বাড়ীর ছাদে পড়বে,—বলেই সে ভারী খুশী হয়ে উঠল।

হঠাৎ আমার খাগড়া বাজারের শ্যামাচরণের কথা মনে পড়ল। খোকনও ঠিক সেই সময় বল্‌ল—বাবা, মা যে ঘুড়িওয়ালা শ্যামাচরণের কথা বলে, সে কি এর চেয়েও ভাল ঘুড়ি বানাতে পারত।

শ্যামাচরণের কথা মনে হলেই ভাবি—কার জীবনের যে কি পরিণতি হয় কে বলতে পারে। আমার ছেলের মত বয়স যখন আমার নিজের, সেই সময় শ্যামাচরণের নাম খাগড়া বাজার ছাপিয়ে উঠেছে। মস্ত বড় কাঠের আড়ৎ, জমজমে তার ব্যবসা।

আবার আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন শ্যামাচরণ রীতিমত বড়লোক নাম পেয়েছে।

সাহায্যপ্রার্থীরা আগে তার কাছে যায়—কেউ বলে আপনার গাঁয়ের ইস্কুলটার একটা উন্নতি করুন, কেউ বলে রাস্তাটা পাকা করে দিন।

শ্যামাচরণ খুব দরাজ মনের লোক ছিল বরাবরই। যেমন ছিল, তেমনি দিতেও কোনও দিন কুণ্ঠিত হয় নি।

শ্যামাচরণের বুড়ো বয়েসে এক ছেলে হ'ল শুনলাম। ছেলেটাকে বছর তিনেকের রেখে শ্যামাচরণের স্ত্রী গেল মারা। একে তো বুড়ো বয়েসে অনেক দেবতার মানত করে তবে ঐ ছেলে, তার ওপর আবার মা-মরা,—যেমনি তার আদর, তেমনি তার নাম হ'ল—নাড়ুগোপাল।

শ্যামাচরণের ছেলের অন্নপ্রাশনের ঘটাও দেখলাম। শহর বাজারের কোনও লোক সেদিন বঞ্চিত হয়নি। অনাহূত, রবাহূত, সবাই পাত পেড়েছিল।

কিন্তু ছেলেটা একটু জড়বুদ্ধি হ'ল। শ্যামাচরণের ভারী সাধ—নিজে বড়লোক হয়েছে বটে ভাগ্যের জোরে, কিন্তু লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি বাপ ছোটবেলায় মারা যাওয়াতে। তাই ছেলেকে সে আর কিছু না করুক, বিদ্বান করবেই, অনেকগুলো পাস দেওয়াবে। কিন্তু ছেলেকে স্কুলের যে ক্লাসে ভর্ত্তি করেছিল, সেই ক্লাসেই সে বছরের পর বছর রয়ে গেল।

শেষে শ্যামাচরণ ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে বাড়ীতে ছেলের জন্য মাষ্টার রেখে দিল।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, শ্যামাচরণ সেতার বাজাতে খুব ভালবাস্‌ত, বাজাতও ভারী সুন্দর। তার সেতারটা ছিল কোন এক মান্ধাতার আমলের।

ইদানীং শ্যামাচরণের দিনে রাতে সেতার বাজানোই এক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসা কর্ম্মচারীদের দিয়েই চালাত।

শ্যামাচরণের বাড়ী ও আমাদের বাড়ী পাশাপাশি ছিল। এক একদিন রাত তিনটে চারটের সময়ও শ্যামাচরণের সেতারে রাতদুর্গার ঝঙ্কার শুনেছি। আমরা তখন ছাত্রের দল বলাবলি করতাম—বুড়ো টাকার ওপর বসে আছে। সময় কাটে না, কি করবে, তাই অহোরাত্র টুং টুং করছে।

এমনি এক চৈত্রের ভরা দুপুরে বুড়ো শ্যামাচরণ সেতারে কি একটা রাগিণীকে নিয়ে খুব খেলাচ্ছে, একেবারে মেতে গেছে,—সেই সময় ওর ছেলে নাড়ু গিয়ে বলছে—বাবা, চারটে পয়সা দাও না, এক পয়সার ঘুড়ী, দুপয়সার লাটাই, আর এক পয়সার মাঞ্জা দেওয়া সুতো।

শ্যামাচরণ রাগের মাথায় মহা তাড়া দিয়ে বলল—ছেলের পড়াশুনোর নামে খোঁজ নেই। একদিন চাই লাট্টু, একদিন লজেঞ্চুস্, একদিন মারবেল। ঘুড়ী উড়িয়ে পয়সা নষ্ট না করলে, আর ঘুম হচ্ছে না। নিজে তো পথে বসবেই, আমাকেও পথে না বসিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

শ্যামাচরণ মুখে বললেও মনে তেমন কিছু করেনি। সে যখন সেতার নিয়ে বসত সেই সময় যদি কেউ তাকে বিরক্ত করত, তার ভারী রাগ হত।

হঠাৎ পরেরদিন শুনি, শহর বাজারে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিচ্ছে—শ্যামাচরণ পোদ্দারের ছেলে নাড়ুগোপাল কাল রাত্তির থেকে নিরুদ্দেশ। যদি কেউ অনুসন্ধান দিতে পারেন, উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। পুলিশে খবর দেওয়া হ'ল, চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল—নাড়ুগোপালকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আজও গেল, কালও গেল, নাড়ুকে আর কেউ খুঁজে বের করতে পারল না।

বুড়ো তো পাগলের মত হয়ে, গঙ্গারঘাটে গিয়ে চীৎকার করে—ওরে, বাছা কোথায় গেলি, আয় কটা ঘুড়ী চাস্, নিয়ে যা।

ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, বুড়োকে সবাই ডাকত, পাগলা শ্যামাচরণ। সত্যিই একরকম সে পাগলই হয়ে গিয়েছিল।

তারপর একদিন হঠাৎ দেখি পাগলা শ্যামাচরণ ছেলেদের স্কুলের সংলগ্ন ঝুরিনামা বুড়ো বটগাছ তলায় দোকান খুলেছে—তাতে বিক্রির জিনিষ হচ্ছে—ঘুড়ী, লাট্টু, মারবেল, লজেন্স, খুচরো ইস্কুল বিস্কুট, রঙ্গীন চিনির লিচু, আম—যেসব জিনিষ তার ছেলে ভালবাসত। সবাই বল্‌ত—একেবারে ক্ষেপেছে। ছেলেটা এই বুড়ো বয়েসে মাথায় বাড়ি দিয়ে গেল। কথাটা একরকম ঠিকই বলত।

বুড়ো ছোট্ট দোকানটিতে বসে বসে, চোখ বুজে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, পাকা বাব্‌রী চুলে ভরা মাথা নীচু করে সেতারে ঝঙ্কার দিচ্ছে। ছোট ছোট ছেলের দল তার দোকানের সামনে ভীড় জমাতো আর বলত—এটা চাই, ওটা চাই।

শ্যামাচরণ শুধু হাত নেড়ে ইসারা করত, নিয়ে যাও।

ছেলেরা যখন পয়সা দিতে যেত তখন তেমনি ইসারায় বলত—রেখে যাও। ছেলেরা শেষে তাকে বেশ পেয়ে বসল।

তারা দেখলে যে, কে পয়সা দিল না দিল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপই নেই।

যখন দোকানের জিনিষ ফুরিয়ে যেত, নিজের তহবিল ভেঙ্গে নিয়ে আসত। আবার মাঝে মাঝে তার খেয়াল মত কোনও কোনও ছেলেকে চেপে ধরত, আর জিজ্ঞাসা করত—এই তোর নাম নাড়ু না? তারা অস্বীকার করলেও তার বিশ্বাস হত না। তখন ছেলেটাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখে বলত—"চোখে তো ভাল দেখতে পাই না, আমার নাড়ুই তো মনে হয়। নাড়ুর বাঁ কাঁধে একটা তিল ছিল, ও তোর নেই, তবে তুই নাড়ু না। যাঃ।" এই বলে তাকে নিষ্কৃতি দিত।

অবিলম্বে শিশুমহলে শ্যামাচরণ খ্যাতি অর্জ্জন করল। তার মত ঘুড়ী কেউ করতে পারে না। শ্যামাচরণের এই যশের গৌরবের প্রধান কারণ—বোধ হয় ছেলেদের বিনা পয়সায় ঘুড়ী বিতরণ। সঞ্চিত অর্থ থেকে শ্যামাচরণের দোকান বেশ চলতে লাগল। তাতেই পরম পরিতৃপ্তি—যদি ফিরে আসে। কত ছেলেই তো দোকানে আসে।

শুধু এটুইকু আশা।

যখন শ্যামাচরণ খুব স্থবির হয়ে পড়ল তখনও বসে বসে শিথিল লোল চর্ম্মসার হাতে ঘুড়ী বানাত আর মাঝে মাঝে ঝিমোত।

এইরকম করে শ্যামাচরণ অনেকদিন বেঁচেছিল।

কিন্তু শ্যামাচরণের কথা পুরুষানুক্রমে ছেলেমহলে প্রবাদ হয়ে দাঁড়াল।

একদিন দেখি, আমার স্ত্রী আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমটিকে—"শ্যামাচরণ, লক্ষ্মী ছেলেদের ঘুড়ী দেয়, লজেন্স দেয়, দুষ্টু ছেলেদের কিছু দেয় না। তুমি যদি লক্ষ্মী ছেলের মত দুপুরে ঘুমোও, তোমাকেও দেবে।" বলে বহু আয়াসে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন। আমার অত্যন্ত চঞ্চল ছেলেটির ওপর তার অজানা কাল্পনিক শ্যামাচরণের অলৌকিক প্রভাব যাদুবিদ্যার মত কাজ করত দেখে ভারী মুগ্ধ হতাম।

ইতিহাসের বাণী

(৮০ পৃষ্ঠার পর)

ক'রে আমরা কোনো দিনই পাবো না। আইডিয়ার জয়যাত্রা আমাদের দৃষ্টিকে কেবল উদার থেকে উদারতর ক'রে তুলবে। এক যুগের জ্ঞানের সাধনা আর এক যুগের জ্ঞান-সাধনার পথকে আরও প্রশস্ত ক'রে দেবে।

কিন্তু নব নব জ্ঞানের উত্তরাধিকার কি সব সময়েই আমাদের উন্নতির পথে আগিয়ে দেবে? জ্ঞানের প্রসার কি সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে চালিত করতে পারে না? আজ বিজ্ঞানের সাধনা জগতকে কোন্ অতল অন্ধকারে ঠেলে দিতে বসেছে। এরোপ্লেন আর বোমা, বারুদ আর কামান তো বিজ্ঞানেরই দান। এরোপ্লেন থেকে বর্ষিত বোমা পৃথিবীর কত বড়ো বড়ো শহরকে যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে দিচ্ছে! কামানের গোলায় কত যে বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে ভেঙে পড়ছে!

হোয়াইটহেড্ তাঁর Adventures of Ideas-এর মধ্যে একটি বড়ো মূল্যবান কথা লিখেছেন।

> Philosophy should now perform its final service. It should seek the insight, dim though it be, to escape the wide wreckage of a race of beings sensitive to values beyond those of mere animal enjoyment.

দর্শনের চরম কাজ করবার সময় এসেছে আজ। দর্শনের উচিত হচ্ছে আজ, সেই অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান করা যে দৃষ্টি মানবজাতিকে আসন্ন ধ্বংস থেকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবে। মানুষের জাত—সে তো কেবল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকে তার জীবনের লক্ষ্য করতে পারে নি। তার আদর্শ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে ছাড়িয়ে আছে।

এই দর্শনই গান্ধীর কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে জগতকে নূতন পথের পথিক হবার জন্য আহ্বান করছে। পুরাতন সভ্যতার শ্মশানভূমিতে নয়া সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই কি গান্ধীর আবির্ভাব নয়? কিন্তু নবযুগের মর্ম্মবাণীকে শুনবার মতো কান কোথায়? যে স্তরে উঠে বঙ্কিম বন্দেমাতরম্ মহা-সংগীত রচনা করেছিলেন সে স্তরে আমরা আজ উঠেছি ব'লেই তাঁর বন্দনাগান উৎসারিত হচ্ছে আকাশে আকাশে। সে স্তরে যতদিন আমরা উঠিনি ততদিন বঙ্কিমের প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর হয় নি। গান্ধী যে নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন—তার হৃদয়ের সুরটিকে ধরবার মতো আমাদের প্রাণ এখনও প্রস্তুত হয় নি। আমাদের মনের মধ্যে এখনও রয়েছে বর্ব্বরতার প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। তাই সভ্যতার বুকে বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রেমের যে অভিযান আজ সুরু হয়েছে—তার মহিমাকে আমরা এখনও উপলব্ধি করতে পারছিনে। আমাদের হৃদয় বিংশ-শতাব্দীর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে যত বেশী বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে—ইতিহাসের এই মহাযুগের মর্ম্মের কথা আমরা তত বেশী হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো।

বিশ্বভারতীর লোক-শিক্ষা পরিকল্পনা

বিদ্যা বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে বিপুল দান, তাহার মধ্যে নবতম তাঁহার লোকশিক্ষার পরিকল্পনা। বিশ্বভারতী এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং বিশ্বভারতীর অধীনে এতদুদ্দেশ্যে লোক-শিক্ষা-সংসদ স্থাপিত হইয়াছে। সংসদের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বিশ্বভারতীর কর্ম-সচিব শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিবৃতি দিয়াছেন।

পূর্বকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে উচ্চ শিক্ষার এবং বিদ্যার উৎকর্ষ পরীক্ষার জন্য বৃহত্তর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ছিল বটে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য তাহার উপর নির্ভর করা হইত না। তজ্জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ও প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল, যাহার মধ্য দিয়া দেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-সাধনার ধারা সুদূর গ্রামজীবনের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িত। একালে বিদেশী আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা শিক্ষাকে কেবলই কেন্দ্রীভূত করিয়াছি, প্রসারিত করিবার কোন ব্যবস্থাই করি নাই। ফলে, পূর্বে সমাজের বিভিন্ন অংশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে সামঞ্জস্য ছিল, তাহা এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একদিকে দাঁড়াইয়াছে আধুনিক উচ্চতম জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা, অপরদিকে সাধারণ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থারও অভাব।

এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে না পারিলে সমষ্টিগতভাবে জাতি কখনও অগ্রসর হইতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথ যে সেই শুভচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা দেশের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রসার ও অগ্রগতির পথ প্রদর্শন করিতে তাঁহার তুল্য আর কে আছে?

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ
কর্ম-সচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবেদন

বিশ্বভারতীর কর্ম-সচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ সম্বন্ধে সংবাদপত্র মারফৎ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আজকাল বাঙলাদেশে সর্বত্র লোকের মধ্যে জ্ঞানলাভের একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সকলের পক্ষে বিদ্যালয়ে যোগ দিয়া সে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নহে। এইজন্য আচার্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন ও সেই সঙ্গে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের শিক্ষা-সচিব মহাশয়কে একখানি পত্রে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

'দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাঁদের পাঠ্য-পুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষে পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জন-সাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।' রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অন্যত্র লিখিয়াছেন, 'একদা আমাদের দেশে কাশী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতি রক্ষা ও শিক্ষাচর্চা নানা প্রণালীতে পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিক কালের শিক্ষাকে কোনো উপায়ে এদেশে তেমন করে যদি প্রসারিত করে না দেওয়া যায়, তবে এ যুগের মানব-সমাজে আমরা নিজের বিদ্যাগত যোগ রক্ষা করতে পারব না এবং না পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে এ কথা বলা বাহুল্য।'

"দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দিষ্ট করিয়াছি। যথেষ্ট মনোযোগপূর্বক পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কি-না, এই প্রদেশব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ করা হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন, তাঁহারা আপন অভিমতসহ পত্র লিখিয়া জানাইলে উপকৃত হইব।

"১৩৪৬ সালের পরীক্ষা আগামী ফাল্গুন মাসের শেষার্ধে হইবে। পরীক্ষার নিয়মাবলী এবং পাঠ্যপুস্তকের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। পরীক্ষার্থিগণ বিস্তারিত বিবরণীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। সম্পাদক, লোকশিক্ষা সংসদ, শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, জেলা বীরভূম।"

পুস্তক পরিচয়

আগডুম বাগডুম শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম ছয় আনা।

কার্ত্তিকবাবু ছেলেমেয়েদের মনের খোরাক জোগাইতে সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য বইখানিতে তাহার নূতন করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি মানুষ, মৎস্য, সরীসৃপ, হস্তী প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি ছড়া গাঁথিয়াছেন। এই ছড়াগুলি পড়িয়া শিশুরা বেশ আনন্দ পাইবে। পড়িতে পড়িতে রুই, কাৎলা, ন্যাদা প্রভৃতির আস্বাদও স্মরণ করিয়া লইবে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুন্দর হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

গুরুতত্ত্ব রহস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত। নবভাব লাইব্রেরী, ১নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অন্যান্য ভক্তিতত্ত্বমূলক পুস্তকের সমালোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। তিনি বর্ত্তমান পুস্তকে সদ্‌গুরু রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। সদ্‌গুরু কাহাকে বলে, কোথায় পাওয়া যায়, তাঁহার আদেশ কি ভাবে পালনীয় ইত্যাদি নানা বিষয় কাঙ্গাল হরিনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধু ভক্তবৃন্দের বাণী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সদ্‌গুরু বিষয়ে নিজ মতামতও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। লেখক গুরুবাদের পক্ষপাতী, কিন্তু প্রচলিত লৌকিক গুরু করণ প্রথার তিনি বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। যুক্তিবাদীরাও ইহা পাঠে চিন্তার খোরাক পাইবেন।

লিপিকা—মাসিকপত্র, আষাঢ় সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য্য। মূল্য ছয় আনা, বার্ষিক পাঁচ টাকা। কার্য্যালয়—৩৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লিপিকার প্রথম সংখ্যা পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। বিশিষ্ট লেখকদের লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা এবং গল্পে বর্ত্তমান সংখ্যা সমৃদ্ধ। আমরা সহযোগীর সাফল্য কামনা করিতেছি।

বৃটিশ ভারতীয় বীমা আইন—সঙ্কলয়িতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল বি-এ, সম্পাদক, জীবন বীমা। প্রাপ্তিস্থান—জীবন বীমা কার্য্যালয়, ৫নং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

১৯৩৯ সালে জীবন বীমা সম্পর্কিত যে আইনটি পাশ হইয়া ১লা জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে, আলোচ্য পুস্তকে সহজ সরল ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত আইনের ১১৪নং ধারা অনুযায়ী রুলসমূহের অনুবাদ আইনের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে। বাঙালী বীমাকর্ম্মীর সংখ্যা কম নয়, বীমাকারীর সংখ্যাও দিন দিন প্রসারলাভ করিতেছে, এই পুস্তকে বর্ত্তমান আইনের খুঁটিনাটি সব বিষয় জানিতে পারিবেন।

চাষীর কথা—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাম দুই আনা। প্রকাশক প্রভাত সেন, গণবাণী পাবলিসিং হাউস, ২২০নং, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট। লেখক কমিউনিষ্ট মতবাদী। তিনি বলেন, 'চাষীর কাস্তের সঙ্গে মজুরের হাতুড়ীর মিলনে যে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হবে, একমাত্র সেই ঐক্যই সাম্রাজ্যবাদকে ধূলিসাৎ করবে ও দেশকে স্বাধীন করবে।' এই উদ্দেশ্যে তিনি কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে কৃষক সমিতি গঠনের পক্ষপাতী।

আগামী কাল

সুনীলবরণ রায়চৌধুরী

আজিকার রাত ফুরাইবে যবে, আসিবে আগামী কাল
জীবন পাতার একটি অঙ্ক নীরবে বিয়োগ করি।
গত দিবসের সঞ্চিত যত অযাচিত জঞ্জাল,
জমায়িত হোয়ে উঠিবে ক্রমশ জীবন পাত্র ভরি।

প্রভাতে জাগিয়া প্রাণের বেদনা রোদন করিবে সুরু,
কঠিন আলোকে উপবাসী মোর আসিছে আগামী কাল।
ভাবি তাই, আর অজানা ব্যথায় হিয়া করে দুরু দুরু,
মলিন শয়নে কাঁপে থরথর ক্ষীণ দেহ কংকাল!

নব বধূ আর বরণের ডালা, ঊষারে উপমা দিয়া,
দেখেছি ভরিতে অনেক কবিরে সাপ্তাহিকের পাত।
দেখে যদি তারা আমাদের ঊষা ক্ষুধিত চক্ষু নিয়া,
বুঝিবে তখন কত যে মিথ্যা—কথার মালিকা গাঁথা

মোর জীবনের দুর্ব্বহ এই আগামী কালের রাশি,
আসে আর যায়, নূতন ব্যথায় অতীতেরে করি কোলে।
কণ্ঠের যত ভাষা কাড়ে আর নিভায় প্রাণের হাসি
পদে পদে শুধু খিন্ন জীবন অসহ করিয়া তোলে।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

"তরুণ"এর উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। তরুণ ছাত্র, ছাত্রী সকলেই যোগ দিন। সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ লেখা এবং চিত্রের জন্য নিম্নের ঘোষিত পুরস্কার দেওয়া হইবে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি "তরুণ" মাসিকে প্রকাশিত হইবে। ২৫শে ভাদ্র ১৩৪৬ সাল পাঠাইবার শেষ তারিখ। ঐ তারিখের মধ্যে নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১। **প্রবন্ধঃ**—'সিনেমার আকর্ষণে বর্তমান ছাত্রসমাজ' পুরস্কার ১টি রৌপ্য পদক।

২। **আধুনিক গল্পঃ**—(যে কোন বিষয়ে; কেবল মহিলা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য), পুরস্কার ২টি রৌপ্য পদক।

৩। **কবিতাঃ**—(যে কোন বিষয়ে), পুরস্কার ১টি রৌপ্য পদক।

৪। **চিত্রঃ**—(তুলি দ্বারা আঁকা বা ফটো) "প্রাকৃতিক দৃশ্য পল্লীর"। পুরস্কার ১টি রৌপ্য পদক।

লেখা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানাঃ—সম্পাদক **"তরুণ"** শ্রীমহাদেব ধাড়া। গ্রাম মানশ্রী, পোঃ চিত্রসেনপুর, হাওড়া।

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১৮ই মার্চ "দেশ" পত্রিকাতে সাথী সম্প্রদায় কর্তৃক যে গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

গল্প (মহিলা বিভাগ)ঃ—"সন্ন্যাসী"র লেখিকা—শ্রীমতী লেখা দেবী পেয়েছেন প্রথম পুরস্কার। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন "খোকাবাবুর এ্যাডভেঞ্চার"-এর লেখিকা—কুমারী নিভা সরকার। "অদৃষ্ট"-এর লেখিকা—কুমারী দুলারী বেগম পেয়েছেন তৃতীয় পুরস্কার।

গল্প (পুরুষ বিভাগ)ঃ—"অনাদৃতা"-র লেখক—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাবিড়া প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—"প্রতিযোগিতা"-র লেখক—এনাসার কবীর। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন—"বন্দিনী"-র লেখক—নির্মলকুমার মুখার্জ্জী।

প্রবন্ধ (মহিলা বিভাগ)ঃ—প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন "সমাজ জীবনে নারীর স্থান"-এর লেখিকা—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী, সাহিত্য-কুশলা। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন পেয়েছেন "বাঙলা সাহিত্যে নারীর স্থান"-এর লেখিকা—শ্রীমতী হোসনে আরা খাতুন। "ভারতের নারী"-র লেখিকা—শ্রীমতী ঊষারাণী সেন পেয়েছেন তৃতীয় পুরস্কার।

প্রবন্ধ (পুরুষ বিভাগ)ঃ—"সমাজ জীবনে নারীর স্থান"-এর লেখক—শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন "ভারতে দারিদ্র্য—তাহার মূল ও প্রতিকার"-এর লেখক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন "শরৎ-সাহিত্যে নারী"-র লেখক—আবদুল রসিদ।

দ্রষ্টব্যঃ—যাঁহারা ডাকে পুরস্কার লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দয়া করিয়া ছয় আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন। নতুবা নিজেরা আসিয়া পুরস্কার লইবেন।

সম্পাদক—'সাথী সম্প্রদায়', ২৬।এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ।

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

তরুণ সঙ্ঘ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত রচনা ও চিত্র ২০শে আগষ্ট (১৯৩৯)এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

রচনাঃ—"বর্তমানে দেশের দুরবস্থার সঙ্গে বর্তমান ছাত্রদের কি সম্বন্ধ ও তাহাদের কি কর্তব্য।"

চিত্রঃ—"সমুদ্রবক্ষে সূর্যোদয়ের দৃশ্য।"

নিয়মাবলীর জন্য অনুসন্ধান করুনঃ—শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, ৬।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হস্তলিখিত মাসিক 'ঝরণা পত্রিকার উদ্যোগে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। কোন প্রবেশ মূল্য নাই। যে কোন প্রতিযোগী যোগদান করিতে পারেন।

প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ—(১) গল্প। প্রগতিশীল হওয়া চাই। এক্সারসাইজ বুকের ১ পৃষ্ঠা করিয়া ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

(২) প্রবন্ধ। নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় নাই। এক্সারসাইজ বুকের ১ পৃষ্ঠা করিয়া লিখিতে হইবে।

(৩) কবিতা প্রগতিশীল হওয়া চাই। স্পষ্টাক্ষরে কালি দিয়া এক পৃষ্ঠা করিয়া লিখিতে হইবে।

(৪) চিত্র। ছবির সাইজ ৭"×৫" পর্যন্ত চলিতে পারে। বহুবর্ণে রঞ্জিত হওয়া চাই। কেবলমাত্র চিত্র পাঠাইবার শেষ তারিখ—১০ই আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল।

উক্ত রচনাসমূহ ২০শে ভাদ্র, ১৩৪৬ সালের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছান চাই। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরং দেওয়া হইবে, নচেৎ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না। যাঁহার লেখা প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাঁহার লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। রচনার নিম্নে প্রত্যেকের পুরা নাম ও ঠিকানা দেওয়া চাই।

পুরস্কারঃ—প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থানের জন্য ১খানি করিয়া রৌপ্যপদক।

বিঃ দ্রঃ—অতিরিক্ত লেখা ও চিত্র আসিলে, ২য় ও ৩য় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার গুঁই, সম্পাদক, ঝরণা কার্য্যালয় তেমাথা, সত্যপীরতলা, পোঃ চন্দননগর।

গীতি-কবিতা প্রতিযোগিতা

মাইজপাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতির (যশোহর) উদ্যোগে একটি গীতি-কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। কবিতা মৌলিক হওয়া চাই। শ্রেষ্ঠ লেখককে 'গণেশচন্দ্র স্মৃতি-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। সমিতি পরিচালিত 'সবুজ' পত্রিকায় শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রকাশিত হইবে। শ্রাবণ মাসের মধ্যে কবিতাগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক। **শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য বি-এ, কাব্যবিনোদ, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।**

নিউ থিয়েটার্সের "রজত-জয়ন্তী" ছবি আগামী ১২ই আগষ্ট হইতে চিত্রায় আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন; শ্রীযুত সুধীর মজুমদার চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন; শ্রীযুত লোকেন বসু শব্দগ্রহণ করিয়াছেন; সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত রাইচাঁদ বড়াল; সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীযুত এইচ মহালানোবিশ এবং সংগীত রচনা করিয়াছেন শ্রীযুত অজয় ভট্টাচার্য্য। রজত-জয়ন্তীর চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

বগলা—শৈলেন চৌধুরী; হরনাথ—দীনেশরঞ্জন দাস; রজত—প্রমথেশ বড়ুয়া; বিশ্বনাথ—পাহাড়ী সান্যাল; সমীর-কান্তি—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়; সেক্রেটারী—বীরেন দাস; গজানন—পণ্ডিত শোর; নটরাজ—ইন্দু মুখার্জ্জি; জয়ন্তী—মেনকা; সুপ্তাদেবী—মলিনা ও ভৃত্য—সত্য মুখার্জ্জি।

* * * *

নিউ থিয়েটার্সের হইয়া শ্রীযুত নীতিন বসু "জীবন-মরণ" নামে যে বাঙলা ছবি তুলিতেছেন সে সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারই পরিচালনায় তোলা হিন্দি ছবি "দুষমনের" কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য ছবিখানি তোলা হইতেছে। শ্রীযুত নীতিন বসু স্বয়ং এই ছবির চিত্রগ্রহণ করিতেছেন; শব্দগ্রহণ করিতেছেন শ্রীযুত মুকুল বসু এবং সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিক। "জীবন-মরণ" ছবির চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

গীতা—লীলা দেশাই; মোহন—সায়গল; ডাঃ বিজয়—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়; রেডিও ম্যানেজার—অমর মল্লিক; গোপেন (গীতার পিতা)—ইন্দু মুখোপাধ্যায়; গীতার মাতা—নিভাননী; গীতার খুড়ী—মনোরমা; স্যানিটোরিয়ামের ডাক্তার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; ডাক্তারের সহকারী—হুয়া; মোহনের ভৃত্য—কেনারাম ব্যানার্জ্জি ও রেস্তোরাঁ ম্যানেজার—বোকেন চট্টোপাধ্যায়।

* * * * *

দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেডের নূতন পৌরাণিক চিত্র "রুক্মিণী"র চিত্রগ্রহণ শেষ হইয়াছে। ছবিটি অল্পদিনের মধ্যেই মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীমতী পান্না, প্রতিমা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু, রতীন [illegible], জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহযোগিতায় শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "রুক্মিণী" ছবি পরিচালনা করিয়াছেন।

দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেডের হাস্যরসাত্মক সামাজিক চিত্র

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'পরশমণি' চিত্রে জ্যোৎস্না ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথ-ভুলে'র কাজও শ্রীধীরেন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 'পথ-ভুলে' চিত্রে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে নূতন দিক দিয়া চিত্রপ্রিয়দের আনন্দ দিবার ব্যবস্থা তিনি করিতেছেন বলিয়া আমাদের জানান হইয়াছে। স্বয়ং পরিচালক, প্রতিমা, পান্না ভূমেন রায়, রঞ্জিত, রতীন, বিভূতি গাঙ্গুলী, সত্য মুখার্জ্জি ইত্যাদি এই চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

* * * * *

কালী ফিল্মসের হইয়া শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় "চাণক্য" ছবি তুলিতেছেন, এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ছবিখানি এখন খুব দ্রুতগতিতে তোলা হইতেছে—ইহা ছাড়া আর কোন নূতন খবর দিবার নাই।

শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র "শর্ম্মিষ্ঠা" ছবি পরিচালনা করিতেছেন।

আগামী শনিবার হইতে উত্তর কলিকাতার 'উত্তরা' চিত্রগৃহে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "পরশমণি" ছবি মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবির কাহিনী লিখিয়াছেন শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত প্রফুল্ল রায়। শ্রীযুত বিভূতি দাস চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন ও মিঃ চার্লস ক্রীড্ শব্দগ্রহণ করিয়াছেন। সুর সংযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুত হিমাংশু দত্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, সত্য মুখার্জ্জি, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ, রাণীবালা, জ্যোৎস্না, দেববালা, প্রভা, রাজলক্ষ্মী অরুণা, বীণা বাগচি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

ফিল্ম করপোরেশনের "রিক্তা" ছবিখানি সম্ভবত আগামী ১৯শে আগষ্ট তারিখে রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীযুত সুশীল মজুমদার মহাশয় ছবিখানা পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্নভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া সুশীল মজুমদার, তুলসী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী, মোহন, রমলা, কানু, নৃপতি, সন্তোষ প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের 'রজত জয়ন্তী' চিত্রে মেনকা ও প্রমথেশ বড়ুয়া

* * * *

মতিমহল থিয়েটার্স—"দেবযানী" নামক একখানি পৌরাণিক ছবি তুলিতেছেন। শ্রীযুত কৃষ্ণধন দে কাহিনী লিখিয়াছেন এবং ফণী বর্ম্মা পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায়—ছায়া, মীরা, রাধারাণী, কমলা (ঝরিয়া), নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিভূতি গাঙ্গুলী, মোহন ঘোষাল, মৃণাল ঘোষ, সুশীল রায়, কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * * * * *

মেসার্স ফিল্ম প্রডিউসার্স লিমিটেডের নূতন ষ্টুডিওর উদ্বোধন উৎসব গত সোমবার সন্ধ্যায় ৪৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শোণপুরের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত হারু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে মাল্যভূষিত করেন এবং ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, মিঃ এস এম বাগড়ে শ্রীযুত মাখনলাল মল্লিক প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

সভার শেষে নিমন্ত্রিতগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় এবং তাহার পর কমলা টকিজের "স্বামী-স্ত্রী" চিত্রের খানিকটা স্যুটিং করিয়া ষ্টুডিওর উদ্বোধন করা হয়। শ্রীযুত সতু সেন ছবিখানা পরিচালনা করিতেছেন।

মিঃ বি এল খেমকা, কুমার শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীযুত শরৎ মিত্র, মিঃ এম এল ট্যাণ্ডন, শ্রীযুত সুনীতেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দাসরথি চ্যাটার্জ্জি, জে সি ব্যানার্জ্জি, সি বি দেশাই, বি মানসাটা, মুরলীধর চ্যাটার্জ্জি, নির্ম্মলকুমার ঘোষ, আর এস শর্ম্মা, মধু শীল, সুধাংশু চৌধুরী, সানু ব্যানার্জ্জি, সুকুমার দাশগুপ্ত, সুশীল মজুমদার, সুধীর দাস, ননী সান্যাল, ডাঃ ফ্রেডারাণ, বি সি গাঙ্গুলী, উমানাথ গাঙ্গুলী, মাখনলাল ব্যানার্জ্জি, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্লকৃষ্ণ মুখার্জ্জি, বিমল ঘোষ, বিশ্ববসু রায় চৌধুরী প্রভৃতি এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

* * * * *

গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজবাসী সিংহ পরিচালিত মণিপুরী নৃত্য বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে নৃত্যগীতাদির এক বিরাট জলসা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী শীলা হালদারের মণিপুরী ও উর্ব্বশী নৃত্য মনোরম হইয়াছিল। শ্রীমতী প্রতিমা মোদকের বেহুলা নৃত্য, সেনারিক রাজকুমারের মণিপুরী নৃত্য, রাজকুমারের পত্নী বীরবালা সিংহের নৃত্যও উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীমতী হিমানী দাস ও শ্রীমতী তটিনী দাসের দ্বৈত নৃত্যও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজবাসী সিংহের পরিচালিত ধান্যোৎসব নৃত্যটি এই জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক, শ্রীমতী সুশীলা সেন ও শ্রীমতী সিপ্রা দেবীর গান চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীমতী সিপ্রা দেবীর উদ্বোধন সঙ্গীত বন্দেমাতরমের সহিত মিসেস এন দাসের পরিকল্পনা মত শীলা হালদার, তটিনী ও হিমানী দাসের দুর্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মীরূপে নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হইবার দৃশ্যটি অভিনব হইয়াছিল।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা এই সপ্তাহেই শেষ হইবে। ৩রা আগষ্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমাদের ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতার স্থানীয় দুইটি দল, কাষ্টমস ও পুলিশ ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। এই বৎসরের কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় লীগ তালিকায় এই দুইটি দল নিম্নভাগে স্থান লাভ করায় যে অখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় উন্নীত হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে ইতিপূর্বেও এই দুইটি দলের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পুলিশ ক্লাব সম্প্রতি অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৪-১ গোলে পরাজিত হয়। কাষ্টমস দলও ইতিপূর্বে তিনবার আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার রাণার্স আপ হইয়াছে। তবে ইহা বহু বৎসর পূর্বের কথা। ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে উক্ত দলকে দুর্ধর্ষ গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স দলের নিকট ফাইনালে পরাজয় বরণ করিতে হয় এবং ১৯১৫ সালে ক্যালকাটা ক্লাবের নিকট ফাইনালে উক্ত দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত হইতে হয়। ইহার পর দীর্ঘ ২৪ বৎসর পরে পুনরায় কাষ্টমস দল শীল্ড ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিল। সেমি ফাইনালের খেলায় সম্প্রতি এই দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, এইবার কাষ্টমস দল শীল্ডের রাণার্স আপ না হইয়া বিজয়ীই হইবে। তবে খেলার ফলাফল সকল সময়ই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। গত আটদিন ধরিয়া অবিরল বারিপাতের ফলে মাঠের অবস্থাও খুবই খারাপ হইয়াছে। পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত মাঠে কোন দলের প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হইবেন তাহা বলা বড়ই কঠিন। তবে ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুইটির শক্তি বিচার করিলে কাষ্টমস দলকেই অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়।

দল দুইটি কিরূপে ফাইন্যালে উঠিয়াছে

কাষ্টমস এ সি

ভবানীপুর ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। দিল্লী জেলা এসোসিয়েশনকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। উয়াড়ী ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। ক্যামেরোনিয়ান্স দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে।

পুলিশ এ সি

মহারাণা ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। রয়াল ফুসিলিয়ার্স দলকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে, বি এন আর দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। ক্যালকাটা এফ সিকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। ই বি আর দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

বেঙ্গল ওয়াটার পোলো লীগ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটার-পোলো লীগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি, হাটখোলা ও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য জোর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। এই তিন দলের মধ্যে কোন দলটি লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা এখনও সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। হাটখোলা দল প্রথমার্ধের খেলায় লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করায় অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, এই দল শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইতেই বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি ও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব সেই ধারণার পরিবর্তন করিয়াছে। এই দুইটি দল হাটখোলা অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। বিশেষ করিয়া বৌবাজার দল এখনও পর্যন্ত কোন খেলায় পরাজিত হয় নাই। সহজে যে কোন দল পরাজিত করিবে তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। রক্ষণভাগে এই দলের যে শক্তিহীনতার পরিচয় ইতিপূর্বে কয়েকটি খেলায় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা একরূপ বিদূরিত হইয়াছে। বি সেনগুপ্ত ও এইচ চৌধুরী এই বিভাগে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। সেই জন্য মনে হয়, বৌবাজার দলই শেষ পর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। তবে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে বৌবাজার দলকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রেফারী সমস্যা

রেফারী সমস্যা এই প্রতিযোগিতার দ্রুত পরিসমাপ্তির বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায়ই রেফারীর অভাবে খেলা স্থগিত থাকিতেছে। প্রতিযোগিতার সূচনায় কয়েকদিন এইরূপ রেফারীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম পরিচালকগণ ইহা অবগত হইয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু অতি দুঃখের সহিতই বলিতে হইতেছে যে, আমাদের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়াই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত প্রায়ই রেফারীর অভাবে খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে না।

প্রায় দুই মাস হইল ওয়াটার পোলো লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। অথচ এই দুই মাসের মধ্যে রেফারী সমস্যার সমাধান হইল না ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। রেফারিগণের নির্দিষ্ট খেলায় অনুপস্থিতি যেরূপ নিন্দনীয়, পরিচালকগণের দুই মাসের মধ্যে বিহিত ব্যবস্থা না করিতে পারাও সেইরূপ দূষণীয়। রেফারীর অভাব অথবা রেফারিগণের অবহেলার জন্য এইরূপ হইতেছে বা হইয়াছে, বর্তমানে যদি পরিচালকগণ এইরূপ যুক্তি দেখান তবে নিজেদেরই অক্ষমতার পরিচয় দিবেন। এক বৎসর প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিয়া এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবার পরও যদি তাঁহারা বিহিত ব্যবস্থা না করেন তবে কবে যে করিবেন তাহা আমরা ভাবিয়াই পাই না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৫শে জুলাই—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রায় দেড়মাসকাল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিংহল হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাদ্রাজে বিমান ঘাটিতে অবতরণের পর সিংহল যাত্রার ফলাফল সম্পর্কে পণ্ডিতজী বলেন, "অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে, সিংহল সরকারের ভারতীয় বিতাড়ন নীতি পরিত্যক্ত হয় নাই।"

ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিমিটেডের এক অভিযোগ সম্পর্কে গত রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও বাঙলার ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ গ্রেপ্তার হন। পরে তিনি জামীনে মুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিংহলে ফরোয়ার্ড ব্লকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যদিগকে ফ্যাসিস্ত মনোভাবাপন্ন এবং সুবিধাবাদী বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, পণ্ডিতজী যেন তাঁহার উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত করেন, আর না হয় বিনাসর্ত্তে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লন।

আলীপুর ও দমদম জেলের ৮৯ জন রাজনৈতিক বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘটের অদ্য ঊনবিংশ দিবস। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা পৌঁছিয়াই অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা অবগত হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিংহল হইতে মাদ্রাজ আগমন করিয়াই এক বিবৃতি প্রসঙ্গে অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পরলোকগত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড অরুণ সিংহ তাঁহার 'লর্ড' উপাধির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লর্ড সভায় যে আবেদন করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে লর্ড চ্যান্সেলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আবেদনকারী যে সকল তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, তিনি স্বর্গীয় লর্ড সিংহের বৈধ সন্তান এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী। এই ঘোষণানুযায়ী লর্ড সিংহ লর্ড সভায় আসন লাভ করিলেন।

২৬শে জুলাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যদিগের বন্দিমুক্তি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক সভা হয়। বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্ত করিবার জন্য কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন,—"দেশবাসীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত প্রায়—বাঙলা সরকারের অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত ১৯১১ সালের বাণিজ্য ও নৌ-চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়েছে। ইহার ফলে জাপানে কাঁচা মাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া দিবার উপায় হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে (কর্ম্মকর্ত্তাগণ সহ) অপসারিত করিয়া তৎস্থলে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নির্ব্বাচনের জন্য ১৫৬জন সদস্য কিছুদিন পূর্ব্বে সমিতির সম্পাদক মৌলবী আশ্‌রফ উদ্দীন আমেদ চৌধুরীর নিকট এক রিকুইজিসন সভা আহ্বানের এক নোটিশ দেন। তদনুযায়ী অদ্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির এক রিকুইজিশন সভার অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অপসারিত করিয়া নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তার পদে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য সংখ্যা ১৪৯; পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যগণ ২৮জন ছাড়া আর সকলেই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বের ২৮জন সদস্যের স্থলে নূতন ২৮জন সদস্য নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় কংগ্রেসের সকল দলের প্রতিনিধিই আছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশনের ফলে দেশব্যাপী যে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক জরুরী সভায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। কর্পোরেশন অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষা করিতে বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২৭শে জুলাই

দমদম ও আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের অনশনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, ঐ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়াছেন।

ঢাকা মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রকাশ, মন্ত্রিসভা বন্দিমুক্তি সম্পর্কে বাঙলা সরকারের পূর্ব্বানুসৃত নীতিতেই দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করেন।

নবগঠিত জাপ-নৌবহরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া নৌ-দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, পূর্ব্ব এশিয়ায় নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা জাপানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই উদ্দেশ্যেই উক্ত নৌবহর গঠিত হইয়াছে।

পেশোয়ার ফরোয়ার্ড ব্লকের অর্গানাইজার বাঙলার মির্জা আমীর হাসানকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাকে অবিলম্বে সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

মাদ্রাজ শহরের মধ্যে অদ্য হইতে দুই মাসের মধ্যে কোন জনসভায় বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রাজ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের যুক্তসম্পাদক শ্রীযুত সি পি ইল্লাঙ্গোর উপর ১৪৪ ধারার এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

১৪৪ ধারা অমান্য করার অভিযোগে কাশীতে এস পি

ত্রিপাঠ এবং সত্যব্রত দাশগুপ্ত প্রভৃতি চারজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসামের প্রবীণ জননায়ক দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন (ব্যারিষ্টার) হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গৌহাটিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আসাম উপত্যকার একজন বিশিষ্ট জননায়কের তিরোধান ঘটিল।

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের করভার প্রপীড়িত প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য এই যে, কমিটির মতে সার্ব্বভৌম শক্তি কর্ত্তৃক দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজাদিগকে যে সকল সনদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বাতিল করিয়া দিয়া ঐ সকল রাজাকে আউল, কণিকা ও কুজান্দের জমিদারদের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তযুক্ত জমিদারের পর্য্যায়ভুক্ত করা উচিত। ঢেনকানল রাজ্য সম্বন্ধে কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, উড়িষ্যা রাজ্য-সমূহের রাজাদের সনদ বাতিল সাপেক্ষ রাজ্যে সুশাসনের জন্য ঢেনকানল রাজ্যের রাজাকে গদিচ্যুত করা উচিত।

ব্যাংক অব বরোদার অভিযোগক্রমে উক্ত ব্যাংককে মোটা টাকা প্রতারণার অভিযোগে কলিকাতার পুলিশ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে তিনি জামীনে মুক্ত হন। এই সম্পর্কে পরলোকগত স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং ব্যাংক অব বরোদা লিমিটেডের কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ এম পি আমীন পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। উভয়েই জামীনে মুক্ত হইয়াছেন।

কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত হরিকুমার রায় নামক একজন ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী সীমান্ত সফর সমাপনান্তে দিল্লী গিয়াছেন। দিল্লীতে পেঁাছিয়া গান্ধীজী হরিজন উপনিবেশে হরিজন শিল্প বিদ্যালয়ের প্রথম কনভোকেশনে সভাপতিত্ব করেন।

২৮শে জুলাই—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে বাঙলা সরকারের নীতির প্রতিবাদকল্পে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বোম্বাইয়ের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বর্ত্তমান অবস্থায় বন্দি-মুক্তি প্রশ্নে পদত্যাগ করিতে পারেন না।

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনীত হইয়াছে এবং ইঁহাদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য বাঙলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

হিমালয় অভিযাত্রীদলের নেতা মিঃ কার-পিনক্ষি ও দলের অন্যতম সদস্য মিঃ হারণ গত ১৪ই জুলাই রাত্রে বিশ হাজার ফুট উচ্চে ক্যাম্পে অবস্থানকালে তুষার-স্তূপে প্রোথিত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৩০শে জুলাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নবনির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে বন্দীদের মুক্তি দিতে অনুরোধ জানান হয় এবং বাঙলা সরকার বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি না দিলে সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত হয়।

২৯শে জুলাই—

অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভায় ঘোষণা করেন যে, যদি নিয়মতান্ত্রিকতার পথে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা না যায়, তাহা হইলে সত্যাগ্রহ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি আদায় করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বসু এই উদ্দেশ্যে ৭ দিনের মধ্যে দশহাজার সত্যাগ্রহী ও দশহাজার অর্থ চান। শ্রীযুক্ত বসুর এই আহ্বানে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সৈয়দ নৌসেরআলি রাজনৈতিক বন্দি-মুক্তি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্বীকার পত্রে প্রথম স্বাক্ষর করিয়া বাঙলার প্রথম সত্যাগ্রহী হন।

শ্রীযুক্ত বসু জানান যে, দমদম ও আলিপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বন্দীরা তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের দাবী পূরণের পূর্ব্বে যদি তাঁহাদিগকে অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়, সেই অনুরোধ তাঁহারা রাখিবেন না, রাখিতে পারেন না।

বাঙলা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বসু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলে অথবা মুক্তির চেষ্টা করিলে যদি মন্ত্রিমণ্ডলীকে কোন সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, বাঙলা কংগ্রেস তাঁহাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে এবং তাঁহাদের পিছনে থাকিবে।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই সমভিব্যাহারে আলিপুর ও দমদম জেলে অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত তাঁহাদের সাড়ে চারি ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। প্রকাশ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও দেশাই উভয়েই বন্দীদিগকে মহাত্মাজীর কথামত অনশন ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য মহাত্মাজীর উপর নির্ভর করিতে বলেন। উত্তরে বন্দীরা নাকি কংগ্রেস সভা-পতিকে জানাইয়াছেন যে, কোন্ তারিখের মধ্যে বা কয় মাসের তাঁহাদের সকলের মুক্তি দেওয়া হইবে, এইরূপ কোন নিশ্চিত

আশা কেহ না দিতে পারিলে, তাঁহাদের পক্ষে অনশন ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

ভাওয়ালের মধ্যম কুমারের ভগ্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এই মামলার বাদীকে সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো, বিচারপতি মিঃ বিশ্বাস ও বিচারপতি মিঃ লজের সহিত চেম্বারে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় রাণী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীও অপ্রত্যাশিতভাবে কোর্টে উপস্থিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এই উৎসবে বক্তৃতা করেন।

হায়দরাবাদে মহাশয় মথুরামজী নামক আর একজন আর্য্য সত্যাগ্রহী মারা গিয়াছেন।

সত্যাগ্রহ বিষয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে ডাঃ লোহিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার হরিজন পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ফরাসী মন্ত্রিসভার অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দুই বৎসরকালের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা সম্পর্কে আদেশ জারীর সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

৩০শে জুলাই—

নিম্নলিখিত তিনজনকে লইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ইলেকসন ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইয়াছেঃ—(১) ডাঃ চারুচন্দ্র ব্যানার্জি, (২) ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়, (৩) মিঃ মুজাফর আহম্মদ। রাষ্ট্রীয় সমিতির কোন সদস্য ট্রাইব্যুন্যালের সদস্য হইতে পারেন না বলিয়া ডাঃ ব্যানার্জি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ ৮ জন রাষ্ট্রীয় সমিতির নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সভার সদস্য পদত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট পত্র দেন। কার্যনির্বাহক সভা তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সংগ্রামে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বালিগঞ্জের দেশপ্রিয় পার্কে দক্ষিণ-কলিকাতার নাগরিকগণের একটি জনসভা হইয়াছিল। বাবা গুরুদিৎ সিং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত মহাদেব দেশাই, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দমদম জেলে যাইয়া বন্দিগণের সহিত প্রায় তিনঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দীনের সহিত কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের দুইঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

পুণায় শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে হায়দরাবাদ রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ সমগ্র ভারতকে সাতটি এলাকায় বিভক্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতা নিখিল ভারত বৈদ্য মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহীশূরের আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীযুত মন্দুর রামস্বামী শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন

৩১শে জুলাই—

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের অন্যতম অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দেবের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীযুত দেব আমাশয় রোগে ভুগিতেছেন।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য সর্বপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক উপায় ব্যর্থ হইলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে দশ সহস্র স্বেচ্ছাসেবকের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে আবেদন করিয়াছিলেন, তদনুসারে গত দুইদিনে এক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সত্যাগ্রহী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অদ্য প্রাতে স্বরাষ্ট্র-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় দুইঘণ্টাকাল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত বসু বন্দি-মুক্তি প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার মতামত স্যার নাজিমুদ্দীনকে জ্ঞাপন করেন।

গত তিনদিন যাবৎ কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীযুত মহাদেব দেশাই রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অনশন ত্যাগে সম্মত করিবার জন্য ও তাঁহাদের মুক্তির জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে ব্যর্থ হইয়া তাঁহারা নিরাশ হৃদয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি বলেন যে, সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বন্দীরা মনে করেন যে বন্দি-মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা অনশন অবলম্বন করিয়াছেন। বহু চিন্তার পর তাঁহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের দাবী পূরণ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি না পাইলে তাঁহারা ঐ পন্থা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের দাবী। অপর পক্ষে স্বরাষ্ট্র-সচিবের মত এই যে যতদিন পর্যন্ত অনশন চলিতে থাকিবে ততদিন তিনি বন্দি-মুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারেন না।

ধামী রাজ্যে পুলিশী গুলী বর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী জানাইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সার্বভৌম শক্তি এবং ধামীর রাজার বরাবরে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

বড়লাট ১৯৩৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে পুনরায় এক বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়াছেন।

যারবেদা সেণ্ট্রাল জেলে এক গুরুতর দাঙ্গার ফলে তথাকার ইউরোপীয় জেলার, কয়েকজন ওয়ার্ডার এবং বহু কয়েদী আহত হইয়াছে।

৬ষ্ট বর্ষ] শনিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৬ Saturday, 29th July, 1939 [৩৭ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মুক্তি কোন পথে ?

দমদম ও আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে তাঁহারা তাঁহাদের অনশন-ধর্ম্মঘট অবলম্বন করিবার কারণ কি তাহা বলিয়াছেন এবং আমরণ অনশন চালাইবার দৃঢ় সংকল্পই প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজনৈতিক বন্দীরা অবুঝ লোক নহেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহারা চরম ব্যবস্থারূপে অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে এই দৃঢ়সংকল্প জন্মিয়াছে যে, বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলীর দ্বারা তাঁহাদের মুক্তি লাভ সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর, তাঁহাদের মুক্তি দানে ইচ্ছা বা আন্তরিকতার উপর তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। তাঁহারা সংকল্পশীল লোক, তাঁহাদের মতিগতি সহজে ঘুরান যাইবে না, এদিকে বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলও জেদ ধরিয়া বসিয়াছেন যে, তাঁহারা কিছুতেই ব্যক্তিগত-বিচার-নিরপেক্ষভাবে, অর্থাৎ ব্যাপকভাবে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবেন না। রাজনীতিক বন্দীদের সংকল্প একদিকে, আর বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর সংকল্প অন্যদিকে। ইহার ভিতর দিয়া বন্দীদের জীবন-মরণ দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং এই দ্বন্দ্ব যদি আর কিছু দিন চলে, তবে শোচনীয় এবং মর্ম্মান্তিক কিছু একটা অনিবার্য্যরূপেই ঘটিয়া যাইবে। এমন অবস্থায় উপায় কি? রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বন্দী-দিগকে অনশন ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, মহাত্মাজীও দিতেছেন সেই পরামর্শ, আমরাও সে অনুরোধ জানাইয়াছি, কিন্তু বন্দীরা সেই উপদেশ এবং পরামর্শে মুক্তি লাভ ঘটিবে, এরূপ মনে করিতে পারিতেছেন না। কেন মনে করিতেছেন না, সে বিচার করিয়া লাভ নাই, দরকার ইহাদিগকে বাঁচান এবং বাঁচাইতে হইলে উপায় কি? একপক্ষে মরণ-পণ সঙ্কল্পশীল একদল যুবক, অন্যদিকে মানবতার সকল অনুভূতি এবং রাজনীতিক দূরদর্শিতার ও যুক্তি-বুদ্ধির অতীত একগুঁয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডল, এই অবস্থায় বন্দীদিগকে বাঁচাইতে হইলে প্রয়োজন এমন কোন ব্যবস্থা অচিরে অবলম্বন করা—যাহাতে নিশ্চিতভাবে কাজ হয়। অপরের কৃপা বা দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বা তেমন দয়া উদ্রিক্ত হইবে, এই অনুমানের উপর কোন কাজ চালাইয়া বন্দীদিগকে বাঁচান যাইবে না। বাঁচাইতে হইলে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজনীতিক বন্দীদের মধ্যে নৈরাশ্য আসিয়াছে—তাঁহারা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়াছেন এবং করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, সুতরাং আরও বেশী দিন অপেক্ষা করিলেই যে ফল হইবে, কোনরূপ উঁচু মহল হইতেই তেমন আশ্বাসে তাঁহারা একান্তভাবে আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। তবে কি রাজনীতিক বন্দীরা তিল তিল করিয়া নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন? দেশবাসীরা তাহা ঘটিতে দিতে পারে না। কংগ্রেসেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে, রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্ত করা—কংগ্রেসও নিজেদের প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া তেমনভাবে তাঁহাদিগকে মরিতে দিতে পারেন না। বাঁচাইতে হইবেই ইঁহাদিগকে এবং যদি বাঁচাইতেই হয়, তবে কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সে কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কি বিবেচনা করিতেছেন? গরজ এখনও তেমন কিছু দেখি না। যদি তেমন গরজ থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এই সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক আহ্বান করিতেন এবং জানাইতেন রাজনীতিক বন্দী-দিগকে যে, তাঁহারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা কি। কংগ্রেসের শক্তি আছে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার। যদি এই প্রশ্নটি নিখিল ভারতীয় প্রশ্নে পরিণত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসের মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি কেমন না ঘটে—আমরা দেখিতে পারি। ভারতের আটটি প্রদেশে শাসন-সঙ্কটের তেমন ধাক্কা পোহাইবার মত অবস্থা এখন কর্ত্তাদের নাই। নিতান্ত সুবোধ এবং সুশীলের মত বড়কর্ত্তাদের শুভ বুদ্ধি সেদিন উদয় হইবে এবং বাঙলার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর অনিবার্য্যভাবে চাপ পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে এখনকার মন্ত্রিমণ্ডলীর সকল নীতির

চাবিকাঠি ঘুরাইতেছেন যাঁহারা, সেই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়েরই মতিগতিও ঘুরিয়া যাইবে। ইহা ভিন্ন অন্য পথ আর নাই।

পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতি—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—কেহ এমন কথা বলিতে পারিবেন না যে, তাড়াহুড়া করিয়া এই ব্যাপারে কিছু করা হইয়াছে। এই সমস্যাটি ভারতের রাষ্ট্রদেহে গভীর ক্ষতের মত হইয়া রহিয়াছে। সমস্যাটি বিশেষভাবে বাঙলার হইলেও সমগ্র ভারতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সমস্যাটির যে পর্য্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার আমাদের মনেক পীড়িত করিতেই থাকিবে। রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্ত করিতে পারিলেই শুধু এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। এই সব বন্দীরা বহু বৎসর হইল কারাগারে আবদ্ধ আছেন। যে পর্য্যন্ত ইঁহারা মুক্ত না হইতেছেন সে পর্য্যন্ত আমাদের মনে নানাভাবে উদ্বেগ থাকিবে এবং নানাদিক হইতে নানা সমস্যার সৃষ্টি করিবে। গবর্ণমেণ্টের দূরদৃষ্টি সহকারে এই বিষয়টির সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত। পণ্ডিত নেহরু এখন দেশে ফিরিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও রাজনীতিক বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিতেছেন। আশার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু আলোচনার ফল কি হইবে, সেই সম্বন্ধে একটা আন্দাজ বা অনুমান লইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। পণ্ডিত জওহরলালজী বলিতেছেন, সমস্যাটি শুধু বাঙলার নহে, সমগ্র ভারতের—কংগ্রেস হইতে এই সমস্যাটিকে নিখিল ভারতীয় প্রশ্নস্বরূপে দেখিবার কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত কর্ত্তাদিগকে দৃঢ়সংকল্প থাকিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, সেই পথের সম্মুখীন না হইতে পারিলে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি ঘটিবে না।

নিয়মতান্ত্রিকতার দোহাই—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে আমরা পরম গান্ধীনিষ্ঠ পুরুষ বলিয়াই আমরা জানি। তিনি সম্প্রতি এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, বাঙলার আইন-সভার অধিকাংশ সদস্য রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির বিরুদ্ধতা করাতেই সমস্যাটা বেশী জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগের হুমকী দেখাইয়া যে ভাবে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্ত করাইয়া লইয়াছিলেন, এখানে কংগ্রেস সে নীতি অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের আইন-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত ছিল রাজনীতিক বন্দীদের মুক্ত করা, বাঙলায় তাহা নহে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গবর্ণরের উপর চাপ দেওয়া নিয়মতান্ত্রিকতার বিরোধী হইবে, পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী গান্ধী-ভক্তের মুখে নিয়মতান্ত্রিকতার আনুরক্তির এই অমৃতময় উপদেশ পাইয়া আমাদের মত অভাজনগণ নিশ্চয়ই কৃতার্থ বোধ করিবেন। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে এই যে, এই নিয়মতান্ত্রিকতার যদি সর্ব্বত্র মর্য্যাদা দেওয়াই কংগ্রেসের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজকোটের ব্যাপারে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগের হুমকী দিয়াছিলেন কোন্ যুক্তিতে? সেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁহাদের কি কারণ ছিল? এই সব ছেঁদো যুক্তি, নিয়মতান্ত্রিক যুক্তি আমরা শুনিতে চাই না। দেশের লোকও শুনিবে না। বিষয়টি মন্ত্রীদের প্রাদেশিক গণ্ডীর বাহিরে—এমন কথাতেও আমরা সন্তুষ্ট নহি। কংগ্রেসের যদি একটা নিখিল ভারতীয় আদর্শ থাকে এবং কংগ্রেস যদি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান না হয়, ভারতের সকল প্রদেশের সঙ্গে যদি তাহার কেন্দ্রগত নীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে—ইহা স্বীকার করিয়াই লইতে হয়; তাহা হইলে ভারতের একটি প্রদেশের এতগুলি রাজনীতিক বন্দী তিল তিল করিয়া জীবন দান করিবে, আর কংগ্রেস তাঁহাদের মুক্তি সম্পর্কে দায়িত্ববিশিষ্ট হইয়াও কিছু করিবে না, এমন যুক্তি একান্ত অপদার্থেরই যুক্তি। যদি তেমন যুক্তিই মানিতে হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় আদর্শের কোন মূল্য থাকে না। কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড কিম্বা ওয়ার্কিং কমিটির নিখিল ভারতীয় নীতি-নিয়ন্ত্রণে কোন অধিকারের কার্য্যতঃ কোন সার্থকতা থাকে না। আমাদের স্পষ্ট কথা এই যে, রাজনীতিক বন্দীদের এই সমস্যাটি কংগ্রেসী নীতি ও আদর্শের পরীক্ষাস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছে। রাজনীতিক বন্দীরা শুকাইয়া মরিবে, আর কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী কর্ত্তারা নিয়মতান্ত্রিক নীতির ব্যাখ্যা করিবেন এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রীর গদীতে বসিয়া মজা লুটিবেন, ইহা হইতেই পারে না। ত্যাগপরায়ণতার প্রবৃত্তির ভিতর দিয়াই ব্যক্তির স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষা হয় এবং সেই ত্যাগমূলক বৃত্তি এবং বুদ্ধিকে সংগ্রামস্থলে বলবত্তর করিয়া তুলিবার উপরই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তির পরীক্ষা হইয়া থাকে। কংগ্রেস আজ অমোঘ বীর্য্যে সেই সংগ্রামে আগাইয়া আসুক। বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের প্রশ্নটিকে সমস্যা করিয়া ধরিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হউন।

মন্ত্রীদের অসহায়ত্ব—

উপর হইতে বড়লাটের চাপ না পড়িলে বাঙলার মন্ত্রীদের সাধ্য নাই যে, তাঁহারা রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করেন—শুধু সভা-সমিতি প্রভৃতি আন্দোলনের দ্বারা মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রখর করিয়া তুলিয়া রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি লাভ হইবে, এমন আশা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা মন্ত্রীদের এই অসহায়ত্বটির সম্বন্ধে ভুল বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না এ কথাটা যে, বাঙলার যাঁহারা মন্ত্রী, জনমতের আনুকূল্যে বা জনপ্রিয়তার জোরে তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব নয়। তাঁহাদের চাকুরী-নোকরীর মালিক হইতেছে

অন্য লোকে, দেশের লোকে নয়। এবং তাঁহাদের সেই যে মালিক পক্ষ, সেই পক্ষের মন যোগাইয়া সদা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে চলিতে হয়। মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুগত দলের একজন বড় চাঁই, কোয়ালিশনী দলের একজন বৃহৎ ব্যক্তি। এই কোয়ালিশনী দলের দুর্দ্ধর্ষ-কর্ণধার পুরুষ, সেদিন শ্রীহট্টের মুসলিম লীগ সম্মেলনে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এই গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ রাজের আদেশে পরিচালিত হয় না—পরিচালিত হয়, কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের খেয়াল মাফিক। বলিতে গেলে প্রত্যেক ব্যবস্থা, প্রত্যেক আইন-ই এই বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সাহেবদের অনুমোদনের জন্য তাঁহাদের নিকট দাখিল করিতে হয়।" বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর এই যে মর্ম্মতত্ত্ব নিতান্ত উমিলোক হইলেও আমরা ইহা না বুঝিতাম এমন নহে তথাপি বাঙলার মন্ত্রীদের রাজত্ব যে ইউরোপীয় প্রভুদের খেয়াল মাফিকই চলিতেছে, তাহাদিগকে চটাইবার সাহস মন্ত্রীদের নাই, এই তত্ত্বটি কোয়ালিশনী দলের অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর একজনের মুখে শুনিয়া অনেকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। এমন অবস্থায় ইহা স্থির যে, বাঙলার রাজনীতিক বন্দীরা মরুক আর বাঁচুক, সেজন্য শ্বেতাঙ্গ বণিক দলের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিবে না এবং তাহাদের মঞ্জুরী না পাইলে মন্ত্রীরা ইচ্ছা করিলেও, মন্ত্রিগিরির মায়ায় রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে পারিবেন না। কিন্তু ভারত সরকারের নিকট হইতে যদি চাপ আসে, তবে শ্বেতাঙ্গ বণিক দলের আর কোন উচ্চবাচ্য করিবার শক্তি থাকিবে না। কায়েমী স্বার্থহানির বিভীষিকা অন্তরে লইয়াই রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির ন্যায় অপ্রিয় সত্যকে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

নারী রক্ষার প্রশ্ন—

কোন্ সমাজ নারীর উপর কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইতে সমাজের উন্নতি-অবনতির স্তরটা বুঝা যায়। নারী রক্ষা সমিতির রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, গত পাঁচ বৎসরে ৪৩৬২ জন নারী ধর্ষিতা হইয়াছে এই বাঙলা দেশে। এই হিসাব দেখিয়া এমন বাঙালী কে আছে যে, লজ্জায় তাহার মাথা নীচু না হইবে? গত রবিবার নারী-রক্ষা সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, সমাজের ভিতর হইতে ইহার প্রতিরোধ ও প্রতিষেধ-শক্তিকে উদ্বোধন করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার তিনি সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। নারী জাতির অবস্থার উন্নতি বা সামাজিক নির্য্যাতন নিবারণকল্পে আইন প্রণয়নে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের তেমন আস্থা নাই। স্যার নৃপেন্দ্রনাথের যুক্তি বুঝা যায়। কিন্তু যুক্তি বুঝা এক কথা, আর সমাজের বাস্তব অবস্থাকে ফিরান অন্য কথা। যে দেশে পাঁচ বৎসরে ৪৩৬২ জন নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে, সেই সমাজের নৈতিক অনুভূতির শক্তি সহজে কোন যুক্তি, বুদ্ধি বা সৎপরামর্শকে গ্রহণ করিবার মত অবস্থায় আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। সমাজের শুভ বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করিলে, এ সমস্যার পাকাভাবে সমাধান হয়, ইহা সত্য কথা; কিন্তু সমাজের কোন রীতিনীতিই স্বাভাবিকভাবে দুই এক দিনে পরিবর্ত্তিত হয় না, দীর্ঘ দিনের প্রয়োজন হয় এবং এইজন্যই আইন প্রণয়ন আবশ্যক হইয়া থাকে। আইনও সমাজের সুস্থ শুভ বুদ্ধিটি সজাগ রাখিয়া স্থায়ীভাবে সমস্যা সমাধানের পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। আশু প্রতিকার হয় দণ্ডের ভয়ে এবং স্থায়ী প্রতিকার হয়—বিষয়টির অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে সমাজ সজাগ থাকার দরুণ। এইজন্যই আমরা সর্ব্বতোভাবে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের যুক্তি সমর্থন করিতে পারি না। বর্ব্বরদের জন্যই দণ্ডের প্রয়োজন হয়, বুদ্ধিমানদের জন্য হয় না—কিন্তু বর্ব্বরতা নির্জ্জিত রাখিতে হইলে কঠোর রাজদণ্ডেরই প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার সব দেশেই আছে; কিন্তু এক বাঙলা দেশেই দলবদ্ধভাবে নারীর উপর অত্যাচার করা সম্ভব হয় এবং নারীর উপর অত্যাচার করিয়াও এদেশে দুর্ব্বৃত্তেরা লোকালয়ে এবং লোকাশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারে। শুধু উপদেশে শুভবুদ্ধি জাগিবার মত অবস্থা ইহা নয়। মানুষ যদি এদেশে থাকিত, তবে নারীর উপর এমন অত্যাচার ঘটিতে পারিত না। নারীর প্রতি মর্য্যাদাবোধ যদি এদেশে থাকিত, তবে এমন পশ্বাচার সম্ভব হইত না—নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মানুষকে আগাইতে দেখিতাম, অন্তত উত্তেজনার বশেও দুই একটি স্থলে আততায়ীকে বাধা দিতে গিয়া মানুষকে প্রাণ দিতে দেখিতাম। নিরুদ্বেগ এমন একটা প্রশান্তি সমাজ-দেহে থাকিত না। পশুদের এমন বর্ব্বর লীলার মধ্যে বিক্ষোভ জাগিতই প্রচণ্ড রকমে এবং তেমন বিক্ষোভ জাগিবার মত নৈতিক অনুভূতি সমাজে যদি থাকিত, তবে কঠোর দণ্ডেরও প্রয়োজন হইত না। বাস্তবিকবিচারে যখন সে জিনিষটার অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে না, তখন কঠোর দণ্ডের এবং এমন কঠোর দণ্ডের প্রয়োজন, যাহাতে দুর্ব্বৃত্তেরা অপরাধ অনুষ্ঠানের চিন্তা করিতেও শিহরিত হইয়া উঠে। এইভাবে অপরাধের হীনতা এবং দণ্ডের ভীষণতার উপলব্ধিকে সজাগ রাখিয়া সমাজে সুস্থ আবহাওয়া যদি আনা যায়। ইহা ভিন্ন এই নিদারুণ লজ্জা হইতে বাঙলা দেশকে রক্ষা করিবার কোন উপায় যে আছে, আমাদের এমন মনে হয় না।

হায়দরাবাদে শাসন-সংস্কার—

গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজীতে স্বেচ্ছাচারকে দৃঢ় করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্রই হইল বিংশ শতাব্দীতে এই ভারতবর্ষ। নিজাম দরবার সাম্রাজ্যবাদীদের সেই মহদাদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা শাসন-সংস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, প্রজাদিগকে শাসনাধিকার দিয়াছেন—গণতান্ত্রিক অধিকার! সে অধিকারের স্বরূপ কি, কয়েকটি কথাতেই তাহা বুঝান যাইবে। হায়দরাবাদে হিন্দুর জনসংখ্যা হইল শতকরা ৮৮ জন, আর মুসলমান হইল শতকরা ১০½। অথচ আইন-সভায় মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা হিন্দুদের সমান সমান করা হইয়াছে। যাহারা সংখ্যায় শতকরা ১০½ জন, সেই মুসলমানেরা

আইন-সভায় শতকরা পঞ্চাশটি আসন পাইবে। শুধু ইহাই নহে, সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের যাহাতে প্রাধান্য থাকে, এমন ব্যবস্থাও পাকা করা হইয়াছে। দরবারের অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির চূড়ান্ত প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কি থাকিতে পারে? রাজ্যের রাজস্বের শতকরা ৯০ টাকাই যোগাইবে হিন্দুরা, অথচ সর্ব্বত্র তাহাদিগকেই অন্য সম্প্রদায়ের পায়ের নীচে পড়িয়া থাকিতে হইবে, গণতান্ত্রিকতার সুরু এইভাবেই হয় বটে! হায়দরাবাদের নিজাম সরকারের সরকারী চাকুরিয়াদের মধ্যে শতকরা ৬৮ জন মুসলমান, ২২ জন মাত্র হিন্দু, করদাতাদের স্বার্থের দিক হইতে এই অব্যবস্থার কিছুমাত্র প্রতিকার করা হয় নাই এবং প্রতিকার যে কোন দিন করা হইবে, এমন কোন সম্ভাবনাও রাখা হয় নাই। যে অন্যায় এবং অসংগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ রাজ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছিল, নূতন ফারমানে তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই। ধর্ম্মগত অধিকার এবং পৌর-অধিকার পরিচালনার স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইহাতে কোন কথাই নাই। রাজ্যের ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ব্যাপার পরিচালনার জন্য যে বিভাগ আছে, সেই বিভাগেও মুসলমানদের প্রাধান্য আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। মুসলমান কর্ত্তারা হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সাম্প্রদায়িকভাবে আমরা কোন বিচারের কথা তুলিতে চাই না—জনগণের অধিকারের দিক হইতে এই শাসন-সংস্কারের কোন মূল্য আছে বলিয়াই আমরা মনে করি না। ইহা আগাগোড়া একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র। হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রজার প্রকৃত অধিকার যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা কোন হিসাবেই এমন ধাপ্পাবাজীকে সমর্থন করিতে পারিবেন না। নিজাম দরবার এক্ষেত্রে ধাপ্পাবাজীতে সাম্রাজ্যবাদীদেরও যে উপরে উঠিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয়।

সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসব—

গত সোমবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব নিষ্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসের পৌরোহিত্য করিতে গিয়া পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, বাঙালী জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাধনার উপর আজ নানা দিক হইতে আঘাত আসিতেছে। এই আঘাত হইতে জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নিরাপদ রাখিবার ক্ষমতা সাহিত্য-পরিষদেরই আছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, আজ তাহা একটি বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার সুশীতল ছায়ায় সকলে উপস্থিত হইয়া বাঙালীর সেবা করিতে পারিতেছেন। হীরেন্দ্রনাথের এই উক্তির গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির কিছুই নাই—সে জাতি জাতি-হিসাবে কোন দিনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জাতির একটা জীবন্ত সাহিত্য আছে, বাহিরের কোন প্রতিকূল শক্তিই সে জাতিকে পিষ্ট করিতে পারে না। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙলার উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝাপ্টা বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙালী যে ভারতে গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে, সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছে, স্বদেশ-প্রেম ছড়াইয়াছে, জাতীয়তার দিক্‌জোড়া প্লাবন বহাইয়াছে ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে খুঁজিলেই দেখা যাইবে যে, ঐ সকলের মূলে কার্য্য করিয়াছে সাহিত্যিকদেরই সাধনা। সাহিত্যিকের সম্বল ঐকান্তিক যজ্ঞ-প্রবৃত্তি, অন্তরের একটা নিরপেক্ষ আনন্দ, এই আনন্দধারাই জাতিকে সঞ্জীবিত রাখে এবং বিভিন্ন মুখে জাতির সৃষ্টি-প্রতিভাকে বিচ্ছুরিত করে। বাঙলার যে সব মনীষী সন্তানের সাধনা সাহিত্য-পরিষদকে সুদৃঢ় করিতেছে, তাঁহারা চিরদিন জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন।

অন্তরীণ নীতির ব্যর্থতা—

স্যার স্যামুয়েল হোর বিলাতের সংরক্ষণশীল দলের একজন বড় চাঁই এবং আমাদের সুপরিচিত ব্যক্তি। ইনি এককালে ভারত-সচিব ছিলেন। বিলাতে সম্প্রতি একটি আইন পাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে, এই আইনে লোককে বিনা বিচারে অন্তরীণ রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। ইংলণ্ডে কিছুদিন হইল আইরিশ সাধারণতন্ত্রী দলের যে আতংক দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এই আইন করা হইতেছে। এই বিধানের সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া সেদিন স্যার স্যামুয়েল বলিয়াছেন,—এই বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে; কারণ, আমি যখন ভারত-সচিব ছিলাম, তখন অন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সম্বন্ধে আমাকে বিবেচনা করিতে হইত। মানুষকে অন্তরীণ করা অবশ্য খুবই সোজা, কিন্তু কি ভাবে তাহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং কখন মুক্তি দেওয়া দরকার, ইহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। স্যার স্যামুয়েলের দেশ সুয়েজ খালের পশ্চিম দিকে, সেজন্যই অন্তরীণ-নীতির এই জটিলতার দিকটা স্যার স্যামুয়েলের মত জাঁদরেল সংরক্ষণশীলেরও নজরে পড়িয়াছে—কিন্তু ইংলণ্ড যদি সুয়েজ খালের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে এ সমস্যা থাকিত না,—মুখ্য লক্ষ্য হইয়া পড়িত অন্তরীণ করা। অন্তরীণদিগকে কখন মুক্তি দেওয়া হইবে এবং কেমন করিয়া মুক্তি দেওয়া যাইবে, এ তো প্রশ্নেরও বাহিরে, কারণ মুক্তি দিবার জন্য মাথা ব্যথাই যে থাকিত না। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্য। এখানে জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া যাহা খুশী করা চলে, সেখানে কর্ত্তারা নিজেদের হাতে স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা রাখিতেই সাহস পান না, জনমতের চাপের ভয়ে। এইজন্যই ভারতবাসীদের পক্ষে যাহা অমৃত, ইংরেজের পক্ষে তাহা বিষ।

পণ্ডিত জওহরলালের প্রত্যাবর্ত্তন—

সিংহলের মন্ত্রীদের সঙ্গে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সিংহলী মন্ত্রীরা ইতিপূর্ব্বে সিংহল হইতে ভারতীয় মজুরদিগকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত যে গোঁ ধরিয়াছিলেন, পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলোচনা চালাইবার পর তাঁহাদের সে মতিগতির কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় শ্রমিককে বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে ভারতে

প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছিল, তাহাদের উপর প্রদত্ত ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ মীমাংসা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। এখন আলোচনা পত্রযোগে চলিবে। শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সহিত প্রীতির ভাব সিংহলীদের স্বার্থের দিক হইতেও রক্ষা করা যে কতটা প্রয়োজন, পণ্ডিত জওহরলাল তাহা মন্ত্রীদিগকে সমঝাইয়া দিবার ফলেই তাঁহারা একটু বিবেচনাপরায়ণ হইয়াছেন। ভারতবাসীরা এখন পরাধীন, কিন্তু পরাধীন হইলেও তাঁহারা যে একেবারে অসহায় নহে, জাঞ্জিবারের ব্যাপারেই কংগ্রেস-পরিচালিত ভারতের জন-আন্দোলনের সে শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সিংহলী সরকার যদি আজ ভারতীয়দের উপর অন্যায় বিধি-ব্যবস্থা চাপাইতে চান, তাহা হইলে তেমন ব্যবস্থা তাহাদের নিজেদের পক্ষেও কল্যাণকর হইবে না—পণ্ডিতজীর দৌত্যে সিংহলী সরকারের এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

চা-কর সাহেবদের উষ্মা—

তিন মাসের উপর, প্রায় ৪ মাস হইতে চলিল, আসামের ডিগবয়ের ধর্ম্মঘট চলিতেছে, এখনও মীমাংসা হয় নাই। ডিগবয় তেলের কারখানার মালিকদের সঙ্গে আসামের প্রধান মন্ত্রীর মীমাংসার আলোচনা সফল হয় নাই। আসাম সরকার ইতিমধ্যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সালিশী বোর্ড নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছেন। কোম্পানীর সাহেবেরা এ সম্বন্ধে কিরূপ মতিগতি অবলম্বন করিবেন বুঝা যাইতেছে না। এদিকে আসামের চা-কর সাহেবদের মেজাজ কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের উপর উত্তরোত্তর তিরিক্ষি হইয়া উঠিতেছে। আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যাঁহারা শ্রমিক তদন্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, চা-কর সাহেবদের চাইয়েরা তাঁহাদিগকে অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা গ্লানি প্রচার করিতেছে। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসীদলের ডেপুটি লীডার মিঃ এ কে চন্দ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে ইহাদের গ্লানি প্রচারের মাত্রাটা কেমন তাহা কিছু দেখাইয়াছেন। স্বার্থে আঘাত পড়িলে, মানুষ এমন উত্তেজিত হয়। যাহারা এতদিন দরিদ্রের রক্ত জল করিয়া নিজেদের বিলাস-ব্যসনে পুষ্ট হইয়াছে, আজ দেশের গরীব শ্রমিকদের স্বার্থের দিক হইতে সুবিচার কিছু করিতে গেলে তাহারা আর্ত্তনাদ তুলিবেই। এ দেশের গরীবদের সঙ্গে ইহাদের প্রাণের টান কিছু নাই—তাহাদের উদ্দেশ্য হইল দেশকে শোষণ করা; সুতরাং তাহাদের এই যে উত্তেজনা ইহাকে আমরা বিশেষ কিছু গুরুত্ব দান করি না। মানুষ তাহার স্বভাব ছাড়িতে পারে না। আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসীদলের স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই—এইটিই হইল ভাবিবার বিষয়। বিদেশী শোষণকারী-দলের টিকায় জোর আছে—তাহা ছাড়া নিজেদের জাতি-গোষ্ঠীর শাসনাধিকারগত প্রভুত্বের স্পর্দ্ধাও তাহারা ছাড়িতে পারে নাই; কিন্তু তাহার চেয়ে ভাবিবার কথা হইল এই যে, এই দেশে এখনও মীরজাফর, উমিচাঁদের উত্তরাধিকারীর অভাব নাই। ইহারা দেশের স্বার্থকে বিক্রয় করিতে পারে, সাহেবদের আশা ভরসা হইল ইহারা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ইঁহারা সেই সব দেশদ্রোহীকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি, আসামের আইন-সভার সদস্যেরা এই সব শ্বেতাঙ্গ স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইবেন না—বাঙলার আইন-সভার সদস্যদের অপেক্ষা এদিকে আমরা তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধির পরিচয় বেশী পাইব, ইহাই আশা করি। দেশের স্বার্থ, দেশের গরীবদের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক অর্জ্জনের উপর বিতৃষ্ণা তাঁহাদের যদি দৃঢ় থাকে তবে বিদেশী স্বার্থসেবীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এই সব বিদেশী স্বার্থ-সেবীর দল বুঝিবে যে, এদেশের লোকে আর তাহাদের ক্রীতদাসত্ব বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়।

প্রাদেশিকতার প্রসার—

সম্প্রতি শ্রীযুত জামসেদজী মেহতা মহাত্মা গান্ধীর নিকট একখানা চিঠিতে লিখিয়াছেন,—"প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন আমাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ না হইয়া অভিশাপস্বরূপ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি অনেক সময় বিহ্বল হই। জাতীয়তার মনোভাব বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমার দেশ বলিলে ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য পড়িত, এখন আমার প্রদেশের কথাই মনে জাগে।" বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীদের উদ্দেশ্য আমরা বুঝি, তাহারা ভেদনীতির সাহায্যে এদেশের সংহতি শক্তি দুর্ব্বল করিতে চায়। বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ভেদনীতির বিষ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, অন্য দিকে প্রাদেশিকতা, এই দুইটি হাতিয়ার তাহারা চালাইতেছে। নিজেদের স্বার্থের জন্য তাহারা চালাইবেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের রাষ্ট্রীয়তা যাঁহাদের আদর্শ তাঁহারাও এই বিধিকে উৎখাত করিবার জন্য তৎপর নহেন, বরং অনেক স্থলে এই প্রাদেশিকতার মধ্যে গিয়াই তাঁহারা পড়িতেছেন। বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্বন্ধে বিহারের কংগ্রেসী সরকারের মনোভাবও এ সম্বন্ধে নজীর। বাঙলাদেশ কোন দিনও প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। বাঙালীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধারা নিখিল ভারতকে সঞ্জীবিত করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। বাঙলার কবি এবং সাহিত্যিক সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার দিকেই মানুষের দরদকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই আত্মদানের হোম-শিখা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে—সিন্ধু হইতে কন্যাকুমারী, সর্ব্বত্র বহিয়াছিল বাঙলাদেশ

হইতে সেই প্রেরণা। কিন্তু আজ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পিছনে মুখ্যভাবে সে জিনিষটির যে অভাব ঘটিয়াছে, এ কথা স্বীকার না করিলে চলে না। এই অবস্থায় একমাত্র প্রতীকার সম্ভব হয় আমাদের মতে কংগ্রেস যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মোহমায়াকে তুচ্ছ করিয়া নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনায় উগ্রতরভাবে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন তবে। মহাত্মাজী লিখিয়াছেন—"ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্বেষের কোন অবকাশ নাই। নচেৎ ভারতবর্ষ পরস্পর সংগ্রামরত বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে এমন কি অপরের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে। দেশে সেই দুর্দ্দিন যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত করিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টার প্রতিবাদ করিতে হইবে।" আমরাও এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের মতে সেই প্রতিবাদের শক্তির রূপ হইল বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মোহজালকে ছিন্ন করিয়া—মন্ত্রিগিরির লোভ ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র ভারতের মুক্তি সাধনার দিকে কর্ম্মশক্তিকে একান্তভাবে প্রয়োগ করা। কংগ্রেসের দক্ষিণী দল এইটি যত সত্বর বুঝেন, ততই মঙ্গল।

বন্দে মাতরম্‌ ও মহাত্মাজী—

'বন্দে মাতরম্‌' সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে একটি মন্তব্য করিয়াছেন। এই মন্তব্য লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছে, মাহাত্মাজী যাহা বলিতেছেন তাহা মোটামুটি এই যে, বিভিন্ন মতবাদীদের কোনও সভায় যদি 'বন্দে মাতরম্‌' সম্বন্ধে একজন লোকও আপত্তি করে, তাহা হইলে 'বন্দে মাতরম্‌' গাওয়া চলিবে না। কিন্তু একমতাবলম্বীদের মধ্যে 'বন্দে মাতরম্‌' গাওয়ায় কোন আপত্তি স্বীকার করিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। মহাত্মাজীর এই উক্তিরও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা দুরূহ—এখানে একমতাবলম্বী বলিয়া কি বুঝিতে হইবে, এক সম্প্রদায়ের লোক কি? যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ 'বন্দে মাতরম' যদি সম্প্রদায়বিশেষেরই সংগীত হয়, তবে আর উহাকে জাতীয় সংগীত বলার সার্থকতা থাকে কি? আর জাতীয় অর্থের মর্য্যাদাই যদি উহার স্বীকার না করিতে হয়, তাহা হইলে অকারণ ঐ সংগীতটির অংগচ্ছেদই করা কেন হইল? সেই অংগচ্ছেদের পরও উহা জাতীয় সংগীত হয় নাই—মহাত্মাজী এই কথা বলিতে চাহেন? সহস্র সহস্র দেশ-প্রেমিকের তপঃ-সাধনার শক্তি সমন্বিত এই সংগীতকে তদুপযুক্ত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে যাঁহারা না দেখেন, তাঁহারা খোলাখুলি সে কথা বলুন, আমরা কথার এই ধারার নানা রকমের ঘুরফের ভালবাসি না। বাঙলার যাঁহারা জাতীয়তাবাদী, যাঁহারা স্বদেশ-প্রেমিক—তাঁহারা 'বন্দে মাতরমে'র জাতীয়তার বিরোধী—এই সব পণ্ডিতী ভাষ্য কিছুতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নন—তাঁহাদের সমর্থনকারীর অভাব যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও নাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বেদীমূলে যাঁহারা এই সংগীত গান করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি সে পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এবং সে প্রমাণের কাছে পণ্ডিতী ভাষ্যের মূল্য অতি তুচ্ছ।

সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন—

প্রায় দেড় মাসকাল ভারতের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া গত মংগলবার সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙলার নানা সমস্যা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, প্রথমেই রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যা। দেশের জনমত উত্তরোত্তর এই সম্পর্কে বাঙলার মন্ত্রীদের অবলম্বিত নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেই বিক্ষোভকে বিরাট আকার দিয়া দুর্জ্জয় সংকল্পশীলতাকে সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল আর একটি ব্যাপার। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল প্রকাশ্যভাবে এই বিলের মারফৎ কংগ্রেসকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছেন এবং সুভাষচন্দ্র কিছুদিন আগে এতৎ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দান করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলকে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া ঔদ্ধত্যভরে দাঁড়াইয়াছেন। এই অন্যায় এবং অসংগত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সুভাষচন্দ্রকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কর্ম্মপ্রণালী দিতে হইবে কলিকাতাবাসীদিগকে যাহার সাহায্যে তাঁহারা এই বিলকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারেন। শুধু ফাঁকা কথা নয়—এখন চাই রীতিমত কাজ। বাঙলাদেশের আসন্ন এই দুই সমস্যা সমাধানের পথে নেতৃত্ব করিবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙলার আসন্ন সংকটগুলির সমাধান-পথে সাহস-সমন্বিত কর্ম্মপ্রণালী প্রয়োগ করিয়া তিনি ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে অগ্নিময়ী উদ্দীপনার সৃষ্টি করুন।

চা (TEA)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বর্ত্তমানে চা ভারতের এক সম্পদ, অর্থাৎ প্রতি বৎসর বহু কোটি পাউন্ড বাহিরে যায় এবং তাহাতে বিদেশ হইতে টাকা আসে। ইহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে, অর্থাৎ মোট ২০ কোটি টাকার উপর। প্রকৃতপক্ষে দেশ হইতে যে কয়টি কাঁচা হইতে সংস্কৃত বা প্রস্তুত (manufactured) মাল বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে চায়ের স্থান দ্বিতীয়; প্রধান—পাটজাত মাল। সম্মিলিত রপ্তানীর মধ্যে পাট ও পাটজাত বস্তু এবং তুলা ও তুলোজাত বস্তুর পরেই চায়ের রপ্তানী পড়ে।

পুরাতন ইতিহাস

চায়ের এ সম্বন্ধে খুব বেশী দিনের নয়, অর্থাৎ ইহার উন্নতির সুসংবদ্ধ ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তবে চীনে বা ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে চা-গাছ জন্মিয়া আছে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না।

বিদেশী ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাতি চায়ের বিশেষ পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, তাহা না হইলে চায়ের ব্যবহার মাত্র চীন দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল; অন্যত্র নহে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৩৭ সালের চৈনিক অভিধানে চায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চিয়াংরাজ বংশের ইতিহাসে চা পণ্যরূপে পরিচয় লাভ করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে টং বংশের রাজত্বকালে চায়ের উপর নিয়মিত কর ধার্য্য হইয়াছিল; এ কারণে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্তত এই সময় চায়ের নিয়মিত বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন এই কালের পূর্ব্বে চীন দেশে ঔষধরূপেই চায়ের প্রচলন ছিল, কিন্তু উত্তেজক পানীয় হিসাবে চায়ের ব্যবহার ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। ৭৮০ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র চা উপলক্ষ্য করিয়া এক পুস্তক রচিত হয় (চা চিং অর্থাৎ চা কাব্য) ৯৬০ হইতে ১২৮০ সালের মধ্যে চীনের সকল প্রদেশেই চা ব্যবহার হইতে থাকে।

যতদূর জানিতে পারা যায়, ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে জাপানে প্রবেশলাভ করে এবং ব্যবহার আরম্ভ হয়। ওলন্দাজেরা ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে চা লইয়া যায় এবং আন্দাজ ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হল্যান্ড হইতে লর্ড আর্লিংটন (Lord Arlington) ইংলণ্ডে চা আমদানী করেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ডে চা বিক্রীত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে চা ব্যবহার সম্বন্ধে ম্যান্ডেলসেস্লো (Albert de mandelslo)র বিবৃতিই বোধ হয়, প্রথম পরিচয়। তাঁহার মতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে প্রায় একই সময় লোকে চা ব্যবহার আরম্ভ করে। আন্দাজ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে চা ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

আদিবাস

বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের ধারণা ছিল, চা একমাত্র চীন দেশের সম্পত্তি এবং তথা হইতে নানাদেশে বিশেষত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ ধারণা যে অমূলক তাহা নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ওলন্দাজ কর্ত্তৃক চীন হইতে চা রপ্তানী হয় বলিয়া লোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। যদি চীনের সহিত কোনও সময় গোলযোগ বাধে এবং ইংলণ্ডে চা আমদানী করিবার অসুবিধা হয়, সেই আশঙ্কায় ভারতবর্ষে চা-বাগান প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, আসামের জঙ্গলে চা গাছ জন্মিয়া আছে। তাহা হইতে লোকে মনে করে চীন ও ভারতের সংযোগ স্থলে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, যে স্থলে প্রচুর বারিপাত হয়, অথচ বৃক্ষমূলে জল জমিয়া থাকে না, সেই দেশই চা গাছের আদি জন্মস্থান। পরে একদিকে যেমন চীন দেশে ছড়াইয়াছে, অপর দিকে আসামের জঙ্গলে আসিয়া বহুকাল অনাদৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে.

ভারতে চায়ের প্রথম পরিচয়

উপরে বলা হইয়াছে, চীন রাজ্যের সহিত কোনও গোলমালের সম্ভাবনায় ভারতে চায়ের আবাদ করিবার চেষ্টা হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৭৮৮ সালে ব্যাঙ্কস্ (Sir Joseph Banks) ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশে, বিশেষত রংপুরে, কুচবিহার ও বিহারে চা-আবাদ করিবার কথা বলেন; কিন্তু সে কথা তখন চাপা পড়িয়া যায়। ১৮২১ হইতে ১৮২৬ সনের মধ্যে সম্ভবত ১৮২৩ সালে ব্রুস্ (Robert Bruce) আসামের জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং বর্ত্তমান শিবসাগর জেলায় ভারতীয় চা গাছ দেখিতে পান; পরে স্কট্ (Scott) মণিপুরেও চা গাছ আবিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে চীন হইতে বীজ আনিয়া ভারতে আবাদ করা সম্ভব কিনা, এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতে থাকে; এবং এই কার্য্যের ভার গর্ডন (J. G. Gordon) সাহেবের উপর পড়ে। কিন্তু চার্লটন্ (Capt Charlton) প্রমাণ করেন যে, চা গাছ ভারতের নিজস্ব সম্পদ এবং আমদানী করা যে কোনও প্রকার চা অপেক্ষা কোনও রকমে নিকৃষ্ট নহে, হয়ত বা তাহা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন। এই কার্য্যের জন্য ১৮৪২ সালে ভারতীয় কৃষি সমিতি (Agricultural & Horticultural Society of Bengal) হইতে তাঁহাকে সুবর্ণপদক প্রদান করা হয়। বলা বাহুল্য ইহাতে কোম্পানীর বহু অর্থ ও ক্লেশ বাঁচিয়া যায়; এবং ভারতের চা বিক্রয় করিয়া চার্লটনকে প্রদত্ত পদকের সামান্য সুবর্ণের পরিবর্ত্তে বহু কোটি গুণ স্বর্ণমুদ্রা তাহারা আহরণ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছে।

আবাদ প্রতিষ্ঠা

এই সকল অনুসন্ধানের সঙ্গে আসামে আবাদ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে এবং ১৮৩৬ সালে ব্রুসকে (C. A. Bruce) আসামের বাগানের কর্ম্মাধ্যক্ষ বা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

অনেক বিতর্ক ও বিবরণী লেখা চলিতে থাকে এবং আসামে কয়েকটি সরকারী বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৮ সালে ভারতীয় চা ইংলণ্ডে প্রথম রপ্তানী হয় এবং এই সময় স্থির হয় যে, সরকারী বাগান তুলিয়া দিয়া কোনও বে-সরকারী সাধারণ ব্যবসায়ীকে চায়ের আবাদ করিতে সুযোগ দিলে অনেক গোলমালের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। ১৮৩৯ সালে "আসাম কোম্পানীর" (Assam Company) ৫ লক্ষ পাউন্ড মূলধনে স্থাপিত হয় এবং পর

বৎসর তাহাদের নিকট শিবসাগর (জয়পুরে) বাগান ও অন্যান্য সরকারী বাগান বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। দার্জিলিঙ ও চট্টগ্রামে ১৮৪০ সালে, কাছাড়ে ১৮৫৫ সালে, তেরাই অঞ্চলে ১৮৬২ এবং ১৮৭৪ সালে পশ্চিম ডুয়ার্সে (Western Dooars) বহু বাগান আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ সালে দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে আবাদ সুরু হয়, এবং সেখানে এখনও অনেক আবাদ বাঁচিয়া আছে; পরে ইহার সমস্ত পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

কলঙ্ক কাহিনী

নীল আবাদ করার সহিত এদেশীয় লোকের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার গিয়াছে, চা আবাদের সঙ্গেও অনুরূপ কাহিনী গ্রথিত আছে। এ ইতিহাস হয়ত আরও মসীলিপ্ত। নীলের আবাদের নিকটবর্তী স্থানে লোকালয় ছিল, সুতরাং তাহাদের অত্যাচারের কাহিনী পরম্পরে জানিতে পারিত। নীলকুঠীতে যে নিপীড়ন হইত, লোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিত। নির্য্যাতনের ক্ষুদ্র বিবরণ পর্য্যন্ত লোকসমক্ষে প্রচার হইয়া পড়িত। কখনও কখনও যে "গুম্ খুন" হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু আসামের কুলীদের কাহিনী আরও করুণ, আরও হৃদয়বিদারক। যখন এ কাহিনী লিখিবার দিন আসিবে, তখন হয়ত লোকে বিশ্বাস করিবে না যে, "সুসভ্য" ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক এই অত্যাচার কি করিয়া সংসাধিত হইয়াছিল। "আড়কাঠী" চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকার ধরিয়া বেড়াইত। অর্থলোভে, সাহেবদের উৎসাহে, তাহাদের অসাধ্য কুকাজ কিছুই ছিল না। দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর লোকদের ধরিয়া "রাতারাতি" ধনী করিয়া দিবার প্রলোভনে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করাইয়া বা নাম জাল করিয়া একবার চা-বাগানের পথে ঠেলিয়া দিতে পারিলে তাহারা নিশ্চিন্ত; কিন্তু যাহারা পথিক, তাহাদের অনেকের ভাগ্যেই প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চিরতরে রুদ্ধ ছিল. সুরু হইতেই চা-বাগান লাভজনক হয় নাই; ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিল। সে কারণে কুলি মজুরদিগের নিকট হইতে বেশী কাজ পাইবার আশায় তাহাদের উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক বলিলে সে অত্যাচারের সুখ্যাতি করা হয় মাত্র। অস্বাস্থ্যকর আসাম ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে লোকে আসামের কালাজ্বরে বা কালজ্বরে পড়িত; বিনা শুশ্রুষায়, বিনা চিকিৎসায়, আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুর সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে; তাহার সহিত কখন অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার হিসাব রাখিবার লোকও ছিল না, সুযোগও ছিল না। কুলী রমণীর উপর বহু পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী দুর্ভেদ্য বনানীর মধ্য দিয়াও শহরে ক্বচিৎ আসিয়াছে, কিন্তু বিদেশীর নিকট তাহাদের স্বজাতীয়ের বিচারে যে ফল হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। এমন প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে যে, আসামের কুলীদের প্লীহা বিবৃদ্ধি-লাভ করিতে করিতে স্বতঃই ফাটিয়া গিয়াছে, আর দুষ্টস্বভাব ভারতবাসী মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া দেবোপম ইউরোপীয় জাতির নামে অযথা কলঙ্ক দিয়াছে। তাহার ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, অভিযুক্ত বে-কসুর মুক্তিলাভ করিয়া মিথ্যা-বাদী ভারতবাসীকে যথাযোগ্য নামে পুরস্কৃত করিয়াছে। কদাচ প্রমাণ হইয়া গেলে প্লীহার মূল্য ১৫, হইতে ২৫, টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এই দাম প্লীহার হিসাবে দেওয়া হয়। প্লীহা ফাটিয়া যদি প্রাণনাশ হয়, তাহা ক্ষুদ্র প্রাণের দোষ; শাসন করিতে প্লীহা ফাটিয়াছে, সুতরাং তাহার মূল্যই প্রাপ্য; দুষ্টামি করিয়া প্রাণ যদি চলিয়া যায়, তাহার ফল অপরে কেন ভোগ করিতে যাইবে?

এই সকল ঘটনা এত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ লোকে বিচারে কখনও সুফল আশা করিত না। লোকালয় হইতে এত দূরে সে সমস্ত ঘটনা আসিয়া পৌঁছিত না। স্থানীয় জনমত বলিতে কিছুই ছিল না, কারণ ঐ সকল আবাদ হইতে লোকালয় বহুদূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং "নীলের বিদ্রোহের" মত কোনও চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা ছিল না। এক কথায় বলা যায়, চা-বাগানের কুলীর দুর্দ্দশার সহিত আর কোনও মজুরের দুর্দ্দশার সহিত তুলনা করা যায় না।

আবাদের কাল

চায়ের বীজ লইয়া "বীজতলা" প্রস্তুত করিয়া তথা হইতে তুলিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। যে সকল গাছ হইতে বীজ সংগৃহীত হয়, তাহাদিগকে ছাঁটিয়া দেওয়া হয় না; বিনা বাধায় বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ সুযোগ পাইলে গাছগুলি পনেরো হইতে বিশ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে; কিন্তু সাধারণত দশ বারো হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। উত্তর ভারতে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ গাছে ফুল আসে এবং বীজগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়া যায়। ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে গাছে আর একবার ফুল ফুটিতে দেখা যায়। অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বীজগুলি সংগৃহীত হইলে মার্চ্চ মাস নাগাদ রোপণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ পরিপুষ্ট বীজ বেশীদিন পড়িয়া থাকিলে তাহার অঙ্কুরিত হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই বীজতলার জন্য বিশেষ উর্ব্বর জমির প্রয়োজন। সাধারণত নবেম্বর ডিসেম্বর মাসের চারা ছয় মাস বাদে স্থানান্তরে রোপিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা রাখিয়া দেয়।

চা আবাদের জন্য খুব ভাল জমি তৈয়ার করা প্রয়োজন এবং গাছও চার পাঁচ ফুট অন্তর রোপণ করা যুক্তিযুক্ত। নূতন গাছের চতুর্দ্দিক জঙ্গল ঝোপ হইতে মুক্ত করিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ গাছের বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটে। বিশেষভাবে সার দিয়া গাছ সতেজ রাখিলে তবে অধিক পরিমাণে পাতা পাওয়া যায়।

গাছ ঝোপ হইলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা বেশী হইলে কচি পাতা অধিক মাত্রায় পাইবার সম্ভাবনা। সেই কারণে গাছগুলি আন্দাজ এক বৎসরের হইলে তাহার শিরোভাগ ছাঁটিয়া দিলে, কাণ্ড হইতে তিন চার বা ততোধিক ক্ষুদ্র শাখা বাহির হয়। সেই গুলিকে দুই তিন বৎসর বাড়িতে দিলে, আবার ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। পরে প্রতি বৎসরই পূর্ব্ব বৎসরের শাখার উপরিভাগে এক বা দুই ইঞ্চি বাড়িতে দিয়া

(শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচ্যের মিউনিক?

ইদানীং মিউনিক নামটি কুখ্যাত হইয়াছে। এই শহরে বসিয়াই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করা হয়। মিউনিক চুক্তি সংঘটিত না হইলে চেকোশ্লোভাকিয়া নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটি আজ ইউরোপের মানচিত্র হইতে মুছিয়া যাইত না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর এই রাষ্ট্রটির একান্ত নির্ভর ছিল। শেষে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের তোষণ নীতির পাল্লায় পড়িয়া নিজ অস্তিত্ব বিলোপের পথ সুগম করিয়া দিতে বাধ্য হয়। অল্পদিন পরেই ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে একেবারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। মিউনিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সুরক্ষিত সীমানা ছাড়াইয়া জার্মানরা চেক রাষ্ট্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহারা সহজেই এক হুমকিতে চেকোশ্লোভাকিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিয়াছিল। মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের তোষণ-নীতিই

ব্যঙ্গচিত্র। মিঃ নেভিল চেম্বারলেন

ইহার জন্য দায়ী, একথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দুর্দ্দম হিটলারকে তুষ্ট করিবার জন্যই মিউনিকে বসিয়া এইরূপ করা হইয়াছিল।

আজ প্রাচ্যে কি তাহাই হইতেছে না? টিয়েনসিনের ব্যাপারের কথা শীঘ্র কেহ ভুলিতে পারিবেন না। ইংরেজের উপর জাপানীদের ব্যবহার শুধু ইংরেজকেই যে লজ্জা দিয়াছে তাহা নয়, বিশ্ববাসীও তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। জাপানীরা জিদ ধরিয়া বলিতেছে, হয় আমাদের কথা মানিয়া লও, নয় এখান হইতে চলিয়া যাও। শুধু টিয়েনসিনে বসিয়াই যে ইহা বলিয়াছে তাহা নয়, টোকিওর ইংরেজ দূতাবাসের সম্মুখে সহস্র সহস্র জাপানী এই বলিয়া দাবী জানাইয়াছে যে, ভাল চাও ত এশিয়া হইতে চলিয়া যাও। ইংরেজ ইহার কি জবাব দিবে তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছিল।

চীনারাও এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, হয়ত বা ইংরেজ এবার তাহার দোমনা-ভাব ত্যাগ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে গোঁ ধরিবে। চীনাদের আশ্বস্ত হইবার পক্ষে কিছু কারণ যে না ছিল, তাহাও নয়। তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের আরম্ভ হইতেই ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিনদের দুয়ারে ধর্না দিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মারফৎ রাষ্ট্র-সভ্যদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তখন ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। শেষদিকে যখন চীনারা জাপানের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছিল, তখন ব্রিটিশ ও মার্কিনরা অর্থ দিয়া কতকটা সাহায্য করিয়াছে। ইংরেজ রাজ্যের ভিতর দিয়া যাহাতে অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়া যায় তাহার উপায় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ দেখিতেছি বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অথবা নিছক আত্মরক্ষার জন্যই ব্রিটেন জাপানের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হইতে চলিয়াছে। মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, জাপানীরা চীনের যে সব অংশ দখল করিয়াছে, সেখানে নিরাপদে আমল-দখল স্থাপনের জন্য যাহাতে কোন বিঘ্ন না জন্মে তাহাই তাঁহারা দেখিবেন। কেননা চীনে এখন ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। একথা হয়ত শুনিতে খুবই ভাল, কিন্তু প্রশ্ন করি, ইহা দ্বারাই কি চীনের স্বাধীনতা জাপানের নিকট বিকাইয়া দেওয়া হইল না? আশঙ্কা, চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে যেমন হইয়াছিল এবারেও ঠিক তেমনই হইবে। অর্থাৎ চীনের ভিতরে যদি কতকটা জায়গা জাপানীদের বলিয়াই সাব্যস্ত হয় এবং অন্যান্য শক্তিবর্গ তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে সেখান হইতে চীনের বাকী অংশ দখল করা তাহাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে না। আজ যে ব্রিটিশ রাজ্যের ভিতর দিয়া চীনারা অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিতে সক্ষম হইতেছে তাহাতেও হয়ত বিঘ্ন জন্মিবে, কেননা যে মূল ভিত্তির উপর ইঙ্গ-জাপান চুক্তি হইতে চলিয়াছে তাহাই হইল এই যে, যাহাতে জাপানী অধিকৃত চীন অঞ্চলে শান্তি রক্ষা হয়, তাহাও ইংরেজকে দেখিতে হইবে। আজ যে চীনে চীনা ডলারের মূল্য একেবারে কমিয়া গিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ব্রিটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি একেবারে হাত গুটাইয়াছে। আগে বুঝা যায় নাই ব্রিটিশ ধনিকরা কেন এ পথ অবলম্বন করিয়াছিল। এখন কিন্তু সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

ব্রিটেন সম্প্রতি ইউরোপে বহু রাষ্ট্রকে তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে। নাৎসীরা কিন্তু এই বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে যে, ইংরেজ সম্প্রতিকার নানা ঘটনায় তাহার আত্মদৌর্ব্বল্যই বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছে। আবিসিনিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার কোন কোন প্রকারে আশ্বাস দিয়া আবার তাহাদের নিকট হইতে হাত গুটাইয়া লইয়াছে। সুতরাং আজ যে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, গ্রীস, তুরস্ক আপৎকালে ইংরেজের সাহায্যের উপরে নির্ভর করিতে চাহিতেছে তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। নাৎসী মুখপাত্রদের কথার মূলে কি এতটুকুও সত্য নাই? ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতি আজ যে খাতে চলিয়াছে তাহাতে জগতের অশান্তি ত বিদূরিত হইতেছেই না বরং ইহা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংরেজ

ধাহিয়ে প্রকাশ করে এবং তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিয়াও মনে হয়—একদিকে সে তোষণ-নীতির অনুশীলন করিবে, অন্যদিকে নিজ অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইতে থাকিবে। কিন্তু ইহার পরিণাম বিষময়। যাহাকে সে খুশী করিতে চাহিতেছে, খুশী হওয়া ত দূরে থাকুক, তাহার দাবী-দাওয়া ক্রমশ পূরণের ফলে আরও বাড়িয়াই চলিবে। আজ হইতেছেও তাহাই। জার্ম্মানী তাহার দাবী ক্রমশ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। ইটালী—সেও স্থির হইয়া বসিয়া নাই। বাকী ছিল জাপান। ইউরোপীয় বন্ধুদের কৃতিত্ব দেখিয়া নিজেও তাহাদের অনুসৃত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। হুমকি দেখাইলেই যখন ফল হয়, তখন বৃথা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া শক্তি ক্ষয় করা কেন? বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, কি জার্ম্মান, কি ইটালী, কি জাপান সকলেরই আভ্যন্তরিক আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, কোন বিশিষ্ট জাতি বা কোন বিশিষ্ট দল যখন নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মরিয়া হইয়া উঠে, তখন যে কোন রকম ত্যাগ

জাপানের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ হাচিরো আরিতা

স্বীকার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। বুঝিয়াই করুক বা না বুঝিয়াই করুক, ঐ সব দেশের লোকেরাও সর্ব্বরকম ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। জাপান দুই বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া দেখিয়াছে, চীনকে সায়েস্তা করা ততটা সহজ নহে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ব্রিটিশ ও মার্কিনের প্রচুর স্বার্থ চীনে রহিয়াছে। সেই স্বার্থ যদি ইহারা না ছাড়িয়া যায় বা তাহা রক্ষা করিবার আশ্বাস না দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চীন-বিজয় কার্য্য তাহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াই থাকিবে। তাই তাহারা যেন-তেন প্রকারে ইংরেজকে স্বমতে আনিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। তিয়েনসিনে ব্রিটিশ লাঞ্ছনা তাহাদের এই নীতিরই অংগীভূত। ব্রিটেন তাহার গত কয়েক বছরের অবলম্বিত পররাষ্ট্র নীতির ফলে বিপক্ষীয়দের লোভ বা আকাঙ্ক্ষা অতি মাত্রায় বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার কুর্ম্ম-মনোবৃত্তি বিপদও ঘনাইয়া আনিয়াছে। দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই। তাহার দীর্ঘ দিনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একই কালে দূরবর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শত্রুর সম্মুখীন সে হয় নাই। আজ ইউরোপ ও এশিয়ায় যে-সব বিপক্ষ রাষ্ট্র দেখা দিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে একই সময়ে লড়াই করা বা লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়া সে এড়াইতেই চায়। তাই দেখিতেছি কখনও জার্ম্মানীকে তুষ্ট রাখিয়া জাপানকে চোখ রাঙাইতেছে। আবার জাপানকে খুশী করিতে গিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছে। ফল কিন্তু সর্ব্বত্রই বিষময় হইতেছে। ইউরোপ ও এশিয়ায় যে সব রাষ্ট্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে, তাহারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও পরপদদলিত হইতেছে। আবিসিনিয়া ইংরেজের কথায় ভুলিয়াছিল। স্পেন সরকার ইংরেজের গণতন্ত্র নীতির উপর নির্ভর করিয়াছিল, চেকো-শ্লোভাকিয়া ভাবিয়াছিল—এমন সব বন্ধু থাকিতে তাহার উপরে কে আক্রমণ চালাইবে। চীনারাও ভাবিয়াছিল তাহাদের দেশে যখন ব্রিটিশ ও মার্কিন স্বার্থ এতই রহিয়াছে তখন ইংরেজ কখনই জাপানের নিকট তাহাকে বিলাইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থ বেশী বুঝে। চীনের স্বাধীনতা রহিল কি গেল—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার কথা তাহার নয়। যাহার নিকট তাহার স্বার্থ ষোল আনা বজায় থাকিবে, তাহাকেই সে মানিয়া লইতে বাধ্য। আজ ক্ষুদ্র তিয়েনসিনের ব্যাপার লইয়া টোকিওতে যে চুক্তি হইতে যাইতেছে তাহার মূলে এই মনো-বৃত্তিই কার্য্য করিতেছে এবং ইহার আভাসও পাওয়া গিয়াছে।

আমরা গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভারতবর্ষে সামরিক নীতির তোড়জোড় লক্ষ্য করিতেছি। ইহা নাকি পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য। জাপান চীনের ভিতরে এতটা অগ্রসর হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করা এখন অত্যন্ত আবশ্যক। এই মর্ম্মে নানারূপ আলোচনাও হইতেছে দেখিতেছি। লর্ড লিনলিথগো ব্রহ্ম-লাটকে সিমলায় ডাকিয়া সীমান্ত রক্ষার পরামর্শ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যে আত্মরক্ষায় মোটেই প্রস্তুত নয়, তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নাই। ইংরেজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করিয়া তাহার সমরনীতির সংগে পরিচয় করাইয়া দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষা করাও তাহার একান্ত দরকার। কাজেই জাপানের সংগে এখন যদি কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে চীনে তাহার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ত হইবেই, উপরন্তু ভারতবর্ষকে লইয়াও তাহার বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। তিয়েনসিনে এত অপমান ও লাঞ্ছনা যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সহ্য করিয়াছে এবং সহ্য করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনাকারী জাপানীদের সহিত চুক্তি করিতে রাজী হইয়াছে, তাহার মূলে এ বিষয়ও কার্য্য করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কথা উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের জন্য ব্রিটেনকে মিউনিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইয়াছিল। আজও কি তাই ঐ একই কারণে চীনের স্বাধীনতাও বিনষ্ট হইতে চলিবে? টোকিওর ভাবী চুক্তির সর্ত্তগুলি ইহারই জবাব দিবে হয়ত। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরাও ইহার প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছি এরূপ কথা কি বলিতে পারি? — ২৫শে জুলাই, ১৯৩৯।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আগামী ৫ই আগষ্ট, শনিবার মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিসভার যে অধিবেশন হইবে—তাহার আয়োজন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মহারথীবৃন্দ। আপন প্রতিভাবলে সতেজ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যাঁহারা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালী এবং বাঙালী জাতিকে অমর গৌরবের অধিকারী করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিমেয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধারগণ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভিটার অবস্থা শোচনীয়। যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্মকর্ত্তাগণ উদ্যোগী হইলে কৃষ্ণনগরে কবির স্মৃতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ কলিকাতায় কবির স্মৃতি-সভার যেরূপ আয়োজন করিতেছেন, কৃষ্ণনগরের নাগরিকবৃন্দও কবির জন্মভূমিতে অনুরূপ স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন। স্বনামধন্য ডাঃ কালিদাস নাগ এই পূজায় পৌরোহিত্য করিবেন। পরলোকগত জাতীয় কবির স্মৃতিকে সম্মানিত করিবার জন্য এই যে দিকে দিকে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে আমাদের দেশাত্মবোধের জাগরণেরই সূচনা। কোনো নগর যখন তাহার কবিকে সম্মানিত করিতে অগ্রসর হয় তখন সে আপনার মহত্ত্বেরই পরিচয় প্রদান করে। কবির বাঁশিতে যে আদর্শের জয়গান বাজিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার স্মৃতি-পূজার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই সেই আদর্শের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগের নিদর্শন। কবিরা হইলেন ভগীরথ। জাতির চিত্তভূমিতে নূতন ভাবের যৌবন-জল-তরঙ্গ আনিয়া থাকে তাঁহাদেরই সঙ্গীতের আকর্ষণী শক্তি। তাঁহারা গান করেন আর সেই গানের মোহিনী সুর জাতির রক্তে আনে পাগলামির ঝড়। কবিরা জাতির মনের মধ্যে কেবল যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেন—তাহা নহে। উন্মাদনা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা জাতির চিত্তে আদর্শেরও প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই'—এই মৃত্যুহীন সমুজ্জ্বল আদর্শের স্রষ্টা হইলেন কবিরা। তাই সকল নায়কের পুরোভাগে তাঁহাদেরই আসন। যে সহর তাহার কবিকে সম্মান করিতে শিখে নাই—বুঝিতে হইবে সেখানকার নাগরিকেরা স্বাধীনতাকে ভালোবাসিতে শিখে নাই। সে সহর দুর্ভাগা—তাহার নাগরিকগণের চিত্ত আদর্শের শুভ্র জ্যোতি হইতে বঞ্চিত

কবির যাহা আসল কাজ—তাহাই দ্বিজেন্দ্রলাল করিয়া গিয়াছেন। কি সেই কাজটী যাহা সম্পন্ন করিবার জন্য যুগে যুগে চারণের আবির্ভাব হইয়া থাকে? স্বাধীনতার বিজয় ধ্বজা বহন করিয়া অভিযানের পুরোভাগে চলা—নিদ্রিত জাতিকে সাম্যের ভেরীনিনাদে জাগাইয়া দেওয়া—দেশের অসাড় চিত্তে নবজীবনের চাঞ্চল্য আনা—মেরুদণ্ডহীন মূঢ়জাতিকে অকুতোভয়ে শক্তিমানের সম্মুখীন হইতে শেখানো—ক্রীতদাস যাহারা, তাহাদের অবসন্ন চিত্তে বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মাদনা জাগানো। দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতগুলি আমাদের চিত্তকে মুক্তির দুর্গম পথে চলিবার প্রেরণা দিয়াছে—তাঁহার হাসির গানগুলি তীব্র কশাঘাতে আমাদের অচেতন চিত্তে বন্ধনের বেদনা জাগাইয়াছে—তাঁহার রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবারপতন প্রভৃতি নাটকগুলি পরাধীনতার শিকল ভাঙিয়া মনুষ্যত্বের গৌরব লাভ করিবার জন্য আমাদের অন্তরে ব্যাকুলতা আনিয়াছে।

আমাদের অনেকেরই মনে একটী ভ্রান্ত ধারণা এখনও বদ্ধমূল হইয়া আছে। আমরা মনে করি—কবিদের কারবার কেবল আকাশের তারা, বনের ফুল, নদীর কলধ্বনি, মেঘের শোভা আর প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসার লইয়া। বাস্তবের সঙ্গে কবিদের বুঝি কোনো সম্পর্ক থাকিতে নাই! মাটিতে বিচরণ করিবে কর্ম্মীরা! তাহাদের তো কবিদের মতো কল্পনার পাখা নাই! কবিদের জন্য আকাশ—যাহা মাটী হইতে অনেক—অনেক দূরে! কবি আর সাহিত্যিকদের সম্পর্কে এই ধারণাকে বর্জ্জন করিবার সময় আসিয়াছে। যে শক্তির সাহায্যে আমরা চেতনাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাদের দুঃখ-বেদনাকে নিজেদের দুঃখ-বেদনা বলিয়া অনুভব করিতে পারি—তাহার নাম কি কল্পনা-শক্তি নয়? কে বলিয়াছে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নাই? কবি হইতে গেলে বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করিতে হইবে? মানুষের জগতকে উপেক্ষা করিয়া কবিরা যাহা অবাস্তব—যাহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না—তাহার পিছু পিছু দৌড়াইতে গিয়াই কাব্যকে বর্ত্তমান জগতে প্রায় অস্পৃশ্যের কোঠায় ফেলিয়া দিয়াছে। এই যে লোহা-লক্কড়, কল-কারখানা, কামান-বন্দুক আর ডিক্টেটরদের জগত—এই জগতের রূঢ় বাস্তবতাকে ভুলিয়া গিয়া আমরা আজ আর মেঘের জগতে ডুবিয়া থাকিতে পারি না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘটনার পর ঘটনা নিষ্ঠুর আঘাতে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় কঠিন বাস্তবের অস্তিত্বকে। তাই কাব্যকে যদি আবার গৌরবের স্থান অধিকার করিতে হয়—বাস্তবের সঙ্গে তাহাকে নাড়ীর যোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিজ্ঞান, রাজনীতি, যন্ত্রশিল্প, জনসাধারণের প্রতিদিনের দুঃখসুখের জীবন—ইহাদের মধ্যে কবিকে খুঁজিতে হইবে তাহার কাব্য-সৃষ্টির উপাদান।

একথা আমরা আজ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি, সংস্কৃতির (culture) এবং রাজনীতির মধ্যে এমন কোনো ভেদরেখা নাই যাহা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের জীবন তো পায়রার খোপের মতো কতকগুলি খোপের সমষ্টি নয়—যাহাদের একটির গায়ে লেখা আছে রাজনীতি, একটির গায়ে ধর্ম্ম, অন্য একটির গায়ে সাহিত্য—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের জীবন অখণ্ড—খোপে খোপে ভাগ করা নয়। এই অখণ্ড জীবনকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া আমরা যখন কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের, রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া বসি তখনই অকল্যাণের সূত্রপাত হয়। জগতের উপরে আজ যে সর্ব্বনাশের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহার মূলে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিচ্ছেদ। আমরা ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছি, উড়োজাহাজ বানাইয়াছি, প্রকৃতির অনেক রহস্যকে ধরিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু যে দার্শনিক দৃষ্টি থাকিলে মানুষের সঙ্গে

মানুষের ঐক্যকে উপলব্ধি করা যায় সেই উদার দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। বিজ্ঞান তাই দৃষ্টিহীন বর্ব্বরদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া আজ সভ্যতার অবসান ঘটাইতে বসিয়াছে।

রাজনীতির ও সংস্কৃতির মধ্যে যখন আমরা এই রকমের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার গড়িয়া তুলি তখনও সমাজের শিরে অমঙ্গলকে আমরা ডাকিয়া আনি। এই গভীর সত্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়া টমাস ম্যান সেদিন লিখিয়াছেন,—

Only in my riper years have I seen, and come to admit, that there is no clear distinction between the intellectual and the political. I see now, it was a mistake for the German citizen to believe that a man could be cultured and non-political. I realise that culture is in danger, when it lacks the instinct and the desire to understand the political.

আজ রক্ত-পাগল জার্ম্মানী পশু-শক্তির পায়ে ঢালিতেছে তাহার সমস্ত অর্ঘ্য। বেটোফেনের জার্ম্মানী, গ্যেটের জার্ম্মানী! যে জার্ম্মানী বিশ্বের সভ্যতার ভাণ্ডারে সংগীতের, কাব্যের, দর্শনের এত মহার্ঘ্য সম্পদ দান করিয়াছে সে জার্ম্মানী আজ বর্ব্বরতার পূজারী। সেখানে ইহুদীদের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে নিছক বর্ব্বরতার প্রকাশ। রাজনীতিকে অবহেলা করিয়া জার্ম্মানীর সাহিত্যিকরা স্বপ্নের জগতে ডুবিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল—যাহারা সাহিত্যিক তাহাদের জন্য রাজনৈতিক জগতের কোলাহল এবং জনতার ভীড় নয়। রাজনীতি বিসমার্ক আর মুসোলিনীর মতো তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের জন্য। বেটোফেন আর সেক্সপীয়ার, মাইকেল এঞ্জেলো আর গ্যেটে—এ'দের জন্য ধ্যানের নিভৃত জগত, যেখানে বাজে চিরন্তনের বাঁশি। কই, জার্ম্মানীর চিন্তাবীরেরা স্বদেশে সংস্কৃতির হোমানলকে তো জ্বালাইয়া রাখিতে পারিলেন না। হিটলারের বর্ব্বরতা সেই হোমানলকে রক্ত ধারায় নিভাইয়া দিয়া দিকে দিকে জ্বালিয়াছে চিতানল যার শিখার মধ্যে মানব-সভ্যতার সমস্ত গৌরবময় নিদর্শন ভস্মে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। হিটলারের আর মুসোলিনীর উড়ো-জাহাজ স্পেনের আকাশ হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া কত যে বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্মমন্দির, চিত্রশালা প্রভৃতি ভাঙিয়া দিল—কেউ তো সে বর্ব্বরতার গতিরোধ করিতে পারিল না। আজ এই বর্ব্বরতার অভিযান যদি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছায় এবং আকাশ হইতে ইটালির, জাপানের এবং জার্ম্মানীর এরোপ্লেনগুলি তাজমহলের, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অথবা শান্তিনিকেতনের উপরে কতকগুলি বোমা ছাড়িয়া দেয়—মানুষের কত তপস্যার ফল নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আর্টিস্টের দল রাজনীতির কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন, উপন্যাস লিখিতেছেন, কবিতা রচনা করিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন, A thing of beauty is a joy for ever. আমরা এমন কিছু সৃষ্টি করিয়া যাইতেছি যাহার গরিমাকে মহাকাল ম্লান করিতে পারিবে না এবং যাহার মধ্যে গৌড়জন চিরকাল ধরিয়া পাইবে অমৃতের আস্বাদ। খুব সাধু সংকল্প সন্দেহ নাই কিন্তু কীটস্ যখন উপরের অমর লাইনটি লিখিয়াছিলেন তখন উড়ো-জাহাজের সৃষ্টি হয় নাই, কামানের পাল্লাও খুব বেশী দূরে ছিল না। তিনি যদি আজ স্পেনের অথবা চীনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহরের অট্টালিকাগুলি বোমার আঘাতে যদি তাঁহার চোখের সামনে হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িত তবে সুন্দর বস্তুকে চিরন্তন আনন্দের উৎস ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতে তিনি একটু কুণ্ঠাবোধ করিতেন। হায়রে, কামানের গোলা আর এরোপ্লেনের বোমা সুন্দরকে খাতির করে না! তাহারা যেখানে পড়ে সেখানে রাখিয়া যায় কেবল অঙ্গার। আর এই যে সাম্রাজ্যবাদীর দল—ইহাদের কাছে সৌন্দর্য্যের মূল্য কি? ইহারা উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে 'মার' 'মার' 'কাট্' 'কাট্' শব্দে চলিয়াছে দিকে দিকে ধ্বংসের দাবানল জ্বালাইয়া।

আজ পৃথিবীর দেশে দেশে সাহিত্যিকের দল বড়ো বেদনায় বুঝিতেছেন—রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া তাঁহারা কি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন! রোম যখন পুড়িয়াছে তাঁহারা তখন বাঁশি বাজাইয়াছেন। সেই ঔদাসীন্যের ফলে পৃথিবী আজ নরকের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবির ব্রত পালন করিতে গিয়া বাস্তবের দাবিকে কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। পরাধীনতার জ্বালা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত দেখিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন শৌর্য্য এবং আত্মদান ব্যতীত গোলামির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার নয়। তাই বঙ্কিম যেমন অন্যায়কে বাধা দিবার আদর্শকে জয়যুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণচরিত্রকে আঁকিলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি আঁকিলেন রাণা প্রতাপকে, দুর্গাদাসকে। তিনি রাজপুতানার চারণ-চারণীদিগকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলেন—তাহাদের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্ব বলিদানের আদর্শকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিলেন। দুর্গাদাস বলিতেছেন,

["মৃত্যু কি একদিন আসবে না? সে যখন বিছানায় এসে তোমার টুঁটি চেপে ধরবে, সে বড় সুখ-মৃত্যু নয়। কিন্তু স্বেচ্ছায়, দেশের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখ-মৃত্যু।"]

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের সামনে তুলিয়া ধরিলেন মৃত্যুর আদর্শকে —যে মৃত্যুর বুক হইতে আসে জীবনের ঐশ্বর্য্য। তিনি আমাদিগকে ডমরু বাজাইয়া ডাকিলেন মুক্ত পথের কঠিন বুকে যেখানে দারিদ্র্য, অনাহার, কারাগার, নির্য্যাতন, মৃত্যু। পৌরুষের যে আদর্শ—সেই আদর্শের পদপ্রান্তে তিনি সঁপিয়া দিলেন তাঁহার গানের অর্ঘ্য। মেবারপতনে সত্যবতী রাণাকে বলিতেছে,

বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে। দুঃখ সে দেশের

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসারে অভিনব প্রতিষ্ঠান

১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে গার্ডিনার গ্রীন হ্বার্ড প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও ভূগোলবিজ্ঞানবিদ্ দেশ-বিদেশের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার অন্তর্গত ওয়াশিংটন শহরে একটি সমিতি সংগঠন করেন। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানানুশীলনের জন্য এরূপ সমিতি অনেক সংগঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু ওয়াশিংটন শহরে সেইদিন যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন হয়, ভবিষ্যতে তাহা যে এরূপভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে সেদিনের উদ্যোক্তাগণও তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আজ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির নাম সর্বত্র পরিচিত। উক্ত সমিতি কর্তৃক পরিচালিত মাসিক পত্রিকাখানির নাম শুনেন নাই—শিক্ষিত মহলে
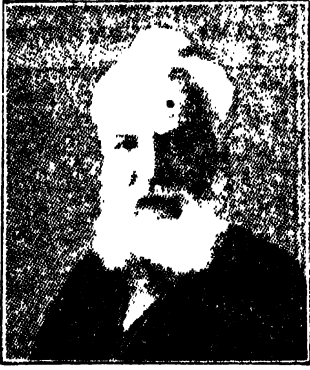
ডাঃ আলেকজাণ্ডার গ্রাহামবেল

আজ এরূপ ব্যক্তি অতি অল্পই রহিয়াছেন। আজ পৃথিবীর সর্বত্র ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রচারসংখ্যাও আজ এগার লক্ষ বত্রিশ হাজার অতিক্রম করিয়াছে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তার সাধনে যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে উহার গৌরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কৃতিত্ব অর্জনের পশ্চাতে যে অনুসন্ধিৎসা, কর্মপ্রেরণা, অফুরন্ত ধৈর্য ও কর্মশক্তি রহিয়াছে, তাহার ইতিহাস উপেক্ষণীয় নহে।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের তেত্রিশ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ্ যখন এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন ও ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেন, তখন তাঁহাদের তেমন অর্থবল ছিল না। জ্ঞান বিতরণের মহান সংকল্পই তাঁহাদিগকে এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করে। ওয়াশিংটন শহরে ক্ষুদ্র একটি ঘর ভাড়া লইয়া তাঁহারা প্রথমত তাঁহাদের কার্যে প্রবৃত্ত হন এবং এই স্থান হইতেই কয়েক মাস পরে সোসাইটির মুখপত্রের প্রথম সংখ্যাখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু দশ বৎসর অত্যন্ত অর্থ কষ্টের মধ্যে পত্রিকা পরিচালনা করিয়াও তিন শতের অধিক গ্রাহক তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

১৮৯৭ সালে সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হ্বার্ড পরলোকগমন করিলে পর তাঁহার জামাতা সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ডাঃ বেল যখন কর্মভার গ্রহণ করেন, তখন সোসাইটি ঋণভারে জর্জরিত। ডাঃ বেল দেখিলেন, অদম্য উৎসাহ থাকিলেও শুধু অবৈতনিক কর্মকর্তার দ্বারা সমিতির কার্যাবলী পরিচালিত হইলে সমিতি কোনদিন সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে কি না সন্দেহ। তিনি তখন বাছিয়া বাছিয়া গিলবার্ট গ্রোসভেনর নামে উৎসাহী এক তরুণ যুবককে সমিতির সহ-সম্পাদক পদে নিয়োগ করেন। এই যুবকই পরে তাঁহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর কাল পর্যন্ত গ্রোসভেনরের বার্ষিক বারশত ডলার বেতন ডাঃ বেল তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতে বহন করেন। তরুণ গ্রোসভেনরের কঠিন পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার ফলে সমিতির কার্যাবলীতে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। শুধু তাহাই নহে, পত্রিকার আয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সোসাইটি তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথেও অগ্রসর হইতে লাগিল। এভাবে সমিতির কাজ বৃদ্ধি পাইলে ১৯০৫ সালে জন অলিভার লা গোরেস্ নামে আর একজন তরুণ যুবককেও গ্রোসভেনরের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।
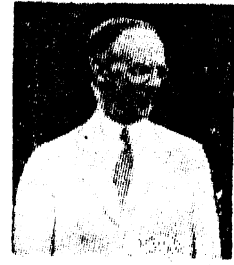
ডাঃ গিলবার্ট গ্রোসভেনর

আজ ডাঃ গ্রোসভেনর ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট এবং সমিতি-পরিচালিত পত্রিকাগুলির সম্পাদক—একাধারে সমিতির প্রাণস্বরূপ। ডাঃ লা গোরেস্ সমিতির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ও গ্রোসভেনরের যোগ্য সহকর্মী ও পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। এই দুই ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সমিতি যেমন উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিয়াছে, সমিতির পরিচালিত পত্রিকাখানির প্রচারসংখ্যাও তেমনি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯০৫ সালেও ইহার প্রচার সংখ্যা দশ হাজারের বেশী ছিল না। ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি তাহাদের পত্রিকায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মান-চিত্র ও জাতীয় পতাকা, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যে বিবরণ প্রকাশ করে, তাহাতে বিভিন্ন দেশে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। ফলে, দেখিতে দেখিতে ১৯২০ সালে সমিতির পত্রিকাখানির প্রচার সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আজ প্রচারসংখ্যা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন' জগতে শীর্ষ সংবাদপত্র অধিকার করিয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান একদিন কয়েকজন ব্যক্তির শুধু সুযোগ-সুবিধা মত অবৈতনিক শ্রমের দ্বারা পরিচালিত হইত, সেখানে আজ আট শতেরও অধিক বেতনভোগী কর্মী এই পত্রিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

ভাড়াটে ক্ষুদ্র ঘরের পরিবর্তে আজ সমিতির যে প্রাসাদোপম গৃহ ও ছাপাখানা নির্মিত হইয়াছে, তাহা ওয়াশিংটন শহরের দ্রষ্টব্য জিনিষের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। সমিতির সভ্য-সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পাঁচশত কর্মীকে শুধু সদস্যদের আবেদনপত্র গ্রহণ ও পত্রিকা প্রেরণের কাজেই নিযুক্ত থাকিতে হয়।

শুধু পত্রিকা-পরিচালনা করাই কিন্তু ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির কাজ নহে। ভৌগোলিক জ্ঞান পরিবেশন যেমন ইহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি ইহার সদস্যগণ দেশ-বিদেশে বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণ করিয়া ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করিতেও কম সহায়তা করেন না! টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা ডাঃ গ্রাহাম বেল বিজ্ঞানে যেমন অভিনবত্ব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্ সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট হিসাবেও তিনি এক অভিনব পরিকল্পনা দ্বারা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক তিন ডলার চাঁদা দিলে যে কোন ব্যক্তি সমিতির অপর যে কোন সদস্যের সমর্থনক্রমে উহার সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক সদস্যের নিকটও সমিতির পরিচালিত মাসিক পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। সমিতি হইতে ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে যে সমস্ত অভিযান পরিচালিত হয়, তাহাতে এই সমিতির সভ্যগণ অন্তত এইটুকু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন যে, ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা বৃহত্তর ব্যাপারে তাঁহারাও সহায়তা করিতে পারিতেছেন, সুদূর সুমেরু বা কুমেরু প্রদেশের অভিযানে তাঁহারাও যেন বৈজ্ঞানিকগণ বা অভিযাত্রীদলের সহিতই সমান অংশ গ্রহণ করিতেছেন। ঘরে বসিয়া আরাম কেদারায় শায়িত অবস্থাতেও বড় বড় অভিযানে যোগদানের আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার এই সুযোগ বিভিন্ন দেশের জনগণ ব্যাপকভাবেই গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি'র সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আজ সোসাইটির অর্থ ও সামর্থ্য উভয়ই গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সোসাইটির পরিচালিত মাসিক পত্রিকাখানিও অতুলনীয়। ভূগোলবিষয়ক আলোচনা হইলেও উহাতে শুধু শুষ্ক কতকগুলি দেশ-বিদেশের নাম-ধাম বা ভূগোল-বিজ্ঞানের জটিল সমস্যার বিষয়ই লিখিত হয় না। জগতের বিভিন্ন নামজাদা পর্যটক বিভিন্নদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে কিংবা দেশের গঠন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন, এই পত্রিকায় বহু চিত্রে সুশোভিত হইয়া তাহাই শুধু প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিবরণ এত মনোজ্ঞ যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতেও পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। দেশ-কালের সীমা-রেখার ঊর্ধ্বে শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী সহকারে যেভাবে ভৌগোলিক তথ্য সমূহ সংগ্রহ ও পত্রিকায় আলোচিত হয়, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির অফিস-গৃহ

জ্ঞানের বিস্তার-কল্পে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি' প্রথম পরিকল্পনা হয় বটে, কিন্তু আজ উহার মুখপত্রটি এরূপ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, উহা দ্বারাই সমিতির সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, প্রতি বৎসর এই পত্রিকা হইতে যে অর্থাগম হয়, তাহার পরিমাণও কয়েক লক্ষ ডলারের কম হইবে না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহার আয়লব্ধ সমস্ত অর্থই এমন একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে নিয়োজিত হয়, যাহা শুধু অলাভজনক অথচ ব্যয়সাধ্য বৈজ্ঞানিক বা ভৌগোলিক অভিযানেরই উদ্যোগে আয়োজন করে। সমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য—ভৌগোলিক জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধন ইহার সেই উদ্দেশ্য যথার্থই সার্থক হইয়াছে। (ক্রমশ)

(কথিকা)

শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুড়ুম

পিস্তলের ভীষণ শব্দে পার্শ্বে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া রহিলাম। দেখি আমারই পার্শ্বে ঘরের মেঝেতে একটি যুবতী রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া আছে। সম্মুখে এক যুবক পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান। পিস্তল হইতে তখনও ধূম উদ্‌গিরণ হইতেছে। এই যুবকই যে আততায়ী তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে কয়েক মুহূর্ত্ত এই মৃতা যুবতীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার পর সম্মুখের দরজা দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। প্রাণপণে চীৎকার করিতে গেলাম কিন্তু কণ্ঠ দিয়া স্বর বাহির হইল না। উঠিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম সে শক্তিও হারাইয়াছি। নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে এই যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিলাম। চাহিয়া দেখিবার দৃশ্য বটে।

যুবতী অপূর্ব্ব সুন্দরী—রূপ-যৌবন দেহের কানায় কানায় উছলিয়া উঠিতেছে। তাহার মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ—নচেৎ আরও সুন্দর দেখাইত। বক্ষের এক পাশ দিয়া রক্ত গড়াইয়া ঘরের মেঝে লাল করিয়া ফেলিয়াছে। অবাক হইয়া ভাবিতেছি কে ইহারা—আমার ঘরেই বা কোথা হইতে আসিল?...কেনই বা এই নৃশংস কাণ্ড ঘটিল?..

এতক্ষণে এই যুবতীর প্রতিই চাহিয়াছিলাম আর কোথাও লক্ষ্য করি নাই। এক্ষণে হঠাৎ মুখ তুলিতে দেখিতে পাইলাম আমার সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া এক প্রৌঢ় দীর্ঘ দেহ ভদ্রলোক একদৃষ্টে এই যুবতীর শবদেহের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। একটু দূরে টেবিলের উপর আলো ছিল তাহারই ঈষৎ রশ্মি ইঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে। সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম আগন্তুকের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ। তাঁহাকে যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইল—পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি, স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু পারিতেছি না। এমন সময় ভারী দীর্ঘশ্বাসের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম ভদ্রলোক আমার প্রতি চাহিলেন। এই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপারে এতদূর বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলাম যে, কিছুক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে সচেতন হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কে?"

—"আমি এই মেয়েটির বাবা"—স্বর গম্ভীর। বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল।

—"আপনি এঁর বাবা—ইনি এখানে এভাবে খুন হলেন কি করে? আর সেই লোকটাই বা পালাল কোথায়?"

—"আমিই তাকে পালাতে সাহায্য করেছি—আর আমারই ইচ্ছায় একে খুন করা হয়েছে।"

"আপনি—আপনি খুন করিয়েছেন নিজের মেয়েকে—তাও আবার—?" ভয়ে বিস্ময়ে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে এই অদ্ভুত আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

এবার তিনিই প্রথম কথা কহিলেন—"কেন খুব অন্যায় [illegible] নাকি?"

"অন্যায়...? এ রকম কথা কেউ কখনও শুনেছে নাকি?... কিন্তু কেন?"

এইবার ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্রু তখনও শুকায় নাই। বলিলেন—"প্রয়োজন হয়েছিল তাই।"

—"প্রয়োজন হয়েছিল নিজের মেয়েকে মেরে ফেলবার?"

তিনি একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"ঠিক তাই—আর এজন্যে এত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন? এরকম ত জগতে কত হয়েছে, এত নতুন নয়। প্রয়োজন হলেই এ কাজ করতে হয়।"

পাগল না কি? আমার মাথার মধ্যে যেন কি রকম গোলমাল হইয়া গেল। কি করিব তাহাই ভাবিতেছি। প্রয়োজনের খাতিরে যাহার স্বীয় কন্যাকেও বধ করিতে বাধে না তাহার কথার কি জবাব দিব?

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার মনের ভাব কতকটা আন্দাজ করিয়াই বলিলেন—"সত্যিই এ ঘটনা জগতে আজ নতুন নয়। যখনই স্থূল কামনা সূক্ষ্মপ্রেমের গণ্ডী ছাড়িয়ে মাথা তুলতে চায়, তখনই তা যতই প্রিয় হোক না কেন তাকে ধ্বংস করে দেওয়া জগতের পক্ষে কল্যাণকর। তাতে কষ্ট হয়ত হবে কিন্তু এ ছাড়া যে আর উপায় নেই। তাই তো আমরা দেখেছি মহাদেবের তৃতীয় নয়নে মদনকে ভস্ম হয়ে যেতে। সেখানে দেহ-লালসা স্বর্গীয় প্রেমকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিবের তৃতীয় নয়নরূপ জ্ঞান-চক্ষুর কাছে সে ফাঁকি টিকলো না। আবার দেখ, শকুন্তলা যখন এমনি কামনায় অন্ধ হয়ে নারীর কর্ত্তব্য—মানুষের ধর্ম্ম ভুলে যেতে বসেছিল তখনই ঋষি দুর্ব্বাসার অভিশাপ সেটা ধ্বংস করে দিল। ঠিক ঐ একই কারণে আমার এই মেয়েটিকে আজ মেরে ফেলতে হয়েছে—জগতের মুখ চেয়ে। দুঃখ আমার কারও চেয়ে কম হয়নি কিন্তু বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ আমায় নিজের হাতেই করতে হল—এতে ঘরে ঘরে অমৃত ফলবে—এই আমার আশা।"

বিমূঢ়ের মত আগন্তুকের বক্তৃতা শুনিতেছিলাম, কিন্তু কিছুই যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এতক্ষণে কথা কহিলাম। রূঢ়ভাবে বলিলাম—"আপনি নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে যতই যুক্তি দেখান না কেন, আপনার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আপনাকে আমি পুলিশে দেব। এদের নাম কি? আর আপনারও নাম-ধাম বলুন।"

তিনি একটু হাসিলেন।

—"শাস্তি তোমরা আমাকে কম দাওনি—তবু শাস্তি হবে জেনেও এ কাজ আমি করেছি।"

একটু থামিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—"এই মেয়েটি কে জান? রোহিণী—আর যে একে গুলী করেছে সে গোবিন্দলাল।"

—"রোহিণী?—গোবিন্দলাল?...আর আপনি—আপনার নাম কি?—বাড়ী কোথায়?'

—"বঙ্কিম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কাঁটালপাড়া।"

আগন্তুকের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

ঠিক,—আমাদের বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বড় ছবিটি আছে তাহার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু...

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

—"আচ্ছা এখন তবে আসি। আমাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে—ভ্রমরের বড় অসুখ।"

এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। আমি সেই দিকে অপলকে চাহিয়া রহিলাম।......

অকস্মাৎ দরজায় বারবার করাঘাত শুনিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। দেখি রাত্রি আর নাই, চারিদিক রৌদ্রে ভরিয়া গিয়াছে। আমার দুই চোখের পাশ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে ও বুকের উপর খোলা "কৃষ্ণকান্তের উইল বইখানা। স্মরণ হইল গত রাত্রে ইহা পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি বৌদি চায়ের কাপ লইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"কি ঘুমোতেই যে পার—কুম্ভকর্ণকেও হার মানিয়েছ।"

অপর দিনের ন্যায় আজ আর তাঁহার বিদ্রূপের জবাব দিতে পারিলাম না। চা সেবন করিতে করিতে ভাবিতেছি, "কমলাকান্তের" আফিমের সংগে চা নামক এই মাদক দ্রব্যের তফাৎ আছে কি?

দেশের কথা—ভারতের পণ্য—চা

(৮ পৃষ্ঠার পর)

ছাঁটিয়া দেয়। আট দশ বৎসরের গাছ হইলে তখন মাটীর উপরে কাণ্ডের দেড় বা দুই ফুট রাখিয়া সমস্ত কাটিয়া দেয়।

যাহাতে খুব অধিক পরিমাণে পাতা জন্মিতে পারে, সেই কারণেই এইভাবে ছাঁটিয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

চা পাতা তৈয়ারী

গাছ ছাঁটিয়া দেওয়ার পর দুই তিন মাস নূতন ডাঁটা-পাতাগুলিকে বাড়িতে দেয় এবং তিন হইতে ছয় পাতার কচি প্রশাখা নির্গত হইলে মজুর দিয়া উহার দুই তিনটি পাতা ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। ইহার দুই তিন মাস বাদে আবার দুই তিনটি পাতা সংগ্রহ করে। এইভাবে কাজ চলিতে থাকে এবং সমস্ত বৎসরে বিশ হইতে ত্রিশবার পর্য্যন্ত পাতা সংগৃহীত হইতে দেখা যায়। সাধারণত মার্চ্চ মাসের শেষভাগ হইতে মজুররা কার্য্যারম্ভ করে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ জোরে চলে এবং পাতার পরিমাণও খুব বেশী হয়।

পাতা তুলিয়া আনিয়া নিস্তেজ বা অর্দ্ধ শুষ্ক বা অবসন্ন (withering) করিবার জন্য ছায়াযুক্ত স্থানে কাপড়, বাঁশ বা তারের "মাচানের" উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। কোথাও বা তপ্ত বায়ু দিয়া শুকাইয়া লয়; অর্দ্ধ শুষ্ক করিতে বেশী সময় লাগিলে চায়ের গুণ হীন হইয়া পড়ে। পাতাগুলি অর্দ্ধ শুষ্ক রাখিবার সময় তাহার মধ্যে যে রস থাকে তাহা গাঁজিয়া বা মাতিয়া (fermentation) উঠে। সুতরাং যাহারা এই কাজ ভাল পারে, তাহাদের চা অধিক গুণসম্পন্ন হয়।

ইহার পর চায়ের পাতাগুলি পাকাইয়া লওয়া দরকার। পূর্ব্বে হাতের তালুর মধ্যে পাকাইয়া লওয়া হইত (rolling)। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় সমস্তই যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। হাতের বা যন্ত্রের চাপে কতকটা রস নিঙড়াইয়া উপরে উঠে এবং বায়ুর সহিত মিশিয়া গুণপ্রাপ্ত হয়। তখন পাতাগুলির বর্ণ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কোনও বাগানে এই সময় fermenting room-এ পাতাগুলি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

ইহার পরই পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করে (firing); ইহার জন্য যে রূপেই হউক উত্তপ্ত বায়ু পাতাগুলির উপর প্রবাহিত করা হয়। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করে। তখন পাতাগুলি নানাভাবে (grading) বিভক্ত হয় এবং বিভিন্ন নামে বাজারে পরিচয় লাভ করে। পিকো (Pekoe) ও ছুচাং (Souchang) নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিভিন্ন গুণে Pekoe, Orange Pekoe, broken pekoe, broken orange pekoe, Souchang, pekoe Souchang প্রভৃতি এবং গুঁড়া চা মোটামুটি broken Tea বলিয়া বিক্রীত হয়। Fannings, dust প্রভৃতি ইহাদের অন্য আকার।

চা তৈয়ারী হইবার পর কাঠের বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহাতে বাহিরের বায়ুর সহিত কোনওরূপে সংযোগ না থাকে এবং বাক্সের তক্তার গন্ধ চা টানিয়া না লয়, তাহার জন্য সীসার পাত দিয়া বাক্সের অভ্যন্তরভাগ মোড়া থাকে এবং বাণিজ্যের উপযোগী হয়।

জাগরণ

(গল্প)

শ্রীকরুণাকণা সেন

ক্ষিতিনাথ মুখুয্যের ছয় মেয়ে। তার মধ্যে নন্দরাণী সকলের ছোট। কে না চেনে ক্ষিতিনাথ মুখুয্যেকে? মোটা মাইনের গবর্ণমেণ্ট অফিসার তিনি, ওদিকে আবার একাধারে প্রচণ্ড ধার্মিক ও পণ্ডিত। কোনও এক বাঙলা মাসিকপত্রে প্রথম যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি বের হয়, সেটি ত তাঁরই। অবশ্য মন্দ লোকে বলে যে তাঁর প্রবন্ধ নাকি তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ পড়ে না—কিন্তু যাক্, মন্দরা চিরকালই মন্দ।

এ পর্যন্ত ক্ষিতিনাথের জীবন চলে এসেছে বাধাহীন স্রোতের মত। সগোত্রীয় পণ্ডিতদের বাহবা সহকারে তিনি তাঁর পাঁচ মেয়েকে বারো বছরের মধ্যে পাত্রস্থ করেছেন। কত লোক কত ভাবে তাঁকে নিন্দা করেছে ও করছে তাকি আর কানে আসেনি ক্ষিতিনাথের? কিন্তু ক্ষিতিনাথের ধৈর্য অসীম। বর্তমান যুগের নারী-প্রগতির কুৎসা প্রচার করে ও অতীত যুগের সতীনারীর মহিমা কীর্তন করে ক্ষিতিনাথের জীবন শেষ পর্যন্ত শান্তিতেই কেটে যেত হয়ত, যদি না নন্দরাণী মূর্তিমতী বিদ্রোহ-বিভীষিকা হয়ে তাঁর ঘরে জন্ম নিত।

নন্দরাণী ক্ষিতিনাথের শেষ বয়সের মেয়ে। অন্য মেয়েদের থেকে তার বয়সের অনেক তফাৎ। হয়ত সেই কারণেই ষষ্ঠ মেয়ে বলে অনাদর পাওয়ার চাইতে নন্দরাণী আদর পেল বেশী। কিন্তু আদর পেল বলেই যে সে এমন অদ্ভুত আবদার করবে তার কি মানে আছে? ক্ষিতিনাথ যুগপৎ চিন্তিত ও ক্রোধান্বিত হলেন। হয়ত আবদারটা এমন কিছুই নয়—অন্য লোকের পক্ষে। কিন্তু ক্ষিতিনাথের মত নিষ্ঠাবান ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ সে আবদার রাখেন কেমন করে? ব্যাপারটা এই। সেদিন যখন ক্ষিতিনাথ অভিধান থেকে বাছা বাছা শব্দ যোগাড় করে, বর্তমান নারী-সমাজের স্বাধীনতা ও তাঁর মতে অধঃপতনের সমালোচনা লিখছিলেন, সেই সময় নন্দরাণী তাঁর কাছে এসে বললে, "বাবা, আমি ইস্কুলে পড়ব।" শুনে ক্ষিতিনাথ খুশী হলেন। তিনি নিরক্ষরতার পক্ষপাতী নন। অন্য পাঁচ মেয়েকেও তিনি এক বাঙলা ইস্কুলে পড়িয়েছিলেন। অবশ্য এ ইস্কুল মোটেই অন্য পাঁচটা লক্ষ্মীছাড়া ইস্কুলের মত নয়, এখানে দস্তুর মত শিবপূজো থেকে ইতুপূজো, শনিপূজো অবধি শিক্ষা দেওয়া হয়। বেশত' নন্দরাণী পড়ুক না সেই ইস্কুলে।

কিন্তু এইখানেই গোলযোগ বাধল। নন্দরাণী সে ইস্কুলের নামে বেঁকে বসল। ঐ 'আদর্শ শিক্ষাসদনে' ও মোটেই পড়তে চায় না। ওখানে একটা পর্দা-ঢাকা বাসে করে যেতে হয়, আর পড়াশুনো ত' ছাই হয়, খালি শিবপূজো আর ইয়েপূজো। খালি-গায়ে আর খালি-পায়ে যেতে হয় ঐ ইস্কুলে, জানে না বুঝি নন্দরাণী? বারে, সকলেই ত ভাল ইস্কুলে পড়ে—কেমন সুন্দর জুতা পরে আর—

নন্দরাণীর কথা শেষ হল না। ঠাস্ করে এক চড় পড়ল তার গালে, আর বজ্রকণ্ঠে ক্ষিতিনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন—"যা এখান থেকে, যা বলছি।" উচ্চৈঃস্বরে পাড়া কাঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নন্দরাণী ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহী মেয়ে নন্দরাণী; সেই দিন থেকে সুরু [illegible] সে জায়গায় রাজী নয় কাজেই সে সুরু করল গলাবাজী। মিনিটে মিনিটে সুরু হল তার সরব কান্না। কেউ তাকে ছোঁবে না, কেউ তার দিকে তাকাবে না, তাহলেই নন্দরাণী গলা সাধতে সুরু করবে। বাড়ীর লোক অস্থির হয়ে উঠল। "আমার জায়গায় কেন ও বসেছে"—যদিও ও জায়গাটা যে নন্দরাণীর জন্য 'রিজার্ভ' সেটা তার নিজেরও এক মুহূর্ত আগে খেয়াল ছিল না। কিন্তু ছুতোর অভাব নেই নন্দরাণীর—সাত দিনের মধ্যেই কারণে অকারণে চক্ষের জলে ভাসতে সে নিপুণ হয়ে উঠল।

আর ওদিকে অস্থির হয়ে উঠলেন ক্ষিতিনাথ। অবশেষে একদিন তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, "যা যা তোর যে চুলায় ভর্তি হতে সখ হয়েছে, হ' গিয়ে সেখানে ভর্তি। উঃ কানের পোকা বের করে দিল লক্ষ্মীছাড়ী!"

মুহূর্তে নন্দরাণীর চোখের জল গেল শুকিয়ে। তারপর একদিন তার এক মামার সঙ্গে গিয়ে সে তার প্রাণের বন্ধু ক্ষান্তির ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়ে এল। বাড়ীর লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ক্ষিতিনাথও সনিশ্বাসে ভাবলেন, "যাক্‌গে, মোটে আট বছর বয়স, পড়ুক ওখানে বছর তিন, তারপর ছাড়িয়ে আনব।"

কিন্তু নন্দরাণীর বিদ্রোহের এইখানেই শেষ নাকি! সে ইস্কুলে ভাল মেয়ে বলে নাম কিনল। কি পড়াশুনায়, কি খেলা-ধূলায়, নন্দরাণী সকলের অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। ক্লাসের মেয়েরা তো নিশ্চয়ই অন্য ইস্কুলের মেয়েরা পর্যন্ত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাইত।

মেয়ের প্রশংসা ক্ষিতিনাথের কানেও পৌঁছল। তিনি যে এ ধরণের প্রশংসায় ঠিক খুশী হচ্ছিলেন তা নয়, তবে চটতেও পারছিলেন না। আর ওদিকে নন্দরাণীর পাঁচ বোন সঈর্ষায় ভাবছিল, 'বেশ আছে নন্দিটা, আমরা ত শুধু শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, শিবপূজো করেই কাটালাম—খালি গায়ে আর পায়ে।'

এদিকে নন্দরাণী হেলায় প্রথম হয়ে ক্লাসে উঠছে, ও স্পোর্টসে মেডেল পাচ্ছে। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। ক্ষিতিনাথ সজাগ হয়ে উঠলেন, এইবার মেয়েকে ইস্কুল থেকে ছাড়াতে হয়, যথেষ্ট ধিঙ্গিপনা হয়েছে, আর চলে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নন্দরাণীর ইস্কুল ছাড়তে হল না। কর্তৃপক্ষকে জানান মাত্র, স্বয়ং হেডমাষ্টার এসে হাজির হলেন। ইস্কুলের বয়স বেশী নয় এবং তিনিই খুলেছেন। নন্দরাণীর পরে তাঁরা অনেক আশা করেন। তার মত প্রতিভাসম্পন্না মেয়েকে কি এরকমভাবে বঞ্চিত করা উচিত হবে? তাঁর মেয়ে বলেই যে সে এরকম হতে পেরেছে সে কথা ত' সবাই জানে! ইত্যাদি, ইত্যাদি। কতক চাটুবাদে, কতক অশান্তি এড়াতে ক্ষিতিনাথ রাজী হলেন। কিন্তু এজন্যে তাঁকে অগত্যা নারী-প্রগতির অনাচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করতে হল। তিনি মনোনিবেশ করলেন ধর্মগ্রন্থের আলোচনায়।

নন্দরাণীর পাঁচ বোনকে দোষ দেওয়া চলে না। নন্দরাণী যদি তাদের ছোট ভাই হত, তবে তারা বাপের পক্ষপাতিত্বের কথা ঘেরাক্ষেও করত না। ভাবত তার প্রাপ্য জিনিষই পাচ্ছে। নন্দরাণীর যখন জন্ম তখন তারা সকলেই শ্বশুরবাড়ী।

বোনকে এরা ভালবাসতে সময়ই পেল না। বোনও তাদের জন্যে বিশেষ ব্যাকুল নয়। অত বড় বড় দিদিদের সে যতটা সমীহ করে, এড়িয়ে চলে, ততটা স্নেহ করে না। সে ষোল বছর বয়সেও মা-বাবার কোলের খুকী হয়ে রইল, অথচ তার দিদিরা তার বয়সে প্রত্যেকে দুটি তিনটি সন্তানের মা হয়েছে এবং ফলে নিজেরা হয়েছে রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। কাজে কাজেই একদিন তারা ঝাঁকবেঁধে বেড়াতে এল বাপেরবাড়ী। ছেলেপিলেদের অবশ্য রেখে এল শ্বশুরবাড়ীতে, না হলে চ্যাঁ-ভ্যাঁর চোটে একটা কথা বলতে দেবে নাকি হতভাগাগুলো!

নন্দরাণী ছিল তখন ইস্কুলে। পাঁচ মেয়েকে অকস্মাৎ একই সঙ্গে উদয় হতে দেখে মা একটু অবাক হলেন। তারা যে নিছক বাপেরবাড়ীতে হাওয়া খেতে আসেনি, সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। এমন সময় নন্দরাণী ইস্কুল থেকে ফিরল। নিজের ঘরে যেতে যেতে মার ঘর থেকে অনেকের গলা শুনে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল। কারা আসতে পারে? ভেসে এল তার সেজদির গলা।

"কালো কুচ্ছিত মেয়েকে ত খুব মেমসাহেব করে তুলছ..." সেজদিদির রঙটা ফরসাই। নন্দরাণী ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। মা যেন ক্ষীণকণ্ঠে কি বললেন, বোঝা গেল না। ব্যাপার কি, মা-র এত কোণঠাসা ভাব কেন? তার লেখাপড়ার খোঁটা ত নতুন নয়! এবার বেশ ভারীক্কি গিন্নি-বান্নির গলা—বড়দিদি। "শুনেবেনা ত' তোমরা—এইত আমার বড় জার মামাত' ভাই ছিল সেদিন অবধি আইবুড়ো,—সোনার চাঁ—দ ছেলে..." সোনার চাঁদ হাতছাড়া হওয়ায় বড়দি-র একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল বুঝি।

নন্দরাণী আর দাঁড়াল না। তার বিয়ের ওকালতি করছে দিদিরা। করতে দাও যত খুশী, নন্দরাণী আপন মনে ঠোঁট ওল্টাল। বাবা ত' বলেন নি যে ভয় পাবে! বাবা কিন্তু আশ্চর্য বদলে গেছেন, নন্দরাণী ভাবল, ভাগ্যিস......

হঠাৎ কি ভেবে সে তার বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল। কি বলছিল যেন সেজদিদি? ...কালো কুচ্ছিত...

বাইরে প্রায় সন্ধ্যা। সেই আলোয় নন্দরাণী তার প্রতিচ্ছবির দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল। এখন তাকে একটু ক্লান্ত লাগছে—একটু ম্লান। ইস্কুলে যাবার সময় সে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে গিয়েছিল, এখন আর তার চিহ্নও নেই। রঙ কালোই বলা চলে, যদিও সে যখন গা ধুয়ে আসবে তখন তাকে এতটা ময়লা লাগবে না।

মুখটা লম্বাটে ধরণের, মসৃণ কপালে দুপুরের পরা কুমকুমের টিপটা যেন কাঁদতে হয়ে উঠেছে। তৃতীয় ব্যক্তির মত নন্দরাণী নিজের প্রতিচ্ছবিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ছোটবেলায় নন্দরাণী ছিল বেশ টাপাটোপা, গোলগাল, আহ্লাদী পুতুলের মত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে এল কৃশতা, মুখখানাও হয়ে এল লম্বাটে, একটু রুক্ষ। চোখ দুটো বড় নয় বেশী কিন্তু দীর্ঘপক্ষ্ম ও স্বচ্ছদৃষ্টি। অনেকে বলেছে ওর চোখ দুটো বেশ। কিন্তু নন্দরাণী [illegible]

নন্দরাণী আয়নার ধার থেকে সরে এল। সেকি সত্যিই কুৎসিত? কে জানে? নিজেকে ত তার বেশ ভালই লাগে!

ধুত্তোর, কি ভাবছে সে? দিদিরা চলে গেল কিনা কে জানে! আলনা থেকে শাড়ী জামা নিয়ে নন্দরাণী বাথরুমে ঢুকে গেল। কলের জলটা আজ কি রকম ঠাণ্ডা!

স্নান সেরে নন্দরাণীর খুব স্নিগ্ধ বোধ হল নিজেকে। আজ তার মনটা প্রথম থেকেই খুশী ছিল, টারমিনালে সে ইংরেজীতে ফার্স্ট হয়েছে। অবশ্য অন্য সময় হলে কথাটা পুরানই লাগত। কিন্তু ইতিমধ্যে ওর এক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে, এইবারই এসেছে মফঃস্বল থেকে। সে নাকি দারুণ ভাল ইংরেজীতে। যাক্ ফাঁড়া কেটে গেছে। একেবারে সাতটি নম্বর তফাৎ রেখে নন্দরাণী উপরে উঠে গেল, স্বর্ণলতা হল দ্বিতীয়।

স্বর্ণলতা দেখতে কিন্তু চমৎকার। নন্দরাণী যদি ওর মত দেখতে হত?

পরদিন শনিবার; নন্দরাণীর অনেক আগে ছুটি হল। পড়ার টেবিলে বইগুলো সযত্নে গুছিয়ে রেখে সে শান্তির নিশ্বাস ফেলল। কাল রবিবার, আজ এই সময়টা তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। মা'র ঘরে ফ্যান আছে, সেখানে চারটে পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে গড়ান যাবে। কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই নন্দরাণী থমকে দাঁড়াল। কে একজন ছেলে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে মার সঙ্গে গল্প করছে। তাদের বাড়ীতে আবার এ বয়সের ছেলে আসবে কোত্থেকে? খুড়তুতো ভাইদের কেউ বলেওত' মনে হচ্ছে না। আর তারা কি এই দুপুর বেলায় সুখ-নিদ্রা ছেড়ে জ্যাঠার বাড়ী আসবে। টুনুটাকে ও কয়দিন আগে ডেকে পাঠিয়েছিল একটু 'কনসোল্ট' করে পড়বে বলে, তা সে উইকেটতো ক্লাব ক্লাব করেই মেতে রয়েছে—ফেল যদি না করে তো—।

ভাবতে ভাবতে নন্দরাণী চলে আসছিল। কিন্তু মা বোধ হয় তার পায়ের শব্দ পেয়েছিলেন, তাকে ডাকলেন। নিজের অজ্ঞাতেই নন্দরাণী হাঁ করল। মা'র ত' সাতগুষ্টি কুটুম্ব আছে, তাদেরই কেউ এসেছে হয়ত, কিন্তু সে তো কারো সামনে যায় না! এটা সাহেববাড়ী নয়, সে অনেকবার শুনেছে। তাই নন্দরাণী দ্বিধাভরে মা'র ঘরে ঢুকল। মা হেসে বললেন, "দেখত, একে চিনতে পারিস?" নন্দরাণী আবছা আবছা চিনল, আদিত্য না? আদিত্যই বটে; বড়দিদির ভাগ্নে হয় আদিত্য, ছোটবেলায় সে এ বাড়ীতে অনেক এসেছে ও নন্দরাণীর সঙ্গে খেলেছে। ওর চেয়ে আদিত্য দুই কি আড়াই বছরের বড়, কিন্তু তখন সে এত ছোট্ট দেখতে ছিল যে নন্দরাণী তাকে সমানবয়সী ভেবে নাম ধরে ডাকত। আদিত্যকে ওর এখন কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। স্বর্ণলতাই ওকে উদ্ধার করল, বলল, 'ভানু কি তোমার সঙ্গে পড়ে—মানে তোমার এখন কোন ক্লাস ভুলে গেছি—" বলে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসল। জানু আদিত্যের দূর সম্পর্কের বোন হয়, নন্দরাণীর চেয়ে এক ক্লাস নীচে, অর্থাৎ [illegible]

কাজে। ফ্যানটাকে সম্পূর্ণ জোর করে দিয়ে নন্দরাণী মার বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না।

আদিত্যকে বেশ লাগল কিন্তু। সেই যে ছোট্টবেলায় সে আদিত্যের সঙ্গে খেলেছে, তার পরে ও আদিত্যকে আর একবার দেখেছিল। কিন্তু তখন আর সেই ছোট্ট আদিত্য নয়। অনেকখানি লম্বা হয়েছিল আদিত্য, আর ঠ্যাং দুটো হয়েছিল সেই পরিমাণে সরু। সেদিন তাকে দেখে নন্দরাণীর একটুও ভাল লাগেনি। আদিত্যর তখন বছর পনের বয়স। একগাদা বহুদিন না-ছাঁটা চুল মাথায়, কানের নীচে অসমান জুলপি, খুসকিতে ভরা। মুখখানা হয়ত ভাল, কিন্তু তখন আদিত্যর মুখ ভরে উঠেছে পাতলা ঘাসের মত দাড়ি আর গোঁপ। ঐটুকু ছেলে দাড়ি-গোঁপ কামাচ্ছে একথাও ভাবতে বিশ্রী লাগে, কিন্তু দাড়ি-গোঁপ সমেত আদিত্যকে নন্দরাণীর ভারী খারাপ লেগেছিল। ছোটবেলার খেলারসাথী হলেও সে সেদিন এগিয়ে এসে নন্দরাণীর সঙ্গে কথা বলেনি, দূর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে বোকার মত একটু হেসেছিল, তারপর ওরই বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে নেমে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে।

তারপরে আজ দেখল আদিত্যকে । আদিত্য সম্বন্ধে ওর মা, বাবা, বরাবরই উদার, হয়ত নন্দরাণীর শিশুবয়সের খেলার-সাথী বলেই। আদিত্য কিন্তু আর সেই আদিত্য নেই। অনেকটা ফর্সা হয়েছে আগের থেকে, মুখ ত ওর চিরকালই সুন্দর। কিন্তু সেই শিশুবয়সের আদিত্য থেকে, সেই বালক-বয়সের আদিত্য থেকে এ আদিত্যর অনেক তফাৎ,—অনেক স্নিগ্ধ, অনেক সপ্রতিভ...তন্দ্রায় নন্দরাণীর চোখদুটি ভারী হয়ে এল।

পরদিন রবিবার। রবিবার সম্বন্ধে নন্দরাণীর পড়া-পালানো দুষ্টু ছেলের মত একটা মোহ আছে। প্রত্যেক রবি-বার অভ্যাস মত তার ঘুম পৌনে ছয়টায় পাতলা হয়ে আসে বটে, কিন্তু সেই আধো-ঘুম আধো-জাগার মধ্যেও সে অনুভব করে, আজ রবিবার। রবিবার দিনটা কি ভাল লাগে। আলস্যের মধুরতায় প্রতিটি মুহূর্ত যেন শ্লথ। রবিবার ভোরবেলা এলার্মের কর্কশ স্বর তাকে জাগিয়ে তোলে না, মধুর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নন্দরাণীর তন্দ্রা কেটে আসে।

আজও তার মনে পড়ল রবিবারের কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও যেন কি মনে পড়ার আছে। ঘুমের জড়তার সঙ্গে যেন একটা মধুর অনুভূতি জড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নন্দ-রাণীর মনে পড়ল। কাল আদিত্য এসেছিল।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর মনের হাসি নিভে গেল। স্নিগ্ধ প্রভাতে নিদ্রাজড়-মনে যে কথাটি চকিত সুখ-স্বপ্নের মত দোলা দিয়ে গিয়েছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার রহস্যের আবরণ পড়ল খসে। যেটাকে মনে হয়েছিল পরম লাভ, সেটা হয়ে দাঁড়াল চরম ক্ষতি। একটি দিনের জন্য খামখেয়ালীর বেড়ান বেড়াতে আসবার আদিত্যর কি দরকার ছিল?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিন শেষ হল। সূর্য ডুবে এল প্রায়। এল খারাপ লাগে কেন? চমকে উঠল নন্দরাণী। অন্যদিন ত' লাগে না?

আজকের সকালে ও সন্ধ্যায় কত প্রভেদ। সূর্যের শেষ আলোর দিকে নন্দরাণী স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইল। যার চিন্তায় মধুর হল তার প্রভাত, তারই চিন্তায় তিক্ত হল তার সন্ধ্যা।

আদিত্য আজ আসবে না, হয়ত আর কোনও দিনই আসবে না। ছাদের আলসেয় ভর দিয়ে নন্দরাণী অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মা বাড়ী নেই, সাঁড়ে আটটার আগে ফিরবেন না, সে পড়ার অজুহাতে যায়নি। বাবা ত' পেন্সন নেওয়ার পর থেকে শাস্ত্র-চর্চা নিয়েই আছেন, রাত না হলে ভিতরে আসবেন না। কাজেই এত বড় বাড়ীতে সে প্রায় একলা।

নিস্তব্ধ ছাদের পরে নিস্তব্ধতর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে নন্দরাণী ভাবতে লাগল, এই তার প্রথম পরাজয়, প্রথম দুর্বলতা। এতদিন সে সুখী ছিল, অন্ধের মত, বোকার মত —কিন্তু আদিত্য ত' আর আসবে না!

তারপর আদিত্য সত্যি সত্যি এল। সেই দিনই। হতবুদ্ধি হয়ে নন্দরাণী ভেবেছিল তাকে ফিরিয়ে দেবে, মা বাড়ী নেই বলে, কিন্তু মাকে কি কৈফিয়ৎ দেবে? অগত্যা নেমে এল সে। পায়ে পায়ে নন্দরাণী বসবার ঘরের দিকে গেল। তার গলাটা জ্বলছে, শরীর অস্থির লাগছে। কেন এল আদিত্য?

উজ্জ্বল আলোর নীচে আদিত্যর সামনা-সামনি এসে নন্দ-রাণীর যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চটকা ভাঙ্গল। তার মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ লাগছিল, ধীরে ধীরে সে মুখে রক্ত ফিরে এল। তাকে দেখে আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠেছিল। তাকে বসতে বলে সে নিজেও বসল।

কিন্তু আদিত্য আর আজকে সে রকম সপ্রতিভ নেই, কেমন যেন 'নার্ভাস' লাগছে তাকে। কপালের উপরে একগোছা চুল এসে পড়ায় তাকে বয়সের চেয়েও ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল চোখে নন্দরাণী আদিত্যর দিকে তাকাল, আদিত্য কি বলতে চায়? কিন্তু আদিত্য কথা বলছে না। অগত্যা নন্দ-রাণী একটু খাপছাড়া হেসে বলল, "কি খবর?" তখন আদিত্য কথা বলল। "ইয়ে—তোমার মা বাড়ী নেই?" না-সূচক মাথা নাড়ল নন্দরাণী। আদিত্য একবার গলা খাঁকারি দিল, একবার একটা দেওয়ালে টাঙান ছবির দিকে তাকাল, তারপর নন্দরাণীর দিকে তাকাল। বসার ভঙ্গীটা বদলিয়ে নিয়ে বলল, "আ—আমার মেজ-দার বিয়ে।" নন্দরাণী এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল', হেসে বলল, "ভাব দেখে ত মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে।" আদিত্য অপ্রতিভ হল; একটু থেকে বলল, "তোমার কাছেই এসেছিলাম।" নন্দরাণীর মনে হল তার চোখের পাতা কাঁপছে; সে জোর করে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল, ধীরে বলল "কেন?" আদিত্যর মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল, "তুমি মোহন রায়কে চেন—ডাক্তার?" প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত। নন্দরাণী বিস্মিত হল, বলল, "আমি কি করে চিনব?" আদিত্য যেন হতাশ হল। নন্দরাণী আরও

মিসিসিপির বুকে

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

(২)

পরদিন প্রাতে আমরা সমুদ্র থেকেই ষ্টিমার ছেড়ে দিলাম বিষম বেগে। রাত হবার আগেই আমাদের পৌঁছাতে হবে—কেইরো—কিন্তু মিঃ বিক্সবির সঙ্গে পালাক্রমে যে অন্য পাকা পাইলট কাজ করছিল, সে ষ্টিমার আটকে দিলে চড়ায়। তাতে এত দেরী হয়ে গেল চড়া থেকে বার করে পুনরায় রওনা হতে যে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবার ঢের আগেই রাত এসে পড়বে—এ একেবারে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। উজান যাবার সময় পাইলটদের তেমন হুঁসিয়ার থাকতে হয় না, জলের অগভীরতা বা আঁধার তেমন কিছু অসুবিধা দাঁড় করাতে পারে না; কুয়াশা হলে সে আলাদা কথা। কিন্তু স্রোতের ভাটিতে যাওয়া একেবারে অন্য রকম ব্যাপার। জোরালো স্রোত সব সময় ষ্টিমারটিকে যেন পিছন হতে ঠেলতে থাকে—ফলে ষ্টিমারটির অবস্থা প্রায় উপায়হীনের সংজ্ঞায় এসে পড়ে; এই কারণে যেখানে নদীর গভীরতা সন্দেহজনক সেখানে রাতের বেলা ষ্টিমার চালান (ভাটিমুখে) প্রচলিত রীতি নয়।

তবু একটিমাত্র ক্ষীণ আশা আমাদের ছিল যথাসময়ে পৌঁছাবার যদি ঘোর আঁধার হবার আগে হ্যাট্ দ্বীপের বিপজ্জনক জটিল পথটি পার হওয়া যায়, তাহলে বাকি পথের ঝাঁক নেওয়া যাবে অন্ধকারের ভিতরও। কারণ হ্যাট দ্বীপ ছাড়ালে আর অগভীর জলভাগ থাকবে না—ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাবার ভয়ও দূর হবে। এজন্যে পাইলট কক্ষ থেকে কেবলই ষ্টিমারের গতি বাড়াতে সঙ্কেত করা হতে লাগল। আর এ উত্তেজনার কবলে পড়ে ডিউটি থেকে খালাস লোকটি অবধি ছুটি পেলে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা—ষ্টিমারের সমগ্র স্টাফই কাজে ভেজে গেল দারুণ ব্যস্ততার সঙ্গে।

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা যখন বাকি, তখন মিঃ বিক্সবি স্বয়ং এসে হুইল ধরলেন। ইহার পর অর্ধঘণ্টা সকলগুলি লোক নিজ নিজ পকেট ঘড়ি হাতে করে দাঁড়াল নির্বাকে স্পন্দিত হৃদয়ে পাইলট প্রধানের অসাধ্য সাধন প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হতে। মনে মনে তাদের কিন্তু বিষম আশংকা—লুকোয়িত পাহাড়ে ঘা খেয়ে, ষ্টিমার গুঁড়ো হবার।

কে যেন কম্পিতস্বরে বলে উঠ্লো—"ঐ দেখা যাচ্ছে হ্যাট দ্বীপ—কিন্তু কি করে যে আমাদের ষ্টিমার ও বাঁকা-চোরা পথ পার হবে ঘনায়মান আঁধারের নিরন্ধ্র কৃষ্ণতায়, তা ত বুঝিতে জুয়ায় না।"

পাইলট কক্ষের চারিদিকে হতাশের তপ্তশ্বাস যেন জমাট বেধে গেছে। কেহ কেহ সজ্জিত হয়ে এসেছে ডাঙায় নেমে টহল দেবার জন্যে, কিন্তু ষ্টিমার থামাবার ঘণ্টা ত বাজল না! কি আশ্চর্য, গতিও কমাচ্ছে না এতটুকু! সূর্যমামার লাল-চাকি দিগন্ত রেখার নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল—ষ্টিমার তার নির্দিষ্ট জোড়ে প্রথম মোড় ঘুরে চলল। যানু আরোহী পাইলটেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে—কেহ নিরাশ হৃদয়ে এ গোয়ার্তুমিকে নিন্দা করে [illegible]

[illegible]

রা নেই। অজ্ঞানিতেই পাকা ওস্তাদের দল মিঃ বিক্সবির পশ্চাতে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। আকাশ যেমনই মসীলিপ্ত হতে লাগল, একটি একটি করে তারকা দেখা দিল। সে মৃত নিস্তব্ধতায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। মিঃ বিক্সবি দড়ি ধরে টানল, এক জোড়া সংক্ষিপ্ত সিটি বেজে উঠল, রাতের আঁধার ফুঁড়ে মেঘের গায়ে বিজলীর মত দুটি আলাদা আলাদা বাষ্পরেখা অঙ্কিত হল; আবার দুটি ক্ষণস্থায়ী সিটির রেশ আঁধারে মিলিয়ে গেল।

ঝটিকা-মঞ্চ হতে পাহারাদার হেঁকে উঠল—'আগা-পাছা গলুই থেকে জল মাপ্তে লেড্-চেইন্ ফেল!'

অতি দূর হতে যেন ভেসে আসতে লাগল জল-মাপকদের চীৎকার—মার্ক থ্রি! মার্ক থ্রি! সিকিকম তিন! আড়াই! সোয়া দুই! মার্ক টু! সিকি কম—

মিঃ বিক্সবি ঘণ্টা বাজানর দড়ি টানল—দুটো ঘণ্টা বাজল! জবাবে এঞ্জিন ঘর থেকে টুংটাং-ঝনাৎ এল অতি ক্ষীণসুরে। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিমারের গতি কমে এল। জল-মাপকদের হাঁক সমানভাবেই শোনা যেতে লাগল, এঞ্জিনের গর্জন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে সে যেন ঘনঘোর তমসার অঙ্কে পৈশাচিক সুর! এখন সকল ওস্তাদ পাইলটই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—এই বুঝি ঘটে দুর্ঘটনা—এই বুঝি দুঃসাহসী বিক্সবি তাদের সলিল সমাধির পথ এগিয়ে দেয়। সবগুলি লোকই অস্থির—উদ্বেগ আকুল; কেবল মিঃ বিক্সবি ব্যতীত। সে নীরবে হুইলটি ঘুরায়, তারপর একটা স্পোকে পা দিয়ে দাঁড়ায় আর লক্ষ্য করতে থাকে ষ্টিমারটা ঠিকমত ঘুরেছে কিনা—তার চেনা নিশানা ঠাউরে নিয়ে: এখানে কিন্তু আমায় স্বীকার করতে হবেই যে মিঃ বিক্সবি তীরের যে নিশানা লক্ষ্য করে বলে মনে হল, সেখানে কাল আঁধার ছাড়া আমার চোখে আর কিছুই পড়েনি। কিছুক্ষণ সেভাবেই হুইলটি বেঁধে রাখে—তারপর যখন তার মনে হয় সে অদৃশ্য (?) নিশানা পার হওয়া গেছে, তখন আবার সে নূতন মোড়ের জন্য নূতনভাবে হুইলটি ঘোরায়। তীরের নিশানা ভিন্ন অন্যদিকে তার নজর নেই—হুঁস নেই।

এরই মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কত জনে কত কথা বলল, আমার কানে তার কতটুকুই বা এল!

এক আওয়াজ শোনা গেল—যা হোক, প্রথম ডুবা-পাহাড়টা এড়ান গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অগণিত হাঁফ ছাড়ার শব্দ।

—কি আশ্চর্য, ষ্টিমারের পিছনটা অবধি ঠিক সময়ে ঘুরে গেছে পাহাড়টার ছুঁচাল নাকটায় ঘা না খেয়ে! সাবাস!

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল—চমৎকার, চমৎকার পার হওয়া গেছে। খাসা!

এইবার এঞ্জিন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল, শুধু স্রোতেই ষ্টিমারকে টেনে নিয়ে চলল, হঠাৎ আমার নজর [illegible]

[illegible]

—এখন আমাদের চারপাশে যে অন্ধকার, তার চেয়ে ঢের বেশী কালো—ঝুলের মত কালো। ওটা নাকি দ্বীপের ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া ডগাটা। আমরা যেন ওটার ওপরই হুড়মুড় করে পড়তে যাচ্ছি স্রোতের তোড়ে। পর মুহূর্তেই কালো আঁধার রাক্ষসের মত মুখব্যাদান করে ষ্টিমারটিকে গ্রাস করল। কাজেই বিপদ এতটা ঘনিয়ে এয়েছে বলে মনে হ'ল যে, আতঙ্কেই আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল। পায়ের তলা শির শির করতে লাগল। কিন্তু মিঃ বিকসবি যেন লোহার মূর্তি, কোন বিকার নেই তার মুখে, ভাবনার লেশ নেই; হুইলটি দৃঢ়হস্তে ধরে চেয়ে আছে যেন শিকারী বিড়ালের শিখা-ছড়ান দৃষ্টিতে—কি তীক্ষ্ণ সে ভঙ্গী, যেন সারা মন-প্রাণ চোখ দুটিতে এসে ভর করেছে! আর নিখিল সেয়ানা পাইলটের দল কাঁধে কাঁধে ঠোকাঠুকি করে দাঁড়িয়ে আছে বে-পরোয়া মিঃ বিকসবির পশ্চাতে—নিতান্তই সন্ত্রস্ত তাদের যেন নিস্তব্ধ—অসাড়।

'এ পয়েণ্ট পার হতে পারা যাবে না'—কে যেন বল্লে, হতাশা-মগ্ন শিহরণের সঙ্গে।

জল-মাপকদের চীৎকারে যেন ক্রমশই করুণতা উচ্ছলিয়ে উঠছে—নিমেষে যেন জলের গভীরতা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে আসন্ন বিপদ ঘোষণা করে।

সাড়ে আট ফুট! আট ফুট! পৌনে আট—

হুঁসিয়ারী চীৎকারে নলের ভিতর দিয়ে মিঃ বিকসবি ইঞ্জিনীয়ারদের জানাল—'সব তৈরী হয়ে থাক!' (অর্থাৎ চালাবার জন্যে হুকুম মাত্র)।

—আচ্ছা, আচ্ছা স্যর!

—সাড়ে সাত ফুট! সা-ত-ফু-ট! পৌনে সা-ত!

জাহাজের তলা মাটি স্পর্শ করলো! ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ বিকসবির আদেশ গম্ভীর নির্ঘোষে বেজে উঠলো—'এইবার চালাও তোমার এঞ্জিনের পুরো শক্তিতে এক ফোঁটা ষ্টিমও যেন কমতি না হয়।' পাশের সহকারীকে বল্লে—'হাত লাগাও, চেপে ধর হুইলটাকে দাবিয়ে আরো জোরে।'

এঞ্জিন গর্জন করে উঠলো—জাহাজ অচল থেকেই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, ঝানু পাইলটদের মুখ গেল শুকিয়ে—আর দুর্ঘটনা থেকে বুঝি রেহাই পাওয়া যায় না। সেই এক নিমেষ গভীর সংশয় পূরিত—নিবিড় শঙ্কাকুল—আসন্ন দুর্ঘটনা-পীড়িত নিমেষ যেন এক যুগের মত, সবার বুকে হাতুড়ী পিটতে লাগলো নির্মম আঘাতে। হায় হায়! সব বুঝি যায় শেষ হয়ে। কিন্তু না—

পর মুহূর্তে কড় কড় ঘস ঘস শব্দে নদীতলের বালুরাশি ঘষে ঘষে ষ্টিমার সচল হ'ল অতি ক্ষীণ বেগে—প্রতি নিমেষে বেগ বাধিত হতে লাগলো! ব্যস ফাঁড়া কেটে গেছে! তখন চারিদিক থেকে মুখে মুখে উত্থিত হ'ল যে উল্লাসের কলরোল—মিঃ বিকসবির পশ্চাৎ হতে, এমন [illegible] হর্ষধ্বনি বুঝি আর কোন দিন কোন ষ্টিমারের [illegible] আলোড়িত করে নি।

এর পরে আর কোন বেগ পেতে হয় নি। মিঃ বিকসবি তো সে রাতে দিগ্বিজয়ী বীর। তার এ অসাধ্য-সাধনের কথা যেন সে রাতে আর ফুরাতে চায় না।

এ অসাধ্য-সাধনের বাস্তবরূপ কিন্তু পাইলট ভিন্ন অন্য কারু কাছে উদ্ঘাটিত হয় নি; কারণ, শুধু অগভীর জলে ষ্টিমার চালনা নয় আঁধারে, পথটি এতটা সর্পিল বক্র যে, দ্বীপের সঙ্কীর্ণ অগ্রভাগটির পাশ কাটাবার সময় খুব কাছ ঘেঁসে যেতে বলে ষ্টিমারের পশ্চাৎভাগে দ্বীপের উঁচু গাছের শাখার ঝাপটা লাগে; তার উপর জলে ডোবা চোরা পাহাড় আর খাড়া পাহাড়ের গা-থেকে বেরিয়ে আসা নাকপানা রয়েছে বড় বড় পাথরের চাংড়া। দিনের বেলায়ও এমন জটিল পথে ষ্টীমার চলাচল বিপজ্জনক, আঁধার রাতের তো কথাই নাই। কিন্তু এ সকলও নগণ্য, যখন পাইলটদের মুখে শোনা যায় যে, ঠিক দ্বীপটির অগ্রভাগ ঘুরে বেরিয়ে আসবার মুখের সঙ্কীর্ণ প্রণালীটিকে যুগপৎ সঙ্কীর্ণতর ও বিপুল ভয়াবহ করে রেখেছে কিছুদিন পূর্বে নিমজ্জিত একটা ষ্টীমারের অর্ধাংশ—যাহার সহিত সংঘর্ষ হ'লে যে কোন ষ্টীমারের তলদেশ বিদীর্ণ হবে অগোণে—ফলে আড়াই লক্ষ ডলারের ষ্টিমার তার হাজার হাজার ডলারের মালপত্র এবং দেড় শতটি মানব-প্রাণসহ হয়ত খোয়া যাবে হেলায়।

সে রাতে ডিনারের পর একটি সেরা কথা শুনেলাম বৃদ্ধ এক পাইলটের মুখে—"মৃত্যুর প্রসারিত হস্তের শুড়শুড়ি খেয়ে এখন আমি মনে-প্রাণে স্বীকার করছি, বিকসবি সত্যি সত্যি বিদ্যুৎ-দীপ্ত পাইলট।"

অবশেষে নিপুণ শিক্ষকের হাতে-কলমে শিক্ষাদানে আমিও বেশ উন্নতি করলাম। এখন আমি প্রতি পঞ্চাশ মাইল পথের দশ মাইল পথ চোখ বুজেও পার করে নিতে পারি ষ্টিমারকে। কিন্তু তবু যদি কোন সময়ে আমি এক মুহূর্তের জন্যও নাক উঁচু করে ধরি ছাদের দিকে, অমনি মিঃ বিকসবি চিমটে খুঁজতে থাকে নাকটিকে ধরে যথাস্থানে নামিয়ে আনতে।

একদিন হঠাৎ আমার মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করে বসল—'ওয়ালনাট মোড়ের আকারটি কিসের মত বল ত!'

আমায় ভাবিত হতে হ'ল। অতি সসম্মানে উত্তর দিলাম —এর যে আবার বিশেষ একটা আকার আছে, তা তো জানিনে। গোলা-বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হ'ল—ভীষণ বিস্ফোরণে শিক্ষক আমার উপর ফেটে পড়লো, আর আহাম্মোক, গাধা, জড়ভরত, হাঁদারাম প্রভৃতি বিশেষণে আমায় অবিরাম বিশেষিত করতে লাগল মেশিন-গানের অফুরন্ত গোলা-গুলীর মত; শেষটায় আর কোন বলবার মত বিশেষণ স্মরণ না হওয়ায় থেমে পড়ল ধূমাচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত স্তব্ধতায়। আমার জীবনে সেদিনই মাত্র জানতে পারলুম আমার মাষ্টার মশায়ের বারুদের ভাণ্ডার কত বিশাল!

অবশেষে মিঃ বিকসবি যখন আপন সত্তায় ফিরে এল, তখন আমায় ডেকে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে চললো—

"শোন বাবাজী, ও-রকম করলে তো চলবে না। তোমায় শিখতে হবে নদীটির কোথায় কি আকার—ছবির মত তা ভাসতে থাকবে তোমার চোখের ওপর, তবে না আঁধার হোক,

আলো হোক, তুমি ঠিক ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে ষ্টিমারটিকে। তবে মনে রাখবে সে আকার কিন্তু আলোতে এক রকম, আবার আঁধারে অন্য রকম। এ সবই তোমায় মনের সঙ্গে গেঁথে রাখতে হবে।

"পরিষ্কার জ্যোৎস্নারাতে আবার প্রতিটি পাথরের এমন নিবিড় ছায়া পড়ে যে, পাথরটার বাস্তব আকার তোমার জানা না থাকলে প্রমাদ ঘটিয়ে বসবে। আবার একটা গাছ বা খুঁটার ছায়াকেও পাথর বলে ভুল করে সরে যাবে দূরে—৫০ ফুট; অথচ তীর ঘেঁসে যেতে হলে ৩-৫০ ফুট তোমায় গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে হবে না। চোখে দেখতে না পেলেও তীরের আকারটি জানা থাকলে, নিবিড় ছায়ার ভিতর ঢুকে ষ্টিমার চালাতে বেগ পেতে হবে না।"

—ওরে বাপ্‌রে, দিনে, রাতে, জ্যোৎস্নায়—এরকম পাঁচশ আলাদা অবস্থায় নদীর বাঁক শিখে রাখতে হবে নাকি? তবেই গেছি আমি!

—আরে না না। তা কেন। তুমি শিখবে নদীর সঠিক রূপটি। একেবারে হুবহু বাস্তব আকারটি শিখবে চোখে চোখে রাখার মত, কোথাও তার খুঁটকা-সন্দেহ থাকবে না এতটুকু। চোখে তোমার যে রূপই পড়ুক না, মনে আঁকা থাকবে আসল আকারটি।

—বেশ, এখন থেকে সে চেষ্টাই করব। কিন্তু শেখার পর কি নির্ভর করতে পারব তার ওপর? নদীটা তো বদলাবে না কখনও?

তখনই পাইলট মিঃ ডবলিউ এসে মাষ্টার মশায়কে বললে—

বিক্‌সবি, তোমায় প্রেসিডেণ্ট দ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চলটার তীর ভাল করে দেখে রাখতে হবে। ওখানটায় বাঁ তীরে চড়া পড়ে আর ডান তীরে ভেঙে ভেঙে নদীটার চেহারা বদলে গেছে। পয়েণ্ট ৪০ আর তার পরের খানিকটা জায়গা এখন আর দেখে চেনা যায় না।

আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম। এখানে আট দশ মাইল জুড়ে নদীতীর একেবারে পাল্টে যাচ্ছে। শুনে মনটা দমে গেল একেবারে। এমন নিত্যপরিবর্তনশীল জায়গার আবার নিশানা ঠাউরে রাখা যাবে কি করে?' দুটো জিনিষ মালুম হ'ল এ থেকে—যে কোন পাইলটকে নদী আর নদীতীরের এত সব খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে হবে, যা এক ব্যক্তির পক্ষে শিখে রাখা অসম্ভব; আর দ্বিতীয় কথা হ'ল,—জীবনে তার শিক্ষা শেষ হবে না, কেননা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আবার শেখা জিনিষের নূতন পরিবর্তিত রূপটি তার মনে গেঁথে রাখতে হবে, পুরাতনটি মন থেকে মুছে ফেলে।

অন্য উপায় যখন নেই, তখন আর কি করি নদী আর নদীতীরের আকারটি শিখতে লেগে গেলাম। অসাধ্য ও ধারণাতীত সব নিদর্শনই হ'ল শিক্ষার সূত্রপাত। কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছে দূরে—কয়েক মাইল সম্মুখে একটা পয়েণ্ট অন্তরীপের মত বেরিয়ে এসেছে যেন নদীর মাঝখানে; আমি এই রূপটি মনে রাখতে চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু যেই ষ্টিমার ওর কাছাকাছি এল, তখন দেখি ওটা [illegible] [illegible]

একটা শুষ্ক মরা গাছ দেখা যাচ্ছে দূরে থেকে, অন্য সকল গাছ থেকে পৃথক হয়ে তীরের জল ছুঁয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পাশাপাশি যেতে যেতে সে গাছ তীর থেকে কতদূরে ভিতরে চলে গেছে নিবিড় একটা বনের মধ্যকেন্দ্র হয়ে। কোন বড় পাহাড়ই আমার চোখের সমুখে একই আকারে থাকে না বেশী সময়, ওটার প্রথম দেখা আকার মনে রাখবার চেষ্টা করছি, পরমুহূর্তে ওটার আকার বদ্‌লে নূতন রূপায়ন মেলে ধর্‌ল—আবার অন্য রূপ—আবার অন্য রূপ। এমন বহুরূপী আকার মনে রাখা মানুষের শক্তিতে কি করে সম্ভব হতে পারে! শুধু কি তাই? উজান যাবার সময় যে পাহাড়টার ক্রমে ক্রমে যে রূপ দেখেছি, ভাটি বয়ে যাবার বেলা সে পাহাড়েরও আকার হয়ে পড়েছে নূতন এক রকমের—পরিবর্তনও হয়েছে আলাদা রকমের! মিঃ বিক্‌সবিকে বল্‌লাম সে কথা।

সে বললোঃ—ওই তো মজা! এ রকম করে চল্‌তিমুখে যদি প্রতি মুহূর্তে একই জিনিষের নতুন রূপ দেখা না যেত, তা হলে তো নিশানা হিসাবে আমাদের কোন কাজেই আসতো না। এই ধর—ওই যে নজরে পড়ছে পাহাড়টা। যতক্ষণ ওটার চূড়া একটাই আছে দেখা যাবে, ততক্ষণ আমায় তীর ঘেঁসে যেতে হবে; যে মুহূর্তে পাহাড়টার চূড়া ভি (V)-য়ের আকার ধরবে তখনই আমায় তীর ছেড়ে মাঝ দরিয়ায় যেতে হবে, নইলে তীরের পাহাড়ে গায়ে ঘা খেয়ে চূর্ণ হতে হবে। আবার মাঝ দরিয়ায় যেতে যেতে যখন নজরে পড়বে যে, পাহাড়টার ভি-চূড়ার একটা শাখা অপর শাখার আড়ালে পড়েছে, সেই মুহূর্তে আমায় আবার তীরের কাছ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হবে—তা না করলে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খান্ খান্ হতে হবে। ও পাহাড়টার আকার যদি না বদলাত, তাহলে ক'জন ঠিক সময়ে এ রকম বিপদের মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিতে পারতো?—একটু দেরীতে বা একটু আগে মোড় নিয়ে বিপদে পড়তো শতকরা নব্বইটা ষ্টিমার।

এমনি করে অসম্ভব সাধনায় ব্রতী হয়ে যেন কতকটা মাথায় আনতে পেরেছি নদীর গভীরতার আর তীরের নিদর্শনের। তৃপ্তিও কিছুটা হয়ে থাকবে—হয় তো তার ছাপ মুখেচোখে দেখেই আমার গর্ব চূর্ণ করবার জন্যে মিঃ বিক্‌সবি একদিন প্রশ্ন করলে—

সমুখে ঐ যে দেখছ Hole-in-the wall, ওটার মাথা বরাবর কত জল ছিল বল ত, যখন গেল-বারের আগের ট্রিপে উজান বেয়ে যাই?

আমার মনে হ'ল এ নিছক নির্যাতন।—'কি বলছেন আপনি! ৪০।৪৫ মিনিট ধরে ওখানটায় জল মেপে মেপে লেড্‌সম্যান্‌গুলো গভীরতার পরিমাণ সুর করে বলে যায়; তখনকার মত মনে আঁচড় কাটলেও পরে কি ছাই কেউ মনে রাখতে পারে ও-সব?"

—মনে রাখা? শুধু মনে রাখা, মুখস্থ রাখতে হবে যতগুলো অবস্থার মই আছে, সবের [illegible] মনে রাখবে ওর [illegible]

ফেল্‌বে না এক ট্রিপের সঙ্গে অন্য ট্রিপের—কারণ অগভীরতার মাপ সমান তুমি পাবে না কোথাও দুবারের ট্রিপে।

হতভম্ব হয়ে রইলাম কতক্ষণ মনে নেই, যখন চমক ভাঙলো, বল্‌লাম—

—'তা যেদিন করতে পারবো, সেদিন আমি মড়াও বাঁচাতে পারবো। তাহ'লে আর আমায় পাইলটগিরি করে খেতে হবে না। যা দেখ্‌ছি, এ জিনিষ আমা দ্বারা হবে না শেখা। পাইলট হবার উপযুক্ত মগজ আমার নেই। সে মগজ যদি বা হয় কোন দিন এমনি করে শিখতে শিখতে, সেদিন মাথাটা এত ভারী হবে যে, আমার দেহে তার ভার সইবে না।'

—থাম বল্‌ছি। ও সব নাকে কান্না আমার বরদাস্ত হয় না। যখন আমি কাকেও শেখাব বলে হাতে নি, তখন হয় আমি তাকে শিক্ষিত করে তুলি, নয় তাকে আমি হত্যা করি।

এমন সর্বনেশে না-ছোড় মাষ্টারের সঙ্গে কি পেরে ওঠা যায়। তর্ক করে কোন লাভ নেই; লোহা দিয়ে তৈরী মনটা তার কিছুতে টল্‌বে না এক চুল। কাজেই অগভীর সবগুলো ঠাঁইয়ের মাপ কণ্ঠস্থ কর্‌তে হ'ল আর যখনই অন্য পাইলটের নাগাল পেতাম তার সঙ্গে সে মাপগুলো যাচাই করে নিতাম। এমনি সে-মাপও আয়ত্ত হ'ল। কিন্তু এবার এল যে বিষম পরীক্ষা, তার কথা মনে হলে এখনও আমি পাগল হয়ে যাই। এবারে এতটা শিখেছি যে, মিঃ বিক্‌স্‌বির মুখের গালি-গালাজও তার স্বাভাবিক কঠোরতা হতে বঞ্চিত হয়েছে। একদিন সে বল্‌লে—

—জলের ওপর ঐ যে হেলান রেখা দেখছ, কি বল ত?

—ডুবো পাহাড় নিশ্চয়।

—ডুবোই বটে তবে পাহাড় নয়, একে বলে ধোঁকা-পাহাড়। কেন না এটা জমাট বালি ছাড়া আর কিছুই নয়। একপাশ সোজা খাড়া, অন্য পাশ হেলান। খাড়া ধারে ধাক্কা খেলে ষ্টিমার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু হেলান ধারে ষ্টিমার তুলে দিলে হানি হয় না। ওর চার ধারে গভীর জল, কিন্তু ওপরে বেশী নেই। খাড়া ধার দেখছ ত?

—হাঁ।

—এবারে হেলান ধারে ষ্টিমার নাও। ওখান দিয়ে পূর্ণ গতিতেও যেতে পার। কিছু হবে না, যাও পার হয়ে যাও। বেশী স্রোত নেই।

বিকেল বেলা। মিঃ বিক্‌স্‌বি পাইলট কক্ষ ছেড়ে গেল। ধোঁকা ডুবো পাহাড় শিখে বেশ গর্ব হয়েছে আমার। আমি ফুর্তির সঙ্গেই মাঝে মাঝে হুইল ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে ভরসা পেলাম। কেমন সুন্দর আঁচড় কেটে ঢেউ তুলে চলে হালটা। বোধ হয় বেশী রকম আত্মনির্ভরতায় ফুলে উঠে-ছিলাম—একবার বেশী সময় তাকিয়ে রইলাম পেছনের সৌন্দর্যে। সমুখে মুখ ফিরিয়ে দেখি সর্বনাশ! ধোঁকা-পাহাড় যে সমুখ জুড়ে রয়েছে আড়াআড়ি লম্বা হয়ে। মাথা গুলিয়ে গেল। মুহূর্তে ষ্টিমার ঘুরালাম—কিন্তু বিপদ সেখানেও, ধোঁকা পাহাড়টা যেন জলজন্তুর মত সেখানেও পোঁছে [illegible] আমায় [illegible] ছিনিয়ে নেবে। কি করি, উপায় নেই, সংঘর্ষ—মাথা আমার একেবারে বিকৃত—উপায় না পেয়ে সেখান থেকে পালাব ঠিক করলাম। ষ্টিমারের একটা ধারে লাগলো একটা গাছের ডালের ঝাপটা—আরোহীরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি সুরু করলো। সে মুহূর্তে মিঃ বিক্‌স্‌বি এসে দরাজ গলায় আদেশ দিলে—

ডান-বাঁ বন্ধ কর। পিছু হট।

এক নিমেষ থেমে ষ্টিমার যেন গাছটার ঘাড়ে পড়তে যায়। পর মুহূর্তে সরে আসে। পিছু হটে এলে ধোঁকা-পাহাড়ের হেলান ধার নজরে পড়লো। এবার আর বিপদ নেই।

মিঃ বিক্‌স্‌বি ঠাট্টা করে বল্‌লে—ভুলে যাও কেন, তীরে লাগাতে হলে তিনবার ঘণ্টা বাজাতে হয়, তা হলেই ইঞ্জিনীয়ার ডাঙায় ভিড়িয়ে দেবে। তা বলে আরোহীরা গাছের মাথা বয়ে নামতে পারে না।

লজ্জায় মরে গেলাম। অতি ক্ষীণস্বরে বললাম—ডাঙায় ভিড়াতে চাই নি।

—বটে! তবে ওখানে কি করতে গেছলে?

—ধোঁকা পাহাড়টা এড়াতে গেছলাম—নইলে আর ওখানে যাব কেন!

—ওটা ধোঁকা পাহাড় নয়। তিন মাইলের ভিতরও নেই একটা।

—কিন্তু আমি যেন দেখলাম হুবহু ধোঁকা পাহাড়। সমুখে ঐ যে দেখাচ্ছে ওটার মতই ত মনে হ'ল।

—বেশ, তুমি ওটার ওপর দিয়ে চলে যাও, আমি সব ঝাক্কি নিচ্ছি।

তার আদেশে নিলাম ষ্টিমার, বেশ পেরিয়ে গেল। তখন তফাৎ কোথায় ভাবতে লাগলাম।

মিঃ বিক্‌স্‌বি বললে—তফাৎ বুঝছ না বুঝি? এটা হ'ল হাওয়া পাহাড়—বাতাসের কারসাজি—ধোঁকা পাহাড় নয়।

—কিন্তু দেখতে ত একই রকম। কি করে চেনা যায়?

—এ দেখে ঠাউরে নিতে হয়। বলে বোঝান যায় না। তুমিও পার্‌বে দেখতে দেখতে।

সত্যি তাই, দুদিনেই সে ব্যাপার জলের মত সোজা হয়ে গেল। কিন্তু এখানেই পরীক্ষা শেষ নয়।

সেদিন বিকালে অতি সোজা রাস্তা। ২ ঘণ্টার ভিতরও কোন ঝামেলা থাকবার কথা নয়। মিঃ বিক্‌স্‌বি বললে—আমি নীচে যাচ্ছি, তুমি ত জান এ রাস্তা?

—হাঁ, জানি। মনে ভাবি জিজ্ঞাসার হেতু ছিল না, একটা কাণা লোকও এখানে হাল ধরতে পারে।

কেন পারব না। সোজা রাস্তা এটা।

—সোজা? কত জল পাবে ও ক্রসিং-য়ে?

—এখানে? জল মাপতে হবে না।

—তুমি তাই মনে কর, না?

প্রশ্নটা ধোঁকা দিলে। এ সোজা রাস্তায় জল অথৈ, এ ত জানা কথা। সে চলে গেল। আমার কেমন একটু খট্‌কা লাগল।

একজন অফিসার এল। ব্যাপার কি? কিন্তু কেন এল ওরা, কোন ঝামেলা নেই এপথ টুকুতে।

মেট চেঁচায়—মিঃ বিক্‌স্‌বি কোথায়?

আমি বল্লি—নীচে।

তাহলে নিশ্চয় সঙিন্ অবস্থায় ফেলেছি ষ্টিমারকে। আবার আমার মাথা কেমন গুলিয়ে গেল। সম্মুখে যেন অগভীর জলের নিশানা। আত্মনির্ভরতা গেল উবে। একবার ঘণ্টা বাজাতে গেলাম, আবার লজ্জায় হাত টেনে নিলাম। আবার শঙ্কা হ'ল মনে—অতি আস্তে ঘণ্টাধ্বনি করলাম।

কাপ্তেন চীৎকার করে বললে জল-মাপকদের কাজে লাগতে।

খটকা আরও বাড়ল—এখানে এত কম জল কি করে আসবে। কিন্তু কম জলই ত—এরা বল্‌ছে—চার—সাড়ে তিন—তিন—কি সর্বনাশ! এখন উপায়। এখানে কি করতে হবে জানা নেই ত।

—পোনে তিন—আড়াই—

আমি ষ্টিমার থামিয়ে দিলাম ভয়ে। কি আশ্চর্য, এখানকার অবস্থা ত তা হলে ঠিক ঠিক শেখা হয় নি।

—সোয়া দুই—দুই—

আমি নিরুপায়। জানি না কি করে ষ্টিমার বার করব। আমার হাত অসাড়। ঘণ্টা বাজাবার শক্তি নেই। আমি টিউবের কাছে ছুটে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারকে নাম ধরে বল্‌লাম—আমায় বাঁচা ভাই, পিছু হটিয়ে।

অমনি চারিদিক থেকে উঠল হাসির রোল। বিস্ময়ে মূর্ছা যাই আর কি। তখন কানে এল কাপ্তেনের কথা—এ বেচারীকে নিয়ে এরকম ধাপ্পা দেওয়া কি ঠিক!

ধাপ্পা? —মিঃ বিক্‌স্‌বির ধাপ্পা! কি ভয়ানক! সব ধাপ্পা!

মিঃ বিক্‌স্‌বি বল্‌লে এবার হাসিমুখে—তুমি যা ঠিক বলে জান, তা কারু কথায় বেঠিক বলে বিশ্বাস কর কেন। আমার কথায় তোমার খটকা লাগলো কেন? তা করলে না, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখবে। আর একটা কথা, বিপদের সময় ভীরু কাপুরুষ বনে যাবে না।

শিক্ষা ভাল রকমই পেলাম। ঠাট্টা করে সবাই আমায় বলত,—"আমায় বাঁচা ভাই, পিছু হটে।" সে শিক্ষা জীবনে ভুলব না।

পাইলটের ব্যবসা আমি ভালবাসি—তার চেয়েও বেশী ভালবাসি মিঃ বিক্‌স্‌বির গালাগালি।

—শেষ—

হিংসা

(Walt Whitman)

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি,

পৃথিবীর যাঁরা মহাবীর,
জয়মাল্য লভিলেন ধ্বংসের রক্তাক্ত-যানে চড়ি',
পরাজিত অরিকুল যাঁদের গর্ব্বের তলে,
ধূলিসম ম্লান হ'য়ে পড়ে,
যাঁহাদের জয়-জ্যোতি দীপ্তির সহস্র শিখা মেলি,
অন্ধ করে বিশ্বের নয়ন,—
—যখনি তাঁদের কথা শুনি কিংবা পড়ি,
হিংসা হয় নাকো।

* * * * * *

বিরাট রাজ্যের অধিপতি,
প্রেসিডেণ্ট কিংবা ডিক্টেটর,
রক্ত চক্ষু হেরি যাঁর কাঁপে দেশবাসী,
দেশের গতির বেগ যাঁহাদের করে নিয়ন্ত্রিত,—
অথবা বিলাস-দাস যে ধনীরা আরাম-শয্যায়
অলস স্বপন দেখে,
তাদেরও কাহিনী যবে শুনি কিংবা পড়ি,
—হিংসা হয় নাকো।

* * * * * *

সেদিন শুনিনু বসি' বিশ্ব-প্রেম-প্রাণ
সেই মহাবীর কথা
স্থির, ধীর অবিচল, যারা ছিল বাঁচার নেশায়
জীবন্ত জ্বলন্ত শুধু,
বিপদের ঝঞ্ঝাবর্ত্তে কাঁপে নাই যাহাদের দৃপ্ত প্রাণ-শিখা,
শৈশবের খেলাঘরে, যৌবনের উপবনে,
বার্দ্ধক্যের ভাঙ্গা ঘাটে,
একই সুরে গাহিয়াছে জাগরণী-গান,
যাদের বিশ্বাস ছিল প্রেম-মন্ত্রে চির-অধিষ্ঠিত,
দেশের সীমানা ছাড়ি দেশান্তরে লভিয়াছে স্থান,
—তবু কভু ম্লান হয় নাই;
অনির্ব্বাণ, রবে চির যুগ
যাহাদের দৃপ্ত প্রাণ-দীপ।
শুনিয়া চমক লাগে;
[illegible]
[illegible]

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(১২)

মেয়ে মহলের সভায় প্রকাশ দু'টা কথাও গুছাইয়া বলিতে পারে নাই। প্রথম হইতেই কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, সংকোচটা বৃদ্ধি পাইল প্রতিমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রকাশের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল, মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রতিমা লক্ষ্য করিল তার প্রতি তরুণ সভাপতির মুগ্ধ দৃষ্টি। সে তাদের সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত আসিল, নিজেই পরের দিন তাদের বাড়ী যাইবার প্রস্তাব করিল এবং ধরা দিল আরও নানা রকমে।

প্রতিমা সেই রাত্রেই রোজনামচায় লিখিল, আজ একটি নতুন ধরণের মানুষ দেখিলাম, মেয়ে মহলের বার্ষিক উৎসবের সভাপতি, কদমছাঁটা চুল, গায়ে গলাবন্ধ জিনের কোট, মাথায় টিকি, বয়সে তরুণ হলেও মানুষটি যেন বিদ্যাসাগরী যুগের। চেহারা সুন্দর বটে কিন্তু নিজেকে সুন্দর করে তুলে ধরবার আর্ট তাঁর মোটেই জানা নাই; এবং সেদিকে লক্ষ্যও নেই আদপে।

বক্তৃতা করবার সময় যে লোক এতটা নার্ভাস হয়ে পড়ে, কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের সঙ্গতি রাখতে পারে না, প্রফেসর হিসেবে তার সুখ্যাতি হল কি করে এইটেই আশ্চর্যের কথা।

দীপা দিলে একটা অদ্ভুত খবর; প্রকাশবাবু অর্থাৎ এই সভাপতি মশায় নাকি কোন এক সুন্দরীকে সিনেমায় দেখে প্রেমে পড়েছেন এবং ব্যায়াম চর্চা সুরু করে দিয়েছেন ফ্যাট কমাবার জন্য। ব্যাপারটা হাস্যকর বটে।

পরদিনের ডায়েরীতে ছিল, আজও বিকেল থেকে পড়া হল না। সন্ধ্যের আগেই প্রকাশবাবু এসেছিলেন। মা বাড়ী না থাকায় চা তৈরীর ভার পড়ল আমার উপর।

প্রকাশবাবু প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বাবার লেখা শুনলেন। শুনতে শুনতে কয়েকবার আমার দিকে তাকালেন। পুরুষরা অনেকেই এমনিভাবে চায়, কিন্তু ধরা পড়ে তারা কম এবং ধরা পড়লেও এঁর মত নার্ভাস হয়ে যায় না।

মা আজ একটা কুকুর কিনেছেন। তার নাম রাখা হয়েছে সিবাষ্টোপোল, কুকুরটা দেখতে বাঘের মত। গায়ের রং কালো, গলার স্বর গম্ভীর। তার চোখ দু'টা দেখলে পরিচিত একজন দার্শনিকের কথা মনে পড়ে।

দুপুরে বিদেশী একটা গল্প পড়েছি, ষ্টোভ। ঘটনা খুব সামান্য কিন্তু গাঁথুনী ও পরিবেশন দুইই চমৎকার।

তাদের বিবাহ হ'ল কোর্টশিপ করে, ওদেশে যা হয়ে থাকে; কিন্তু কিছুদিন পরেই স্বামী স্ত্রীতে মন কষাকষি সুরু হল একটা ষ্টোভ নিয়ে। স্বামী মনে করেন জিনিষটার কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু স্ত্রীর বিশ্বাস তার সুখ শান্তি এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করছে ঐ ষ্টোভের উপর।

গল্পটা মনের উপর একটা ছাপ রেখে গেছে।

প্রকাশ আসিবে শুনিয়া প্রতিমা দীপাকে ফোন করিল; আজ বিকেলে একবার এস ভাই।

কেন?

কারণ আমি বলব না, কিন্তু তোমায় আসতে হবে।

আচ্ছা যাব। দাদাও বলছিলেন একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ ক্লাসের আর কেউ আসবে না কি?

ক্লাসের কেউ নয়, তবে আসবেন একজন। তোমার দাদার বন্ধু—প্রকাশবাবু।

দীপা বলিল, দাদা বললেন তিনি নাকি তোমাদের ওখানে আজকাল খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছেন।

মিথ্যা কথা। এসেছিলেন মাত্র একদিন বাবার প্রবন্ধ শুনতে।

মাত্র একদিন বুঝি? দাদা তাই বলছিলেন কদিন তোমাদের খবর না পেয়ে প্রকাশদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রতিমা কহিল, তোমার প্রকাশদা দেখছি একটি বদ্ধ পাগল।

দীপা বলিল, ভাল কথা উনি ব্যায়াম সুরু করেছেন কাকে দেখে জানত'?

প্রতিমা বলিল, আমি একথা বিশ্বাস করি না।

দীপা বলিল, আমার অনুমান মিথ্যে নয়, তিনি হচ্ছেন আমার বন্ধু প্রতিমা।

প্রতিমা বলিল, ননসেন্স।

উনি দাদাকে বলেছেন শুনলাম।

প্রতিমা বলিল, আমি একথা বিশ্বাস করিনা।

তা নয় নাই করলে, কিন্তু তুমি কিছু আরম্ভ করনি?

তার মানে?

ব্যায়াম না হ'ক অন্য কিছুর চর্চা?

হ্যাঁ, ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখ্‌ব ভাবছি।

তোমার কণ্ঠস্বর কি বলছে জান?

প্রতিমা কহিল, থাক আর তোমায় ফাজলামি করতে হবেনা। আজ এস নিশ্চয়।

দীপা আসিল ঠিক সময়েই। প্রতিমা তার সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলিবার সুযোগ পাইল না। তবে এইটুকু পর্যন্ত জানিল যে, প্রকাশের অবস্থা ভাল। দীপার দাদা বলেন, ও রকম চরিত্রবান ইয়ংম্যান আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না।

দীপা ও প্রকাশের সঙ্গে তার মা বরাবরই বেশ দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলায় প্রতিমা বেশ লজ্জা বোধ করিল।

সে ডায়েরীতে লিখিল,—

আজ দীপার সঙ্গে মার ব্যবহারে লজ্জিত হয়েছি। আর দুঃখ হচ্ছে প্রকাশবাবুর জন্য। তিনি ডাঙ্গার মাছের মতন বরাবরই একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অতনুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেনই। আই-সি-এস থেকে এবার ব্যারিষ্টারে নেমেছেন। তাঁর ধারণা বিলেত না গেলে কেউ মানুষ হতে পারে না।

কিন্তু বিলেত ফেরতের নমুনা যদি অতনু হয় তা হলে ভগবানকে বলব, রক্ষে কর।

দীপা আজ সেই ব্যায়ামের কথার পুনরাবৃত্তি করল।

আলাপ নেই, পরিচয় নেই অথচ একটি শিক্ষিত তরুণ একটি মেয়েকে দেখে ডন কুইক্সো বনে গেল, এ যেন মধ্য যুগের কাহিনী। বিংশ শতাব্দীতে এটা একান্ত হাস্যকর।

কিন্তু আজ ডায়েরীতে দেখলাম, তারিখটা মিলে যাচ্ছে। যে দিনের কথা দীপা বলছে ঐ তারিখে বাবা এবং মার সংগে আমিও বায়স্কোপে গিছলাম।

প্রতিমার ডায়েরীর পাতার কোন খবরই প্রকাশ জানিত না। জানিলে তার মনটা অনেকটা হাল্কা হইত।

(১৩)

দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে প্রকাশ খুবই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে ক্ষিতীশকে বলিল, ভাই ভরসা আর কিছু নেই, তারপর ভৃগুলাঞ্ছনের নিকট অনুযোগ করিল, আপনার কবচ, তাবিজ, ছাই-ভস্ম সবই বৃথা হল।

রামবাঞ্ছা কহিলেন, ধৈর্যই রক্ষ, প্রকাশবাবু,

কিন্তু প্রকাশের জন্য প্রস্তুত ছিল এর চেয়েও বড় একটা আঘাত এবং সেই আঘাতটা আসিল একেবারে অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে।

দিন কয়েক পরের কথা। হলধর দৌহিত্রকে ডাকিয়া বলিলেন পৃথিবীটা অল রট্, প্রকাশ।

সে মাতামহের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিল না। দাক্ষায়ণী এ সংসারে আছে বটে, কিন্তু প্রতিমাও ত' আছে অতএব পৃথিবীটাকে পুরোপুরি অল রট্ বলিলে চলিবে কেন?

হলধর বলিলেন, উদ্ধাম তুমিই বল অল রট্ কি না?

উদ্ধাম ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলিত করিয়া প্রভুর কথার সমর্থন করিল।

গেলাসে একটা চুমুক দিয়া হলধর টেবিলের উপর হইতে একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া কহিলেন, এই লোকটাকে জেলে দেওয়া উচিত।

প্রকাশ বলিল, কাকে?

এই সাহিত্য তস্করকে, পড়ে দেখ।

তিনি প্রকাশের হাতে দিলেন "তাণ্ডবের" একটি সংখ্যা। কভার উল্টাইয়া প্রথম পাতায়ই প্রকাশ দেখিল বড় বড় হরপে ছাপান শিরোনামা,

সমাজ দর্পণের কথা—

(ঘটকর্পর রচিত)

ঘটকর্পরের নামের পাশেই হলধরবাবু লাল কালি দিয়া লিখিয়াছেন, Jail and fine both (কয়েদ আর জরিমানা দুই)।

হলধর কহিলেন, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে লোকটাকে তুমি চেন।

ঘটকর্পরই প্রতিমার পিতা সেকথা বলিতে প্রকাশের সাহসে কুলাইল না। সে শুধু কহিল, হ্যাঁ, আলাপ আছে।

লোকটা একের নম্বরের চোর, স্কাউণ্ড্রেল।

প্রকাশ বলিল, তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

তাই আমার পুঁথি চুরি করে গবেষক সেজেছেন?

তিনি হয়ত অন্য জায়গা থেকে কপি যোগাড় করেছেন।

করলেই হল? এর মাত্র একটা কপি ছিল তরুণের কাছে, সেইটে আমি কিনেছি।

প্রকাশ কোন উত্তর করিল না।

হলধর বলিলেন, চুরি করে লোকটার গবেষক হওয়ার চেষ্টা। উদ্ধাম একবার "পেনাল কোড খানা" নিয়ে এস ত. আমি তোমায় বলিনি কি প্রকাশ যে, সাহিত্য-তস্করে বাঙলা দেশ বোঝাই? আর বেশীর ভাগ চোর হচ্ছে ঐ গবেষক দল।

প্রকাশ বলিল, আমি কালই ঘটকর্পর মশাইর সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করব।

বেশ তা হলে জেনে নেবে কোথায় তিনি বই পেলেন, কে তার কাছে বেচেছে। তাকে বল যে আমি একজন রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট এবং দু'তিন দিনের মধ্যেই জাষ্টিস অব দি পিস হব। তার মতন স্কাউ—

দাদু তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

চোরকে শ্রদ্ধা, তোমার দ্বারা কিছু হবে না, আমারই যেতে হবে দেখছি।

প্রকাশ অনুনয়ের সুরে বলিল, আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি এখন যেওনা। আমি যদি না পারি তখন তুমি যা হয় ক'র।

পরদিন প্রাতেই প্রকাশ দেবেনবাবুকে ফোন করিল, বিশেষ দরকার আজই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দেবেনবাবু বলিলেন, ভাল কথা। তারপরই কি যেন ভাবিয়া আবার বলিলেন, তুমি একটু দাঁড়াও।

মিনিট খানেক কাটিয়া গেল, তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি না আসবে বলছিলে প্রকাশ, কি যেন জরুরী কাজ আছে?

হাঁ, খুবই জরুরী।

দেবেনবাবু অন্য কাহারও উদ্দেশে বলিলেন, শুনো প্রকাশের কাজ খুব জরুরী।

তারপর প্রকাশকে ডাকিয়া—তোমার কখন সুবিধে হবে?

ছ'টায়।

দেবেনবাবু বলিলেন, প্রকাশের সুবিধে হবে ছ'টায়।

এবার প্রকাশ শুনিতে পাইল দাক্ষায়ণীর কণ্ঠস্বর, বিশেষ দরকার থাকলে ছ'টায়ই আসতে বলে দাও।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় প্রকাশ দেবেনবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, এই যে এস প্রকাশ, তোমায় ক'দিন পরে দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে।

প্রকাশ আসন গ্রহণ করিলে দেবেনবাবু ডাকিলেন সোনাবাতি চা নিয়ে এস।

প্রকাশ আশা করিয়াছিল চায়ের জন্য ডাক পড়িবে প্রতিমার। দেবেনবাবু সোনাবাতিকে ডাকিলে চায়ের প্রতি তার আর সে রকম স্পৃহা রহিল না।

দেবেনবাবু বলিলেন, ফোনে বলছিলে দরকারী কথা আছে, কি ব্যাপার বল দেখি?

পরে বলব।

বেশ তাই বল। আমারও কাজ ছিল তোমার সঙ্গে।

কি কাজ?

'তাণ্ডবে' সমাজদর্পণ নামে আমার একটা লেখা বেরিয়েছে তোমায় শোনাব ভাবছিলাম।

হ্যাঁ জানি।

জান, পড়েছ নিশ্চয়ই? হাই ক্লাশ লেখা, কি বল? ওঃ পড়নি? তাহলে লেখকের নিজের মুখে শোনাই ভাল।

প্রবন্ধ শুনিবার মতন মনের অবস্থা তার ছিল না তবু প্রকাশ না বলিতে পারিল না।

যে লেখা চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছে প্রকৃতির পরিহাসে প্রকাশকে আজ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিটকাল বসিয়া তাহা শুনিতে হইল।

লেখকের বক্তব্য কি, লেখাটা ভাল কি মন্দ সেদিকে শ্রোতার কোন খেয়ালই ছিল না। সে ভাবিতেছিল প্রতিমার কথা, দাক্ষায়ণীর কথা, বই চুরি এবং ঐরূপ আরও কত কি? তবে এই বৃদ্ধ বয়সেও দেবেনবাবুর উৎসাহ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। কী অসাধারণ সাহিত্য-প্রীতি। তিনি লেখাটা পড়িতেছিলেন আত্মস্থ যোগীর মত।

এই নিরীহ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে তার মাতামহ হীন ধারণা পোষণ করেন ভাবিয়া প্রকাশ মনে একটা বেদনা অনুভব করিল।

পড়া শেষ হইলে দেবেনবাবু বলিলেন, "তাণ্ডবের" প্রভঞ্জন গড়গড়িই বলেন, এরূপ লেখা বাঙলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। হেঃ হেঃ তুমি কি বল, ইয়ং প্রফেসর?

অন্যমনস্কভাবে প্রকাশ বলিল—হুঁ।

এই সংক্ষিপ্ত হুঁতে দেবেনবাবু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, গড়গড়িই মস্ত বড় বোদ্ধা। তাকে এখন সাহিত্যের ডিক্টেটর বললেই চলে। আর ফতোয়া দিচ্ছেন দধীচি সব চেয়ে ভাল লেখক। লোকে তাকে মেনে নিলে। কাল বললেন, না হে লেখক হিসাবে বড় ঐ ভজরাম।

প্রকাশ বলিল, গড়গড়ির নাম শুনেছি।

শুনবে বৈকি কাগজে কাগজে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ বেরুচ্ছে, সভাহুজুগেদের মধ্যে যেন কম্পিটিশন লেগে গেছে তাঁকে নিয়ে কে আগে সভাপতির তক্তাউসে বসাবে। অথচ এই গড়গড়িই সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেছিলেন কম্পোজিটর হিসাবে।

প্রকাশ বলিল, তা হলে ত' ভাগ্যবান পুরুষ বলতে হবে।

নিশ্চয়।

দেবেনবাবু নিজের সাহিত্য প্রতিভা ও 'তাণ্ডব' সম্পাদকের সুখ্যাতি করিয়াই চলিয়াছেন। প্রকাশকে কথা বলিবার কোন অবকাশই দেন নাই।

স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও প্রকাশ প্রথম হইতেই সমাজদর্পণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। কিন্তু কথাটা না তুলিয়াও উপায় নাই।

দেবেনবাবু নিশ্বাস গ্রহণের জন্যই একটুক্ষণ চুপ করিলে ইতস্তত করিতে করিতে প্রকাশ কহিল, এই লেখাটা সম্বন্ধেই কিছু বলতে এসেছিলাম।

দেবেনবাবু কহিলেন, বেশ, এস আলোচনা করা যাক্। কেরী সাহেব বাঙলা বই ছাপাবার বহু পূর্বে সমাজদর্পণ রচিত হয়েছে।

আপনি বইখানা পেলেন কোথায়?

খুব একজন ভাল লোকের কাছ থেকে পেয়েছি। দুষ্প্রাপ্য বই যোগাড় করতে লোকটি সিদ্ধহস্ত। যদিও নিজে সে একজন সাহিত্যরসিক নয়।

লোকটি কে?

আমার শ্বশুর মহাশয়ের স্বগ্রামবাসী।

তার নাম?

উদয়রাম রায়।

উদয়রাম!

হ্যাঁ, চেন তাকে?

প্রকাশ বলিল, সে আমাদের বাড়ীতেই—

দেবেনবাবু বলিলেন, খাসা লোক। আমার কাছে সে আরও অনেক বই বেচেছে।

কি কি বই?

পুরানো পুঁথি।

প্রকাশ বলিয়া উঠিল, স্কাউণ্ড্রেল।

কেন বল দেখি?

সে আমাদের বাড়ীতেই থাকে। আমার মাতামহের পুরানো পুঁথি সংগ্রহের বাতিক আছে।

বাতিক বলনা প্রকাশ।

ক্ষমা করবেন। আমি সে ভাবে কিছু বলিনি।

বেশ, বেশ, সাহিত্যসেবা হচ্ছে অতি উঁচুদরের জিনিষ।

প্রকাশ বলিল, উদয়রাম আমার মাতামহের সংগৃহীত বই চুরি করে নিয়ে আপনার কাছে বেচে।

বড় ঘৃণিত ব্যাপার ত'। আমি ত লোকটাকে এতদিন ভালই মনে করতাম। এখন দেখছি প্রথম শ্রেণীর জোচ্চোর।

একটু থামিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতামহের নাম?

রায় হলধর চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

নিশ্চয়ই তিনি একজন গবেষক।

হ্যাঁ।

তা না হলে পুঁথি সংগ্রহ করবেন কেন? তিনি দেখছি রিমার্কেবল (বিখ্যাত) লোক।

প্রকাশ কোন উত্তর করিল না।

দেবেনবাবু বলিলেন, কি ভাববেন রায় বাহাদুর যদি তিনি জানতে পারেন যে, আমি তাঁর চাকরের কাছ থেকে চোরাই মাল কিনি? যদিও আমি কিনেছি নিতান্ত সরল বিশ্বাসে।

প্রকাশ বলিল, আমি তা বুঝতে পেরেছি বটে, কিন্তু আমার মাতামহ বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

হবারই কথা। আমিও হতাম। তুমি তাঁকে ব'ল আমি এই জন্য ভারী লজ্জিত। তিনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝবেন। আমার সঙ্গে আত্মিক যোগ আছে কিনা, যাকে বলে সোলের এফিনিটি, উভয়েই আমরা ব্রাদার গবেষক।

প্রকাশ বলিল, হ্যাঁ, তিনি বুঝবেন বৈকি।

আমি এতদিন উদয়রাম লোকটাকে চিনতে পারিনি। আজও সে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গেছে।

কেন?

স্ত্রুস্বামীর ভাগ্যে বিপর্যয়ের জন্য।

ওখানাও আপনি কিনেছেন?

ভাগ্য বিপর্যয়ও হলধরবাবুর বই বুঝি? কি কেলেঙ্কারি বল ত'? তোমাদের হারান বইয়ের একটা লিষ্ট দিও ত'।

দেব। আপনি ভূস্বামীর ভাগ্যবিপর্যয় সবটা পেয়েছেন?

এতদিন সবটা পাইনি, তোমাকে প্রাইভেটলি বলছি আমার ব্যক্তিগত অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। তাই সব টাকাটা আগে দিতে পারিনি। আজ উদয়রাম, বইখানার অবশিষ্ট অংশ নিয়ে এসে বললে, যা পারেন দিয়ে দিন, আমি বইয়ের বাকীটা রেখে যাচ্ছি আজই আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

বাড়ী যাবে বললে?

হ্যাঁ, ওর স্ত্রীর অসুখ।

স্ত্রীর! ও ত' বিয়েই করেনি।

দেবেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, তাহলে বল লোকটা একেবারে ধাপ্পা সম্রাট।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, উনি কখন যাবে বললে?

দেবেনবাবু উত্তর করিলেন, সন্ধ্যের গাড়ীতে। থাক সে কথা। ভূস্বামীর ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা হয়ত' রায় বাহাদুর জানেন না।

প্রকাশ কোন উত্তর করিল না।

দেবেনবাবু বলিলেন, আশা করি সব জেনে রায় বাহাদুর আমায় ক্ষমা করবেন।

সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও প্রকাশ বলিল, সে ভার আমি নিচ্ছি।

আপনার প্রতি আমার মাতামহের কোন অশ্রদ্ধার ভাব দেখলে পৃথিবীতে আমিই সব চাইতে ব্যথিত হব।

দেবেনবাবু আসন ছাড়িয়া তার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, তুমি একটি জুয়েল, প্রকাশ। তোমার মতন ছেলের কাছে যদি—

বক্তব্যটা তিনি শেষ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিতে প্রকাশ পরম পুলকিত হইয়া দেবেনবাবুর পদধূলি লইয়া বলিল; আশীর্বাদ করুন যেন আপনার স্নেহের উপযুক্ত হতে পারি।

দেবেনবাবু বলিলেন, তোমার মাতামহ কি বলেন কালই জানিয়ো আমায়। আর দেখ, দাক্ষায়ণী যেন টের না পান। অবশ্য এটা খুব প্রাইভেটলি বলছি।

প্রকাশ যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়ীর এঁরা সব ভাল আছেন ত'?

কার কথা বলছ?

প্রতিমা ও তার মার।

হ্যাঁ, তাঁরা ভাল আছেন।

বেশ বেশ বলিয়া প্রকাশ বাহির হইয়া গেল বটে কিন্তু সে ফিরিল একটা ভারাক্রান্ত মন লইয়া।

প্রতিমা আজ একবারও যে আসিল না নিশ্চয়ই ইহার পিছনে দাক্ষায়ণীর হাত আছে।

তিনি কি উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে চান?

(১৪)

বাড়ী ফিরিয়া ফটকের সামনেই উদয়রামকে দেখিয়া প্রকাশের মুখে একটা তীব্র বিরক্তির ছাপ পড়িল।

উদয়রাম কহিল, তুমি খুব রেগে গেছ না?

প্রকাশ বলিল, এখনও তুমি দেশে যাওনি যে?

দেবেনবাবু সব বলেছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

তারপর উভয়েই নীরব। প্রকাশ ভাবিল মানুষ এতটা নামিয়া যায় কি করিয়া যে লজ্জার বালাই পর্যন্ত তার আর থাকে না।

খানিকটা পরে উদয়রাম বলিল, ভেবেছিলাম চলে যাব; কিন্তু—

প্রকাশ বলিল, দাদাবাবু যদি জানতে পারেন যে তাঁর পুঁথিগুলি দেবেনবাবুর কাছে তুমিই বেচে দিয়েছ তা হ'লে কি হবে বল দেখি?

উদয়রাম উত্তর করিল, তিনি জানলে আর রক্ষে থাকবেনা জানি, কিন্তু জানতে তাঁকে দেওয়া হবে না।

কিন্তু তা কি সম্ভব?

সেই ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। তিনি জানলে তৎক্ষণাৎ আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এ বাড়ী ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রকাশের মনে হইল উদয়রাম তার মদের অভ্যাসের কথাই ইঙ্গিত করিতেছে। মদের জন্যই হয়ত এবাড়ী ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

উদয়রাম বলিল, আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু যখন আমি প্রথম এখানে আসি তখন তুমি ছিলে এতটুকু। তোমাকে কি ভাবে মানুষ করেছি হয়ত' তা তোমার মনে নেই। কিন্তু—

তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা প্রকাশের হৃদয় স্পর্শ করিল।

তার মনে পড়িল বাল্যের বহু স্মৃতি। প্রকাশের মার শরীর ভাল না থাকায় তার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল দাস দাসীর উপর। কিন্তু তাদের পরিচর্যায় উদয়রামের মন উঠিত না। সে নিজের হাতে স্নান করাইয়া তার চুল আঁচড়াইত, সিঁথি কাটিয়া দিত।

একবার উদয়রামের গ্রাম হইতে কয়েকটি যুবক কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়া একবেলার জন্য হলধরবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লয়। তারা খাইতে বসিলে উদয়রাম ভুল করিয়া তাদের দু'জনকে প্রকাশ বলিয়া ডাকে। ভুল করিয়াও সে ভাবিত প্রকাশের কথা।

প্রকাশ চাহিয়া দেখিল উদয়রামের চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে উদয়রাম বলিল, দেবেনবাবু অত্যন্ত ভালমানুষ লোক। তাঁর সম্ভ্রম যাতে বজায় থাকে তার প্রতি তোমার লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রকাশ বলিল, তিনি ভাল লোক তা জানি।

উদয়রাম বলিল, তুমি তাঁর মেয়ে প্রতিমাকে ভালবাস, তোমার দেখা উচিত যাতে তিনি অসন্তুষ্ট না হ'ন।

প্রকাশ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে তোমায়?

(শেষাংশ ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরিদপুরের পল্লীসম্পদ

শ্রীউপেন্দ্রকুমার নন্দী

বাঙলা সাহিত্যে পল্লী কবিদের দান এক অপূর্ব সম্পদ। পূর্বে বাঙলার পল্লীগুলির শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কবি সম্প্রদায় নানা প্রকার ছড়া গান ইত্যাদি পৌরাণিক ও সাময়িক ইতিহাস ও ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রচনা করিত। আজিকার অগ্রগামী সাহিত্যক্ষেত্রেও এর স্থান নির্দেশিত হইয়াছে। কারণ মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে থাকে আনন্দ। মানুষ সুন্দরের পূজারী। সুন্দরের পূজায় শিবের অনাবিল আরাধনা যখন পূত ও সত্য হইয়া উঠে তখনই তাহার মনের প্রতিটি যন্ত্রে সে ভাবের প্রকাশ কথা ধ্বনিত হইয়া উঠে আর মানুষ তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি করে তাহা প্রকৃতই আনন্দদায়ক হয়। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পল্লী কবিদের অমিল ছন্দবিহীন কবিতায় আধুনিকদের মনের খোরাকের অভাব হয়ত হইবে কিন্তু যাহারা প্রকৃত সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক তাহাদের নিকট ঐ সমস্ত শ্রীহীন কবিতার আদর আজও আছে—শত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল।

পল্লী কবিদের ঐ সমস্ত রচনা রাখালগণেরও কর্মক্লান্ত কৃষকগণের মুখে বড়ই মধুর হইয়া উঠিত। হিন্দু বৈরাগী ও মুসলমান ফকির সবাই ঐ সমস্ত ছড়া বা গান গৃহস্থদিগকে শুনাইয়া অন্নসংস্থান করিত। পল্লীবাসী কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া ঐরূপ কবি সম্প্রদায় আনন্দিত হইত। সুধীসমাজ এখনও এই সব লুপ্ত সম্পদ উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার রাস্তা ঘাটে চানাচুরওয়ালাদের উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে রচিত উত্তর প্রত্যুত্তর যেমন আনন্দদায়ক, বাঙলার পল্লীতে দুজন গ্রাম্য কবিদের তর্কও ঠিক সেইরূপ সুন্দর। তর্জাগান বা কবির লড়াই নামে বাঙলা দেশে ইহা বিশেষ খ্যাত।

প্রাচীন বাঙলা দেশের অবস্থা আধুনিক বাঙলা দেশের মত ছিল না। তখন গ্রামে গ্রামে ঐশ্বর্য ছিল, চাষীদের গোলা ভরা ধান, পুকুরে মাছ ও মনে শান্তি ছিল। বার মাসে তের পার্বণের সুযোগ লইয়া গ্রাম্য কবিরা নানা রকমের গান ও ছড়া তৈরী করিয়া গৃহস্থদের আনন্দিত করিত। পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ, ধান্য লক্ষ্মীর পূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার বর্ণনা প্রভৃতি রচনা করিয়া পল্লীর সমস্ত গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান করিয়া অর্থ উপার্জন করিত। এইভাবে বেকার থাকা হইতে তাহারা নিজেদের রক্ষা করিত।

পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলিতে পল্লী সম্পদের আধিক্য বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এখনও গ্রামে গ্রামে কত শত শত অনামা কবিদের রচনা সগৌরবে গীত হইতেছে; কি মুসলমান কি হিন্দু প্রত্যেকেই ঐ সব গানের সমাদর করিত। স্বদেশে এবং বিদেশে এরূপ গানের প্রচলনের জন্য গ্রাম্য কবিরা দেশ দেশান্তরে ঐ বৃত্তিকেই জীবন ধারণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত গানের মধ্যে যে শুধু দেব দেবীর বন্দনাই ছিল তাহা নহে, উহাতে গৃহস্থের দুঃখ শোকের কথা, গ্রামবাসীর উদারতার কথা প্রভৃতি নানা প্রকার সত্য ঘটনার উল্লেখও থাকিত। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সুরও সুন্দরভাবে ধ্বনিত হইত।

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে এখনও এ সমস্ত নাম গোত্রবিহীন কবিদের কবিত্ব, গান ও ছড়ার প্রচলন আছে। ফরিদপুরের এক শ্রেণীর মুসলমান আছে যাহারা গ্রাম গ্রামান্তরে যাইয়া হিন্দুদের দেব দেবীর কীর্তিকথা গাহিয়া রোজগার করে। নিম্নে তাহাদের গীত একটি গানের উল্লেখ করিলাম।

"ভক্তের ভগবান ঠাকুর অভক্তের বাম
ভক্তিভরে তরায় তিনি হিন্দু মুসলমান।"

এই দুই ছত্রে এক ঈশ্বরবাদের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।

"কপালে তিলকের ফোঁটা, গলে জপের মালা
সর্ব্ব অঙ্গে ভস্মমাখা করে ঝোলে ঝোলা
মুখে বলে রাধাকৃষ্ণ করে জপে তুলসী
লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে যাবো মোরা কাশী।"

হিন্দুদের সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে পুরী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। পুরীকে লোকে শ্রীক্ষেত্র বলিয়া থাকে। পুরীর বাজারে জাতিভেদ নাই, ভাত (অন্নপ্রসাদ) বিক্রয় হয়—এই অপূর্ব ব্যবস্থাকে ফকির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে—

"আগে যাইয়া আমরা দেখুবো পুরীর জগন্নাথ
অপূর্ব্ব তামাসা তার বাজারে বিকায় (বিক্রয় হয়)
ভাত।"

তারপর মুসলমান ফকিরের প্রতি হিন্দুদের ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া "কবীরের" মঠের পান্তা প্রসাদের কথা বলিতেছে। পুরীতে কবীরের একটি মঠ আছে সেখানে প্রসাদ হিসাবে পান্তা ভাত ও ইহার জল দেওয়া হয়—সমস্ত হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ আনন্দে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"তার সাক্ষী আছে যদি শ্রীক্ষেত্তরে যাও
কবীরের হাতের পান্ত কি কারণে খাও—
কবীর গাজি জোলার ছেলে............।"

ইত্যাদি।

এইরূপ নানা প্রকার ছড়ার মধ্যে তদানীন্তন গ্রাম্য আদর্শ ফুটিয়া উঠে।

বাঙলার অনুন্নত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ ছড়ার বিশেষ প্রচলন আজও আছে। ছেলে ভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া প্রভৃতি সত্যই শুনিতে সুন্দর লাগে। পূর্ব বঙ্গীয় মহিলাদের মধ্যে এইরূপ ছড়ার সমাদর খুবই বেশী।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট মহাশয় পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিং জিলার গ্রাম্য-গাথা ছড়া গীতিকা সংগ্রহ করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"আদি যুগের সাহিত্যে অনেক জঞ্জাল আছে, কারণ তাহা তো পণ্ডিতেরা লিখেন নাই। অল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরা মুখেমুখেই ছড়া তৈরী করিত।...এই সকল কাব্যের ছন্দে মেঠো সুরের সেই সকল গান মনে পড়ে যাহা বাঙলার ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটার সময়, চাষার সানন্দ কণ্ঠ

হইতে এখনও উত্থিত হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে। এ সাহিত্য খাঁটি বাঙলার সাহিত্য, দেশের নিজস্ব, বাঙালীর মর্মকথা।" এ কথা প্রকৃতই সত্য। দেশ পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ২৩ সংখ্যায় শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত "দক্ষিণ বঙ্গের ধলাই গান ও বাল গোপালের ছড়া" নামক পল্লী কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সত্যিই বিশেষ আনন্দ আমরা পাইয়া থাকি এবং সুদূর অতীতেও যে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে সাহিত্যের ও কাব্যের কদর ছিল ইহা মনে করিয়া আমরা গর্ব অনুভব করি।

পূর্ব বঙ্গের ঘুমপাড়ানি ও ছেলে ভুলানো দুইটি ছড়া উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১)

উলু উলু মাদারের ফুল
ঝাইকা উড়ে টিয়া—(টিয়ে পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে)
ধান কুটিতে যাইয়া শেষে
হইল আমার বিয়া
মা কাঁদেন, বাবা কাঁদেন,
সকল হইল পর,
বিদ্যাপতি লিখে দিলো পদ্মাবতীর ঘর।

(২)

অন্যটি—

কি কর চাঁদের মা দুয়ারে বসিয়া
ছেলে তোমার মার খায় দরবারে বসিয়া
ছোট বউ করল বেগুন চুরি বড় বউ চুরি করলে নুন।

আর কি যাবি সাধন পাড়ায়—
সাধন পাড়া কত দূর
বাড়ীর বাইরে চাঁপা ফুল
চাপা ফুলের গন্ধে
বুড়ী তোর সুতা নিল নন্দে॥

এই সব পল্লীসম্পদ উদ্ধারের ব্যাপক আন্দোলন প্রয়োজন, কারণ প্রাচীন বাঙলা দেশের গৌরবের কথায় আমরা এখনো গৌরবান্বিত বলিয়া নিজেদের মনে করিব। গ্রাম্য কবিদের কাব্য প্রতিভার, তাহাদের মানসিক উন্নতির, দেশের ও দশের সর্বজনীন সংবাদ—এই সব গানগুলি হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে এই সব পল্লী সাহিত্যের স্থান অনেক উচ্চে।

টিকি বনাম প্রেম

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

ওকথা বলতে হয় না। ধরণ ধারণেই লোকে বুঝতে পারে।

প্রকাশের মনে হইল কি লজ্জার কথা। হয়ত' আরও অনেকের কাছেই সে ধরা পড়িয়াছে।

উদয়রাম কহিল, তোমার দাদাবাবুকে আমি চিনি আজ বিশ বছর। তিনি যদি জানতে পারেন যে, দেবেনবাবু আমার কাছ থেকে তাঁর বইগুলো নিয়েছেন তাহলে এমনই চটে যাবেন যে, প্রতিমার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব পর্যন্ত কানে তুলবেন না।

প্রকাশ বলিল, কিন্তু দেবেনবাবু সরল বিশ্বাসে কিনেছেন।

তোমার মাতামহ ছিলেন হাকিম। হাকিমরা অত তলিয়ে দেখেন না। দেবেনবাবু অন্য কারও কাছ থেকে পুঁথিগুলি কিনলে সরল বিশ্বাসের কথা তবু উঠতে পারত। কিন্তু আমি এর মধ্যে আছি জানলে তোমার দাদাবাবু মনে করবেন দেবেনবাবুই ষড়যন্ত্র করে এসব করিয়েছেন।

কথাগুলি প্রকাশের মনে লাগিল। সে বলিল, এখন উপায় ?

উদয়রাম বলিল, ভেবে দেখা যাক্।

দাদাবাবু কি ঘুমিয়েছেন ?

হ্যাঁ।

প্রকাশ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। যাক আজ রাত্রে অন্তত তাঁর সামনে দাঁড়াইয়া তাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না।

রাত্রে অনেকগুলি কথাই তার মাথার মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল।

দেবেনবাবু পুঁথিগুলি কোথায় পাইলেন সে সম্বন্ধে তাকে একটা মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ত তাহা সমর্থন করিবেন না। সমর্থন করিলেও হলধর তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন।

তারপর দাক্ষায়ণীর কথা। আজই তিনি প্রতিমাকে তার সামনে আসিতে দেন নাই। পুঁথির ব্যাপার লইয়া তাঁর স্বামী ও হলধরবাবুর মধ্যে গোলমাল বাধিয়াছে জানিতে পারিলে দাক্ষায়ণী তার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিবেন।

সর্বোপরি প্রতিমা। তার পিতার কাজের উপর গোয়েন্দাগিরি সে কখনও ক্ষমা করিবে না।

ব্যাপার ক্রমেই এত জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, ভাবিলে মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব। এ অবস্থায় একমাত্র নির্ভর ভবিষ্যতের উপর। কালস্রোতে ঘটনার ধারা হয়ত' আবার অনুকূল পথে যাইবে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া সেই রাত্রে প্রকাশ আর ঘুমাইতে পারিল না।

প্রাতের দিকে তন্দ্রার ঘোরে দেখিল প্রতিমা অতনুর সঙ্গে মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

প্রকাশ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল তারপর কুঁজা হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিল, আঃ।

(ক্রমশ)

বর্ষারাতের কাব্য

(গল্প)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু মালতী ইতিমধ্যেই ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া চুপ করিয়া দরজার ধারে বসিয়াছিল। তাহার কারণ সকাল হইতে সেই যে বৃষ্টি নামিয়াছে, সে বৃষ্টি এখনও থামে নাই; সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই একটা ঝাপ্‌সা অন্ধকার শহরের বুকে নামিয়া আসিয়াছে। গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে প্রায় এক হাঁটু, পথিকের পথ চলাচল একরকম বন্ধই, বিশেষ প্রয়োজন না পড়িলে এ অবস্থায় কেহ বাহির হয় না। কিন্তু তবু মালতী যেন কিসের আশায় সেই গলির দিকেই চাহিয়া বসিয়াছিল।

মালতী বিধবা, তাহার বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হইবে কিংবা আরও একটু বেশী। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বৈধব্যের করুণ বৈরাগ্য বিরাজ করিতেছে, কোথাও কোন অলঙ্কারের চিহ্ন পর্যন্ত নাই, গায়ের রঙ্ তাহার উজ্জ্বল শ্যাম, মুখ-চোখের মধ্যেও তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই; কিন্তু তাহার দেহখানি ঘিরিয়া এমন একটি সুকুমার-শ্রী বিরাজিত যে, তাহার দিকে চাহিলেই যেন পুলক মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

বহুক্ষণ সেই একভাবে বসিয়া থাকিবার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মালতী উঠিয়া দাঁড়াইল, কবাট বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময়ে গলির মোড়ে একটা মোটর থামিবার শব্দ পাইয়া সে যেন চমকিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছ হইতে সরিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

মালতীর আশা বা আশঙ্কা যে মিথ্যা নয় তাহা একটু পরেই বোঝা গেল। এক ভদ্রলোক সেই জলের মধ্যেই ছাতি মাথায় দিয়া তাহারই ঘরের রকে আসিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তকাল বাহিরে একটু ইতস্তত করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, মালতী!

মালতী মাথার উপর কাপড়টা টানিয়া দিয়া কহিল, আসুন।

ভদ্রলোক ছাতিটা বাহিরে রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। মোটরে আসিলেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ইতিমধ্যেই ভিজিয়া গিয়াছে, মূল্যবান সিল্কের পাঞ্জাবী যেন ন্যাতার মত গায়ে লেপিয়া গিয়াছে, দেশী কাপড়ের কোঁচা রাস্তার কাদাজলে গৈরিক বর্ণ ধারণ করিয়াছে আর দামী সোয়েডের জুতার যে কি অবস্থা তাহা বর্ণনা না করাই ভাল।

মালতী নিঃশব্দে আলনা হইতে একটা কাচা তোয়ালে আনিয়া দিয়া কহিল, জলটা যতটা পারেন মুছে ফেলুন। ভিজে জুতোটাও ছেড়ে ফেলুন—

ভদ্রলোক তোয়ালে হাতে করিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছ কিন্তু এতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

মালতী নতমুখে জবাব দিল, ওসব কথা আর কেন তুলছেন মিছামিছি?......মাথা-গা মুছে নিন্—জলে ভিজলেই আপনার শরীর খারাপ হয়!

ভদ্রলোক আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, চারখানা চিঠি লিখলুম তার জবাব দিলে না, খোঁজ নিয়ে জানলুম যে তোমার দাদার বাড়ীতেও যাও নি, কি কষ্টে যে এ ঠিকানা খুঁজে বার করেছি তা আমিই জানি।

মালতী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, জবাব দিল না।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, ভুল সকলেরই হয় মালতী, আমিও ত মানুষ। কিন্তু তুমি কষ্টও তার জন্য কম দাওনি ত! এততেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

মালতী কহিল, কিন্তু আপনার অসুখ করবে যে দেবেনবাবু!

দেবেনবাবু কহিলেন, তা করুক—আর সেও ত তোমারি হাতে, তোমাকে না নিয়ে আর বাড়ী ফিরব না আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

মালতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, সে হবে, কিন্তু দোহাই আপনার আপনি গা-মাথা মুছুন! নইলে আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পারছি না।

দেবেনবাবু আরও দুই পা তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, তুমি চল তাহ'লে, আমি একেবারে বাড়ীতে ফিরে কাপড় ছাড়ব!

বিস্ময়-ব্যাকুলকণ্ঠে মালতী কহিল, সে কি, এক্ষুণি? এইভাবে?

দৃঢ়কণ্ঠে দেবেনবাবু জবাব দিলেন, বলেছি ত, তা নইলে আমিও আর ফিরব না! তোমাকে হারিয়ে অবধি আমার যে কি দুর্দ্দশায় দিন কাট্‌ছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না মালতী!

মুহূর্ত্ত দুই মালতী কেমন যেন বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, চলুন, যাচ্ছি! শুধু একবার বাড়ীওয়ালাকে বলে আসি—

দেবেনবাবু ছাতাটা তুলিয়া লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, মিনিট দুই পরে মালতী গায়ে একটা চাদর দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দুইজনে মোটরে আসিয়া বসিতেই সোফেয়ার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই প্রবল বারিধারার মধ্যে গাড়ী ছুটিয়া চলিল হু-হু করিয়া—গাড়ীর দুইটি মাত্র আরোহী কিন্তু নির্ব্বাক্। সমস্ত পথটা দুজনেই এম্‌নি নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ একটি শব্দ পর্যন্ত করিল না।

এ-পথ সে-পথ ঘুরিয়া অবশেষে গাড়ী বালিগঞ্জের একটা বিরাট বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবেনবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া কহিলেন, এস মালতী—

মালতী তবুও যেন একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবেনবাবুরই পিছনে পিছনে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই মলিনা ছুটিয়া আসিল, হ্যাঁগা পেলে কি মালতীকে?

দেবেনবাবু কৌতুকপূর্ণস্বরে কহিলেন, চেয়ে দেখ না!

মলিনা কহিল, আঃ বাঁচলুম। সে উড়ে ঠাকুরটাও এসেছে

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জিপসিদের বার্ষিক উৎসব

শ্রীগুণময় আচার্য

খৃষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, সেই প্রাচীনকালে প্যালেস্টাইনে যখন খৃষ্টভক্তগণের উপর অশেষ নির্যাতন চলিতে থাকে, সেই সময়ে নিপীড়ন এড়াইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য ভার্জিন মেরীর ভগ্নী—মেরী সালোমে (Marie Salome), য়্যাপস্‌ল্ জেম্‌স্ ও জনের মাতা—মেরী জ্যাকবে (Marie Jacobe), এবং খৃষ্টের অন্যান্য বন্ধুগণ সপরিবারে

সেইণ্ট সারা মূর্তি—প্যালেস্টাইন হইতে পলায়নের সময় যীশুর দুই মাসীমাতা (সেইণ্ট মেরীজ) মিশরীয় পরিচারিকা সারাকে সঙ্গে আনয়ন করেন—সেই 'সারা' মূর্তিই এখন জিপসিদের 'পেট্রন সেইণ্ট'রূপে পূজিত হয়।

প্যালেস্টাইন হইতে পলায়ন করে। আরও বর্ণিত আছে যে, দৈব কৃপায় অতি রহস্যজনকভাবে এই সকল পলাতক খৃষ্টানুরক্তগণ প্রোভেন্স তীরে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেই স্থানেই তাহারা নিরাপদে বসবাস করিতে থাকে এবং খৃষ্ট প্রবর্তিত ধর্মাচরণ অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এই দুই মেরীর সহিত একটি মিশর দেশীয় পরিচারিকাও গমন করে, নাম তাহার সারা ([illegible])। ক্রমশঃ তাহাদের মৃত্যু হইলে ঐ মেরী এবং তাহাদের নারীভৃত্য সারার মৃতদেহ রোন্ নদীর সাগর-মিলন সঙ্গমস্থ কোনও গীর্জায় সমাহিত করা হয়।

বহুকাল পরে, ১৪৪৮ সালে প্রোভেন্সের কাউণ্ট, রেনি অফ্ এঞ্জো এই পবিত্র সমাধিস্থান আবিষ্কার করিয়া বহু অর্থব্যয়ে জাঁকজমকের সহিত নব সমাধি প্রতীক নির্মাণ করেন। সেই সময় হইতেই এই স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়। আজিও বৎসরে দুইবার মে ও অক্টোবর মাসে এই তিন মহীয়সী নারীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় শোভাযাত্রা এবং উৎসবাদি দ্বারা।

দক্ষিণ-ফরাসী দেশে ভূমধ্যসাগরের তীরে (মার্সিলের বহু পশ্চিমে) যেখানে রোন নদীর একটি শাখা সাগরে পতিত হইয়াছে—বাস্তবে রোনের দুই নদীমুখের মধ্যবর্তী সাগর তীরের স্থান—কামার্গ নামে পরিচিত। এই দুই নদীমুখের ভিতর যেটি পশ্চিমে স্থিত উহারই সাগর-সঙ্গম স্থানে লে-সেইণ্টেস্-মেরীজ-ডি-লা-মার নামক পল্লী অবস্থিত। এই পল্লীর গীর্জা-প্রাঙ্গণে পূর্বোক্ত পবিত্র সমাধি তিনটি অবস্থিত। আর এই স্থানেই জিপ্‌সিগণ বৎসরে দুইবার তাহাদের পৃষ্ঠপোষক অভিভাবক পেট্রন্ সেণ্টস্ মেরীজ ও সারার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া থাকে।

সমগ্র কামার্গ অঞ্চলই লবণাক্ত—এইজন্য সকল স্থানেই মৃত্তিকা শ্বেতবর্ণ। মনুষ্যবাসের পক্ষে নানা অসুবিধাপূর্ণ হইলেও এখানে বিচিত্র পশুপাখীর বসবাস দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া অতি অদ্ভুত নানাবিধ পাখী এই কামার্গ অঞ্চলে সদাসর্বদা আনাগোনা করে—উহাদের ভিতর ফ্লামিঙ্গো, আইবিস্ প্রভৃতি বিচিত্র পাখীই প্রধান। আবার যে সকল পাখী হাওয়া বদলের সফরে শীত এড়াইতে অপেক্ষাকৃত গরম প্রদেশ খুঁজিয়া বেড়ায়, উহাদের অনেক দল একবার এই জনবিরল প্রদেশে আসিয়া হাজির হইলে আর এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যায় না। কারণ এখানে তাহাদের আহার্যের অভাব থাকে না, মানুষের বসবাস কম থাকায় বিপদের সম্ভাবনাও প্রায় থাকে না। দলে দলে পিপীলিকা ও মশক এদেশের জলার ধারে অগণিত সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে, কাজেই পাখীদের পক্ষে ইহা অমরাবতী তুল্য।

তথাপি জলা ও কর্দমাক্ত স্থান বাদ দিলে যে ডাঙা রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন দেশ অপেক্ষা কম উর্বর নহে—এখানে যেমন গমাদি উৎপন্ন হয়, তেমনই ফরাসী দেশের অন্যান্য অংশের মত আঙুরও উৎপন্ন হয় প্রচুর। আবার লম্বা ঘাসে ঢাকা প্রান্তরও রহিয়াছে বিস্তৃত, যেখানে বন্য অশ্বাদি ও কালো ষাঁড় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। এই স্থানে কোথাও ৫।৭খানা কুটিরগুচ্ছে, কোথাও একক বাস করে এই দেশবাসী, যাহাদের নাম গার্ডিয়ানস্ (Gardians)। উহারা বন্য অশ্ব ধরিয়া পোষ মানায় ও তাহাতে চড়িয়া যাতায়াত করে। তাহাদের প্রধান অবলম্বন গোচারণ ও কৃষি। তবে ইহার পরেই যে পেশা জনপ্রিয়, তাহা হইল মৎস্য ধরা ও বিক্রয়। দেশে রাস্তা-ঘাটের অভাব এবং ইতস্তত ছড়ান জলা, তাই অশ্বই তাহাদের একমাত্র নিরাপদ বাহন। কিন্তু ইহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী একেবারে

সেই আদিম যুগীয়। পাশ্চাত্যের এমন সভ্যতার অগ্রগতির দিনেও যে ইহারা সভ্যতার স্পর্শের বাহিরে রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য।

পূর্বে 'লে-সেইণ্টস-মেরীজ'য়ের যে গীর্জার কথা বলা হইয়াছে, উহাকে মধ্য যুগীয় কেল্লা বলাও চলে। কারণ সেকালে সারাসেন জলদস্যুদের অত্যাচার এই অঞ্চলে ছিল ভয়ানক। আত্মরক্ষার জন্য ঐ গীর্জার চারিদিক ঘিরিয়াই ছিল বস্তি। বাহিরের আক্রমণের সময় সকলে যাইয়া প্রবেশ করিত ঐ দুর্গ-তুল্য গীর্জার অভ্যন্তরে এবং উহার বহিঃপ্রাচীরের অংগে যে ছিদ্র রহিয়াছে (আপাতদৃষ্টিতে উহা কামান বসাইবার জন্য মনে হইলেও) তাহার ভিতর দিয়া প্রস্তর-খণ্ড কিম্বা ফুটন্ত তেল বর্ষণ করিত শত্রুর শিরে।

উৎসবের সময় অবশ্য এই জনবিরল পল্লী তেমন নিরালা নীরব থাকে না। যদিও ষাঁড় ও ঘোড়াটানা গাড়ী এখানকার রেওয়াজ হইলেও উৎসবকালে মোটর গাড়ীও দেখা যায় বহু। নানা প্রকার অস্থায়ী দোকান-পসার স্থাপন করা হয় গীর্জার চারিদিক বেড়িয়া। আর যে দুই-একটি সরাইখানা রহিয়াছে, আগন্তুকের অস্থায়ী বাসের জন্য, তাহাতে সমাগত তীর্থ-যাত্রীদের একাংশেরও স্থান-সঙ্কুলান হয় না। এই জন্যও পল্লীবাসীরা অস্থায়ী কুটির নির্মাণ করিয়া রাখে ভাড়া খাটাইয়া দুই পয়সা উপার্জন করিবার আশায়।

কিন্তু তীর্থ যাত্রীদের অধিকাংশই জিপ্‌সি, তাহারা ভাড়া-টিয়া কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করে না—কারণ, তাহারা যাযাবর এবং নিজেদের ক্যারাভ্যান্‌ কিম্বা তাঁবু তাহারা সংগে লইয়া আসে। ক্যারাভ্যান্‌ হইল শকট, যাহাতে তাহাদের ঘর-বাড়ী; এই শকটেই তাহারা বাস করে এবং এই শকটে ঘোড়া অথবা গাধা বা অশ্বতর জুড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইউরোপের সকল অঞ্চল হইতেই জিপ্‌সিগণ এই উৎসব উপলক্ষে কামার্গে আগমন করে।

উৎসবের প্রধানত দুইটি অংগ। একটি শোভাযাত্রা, অপরটি পূর্বোক্ত তিন পেট্রন্‌ সেণ্টের নিকট উপাসনা। জিপ্‌সিগণ বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানায় সেণ্ট সারার নিকট, কারণ তাহাকেই তাহারা তাহাদের সর্বপ্রকারে পৃষ্ঠপোষক এবং পূজার্হ মনে করিয়া থাকে।

তথাপি কিন্তু খৃষ্টীয় চার্চ 'সেণ্ট সারা'কে কখনও স্বীকার করে নাই। কিন্তু জিপ্‌সিগণের ভিতর সেণ্ট সারার অনেক অলৌকিক কাহিনী বংশপরম্পরা মুখে মুখে প্রচারিত। খৃষ্টের দুই মাসী, মেরী সালোমে ও মেরী জ্যাকবের ভৃত্য বলিয়া এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া সেণ্ট সারা সকল জিপ্‌সিদের উপাস্য দেবতা।

জিপ্‌সিগণ তাহাদের ক্যারাভ্যান্‌ পাশাপাশি সাজাইয়া একেবারে পল্লী গড়িয়া তোলে—তাহার ভিতর আবার কদাকার অতি পুরাতন মোটর গাড়ীও স্থান পাইয়াছে। জিপ্‌সি-রাজ এমানুয়েল আসে একখানি সুন্দর মোটর-কারে—সে আড্ডা গাড়ে স্থানীয় কাফেতে। সেখানে সকল জিপ্‌সিই যাইয়া রাজার নিকট অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া মর্যাদা দান করে। রাজা কিন্তু নিজেকে 'রাজা' বলিয়া প্রচার করে না—বলে সে সর্দার। কারণ উৎসব উপলক্ষে তাহার কর্তব্য দ্বিবিধ—স্থানীয় শান্তিরক্ষক পুলিশের কাজ এবং নিজ দলের জীবন-মরণের বিচার। রাজার মহাসম্মানের এই দিন। প্রজারা আসিয়া তাহাদের অভিযোগ জানায়, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা বলে। রাজা তাহাদের যথাযোগ্য বিচার করে—হিত উপদেশ দান করে। নানা দেশাগত জিপ্‌সি বাদ্যকরগণ তাহার নিকট নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী নৃত্য করে রাজার সম্মুখে। জাদুকরগণ নানা প্রকার আশ্চর্য কৌশলে রাজাকেও চমৎকৃত করে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে দুই সেইণ্ট মেরীজ মূর্তি ও সেইণ্ট সারা মূর্তিটি জিপসিগণ স্কন্ধে বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহ সাগরতীরে লইয়া যায়, তথায় ক্ষুদ্র ছাদহীন নৌকায় তোলা হয়—প্যালেস্টাইন হইতে অত্যাচারের ভয়ে পলায়নের ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার্থে।

আগেই বলিয়াছি গীর্জাটি দুর্গের আকারে নির্মিত। মধ্যস্থলের কক্ষটি দ্বিতল। উপর তলার কক্ষটি আবার অতি-শয় উচ্চ—উহার ছাদ গম্বুজে পরিণত। সেই উচ্চ গম্বুজের ছাদসহ ঝুলান থাকে দুই মেরী ভগ্নীর ধাতুজ মূর্তি। দ্বিতলের মেঝেতে সকল তীর্থযাত্রী জিপসি সমবেত হইয়া প্রার্থনা করে। অগণিত দীপাধারে দীপ প্রজ্বলিত হয়। তৎপর উচ্চ চীৎকার হয়—'সেইণ্ট মেরীদ্বয়ের জয়'। তখন গম্বুজের নিম্ন হইতে ধীরে ধীরে মূর্তিদ্বয় নামাইয়া আনা হয়। সকলে হাত উঁচু করিয়া ধরে—যাহার হাত সর্বাগ্রে এই পবিত্র সমাধি স্পর্শ করিবে, তাহার পুণ্য হইবে বেশী। কফিন মেঝেতে আসিয়া পৌঁছিলে সকলে ছুটিয়া গিয়া উহা স্পর্শ করে—চুম্বন করে। সারা রাত্রি ধরিয়া চলে ধর্মানুষ্ঠান—প্রার্থনা—জয়গান।

ইহার পর তীর্থযাত্রীরা আগমন করে নিম্ন কক্ষে। সেখানে সেণ্ট সারার সমাধি। দুইটি সমাধি পাশাপাশি, একটি

খৃষ্টীয় প্রথায়, একটি মিশরীয় প্রথায়। সেখানে ফুলে ফুলে একেবারে সমগ্র সমাধি আবৃত। ভক্তদের প্রদত্ত খাদ্য, প্রজ্বলিত বাতি চারিদিকে সজ্জিত। জিপসি নর-নারী এখানে সমাধির সোপানে সোপানে পা গুটাইয়া শুইয়া পড়ে—নারীগণ কেহ-বা মেঝের রাগের উপর শায়িত হয়। তরুণেরা এক পাশের বেঞ্চিতে বসিয়া ধূমপান করে, ইহাতে অন্যায় কিছু তাহারা মনে করে না।

পরদিন প্রত্যুষে আরম্ভ হয় শোভাযাত্রা। কামার্গবাসী গার্ডিয়ানগণ তাহাদের শাদা ঘোড়ায় চড়িয়া এবং হাতে লম্বা লাগি লইয়া যোগদান করে। এই লাগি বা দণ্ড দ্বারা তাহারা সেইণ্ট মেরীদের অভিবাদন করে। গীর্জাদ্বারে জিপসিরাজ এমানুয়েল দলবল সহ অপেক্ষা করে। প্রথম বাহির হয় কৃশ হস্তে 'কয়ার' বালকগণ, তাহার পশ্চাতে জিপসি দলের স্কন্ধে বাহিত হয় পর পর সেইণ্ট তিনটির বিগ্রহমূর্তি। গীর্জা হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা গমন করে। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাদহীন নৌকায় সেইণ্ট মূর্তি তোলা হয়। সেখানে অপর এক নৌকায় আর্চবিশপ অফ্ এয়ি—দেবতার আশিস্ আবাহন করে—আশীর্বাদ করে সাগরকে—আশীর্বাদ করে জিপসিদের—আশীর্বাদ করে কামার্গবাসীদের।

তৎপর আবার সেইণ্ট মূর্তি শোভাযাত্রা করিয়া গীর্জায় ফিরাইয়া নেওয়া হয়।

শোভাযাত্রা করিয়া সাগরে কেন নেওয়া হয়, ক্ষুদ্র ডিঙিতেই বা কেন তোলা হয়,—তাহার কারণ আর কিছুই নয়। পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, প্যালেস্টাইন হইতে পলায়নের সময় মেরীদ্বয় এবং আর যাহারা সঙ্গে ছিল সকলে মিলিয় কয়খানা খোলা ছোট নৌকায় সাগরে পাড়ি দেয় এবং দৈবানুগ্রহে অতি রহস্যজনকভাবেই ভীষণ ভূমধ্যসাগর বাহিয়া এই তীরে আশ্রয় লাভ করে। সেইণ্টদের সেই অলৌকিক রক্ষার কাহিনী জনচিত্তে চিরজাগরূক রাখিবার জন্যই সাগরের বক্ষে নৌকা-রোহণ অনুষ্ঠান আচরিত হয়।

জাগরণ

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না। আদিত্যও আবার প্রশ্ন করল, "ও'র এক মেয়ে তোমার সঙ্গে পড়ে না?—স্বর্ণলতা—" হ্যাঁ নন্দরাণী চেনে। আদিত্য এবার উৎসাহের সঙ্গে বলল, "ওইখানেই ত' মেজ-দার বিয়ে।" নন্দরাণী এতক্ষণে প্রশ্ন-গুলোর অর্থ খুঁজে পেল। বলল, "স্বর্ণলতার সঙ্গেই বিয়ে নাকি?" উত্তরে আদিত্য সলজ্জভাবে হাসল—"না, বিয়ে ও'র দিদির সঙ্গে—কল্পলতা, খুব সুন্দর দেখতে—ও'দের বাড়ীর সকলেই খুব সুন্দর—"

নন্দরাণী বললে "ও"—

আদিত্য আবার বসবার ভাঙ্গটা বদলাল, "এইজন্যেই ত তোমার কাছে এসেছিলাম..."

নন্দরাণী আবার বললে 'ও'। তারপর উঠে চলে গেল। আর আদিত্য দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল কেন নন্দরাণী উঠে গেল, স্বর্ণলতার কথা যে তার অনেক জিগ্যেস করার ছিল।

বর্ষারাতের কাব্য

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

পালিয়েছে, কি দুর্ভাবনা যে হয়েছিল তা বলবার কথা নয়। এতগুলো লোক থায় কি? আচ্ছা, তাও বলি মালতী, জানই ত যে আমি একমিনিট আগুন তাতে থেতে পারি না, যেনে শুনে এমন কষ্ট দেওয়া কি ঠিক হয়েছে তোমার।

দেবেনবাবু কহিলেন, তবু ভাগ্যি ও আর কোথাও কাজে যায়নি, তাহলে যে কি করতুম, ভাবতেও আমার গা [illegible]।

দেবেনবাবুর স্ত্রী মলিনা জবাব দিল, আমি ঠিকানা পেলে গিয়ে জোর করে ধরে আনতুম, তারা আমার কি করত?

মালতী লজ্জিত হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।*

---

*O. Henry হইতে।

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(২২)

ভারতের প্রায় সকল স্বাস্থ্যকর স্থানই একে একে পরীক্ষা করিয়া অমর দেখিল প্রভার দেহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। ছয় মাসের অধিককাল নানা স্থানে বাস করিয়াও অসুখ যখন বাড়িয়াই চলিল, প্রভা তখন নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া—অমরকে কহিল, "বৃথাই তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করলে। আমি আর বাঁচব না। আমায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে চল,—বাপ-মায়ের কোলের কাছে। তাঁদের সকলকে দেখতে দেখতে মরব, সেও আমার এক সান্ত্বনা। মৃত্যুই যার নিয়তি—জল-হাওয়া বদলালে তার কিছু হয় না গো। ওষুধে চিকিৎসায় মরণকে ফেরান যায় না।"

অমর নিজেও প্রভার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তার উপর পত্নীর অনুরোধে ইহারই কয়দিন পরে রুগ্না প্রভাকে লইয়া কলিকাতায় প্রভার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

প্রভার জীবন-প্রদীপের তৈলটুকু ফুরাইয়া আসিয়াছিল—সলিতাটুকু নিঃশেষ হইতে যেটুকু বাকী। তবুও নূতন করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হইল—এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী কোনটাই বাদ রহিল না।

অমর কলিকাতা পৌঁছিয়াই লীলার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু দেখা হয় নাই। কয়দিন পূর্বেই মায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া লীলা পিত্রালয়ে গিয়াছে। প্রভা কিন্তু লীলাকে দেখিবার জন্য বিশেষত অন্তিম মুহূর্তে লীলাকে কাছে পাইবার জন্য অনুরোধ জানাইল। অমর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া প্রভার ইচ্ছা জানাইয়া দিল।

ইহারই দুই দিন পরে প্রভা অমরকে নিকটে পাইয়া কহিল, "তুমি একবার বাড়ী যাও! বাবা-মাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার যেন আর বেশী সময় নেই। তাঁদের বংশের দুলালকে তাঁদের হাতে সঁপে দিয়ে আমার বৌ-জীবনের কর্তব্য শেষ করে যেতে চাই। ওকি অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? আমি বাঁচব এ আশা আজও রাখ? না গো, সত্যিই আমি বাঁচব না। মরতে আর আমার দুঃখ নেই। এত সেবা তোমার হাতের পেলাম। এরই স্মৃতি নিয়ে পরলোকেও আমার সুখে কাটবে। আজ বুঝতে পারছি,—অনেক তপস্যা করলে তবে তোমার মত স্বামী পাওয়া যায়। সে হিসেবে আমি কারুর চেয়ে কম ভাগ্যবতী নই। বেশত—তোমাকে পাবার আশা নিয়ে মরব, আবার নূতন জীবনে, নূতন দেহে তোমাকেই ত ফিরে পাব। সেই ভাল—এ দেহটাও তোমার সেবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তুমি যখন গীতার ঐ শ্লোকটি প'ড়ে আমায় শোনাও—ঐ যে ছেঁড়া কাপড় ছাড়ার মতই পুরান দেহ ছেড়ে আত্মা নূতন দেহ ধারণ করে, তখন কি আনন্দ যে আমার হয়—। মরণ দেখে একটুও ভয় করে না। কি আর কষ্ট হবে এই পরিবর্তনটুকুতে। কতই আর লাগবে। কতক্ষণই-বা সময়, পারব সইতে।"

তারপর একটু থামিয়া বলিল, "পরকালে তোমায় পাব বলেই একালে তোমায় কিন্তু একলা থাকতে বলছি নে। আবার বে' কর', চারুকে নিও। পরজন্মে না হয় দু'বোনেই তোমায় নেব।"

আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভা কহিল, "আজই তুমি রওনা হয়ে যাও! ভেবনা, দুই এক দিনেই আমি মরছি নে। তোমার পায়ে মাথা না রেখে আমি মরব না। যত হিংসুটে স্বভাবই আমার হ'ক—আমিও সতী নারী, এ গর্ব আমারও আছে। ও জায়গায় তোমার লীলাও আমায় ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। তুমি আমার কথা ব'লে বাবা-মাকে নিয়ে এস। লীলা ঠাকুরঝি যদি এর মধ্যে রওনা না হ'য়ে থাকে, তাকেও সঙ্গে করে আনবে।"

চারুকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া রাত্রির ট্রেনেই অমর বাড়ী রওনা হইল।

বাড়ী পৌঁছিয়া অমর প্রভার অন্তিম ইচ্ছা মায়ের নিকট প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, সে তাঁহাদের এবং লীলাকে লইতে আসিয়াছে। সমস্ত কথা শুনিয়া এবং পুত্রের ম্লান মূর্তির দিকে চাহিয়া জননী বুঝিলেন—ছেলে এখন বৌকে অনেকখানি আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু বৌ যে বাঁচে না!

জননীকে পিতার নিকট সমস্ত বলিবার জন্য বলিয়া অমর লীলাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরকে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিতে দেখিয়া লীলা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "হঠাৎ তুমি এখানে অমর-দা?"

প্রভার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। অমর কহিল, "তোর বৌদির অসুখ খুব বেড়ে গেছে। আর বাঁচবার আশা নেই। মৃত্যুকালে বাবা-মাকে আর তোকে দেখতে চেয়েছে। তাই আমি নিতে এসেছি। নরেনবাবু কিছু লেখেন নি তোকে?"

লীলা কহিল, "কাল তাঁর চিঠি পেয়েছি। বৌদির অসুখের কথা এবং আজই রওনা হ'তে লিখেছেন। আমিও যাব বলে তৈরী হচ্ছিলাম। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। বাবাকে আর যেতে হ'ল না। হাঁ অমর-দা তুমি অমন রোগা হয়ে গেছ কেন?"

অমর কহিল, "দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মানুষের শরীর ত ভাল থাকে না ভাই। ছমাসের ওপর ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাটল, কিছুই ত করতে পারলাম না।"

লীলা বলিল, "কেন পারলে না অমর-দা, তোমার পারাই যে সব চেয়ে বেশী উচিত ছিল!"

অমর কহিল, "ওষুধ-পত্তরে আর সেবা-শুশ্রূষায় মানুষের পরমায়ু কি বাড়িয়ে দিতে পারে রে পাগলী! জন্ম-মৃত্যুর বেলায় মানুষের চেষ্টা যে নিয়তির কাছে চিরদিন হার মেনেই এসেছে!"

"তবে কি সেদিন আমার কাছে মিথ্যে ক'রে লিখেছিলে,

যে, মানুষের তপস্যার বলে বিধাতার কলমও উল্টে যেতে পারে !"

অমরনাথ গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল। লীলা বলিল, "তোমার কোন্ কথাটি সত্যি অমরদা, সেদিনকার সেই চিঠির লেখাটা না আজকার এই অসহায় দুর্বলতা ?"

অমর কহিল, "দুটোই সত্যি। সংসারে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠও বেশী থাকে না—সাবিত্রী বেহুলাও বেশী জন্মে না। ওঁরা যদি অধিক সংখ্যায় জন্মাতেন, তবে বিশ্বের নিয়ম শৃঙ্খলা থাকত না। শক্তিশালীরাই শক্তির সাধনা করতে পারে। দুর্বলের পক্ষে তা অসাধ্য। গুরুর দেওয়া মন্ত্রে শিষ্যের সিদ্ধিলাভ হয় তার নিজের বিশ্বাসে এবং সাধনায়। শিষ্যের সিদ্ধিলাভ দেখেই তার গুরুও যে সিদ্ধ এ সিদ্ধান্ত সবক্ষেত্রে খাটে না। গুরু সিদ্ধ নন ব'লে তাঁর দেওয়া সাধনা প্রণালীও যে মিথ্যে এ কথা বলা চলে না। নিয়ম-প্রণালী জানা এক কথা আর সেই প্রণালীতে কাজ করা অন্য কথা। আমার পাথেয় নেই—চলবার শক্তি নেই—কোন্ পথে যেতে হবে তা হয়ত জানি। পাথেয় আর শক্তির অভাবে গন্তব্যে যাওয়া আমার সম্ভব নয় বলে তুমি আমার কাছে পথের খবর নিয়ে চলতে সুরু করে লক্ষ্যে গিয়ে পৌছালে, আমার জানাটা ত আর মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না।"

সন্দেহের সুরে লীলা কহিল, "নিজের জীবনে উপলব্ধি না করে অন্যকে কি করে উপদেশ দেওয়া চলে, আমি ভেবে পাইনে অমরদা ! শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার শক্তি যে অন্যকে দিতে পারে, সে যে নিজে শক্তিহীন এ কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।"

অমর হাসিল। নিতান্ত প্রাণহীন সে হাসি। তারপর কহিল, "সবই হয়ত নিয়তি। সাবিত্রী, বেহুলো যে মরা স্বামী ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল—তাদের পেছনেও ছিল হয়ত ফিরে পাওয়ার বিধিলিপি। শক্তি জাগিয়ে জগতে অমরকীর্ত্তি লাভ করা ছিল তাদের ললাট-লিখন। নইলে কত সাবিত্রী কত সত্যবানের দেহত্যাগের সঙ্গে নিজেরাও যমালয়ে গিয়েছে—সত্যবানকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি, নিজেরাও ফিরে আসে নি। কি জানি শক্তির তারতম্যও থাকতে পারে।"

লীলার তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না। বলিল, "ভেতরে চল—মাকে দেখে যাবে। তাঁর অসুখ কমেছে বটে দুর্বলতা এখনও যায় নি।"

নন্দরাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া, অমর বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং রাত্রির গাড়ীতে পিতামাতা ও লীলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল।

পিতামাতাকে আনিবার জন্য অমরের কলিকাতা ত্যাগের পরদিন সন্ধ্যা হইতেই প্রভা যেন কেমন ছটফট করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িতেছিল—প্রভাও যেন কেমন অস্থির হইয়া পড়িতেছিল।

চারু প্রভার নিকটে ছিল। মাথার কাছের টেবল ফ্যানটি খুলিয়া দিয়া বলিল, "অমন করছ কেন মেজদি—দাদাবাবু কাছে নেই, তাই ভাল লাগছে না।"

প্রভা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "রাত্রি এখন ক'টা বেজেছে চারু ?"

দেওয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া চারু বলিল, "বারোটা। ভোরেই ত দাদাবাবু এসে পৌছবেন।"

"ততক্ষণ আমায় বাঁচিয়ে রাখিস ভাই, তাঁরই পায়ে মাথা রেখে যেন আমি মরতে পারি।"

প্রভার কোটরগত আঁখির কোণে জল দেখা গেল। একটু দম লইয়া প্রভা কহিল, "কথা আমার ফুরিয়ে আসছে—এই সুন্দর পৃথিবী চোখের উপর আঁধার হয়ে উঠছে, তোদের সবাইকে ছেড়ে কোথায় চ'লে যাচ্ছি ভাই !"

চারু নীরবে কাঁদিয়া উঠিল। প্রভার জীবন-দীপ যে যে-কোন মুহূর্তে নির্বাপিত হইতে পারে—পরিবারস্থ সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তবুও প্রভাকে সান্ত্বনা দিবার আশায় চারু চোখের জল মুছিয়া বলিল, "ডাক্তার-বাবুরা ত বলছেন, এমন রোগীও বাঁচে। তুমিই-বা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছ কেন মেজদি ?"

"ও তাঁদের মিথ্যে সান্ত্বনা চারু ! আমি জানি, আমি আর বাঁচব না। মৃত্যুর ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি। তাই ত ওঁকে পাঠিয়ে দিলাম সকলকে নিয়ে আসতে। যাবার বেলায় সবার কাছে জীবনের সব ভুল ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিদেয় হ'তে চাই। ওই হতভাগ্য শিশু জন্মে অবধি এক ফোঁটা মায়ের দুধ পেলে না। শিশু সন্তান যে মায়ের কি বস্তু—তাকে ছেড়েও আমায় চলে যেতে হচ্ছে। শুধু চোখেই দেখে গেলাম, বুকে নিয়ে দুদিন আদর করতে পারলাম না।"

চারু বলিল, "চুপ কর না মেজদি—ওতে তোমার কষ্টই বেড়ে যাচ্ছে।"

প্রভা কহিল, "এ জন্মের সব কথা যে ফুরিয়ে যাচ্ছে বোন। চুপ—একেবারেই যে চুপ ক'রে যেতে হবে। কত কথাই না তোলা থাকবে। সময় যত ঘনিয়ে আসছে—পেছন পানে চেয়ে প্রাণ ততই কেঁদে উঠছে। আমি মরণ চাই নি, তবু আমায় মরতে হবে—। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যে মৃত্যু দেবে না। মনে পড়ে, এই ত সেদিন মায়ের কোল ছেড়ে স্কুলে গিয়েছি, সেদিনের কথা বিয়ে হ'ল। এরই মধ্যে ছেলের মা হলাম, আবার আজই চ'লে যাচ্ছি। এবার যদি তাঁর দেখা পাই, তবে তাঁকে জিজ্ঞেস করব, ওগো, নারায়ণ মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে এ খেলা খেলবার তোমার কি প্রয়োজন ! কেন পাঠাও কেন নাও।"

বলিয়াই প্রভা আত্মস্থভাবে যেন তন্ময় হইয়া রহিল। তার চিত্ত দেহরাজ্য ছাড়িয়া যেন কোন অজ্ঞেয় বস্তুর সন্ধানে বহু দূরে চলিয়া গেল। জ্ঞান রহিল না—কে সে, কোথায় যাইতেছে কোথায় যাইবে। বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চারু ভাবিল প্রভা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। বুকে হাত দিয়া দেখিল হৃদপিণ্ডের স্পন্দন পূর্বেরই মত, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় নিয়মিত। আবার ভাবিল বুঝি নিদ্রা। জাগাইবে কি জাগাইবে না এই লইয়া অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া চারু ডাকিল "মেজদি।"

প্রভা প্রথমে শুনিতে পাইল না। চারু প্রভার দেহ নাড়া

দিয়া আবার প্রভাকে ডাকিল। এবার চারুর স্বর তাহার কানে গেল। চমকিত বিস্মিত চোখে চাহিয়া যেন কি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া স্মৃতি যেন ফিরিয়া পাইল। বলিল, "তবে সে সত্যি নয়—স্বপ্ন! কোথায় চলে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর সে দেশ—কি সুন্দর সেই ছেলেটি নাম বললে নারায়ণ। কেন ডাকলি চারু—কেন জাগালি ভাই—এই ঘুম কেন আমার শেষ ঘুম হ'ল না! নারায়ণ, নারায়ণ—কি মিষ্টি নাম। আমি আবার ঘুমাচ্ছি, ঘুমালেই সে আসবে—আর যেন ডাকিস নি।"

প্রভা আবার চক্ষু মুদিল। চারু আর ডাকিল না। রাত্রি কাটিয়া গেল—প্রভা জাগিল না। প্রভার মূর্ছা ভাঙ্গিল না দেখিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "জ্ঞান হয়ত ফিরিতে পারে, কিন্তু জীবনের আর কোন আশাই নাই।"

এমন সময়ে অমরনাথ সকলকে লইয়া প্রভার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সংজ্ঞাহীনা পত্নীর মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নিকটস্থ চিকিৎসককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "জ্ঞান কি আর ফিরবে না ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার এম্পূল হইতে সিরিঞ্জে ঔষধ পুরিতে পুরিতে বলিলেন, "ইনজেকশনটা ত দিয়ে দেখি। জ্ঞান ফিরবে নিশ্চয়, কতক্ষণ স্থায়ী হবে বলা যায় না।

মিনতিপূর্ণ স্বরে অমর কহিল, "যত অল্পক্ষণের জন্য হ'ক, ওর সংজ্ঞা একবার ফিরিয়ে দিন ডাক্তারবাবু; শেষ মুহূর্তে আমার মা-বাবাকে দেখতে চেয়েছিল।"

তারাসুন্দরী বধূর এই অন্তিম মুহূর্তে আসিয়া পৌঁছিবেন, এরূপ আশা করেন নাই। কঙ্কালসার প্রভার দিকে চাহিয়া তারাসুন্দরী আজ অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। সকলেই রোগিণীর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রভার জননী তারাসুন্দরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিসর্জনের বেলায় আগমনীর আনন্দ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারিল না।

প্রভার পিতা সজল-চোখে যোগীন্দ্রবাবুকে সংবর্ধনা করিয়া কহিলেন, "মা আমার চলে যাচ্ছে—" তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিয়াছিল, মুখে আর কথা ফুটিল না।

ডাক্তার ইনজেকশন দিয়া বাহিরে আসিলে লীলা যাইয়া প্রভার পার্শ্বে বসিল। তারাসুন্দরীও বধূর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মায়ের পার্শ্বে থাকিয়া প্রভার জ্ঞান ফিরিয়া আসে কি না অমর তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে মুদিত চক্ষেই অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "নারায়ণ"। তারপর বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়া ইতস্তত চাহিয়া দেখিতে লাগিল যেন পরিচিত কিছু খুঁজিতেছে! কোটরগত চক্ষু আরও বিস্ফারিত করিয়া একবার লীলার দিকে একবার তারাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পরে যন্ত্রণাসূচক মুখ-ভঙ্গী করিয়া কহিল, "এসেছ মা, তুমিও এসেছ ঠাকুরঝি—বাবা এসেছেন?"

যোগীন্দ্রবাবু প্রভার নিকটে গেলেন। প্রভা ক্ষীণতম কণ্ঠে কহিল, "একটু পায়ের ধূলো!"

প্রভা দুর্বল হাতখানি তুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। ডাক্তারের নির্দেশমত চারু আসিয়া প্রভার মুখে এক ডোজ ঔষধ ঢালিয়া দিতেই প্রভা উহা গলাধঃকরণ করিয়া বিকৃত মুখে কহিল, "উঃ গলা জ্বলে গেল। এই সময় বুঝি এই ওষুধ খাওয়ায় ওরে হতভাগী, গঙ্গাজল দিতে পারলি নে?"

শ্বশুর-শাশুড়ী বধূর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রভা কষ্টে হাতজোড় করিয়া বলিল, "তোমরা আমায় ক্ষমা ক'র মা। তোমাদের সংসারে যেয়ে তোমাদের সুখী করতে পারি নি। যদি বাঁচতাম, এবার তোমাদের চরণ-সেবার দাবী নিয়েই বাড়ী যেতাম! খোকা রইল, ওর মাঝেই আমি থাকব। ওর নাম রেখেছি আমি নারায়ণ। তোমরা ওকে নারায়ণ ব'লে ডেক। হবার আগেই মরব জেনে লীলা ঠাকুরঝিকে দিতে চেয়েছিলাম। দিই মা ওর হাতে তুলে? তোমাদের ছেলে তোমাদেরই থাকবে, ও শুধু মানুষ করবে!"

শাশুড়ীর সম্মতি পাইবার আশায় উৎসুক দৃষ্টিতে প্রভা চাহিয়া রহিল, তারাসুন্দরী সম্মতি জানাইলে প্রভা শ্বশুরের দিকে চোখ রাখিয়া বলিল, "তুমি সম্মতি দিচ্ছ বাবা?"

ইচ্ছা না থাকিলেও মুমূর্ষু বধূর মনে ক্লেশ দিবার প্রবৃত্তি শ্বশুরের হইল না। বলিলেন, "তুমি যদি সুখী হও বৌমা, লীলার ওপরই ওর ভার দিয়ে যাও।"

ক্লান্তিভরে প্রভা আবার চক্ষু মুদিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অন্তত ঘণ্টা দুই আর ভয়ের কোন কারণ নাই। এই অবস্থা স্থায়ী হইলে জীবনের আশাও করা যাইতে পারে।"

ভিড় ছাড়াইয়া রোগীকে একটু মুক্ত বায়ুতে রাখিবার আদেশ দিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন। রোগীর ঘর ছাড়িয়া সকলেই বাহিরে আসিলেন, কাছে রহিল অমর আর লীলা।

মিনিট কুড়ি নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভা বোধ হয় একটু আরাম বোধ করিতেছিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া লীলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "জানি ঠাকুরঝি, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ। আজ যাবার বেলায় একটা শেষ অনুরোধ ক'রে যাই। ওঁকে তুমি দেখ। এ সংসারে তোমার চেয়ে ওঁর আপনার জন যে আর কেউ নেই—তা আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি। যত ফাঁকই তোমাদের ভেতর থাক তোমরা দু'টি ভাই-বোন যে সব চেয়ে নিকট এ সত্য আমার কাছে আর এতটুকু গোপন নেই। ওঁকে দেখবার ভার আমি তোমার ওপরেই দিয়ে যাচ্ছি। আর পার যদি চারুকে ওঁর হাতে তুলে দিও। আমি মলে ওঁকে সন্ন্যাসী হ'তে দিও না ভাই। আমি জানি সংসার করতে উনি চাইবেন না। ওঁকে ঘরে রাখবার ভার তোমার।"

লীলা নীরবে সম্মতি জানাইল। প্রভা অমরের পানে চাহিয়া বলিল, "নারায়ণ—নারায়ণ—কি সুন্দর নাম। এক নারায়ণ তোমাকেও দিয়ে গেলাম। আমাকে এক নারায়ণ মা ব'লে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। দেখনি তাকে, আমি দেখেছি। দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেল। তোমাদের সবাইকে ভুলে গেলাম।"

অমর ও লীলা পরম বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিল! ইহা ত অজ্ঞানের প্রলাপ নয়? এত সুকৃতি এই মুখরা ঈর্ষা-পরায়ণা প্রভা পাইল কোথায় যে অন্তিম মুহূর্তে শুদ্ধ

নারায়ণ নামই তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে না, দেহাতীত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাতীত অরূপ বস্তুকেও সে রূপের মধ্যে ধরিতে পারিয়াছে। জন্মজন্মের কত তপস্যাই তাহার ছিল যে, অবাঙ মনসো-গোচর ত্রিভুবনের মূল কারণ আজ গোচরীভূত হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। সত্যই কি তাই—না শুধু স্বপ্ন—না বিকার! ইঁহা যদি স্বপ্ন হয় এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই যেন সে মরিতে পারে! এতকাল পরে গভীর শ্রদ্ধায় অমরের অন্তর ভরিয়া উঠিল। পত্নীর পানে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে অমর কহিল, "নারায়ণকে তুমি দেখেছ প্রভা, আমায় দেখাতে পার?"

প্রভা কহিল, "দেখেছি। ডাকলে সে আসে—ঘুমালে আসে, জেগে থাকলে আসে না। তুমি ডেক, সে আসবে। এক নারায়ণ ত তোমাদের কাছেই রইল। ওকে ডাকলেই তাকে পাবে—ওকে ডাকতে ডাকতেই তাসে এল।"

বলিয়াই প্রভা আবার নিস্তব্ধ হইল। যেন আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লীলা অমরের দিকে চাহিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, "এ কি ক'রে সম্ভব হয় অমর-দা?"

"জানিনে বোন! হয়ত এ স্বপ্ন, না হয় বিকারের প্রলাপ। কিন্তু এ স্বপ্ন যে বাস্তবের চেয়েও কাম্য। আগাগোড়া জীবনটা যদিও স্বপ্ন, তবু এ স্বপ্নের মাধুর্য স্বর্গীয়। খোকা জন্মাবার সূচনা থেকেই ত কত পরিবর্তনই ওর লক্ষ্য করছি। কিন্তু জন্মাবার পর হ'তে যেন আগাগোড়া বদলে গেছে। শিশুকে মায়ের ভালবাসতে দেখেছি, কিন্তু এমন তন্ময়তা কোথাও দেখিনি রে! মানুষকে ভালবাসলে যদি সে ভালবাসা ভগবানকেই নিবেদন করা হয়—তবে হয়ত ওর বাৎসল্যের যত স্নেহ নারায়ণই পেয়েছেন।"

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এই নীরবতা ভঙ্গ হইল নরেন্দ্রের আগমনে। লীলাদের আসিবার খবর পাইয়া নরেন্দ্রনাথ বরাবর প্রভার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লীলা স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া কহিল, "বৌদির অসুখ বড্ড বেশী তাই এখানে এসেই উঠেছি! দেখ না তুমি বৌদিকে একবার।"

নরেন্দ্র ডাক্তারী কায়দায় ষ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া প্রভাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সহসা চক্ষু মেলিয়া নরেন্দ্রকে দেখিয়া প্রভা কহিল, "কে জামাইবাবু, আর ডাক্তারী ক'রে কাজ নেই। আত্মীয়ের মত কাছে এসে বসুন। ওই বিদ্যেয় মরা মানুষকে বাঁচান যায় না।"

পরে অমরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সারাটি রাত জেগে এসেছ, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়াটা সেরে ফেলগে। শেষ-ডাক এসে গেলে শেষে মুখে কিছুই উঠবে না। ওকি, তোমার চোখ ছল ছল করছে! তুমি ত সাধারণ মানুষের মত দুর্বল নও। সবাইত যায়। আমি না হয় দু'দিন আগেই যাচ্ছি! চেষ্টা ত কম করলে না, রাখতে ত পারলে না।"

সকাল বেলাটা একরূপে কাটিল। বেলা ১২টার পর হইতে অবস্থা নিতান্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। ভয়ানক শ্বাস-কষ্ট দেখা দিল। মুহুর্মুহু জ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল, অস্থিরতা চরমে উঠিল। ডাক্তার আসিয়া আশা নাই বলিয়া বিদায় লইলেন। পরিবারস্থ সকলে আসিয়া প্রভাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রভার জননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

বেলা ৩টার সময় প্রভা একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শ্বাসের প্রবল টানে মুখে কথা ফুটিতেছিল না। তবুও আপ্রাণ চেষ্টায় ডাকিল, "বাবা, মা"

পিতা-মাতা নিকটে গেলেন। প্রভা জড়িত কণ্ঠে কহিল, "বিদায়; আমার নারায়ণ!" চারু প্রভার শিশু পুত্রকে প্রভার বুকের কাছে শোয়াইয়া দিল।

প্রভার হাত-পা নাড়িবার শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল, কষ্টে ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, "লীলা, ভাই—"

লীলা কাছে আসিল। ইঙ্গিতে প্রভা নিজের বুক হইতে ছেলেকে তুলিয়া লইতে বলিল। চোখ মুছিয়া লীলা শিশুকে মায়ের বুক হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিল।

শিশু একবার মায়ের দিকে একবার লীলার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রভা ইঙ্গিতে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিকটে আসিতে বলিয়া—ইসারায় তাঁহাদের পায়ের ধূলা চাহিল। অমর পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ের ধূলি লইয়া প্রভার মাথায় মাখাইয়া দিল।

প্রভা জল চাহিল। অমর গঙ্গাবারি মুখে ঢালিয়া দিল। প্রভা নিজের বাহ্যজ্ঞান আর স্থির রাখিতে পারিল না। নাভি-শ্বাসে আপাদ-মস্তক কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উপাধান হইতে প্রভার মস্তক অমরের পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। অমর উহা সযত্নে তুলিয়া নিজের কোলের উপর রাখিল। চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, কণ্ঠ নীরব হইয়া যাইতে-ছিল, অস্ফুট জড়িত স্বরে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রভা তবুও ডাকিয়া উঠিল। দৃষ্টি ঊর্দ্ধমুখী করিয়া শেষবারের জন্য অমরের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি আর নামিল না। যেন একবার অস্ফুট 'নারায়ণ' ধ্বনি শুনা গেল,—তারপর সব নীরব হইল, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি স্থির হইয়া গেল, হৃদস্পন্দন চিরদিনের জন্য থামিয়া গেল।

আবিষ্টের মত মৃত পত্নীর মস্তক কোলে লইয়া অমর বসিয়া রহিল। যখন চমক ভাঙ্গিল, দেখিল প্রভা নাই! বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গিয়াছে। উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে না পারিয়া অমর দুই হস্তে মুখ ঢাকিল।

(ক্রমশ)

প্যালেষ্টাইন ও ভারতবর্ষ

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

প্যালেসটাইন আর ভারতবর্ষ—বিধাতা-পরিত্যক্ত এই দুইটি দেশের আজ দুঃখ-দুর্দ্দশার অবধি নাই। এই দুই দেশের উপর আজ সাম্রাজ্যবাদ কুলিশকঠোর বজ্রকরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ভারত চায় স্বাধীনতা, প্যালেসটাইন চায় স্বাধীনতা। আর সেই স্বাধীনতার জন্যই তাহারা আমরণ সংগ্রাম করিতেছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের কঠোর অস্ত্র—জেল কারাগার ও অন্যান্য রুদ্রনীতির উন্মাদ নৃত্য আর অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী স্বদেশ প্রেমিকদের মরণ পণ সাধনা। শেষ পর্য্যন্ত কোনটা জয়লাভ করিবে তাহা বলা অসম্ভব। জয় পরাজয়ের অনিশ্চিয়তার মধ্যেই আজ সংগ্রাম চলিতেছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। কিন্তু কেন এমন হয়? দেশ যদি চায় স্বাধীনতা, দেশবাসীর প্রাণে প্রাণে যদি স্বাধীনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতে থাকে, তবে কেন তাহাদিগকে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতে হয়? ইহার একমাত্র উত্তর, দেশের মধ্যে আছে এক দল মীরজাফর ও উমিচাঁদ যাহারা কোন সময় দেশদ্রোহিতা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মীরজাফর সামান্য ক্ষুধকুড়ার লোভে স্বদেশের স্বাধীনতাকে বিদেশীর পদতলে নিবেদন করিয়াছিল। আর বিংশ শতাব্দীর মীরজাফর উমিচাঁদের দল স্বদেশের পরাধীনতাকে স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সত্যসাধক স্বদেশপ্রেমিকের দল তাহাদের কুপ্রভাব হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তাই আজ ভারতে ও প্যালেসটাইনে স্বাধীনতার সংগ্রাম সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না। অলেকজাণ্ডার, সিজার হানিবল যেমন বাহুবলে দেশের পর দেশ জয় করিয়া জগতে বীরত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও প্যালেসটাইনের বিজেতাগণ সেরূপ বাহুবলের আশ্রয় লন নাই—তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন মীরজাফর ও উমিচাঁদের মত লোকদের। তাই অনায়াসে একরূপ বিনা রক্তপাতে এই দুইটি প্রাচীন দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত হইয়া গিয়াছে। এ দেশদ্বয়কে স্বাধীন করিতে হইলে মীরজাফর দলের অবসান করিতে হইবে। তাহা হইলে দেশ এক দণ্ডেই স্বাধীন হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ কেমন করিয়া স্বাধীনতা হারাইল সে কথা অনেকেই জানেন, আজ তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। কেবল প্যালেসটাইনের কথা আজ বলিব। মহাসমরের পূর্ব্বে নিকট-প্রাচ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীনে এক একটি প্রদেশ। হেজাজ, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটেমিয়া (বর্ত্তমান ইরাক) এই সব প্রদেশের উপর তুরস্কের ছিল দোর্দ্দণ্ড ক্ষমতা। তুরস্কে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল না, সুতরাং এই সব অধীনস্থ দেশের উপর তুরস্ক চালাইত স্বেচ্ছাচার। কখন কখন যে অত্যাচার হইত না তাহা বলা যায় না, ভাল শাসন ছিল না, অবিচারও কিছু কিছু ছিল। তুরস্ক এই সব দেশে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কিন্তু এই সব দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও একটা বিষয়ে তুরস্ককে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, তুরস্ক কখনও এই সব দেশকে নিরস্ত্র করে নাই, নিবীর্য্য করে নাই, তাহাদের সামরিক শক্তিকে খর্ব্ব করে নাই। বরং সেই সব দেশের বহু লোককে তুরস্কের জাতীয় সৈন্য বাহিনীতে ভর্ত্তি করিত। ঠিক এই সময় মহাসমর বাধিয়া গেল। আর তাহাতে তুরস্ক যোগ দিল মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর সহিত। জলে স্থলে আকাশে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। শত্রুপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য প্রত্যেক দল পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তুরস্ককে দুর্ব্বল করিবার উপায় সহজেই আবিষ্কৃত হইল। তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্যে একটু একটু অসন্তোষ বহুদিন হইতেই জাগিয়াছিল। মিত্র পক্ষ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে কসুর করিল না। মিত্র পক্ষের গুপ্তচরগণ সিরিয়া প্যালেসটাইন প্রভৃতি অঞ্চলে তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিতে লাগিল। তাহারা তাহাদিগকে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে উৎসাহ দিল এবং আশ্বাস দিল মহাযুদ্ধের অন্তে মিত্র পক্ষ তাহাদিগকে পূর্ণস্বাধীনতা প্রদান করিবেন। সেই সঙ্গে উৎকোচ, কানফুসলানি, মনভাঙ্গানি প্রভৃতির দ্বারা বহু আরবকে হাত করা হইল। এই সব মীরজাফরের দল সামরিক প্রলোভনে মত্ত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বিদেশীর চরণ তলে বিসর্জ্জন করিল। গোপনে গোপনে নানা পরামর্শ চলিল, সৈন্য আমদানী হইতে লাগিল। এবং হতভাগ্য আরবগণ হঠাৎ দেখিল তাহাদের দেশে ইউরোপীয় সৈন্যের মহড়া আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে চোখের নিমিষে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন মিত্র পক্ষের কবলিত হইয়া গেল। কোথায় রহিল প্রতিশ্রুতি আর কোথায় রহিল তাহাদের শুভেচ্ছা। আরবগণ বিমূঢ় হইয়া আফশোষ করিতে লাগিল।

কিন্তু সব ব্যাপারের এইখানে পরিসমাপ্তি হইল না—মিত্র পক্ষ আরবগণকে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সেইরূপ অতি সঙ্গোপনে ইহুদীদেরকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, আর সে প্রতিশ্রুতি ছিল আরবদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাসমরের সময় বিশ্বের ইহুদীগণ মিত্র পক্ষকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা সেই উপকারের একটিমাত্র প্রতিদান চাহিয়াছিল। পৃথিবীর কোথাও ইহুদীদের জাতীয় ভূমি ছিল না। "আমার দেশ" বলিয়া কোথাও মাথা রাখিবার ঠাঁই ছিল না। তাহারা মিত্র পক্ষের নিকট এই দাবী করিল, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আদি ভূমি প্যালেস্টাইনকে ইহুদীদের জন্য জাতীয় ভূমিতে পরিণত করিতে হইবে। ইহুদীদের টাকার বিনিময়ে মিত্র-পক্ষ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। সেই সময় তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিল না যে, প্যালেস্টাইনের আরবদেরকে অন্যরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক মহাসমরের শেষে আরবগণ চাহিল স্বাধীনতা, আর ইহুদীগণ করিল প্যালেস্টাইনকে জাতীয় ভূমিতে পরিণত করিবার দাবী। মিত্রপক্ষ আরবদের দাবী অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু ইহুদীদের দাবী কতকটা পূরণ করিলেন। তারপর হইতে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে দলে দলে ইহুদী আসিয়া প্যালেস্টাইনে বসতি বিস্তার করিতে

লাগিল। লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদী আমদানী আরম্ভ হইল। ইহুদীদের ধনৈশ্বর্য্যের কথা বিশ্ববিশ্রুত। এই ধন দিয়া তাহারা প্যালেস্টাইনের ভূমি ক্রয় করিতে লাগিল। দেশের চারিদিকে টাকা ঢালিতে লাগিল। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিল, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া ফেলিল। মরুভূমিকে নন্দনে পরিণত করিল। ঐশ্বর্য্যের বিলাসে সারা দেশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আর তাহাদেরই পার্শ্বে হতভাগ্য আরবগণ দেখিল তাহাদের বাসভূমি, কৃষি-ভূমি জীবিকার উপায়সমূহ পরদেশের লোক টাকার জোরে অধিকার করিয়া লইয়াছে। প্রথমে তাহারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করিয়া স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল ইহা তাহাদের স্বদেশদ্রোহিতার ফল। যেসব মীরজাফর ক্ষণিক সুখের লোভে মিত্রপক্ষের নিকট দেশের স্বাধীনতা বিকাইয়া দিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থা সেই দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। কিন্তু হায় এখন আর অনুতাপ করিবার উপায় নাই। তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত, তাহাদের বুকের উপর বিদেশীয় সৈন্য প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের মাতৃ-স্বরূপা দেশে বিদেশী জাতি আসিয়া বসতি বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের বিষয়সম্পত্তি অপরের হস্তগত, তাহাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা হীনবল ও নিরস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল, এখন আর পরিতাপ করিয়া লাভ নাই। চোখের উপর দিনের পর দিন এই সব অত্যাচার হইতে দেখিয়া কয়েকজন স্বদেশ প্রাণ যুবক ইহার প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা গোপন সভাসমিতি করিয়া দেশোদ্ধারের জন্য একটা কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া লইল এবং তদনুসারে গরিলা সংগ্রাম করিতে লাগিল। এই সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ দিবার দরকার নাই। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে এখন পর্য্যন্ত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয় নাই। আরবগণ দেখিল, সসৈন্যে তাহাদের দেশের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, আর ইহুদীগণ টাকার বিনিময়ে ইংরেজের সহায়তায় তাহাদের গণ টাকার বিনিময়ে ইংরেজের সহায়তায় তাহাদের এক হস্তে ধনসম্পদ লুটিয়া লইতেছে। তাই তাহারা এক হস্তে ইংরেজ বিতাড়ন ও অন্য হস্তে ইহুদী দলন করিতে লাগিল। ফলে ইহুদীগণ আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় লইল। আজ ইংরেজ আর ইহুদী এক হইয়া আরবদের স্বাধীনতার আগ্রহকে দমন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সংগ্রাম কত দিন চলিবে, আর ইহার শেষ পরিণতিই বা কি হইবে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আরব-ইহুদী সংঘর্ষের চারি প্রকার পরিণতি হইতে পারে। (১) অন্য কোন শক্তির সাহায্যে আরবগণ ইহুদী ও ইংরেজগণকে বিতাড়িত করিয়া স্বদেশকে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন করিতে পারে। (২) ইংরেজের চাপে ইহুদী ও আরবগণ চির দাসজাতিতে পরিণত হইতে পারে। (৩) ইহুদীগণ প্যালেস্টাইনকে সম্পূর্ণরূপে ইহুদী-নিয়ন্ত্রে পরিচালিত করিতে পারে। অথবা (৪) ইহুদী ও আরবগণ [illegible] বিতাড়িত করিয়া [illegible] একটি স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র স্থাপিত করিতে পারে। কোন পন্থা অবলম্বন করিলে আরবদের সর্ব্বাপেক্ষা উপকার হইতে পারে এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিব। আমরা একে একে উক্ত চারিটি বিষয়ের উত্তর দিব।

(১) বর্ত্তমানে প্যালেস্টাইনে ইহুদীগণ এরূপভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের একেবারে বিতাড়িত করা একরূপ অসম্ভব হইবে। ইহাই হইল তাহাদের ধর্ম্মভূমি। বহু যুগ হইতে তাহারা এই স্থানে বসতি বিস্তার করিবার জন্য সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছিল। আজ যখন এই সুযোগ মিলিয়াছে, তখন তাহারা সহজে তাহা ছাড়িবে না। প্যালেস্টাইনে নানাভাবে তাহাদের স্বার্থ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এখন উহাকে মাতৃভূমি ও জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে গৌরব অনুভব করে। আরবগণের সহিত যদি উহাদের সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়, তবে তাহাতে উভয় পক্ষের লাভ হইবে প্যালেস্টাইন হইতে ইহুদী বিতাড়ন করিবার কল্পনা পোষণ করিলে ইহুদীগণ সব সময় ইংরেজগণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিবে। সুতরাং অন্য কোন শক্তির সাহায্যে এই দুই সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে না। ফলে প্যালেস্টাইনের দাসত্ব স্থায়ী হইয়া রহিবে। তাছাড়া যে শক্তি এইভাবে আরবগণকে সাহায্য করিবে, সে শক্তি নিশ্চয় নিজেদের জন্য সুবিধা করিয়া লইতে ছাড়িবে না। সুতরাং অন্য শক্তির সাহায্যে প্যালেস্টাইন কোন দিন স্বাধীন হইতে পারিবে না। বরং তাহাতে ইহুদী ও আরবদের বিবাদ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করিবে। (২) যদি ইহুদী ও আরবদের মধ্যে কোনরূপ সৌহৃদ্য স্থাপিত না হয়, তবে তাহাদের অনৈক্যের সুবিধায় ইংরেজেরা চিরকালই প্যালেস্টাইনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত সমস্যা সব সময় সেখানে উঠিতে থাকিবে। আর তাহা তাহাদের জাতীয় ঐক্যের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিবে। প্যালেস্টাইনকে তিন ভাগে বণ্টন করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার গোপন উদ্দেশ্যই হইল তথায় ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম করিয়া রাখা। সেই পরিকল্পনা অনুসারে এক অংশ দেওয়া হইবে আরব-গণকে, অন্য অংশ দেওয়া হইবে ইহুদীদেরকে, আর দেশের মধ্যভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রহিবে বৃটিশ শক্তি। যাহার এতটুকু বুদ্ধি আছে সেই বুঝিতে পারে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি? সুতরাং পরিষ্কারভাবে দেখা গেল ইহুদী-আরব সংগ্রামের শেষ পরিণতি হইল দেশকে চিরকাল বৃটিশের পদানত করিয়া রাখা। (৩) তৃতীয় কথা হইতেছে যে, ইংরেজের সাহায্যে ইহুদীগণ আরবদেরকে দাবাইয়া রাখিয়া প্যালেস্টাইনকে ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে কিনা। যেভাবে ইহুদী-আরব সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা সহজেই শেষ হইবে না, শেষ হইতে বহুদিন লাগিবে। আমার ভয় হয় যে, যদি আরবগণ এইভাবে চলিতে থাকে এবং আপাত সুবিধার জন্য নাজী জার্ম্মানী ফ্যাসিষ্ট ইটালীর প্ররোচনায় নাচিতে থাকে, তবে তাহাতে [illegible] অধিক হইবে।

ইংরেজ-ইহুদী সহযোগিতা আরবদের নিরাপত্তার জন্য ঘোর অনিষ্টকর। এই সহযোগিতায় বাধা দিতে হইলে ইহুদীর সহিত আরবদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা দরকার। (৪) আমাদের আলোচনার চতুর্থ বিষয় হইতেছে, আরব-ইহুদী সম্মিলন। আরব-ইহুদী মিলনই বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ। এই মিলন স্থাপিত হইলে দেশের উপর আর ম্যানডেটের দরকার হইবে না। আর ম্যানডেট উঠিয়া গেলেই বৃটিশকে সরিয়া যাইতে হইবে। এই মিলনের ফলে তৃতীয় শক্তির বিনাসাহায্যে প্যালেস্টাইন স্বাধীন হইয়া যাইবে। সেখানে ইংরেজ থাকিবে না, জার্ম্মান ও ইটালীর সাহায্যের দরকার হইবে না। আরব ও ইহুদীগণ একত্রে মিলিত হইয়া একটি সম্মিলিত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। ভারতে প্যালেস্টাইনে আরবদের দরদীর অভাব নাই। তাঁহারা নানাভাবে সেই দরদ দেখাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুল পথে আন্দোলন চালাইতেছেন। তাঁহারা আরব-ইহুদীর বিরোধটাকে বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় আরবদের দরদী বন্ধুর কর্ত্তব্য হইবে, তাহাদের সহিত ইহুদীর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করা! এই সহযোগিতা ব্যতীত আরবগণ একদণ্ড টিকিতে পারিবে না।

আমরা ভারতের মুসলমান, আমরা ভাল করিয়া জানি, সাম্প্রদায়িক বিবাদে আমাদের কি সর্ব্বনাশটাই না হইতেছে। যে মুসলিম লীগ হিন্দু-মুসলমানের বিবাদকে সর্ব্বদাই উস্কাইয়া দিতেছে, তাহারাই যে আরব-ইহুদীদের মধ্যে মিলনে বাধা দিবে, তাহা একরূপ নিশ্চিত। কিন্তু সত্যসন্ধ প্রত্যেক মুসলমানকে বলি, আজি হইতে এমনভাবে আন্দোলন করিতে থাক যাহাতে আরব-ইহুদীর মধ্যে সহযোগিতা হইতে পারে! মুসলিম লীগ এই বিষয়ে কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। বরং তাহার প্রধান প্রচেষ্টা হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের জন্য আরব-ইহুদী সংগ্রামকে আরও উস্কাইয়া দেওয়া। ভারতবর্ষের সহিত প্যালেস্টাইনের সামঞ্জস্য কোথায়, তাহা পাঠকগণ দেখিলেন। উভয় দেশই আজ ভেদনীতির কবলে পতিত হইয়া স্বাধীনতার জন্য কোন কাজ করিতে পারিতেছে না। এখানে হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া, আর সেখানে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে ঝগড়া—উভয়েরই পরিণতি দেশের চিরদাসত্ব। হায় এইভাবে দেশ যদি আত্মকলহে জর্জ্জরিত হইতে থাকে, তবে কি কোন দিন আমরা স্বাধীনতার মুখ দেখিতে পাইব? ভারতবর্ষে ইসলাম বিদেশ হইতে আগত, কিন্তু তাহার অস্থি-মজ্জায় ইসলাম এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে দূরে করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্যালেস্টাইনে ইহুদী আমদানী সেদিনের ঘটনা বটে, কিন্তু দেশের পরতে পরতে ইহুদিগণ এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, মনে হয় আরবগণ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিবে না। যেমন আমাদের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়াতে সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত অন্য কেহ লাভবান হইবে না, সেইরূপ আরব-ইহুদীর সংঘর্ষের কারণে লাভবান হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। সেই জন্য আরববাসীর কর্ত্তব্য ইহুদীদের সহিত মিত্রতা স্থাপিত করিয়া স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়া। এইরূপ না করিলে প্যালেস্টাইন চিরকালই বিদেশীর পদানত হইয়া রহিবে।

তোমরা ও আমরা

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

তোমরা সকলে 'পিক্‌নিক্‌' কর' ভুরিভোজীদের নিয়ে
নিশাচর প্রাণী যত,
আমরা শুধুই কাঁদি যে গো হায় দুয়ারে কবাট দিয়ে
অসহায় বিক্ষত।

তোমরা নিয়ত উৎসব কর' বন্ধু 'ব্রাদারে' মিলে
রাজনটীদের সাথে,
ক্ষুধাতুর মোরা অন্ন অভাবে মরে যাই তিলে তিলে
যুগে যুগে দিনে রাতে।

আমাদের গড়া প্রাসাদে তোমরা সুখের শয্যা পাতি'
সাজাও বিজলী পাখা,
আমরা কেবল জীর্ণ কুটিরে যাপিয়া দিবস রাতি
অবোট কাজের ঢাকা।

তোমাদের প্রাণে আমাদের লাগি' জাগে না করুণা কণে,
ওঠেনা ব্যথার ঢেউ;
আমরা নীরবে ধূলোয় লুটায়ে কাঁদি যে আপন মনে,
তোমরা দেখ না কেউ।

তোমাদের নভে চাঁদ হেসে যায় পাখী গেয়ে যায় গান,
নাচে যে অলকা পরী;
মোদের আকাশে নিত্য চলে যে ঝঞ্ঝার অভিযান,
হাসে অমা-বিভাবরী।

শাসনদণ্ড তোমাদের হাতে—তোমরা দেশের রাজা
শান্তি, তোমার তরে;
দুর্ব্বল মোরা ধর্ম্মের নামে পেয়েছি শুধুই সাজা,
কাঁদি যে জনম ভরে॥

আঙুর

(গল্প)

শ্রীনীলকণ্ঠ দাশ-শর্ম্মা

মাঠের মধ্যে বিল। উঁচু রাস্তাগুলি পর্য্যন্ত যায়গায় যায়গায় জলে তলিয়ে গেছে। ফলন্ত ধানগাছ, পাটগাছ—সবই গেছে তলিয়ে। কোথায়ই বা বিল, কোথায়ই বা ক্ষেত, কিছুই রজনী বুঝতে পারে না—মাছ ধরা ত দূরের কথা। অথচ এই বোয়ালের বিলেই এক এক রাতে সে কত বড় বড় মাছ ধরেছে। তার মনে আছে সেবার বাবুর বাড়ী বিয়ের সময় সব মাছই সে জুগিয়েছিল। মাছও একটু আধটু নয়; তেরো মণ মাছ ধরেছিল এক রাত্রিতে। আর এখন কিনা সেই যায়গা এমনি! একটা মাছের ঘাইও রজনীর উৎকর্ণ কানে পৌঁছায় না।

নিঝুম গভীর রাতে, কূল-কিনারা নাই সেই বোয়ালের বিলে রজনী তার বছর পাঁচ ছয়ের ছোট্ট ছেলে আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে মাছের খোঁজে বেরিয়েছে। এত বৃষ্টি, এত ঠাণ্ডা, এত রাত-জাগা, এতে আনন্দর আর অসুখ করে না, এ সমস্ত ওর সয়ে গেছে।

আনন্দর সাহায্যটুকু একেবারে ফেলনা নয়। রজনী আগে ছিল একা, তখন তার অসুবিধে হত খুবই,—পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে সে তখন বেরুত। নৌকার একদিকে আছে তাওয়ায় করে তুষের আগুন, আর তারই কাছে আছে হুঁকা, কল্কে এবং অন্যান্য তামাক খাবার সরঞ্জাম। রাত জেগে, অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে মাছের গতি লক্ষ্য করবার সময় যখন ক্লান্তি আসে, তখন এই হুঁকায় দুই একটি টান শান্তি এবং তৃপ্তি এনে দেয়। হয়ত কল্কেতে আগুন দিয়ে তামাকটি ভাল ক'রে সেজে নিচ্ছে, আর এমনি সময়েই তীক্ষ্ণ এবং মনোযোগী চক্ষু দেখতে পেল কিছু দূরে একটি লম্বা ধানের গাছ আস্তে আস্তে নুইয়ে পড়ছে, আবার আস্তে আস্তে সোজা হয়ে উঠছে। অভিজ্ঞ রজনীর বুঝতে বাকী থাকে না কিসে গাছটির গোড়া নাড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রজনীর চোখ দুটীতে দেখা দেয় পুলকের দীপ্তি। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে গাছটির গোড়ায় অব্যর্থ লক্ষ্য করে হাত তুলে। কিন্তু হাতে যে ওর কল্কে—তামাকও প্রায় সাজা হয়ে গেছে, সেটাকে ফেলে দেওয়াও আবার যায় না। অথচ মাছটাও মারা সম্পূর্ণ সম্ভব। এমনি সব এবং জেলেদের মাছ ধরবার সময় বিলের মধ্যে আরও বহু সমস্যাপূর্ণ যায়গায় দরকার হয় একজন সঙ্গীর। হয়ত বা মাছটাকে লক্ষ্য করে জুতিটা ছুড়তে যাচ্ছে এমনি সময় এল একটা দমকা হাওয়া, নৌকা বোঁ করে ঘুরিয়ে ফেল্লে অন্যদিকে, মাছ চলে গেল জোরে ঝাপটা মেরে জেলের চোখের উপর দিয়ে। জেলের পক্ষে এ দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। তাই সঙ্গীর একজন দরকার হয় তাদের মাঝে মাঝে এই সব কঠিন কঠিন যায়গায়, অন্তত সুসময় সময় বোঠে ধরবার জন্যও। আনন্দকে দিয়ে রজনী এই কাজগুলি করিয়ে নিত।

আনন্দ ছোট হ'লে কি হয়, ও পারত বেশ।

[illegible]

তবু মাছ যে রজনীকে পেতেই হবে, নইলে কি দিয়ে চলবে কাল তাদের? ঘরে তার মার, আট বছরের মেয়ে শ্যামলীর এবং স্ত্রীর জ্বর; আজ প্রায় একমাস হতে চলল, এক ফোঁটা ওষুধও পড়েনি আজ পর্য্যন্ত। ভাল একটু পথ্যও দিতে পারেনি। আজ বিকালে শ্যামলী তাকে বলেছিল, —"বাবা, ঐ দত্তবাড়ীর ছেলেটির যখন অসুখ হয়েছিল, সে তখন কত আঙুর খেত, কমলা খেত।" শিশু-মনের সারল্য এবং আকাঙ্ক্ষা রজনীর মনে এনে দেয় বিষাদ। রজনী ভাবে, বোকা মেয়ে, বোঝে না যে, যাদের অন্নই জোটে না, আঙুর তারা কোথায় পাবে? এ যুক্তি কিন্তু রজনীর মনকে পাতলা করে দিতে পারে না। আদরের মেয়ে ছোট্ট শ্যামলীর জন্য ওর ভারী কষ্ট হয়। শ্যামলীর ফ্যাকাসে এবং শুকনো মুখখানা বারবার রজনীর মনে পড়ে।

অভাবের তাড়নায় ওর মাঝে মাঝে কান্না আসে। বড় ছেলেটির কথা মনে পড়ে। সে শ্যামলীরই কেবল বড় ছিল। সে যদি বেঁচে থাকত, তবে ত তার আজ একলা ভাবতে হত না এদের জন্য! কালাজ্বরে ভুগে ভুগে সে মারা গিয়েছে বছর নয়েক হ'ল। একটুও চিকিৎসা রজনী করাতে পারেনি! আবার এখন শ্যামলীর অসুখ, বাড়ীর সবারই অসুখ।

সামনে ঘোর অন্ধকার, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নীচে এই বোয়ালের বিল, তারই মধ্যে ছোট্ট একখানি নৌকায় মাছের আশায় জুতি-হাতে বসে রজনী। আর তার মনের মধ্য দিয়ে চলেছে এই সব ভাবনার ঝড়।

শ্যামলী যদি মারা যায়?—রজনী আর ভাবতে পারে না। চোখ দিয়ে তার ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে গড়িয়ে। তাড়াতাড়ি তা' ও মুছে ফেলে, পাছে আনন্দ বুঝতে পারে। শ্যামলীর মুখখানি ওর আবার মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কি মনে পড়ে যায়। ভাবতে ভাবতে শ্যামলীর অসুখের পরিণামের দৃশ্য রজনীর চোখের উপর ফুটে ওঠে। আনন্দ তখন বলে,—"ওই দেখ, বাবা, আবার বৃষ্টি আসছে। আমাদের ঘরে চালের যে দিকটা ভাল ছিল, কালকের বাতাসে সে-দিকটার খড়ও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বৃষ্টি এলে দিদি, মা সবাই একেবারে ভিজে যাবে। আচ্ছা, বাবা, ওদের অসুখ সারবে না? দিদির ত কতদিন হ'ল অসুখ করেছে।" আনন্দর শ্যামলীর অসুখের জন্যই চিন্তা বেশী। ও খেলার সাথী পায় না। ঝাঁপাঝাঁপি, মারামারি, স্নান করবার সময় দুরন্তপনা, দিদির অসুখ হ'লে, এ সমস্তর জন্য তার সঙ্গী জোটে না।

রজনীর আবার মনে পড়ে, তাইত, ঘরের অবস্থাও ত একেবারেই যাওয়ার মত। ও কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না। যেদিকে চায় দেখে অভাব, অভিযোগ, কান্না, দাবী—যার একটিকেও সে মেটাতে পারছে না। আনন্দকে বলে,—"চুপ কর্। কথা বললে মাছ পালিয়ে যাবে।"

রজনী [illegible] তুলে নৌকা বেয়ে বাড়ীর দিকে চলে। তার [illegible]

আস্তে বেয়ে চলে। হাতের বোঠেখানা ওর খুব পছন্দ-সই বোঠে হয়েছিল। নিজে গিয়ে গত বছর বড়ুদের হাট থেকে কিনে এনেছিল। কিন্তু এটিও গেছে ভেঙে। তার দিয়ে জুড়ে রেখেছিল। সে তারও পর্যন্ত খুলে খুলে বেরিয়েছে। রজনী দেখে ছোটখাটো অভাবগুলিও জমা হয়েছে অনেক। জালগুলিতে গাব পড়ে না বহুদিন—প্রায় মাস চারেক হবে; কাঠিগুলিও অনেক ছিঁড়ে গেছে। নতুন কতকগুলো দরকার। নৌকার চালিগুলিই বা কি হয়? চুরি করেই নেয়, না কি?

অনেকক্ষণ পরে রজনী কথা বলে,—"কাল থেকে আর আমরা এখানে আসব না। নদীতে ইলশে মাছের জাল বেয়ে দেখি, যদি দুই একটা বাধে।" আনন্দ উৎফুল্ল হয় এবং খুব আমোদের সহিত তার বাবার এ প্রস্তাবে সায় দেয়। আর রজনী ভাবে, ভাঙা, জীর্ণ ডিঙিখানাকে ঘরে যেটুকু আলকাৎরা আছে ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তাই দিয়েই কোনমতে ওটাকে চলন-সই ক'রে নিতে হবে।

বিলে আর ওরা যায় না। নদীতে যায় ইলিশমাছ মারতে, কিন্তু পায় না। রোজই ছেলে আর বাপ বৃষ্টিতে ভিজে জাবজুবো হয়ে আসে। তবুও যায়। কি করবে? বসে থাকলে ত চলবে না। অভাবে সে সে ঘেরা। কি দিয়ে মেটাবে? রোজই যায়, কিন্তু ফিরে আসে খালি হাতে।

শ্যামলীর অসুখ আরও বেড়ে ওঠে। ওষুধের নাম গন্ধও নাই। আজকাল আবার জ্বরের ঘোরে সে প্রলাপ বকে অনেক সময়।

শেষে একদিন এল সাঁতাই;—রজনীর জাল ঠেকল ভারী। দারুণ আশা নিয়ে সে টানল। চক্ষুকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যখন দেখল জালের মধ্যে বেশ বড় রকমের একটি ইলিশমাছ ছটফট করছে। আনন্দ আমোদের চোটে হাত তালি দেয়। রজনীর ঠোঁটে ফুটে উঠে হাসির রেখা। আনন্দ মাছটিকে তুলে চড়াটের নীচে রাখে। ও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে,—"কত হতে পারে বেচলে, বাবা?" ভ্রু দু'টি একটু কুঞ্চিত করে বলে,—"এই দশ আনা বার আনা হবে।" গাম্ভীর্য্য ছাপিয়ে উৎফুল্লতার আভাষ রজনীর ভাব-ভঙ্গী, কথা বার্ত্তায় প্রকাশ পায়। কিন্তু আনন্দর মনে হয় এ দাম খুবই অল্প। এ রকম সুন্দর মাছটি এত অল্প দামে বিক্রী করে দিতে ওর মনে মনে রাগ হয়।

বাজারের পথে যেতে যেতে আনন্দর কি যেন মনে হয়, ও বলে,—"বাবা চল না বাড়ী হয়ে, দিদিকে দেখিয়ে নিয়ে যাব একবার।" আমোদের ভাগ দিদিকে না দিতে পারলে আনন্দর ভাল লাগে না।

রজনী আনন্দর অনুরোধ ফেলতে পারে না। মাছ নিয়ে তারা বাড়ীতে আসে। খুশীতে শ্যামলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রাণ-ভরা আশা নিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলে,—"বাবা, তাহলে আঙুর এন আজকে।" রজনীর মুখেও হাসি। শ্যামলীকে আদর করে আশ্বাস দিয়ে বলে,—"নিশ্চয়ই! আংগুর তোর জন্য আনবই আজকে, ওষুধও আনব।"

পথে যেতে যেতে রজনী ভাবে সস্তায় যদি দুটো কমলা [illegible] তা-ও আনবে। শ্যামলী কতদিন হল কিছুই এক রকম খায় না। বার্লি ও খেতে পারে না। রজনী আবার ভাবে শ্যামলী তাকে কি ভালই বাসে, আর কি বাধ্য তার। মার কাছে মার খেয়ে শ্যামলী ছুটে এসে তার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদে।......

শ্যামলীর জন্য আজ ওষুধ এবং পথ্য দুইই আনবে......

রজনী বাজারের দিকে এগোতে থাকে। ইলিশমাছের তখন ভারী অভাব, তাই দরও খুব।

প্রায় বাজারে পেঁৗছে গেছে, এমনি সময় রজনী দেখতে পায় বাবুর বাড়ীর বড়কর্ত্তা তেল মেখে গামছা কাঁধে করে স্নান করতে আসছেন নদীতে। জেলে, কৃষক, দোকানদার হতে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সবই প্রায় বড়কর্ত্তার কাছে সুদে টাকা ধারে। মামলা মোকদ্দমা, জাল, জালিয়াতীতে বড়কর্ত্তা একেবারে সিদ্ধহস্ত। তার টাকার সুদ অসম্ভব গতিতে বেড়ে চলে। তার খপ্পরে যেই পড়েছে মরণ ছাড় আর কিছুতেই নিষ্কৃতি সে পায়নি। রজনীও কয়েক বছর আগে খুব বেশী অভাবে পড়ে পঁচিশটি টাকা কর্জ্জ করেছিল। সেই টাকা সুদে আসলে বেড়ে পেঁৗচেছে এখন সাড়ে চারশয়ে।

বড়কর্ত্তাকে দেখে দূর থেকে রজনীর সব আশা এক মুহূর্ত্তে শুকিয়ে গেল। আনন্দর হাত থেকে মাছটি নিয়ে একটু আড়াল ক'রে তাড়াতাড়ি যাবে, এর মধ্যে বড়কর্ত্তার গলা শোনা গেল,—"আরে রজনী নাকি? দাঁড়া, দেখি কেমন মাছটা ....ছাড়্না।" ধমক দিয়ে আনন্দর অনিচ্ছুক হাত থেকে একরকম মাছটি কেড়েই নিলে। "বাঃ! বেশ মাছটি ত পেয়েছিস্। খাসা! ভালই হল, ইলিশমাছ খাবার ইচ্ছে অনেক দিন থেকে হচ্ছিল। তা তুই-ই শেষ পর্য্যন্ত খাওয়ালি" —বলে বড়কর্ত্তা আন্তরিক তৃপ্তির সঙ্গে হাসলেন।

আনন্দর রাগ হতে লাগল। অন্য উপায় না দেখে তার ইচ্ছে করছিল কেঁদে গড়িয়ে পড়তে রাস্তার কাদার মধ্যে।

রজনীর বুকে যেন পাথরের ভার চেপে বসেছিল। অনেক ইতস্ততঃ করে একটু আপত্তি করল, "বড়কর্ত্তা, ও মাছটা বিক্রী করব—"। ঠাট্টার ভঙ্গীতে এবং গম্ভীরভাবে দাঁতমুখের এক নিষ্ঠুর বিকৃতি করে, মাছটির রক্তমাখা কানকোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে চলে যেতে যেতে বড়কর্ত্তা বলে গেল,—"চুপ কর, ব্যাটা! টাকার নামে নেই খোঁজ। ওর বাপের বয়সে টাকা দেবে কিনা সন্দেহ।—তার সামান্য একটা মাছ, তাই সখ করে নিতে গেছি বলে কি না বিক্রী করবে।"

চলেই যাচ্ছিলেন। একটু থেমে ফিরলেন। পরে কোমরটা একটু সামনের দিকে বাঁকা করে বাঁ হাতের বদ্ধ মুষ্টিটা একটু উঁচু করে একটি ঝাঁকির সঙ্গে বললেন,—"ব্যাটা, তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি না যে, বড়কর্ত্তা আজ তোর কাছে মাছ চেয়ে নিলেন?"

রোষারিত লোচনে পা ফেলতে ফেলতে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আনন্দ বলে,—"মাছ তুমি কেন দিতে বললে বাবা?" রজনীর চোখ বুজে আসে। কোন উত্তর না দিয়ে তার বদলে একটু হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসিটা খুবই ক্ষীণ এবং

(শেষাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিমান অভিযান

(সমর-তাণ্ডব-প্লাবিত স্পেনের একটি চিত্র)

শ্রীঅমলা গুপ্তা

মনস্তুলান সাঝের আমেজ। সৌম্য, শান্ত, স্তব্ধ। অভ্র-ধবল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের গায়ে লেগেছে অস্তায়মান রবি-ছবির রাম-ধনু-রঙিন অনুরাগ-মায়া। মখমল-লালের নিবিড় লুকোচুরির নীল পর্দাখানিতেও রক্তিম ছোপের আলপনা এঁকে দিয়েছে। প্রকৃতির চলচ্চিত্র ফুটে উঠেছে অপরূপ বর্ণ-সুষমায় মহাশূন্যের গায়ে।

শহরের আওতার বাহিরে প্রান্তর ছেড়ে দিয়েছে আপন সত্তাকে দিকে দিকে প্রসারিত করে—বল্গাহীন অশ্বের মত—দিগন্তের সঙ্গে চিরমিলনের মধুর পুলক-স্পন্দনে।

বোমা-বৃষ্টি আর শেল-বিস্ফোরণ প্রান্তরের বুকটিকে করে ফেলেছে শতচ্ছিদ্র—যেন ওর অন্তরের মণিকোঠাটির আবিষ্কারে। কিন্তু সে গোপন মরম-কোণটি রয়ে গেছে চির লুক্কায়িত।

তারই মাঝে মাঝে উঁকি মারছে নিপুণ হস্তের স্নেহ-পরশে লালিত দুই চারটি বিনের (bean) লতা। বৃদ্ধ পেড্রো, যে নাকি ফেলে এসেছে জীবন পশ্চাতে, তার শীর্ণ হস্তের দরদ আর কি বেশী রস পরিবেশন করতে পারে! যেখানে ছিল হাজার হাজার সারি বিনের লতা—সেখানে অন্তত একটি সারিকে সজীব করে তুলতেই বৃদ্ধের প্রয়াস। যুগে যুগে কতবার এরকম প্রয়াসই তো করেছে পেড্রো জীবনভর' আর বিধাতা নির্মম আঘাতেই তা নিশ্চিহ্ন করেছে বারে বারে। তবু পেড্রো করবে না পরাজয় স্বীকার—করবে না শির নত, ছেড়ে দেবে না তার একদা-বৃহৎ-অধুনা-ক্ষুদ্র সংসারের হাল।

মাটি—স্পেনের সোনা-মাটি আজ শুষ্ক, প্রাণহীন, কিন্তু শাশ্বত সোনার বরণ তার মলিন হয়নি। উগ্র বিস্ফোরকের মর্মান্তিক বজ্রনিনাদে এ সোনালী মাটির রস-গন্ধ-সৃজন-প্রতিভা সকলই আজ নিঃশেষে শোষিত।

এমন কি, সমর সংঘর্ষে হতাহতদের হৃদয়-রক্তের অফুরন্ত প্লাবনেও এর উর্বরতা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি।

দিগ্‌দাহী সমর-শিখা আলেয়ার মত চকিতে এসে ঝলসিয়ে দিয়ে গিয়েছে এখানকার অন্তর বাহির। আজ সমর এগিয়ে গিয়েছে বহুদূরে, কিন্তু আর তাকিয়ে দেখেনি পশ্চাতে।

বৃদ্ধ পেড্রো শত-কুঞ্চিত চোখের পাতা মেলে ধরে একবার তাকায় আকাশের দিকে, পর মুহূর্তেই অবনত মস্তকে আপন কাজে মন দেয়। বাতে পঙ্গু বৃদ্ধের শিরতোলা হাত হতে অতিকায় নিড়ুনী দাওলিখানা ফসকে পড়ে যায়—সৈনিকদের ফেলে যাওয়া সঙিনটিকে পিটিয়ে বাঁকিয়ে গড়ে নিয়েছে সে দাওলি, নইলে আর অস্ত্র পাইব কোথা! বিমান-বোমা আপন কর্তব্য সাধন করেছে নিখুঁতভাবে—যাতে বৃদ্ধের আপন বলবার মত তৃণটুকু পর্যন্ত না থাকে—সে ব্যবস্থা ওরা করে গিয়েছে নিতান্ত কঠোরভাবে।

[illegible] শিং ঝিঁঝিটি [illegible] করে নিয়েছে যে অদ্ভুত আঁচড়া-[illegible] [illegible] [illegible]

যখন ওটাকে কাঁধে ফেলে পেড্রো আস্তানার দিকে পা ফিরাবে দিনের কাজ সারা করে—ঐ শহর-মুখো।

আহা, বেচারী জরাজীর্ণ পেড্রো!...সকাল থেকে সাঁঝ অবধি মাঠে মাঠে খেটে রক্ত জল না করে, আজ তার আরামে বাগানের বড় গাছটির ছায়ায় বসে তৃপ্তির পাইপটি টানবার কথা। সেই ছেলেবয়স থেকে যারা তার ইয়ার, তাদের জড়ো করে ঘরে-তৈরী মদ্য পান করতে করতে গিন্নি ডেম্ পেড্রোর অনুযোগ শত-সহস্রে বিব্রত হবার কথা।

অপয়া লড়াইটাই তো যত নষ্টের মূল, নইলে আজ পেড্রোর স্থানে পেড্রোর ছেলেই আসতো মাঠে—পেড্রো থাকতো মজলিশে ডুবে।

কিন্তু লড়াইটা এনেছে সে সব রঙিন আশার সমাধি। ছেলেটি তার নেহাৎই অকালে—বেপরোয়া যৌবনের উম্মাদনার ঝোঁকেই মহাযাত্রা করেছে সেদেশের উদ্দেশে, যেখান থেকে কেউ আজও ফিরে আসতে পারেনি।

....

ছেলে তার রোগে ভুগে প্রাণ হারায় নি—বীরের মত, দেশভক্ত সন্তানের মত মরেছে মাদ্রিদ শহরটি রক্ষার অটল পণে। মাদ্রিদ—পেড্রো শুধু তার নামই শুনেছে—এত দূরে, যেন কোন সুদূর বিদেশে। মাদ্রিদ—বৃদ্ধ পেড্রোর কাছে এ শহরটার অস্তিত্ব কোনকালে না থাকলেই যেন সঙ্গত হ'ত। মাদ্রিদ বৃদ্ধের কাছে অর্থশূন্য গুরুত্বহীন নাম মাত্র। আর তার জনাই সঁপে দিতে হয়েছে প্রাণের পুতলী পুত্রটিকে।

পুত্রের অশ্রুমাখা স্মৃতিকে আরও নিষ্করুণ করে তুলেছে। বিধবা পুত্রবধূটি গার্কিয়া আর তার শিশুকন্যা বেলা-রোজা। জরাবক্র পেড্রো ছাড়া ত্রি-সংসারে তাদের আর কেউ নেই। তাই বৃদ্ধ পেড্রো অনশনের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাতদিন বুকের দাব-দাহ নির্বাপিত করতে চায় দেহ-ঘর্মের দুর্ভাগ্য প্রবাহে।

আবার পেড্রো তার বার্ধক্য-ক্ষীণ চক্ষু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আকাশের গায়। আর এক ঘণ্টায় আঁধার ঘনিয়ে আসবে নিবিড় হয়ে—বৃদ্ধের কাজ চালান হবে অসম্ভব।

শুষ্ক ঠোঁট দুটি সিক্ত করে নেয় জিভ দিয়ে। গার্কিয়া আর শিশুটির মাঠে আসবার তো সময় হয়েছে—তারা নিয়ে আসবে এক বোতল জল আর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যা কিছু আছে অবশিষ্ট।

চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে বৃদ্ধ তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয় শহর থেকে আসবার পথের ধূলায়। শাদাপানা কি যেন চমক দিয়ে মিলিয়ে যায় তার চোখের সম্মুখে। নিশ্চয় দিগন্ত রেখায় ও-অবছা শাদার কম্পিত আবির্ভাব গার্কিয়ার এপ্রনের সূচনা করছে। শিশুকন্যাটি হয়তো মাতার হাত ধরে চলে আসছে লাফিয়ে লাফিয়ে মেষশিশুর মত নাচা-কুঁদার ভঙ্গীতে—বোমা আর শেল-এ কাটা প্রান্তরের বুকের প্রতিটি গর্ত পার হয়ে।

[illegible]

উৎফুল্ল ইসারাও জানায় না তুলে ধরে। কাজ—কাজ—কাজ, কত কিছু করবার রয়েছে বোমা-বিদীর্ণ এ বিনের ক্ষেতে।

না—এ তো গার্কিয়ার কণ্ঠস্বর নয়—যদিও ততক্ষণে সে এসে পড়েছে অন্তত তার চীৎকার শোনা যাবার গণ্ডীর ভিতরে। না—এ যে একটানা গুন-গুনানী, পেড্রোকে তৃতীয়বার বাধ্য করলো আকাশের দিকে চক্ষু ফিরাতে। তার পর কান পেতে কানের পেছনে হাতের চেটো বাটিপানা করে ধরে ক্ষীণ অস্পষ্ট সে গুন্ গুন্ শব্দ সঠিক ঠাওরাতে চেষ্টা করে পেড্রো। পেড্রোর মনে হয়, শহরের মাথার উপরকার নিবিড় মেঘের স্তূপে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা আরও গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।

প্রতি নিমেষে শব্দটা হতে থাকে জোরাল।

সহসা মহাশূন্যে বাজ পাখীর মত দেখা দেয় একটা বোমা-বর্ষী বিমান। নিছক ক্ষুদ্র বাজ পাখী একটি—কিন্তু সারাটি আকাশ ভরে গেছে তারই ডানা থেকে উত্থিত গর্জন-মুখর মরণ-গানের বিচিত্র একঘেয়ে সুরে।

বাজ পাখীটা বড় হয়, গর্জনও উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে যায়।......

বিমানধ্বংসী কামান প্রেরণ করে উচ্চে তার অগ্নি-বিষ শ্রাপ্‌নেলের আকারে—শহরের অপর সীমান্ত থেকে। শেল্-গুচ্ছ মহাশূন্যে ফেটে বরফের ভাঁটার মত ছড়িয়ে পড়ে শাদা ধব্‌ধবে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে।

বিমানটা যেভাবে শেলগুলোকে অগ্রাহ্য করে চলেছে, তাতে সত্যি মনে হ'ল পেড্রোর যে, ও-ভাঁটাগুলো তাহলে বুঝি তুষার-জমাট-করা নিশ্চয়।

পাখীর মত ডানা কাত করে এক ঝাপটায় বিমানটা নেমে এল নীচে শহরের বাড়ীগুলোর ছাদের ওপর—বেশী হলে হবে ছাদ থেকে দুশ ফুট তফাতে। চক্র দিয়ে যেতে যেতে শহরতলীর যে অঞ্চলটায় পেড্রোদের বাস, সে-বরাবর উঠল আগুনের একটা বিস্তৃত জিহ্বা—কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধূম—রক্ত-জল-করা একটা বিষম কোলাহল।

প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে প্রবল একটা ঘূর্ণিবাত্যা ছুটে এল—ধোঁয়ায় ধুলোয় চারদিক আঁধার করে। বৃদ্ধ সে প্রবল তোড়ের মুখে স্থির থাকতে পারলো না দাঁড়িয়ে—তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিয়ে গেল যেন কাঁধে চেপে ধরে।

পর মুহূর্তেই পেড্রো অতি কষ্টে টলতে টলতে উঠে পড়লো। চোখ থেকে ধুলোর পুঞ্জ ঝেড়ে-পুঁছে ফেলতে ফেলতে উন্মাদের মত তাকাতে লাগলো—গার্কিয়া আর শিশুটির সন্ধানে।

এক ঝাপটা বাতাসকে অনুসরণ করে অন্য ঝাপটা এসে পড়বার ফাঁকে পেড্রো দেখতে পেল পুত্রবধূকে। প্রায় তিনশত গজ দূরে গার্কিয়া শিশুটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে ছুটে আসতে চেষ্টা করছে পেড্রোর দিকে প্রতি পদে হুঁচোট খেতে খেতে।

'শুয়ে পড়। শুয়ে পড়!'—আপ্রাণ চেষ্টায় বৃদ্ধের ওষ্ঠ থেকে এ কথাকটি মুক্তি পায়। তখনই একটা প্রবল ঝড়ো হাওয়া ক্ষেত থেকে ঝুরো মাটি তুলে পেড্রোর মুখে পুরে দিল—কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল। এক নিমেষ—এরই মধ্যে গার্কিয়া আর শিশু-[illegible] আড়ালে পড়েছে।

শহরের মাথার ওপর দিয়ে বিমানটা বিকট চীৎকার আর গর্জন করে চলেছে। বোমা বিস্ফোরণের উচ্চ রোলের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছে বিমানের সেই একটানা গর্জন।

সহসা যেন গর্জন ঝিমিয়ে গেল...আবার দ্বিগুণ গর্জন সুরু হল...আবার যেন গর্জনে লেগেছে স্তব্ধ শিহরণ...সহসা আবার থেমে থেমে নতুন সুরের উদ্ভব...বিষম আলোড়নের শব্দ...আবার নীরবতা...আবার একটা অগ্নিশিখার সশব্দ কম্পন...

মনে হ'ল পেড্রোর বিমানটার যেন নাভিশ্বাস উপস্থিত—তাই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে কিছু সময় অন্তরে অন্তরে...

ব্যাপারও ঘটেছে তাই। শ্রাপ্‌নেল থেকে একটা চিল্‌ বিমানের পেট্রলবাহী পাইপকে করেছে খণ্ডিত, পাইলট তাই বিমানকে ছুটিয়েছে প্রান্তরের দিকে—আর ভূমি স্পর্শ করবার আগে ক্রম-হেলান অবস্থায় লম্বা ছুট্‌ দিয়েছে সংঘর্ষটা যাতে হয় হাল্‌কা।

'বাবা! বাবা! কোথায় তুমি?' আতঙ্কে বিকৃত গার্কিয়ার ভগ্নস্বর ভেসে এল যেন আঁধার রাতে ভূতের গলা। ধুলোর ঝড়ে সে ধ্বনি মিলিয়ে গেল উত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে।

'শুয়ে পড়! শুয়ে পড়!'

বিমানের ঘর্ঘর শব্দ তেমন কানে বাজে না, তবু বৃদ্ধ যেন মাথার ওপর শূন্যে কোথাও শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে—যেমন শব্দ হয় বেগবান কোন বস্তুর হাওয়া ফুঁড়ে যেতে।

শোঁ-শোঁ শব্দটা ক্রমে ঘনিয়ে আসছে কাছে।

পাইলট তার বেসামাল বিমানকে বাগ মানাবার বৃথা চেষ্টায় শেষ বোমাটিকে ছেড়ে দেয় আয়ত্ত থেকে।

প্রান্তরের বুকে নেমে আসে প্রলয় ভূকম্প—নিদারুণ দোলা সমগ্র পৃথিবীশুদ্ধ তোলপাড়।

বৃদ্ধ পেড্রো শোঁ-শোঁ শব্দ কাছে শুনেই একটা গর্তের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। যখন বাত্যা-তাড়িত ধূলিকণার কানাকানি মিলিয়ে গেল নিথর স্তব্ধতায়, তখন বৃদ্ধ হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গর্ত থেকে—তখনও তার আঁচড়া-যন্ত্রটি লম্বা হাতলসহ কাঁধে রয়েছে। যেদিক থেকে গার্কিয়ার কণ্ঠ-স্বর ভেসে এসেছিল বলে তার বিশ্বাস সেদিক উদ্দেশ করেই পেড্রো চললো।

সারা অঙ্গ যেন তার অসাড়—ব্যথা-বেদনাহীন—কিন্তু একটা কম্পন ঠেলে উঠছে তার বুকের ভিতর থেকে। অমানুষিক উত্তেজনায় তার সকল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে আপন সত্তা—কোন্ সুদূর হতে যেন শুধু একটা প্রেরণা এসে ক্ষণে ক্ষণে তার মগজে দিচ্ছে হুল ফুটিয়ে—গার্কিয়া—গার্কিয়া...

চরম কষ্টসহিষ্ণু পেড্রোর বাস্ক প্রকৃতি—বাস্কের স্বাভাবিক দৃঢ়তা বৃদ্ধকে অবসাদ নির্জীবতার মধ্যেও সচল করে তুললো। সমগ্র দেহকে পাপের থলের মত বহন করে বৃদ্ধ পা-পা এগুতে লাগলো।

যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে তার মনে হ'ল বোমা যেখানে পড়েছে ধোঁয়ায় ঢাকা সে গর্তটা খুঁজে বার করতে। বিকৃত মস্তিষ্কের মত সে দুহাতে সে গর্তের মাটি সরাতে

লাগল—জানোয়াররা যেমন করে থাবার আঁচড়ে মাটি তুলে ফেলে।

কি একটা নরম জিনিষে তার আঙুল ঠেকলো। জিনিষটাকে তুলে নিয়ে এল পেড্রো। তারপর তার ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সমুখে মুখের কাছে ধরলো।

ন্যাকড়ার পুতুল একটা। পাশের ফুটো দিয়ে কাঠের গুঁড়ো ঝর ঝর করে পড়ে গেল মাটিতে—পুতুলটার মুখটা রক্তে রাঙা! .....আর কোন কিছুরই সন্ধান নেই সেখানে—আশে পাশে কোথাও!

কাঁধের আঁচড়াটা দিয়ে পাগলের মত পেড্রো মাটি ওলট পালট করে ফেললে সেখানটায়। স্তূপে স্তূপে মাটি জমায়েত হ'ল গর্তের মুখে, কিন্তু খোঁজ মিললো না পুত্রবধূর আর শিশুটির!

অতি ধীরে রোমাঞ্চিত দেহ তার সোজা খাড়া করলো পেড্রো—বৃথা-বৃথাই অনুসন্ধান! বিমানটা একটু দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যেখানটায় একটু আগে পেড্রো নিরত ছিল বিনের সারিটির পরিচর্যায়। লেজটা উঁচু হয়ে আছে বাতাসে পবিত্র ক্রুশের আকারে যেন যত নর-নারীকে হত্যা করেছে, তাদের সমাধিস্থান চিহ্নিত করে।

পেড্রো তাকাল ওটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে, বিষাদ-পীড়িত কৌতূহলের আবেগহীন নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে। যেতে হবে তাকে ওটার কাছে।

পদদ্বয় দেহের ভার বহে না, তবু সে মাতালের মত এগিয়ে চলে।

সংজ্ঞাহীন পাইলট পড়ে আছে—দেহের অর্ধ আসনে, বাকি অর্ধ একপাশে এলায়িত। বাতাসে পেট্রলের সুতীব্র গন্ধ—পাইপ থেকে তখনও ঝরে পড়ছে পেট্রল, আর ছড়াচ্ছে চারপাশের মাটিকে একেবারে সিক্ত আর্দ্র করে। এঞ্জিনের ভিতর ক্ষুদ্র একটি নীল শিখা মিট মিট করছে—এখনই হয়তো ঝরে-পড়া পেট্রলের স্পর্শে এসে যাবে।

শেষ শক্তি-বিন্দু সঞ্চয় করে পেড্রো পাইলটের দেহ টেনে আনে আসন থেকে। পেট্রল-সিক্ত মৃত্তিকার সীমা হতে অনেকটা দূরে এনে শুইয়ে দেয়। লোকটার পোষাক ধরে টেনে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

সেই মুহূর্তেই আগুনের শিখা পড়ন্ত পেট্রলের নাগাল পেয়ে লক্ লক্ জিভ্ বাড়িয়ে দেয় সশব্দে। সে শব্দ আর তাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, পেড্রো তাপ এড়াবার জন্য পাইলটের বুকে নিজ মুখখানি চেপে ধরে।

মৃদু অস্ফুট স্বর তার কানে ভেসে আসে—'মাদ্রে দি দিয়স্! মাদ্রে দি দিয়স্! আমায় বাঁচিয়েছ ভাই। ও-আগুনে কুণ্ড থেকে—নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আমায় বাঁচিয়েছ।'

বলবার ভঙ্গী—বিদেশী ভাষার অপরিচিত উচ্চারণ সুর জাগিয়ে তোলে পেড্রোর অন্তরে [illegible]। এই লোকটা—এ-ই তো হত্যা করেছে গার্সিয়াকে, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে শিশু-কন্যাটিকে...প্রতিশোধ চাই...পেড্রোও হত্যা করবে...

ব্যস্ততার আতিশয্যে আঁচড়ার হাতল বাগিয়ে ধরতে পেড্রো টলে পড়লো পেছন দিকে। আবার দাঁড়িয়ে উঠে আঁচড়াটি হাতে তুলে নিল—রক্তসিক্ত পুতুল যা এতক্ষণে সে বহন করে এনেছে, পড়ে রইল মাটিতে।

ঠিক হয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আঁচড়াটি উঁচিয়ে তুললো মাথার ওপর। এর হাতলটা আর পিচ্ছিল নেই, ঘর্ম-সিক্ত অঙ্গের ওপর পড়েছে ধুলো-বালির প্রলেপ; দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে পেড্রো আঘাত করতে উদ্যত হ'ল।

কিন্তু আঘাত করা তার হ'ল না। লোকটা যে চোখ বুজে আছে। ঠোঁট দুটো থেকে বিড়্ বিড়্ করে অবিরাম প্রার্থনার মৃদু বাক্যস্রোত নির্গত হচ্ছে, কিন্তু চোখ দুটি মুদিত।

পেড্রো অপেক্ষা করতে থাকে—চোখ খুলুক। পেড্রো চায় লোকটা চোখ মেলে দেখুক পেড্রো তাকে আঘাত করছে।

অবশেষে পাইলট চোখ মেলে তাকাল—পরিষ্কার দেখতে পেল ঘূর্ণায়মান উদ্যত দণ্ডটি। প্রাণের আশায় সে কি আকুতি—সে কি কাতর জীবন-ভিক্ষা—শেষ সেই শক্তিও তার স্তব্ধ হ'ল—বাক্য অস্ফুরিত রয়ে গেল জিহ্বাগ্রে—আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় আক্ষেপ উপস্থিত হ'ল তার অঙ্গে অঙ্গে মৃগীরোগীর মত।

তথাপি পেড্রোর উদ্যত আঘাত নিপতিত হ'ল না।

লোকটা সাহস সঞ্চয় করলো—ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বিদেশীর অপটুউচ্চারিত কাকুতিতে আবার বাতাস ছেয়ে গেল।

অকস্মাৎ পেড্রোর নজর পড়লো পাইলটের মুখের ওপর—তরুণ মুখখানি—অতি কাঁচ ঢলঢল গাল দুটি। মনে পড়ে গেল পেড্রোর আপন পুত্রের মুখখানি—মনে পড়ে গেল, এমনি করেই হয়তো সে তার যৌবন-চঞ্চল প্রাণটি বিসর্জন দিয়েছে মাদ্রিদের অবরোধ-প্রাকার পার্শ্বে।

তখন সহসা উদ্যত অস্ত্র পতিত হ'ল। পাইলটের বক্ষে নয়—শুষ্ক মৃত্তিকা-বক্ষে শায়িত পাইলটের পার্শ্বে।

দ্রুত নত হয়ে বৃদ্ধ পেড্রো শতছিন্ন ন্যাকড়ার পুতুলটি হাতে তুলে নিল—পাইলটের জামার বোতাম খুলে ঠিক তার বুকটির কাছে গুঁজে দিল হত্যার সে নিদর্শনটি। তারপর আবার বোতাম এঁটে দিয়ে নির্বাকে আঁচড়াটিকে কাঁধে ফেললে।

এক মুহূর্ত পেড্রো আর সেখানে অপেক্ষা করলে না—আপন মনে বিড়্ বিড়্ করতে করতে এগিয়ে চললো ধোঁয়ায় ঢাকা শহরতলীর দিকে।

তখনও তার কানে ভেসে আসছিল পাইলটের আক্ষেপ-বাণী—তার ডুকরে কান্না।

মনজুলান সাঁঝের রূপায়ন তখনও স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত।

---

* Air-Raid নামক ছোট গল্পের অনুবাদ।

নূতন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত

জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কোন একটা জাতির হৃদয় যখন যুগ যুগ সঞ্চিত নানা ব্যথা, নানা কথা, নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার অপ্রকাশিত বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া যায়, তখন তাহার একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে কোন একজন মানুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সমগ্র জাতির অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে রূপ দেবার জন্যই হয়ত তিনি জন্মলাভ করেন। সমগ্র জাতির অন্তরের বেদনা, যাহা বাণীহীন আকুলতায় পথ থাকে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত। জাতি মুক্তের বন্ধন হইতে খুঁজিয়া মরিতেছিল, তাহার লেখনী অগ্রে তাহা প্রকাশিত হইতে মুক্তিলাভ করে, আর তার হৃদয়ে জাগে একটা দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা।

ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে এমনিতর এক একজন মানুষ আসিয়া সমগ্র জাতির প্রাণে এক একটা আইডিয়ার প্রেরণা দিয়াছে, আর সমগ্র জাতি দেখিতে দেখিতে সেই প্রেরণার মাঝে লাভ করিয়াছে নবজন্ম। রুসো আর ভল্‌টেয়ার, লেনিন আর গোর্কি, বঙ্কিম আর ম্যাজিনি—এরা সকলেই সেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং নবযুগের প্রবর্ত্তক।

যে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষের বহ্নিশিখা সহসা একদিন আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতির অন্তরে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহার পর একদিন সেই আইডিয়ার তড়িত স্পর্শে সহসা তাহা দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত রুশিয়ার হৃদয়ের তলে তলে সঞ্চিত হইতেছিল বিদ্রোহিতার অগ্ন্যুৎপাত, সেই আগুন উদ্গিরণ করিতে সুরু করিল সেই দিন যেদিন লেনিন আসিয়া অধিকার হারা রুশিয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিলেন, Land to the peasants, Bread to the starving and peace to all men. দেখিতে দেখিতে সমগ্র রুশিয়া নূতন গরিমায় জগতের মাঝে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল। রুসো আসিয়া বলিলেন, Liberty, equality and fraternity [illegible] বাণী। ম্যাজিনি আসিয়া ঘোষণা করিলেন Italian Republic এর মহামন্ত্র। আর বঙ্কিম শুনাইলেন, 'বন্দে মাতরম্'।

এমনি করিয়া যুগে যুগে, কালে কালে, দেশে দেশে, এক একজন মানুষ আসিয়া এক একটি জাতির প্রাণে এক একটি আইডিয়ার প্রেরণা দিয়াছে, সমগ্র জাতির চিন্তা-জগতে উঠিয়াছে ঝড়, বিপ্লবের পাগল করা আইডিয়া তাহার রক্তে জাগাইয়াছে সর্ব্বনাশের নেশা।

আইডিয়া ব্যতীত যেমন জাতি প্রেরণা লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ উপযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি না হইলেও সেইরূপ আইডিয়া জাতির প্রাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। গোর্কি যদি 'মাদার' না লিখিত, জোলা যদি 'জার্মিনাল' না লিখিত, তাহা হইলে আপামর জনসাধারণের নিকট ঐ সকল আইডিয়া হয়ত [illegible] হইয়াই থাকিত। তাই সাহিত্যে সহজ সরল [illegible]। আইডিয়াকে সার্থক করিতে, জাতির দিতে সাহিত্যের একান্ত প্রয়োজন আছে। সকল দেশেই বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাশি রাশি সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জাতি যা চাই, সমাজ যা চাই, মানুষের যাহা প্রয়োজন তাহারি প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইয়াছে সাহিত্যে, কবিতায়, চিত্রে, ভাস্কর্যে।

আমাদের সম্মুখে আজ যে আইডিয়া নূতন মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিয়াছে সেই আইডিয়াকে সার্থক করিতে নূতন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। যে বিপুল ভাবধারা মধ্যযুগ হইতে বর্ত্তমানে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই সকল সাহিত্যের মধ্যে আমরা বর্ত্তমান সমস্যার তেমন সমাধান পাই না। অথচ সে যুগের সাহিত্য-রসের সৃষ্টি অতুলনীয়। কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, সাহিত্য সৃষ্টির মূল লক্ষ্য কি? ইহা মানুষের যাহা প্রয়োজন, জাতির যাহা প্রয়োজন, তাহাই সুন্দরভাবে কথায় ফুটাইয়া তুলিবে, না জাতি সময় ও সকল সমস্যার ঊর্দ্ধে সাহিত্য নিত্যকালের জন্য শুধু আনন্দ-রস সৃষ্টি করিবে? রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পৃথিবীকে সেই আনন্দ-রসই পরিবেশন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার চিন্তা কোন দেশ, কোন জাতি বা কোন সমস্যাতে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই সুতরাং তাহা নিত্যকালের এবং সেই জন্যই তাহা চির সবুজ, চির নবীন শরৎচন্দ্রও সেই আদর্শ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আদর্শটি যে অত্যন্ত সুন্দর এবং মহান তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, কোন সাহিত্য যদি ক্রমশ মানুষের বাস্তব জীবন হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, জাতি যদি প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে তাহাকে না পায়, তাহা হইলে সকল সময়ে জাতির নিকট তাহা মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের হৃদয়ের যোগসূত্র এক প্রকার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। নতুবা এত বড় একটা জাগরণের ঢেউ সারা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, অথচ ভারতীয় সাহিত্যে তাহার কোন ছাপ নাই, এত বেদনা স্তরে স্তরে সমাজের বুকে জমিয়া আছে, কিন্তু কোথাও তাহার বলিষ্ঠ প্রকাশ নাই। কোথায় সে সাহিত্যিক, কোথায় সে বাণীসাধক, যে জাতির এই পুঞ্জীভূত বেদনাকে অন্তরের অসীম দরদে রূপ দিবে? যে কথা আজ লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ঘরে অজ্ঞতার নিগূঢ় অন্ধকারে গুমরাইয়া মরিতেছে, যে অসহায় আর্ত্তনাদ আজ কোটি বক্ষে তুফান তুলিতেছে, কে সেই অন্ধকার ঘরের বিলুপ্ত গুমরানিকে জাতির বুক হইতে ছিনাইয়া আনিয়া জাগরণের বাণীতে পরিণত করিবে? অসহায়ের ব্যর্থ আর্ত্তনাদকে নবজীবনের মহাসঙ্গীতে রূপ দিবে সে কে? যৌবন আজ মুমূর্ষু, দেশ আজ বিপন্ন, মানুষ আজ লাঞ্ছিত, অন্ন আজ দুর্লভ, মৃত্যু আজ জীবনের সাথী, কিন্তু কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সেই আইডিয়ার পাগল-করা বাণী, মানবত্বের দাবীর সে বলি

গল্প আর গল্প, শুধু ভুয়া প্রেমের গল্প শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গেল। অধিকাংশ গল্প আর উপন্যাস লেখকেরা আকাশতত্ত্ব দেহতত্ত্ব আর প্রেমতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত আছেন, আর কবিরা কোন প্রেমিকার প্রেমে পড়িয়া অবশেষে হতাশ হইয়া সেই ব্যর্থ প্রেমিকার উদ্দেশে নাকিসুরে অনুবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। সাহিত্যের মাঝে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যাগুলি যোগ্য স্থান পাইতেছে না।

তাই বলি নিত্যকালের রসসৃষ্টি আপাততঃ থাক কিছু-দিন বন্ধ। আকাশতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব আর প্রেমতত্ত্ব লইয়া লিখিবার সময় আমরা অনেক পাইব। আজ আমরা যেটুকু ভাষা পাইয়াছি, তাই দিয়া এস সকলে দেখি জল পাই নাই বলিয়া তৃষ্ণায় কে কাঁদিতেছে, অন্ন নাই বলিয়া কোথায় মানুষ মরিতেছে, আঘাত করিবার সাহস নাই বলিয়া আঘাত সহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতেছে। এস বন্ধু, যেটুকু ভাষা পাইয়াছি তাই লইয়াই আমরা প্রয়োজনের রাজ-পথে বাহির হইয়া পড়ি।

আমাদের সাহিত্য আজ হোক তৃষ্ণার জল, ক্ষুধিতের অন্ন, অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, অন্ধের যষ্টি, অত্যাচারের প্রতি-কার। আকাশের তারা আর বনের ফুল আমরা অনেক উপভোগ করিয়াছি, এখন উপভোগ করিতে চাই স্বাধীন বিশ্বে মানুষের অধিকার। আকাশের তারা আর বনের ফুলকে উপভোগ করিবার মানুষকে বাঁচাইতে চাই।

আঙুর

(৪৩ পৃষ্ঠার পর)

কৃত্রিম হয়ে যায়। মুখের উপর তার একটা স্পষ্ট বিশ্রী কারুণ্যের ছাপ ফুটে ওঠে।

আনন্দর কেমন লাগে। অসহায় মনে হয়। অবুঝভাবে ও বায়না ধরে, বাড়ী যাবে না। শেষ পর্য্যন্ত রজনীর মারতেই হল তাকে একটা চড়। চোখে জলের ধারা রজনী লুকোতে পারে না।

শ্যামলী তারপর আর দুটো দিন মাত্র জীবিত ছিল। তাও কেবল প্রলাপ বকেছে—সব ভুল, অসংলগ্ন। মরার দিন সকাল বেলায়ও ও রজনীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল,—"বাবা, আঙুর আনলে না?" উত্তরে রজনী শুধু শ্যামলীর হাত দুখানি চেপে ধরেছে। হতাশ বিষাদের অসহ্য আবেগ ফিরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করে ঠোঁট কামড়িয়ে ধরেছে জোরে। বড়কর্ত্তার দাঁত মুখ খিঁচান মুখখানি তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

পল্লী আজিকে ধ্বংস দ্বারে

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক

শান্ত সৌম্য শস্যশ্যামলা পল্লী-মা তোর কি দশা আজ?
ক্রন্দন জাগে বক্ষ বিদারি হেরি তব দীন-ভিখারী সাজ।
অন্নপূর্ণা ছিলে যে একদা, ছিলে যে অপার করুণাময়ী,
দিয়েছ সবারে স্নেহ দয়া প্রীতি, ব্যথিতে শান্তি, জননী অয়ি!
[illegible] সাহস শক্তি শ্রী ও সুষমা সকলি ছিল,
পূজো-পার্ব্বণ আমোদ-প্রমোদ হাসি-কলরব—কে হরি' নিল!

[illegible] ভরেছে পল্লী, হাট-ঘাট-মাঠ শ্মশান প্রায়,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পাঠশালা ঘরে পড়িয়াছে তালা, ছাত্র কোথায়, পড়িবে কেবা,
কোথা গোলাভরা কৃষক-ভবন, হ'ত যেথা নিতি অতিথি সেবা।

ভগ্ন দেউল দাঁড়ায়ে র'য়েছে অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধরি,
বাঁশ-বাবলার বৈঁচি-ছাতিমে ঘিরে আছে তারে নিবিড় করি।
বাঁধা বটতলে ফাটল ধরেছে, পুকুরে কচুরীপানার রাশি,
ঝাউ তরুতলে বাজেনাক' আর রাখাল ছেলের বাঁশের বাঁশী।
রিক্ত নিঃস্ব কঙ্কালসার পল্লী আজিকে ধ্বংস-দ্বারে—
[illegible]

বিচিত্র বার্তা
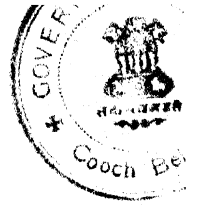
মধ্যযুগীয় দস্যুর গুপ্তভাণ্ডার

চীনের চেতুং শহরে খননকার্য চলিয়াছে। অস্থিপুঞ্জ এবং প্রস্তরলিপি উত্তোলিত হইয়াছে। খননকারীদের বিশ্বাস এই স্থানে ১০ কোটি ডলার মূল্যের রৌপ্য কোথাও ভূপ্রোথিত রহিয়াছে—বিখ্যাত দস্যু নেতা চাং সিয়েন চুং এইস্থানে তাহার লুণ্ঠিত ভাণ্ডার লুক্কায়িত রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি। ১৬৪৫-৫১ সালে সে সেচুয়ান প্রদেশ শাসন করিত। তাহার মত নিষ্ঠুর হত্যাকারী সমগ্র চীনের ইতিহাসে আর বিদিত নাই। উত্তর সেচুয়ানে তাহার অনুশাসিত এক প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে যাহাতে সাতজন বিখ্যাত ধনিকের হত্যার বার্তা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সেচুয়ানে পদার্পণ করিয়া সে কঠোর আদেশ প্রদান করে যে, সে নিজে ভিন্ন অন্য কোন লোক রৌপ্যের মালিক থাকিতে পারিবে না। যাহার নিকট রৌপ্য পাওয়া যাইবে তাহাকেই হত্যা করা হইবে। তাহার অত্যাচারের ভয়ে যখন যেখানে সে উপস্থিত হইয়াছে, সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সঞ্চিত রৌপ্য প্রকাশ্য রাজপথে ফেলিয়া দিয়াছে। কথিত আছে চেংতু ও আশপাশের অঞ্চল হইতে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ তোলা রূপা সংগৃহীত হইয়াছিল। সিয়েন চুং তখন সেই রৌপ্য এবং তাহার পূর্বসঞ্চিত ভাণ্ডার সমুদয় একত্রিত করিয়া এইস্থানে ভূপ্রোথিত করে। যে সকল মজুর এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই কার্য সাধিত করে—সিয়ান চুংয়ের আদেশে তাহাদের সকলেরই প্রাণবিনাশ করা হয়। পাছে তাহাদের মারফতে সন্ধান পাইয়া অপর কেহ সেই ভাণ্ডার উদ্ধার করে।

চেংতুর এক পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ বলে সে এই ঘটনার বিষয় মুখে মুখে প্রচারের কথা পরিষ্কার স্মরণ করিতে পারে। বিগত ২০ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ফাইল ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া এবং সরেজমীনে তদারক করিয়া তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে গুপ্তভাণ্ডারের স্থান নির্দেশ করিতে পারিবে। তাহার নিশ্চিত ধারণা চেংতু শহরের এক কিলোমিটার পূর্বদিকে ওয়াংকিয়েংলো নামক স্থানে এই প্রোথিত ভাণ্ডারের উদ্ধার হইবে। সে এতটা দৃঢ় বিশ্বাসী যে, খনন দ্বারা ঐ স্থানে দস্যুর ভাণ্ডার না পাওয়া গেলে খনিত গর্তে জীবন্তে সমাহিত হইতে সে স্বীকৃত।

অবসরপ্রাপ্ত সমর-বিভাগীয় কমাণ্ডার কোয়েনশনের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বৃদ্ধ চিং কিয়াং এক্‌স্‌কাভেশন্‌ কোম্পানী নামে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া খননকার্যে লিপ্ত হইয়াছে। কোম্পানী রেজিস্টারী করা হইয়াছে এবং উত্তোলিত ভাণ্ডারের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিবার চুক্তি হইয়াছে।

৬০ জন মজুর খনন করিতেছে। প্রথমস্তরে উঠিয়াছে অস্থি—বেশীর ভাগ শূকরাস্থি। দ্বিতীয় স্তরে একটি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে—উহাতে 'চ্যাং' এই কথাটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তৃতীয় স্তরে জমাট বাঁধা গভীর এমন এক আস্তরণের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে - যাহা চূর্ণপাথর এবং টাং তেল মিশ্রিত জল-নিরোধক এক অপূর্ব উপাদানে গঠিত বলিয়া খননকারীদের বিশ্বাস। বৃদ্ধের বিশ্বাস ইহার ভিতরই গুপ্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে।

আমেরিকার ব্যবসায়ীর উচ্চতম আয়

নিউ ইয়র্কের সিকিউরিটিজ একস্‌চেঞ্জ কমিশনের প্রদত্ত তালিকা অনুসারে ১৯৩৮ সালে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের ভিতর উচ্চতম আয়—আমেরিকান্‌ টেলিগ্রাফ এণ্ড টেলিফোন কোং'র প্রেসিডেণ্ট, মিঃ ওয়ালটার গিফোর্ডের। তাঁহার আয় ঐ বর্ষে ছিল—৪৪ হাজার পাউণ্ড।

আয়ের পরিমাণে দ্বিতীয়—ইণ্টারন্যাশনাল নিকেল কোং'র চেয়ারম্যান; তাঁহার আয় ৪৩ হাজার পাউণ্ড।

তৃতীয়—প্রেসিডেণ্ট, জেনারেল মোটরস্‌, ৪১ হাজার পাউণ্ড।

চতুর্থ—প্রেসিডেণ্ট, কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং সিষ্টেম, ৩৮ হাজার পাউণ্ড।

পঞ্চম—প্রেসিডেণ্ট, ন্যাশনেল ডিষ্টিলার্স, ৩৬ হাজার পাউণ্ড।

ষষ্ঠ—চেয়ারম্যান, জেনারেল মোটরস, ৩৪ হাজার পাউণ্ড।

ইহার পর যাহার স্থান তাহার আয় মাত্র ২১ হাজার পাউণ্ড এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আয় ইহা অপেক্ষা নিম্নে।

জাপানের অবাঞ্ছিত বিদেশীর প্রতি নিষেধ-বিধি

বিগত ১লা মে হইতে জাপানে বিদেশীদের আচরণ সম্বন্ধে সংশোধিত নূতন বিধান জারী হইয়াছে। ইহাতে একটি বিধি এই প্রকারঃ—কোনও বিদেশী রাত্রিকালে রাজপথে জাপানী নারীকে চুম্বন করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না, কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে তাহার ঐ প্রকার আচরণ অশ্লীল বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উহার দণ্ডস্বরূপ ঐ বিদেশীকে জাপান হইতে বহিষ্কারের আদেশও দেওয়া যাইতে পারে। অবাঞ্ছিত বৈদেশিক, যাহাদের জাপানে বাস সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া জাপানী কর্তৃপক্ষ প্রচার করেন, তাহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এইভাবে যে, যে বৈদেশিক আইন ভঙ্গ করে অথবা সাধারণ নৈতিক শ্লীলতার বিরোধী আচরণ করে, তাহাকেই অবাঞ্ছিত বলিয়া ধরা হইবে।

কর্তৃপক্ষ আরও বলেন, নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিলেই যে, তাহাকে বহিষ্কার করা হইবে এমন নয়। যে পরিস্থিতিতে ঐ আচরণ করা হইবে, তাহার গুরুত্ব এবং অনিষ্টকারিতার নিরিখেই বিচার করা হইবে। যদি কোনও বৈদেশিক জাপানী নারীকে বিপথগামী করে তথাপি হয়ত তাহা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করা হইবে; কিন্তু প্রকাশ্যে যদি চুম্বনের মত একটি অশিষ্ট আচরণ করা হয়, তাহা ক্ষমা করা যাইবে না।

পাশ্চাত্যের সভ্য চোখে যে ইহা অদ্ভুত ঠেকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই; কারণ সেই দেশে নারীর ইচ্ছা বা সম্মতিক্রমে প্রকাশ্য রাজপথে চুম্বন আইনের ধারায় দোষাবহ নহে।

বৃক্ষকাণ্ডের সেতু

গোটা একটি গাছ দ্বারা নদী বা খালের উপর সেতু তৈরী করিয়া, উহারই শাখা-প্রশাখা দ্বারা রেলিংএর মত ধরণা গড়িয়া লওয়া অনুন্নত দেশেরই প্রথা। কিন্তু এমন একটি সেতু যে সুসভ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানে শীর্ষস্থানীয় ইউরোপের বুকেও চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় বিরাজ করিতে পারে, ইহা অবশ্য আশ্চর্যের বিষয়। বেলজিয়ামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে—যে অঞ্চল একদিকে ফরাসী দেশের ও অপর দিকে জার্মানীর

সীমারেখাকে আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে—বেলজিয়ামের সেই কোণের অন্তরাবেশেই এই সেতুটি নির্মিত। অরণ্যাকুল এই প্রদেশে কাঠের অভাব নাই, অধিবাসীরাও গরীব কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী। তাহারা অতি প্রয়োজনীয় এই সেতুটি বিনা অর্থব্যয়ে শুধু নিজেদের দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে প্রস্তুত করিয়াছে। সেতুটির গুরুত্বও রহিয়াছে এই কারণে যে, উহার ১০।১৫ মাইলের ভিতর কোথাও আর নদী পার হইবার সেতু দ্বিতীয়টি নাই। কেবল পারাপারের উপায়রূপেই ইহা ব্যবহৃত হয় না, তীব্রস্রোতা এই নদী হইতে জল উত্তোলনের সোপানরূপেও ব্যবহৃত হয়। পাশের রেলিং এক হাতে ধরিয়া অন্য হাতে বাল্‌তি ঝুলাইয়া দিয়া জল তোলা হয়—ছবিতে দেখা যাইতেছে।

খৃষ্টপূর্ব ৪৮০ সালের যুদ্ধাস্ত্র

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীসের থার্মপাইলি ক্ষেত্রে বিখ্যাত যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রোঃ মেরিনেটস্ (গ্রীক মিনিষ্ট্রী অফ্ এডুকেশন-এর আর্কেয়লজিক্যাল ডিরেক্টর) ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের আবিষ্কার এতদিনে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। থার্মপাইলি [illegible] [illegible] ৪৮০ যোদ্ধাসহ নিহত হইয়াছিল। উহার সম্মুখস্থ প্রান্তরে খননের ফলে বহু তীর পাওয়া গিয়াছে, যাহা উভয়পক্ষ ব্যবহার করিয়াছিল। নরকঙ্কালও বহু পাওয়া গিয়াছে ঐস্থানে। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সেকালে এই থার্মপাইলি গিরিবর্ত্ম মাত্র ১৭ গজ প্রশস্ত ছিল; কিন্তু বর্তমানে উহা প্রায় নয় মাইল পরিমাণ প্রশস্ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই-স্থানে বালুকাস্তর জমায়েৎ হইয়া এই প্রকার পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে।

আলোকোজ্জ্বল পাহারাওয়ালা

ব্রাইটন বরো পুলিশের কনেষ্টবল লর্ড বিমান মহলার দীপালোকবিহীন 'ব্ল্যাক আউট' রাত্রিতে আলোকোজ্জ্বল পরিচ্ছদে রাজপথে আবির্ভূত হয়! এই দেশে পুলিশের এই প্রকার অন্ধকারে দীপ্তিমান পোষাক ঐ রাত্রিতে সর্বপ্রথম দেখা গেল।

মাথায় ধাতুজ শিরস্ত্রাণ (helmet)—পোষাকে এমন নূতন ধরণের রং মাখান যাহা রাত্রির ঘনান্ধকারেও জ্বলজ্বল্ করে, পাহারাওয়ালা লর্ড উক্তপ্রকার সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া ব্রাইটন শহরের সর্বাপেক্ষা নিবিড় জনস্রোতের রাজপথে চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। বিমান-বিভাগের 'ব্ল্যাক্ আউট' মঞ্চে দাঁড়াইয়া সে সংকেত প্রদর্শন করিয়াছে—তাহার ফস্‌ফরেসেণ্ট রং য়ের পোষাক সর্বাগ্রে পথবাহী যানবাহন চালক ও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রাস্তার সকল বাতি ছিল নির্বাপিত। পথচারীদের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে মাত্র লাল হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালান ছিল। চলাচল নিয়ন্ত্রণের যে সকল সংকেত-বাতি ছিল তাহাও হুড দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল যেন শূন্য হইতে কোন বিমান তাহা লক্ষ্য করিতে না পারে।

দশ লক্ষ পাউণ্ডের উত্তরাধিকারিণী

২৩ বৎসর বয়স্কা প্রমা আবাতিলো ছয় মাস পূর্বে নিউ ইয়র্কে ওয়েটরেসের কাজ করিত। সে ফিরি করিত 'হ্যামবুর্গার' প্রতিটি ছয় পেনি দরে। ইহাতে তাহার আয় হইত প্রতি সপ্তাহে চারি পাউণ্ড অবশ্য, উহার অতিরিক্ত বখশিস কিছু ছিল।

বর্তমানে সে মিসিস পটার ডোরুসে পামার—দশ লক্ষ পাউণ্ডের উত্তরাধিকারিণী। এই অতুল সম্পদ সে পাইয়াছে তাহার স্বামী, পটার পামারের মৃত্যুতে। পটার পামার খেলোয়াড়—সে জীবনে চারিবার বিবাহ করিয়াছে। শেষ অবশ্য ঐ ওয়েট্রেস্ প্রমাকে। একদিন বন্ধু-বান্ধবী সহ চড়ুইভাতিতে ব্যাপৃত থাকাকালে এমন এক আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, তাহারই ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার মৃত্যুতে পামার পরিবারের সকল সম্পত্তির মালিক হইয়াছে তাহার পত্নী—ছয় মাস পূর্বেও যে ছিল সামান্য পরিচারিকা।

বন্ধুত্বটি বিবাহ-ব্যুরো

সম্প্রতি মে-ফেয়ারে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে—দুইটি তরুণী ইহার স্থাপয়িত্রী। মাত্র সামান্য কয়মাস কাজ চালাইবার পর স্থাপয়িত্রীগণের অভিমত যে, তরুণ-তরুণীরা বড় একটা এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাহে না [illegible]

বরং ৪০ হইতে ৭০ বয়স্ক পুরুষেরাই আবেদন জানায় মধ্য-বয়সী বিধবা মহিলাকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য। এবং মধ্য-বয়সী বিধবারা অনুসন্ধান করে মনের মত প্রৌঢ় স্বামী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। মনে হয় সকল নারী বিবাহার্থিনীই (মেফেয়ারের সুন্দরী যুবতীরা পর্যন্ত) সজীব তরুণ দলের উপর বিরূপ হইয়া পড়িয়াছে—হামেশা পার্টিতে যাহাদের সাক্ষাৎ পায়। শতকরা আশিটি বিবাহার্থিনীই চাহে ৪০ কিংবা তদূর্ধ্বের প্রৌঢ় স্বামী—যাহাদের স্থায়ী চাকুরী থাকিবে এবং যাহাদের মতিগতি থাকিবে গৃহের বাহিরে প্রজাপতিবৃত্তি করিয়া ফিরিবার বিরুদ্ধে। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানের মতে সজীব তরুণের প্রাণময়তার তারিফ যেন অতীত হইয়াছে।

তরুণ বিবাহার্থীর অবশ্য আকর্ষণ সেই চিরাগত ফ্যাশানেই সুন্দরী তরুণীর প্রতি, কিন্তু সেখানেও সবার উপরে তরুণীর ঝোঁক থাকা চাই অকৃত্রিম—গৃহস্থালীর প্রতি। দশজন তরুণের ভিতর নয়জনই চাহিবে যাহাকে বলে ব্লণ্ডে (blonde); ব্রুনেট (brunette)-এর প্রতি যেন প্রায় সকলেই উদাসীন।

কিন্তু বিবাহের অনুসন্ধান আসে তরুণ-তরুণী অপেক্ষা বয়স্ক-বয়স্কাদের কাছ হইতেই বেশী। পঞ্চাশ বৎসর বয়সের এক সমর বিভাগীয় অফিসার চাহিলেন এক তরুণী ভার্যা—যে ভাল খেলোয়াড় এবং অশ্বারোহণের পক্ষপাতিনী হইবে। অভিজাত বংশের এক মহিলা তাঁহার পুত্রের জন্য তরুণী পত্নী চাহেন; পুত্রের বার্ষিক আয় ২০০০ পাউন্ড, কিন্তু সে অতি লাজুক; তাই এমন ধনিক-তরুণী চাই যে স্বামীকে তাহার ভাবী উত্তরাধিকারের জাঁকজমকের হালচালে অভ্যস্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে, যেন যখন পুত্রটি পারিবারিক সম্পদের মালিক হইবে, তখন না কোন প্রকার অসুবিধায় পড়ে। একটি কেরাণী এমন পত্নী চায়, যে কোনও অফিসে চাকুরী করে, তাহার সঞ্চিত অর্থ কিছু না থাকিলেও চলিবে, কিন্তু মুক্তবায়ুতে খেলাধূলায় পত্নীর ঝোঁক থাকা চাই।

দেশের সকল অঞ্চলের এবং সকল শ্রেণীর নর-নারীর বিবাহ ঘটাইয়া দিলেও কিন্তু স্থাপয়িত্রীদ্বয় আজিও অবিবাহিত এবং তাহাদের পণ যে তাহারা বিবাহ করিবে না যত লোভনীয় বরই আসিয়া তাহাদের পাণিপ্রার্থী হউক না কেন।

সাবাস টহল-ফেরা

দুনিয়ার দিকে দিকে বিচিত্র সকল নিষেধ-বিধির কঠোরতা দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ-ভারতের তোড়াদের ভিতর প্রচলিত রীতি রহিয়াছে যে, গোয়ালা যখন ব্রত-পূজাদির উদ্দেশ্যে দুগ্ধ বহন করিয়া চলিবে, তখন কোনও সেতুতে আরোহণ করিতে পারিবে না, তাহাকে যাইতে হইবে জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া। পশ্চিম-আফ্রিকার কোনও রাজার পক্ষে নিয়ম হইল, তাহাকে সিংহাসনে বসিয়াই ঘুমাইতে হইবে, কারণ যদি এক নিমেষের জন্যও সে সিংহাসন ত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ সাগরবক্ষের সকল জাহাজ নিশ্চল হইয়া পড়িবে। কিরঘিজ নারী রাত্রিবেলা জীব-জন্তু উদ্ভিদ—কোনও কিছুরই নাম মুখে আনিতে পারিবে না; ফলে সেয়ানা নেকড়ে গোয়াল হইতে মেষশিশু লইয়া ঝোপে পলায়ন করিতেছে দেখিলে তাহার ব[illegible]তে হইবে—দেখ দেখ, গর্জনকারীটি ভ্যা-ভ্যাকারীটির বাচ্চা লইয়া খস্‌মস্‌কারীটির ভিতর পলাইল। ইংলণ্ডও এই প্রকার নিষেধ-বিধি হইতে মুক্ত নয়। ডিনার-ভোজে যে ব্যক্তি তালি-দেওয়া 'টাই' পরিয়া যাইবে, সে ব্যক্তির সমগ্র পরিবার সকলের নিকট হীন প্রতিপন্ন হইবে, সে পরিবারকে আর কেহ নিমন্ত্রণ করিবে না। ইংলণ্ডের যে শিকারী উপবিষ্ট ফেজেন্ট পাখীকে গুলী করিবে সে আর বাকি জীবনে নিজ নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও নিতান্ত বিচিত্র নিষেধ-বিধির ভঙ্গ দেখা গেল সেদিন ওয়ারাদিং শহরের ক্রিকেট খেলার মাঠে। সাসেক্স কাউন্টির তখনও ইনিংস শেষ হয় নাই—খেলোয়াড়গণ নিবিড় মনোযোগে খেলা করিতেছে। একটি দর্শক তখন সোজাসুজি খেলার মাঠের ঠিক মাঝখান দিয়া চলিল অপর পার্শ্বে তাহার আসন অধিকার করিতে। দর্শকটি আর কেহই নহেন—কোন গেঁয়ো ভূত নহেন—একজন ওয়ারাদিং হ্যাম্পডেন্।

সুদ-হিসাবীর অক্কেল সেলামী

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে স্যাম লুই নামে এক সুদখোর বাস করিত। লোকটা ছিল টাকার কুমীর এবং খাঁটি চশমখোর। শতকরা ৫০।৬০ টাকা সুদের কমে সে টাকা ধার দিত না।

একদিন এক বিশিষ্ট ধনী তাহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। লুই মনে করিল, বড়লোক নিশ্চয়ই অকস্মাৎ টাকার অভাবে পড়িয়া কর্জ করিতে আসিয়াছেন। সে ভাবিতে লাগিল কত সুদ হাকিবে। বলিল—আজ্ঞে, টাকা চাই, তা আপনাকে দিব না তো কাকে দিব? সুদও আপনাকে তেমন কিছু......।

আগন্তুক বলিলেন—নাহে, টাকা আমি ধার করিতে আসি নাই। আমার অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কে সুদ নাই। কোথায় খাটাই, ঠিক পাইতেছি না। তুমি তো খুব সুদে টাকা খাটাও। আমার টাকাটা তুমি লও, তুমি পঞ্চাশ-ষাট টাকা সুদে খাটাও, আমাকে দশ টাকা দিলেই চলিবে।

লুই উত্তর দিল—কি বলেন মশাই। আর কি সে কাল আছে। লোকে টাকা ধারই করে না। আমারই কত টাকা জমিয়া গিয়াছে, আবার আপনার টাকা খাটাইবার মেহানৎ কে করিবে।

আগন্তুক অনেক বলিয়া কহিয়া লুইকে রাজী করাইল যে, টাকাটা খাটাইয়া শতকরা সাত টাকা সুদ দিবে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই লুই সমস্ত টাকা উক্ত ধনীর পুত্রকে শতকরা পঞ্চাশ টাকা সুদে ধার দিল।

পিতা পুত্রে এ বিষয়ে কিছুই জানাজানি হইল না। যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ড ছিলেন উক্ত ধনীর বন্ধু। তিনি ধনীকে জানাইলেন যে, তাঁহার পুত্র খুব টাকা উড়াইতেছে। পিতা খোঁজ করিয়া জানিলেন, পুত্র লুইর নিকট হইতেই টাকা ধার করিয়াছে।

ধনী দিয়াছিলেন ষাট হাজার পাউন্ড। হিসাব করিয়া দেখা গেল, সুদ বাবদই লুইর প্রাপ্য হইয়াছে ৯০ হাজার পাউন্ড। পিতা ঐ ৯০ হাজার পাউন্ড সুদ দিয়া নিজ প্রাপ্য ৩০ হাজার পাউন্ড এবং স্বীয় সুদের অংশ লইয়াই ঘরে ফিরিলেন।

পুস্তক পরিচয়

লঘুগুরু:—শ্রীরাজশেখর বসু প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫-২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১৪। মূল্য এক টাকা।

বাঙলার পাঠক সমাজ 'পরশুরাম' ও তাঁহার কজ্জলি, গড্ডলিকার সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। এই সুপ্রসিদ্ধ রস-সাহিত্য লেখক নিজ নামে সময়ে সময়ে লঘু গুরু নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিয়াও পাঠককে পরিবেশন করিয়াছেন। তাহাই 'লঘুগুরু' নামে পুস্তকাকারে আমরা বর্তমানে পাইয়াছি। প্রকাশক এই উপাদেয় লেখাগুলির সংগ্রহ সুলভ করিয়া দিয়া বাঙালীর বাস্তবিকই কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য বইখানিতে দশটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠক ইহা পাঠে যেমন আনন্দ পাইবেন, তেমনি সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তার খোরাকও ইহাতে বিস্তর পাইবেন। কোন কোনটি (যেমন, ডাক্তারি ও কবিরাজি, ভদ্র-জীবিকা) বহু বৎসর পূর্বে লিখিত, কিন্তু যে সব সমস্যার বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে ও সমাধানের যে সব নির্দেশ তিনি দিয়াছেন, সে বিষয়ে এখনও আমাদের অনেক ভাবিবার ও করিবার আছে। এ-দিক দিয়া পুস্তকখানির প্রকাশ সময়োপযোগীই হইয়াছে বলিতে হইবে। রস ও রুচি, সাধু ও চলিত ভাষা, বাংলা পরিভাষা প্রভৃতি প্রবন্ধনিচয় সকলকে একবার পড়িয়া দেখিতে বলি। শিক্ষিত সমাজে পুস্তকখানির যে আদর হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সংগঠন:—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৭০। দাম ছয় আনা।

মতিবাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তিনি একাধারে কর্মী ও সাধক। দেশ সেবাই তাঁহার আজীবন সাধনা। তিনি নিজ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাবলে জাতীয় সংগঠনের কয়েকটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায়ই বলি, "সংগঠন-যজ্ঞের বীজ যদি হয় ঈশ্বর চেতনা, ঈশ্বরযুক্ত নারী-পুরুষের সংহতি ইহার কাণ্ড, শিক্ষা ও সাধনা ইহার শাখা-প্রশাখা এবং অর্থ সাধনাই এই বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এই বিষয় চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যান বইখানিতে দেওয়া হইয়াছে। দেশ-সেবী ও দেশকর্মীদের ইহা অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

দুরন্ত:—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১-বি, রসা রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯০। মূল্য দশ আনা।

নিধু নামে একটি দুরন্ত বালকের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত জীবন কাহিনী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ভাষা বেশ ঝর্‌ঝরে, পড়িতে কষ্ট হয় না।

কেদার রায়:—শ্রীকেশব সেন প্রণীত। এস কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

বঙ্গের বারভুঁঞার এক ভুঁঞা চাঁদ রায় কেদার রায়ের কথা কে না শুনিয়াছেন? কিছুদিন পূর্বে এ সম্বন্ধে একখানা নাটক কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল। বর্তমান বইখানিও নাটক, তবে ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিত। মোগলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বারভুঁঞারা খণ্ড খণ্ড ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও জোট বাঁধিয়া দাঁড়ান নাই। ফলে বাঙলা পরাধীন হইয়া যায়। বইখানিতে এ-বিষয় যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি মগদের বিতাড়নে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গবাসীদের ঐক্যবদ্ধ সার্থক প্রচেষ্টার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ঐক্যের সুফল ও অনৈক্যের কুফল ছেলে-মেয়েরা একই সঙ্গে জানিতে পারিবে। ছাপা বাঁধাই ভাল, প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর। নাটকখানির বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

কশ্যপ ও সুরভি:—শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত, আনন্দ সাহিত্য-ভবন, কুষ্টিয়া (নদীয়া) হইতে শ্রীমতী চারুচন্দ্র দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—রসচক্র সাহিত্য-সংসদ, দক্ষিণ কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯১। মূল্য—এক টাকা পাঁচ আনা।

ইহা একখানি কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক। জগদীশবাবুর বহু গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ আমাদের পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। কিন্তু কবিতা-পুস্তক এইখানাই প্রথম।

আলোচ্য গ্রন্থে বারোটি কবিতা আছে। এগুলি নিছক ভাব-বিলাসের কবিতা নহে। প্রত্যেক কবিতায়ই এক একটি করুণ গল্পাংশ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পুস্তকখানি একখানি কথা-কাব্য। প্রত্যেকটি কবিতার প্রধান নায়ক অচ্যুতানন্দ, কোথাও কোথাও পটভূমিকায় অচ্যুতানন্দের স্ত্রী সুরবালাও আছেন। কবিতাগুলির বক্তা অচ্যুতানন্দ নিজে। বারোটি কবিতায় অচ্যুতানন্দের জীবনের ও অভিজ্ঞতার বারোটি বিচিত্র দিক দেখানো হইয়াছে। জগদীশবাবু দুঃখবাদী লেখক। মানুষের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, চরিত্রের নানা দুর্বলতা, স্বার্থ-পরতা, ঈর্ষা, অহঙ্কার ইত্যাদির চিত্র তাঁহার রচনায় ফুটিয়া উঠে। আলোচ্য পুস্তকেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একটি মানুষ জীবনে সংসারের নিকট হইতে কি পাইয়াছে, তাহারই করুণ ইতিহাস তিনি কবিতাগুলির ভিতর দিয়া রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মম কশাঘাতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ যেমন মর্মান্তিক, তেমনই উপভোগ্য। জগদীশবাবুর গল্প উপন্যাসের মতো আশা করি, এই কথা-কাব্যখানিও সাহিত্য-রসিকের কাছে সমাদর লাভ করিবে।

তৃষিত সৃক্কণী:—শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রসচক্র সাহিত্য-সংসদ, দক্ষিণ কলিকাতা। মূল্য এক টাকা পাঁচ আনা। "ভবিষ্যৎ", "তৃষিত সৃক্কণী" ও "পৃষ্ঠে শর-লেখা" এই তিনটি গল্প আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রথিত হইয়াছে। বর্তমানকালে যে সমস্ত গল্প প্রকাশিত হইতেছে, এই তিনটির অনুরূপ গল্পের সংখ্যা তাহাতে বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনটি গল্পই করুণ এবং জগদীশবাবুর চির-পোষিত দুঃখবাদের অভিব্যক্তি।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম "তৃষিত সৃক্কণী"। এই গল্পটির নামানুসারেই পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। এই গল্পটি

"প্রবাসীতে" প্রকাশিত 'তৃষিত আত্মা' গল্পটি স্মরণ করাইয়া দেয়। উভয় গল্পই একটি অতি প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় রহস্যময় এবং মনে কেমন যেন একটা ভয় মিশ্রিত কৌতূহল জাগ্রত করে। প্রথম এবং তৃতীয় গল্পের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মর্মান্তিক এবং উপভোগ্য। প্রত্যেকটি গল্পই চমৎকার। জগদীশবাবুর এই গল্প-পুস্তকখানির অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

অলখ-চোরা—(রূপকথা) গ্রন্থকার—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

বাঙলার অফুরন্ত উপকথা ভাণ্ডারের একটি স্ফুট কমল। বাঙলার আধুনিক মাতৃজাতি আর এই অমিয়-নির্ঝরের উৎস সন্ধানে তেমন পক্ষপাতিনী নহেন। কাজেই ছোটদের মনের খোরাক জোগাইতে এই প্রকার অবাধ কল্পনার প্রসারের যে কিছুটা প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। তথাপি জাতির কল্যাণে ছোটদের সম্মুখে বাস্তব জীবনপটেপনার চিত্রই ধরা উচিত বেশী। ভাষা সরল সহজ। সহজেই কচি মনে রেখাপাত করিবে। ছবি ছাপা উৎকৃষ্ট, প্রচ্ছদ মনভুলান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়—(ছোটদের জন্য) গ্রন্থকার—শ্রীরাধাভূষণ বসু এম-এ। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

বিজ্ঞানের শিক্ষা আজিকার দুনিয়ায় আর সকল শিক্ষাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ইহার বিস্ময়কর দানের প্রভাবে নিখিল বিশ্বের প্রশংস দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। আমাদের দেশের ছোটদের এই জাতীয় পুস্তক বেশী করিয়াই পড়িতে দেওয়া উচিত এইজন্য যে, যাহাদের উচ্চশিক্ষার সুবিধা হইবে না, তাহারা অন্ততঃ এই সকল পুস্তক হইতে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয়ের একটা আভাষ পাইতে পারিবে। ঠিক প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী ইহার সকল পরিচ্ছেদ না হইলেও ইহা হইতে বালক-বালিকারা অনেক কিছু শিখিবার মত জিনিষ পাইবে।

শিশু-সাহিত্যে এই জাতীয় পুস্তক যত বেশী প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল।

ঘুমপাড়ানি গান—(উপন্যাস)। লেখক—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন, ১২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা। দাম দেড় টাকা। পৃষ্ঠা—একশ' ছত্রিশ।

সমাজের সনাতনী রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্যর্থ ও অর্দ্ধ-ব্যর্থ জীবনের দৃষ্টান্ত সাহায্যে 'নূতনত্বের রোমাণ্ড' সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। এক কথায় গ্রন্থখানিকে 'সমাজের আগামী দিনের স্বপ্নেভরা' চিত্র-মালিকার কয়েক লহর বলা চলে। ভাষার বাঁধুনি সরস, কথোপকথনের স্রোত সুর্দ্দলিত। তাহা হইলেও গল্পটি নিবিড়তায় তেমন রসঘন হইয়া উঠে নাই। তবু যুগোপযোগী গতানুগতিকতার অমোঘ প্রভাব এড়াইবার প্রয়াসে সংযম ও লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য।

রাজার ছেলে—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু। মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ ল হাউস; ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শিশু সাহিত্যে গ্রন্থকারের হাত পাকা। শিশুদের সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 'রাজার ছেলে' তাঁহার সেই পাকা হাতের পরিচয় দিবে। গ্রন্থকার কবি। তাঁহার সেই কাব্য-প্রতিভা কল্পনার স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়া 'রাজার ছেলের' জীবনে যে সম্পদ ছড়াইয়াছে, তাহাতে শিশুরা বাস্তব-জীবনে সত্যকার মানুষ হইবার অনেক শিক্ষালাভ করিবে। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা, কৌতূহলের সঙ্গে কৌতুক তাহারা পাইবে। এত অল্প দামে এমন সুন্দর ছাপা, বাঁধাই এবং এত ভাল ছবিওয়ালা বই যে শিশু-সমাজের সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংশোধনঃ—'দেশ', ৩৬শ সংখ্যা ৭৪৯ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের প্রথমে দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথমে মুদ্রিত 'ভিতর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, মায়া ব্রহ্মচারিণীই' পড়িতে হইবে।

'প্রথম প্রশ্ন' পুস্তকের সমালোচনার শেষ প্যারাগ্রাফটি এই রূপ পড়িতে হইবে,—

"উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই। লেখকের ভাষার সহজ গতি আছে। ইহা যে একখানি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এবং তাহার মূলীভূত পরাধীনতা হইতে সমুদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাগুলি লেখকের চিত্তকে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তিনি অন্তরের বেদনা দিয়া সেগুলির সমাধানের জন্য একটা আকুলতা জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হউক, ইহাই কামনা করি।

সাহিত্য-সংবাদ

নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা ফলাফল

'শ্রী' পত্রিকা পরিচালিত শশিভূষণ নন্দী স্মৃতি-সঙ্ঘের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে আহূত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতার (৬ষ্ঠ বর্ষ ২৬ সংখ্যা দেশে বিজ্ঞাপিত) মধ্যে কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল। আশাতীত গল্প প্রতিযোগিতার জন্য প্রাপ্ত হওয়ায় গল্প প্রতিযোগিতার বিচারে বিলম্ব হইতেছে। শীঘ্রই উহার ফলাফল বিজ্ঞাপিত হইবে।

প্রবন্ধঃ—প্রথম—ভারতীয় বৈশিষ্ট্য—ধর্ম ও শান্তি—সমর সরকার, ভবানীপুর। দ্বিতীয়ঃ—শরৎসাহিত্যে নারী—দ্বিজেন্দ্র দাস, বিষ্ণুপুর। কবিতাঃ—প্রথম—'অতি অকরুণ বাদলের ধারা'—অণিমা ব্যানার্জি, কলিকাতা।

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের শশি-স্মৃতি রৌপ্যপদক আমাদের সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের পর দেওয়া হইবে।

স্বাঃ—শ্রীউপেন্দ্রকুমার নন্দী,
'সাহিত্যশাখা'র সম্পাদক
শশি স্মৃতি-সঙ্ঘ, ভবানীপুর।

শেষ তারিখ ঘোষণা

তরুণ সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে নিখিল বঙ্গ রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতায় সকল রচনা ও চিত্র পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে আগষ্ট (১৯৩৯)।

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক, ৬।২, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

> নয় রাণা যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করিবার জন্য আনন্দমঠ আর সীতারাম, রাজসিংহ আর দেবী চৌধুরাণী লিখিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি লিখিলেন প্রতাপ সিংহ আর দুর্গাদাস, সিংহল-বিজয় আর মেবার-পতন। তিনি জাতির কর্ণে উচ্চারণ করিলেন, Live dangerously. বিপদকে সাথী করিয়া বাঁচো। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়—তাঁহার লেখায় তাই ঝড়ের ঝঙ্কার—সমুদ্রের কলগর্জ্জন। দুর্গাদাস বলিতেছে,

> এত তরল কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত করতে গেলে সেও বাধা দেয়; আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্টভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে?

দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা হইতে এই দৃপ্ত পৌরুষের সুর উৎসারিত হইয়াছে। যে আদর্শ আমাদিগকে বেনিয়া বুদ্ধির আত্মরক্ষা লইয়া পদে পদে হিসাব করিয়া চলিতে শেখায় সে আদর্শের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে অনুমাত্রও শ্রদ্ধা ছিল না। যে উন্মাদনায় মানুষে হিসাব-বুদ্ধিকে জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া একটা মহৎ আদর্শের জন্য বিপদের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে—সেই উন্মত্ততার জয়গান দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। মেবারপতনে রাণা যখন বলিলেন, "এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ববিজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অবিমিশ্র উন্মত্ততা" তখন সত্যবতীর নারীকণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে,

'উন্মত্ততা? তাই যদি হয় তবে এ' উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু ঊর্দ্ধে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হ'তে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোনকালে কোন মহৎ কাজ কর্ত্তে পেরেছে?"

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশকে শিখাইয়া গিয়াছেন স্বাধীনতার জন্য পাগল হইতে। আমাদের মহাসৌভাগ্য বশতঃই তাঁহার মতো প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে। দেশবাসী তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে—ইহা দেশের জাগ্রত মনেরই পরিচায়।

"শ্রী" চিত্রগৃহে "হাতেখড়ি"

"হাতে খড়ি" নামক চিত্রটি দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিলাম। ছবিখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে আনন্দ দানের সহিত অতি প্রয়োজনীয় একটি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুনিয়াছি, গাধা পিটিয়া নাকি মানুষ করা যায়। একথা কতটা সত্য তাহা জানি না, তবে মানুষ পিটিলে যে গাধা হয়, ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সত্যটি আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার জনাই এই চিত্রটি সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমার বিশ্বাস চিত্রকরের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। বর্ত্তমান শিশু ভবিষ্যৎ জাতির জনক, সুতরাং তাহার শিক্ষার ত্রুটি হইলে জাতির সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সাধারণত অনভিজ্ঞ শিক্ষকগণের হস্তেই তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। তাহার ফল যে কি বিষময় হয় তাহা এই চিত্রে সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। আমি আশা করি আমাদের দেশের প্রত্যেক শিক্ষক ও অভিভাবক এই চিত্রখানি দেখিবেন এবং বর্ত্তমান শিশুশিক্ষা পদ্ধতি কি করিয়া পরিবর্ত্তন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন। আর আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য এই চিত্রখানি গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করাইবার ব্যবস্থা করা। আজকাল একটা ধুয়া উঠিয়াছে দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁহার পরিচালনায় তোলা নিউ থিয়েটার্সের "রজত-জয়ন্তী" ছবি শীঘ্রই চিত্রায় দেখান হইবে। সেই ছবিতে শ্রীযুত বড়ুয়া নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং সে জন্য প্রত্যহ রাশি রাশি 'স্কিমও' প্রস্তুত হইতেছে। কতদিনে সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইবে জানি না; কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপভাবে সিনেমার সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস তাঁহারা সফলতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিবেন। বস্তুত, ইহার ন্যায় শক্তিশালী শিক্ষাযন্ত্র অতি অল্পই আছে, অথচ ইহার সাহায্যে শিক্ষা দানের ব্যবস্থার জন্য অর্থ-সচিবকে অর্থ সংগ্রহের জন্য চিন্তান্বিত হইতে হইবে না। যাহা হউক, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন' এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিয়া যে সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি। ইহার প্রযোজনা অভিনয়াদিও যথাসম্ভব সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ ইহার শিশু-নায়ক "ক্যাপ্টেন ভোলানাথকে" আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। এরূপ একজন শিশুকে এমনভাবে অভিনয় করিতে শিক্ষাদানও কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সেজন্য পরিচালক মহাশয়ও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। (স্বাঃ) শ্রীমন্মথমোহন বসু।

["ভাতেখাড়" ছবিখানি অরোরা ফিল্ম কোম্পানী তুলিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। ছবিখানি ২২শে জুলাই হইতে "শ্রী" চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে।]

* * * * * *

হাজার টাকা মূল্যের কাশ্মীরী শালের সঙ্গে পাঁচ টাকা মূল্যের খদ্দরের শালের তুলনা করিয়া কোন এক অতি বুদ্ধিমান প্রচার সম্পাদক তাঁহাদের কোম্পানীর তোলা ছবি সমর্থন করার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি একথা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের ছবি ষোল আনা দেশী এবং তৈয়ারী করিতে পাঁচ টাকা পড়িয়াছে; সুতরাং ১০০০ টাকার সহিত তাহার তুলনা করা উচিত নহে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রচার সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের ছবি তোলার খরচ কি মাত্র ৫ টাকা বলিয়া মনে করেন এবং তিনি কি ইহাই বলিতে চাহেন যে, তাহার দুইশত গুণ বেশী খরচ করিয়া যদি তাঁহারা ছবি তুলিতে পারিতেন; অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে খরচে একখানি ছবি তোলা হয় তাহার দুইশত গুণ বেশী খরচ করিয়া তাঁহারা ছবি তুলিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ছবির সহিত কাশ্মীরী শালের তুলনা করা চলিতে পারিত। অথচ আজ কে না জানে যে, উক্ত কোম্পানীর ছবি তুলিতে সাধারণত গড়ে ৮০ হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এবং ততোধিক খরচ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছবিতে এই যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তাহার দাম কি প্রচার সম্পাদকের মতে মাত্র পাঁচ টাকা? 'আর্টের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন' করিতে প্রচার সম্পাদকের মতে প্রত্যেক ছবির জন্য কি এক লক্ষের দুইশত গুণ অর্থাৎ দুই কোটি টাকা প্রয়োজন? কোন ছবির জন্য যদি দুই কোটি টাকা খরচ করা না যায়, তাহা হইলে কি তাহা আর্টের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিবে না? প্রচার সম্পাদকের এ যুক্তি অভিনব।

এই ত গেল টাকার কথা। এখন ছবির কথায় আসা যাক্। প্রচার সম্পাদক মহাশয় খদ্দরের শাল বলিতে মোটা চটকেই বোঝেন; খদ্দরের শাল যে কত ভাল হইতে পারে তাহার খবর তিনি রাখেন না। শুধু টাকা খরচ করিলেই হয় না; রুচি ও রসবোধ থাকিলে সামান্য অর্থে যে কত ভাল জিনিষ তৈয়ারী করা যায় তাহা প্রচার সম্পাদক মহাশয়ের বুদ্ধির অগম্য। দৃষ্টিভঙ্গি যাঁহার চটের উপরেই নিবদ্ধ তাঁহার নিকট হইতে এ আশা আমরা করিতেও পারি না। জাঁক-জমক হিসাবে দরিদ্রের কুটীরের সহিত রাজা মহারাজার প্রাসাদের অনেক তফাৎ হইতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্র কুটীরের অতি সামান্য অবস্থার অধিস্বামীর যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ ও রসবোধ থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই অপরিসর গৃহের অতি সামান্য সাজ-সজ্জার মধ্যে যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতে পারেন, তাহা রাজা মহারাজার অট্টালিকার মধ্যে অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রচার সম্পাদক মহাশয় যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে এই রকম হাস্যকর যুক্তি অনেক আছে। আজ আমরা মাত্র তার একটা দিক আলোচনা করিলাম। বারান্তরে অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

খেলা-ধুলা

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

মাত্র ৭০ মিনিট সময় থাকায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দিনের শেষ পর্য্যন্ত খেলিয়া চার উইকেটে ৪৩ রাণ করে। ফলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। বৃষ্টির জন্য মাঠ নরম হওয়ায় বোলারদের বল মারাত্মক ভাব ধারণ করিয়াছিল বলিয়াই কোন দলের ব্যাট্‌সম্যান অধিক রাণ করিতে পারেন নাই। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল।

ইংল্যাণ্ড দল

প্রথম ইনিংসঃ—৭ উইকেটে ১৬৪ রাণ

(হার্ডষ্টাফ ৭৬, উড ২৬, হ্যামণ্ড ২২, ক্লার্ক ৫৯ রাণে তিনটি, গ্রাণ্ট ১৬ রাণে দুইটি উইকেট পান)।

দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৬ উইকেটে ১২৮ রাণ

(ফ্যাগ ৩২, হ্যামণ্ড ৩২, কম্পটন ৩৪ নট আউট, কনষ্ট্যানটাইন ৪২ রাণে ৪টি ও মার্টিণ্ডেল ৩৪ রাণে ২টি)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল

প্রথম ইনিংসঃ—১৩৩ রাণ

(হেডলী ৫১, গ্রাণ্ট ৪৭, বাওয়েস ৩৩ রাণে ছয়টি, গডার্ড ৪৩ রাণে ২টি, কম্পটন ৩১ রাণে ২টি উইকেট পান)।

দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৪ উইকেটে ৪৩ রাণ

(সিলী নট আউট ১৩ রাণ)

(খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ)

আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা

গত দুই সপ্তাহ হইল আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইবে। নিম্নলিখিত দলগুলি প্রতিযোগিতার চতুর্থ রাউণ্ডে উঠিয়াছে ঃ—

পুলিশ, ক্যালকাটা, হবিগঞ্জ টাউন ক্লাব, ই বি আর, উয়াড়ী (ঢাকা), ক্যামেরোনিয়ান্স। নিম্নলিখিত দলগুলির উঠিবার সম্ভাবনা আছেঃ—কাষ্টমস অথবা দিল্লী, খুলনা টাউন অথবা এরিয়ান্স।

উক্ত দলগুলির কোনটিই যে শীল্ড প্রতিযোগিতার এত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে, ইহা প্রতিযোগিতার আরম্ভের সময় কেহই আশা করিতে পারেন নাই। শীল্ড তালিকা প্রস্তুত হইলে সকলেরই আশা ছিল ইষ্টইয়র্ক গত বৎসরের বিজয়ী ও মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। কিন্তু ফলত তাহা হইল না। অপ্রত্যাশিতভাবে এই দল দুইটি বিদায় গ্রহণ করিল। এই বৎসরের শীল্ড প্রতিযোগিতার তালিকা প্রকাশিত হইবার পর হইতেই অনেক ক্রীড়ামোদীরই এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দেখিবার উৎসাহ কমিয়া যায়। আই-এফ-এ-র সহিত ইষ্ট বেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, কালীঘাট প্রভৃতি বিশিষ্ট দলের গণ্ডগোল ও শীল্ড প্রতিযোগিতায় উক্ত দলসমূহের যোগদান করিতে না পারাই যে অন্যতম কারণ ইহা বলাই বাহুল্য। তাহার উপর জনপ্রিয় মোহনবাগান ও ইষ্টইয়র্ক ক্লাব খেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করায় ক্রীড়ামোদিগণের আরও উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। প্রতিদিনই মাঠের ভীড় কমিয়া যাইতেছে। অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, শীল্ড ফাইনাল বুঝি বা এইবার দর্শকশূন্য মাঠে অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের কিন্তু ঠিক এইরূপ কোন ধারণা নাই। আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি হিসাবে যেরূপ উৎসাহ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে হওয়া উচিত বা যেরূপ অন্যান্য বৎসর হইয়া থাকে এইবার সেইরূপ হইবে না। না হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। চতুর্থ রাউণ্ডে যে সকল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে ইহাদের মধ্যে কোন দলকেই ঠিক প্রথম শ্রেণীর ফুটবল দল বলা চলে না। নেহাৎ সৌভাগ্য বলেই ইহারা শীল্ড প্রতিযোগিতায় চতুর্থ রাউণ্ডে উঠিয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। একটি দলেও খুব উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য অধিকারী খেলোয়াড় নাই।

এই সকল দলের মধ্যে কোন্ দুইটি দল ফাইনালে উঠিবে ইহা বলাও বড় কঠিন। শীল্ড প্রতিযোগিতায় প্রতিদিনের অপ্রত্যাশিত ফলাফল আমাদের এই উক্তি করিতে বাধ্য করিতেছে। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বলিতে পারি যে, দুইটি স্থানীয় দলের ফাইনালে উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং কলিকাতার আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী একটি স্থানীয় দলই হইবে।

ফুটবল খেলার বিরোধ

কলিকাতা ফুটবল খেলার বিরোধের এখনও কোন মিটমাট হয় নাই। আই-এফ-এ পরিচালকমণ্ডলীর আলাপ-আলোচনা ও বহিষ্কৃত দল তিনটির পরিচালকমণ্ডলীর নূতন এসোসিয়েশন গঠনের পরিকল্পনা-বিষয় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি-বা এই বিরোধ চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বিরোধের অবসান শীঘ্রই হইবে। আই-এফ-এ পরিচালকমণ্ডলী শীল্ড প্রতিযোগিতা হইতে ইষ্ট বেঙ্গল, মহমেডান ও কালীঘাট এই তিনটি বিশিষ্ট দলকে বঞ্চিত করিয়া যে খুব ভাল কাজ করেন নাই, তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। অপর দিকে বহিষ্কৃত দল তিনটির পরিচালকমণ্ডলীও নব এসোসিয়েশন গঠন করিয়া যেমন সর্বভারতীয় তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারিবেন না বলিয়াও বুঝিতে পারিয়াছেন। এই জন্য বর্ত্তমানে এক আপোষ রফার চেষ্টা চলিয়াছে। উভয়পক্ষই পূর্ব্বের ন্যায় নিজ নিজ সিদ্ধান্ত পালন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া নাই। কোন দল কতখানি দাবী ছাড়িয়া দিতে পারে তাহারই চিন্তা করিতেছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। খুব শীঘ্রই একটি মীমাংসা হইলে ক্রীড়ামোদিগণ সকলেই খুবই আনন্দিত হইবে। আরও দীর্ঘ দিন ধরিয়া একটা সামান্য বিষয় লইয়া এত টানাটানি হইলে, এখনও পর্য্যন্ত আই-এফ-এ ও বহিষ্কৃত দলসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ ক্রীড়ামোদীদের যেটুকু সহানুভূতি আছে, তাহাও বিলোপ পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এখনই অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোক বুঝি দুই পক্ষের মধ্যে একজনও নাই, নতুবা এইরূপ একটা সামান্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে এত অধিক দিন লাগিতেই পারে না।" এই উক্তি যে সত্য এইরূপ আমরা মনে করি না তবে কোন পক্ষের মধ্যে প্রকৃত খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির কিছু যে অভাব আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ম্যাঞ্চেষ্টার মাঠে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। বৃষ্টির জন্য প্রথম দিন মাত্র অর্দ্ধঘণ্টার জন্য খেলা হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হইয়াও ইংল্যাণ্ড দলকে ব্যাট করিতে দেয়। দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির জন্য খেলা বিলম্বে আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ড দল প্রথম ইনিংসে সাত উইকেটে মাত্র ১৬৪ রাণ করিবার পর ডিক্লেয়ার্ড করে। একমাত্র হার্ডষ্টাফ ৭৬ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পরে খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনে তিন উইকেটে ৮৫ রাণ করে। কিন্তু তৃতীয় দিনে ১৩৩ রাণে সকলে আউট হয়। হেডলী একা ৫১ রাণ করেন। বাওয়েসের বোলিং বিশেষ কার্য্যকারী হয়। ইংল্যাণ্ড দল পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেটে ১২৮ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে।

(শেষাংশ ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৮ই জুলাই—

বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি অনশন-ব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অনশন ত্যাগ করিতে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বাঙলা সরকার যাহাতে বাধ্য হন, তজ্জন্য জনসাধারণ এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গত রবিবার রাজনৈতিক বন্দি-মুক্তি দিবস উপলক্ষে চাঁদপুরের এক জনসভায় ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী উকিল শ্রীযুত নিবারণ দত্ত ও শ্রীযুত মাখন দত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরদিন আর একটি জনসভায় চাঁদপুর টাউন কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত মুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত ললিত দত্ত ও শ্রীযুত বিনোদ সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই ছাত্র-কর্ম্মী। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুত অমূল্য মুখার্জ্জি, শ্রীযুত বিমল মজুমদার, শ্রীযুত হরিকুমার রায় ও শ্রীযুত সুনীল মজুমদারের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের সকলের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

ডানজিগকে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জার্ম্মানীকে নূতন করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়া পোল্যাণ্ড সরকারের এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, যেভাবেই জার্ম্মানী ডানজিগকে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, পোল্যাণ্ড তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। হের হিটলারকে ডানজিগের সিনেটের সভাপতি নির্ব্বাচিত করার গুজব নানাস্থানে প্রকাশের পর ইস্তাহারটি প্রকাশিত হইয়াছে।

টোকিওতে ইঙ্গ-জাপ আলোচনায় যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। তিয়েনৎসিন সমস্যার আলোচনার ভিত্তি সম্পর্কে উভয় পক্ষ একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

জাপ প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ হিরানুমা সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট সদম্ভ ঘোষণা করেন যে, এই মীমাংসার ফলে যে মূলনীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা শুধু তিয়েনৎসিন সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু, সমগ্র চীনের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে। ব্যারণ হিরানুমা বলেন যে, চীন, জাপান ও মাঞ্চুকুওর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার যে যোগসূত্র রহিয়াছে, ব্রিটেন যদি তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে জাপান চীনে ব্রিটেনের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। অতঃপর ব্যারণ হিরানুমা বলেন যে, ব্রিটেন ঋণ দিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে চিয়াংকাইশেককে সাহায্য করিবে না বলিয়া তিনি আশা করেন; কিন্তু ব্রিটেন যদি ঐরূপ করে, তবে ব্রিটেনের কার্য্য জাপ-বিরোধী বলিয়া গণ্য হইবে।

বোম্বাই সরকারের মদ্যবর্জ্জন পরিকল্পনার সমালোচনার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে শ্রীযুত [illegible] বসু এক দীর্ঘ বিবৃতি [illegible] বক্তব্য [illegible]। "কংগ্রেসী [illegible] মেজাজ ক্রমেই চড়িয়া যাইতেছে; তাঁহারা এখন কিছুই বরদাস্ত করিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের কার্য্যের অণুমাত্র সমালোচনা কেহ করিলে তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন এবং দেশব্যাপী এমন তুমুল প্রচার-কার্য্যের ঝড় বহাইয়া দেন, সাধারণ কংগ্রেস কর্ম্মীরা কাজেই ভয়ে ভয়ে নীরব থাকিতে বাধ্য হয়।"

সিমলায় জাপ-ভারত বাণিজ্য আলোচনার বে-সরকারী পরামর্শ দাতাদের বৈঠক হয়। এই দুইটি দেশের মধ্যে নূতন করিয়া কোন বাণিজ্য চুক্তি করিতে হইলে তাহার সর্ত্ত কিরূপ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্যই তাঁহারা সমবেত হন। অদ্যকার বৈঠকে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ীদের দাবী সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

সিংহলের ভারতীয় বণিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, এস্, দেশাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সম্মানার্থে এক ভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী সিংহল ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করিতে অনুরোধ জানান এবং ভারতের জাতীয়তার মহান্ আদর্শ বিশ্লেষণ করেন।

১৯শে জুলাই—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশনের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতার ছাত্র-সমাজ রাজনৈতিক বন্দি-দিবস উদ্‌যাপন করেন।

মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে অনশন-ব্রতী রাজনৈতিক বন্দিগণকে জনমতের প্রবল সমর্থনে তুষ্ট হইয়া অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মানজনক মুক্তি অর্জ্জনের জন্য গান্ধীজী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, এখন হইতে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোরেশনের পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের পদগুলিতে লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রস্তাবটি ৩৫—৩১ ভোটে গৃহীত হয়। ডাঃ রায়ের দল, ইউরোপীয়ান দল ও মনোনীত দলের কয়েকজন প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সদস্যগণ, কয়েকজন মুসলমান কাউন্সিলার ও তিনজন মনোনীত কাউন্সিলার উহার বিরোধিতা করেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বৎসর ১২ই মে তারিখে কর্পোরেশনে লোক নিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ক্ষমতাসমূহ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া এবং ঐগুলি বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে অর্পণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপূর্ব্বে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার দুইশত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের পদসমূহে লোক নিয়োগের ক্ষমতা ছিল।

নিজাম সরকার শাসন-সংস্কার মঞ্জুর করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। উক্ত ঘোষণানুযায়ী ৮৫ জন সদস্য লইয়া একটি ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে। তন্মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ৪২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং সমসংখ্যক আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। অন্য বিষয়ে পরামর্শ

দিবার জন্য একটি রাজকীয় ধর্ম্ম-বিষয়ক কমিটি এবং জাতি-গঠন বিভাগ পরিচালনায় মন্ত্রিগণকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিটি নিযুক্ত হইবে। উক্ত ঘোষণায় নিজাম বাহাদুরের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, আইন-সভায় বক্তৃতা ইত্যাদি স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল নিজাম রাজ্যের লোকই সরকারী চাকুরী পাইবে। প্রার্থী নির্ব্বাচনের জন্য একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ বোর্ড গঠিত হইবে।

গত ১৮ই মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হিন্দুদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলে সম্মতি না দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া কলিকাতার পঞ্চাশ হাজার নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন-পত্র বাঙলার গবর্ণরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি। তিনি বাঙলার লাটের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত এক পত্রে কলিকাতার হিন্দু নাগরিকগণের পক্ষ হইতে বাঙলার লাটকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন বিলটি অনুমোদন না করেন।

ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আসাম সীমান্ত সুরক্ষিত করার আবশ্যকতা সম্পর্কে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারী এক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত পর্ব্বত ও অরণ্য সমাকীর্ণ; আধুনিক বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অন্ততঃ দশ লক্ষ পাউন্ড ব্যয়ে উহাকে সুরক্ষিত করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, সদিয়া, ডিব্রুগড়, আসামের তেলের খনি অঞ্চল, তেজপুর, গৌহাটী, শিলং, ময়মনসিংহ, ঢাকা, যশোহর, কলিকাতা—এই সমস্তই বিমান দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। দূর পাল্লার জাপানী বিমানের আক্রমণ হইতে কলিকাতার ভয় খুব বেশী। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে কলিকাতা ও বাঙলা ও আসামের অন্যান্য শহর রক্ষার জন্য উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পাহাড়গুলির উপর সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও শক্তিশালী বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

২০শে জুলাই—

সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা সম্পর্কে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া গত ৯ই জুলাই বাঙলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির জরুরী বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কার্য্যকরী সমিতির যে সকল সদস্য উহা সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্ত কার্য্যের পক্ষে কি যুক্তি আছে, কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলা কংগ্রেসের সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখিয়া তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত সুভাষ-চন্দ্র বসুর নিকটও অনুরূপ পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

নিজাম ঘোষিত শাসন-সংস্কার বিবেচনা করিয়া ইতি কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছান পর্য্যন্ত আপোষ মূলক মনোভাব প্রদর্শন হিসাবে এক সপ্তাহের জন্য হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ডানজিগে শুল্ক বিভাগের জনৈক জার্ম্মান কর্ম্মচারী পোলিশ শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারীকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। গুলী করার সময় উক্ত পোলিশ কর্ম্মচারী নাকি পোলিশ এলাকায় ছিলেন। ডানজিগ সিনেট তজ্জন্য পোলিশ কমিশনারের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

'মন্দিরা' পত্রিকার গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন লিখিত 'সমাজতন্ত্রবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায়, কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত পত্রিকার নিকট এক হাজার টাকা জামিন তলব করিয়া নোটিশ জারী করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দিনী কুমারী কমলা দাশগুপ্তা বি-এ, এই সাময়িক পত্রিকাখানির সম্পাদিকা।

২১শে জুলাই—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল রদের জন্য সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন চালাইতে কলিকাতা ও সমগ্র বাঙলার নরনারীকে আহ্বান করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতা নাগরিকদের একটি বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে প্রবাসী ভারতীয়েরা আগামী ১লা আগষ্ট হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা কংগ্রেসকে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কাশ্মীর পরিভ্রমণ বাতিল করিয়াছেন।

২২শে জুলাই—

আলিপুর ও দমদম জেলের ৮৯ জন অনশন-ব্রতী রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবী কল্পে কলিকাতা ও সহরতলীর নানা স্থানে সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বন্দি-মুক্তি সমিতির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকদের এক বিরাট সমাবেশ হয়।

এবটাবাদের সীমান্ত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সুদীর্ঘ অধিবেশন হয়। অধিবেশনের পর উক্ত সমিতির সদস্যগণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে কেহ কোনও দলের এই কারণে কাহাকেও কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত নহে। সীমান্ত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে অধিক সংখ্যক ভোটে কংগ্রেসের মধ্যে যে সকল দল ও ব্লক আছে, উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সীমান্ত কংগ্রেসকে বিশেষ অনুমতি দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট আবেদন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব হইতেই গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি উপরোক্ত মর্ম্মে জবাব দেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু গুজরাট ভ্রমণান্তে বোম্বাই

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গুজরাটের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলার অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তি সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি অনশনব্রতী বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া দেশের সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ছয়জন অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

অদ্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয়ের সমাধিস্থলে স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান হয়।

হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাকরাইল দাঙ্গা মামলার রায় দিয়াছেন। তিনি ২৭জন আসামীকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করেন এবং ১৫জন আসামীকে মুক্তি দেন।

২৩শে জুলাই—

আলিপুরে ও দমদম জেলের অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য জনসাধারণ কিরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং বন্দীদের মুক্তির দাবী যে জনসাধারণ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন, অদ্য কলিকাতায় ও হাওড়ায় বিভিন্ন জনসভায় তাহা পুনরায় সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে। সভায় অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয় এবং বাঙলায় মন্ত্রিমণ্ডলীর মনোভাবের তীব্র নিন্দা করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে শ্রমিকদের মধ্যে কিরূপ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, মহিষ ও গরুর গাড়ীর এক শোভাযাত্রায় তাহা আরও বেশ পরিস্ফুট হয়। চালকেরা তাহাদের গাড়ীগুলিতে কংগ্রেস ও লাল পতাকা উড়াইয়া শহরের বড় বড় রাস্তা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বন্দীদের মুক্তি দাবী জানায়।

অনশনব্রতী বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে। শ্রীযুক্ত ফণী দাশগুপ্তের অবস্থা গভীর উদ্বেগজনক। তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বিরাজ দেবের অবস্থাও উদ্বেগজনক। তিনি রক্তামাশয়ে ভুগিতেছেন।

বাঙলায় নারী নির্য্যাতন ও তাহার প্রতিকার বিষয় আলোচনার জন্য কলিকাতা এলবার্ট হলে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। নারীরক্ষা সমিতির উদ্যোগে সভা আহূত হয়।

সীমান্ত প্রদেশের এবটাবাদে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন, "হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ব্যতীত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।"

আসাম ভ্যালী জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কে কে হাজরা আই-সি-এস ডিগবয় ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য সালিশ নিযুক্ত হইয়াছেন। যদি কোম্পানী কর্তৃপক্ষ মিঃ হাজরার সিদ্ধান্ত মানিয়া না লন, তবে আসাম সরকার আইন প্রণয়ন করিবেন। আসাম সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জিকে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি আগষ্ট মাস হইতে ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিবেন।

ভারত সরকার মিঃ আর এইচ হাচিনসকে ব্রহ্মে ভারত সরকারের এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৪শে জুলাই—

'বোম্বে ক্রনিকল' সংবাদপত্রের পাটনার সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন,—রাজনৈতিক বন্দি-মুক্তি কমিটির সম্পাদকের মারফৎ কংগ্রেস সভাপতি বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ন্যায় বাঙলাদেশে শাসন তান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করিয়া রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তিদানে হক মন্ত্রিমণ্ডলী যদি জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকার সাব্যস্ত করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে কংগ্রেস তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবে এবং ভারতের সর্ব্বত্র শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করিয়া বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত যোগ দিবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত সিংহলের মন্ত্রিমণ্ডলীর আলাপ আলোচনা শেষ হইয়াছে। 'ইউনাইটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন যে, গত কয়েকদিন যাবৎ পণ্ডিতজীর সহিত সিংহলের মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের ভারতীয় বিতাড়ন পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পণ্ডিতজী ২৫শে জুলাই সিংহল হইতে মাদ্রাজ পৌঁছিবেন।

বাঙলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, ময়মনসিংহ জেলার দেলদুয়ারের জমিদার আলহজ স্যার আব্দুল করিম গজনবী অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস, সুধীরচন্দ্র ঘোষ ও মনোমোহন চৌধুরী উৎকল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

অদ্য ঢাকেশ্বরী মিলে ধর্ম্মঘটের সপ্তম দিবস। এযাবৎ প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে।

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে মিস্ লীলা ঘোষ সর্ব্বপ্রথম ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিস্ ঘোষ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এই পদ লাভ করিয়াছেন।

টোকিওতে মিঃ আরিতা ও স্যার রবার্ট ক্রেগীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, অদ্য কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, চীনে জাপ অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে জাপ বাহিনীর কার্য্যে বৃটেন কোন ব্যাঘাত ঘটাইবে না। বৃটেন উক্ত চুক্তি দ্বারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহাতে চীনের জাপবাহিনী অধিকৃত এলাকার উপর জাপানের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব কার্য্যত স্বীকার করিয়া লওয়া হইল কিনা—মিঃ হেণ্ডারসনের এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, এতদ্বারা জাপানের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(৬ষ্ঠ বর্ষ—দেশ, ২৫শ হইতে ৩৬শ সংখ্যা পর্য্যন্ত)

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৬ Saturday, 22nd July, 1939. [৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি—

আলীপুর ও দমদম জেলের অনশনব্রতী বন্দীদের
অবস্থায় দেশের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, জনমত
বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। এই কয়েক দিনে কলিকাতার বিভিন্ন
স্থানে বিপুল জনসভায় এবং গত রবিবার কলিকাতাব্যাপী
হরতালে সে বিক্ষোভের ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। মানুষ
যে তাহার চিত্তে বিক্ষোভ ঘটিবারই কথা। কারাগারের
রুদ্ধকক্ষে বন্দীদের জীবনদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছে
দেশের এতগুলি যুবক নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে আজ মৃত্যুর
পথযাত্রী—চাঞ্চল্য জন্মিবে না দেশের জনসাধারণের মধ্যে
ইহাতেও? স্যার নাজিমুদ্দিন যাহাই বলুন, আর নলিনী-
নাজিম-ধীরজ-নিবন্ধমূর্ত্তি বাঙলার আর আর মাতব্বর
মন্ত্রীরা যে যুক্তিই দেখান না কেন,—একথা অস্বীকার করিলে
চলিবে না যে, রাজনীতিক বন্দীদের সঙ্গে দেশের লোকের
সহানুভূতির সংযোগ একটা রহিয়াছে। সব পরাধীন দেশেই
ইহা থাকে। দেশের জনসাধারণ ইহাদিগকে মরিতে দিতে
পারে না। মহাত্মা গান্ধী বাঙলা সরকারের কাছে আর এব
দফা আবেদন করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন "রাজ-
নৈতিক বন্দিগণকে বহুপূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল।
দায়িত্বশীল আইন সভার হস্তে ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় জন-
সাধারণ আশা করিয়াছিল যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি
দেওয়া হইবে। জনসাধারণের এই আশা বহু পূর্ব্বেই পূর্ণ
হওয়া উচিত ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান ব্যাপারে
গবর্ণমেণ্ট যদি জনমতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে
তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হইবে না বরং লাভ হইবে অনেক
বেশী।"

মহাত্মাজীর এই ধরণের অনুরোধে কাজ যে কিছু হইবে,
আমরা ইহা মনে করি না। আবেদন-নিবেদনের দিন গিয়াছে।
এ সব ধর্ম্মের কাহিনী বাঙলার মন্ত্রীদের কাছে খাটিবে না;

কারণ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সমর্থনে নিজেদের মন্ত্রিত্ব কায়েম
রাখাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। দেশের জনমতের প্রতি বিন্দু-
মাত্র শ্রদ্ধাও তাঁহাদের নাই। নিজেদের ধাপ্পাবাজীর সাহায্যে,
বাঙলার আইন সভায় ম্যাকডোনাল্ডী বাঁটোয়ারার মহিমায় এমন
জোট বাঁধা দল বাগাইয়া লইয়াছেন যে, জনমতকে তাঁহারা
গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। সুতরাং উপায় কি এক্ষেত্রে?
ঢিমে তেতালায় কর্ম্ম নয়—কাজের পথ ধরিতে হইবে! শুধু
সভা সমিতিও নয়, আবেদন-নিবেদনেও নয়। তাহারও অপেক্ষা
ব্যাপক কিছু, বড় কিছু! সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলন
জাগাইয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর চাপ দিতে
হইবে কিন্তু সেজন্য গরজ কাহার? কংগ্রেসী দক্ষিণী
দলের নেতাদের গরজ তো দেখা যাইতেছে না।
তাঁহারা লড়াই বাধিলে হাতীয়ার ধরিবেন কি না ধরিবেন এই
সব বড় বড় কথা বলিতেছেন। কংগ্রেস হইতে অহিংসার
আঁচ দূর করিবার জন্য দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
কোথায় কাহার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী একসন অবলম্বন
করিতে হইবে, এই জন্য ব্যস্ত আছেন। মহাত্মা গান্ধী নিজে
—যিনি এ সম্বন্ধে দায়িত্ব লইয়াছিলেন, তিনি এখন অহিংসার
অনুদ্ধ স্তরে উঠিয়া কতকটা উদাসীন গতব্যথেরই ভাব
দেখাইতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল চলিলেন লঙ্কাদ্বীপে
দিগ্বিজয় করিতে। এদিকে বাঙলা দেশের কারাগারে বন্দীদের
জীবনদীপ ক্রমে স্তিমিত হইতে অধিকতর স্তিমিত হইয়া
পড়িতেছে! এজন্য বেদনা গভীরভাবে বাজিতেছে কোন্ নেতার
অন্তরে?—সত্যই যদি তেমন বেদনা বাজিত, রাষ্ট্রনৈতিক
নেতার অন্তরে—যদি তেমন বেদনা বাজিত, রাষ্ট্রনৈতিক
সংকট গড়িয়া উঠিত সমগ্র ভারতে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া।
প্রকৃতপক্ষে তেমন সংকট বা সমস্যা গড়িবার পক্ষে এই কারণটি
যত বড়, এমন আর কোনটিই নয়—অথচ কংগ্রেসের যিনি
রাষ্ট্রপতি, তিনি এ সম্বন্ধে এতদিন নীরব ছিলেন, এখন

চিন্তা করিতেছেন শুনিতেছি; কিন্তু গবেষণার কাল কাটাইবার সময় নাই, দরকার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের! বাঙলা দেশ এতগুলি বন্দীর জীবন-মরণ সমস্যাতেও কংগ্রেসের দক্ষিণী দলের ধনুর্দ্ধরগণ অচঞ্চল। তাঁহারা নিজেদের দলের জোট বাঁধার দিকেই ব্যস্ত আছেন। নির্ভেজাল অকৃত্রিম খাঁটি অহিংস অন্তরঙ্গ সঙ্গে রস আস্বাদনের জন্যই তাঁহাদের আকুলতা। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রহিয়াছে—কংগ্রেসের মর্য্যাদা আজ বাঙলা দেশে বিপন্ন, এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি—এদিকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যবোধ নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা বাঙলা দেশ হইতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হইয়াছেন তাঁহাদিগকে, তাঁহারা কি করিতেছেন এ সম্বন্ধে? জেলে গিয়া রাজনীতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল আমরা এমন মনে করি না। যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা অবুঝ নহেন। সহজে তাহারা এমন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কংগ্রেসের মর্য্যাদা যদি অব্যাহত রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত এই প্রশ্নটিকে নিখিল ভারতীয় সমস্যায় পরিণত করিতে হইবে। কর্ত্তব্য উহাই বলিবে! আজ কংগ্রেসী দক্ষিণী দল যদি সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সাহসী না হন তাহা হইলে সে দুর্ব্বলতার কারণ কি, এ কৈফিয়ৎ দেশের লোকের নিকট দিতে হইবে। অসম্ভব দাবী করিলে সে দাবী রাখা যায় না—এই ধরণের কথা বাঙলা দেশের লোকে শুনিতে চায় না। রাজকোটের ব্যাপারের জন্য যদি অনশনব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বোধ হয়, যদি অনশনব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বোধ হয়, পুণা-চুক্তির জন্য, তবে মৃত্যুপথবর্ত্তী এতগুলি তরুণ প্রাণকে বাঁচাইবার জন্য সে প্রেরণা কেন জাগে না! বিহারের ও যুক্তপ্রদেশের রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি পদত্যাগ করিবার হুমকী দিতে পারেন, যদি তাঁহারা হুমকী দিতে পারেন, কোথায় কোন রাজ্য রাজকোট—সেইখানকার ব্যাপার লইয়া মহাত্মা গান্ধী অনশন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহা হইলে কংগ্রেসের এই নীতিগত প্রশ্নের গুরুত্ব তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যবোধে প্ররোচিত করে না কেন! এ প্রশ্নের আজ জবাব দিতে হইবে। কংগ্রেসী কর্ত্তারা যদি আজ এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করেন, বাঙলার জনমত তাঁহাদের সে কার্য্য বরদাস্ত করিতে পারিবে না। তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক মায়ার মোহে কংগ্রেসের মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করিবেন। ভীরু, দুর্ব্বল এবং অনুদারচেতা ব্যক্তিদের স্থান স্বাধীনতার সংগ্রামে নাই।

রাষ্ট্রপতির বিবৃতি—

রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এতদিন পরেও যে তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেখিতেছি আমরা একটি। সে প্রস্তাব এই যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিতেছেন। রাষ্ট্রপতির উক্তি এই সম্বন্ধে খুব সতর্কতাপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, এ বিষয়ে তাঁহার মনে কোন রকম সন্দেহ নাই। এই 'সাধ্যমত' কথাটির মধ্যে কি ভাব উহ্য থাকিতে পারে, আমরা তাহাই ভাবিতেছি। ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে কি করিবেন কিংবা কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত এবং ফলদায়ক হইতে পারে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যদি আরও একটু খোলাখুলি তাহা বলিতেন, তবে দেশের লোক অধিকতর আশ্বস্ত হইত। কারণ, বাঙলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ একটা সন্দেহের ভাব দেখা দিয়াছে যে, বাঙলা দেশের এই সব রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা তাঁহারা করেন নাই। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের ব্যাপারটি প্রদেশ বিশেষের প্রশ্ন, উহা বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের সম্পর্কিত ব্যাপার; ইহার সঙ্গে অন্য প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে জড়িত করা উচিত হইবে না। ওয়ার্কিং কমিটি এইরূপ মনোভাব এখন অবলম্বন করিয়া না বসেন, এইটুকু আমাদের নিবেদন। আমাদের কথা এই যে, বাঙলা সরকার রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি না দেওয়ার গোঁ যদি না ছাড়েন, তাহা হইলে, ওয়ার্কিং কমিটি হইতে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের উপর এই নির্দ্দেশ দান করা হউক যে, তাঁহারা এই প্রশ্নকে ভিত্তি করিয়া যেন একটি রাষ্ট্রীয় সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া তুলেন। বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি শুধু প্রাদেশিক প্রশ্ন নয়, কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় নীতি-গত প্রশ্ন। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই প্রশ্ন লইয়া রাষ্ট্রসঙ্কট সৃষ্টি করিয়া বড়লাটকে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে নির্দ্দেশ দান করিতে বাধ্য করিতে পারেন। যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দানের নীতিতে ঐ ঐ প্রদেশের গবর্ণরেরা অসম্মত হইলে মন্ত্রিমণ্ডল হইতে তেমন চাপ দিয়া গবর্ণরদিগকে বাধ্য করান হইয়াছিল। বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদিগের মুক্তিকার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ইহাই হইল সব চেয়ে কার্য্যকর উপায়। বাঙলার প্রগতি-বিরোধী মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির আলোচনা চালাইয়া কিংবা যুক্তি-বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়া সে কাজ সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

কর্পোরেশনের উপর আক্রমণ—

বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপ্যাল বিল মন্ত্রীদের মনোমতভাবেই এবার পাশ হইয়া গিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সভার সদস্যেরা যে মত দিয়াছিলেন, তাহা উল্টিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই—কারণ কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, এই শ্রেণীর মনুষ্যত্বহীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন অপদার্থের দলেরই প্রশ্রয় যেখানে, সেখানে স্বাধীন-চিত্ততা বা মত-স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা আশা করা যাইতে

পারে না। মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব বিতর্কের জবাবে মিউনিসিপ্যাল বিলের মূলীভূত মহৎ উদ্দেশ্যের কথাটি খোলাখুলি বলিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য হইল কর্পোরেশন হইতে কংগ্রেসের প্রভুত্বকে নষ্ট করা এবং শ্বেতাঙ্গ সদস্যের দল সে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিবেন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কংগ্রেসের প্রভুত্ব নষ্ট করার এই যে যুক্তি, এটা মুখ্য নয়, আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। এই বিলের ফলে কার্য্যত কি হইবে? কার্য্যত কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্বের ন্যায্য অধিকার যাহাদের, যাহারা কর্পোরেশনের ট্যাক্স বেশী যোগায়, সেই হিন্দুদের প্রভুত্বকেই ক্ষুন্ন করা হইয়াছে। হিন্দুদের ন্যায্য অধিকারকে অসঙ্গত এবং অযৌক্তিকভাবে পদদলিত করিয়া বিদেশীয় প্রভুত্ব কলিকাতার পৌরজনগণের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। কলিকাতার পৌরজনগণ কি এই ব্যবস্থা মানিয়া লইবে, মানিয়া লইবে কি জাতীয়তাবাদী বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমান গণতন্ত্র-বিরোধী স্বেচ্ছাচারিতার এই নীতিকে? আমরা সেই প্রশ্নই করিতেছি! যে জাতীয়তাবাদী বাঙলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের একদিন সঙ্কল্পশীলতা এবং সংহতি শক্তির দ্বারা হেঁট মানাইয়াছিল—পাকা সিদ্ধান্তকে কাঁচা করিয়াছিল, সেই বাঙলা দেশ কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চাকরের চোকর—চোকরের বস্কর এই সব সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি-প্রভাবিত মন্ত্রীদের মারাত্মক নীতিকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না? আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী এখনও মরে নাই, তাহাদের ধমনীতে মর্য্যাদার অনুভূতি এখনও এতটা শিথিল হইয়া যায় নাই যে, বাঙলার বুকের উপর দাঁড়াইয়া জন-কয়েক স্বার্থাভিসন্ধী লোক যাহা খুশী তাহাই করিয়া যাইবে। ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদের ভোটের বিচার আমরা করিতে চাহি না, আমরা বাঙলার জনমতের সংহত সঙ্কল্প-শক্তির জাগরণ দেখিতে চাই, এই শ্রেণীর ক্রম-বর্দ্ধমান অনাচারের উপসংহার ঘটাইবার অভিমুখে।

পৌরাধিকারের জন্য সংগ্রাম—

বাঙলার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মৌলবী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী একটি বিবৃতি বাহির করিয়া এই অনিষ্টকর বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্ত কলিকাতার পৌরজনকে আহ্বান করিয়াছেন। মৌলবী আশরফউদ্দীন চৌধুরীর এই বিবৃতি বিলের প্রকৃত স্বরূপ দেশবাসীর নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তিনি বিলের প্রত্যেকটি ধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিলটি কলিকাতার পৌরজনের পক্ষে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র বাঙলাদেশের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক এবং ভয়াবহ তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এই বিলের ফলে শ্বেতাঙ্গেরাই হইবে প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা শহরের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, কলকাঠি ঘুরাইবেন তাঁহারাই এবং তাঁহারাই যেমন খুশী কলিকাতাবাসী-দের ঘাড়ে চাপিয়া বাঙলা শাসনে বাঁটোয়ারা ভোগ করিবেন। মন্ত্রীরা মুসলমান স্বার্থরক্ষার যে ধুয়া তুলিয়াছেন, সেটা যে কত বড় ধাপ্পাবাজী আশরফউদ্দীন সাহেব তাহাও উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মুসলমানদের আসন বণ্টনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার হিসাব খুলিয়া দেখাইয়াছেন, বিদেশী যে সব মুসলমানেরা শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের মালের কারবার করিয়া থাকে এবং সেইভাবে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা এই দেশ-শোষণে সাহায্য করে তাহাদিগকেই বেশীর ভাগ আসন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এ কথাটা যে, বাঙলাদেশ হইল জাতীয়তা-বাদের কেন্দ্রস্থল এবং বাঙলাদেশের রাজধানী, বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্র এই কলিকাতা শহর হইতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাঙলার জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্য-বাদীরা ম্যাকডোনাল্ডী ব্যবস্থার কৌশল প্রয়োগ করিয়াছে এভাবে যাহাতে বাঙলাদেশের আইনসভায় জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্য না ঘটিতে পারে, হক মন্ত্রিমণ্ডল কলিকাতা কর্পোরেশনে সাম্রাজ্যবাদীদেরই সেই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাদীদের সেলামীস্বরূপে কলিকাতা শহরটি তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের মূলীভূত উদ্দেশ্য হইল—সাম্রাজ্যবাদীদের কার্য্যসাধন করা, বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করা—স্বাধীনতার সাধনায় বাঙলাদেশের প্রগতিশীল মনোবৃত্তিকে সাম্প্রদায়িকতার বিসপ্রয়োগে অভিভূত করা। এই বিলের ভিতরে অন্য কোন নীতি নাই, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই; কি প্রতিনিধিত্বের নীতি, কি করদাতাদের স্বার্থসম্পর্কিত নীতি, কোন দিক হইতে ইহার মূলে কোন যৌক্তিকতা নাই বরং আছে অযৌক্তিকতা এবং একান্ত রকমের অসঙ্গতি। বাঙলাদেশ এই স্বেচ্ছাচারিতার নীতির বিরুদ্ধে উপযুক্তভাবেই সাড়া দিবে, আমাদের এমন বিশ্বাস আছে। আমাদের বিশ্বাস আছে, হক মন্ত্রিমণ্ডল সত্বরই হাড়ে হাড়ে এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বাঙলাদেশটাকে নিজেদের অনুগত কতকগুলো অপদার্থদের জোটবাঁধা দলের জোরে তাঁহারা যতটা হাতের মুঠোর মধ্যে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে দেশের অবস্থা ততটা অসহায় হয় নাই, অন্ততপক্ষে মহা আদর্শের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিবার মত মানুষের অভাব এদেশে এখনও নাই। স্বদেশী যুগের শক্ত বাঙালী এখনও বাঁচিয়া আছে।

চা-কর সাহেবদের বেয়াড়াপনা—

আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, চা-কর সাহেবেরা সেই কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। করিবার কারণ ত আছেই। এতদিন তাহারা গরীবের রক্ত জল করিয়া ফলাও করিয়া কারবার চালাইয়াছেন, তদন্ত চলিতে দিলে ব্যাপারটা যে ধরা পড়িয়া যায়, তাই এই সেয়ানাপনা। এই সব চা-কর প্রভুদের আবদারটা কেমন শুনুন। তাঁহারা এই বায়না ধরিয়াছেন যে, ডিগবয়ের ধর্ম্মঘট কিজন্য হইল, কোন্

কারণে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘাট করিল, কোন শ্রমিক কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে আসিলে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তাহাকে করা চলিবে না। এই যে আবদার—এই আবদারে মনের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। বুঝা যায় এই সোজা কথাটা যে, তদন্তের ফলে অভাব-অভিযোগের কোন কারণ প্রকাশ পায়, সাহেবেরা ইহা চাহেন না। অভাব-অভিযোগের কারণ যতই থাকুক—শ্রমিকদের মুখ হইতে সেকথা শুনা চলিবে না। চমৎকার যুক্তি নয় কি? যদি এমন যুক্তিই মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে আর তদন্তেরই বা সার্থকতা থাকে কোথায়? সাহেব কর্ত্তাদের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেই ত চলে। আর এক আবদার হইল এই যে, চা-বাগিচার ব্যবসার সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে যদি তদন্তকার্য্য পরিচালিত হয়, কিংবা ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয়, তবে তেমন কমিটির কার্য্যেই চা-কর সাহেব প্রভুরা সহযোগিতা করিবেন। প্রথম যুক্তি একেবারেই অবান্তর। শোষণকারী পাটি ওয়ালারাই যদি তদন্তের কর্ত্তৃত্ব করে, তবে শ্রমিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে কোন সুবিচারের আশাই সেখানে করা যাইতে পারে না; দ্বিতীয় যুক্তি চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যমূলক—জনকয়েক চা-কর সাহেবদের দাবীতে আসাম সরকার তাঁহাদের নিজেদের অধিকারকে বিকাইয়া দিতে পারেন না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি। এদেশের গরীবদের ন্যায্য স্বার্থ দেখিতে গেলে এই সব সাহেব শোষণকারীর দল আর্ত্তনাদ তুলিবেই। সুখের বিষয়, আসামের বরদলৈ মন্ত্রি-মণ্ডল এই আর্ত্তনাদকে উপেক্ষা করিয়াই তদন্তকার্য্য চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং আমরা এই আশাও করিতেছি যে, এই শ্রেণীর শোষকদের আর্ত্তনাদকে সমভাবে উপেক্ষা করিয়াই গরীব শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার নিমিত্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা তাঁহারা অবলম্বন করিবেন; চা-কর সাহেবদের অসুবিধা হয়, তাহারা অন্যত্র চেষ্টা দেখুক। তাহাদের স্বার্থসেবা করিবার জন্যই যে ভারতের কালা আদমীদের সৃষ্টি হয় নাই, এই সত্যটি একান্ত নির্ম্মমভাবে তাহাদিগকে উপলব্ধি করাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। আসাম সরকারের এই দিককার দৃঢ়তা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আদর্শ ও নীতির সহিত পাটকলের সাহেবদের সম্পর্কে বাঙলাদেশের মন্ত্রীদের নীতির তুলনা করিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, এখানকার মন্ত্রীদের জনস্বার্থ রক্ষায় ঔদাসীন্য কতখানি, দেশের গরীবদের প্রতি দরদের অভাব ইহাদের কত বেশী।

রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা—

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি শ্রীনিকেতনের এক সভায় তাঁহার পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"পল্লীবাসীদের সেবা করতে গিয়ে প্রথমে যে অভিজ্ঞতা হ'ল, আজও মনে আছে, সেটা মোটেই লোভনীয় হয় নি। সেবা যাদের করবো, তাদের কাছে পেলাম বাধা; আর যারা জোর করে বাধা দিল না, তারা রইল উদাসীন। মন কিন্তু আমার দমে গেল না। আমি জানতাম যে, তারা যখন বুঝবে আমি তাদের সেবা করতেই চাই, কৃপা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তখন তারা আমার সেবা গ্রহণ করবেই। মনে রেখো যে, সমাজ সেবার প্রেরণায় থাকা চাই প্রেম। নিশ্চিত জেনো তথাকথিত সমাজসেবীরা যাদের পল্লী-উন্নয়ন কাজে দয়া আর কৃপার ভাব ফুটে উঠে, পল্লীবাসীরা তাদের অবজ্ঞাই করে।"

সেবা এবং কৃপা এই দুইয়ে তফাৎ কোথায়, রবীন্দ্রনাথ সেই জিনিষটা বুঝাইয়াছেন। কৃপায় মানুষ বশ হয় না, মানুষ বশ হয় সেবার কাছে। মানবের অন্তরে যে পুরুষ রহিয়াছেন, মানুষ অহঙ্কারের বশে কৃপার দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলে প্রতিক্রিয়াস্বরূপে উপেক্ষাই লাভ করিয়া থাকে। পল্লী-বসীরা অজ্ঞ, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আমি শহুরীয়া, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, মনের এমন ভাব লইয়া দেশের কাজ যাঁহারা করিতে চাহেন, তাঁহারা কাজের পথে বেশী দূর আগাইয়া যাইতে পারেন না, তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তি-অভিমানই কর্ম্মে অধ্যবসায়ের পক্ষে অন্তরায় ঘটায় আত্মাভিমান যেখানে যত বেশী বাহির হইতে আপনার উপর আঘাতের অনুভূতিও তত বেশী। আত্মনিবেদনের আনন্দের উপলব্ধির পথেই বৃহদাদর্শের অনুপ্রেরণায় প্রত্যক্ষভাবে মানুষ সঞ্জীবিত হয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। যিনি প্রকৃত কর্ম্মী—তিনি মানব-সেবার অন্তর্নিহিত এই আনন্দ-ধারার আস্বাদনের উপায়টি ধরিয়া ফেলেন এবং কর্ম্মের ইহাই হইতেছে কৌশল। কর্ম্মযোগের ভিত্তি এইখানে। তেমন আত্ম-নিবেদন-পরায়ণ কর্ম্মীদের সাধনাতেই সমাজের উন্নতি ঘটে—জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। এমন অনহঙ্কারী সেবানিষ্ঠ কর্ম্মী দলের প্রয়োজন আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তথাকথিত নেতার প্রয়োজনীয়তা তত নয়।

আত্মদান ও আত্মহত্যা—

মুলসীপেটা সত্যাগ্রহ—অনেকদিনের কথা। সেনাপতি বাপাতের জীবন সংগ্রামময়; তিনি বহু যুদ্ধের বীর। সম্প্রতি ইনি স্বরাজের জন্য সংগ্রামকে তীব্র করিয়া তুলিবার উদ্দেশে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিবেন, এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি পুণার তিলক মন্দিরে একটি সভায় বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্কল্পে দৃঢ় আছেন এবং তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য এ দেশের কতকগুলি লোকের জীবন দান করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, এবং তেমন জীবন দানের ফলে জগতের জনমত ভারতের অনুকূল হইয়া উঠিবে। স্বাধীনতার পথে জীবন দানের প্রেরণা যে থাকা আবশ্যক, এবং জীবন দিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে শুধু কথার বড় বড় বোলচাল আওড়াইয়া যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে সেনাপতি বাপাতের সঙ্গে মতদ্বৈধ হইবে খুব কম লোকের। কিন্তু আত্মহত্যা আর আত্মদান এক জিনিষ নয়। যিনি কর্ম্মী তিনি যোগ্য উপায়ের সঙ্গে নিজের পুরুষকারকে যুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন, মহাকবি ভারবীর উক্তির মূল্যকে কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রতিকূল শক্তিকে বাধা দমনের ভিতরই বীরত্ব, এবং সেই বীর্য্যোচিত সাধনার পথেই আত্মদান

সার্থক হইয়া থাকে; অন্যায়ের বিরুদ্ধতায় মানবের মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—এই যুদ্ধে অপলায়ন-প্রবৃত্তির ভিতর দিয়াই। সেনাপতি বাপাত এই প্রতিকূল শক্তির সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে সম্মুখীন হইয়া যদি জীবন দান করিতেন, আত্মদানের উদ্দীপনা দেশ তাহা হইলে লাভ করিত। কিন্তু যে ভাবে তিনি জীবন বিসর্জ্জনের সংকল্প করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রতিকূল শক্তির সংগে সম্মুখে সংগ্রামের এই শৌর্য্য নাই, বড় জোর একটা বিষাদের ভাব আছে। এই বিষাদকে অতিক্রম করিয়াই কর্ম্ম-সাধনার পথে বীর্য্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। বিঘ্ন-বিপত্তির ভিতর দিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিতে হয়। বিঘ্নকণ্টকময় এই পথে সাধন-নিষ্ঠার ভিতর দিয়া যেখানে আত্মদান ঘটে, সেইখানেই একটা অমোঘ শক্তির স্ফুরণ হয়। সংগ্রামক্ষেত্রে অন্তরায়ের বাহুল্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া যেখানে কেহ জীবন দেয়, তাহার ফল বিপরীতই হইয়া থাকে। আগামী রবিবার মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি বাপাত জীবন বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা এখনও আশা করিতেছি তিনি আত্মহত্যা না করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীমূলে আত্মদান করিবার সার্থকতাকেই উপলব্ধি করিয়া সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।

বাঙলার আসন্ন সংগ্রাম—

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত সোমবার আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—"আমার একটি কথা বলিবার আছে, তাহা এই যে এ দেশের ইতিহাসে বর্ত্তমানে যেমন সংকটকাল দেখা দিয়াছে এমন আর কোন দিনই দেখা দেয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে যদি আমরা একটু বিবেচনা করি তবেই বুঝিতে পারিব যে, বাঙলার ইতিহাসে ইহাই বোধ হয় সবচেয়ে সংকটজনক কাল। এমন সংকটকালে আমাদের লোক-বল দরকার। আমাদের সম্মুখে যে সংগ্রাম আসিতেছে, এমন অবস্থায় আমাদের সকলকেই এই সংগ্রামের জন্য মনে-প্রাণে প্রস্তুত হইতে হইবে। আপনারা যাঁহারা এখানে শিক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, আমি আশা করি, তাঁহারা কেবল বই-কেতাব লইয়াই থাকিবেন না, কলেজের বাহিরে কি ঘটিতেছে বাঙলা দেশের ব্যাপার কি, সে সম্বন্ধেও ভাবনা-চিন্তা করিবেন। আমি আশা করি, দরকার যখন হইবে বাঙলার ছাত্র সমাজ উপযুক্তভাবেই সাড়া দিবে।"

বাঙলার সংকট চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসিতেছে। বাঙলার শিক্ষা স্বাধীনতা এবং বাঙ্গলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ সরকারের গোলামখানায় পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বাঙলার প্রধান পৌর-প্রতিষ্ঠান, যে কলিকাতা কর্পোরেশন, সেই কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব এখন নিতান্ত অন্যায়ভাবে বিদেশীর কাছে বিকাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে বাঙলা দেশ সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। বাঙালীর জাতি হিসাবে উন্নতির আশা চির-দিনের জন্য নষ্ট হইবে এবং বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের সকল সাধনা ব্যর্থ হইবে। দেশের তরুণের দলের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে দেশকে এই সংকট হইতে রক্ষা করা, পুঁথি কেতাব অপেক্ষাকৃত পরের কথা। বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতিই যদি নষ্ট হয়, তবে আর রহিল কি? পশুর মত ক্রীতদাসের জীবন-ধারণে সার্থকতা কিছু নাই এবং তেমন জীবনের অন্ততঃ যুবকদের কাছে আকর্ষণ থাকিতে পারে না।

শিক্ষায় নারীর মর্য্যাদা—

কুমারী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী প্রতিমা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। কুমারী রমা ঐ একই বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহাদের এই সম্মানলাভে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। খনা, লীলাবতী—ভারতের এই সব প্রাচীনা মহিলাদের কথা আমাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত হইতেছে। পরাধীন ভারতের দুর্গতি অবস্থায় জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র হইতে নারী অপসৃতা হইয়াছিলেন, ইহার ফলে মৈত্রেয়ী, গার্গী, জ্ঞান-সাধনার কথা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বাঙলার মাতৃগণ আবার ভারতের সেই গৌরবের যুগকে ফিরাইয়া আনুন। দেশের সামাজিক এবং রাজনীতিক জীবনে তাঁহারা নূতন শক্তির সঞ্চার করুন। দেশ শুধু পুরুষের সাধনাই নয়, সমভাবেই নারী সাধনার প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—

২২শে জুলাই, শনিবার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। অগ্নিময়ী মায়ের উদ্বোধনের জন্য বাঙলার যে সব বীরসন্তান আত্মবিনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের একজন অগ্রণী। তাঁহার রাজনীতি শুধু পাশ্চাত্যের মন্ত্রবুলি জিনিষ ছিল না, ছিল না মান প্রতিষ্ঠার উপরে, দেশের জনসাধারণের অন্তরের সংগে গভীরভাবে তাঁহার যোগ ছিল। দেশবাসীর দুঃখ কষ্টকে একাত্মতার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশসেবার যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাঁহার অন্তরে তাহা সকল ইতর আসক্তিকে দগ্ধ করিয়া আত্ম নিবেদনের ঊর্দ্ধশিখ হোম-হুতাশনকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশাত্মবোধের সুতীব্র এই উদার এবং আন্তরিক অনুভূতির ফলে তিনি মান-যশকে যেমন তুচ্ছ করিয়াছিলেন, তেমনই ভয়কেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। পরাধীন দেশের স্বদেশ-প্রেমিকদের যোগ্য পরস্কার তিনি তাঁহার জীবনে পর্য্যাপ্ত-

ভাবেই লাভ করিয়াছিলেন। বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ, অসম্মান, নির্য্যাতন—অভাব কিছুরই ঘটে নাই এবং এই বন্ধন, পীড়ন এবং নির্য্যাতনের মধ্যে দেশসেবার অনির্ব্বাণ আত্মপ্রসাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি জাতির মঙ্গল সাধনায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া অমরত্বকে অর্জ্জন করিয়াছেন। স্বদেশের মুক্তি-সাধনার সুদুষ্কর তপস্যার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতির উদ্দেশে আজ আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। তাঁহার আদর্শ জাতিকে মহাদাদর্শে উদ্দীপ্ত করুক। যতীন্দ্রমোহনের দেশাত্মবোধের জীবন্ত দীপ আজ অবসাদের ঘনান্ধকার সমাচ্ছন্ন বঙ্গের দিকচক্রবালে আত্মদানের অরুণ রাগ-রেখা ফুটাইয়া [illegible] আত্মদাতার মৃত্যু নাই—মরণের ভিতর দিয়া তিনি জাতির [illegible] নব প্রেরণা সঞ্চার করুন।

মহাত্মাজী যখন সেখানে ছিলেন, তদপেক্ষা এখনকার অবস্থা অনেকটা অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কতটা কি করিবেন আমরা জানি না; কিন্তু একথা সত্য যে, অনুরোধ উপরোধে কিছু কাজ হইবে না। শক্তি না দেখাইতে পারিলে এ জগতে ভক্তি আদায় করিবার উপায় নাই। ভারতবাসীরা যেদিন স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং স্বাধীন ভারত নিজের অপমানের পাল্টা হিসাবে অপরকে আক্কেল দিবার অধিকার হাতে পাইবে, সেই দিন ভারতীয়েরা মানুষের মর্য্যাদার অধিকারী হইবে, তৎপূর্ব্বে নয়। ট্রান্সভালের ভারতীয়েরা আজ অনাচারের বিরুদ্ধে যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন, উহাতে আত্মশক্তিতে তাঁহাদের আস্থার পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি. অন্ততঃ আবেদন-নিবেদনের মোহ-মায়াকে যে তাঁহারা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাও সুখের বিষয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—

১লা আগষ্ট হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমাজের মধ্যে স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নানাস্থানে ভারতীয়দের সভা-সমিতি হইতেছে এবং হাজার হাজার যুবক প্রত্যহ স্বেচ্ছাসেবক হইতেছে। ট্রান্সভাল রাজ্যে ভারতীয়দের উপর যে-সব অবিচার হইতেছে, অন্য কোন জাতিই তাহা বরদাস্ত করিয়া লইতে পারে না। স্বামী ভবানীদয়াল এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি বলেন, ভারতীয়দের প্রতি কুকুর বিড়ালের অপেক্ষাও খারাপ ব্যবহার করা হয়। দেখিতেছি, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবার একটু চঞ্চল হইয়াছেন, এবং মহাত্মা গান্ধীর নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন। মহাত্মাজীর এ সম্বন্ধে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু

হক সাহেবের ছুটি—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক ছুটি লইয়াছেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কিছুদিন বিশ্রাম লাভের জন্য পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে এমন গুজবও রটিয়াছিল যে, নানা কারণে মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে অনেকটা পরের হাতের পুতুল হইয়াই মন্ত্রিমণ্ডলীতে থাকিতে হয়, ইত্যাদি কথা শুনা গিয়াছিল। এ সমস্ত কথাকে আমরা গুরুত্ব প্রদান করি নাই; কারণ বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের আদর্শ এবং বিবেক-বুদ্ধির স্থান কোথায়—সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট রকমেই অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন এমন কথার প্রতিবাদে আমরা বিস্মিত হই নাই। আমরা আশা করি, তিনি সত্বরই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বীর-রসের আস্বাদন দিয়া বঙ্গজনকে তৃপ্ত এবং ভূ-ভারতের লোককে বিস্মিত করিবেন। বিপন্ন ইসলামকে রক্ষা করিতে তিনি ছাড়া আর কে আছে?

ব্যথা শতদল

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আকাশেতে নামিল কালো মেঘ আজ হে,
বেদনা-বিলাপ অট্ট-রবে চলে বাজি হে।
আঁধার ঘনায়েছে নদীর দুই তীরে,
হতাশ-আশ্বাস আমারে ফেলে ঘিরে
কোথায় কতদূরে আসিছ তুমি মোর মাঝি হে।

তুমিকে রবিলেন, কেহ যে পারে নাই বাসিতে,—
[illegible] শুধুই বাহু তুলে লইয়া।

আমার আঁখি মাঝে ভরিয়া আসে জল,
নিশাস বাহিরায় ভেদিয়া হৃদিতল,
আসিবে পুনঃ তুমি কে যেন কয় বুকে পাশিয়া।

আমার ভাঙা ঘরে নরক-মাঝে তুমি আসিবে,
আমার পাপে ভরা বুকের কালিমারে নাশিবে।
পরাণে বসি মোর যে কবে কানাকানি,
তাহার কাঁকে নিয়ে তোমার শুভ-বাণী,
আবার আঁধারেতে শতদল ফুটিয়া উঠে হাসিবে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

স্বাধীন মণ্ডলীবদ্ধতার নীতি—ইহার অবলম্বনের দৃষ্টান্ত—

এইরূপ মণ্ডলীবদ্ধতার স্বাভাবিক ইউনিট হইতেছে অধিজাতি (nation) কারণ প্রাকৃত ক্রমবিবর্তন ঐ ভিত্তিটিকেই শক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, বস্তুত মনে হয় যে, মহত্তর ঐক্যটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঐটি সম্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব যদি না ঐক্যসাধন আমাদের ইতিহাসে অনেক দূরে পিছাইয়া দেওয়া হয় এবং ইতিমধ্যে সমুচ্চয়গঠনের আধিজাতিক নীতিটি সতেজতা ও প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলে এবং অন্য কিছুর মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে স্বাধীন এবং স্বাভাবিক অধিজাতি—ইউনিট এবং সম্ভবত অধিজাতিমণ্ডলীই সুদৃঢ় এবং সুসংগত জগৎ ব্যবস্থার যথাযোগ্য এবং জীবন্ত স্তম্ভস্বরূপ হইবে। জাতি (race) এখনও নগণ্য হয় নাই, উহাও একটি উপাদানরূপে প্রবেশ করিবে, কিন্তু সে উপাদান হইবে গৌণ। কোন কোন মণ্ডলী-ব্যবস্থায় ঐটিই প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ঐটির দ্বারাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে; আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং আধিজাতিক ভাব ভাষা ও জাতির পার্থক্যকে অতিক্রম করায় উহা কতকটা অগ্রাহ্য হইবে, আবার কতকটা স্থানিক সংস্পর্শ এবং ভৌগোলিক একত্বের দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সম্বন্ধের দ্বারা উহা অগ্রাহ্য হইবে। সাংস্কৃতিক ঐক্য গণ্য হইবে কিন্তু উহা যে সকল ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ করিবে এমন কোন কথা নাই; এমন কি জাতি এবং সংস্কৃতির সম্মিলিত শক্তিও চূড়ান্ত হইবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী না হইতে পারে।

এই জটিলতার দৃষ্টান্ত সর্বত্রই রহিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি, এমন কি ভাবের সম্বন্ধের দিক দিয়াও বিভিন্ন স্বাভাবিক সমুচ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত; দুইটি হইতেছে ভাব ও সংস্কৃতি, ল্যাতিন ও টিউটনিক, তিনটি হইতেছে জাতি ও ভাষার, জার্মান, ফরাসী এবং ইটালীয় এবং বর্তমানে * আমরা দেখিতে পাইতেছি জাতি সকলের সংঘর্ষে এই সকল পার্থক্য সুইস্‌গণের সহানুভূতিকে কিরূপ বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করিয়াছে; কিন্তু অন্য সব কিছুকেই ছাপাইয়া রহিয়াছে হেল্‌ভেশিয়ান জাতীয়তার ভাব, এবং মনে হয় যে, উহা এখন এবং সর্বদাই স্বেচ্ছাকৃত বিভাগ এবং সুইজারল্যাণ্ডের সুদীর্ঘকাল স্থায়ী স্বাভাবিক, স্থানিক ও ঐতিহাসিক ঐক্যের বিলয় নিবারণ করিবে। আল্‌সাস্‌ (Alsace) জাতি, ভাষা এবং পূর্বকালীন ইতিহাসের দিক দিয়া প্রধানত জার্মান ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু জার্মানগণ বৃথাই এই সকল স্বত্বের দোহাই দিতেছে এবং তাহাদের (Alsace-Lorraine) আল্‌সাস্‌-লোরাইনকে (Elsass-Lothringen) এল্‌সাস্‌-লোথ্রিঙ্গেনে পরিণত করিবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইতেছে; ঐ লোকগুলির আধিজাতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক জীবন্ত ভাব ও অনুরক্তি উহাদিগকে ফ্রান্সের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সহিত অথবা নিজেদের মধ্যেও কোনরূপ ভৌগোলিক যোগসূত্র নাই এবং মনে হয়, আমেরিকানমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই প্রথমটির ভবিতব্যতা; কিন্তু যদি ভাবের পরিবর্তন না হয় এবং তাহার কোন সম্ভাবনা এখন দেখা যাইতেছে না—উভয়েই ব্রিটিশ-মণ্ডলীর মধ্যে থাকিতে ইচ্ছুক হইবে, একটি ক্রমশ বিশ্বভাবাপন্ন (cosmopolitan) আমেরিকান অধি[illegible] সহিত মিলিত হইতে অথবা অপরটি একটি অস্ট্রেলেসিয়ান[illegible] রূপে স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হইতে চাহিবে না। অন্যপক্ষে যদিও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর স্লাভ্‌ ও ল্যাতিন অংশগুলি ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক সুবিধার দিক দিয়া সাম্রাজ্যটিরই অন্তর্গত তথাপি তাহারা সম্বন্ধচ্ছেদের জন্য এবং যেখানে স্থানীয় মতিগতি অনুকূল, সেখানে যাহারা জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষার দিক দিয়া তাহাদের কুটুম্ব তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছে। অস্ট্রিয় মাজ্যারদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার স্লাভ্‌-প্রজাদের সহিতও যদি সেইরূপ ব্যবহার করিত অথবা তাহার জার্মান, স্লাভ্‌, মাজ্যার ও ইটালীয় অংশগুলিকে লইয়া একটা নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে পরিস্থিতি অন্য রকম হইত এবং সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ধ্বংসমুখী শক্তির বিরুদ্ধে তাহার ঐক্য অটুট থাকিত। জাতি, ভাষা, স্থানীয় সম্বন্ধ এবং অর্থনৈতিক সুবিধা এসব হইতেছে শক্তিশালী জিনিষ, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে ঐক্যের দিকে উন্মুখ মানসিক ভাবগতির দ্বারা। ঐ সূক্ষ্মতর শক্তির নিকটে আর সবকেই পরাজিত হইতে হইবে, তাহারা যতই অশান্ত হউক না কেন, অথবা তাহারা বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য যতই আগ্রহান্বিত হউক না কেন, অধিকতর শক্তিশালী আকর্ষণটির সম্মুখে তাহাদিগকে নত হইতেই হইবে।

ঠিক এইজন্যই স্বাধীন-মণ্ডলীবদ্ধতাকেই মূলনীতিরূপে অবলম্বন করিতে হইবে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অথবা জাতি-সকলের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া বর্তমান ব্যবস্থাকেই অবিচ্ছিন্ন বা ব্যবহারিক নীতি বা বিধি করিলে চলিবে না। মনে মনে একটা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা এবং প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হইবে এরূপ ভিত্তির উপর উহাকে খাড়া করিবার প্রস্তাব করা সহজ। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মানবজাতির ঐক্য সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও সুবিধাজনকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে এই ভিত্তিতে একটি ইউরোপীয়মণ্ডলী একটি এশিয়াটিক-মণ্ডলী, একটি আমেরিকানমণ্ডলী সেই সঙ্গে কয়েকটি করিয়া উপমণ্ডলী থাকিবে, আমেরিকার দুইটি কি তিনটি উপমণ্ডলী, ল্যাতিনভাষী এবং ইংরেজী-ভাষী, এশিয়ার তিনটি মোঙ্গলিয়ান, ভারতীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ান, শেষের-টির সহিত মুশ্লিম উত্তর আফ্রিকাকে জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে চারিটি ল্যাতিন স্লাভনীয় টিউটনিক এবং অ্যাংলো-কেল্‌টিক, শেষেরটির সহিত যে সকল উপ-নিবেশযুক্ত থাকিতে চায়—থাকিতে পারিবে, আর মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্তমান অবস্থাতেই বিকশিত হইবার জন্য রাখিয়া দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মানবজাতির হৃদয়-বৃত্তি যেরূপ চাহিবে তদনুযায়ী অধিকতর মার্জিত ও প্রগতিশীল নীতি অনুসারে। কতকগুলি বাস্তব ও

সুস্পষ্ট বাধা-বিঘ্ন থাকিলেও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার মধ্যে তাহাদের বিশেষ গুরুত্ব না হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা জানি যে, সকলপ্রকার পরিদৃশ্যমান সম্বন্ধের সূত্রে আবদ্ধ অধিজাতিগুলি বস্তুত যে-সব বিদ্বেষের দ্বারা বিভক্ত, তাহাদের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধহীন অধিজাতিসকলের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ তত তীব্র নহে, তাহা অধিকতর কাল্পনিক ও অবাস্তব। মোঙ্গলিয়ান জাপান এবং মোঙ্গলিয়ান চীন ভাবের দিক দিয়া পরস্পর হইতে সুতীব্রভাবে বিভক্ত; আরব, তুর্ক ও ইরাণ যদিও ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মুসলমান, তথাপি তাহাদের বর্তমান ভাব স্থায়ী হইলে তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে সুখী পরিবার হইতে পারিবে তাহা নহে। স্কান্ডিনেভীয় নরওয়ে এবং সুইডেনের একত্র মিলিত হইবার এবং স্থায়ী ঐক্যে বদ্ধ হইবার অনুকূল সকল জিনিষই ছিল,—কেবল একটা তীব্র ভাবাবেশ (সেটা অযৌক্তিক হইলেও) তাহাদের সেই মিলনের স্থায়িত্বকে অসম্ভব করিয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদ্বেষভাব বস্তুতপক্ষে ততদিনই স্থায়ী হয়, যতদিন কোন বাস্তব শত্রুতাচরণ থাকে অথবা অধীনতার বোধ অথবা একটির দ্বারা অপরটির ব্যষ্টি বিমর্দিত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে; আর একবার তাহা দূর হইলে এইসব বিদ্বেষ লুপ্ত হওয়াই সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ হইবার পর হইতে তিনটি স্কান্ডিনেভীয় দেশ একত্র কাজ করিতে এবং নিজদিগকে ইউরোপের মধ্যে একটি স্বাভাবিক মণ্ডলী বলিয়া মনে করিতে উত্তরোত্তর উন্মুখ হইতেছে। আইরিশ ও ইংরেজজাতির মধ্যে দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিদ্বেষ এই দুইটি আধিজাতিক ব্যষ্টির মধ্যে একটা যথাযথ সম্বন্ধের সম্ভাবনায় দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে *, যেমন অষ্ট্রিয়া ও মাজয়ারের মধ্যে বিদ্বেষ ঐ দুইটি রাজ্যের মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ একবার স্থাপনের পর আর স্থায়ী হইতে পারে নাই। অতএব ইহা সহজেই কল্পনীয় যে ব্যবস্থায় শত্রুতার কারণগুলি দূর হইয়া যাইবে, তাহাতে স্বাভাবিক সম্বন্ধের সূত্রগুলিই জয়ী হইবে এবং যেরূপ মণ্ডলীবদ্ধতা পরিকল্পনা করা যাইতেছে, তাহা অধিকতর সহজসাধ্য হইবে। আর ইহাও যুক্তিসংগত যে, ঐক্যসাধনের দিকে প্রবৃত্তির প্রবল চাপে মানবজাতির গতি স্বভাবতই হইবে এইরূপ সুসংগতির দিকে; আবার ইহাও কল্পনীয় যে জগতে একটা মহান পরিবর্তন ও বিপ্লব আসিলে তাহা শক্তির সহিত দ্রুত সকল বাধা-বিঘ্নকে বিলুপ্ত করিয়া দিবে, যেমন ফ্রান্সে ফরাসী-বিপ্লব সমরূপ গণতন্ত্রের পথে প্রাচীন ব্যবস্থার সকল বাধা-বিঘ্নকে অপসারিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রধান কথা হইতেছে এই যে, এইরূপ যুক্তি-সঙ্গত বিন্যাস কার্যত অসাধ্য হইবে, যদি না এবং যতক্ষণ না জাতিসকলের বাস্তব মনোভাব এই সব যুক্তিসংগত ব্যবস্থার অনুরূপ হইতেছে। আর জগতের অবস্থা বর্তমানে এরূপ আদর্শ সম্পত্তি হইতে বহুদূরে।

আধিজাতিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন ভিত্তির পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা নূতন ভিত্তির পরিকল্পনা সম্প্রতি একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রস্তাবের রূপ গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। * ইহা ইউরোপের পুনর্বিন্যাসেই সীমাবদ্ধ এবং সেখানেও ইহা যুদ্ধের যথাসংগত পরিণতিরূপে পরাজিত সাম্রাজ্যগুলির উপর বলপূর্বক চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অন্যেরা এইটিকে সঙ্কীর্ণতররূপে স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিতেছে। রুশিয়া, পোল্যান্ডকে স্বায়ত্তশাসন দিবে, ইংলণ্ড আয়র্ল্যান্ডকে হোমরুল দিবে এবং উপনিবেশগুলিকে লইয়া ফেডারেশন গঠন করিবে, কিন্তু ঐ নীতির অন্যান্য ব্যতিক্রমগুলি এখনও বর্তিয়া থাকিবে। এমন কি সাম্রাজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের খাতিরে দুই একটা নূতন ব্যতিক্রমও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি ইহার প্রয়োগ যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, কার্যত যদি এইটিকে প্রচলিত করা যায়, ইহার অর্থ হইবে একটা নূতন আদর্শের শারীরিক জন্ম ও শৈশবাবস্থা, ইহা কালক্রমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত সার্বলৌকিক হইবে এই আশা ইহা মানবজাতির হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিবে। অতএব আমরা স্বাধীন আধি-জাতিক মণ্ডলীবদ্ধতার ভিত্তিতে জগতের পুনর্বিন্যাসের এই আদর্শটিকে অসম্ভব বলিয়া, একেবারে আকাশকুসুম বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না।

আধিজাতিক এবং সাম্রাজ্যিক অহমিকার প্রবল বাধা—ইউরোপের দাবী

তথাপি ইহার বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সেগুলি গুরুতর আর তাহারা যে সুদীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম ব্যতীত বিজিত হইবে, সে আশা করাও বৃথা। আধিজাতিক এবং সাম্রাজ্যিক অহমিকাই হইতেছে বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রবল। প্রভুত্ব করিবার সহজ প্রবৃত্তি বর্জন করা। যেখানে শাসন ও প্রাধান্য অতীতের প্রয়াসের পুরস্কারস্বরূপে লব্ধ হইয়াছে, সেখানে এখনও শাসক ও প্রধান হইয়া থাকিবার বাসনা বর্জন করা, অধীন দেশ ও উপনিবেশগুলিকে বাণিজ্যের ভিতর দিয়া শোষণ করিবার সুবিধা (শাসন ও আধিপত্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই ইহা স্থায়ী হইতে পারে) বর্জন করা, তেজস্বান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাট জনসমূহ স্বাধীন আধিজাতিক জীবন ও কর্ম লইয়া আবির্ভূত হইবে, যাহারা এককালে অধীন প্রজা ছিল এবং ধনোপার্জনের উপায়স্বরূপে ছিল, তাহারা এখন হইতে শক্তিশালী সমকক্ষ হইবে, সম্ভবত ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে, নিঃস্বার্থভাবে এইরূপ পরি-স্থিতির সম্মুখীন হওয়া—ইহার দাবী করিলে অহংভাবাপন্ন মানব-প্রকৃতির নিকট হইতে বড় বেশী আশা করা হয়। ইহা বস্তুত অপরিহার্য বলিয়া মনে না হইলে অথবা উপস্থিত ও দৃশ্য ক্ষতির পূরণস্বরূপ কোন বৃহৎ ও সুস্পষ্ট লাভের আশা না থাকিলে সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দাবী পূরণ করিতে

(শেষাংশ ৭০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* [illegible]

* এইরূপ সম্বন্ধ এখন বস্তুতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, [illegible]

জাপানের ভারত আক্রমণ

কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপে সিংহলে উপনীত হইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতির সম্পর্কে একটি বিবৃতি দান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন,—"বর্ত্তমানে ভারত বা সিংহলের জাপান সম্পর্কে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। সমগ্র জগতে ফ্যাসিষ্ট আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কিংবা জাপান সম্পূর্ণরূপে চীন জয় করিলে এইরূপ আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে; উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েট রুশিয়ার দিক হইতে জাপানের আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। এমন কি, ভারত কিংবা সিংহল আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে জাপানের সহিত চীন, ওলন্দাজ, নীতিরূপে অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ করে নাই। চীনে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সব আন্দো[লন] হইতেছে, জাপান সরকার এখনও সরকারীভাবে সেগু[লিকে] ব্রিটিশের বিরোধী ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সাহস পান নাই। কিছুদিন আগে টিয়েনসিনে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাপানী সেনারা অবমাননাকর কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে, ইংরেজ পক্ষ হইতে তখন গরম গরম বুলি কিছু বাহির হইয়াছিল বটে; কিন্তু খোলাখুলি বিরোধের ভাব লইয়া দাঁড়াইতে সাহস কি ইংরেজ, কি জাপান এ পর্য্যন্ত কেহই পায় নাই। সেদিন সিংটাও শহরের ব্রিটিশ দূতাবাসের উপরও জাপানীরা দুইটি বোমা নিক্ষেপ করে; ইহার ফলে
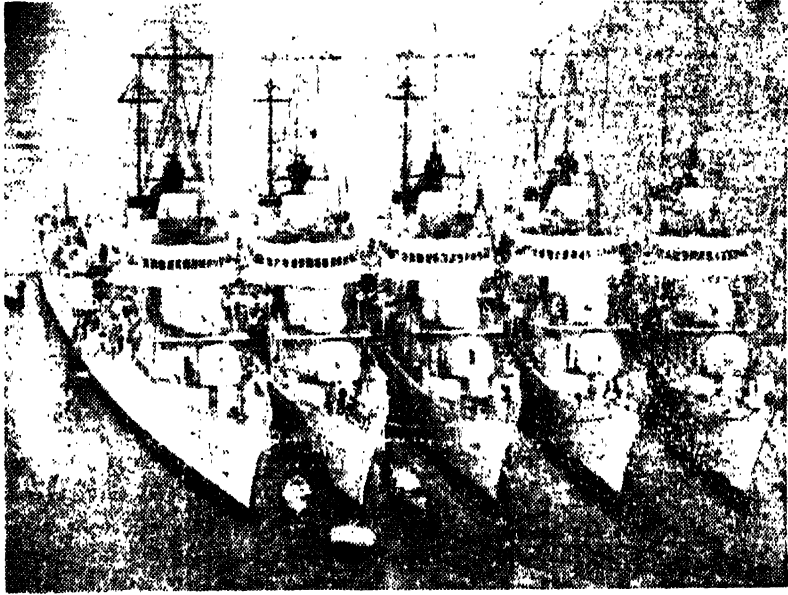
আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরস্থ নৌবহরের কয়েকখানি আধুনিক ডেষ্ট্রয়ার

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সংঘর্ষ বাধিবার অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি রয়টার জাপানে ব্রিটিশ বিদ্বেষের ভাব কিরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সে সম্বন্ধে পর পর কয়েকটি সংবাদ দিয়াছেন। টোকিওতে ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাপানীদের বৈঠক চলিতেছে। এদিকে সেদিন ব্রিটিশ বিরোধী সঙ্ঘের উদ্যোগে টোকিও শহরে একটি জন-আন্দোলন হয়। আন্দোলনকারীরা সভা করিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত জাপানীরা চীনে ধর্ম্মযুদ্ধ চালাইতে থাকিবে!

জাপানী জাতীয়তাবাদী দলের এই ব্রিটিশ বিরোধী ভাব আজ নূতন নহে, বহু দিন হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এই বিদ্বেষ এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের কর্ম্মক্রমে সুস্পষ্ট কেহ জখম হয় নাই; কিছু সামান্য ক্ষতি হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এ সব কোন ব্যাপারকেই কোন পক্ষ এতটা গুরুত্ব দিবে না যাহার ফলে সত্যই একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতে পারে। টিয়েনসিন ও সিংটাওয়ের ব্যাপারের পরও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব সেদিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় সুদূর প্রাচীর সমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই কর্ত্তাদের মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুর নরম হইতে একেবারে নরম। খবরের কাগজের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিও না। জাপ সরকারের মতিগতি খারাপ নয়। এমন অবস্থায় জাপানীদের বিরুদ্ধে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যাহাতে তাঁহাদের সঙ্গে যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে বিঘ্ন ঘটে। আজ ইংরেজ অহিংসার একেবারে উচ্চস্তরে গিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সাধে নয়, স্বার্থের দায়ে।

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর দল ব্রিটিশ জাতির অপমান কম করে নাই। ইংরেজের জাহাজ বোমা ফেলিয়া ডুবাইয়াছে, ইংরেজের প্রাণ হানি করিয়াছে; কিন্তু ইংরেজ সবই হজম করিয়া লইয়াছে। জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে চীনে

চিয়াং কাইশেক

ইংরেজের সম্পত্তিগত ক্ষতি সামান্য হয় নাই। সাংহাইতে ইংরেজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ক্যান্টনে; টিয়েনসিনে ইংরেজকে ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে; কিন্তু ইংরেজ এ সবই সহ্য করিবে, সহ্য করিবে তাহার কারণ আছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সব ব্যাপারে

[illegible] ৩.কম্ব অমরাংগনে একটি সেতু অতিক্রম করিতেছে

[illegible] ক্ষতি দেখা যাইতেছে বটে; কিন্তু অন্যদিক হইতে [illegible] ইংরেজের লাভ আছে বেশী। জাপানের সঙ্গে [illegible] চালাইবার জন্য ইংরেজ পুঁজীওয়ালা ব্যব- [illegible] মোটা হইতেছে, সমরোপকরণ [illegible] লাভ করিতেছে। চীনে জাপানীরা

যে সব উড়ো জাহাজে বোমা ফেলিতেছে, সেই সব উড়ো জাহাজের মাল-মসলা অধিকাংশই যোগাইতেছে ইংরেজ সওদাগরেরা, ব্রিটিশ বোর্ণিওর পেট্রল চড়া দামে বেচিয়া ইংরেজেরা লাভের অঙ্ক মোটা করিতেছে। ইংরেজের সম্বন্ধে যে কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। মিঃ ইলিয়াট জেনওয়ে জুন মাসের 'এসিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ

মঙ্গোলীয়ার সীমান্তে জাপ-সেনাদল মাইন বসাইতেছে

লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এ পর্যন্ত আমেরিকার উৎপন্ন লোহের কলকব্জা ইঞ্জিন প্রভৃতির জাপানে চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। মার্কিন ব্যাবসায়ীরা দুই হাতে পয়সা লুটিতেছে, সুতরাং এমন সুবিধা পাইলে সহজে ছাড়ে কে?

চীনকে জাপান যদি একেবারে করতলগত করিয়া লয়, তবে ইংরেজের আতঙ্কের কারণ আছে ইহা সত্য, কিন্তু ইংরেজ রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ উহা বিবেচনা না করিয়া দেখিতেছেন এমন নয়; কিন্তু তাঁহারা যথেষ্ট রকমই সেয়ানা আছেন, জাপান যাহাতে সহজে সে কাজটি করিতে না পারে, তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় হইল ইহাই। এই জন্যই ইংরেজের বিরুদ্ধে জাপানের বিক্ষোভ। জাপান অবশ্য গর্ব করিয়া [illegible]

লইবে; কিন্তু ব্যাপার যে তেমন সহজ নয়, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিকগণ সকলেই সেকথা বলিতেছেন। কয়েকটা বড় বড় শহর দখল করিয়া সেখানে সেনা পাহারা বসান এক কথা, আর দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকে গুছাইয়া নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক করিয়া লওয়া অন্য কথা। চীনের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা হইতে বেশই বুঝা যাইতেছে যে, জাপান সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী কয়েকটি শহর দখল করিলেও চীনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। দেশের লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জনসাধারণের অন্তরে ষোল আনাই রহিয়াছে। পিকিং, ক্যান্টন, সাংহাই জাপ অধিকৃত শহরগুলির দ্বারদেশে পর্য্যন্ত আসিয়া চীনের গরিলা বাহিনী যে মাঝে মাঝে

মোংগলীয় সীমান্তে জাপ সেনানীগ

হানা দিতেছে ইহাতেই বুঝা যায় যে, কয়েকটি শহরের সেনা শিবিরের বাহিরে জাপানের প্রভাব কিছুমাত্র নাই এবং যতদিন পর্য্যন্ত জাপান চীনের অভ্যন্তরভাগে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত চীনের প্রাকৃতিক সম্পদের বলে ইংরেজ কিংবা মার্কিনের সাহায্যের নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি জাপানের হইবে না।

ইংরেজ ইহা বেশই বুঝিতেছে; কিন্তু বুঝিলেও সে একবারে নিশ্চিন্ত নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে সিংগাপুরে বসিয়া ইংরেজ এবং ফরাসী সামরিক কর্ত্তাদের সপ্তাহকালব্যাপী সুদীর্ঘ বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং বৈঠকে জাপানের আক্রমণকে প্রতিহত করা যদি আবশ্যক মনে হয়, তাহা হইলে ইংরেজ ও ফরাসী কিভাবে কাজ করিবে এবং সেই সংগ্রামে ভারতের স্থানই বা হইবে কোথায় সে সম্বন্ধে অলোচনা হইয়াছে। আয়োজনে কতকগুলি ব্যবস্থা ঠিকও হইয়া গিয়াছে। ওলন্দাজদের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজ পাকা চুক্তি করিয়া রাখিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তকে সুদৃঢ় করিবার সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতের কর্ত্তাদের জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছে। শুনিতেছি ব্রহ্মদেশ হইতে সরাসরি ভারতে রেলপথের সংযোগ সাধন করিবার নিমিত্ত ভারতের সমর বিভাগের কর্ত্তারা আগ্রহপরায়ণ হইয়াছেন এবং এতৎ-সম্পর্কিত কয়েকটি স্কীমের সম্বন্ধে বিবেচনা চলিতেছে।

প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাপান সত্যই চীন দেশ অধিকার করিতে পারিবে কি না। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, জাপানের পক্ষে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা এখনও সুদূরপরাহত। চীনের দুর্ব্বলতা আছে সত্য; জাপানীরা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত তোড়জোড়ে অধিকতর সমৃদ্ধ, চীনের তাহা নাই; কিন্তু চীনের পক্ষে অন্যদিক হইতে আত্মরক্ষার শক্তি রহিয়াছে। সম্প্রতি ক্যান্টন শহরের মেয়র সাংবাদিকদের নিকট একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"চীনের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করিতেছে তাহার জনশক্তিকে গঠিত করিয়া তুলিবার উপরে। আপনি যতই চীনের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিবেন, ততই স্বাধীন জন-প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তির পরিচয় পাইবেন। চীনের কর্তৃপক্ষকে চীনের বিপুল জনসম্পদকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই সংগঠনের ফলে চীন যে জাপানের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম হইবে, ইহাই নয়,

ভবিষ্যতে রাষ্ট্র-মর্য্যাদায়ও সে প্রতিষ্ঠিত হইবে এই শক্তিরই বলে।"

জাপানের সংগে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে চীন দেশের শিক্ষা-প্রণালী অনেকটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যমূলক ছিল। চীনের প্রধান প্রধান শিক্ষা-

মাদাম চিয়াং কাইসেক্

প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল পিকিং, টিয়েনসিন, সাংহাই প্রভৃতি শহরে এবং সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছেলেদের রোখ ছিল সরকারী চাকুরী বা সওদাগরী অফিসের কেরাণীগিরির দিকে। যুদ্ধের ফলে নাগরিক এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়াই চীনের নব জাগ্রত জ্ঞান-পিপাসার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মতৎপরতা চলিতেছে চীনের অভ্যন্তরভাগে এবং কৃষক, শ্রমিক এই সব শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর অন্তরংগভাবে। যে সব চাষী এবং কৃষকদের পক্ষে যে সব বড় পণ্ডিতের সাক্ষাৎলাভ দুর্ঘট ছিল, পিকিন এবং ক্যাণ্টন প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পণ্ডিতেরা তাহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এইভাবে শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমেই অধিকতর কার্য্যকরী দিতেছে এইভাবে জাতীয়তার ভাব দেশের অভ্যন্তরভাগে গিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করিতেছে কিংবা সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে। এইভাবে জাতীয়তার ভাব দেশের অভ্যন্তর ভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে এবং সেই সংগে সংগে জনসাধারণের মধ্যে যে জাপবিরোধী মতিগতি প্রসার হইয়া পড়িতেছে, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কয়েটা যুদ্ধে জাপান যদি জয়লাভও করিতে পারে, তাহা হইলেও চীনের উপর যাহাকে বলা যায় সুস্থির রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব তাহা সে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। চীন জয়ে তাহার লাভের চেয়ে লোকসানই বহন করিতে হইবে বেশী। রাজকোষের ধন ক্ষয় করিতে হইবে এবং সমরোপকরণের জন্যও পরের দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে; সুতরাং এমন অবস্থায় এক সংগে চীনে লড়াই চালানো এবং ইংরেজের পক্ষে আতংকর পরাক্রম লাভ করা জাপানের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবে ইউরোপে যদি একটা লড়াই বাধে এবং সেইভাবে ইংরেজকে ফ্যাসিস্ট ইটালী এবং জার্ম্মানীর চক্রান্তে পড়িয়া ইউরোপে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়, তবে জাপানের পক্ষে এইদিক হইতে কিছু সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু ইংরেজ এমন হুঁসিয়ারীর সহিত চলিতেছে যাহাতে সে এসিয়ার আটঘাট বাঁধিয়া না লইয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে কিছুতেই চটাইবে না। বেমালুমভাবে ইটালী এবং জার্ম্মানীর সব দাবীই স্বীকার করিয়া যাইবে, ইহা ছাড়া অন্যা উপায় তাহার নাই।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৭০২ পৃষ্ঠার পর)

কেহই অগ্রসর হইবে না। আবার সভ্যতার খাতিরে বাকী জগৎকে অধিকার করিয়া রাখিবার দাবী ইউরোপ এখনও ছাড়ে নাই, এখানে সভ্যতার অর্থ অবশ্য ইউরোপীয় সভ্যতা এবং এশিয়ার জাতিগুলিকে কোনরূপ সমকক্ষতা বা স্বাধীনতার অধিকার লাভ করিতে হইলে এই ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতেই হইবে। যদিও এশিয়াতে এই দাবীর দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি আফ্রিকা মহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে এখনও ইহার প্রবল ন্যায্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। উপস্থিত আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, নব-জাত আদর্শটির ব্যাপক স্বীকৃতির বিরুদ্ধে ইহা প্রবলভাবে ক্রিয়া করিতেছে, আর যতদিন না ইহার দ্বারা উত্থাপিত সমস্যা-গুলির সমাধান হইতেছে, ততদিন এরূপ কোন আদর্শ নীতির [illegible] [illegible] [illegible] মতো শক্তিসমূহের প্রতি-বিকাশের উপর এবং এশিয়া ও ইউরোপ উভয় স্থানেই এখনও অনিষ্পন্ন, আধ্যাত্মিক, মানসিক ও বাহ্যিক বিপ্লব মাথা তুলিয়া উঠার উপর নির্ভর করিবে। * (ক্রমশ)

---

* এই নূতন নীতির একটা নামও দেওয়া হইয়াছিল এবং self-determination-এর পরিকল্পনা কিছুকালের জন্য সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, এমন কি উহা একটি gospel, দিব্য-বাণীস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মিত্রশক্তির বিজয়লাভ হওয়ার পর ঐ সব বড় বড় কথার শেষ হইয়াছে তথাপি এই আদর্শকে আর অসম্ভব বলিতে পারা যায় না।

The Ideal of Human Unity হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ভোরের আলো

(গল্প)

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সকলে যেমন করে সুভাষও তাহাই করিল। বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া সুভাষ নিরুদ্দিষ্ট হইল।

পরীক্ষার অসাফল্যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় আজকাল তেমন বৈচিত্র্য নাই; মাতাপিতা বন্ধুবান্ধবের ক্রূর কটাক্ষ হইতে দূরে গা-ঢাকা দেওয়ার ইহাই একমাত্র প্রশস্ত পথ। কিন্তু শেষে সুভাষের মত মুখচোরা ঘরকুণো ছেলেও চলিয়া গেল ইহাই আশ্চর্য্য। তাই সকাল বেলায় ঘর ঝাঁট দিবার সময়ে টেবিলের উপর একখণ্ড লিখিত কাগজে সুভাষের এই কীর্ত্তি জানিয়া জননী গিরিবালা যখন কর্ত্তার গোচরীভূত করিলেন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া অস্ফুটে শুধু বলিলেন, আমার পোড়া কপাল!

কাগজে লেখা ছিল—

আমি বড় দুঃখে অচেনা জগতে পা বাড়াইয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ না হই, আপনাদের নিকট এ কালোমুখ দেখাইব না। আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।

চিঠির এই শেষোক্ত কথাটা যোগেন্দ্র চৌধুরীর নিকট বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। তিনি গম্ভীর মুখ আরও বীভৎস করিয়া কহিলেন, বুঝলে গিন্নী, আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।

গিরিবালা খোঁচাটা বুঝিলেন, কাঁদিয়া ফেলিলেন,—ও পাগলের কথা তুমি কানে তুল না গো, ওগো কি হবে তাই বল।

"কি আর হবে?" বলিয়া যোগেন্দ্র কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে এ ঘটনাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। শুনিয়া অনেকে আসিয়া যোগেন্দ্র ও গিরিবালাকে সান্ত্বনা দিল সুভাষের মত ছেলে অল্পদিন বাদেই ফিরিবে এমন আশা দিলে, একজন যোগেন্দ্রকে খবরের কাগজে নিরুদ্দেশ সংবাদ দিতেও বুদ্ধি দিল। যোগেন্দ্র সকলের উপদেশ, মন্তব্য ও ব্যবস্থা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, কিন্তু কোন কিছু তৎক্ষণাৎ করিতে আগ্রহ দেখাইলেন না।

এমনি করিয়া মাস তিনেক কাটিয়া গেল। সংসার-চক্র আবার ঘুরিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার আবছা আঁধারে সিক্ত কাপড়ে জলপূর্ণ কলসীটি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া নিকটে কর্ম্মরতা একটি বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া গিরিবালা কহিলেন, বিণু তোর আজ বাটনা বাটার দরকার নেই মা। শীগগির ক'রে খেয়ে-দেয়ে বাড়ী যা, ছোট বোনের অসুখ করেছে যখন।

বীণা মুখ তুলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা জেঠাইমা, যাচ্ছি। তুমি পারবে ত সব?

—পারব মা, সব পারব।

সুভাষদের বাড়ীর দুই ঘর পরে বীণাদের বসত-বাটী। গরীব বিধবা তার দুটি মাত্র মেয়ে লইয়া দুঃখে-কষ্টে দিন চালায়। যখন যাহা দরকার হয় গিরিবালার নিকট ছুটিয়া আসে, চাহিয়া লয়—লজ্জা করে না। বীণা বরাবরই জেঠাইমার কাছে কাছে থাকে, এ-বাড়ীর খুঁটি-নাটি কাজ করে, গিরিবালাকে ভালবাসে, কখনও বা তাহার উপর রাগ করে। দুই বাড়ীর অনবরত যাতায়াতে এমনি হইয়াছে যে, বীণা গিরিবালার কাছে রাত্রিতে শোয়—এখানেই আহার করে। বিধবা মেয়েটিকে গিরিবালার উপর ছাড়িয়া দিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে, একটি প্রাণীর খোরাকীর চিন্তা ত তাহাকে করিতে হয় না। বীণা সবে তেরয় পা দিয়াছে। গিরিবালা মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছেন, এই লক্ষ্মী মেয়েটিকেই ঘরে তুলিবেন। বীণার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন গিরিবালা যাচিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বৌ, সুভোর সঙ্গে আমি কিন্তু বিণুর বিয়ে দেব। বিধবা এতটা আশা করে নাই, সেদিন সাশ্রুনেত্রে গিরিবালার পদধূলি লইয়া বলিয়াছিল, আমার কিছু বলার নেই দিদি—বিণুর ভার তোমার 'পর।

তারপরে তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুভাষ এতকাল কলিকাতায় পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে বাড়ী আসিয়া দেখা দিয়াছে। মাতা ও পিতা স্থির করিয়াছিলেন, বি-এ দিলেই সুভাষের সঙ্গে বীণার বিবাহ দিবেন

কিন্তু তিন মাস হইতে চলিল সুভাষের খোঁজ নাই। তারপর বছর ঘুরিয়া আসিল, সুভাষের সংবাদ নাই। বৃদ্ধ যোগেন্দ্র আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তর এখন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় জর্জ্জরিত হইতেছিল। একটি করিয়া দিন যায়, তিনি ভাবেন সুভাষ বুঝি পরের দিনই আসিবে। কই, আসিল ত না? এক এক সময়ে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ডাকেন, বিণু।

বীণা নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ ভাঙ্গিয়া পড়েন, ভগ্নস্বরে জড়াইয়া জড়াইয়া বলেন, মা আর ত পারি নে।

বীণা তাহার প্রশান্ত মুখের আয়ত নেত্র দুইটি মেলিয়া বলে, আসবে বৈ কি সুভোদা।

বৃদ্ধ সহসা চেতনা পাইয়া জাগিয়া, বলেন, সত্যি?

বীণা আর কিছু বলিতে পারে না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বাহিরে চলিয়া যায়।

আরও দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ যোগেন্দ্র চৌধুরী মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি সুভাষের কোন তথ্য জানিতে পারিলেন না, ইহাই তাঁহাকে দারুণ পীড়া দিতেছিল। গিরিবালা পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের কি হবে গো? বিণুকে নিয়ে আমি কি করব তুমি বলে যাও—বলে যাও। যোগেন্দ্র কিছুই বলিতে পারিলেন না, অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে চিরদিনের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

বীণা পূর্ব্বে যদি-বা দুই একবার নিজের বাড়ীতে যাইত, এখন গিরিবালা তাহাকে এক দণ্ডের জন্যও সঙ্গছাড়া করেন না। সমস্ত দিন তাহাকে লইয়া থাকেন, রাত্রিতে শয্যায় বুকের কাছে টানিয়া লন।

প্রতিদিনের নিয়মমত বীণা প্রভাতে খিড়কীর দরজা খুলিয়া পুকুরপাড়ে যাইতেছিল, সহসা দেখিতে পাইল অদূরে

আমড়া গাছটার তলায় কে একজন চেনা-চেনা লোক তাহাদেরই বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। কুণ্ঠিত পদে নিকটে আসিয়া বীণা দেখিল, লোকটার মস্তক মুণ্ডিত, পরণে গিরিমাটি-রঙের একখানি কাপড়, গায়ে জীর্ণ আলখাল্লা। সম্পূর্ণ অদ্ভুত, নূতন একটা লোক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অপরিচিত অচেনা বলিয়া ঠেকে, তবু ঐ কালো দীর্ঘায়ত চোখ দুটিতে যেন পুরান কাহার হুবহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রশস্ত ললাটের বামদিকের ক্ষুদ্র তিলটা রহিয়াছে। তাই ত? সুভো-দারও ত এমনি চোখ, এমনি তিল ছিল! সেই সুভো-দা নাকি? বিশ্বাস হইতে চায় না প্রশ্ন করিতে জিহ্বা জড়াইয়া আসে। বুকের কাছটায় কেমন যেন চমক লাগে। রুদ্ধকণ্ঠে বীণা জিজ্ঞাসা করে, এখানে বসে কেন?

লোকটি উঠিয়া দাঁড়ায়, কিছু বলে না। বীণা দৌড়াইয়া গিয়া জেঠাইমার নিকট বলে, দেখে যাও ত জেঠাইমা।

কিন্তু জেঠাইমা যখন বাহিরে আসিয়াছেন, লোকটা চলিয়া যাইতেছে। গিরিবালা মুহূর্তে কি যেন আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, চীৎকার করিয়া বলেন,—চিনলি নে পোড়ামুখী, ওযে আমার সুভো চলে যাচ্ছে। বলিয়া তিনি পাগলের মত দৌড়াইয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া ফেলেন। টানিতে টানিতে বাড়ী আনিয়া গিরিবালা বলেন, কি ছিরি করেছিস সুভো। এমন করে এতদিন কোথায় ছিলি বল দিকিন। ছি-ছি এমন সাধুর বেশ পরতেও আছে রে!

সুভাষ সংক্ষেপে বিষণ্ণসুরে বলে, কিন্তু মানুষ এখনও হতে পারি নি মা.

মা ধমকাইয়া বলেন, ছেলেমি করিস নি। পরে মনে পড়িয়া যায়, সুভাষের ত খাওয়া হয় নাই। ডাকিয়া বলেন, বিণু!

বীণা সঙ্কুচিত হইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে দেখিয়া গিরিবালা বলেন, তোর সুভো-দার খাবার নিয়ে আয় মা।

সুভাষ কখন যেন বলিয়া ফেলে, বাবাকে ত......

গিরিবালা কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া সুভাষকে বুকে টানিয়া বলেন, চুপ কর বাবা— আর বলিস নি।

সুভাষ পিতার মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইল। নিজের এতকাল অজ্ঞাতবাসে পিতা শেষজীবনে উৎকণ্ঠায় অশান্তিতে মারা গেছেন ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত ক্ষুণ্ণ আহত হইল। মার নিকট কাঁদিয়া বলিল, আমারই ত দোষ মা।

পুত্রকে পাইয়া গিরিবালা পতি-শোক ভুলিয়া আবার বিচ্ছিন্ন সংসারে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছেন। সুভাষ মায়ের দুঃখ মুছিবার জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ খুলিয়া পূর্ব্বের মত কাপড়-চোপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মুণ্ডিত শিরে আবার কৃষ্ণ কেশ গজাইয়া উঠিতেছে। মাতা দেখিয়া আনন্দ অশ্রু ফেলেন, বাঁচালি বাবা। আর বৈরাগী বেশ পরিস নি কখনও।

সুভাষ কোন আপত্তি করে না, তবে মা লক্ষ্য করেন একটা নূতন পরিবর্ত্তন। সুভাষ পূর্ব্বের মত তেমন অকারণে হাসে না, কথায় কথায় অমনি গম্ভীর হইয়া পড়ে।

সকালে উঠিয়া বীণা উঠানে বসিয়া বাসন মাজে। ঘরে বসিয়া সুভাষ [illegible] করে। আগে যখন তাহার কোন কিছুর প্রয়োজন হইত, অমনি বিণুকে ডাকিয়া হুকুম করিত। এখন তেমন আর ডাকে না। কচিৎ কোনদিন ঘর কুড়াইতে আসিয়া বীণা কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে সুভাষ বলে, এধারটা কুড়ুবে বুঝি? আচ্ছা যাচ্ছি।

জেঠাইমা পুকুর-ঘাট হইতে ফেরার পূর্ব্বে বীণা বাটি মাজিয়া মুড়ি ভরিয়া সসঙ্কোচে এ-ঘরে আসিয়া নীরবে সুভাষের নিকট রাখিয়া যায়।

গিরিবালা ঘাট হইতে ফিরিয়া যদি শুনিতে পান সুভাষ অভুক্ত, তবে বীণার আর রক্ষা থাকে না। তাহার লজ্জা করে, তবু জেঠাইমার আদেশ মানিতে হয়। প্রথম একদিন ও বলিয়াও ছিল, তুমি খাবার দিলে পার জেঠাইমা।

জেঠাইমা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বুড়ো মেয়ে বুঝিস নে যে আমার সন্ধ্যে সেরে আসতে দেরী হয়ে যায়।

আর প্রতিবাদ করা চলে না।

সন্ধ্যাকালে সুভাষদের বাড়ীর পিছন দিকের বাঁশঝাড়ের সমুচ্চ মাথাগুলি অন্ধকারে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, দূরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অগণিত ঝিল্লীর অবিশ্রাম নিনাদ উঠিতেছিল। পাড়া হইতে এইমাত্র ফিরিয়া গিরিবালা চীৎকার করিয়া কহিলেন, এখনও আলো জ্বালিস নি বিণু?

বীণা রান্নাঘর হইতে অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, এই যে যাচ্ছি জেঠাইমা।

গিরিবালা ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, আহা! তুই একহাতে আর কত এগুবি মা। তারপর সহসা মনে পড়ায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সুভো বুঝি আঁধারেই বসে আছে, আঃ কি যে ছেলেটা হয়েছে। আলোটা চেয়েও নেবে না এমনি ওর স্বভাব— কিছু যেন আর আবশ্যক নেই। বলিয়া বীণাকে পুনরায় কহিলেন, যা মা আলো জেলে বড়ঘরে দিয়ে আয়। আমিই ডাল চড়িয়ে দিচ্ছি।

বীণা যখন লণ্ঠন জ্বালাইয়া এ-ঘরে আসিয়াছে, সুভাষ তখনও নিশ্চল মূর্ত্তির মত নিবিষ্ট বসিয়াছিল। আলোকের উজ্জ্বল রশ্মিতে ধ্যানমগ্ন যোগীর চেতনার সঞ্চার হইল, নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সুভাষ মৃদুকণ্ঠে অতি সঙ্কোচে কহিল, রাত্তিরে আমি খাব না।

শুনিয়া বীণা মনে মনে ভাবিল, একবার বলে কেন সুভো-দা খাবে না। কিন্তু কি যেন কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল, কুণ্ঠা ঠেলিয়া তাই তাহার মুখে কোন প্রশ্ন যোগাইল না। কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া গিরিবালাকে কহিল, সুভো-দা কিছু খাবে না।

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন, কেন

বীণা কিছু বলিতে পারিল না। গিরিবালা বুঝিতে কহিলেন, তুইও যেমন মেয়ে হয়েছিস! বলিয়া সুভাষের নিকট আসিয়া তাহার অনাহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আজ যে মহাপ্রভুর জন্মদিন মা। এই দিনটাতে রাত্রিতে অনাহারে আমরা তাঁর সেবা করে কত উপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনতাম, তার কি মজাব মা।

গিরিবালা পুত্রের এই অদ্ভুত ব্রত-পালন উদ্‌যাপনে

মনে মনে সুখী হইতে পারিতেন না, তাঁহার কোন অনুনয় যে ছেলের এই কঠোর অনুষ্ঠান পণ্ড করিতে পারিবে না তাহা তিনি জানিতেন, তাই মুখে শুধু কহিলেন,—কি সব অনাছিষ্টি নিয়মই শিখেছিস। আজ এটা খাব না—কাল উপোস, এমনি করে শরীর থাকে কখনও!

দিন এমনিভাবে চলিতেছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর গিরিবালা দরজার গোড়ায় বসিয়া অদূরে অধ্যয়ন নিরত পুত্রকে উপলক্ষ করিয়া কহিলেন, আর ক'দিনই বা বাঁচব, বুড়ো বয়সে কাজকর্ম্ম আর পারি নে। আর বীণাও ত বড় হয়েছে।

পুত্র সোজা হইয়া বসিয়া গীতার একটি পাতা উল্টাইয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া কহিল, বীণার বয়সের সঙ্গে তোমার কাজকর্ম্মে অক্ষমতার কারণ কি মা, বুঝলাম ত না।

—বুঝলি নে সুভো? বলি, মেয়েটির বিয়ে ত দেওয়া চাই। আর ও গেলে আমি একলা সংসার চালাব কেমন করে?

—বিণুর বিয়ে দেওয়া দরকারই বটে। কিন্তু তুমি কি করে সব করবে বুঝে উঠতে পাচ্ছি ত না।

গিরিবালা স্নেহকরুণ হাসিতে মুখখানি ভরিয়া দিয়া কহিলেন, বোকা ছেলে, বিয়ে কর তবে আমার সব দুঃখু ঘুচে যাবে।

সহসা সুভাষের মুখ বিবর্ণ বিশুষ্ক হইয়া গেল, অনেকক্ষণ মনে মনে হিসাব করিয়া সে যখন কথা কহিল, তখন সে স্বর তাহার বলিয়া আর চেনা যায় না। শান্ত গম্ভীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল, বিয়ে ত জীবনে আমাদের করতে নেই মা। মহাপ্রভুর নিষেধ।

গিরিবালা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বলিস কি রে!

কিন্তু সুভাষের মুখে ইহার কোন প্রত্যুত্তর শোনা গেল না। গিরিবালা উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তভাবে কহিলেন, তুই বিয়ে করবি নে? তবে বীণার কি হবে ভেবে দেখ ত।

গিরিবালার এই সহজ কথাটা সুভাষের কর্ণে যেন বহুদূর হইতে কাহার অনুচ্চ উচ্চারিত বাণীর মত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। মিনিট কয়েক নীরবে কাটিলে সে কহিল, তুমি কি ভেবেছ মা বিণুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে? তাও কি আর হয়? তবে আমার দীক্ষা নেবার কোন্ সার্থকতা থাকে, তুমিই বল না। জেনে রেখ মা, বিয়ে আমি জীবনে করব না।

গিরিবালা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল জানালার পার্শ্ব হইতে কে যেন অতি সন্তর্পণে সরিয়া যাইতেছে।

গিরিবালা ভাবিলেন,—বাড়ী-ঘর ছেড়ে কোথাকার কোন মহাপ্রভুর সঙ্গমে এতকাল কাটিয়ে ছেলেটার মাথা বিগড়ে গেছে। অমনি হয়েই থাকে। দু'দিন বাদে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

তাই দিন দশেক পরে সন্ধ্যাকালে একদিন বীণার বিধবা মায়ের হাত ধরিয়া গিরিবালা সুভাষের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, সুভো এদিকে আয় বাবা, তোকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে। দরজার দুইধার ঘিরিয়া পাড়ার মেয়েরা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে আনন্দে কৌতূহলে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। এতগুলি চেনা-অচেনা লোকের এহেন সময়ে এই আকস্মিক আগমন ও মায়ের আহ্বানে সুভাষের যখন চমক ভাঙিল, তখন বীণার মা তাহার মাথায় ধান-দুর্ব্বা দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। বিমূঢ় সুভাষ ঢিপ্ করিয়া বিধবার পায়ের ধূলি লইয়া সহসা কহিল, কিন্তু এসব কেন?

ততক্ষণে সমবেত নারীমহলে ঠাট্টার চাপা হাসি ফাটিয়া পড়িতেছে। গিরিবালা পুত্রের প্রতি একবারেক সস্নেহ কটাক্ষ করিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

ইহারই পরের দিন রাত্রিতে গিরিবালা সুভাষকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া বিস্ময়ে দেখিলেন, সুভাষ তাহার গীতাখানা সযত্নে বগলে করিয়া ছোটমত একটা বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে। কিয়ৎকাল এই দৃশ্য দেখিয়া গিরিবালা বলিলেন, যাচ্ছিস্ কোথা—হ্যাঁ রে, খাবি নে?

সুভাষ মহাব্যস্ত হইয়া বোঁচ্‌কাটা কষিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, আর খাওয়া হয়ে উঠবে না মা। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

—কিন্তু কোথায়?

—আবার সেই মহাপ্রভুর আশ্রমে মা। আর না, অনেক হয়েছে। সংসারের বাঁধন আমাকে ক্রমেই জড়াচ্ছিল, তাই আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। বলিয়া মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া চলিতে লাগিল।

সমস্ত ব্যাপারটা চোখের উপর দেখিয়া গিরিবালা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পাথরের নিৰ্জ্জীব পুতুলীর মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য,—তাই হঠাৎ দৌড়াইয়া গমনোদ্যত পুত্রের পথরোধ করিয়া কহিলেন, তুই কি পাগল? আর দিন চৌদ্দ বিয়ের বাকী, আর তুই চলি…………

আর বলা হইল না, ক্রন্দনের মহাসমুদ্র তখন তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহার হৃদয়কে আছড়াইয়া ভাঙিতেছিল। সুভাষ যন্ত্রচালিতের মত বিপুল উদ্যমে কহিল, মিছে কি সব বলছ মা। আমি বিয়ে করব না, ঘরেও থাকব না। আর জীবনে বোধ করি দেখা হবে না, এই শেষ। শেষের কথাটা উচ্চারণ করিতে তাহার শ্বাসরোধ হইতেছিল, তবুও কোনরকমে শেষ করিয়া মায়ের সকাতর অনুনয় ও আবদার ঠেলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে মাঠের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

পিছনে পিছনে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্র ধাওয়া করিতে লাগিলে মানুষ যেমন প্রাণপণ শক্তিতে যথাসাধ্য ত্বরিত পদক্ষেপে পলাইতে থাকে, তেমনি ব্যস্ততায় অত্যন্ত আতঙ্কে পশ্চাতের শত প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া সুভাষ ছুটিতে লাগিল। পিছনে তাকাইবার অবকাশ নাই, কেবল সম্মুখের পথরেখা তাহাকে দূর-দূরান্তরে মদের নেশার মত টানিয়া লইয়া চলিল। এই ঊর্দ্ধশ্বাস পলায়ন—ত্বরিত পদচারণাতেও কিন্তু তাহার মনের উপর ছায়াবাজির মত যেসব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় চিন্তার ফেনায়িত তরঙ্গ একটির পর একটি দ্রুত নাচিতে নাচিতে সরিয়া যাইতেছিল, তাহার অবসানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুভাষ যত তাড়াতাড়ি চলিতেছিল আর যতই তাহার মনে পড়িতে লাগিল যে মায়ের

সন্ধ্যার অনুনয় ক্রমে ক্রমে বাতাসে মিলিয়া যাইতেছে, তবুই কিন্তু তাহার ব্যগ্রতা ও অস্বস্তি বাড়িয়া চলিল। সহসা সে তাহার মনের গহন গহ্বরে দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এমন উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া কোথায় সরিয়া পড়িতেছে। আর আশ্চর্য্য এই যে, ঐ বিঘ্নরূপী মায়ের অশ্রুসজল পাষাণ মূর্ত্তি—তাহার আকুল নিবেদন, আর সেই বালিকা—যাহার মুখ-চ্ছবি একদিনের জন্যও তাহার মনে ভাসিয়া উঠে নাই, তাহারাই তাহার নিকট সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠিল। মনে হইল, আবার ত সেই তপস্বীর শুষ্ক কঠোর জীবন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ সার্থকতা তাহাতে? মুণ্ডিত শিরে নিস্পৃহ প্রাণ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে, মহাপ্রভুর সাড়ম্বর পরিচর্য্যা করিবে, আর পরের সাহায্য করিবে? কিন্তু ছি ছি, সাহায্য করিবে পরের? নিজের গৃহে যে মায়ের বার্দ্ধক্যে এতটুকু সাহায্য করিল না, যে তাহাদের স্নেহ-মায়ার বন্ধন নিষ্ঠুরের মত ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার সাহায্য অপরে কিরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিবে? আহা তাহার পিতাও না জানি কত দুঃখে—পুত্র বিচ্ছেদের কত বড় আঘাত পাইয়া শেষ জীবনে পড়িয়া পুড়িয়া মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সন্ন্যাস ধর্ম্মই এতসব অনিষ্ট ও অপকার ঘটাইয়াছে। ইহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সে কিরূপে বিশ্বের নিকট আবার যোগীর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র দুঃখলেশহীন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইবে? আর—আর, সুভাষ চিন্তা করিতে পারে না, ঐ নিষ্কলুষ পুষ্পের মত শুভ্র বালিকা—সে তাহারই মায়ের সর্ব্বকর্ম্মে প্রতিনিয়ত সাহায্য করিতেছে, তাহার মনে কি কোন লাভের প্রত্যাশা, পাইবার কোন উদ্দীপনা জাগে না?

সুভাষের যে এইবার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, বীণা সকালে সেদিন মুড়ি দিতে আসিলে তাহার বিশুষ্ক পাণ্ডুর মুখে বেদনার সে কি স্পষ্ট ছাপ সে দেখিয়াছে। আহা! তাহার সারাদিনের পরিশ্রান্তিতে তাহার আড়ষ্ট শিথিল বেদনাতুর মুখের উপর কত যেন নীরব প্রার্থনা—কত প্রাণান্ত নিবেদন ফুটিয়াছিল। তবু সুভাষ ছুটিতেছিল, কিন্তু আর না। সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কখন সে বাড়ীর মুখে পা বাড়াইয়া দিয়াছে। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে যে লোকটা বিপুল উদ্যমে অসীম উৎসাহে পলাইয়া যাইতেছিল, সেই লোকটাই এক্ষণে দ্বিগুণ উত্তেজনায় বাড়ীর পথে চলিতে লাগিল।

সুভাষ সেই সেদিন সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবনের পর প্রথমে বাড়ীতে না ঢুকিয়া সে আমড়া গাছটার নীচে বসিয়াছিল, আজও গভীর নিশীথে তেমনি নিঃশব্দে সেইখানে বসিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে দ্বিপ্রহর রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল। সুভাষ গভীর চিন্তায় ডুবিয়া রহিল।

পূবের আকাশে আলোকের স্বচ্ছ রেখা তখনও ফুটিয়া উঠে নাই। আঁধারের নিবিড় আস্তরণ সুপ্ত রবির স্তিমিত প্রভায় কেবল সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, সুভাষ চকিতে সচেতন হইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নিকটে আসিয়া নিঃসঙ্কোচ গলায় ডাকিল, মা।

যাহার সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রী আজ এই মাতৃ সম্বোধন শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তাহার উৎকর্ণ কর্ণে এই মৃদুধ্বনিও প্রবেশ করিল। তাই রাত্রির শেষে এইমাত্র যে সামান্য তন্দ্রাটুকু তাহার চোখের পাতায় জড়াইতেছিল, নিমিষে তাহা টুটিয়া গেল।

আবার সেই ডাক আসিল, মা!

এইত সুভাষের ডাকই ত বটে! গিরিবালার বুকটা অজ্ঞাতে টনটন্ করিয়া উঠে। দৌড়াইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া অবিশ্বাসে চাহিয়া দেখেন—সত্যই সুভাষ। সুভাষ বাগ্র-কণ্ঠে বলে, মা আমি ফিরে এসেছি।

গিরিবালা বলেন, এস বাবা!

আবার সুভাষ বলে, আমার ভুল ধরা পড়ে গেছে মা। তাই আবার ফিরে এসেছি মা। ঘরের কথা না ভেবে পরের কথা ত সত্যই ভাবা যায় না। আর, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেলে ত আমার পাপ বেড়ে চলবে।

গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মত কথা কয়টি শোনেন, তাহার মুখে কোন জবাব আসে না। সংজ্ঞা পাইয়া তিনি যখন চোখে আঁচল চাপা দিলেন, তখন দরদর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। দূরে এমনি সময়ে গাছের মাথায় জড়িতস্বরে একটা কাক কা-কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

গিরিবালা দৌড়াইয়া এঘরে আসিয়া ডাকিলেন, ওঠ্ মা বিণু, ওঠ্। ভোরের আলোয় দেখ দেখি কে এসেছে।

বীণা পাশ ফিরিয়া চোখ কচ্লাইয়া কহিল, উঠি—এই উঠি।

স্বপ্নাবিষ্ট বীণার অধরে তখনও এক টুকরা হাসি মদালস মায়ায় উঁকি দিতেছিল।

সঙ্গীতের মুক্তি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

বিশ্বের ব্যথা গোপনতা মাঝে হয় নাই কভু হারা,
সারা জগতের অন্তর রস সঙ্গীতে পেল ছাড়া।
মানুষের যাহা আপনার মাঝে টানিল না শেষ রেখা
বিশ্ব প্রকৃতি রাগিণী দোলায় আঁকে মিলনের লেখা।
বনের সবুজে, সাগর দোলায়, উন্মাদ বেণু বনে
সুরের নিঝর গোপনে বহাল মানুষের সারা মনে,

উষা অঙ্গনে ভৈঁরো আলাপ আলোকের জাগরণ,
ভৈরবী তানে সঙ্গবিহীন অন্তর নিবেদন;
পূরবী বেলায় বিধবা সন্ধ্যা অশ্রুর গাঁথে মালা,
শ্মশানের বুকে গৃহছাড়া বসি' সাহানায় ভরে ডালা।
মেঘমল্লার রাগিণীর তানে আষাঢ়ের নব দিনে
যক্ষ-দয়িতা আজো গাহে গান বিরহের মনোবীণে॥

আলো

(গল্প—শেষার্দ্ধ)

শ্রীনীহার গুপ্ত ও কনক গুপ্ত

দিন যায়। গৃহে লোকজনের মধ্যে সুলতা নিজে, অমিয়র দিদি মৃণাল আর ছোট ভাই বিনয়। একজন ঠিকা ঝি ও বামুন একজন রাত্রি দিনের চাকর। সংসারের যাবতীয় কাজ তাহারাই করে!

বিনয় তাহার কলেজ ও পাঠ্যপুস্তক লইয়াই ব্যস্ত! আর দিদি সংসারের খুঁটিনাটি লইয়াই থাকেন! অসুবিধা হইল সুলতার! অখণ্ড অবসর! অথচ হাতে কোন কাজই নাই! এতদিন পিত্রালয়ে সদা সর্বদা আপন পাঠ্য পুস্তক ও অসংখ্য খেয়াল লইয়া ব্যস্ত ছিল; সংসারের কোন কাজেই সে কোন দিনই ঘেঁসে নাই এবং সেই জন্যই পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে সংসার বলিয়া যে আরও একটা জগৎ আছে, সে সংবাদ সে কোন দিনও রাখে নাই! এমন কি রাখিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই; ফলে সে যখন এতদিন পরে একান্ত অতর্কিত ভাবেই সংসারের মাঝে আসিয়া পা দিল, সে যেন কতকটা দিশেহারা হইয়া পড়িল!

রান্নার জন্য ঠাকুর চাল চাহিলে, সে চারিজন লোকের ভাতের জন্য সাত আট জনেরও অধিক লাগে এমন পরিমাণ চাল হয়ত পাত্রে ঢালিয়া দিত! একবেলার তরকারী কুটিতে গিয়া হয়ত চার বেলার মত তরকারী কুটিয়া বসিয়া থাকিত! দিদি বধূর অজ্ঞতায় হাসিয়া উঠিতেন, থাক! বৌ তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না! এমন কয়েকটা দিন দেখ, তাহলেই বুঝতে ও শিখতে পারবে!

সুলতা কিন্তু নিজের এই অমার্জনীয় অজ্ঞতায় একান্ত দুঃখিত ও লজ্জিতই হইয়া উঠিত! কুণ্ঠিতভাবে একটি পাশে সরিয়া দাঁড়াইত! কাজে কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া এক প্রকার শুইয়া বসিয়া ও আজে বাজে বই পড়িয়া কাটাইতে হইত! কিন্তু কতদিন আর একটা মানুষ এমনিভাবে কাটাইতে পারে! শীঘ্রই সুলতা হাঁপাইয়া উঠিল!

সেদিনও দ্বিপ্রহরে কিছুতেই যখন আর সময় কাটিতে চায় না সুলতা ধীরে ধীরে বিনয়ের পড়িবার ঘরটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল! বিনয়ের অবর্তমানে সুলতা এ ঘরে কোন দিনও আসে নাই। কেননা বিনয় স্বভাবতই একটু নির্জনতা প্রিয়! বিনয় এখন কলেজে গিয়াছে; ভেজান দরজাটি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া সুলতা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। টেবিলের উপর বইগুলি অগোছাল অবস্থায় ইতস্তত ছড়ান। সুলতা আস্তে আস্তে একটি একটি করিয়া বইগুলি গুছাইয়া রাখিল! বইগুলি গুছান হইলে সুলতা ঘরের এক পাশের একটি খোলা জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল!

সুলতা দেখিল, সামনেই একটা ছোটখাট একতলা বাড়ী, বাড়ীর ভিতরে একটি ছোট্ট উঠান! উঠানে দড়িতে গোটা কয়েক রঙিন ছোট ছোট জামা ও লালপাড় একখানি রঙিন শাড়ী রৌদ্রে শুকাইতেছে। দালানে দোলনায় বুঝি একটি শিশু ঘুমাইয়া! দোলনাটা মৃদু মৃদু দুলিতেছে, বোধ হয় এইমাত্র কেউ দোলা দিয়া গিয়াছে!

এমন সময় সহসা দোলনায় শায়িত শিশুটি একটু নড়িয়া চড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল! দালানের একপাশে রান্নাঘর হইতে একটি অল্পবয়সী বৌ তাড়াতাড়ি আসিয়া আলগোছে শিশুটিকে দোলনা হইতে আপন বক্ষে তুলিয়া লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে সান্ত্বনার ভাষায় কহিতে লাগিল, ওরে আমার যাদু! ওরে আমার মাণিক! ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি

সুলতা চমকাইয়া উঠিল! এ কণ্ঠস্বর যে তাহার একান্ত পরিচিত। এ-যে অবিকল তাহার প্রিয় বান্ধবী রেখা মিত্রের গলার স্বরের মতই! কিন্তু রেখা? রেখা এখানে আসিল কিরূপে?

এমন সময় বৌটি ছেলেটিকে স্বীয় বক্ষে চাপিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওমা! এ-যে সত্য সত্যই তার সহপাঠিনী রেখা মিত্রই! সুলতা অসহ আনন্দের উচ্ছ্বাসে একপ্রকার চীৎকার করিয়াই ডাকিল ঃ রেখা!

বৌটিও ডাকে চমকাইয়া মুখ তুলিয়া তাকাইল! তাকাইতেই জানালার ধারে অবস্থিত সুলতার ব্যগ্র ব্যাকুল চোখের সহিত রেখার চোখা-চোখি হইয়া গেল! রেখাও সুলতাকে এইভাবে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—এ্যা সুলি নাকি? তুই ওখানে? ও বাড়ীতে?

সুলতা স্মিত মুখে জবাব দিল,—হাঁ! এটা আমার শ্বশুর বাড়ী।

রেখা সুলতার কথায় বিস্ময়ের সুরে কহিয়া উঠিল—শ্বশুর বাড়ী! তোর আবার বিয়ে হল কবে? এ্যা আমাদের একেবারে ফাঁকি দিয়েই কাজটা সারলি ভাই? তারপর একটু থামিয়া কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে শুধাইল, তারপর বিবাহ নিবারণী সভার সভানেত্রী, এমতিগতি তোরই শেষ পর্যন্ত হল! না এতটা অধঃপতন কিন্তু আমি অন্তত তোর কাছ হতে কোন দিনও আশা করিনি! না, শেষ পর্যন্ত দেখছি, এজগতে কিছুই আশ্চর্য নয়।

সুলতা রেখার অনর্গল বক্তৃতার স্রোতে বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল,—থামুন বাক্যবাগীশ! তারপর এটা বুঝি তোদের বাসা-বাড়ী?

রেখা ঘাড় হেলাইয়া কহিল, হাঁ।

তারপর কর্তাটি করেন কি? কোলে বুঝি তোরই ছেলে, না মেয়ে?

রেখা অল্প একটু হাসিয়া বক্ষস্থিত সন্তানের দিকে একটিবার তাকাইয়া স্নেহসিক্ত স্বরে জবাব দিল,—কি মনে হয়? তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুলতার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, তোর কর্তাটি এইখানেই থাকেন ত'?

সুলতা ঘাড় দোলাইয়া জবাব দিল, না! বাঁকুড়ায়!

ও! তা হলে তোর এখন বিরহে এ তনু জর-জর। প্রোষিতভর্তৃকা।

সুলতাও হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, হাঁ! কতকটা তাই বটে!

নিরবচ্ছিন্ন অপরিমিত একাকিত্বের মাঝে রেখাকে পাইয়া সুলতা যেন কতকটা হাঁপ ছাড়িয়াই বাঁচিল।

রেখার স্বামী শেয়ার মার্কেটে দালালী করে। মাত্র তিনটি প্রাণী লইয়া তাহাদের ছোট্ট সংসারটি। রেখা, তাহার স্বামী চিন্তাহরণ ও দেড় বৎসরের শিশু-পুত্র টুকুকু! সংসারে স্বামীর আপনার বলিতে কেহই এক প্রকার নাই, মা-বাবা শিশু বয়সেই মারা যান। মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়া সে আজ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়াছে।

সকাল ও বিকালে সংসারের টুক-টাক দু'একটা কাজ করিয়া সুলতা যে সময়টুকু পাইত, রেখার ওখানে গিয়া কাটাইয়া দিত! রেখার নিরবচ্ছিন্ন সংসার-প্রবাহের আনন্দঘন স্পন্দন তার গোপন হৃদয়তলে যেন একটা মৃদু আলোড়ন জাগাইয়া তুলিত।

সারাদিন পরিশ্রমের পর স্বামী গৃহে ফিরিবেন, তাহার বিশ্রামের জন্য, ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ-মনকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্য রেখার পরিপূর্ণ হৃদয়ঢালা প্রয়াস সুলতাকে মুগ্ধ করিত! তার গোপন হৃদয়-তলে কি একটা না-পাওয়া বেদনার মৃদু কম্পন চকিতে যেন তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিত। তার চোখের পাতায় বারেকের তরে জাগিয়া উঠিত ঠিক এমনি একটি নিরালা গৃহ কোণ—ঠিক এমনি একটি পরিশ্রান্ত অবসন্ন মানুষের অস্পষ্ট ছায়া, দু'চোখে তার কি গভীর আকুতি! এমনি করিয়াই সুলতার দিনগুলি কাটিতেছিল, এমন সময় সুলতাদের ওখানে অমিয়র এক দূর-সম্পর্কীয় মামাতুত ভাই অনিল বেড়াইতে আসিল।

অনিল গত বৎসর জাপান হইতে সেরিকালচার পড়িয়া আসিয়াছে, এতদিন গ্রামেই বসিয়াছিল, শ্রীরামপুর উইভিং কলেজে একটা চাকুরী পাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে; কলেজে এখনও তাহার জন্য কোয়াটার তৈয়ারী হয় নাই, তাই আপাতত কয়েক মাসের জন্য অমিয়দের বাসায় থাকিয়াই কলেজ করিবে

অফুরন্ত রূপ ও বাঁশীর মত মিষ্টি গলা ছিল অনিলের মস্তবড় দুটি সম্বল। বুদ্ধি তাহার কাহারও চাইতে কোন অংশে কম ছিল না; কিন্তু রূপ ও কণ্ঠের চর্চায় তাহার এতটা সময় অতিবাহিত হইত যে, বিদ্যা-চর্চাটুকু চিরকালই অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে!

অনিলের রূপে মোহের চাইতে প্রখরতা ছিল ঢের বেশী, এত উগ্র ছিল তার রূপ যে, একবার চোখে পড়িলে চক্ষু যেন ফিরানই যাইত না এবং অনিলের সেইটাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় অহমিকা। ইতিপূর্বে তাহার জীবন পথে অনেক নারীই পা ফেলিয়া গিয়াছে—সুলতাও এই রূপের আভায় কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সুলতার দুই চোখ ঝলসাইয়া গেল। সুলতা প্রথমে অনিলের সাথে বিশেষ কোন কথাবার্তা কহিত না, বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কথাবার্তা ছাড়া; কিন্তু অনিল শীঘ্রই তাহার স্বাভাবিক মিশুক স্বভাবের গুণে সুলতার সে ভালবাসিত। অনিলের সুললিত কণ্ঠস্বর সুলতাকে মোহিত করিল! ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল, সুলতা একটু একটু করিয়া অনিলের গান শুনিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িল।

সেদিন বিকালের দিকে কলেজ হইতে ফিরিয়া অনিল সুলতাকে কহিল, চল বৌদি উপরে ছাতে যাওয়া যাক; কেমন আকাশ ঘিরে নব আষাঢ়ের সজল মেঘের ইসারা জেগেছে। বলিতে বলিতে অনিল গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিল।

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরষায়
এমন মেঘ স্বরে
বাদল ঝরো ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়

সুলতা ও অনিল ছাতে আসিয়া উঠিল। সমস্ত আকাশ ঘিরে মেঘ জমেছে পুঞ্জে পুঞ্জে থোকায় থোকায়। মাঝে মাঝে বিজলীর চাপা ইসারা! একটা মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া শির্ শির্ করে কাঁপন জাগিয়ে যায়; পথের ধারের কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যেন মেঘভারে নুইয়ে পড়েছে।

ঃ আচ্ছা বৌদি, মানুষের মন এত দুরাশা-প্রিয় কেন বলত?

ঃ ওটা বোধ হয় আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

ঃ সত্যি! বোধ হয়ত তাই! নইলে সত্যিকারের পাওয়া আমরা কতটুকুই বা পাই; এদিকে চাওয়ার অন্তও আমাদের নেই! যা পাই তাতেও আমাদের তৃপ্তি নেই, আবার যা পেলাম না তার জন্যও আমাদের অতৃপ্ততার অন্ত নেই! আসলে আমরা যে কি চাই আর কি চাইনে সেইটাই ভাল করে বুঝতে পারি না।

ঃ অনেক সময় মন আমাদের মোহবশত অনেক কিছুই কামনা করে তাই বলে প্রত্যেক চাওয়ারই মঙ্গল, অমঙ্গল আছে ত'।

ঃ মঙ্গল, অমঙ্গল! তার মানেই সফল, অসফল। কিন্তু মুস্কিল এই—না পেলে বোঝবার জো নেই, কোনটা অসফল। কাজেই পাবার আনন্দ ত' পূর্ণ হয় না।

ঃ আনন্দ, সে-কি শুধু পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার মধ্য দিয়েই আমরা পাই ঠাকুরপো, না-পাওয়ার মধ্যেও কি পরিপূর্ণ আনন্দের সাড়া নেই?

ঃ না নেই এতটুকুও নেই, ও শুধু দুর্বলের স্তোক মাত্র! না-পাওয়ার মধ্যে পাওয়ার আনন্দ, দুঃখের মাঝে সুখের পরিকল্পনা, এগুলি শুধু নিজেকে নিজে ফাঁকি দেওয়ার কতকগুলো বাঁধা ফরমুলা; ওতে করে উত্তর হয়ত মিলতে পারে; কিন্তু সত্যিকারের মীমাংসা মেলে না বা মিলতে পারে না।

ঃ ফাঁকি অর্থাৎ না পাওয়া বা ত্যাগের মধ্যেও কি আনন্দ নেই ঠাকুরপো?

ঃ না, নেই বিন্দুমাত্রও নেই! সত্যিকারের আনন্দ এক বস্তু আর তায় পাওয়ার কল্পনা অন্য বস্তু!

সেদিন হঠাৎ অনিল সুলতাকে প্রশ্ন করে বসল,

ঃ আচ্ছা বৌদি! সুন্দর বস্তুর প্রতি অধিকার ত' সকলেরই

সুলতা হাসিতে হাসিতে কহিল, সকলের রুচি ত সমান নয়; কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ঠাকুরপো?

ঃ প্রশ্নর আবার কি ও কেন আছে না-কি বৌদি! একটা গল্প মনে পড়ে গেল বৌদি; তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, মার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়র সঙ্গে হঠাৎ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়; ভদ্রলোকের দুটি অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল, বড়টির নাম কমল, ছোটটির নাম দুলু! আমি প্রায়ই ছুটি পেলে সেখানে বেড়াতে যেতাম, গান হ'ত, গল্প হ'ত—বেশ লাগত কিন্তু। সেই তাদের ওখানে ঘন ঘন যাতায়তের ফলে সেই মেয়ে দুটির মা ও তার মেয়েরা ঠিক করে ফেললে আমি প্রেমে পড়ে গেছি। মেয়ে দুটি ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতে লাগল সঠিক জানতে কে আমার প্রিয়। কিন্তু একটা জিনিষ আমার মনে অত্যন্ত আঘাত দিল। বড়টি স্থানীয় একটি মেডিকেল স্কুল হতে পাশ করা ছেলের সঙ্গে তখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েটির মার অপরিসীম জেদ আমায় ক্ষেপিয়ে তুলল। একদিন সে স্পষ্টা-স্পষ্টি তার একটি মেয়েকে বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ জানাল, আমি পরিষ্কার না বলে দিলাম, তিনি শুধালেন, কেন? আমি বললাম আপনার মেয়েদের ওপর আমার একটুকু অনুরাগ নেই!

তিনি বললেনঃ কেন? তারা কি কুৎসিত? আমি বললাম কুৎসিতের কথা হচ্ছে না আমার মনের মত ঠিক নয়। তুমি হয়ত বলতে পার বৌদি সত্যি কি তারা আমার অনুপযুক্ত ছিল, তার উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি দেহটাই ত' সব নয়; দেহের বাইরে আরও অনেক কিছু আছে যা দেহের সীমানা ছাড়িয়ে মনকে ছোঁয়া দিয়ে যায়। এ কেনর জবাব কিছু নেই; তাই বলছিলাম সকল প্রশ্নেরই কি ও কেন থাকে না। সব কিছুই কি আমরা ভেবে বলি বা করি? আমাদের মন আমাদের কর্মের চাইতে ঢের বেশী দ্রুত ও চলমান।

ঃ হঠাৎ আজ এমনি করে তোমার জীবনের প্রেমের গল্প শোনালে কেন ঠাকুরপো?

ঃ তুমি রুচির কথা বললে কিনা তাই বললাম। মানুষের রুচি অনেক সময় মানুষের বাসনার অপমৃত্যু ঘটায়; কিন্তু এমনও দেখা যায় রুচিকে বাসনার কাছে হার মানতে হয়েছে। তাই বলে কি রুচিটা বদলে যায়! তা যায় না।

এইভাবে সুলতার মন যখন নানারূপ সংশয় ও অসংশয়ের দোলায় দোল খাইতেছে, তাহার চিরাচরিত সমাজ-নীতি, সংস্কার ও বিবেক-বুদ্ধি, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা একবার তাহাকে বাহিরের পানে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল, আবার পরক্ষণেই ঘরের ভিতর টানিতেছিল। সত্যই সুলতা হাঁপাইয়া উঠিল।

দ্বি-প্রহরে সেদিন একটা তার আসিল,
Omiya seriously wounded, Come sharp.
(অমিয় ভীষণভাবে আহত। শীঘ্র এস।)
তার দেখিয়া দিদি ত কাঁদিয়াই আকুল।

কবিতা লইয়া তুমুল তর্কের ঝড় তুলিয়াছিল, দিদি অশ্রুসজল চোখে তারটা সেখানে ফেলিয়া দিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া গেলেন!

সুলতা নীচু হইয়া তারটা তুলিয়া লইল!

সহসা যেন একটা চাবুকের ঘা সপাং করিয়া তাহার পিঠের উপর আসিয়া পড়িল।

অনিল ঝুঁকিয়া পড়িল, What's wrong?

সুলতা একটি কথাও না বলিয়া নীরবে শুধু তারখানি অনিলের দিকে আগাইয়া দিল।

অনিল কহিল, তাই ত!

সুলতা ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। সমস্ত ঘরের আবহাওয়া যেন মুহূর্তে তাহার কাছে বিষাইয়া উঠিয়াছে!

শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে।

নীচে আসিয়া দেখিল দিদি একহাতে চোখের জল মুছিতেছেন ও অন্য হাতে যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

সুলতা নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পার্শটিতে দাঁড়াইল।

সুলতার আগমণ টের পাওয়া সত্ত্বেও দিদি তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করিলেন না।

সুলতা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তারপর এক সময় ধীরে ধীরে বিনয়ের পড়ার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

নাঃ কিছুতেই তোমায় আজ আমি অফিসে যেতে দেব না! কিছুতেই না। রেখার গলা!

কিন্তু আমার ত' কিছু হয়নি রেখা!.........সামান্য একটু মাথা ধরেছে মাত্র। সুলতা আপনার অজ্ঞাতেই পায়ে পায়ে এক সময় খোলা জানলাটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেখা দুয়ার আগলাইয়া রহিয়াছে; আর চিন্তাহরণ অফিসের জামা-কাপড় পরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

সারারাত তুমি মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করেছ! একদিন অফিস কামাই করলে কিছু হবে না।

চিন্তাহরণ হাসিতে থাকে; একদিন অফিস কামাই মানে দু'টাকা দশ আনা একদিনের মাইনা!

তা থাক! তবু যেতে পারবে না!

শোন রেখা। অবুঝ হয়ো না। যতই ক্লান্ত হই না কেন, তোমার ঐ কোমল হাতের ছোঁয়া পেলেই আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হবে প্রিয়।

রেখা হাসিয়া উঠিল, না গো না! যেতে দেবো না! যেতে দেবো না!

সুলতা জানালার ধার হইতে সরিয়া আসিল। একটি কথা বার বার তাহার মনের মাঝে নানা সুরে গুঞ্জন তুলিয়া ফিরিতে লাগিল, তোমার হাতের ছোঁয়া পেলেই যে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হবে প্রিয়!

সারা বাড়ীটাই যেন একটা মৌন বিষণ্ণতায় অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, দিদি, বিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর দাসী-চাকরগুলি পর্যন্ত যেন আজ

সুলতার যে কি হয়েছে!

ভাবিবার বুঝিবার মত এতটুকু শক্তিও বুঝি আর তাহার নাই! তার দেহ ও মন বুঝি পক্ষাঘাতে অচল ও অবশ হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় গাড়ী। দুয়ারে মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিদি অবাধ্য অশ্রু কোনমতে চাপিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, বিনয় সঙ্গে যাইতেছে!

সহসা দিদি চমকাইয়া উঠিলেন, একটা ভারী শাদা চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া সুলতা গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিদি বিস্মিত হইলেন, একি বৌ!.......

হাঁ দিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব! মৃদুকণ্ঠে সুলতা শুধু জবাব দিল মাত্র।

সুলতা গাড়ীর দরজা খুলিয়া একপাশে উঠিয়া বসিল

দিদির চোখ দুটি সহসা জলে ভরিয়া গেল; গভীর স্নেহে তিনি সুলতাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইলেন!

অমিয় মোটরে করিয়া টুরে যাইতেছিল! সহসা বেকায়দা-ভাবে মোড় ফিরাইতে গিয়া একটা গাছের সহিত গাড়ী ধাক্কা খায়, ফলে গাড়ী উল্টাইয়া অমিয় গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া মাথায় ও বুকে ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। ড্রাইভারটী সেখানেই মারা যায়। অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় অমিয় সেইখানেই পড়িয়াছিল, পরে ঘর ফিরতি কতকগুলি সাঁওতাল সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে অমিয়কে ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া শহরে গিয়া খবর দেয় এবং পরে তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

অমিয়র জ্ঞান এখনও ফিরিয়া আসে নাই.........

দিদি, সুলতা ও বিনয় যখন হাসপাতালে আসিয়া ঢুকিল, সবে তখন রাতের আকাশ ভোরের আলোর ছোঁয়ায় রাঙিয়া হইয়া উঠিতেছে। ইনচার্জ মেডিকাল অফিসার খবর পাইয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি একজন পাঞ্জাবী। নাম গুরুবক্স।

বিনয় শুধাইল Doctor! what's the condition of Mr. Amiya Mookerjee?

ডাক্তার গুরুবক্স বিষণ্ণমুখে জবাব দিলেন, It's a cerebel haemorrhage! There is no treatment for it at all.

সুলতা!......সুলতা দাঁড়াইয়াছিল সহসা পায়ের তলার মাটি যেমন যেন সরিয়া সরিয়া যায়।.......

চারিপাশের বাতাস এত ভারী ও জমাট বোধ হয় কেন?

বিনয় সুলতার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সহসা হাত বাড়াইয়া সুলতাকে ধরিয়া ফেলিল। বৌদি!........

সুলতা যেন একবার হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখটা একটিবার বিকৃত হইল মাত্র এবং ধীরে ধীরে আবার ঠিক হইয়া দাঁড়াইল।........

বিনয় বলিতেছিল—at all no hope doctor?

least!........ডাক্তার কঠিনস্বরে জবাব দিলেন।

...........সকলে আসিয়া অমিয়কে যে ঘরে রাখা হইয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বুকের উপর light bath এ heat দেওয়া হচ্ছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গায়ে একটা লাল কম্বল চাপান, নাকে অক্সিজেনের টিউব ঠোঁটের সঙ্গে এডহিসিভ প্লাষ্টার দিয়ে লাগান। চোখ দুটি বোজা।

অমিয়! অমি!.....ভাই! রুদ্ধ ক্রন্দনে দিদি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহসা এমন সময় অমিয় একবার মাথাটা কাত করিয়া যেন নিশ্বাস লইবার চেষ্টা করিল। পরক্ষণেই, খানিকটা রক্ত নাক দিয়া গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সমস্ত শরীরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তারপর সব স্থির।

...........সুলতার খেয়াল হইল উচ্চ ক্রন্দনের শব্দে!.....কেমন যেন ঘুম আসে। ওঃ, যেন কত রাতের ঘুম আজ সুলতার দু'চোখের পাতায় ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেহ ও মন অবশ ও অসাড় অবসন্নতায় ঝিমাইয়া আসে।........

দিদি আকুল হইয়া দুই হাতে অমিয়র দেহটা জড়াইয়া তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে।

সুলতা টলিতে টলিতে অমিয়র মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওগো! প্রিয় আমার! বড় ঘুম পেয়েছে না?.........বুকে-মাথায় বড় লেগেছে না?......জলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে কেন? উঃ এত অন্ধকার!......... বড্ড অভিমান হয়েছে বুঝি? সুলতা তাহার কম্পিত হাত দুটি দিয়া অমিয়র নিস্তব্ধ স্থির নিষ্প্রাণ মুখখানি চাপিয়া ধরিল!

ওগো! আমি এসেছি! চেয়ে দেখ প্রিয় আমার! চেয়ে দেখ! আর আমার অভিমান নেই! অহংকার আর ত আমার নেই! চাও, ওগো চোখ খুলে দেখ!...উঃ কি আঁধার একি! কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না! কোথায়? কোথায় তুমি! আলো! আলো!

......সুলতার প্রাণহীন দেহ অমিয়র বুকের উপর নিঃশব্দে নেতাইয়া পড়িল— [illegible]

—শেষ—

মিসিসিপির বুকে

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

নেহাৎ বালক বয়সে যখন বাস করতাম পল্লীতে, আমাদের সমবয়সীদের ভিতর একটিমাত্র গর্বিত লক্ষ্য ছিল জীবনের—আর তা ছিল নদীতে চলাচলের ষ্টিমারের চালক হওয়া। মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরের সকল পল্লীবালকেরই বুকে ছিল ষ্টিমার সম্পর্কে একটা অপরিসীম পক্ষপাতিত্ব।

দিনে একবার উজান বেয়ে সস্তা একটা জবরজং ষ্টিমার এসে পৌঁছাত সেণ্ট লুই শহর-ঘাটে, আর একটা আসত উজান থেকে স্রোতে গা ঢেলে কেওকুক নামক বন্দরটি হতে।

পর্দার ছবির মত এখনও [illegible] ভেসে ওঠে সে দৃশ্য—গ্রীষ্মপ্রভাতের চটকদার সূর্যা[illegible] শহরটি যেন তন্দ্রা-মায়ায় যেন ঝিমাচ্ছে; পথঘাট জনশূন্য; দু একটি কেরাণী বসে আছে ওয়াটার ষ্ট্রীটের ষ্টোরগুলোর সমুখে; বসে বসেই তারা ঘুমোচ্ছে চেয়ারগুলোর পিঠ দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে, টুপীগুলো মাথা থেকে খুলে মুখের ওপর ঢাকা দিয়ে; চারিদিকে তাদের রয়েছে ছড়ান পাথরকুচি, কাঠের সংঘর্ষের সাক্ষ্য দিতে; এক পাল বাচ্চা নিয়ে শুয়োর একটা আনাগোনা করছে পাশের গলিটায় সামান্য কিছু খাদ্য রাহাজানি করবার আশায়—যদি বা দৈবাৎ তরমুজের খোসা আর দানাগুলি মিলে যায় তা হলে ত রাজভোগ; প্রাঙ্গনে দু-একটি [illegible] মাথা উঁচু করে আছে নিলামের [illegible] পাক করা মালপত্রের। তারই একটির আড়ালে নিদ্রিত রয়েছে শহরের মাতাল একটি [illegible] গন্ধবহুল [illegible] মাদকতায় বাতাস ভারী করে; আর এক মাইল প্রশস্ত স্রোতোধারা বুকে করে মহিমান্বিত মিসিসিপি আড়ম্বরের সঙ্গে গড়িয়ে চলেছে সূর্যালোকে ঝলমল—উজ্জ্বল। চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে যেন কালো ধূম্ররেখা ফুটে ওঠে নদীর ওপর সেই উজানে; [illegible] একটি নিগ্রো—দরাজ গলার জন্য যার প্রসিদ্ধি [illegible] অপ্রতিদ্বন্দ্বী—সে তার অত্যন্ত কর্কশ [illegible] জানিয়ে দেয়—'ষ্টিমার য়্যা-কামিং' (ষ্টিমার আসছে)!

আকাশ-বাতাস স্পন্দনকারী সে চীৎকার যেন যাদুমন্ত্রে দৃশ্যপট পাল্টে দেয়। মাতাল তার ঘুম টুটিয়ে উঠে বসে; কেরাণীরা [illegible] ক্ষণিক বিদায় নেয়; আর এক নিমেষে নিস্পন্দ শহরখানি সচকিত, সজীব, সচল হয়ে পড়ে। ঠেলাগাড়ী, মালটানা ঘোড়াগাড়ী, ছেলে বুড়ো—সকলে হুটোপাটি করে এলোমেলোভাবে ছুটে চলে ষ্টিমার-ঘাট উদ্দেশ্য করে।

ঘাটের পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকগুলো দৃষ্টি মেলে ধরে আগন্তুক ঐ ষ্টিমারটির উপর—যেন সে পৃথিবীর এক অদ্ভুত আশ্চর্য, যা এইসবে প্রথমবার তারা দেখবার সুযোগ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে ষ্টিমারটি—যেমন লম্বা তেমনই পরিপাটি তেমনই সুডৌল; কি সুন্দর লম্বা দুটি চোঙ, মাঝখানে চক্চক্ করছে সোনালী একটা [illegible] গম্বুজ; তারপাশে রয়েছে আড়কাটি অর্থাৎ চালকের (পাইলট) কেবিন, আগাগোড়া কাচে মোড়া, দুপাশে রেলিং-ঘেরা [illegible] তাতে বাহা-

পাইলট কেবিনের আকার থেকে তাকে পাইলটগণ ও ষ্টিমার-সংশ্লিষ্ট সবাই বলে থাকে জিঞ্জার ব্রেড্। দুপাশের বিরাট চাকা, যার সাহায্যে ষ্টিমার দাঁড়টানার কাজ করে, তারই গায়ে গিল্টি করা রয়েছে ষ্টিমারের নামটি। ডেক কি পরিচ্ছন্ন দেখায়; আবার সমুখে পশ্চাতে দাণ্ডায় সংলগ্ন রয়েছে নিশান; বয়লারের সমুখের আগুনকুণ্ডের দোর খুললে চুল্লীর বিভীষিকাময় প্রজ্বলিত শিখা এক রহস্যের উদ্ভব করে, যাতে তেমন সাহসিকেরও হৃদকম্প উপস্থিত হয়; দোতলার রেলিং-য়ের পশ্চাতে কেবল আরোহীদের ভিড়; কাপ্তান দাঁড়িয়ে আছে বড় ঘণ্টাটার পাশে, শান্ত সৌম্য মূর্তি নিয়ে আর দর্শকদের ঈর্ষা জাগিয়ে, ওপরে চিমনীর মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে নিবিড় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। প্রত্যেক বড় ষ্টেশন-ঘাটে পৌঁছবার আগে পিচ্-পাইন সাহায্যে এ জাঁকাল ধোঁয়ার সৃষ্টি করা হয়। খালাসীগুলো একেবারে সমুখের গলুইতে জড়ো হয়ে আছে; [illegible] মাথা বের করে রয়েছে জাহাজের গলুই থেকে; একটা [illegible] খালাসী সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে হাতে দড়ির একটা কুণ্ডলী করা গোছা নিয়ে। সমুখের গলুইয়ের দুপাশের চোখ-পানা দুটি গর্ত দিয়ে হিস্ হিস্ করে বেরুচ্ছে সাদা বাষ্প। কাপ্তেন হাত তোলে, ঢঙ্ ঢঙ্ করে একটা ঘণ্টা বাজে, দাঁড়ের চাকা থেমে যায়। পর মুহূর্তেই আবার উল্টোদিকে ধীরে ধীরে ঘোরে—ষ্টিমারের দুপাশের নদীবক্ষ একেবারে ঘুলিয়ে আর ফেনা ভাসিয়ে তুলে—এইবারে চাকা নিশ্চল হবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিমারও থেমে যায়!

তারপরে সুরু হয় যেন কুরুক্ষেত্র তাণ্ডব ষ্টিমার থেকে নামবার ভিড়, উঠবার জন্য হৈ-হল্লা, মালপত্র নামাবার তুলে নেবার কসরৎ, খালাসীদের চেঁচামেচি, মজুরদের হাঁকডাক, মালের ভারপ্রাপ্ত মেটের হুঁসিয়ারী হুকুম—সে যেন এক নারকীয় দৃশ্য!

দশ মিনিট—ব্যস্, সব শেষ, কোলাহল গেছে উবে, হুটোপাটি হয়েছে স্তব্ধ, আবার ষ্টিমার আবার পথ ধরে নিয়েছে নদীর বুকে। শহরটা আবার যে মৃত সেই মৃত।

এই যে বিচিত্র শব্দ মুখর ঘনঘটা এর প্রভাব ছোটদের কাছে একটিমাত্র হতে পারে। এই নদী তীরের বালকেরা, একটির পর একটি, যে করেই হোক প্রস্থান করে যেত এই ষ্টিমারে। মিনিষ্টারের ছেলে হয়ে পড়ল ইঞ্জিনিয়ার। প্রধান সওদাগরের চার পুত্র ও জজের দুই পুত্র হয়ে গেল পাইলট। পাইলটের পদে সেকালে ছিল সবচেয়ে সেরা মর্যাদা বেতনও সে অবর্ণনীয় [illegible] ছিল তাদের আমিরী ধরণের। মাসিক ১৫০ হতে ২৫০ ডলার পর্যন্ত। তার দুমাসের বেতনে একটি হেড মাষ্টার বা ধর্মপ্রচারকের এক বছরের মাহিনা পূর্ণ হয়ে যায়। আমিও তাই পণ করে বসলাম—আমি হব পাইলট।

বাড়ীর কেউ রাজী হয় না—তারা আমায় নদীবক্ষের চাকুরীতে যেতে দেবে না। কি আর করা যায় এমন অবস্থায়?

যতদিন না পাইলট হতে পারি, যতদিন না যশ অর্জন করতে পারি, ততদিন আর বাড়ীমুখো হব না।

তাহলেও দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করেও পারলাম না ঢুকতে ষ্টিমারের কাজে। কিন্তু বাড়ী ফিরে যাওয়াও হতে পারে না, পরাজয় স্বীকার করবো?—কি লজ্জার কথা। কাজেই তিন বছর ধরে আমি ঘুরেই বেড়ালাম—রসদ ফুরিয়ে গেলেই ঢুকতাম আমার শেখা পেশায়—ছাপাখানার কাজে।

তারপর একদিন নিউ ওরলিনস শহরে 'পল জোনস' জাহাজের পাইলটের কাছে দিলাম ধন্না। কঠোর তিনটি দিন-রাতের পরে পাইলটের মন ভিজলো। ৫০০ ডলারে সে স্বীকৃত হ'ল আমায় মিসিসিপি নদীর নিউ ওরলিনস থেকে সেণ্ট লুই অবধি অংশে ষ্টিমার চালন শিখিয়ে দেবে। টাকাটা অবশ্য এখনই দিতে হবে না, এখন আমি এত টাকা পাব কোথা,—শেখা হয়ে গেলে প্রথম যে মাহিনা মিলবে তা থেকে পরিশোধ করতে হবে। নদীটির এই ১২০০ কি ১৩০০ মাইল দীর্ঘপথের সকল খুঁটিনাটি চালন-কায়দা শিখবার ব্যাপারে দৃঢ়তা ও অদম্য বিশ্বাসের সঙ্গে লেগে গেলাম। আমার ধারণা ছিল পাইলটের কাজ আর এমন কি শক্ত—এক মাইল চওড়া একটা নদীর বুকে নিরাপদে ষ্টিমার চালান—এতে আবার মুস্কিলটা কি থাকতে পারে!

বিকাল চারটের সময় ষ্টিমার নিউ ওরলিনস ঘাট থেকে রওনা হ'ল। আমার ওপরওলা প্রধান পাইলট মিঃ বিক্সবি ষ্টিমারটিকে পিছু হটিয়ে পরে ঘুরিয়ে সোজা করে ঘাটের আশপাশের অন্য ষ্টিমারগুলোর হাল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গন্তব্য পথে এনে বললে—যাও, এবার তুমি নাও; ঐ যে ষ্টিমারগুলো দেখছো ওগুলোর এতটা ধার ঘেঁসে যাবে একটা আপেলের খোসা ছাড়াতে হলে যেমন করে ছুরি চালাতে হয়।

আমি হাল-নিয়ন্ত্রণ চাকা ধরে বসলাম—বুকটা এমন ঢিব ঢিব করতে লাগলো যেন মনে হল সেকেণ্ডে একশবার চলছে। এক একটা ষ্টিমারের পাশ কাটাতে লাগলো, আর মনে হ'ল এই বুঝি সেটার বাইরের ধার অবধি চেঁছে-ছুলে নিয়ে চললাম আমাদের ষ্টিমারের সঙ্গে। প্রত্যেকবারেই আমি অনেক দম বন্ধ করে আমাদের ষ্টিমারটিকে ছোঁয়াচের বাইরে নিয়ে যাই। অর্ধ মিনিটের ভিতর আর একখানা ষ্টিমার 'পার্ল' জোনস সমুখে; তার ধার থেকে ঢের তফাতে নিয়ে গেলাম, আর বিপদের আশঙ্কা নেই! তবু দশ সেকেণ্ড পার না হতে এল নালিশ মিঃ বিক্সবির তরফ থেকে। আমার এই ভীরুতার জন্য ওপরওলা আমায় শুধু গোটাগাল তুলে ফেলতে বাকি রাখলে তার অদ্ভুত ভাষার বহরে। হুইল হাতে নিয়ে সে এত কাছ ঘেঁসে নিয়ে গেল ষ্টিমারটির আমার মনে হ'ল ওটার এক পাল্টা রং উঠে এল—আমার কেবলই শঙ্কা হতে লাগলো—এই গেলাম, এই গেল ঠোকাঠুকিতে সব চুরমার হয়ে। কিন্তু আশ্চর্য কোন ষ্টিমারেরই কিছু হ'ল না, আমাদেরটারও না।

রাগ তার পড়ে এলে সে ধমকে বলে উঠলো—আহাম্মোক, যা বলি তাই শুনবে, তোমার আবার ভাবনা কি! তীরের

...বেলা তোড়টা এড়াতে হবে; আর যখন ভাটিতে চলবো তখন ...দিতে হবে তোড়ে, ও-সুবিধাটুকু গ্রহণ করতে।

মাঝে মাঝে আমায় ডেকে মিঃ বিক্সবি দেখাতে লাগলেন—এটা ছয় মাইল নিশানা' 'এটা নয় মাইল পয়েণ্ট' পরে আবার এটা বার মাইল।' সব কটা দেখতে ঠিক একই রকম, আমি আশা করতে থাকলাম অন্য রকম নিশানাও সে দেখাবে আমায় ঠাহর করবার সুযোগের জন্যে। কিন্তু সে রকম সদিচ্ছা তার হ'ল না: এক একটা পয়েণ্ট নদীর ভেতরে বেরিয়ে আসা, যেন দরদে আলিঙ্গন করে চলে সে তিন দিক ঘুরে, সঙ্গে সঙ্গে বলে—সমুখে ঐ যে চীনাগাছের সার এ অবধি নদীর এ কূলের হাল্কা স্রোত, তার পরেই কড়া তোড়, তাই এবার পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে হবে।

এর পর দু-একবার আমার হাতে চাকা ছেড়ে দিলে, কিন্তু আমি তাকে হতাশই করলাম। হয় ষ্টিমারটিকে নিয়ে কোন আখের ক্ষেতে তুলে দেবার উপক্রম করলাম, না হয় তীর ছেড়ে নিষিদ্ধ তোড়ের মুখে নিয়ে ফেললাম, কাজেই লাঞ্ছিত হয়ে হুইল থেকে বিদায় নিতে হ'ল।

পাহারার সময় অবশেষে সমাপ্ত হল; রাতের খাবার খেয়ে শুতে গেলাম আমরা। ঠিক মাঝরাতে একটা লণ্ঠনের জোরাল আলো আমার নিদ্রিত চোখে পড়ে আমায় সজাগ করে দিলে, রাতের পাহারাওলা বললে—

'এস, আমার পালা শেষ!'

আবার নতুন এক ফ্যাসাদ। মাঝরাতে এমন করে অতি সুখকর শয্যা ছেড়ে যেতে হবে কাজে—পাইলটের পদে এমন বিপদ, কই কেউ তো বলেনি আগে। আমি অবশ্য এ খবর জানতাম যে ষ্টিমার চলাচল করে সারা রাত ধরে অবিরাম, তা হলেও রাতে যে পাইলটদের জেগে থেকে পালাক্রমে পাহারা দিতে হয় এ কথা তো আগে ভেবে দেখিনি। আরামের শয্যা ছেড়ে কেউ না কেউ পাহারার কাজ করলে তবেই ষ্টিমারের চলাচল সম্ভব, এ শাদা কথাটা মাথায় আসেনি এর আগে।

ঘোলাটে গোছের একটা রাত। তীরগুলো যেন রহস্যজনকভাবে অতি দূরে সরে গেছে আবছা হয়ে। মেট বললো—

আমাদের নামতে হবে জোন্সুরের প্ল্যান্টেশনে, স্যার।

আমার একবার ইচ্ছা হ'ল মিঃ বিক্সবিকে জিজ্ঞাসা করি—এমন একটা রাতে সত্যি সে আবাদ একটা বেছে নিতে পারবে বলে ঠাউরে রেখেছে নাকি, যখন রাতের ঘোলাটে পর্দায় ঢাকা হয়ে সব আবাদই সমান আবছা আঁধার দেখাচ্ছে। কিন্তু মুখের কথা আমার মুখেই রইলো—বিক্সবি তীরমুখো চালালো আর তারপর তীর ছুঁয়ে ছুঁয়েই চললো যেন দিনের আলোয় ষ্টিমার ছুটিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভয়ের লেশ নেই, একটু ভাবনা নেই, নিশ্চিত মনে আবার সুর টেনে যাচ্ছে—

পরপারের পিতা আমার! বেলা যে ডুবিয়া যায়...

আরে হতভাগা বলতো নিউ ওরলিনস্ ছেড়ে প্রথম পয়েণ্ট

জানি না।—বলতে বাধ্য হলাম।'

—আহা, কি আমার কাজের লোকরে! আচ্ছা দুই নম্বরেরটার নাম কি? আবার আমায় আগের বারের মত বলতে হল—জানি না।

—খুব যা হোক সাকরেদ আমার! আচ্ছা বল দিকিনি যে-কোন একটা পয়েন্টের নাম—এতগুলো তো পেরিয়ে এলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটা নামও মনে এল না। কাজেই পূর্ববৎ জবাব দিতে হল—জানি না।

—মহাত্মা সিজারের ভূতে পাক! তোর মত একটা আহাম্মকের ধাড়ী বিদ্যা-দিগ্‌গজ আমার জীবনে দেখিনি, শুনিওনি কোন কালে! জিজ্ঞেস করি তবে কিসের জন্যে এতগুলো পয়েন্টের নাম যে তোকে বলা হল—জিজ্ঞেস করি সে কিসের জন্যে?

—সে তো শুধু আমার মনে হল, সময় কাটাবার জন্যে।

এ যেন পাগলা ষাঁড়কে লাল ন্যাকড়া দেখানো আর কি! এমনি রেগে-টং হয়ে সে তর্জন গর্জন করতে লাগলো যে বেহুঁস হয়ে একটা ছোট নৌকার বারকয়া দাঁড় ধাক্কা দিয়ে দিলে ভেঙে। আর কি কথা আছে! নৌকা থেকে পণ্যের মালিক ব্যবসাদাররা একেবারে জ্বলন্ত দুর্বাক্যের তোড় ঢেলে দিল পাইলটকে উদ্দেশ করে। সুযোগ পেয়ে মিঃ বিকসবি যেন সজীব হয়ে উঠলো কৃতজ্ঞতায়। তারপর পাশের জানালাটি খুলে সস্নেহে সুর চড়িয়ে এমন এক পশলা অগ্নিবৃষ্টি করলে অপভাষায় যার শতাংশের একাংশও কোন দিন কানে শুনিনি। হয়রান হয়ে জানালা বন্ধ করে সে বললে আমায় ধীরে ধীরে—

বুঝলে ছোকরা, একটা নোটবুক করে নাও, যখনই আমি যা বলি, অমনি তা লিখে রাখবে। পাইলট হবার একটিমাত্র উপায়ই রয়েছে—সমগ্র নদীপথটি একেবারে মুখস্থ করে ফেলা। ক-খ-এর মত রপ্ত করে নিতে হবে এ পথটিকে।

হায়রে হায়! এ আবার বলে কি! এ যে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! অপরূপ এক রহস্যের উদ্ঘাটন। স্মৃতিকে আমার কোনদিনই কোন কিছু দিয়ে ভারাক্রান্ত করিনি অকেজো থালি কার্তুজ ছাড়া।

যে সময়ের ভিতর ৭ শত কি ৮ শত মাইল পেরিয়েছি তখন আমার একরকম শেখা হয়ে গেছে—উজানে কি করে ষ্টীমার চালাতে হয় দিনের বেলা। ততক্ষণে আমার নোটবুক ভর্তি হয়ে গেছে নামে নামে—শহরের, পয়েন্টের, দ্বীপের, মোড়ের, চড়ার প্রভৃতি প্রভৃতি। কিন্তু সে নাম শুধু নোটবুকের গায়েই আঁকা ছিল—আমার মনের দেওয়ালে রেখাপাত করতে পারে নি। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো এই স্মরণ করে যে, সবে সারা নদীপথের অর্ধেকটা লেখা হয়েছে; তার ওপর আবার আমাদের পাহারার পালা ছিল ৪ ঘণ্টা করে, কাজেই আমার নোটবুকে ঐ অর্ধেকেও আবার স্থান শূন্য রয়েছে চার চার ঘণ্টার, যখনই আমি গিয়েছি শুতে।

সেণ্ট লুই বন্দরে পৌঁছুলে মিঃ বিকসবিকে নিউ অর্লিন্সের একটি বিরাট ষ্টীমারে মোটা বেতনে কিছু সময়ের জন্য, আমিও আমার পাততাড়ি গুটিয়ে তার সঙ্গে গেলাম। সে ষ্টিমারে এক বিরাট ব্যাপার। ওটার ছাদে পাইলট-কক্ষে যখন আমি ঢুকে নীচের দিকে তাকালাম, আমার মনে হ'ল আমি যেন পর্বত-শিখরে উঠেছি—জল এতটা নীচে। কক্ষটি যেন কাচে মোড়া আজব মন্দির! লালের ওপর সোনালী কাজ করা সব পর্দা; সোফা জাঁকাল; উঁচু বেঞ্চি, যেটায় বসে পাইলট নদীর দিকে নজর রাখে আর অবসর সময়ে আরামে গল্প করে, সেটার আসনে ও হেলান দিবার পিঠে চামড়ার সুন্দর গদি আঁটা। হুইলটা আমার মাথার সমান উঁচু, তাতে কত মূল্যবান কারুকার্য; কফি, বরফ, জলখাবার প্রভৃতি বয়ে আনবার সুন্দর একখানি চাকাওলা টেবিল—কালো অঙ্গে তার শাদা ধব্‌ধবে ঢাকনী। পাহারার সময় দিন-রাত এ বিলাসিতা কত উপাদেয়! আমার হতাশভাব কেটে গিয়ে পাইলটের পদের প্রতি আমার পূর্ব অনুরাগ নূতন আকারে জন্মিল। এ কাজে বাহার আছে ত মন্দ নয়।

যেমন ষ্টিমারটি সচল হ'ল, অমনি আমি ঘুরে দেখতে লাগলাম চারদিক। অভিজাত-বৈঠকখানার মতই ষ্টিমারের অভ্যন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সোনালী গিল্টি করা সেলুন (আহার স্থান)—সে যেন স্বপ্নে মোড়া সুড়ঙ্গ একটি। প্রত্যেক কেবিনের দোরে তৈলচিত্র—প্রিজমের ঝালরওলা ঝাড়গুলো ঝক্ ঝক্ করছে—চারিদিকের রঙীন কাচের ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে রামধনুর জেল্লায় ভরিয়ে দিয়েছে সমগ্র অভ্যন্তরটা। আমার কাছে এবং অনেক আরোহীদের কাছেও এ ষ্টিমার একটা গর্বের জিনিষ, আমি ত কোথাও আর এমন জাঁকজমক দেখিনি ডাঙায়ও। এ যেন রহস্যজনক এক নূতন জগতে সহসা প্রবেশ। এর পরে যখন আবার পরিচ্ছন্ন উর্দি-আঁটা এক দল চাকর সশ্রদ্ধ ও বিপুল সম্মান প্রদর্শনে আমায় 'স্যর' 'স্যর' করতে লাগল, তখন আমি তৃপ্তির স্বর্গে উত্তোলিত হলাম।

ঘুরে-ফিরে যখন পাইলট-কক্ষে প্রবেশ করলাম, তখন সেণ্টলুই অদৃশ্য; আমিও দিশেহারা। কারণ যদিও আমার নোটবুকে নদীপথের এ অংশের সব নিশানা লিপিবদ্ধ, তবু এর কোন পাত্তাই ঠাওরাতে পারছিলেম না। আসবার নিশানাই লেখা আছে, ফিরে যাবার ত নয়। আমার বুক ফেটে হাহাকার মুক্তি পেতে চায় এ কথা স্মরণ করে যে, ঠিক আসবার সময়ের মত করেই আমায় ফিরে শিখতে হবে প্রত্যাবর্তনের পথটিও।

পাইলট-কক্ষভর্তি সব আড়কাটি—তারা বিভিন্ন জায়গায় নেমে যাবে নদীর এক একটা অংশের গভীরতা মাপতে—চড়ার স্থান নির্দেশ করতে নতুন নতুন; এর কারণ আর কিছুই নয়, নদীটি অনবরত তার স্রোতের গতিপথ বদলায়। তাই যখন যে ষ্টিমার ছুটির সপ্তাহ ভোগ করতে অচল থাকে, তখনই তার পাইলটগণ যায় সেণ্টলুই থেকে কেইরো অবধি নদীর বুকে ও গর্ভে নতুন করে নজর বুলাতে। নতুন শিক্ষার্থী পাইলটরাও এ ছুটির সপ্তাহে ডাঙায় থাকে না,

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(২১)

সতীশ বাড়ী চলিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে লীলা নরেন্দ্রকে কহিল, "দেখ, আমার বড় ইচ্ছে সতীশ ঠাকুরপোর সঙ্গে মণির বে দিই! তুমি কি বল?"

হাসিয়া নরেন্দ্র কহিল, "যোগ্যতম পাত্র। কিন্তু ও যে একেবারে মাটি হয়ে যাবে!"

বুঝিতে না পারিয়া লীলা স্বামীর পানে চাহিল। নরেন্দ্র কহিল, "অর্থাৎ ছিল ও একজন কবি, সেবার নিয়ে গেলাম ওখানে। মণিকে দেখে হয়ে গেল দার্শনিক! বিয়ে হলেই হয়ে যাবে বৈজ্ঞানিক!"

"সব তাতেই তোমার ঠাট্টা; যাও!"

"দেখ এই সতী সাধ্বী স্ত্রীগুলো সব বিষয়েই ভাল, তবে একটু বে-রসিক, এই যা দুঃখ! আগে শোনই না! মণিকে দেখিয়ে বললাম, দেখ ভেবে কেমন! চমকে উঠে বল্লে কি! যেন আমার কথা কানেই যায়নি। হাঁ করে অসভ্যের মত চেয়ে রইল। শেষে দেখে বল্লে, বেশ! আর কোন কথাই ওর জুটল না মুখে। সুন্দরের পক্ষে ওই না কি সবচেয়ে বড় বিশেষণ! সত্যিই ত, দেখলে ত আর চোখ ফেরান যায় না। প্রথম সংস্করণে দোষ-ত্রুটি যদিও বা একটু-আধটু আছে—দ্বিতীয় সংস্করণে একেবারে নির্ভুল!"

বলিয়াই নরেন্দ্র লীলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

লীলা কহিল, "বাবাকে আমি লিখেছিলাম, ছেলে দেখে বাবা মা দুজনারই বেশ পছন্দ হয়েছে। হ'লে বেশ মানাবে, না?"

নরেন্দ্র এবার রহস্য রাখিয়া বলিল, "ওকে রাজী করাই যে হবে শক্ত! যে খেয়ালী মানুষ! কি জানি, তোমার যে ভক্ত—"

বলিয়াই নরেন্দ্র আবার বক্র-দৃষ্টিতে লীলার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

লীলা বলিল, "ও-বেলা একবার ঠাকুরপোর ওখানে যেও না। একবার আসতে বল!"

স্বীকার করিয়া নরেন্দ্র রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেল।

বিকালে শ্যামবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্র লীলাকে জানাইল, সতীশ জমিদারী দেখিতে দেশে চলিয়া গিয়াছে, কবে ফিরিবে নিশ্চয়তা নাই।

ইহারই প্রায় মাস খানেক পরে একদিন সতীশ সহসা লীলার গৃহদ্বারে আসিয়া ডাকিল, "বৌদি"।

লীলা হর্ষোজ্জ্বল মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কে, ঠাকুরপো, আসুন, তবু ভাল এতদিন পরে বৌদির কথা মনে পড়েছে! জমিদারী বুঝি আর কেউ করে না। এ সত্যি সত্যি কাজের চাপ, না কোন কাজল চোখের সজল মায়া! কোনটিতে আটকে রেখেছিল এতদিন?"

সতীশ হাসিমুখে কহিল, "মহালের কাজ, বাকী পড়া খাজানা—প্রজাদের কান্নাকাটি—কত কি—"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই লীলা কহিল, "সে আমি জানি। কত কি ছেড়ে একটা কিছু নিয়ে ক'দিন থাকুন না!"

বলিয়াই লীলা একটু মৃদু হাসিল, পরে বলিতে লাগিল, "মালিক ছাড়া পথে পড়ে থাকা বস্তুগুলোর একটা অধিকারী দাবস্ত করে দিতে পারলে অযথা পদ্য লেখার হাত থেকে তবু কতক রেহাই পাওয়া যায়। দেশের পল্লীতেও ত লছমিয়া-দের অভাব নেই, ঠাকুরপো!"

তারপর একটু থামিয়া কহিল, "সে যাক্‌গে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

সতীশ বলিল, "নরেনের ডিস্‌পেনসারিতে গিয়েছিলাম বৌদি! সে বল্লে, ক'দিন নাকি আমার খোঁজ নিয়েছেন!"

লীলা কহিল, "তিন চারদিন আপনার ওখানে লোক পাঠিয়েছি। খুব দরকারী কটি কথা আমার শুনতে হবে ঠাকুরপো!"

সতীশ লীলার স্বরের গাম্ভীর্য অনুভব করিতে পারিয়া কহিল, "বলুন আমি শুনেছি—।"

লীলা কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই কহিল, "আমি আপনার বে'র সম্বন্ধ করতে চাই।—"

সবটুকু শুনিবার ধৈর্য বুঝি সতীশের হইল না। বলিয়া ফেলিল, "আমার ফুরসৎ নেই বৌদি"!

লীলা যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইল। কহিল, "সব কথাই অমন হাল্কাভাবে নেন কেন বলুন ত! আপনি ত আর ছেলে-মানুষ নন! পিতা পিতামহের সঞ্চয়ের পয়সা না হয় আপনি খেয়াল বশে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের জল-পিণ্ডটুকুর ব্যবস্থাও ত করতে হবে। তারপর বে যদি মানুষে নাই করবে তবে এই সৃষ্টিটা কি করে রক্ষা হবে তাই শুনি। আপনাদের স্বদেশী পাণ্ডারা যারা চিরকুমার থাকবার সুবিধাটুকু ভোগ করতে চান, তারা ত কেউ মাটি ফুঁড়ে বের হননি! আমি আপনার বে' দিতে চাই।"

সতীশ চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। লীলা কহিল, "আমি জানি আপনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না। তবুও চির-জীবনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করতে অতটা জুলুম করা আমার উচিত নয় ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।"

সতীশ ধীরভাবে কহিল, "বিয়ের ওপর আমার লোভ নেই বৌদি! দেশের ও দশের কাজে আমি হাত দিয়ে এইটুকু বুঝেছি যে, সংসার পেতে বসলে শুধু নিজের দিকেই চোখ পড়ে, পরের ভাল বড় বেশী কিছু করা যায় না। আমাদের এই পতিত ভারতের সেবার জন্য এমন কতকগুলি ত্যাগী কর্ম্মবীর চিরকুমার ব্রহ্মচারী চাই—যারা দেশের জন্য নিজেকে সঁপে দিতে পারে। দেশের ও দশের স্বার্থে নিজের ভোগ-বাসনাকে বিসর্জন দিতে পারে। ভগবান আমার দেহে বল দিয়েছেন, পিতা-পিতামহের সঞ্চিত অর্থ আছে—আমিও নিজে কিছু কিছু রোজগার করছি—আমার সমস্ত যদি আমি দেশের সেবায় বিলিয়ে দিই বৌদি, সে কি সংসার পেতে বসার চেয়ে বড় কাজ হবে না বৌদি! কত কাজ পড়ে রয়েছে! চেয়ে দেখবার মত চোখ যাদের আছে—তারা দেখতে পায়; নিজের নিয়ে ব্যস্ত থাকবার সময় আর দেশের নেই। ঐ যে অর্দ্ধভুক্ত—অভুক্ত নর-নারায়ণ—ওদের মুখে অন্নের গ্রাস তুলে দিতে হবে—ঐ যে বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধ-নগ্ন মাতৃজাতি নিজের লজ্জাটুকু ঢেকে রাখতে পারছে না, ওদের সামনে দু-একখানা কাপড় এগিয়ে ধরতে হবে।

কোটি মূক জনসাধারণের মুখে ভাষা ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন শোষণে দেশের রক্ত শুকিয়ে গেছে, এই বৈদেশিক শোষণের পথ রোধ করতে হবে। শ্রমিকের কৃষকের বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করা পয়সায় ধনিকের সিন্দুক ভরে উঠছে, আর ওরা খেতে পাচ্ছে না, তার একটা বিধিব্যবস্থা করতে হবে। অস্পৃশ্যতার দুষ্ট ক্ষতে হিন্দুর জাতীয় জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে, ওতে প্রলেপ দিতে হবে। মানুষকে মানুষের দাবী নিয়ে দাঁড়াতে শেখাতে হবে,—জগৎসভায় ভারতের স্থান করে নিতে হবে। এই ব্রতে দীক্ষা নিয়ে আমি চির-কুমার থাকতে চাই বৌদি!"

চুপ করিয়া লীলা সতীশের কথা শুনিল। পরে বলিল, "বে'থা করেও ত এ-সব করা যায় ঠাকুরপো! মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিতজী, দেশবন্ধু—এ'রা ত কেউ চির-কুমার নন! বরং উপযুক্ত স্ত্রী পেয়ে তাদের কাছ থেকে সাহায্যই ওঁরা পেয়েছেন। আপনি যে করুন, নিজের মত করে তাকে গড়ে তুলবেন। জীবন পথে সে আপনার সহায় হয়েই পাশে এসে দাঁড়াবে!"

সতীশ নীরব রহিল। সতীশের মৌনতা লক্ষ্য করিয়া সুর বদলাইয়া লীলা কহিল, "ও-সব বক্তৃতা শুনতে বেশ ভাল শোনায়, লোকেও বাহবা দেয়! দেশ উদ্ধারের নামে চির কৌমার্যের ব্রত, কংগ্রেসের নাম নিয়ে দেশের টাকা আত্মসাৎ করার দৃষ্টান্ত বাঙলা দেশে বিরল নয় ঠাকুরপো! আজকাল যুবতী কুমারীরা দেশের কাজে নেমে পড়েছে,—তারাও ত হুজুগ কেটে যাবার পর বিয়ে করছে অনেকে।"

সতীশ সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। লীলা বলিতে লাগিল, "আজকাল ঐ এক সুর উঠেছে, ঠাকুরপো—! বন্ধন-হীন মুক্ত জীবনই জীবনকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করবার উপায়। বিয়ে একটা বাঁধন। সংসারের নাগপাশে মেয়েদের মনুষ্যত্বকে বে'ধে ফেলে দস্তুর মত অপমান করা হচ্ছে; স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার! অবাধ মিলন প্রয়াসী মানুষের মন, বিয়ে তার স্বাধীন পথের কাঁটা—এই না আসল কথা ঠাকুরপো!"

এইবার সতীশ কহিল, "আমার ওপর অবিচার করছেন বৌদি!"

দৃঢ় স্বরে অথচ তাচ্ছিল্য ভরে লীলা কহিল, "মোহ যত মধুরই হোক তার মাধুর্য বেশী দিন থাকে না। মোহ কাটে, তাই পরকিয়া প্রীতি তখন আপনা থেকেই দূর হয়। সেদিনে স্বকীয় বস্তুর অভাবে বড় দুঃখই পেতে হয় ঠাকুরপো! সমাজের এই যে বন্ধন, একে ধর্মের বন্ধন বলে স্বীকার না হয় নাই করলেন, কিন্তু সমাজ জীবনে এর প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারবেন না। একের অবাধ স্বাধীনতা অন্যের স্বাভাবিক এবং সংগত অধিকারের ওপর যেখানে হাত দিতে কসুর করছে না সেখানে ধরা পড়ে যায় স্বাধীনতায় গলদ কোথায়!"

তারপর একটু থামিয়া লীলা কহিল, "আজ যে বড় বাঁধা পড়তে চান না, সে ত শুধু নূতনের মোহে। কিন্তু নূতনও চিরদিন কিছু নূতন থাকবে না। এক নূতন কয়েকদিন বে'চে থেকে অন্য নূতনকে তার নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। নবাগত নূতনের বেলায় কিন্তু [illegible] দেখাবে ঠাকুরপো! একান্ত অনিচ্ছায়ই হটে আসতে হবে পেছনে দিকে! কি যে অবস্থা হবে আপনাদের তখন। দেহ হবে খানিকটা অচল—বর্ণ হয়ে যাবে মলিন গায়ের চামড়া হয়ে পড়বে শ্রীহীন—ফিরে চাইবে না সে নবীনারা। প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতেই সাহস হবে না! নিজের পানে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে কান্না পাবে! পড়ন্ত বেলার অবসাদে একটু মৌখিক সহানুভূতি দেখাতেও কেউ আসবে না!"

সতীশ নীরবে শুনিতেছিল; বলিল, "আজ আপনার একতরফা আরগুমেন্টই শুনব বৌদি!"

"আজ না হয় তাই শুনে যান। দেখুন, প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানর চেয়ে নমিনেশনের চাকুরী কিন্তু অনেক জায়গায় ভাল হয় ঠাকুরপো!"

"ক্ষেত্র-বিশেষে তা যে হয় আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু তাতে গৌরবও নেই, আর তৃপ্তিও মেলে না। সে তর্ক আর আজ করব না। তর্ক আর জমে না বৌদি!"

সতীশের দিকে চাহিয়া লীলা কহিল, "কেন জমে না ঠাকুরপো?"

"তা জানিনে বৌদি, হয়ত আমি আর তেমন ছোটটি নেই।"

"আপনি মনে মনে বেশ জানেন তর্ক কেন আর জমছে না! কিন্তু বলবেন না। আমিও জানি বলবে না। একটি কথা আজ জিজ্ঞেস করছি ঠাকুরপো, আমাকে কেন আপনার এত ভাল লাগত?"

সতীশ কথা কহিল না। লীলা বলিতে লাগিল, "শুধু বন্ধুর বৌ বলে যে নয়; একথা আপনিও স্বীকার না করে পারবেন না। আমার শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য? তার পরিচয় ত পূর্বে পান নি! কি জন্য এত কাছে কাছে আসতেন? আমার একটু হাল্কা বন্ধুত্বের লোভে না একটু প্রশংসার জন্য, যাকে আপনারা বলেন, লেডিস এডমিরেশন! আজ আর আমায় সইতে পারছেন না। হেরে গেছেন আমার কাছে।"

সতীশ সহসা উঠিয়া লীলার পায়ের ধূলি লইয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন বৌদি!"

লীলা বাধা দিতে যাইতেছিল, পারিল না। কহিল, "পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেই এ অপরাধের ক্ষমা আমি করব না ঠাকুরপো! হাঁ, তবে পারি ক্ষমা করতে যদি এই দুষ্টু স্বভাবটা বদলায়!—রূপের পেছনে পেছনে আর ঘোরা-ফেরা না করেন!"

তারপর একটু থামিয়া লীলা কহিল, "ওগো, রূপের পূজারী, রূপের প্রতিমাই আপনার জন্য রেখেছি। আমার চেয়েও যে রূপসী তাকেই দিতে চাই! আমার বোন মণিকে দেখেছেন ত! আপনি তৈরী হন্ যেয়ে, আসছে মাসেই—"

"আসছে মাসেই"—? সতীশ কি বলিতে যাইতেছিল। বাধা দিয়া লীলা কহিল, "হাঁ আসছে মাসেই! আমি আজই বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। এ আমার অনুরোধ নয় আদেশ!"

তবুও সতীশ চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া লীলা ধীরভাবে কতক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপর কহিল, "আচ্ছা বেশ, মণির আমার [illegible] হবে না!"

বিরক্তিভরে লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

সতীশ পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া বলিল, "আমার দুর্বলতা কোথায় জানেন বলেই গালও দিচ্ছেন—আবার রাগ করে চলেও যাচ্ছেন। মেয়েদের এই-ই স্বভাব! পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই! আমার ওপর রাগ করবার পূর্বে এইটুকু জেনে যান বৌদি, বিজয়-মাল্যের অধিকারিণী শুধু আপনি একা নন। আমাকে পরাজিত করতে যেয়ে নিজের পরাজয়কে লুকোতে পাচ্ছেন না!"

লীলা ফিরিয়া আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল। বলিল, "তার মানে?"

"ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন!"

"ভেবে দেখতে চাইনে। আমার পরাজয়ের তত্ত্বটা আপনার মুখেই শুনতে চাই—[illegible]।"

হাসিয়া সতীশ বলিল, "কথার [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু তার বিউটি নষ্ট হয়ে যায় বৌদি! কি হবে আর ও সব জয়-পরাজয়ের কথায়! পরাজয় যখন আমার লোকসানে দাঁড়ায় নি, ওতে লজ্জার চেয়ে আমার গৌরবই বেশী। এতদিন মুক্তির মাঝে বন্ধনের কামনা করেছি,—এখন থেকে বন্ধনই না হয় আমার মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে। আপনার আঘাত দিয়ে কথা বলা আর সইতে পারছি নে বৌদি! [illegible] হলে অন্তত খোঁচা খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাব। আজ একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছিনে। যাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে ভাবতেন, রূপের পূজারী বলে যাকে এত অখ্যাতি করতেন—এখনও করেন, বিশ্বাস করেন না এতটুকুও, স্নেহ করেন বলেই না হয় ফেলতে পারেন না, তার হাতে নিজের বোনটিকে তুলে দিতে চান কি বলে?"

লীলা কথা কহিল না। সতীশ বলিতে লাগিল, "আমার প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা আছে, কিন্তু বলতে পারছেন না। বলবার জন্য আমি জেদও করছি নে। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, ঐ জায়গাই আপনার পরাজয় আর আমি জয়ী। মনে পড়ে বৌদি, একদিন আমায় সইতে পারেন নি? সে-দিন আমার হাসি পেয়েছিল, আজও মনে মনে এই ভেবে হাসি পাচ্ছে যে, তাকেই আবার মায়ের স্নেহে বোনের মমতায় এত সেবা করলেন! তা না হয় নারী জাতির মাতৃত্বের একটা দিক! কিন্তু আজকের এই দান তাও কি বলবেন আমারই পরাজয়!"

লীলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কথা কহিল না।

সতীশ কহিল, "আশীর্বাদ করুন দিদি, ঘরের মায়ায় যেন বাইরের ডাক ভুলে না যাই। সে যেন আমার চলার পথে উৎসাহই দেয়, পিছু না ডাকে। যে বিশীর্ণ মাতৃমূর্তি ভারতের কোটি কোটি নর-নারায়ণের অর্ধ উপবাসী মুখ আমাকে পাগল করেছে—সে মূর্তি, সে মুখ যেন আমার ভোগের পথের সামনে এসে দাঁড়ায়। কবি বলে আমায় একদিন ঠাট্টা করতেন—যদি সত্যিই কোনদিন কিছু আমার কলম থেকে বেরয়—তা যেন মৃত-জাতির প্রাণে শক্তিসঞ্চার করে—জাতিকে শুধু হাল্কা প্রেমের গানে দুর্বল করে না ফেলে।"

বলিতে বলিতে সতীশ লীলার পায়ে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিল। লীলা কোনই আপত্তি করিল না। কোমল কর-পল্লব সতীশের মাথায় রাখিয়া মনে মনে যেন কি আশীর্বাদ করিল। (ক্রমশ)

মিসিসিপির বুকে

(৭১৭ পৃষ্ঠার পর)

কেন না তা হলে নিজের খরচে খেতে হবে, ষ্টিমারে গেলে পকেটের পয়সা খরচ করে খেতে হবে না। এ সব হুটির পাইলটরা কাজেও আসে খুব ষ্টিমারটির পাইলটের কাছে, কেননা তারা সব সময়েই যে কোন রকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিশেষ করে তাদের অভ্যর্থনা করে নেওয়া হত এজন্য যে, প্রত্যেক পাকা পাইলটই বহুভাষী—কথা বল্‌তে তাদের অবসাদ নেই একটানা দশ-বার ঘণ্টা অবধি। এক-সঙ্গে জড়ো হ'লে তারা নদীপথের কথা ছাড়া অন্য কোন বার্তা তোলে না, তাই যেমন তা হয় সবার পক্ষে বোধগম্য, তেমনি আকর্ষণযোগ্য, বাস্তব যে আড়কাটি, সে সারা দুনিয়ায় এ নদীটি ভিন্ন অন্য কিছু গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না আর তার পেশার গর্ব রাজার রাজত্ব-গর্বেরও ঢের ওপরে!

ঝানু পাইলটেরা বলাবলি করতে লাগল কে কোথায় কি কৃতিত্ব করেছে—কে কখন অসাধ্য সাধন করেছে ৩ ঘণ্টার পথ দেড় ঘণ্টায় পার হয়ে। এমন একটা নিবিড় আত্মনির্ভরতা ও অশেষ নিপুণতার ছাপ তাদের চোখে-মুখে এবং এমন চরম বিলাসিতা তাদের পোষাকে আষাকে মায় হীরের আংটি হীরের ব্রেষ্ট পিন্‌সহ যে, আমি যেন তাদের কাছে নগণ্য কেঁচো বনে গেলাম। তাদের সে মহা-মহা রথীর দরবারে আমি একেবারে মূল্যহীন শূন্যে পরিণত। মনমরা হয়ে গেলাম—একদিন ওদের সমান বনে যাবার সকল আশা আমায় পরিহার করে চলে গেল। আমার ভাবনা হ'ল—ওদের মত আঁধার রাতে নদীর ক্ষুদ্র বাঁকটি পর্যন্ত কোনদিন ঠাউরে নিতে আমার শক্তিতে আদপেই কুলিয়ে উঠবে কিনা।

আরো তাক্ লেগে গেল, যখন সন্ধ্যাবেলা মিঃ বিক্‌সবি বড় বেলটার ঢং ঢং করে তিনবার বাজিয়ে দিলে—এ হ'ল ডাঙায় নিয়ে ষ্টিমার ভিড়াবার আদেশের সঙ্কেত। ঘণ্টা বাজবার [illegible] [illegible] কাপ্তেন নীচের ডেক থেকে মুখ বাড়িয়ে পাইলট-কক্ষের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসুনেত্রে। মিঃ বিক্‌সবি বল্‌লে—আমরা এখানে সারারাত কাটাব, কাপ্তেন।

—আচ্ছা স্যার।

ব্যস, আর দ্বিতীয় কথাটি নেই। ষ্টিমার অমনি তীরে ভিড়ে নোঙর করল, রাতের তরে লোহার শেকল বাঁধা হ'ল ডাঙার খুঁটার সঙ্গে। পাইলটের পদের কি অপরিসীম মর্যাদা—যা খুশী সে করবে—কাপ্তেনের মত একটা জাঁদরেল অফিসারও তার হুকুমে চলবে। ভরপুর আশা আমার বুকটাকে উঁচিয়ে দিলে দশ হাত। আমার শিক্ষানবীশী জীবনে এই প্রথম একটা শান্তিপূর্ণ রাত কাটালাম—রাতের পাহারার তিক্ত অভিজ্ঞতা—দ্বিপ্রহর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তিকর উদ্বেগ হতে পুরোপুরি রেহাই পেয়ে। (ক্রমশ)

লণ্ডন

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস
(ভ্রমণ-কাহিনী)

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

পহেলা জুন বেলা সাড়ে সাতটার সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ?" যে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে ছিল মুফতি পোষাকে। সে বল্‌ল, ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভিতরে যেতে কোন কষ্ট নাই। সামনেই লেখা রয়েছে "Enquiry". একজন অফিসার তথায় কতকগুলি ছোট বই গুনছিল, তাকে তার গুন্‌তিতে বাধা দিয়ে বল্‌লাম, I say, is it Scotland Yard ? লোকটি মাথা তুলে বল্‌লে, "Though it is, but just opposite, next door sir." মনে একটু স্ফুর্তি এল, 'Sir' বলে আমার মত একটা কালো লোককেও এরা বলে এবং বল্‌তে অপমান বোধ করে না। আমার সঙ্গে এক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, তাকে বল্‌লাম, এই প্রকাণ্ড দালানটাই হল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, আমাকে যেতে হবে, ঐ দরজাটাতে, আপনি এখানেই দাঁড়ান তবে। তিনি বল্‌লেন, "যান আমি দাঁড়িয়ে আছি।" এবার আর দরজায় টোকা দিতে হল না, একদম ঘরে গিয়ে হাজির। একজন অফিসার বল্‌ল, "Look at the door Sir, দেখ্‌লাম তাতে লেখা রয়েছে, "Strictly Private." আমি বললাম, তবে কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করতে হয় ? আমার সঙ্গে আসুন মশাই, দেখিয়ে দিচ্ছি; বলেই ডানদিকের দরজায় আঘাত করল এবং দরজাটা খুলে গেল। আমি অফিসারের সঙ্গে গিয়ে তথায় প্রবেশ করলাম। একজন অফিসার তথায় বসেছিলেন, "তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "What can I do for you Sir ?" আমি বল্‌লাম, "You can do a lot for me Mister." তারপর আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে লোকটির মুখ একটু শুকিয়ে গেল, তারপরই একটু গলা ঝেড়ে বল্‌ল, "Sit down Sir, Please excuse me Sir, Few minutes Sir, I think you won't mind Sir," আমার মন একেবারে গলে গেল।

যারা এত বড় একটা সাম্রাজ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, অন্তত তাদের কথাবার্তায় ত বুঝা যায় না যে, তারা খারাপ লোক। অতি সভ্য আদব-কায়দা, তার উপর আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস ও মর্যাদা—এই গুণগুলোই চোখে পড়লো আগে।

অফিসার ফিরে এসে আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। তথায় একজন অফিসার কি কথা বল্‌ছিলেন এবং একখানা কাগজের বিনিময়ে টাকা নিচ্ছিলেন। তা ও দেখবার মতই। এত বড় একটা অফিসার, তিনি তাঁর নীচের কর্মচারীর সঙ্গে বেশ সমতাই দেখাচ্ছিলেন, এমন কি অন্যলোক হলে বুঝ্‌তে পারত না, এদের মাঝে পদবীর কোন পার্থক্য আছে কিনা। অফিসারের কাগজ বিক্রী হয়ে গেলে আমার কাছে প্রথম ক্ষমা চেয়ে বল্‌লেন, "I will certainly give my autograph Sir and am very happy to meet a world tourist." তারপর বইটা হাত হতে নিয়ে অটোগ্রাফ দিলেন এবং তাতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সিল মেরে দিয়ে, আমার সঙ্গে করমর্দন করে গেটের বাহির পর্যন্ত এসে ফের "গুড-বাই" করলেন।

বাইরে এসে নীরবে পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম। বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে কোন কথা বল্‌লাম না। ভাবতে লাগ্‌লাম অনেক কথা। বিশেষ করে লর্ড সিংহ রোডের কথা। তথায়ও গিয়েছিলাম। ইচ্ছা করে যাই নাই, ডেকে পাঠান হয়েছিল। শরীর দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মাঝেই ঘাম বের হয়েছিল। মুখ মলিন হয়েছিল, মাথায় কোন চিন্তাশক্তি ছিল না। তথায় কজন বৃটিশ কাজ করে? সবাই ত বাঙালী। বাঙালী হয়ে বাঙালীর সঙ্গে কি ভালভাবে কথাও বল্‌তে পারে না ? ভালভাবে কথা বলা, ভদ্রভাবে কথা বলা কি অন্যায় ? আমি লণ্ডনের পথের ধূলা এখন আর সহ্য করতে পারি না কেন পারি না তাই বল্‌ছি। উন্মুক্ত বনে-জঙ্গলে কাটিয়ে মনের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, শরীরেও তেমনি হয়েছে। এই ঠাণ্ডার মাঝেও দরজা খুলে শুতে হয়, কারণ আমি মুক্ত বাতাসে শুতে চাই নতুবা ঘুম আসে না। পৃথিবীর যথায় যাই না কেন আমার মন রয়েছে আমার বঙ্গভূমির উপর, ফিরে যেতে হবেই, কিন্তু তথায় গিয়ে যদি আবার ঐ মুখী হতে হয়, অর্থাৎ লর্ড সিংহ রোডের দিকে, তবে হয়ত বাঁচব না কারণ কোথায় সেই মুক্ত বাতাস, কোথায় সেই বন্য মুখ। তাই ভয় হয় কথা বল্‌তে। তারপর যাদের আত্মসম্মান নাই, তারা কিন্তু artificial সম্মানকে পছন্দ করে। যারা artificial সম্মানকে পছন্দ করে তারা অমানুষ, তারা না করতে পারে এমন কাজ নাই, অতএব ভয়। আফ্রিকার জঙ্গলের সাপ, বাঘ, সিংহ, বন্য বৃক্ষ, গুপ্ত পোকা এদের ভয় করি নাই, মরতে মোটেই ভয় হয় না, কিন্তু যাদের আত্ম-সম্মান নাই, তাদের কাছে যেতে আমার ভয় হয়, কেন সেই ভয়, তার কারণ কি ? এসব কথার উত্তর আছে, তবে এখানে আর বলে দরকার নাই।

গাওয়ার ষ্ট্রীট

১১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীট হল ভারতীয় ছাত্রদের আড্ডা। তবে সকল ছাত্রের নয়, যাদের টাকার জোর আছে তাদেরই মাত্র। আমার টাকার জোর নাই বটে, তবে বাচালতার জোর আছে। আই-সি-এস, আই-এম-এস, বার-এট-ল যে-ই হউন না কেন আমার সঙ্গে উচ্চবাচ্য বড় করেন না। তার একমাত্র কারণ হল, আমি কিছুটা এদুনিয়ার দেখেছি। বিদ্যা এবং টাকা, এদুটা অপরিহার্য হলেও অতি ছোট জিনিষ। যাদের স্বাধীনতা আছে, বিদ্যা এবং টাকা নাই, তাদের এর চেয়েও বড় কিছু আছে। যখনই কোন ইংরেজ কুলি বলে "Oh, you come from our colony", তখন মুখ থাকে কোথায় ?

এবার এখানে আসার পরই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি হলেন মৌলানা হাসরত মোহানী। তাঁর বক্তৃতা শুনলাম, তাঁর উপদেশ শুনলাম, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মতালিকা শুনলাম। সকল কথার সেরা কথা শুনলাম কেন 'সদ্ভাব

বসু" কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। এখানে সুভাষ বসুর নামের পেছনে এবং নামের আগে কোন বিশেষণ আমি লিখলাম না, তার একমাত্র কারণ হ'ল বৈদেশিক কোন সংবাদপত্র তা ব্যবহার করে না। ইটালীয়ান, জার্মান, মিশরীয়, তুরস্ক, এই চার শ্রেণীর সংবাদপত্রে সুভাষ বসুর নাম এবং চিত্র আমি দেখেছি, তারাও তাঁর নামের আগে কিম্বা পিছে কিছুই দেয় নাই, তাই আমিও দিলাম না। এ সম্বন্ধে ভাল করলাম কি মন্দ করলাম তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারি নাই।

যা হোক মৌলানা সাহেব বেশ ভাল করেই সুভাষ বসুর নাম বিক্রি করছেন এবং অনেক সময় বলে থাকেন ঐ লোকটাই হ'ল এখন ভারতের একমাত্র খাঁটি লোক। মৌলানা সাহেব আরও বলেছেন, তিনি সোশিয়্যালিষ্ট পার্টি করবেন এবং ঐ পার্টি ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আর কেউ আনতে পারবে না। তাঁর বক্তৃতা শোনার পর মনে হ'ল—যে লোকটা ছয়বার জেলে গেছে, তার মাথায় এখন সেই শিখাধারী লাল টুপি কেন ? আর মুখে লম্বা দাড়ি কেন ? আবার এই লোকটাই বলতে চায় সোশিয়্যালিষ্ট পার্টি করবে ? তারপর ঐ লোকটির নাম অনেক শুনেছি। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাননীয় মৌলানা সাহেব, তবে আপনি মুসলিম ধর্মের যে কলমা নিয়েছিলেন তার হবে কি? সোশিয়ালিজম ত এ-সকল প্রশ্রয় দেয় না!" মৌলানার অন্তরে যাই থাক না কেন, বাইরে বলতে হ'ল, তিনি ধর্ম মেনে, ধর্মের মাঝ দিয়েই সোশিয়্যালিজম চালাবেন। আমি বললাম তবে আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে লাভ নাই, তারাও খারাপ করছে না। মৌলানা হেসে বললেন, কংগ্রেস, কৃষাণ এবং মজুরের দিকে যেমন তাকায় না, প্রজা পার্টিও তেমনি কিছুই করে না। এসকলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে কৃষক এবং মজুর দলের লোকই পরবর্তী নির্বাচনে যদি জয়যুক্ত হয়, তবে দেশের ও দশের উন্নতি হবে। হয়ত সুভাষ বসুর মত লোক যদি এই দলের নেতা হন দেশ বিদেশের লোক সুখী হবে। বাস্তবিকই লণ্ডনের নিকটস্থ প্রাচ্য দেশের লোক বুঝতে পারে না, কেন সুভাষ বসু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদবী হতে বিদায় নিয়েছেন। তবে এদেশের মজুর দলের লোক বলতে চায় কংগ্রেস ধনীদের মুখপাত্র। কি জানি দেশের লোকই তা ভাল করে অবগত আছেন। ১৮।৫।৩৯ তারিখে বিস্কে সাগরে বেসেল লাইনের জাহাজী দৈনিকে দেখলাম সুভাষ বসু একটি এন্‌টি-ইম্‌পেরিয়েলিষ্ট পার্টি করেছেন এবং তাও কংগ্রেসের ভিতর থেকে কাজ চালাবেন। এ-সকল বেতারবার্তাও সুভাষ বসুর নামের পূর্বে মিষ্টার লিখে না।

লড়াই বাধবে কি ?

লড়াইয়ের কথা আশ্চর্যজনক। এই কথা সর্বত্র অনবরত হয়ে থাকে! এইত গতকল্য একটা সাবমেরিন ডুবে গেছে, তার কথাই লোকে বলছে বেশী। এসব বলা-কহার মানে আর কিছুই নয়, একটা মরণাত্মক রোগ বৃটেনে এসেছে। এই রোগ এসেছিল ইহুদীদের মাঝে, সে রোগ এখনও তাদের যায় নাই বলেই সকলের লাথি খেয়ে মরছে। এই রোগটা হিন্দুদের মাঝেও এসেছিল, কিন্তু অনেকটা সারতে বসেছে। রোগটা বড়ই মারাত্মক কিনা, তাই এই রোগের অবসান হলেও হিন্দুদের শরীর সবল করতে অনেকদিন লাগবে। কিন্তু আমাদের মনিবদের এই রোগটা বড় রকমেই আক্রমণ করেছে। এরূপে বিকারগ্রস্ত বললেও দোষ হয় না। কৈ ইটালি, জার্মানী, জাপান, রুশিয়া, চীন এমন কি স্পেন পর্যন্ত মরণাত্মক রোগে ভুগছে না!

গতকল্য অর্থাৎ শুক্রবার, ২।৬।৩৯ তারিখে হাইড পার্কে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। কাশীধামে গঙ্গাতীরে যেমন কথকরা বসে কথা বলে আর লোক যার যথায় ভাল লাগে তথায়ই বসে শুনে, এখানেও তাই। বাগানটা পেছন করে বক্তারা একটু একটু দূরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

একজন বলছিলেন সেপ্টেম্বরের আসন্ন-বিপদের সময় চেম্বারলেন বাড়ীতে ফিরে এসে চীৎকার করে বলতে লাগলেন এক টুকরা কাগজ দেখিয়ে, "I have got it, I have got it" আর জার্মানে হিটলার কি করলেন? বক্তার হাতে একটা সংবাদপত্র ছিল তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "হিটলার করল এই"। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নিল। কেন করতে পারল, "বৃটেনের লোকের মাঝে মরণাত্মক রোগের এপিডেমিক এসেছে, তাতে সকলেই সন্নিপাতগ্রস্ত হয়েছে।"। পেছন থেকে একটা লোক বক্তার কাছে গিয়ে ধীরে বলছিল, "You war monger, keep quite." কিন্তু বক্তা তাতে কান দেন নি।

ছোট বেলায় যখন গল্প শুনতাম রাজা পালিয়ে গিয়ে চোর-কুঠরীতে বসে রইল/ কেউ তাকে খুঁজে পায় নাই। লণ্ডনে এইরূপ চোরকুঠরী তৈরী হচ্ছে এবং সংগে সঙ্গেই তা বিক্রি হচ্ছে। মরণ বড় বালাই, কেউ মরতে চায় না। তবে এটা ঠিক কথা, স্পেন একটু ঠিক হয়ে গেলেই, ইটালী একটা থাবা মারবে, সে থাবা কোন দিকে গিয়ে পড়ে কে জানে। হয়ত জার্মানীও থাবা মারতে পারে, তবে কার উপর সেই থাবা পড়বে, নানা লোক এখন থেকেই নানা কথা বলছে। তবে একটা বড় কথার এখনও অবসান হয় নাই সেই বড় কথা হল রুশিয়া। রুশিয়ায় যাব যাব ভাবছিলাম কিন্তু আমেরিকা আমাকে টানছে, সেদিকেই যেতে হবে।

রুশিয়া

রুশিয়ার বর্তমান অবস্থা হওয়ার কারণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। রুশিয়ার বিরুদ্ধে কত কথাই শুনেছি, এখনও শুনেছি, তবে বর্তমানে লণ্ডনে দু-একটা রুশিয়ান দেখা যায় এবং তারা জিজ্ঞাসুকে জবাবও দেয়। ভারতের বর্তমান অবস্থা যা, রুশিয়ারও ঠিক সেই অবস্থা ছিল যখন বিদ্রোহ হয়েছিল। মৌলানা হসরত মোহানীর বক্তৃতা শোনবার জন্য একটা লাল রাশিয়ানকে আমি আমার আপন খরচায় নিয়ে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ যাওয়া আসার ট্রাম ভাড়া দিতে হয়েছে। মোট খরচ আট পেনি।

হসরত মোহানী যখন বলছিলেন, হিন্দু তুমি হিন্দু হয়ে থাক, মুসলিমকে মুসলিম থাকতে দাও। এই কথা শুনে লোকটা হেসে বলল, হয়ত এখন মুসলিম হিন্দুকে হিন্দু ধর্ম আর ত্যাগ করতে দিবে না, মুসলিম ধর্মও মরতে আর থাকতে দিবে না। কারণ সামনে তার সাম্যবাদ, যে কিছুই মানে না

লণ্ডনের শিল্পগুলি প্রায়ই সাম্যবাদী কিনা, তাই এখানে সকলেই এসে বলেন, হিন্দু, তুমি হিন্দু ধর্মকে আঁকড়িয়ে ধর, একটু অগ্রসর হলেই মারা পড়বে। তারপর এখানকার হিন্দু মুসলিম হতে একটু উঁচু স্তরের সভ্য। তার অখাদ্য বলতে কিছু নাই, যাহা হজম করতে পারে তাই তার খাদ্য। এখানকার হিন্দুরা হিন্দু নাম বদলিয়ে কাজ হাসিল করে, ফের আপন নাম গ্রহণ করে, কারণ যার ধর্ম কিছুতেই বিগড়ায় না তার ডিগবাজী খেলে দোষ কি? ঝেড়ে ফেললেই সকল বালি দূর হয়ে যায়। তাই এই ভড়ং দেখান হয়, হিন্দু তুমি গো-মাংস খেওনা, শূকর-মাংস খেওনা, খেলে তোমার জাত যাবে। কিন্তু বর্তমানের গোঁড়া হিন্দু সেদিকে কান দেয় না, বলে, আমার ধর্মে লেখা আছে—যা খেলে শরীরের স্বাস্থ্য অটুট থাকে তাই আমার খাদ্য। হয়ত দেশের বেকুব হিন্দু তা মানেন না, কিন্তু বিদেশ-ফেরতা যেই হউন না কেন তাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, বিদেশে কি করে গেছেন।

এখন আসল কথায় আসতে চাই। রুশিয়ার লোক আপন আপন ভাইদেরে হত্যা করে তারপর বিদ্রোহে কৃতকার্য হয়েছে। ধনের প্রতি লিপ্সা কার নাই? সেই লালসা যে ত্যাগ না করেছে তাকেই হত্যা করেছে। কাজ না করে উদরপূর্তির কার না ইচ্ছা রয়েছে? সেই বাক্যবাগীশ, ধর্মবীরকে কাজে লাগান হয়েছে নয়ত পৃথিবী হতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে এসেছে সাম্যবাদ। রুশিয়ায় এখনও সাম্যবাদ কায়েম হয় নাই, বিনা কাজে অনেকেই টাকা রোজগার করতে চায়, তাই মাঝে মাঝে খুন, জেলের ব্যবস্থা হয়, আর বৃটিশ প্রপেগেণ্ডাকারী তাই ভারতের দরজায় নিয়ে হাজির করে আরও কিছু বাড়িয়ে নয়ত বিক্রয় করে। কিন্তু বিপদ বড় বালাই। ইংরেজকে মরণাত্মক রোগ ভয়ানক আক্রমণ করেছে। এ-রোগের ঔষধ রুশিয়ার কাছেই আছে, অন্যের কাছে নাই। তাই নেতারা মস্কো যাবার বন্দোবস্ত করছেন ঔষধ আনতে।

এদিকে রুশিয়াও হয়ত ঔষধ দিতে রাজি হবে। আমার ভবিষ্যৎ-বাণী হল যেদিন রুশিয়া এবং ইংরেজের মাঝে সন্ধি হয়ে যাবে সেদিন হতেই জাপান চীন হতে ঘরমুখী হবে। এটা নিতান্ত সত্য কথা যে, ইংরেজের ইঙ্গিতেই জাপান চীনকে আক্রমণ করেছিল, যেদিন জেনারেল চিয়াং-কাইশেক, চাং-সুয়া-লিয়াং-এর সঙ্গে দশ পয়েণ্টে সন্ধি করেন। কেন এমন করে লেলিয়ে দেওয়া হয়। তার মানে হল "যা শত্রু পরে পরে।" কিন্তু শত্রু যে আপন ঘাড়ে এসে পড়বে তা তখনকার বৃদ্ধ বলড়ুইন জানতেন না, এখনই অনেকটা এসে পড়েছে। হংকঙের কাছে আর জাহাজ আসতে দেয় না। তারপর রুশিয়ার পোষ্যপুত্র তুর্কির ঘাড়ে হাত দিবার বন্দোবস্ত করেছে ইটালী। এমন বন্দোবস্ত করে রেখেছে ইটালী যে, তিন ঘণ্টার মাঝে গিয়ে স্মার্ণা পৌঁছাবে কোনও ওজুহাতে। এই পোষ্যপুত্রকে যদি রুশিয়ার বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে ইংরেজের সঙ্গে একটা কিছু রফা করা চাই, কিন্তু সেই রফা করা হবে, যদি ইংরেজ বলে যে, জাপানের সঙ্গে ইংরেজ আর মিতালী রাখবে না। অন্যথায় রুশিয়া কখনও ইংরেজের সঙ্গে মিশবে না। যদি ইটালী তুর্কি আক্রমণ করে, তবে ইটালী, জার্মানী, জাপান একদিকে, আরএকদিকে রুশিয়া, তুর্কি, পারস্য এবং আফগানিস্তান। তার বন্দোবস্ত অনেকদিন পূর্বেই হয়েছে এবং যারা বুনো সাম্রাজ্যবাদী তারাও অবগত আছেন, আমি সত্য কি মিথ্যা বলছি। কিন্তু রুশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের মিতালী করতে হলে, বাল্টিক—বাল্টিক বলে চীৎকার করে জগতকে শুনালে চলবে না, যারা ব্রিটিশ প্রপেগেণ্ডা বুঝে না, তারা হয়ত মনে করে ঠিকইত, লাটভিয়া এবং লিথুয়েনিয়ার তবে কি হবে? জার্মানী মেমেল চেয়েছিল পেয়ে গেছে, আর কিছু চায় না। তবে এই বাজে কথা বলে লাভ কি? বল মুক্ত গলায় চীনকে ইংরেজ কম্যুনিষ্ট হতে দেখতে চায় না। যদি না চাও তবে রুশিয়াও দলে ভিড়বে না। মরণাতঙ্ক রোগে মরতে হবে। একে একে অনেক ছোট ছোট দেশকে ইটালী এবং জার্মানী দখল করবে। আর [illegible] আর কাঁদতে হবে।

তুমি কে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ছিলাম ত
চিরকেলে অশান্ত
রোদ্দুরে ঝলোমলো সারাবেলা,
হঠাৎ ছড়িয়ে যাবে মেঘেদের এ নসী মেলা
কে জানত!
তুমি কে যে
আজি এই দিন শেষে
বন্ধন-চঞ্চল তৃষ্ণায়
সঙ্গোপে কায়া নিয়ে ঘূর্ণিত ঝঞ্ঝার,
এলে সেজে।

কিন্তু এ
জীবন ত সিন্ধু যে!
এনেছ কি মন্দর বিধাতার—
পাত্র যে ভরে নিতে চাইছ গড়ে সুধার
বিন্দুতে?

(গল্প)

শ্রীঅজিতকুমার রায় চৌধুরী

অবশেষে মীরা কেঁদে ফেল্‌ল। আর কাঁদবেই বা না কেন ? যে জ্বালায় ওর দাদা ননী ওকে জ্বালায়। বাবা যতক্ষণ বাড়ী থাকেন ততক্ষণ মীরা যে মার কাছে নালিশ করবে ওর নামে তারও উপায় নেই। বাবা কি ভালবাসাটাই না বাসেন ননীকে। বাবা আফিস গেলে ননীর হয় অসুবিধা, বিশেষত ছুটীর মাসটা। দুপুরে মীরা যদি একবার মার কাছে নালিশ করে, বাস্—আর রক্ষে নেই। মা অমনি মারতে সুরু করেন ননীকে। মীরার এক একবার মনে হয় এবার থেকে জন্মের মত আড়ি করে দেবে ননীর সঙ্গে। সাত জন্মেও আর কথা বল্‌বে না। ওকে আবার দাদা বলবে, ভারি ত এক বছর নয় মাসের বড়।

সেদিন সকালে উঠেই লেগে গেল ঝগড়া, কারণটা অবশ্য মীরা ননীর কাছে সামান্য নয়। মীরা প্রশ্ন করলে ননীকে, 'আচ্ছা বল্‌ত, বাবা বড় না মা বড়।'

ননী বললে, 'বাবা বড়।'

'দূর, মা বড়, দেখিস্ না মা যা বলে বাবা তাই করে। বড়কেই লোকে মানে।'

'আমি তো তোর চেয়ে বড়, তবে আমায় মানিস্ না কেন ?'

'বড় না ছাই, আম না মাপ মাথার। ওকি, বুড়ো আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়েছিস্ কেন ?'

'ভর দিয়েছি ? দেখ্‌না, ছোট বলে কি মিথ্যে কথা বলতে নেই ?'

'ঐ ত, নামা না, সিধে হয়ে দাঁড়া দেখি।'

'এই তো দাঁড়িয়েছি, আবার কেমন করে দাঁড়াতে হয়রে, মুখপুড়ী।'

'মুখপুড়ী ? দাঁড়াও না বাবা আফিস্ যাক, মাকে যদি না বলে দিই, তবে আমার নাম নেই। মা না তোকে মুখপুড়ী বল্‌তে বারণ করেছে।'

'বাবা না তোকে ননী বল্‌তে বারণ করেছে। মাকে বল্‌গে যা না, এই ত হেরে গেলি, হেরে গেলেই ত লোকে নালিশ করে, আর ছোটরাই ত হারে।'

মীরার আর সহ্য হ'ল না। ননীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, চোখমুখ ওর জ্বলছে। ননীরও পুরুষত্বে ঘা লাগল, মারল প্রাণপণ শক্তিতে এক চড়, ফলে মীরা ফেল্‌ল কেঁদে। ইচ্ছে করেই কান্নার সুর আস্তে আস্তে চড়িয়ে তুল্‌ল, ননী ঘর ছেড়ে পালাল।

'মীরা, কাঁদছিস্ কেন ? ননেটা মেরেছে বুঝি ?' মীরার মা সীমা ঘরে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গেই মীরা উঠ্‌ল প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে।

[illegible] এক্ষুণি উনি এসে যদি দেখেন কাঁদছিস্, তবে তোকেই [illegible]। ছেলেটাকে তো আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন। কাঁদিস্‌নে, উনি আফিস্ গেলে আচ্ছা করে বকে দেব।'

এই সহজে [illegible] মেয়ে মীরা নয়। সীমা বিকেলে দু'পয়সার চকোলেট আর এক পয়সার চিনা বাদামের লোভ দেখিয়ে তবে তাকে শান্ত করল।

মীরার চীৎকার শুনেই ননী ঘর ছেড়ে একদম তার বাবার কাছে গিয়ে হাজির। ননীর আশ্রয় স্থল এই জায়গায় আর মীরার মায়ের আঁচল তলায়। অসীম তখন সকালের খবরের কাগজ পড়ছিল, ননীকে দেখে বল্‌ল, 'কি ননী, হাঁপাচ্ছিস্ কেন ?'

'দৌড়ে পালিয়ে এলেম বাবা, মীরা এ্যায়সা কাঁদ্‌ছে, আবার মা গিয়ে সে ঘরে হাজির, আমায় দেখ্‌তে পেলে আর রক্ষে ছিল না।'

'কি হচ্ছিল আবার মায়ের নামে। বেশ ছেলে তৈরী করেছ বা হোক্, ছেলে যেন মায়ের নামে নালিশ করতে পেলে আর কিছুই চায় না। এই দেখ না, সকালে উঠেই মেয়েটাকে মারধর সুরু করেছে, আর কিছু যদি বলি, অমনি সাতখানা করে তোমার কাছে লাগাবে।'

'তোকে কিছু বলেছি ? জান্‌লে বাবা, ও বলে কিনা বাবা মার চেয়ে ছোট। যেই হেরে গেল তর্ক করে, অমনি আমাকে কামড়ে খিম্‌চে—একাকার। আমি তোকে মেরেছি ?

মারিস্‌নি, এমন চড় মেরেছে, মা শুদ্দ দেখেছে কাঁদতে।'

'ওকি, ভাল করে কথা বল্‌তে শেখনি, মারিস্‌নি কি ? বড় ভাইকে তুই বল্‌তে হয় ? আপনি, না হয় তুমি বলবে। কই দেখি, তোমার কোথায় মেরেছে ?'

'ওই তোমার দোষ, ছেলের নামে কিছু নালিশ করতে এলেই তুমি ওকেই আগে [illegible]। মেয়েটা যে তোমার কি চক্ষুশূলেই হয়েছে তা জানিনে। ভাবছ, মেয়ে পার করতে অনেক টাকা লাগ্‌বে, আর ছেলেকে এখন আদর যত্ন করলে বুড়ো বয়সে সে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে। ঈস্, তা আর হয় না। যে ছেলে তোমার, ও যদি তখন মুখও দেখে।' অভিমানে সীমার গলাটা ধরে গেল, চোখ দুটো জলে ভিজে এল, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'ল।

'মুখ নাই দেখলে, কিন্তু তুমি অন্যায় রাগ কর কেন সীমা ?'

'হাঁ গো, আমি তো চিরদিনই অন্যায় রাগ করে আস্‌ছি। এ মুখপোড়াটারও লাজ নেই, খালি নালিশ আর নালিশ। ফের যদি শোনি, ননীর নামে নালিশ করেছিস্ তবে দেখ্‌বে মজাটা।'

স্বামী ও পুত্রের ওপরের রাগটা গিয়ে পড়ল মীরার ওপর, ঘা কতক খেল, ননী বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাস্‌তে লাগল মুখ টিপে টিপে।

'কেন ওকে মারছ সীমা ? মারলেই কি ছেলে মেয়েকে শাসন করা হয় ?'

'যাও, তোমাকে আর মেয়ের হয়ে সোহাগ জানাতে হবে না। আমার মেয়ে আমি শাসন করতে জানি, তোমার ছেলেটিকে দয়া করে ওর সঙ্গে মিশ্‌তে বারণ কর।' মীরাকে চুলের মুঠি ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল।

সীমার এই যে ভাগাভাগি, এটা নতুন নয়। মীরার জন্ম থেকেই সপ্তাহে দুবার করে ভাগ হয়, আবার দিন কয়েকের জন্য জোড়াও লাগে। সীমা আর অসীমের মধ্যে যা কিছু ঝগড়া বা মনোমালিন্য তা কেবল এই ছেলেমেয়ের জন্যই। বরাবরই অসীম ননীকে মীরার চাইতে আলাদা করে দেখে, সীমা আবার ঠিক তেমনি করেই দেখে মীরাকে। প্রায়ই দেখা

যায়, ছেলে মায়ের ভালবাসা আর মেয়ে বাবার ভালবাসা পায় বেশী, কিন্তু সীমা আর অসীম ঠিক প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। ওদের দুজনের মধ্যে অসীম তবুও একটু নরম মনের, মীরাকে ভাল যে বাসত না তা নয়, সীমা কিন্তু ননীকে মোটেই দেখতে পারত না।

অসীম আফিস গেলে, সীমা ঠাকুরকে অসীমের বিকেলের জলখাবার তৈরী করা দেখিয়ে দেবার জন্যে রান্না ঘরে ঢোকে, মীরা আর ননী ঘণ্টা কয়েকের জন্যে স্বাধীনভাবে খেলা করবার সুযোগ পায়। সীমা একবার শুতে এলে আর রক্ষে নেই, ননীকে তখন যেন বন্দী হয়ে থাকতে হয়। সীমা এসেই খান কয়েক হাতের লেখা ও গোটা পাঁচ সাত অঙ্ক দিত, যদি বেলা চারটের মধ্যে না হত, তবে ননীর আর রক্ষে থাকত না। সেই দিন সীমা রান্না ঘরে ঠাকুরকে নিয়ে খাবার তৈরী করছে, উপরে মীরা আর ননী বিশেষ ব্যস্ত। সকালের ঘটনা দুজনের মন থেকেই ধুয়ে মুছে গেছে। ননী প্রতিজ্ঞা করেছে মীরাকে আর মারবে না, মীরাও প্রতিজ্ঞা করেছে, কোন রকম উদ্ভট প্রশ্ন করে মারামারির সৃষ্টি করবে না।

অন্য দিনের চাইতে মীরা আর ননী বিশেষ ব্যস্ত। ওরা ঠিক করেছে, যতক্ষণ না মা উপরে আসে ততক্ষণ 'সাবিত্রী' অভিনয় করা যাবে। কিছুদিন আগে গয়লা পাড়ায় 'সাবিত্রী' পালা হয়েছিল। মীরা ও ননী যেটুকু দেখেছিল, তার মধ্যে যমরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর অভিনয় দৃশ্যটা ওদের মনে বিশেষ ভাল লেগেছিল। যমরাজের ভূমিকায় প্লে করবে ননী সাবিত্রীর ভূমিকায় মীরা।

অসীমের নতুন সিল্কের স্যুটটা আলনায় ছিল। ননী পরবে সেইটে, আর বাড়ীতে একটা পুরানো হুঁকো ছিল সেটা হবে গদা, মীরা পরবে বাসন্তী রঙের শাড়ীটা। অসীমের প্যান্টলুনটা বড় হয় দেখে মীরা নির্মমভাবে কাঁচি চালিয়ে চলনসই করে দিল। সব ঠিক ঠাক, মীরা চোখ দিয়ে জল বার করবার জন্যে একটা আস্ত কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খেল।

অভিনয় আরম্ভ হল। সাবিত্রীরূপিণী মীরা বড় ডলকে কোলে নিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো, যমরূপী ননী যতদূর সম্ভব চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'ছাড়ি দাও সাবিত্রী তোমার পুতুলরে—' হঠাৎ নজরে পড়ল দরজায় দাঁড়িয়ে মা। মীরা ননীর ভাবান্তর বুঝতে না পেরে বলল, 'থামলি কেন, পাঠ ভুলে গেছিস্? নে বল, নিয়ে যাই যমালয়ে।'

'যমালয়ে পাঠাচ্ছি তোমায়। লেখা নেই পড়া নেই, খালি খেলা, হাঁরে ননী, বয়স তো আট হতে চলল এখনও যোগ বিয়োগ শিখলিনে, গিলতে লজ্জা করে না? কিরে মীরা, এ সব হচ্ছে কি? তোকে না ননের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছি। ওমা, একি করেছিস্‌রে, নতুন প্যান্টটা এমনভাবে কেটে ফেল্‌লে কে? ননে তুই বুঝি?'

'যা কিছু হয় সবই বুঝি ননী করে, না? কাটলে মীরা, আর দোষ পড়ল ননীর। বাবা বাড়ী নেই কিনা, এখন ননীকে কেটে ফেল্‌লেও কেউ কিছু বল্‌বে না।'

'মীরা কাটল, তুই কি করছিলি? বারণ করতে পারিসনি।'

'বারণ করলে শোনে কিনা, যে মেয়ে তোমার।'

'আবার সেই চেনা কথা। মীরা পাখাটা দেত। এত মার খায় তবু আক্কেল হয় না। তার বল্‌বি লম্বা চওড়া কথা?'

'বল্‌বই ত, মীরা কাট্‌ল, আর দোষ পড়ল ননীর।'

সীমা উত্তর দেওয়ার অপেক্ষায় না থেকে আরম্ভ করল পাখা দিয়ে মারতে। প্রথম ঘা গিয়ে পড়ল কপালের ওপর ফুলে জায়গাটা নীল হয়ে গেল। ননীর চীৎকারে বোধ হয় মীরার মনে ঘা লাগ্‌ল, সে বল্‌ল, 'মের না দাদাকে মা।'

'ওরে আমার দরদী। উনি এলেন আবার দাদার হয়ে সোহাগ জানাতে। দাদা যে তোমার লেখা পড়ার মুখে নুড়ো জেলে দিল তার খেয়াল নেই মুখপুড়ী? শুগে যা, যা বল্‌ছি। দেখ্‌বি, দেখ, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি। মীরা, ভীষণ মারব, যা বল্‌ছি। দেখ, কেমন লাগে।' কয়েক ঘা মীরার পিঠেও পড়ল।

ঘণ্টাখানেক আবার সব চুপ। ঘরের মধ্যে খালি শোনা যাচ্ছে, সীমার নাক ডাকার শব্দ আর ননীর ফোঁস ফোঁসানি। মীরা বার দুই সীমার গায়ে পিঠে হাত, পা দিয়ে ধাক্কা দিল, যেন ঘুমের মধ্যে হাত, পা গিয়ে মায়ের গায়ে পড়ছে। যখন দেখ্‌ল, মায়ের ঘুম সহজে ভাঙবার নয়, তখন আস্তে আস্তে খাটের নীচে ননী যেখানে ছিল সেইখানে গেল। আস্তে আস্তে ননীর কপালে যেখানটা ফুলেছিল সেইখানে হাত দিল। ননী এক ঝাঁকি দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল।

'মা, ভারী দুষ্টু, নারে? বাবা এলে বলে দিস্, দাদা।'

'যা, তোকে আর আমায় দাদা ডাকতে হবে না। মারধর খাইয়ে এখন 'দাদা' 'দাদা' বলে ভাব করতে এয়েছে।'

'বা, আমি মার খাওয়ালাম তোকে। মা ত মারলে, তোর হয়ে বলতে গিয়ে আমি অবধি মার খেলুম। তোর খুব লেগেছে, নারে। একটু জলপটি দিয়ে দেব, ব্যথা সেরে যাবে।'

'না না, তোকে কিছু করতে হবে না। যা আমার কাছ থেকে।'

'দাদা, লক্ষ্মীটি রাগ করিস্ না। আচ্ছা, আমার ছোট কাঠের হাতীটা তোকে দিলুম।'

'না না, হাতী ফাতী আমায় দিতে হবে না।'

'তবে সেই ছোট্ট তাজমহলটা।' গলায় অভিমানের সুর ছিল।

'মাইরি, সত্যি বল্‌ছিস্ মীরা?'

'সত্যি, মাইরি বল্‌ছি।'

আফিস থেকে ফিরে এসে যখন পোষাকের দুরবস্থা অসীমের নজরে পড়ল, তখন সে রেগে একেবারে আগুন। ননী ও মীরার ডাক পড়ল। ভয়ে ভয়ে দুজনে অসীমের কাছে গেল। ভয়টা বেশী হচ্ছিল মীরার, মা আবার এ সময়ে গেল কোথায়? বুঝেছি, আমাকে বাবার কাছে দাঁড় করিয়ে সরে পড়েছেন। আচ্ছা, আমিও সব ফাঁস করে দেব বাবার কাছে। ননীকে মিছামিছি মারা বেরিয়ে যাবে।

ননী, মীরা, সত্যি করে বল, কে প্যান্টটার এ দুর্দশা

করেছে।' অসীমের স্বর গুরু গম্ভীর।

মীরা করুণভাবে ননীর দিক চাইল, ভাবটা, এবার তুই বাঁচা।

'আমি করেছি বাবা, মীরার কোন দোষ নেই।'

সীমা জলখাবার নিয়ে এল। অসীম কোন কথা না বলে সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, দেখ্‌ছ, ছেলেমেয়েদের কীর্ত্তি।'

'আমি তো আর পারিনে বাপু, দুপুরে আচ্ছা করে দুটোকে ঠেঙিয়েছি। যা নীচে যা ননী। মীরা, তোর গানের মাষ্টার বসে আছেন।'

ননী ও মীরা বাইরে গেল। যেতে যেতে ননী মীরাকে যে বাঁচিয়েছে সেইটে বার বার ঘোষণা করতে করতে নীচে গেল।

'নাও খাবার খেয়ে নাও দিকি। হ্যাঁ ভাল কথা, সোনা ঠাকুরঝির ছেলের বৌভাত কিন্তু কাল। নিজে আস্‌তে পারেনি বলে লোক দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। না গেলে ভারী দুঃখিত হবে।'

'কিন্তু, আমার কাল যে ভীষণ কাজ; আটটার আগে আফিস থেকে বের হতেই পারব না। তুমি বরং মীরা আর ননীকে নিয়ে যেয়ো।'

'না, তা কি কখন হয়। ভীষণ দুঃখ করবে কিন্তু। খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না, তুমি বরং কাল সকালে একটা ভাল দেখে শাড়ী কিনে এন।'

'ও সব আমি পারব না, ও সব শাড়ী-টাড়ী আমার দ্বারা কেনা হবে না। তোমাদের শাড়ী আর গয়না মনোমত আনা শিবেরও অসাধ্য। থাক গে, আমার একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে, পরে দেখ।'

তোমার আর্টিকেল মানে, মেয়েদের গালাগাল দেওয়া ত, ও সব আমি পড়তে পারব না বাপু। সেদিন ও বাড়ীর বকুল ফুল তোমার লেখা পড়ে কত ঠাট্টা করলে। বল্‌লে, তোর বর কিন্তু ভাই ভীষণ লোক, তোকে বাড়ীতে মারধর করে না ত।'

'বলি তোমার বয়স কত হল?'

'কেন, ছাব্বিশ পেরিয়ে সাতাশে পা দেব সামনের আষাঢ়ে।'

'বকুল ফুল পাতাবার বয়েস তোমার আছে?'

'কোথায় যাব, বকুল ফুল পাতাবার আবার বয়সের দরকার হয় নাকি? সত্যি, তোমার কথাগুলো এমন, ওরা শুন্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে মরে যাবে।'

'ওদের ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াতে বল। বকুল ফুলের শাশুড়ী আছেন ত?'

'না, এ তোমার ভারী অন্যায়। মেয়েদের ওপর তোমার এত রাগ কেন। সত্যি, তুমি বড় একচোখো, মেয়েদের এত ঠাট্টাও করতে পার।'

'যারা ছেলেপিলের মা হয়েও ছাব্বিশ বছরে বকুল ফুল পাতাতে লজ্জা বোধ করে না, তাদের ঠাট্টা না করে কি পুরুষদের নিন্দে করব?'

'জানি, অত করে আর খোঁটা দিতে হবে না। তোমার বন্ধু বান্ধব থাক্‌তে পারে, তাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে পার, আর আমার বেলায় যত দোষ। আমার বন্ধুর জন্যে তোমার এক পয়সাও খরচ হবে না, ভয় নেই।'

'ওই দেখ, কথায় কথায় অভিমান। কথার উল্টো মানে ধরতে তোমরা এত ওস্তাদ, তা আর বল্‌তে নেই।'

'হ্যাঁ, আমরা তো উল্টো মানেই ধরি। এমন ঘরেই পড়েছিলুম, জীবনে একটু আমোদ আহ্লাদও করতে পারলুম না।'

'সীমা, নোবেল প্রাইজ তুমিই পাবে, আজ দশ বছর বাদে বুঝি তুমি টের পেলে যে, মনোমত ঘরে পড়নি। তা দেখ, এক কাজ কর, ঝাঁ করে আমি মরে যাই, আর তুমি—'

'ফের আরম্ভ করলে ত।' কৃত্রিম রাগের ভাণ সীমার ভেতর দেখা দিল।

সত্যি, রাগে তোমায় ভারী সুন্দর দেখায়, সীমা। শোন, কাছে এস।' অসীম চেয়ারটা সীমার কাছে টেনে নিল।

'আঃ, বুড়ো হতে চল্‌লে তবু ছেলেমানুষী গেল না। ছাড়, চাকরটা আস্‌ছে, দেখে ফেল্‌লে কি ভাব্‌বে, বলত?'

সীমা বেরিয়ে গেল, অসীম মন দিল নভেলের পাতায়।

খানিকক্ষণ বাদে সীমা এসে হাজির। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, বেশ রেগেছে।

দেখ, তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ড।'

'কি হয়েছে?'

'হবে আবার কি? মাষ্টার মশায় চলে গেছেন, ভাঁড়ারে গিয়ে দেখি গুড়ের হাঁড়ির ভেতর শ্রীমানের হাত, মুখময় গুড়ে মাখামাখি। এমনি জিনিষ নষ্ট করলে সংসারে কোন দিন লক্ষ্মী থাকে, না সংসারের উন্নতি হয়।'

'ননী, ননী, শীগ্‌গির ওপরে আয়।'

হাতে মুখে গুড়মাখা ননী এসে হাজির। সেই অবস্থায়ও ননীর চেহারা দেখে অসীমের চীৎকার করে হাস্‌তে ইচ্ছে করল। হাসি চেপে, গলার স্বর গম্ভীর করে বল্‌লে, 'করেছ কি? এমনি করে জিনিষ নষ্ট করতে হয়?'

'আমি একলা করেছি বুঝি, মীরাই ও আগে এসে আমায় দিলে!'

'মীরা দিলে, ছেলেটা এত মিথ্যে কথাও বল্‌তে পারে। মীরা না, মাষ্টারের কাছে গান শিখ্‌ছে।'

দেখ্‌ছ বাবা, মা কি রকম মিথ্যে কথা বলে! গান করলে বাবা বুঝি শুন্‌তে পেত না। দেখে এস না, মীরা নীচে পুতুল খেল্‌ছে।'

'মীরা নীচে পুতুল খেল্‌ছে, তাতে তোর কিরে হতভাগা। দিন রাত মীরা, মীরা, মীরা। মীরা মরলে খুব ভাল হয় না।

সীমা ননীর কানটা খুব জোরে মলে দিল। বাবার সামনে এমন অপদস্থ ননী আর কোন দিনই হয়নি, আঘাতের চাইতে ক্রন্দনের মাত্রা উঠ্‌ল ছাড়িয়ে। অসীম চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, 'কেন অমন করে মার।'

'না মারবে না, ছেলে যেন নবাব। কথায় কথায় মীরা আর মা, মীরা আর মা। এমন ছেলে মরে গেলে তবে হাড় জুড়োয়,

'দেখ সীমা, তোমার ব্যবহার দিন দিন যেন খারাপ হতে চলেছে।'

'তাতে কারুর কোন ক্ষতি হয়নি ত।'

'ক্ষতির কথা হচ্ছে না, ছেলে মেয়েগুলো এই সবই শিখবে ত। যখন তখন ছেলেমেয়েকে মারধর কর না।'

'না মারবে না। ছেলে বলে মাথা কিনে নিয়েছে। মার, মারের হয়েছে কি?'

'খবরদার সীমা, ওর গায়ে হাত তুলো না।' চাপা গর্জ্জন অসীম করল।

'কেন, হাত তুললে হবে কি?' সীমা উঠল গর্জ্জে।

'হবে আবার কি, আমি বারণ করলাম, তোমার মানা উচিত।'

'কি, শেষকালে ছেলের হয়ে তুমিও শাসন করবে নাকি?'

'ঠিক শাসন নয়, তোমাকে অন্যায় কাজ করতে বারণ করছি।'

'আমি যা করি তাই অন্যায়, তোমার ছেলে আর তুমি যা কর তাই ন্যায়? থাক তুমি, তোমার ছেলে আর ন্যায় নিয়ে।'

পায়ের শব্দে ঘরখানা যতদূর সম্ভব কাঁপিয়ে সীমা নীচে গেল। খানিকক্ষণ বাদেই দুমদুম্ করে কীল মারার শব্দ ও মীরার কান্না অসীম শুনতে পেল।

সীমা মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় মেঝের ওপর রাত কাটিয়ে দিল। ভোর বেলা অসীম উঠে দেখল, সীমা মীরা কেউ নেই। চাকর হরিদাস জানাল, মা, দিদিমণিকে নিয়ে বকুল-বাগান চলে গেছে। বকুলবাগানে সীমার বাপের বাড়ী।

সীমাকে অসময়ে দেখে, সীমার বাবা শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে গেলেন। 'কিরে সীমা, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই সকাল বেলা'

'বাপের বাড়ী আসব, তার আবার নেমন্তন্ন করা লাগবে নাকি?'

'না না, তা কি বলছি। যাকগে, বাড়ীর সব ভাল ত। অসীম কেমন আছে, ননীকে আনলি না কেন?'

'সবাই ভাল, ননীর আজ একজামিন কি না, তাই উনি আনতে দিলেন না।'

'বেশ, ওরে রামু, বাড়ীর ভেতরে খবর দে, সীমা দিদিমণি এয়েছেন।'

'বাবা, তুমি কিন্তু ওঁকে জানিও না। আমি সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে এয়েছি। সোনা ঠাকুরঝির ছেলের বৌভাত আজ, আর উনি বললেন, যেতে হবে না। সোনা ঠাকুরঝির শ্বশুর বাড়ীর সংগে কি নিয়ে একটা গোল-মাল আছে। তবুও, নেমন্তন্ন যখন করেছে ভদ্রতার খাতিরেও যাওয়া দরকার।'

'তা ঠিকই, কিন্তু, না বলে এলে এটা কি ভাল হল?'

'সে তুমি ভেব না, বাবা।'

'কি মা মীরা, বুড়ো ছেলেকে দেখছি ভুলেই গেছ?'

দাদাকে রেখে দিদিমার বাড়ী আসতে মীরার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। কেবলই নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। শশাঙ্কবাবুর কথা তার ভাল লাগল না। দাদুর কোল নিয়ে ভাই বোনের মধ্যে আগে কত ঝগড়া হত, ঝগড়ায় অবশ্য মীরাই জিতত। কারণ, সীমার চোখ রাঙানর সামনে ননী দাঁড়াতে পারত না, তার ওপর অসীমও কাছে থাকত না। আজ কিন্তু দাদার অভাব বেশী করে মীরার চোখে পড়ল।

রাগের মাথায় চলে এলেও সীমার মনে অনুতাপ এসেছিল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর যখন মীরাকে নিয়ে শুতে গেল, তখন নিৰ্জ্জনতায় মনকে একলা পেল। সত্যিই কাজটা তার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। ননীকে অমনভাবে কানমলা দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। তা'ছাড়া, ওঁর মনে কতখানি কষ্ট হবে। না, কালই, কিম্বা আজই বিকেলে চলে যাবে। কিন্তু, এই নিয়ে যখন তখন যে ঠাট্টা করবেন তা অসহ্য। আর, আজ গেলে বাবাই বা মনে করবেন কি? বৌদিরা সকাল থেকেই পিছনে লেগেছে। সীমা নিজে কিছুই স্থির করতে পারল না। যাবার ইচ্ছাটা আছে, আবার নিজের পরাজয়টাও মনের মধ্যে থেকে থেকে নিষেধ করছে।

'মীরা, বাড়ী যাবি, তোর বাবার কাছে, দাদার কাছে।'

'হ্যাঁ, বাবা হয়ত কাঁদছে। দাদা দেখবে, ঠিক না খেয়ে থাকবে।'

'কাঁদছে না হাতী। আমি মরলে সেইদিনই বিয়ে করবে, তার আবার কান্না।'

বিকেলে চা খেতে খেতে সীমার মা শশাঙ্কবাবুর কাছে সীমার চলে আসার অন্য রকম ব্যাখ্যা করে বললেন, 'তুমি দেখে নিও। সীমা নিশ্চয় অসীমের সংগে ঝগড়া করে এসেছে। তা না হলে, অত সকালে কেউ আসে?'

'না না, ঝগড়া করেনি এটা ঠিক। তবে, যা খেয়ালী মেয়ে হয়ত মন গেল এখানে আসতে, অমনি এল।'

সীমা ঘরে এল। মুখখানি শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, বোধ হয় দুপুরে বেলাকার ভাবনায়। সীমাকে কাছে বসিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'সীমা, কি হয়েছে আমায় খুলে বল।'

'কি আবার হবে?'

'তবে সকাল বেলাই অমন করে চলে এলি।'

'কেন বাপের বাড়ী আসব তার আবার সকাল বিকেল কি?'

'তার কথা নয়, তবুও একবার খবর দেওয়া উচিত ছিল। তোর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা শুনলে কি ভাববেন, বলত?'

'কেমন পাঁচজনের ঘরেই পড়েছি কি না? শ্বশুর বাড়ীর মধ্যে এক বুড়ো ভাসুর, তা তিনি তো দেশেই জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত, একটা কথা কইবার লোক পাওয়া যায় না। দুপুরে বেলা যে কি করে কাটে।' শেষের দিকে গলার স্বর ভারী হয়ে গেল।

শশাঙ্কবাবু স্ত্রীকে বললেন, 'কেন বাপু মেয়েটাকে জেরা করছ। আসবি বই কি মা, সপ্তাহে দু'দিন করে আসবি। আমি যে কদিন আছি সে কদিন তুই রোজ আসিস্। একবার চোখ বুজলে ভাইগুলো ফিরেও তাকাবে না, বোনটা আছে কি গেল।'

'না না, সে কথা হচ্ছে না। এই যে এল, যদি অসীমকে না বলেই আসে, তা'হলে সেও তো রাগ করতে পারে।'

'সবাই ত তোমার ছেলের মতন নয়। দু'দিন বৌ বাপের বাড়ী যায় যদি তবে পেছন পেছন দৌড়।'

'শেষ রক্ষে হলেই হয়। অসীম যেন রাগ করে একটা কিছু করে না বসে।'

'করে অমনি বসলেই হ'ল? তোমার বউরা বায়স্কোপ দেখবার নাম করে যে বাপের বাড়ী যায়, তাতে আমি বা ছেলেরা রেগে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ করে বসি, না?'

সীমা দেখল এই সুবর্ণ সুযোগ। এখন যদি মায়ের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে যাওয়া যায়, তবে হয়ত বাবা নিজেই গিয়ে দিয়ে আসবেন। বাবাকে দেখলে অসীম যে কিছু বলবে না, এটা সীমা ঠিকই জানত।

'দরকার নেই বাবা। মেয়ে বিয়ে দিলে পর হয়ে যায়, এ সব কথা যদি বৌদিদের কানে যায় তবে আমাকেই দুষবে। দরকার নেই, একখানা গাড়ী করে দেও, আমি নিজেই যেতে পারব'খন।'

'কোথায় যাবি, থাক তুই. আমি যে কদিন আছি তোর কোন ভাবনা নেই।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল। সীমা, তোকে চলে যাওয়ার কথা ত আমি বলিনি। বৌদিরা ত তেমন খারাপ নয়।'

'হয়েছে মা, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকনা।'

তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া খেয়ে সীমা শুতে গেল। শশাঙ্কবাবু দুঃখ দূর করবার জন্যে বিশেষ করে সীমাকে জানিয়ে দিলেন, তার মার কদিন ধরে মাথার রোগটা বেড়েছে। যাবার সময় সীমার বৌদিরা রসিকতার অবতারণা করেছিল। বড় বৌদি বীথি বলেছিল, 'কি ভাই ঠাকুরঝি, এর পরে মহারাজ দুষ্মন্ত চিনতে পারবে ত?'

'না পারলেও তোমার বাপের বাড়ী যাবনা বৌদি।'

জবাব শুনে বীথি অবাক্। মেজ-বৌদি প্রীতি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বীথির কথার জবাব শুনে চুপ করে গেল। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে সীমা উঠে গেল. এর পর কথা বলতে কারুর আর সাহস ছিল না।

যেদিন সকালে সীমা বাপের বাড়ী চলে গেল সেইদিনই ননীর জ্বর হ'ল। অসীম আফিস কামাই করে ছেলের শুশ্রূষা করতে লাগল, সীমাকে আনতে শ্বশুরবাড়ী গেল না বা লোকও পাঠাল না। চাকরটা সীমাকে আনবার কথা বলতে গিয়ে বেশ জোর ধমক খেল।

সকাল বেলা উঠেই সীমার মনে হল, আর থাকাটা তার কোন মতেই উচিত নয়। কথাটা শশাঙ্কবাবুর কাছে বলতেই, তিনি অন্য কথা বলে সীমার কথাটা উড়িয়ে দিলেন। ফলে, সীমার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও যাওয়া হ'ল না। তিন দিন যখন কেটে গেল তখন সীমা হাঁপিয়ে উঠল, মীরার চেহারাটা এর মধ্যে যেন কেমন খারাপ হয়েছে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, মামাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথাও বলে না, খায় না। অবশেষে থাকতে না পেরে সীমা কথাটা বলল, 'বাবা সত্যি মন কেমন করছে। আজ চারদিন হল এসেছি, এর মধ্যে ওঁর কোন খবরই পাওয়া গেল না। আমি আজ যাব, আমার ভাল লাগছে না। এর পর গেলে উনি হয়ত রেগে একটা কিছু করে বসবেন। দাদাদের স্বভাব দেখেই ত ছেলেদের অবস্থা বুঝতে পার।'

'দাদাদের কথা ছেড়ে দে। মন যখন খারাপ করছে তখন অবিশ্যি আমি আর থাকতে বলব না। মীরা, তোমার দিদিমাকে একবার ডাক ত'

মীরা দিদিমাকে ডেকে নিয়ে এল।

'সীমা তো আজ যেতে চায়, তুমি কি বল?'

'আজ যাওয়া হতেই পারে না। তেরস্পর্শ'র মধ্যে কি করে পাঠাই। কি হয়েছে তোর সীমা, সত্যি করে বল ত। এ ক'দিন আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বললি না। কি হয়েছে, আমায় বল। অন্য বার যখন আসতিস, তখন এমন গুমরো ভাব ত দেখিনি।'

'মনটা ছটফট করছে মা।'

এমন সময় শচী এসে বললে, 'পিসিমা, তোমাদের বাড়ী থেকে লোক এসেছে।'

সীমার বুকটা কেঁপে উঠল। মীরাকে বলল, 'যা ত মীরা দেখে আয়, কে?'

মীরা দেখে এসে বলল, 'মা, পাঁচু এসেছে।'

পাঁচু সীমাদের ঠাকুর। সীমা নীচে গিয়ে দেখে পাঁচু দাঁড়িয়ে সীমাকে দেখে ধরা গলায় বলল, 'বাড়ী চলুন মা।'

'কি হয়েছে পাঁচু?' কথাটা যেন জোর করে গলা চিরে বের করতে হ'ল।

কাঁদ কাঁদ হয়ে পাঁচু বলল, 'দাদাবাবুর অসুখ করেছে, ডাক্তার বলেছে, টাইফয়েড। বাবু আফিস কামাই করে দেখছে। দাদাবাবু খালি তোমাকে আর দিদিমণিকে দেখতে চাইছে।'

'এদ্দিন আমায় খবর দিসনি কেন?'

'বাবু বারণ করেছিল, মা। আমি আজ পালিয়ে তোমায় খবর দিতে এলাম।'

শশাঙ্কবাবু শুনে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সীমার মা বললেন, 'কি সর্ব্বনাশ, ছেলেটার অসুখ আমাদের জানায়নি। খারাপ দিনে সংবাদটা শুনলাম, এখন বাবা তারকনাথ যা করেন।'

ননীর জ্ঞান নেই। অসীম মাথায় আইসব্যাগ ধরে আছে। যতীন ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন। এই কয়দিনের পরিশ্রমে অসীমের চেহারাও খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর ভাবনা চিন্তাও আছে।

সীমা আর মীরা এসে ঘরে ঢুকল। ভৃত্য হরিদাস ননীর পায়ের দিকে বসে গেলাসে বেদানা ছাড়িয়ে রাখছিল, সীমাকে দেখে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সীমা ইসারায় কথা বলতে নিষেধ করল।

অসীম পিছনে থাকিয়ে সীমাকে দেখে ননীর মাথা থেকে আইসব্যাগটা নামিয়ে বাইরে গেল। মীরা, ননীর মাথার গোড়ায় এসে দাঁড়াল, মুখের ভাব থমথমে।

বাইরে অসীমের পিছনে সীমাও গেল। অসীম বারান্দায়

(শেষাংশ ৭৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ

শ্রীঅমলা গুপ্তা

রবিবার। ছ'দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিশ্রামের দিবস—রক্ত জল করা মেহনতের একটানা ক্লান্তিকর প্রবাহ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ক্ষণস্থায়ী আরামের মুহূর্তটি।

অতি সঙ্কীর্ণ বাক্সপানা খুপরিটিতে বসে সুধারাম করে ষ্টোভ মেরামত—করে যায় ঝালাইয়ের কাজ—সেই কাকভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি। তবু কোনদিন বিশেষ করে শনিবারে—কেরোসিনের ডিবের মিটমিটে আলোয় রাতের প্রথম প্রহর পার করে তবে তার দিনের কাজ সারা হয়।

ব্যবসায় স্বাধীন সে—সুধারাম কর্মকার, কেবল দাস সে অন্নের—স্ত্রী, শিশুকন্যা আর নিজের আহার তাকে জোটাতে হয় নির্মম এ মাটির ধরায়; পেশা তার স্বাধীন বলে গর্ব করবার, কিন্তু বাস্তবে সে দেখতে পায় সে অধীন, শুধু অধীন কেন, ক্রীতদাস—তার ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতি কর্তব্যের। তাই সময় হয় না তার দিনের আলোয় দুটি গ্রাস মুখে পোরবার ফুরসৎ নেই তার হাত কামাই করে নির্বিঘ্নে হুঁকো ছাড়বার। স্ত্রী ফুলমণির নেহাৎ জেদ ও কান্নাকাটির বাধাই তাকে বাধ্য করেছে রবিবারে দোকানটি বন্ধ রাখতে। সেবারে প্লুরিসিতে ভুগে উঠে অবধি সে আর ভরসাও পায় না রবিবারের ছুটি উপভোগ বাদ দিয়ে চলতে। তথাপি এক-ঘেয়েমির মাঝে তৃপ্তিকর সে ছেদের কাছে মাথা নত করে সে অনিচ্ছায়।

....

রবিবার ভোরের সূর্য যখন তার উষ্ণ স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে কর্মকার সুধারামের চোখ দুটিতে, তখন সে চেয়ে দেখে, বাইরেটা আলোয় আলোয় ফেটে পড়ছে আর শয্যায় তার পাশের স্থানটি শূন্য—ফুলমণি না জানি কত ভোরে উঠে গেছে।

ইস! এ ভোরের বেলাই যে সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে—বালিশটা ভিজে রয়েছে, মাদুরটাও। ইঞ্জিনের বয়লারের মত শতধারে নিদারুণ তাপ ঢেলে দিচ্ছে সূর্য-রশ্মি আজ কামরাটির ভিতর। কত বেলা হয়ে গেছে তা হলে। আড়ামোড়া ভেঙে সুধারাম এপাশ-ওপাশ করে—আজ রবিবার। তবু তাকে উঠে পড়তে হয়। রবিবার ছাড়া সময় কোথায় দেখাশোনা করবার নিতান্ত আপনজনের সঙ্গেও।

স্নানটা সেরে ঘরে কাচা আধ ফরসা ধুতি একখানা পরে। হাফ শার্টটা পরে নেয়—জুতোজোড়া ঝেড়ে পুঁছে ঠিক করে রাখে। আজ তাদের যেতে হবে তার মাকে দেখতে, তারপর যাবে শ্বশুর-শাশুড়ীর ওখানে।

পিতলের পাত একটা দিয়ে সুধা জুড়ে নিয়েছিল তার ভাঙা তক্তপোষের কোণটা—চক্ চক্ করছে তালি দেওয়া খুড়োর সেই মাথাটা—সেই কবেকার কেনা আর্শিখানা দেওয়ালে ঝুলান, এরই মধ্যে পালিশ করা বুকটা তার ঝাপ্সা হয়ে উঠেছে;—বসবার বেতের মোড়াটা হলদেপানা হয়ে চক্‌মকিয়ে উঠেছে রোদের আমেজে।

দাওয়া থেকে একবার সুধারাম তাকাল ও-পাশের রান্না ঘরটির দিকে—আঁধার আর অস্বস্তির ঠাণ্ডা একটা আবহাওয়া যেন ও-দিকটায় ছেয়ে গেছে। চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সুধা আর বৃথা তাড়া দিয়ে ফুলমণিকে ব্যস্ত করে তুলে না;—তবু ফুলমণির জানতে বাকি থাকে না যে স্বামী তার প্রস্তুত। সেটুকু আভাষে বুঝবার ক্ষমতা ফুলমণির মত গিন্নিদের সহজাত।

—এস না গো, দুটি মুখে দিয়ে নাও। এরপর রোদ একেবারে চনচনে হয়ে উঠবে, পথ চলা দায় হবে।

নীরবেই সুধা এগিয়ে যায় রান্না ঘরের দিকে। ঘরের কানাচে বসে খেলা করছিল আপন মনে তাদের শিশুকন্যাটি—সুধা তাকে দুহাতে তুলে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে আদর করে। 'খাবে চল রাণী' বলে তাকে কোল আবুজা করেই রান্নার চালায় হাজির হয়।

খেতে বসতে বসতে ফুলমণিকে বলে—'খাসা দিনটি করেছে আজ।' বলেই সে হেসে ওঠে, ফুলমণিও স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে তোলে।

খেতে বসে সুধার মনে পড়ে যায় আগের দিন শুনে আশা খদ্দেরদের মুখে মিলে ধর্মঘট, মজদুর সমিতির সভা, মজুরদের কত রকম সুখ-দুঃখের কাহিনী। ফুলমণিকে সে সব কথাই আবার বোঝাতে থাকে। ফুলমণি অতশত বোঝে না—কি দরকার ঝামেলা বাধিয়ে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, তবে গরীবের সংসার এক রকম করে চলেই যায়। ফুলমণির কথায় অবশ্য সুধা আর প্রতিবাদ করে না, কিন্তু মজুর সমিতির বাবুর বুঝিয়ে দেওয়া কথাগুলো মনের মাঝে কলরব করে ওঠে। বিজ্ঞের মত হাসি দিয়েই সে পত্নীর কথার জবাব দে

ফুলমণি স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—আমার মনে হয়, আর দেরী করা আমাদের ঠিক হবে না। মা বলেছিল রবিবারে তারা দেরীতে খায় না—সেখানেই না হয় আগে যাব, পরে তোমার মার ওখানে গেলেই হবে।

কথা আর না বাড়িয়ে সুধা চট্‌পট্ খাওয়া শেষ করে ওঠে। ফুলমণি সে পাতেই বসে পড়ে। এমনি করে তারা যখন বেরুলো বেলা তখন এগারটা। ফুলমণির ছোট বোনটির এই প্রথম সন্তান জন্মেছে, তার জন্যে ফুলমণি কিনে রেখেছিল একটা পেনি আর একটা কাঠের ঝুমঝুমি। ছোট ভাইটির জন্যে একটা রবারের বল। এসব নিয়ে তারা চলল—গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে—দুটো বাড়ী ছাড়িয়ে বাস-ষ্ট্যান্ড-এ যেয়ে দাঁড়াল। সুধার মা-ভাই দুটি আর ফুলমণির বাপ মা—সবাই থাকে শহরটি পেরিয়ে একেবারে ও-পাশের শহরতলীতে, যেমন সুধা থাকে এ-পাশের শহরতলীতে। বাসের আনাগোনার রাস্তা থেকে সেই সব আপনজনদের বাড়ীও খুব বেশী তফাতে নয়। তবে মিলের মজুর-বস্তি কি না বেশ একটু পরিষ্কার, যদিও নিতান্ত অপরিসর। মাঝে মাঝে বাস চলাচলের গর্জন আর রাস্তায় বল খেলায় রত ছোট ছেলে-মেয়েদের কোলাহল—এ-ছাড়া সে শহরতলীর রবিবারের কর্মহীন নীরবতা নয়, যেন পূর্বগত হাজার রবিবারের নিস্তব্ধতার পুঞ্জ সঞ্চিত হয়ে পাড়াটিকে অসাড় করে তুলেছে।

কড়্-কড়াৎ শব্দে বাসটি থেমে যখন তাদের নামিয়ে দিল, বেলা তখন ২টো। পাঁচ সাতটি আসনে বসে এতক্ষণ তারা যে

শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিকে অপসৃত হতে দেখেছে, জাঁকাল দোকান-পশার নিয়ে তা যেন তাদের চোখে লাগিয়েছে ধাঁধা। এখন নিজেদের পল্লীর সরু গলি পথটির মতই একটি গলির মুখে তাই তারা পৌঁছে একবার চোখ বুলিয়ে নিল চারপাশে। তারপরে বিরাট মিলের কম্পাউন্ডের পশ্চাতে যে মজুর-বস্তী সে-দিকেই পা চালিয়ে দিল।

মাঝে মাঝে শিশুকন্যাটি জিজ্ঞাসা করতে লাগল—ঠাকুমার বাড়ী যাবে বাবা? দিদিমার বাড়ী যাবে মা? মন্টু মামা আমার সঙ্গে খেলবে ত? রাণীর কথার আর জবাব তাদের দিতে হল না। দূর থেকেই দেখা গেল, সুধার মা তাদের মজুর লাইনের ফটকে বসে আছে। সুধা, ফুলমণি তার কাছে গেলেও সুধার মা উঠল না। মার শরীর ভাল নেই তো দিন থেকেই; তার ওপর সুধা দেখতে পেল, মা নিশ্চয়ই কেঁদে কেঁদে দুচোখ রাঙা করেছে।

কি হয়েছে মা?—সুধা জিজ্ঞাসা করে।

কাতর মুখখানি ছেলের দিকে তুলে ধরে মা বলে—কি আর, মিলে যে ধর্মঘট!

ও!—সুধা আর মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না, মাথা নত করে শুধায়—এরা কেমন আছে, গংগা আর হারু?

গংগা আর হারু হল সুধার ছোট দুইভাই। ওরা কাজ করে এই মিলে। গংগা বিয়ে করেছে, সে বাস করে আলাদা, অবশ্য মজুর-বস্তীতেই। হারু আর মা বাস করে একসংগে গংগার ভগ্নীপতির সংগে। ভগ্নীপতি কাজ করত এ মিলে, কিন্তু মাসে তার জবাব হয়েছে। সে-ই ধর্মঘটের এখন মূল পান্ডা।

সুধার মা আর সামলে রাখতে পারে না নিজেকে, চোখের জলে ভেসে ডুকরে ওঠে—গংগা বেরিয়েছে একটু আগে কোথা যেন জামাইয়ের সংগে। কিন্তু হারু—হারু যে কারখানা থেকে বাড়ী ফেরেনি। কেন জানিনে। টাকার কথা নয়, কতজনে কত কথা বলছে, কারখানায় নাকি জোর করে ধরে রাখা হয় আজকাল। কিছুই বুঝিনে বাপু!

মা একেবারে ভেঙে পড়ে। সুধা তখন কথার মোড় ঘুরাতে বোনটির কথা, ভগ্নীপতির কাজের কথা পাড়ে। মাকে একটু ঠান্ডা করে সুধা বলে, সে যাবে গংগার খোঁজে—হারুর কথা সে নিশ্চয়ই জানে। ফুলমণিকে মায়ের কাছে রেখে সুধারাম এগিয়ে চলে গংগার আস্তানা উদ্দেশ করে। মেয়েটা বাবার পিছু নেয়—বাবা, বাবা বলে। সুধা রাণীকে কোলে নিয়ে চুমা খায়, তারপর নামিয়ে দেয় ফুলমণির কাছে যেতে। লক্ষ্মী মেয়ে রাণী মায়ের কাছে ফিরে যেতে যেতে বলে ডান হাত তুলে—শীগ্‌গির এস বাবা। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সুধা একটু দ্রুত চলে।

গংগা বাড়ীতে নেই—সুধার মা তো আগেই বলে দিয়েছে। গংগার স্ত্রী ভাদ্রবধূ—তাই সে অস্ফুট গলায় জানাল—মজদুর ইউনিয়নের মস্ত বড় একটা সভা হচ্ছে, নিতে মুদীর দোকানের প্রাংগনে—সেটাই হল ধর্মঘটের প্রধান আড্ডা। সুধা আর সেখানে দেরী করে না, উড়ুনীখানা পাগড়ীর মত মাথায় বেঁধে এগিয়ে যায়। এখানে ওখানে ছড়ান মজুরদের ছোট ছোট বস্তী—চারপাশে খানা ডোবা। দূরে দাঁড়িয়েছে সারি। মুদী দোকানের সমুখে লোক গিস্‌গিস্ করছে—এখান থেকেই দেখা যায়। সভায় পৌঁছে সুধা দেখতে পেল—বস্তীগুলোর পেছনে মিলের চিমনী থেকে ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে আজ রবিবারেও।

সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে একজন—সুধা তাকে চেনে না। কিন্তু সভার উপস্থিত অনেকেই তার চেনা। ভিড়ের ভিতর ঘুরে সে গংগার খোঁজ করে। গংগা নিশ্চয়ই জানে—হারুর হালত। কত মেয়েছেলে রয়েছে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকলেই একটু সভাগোছের পোষাকে সজ্জিত, যেমন সুধা নিজেও করে এসেছে। কেউ কেউ বললে, একটু আগে গংগাকে দেখেছে তাঁর ভগ্নীপতির সংগে। সে চুপ করে বক্তৃতা শুনল কতক্ষণ। বক্তা একটা লেখা কাগজ থেকে অহিংস সত্যাগ্রহ—শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের কথা পড়ে যাচ্ছিল। তারপর দেওয়ান সাহেব যে কথা বলেছিল, তা নিয়ে আলোচনা চলল। অবশেষে সে বলল—একটা শোভাযাত্রা এখনই বের করতে হবে, সকলেই তাতে যেন যোগ দেয়। তারা মার্চ করে যাবে মিলের ফটক অবধি—সেখানে সারবন্দী সত্যাগ্রহীর দল দিবে ধন্না মিলের সমুখে।

মহা সোরগোলের সংগে সভা ভংগ হ'ল। শোভাযাত্রা সুরু হ'ল। দুটি লোক পতাকা হস্তে সকলের আগে চলল। বাখারী আর লাঠির মাথায় বাঁধা প্লাকার্ড ছিল নানা রকমের—দুজনে দুজনে ধরে নিয়ে চলেছে। মজুর, নারী-মজুর, বালক-বালিকা—এলোমেলোভাবে সংগ নিয়েছে। সুধা প্রথমটা শোভাযাত্রীদের দলে যোগ দিল না। পাশ কাটিয়ে একবার আগিয়ে যায়, আবার ধার ঘেঁসে ফিরে আসে—যাতে গংগার সন্ধান পেতে পারে দলের ভিতর। কিন্তু প্রায় হাজার দুই লোকের ভিতর থেকে গংগাকে বেছে নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যতটা পারে ঘাড় উঁচিয়ে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলো—ভাইকে খুঁজতে, সহসা এক পরিচিত কণ্ঠস্বরে কে তাকে ডাক্‌লো। চেয়ে দেখে পুরাতন বন্ধু একটি শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে নিশান হাতে। সুধার মনে হয়, ভিড়ের সংগে মিশে গেলেই বুঝি গংগার দেখা পাওয়া যাবে। তাই সে যায় বন্ধুর পাশে—তার সংগেই এগিয়ে চলে। বন্ধু তার মা আর বাপের সংগে সুধার পরিচয় করে দেয়। খানিকদূর এগিয়ে সুধা আবার ভিড়ের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে। ভিড়ের ধারে ধারে থেকে এগিয়ে যায়—পিছিয়ে আসে। শেষ আবার যখন সে দলে যোগ দিলে, তখন একেবারে শোভাযাত্রার সমুখভাগে এসে পড়েছে।

এখন সে পরিস্কার দেখতে পায়—এক সারি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধচন্দ্রের মত গোলাকারে তারা লাইন বেঁধেছে ফটকটিকে অনেকখানি পিছনে রেখে। শোভাযাত্রা সেদিকেই এগিয়ে চলে। ফটকের ভিতর দিয়ে দেখা যায়, অনেকগুলো মজুর আনাগোনা করছে মিলের ভিতরে, হয়ত হারু তাদের একজন। আর একটু এগিয়ে গেলে হয়ত সে ঠাউরে নিতে পারবে হারুকে—তখন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকতেই হবে। সে একটু তাড়াহুড়া করে এগিয়ে যায়—শোভাযাত্রীদের নিয়েলে ফেলে। গোরা সার্জেণ্টটার দিকে

এগোতে তার সাহস হয় না—দারোগাবাবুর কাছে যায়, বলে—

দেখুন বাবু, আমার ভাই রয়েছে কয়েদখানার ভিতরে, মায়ের অসুখ, তাকে সে কথাটা জানাতে চাই। নাম তার হারু দাস।

দারোগাবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান।

দয়া করে বাবু যদি আমায় পাঠাতেন দুটি পুলিশের সঙ্গে, আমি শুধু কথাটা বলেই চলে আসতাম। মায়ের বড্ড অসুখ।

কথা বলতে বলতে সুধা চেয়ে দেখে দারোগাবাবু তার কথা আদপেই শুনছেন না, সুধার মাথার উপর দিয়ে শোভাযাত্রার দলের দিকে তাকিয়ে আছেন আর মাথা নাড়ছেন নির্বাকে। এমন সময় সে শুনতে পেল সার্জেণ্ট বলছে শোভাযাত্রীদের—হট্ যাও শুয়োর, ইধার্ মৎ্ আও। গুলী খানেকো দিল চায়তা।

সুধা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে ডানে বাঁয়ে যে ছোট-বড় দারোগারা দাঁড়িয়ে আছে, সবার হাতেই পিস্তল আর পুলিশেরা সবাই বন্দুক বার করে বাগিয়ে ধরেছে। সেই প্রথম তার নজরে পড়ল বন্দুক। অজানিতেই সে পিছিয়ে আসে।

শোভাযাত্রীদের দলে একটা কি গোলমাল। হঠাৎ সিটি বেজে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ। তার মাথার বাঁ পাশে যেন কিসের আঘাত লাগে—তৎক্ষণাৎ সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার বাঁ দিকের গালটা

নিজের রক্তদর্শনে একটা নিদারুণ আতঙ্ক তাকে অসাড় করে ফেলে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মুখে সুধা মাটিতে উবু হয়ে থাকে—তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সেইরকমভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে সে পিছন দিকে আরো সরে যেতে থাকে—তখন সে লক্ষ্য করে যে, তার বাঁ চোখে সে কিছুই দেখতে পায় না। আবার বন্দুকের আওয়াজ—আবার তার সমুখেই কত লোক পড়ে যায় মাটিতে—গড়াগড়ি খায়। অর্ধচেতন অবস্থায় সে ভাবতে চেষ্টা করে—কিসে তাদের এমনভাবে ভূপাতিত করছে, কিছু ঠাউরে উঠতে পারে না। পিছন ফিরে দেখে পুলিশের বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

অনেক দূর পিছিয়ে সে রাস্তার পাশে এক নর্দমার ধারে হুমড়ি খেয়ে থাকে—বন্দুকের গুলী এবার আর বোধ হয় তাকে ছুঁতে পারবে না ঐ খানায় থাকলে। তার বাঁদিক থেকে কে যেন বলছে,—গেলাম, গেলাম, আমায় ধর।

সুধার সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই। সে তাকে দেখবার বুঝতে চেষ্টা করে। তখনই একটা নীল আলোর টুকরো কোথায় যেন পড়ে তার কাছেই। ধোঁয়ায় সে হাঁফিয়ে ওঠে—ডান চোখটা জ্বালা করে ওঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় সে মাতালের মত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, চলতে চায়, প্রতিপদেই হুঁছোট খায়, মাথা ঘুরতে থাকে, চোখে কিছু দেখতে পায় না, কেমন একটা বমি-বমির ভাব তাকে পেয়ে বসে। পেটের ভিতর মোচড় দেয়, সে হাতড়ে হাতড়ে চলে—মুখে করুণ চীৎকার। অবশেষে কে একজন তাকে জড়িয়ে ধরে—পা-দুটো তার অবশ হয়ে দেহ নেতিয়ে পড়ে।

তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে একটা গাড়ীতে বসান হয়। সে গাড়ীতে আরো কত লোক কাতরাচ্ছে। কে একজন বলে—হাসপাতাল, হাসপাতালে নাও। গাড়ীটা আস্তে আস্তে চলে।

কিন্তু গাড়ীটা বেশী দূর যেতে পারে না। সে টের পায় গাড়ী থামে—আর সব দাপাদাপিতে লাফিয়ে ওঠে। তারপর তাকে সে-গাড়ী থেকে তুলে নিয়ে অপর একটা গাড়ীতে তোলা হয়।

কুয়াশা যেন তাকে ঢেকে রেখেছে। পাশে যেন মৃত্যু-পথযাত্রীর করুণ আর্তনাদ। এটা সত্যি, না স্বপ্ন? নিজেও সে যাতনায় চেঁচিয়ে ওঠে। স্বপ্নের সে নির্মম আমেজে সে বুঝতে পারল, গাড়ী থামছে, আবার চলছে, আবার যেন ধুপ করে কি রাখা হচ্ছে, আবার চলছে। স্বপ্নের ঘোরেই সে কাঁদিয়ে ওঠে, হঠাৎ দোর খুলে যায়—কে যেন রূঢ় কণ্ঠে বলে—চুপ কর, শুয়োর। তারপর ডাক্তার দেখানর কি একটা কথা হ'ল। সে আর কিছুতে ঘুম ঠেকিয়ে রাখতে পারে না দুচোখ থেকে, সে ঘুমুতে যায়।

যখন সে চোখ মেলে তাকাল তখন গাড়ী থেমে আছে। একজন বললে—এই একটিকে তুলে দাও আমাদের এখানে—বাকি সবের আর কিছু করবার নেই। তখন তারা সুধাকে হাতে ধরে টেনে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল—পা দুটো তার অসাড় হয়ে নুয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে একটা বেঞ্চিতে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

অনেকক্ষণ পরে নার্সরা সব এসে তার জামা-কাপড় ছাড়িয়ে ধুইয়ে পুঁছিয়ে, চোখে ব্যাণ্ডেজ করে বিছানায় রেখে দিল। সময় কেটে যেতে লাগল। কতক্ষণ তার হিসেব রাখার উপায় ছিল না। আহার দেওয়া হ'ল তার সমুখে। পেটে বেজায় খিদে, কিন্তু চোখে ব্যাণ্ডেজ, দেখতে পায় না কিছু, খাবে কি করে। একজন এল তাকে সাহায্য করতে। তখন কড়া হুকুম হ'ল—তোমার বেড্-এ যাও। দুধ একটু খেতে চাইল সুধা, কিন্তু কেউ দিলে না কিছু। ফুলমণির নাম ধরে ডাকলে, কেউ সাড়া দিলে না। মাঝে মাঝে গঙ্গা আর হারুর কথা জানতে চেয়েছে, কিন্তু তারা কেউ বোধ হয় ওখানে আসেনি। মাথায় তার তীব্র বেদনা ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে, আবার বেহুঁস হয়ে যায়।

এর পরে যখন তার চেতনা ফিরে এল সে টের পেল, ডাক্তার রয়েছে পাশে—নিশ্চয় ডাক্তার। ডাক্তার বাঁ চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললে, সুধার বেশ মালুম হ'ল বাহুতে একটা ইনজেকশান দেওয়া হ'ল। বাঁ চোখে কি সব করলে, সেলাইটা সে বুঝতে পারলে ঠিক। আবার ব্যাণ্ডেজ করা হল।

পরে ডান চোখ খোলা হ'ল। বেজায় ফুলে গেছে এ চোখটা, তবু একটু একটু সে দেখতে পাচ্ছে। এবার সে খেতে পারবে, যা হোক দেখতে পারবে ত। এইবার ফুলমণির দেখা মিলল। পরিষ্কার কাপড় জামা এনেছে সে।

(শেষাংশ ৭৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরিসমাপ্তি

(গল্প)

শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোঁৎ (Comte) লরমেরিণের এইমাত্র প্রসাধন শেষ হ'ল। তাঁর প্রসাধনকক্ষের বেশীরভাগ জুড়ে ছিল একখানা বড় আয়না। ঘর থেকে বেরুবার সময় তিনি আর একবার নিজেকে তাতে দেখে নিলেন। মুখে তাঁর একটু মৃদু হাসি।

যদিও তাঁর চুলগুলো প্রায় সবই পেকে এসেছিল, তবুও তাঁকে দেখলে বাস্তবিকই একজন সুপুরুষ বলে মনে হয়। বেশ ছিমছাম গড়ন—দেখতে সুশ্রী, ভুঁড়ি উঁচু হয়ে নেই। পাতলা পাতলা মুখ, মুখের রঙ সাদা না বলে গৌর বললেই ঠিক হয়—মুখে অল্প অল্প গোঁফ আছে। তাঁর চালচলনের একটি বিশেষ ভঙ্গী ছিল। সেটা মুখে ঠিক বলা না গেলেও দু'জন লোকের মাঝখানে সেটাকে খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে দেখা যেত :

তিনি অস্পষ্টভাবেই বললেন "লরমেরিণ এখনও বেঁচে আছে!" বসবার ঘরে চিঠিপত্রগুলো এসে পড়েছিল। তিনি সেইখানেই চলে গেলেন। যে সকল ভদ্রলোক টেবিলে বসে কাজ করেন না, তাঁদের টেবিলে যেমন যাবতীয় জিনিষের সমাবেশ হতে থাকে—তাঁর টেবিলখানিও হ'য়ে উঠেছে ঠিক সেইরকম। তিন রকম মতবাদী তিনখানা খবরের কাগজ রয়েছে—আর তার পাশেই পড়ে রয়েছে ডজনখানেক চিঠি। একখানা তাস ইচ্ছামত নেবার জন্য বাজীকর যেমন করে তাসগুলো দর্শকদের সামনে ছড়িয়ে ধরে, তিনিও তেমনিভাবে সব চিঠিগুলো মেলে ধরলেন, চোখের সামনে। তারপর খুব মন দিয়ে সব চিঠিগুলোকেই একবার দেখে নিলেন। প্রত্যেক-দিন সকালে খামগুলো ছেঁড়বার আগে সেগুলোকে এমনি করে একবার দেখে নেওয়াই তাঁর অভ্যাস।

এই সময়টাতে তাঁর মন কখন আশা-উজ্জ্বল আনন্দে, কখনও অনুসন্ধিৎসায়, কখন বা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠত—এই সব মোহরাঙ্কিত রহস্যে ঢাকা কাগজগুলো কি সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে তাঁর কাছে। যে বার্তা রয়েছে ওদের বুকে, তা কি আনন্দের, সুখের অথবা দুঃখে ভরা। চিঠিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই তিনি সেগুলোকে দু'তিনটে ভাগ করে রেখে দিতেন। কোন্ চিঠিগুলো যে কোথা থেকে আসছে, কোন্‌গুলোর থেকে তিনি কি রকম সংবাদ পাবেন, তা তিনি বুঝতে পারতেন। এইগুলো বন্ধুদের, এগুলোর খবর জানবার বিশেষ আগ্রহ নেই; বাকীগুলো অপরিচিত লোকদের প্রেরিত। অপরিচিত হাতের লেখাগুলোকে তাঁকে একটু বিশেষ চঞ্চল করে তুলত। এই লোকগুলো তাঁর কাছ থেকে কি চায়? ঐ চিঠিগুলো যারা লিখেছে, তাদের কাছে ভয়, ভাবনা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মত কিছু আছে না কি?

আজ একখানা চিঠি একটু বিশেষত্ব নিয়েই তাঁর চোখে পড়ল। চিঠিখানা খুব সাদাসিদে—ভেতরে যে বিশেষ কিছু তা মনেই হয় না। তবুও তাঁর মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠল—অন্তরে যেন একটা কাঁপন জাগিয়ে দিলে।

তিনি ভাবলেন—"এটা কার কাছ থেকে এল? হাতের লেখাটা চেনা চেনা ঠেকছে অথচ কে যে লিখলে, তা তো বুঝতে পারছি না।"

আস্তে আস্তে দু-আঙুলে খামখানা তুলে ধরে—না খুলেই তার ভেতর দিয়ে কিছু পড়া যায় কি-না, তার চেষ্টা করলেন।

তারপর চিঠিখানার আঘ্রাণ নিয়ে, তিনি টেবিলের ওপর থেকে "ম্যাগনিফাইং গ্লাস"-খানা তুলে নিলেন। কোনও লেখা অস্পষ্ট থাকলে তা ভাল করে দেখবার জন্য তিনি এই কাচ-খানা ব্যবহার করতেন। হঠাৎ তাঁর স্নায়ুগুলো যেন অবসন্ন হয়ে পড়ল—"কার দেওয়া চিঠি এ?—লেখাটা আমার খুব পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু সে তো বহুদিন আগের কথা। দূর ছাই কার কে জানে? হুঁ—হুঁ, এ কিছু নয়, কেউ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে আর কি?"

এবার তিনি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলেন—

প্রিয় বন্ধু!

তুমি যে আমাকে ভুলে গেছ, তাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ পঁচিশ বছরের ভেতর আর তো আমাদের দেখাশুনো হয় নি। তখনকার সেই তরুণ মন এখন প্রাচীনের কোঠায় এসে পৌঁচেছে। সেই তোমায় বিদায় জানিয়ে প্যারিস থেকে চলে আসতে হ'ল আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে। সেই আমার বৃদ্ধ স্বামী—তাঁকে কি মনে পড়ে তোমার? পাঁচ বছর হল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এবার আমায় প্যারিসে ফিরতে হ'ল। মেয়েটি বছর আঠারোর হয়েছে, বিয়ে তো দিতে হবে। তুমি একে দেখনি—এ কিন্তু বড় সুন্দর দেখতে হয়েছে। তার বিয়ের কথা তোমাকে জানালাম—কিন্তু তুমি যে এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে মনোযোগ দেবে না, সে তো জানা কথা।

আমি শুনেছি—তুমি সেই সুন্দর, সৌখীন লরমেরিণই আছ। যাই হোক্, যদি তোমাদের সেই আদরের লিসি, যাকে তুমি 'লাইসন' বলে ডাকতে, তার কথা তোমার মনে থাকে, তবে আজ সন্ধ্যায় তোমার নিমন্ত্রণ রইল ভ্যান্সের এই ব্যারণ-পত্নীর বাড়ী। আজও কতকটা আবেগভরে তোমার সেই চিরবিশ্বাসী বন্ধু তোমাতেই অনুরক্ত একখানা হাত দিচ্ছে এগিয়ে—যা তুমি অবশ্যই জড়িয়ে নিও তোমার হাতে, কিন্তু আর চুম্বন ক'র না। ওগো জ্যাকুলেট! এর জন্য আমি আমার অদৃষ্টের উপর কোন দোষ দিই না।

"লিসি ডি ভ্যান্স"

লরমেরিণের বুকের ভেতরটায় একটা স্পন্দন উঠল। সে বসে পড়ল একখানা আরাম-কেদারায়। চিঠিশুদ্ধ হাতখানা রয়েছে তার হাঁটুর ওপর—দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। একটা জিনিষের তীব্র অনুভূতির ফলে তার চোখ ছেপে উঠেছে জলে।

যদি জীবনে সে কোনও নারীকে ভালবেসে থাকে, তবে সে এই লিসি—ভ্যান্সের লিসি। তার চুলের রঙ ছিল এক চমৎকার রকমের; আর চোখ দুটি ছিল ঈষৎ ধুমেল। তাই সে আদর করে তাকে ডাকতো "সিস্তার ফুল"। বাস্তবিক কি চমৎকার সুন্দর, আর মনোহর রূপ ছিল তার—আজকের এই

শীর্ণতাপ্রাপ্তা ক্ষীণ ব্যারণ-পত্নীর। এর স্বামী ছিল বাতে পঙ্গু এক ব্যারণ—মুখে তার আঁচিল আর ব্রণ। হঠাৎ একদিন সেই ব্যারণ এসে একে নিয়ে চলে গেল নিজের দেশে। তারপর আটকে রাখলে একে—আর একবারও আসতে দিলে না। এটা শুধু সে বিদ্বেষের বশেই করেছিল; কারণ সুন্দর লরমোরিণকে দেখে তার মনে জেগেছিল শঙ্কা।

হাঁ, সে তাকে ভালবাসত এবং লিসিও যে তাকে ভালবাসে, এ বিশ্বাস তার ছিল। সে আদর করেই তার নাম দিয়েছিল 'জ্যাকুলেট' আর এক অতুলন-ভংগীতে সে উচ্চারণ করত ঐ নামটা।

মন থেকে মুছে যাওয়া অতীতের কত মধুর স্মৃতিই আজ করুণ হয়ে দেখা দিতে লাগল তার অন্তরে। একদিন সন্ধ্যায় নাচের মজলিশ হতে বাড়ী ফেরবার সময় লিসি তাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে চললো, 'বয়েস ডি বুলোনে'—একটু ঘুরে ফিরে আসবার জন্য। তখন বসন্তকাল, আকাশ বাতাসের অবস্থা ছিল চমৎকার। সেই উষ্ণ বাতাস পরিপূরিত হয়ে উঠল তার বডিসের সুগন্ধে—তার শরীর থেকে মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছিল বাতাসে ভর করে। রাত্রিটা ছিল স্বর্গীয় সুষমায় ভরা। লেকের ধারে পৌঁছে তারা দেখলে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের কিরণ এসে পড়েছে জলের ওপর। সে দৃশ্য দেখে লিসির চোখে এল জল। বিস্মিত হয়ে সে জানতে চাইল তার কাঁদবার কারণ।

উত্তরে লিসি বললে—"আমি ঠিক জানি না; তবে এই চাঁদের আলো আর জলের শোভাই আমাকে বিচলিত করছে। যখনই কবিদের উপভোগ্য কোন জিনিষ আমার চোখের সামনে পড়ে, কি জানি কেন তারা আমার অন্তরকে আকর্ষণ করে, আর আমি কেঁদে ফেলি।"

সে একটু হাসলে, আর এই স্ত্রীসুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের মনোহারিত্ব তার মনটাকেও একটু দোলা দিলে। এই সব দুর্ব্বল নারী মনের একটুখানি উচ্ছ্বাসেই এরা অভিভূত হয়ে পড়ে। সে আবেগভরে টেনে নিলে তাকে বুকের মাঝে—বলে উঠলঃ—

"আমার ছোট্ট লিসি! তুমি কি সুন্দর!"

সুরে তার একটা মিষ্টতা। কি মোহনীয়তার মাঝেই উন্মেষিত হচ্ছিল এই প্রেম; কিন্তু এর আয়ু হয়ে এল ক্ষীণ—উত্তাপটুকু গেল মাঝপথেই নিভে—অতি দ্রুত ঘটে গেল এ সবের সমাপ্তি। ব্যারণের মধ্যের বৃদ্ধ পশুটা করেছিল একে বিয়ে। তারই দাবীতে সে তাকে নিয়ে চলে গেল—আর তারপর থেকে তাকে দেখা করতে দিলে না কারুর সঙ্গে।

মাস দুই তিন ধরে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে লরমোরিণ ভুলিয়েছিল তার মনকে। প্যারিসে যারা অবিবাহিত পুরুষ, তাদের মনে একজন স্ত্রীলোকের স্থান অনায়াসেই আর একজনের দ্বারা পরিপূরিত হতে পারে। কিন্তু লরমোরিণ শুধু লিসিরই জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছিল তার হৃদয়-দেউল। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, আজও তার ভালবাসা বেঁচে আছে লিসিকে ঘিরে।

সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"নিশ্চয়ই আজ আমি তার নিমন্ত্রণ রাখতে যাব।" কথাটা একটু জোরেই সে বলে ফেলেছিল।

অভ্যাসবশে আয়নায় সে আর একবার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিলে। তার মনে ভেসে উঠল এই চিন্তা—"আজ সে আমার চেয়েও হয়তো বেশী বুড়ো হয়ে গেছে।" সে যে আজও তার কাছে নিজেকে সুন্দর সতেজ বলে পরিচয় দিয়ে তাকে চমক লাগিয়ে দিতে পারবে—আর সেও হয়ত একটা উচ্ছ্বাসের বশে সেই অতীতদিনের কথাগুলো ভেবে দুঃখ করবে—এই সব ভাবতে সে নিজের মনে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল।

এবার সে বাকী চিঠিগুলো দেখতে লাগল, কিন্তু প্রয়োজনের আধিক্য সেগুলোতে ছিল না। ....

সমস্ত দিনটাই তার কাটল এই সব কল্পনার ভেতর দিয়ে। না জানি তাকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে? আজ এই পঁচিশ বছর পরে এইভাবে তার সঙ্গে দেখা হওয়াটা কতই না মজার হবে! সে কি শুধু একাই তাকে চিনতে পারবে?

সে একটু মেয়েলী ধরণেই তার প্রসাধনটা আর একবার সেরে নিলে। কোটের সঙ্গে শাদা ওয়েষ্ট কোটটা তাকে ভাল মানায় বলে সেইটেই সে পরে ফেলাখলে। মাথায় সে সখ করে চুল রেখেছিল—চুলটা আর একবার ভাল করে কুঁকড়ে নেবে বলে নাপিত ডেকে পাঠালে। তারপর খুব সকালে করেই সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। তার ইচ্ছা হল, সে দেখিয়ে দেবে তাকে দেখতে যাওয়ার আগ্রহটা তার কত বেশী।

নূতন করে সাজানো একখানা বসবার ঘরে ঢুকতেই তার চোখে পড়ল এ্যাণ্টিক সিল্ক ফ্রেমে বাঁধান তারই একখানা প্রতিকৃতি দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। ফটোখানার রং মলিন হলেও সেখানা তার অতীতদিনের সৌভাগ্যের পরিচয় দিচ্ছে।

সে বসে রইল সেই ঘরে তার আসার পথ চেয়ে: পিছন দিক থেকে একটা দরজা খুলে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে পিছন ফিরতেই দেখে একজন স্ত্রীলোক তারই দিকে এগিয়ে আসছে, তার হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে। তার মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে।

হাত দুখানা ধরে সে একটির পর একটিকে চুম্বন করতে লাগল—কি গভীর সে চুম্বন! তারপর যে নারীকে একদিন ভালবেসেছিল, তারই দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

হাঁ, এ একজন বর্ষীয়সী মহিলা বটে, কিন্তু একে তো সে চেনে না। আর তার মুখের হাসি কান্নার প্রতীক বলেই মনে হচ্ছে।

সে নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে অস্পষ্টভাবেই বলে উঠল—"লিসি! একি তুমিই?"

উত্তরে সে বললে—"হাঁ, সেই আমিই! আমাকে তুমি চিনতেই পারছ না, নয়? ওগো আমার সে কত দুঃখ—কত দুঃখ! দুঃখই আমার জীবনকে নিঃশোষিত করে এনেছে। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ—কিংবা না থাক—তার দরকার নেই। কিন্তু তুমি তো আজও নিজেকে বেশ সুন্দর আর নবীন করে রাখতে পেরেছ। যদি দৈবাৎ তোমার সঙ্গে রাস্তায় আমার দেখা হতো সেই, তাহলে আমি তো

"জ্যাকুলেট" বলেই চেঁচিয়ে উঠতাম। নাও, এখন বস। আগে আমরা একটু গল্প-গুজব করি এস। তারপর তোমাকে আমার মেয়ে এনে দেখাব। সে এখন বড় হয়ে ঠিক আমার মত দেখ্‌তে হয়েছে কিংবা আমিই হয়ত তার মত—না, না—ঠিক তা নয়; সেই আগে যেমন আমি ছিলাম, তাকে ঠিক সেই রকম দেখাবে, দেখো.......................কিন্তু প্রথমে আমি তোমার সঙ্গে খানিক একা থাকতে চেয়েছিলাম। কি জানি, হয়ত এই প্রথম সাক্ষাতের সময় আমার দিক থেকে কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পেতেও পারে—এই ভয়ে। থাক্, সে সব এখন চুকে গেছে। বস, বন্ধু বস।"

লরমেরিণ তার হাত ধরে বসে রইল তার পাশে; কি যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না; এই নারীকে সে তো চেনে না—তার মনে হল একে সে এর আগে বোধ হয় আর কখনও দেখে নি। তবে সে কি করতে এখানে এসেছে? কি কথাই বা সে বলবে? তবে কি অতীতের কোন কথা সে তুলবে? আজ তাদের দুজনের মধ্যে কি কোনরকম ব্যবধান গড়ে ওঠেনি? এই বর্ষীয়সী মহিলার সামনে বসে সে আর কিছুই মনে করতে পারলে না। যখন সে তার সেই আদরের লিসি—সেই সুন্দর "সিন্ডার ফুলের" কথা মনে করত, তখন যে সব মনোময় জিনিষ তার মনে মধুর আলোড়ন জাগাত—তারপর দুঃখের যে তীব্র কশাঘাত পড়ল মনের ওপর—সে সব কোন কথাই এখন আর তার মনে এল না। কিন্তু যে নারীকে সে পূর্ব্বে একদিন ভালবেসেছিল, সেই বা কোথায় গেল? সেই সুন্দর কল্পনার নারী—সেই সুন্দরী, সুকেশী, ধূসরাক্ষী তরুণী—যে তাকে আদর করে "জ্যাকুলেট" বলে ডাকত—সে আজ কোথায় গেল?

তাদের দুজনেরই মুখে কথা নেই—চিত্ত উদ্বেল—স্বস্তির মধ্যেও একটা গভীর পীড়া নিয়ে নিশ্চলভাবে তারা বসে রইল পাশাপাশি!

তারপর দুই একটা খুব সাধারণ কথা—তাও অসংলগ্ন-ভাবে আলাপ অলোচনার পর ব্যারণ-পত্নী উঠে গিয়ে একটা ঘণ্টার বোতাম টিপে দিয়ে বল্লেন—"আমি রেণিকে ডেকে পাঠালাম।"

দরজায় একটা টোকা শোনা গেল—আর শোনা গেল পোষাকের একটা খস্‌খস্ শব্দ—পরক্ষণেই একজন তরুণী-কণ্ঠে ডেকে উঠল—"মা! আমি এসেছি।"

লরমেরিণ এমনভাবে বসে রইল, যেন সে কোন ছায়া-মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছে।

'মেড্‌ময়সেল! নমস্কার" তার স্বর কাঁপছে।

তারপর সে মেয়েটির মায়ের দিকে চেয়ে বললে—ওহো, এ অবিকল তুমি!................."

আগে সে যে লিসিকে চিন্‌ত—সত্যই এ যেন সেই-ই—একবার অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে এসেছে। পঁচিশ বছর আগে সে যে নারীর হৃদয় জয় করেছিল, এই তরুণীর মধ্যেই সে আবার তাকে খুঁজে পেলে। তবে একে আরও একটু তরুণ, নবীন আর শিশুসুলভ দেখাচ্ছে।

এই তরুণীকে বাহুবেষ্টনে বুকের মাঝে টেনে তার কানে কানে আবার সেই কথাটাই বলবার জন্য তার মনে একটা উদ্দাম বাসনা জেগে উঠল—"লাইসন, আজ আমাদের সুদিন।"

একটা চাকর এসে জানিয়ে গেল খাবার তৈরী হয়ে গেছে। তারা সকলেই চল্‌লো আহার করতে।

আহারে বসে কি ঘটল? তারা কি বল্‌লে? সেই বা কি উত্তর দিলে? তার মনে হ'ল, সে যে রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে, তা মস্তিষ্ক-বিকৃতির পূর্ব্ব-লক্ষণ। তার মনের মধ্যে রয়েছে, শুধু একটা চিন্তা—যা ক্রমে ক্রমে হয়ে আস্‌ছে অস্পষ্ট—যার মধ্যে চলেছে একটা বিরোধিতা। সে এই নারী দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই ভাবছে—"কোন্‌টি আসল?"

মেয়েটির মা বারকয়েক হাসতে হাসতে বল্‌লে—"চিন্‌তে পারছ?" সেই মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে, আবার তার মনে পড়ে গেল সেই হারান স্মৃতির কথা। সে বিশবার এই কথাটা বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল—"লাইসন, তোমার মনে পড়ছে আমাকে?" অথচ সেই পক্ককেশা নারী একটা কোমল দৃষ্টি দিয়ে যে তার দিকে চেয়ে আছে, তা সে ভুলেই গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ঠিক বুঝতে পারলে না যে, কেমন করে তার মনটা অত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল। সে বেশ বুঝতে পারলে যে, যে নারীকে সে বহুদিন পূর্ব্বে দেখেছিল, তার সঙ্গে আজকের এই নারীর অনেক সাদৃশ্যই নেই। পূর্ব্বের সেই নারীর কথাবার্ত্তায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে তার সমস্ত সত্তার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা সে আজ আর খুঁজে পাচ্ছে না। তার সেই পুরানোদিনের ভালবাসার কথা স্মরণ করবার—আর সেই নারীর কাছ থেকে পাওয়া যে জিনিষটার অভাব সে অনুভব করছে অথচ যা এই নবীনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—সেই জিনিষটাকেই আবার খুঁজে বার করবার জন্য প্রবল চেষ্টা চল্‌ল তার মনের ভেতর।

ব্যারণ-পত্নী বল্‌লেন—"বন্ধু, তুমি তোমার সেই আগের সজীবতা হারিয়ে ফেলেছ।"

"আর অনেক জিনিষই হারিয়ে ফেলেছি।" তার স্বরটা বেশ স্পষ্ট হ'ল না। তার অন্তরটা গেছে উত্তেজনায় ভরে; সে বুঝলে তার পুরান ভালবাসাটা আবার যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া হিংস্র পশুর মতই তাকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছে।

সেই তরুণী কত কথাই বলে চলেছে। সময় সময় এমন দু'একটা কথা সে বলছিল, যা শুন্‌লে মনে হয়, সে যেন সেই কথাগুলো তার মায়ের কাছ থেকে ধার করে বল্‌ছে। তার কথা বলার বা চিন্তা করার ভঙ্গীটিও ছিল তার মায়ের অনুরূপ। মানুষ একসঙ্গে থাকার ফলে তাদের মধ্যে মনের আর আচরণের যে সাদৃশ্য জন্মায়, এ মেয়েটিরও সে সবই হয়েছিল তার মায়ের মত। এই সব দেখে আর তার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে লরমেরিণের সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছিল। এতে তার অন্তরটা যাচ্ছিল বিদীর্ণ হয়ে। নূতন করে খুলে যাওয়া দুঃখের ক্ষত মুখগুলো দিয়ে আবার ঝরে পড়তে লাগল রক্তের ধারা।

লরমেরিণ সেখান থেকে একটু সকাল করে উঠে এসে

বায়ুসেবন ক্ষেত্রটার চারদিকে একবার ঘুরে এল। কিন্তু সেই তরুণীর মূর্ত্তি কিছুতেই তার মন থেকে মুছে যাচ্ছিল না—তা যেন ছায়ার মত তার অনুসরণ করছিল। তার হৃৎপিণ্ডের গতি হ'ল দ্রুত—রক্তে বইছিল একটা উন্মাদনা। ঐ দুজন রমণীর কেউই ঠাঁই পেলে না তার মনে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল শুধু একজন—সে সেই অতীতের এক তরুণী। পূর্ব্বের মত সে আজও ঢেলে দিলে তাকে নিজের সবটুকু ভালবাসা। পঁচিশ বছর পরে আজকের এই প্রেম নিবেদনে গভীরতা একটু বেশীই ছিল। এই বিচিত্র, পীড়াদায়ক জিনিসটাকে একবার বেশ করে ভেবে নিয়ে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করবার জন্য সে বাড়ী চলে গেল।

কিন্তু একটা মোমবাতী হাতে করে সেই আয়নাখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় সে একজন মানুষের ছায়া দেখতে পেলে তাতে। তার বয়স হয়েছে অনেক, চুল শাদা হয়ে আসছে। সে আজ বাড়ী থেকে বেরুবার সময় এই আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে কত রকম চিন্তাই না করেছে—নিজেকে নিজেই কত তারিফ করেছে। এখন হঠাৎ সে বুঝতে পারলে যে, প্রথম যখন লিসিকে সে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল, তখন তাহার চেহারাটা অন্যরকম ছিল—সে বুঝতে পারলে লিসির কাছ হতে যখন সে ভালবাসা পেয়েছিল, তখন সে কত মনোহর আর সুশ্রী ছিল।

কোন একটা বিচিত্র জিনিষ ভাল করে দেখতে গেলে মানুষ যেমন 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস' ব্যবহার করে, সেই বাতিটা আয়নার খুব কাছে নিয়ে গিয়ে তেমনি নিখুঁতভাবেই নিজেকে দেখতে লাগল। সে দেখতে পেলে, তাহার গায়ে চামড়ায় ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করেছে—কি বিশ্রী হয়েছে সেগুলো—দেখলে যেন ভয় লাগে অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও সে তা জানতে পারেনি।

সে আজ তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে মুষড়ে পড়ল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল—"পরমেরিণ! সব শেষ হয়ে গেছে।"*

---

*একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ।

শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ

(৭৩১ পৃষ্ঠার পর)

ফুলমণি চলে যাবার পর, কারা সব এল। তারা তার রক্তে রাঙা জামা-কাপড় দিয়ে বললে সেগুলো পরতে। সে বলল ফুলমণির কথা আর তার আনা পরিষ্কার কাপড়-জামার কথা। আরও বললে যে সে হাঁটবে কি, দাঁড়াতেই পারেনা। কিন্তু তারা সে-কথায় কান দিলে না। একজন তাকে সেই রক্তমাখা কাপড় পরিয়ে দিলে—গন্ধে আবার তার বমির ভাব ফিরে এল। এর পরে তাকে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে বলা হল অপেক্ষা করতে।

অনেকক্ষণ বাদে ফুলমণি এল সঙ্গে আর একজন মজুর এ-পাড়ার—তাদের পুরাতন বন্ধু। তারা তাকে নিয়ে রিক্সায় তুলল। অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবে। রাস্তায় আবার সে চেতনা হারাল।

আবার রবিবার ফিরে এসেছে। সুধা যখন চোখ মেলে তাকাল, সূর্য এসে পড়েছে তার মুখে। নিঃসাড়েই বিছানায় পড়ে থাকে সে। ব্যাণ্ডেজ এখন তার বাঁ চোখটিকে কেবল ঢেকে রেখেছে। মনে পড়ে যায়, বাঁ চোখ তার জন্মের মত গিয়েছে। তখনই আবার চোখ পড়ে ফুলমণির দিকে।

কেমন আছ-গা আজ?

অতি কষ্টে সে মাথা ফিরিয়ে ফুলমণির চোখে চোখ রাখে। দম নিয়ে নিয়ে বলে—

আমি কিছু করিনি। ঝামেলার ভিতরে মাথা দিইনি, তবু......।

সে কি আর আমি জানিনে। কথা বল না বেশী, দাঁড়াও, আমি তোমার চা নিয়ে আসি।

আগে জানলে যেতামই না ওখানে। আমি শুধু চেয়েছিলাম গঙ্গাকে খুঁজে বার করতে। কে চায় এ-সব ঝঞ্ঝাট বাধাতে। নিত্যর ভাই গেছল পরিবার আর ছেলেমেয়ে নিয়ে, তারক আর তার বাপ-মা......কি যে হল তাদের।

বালিশের উপরে মাথাটা একটু ঘুরাতে চাইল—ক্ষীণ-কণ্ঠে একটা হাহাকার মুক্তি পেল তার মুখ থেকে।

ফুলমণি জানালাটা বন্ধ করে দিলে—রোদটা আজ আবার চনচনে হয়ে উঠেছে—আষাঢ় মাসের মেঘের আড়াল থেকে উঁকি-মারা সূর্যের আগুন ছড়ান রোদ।*

*Margaret Marshell-এর 'Remember Chicago!' গল্প অবলম্বনে।

আশ্চর্য বাতি

বৈজ্ঞানিকের অসাধ্য সাধনে আলাদিনের আশ্চর্য বাতি প্রকৃতই আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ড দেশীয় কেমিষ্ট মিঃ জে মুইর এই বাতিটির আবিষ্কর্তা; কোনও ইংলিশ প্রতিষ্ঠানের সহযোগে তিনি এই বিষয় লইয়া এখনও গবেষণায় ব্যাপৃত। কিন্তু বাতিটির সম্ভাব্যতা দেখা যাইতেছে একেবারে অশেষ।

বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিরোধে এই বাতি চিকিৎসকগণ দ্বারা সাদরে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার অনুরূপ উদ্যমের সহিতই পুলিশ ইহা দ্বারা আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে।

শুধু অপরাধ অনুসন্ধানেই নয়, খাদ্য-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভাগ কর্তৃকও ইহা ব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে।

এই বাতির রশ্মিতে উন্মুক্ত করিয়া ধরিলে জাল-নোট অতি সহজেই ধরা পড়ে, এমন কি একতাড়া সাচ্চা নোটের ভিতর হইতেও। ইহা খাদ্যের ভিতরে দূষিত পদার্থ বা ভেজালের অস্তিত্ব উদঘাটিত করে—তাহা সেই খাদ্য দ্রব্য যে প্রকারেরই হউক।

ব্রিটেনের সর্বত্র সি-আই-ডি কর্তৃক অনেক অনুসন্ধানেই এই বাতির ব্যবহার প্রচলিত—পোষাক পরিচ্ছদে রক্তের দাগ উদ্ধারে, ছিন্ন কেশ, টিপসই বা আঙুলের ছাপ অথবা অন্যান্য অপরাধ নিদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে, যাহা নগ্ন চোখে দ্রষ্টব্য নহে।

মোটরগাড়ীর চোর পাকড়াও করিতে গোয়েন্দাগণ এই বাতির রহস্যভেদী চক্ষুর (লেন্স) সাহায্য গ্রহণ করে। নাম-প্লেট, গাড়ীর নম্বর-প্লেট প্রভৃতিতে কৃত্রিমতা দ্বারা পরিবর্তন করিলে, এই বাতির রশ্মিতে ঘষিয়া তোলা মূল লেখা পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়।

যে সমস্ত জিনিষ পরখ করিতে হইবে, তাহা এই বাতির আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে রাখা হয়। কয়েক সেকেণ্ড মধ্যে ঐ জিনিসগুলি উপাদানের বৈশিষ্ট্যে নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক বর্ণের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতে থাকে। উপাদানের স্বাভাবিক বর্ণ প্রদর্শন না করিয়া অন্যপ্রকার হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে জিনিষটি ভেজাল।

এই বাতি এমনভাবে নির্মিত যে, সকল প্রকার পেশা, ব্যবসায় বা শিল্পে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেমিষ্টগণ তাহাদের ঔষধ—তরল হউক, বটিকা হউক, সকল প্রকারেরই কৃত্রিমতা নির্ণয় করিতে পারে ইহার সাহায্যে।

নব চীনের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

জাপানের চীন-অভিযানের ফলে কত কত অঞ্চলের শিশু যে আজ অনাথ ও নিরাশ্রয়, তাহা সংখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহাদের অবস্থান ও শিক্ষাদানের জন্য প্রকার ১০০০ নিরাশ্রয় বালক-বালিকা লইয়া প্রতিষ্ঠান দুইটি "চিলড্রেনস্ হোম" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রথমত এই প্রকার ১০০০ নিরাশ্রয় বালক-বালিকা লইয়া প্রতিষ্ঠান দুইটি খোলা হয়। বর্তমানে ৬ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের ৫০০০ উপায়হীন অনাথ বালক-বালিকার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চুংকিং-এর এই দুইটি বাসগৃহ ছাড়া সকল প্রদেশেই অনুরূপ "শিশুমঙ্গল গৃহ" নির্মিত হইবে। খোরাক-পোষাক প্রদান করিয়াই কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত নাই, শিশুদের নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থাও হইয়াছে। যাহাতে উহারা গোড়া হইতে স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখে, আচার-ব্যবহারে ভদ্র হয়—সেই শিক্ষাপ্রদান ব্যাপকভাবেই করা হয়। তদুপরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় লেখাপড়াও শিখান হয়। শিল্প শিক্ষাদানের গৃহ নির্মিত হইতেছে।

শিশুমঙ্গল গৃহের শিশুদের শিক্ষাদান প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত চলে। ছোট ছোট দলে "বয়-স্কাউটের" মত বিভক্ত করিয়া এক একজন শিশুকেই তাহার নেতা করা হয়। শিক্ষকের নির্দেশে নেতা নিজ দল লইয়া গৃহ-উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার পর্যবেক্ষণ করে। শিক্ষক তখন প্রশ্ন দ্বারা তাহাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরখ করেন এবং ভুল-ত্রুটি শোধরাইয়া দেন। সেলাই, বোনা, সূতাকাটা প্রভৃতিও মেয়েদের শিখান হয়।

জীবনের বাস্তব সত্য

ক্রমবর্ধমান জটিলতায় ঘেরা আজিকার দুনিয়ায় বাস করিবার একটা পরিণতি এই যে, আমরা আর কোনও সরল রহস্যবিরহিত সংবাদকণাটিকে পর্যন্ত উহার স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করি না। জনৈকা ডিউক-পত্নীর পোষা কুকুরটা চুরি হইয়া গিয়াছে; আমরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলি—বুঝলে কিনা, নিশ্চয় এর ভিতর বামপন্থীদের কূট ষড়যন্ত্র রয়েছে! বিদেশী রাজনীতিক একজন ছেলেমেয়ে পরিবার সহ ছুটি উপভোগ করিতে যান সাগরতীরের শহরে; "ওঃ!" চোখ মটকাইয়া আমরা ইঙ্গিত করি, "ব্যাপার তো তাহলে সঙ্গিন বলতে হবে।" আমরা সদা-সন্দিগ্ধ—সদাই খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত আপাতদৃষ্টিতে যাহা নির্দোষ, তাহার অন্তর-মহলে কোন্ অব্যক্ত অদৃশ্য রহস্য উজান বহিয়া চলিয়াছে। নগ্ন চোখ যে সত্য আবিষ্কার করে, আমরা নিশ্চিত ধারণা করিয়া লই, উহার সহিত গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে আরও কিছু বিচিত্র—আরও কিছু অসামান্য।

কাজেই যখন ওয়ারস হইতে প্রেরিত ছয়টি মৃত সারস (Stork) আসিয়া পৌঁছিল হেস্‌ল্‌মিয়ার যাদুঘরকে উদ্দেশ্য করিয়া, তখন ইহা তো স্বাভাবিকই যে, এই ঘোষণার অন্তরালে অনেক কিছু বিরাট সম্ভাব্যতার সোনালী স্বপ্ন ইংরেজদের মনের কোণে ফুটিয়া উঠিবে। অনেকে আবার সহসা এতটা যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিল যে, তাহারা সারে শহরে যাইয়া হাজির হইল প্রত্যক্ষ করিতে—সত্যই সারস ছয়টাকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া [illegible]

দিকে পুনরায় যাত্রা করে কি-না। বিজ্ঞের মত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অন্য একদল বলিয়া উঠিল—'আশ্চর্য মিল যা হোক্; পাখীগুলোর আবির্ভাব হ'ল ঠিক সেইদিনে, যেদিন হাউস অব্ লর্ডস্ জন্মহারের হ্রাস সম্পর্কিত বিতর্কে সমগ্র ব্রিটেনবাসীকে চমকিত ক'রছে! নিশ্চয় একটা ষড়যন্ত্র—ঘোর নৃশংস ষড়যন্ত্র গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে। কেননা, ব্রিটেনবাসী যখন গ্যাস-নিরোধক বক্তৃতা শুনতে বা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ শিখতে ব্যাপৃত, সেই ফাঁকে গবর্ণমেণ্ট এসে ব্রিটেনদের গৃহে গৃহে দোলা ভর্ত্তি কর রেখে যাবে জোড়া জোড়া শিশুসন্তান দিয়ে। ষড়যন্ত্র আর কাকে বলে শুনি?'

ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিবে ইংরেজদের মত সেয়ানা লোকদের নিমেষের জন্যও ধোঁকা দিতে—এমন একটা অসার অবিশ্বাস্য বিকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা—যাহার সারমর্ম হইল মৃতপাখীর হাওয়া বদলের শফর; একটা জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা যাহারা, তাহারা যদি জীবনের বাস্তব সত্য সম্বন্ধে এতটা অজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সে জাতির আর আশা কোথায়? ইহার পরে হয়ত একদিন গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক ভাতা প্রদানের অঙ্গীকার প্রচার করিবে দেশব্যাপী ছোটবড় সকল গুরুবেরি-কৃষি নিরত ঝানু ওস্তাদদের প্রতি।

মদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষায় দৌড় প্রতিযোগিতা

ক্ষিপ্রতা ও শারীরিক যোগ্যতার উপর সুরার প্রভাব সু কিম্বা কু—এই বিতর্কের মীমাংসার জন্য জনৈক ক্রাইষ্ট-চার্চ 'ডন্' (অক্স্ফোর্ড) নাম যাঁহার অনারেবল্ ফ্র্যাঙ্ক প্যাকেনহাম—তিনি প্রতিপক্ষে আটজনের এক দৌড় প্রতি-যোগিতার আহ্বান প্রেরণ করিয়াছেন অক্সফোর্ডের মেয়র ডাঃ এইচ্ টি গিলেটের নিকট এই মর্ম্মে যে, মেয়র তাঁহার সুরা বর্জনকারী দল হইতে আটজন বাছিয়া লউন, উঁহারা মিঃ প্যাকেনহামের মিতপায়ী দলের মনোনীত আটজনের সহিত মিলে দৌড়ে অবতীর্ণ হউক। উহার ফলাফল হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে পরিমিত সুরাপানের ফলে দৈহিক অবনতি হয় কি না। মিঃ প্যাকেনহাম আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মনোনীত দলে তিনি স্বয়ংও থাকিবেন দৌড়ের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী।

ডাঃ গিলেট একজন সাক্ষাৎকারীর নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি এখনও ঐ আহ্বান-পত্র প্রাপ্ত হন নাই, পত্র না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বলিতে পারেন না, তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মতি দিবেন কি না। বিশেষ করিয়া তাঁহার অভিমত এই যে, এই প্রকার পরীক্ষায় সুরা-প্রভাব বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না, কারণ একপক্ষ সুনিপুণ দৌড়ে অভিজ্ঞ অ্যাথলিট্ আটজনের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। দৌড়ের সাফল্য মদ্যপান বা বর্জনের উপর আদৌ নির্ভর করে না, কাজেই এই উপায়ে মদ্যপানের সার্থকতা বা বর্জনের উপকারিতা কিছুই প্রমাণিত হইবে না।।

এই বিতর্ক উপস্থিত হইবার কারণ নিম্নলিখিত

গবর্ণমেণ্ট সুরা বর্জন কমিটি সুরাপানের ফলাফল বিবৃত করিয়া একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছে। মেয়র ডাঃ গিলেট ঐ রিপোর্টটি মিঃ প্যাকেনহামকে পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ প্যাকেনহাম উক্ত রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইয়া উপরিলিখিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে মেয়রকে আহ্বান করিয়াছেন এবং এই পরীক্ষা দ্বারা তিনি মিতপায়ীদের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্টতর না হইলেও কোন ক্রমে অপকৃষ্টতর নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

মৃতের দ্বারা মৃতপ্রায়ের পুনরুজ্জীবন

চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির সংগে সংগে সুস্থ ব্যক্তির রক্ত দ্বারা রুগ্নব্যক্তির জীবনলাভ সম্ভব হইয়াছে। এই উপায়ে আশ্চর্য আরোগ্যলাভ ক্রমেই ব্যাপকতা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু ইহার উপরও এক অদ্ভুত পর্যায়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছে—মৃতের সাহায্যে রুগ্নকে নিরাময় করিয়া। রুশীয় অধ্যাপকগণ—শ্যানভ (Shanov) এবং য়ুদিন (Yudin) মৃত এবং আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির দেহ হইতে রক্ত নিষ্কাশন করিয়া উহা সুদীর্ঘকাল নিখুঁত অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সোভিয়েটে বর্ত্তমানে কয়েকটি হাসপাতাল গড়িয়া উঠিয়াছে, যেখানে বিবিধ প্রকারের মানব-রক্ত ভাণ্ডারজাত করিয়া সুকৌশলে সংরক্ষণ করা হইতেছে। যখনই কোনও অস্ত্রোপচার-সাধ্য রোগীর দেহে রক্ত অনুপ্রবিষ্ট করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই ঐ ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত শক্তির রক্ত লইয়া রোগীর জীবন বাঁচাইতে চেষ্টা করা হয়। এই উপায়েও বহু জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

মানবদেহের প্রতি যন্ত্রই স্বাধীনভাবে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েকদিন পর্যন্ত সজীব ও সচল থাকিতে পারে, যন্ত্রের মালিক ব্যক্তিটির মৃত্যুর পরেও। আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মৃতদেহ হইতে নিষ্কাশিত লিভার (যকৃত) এবং কিড্নিদ্বয় (মূত্রাশয়) দ্বারা জীবন্ত কোনও রুগ্ন ব্যক্তির রোগ আরাম করান যায়। কাজেই বর্তমানে যাহা শুধু 'রক্ত-ভাণ্ডার-সংরক্ষণ' উহাই একদিন মানবদেহের সকল যন্ত্রের—মানবের রক্ত ও ত্বকের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

সুতরাং এমন দিন বোধ হয় বেশী দূরে নয়, যেদিন বিশেষ বিশেষ রোগী এই জাতীয় 'সংরক্ষণ' হাসপাতালে হাজির হইয়া আপন রুগ্ন যন্ত্রের স্থানে মৃতের সংরক্ষিত যন্ত্রটি বদল করিয়া লইয়া পরমায়ুর দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া লইতে সক্ষম হইবে।

প্রাণ বিয়োগের পর মৃতের কোন্ যন্ত্র কত সময় সচল-সজীব থাকিতে পারে তাহার আনুমানিক তালিকা এই প্রকারঃ—(১) মস্তিষ্ক—১০ মিনিট; (২) হৃৎযন্ত্র-মাংসপেশী—২০ মিনিট; (৩) চক্ষু—৩০ মিনিট; (৪) কান—১ ঘণ্টা; (৫) হস্ত ও পদের মাংসপেশী—৪ ঘণ্টা; (৬) রক্ত-অণু—[illegible] দিন এবং (৮) ত্বক—৫ দিন।

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(১০)

আলোর নীচে অন্ধকারের মত প্রতিভার খুব নিকটেই থাকে কতকগুলি বিরোধী শক্তি, প্রতিভাকে যারা শুধু অস্বীকারই করে না অবিশ্বাসও করে এবং পদে পদে তার অগ্রগতিতে বাধা জন্মায়।

প্রতিভাবানের বেশীর ভাগ বাধাই আসে স্ত্রীর নিকট হইতে। সহধর্ম্মিণীগণ স্বামীদের প্রতিভাকে বুঝিতে ভুল করেন এবং এই ভুল বোঝার জন্য অশান্তি লাগিয়াই থাকে।

একদল এই দাম্পত্য-বাধাকে পরাস্ত করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন, আর এক দলের ঘটে পরাজয়। আমাদের দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

তাঁর স্ত্রী দাক্ষায়ণী দেবী স্বামীর সাহিত্য সাধনায় অনেক বাধা দিয়াছেন; তিনি শুধু দেবেনবাবুর শক্তিই অস্বীকার করেন নাই, সাহিত্যকেই তাঁর জীবনের অসাফল্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

তাঁর পিতা কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্নের হাতেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সকলে আশা করিল, তরণ-তারণবাবুর জামাতা একদিন হাইকোর্টের জজ হইবে। কিন্তু জজের পরিবর্ত্তে দেবেন্দ্রনাথ হইলেন একজন সাহিত্যিক —ইহাতে স্ত্রীর রাগ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

পরিবার প্রতিপালনের জন্য দেবেনবাবুকে অবশ্য কোন-দিনই ভাবিতে হয় নাই। প্রথমে আসিত শ্বশুর প্রদত্ত মোটা মাসোহারা, তরণ-তারণের মৃত্যুর পর পাইলেন জমিদারী। তিনি নিজে জমিদার হইলেন বলিলে ভুল করা হইবে। দাক্ষায়ণী হইলেন জমিদার, আর দেবেনবাবুর বন্ধু-বান্ধবদের ভাষায় বলিতে গেলে তিনি হইলেন প্রিন্স কনসর্ট।

উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন নাম হইল না। তাঁর উপন্যাসগুলি মুদিরা সের দরে কিনিতে লাগিল। দেবেনবাবু দেখিলেন ইহা অপেক্ষা সমালোচক হওয়াই সহজ।

সাহিত্য জগতে সমালোচকের শত্রুই সকলের চেয়ে বেশী, যার লেখা খারাপ বলিবে সে শুধু তোমার বোধশক্তির নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, অন্বেষণ করিবে তোমার সহস্র ছিদ্রের।

অল্পদিনের মধ্যেই কেহ তাঁর নাম দিলেন ডোমেস্টিকেটেড জামাতা, সাপ্তাহিক শিঙা বাহির করিল দক্ষ-দেবেন্দ্র সংবাদ।

নির্ব্বিরোধী দেবেন্দ্রনাথ তার পরেই প্রবেশ করিলেন গবেষণার গহন বনে।

আজ কয়েক বৎসর তিনি গবেষণা লইয়াই আছেন, খাতার পর খাতা লিখিয়া আলমারী বোঝাই করেন। লিখিয়া তিনি আনন্দ পান কিন্তু ততোধিক উৎসাহিত হন কোন সমজদার ব্যক্তি রচনার প্রশংসা করিলে।

তাঁর গোটাকয়েক লেখা 'তাণ্ডবে' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিনিময়ে 'তাণ্ডব' সম্পাদক দেবেনবাবুর বাড়ীতে কয়েকবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, কখনও বা তার মোটরে চড়িয়াছেন।

'তাণ্ডব' সম্পাদক অত্যন্ত ভদ্রলোক এবং কৃতজ্ঞ প্রকৃতির। মোটরে চড়িয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিলে তাঁর চরিত্রের এই গুণটি সর্ব্বাধিক প্রকাশ পায়, তখন তিনি বলেন, আজকাল আপনার লেখার খুবই প্রশংসা হচ্ছে।

দেবেনবাবুর বন্ধুরা বলেন, সম্পাদক মহাশয় তাঁর নিকট হইতে কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন (অবশ্য কাগজ চালাইবার জন্য)।

দেবেনবাবুর ব্যক্তিগত অর্থস্বচ্ছলতা ছিল না, সহধর্ম্মিণীর প্রদত্ত মাসোহারার টাকার উপরেই তা ছিল নির্ভর। তিনি টাকা দিয়া পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। দাক্ষায়ণী বলেন, পাণ্ডুলিপি না ছাই, লোকে ওঁকে ঠকিয়ে নেয়।

দাক্ষায়ণী দেখিলেন স্বামীকে সংশোধন করা অসম্ভব, সাহিত্য ব্যাধি তাঁকে পাইয়া বসিয়াছে।

প্রকাশ যেদিন প্রবন্ধ শুনিতে যায় সেইদিন হগসাহেবের বাজার হইতে ফিরিয়া দাক্ষায়ণী কহিলেন, টি-পয় কাপ সব ছড়ান রয়েছে, দেখছি। কোন সাহিত্যরসিক এসেছিল বুঝি?

দেবেনবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, একজন প্রফেসর, খুব পণ্ডিত লোক।

নিশ্চয়ই তোমার লেখার সুখ্যাতি করেছে?

তুমি ছাড়া সকলেই করে।

এই পণ্ডিত লোকটির সঙ্গে আলাপ হল কবে?

কাল।

এরই মধ্যে নিমন্ত্রণ করেছ লেখা শোনাতে?

তিনি আসতে চাইলেন। কাল ইনিই প্রতিমাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন।

ওঃ কালকের সেই ছোকরা সভাপতি?

ভাল ছেলে, খুব সাহিত্যানুরাগী।

যেমন অনুরাগী ছিলেন কমরেড সুসীম, তরুণ কবি রক্তোৎপল, বলিয়াই দাক্ষায়ণী বিদ্রুপের হাসি হাসিলেন।

এর আগেও দেবেনবাবুর সাহিত্যের এইরূপ অনেক যুবক শ্রোতা জুটিয়াছে, কেহ সাহিত্য-রসিক ডাক্তার, কেহবা লেখক ব্যারিষ্টার, কেহ কেহবা শুধু সাহিত্যিক। তাঁর লেখার সুখ্যাতি করিয়াছে সকলেই কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গিয়াছে তাদের এই আর্টপ্রীতির মূল উৎস দেবেনবাবুর গবেষণা নয়, তাঁর কন্যা প্রতিমা।

দেবেনবাবু প্রকাশকে সেরূপ মনে করিতে পারেন না, না না সে অসম্ভব, অমন ভাল ছেলে।

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে আজকাল আর ততটা খিটিমিটি বাধে না, এখন দুজনের যত কিছু মত-বিরোধের সৃষ্টি হয় প্রতিমার বিবাহ লইয়া।

দাক্ষায়ণী কোন পাত্রকে পছন্দ করিলেই দেবেনবাবু বাঁকিয়া বসেন আর কোন পাত্র [illegible]

দাক্ষায়ণী বলেন, ও নিশ্চয়ই অপদার্থ, নিশ্চয়ই একটা সাহিত্যিক।

প্রতিমার মার পছন্দ বিলাত ফেরতা জামাই, আই-সি-এস হইলে ত কথাই নাই; অগত্যাপক্ষে ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার বা চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট।

দেবেনবাবুর ছিল বিলাত ফেরত সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি। বিলাত ফেরতারা প্রায় সকলেই মদ খায়, অন্ততঃপক্ষে বিলাতে খাইত। মদ্যপের হাতে কন্যা সম্প্রদান আর জুয়াচোরকে সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করা একই কথা। তিনি চান শান্তশিষ্ট একটি ছেলে, মনে মনে ভাবেন তার একটু সাহিত্যপ্রীতি থাকিলে আরও ভাল হয়।

দাক্ষায়ণীর চোখে শান্ত স্বভাব একটা গুণের মধ্যেই নয়। সাহিত্য-প্রীতিকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন। সাহিত্য-রসিকদের সাধারণ বুদ্ধি-শুদ্ধি এতই কম যে তাদের কাহারও হাতে প্রতিমাকে দিলে মেয়েটার দুঃখ-কষ্টের আর অবধি থাকিবে না।

এই অধিকতর ব্যক্তিত্ব সম্পন্না স্ত্রীর ভয়ে দেবেনবাবু আর প্রকাশকে লেখা শুনাইতে ডাকেন নাই। আর শুনাইবার মতন অমুদ্রিত কোন রচনাও তখন হাতে ছিল না।

প্রকাশের সঙ্গে ফোনে কথা বলিবার পর দাক্ষায়ণী স্বামীকে বলিলেন, তোমার মাষ্টার সাহিত্যিক আজ ফোন করেছিল।

কি বল্‌লে?

বল্‌বেন আর কি, একবার এখানে আসতে চান এই হ'ল মোদ্দা কথা।

তুমি তার উপর অবিচার করছ।

অবিচার কিছু করিনি।

তুমি কি বল্‌লে তাকে?

ঢং করে রিসিভার রেখে দিলাম।

দেবেনবাবু আর কোন কথা বলিলেন না।

(১১)

কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই দাক্ষায়ণী স্বামীকে বলিলেন, তোমার প্রকাশ মাষ্টারকে ফোন করে দাও।

কেন বল দেখি?

সে পরে হবে, বলে দিও কাল বিকেলে আসতে।

দেবেনবাবু বিস্মিত হইলেন। বিলেত ফেরত নয় এমন কোনও অনাত্মীয় যুবককে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিমন্ত্রণ করা দাক্ষায়ণীর জীবনে এই প্রথম।

দেবেনবাবু তখনই প্রকাশকে ফোন করিলেন, কাল এস প্রকাশ, আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ।

প্রকাশ বলিল, নিশ্চয়, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন। আপনার শরীর? আপনাদের—

দেবেনবাবু বলিলেন, হাঁ আমাদের খবর ভাল।

তিনি আগের দিনই একটা প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলেন। কাল প্রকাশকে উহা শুনাইবেন, তাকে বলিবেন সম্ভব হইলে সে যেন তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখে।

কোন একটা বহুল প্রচারিত কাগজে প্রকাশের প্রবন্ধ বাহির হইলে গবেষক হিসাবে দু'দিনেই তাঁর নাম ছড়াইয়া পড়িবে। এই বিজ্ঞাপনের যুগে প্রচার করিতে না পারিলে কিছুই হয় না।

পরদিন বৈকালে দেবেনবাবু সাগ্রহে প্রকাশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বাহিরে জুতার শব্দ হইল স্প্রিংয়ের দরজা নাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, এই যে এস, তোমার জন্যেই—

কথাটা শেষ হইল না। তিনি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন।

প্রকাশের পরিবর্তে চুরুট টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল পাতলুন পরিহিত বাঁশের মতন ছিপছিপে লম্বা একটি যুবক। সে বলিল, গুড্‌ডে, মিষ্টার চকারভার্টি।

দেবেনবাবু অপ্রসন্ন মনে বলিলেন, এস।

অতনু জিজ্ঞাসা করিল ও, কে (O. K.)?

হাঁ, তোমরা?

সো সো (So So)

দেবেনবাবুর মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া গেল।

কেস্ হইতে একটা চুরুট বাহির করিয়া অতনু বলিল, হ্যাভ্ ওয়ান্, প্লিজ।

দেশলাই জ্বালাইয়া দেবেনবাবুর চুরুট ধরাইয়া দিতে দিতে সে গাহিতে আরম্ভ করিলঃ-

হাম্পটি, ডাম্পটি ডাড

হাম্পটি, ডাম্পটি ডা

আ, আ, আ,

এই সময় একটি অপরিচিতা তরুণীকে লইয়া প্রতিমা প্রবেশ করিল।

দেশলাইর কাঠির মন বলিয়া কোন পদার্থ থাকিলে ঘটনার পরিণতি কি হইত বলা যায় না।

চুরুটে অগ্নি-সংযোগ শেষ হইলে ঠিক উপরেই দাহ্য পদার্থ পাইয়া আগুনের শিখাটা দেবেনবাবুর গোঁফের দিকে লেলিহান জিহ্বা বাড়াইয়া দিল।

প্রতিমার দিকে চাহিয়া অতনু কহিল, গ্ল্যাড্, ভেরি।

দেবেনবাবু লাফাইয়া উঠিলেন, গ্ল্যাড্, কী করেছ অতনু! I see.

দেবেনবাবুর মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, উঃ

অতনু বলিল, সরি, ড্যাড্

প্রতিমা পিতার নিকটে আসিয়া দেখিল তাঁর নাকের পাশে গোঁফের খানিকটা পুড়িয়া গালের উপর লাল একটা দাগ পড়িয়াছে

সে কহিল, একটু আইডিন্ লাগিয়ে দি, বাবা।

অতনু বলিল, আইডিন্ এ্যাণ্টিসেপ্টিক।

দেবেনবাবু বলিলেন, একটু ভ্যাসলিন দেও, প্রতিমা।

বৈঠকের সূত্রপাত হইল এই দুর্ঘটনার মধ্যে। প্রকাশ আসিয়া দেখিল গালে ন্যাকড়ার পটি লাগাইয়া দেবেনবাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন।

একটি প্রৌঢ়া দীপার সঙ্গে একটি কৃশতনু যুবকের পরিচয় করাইয়া দিতেছেন, ইনি অতনু রায় বড় কৌসুলী

কয়লার রাজা বিরূপাক্ষ রায়ের ছেলে আর ইনি দীপা সেন, প্রতিমার ক্লাশ ফ্রেন্ড্।

প্রকাশের মনে পড়িল ফোনের সেই কণ্ঠস্বর, উহা যে নারী-কণ্ঠ হইতে পারে এরূপ ধারণা তার ছিল না। আর আজ সে দেখিল সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কি না প্রতিমার মা। তার মনটা একটু দমিয়া গেল।

দেবেনবাবু স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি প্রকাশ মুখুয্যে প্রফেসর, সুধী ও সাহিত্যরসিক।

দাক্ষায়ণী একবার প্রকাশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ওঃ—

তারপরই অতনুর দিকে ফিরিয়া—বড় কষ্ট দেওয়া হ'ল তোমায়। কোর্ট থেকে সোজা আসছ বোধ হয়, কাপড়-চোপড় ছেড়েও আসতে পারনি।

কষ্ট? Not at all. অবশ্য ডাইরেক্ট কোর্ট থেকেই। ধুব প্রেসার। দুটো কেস ব্যানার্জ্জির সংগে, স্ট্রিক্ট সিনিয়র, খালি কাজ আদায়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিফ্ আলীপুরে। নিজের একার ব্রিফ।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, তোমার সেই ভাটিয়া মক্কেল বুঝি?

এবার ইজিকিয়েল, জ্যু, বিগ্ কেস্, ভাটিখানা, মিলিয়-নেয়র, জলি গুড্ ফেলো।

দাক্ষায়ণী স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, আজকাল অতনুর কাজকর্ম্ম এত বেশী যে আসতেই সময় পায় না।

দেবেনবাবু মনে মনে বলিলেন, না আসাই মঙ্গল।

অতনু চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, প্রেসার হেভি, সাক্সেস্ ফেনমেনাল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তা বলে আত্মীয়-স্বজনদের ভুললেও ত চলবে না, বাবা। প্রতিমা প্রায়ই তোমার কথা বলে।

ইচ্ছা থাকিলেও এই মিথ্যার প্রতিবাদ করিতে প্রতিমার সাহসে কুলাইল না।

ঘাড় দুলাইতে দুলাইতে অতনু বলিল, রাইট্ ও প্রতিমা ভেরি কাইন্ড; ব্যানার্জ্জি বলেন, মোষ্ট ব্রিলিয়ান্ট ডেভিল।

প্রতিমা বিস্মিতভাবে অতনুর দিকে চাহিল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, ঐ শেষের কথাটায় আমার আপত্তি আছে।

অতনু বলিল, ওঃ ডেভিল? সরি এক্সকিউজ, দ্বিতীয় স্বভাব যাকে বলে সেকেন্ড নেচর, উজ্জ্বল সহকারী।

আগে অতনু এই কাটা কাটা কথাগুলি ইংরেজিতেই বলিত, এখন আবার সুরু করিয়াছে মধ্যে মধ্যে বাঙলা তর্জ্জমা করিতে। কিন্তু এর চেয়ে যে ইংরেজীই ভাল ছিল। দেবেনবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে সে আজকাল ইংরেজী ও বাঙলা দুটো ভাষারই আদ্যশ্রাদ্ধ করে।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তুমি ওকে আসতে অনুরোধ কর, প্রতিমা। তোমার বাবার সাহিত্য শুনতে ঘন ঘন আসবার মতন প্রচুর সময় ত' আর অতনুর নেই।

প্রতিমা কোন কথা বলিল না।

দাক্ষায়ণী আবার বলিলেন, তোমার ডাক্তা করে অনুরোধ

অতনু হাসিয়া কহিল, নোঃ নোঃ, অনুরোধ সুপার-ফ্লুয়াস (Superfluous)। তারপরই ওয়েষ্ট কোটের পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, কন্সালটেশন্ কার্ডেন নোড্।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, বড় ব্যারিষ্টার বুঝি?

অতনু ডান হাতের আংগুল তুলিয়া বলিল, His equals—fingers end সরকার, জিন্না, সাপ্রু, পি আর দাশ।

কার্ডেন নোডের সংগে কাজ অতনুর, কিন্তু তার চেয়েও দাক্ষায়ণী বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বারান্দায় যাইয়া ডাক হাঁক ছাড়িলেন, সোবরাতি, জলদি চায়ের জল নিয়ে এস, রায় সাহেবের জরুর জানে পড়ে গা।

তারপরই ঘরে আসিয়া প্রতিমাকে বলিলেন, ও কোর্ট থেকে আসছে, কিছু খাবার নিয়ে এস।

অতনু বলিল, খাবার, সুপারফ্লুয়াস।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তা কি হয় বাবা? আমাদের দেখতে হবে যাতে তোমার শরীরটা ভাল থাকে।

তিনি নিজে চা তৈরী করিলেন। চা খাওয়ার সময় বারবার অতনুকে অনুরোধ করিলেন, স্যান্ডউইচটে খাও, ফলগুলি ফেলে রেখনা, কড়াইশুঁটির কচুরীটা ভাল ..নি বুঝি?

অতনু বলিল, ডিলিস্যাস্, উপাদেয়।

কচুরী খাইতে খাইতে সে দীপাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রতিমার ক্লাশফ্রেন্ড?

হ্যাঁ।

গুড্ ভেরী। কম্বিনেশন?

দীপা বলিল, ইকনমিক্স, ফিলজফি।

অনার্স?

ইকনমিক্স।

ব্রিলিয়ান্ট। প্রতিমা তোমার Mathematics, Sanskrit না?

প্রতিমা বলিল, হ্যাঁ।

দীপা বলিল, ম্যাথমেটিক্স শক্ত সাবজেক্ট।

অতনু বলিল, নোঃ নোঃ Easy as water.

আপনার সংগে আলাপ হয়ে গ্ল্যাড, ভেরী মাচ (glad very much)।

দাক্ষায়ণী অতনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবার শরীর কেমন, অতনু?

চলছে দন্তশূল, ডায়বেটিস্, লক্-জ।

প্রায়ই ত কষ্ট পান শুনতে পাই।

অতনু বলিল Senility.

দেবেনবাবু প্রকাশকে কহিলেন, তুমি দু'খানা কপির কচুরী খাও, প্রকাশ।

দাক্ষায়ণী দূর হইতেই বলিলেন, নিশ্চয় খাবেন। লজ্জা করবেন না আপনি, প্রকাশবাবু।

প্রকাশ বলিল, না না লজ্জা কিসের?

ও ছেলেমানুষ যদিও এর মধ্যেই লিটরেচরের প্রফেসর হিসাবে বেশ নাম করেছে।

দাক্ষায়ণী প্রকাশের দিকে একবার চাহিলেন।

তাঁর অনুরোধে পড়িয়াই হোক বা বুভুক্ষা বলিয়াই হোক অতনু খাইল সকলের চেয়ে বেশী, কিন্তু কোন খাবার দিতে গেলেই বলিল, সুপারফ্লুয়াস। খাওয়া শেষ হইলে সে দীপার উদ্দেশে কহিল, একটা গান, মিস্ সেন।

প্রতিমা বলিল, ও বেশ গায়।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তুমি গান শিখছ বুঝি দীপা?

দীপা বলিল, হ্যাঁ।

বেশ বেশ কোথায় শিখছ যেন?

আজকের দিন লইয়া দাক্ষায়ণী অন্তত পাঁচবার এই প্রশ্ন করিলেন। অন্য কোন লোক সামনে থাকিলেই তিনি এইরূপ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান বলিয়া দীপা এ বাড়ীতে আসা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে। আজ আসিয়াছিল দাদার অনুরোধে, প্রতিমাও তাকে ফোন করিয়াছিল। দুজনের উপরই দীপার রাগ হইল।

অতনু বলিল, কোন স্কুলে গান, মিস্ সেন?

দীপা কহিল, উত্তর কলিকাতা সংগীত বিদ্যালয়।

ওঃ নর্থ এণ্ড? সাউথ এণ্ড মিউজিক স্কুল এক্সিকিউটিভ কমিটি।

দাক্ষায়ণী বলিলেন, তুমি বুঝি তার এক্জিকিউটিভ সভ্য?

অতনু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, ডিউটি সোস্যাল।

ঠিক বলেছ, বড় যাঁরা সমাজের প্রতি তাদের একটা ডিউটি আছে বৈকি। কিন্তু উন্নতি না করেই ঝামেলা টেনে আনলে—কথাটা শেষ না করিয়াই দাক্ষায়ণী স্বামীর দিকে চাহিলেন।

পাদপূরণ করিল অতনু, সে কহিল, failure sure তারপরই প্রতিমার দিকে চাহিয়া কহিল Request friend. একখানা গান ঃ—

প্রতিমার অনুরোধে দীপা গাহিল,—

'তুমি ধন্য ধন্য হে—'

গান শেষ হইলে অতনু চেঁচাইয়া উঠিল, Enchanting very. (মনোমুগ্ধকর, খুব)

দীপা জানিত গানটা ভাল হয় নাই, অতনুর মতন লোকের সামনে গাওয়া শাস্তির রূপান্তর মাত্র তার উপর আবার সমস্তক্ষণ দাক্ষায়ণী উঁচু-গলায় কথা বলিতেছিলেন।

অতনু বলিল, টার্ণ, প্রতিমা!

প্রতিমা বলিল, এবার আমার গানের পালা বুঝি? কি গাইব?

সেই বিষ্যুৎবারের ডেলিসাস্ গান।

ওটা আমার জানা নেই।

অলরাইট্, কোথায় যেন বাঁশী বাজায়, সেইটা।

দীপা বলিল, 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী'।

অতনু বলিল, এনচ্যান্টিং, হার্ড ইট বাগরাম আগরওয়ালা

প্রতিমা ধরিল, 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী।'

তার সুন্দর কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরখানায় একটা ঝঙ্কার তুলিল, প্রকাশ মুগ্ধ হইয়া গেল, দেবেনবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

প্রতিমার গান শেষ হইলে বিউইচিং ভেরি (Bewitching very) বলিয়াই অতনু প্রকাশকে অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এ্যাড্রেস? তারপর জানিতে চাহিলে দীপার ঠিকানা ও বিস্তৃত পরিচয়।

প্রতিমা বলিল, দীপা এ্যাডভোকেট ক্ষিতীশ সেনের বোন।

ক্ষিতীশ সেন, হার্ড হিজ নেম, টাইম ওভার।

দাক্ষায়ণী প্রতিমাকে অতনুর জন্য আবার একটু চা করিতে বলিলেন।

দীপা বলিল ততক্ষণ আপনার একটা গান হোক্, মিঃ রায়।

গ্ল্যাড্ ভেরি বলিয়া শরীর দুলাইতে দুলাইতে অতনু আরম্ভ করিল—

"শালের বনে থেকে থেকে—"

প্রতিমার চা তৈরী শেষ হইলে এক চুমুকে কাপের ধূমায়মান তরল পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করিয়া অতনু সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল এবং মুখ দিয়া এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, ওয়াণ্ডারফুল।

তারপর স্প্রিংয়ের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়া বলিল,

গুড্ বাই, প্রতিমা,

গুড্ বাই, দীপা,

গুড্ বাই—অল্।

ঘুরিবার সময় তার শরীরের আঘাতে স্প্রিংয়ের দরজাটা খুলিয়া গিয়াছিল। উহা দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই অতনু বেগে বাহির হইয়া গেল।

দাক্ষায়ণী কহিলেন, কাজের লোক বটে।

কেহই তাঁর কথায় সায় দিলনা।

দেবেনবাবু ভাবিতেছিলেন ছোকরা বৈকালটাকে একেবারে মাটি করিয়া দিল।

প্রকাশ বুঝিল কেন এতদিন দেবেন বাবু তাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন নাই। এ বাড়ীর সত্যকার মালিক দাক্ষায়ণী। প্রকাশের মতন একজন প্রফেসরের সংগে ঘনিষ্ঠতা করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ।

অতনুর প্রায় সংগে সংগেই দাক্ষায়ণীও বাহির হইয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিলেন, তোমার সংগে কথা আছে প্রতিমা।

তার এখানে থাকা মাতার অভিপ্রেত নয় বুঝিয়া প্রতিমা দীপাকে লইয়া একটু পরে উঠিয়া গেল।

দেবেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, বাঁচলাম, ছোকরা একটা ন্যুসানস্, লোকের গোঁফ পুড়িয়ে দেয়—

প্রকাশ বলিল, ভদ্রলোক বড্ড খেলো ধরণের।

নানাকারণে দেবেনবাবু অতনুকে পছন্দ করিতেন না।

সে যে শুধু লঘু প্রকৃতি ও বাচাল তাহাই নয় তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে সে অস্বীকার করে এবং দাক্ষায়ণীর সঙ্গে সুর মিশাইয়া বলে সাহিত্যেই দেবেনবাবুকে মাটি করিয়া দিল।

দেবেনবাবু বলিলেন, খেলো না হ'লে আর সাহিত্য বিরোধী হয়। অথচ প্রতিমার না ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান।

প্রকাশের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে বলিল, ওর সঙ্গে?

দেবেনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ।

প্রকাশ বলিল, ইম্‌পসিবল।

দেবেনবাবু বলিলেন, ঠিক বলেছ, প্রকাশ, অসম্ভব। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে আমার সঙ্গে একমত হবেই ত'।

দু'জনের এতটা ঐকামত হয়ত' আর কোন বিষয়েই সম্ভব হইত না।

দেবেনবাবু কহিলেন, আমি জানতুম না অতনু আসবে। আমার স্ত্রী কাল তোমাকে ফোন করতে বল্‌লেন। অতনু উপস্থিত থাকবে জানলে তোমায় আমি খবর দিতাম না।

প্রকাশ বলিল, খবর দিয়ে ভালই করেছেন, তবু একবার দেখা হ'ল।

তা' বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল একটা লেখা পড়ে শোনাই। লেখাটা সবে শেষ হ'য়েছে।

বেশ, আর একদিন এসে শুনে যাব, কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন।

পরে জানাব। আজ অতনু একটু আগে উঠলেই পড়া হ'ত। তারপর একটু থামিয়া দেবেনবাবু আবার বলিলেন, কিন্তু ও যত ঘনিষ্ঠতাই করুক না কেন এ বিয়ে আমি হতে দেব না।

কিছুতেই দেবেন না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।

কিছুতেই নয়। তুমি খুব নির্ভরযোগ্য লোক তাই তোমায় বললাম।

প্রকাশ কহিল, আপনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন সে আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু তার চোখের উপর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল ঘটনার বাস্তব দিকটা। মেয়ের বিবাহ ব্যাপারে দেবেনবাবুর সংকল্প কতটা কার্যকরী হইবে সে সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সন্দেহ হইল। সে বলিল, মিসেস চক্রবর্ত্তী—

দেবেনবাবু বলিলেন, তিনি যতই বলুন অতনু আমার জামাই, "নেভার"।

প্রকাশের চোখ দুটো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল, আপনার বিবেচনা শক্তি অতি গভীর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার স্ত্রীর পছন্দ যত সব চটকদার ইয়ংম্যান। যখনই প্রতিমার বিয়ের কথা ওঠে তখনই উনি ঐ ধরণের বিলেত ফেরতাদের নাম করেন। আমি কিন্তু এ বিষয় বজ্রের মত দৃঢ়।

প্রকাশ বলিল, দৃঢ়ই থাকবেন।

সেই রাত্রেই দাক্ষায়ণী স্বামীকে কহিলেন, ইনিই তোমার প্রকাশ মুখুয্যে?

হ্যাঁ।

মাথায় শিখা রেখেছেন কেন?

দেবেনবাবু বলিলেন, ছেলেটির সুন্দর চেহারা, শান্ত-শিষ্ট স্বভাব।

শান্ত শিষ্টের কোন মূল্য নেই। আমি ত' ওর কোন ভবিষ্যৎই দেখতে পাই না।

আমি প্রকাশের সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা পোষণ করি।

তোমার যেমন আশা। একবার যখন সাহিত্যরসিক হয়েছেন তখন আর ওর দ্বারা কিছু হবে না।

দেবেনবাবু বলিলেন, তুমি ওকে আসতে বলেছিলে কেন বুঝলাম না ত'।

তোমাদের প্রশংসা শুনে বলেছিলাম। কিন্তু দেখে মনে হ'ল একেবারেই স্মার্ট নয়।

বাদানুবাদ চলিল অনেকক্ষণ। প্রকাশের সম্বন্ধে স্ত্রীর ভাল ধারণা করাইতে না পারিয়া দেবেনবাবু নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন।

(ক্রমশ)

সীমা ও অসীম

(৭২৮ পৃষ্ঠার পর)

গিয়ে দাঁড়াল। সীমা কাঁদ কাঁদভাবে বল্‌ল, 'ছেলেটার অসুখ আমায় একবার খবরও দেওনি।'

'খবর দিলেই বা হত কি?'

'এখনও রাগ গেল না। গেছি বটে, মনটা কিন্তু আমার এখানেই ছিল। ডাক্তারবাবু কি বল্‌লেন?'

'বল্‌লেন বিশেষ ভাল নয়। এর সঙ্গে মেনেনজাইটিস্‌ হলে বাঁচান শক্ত হয়ে পড়বে। মীরা কোথায়?'

'ননীর কাছে, দেখি কি করছে?'

'কোথায় চল্‌লে?'

'কেন, ননীর কাছে। আমি যে ওর মা।'

'যাও, আজ সত্যিই একটু ঘুমুতে পারব।'

অসীম তৃপ্তির হাসি হাস্‌ল। সীমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গালের ওপর পড়ল।

চাই দৃষ্টি

দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানের গোড়াতেই এই কয়েকটি কথা আছে—"নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।" নতুন-কিছু করার যে উন্মাদনা—এই উন্মাদনার ভালো আর মন্দ দুটো দিকই আছে।

আগে ভালোর দিকটা দেখাই। কীট-পতঙ্গের সমাজ থেকে মানুষের সমাজের স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে—পতঙ্গেরা উন্নতিশীল নয়, মানুষ উন্নতিশীল। হাজার বছর আগে মৌমাছিরা যেভাবে বাস করতো আজও সেইভাবেই বাস করে থাকে সেদিন তাদের জীবন-প্রণালী যে ধরণের ছিল, আজও সেই ধরণের আছে। মানুষ কিন্তু হাজার বছর আগে যেভাবে জীবন-যাপন করতো—আজ সেভাবে জীবন-যাপন করে না। বাপ-ঠাকুর্দারা যে অবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেছেন—আমিও ঠিক সেই অবস্থার মধ্যেই আমার দিনগুলি অতিবাহিত করবো—এমন মনোভাবকে মানুষ প্রশ্রয় দেয় নি। যন্ত্রের মত গতানুগতিকের অনুসরণ না ক'রে মানুষ নিজের মন দিয়ে ভেবেছে আর সেই চিন্তা তার আচারে ব্যবহারে এনেছে পরিবর্ত্তন, জীবনের ধারাকে দিয়েছে নতুন খাতে ছুটিয়ে। আগুন জ্বালানোর কৌশল, ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার, গবাদি পশু-পালন যেমন যেমন সে শিখেছে—সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন-যাত্রার প্রণালী গিয়েছে বদ্‌লে। বারুদের আর মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারকে আশ্রয় ক'রে মানুষের ইতিহাস আপনাকে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপ যে আজ জগতকে কামধেনুতে পরিণত ক'রে তার দুগ্ধ আত্মসাৎ করতে পারছে—এর মূলে রয়েছে বারুদ ব্যবহারের ক্ষমতা। বারুদের জোরেই পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে করেছে পদানত। ১৭৮০ সাল থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে যন্ত্রশিল্পের জগতে যে নূতন নূতন আবিষ্কার ঘটেছে—মানব-সভ্যতার উপরে তাদের প্রভাব অপরিসীম। মানুষ যদি কীট-পতঙ্গের মতো কেবল অতীতের অনুসরণ ক'রে চলতো—ইতিহাসের বুকে তার জয়যাত্রার কোনো চিহ্নই আজ থাকতো না।

নতুন কিছু করবার উন্মাদনায় মানুষ যেমন কল্যাণকে ডেকে আনে, তেমনি অকল্যাণকেও ডেকে আনে। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অতীতের ধারাকে অনুসরণ করবার প্রয়োজন আছে—যেখানে সবই চঞ্চল সেখানে সমাজজীবনে শৃঙ্খলারক্ষা অসম্ভব। 'রুটিন' আছে বলেই সমাজযন্ত্র ঘড়ির মতো কাজ ক'রে চলেছে। অপরাধ হলেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার নিয়ম আছে। অপরাধী গ্রেপ্তার হ'লেই তার বিচারের জন্য আদালত রয়েছে। বিচারে যে দোষী সাব্যস্ত হবে সে দণ্ড পাবে—এই হচ্ছে বিধান। পুলিশ, পেস্কার, জজসাহেব, জেলার সবাই যন্ত্রের মতো আপন আপন কাজ ক'রে চলেছে। প্রত্যেক পুলিশ যদি গ্রেপ্তার করার সময় ভাবে—আইন যাকে অপরাধ বলে তা সত্যিকারের অপরাধ কিনা, প্রত্যেক জজ দণ্ড দেবার সময় যদি চিন্তা করে—অপরাধীকে দণ্ড দেবার আমার কি অধিকার আছে?—তা হ'লে সমাজযন্ত্র অচল হ'য়ে যায়। মটরকারের ব্যবসায়ের কথাই ধরা যাক না। তার জীবনের সূত্র অন্বেষণ করলে দেখা যাবে—একপ্রান্তে রয়েছে খনিতে কয়লা আর লোহা, আর এক প্রান্তে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন মটর এবং ব্যবসায়ী সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট লভ্যাংশের রসিদে করছেন স্বাক্ষর। খনির সামান্য কুলি থেকে প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত মটর ব্যবসায়ের সঙ্গে যারা যারা সংশ্লিষ্ট সবাই আপন আপন কাজটুকু কলের মতো ক'রে চলেছে। কুলি জানে না ইঞ্জিনীয়ারের কাজ, ইঞ্জিনীয়ার জানে না প্রেসিডেণ্টের কাজ—অথচ দিব্যি মটর তৈরী হ'য়ে লাখে লাখে বিক্রয় হয়ে যাচ্ছে। সকলের সকল কাজ জানবার দরকার নেই; নিজের নিজের কাজটুকু ভাল ক'রে জানলেই হোলো। কাজ করতে করতে কাজে একবার অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে বুদ্ধি খরচ করবার দরকার হয় না। হঠাৎ খনি জলে ভেসে গেলে অথবা কুলিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মড়ক লাগলে মগজকে খাটানোর প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। একটা কিছু প্রতিষ্ঠানকে সৃষ্টি করবার জন্য জ্ঞানের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানকে চালানোর জন্য কাজের ধারা একবার ঠিক হ'য়ে গেলে কলের মতো সব চলতে থাকে—বুদ্ধির কাজ তখন শেষ হ'য়ে যায়। আমরা যদি সমাজ-জীবনে পদে পদে আমাদের কর্ত্তব্য নিয়ে মাথা ঘামাতাম, পদে পদে কর্ম্ম করার আগে সব কিছুকে জানতে চাইতাম, সব কিছুকে প্রশ্ন করতাম—তবে সভ্যতা কখনো টিঁকতো না। সমাজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য স্থিরত্বের প্রয়োজন আছে। যেখানে সবাই বেদুইনের মতো নিত্য চঞ্চল—সেখানে সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব।

মানুষ যন্ত্রের মতো কেবল কাজ ক'রে চলবে—প্রশ্ন করবে না—জানতে চাইবে না—এমন কখনো হবে না। মানুষ প্রজাপতির মত চঞ্চল হ'য়ে কেবলই দিগ্বিদিকে ছুটবে, কখনো স্থির হ'য়ে বসবে না, ক্রমাগত জানতে চাইবে, ক্রমাগত প্রশ্ন করবে—এমনটিও কখনো হবে না। আমরা প্রগতির নেশায় অভিভূত হয়ে অনেক সময় ভাবি, যা আমাদের জ্ঞানের কাছে ধরা দেয় না—তাই বুঝি নিরর্থক। আমাদের এই ধারণা ভুল। মানুষের সমাজে যে সব বিধি-নিষেধ প্রচলিত হয়ে আসছে—তাদের পিছনে আছে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা। তার মানে এই নয় যে নির্ব্বিচারে তাদের মেনে চলতে হবে। অনেক বিধিনিষেধের প্রয়োজন নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে এবং সেই জন্য তাদের ভাঙা প্রয়োজনও। ভাঙার উন্মাদনায় ঢাকী পর্য্যন্ত যেন বিসর্জ্জন না দেই—এইটুকু নজরে রাখলেই হোলো। আমরা দেখতে পাই মৌমাছিরা অথবা পিপীলিকারা অনেক কিছু ক'রে থাকে যার অর্থ তারা বোঝে না—জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকবার জন্য সেসব কাজের মূল্য কিন্তু যথেষ্ট। সমাজের সাধারণ লোক শাস্ত্রের যে সব বিধিনিষেধ মেনে চলে তাদের মূল্য সব সময় বোধগম্য নয় ব'লেই কি বর্জ্জনীয় তারা? সমাজ-রক্ষার জন্য সেই সব বিধিনিষেধের কি কোনোই দরকার নেই? আমরা যদি জনসাধারণের কাছে বলতে আরম্ভ করি অতীত থেকে আমরা যে সব আদর্শ পেয়েছি তাদের সবগুলিই পরিত্যাজ্য—তবে মহা অনর্থের সূত্রপাত হবে। মন্দগুলিকে ভাঙতে গিয়ে মানুষ ভালগুলিকেও ভাঙতে আরম্ভ করবে। অবশ্য কালাপাহাড়ের মতো গদাহস্তে ভাঙতে বললেই লোকেরা দক্ষযজ্ঞ সুরু ক'রে দেবে—এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। না ভেবে কাজ করা যেমন মানুষের স্বভাব নয়—সব সময় ভেবে চিন্তে কাজ

করাও তেমনি মানুষের স্বভাব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে বিচারবুদ্ধি নয়—'রুটিন'। অনেক সময়ে অনেক বড়ো বড়ো ভাবুকের বাণী যে অরণ্যে রোদনের মতোই ব্যর্থ হয়ে যায় তার কারণ তাঁরা বাস্তব জীবনের একটা বিরাট সত্যকে ভুলে যান। এই বিরাট সত্যটি হোলো Routine is the God of every social system, it is the seventh heaven of business, the essential component in the success of every factory, the ideal of every statesman.

আমাদের সমাজ-জীবনে অতীতের প্রভাবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তবেই নূতনের আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব। নতুন আর পুরোনো—এদের একটিকে রেখে আর একটিকে বাদ দিতে গেলে হয় আমরা পেঁচার মতো খোঁড়লের মধ্যে ব'সে নতুন দিনের আলো-কে অস্বীকার করবো—নয়তো নিত্য নূতনের পিছনে পিছনে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে বেড়াবো। জাতির নেতৃত্ব করতে পারে সেই মানুষ যার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আছে। ভবিষ্যদ্দৃষ্টির উপরে দাবী করতে হ'লে দুটো জিনিষ চাই। প্রথমত জানতে হবে, যা চলে আসছে তা নিয়ে মানুষ কখনো চিরকাল তৃপ্ত থাকতে পারে না। পুরাতন আদর্শের জয়যাত্রা একটা জায়গায় এসে ফুরিয়ে যায়। নতুন দিনের প্রয়োজন নতুন আদর্শের দাবী করে। জাতিকে যে পরিচালিত করবে তায় জানা চাই পুরোনোকেই বা কতখানি স্বীকার করবো এবং নতুনকেই বা কতখানি মেনে নেবো. যাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আছে তিনি জানেন পুরাতনের প্রয়োজন কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এবং নতুনকালের দাবীকে মেটাতে গেলেই বা কি কি করতে হবে। যুগস্রষ্টা প্রত্যেক ঋষিই পুরাতনের পাশে নূতনকে দাঁড় করিয়ে কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করেন। মাইকেল মধুসূদন নতুনকে গ্রহণ করতে গিয়ে পুরাতনকে কেবল আঘাতই করলেন। কেশব সেন তাঁর আদর্শ খুঁজতে গেলেন খৃষ্টের মধ্যে, কৃষ্ণের মধ্যে নয়। বঙ্কিম কিন্তু নতুনের দাবীকে স্বীকার করতে গিয়ে পুরোনোকে রসাতলে ভাসিয়ে দিলেন না। সহস্র সহস্র দেশবাসীর অন্তরে কৃষ্ণকেই তিনি আদর্শ-পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন—কৃষ্ণ যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জাতির রক্তমজ্জার সংগে মিশিয়ে আছেন! কেশব সেন যেখানে আদর্শকে খুঁজতে গেলেন দেশের বাহিরে—বঙ্কিম সেখানে আদর্শকে খুঁজে পেলেন দেশেরই ভিতরে। লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টান ধর্ম্মের অংগ ব'লেই মনে করতে লাগলো।—কেশব সেন তাঁর খোল-করতাল আমদানি ক'রেও দেশের হৃদয় থেকে দূরে থেকে গেলেন। বঙ্কিম আজও অগণমানুষের হৃদয়-আসনে মুকুটহীন সম্রাটের গরিমায় অধিষ্ঠিত। জয়দেবের কৃষ্ণকে অথবা যাত্রাদলের কৃষ্ণকে দেশের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে বঙ্কিমের অবস্থা কিন্তু কেশব সেনেরই অনুরূপ হোতো। নতুনকালের প্রয়োজন দাবী করছিল ...র শৌর্য্যের আদর্শকে—কারণ শৌর্য্য ভিন্ন স্বাধীনতা অসম্ভব। বঙ্কিম তাই মহাভারতের পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণকে আদর্শপুরুষ করে আঁকলেন। বাঙালী যখন পাশ্চাত্যের মোহে প্রাচ্যের আদর্শকে ভুলতে চলেছিল তখন বঙ্কিম শুচিতার এবং সংযমের আদর্শকেই উচ্চে তুলে ধরলেন। কিন্তু ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সংগে তাঁর তফাৎ হচ্ছে—সেখানকার পণ্ডিতেরা মনুসংহিতার দোহাই দিয়ে কেবল সংযমের উপরেই জোর দিয়েছেন—নতুন যুগের প্রয়োজন যে স্বাধীনতা—তার কথা কিছুই বলেন নি। বঙ্কিম নবদ্বীপের এবং ভাটপাড়ার প্রাচীন-পন্থীদের মতো কেবল সংযমের আর শুচিতার আদর্শকে মেনে নিয়ে ক্ষান্ত থাকলেন না। তিনি দেখলেন যেখানে হাজার হাজার মানুষ অন্নাভাবে মৃতের সামিল সেখানে মানুষ সংযমের আদর্শ নিয়ে ব'সে থাকবে না—তারা অন্নের জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌বে আর সেই দেশব্যাপী অন্নের দুর্ভিক্ষ ঘোচাবার জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই স্বাধীনতা। বঙ্কিম তাই আনন্দমঠে ওড়ালেন স্বাধীনতার জয়ধ্বজা। বিষবৃক্ষ আর কৃষ্ণকান্তের উইল লিখে তিনি দিলেন প্রাচীনের বেদীমূলে পুষ্পচন্দন—আনন্দমঠ আর কৃষ্ণচরিত্রে শুনতে পাই নূতনের জলদগর্জ্জন। জাতি-প্রতিষ্ঠার এবং স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার আদর্শ এদেশে নতুন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও দেখতে পাই—নতুন আর পুরাতনের মিলন। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন থেকে যে মৃত্যুহীন বাণী উৎসারিত হয়েছিল—তারই জয়ধ্বনি তাঁর নৈবেদ্যে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন ঋষিদের কণ্ঠস্বর শুনছি। আবার যখন বলাকা পড়ি, তাসের দেশ আর ফাল্গুনী পড়ি, রক্তকরবী আর মুক্তধারা পড়ি মনে হয় যেন নীট্‌শে, ইবসেন আর বার্ণার্ড্‌ শ' পড়ছি। ঐগুলির মধ্যে নবযুগের ঝড়ের গান, ক্ষিপ্ত সমুদ্রের কল-গর্জ্জন, ভাঙনের মহোল্লাস। মহাত্মা গান্ধীর নন্‌ভায়োলেন্সের মধ্যে আমাদেরই বুদ্ধ আর পাতঞ্জলের, মহাবীরের আর চৈতন্যের কণ্ঠধ্বনি। কিন্তু যেখানে তিনি Civil Disobedience-এর কথা বলেছেন সেখানে নতুন কালের দাবী তাঁর কণ্ঠে। ভাঙো—সাম্রাজ্যবাদকে ভাঙো, লোভের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙো, শক্তির ঔদ্ধত্যকে ভাঙো। এই Civil Disobedience-এর কথা না বল্‌লে তিনি কখনো যুগ-স্রষ্টা হতে পারতেন না। নতুন যুগের শৌর্য্যের বাণীকে ঘোষণা না করলে তাঁর স্থান হোতো নবদ্বীপের ন্যাড়ানেড়ীদের দলে। ওরকম অহিংসার পানসে কথা অনেক মেরুদণ্ডহীন ক্লীবের মৃদুকণ্ঠ থেকে ভারতবর্ষ বহুকাল ধরে শুনে আসছে। ওর মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? নতুন কথা শোনাতে না পারলে যুগস্রষ্টা হওয়া যায় না। গান্ধীজীর মধ্যে আমরা আবার দেখলাম প্রাচীনের এবং নবীনের সামঞ্জস্য।

যে কাল আমাদের দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে তার বুকে চলেছে নিত্য নূতনের আনাগোনা। সমাজে পরিবর্ত্তন চিরদিনই ঘটছে কিন্তু এমন ঘন-ঘন পরিবর্ত্তন আগেকার যুগে কখনো কি ঘটেছে? এই পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য করার মতো দৃষ্টি নেই যার চোখে—তার পক্ষে ব্যবসায়ের জগতে উন্নতিলাভ অসম্ভব। এক একটা বড়ো বড়ো সহরে আমরা এখন ভীড় জমিয়ে বাস করছি। সহরে ভীড় জমানোর কারণ আছে অনেক। মানুষের এখন উল্টো চেষ্টা চলেছে সহরের ভীড় থেকে দূরে বসতি করবার। রাস্তাঘাটের এবং যানবাহনের উন্নতির সংগে একটু অবস্থাপন্ন লোকেরা শহরের উপকণ্ঠে

(শেষাংশ ৭৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কয়েকটি অতি আধুনিক আবিষ্কার

(৩)

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

মানুষ মৃত্যুকে জয় করিবার কৌশল এ পর্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলেও ব্যাধির বিরুদ্ধে সে বহুদিন যাবতই জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। ব্যাধি নিবারণ করিবার ও রোগ-যন্ত্রণা লাঘব করিবার নিমিত্ত চিকিৎসাবিদ্গণের চেষ্টার বিরাম নাই। বৎসরের পরে বৎসর তাই নিত্য নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে। দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিত্য নূতন কৌশলও অবলম্বিত হইতেছে। বিভিন্ন রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে প্রতি বৎসর বিভিন্ন গবেষণাগারে যে পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়, তাহা হইতে বিজ্ঞানের এই বিভাগের কর্মীদের নীরব সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। সেবার যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সমস্ত গবেষক মানুষের রোগ যন্ত্রণা লাঘব করিবার নিমিত্ত গবেষণাগারের নিভৃতে বসিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাহার তুলনাও জগতে দুর্লভ।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গত বৎসরও বিজ্ঞানের এই শাখায় বহু বিষয়ে বহু গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে অনেক রোগ সম্পর্কে একদিকে যেমন নূতন আলোকপাত হইয়াছে, তেমনি অনেক রোগের নূতন ঔষধও আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত বৎসর যে সমস্ত নূতন রোগ চিকিৎসাবিদ্গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অংশে শিশুদের মধ্যে "স্লিপিং সিক্নেস্" নামে এক-প্রকার নূতন ব্যাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রোগে জ্বরের সহিত মাথাধরা, অস্থিরতা, অলসভাব, প্রলাপ বকা, দৃষ্টি-বিভ্রম প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা প্রভৃতিতে অনিচ্ছাকৃত একরূপ কম্পন হইয়া রোগী কিরূপ যেন অসাড় হইয়া পড়ে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মার্কিন মুল্লুকে শিশুদের মধ্যে এরূপ রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং বহু শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে। চিকিৎসাবিদ্গণ এই রোগের কারণ অনেক-দিন পর্যান্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গত বৎসর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার বহু স্থানে বহুসংখ্যক ঘোড়াকে সহসা ঘাড় মট্কাইয়া ও পা দুমড়াইয়া পড়িয়া গিয়া মারা পড়িতে দেখা যায়। অশ্বদেহের এই রোগ-জীবাণু পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাবিদ্গণ দেখিতে পান যে, এইরূপ জীবাণু মস্তিষ্ক ও শিরদাঁড়াকে বিশেষভাবে আক্রমণ করে এবং একরূপ প্রদাহের সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বে মৃত্যু ডাকিয়া আনে। এইরূপ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া থাকে এবং বলিষ্ঠ দেহ ঘোড়া পর্যন্ত অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুদের যে 'স্লিপিং সিক্নেসের' বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ঘোড়ার উপরোক্ত রোগের (Encephalomyelitis) সহিত তাহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বোষ্টনের কয়েকজন চিকিৎসাতত্ত্ব-বিদ্ এ সম্পর্কে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। গত বৎসর এইরূপ রোগাক্রান্ত শিশুদেহ হইতে তাঁহারা যে জীবাণু পৃথক করিয়া লইতে সমর্থ হন, তাহা পরীক্ষা করিয়া ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, একইরূপ রোগ-জীবাণু মানুষ ও অশ্বদেহে এই রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণত গৃহপালিত মোরগ কিংবা বনের পাখী, মশা প্রভৃতি দ্বারা এই জীবাণু সংক্রমিত হয়। বোষ্টনের চিকিৎসাবিদগণের এই আবিষ্কার পরে মানহাট্টানের রকফেলার ইনষ্টিটিউটের' জীবাণুতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃকও বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে উপরোক্ত শিশু-রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা অবলম্বনে যে বিশেষ সহায়তা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের এক বিভাগের গবেষণা বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপর শাখাকেও কম সমৃদ্ধ করে না! পদার্থের পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার নিমিত্ত পদার্থবিদ্গণ ইদানীং যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন,

অধ্যাপক আর্নেষ্ট লরেন্স

তন্মধ্যে অধ্যাপক আর্নেষ্ট লরেন্স-উদ্ভাবিত পরমাণু বিভাজন-কারী 'সাইক্লোট্রোন্' যন্ত্রটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্র সাহায্যে পদার্থের পরমাণুকে ভাঙিয়া চুরিয়া উহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। 'সাইক্লোট্রোন্' যন্ত্রের মধ্যস্থিত সুবৃহৎ তড়িৎ-চুম্বকটির শক্তির বলে ভারী জল বা ডিউটারন্ দ্বারা পদার্থবিশেষকে সঙ্ঘাত করা হইলে তাহা হইতে 'নিউট্রন' নামে তড়িৎশক্তিবিহীন এক বস্তুকণার উদ্ভব ঘটে। অধ্যাপক আর্নেষ্ট লরেন্স এবং তাঁহার ভ্রাতা চিকিৎসাবিদ্ জন হান্ডেল লরেন্স গত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, 'নিউট্রন-রশ্মি' কোন প্রাণীর উপর এক্স-রে হইতেও অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং ক্যানসার প্রভৃতি রোগে 'টিউমার টিসু'র উপর ইহা বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে।

লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের এই আবিষ্কার ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় এক নূতন পদ্ধতির সূচনা করিয়াছে। 'সাইক্লো-

ট্রোন' যন্ত্র সাহায্যে ক্যানসার রোগের উপরোক্তরূপ চিকিৎসা ব্যতীত এই যন্ত্রের অন্য প্রকার ব্যবহারও এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখা গিয়াছে, দ্রুতগতি ডিউটারন্ দ্বারা যদি এই যন্ত্র সাহায্যে সাধারণ লবণের বিভাজন সংঘটিত করা যায়, তবে তাহা হইতেও প্রথমতঃ সোডিয়মের এক প্রকার রেডিও-এ্যাকটিভ্ 'আইসোটোপের' উৎপত্তি ঘটে। ইহাই পরে ভাঙিয়া গিয়া শুধু 'বিটা-কণিকা'রই সৃষ্টি করে না, পরন্তু এরূপ গামা-রশ্মিও ইহার মধ্য হইতে নির্গত হইতে থাকে, যাহা স্বাভাবিক 'রেডিয়ম' পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মির ন্যায় বিশেষ শক্তিশালী। ক্যানসার রোগে রেডিয়ম চিকিৎসার কার্যকারিতা বহুদিন যাবৎ স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যয়সাধ্য রেডিয়ম-চিকিৎসা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক লরেন্স-উদ্ভাবিত 'সাইক্লোট্রোন্' যন্ত্র সাহায্যে সাধারণ লবণ হইতেই যদি রেডিয়মের গুণবিশিষ্ট পদার্থ আমরা লাভ করিতে পারি, তবে ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় তাহা যে যুগান্তর আনয়ন করিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ক্যানসার সংক্রান্ত উপরোক্ত গবেষণার নিমিত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্জেন জেনারেল গত বৎসর অধ্যাপক লরেন্সের হস্তে ত্রিশ হাজার ডলার সমর্পণ করিয়াছেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ-জীবাণু সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এরূপ বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগ-জীবাণু রহিয়াছে, যাহা সাধারণ 'মাইক্রোসকোপ্' যন্ত্রে ধরা সুকঠিন। ডাঃ ভ্লাডিমির জোরিকিন নামে একজন বৈজ্ঞানিক গত বৎসর এরূপ একটি শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ্ উদ্ভাবন করেন যাহার সাহায্যে এতাবৎকালের অদৃশ্য বহু সূক্ষ্ম জীবাণু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইবে। এই নূতন 'সুপার-মাইক্রোস্কোপ্' যন্ত্রটিতে আলোক রশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রনের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণারও প্রতিচ্ছবি কোন ফটোগ্রাফিক পটভূমিকার উপর এমনভাবে পাতিত করা যাইতে পারে যে, অকল্প পদার্থটিকে লক্ষ গুণ বড় করিয়া দেখানও অসম্ভব নহে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনও পদার্থকে বড় করিয়া দেখিবার শক্তি আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দ্বারা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে যে সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, তাহাদিগকে এরূপ যন্ত্রে দেখা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কিন্তু ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতে সহস্র গুণ অধিক ক্ষুদ্রতর। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া জোরিকিন যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রসারিত করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বহু 'ভিটামিন' আবিষ্কৃত হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব হেতু যে যে রোগের উৎপত্তি ঘটে, তাহাও বিজ্ঞানের এই বিভাগের গবেষকগণ নির্ধারণ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যে এক প্রকার ভিটামিনের অভাবের দরুণ বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রচলিত প্রণালীতেও খাদ্যের বহু সারাংশ অনেক সময় বাদ পড়িয়া যায়। ইদানীং চিকিৎসাবিদ্‌গণ এ বিষয়ে জন-সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ব্যাধি নিবারণের নিমিত্ত এবং খাদ্যসারাংশের অভাব পূরণ করিবার জন্য তাঁহারা কৃত্রিম উপায়েও বহু 'ভিটামিন' প্রস্তুত করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যে 'ভিটামিন' বি (১) বেরিবেরি রোগের বিশেষ প্রতিষেধক বলিয়া বিবেচিত হয়। বেল টেলিফোন লেবরেটরিসের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ রবার্ট রানেল্‌স্ উইলিয়মস্ গত বৎসর কৃত্রিম উপায়ে ইহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন এবং 'আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি' হইতে 'উইলার্ড গিবস্ পদক' প্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত গবেষণা ব্যতীত গত বৎসর আরও কয়েকটি ভিটামিনের গুণাবলী সম্পর্কেও বিশেষ গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়।

এডওয়ার্ড এস্টলিন কামিংস্

এই সমস্ত গবেষণা হইতে মনে হয় যে, পুষ্টিকর খাদ্য সমস্যার উপর আধুনিক চিকিৎসাবিদ্‌গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যে কোন কোন ভিটামিনের অভাবে শুধু যে শারীরিক পুষ্টিসাধনই হয় না, তাহা নহে, কালা বা বধির হওয়ার মূলে এরূপ ভিটামিনের অভাবও বহুক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক শক্তির অভাব পূরণের নিমিত্ত গত বৎসর চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে ব্যবস্থা হয়, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রাকারের রেডিও-টিউব দ্বারা কালা বা বধির ব্যক্তিদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করিবার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পূর্তবিদ্যা ও ফলিত-বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় এই শাখা দুইটিতেও গত বৎসর বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ গবেষণাগারের একান্তে বসিয়া যে সমস্ত আবিষ্কার করেন, সাধারণত সেইগুলিকে মানুষের সুখ-সুবিধার কাজে প্রয়োগ করাই শিল্পবিদ্ ও পূর্তবিদ্‌গণের কাজ। সেই হিসাবে গত বৎসরের কার্য-তালিকায় ইঁহাদের দানও কম হইবে না! দূরদর্শন (Television) এবং দূরদেশান্তে কোন লেখার অবিকল নকল বা কোনও চিত্রের নিখুঁত প্রতিকৃতি প্রেরণ—এই দুইটি আবিষ্কার যে আধুনিক

বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে জয়যুক্ত করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। গবেষণাগারের গণ্ডী পার হইয়া এই যুগান্তকারী আবিষ্কার আজ পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তবর্তী দুই স্থানের মধ্যেও লিপি বিনিময় ও ভাবের আদান-প্রদানের যে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আমরা বিভিন্ন পূর্তবিদ্‌গণের নিকট কম ঋণী নহি; তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নের ফলে, টেলিভিশানের প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্রের ক্রমেই উন্নতি সাধিত হইতেছে। 'টেলিভিশান রিসিভার' আজ আর তত দুষ্প্রাপ্য নহে! বেতারে কোনও লেখার অবিকল নকল প্রেরণের কাজও গত বৎসরের প্রথমভাগে বিভিন্ন যন্ত্রবিদ্‌গণের চেষ্টায় আরম্ভ হয়। আজ উহার ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইতেছেন।

বেতারের উপর আবহাওয়ার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়ার বিপর্যয়ে বেতার ব্রডকাস্টিং-এ যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে, বিভিন্ন দেশের বেতার-বিভাগ হইতে সে সম্পর্কে বহুদিন যাবৎই গবেষণা চলিতেছে। এ সমস্ত গবেষণার মধ্যে অতিশয় হ্রস্ব-তরঙ্গ (Ultra Short Waves) সম্পর্কে গত বৎসর বিশেষ কয়েকটি গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়। টেলিভিশানে এবং বেতার-বার্তা প্রেরণে এইরূপ হ্রস্ব-তরঙ্গ ব্যবহারের উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন দেশে বেতার ব্রডকাস্টিং-এ এরূপ তরঙ্গ ব্যবহারের প্রচলন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

বিমান-পরিচালনার নিরাপত্তার নিমিত্ত গত বৎসর কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে, সম্মুখে কোনরূপ বাধাবিপত্তির বিষয় পূর্বাহ্নে জানিতে না পারায়, বহু বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াও বহু বিমান-চালককে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। বিমান-চালকগণকে যাহাতে এরূপ অসুবিধায় পড়িতে না হয়, তজ্জন্য পূর্তবিদ্‌গণ কয়েক বৎসর যাবৎ নানারূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। গত বৎসর ইঁহারা এমন দুইটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা বিমান-বিহারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে হয়। 'এবসোলিউট্ অলটিমিটার' (absolute altimeter) নামে উচ্চতাজ্ঞাপক একটি যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। বিমানের সম্মুখ-পথে কোন উচ্চ পর্বত বা বাধা-বিঘ্ন থাকিলে এই যন্ত্র বিমানপোতটি উহার কতটা ঊর্ধ দিয়া চলিয়াছে, তাহা আপনা হইতেই নির্দেশ করিয়া দিবে। আপনা হইতেই দিক নির্দেশ করিয়া দিতে পারে এরূপ একটি যন্ত্রও (automatic direction finder) বিমানপোতে ব্যবহারের নিমিত্ত পূর্তবিদ্‌গণ গত বৎসর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উভয়বিধ যন্ত্র ব্যবহারে বিমান-পরিচালনার নিরাপত্তা যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

উপরোক্ত উদ্ভাবন ব্যতীত নূতন ধরণের কয়েকটি সুবৃহৎ বিমান এবং নৌপোতও গত বৎসর নির্মিত হইয়াছে, যাহা পূর্তবিদ্‌গণের কৃতিত্বের পরিচায়ক। 'কুইন এলিজাবেথ' নামে যে সমুদ্রগামী জলজানখানি গত বৎসর জলে ভাসান হয়, উহা বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্ণবযান বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সুবৃহৎ যাত্রী-বিমান 'ডগলাস ডি-সি-৪' এবং ট্রানস-আতলান্তিক সার্ভিসের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত সুবৃহৎ সি-প্লেন 'বোইং ক্লিপার' (Boeing Clipper)-এর সাফল্য গত বৎসরের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্তবিদ্‌ ও শিল্পবিদ্‌গণের হস্তে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার যে রূপ পরিগ্রহ করে, তাহার ফলেই মানুষের শ্রম-লাঘবকর নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। একদিনে ছয় মাসের পথ উত্তরণের যে আধুনিক ব্যবস্থা, তাহাও তাঁহাদের সাধনার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতে বিভিন্ন বিষয়ে নিত্য নূতন 'রেকর্ড'ও স্থাপিত হইতেছে। এ সমস্ত রেকর্ডের মধ্যে গত বৎসরের হিসাব-নিকাশে নিম্নলিখিত কয়টি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) বিশেষভাবে নির্মিত ইতালীর একখানি বিমানপোত এই বৎসর ঊর্ধে ৫৬,০১৬ ফুট পর্যন্ত উঠিতে সমর্থ হয়। ইহার পূর্বে কোন বিমানপোত এরূপ উচ্চে উঠিতে পারে নাই।

(২) ইংলণ্ডের 'কুইন মেরী' নামক সুবৃহৎ জলযানখানি আতলান্তিক মহাসাগর পারাপারে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করে।

(৩) ঘণ্টায় ৩৫৭·৫ মাইল অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিলাতের একজন মোটরচালক মোটর রেসে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে।

(৪) একখানি জার্মান সামরিক বিমানপোত ঘণ্টায় গড়ে ৩৭৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ল্যাণ্ডপ্লেনের গতিবেগে এক নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে।

(৫) না থামিয়া একটানা ৭১৬২ মাইল পথ চলিয়াও একটিমাত্র ইঞ্জিন বিশিষ্ট ব্রিটিশ সামরিক অগ্নিবর্ষী বিমানপোত (bomber) বিমান-বিহারে নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

প্রধানত, পূর্তবিদ্‌গণের চেষ্টায়ই যে এ সমস্ত যন্ত্রদানবগুলি এরূপ কাজ করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

মানুষের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির কাছে প্রকৃতিকে যথার্থই পদে পদে পরাজয় স্বীকার করিতে হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস মানুষের এই জয়যাত্রার কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। বৎসরের পর বৎসর বিজ্ঞান যেরূপ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। 'জ্ঞানই যে প্রকৃত শক্তি' আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা পদে পদে প্রমাণ করিতেছেন

পুস্তক পরিচয়

ময়দানবের দ্বীপ—(ছোটদের উপন্যাস) গ্রন্থকার—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—ভরদ্বাজ পাবলিসিং হাউস্, ১১, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বাঙালী তরুণদলের অযাচিত অভিযানে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। প্রেমেন্দ্রবাবুর ভাষার যাদুতে এবং ঘটনার চমকপ্রদ লহরে বাঙলার বালক বালিকাদের মনে শিহরণ জাগাইবে। শুধু চমকেই স্তব্ধ হইবে না, ভাবিবার মত শিখিবার মত অনেক কিছু মনের খোরাকই তাহারা পাইবে। সুকৌশলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যে রূপটি আরোপ করা হইয়াছে, সম্ভাব্যতার দিক হইতে তাহা কোমলচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিবে—তাহাদের আশা ও কল্পনা প্রসারিত করিতেই সাহায্য করিবে।

বেপরোয়া ডানপিটেপনার মন্ত্র বাঙলার তরুণদের কানে যত বেশী ঝঙ্কৃত হয়, অসমসাহসিকতার মূর্ত্তি যত বেশী তাহাদের চোখের সম্মুখে ধরা যায়, ততই তাহাদের মঙ্গল—দেশেরও মঙ্গল।

এই পুস্তকখানি আপন গুণেই ছোটদের অন্তর অধিকার করিয়া লইবে, এ আশা লেখক অনায়াসেই করিতে পারেন।

বাঙলার টার্জ্জান—(ছোটদের জন্য) গ্রন্থকার—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ; প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছোটদের জন্য লিখিত য়্যাডভেঞ্চারের বই। নামেই পরিচয়—বিদেশী সিনেমার প্রসিদ্ধ 'টার্জান'কে বাঙলার মায়াপুরুষ বুলাইয়া নূতন মূর্ত্তিতে হাজির করা হইয়াছে—যদিও ঘটনাস্থল "সুন্দরদ্বীপ" প্রাচ্যের কোনও নিরালা দ্বীপ। রোমাঞ্চকর ঘটনাস্রোতে কচি পাঠক পাঠিকারা যে মুগ্ধ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা সহজ সরল, বাচনভঙ্গী ছোটদের উপযোগী। অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী যাহাদের ভাল লাগে—বাস্তবের সঙ্গে রূপকথার যোগ যাহাদের মনের মত, এ বই তাহাদের সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীভারতী—আষাঢ়। সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রচরণ বিদ্যা-ভূষণ। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। মাসিকপত্র। বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা; প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত "ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয়ের" পর্য্যালোচনা চলিতেছে। সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত লেখা পণ্ডিত সমাজের কৌতূহল জাগ্রত করিয়াছে। "সাংখ্য মতে আত্মবাদ" সুপণ্ডিত শ্রীযুত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের লেখার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। 'নালন্দা' 'রথযাত্রা' মায়াবাদ সারগর্ভ রচনার সুনির্বাচিত সমাবেশে শ্রীভারতী সর্ব্বদা সমৃদ্ধ।

সাথী—মাসিকপত্র। সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র সাহিত্য-শাস্ত্রী। বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ। প্রতি সংখ্যা দুই আনা, বার্ষিক ১৷৵০ আনা। ৭।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুত মতিলাল রায়ের 'ভারতের সন্ন্যাস', শ্রীযুত সত্যচরণ পালের 'ধন্বন্তরের মহাত্মা নৈসা' লেখাগুলি ভাল। ব্রহ্মচারী ভাস্কর মহাশয়ের রচিত 'পল্লীবাসীর খেদ' কবিতাটি [illegible] করিবে। দেশপ্রীতির একটি অনাবিল মাধুর্য্যের স্পর্শ মনে পড়ে। 'সাথী' সুসম্পাদিত পত্র।

দি সোসিয়ালিষ্ট—সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্র সরকার। বার্ষিক মূল্য ২ টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই আনা। ৩১এ, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জুরিচ শহরের যে মুদির বাড়ীতে ১৯১৭ সালে লেনিন পরিবার ছিলেন, তাঁহার লিখিত লেনিনের পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সকলেরই উপভোগ্য হইবে। "ইউরোপের উপর যুদ্ধের ছায়া", "ষ্টালিন সত্যই কি চান" লেখাগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। পুস্তক সমালোচনা সুচিন্তিত এবং এই পত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—(৪৬শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সুধী সমাজে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা যে খুবই সমাদৃত, তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যার ন্যায় এখানিতেও নানারূপ গবেষণামূলক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ, সুপণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়ের বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন, শ্রীযুত অনুকুলচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মুসলমান সাহিত্যে ভারতবাসীর দান, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগীর ম্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ (৫) ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিভাগে যাঁহারা গবেষণায় রত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহাতে চিন্তার খোরাক পাইবেন। কয়েকখানি চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনীয়।

প্রথম প্রশ্ন—শ্রীরাইমোহন সাহা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫৫৩। দাম তিন টাকা।

প্রসিদ্ধ লেখক অনুপম রায় ওরফে পদ্মদাকে কেন্দ্র করিয়া এই দীর্ঘ উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। এই অনুপম চরিত্রের মধ্যেই লেখক প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার জবাব লেখক দেন নাই। পাঠক-পাঠিকা এবং তাঁহাদের ভিতর দিয়া বৃহৎ জন-সমষ্টির উপরই ইহার যথাযথ উত্তর দিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহা করিয়া লেখক ভালই করিয়াছেন। তবে আমরা যে সমস্যা সমাধানের কতকটা ইঙ্গিত ইহার মধ্যে না পাই, তাহা নহে।

সমাজ বিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি কথা উঠিয়াছে। কলেজের ছাত্রী মায়া ও বীণা ইহা লইয়া আলোচনায় রত। ব্রাহ্মণ-কন্যা মায়া অব্রাহ্মণ পরেশকে ভালবাসিয়াছে। কিন্তু সমাজের বন্ধন তাহাদের মিলন পথে বিঘ্ন জন্মাইল। এক বৃদ্ধের সঙ্গে মায়ার বিবাহ হইল। কিন্তু এক বৎসর পরেই বৈধব্য বেশে সে মাতার নিকট ফিরিয়া আসিল। মাতার মৃত্যু হইলে, নিরুদ্ধ মায়া পরেশের আশ্রয় গ্রহণ করিল। উভয়ের

রহিয়া গেল। বীণা জজের কন্যা। জজের আশ্রিত বিমান গুপ্ত যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইল, তখন জজবাবু একরূপ স্থির করিয়াই ফেলিলেন যে, বিমানের সঙ্গে বীণার বিবাহ দিবেন। কিন্তু এ পথে বাধা উপস্থিত হইল শ্রীঅনুরূপ রায় বা পমুদা। পমু ফেরি-ওয়ালারূপে পূজার সময় আসিয়া জজবাবুর গৃহে উপস্থিত হইল। এই সময় হইতে তাহার কার্য্যকলাপ—যাত্রার দল আনয়ন, দশমীর মেলায় হাঙ্গামার সময় বীণাকে উদ্ধার, এক লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা জমা রাখা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিমূলক মতামত প্রভৃতি মিলিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া জজবাবুর কন্যা বীণা সেনকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। উভয়ের মধ্যে পরিচয় ক্রমে প্রণয়ের স্তরে উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন বীণা তাহার দাদাবাবুর মুখে শুনিতে পাইল যে, পমুদা জাতিতে চামার, তখন তাহার প্রতি বীণার মনে কেমন একটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব উপস্থিত হইল। বিমানের সঙ্গে অতঃপর তাহার বিবাহ ঠিক হইল। কিন্তু পমুর প্রতি বিমানের নিষ্ঠুর ব্যবহারে বীণা অকস্মাৎ একেবারে বিগড়াইয়া গেল। বিবাহের তারিখে নিমন্ত্রিত পরেশ ও বীণার বন্ধু কমলার বিবাহ হইয়া গেল! ভিতর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, মায়া ব্রহ্মচারিণীই ইহার পর বীণা পমুকে পতি পদে বরণ করিতে চাহিল, কিন্তু সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই। লেখকের ভাষার সহজ গতি আছে। তিনি মূল সমস্যাটি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বহু বিষয়ের ও ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে আসল বক্তব্যটি যেন কতকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহা যে একখানি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হউক, ইহাই কামনা করি।

ভ্রম-সংশোধন

বিগত ৩৪ সংখ্যা (৮ই জুলাই, ১৯৩৯) দেশ পত্রিকার 'পুস্তকপরিচয়' অধ্যায়ে "বাঙ্গালীর বল" (শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত) পুস্তকের সমালোচনায় ভ্রমক্রমে 'প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই পুস্তকের প্রকাশক—ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, দেশ

চাই দৃষ্টি

(৭৬৪ পৃষ্ঠার পর)

াস করতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি যত বেশী হবে, বড়ো বড়ো শহরে ভীড় ক'রে বাস করবার প্রয়োজন তত বেশী কমে আসবে। কলকাতার মতো জনাকীর্ণ শহরে কেন মানুষ ঠেসাঠেসি ক'রে বাস করতে যাবে? আর কিছু-কাল পরে সর্ব্বত্র লোকে টেলিফোনে কথা বলবার সুযোগ পাবে, গ্রামে গ্রামে সিনেমা-হল তৈরী হবে, পল্লীতে পল্লীতে রেডিওর সাহায্যে গান ও বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যাবে, এরোপ্লেনে অল্পকালের মধ্যেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া চলবে। এখনকার বড়ো বড়ো শহরগুলির দশা কিছুদিন পরে কি হবে—আন্দাজ করা শক্ত নয়। যন্ত্রশিল্পের রাজ্যে নব নব আবিষ্কার এবং মানুষের মনের উপরে তাদের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে যারা কাজ করবে—তাদেরই কণ্ঠকে ভূষিত করবে জয়লক্ষ্মীর বরণমালা।

নতুনকালের চাঁদসদাগর হবে যারা তাদের হতে হবে নতুন ধরণের মানুষ। আর দশজনকে বেশী দামে ভেজাল জিনিষ বেচে লাভ করবো—এই ধরণের মানুষ ভবিষ্যতে ব্যবসায়ে সুবিধা করতে পারবে না। যারা ব্যবসায় করে তারা যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নয়। সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বহুজনের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে হবে। ব্যবসাদার হবে যে—তার দৃষ্টি হবে উদার—সকলের কল্যাণ হবে তার লক্ষ্য। গণতন্ত্রের আদর্শ সমাজে কখনোই জয়যুক্ত হতে পারে না যতক্ষণ শিক্ষার বিস্তার মানুষের চিত্তকে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি অনুরাগী ক'রে তুলতে না পারবে।

There can be no successful democratic society till general education conveys a philosophic outlook.

চিন্তাশীলতার প্রয়োজন আজকের দিনে হ'য়ে পড়েছে অত্যন্ত বেশী। জীবনের নীচুস্তরে যখন ছিলাম তখন ভাবুকতার এত প্রয়োজন ছিল না। আজ সভ্যতার প্রায় উচ্চতম স্তরে গিয়ে আমরা পেঁচেছি। আজ যদি আমরা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখ্‌তে না পারি, একটা মহান আদর্শকে কেন্দ্র করে আমাদের কর্ম্মধারা যদি উচ্ছ্বসিত হয়ে না ওঠে তবে আমাদের উদ্যম একদিন শিথিল এবং সমাজ অধঃপতিত হতে বাধ্য। আমাদের ঘাড়ে ইউরোপীয় সভ্যতা তার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসে পড়েছে। এর প্রভাব আমাদের উপরে কেমন হবে—তা নির্ভর করছে আমাদের মূল বিশ্বাসগুলির উপরে—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমার উপরে—আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানের শক্তির উপরে। আমরা নতুনের মোহে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী জাপান ক'রে তুলবো, না তাকে বিশ্বব্যাপী কল্যাণের বাহন ক'রে তুলবো? আমাদের কাজ হচ্ছে সেই নবজগতের স্বপ্নকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া—যে জগতের প্রতিষ্ঠা সাম্যের এবং স্বাধীনতার উপরে—যে জগত সত্য এবং প্রেমের আদর্শে অণুপ্রাণিত। যে জ্ঞান আমাদের এমনি একটা জগতের ধ্যানমূর্ত্তি কল্পনা করতে সাহায্য করবে সেই জ্ঞানই হোলো সকল মঙ্গলের মূল।

সাহিত্য-সংবাদ

ফলাফল

গত ১৩ই মে তারিখের "দেশ" পত্রিকায় দুমকা বান্ধব সমিতির পক্ষ হইতে "কাকলির" জন্য যে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছবির প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) **প্রবন্ধ**—(১ম) "ভারতের রাষ্ট্রভাষা"। লেখক শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ, ৪১নং বেলতলা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(২) **কবিতা**—(১ম) "আবর্তন"। লেখক শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় C/o, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তৈলমাড়ুই রোড, বর্ধমান।

(৩) **গল্প** (১ম) "সংঘর্ষ"। লেখক শ্রীভূতনাথ ঘোষ, সায়েন্স কলেজ, পাটনা।

(৪) **ছবি** (১ম) "তুলির লিখন"। শিল্পী শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্তী, দুমকা, (সাঁওতাল পরগণা)।

প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া নামাঙ্কিত রৌপ্যপদক স্ব স্ব ঠিকানায় যথাসময়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীপরিমলেন্দু রায়চৌধুরী,
সম্পাদক, বান্ধব সমিতি, দুমকা (সাঁওতাল পরগণা)।

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

তরুণ সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা ছাত্রদের সহিত কি সম্বন্ধ ও তাহাদের কি কর্তব্য।" ১ম ও ২য়কে দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

রচনা:—বিষয় "বর্তমান দেশের দুরবস্থার সঙ্গে বর্তমান ছাত্রদের সহিত কি সম্বন্ধ ও তাহাদের কি কর্তব্য। ১ম ও ২য়কে দুইটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

চিত্র:—"সমুদ্রবক্ষে সূর্যোদয়ের দৃশ্য।" শ্রেষ্ঠ চিত্রের একটি অত্যুৎকৃষ্ট রৌপ্য পদক। নিম্নঠিকানায় রচনা ও চিত্র পাঠাইতে হইবে।

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাঃ সম্পাদক, ৬।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

আমাদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'বিদ্রোহীর' উদ্যোগে যে গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে "শেষ অশ্রু" শ্রীমান বিপ্লবচন্দ্র রায়, নবদ্বীপ, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কবিতা প্রতিযোগিতায় "বর্ষ শেষে" নামক কবিতার লেখিকা কুমারী শান্তিসুধা দাশ, ভাটিয়াইন, চট্টগ্রাম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আষাঢ় মাসের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ লেখক ও লেখিকাকে দুইখানি রৌপ্যপদক পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এর মধ্যে কেহ যদি ঠিকানা বদলান তাহা হইলে যেন দয়া করিয়া আমাদের খবর দেন।

—শ্রীসুশান্তকুমার পাঠক, সম্পাদক "বিদ্রোহী", সাধনপাড়া, পোঃ বহিরগাছি, নদীয়া।

চলন্তিকা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

কিছুকাল পূর্বে "চলন্তিকা" রঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়া "দেশ" পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রবন্ধগুলি কোনটিই "চলন্তিকা" পদকের উপযোগী হয় নাই। পরীক্ষার ফল রচনার উৎকর্ষ হিসাবে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সেন (প্রফেসার বিভূ), দ্বিতীয় ভবতারণের দুর্গাপূজো (শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাটনা), তৃতীয় নাম ভূমিকা (কুমার শ্রীমানসিং বাহাদুর আসাম)।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র-ছাত্রী সাহিত্য সম্মেলন

(দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশন)

উক্ত সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ৭ঠা আগষ্ট ১৯৩৯, শুক্রবার হইতে আরম্ভ হইবে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীগণকে পদক প্রদান করা হইবে ও তাঁহাদের নাম যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে। সম্মিলন ও প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত শাখাভুক্ত হইবে:—

(ক) সাহিত্য বিভাগ, (খ) বিজ্ঞান বিভাগ, (গ) অর্থনীতি বিভাগ, (ঘ) ইতিহাস বিভাগ, (ঙ) চারুকলা ও সংগীত বিভাগ, (চ) দেশ-সেবা বিভাগ, (ছ) শিশু-সাহিত্য বিভাগ। উপরি-উক্ত বিভিন্ন শাখাভুক্ত প্রবন্ধাদি ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিগণকে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এ বৎসর ১লা আগষ্ট তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিগণ স্ব স্ব প্রবন্ধ সম্মিলনের বিভিন্ন শাখা-অধিবেশনে নিজে পাঠ করিবেন। অধিবেশনের তারিখ ও সময় যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ

গত ৮ই জুলাই, শনিবার জামসেদপুরে এসোসিয়েশন হলে চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে একটি বিশে সাহিত্য সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার আলো বিষয় ছিল "প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা"। জামসেদপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রব বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী, সাহিত্যবিনোদ মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় ভারতীয় শি সমস্যা সম্বন্ধে বহু তথ্যের বিশ্লেষণ করিয়া একটি সার বক্তৃতা দেন এবং ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা, গুরুকুল বিদ্যা এবং বিশ্বভারতীর সহিত তুলনা করিয়া বর্তমান শি পদ্ধতির বিশদ সমালোচনা করেন। শহরের গণ্যমান্য ব গণের অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় যো দিয়াছিলেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত,
সম্পাদক

আগষ্ট মাসের মধ্যে উত্তর কলিকাতার ৪টি চিত্রগৃহে ৪ খানি নূতন ছবি মুক্তিলাভের কথা আছে। চিত্রায় আরম্ভ হইবে নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি "রজত-জয়ন্তী", রূপবাণীতে আরম্ভ হইবে ফিল্ম করপোরেসনের "রিক্তা", উত্তরায় আরম্ভ হইবে শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের 'পরশমণি" এবং শ্রীতে মুক্তিলাভ করিবে দেবদত্ত ফিল্মসের "রুক্মিণী"।

রজত-জয়ন্তী ছবি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া, মেনকা, মলিনা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্ন্যাল, ইন্দু মুখার্জ্জি, দীনেশ দাস, সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন।

শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'পরশমণি' ছবি পরিচালনা করিয়াছেন। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না, রবি রায়, রাণীবালা, তুলসী লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বীণা বার্গাচ, অরুণা, প্রভা, সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

শ্রীযুত সুশীল মজুমদার ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রিক্তা' ছবি পরিচালনা করিয়াছেন। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া, রমলা, তুলসী লাহিড়ী, সুশীল মজুমদার প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

দেবদত্ত ফিল্মসের 'রুক্মিণী' ছবি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিভিন্ন ভূমিকায় পান্না, প্রতিমা, দেববালা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি, জহর গাঙ্গুলী, বেচু সিংহ, সন্তোষ দাস প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * * *

সম্প্রতি কলিকাতায় এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স নামে যে একটি নূতন চিত্র পরিবেশন কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি দুইখানি ছবি পরিবেশনের ভার লইয়াছেন। প্রথমখানি হইতেছে 'এসোসিয়েটেড প্রডিউসারের "আলো-ছায়া" ছবি। নিউ থিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিওতে এই ছবিখানি তোলা হইবে। পরিচালনা করিবেন শ্রীযুত দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রযোজনা করিবেন শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মিত্র। সংগীত পরিচালনা করিবেন শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায়—মেনকা, মলিনা, পঙ্কজ মল্লিক, মঞ্জু, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি অভিনয় করিবেন।

এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ছবি হইবে—নিউ থিয়েটার্সের একখানি ছবি। শ্রীমতী কাননবালা সেই চিত্রের নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

সাগর মুভিটোনের 'কুংকুম' চিত্রে শ্রীমতী সাধনা বসু।

* * * * * *

পুণার প্রভাত ষ্টুডিওর অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তা আপ্তে তাঁহার অভিযোগের প্রতিকারকল্পে সোমবার সন্ধ্যা হইতে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত দাবী জানাইয়াছেন তাহার মধ্যে একটি দাবী এই যে, তিনি যতদিন

ছুটীতে ছিলেন সেই কয়দিনের বেতন তাঁহাকে দিতে হইবে। সোমবার রাত্রে শ্রীমতী শান্তা শিকারীর পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া ষ্টুডিওর দরজার কাছে শুইয়া ছিলেন। শান্তা আপ্তের ভ্রাতা ও আর একজন সহকর্ম্মী তাঁহার কাছে ছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। মঙ্গলবার সমস্ত দিন শ্রীমতী শান্তা আপ্তেকে খাওয়াইবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি জল পর্যান্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তা আপ্তের অনশনে প্রভাত ষ্টুডিওতে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। মঙ্গলবার সমস্ত দিন ধরিয়া ষ্টুডিওর পরিচালকবর্গের ঘন ঘন বৈঠক হয়। ষ্টুডিও কর্ত্তৃপক্ষ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শ্রীমতী শান্তা আপ্তে অনশন ভঙ্গ না করিলে তাঁহারা শ্রীমতী শান্তা আপ্তের দাবী বিবেচনা করিতে পারেন না; কারণ তাহা খারাপ আদর্শের সৃষ্টি করিবে এবং ষ্টুডিওর শৃঙ্খলা তাহাতে ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

অপরপক্ষে শ্রীমতী শান্তা আপ্তে এই কথা বলিয়াছেন যে, যদি তাঁহাকে লিখিতভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি অনশন ভঙ্গ করিতে রাজী আছেন।

মঙ্গলবার গভীর রাত্রে জনৈক চিকিৎসক শ্রীমতী শান্তা আপ্তেকে পরীক্ষা করিয়া এই অভিমত দেন যে আর অধিককাল অনশন করিলে তাঁহাকে অসমর্থ হইয়া পড়িতে হইবে। কাজে কাজেই তিনি মঙ্গলবার শেষ রাত্রে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

* * * * * *

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন বালক-বালিকাদের জন্য বিশেষভাবে একখানি ছবি তুলিয়াছেন। ছবিখানির নাম "হাতে খড়ি"। শ্রীযুত নিরঞ্জন পাল ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। আগামী ২২শে জুলাই হইতে ছবিখানি শ্রী চিত্রগৃহে দেখান হইবে।

এই স্থলে এই কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশে এমন অনেক চিত্রপ্রতিষ্ঠান আছে যাহারা সেই সমস্ত দেশের বালক-বালিকাদের শিক্ষার দিক বিবেচনা করিয়া বিশেষভাবে তাহাদের জন্য ছবি তোলে। ভারতবর্ষে একমাত্র অরোরা ফিল্ম কোম্পানী এইরূপ ছবি তুলিলেন। এই জন্য আমরা অরোরা কর্ত্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করিতেছি।

* * * * * *

নৃত্যশিল্পী ললিতকুমার প্রায় তিন মাসকাল আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর দলের শিক্ষা শিবিরে থাকিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আলমোড়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি কালী ফিল্মের নৃত্য পরিচালক ছিলেন। আপাতত কয়েক দিনের জন্য তিনি তাঁহার জন্মভূমি শ্রীহট্টে যাইতেছেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আবার কলিকাতার নৃত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবেন। উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে তাঁহার বিদেশ ভ্রমণে যাইবার কথা আছে।

* * * * * *

ঢাকা, গেণ্ডেরিয়াস্থ শ্রীযুত যামিনীকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা কুমারী রেখা বসু অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ঢাকা নগরীর সঙ্গীতামোদী জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কংগ্রেস সুবর্ণ-জয়ন্তী, গৌতম মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কুমারী রেখা খেয়াল, আধুনিক বাঙলা ও ভাটিয়ালিতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বহু কাপ ও পদক লাভ করিয়াছে। কুমারী রেখার বয়স মাত্র দশ বৎসর। সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুত হৃদয়রঞ্জন রায়ের ছাত্রী।

খেলা-ধূলা

(৭৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শনের পরিচালিত কয়েকটি জুনিয়ার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ১৯০০ সালে উক্ত ক্লাব বহু চেষ্টার পর কলিকাতা ময়দানে একটি খেলিবার মাঠ পায়। ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে উক্ত ক্লাব কুচবিহার কাপ বিজয়ী হয়। ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে ট্রেডস কাপ বিজয়ী হয়। উক্ত দুইটি প্রতিযোগিতার সাফল্য মোহনবাগান ক্লাবের জনপ্রিয়তা লাভের সহায়তা করে। ১৯০৭ সালে উক্ত ক্লাব সেই সময়ের দুর্দ্ধর্ষ ক্যালকাটা দলকে পরাজিত করে। ১৯০৯ সাল হইতে উক্ত দল আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ১৯১০ সালে গর্ডন হাইল্যাণ্ডাস দলের নিকট পরাজিত হইয়া শীল্ড বিজয়ী হইতে পারে না। ১৯১১ সালে উক্ত দল শীল্ড বিজয়ী হয়। এই সাফল্যই মোহনবাগান দলকে বাঙলার সর্ব্বজনপ্রিয় ক্লাবে পরিণত করে। ইহার ফলেই ১৯১৪ সালে মোহনবাগান ক্লাবকে কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বিভাগে খেলিবার অধিকার দেওয়া হয়। এই বৎসর মোহনবাগান লীগ খেলায় মেসারার্স "বি" দলের সহিত ২২ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দুইটি দলকে পুনরায় খেলিবার সুবিধা দিলে মোহনবাগান দ্বিতীয় দিনে এক গোলে পরাজিত হয়। আই এফ এর সহ-সভাপতি ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মিঃ টি সি ক্রফোর্ডের প্রচেষ্টায় মোহনবাগান পরবর্ত্তী বৎসরেই প্রথম বিভাগে খেলিবার অধিকার লাভ করে। সেই হইতেই মোহনবাগান দল প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় খেলিতেছে। এই দীর্ঘ ২৫ বৎসরের মধ্যে বহু ভারতীয় ক্লাব প্রথম বিভাগীয় লীগে উন্নীত হইয়াছে ও নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু মোহনবাগান সমানে তাহার স্থান বজায় রাখিয়াছে।

মোহনবাগান দল ১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ী হইয়া ১৯২৩ সালে শীল্ডে রাণার্স আপ হইতে সক্ষম হয়। উক্ত প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে মোহনবাগান ক্লাব ১৯২০ সালে কুমারটুলীর নিকট, ১৯৩১ সালে এইচ এল আইর নিকট ও ১৯৩৬ সালে ক্যালকাটার নিকট পরাজিত হইয়াছে। ১৯২৩ সালে মোহনবাগান ক্লাব বোম্বাইয়ের রেভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় রাণার্স আপ হয়। ডারহামস সৈনিক দল উক্ত কাপ বিজয়ী হয়। ১৯২৪, ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে মোহনবাগান সিমলার ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব

১৯৩৯ সালের কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মোহনবাগান ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। ১৯১৫ সালে লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া মোহনবাগান ক্লাব এই বৎসর প্রথম এই সম্মান লাভে সক্ষম হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১ ও ১৯২৫ সালে মোহনবাগান ক্লাব প্রতিযোগিতায় রাণার্স আপ হইয়াছে। ১৯২৯ ও ১৯৩৪ সালে রাণার্স আপ ডি সি এল আই ও ডালহৌসী দলের সহিত সমান সংখ্যক পয়েণ্ট পাইয়া মোহনবাগান ক্লাব লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। একটি কথা উল্লেখ করিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, মোহনবাগান ক্লাব লীগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ ২৫ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসরই লীগ তালিকার নিম্নভাগে স্থান লাভ করে নাই। মোহনবাগান ক্লাবের এই কৃতিত্ব প্রশংসনীয় ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১৯৩৯ সালের প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল। বাম দিক হইতে পিছনের সারিতে দণ্ডায়মান:— বি দে, আর সাহা, এস গুই, জে ঘোষ, এ দে। সামনের সারিতে দণ্ডায়মান:—কে ব্যানার্জ্জি, এস চৌধুরী, পি চক্রবর্ত্তী, বি ডি চ্যাটার্জ্জি (ট্রেণার) পি সেট, আর সেন ও এম ব্যানার্জ্জি। চেয়ারে উপবিষ্ট:—প্রেমলাল, বেণীপ্রসাদ, এ রায় চৌধুরী, (সহকারী অধিনায়ক) বি কে ঘোষ (সহকারী সাধারণ সম্পাদক), বিমল মুখার্জ্জি (অধিনায়ক), ইউ কুমার (ফুটবল সম্পাদক), ডাঃ এস দত্ত। মাটিতে উপবিষ্ট:—এস দেবরায়, কে দত্ত ও সুকুমার দত্ত।

মোহনবাগানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৮৮৯ সালে উত্তর কলিকাতার কতকগুলি কলেজের ছাত্র একত্র মিলিত হইয়া "মোহনবাগান ভিলায়" এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৯৩ সালে এই ক্লাব ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়ে-

(শেষাংশ ৫৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ই জুলাই—

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অবশিষ্ট ৯ জন রাজনৈতিক বন্দী অদ্য অনশন ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে লইয়া আলিপুর ও দমদম সেণ্ট্রাল জেলের অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা মোট ৮৯ হইল।

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বিলম্ব করায় ও মুক্তি দিতে অপরাগ হওয়ায় দমদম ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা যে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেস দলের সভ্য রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন; প্রস্তাবটির পক্ষে ৮১ ও বিপক্ষে ১১৬ ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হয়।

মুজঃফর নগরের স্বামী কল্যাণানন্দ গত ৮ই জুলাই গুলবার্গা জেলে মারা গিয়াছেন। হায়দরাবাদ জেলে এ পর্য্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হইল।

বোম্বাইয়ে প্রগতিবাদী কংগ্রেসকর্ম্মী সঙ্ঘের এক জরুরী সভায় স্থির হইয়াছে যে, বামপন্থিগণ ফরোয়ার্ড ব্লকের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন। মিঃ এম এন রায় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ প্রস্তাব অনুসারে প্রগতিবাদী কংগ্রেসকর্ম্মী সঙ্ঘ বামপন্থী সমন্বয় কমিটি হইতে তাঁহাদের তিনজন প্রতিনিধিকে অবিলম্বে পদত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

বিশ্ববিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ সিগমণ্ড ফ্রয়েডকে বৃটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য করিবার জন্য একটি আন্দোলন সুরু হইয়াছে। শীঘ্রই বোধ হয় এজন্য গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরবর্ত্তী বৃটিশ রাজদূতরূপে মনোনীত লর্ড লোথিয়ান প্যারিসে গিয়াছেন। প্রকাশ, মিঃ চেম্বারলেন সোভিয়েটের সহিত কোন চুক্তি করিতে চান না, তাহা মঃ দালাদিয়েরকে বুঝাইয়া বলাই লর্ড লোথিয়ানের প্যারিস গমনের উদ্দেশ্য। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করিবার জন্য চাপ দিতেছেন বলিয়া মিঃ চেম্বারলেন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

পোলাণ্ড যাহাতে জার্ম্মানীকে বাধা না দেয়, সেজন্য পোলাণ্ডকে চাপ দিয়া রাজী করাইবার কাজে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করা উচিত, লর্ড লোথিয়ান এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ডানজিগে জেম্মান সামরিক তোড়জোড়ের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডের প্রতিবাদ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মাদক বর্জ্জন পরিকল্পনা সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, বোম্বাই-এ অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জ্জনের জন্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার ফলে বহু পার্শী পরিবার নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইবে। তাহা ছাড়া বোম্বাইয়ের মুসলমানরাও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "ধীরে ধীরে মাদক বর্জ্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে, উহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।"

গত তিন বৎসরের মধ্যে পাবনা জেলায় যে সমস্ত স্থানে মন্দির কলুষিত করা হইয়াছে, স্বরাষ্ট্র সচিব তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন।

ইটালীয় টিরলের স্থায়ী বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ এবং সুইস বাসিন্দাগণকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে টিরল ত্যাগ করার জন্য ইটালীয় পুলিশ এক আদেশ জারী করিয়াছে।

১২ই জুলাই—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিংহলে যাইবার জন্য এলাহাবাদ হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

ধারোয়ারে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বামপন্থিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠার আসন অধিকার করিতে অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্ত বসু দক্ষিণ-পন্থীদের মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থীদের আস্থা হারাইয়াছে। তিনি বলেন, দেশ এখন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বর্ত্তমান নেতাদের সাহায্যেরই অভাব। আন্তর্জ্জাতিক এই সঙ্কট সময়ে গণ-আন্দোলনের জন্য আমরা প্রস্তুত হইলেই আমরা আমাদের দাবী আদায় করিয়া লইতে পারিব।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বৃটিশ একাডেমীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সম্মানলাভ করিলেন।

আসাম গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে গতকল্য শিলংয়ে ডিগবয় শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক এবং আসাম অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজারের এক সম্মেলন হয়। তাহাতে উভয়পক্ষই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক সঙ্ঘের বিরোধের প্রধান বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার পথ সুগম করিতে ডিগবয়ের শ্রমিক ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিরাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাও গ্রাম হইতে আবার কালী-প্রতিমা ভঙ্গের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ রবিবার রাত্রে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত কালীঘরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমার মুণ্ড ভাঙিয়া দিয়াছে।

লণ্ডনে শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনার জন্য পার্লামেণ্টের কতিপয় শ্রমিক সদস্য একটি চা-পার্টির আয়োজন করেন। শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায় ঐ পার্টিতে বলেন, "ভারতীয়গণ অনায়াসে নিজেদের দেশ শাসন করিতে এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে পারে। একথা বলিলে হয়ত অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইবে না যে, বৃটিশরা ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ভারত শাসন করিবার উপযুক্ত নয়।"

বৃটিশ এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের নেতা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস ব্রুস পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৩ই জুলাই—

নিখিল ভারত কিষাণ সভার জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী সহজানন্দের উপর পাঞ্জাব সং ফৌঃ আইনানুসারে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। এই আদেশ দ্বারা তাঁহাকে পাঞ্জাব

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৬ Saturday, 15th July, 1939 [৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ম্মুক্তি ও কংগ্রেস--

আলীপুর ও দমদম সেণ্ট্রাল জেলের ৮০ জন রাজনীতিক
ী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এই অনশন ধর্ম্ম-
দেশের সর্ব্বত্র একটা দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।
রা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি--
ন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হইবার
র্ব কংগ্রেসের উচিত ছিল রাজনীতিক বন্দীদিগকে
করাইয়া লওয়া। অন্য দেশের নেতারা
ই করিতেন। আয়র্লণ্ডে এবং মিশরে ইহাই করা
াছিল। আয়র্লণ্ডের বিপ্লবী বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে
শ গবর্ণমেণ্ট সহজে রাজী হন নাই; কিন্তু সিনফিন
রা এই সর্ত্তটিতে দৃঢ় থাকাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য
। সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হয়। এখানেও তাহাই
।। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যদি জোর করিয়া এই দাবী ধরিয়া
তেন যে, রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি না দিলে আমরা
। গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে
হইয়া বাধ্য হইয়া ঘাট মানিতে হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে
াস নীতিগতভাবে বিষয়টিকে না দেখিয়া
। প্রাদেশিক হিসাবে বিষয়টি দেখেন। যে সব
ণ কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল সেই ক্ষেত্রেই মন্ত্রিমণ্ডলের
ক্ত মানিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হন। ফলে
ব এবং বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদের সমস্যার সমাধান
উঠে না। বাঙলার রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি
জন্য মহাত্মা গান্ধী চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু
। সে চেষ্টাকে বাঙলা সরকার কেমন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন
ষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন এ সম্বন্ধে সেদিন যে বিবৃতি
করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।
সের প্রতি বাঙলার মন্ত্রীদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি নাই, থাকিবে
মন আশাও করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর উপরও
শ্রদ্ধাবুদ্ধি তাঁহাদের নাই, এমন কি মন্ত্রী হিসাবে যে শ্রদ্ধা-
বুদ্ধি তাঁহাদের থাকা উচিত সেই জনমতের উপরও তাঁহাদের
সে শ্রদ্ধাবুদ্ধি একটুও নাই। বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব নিতান্ত
ঔদ্ধত্যভরে তাঁহার বিবৃতিতে বাঙলার জাতীয়তাবাদীকে
সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি হুমকী দেখাইয়াছেন
যে, তাঁহারা নিজেদের জিদই বজায় রাখিবেন দেশের লোক
যতই চীৎকার করুক না কেন। দেশের লোকের পক্ষ হইতেও
জবাব তাহার আসিবে। বাঙলার জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া
উঠিতেছে। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য সর্ব্বত্র নূতন
যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেই সেই পরিচয়।
কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব সভাসমিতি এবং
আন্দোলনেও বাঙলার মন্ত্রীরা বিচলিত হইবেন না; কারণ
তাঁহারা এক দিকে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি, অপর দিকে
সাম্প্রদায়িক ও ভেদবুদ্ধির বিস্তার এই দুই হাতীয়ার
ধরিয়া নিজেদের সিংহাসন নিষ্কণ্টক রাখিতে বদ্ধপরিকর
হইয়াছেন। আমাদের মতে প্রধান উপায় এবং একমাত্র উপায়
হইল নিখিল ভারতীয় প্রশ্ন হিসাবে কংগ্রেস হইতে এই
বিষয়টি লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের
উপর চাপ দেওয়া। রাজকোটের সমস্যা লইয়া মহাত্মা গান্ধী
অনশন-ব্রত অবলম্বন করিলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা জোট বাঁধিয়া
ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর যেরূপ চাপ দিয়াছিলেন, তেমন চাপ
যদি এক্ষেত্রে দেন, তাহা হইলে সব সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের সমস্যাটিকে
যতটা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, বাঙলা ও পাঞ্জাবের রাজ-
নীতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাবটি তেমন বড় করিয়া দেখিতে-
ছেন না; অথচ কংগ্রেসের মান-মর্য্যাদা রক্ষার দিক হইতে,
কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালনের দিক হইতে এই প্রশ্নটির
গুরুত্ব অনেক বেশী। মহাত্মাজীর অন্তরে আধ্যাত্মিক অনু-
ভূতি এই বিষয়ে ততটা কেন হইতেছে না, যতটা প্রবল

হইয়াছিল রাজকোটের ব্যাপারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য, অথচ তাঁহার প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদার সঙ্গে এই বিষয়টির প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের কর্ত্তব্যবোধও এক্ষেত্রে যথেষ্ট রকমে প্রখর হইতেছে না কেন, ইহা আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। কারণ কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম সর্ত্তই ছিল এই রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান। মহাত্মা গান্ধীর উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা বলিব—নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার শক্তি যে প্রতিষ্ঠানের নাই, সে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখিবারই অধিকার নাই।

দক্ষিণীদলের স্বৈরাচার—

বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র আদর্শ বলিয়া মনে করে এবং সেই আদর্শেই তাহারা জীবন দান করিয়াছে। দেশের বৃহত্তর সাধনার এই যে প্রেরণা এই প্রেরণা বাঙলা দেশ হইতে আজও যে যায় নাই সে পরিচয় আমরা সেদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত হইতে পাইয়াছি। সত্যাগ্রহ এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি বোম্বাইয়ের অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া স্বৈরাচারমূলক—দক্ষিণীদলের নিয়মতান্ত্রিক মর্জ্জি—দেশের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইবার উহা কৌশল মাত্র। বাঙলার কংগ্রেসকর্ম্মিগণ তীব্রভাবে ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের পক্ষে হয় ৫১ ভোট এবং বিরুদ্ধে হয় ১৬ ভোট মাত্র। সুতরাং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদীরা নগণ্য মাত্র। বাঙলা দেশের জনসাধারণের মনের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব নাই, প্রভাব যে নাই কলিকাতার পৌরবাসীদের কয়েকটি সভায় এ সম্বন্ধে যে বিপুল উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, দক্ষিণীদলের কর্ত্তারা নাকি তাঁহাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য মতলব আঁটিতেছেন। যদি তাঁহারা তেমন অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আত্মঘাতী পন্থাই অবলম্বন করিবেন। স্রোতের গতিকে রুদ্ধ তাঁহারা করিতে পারিবেন না। দেশের লোক আজ চায় সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার আপোষের ভাবকে তাহারা ঘৃণা করে। দক্ষিণীদল যদি নিজেদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সেই বৃহদাদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সাহসী না হন, তাহা হইলে রাজনীতিক সাধনার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়া আধ্যাত্মিক অহিংসার গুণাতীত নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যেই তাঁহাদের নিমগ্ন থাকা উচিত।

প্রতিবাদের অধিকার—

কংগ্রেসের যাহা আদর্শ—যে ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস টিকিয়া আছে, ভারতের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাই কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ। প্রাণশক্তি নষ্ট [illegible] বাড়াবাড়ির উপর টিকিতে পারে না। নিয়ম বা শৃঙ্খলার মূল্য না আছে, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু নিয়ম এবং শৃঙ্খলা প্রকৃতপক্ষে সেইখানেই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথে সহায়ক হয়, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিকে সেগুলি পুষ্ট করে। প্রাণ-ধর্ম্মের উপর আঘাত করিয়া নিয়ম ও শৃঙ্খলার বাঁধনের অনাচার বা ইতরতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আত্মঘাতীই হইয়া থাকে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল আজ সেই অনাচারকেই আচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, দেশের লোকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতেছে যে, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতার পথ নয়। তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিকতার নীতিকেই উত্তরোত্তর একান্ত করিয়া তুলিতেছেন। কংগ্রেসের প্রাণ-পদার্থের উপর পড়িতেছে তাঁহাদের এই সব উদ্যমের আঘাত। এই আঘাত আর কিছুদিন চলিলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদীদেরই একটা শাখারূপে পরিণত হইবে। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত আদর্শের অনুভূতি আছে যাঁহাদের অন্তরে, তাঁহাদের অন্তরে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইবেই এবং নিষ্ঠা বলিয়া কোন বস্তু যদি থাকে, তাহার পরিচয়ও ফুটিয়া উঠিবে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণ-ধর্ম্মের ব্যভিচারী ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। দক্ষিণী দল এই সত্যটা তলাইয়া দেখিতেছেন না যে, এই যে প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতা ইহার মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব নাই, কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই রহিয়াছে। জনমতের গতি কোন্ দিকে উহারই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। জনমতানুসারে চালিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা প্রয়োজন। দক্ষিণী দল যদি কংগ্রেসের আদর্শকে আজ ধ্বংস করিতে উদ্যত হন, দেশের লোকে তাহাতে সাড়া দিবে না, দেয় যে নাই তাহাতেই কংগ্রেসের আদর্শের পরিব্যাপ্তির পরিচয় রহিয়াছে। সেই পরিচয়ই রহিয়াছে এই আন্দোলনের ভিতর। ইহাতেই বুঝা যায় যে, কংগ্রেস দুর্ব্বল হয় নাই। দক্ষিণপন্থী নেতার দলই নিয়মতান্ত্রিকতার মোহে বৃহদাদর্শের প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের অন্তরে দুর্ব্বলতাকে উপলব্ধি করিতেছেন; তাঁহাদের এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধতার তীব্রতার মধ্যে রহিয়াছে যে সঙ্কল্পশক্তি—সেই সঙ্কল্পশক্তিই কংগ্রেসের প্রাণধর্ম্মকে অক্ষুন্ন রাখিবে এবং আপোষ-মনোবৃত্তির বিরুদ্ধতার উগ্রতার অনুপাতেই দেশের মুক্তির দিন নিকটবর্ত্তী হইবে। সেই মুক্তির দিনকে আগাইয়া আনাই কংগ্রেসের সাধ্য এবং সাধনা। এই সাধ্যের এবং সাধনার নিষ্ঠা সাধকদিগকে সকল রকম বিঘ্ন-বিপদে অচঞ্চল রাখে। তাঁহারা আদর্শের সেবায় আত্মদানেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন। চোখ রাঙ্গানীর ভয় তাঁহারা রাখেন না।

হক সাহেবের উদারতা—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সম্প্রতি বিহারে গিয়াছিলেন। তিনি বিহার শরিফের এক বক্তৃতায় বলেন, মুসলীম লীগ ছাড়া যে সব মুসলমান অন্য কোন [illegible] হইলে কোন মুসলমানের

তাহাতে যোগদান করা উচিত নয়। তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মার কল্যাণ কামনা করা ইমানদার মুসলমানের পক্ষে গোনাহ। ইসলামের কোন বিধানে এরূপ আছে আমরা জানি না। পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ এস হায়দার বাঙলার প্রধান মন্ত্রীকে শাস্ত্রের তেমন নজীর দেখাইতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এমন কথা বলিয়া হক সাহেব লীগ কিংবা ইসলাম কাহারও সেবা করেন নাই। ইমাম সাহেব বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ঐ দুই সেবা ছাড়াও অন্য সেবা আছে, সে সেবা হইল আত্ম-সেবা। লীগের সিংহ এবং ব্যাঘ্রদের মুখে ইসলামের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উদার ব্যাখ্যা অপেক্ষা সেই সেবা-ধর্ম্মেরই ওয়াজ আশা করা উচিত। মধ্যযুগীয় অনুদার মনোবৃত্তিকে ভাঙ্গাইয়াই ইঁহারা নিজেদের ব্যবসা বজায় রাখিতে চাহেন। হক সাহেব লীগওয়ালাদের এই স্বভাবজ ধর্ম্মকেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কিছু করেন নাই। 'বিপন্ন ইসলামী' এই বুজরুকী না চালাইলে ইঁহাদের পদ, মান, প্রতিষ্ঠা বজায় থাকিবে কিসে? সকল বিচারের উপরে হইল যে সেই বিচার। সভ্যতা, সংস্কৃতি সকল কথাই তুচ্ছ।

বাঙলা ভাষার শক্তি—

পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরের বার্ষিক উৎসবে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষাকে জোর করিয়া মানভূম জেলায় চাপিয়া মারিবার জন্য বিহারী মন্ত্রিমণ্ডল যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন পাঠকেরা তাহা কিছু কিছু অবগত আছেন। চাটুজ্যে মহাশয় এ সম্বন্ধে সোজা কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। মানভূম জেলা, খাঁটি বাঙালীর দেশ। তিনি মানভূমের বাঙালীদিগকে সাহস দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহ জাগাইয়াছেন, মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠাবুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়াছেন। তিনি বলেন—'বর্ত্তমানে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে নিয়ে নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, সেই সম্পর্কে এই কথাটি বলে রাখি যে, জোর করে কেহ কোন ভাষা চাপিয়ে দিতে পারে না। জাতির চরিত্র ও প্রতিভার দ্বারা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে তার জন্যে আমি কিছুমাত্র উদ্বেগ অনুভব করি না, কারণ, আমি জানি যে, আমাদের চরিত্র বল ও প্রতিভার দ্বারা এ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবো। তবে এই সব অন্যায় আমরা সহ্য করতে কোন মতেই প্রস্তুত নই। বাঙলা ভাষার উপর উৎপীড়ন চলছে। কিন্তু তাতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, যেহেতু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিনষ্ট করতে হলে তা আমরা একলাই পারি—অন্য কেহ নয়। কারণ, আমরা যদি ক্লীব ও অপদার্থ হই, তবেই বঙ্গ ভাষার দুর্দ্দিন আসবে। বাঙলা ভাষা সমস্ত প্রকার অত্যাচার কাটিয়ে উঠতে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাঙলাকে যাঁরা ঈর্ষা করেন, তাঁদের বলি যে, আপনারা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ দেখান তখন আমরা আপনা থেকেই বাঙলায় যে সব সাহিত্যের অনুবাদ করব। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য কখনই মরবে না।' আমাদেরও মত ইহাই। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের মর্য্যাদাবুদ্ধি বাড়িবার সঙ্গে, সেই মর্য্যাদার উপর আঘাত পড়িলে চিত্তের বিক্ষোভও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে—সে ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রেম বা আন্তঃপ্রাদেশিক প্রেমের প্যাকামি ও জেঠামিও ভাল লাগিবে না। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তার আদর্শের দোহাই দিয়া বাঙলা ভাষার উপর আঘাত করিয়া প্রাদেশিক বিদ্বেষ-বুদ্ধির আগুনই জ্বালাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা বাঙালীদিগকে করিতে হইবে; নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দুর্ব্বলের উপর শক্তির সর্ব্বত্রই অপপ্রয়োগ ঘটে, ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

বন্দে মাতরম্‌-এর মর্য্যাদা—

হায়দরাবাদের ছাত্রের 'বন্দে মাতরমে'র মর্য্যাদা রাখিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্পশীলতার পরিচয় দিয়াছে, ভারতের তরুণ-আন্দোলনের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাহাদের এই কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে। এই সব ছেলে হায়দরাবাদ ছাড়িয়া এখন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে। তাহাদের জন্য শোলাপুরে 'বন্দে-মাতরম্‌' কলেজ নাম দিয়া একটি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। ইতিমধ্যে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ছাত্রেরা এই সর্ত্ত দিয়াছে যে, নিজাম কর্ত্তৃপক্ষ যদি 'বন্দে মাতরম্‌' সংগীতের উপর হইতে নিষেধ বিধি প্রত্যাহার করেন, তাহা হইলে তাহারা ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে। বর্ত্তমানে যে তিক্ত উত্তেজিত মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কমাইবার জন্য ছাত্রেরা ৬ মাসকাল 'বন্দে মাতরম্‌' গান স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত আছে। প্রার্থনার সময় একজনে ঐ সংগীত গাহিবে, অন্য সকলে নীরবে থাকিবে ইহাতেও তাহারা রাজী আছে। নিজাম সরকার এই দাবী মানিয়া লইতে রাজী হইলেন কিনা আমরা জানি না; তাঁহারা সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে, তাঁহারা ঐ দাবী স্বীকার করিয়া লইবেন। যদি নিজেদের জিদ তাঁহারা কিছুতেই না ছাড়েন তাহা হইলে ছাত্রেরাও সংকল্পচ্যুত হইবে না,আমরা এই বিশ্বাস করি। এই সব ছাত্রেরা আজ যে কত অসুবিধা ভোগ করিতেছে, আমরা তাহা কল্পনা করিতে পারিতেছি না—মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহাদের এই যে ত্যাগ—নিজেদের ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করিবার এই যে ঝুঁকি, ইহা আমাদের অন্তরে আশার সঞ্চার করে। প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায় আত্ম স্বার্থের প্রতি এই যে উপেক্ষা, এইখানেই তরুণের তারুণ্য এবং ইহার মধ্যেই মানবতার স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়—হিসাব-নিকাশের বরাদ্দ বাঁধা ভবিষ্যতের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করিয়া মানবতার সেই স্পন্দন মানুষকে বড় করে। এমন যাহারা বে-হিসাবী, জাতির বাঁধন ভাঙ্গে তাহারাই। অলক্ষ্মী তাহাদের জয়যাত্রার পথ উন্মুক্ত করেন।

মজা দেখার মনস্তত্ত্ব—

বাঙলার রাজস্ব-সচিব স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, **মহারাজা শ্রীশচন্দ্র** নন্দী এবং মিঃ সহীদ সুরাবর্দী এই তিন **মন্ত্রী** সেদিন **বর্দ্ধমানে** হানা দিয়াছিলেন। তাঁহারা গলসী **উচ্চ ইংরেজী** বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করেন। কাশীমবাজার **এবং সুরাবর্দী** সাহেব নিজেদের গুণপনা কতখানি, তাহা কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন; রাজস্ব-সচিব একটা ঘোষণা করেন। ঘোষণাটা এই যে, ক্যানেলের কর সাড়ে পাঁচ টাকা হইতে দুই টাকা নয় আনা করা হইল। সাড়ে পাঁচ টাকা হারটা যে বড় **বেশী হইয়াছিল**, মন্ত্রিমহোদয়গণ নিজেরাও অনেক আগে তাহা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু তবু সাড়ে পাঁচ টাকার দাবী ছাড়েন নাই কেন, তাহার কারণ হইল কংগ্রেস। কংগ্রেসীরা করের হার দেড় টাকা করিবার জন্য জিদ ধরিয়াছিল; তাই সরকারের পক্ষে দুই টাকা নয় আনা হারের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘটিল। এমন যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে হয়। যুক্তির মধ্যে কি উদারতা, গরীবের উপর দরদের কি গভীরতাই রহিয়াছে একবার বুঝুন! কংগ্রেসীরা না হয় হার দেড় টাকা করিবার জন্য আন্দোলন চালাইয়া বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, কিন্তু বাঙলার মন্ত্রীরা—সাড়ে পাঁচ টাকা হার বহন করিবার যোগ্যতা দেশের লোকের নাই, হারটা কমাইয়া দুই টাকা নয় আনা করা উচিত, ইহা বুঝিয়াও হার কমান হইল—একথাটা ঘোষণা করেন নাই কেন? তাহা করিতে গেলে কংগ্রেসীরা কি তাঁহাদের গলা চাপিয়া ধরিত? হাঁ, তাহা হইলে পুলিশ ও মিলিটারী পাঠাইয়া মন্ত্রীদের প্রতাপ দেখান হয়ত চলিত না। গরীবের গরু-ভেড়া, বাটী-লোটা ক্রোক করিয়া, তাহাদিগকে জেলে পুরিয়া—জেনারেল ডায়ার যে নৈতিক প্রভাবের দোহাই দিয়াছিল, সেই ধরণের নৈতিক প্রভাব দেশের লোকের উপর ফলান যাইত না। সুতরাং দেশের লোকের উপর সেই নৈতিক প্রভাব ফলানোর মজাটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া লইবার অকৈতব কামনাতেই মন্ত্রিমহোদয়েরা মুখ ফুটিয়া করের হার কমানোর কথাটা এতাবৎকাল উচ্চারণ করেন নাই। মন্ত্রিমহোদয়গণের এমন মহাপ্রাণতাকে উপলব্ধি করিয়া বর্দ্ধমানের লোকেরা দুই হাত তুলিয়া তাঁহাদের জয়গান করিবে—মন্ত্রীরা এই আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু বর্দ্ধমানের গরীবেরা তাঁহাদের এই উদারতাকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। দুই টাকা নয় আনায় রাজী হও নহিলে না হয় নৈতিক প্রভাব উপরে আসিয়া পড়িবে, সে নৈতিক প্রভাবের প্রকট রূপ ত দেখিয়াছ, এবং তাহা দেখাইবার জন্যই হার কমানোর ঔচিত্য উপলব্ধি করিয়াও আমরা সে কথাটা এতদিন উচ্চারণ করি নাই। মন্ত্রীদের এমন মনোবৃত্তি গরীবের মনে আন্তরিক উচ্ছ্বাস জাগায় নাই—তাহার ফলে মন্ত্রীদিগকে যথাসম্ভব সত্বর সভা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়। তাঁহাদের সম্বন্ধে দেশের লোকের মতামত কি সে কথা শুনিতে সাহসে তাঁহাদের কুলায় নাই। মন্ত্রীদের জনপ্রিয়তার এ এক দফা বড় নজীর সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিমণ্ডলের আক্কেল সেলামী—

গত ১২ই নবেম্বর দৈনিক বসুমতীতে 'কালীপূজা ও রমজান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বসুমতীর নামে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগ আনয়ন **করা হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজদ্রোহের** দায় হইতে সম্পাদক এবং মুদ্রাকর উভয়কেই মুক্তিদান করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলেন,—"আলোচ্য প্রবন্ধটি পাঠ করিলে ইহার আদ্যোপান্ত, হক মন্ত্রিমণ্ডলী অথবা হক গবর্ণমেন্টের উপরেই যে আক্রমণ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু মন্ত্রিসভার প্রতি আক্রমণ ব্রিটিশ ভারতের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্টের উপর আক্রমণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এই সম্পর্কে কলিকাতা হাই-কোর্ট যে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ ভারত সম্রাট বনাম ধীরেন্দ্রনাথ সেনের মামলায় (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড রাজদ্রোহ মামলা) এই প্রশ্নের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মন্ত্রিসভাকে কোন প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহক গবর্ণমেন্টের অংশ বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে না। আইনের সূক্ষ্ম বিতর্কের প্রশ্ন না তুলিয়াও সাধারণ বুদ্ধিতে এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করা যাইতে পারে। মন্ত্রিমণ্ডলকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা যদি দেশের লোকের হাতে থাকে, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকারও সেই সঙ্গে যে তাহাদের আছে, নেহাৎ মোটা বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায়; কারণ, মন্ত্রিমণ্ডলকে অপদস্থ করিতে না পারিলে তাঁহাদিগকে অপসারিত করিবার উপযুক্ত জনমতও গঠিত হইতে পারে না। এই যে অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল কথা হইল ইহাই। এই অধিকার না থাকিলে সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকারও থাকে না। বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডল গণতান্ত্রিক অধিকারের বড় বড় কথা মুখে বলেন, অথচ সেই অধিকারের মূলীভূত সমালোচনার অধিকারকে তাঁহারা স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির অনিষ্টকারিতাকে উন্মুক্ত করিতে গেলেই তাঁহারা অধীর হইয়া খবরের কাগজওয়ালাদের মুণ্ডপাত করিবার অষ্টপাশ কসিতে থাকেন। বসুমতীর মামলার রায় মন্ত্রিমণ্ডলের এই মতিগতির পক্ষে আক্কেলসেলামীস্বরূপ হইবে।

ডিগবয়ের ব্যাপার—

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আসাম সরকার ডিগবয়ের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যে তদন্ত হইয়াছিল, দেশের জনসাধারণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিচার বিভাগীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ডিগবয় ধর্ম্মঘটের কারণ কি এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই ধরণের সমস্যার প্রতিকার হইতে পারে, কমিটির উপর তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভারও রহিয়াছে। এই ধর্মঘটের ব্যাপার লইয়া আসাম সরকারের কার্য্য সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ তেলের খনিওয়ালার দল তাহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের সাহায্য

আসাম সরকারের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে কোনরূপ কসুর করে নাই। আসাম সরকারকে আমরা এইজন্য ধন্যবাদ দিতেছি যে, পুঁজিদার এই সব শ্বেতাঙ্গদের চীৎকার সত্ত্বেও তাঁহারা বিচলিত হন নাই। দেশের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করার বৃহত্তর দায়িত্ব হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হন নাই। আমরা আশা করি, এই কমিটি নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব করিবেন, শ্বেতাঙ্গদের হুমকীতে না ডরাইয়া তাঁহারা সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত আইন-কানুনের ব্যবস্থা করিবেন। শ্বেতাঙ্গ পুঁজি-ওয়ালার দল ভারত সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাতের বড় কর্ত্তাদের কান পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে; শাসন-সমস্যা সৃষ্টির ভয় দেখাইবে; কিন্তু দেশবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনাই যে দেশের লোকের কাছে বড়, সাম্রাজ্য-বাদীদের কিংবা শোষক দলের স্বার্থের জন্য দেশের লোকের সে স্বার্থ তুচ্ছ করা চলিবে না। আসাম সরকারের দৃঢ়তা হইতে এই শিক্ষাটি যদি সুস্পষ্ট হয়, তাহাতেও শাসনাধি-কারের এবং নীতির দিক হইতে একটা বড় কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

স্বরাষ্ট্র সচিবের সাফাই—

গত মঙ্গলবার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ প্রকৃত প্রস্তাবে ধামাধরা দলের একটা আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং এমন প্রস্তাব যে সেখানে অগ্রাহ্য হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, বরং এমন প্রস্তাব পাশ হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয়ের খোঁজ করিলেই বুঝা যাইবে, দেশের সেবার সঙ্গে, দেশের জনসাধারণের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ত্যাগ স্বীকারের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্কই নাই; পক্ষান্তরে দেশের হিত এবং জনসাধারণের হিতের সঙ্গে যাঁহাদের কোন রকম সম্পর্ক আছে, তাঁহারা সকলেই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১১৬ জন সদস্য রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, বাঙালীর পক্ষে ইহা লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ এই সব রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির নীতি সমর্থনের দ্বারা প্রত্যেক পরাধীন জাতির স্বাধীনতা স্পৃহা এবং স্বদেশপ্রেমের প্রগাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়া স্যার নাজিমুদ্দীন আমলাতান্ত্রিক একঘেয়ে মামুলী যুক্তিরই অবতারণা করিয়াছেন। উদার রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে তাঁহার ঐ সব যুক্তির কোন মূল্য নাই। সাম্প্রদায়িক অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কৃত অপরাধের সঙ্গে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অপরাধের মূলীভূত উদ্দেশ্যের তুলনা কিছু চলে না। রাজনীতিক [illegible] নীতিহীন মনোবৃত্তির পরিচয় নয়, বিশেষ রাজনীতিক অবস্থার মধ্যেই সে সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের কারণও দূর হইয়া থাকে এবং রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি এই হিসাবে শান্তির সহায়ক রাজনীতিক আবহাওয়াই দেশে ফিরাইয়া আনে। এই দিক হইতে বিষয়টি বিচার করিয়াই রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং হ্যারল্ড ল্যাস্কি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যবহার-বিদ্‌গণ বিশেষ জোরের সঙ্গে একথা বলিয়াছেন যে, নীতিগত এই উদারতার দিক হইতেই রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত, ব্যক্তি বিশেষের অপরাধের গুণ-দোষ বিচার করিয়া নয়। রাজনীতিক বন্দীদের সহিত সাধারণ অপরাধীর গুণ-দোষের এই যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে, বাঙলার মন্ত্রীরা যে তাহা না বুঝেন এমন নহে। আসল কথা হইল এই যে, রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইলে যে স্বাধীন চিত্ততার আবশ্যক হয়, আবশ্যক হয় পরাধীনতার বেদনার যেমন তপ্ততা—অনুভূতির সে জিনিষ তাঁহাদের প্রকৃতিতে তাঁহারা পান নাই। দেশের অন্তরের সঙ্গে নাই তাঁহাদের যোগ। যুক্তি-তর্কের দ্বারা এ বুদ্ধি তাঁহাদের মধ্যে জাগাইবার আশা আর নাই, স্যার নাজিমুদ্দীনের জবাবেই তাহা বুঝা গিয়াছে। মন্ত্রীদের সঙ্গে এমন ব্যাপারে আপোষ-নিষ্পত্তি অসম্ভব বলিয়াই আমরা মনে করি। একমাত্র উপর হইতে জনমতের চাপ দিয়া তাঁহাদিগকে বাধ্য করা অথবা দেশের সহিত সহানুভূতিহীন পরমুখাপেক্ষী এবং উদার আদর্শবিরহিত এই একান্ত অপদার্থ মন্ত্রিমণ্ডলকে অপসারিত করা। বাঙলা দেশের কর্ম্মীদিগকে আজ অতি দ্রুতভাবে সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুইদালোর মুক্তির দাবী—

নাগা বালিকা গুইদালোকে মুক্তি দেওয়া হইবে না, কর্ত্তারা সকলেই সমস্বরে এই কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। আসাম সরকার এ বিষয়ে কি করিতেছেন, আমরা জানি না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি জোরের সঙ্গে চাপ দিতে না পারিলে, এ সব কাজ হয় না। সম্প্রতি শ্রীহট্টের মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী আসামের স্বরাষ্ট্র সচিবের মারফৎ বড়লাটের নিকট রাণী গুইদালোর সম্বন্ধে একটি আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আবেদনে রাণী গুইদালোকে রাজনীতিক বন্দীস্বরূপে গণ্য করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং এই কথাও বলা হইয়াছে, গুইদালোকে মুক্তি দিয়া মহিলা সঙ্ঘে থাকিতে দেওয়া হউক। সঙ্ঘই তাঁহার অপরাধের জন্য জামীন স্বরূপে থাকিবেন। ব্রহ্মের যে সব বিদ্রোহী প্রত্যক্ষ-ভাবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লড়াই করিল, তাহারা মুক্তি পাইতে পারে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুতর রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করাতে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপর্যয় যদি না ঘটিয়া থাকে, তবে একটি নাগা বালিকার মুক্তিতে আশঙ্কার এমন কি কারণ থাকিতে পারে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মণিপুর রাজ্যে তাঁহাকে থাকিতে দিতে মণিপুরের দরবারের সাহসে যদি না কুলায়, তবে শ্রীহট্টে এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মহিলা সঙ্ঘে তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হউক; অন্ততঃ এটুকু করিতেও কর্ত্তাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত লেখা—

বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] স্বর্গীয় [illegible]চন্দ্র চাটুজ্যে মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে যে সব [illegible] রাখিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি গল্প ও অসমাপ্ত উপন্যাস পাওয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী-লেখক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চাটুজ্যে মহাশয় সত্বরই সেগুলি প্রকাশ করিবেন, এই সংবাদ জানিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হওয়াতে দেশের এক বিশেষ অভাব দূর হইয়াছে। পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্কিম প্রতিভা' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজীতে লিখিত হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে মূল্যবান লেখাগুলি প্রকাশ করিয়া সমাজের একটি বড় কাজ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত গল্প এবং অসমাপ্ত উপন্যাসগুলির প্রকাশ দেখিবার জন্য দেশবাসী মাত্রেই যে আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা এবং সাধনার গুরুত্বকে আমরা এখনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেদিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুধ্যানকে আকর্ষণ করা দেশের এবং সমাজের দিক হইতে এখনও অনেকখানি প্রয়োজন আছে।

হ্যাভেলক এলিস—

বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হ্যাভেলক এলিস ইহজগতে আর নাই। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যাহা তিনি দান করিয়াছেন—তাহার বিপুলতা জ্ঞান-পিপাসুদের কাছে চিরদিনই শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য জগতের তিনি বাৎস্যায়ন। যৌন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার গবেষণা জ্ঞান-রাজ্যের একটি নূতন তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কীয় তাঁহার গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় কি অসাধারণ ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিমার সঙ্গে সাহিত্যিকের রসবোধ ইহাদের অদ্ভুত মিলন ঘটিয়াছিল এলিসের বিরাট প্রতিভার মধ্যে। বিশ্ব সাহিত্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া যে মধু তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন তাহার রস সকলকে তিনি বিতরণ করিয়াছেন। উদার মানবপ্রেমই যে সকল ধর্ম্মের সার, ইহাই ছিল এলিসের অন্তরের বিশ্বাস। এই প্রেম-ধর্ম্মের বাণী নানা লেখার মধ্য দিয়া তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই গগনস্পর্শী প্রতিভার বেদীমূলে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আমরা নিবেদন করিতেছি।

ভেদের দ্বন্দ্ব

শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible]

একই ধরণীতে বাস করি মোরা একই আকাশের তলে,
সকলের গৃহে সমানভাবেই চাঁদের প্রদীপ জ্বলে;
তবে কেন ভেদ ছোটতে বড়তে
ঘৃণা জাগে শুধু মনের পরতে
বলবান কেন দুর্ব্বল জনে দলে চরণের তলে,
ধরণীর বুকে বিদ্রোহ শিখা কেন উঠিয়াছে জ্বলে।

বিধাতা যখন গড়েছে সৃজন সুন্দর ধরাখানি,
ছোট বড় বলে ছিল না কো কিছু, সবাই সমান জানি—
স্বার্থপরেরা সুখের লাগিয়া
বিধির নিয়ম ভাঙিয়া চুরিয়া
নূতন করিয়া গড়িতে বিশ্ব ভেদের গণ্ডী টানি
মানুষের হাতে মানুষ সহিছে অত্যাচারের গ্লানি।

তাই [illegible] বুকে বিদ্রোহ চলিয়াছে,
মনের আগুন আপনা হতেই দিকে দিকে জ্বলিয়াছে:
বড় মানুষের হীন অবিচার
ছোটদের প্রাণে খুলিয়াছে দ্বার—
রক্ত-মাতাল পাগলের মত আজি তারা ছুটিয়াছে,
ছোটতে বড়তে মনের দ্বন্দ্ব, তাই আজ চলিয়াছে।

এতদিন যারা নীরবে সয়েছে শত শত অপমান,
অত্যাচারের তীব্র দাহনে জ্বলেছে যাদের প্রাণ;
উঁচু করি শির উঠিয়াছে তারা,
মানুষের চোখে পতিত যাহারা,—
লাঞ্ছিত যত ঘৃণিত জীবন চাহে আজ নব প্রাণ,
পতিতের বুকে জাগিয়া উঠেছে পদাহত সম্মান।

তামাক (TOBACCO)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(২)

বাণিজ্য

তামাকের ব্যবহার যেরূপ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার বাণিজ্যের বিষয় সবিশেষ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যতদূর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে লোহিত সাগরের বন্দরে তামাক চালান যাইত। পণ্যের হিসাবে,—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ মসুলীপট্টমে খুব ভাল তামাক পাওয়া যাইত এবং তথাকার নস্য ইংলণ্ডে চালান যাইত। ১৮০৯-১১ সালে লিখিত পুস্তকে প্রকাশ (বুকানন হ্যামিল্টনের "দিনাজপুরের ইতিহাস"), ১৮৩০ বা ১৮৩৫ সালে তামাক ভারতের প্রধান কৃষিভুক্ত হইয়াছে এবং তাহার বাণিজ্য বিশেষভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

রপ্তানি

১৮৬৬-৬৭ সালে আন্দাজ ছয় লক্ষ টাকার তামাক এবং তামাক-জাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। ১৮৭৬-৭৭ সালে "কাঁচা তামাক, সিগার এবং নানাবিধ" এই তিন ভাগে চালান যাইতে থাকে এবং মূল্য প্রায় নয় লক্ষ টাকায় পৌঁছে। দশ বৎসরে (১৮৮৬-৮৭) মাত্র এক লক্ষ টাকার রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। পরের দশ বৎসরে (১৮৯৬-৯৭) সালে উহা দ্বিগুণ (১৮ লক্ষ টাকা) হইয়া যায়। ১৯০১-২ সালে সিগারের রপ্তানি হঠাৎ খুব বৃদ্ধি পায়। ১৯০০-০১ সালে মাত্র সাড়ে আট লক্ষ টাকার ছিল; উহা পর বৎসর সাড়ে ষোল লক্ষ টাকায় পৌঁছে এবং মোট রপ্তানি প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। মহাযুদ্ধের পর রপ্তানি প্রায় এক কোটি টাকায় পৌঁছে (১৯১৮-১৯ সালে ৯৬ লক্ষ ৩৬ হাজার; ১৯১৯-২০ সালে ৯২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা)। ১৯২৩-২৪ সালে এক কোটি টাকা ছাড়াইয়া যায় এবং ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। তাহার পর কয় বৎসর ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৬-৩৭ পর্য্যন্ত বরাবরই রপ্তানির মূল্য কম থাকে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মবিচ্ছেদ হওয়ায় এবং হঠাৎ ব্রিটেন কাঁচা তামাক অধিক লওয়ায় রপ্তানি একেবারে দুই কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও ভারতের তামাক বাণিজ্যের অন্য বিপদ রহিয়াছে। ক্রেতা যে রকম গুণের পাতা চায় এবং তাহার জন্য পূর্ণ দাম দিতে প্রস্তুত, তাহা সে অনেক সময় পায় না। সুতরাং মূল্য নির্দ্ধারণের সময় ক্রেতা কম দাম উল্লেখ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই দরেই বিক্রয় করিতে হয়। পাতার গুণানুসারে ভাগ করা এবং বিদেশের বাজারে কোন্ জাতীয় পাতা চড়া দরে বিক্রয় হইতে পারে, চাষীকে সেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য চেষ্টাও হইতেছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নহে।

চাষীর আরও অন্য বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহাতে ভাল পাতার চাষ হয়, তাহার জন্য বীজ সংগ্রহ করা এবং আবহাওয়া, জল, মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা দরকার। গতানুগতিকের ধারা অনুযায়ী চাষ হওয়ায় বহুদিন হইতে কোনই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

স্থান বিশেষে নানাপ্রকার তামাকের চাষ হইতেছে। উত্তর বঙ্গে এবং উত্তর বিহারে হুঁকার তামাক এবং অন্যান্য প্রকারের তামাক পাওয়া যায়; গুর্জ্জরের চারতোয়ার এবং বোম্বাইয়ের নিপানী প্রদেশে বিড়ির উপযোগী তামাক হয় এবং মন্দ্রে গণ্টুর প্রদেশে "golden leaf" নামে সিগারেটের উপযুক্ত ভাল তামাক জন্মে। বাঙলার বাজারে "রঙ্গপুর" নামে পরিচিত তামাক সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহাকে আবার "পুলা" এবং 'বিষপাত' রূপে ভাগ করা হয়; তন্মধ্যে পুলাই শ্রেষ্ঠ।

ভারতবর্ষে যে তামাক জন্মে, তাহার অধিকাংশ দেশের মধ্যে খরচ হইয়া যায়। এখানে হুঁকার জন্য যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশই অতি সাধারণ পাতা হইতে প্রাপ্ত।

আমদানী

রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দেশ হইতে কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইয়া তাহার পর দশ গুণ অথবা বিশ গুণ মূল্যে ক্রয় করার অভ্যাস যে আমাদের আছে, তামাকের বাণিজ্য তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮৭৬-৭৭ সালে সাড়ে নয় লক্ষ টাকার সিগার, সিগারেট আমদানীর পরিচয় পাইয়া থাকি। পরের দশ বৎসরের মধ্যে (১৮৮৬-৮৭) সালে তাহা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়া যায়। ১৮৯৬-৯৭ সালে সামান্য কম ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার হইলেও ১৯০৭-০৮ সালে তাহা ৮৬ লক্ষ টাকা হইয়া যায়। বিলাতী তামাকের নেশা এমন ভারতবাসীকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, প্রতি বৎসরই আমদানী বাড়িয়া চলিল। ১৯১৬-১৭ সালে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ এবং ১৯১৮-১৯ সালে দুই কোটি পনের লক্ষ টাকায় বিলাতী তামাকের আমদানী পৌঁছে। তখন হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত কম বেশ দুই কোটি টাকায় নিবদ্ধ থাকিয়া ১৯২৬-২৭ সালে আড়াই কোটি এবং পর বৎসর প্রায় তিন কোটি টাকায় আসে। পরের তিন বৎসর এই অবস্থায় চলিতে থাকে; ১৯৩০-৩১ সালে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহাতে সুফল দেখা যায়, অর্থাৎ আমদানী দেড় কোটি টাকায় নামে। তাহার পর কম হইতে সুরু করিয়া মোট ৬৬ লক্ষ টাকায় আসিয়াছে। যদি কেহ মনে করেন ইহাতে ভারতবাসী লাভবান হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত, কারণ ইত্যবসরে বিদেশী কোম্পানী দেশী পোষাক পরিয়া আসরে অবতীর্ণ হন এবং সমস্ত 'লাভের গুড়' বিলাতী 'পিঁপড়ায় খাইতেছে।' (জ) দেখুন।

সিগারেট—এই সঙ্গে আমাদের গ্লানির আর এক

অধ্যায় লোকের চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ১৯০০-০১ সাল নাগাদ বিদেশী আমদানী আন্দাজ চল্লিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে সিগারেটের অংশ ছিল ১৭ লক্ষ টাকা। ঐ সালে সিগারেটের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতে আরম্ভ হয়, তৎপূর্ব্বে সাধারণ তামাক আমদানীর সহিত দেখান হইত। পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে, অর্থাৎ ১৯০৬-৭ সালে সিগারেটের আমদানী ৯৬ লক্ষ টাকায় আসে। লোকের হঠাৎ এই রুচির পরিবর্ত্তন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হয়। এই দরিদ্র দেশের লোকের মধ্যে এত বড় বিরাট বাণিজ্য যে হওয়া সম্ভব, তাহা ঘটনায় প্রমাণিত না হইলে বিশ্বাস করা সম্ভব হইত না। হুঁকো বা গড়গড়ায় তামাক সেবন অসভ্য রকম পিছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সিগারেট সে-স্থান দখল করিতে লাগিল। যাহাতে লোকের ভাল রকম 'নেশা' ধরে তাহার জন্য প্রতি পয়সায় আট বা দশ সিগারেটের প্যাকেট আমদানী হইয়াছে এবং লোকে নির্বিচারে তাহা সেবন করিতে আরম্ভ করে। ১৯০৬-৭ সালে ৯৬ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানী করা হয়। এই আমদানী ক্রমেই দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া শীঘ্রই (আন্দাজ ১৯১৩-১৪) এক কোটি টাকা হয়; ১৯২৬-২৭ সালে একেবারে দুই কোটি (এক কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা) এবং পর বৎসর আড়াই কোটি টাকার কেবল সিগারেট আমদানী হইল। ঐ সালে মোট তাম্রকূট-জাত দ্রব্যাদি আসে দুই কোটি ৯১ লক্ষ টাকার। অর্থাৎ সিগারেট একেবারে ছাইয়া পড়িয়াছে। এখানেও জাতীয়তার আন্দোলন সিগারেট আমদানীকে বিশেষ ধাক্কা দিতে সমর্থ হয় এবং ইহা দ্রুতগতিতে কমিতে থাকে, এমন কি ১৯৩৩-৩৪ সালে মাত্র ১৯ লক্ষ টাকায় নামে, (পরিশিষ্ট (ড) দ্রষ্টব্য)।

ভারতবাসীর এই খেলা শেষ হইয়াছে, আবার ছেলে বুড়া এমন কি, ভারতীয় নারীদের মধ্যে ভীষণভাবে সিগারেটের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ১৯ লক্ষ হইতে আমদানী ৪০ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। এ গতির মুখে বাধা দিতে না পারিলে, আবার দুই কোটি টাকার সিগারেট আমদানী অসম্ভব নহে। ইতিমধ্যে যে সকল বিদেশী কোম্পানী এদেশে সিগারেট প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদেরও কাটতি সমানভাবেই চলিতে থাকিবে। (পরিশিষ্ট (ড) দ্রষ্টব্য)।

রপ্তানি—কাঁচা তামাক—ক্রেতা ও বিক্রেতা

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার তামাক চালান যায় প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকার; তন্মধ্যে কাঁচা তামাকের পরিমাণ দুই কোটি এক লক্ষ টাকার, অর্থাৎ মোট রপ্তানির তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ (৭২.৮%)।

যদিও বাঙলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাষ হইয়া থাকে, তথাপি মদ্র সর্ব্বপ্রধান বিক্রেতা, অর্থাৎ দুই কোটির মধ্যে এক কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। পরে অবশ্য বাঙলার স্থান, কিন্তু মদ্রের তুলনায় কিছুই নহে, অর্থাৎ মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। বোম্বাই সামান্য রপ্তানি করে, (পরিশিষ্ট (ঙ) দেখুন)।

ক্রেতার মধ্যে ইংরেজই সর্ব্বপ্রধান, অর্থাৎ সে একাই এক কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার [illegible]

৭৭.৫%। টাকার পরিমাণ অনুসারে পরে পরে ক্রেতার নাম,—ব্রহ্ম, এডেন, মালয়, জাপান, নেদারলণ্ড প্রভৃতি দেশ: (পরিশিষ্ট (ঘ) দেখুন)।

রপ্তানি—সংস্কৃত তামাক
বিক্রেতা ও ক্রেতা

সংস্কৃত তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যাদি মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা যায়, তাহার মধ্যে সিগারেটই প্রধান;—পরিমাণ ৬১ লক্ষ টাকা। সিগার বা চুরুট রপ্তানি নাই বলিলেও চলে, অর্থাৎ মাত্র ৬৮ হাজার টাকার। এস্থলে প্রধান বিক্রেতা বাঙলা, ৪৪ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করে; মদ্রের স্থান দ্বিতীয়, ৩০ লক্ষ টাকা। বোম্বাই, সিন্ধু হইতেও কিছু মাল যায়; উড়িষ্যার অংশ মাত্র ৫০ টাকা। (পরিশিষ্ট (ছ) দেখুন)।

ক্রেতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মই প্রধান, অর্থাৎ সমস্ত একা লয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন ব্রহ্ম বিচ্ছেদ হয় নাই, তখন মাত্র ৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইত। সুতরাং ভারতের যে বাজার ছিল, তাহাই আছে। ৭৫ লক্ষ টাকার মালের মধ্যে ব্রহ্ম লয় ৭০ লক্ষ; সিংহল, ষ্ট্রেটস সেটেলমেণ্টস, ইংলণ্ড প্রভৃতি সামান্য লইয়া থাকে। (পরিশিষ্ট (চ) দেখুন)।

আমদানী—কাঁচা তামাক
বিক্রেতা ও ক্রেতা

মোট তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যাদি আসে ১ কোটি টাকার কিছু বেশী, তাহার মধ্যে কাঁচা মালের অংশ ৫৮ লক্ষ টাকার। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বিশেষ গুণসম্পন্ন পাতা; ভারতীয় সিগারের উপরের ছাল ঢাকিবার জন্য আনীত হয়। আমেরিকা ইহার প্রধান বিক্রেতা, শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী তথা হইতে আসে। ব্রহ্ম, নেদারলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে সামান্য পরিমাণ আমদানী করা হয়। (পরিশিষ্ট (ট) দেখুন)।

ক্রেতার মধ্যে বাঙলার নামই প্রধান; তিন ভাগের দুই ভাগ মালই বাঙলায় আসে। পরে মদ্রের স্থান, শতকরা ৩২ ভাগ সেখানে যায়। এ বিষয়ে বোম্বাই খুবই ভাল, কিছুই তাহার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় না। (পরিশিষ্ট (ঠ) দেখুন।

আমদানী—সিগার, সিগারেট
বিক্রেতা ও ক্রেতা

সিগার বিদেশ হইতে খুব বেশী আসে না, কম বেশ দুই লক্ষ টাকার মত এবং ব্রহ্মই তাহার প্রধান বিক্রেতা; শতকরা ৮৫ টাকার মাল আসে। ফিলিপাইন, আমেরিকাও সিগার সরবরাহ করে। ক্রেতার মধ্যে পুনরায় বাঙলা দেশই প্রধান; অর্দ্ধেকের উপরে (৫৩.৭%) তাহার প্রয়োজন; বোম্বাই, সিন্ধু লয় তিন ভাগের এক ভাগ; বাকী সিকি সকলে মিলিয়া লয়। (পরিশিষ্ট (ত) ও (থ) দেখুন)।

সিগারেট আমদানী হয় ৩৪ লক্ষ টাকার; এখানে বিক্রেতা একমাত্র ইংরেজ, সুতরাং আমরা যাহাই কিনি, সমস্তই ইংরেজ পায়। এস্থলে "বৃটিশ সিংহের" অংশ শতকরা ৯৫। অবশিষ্ট আমেরিকা (৩.৯%) এবং ব্রহ্ম লয়। তালিকায় স্থান পাইবার মত নামেই রপ্তানি আছে, আর কিছু নয়। (পরিশিষ্ট (ঢ)

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সিগারেট বেশী 'খায়' কে? বা সিগারেট কাহাদের বেশী "খাইয়াছে"? বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে বাঙালী নিশ্চয়ই প্রথম স্থান পাইবে, প্রায় অর্দ্ধেক বাঙলা আমদানী করে (৪৭%)। পরে পরে বোম্বাই, সিন্ধু এবং মদ্র নামমাত্র সিগারেট আমদানী করে (৪%)। (পরিশিষ্ট (গ) দেখুন)।

তামাকের ব্যবহার

নানা আকারে আজ তামাক জনসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে। উত্তেজক পদার্থ হিসাবে ইহার প্রয়োজন; তাহা ভিন্ন ইহার ব্যবহারের অপরাপর তালিকা খুব বেশী নহে।

সিগারেটরূপেই তাম্রকূট-জগতে বেশী টাকার কারবার হইতেছে, সুতরাং তাহার নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হইল। সিগার, পাইপের মশলা, বিড়ি, গুড়ুক তামাক অর্থাৎ আলবোলা বা হুঁকার উপর কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে সেবন, নস্য, খৈনী বা শুখা, 'মিসি', জর্দ্দা, দোক্তা বা পানের মশলা এই কয়টি মাদক বা উত্তেজকরূপে তামাকের প্রধান ব্যবহার।

শুষ্ক দোক্তা পাতা, কাঁচা চূণ সংযোগে হাতের তালুতে টিপিয়া গুঁড়া করিয়া লোকে দাঁতের মাড়ি ও অধরোষ্ঠের মধ্যে রাখে। বহুক্ষণ এইভাবে থাকিলে যখন ইহার উত্তেজক শক্তি আর থাকিতে পারা যায় না, তখন ইহা বদল করিয়া আবার নূতন খৈনী দেয়।

"মিসি" ব্যবহার পল্লীর বৃদ্ধা এমন কি তরুণীদের মধ্যেও প্রচলিত। নারিকেল পাতার ভস্মের সহিত তামাকের গুঁড়া মিশাইয়া এই মিসি তৈয়ারী করে এবং মুখের মধ্যে রাখিয়া দেয়। ইহা খৈনীর দেশীয় সংস্করণ বলিলেও চলে।

অন্যগুলির ব্যবহার সাধারণ লোকে দেখিতে পায়, তাহার আর বিবরণ দিবার প্রয়োজন দেখি না। জর্দ্দা, দোক্তা বা পানের মশলায় তামাকের সার বা পাতার গুঁড়া নানারূপে গন্ধ সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গুড়ুক তামাক—অর্থাৎ দোক্তা পাতা, চিটে গুড়, মাটী এবং মূল্যবান তামাকে আতর, মৃগনাভি বা অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যযোগে প্রস্তুত তামাক, ধূম্রপথ ছাড়া, দন্তমাড়ি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে মাজনের মত কেহ কেহ ব্যবহার করেন। যাঁহারা এইরূপে ব্যবহার করেন, সাধারণত তাঁহারা মুখের মধ্যে দন্তমূলে অনেকক্ষণ সময় রাখিয়া দেন এবং খৈনী বা "শুকা" ব্যবহারের দুঃখ মিটাইয়া লন। অনেকে সিগার বা চুরুটের ভস্ম মাজনরূপে কাজে লাগান।

তামাক পুড়িয়া গেলে যে কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে "গুল" বলে। লোকে মিহি করিয়া গুঁড়া করে এবং মাজনরূপে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি মহা উপকারী বস্তু।

মাজনের মত তামাক নানারূপে ব্যবহার করিবার বিশেষ হেতু আছে। ইহা বীজানুনাশক, সুতরাং মুখবিবরে নানারূপে বীজাণু ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তামাকের পাতা ভিজানো জল বা ক্বাথ উদ্ভিদের এবং অন্যান্য স্থানের ক্ষুদ্র কীটাদি নাশ করিবার বা দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হুঁকা বা আলবোলায় ব্যবহৃত জল অনেকে কুলকুচা করিবার জন্য সংগ্রহ করেন। ইহাতে কেবল দন্তমাড়ি দৃঢ় হয়, তাহা নহে, মাড়ির বেদনার উপশম করে।

হুঁকার জল, তামাক পাতা ঔষধার্থে আরও অনেক কাজে লাগে। বিশেষত, হুঁকার জল—ফোড়ার প্রলেপের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাত বেদনায় দোক্তা পাতা বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ রাখিলে চর্ম্মের উগ্রতা (irritation) প্রকাশ করে।

এই সকল ছাড়া, কষ্ ধরাইবার (tanning) জন্য তামাকের বিশেষ প্রয়োজন। সুবিধার মধ্যে এই যে, ভাল তামাক সমস্তই নেশার জন্য ব্যবহৃত হইবার পর অব্যবহার্য্য তামাক দ্বারা রঞ্জনের কার্য্য হইতে পারে। এই নিকৃষ্ট তামাক, বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে; আমাদের এখানেও সামান্য পরিমাণ কাজে লাগে। বীজাণুনাশক শক্তি আছে বলিয়া তামাকের খ্যাতি আছে। এদেশে বীজাণুনাশক ঔষধাদি (insecticide) প্রায়ই প্রস্তুত হয় না; আমদানী করা হয়। সুতরাং এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তামাক পাতার মধ্যের ডাঁটা, কোনই কাজে লাগে না, সুতরাং সেগুলি কাজে লাগানো যাইতে পারে।

তামাকের ক্রিয়া

তামাকের ব্যবহার তাহার উত্তেজনাশক্তির উপর নির্ভর করে। সাময়িক উত্তেজনার আশায় লোকে এই বিষের শরণাপন্ন হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে। নিকোটিন নামক বিষ এই শক্তির কারণ এবং এই বিষ এত উগ্র যে সামান্য পরিমাণ সেবনেও জীবনের হানি ঘটিতে পারে। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মাদকতা নিবারণের জন্য নানাস্থানে নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এই তাম্রকূটের হাত হইতে অজ্ঞ লোককে রক্ষা করিবার কোনই পন্থা অবলম্বিত হয় না। ধীরে ধীরে ক্ষতি করে বলিয়া লোকে ইহাতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ মনে করা উপরন্তু অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেদের দেহ সম্বন্ধে যত্ন না ইহাতে লোকের মানসিক শক্তি এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, মাঝে মাঝে এই "কূট" সেবন না করিলে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন বাধ্য হইয়া লোকে আবার ইহার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। আফিম, মদ সেবনে সাধারণের আপত্তি আছে, কিন্তু তামাক সেবনে নাই; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

অর্থ নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে তামাক, সিগারেটের নাম করা যাইতে পারে। যাহারা সন্তানের দুধ যোগাইতে পারে না, নিজেদের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে না, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারাও দিনের মধ্যে কয়েক পয়সা বা আনার সিগারেট, বিড়ি দগ্ধ করিয়া থাকে। এই জঞ্জালের কৃপায় কত পোষাক পুড়িয়াছে, নানাদেশে কত বড় বড় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব রাখিলে তামাক ব্যবহারীদিগকে "arson"এর দায় দিয়া অভিযুক্ত করা উচিত।

নস্য যাঁহারা লন, মিসি যাঁহারা ব্যবহার করেন, খৈনী যাঁহারা মুখে রাখেন, তাঁহাদের নিজেদের অস্বস্তি ত আছেই, উপরন্তু অনেকে আছেন যহারা নিজেদের দেহ সম্বন্ধে যত্ন না

(ঠ)

১৯৩৭-৩৮

আমদানী—কাঁচা তামাক বিক্রেতার নাম ও অংশ

মোট—৪৪,৭৮,৫৩০ টাকা

	টাকা	শতকরা অংশ
আমেরিকা	৪০,৮৫,৭০২	৯১·২
ব্রহ্ম	৩,৩৮,৯৫৮	৭·৪
নেদারল্যাণ্ড	৪১,৪০৭	০·৯
অপরাপর	—	০·৫

(ড)

১৯৩৭-৩৮

আমদানী—অসংস্কৃত (কাঁচা) তামাকের ক্রেতার নাম ও অংশ

	টাকা	শতকরা অংশ
বাংলা	২৯,৫৩,৮১৯	৬৬·২
মাদ্রাজ	১৪,৫৭,৯৯৩	৩২·৯
সিন্ধু	৪০,১২৬	·৯
বোম্বাই	১৫,১২২	৫

(ঢ)

সিগারেটের আমদানী

সাল		হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯০০-০১		১১,৬৫	১৭,০৪
১৯০৬-০৭	...	২৯,১৩	৪৫,৯৭
১৯১৩-১৪	...	—	১,০২,১২ (?)
১৯২৬-২৭	.. ...	৮২,৭৭	১,৯৪,৬১
১৯২৭-২৮	...	৬৫,৯৬	২,২১,৯৬
১৯৩০-৩১	...	৩০,৮০	১,২২,১৮
১৯৩১-৩২	...	১৪,৩৬	৫২,৭৮
১৯৩২-৩৩	...	৮,৩২	২৮,১৫
১৯৩৩-৩৪	...	৫,৯৩	১৯,০৬

(এখন হইতে আমদানী ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।)

সাল		হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৪-৩৫	...	৬,২৪	২২,২১
১৯৩৫-৩৬	...	৮,৩১	২৮,১০
১৯৩৬-৩৭	...	৯,২৯	৩২,৫০
১৯৩৭-৩৮	...	৯,৯৩	৩৪,৩৭
১৯৩৮-৩৯	...	১২,১৮	৪০,২৭

চ

১৯৩৭-৩৮

আমদানী—সিগারেট

বিক্রেতার নাম ও অংশ

মোট—৩৪,৩৬,৯৪৫ টাকা

	টাকা	শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	৩২,৫৯,৯৭৮	৯৪·৮
আমেরিকা	১,০৯,৬৬২	৩·১
ব্রহ্ম	১৬,৮৭৯	·৫
অপরাপর	—	১·৬

ণ

১৯৩৭-৩৮

আমদানী—সিগারেট

ক্রেতার নাম ও অংশ

	টাকা	শতকরা অংশ
বাঙলা	১৬,১৮,২৩৮	৪৭·০
বোম্বাই	১৪,৬৯,৩১১	৪২·৭
সিন্ধু	২,১২,১৫৩	৬·১
মাদ্রাজ	১,৩৭,২৪৩	৪·০

ত

১৯৩৭-৩৮

আমদানী সিগার—ক্রেতার নাম ও অংশ

	টাকা	শতকরা অংশ
বাংলা	১,০৬,৪৫৫	৫৪·০
বোম্বাই	৭২,২৩৭	৩৬·০
সিন্ধু	১৪,৯৯০	৮·০

থ

১৯৩৭-৩৮

আমদানী সিগার—বিক্রেতার নাম ও অংশ

মোট—১,৯৭,০০৮ টাকা

	টাকা	শতকরা অংশ
ব্রহ্ম	১,২৮,১৪৩	৬৪·৯
ফিলিপাইন	৩১,৬২৫	১৬·০
আমেরিকা	৬,৬০৪	৩·৩
অপরাপর	—	—

প্রার্থনা

শ্রীকালিদাস কাঞ্জিলাল

দুঃখ সে দিয়েছে যত
প্রাণে মম অবিরত
তত সুখ দিও তারে—
দিও ভগবান।
কেঁদেছিগো আমি যত
হাসি তারে দিও তত,
তত মান দিও, মোর
যত অপমান।

বিফল হয়েছে আশা,
হৃদয়ের ভালবাসা;
জানি জানি এ পিয়াসা
জ্বালাবে পরাণ।
যাব না যাব না তবু
যেচে তার পাশে কভু,
চাহি না চাহি না প্রভু
কোনো প্রতিদান।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বৎসর

চীন-জাপান সংগ্রামের দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। গত ৭ই জুলাই দিবসে চীনে ও জাপানে যথারীতি দ্বিবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাপানে এবার মহাসমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার নূতন রূপও দেখা গিয়াছে। ব্রিটিশ দূতাবাসের সম্মুখে সমবেত হইয়া জাপানীরা সমস্বরে বলিয়াছে, "Britishers, withdraw out of the Continent of Asia!" অর্থাৎ ব্রিটিশ, তোমরা এশিয়া মহাদেশ হইতে চলিয়া যাও।" এই ধ্বনি নাকি আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া জাপানের দূরতম প্রদেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে! এই সময় পুলিশ পাহারায় ব্রিটিশ দূতাবাসের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইয়াছিল। হায়, ব্রিটিশের আজ বিপদের অন্ত নাই। স্বদেশে জার্ম্মানী ইটালী তাহাকে সোয়াস্তি দিতেছে না। প্রাচ্যে জাপান এতদিন পরে তাহারও মুখোস খুলিয়াছে। টিয়েনসিনের ব্যাপারে জাপানের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সম্যক পরিচয় আপনারা পাইয়াছেন। এখন বুঝা যাইতেছে, জাপ-জার্ম্মান চুক্তি বা জাপ জার্ম্মান-ইটালীয়ান কম্প্যাক্টের মূল লক্ষ্য সোভিয়েট-রুশিয়া নহে, বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক যাহারা, সেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সকেই তাহারা দুর্ব্বল করিতে চায়। নহিলে তাহাদের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা মিটিবার অন্য উপায় আর নাই।

যাহা হউক, জাপানের উৎসবের অন্যান্য অঙ্গ প্রতিপালনেও ত্রুটি হয় নাই। জাতির মুখপাত্রগণ দেশবাসীদের বুঝাইয়া দিয়াছে, চীন-বিজয়ে আর বেশী বিলম্ব নাই। চীনের প্রায় অর্দ্ধেকটা তাহারা হস্তগত করিয়াছে, সেখানে স্বেচ্ছামত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হইতেছে, শিল্প কারখানাদিও স্থাপিত হইতেছে, উপরন্তু চীনের কাঁচা মালের একটি প্রধান অংশ তাহাদের মুঠোর মধ্যে। এখন চীন সম্পূর্ণ হস্তগত করিতে বাধা জন্মাইতেছে ঐ বিদেশীরা। তাহারাও অতঃপর আর ইহা করিতে পারিবে না, কেননা যে-সব বন্দর হইতে চীনারা ইহাদের সাহায্যে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিত, তাহা একে একে তাহারা অধিকার করিয়াছে। নূতন রাজধানী চুংকিং পর্য্যন্ত তাহারা গিয়া পৌঁছিয়াছে। যে সব স্থলে বিদেশীরা বিশেষ অধিকার বলে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে, তাহার উপরও তাহারা নজর দিয়াছে। এখন আর চীন বিজয়ে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।

আমরা বিশেষজ্ঞদের মুখে জাপানের আর্থিক অবস্থার কথা খুবই শুনিতে পাই। একদল বলেন, জাপানের জীবিকার মান এত নিম্নস্তরের যে, বাহিরের দৃষ্টিতে যত অভাব অনটনই দেখা যাউক না কেন, জাপানীরা ইহা সহ্য করিয়া চলিবেই। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা এইরূপ ভাবে যে চলিতে পারিবে, সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। আর একদল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন। জাপানের আর্থিক অবস্থা ইঁহাদের মতে দিন দিন অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িতেছে। যতই দিন যাইতেছে অভাবের তাড়নায় জাপানের জনসাধারণ ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। চীন যদি আরও কিছুকাল নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে, তবে জাপানের ঔদ্ধত্য হ্রাস অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। এই উভয় দলের কথাই কিছু বাদসাধ দিয়া লইতে হইবে। তবে চীনের নেতৃবর্গ যে দ্বিতীয় মতবাদের উপর বিশেষ জোর দিতেছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই কারণেই বোধ হয়, মাদাম চিয়াং-কাইশেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নূতন করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা জাপানের সঙ্গে যেন আর্থিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বস্তুত এ-কথা ঠিক যে, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্র যদি জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই জাপান চীনের সঙ্গে রফা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাহা এ যাবৎ হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ বড় করিয়া দেখায় বিপদ ঘটিয়াছে। এখন ইহারা একে একে জাপানের হস্তে নাকাল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার প্রতিরোধকল্পে কোন কার্য্যকর পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা দেখিতেছি না।
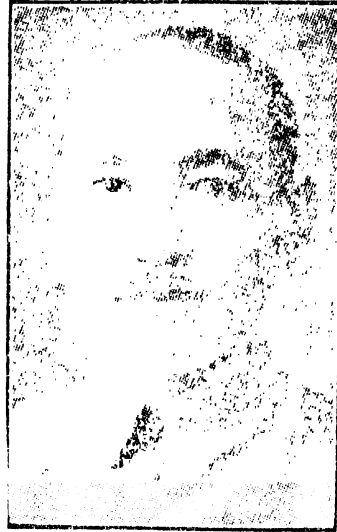
চিয়াং কাইশেক

[illegible] বিভিন্ন দেশের নিকট প্রতিনিধিদের এবং রাষ্ট্রসংঘের মারফৎ সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন, কিন্তু কেহ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়া অর্থের বিনিময়ে পরিমিত অস্ত্রশস্ত্র ও যোগান দিয়া চীনকে সাহায্য করিতেছে। চীনে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সকলের চেয়ে বেশী। ইহারা ক্রমশ যখন বুঝিতে পারিল যে, চীন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে তাহাদের স্বার্থসমূহ বিপন্ন হইবে, তখন কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিয়া সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। একে একে সমুদ্রোপকূলের সমস্ত বন্দর জাপান অধিকার করিয়া লওয়ায় অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর পথও প্রায় রুদ্ধ। ব্রহ্মদেশ হইতে চীনে যে নূতন রাস্তা খোলা হইয়াছে, সেই পথেই এখন অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়া হইতেছে। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই কিন্তু চীনারা গত দুই বৎসর যাবৎ প্রবলশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে সমানে যুঝিয়া আসিতেছে।

চীনাদের বিমানপোত সংখ্যা সামান্য, আধুনিক রণাস্ত্রও তাহাদের বেশী নাই। তাই শত্রুর সম্মুখীন হওয়া বা আক্রমণ ব্যাহত করার অন্য উপায় তাহাদিগকে খুঁজিতে হইয়াছে। তাহারা এই উপায়ে পটুও। গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া অমন প্রবল শক্তি জাপানকে সময় সময় নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়াছে। জাপানী তরফেই প্রকাশ, এখনও সাংহাই-এর নিকটে প্রায় পাঁচিশ হাজার গরিলা সৈন্য আনাগোনা করিতেছে। জাপানীদের আক্রমণে চীনারা ক্রমশ পশ্চাৎ হটিয়াছে বটে, কিন্তু পরে তাহারা তাহার প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত হয় নাই। জাপানীরা যখন কোন স্থান দখল করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে, তখনই গরিলা বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা নিজেদের ফলভোগ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়াছে। চীনের মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন, ইহার প্রায় অর্দ্ধেক জাপানীরা দখল করিয়াছে, কিন্তু এখানে

মাদাম চিয়াং কাইশেক

তাহাদের [illegible] নিজের অধিকারে পায় নাই। [illegible] রেল [illegible] শহরগুলি আগলাইয়া [illegible]। তাহা[illegible] অতি শক্তিত চিত্তে করিতে হইতেছে। [illegible] জায়গা [illegible] ইচ্ছামত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার বাহিরে কিন্তু তাহাদের কথা কেহই বড় একটা মান্য করিতেছে না। [illegible] জাপানী সৈন্য[illegible] [illegible] তাহার বিজয় বাত্তা। [illegible] মাঝে মাঝে চীনাদের সঙ্গে আপোষ-রফা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেছে। জাপানীরা এখন অন্য পথ ধরিয়াছে। [illegible] জানিয়াছে, চীনাদের ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, কিসের জোরে তাহারা লড়িতেছে! চীনে তাহারা পাত্তা [illegible] ইংরেজকেই চীনাদের খুঁটো বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। তাই তাহার উপর এখন নিজ হুমকি চালাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এতদিন ইংরেজ প্রকাশ্যে জাপানের বিরোধিতা করে নাই। এখনও নানা-ভাবে লাঞ্ছিত হইলেও জাপানীদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কায কেরী পন্থা অবলম্বন করে নাই। কেহ কেহ বলেন, চীন জাপানের কবলিত হউক ইহা যেমন ইংরেজ চাহে না, তেমনি সোভিয়েট রুশিয়ার সাম্যবাদ সেখানে চালু হয়, ইহাও তাহার কাম্য নয়। এই জন্য 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' নীতিই সে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে এতদিন; এখন বুঝি তাহার এ নীতি বর্জ্জন করিবার সময় উপস্থিত।

চীনারাও আজ আশায় বুক বাঁধিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ক্রমশ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ইউরোপে জার্ম্মানী ও ইটালীর প্রাবল্যে ব্রিটেন ফ্রান্স আজ বড়ই কর্ম্মতৎপর হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়াকে দলে টানাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা। ব্রিটেন ফ্রান্স যদি সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় রাজ-নীতির পটই যে শুধু বদলাইয়া যাইবে তাহা নহে, প্রাচ্য-খণ্ডেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ইটালী-জার্ম্মানীর বন্ধু জাপানকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য চীনের শক্তিবৃদ্ধি করাও প্রয়োজন হইবে। ব্রিটিশ ও ফরাসী নৌ-প্রতিনিধিগণ—যাহারা প্রাচ্য রক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত, সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে নিজেদের ঘরোয়া বৈঠকে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছেন। ইউরোপে কোনরূপ সংকট উপস্থিত হইলে প্রাচ্যের ঘাঁটি তাঁহারা আগলাইবার সুবন্দোবস্ত করিবেন। ইদানীং জাপানের মনোভাব যেরূপ বিকৃত, তাহাতে ইউরোপে অনর্থ না ঘটিলেও হয়ত তাহারা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইবে। ও-দিকে সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে মাঞ্চুকুয়ো ও বহির্মোঙ্গোলিয়া সীমান্তে আবার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। চীনা নেতৃগণ এই সবের ভিতরেও নিজ মুক্তির পথ যেন খুঁজিয়া পাইতেছেন।

গত ৭ই জুলাই চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিবার্ষিকী উৎসব যথারীতি উদ্যাপিত হইয়াছে। মার্শাল চিয়াং-কাইশেক চীনকে আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সংগ্রাম চালাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। চীনের ঐক্য ও দৃঢ়চিত্ততা তাহাদিগকে এ বিপদে বাঁচাইবে। চীনারা অস্ত্রশস্ত্রে দুর্ব্বল হইলেও আক্রমণকারী যে দেশের উপর জাপানীকে নিধন করিয়াছে! চীনেরও অসংখ্য নরনারী তাহাদের জীবন দান করিয়াছে এই স্বাধীনতা আহবে। আজও তাহারা সংকল্পে দৃঢ়। মার্শাল চিয়াং-কাইশেক বলিয়াছেন যে, যাহারা আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া জাপানের চক্রান্তে জড়াইয়া পড়িতেছে ও যেন তেন প্রকারেণ একটা আপোষ-রফা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা জাতির শত্রু, তাহাদের কথা কেহ শুনিবে না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, চীনারা আরও কিছুকাল সংগ্রাম চালাইতে পারিলে জয়লাভ তাহাদের নিশ্চিত। কেননা একদিকে যেমন জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া পড়িতেছে, তেমনি অন্যদিকে আসন্ন আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটে তাহাকে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইবে। তখন চীন বিজয়ের চেয়ে আত্মরক্ষার দিকে তাহাকে নজর দিতে হইবে বেশী। চীন তাই আবার নূতন উদ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার প্রতীক্ষা করিতেছে আজ।

তাহারা ও আমরা

জড়প্রকৃতির শাসনকে যেখানে নির্ব্বিচারে মানুষ স্বীকার ক'রে নিয়েছে সেখানে মৃত্যুর পানে আপনাকে সে ঠেলে দিয়েছে। জীবনের লক্ষণ হ'চ্ছে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে দূর ক'রে আলোর পানে যেখানে আমরা ছুটেছি—সেখানেই আমাদের প্রাণশক্তির প্রকাশ। মাটি নিশ্চল হ'য়ে পড়ে আছে। গাছের শিকড় কিন্তু চঞ্চল। নিশ্চলতা তার মধ্যে একেবারেই নেই। দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে সরিয়ে শিকড় ছুটেছে খাদ্যের সন্ধানে। শিকড়ের মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা।

সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, যে সব জাতি বিরাট কোনো লক্ষ্যকে স্বীকার করেনি তাদের অস্তিত্ব গৌরব থেকে হয়েছে বঞ্চিত। চীন আর ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের তুলনা করা যাক। ম্যালথাস্ বলছেন, লোকসংখ্যা যেখানে অবাধে বেড়ে চলেছে সেখানে এমন একটা দিন আসবেই যখন খাদ্যদ্রব্য অভাবে দুর্লভ। ম্যালথাসের নীতি যে সত্য—তার প্রমাণ চীন আর ভারতবর্ষ। লোকসংখ্যা আমাদের হু হু করে বেড়ে চলেছে—কিন্তু যে অনুপাতে লোক বেড়ে চলেছে সে অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ তো বাড়ছে না। প্রকৃতির কঠোর বিধান হ'চ্ছে—মানুষকে বাঁচতে হ'লে ভাত, কাপড় আর বাসস্থান তার চাই। আমরা বছরে বছরে পৃথিবীতে হাজার হাজার শিশু নিয়ে আসছি। কিন্তু তাদের মানুষের মতো বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারছি কৈ? ভাত কৈ? কাপড় কৈ? বাসস্থান কৈ? মানুষের সংখ্যা বাড়ছে—জমি তো জোর ক'রে বাড়ানো চলে না। বনজঙ্গল কেটে নতুন জমি তৈরী করবার ক্ষমতা—তারও একটা সীমা আছে। তারপর জমির উর্ব্বরতা। একই জমি থেকে বছরের পর বছর ধ'রে চলেছে শস্য আদায়ের চেষ্টা। বেচারা জমি কত ফসল আর দেবে! আকবরের সময়ে বিঘাপিছু যত ফসল উৎপন্ন হোতো—এখন আর তত হয় না। জমির উর্ব্বরতা শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আমরা আমাদের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দেহ নিয়ে শীর্ণ দুটী বলদ দিয়ে চাষ করে চলেছি সামান্য এক এক খণ্ড জমি যার শস্য দেবার ক্ষমতা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মা-লক্ষ্মীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হ'লেও মা-ষষ্ঠী আমাদের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন। আঙিনায় ধান নেই, ক্ষেতে ফসল নেই কিন্তু ঘরে আছে ছেলেমেয়ের প্রাচুর্য্য। বছর বছর বন্যার মতো খোকাখুকী আসছেই। এমন অবস্থায় যা হওয়া অনিবার্য্য—তাই হ'চ্ছে। কোনো রকমে ম'রে-বেঁচে আছি। পাট ক্ষেতের মধ্যে, বাঁশঝাড়ের তলায়, পচাপুকুরের ধারে পেট-জোড়া পিলে নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। দুর্ভিক্ষ আমাদের নিত্য সহচর—ম্যালেরিয়া আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। দিনের পর দিন উপবাসী থেকেও কেমন ক'রে যে দেহকে প্রাণের সঙ্গে যুক্ত রেখে বংশবৃদ্ধি করা যেতে পারে—তারই প্রমাণ দেবার জন্য বেঁচে আছি আমরা।

ইউরোপের পানে চাইলে কিন্তু ম্যালথাসের থিয়োরিতে বিশ্বাস আর অবিচলিত থাকে না—সব কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়। শার্লমেনের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত এগারো শতাব্দী ধ'রে ইউরোপের লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে—কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চীনে আর ভারতবর্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে—ইউরোপে তা হয়নি। ইউরোপে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। সুতরাং লোকের সংখ্যা বাড়লে খাদ্যের পরিমাণ কমবে—ম্যালথাসের এই মত ইউরোপের বেলায় খাটছে না।

কেমন ক'রে ইউরোপ ম্যালথাসের আইনকে ফাঁকি দিয়ে মৃত্যু-সাগরকে অতিক্রম করতে সক্ষম হোলো? সেও তো চীনের এবং ভারতবর্ষের মতোই দুর্ভাগা হ'তে পারতো! হোয়াইটহেড (Whitehead) বলছেন,—

> Granting the increase of population, History has only disclosed three ways of escape—expanding Commerce, improving Technology, and utilisation of Empty Regions."

অর্থাৎ

> "লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ইতিহাস মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার তিনটে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে—বাণিজ্যের বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি এবং লোকসংখ্যা যেখানে বিরল সেখানে উপনিবেশ স্থাপন।"

এই তিনটে কারণের জন্য ইউরোপ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল। পৃথিবীতে যখনই কোনো দেশ বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—যন্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধনে অক্ষম হয়েছে—জন-বিরল দেশকে কাজে লাগাতে ভুলে গিয়েছে—তখনই তার উপরে ঘনিয়ে এসেছে মৃত্যুর ছায়া। চীন আর ভারতবর্ষ বেঁচে আছে বটে কিন্তু তাদের অধিবাসীবৃন্দ মৃতেরই সামিল। দারিদ্র্য তাদের জীবনীশক্তিকে হরণ ক'রেছে। রোম-সাম্রাজ্যের যে পতন—সেও একই কারণে। লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে—মানুষ ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করবার জন্য বনের পর বন কেটেছে—মাঠের সঙ্গে মাঠকে যুক্ত করেছে। অবশেষে সমস্ত উর্ব্বর জমি মানুষের অধিকারের মধ্যে এসেছে। তারপর এলো আর একদিন যখন জমিগুলির উর্ব্বরতাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। পতিত জমিতে শেয়ালকাঁটা আর আকন্দ গাছ জন্মাতে লাগলো। হাজার হাজার মানুষের জীবনে মৃত্যুর ছায়া এলো ঘনিয়ে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার গ্রাম এমনি শ্মশানে পরিণত হ'তে চলেছে। চীনের আর বাগদাদের সম্পদ এমনি ক'রেই লোপ পেয়েছে। লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে—খাদ্যের পরিমাণ সে অনুপাতে বাড়েনি। ইউরোপেরও অনুরূপ অবস্থা হতে পারতো—কিন্তু বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে সে বেঁচে গেল। চীনের এবং ভারতবর্ষের বেলায় প্রকৃতি তার হাতের মুঠো আর খুললো না—কিন্তু ইউরোপ তার হাতের মুঠো না খুলিয়ে আর ছাড়লে না। বিজ্ঞানের কৃতিত্ব কোন্ জায়গায়? যন্ত্রশিল্পের সার্থকতা কোথায়? মানুষের জ্ঞানের আলো থেকে প্রকৃতি যেখানে বঞ্চিত সেখানে তার দেওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যন্ত্রশিল্পকে সহায় ক'রে মানুষ কিন্তু প্রকৃতির দানের ক্ষমতাকে বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে। ইউরোপ খুঁজে পেলো একটা নূতন দৃষ্টি আর সেই দৃষ্টির প্রদীপালোকে সে প্রকৃতির অন্তঃপুরকে ভালো ক'রে

চিনে নিলো। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ব্যবধান ছিলো, সে ব্যবধান ঘুচে গেল—তাদের মধ্যে চলতে লাগলো দেওয়া-নেওয়ার কারবার। প্রকৃতির রহস্যকে জেনে নিয়ে ইউরোপ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর কৃপায় সম্পদের পেলো দেখা। চীন আর ভারতবর্ষ নদীর পারে শস্যক্ষেতে ভাবতে লাগলো দর্শনের বড়ো বড়ো সমস্যার কথা। বিজ্ঞানকে আমরা করলাম উপেক্ষা। কি হবে লোহা-লক্কর আর যন্ত্রপাতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? এই যে প্রজাপতির পাখায় পাখায় নানা রঙের ঐশ্বর্য্য, এই যে সান্ধ্য মেঘের অতুলনীয় বর্ণশোভা, এই যে বনে বনে বিহঙ্গের কূজনমুখর-জীবনের এই সব অমূল্য সম্পদ পরিত্যাগ ক'রে কি হবে যন্ত্রপাতির পিছনে ছুটে? কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করতে ছুটেছেন আমরা তখন তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছি, চাঁদপুরা নিয়ে গলা সেধেছি, পুকুরের ধারে নারকেলের চারা পুঁতেছি, শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা পড়েছি, অধ্যাত্মরাজ্যে পরমানন্দে বিচরণ করেছি। ক্যাপটেন কুক যখন জাহাজে চ'ড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন, মাঙ্গো-পার্ক আর লিভিংস্টোন যখন আফ্রিকার অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেরিয়েছেন আমরা তখন কি করেছি? উঠানে বেগুন আর লঙ্কার চারা লাগিয়েছি, কালিদাসের আর ভবভূতির কাব্যের মধ্যে ডুবে থেকেছি, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন ক'রে পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়েছি, আসরে ব'সে সারারাত যাত্রা শুনেছি নয়তো বাইজীর নাচ দেখেছি, ঘটা ক'রে ছেলের বিয়ে দিয়ে এনেছি আর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়েছি। আজ যে ভাতের অভাবে এত দুঃখ পাচ্ছি—সে দুঃখের জন্য দায়ী তো আমরাই। জগৎকে দুদিনের ভেবে বাস্তবকে উপেক্ষা করেছি বাস্তব তাই আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অবশ্য একথা সত্য নয় যে, আমরা চিরদিনই কুণো ছিলাম। ভারতের বাণিজ্য-তরণী একদিন সুদূর মিশরে নিয়ে গেছে পণ্যসম্ভার। জনবিরল ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন আমরা করিনি একথাও ঠিক নয়। যন্ত্রশিল্পের দিক দিয়েও চীন অথবা ভারতবর্ষ যে উন্নত ছিলো তার প্রমাণ আছে। কিন্তু কোন এক মুহূর্ত্তে এলো সেই সর্ব্বনেশে ঘুম যখন আমাদের স্নায়ুগুলি অবশ হয়ে গেলো। দিগন্তের আহ্বানে সাড়া দিতে আমরা ভুলে গেলাম। আমাদের সামনে রইলো না কোনো সুউচ্চ আদর্শ। আমরা ছিলাম সমুদ্রের মহান, হ'য়ে গেলাম কুণো ব্যাঙ। কোন্ দিন অলাবু ভোজন করা বিধেয় আর কোন্ দিন বার্ত্তাকু ভোজন নিষিদ্ধ—এ সমস্যা আর সব সমস্যা থেকে বড় হ'য়ে উঠলো। জানবার যে আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষাও মরীভূত হ'য়ে গেলো। জড়প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের জন্য নিউটন যখন মাথা ঘামাচ্ছেন আমরা তখন শূদ্রের বেদপড়ার অধিকার আছে কিনা তাই নিয়ে প্রবল তর্ক জুড়ে দিয়েছি।

আমরা যে এত অধঃপতিত, তার আর একটা কারণ হচ্ছে, মানুষকে মর্য্যাদা দান করতে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের এই দেশে সাধারণ মানুষকে কোনো মূল্যই দেওয়া হয়নি। দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনায় তাদের কোনো হাতই ছিল না। বাদসা অথবা নবাব যা হুকুম ক'রেছে—তাই সকলের বড়ো আইন ব'লে গণ্য হয়েছে। মানুষের জীবনকে আমরা কি মূল্য দিয়েছি? জমিদার প্রজাকে কাছারি বাড়ী নিয়ে এসে গোমস্তাকে দিয়ে চাবুকিয়েছে। মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে ঘরে ফিরে গেছে। নিম্নবর্ণের মানুষগুলি তথা-কথিত উচ্চবর্ণের কাছ থেকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পায়নি। এই যে মানুষকে অসম্মান করবার প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তি নারী-পুরুষের সম্পর্ককেও বিষাক্ত করেছে। আমরা নারীকে করে রেখেছি পর্দ্দার আড়ালে বন্দিনী। এমনি ক'রে মানুষকে অসম্মান করেছে যারা, প্রেমের চাইতে শক্তিকে দিয়েছে উচ্চতর আসন, রাজা-বাদসাদের ইচ্ছাকে করেছে সর্ব্বজয়ী, নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বৈষম্য, হাজার হাজার মানুষকে ক'রে রেখেছে অস্পৃশ্য—তারা আজ সভ্যতার দরবারে সকলের পিছনে আছে প'ড়ে। শাসনের কোনো প্রয়োজন নেই—একথা সত্য নয়। এমন মানুষ সব সমাজেই থাকবে যাদের উৎকট প্রবৃত্তি সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার পথে বারে বারে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এদের শাসনে রাখবার জন্য শাসনদণ্ডের অবশ্যই প্রয়োজন আছে আর শাসনদণ্ড পরিচালনা মানে স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করা।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে সেই সব জাতি পৃথিবীতে উন্নতি করেছে যারা শক্তির পরিবর্ত্তে যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্ব ফোটে যুক্তির কাছে মাথা নত করায়। ভালো আর মন্দ দুটো পথই বেছে নেবার ক্ষমতা আছে তার। যুক্তির কাছে মানুষ মাথা নত করেছে বলেই সভ্যতা বেঁচে আছে। যেখানে যুক্তির বদলে শক্তির আশ্রয় নিই আমরা সেখানে সভ্যতার অঙ্গহানি ঘটে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চারটী উপাদান সমাজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম, যেখানে উচ্চতর কোনো লক্ষ্য নেই সেখানে সমাজ হয় ভোগের পঙ্কিলতায় ডুবে থাকে, নয় গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়, প্রকৃতির নির্ম্মম বিধানে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। যেখানে মানুষ বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে প্রকৃতির সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য ঘটাতে না পেরেছে সেখানে খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের অভাবে সমাজের অবনতি অনিবার্য্য। তৃতীয়, যেখানে একদল মানুষ আর একদল মানুষকে শাসন করে সেখানে ভালো যেমন আছে, মন্দও তেমনি আছে। ভালোর দিকটা হচ্ছে—শাসন সমাজে একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করে। মন্দের দিকটা হচ্ছে—শৃঙ্খলা অত্যাচারে পর্য্যবসিত হ'তে কতক্ষণ? চতুর্থ হচ্ছে—সেই সমাজই উন্নতির পথে এগিয়ে যায় যার আশ্রয় শক্তি নয়, যুক্তি।

গরু ও গিরিনবাবু

(গল্প)

শ্রীঅধীরকুমার রাহা

গো-জাতির পুরুষ শ্রেণীর উপর কয়েক বছর হইতে গিরিনবাবু মোটেও প্রসন্ন ছিলেন না।

তবুও দশদশটি বৃষরাজ আসিয়া গিরিনবাবুর স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। অদৃষ্ট আর কাহাকে বলে!

গিরিনবাবুর বৃষ-বিদ্বেষের পশ্চাতে ছোট্ট একটু করুণ ও হাস্যকর ঘটনার স্মৃতি জড়িত : সামান্য হইলেও ঘটনাটা গিরিনবাবু সহজে ভোলেন নাই :

চার-পাঁচ বছর পূর্ব্বেকার এক শীতের সকাল।

তটিনীবাবুর বাড়ীর সামনে খোলা জায়গাটুকুতে আসিয়া পড়িয়াছে শীতের সোনালী রোদ্র—চেয়ার পাতিয়া বসিয়া সেখানে গিরিনবাবু বন্ধুবরের সহিত গল্পরত......

এমন সময় কোথা হইতে শীতার্ত্ত ও রোদ্র-লোভাতুর পথচারী এক বৃষরাজ শিং বাঁকাইয়া মাথা দোলাইয়া বে-পরোয়া-ভাবে গল্পরত ভদ্রদ্বয়কে আক্রমণ করিল।

অত্যন্ত অন্যায় ও অকস্মাৎ আক্রমণ। কিন্তু বৃষরাজ, আধুনিক কালের ডিক্টেটরদের মত পরস্থান অপহরণে যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। প্রয়োজনই তাহার কাছে যুক্তি ও তর্ক।

অপ্রস্তুত গিরিনবাবু কি আর করিবেন? প্রাণ বাঁচাইবার সেই সনাতন পথই তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইল—

য পলায়তি স জীবতি।

গিরিনবাবু চোঁ-চা ছুট দিলেন......সামনেই যে তটিনী-বাবুর গৃহ (দুর্গ) রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় লইবার কথা তাঁহার মনেও পড়িল না। যদি পড়িত তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, বুদ্ধিমান তটিনীবাবু আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাকেও সেখানে আসিবার জন্য হাত নাড়িয়া ও চীৎকার করিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে মুহুর্মুহু নিমন্ত্রণ জানাইতেছেন......

বাতের শরীর লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে একটানা প্রায় একশ চল্লিশ গজ দৌড়িয়া শ্বাস লইবার জন্য তাঁহাকে একটু থামিতে হইল এই ফাঁকে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কতদূর পশ্চাতে ফেলিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি একবার পিছনে চোখ ফিরাইলেন......।

দেখিলেন, ষণ্ডবর কিন্তু তাঁহার তুলনায় মোটেই দৌড় ঝাঁপ করে নাই। রৌদ্রতপ্ত স্থানটুকু খালি হইতেই তিনি তাহা দখল করিয়া গভীর রাজসিক ভঙ্গীতে শুইয়া শুইয়া 'সানবাথ' করিতেছেন......।

গিরিনবাবু সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন।

সদর রাস্তা। গিরিনবাবু চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন ইতিমধ্যেই রাস্তায় লোক জড় হইয়া গিয়াছে। তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরমানন্দে মজা উপভোগ করিতেছে।

একটি ছোকরা আর একজনকে বলিতেছে : মাত্র আধ মিনিটে কি কান্ডটাই না ঘটল......ষাঁড়টা ত মাত্র একটুখানি শিং নেড়েছে, তারই জন্য ভদ্রলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ফ্লাট-রেস দৌড়াচ্ছেন......। ভদ্রলোকের চটি গেছে, লাঠি গেছে, শালখানা পরে ত আর ভদ্র সমাজে বেরুতে পারবেন না......অথচ দেখ দেখি মহারাজ কেমন নিরুদ্বেগে বসে বসে গাত্র লেহন করছেন—যেন কিছুই হয়নি। যেমন প্রভু তেমনি বাহন। মহাদেবের বাহন বাছার তারিফ করতে হয়......।

কটমট করিতে করিতে গিরিনবাবু ছেলেটার দিকে তাকাইলেন। হাতে ক্ষমতা থাকিলে বোধ হয় ছেলেটিকে কোতল করিতেন।

চটি, লাঠি ও শালখানা কুড়াইয়া আনিয়া গিরিনবাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ী যাইতে যাইতে সমস্ত ঘটনাটা স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুশোচনা হইতে লাগিল।

তাইত! রাস্তাভরা লোকের নিকট এতখানি কাপুরুষতা দেখান উচিত হয় নাই। হাতে যে লাঠি ছিল (এতক্ষণ পরে তাহার মনে পড়িল) তাহা দিয়া একটু তাড়াহুড়া করিলেও বোধ হয় ষাঁড়টি পালাইত......

কেন তাহা করিলেন না!

নিজের উপর তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। এত লোকে তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া গেল—এখন হইতেই তাহারা উহা লইয়া গল্প তৈয়ারী করিতে বসিয়া যাইবে......। বিদ্রূপ যে করিবে তাহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন।

গিরিনবাবু অশান্ত মনকে বুঝাইতে লাগিলেন : ওক্ষেত্রে লাঠির ব্যবহার করা মোটেই যায় না। একে বাতের শরীর, তাহার উপর ষাঁড়টির যে দীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ম শিং, হয়ত উহার সাহায্যেই বৃষরাজ তাঁহাকে তাহার প্রভুর নিকট পৌঁছিয়ে দিত......।

তাহার চেয়ে এই ভাল হইয়াছে......।

সেই হইতে গিরিনবাবু ঘোর বৃষ-বিদ্বেষী—বৃষকুলের কালাপাহাড়।

(২)

বাড়ী আসিতেই পলায়নের স্বপক্ষে আর একটি প্রথম শ্রেণীর যুক্তি তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল......

সম্রাট বাহাদুরের 'জুবিলী তহবিলে' গিরিনবাবু চারিটি অংকযুক্ত একটি সংখ্যা দান করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে যে নিছক রাজ-ভক্তির প্রেরণা ছিল তাহা নয়......।

অর্থাৎ আর দশজনে যে জন্য মোটা টাকা চাঁদা দিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য—তাহাদের অপেক্ষা কোন মতেই হীন নয়।

গিরিনবাবু দেখিতেছেন, নিত্য তাঁহার চোখের উপর কত "ভাগ্যবান" পুরুষ রায় বাহাদুর, খানবাহাদুর, ইত্যাদি খেতাব জুটাইয়া লইতেছে,—মায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী খুল্লতাতও......

গিরিনবাবুর গোপন বাসনা, তিনিও উহাদের ঐ লেবেল আঁটিয়া উহাদের পর্য্যায়ভুক্ত হন।

এজন্য অনেক দিন হইতে তিনি প্রবল রাজভক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। "রাজ-ভোগে" অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, অজস্র অর্থ ব্যয়ে বড়, ছোট, সামান্য, অসামান্য—যাহাদের শ্রীচরণে তৈল মর্দ্দন করিলে "আশা" আছে বুঝিয়াছেন, তাহাদেরই বন্দনা করিয়াছেন।

কিন্তু এক শ্রেণীর জীবের উপর শূন্যে বিলম্বিত শিকা যদি কদাচিৎ ছিঁড়িয়া পড়ে।

গিরিনবাবুর অবস্থাটা তাহাদেরই মত দাঁড়াইয়াছে।

শিকাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য মার্জ্জার শাবকের লম্ফ-ঝম্পের অন্ত নাই।

কিন্তু নিষ্ঠুর শিকা......

গিরিনবাবু অধ্যবসায়ী, পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় রবার্ট ব্রুসের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। তিনি অবিচলিত চিত্তে শূন্যে বিলম্বিত "রায় বাহাদুরেকে" নাগালের মধ্যে আনিবার কঠোর সাধনায় মগ্ন.....

রবার্ট ব্রুসের অবসাদ আসিয়াছিল ষষ্ঠ পরাজয়ে। কিন্তু অধ্যবসায়ে গিরিনবাবু তাঁহাকেও ছাড়াইয়া গেলেন। "খেতাব সাধনায়" তাহার অবসাদ আসিল না। সাধনার অষ্টম বর্ষে তিনি একবার শুধু অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন ঃ হায় খেতাব পাবার জন্য আমি যে সাধনা করলাম নীলকণ্ঠকে পাবার জন্য বোধ হয় গৌরীও এমন তপস্যা করেনি.....।

গিরিনবাবুর সাধনা অবশ্য শুধু তৈল প্রদান ও অর্থ-ব্যয়......।

এত তপস্যার পরেও অবশ্য ঈপ্সিত লাভ না করিবার সামান্য একটু কারণ ছিল.....

গিরিনবাবুর কোন এক শ্যালক পুত্র নাকি স্বদেশী করিয়া ৬ সপ্তাহ জেল খাটিয়াছিল--তাহারই ছোঁয়াচ আসিয়া গিরিনবাবুকে অপবিত্র করিয়া গিয়াছে--সম্ভবত উহারই জন্য এত সাধন-ভজন করিয়াও গিরিনবাবুর উপর কৃপা বর্ষণ হইতেছে না......।

না হইলেও গিরিনবাবুর পক্ষ হইতে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

পূজার আয়োজনের নৈবেদ্যের মধ্যে একটি অনুচিত উপচার আসিয়া সমস্ত আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিয়াছে।......

জুবিলী উৎসবে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া, ও ভবসা বোধ উদ্দিপ্ত করিয়া তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন ঃ এইবার সাধনার সিদ্ধিমার্গে না পৌঁছিয়া যান না। এবং চারিদিকে প্রবল গুজব ঃ তিনি নাকি সত্যই......

লোকের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না--কয়েকবার এইরূপ গুজবে বিশ্বাস করিয়া পরিশেষে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন। গেজেট ও বিশ্বাসযোগ্য স্থান হইতে খবরের আশায় তিনি অধীর আগ্রহে দিন গুনিতেছিলেন.....

এইবার তাঁহার মনে পড়িল, যাঁড়টির নিকট বিক্রম না দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন--যদি যুদ্ধে মারা যাইতেন, তাহা হইলে ত আর গেজেট দেখা হইত না।

যদি মরিতে হয়, উপাধি লইয়াই মরিবেন, তাহার আগে নয়।

কিন্তু জুবিলী উৎসবের এত অর্থব্যয় ও গিরিনবাবুর এত আশা ধোঁয়ায় মিলাইল। গিরিনবাবু উপাধি পান নাই।

গিরিনবাবু কয়েকদিন গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেশে যদি স্বরাজী গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় অনশন করিয়া 'রায় বাহাদুরী' আদায় করিতেন। যাহা হউক, গিরিনবাবু এবার অর্দ্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বরের বন্দনা ছাড়িয়া, একেবারে গোটা পৃথিবীর অধীশ্বরের আরাধনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ঈশ্বর ভজনরত গিরিনবাবু ভিতরে ভিতরে যত অশ্রুপাত করেন, আত্মীয় অনাত্মীয়েরা বাইরে বাইরে সেই অনুপাতে হাসে।

হাসিবারই কথা।

(৩)

গিরিনবাবু ধর্ম্মে-কর্ম্মে ডুবিয়া গিয়া মোক্ষ লাভের পথটা প্রায় পরিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন, ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বিরাট বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল--ফলে গিরিনবাবুর চাপা-চাপা দেওয়া বাসনা আবার জাগিয়া উঠিল--রস পাইয়া যেন বাঁচিয়া উঠিল বাঁধের মধ্যকার বৃক্ষশিশু......'

লর্ড লিনলিথগো বড়লাট হইয়া আসিলেন।

এবং আসিয়াই তাঁহার উদার হৃদয় দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃখে একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। তাই নিরন্ন, দুস্থ ও পলিটিক্স-প্রবণ ভারতবাসীকে দুবেলা, পেট ভরিয়া ভিটামিনযুক্ত গো-দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাদের দৈহিক পুষ্টির জন্য (ও আধ্যাত্মিক উন্নতি) ভারতের গো-সমস্যায় নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিলেন।

কতকগুলি কাগজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া নিত্য এক পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয় ও সচিত্র প্রবন্ধ ছাপিতে লাগিল, কতকগুলি কাগজের বিদ্রুপবাণ-জর্জ্জরিত প্রবন্ধগুলি হট কেকের ন্যায় বাঙ্গপ্রিয় জনসাধারণের মুখরোচক হইয়া উঠিল.....

আর গিরিনবাবু দেখিলেন, সম্মুখে রায় বাহাদুর লাভের আর এক নূতন সুযোগ উপস্থিত।

তিনি বিচক্ষণ লোক। গো-সমস্যা সমাধানের মর্ম্ম তিনি এক নিমিষে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিলেন......।

শেষ বারের মত রায় বাহাদুর শিকারে আবার আসরে নামিলেন.....

ওটিনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া গিরিনবাবু ভাগলপুর হইতে দশটি হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় (তাহারই স্বজাতি যে এক বৃদ্ধের শীতের প্রভাতে অপ্রস্তুত গিরিনবাবুকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত করিয়াছিল) আনাইতে দিলেন।

বাড়ীর পিছনে যে খোলা জমিটুকু পড়িয়াছিল, সেখানে চালা বাঁধিয়া বৃষরাজগণের আবাস নির্ম্মিত হইল। গো পালন ও রক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা হইল।

আসরে নামিবার ইহা হইল প্রাথমিক অনুষ্ঠান।

ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য তাঁহার হাতে রহিয়াছে।

তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পোষ্য যুবকদের লইয়া গিরিনবাবু একটা গোপন বৈঠক বসাইলেন।

তাহার পরই দেখা গেল, ওটিনীবাবুর বাড়ীতে সাইন বোর্ড লটকানো ঃ

গো সংরক্ষণী সমিতি

কার্য্যালয়

সভাপতিঃ--শ্রীগিরিন্দ্রমোহন রুদ্র।

যাহারা গিরিনবাবুকে ঘোর বৃষ-বিদ্বেষী বলিয়া জানিত তাহারা তাঁহাকে গো-সংরক্ষণী সমিতির সভাপতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সেই বৃষটির নিকট সর্ব্ব সমক্ষে অপমানিত হইয়া গিরিনবাবু গো-দুগ্ধ ছাড়িয়া ছাগ দুগ্ধ পান

ধরিয়াছিলেন এবং বাড়ীর সমস্ত গরু সেই দিনই বিক্রয় করিয়া দেন। সেই গিরিনবাবু গো-হিতৈষী......

ঢাক-ঢোল পিটাইয়া শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে একদিন মহাসমারোহে গো-সংরক্ষণী সমিতির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল......।

গিরিনবাবু ছোট একটা বক্তৃতায় সমিতির মহান উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন : গো-জাতির অবনতি, তৎসহ ভারতবাসীর অবনতি......দুধ খাইতে না পাইয়া পরাধীন ভারতীয়ের এই দুর্দ্দশা—গো-সমস্যা সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তা, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবেদন প্রচার করিলেন ......। সদাশয় গবর্ণর বাহাদুরের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে—দেশের লোকেরও সর্ব্বাগ্রে এদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। গো-মাতার দুর্দ্দশায় বিগলিত হইয়া অনেকে সমিতির সভ্য হইয়া পড়িলেন—অনেকে শুধু পিঠ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত......।

গিরিনবাবুর সমিতির উৎসাহী সভ্য ও যুবকেরা সভা-সমিতি করিয়া শহরের লোকের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিবার উপক্রম করিল......।

সকলেই বলে : এতদিন পর বুঝি গোকুল রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব হ'ল......।

বক্তৃতা দিবার নামে পূর্ব্বে গিরিনবাবুর কম্প দিয়া জ্বর আসিত। বক্তৃতা দেওয়াকে তিনি জীবনে কঠিনতম কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন তিনি গো-সমিতির সভাপতি—অন্তত ২।১ সভায়ও তাঁহাকে দু'চারটি কথা না বলিলে চলে না।

তাই ব্যাপারটিকে সহজ করিয়া আনিবার জন্য তিনি কতকগুলি কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন—প্রত্যেক মিটিংয়েই তাহাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলেন......"আমাদের কিনা ছিল? গোয়ালে গরু, গোলাঠাসা ধান, বাগানে কচু ও শাক, পুকুরে সুশীতল জল, পুঁটি ও পানা, মাচা ভরা লাউ, বৃক্ষে বৃক্ষে কদলী ও নারিকেল—অর্থাৎ আমরা ছিলাম যম স্বর্গে; কিন্তু যে দিন হইতে আমরা গো-জাতিকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেইদিন হইতে আমাদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। আজ আমাদের গোয়াল শূন্য, তাই গোলা ফাঁকা, আমাদের বাণিজ্য পরহস্তে, আমরা শ্রীহীন, স্বাস্থ্যহীন। এ সবই গো-মাতাকে অবমাননা করার ফল। আমাদের যদি বাঁচিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে গো-জাতিকে বাঁচাইতে হইবে......। গো-মাতা বাঁচিলে তবেই আমরা বাঁচিব। অবশ্য কতকগুলি অর্ব্বাচীন মতলবরাজ লোক ইদানীং প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে স্বরাজ ভিন্ন আমাদের মুক্তি নাই......। আমরা ক্ষীণদেহী, দুর্ব্বল। এই অর্ব্বাচীনেরা বুঝে না যে, যাহারা দুর্ব্বল, দু'বেলা পেট ভরিয়া দুগ্ধ পান করিতে পায় না তাহারা পরিণামে স্বরাজের গুরুভার বহন করিবে কি করিয়া? স্বরাজ না হইলেও আমাদের চলিবে, কিন্তু প্রত্যহ আকণ্ঠ দুগ্ধ পান করিতে না পাইলে আমরা তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় পট পট করিয়া মারা পড়িব......। আমাদের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর এই তীব্র সমস্যা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্ত শুধু সরকারের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—নিজেদেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে......।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪)

নূতন সম্ভাবনা লইয়া নূতন বছর আসিল।

কয়েক সপ্তাহ হইতে গিরিনবাবুর চোখে ঘুম নাই। আবার নানারকম গুঞ্জন শোনা যাইতেছে। প্রত্যেকবারই যায়; কোন কিছু হয় না। এসবে তাঁহার আর বিশ্বাস নাই। গুজব—গুজব, সত্য নয়। হইতেও পারে। গেজেট হাতে না আসা পর্য্যন্ত বিশ্বাস নাই.........।

অবশেষে বহু প্রত্যাশিত 'তালিকা' হাতে আসিল। অখ্যাত, কুখ্যাত, বহু ভাগ্যবানের রাশি রাশি নামে ভর্ত্তি গেজেট।.........কিন্তু গিরিনবাবুর নাম নাই কেন?

মাথা ঠাণ্ডা থাকিলে তিনি নিজেই এর উত্তর দিতে পারিতেন : হিষ্টরি রিপিটস্ ইটসেল্ফ।.........

এত বড় আঘাতেও যদি মানুষে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, তবে 'ভাঙ্গিয়া পড়া' কথাটার আর কোন দরকার থাকিত না। অতএব গিরিনবাবু ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

এত বড় আঘাত! তাঁহার সবচেয়ে প্রাণে বাজিয়াছে—ছোট তরফের উমানন্দ সেও কি-না—শুধুমাত্র তৈলপ্রসাদ ও রৌপ্য শক্তির (যে সাধনায় ইতিপূর্ব্বে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন) প্রভাবে নববর্ষের সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের তালিকায় পড়িয়া গেল—অথচ; তাঁহার মত কঠোর সাধনা, কিংবা গোপালন, কিছুই করিল না।

আশ্চর্য্য!

তাঁহার রাগ হইতে লাগিল সেই দেশসেবক অর্ব্বাচীন শ্যালকপুত্রের উপর; ছোঁড়া দেশসেবা করিয়া দেশের কতখানি উপকার করিয়াছে ভগবানই জানেন, কিন্তু দেশের একটি লোকের যে কি ভীষণ অপকার করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই.........। না হইলে করতলগত জিনিষ বারবার ফসকাইয়া যায়।.........

গেজেট পাঠ (তন্ন তন্ন করিয়া) সাঙ্গ করিয়া, কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া গিরিনবাবু মনে মনে হিসাব করিতে বসিলেন : গো-হিতে ও অন্যান্য হিতকর কর্ম্মে এ পর্য্যন্ত কত খরচ হইয়াছে.........। পাঁচটি শূন্যের একটি সংখ্যায় আসিয়া অঙ্ক গোলমাল হইয়া গেল—মনে মনে না পারিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতে ছিলেন, এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু (গো-সংরক্ষণী সভার সম্পাদক, গিরিনবাবুর মতই "আশায় বিফল"......) ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন : গিরিন তুমি দুঃখ ক'র না.........

চন্দ্রনাথ বোধ হয় সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে। গিরিনবাবুর হাসি পাইল.........।

তের বছরের সাধনার পরও অকৃতকার্য্য হওয়ার কি দুঃখ, এ জগতে কে বুঝিবে? কেউ না—মাইনাস গিরিনবাবু।......

চন্দ্রনাথবাবু বলিয়া চলিলেন : গিরিন, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। দেখ টাকায় রায় বাহাদুর হওয়া যায় না, কিন্তু টাকায় দেশসেবক হওয়া যায়। চল আমরা কংগ্রেসে ঢুকে পড়ি। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে এ...

(শেষাংশ ৬৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উত্তর বঙ্গের শিবের ছড়া

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্য প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্ট **স্থান অধিকার করিয়া আছে।** রামেশ্বরের শিবায়ন, ভারত-**চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং কয়েকখানি** মনসামঙ্গল কাব্য ধর্ম্ম-**মঙ্গল সাহিত্যের পরম সম্পদ।** লাউসেন নামে কোন এক **রাজার আমল হইতে এই** ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যের উদ্ভব হয়। **কোন প্রামাণিক গ্রন্থের সহায়তা** গ্রহণ না করিলেও সাধারণ **ছড়া-গানের মধ্যে আমরা** রাউসেন (লাউসেন ?) রাজার নাম **পাই।** দক্ষিণ বঙ্গের "চড়ক পূজার" ছড়ার মধ্যে রাউসেন **রাজার** নামোল্লেখ আছে। তিনিই ধর্ম্মমঙ্গলের প্রবর্ত্তক রাজা **লাউসেন** কিনা তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

রাউসেন নামে রাজা ছিল নৃপবর।
কঠোর করিল স্তব কয়েক বৎসর॥
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ করিল সেই রাজা।
সেই হইতে প্রকাশ হইল শিবপূজা॥

যাহা হউক, গ্রাম্যছড়ার মধ্যে শিবের বিষয়বস্তুর সন্ধান **অনেক** মিলে। এককালে শিবের ছড়া-গান দেশময় ছড়াইয়া **পড়িয়াছিল।** সেজন্য "ধান ভানতে শিবের গীত" এখনও **প্রবচনের** মত প্রচলিত আছে।

উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় "শিবের গীত" পূর্ব্বকালে গাহিতে শোনা যাইত। রাত বাহির গান গাহিয়াও নাকি ফুরাইত না। সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও তাহার প্রচলন **থাকিতে** পারে, কিন্তু তাহা উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য। বগুড়ার ? কবি জগজ্জীবন মৈত্রের "মনসা পুরাণ" কাব্যে শিবের বিয়ে, কৃষি, মালঞ্চ নির্ম্মাণ প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত "মনসা পুরাণ" কাব্যখানি কাব্য-সম্পদে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত সাহিত্যিকের দৃষ্টির অভাবে তাহা শিক্ষিত সমাজের নিকট অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে। এস্থলে জগজ্জীবন কবির "মনসা পুরাণ" হইতে শিবের গানের কিছু উল্লেখ করিতেছি। পার্ব্বতী পুষ্পবনে যাইতেছেন, তাঁহার জন্য ফুলের সাজি তৈয়ার করা হইতেছে।

আমের গাছের আম্র সারো, জাম্বের গাছে শাখা;
সামনে বাসুয়া কান্দে ফটিক জল বলিয়া॥
আখোয়াল ডুবুকা দেখে, আখোয়াল দুলকায়।
[illegible] সোম্দাসে পাখীর লাগা নাহি পায়॥
রাজ হংস, বালি হংস, সারস সরালি।
অনেক চকোয়া পাখী নিত্য করে কেলি॥
আর ভেলা পাখী দেখে, আছেন ঠাকুর।
তাহার কশ্যপ দেখে, জোনাক পুকুর॥ ইত্যাদি।

শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ, ধনরাজা কহিয়া কোন্দল, গঙ্গা-দুর্গার কোন্দল ইত্যাদি শিবের ছড়ার অনুগামী বিষয়গুলি উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ বাঙলার সর্ব্বত্র চৈত্র মাসের সংক্রান্তির তিন চার **দিন পূর্ব্ব হইতে** শিবের ছড়া-গানের আরম্ভ হইতে দেখা যায়। **গ্রাম্য** যুবকেরা নানাভাবে সজ্জিত হইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া **বেড়ায়** এবং শিবের ছড়া-গান গাহিতে থাকে। পাড়াগাঁর অনেক **স্থলেই** এখন "দেল পূজার" সময় বাহির হয়—পাড়ার ছেলে-**ছোকরার দল আনন্দে মাতিয়া যায়। দক্ষিণ বঙ্গের খুলনা** জেলা হইতে সংগৃহীত "অষ্টকের ছড়ার" মধ্যে **শিবের বিয়ের** রঙ্গ-কথা উল্লিখিত আছে।

ও শুন সবে মন দিয়ে
হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাশেতে করে অধিবাস।
ও তাতে নারদ করে আনা-গোনা,
কৈলাশে বিয়ের ঘটনা,
শিবের বিয়ের কত ইতিহাস॥
ও তবে একদিনে শূলপাণি,
নারদকে ডাকিয়া আনি,
বলিতে লাগিল মুনির ঠাঁই।
আমি একেলা ঘরে শুয়ে থাকি,
ঘুম আসে না আমার চোখে,
উথপুথি করে রাত কাটাই॥

*　　*　　*　　*

আমার বিয়ের কথা মনে পড়লে,
হারায়ে যাই সিদ্ধির ফলে,
একে পাগল আরও পাগল হই॥

বিয়ের জন্য ভোলানাথ পাগল হইয়া গিয়াছেন। কোন্দল-সম্বল নারদ মুনি ঘটক সাজিয়া কনের অন্বেষণে বাহির হইলেন। ক্রমে হরগৌরীর বিবাহ হইল; নানা মায়ায় গৌরী হরকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক উপভোগ্য তথ্যের কথা গানের মধ্যে আছে। গানের সঙ্গে সমভাবে নাচ চলিতে থাকে। নাচ-গান যেন ফুরাইতে চায় না। দেলমণ্ডপে ঠাকুর উঠাইবার সময় হয়—এখন ছড়া-গান স্থগিত রাখিবার কথা গায়েনদের সেদিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা মনের আনন্দে নাচিতে গাহিতে থাকে। সেজন্য কথায় বলে—"দেল মণ্ডপে উঠ্‌ল, এখনও নাচুনী ফুরাল না।"

ঠাকুরের পাট কাঁধে করিয়া যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা-দিগকে বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে "বালা শ্রেণী" বলে। তাহারা দেবতার নাম স্মরণ করিয়া কয়েকদিন উপবাস করিয়া থাকে এবং অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে। উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে তাহাদিগকে "দেব বংশী" বলা হয়। "দেব বংশীর" অনুচরেরা শিবের নাম করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। গৃহস্থের বাড়ী যে সমস্ত ছড়া বলে, তাহাদিগকে "আশীর্ব্বাদ"রূপে ধারণা করা হয়। এস্থলে একটি ছড়া উল্লেখ করিতেছি।

ঝিলি মিলি গাছে হে,
ঝিলি মিলি পাত।
তাহাতে ফুটিয়াছে হে
নব দণ্ডের গাছ॥
চইরে আতা চইরে পাতা,
চইরে বন্দো মূল।
তাহাতে ফুটিয়াছে হে,
বেয়াল্লিশ ফুল॥
বেয়াল্লিশ ফুলে হে,
তেতাল্লিশ জোড়া।
তাহাতে ফুটিয়াছে হে
গঞ্জোর ভোমরা॥

উড়িয়া যারে ভোমরা পাখী,
পাখায় দিয়া সাট্।
শিবের আইজ্ঞা মহাদেবের বর,
শিব আছে মণ্ডবেতে
প্রণাম করি তাক্ ॥*

অর্থের দিক দিয়া কিছু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু পল্লীকবির সহজ সরল বর্ণনায় মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই।

চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক-পূজা শেষ হইলেও, শিবের ছড়া-গানের শেষ নাই। বৈশাখ মাস পড়িতেই রঙ্গপুর অঞ্চলের নাম-বালকেরা ভিক্ষারপাত্র হাতে করিয়া গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের দ্বারা তাহারা সন্ধ্যার পর শিবের নামে পূজা দেয়। তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পায়, তাহার দ্বারা অনেককে জোট বাঁধিয়া গাঁজিকা সেবন করিতে দেখা যায়। তাহারা শিবের অনুচর, সুতরাং গাঁজিকা সেবনে কোন দোষ নাই, এরূপ তাহাদের বিশ্বাস। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে "গোরখনাথ" অথবা "ত্রিনাথের" পূজা আলোচ্য বিষয়বস্তুর অনুরূপ। উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এই ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে "ধরম পূজা" বলে। বৈশাখ মাসকে সাধারণত ধর্ম্ম মাস বলা হয়। এই সময় গৃহস্থেরা "দান-ধ্যান" করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। এ সময় মেয়েদের মধ্যে ফল-দান ব্রত প্রতিপালিত হইতে থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা বট অশ্বত্থের বিবাহ দিয়া রাস্তার পার্শ্বে জলসত্র খুলিয়া পথিকের তৃষ্ণা দূর করিবার চেষ্টা করেন। যতই আমরা বাহিরের সভ্যতার সংস্পর্শে আসিতেছি, ততই আমরা বাস্তবপন্থী হইয়া পড়িতেছি এবং স্বার্থের মাপকাঠিতে সব বিচার করিতে থাকায় প্রীতির গ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইতেছে।

উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে যে "ধর্ম্ম পূজার" ছড়া আবৃত্তি করিতে শোনা যায়, তাহার অধিকাংশই শিবকে উপলক্ষ্য করিয়া। শিবই ধর্ম্মের প্রতীক স্বরূপ; তিনি সত্য এবং সুন্দর। তিনিই জগতের পালন-কর্ত্তা, আবার তিনি জগতের ধ্বংসের কারণ। তিনি জগতের যাবৎ জীবের সুখ-দুঃখের চিন্তাতে বিভোর।

আমরা এস্থলে "ধরম পূজার" কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ছড়ার মধ্যে শিবপূজার মামুলী কোন্দল কথা থাকিলেও বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি।*

(এক)

শিব শিব বল গোসাঞি ভোলা মহেশ্বর।
গাইলে শিবের নাম ১যমোক্ নাহি ডর ॥
গাঞ্জা খাব সেরে সেরে বিশেরে ভোজন।
আড়াই পুটি রন্ন হইলে শিবের আন্দোন ॥
২আন্দিয়া বাড়িয়া দিলে ভোলা শিবের আগে।
৩তামান্ গুটীক্ রন্ন খাইলে. গাঞ্জার খেয়ালে ॥
বারোখানি ঢেঁকীরে শিব তোর তেরখানি কুলা।
দিনে আইতে পড়ে পাখা সুধা ভাঙের গুড়া ॥
ভাঙ টুকিতে গোরীর হস্তে পইল কড়া।
না রওঁ তোর শিবের ঘরে কে মোরে(?) ঝগড়া ॥
বল দল ঝগড়ার কার্য্য নাই, ৪বেগল খা ভাংগরা ॥
কাইল গুয়া বাড়ী দিম্, দেব তাক্ করিম জোট্।
পুষিবার না পারিস্ ভাংগর ক্যানে দুই মাউগ কর ॥
দুই চউক খাইলে বাপো মায়ে,
আর দুই চউক খাইলে আন্দারা পাড়ার লোক।
জরম ৫ঠেংগুয়ার ঘরে বেচেয়া খাইলে মোক্ ॥৬
এই ত ধরমের পত্র ফিরে ঘরে ঘর।
চাউল কড়ি দিয়া তোমরা ধরম সেবা কর ॥

(দুই)

পুবে উঠিল ভানুরে মোর হইল রণ্ডিপুর।
শাল মন্দির ভাঙ্গিয়া পবনে কইরলে চুর ॥
যত মরে বাপো, মরে এণ্ডা পাড়ার লোক।
জরম ঠেংগুয়ার ঘরে বেচেয়া খাইলে মোক ॥
মোর ৭জারের কলু কথা তুই বরুয়ার বেটী।
তোর জারের কওঁছো কথা শুনেক বদন ভরি ॥
তোর বাপের বাড়ী গেছু দান পাবার আশে।
কিসের শ্বশুর দান দিবে পেটের ৮ভোকে মরে ॥
তোর বাপের বাড়ী গেছু বইসতে দিছে পাটী।
ভাত খাইসতে আর জামাই বসিয়া কাটেক বাটী ॥৯
তোর বাপের বাড়ী গেছু বইসতে দিছে গুণ।১০
এণ্ডা বাড়ীর ১১খুড়িয়া বতুয়া ১২করজ করা নুন ॥
এই ত ধরমের পত্র ফিরে ঘরে ঘর।
চাউল কড়ি দিয়া তোমরা ধরম সেবা কর ॥
তলে লবণ চাউল কড়ি উপরে সেন্দুর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক তোমার ধরম ঠাকুর(?) ॥

এখন শিবের ছড়া-গানের রচয়িতা এবং রচনাকাল লইয়া একটু আলোচনা করা যাউক। এ বিষয়ে আমাদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পল্লীর ধর্ম্ম-গীতি যে নাথ সম্প্রদায়ের দ্বারা বিরচিত হইয়াছিল, তাহা ধারণা করিবার অনেক কারণ আছে। এখনও নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবের ছড়া-গানের বিশেষ প্রচলন হইতে দেখা যায়।* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর হইতে নাথেরা ধর্ম্ম-মঙ্গল-সম্বন্ধীয় গীতি রচনা করিতে থাকে। ক্রমে তাহারা বৌদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কালে বর্ণাশ্রম হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহারা বৌদ্ধ প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই। তবে, বোধ করি গোঁড়া হিন্দুরা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তাঁহাদের

---

* তাক্=তাহাকে।

* "ধরম পূজার" ছড়াগুলি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বর্ম্মা (শিমুলবাড়ী, রাজসাহী) আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১। যমোক=যমকে ২। আন্দিয়া=রন্ধন করিয়া ৩। তামান্=সমস্ত ৪। বেগল=পৃথক ৫। ঠেংগুয়া=নিঃস্ব ৬। মোক=আমাকে ৭। জারের (?)=কলঙ্কের ৮। ভোকে=ক্ষুধায় ৯। বাটী=দাঁড়ির পুলি ১০। গুণ=ছালা জাতীয় বসিবার আসন বিশেষ। ১১। খুড়িয়া বতুয়া=কাটা

* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত = বৌদ্ধ গান ও দোহার মুখবন্ধ (ভূমিকা)।

আচার ব্যবহারেও বৌদ্ধ ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। এখনও বাঙলার পল্লী অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া যায়, যেগুলি শিব মূর্ত্তি বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে।

নাথ সম্প্রদায়ের অনেকে নিজদিগকে শিব গোত্র বলিয়া প্রকাশ করে এবং "সামবেদী" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। সাধারণভাবে, আমরা তাহাদিগকে শিবের ছড়া গানের রচয়িতা বলিয়া ধারণা করিতে পারি।

আমরা যে কয়েকটি "ধরম পূজার" ছড়ার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একস্থানে—"আড়াই পুটি রন্ন দিয়া শিবেরে আন্দোন"—কথা পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংকলিত "গোপীচন্দ্রের গানে" আমরা হাড়ি সিদ্ধা প্রদত্ত "আড়াই পুটী অন্ন" খাইয়া জ্ঞান শিখিবার কথা পাই;—হাড়িসিদ্ধা ধর্ম্মরাজকে "আড়াই পুটী" অন্ন মন্ত্র দিয়াছিলেন, এই আড়াই পুটী অন্নের প্রতি দেখিতেছি নাথপন্থীদের একটি বিশেষ মোহ আছে। এই সব ছড়া-গানের মধ্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

গরু ও গিরিন বাবু

(৬৪৯ পৃষ্ঠার পর)

অদৃশ্য বস্তুকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার ভঙ্গি দেখাইয়া বলিলেন—এই থাকলে আবার দেশসেবক হতে কি ? তারপর একবার নামকরা দেশ নেতা হয়ে পড়তে পারলে, কাউন্সিল, এসেম্বলী, মিনিষ্ট্রী, মালাচন্দন.........মারে কে ? এর কাছে কোথায় লাগে তোমার রায় বাহাদুরী.......

গিরিনবাবু ঢোক গিলিয়া বলিলেন : ......কিন্তু এতদিন, রাজ-সেবা ও গো-সেবার পর এখন দেশসেবা কি মানাবে.....?

কেন মানাবে না ? চন্দ্রনাথবাবু টেবিলের পিঠটা সশব্দে চাপড়ে দিলেন, যে বাঙালীটি চিরদিন বিলেতী হোটেলে লাঞ্চ মেরে এসেছে সে কি কোন দিন মোচার ঘণ্ট দিয়ে ভাত খেতে পারে না ?'

শোকে মুহ্যমান গিরিনবাবুর সামনে একটি নূতন জগৎ ভেসে উঠল।

তিনি লাফাইয়া উঠিলেন : দি আইডিয়া

চন্দ্রনাথবাবুর প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল।

আমারি চোখের পরে

শ্রীসুষমা দে (পঞ্চখণ্ড)

আমারি চোখের পরে
তারকা-খচিত অসীম নীলিমা বিলীন দিগন্তরে।
আমি তারে দেখি দিনে রাতে,
আমি চেয়েছিনু তার গুণ্ঠন খসাতে;
সবুজের সুষমায় যে রহস্য লুকায়ে গভীরে
সাড়া দেয় অন্তর কবিরে
আমারে লইল টানি আনন্দে উন্মত্ত
ঘর ছাড়া পাগলের মত।

আমারি চোখের পরে
মানুষের সৃষ্টি সেথা দাঁড়াইল জয়গর্ব্ব ভরে।
প্রাসাদের চূড়া অভ্রভেদী
যন্ত্রের নির্ঘোষ উঠে ঘর্ঘর নিনাদী
প্রকৃতির বক্ষ চিরি ঐশ্বর্য্যের সুধা করি পান
মানুষ হইল ভগবান।
হেরিনু তাহার যাত্রা বিজয়ের রথে
তমো হতে আলোকের পথে।

আমারি চোখের পরে
তারপর মায়াময়ী যবনিকা ঠেলিয়া সত্বরে
কর্ণে পশে সকরুণ সুর;
বঞ্চিত বুভুক্ষু আত্মা কাঁদে ব্যথাতুর
অন্ন লাগি, বস্ত্র লাগি, অন্ধকারে আলোক মাগিয়া,—
তার ক্ষুব্ধ কামনা চাপিয়া
মানুষ হানিছে ঘাত মানুষেরি বুকে
হিংসালুব্ধ পরম কৌতুকে!

আমারি চোখের পরে
রিক্ত তার শূন্য পাত্র আনমনে বহিয়া অন্তরে
ফিরিলাম ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ রাতে
মানুষের দেবতারে নালিশ জানাতে,—
যারা হেথা শত কোটি নয়নের দৃষ্টি করি কালো
নিভাইয়া দেছে তব আলো
তাহাদেরে হে বিধাতা, দেখাবে না পথ?
নামিবে না বিপ্লবের রথ?

কালের যাত্রার ধ্বনি

(গল্প)

শ্রীমানসকুমার চক্রবর্ত্তী

সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূরমার করিয়া একদিন জেলের গরাদে আমাকেও গ্রাস করিল।

ছেলে বেলা হইতে যে-দেশের জলবায়ুতে মানুষ হইয়াছি, যে-দেশের শ্যামল বনানী ও পথঘাট আমার প্রাণে চিরজাগ্রত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই স্মৃতি আজ আমার মনে একে একে উদিত হইতেছে। মনে পড়িতেছে শৈশবের সে চঞ্চল মুহূর্ত্ত-গুলির কথা। কতদিন ইস্কুল পলাইয়া "তালপুকুর"-এর ভিটে বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। গল্প করিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া কখনওবা গাছে উঠিয়া সারাদিন কাটাইয়া দিয়াছি। সন্ধ্যার কিছু আগে লক্ষ্মী ছেলেটির মত আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি। মায়ের আদর-যত্ন ও পিতার কঠোর শাসনের ভিতর দিয়া এইভাবে জীবনের এক অধ্যায় কাটিয়া গেল।

তারপর যুব-ভারতের মনপ্রাণ একদিন মাতিয়া উঠিল। স্বদেশী আন্দোলনের ভাব-বন্যা বাঙলার যুব-প্রাণের উপর দিয়া চলিতে লাগিল উদ্দাম গতিতে—বাঙলার আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া একদল ছন্নছাড়া যুবক প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া স্বদেশ-উদ্ধারের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। দিকে দিকে তাহাদের জয়যাত্রা চলিতে লাগিল। কবি রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়াগাঁয়ের দরবেশ ফকিররাও তাঁহাদের রুদ্রবীণা লইয়া নবীন-সুরে বাঙলার আকাশ-বাতাস রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে আমিও বিলাসের আরাম-কেদারা দূরে ফেলিয়া সে বন্যায় নিজেকে ভাসাইয়া দিলাম। ধ্বনিত হইল ক্ষুধিত সর্বহারাদের আকুল ক্রন্দন! দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যোবাত্রব্যাপী এই যে নিপীড়নের উৎসব চলিয়াছে, কবে যে ইহার অন্ত্যেষ্টি হইবে কে জানে?

ভারতের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল—সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইল বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ এ-কথা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম তখনই যখন দেখিলাম, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্ন-পাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি। ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য বন্ধপরিকর হইলাম—রাজপুরুষদের নির্ম্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও প্রবল প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে কোন বিপদের সম্ভাবনাই আমাদিগকে বাধ দিতেছে না।

সদর হইতে একদিন হুকুম আসিল—অন্যায় জ্ঞানে যাহার বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতেছি—নিষ্পেষিত জনগণের বুকে আশার বাণী সঞ্চারিত করিতেছি সেজন্য আমাকে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। স্থির করিলাম—প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার কিন্তু কৈফিয়ৎ দিব না। সে মনোভাবকে বহু দূরে রাখিয়া করিলাম অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা!

* * *

দীর্ঘ চারিটি বৎসর নানা দুঃখ-লাঞ্ছনা ও দৈন্যের মধ্যে কাটিয়া গেল। অজ্ঞাতবাসের তীব্র লাঞ্ছনা ও দুঃখকষ্টের মধ্যে যে প্রেরণা পাইয়াছি, বাহিরে বিলাসের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াও বোধ হয়, তাহা কোন দিন পাই নাই। কত রাত্রি কত দিন অনাহারে অনিদ্রায় যে কাটিয়া গিয়াছে—কৈ তেমন ত শ্রান্ত হই নাই? যে দুর্বার দেশোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা একদিন কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে মনে বাসা বাঁধিয়াছিল—শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ ও কালবৈশাখীর রুদ্রগর্জ্জনেও ত তাহা কোন দিন ক্ষান্ত হয় নাই—দিনের পর দিন লাঞ্ছনা ও দৈন্যের মধ্যে যেন নূতন জীবনের স্পন্দন পাইয়াছি। আজ কারাগারের রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া কেবলই ভাবিতেছি—সে চেতনা আবার ফিরিয়া আসিবে কি?

নিরুদ্দেশ-পথের যাত্রী—আমাদের একটি দিনের কথা এখনও বার বার মনে উঁকি মারিতেছে।

শ্রাবণ মাস। অরুণ ও আমার বাল্যসুহৃদ অসীমকে লইয়া চলিলাম নৌকাযোগে। যাইব কোথায়—তখনও জানা নাই। অজানা পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া থামিলাম। দিন অবসান প্রায়। দেখিলাম ক্ষেতে কৃষকের দল সারি বাঁধিয়া জারি গান গাহিতেছে—আর পাটের আঁটি বাঁধিয়া বাঁধিয়া এ-পাশ হইতে ও-পাশে ফেলিতেছে। তাহাদের গানের কথা ও সুর আজ আমার মনে অস্পষ্ট ঠেকিতেছে—তাহার ভাব এই: "কোন্ সুদূরে আমার বন্ধু তুমি যাও, জানি না; যেখানেই যাও আমাকে স্মরণ রাখিয়ো—হে আমার বন্ধু।" তাহাদের গান অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু কৈ তেমন ত ছায়াপাত করে নাই মনে? আজ এ-গান এত মধুর এত সুন্দর লাগিতেছে কেন? অসীম বলিল,—চল, আর দেরি করিলে চলিবে না। অনেক দূর যাইতে হইবে—মেঘনা পাড়ি দিয়া ও-পারে পড়িতে হইবে। শ্রাবণের নদী; রাত্রিতে ঝড় হইতে পারে। আমিও বলিলাম—চল। চলিলাম, কিন্তু তখনও পিছন হইতে সে গানের রেশ বার বার বাতাসে ঝংকৃত হইয়া আমাদের কানে আসিতেছে—"কোন্ সুদূরে যাওরে বন্ধু........" অসীম মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিল।

অসীম ভাবিতেছে—ভাবিতেছে এই বলিয়া, এই যে চলার-পথে অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া চলিয়াছি ইহার শেষ কোথায়? যে কোন মুহূর্ত্তে সরকারের রুদ্ররোষ আমাদের উপর পতিত হইবে। হয়ত বা কেহ ইহ জন্মের জন্য এ-জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। নিয়তির কুটিল চক্র কখন কাহাকে কোথায় লইয়া যায় কে জানে? এমনি করিয়াই ত কত বন্ধুকে হারাইয়াছি। আজও বিপদ মাথায় করিয়া চলিলাম।

কতদূর যাইতে না যাইতে একটি পুলিশ-ফাঁড়ি দেখিতে পাইলাম। রাস্তার সম্মুখেই একটা ছোট্ট ঘর—ঘরের বারান্দায় দারোগাবাবুটি তাঁহার স্বাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গল্প-গুজবে দিনান্তের অবসর বিনোদন করিতেছেন। হাতের কাছেই সযত্নে রক্ষিত হুঁকাটি মজলিসের অপূর্ণ অংশটি পূর্ণ করিতেছিল। একজন ক্ষীণাঙ্গ প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতেই আমার বুকের রক্ত টগবগ করিয়া উঠিল। অসীম আস্তে বলিল—উপায়? বলিলাম—উপায় আর কি?

হঠাৎ বুদ্ধি খেলিল। অসীম তাড়াতাড়ি তাহার টুপিটা মাথায় পরিয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে 'কোর-আন' হইতে মহম্মদের মদিনা যাত্রা অংশটি সুর তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। অরুণ (মাঝি) আপন মনে নৌকা চালাইয়া যাইতে লাগিল। আমি নৌকার আগে বসিয়া হুঁকোটা হাতে করিয়া মাঝিকে পথের নির্দেশ দিতেছি। ফাঁড়ির সম্মুখে আসিতেই সেই ক্ষীণাঙ্গ ভদ্রলোকটি আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা যাবে গো মাঝি? মাঝি উত্তর দিল ওপারে। চারিটার ট্রেন ফেল হইয়াছে বাবু, রাত্রিও প্রায় ঘনাইয়া আসিল এ বিদেশে বিভূঁয়ে কোথায়ই-বা যাই—দিবেন বাবু এক ছিলিম তামাক, খাইয়া প্রাণটা বাঁচাই। আমি ধমক দিয়া বলিলাম—বেটা চল্ তোকে "ইছাপুর"-এর হাটে তামাক কিনিয়া দিব। সন্ধ্যার আগে 'ইছাপুর' পৌঁছিতে হইবে নইলে তোর রক্ষা নাই। মাঝি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া রহিল—ভদ্রলোক কি মনে করিল জানি না—তবে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আনন্দে বুক ভরপুর হইয়া উঠিল,

মাঝি গুন্ গুন্ করিয়া আপন মনে গান গাহিতে লাগিল—আর দ্বিগুণ বেগে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইল কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা মনের কোণে ছায়াপাত করে নাই—অথচ তখনও একটি পয়সা সঙ্গে নাই। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিল। মাঝির শরীর হইতে অবিরত ঘর্ম বাহির হইতেছে, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সন্ধ্যার পূর্বে যে তাহাকে 'ইছাপুর' পৌঁছিতেই হইবে। সে প্রাণ উজাড় করিয়া গান ধরিল "ও-পারেতে বন্ধুর বাড়ী যায়গো তরী বাইয়া—আ-আ" কি দারুণ কর্তব্যবোধ এই মাঝির!

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, অদূরের সড়ক দিয়া চাষা-ভুষা দিন-মজুরেরা কর্মাবসানে ঘরে ফিরিতেছে। পরিধানে শত ছিন্ন গামছা। জলে ভিজিয়া, রোদে তাতিয়া অবসন্ন দেহ-মন লইয়া চলিয়াছে—হয়ত বা সে-দিনের রোজগার তাহার দুই আনা! ইহার দ্বারা সে তাহার পরিবারের উদরপূর্তি করিবে রোগের ঔষধ, পরিধানের কাপড়; হায়রে বাঙলার কৃষককুল! অসীম ক্ষুধা ও পথশ্রান্তিতে নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিল। কতক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পর আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী........................."

নিশ্চল নিস্পন্দের মত অসীমের আবৃত্তি শুনিতে লাগিলাম। সে প্রাণ খুলিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—

"ঊর্দ্ধে আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া—
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি........"

আর শুনিতে পাইলাম না। অবসন্ন দেহ-মন ঘুমে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

* * *

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, জানি না। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম মাঝি ডাকিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। অসীম নিশ্চিন্তে তখনও ঘুমাইতেছে। শুনা গেল অদূরে মেঘনার গুরু গুরু মেঘনাদ। ঢেউয়ের তাণ্ডব নর্তনে দিগ্‌দিগন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। কলকল্লোলের ধ্বনি সে-দিন কিন্তু তত মধুর লাগিল না। অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় গায়ের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল। মাঝি চতুর লোক; বলিল—রক্ষা নাই, রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুর্ভেদ্য অন্ধকার! মাঝে মাঝে অতি দূরে দু'একখানা ডিঙ্গী নৌকার বাতি মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঢেউয়ের তালে ডিঙ্গী একবার নামিতেছে আর একবার উঠিতেছে। অসীমকে ডাকিয়া তুলিলাম। অরুণ বলিল, শক্ত করিয়া হাল ধর। এ-পাকটা কোন রকমে কাটাইতে পারিলেই রক্ষা—নাইলে হয়তো এইখানেই সব শেষ!

আমি হাল ধরিয়া বসিলাম। শত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া নদী আমাদের নৌকাখানাকে উল্টাইয়া দিল। অসীম সন্তরণে অপটু। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে উঠিতে পারিল না। আমরা জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনপ্রকারে তীরে পৌঁছিলাম। কিন্তু অসীম?

যেন পুষ্পকে নিশীথিনী নিমীলিত করিয়া যাইতেছে। নদীর ধ্বংস-লীলাও চলিয়াছে অবিরাম গতিতে। অসীম চলিয়া গেল—চলিয়া গেল শুধু একটি কথা বলিয়া—"জীবনের সে-সাধ পূর্ণ হইল না ভাই—"। তাহার ক্ষীণ স্বর ঢেউয়ের তালে তালে কোথায় কোন সুদূরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল কে জানে?

আজ থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মনে পড়িতেছে সে স্মৃতি বিস্মৃত দিনের কথাগুলি। আজ কারাগৃহের রুদ্ধ-কক্ষে বসিয়া মনে পড়িতেছে একে একে তাহাদের কথা—কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি, কখনও স্টেশনের কুলী, কখনও নৌকার মাঝি, কখনও পাল্কীর বেহারা সাজিয়া।

বিগত দিনের সে সুখ-স্মৃতি এখনও যখন মনে পড়ে, তখন আনন্দে বুক ভরিয়া উঠে। অসীমকে হারাইয়াছি দুঃখ নাই, একদিন সবাইকে হারাইতে হইবে। চলতি পথে হঠাৎ কার বীণার তার ছিঁড়িয়া যায় কে জানে? কিন্তু অসীম আমার মনের কোণে যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাহার সে দিনের সে আবৃত্তি:—

"নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি........" এখনও আমার মনে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

* * * * *

এমনি করিয়া বছরের পর বছর চলিয়া যাইতেছে, কত শ্রাবণ রজনী কাটিয়া গেল এই জেলের গরাদের ভিতর, আরও কত দীর্ঘদিন হয়ত এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইবে।

* * * * *

কারাগৃহের দীপালোক অনেকক্ষণ হয় নিবিয়া গিয়াছে—ঝিল্লীর রব চলিতেছে অবিশ্রান্ত গতিতে। বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণের নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রহরী তেমনি ডাকিয়া উঠিল—"সব ঠিক হো..........."

বিহারে বাঙালী ও বেঙ্গলী এসোসিয়েশন

শ্রীশিবদাস মিত্র

বিহার বাঙলা হইতে স্বতন্ত্র হওয়া অবধি বিহারবাসী বাঙালীদের নানা দিক হইতে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। মানভূম প্রভৃতি অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশেরই অংশ, অধিবাসীরা বাঙলাভাষী। এই অঞ্চলগুলি বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যখন করাই হইল, তখন অধিবাসীদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার যাহাই হউক না কেন, তাহাদের বিহারের অধিবাসী বলিয়াই গণ্য করা উচিৎ। কিন্তু তাহা হয় নাই। চাকুরী, শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে তাহাদের নিকট 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' দাবী করা হয়। অর্থাৎ তাহাদের সহিত বিদেশীবৎ আচরণ করা হয়। পুরুষানুক্রমে যাহারা ঐ স্থানের অধিবাসী, প্রকৃতি যাহাদের ঐ মাটির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত করিয়াছে, মানুষের বিধানে তাহারাই 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইল।

বিহার প্রদেশের অন্যান্য অংশে যে সকল বাঙালী আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ১৯১১ সালের পূর্ব্বে অর্থাৎ বিহার যখন বাঙলার অংশ ছিল, তখন নানা কার্য্য উপলক্ষে ঐ প্রদেশেরই এক অংশ হইতে অপর অংশে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তখন তাঁহারা ভাবেন নাই, তাঁহারা একদিন বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তাঁহাদের বংশধরেরা যাঁহাদের জন্ম, শিক্ষা ও স্থায়ী বাসভূমি এই বিহার তাঁহারাও একরূপে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়াছেন।

কেন এইরূপ হইল? কারণ, আমরা আমাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা, সংস্কৃতি ত্যাগ করিতে পারি না। বাঙালী যেখানেই যায়, সঙ্গে লইয়া যায় তাহার দুর্গাবাড়ী বা ক্লাব এবং বাঙলা স্কুল। সহজাত সংস্কারবশেই হউক বা practical sense-এর অভাবেই হউক, বাঙালী নিজের আচার-ব্যবহার ও সামাজিকতা আঁকড়াইয়া থাকে। নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাহার এক সজাগ দরদ আছে। বোধ হয় নিজের সাহিত্য, নিজের সংস্কৃতি কাহারও অপেক্ষা হীন নয় বলিয়াই বাঙালী সহজে অপরের কিছু গ্রহণ করিতে চায় না। বিহারে বাঙালী ছাড়া অন্যান্য প্রদেশেরও লোক বহু আছে। কিন্তু তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য লইয়া বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাহারা বিহারীদের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। বিহারীরাও তাহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না এবং ডোমিসাইল প্রশ্ন তাহাদের সম্বন্ধে ওঠে না। যত সমস্যা ও ভাবনা-ভাবনা বাঙালীদের লইয়া। কিন্তু একটা ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন আমরা তাহাদের করিতে পারি। তোমাদের আমাদের মধ্যে ভাষার প্রভেদ, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতি-নীতির বৈষম্য যাহাই থাকুক না কেন, তাহার জন্য আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯১১ সাল হইতেই বিহারে বাঙালী-দের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। উদারতাবশতই হউক বা নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীনতাবশতই হউক, বাঙালী এতদিন এই সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জাতি ... সংবে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের প্রতিবেশী ও মিত্র বাঙালীদের প্রতি এইরূপ আচরণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন শিশুর সহিত তুলনা করিয়া বাঙালী স্নেহ-মিশ্রিত ঔদাস্যভরে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, ভাবিয়াছিল, নূতন অধিকার লাভের মোহ কাটিয়া গেলে, দায়িত্ববোধ জন্মিবে এবং তাহারা নিজেরাই এই আচরণের সংশোধন করিবে।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে, প্রদেশে প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসন (?) প্রতিষ্ঠিত হইল। বিহার প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল। ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের আমলে এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক ভেদ-বুদ্ধির অবসান ঘটিবে, এই আশাই বাঙালী করিয়াছিল। কিন্তু অবসান ঘটানর চেষ্টা দূরে থাক, বাঙালীকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। কুখ্যাত 'ব্রেট সার্কুলার' এবং অন্যান্য সরকারী ইস্তাহার জারী করিয়া বাঙালী যাহাতে আর সরকারী বা আধা-সরকারী চাকুরী না পায়, তাহার ব্যবস্থা কায়েমী করা হইল। সংবাদপত্র মারফৎ ও অন্যান্য প্রকারে বাঙালীর বিরুদ্ধে আন্দোলন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া গেল।

বিহারবাসী বাঙালীর আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলিল না। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নেতৃত্বে বিহারে বেঙ্গলী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইল। এই এসোসিয়েশনকে কেন্দ্র করিয়া আজ বিহারবাসী বাঙালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। বিহারে সর্বত্র এই এসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আন্দোলনের ফলে, প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি বাঙালী-বিহারী সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত এক award দিয়াছেন। ইহার দ্বারা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রথা রদের সুপারিশ করা হইয়াছে। বিহারে জন্ম অথবা দশ বৎসর স্থায়ীভাবে বাস, ঐ প্রদেশে ডোমিসাইল হইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইবে। চাকুরী সম্বন্ধে কিন্তু বর্ত্তমান সরকারী নীতিকেই প্রকারান্তরে বজায় রাখা হইয়াছে। যদিও বলা হইয়াছে,—

"The Committee wish to discourage all separatist tendencies and narrow provincialism. No distinction should be made between Beharees properly so called and the Bengalee-speaking residents of the province born or domiciled there. The term should in fact include both these classes and in matter of service as well as other matters identical treatment should be given to both."

তথাপি চাকুরী সম্বন্ধে কতকগুলি রক্ষাকবচ রাখা হইয়াছে। যথাঃ—

(a) A fair representation of the various communities in the province.

(b) Encouragement as far as possible of the backward classes and groups, so that they might develop and play their full part in the national

(c) Preferential treatment to the people of the province.

জাতীয় কংগ্রেসের, এইরূপ সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ভিত্তিতে চাকুরী বন্টনের সুপারিশ, তাহার আদর্শ-বিরোধী এবং যে-কোন জাতীয়তাবাদী লোকের মনকে পীড়িত করে।

চাকুরী সম্বন্ধে যাহা হইল, তাহা ত হইলই, কিন্তু বাঙালী ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে, তাহাতে আরও শঙ্কিত হইতে হয়ঃ—

"When accommodation is limited in educational institutions, places may be reserved for different communities in the province."

বিহারে বাঙালী শিক্ষার বিশেষ [illegible]। বাঙালীকে পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তাহাদের [illegible]-সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষায়তনগুলিতে তাহাদের জন্য অত্যন্ত অল্পসংখ্যক স্থান নির্দ্দিষ্ট করার অর্থ, বিহারে বাঙালীর শিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ বা রুদ্ধ করা। শিক্ষালাভের অধিকার প্রত্যেক প্রজার আছে। এইরূপ ব্যবস্থা উদার নীতির পরিচায়ক নয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বাঙালী ছেলেদের শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, এই প্রশ্নকেও কংগ্রেস award-এ সযত্নে এড়ান হইয়াছে।

"In Hindustani speaking areas education in primary schools should be given in Hindustani but if there is a reasonable number of Bengali-speaking students they should be taught in Bengali. In Secondary Schools education should be given through the medium of the language of the province but the State should provide for education through the medium of any other language, where there is a demand for it on the part of the residents of any district where this other language is spoken."

কতগুলি ছাত্র হইলে 'reasonable number' বলা হইবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে 'demand' গ্রাহ্য হইবে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এই সকল বিবেচনা করিলে, কংগ্রেস রায় বা awardকে সন্তোষজনক বলা চলে না। তথাপি বিহার গবর্ণমেণ্ট যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে ইহার প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বাঙালীর প্রতি অন্যায়ের কিছু প্রতিকার হইত। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে বিহার পরিষদে রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, কংগ্রেসের রায় এখনও তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে ও গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। কবে হইবেন, তাহাও বলেন নাই।

কংগ্রেস সিদ্ধান্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল মানিয়া লইবেন ইহাই সকলে বুঝিয়াছিল। এখন কি অন্যরূপ বুঝিতে হইবে?

ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রথা এখনও বলবৎ আছে। উক্ত সার্টিফিকেট না পাইলে বাঙালী ছাত্রের পক্ষে বহু বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিশেষত ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি স্কুল ও কলেজে কেবলমাত্র ডোমিসাইলড্ বাঙালী-দের জন্য অল্প কয়েকটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত অনুসারে যাহারা ডোমিসাইলড্ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, বর্ত্তমান domicile rules অনুযায়ী তাহারা সার্টিফিকেট পাইবার অধিকারী নয়। অতএব অন্তত আর এক বৎসর এই শ্রেণীর ছাত্ররা নিতান্ত অন্যায়ভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ হারাইল। অনেকক্ষেত্রে ডোমিসাইলড্ না হইলে বাঙালী ছাত্র স্কলারসিপ্ পায় না। অন্তত কিছু সংখ্যক ছাত্র, প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইয়াও, কোন ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের অভাবে তাহা হইতে বঞ্চিত হইল। অনেকে, সকল প্রকারে উপযুক্ত হইয়াও কেবল সার্টিফিকেটের অভাবে কোন চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পাইল না। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে অন্তত এই সকল অন্যায়ের প্রতিকার হইত।

বিহারী বাঙালী সমস্যার স্বরূপ ও তৎসম্পর্কে কংগ্রেসী ও সরকারী নীতির বিষয় এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। এইবার এ বিষয় আমাদের অর্থাৎ বিহারে বাঙালীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলন দ্বারা আমাদের প্রতি কৃত অন্যায়ের কিছু প্রতিকার হইতে পারে বটে, কিন্তু কেবল ইহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করিতে হইবে। বাঙালী-বিহারী সমস্যার চরম অবস্থায় বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের জন্ম হইয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিহারে ছোট বড় সকল বাঙালীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সঙ্ঘ-শক্তি বলেই আমরা সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হইব। অতএব প্রথম কার্য্য হইল ইহাই। এখনও অনেকে বিহারী বিদ্বেষ অর্জ্জনের ভয়ে বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখিতে চান না। তাঁহাদের এই ভুল ভাঙ্গাতে হইবে। বিদ্বেষ যতদূর গড়াইবার গড়াইয়াছে। বরঞ্চ এসোসিয়েশনের উদার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কার্য্য-পদ্ধতির দ্বারা আমরা এইরূপ মনোভাব দূর করিবার প্রয়াস পাইব। তাহা ছাড়া আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। চক্ষু বুজিয়া থাকিলে বিপদ এড়ান যায় না। চক্ষুষ্মানের মত তাহার সম্মুখীন হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব কোন অজুহাতেই কোন বাঙালীর বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের বাহিরে থাকা উচিত নয়।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, এসোসিয়েশনের মুখপত্র বিহার হেরাল্ডের (Behar Herald) গ্রাহক হওয়া। কারণ আমাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন ও সংগঠন কার্য্য চলিবে ইহার মারফৎ। অনেকে বিহার হেরাল্ডের গ্রাহক হইবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া [illegible] সেবার হেরাল্ড সাপ্তাহিক ও সম্প্রদায় বিশেষের পত্রিকা কেবল [illegible] পড়িয়া সংবাদপত্র

পাঠের কার্য্য চলে না। সুতরাং বেহার হেরাল্ড লইলে, আরও একটি দৈনিক কাগজ লইতে হইবে। দুইটি পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ সাধ্যাতীত! বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে, এই যুক্তি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু তথাপি আমাদের বুঝিতে হইবে, যতদিন এই পত্রিকা স্বাবলম্বী না হয়, ততদিন ইহাকে চালানর দায়িত্ব আমাদেরই। কারণ মুখ্যত, আমাদের প্রয়োজন সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। অবশ্য ইহার পরিচালকগণকে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে ইহা একটি উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্রে পরিণত হয় এবং সকল প্রকার পাঠককে তৃপ্তিদান করিতে পারে। তাহা হইলেই ক্রমশ বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশে ইহার বহু গ্রাহক পাওয়া যাইবে।

এইবার আমরা বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের গঠনমূলক কার্য্যসমূহের আলোচনা করিব।

(১) বেকার সমস্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

বেকার সমস্যা বর্ত্তমান যুগে সকল সমাজেই বিশেষ ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান। চাকুরীর দ্বারা তাহার সমাধান সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিহার সরকারের অধীন সমস্ত চাকুরীও যদি বাঙালীকে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহাদের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। অতএব দুই চারিটা চাকুরীর জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া শক্তিক্ষয় ও বিদ্বেষ কুড়াইবার প্রয়োজন কি? ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় বেকার সমস্যা নিবারণের ইহাই একমাত্র পথ। বিহারে শিল্পোন্নতির যথেষ্ট অবকাশ আছে। কাঁচামালের অভাব নাই, তৈরী মালের বাজার খুঁজিতে ক্লেশ পাইতে হইবে না। বাঙালী মস্তিষ্কবান জাতি, শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে শিক্ষিত বাঙালী যুবক এই পথ গ্রহণ করিবে এবং অচিরে বিহারে বাঙালীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশে সেরূপ অবস্থা এখনও আসে নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরই সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিহারে একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) স্থাপনের পরিকল্পনা বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের ছিল। এইরূপ ব্যাঙ্কের একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ছোট খাট ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সহজেই গড়িয়া উঠিবে। বিহারে কিরূপ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙালী কর্ত্তৃক পরিচালিত, সে বিষয় তদন্ত করিবার নিমিত্ত বেঙ্গলী এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ তদন্তের প্রয়োজন আছে এবং আরও প্রয়োজন হাতে কলমে কাজ আরম্ভ। দেরী না করিয়া, এ বিষয় কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া এসোসিয়েশনের বিশেষ উচিত। বিহারকে industrialize করিবার প্রচুর সুযোগ এখনও আছে। সেই সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহার দ্বারা শুধু আমাদেরই লাভ হইবে না, পরন্তু সেই সঙ্গে এই প্রদেশবাসীরাও লাভবান হইবে। ইহা দ্বারা তাহাদের মনের বিরুদ্ধ ধারণা দূর হইবে এবং পুনরায় আমাদের মঙ্গলকামী বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে, এই প্রদেশে আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা পুনরায় স্বীকৃত হইবে।

(২) শিক্ষা সমস্যা

প্রথমে বাঙালী যাহারা এই প্রদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ছেলে-মেয়ের শিক্ষা-সমস্যার কথা ভাবিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। বহু স্থানে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বাঙলা স্কুলসমূহ বর্ত্তমান এবং সেগুলি এখন পর্য্যন্ত বাঙালী ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও বিহারে আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান এই পথেই হইতে পারে। বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের কর্ত্তব্য এই বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য ও রক্ষা করা এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করা। অনেকস্থলে চেষ্টা করিলে সরকারী সাহায্যও পাওয়া যাইবে। এই প্রকারে সহজেই এই সমস্যার সমাধান হইবে।

(৩) বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাঙলা ভাষায় শিক্ষা-প্রদান সমস্যা

শুনিতে অদ্ভুত হইলেও, সম্প্রতি এই সমস্যা বিশেষ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। মানভূমের শতকরা সত্তরজন অধিবাসী বাঙলা ভাষী। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের নামে, বিহার গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা-ভাষীদের মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রচলনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে ও রাষ্ট্রভাষা বলিয়া কেহ হিন্দি শিখিতে চাহিলে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দি ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের অন্যায় অসঙ্গত ব্যবস্থার প্রতিরোধ বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের কর্ত্তব্য। সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া অবিলম্বে ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে, এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে, বিহারে অনুন্নত বাঙালী সম্প্রদায়ের শিক্ষার ভার বেঙ্গলী এসোসিয়েশনকে গ্রহণ করিতে হইবে;

(৪) বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ক্লাব, লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

বিহারের যেখানেই কয়েক ঘর বাঙালী আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেইখানেই দুর্গাবাড়ী বা ক্লাব ও লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর সামাজিক জীবন এখনও অব্যাহত আছে। অনেকস্থানে সহানুভূতি ও চেষ্টার অভাবে এইরূপ প্রতিষ্ঠান মৃতকল্প হইয়া আছে। এইগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার এবং বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের এ বিষয় তৎপর হওয়া উচিত। বাঙলার বাহিরে থাকিয়া বাঙালীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা বজায়

(শেষাংশ ৬৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(২০)

লীলার সেবায় মাতৃত্বের স্পর্শ পাইয়া সতীশ এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে, সন্তানের জননী না হইয়াও এই বয়সে এই নারী মাতৃদরদের অধিকারিণী হইল কেমন করিয়া। বহুবার বহুরূপে সতীশ লীলাকে দেখিতে পাইয়াছে সত্য, কিন্তু লীলার এই মাতৃরূপ সতীশের চক্ষে আর কোন দিন প্রতিভাত হয় নাই। কথায় এই নারী প্রগল্‌ভা; আলাপে সঙ্কোচশূন্যা, ব্যবহারে, চালচলনে নিতান্ত আধুনিকা। আবার সেবা-যত্নে অকুণ্ঠিতা। লীলার বিভিন্ন রূপ সতীশকে মুগ্ধ করিয়াছে। আজ লীলার এই জননী মূর্ত্তি সতীশকে আরও বেশী অভিভূত করিয়া ফেলিল। পতিব্রতা পত্নীরূপে নরেন্দ্রকে সেবা করিতে সতীশ দেখিয়াছিল, কিন্তু নিজের বেলায় সতীশ দেখিতে পাইল —সেবা, ধর্ম্মে স্ত্রীর চেয়ে মায়ের আসন উপরে।

সতীশের অসুখ সত্য সত্যই সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করে নাই। সামান্য রকমের গুটিকা উঠিয়াই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল। এবং দুই চারিটি পাকিয়া বাকীগুলি সব দেহেই মিলাইয়া গিয়াছিল। সপ্তাহ খানেক শয্যাগত থাকিয়া সতীশ সারিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল লীলার মাতৃরূপ বদলাইয়া গিয়াছে, আবার সে প্রগল্‌ভা বান্ধবীর মূর্ত্তি ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাহিরে যাইবার মত সুস্থতা লাভ করিয়া সতীশ বাড়ী ফিরিবার জন্য সকলের নিকট বিদায় লইয়া লীলার কাছে বিদায় লইতে গেল।

সতীশের এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইবার ব্যগ্রতা দেখিয়া লীলা কহিল, "লছমিয়া হয়ত এরই মধ্যে কদিন এসে ফিরে গেছে। তাকে আর বৃথা ভাবনার মধ্যে ফেলে লাভ কি।"

অসুখের পর হইতে সতীশ আর লীলাকে ঠিক ঠিক বান্ধবীর আসনে বসাইতে পারিতেছিল না। সতীশকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নরেন্দ্র লীলাকে কহিল, "ওকে কি বলছ, লছমিয়া কে?"

লীলা বিম্বাধরে মৃদু হাসি ফুটাইয়া কহিল, "সে এক অসামান্যা রূপসী। ঠাকুরপোর এক পরম ভক্ত। তুমি দেখলে চোখ ফিরাতে পারবে না। ঠাট্টা নয়, সত্যি সুন্দরী। না ঠাকুরপো, সুন্দরী নয়। যেন কবিদের কল্পলোকের মানসী প্রতিমা! তোমাদের সংস্কৃতের কবিদের বর্ণনায়—তন্বী, শ্যামা, মধ্যক্ষীণা—"

মুহূর্ত্তের জন্য মৌন থাকিয়া লীলা যেন কি ভাবিল। তার রহস্যোজ্জ্বল মুখ সহসা কঠোর গম্ভীর হইয়া উঠিল। সতীশের পানে চাহিয়া রীতিমত আদেশের সুরে ডাকিল, "ঠাকুরপো।"

ভীত নয়নে সতীশ মুখ তুলিয়া চাহিল। লীলা কহিল, "লছমিয়াদের পাড়ায় আর যাবেন না। নিস্বার্থ পরোপকারের পেছনে লালসাও উঁকি মারতে পারে।"

পরক্ষণে একটু থামিয়া লীলা অপূর্ব মাধুর্যে হাসিয়া উঠিল। মুখের কঠোর গাম্ভীর্য সরিয়া গেল, চক্ষে লীলা-চঞ্চল দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। মুহূর্ত্তের গুমট ভাবটি হাল্কা হাসিতে দূর করিয়া দিয়া নরেন্দ্রকে বলিল, "তুমি এ হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছ। তোমার বন্ধুর কীর্ত্তির ত সীমা-পরিসীমা নেই। এই যেদিন ঠাকুরপোকে আনতে যাই, গাড়ীতে ওঠবার বেলায় দেখি একটি সতের আঠার বছরের মেয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। বন্ধু বললেন নাম তার লছমিয়া; মেথরদের মেয়ে। বন্ধুর কাছে কি দরকারে এসেছিল। চেয়ে দেখলাম পরমা সুন্দরী। মেথরের ঘরেও অমন মেয়ে জন্মায়! স্বামী নাকি তার গেল বছর মারা গেছে!"

পুনরায় সতীশের পানে চাহিয়া কহিল, "করুণা কিন্তু এমনি করেই মানুষকে প্রীতির কোঠায় নামিয়ে দেয়—কৃতজ্ঞতা রূপ বদলিয়ে ধীরে ধীরে ভালবাসা হ'য়ে দাঁড়ায়। আর নাই বা গেলেন ওধারে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য ত কম নয়! ধ্যান-ধারণায় মাটির পুতুলেও যদি দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, জীবন্ত মানুষের প্রাণে প্রাণের ডাক পৌঁছুবে না! হৃদয় ধর্ম্মের কাছে ত স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নেই! কেমন, আর যাবেন না ত লছমিয়ার কাছে?"

সতীশ অবনত মুখে ছোট একটি 'না' বলিয়াই তার বক্তব্য শেষ করিল দেখিয়া লীলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল "খুবই কি লাগল ঠাকুরপো?"

এইবার সতীশ মুখ তুলিয়া লীলার পানে চাহিয়া কহিল, "লাগে নি বৌদি, আপনি ভালই করলেন। আমি হয়ত বুঝি নি।"

বলিয়াই হঠাৎ সতীশ আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল। লীলার দিকে অগ্রসর হইয়া লীলার পায়ের ধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই বিদ্যুৎবেগে লীলা পশ্চাতে হটিয়া আসিল। বলিল, "ছিঃ ঠাকুরপো, আপনি বয়সে আমার কত বড়। আপনি ওঁর বন্ধু। আপনিই আমার নমস্য, আমি আপনার নয়।"

"বয়সে ছোট হ'লেও আপনার শ্রেণীর মেয়েরা পুরুষ জাতিরই প্রণম্য" বলিয়াই সতীশ হাতজোড় করিয়া লীলাকে নমস্কার করিল।

লীলা প্রতিনমস্কার করিয়া হাসিমুখে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তোমার বন্ধুর পাগলামি ত দেখলে! অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নয়?"

লীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সতীশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী পৌঁছিয়া দারোয়ান খড়গ সিংয়ের নিকট অনুসন্ধান লইয়া জানিল, একটি স্ত্রীলোক প্রতিদিনই বাবুর সংবাদ লইতে আসিত। আবার আসিলে তাহাকে যেন খবর দেওয়া হয়—দারোয়ানকে এই উপদেশ দিয়া সতীশ উপরে উঠিয়া গেল।

এই স্ত্রীলোকটি যে কে তাহা বুঝিতে সতীশের বিলম্ব হইল না। কিন্তু কেন আসে, কি চায় এই লছমিয়া তার

কাছে ? এ অনুরাগ তার কোন্ কাজে লাগিবে যার জন্য সে এমন করিয়া বৃথাই ঘুরিয়া মরিতেছে! এবার আসিলে সে এমন কথা শুনাইয়া দিবে যে আর কোন দিন সে এ-মুখো না হয়। কিন্তু তবুও যেন কোথায় একটু কি বিঁধিতেছিল, কিসে যেন মনটাকে অকারণে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল।

নিত্যকার মত লছমিয়া আসিলে দারোয়ান তাহাকে বসিতে বলিয়া সতীশকে সংবাদ পাঠাইল যে, সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়াছে।

সতীশ নীচে নামিয়া দেখিল, সর্বাঙ্গ একটা মোটা চাদরে আবৃত করিয়া লছমিয়া বৈঠকখানার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

সতীশ নিকটে আসিলে লছমিয়া তাহাকে সেলাম করিয়া কহিল, "অসুখ ভাল হয়েছে বাবু ?"

সতীশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁরে, লছমিয়া তুই নাকি রোজ রোজ আমার খবর নিতে আসছিস্ ?"

লছমিয়ার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। আরক্ত মুখ লুকাইতে যাইয়া মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মনে মনে ভাবিল কি সুন্দর এই লছমিয়া! বিধাতার কোন্ অভিশাপ বহিয়া সে সমাজের এমন নিম্নস্তরে আসিয়া জন্মিয়াছে। এ ফুল যে ধনিকের ফুলদানীতেই শোভা পাইবার যোগ্য, রাজোদ্যানে ফুটিলেও মানাইত।

এইবার সতীশ যেন বুঝিতে পারিল নারী-রূপের মাদকতা কোথায় এবং তার আকর্ষণের শক্তি কত বেশী। রূপ ত সে কতই দেখিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া সমস্ত মন প্রাণকে মোহিত করিয়া প্রবল অনুরাগ জাগাইবার মত রূপ ত সে আর একটিও দেখে নাই। অনিন্দ্য সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী তাকে চমকিত করিয়াছে—কই হৃদয় ত এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। এ রূপে চোখ ঝলসিয়া যায় না স্নিগ্ধতায় তৃপ্ত হয়—আরও দেখিবার শক্তি লাভ করে। দেখিতে দেখিতে বুক কাঁপিয়া উঠে বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য আর সে স্পন্দনও তৃপ্তিকর। ইহা রত্নের মতই গর্বের জিনিষ, কিন্তু বাক্সে তুলিয়া রাখিবার—বিশ্ববিহীন বিপিনে আবরিত করিয়া রাখিবার বস্তু নয়—নিত্য-পূজার পুণ্য প্রতিমা।

না এ আকর্ষণ হইতে তাহাকে দূরে থাকিতেই হইবে। আগুন লইয়া খেলিয়া এতকাল হাত পোড়ে নাই বলিয়া কোন কালেই পুড়িবে না এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু তবুও আহা বেচারী—নির্মলা কমল কলিকা!

স্বরে জোর করিয়া রূঢ়তা আনিয়া সতীশ কহিল,—"তুই না সেদিন আমায় বল্‌লি, তোর সাম্‌নে আমি আর না যাই—আর তুই কোন্ সাহসে রোজ আমায় দেখ্‌তে আসিস্। তোর মতলব কিরে লছমিয়া ?"

লছমিয়ার পায়ের নীচে মাটি কাঁপিতেছিল। বাবুর নিকট হইতে এ ব্যবহার সে প্রত্যাশা করিতে পারে নাই। বাবু যে দেবতার মাফিক ভাল মানুষ—এত দয়ার শরীর!

সতীশ বলিয়া যাইতে লাগিল, "কি চাস্ তুই আমার কাছে? আমাকে ভালবেসে তোর কি লাভ—আমি বামুনের ছেলে তা ভুলে যাস কেন!"

লছমিয়া সহসা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর দেবতাকে মানুষ ভালবাসে তবে কেনরে বাবু!"

সতীশ সে সুরে—সে কথায়, সচকিত দৃষ্টি মেলিয়া অপলকে চাহিয়া রহিল মেয়েটির দিকে। ভাল লাগে বলিয়াই যে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না—লাভ-লোকসানের হিসাব খতাইয়া যে অনুরাগ জন্মে না, এ জ্ঞান—এ শিক্ষা এই নিরক্ষর তরুণী পাইল কোথায়!

সবিস্ময়ে সতীশ কহিল, "মানুষকে আর দেবতাকে ভালবাসা কি এক কথারে পাগ্‌লী! মানুষে চায় দেবতাকে 'দিলে'র ভিতর পেতে। তুই অত বুঝিস্ আর এটুকু বুঝতে পারিস নে লছমিয়া—মানুষেরা শুধু দিলই চায় , না—চায় আরও কিছু। তাদের এ চাওয়ার ভিতর থাকে নোংরামি। এই ধর—আমি দেখ্‌তে সুন্দর—জোয়ান আদমী। আমাকে তোর ভাল লাগে। আমি বুড়ো হলে চামড়া কুঁচকে কদাকার হলে তোর আর ভাল লাগ্‌বে না। তখন চোখ তুলেও তাকাবি নে।"

আবার লছমিয়ার গোলাপী গণ্ডে রক্তের ঢেউ খেলিয়া গেল, কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। ঈষৎ লজ্জা-পুলকে সতীশের পানে একবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। কি যেন বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। অক্ষরহীন হইলে কি হইবে, এ তরুণীরও তো প্রাণ বলিয়া জিনিষটি রহিয়াছে।

সতীশ আবার মুগ্ধ চক্ষে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুই আবার 'সাদি' কর্, সংসারী হ'। আমার পিছে পিছে মিছামিছি ঘুরে মরিস কেন? এইত রোজ আসিস্, কত লোকের নজরে হয়ত পড়েছিস। সেদিন বৌদিও তোকে দেখেছেন। এমন করে আমার পেছনে ঘুর্‌লে লোকে কি ভাব্‌বে বল দেখি! ওরে লছ্‌মিয়া, শুধু 'খোয়াব' নিয়ে কি জীবন কাটেরে! এ নেশা তোর একদিন ছুট্‌বে। কিন্তু তখন এ বয়স আর ফিরে পাবিনে। কেউ আর পুছ্‌বে না। মণ্টুয়া এত করে বল্‌ছে—তারই ঘর কর্‌গে, যা।"

"বাবু!" লছমিয়া সজল চোখে সতীশের পানে তাকাইল। বিশ্বের যত বেদনা—যত কাতরতা চোখের দৃষ্টিতে ফুটাইয়া তুলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর গায়ের চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে কহিল, "আর আমি আস্‌বেক নি বাবু। তুহার মান-ইজ্জত নষ্ট করবেক নি। তু ভদ্দর—বাম্মণ—তুহার মান বড়—আর জানিস্ বাবু, আমারও প্রাণ আছে—আমার কাছে প্রাণটাই বড়। এ বাত তু জানিয়ে রাখ বাবু, ফিন সাদি আমি করবেক না সারা জনমে, এ বাত সাঁচ্চা। আমার পাগলামি আমারই সাথকে রবে। তুহার মান লিয়ে তু থাক্‌বে। তু বাম্মণ—আমি মেথরাণী আছে। লেকিন পরাণমে দেবতা তো একই আছে। তুহারে আমি ভালবাসে, কলিজাকে কলিজা মাফিক পেয়ার করেক। যতদিন বাঁচ্‌বে পেয়ার করবে—দিলমে তুহারই মুরত রাখতে চাইবে। দিলমে তু রহিবি হামার দিল্‌কো রাজা—বাহার দুনিয়া কোই জান্‌বেক নি।"

"সেলাম বাবু" বলিয়া আর একবার সতীশের দিকে আকুতিপূর্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লছ্‌মিয়া চোখ মুছিল। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া তাকাইল। তার নয়নের বারি বাধা মানিতেছিল না। মুছিয়া মুছিয়াও চোখের ধারা রুদ্ধ করিতে পারিতেছিল না।

সতীশের চক্ষুও করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। লছ্‌মিয়ার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বাষ্পভারাকুল কণ্ঠে বলিল, "কাঁদিস্ কেন লছ্‌মিয়া, আমায় তুই ভুলে যা! এ তোর খোয়াব —যৌবনের স্বপ্ন। এ স্বপ্নও তোর একদিন ছুটবে—মোহও কাটবে।"

নিজের অজ্ঞাতসারেই সতীশের পদদ্বয় লছ্‌মিয়ার অতি নিকটে সরিয়া আসিয়াছিল। সচেতন হইয়া সতীশ একপদ পিছু হটিয়া আসিল।

চোখের জল মুছিয়া বিদ্রূপের স্বরে লছ্‌মিয়া কহিল, "এ আমার কালতু পেয়ার আছে, না? খোয়াব স্বপনা? তুহারে আমি চায়। তু জনম আমি মেহরাণী তু ভালবাসা জানে আমি জানে না আমি আঁখি তুলে ধরলে তুহার বে-ইজ্জত হোবে! আমি তো জানোয়ার!"

লছ্‌মিয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া আসিল, আর পেছন ফিরিয়া চাহিল না। সতীশ এক দৃষ্টে লছ্‌মিয়ার গমনপথে চাহিয়া থাকিয়া সহসা আসন ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। সদর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সতীশ দেখিল চোখ মুছিতে মুছিতে লছ্‌মিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। চলিয়াছে টলিতে টলিতে—প্রতি পদক্ষেপে সে যেন মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে।

সতীশ ডাকিল, "লছ্‌মিয়া ফিরে আয়—শুনে যা।"

লছ্‌মিয়া শুনিল না অথবা ইচ্ছা করিয়াই কানে তুলিল না। সতীশের ডাকে কোন সাড়া না দিয়া চলিতে লাগিল। দুর্দমনীয় হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সতীশ দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "ঐ মেয়েটিকে ফিরিয়ে আন্‌তে খড়্‌গ সিং।"

খড়্‌গ সিং তখন দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দিয়া বাম হাতের তালুতে চূণ সহযোগে খৈনী প্রস্তুত করিতেছিল। সুতরাং প্রস্তুত খৈনী মুখে পুরিয়া রাস্তায় বাহির হইতে তাহার বেশ কিছুক্ষণ দেরী হইল। অবশেষে সে যখন লাঠি হস্তে রাস্তায় পৌঁছিল, লছ্‌মিয়া তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। (ক্রমশ)

বিহারে বাঙালী ও বেঙ্গলী এসোসিয়েশন

(৬৫৭ পৃষ্ঠার পর)

রাখিতে হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ চাই। এইগুলির মধ্য দিয়াই নিজেদের মধ্যে এবং অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে।

শিক্ষিত মনের ক্ষুধা মিটাইতে এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য লাইব্রেরী অপরিহার্য। যেখানে আছে সেখানে ইহাকে রক্ষা করা এবং যেখানে নাই প্রয়োজনানুযায়ী সে-স্থানে স্থাপন করা বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের কর্ত্তব্য।

অনেক সমস্যাই আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। বহু শক্তি আজ আমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে। সেই সকল বিরুদ্ধ শক্তির চাপে আমরা পিষ্ট হইয়া যাইব, না সকল বাধা নিষেধ অতিক্রম করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইব? এই প্রশ্নের উত্তর আজ আমাদের দিতে হইবে—কথায় নয়, কাজে। আত্মচেষ্টায় অবিশ্বাস, আত্মসামর্থ্যে অবিশ্বাস, আত্মগৌরবে অনাসক্তি এবং ঐক্যের একান্ত অভাব, মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় বাঙালীর শক্তিকে ম্লান করিয়াছে। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিতের কৃত্রিম পার্থক্য ভুলিয়া আজ যদি সকল বাঙালী এক প্রাণ ও এক মন হইয়া দৃঢ় পদে কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে অচিরে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার কৃত্রিম কুজ্ঝটিকা জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া বাঙালীর গৌরব-রবি পুনরায় পরিপূর্ণ দীপ্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করিবে।

জীবজন্তুর দুর্নাম

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

প্রচলিত সকল বিশ্বাস ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিয়া বর্তমান যুগের প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কতকগুলি পশুপাখীর উপর আরোপিত হিংস্রতা বা ব্যাপক অনিষ্টকারিতা বিদূরিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

এই শ্রেণীর পশুপাখীর ভিতর প্রথমই নাম করিতে হয় শিকারী বাজপাখী, যাহাদের শ্যেন জাতীয় বলা হয়। ইউরোপ আমেরিকায় এই জাতীয় পাখী দেখিবামাত্র গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। যাহাতে শিকারিগণ, কানন-প্রহরী এবং কৃষকগণ আর প্রচলিত বিশ্বাসের বশে এই পাখীগুলিকে জীব-মাত্রেরই শত্রু বলিয়া নির্ধারণ করিয়া মারিয়া না ফেলে এই উদ্দেশ্যে পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে-ছেন। তাঁহারা জানেন অবশ্য একদিনের প্রচারকার্যেই এই প্রাচীন দৃঢ় বিশ্বাস পরিবর্তিত হইতে পারে না। তাই তাঁহারা শিকারী, কৃষক ও বনরক্ষকগণের মনোবৃত্তিকে নূতন মতবাদের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন এই বলিয়া যে, বাজপাখী হইতেও আমাদের উপকার হয় যথেষ্ট।

সর্বাপেক্ষা দুর্নামের ভাগী হইল—ঈগল ও সাপ, যাহাদের দেখিবামাত্র হত্যা করা হয়।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এই পাখী-জাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া নানা অজ্ঞাত-পূর্ব তথ্য প্রচার করিতেছেন। হাঁস-মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পাখীর ধ্বংসকারী, বন্য উভচর পাখীর প্রধান শত্রু, শিকারীদের গুলীতে আহত বা নিহত শেয়াল, ফেজেণ্ট পাখী প্রভৃতি শিকারের প্রত্যক্ষ দুষমন্—বাজপাখীকে কেহ সুনজরে দেখে না; বিশেষ করিয়া যখন শিকারীদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার এমন ক্ষিপ্রতা অন্য কোনও জীবের দেখা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বাজপাখীর খাদ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও দেশভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহারা প্রধানত নেংটি-ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, খুদে খরগোস, পঙ্গপাল, উচ্চিংড়ে প্রভৃতি ও অন্যান্য পোকামাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং বাজপাখীর আহারের অভ্যস্ত সামগ্রী লইয়া গবেষণা করিয়া পণ্ডিতগণ নিশ্চিত হইয়াছেন যে, এমন সব জীবজন্তু ও পোকামাকড় উহাদের খাদ্য, যাহারা বিশেষ করিয়া কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে অনিষ্টকারক। কাজেই বাজপাখীকে দেখা মাত্র শিকার না করিয়া উহাকে উহার স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে দিলেই বরং মানব-জাতির বেশী উপকার। ইঁদুর আর র‍্যাবিটের উপর উহাদের যে বিষম আক্রোশ ও নির্মম আচরণ, ইহাতে উহারা যদি অবাধে এই খাদ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পায়, তবে সেই বিনাশের কার্যে কৃষির সাফল্যের পথের এত বিঘ্ন বিদূরিত হইবে যে, তাহার বিনিময়ে দুই একটা হাঁস-মুরগী, ভেড়া-পাঁঠার বাচ্চা কদাচিৎ কখনও যদি নেয়ই, তাহা আমাদের বরদাস্ত করা উচিত।

কয়েক বৎসর পূর্বে মাত্র বিশেষজ্ঞগণ বাজপাখীর এই অভ্যস্ত আহারের সন্ধান পাইয়া উহাদের দুর্নাম দূর করিতে চেষ্টিত হন। আজ অনেক কৃষি-বিদ পণ্ডিতও এই দলে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের মত, শ্যেন জাতীয় পাখীর কোনগুলি প্রকৃতই গৃহ-পালিত পশুপাখীর শত্রু, তাহা প্রত্যেক চাষী ও কৃষককে শিক্ষা-দান করিতে হইবে। তিন প্রকার বাজপাখী মাত্র এই 'শত্রু'র পর্যায়ে পড়ে—কাউপারস হক, কালো-খয়েরি ও সরু ধারাল পা-ওয়ালা হক্।

কিন্তু সাধারণ চাষী বা কৃষকের প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই, কোন বাজ প্রকৃতই উপকারী, কোনটা অনিষ্টকারী, তাহা তাহারা উড়ন্ত অবস্থায় ঠাওরাইতে পারে না। আকাশে উড়িতে থাকিলে সকল বাজই কালো বলিয়া মনে হয়—আলোক-উৎস ও আমাদের দৃষ্টির মাঝখানে থাকে বলিয়া। কিন্তু পণ্ডিতগণ শুধু 'শত্রু' ও 'মিত্র' বাজ চিনাইয়া দিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন যেগুলোকে 'শত্রু' আখ্যা দেওয়া হইল, সেইগুলোও 'মিত্র' বাজ অপেক্ষা খুব বেশী অনিষ্টকারক নয়, সুতরাং উহাদের প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হয়, তাহাও সমর্থন করা যায় না।

আদিম যুগে জীব-জগতের সহিত আপোষ-রফা করিবার বাঁধা ধরা নিয়ম ছিল—যে জীব হইতে কোনও উপকার পাওয়া যায় না, যে জীব কোনও কাজে লাগে না—সেটিই শত্রু। প্রকৃত

প্রস্তাবে জীবজন্তু সম্বন্ধে জনসাধারণের যে জ্ঞান, তাহা কতকগুলি অন্ধসংস্কার ও বিদ্বেষের সমষ্টি মাত্র। এবং সেই ধারণা দূর করা সহজ ব্যাপার নয়।

জানোয়ার সম্বন্ধে অপধারণা আমাদের এখনও বহু রহিয়াছে। পেচক জ্ঞানবৃদ্ধিতে অতি বিজ্ঞ বলিয়া হাজার হাজার লোকের বিশ্বাস। সাপগুলি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন অন্তত দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন অতি সেয়ানা জীব বলিয়া বহু লোকের ধারণা। সাপ আর পেঁচা—দুইটিই যেমন আতঙ্কের প্রতীক, তেমনই অমঙ্গলসূচক। বৃথাই পণ্ডিতগণ পেঁচার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আতঙ্ক দূর করিতে চেষ্টা করেন; বৃথাই সাপের মাথার খুলি মাপিয়া দেখান যে উহাতে মগজ পদার্থের স্থানাভাব নিতান্তই।

বৃথাই বৈজ্ঞানিকগণ চীৎকার করিয়া বেড়ায় যে, পেচক বিজ্ঞ নয় আদপেই, অমঙ্গলসূচকও নয়, কিন্তু সাধারণের অন্ধ সংস্কার দূর হয় না

কিন্তু যুগযুগান্ত অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার জনসাধারণকে অন্ধ ও বধির করিয়া রাখিয়াছে। জীবজন্তুর সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর সত্য অবহেলিত হইয়াই আসিতেছে। এই হীরার মত অগণিত পদবিশিষ্ট গঙ্গাফড়িং বা চেলুটির আশ্চর্য গঠন সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় না করিয়া উহাকে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে দলের অমূলক ভয় দেখাইয়া। অনেকে অজ্ঞমতি শিশুদের ভয় দেখায়—যে মিথ্যা কথা বলিলে, গঙ্গাফড়িং আসিয়া উহার দলে দিয়া তাহার মুখ সেলাই করিয়া দিবে। অনেকে বিশ্বাস করে, কেন্নুই কানে প্রবেশ করিয়া গর্ত কাটিতে কাটিতে মগজে যায়, তখন মানুষ উন্মাদ হইয়া পড়ে।

জানোয়ারদের দেহ গঠন ও স্বভাব সম্বন্ধে নানা অমূলক তথ্য সেই সেকাল হইতেই প্রচার করা হইতেছে। কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐ অমূলক বিবরণকেই জোরের সহিত নিশ্চিততার ছাপে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। এরিস্টটল্ নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, কুমীরের উপরকার চোয়ালই কব্জার পাটের মত যথেচ্ছ সঞ্চালিত হইতে পারে নিম্নের চোয়াল নয়; সিংহ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, মেরুদণ্ডের যে অংশ উহার ঘাড়ের ভিতর, সেই অংশে একখানি লম্বা হাড় রহিয়াছে মস্তক হইতে পৃষ্ঠ পর্যন্ত—ছোট ছোট কতকগুলি হাড়ের শৃঙ্খলিত সমষ্টি নয়। আর একথা তিনি সাধারণ সূত্র হিসাবে প্রদান করিলেন সেই সকল দেশে, যেখানে সিংহ ও কুমীর বাস করিত অগণিত সংখ্যায়।

সিজারের বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় সেকালে জার্মানীতে হরিণ জাতীয় একপ্রকার জীব ছিল, যাহা দাঁড়াইতে পারিত না, থাকিত কোনও গাছে ঠেস দিয়া। সেই অবস্থায়ই মাত্র উহাকে ধরিতে পারা যাইত গাছটি কাটিয়া ফেলিয়া, নতুবা উহা নাকি এই প্রকার দ্রুত দৌড়াইতে পারিত যে উহার নাগাল কেহ পাইত না।

এই সকল হাস্যজনক বিবরণ হইতে বোঝা যায়—সাধারণ চাষাভুষাদের কথিত খোশ-গল্প হইতেই এই প্রকার অদ্ভুত বিবরণের উপাদান সংগৃহীত। সেকালে বহু পর্যটক বহু আশ্চর্য বিবরণ লিখিয়া গিয়াছে জীবজন্তুর হালচাল সম্বন্ধে—কিন্তু তাহারা আশা করে নাই যে, সেই সকল কথা লোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে। কিন্তু আজিকার দিনেও এমন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মাঝে মাঝে দেখা যায়, যিনি সত্য সত্যই লোককে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, সজারু তাহার কাঁটা নিক্ষেপ করে আততায়ীর উপর এবং 'ব্লো-স্নেক্' ফুঁ দিয়া গরল সিঞ্চন করে যে-কোন জীবের চোখে।

নেহাৎ অজ্ঞলোকের উপকথা প্রভৃতিতে ছাড়া এমন পৌরাণিক সাপের কথা শোনা যায় না যে সাপ (hoop snake) পাহাড় হইতে নামিবার সময় লেজটি খুলিয়া মুখে করিয়া লয় এবং সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া আবার যথাস্থানে জুড়িয়া দেয়। তথাপি কিন্তু র‍্যাট্‌ল্ সাপের বেলা বলা হয় যে, উহার লেজের 'রিং' কয়টির সংখ্যা দ্বারা উহার বয়স নির্ণয় করা যায়। বয়স নির্ণয় করা যায় সত্য, কিন্তু খোলস ছাড়ার সময় যদি কোনটি খসিয়া পড়ে কিম্বা কোনও দুর্বিপাকে পড়িয়া এক বা একাধিক 'রিং' যদি খসিয়া যায়, তবে ত নির্ণয়-করা সংখ্যা সঠিক হইবে না। 'রিং' গুচ্ছির পূর্ণ সংখ্যা যে অটুট রহিয়াছে তাহার সার্টিফিকেট দিবে কে? শুধু দুর্বিপাকই নয়, 'রিং' গুলির সংখ্যার সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্যেরও একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। উপযুক্ত খাদ্য পাইলে র‍্যাট্‌লের লেজে তিনটি পর্যন্ত 'রিং' গঠিত হইতে পারে কিন্তু প্রথম ২।৩ বৎসর গত হইলে আর ঐ অনুপাত কার্যকরী থাকে না। তাহা ছাড়া খাদ্যের অভাবে অনেক স্থলেই বৎসরে একটি মাত্র রিং সৃষ্টি হয়। সুতরাং বয়সের এই সার্টিফিকেট হইতে ঠিক বয়স নির্ধারণের চেষ্টাও ভুল-ভ্রান্তির অতীত নয়।

সাপ সম্বন্ধে এই জাতীয় অগণিত অদ্ভুত গুজব সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু এই সকল অস্বাভাবিক ও অসম্ভব গল্পের বিস্তৃতির জন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ অবশ্য ততটা বিরক্ত নয় যতটা

দুঃখ অনুভব করে তাহারা, দর্শনমাত্র সাপকে মারিয়া ফেলার ধর্মান্ধ কর্তব্যের ন্যায় কঠোরতায়। যে দেশেই পদার্পণ করা যায় সাপকে সকল জীবের প্রধান শত্রুজ্ঞানে সাক্ষাৎমাত্র বিনাশ করা হয়—সেই সাপ প্রখর বিষধরই হউক আর নির্বিষ নিরীহই হউক।

কিন্তু সামান্য মাত্র বিচার-বিবেচনা করিলেই দেখা যায় জীব-জগতে সাপের এমন একটি স্থান, যাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। সাপ সাধারণত ধ্বংস করে—ইঁদুর, ব্যাঙ, উচ্চিংড়ে, গঙ্গাফড়িং আরও কত পোকা-মাকড়। ইহা অবশ্য সত্য যে উহারা মাঝে মাঝে মাছ, পাখী ও পাখীর ডিম—এই সকলও খাইয়া ফেলে। কোলা ব্যাঙও সাপের আহার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এই খাদ্য-খাদক সম্পর্কই সমগ্র জীবজগতে সমতা রক্ষা করে। কোনও একটি বিশেষ জাতি সংখ্যায় ছাপাইয়া উঠিতে পারে না, এই ব্যবস্থার জন্যই।

কোলাব্যাঙ কদাকার—উহার প্রতি কাহারও দরদ নাই

পিপীলিকাকেও বলা হয়, অদ্ভুত ধারণাশক্তির মালিক, কিন্তু যে সামান্য শক্তিটুকু উহাদের আছে, তাহা সহজাত প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এতটুকু। তদুপরি কৃষির পক্ষে অনিষ্ট কারকও কম নয় তথাপি উহাও কৃষি নষ্টকারী অনেক পোকামাকড় খাইয়া উজাড় করে। ইহারও বদনাম আছে যে ইহার বিষ আছে। কিন্তু সেই বিষের প্রখরতা কি?—মানুষের হস্তের ত্বকের উপর ঐ বিষের কোনই ক্রিয়া নাই। তাহা ছাড়া উহা সকল সময়ই বিষস্রাব করিতে পারে না। যখন অশেষ যাতনায় পড়িয়া একেবারে মরিয়া হইয়া যায়, তখনই ঐ তথাকথিত বিষস্রাব হইতে থাকে:—যেমন হয়, কুকুরে আক্রমণ করিয়া কোলাব্যাঙটাকে কামড় দিয়া ধরিল, তখন কুকুরের মুখের ভিতর ঐ বিষের সংস্পর্শে একটা ঝাঁজ লাগিবে, ঝিল্লীপ্রদাহ উপস্থিত হইবে, ফলে কুকুরটা উহাকে ওগড়াইয়া ফেলিবে। বিষের ক্রিয়া ইহার বেশী নয়। কিন্তু মানুষ উহার স্পর্শের বাহিরে থাকে সর্বদা উহার লালা ও গাত্র-স্রাবের বিষের ভয়ে। প্রয়োজন হইলে এই কোলাব্যাঙকে বিনাশ করিতেও চাষীরা ইতস্তুত করে না এতটুকু।

পেঁচা ও ঈগলপাখীকে মানুষ এমনই দুষমন মনে করে যে, উহাদের বাগে পাইলেই হত্যা করিবে। উহারা ইঁদুর, গেছো-ইঁদুর, খুদে খরগোস, প্রভৃতি কৃষির অনিষ্টকারী খুদে জীবগুলিকে গ্রাস করে, এই কথার গুরুত্ব কেহ দেয় না।

ঈগল সম্বন্ধে আর একটা বদনাম যে, মেষশিশু, ছাগশিশু, হাঁস-মুরগীর বাচ্চা ছোঁ মারিয়া নিয়াই উহারা ক্ষান্ত হয় না, মানবশিশুও উহারা লইয়া যায়। প্রতি বৎসর এই প্রকার সংবাদ বহু প্রকাশিত হয় সংবাদ-পত্রে যে ছোট্ট একটি শিশুকে ঈগল লইয়া গিয়াছে, অথবা ঐ প্রকার ছোঁ মারিবার চেষ্টায় প্রতিহত হইয়াছে সাহসিকা শিশুর মাতা কর্তৃক। কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে এমন ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। অডুবন সোসাইটি এই জাতীয় সকল ঘটনা প্রতি বৎসর অনুসন্ধান করে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় এইরূপঃ—যে স্থানের নাম ও মাতার নাম ছাপা হইয়াছে, সেখানে গেলে শোনা যাইবে ১০ মাইল দূরবর্তী গ্রামের অন্য নামের একটি মাতার কথা। সেখানে গেলে আবার আরও দূরবর্তী কোনও স্থানের নাম বলা হইবে। শেষ দেখা যাইবে উহা গুজব মাত্র।

আর একটি ধারণা আমেরিকায় বলবৎ—সন্ধ্যাবেলা কোন রমণী এলোচুলে বনপার্শ্বে দাঁড়াইলে বাদুড় অথবা পেঁচা উহার চুলকে মাকড়সার জাল মনে করিয়া উহাতে আসিয়া বসিবেই। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহ প্রত্যক্ষ দর্শন করে নাই।

সর্বশেষ পিপীলিকা। ইহার উপর অবশ্য দুর্নাম আরোপ করা হয় না, ইহাকে মানবোচিত বুদ্ধিবৃত্তি ও নিপুণতার মালিক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কোনও বিখ্যাত ভূ-পর্যটক বলিয়াছেন,—দল বাঁধিয়া পথচলার সময় উহারা প্রতি মোড়ে মোড়ে 'ট্রাফিক পুলিশ' দাঁড় করাইয়া দেয়। অন্য একজন বলিয়াছেন,—উহাদের যাইবার পথে নদী পড়িলে, একপার হইতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া নদীর তলা দিয়া অপর পারে যাইয়া হাজির হয়। আবার শোনা যায় লড়াইয়ের সময় উহারা চৌকা অথবা ত্রিকোণাকারে ফৌজ সাজাইয়া অগ্রসর হয়। কেহ বলিয়াছেন শ্রম-বণ্টনের হিসাবে উহারা একের দুখের বোঝা অপরকে দান করে।

ইহার প্রথম দুইটি নিতান্তই রূপকথা। শেষ দুইটিরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শ্রম-বণ্টন যাহাকে বলা হইয়াছে, তাহা যে ইচ্ছাকৃত নয়, 'জোর যার মুলুক তার' নীতিরই পরিণাম, একথা যে কেহ পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন।

প্রাণিতত্ত্ববিদের আক্ষেপের বিষয় এই যে, জীবজন্তু সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আরোপ করিতে জনসাধারণ যেন অপ্রকৃতিস্থতার ভাবই প্রকাশ করে এবং অধিকাংশ স্থলেই অর্ধ সত্যকে নিশ্চিত রূপায়ণে ভূষিত করে। অনেক স্থলে খুশীমত কারণ নির্দেশ করিয়া পরিণাম-ফলটি অতিরঞ্জিত করিবার লোভ অনেকে সংবরণ করিতে পারেন না।

প্রাণিতত্ত্ববিদের ইহা অপেক্ষাও আক্ষেপের বিষয় রহিয়াছে, তাহা হইল সাধারণের জীবজন্তু সম্বন্ধে সাধারণ কথাগুলো জানিবার প্রবৃত্তির অভাব। তাহারা অনেক

(শেষাংশ ৮৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুরের প্রভাব

(গল্প)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত

ওস্তাদ বিনোদবিহারী একটি দুরূহ সুর আয়ত্ত করিবার ইচ্ছায় গুন্ গুন্ করিতে করিতে ও হাত নাড়িয়া তাল রাখিতে রাখিতে জনবহুল রাস্তা দিয়া চলিতেছিল। তাহার চলার ভঙ্গীর দিকে তাকাইয়া কেহ বা হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, কেহ বা তাহার গুণরাশি স্মরণ করিয়া প্রশংসাও করিতেছিলেন আবার কেহ কেহ বা টীকা-টিপ্পনীও কাটিতেছিলেন। কিন্তু বিনোদবিহারী নির্বিকার, কর্ত্তব্য কর্ম্মে কেহ তাহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই। কিন্তু আজ এই অখণ্ড মনোযোগেও বাধা পড়িল বা পাশের ডাক্তারখানা হইতে চন্দ্রকান্ত কম্পাউণ্ডারের আহ্বানে। বিনোদবিহারী সচকিত হইয়া নিরুত্তরে সেদিকপানে তাকাইল। কম্পাউণ্ডার তাহাকে হাত ইসারায় ডাকিল। সে ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার ব্রজগোপালবাবু বলিলেন,—"এই যে বিনোদ, বস।"

বন্ধু নবকুমারের পিতা ইনি। তাই সসম্ভ্রমে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বলুন—!"

"একটা ভাল হারমোনিয়াম কত হলে কেনা যেতে পারে?"

এই বিরাট বিস্ময়টা কি দুলিয়া উঠিল নাকি? বাহিরের ঝাঁ ঝাঁ করা রৌদ্রের মধ্যেই বুঝি-বা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, বোকাবুবের মত হাসিয়া বিনোদবিহারী দুই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল। জবাব যেন ঠোঁটের কাছে আসিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

ডাক্তারবাবুও জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া আবার বলিলেন "চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মধ্যে হবে না!"

"হ্যাঁ, খুব ভাল হবে।"

"তা হলে কাল বিকেলে এসে টাকা নিয়ে যেও।"

"আচ্ছা—!"

"আরও একটা কথা—!"

"বলুন!"

"তোমার খুব সুখ্যাতি শুনতে পাচ্ছি। তুমিই কিন্তু এসে মুদ্রাকে গান শেখাবে!"

বিনোদ মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল।

"কাল বিকেলে এস কিন্তু—।"

"আচ্ছা—।"

সে উঠিল কিন্তু রাজ্যের চিন্তারাশি তাহার মাথায় আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। নির্ম্মম পাথরের বুকে ফুলের হাসি! কি করিয়া এ-হেন অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা। শৈশবের নিদারুণ দুর্দ্দশার পর ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছিল এই ব্রজগোপালবাবুর সংসারটি। ঠিক তখনই এক শুভক্ষণে নবকুমারের বোনের বিবাহ সুসম্পন্ন হয় সেই বিবাহের দিনে বাড়ীময় আনন্দ-কোলাহল। ছেলেপিলেদের হৈ-চৈ হট্টগোল—দিকে দিকে কর্ম্ম-ব্যস্ততা। বরযাত্রীদের মুখে হাসিরেখা সজীব রাখিবার জন্য তাহার ও নবকুমারের অকৃত্রিম চাঞ্চল্য। বরযাত্রীরা কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল, অমায়িক, সদালাপী। ঘণ্টা দুই পরে লগ্ন। দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতে হইবে। একজন বরযাত্রী গান ধরিলেন—একজন তবলা বাজাইতে লাগিলেন। ক্রমে গায়ক পরিবর্ত্তিত হইল কিন্তু বাদক অপরিবর্ত্তনীয়। আসর জমিয়া গেল। সে ও নবকুমার কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল অদূরে দাঁড়াইয়া সাত কি আট বৎসর বয়সের সুশ্রী একটি মেয়ে একটি গানের সাথে সাথে গুন্ গুন্ করিতেছিল। বোধ হয় গানটি তাহার জানা। বরের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধুর চক্ষু ও কর্ণ বড় সজাগ। গান থামিতেই সে চট্ করিয়া মেয়েটিকে ধরিয়া বসাইয়া বলিল,—"তুমি বেশ গাইতে পার, একটা গান গাও—।"

মেয়েটি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

প্রবীণ একজন অতিথি বলিলেন—"গাও না মা, লজ্জা কি?"

নবকুমার কহিল "ছেলে মানুষ ও কি—।"

বরের বন্ধু বলিলেন—"ছেলে মানুষ বলেই ত শুনতে চাচ্ছি!"

সেও বলিয়াছিল—"এত করে ওরা বলছেন যখন, গা-না একখানা ছন্দা—!"

তাহার কথায় মেয়েটি একটু সাহস পাইয়া বলিল—"তবে তোমাকেও একখানা গাইতে হবে বিনোদ-দা—।"

"আচ্ছা আচ্ছা সে হবে'খন।"

"তবে তুমি বাজাও—।"

সে হারমোনিয়াম টানিয়া কয়েকবার রিড্‌গুলির উপর হাত বুলাইয়া কহিয়াছিল—"কোনটি গাইবি—!"

"চিনি গো চিনি তোমারে—।"

"আমার মুখে শুনে শিখেছিস। বেশ—।"

ছন্দার গান শুনিয়া শেখা। স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠস্বর গান তুলিবার অপূর্ব্ব কৌশল ভগবানের বিশেষ দান। ছন্দার কণ্ঠস্বর আর তাহার বাজনা একত্রে মিশিয়া এক অতি মিষ্ট মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হইতেছিল।

"অকস্মাৎ বজ্রপাত—" বাহিরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"নবকুমার—!"

"আজ্ঞে—।" তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

"কে গান গাইছেরে—!"

"ছন্দা—!"

"আমার বাড়ীর মেয়ে! ছন্দা—।

ছন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে পালাইবার চেষ্টা করিতেই ব্রজগোপালবাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ছন্দা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল—"আমায় মের না জ্যাঠামশাই আমায়—।"

"মারব না! প্রগতি-প্রগতি! বেয়াদপ পাজী—।" কয়েকটি প্রচণ্ড চড় দিয়া টানিতে টানিতে ছন্দাকে লইয়া তিনি চলিয়া

গিয়াছিলেন বরযাত্রীদের অপ্রস্তুত ও হতভম্ব করিয়া। আজ কিনা সেই প্রগতি-বিরোধী বাঘ-মার্কা লোকের মুখে গানের কথা—হারমনিয়াম কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ! ছন্দার মেয়ে কি তবে সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পরে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতেই এই একগুঁয়ে বৃদ্ধের দেমাক ও সংকল্পের মূলে আগুন ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে নাকি? বিনোদবিহারী চিন্তার কোন কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে বন্ধুবরের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"পিসীমা!"

"কি বাবা!"

"কর্ত্তা আজ আমায় হারমনিয়াম কিনতে বললেন, তিনি ত আমার সাথে কোনদিন ঠাট্টা করেন না!"

"হারমনিয়াম!"

"শুধু তাই নয়, মুদ্রাকে গানও শেখাতে হবে!"

"বলছিস্ কি তুই!"

"হ্যাঁ সত্যি! কাল বিকেলে টাকা দেবেন হারমোনিয়ামের জন্যে।"

"কিছুই ত বুঝতে পারছি না!"

শুধু পিসীমা কেন, বাড়ীশুদ্ধ ছোট বড় সবাই কল্পনাতীত বিস্ময়ে হতবাক্।

যথা সময়ে হারমনিয়াম আসিল। মুদ্রা বিনোদের কাছে সংগীত-চর্চ্চাও করিতে লাগিল। কিন্তু এই মহাপরিবর্ত্তনের ইতিহাস কেহ এখন পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পায় নাই। হয়ত বা সেই কাহিনী দুনিয়ার বুকে চিরতরে অজ্ঞাত থাকিয়াই যাইত। কিন্তু...।

কর্ম্মময় জীবনের অবসাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ডাক্তার ব্রজগোপাল ঘরে ফিরিয়া দ্বিতলের ছাদের পশ্চিম প্রান্তে একটি আরাম কেদারায় মুদ্রিত চক্ষে প্রায়ই শুইয়া থাকিতেন। মৃদু-মন্দ হাওয়ায় শ্রান্তি হইত দূরীভূত, প্রাণে ফিরিয়া পাইতেন লুপ্তপ্রায় শক্তি, সঞ্জীবিত হইত মৃতপ্রায় উৎসাহ। এই ছাদেরই উপরে কোন এক রাত্রিতে অপ্রত্যাশিতভাবে মহা সন্ধিক্ষণে আজন্মের সংস্কার হারাইয়া মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল যাহার মোহন স্পর্শে তাহাই আর একটা রাত্রিতে দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল বিনোদের চোখের সম্মুখে।

সেদিন ভোরে কাহার মুখ দেখিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিলেন তিনি তাহা একমাত্র বিধাতা পুরুষই জানেন। ডিস্পেন্সারীতে যাইয়া ঔষধের নূতন একটি পার্শেল খুলিতেই দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্যবান বিভিন্ন ঔষধের শিশি বোতল ভাঙ্গিয়া একাকার। তাঁহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল। সমাগত রোগিবৃন্দের প্রতি তেমন নজরই দিতে পারিলেন না। দায়-সারা গোছের ভদ্রতা করিয়া সেদিনকার মত কাজ চালাইতে লাগিলেন। দুপুরে কাঠ-ফাটা রৌদ্রে ঘরে ফিরিয়া স্নান করিয়া খাইতে বসিবার সময় পায়ের ধাক্কা লাগিয়া জলের গ্লাস গেল কাৎ হইয়া পড়িয়া—ঘরের কতকাংশ হইল জলাকীর্ণ। খাওয়াও ভাল হইল না, রান্না নাকি হইয়াছে অতি বিশ্রী। পর পর এতগুলি পীড়াদায়ক ব্যাপারে কাহার মেজাজ বা ঠিক থাকে! অতি সামান্য কারণেও চেঁচামেচি চটাচটি করিতে করিতে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় শয্যার আশ্রয় যখন গ্রহণ করিলেন তখন তিনটা বাজিবার পনের মিনিট বাকী। মাথা গরম, ঘুম কি আর আসিতে চায়? আধ ঘণ্টাখানেক এপাশ ও-পাশ করিতেই তাঁহার চোখ জুড়িয়া ঘুম আসিয়া পড়িল। কিন্তু হা অদৃষ্ট, চারিটা বাজিয়া দুই মিনিট হইতেই বাহিরের গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাথাটা চন্ করিয়া ধরিয়া গেল। অসীম ক্রোধে বিছানা ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পাড়ার প্রায় ২০।২২টি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে জড়ো হইয়া হৈ-হল্লা করিয়া খেলা করিতেছে। তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ছেলেপিলেদের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহারা একে একে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম কি আর নূতন করিয়া আসে! সুযোগও হইল না। কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হইতেই জরুরী একটি "কল" আসিল। ধড়াচূড়া পরিয়া তিনি চলিয়া গেলেন নূতন রোগীটির বাড়ীতে। আরও তিন চারিজন ডাক্তার পূর্ব্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এইখানেই বাধিল ভীষণ গণ্ডগোল। যে ডাক্তারের রোগ নিরূপণ ও ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে তেমন জোর করিয়া কেহ সাহসী হয় নাই, আজ কিনা সদ্য এম-বি পাশ ছোকরাটি তাঁহাকেই রীতিমত চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিল! একটানা আধিপত্যের উপর এইরূপভাবে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইতে দেখিয়া তাঁহার সেদিনকার চঞ্চল মনটি উষ্ণ হইয়া উঠিল। রোগীর সংকটাপন্ন অবস্থার কথা দুইজনেই ভুলিয়া গেলেন—সুরু হইল সায়েন্সের তর্ক। পরিশেষে মীমাংসা কিছুই হইল না বটে, সাময়িকভাবে সন্ধি করিয়া ডাক্তারগণ যাঁহার যাঁহার আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ব্রজগোপালবাবু সেদিন আর ডিস্পেন্সারীতে মন বসাইতে পারিলেন না। অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ মন ও শ্রান্ত দেহ লইয়া অতি অসময়ে ঘরে ফিরিলেন এবং ধড়াচূড়া ছাড়িয়া ফেলিয়া নিত্যকার মত ছাদের উপরে উঠিয়া দেখিলেন আরাম কেদারার স্থান শূন্য। গম্ভীর সুরে ডাকিলেন—

"নন্দ!"

"আজ্ঞে—!"

"হতভাগা পাজী, ইজি চেয়ার কোথায়?"

নন্দ আর কোন কথা না কহিয়া দৌড়িয়া আসিয়া ইজি চেয়ার পাতিয়া দিল।

"এতক্ষণ দেওয়া হয় নি কেন?"

"আপনি যে এত সকাল সকাল...।"

"মুখে মুখে তর্ক! যা তামাক নিয়ে আয়—।"

নন্দ দ্রুত প্রস্থান করিল, আর তিনি ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। অচিরেই নন্দ তামাক আনিয়া দিল। গড়গড়ার নলটি ঠোঁটে লাগাইয়া তিনি এলাইয়া পড়িয়া একটু একটু টানিতে লাগিলেন। চমৎকার হাওয়া আর রাত্রির ঘন অন্ধকার তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া তুলিতেছে, মাথাটাও ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া স্থির হইয়া আসিতেছে—এমন সময় মুদ্রা তথায় আসিয়া ডাকিল—"দাদু—"

"কে দিদি, আয়!"

মুদ্রা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কোলের কাছে

টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন—"কটা গান শিখ্‌লিরে!"

"এখনও ত গান দেননি।"

"দেয়নি। তবে এতদিন বিনোদ কি করছে!"

"প্রথম প্রথম সা-রে-গা-মা না সাধলে—"

"কচু সাধবি। শুনেছিস্ ঐ বাড়ীর মেয়েটি কেমন চমৎকার গায়। রোজই ত আমি এখানে বসে বসে শুনি।" অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অনতিদূরের একটি বাড়ী তিনি দেখাইয়া দিলেন। অন্ধকারে বাড়ীটি দেখা না গেলেও মৃদ্রা বুঝিতে পারিল দাদু কাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই একটুকুও না ভাবিয়া কহিল—"ও ত—"

"তর্ক করিস্‌নে। বলতে পারিস্ ওকে শেখায় কে? বিনোদকে আর মাষ্টার রাখব না। ঐ বাড়ীর মাষ্টার—এই যে বিনোদ তুমিও এসেছ। বলতে পার ঐ বাড়ীর মেয়েটিকে কে গান শেখায়—বড় চমৎকার গায়। আর তুমি পারলে না মৃদ্রাকে একটা গান শেখাতে। কেবল যে হাত নেড়ে নেড়ে গলাবাজি কর—"

"আজ্ঞে ওকে ত আমিই শেখাই!"

"তুমি বিনোদ—!"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"চমৎকার। তাহ'লে মৃদ্রার এত সময় লাগে কেন?

"আগে গলা সেধে সুর আয়ত্ত করে নিলে সব গানই ভাল হয়।"

"ওঃ—। কিন্তু ঐ মেয়েটি কিন্তু বড্ড ভাল গায়।"

"আজ্ঞে হাঁ। প্রথম প্রথম ওকেও সুর সাধতে হয়েছে কিন্তু ওস্তাদী গান ও পছন্দ করে না। মেয়েটি বাল-বিধবা ব'লে কেবল করুণ ও কান্নার গানই শিখ্‌তে চায়, গায়ও।"

"বাল-বিধবা! আহা—! সত্যি বিনোদ জীবনের পরিণত বয়সে, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ঐ সুর ঐ গান বড় ভাল—বড় চমৎকার। ও ত বিধবাই—ওর গান ত দুঃখের গানই হবে। এতকাল দাপটে সদম্ভে প্রগতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে করে বার্দ্ধক্যের সীমা-রেখায় এসে বুঝতে পারলাম—সৃষ্টির মহা হৈ-চৈ গণ্ডগোল হৈ হুল্লোড়ের অন্তরের সত্যিকার রূপ হচ্ছে ঐ করুণ সুর যা শাশ্বত—অবিনশ্বর। বুঝিবা ঐ সত্যিকার সুরেই সজল করে তুলবে ভগবানের অচঞ্চল নয়ন-যুগল মহাপ্রলয়ের দিনে, ধরণীর হাসি ঠাট্টা সুখ-সুবিধা হবে বিধৌত সেই নয়নের জলে। সেই সত্যই প্রথম জানতে পারলাম কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ মেয়েটির সাবলীল বেদনা মাখান কণ্ঠস্বরে। মৃদ্রাকেও অমনি গান শেখাতে হবে বিনোদ।"

তমসাচ্ছন্ন আবরণ ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। স্নিগ্ধ ঊষার আলো ধরণীর বুকে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। বিনোদ বলিল—"আমি যত্ন করেই ওকে শেখাব।"

মেয়েটি তখন নিত্যকারের মত সুমিষ্টকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছে—

—"ওগো ধর আলো ধর

আঁধারে ঢেকেছে পথ—ইত্যাদি।"

ডাক্তার ব্রজগোপাল ভুলিয়া গেলেন গায়িকার শিক্ষা-দাতাকে, অসীম উৎসাহে তাহাকেই বলিলেন—"শোন বিনোদ, কি চমৎকার গায় মেয়েটি, কি সুন্দর!"

জীবজন্তুর দুর্নাম

(৬৬৩ পৃষ্ঠার পর)

জীবজন্তু সম্বন্ধেই অনেক অদ্ভুত গুজব সৃষ্টি করিবে, কিন্তু প্রকৃত যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা উহাদের রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করিবে না।

কোলাব্যাঙ বিষাক্ত বলিয়া 'রায়' দিলেও তিনি বলিতে পারিবেন না উহারা জলপান করে কি ভাবে! উহারা যে মুখ-দ্বারা পান না করিয়া ত্বক দ্বারা পান করে কয়জন তাহা জানিতে উৎসুক? পোকামাকড়ের ফুসফুস নাই, তবে শ্বাস গ্রহণ করে কি করিয়া? কই মাছ বাম মাছ এক জলাশয় হইতে সংযোগরহিত অপর জলাশয়ে যায় কোন পথে? কোন কোন প্রজাপতি পিপীলিকার নীড়ে বাস করিয়া পিপীলিকার বংশ নিপাত করে কোন্ কৌশলে? মানুষ ব্যতীত কোন তিনটি জীব যন্ত্র ব্যবহারে পটু?—এই প্রকার শত শত আশ্চর্য তথ্য বলা যাইতে পারে, যে সম্বন্ধে সাধারণের কোন কৌতূহল নাই। অথচ আজব গল্প সৃষ্টির বেলা তাহারা বিলক্ষণ নিপুণ। সারা দুনিয়া আশ্চর্য প্রাকৃতিক লীলাখেলায় ভরপুর, তাহা যেমন সত্য তেমনই বিস্ময়জনক। রহস্যময় হইলেও তাহা সত্য—এজন্যই সামান্য কৌশলে বিবৃত অসত্য বা অর্দ্ধসত্য ঘটনা এত সহজে অজ্ঞ সাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে।

সাগর-তলে কৃষি

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়

মেক্সিকোর পূর্ব তীরে বহু জাপানী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যাহাদের মূল ব্যবসা ভেষজাদির সরবরাহ। সকল প্রতিষ্ঠানেরই গবেষণাগার, ল্যাবরেটরী, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি রহিয়াছে। তেমনই আবার এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধীন নিযুক্ত আছে ডুবুরীর দল। ডুবুরীর ভিতর অন্য কোন জাতীয় ব্যক্তির নিয়োগ দেখা যায় না। ঔষধের ব্যবসায় ডুবুরীর প্রয়োজনীয়তা কোথায় আপাত দৃষ্টিতে তাহা উপলব্ধি হইবার কথা নয়। সেই বিষয়েরই আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আটলান্টিক মহাসাগরের অংশবিশেষে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে সারগাসো (Sargasso) নামক জলজ উদ্ভিদ (Sea-weed) ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যাইত। ইহা বহু ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ক্রমে ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তেমন প্রচুর পরিমাণে আর ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাই চতুর ও দুঃসাহসী জাপানীগণ ইহারই চাষ আরম্ভ করিয়াছে সাগর-গর্ভে। এই কৃষি পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যেই ডুবুরীদের নিয়োগ। উহারা সাগরতলের এই চারাগাছটির ডাঙ্গায় চাষের প্রয়াসে বিফলমনোরথ হইয়া ডুবুরীদের সাহায্যে ঐ গভীর সমুদ্রতলে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। সাগরতলকে সারগাসো কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, কারণ অন্য যতপ্রকার উদ্ভিদ ও সমুদ্রকীট এই চারাগাছগুলির পক্ষে অনিষ্টকর, তাহা বিদূরিত করিতে হয়। সাগরতলকে এইপ্রকারে কৃষির উপযুক্ত করিতে চার হইতে নয় বৎসরের অমানুষিক শ্রম দরকার হয়। তবে সুবিধা এই যে, একবার কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া গেলে চারাগুলির বৃদ্ধি পাইতে বেশী সময় লাগে না, তখন অবিরাম উহার ফসল পাওয়া যায়। তবে ডাঙার কৃষির ন্যায়, ঐ সাগরতলের কৃষিক্ষেত্রেও তত্ত্বাবধান ও সতর্কতা কম দরকার হয় না। বপনের পর আগাছা পরিষ্কার, নিড়ান এবং ফসলের চারা অতিরিক্ত ঘন হইলে আঁচড়া দ্বারা অবাঞ্ছিত চারা তুলিয়া ফেলা—সকল কার্যই অতি সতর্কতা ও ধৈর্যের সহিত সম্পন্ন করিতে হয় যেমন আমাদের দেশে যে-কোনও কৃষিক্ষেত্রে করা হয়। এই জলজ উদ্ভিদের ল্যাবরেটরীতে নানা প্রক্রিয়াকালে উহার যে ছত্রাক (fungus) পাওয়া যায়, তাহা হইতে সহজাত উপাদান (by-product) হিসাবে Agar-agar উৎপন্ন হয়।

এই ডুবুরীদের কার্য যে সহজ নয় তাহা বুঝিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। ঐ গভীর সমুদ্রতলে ডুবুরীর বিশেষ পোষাক পরিহিত অবস্থায় কার্য করিতে করিতে উহাদের জীবনী-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোন ডুবুরীই দীর্ঘকাল অনবরত এই কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে না। নির্দিষ্টকাল অন্তর অন্তর তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয়। তথাপি শুধু সাগর-তলের অতিরিক্ত শ্রম ও শ্বাস গ্রহণের কৃত্রিমতার ফলে কত ডুবুরী অকালে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ইহার উপর আবার নানাবিধ সমুদ্র-জন্তুর উপদ্রব রহিয়াছে। কিন্তু এই অসীম সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়সম্পন্ন জাতির প্রাণে তথাপি আতঙ্কের উদ্রেক নাই। উহারা অভিজ্ঞতা হইতে গভীর সাগর-তলে কিপ্রকারে কোন্ জলজন্তুর হাতে নিস্তার পাইতে হয়—কোন্ দুরন্ত জলজন্তুর কোন্‌টি প্রধান অস্ত্র এবং তাহা কিভাবে এড়াইতে হয় বা উহার সহিত কোন্ কৌশলে লড়াই করিতে হয়,—তাহা সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, পরবর্তী ডুবুরীদিগের অভিযান পথ সরল করিবার জন্য, এই সকল আবিষ্কৃত কৌশল জাপানী ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিতও করা হইয়াছে। এত সকল ব্যবস্থা ও সাবধানতা সত্ত্বেও ডুবুরীদের ভিতর মৃত্যুহার কম নয়।

জাপানী ডুবুরীর দল এমনই অসমসাহসিক যে, এত সকল বিপদ মাথায় করিয়া এবং নিদারুণ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইলেও, কৃষিক্ষেত্র তৈরীর ব্যাপারে কি ফসল সংগ্রহে উহাদের ভিতর প্রতিযোগিতার পাল্লা রহিয়াছে অশেষ। কে কত বেশী কাজ করিতে পারে সাগর-তলে তাহা লইয়া আড়াআড়ি করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেও উহারা দৃকপাত করে না। ফসল সংগ্রহের ব্যাপারে একক একজন ডুবুরী সাধারণত একদিনের কাজে ১০০ ডলার মূল্যের সারগাসো সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, ঐ ১০০ ডলার স্থলে ৩৫০ ডলার পর্যন্ত মূল্যের সারগাসো সংগৃহীত হইয়াছে দৈনিক জনপ্রতি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, কি অদম্য সাহস ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার সহিত জাপানী ডুবুরী গভীর সাগর নিম্নেও শ্রমলিপ্ত থাকিতে পারে। উপরের মুক্ত আকাশতলের সহিত সামান্য দুইটি লৌহ-রজ্জু ভিন্ন যাহার আর কোন যোগাযোগ নাই, ঘোর অন্ধকারময় সেই সাগর-তলে অসীম জলরাশি বেষ্টিত হইয়া ডুবুরী কাজ করিয়া যায়। কত জলজন্তু, কত ভীষণদর্শন দুরন্ত জলজন্তু তাহাদের গ্রাস করিতে উদ্যত তথাপি নির্ভীক ডুবুরী টর্চ দ্বারা যতটুকু সম্ভব চারিদিক আলোকিত করিয়া আপন কাজে মনোনিবেশ করিয়া আছে।

অন্ধকার সেই সমুদ্রগর্ভে ডুবুরীর সর্বাপেক্ষা ভয়ের জীব হইল অক্টোপাস। অধুনা অনেক দেশেই সাগর-তলে সিনেমা-ফিল্মে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে, জলজন্তু ও বিচিত্র জলজ উদ্ভিদের লীলাখেলা প্রকটিত করিবার জন্য। এই শ্রেণীর সিনেমা-ডুবুরী প্রথমত জাপানী ডুবুরীদের নিকট উপদেশের জন্য গমন করিলে অক্টোপাস্ সম্বন্ধে তাহারা বলে,—সাগর-তলে অক্টোপাস্ যখন তোমায় ধরে, তখন নড়বে না একেবারে। যদি তুমি ওর বন্ধন থেকে ছাড়ান পেতে ছুটোপাটি কর, তা হলে ওটা উত্তেজিত হয়ে তোমায় বিষম আক্রোশে আক্রমণ করবে। কিন্তু তুমি যদি অনড় নিথর হয়ে থাক, তা হলে তোমার রেহাই পাবারই সম্ভাবনা বেশী—কেন না, অক্টোপাসটা ওর লম্বা শুণ্ডবৎ বাহু দিয়ে তোমার এখানে ওখানে স্পর্শ করবে কৌতূহলবশে, তারপর তোমায় ছেড়ে চলে যাবে। এই উপদেশ অনেক আনাড়ী ডুবুরীকে বহু ক্ষেত্রে প্রাণে বাঁচাইয়াছে। আট কি নয় ফুট লম্বা শুঁড়-ওয়ালা অক্টোপাসের দেহবল অসীম। ১৫।২০ মিনিটে ও-রকমের একটা অক্টোপাস্ মানবদেহের সমস্ত মাংস অস্থি হইতে পিষিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে পারে।

সাগর-তলের চির অন্ধকারময় প্রস্তর বা ক্ষুদ্র পাহাড়ে-ভরা স্থলের গর্তের আশে-পাশে এরা আনাগোনা করে বেশীর ভাগ। ধাড়ী অক্টোপাস্ একবারে ৪০,০০০ হইতে

৫০,০০০ ডিম প্রসব করে—জলনিম্নের পাহাড়ের গহ্বরমুখে। ডিম পাড়িবার পর ৫০ দিন পর্যন্ত ধাড়ী সে স্থান ছাড়িয়া নড়ে না। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা যখন বাহির হয়, তখন উহার আকার এক-একটা বড় মটরের মত হয়। সে সময় ঐগুলি সাগরবক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়—সূর্য-রশ্মির তাপ পাইবার জন্য। ঐ অবস্থায় বাচ্চাগুলির অধিকাংশই মাছ আর পাখীতে খাইয়া ফেলে।

যেগুলো কোনরকমে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এক বৎসর পূর্ণ হইলে উহাদের আকার হয় ৪ হইতে ৫ ফুট চওড়া। সাগরতলে মাটি বা পাথরে ভর দিয়া যখন চলে, তখন আটটি পায়েই হাঁটে, আবার যখন সাঁতার কাটে, জলের ভিতর মনে হয়, যেন পিছু হটিয়া যাইতেছে—মাথার নীচেই একটা নল আছে, সেই নল হইতে সজোরে জল বাহির করিয়া দিয়া। বড় বড় অক্টোপাসেরা এই প্রণালীতে আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতার কাটিয়া চলিতে পারে। উহার প্রতিটি শুঁড় বা পদের তলায় একটি করিয়া বাটিপানা থলিয়া আছে, তাহাতে যে-চাপ দিতে পারে, জলে সেই চাপের শক্তি হইবে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১৯ পাউণ্ড। যখন কোনও প্রকার শিকারের উপর চড়াও হয়, তখন সাধারণত উহারা চারিপায়ে সাগর-তল আঁকড়াইয়া থাকে এবং বাকি চারি পা লড়াইয়ের কাজে লাগায়। উহার প্রধান অস্ত্র হইল টিয়াপাখীর মত ধারাল ঠোঁট—এই ঠোঁটটি থাকে উহার টুপীপানা শিরস্ত্রাণের ঠিক মধ্যস্থলে। এই ঠোঁটে উহাদের এত শক্তি রহিয়াছে যে, বড় বড় অক্টোপাসেরা অনায়াসে ডুবুরীর গভীর সমুদ্রের পোষাকও চিরিয়া টুকরো টুকরো করিয়া ফেলিতে পারে।

অক্টোপাসের আক্রমণ সম্বন্ধে এক অতি আতঙ্ককর ঘটনার বিবৃতি দিয়াছেন, ক্যাপটেন জন ডি ক্রেগ। তিনি গভীর জলের ডুবুরী এবং সাগরতলে চলচ্চিত্র তুলিবার বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেনঃ—

আমার ডুবুরীর কাজে একবার মাত্র অক্টোপাসের আক্রমণের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। সাগর-নিম্নের সিনেমা ফিল্ম তুলিবার জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে সাগরে নামিয়াছি মেক্সিকো উপকূলে। সাগর-তলের একটি নির্দিষ্ট স্থল মনোনয়ন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, এবং সম্ভব হইলে কোনও জলমগ্ন জাহাজ বা নৌকার অংশেরই খোঁজ করিতেছিলাম বিশেষ করিয়া।

এই প্রকার চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার দৃষ্টি পড়িল গভীর এক কালোপানা গর্তের দিকে। ঐ স্থানটি ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইল। অতি সন্তর্পণে আমি কুড়ি ফুট আন্দাজ নিচে নামিলাম, জলের তলের একটা পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির ধাপের মত প্রস্তরখণ্ডে পা রাখিবার স্থান পাইয়া সেখানেই দাঁড়াইলাম। একটু নত হইয়া নীচের দিকে গর্তের ভিতর তাকাইলাম; দুইটি বড় বড় অক্টোপাস সমগ্র গর্তের তলদেশ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। উহারা যেন নিদ্রিত মনে হইল, যেহেতু একেবারে নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। আমার প্রথম মতলব হইল সেই মুহূর্তেই সেস্থান ত্যাগ করিয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিপুণ জাপানী ডুবুরীদের উপদেশ স্মরণ হইল, কাজেই নিরাপদ পন্থা গ্রহণ করিতেই মনস্থ করিলাম। নিশ্চল অবস্থায় ঠায়ে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অক্টোপাসদের গতিবিধির সাড়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

বোধ হয় এক মিনিটও কাটিল না সহসা যেন একটা অক্টোপাস নড়িয়া উঠিল এবং পর মুহূর্তেই লম্বা শুঁড় একটি বাড়াইয়া দিল। সীসকের জুতা পরিহিত পায়ে শুঁড়ের স্পর্শ লাগিল। আমি অচঞ্চল স্তব্ধবৎ দাঁড়াইয়াই রহিলাম। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আমি আমার নগ্ন বাহুদ্বয় ইতিমধ্যে পোষাকের বগলের ফাঁকে ঢুকাইয়া দিয়াছি। প্রায় দুই মিনিট কাল পরে অক্টোপাসটা উহার সংগীর নিকট গর্তে ফিরিয়া গেল। আমিও আমার সীসকের জুতা পরা পা দুখানি পাহাড়ের গায়ে কৌশলে আটকাইয়া পোষাকটা ফুলাইতে লাগিলাম উপরে ভাসিয়া উঠিবার তোড়জোড়ে। আমি বোধ হয় তাড়াতাড়ি উপরে উঠিবার আগ্রহে অতিরিক্ত অংগচালনা করিয়াছিলাম, তাই যখন আমি খানিকটা দূর উঁচুতে উঠিয়াছি সাগর-বক্ষে পৌঁছিবার পথে, আমার মনে হইল এত তাড়াহুড়া করিয়া ভাল কাজ করি নাই। এবং তাহার নিদর্শন টের পাইতে দেরী হইল না। জানোয়ারটার কৌতুহল নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হয় নাই—কারণ সেই অর্দ্ধপথেই উহা আবার একটা শুঁড় বাড়াইয়া আমার গোড়ালি ধরিয়া ফেলিল। উহার নাগালের বাহিরে যাইতে পারি নাই, উহার বন্ধন ছাড়াইতে না পারিলে আর উপরে উঠিবার আশা নাই। কাজেই সজোরে পা-ঝাড়া দিলাম এবং পোষাকের ভাসাইয়া তুলিবার শক্তি আমাকে সাহায্য করিল আর খুব সম্ভবত অক্টোপাসটা তেমন বাগাইয়া আমাকে ধরিতে পারে নাই, তাই মুহূর্তে উহার বন্ধন শিথিল হইল, আমার পা উহার শুঁড় হইতে ফসকাইয়া আলগা হইয়া আসিল। ক্ষিপ্রগতিতে আমিও উপরে উঠিয়া আসিলাম।

অক্টোপাসেরা সহজে সাগর-বক্ষে ভাসিয়া উঠে না শিকারকে বাগাইতে, কারণ সে অবস্থায়, সাগরতলে আঁকড়াইয়া ধরিবার যে অবলম্বন পায়, তাহার কোন সুযোগ উহার থাকে না। কিন্তু এইটি তাহা বলিয়া ক্ষান্ত হইল না। আমি তখন সাগরবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটাও আমাকে একেবারে বেড়িয়া জড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমার চারিপাশ হইতেই কেবল নাগপাশের মত বন্ধন অষ্টপৃষ্ঠে। তখন নৌকাস্থ আমার সংগীরা আমাকে ঐ মৃত্যু-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে অক্টোপাসটার চারটি শুঁড় কাটিয়া ফেলিল কুঠার দ্বারা।

একটি শুঁড় আমি সংগ্রহ করিয়া লইলাম। অদ্যাপি তাহা সংরক্ষণ করিয়াছি। পরিমাপে উহা আট ফুট।

এই অক্টোপাসের আক্রমণের কাহিনী হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, জাপানী ডুবুরীদের সারগাসো কৃষির ক্ষেত সাগরতলে প্রস্তুত করিতে কত বিপদের মুখে পড়িতে হয়। ক্যাপটেন ক্রেগ্ বলিয়াছেন যে, তিনি মেক্সিকোর পূর্বতীরে জাপানী প্রতিষ্ঠানগুলির ডুবুরীদের ২২টি সমাধি দর্শন করিয়াছেন। ইহারা সকলেই সাগরতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। তথাপি কিন্তু এই বিপজ্জনক কার্যে জাপানী ডুবুরীর অভাব হয় নাই কোন দিন।

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(৮)

আর একটু হইলেই দু'জনের মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইত। তাহা হইল না বটে কিন্তু প্রকাশ বাহির হইতে স্প্রিংয়ের দরজাটা ঠেলিয়া দেওয়ার সংগে সংগে ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, উঃ। এবং প্রায় সংগে সংগেই নাকের ডগা চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল স্বয়ং উদ্রাম।

পরস্পরের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সাক্ষাতে উভয়েরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রকাশ বলিল, তুমি এখানে, উদয়দা?

উদ্রাম প্রথমে যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, এরা আমার দেশের লোক।

সে বলিল, ওঃ তোমার দেশের লোক, এতদিন বলনি কেন?

আমি তা জানতাম না যে এদের সংগে তোমার পরিচয় আছে।

প্রকাশের ইচ্ছা ছিল আরও প্রশ্ন করে কিন্তু উদয়রামের ঠিক তার বিপরীত।

দেবেনবাবু ঐ ঘরে আছেন তুমি যাও বলিয়াই সে পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ডানদিকের ঘরে বসিয়া দেবেনবাবু একটা খড়কের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে পান্ডুলিপির পাতা উলটাইতেছিলেন।

প্রকাশকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, আসুন প্রকাশবাবু।

দয়া করে আমায় তুমি বলবেন। বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পদমর্যাদায় সকল বিষয়েই আপনি শ্রেষ্ঠ।

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, অন্য কিছুতে শ্রেষ্ঠত্ব আমার নেই। তবে বয়সের দাবীতে অবশ্য তুমি বলতে পারি, কিন্তু আজকালকার ইয়ং বেঙ্গল ওটা পছন্দ করেন না।

যাঁরা করেন না তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র কিন্তু আমি আপনার কাছে তুমি শুনলেই সুখী হ'ব।

বেশ, বেশ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং; তোমার ওটাও একটা ভূষণ।

দেবেনবাবু তারপর চায়ের হুকুম করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভারী সুখী হয়েছি তোমার সংগে পরিচিত হ'য়ে। বয়সের যতই পার্থক্য থাক না কেন আমার মনের মিলন হয় প্রকৃত রসিক লোকের সংগে।

আপনি নিজে একজন মস্তবড় রসজ্ঞ ব্যক্তি কি-না।

ঠিক বলেছ, আমি আজকাল সত্যিকার ইনটারেষ্ট নেই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে। কিন্তু প্রতিমা যখন নাচ শিখতে আরম্ভ করল তখন আমি আরম্ভ করলাম নৃত্য-শাস্ত্র চর্চা করতে। ওর দেহের কমনীয় গঠনের সংগে নাচের যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে ছিল আমার বেশী ঝোঁক। উ'চুদরের নাচের যোগ্য ওর গড়ন, নয় কি প্রকাশ?

নিশ্চয়ই সে কথা আর বলতে? I can swear as to that ঐটে করনা প্রকাশ, শপথ সম্বন্ধে-

প্রকাশ কহিল, মাপ করবেন, অন্যায় হয়েছে।

না, না অতটা লজ্জিত হ'বার কোন কারণ নেই।

এর পর আরম্ভ হইল সাহিত্য-চর্চা।

দেবেনবাবু আলমারী খুলিয়া পুঁথির একটা তাড়া বাহির করিতে করিতে বলিলেন এইগুলো হ'চ্ছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিষ আছে, তুমি বোধ হয় জান আমি একজন গবেষক।

প্রকাশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, হুঁ।

আমার গবেষণার বিষয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য। বহু টাকা ব্যয় ক'রে তৎকালীন অনেক পুঁথি আমি সংগ্রহ করেছি। চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাহা থেকে আনিয়েছি অশ্বত্থামা-বিকীর্ণ সন্দেশ। জানত' শহরটার নাম প্রাগ নয়, প্রাহা!

হ্যাঁ।

প্রকাশ, হুঁ, হ্যাঁ করিতেছিল বটে কিন্তু তার পিপাসু চোখ ও মন পড়িয়াছিল দরজার দিকে। প্রতিমা কোথায়? আধ ঘন্টা হইয়া গেল, তবু তার দেখা নাই।

দেবেনবাবু বলিলেন, বার্লিন থেকে আনিয়েছি কাব্য-ডিণ্ডিমের কণ্ডুয়ন।

বই দু'খানা কি ধরণের?

আশ্বত্থামা-বিকর্ণ সন্দেশ একখানা Socio-Histo-Political আলোচনার বই, তাতে সেকেলে বাঙলা ভাষার অদ্ভুত নমুনা পাওয়া যায়। সেইদিক থেকে বইখানি মূল্যবান।

কণ্ডুয়ন?—

কাব্য ডিণ্ডিমের কণ্ডুয়ন একখানা উঁচুদরের Satire। সংগে সাহিত্য আলোচনা করছিলাম। উনি হচ্ছেন যাকে বলে, চুটকিল।

দেবেনবাবু কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্রকাশের সংগে সাহিত্য আলোচনা করছিলাম। উনি হচ্ছেন যাকে বলে, রসবেত্তা।

আর আমার প্রতিমাও—বুঝলে প্রকাশ, সাহিত্য-বোধ ওর অপূর্ব।

প্রকাশ কহিল, নিশ্চয়।

দেবেনবাবু কহিলেন, তারপর ওর নাচের কথা, সে আগেই আলোচনা হ'য়েছে। ভগবান ওর সমস্ত অবয়বে এমন একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা—

বাধা দিয়া প্রকাশ কহিল, She is the cream of Indian dance বলিয়াই তার মুখখানা রাঙা হইয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া প্রতিমা হাসিয়া ফেলিল। প্রকাশের মনে হইল কেন সে আর্টিষ্ট হয় নাই, হইলে এই হাসিটুকুকে রংয়ে ফলাইয়া ধন্য হইতে পারিত।

চা'র জল আসিলে দেবেনবাবু প্রতিমাকে বলিলেন, তোমার মা ফিরেছেন?

না ফোনে জানিয়েছেন যে, ফিরতে রাত প্রায় ন'টা বাজবে।

দেবেনবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, চা'টা তুমিই কর।

প্রতিমা চা তৈরী করতে ভাল পারত না কিন্তু কাপে একটা চুমুক দিয়াই প্রকাশ কহিল, অপূর্ব।

দেবেনবাবু কন্যাকে কহিলেন, তুমি চা খাবে না?

এই যে নিচ্ছি, বাবা।

প্রকাশের মনে হইল প্রতিমাকে তারই অনুরোধ করা উচিত ছিল কিন্তু লাজুক বলিয়া যে সময় যাহা করা উচিৎ তাহা সে করিয়া উঠিতে পারে না। এ-লজ্জা ক্ষমারও অযোগ্য।

চা ও জলযোগের পর দেবেনবাবু স্বরচিত প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে পড়িলেন, আদি বাঙলা ঔপন্যাসিক।

প্রবন্ধটি নাতিবৃহৎ. ইহাতে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বাঙলার কথা-সাহিত্যের জন্মদাতা হরিহর ভট্টশালী, তাঁর উপন্যাসের নাম, 'ব্রহ্মরসাস্বাদ সহোদর' ইহারই রচিত অশ্বত্থামা-বিকর্ণ সন্দেশ দেবেনবাবু প্রাহ্ন হইতে আনাইয়াছেন।

আদি বাঙলা উপন্যাসিক পাঠ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, আর একটা রচনা তোমায় শোনাতে চাই, অসুবিধা হবে না ত?

প্রকাশ বলিল, অসুবিধা? না, না অসুবিধা কিছুই হবে না।

সে ঘন্টার পর ঘন্টা এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারে! প্রতিমা সামনে বসিয়া থাকিলে সাহিত্য-শ্রবণের ক্লেশ ত দূরের কথা—তার চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করিতে সে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ শোনার সময় প্রকাশের সাহস একটু বাড়িল. সে তিন-তিনবার প্রতিমার দিকে চাহিল এবং প্রতিবারই তাদের চোখে চোখে মিলন হইয়া গেল।

দেবেন বাবু গভীর একাগ্রতার সহিত প্রবন্ধ পড়িতে-ছিলেন।

এরূপ মনোযোগী শ্রোতা তিনি অনেকদিন পান নাই। প্রকাশের প্রতি তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

পাঠ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, যাঁদের কাছে পড়েছি তাঁরাই প্রশংসা করেছেন।

করবেনই ত। এমন চিন্তাশীল, যুক্তিপূর্ণ রচনা। কোন কাগজে দিয়েছেন ?

এই দুটো নূতন রচনা, এখনও দেই নি। তবে অন্য রচনা বেরিয়েছে 'তাণ্ডবে'। কাগজখানা হাইক্লাশ সাপ্তাহিক, শুধু উঁচুদরের প্রবন্ধ ওঁরা ছাপেন। আমি ওঁদের কাগজে লিখি ঘটকর্পর নামে।

নামটা প্রকাশের চোখে পড়িয়াছিল, সে বলিল, ও আপনিই ঘটকর্পর!

তাহলে ঘটকর্পরকে তুমি আগেই চিনতে? একদিন বাঙলার সবাই চিনবে। সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার ফল নিশ্চয়ই পাব। মন দিয়ে প্রাকটিস্ করি নি সাহিত্যের জন্য, এখন ত' ছেড়েই দিয়েছি। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা চলে গেছে আমার উপর দিয়ে।

প্রকাশ বলিল, বাণীর পূজারীরা অনেক কিছু কষ্ট সহ্য ক'রে জগৎকে আনন্দ দিয়ে যান।

ঠিক ব'লেছ, মাইকেল, হেমচন্দ্র, গোবিন্দ দাস হচ্ছেন এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। যাক্ আমি ভাবছি একটা বই লিখব 'সূচনা যার পলাশীতে'।

পলাশী যুদ্ধের পরে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বুঝি?

ঠিক ধ'রেছ। এই বইতে অনেক প্রচলিত ভুলমত খণ্ডন ক'রে নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করব। নব নব আলোকসম্পাত হবে বাঙলা সাহিত্যের উপর। বুঝলে প্রকাশ ?

প্রকাশ বলিল, পলাশীর যুদ্ধ খুব ভাল বিষয়।

তুমি বড় অন্যমনস্ক, যুদ্ধ নয়; যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্য।

এই সময় ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা শব্দ হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেবেনবাবু কহিলেন, রাত হ'য়ে গেল, তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে, প্রকাশ। আজ তবে থাক।

প্রকাশের রাগ হইল ঘড়ির উপর। ঘড়ি এত তাড়াতাড়ি বাজিয়া যায় কেন? দরিদ্র ও রোগীর ঘড়ি এত দ্রুত চলুক, কিন্তু যে ঘড়ির সামনে প্রতিমা বসিয়া সেটা একটু বন্ধ থাকিলেই বা দোষ কি?

(৯)

উদয়রাম প্রকাশকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সহ্য করিয়াছে তার বাল্যের অসংখ্য অত্যাচার।

প্রকাশের মার শরীর ভাল না থাকায় উদয়রাম প্রায়ই প্রকাশকে নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিত। দশ বৎসর বয়সে সে মাতৃহারা হওয়ার পর হইতে তাকে পালন করার সম্পূর্ণ দায়িত্বই পড়িয়া গেল উদয়রামের উপর।

প্রকাশ তাকে ডাকিত উদয় দা' বলিয়া, ভালবাসিত নিজের পরিবারেরই লোকের মতন।

তারপর কাটিয়া গেছে দেড় যুগ। প্রকাশ আজ একটা ফাস্টগ্রেড কলেজের অধ্যাপক; কিন্তু উদয়রাম সেই উদয়দা'ই আছে। উদয়দা থাকিলেও কথা ছিল না সে একেবারে বনিয়া গিয়াছে উদ্রাম।

প্রকাশের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তার গৃহ-শিক্ষক হিসাবে উদয়রাম এই সংসারে প্রবেশ করে। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও নম্র ব্যবহার ও অন্যান্য অনেক গুণ থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়।

আজ বিশিষ্ট দুইজন লোক খাইবেন বাজারে পাঠাও উদয়রামকে। অমুকের অসুখ, উদয়রাম ডাক্তার বাড়ী যাউক, না হইলে ঠিক রিপোর্ট দেওয়া হইবে না। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাকে দিয়া না করাইলে হলধর ও তাঁর স্ত্রীর মনঃপূত হইত না।

কালক্রমে প্রকাশের বিদ্যা উদয়রামের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় কিন্ত চাকরী সের বকায় ...

হলধরবাবুদের চলে না, সেও ছাড়িতে পারে না এই পরিবারের বন্ধন। হাকিম হলধর স্থান হইতে স্থানান্তরে বদলী হন, উদয়রামও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়।

বছর কয়েক পরে হলধরবাবুর পত্নী বিয়োগ ঘটিলে কোন কোন সুহৃৎ ও স্বজন তাঁকে পুনরায় দার-পরিগ্রহের পরামর্শ দেন। প্রৌঢ় হলধর দারা আর গ্রহণ করলেন না বটে কিন্তু ধরিলেন মদ।

ছোট শহরের বড় হাকিম, লোকে জানে চরিত্রবান পুরুষ এই সুনাম বজায় রাখিবার জন্য হলধর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গোপনে মদ খান, বিশ্বাসী উদয়রাম যাইয়া মদ কিনিয়া আনে।

উদয়রাম সোডা মিশাইয়া দেয়, মদ-মিশ্রিত সোডার বুদ্বুদের দিকে চাহিয়া হলধর বলেন, কি সুন্দর!

নেশার একজন সঙ্গী চাই, উদয়রাম ভদ্রঘরের ছেলে, তার সঙ্গে মদ খাইতে দোষ কি? একটু নেশা হইলেই হলধর বলেন, চেখে দেখ-না উদয়রাম।

সে প্রথম প্রথম আপত্তি করিত, কিন্তু বেশীদিন তাহা টিকিল না। উদয়রামও মদ ধরিল।

নেশার ঝোঁকে হাকিম সাহেবের একদিন মনে হইল উদ্রাম নামটা বেশ, যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি জোরালো। সেই দিন হইতেই উদয়রাম উদ্রামে পরিণত হইল।

এই-ই উদয়রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তার এই কাহিনীর সবচেয়ে ট্র্যাজেডী এই যে সে নিজে মোটেই বোঝে না যে কি অবস্থা তার দাঁড়াইয়াছে। উদয়বাবুরূপে আসিয়া আজ সে বনিয়া গিয়াছে একটি বাবু চাকর।

বড় হইয়া প্রকাশ দেখিল উদয়দা তার মাতামহকে মদ ঢালিয়া দেয়, চেষ্টা করে তাকে বেশী মদ খাওয়াইবার এবং হিসাবপত্রেও সামান্য এধার-ওধার করে। মনে মনে বিরক্ত হইলেও বাল্যের কথা ভাবিয়া উদয়দাকে সে কিছু বলে না।

প্রকাশ জানে তার দাদাবাবুরও দরকার ঐ রকম একজন লোকের।

সেদিন প্রকাশ বাড়ী ফিরিয়া ডাকিল, 'উদয়দা।'

উদয় তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিল, অনেকদিন এরূপ হৃদ্যতার সহিত সে ডাকে নাই।

উদয় বলিল, কি প্রকাশ?

দেবেনবাবুদের তুমি চেন কতদিন থেকে?

অনেক দিন।

আমায় বলনি কেন?

আমি ত জানতুম না যে তোমার সঙ্গে ওঁদের আলাপ আছে।

ওঃ তা বটে। বেশ ভাল লোক ওঁরা, না?

হ্যাঁ।

খুব সদাশয়?

উদয়রাম বলিল, হ্যাঁ।

প্রকাশ বলিল, যেমন বাপ, তেমন মেয়ে। মেয়েটি বেশ ভাল।

ভাল তুমি কি করে জানলে।

ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

ও, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ।

উদয়রাম আজ নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করিল কেন না প্রকাশের নিকট হইতে বহুদিন এরূপ ব্যবহার পায় নাই।

সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে দেবেনবাবুদের আলাপ হল কোথা

দেবেনবাবুদের শ্বশুর বাড়ী আমাদের গাঁয়ে। ওঁরা আমাদের জমিদার।

জমিদার?

দেবেনবাবুর স্ত্রী আমাদের জমিদার।

সেইদিন হইতেই প্রকাশের নিকট উদয়রামের মর্যাদা বাড়িয়া গেল। আজকাল দেখা হইলেই সে বিনা-কারণেও দু'একবার উদয়দা বলিয়া ডাকে!

দু' দিন পরে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, ওদের খবর কি?

কাদের?

প্রতিমাদের, I mean দেবেনবাবুদের।

জানি না।

কেন?

আরত যাই নি। আমি যাই কালে-ভদ্রে।

আমার অনুরোধে নয় আর একদিন দেখা করে এস।

আসল কথা প্রকাশ আশা করিয়াছিল যে মধ্যে মধ্যে দেবেনবাবু তাকে প্রবন্ধ শুনাইতে নিমন্ত্রণ করিবেন।

একদিন যায়, দুদিন যায়, এইভাবে সাত সাতটা দিন কাটিয়া গেল, কোন খবরই আসিল না। প্রকাশ বুঝিতে পারিল না প্রবন্ধ শুনাইবার এত যাঁর আগ্রহ হঠাৎ তিনি এরূপ নীরব হইয়া গেলেন কেন?

এদিকে আজ কাল করিয়া উদয়রামও গড়িমসি করিতে লাগিল।

শেষটায় প্রকাশ, একদিন ফোন করিল। ফোনে অত্যন্ত মোটা গলায় জবাব আসিল, কাকে চাই?

দেবেনবাবুকে।

তিনি ত বাড়ী নেই, আপনি কে?

প্রকাশ কহিল, দেবেনবাবু বাড়ী ফিরলে দয়া করে বলবেন যে প্রকাশ মুখুয্যে—

প্রকাশ মুখুয্যে, সে আবার কে?

আমিই প্রকাশ মুখুয্যে, তাঁকে বলবেন আমিই ফোন করেছিলাম, তিনি ভাল আছেন ত'?

হুঃ বলিয়াই লোকটি বিরক্তভাবে রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

বৈকালে রায় বাহাদুর তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখ এত গম্ভীর কেন, প্রতিমা ধমক দিয়েছে বুঝি?

প্রতিমার খবরই পাচ্ছি না।

হলধরবাবু বলিলেন, অল রট্, দেবেন চকোত্তিরা হচ্ছে, a family of fools.

না দাদু, খুব ভাল ফ্যামিলি, জমিদার।

হলধর হাসিয়া বলিলেন আমি প্রতিমাকে বাদ দিয়েই অবশ্য বলেছি।

ফ্লাস নয়? পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে তুমি কলকাতার এত-গ্লো বাড়ীর মালিক, আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান—তোমাকে যদি ওরা হেলায় হারায়, তাহলে বোকা ছাড়া কি বলব বল?

ওঁরাও কম' নয় দাদু, প্রতিমার মা বিরাট জমিদারীর মালিক। তা ছাড়া প্রতিমা She is fit to be the queen of—queen of Congoes.

যাক আজ রাত্রে ক্ষিতীশকে নিমন্ত্রণ কর। আমিও তিনটি বন্ধুকে বলেছি। আজ আমরা প্রতিমার স্বাস্থ্য পান করব।

রাত্রে হলধরের তিনটি বন্ধু ও ক্ষিতীশ ডিনারে যোগদান করিলেন। কাহারও স্বাস্থ্য পান করিলে যদি সত্যকার স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে হলধর বন্ধু চতুষ্টয় মিলিয়া যে পরিমাণ মদ্য পান করিলেন, তাহাতে প্রতিমার শতায়ু হইবার সম্বন্ধে প্রকাশের আর কোন সন্দেহ রহিল না।

কাউন্সিল ননীবাবু বেশী মদ খাইলেন কি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা চন্দ্র মুখুয্যে তাঁহাকে হারাইয়া দিলেন, এই সম্বন্ধে ক্ষিতীশ ও প্রকাশ বাজী ধরিল।

প্রকাশ করিল ননীবাবুর নাম, ক্ষিতীশ বলিল চন্দ্র মুখুয্যে।

সেদিন হলধর কম খাইলেন, আর কম খাইলেন তার বন্ধু বেদান্তের অধ্যাপক মহীন্দ্র পন্থো।

পন্থো বলিলেন, ডিনারের পর তিন গেলাসের বেশী আর শ্যাম্পেন খেতে পারি না।

খাওয়া শেষ হইলে ক্ষিতীশকে নিজের ঘরে লইয়া গেল।

ক্ষিতীশ বলিল, তুমি অত মুষড়ে গেছ কেন?

সাত দিন হয়ে গেল প্রতিমাদের কোন খবর পেলাম না!

ক্ষিতীশ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, চিন্তার বিষয় বটে।

তুমিও বলছ চিন্তার বিষয় বটে, তাহলে ত'—আচ্ছা দেবেনবাবু চটে গেলেন নাকি আমার উপর?

অসম্ভব নয়।

কেন বল দেখি? আমি ত এমন কিছু করিনি।

তুমি যে রকম অস্থিরতা প্রকাশ কর সেটা কোন মেয়ের বাবা পছন্দ করতে পারে না।

প্রকাশ কহিল, ঠিক বলেছ ভাই, আমি একটু বেশী রকম উল্লসিত হয়ে পড়েছি কিনা।

উল্লসিত হলেও মাত্রা-জ্ঞান তোমার থাকা উচিত ছিল।

এই আমার প্রথম প্রেম তাই মাত্রা ঠিক রাখতে পারিনি। একবার গিয়ে দেবেনবাবুকে সব বুঝিয়ে বললে হয় না?

তাহলে তিনি মনে করবেন তুমি একটি একের নম্বর অপদার্থ।

সেটা ত ভেবে দেখিনি, আমি মনে করেছিলাম নিজে একবার যাব।

খবরদার তা হলে সব পণ্ড হবে।

কিন্তু তুমি এ বিষয়ে ইচ্ছে করলে আমায় সাহায্য করতে পার।

কি ভাবে?

দীপাকে পাঠিয়ে। সে প্রতিমার বন্ধু, সে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসতে পারে।

এ যুক্তি মন্দ নয়, আচ্ছা আমি দীপাকে বলব'খন।

বলব'খন নয়, আজকালের ভিতরই পাঠিয়ে দাও। দীপাকে ব'ল সে যেন প্রতিমার মতামতটাও বুঝবার চেষ্টা করে।

ক্ষিতীশ—আচ্ছা, কিন্তু দীপা কি ভাববে বল দেখি।

বেশ, যা তোমার ভাল মনে হয় তাই কর।

ক্ষিতীশ বলিল, দেখি। (ক্রমশ)

দেশবন্ধু স্মৃতিতর্পণ

শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

ঐশ্বর্য্যে, বিলাসে ভোগে ছিলে কল্প অমরার পুরে
মগ্ন সুখে স্বপনঘোরে, অকস্মাৎ দৃপ্ত কোন্ সুরে
সেই মোহস্বপ্ন টুটি নবরূপে হইলে জাগ্রত,
আপনারে নিবেদিলে পরহিতে লয়ে দানব্রত।

চিত্ত রয় দীপ্তিহীন, শুচিহীন স্বার্থকেন্দ্র ঘিরে
প্রকাশের দীনতায় মোহাচ্ছন্ন অস্পষ্ট তিমিরে;
আপনারে বিকাশিলে তাই তুমি স্থলপদ্ম সম
অর্চ্চনার অর্ঘ্যরূপে হৃদয় দেউলে অনুপম।

অস্পৃশ্যেরে চণ্ডালেরে বক্ষে দিলে বন্ধুরূপে স্থান
স্বদেশ কল্যাণ লাগি' উপেক্ষিলে আত্ম-অভিমান,
চিত্তের বুভুক্ষা তব তৃপ্ত হ'ল তাই আত্মদানে,
আসক্তিরে জিনিবারে মহাশক্তি প্রবেশিল প্রাণে।
দানবীর, মহামুক্ত, চিরবন্দী মুক্তি বন্দনার!
'পরার্থে কামনা' মন্ত্রে সিদ্ধি হ'ল তব সাধনার।
তব প্রাণবীণে ছিল স্রষ্টার কামনাতন্ত্র বাঁধা,
তোমার অমিত শক্তি মহাকর্ম্মে হয়েছে সমাধা।
মৃন্ময় মূরতি তব ভস্মীভূত মৃত্যুহোমাগ্নিতে,
'দেশবন্ধু' রূপে তুমি চিরদীপ্ত আজও দেশচিতে।

চাক্মা জাতির কথা

শ্রীশান্তি রায় (চাক্মা)

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাঙলা দেশের অন্যান্য জিলাসমূহের মধ্যে একটি। ইহা বাঙলার ঠিক পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত। জিলাটি কতকটা পর্ব্বত ও জঙ্গল সমাকীর্ণ, পাহাড়গুলি খুব উচ্চ বা দুরধিগম্য নহে। মাঝে মাঝে সুবিস্তৃত মাঠ। ক্রীড়ারতা চঞ্চলা মেয়ের মত নদীর স্রোতগুলি পাহাড়ের শিলায় শিলায় নৃত্য করিতে করিতে ঐসব মাঠে আসিয়া ধীরশান্তভাবে প্রকৃতি মায়ের মত দুই কূলে সার জোগাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পর্ব্বতশ্রেণীর সমাবেশ। তাহাদের অবস্থান বাস্তবিকই অতি সুন্দর। উত্তর দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত, দেখিলেই মনে হয় যেন বিভিন্ন শ্রেণীবিদ্ধ সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের রূপ বর্ণনায় কোন এক কবি গাহিয়াছেন —

চট্টলা গিরিপুরে রৌম্য পাহাড় চূড়ে
কিবা শোভা হেসে যায়!
চট্ট মাতার ধন, ভূধর গহন
ঈশ লীলা নিকেতন
যদি প্রকৃতি ঠাঁই।
সারি সারি গিরিরাজি
বলিহারি সাজে সাজি
দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রহরী প্রায়॥ ইত্যাদি।

কবির গান হইতে সুজলা সুফলা চট্টলাকে আমরা বাস্তবিকই সুন্দর বলিতে পারি। কবির ভাষায় নৃত্যমান এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান অধিবাসী আমার প্রিয় "চাকমা-জাতি।" এই জায়গায় যত রকম লোকের বাস তাহাদের মধ্যে চাকমাগণ শিক্ষাদীক্ষায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সকলের অগ্রগণ্য। জল-বায়ুর প্রভাবে তাহারা অধিকাংশই ফর্সা, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ। মুখের অবয়ব কতকটা আসামীদের অনুরূপ। তাহাদের সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র অতি সাধাসিধা। তাহারা তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রায় নিজেদের হাতেই তৈয়ারি ও রং করা সূতায় প্রস্তুত।

চাকমাদের নিজেদের ভাষা ও অক্ষর আছে, তবে তাহা বাঙলায় বা অন্য কোন জায়গায় প্রচলিত ভাষা (current language) নহে। তাহাতে বাঙলা, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই সব ভাষা ও অক্ষর থাকিলেও তাহারা বাঙলা ভাষাকে বিশেষভাবে সমাদর করে এবং এই ভাষার সাহায্যে তাহারা তাহাদের মৃত ও বিস্মৃত ভাষা ও জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছে।

চাকমাগণ গ্রাম করিয়া থাকিতে অভ্যস্ত, তবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা অন্যান্য জিলাসমূহের তুলনায় কম বলিয়া অনেক জায়গায় পাঁচ সাতখানি বাড়ী-ঘর লইয়া এক একখানি গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। তাহাদের বাড়ী-ঘর দেখিতে অতি সুন্দর ও পরিষ্কার। তাহারা তাহাদের বসতবাটী সাধারণত বাঁশে ও কাঠের দ্বারা তৈয়ার করে। বসতবাটীর মেজে (floor) মাটি হইতে সাধারণত দুই হইতে তিন হাত পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করে এবং নির্ম্মিত মেজের নীচে বাতাস মুক্তভাবে চলাফেরা করিতে পারায় কোন রকম দুর্গন্ধ হয় না। মেজের উপর সাত হইতে চৌদ্দ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ করিয়া বাটীর ছাদ তৈয়ার করে। ছাদ সমতল নহে। সাধারণত দুইদিকে ঢালু ও মধ্যে উচ্চ, ফলে, চালের উপর বৃষ্টির জল মোটেই দাঁড়াইতে পারে না। ঘরের চাল শণ অথবা সূক্ষ্ম বাঁশের ফলক দ্বারা তৈয়ার করা হয়। বাড়ী-খানির মেজে প্রয়োজন মত বহু ভাগে ভাগ করা হয় এবং বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রায় পাঁচ হাত করিয়া বারান্দা রাখা হয়। পশ্চাতের বারান্দা সাধারণত ঘন রেলিং দ্বারা চালের সঙ্গে আটকাইয়া দেওয়া হয় এবং সেদিকে ঘরে উঠিবার বা ঘর হইতে নামিবার কোন রকম সিঁড়ি থাকে না। সম্মুখের পাঁচ হাত বারান্দা চালের ভিতরে হইবে সত্য কিন্তু ইহা চালের সঙ্গে আটকানো থাকে না। ইহা বৈঠকখানার কাজ করে। তাহার পর সেই বারান্দার সংলগ্ন ২ হইতে ৩ হাত নিম্নে আরও ১২।১৪ হাত পরিমাণ লম্বা একখানি খোলা মেজে করা হয়। ইহাকে চাকমা ভাষায় "ইজর" বলে। এই-খানি তাহাদের বেশী দরকারী। এখানে তাহারা কাপড়-চোপড়, ধান, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। ঘরে উঠিতে হইলে আগে এই খোলা ইজরের দুই পাশের সংলগ্ন দুইখানি বড় বড় কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। ইজরখানি একখানা সুন্দর বাঁশের তৈয়ারী বেড়া দ্বারা দুই-ভাগে ভাগ করা হয়। ঐ বেড়াই ওখানে একদিকে বাড়ীর ও কুলমহিলাদের পর্দ্দার কাজ করিবে। অনেক জায়গায় মাটির ঘরও করিয়া থাকে, তবে আগেরটি দেখিতে অনেক সুন্দর ও স্বাস্থ্যানুকূল।

চাকমাগণ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত কোন চাকমাই তাহাদের নিজেদের জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির ঘরে চাকুরী করিতে যায় না। অনেক হিন্দু ভদ্রলোক ও সরকারী চাকুরীয়া উপযুক্ত বেতন দিতে চাহিয়াও চাকমা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। চাকমাগণ সাধারণত দুই রকম কৃষির উপর নির্ভর করে—যথা কর্ষণ কৃষি (Plough cultivation) ও "জুম" কৃষি। প্রথমটি সকলেই জানেন কিন্তু দ্বিতীয়টি শতকরা নিরানব্বই জনেই জানেন না বলিয়া মনে হয়, তাই তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। যাহারা "জুম" কৃষি করিয়া জীবনধারণ করে তাহাদিগকে "জুমিয়া-চাষা" বলে। মাঘ মাসের শেষের ভাগে জুমিয়াগণ নিজেদের কাজের সামর্থ্য অনুসারে পরিবার ভরণপোষণোপযোগী করিয়া পর্ব্বত গাত্রের জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করে এবং গাছপালা যখন ফাল্গুন ও চৈত্রের রৌদ্রে শুকাইয়া যায় তখন ওখানে অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া পরিষ্কার করে। এই জায়গাখানিকে "জুম" বলে এবং যখন এইস্থান হইতে ধান কাটা শেষ হয়, তখন উহাকে "রান্যা" বলে। ইহা শুধু এক বৎসরের জন্য পরিষ্কার করা হয়। জুম করিবার পরে অন্ততপক্ষে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐস্থান আর জুমের জন্য পরিষ্কার করা হয় না। অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া পরিষ্কার করিবার পরে জুমিয়াগণ বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে এবং বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া ওখানে ধান, তিসি, যব, ভুট্টা, গম, সূতাবীজ ইত্যাদি দা দিয়া মাটিতে গর্ত্ত করিয়া রোপণ করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া তাহারা তাহাতে নানারকম তরীতরকারী ও শাকসব্জীর বীজ বপন করিয়া থাকে।

মোটের উপর ঐ একখানা জায়গা হইতে জুমিয়াগণ তাহাদের সংসারের যাবতীয় দরকারী জিনিসই উৎপন্ন করে। বীজ বপনের পর হইতে তাহারা ধান কাটিবার সময় পর্য্যন্ত ঐ জুমে প্রায় তিনবার আগাছা নিড়াইয়া দেয় এবং সর্ব্বশেষে সুতো আনিয়া তাহা হইতে চলিয়া যায়।

জুমে কাজ করিবার সময় প্রত্যেক জুমিয়া-চাষাকে নিজ গ্রাম ছাড়িয়া জুমে অস্থায়ীভাবে বাড়ী-ঘর করিয়া থাকিতে হয়, না হয় গ্রাম হইতে রোজ হাঁটিয়া গিয়া কাজ করা সম্ভবে, না। যখন জুমের যাবতীয় কাজ শেষ করিয়া ওখান হইতে আবার নিজ গ্রামে চলিয়া যায়, তখনই জুমখানিকে "রাপ্পা" বলে।

চাকমাগণ প্রায় একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিতে পছন্দ করে। এখনও মধ্যে মধ্যে এমন ঘর দেখা যায় যেখানে শতাধিক লোক এক পরিবারে বাস করে। চাকমাগণ সাধারণত সরল সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু; কিন্তু অদম্য সাহসী ও কষ্ট সহিষ্ণু। সাহস ও সহিষ্ণুতার গুণে অনেক চাকমা নানা জায়গায় অনেক রকম পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়াছে দেখা যায়। তাহাদের সারল্য ও ধর্ম্মভীরুতারও বিশেষ খ্যাতি আছে।

চাকমাগণ তাহাদের জীবনধারণের জন্য দুই রকম কৃষির উপর নির্ভর করে—তাহা আগে লিখিয়াছি। তাহারা এই উদ্দেশ্যে মহিষ, গরু পালন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহারা ছাগল, ভেড়া, কুকুর বিড়াল এবং কেহ কেহ শূকরও পালন করিয়া থাকে অবশ্য তাহা জুমিয়াদের গ্রামে দেখা যায় এবং তাহাও অতি বিরল।

চাকমাগণ নানারকমের উপাধিতে ভূষিত যথা—রায়, রায় চৌধুরী, দেওয়ান, তালুকদার, খীসা, কার্ব্বারী এবং যাহারা সেই রকম উপাধিতে ভূষিত হয় নাই, তাহারা "চাকমা" লিখিয়া থাকে। তাহাদের এই সমস্ত তারতম্য হইলেও তাহাদের অশুচি-বাদ নাই। তাহাদের সকলেই একই সমাজের ও একই ধর্ম্মের অনুশাসনে শাসিত, দরকার হইলে সকলেই এক সঙ্গে বসিয়া খাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের মধ্যে গোষ্ঠীর তারতম্যও দেখা যায় এবং হিন্দুদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা দেখা যায়, চাকমাদের মধ্যেও সেই রকম শাখা-প্রশাখা আছে—যেমন লাম্বা গোষা, বোংসা গোষা, কাম্বি গোষা ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও আসন ছোট বা বড় নহে, সকলেই সমান। তাহাদের মধ্যে যে কোন শাখা-প্রশাখার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারে।

বাঙলায় ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় যত রকম অতিথি-পরায়ণ লোকের নাম শ্রুত তাহাদের সঙ্গে চাকমাদেরও বিশেষভাবে নাম করা চলে। চাকমারা সকলেই এই গুণে গুণান্বিত। অতিথিকে তাহারা প্রকৃত পক্ষে দেবতার মত সম্মান করে। এতদ্ব্যতীত মাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক একবার করিয়া জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধব ও গরীব-দুঃখীদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইবার বন্দোবস্ত প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে মৃত আত্মীয়স্বজনের পুণ্য কামনা করা হইয়া থাকে।

অশুচি-বাদ তাহাদের মধ্যে নাই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ তাহাদের সমাজে গুরুতর-রূপে নিষিদ্ধ; কিন্তু বিধবা বিবাহ হইয়া থাকে। তাহাও বাঁধাবাঁধিভাবে নহে। চাকমাগণ তাহাদের সমাজের মধ্যে গ্রামের পঞ্চায়েৎ শাসনটিকে অতিশয় সম্মান করে। এই বিচারকে তাহারা অতি সুবিচার ও পবিত্র বিচার বলিয়া মনে করে। গ্রামে চুরি, মারামারি ইত্যাদি ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি হইলে পঞ্চায়েতের সাহায্যে তাহা মীমাংসা করে। তাহাদের সমাজে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত নাই। চাকমা মহিলাদের মধ্যে পর্দ্দার প্রথা নাই। চাকমাগণ সকলেই যেন কিছু মাত্রায় সৌখীন বলিয়া মনে হয়। তাহারা সাধারণত নিজেদের হাতের তৈয়ারী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ভালবাসে। স্ত্রী-লোকেরা সোনা রূপার গহনাদি পাঞ্জাবী প্রভৃতিদের মতই ব্যবহার করে। কিন্তু তাহা আজকাল বিশেষ ব্যবহৃত মধ্যে নাই। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে চাকমাগণ বিশেষভাবে হিন্দু-দেরই অনুসরণ করে। গোমাংস বিশেষভাবে নিষিদ্ধ; মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে তাহারা দুই পন্থাবলম্বী। নিতান্ত শিশু বা সংক্রামক রোগে মৃত্যু হইলে তাহাকে গভীর মাটির নীচে কবর দেয়, অন্যগুলি সব চিতা সাজাইয়া পোড়াইয়া ফেলে। গ্রামের কোন প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সাজানো রথে করিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় মহাসমারোহে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চিতা সাজাইয়া আগুনে দেওয়া হয়। মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। তাহাদের সমাজ শব-দাহের সপ্তদিবসান্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকার দেয়। কোন প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার স্মৃতি রক্ষার্থে বার্ষিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য সকল ক্ষেত্রে বাঁধাবাঁধি নহে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সমাজে দশ হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক গোত্রের একবার করিয়া জ্ঞাতি-ভোজন (চাকমা ভাষায় ইহাকে "ভাতো" বলে) হইয়া থাকে। যে গোত্রে এই কাজ করা হইবে, সেই গোত্রে লোকগুলি সব আসিয়া একত্রিত হইবে, তাহা না হইলে কার্য্য অসম্পূর্ণ হইবে, অধিকন্তু যাহারা আসিবে না তাহারা সেই গোত্র হইতে ভিন্ন হইতে বাধ্য হইবে। কাজেই সকলে আসিয়া এক সঙ্গে কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে এবং আসিয়া মৃত আত্মীয়দিগের নামে দানাদিকার্য্য করিয়া তাহাদের জন্য পুণ্য কামনা করে।

চাকমাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধ বিহার রাখিয়া ভগবান বুদ্ধের পূজাদি করিয়া থাকে এবং বৌদ্ধ পর্ব্বদিন লক্ষ্য করিয়া সকলেই নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী বুদ্ধ-নির্দ্দেশিত "পঞ্চশীল" ও "অষ্টশীল" পালন করে। এতদ্ব্যতীত জীবনে অন্ততপক্ষে একবার করিয়া প্রত্যেকে নিজেকে শুচি করিবার জন্য বৌদ্ধসমাজ প্রচলিত অস্থায়ীভাবে "শ্রমণ" হয়।

চাকমা জাতিটি যদিও বর্ত্তমানে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করিতেছে তবুও তাহাদের কথায় ও পুরানো ইতিহাস প্রমাণিত ঘটনায় তাহারা সেই দেশের লোক নয়। বাহির হইতে প্রতাপশালী ও অত্যাচারী রাজার ভয়ে ও বৌদ্ধের ব্যতি

(কথিকা)

শ্রীসুরেখা রায় চৌধুরী

বয় ওকে ঘরের মধ্যে পৌঁছে দেয়। একটা সোফার ওপর এলিয়ে শুয়েছিল মাদমোয়াসেল ওফেলিয়া। দুরাদ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ও দাঁড়িয়ে উঠে বলে "এই যে বসিয়ে দুরাদ। আমি এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম।" "সত্যি, সত্যি বলছেন!" ব্যগ্র কণ্ঠে দুরাদ প্রশ্ন করে। "মিথ্যে বলে আমার লাভ" প্রশান্তভাবে মাদমোয়াসেল উত্তর দেয়। দুরাদ যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পায়। বেশী কিছু সে বলতে পারে না—"বহু ভাগ্য আমার বহু ভাগ্য", সে আস্তে আস্তে বলে। হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে কুমারী ওফেলিয়া বলে "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কিছু পান করুন।" বলার সঙ্গে সঙ্গে ও একটা দড়ি ধরে টান দেয়। মুহূর্ত্তে পরে বয় ঘরে ঢোকে। একটা ট্রে ওদের সামনে বসিয়ে নিঃশব্দে সে চলে যায়। একটা গ্লাসে খানিকটা স্যাম্পেন ঢেলে দুরাদের দিকে এগিয়ে দেয় ওফেলিয়া। দুরাদ তার সবটুকুই পান করে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে মাথা নীচু করে বলে—"আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল—শোনবার সময় হবে কি!" "হ্যাঁ নিশ্চয় হবে" কুমারী উত্তর দেয়। এরকম উত্তরে ও একটু ঘাবড়ে যায়। তবুও একটু হেসে বলে—"এই এই কথাটা এমন কিছুই নয়। আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি যদি আমায় ভালবাসেন তাহলে আমাদের বিবাহের কথাটা পিতার কাছে পাড়তে পারি।" কথাটা যে এমন সহজ করে বলতে পারবে দুরাদ স্বপ্নেও তা ভাবতে পারে নি। কথাটা বলে ওর বুকটা হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু কথাটা শুনে মাদমোয়াসেলের ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায়। সে সোজা হয়ে বসে বলে "আপনি আমায় বিবাহ করতে চান?" দুরাদ ঘাড় নাড়ে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ওফেলিয়া স্পষ্ট করে বলে—"কিন্তু আপনার প্রস্তাব আমি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি। জানেন আমি বোর্বোঁ বংশের মেয়ে। আমি ভেবে পাই না আপনি আমায় কি করে ও কথা বললেন! একটা সাধারণ লোককে বিবাহ করবে বোর্বোঁ বংশের মেয়ে। সমুদ্র স্নানের সময় আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন বলে আমি আপনাকে একটু খাতির করি। তা যে আপনাকে এতদূর দুঃসাহসী করতে পারে এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। যান আর কোন কথা নয়। আর আমার বাড়ীর ছায়া মাড়াবেন না। তীব্রভাবে কথাগুলো বলে ওফেলিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ম্লান মুখে দুরাদ প্রাসাদ ত্যাগ করে। এতখানি রূক্ষ ব্যবহার সে আশা করে নি। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অশ্রুসজল চক্ষে সে একবার প্রাসাদের দিকে তাকায়। তারপর হাত তুলে "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!" বলে একদিকে চলে যায়।

* * * * *

কয়েক বৎসর পরে। ফ্রান্সের চারিদিকে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলে উঠল। কত লোক যে তাতে আত্মাহুতি দিলে তার আর ইয়ত্তা নেই। দুরাদও এই বিদ্রোহে যোগ দিলে। সেদিন রাত্রে সে জেলখানার একটা কুঠরীর বাইরে বসে পাহারা দিচ্ছে; এমন সময়ে একটা করুণ কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল। ভেতর থেকে কে যেন বলছে, "ওঃ ভগবান, আর যে সইতে পারি না।" দুরাদ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দেখে ওফেলিয়া হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে। আস্তে আস্তে দুরাদ ডাকলে "ওফেলিয়া," ওফেলিয়া চমকে পিছন ফিরে দেখে দুরাদ। সে ছুটে এসে দুরাদের দু'পা জড়িয়ে ধরে বলে—"আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!" দুরাদ আস্তে আস্তে পা টেনে নিয়ে বলে "হ্যাঁ তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই এসেছি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও।" "দুরাদ! দুরাদ! তোমার এত দয়া!" ওফেলিয়া আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে; তারপর কণ্ঠলগ্ন হয়ে দুরাদকে চুম্বন করে। মুহূর্ত্তে দুরাদ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর সংযত হয়ে বলে "আস্তে আস্তে, বেরিয়ে এস।" ওফেলিয়া তার পেছন পেছন কারাগৃহ হতে বেরিয়ে যায়। গোটাকতক ঘোড়া এক জায়গায় বাঁধা ছিল। দুরাদ তার একটাকে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলে "ওফেলিয়া, এই ঘোড়াটা খুব দ্রুতগামী। আধ ঘণ্টার ভিতর তোমাকে সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি যাও—আর দেরী কর না।" "কিন্তু তুমি?" ব্যগ্র কণ্ঠে ওফেলিয়া প্রশ্ন করে। ম্লান হেসে দুরাদ বলে—"আমি—আমি। যাও, যাও দেরী কর না। কেউ এসে পড়লে বিপদ হবে।" দ্রুতগামী ঘোড়ার ওফেলিয়াকে নিয়ে তীরবেগে ছুটতে থাকে। দুরাদ ম্লান দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ক্যাম্পে চলে যায়।

পরদিন প্রকাশ পেল ডিউক অব সস্‌পেনির কন্যা মাদ-মোয়াসেল ওফেলিয়া, প্রহরী দুরাদের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তখনি দুরাদকে বন্দী করা হ'ল। হাসামুখে দুরাদ মৃত্যুবরণ করলে। তার রক্তে গিলোটিন যখন রাঙা হয়ে উঠল, ওফেলিয়া তখন নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছে।

এফেল টাওয়ারের পতাকা

এফেল টাওয়ারের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় যত রকম পদের সৃষ্টি হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও অসাধারণ তাহার ভিতর **হইল** পতাকাটির পরিচর্যায় নিযুক্ত মহিলাটির চাকুরী। এই পতাকা টাওয়ারের উচ্চতম শিরে উড্ডীন—মাটি হইতে প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চে। মহিলাটি সারাজীবন ঐ ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার যথাযথ রক্ষণে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। ৩৫ বৎসর ধরিয়া সে আর অন্য কোন কাজ করে নাই—তাহার 'ডিউটি' হইল রাত্রিতে।

সারাদিন বৃহৎ পতাকাটি মহাশূন্যের দণ্ডের গায়ে ঝুলিয়া বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে—প্যারী শহরের সকল অংশ হইতে তো নজরে পড়েই, এমন কি, সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্যাস্ত কালে পতাকাটি নামাইয়া আনা হয়।' লড়াইতে আহত পতাকার চিরগুলি তখন মহিলাকে সেলাই করিয়া দিতে হয়। কারণ প্রভাতে যখন পুনরায় উহাকে উচ্চে তুলিয়া দেওয়া হইবে, তখন যেন ছেঁড়া না থাকে। সারাদিনটি যদি থাকে ঠাণ্ডা - প্রবল বায়ুপ্রবাহ-বিহীন, তবে মহিলাটির আর করিবার থাকে না কিছুই, সেইরাত্রি সে আরামে ছুটি উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু ঝড়-ঝঞ্জা বা বাত্যা থাকিলে অথবা প্রবল বারিপাত হইলে পতাকার গায়ে চির দেখা দেয় অসংখ্য—মহিলারও আর কাজের অন্ত থাকে না। কখন কখন এমন হয় যে, রাত্রি বারটা-একটা পর্যন্ত তাহাকে সেলাই করিয়া যাইতে হয়।

তবে সুবিধার বিষয় এই যে, ঐ মহিলার এই প্রকার কঠোর পরিশ্রমের রজনী খুব বেশী আসিতে পারে না। কারণ এফেল টাওয়ার-পতাকার জীবন ক্ষণস্থায়ীই বলিতে হইবে, যেহেতু পতাকা জীর্ণ ও অকর্মণ্য হইবার একটা গড়পড়তা সময় ধার্য করা আছে। বাঁধা-ধরা নিয়ম রহিয়াছে যে, দুই মাস অন্তর নূতন পতাকা বদল করিয়া দেওয়া হইবে। দুই মাসের ভিতর পতাকার যাহা কিছু অনিষ্ট হইবে দিনের প্রখরতায়, তাহাই শুধু মেরামত করিতে হইবে।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হস্তী

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তী হইল আফ্রিকাবাসী। এলিফ্যাস এফ্রিকেনাস (Elephas Africanus) বার ফুট উচ্চ এবং ওজনে সাড়ে ছয় টন পর্যন্ত হইতে জানা গিয়াছে। যদিও কাহারও কাহারও মতে ১৪ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হস্তী নাকি আফ্রিকায় ছিল, কিন্তু তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১০ ফুট উঁচু হাতী হামেশাই দেখিতে পাওয়া যায় আফ্রিকার বনে আজিও। দাঁতও উহাদের তেমনই ভারী—২৩৫ পাউণ্ড ওজনের দাঁত অবধি আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। ভারতের হাতীর দাঁত ১০২ পাউণ্ড পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। **মলয় উপদ্বীপ অঞ্চলে ১০ ফুট হাতী কখনও দেখা যায় নাই।**

জুতা ও স্মারক দৌত্য

জেনারেল চিয়াং কাইশেক ও মাদাম চিয়াং কাইশেকের ভক্ত-সংখ্যা অগণিত। এজন্য নানা প্রকার আবেদন-নিবেদন সম্বলিত চিঠি তাঁহারা পান হাজারে হাজারে—ঠিক যেমন প্রসিদ্ধ সুন্দরী সিনেমা-তারকা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকে। বীর-বীরাঙ্গনার পূজারী, সমর্থক, স্মারক-নিদর্শন সংগ্রহকারী হিতৈষী বন্ধু, প্রতিপক্ষীয় এই প্রকার সংখ্যাতীত নর-নারীর লিপি আসিয়া পৌঁছে জেনারেল ও মাদামের নিকট।

হাঙ্কাউয়ের পতনের পর কিন্তু চীনের এই নেতা ও নেতৃপত্নীর ডাকের বহর যেন কমিয়া যায়—বোধ হয় নিরাপদে পৌঁছে কিনা এই সংশয়ে। বিশেষ করিয়া সেই সময়ে জেনারেল ও মাদামের ঠিকানার কোন স্থিরতা ছিল না। পরে যখন তাঁহারা চুংকিং-য়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন কয়েক মাস ধরিয়া, তখন আবার এই 'ফ্যান্ মেইল' বৃদ্ধি পাইয়া পুরাতন আকার ধারণ করিয়াছে।

এই সকল চিঠি বাছিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়া জেনারেল ও মাদামের মত গ্রহণ করিয়া উত্তর দান অথবা উহার নির্দেশ মত আবেদন মঞ্জুরের ব্যবস্থা—এই সকল কার্য করিবার জন্য বিশেষ সেক্রেটারিয়াল ষ্টাফ রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অতি দূরতম অঞ্চল হইতেও বহু চিঠি আসিয়া থাকে। অনেকেই চিঠি লিখে এই প্রকার একটি মহৎ ব্যক্তির নিকট হইতে জবাব পাইবার আশায়, কারণ ঐ নিদর্শন লইয়া সে গর্ব করিতে পারিবে উচ্চ সমাজে চলাফেরা করিবার। কেহ এই প্রকার চিঠি পাওয়া গৌরবের বিষয় মনে করিয়াই চিঠি লিখে। কেহ কেহ (ইহাদের সংখ্যাই বেশী) চিঠি লিখে—এই দম্পতির ব্যবহৃত যে কোনও একটি জিনিষ পুণ্য-স্মৃতিরূপে সযত্নে রক্ষা করিতে।

জেনারেল এই সকল অযাচিত পত্র-লেখকদের ভিতর স্মৃতি-প্রতীক-ভিখারীরাই সর্বাপেক্ষা বিরক্তিকর। ফটোগ্রাফ অনেকে চাহে, তাহা তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি একজন আমেরিকান চাহিয়া পাঠাইল জেনারেলের ব্যবহৃত একজোড়া পুরাতন জুতা, দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে এক ব্যক্তি চাহিয়া পাঠাইল মাদামের পুরাতন পাজামা—এই সকল অদ্ভুত চাহিদা মিটান সোজা কথা নয়।

আমেরিকার ওহিও হইতে একটি ১০ বৎসর বয়স্ক বালিকা আবেদন জানাইল জেনারেলের একটি গলবন্ধ (Cravat) পাইবার জন্য। কিন্তু জেনারেল কোন ক্র্যাভাট ব্যবহার করে না, কাজেই বালিকাকে অন্য কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া বহু চিঠি আইসে আবিষ্কর্তাদের নিকট হইতে অতি ভয়ানক বোমা তৈরীর গোপন ফরমূলা, ফিল্ড রেডিওর নূতন পরিকল্পনা নূতন

কৌশল চিত্রসহ হামেশাই প্রেরিত হয়। অন্যান্য সমরাস্ত্র সম্বন্ধেও নূতন আবিষ্কারের বার্তা খুঁটিনাটি সহ জানান হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু জেনারেলের উপকার করা।

বহু দেশ হইতে লোকেরা আবেদন জানায়, চীনের সমর বিভাগে যোগদান করিয়া যুদ্ধে সাহায্য করিতে। চিকিৎসক উড়োজাহাজ চালক, মোটর চালক প্রভৃতিই এই প্রকার পত্র লেখে বেশী।

জাপানীগণও পত্র লেখে। কেহ গালিগালাজ করিয়া চিঠি দেয়। কেহ বা নামধাম গোপন রাখিয়া অথবা ছদ্মনামে জেনারেলের তারিফ করে ও যুদ্ধ চালাইতে উৎসাহ প্রদান করে।

সেক্রেটারীগণ সকল চিঠিরই উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করে। গুরুত্বমূলক চিঠির উত্তর জেনারেল বা মাদাম স্বয়ংই প্রদান করে। অনেক চিঠির জবাব তাহারা মুখে মুখে বলিয়া দেয় সেক্রেটারীকে।

এই প্রকার ডাক-বাহুল্যে জেনারেল বা মাদাম একটুও বিরক্তি প্রকাশ করেন না। বরং তাহারা মনে করেন—চীনের এই যুদ্ধে বিশ্বের প্রায় সকল দেশই সহানুভূতিসম্পন্ন চীনের প্রতিই, তাহারই অভিব্যক্তি এই প্রকার অগণিত চিঠিপত্রে। এই প্রকার চিঠির আদান-প্রদান তাহাদের দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়াই জেনারেল ও মাদাম চিয়াংকাইশেক মনে করিয়া থাকেন।

চুরি—না, বাহাদুরী ?

নামটি তাহার লিট্‌ল সান্ (Little Sun) চিরটা জীবন অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সের প্রায় পনর বৎসরকাল সে কাটাইয়াছে চৌর্যবৃত্তিতে হাত পাকাইয়া। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে যখন জাপানীগণ মধ্য চীনের ইয়োচাউ শহরটি অধিকারের তোড়জোড়ে নিরত—সে গুজব ছড়াইয়া পড়িল। লিট্‌ল সান্ এইবার তাহার পনর বৎসরের অকাজের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পণ করিয়া বসিল নিজেকে নিশ্চিতই নিয়োজিত করিবে আসন্ন অভিযানের বিরুদ্ধে বাসভূমি ইয়োচাউ রক্ষার কাজে আর অগোণে যাইয়া সমর বিভাগের মজুররূপে চাকরী লইল। ইয়োচাউ একটি রেল ষ্টেশন—হাংকাউ এবং চাংসার মধ্যবর্তী। ফৌজের সঙ্গে সে রওনা হইল। উদ্যমে সে অতুলনীয়—সাহসেও কমতি যায় না, কিন্তু তিন মাসের একঘেয়ে জীবন তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। মোট বহিয়া ফৌজের পিছনে পিছনে দিনের পর দিন কাটাইতে আর তাহার ভাল লাগে না। ভগবান বোধ হয়, তাহার আকুতি শেষটায় শুনিয়া ফেলিলেন। তাই ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসের এক রাত্রিতে কি রকম করিয়া সে আসিয়া হাজির হইল জাপানী লাইনের ভিতরে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। লিট্‌ল্ সান্ জীবনে সে রাতের অভিজ্ঞতা ভুলিবে না। গ্রেপ্তার হওয়া মাত্র দুইজন জাপানী প্রহরী তাহাকে লইয়া হাজির করিল খোদ কমাণ্ডারের সমুখে। তখন চলিল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কিন্তু সে নির্বাক। জাপানী সৈনিকেরা প্রহারের দাপটে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু লিট্‌ল্ সান্ ঠোঁট কামড়াইয়া সকল নির্যাতন নীরবে বরদাস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে দেহ তাহার অবসন্ন হইয়া আসিল—প্রহারে জর্জরিত হইয়া চেতনা হারাইল।

কতক্ষণ পরে, তাহা তাহার হুঁস নাই, যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল চারিদিকে কেবল কালো আঁধার—তবে হাত দুইটি তাহার পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা এবং যে কুঁড়ে ঘরটিতে সে রহিয়াছে সেটি নিশ্চয়ই গোশালা, কারণ গন্ধেই তাহা মালুম করাইয়া দেয়। অকস্মাৎ পাশের এক গৃহ হইতে হাসির উচ্চরোল তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। বুঝিল, সে গৃহে নিশ্চয়ই জাপানী সেনারা মজলিশ জমাইয়াছে। তাহার উপস্থিত দুর্দশা—তদুপরি জাপানীদের হাস্য-কৌতুক হৈ হল্লা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

ঘরের মেঝেয় গড়াইতে গড়াইতে কি একটা শক্তপানা পদার্থ পায়ে ঠেকিল। উহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিল—প্লেটের ভাঙা টুকরা। তখন সে কাজে লাগিয়া গেল। পায়ের আঙুলে ধরিয়া ঐ টুকরা দ্বারা দীর্ঘকালের চেষ্টায় হাতের বাঁধন কাটিল। চিরকালের অভ্যাস—সে অতি সন্তর্পণে জাপানী সেনাদের মজলিশের গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে গৃহে তখন কেহ ছিল না, ঘরটিও আঁধার। হাতড়াইতে হাতড়াইতে টেবিল পাইল একটি। বাস্! উহার উপর হইতে একটা ব্রিফ্ কেস্-পানা ব্যাগ লইয়া বাহির হইল। শত্রুশিবির হইতে একটা কিছু না লইয়া গেলে সে কি বলিয়া নিজ কমাণ্ডারকে বুঝাইবে—সে কোথায় ছিল ঐ রাত্রি।

অন্ধকারে সে বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই গৃহ হইতে আন্দাজ ২৫০ মিটার দূরে পৌঁছিলে জাপানী প্রহরীরা টের পাইয়া গুলী ছুড়িল। তাহার আনুমানিক প্রয়াসে এড়াইল, কিন্তু একবার একটা গুলী পায়ের আঙুল ঘেঁসিয়া গেল। তাহাতেও সে দমিয়া গেল না, বরং সে আরও দ্রুত ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে ভোর রাত্রিতে আসিয়া আপন ফৌজের আস্তানায় পৌঁছিল। কিন্তু এমনই ক্ষুধাকাতর ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে সে প্রথম সারির প্রহরীদের পায়ের গোড়ায় বেহুঁস হইয়া পড়িয়া গেল।

ভোরবেলা সে যখন অতি কষ্টে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিতে পাইল সে বন্দী। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পলায়নের সন্দেহে তাহার এই দশা। অথচ ব্যাগটিও উধাও। হতাশ হইয়া সে প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল।

একে ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাহার উপর এই সঙীন্ অবস্থা। তাহার ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রহরী আসিয়া জানাইল কমাণ্ডারের হুকুম। লিট্‌ল সান্ কাঁপিতে কাঁপিতে ফৌজের সর্বময় কর্তার নিকটে গেল। আরও তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল কমাণ্ডারের মুখে মুচকি হাসি দেখিয়া। বিচারকদের ঐ হাসিটি কিরূপ ভয়ানক তাহা তাহার জানিতে বাকি নাই।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন। লিট্‌ল সান্ জীবনে এইবার সব সত্য কথা বলিল। সব শুনিয়া কমাণ্ডার বলিলেন—বাহাদুর!

এই নাও ১০০ ডলার। আজ থেকে তুমি আমাদের ফৌজ-মজুর দলের সর্দার!

লিট্‌ল সান্ বিশ্বাস করিতে পারে না সহসা। সে স্বপ্ন দেখিতেছে না ত! দুর্ভাবনায় সে নিজের চুল নিজেই টানিয়া ছিঁড়িতে চেষ্টা করে। এমন সময় কমাণ্ডার বলেন—তুমি যে ব্যাগ এনেছ তাতে আছে চমৎকার সামরিক সংবাদ জাপানীদের তরফের।

লিট্‌ল সান্ এখন যাহাকে পায়, তাহাকেই এই ঘটনা বলিয়া বুকটা হাল্‌কা করে এবং ঘটনা বলা হইয়া গেলে বিজ্ঞের মত মন্তব্য করেঃ—"জীবনে অন্তত এই একবার আমি চুরি করতে পেরেছি—যা বে-আইনী নয়!"

কনের মাতাকে বিবাহ

মার্কিনের নিউ হ্যামশায়ার অঞ্চলে লিবেনন নামে ছোট্ট একটা শহর আছে। ২৬ বৎসর বয়স্ক রেমণ্ড সোয়েইন্—২৭ বৎসর বয়স্ক এক খঞ্জ নারীর প্রেমে পড়ে। তাহাদের বিবাহ দিন ধার্য হয়, বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্বে প্রেমমোহিত জীব দুইটির হয় কলহ। ফলে কনেটি আর বিবাহে সম্মত হয় না। সোয়েইন্ বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও কনের মত পরিবর্তন করিতে অপারগ হয়। শেষে এতটা হতাশ ও উন্মাদপ্রায় হইল হবু বরটি যে, সে নানা প্রকার আক্ষেপ আর্তনাদ করিয়া এবং কনের মাতাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব সহ এক চিঠি লিখে। কনের মাতা অগৌণে বিবাহে স্বীকৃত হয়। এই ৬৪ বৎসর বয়স্কা মহিলার সহিত সোয়েইনের বিবাহ কাউণ্টী গীর্জায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৪৩২ বৎসর জ্বলন্ত বাতি

পিয়েত্রো টোস্কল নামীয় এক ভেনিসবাসী বিস্কুট-নির্মাতার প্রাণদণ্ড হয়, লুণ্ঠন করা ও এক প্রৌঢ়া মহিলার উপর অত্যাচার করিবার আরোপিত অপরাধে। অতি তাড়াতাড়ি বিচার সাঙ্গ করা হয় সাক্ষ্যাদির প্রতি তেমন মনোযোগ না দিয়া। নির্দোষ টোস্কলের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হইবার দুই দিবস পরে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া প্রকৃত অপরাধী আসিয়া আত্মসমর্পণ করে।

তখন ভেনিসের দশজন বিশিষ্ট অধিবাসী ম্যাডোনা মূর্তির সম্মুখে প্রকাশ্য রাজপথে পিয়েত্রো টোস্কলের আত্মদান স্মরণীয় রাখিবার জন্য এবং মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করেন। ঐ বাতি ৪৩২ বৎসর পূর্বে প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, আজিও তাহা প্রজ্বলিত রাখা হইতেছে।

পথ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমি পথিক হ'য়ে এ জগতে জন্ম নিলুম।
ধরার ধূলিপথ আমার মন হরণ করেছে;
অন্তহীন পথ নিরন্তর হাত ইসারায় আমায় ডাকে,
আমি চলি।
আমি চাই পথের সাথে মিতালি করতে
শুনতে তার হ'তে দুটি মিষ্ট সম্ভাষণ
শুধু চলার সে শ্রান্তি আসে!
কিন্তু পথ আমায় করেছে হতাশ
বন্ধু সে হবে না, ধরা দেবে না সে আমার বাহুবন্ধনে
সে শুধু মরীচিকার মত ছলনা করবে,
নিয়ে যাবে দূর থেকে দূরে;
দিগন্তে তাই সাত রঙের কুহক সৃষ্টি করে রেখেছে সে!
কিন্তু আর কতকাল?

চলতে চলতে দেহের বাঁধন যখন আলগা হবে,
ঘুমের জড়তা ধরবে চোখে,
মৃত্যুর হিমশীতল পরশে সব হবে নিস্পন্দ অসাড়;
রথচক্রের ধ্বনি বাতাসে হবে না আর ধ্বনিত,
আমার অগ্রগতির পথে যেদিন পড়বে একটা শান্ত যতি,
সেদিনো কি সে আর এম্নি করে দূরে রাখতে পারবে ঠেলে
পারবে না।
দিতে হবে সেদিন তার বুকেই ঠাঁই;
তার পেলব দুটি বাহুলতা মেলে দেহখানা আমার
টেনে নিতেই হবে
বলতে হবে ঃ বন্ধু, এস আলিঙ্গনে।
আমার জীবনে জন্মের মত সে-ও এক পরম ক্ষণ হবে!

আলো

(বড় গল্প)

শ্রীনীহার গুপ্ত ও কনক গুপ্ত

আলো! আলো!....

আজিও গভীর রাত্রে ডাঃ ধরমবীরের প্রতিরাত্রের মত ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া ঝর ঝর বরিষার ধারা নামিয়াছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু দেওয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বুঝিবা কোন বিরহীর বুক ভাংগা বিরহ বেদনার আভাষ জানায়।

এখনও যেন ঘরের নিস্তব্ধতার মাঝে সেই করুণ স্বর রণিয়া রণিয়া ফিরিতেছে;

আহা প্রিয় আমার! বড্ড ঘুম পেয়েছে না? বুকে মাথায় বড্ড লেগেছে না? কি করুণ ও হৃদয়দ্রাবী কাকুতি!

ওগো! আমি এসেছি! চেয়ে দেখ প্রিয় আমার! চেয়ে দেখ! সে আজ বছর দেড়েকের কথা।

ডাঃ ধরমবীরের এখনও পরিষ্কার প্রতিটি ঘটনাই মনে আছে। তিনি মাত্র মাস দুই এখানে, এই বাঁকুড়ার হাসপাতালের চার্জ্জ লইয়া আসিয়াছেন।

একদিন ভোরবেলা সবে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

এ্যাসিষ্টেণ্টের এক জরুরী ডাকে হাসপাতালে গেলেন।

স্থানীয় তরুণ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অমিয় মুখার্জি যার সহিত মাত্র কয়েকদিন আগে আলাপ হইয়াছে, দারুণ মোটর accident-য়ে আহত! অজ্ঞান!

ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেই দেখা গেল, Cerebral haemorrhage সেরিব্রাল হিমারেজ। সকল প্রকার ঔষধ ও চেষ্টার বাহিরে।

তথাপি যথাসাধ্য চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। কলিকাতার ঠিকানায় একটা তার করিয়া দিলেন।

পরের দিন বিধবা বোন, ছোট ভাই, স্ত্রী আসিল। প্রথমটায় তিনি একটু আশ্চর্য্যই হইয়াছিলেন, মুখার্জির যে স্ত্রী আছে, একথা ত তিনি তার কাছে শোনেন নাই।

......সকলে গিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং স্ত্রী স্বামীর মাথার কাছটিতে গিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে।......বেচারীর পা দুটা টলিতেছে! ডাঃ আগাইয়া ধরিতে গেলেন; এমন সময় নাক দিয়া দুফোঁটা রক্ত মুখার্জির বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও শেষ হয়ে গেল।

তারপর—

* * * * *

একটি নয় বা দুইটি নয়, তিন তিনটা পাশ দিবার পরও যদি সেই শতকরা নিরানব্বইটা মেয়ের মতই সুলতাকে শেষ পর্য্যন্ত বিবাহই করিতে হইলে, তবে এ ভূতের ব্যাগার খাটিবার কী এমন প্রয়োজন ছিল।

সুলতা রীতিমতই বাঁকিয়া বসিল, না কখনই না! বিবাহ সে প্রাণ গেলেও করিবে না! মাতা জাহ্নবী মুখ বাঁকাইলেন, সে আমি তখনি বলেছিলাম—এসব ম্লেচ্ছপনা মোটেই ভাল না; তা কর্তার তখন ভিমরতীতে ধরেছিল যে—নইলে!...... নাও এখন বিবির ঠেলা সামলাও!

বৌদি বেশ একটু ঠাট্টার সুরেই টানিয়া টানিয়া কহিলেন, তা ভাই তিনটে পাশ না দিই, গোটা দুইত' দিয়েছিলাম! আর যার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এসেছে সে নেহাৎ এমন কিছু গোমুখ্যু নয়, শোনা যায় গোটা চার পাঁচ পাশও দিয়েছে, আবার এদিকে জেলার একটা হাকিমও বটে!

সুলতাও বেশ একটু রাগিয়াই জবাব দিল, এ হাকিম বা পাশের কথা ত' হচ্ছে না। মোট কথা আমি বিয়েই করব না, তা সে পাত্র রাজাই হ'ন বা বিদ্যাদিগ্‌গজই হ'ন তাতে করে কি এসে যাচ্ছে! ও-সব ধরা-বাঁধার মধ্যে আমি নেই! যত সব nasty system (বিশ্রী নিয়ম)—সুলতা ঘৃণাভরে নাক সিঁটকাল! কেনরে বাপু একটা জীবন বিয়ে না করে কি কাটান এমনই কঠিন! বাবাঃ বিয়ে ত' আষ্টে পৃষ্ঠে শিকলের বাঁধন!

শিকলই বটে, তবে সেটা প্রেমের শিকল! বৌদি জবাব দিলেন।

আরে রেখে দাও তোমাদের ও কাব্য কথা!

কথাটা কিন্তু এইখানেই চাপা পড়িল না বা থামিয়াও গেল না। সুলতার পিতা খগেন্দ্রনাথ যখন স্ত্রীর মুখে সুলতার বিবাহ সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি তুলিবার কথা শুনিলেন, তিনি মৃদু হাসিলেন মাত্র। বলিলেন, মেয়ে আমার চিরকালই পাগলী। তোমরাই কেউ ওকে কোনদিন বুঝলে না গিন্নী! তোমরা নিশ্চিন্ত থাক! আমার মাকে আমিই বুঝিয়ে বলব'খন।

জাহ্নবী দেবী মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, ওই আদর দিয়ে দিয়েই তুমি মেয়েটার মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছ।

স্ত্রীর কথায় খগেন্দ্রনাথ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বস্তুত সাত ছেলের পর যখন এই মেয়ে সুলতা জন্মাইল, তখন হইতেই খগেন্দ্রনাথের সমস্ত স্নেহের ধারাটা যেন সহসা এই কন্যাটিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত রচনা করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল।

কন্যার প্রতি তাঁহার এই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিত, খগেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া জবাব দিতেন, আহা ও ক'টা দিনই বা আমার ঘরে আর থাকবে! ও-ত' পরের ঘর আলো করতেই আমার ঘরে এসে জন্মেছে। তবু যে ক'টা দিন এখানে আছে, একটু আদর-যত্ন করে নিই। এর পর বিয়ে-থা হলে যখন শ্বশুর ঘর করতে যাবে তখন হয়ত আনতে গেলে বলবে, এই দেখছ ত' বাবা, এত বড় সংসার আর আমি একা মানুষ! বলিতে বলিতে তিনি হয়ত পার্শ্বস্থিত দণ্ডায়মান কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিতেন, কি বলিস্‌, পাগলী? তখন তাই বলবি ত!

সুলতা ঘাড় দোলাইয়া জবাব দিত, 'হুঁ বিয়ে করলে ত! আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও না!'

খগেন্দ্রনাথ কন্যার কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, শুনলে! শুনলে একবার মেয়ের কথা! বিয়ে করবি নি কিরে! বিয়েটা যে মেয়ে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম'!

শৈশব ও কৈশোরের কোঠা ছাড়াইয়া সুলতা যখন ক্রমে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, জাহ্নবী খগেন্দ্রনাথকে কহিলেন, মেয়ে ত' বড় হল, এবার বিয়ের

যোগাড় দেখ। আর কতদিন মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখবে?

খগেন্দ্রনাথ কহিলেন, আহা! দুটো বছর যাক্ না গিন্নী! কেন বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ? এই অল্প বয়সেই একটা কাঁধের উপর জোয়াল চাপিয়ে কি এমন লাভ?

সুলতা যেদিন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ পড়িতে কলেজে গিয়া নাম লিখাইল জাহ্নবী দেবী কহিলেন, 'মেয়ে ত' ষোল পেরিয়ে সতেরয় পড়ল, আর কতকাল মেয়েকে এমন ধিঙ্গি করে রাখবে? এদিকে লোকের কথায় যে কান পাতা যায় না।

খগেন্দ্রনাথ কহিলেন, না, তুমি দেখছি মেয়েটাকে বাড়ী থেকে বিদেয় না করে আর সোয়াস্তি পাচ্ছ না!......আরে লোকের ত' ধর্মই ওই! কান পাতাই যদি যাবে, তবে আর 'লোকের কথা' বলছ কেন?......'লোকের কথা'র একমাত্র উপযুক্ত জবাব হচ্ছে, এক কান দিয়ে শোনা আর অন্য কান দিয়ে বের করা!

এর পর হইতে জাহ্নবী দেবী কন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেন ইচ্ছা করিয়াই কোন রকম গা দিতেন না!

সুলতা ক্রমে আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতে লাগিল। এবং শেষ পর্যন্ত বি-এও পাশ দিল। সুলতার বয়স এখন কুড়ির কোঠা ছাড়াইয়া একুশে পড়িয়াছে। এতদিন পরে সত্যই খগেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র দেখিতে লাগিলেন এবং অল্প চেষ্টাতেই বেশ একটি ভাল পাত্র জুটিয়া গেল! পাত্র পক্ষ মেয়ে না দেখিয়াই পাত্রী পছন্দ করিয়াছে। পাত্র হাকিম! বয়সও অল্প!

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সুলতা একটি শিক্ষয়িত্রী কাজের জন্য দরখাস্ত লিখিতেছিল, খগেন্দ্রনাথ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।—কি হচ্ছে মা?

একটা কাজের জন্য application (দরখাস্ত) করছি! পোস্টটা (চাকরী) ভালই! বেশ decent (ভদ্র গোছের) মাইনে দেবে!

খগেন্দ্রনাথ একবার মাত্র আড়চোখে কাগজখানার দিকে তাকাইয়া সম্মুখের চেয়ারখানি টানিয়া বসিলেন।—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল মা।

বিশেষ কি জরুরী? কন্যা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে তাকাইল।

তা হাঁ, জরুরী বইকি! তুমি বোধ হয় তোমার মার মুখে শুনে থাকবে—তোমার বিয়ের একপ্রকার সব ঠিক করেছি অবশ্য আমাদের দিনে এ-সব বিষয়ে বাপ-মা'র পছন্দই আমাদের বিনা বিচারে মাথা পেতে নিতে হয়েছে; কিন্তু সেদিনও আর যেমন নেই, সে নিয়মও আর তেমনি চলবে না!......এ যুগে এ যুগ-ধর্ম মেনেই চলতে হবে। আর বিশেষ করে যখন তোমাকে আমি শিক্ষিত করে তুলেছি, সেইজন্যই আজ তোমার নিজের মতামতটা প্রয়োজন। আমার মনে হয় পাত্র হিসাবে, ছেলেটি খুবই উপযুক্ত; তবে তুমিও ভেবে দেখ!—খগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—আমার আবার কাছারীর বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি উঠলাম।

বাবা!

কন্যার ডাকে খগেন্দ্রনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, আমার কি কিছু বলবে মা?

সুলতা কাপড়ের আঁচলের খুঁটটা বাঁ হাতের তর্জনীঃ জড়াইতে জড়াইতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমারও কিছু বলবার ছিল, বাবা।

বেশ ত' বল, তোমার কি কথা! খগেন্দ্রনাথ পুনরা চেয়ারটার উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন।

আমি ভাবছিলাম!.....সুলতা ইতস্তত করিতে লাগিল।

খগেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া শুধাইলেন, কি ভাবছিলে মা?

আচ্ছা বাবা! মেয়ে মানুষের এই বিবাহ ছাড়া কি আর অন্য কোন উপায়ই নেই?

না! বিবাহ মেয়ে মানুষকে করতেই হবে। তোমরা আজ-কালকার শিক্ষিতা মেয়েরা পাশ্চাত্যের হুজুগটাকেই আগে ধর আঁকড়ে। ভুলে যাও—সেদেশে এদেশে সমাজ-ব্যবস্থায় তফাৎ আকাশ-পাতাল। বিশেষত আজ তোমার অল্প বয়স! আর এই বয়সে একটা বয়সসুলভ চপলতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ধরে নাও তোমার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু পরে মোহের যখন মুক্তি হয়, তখন আসে তীব্র অনুশোচনা—কেননা, তোমার যুক্তিতে দৃঢ়সংকল্প যতটা ছিল, অনুপাতে অভিজ্ঞতা ছিল নেহাৎ কম।

কিন্তু বাবা, নিজের সমস্ত স্বাধীন ইচ্ছাটুকু বর্জন করে, আর একজনের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীনে সমস্ত কাজেই তার মুখাপেক্ষী হয়েই যদি থাকতে হল, তবে এতকাল ধরে এ শিক্ষারই বা কি প্রয়োজন ছিল বাবা? আর এইভাবে আপনাকে একটা স্বাধীন মতামত নিয়ে গড়ে তোলবারই বা কি দরকার ছিল?

এটা তোমার ভুল ধারণা মা। যা অসত্য, যা অন্যায়, তাকে চিরদিন সত্যের কাছে পরাভব মানতে হয়েছে। মনেঃ স্বাধীনতা কে কার হরণ করতে পারে মা?

স্বামী আর স্ত্রী, এরা কি আলাদা বা পৃথক পৃথক সত্তা মা, যে একে অন্যের কাছে অধীন বা পরাধীন হয়ে থাকবে? এ-যে একই বস্তুর দুইটি অংশ! বরং দেখতে গেলে মেয়ে মানুষ সকলের কাছেই পরাধীন, একমাত্র শুধু স্বামীর কাছেই সে স্বাধীন! তোমরা লেখাপড়া শিখেছ; শিক্ষার আলো পেয়েছ, তবে এ কথা কেন ভুলে যাও মা যে, স্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছাচারিতা নয়! স্বাধীনতার অর্থ সংযম! স্বাধীনতার অর্থ কর্তব্যপালনে একান্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়সংকল্প বা ইচ্ছা! তারপর একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, আর বিবাহের কথা যদি বল, ফুলের পূর্ণ পরিণতি যেমন ফলে, তেমনি নারীর চরম সার্থকতা বা পরিণতি মাতৃত্বে! বিবাহ এই চরম ও একমাত্র সত্য পরিণতির পথে সোপান বা সেতু! তুমি মা, তুমি স্নেহ, তুমি দয়া, তুমি মায়া, বিভিন্নরূপে তুমিই এই সংসারের মাঝে বিচরণ কর! কে জানে মা তোমা হতেই একদিন শঙ্কর, উমানাথ, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বীরা জন্ম নেবেন না! নিজেকে ত' তুমি বঞ্চিত করতে পার না মা? নারীর ধর্মই আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া! তোমাকেও ঠিক তেমনি আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হতে হবে মা! এখন আমার এ সমস্ত কথা

হয়ত তুমি ভাল করে বুঝবে না, হয়ত ভালও লাগবে না। আশীর্বাদ করছি, সেদিন যেন তোমার একদিন আসে, যেদিন বুঝবে 'বিবাহ' বলতে কি বুঝায় আর নারীর চরম সার্থকতা কিসে এবং কোথায়!

খগেন্দ্রনাথ উঠিয়া পড়িলেন, আমি এখন উঠি মা! আর একথাও তুমি ভুল না যে, তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে—বিবাহ তোমায় করতেই হবে! তবে বর্তমান পাত্র সম্বন্ধে যদি তোমার বিশেষ কোন আপত্তির কারণ থাকে, তবে আমি অবিলম্বেই এ সম্বন্ধ ভেঙে অন্য পাত্রের চেষ্টা দেখব। বলিতে বলিতে খগেন্দ্রনাথ ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

শেষ পর্যন্ত একপ্রকার নির্বিবাদেই সেই হাকিম পাত্রের সহিত সুলতার বিবাহ হইয়া গেল। সুলতার মাতা জাহ্নবী দেবীর শেষ পর্যন্ত বেশ একটা মনের মধ্যে ভয়ই ছিল, কি জানি শেষটা মেয়ে না একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইয়া বসে!

এ সংসারে খগেন্দ্রনাথই সুলতার সর্বপ্রকার ভরসা ও আশ্রয়স্থল ছিল। পিতাকে যেমন সে ভক্তি করিত বা ভালবাসিত, ঠিক তেমনি ভয়ও করিত। খগেন্দ্রনাথ লোকটাই ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী! সেই ছোটবেলা হইতে যখনই যে আব্দার সুলতা বাপের কাছে করিয়াছে, খগেন্দ্রনাথ হাসিমুখেই তখনি তাহা শুনিয়াছেন! ম্যাট্রিক পাশ দিবার পর কলেজে পড়ার বিষয় নিয়া মাতা যখন আপত্তি তুলিলেন, সুলতা পিতার নিকট গিয়া হাজির হইল। পিতা সুলতার ইচ্ছার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, বেশ ত' মা চল কালই তোমায় আই-এ ক্লাশে ভর্তি করে দিয়ে আসছি। কলেজের মেয়েরা হয়ত দল বাঁধিয়া কোন দূর স্থানে বেড়াইতে যাইবে, মাতা শুনিয়া প্রবল আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু খগেন্দ্রনাথের কাছে বলিতেই তিনি সানন্দচিত্তে সকল আয়োজন করিয়া দিলেন। চিরটা কাল যে পিতা, চিরহাসিমুখে তাহার সকল প্রকার আব্দার-আব্দার সহিয়া আসিয়াছেন, সেই পিতাই যখন বেশ জোর গলায় শুনাইয়া দিয়া গেলেন—বিবাহ সুলতাকে করিতেই হইবে, পিতার প্রতি একটা বিরাট অভিমানে সুলতার সারা বুকখানি ভরিয়া গেল! সে বিবাহের কথা লইয়া আর একটি উচ্চবাচ্য‌ও করিল না। সে পিতাকে খুব ভালভাবেই জানিত, যে কথা তাহার মুখ দিয়া একটিবার বাহির হইয়াছে তাহার আর নড়নচড়ন নাই!

শুভদৃষ্টির সময় অমিয় হাসিমুখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইতে গিয়া, স্ত্রীর নব আষাঢ়ের আকাশের ন্যায় মেঘভারানত মুখখানির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল!

বর-কন্যা বিদায়ের সময়, কন্যার অবনতমস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিবার সময় খগেন্দ্রনাথের গলাটা অশ্রুভারে বুজিয়া আসিল। তিনি কোনমতে আশীর্বাদ সারিয়া নিজের ঘরে গিয়া আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রীকে এমনি করিয়া বিদায় দিতে সত্যই বুঝি আজ তাঁহার সমগ্র অন্তরটাই হা-হা করিয়া উঠিতেছিল।

জাহ্নবী দেবী অমিয়র একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া অশ্রু-

খেয়ালী! ওর দোষ-ত্রুটি তুমি না ক্ষমা করলে আর কে করবে বল!

ফুলশয্যার রাতে বেশ একটু রাত করিয়াই অমিয় শয়নঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ঘরের দেওয়ালে, পালঙ্কে, মেঝেয়—চারিপাশের ফুলের যেন ছড়াছড়ি! একটা মৃদু তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসটাকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। খোলা বাতায়নপথে মাঝে মাঝে শীত-শেষের হাওয়া নেটের মশারীটাকে মৃদু মৃদু দোলা দিয়া যাইতেছে! সবুজ বর্ণের ঘেরটোপের আড়াল হইতে অনুজ্জ্বল একটা সবুজ আলোর মৃদু আভা সমস্ত ঘরখানি জুড়িয়া যেন একটা মায়া-স্বপ্ন রচিয়া তুলিয়াছে!

পালঙ্কের দুগ্ধফেনানিভ শয্যায় গা এলাইয়া সুলতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পরিধানে একখানি গাঢ় রক্তবর্ণের বেনারসী শাড়ী! বড় বড় জরীর ফুলগুলি আলোয় চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ফুলের গহনায় সুলতাকে আজ ভারী সুন্দর মানাইয়াছে!

অমিয় ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ধীরে অতি ধীরে পায়ে পায়ে শয্যার, একেবারে কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল! ঘুমের ঘোরে সুলতা পাশ ফিরিতে গিয়া সহসা অচমকা একখানি হাত অমিয়র গায়ে ঠেকিতেই ধড়ফড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

সুলতার এইভাবে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় অমিয় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে।

অমিয় তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিল, তুমি উঠ না, শোও!......

সুলতা আড়চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কহিল, 'না, আমার ঘুম হয়ে গেছে! আপনার জন্য অনেকক্ষণ ধরে জেগে বসে বসে কখন এক সময় ঘুমিয়ে গেছি!' সুলতার কণ্ঠস্বরে কোথায়ও এতটুকু জড়তা নাই!

অমিয় সুলতার মুখের দিকে তাকাইল, কেন?

আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে। ও কি! এখনও দাঁড়িয়েই আছেন যে? বসুন না এখানে, সুলতা হাত দিয়া শয্যার উপরে নিজের পাশের স্থানটি দেখাইয়া দিল।

অমিয় মৃদু হাসিয়া কহিল, না থাক, ব্যস্ত হবেন না! ......দাঁড়িয়ে থাকতে আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না ত'।

বা তাই কি কখন হয় নাকি? একজন থাকবে বসে, আর অন্যজন থাকবে দাঁড়িয়ে? না না, আসুন এখানে বসুন।

অমিয় আসিয়া সুলতার পাশেই পালঙ্কের উপর উপবেশন করিল।

দেখুন! কথাটা একটু অপ্রিয় হলেও, আমায় বলতেই হবে।

অমিয় সুলতার কথায় বেশ একটু আশ্চর্যই হইল! কি এমন অপ্রিয় কথা থাকিতে পারে যাহা একান্ত না বলিলেই নয়! সে মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার যদি তেমন কোন আপত্তি থাকে, তবে না-ই বা বললেন! কথাটা শোনবার জন্য আমার নিজেরও এমন কিছু ইচ্ছা বা ব্যগ্রতা নেই!

না না! কথাটা আমার বলতেই হবে। কেননা, আমি [illegible] মধ্যে এমন কোন misunder-

standing থাকে, যাতে করে আমাদের একে অন্যকে ভুল বুঝতে হয়!

বেশ! আপনার যখন একান্তই ইচ্ছা তখন বলুন।

দেখুন! আপনার সঙ্গে আমার এই বিবাহটা একপ্রকার বাবার ইচ্ছাতেই হয়েছে! বিয়েটা আমার; আর সেইজন্যই এই বিবাহে আমার নিজের মতামতের প্রয়োজনটাই ছিল ষোল আনা, অথচ সব চাইতে মজা এই যে, এই বিষয়ে আমার মতামতটার মর্যাদা কিন্তু তেমন কেউ দেন নি। কাজে কাজেই সেক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, আমি জিনিষটাকে আদপেই অন্তর হতে মেনে নিতে পারছি না! যেখানে আমার নিজের মনের সাড়া মিলছে না, সেখানে এমনি একটা মিথ্যে লোক-দেখান ধরা-বাঁধা নিয়ম-কানুনের মধ্যে আপনাকে জড়াতে আমি মোটেই রাজী নই! আমি জানি আপনি শিক্ষিত, আপনি আমাকে নিশ্চয়ই বুঝবেন!

অমিয় যতখানি না দুঃখিত হইল, তার চাইতে ঢের বেশী খুশী হইল সুলতার সবল মনের পরিচয়টুকু পাইয়া! সে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল,—'তা আপনার কি ইচ্ছা?'

সুলতা কহিল, লোক সম্পর্কে আমরা যেমন স্বামী-স্ত্রী তেমনি থাকব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমরা দু'জনে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেউ কাউকে চিনি না, কারও উপরেই কারও কোন দাবী-দাওয়া থাকবে না! সম্পূর্ণ মুক্ত, যে যার নিজ নিজ ইচ্ছাধীন!

অমিয় দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, বেশ তাই হবে! কিন্তু আজকার রাতটা?

সুলতা মৃদু একটু হাসিল, আজকের রাতে আর কোথা যাবেন? এ ঘরেই থাকুন, আপনার উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

অমিয় স্ত্রীর কথায় আর কোন উত্তর দিল না।

অমিয় কর্ম্মস্থল হইতে দশ দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল। পরের দিন সকালে তাহার দিদিকে ডাকিয়া কহিল, দিদি ভাবছি কালই বাঁকুড়া রওনা হয়ে যাব। অনেকগুলো ডিটেকসনের কাজ জমা করে রেখে এসেছি, ইন-চার্জ্জ হয়ে যে ছেলেটি এসেছে, সে একবারেই নূতন, সবে বিলেত হতে এসেছে মাত্র, কাজকর্ম তেমন কিছু জানেও না।

দিদি কহিলেন, সে কিরে? এরই মধ্যে যাবি!......এখনও ছুটির পাঁচ দিন বাকী!

অমিয় কথার উপর বেশ একটু জোর দিয়াই কহিল, না না, দিদি যেতে আমায় হবেই। বাধা দিও না!

সংসারে অমিয়র এই একটিমাত্র বিধবা দিদি ও একটি ছোট ভাই, বিনয়। বিনয় কোন এক যে সরকারী কলেজে বি-এ পড়ে। চাকুরীর জন্য আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরিতে হয় আর এদিকে বিনয়ের পড়ার ক্ষতি হয়, সেইজন্যই অমিয় কলিকাতায় একটা ছোট্ট বাটী ভাড়া করিয়া দিদি ও ছোট ভাইটির থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। মাঝে মাঝে ছুটী পাইলে দিদি ও ছোট ভাইটিকে আসিয়া দেখিয়া যাইত।

সুলতার কানেও একথা উঠিল।

কলিকাতার হর্ম্ম্যপুঞ্জের অন্তরালে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ তার মায়া স্বপ্ন বিকীর্ণ করিতেছিল। অমিয় একাকী ছাতে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মনের মধ্যে আজ অনেকগুলি চিন্তাই এক সাথে জট পাকাইয়া উঠিয়াছে। তাহার শান্ত একটানা জীবন পথে আজ এই যে প্রশ্নের ঝড় উঠিয়াছে, ইহার সমাপ্তি কোথায়?

সহসা কাহার ডাকে সে চমকাইয়া, পিছন ফিরিয়া তাকাইল, কে?

আমি সুলতা!

ও! আচ্ছা আমি যাচ্ছি; আপনি এখানে থাকুন, অমিয় স্থান ত্যাগ করিবার জন্য নীচের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল!

শুনুন!

আমায় ডাকছেন? অমিয় যেন বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হাঁ! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম!

আমাকে? কি বলুন!

বাড়ীতে শুনলাম, আপনি নাকি কালই কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন, অথচ এখনও আপনার পাঁচ দিন ছুটী বাকী!

অমিয় একবার মনে মনে ভাবিল বলে, তাতে তোমার এমন কি প্রয়োজন, আবার কি ভাবিয়া কহিল, হাঁ! কালই যেতে হবে আমায়!

সুলতা অমিয়র কথায় হাসিয়া উঠিল, কহিল, যেতে হবে! কিন্তু না গেলেও ত' চলতে পারে?

অমিয় গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, না চলতে পারে না; আর চলতে পারে না বলেই কালই আমায় যেতে হবে! তাহার কথার সুরে বেশ একটা কঠিন দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল!

কিন্তু দিদির একান্তই ইচ্ছা যে, এ-কটা দিন আপনি এখানেই থেকে যান।

না তা সম্ভব নয়! আচ্ছা আমি এখন নীচে চললাম, আমার কাজ আছে! আপনার আর অন্য কথা নেই ত?

না, সুলতা মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল।

অমিয় নীচে নামিয়া গেল!

সুলতা অনেকক্ষণ ধরিয়া একাকী অন্ধকার ছাতে পায়চারী করিয়া বেড়াইল! এক সময় ঝি আসিয়া কহিল, ওমা! বৌদি! আপনি এখানে, এদিকে দিদি যে আপনাকে খুঁজতে লেগেছে!

কই ঝি? আমি ত' তা শুনতে পাইনি। চল নীচে যাই!

সুলতা নীচে দিদিকে গিয়া শুধাইল, দিদি! আমায় ডেকেছিলেন?

দিদি অমিয়র ঘরে বসিয়া চারি পাশে কাপড়-চোপড় যাত্রা-পত্র সব ছড়াইয়া দিয়া একটা চামড়ার বাক্স গুছাইতেছিলেন! সুলতার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, হাঁ ভাই! অমুর বাক্সটা গুছিয়ে রাখতে হবে! কি কি জিনিষ যাবে একটু দেখে শুনে দাও!

সুলতা মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত' ওর বাক্স কোনদিনই গুছুইনি! চিরকাল ত' আপনিই গুছিয়ে দেন!

তা হোক ভাই! চিরকাল দিয়ে এসেছি বলে, আজও যে

(শেষাংশ ৬৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কয়েকটী অতি আধুনিক আবিষ্কার

(২)

রসায়ন শাস্ত্র

পদার্থ-বিজ্ঞানে নূতন নূতন আবিষ্কারের সংগে সংগে বিশেষত পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার পর হইতে আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রেও তাহার প্রভাব কম বিস্তারলাভ করে নাই। বিজ্ঞান-আলোচনার প্রথম অবস্থায় পদার্থে পদার্থে যে পার্থক্য করা হইত, আধুনিক গবেষণায় তাহা যে বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বস্তুত বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সংগঠন সম্পর্কে গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ যে আভাষ পাইয়াছেন, তাহাতে সকল পদার্থই মূলত এক বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করিবার নানাবিধ উপায় পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

জাঁ বাতিস্ত্ পেরাঁ
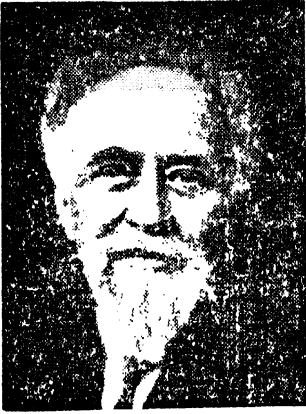
আমাদের এতাবৎকালের পরিচিত মৌলিক পদার্থের অনেকগুলিই ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'প্লাটিনাম' নামক ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও কোন কোন বৈজ্ঞানিক দাবী করিতেছেন। প্রাচীন কিমিয়াবিদ্গণের (alchemists) স্বপ্ন এইভাবে আজ যথার্থই বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে!

বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ্ মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণবিক ওজন ও রাসায়নিক গুণ অনুযায়ী উহাদের যে তালিকার প্রবর্তন করেন, তাহাতে সর্বাপেক্ষা হাল্কা 'হাইড্রোজেন' হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বাপেক্ষা ভারী 'ইউরেনিয়ম' পর্যান্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থের স্থান নির্দিষ্ট হয়। উপরোক্ত তালিকার ৮৫ ও ৮৭ সংখ্যক (য়্যালবামাইন এবং ভার্জিনিয়ম) মৌলিক পদার্থ দুইটির অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত না হইলেও, বাকি মৌলিক পদার্থগুলির অস্তিত্বে আজ আর কাহারও সন্দেহ নাই। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে যে নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, 'হাইড্রোজেন' পরমাণুর নিউক্লিয়স্ মধ্যে একটি মাত্র ধনাত্মক তড়িৎকণা রহিয়াছে, আর উহাকে কেন্দ্র করিয়া একটিমাত্র ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেক্‌ট্রন্ বিরাজ করিতেছে। 'ইউরেনিয়ম' পরমাণুর নিউক্লিয়স্ মধ্যস্থিত ধনাত্মক তড়িতের পরিমাণ তেমনি ৯২ এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া ৯২টি ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রন্ রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তালিকায় নির্দিষ্ট স্থানের সহিত মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণু মধ্যস্থিত নিউক্লিয়সের তড়িৎ পরিমাণের যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইতে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা হয় যে, ৯২ সংখ্যাবিশিষ্ট 'ইউরেনিয়ম' অপেক্ষাও নিউক্লিয়সে ঊর্ধ্বতর সংখ্যক তড়িৎকণাযুক্ত মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিবার কোন কারণ নাই। হয়তো সুদূর আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর অভ্যন্তরভাগে এইরূপ মৌলিক পদাথ অধিকতর পরিমাণে বিরাজ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল এভাবে চিন্তা করিলেও এইরূপ মৌলিক পদার্থের যথার্থ সন্ধান অনেকদিন পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই।

পদার্থের রূপান্তর সাধনে আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিগণ যেরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহার ফলে বহু অজানা জিনিষের সন্ধানই আমরা পাইয়াছি। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় বৈজ্ঞানিক এন্‌রিকো ফের্মি 'ইউরেনিয়ম' পদার্থটিকে 'নিউট্রন' নামক তড়িৎবিহীন বস্তুকণা দ্বারা সংঘাত করিয়া 'ইউরেনিয়ম' হইতে অধিকতর ভারী 'একা-রেহ্নিয়ম' (Ekarhenium) এবং 'একা-ওসমিয়ম' (Ekaosmium) নামক দুইটি ক্ষণস্থায়ী নূতন পদার্থের (তালিকা অনুযায়ী যাহাদিগকে ৯৩ ও ৯৪নং বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে) কণিকামাত্র লাভ করিতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু পদার্থ দুইটির স্বাভাবিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ইহা দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কারণ আল্‌ফা-কণা, ডিউটারন্ প্রভৃতি বস্তুকণা দ্বারা সংঘাত করিয়া বা অন্যবিধ উপায়ে যেমন বহু কৃত্রিম রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থ লাভ করা যায়, ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। স্বাভাবিকভাবে এইরূপ পদার্থ প্রকৃতির ভাণ্ডারে যথার্থই রহিয়াছে কিনা, এই প্রশ্নই তখন বিজ্ঞানীদের সম্মুখে প্রধান হইয়া উঠে। সুখের বিষয়, গত বৎসর (১৯৩৮) আমরা ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাঁ বাতিস্ত পেরাঁর নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। বিজ্ঞানে পেরাঁর দান সামান্য নহে। তিনি পরমাণবিক গবেষণাতেই জীবনের বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৯১০ সালে তিনি প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রাকৃতিক রসায়নের" অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। আণবিক গতিবিধি বিশেষত তরল পদার্থের মধ্যে দৃশ্যমান বস্তুকণার গতিবিধি (Brownian movement) সম্পর্কে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারও প্রাপ্ত হন। গত বৎসর তিনি "একা-রেহ্নিয়ম" সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, উক্ত পদার্থ শুধু কৃত্রিম উপায়েই প্রস্তুত হয় না; প্রকৃতির ভাণ্ডারেও উহা স্বাভাবিকভাবেই বিরাজ করিতেছে। পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ধৃত যে বিমিশ্র খনিজ ধাতু হইতে মাদাম ক্যুরি "রেডিয়ম" আবিষ্কার করেন, 'একা-রেহ্নিয়ম'ও তাহার মধ্যেই পাওয়া

যাইতে পারে। বিশেষ বর্ণচ্ছত্রমূলক পরীক্ষার সাহায্যে পেরো ও তাঁহার সহকর্মিগণ পিচ্‌ব্লেণ্ড বিশ্লেষণ করিয়া চারিটি অস্পষ্ট রেখার সন্ধান লাভ করিয়াছেন। ইহা যে "একা-রেহ্‌নিয়ম" পদার্থেরই অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে তাহাতে বৈজ্ঞানিকগণ নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

উপরোক্ত আবিষ্কার ব্যতীত রসায়নের অন্যান্য বিভাগেও গত বৎসর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকলের মধ্যে নানাপ্রকার কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেলুলয়েড্, সেলুলোস্, ব্যাকেলাইট, 'কেসিন' রেয়ন, প্রভৃতি কৃত্রিম পদার্থগুলির সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর সকলেরই পরিচয় রহিয়াছে। গত বৎসর রসায়নবিদ-গণ আবার কয়লা, জল ও বায়ুর সাধারণ উপাদান হইতে আর একটি নূতন কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার নাম "নিলন" (Nylon)। ইহা হইতে

এনারিকো ফের্মি

এরূপ সূক্ষ্ম তন্তু প্রস্তুত হইতে পারে, যাহা তুলনায় স্বভাব-জাত সিল্কের চেয়েও অধিকতর নমনীয় ও টেকসই হইয়া থাকে। "নিলন" হইতে আবার অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের তন্তুও প্রস্তুত করা যায়। ইহা দ্বারা আমাদের সেলাই করার সূতা, দন্তধাবনের ব্রাস্ প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কয়লার খনিতে যে জল জমে (waste water) তাহা পরীক্ষা করিয়া রসায়নবিদ্‌গণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, গত বৎসরের গবেষণার মধ্যে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খনি মধ্যস্থ "কার্বোন-মনোক্সাইড্" গ্যাস যে কিরূপ মারাত্মক তাহা সকলেই অবগত আছেন। কয়লা খনি দুর্ঘটনার মূলে এরূপ বিষবাষ্পের প্রভাব কম নহে। রসায়নবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কয়লা খনি-মধ্যস্থ উপরোক্ত জলে এক প্রকার জীবাণুর উৎপত্তি ঘটে। ইহারাই "কার্বোন মনোক্সাইড গ্যাস"কে "কার্বোন ডায়োক্সাইড্ গ্যাসে" পরিবর্তিত করিয়া খনিমজুরদের পক্ষে খাদগুলিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ করিয়া থাকে। কয়লা খনির আশঙ্কাজনক অবস্থার লাঘব করার কাজে এইরূপ জীবাণুর প্রভাব যে কম নহে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত গবেষণা ব্যতীত গত বৎসর আলাস্কাতে দুষ্প্রাপ্য "ইরিডিয়ম" ধাতুরও সন্ধান পাওয়া যায়।

জীব বিজ্ঞান

জীব বিজ্ঞানেও গত বৎসর কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এসমস্ত গবেষণার ফল সুদূর প্রসারী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। প্রাণীদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও প্রাণীকোষ বহুদিন পর্যন্ত জীবন্ত থাকে। অনুরূপভাবে উদ্ভিদকোষকে তাহাদের আসল তন্তু বা পেশী (Parent tissue) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা গিয়াছে, উহারাও বৎসরাধিককাল বেশ সজীব থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, এরূপ আহত বা বিচ্ছিন্ন কোষ হইতে এমন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, যাহা দ্বারা অনাহত কোষেরও বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। ক্যান্‌সার বা পোড়া ঘা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় উপরোক্ত গবেষণা বিশেষ আলোকপাত করিবে বলিয়া মনে হয়। জীবন্ত কোষগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি পূর্বে আংশিকভাবেও উত্তপ্ত করিয়া লইয়া ইহাদিগকে সত্বর ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া যায়, তবে পরে তুহিন শীতল তরল বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেও ইহারা জমাট বাঁধে না।

আধুনিক যুগে 'হরমোন' সম্পর্কেও জীব বিজ্ঞানে বহু গবেষণা হইয়াছে। গত বৎসর এ সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অনেক উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেহে "ট্রাইমিথিলে-মাইন" নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ স্বভাবতই বিরাজ করে। ইহারা উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহা অনেকটা "সেক্স-হরমোনের" অনুরূপ।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্যান্য গবেষণার মধ্যে উদ্ভিদ্ মূলের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কিত কয়েকটি গবেষণাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরূপ গবেষণার ফলে "ভিটামিন বি (১)" উদ্ভিদমূলের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শর্করা জাতীয় দ্রব্যও উদ্ভিদমূলের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। পরীক্ষায় জানা যায়, উপরোক্ত ভিটামিন ও শর্করা-জাতীয় পদার্থ উভয়ই উদ্ভিদের শীর্ষভাগে রহিয়াছে। জটিল ভিটামিন-ডি'র অংশবিশেষ নিকোটাইনিক এ্যাসিড প্রভৃতি ও উদ্ভিদপত্রের বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকে বলিয়া গবেষণায় প্রকাশ পাইয়াছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞানে গত বৎসর যে কয়েকটি আবিষ্কার হইয়াছে তন্মধ্যে বৃহস্পতি গ্রহের নূতন দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গেইলের ধূমকেতু (Gale's comet) বার বৎসর পূর্বে একবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। জ্যোতির্বিদগণ গত বৎসর আবার তাহার সন্ধান লাভ করেন। সাধারণত ধূমকেতুগুলি যখন পুচ্ছ দোলাইয়া সূর্যের নিকটবর্তী স্থান হইতে অসীম শূন্যে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর যাইতে পারে। যে সমস্ত ধূমকেতুর কক্ষ ডিম্বাকৃতি সাধারণত সেরূপ ধূমকেতুগুলিকেই বহু বৎসর পরে একবার করিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। যাহাদের কক্ষ অন্যরূপ তাহারা অসীম শূন্যে এমন স্থান দিয়া অতিক্রম করে, যে পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে পুনর্বার দেখিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যথানিয়মে যাহাদের ডিম্বাকৃতি কক্ষ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবার কথা, তাহাদের সময় পর্যন্ত জ্যোতির্বিদগণ

পূর্ব হইতেই গণনা করিয়া রাখিতে পারেন। নৈসর্গিক কোন কারণে বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহের আকর্ষণে ইহাদের চলার পথের ব্যতিক্রম না হইলে যথাসময়েই এ সমস্ত ধূমকেতুকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। এত বৎসর পরে 'গেইলের ধূমকেতুর' পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে সন্দেহ নাই।

সূর্যোন্নিত জ্বালা ও ছায়াপথ সম্পর্কেও গত বৎসর বিশেষ গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়। ছায়াপথের বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া 'হাইড্রোজেন' ও 'অক্সিজেন' গ্যাসের জ্বলন্ত উজ্জ্বল আলোরাশি বিরাজ করিতেছে বলিয়া জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি নূতন নীহারিকাগুচ্ছের সন্ধানও তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদানে সোডিয়ম পরমাণুর সন্ধান লাভ গত বৎসরের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বলা যাইতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার সুবিধার জন্য গত বৎসর বিশেষ কতকগুলি উদ্যোগ আয়োজনের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়। তাহাও এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ২০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং উহা কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত পালোমার পর্বতে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য-রশ্মি হইতে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহা যাহাতে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা যায় তজ্জন্য এক ব্যাপক কার্য তালিকাও গত বৎসর বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আলো

(৬৮২ পৃষ্ঠার পর)

আমায়ই গুছিয়ে দিতে হবে এর কি কোন মানে আছে! আর বিশেষ করে তুমি যখন ঘরের লক্ষ্মী এসেছ! দিদি সুলতার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন! কহিলেন, এবার হতে এ সব কাজ ত' তোমায়ই করতে হবে ভাই! এখন তুমি তোমার সব বুঝে পড়ে নিয়ে আমায় ছুটী দাও!

সুলতা কহিল, ও! আপনি বুঝি এমনি করে আমাদের ফাঁকি দেবার মতলব করেছেন? তা কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না দিদি!

দিদির চোখের কোলে জল আসিয়া গেল, কহিলেন, না ভাই ফাঁকি দেব কেন? তবে আমি ত' আর চিরটাকাল কিছু তোমাদের সাথে সাথে থাকতে পারব না! তোমার সংসার তোমায়ই ত' একদিন সকল ভার নিতে হবে; তাই শুধু বলছিলাম ভাই!

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুলতা দেখিল, ঘরের এক কোণে টিপয়ের উপর রক্ষিত সবুজ ঘেরটোপ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় একখানি চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত অমিয় কি একখানা বই পড়িতেছে!

এমন সময় দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা ঘোষণা করিল!

সুলতা বেশ একটু বিস্মিতই হইল! শয্যা হইতে উঠিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে অমিয়র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদু স্বরে ডাকিল, রাত অনেক হয়েছে, শোবেন না?

অমিয় এতখানি মনোযোগের সহিত পুস্তক পড়িতেছিল যে, প্রথমটা সুলতার ডাক শুনিতেই পাইল না। সুলতা আবার ডাকিল, শোবেন না?

এ্যাঁ! এইবারে অমিয় চমকাইয়া মুখ তুলিল!

রাত অনেক হয়েছে! শুতে চলুন!

ও রাত বুঝি অনেক হয়েছে! আপনি শোন গিয়ে! আমার ত' এখনও ঘুম পায়নি! ঘুম পেলেই শুতে যাব'খন!

কিন্তু সারারাত্রি জাগলে শরীর অসুস্থ হতে পারে!

না! রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে! ব্যস্ত হবেন না! যান শোন গিয়ে!

সুলতা আর কথা কাটাকাটি না করিয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল! কিন্তু বাকী রাতটুকু আর একটিবারের জন্যও সুলতা তাহার চোখের পাতাদুটি এক করিতে পারিল না!

তখনও ভাল করিয়া রাত্রির আঁধার কাটিয়া সুস্পষ্টভাবে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠে নাই! সুলতা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল! ওদিকে তাকাইয়া দেখিল, কখন এক সময় না জানি হাতের উপরই মাথা রাখিয়া ক্লান্তিভরে অমিয় চেয়ারটার উপর বসিয়া বসিয়াই বই কোলে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! টেবিল ল্যাম্পটা তখনও একইভাবে জ্বলিতেছে!

প্লাগ পয়েন্টটা খুলিয়া সুলতা আলোটা নিভাইয়া দিল! তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দরজাটা খুলিয়া, ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল! এবং যাইবার সময় দরজার কবাট দুটি ভেজাইয়া দিয়া গেল!

যাইবার সময় অমিয় বাড়ীর সকলের কাছেই বিদায় লইয়া গেল; শুধু সুলতার কাছেই বিদায় লইল না! সে যেন কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সুলতাকে এড়াইয়া গেল! সুলতা উপরের ঘরের জানালা দিয়া দেখিল, মালপত্র বোঝাই একটা ট্যাক্সি অমিয়কে লইয়া বাড়ীর গেট পার হইয়া গেল! সুলতা ধীরে ধীরে এক সময় নিজের শয়ন ঘরটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল! যাক্! বাঁচা গেল! এ যেন কোথায় একটা বিশ্রী অস্বস্তি অদৃশ্য কাঁটার মতই মনের মাঝে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। এখন একেবারে নিশ্চিন্ত!

(আগামীবারে সমাপ্য)

মুসলিম স্বার্থ

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা তুলিয়া আজ মুসলিম লীগ দাঁড়াইয়া আছে একটা মিথ্যা আদর্শের ভিত্তির উপর। মুসলমানের উপকার করিব—এই হইল, তাহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লীগকে প্রচার করিতে হইতেছে জাতি বিদ্বেষ, জাগাইয়া দিতে হইতেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও ঘৃণার ভাব। মুসলিম স্বার্থ মানে লীগপন্থীরা বুঝেন, ভারতের অপরাপর সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা অদ্ভুত ধরণের বস্তু। স্বাধীনতা মুসলিম স্বার্থ নয়, জনসাধারণের আর্থিক সুব্যবস্থা মুসলিম স্বার্থ নয়, যাহা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই উপকার করিবে, তাহাও মুসলিম স্বার্থ নয়। তবে মুসলিম স্বার্থ কি? লীগ-ওয়ালাদের বিবেচনায় মুসলিম স্বার্থ তাহাই যাহা ভারতের অপরাপর সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত করিবে এবং সেইজন্য সেই সম্প্রদায় যাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে। আর তাহাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যেগুলিকে মুসলিম নেতারা পুনঃপুনঃ মুসলিম স্বার্থ বলিয়া ঘোষণা করিবেন তাহাই মুসলিম স্বার্থ। যে দাবী পেশ করিলে হিন্দুরা বিরক্ত হয় না বরং অবিলম্বে দিতে স্বীকৃত হয়, যে দাবীর সহিত কংগ্রেসের দাবীর মিল থাকিয়া যায়, যে দাবীর বহর দেখিয়া বৃটিশ সরকার ঘাবড়াইয়া যান, তাহা কি কখনও মুসলিম স্বার্থ হইতে পারে? মুসলিম স্বার্থ এমন হইবে যে, তাহার নামোল্লেখমাত্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকিবে, তাহারা তারস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিবে আর বৃটিশ সরকার মুচকি-মুচকি হাসিয়া সেই দাবীর দুএকটা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যাহা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে, তাহা মুসলিম স্বার্থ নয়, কিন্তু যাহা বিভেদ ও কলহ সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে তাহাই প্রকৃত মুসলিম স্বার্থ। কংগ্রেস যাহার জন্য সংগ্রাম করিবে, তাহার বিপরীত দিকটা হইতেছে মুসলিম স্বার্থ। আজ কুড়ি বৎসর হইতে তথাকথিত মুসলিম নেতারা এইভাবে মুসলিম স্বার্থের সংজ্ঞা দিয়া আসিতেছেন এবং এইরূপে জাতীয়তা বিরোধী ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর আদর্শগুলিকেই মুসলিম স্বার্থ বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ হয়ত বলিবেন, ইহাতে তাঁহা-দের লাভ কি হইবে। কি লাভের আশায় যে তাঁহারা ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের নামে এরূপ দেশদ্রোহিতা করিতেছেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা মুস্কিল, কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের সরকারের নেক নজরে পড়িবার উদাহরণ দেখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না।

আজ প্রায় দুই যুগ হইতে কি-ভাবে মুসলিম স্বার্থের মিথ্যা বাহানাকে আমাদের তথাকথিত নেতারা নিজেদের ও সাম্রাজ্যবাদের কাজে লাগাইয়াছেন, তাহার দু-একটা উদাহরণ দেওয়া দরকার। স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারের দুইটা দিক আছে—একটা Positive দিক আর একটা Negative দিক। একটা হইতেছে, কোনটা আমার স্বার্থ তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা, আর অন্যটা হইতেছে, কোনটা আমার স্বার্থ নয় তাহাই প্রকাশ করা। কি আমার স্বার্থ নয় ইহা বলার চেয়ে কি আমার স্বার্থ তাহাই সর্বাগ্রে বলা দরকার। তাহা হইলে স্বার্থ সম্বন্ধে আমা-দের মনে একটা স্পষ্ট দ্বিধাশূন্য ও অকপট ধারণা জন্মিতে পারে। তাহাতে কাহারও মনে ধোঁকা লাগিবে না। কিন্তু যদি আমি স্পষ্টভাবে আমার স্বার্থের কথা না বলিয়া জিলিপির পাকের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাজে কথা বলি তবে আমার আদর্শ সম্বন্ধে অপরে পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবে না। ইহা আমার স্বার্থ-বিরোধী, উহা আমার জন্য অহিতকর ইত্যাদি কথাও সেই ধরণের। এরূপভাবে যে-সব লোক আসল কথা চাপা দিয়া বক্তৃতার আশ্রয় লয়, তাহাদের সহৃদয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মুসলিম লীগ আজ কয়েক বৎসর হইতে মুসলিম স্বার্থের ন্যাস রক্ষক বলিয়া দাবী করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানের প্রকৃত স্বার্থটা যে কি, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা না দিয়া কেবল বাজে কথা বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। যখনই কোন একটি কর্ম পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তখনই মুসলিম লীগ তাহার কার্যকারিতার দিকটা না দেখিয়া উহার Negative দিকটাকেই দেখিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা গোটা মুসলমান সমাজকে কোনদিন তাহাদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন নাই "মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী" "মুসলিম স্বার্থানুযায়ী নহে" এই ধরণের কথা পাড়িয়া গঠন-মূলক প্রত্যেক কাজকে বাধা দিয়া আসিতেছেন। এরূপ অস্পষ্ট ও হেঁয়ালিপূর্ণ কথাতে মুসলমান সমাজ নিত্য প্রতারিত হইতেছে। আমাদের তথাকথিত নেতারা ভাল করিয়া জানেন যে, মুসলিম-স্বার্থ ও হিন্দু-স্বার্থের মধ্যে মূলতঃ ও প্রধানতঃ কোন পার্থক্য নাই, কোন বিরোধ নাই এবং উভয়ই এক ও অভিন্ন। 'এক ও অভিন্ন' এই ধারণা যাহাতে কোনদিন মুসলমানের মনে জাগিতে না পারে, তাহারই জন্য তাঁহারা সব সময় দেখাইতে চান যে, আমাদের স্বার্থ বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী।

মুসলিম-স্বার্থ কথাটা সাধারণ মুসলমানের নিকট বড়ই মধুর। এই একটিমাত্র কথা উচ্চারণমাত্র তুমি সহজেই তাহা-দিগকে দেশ, জাতি, স্বাধীনতা, জন-কল্যাণ প্রভৃতি সমস্ত কথা ভুলাইয়া দিতে পারিবে। কি হইবে দেশ লইয়া, দেশের স্বাধীনতা লইয়া, জনকল্যাণ লইয়া যদি মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়ে? অর্থাৎ মুসলিম স্বার্থ দেশ নহে, দেশের স্বাধীনতা নহে, জনকল্যাণ নহে, উহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। তাই মুসলিম-স্বার্থের নামে একজন মুসলমান দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কোন কার্য করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। শুধু ভারতবর্ষে নহে, নিকট প্রাচ্যের যে যে দেশ সাম্রাজ্যবাদের কবলিত হইয়াছে, সেখানে একটিমাত্র কথা তথাকার মানুষ-গুলিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন করিয়াছে, আর তাহা হইতেছে, 'মুসলিম-স্বার্থ'। এই ধুয়াই খলিফার অধীনস্থ তুরস্ককে কোনদিনই এক হইতে দেয় না, এই ধুয়াই মিসরে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন দৃঢ় করিয়াছে। এই মুসলিম-স্বার্থের নামে রাজা আমানুল্লাহ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া-ছিলেন। আরব জগতে ইউরোপীয়ানদের যে প্রভাব বৃদ্ধি

পাইয়াছে, তাহারও মূল কারণ মুসলিম-স্বার্থের নামে তাহা-দিগকে নানা বিষয়ে প্রতারিত করা হইয়াছে বলিয়া। সুতরাং ভারতীয় মুসলমানগণ যে মুসলিম-স্বার্থের নামে প্রতারিত হইবে, আত্ম-কর্তব্য বিস্মৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? নির্দিষ্টপ্রার্থীকে ভোট না দিলে সে হয় কাফের আর লীগ ব্যতীত অন্য কোন দলে যোগ দিলে সে হয় মুসলমানের শত্রু ইহাই হইতেছে, মুসলিম-স্বার্থের মিথ্যা আদর্শের অনার্য পরিণতি। লীগের ভ্রান্ত নেতাদের প্রচারণার ফলে মুসলমান সমাজ আজ কোনওরূপ রাজনৈতিক আদর্শ পাইতেছে না। তাহারা ইসলামের নামে যে আদর্শের পরিচয় পাইতেছে, তাহা যে শুধু ইসলাম হইতে বিভিন্ন তাহা নহে, সে আদর্শ মনুষ্যত্বের দিক হইতেও ঘোর কলঙ্কের। দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বহু সমস্যা আজ নানাভাবে আলোচিত হইতেছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেক ও জ্ঞান মত ঐগুলির আলোচনা করে এবং বিভিন্ন দলে যোগদান করে। কিন্তু সেখানে মুসলমানের জন্য বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনার পথ বন্ধ। মুসলিম-স্বার্থ ও সংহতির নামে তাহাকে একইরূপ কথা বলিতে হইবে, একই দলে যোগ দিতে হইবে। নতুবা সে ইসলামের শত্রু। এই ভাবে স্বার্থসর্বস্ব নেতারা ইসলামকে ও মুসলমানকে জবাই করিতেছেন।

দেশের প্রত্যেক ভাল কাজের বিরুদ্ধে তাহারা আরম্ভ করিয়াছেন, একটা পাল্টা আয়োজন মুসলিম-স্বার্থের নামে। কংগ্রেস যখন ধীরে ধীরে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন তাহার অগ্রগতির পথে কণ্টক সৃষ্টি করা দরকার হইল, কিন্তু সে ভার লইবার লোকের অভাব হইল না। স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল মুসলিম-স্বার্থ। ভারত যদি স্বাধীন হয়, তবে মুসলমানের কি হইবে? ইংরেজেরা তবুও ভাল, তাহারা মুসলমানকে একেবারেই মারে নাই, কিন্তু ইংরেজশূন্য ভারতে হিন্দুরা যে মুসলমানকে আস্ত গিলিয়া খাইবে। সুতরাং হিন্দুদের হাত হইতে মুসলমানকে বাঁচাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল মুসলিম লীগ। এই মুসলিম লীগ সহযোগিতা করিল ইউরোপীয়ান বণিকদের সহিত, মডারেট হিন্দুগণের সহিত। এমন কি যে-সব হিন্দু আপনাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বিশ্বাসবান, তাহাদের সহিত মিতালি পাতাইতে মুসলিম লীগের বিবেকে বাধিল না বা মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া হইল না। কিন্তু যেই তুমি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছ, অথবা কংগ্রেসের কোন কার্য পরিক্রমা গ্রহণ করিয়াছ, অমনি তুমি হইলে ইসলামের শত্রু ও মুসলিম-স্বার্থের কণ্টক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কাহারা মুসলিম-স্বার্থের বিরোধী ছিল? যাহারা বঙ্গভঙ্গে বিরোধিতা করিয়াছিল, যাহারা চাহিয়াছিল সমস্ত বঙ্গকে এক করিয়া দেখিতে, তাহারাই সে-দিন ছিল মুসলমানের শত্রু, আর যাহারা চাহিয়াছিল বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিতে তাহারাই সে-দিন ছিল মুসলমানের মিত্র। তাই ঢাকার বর্তমান নবাব বাহাদুরের পিতা মরহুম সলিমুল্লাহ সাহেব সে-দিন ছিলেন খাঁটি মুসলমান আর মৌলানা আকরম খাঁ ছিলেন সেদিন মুসলমানের "জানী-তাহারা ছিল মুসলমানের স্বার্থের বিরোধী কিন্তু যাহারা বিদেশী বস্ত্র প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করিত, তাহারাই ছিল, খাঁটি মুসলমান এইভাবে যুগের পর যুগ ধরিয়া দেশের স্বার্থ ও মুসলিম-স্বার্থের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমা রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেশের সাধারণ স্বার্থের সহিত মুসলমান স্বার্থের চির বিরোধ রহিয়াছে। আর এই সাধারণ স্বার্থের বিরোধিতা করাই হইল প্রকৃত মুসলিম-স্বার্থ। এই প্রকার হীন আদর্শের দ্বারা লীগপন্থীরা পরিচালিত হইতেছেন। তাই দেশের কাজে তাঁহাদিগকে পাওয়া যায় না। তাই আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করি যে, মুসলিম স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। উদাহরণ আর কত বাড়াইব? জাতীয়-সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" ও জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কাহারও বলিবার বিশেষ কিছু নাই। বিশেষত যখন কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের আপত্তিকর (?) দুই কলিকা কাটিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখানেও আসিল মুসলিম-স্বার্থ। সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাইবার এমন অবসর কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? এই মুসলিম স্বার্থের নামে আরম্ভ হইল আন্দোলন, জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত ইসলামের বিরোধী, মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধী, মুসলিম কল্যাণের বিরোধী। কেহ দেখিল না, বুঝিল না, বিবেচনা করিল না, সবাই নির্বিকার গড্ডলিকায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকার বিরুদ্ধে অভি-যোগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু সরকারের পুলিশ যাহা চাহে না সাম্রাজ্যবাদও শ্বেতাঙ্গগণ যাহা দেখিয়া বাগান্বিত হন, তাহা কি মুসলমান গ্রহণ করিতে পারে? মুসলিম-স্বার্থের নামে জাতীয় পতাকা অপসারিত হইল, কিন্তু অপসারিত করিয়া তাঁহারা সর্বসাধারণের জন্য কোন পতাকার সন্ধান দিতে পারিলেন? অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা ত তুরস্কের পতাকা। তাহার সহিত ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের কোনই সংস্রব নাই। কিন্তু লীগওয়ালারা ভাল করিয়াই জানেন যে, এই সাম্প্রদায়িক পতাকা অন্যান্য সম্প্রদায় গ্রহণ করিবে না। সুতরাং এই পতাকা ব্যবহার করিলে বিরোধের কারণটা আরও ঘনীভূত হইবে। তাই সাম্প্রদায়িক মিলনের পথে বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্যই অর্ধচন্দ্র পতাকাকে তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেস পতাকার বিরুদ্ধে তাঁহারা যদি এমন একটা পতাকা সৃষ্টি করিতেন, যাহা কংগ্রেস বিরোধী অ-মুসলমানগণও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কারণ তাহা সাম্প্রদায়িক পতাকা হইত না। কিন্তু সেরূপ না করিয়া লীগ পতাকা ব্যবহার করিবার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? হায় মুসলিম-স্বার্থ! মুসলমানকে গলা টিপিয়া না মারিলে তোমার কর্তব্যের শেষ নাই। তুমি অনেক অঘটন ঘটাইয়াছ! সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলিকে তুমিই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছ। তুমি ভারতীয় মুসলমানের জাতীয় চেতনাবোধের পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছ। তুমি ভারতের স্বাধীনতার সর্বপ্রধান শত্রু! মুসলমান তোমার

করিতেছে। নকল নেতারা তোমাকে যন্ত্র-স্বরূপ লইয়া গোটা সমাজকে পুতুলের মত নাচাইতেছে। হে মুসলিম-স্বার্থ! তোমাকে বিদায়। তুমি আর মুসলমানকে প্রতারণা করিও না! তুমি চলিয়া যাও ভারতীয় মুসলমানকে স্বপদে দাঁড়াইবার একটু অবসর দাও। এই প্রকারে মুসলিম-স্বার্থ অপেক্ষা যে বিপরীত কথা বলিবে তাহাকেই আমি আজ বরণ করিব। আর মুসলিম-স্বার্থের ধুয়া যে তুলিবে, তাহাকেই জানিব মুসলমানের প্রকৃত শত্রু বলিয়া।

প্রত্যেক মুসলমানের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, লীগপন্থিগণ যাহাকে মুসলিম-স্বার্থ বলিয়া চালাইতে চান, তাহা মুসলিম-স্বার্থ মোটেই নয়। মুসলমানের কল্যাণের নামে তাহা মুসলমানকে পঙ্গু করিবার কল-বিশেষ! মুসলিম-স্বার্থ বড় কথা নয়,—বড় কথা দেশের স্বাধীনতা, দেশের আর্থিক মুক্তি। এই স্বাধীনতা ও এই মুক্তির জন্য মুসলমানকে যে কোন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তারপর দেখা যাইবে যে, যে বিশেষ স্বার্থের নামে আজ সে পাগল, সেই বিশেষ স্বার্থকে সে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে ইতস্তত করিবে না। লীগপন্থীদের পুনঃপুন আন্দোলনের ফলে অনেকগুলি বিশেষ স্বার্থ মুসলমানের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে। তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহারই প্রার্থনামত পৃথক-নির্বাচন, আইন সভায় অতিরিক্ত আসন, চাকরীর একটা মোটা অংশ, তাহারই স্বার্থরক্ষার জন্য গবর্ণরের হাতে সংরক্ষিত হইয়াছে অতিরিক্ত ক্ষমতা। কিন্তু এত সব পাইয়াও তাহার সাধারণ অবস্থার এতটুকু কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে? কোটি কোটি দরিদ্র নিরন্ন মুসলমান আগে যেখানে ছিল, আজও সেইখানেই আছে। বরং তাহাদের দারিদ্র্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার ক্ষুধা পিপাসার নিবারণের কোন উপায়ই নির্ণীত হয় নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে এত সব বিশেষ সুবিধা যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, বিশেষ সুবিধায় কাহারও কল্যাণ হয় না। ভাণ্ডার ঘরের চাবি নাই যাহার হাতে, ঘরের উঠানে বসিতে দিবার অধিকার দিলেই কি তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে? যুগ যুগ ধরিয়া সেখানে বসিয়া থাকিলে এক কণা তণ্ডুলও তাহার ভাগ্যে জুটিবে না। ভাণ্ডার ঘরে অবারিত অধিকার পাইতে হইলে চাই স্বাধীনতা, চাই দেশের মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের সহিত চির-বিচ্ছেদ। তথাকথিত মুসলিম-স্বার্থ তাহা পারিবে না। মুসলিম-স্বার্থের ধুয়া খুব শুনিয়াছি—শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। আর ভাল লাগে না। যাহাতে কৃষকের মুক্তি হয়, শ্রমিকের কল্যাণ, অগণিত বেকার যুবকের বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার মত স্থান হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিথ্যা মুসলিম-স্বার্থের মোহে এই সমাজকে ভুলাইয়া রাখিলে চলিবে না।

সাহিত্য-সংবাদ

'দোলকুণ্ডী (ফরিদপুর) তরুণ সমিতি" কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় "বঙ্গে পল্লী উন্নয়ন" সম্পর্কে নিম্নলিখিত তিন ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং উহা সমিতি পরিচালিত হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষাল গোয়ালপাড়া, (আসাম) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ সিংহ, ঘোড়ামারা, (রাজসাহী) ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ফরিদপুর। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে প্রতিযোগিতার পুরস্কার রৌপ্য-পদক প্রদান করা হইয়াছে।

এই সমিতি কর্ত্তৃক পুনরায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য-পদক প্রদান করা হইবে। বিষয় "যদি বাঁচিতে চাও তবে লাঙ্গল ধর"। আগামী ৩১শে জুলাই তারিখ মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় ৮ পাতার অনধিক এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যান্য মনোনীত প্রবন্ধ সমিতি পরিচালিত হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমুকুন্দলাল ধর বর্ম্মা, সাধারণ সম্পাদক, দোলকুণ্ডী তরুণ সমিতি, পোঃ হাট-শিরুয়াইল (ফরিদপুর)।

তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ২রা আষাঢ় ৩১শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় আমাদের 'বৈশাখী' মাসিক পত্রিকার মারফতে যে, (১) 'চলচ্চিত্রের সহিত হাল বাঙলার তরুণের সম্বন্ধ' নামক প্রবন্ধ ও (২) যে কোন ছোট গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক রচনা আমাদের হস্তগত না হওয়ায় গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই আষাঢ় স্থলে আগামী ৩২শে শ্রাবণ ধার্য্য করা হইল।

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, 'বৈশাখী', তেলমাড়ুই রোড, বর্দ্ধমান।

ভ্রম-সংশোধন

৩রা জুনের সংখ্যায় বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতির রচনা প্রতিযোগিতার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটি ভুল রহিয়াছে। রচনার বিষয় "শিক্ষা" হইবে "শিল্প" নহে।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাব লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। ইষ্ট বেঙ্গল, মহমেডান ও কালীঘাট এই তিনটি দল হঠাৎ প্রতিবাদস্বরূপ খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করায় লীগ খেলা পণ্ড হইবে বলিয়া যাহা আশঙ্কা করা গিয়াছিল, আই-এফ-এ'র পরিচালকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের ফলেই তাহার অবসান হয়। আই-এফ-এ পরিচালকমণ্ডলী উক্ত তিনটি ক্লাবের আচরণ বরদাস্ত না করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেন। এই ব্যবস্থার ফলে উক্ত তিনটি ক্লাব আই-এফ-এর পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার অধিকার হইতে এই বৎসরের জন্য বঞ্চিত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, কলিকাতার খেলার মাঠে ভীষণ অরাজকতার উদ্ভব হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। লীগের অবশিষ্ট খেলাগুলি উক্ত তিন ক্লাবের ছাড়া, নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে।

দীর্ঘ ২৫ বৎসরের উপর লীগ খেলায় যোগদান করিয়া মোহনবাগান ক্লাব এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হইল। ইতিপূর্ব্বে চারিবার মোহনবাগান ক্লাব লীগ প্রতিযোগিতায় রাণার্স আপ হইয়াছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পর মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় ভারতীয় দল যাহার ভাগ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব হইল। মোহনবাগান ক্লাবের এই সাফল্য প্রশংসনীয়। স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড়দের সাহায্যেই উক্ত সম্মান লাভ সক্ষম হইল। বাঙলার বাহির হইতে বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে আনিয়া দল পুষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় নাই, মোহনবাগান ক্লাবের এই সাফল্য বাঙালী উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রাণে উৎসাহ ও আনন্দ দান করিবে। ভবিষ্যতে তাহারাও যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছে :

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	পক্ষে	বিঃ	পয়েণ্ট
মোহনবাগান ...	২১	১৩	৭	১	২৮	৬	৩৩
রেঞ্জার্স ...	২০	১২	২	৬	২৫	১৯	২৬
মহমেডান স্পোর্টিং ...	১৯	১০	৫	৪	৩১	১৩	২৫
ইষ্টবেঙ্গল ...	১৯	৮	৮	৩	২৩	১০	২৪
কাষ্টমস্ ...	২২	৮	৮	৬	২৩	২০	২৪
ই বি আর ...	২২	৯	৬	৭	৩২	৩০	২৪
কালীঘাট ...	১৫	৯	৫	৪	৩১	১৯	২৩
পুলিশ ...	২২	৭	৫	১০	২০	৩৪	১৯
ক্যামেরোনিয়ান্স ...	২২	৫	৮	৯	১৮	২৮	১৮
এরিয়ান্স ...	২১	৬	৪	১১	২০	৩১	১৬
ভবানীপুর ...	২২	৬	৪	১২	২২	৩৭	১৬
বর্ডার রেজিমেণ্ট ...	২৩	৫	৪	১৪	১৯	৩৭	১৪
ক্যালকাটা ...	২১	১	৮	১২	২২	২৩	১০

আই এফ এ শীল্ড

মোহনবাগান ইষ্ট ইয়র্ক ফাইন্যাল পৌঁছিবার সম্ভাবনা

গত মঙ্গলবার আই এফ এ শীল্ড সাব-কমিটির সভায় এই বৎসরের শীল্ডের খেলার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, আই এফ এ'র সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট দলের পক্ষে যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই। তাহা ছাড়াও বাহিরের নাম করা গোরা দলের সংখ্যাও খুবই কম। সুতরাং এইবারকার শীল্ডের খেলা যে ভালভাবে জমিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। আই এফ এ শীল্ডের খ্যাতি যে খানিকটা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আশঙ্কা করা যাইতে পারে। তবে একেবারে নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই—একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে ফুটবল খেলার গণ্ডগোল অবসান হইবার সম্ভাবনা আছে এবং তাহা হইলে শীল্ড খেলার তালিকায় যদি একটু-আধটু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবে না।

আগামী ১৩ই জুলাই হইতে শীল্ডের খেলা আরম্ভ হইবে।

গত বৎসরের বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক দলের এইবারেও ফাইন্যালে পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। তাহাদের সুবিখ্যাত গোলরক্ষক পটার এইবার তাহাদের দলে নাই, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের যথেষ্ট শক্তিশালী দল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শীল্ডের তালিকায় ইষ্ট ইয়র্কের স্থান উপরের অর্দ্ধে এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে তাহাদের প্রথম খেলিতে হইবে।

স্থানীয় দলসমূহের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলকেই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া বলা যাইতে পারে এবং তাহাদেরও ফাইন্যালে পৌঁছিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শীল্ডের তালিকায় নিম্নভাগে মোহনবাগান দল অবস্থিত এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে তাহাদের প্রথমে এরিয়ান্স দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। মোহনবাগান দল এরিয়ান্সকে পরাজিত করিতে পারিলে সম্ভবত সেমি-ফাইন্যালে তাহাদের ডি সি এল আই, কাষ্টমস কিম্বা রেঞ্জার্স দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। নিম্নে শীল্ড খেলার তালিকা দেওয়া হইল।

প্রথম রাউণ্ড

১। কাণপুর এসোঃ : বি এন আর, ২। ক্যালকাটা পুলিশ : মহারাণা ক্লাব (গৌহাটী), ৩। রাজসাহী জেলা এসোঃ : ফরিদপুর জেলা এসোঃ, ৪। হাওড়া ইউনিয়নঃ উয়াড়ী ক্লাব (ঢাকা), ৫। ভবানীপুর ক্লাব : অরোরা ক্লাব, ৬। কুমিল্লা জেলা এসোঃ : উড়িষ্যা প্রাদেশিক এসোঃ, ৭। বরিশাল ফুটবল এসোঃ : এরিয়ান্স ক্লাব (গয়া), ৮। বেঙ্গল আর্টিলারী : বনবিহারী জেলা এসো (বর্দ্ধমান)।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

ক। ইষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেণ্ট : বিজয়ী ১, খ। রয়াল ফুসিলিয়াস : বিজয়ী ২, গ। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব : বিজয়ী ৩.

(শেষাংশ ৬৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাপ্তাহিক সংবাদ

৪ঠা জুলাই—

ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় দণ্ডিত ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় দীর্ঘ নয় বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া দমদম সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত কৃপালনী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি সমূহের প্রতি নোটিশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাহারা নিঃ, ভাঃ, রাঃ সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের কোনরূপ সমালোচনামূলক মন্তব্য করিতে পারিবে না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নব-গঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির কর্ম্মকর্ত্তা ও সদস্যদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন:—সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু; সহকারী সভাপতি—সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশের; সম্পাদকদ্বয়—পণ্ডিত বিশ্বম্ভরদয়াল ত্রিপাঠি ও মিঃ কে, এফ্, নরীম্যান; কোষাধ্যক্ষ—মিঃ নাথলাল, ডি, পারেখ; সদস্যগণ—মিঃ আকবর সাহ, ডাঃ সত্যপাল, শ্রীরামকিষণ, মিঃ আর এস রুইকর, মিঃ এন দত্ত মজুমদার, শেঠ দামোদর স্বরূপ, মিঃ আব্দুল রহমন, মিঃ ইন্দুলাল যাজ্ঞিক; সংগঠন সম্পাদক—মিঃ এইচ, ভি, কামাথ।

গতকল্য বাঙলার সর্ব্বত্র সিরাজদ্দৌলা স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ঢাকায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঢাকা জেলা মুস্লিম ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ আহিনুল হক ঘোষণা করেন যে, যদি একমাসের মধ্যে অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি-স্তম্ভ অপসারিত করা না হয়, তাহা হইলে এক জোর আন্দোলন সুরু করা হইবে এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উদ্দেশ্যে অনশন আরম্ভ করিবেন।

মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী সীমান্ত সফর শেষ করিয়া কোট্টালম অভিমুখে আসিবার কালে দেশীয় রাজ্যের একটি কংগ্রেসের উদ্বোধনের জন্য ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের নিকট ত্রিবাঙ্কুর প্রবেশের অনুমোতি চাহিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সোজাসুজি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

ব্যারাকপুর মহকুমার গারুলিয়ার শ্যামনগর সাউথ জুট মিলে এক হাঙ্গামা হয়। প্রকাশ যে, পাঁচশতাধিক শ্রমিক নওপাড়া থানায় হানা দেয়; পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করে এবং ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে। শ্যামনগর জুটমিল বন্ধ আছে। আরও কয়েকটি চটকল ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে।

গতকল্য টাটানগরে শ্রমিক কর্ম্মী হাজরা সিং পিকেটিং করার সময় কোম্পানীর লরী চাপা পড়িয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৫ই জুলাই—

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ইউনি কুমারী সুজাতা সরকারের মৃত্যু সম্পর্কিত মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় ডাঃ এস, এন, চ্যাটার্জ্জি; ঊষানলিনী ঘোষ; ডাক্তারের সহকারী বারীণ মুখার্জ্জি এবং মোটরকারের এজেন্ট মণি ভট্টাচার্য্যকে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী সুজাতা সরকারের গর্ভপাত করিয়া মৃত্যু ঘটানর এবং গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। দায়রা জজ মিঃ ইউনি আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হন এবং আসামীদিগকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ডাঃ এস, চ্যাটার্জ্জির ৭ বৎসর, বারীণ মুখার্জ্জির ৪ বৎসর এবং ঊষানলিনী ঘোষের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জজ আসামী মণি ভট্টাচার্য্যকে বে-কসুর খালাস দেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ধরণী কুমার বসু শ্রীহট্ট হইতে শিলচর যাইবার পথে এক গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়া শ্রীহট্ট হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। শ্রীহট্ট হইতে ১৮ মাইল দূরে কাছাড় ট্রাঙ্ক রোডে চুরখাই নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, প্রসিদ্ধ ছায়া-চিত্রশিল্পি শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতিও এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। তবে তাঁহাদের অবস্থা সন্তোষজনক।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী সহজানন্দ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভাকে এক সার্কুলার দিয়া জানাইয়াছেন যে, বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাস হইয়াছে, কিষাণ কর্ম্মীরা তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন না।

শ্রীযুক্ত পি, সি, যোশী সম্পাদিত বোম্বাই-এর ইংরেজি সাপ্তাহিক "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" এর দ্বিতীয় বর্ষের ১৮ই জুন প্রকাশিত ১৯শ সংখ্যা কাগজ বাঙলা সরকার জরুরী প্রেস আইন অনুসারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ফারুকীশয়ার প্রণীত "মুস্লিম জাগরণী" পুস্তিকাখানিও বাঙলা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

৬ই জুলাই

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদার্থ ৯ই জুলাই দিন ধার্য্য করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি কংগ্রেস কমিটি এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে নিয়মানুবর্ত্তিতা ভংগ করা হইবে।

কলিকাতা ভবানীপুরের ভোলানাথ বসু (২৩) ও তাহার স্ত্রী রাধারাণী বসু (১৬) পটাসিয়াম সাইনাইড খাইয়া একসংগে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক চিঠিতে তাহারা লিখিয়া গিয়াছে, সাংসারিক অবস্থা খারাপ বলিয়া জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া তাহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইতেছে।

চীনে যুদ্ধারম্ভের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি-দিবস উপলক্ষে মার্শাল চিয়াং কাইসেক চীনাদের প্রতি এক বাণীতে জাপানের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার দৃঢ়সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইয়াংসি রণক্ষেত্রের চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চেংচ্যাং একটি বাণীতে ১৯৪১ সালে চীন সংগ্রামে জয়লাভ করিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

২ই জুলাই-

অবিলম্বে সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীর বিনাসর্ত্তে মুক্তি দাবী করিয়া এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবী করিয়া দমদম সেণ্ট্রাল জেলের ৩৭ জন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন।

দমদম জেলের বন্দীদের এই অনশন সম্পর্কে বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব বাঙলা গবর্ণমেণ্টের বন্দি-মুক্তি নীতি বিশ্লেষণ করিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট প্রকাশ্যে গবর্ণমেণ্টকে ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার ফলে বন্দি-মুক্তিলাভের যোগ্য আবহাওয়া বিদূরিত হইবে। তিনি এই ভীতিও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দেশে উপযুক্ত আবহাওয়া বজায় থাকার মত সুনিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বন্দি-মুক্তি স্থগিত রাখিবেন এবং মুক্তিদানের বিষয় বিবেচনা করার জন্য যে সব বন্দীর বিষয় কমিটির নিকট দাখিল করা হইয়াছে, তাহাও স্থগিত রাখার জন্য কমিটিকে নির্দ্দেশ দিবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ৯ই জুলাই তারিখে নিখিল ভারতীয় দিবস প্রতিপালনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাহা বাতিল করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট উত্তর প্রেরণ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী সীমান্ত সফরে এবটাবাদ গিয়াছেন।

মাদ্রাজ সরকার আন্দামানে বন্দী প্রেরণ নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদিন যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দীকে বিধিমত আন্দামান প্রেরণের রীতি ছিল; কিন্তু এখন হইতে এই শ্রেণীর বন্দীদিগকে—তাহারা আন্দামানে যাইবে অথবা ভারতের বন্দিশালায় থাকিবে,—তাহা নিজ ইচ্ছামত স্থির করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত আলেকজান্দ্রেত্তা প্রদেশ তুরস্ককে অর্পণ করায় সিরিয়াবাসিগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। উহার প্রতিবাদে সিরিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করিয়াছেন।

৮ই জুলাই

সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দাবী করিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দিগণ অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। অনশন আরম্ভের পূর্ব্বে বন্দিগণ তাঁহাদের দাবী ও সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের বরাবরে এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বন্দিগণ মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, বড়লাট এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক আগামী ১৫ই জুলাই রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি-দিবস প্রতিপালন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের গলসীতে দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের জনসাধারণের এক সভায় উন্নতি বিধায়ক আইনানুসারে গবর্ণমেণ্ট ক্যানাল কর ২৸৴৹ আনা ধার্য্য করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ডাঃ এন আর ধরমবীর পাঞ্জাবের ডালহৌসীতে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। ডাঃ ধরমবীর অনাড়ম্বর দেশসেবক এবং সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। ডাঃ ধরমবীরের সহিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মাদুরার শ্রীমীনাক্ষী মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৯ই জুলাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক জরুরী অধিবেশন হয়। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে যে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, অদ্যকার এই অধিবেশনে তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া এবং উক্ত প্রস্তাব দুইটির প্রয়োগ বন্ধ রাখিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত বোম্বাই অধিবেশনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদকল্পে ভারতের নানাস্থানে জনসভা হয়। বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে যে বিরাট জনসভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত বসু উক্ত দুইটি প্রস্তাবের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। শ্রীযুক্ত বসুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের যে ধুয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন হয়, উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য। উহার কণ্ঠরোধের জন্য নহে। এই সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বামপন্থী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় যে বিরাট জনসভা হয়, তাহাতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত উক্ত দুইটি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয় এবং প্রস্তাব দুইটির প্রয়োগ বন্ধ রাখিবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানান হয়।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ৫৩ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ৪৪ জন অনশন আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আলিপুর ও দমদম জেলে অনশনকারীর সংখ্যা মোট ৮০ জন। এই সম্পর্কে এবটাবাদ হইতে মহাত্মা গান্ধী তার করিয়া রাজনৈতিক বন্দিগণকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি এই অনশন সমর্থন করেন নাই।

আসাম গবর্ণমেণ্ট ডিগবয় ধর্ম্মঘট হইতে উদ্ভূত কতকগুলি ব্যাপারের এবং তৎসম্পর্কিত ঘটনাসমূহের তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উহার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

হাই কমিশনার সিরিয়ার বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীনে গঠিত একটি কাউন্সিলের উপর শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

১০ই জুলাই

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাই হইতে পুণায় গিয়াছেন। সেখানে এক বিরাট জনসভায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সংকল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুত বসু বলেন, "আমি কোন শাস্তি বিধানের হুমকিতে ভীত নহি — সব কিছুর সম্মুখীন হইবার জন্য আমি প্রস্তুত।"

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে এক বিরাট জনসভায় দমদম এবং আলিপুর জেলের অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তির জন্য এক ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

গত ১২ই নবেম্বর তারিখের দৈনিক বসুমতীতে "কালীপূজা এবং রমজান" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও মুদ্রাকর শ্রীযুত শশিভূষণ দত্তকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত তাঁহাদের উভয়কেই মুক্তি দিয়াছেন।

ফৌঃ বিঃ ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যের অপরাধে ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রমিক নেতা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়কে ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং অবশিষ্ট ৪ জন আসামীকে একশত টাকা করিয়া জরিমানা করেন। আলীপুরের দায়রা জজ দণ্ডাদেশ বহাল রাখিলে আসামীগণ হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের প্রতিবাদস্বরূপ গতকল্য বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নয়জন কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অবাধ্যতার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মিঃ কে এফ নরীম্যান, মিঃ বি ভি কর্ণিক, মিসেস মণিবেন মুলজী প্রভৃতি আছেন।

বিহারের কিষাণ নেতা শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন সারণ জেলার কিষাণ আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গতকল্য হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলে মনোনীত সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা যে সংশোধনটি করেন দুইদিন আলোচনার পর ব্যবস্থা পরিষদ তাহা অগ্রাহ্য করেন এবং ব্যবস্থা পরিষদে প্রথমে বিলে মনোনীত কাউন্সিলর সংখ্যা সম্পর্কে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা পুনর্ব্বহাল করেন। বিলটি পুনরায় বিবেচনার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় যাইবে।

ট্রান্সভাল এশিয়াটিক ল্যাণ্ড এণ্ড ট্রেডিং এ্যাক্টের প্রতিবাদে প্রবাসী ভারতীয়রা ট্রান্সভালে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

আফগানের কোয়েটা শহরে বৃটিশ বিরোধী এক সমাবেশে ৬০ হাজার লোক যোগদান করে। উক্ত জনসভায় বৃটিশ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চীনের দক্ষিণ সান্সী প্রদেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। জাপানীরা তথায় দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ হেনরী হ্যাভলক এলিস মারা গিয়াছেন।

ইটালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সিয়ানো বার্সিলোনায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি সরকারীভাবে স্পেন পরিদর্শন করিতেছেন।

মস্কোতে ইঙ্গ-ফরাসী সোভিয়েট চুক্তির আলোচনা চলিতেছে। বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মস্কোস্থিত দূতদের নিকট আরও কতকগুলি নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সোভিয়েট সরকার আরও কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

খেলা-ধুলা

(৬৯১ পৃষ্ঠার পর)

ঘ। ছোটনাগপুরে এফ এ (রাঁচী) : ই আই আর, ঙ। ক্যাণ্টনমেণ্ট জিমখানা (পেশোয়ার) : মহমেডান স্পোর্টিং (ময়মনসিংহ), চ। বর্ডার রেজিমেণ্ট : হবিগঞ্জ এফ সি (আসাম), ছ। ই বি আর : স্পোর্টিং ইউনিয়ন, জ। একস টেলিগ্রাফ : ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব, ঝ। ডি সি এল আই : চট্টগ্রাম ফুটবল এসোঃ, ঞ। ডালহাউসি এসিঃ বিজয়ী ৪, ট। ক্যালকাটা কাষ্টমসঃ বিজয়ী ৫, ঠ। দিল্লী ফুটবল এসোঃ : বিজয়ী ৬, ড। ক্যামেরোনিয়ান্স : বিজয়ী ৭, ঢ। কুলটি ক্লাব (কুলটি) : বিজয়ী ৮, ণ। খুলনা জেলা এসোঃ : কুমারটুলী ইনষ্টিটিউট, ত। মোহনবাগান : এরিয়ান্স।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৬, Saturday, 8th July, 1939 [৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

'বন্দে মাতরম্' ও জাতীয় পতাকা—

মহাত্মা গান্ধীর দার্শনিক দৃষ্টি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে গিয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে 'জাতীয় পতাকা' এবং 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, যদি কোন জনসভায় বা সাধারণ অনুষ্ঠানে একজন লোকও আপত্তি করে, তাহা হইলে সেখানে জাতীয় পতাকা তোলা উচিত নয়। সেই রকম 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধেও কোথাও একজন লোকও যদি প্রতিবাদী থাকে, তবে সেখানে 'বন্দে মাতরম্' গান করা কর্ত্তব্য হইবে না। মহাত্মাজী অহিংসার অত্যুচ্চ স্তরে উঠিয়া এই যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই যুক্তি মানিয়া চলিতে গেলে সমাজ-ধর্ম্ম বলিতে কোন জিনিসের অন্ততঃ ব্যবহার-জগতে অস্তিত্ব থাকে না। ব্যক্তির মর্জ্জি বা ইচ্ছার কাছেই সমাজকে নত হইয়া থাকিতে হয়, বৃহৎ-স্বার্থের ব্যবহারিক রূপ লোপ পায়; স্বেচ্ছাচার বড় হইয়া উঠে। সমাজের স্বার্থের কাছে, বহুর নিকট ব্যক্তির স্বার্থকে ব্যক্তির প্রবৃত্তিকে তুচ্ছ করিতে হইবে, ইহাই মানব-ধর্ম্ম এবং ইহার উপরই সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। মহাত্মাজীর যুক্তি মানিয়া লইতে হইলে এই আদর্শের অপহ্নব ঘটিবে। মহাত্মাজীর পক্ষে হয়ত যুক্তি এই যে, ব্যক্তির কাছে সমষ্টির সাময়িকভাবে এই যে আত্মাবদান, ইহার ফলে সমাজ-স্বার্থের বৃহত্তর অনুভূতির উচ্চ প্রভাব ব্যক্তির মনে জাগিবে; কিন্তু ব্যবহারিক দিক হইতে ইহার কোন মূল্যই নাই। বরং ইহার ফলে অহিংসার নামে দুর্ব্বলতাই বৃদ্ধি পায়। দুর্ব্বলতার স্পর্শে তাহারও মধ্যে কোন সদ্গুণই জাগে না। দুর্ব্বলতার পাপ, যে দুর্ব্বল তাহাকে ত ভোগ করিতেই হয়, যে সমাজ তেমন দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়, সেই সমাজের পর্য্যন্ত অধঃপতন ঘটে; সাত্ত্বিকতার নামে তামসিকতাই ছড়াইয়া পড়ে। মহাত্মাজীর আধুনিক অহিংস নীতি যেরূপ নিরন্তর নৈর্গুণ্যের স্তরে উঠিতেছে এবং কর্ম্ম-সাধনার সম্পর্ক ছাড়াইয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশের হিতের পক্ষে ঐ সব যুক্তি কতটা সহায়ক হইবে, এ সম্বন্ধে সকলের মনেই সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে। আমরা আমাদের নিজেদের দিক হইতে বলিতে পারি, তাঁহার এই যে উত্তরোত্তর আত্মসমর্পণের নীতি—বাঙলা দেশ এ নীতিতে সায় দিতে পারিবে না। 'জাতীয় পতাকা' ও 'বন্দে মাতরম্'-এর মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার মধ্যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, বাঙালী ইহা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না। সাত্ত্বিকতা গুণ; কিন্তু তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া বুঝা পাপ—তেমন পাপের স্পর্শ হইতে এ জাতিকে আজ রক্ষা করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, কর্ম্মের পথ, তেজোদৃপ্ত কর্ম্মমার্গই জাতির মুক্তি আনিতে পারিবে।

ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ—

অধ্যাপক স্যর রাধাকৃষ্ণান্ গত ২৯শে জুন বিলাত ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। বোম্বাই শহরে অবতরণ করিয়া তিনি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভিতরকার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া স্যর রাধাকৃষ্ণান্ বলেন, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সেদিন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহকে শোষণ করিতে চাহে না। ঐ সব দেশের অধিবাসীদের স্বার্থের জন্য ঐ সকল দেশের উন্নতি সাধনই ইংরেজদের নীতি। অধ্যাপক স্যর রাধাকৃষ্ণান্ বলেন, 'ইংরেজ মুখে এই সব বড় বড় কথা বলে বটে, কিন্তু ভাবতে ঐ নীতি অনুসারে তাহারা কাজ করে না।' স্যর রাধাকৃষ্ণানের এই যে মন্তব্য, ইহার যৌক্তিকতা বিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগে বুঝাইয়া দেওয়ার দরকার হয় না। শতাধিক বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসই

তাহার প্রমাণ এবং জগতের যে সব দেশ স্বাধীন, সে সব দেশ কত দ্রুত উন্নতির পথে উঠিতেছে, তাহাই সে পক্ষে বড় প্রমাণ। ডাক্তার মেঘনাদ সাহা মহাশয় সেদিন ভবানীপুরের আশুতোষ হলে স্যার আশুতোষের স্মৃতি-সভায় কথাটা কিছু ভাঙিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'ভারতবাসীদের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় মাত্র ৬৫, টাকা। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডে লোকদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় হইতেছে ৭০০, হইতে ৮০০, টাকা। অথচ ভারতবর্ষও ঐ সব দেশের মতই নানা সম্পদে সমৃদ্ধ। জাপানের উর্ব্বরা ভূমির পরিমাণ খুব কম, খনিজ সম্পদও খুব কম, অথচ গড়পড়তা পক্ষে জাপানীর আয় ভারতবাসীদের আয়ের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশী। 'ভারতের এই যে অবস্থা, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বিদেশীর শোষণ, ইহার কারণ বিদেশীর অবলম্বিত সেই সব নীতি, যে সব নীতির ফলে ভারতভূমি বিদেশীর শোষণের পক্ষে উপযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবাসীদের স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষ যদি শাসিত হইত, তবে ভারতবাসীদের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। ভারতবাসীদের স্বার্থকে মুখ্য করিয়া দেখিয়া ভারতের শাসন-নীতি পরিচালিত হয় না; হইতে পারেও না—বিদেশীর প্রভুত্ব-পরিচালিত কোন শাসনই কোন দেশের প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে পারে না। ভারতবর্ষ তখনই ভারতবাসীদের স্বার্থের জন্য শাসিত হইবে, যখন ভারতবাসীরা পাইবে নিজেদের দেশের শাসন ক্ষমতা; কিন্তু ইংরেজ ভারতবাসীকে তাহা দেয় নাই। স্যার রাধাকৃষ্ণান্ ইতিহাসের নজীর দেখাইয়া ইংরেজকে ভারত-শাসন সম্পর্কে তাহাদের নীতির ব্যর্থতা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'আমেরিকার উপনিবেশ হারান তাহার নীতির ব্যর্থতার চরম নিদর্শন। আয়র্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনে বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে ইংরেজেরা আয়র্ল্যাণ্ড হারাইয়াছে। গড়িমসি করিয়া কাজ করিলে ভারতেও তেমন আশঙ্কা দেখা দিতে পারে ইত্যাদি। যুক্তি তাঁহার সবই সত্য, কিন্তু তেমন আশঙ্কা অনিবার্য্য হইয়া না উঠিলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সে শুভবুদ্ধি হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা করি না। ইংরেজ যেখানেই কোন অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে, ছাড়িয়া দিয়াছে নেহাৎ দায়ে পড়িয়া। ভারতের জাগ্রত জনশক্তি সেদিন এখানে ইংরেজের পক্ষে তেমন দায় সৃষ্টি করিবে, ইংরেজ এ দেশের লোকের হাতেও অধিকার প্রকৃতপক্ষে ছাড়িয়া দিবে তখন, তাহার আগে নয়।

বাঙলার সমস্যা—

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলা দেশের সমস্যাগুলি লইয়া বহুদিন হইতেই আলোচনা করিতেছেন। সেদিনও তিনি ভবানীপুরের আশুতোষ হলে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। মুখুজ্যে মহাশয় বলেন—'ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে তাহারা এখনকার যুগকে নির্ব্বোধ এবং দূরদৃষ্টি-বিহীন বলিয়া অভিসম্পাত দিবে।' মুখুজ্যে মহাশয় এই যে কথাটি বলিয়াছেন ইহার গুরুত্ব আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র একটা যেন নৈরাশ্যের অন্ধকার ছাইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী জাতির জীবনে বর্ত্তমানে কোন লক্ষ্য নাই, আদর্শ নাই; কোন একটা বড় ভাব বাঙালী জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে না। সে যেন স্রোতের শেওলার মত বাহিরের ঢেউয়ের ধাক্কাতেই অজ্ঞাতের পথে ভাসিয়া চলিয়াছে। বাঙালীকে এই অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইবে। বৃহত্তর ভারতের ভাবধারার সঙ্গে যোগ রাখিতে না হইবে, এমন নয়, কিন্তু ঘরের ভাবনা হইতে হইবে তাহা সুদৃঢ়। বাঙলার এই যে নৈরাশ্য—বৃহত্তর ভাবাদর্শ হইতে তাহার এই যে বিচ্যুতি, ইহার কারণ কি? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ কৌশলগত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই রহিয়াছে ইহার মূলে। এই সিদ্ধান্তই কতকগুলি আদর্শহীন লোকের ইতর স্বার্থ-সাধনার প্রশ্রয় দিয়া সারা দেশের আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। বড় ভাবনা, বড় চিন্তা দেশের লোকের নাই—সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অন্তর্জ্জগতের যে আলোকের উদ্দীপনায় ফুটিয়া উঠে, অন্তর্জ্জগতের সে আলোক যেন নিভিয়া গিয়াছে বাঙলায়। বাঙলাকে আজ গভীরভাবে নিজেদের ঘরের এই সমস্যাগুলির বিষয় চিন্তা করিতে হইবে এবং সমস্যার নিরাকরণের জন্য পথ বাহির করিতে হইবে। বাঙালীর সমস্যা আজ জীবন-মরণ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান শুধু উপর-চপকা বোলচালে হইবে না। বাঙলার ভাবনা গভীরভাবে এমন কর্ম্মীদলকে আজ আগাইয়া আসিতে হইবে। এমন নেতার আজ দরকার, যিনি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ইতর ব্যবসার মোহ হইতে দেশবাসীর চিত্তকে বৃহদাদর্শের উদ্দীপনায় উপরে তুলিতে পারিবেন—বাঙালীর মনোবীণায় যিনি এমন ঝঙ্কার তুলিতে পারিবেন, যাহাতে সহস্র সহস্র কর্ম্মী মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এ যুগ সত্যই বাঙলার বড়ই অবসাদের যুগ। বাঙালীর মননশীলতা আজ সত্যই কি উজাড় হইয়া গিয়াছে? যদি তাহাই না হইবে, মানুষের জীবনের স্পন্দন এখানে মিলে না কেন? মননের বলেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব।

হক মন্ত্রীদের হক কথা—

সিমলাতে বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদিগকে লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিবের পৌরোহিত্যে কিছুদিন আগে যে সভা হইয়া গিয়াছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙলাতে আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। সেদিন নিখিল ভারত মুশ্লীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির কর্ত্তারা এক সভা করিয়া ঐ সভার সিদ্ধান্তটা নিজেদের কাজ বাগাইবার জন্য খাটাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট এই আরজি করিয়াছেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যে যে সত্যাগ্রহ চালান হইতেছে, সেই সত্যাগ্রহের পক্ষে প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, কারণ ঐ ধরণের প্রচার-কার্য্য সাম্প্রদায়িকতামূলক। কিন্তু পরের বেলায় এ ব্যবস্থা হইলেও নিজেদের বেলায় কমিটির কর্ত্তারা হুঁসিয়ার আছেন। তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট এক আরজি পেশ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, হায়দরাবাদের

সত্যাগ্রহের পক্ষে প্রচারকার্য্য প্রভৃতি আর্যসমাজীরা বা হিন্দুরা যেসব কাজ করিতেছে, সেই সবই সাম্প্রদায়িকতা-মূলক, সুতরাং সিমলার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রীদের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য; কিন্তু তাঁহারা যেসব প্রচারকার্য্য করিবেন, মোশ্লেম লীগের পক্ষ হইতে সে সব সাম্প্রদায়িকতামূলক নয়। কংগ্রেসী হিন্দু মন্ত্রীরা যদি লীগওয়ালাদের কার্য্য সাম্প্রদায়িকতামূলক ধরিয়া কোন ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অন্যায় হইবে। সুতরাং বিশেষ ভাষা সহকারে সিমলা সভায় সিদ্ধান্তের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বলিয়া নিন্দিত কর্ম-প্রচেষ্টা হইতে লীগের কার্য যাহাতে বাদ পড়ে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এমন ব্যবস্থা করুন। কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া নবাবের যে কথা বলা হইয়া থাকে, এবারও তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, অথচ প্রমাণের প্রসংগ নাই। ওদিকে বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব এই উপলক্ষে বোম্বাইতে গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন যে, হক্ মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিতে সাম্প্রদায়িকতার নাম-গন্ধও নাই, শুধু কংগ্রেসী মন্ত্রীরাই ঐ অপরাধে অপরাধী। তবে যে বাঙলার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানা কথা বাহির হয়, সে শুধু হিন্দু খবরের কাগজওয়ালাদের নষ্টামী দুষ্টামী মাত্র। কথায় আছে ফল দেখিয়া বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা দেশের হক মন্ত্রিমণ্ডলী কোন নীতি ধরিয়া চলিয়া থাকেন, ফলেই তাহার পরিচয়। ভারতে অন্য প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া ঘুরিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দীন সাহেব দেখাইতে পারেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের মত একটা আইন, যাহাতে জোর করিয়া একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকারকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে? স্যার নাজিমুদ্দীন সাহেব দেখাইতে পারেন বাঙলা সরকার সাম্প্রদায়িক হারে চাকুরী বাঁটোয়ারা করিবার যে ব্যবস্থা ফাঁদিয়াছেন যোগ্যতার সকল যুক্তিকে বাতিল করিয়া তেমন একটা অযৌক্তিক এবং একান্ত অসংগত ব্যবস্থার নজীর? হিন্দু খবরের কাগজওয়ালাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলেই কি তাঁহাদের এইসব প্রচেষ্টা অসাম্প্রদায়িক এবং একান্ত উদার হইয়া উঠিবে। দেশের লোকগুলো এতটা বোকা নয়।

বাঙলার জন-আন্দোলন—

ময়মনসিংহের অধিবাসীরা গত ২রা জুলাই নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানকে একটি অভিনন্দন পত্রের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে দেবেন্দ্রলাল যে কথা কয়েকটি বলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, বাঙলার যুবকেরা দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যে আত্মদানের শক্তি দেখাইয়াছে, ভারতের কোন প্রদেশের সংগে তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা বাঙলার এই আত্মত্যাগের মর্য্যাদাকে যথোচিতভাবে স্বীকার করেন নাই, বা বাঙলার জন্য তাঁহাদের যাহা করা উচিত তাঁহারা তাহা করেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তাকে বলেন যে, বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী উন্নত ইহা সত্য; কিন্তু জনসাধারণের সংগে তাহাদের যোগ নাই। পণ্ডিতজীর এই অভিযোগের জবাবস্বরূপে দেবেন্দ্রলাল মেদিনীপুরের জন-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'দেশপ্রিয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালায়, তাহাতে তাহারা গবর্ণমেণ্টকে হার মানাইতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণীদলের কর্ত্তৃপক্ষ এই আন্দোলনের শক্তিকে স্বীকার করেন না।' বাঙলা দেশের জন-আন্দোলনের শক্তি আছে কি নাই, তাহা প্রমাণ করিতে আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে হয় না। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একজন নেতা, পশ্চাতে কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি, বড়লাটের সমর্থনের জোর লইয়াও রাজকোটের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি সামন্ত রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই; কিন্তু বাঙালী স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পাকা সিদ্ধান্তকে পর্যন্ত নাকচ করিয়া দিয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙলার মেদিনীপুরের অধিকাংশ নিরক্ষর জনসাধারণ যে ত্যাগ ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা কোথায়ও আছে কি? মহাত্মা গান্ধী নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বারদোলীর কৃষকদের আত্মত্যাগের চেয়ে মেদিনীপুরের অধিবাসীদের আত্মত্যাগ কোন অংশে সামান্য নয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙালী যে স্থান অধিকার করিয়াছে, দক্ষিণপন্থী নেতার দল তাহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নূতন প্রেরণা এবং নূতন শক্তি সঞ্চার যদি করিতে হয় করিবে এই বাঙালীই। আজ কংগ্রেসী রাজনীতির গতি নিয়মতান্ত্রিকদের অষ্ট পাশের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে—এই বন্ধন পাশ হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিবে এই বাঙালীই। শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় সেই কথাই ময়মনসিংহে সেদিন বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভারতকে যদি আগাইয়া লইতে হয়, আসন্ন সংগ্রামের বেশী ঝুঁকি বাঙালীকেই পোহাইতে হইবে। আমাদেরও এমনই বিশ্বাস। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ছেঁদো নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর জাল বিস্তার করিয়াছে, নেতারা বৃহত্তর আদর্শকে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শের বেদনা আজ নানা সমস্যার ভিতর দিয়া বাঙলার বুকেই তীব্র এবং একান্ত হইয়া উঠিতেছে—বংগভাব-জলধি মথিত করিয়া তরংগ তাহার উঠিবে এবং সে তরংগ সারা ভারতে ছড়াইবে। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

সিরাজ স্মৃতি দিবস—

গত ৩রা জুলাই কলিকাতার এলবার্ট হলে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রস্তাব হয়—(১) যে সমস্ত বৈদেশিক ঐতিহাসিক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অন্যায়ভাবে সিরাজের

চরিত্র বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণ করিয়া যে সমস্ত দেশীয় ঐতিহাসিক এই বীরের স্মৃতির অমর্য্যাদা করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং সকল সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিককে ইহার যথোচিত প্রতিবিধান করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা বাঙলা সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন সভাসমূহকে পাঠ্য পুস্তক হইতে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার জীবনী সংক্রান্ত ভ্রান্ত, মিথ্যা, অলীক এবং আক্রমণমূলক কাহিনীগুলি তুলিয়া দেওয়ার জন্য দৃঢ় মত জ্ঞাপন করিতেছে। (২) সিরাজের জীবনী সংক্রান্ত মিথ্যা ও ঐতিহাসিক সত্যবর্জ্জিত কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ [illegible] প অন্যান্য যে সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে, [illegible] জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অনতিবিলম্বে [illegible] জন্য এই সভা কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।"

যাহারা 'বন্দে মাতরম্'ওয়ালা এবং আনন্দমঠের অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিল, তাহারাই সিরাজের জন্য বেদনাবোধ করিয়াছিল সকলের আগে। 'বন্দে মাতরম্' নিষিদ্ধ করিবার জন্য এবং আনন্দমঠকে পোড়াইবার জন্য যাঁহারা জিগীর তুলেন, পুণ্য-স্মৃতি বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া শুভবুদ্ধির আলোকে এই সত্যটি যদি তাঁহাদের অধিগত হয়, তবে দেশের একটি বড় লাভ হইবে। সাম্প্রদায়িকতার ভাব জাগাইয়া দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিবার ব্যবসা তাঁহাদের ভাঙ্গিবে। এইটি দেশের আজ আগে দরকার। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের সম্বন্ধে দ্বিমত কাহারও নাই, অন্তত বাঙলা দেশের জাতীয়তাবাদীদের নাই। সভায় তাঁহাদের অন্তরের ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এ সব কথা আগে অনেকবার বলিয়াছি। সিরাজের চরিত্রের উপর আরোপিত মিথ্যা গ্লানি অপসারিত করিবার জন্য বাঙালীর হিন্দু সমাজ অন্তরের বেদনাকে শুধু ফাঁকা কথাতেই ব্যক্ত করে নাই। অন্তরের বেদনা দিয়া ব্যক্ত করিয়াছে এবং সেজন্য দুঃখকষ্টও ভোগ করিয়াছে। হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভের উপর আঘাত করিতে গিয়া হিন্দু কারাদণ্ড বরণ করিয়াছে। হিন্দু লেখক, সাহিত্যিকদের বই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, নাটক বন্ধ হইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মোস্লেম-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার বীর ব্রতের সাধনা করিতেছেন। দেখা যাউক এইদিকে তাঁহার বীরপণা কতদূর গিয়া দাঁড়ায়। তিনি কলিকাতা শহরের বুক হইতে স্মৃতিস্তম্ভ সরাইয়া ফেলুন। কার্জ্জন সাহেবের এই কুকীর্ত্তিকে গঙ্গা-গর্ভে বিসর্জ্জন করা হউক, যদি কাহারও প্রাণে তাহাতে বাধে, যাদুঘরের এক কোণে পর্দ্দা ঘিরিয়া সেটিকে রাখা হউক এবং এই লেবেল তাহার গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হউক যে, লর্ড কার্জ্জন সাহেব এই যে কীর্ত্তি ফলাইয়াছিলেন—বাঙলার জনসাধারণের দাবী অনুসারে তাহা অপসারিত করিয়া এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এই কাজটি করা বাঙলা সরকারের অধিকারের মধ্যে যদি আইনত না থাকে, তাহা হইলে ভারত সরকারকে চাপিয়া ধরুন এবং যাহাতে এই কাজটি হয়, তাহাই করুন। শ্বেতাঙ্গদের মনস্তুষ্টি একদিকে, অপর দিকে বিপন্ন ইসলামের জিগীর তুলিয়া নিজেদের মন্ত্রিগিরি কায়েম রাখিবার কৌশল—বাঙলার মন্ত্রীদের নীতির ব্যবহারিক রূপ ত দেখিতেছি ইহাই। সিরাজের স্মৃতির বেদনা যদি বাঙলার বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতির আলোকে এই নীতির অনিষ্টকারিতাকে উন্মুক্ত করে, মীরজাফর, উমিচাঁদের দলের মুখোস খুলিয়া দেয়, তবেই এই স্মৃতি দিবস প্রতিপালন সার্থক হইবে।

ভবিষ্যতের আভাষ -

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের হুকুমে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বার্ণাড শ, এইচ জি ওয়েলস ও অপর কয়েকজন জগৎ-প্রসিদ্ধ লেখকের পুস্তকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁহারা একটু সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, তাঁহাদিগকে কেন চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না, এই হুমকি দেখাইয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে। বাণীর মন্দিরে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই, আমরা ইহাই জানিতাম। কিন্তু আলীগড়ে বিপন্ন ইসলামী মনোবৃত্তি বিদ্যাপীঠের সে আদর্শকে বিলুপ্ত করিয়া, সেখানে মধ্য-যুগীয় সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইতেছে। আজ যেমন ব্যাপার আলীগড়ে ঘটিতে দেখিতেছি, বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে আন্দাজ জাগাইয়া তুলিতেছেন, তাহাতে আগামী কল্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই অভিনয় আরম্ভ হইতে আটক একটুও নাই। হক মন্ত্রি-মণ্ডলের বর্ত্তমান নীতিকে যদি ব্যর্থ না করা যায়, তাহা হইলে শুধু অনুমান নয়, ঐ আতঙ্ক বাস্তবে পরিণত হইবে এমনই আমাদের বিশ্বাস। সভ্যতা এবং সংস্কৃতি-গত উদারতার যে সার্ব্বভৌম আদর্শ বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল, সেই আদর্শকে অব্যাহত রাখিতে বাঙালীকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার এই শিক্ষাই দিতেছে।

আবার বন্যার আতঙ্ক—

আবার [illegible] আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রে ভীষণভাবে জল বাড়িবার ফলে আসাম বাঙলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। শ্রীহট্ট শহর জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উপনদীগুলিতে জল বাড়িবার ফলে কামরূপ জেলার চাষ-আবাদ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রে জল বাড়িবার ফলে সচরাচর যেরূপ হয়, বাঙলা দেশে সেই ঢল নামিয়া আসিতেছে। পদ্মা এবং গড়াই নদীতে অসম্ভব রকমে জল বৃদ্ধি ঘটিয়া উভয় পার্শ্বের গ্রামসমূহ জলে প্লাবিত হইবার আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। সারা বাঙলায় বর্ত্তমানে অন্নকষ্ট চলিতেছে, ইহার উপর যদি আবার সময়ে অনাবৃষ্টি এবং অসময়ে অতিবৃষ্টি এবং বন্যা এই সব উপদ্রব আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেশের কি ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা ভাবিলেও আমরা শঙ্কিত হইতেছি। যাঁহারা মন্ত্রি-

গিরির মজা লুটিতেছেন, তাঁহাদের অবশ্য ভাবনা-চিন্তার বিশেষ কারণ নাই তাঁহারা দুই-চারিটি জায়গায় সখের সফর করিয়া আসিয়া অন্নকষ্ট কথাটা যে অসত্য এবং কংগ্রেস-ওয়ালাদের দৌরাত্ম্যেরই ফল, সে সম্বন্ধে বিবৃতি বাহির করিতে পারিলেই খালাস।

বাঙলায় ম্যালেরিয়া—

নূতন কথা নয়—কথা পুরাতন। ম্যালেরিয়ার সমস্যা বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় সমস্যা। সেদিন বাঙলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর লেফটন্যান্ট কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জি হিসাবের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর বাঙলা দেশের পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় চার কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং পাঁচ লক্ষ লোক এই একটি রোগেই মারা যায়। মোটের উপর গোটা ভারতবর্ষে যত লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মারা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ জন বাঙলা দেশের লোক। মরিবার জন্যই এদেশের লোকের সৃষ্টি, লোকে মরিতেছে এবং পোকা মাকড়ের মত এমনভাবেই মরিবে, কিন্তু এমন মহামারী বন্ধ করিবার পক্ষে কোন উপায় আছে কি? অভিজ্ঞগণ বলিবেন, উপায় আছে বই কি! মানুষে যাহারা, মানুষের মত যাহারা বাঁচিতে চায়, তাহারা বাঁচিবার উপায় বাহির করে এবং বাঁচে। মার্কিন গবর্ণমেন্ট পানামা অঞ্চল হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়াছেন, মুসোলিনী পন্টাইনের জলা ভরাট করিয়া ইটালী হইতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়াকে বিদায় দিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কিন্তু এ বাঙলা দেশ, কাহার বা গোয়াল কে বা দেয় ধূঁয়া! এখানে শাসনকার্য্যের বাবদ দুনিয়া ছাড়া হারে পয়সা ব্যয় করা হয়, কিন্তু যাহাদের জন্য শাসন, তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় না। লেফটন্যান্ট কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাইবার অনেক ব্যবস্থা বাৎলাইয়াছেন। ডাক্তার বেণ্টলীর আমল হইতেই এ সব কথা আমরা শুনিতেছি এবং শুনিতে শুনিতে আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার ত সেই শ্রবণ-মাহাত্ম্যে শুধু কমে নাই। ম্যালেরিয়া যদি তাড়াইতে হয়, তবে তুকতাকের কর্ম্ম নয়—এ সব ব্যাধি নহে তেমন! তোড়জোড়ে বিধি-ব্যবস্থা দরকার, দরকার টাকা-পয়সার। শুধু বক্তৃতাবাজী নয়। এ কাজ করিতে হইলে সরকারকে উদ্যোগী হইতে হয়, ধরাবাঁধা পদ্ধতিতে দস্তুরমত সংগ্রাম চালাইতে হয়; কিন্তু সেজন্য চিন্তা কাহার? এদেশে মন্ত্রিমণ্ডল দেশের কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন শুনি, কিন্তু তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার সেবাতেই মন-প্রাণ বিকাইয়া দিয়াছেন; সস্তায় বাহবা লাভ হয় এবং সেই সঙ্গে নিজেদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থাটাও পাকা থাকে, এই দিকেই তাঁহাদের শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। দেশের পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে চার কোটি লোক ব্যাধিতে পোকা-মাকড়ের মত আক্রান্ত হইয়া অকালে মানবলীলা শেষ করিতেছে, সেদিকে চিন্তা করিবার ফুরসৎ তাঁহাদের কোথায়? যাঁহারা বিপন্ন ইসলামের জিগীর তুলিয়া এই মনোবৃত্তিকে সমর্থন করিতেছেন, আজ বাঙলার মুসলমান সমাজ সচেতন থাকিলে সকলের আগে তাঁহাদিগকে এই প্রশ্ন করিত যে, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া এই যে আমরা মরিতেছি এবং বৎসরের মধ্যে আট মাস থাকি শয্যাগত, আমাদিগকে সেই কাল ব্যাধির হাত হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা কি করিয়াছ? আগে বাঁচি, তবে ত হুজুরদের ছত্র-ছায়াতলে ক্লাইভের উত্তরাধিকারীদের হাত হইতে ফেরৎ পাওয়া দেওয়ানী ভোগ! কথার ধাপ্পাবাজী ছাড়িয়া আগে আমাদিগকে বাঁচাও।

পণ-প্রথার প্রভাব—

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে কিছুদিন পূর্ব্বে পণ-প্রথা বিরোধী বিল পাশ হয়। সম্প্রতি সিন্ধুর গবর্ণর ঐ বিধিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং উহা এখন আইনে প্রবর্ত্তিত হইল। এই কু-প্রথার পীড়ন বাঙলা দেশে কত বেশী কাহাকেও তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না; কিন্তু প্রথাটি কু-প্রথা, ইহা বুঝিলেই—এ সমাজ-এমনই ঘুণে ধরিয়া গিয়াছে যে, সেই প্রথাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না। এ দেশের তরুণ সম্প্রদায় প্রগতির অনেক কথা বলে, কিন্তু এমন একটা কু-প্রথার বিরুদ্ধে—এই আত্মদানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাহাদের মধ্যে জাগে না। বাঙলা দেশ হইতে কার্য্যত এই কু-প্রথাকে বিদূরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন কয়জন আমরা জানি না। কিন্তু একজন উদারহৃদয় পুরুষের নাম জানি, তিনি হইলেন শ্রীযুত মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কুমিল্লাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে অনেক রকম সুশিক্ষা বিনা পয়সায় দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রীদের অভিভাবকদিগকে এ বৎসর তিনি এই মর্ম্মে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের মেয়ের বিবাহে পণ দিতে পারিবেন না, ছাত্রীদের নিকট হইতেও এই মর্ম্মে একটি প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইয়াছিল যে, যেখানে পাত্র-পক্ষ পণ দাবী করিবে, তাহারা সেখানে বিবাহে রাজী হইবে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অভি-ভাবকগণ ভড়কাইয়া যান, তাঁহাদের নিকট হইতে সন্তোষ-জনক সাড়া পাওয়া যায় না; ফলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বালিকা বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। বাঙালী সমাজে পণ-প্রথার প্রভাব এখনও কতটা বেশী, ইহাতেই পরিচয় পাওয়া যায়। মহেশবাবু ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন, ছাত্রদের অভিভাবকদের নিকট হইতে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত এবং যে সব যুবক আধুনিকতার উঁচু দরের কথা বলে, তাহাদের নিকট হইতে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত—তরুণেরা যদি মনে-প্রাণে এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে কিছুতেই ইহা সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু এই দিকে তেমন বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির বিকাশ তরুণদের জাগে কই? পুত্র বিক্রয়ীদের বিরুদ্ধে সে বিক্ষোভ তাহাদের বা কোথায়?

অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতি—

সিরাজ-স্মৃতি দিবসে কলিকাতায় এলবার্ট হলে যে সভা হয়, তাহাতে সভাপতিত্ব করেন অযোধ্যার নবাব পরিবারের উত্তরাধিকারী প্রিন্স আক্রাম হোসেন। তিনি উর্দ্দুতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণটি নাতিদীর্ঘ হইলেও বেশ সুন্দর হইয়াছিল। সংযত ভাষায় মনের আবেগ তিনি ব্যক্ত করেন। বাঙলার যে সপ্তদশবর্ষীয় বালক নবাবকে কুটচক্রীদের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত হইয়া জীবন দিতে হইয়াছিল, তিনি কি হিসাবে শহীদ—তিনি তাহা বুঝাইয়া দেন। প্রিন্স আক্রাম হোসেন, অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের পুত্র। সিরাজকে যেরূপ দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে রাজ্যহারা হইতে হয়, অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলীকেও সেইভাবেই রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল। অযোধ্যার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের বেদনা-সূত্রে এমনই একটা যোগ রহিয়াছে। বাঙলার হিন্দু সাহিত্যিকেরা যেমন বাঙলায় নবাবের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বেদনা ছড়াইয়াছেন, তেমনই অযোধ্যার ভাগ্য বিপর্য্যয়েও তাঁহাদের অন্তর হইতে আগুন ছুটিয়াছে। অযোধ্যার বেগমদের উপর পরবর্তী অত্যাচারের বেদনা জাগাইয়া তাঁহারা এদেশের লোকেদের অন্তরে স্বদেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগাইয়াছেন। অতীতের সে কাহিনী স্মৃতিতে জাগাইয়া রাখার সার্থকতা আছে, যদি দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক যাহারা, যাহারা নিজেদের হীন স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থকে, দেশের স্বাধীনতার আদর্শকে বিকাইয়া দেয়, তাহাদের বিরুদ্ধে চিত্তে বিক্ষোভ জাগে। এই স্মৃতি-পূজা বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধের সেই আগুনকে জ্বালাইয়া তুলুক, যে আগুন তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক লাভ-লোকসানের উর্দ্ধে মানুষের চিত্তকে স্বাধীনতার বৃহত্তর আদর্শে উদ্দীপ্ত করে। ভেদ-বিরোধের সাহায্যে দেশের লোকের জাতীয়তার অনুভূতি ধ্বংস করিয়া বিদেশীয় স্বার্থকেই যাহারা সিদ্ধ করে, তাহাদের নীতি নির্ম্মমভাবে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সমাজে যদি সঙ্কল্পশীলতা জাগে, তবেই এই সব স্মৃতি-পূজা সার্থক হইবে। চালাকির দ্বারা কোন মহৎকার্য্য হয় না—দরকার আন্তরিকতার; এক দিকে সাম্প্রদায়িকতার ভাব জাগাইয়া তুলিয়া নিজের কোলে ঝোল টানিব, অন্যদিকে সিরাজের স্মৃতি-পূজা করিব, এই দুই বস্তু এক সঙ্গে হয় না।

সমালোচনা অন্যায়—

রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেদিন একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"এক শ্রেণীর কংগ্রেস কর্ম্মী, কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলের নিকট সম্ভব অসম্ভব সকল কাজই আশা করেন। এইরূপ আশা করা অন্যায় এবং বিশেষ দুঃখের। এই সকল কংগ্রেস কর্ম্মীর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে সাহায্য করিবার এবং তাঁহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করিবার মনোভাব থাকাই উচিত।" কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নিয়মতান্ত্রিক-তার গণ্ডীই মজবুত করিবার ব্যবস্থা করেই সকল রকমে করা হইতেছে। দক্ষিণীদল পরিচালিত ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্যক্রমের এই বৈশিষ্ট্যই দেখিতেছি দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট সম্ভব অসম্ভব সব কিছু কেহ আশা করে না; কিন্তু তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রিত্ব লইয়াছিলেন, সেই আদর্শ যে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা দেশের লোকে চাহিবে এবং তাঁহাদের নীতি যদি সে আদর্শকে লঙ্ঘন করে, তবে তাঁহারা কংগ্রেসী বলিয়াই সমালোচনার অতীত হইবেন এমন ধারণা করা সঙ্গত হইতে পারে না। পুণায় নিখিল ভারতীয় র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত [illegible] এই কথাটার উপর তাঁহার অভিভাষণে জোর দিয়া বলেন—যাঁহারা শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই শাসনতন্ত্রকে সচল রাখিবার কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং যেরূপ মনোবৃত্তি লইয়া তাঁহারা শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন আমাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নিকট হইতে তাঁহারা যে অজস্র প্রশংসা পাইতেছেন তাহার পরিচয় সেইসব প্রশংসাবাদ হইতেই পাওয়া যায়। কংগ্রেসের উদ্ধতন দক্ষিণী কর্তৃপক্ষের গতিগতি দেখিয়া মনে হয়, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্য্যের বাহবা দিবার জন্য মাঝে মাঝে সভাসমিতি করাই এখন কংগ্রেসের একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই মনোবৃত্তির যতদিন পরিবর্ত্তন না ঘটিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসে প্রয়োজনীয় যত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সবই অকেজো থাকিয়া যাইবে। কংগ্রেসের লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা, তাহা স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। যতটুকু কাজ করা যায়, শাসনতন্ত্র লইয়া ততটুকু কাজই করিব, বাস্তবিক পক্ষে ইহাই যদি কংগ্রেসের আদর্শ হয়, তাহা হইলে মডারেটদের অপরাধ হইল কিসে? স্বাধীনতার আদর্শে নব জাগ্রত ভারতের জনশক্তি এমন মডারেট নীতিতে সায় দিতে পারিবে না, বাঙলা দেশ তো নয়ই। মডারেট নীতি অবলম্বন করিয়া বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন এ পর্য্যন্ত কেহই পান নাই।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(১৮)

আদর্শ সমাধান—মানব জাতির স্বাধীন মণ্ডলীবদ্ধতা
(The Ideal Solution—A free grouping of mankind.)

মানবজাতির ঐক্য সাধনের আদর্শ নীতি—

এই তত্ত্বগুলি মানবজীবনের অভিবিকাশে প্রকৃতির মূল ও স্থায়ী প্রবৃত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত; মানবজাতির ঐক্য সাধনের যে-কোন যুক্তিসঙ্গত প্রয়াসে এইগুলিই যে নিয়মিত সূত্র হওয়া উচিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহা এইরূপই করা যাইতে পারিত যদি লাইকারগাসের শাসন-তন্ত্রের ন্যায় (Lycurgan constitution) অথবা একজন আদর্শ মনুর ব্যবস্থার দ্বারা, সিদ্ধ মুনি এবং রাজার দ্বারা ইহা সম্পন্ন করা যাইত। কিন্তু কার্যত এইটি চেষ্টা করা হইবে অতিশয় বিভিন্নভাবে, বিশাল জনসমূহের বাসনা আবেগ এবং স্বার্থের অনুসরণে,—সেটি যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহা জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অর্ধ আলোকিত বুদ্ধি এবং জগতের রাষ্ট্রবিদ ও রাজনীতিকদের ব্যবহারিক সুবিধাবাদের নীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু হইবে না; এইরূপ অবস্থায় ইহা সম্ভবত ক্রমান্বয়ে কতকগুলি বিশৃঙ্খল পরীক্ষা, প্রতিক্রিয়া ও পশ্চাদ্বর্তন, বাধা ও প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়াই সম্পাদিত হইবে; মানুষের বুদ্ধির দৈন্য সত্ত্বেও ইহা প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ ও স্বার্থসমূহের কোলাহলের মধ্যে বিকশিত হইবে, নীতিসমূহের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এলোমেলোভাবে চলিবে, প্রচণ্ড দলাদলির দ্বারা অগ্রসর হইবে এবং শেষ পর্যন্ত অল্পাধিক স্থূল একটা আপোষে পর্যবসিত হইবে। এমন কি, আমরা যেমন বলিয়াছি, ইহা কতকটা ঘোর জবরদস্তির সহিতই কয়েকটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা হয়ত একটি প্রধান বিশ্ব-সাম্রাজ্যের আবির্ভাবের দ্বারাও হইতে পারে, একটি রাজ-রাষ্ট্র, সে নিজেকে মানবজাতির মধ্যরূপেই হয়ত বা শাসকরূপেই জাহির করিবে। এইটি সর্বাপেক্ষা আদর্শ-বিরোধী হইলেও সর্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক পদ্ধতি নহে। কোন বুদ্ধিসম্মত নীতি নহে পরন্তু অপরিহার্য প্রয়োজন ও সুবিধা, নির্বন্ধপর জ্যোতি নহে পরন্তু নির্বন্ধপর বলই মানবজাতির রাজনৈতিক শাসন-বিষয়ক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যসাধনে কার্যকরী শক্তি হইবে বলিয়াই মনে হয়।

তথাপি যদিও আদর্শটি এখনই কার্যত সিদ্ধ করা সম্ভব না হয়, ঐ দিকেই আমাদের কর্মধারাকে উত্তরোত্তর অগ্রসর করিতে হইবে, আর যদি সর্বোত্তম পদ্ধতিটি সকল সময়েই প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, তথাপি সর্বোত্তম পদ্ধতিটি কি তাহা জানা ভাল যেন শক্তি ও নীতি ও স্বার্থসমূহের সংঘর্ষের মধ্যে ঐ পদ্ধতির কতকটাও আমাদের পরস্পরের সহিত ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এবং আমাদের অজ্ঞান ও বুদ্ধিহীনতার জন্য যে-সব ভ্রান্তি, স্খলন এবং দুঃখের মূল্য দিয়া আমাদিগকে প্রগতি লাভ করিতে হয় তাহাদের কতকটা উপশম হইতে পারে। তাহা হইলে নীতির দিক দিয়া মানবজাতির আদর্শ ঐক্যসাধন হইবে এমন একটি ব্যবস্থা যাহার মধ্যে সার্বজনীন ও সুসংগত জীবনের প্রথম বিধিস্বরূপ মানবীয় লোকসমূহ নিজেদের বাসস্থান, জাতি-ধারা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সুবিধার স্বাভাবিক বিভাগ অনুসারে নিজ নিজ মণ্ডলী গঠন করিতে পাইবে, পরন্তু ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত উপদ্রবাত্মক ঘটনাসমূহের অনুসরণে নহে অথবা শক্তিশালী জাতিগুলির অহংমনা ইচ্ছা অনুসারেও নহে; এই সকল জাতির কূটনীতি সকল সময়েই হইতেছে ক্ষুদ্র অথবা সময়োচিত সঙ্ঘবদ্ধতার ন্যূন জাতি সকলকে আশ্রিত জাতিরূপে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে অথবা অধীন জাতিরূপে নিজেদের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য করা। জগতের বর্তমান বিন্যাস অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের দ্বারা, রাজনৈতিক কূটচালের দ্বারা, সন্ধি ও ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা এবং সামরিক বল প্রয়োগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে, কোন উচ্চ নীতি বা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর কোন সাধারণ বিধি বিবেচনা করিয়া ইহা সম্পন্ন করা হয় নাই। বিশ্ব-শক্তির অভিবিকাশে কয়েকটি প্রয়োজন ইহার দ্বারা মোটামুটি-ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহা বহু রক্তপাত, বেদনা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও বিদ্রোহের ভিতর দিয়া মানবজাতিকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিয়া দিয়াছে। যে-সব জিনিষ নিজেরা আদর্শোচিত না হইলেও আবির্ভূত হইয়াছে এবং শক্তির সহিত নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাদের ন্যায় এইটিরও কিছু উপ-যোগিতা ও ন্যায্যতা আছে, নীতির দিক দিয়া নহে পরন্তু জীব-তত্ত্বের দিক দিয়া; প্রকৃতিকে তাহার পশু জগতের সহিত ব্যবহারে যেরূপ রূঢ় পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, অর্ধ-পশু মানবজাতির সহিতও তদনুরূপ ব্যবহারের প্রয়ো-জনীয়তাই হইতেছে ইহার ভিত্তি। কিন্তু ঐক্য সাধনের মহান প্রক্রিয়া একবার আরম্ভ হইলে সংঘটিত কৃত্রিম ব্যবস্থা-গুলিকে বজায় রাখিবার আর কোনই সার্থকতা থাকিবে না। কারণ সাধারণভাবে সমস্ত জগতের সুবিধা ও কল্যাণকেই লক্ষ্যরূপে সম্মুখে রাখিতে হইবে, কতকগুলি বিশেষ জাতির অহমিকা, গর্ব্ব বা লোভের তৃপ্তিকে নহে; দ্বিতীয়ত কোন একটি বিশেষ জাতির অন্যান্য জাতির উপর যে-কোন ন্যায়-সঙ্গত দাবীই থাকুক না কেন,—যথা, অর্থনৈতিক সুবিধা বা বিস্তারের আবশ্যকতা- তাহা একটি সুষ্ঠুভাবে গঠিত বিশ্ব-ঐক্য বা বিশ্ব-রাষ্ট্রের দ্বারাই ব্যবস্থিত হইবে। আর দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতার নীতি অনুসারে নহে, পরন্তু সহযোগিতা এবং পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নীতি অনুসারে, অথবা অন্ততপক্ষে এমন প্রতিযোগিতার নীতি অনুসারে যাহা আইন, ন্যায্যতা এবং যথাযথ আদান-প্রদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। অতএব কৃচ্ছ্রসাধ্য ও কৃত্রিম মণ্ডলীবদ্ধতার অন্য কোন হেতুই থাকিবে না, কেবল মাত্র ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং নিষ্পন্ন ব্যাপার ব্যতীত; আর জগতের পরিস্থিতির কোন মহান পরিবর্তনে ইহাদের গুরুত্ব যে খুবই কম হইবে তাহা সুস্পষ্ট, এরূপ পরিবর্তন অসম্ভবই হইবে যদি না মানবজাতি শত শত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে ভঙ্গ করিতে এবং অধিকাংশ নিষ্পন্ন ব্যাপারকেই উল্টাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়।

মানবীয় ঐক্যের প্রথম নীতি—

মণ্ডলীবন্ধতা আবশ্যকীয় হওয়ায়, মানবীয় ঐক্যের প্রথম নীতি হওয়া উচিত স্বাধীন ও স্বাভাবিক মণ্ডলীবন্ধতার বিধান, তাহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের, জাতির সহিত জাতির, এক শ্রেণীর লোকের সহিত আর এক শ্রেণীর লোকের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য ও উৎপীড়ন ও বিদ্রোহের কোন স্থানই থাকিবে না। কারণ ইহার অন্যথা হইলে বিশ্ব-রাষ্ট্রটি অন্তত আংশিকভাবে আইনানুমোদিত অন্যায় ও উৎপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা, খুব ভাল হইলেও, যত মৃদুভাবেই হউক, বলপ্রয়োগ ও বাধ্যকরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থা কতকগুলি অংশকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া দিবে, তাহারা যে-কোন পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করিতে এবং মানবজাতির মধ্যে বিশৃংখলা, বিচ্ছেদ, ব্যবস্থাটির বিলয় এবং পুরাতন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের দিকে যে কোন প্রবৃত্তি দেখা দিবে তাহারই স্বপক্ষে তাহাদের নৈতিক শক্তি এবং তাহাদের যতটুকু স্থূল শক্তি বজায় রাখিতে তাহারা সমর্থ হইবে সে-সবই প্রয়োগ করিতে উন্মুখ হইয়া থাকিবে। বিদ্রোহের নৈতিক কেন্দ্রগুলি এইভাবে সংরক্ষিত থাকিবে এবং মানবজাতির মনের যেরূপ অস্থিরতা তাহাতে সেগুলি অনুকূল সময় উপস্থিত হইলেই সংক্রামকতা ও আত্ম-বিস্তারের প্রবল শক্তি না হইয়াই পারে না। বস্তুত যে-কোন ব্যবস্থা ব্যভিচারকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে, অবিচার ও অন্যায়কে চিরস্থায়ী করিতে, বাধ্যকরণ এবং বল প্রয়োগের দ্বারা বশীকরণের নীতির উপরেই চিরকাল নির্ভর করিয়া থাকিতে চাহিবে তাহার স্বরূপ হইতেই ক্ষণস্থায়িত্ব তাহার ভবিতব্যতা।

এইটিই হইতেছে জগতের একটা সুব্যবস্থা করিবার দিকে বর্তমানে যে চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রধান দুর্বলতা,—সে ব্যবস্থা বর্তমান পরিস্থিতি যেমনটি রহিয়াছে তেমনটি বজায় রাখিবার ভিত্তিতেই হউক অথবা বর্তমান বিশ্ব-বিপ্লবের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহার ভিত্তিতেই হউক। এইরূপ ব্যবস্থা যে-সব অবস্থা স্বরূপত ক্ষণস্থায়ী সেই-গুলিকেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার দোষে দোষী হইবে। ইহার অর্থ হইবে কেবল অসন্তুষ্ট বিদেশী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর এই জাতির বা ঐ জাতির আধিপত্য নহে পরন্তু এশিয়ার অধিকাংশের উপর এবং সমগ্র আফ্রিকার উপর ইউরোপের প্রভুত্ব। এরূপ অবস্থায় জাতিসমূহের একটা লীগ্ বা প্রারম্ভিক ঐক্যের অর্থ হইবে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ জাতিকে লইয়া গঠিত একটা মুখ্যতন্ত্রের (oligarchy) দ্বারা বিরাট মানবমণ্ডলীর শাসন। ইহা কখনই জগতের একটা দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যবস্থার নীতি হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে দুইটি জিনিষের মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী হইবে। নূতন ব্যবস্থাটিকে আইন বা বলপ্রয়োগের দ্বারা বর্তমান পরিস্থিতি সমর্থন করিতে হইবে এবং সকলপ্রকার আমূল পরিবর্তনের প্রয়াসে বাধা দিতে হইবে; কিন্তু তাহার পরিণাম হইবে মহান প্রাকৃতিক ও নৈতিক শক্তিসমূহের অস্বাভাবিক দমন এবং শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ বিশৃংখলা, হয়ত বা জগৎ বিচূর্ণকারী বিস্ফোরণ; অথবা এমন কোন সাধারণ ব্যবস্থাপক সভার আধিপত্য এবং পরিবর্তনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহা দ্বারা মানবজাতির ন্যায়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি সাম্রাজ্যবাদমূলক অহমিকাকে সংযত করিতে পারিবে এবং ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার বর্তমান পরাধীন জাতি-গুলিকে জগৎ সভায় নিজেদের বিকাশমান আত্ম-চৈতন্যের দাবী উপস্থিত করিতে সমর্থ করিবে*। কিন্তু এরূপ একটি আধিপত্য যাহা বৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলির অহমিকাকে ব্যাহত করিবে, ইহা স্থাপন করা কঠিন হইবে, ইহার কাজ হইবে মন্থর, ইহার শক্তি ও নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করা সহজ হইবে না এবং ইহার মন্ত্রণাগুলিও যে শান্তিময় ও সুসংগত হইবে তাহাও মনে হয় না। হয় ইহা কয়েকটি বৃহৎ শক্তি লইয়া গঠিত আধিপত্যশীল একটা মুখ্যতন্ত্রের মতিগতি ও স্বার্থের প্রতিভূতে পরিণত হইবে অথবা যেমন আমেরিকাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ ও অপসরণের আন্দোলনের দ্বারা সেখানে দাসপ্রথা সমস্যার সমাধান হইয়াছিল সেইরূপ আন্দোলনেই উহা পর্যবসিত হইবে। আর একটি মাত্র অন্য সম্ভাবনা আছে, তাহা এই যে, বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে যে উদার হৃদয়বৃত্তি ও নীতিসমূহ জাগ্রত হইয়াছে এইগুলিই কর্মের প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী নীতি হইয়া উঠিবে, এবং অ-ইউরোপীয় অধীন দেশগুলির সহিত ইউরোপীয় জাতি-সমূহের ব্যবহারেও সেগুলি অনুসৃত হইবে। অন্য কথায় ইউরোপীয় জাতিগুলির নির্ধারিত রাজনৈতিক নীতি হওয়া চাই তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপকে পরিবর্তিত করা এবং যখনই সম্ভব হইবে তাহাদের সাম্রাজ্যগুলিকে কৃত্রিম ঐক্য হইতে সত্য চৈতন্যমূলক ঐক্যে পরিণত করা।

চৈতন্যমূলক ঐক্য এবং জাতি সকলের স্বাধীন সম্মতি—

কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে আমাদের প্রস্তাবিত নীতিটি স্বীকার করিয়া লওয়া, স্বাধীন ও স্বাভাবিক মণ্ডলীবদ্ধতায় জগতের বিন্যাস করা, এ পর্যন্ত যেমন হইয়াছে তেমন আংশিকভাবে মুক্ত এবং আংশিকভাবে বলপূর্বক গঠিত মণ্ডলী লইয়া নহে। কারণ চৈতন্যমূলক ঐক্য নিশ্চিতভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে কেবল যদি এখন যে-সব জাতি পরাধীন রহিয়াছে তাহারা সাম্রাজ্যিক সমুচ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে স্বাধীনভাবে সম্মতি দেয়, এবং স্বাধীনভাবে সম্মতি দিবার শক্তির অর্থ হইবে স্বাধীনভাবে অসম্মতি দিবার এবং বিযুক্ত হইবার শক্তি। যদি সংস্কৃতি, প্রকৃতি অথবা অর্থনৈতিক বা অন্য কোন স্বার্থের অসামঞ্জস্যের জন্য চৈতন্যমূলক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে হয় এইরূপ সম্বন্ধচ্ছেদ অপরিহার্য হইবে নতুবা বলপ্রয়োগের

* জাতি সঙ্ঘ (League of Nations) এইরূপই একটা অস্পষ্ট আদর্শ লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাম্রাজিক অহমিকাকে বাধা দিবার তাহার প্রথম পংগু প্রয়াসের ফল হইল লীগ বর্জন এবং তাহা নিজের অঙ্গীকার সকল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াই মেম্বরদের অন্তর্যুদ্ধ নিবারণ করিল। বস্তুত ইহা কখনই কয়েকটি প্রধান শক্তির কূটনীতির অনুগত যন্ত্র অপেক্ষা আর বেশী কিছু হইতে পারে নাই।

আগে এই আকাঙ্ক্ষা কোন নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। জার্মানীতে নাৎসীকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পরানুগত ম্রিয়মাণ জার্মানরাও আবার চাঙ্গা হইয়া উঠে। গত পাঁচ ছয় বৎসরের ডানজিগের ইতিহাস তথাকার জার্মানদের নিজ কর্তৃত্বলাভ ও জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত হইবার প্রচেষ্টারই ইতিহাস। ডানজিগ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের খাস আমলের জিনিষ, কিন্তু তাহার কথা পদে পদে অগ্রাহ্য করিতে লাগিল এখানকার জার্মান অধিবাসীরা। গত ১৯৩৭ সালে হের গ্রাইসার রাষ্ট্র-সঙ্ঘে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, জার্মানীই তাহাদের জপ-তপ, জার্মানীই তাহাদের দিবসের ধ্যান, নিশীথের চিন্তা, তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে আসিলে ভাল হইবে না। রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গ্রাইসারকে কিঞ্চিৎ ধমক দেয় বটে, কিন্তু আসলে তাঁহার এবং তাঁহার মধ্য দিয়া জার্মান অধিবাসীদেরই সকল ইচ্ছা একে একে

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

পূর্ণ হইতে লাগিল। ডানজিগ হইতে নাৎসী-বিরোধী দল একে একে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহুদীদের বসবাস নিষিদ্ধ। নাৎসীরাই ডায়েট ও সেনেট দখল করিয়া বসিয়া আছে। শাসন ব্যবস্থা তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। জার্মানদের হস্তে পোল প্রভৃতিদেরও নাজেহাল হইতে হইতেছে খুবই। একদা পোল্যাণ্ডেরই অনুগত করিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছিল যাহাকে, আজ সে-ই পোল্যাণ্ডের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। জার্মান স্কুলগুলিতে পোলদের পাঠাভ্যাসেরও আর উপায় নাই। পোল্যাণ্ড ও ডানজিগের মধ্যে গত বিশ বৎসরে নানা বিষয়ে সম্বন্ধেও গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদেশী মাল আমদানী-রপ্তানি ডানজিগের মধ্য দিয়াও অনেকটা হয়। শুল্কাদি আদায় সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ব্যবস্থাও হইয়াছিল। আজ কিন্তু সবই বানচাল হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু ডানজিগের মনোভাব ত এক দিনেই এতটা বদলায় নাই। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, হিটলারের আবির্ভাবকালে জার্মানীতে তাঁহার যত না সমর্থক জুটিয়াছিল, তাহার ঢের বেশী জুটিয়াছিল বিচ্ছিন্নীকৃত জার্মান অঞ্চলসমূহে। ডানজিগবাসীরাও তখন হইতেই এই ভাবিয়া আশায় বুক বাঁধিতে থাকে যে, শীঘ্রই তাহারা তাহাদের পিতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। তাহাদের চেষ্টা প্রথমেই পোল্যাণ্ড-বিরোধী হয় নাই বটে, পোল্যাণ্ডের সঙ্গে হিটলার ত সন্ধি করিয়া সম্প্রীতিই স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যে হিটলারপন্থী তাহা ত বহু পূর্বেই জানা গিয়াছিল। তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের চাঁইরা কোথায় ছিলেন?

ইহার জবাব দিতে হইলে ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতা না উল্টাইয়া উপায় নাই। ভের্সাই-সন্ধি তথা যুদ্ধ-পরবর্তী মিত্রশক্তিদের হালচালের উপর জার্মানী, রুশিয়া উভয়েই সমান খাপ্পা ছিল। মিত্রশক্তিদের অতঃপর চেষ্টা হইল জার্মানীকে রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ তাঁবে আনা। তাহাদের কর্মফলেই জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়। হিটলারকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া রাখিয়া আজন্ম-শত্রু সাম্যবাদ তথা সোভিয়েট রুশিয়ার বিষ দাঁত ভগ্ন করাই ছিল এই সব শক্তির উদ্দেশ্য। মুসোলিনী এই ফাঁদে পা দেন নাই, যদিও তাঁহার প্রতি ব্রিটেন, ফ্রান্স রুষ্ট হয় নাই। আদতে কিন্তু ভের্সাই সন্ধির জ্বালা জার্মানী কখনও ভুলিতে পারে নাই। হিটলারের দাবী প্রায় সবই ব্রিটেন (সুতরাং ফ্রান্স) মানিয়া লইয়াছে। জার্মানী কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড প্রবেশ, অষ্ট্রিয়া অধিকার, শেষ পর্যন্ত সুদেৎ অঞ্চল জবরদখল পর্যন্তও ইহারা আগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহার পর যখন চেকোশ্লোভাকিয়া প্রায় সবটাই গ্রাস করিয়া ফেলা হইল তখনই ইহাদের টনক নড়ে। সোভিয়েট রুশিয়াকে ঠেকাইতে গিয়া ইহারা জার্মানীকে এতটা আস্কারা দিয়াছে যে, সে এখন ইহাদের মোটেই তোয়াক্কা রাখিতেছে না। ব্রিটেনের ভুল ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু মনে হয় দেরীতে। কেননা, ইতিমধ্যে জার্মানী, ইটালী ও জাপান পারস্পরিক কর্মে ও ব্যবহারে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর ব্রিটেনের কর্মতৎপরতায় বিশ্ববাসী বিস্ময় মানিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সহযোগে সে একটা ঐকান্তিক সাহায্যমূলক চুক্তি করিয়া বসে। পোল্যাণ্ডের গায়ে কেহ আঁচড়টি পর্যন্ত কাটিতে পারিবে না, বা আঁচড় কাটিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ডানজিগও কেহ দখল করিতে পারিবে না। কেহ যদি এই সব করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে পোল্যাণ্ডের নির্দিষ্ট্রমতে হস্তক্ষেপ জ্ঞানে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। ব্রিটেন অতঃপর সোভিয়েট রুশিয়ার দিকেও মুখ ফিরায়! কোন ব্রিটিশ মন্ত্রী মস্কোতে যাইবার হয়ত মুখ পান নাই। একজন বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছেন এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী দূত মারফত এখনও আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনা সুরু হইয়াছে আজ তিন মাসের উপর। মিঃ চেম্বারলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই একটা চূড়ান্ত কিছু সংবাদ পেশ করিবেন। সোভিয়েট রুশিয়া কম শেয়ানা নয়। এতকাল যাহারা তাহার প্রতি পদে আজ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, আজ নিতান্তই দায়ে না পড়িলে তাহার শরণাপন্ন হয় নাই বুঝিয়াছে। তথাপি তাহাদের প্রকৃত পরখ করিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজন। তাই গত তিন মাস নানা আলোচনা, কথাবার্তা, হাবভাব, আচরণের মধ্যেই পূর্ব মনো-

ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। গরজ বড় বালাই। ব্রিটেন, ফ্রান্স সোভিয়েটের বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার জন্য প্রতিদিনই তাহার দ্বারে ধন্না দিতেছে! সোভিয়েটের এখন দরদস্তুর করা খুব সুবিধা, কেননা জার্মানীও আজ তলে তলে সোভিয়েটের সাহায্য কামনা করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

ওদিকে ইটালী-জার্মানী-জাপানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য আজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই (এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যও) যে ইহাদের মূল লক্ষ্য তাহা বুঝিতে বোধ হয় এখন আর কাহারও বাকী নাই। টিয়েনসিনের উল্লেখ আগে করিয়াছি। টিয়েনসিনে ব্রিটিশ সিংহের বিক্রম আমাদের বাড়ীর মিনি বিড়ালের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে বারবার। বিশ্ববাসী বিস্মিত হইয়াছে খুবই।
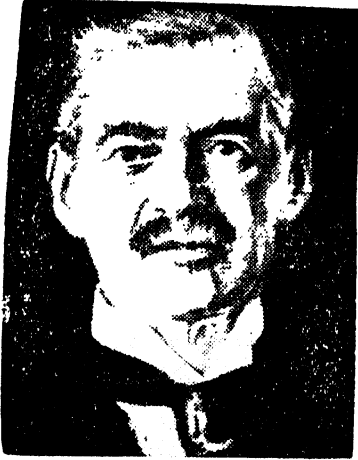
নেভিল চেম্বারলেন

কিন্তু বিস্ময়ের কি এখন কোন অবকাশ আছে? চারিদিক হইতেই যে তাহার বিক্রমের উপর হাহাজানি হইতেছে। কোন্ দিক রাখিবে সে। টোকিওতে ব্রিটিশ ও জাপানীদের মধ্যে টিয়েনসিন সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহা কোন্ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে প্রকাশ নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইউরোপে ঘনঘটা সুরু হইয়াছে। টিয়েনসিনে ব্রিটিশ সিংহের আচরণ লোকে ভুলিতে পারে নাই। ডানজিগের ব্যাপারে কিন্তু দাঁত, নখ খিঁচাইয়া পূর্ণবিক্রম প্রকাশ করিতেছে! ব্রিটেনের রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও শ্রমিক—সর্বদল আজ জোট বাঁধিয়াছে জার্মানীর আচরণে বৈপরীত্য লক্ষিত হইলে তাহাকে সম্যক্ শিক্ষা দিবার জন্য। ব্রিটিশ জনসাধারণও নাকি আজ এই ভাবেই ভাবিত। এখানে সমস্যা ত তুচ্ছ ডানজিগ লইয়া। অতি সামান্য জায়গা। অধিবাসীরাও প্রায় সবই জার্মান। ইহাকে জার্মানীভুক্ত হইতে দেওয়াই ব্রিটেনের পক্ষে তাহার পূর্ব পূর্ব আচরণের অনুযায়ী। ইহা লইয়া তবে আজ এত মাতামাতি কেন? কয়েক বৎসর আগেই ত হিটলারপন্থীদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। আজ কেন ইহাকে জার্মানীভুক্ত হইতে না দিবার জন্য এত চেষ্টা উদ্যোগ লক্ষ্য করিতেছি?

ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। ব্রিটিশমাত্রেই শক্তির উপাসক। তাহারা যদি কোন রকমে বুঝিতে পারে তাহাদের শক্তি কোন মতে হ্রাস পাইবার উপক্রম হইতেছে তখন তাহারা খুবই হুঁশিয়ার হইয়া যায়। তাহাদের শক্তি-কেন্দ্র হইল ইউরোপে। এশিয়ায় কোন কিছু হইলে তাহা সহ্য করা বরং সহজ, কিন্তু আসল শক্তি-কেন্দ্রে যদি ঘা লাগিবার উপক্রম হয় তবে কে না বিচলিত হয়? ব্রিটিশেরও হইয়াছে তাহাই। ডানজিগ থাক্ আর যাক্, ব্রিটিশের তাহাতে কি-ই বা আসে যায় যদি এইরূপ গভীর সন্দেহ তাহার মনে দৃঢ়ভাবে বাসা না বাঁধিত? সমগ্র ইউরোপের তুলনায় ব্রিটেন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। কিন্তু তাহার শক্তি অপরিসীম। কিরূপে ইহা সে বজায় রাখিয়াছে তাহার বিস্তর কারণ আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হইল ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা। ভারসাম্য কথাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটি প্রধান রাষ্ট্র অন্য একটি প্রধান রাষ্ট্রের অপেক্ষা এরূপ অধিক শক্তি লাভ না করে যাহাতে একটি রাষ্ট্র অধিকতর প্রধান ও প্রবল হইয়া উঠে, ও অপর রাষ্ট্রটির প্রাধান্য ও প্রাবল্যে ব্যাঘাত ঘটে। ইংরেজীতে এইজন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'Balance of Power'। ব্রিটেনের শক্তিকেন্দ্রে জার্মানী অতটা প্রবল হইয়া পড়ে, এবং ফলে তাহার শক্তিহীনতা না ঘটে—এই ভয় হইয়াছে ব্রিটিশমাত্রেরই। পোল্যাণ্ডের প্রতি প্রীতি বা অনুগ্রহ ইহার মধ্যে এতটুকুও নাই। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে যে আজ এত আন্তরিক টান দেখা যাইতেছে তাহাও এই কারণেই। এই কথাটিই আজ আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েট আজ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সাম্রাজ্যবাদই আজ ব্রিটেন ফ্রান্সের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আর সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যই শক্তিকেন্দ্রকে অটুট রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

খোদ ডানজিগ হইতে যে সব খবর আসিতেছে তাহাতে একটা প্রশ্ন কিন্তু স্বতঃই মনে জাগে—ব্রিটেনের এ সব আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজে পর্যবসিত হইবে না ত? ডানজিগের শাসকদল ও জনসাধারণ নাৎসীপন্থী জার্মান। তাহারা নাৎসীদের নেতৃত্বে নিজেদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া লইতেছে। জার্মানী হইতে ট্যাংক সাঁজোয়া গাড়ী, সৈন্যসামন্ত, এরোপ্লেন ও বহু সহস্র সৈন্য ডানজিগে আমদানী হইয়াছে। ব্রিটেনের বিরোধিতার তীব্রতা দেখিয়া নাৎসীরা নাকি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারকল্পে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা করিবে না। ডানজিগ আপসে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। তখন পোল্যান্ড ও তাহার ব্রিটেন ফ্রান্স প্রমুখ বন্ধুগণ যদি তাহাকে আক্রমণ করে তখন দোষ হইবে তাহাদেরই। ইহার প্রতিষেধক কোন কার্যকরী ব্যবস্থার কথা এ যাবৎ শোনা যায় নাই। তাই মনে হয়, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এ সব কি ফাঁকা আওয়াজ?

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৯

তোমরা কোথায়, আমরা কোথায় আছি

কলিকাতা সহর আর মেহেরপুরের উত্তরে সেই জঙ্গলে ঢাকা উজলপুর গ্রাম। একটার সঙ্গে আর একটার কোনোখানেই মিল নেই। মেহেরপুর থেকে 'বাস্' গিয়ে গ্রামের প্রান্তে থামলো। সামনে প্রকাণ্ড ছায়াবটের তলায় সভার আয়োজন করা হয়েছে। টেবিল-বেঞ্চি সাজানো রয়েছে। কাঁচের ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। গ্রামবাসীরা অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটিই করে নি।

মিটিংএ লোক তখনও ভালো করে জমে নি। গ্রামের অবস্থা ভালো ক'রে দেখবার জন্য ভিতরে গেলাম। সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ—দু'ধারে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে চালা-ঘর। সেই ঘরে যারা বাস করে—তারা না পায় অন্ন, না পায় আলো, না পায় বাতাস। বেড়ার ধার থেকে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে যারা আমাদের দেখছে—ময়লা তাদের পরিধেয় বস্ত্র। একখানি শাড়ীই যাদের সম্বল, সেই গৃহলক্ষ্মীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন কেমন ক'রে? ছোট ছোট ন্যাঙটা ছেলে-মেয়েদের দল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সরু সরু পা, সরু সরু হাত। পাঁজরের হাড়গুলি এক-একখানা ক'রে গোনা যায়। পথের ধারে ধারে বাঁশগাছের তলায় এক একটা ডোবা পঙ্কিল জল নিয়ে ম্যালেরিয়াবাহী মশকদের বংশবিস্তারের সাহায্য করছে। আশ্বিন কার্তিক মাস এলেই ঘরে ঘরে লোক শয্যা নেবে। মুখে জল দেবে এমন একটী লোকও সুস্থ পাওয়া যাবে না। গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে বটগাছের তলায় ফিরে আসা গেল। আমাদের বক্তৃতা শুনবার জন্য এসেছে যারা তাদের মানুষ বললে ভুল বলা হবে—তারা জীবন্ত এক একটী নরকঙ্কাল। কোন্ সকালে দুটো বাসি ভাত খেয়ে বেরিয়েছে—সারাদিন পেটে আর দানা পড়ে নি। সভা থেকে গিয়ে যা হয় দুটো মুখে দিয়ে চোখ বুজবে। পরিধানে কাপড়ের এক-একখানা টুকরো—কাঁধে গামছা—হাতে বাঁশের ছোটো ছোটো লাঠি। চোখে-মুখে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই। ঘরে ক্ষুধাতুর উলঙ্গ পুত্র-কন্যা।

ফির এলাম কলকাতায়। পটভূমি বদ্‌লে গেল। চওড়া চওড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা। বড়ো বড়ো দোকানে রূপসীদের ভীড়। চলন্ত মোটরে আরোহীরা চলেছে বাতাসে এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে। রেডিওতে বাঁশির মিঠে সুর—সিনেমায় নানা-রঙের শাড়ীর বাহার—পার্কে পার্কে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের দৌড়াদৌড়ি। খেলার মাঠে দর্শকরা দিচ্ছে ঘন ঘন জয়ধ্বনি। বিরাট সৌধগুলি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো হোটেলগুলির ভিতর থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর টুং টাং শব্দ। দামী মদ্যের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে সেখানে। উজলপুর গ্রামের সঙ্গে এই মহানগরীর সত্যি সত্যিই কোনোখানে মিল নেই। সেখানে এতক্ষণে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে মশাদের গুঞ্জন আর শৃগালের কলরব সুরু হয়ে গেছে। আর এই উজলপুরের মতো গ্রামই সংখ্যায় অগুণতি। ভারতবর্ষে কলকাতা সহরের মতো সহর আর কয়টা?

সব চেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে—উজলপুরের মতো সহস্র সহস্র গ্রামকে নিংড়ে তবে ফেঁপে উঠেছে কলকাতার মতো মুষ্টিমেয় সহরগুলি। পল্লীর প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ ক'রে তবেই সহরের যা-কিছু শ্রীবৃদ্ধি। সম্পদকে সৃষ্টি করছে যারা তারা অস্থিপঞ্জর-সার দেহগুলি নিয়ে ডোবার ধারে বাঁশগাছের ছায়ায় ম্যালেরিয়ায় শুকিয়ে মরছে—তারা সমাজের সম্পদ যাতে বৃদ্ধি পায় এমন কোনো কার্য্যেই হাত দেয় না যারা—জীবনকে আজ ষোলআনা ভোগ করছে তারাই। সমাজের হিত হয় যাতে—এমন কাজ করে যাচ্ছে যারা—কোনো অধিকারই নেই তাদের আজ। স্বাস্থ্য থেকে, সম্পদ থেকে, জ্ঞান থেকে—সব-কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। পক্ষান্তরে 'কাজের মধ্যে দুই—খাই আর শুই'—এই যাদের জীবনের 'মটো' তারা কিন্তু নৈবেদ্যের মাথায় নাড়ুটির মতো হ'য়ে ভীমনাগের সন্দেশ আর কাশীর ল্যাঙড়া আমের সদ্ব্যবহার করছে, ছেলে-মেয়েদের বি-এ, এম-এ, পাশ করাচ্ছে, ইলেকট্রিক ফ্যানের তলায় ব'সে বই পড়ছে আর কবিতা লিখছে, পুরীতে আর ওয়ালটেয়ারে গিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছে, বেশ আছে তারা। কাজ নেই- কিন্তু প্রচুর অবসর আছে। টাকার জন্য ভাবনা কি? ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা আছে—চা-বাগানের শেয়ার আছে—গ্রামে জমিদারী আছে। খাও-দাও, ফূর্ত্তি কর। হেসে নাও—দু'দিন বই তো নয়।

আশ্চর্য্য—এই রকম একটা সমাজব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের চিত্ত এখনও অবিচলিত আছে। আমরা শিক্ষিত-শ্রেণী স্বাধীনতা বলতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতার উপরেই বেশী জোর দিয়ে এসেছি। পল্লীর বুভুক্ষু নরনারীর অভিশপ্ত জীবনের পটভূমিতে স্বাধীনতাকে দাঁড় করিয়ে আমরা মুক্তির আদর্শ রচনা করিনি। এর কারণ আছে। লেখাপড়া-জানা মুষ্টিমেয় মানুষের দলই সব দেশে মুক্তির বার্ত্তা বহন ক'রে আনে—কিন্তু তারা খাওয়া-পরার দুঃখ সম্পর্কে থাকে অনভিজ্ঞ। দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করতে হয়েছে—এমন অভিজ্ঞতাও যে কোনো কোনো সাহিত্যিকের জীবনে না ঘটেছে, তা নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। অল্প ব'লেই তাদের দুঃখময় জীবনের কথা আমরা মনে ক'রে রেখেছি। যারা নিজেরা অনাহারে কষ্ট পায়নি, তারা জন-সাধারণকে ক্ষুধার যাতনা থেকে মুক্ত করবার উপরে স্বভাবতই খুব বেশী জোর দেয়নি। তাদের স্বাধীনতার আদর্শ হিন্দু আর মুসলমান সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার দিকেই ঝোঁক দিয়েছে বেশী ক'রে—ধর্ম্ম নিয়ে ক'রেছে বাড়াবাড়ি—স্বাধীন ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকবে না বাইরে যাবে—এই নিয়ে ক'রেছে মাতামাতি। স্বাধীনতার রাজনৈতিক দিকটার উপরে তারা পুনঃ পুনঃ দিয়েছে জোর।

ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী জীবন্ত নরকঙ্কালকে সামনে রেখে স্বরাজের আদর্শ যিনি তৈরী করলেন, তিনি গান্ধী। তিনি বললেন, যে স্বারাজ ভারত-বর্ষের হীনতম মানুষটিকেও তার ন্যায্য অধিকার না দেবে, সে স্বরাজে আমার প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্ররূপ কি রকম হবে—স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক কি রকম দাঁড়াবে—এসব সমস্যা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামালেন না তিনি। Independence কথাটার উপরেও গান্ধী খুব বেশী জোর দিলেন না—কারণ ও কথাটার মধ্যে

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজনকে যতখানি স্বীকার করা হয়েছে, জনগণের কল্যাণের আদর্শকে ততখানি স্বীকার করা হয়নি। গান্ধী Complete Independence কথাটার চেয়ে স্বরাজ কথাটার ভক্ত বেশী—কারণ স্বরাজের মধ্যে রয়েছে জনগণের কল্যাণের আদর্শ। স্বরাজের রূপ কেমন হবে, সে সম্পর্কে গান্ধী বলছেন,—

> Under Swaraj based on non-violence nobody is anybody's enemy, everybody contributes his or her due quota to the common goal, all can read and write, and their knowledge keeps growing from day to day. Sickness and disease are reduced to the minimum. No one is a pauper and labour can always find employment. It should not happen that a handful of rich people should live in jewelled palaces and millions in miserable hovels devoid of sunlight or ventilation."
>
> (Harijon—15. 3. 39)

এর বাংলা অনুবাদ,

"প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে স্বরাজ—সেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না বিদ্বেষ, প্রত্যেকটি নরনারী সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের বেদীমূলে দান করবে তার দেয় অংশ, সবাই পারবে লিখতে পড়তে, তাদের জ্ঞানের পরিমান যাবে দিনে দিনে বেড়ে। স্বরাজে রোগব্যাধি থাকবে না বললেও চলে। ভিক্ষুক সেখানে থাকবে না, কাজের অভাবে কাউকে চুপ করে বসে থাকতেও হবে না। মুষ্টিমেয় ধনকুবের একপ্রান্তে রত্নখচিত প্রাসাদে বাস করবে—আর এক প্রান্তে রৌদ্র-বায়ুহীন কদর্য্য বস্তিতে থাকবে লক্ষ লক্ষ মানুষ—এমন ব্যাপার স্বরাজে হবে অসম্ভব।"

স্বরাজের এই যে ছবি গান্ধীর তুলিকায় অংকিত হয়েছে—এই ছবির মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই সাধারণ মানুষের নতুন জ্যোতির্ম্ময় রূপ। তাকে শোষণ করবার অধিকার থাকবে না কারও—অর্থপিশাচের রাহুগ্রাস থেকে সে পেয়েছে মুক্তি। তার হাড়ভাঙা খাটুনিকে আশ্রয় করে আর সবাই বসে বসে খাবে—এমনটী হবার যো থাকবে না—সমষ্টির মঙ্গলের জন্য খাটতে হবে সবাইকে। তার অন্ধকারাচ্ছন্ন মন জ্ঞানের অরুণালোকে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তার রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত দেহে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য। দৈন্যের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পেয়েছে—বেকার হয়ে থাকবার বিভীষিকাও অপসারিত হয়েছে। বস্তির দুর্গন্ধময় নরক থেকে উদ্ধার পেয়ে সে পেয়েছে নূতন বাসস্থান, সেখানে প্রচুর বাতাস আর প্রচুর সূর্য্যালোক।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, আর দশজনের সামনে বক্তৃতা এবং আর দশজনের সংগে মেলামেশা করবার স্বাধীনতা, সংখ্যালঘিষ্ঠগণের সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্বাধীনতা—এসব স্বাধীনতার অংগ বটে—কিন্তু স্বাধীনতার মেরুদণ্ড হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার। এই সত্যকেই স্বীকার করা হয়ে থাকে 'the economic interpretation of history, গান্ধী মার্ক্সের মতোই জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের উপরে জোর দিয়েছেন বেশী—যদিও তিনি ভগবানে এবং আত্মায় বিশ্বাস করেন। তিনি আত্মার আকাশে বিচরণ করলেও মাটির দাবীকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করেন না। এইজন্যই তাঁর মনে স্বরাজের যে স্বপ্ন রয়েছে তার কেন্দ্রে আছে ক্ষুধাতুর, নিরক্ষর, সর্ব্বহারা মানুষ। এই ক্ষুধাতুর মানুষের দেহকে অন্ন দেবার জন্যই কুটির শিল্পের উপরে এত বেশী জোর—তার জন্যই চরকা এবং খদ্দর। তার আত্মাকে নৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে এই দিগন্তব্যাপী অভিযান। তার তিমিরাচ্ছন্ন মনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করবার জন্য ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষার পরিকল্পনা। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে অভিযান তার মূলেও সাধারণ মানুষের জন্য দরদ। গ্রামে নিজে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন এবং অন্যদেরও আস্তানা গাড়তে বলছেন। মাটীর পানে ফিরে যাবার জন্য এই যে পুনঃ পুনঃ আবেদন—এই আবেদনের মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ-কামনা।

আমাদের স্বাধীনতার অভিযান দুর্ব্বারবেগে চলুক—তার লক্ষ্য হোক সাধারণ মানুষের মঙ্গল। হিন্দুর স্বার্থ, মুসলমানের স্বার্থ—দুয়ের স্বার্থ আলাদা নয়—একই কারণ উভয়েরই শত্রু দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রোগ। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান দারিদ্র্যে পঙ্গু, রোগে অবসন্ন, অজ্ঞতার শৃংখলে শৃংখলিত। ইসলাম সভ্যতা আর হিন্দু সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা নিয়ে এত চেঁচামেচি কেন? আগে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান খেয়ে-পরে বাঁচুক—তারপর ধর্ম্ম-টর্ম্মের কথা হবে। আর এটা ঠিকই, হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের এই যে দুঃসহ দারিদ্র্য—এই দারিদ্র্যই ইতিহাসের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। আমরা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ বই লিখতে পারি, ঐস্লামিক কালচারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বড়ো বড়ো বক্তৃতা দিতে পারি, ভবিষ্যত ভারতের রাষ্ট্ররূপ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি—কিন্তু ইতিহাস কোন্ পথ ধরে চলবে তা নিয়ন্ত্রিত করবে লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক অবস্থা। রুসো-ভলটেয়ার অথবা গান্ধী-লেনিন কর্তৃক আদর্শ-প্রচারের যে কোনো প্রয়োজন নেই, তা নয়। সমাজের ওলোট-পালট ঘটাতে হলে জনসাধারণের ক্ষুধার তাড়নাই যথেষ্ট নয়—জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। বঙ্কিম না জন্মালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে এই ভূমিকম্প কতদিনে ঘটতো, কে জানে? আসল কথা হোলো, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নটরাজের ভাঙার পালা হয় তখনই সুরু যখন বুদ্ধির সংগে প্রবৃত্তির মিলন ঘটে, জনসাধারণের ক্ষুধার যাতনার সংগে যুক্ত হয় সাম্যের আদর্শ। The great convulsions happen when the economic urge on the masses have deve-tailed with some simplified ideal end. Intellect and instinct then combine, and some ancient social order passes away.*

* Adventures of Ideas—by Whitehead, P. 24.

কলেজের মেয়ে

(গল্প—শেষার্দ্ধ)

শ্রীসাতকড়ি চট্টরাজ

(৫)

সুরমা নিজেদের লোক। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিষয়-সম্পত্তির পরিদর্শন করা তাহার কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া এবং ভাবী বিবাহ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়া মনোহর সুরমার কাছারী ঘরের ঘরটি লইয়া ডিস্পেন্সারী খুলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সে এম-বি পাশ করিয়াছিল। বড়লোকের ছেলে, ঘরটি সাজাইয়াছিল ভাল।

অনাথ কাছারী ঘরে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত জমিদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম দেখিতেন। দশটার মধ্যেই স্নানাহার সারিয়া দোকানে গিয়া বসেন। সেখানকার হিসাব-নিকাশ সারিয়া লইয়া তহবিল মিলাইয়া টাকা কড়ি গুছাইয়া রাখিয়া আসিতে কোন দিন রাত্রি এগারটা কোন দিন বা বারটাও বাজিয়া যাইত। এই ছিল অনাথের এই দীর্ঘ চারি বৎসরব্যাপী দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মপ্রণালী।

সুরমা কয়দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল, কাছারী ঘরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া সকালে বসিয়া থাকে এবং অনাথের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে। সন্ন্যাসী ঠাকুর অধিক বয়স্ক হইবেন না, তবে জটাভার এবং রূপলাবণ্য চিত্তাকর্ষক। হিন্দুস্থানী কি বাঙালী দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারিত না।

মধুর সহিত ঘৃতের সংযোগ হইলে যেরূপ অনুপম অমৃত রসায়নশক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে তদ্রূপ বিনয়ের সহিত গাম্ভীর্য্যের সংযোগও অপরিসীম শক্তিশালী হইয়া উঠে। অনাথ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাহার উপর স্বভাবতই বিনয়ী। কাজেই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ সুরমার প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না, সহজ কথা বলিতে কি, সুরমা তাঁহাকে যথেষ্ট ভয়ই করিত। কাজেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিবরণ তাহার আর জিজ্ঞাসা করাই হয় নাই। আগন্তুকের অভিপ্রায় জন্য একদিন ভুঁদিরামকে শুধাইয়াছিল, কিন্তু সে বলিয়াছিল, তাঁহারা ইংরেজীতে কথা কয়েন, সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি যেমন প্রাকৃতিক কোন বিপ্লবের বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার সূচনাগুলি লক্ষ্য করিতে পারে, সুরমাও সেইরূপ অনাথের কিছু অতিরিক্ত বিনয়ের মধ্যেই কোন বিপ্লবের আয়োজন নিহিত আছে, তাহা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া আসিতেছিল। তাহার উপর এই কয়েকদিন হইতে এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া সুরমা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় একরূপ উদ্‌ভ্রান্ত মতই হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আর প্রায়ই দুবেলা আহার হইত না, বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছিল, মুখখানিতে হাসি আর কেহ দেখিতে পাইত না। ব্যাধিভয়ত্রস্তা হরিণীর মত সুরমার স্বরূপ এবং ভীত চক্ষু দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার অন্তরের কথা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও আর বাকী থাকিত না।

অনাথ সন্ধ্যার পরই আজ বাড়ী ফিরিয়া নিজের সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিল। ভুঁদিরাম প্রদত্ত এক কলিকা তামাক নিঃশেষ করিয়া নিঃশব্দে সুরমার গৃহের দিকে চলিতে লাগিল। ঝি তখন সুরমার পিঠে কি একটা তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। কয়েকদিন হইতেই সুরমার পিঠে এবং বুকে খিল ধরিতেছিল, মনোহরবাবু তজ্জন্য ঐ মালিশটা দিয়াছিলেন।

তাহাদের কথার শব্দ পাইয়া ঘরের মধ্যে যাইবেন কি না অনাথ বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন। সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে ঝিকে বলিতেছিল, ঝি বাবার জন্যে এখন আমার কেবলই কান্না পায় কেন?

ঝি বলিল মা, বাপ-মায়ের জন্যে কার মন না কাঁদে বলুন? আপনি আর এমন ক'রে দেহ মাটি করবেন না। সবই সহ্য হয়ে যাবে। রাত্রিতে কিছু কিছু খান, নইলে বাঁচবেন ক'দিন?

না ঝি, আমি আর খাব না, যার এমন বাবা মরে, তাকে কি আর খেতে হয়?

বাহিরে কার শব্দ পাইয়া ঝি বলিল, কে ভুঁদিরাম না কি?

না, আমি অনাথ, সুরমা দিদি কি ঘরে আছেন?

ওমা বাবু যে, বলিয়া ঝি তাড়াতাড়ি উঠিল; সুরমা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরমা এই অশুভ মুহূর্ত্তেরই প্রতীক্ষা আজ কয়দিন হইতেই করিয়া আসিতেছিল।

অনাথকে দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুরমা একখানি আসন বাহিরেই পাতিয়া দিল। অনাথ বসিলেন, সুরমা বিহ্বলদৃষ্টিতে অনাথের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

অনাথ বলিল, দিদি, কালকে একজন উকিল আসবেন তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

'কেন' বলিয়া সুরমা নিকটেই বসিল। অনাথ একটু স্থির-ভাবে কি যেন সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল,—

আজ কয়েক দিন হইতেই দোকানের এবং জমিদারীর হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে অডিট করান হইল। মনোহরবাবুর সাক্ষাতেই এসব হইয়াছে। তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ সহি লইয়া একখানি ছাড়পত্র আমি লইয়াছি। মালিকের সহি তাহাতে দরকার। তাহা গবর্ণমেণ্টের উকিলের সাক্ষাতেই হইবে।

সুরমা বলিল, এখন অডিট করান হইল কেন? কে বলিয়াছিল অডিট করাতে?

অনাথ নতমস্তকে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, আমিই ওটার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলাম।

কেন কি প্রয়োজন অনাথ দা?

অনাথ বলিল, দিদি অল্পস্বল্প টাকার ব্যাপার হইলে আমি উহা করাইতাম না, এ যে লক্ষ লক্ষ টাকার কাণ্ড। তুমি হয়ত আমাকে অবিশ্বাস না করতেও পার, কিন্তু ছেলে-পুলে হ'লে বা আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে ক্ষমা না করতেও পারেন। আমি গরীব মানুষ, শেষে কি বিপদে পড়ব? হিসাব-নিকাশ যত পরিষ্কার থাকে ততই ভাল।

কই এতদিন ত উহা করান নাই?

অনাথ বলিল, না আমি এবার কিছুদিনের জন্য ছুটি নেব মনে করছি, তাই—

সুরমা বলিল, ছুটি নিয়ে কোথায় যাবেন, বাড়ী?

অনাথ বলিল, না, বাড়ী ত আমার নাই দিদি!

সুরমা বিস্মিত হইয়া বলিল, বাড়ী নাই কেন বলছেন?

অনাথ বলিল, সে ত আজ অনেক দিন হ'ল বিক্রী ক'রে দিয়ে এসেছি।

জমি, বাড়ী, বাগান, পুকুর এ-সবই বিক্রী করেছেন?

হাঁ সবই বিক্রী করেছি।

সুরমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কত মূল্য হ'ল?

সাড়ে তিন হাজার, আরও কিছু বেশী হতে পারত, গোবিন্দ ডাক্তারের জন্য দাম আর উঠল না।

সুরমা চক্ষু মুদিল, বলিল পেতৃক ভিটে!—অনাথ দা ঐ টাকা কি করলেন?

অনাথ মাথা চুলকাইয়া একটু ঘতমত করিয়া বলিল, কাশীতে একটি মঠ করিয়াছি দিদি!

সুরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভুঁদিরামকে ডাকিল. ভুঁদিরাম তামাক লইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

সুরমা কতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, অনাথ মনঃসংযোগ পূর্বক তামাক টানিতে লাগিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, কত দিনের ছুটি নিতে চান অনাথ দা?

অনাথ বলিল, দিদি আমাকে এবার একবারেই ছুটি নিতে হবে। আমি কাজে ক্রমশই অক্ষম হ'য়ে পড়ছি। মন আমার একেবারেই অকমনা হয়ে পড়েছে!

সুরমা বলিল, কবে হ'তে ছুটি চান্?

সুরমার সেই সিনেমা দেখার রাত্রিতে যে রাত্রিতে অনাথের ভাবান্তর হইয়াছিল, সেই রাত্রির মত মুখখানি হাসি হাসি করিয়া অনাথ বলিল, কাল ঐ সাইটা হ'লেই আমি বিদায় নেব মনে করছি।

সুরমা ও হাসির অর্থ বুঝিল। আর এক দিন ঐ হাসি অনাথের মুখে দেখিয়া তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাহার রেশ এখনও মিটে নাই। বুঝিল ও হাসি প্রলয় মেঘের বিদ্যুদ্বিকাশের মত, কালোমেঘের অন্ধকারে পথ দেখায় বটে, কিন্তু পথিকের প্রাণকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। সুরমা যদি প্রস্তরমূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া না থাকিত, তাহা হইলে ঐ বিদ্যুদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় চমকাইয়া উঠিত।

সুরমা অচঞ্চলভাবেই বলিল, কার কাছে ছুটি নেবেন অনাথ দা?

অনাথ সরলভাবেই উত্তর করিল, কেন মনিবের কাছে?

কে মনিব আপনার অনাথ দা?

কেন তুমি, তুমি কি আমার মনিব নও?

কখনই না—সুরমা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিল, কেন আমি কি কখন মনিবানা দেখিয়েছি?

অনাথ একটু লজ্জিত হইল,—আঘাতটা বোধ হয় বেশী হইয়া গেল। সুরমা বলিল, আমার কথায় ত আপনি কার্য-ভার নেন নাই। যাঁর কথায় বিপদসাগরে মগ্নপ্রায় নৌকাখানির হাল ধরেছিলেন, তাঁকে যদি আবার পাথারেই ফেলে পালাতে হয়, তা হলে তাঁরই কাছে ছুটি নেওয়া উচিত হবে না কি?

অনাথ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল—সে কেমন কথা হল দিদি? আমার সংকল্প ছিল যে, সুরমা যত দিন সাবালক না হয়, ততদিন আমি দেখাশুনা করব এবং সাধ্যমত হিতসাধন করবার চেষ্টা করব। আমার সে ব্রত ত উদ্‌যাপন হয়েছে দিদি।

সুরমা নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। অনাথকে চঞ্চল হইতে দেখিয়া আর তাহার সংকল্পের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিল না। নিজের অসুবিধা অশান্তি গ্রাহ্যই করিল না, যাহার বিনিময়ে অনাথের সামান্য অসুবিধাও ঘটিতে পারে। সুরমা বুঝিল, যাহার হৃদয় শোকে দুঃখে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে, এখান হ'তে গেলেই যদি সে একটু শান্তি পায়, তবে কেন আমি কোন্ অধিকারে তাহার সে সুখের পথে কণ্টক হতে যাব?

মৌনে সম্মতি জানিয়া অনাথ উঠিল, সুরমা বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

মনোহর আজ একবার ভবানীপুরে গিয়াছিলেন, ফিরিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল। খাইতে বসিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরমা কোথায়? ঝি বলিল, তিনি শুয়ে আছেন।

মনোহর খাইয়া উঠিয়া সুরমার নিকট গিয়া বলিলেন, পিঠের বেদনাটা আজ কেমন আছে সুরমা?

সুরমা বলিল, সেই ভাবেই আছে।

মনোহর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আজ সব মিটে গেল, সুরমা শোন নাই?

হাঁ শুনেছি.

মনোহর বলিলেন, লোকটা পাগল নাকি?

সুরমা কোন উত্তর দিল না, মনোহরের মুখের দিকে চাহিল।

মনোহর বলিল, হিসাব-নিকাশে কোন গোলমাল হয় নাই, তবে—

সুরমা বলিল, তবে কি মনোহর দা?

নিজের মাহিনা এক পয়সাও লয় নাই। কিছু লইতে বলিলে বলিল, আমি ত চাকর নই মনোহরবাবু, অনাহারী সাহিত্য সেবক।

সুরমা পাশ ফিরিয়া শুইল, মনোহর পান চিবাইতে চিবাইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

(৬)

গতকল্য অনাথের আর কাশী যাওয়া হয় নাই। উকিল আসিয়াছিলেন। সব মিটমাট হইতে অসময় হইয়া গিয়াছিল। অনাথ ছাড়পত্র পাইয়াছে।

অনাথ আজ প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ভুঁদিরাম আসিয়া তামাক দিল। অনাথ তামাক টানিয়া ভুঁদিরামকে বলিল, তোমার মাকে একবার খবর দিতে পার?

অনাথ নিজের কাপড়খানি গামছায় জড়াইয়া ছাতাটি হাতে লইয়া ঘরের বাহিরে পা দিতেই সুরমা আসিয়া দাঁড়াইল। অনাথ বলিল আমি চললুম দিদি অনেক দিন এ বাড়ীতে ছিলাম যদি কখন কিছু ভুল করে থাকি, তাতে মনে [illegible] ক'র না।

ভুঁদিরাম প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনাথ বলিল, ভাই মনে কিছু ক'র না; যদি কখন কিছু বলে থাকি, আমাকে ক্ষমা কর।

ভুঁদিরাম হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া আবার একবার গড়াইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইল। সুরমা একটি কথাও বলিল না—তাহাদের এই অভিনয় পাথরের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া দেখিতেছিল।

অনাথ আর বিলম্ব করিল না, উপর হইতে নামিয়া আসিল; নীচে সন্ন্যাসী ঠাকুর দাঁড়াইয়াছিলেন। ভুঁদিরাম আসিয়া বলিল, বাবু একটু দাঁড়ান, মা প্রণাম করবেন।

অনাথ দাঁড়াইতেই সুরমা গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল,—উঠিতে গিয়া টলিয়া অনাথের পায়ের উপরই পড়িয়া গেল।

অনাথ ব্যস্ত হইয়া সুরমার হাত ধরিয়া তুলিলেন, দেখিলেন তাহার চক্ষু দিয়া অজস্র ধারায় সলিল প্রবাহ নির্গত হইতেছে। অনাথ অনেক দিন লক্ষ্য করে নাই, আজ দেখিল সুরমার আর সে মুখশ্রী নাই, চক্ষু কোটরগত হইয়াছে, দুর্দান্ত হিমপ্রবাহ যেন সে ফুল্ল নলিনীকে বিশুষ্ক করিয়া নিজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার যথেষ্ট পরিচয় রাখিয়াছে।

অনাথ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সুরমা মাথা নামাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল—অনাথ দা, অন্য শাস্তি কি আর কিছু ছিল না? আমাকে ক্ষমা করা কি চলত না?

অনাথের হাতের পাটুলীটা কখন পড়িয়া গিয়াছিল, ভুঁদিরাম তাহা কুড়াইয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে 'কাল যাব' ব'লে অনাথ বিদায় দিলেন।

অনাথ সুরমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে যাহাতে সুখী হইবে অনাথ তাহাই করিবে। সুরমার সম্মতি না লইয়া সে আর কোথায়ও যাইবে না।

সুরমা এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। দুবেলা খাইতে পারে, বুকে পিঠে খিলধরা গিয়াছে, মনোহরের মালিশেই হউক বা অন্য কোন কবিরাজের মুষ্টিযোগেই হউক।

সুরমার পিতার বন্ধু ভৈরববাবু একজন বড় উকিল। এক সঙ্গেই তাঁহারা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। ভৈরববাবুর মেয়ে অভয়া দেবী সুরমার একজন অন্তরঙ্গ সখী। এক সঙ্গেই তাহারা স্কুলে এবং কলেজে লেখাপড়া করিয়াছে।

অভয়া এখন প্রায়ই সুরমার কাছে বেড়াইতে আসে। অনাথবাবুর সঙ্গে তাহার পরিচয়ও হইয়াছে। সুরমার ইচ্ছা অভয়ার সহিত অনাথের বিবাহ হউক। সুরমা একদিন জেদ করিয়া অনাথকে ধরিল, অভয়াকে বিবাহ করিতেই হইবে।

সুরমার প্রত্যেক কার্যটির মধ্যেই অনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তথাপি কোন কোন স্থলে নিঃসংশয় হইতে পারিতেন না। এখন তিনি পূর্ণভাবেই বুঝিয়াছেন যে, সুরমা তাহার যাহা কিছু এমন কি জীবনও বোধ হয় তাঁহারই সুখের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। তাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি ত বিবাহ একবার করেছিলাম, ভাগ্যে যতটুকু ছিল সে সুখ ভোগ হইয়া গিয়াছে। তুমি যে মোটেই সংসারী হইলে না, তাহার ব্যবস্থা কি?

সুরমা বলিল, আপনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি যাতে সুখী হব, আপনি তাই করবেন। তবে—

অনাথ বলিল, সত্যই সুরমা আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই ভঙ্গ করিব না। কিন্তু আমাকে কষ্ট দেওয়াই কি তোমার অভিপ্রায়?

কষ্ট কিসের? অনুরূপা পত্নী লাভ কি কষ্টের?

অনাথ বলিল,না—তাহা নিতান্তই সুখের, কিন্তু—

'কিন্তু' আবার কিসের অনাথ দা?

অনাথ ভাবিল এইবার এমন একটি উত্তর দিব যাহাতে সুরমার সমস্ত উদ্যমই নষ্ট হইয়া যাইবে। অনাথ বলিল, আমার পৈতৃক ভিটাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি। বিবাহ করিয়া তাহাকে রাখিব কোথায়?

সুরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক তাড়া কাগজপত্র আনিয়া অনাথের সম্মুখে ধরিল। অনাথ দেখিলেন, নিজের জন্য ঐ বাড়ীরই উপরের একখানি কুঠরী রাখিয়া আর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এমন কি তিনখানি বাড়ী পর্যন্ত অনাথের নামে দানপত্র করিয়া এই দলিল সম্পাদিত তাহা চাপিয়া গেল, কিন্তু একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাত-

তাহা চাপিয়া গেল, কিন্তু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাত-

সারে শব্দ করিয়া উঠিল। ভৈরববাবুর সাহায্যে এবং জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া কিছুদিন পূর্বে সুরমা এই কাজ করিয়াছে। এই অদ্ভুত বালিকাটির সম্বন্ধে অনাথ যতই ভাবিতে লাগিল ততই যেন নূতন নূতন বিস্ময়ের বস্তুর সন্ধান পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল।

অনাথ বলিল, সুরমা, এমন স্পষ্টকথা বোধহয় আর কখনও তোমাকে বলি নাই, বলিবার সুযোগও পাই নাই। শোন—আমি বিবাহ করিয়া অনুরূপা পত্নী লইয়া তোমার চোখের সামনে তোমারই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিব; আর তুমি যৌবনে যোগিনী সাজিয়া ঐ সামনের কুঠরী-খানিতে বসিয়া চাঁদের সঙ্গে তাহাই দেখিবে, এই ত তোমার উদ্দেশ্য?

সুরমা উৎফুল্ল হইয়া বলিল, তাহাই!

অনাথ বলিল, তুমি আমাকে কি মনে কর বলত?

সুরমা বলিল, আমার যে তাতে কি সুখ, তা কি আপনি বুঝেন না?

অনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, না, আমি ওসব কিছুই বুঝি না। তুমি বিবাহ করিবে কিনা বলত?

'না' বলিয়া সুরমা মাথা নামাইল।

অনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে তুমি আমার বিবাহের চেষ্টা করিতেছ কেন, এই নাও তোমার দলিল, আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম।

সুরমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, হাঁ আমি বিবাহ করিব।

(শেষাংশ ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দিঘা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

বঙ্গভূমির নিজস্ব সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাস বলিতে কক্সবাজার ভিন্ন সেরূপ নামকরা এবং সুন্দর ও সুগম স্থান নাই বলিলেই চলে। কক্সবাজার চট্টগ্রামের নিকটে বঙ্গপ্রদেশের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ওই স্থানে সাধারণত পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষে যাওয়াই সুবিধাজনক। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের লোক বেশীর ভাগ পুরীধামে যাইয়াই সমুদ্র-বায়ু সেবন করিয়া আসেন। কলিকাতা হইতে রেলপথে এক রাত্রিতে পুরী পৌঁছান যায়, তাহার উপর শ্রীক্ষেত্রের নীলমাধব জগন্নাথদেব আমাদের ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীদের বহু দিন ধরিয়া আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছেন—সেজন্য পুরী বিশেষ করিয়া বাঙালীর দ্বারাই পুষ্ট—বহু বাঙালী এখানে বাস করিতেছেন এবং বহু সংখ্যক বঙ্গের লোক গৃহনির্মাণও করিয়াছেন।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রাদেশিকতার হুজুগ উড়িষ্যাতেও ক্রিয়া করিতেছে—কাগজে না সংবাদিত হইলেও পাঠকবর্গ উৎকলপ্রবাসী বন্ধু বা আত্মীয় ব্যক্তিদের নিকটে অল্পবিস্তর শুনিয়াছেন নিশ্চয়ই যে, বাঙালীর প্রতিপত্তি ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। পুরীধাম মুলত উড়িষ্যার বর্ত্তমানে গবর্ণরের বাসস্থান। কে বলিতে পারে, ভবিষ্যতে হয়ত বাঙালী প্রবাসী বা চেঞ্জাররা যে সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা আর পাইবে না। সেজন্য বাঙলার সমুদ্র উপকূলে কোন স্থানকে Sanitorium বা স্বাস্থ্যনিবাসরূপে উন্নত করা যাইতে পারে কি না দেখা উচিত। উড়িষ্যা সীমানার একটু আগে কাঁথির দক্ষিণতম কোণে বঙ্গোপসাগরের কোলে "দিঘা" নামে একটি রমণীয় স্থান আছে—যাহার নাম কেহ কেহ পূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমি সম্প্রতি দিঘা দেখিয়া আসিয়া তাঁহাদের সহিত একমত হইয়াছি এবং লোক গোচরে পুনরায় আনিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে কাঁথি মহকুমায় বঙ্গদেশের বিখ্যাত লবণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ছিল—কিন্তু গত শতাব্দীতে বৃটিশ সরকারের প্রতিকূল প্রভাবে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর পল্লীবাসীরা এইদিকে নোনা মাটি চাঁচিয়া দবারী (filks bed)তে ছাঁকিয়া (lixiviate করিয়া) অল্প বিস্তর লবণ প্রস্তুত করে। এই কুটীর-শিল্প সমুদ্রের ধারে ধারে আগাগোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আমি প্রবাসীতে এবং ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। কাঁথির দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলে যে বিস্তৃত নিম্নভূমি পড়িয়া রহিয়াছে ইহাই হিজলীর নিমক-মহাল। লবণ-প্রস্তুতি বন্ধ হইবার পর এই নিম্নভূমি দিয়া জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল বহুদূর পর্যন্ত আসিয়া গ্রাম ও ধান্যক্ষেত্র নষ্ট করিয়া দিত। সেইজন্য একটি সুউচ্চ ৩০।৩৫ ফুট বাঁধ (dyke) দেওয়া হয় রসুলপুর হইতে দিঘার পূর্ব পর্যন্ত। সেইজন্য এই দিককার সমুদ্রতীর সাধারণের অজানা অবস্থায় পড়িয়া আছে। দুর্গম কাদা পাঁকপূর্ণ পথ ভাঙিয়া সমুদ্র-তটে কেহ আসিতে ভরসা করে নাই—লবণ-প্রস্তুতি ভিন্ন স্বাস্থ্য উন্নতি এদিকে সম্ভব কিনা কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই। দিঘা ভিন্ন এই দিকে আর কোন স্থান নাই যাহা মনোরম এবং সুগম। দিঘা সম্বন্ধে কাঁথি মেদিনীপুরের কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় সকল রাজকর্মচারিগণই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন।

দিঘা যাইবার মাত্র একটি রাস্তা—এই পথেই দেউলি গ্রামে যাতায়াত চলে। এই দেউলিতেই স্বদেশী আন্দোলনে কয়েকজন অন্তরীনকে আটক রাখা হইয়াছিল। বর্ষাকালে কয়েক মাস ধরিয়া এই পথ অত্যন্ত দুর্গম হইয়া পড়ে—স্বাস্থ্য ও আবহাওয়া দুইই খারাপ থাকে। দিঘার সমুদ্রতীর কাঁথি শহর হইতে পাকা ২৫ মাইল- প্রথমে মাইল আষ্টেক সম্প্রতি পাকা করা হইয়াছে—পিছাবনী খাল পর্যন্ত পথ বেশ ভালই—বাকিটুকুও মেরামত হইতেছে। বর্ষার কয়মাস বাদ দিয়া নিয়মমত বাস চলাচল করিয়া থাকে—রামনগর থানা পর্যন্ত।

রামনগর বর্ধিষ্ণু গ্রাম, লোকজনের বসতি মন্দ নহে—পরিত্যক্তও নহে, অনাদৃতও নহে, কোঠা বাড়ী আছে কতকগুলি, টিউবওয়েল আছে, পোষ্টঅফিস আছে, প্রতি সপ্তাহে দুইবার হাট বসিয়া থাকে। দিঘায় বাস করিতে হইলে এই রামনগরই ভরসা। রামনগর হইতে মাইল ৫।৬ দূরে দিঘা। এইখানে আসিয়া কাঁথির বিখ্যাত বালিয়াড়ি সমুদ্রতীরে শেষ হইয়াছে। ডাইনের টার্মিনাসে (terminus) বঙ্গোপসাগরের কোলে পল্লবপুঞ্জে ঘেরা সুউচ্চ ঝাউবনের অন্তরালে মনোমুগ্ধকর স্থান দিঘা নিতান্ত সাধারণভাবে পড়িয়া আছে।

এখানে পুরীর মত সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ নেই বটে, কিন্তু কি সুন্দর sea beach বালুকাময় বিস্তৃত সমুদ্র সৈকত—একদিকে লতাচ্ছাদিত বালিয়াড়ী আর এক দিকে সাগরের নীল ঊর্মিমালার অবিরাম খেলা এর মাঝ দিয়া দিঘার রমণীয় তট বরাবর চলিয়া গিয়াছে। ইহার উপর দিয়া ভ্রমণ কি আনন্দদায়ক! যাঁহারা মোটর লইয়া যান তাঁহারা এই তটভূমির উপর দিয়া মনের খুশীতে মোটরিং করেন—ওদিকে উড়িষ্যা বর্ডার পার হইয়া সুবর্ণরেখা নদীর মোহানা আর এদিকে কোষ্ট কেনালের মোহানা—প্রায় ২০।৩০ মাইল পথ বিনা বাধায় গাড়ী চালান সম্ভব। শুক্লপক্ষে এই স্থানে তটভূমি পরম উপভোগ্য। আকাশে চাঁদ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ধরণী যেমন জ্যোৎস্নাপ্লুত হইয়া উঠে—সমুদ্রের জলেও আসে জোয়ার। ভাটার সময় জল প্রায় মাইল খানেক দূরে সরিয়া যায়, গর্জনও তখন কমে থাকে, কিন্তু জোয়ারে সমুদ্রের আসল রূপটি চোখে পড়ে—সেইজন্য সে সময়ে তটদেশে অপরূপ আনন্দ অনুভব করা যায়।

দিঘার বিশেষত্ব এবং বাড়তি সৌন্দর্য এই যে, সমুদ্রের কোলে ক্ষুদ্র একটু স্থানে কেমন করিয়া তৃণ-তরু-লতার প্রাচুর্য ঘটিল। আমি একবার বালেশ্বর শহর হইতে এগার মাইল দূরে চাঁদিপুরে গিয়াছিলাম। চাঁদিপুর আমার অত্যন্ত ভাল লাগিল—উহা প্রধানত দিঘার ন্যায় নির্জন এবং নগরীর

কোলাহল হইতে দূরে। সমুদ্রের তীরে বালিয়াড়ীর উপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক-বাংলোতে কয়েকদিন ছিলাম—খাওয়া দাওয়ার কষ্ট এখানকার মত নহে, তবুও সেই চাঁদিপুরের অপেক্ষা দিঘা আমায় বেশী মুগ্ধ করিয়াছে। চাঁদিপুরে এমন শ্যামল সবুজ ঘাসের মাঝে বৃক্ষলতার প্রাচুর্য নাই, ঐস্থান বেশ ফাঁকা। সুউচ্চ ঝাউ, পাম্ এবং নারিকেল গাছের সারিতে ঘেরা বালুখণ্ডের মাঝে দিঘা যেন ওয়েসিসের মত শীতল ও কাম্য অল্প একটু স্থান। প্রকৃতি নীরস বালিয়াড়ীর ফাঁকে সহসা যেন একটি রমণীয় উদ্যান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন—অনেকটা কোণারকের মত, তবে কোণারক বালুকারাশি বেষ্টিত হইলেও সমুদ্রতীর হইতে বর্তমানে খানিকটা দূরে সরিয়া আসিয়াছে। এখনও কোণারক ডাক-বাংলোতে ঝড়ের মত সাগরের বাতাস অনুভব করিতে পারিলেও নীল সাগরের দৃশ্যমালা দিঘার মত চোখের সম্মুখে ভাসে না। ছায়াঘেরা নির্জন শীতল ক্ষুদ্র পল্লীর মাঝে উচ্চভূমির উপর চমৎকার নাতিবৃহৎ ইন্সপেক্সন্ বাংলোটি ক্লান্তপথের পরিশ্রান্ত ভ্রাম্যমান পথিকের যেন ইউরেকা। সম্মুখের পোর্টিকোতে বসিয়া বঙ্গোপসাগরের নীলাভ তরঙ্গময় অসীম দৃশ্যটি মূর্ত হইয়া অপূর্ব আনন্দ দান করে, তাহার সঙ্গে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে অবিরাম ফেনিল বীচিমালার আছড়ে পড়ার শব্দ এবং পাইনের পাতায় হাওয়ার শিরশিরানি।

বাংলোটিই দিঘার একমাত্র কুটীর যেখানে দুই-একদিন বা অনুমতি লইয়া সপ্তাহখানেক থাকা সম্ভব। এই বাংলোর নিকটে একেবারে সমুদ্রের উপর সম্প্রতি হ্যামিলটন কোম্পানীর এক সাহেব একটি পাকা কুটীর নির্মাণ করাইতেছেন দেখিয়া আসিলাম। সম্ভবতঃ সাহেবটি উহাকে হোটেলে পরিণত করিবেন, যাহাতে কেবল টুরিষ্টেরা থাকিবে। বাঙলা দেশের বিত্তশালী সমাজে ভ্রমণের নেশা বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দিঘাতে বাড়ী করিতে পারেন, অন্ততঃ ভাড়া দিবার জন্যও যদি কয়েকখানা নির্মিত হয় তাহা হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যান্বেষী চেঞ্জারদের সুবিধা হয়। থাকার বিশেষ কষ্ট নাই; সম্প্রতি টিউবওয়েল বসান হইয়াছে নিকটে রামনগর গ্রাম আছে; আশে-পাশে, দূরে-নিকটে গ্রামও আছে। তবে ডাক-বাংলোর ভরসাতে কিছুদিন থাকিবার জন্য যাওয়া যায় না, কারণ, ছুটীতে প্রায়ই কর্মচারিবৃন্দের দ্বারা ইহা অধিকৃত থাকে।

বর্তমান অবস্থায় দিঘা যাওয়া সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। রেলপথ হইতে কাঁথি হইয়া দিঘা আসিতে যাট মাইল পথ ভাঙিতে হয় যাহা ৬।৭ ঘণ্টা সময় লইয়া থাকে। কাঁথি রোড (বল্দা) বা কাঁথি শহর হইতে মোটর ভাড়া করিলে সময় কম লাগে এবং একটু সুবিধা হয়, রামনগর হইতে পদযোগে দিঘা পৌঁছাইতে হয় না; মোটরবাসে রামনগর পর্যন্ত যাওয়া চলে মাত্র।

দিঘা স্থানটিকে বাসোপযোগী করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন যাতায়াতের সুবিধা করা। পূর্বোক্ত পথে সাত মাইলে দুইটি নদী পড়ে। কোষ্ট কেনাল এবং পিছাবনী খাল—ইহাদের উপর সেতু না থাকাতে ভাসমান বোটে পার হইতে হয়। সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয় জলেশ্বর ষ্টেশন হইতে কোন শাখা রেলপথ বা পাকা রাস্তার ব্যবস্থা করিলে। চাঁদিপুরের মত দিঘা অতি সহজে ও অল্প সময়ে আসা যাইবে। নতুবা রেল কোম্পানী যদি কোলাঘাট হইতে তমলুক এবং কাঁথি শহরের মধ্য দিয়া ছোট লাইন বসাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দিঘা আপনা হইতেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে এই জন্য যে, লাইন খুলিলে কাঁথির সমুদ্র-তীরের আগাগোড়া লবণ প্রস্তুতির কারখানা বসিয়া যাইবে যেরূপ কাঁথির বাঁধের গায়ে পুরুষোত্তমপুরে দুইটি কারখানা কাজ করিতেছে। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিমিটেড পুরুষোত্তম-পুর ও দাদনপাত্রে বিরাট লবণের ফ্যাক্টরী নির্মাণ করিয়া ১০।২০ হাজার মণ নূন তৈরী করিতেছে। এখনও কাঁথির সমুদ্র উপকূলে রসুলপুর হইতে দিঘা পর্যন্ত বহু লবণ প্রস্তুতির উপযোগী ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে। কাঁথি শহর হইতে ইহার ধার দিয়া রেলপথ খুলিলে আপনা হইতে অর্থাৎ সুবিধার জন্য তখন লবণের কারখানা বসিয়া যাইবে এবং দিঘাতে পুরীর ন্যায় বঙ্গেরও একটি নিজস্ব রমণীয় স্থান গড়িয়া উঠিবে। আমার আশা যে, ইহাতে শুধু আমরা দিঘাকে পাইব না, পাইব শত শত বেকার যুবকের অন্ন সংস্থান এবং স্বদেশী লবণ—যাহা দ্বারা প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা আমরা বঙ্গের বাহির করিয়া দিই। লোক-বসতি বাড়িলে আপনা হইতেই বাজার বসিবে এবং বাজার বসিলে পোষ্ট-অফিস, থানাও বাদ যাইবে না। যান-বাহন আপনা হইতেই জুটিয়া বসিবে, আর অন্নিবাস সেও কি বাদ যাইবে?

বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তরঞ্জন

(৫৯৪ পৃষ্ঠার পর)

বঙ্গদেশ তথা ভারতের পরমতম সৌভাগ্য দেশের ভীষণ দুর্যোগের সময় জাতির আহ্বানে সর্বস্ব আহুতি দিয়া কবি চিত্তরঞ্জন স্বদেশভক্ত দেশবন্ধুরূপে দেশের রাজনীতিক রঙ্গ-মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি তাঁহার কাব্য-সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া শাক্তবীরের মত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন।

তাই আমরা বলিতেছিলাম, বঙ্কিম "কমলাকান্তের দপ্তর" ও "আনন্দমঠে" যে রকম দেশভক্তর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই মূর্ত্ত জ্বলন্ত প্রকাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। বঙ্কিম কবি, চিত্তরঞ্জন তাঁহার কল্পনাপ্রসূত দেশাত্মবোধের প্রজ্বলিত প্রতীক।

কয়লার দাম দশআনা মণ

(গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

(১)

ঘরে ফিরিয়াই সুকেশ রাগে ফুঁসিতে লাগিল। তরুণী ভার্য্যার দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার কথাই সত্যি! কি আশ্চর্য্য! কি স্পর্দ্ধা!! কি—"

তরুণী ভার্য্যা ঝঙ্কারের সহিত কহিলেন, "থাম! এখন 'কি কি' বলে চীৎকার খুব করতে পার। পুরুষ মানুষ, দু পা এগিয়ে দেখবে যে, কিসের কি দর তা নয়, আমায় বেরুতে হবে পাড়ায় গিয়ে খোঁজ করতে কার ঘরে কোন্ জিনিষ কত দরে আসছে। তারপর তুমি লাফাবে—কি, আশ্চর্য্য! কি আস্পর্দ্ধা! খুব বীরত্ব!"

সুকেশ যেন দমিয়া গেল। বুদ্ধিমান ছিল তবু। বুঝিল একটু বেসুরো চীৎকার নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে। সুরের কোন স্থান বীরত্বব্যঞ্জক হইয়া থাকিবে। তাহাতে হয়তো আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইয়াছে। এত বড় যে একটা আবিষ্কার, যা শার্লক হোমস্-এর পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় হইতে পারিত, তাহার সবটুকু গৌরব ঐ তরুণীরই যে প্রাপ্য এই সাদা সত্য কথাটা তার বিজয়দৃপ্ত বীভৎস চীৎকারে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে। তাই তাহার সুরের পর্দ্দা এখন যথাস্থানে সন্তর্পণে নামাইয়া এবং আঁখির দৃষ্টিও স্নিগ্ধ করিয়া কহিল "আমি তো বলছি তোমার কথাই সত্যি—তুমি না হলে—"

তরুণীর প্রাণ এবার গলিল।

(২)

বিবাহের পর কয়েক মাস মশগুলভাবে কাটিয়াছে, যেমন সকলেরই কাটে। এই বিভোর সময়টাতে দৃষ্টি অনেক দিকেই প্রখর থাকে না। পয়সা কড়ির সঙ্গে প্রেমের তখন আড়ির সম্পর্ক। চিত্তের উপর চিত্তের তখন একাধিপত্য অধিকার। বিত্তের সেখানে স্থান নাই।

কিন্তু তারপর ক্রমশ প্রকাশ হইতে থাকে যে, সেই বিত্তই জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। তন্ময়তার অসতর্ক দিনে সতর্ক তস্কর কতখানি নিজের কাজ গুছাইয়া লইয়াছে সেদিকে ক্রমেই দৃষ্টি পড়ে। প্লাবনের উদ্দামতায় শস্য ধ্বংসের আতঙ্কের অবসানে ধীর জলপ্রবাহকে কৌশলে ক্ষেত্রের গাত্রে জোগান দিবার সময় আসে।

সুকেশ ও লীনার এখন সেই বিভোর ভাব অবসানের অবস্থা। দীর্ঘ মধ্যাহ্নে অলস খাটের উপর পড়িয়া লীনা এখন আর কেবলই ভাবে না—স্বামী আফিসে বসিয়া কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, কখন পাঁচটা বাজিবে ইত্যাদি। ভাঁড়ারের ভাবনা সংসারের ব্যয়সংকোচের কল্পনা এবং গৃহস্থালীর যাবতীয় জল্পনা তাহার মনকে এখন ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে। 'কখন পাঁচটা বাজিবে' তাহা অপেক্ষা কবে মাস পয়লা হইবে সেই ভাবনাটাই এখন প্রবলতর এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সুকেশও এখন আর পাঁচটা বাজিতেই লাফাইয়া প্রথম ট্রামখানি ধরিয়া বাদুড়-ঝোলা হইয়া ছুটিয়া আসে না সটান গৃহিণী সকাশে। রাস্তায় পায়ে চলিয়াই দেখিতে দেখিতে আসিতে [illegible] ছানার দর কত যাইতেছে আজ?—মাছটা আজই কিনিয়া রাখিলে হয় না? লীনা বলে সকালে মাছের দাম চড়া থাকে। আফিসে বসিয়াও এখন মাঝে মাঝে কলম তুলিয়া পাশের চেয়ারের উপবিষ্টের প্রতি ঝুঁকিয়া আলোচনা চলে কার ঘরে সুগৃহিণী। পূর্ব্বেকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কার কার ঘরে বিরাজ করে সুরূপিণী। টিফিনের সময় উৎসুক এবং চতুর নেত্রে অপরের টিফিন কৌটার দিকে তাকাইয়া খাদ্যের নিপুণতার তারতম্য পরখ করিয়া লয়। যে হতভাগা বাজারের খাবারে মুখ ভর্ত্তি করে তাহার দিকে একবার করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভোলে না।

পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নে পাশের বাড়ী হইতে লীনা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে, বহুদিন হইতেই সে বাড়ীতে আট আনা দরে কয়লা আসিতেছে। অথচ সে এ বাড়ীতে গৃহিণীরূপে পদার্পণ করিয়া অবধি দশ আনা দরে যে কয়লা আনিয়াছে তাহাদের বৃদ্ধা ঝি, তা'র আর নড়চড় নাই। সন্ধ্যা বেলায় সুকেশ বাড়ী ফিরিতেই দুই বাহুর কঙ্কণ-গুঞ্জনের সহিত কণ্ঠের ঝঙ্কার মিলাইয়া বৃদ্ধা পরিচারিকার বিরুদ্ধে ফৌজদারি নালিশ করিয়া দিল। তার ফলেই পরদিন প্রাতে প্রথম তদন্ত এই মাত্র যা হইল।

বৃদ্ধা পরিচারিকা তিনকড়ির মা আজিকার নয়। সুকেশের কাছে বহুদিন হইতে চাকরী করিয়া আসিতেছে। সুকেশের সংসার বাঁধিবার পূর্ব্বে অনেক যত্ন সে করিয়াছে। চারি পাঁচটি বন্ধু মিলিয়া তখন একটা মেসের মত করিয়া থাকিত। কিন্তু যদি কেহ মেস বা হোটেল আখ্যা দিত, তবে সুকেশ বা তিনকড়ির মা কেহই সহ্য করিত না। কারণ সুকেশ ছিল সর্ব্বকালীন ম্যানেজার এবং তিনকড়ির মা ছিল গৃহের কর্ত্রী। মাছের বড় টুকরাটা এবং সযত্ন অপসরণে রক্ষিত অথচ তথাকথিত উদ্বৃত্ত উত্তম খাদ্য সামগ্রী ম্যানেজারের পাতে হামেশাই আসিয়া পড়িত। কিন্তু তিনকড়ির মায়ের বার্দ্ধক্যও আজিকার নহে এবং তাহার জন্য সুকেশকে কিছু কষ্ট স্বীকারও করিতে হইত। তাহার তখনকার রাজত্বের সময় হইতেই চোখে সে ভাল দেখিতে পাইত না। কতদিন যে মাছের সঙ্গে আরশুলারও ঝোল রাঁধিয়া পাতে আনিয়া দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া সুকেশ তখনকার দিনে সে সব সহ্য করিয়াছে।

(৩)

কিন্তু আজিকার ব্যাপার অন্যরূপ। কালভেদ, অবস্থা ভেদ, প্রকার ভেদ। রীতিমত তদন্তের পর তদন্ত ও বিচার। বেশ ওজন করিয়া (এবার আর গর্জ্জন নয়) কথাগুলি বলিল সুকেশ—"আচ্ছা, তিনকড়ির মা! আমি যে কয়লার দাম এখুনি জেনে এলাম আট আনা করে, আর তুমি কি করে বল দশ আনা?"

"ও মা! আট আনা কোথা পাবে গা!" গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলে তিনকড়ির মা।

"কয়লার দোকানেই পাব ; আবার কোথা পাব।"

[illegible]

"তুমি কোন্ দোকান থেকে দশ আনা করে আনলে তাই শুনি আগে?"

"ঐ তো হোতা—মুদি দোকানের পাশে জলের কলের পূবে বাগে যে কুমোরের—"

"চল, আমি যাব তোমার সঙ্গে কোন্ দোকানে তোমায় দশ আনা দাম বলে দেখবো।"

সংযমের বিধিমত প্রয়াস সত্ত্বেও সুকেশের মুখ হইতে বীর্য্যের সুর বাহির হইয়া পড়ে অতর্কিতে পুনরায়। কিন্তু এবার বিপত্তি সৃষ্টি করিল না, পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া বোঝে। বরং সেখান হইতে অনুমোদনের দৃষ্টিই অনুমিত হয়।

"চল না, আমি কি ডরাই?" আপনি বললেই আমি শুনেবো তোমার কথা?" তিনকড়ির মাও বীরদর্পে জবাব দিয়া পায়ের কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত তুলিয়া ক্ষিপ্র পদে অগ্রসর হইয়া যায়।

অনতিবিলম্বে মুদি দোকানের পাশে, জলের কলের পূবে বাগে, কুমোরের দোকানের বাঁ হাতে যে বিখ্যাত কয়লার দোকান অবস্থিত তথায় গিয়া তাহারা উপনীত হইল। এ হেন প্রধান সাক্ষীর আসন্ন জবানবন্দীর মত জরুরী কালেও সুকেশের মনের মধ্যে একটা অবান্তর আশা উঁকি মারিতেছিল—এখন আর লীনা তাহাকে অপৌরুষের ধিক্কার দিতে পারিবে না। এই সকালের অপ্রশস্ত সময়টুকুর মধ্যেই দুইবার দুই কয়লার দোকান চষিয়া আসিতেছে একটা দারুণ তদন্তের কার্য্যে। তারপর বিচার, শাস্তি প্রদান, পরিচারিকাকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিলে অপর ভৃত্য বাহাল, তারপর দুটি মুখে গুঁজিয়া দশটায় নৈমিত্তিক আফিসে যাওয়ার ব্যতিক্রমও ঘটিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে লীনা আগেকার দিনে আফিসে বাহির হইবার পথে চৌকাঠ ধরিয়া মূর্ত্ত প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত প্রায় প্রতিদিনই—কতদিন লেট করাইয়াও দিয়াছে, সেই লীনাই আজকাল এই প্রকার প্রয়োজনীয় গুরু কার্য্যের দরুনও দুই মিনিট দেরী হইতে দিবে না। আফিসের কর্ত্তার চেয়ে গৃহের কর্ত্রীরই শাসন বেশী কড়া! শাস্ত্রকারের চপলমতি স্ত্রীর অত্যাচারেই নিশ্চয় তাহার মুখ দিয়া নিঃসৃত হইয়াছিল—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

যাক, অবান্তর আত্মপ্রসাদ ও আক্ষেপপূর্ণ মনস্তত্ত্ব মন হইতে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া দোকানীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার কাছ হ'তেই এই আমার ঝি কয়লা নিয়ে গেছে কাল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!" বিস্মিত দোকানদার জবাব দেয়।

"কত করে নিয়ে গেছে?"

বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে জবাব দেয়—

"কেন বাবু, আট আনা করে দাম নিয়েছি!"

"বরাবরই কি এই দরে দিচ্ছ তুমি কয়লা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—বরাবরই তো!"

তদন্তটা তাহারই বিরুদ্ধে না ঝিয়ের বিরুদ্ধে তাহা না বুঝিতে পারিয়া সত্য কথাটাই বলে।

এইবার তিনকড়ির মায়ের মুখ হইতে অগ্ন্যুৎপাত—"কি! আমি কি চোর? এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে নি গো—হ্যাঁ, হাড় পাকালুম এই গতর খাটিয়ে—কেউ বলুক দিকি চুরি করিছি বা একটা মিথ্যে কথা বলিছি একদিনের তরে!—হ্যাঁ! আমার কাছে স্পষ্ট কথা। মিথ্যে মিথ্যি অপমান করতে নিয়ে এলে বাবু আপনি আমায়? কেন? হুঁ-হুঁ-হুঁ!!"

বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

আবহমান কাল হইতে, এমন কি হয়তো তিনকড়ির জন্মেরও পূর্ব্বে হইতে অর্থাৎ তাহার 'তিনকড়ির মা' নামকরণের পূর্ব্বে হইতে যে চৌর্য্যবৃত্তি তাহাকে অধিকার করিয়াছে সেটার যেন বেচারির উপর দাবী স্থাপনের অধিকার জন্মিয়াছে এবং সেই জন্য যে জবাবদিহির প্রয়োজন কোন কালে হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত ছিল। সেই হেতু হয়তো অসতর্ক বৃদ্ধা পূর্ব্বে হইতে দোকানীর সহিত কোন প্রকার সড় করিয়া রাখে নাই। অথবা তাহারই মত নিম্নস্তরের ব্যক্তি ঐ কয়লাওয়ালার উপর এটুকু বিশ্বাস হয়তো স্বতঃই তাহার ছিল যে, অসময়ে কখনই তাহার বিরুদ্ধে এমন করিয়া সাক্ষ্য সে দিবে না। সম স্তরের লোক যে এমন 'বিশ্বাসঘাতকের' কার্য্য করিতে পারে তাহা হয়তো তাহার ধারণার বাহিরে ছিল।

(৪)

তাহার অগ্নি উদ্গিরণ করিবার আর একটি জায়গা বাকি ছিল এখনও। বাড়ী ফিরিয়া উৎক্ষিপ্ত হস্তের সঞ্চালন এবং গ্রীবার ভঙ্গিমার সহিত চীৎকার করিয়া লীনাকে কহিল, "কেন বৌদি মিথ্যে মিথ্যি আমার নামে লাগালে অমন করে? আমি চুরি করিছি? কই বলুক দিকি কে বলবে! আমার নামে অপবাদ!"

বিস্মিত লীনা স্তম্ভিত সুকেশের দিকে চাহিয়া কহিল "তবে যে তুমি বললে দোকানে দেখে এলে আট আনা করে কয়লা!" সুকেশ কোন জবাব না করিয়া চুপ হইয়া রহিল। জবাব দিল তিনকড়ির মাই "বললেই হ'ল! আমায় বানাবে চোর?"

লীনা আরও অবাক হইয়া কহিল, "কি, তুমি যে বড় কথা কও না? তখন বললে আমার কথাই সত্যি! আর এখন ও আস্ফালনের সামনে রইলে চুপটি মেরে! কোন্টা সত্যি বল!"

কিন্তু সুকেশের কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। সত্যই সে স্তম্ভিত। 'মরিয়া না মরে রাম'। মুখের উপর কয়লাওয়ালা ওর মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিল, তবু সে হার তো মানিতে চায়ই না, উল্টিয়া সকলকে সে-ই দোষারোপ করিল। এখনও সেই তেজের সঙ্গেই লীনার কাছে আসিয়াও আস্ফালন! এত বড় অদ্ভুত তেজের অভ্যন্তরে কোথায় যেন একটা সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহার সন্ধান করিতে পারিতেছে না সুকেশ। তাই লীনা যখন বলিল, 'কোনটা সত্য বল' তখন সে সত্যই সত্যের সন্ধানেই ডুবিয়া গিয়াছে। তল পাইতেছিল না। মনটা ক্রোধে, বিস্ময়ে ও তিক্ততায় ভরিয়া ছিল।

কথা কহিবার স্পৃহা ছিল না। কহিতে গেলেও দুই এক কথার কর্ম্ম নয়। ওদিকে আফিসেরও বেলা হইয়া যায়! লীনা পুনরায় তাগিদ দিতেই নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও নির্লিপ্তভাবে বলিয়া উঠিল, "দেখ, আজ আফিসে অনেক কাজ আছে একটু শীগ্‌গির যেতে হবে। ভাতটা বাড় তো, আমি স্নানটা সেরে এই আসছি। বিকালে এসে একটা হেস্তনেস্ত করা যাবে'খন।"

গামছা কাঁধে স্নানের তরে অপসৃয়মান স্বামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত লীনা ভাবিতে লাগিল—প্রকৃতিস্থ তো.

(৫)

আফিসে সত্যই কাজ সেদিন বেশী ছিল। বার্ষিক হিসাবনিকাশের দিন। সাহেব নিজেই ৯টা হইতে আসিয়া আফিস করিতেছে আজ কয়দিন ধরিয়া। আফিসে আসিয়াও সুকেশের মনের মধ্যে বাড়ীর কথাটা একটা খোঁচার মত রহিয়া গিয়াছিল।

তখনও টিফিনের সময় হয় নাই। কাজেই কেরাণীদের নিদ্রার সময় সেটা নয়। কিন্তু সুকেশ মাথাটা টেবিলে গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। পূর্ব্বরাত্রে সেই কয়লার দাম লইয়া লীনার সহিত আলোচনা করিতে করিতে ভাল ঘুম হয় নাই। চারি-দিকের সহকর্ম্মীদের কাগজের শব্দ ও গলার গুঞ্জন সুকেশের তন্দ্রার যেন অনুকূলতাই সৃষ্টি করিতেছিল। সহজেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ঘর্ঘর শব্দ মুখরিত রেল গাড়ী যেমন নিস্তব্ধ ষ্টেশনে আসিয়া চুপচাপ দাঁড়াইতেই নিদ্রিত যাত্রীর নিদ্রা ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা সময়ে বৃহৎ ঘরখানার সমস্ত শব্দই একসঙ্গে বন্ধ হইয়া সুকেশের তন্দ্রা ছুটাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সুকেশ যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিল বড়সাহেব গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন এবং ঘর-ভরা সকলে সুকেশের দিকেই চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সাহেব সুকেশের দিকেই আসিতেছিলেন, তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বনাশ! তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপ-বিষ্ট যে বাবুটি তাহাকে সংবাদটি দিল তাহাকে সুকেশ ব্যস্ত হইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, সে ঘুমায় নাই—একটা বিষয় চিন্তা করিতেছিল শুধু। তাহার জবাবে সে বলিল যে, কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া লাভ নাই—সুকেশ যেন সাহেবকে গিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করে।

কিছু পরেই চাপরাশী আসিয়া হাজির।—সুকেশের তলপ পড়িয়াছে বড়সাহেবের কামরায়! সুকেশ অকূল পাথারে পড়িয়া এবার বামপার্শ্বের বাবুটিকে বুঝাইতে লাগিল যে, সত্যই সে ঘুমায় নাই,—ঘুমাইয়া থাকিলে আপনা হইতেই কি ঘুম ভাঙিয়া যায় অমনভাবে? এবং কথাটা শেষ করিয়াই অনুমোদন লাভের আশায় খাস কামরার চাপরাশীর মুখের দিকে তাকাইল। বাবুটি হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, সাহেবকে বুঝান না গিয়ে।" চাপরাশী শুধু বলিল, "জলদী চলিয়ে বাবুজী!"

যাইতে যাইতে সুকেশ ভাবিতে লাগিল—এমন ত খুব কমই হয় যে সাহেব নিজে ছুটিয়া আসে কেরাণীদের ঘরে। তবে, হ্যাঁ, আজ কাজ বেশী—সাহেব ছট্‌ফট্ করিয়া ফিরিতেছে। আর আজই কিনা সে টেবিলে দিল মাথা পাতিয়া! রাগ হইল তিনকড়ির মায়ের উপর,—যত নষ্টের গোড়া। রাগ হইল লীনার উপর,—দুই আনার জন্য মরিয়া যাইতেছিল, এখন নেও, সামলাও! এমন কি রাগ হইল কয়লাওয়ালার উপরও,—না হয় মিথ্যা কথাই বলিয়া দিতিস্ তুই বেটা ধর্ম্মবতার যুধিষ্ঠির! আসিয়াছেন কয়লার দোকান দিতে! কিন্তু সাহেবকে যে সত্যই বুঝাইতে হইবে যে, সে হিসাব মিলাইবার ভাবনায় মাথাটা টেবিলে পাতিয়াছিল শুধু ঘুমায় নাই। কোন্ হিসাবটার কথা বলিবে তাহাও মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য! সাহেব ত ঘুমের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না! কয়েকটা কাজের কথা কহিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আজকের দিনের মধ্যে অনেক কাজ করিতে হইবে ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত ঘুমের কথাটা তুলিলেনই না।

সাহেবের ঘর হইতে খুবই আশ্চর্য্য হইয়া সুকেশ ফিরিল। আজিকার অতিরিক্ত কাজের দিনে ঘুমাইতে দেখিয়াও যে কিছু তিনি বলিলেন না তাহাতে সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মনটা ভরিয়া গেল। বুঝিল যে তাহার ত্রুটি হইয়াছে স্বচক্ষে দেখিয়াও শুধু, তাহার সম্ভ্রমের হানি হইবে বলিয়াই সে কথার উল্লেখ করিলেন না। অথচ প্রকারান্তরে জানাইয়াও দিলেন যে সময় নষ্ট করিবার দিন নয়।

এবং এতক্ষণে সুকেশ তিনকড়ির মায়ের অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝিল। মানুষের চরিত্র নামিয়া গেলেও তাহার ইজ্জৎটা নামিতে চাহে না। সেই ইজ্জৎকে যদি কেহ তখন প্রকাশ্যে আঘাত করিতে যায় তখন একটা বিপত্তির সৃষ্টি কিছু আশ্চর্য্য নয়। না, শাস্তি সে দিবে না তিনকড়ির মাকে। বড় জোর সামান্য দুইবারের চুরির পয়সাটা কাটিয়া লইবে মাহিনা হইতে।

কিন্তু বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া বুঝিল যে সামান্য কিছু করিবার ঊর্দ্ধে গিয়া ব্যাপারটা দাঁড়াইয়া। তিনকড়ির মা তল্পীতল্পা বাঁধিয়া প্রস্তুত, আর সে এ বাড়ীতে কাজ করিবে না।

লীনা সারা দুপুর বুঝাইয়াছে, কিছু হয় নাই, এখন সুকেশের অনুনয় বিনয় সবই ব্যর্থ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

যে তিনকড়ির মা একদিন ছিল সুকেশের বিশ্বাসের পাত্রী, সে যদি আজ সুকেশের নূতন কর্ত্রী দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে তস্কর বলিয়া প্রমাণিত হইতে বসে—চোর সে সত্যই হউক আর না-ই হউক—তাহার আত্মসম্মান সেখানে বিক্ষুব্ধ হইবেই। এই সম্মানবোধ ভরা পালের মত বাতাসে ভর করিয়া নৌকাকে ছুটাইয়া লইয়া চলে, আর স্থির থাকিতে দেয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তরঞ্জন

শ্রীশশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত, এম-এ

মহাকবি শুধু রসস্রষ্টা নহেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও। ভাবের অগ্রদূত তাঁহারা, তাই অদূর ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন। অনন্যসাধারণ কল্পনা-প্রকৃতি-প্রভাবে এবং অসাধারণ দূরদৃষ্টিবলে তাঁহারা ভবিষ্যৎ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান। বস্তুতঃ মহাকবিরা এক একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ।

বর্ত্তমান যুগে দেশাত্মবোধের স্রষ্টা কবি বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন তাহা বাস্তবে দেখাইয়াছেন। বঙ্কিম কমলাকান্তকে ও "আনন্দমঠের" সন্তানগণকে কল্পনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, দেশবন্ধু তাহা নিজের জীবনে প্রায় প্রত্যেকটিকেই রূপায়িত করিয়াছেন। বঙ্কিমের মাতৃপূজক কমলাকান্ত রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনরূপে—তাই আমরা বলিতে চাই, বঙ্কিমচন্দ্র দেশবন্ধুকে anticipate করিয়াছিলেন। আমাদের অনুমান যে অসত্য নয়, তাহা আমরা নিম্নোক্ত তথ্য দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের ভক্ত ছিলেন; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও আশৈশব বঙ্কিমের ভক্ত ছিলেন। "দেশবন্ধু-স্মৃতি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, "স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—'চিত্তরঞ্জন ক্লাসের পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, মাষ্টার পড়াইতেন, তিনি বঙ্কিমবাবুর বই পড়িতেন, অথবা কবিতা লিখিতেন।' বাস্তবিক বাল্যে ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তাঁহার খুব ভাল লাগিত। তিনি 'আনন্দমঠ', 'লোকরহস্য', 'অনুশীলন' প্রভৃতি উপন্যাস ও প্রবন্ধ খুব অভিনিবেশ সহকারে পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই নিজের হৃদয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি জাতীয় পুরোহিতের আসনে সংস্থাপন করেন।"

এ বিষয়ে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বলেন,—"আলিপুর জেলে তিনি (চিত্তরঞ্জন) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রায়ই পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর।........"

"বঙ্কিমের মাতৃপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—"আনন্দমঠের দেশপূজার পদ্ধতি পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণ নয়, ভারতের সংস্কৃতিসম্মত নিষ্কাম স্বদেশ প্রেম।.............."

আমরা জানি দেশবন্ধুও এই মতই পরিপোষণ করিতেন। বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে অভিভাষণ উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন—

"...........With me work for my country is no imitation of European politics. It is a part of my religion."

সুভাষচন্দ্রও এ সম্বন্ধে বলেন,—"জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, একচিন্তা,—স্বদেশ সেবা; এবং সেই স্বদেশ সেবা ছিল তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সোপান-স্বরূপ।"

বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মঙ্গল বলিতে জনসাধারণের মঙ্গল বুঝিতেন, দেশের স্বাধীনতা বুঝিতে জনগণের স্বাধীনতা বুঝিতেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়া তিনি একথা একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশবন্ধুও একথা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তাই একদা বলিয়াছিলেন,—"I want Swaraj for the masses and not for classes."

'আনন্দমঠের' সন্তানমণ্ডলী পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—"আমরা অন্য মা মানিনা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা.................."। দেশবন্ধু এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি তথা ভারতভূমির জন্যই তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব, ভাই বন্ধু, এমন কি স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, মায়, তাঁহার বাস্তুভিটা-খানি পর্য্যন্ত দেশহিতার্থে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

সন্তানগণের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের যে আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্তই এক এক করিয়া দেশবন্ধু আপন জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ভবানীপুর সম্মিলনীতে অভিভাষণ প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার দেশভক্তি কত তীব্র তাহা বেশ বোঝা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার বাঙলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙলার যে মূর্ত্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনীমূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।..........আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙলাকে জানে না।............. বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথম বাঙলার মূর্ত্তি গড়িলেন। বঙ্গ জননীকে দর্শন করিলেন। সেই সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্ গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন,—'দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।' কিন্তু আমরা ত সে মূর্ত্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা, মা, বলিয়া রোদন করিতেছি।"—বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙলার ইতিহাসের ধারা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল, মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল।—রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম কেন ইংরেজ এদেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই:—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে,
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।' বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙালী হিন্দু হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙালী বাঙালী।—বুঝিলাম, বাঙালীকে [illegible] বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্তসৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জানিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, সেরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ("গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন" পুস্তিকায়) বলেন,—"বাঙালীকে তাহার প্রাণধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই বঙ্কিমের পর এই প্রাণ-ধর্ম্মী কবি একটা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

মুক্তিকারূপিণী জননী-জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন,—"এস মা, নবরাগরঙ্গিণি, নববল-ধারিণি, নবদর্পদর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি। এসো মা, গৃহে এসো, ছয় কোটি সন্তান একত্রে, এককালে, দ্বাদশকোটি কর জোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয়কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে!—শক্তি দাও সন্তানে।—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব,—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।" (আমার দুর্গোৎসব) "দেশবন্ধু-স্মৃতি" প্রণেতা হেমেনবাবু বলেন, "মায়ের দেখা পাইয়া দেশ-বন্ধু বলিয়াছিলেন,—'মা কে ত' দেখিলাম, এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে।"—কিন্তু পূজা করিয়াছেন একা তিনিই। একাই সপ্তকোটি নরনারীর জন্য বঙ্কিমের সাধনা সার্থক করিয়াছেন, দ্বাদশকোটি চক্ষুর জন্য একা কাঁদিয়াছেন, একাই ভোগ-লালসা ও ঐহিক সুখের মোহ ত্যাগ করিয়া 'আনন্দমঠের' সাধকদিগের মত মায়ের পূজার অধিকারী হইয়াছেন এবং একাই সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল অনন্ত-কালসমুদ্র হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিমজ্জিত মাতৃমূর্ত্তির উদ্ধারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমের আত্মা আজ দেখিতেছেন, তিনি একাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া হতাশ হইয়া ফিরেন নাই, বাঙলার মাটীতে আরও কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছিল।....."

কমলাকান্ত রাজনীতির যে মতবাদে বিশ্বাস করিতেন, চিত্তরঞ্জনও তাহাতেই আস্থাবান ছিলেন। দুই প্রকার রাজ-নীতির কথা বলিয়া কমলাকান্ত যে উদাহরণ দিয়াছেন, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিম্নলিখিতরূপে তাহার সংক্ষিপ্তসার করিয়াছেন, শিবু কলুর ভোজ্যান্নের প্রতি লুব্ধ কুকুর ধীরে ধীরে নানা প্রকার আবেদন নিবেদনের ফলে কয়েকখানি মাছের কাঁটা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কলুগৃহিণী কর্তৃক লোষ্ট্রাহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঠিক সেই সময়ে এক বৃহৎকায় বৃষ উক্ত কলুর জাবনা খাইতেছিল। কলু গৃহিণীর তাড়নায় ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, বরং তাহার হৃদয় মধ্যে নিজের শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল এবং কলু গৃহিণীকে রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। বলা বাহুল্য এই দুই প্রকার রাজনীতি হইল নরম পন্থা ও চরমপন্থা। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় পন্থারই পক্ষপাতী ছিলেন। দেশবন্ধুও ছিলেন কমলাকান্তের মত চরমপন্থী। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।" প্রথম জীবনে দার্জ্জিলিংয়ে রাখীবন্ধন উৎসবে তিনি বলিয়াছিলেন, —"..........আজ আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরে বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণনেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরেজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরেজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছু দিবে না।..........."

কমলাকান্ত দেশমাতৃকার যে রূপটি দেখিয়া বঙ্গবাসীকে কালস্রোতে ঝাঁপ দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রূপটি প্রত্যেক বাঙালীর অন্তর্লোকে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। কমলকান্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে বলিয়াছিলেন,— "উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে, এবার আপনা ভুলিব,— ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব,—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।"

দেশবন্ধু এ সমুদয়ই আপন জীবনে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন।

'আনন্দমঠে'র সন্তানগণ যে ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই সফল করিবার জন্য দেশবন্ধু আমরণ প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

কমলাকান্ত কবি, রসিক, চিন্তানায়ক ও দেশভক্ত। দেশ-বন্ধুও একাধারে এ সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রথমে আমরা কমলাকান্তকে দেখিয়াছি কবিরূপে। একদা তিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সত্যকার কবি ছিলেন তিনি, তাই প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইয়াছেন, প্রতি পত্র মর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিয়াছেন, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-রোহিণীর শোভা দেখিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তিতে আমরা যুগপৎ চিন্তার খোরাক ও নির্ম্মল হাস্যরস পাইয়াছি। আবার তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছি মাতৃ-মন্ত্র সাধক, স্বদেশ-প্রেমিকারূপে।

চিত্তরঞ্জনকে আমরা জানি প্রথমে বৈষ্ণব কবি হিসাবে, "সাগর সঙ্গীতের" কবিরূপে, পরে রাষ্ট্রনেতারূপে, দেশমাতৃ-কার পরম সেবকরূপে।

(শেষাংশ ৫৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(৭)

কালকাতার চোরবাগান অঞ্চলের কোন ধনী গৃহের দ্বিতলে মেয়ে মহলের বার্ষিক অভিনয় অধিবেশন।

সাজঘরে প্রতিমা বসন্ত সাজিতেছিল আর ক্ষিতীশের বোন্ দীপা পরিতেছিল শীতের পোষাক।

বাহুতে কৃত্রিম কিশলয়ের বলয় পরিতে পরিতে প্রতিমা হলঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, এই তোমার প্রকাশ মুখুয্যে, ইংরেজীর প্রফেসর?

দীপা উত্তর করিল, কেন, সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

হচ্ছে বই কি, টিকির যে বহর তাতে ভদ্রলোক টুলো পণ্ডিত না হয়ে যায় না।

দীপার অনুরোধে প্রকাশ আসিয়াছে আদ্যকার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিতে। প্রথমে সে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু দীপা বলিল, আমি যে তাদের কথা দিয়েছি, প্রকাশ দা'।

আমার নাম উঠল কি করে?

সভ্যারা প্রায় সকলেই কলেজের ছাত্রী, তারা একজন প্রফেসরকে সভাপতি করতে চায়, আমি আপনার নাম করি। সম্পাদিকা বলে, খুবই ভাল কথা, তিনি সভাপতি হলে সবাই খুশী হবে।

প্রকাশ হাসিয়া বলিল,—আমি যে এত পপুলার তা ত জানতুম না।

সভায় তখন লেখা হালদার আবৃত্তি করিতেছিল, এর পরেই নাচ হইবে, শীতের প্রয়াণ ও বসন্তের আগমনী।

প্রতিমা জানালার ফাঁক দিয়া সভাগৃহের দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভাই তোমার এ সভাপতিকে কোথায় যেন দেখেছি, তবে তখন চুল ছিল কদম ছাঁটা।

দীপা বলিল, ওঁর চুল ভাল করে ছাঁটবার একটা ইতিহাস দাদার কাছে শুনেছি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তার কারণ বোধ হয় তোমাদের এই সাক্ষাৎ।

কি রকম?

উনি নাকি সিনেমায় কোন এক সুন্দরীকে দেখে ভালবেসে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চুল ভাল করে ছেঁটেছেন। পোষাক বদলে বাবু সেজেছেন, আর আরম্ভ করেছেন ব্যায়াম করতে।

প্রতিমা বলিল, তোর যত বাজে কথা।

এই সময় আবৃত্তি ও তার আনুষঙ্গিক করতালি শেষ হইলে সভাপতি কার্যসূচী দেখিয়া কহিলেন, নৃত্য—প্রতিমা চক্রবর্তী ও দীপা সেন।

প্রতিমা আয়নায় নিজের মুখখানা একবার দেখিয়া লইয়া কপালের ডান দিকের চুলগুলো একটু সরাইল।

বাদ্যের তালে তালে প্রথম প্রবেশ করিল শীত, শুভ্র তার অঙ্গাবরণ, মাথায় শুকনা ফুল ও পাতার করোনেট।

আজ তার বিদায়ের দিনে পাতাগুলি এক একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, শীত ধরিয়াছে ঝরা পাতার গান, মৃদু আলোকসম্পাতে, বেহালার করুণ সুরে শীতের বিদায় মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিল।

তার পরেই ঘরখানা ভরিয়া গেল সবুজ আলোর, তার সঙ্গে ছিল একটা অরুণ আভা। সুন্দর সুঠাম দেহখানিকে নব পল্লবিত লতার মতন দুলাইতে দুলাইতে প্রতিমা সভা-কক্ষে প্রবেশ করিল।

সকলেই তার উজ্জ্বল বর্ণ, অনুপম মুখশ্রী ও লীলায়িত দেহভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিমোহিত হইলেন স্বয়ং সভাধ্যক্ষ মহোদয়।

প্রকাশ নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সেই সুন্দরী আজ বসন্ত বেশে! একি তবে স্বপন?

তার কপাল ঘামিয়া গেল, প্রতিমার দিকে সে চাহিয়া রহিল ধ্যানীর অপলক নেত্রে।

প্রতিমা নাচিতে নাচিতে আগাইয়া আসিয়া তার শান্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি দিয়া প্রকাশের দিকে একবার চাহিল।

প্রকাশের বুকে এবার আরম্ভ হইল মৃদু কম্পন, মাথাটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। এতটা সৌভাগ্যের জন্য ত' সে প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। তার মনে হইল চারিদিকে বসন্তের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, ফাল্গুনের আগুনে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে মেয়ে মহলের এই উৎসব।

এরই জন্য প্রায় দুই মাস সে সিনেমায় সিনেমায় ঘুরিয়াছে, মেয়েদের প্রত্যেকটি নাচের ও জলসার টিকিট কিনিয়াছে। ট্যাক্সিতেই বা খরচ করিয়াছে কত।

প্রতিমা নাম সার্থক বটে। প্রতিমা বাঙালী ব্রাহ্মণের মেয়ে, এই যোগাযোগ অত্যন্ত শুভ ও আশাপ্রদ দেখিয়া প্রকাশ আনন্দে আত্মহারা হইল।

তিন তিনখানা গান গাহিয়া নাচিতে নাচিতে প্রতিমা সভা ত্যাগ করিলে সভাপতি আপন মনে গুন্ গুন্ করিতে লাগিলেন, আজু মঝু শুভদিন ভেলা।

অন্যমনস্ক সভাপতিকে কার্যসূচী দেখাইয়া মেয়েমহলের সম্পাদিকা বলিল, এইবার আপনার অভিভাষণ।

এ্যাঁ আমায় বলতে হবে? কি বলব আমি? মনে হইল সভাপতি যেন স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।

প্রকাশের পাশেই একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, ঐটি আমার মেয়ে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, বসন্ত অর্থাৎ প্রতিমা এরই মেয়ে। মেয়েটি প্রভাতের আলোর চেয়েও সুন্দর আর তার বাবা মোটাসোটা এই ভদ্রলোক, কালো গায়ের রং, উঁচু কপালের মধ্যে নিষ্প্রভ দুই টুকরা কাঠের মতন কোটরগত ম্লান দুইটি চোখ, দেখিলে লরেল ও হার্ডি যুগলের লরেলের কথা মনে হয়।

ভদ্রলোক বলিলেন, প্রতিমা থার্ড ইয়ারে পড়ে।

প্রকাশ বলিল, ওয়াণ্ডারফুল, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, অনেকেই তা বলে বটে।

বলতে তারা বাধ্য, মিষ্টার সান্যাল।

আমি সান্যাল নই, আমার নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রী আমি তুলে দিয়েছি, আমি একজন এ্যাডভোকেট ও গবেষক।

পূর্বেই সম্পাদিকা দেবেনবাবুর সঙ্গে প্রকাশের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হইয়া প্রকাশ কহিল, ক্ষমা করবেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

রাইট্ ও! ভুল ও রকম সকলেরই হয়ে থাকে—বলিয়া দেবেনবাবু সভাপতির পদগৌরব ভুলিয়া গিয়া তার পিঠ চাপড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

প্রতিমার পিতার এই আপ্যায়নে প্রকাশ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার গবেষণার বিষয়?

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য।

সদস্যাগণ ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া সম্পাদিকা সভাপতিকে বলিলেন, আপনি কিছু বলুন।

সভাপতিত্বে একেবারে অনভ্যস্ত প্রকাশ বোধ হয় এটাও তার গুরু দায়িত্বের একটা আবশ্যকীয় অঙ্গ মনে করিয়াই প্রথম বার কয়েক ঢোক গিলিল ও তারপর আরম্ভ করিল কপালের ঘাম মুছিতে।

সে অভিভাষণ দিতে যাইবে ঠিক এই সময় প্রতিমা ও দীপা ঘরে ঢুকিলে সভাপতি আবার নার্ভাস হইয়া গেলেন।

বক্তৃতার জন্য উদ্যত তর্জ্জনী নামিয়া আসিল কোটের বোতামের উপর। তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আক্রমণে প্রথমে ছিঁড়িল একটি বোতাম, পরে আর একটি। সেদিকে সভাপতির লক্ষ্য ছিল না। তিনি তখন বলিয়াই চলিয়াছেন—

মহিলাগণ ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমা অপেক্ষা অনেক যোগ্য ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন, যেমন ধরুন পূজনীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এ্যাডভোকেট ও গবেষক মহাশয়। তিনি সভাপতিত্ব করলেই সর্বাংশে শোভন হ'ত।

আমি নিজের অযোগ্যতার জন্য লজ্জিত, আমাকে এই-ভাবে সম্মানিত করায় আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজ আমার জীবনের একটা শুভ দিন, স্মরণীয় দিন, সর্বাপেক্ষা শুভ দিন বললেও অত্যুক্তি হয় না। (সভাপতি এই সময় প্রতিমার দিকে চাহিলেন)।

দীপা প্রতিমাকে বলিল, প্রকাশদা আর একটা বোতাম ছিঁড়বে দেখছি।

প্রতিমা একটু হাসিল।

সভাপতির অভিভাষণ চলিতে লাগিল—ভবিষ্যতের জননীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে। সেদিক থেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা খুব বেশী। আপনাদের বার্ষিক বিবরণী দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এর দ্বারায় সমাজের ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। আপনারা অনেক কাজেই হাত দিয়েছেন, যেমন বিতর্ক সভা, স্বাস্থ্যোন্নতি শাখা, চারুকলা বিভাগ, রন্ধন সেক্সন। ঝিনুকের বোতাম তৈরী এবং সেলাইর কাজ করে আপনাদের কিছু আয় হয়েছে, এটা বড়ই সুখের বিষয়। আপনাদের দ্বারা গৃহ শিল্পের প্রচলন ও উন্নতি হোক এই প্রার্থনা।

মেয়ে মহলের কর্তৃপক্ষ এই সব পরিকল্পনার জন্য আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি সবই হয়েছে চিত্তাকর্ষক। সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে বসন্তের আগমনী। কুমারী প্রতিমা আজ যে নৃত্য কুশলতা দেখিয়েছেন তা অপূর্ব, তাঁর কণ্ঠস্বর অনবদ্য, ভঙ্গী অপ্রতিম। তাঁকে জিনিয়াস বলা চলে। আমি সভার পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(এই সময় সদস্যরা করতালি দিলেন, দেবেনবাবুর হাতের শব্দটাই সকলের উপরে উঠিল। প্রকাশও তাহাতে যোগ দিল)।

খানিকটা নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সভাপতি আবার বলিতে লাগিলেন, কুমারী প্রতিমার উজ্জ্বল প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপে তাঁকে একটা স্বর্ণ পদক দেওয়া হবে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—দাতার নাম জানতে পারি কি, সভাপতি মশায়?

সভাপতি বিপদে পড়িলেন। পুরস্কারের কথা কেহ তাহাকে বলে নাই। সভাপতি হইলেও বয়স তার এত অল্প যে নিজ হইতে একটা পুরস্কার ঘোষণা করাও শোভন নয়।

সম্পাদিকা সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন, পুরস্কার দেবেন পরিচালক সংঘ।

পরিচালক সংঘের সদস্যারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

দীপা প্রতিমাকে কহিল, সভাপতির দেওয়া পদক এবার কেমন গলায় ঝুলবে দেখছি।

প্রতিমা বলিল, ইস্।

সামান্য জলযোগ করিয়া সভা ভঙ্গের একটু পরে দেবেন বাবু বিদায় লইলেন। প্রকাশ তাঁদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ফটক পর্যন্ত আসিল। দেবেনবাবুর গাড়ীর হাতল ধরিয়া সে আরম্ভ করিল প্রতিমার নৃত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, আপনার প্রতিভায় সকলে চমৎকৃত হয়েছে, মিস্ চক্রবর্ত্তী।

সভার পরিচালকদের মধ্যে যে দু' একজন গাড়ী পর্যন্ত আসিয়াছিল তারা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

দেবেনবাবু ও প্রকাশ উভয়েরই উৎসাহের সীমা নাই, একজন প্রশংসা করিয়াই কৃতার্থ আর একজন কন্যার প্রশংসা শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা তাঁর পক্ষে একান্ত দরকার। কিন্তু প্রতিমা সেকথা ভুলে নাই।

সে পিতাকে স্মরণ করাইয়া দিল, রাত হয়ে গেছে, বাবা।

প্রকাশের মনে হইল, কী সুন্দর কণ্ঠস্বর। দেবেনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ মা, এইবার চল। তারপর প্রকাশের দিকে চাহিয়া—মাঝে মাঝে আসবেন আমার ওখানে, সাহিত্য আলোচনা করা যাবে।

প্রকাশ বলিল, সে ত পরম সৌভাগ্য। আপনার ঠিকানা?

৯৭ ডি নিউ রোড্ আলীপুর। আপনি গেলে বড় সুখী হব। অনেক রিসার্চ্চ করছি প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে। সেগুলি আপনাকে দেখাতে চাই।

প্রকাশ বলিল প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আমারও ঝোঁক খুব।

ঐ বিষয়ে পি আর এস কি পি এইচ ডি একটা দেন না কেন?

দেখি।

কবে আসবেন?

কালই যেতে পারি, আপনার ঠিকানা?

এর মধ্যে ভুলে গেছেন? ৯৭ ডি নিউ রোড।

বিদায় লইবার সময় দেবেনবাবু বলিলেন, আপনার অভিভাষণ হয়েছে খুব সারগর্ভ। কোন্ কাগজে বেরুবে?

সম্পাদিকা বলিলেন, সব কাগজেই পাঠাই এবং অনেকেই অনুগ্রহ করে ছেপে থাকেন।

দেবেনবাবু বলিলেন, বিস্তৃত রিপোর্ট দিও মা, সভায় সম্ভ্রান্ত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নামের উল্লেখ থাকে যেন।

সম্পাদিকা বলিলেন, বিস্তৃত বিবরণ দেব।

কি যেন ভাবিয়া দেবেনবাবু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাল কি কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?

প্রতিমা কোন উত্তর করিল না।

প্রকাশ ভয় পাইয়া গেল, যদি সত্যই কাল প্রতিমার কোন দরকার থাকে তাহা হইলে ত' আর দেখা হইবে না। বুদ্ধের কি আবশ্যক ছিল এই প্রশ্ন করিবার?

দেবেনবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে প্রতিমা কহিল, না, বাবা।

শুধু কণ্ঠস্বরই নারে না, কী অপরিসীম অনুগ্রহ, কৃতজ্ঞতায় প্রকাশের হৃদয় ভরিয়া গেল।

দেবেনবাবুর গাড়ী চলিয়া গেলে উপস্থিত সভ্যদের বিস্মিত করিয়া প্রকাশ ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার চেয়েও বিস্মিত হইলেন সভাগৃহের ভিতরের লোকেরা।

সভাপতির একটি অদ্ভুত লম্ফন শক্তি, এক এক লাফে তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইতেছেন। তিনি বোধ হয়, তখন ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁর পদের গাম্ভীর্য ও বয়সের গুরুত্ব উভয়ই।

যাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন তাঁহারা শশব্যস্তে সভাপতিকে পথ ছাড়িয়া দিলেন।

প্রকাশ উপরে উঠিয়া দেখিল ক্ষিতীশ পুরো একখানা খাস্তা কচুরি মুখে পুরিয়া দিয়েছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রকাশ ডাকিল, ক্ষিতীশ,

খাস্তা কচুরীর গুঁড়া মুখে করিয়া জবাব দেওয়া নিরাপদ নয় তাই ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসু নেত্রে বন্ধুর দিকে চাহিল।

প্রকাশ বলিল, আগুন লেগেছে বনে বনে।

তার ভাবগতিক দেখিয়া ক্ষিতীশ ব্যাপারটা অনেকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, মুখের কচুরী ফুরাইলে বলিল, কাছাকাছি লাগেনি ত'?

প্রকাশ বলিল, ষ্টুপেণ্ডাস্।

প্রেমে পড়িলেও প্রকাশ যে পাগল হইয়া যাইতে পারে ইহা ছিল ক্ষিতীশের ধারণার অতীত। কিন্তু প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সভাপতিত্বের গুরুভার বহন করিয়া আজ সে তার মনের সমতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষিতীশ বলিল, মানে?

প্রকাশ কহিল, Most amazing.

তোমার দাদাবাবুর ভাষায় বলতে গেলে অমরট্। কি যে বাজে বকছ তুমি।

ক্ষমা কর ক্ষিতীশ।

এই সময় দীপা ও তার বন্ধু বিজলী সভাপতির জন্য এক প্লেট খাবার লইয়া আসিল।

প্রকাশ খাইতে আপত্তি করিল। বিজলী ঘাড় একটু বাঁকাইয়া স্মিত মুখে কহিল, না বললে শুনব না আমরা।

প্রকাশের রাগ হইল প্লেটের উপর, বিজলীর উপর—এমন কি দীপার উপরও। এরাই ত' তার মনের আবেগ প্রকাশে বিলম্ব ঘটাইতেছে, কিন্তু উপায় কি কোন অনুষ্ঠানের সভাপতিকে এইরূপ অনেক শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

একখানা শিঙাড়া তুলিয়া লইয়া সে বিজলীকে বলিল, আর নয়, মাপ করবেন।

বিজলী বলিল, এই লেডীকেনিটা।

প্রকাশ লেডিকেনিটা তুলিয়া লইল।

বিজলী আবার বলিল, সন্দেশটাও নিতে হবে আপনাকে।

প্রকাশ সন্দেশটা তুলিয়া পকেটে রাখিলে বিজলী ও দীপা হাসিয়া ফেলিল।

প্রকাশ বন্ধুকে বারান্দার একপ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, She is light of Asia.

ক্ষিতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, কে?

—বসন্ত—প্রতিমা—

ক্ষিতীশ বলিল, সিনেমার সেই সুন্দরীর চেয়েও সুন্দর?

এই সেই।

ঠিক ত?

বল কি ভুল, তাকে ভুল?

কংগ্র্যাচুলেশনস্।

চল ঐ ঘরে, এখন থেকে একটা প্ল্যান করা দরকার।

প্ল্যান সোজা, তুমি বামুনের ছেলে, সুপাত্র, অবস্থা ভাল, সে-ও সম্ভ্রান্ত বামুনের মেয়ে, একটি ঘটক পাঠালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথা মন্দ নয়, আরও সুখবর, আমি কালই যাচ্ছি।

কোথায়?

দেবেনবাবুর বাড়ীতে।

তোমার তা হলে জোর বরাত আরম্ভ হল বল। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রণ লাভ।

ভৃগুলাঞ্ছন ঠিকই বলেছেন, শীঘ্রই সুফল হবে, লোকটা জ্যোতিষ শিরোমণি।

ক্ষিতীশ বলিল : সঙ্গে সঙ্গে কবচ [illegible]ও ত' জোর আছে। গোমেধ, পেড়েলা মুক্তা, শ্মশানের ছাই অনেক কিছুই ধারণ করেছে।

প্রকাশ বলিল তোমার কথা নিয়ে অনেক, তাই ও সব

ধারণ করতে হয়। যাক্, দেখেছ, প্রতিমা যেন সাক্ষাৎ কি বল—

ক্ষিতীশ বলিল, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী যা হয় একটা বলে ফেল—

ঠাট্টা ছেড়ে দাও, তুমি ওকে আগে চিনতে?

হ্যাঁ, দেখেছি দীপার সঙ্গে।

ক্ষিতীশ—

প্রকাশ—

প্রকাশ বলিল, তুমি এখনও প্রেমে পড়নি?

পড়িনি, তবে চেষ্টা করে দেখব।

না, না তা বলছি না। তবে কি না অমন চেহারা দেখে—

এই সময় দীপা নিকটে আসিলে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, প্রতিমা কি তোমাদের ক্লাশ ফ্রেণ্ড?

তারপর সে কি প্রশ্ন করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া প্রকাশ একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শেষটায় বলিল, বেশ ফাংশানটি করেছ তোমরা। তোমাদের নাচ গান উৎকৃষ্ট হয়েছে, বিশেষতঃ তোমার ও প্রতিমার।

দীপা একটু হাসিয়া বলিল, সভাপতির অভিভাষণে ত কই আমার নাম করলেন না?

এ্যা করিনি না কি? দেখ, সভাপতিত্ব আর কখনও করিনি কি না। এই প্রথম; তাই সব কথা গুছিয়ে বলতে পারিনি। তুমি দেবেনবাবুকে চেন?

হ্যাঁ—

আলাপ হয়ে ভারী খুশী হ'লাম খাসা লোক। ভারী আত্মভোলা মানুষ, সাহিত্য নিয়েই থাকেন।

গাড়ীতে উঠিয়াই প্রকাশ ড্রাইভারকে কহিল, বিলায়তি চক্কর।

সীমাবদ্ধ বাড়ীর মধ্যে আজ তার এই আনন্দ রাখিবার স্থান নাই তাই প্রকাশ গঙ্গাতীরে ষ্ট্র্যাণ্ডের দিকে ছুটিয়াছে।

আকাশ ভরা চাঁদের আলো, মাঠে, গাছের পাতায়, গঙ্গার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তার স্নিগ্ধ সুষমা। প্রকাশের আনন্দে প্রকৃতি পারিয়াছে আজ এই অপূর্ব মনোহর রূপ।

প্রকাশ গলা ছাড়িয়া ধরিল,

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—'

(ক্রমশ)

কলেজের মেয়ে

(৫৮৭ পৃষ্ঠার পর)

অনাথ গম্ভীর মুখে বলিল, বেশ বিবাহ করিয়া থাকবো কোথায়? খাইবে কি?

কেন? সুরমা বলিতে লাগিল, কেন অনাথদা, আমার বাবার যদি একটি ছেলে থাকিত তাহা হইলে কি হইত? তাহা হইলে আমার ভাই কি কোন ভাল ঘরে আমার বিবাহ দিতেন না?

অনাথ বলিল, আচ্ছা তবে তোমার বিবাহ আগে দিই, তার পরে আমি বিবাহ করিব।

সুরমা অনাথের পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল অনাথদা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বিবাহ করব, আগে আপনার বিবাহ না দিলে বিশ্বাস হয় না!

অনাথ স্পষ্টই দেখিতে পাইল, এই অসাধারণ বালিকার অন্তঃকরণে স্নিগ্ধের হাহাকার জাগিয়াছে। বলিল, আচ্ছা সুরমা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তোমার শান্তি তোমার সুখ আমি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিব না।

পরদিন শুভযোগে সুরমা সাজসজ্জা করিয়া অনাথের ঘরে আসিল, বলিল এখনও বিলম্ব করছেন কেন?

আজ পাকা দেখা। মহেশকে আশীর্বাদ করিবার জন্য অনাথ ও সুরমা গমন করিল। যাইবার সময় সুরমা তাহার বহুমূল্যের একগাছি হার অভয়াকে উপহার দিবার জন্য সঙ্গে লইয়াছিল। অনাথ আশীর্বাদের জন্য একটি হীরার অঙ্গুরীয়ক লইয়াছেন।

যথাসময়ে পাকা দেখা হইয়া গেল। অনাথ অঙ্গুরীয়কটি অভয়ার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন; সুরমা গলা হইতে খুলিয়া হার গাছটি অভয়ার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল।

অনাথ বাহিরে আসিয়া নূতন বন্ধুদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন এমন সময় গৃহের অভ্যন্তরে হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কেন? কি হইয়াছে? অনাথ ছুটিয়া ঘরের মধ্যে যাইতেই দেখিতে পাইল, সুরমার মূর্চ্ছা হইয়াছে।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, অনাথ বলিল, সুরমার ভিতরে অসুখ আছে; আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, ঘরে ঔষধ আছে, বাড়ী গেলেই সারিয়া যাইবে।

অভয়া ও অনাথ সুরমাকে ধরিয়া গাড়ীতে চাপাইল। অনাথ সুরমার নিকট বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অনাথের অগ্নিপরীক্ষা শেষ হইয়াছে। সুরমা আবার টলিয়া পড়িতেই অনাথ বুকে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিলেন। সুরমা তাহার কমলবল্লরীর ন্যায় বাহু দুইটির দ্বারা অনাথের কণ্ঠ বেষ্টন করিল।

সুরমা বলিল, বল, আমাকে এখান হতে আর ফেলে দিবে না?

অনাথ সস্নেহে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন এ স্থান ত তোমারই সুরমা। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।

—শেষ—

রূপার উপর কারিগরী

উপাদানই আমাদের দিয়াছেন ভগবান, কিন্তু নানা কারুকার্যে খচিত করিয়া তাহাকে মনোরম রূপায়নে উজ্জ্বল করিবার ভার রহিয়াছে আমাদেরই উপর। মানব-ব্যবহারের সম্পূর্ণ যোগ্য করিয়া অভিনব রূপ-সজ্জায় মূল ধাতুকে শোভিত করা মানব-হস্তের নিপুণতার সাহায্যেই সম্ভব। সৃষ্টিকর্তা চাহিয়াছে উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যে, মহৎ হইতে মহত্তর প্রয়াসের পথে মানব-সমাজ অগ্রসর হইবে; এমনই করিয়াই তাহারা পৌঁছাইবে যাইয়া দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ হইয়া চরম সার্থকতায় এবং পরম সম্পূর্ণতায়।

মূল উপাদান, তাহার মিশ্রণ-কৌশলে তাহা যতই কোমল হউক, এবং যদিও এই জটিলতা উহার মূল্যকেই বর্ধিত করে আরও বেশী, তথাপি মনে রাখিতে হইবে ইহা ততক্ষণ অসম্পূর্ণই থাকিবে, যতক্ষণ না উহাতে শিল্পীর মনোমত সজীবতা আরোপিত হইতেছে, যতক্ষণ না উহা উন্নীত হইতেছে আদর্শের স্তরে, যে স্তরেই উহার অননুকরণীয় লোভনীয় স্থান।

আমাদের অবশ্য সৃষ্টিকর্তাকে এমন একটি সুন্দর অযাচিত উপহার প্রদানের জন্য ধন্যবাদই দিতে হইবে; তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেই মৌলিক উপহার-বস্তুটিকে আমাদের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী আকার, আকৃতি, হস্তসাধ্য শিল্প-চারুতা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ করিয়া সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময় অভিলাষকেই বাস্তবে পরিণত করিতেছি। এই জন্যই শিল্পী তাহার সৃষ্ট কারিগরীতে উচ্চতম আদর্শের অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলিতে এতটা যত্নশীল—তাহার নিকট ঐ শিল্প-চারুতা সম্পাদনই সৃষ্টিকর্তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ প্রদানের সর্বোচ্চ পদ্ধতি; এবং এই জন্যই শিল্পীর সতত লক্ষ্য, জাগতিক সম্ভাব্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ। এই মাপকাঠি, এই প্রেরণার অনুপাত দ্বারাই সকল সংস্কৃতির পরিমাপ—সকল আদর্শের বিচার করা হয়। অধিকন্তু এই কারুকার্যের ভিতর নিহিত থাকে এমন একখানি প্রতিফলক-পরকলা, যাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে শিল্পীর সমসাময়িক যুগের রীতিনীতি এবং সমষ্টিগতভাবে যুগটির প্রধান অভিব্যক্তি।

শিল্প ও কারিগরী হইতে কত গোপন তথ্যই না উদ্ঘাটিত হইতে পারে—যে যুগেরই হউক শিল্প-প্রতীক হইতে আমরা অনায়াসে জানিতে পারি সেই শিল্পিগণের স্বাধীনতা ছিল কি না তাহাদের সৃষ্টির নিজস্ব রূপদানে; তাহারা অন্তরের প্রেরণায় সৃষ্টির তীব্র কশাঘাতে আনন্দের আতিশয্যে আপন আপন পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত

বার্লিনের এইচ জে উইলমে কর্তৃক গঠিত বিচিত্র কারুকার্যে রাইখ ঈগল সম্বলিত সিলভার প্লেট

হইয়াছে কি না; তাহাদের অভিনব সৃষ্টির যোগ্য সমর্থন, প্রশংসা ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছে কি না; তাহাদের বিশেষত্ব ব্যাপকভাবে বোধগম্য ও অনুসৃত হইয়াছে কি না। কারণ সৃষ্টিপ্রবণ শিল্পীর প্রেরণা ও শক্তি উচ্চতম আদর্শে স্ফুরিত হয় প্রশংসা ও সমর্থনের অমৃতধারা বর্ষণে, শিল্পিগণও হৃদয়ে প্রচুর বল লাভ করে সমসাময়িক জগতের যোগ্য সম্বর্ধনায়।

এই ভাবেই সেই স্মরণাতীত যুগ হইতেই মহামূল্য ধাতুগুলি অনুপম শিল্পপ্রতীকে রূপায়িত হইয়াছে; বিশেষ,

করিয়া জার্মান শিল্পীদের এই বিভাগে কৃতিত্ব যে অশেষ গুরুত্বসম্পন্ন এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সোনা অবশ্য উচ্চ মূল্যের আভরণ ও তৈজস নির্মাণে ব্যবহৃত হইত, যেহেতু উহা চিরকালই অধিকতর জনপ্রিয়; এই জন্যই যেখানে রমণীর রূপ-লাবণ্য উৎকর্ষ করিবার উপাদানস্বরূপ পরম রমণীয় জ্যোতিষ্কপ্রায় মণি-মাণিক্য আহরণ করা হইত ঐগুলির যোগ্য গঠন-চারুতা সম্পাদনের পটভূমি করিয়া, সেখানে ব্যবহার করা হইত সর্বকালে স্বর্ণ ধাতুটিকেই। রৌপ্যকে কিন্তু সেই হিসাবে অঙ্গে ধারণের আভিজাত্য প্রদান করা হইত কম। এই ধাতু-উপাদানটিকে ব্যবহার করা হইত দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুতে—ফুল-দানী হিসাবে, থালা ঘটি বাটি ডিশ প্রভৃতি নির্মাণে। সেকালেও সদ্য-বিবাহিত দম্পতি উপহার প্রাপ্ত হইত রূপার ছুরি, কাঁটা, চামচ—তাহাদের বিবাহকালীন উপহারস্বরূপ। ইহা ছাড়া খৃষ্টীয় মতে দীক্ষার মগটি তৈরী হইত রূপায়; আবার আজিও দেখা যায় সিল্‌ভার ওয়েডিংস অথবা বিবাহের 'রজত উৎসব' কালে কনের গলার মালাটি তৈরী থাকে রূপায় এমন কি বিবাহের রজত জুবিলী উৎসবে শুচিশুভ্র রৌপ্যের স্নিগ্ধ চটক ছাড়া কিছুতেই উহাকে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

মানব সেই প্রাচীন যুগ হইতেই রৌপ্যের সহিত আকাশে চন্দ্রমার ও অন্ধকার রাত্রিতে উহার স্নিগ্ধ রশ্মির একটা নিকট সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। আবার এখানেই আর একটা যোগাযোগের হেতু নিহিত রহিয়াছে রৌপ্যের মনোমুগ্ধকর আভা এবং শ্বেত তারকা-চুমকি-শোভিত নিশাসুন্দরীর মিশকালো শাড়ীখানির ভিতর। এই জন্যই জার্মান রৌপ্য-পাতে অঙ্কিত রহিয়াছে অর্ধচন্দ্র ও রাইখ মুকুট এবং আজিকার বাজারেও ঐ মার্কাই বিশুদ্ধতার নিদর্শনে পরিণত। অবশ্য ইহা ছাড়াও অন্যান্য মার্কা ব্যবহার করা হয়, যেমন 'বার্লিন বেয়ার' (বার্লিন ভালুক) প্রভৃতি। উহা দ্বারাও আভিজাত্যের মর্যাদাই ঐ সকল পণ্যকে দেওয়া হয়। তথাপি যে সকল ব্যবসায়ী অর্ধচন্দ্র ও রাইখ মুকুট মার্কা ব্যবহার করে, তাহাদের নিকট হইতে ইহাই আশা করা হয় যে, তাহাদের গঠিত পণ্য সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে শুধু উপাদানের শ্রেষ্ঠত্বে নয়, কারিগরীতেও তাহা হইবে অভিনব—পরিকল্পনা ও শিল্প-গঠনের উৎকর্ষে।

শুধু যে পাশ্চাত্যেই জার্মানীর রৌপ্য-শিল্প প্রাধান্য ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, এমন নহে, সুদূর প্রাচ্যেও উহার প্রচলন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচ্যদেশে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে তো এই জার্মান সিলভারের ব্যাপক ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইবেনই, এমন কি যখন ভারত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে পদার্পণ করিবেন—কারণ ভারতের পর অন্তত ব্রহ্মদেশের মান্দালয় শহরটি না দেখিয়া কেহ ফিরেন না—তখন বিস্মিত হইবেন আরও। ব্রহ্মদেশ যে দেশ শুধু মহামূল্য কাষ্ঠ ও কাষ্ঠনির্মিত সামগ্রীর অপরূপ কারুকার্যে শ্রেষ্ঠ নয়, যাহার মৃত্তিকাগর্ভে পর্যন্ত অতুল সম্পদ লুক্কায়িত, সেদেশের প্রাচীন রাজগণের অধ্যুষিত প্রধান নগর মান্দালয় না দেখিলে অনেক কিছুই অজানা থাকিয়া যায়। আরাকান প্যাগোদা, কুইন্‌স্‌ গোলডেন্‌ মোনাষ্টারি আর রাজা থিবোর খল্লাতাত কর্তৃক নির্মিত ৪১০টি প্যাগোদা—সেদৃশ্য একবার দেখিলে আর কি ভোলা যায়। আর সেই সকল প্রাচীন নিদর্শন দর্শন করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িতে না ছাড়িতে যখন ফিরিওয়ালী ব্রহ্মতরুণী আনিয়া হাজির করিবে নানা সামগ্রী এবং তাঁহাকে গছাইতে চেষ্টা করিবে তাহার একটি না একটি, তখন তিনি বিস্ময়চকিত অন্তরে লক্ষ্য করিবেন ব্রহ্মের সেই সুদূরস্থিত পর্বত-অরণ্য-সমাকুল প্রদেশেও রহিয়াছে সেই জার্মান সিলভারের রমণীয় কারিগরী। ব্রহ্ম-তরুণী হয় তো সেই কারিগরীর মূল্য সম্বন্ধে অবহিত নয়—সে হয়ত শুধু তাহার বস্ত্রাঞ্চলের ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডের এক
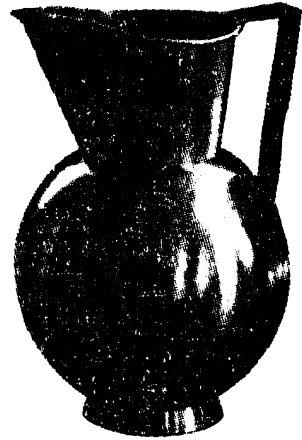
সুন্দর ছাঁচে কল্পিত ওয়াইন্‌ জগ্‌ (wine-jug)—হারম্যান সিদ্‌হুবার (কলোন্‌)

পাল্লায় টাকাগুলি সাজাইয়া অপর পাল্লায় সামগ্রীটি বসাইয়া তৌল করিতেই ব্যগ্র; কিন্তু বিশ্বের সেই সুদূর কোণেও যে ঐ সামগ্রী প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাতেই জার্মান কারিগর-গণের কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়। মানব হস্তে ঐ শিল্প-চারুতা আরোপ না করিলে, শুধু উপাদানটি এত ব্যাপক প্রসার লাভ করিত না।

স্বর্ণ-কারিগরই অধিকাংশস্থলে হয় শ্রেষ্ঠ রৌপ্য-শিল্পী। সোনার উপর নানা রঙের মণি-মাণিক্য সাজান এবং উহার বর্ণ বিন্যাসে নিখুঁত রুচির পরিচয় প্রদান হইতে স্বর্ণকারের যে অভিজ্ঞতা, তাহাই তাহাকে নমনীয় ও কোমল রৌপ্যে উহার যোগ্য আকার দানে এবং সামঞ্জস্য ও সুদৃশ্যতার সহিত কারুকার্য খচিত করিতে অধিকারী প্রতিপন্ন করে। কিন্তু রুচি সর্বদাই দোদুল্যমান। যুগ ও উহার সাংস্কৃতিক মতিগতির নিতান্ত দাস না হইলেও, রুচিকে কিন্তু যুগোচিত পরিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয় নিজেকে। প্রত্যেক যুগেরই একটা নিজস্ব আদর্শ থাকে। সেই আদর্শের

ছাপ সেই যুগের সকল কারিগরির উপরই প্রভাব বিস্তার করিবে। আমরা প্রাচীন কারিগরি দেখিয়াই আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাহার তারিফ করিয়া থাকি; কিন্তু তা বলিয়া যুগ-প্রভাব ও সৌন্দর্য চিরদিন এক থাকে না। প্রাচীন বলিয়াই কোন বস্তুকে সুন্দর আখ্যা প্রদান যুক্তিসহ নহে। ঐ প্রকার নির্বিকার প্রশংসা শিল্প জগতের হিত অপেক্ষা অহিত করে বেশী। আমরা হয়ত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক প্রাচীন নিদর্শনের উৎকৃষ্টতর অনুলিপি প্রস্তুত করিতে পারি। কিন্তু ঐ প্রকার অনুকরণে শিল্প জগতের কোনও উন্নতি হইবে না। শিল্পী যদি আপন উদ্ভাবনী শক্তি, নিজস্ব প্রতিভা ও যে যুগে বাস করে তাহার প্রভাব—এই সকলের পরিচয় প্রদান করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার সকল সৃষ্টিই হইবে গতানুগতিক—যাহাতে প্রশংসা করবার মত কোন বিশেষত্বই থাকিবে না।

জার্মান সিলভারের কারিগরীতে যুগ হইতে যুগে ক্রম-পরিবর্তনের একটা ধারা উহাকে আজিও সজীব রাখিয়াছে। প্রথম ব্যারক যুগ, রকোকো যুগ (ফ্রেডারিক দি গ্রেটের যুগ) বাইডারমায়ার যুগ পরপর যে বিবর্তন আনিয়াছে পদ্ধতি (style)তে, সেই পদ্ধতিও স্থায়ী হইয়া থাকে নাই। উহার উপর বিচিত্রতা ও নূতনত্ব আরোপ করিয়াছে দ্বিতীয় রকোকো যুগ এবং তাহার পরই জার্মান রেনেসাঁ। দ্বিতীয় রাইখ আসিল, উহারও উপর অগ্রগতি চলিল নিও-ব্যারক পদ্ধতি দ্বারা। ইহার পর তৃতীয় রাইখ—তরুণ চঞ্চল পদ্ধতি এখন একেবারে গম্ভীর প্রশান্ত আভিজাত্যে অধিষ্ঠিত।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে আজিকার যুগ—যে অতিরঞ্জন—অলংকরণের বাহুল্য বর্জন ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয় রেনেসাঁ হইতে তাহার চরম ও সুসমঞ্জস বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যাইবে আজিকার কারিগরীতে এবং এই বিবর্তনে চারু-শিল্পের অন্যান্য ধারার সহিত কি সুন্দর সমতাই না রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে রৌপ্য-কারিগরী!

বার্লিনের প্রফেসর এমিল লেৎরে যে ছেনি হাতুড়ী দ্বারা হস্ত কারিগরীর নিদর্শনগুলি খোদাই করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়—স্থপতির সহিত কি প্রকার নিকট সম্পর্ক রাখিয়া নূতনত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ কি মনোরম দেখিতে—পরিকল্পনায় এত দূরে বাস্তবতা। আবার অলংকরণের অযথা বাহুল্যে এতটুকু ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। তথাপি একটি শিশু পর্যন্ত উহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কার্ল মুলার (হেলে), হারমান স্মিদহুবার প্রভৃতির অভিনব কারিগরী যেমন আধুনিক অজটিলতায় বিচিত্র, তেমনই আবার অতি সূক্ষ্ম শিল্প চারুতায় উজ্জ্বল।

এই শিল্প বিভাগের উন্নতির জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, সর্বদা এই সমিতি স্বর্ণ-রৌপ্যকার গিল্ডের নিকট আবেদন জানায় নবসৃষ্টির প্রয়াসের জন্য—যোগ্যতর নিপুণতার আরোপের জন্য। নিশ্চিন্ত মনে বর্তমান কৃতিত্বের তৃপ্তিতে অচল থাকিলে চলিবে না—যাইতে হইবে আগাইয়া। ফ্রিডরিচ নিট্‌শের বাণীই তাহারা তুলিয়া ধরিয়াছে দেশের নিকট—

"Surround yourselves as higher beings with small, good and perfect things! Their golden maturity heals the heart. Perfection teaches us to hope."

"ক্ষুদ্র, উৎকৃষ্ট এবং নিখুঁত জিনিষ তোমাদের চারিপাশে সাজাও যেমন করে লোকাতীতগণ! উহাদের সোনালী চরম অভিব্যক্তি অন্তরকে স্নিগ্ধ তৃপ্ত করে। পূর্ণতাই আমাদের আশাবাদী করিতে পারে।"

দেশবন্ধু স্মরণে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু*

দেশবন্ধুর অমর স্মৃতির পায়
আমার প্রণতি আপনার স্থান চায়।
সর্বত্যাগীর সাধন মন্ত্র 'পরি
মুক্তি সরণি যুগে যুগে ওঠে গড়ি'।
ভারত তাঁহারে পরাল জয়ের টীকা
সেথা বাংলার গৌরব রহে লিখা।
সবার চিত্ত রঞ্জন আজো আছে ঃ
সকল চিত্তে অশরীরী হয়ে বাঁচে।

* সাহাজাদপুর ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত দেশবন্ধু স্মৃতি-বাসরে পঠিত।

মায়া

(গল্প)

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

—"হাঁগা শুনছো ? কে যায় ?"

—ডাক শুনিয়া একজন সন্ন্যাসী ফিরিয়া তাকাইল,—দেখিল, বিশ-বাইশ বৎসরের একটি মেয়ে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া বলিল—"কাকে ডাকছ—আমাকে ?" মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"হাঁ, একটু দয়া করুন না—দয়া করে একবার আমাদের বাড়ীর ভিতরে আসুন। আমার স্বামীর বড় অসুখ, বুঝি আর বাঁচবে না।" বলিয়াই মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল।

সন্ন্যাসী বলিল—"তা যাচ্ছি, কিন্তু এ গাঁয়ের অবস্থা এমন কেন ?"

—"এখানে যে কলেরা দেখা দিয়েছে—মানুষ কি আর আছে, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ীতেই কি কম ছিল—শ্বশুর, শাশুড়ী, দুই দেওর ননদ—সব নিয়েছে, কেবল বাকী আমরা তিনটি প্রাণী—এও বুঝি বা কি হয়। —আপনি আসুন।"

—"চল যাচ্ছি।"

মেয়েটির মুখ চোখ সন্ন্যাসীকে এক মুহূর্তের মধ্যে পাগল করিয়া দিল—অন্তরের কোন অন্ধকার গহ্বর হইতে যেন মায়ার নির্ঝরিণী দুকূল বাহিয়া ফাটিয়া বাহির হইল।

ঘরে আসিয়া দেখিল, স্বামীটির আসন্নকাল—সারা দেহে ভয়ানক ব্যাধির সমস্ত লক্ষণ একেবারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের একপাশে একটি দুই তিন বৎসরের ছেলে ধূলা মাখিতেছে—সন্ন্যাসী সেটাকে কোলে তুলিয়া লইল। রোগীর জন্য আর বেশী ভাবিতে হইল না। শীঘ্র শীঘ্রই সে তাহার সমস্ত কাজ মিটাইয়া লইয়া পাড়ি জমাইল। মেয়েটি কয়েকবার স্বামীর বুকের উপরে লুটাইয়া কাঁদিল, কিন্তু খুব বেশী কাঁদিতে পারিল না, কারণ ক্রন্দন বড় একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে—শ্বশুরের জন্য, শাশুড়ীর জন্য, দেবর, ননদের জন্য কাঁদিয়াছে—স্বামীর জন্যও কাঁদিল। কিন্তু এর পরে আরও যে কি হইবে তাহাই বা কে বলিয়া দিবে ? ভয়ে বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে—ক্রন্দন আসিবে কোথা হইতে ?

এইবার সন্ন্যাসীর কাজ। ভাবিল মৃতদেহটার কেমন করিয়া গতি করা যায়। কিন্তু গ্রামের এমনই অবস্থা যে এক অগতির গতি ভগবানের হাতে সমস্ত সঁপিয়া এ স্থান ত্যাগ করা ভিন্ন অন্য কর্তব্য কিছু ভাবিয়া পাওয়া মুস্কিল। এ গ্রামে এমনি গতি এবার অনেকের হইয়াছে—কেহ নিজের ঘরে মরিয়া পচিয়াছে—কাহাকেও ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে—শিয়াল-কুকুরে টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়াছে।

সন্ন্যাসী মেয়েটির নিকটে আসিয়া ডাকিল—"মা এখন কি করা যায় ?"

মেয়েটি কাঁদিয়া বলিল—"বাবা, কি করব—আমার যে আর কেউ নাই—ছেলেটিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব ?"

—"সে হবে, কিন্তু দেহটা সৎকারের ব্যবস্থা কি করি ?"

—সৎকার ? প্রথমে দুই একজনের হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে ও কাজটি আর কা'রও ভাগ্যে ঘটে নাই। সকলকে টেনে ঐ ভোবায় ফেলে দিয়ে এসেছে। এমনি সারও কত বাড়ী থেকে ফেলেছে, তার কি ঠিক আছে।

যাহা হউক, ভাবনা চিন্তা বৃথা। সন্ন্যাসী উঠানের উপরে কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া মৃতদেহটাকে কোন প্রকারে তাহার উপরে টানিয়া আনিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। পরে মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিল—"মা, যদি বাঁচতে চাও—ছেলেটিকে বাঁচাতে চাও, আমার সঙ্গে সঙ্গে এস আর এক মুহূর্ত এগ্রামে নয়।"

মেয়েটি ছেলে কোলে করিয়া সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে চলিল। সন্ন্যাসী গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল।

(২)

গ্রাম হইতে একটু দূরে মাঠের মাঝে সন্ন্যাসীর আশ্রম—দুই চারিটি আম-কাঁঠালের গাছের ছায়ার তলে খান তিনেক খড়ের কুটীর—হাঁক-ডাক দিলে দুই একজন পাড়া-প্রতিবেশীর সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেও অনেকটা দূরে। সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন—দুই চারি মাস পথে পথে ঘুরিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

মাস ছয়েক কাটিয়া গিয়াছে—মেয়েটি ছোট ছেলেটিকে লইয়া এখানেই আছে—আর যাইবারও তাহার জায়গা নাই। সন্ন্যাসীর সেবা-যত্ন করে, খায়-দায় এক প্রকার সুখেই থাকে।

ছেলেটি ক্রমেই বড় হইতেছে—সুন্দর হইতেছে, আর দুষ্টু হইতেছে। ছোট প্রাঙ্গণের মাঝখানে আমগাছের ছায়ায় একা একা বসিয়া ধুলা-বালি মাখে, হাসে-কাঁদে। সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া আনমনে একদৃষ্টে দেখিতে থাকে। কখনও বা অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘশ্বাস সারা অন্তর মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসে—সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি অন্য কাজে মন দেয়। গত জীবনের কোন দুঃখময় স্মৃতি তাহাকে আঘাত করিতে থাকে—সেই আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু ভুলিতে কি পারে ? তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, কত দিনের পুরাতন সেই সব স্মৃতি—হরিপুর গ্রাম, গ্রামে ঢুকিতেই সকলের প্রথমে তাহার বাড়ীখানি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইখানি মুখ স্ত্রী, আর কন্যা। সন্ন্যাসী আর ভাবিতে পারে না—দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসে। আজ এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরের বিরহ। সংযম শিক্ষাতেই সে অশ্রু রোধ করিতে পারে না।

—সে তো সংসারের কোন ধারই ধারিত না, দরকারও বিশেষ কিছু ছিল না। যে কয়েক বিঘা খামার জমি ছিল, তাহাতেই এক প্রকার সুখেই তিনটি প্রাণীর চলিয়া যাইত। সুতরাং তাহার সমস্ত দিন আড্ডা জমাইয়া কীর্তন গাহিয়া বেড়াইতে বিশেষ বাধা ছিল না।

নিজের স্ত্রী, আহা কি সেবা-যত্নই না জানিত সে!

উঃ সে কি দিন, ভাবিতেও সুখ!

—আর তার মেয়ে,—মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে কি মায়াই না তার! বাড়ীতে আসিয়া যখন রাধারাণী বলিয়া ডাকিত মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিত। মেয়েকে কোলে লইয়া প্রশ্ন করিত,—কি কর্‌ছিলি এতক্ষণ মা ?

—কেন খেলা কর্‌ছিলাম বাবা! আমি ভাত রেঁধেছি, তরকারী রেঁধেছি, দেখবে এস।

কন্যা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। বাধ্য হইয়া সুবোধ ছেলের মত তাহাকে তাহারই পিছনে পিছনে

যাইতে হইত। স্ত্রী আসিয়া অনুযোগ করিত—হাঁগা, বলি বেলার দিকে খেয়াল আছে? দুটি মুখে তুলতে হবে না? যদি বা এত বেলায় এলে তা আবার এখন মেয়ের পিছনে পিছনে ঘোর—যাও না ডুবটা দিয়ে এস।

সে হাসিয়া তেল মাখিয়া, গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িত। স্ত্রী থালায় করিয়া ভাত সাজাইয়া তাহার আশায় বসিয়া থাকি ।

—ভাবিতে ভাবিতে দুচোখ বহিয়া অশ্রু গড়াইতে থাকে! ধুলো-কাদা মাখা হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া হয়তো ছেলেটি আসিয়া ডাকে—দাদু!

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে—কি দাদু!

—তুমি কাঁদ কেন দাদু!

সন্ন্যাসী দুচোখ মুছিয়া বলে—কই কাঁদছিরে পাগল?

—ওই যে!

—ও কিছু নয়।

ছোট দাদু উত্তরে খুশী হইয়া আবার ধুলো-কাদা মাখিতে লাগিয়া যায়। সন্ন্যাসী ভাবে, হায়! এ যদি সত্য হইত। সত্য সত্যই যদি আজ আপনার বলিয়া এমনি করিয়া বুকের মধ্যে কাউকে চাপিয়া ধরিতে পারিত!

(৫)

সন্ন্যাসীর গুরুদেব একদিন আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ, সংসারের সকল মায়ার অতীত, সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। গুরুদেব আসিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন এ তুমি করেছ কি সদানন্দ, শেষে সন্ন্যাস নিয়ে সব মায়া মমতা ছেড়ে একটা মেয়ে আর একটা ছোট ছেলের মায়ায় বাঁধা পড়লে?

সদানন্দ ভয়ে ভয়ে বলিল—আজ্ঞে, আত্মীয়স্বজন কেউ নাই। সব মহামারীতে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি না হলে কোথায় যে দাঁড়াতো তারই ঠিক ছিল না। তাই দায়ে ঠেকে আনতে হ'ল।

—ওই তো তোমাদের ভুল! এ সংসারে কি দুঃখীর অভাব আছে? সারা সংসার ভরেই তো দুঃখ-কষ্ট। তুমি কয়জনের দুঃখ দূর করতে পার? কতটুকু তোমার শক্তি? মায়াময় জগৎ—তুমি মায়া, আমি মায়া। দুঃখও যিনি দিচ্ছেন, সুখও তো তিনিই দিচ্ছেন, সবই তো তাঁরই ইচ্ছা, তুমি আমি দর্শক মাত্র।

এত বড় যুক্তির উপরে আর কথা চলে না। আর কথা বলিবার মত সাহসও সন্ন্যাসীর নাই, সুতরাং মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়াই থাকে।

গুরুদেব বলিতে থাকেন—তাই বলছিলাম কি—ও মেয়েটি আর ছেলেটিকে বিদায় করে দাও। অনাথা, দুস্থ তা বুঝি, তা দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনও তো আছে, তাদের কাছেই না হয় পাঠিয়ে দাও।

সদানন্দ চুপ করিয়াই থাকে।

—আমি হরিদ্বার হতে ফিরবার পথে আবার তোমার আশ্রম হয়ে যাবো—এর মাঝে যা হোক একটা ব্যবস্থা যেন কর। জান তো জড়ভরতের কথা,—একটা জনম তার হরিণ হরিণ করেই গেল। তাই বলছি আগে থাকতেই সাবধান হও।

সাবধানী গুরু শিষ্যকে সাবধান করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কি যে করিবে কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

কাজেই দিন আবার কাটিতে লাগিল। ছেলেটাকে দেখিলেই বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে, মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইলে মায়া হয়, কিন্তু তা বলিয়া তো উপায় নাই! মোট কথা সন্ন্যাসীর মনে এবার অনেকখানি ভাঙন ধরিয়াছে। গুরুর অত সতর্ক উপদেশ, জড়ভরতের একটা জনম বিফলে যাওয়ার কথা, এই সব তাহার মনের মাঝে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

আর কাজেও তো হইতেছে তাহাই—আজকাল কি আর সত্য সত্যই সে আগের মত তার সাধন-ভজন লইয়া থাকিতে পারে? সময় কই? লাভের মধ্যে নিজের পাক-শাকের জন্য আর ভাবিতে হয় না—মেয়েটি সব যোগাড় করিয়া বসিয়া থাকে—স্নান করিতে দেরী হইলে বারে বারে তাড়া দেয়—এই যা!

সেদিন সন্ন্যাসী তাহার পূজা-ঘরে বসিয়া কি যেন সাধন-ভজনের কাজে ব্যস্ত ছিল; কিন্তু মেয়েটির তর সহিল না। ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল—"খোকার জন্যে দুধ নিয়ে এস ওপাড়া থেকে—এখন নইলে আর পাওয়া যাবে না।" সাধন-ভজন চুলায় গেল—এমন করিয়া বিরক্ত করিলে কখনও কি এই সব হয়! সন্ন্যাসী রুক্ষ মেজাজে খেঁকাইয়া উঠিয়া জবাব দিল—পারব না আমি বাপু। পার নিজে নিয়ে এস, আর না হয় পিটুলী গুলে খাওয়াও। রাগে গরগর করিয়া গিয়া সে বাহিরের ঘরটিতে বসিল। বসিল বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ! মনটা যে ছাই মানিতে চায় না! ভাবিতে থাকে—আহা ছেলেটি হয়তো আর একটু পরেই দুধের জন্য বায়না ধরিয়া বসিবে—না পাইলে কান্নাকাটি করিবে। মা হয়তো নিরুপায় হইয়া শেষে ছেলেকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া কোল হইতে নামাইয়া দিবে। আর ছেলেটি তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে খালিপেটে, শুকনো মুখে কখন ঘুমাইয়া পড়িবে! ভাবিতেই সব রাগ একেবারে জল হইয়া যায়। উঠিয়া আসিয়া কোমল কণ্ঠে ডাকে—মা, দে তো ঘটিটা—যাই দুধটা আগে নিয়েই আসি। দাদু! দাদু! দাদু কাছে আসে। শেষ পর্যন্ত দাদুকেও কোলে লইয়া দুধ আনিতে যাইতে হয়।

কিন্তু তবুও মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে এবং ক্রমাগত এভাব একটু একটু করিয়া বাড়িতেই থাকে। সেদিনের ব্যাপারটি একেবারে চরমে উঠিল।

সন্ন্যাসী নিজের ইষ্টমূর্তির সম্মুখে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন—একেবারে একাগ্র চিত্ত—বাহ্য-জ্ঞানের লেশ মাত্রও বা নাই। এমনি সময়ে হঠাৎ পিঠের উপরে একেবারে ধুলো-কাদা মাখা দুইখানি কচি হাতের স্পর্শ! তারপর আধ আধ দুই একটি ডাক—দাদু, দাদুরে—দাদু! বড় দাদু কথা কহিল না দেখিয়া ছোট দাদু ঘুরিয়া একেবারে সম্মুখের দিকে আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। সন্ন্যাসী চোখ মেলিয়া দেখিল—সর্বনাশ!—দাদুর একখানা পা পুজো-পাত্রের উপর, আর একখানা পায়ের ধাক্কা লাগিয়া কোশাকুশি উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসীর রাগ হইল কি দুঃখ হইল বলা শক্ত। কিছুই না বলিয়া ইষ্টমূর্তির সামনে ঢিপ্‌ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া দাদুকে কোলে লইয়া উঠিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল—নাঃ আর না—গুরুর উপদেশ অবহেলা করার শাস্তি যথেষ্ট পাইয়াছি। জড়ভরতের অবস্থা হইবার আর বাকীই বা কত? এই একের পর এক দিব্যি মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়িতেছি। এইবার সব শেষ করিতে হইবে—নিজের জনমটা আর নষ্ট করি কেন?

(৪)

জনমটা নষ্ট করিবার দায় হইতে বাঁচিবার উপায় হইয়াছে—অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া মেয়েটির একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সে এখান হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে। অনেক বলা কহার পর আত্মীয়টি মেয়েটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন। বিদায়ের আর কয়দিন মাত্র বাকী। সন্ন্যাসী আজকাল সাধন-ভজনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দাদু কাঁদিয়া সারা হয়, কিন্তু তাহাকে কোলে লইবার নামও করেন না, কাছে আসিলে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া যান, মেয়েটির মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারেন না।

এমনি করিয়া দিন কয়টি কাটিয়া একেবারে বিদায়ের দিনটি আসিয়া পড়িল। পাল্কী, বেহারা লইয়া আত্মীয়টি আসিয়া হাজির। পরন্তু বেলায় যাত্রা করিবে।

সারা দিন কাজকর্ম করিয়া—সন্ন্যাসীর খাবার যোগাড় করিয়া,—নিজে রাঁধিয়া অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া মেয়েটি প্রস্তুত হইল। একটি বৎসরের সংসার। কিন্তু তবু যেন মায়ার অন্ত নাই! ছোট্ট বাড়ীখানি, তার প্রত্যেকটি বৃক্ষ-লতা, সব যেন তার নখদর্পণে—তার সারা বুক জুড়িয়া আছে!—কাঁঠালগাছ তিনটিতে সবে গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে—কতটি বাহির হইয়াছে সে বলিয়া দিতে পারে। পাঁচটি আম গাছের ভিতরে দুইটিতে এবার আর মুকুল বাহির হইল না, লাউয়ের ডগাগুলি মাচা ছাড়াইয়া বাহিয়া পড়িয়াছে, ফিরাইয়া না দিলে আর ফল দিবে না—এমনি সব।

যাত্রা করিয়া বাহির হইবার সময় মেনী বিড়ালটা আসিয়া পায়ে পায়ে জড়াইয়া পড়িতে লাগিল—গায়ে লেজ ঘষিতে লাগিল। সেটাকে কোলে করিয়া চুমু খাইয়া আদর করিল। পুষিবে বলিয়া কিছুদিন হইল একটি বাছুর কিনিয়াছিল—সেটা ডাকিয়া উঠিল, তাহার গলা চুলকাইয়া মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিল। অবশেষে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া ডাকিল—বাবা!

সন্ন্যাসী অধোমুখে তাকাইয়া বলিল—কি মা?

—যাবার সময় আমার দিকে একবার তাকান! একবার ভালভাবে বিদায় দিন!

সন্ন্যাসী তাহার দিকে তাকাইল, কিন্তু সে চোখ তখন ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিয়াছে।—কঠিন পাথরের তল দিয়াও ঝরণার জল কিল্‌বিল্‌ করিয়া বাহিতে থাকে!

—বলুন, পাক করতে কখনও বেলা করবেন না, সময় মত স্নান আহার করবেন! বেশী রাত জেগে জপ-তপ করবেন না। আর যদি কখনও দরকার হয়—অসুখ-বিসুখ হয়, আমাকে যেন ভুলে যাবেন না!

সন্ন্যাসী কথা বলিতে পারিল না,—অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

—তবে যাই বাবা!

—এস।

মেয়েটি নিজে প্রণাম করিল; ছেলেটিকে দিয়া প্রণাম করাইল। মায়ের কোল হইতে ছেলেটি বলিল—দাদু দাই?

কিন্তু দাদার মুখে কথা জুয়াইল না—অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল—দুই একটি মুক্তা-বিন্দু চোখের কোণ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মেয়েটি ততক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে স্পষ্ট শুনা গেল—দাদু দাই? কিন্তু শুধুই কি শুনা গেল? তারপর হইতে "দাদু দাই" এই দুইটি কথা সন্ন্যাসীর কানে বাসা বাঁধিয়া রহিল।

বিহারাদের বিচিত্র গুঞ্জন দূর হইতে দূরান্তরে ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

শীতের সন্ধ্যা। সম্মুখের মাঠে তরল কুয়াশার আবছায়া পড়িয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল রাই সরিষা আর মটর ফুলের বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ! রাই, সরিষা ফুলের একটা ঝাঁজালো মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া বাতাসকে যেন বিশুদ্ধ করিয়া দিতেছে। সম্মুখের ঘাসে বসিয়া সন্ন্যাসী শুধু উদাস, নিষ্পলক দৃষ্টিতে ইহারই পানে চাহিয়া আছে—মন কোন দূর অতীতে আনাগোনা করিতেছে কে বলিবে!' চোখে অশ্রু নাই। কিন্তু কানে এখনও বাজিতেছে "দাদু দাই?"

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার সারা প্রান্তরটিকে মসীলিপ্ত করিয়া দিল। ঘরে এখনও প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। সন্ন্যাসীর একবার ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু উঠিতে আর পারিল না—তেমনি ঠায় বসিয়াই রহিল।

ওপাশে বাছুরটি ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিয়াছে—অগত্যা উঠিতে হইল। উঠিয়া অবোধ পশুটির গলার দড়ি ছাড়িয়া দিল—সেটা মহানন্দে তাহার রাত্রিবাসের নির্দিষ্ট স্থান খুঁজিয়া লইল। এই অবোধ পশুটি কাহার স্নেহ-কোমল হাতের স্পর্শের আশায় যে এতক্ষণ ডাকাডাকি করিতেছিল, তাহা সন্ন্যাসীর বুঝিবার বাকী রহিল না। কিন্তু হায়রে অবোধ পশু!

সন্ন্যাসী বিছানায় আসিয়া এলাইয়া পড়িল—শ্রান্তিতে সমস্ত শরীরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! সে দুষ্মন্ত শকুন্তলার উপাখ্যান পড়িয়াছিল—ভাবিল, এমন করিয়াই বুঝি শকুন্তলা কন্ব মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুই চোখ বাহিয়া আবার অশ্রুর মালা কেন? আবার সেই আধ আধ ধ্বনি "দাদু দাই—দাদু দাই?"

(৫)

একি হইল? ইষ্টমূর্তির সম্মুখে বসিলে আর মন্ত্র মনে আসে না—জপ-তপ সব ভুল হইয়া গিয়াছে! এই পাঁচ ছয়টা দিনের মধ্যে বুঝি সে একদণ্ডও এই সব লইয়া থাকিতে পারে নাই।

(শেষাংশ ৬১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চাকরীর আপোষ-রফা

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

ইতিপূর্ব্বে চাকুরী সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরী বণ্টন নীতি গঠনতন্ত্রের আদর্শের দিক হইতে অন্যায় ও ক্ষতিকর। গণতন্ত্রকে পবিত্র ও রাষ্ট্রকে অবিভাজ্য রাখিতে হইলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন কাজ করা চলে না। প্রত্যেক আদর্শ জাতি ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ করিলে দেখা যাইবে, শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই মঙ্গল হইবে। দেশের লোক নিশ্চিন্ত হইয়া আয়াসলব্ধ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে থাকিবে। চাকুরী অপেক্ষা এত বড় বড় বিষয়ের প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইবে যে, চাকুরীর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী পাওয়াই যাইবে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, দেশের অনেক লোক এই সব আদর্শকে আমল দিতে চায় না। দিন দিনই চাকরীর প্রতি তাহাদের লোভ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমনভাবে হা-হুতাশ আরম্ভ করিয়াছে যেন চাকুরী না পাইলে তাহাদের সমগ্র জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সমস্ত দাবী ও উপদাবী হইতে চাকুরীর সাম্প্রদায়িক হার নির্ণয়ের কথা উঠিয়াছে। কোন্ সম্প্রদায় কত চাকুরী পাইবে, তাহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট হার না পাইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না। জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের যতই দোহাই দেও, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা যতই বলিতে থাক, তাঁহারা চান একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ। যাঁহাদের হাতে শাসন-দণ্ড ন্যস্ত আছে তাঁহারাও এই মতাবলম্বী। সুতরাং তাঁহারা যে মহান আদর্শের দিকে কর্ণপাত করিবেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। বাজারের শাক, মাছ, আলু-পটলের মত চাকুরীকেও তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে চান। আর সেই ভাবেই জনাব মোঃ ফজলুল হক সাহেব একটা বাঁটোয়ারার কথা ঘোষণাও করিয়া দিয়াছেন। মোটামুটিভাবে তিনি এই মর্ম্মে বাঁটোয়ারা করিয়াছেন যে, বাঙলা সরকারের অধীনস্থ সমস্ত চাকুরীর অর্দ্ধেক পাইবে মুসলমান ও বাকী অর্দ্ধেক পাইবে অ-মুসলমান! যা তা একটা ঘোষণা করা এক কথা, আর বিশেষ বিবেচনা সহকারে সমস্ত দিক আলোচনা করিয়া সংগত অসংগত বিষয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া একটা সুচিন্তিত মত প্রকাশ করা একেবারে ভিন্ন কথা। এখন দেখিতে হইবে হক সাহেব সেইভাবে এই বাঁটোয়ারা করিয়াছেন কিনা।

চাকুরী বণ্টনের উদ্দেশ্যে কিছু করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, বাঙলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি? তাহাদের সংখ্যাই বা কি এবং দেশের বিভিন্ন স্তরে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিই বা কি? বাঙলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে মেজরিটি ও মাইনরিটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে বাঙলায় তাহা কি ধরণের? এই বিষয় আলোচনার পর চাকুরী বণ্টন করিতে হইবে। নতুবা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সুবিচার হইতে পারে না। বহুদিন হইতে বাঙলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বাস করিয়া আসিতেছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরী বণ্টনের নীতি স্বীকার করিতে হইলে, সরকারী চাকুরীতে ইহাদের প্রত্যেকেরই অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। সংখ্যার দিক হইতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারপর হিন্দু, তারপর অন্যান্য সম্প্রদায়। ইহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুরা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে যত সংখ্যায় মেজরিটি বাঙলায় মুসলমান তত সংখ্যায় নহে! এখানে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে কিছু বেশী হইলেও মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা প্রায় সমান সংখ্যক। অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা এত বেশী যে, মাইনরিটিদের চাকুরী বা আইনসভার আসনগুলি 'ওয়েটেজ' সহ দিলেও তাহারাই মেজরিটি থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বাঙলায় সেরূপ 'ওয়েটেজ' দিলে চাকুরীতে বা আইন সভায় মুসলমান মেজরটি হইবে না। সেই জন্য বলিয়াছি, এখানে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা মোটামুটিভাবে সমান। মেজরিটি হইয়া থাকিব অথচ মাইনরিটিকে 'ওয়েটেজ' দিব না, এই নীতি বাঙলায় চলিতে পারে না। ন্যায়, নীতি ও সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বাঙলায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরীতে ও আইনসভায় কেহই মেজরিটি হইয়া থাকিতে পারে না। এই দিক দিয়া বাঙলার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। যে কারণেই হউক, বাঙলা সরকারের অধীনস্থ চাকুরীর অধিকাংশই হিন্দুরা শতাধিক বৎসর হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছে। চাকুরী বণ্টনের সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসারে এই চাকুরীর একটা অংশ অন্যান্য সম্প্রদায়কে দেওয়া দরকার। কিছু দিন হইতে এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন হইতেছে। এবং এই আন্দোলনের ফলেই আইনসভায় চাকুরী সংক্রান্ত একটা প্রস্তাবও পাশ হইয়া গিয়াছে। মোঃ ফজলুল হক সাহেব সেই প্রস্তাবটিকে একটু রদবদল করিয়া পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ফরমুলাকে সরকারী নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন কথা উঠিয়াছে, মোঃ ফজলুল হক সাহেবের এই নীতিটাও বিচার-সংগত কি না। যদি বিচার-সংগত না হয়, তবে কোন ভিত্তিতে চাকুরীর ভাগ-বাঁটোয়ারা হইতে পারে? পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ফরমুলাতে কি কি অসুবিধার উদ্ভব হইতেছে ও কি কি বিষয় উপেক্ষিত হইতেছে তাহা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মুসলমান সমাজ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেও, সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায় ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং তাহারা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। তাহাদের এই আশঙ্কা হইয়াছে যে, এতাবৎ তাহারা যে সব সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। আবার ওদিকে মুসলমানগণ মনে করিতেছে—তাহারা যেসব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সেই সব অধিকার পাইতে থাকিবে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই ফরমুলার পর হইতে সমগ্র দেশে চাকুরী ব্যাপারে একটা ওলটপালট হইয়া যাইবে। এতদিন মুসলমান অভিযোগ করিতেছিল, চাকুরী ব্যাপারে তাহারা সুবিচার পাইতেছে না, এখন হিন্দুরা সেই অভিযোগ করিতে থাকিবে। হক সাহেবের এই ব্যবস্থায় দেশ হইতে অসন্তোষ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে না। সেই জন্য আমরা ইহা সমর্থন করি না।

এবং মনে করি ইহা বিচার-সম্মত হয় নাই। যে ব্যবস্থায় সকল সম্প্রদায়ের চাকুরী-প্রত্যাশী লোকের স্বার্থে আঘাত করে, তাহা সকলের সম্মতিক্রমে হওয়া উচিত। নতুবা কখনই সুবিচার হইবে না। হক সাহেবের উচিত ছিল, যখন আইন-সভায় চাকুরী সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখনই উহাকে বাধা দিয়া সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় লোক লইয়া একটা আপোষ-রফার ব্যবস্থা করা। তাহা হইলে দেশে এত গণ্ডগোল হইত না।

আগেই বলিয়াছি, বাঙলার সমস্যা আলাদা। জনসংখ্যার গরিষ্ঠতার দাবীতে চাকুরী ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার কল্পনা করা এখানে চলিবে না। এখানে এমন কতকগুলি মাইনরিটি সম্প্রদায় আছে যাহাদের 'ওয়েটেজ'-এর দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য। এখানে অন্যতম মাইনরিটি হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতায় অনেকটা অগ্রসর। এখানকার মেজরিটিদের তৎপরিমাণ যোগ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষা নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং মেজরিটি বলিয়াই সব কিছুতেই অধিক সুবিধার দাবী করিলে চলিবে কেন? মাইনরিটিদেরও সুবিধা অসুবিধার দিকটা দেখিতে হইবে বৈ কি! এমত অবস্থায় আপোষ-রফা ব্যতীত বাঙলায় চাকুরী সমস্যার কোনও-রূপ মীমাংসা হইতে পারে না। সেইজন্য আমি মৌঃ ফজলুল হক সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার পঞ্চাশ-পঞ্চাশের ফরমুলা প্রত্যাহার করুন। এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় লোক লইয়া একটা ছোট-খাট সালিশী বোর্ড গঠন করিয়া তাহারই হাতে চাকুরী সমস্যার সমাধানের ভার ছাড়িয়া দিন। তৎপূর্ব্বে এই বোর্ডের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি সকলের নিকট হইতে লইতে হইবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা চাকুরী সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হইয়া যাইবে। দেশের মধ্যে কোনওরূপ অসন্তোষ সৃষ্টি হইবে না। কালনেমির লঙ্কা ভাগের অংশ পাইয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

এ বিষয়ে আমার নিজের মত জনসাধারণের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিব। চাকুরী বণ্টনের সাম্প্রদায়িক নীতিকে দেশের মঙ্গলের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। বর্ণ, ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারাই চাকুরীর প্রত্যেকটা বিভাগ পূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নীতি যদি গ্রহণ করিতেই হয় তবে এমনভাবে করিতে হইবে যেন কাহারও প্রতি কোনওরূপ অবিচার না হয়। বর্ত্তমানে আইন সভায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং সব সময় দেখিতে হইবে, মুসলমান সদস্যগণ যেন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও ব্যভিচার না করেন। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া কেহ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না করে যে, মুসলমান অত্যাচারী, অবিবেচক ও অপরের সুবিধা বুঝিতে অক্ষম। আমাদের সদস্যগণ নিজেদের জন্য যে সব সুবিধা গ্রহণ করিতে যাইবেন, তাহা দেখিয়া অপরে যেন একথা না বলে যে, আমরা স্বার্থপর। কারণ অপরে আমাদের সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করিলে, তাহাতে শুধু যে আমাদের মর্য্যাদার লাঘব হইবে তাহা নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও আমাদের সম্মুখে নানারূপ অসুবিধা আসিয়া দেখা দিবে। মুসলিম স্বার্থের প্রকৃত দরদীগণ সে সব অসুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য শতকরা পঞ্চাশের দাবী আমাদিগকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। আইনসভায় প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, শতকরা যাটটির জন্য; মৌঃ ফজলুল হক সাহেব দিতে রাজি হইয়াছেন শতকরা পঞ্চাশটি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি বলি দাবীটা আরও কিছু কমাইতে হইবে। পূর্ব্বে প্রচলিত আইন অনুসারে মুসলমানের জন্য বরাদ্দ আছে শতকরা পঁয়তাল্লিশটি। বর্ত্তমানে ইহার উপর আর একটি কি দুইটি বাড়াইলেই চলিবে। ইহাতে নিজেদের জেদের কিছু বহাল থাকিবে, অথচ অপরের নিকট উদারতার পরিচয় দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় অপরের সহানুভূতি ও ভালবাসা আমাদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অবশিষ্ট চকুরীগুলি অমুসলমান-গণকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার সুযোগ দিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে দেখা যাইবে, চাকুরীর বরাদ্দ সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের ভাগেই কিছু বেশী পড়িবে। অথচ ইহার জন্য অবিচারের অভিযোগ কেহই করিতে পারিবে না। আজ আমি মুসলমান সমাজের সেই শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন করিতেছি, যাহা স্বার্থপরতার দ্বারা কলুষিত নহে, যাহা উদারতা ও মহানুভবতার দ্বারা পরিশুদ্ধ। একবার সম্রাট বাবর অনর্থক যুদ্ধ করিতে গিয়া অশেষ লোকক্ষয় হইতে দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি এক মুঠা ভুট্টার জন্য হিন্দুস্থানের সিংহাসন হারাইতে বসিয়াছিলাম। আজ বাঙালী মুসলমানকে বলি, দু'চারটা চাকুরীর লোভ করিতে গিয়া বাস্তব জগতের অসুবিধার সম্মুখীন হইতে যাইও না। এক সময় মহামতি বার্ক বলিয়া-ছিলেন, কোনও বিষয়ে আমার অধিকার আছে কি না, তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ইহাই দেখিতে হইবে, সেই অধিকার লাভ করিতে গেলে বাস্তবক্ষেত্রে কোনওরূপ অসুবিধা হইবে কিনা। যদি অসুবিধা হয়, তবে অধিকার ছাড়িয়া দেও। চাকুরী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আইনসভায় যখন পাশ হইয়াছে তখন অধিকার আছে নিশ্চয়। কিন্তু তাহা আদায় করিতে গিয়া বাস্তব দিকটা উপেক্ষা করা মারাত্মক হইবে।

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(১৯)

প্রতিদিন অবসর মত নরেন্দ্রকে আসিয়া দেখিয়া যাইবে চলিয়া আসিবার সময় এই কথাই সতীশ বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ক্রমাগত তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন সতীশ আসিল না, লীলা তখন একটু চিন্তিত না হইয়া পারিল না। সতীশ যে কলিকাতার বাহিরে যায় নাই এবং কোথাও গেলে যে না বলিয়া যাইবে না ইহা নিশ্চিত। এই অনুপস্থিতির কারণ খুঁজিতে যাইয়া সতীশের হঠাৎ অসুস্থতাটাই প্রথম মনে উঁকি দিল। সমস্ত ভাবনার মধ্যে সতীশের ভাবনাটাও যে চিত্তের এক কোণে স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে এ কথা আজ আর লীলা অস্বীকার করিতে পারে না। অমর তাহাকে একদিন বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল একজনের প্রবল ইচ্ছা কেমন করিয়া অন্যের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আজ কিন্তু লীলার মনে হইল এ বস্তু বুঝাইবার জন্য আর তাহার কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন নাই।

লীলা নরেন্দ্রকে বলিল, "সতীশ ঠাকুরপো সেই যে চলে গেলেন তারপর আর এলেন না। কেন আসছেন না! কোন অসুখ করেনি ত?"

নরেন্দ্র প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল "আমিও তাই ভাবছি। কাজ তার যত বেশীই থাক, রোজ অন্ততঃ একবার করে সে আসতই। যে সাংঘাতিক এক ইনফেকশন! তখনই বলেছিলাম হতভাগাকে কাজ নেই তোর এর মাঝে এসে! এখন ওর যদি কিছু হয় কি হবে বল ত! ঝি চাকর ছাড়া নিজের বলে একটি লোকও যে নেই!"

লীলা বলিল, "কারুকে পাঠিয়ে দেব খবর নিতে?"

"রামভজনকেই পাঠিয়ে দাও। জেনে আসুক কি হয়েছে।"

লীলা চাকর ডাকিয়া শ্যামবাজারে পাঠাইয়া দিল। পরে স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই নরেন্দ্র কহিল, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব আছে বলে আমার জানা ছিল না। কিন্তু কি স্বার্থ ওর আছে আমাকে ভালবেসে! এমন বুকভরা দরদ দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে বন্ধুর সেবা! শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে ও যা পেরেছে—আমি তা পারতাম না।"

লীলা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। নরেন্দ্র কহিল "কি কর্ম-চঞ্চল ওর প্রাণ—অথচ ভাবুক, কবি, সৌন্দর্যের পূজারী। সুন্দর কিছু দেখলেই ভালবেসে ফেলে। কিন্তু কোনদিন দেখিনি, প্রবৃত্তি ওর সংযমের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে! আগুন নিয়ে অনেক খেলাই ও খেলেছে—হাত কিন্তু পোড়েনি কোনদিন। মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকে আপনহারা দৃষ্টি দিয়েই—হারিয়ে যায় না ওর এতটুকুও। এই জায়গায় সাধারণের সঙ্গে ওর পার্থক্য।"

এইবার লীলা কহিল, "সাধারণের চোখ দিয়ে দেখে যে ও'কে বিচার করা চলে না তা আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি। প্রথমে দেখলে মনে হয়—কি নির্লজ্জ বেহায়া এই লোকটি।"

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পরে বলিল, "তোমার অসুখের সময় কি সেবাই যে করেছেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পুরুষমানুষে নাকি এত পারে। দেহে ও'র শক্তি আছে, প্রাণে ও'র দরদ আছে, উনি পারবেন। সমাজের, দেশের, দুস্থ মানবতার সেবার ভার নিলে ও'র অনধিকার চর্চা হবে না।"

ঘণ্টা দুই পরে রামভজন আসিয়া জানাইল এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার দিনই বিকালে সতীশের জ্বর হইয়াছে। জ্বর অবশ্য খুব বেশী নহে। সামান্য সর্দি ভাব আর গায়ের বেদনাও কিছু আছে, তবে ভয়ের তেমন কিছু নাই।

ভৃত্যের মুখে সংবাদ শুনিয়া লীলা অপরিসীম উৎকণ্ঠায় স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "বাড়ীতে ত ও'র নিজের বলে কেউ নেই। নিজে ত দেশশুদ্ধ রোগীর সেবা করে বেড়ান, অথচ কারুর হাতে সেবা নেবার প্রয়োজন যে ও'র কোনদিন হতে পারে তা হয়ত ভেবে দেখেননি। সুখের দিনে অনেক বান্ধব জুটলেও বিপদের দিনে একজনকেও যে খুঁজে পাওয়া যায় না, এ জ্ঞান ও'র থাকা উচিত ছিল। বাধাবন্ধহীন মুক্ত জীবনের ট্রেজেডীই ত ঐখানটায়।"

তারপর খানিক থামিয়া বলিল, "জ্বর যখন হয়েছে, হয়ত স্মল পক্সই হবে। বন্ধু ত বন্ধুর কালব্যাধি নিজের দেহে তুলে নিয়ে বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুললেন, এখন বন্ধু কি করবেন শুনি?"

নরেন্দ্র কি করিবে এতক্ষণ তাহাই ভাবিতেছিল। বলিল, "তার শুশ্রূষার ভার তোমাকেই নিতে হবে। সতীশকে এখানে নিয়ে আসতে গাড়ী পাঠাচ্ছি!"

লীলা বলিল, "গাড়ী ত না হয় পাঠাচ্ছ, কিন্তু তার পূর্বে বাবা মার অনুমতি নিতে হবে যে।"

নরেন্দ্রনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। লীলা বলিল, "এর প্রয়োজন আছে। রক্ত সম্পর্কহীন অনাত্মীয় কোন বন্ধুকে তা সে যত বড় বন্ধুই হোক শুশ্রূষার জন্য বাড়ী নিয়ে আসতে হলে বাড়ীর কর্তাদের অনুমতির প্রয়োজন এই জন্য আছে যে, পাছে বন্ধুর কোন অমর্যাদা হয়। আর আমাদেরও উচিত তাঁদের আদেশ নিয়ে কোন কাজ করা। জানি তাঁরা এতে অমত করবেন না।"

নরেন্দ্রনাথ কথাটা একটু ভাবিয়াই দেখিল। পরে ধীরে ধীরে মায়ের কক্ষের দিকে যাইয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা সতীশকে এখানে নিয়ে আসতে বলে দিলেন।"

সতীশকে আনিবার জন্য প্রেরিত গাড়ী ফিরিয়া আসিল সতীশ বলিয়া দিয়াছে অসুখ সামান্যই এবং ইহার জন্য আর টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন নাই।

নরেন্দ্রের প্রত্যয় হইল না। সে নিজে ডাক্তার, জানিত জ্বর যখন হইয়াছে—তখন স্মল-পক্স হয়ত অল্প হউক বেশী হউক হইবেই। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বন্ধুত্বের খাতিরে বন্ধু গৃহে আসিয়া বন্ধু বান্ধবীকে বিপন্ন করা সঙ্গত মনে না করিয়াই সতীশ তার অসুখের সামান্যত্বের ভাণ করিয়াছে। অদ্ভুত মানুষ এই সতীশ—যার সেবায় সে নিজে বিপন্ন তারই সেবা গ্রহণে কুণ্ঠা!

নরেন্দ্র আবার মায়ের কাছে যাইয়া বলিল, "সতীশকে এখানে নিয়ে আসতে গাড়ী পাঠিয়েছিলাম মা, অসুখ সামান্য বলে সে আসতে চাইল না। সামান্য কথাটা ওর নিছক মিথ্যে। আমি ত আর যেতে পারছিনে, ঝির সঙ্গে তোমার বৌমাকে,

পাঠিয়ে দাও তোমার বৌমাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

জননী চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। নরেন্দ্র বলিল, "কি ভাবছ মা, সতীশকে এখানে নিয়ে আসা তোমার ইচ্ছা নয়?"

জননী হাসিলেন, বলিলেন, "তা কেন, ভাবছি বৌমাকে পাঠাব—।"

নরেন্দ্র কহিল, "তোমরা যখন বৌ ছিলে মা, তার চেয়ে কাল কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তারপর তোমার বৌমা যে সব পারে মা! তা তোমার যদি ভাল না লাগে নিজে যেয়ে তাকে নিয়ে এস।"

জননী আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। নরেন্দ্র উঠিয়া আসিলে বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "রামীর মাকে সঙ্গে নিয়ে সতীশের ওখানে একবার যাও বৌমা, আমার কথা বলে তাকে এখানে নিয়ে আসবে। ভোলাও সঙ্গে যাবেখন। গাড়ীতে আসতে কষ্ট হলে পাল্কী করে আনবে।"

লীলা যখন শ্যামবাজারে আসিয়া পৌঁছিল বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে লীলাকে আসিতে দেখিয়া সতীশ কতক্ষণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত লীলার পানে চাহিয়া রহিল।

লীলা মৃদু হাস্যে বলিল, "আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন, না ঠাকুরপো! দেবতা ডাকলেও ভক্ত যদি অভিমানভরে কাছে না যায়, বাধ্য হয়ে দেবতাকেই নেবে আসতে হয় ভক্তের কাছে, যেমন দুরন্ত ছেলে মায়ের ডাকে সাড়া না দিলে মাই এগিয়ে যান ছেলের কাছে!"

বলিয়াই লীলা সতীশের শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িল। বাম হাতখানি সতীশের কপালের উপর রাখিয়া বলিল, "জ্বর হয়েছে, একটু খবর জানাতেও ত পারতেন। সেই যে চলে এলেন আর খোঁজ-খবরটি নেই। যাদের জন্য এতটা করলেন—তারা যে আপনাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে এটা ভেবে দেখলে কোন ক্ষতি হত না বোধ হয়। দশজনের সেবার ব্রত যারা নেয়, নিজের দেহের ওপর এত তাচ্ছিল্য করলে তাদের চলে না। দেহই যদি ভেঙ্গে যায় পরের বেগার খাটবেন কি দিয়ে!"

লীলার আগমনেই সতীশের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। লীলার পানে চাহিয়া সতীশ বলিল, "আপনি কি বৌদি, আপনার স্পর্শেই আমার অর্ধেক অসুখ কমে গেল। তাই ত নরেন বেঁচে উঠল, নইলে অমন ক্রিটিক্যাল অবস্থা থেকে কি মানুষ ফেরে!"

লীলা তাহার সুন্দর আয়ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সতীশের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সতীশ সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। লীলা বলিল, "পাশ ফিরে শুলেন যে বড়! আপনাকে নিয়ে যেতে মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি আর দেরী করতে পারছিনে।"

সতীশ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কিই বা অসুখ এর জন্য আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে বৌদি! নরেনকে নিয়ে রাত জেগে জেগে আপনার কি চেহারা হয়েছে। আমার সামান্য জ্বর দুদিনেই ছেড়ে যাবে। যদি বেশী কিছু হয় খবর পাঠাব।"

হাসিয়া লীলা বলিল, "যার স্পর্শে ব্যারাম অর্ধেক কমে যায়, তার সেবা নিতে এত কুণ্ঠা কেন বন্ধু?"

সতীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া আবার মুখ ফিরাইল। লীলা বলিল, "মুখ ফেরালে ত চলবে না, যাবেন কিনা স্পষ্ট করে বলুন।"

লীলার স্বর কঠিন ও একটু বিরক্তি-ব্যঞ্জক। সতীশ মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি যাব না বৌদি!"

"যাবেন না?" শ্লেষের সহিত লীলা কহিল, "কেন? এখন বড্ড ভয় করে, না ঠাকুরপো। যখন ছোটটি ছিলাম মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি, তখন ত লুকিয়ে লুকিয়ে কারণে-অকারণে আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করেনি। আর আজ যেচে নিতে এসেছি কিনা। অত মুখচোরা মন নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মেশেন কি করে!"

সতীশ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে লীলার দিকে চাহিয়া রহিল যেন সে লীলার কথার একবর্ণও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

লীলা বলিল, "চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন, আমি খুব সুন্দরী তাই?"

লীলার কথা শেষ না হইতেই সতীশ কঠিন কণ্ঠে ডাকিল "বৌদি।"

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া লীলা সতীশের পানে চাহিল। সতীশ কহিল, "মানুষকে অযথা আঘাত দিয়ে কথা বলা মেয়েদের স্বভাব। অত ধাপ্পাবাজ ভাবলে তার সঙ্গে না মেশাই মেয়েদের উচিত।"

হাসিয়া লীলা কহিল, "না মিশতে চাইলেও যে আপনারা জোর করে মিশিয়ে নেন। গায়ের জোর যে মেয়েদের চেয়ে আপনাদের বেশী।"

সতীশ কথা কহিল না। লীলা বলিল "উঠবেন, না ফিরে যাব?"

তথাপি সতীশ নিরুত্তর রহিল। লীলা উঠিয়া আসিয়া ঝির মারফৎ বাড়ীর সরকারকে জানাইয়া দিল তাহারা চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য বাবুকে লইয়া যাইতেছে এবং বাবুর অনুপস্থিতিতে বাড়ীতে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহাই যেন এবারও করা হয়।

সমস্ত বন্দোবস্তের নির্দেশ বা আদেশ দিয়া লীলা সতীশের শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল সতীশ একভাবেই পড়িয়া আছে। নিকটে যাইয়া ঈষৎ হাস্যে বলিল, "ছেলেমানুষের মত অভিমানটি ত ষোল আনাই আছে দেখছি। তবু ও দেখে ভয় করবেন যিনি তার শুভাগমন ত আজও হয়নি।"

পরে দক্ষিণ বাহুমূলে ছোট একটি ধাক্কা দিয়া বলিল, "উঠুন, কি যে ছেলেমানষী করছেন।"

ইহাতেও সতীশ উঠিল না দেখিয়া লীলা একটু বিপদে পড়িয়া গেল। আরও নিকটে সরিয়া গিয়া সতীশের হাত ধরিয়া টানিল। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরপো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার আর দেরী করবেন না।"

এবার সতীশ না উঠিয়া পারিল না। অভিমানী ছোট ভাইটি যেমন বড়বোনের পরম আদর আদায় করিয়া পরে বোন

আসিয়া হাত ধরিয়া ডাকিলেই অভিমানক্ষুব্ধ নতমুখে উঠিয়া আসে অথচ চোখে থাকে দুষ্ট হাসি তেমনি সতীশ লীলার হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। নীচে নামিয়া সম্মুখেই লছমিয়াকে দেখিয়া সতীশের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য লছমিয়ার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাক্যালাপ করিতে সাহস করিল না।

সতীশকে দাঁড়াইতে দেখিয়া লীলা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে পাইল, সস্নেহ করুণ দৃষ্টি দিয়া সতীশ লছমিয়ার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। লীলার কৌতূহল হইল। কে এই রূপসী তন্বী?

লছমিয়াও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া লীলাকেই দেখিতেছিল। বাবু ত বিবাহ করেন নাই—তবে ইনি কাহার হাত ধরিয়া কোথায় চলিয়াছেন!

লীলাই প্রথমে কহিল। বলিল, "তুমি কে বাছা, কার কাছে এসেছ, কি চাও?"

স্থান-কাল-পাত্র বোধশূন্য অমার্জিত রুচি এই অস্পৃশ্য মেয়েটি পাছে আপত্তিজনক কিছু বলিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় লছমিয়া লীলার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বেই সতীশ বলিয়া উঠিল, "ও লছমিয়া বৌদি, মেথরদের মেয়ে! ওদের পাড়ায়ই ত আমি স্কুল করেছি। ওদের কোন অভাব-অভিযোগ হলে আমাকে জানায়। তাই বুঝি কিছু জানাতে এসেছে।"

লছমিয়া হয়ত সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিছু না বলিয়া অন্য দিক চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

লছমিয়াকে লক্ষ্য করিয়া সতীশ বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমার ক'দিন জ্বর হচ্ছে, তাই তোদের ওখানে যেতে পারিনি। ইনি আমার বৌদিদি। অসুখ বলে নিতে এসেছেন। ভাল হয়ে ফিরে এসে তোদের ওখানে যাব। মদটদ খাসনি ত। খবরদার আর খাসনি যেন।"

লছমিয়া শুধু চাহিয়াই রহিল কিছু বলিল না। গাড়ীতে উঠিয়া সতীশ কহিল, "কোন নালিশ থাকলে ফিরে এসে শুনব।"

ষ্টার্ট দিয়া গাড়ী ছাড়িল। যতক্ষণ দেখা গেল লছমিয়া চাহিয়া দেখিল। তারপর যে পথ ধরিয়া আসিয়াছিল সেই পথেই অদৃশ্য হইয়া গেল। গাড়ীর চালককে ধীরে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিয়া লীলা সতীশকে কহিল, "কাজ ত দেখি জুটিয়েছেন অনেক, ভক্তের সংখ্যারও কমতি নেই।"

সতীশ বলিল, "ওদের মানুষ করে তুলতে হবে বৌদি, ভেবে দেখুন ত সমাজের কত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ওরা।"

লীলা হাসিয়া কহিল, "মানুষ হয়ে সমাজের ঐ অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যটি যদি ওরা আর না করতে চায়, তা করবার লোক ত চাই।"

সতীশ বলিল, "শিক্ষা-অশিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির কোন সম্বন্ধ নেই বৌদি! সভ্য দেশে যেমন ইংলণ্ড আমেরিকায়—ময়লা পরিষ্কার করবার লোকও ত আছে। তারা ত এদের মত অন্ধকারের জীব নয়।"

"কারণ সেখানে আভিজাত্য বৃত্তিগত নয়। এদেশটায় যে তার উল্টো। বৃত্তিই যে আভিজাত্যের মাপকাঠি।"

সতীশ অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ঐ মাপকাঠিটাই বদলে দিতে চাই বৌদি। নইলে এদেশ উঠবে না। স্বাধীন-বৃত্তিকে আমরা ঘৃণা করে পরের গোলামীকে উঁচু আসন দিয়েছি, মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল করে তুলেছি। মানুষের স্পর্শ থেকে জাত বাঁচিয়ে বিশ্বের দরবারে নিজেরাই অস্পৃশ্য হয়ে রয়েছি। সবাইকে ধরে তুলতে হবে, ভায়ের কাঁধে হাত দিয়ে ভাই দাঁড়াবে তবে ত ভারত উঠবে।"

"ওঠাতে পারেন ত ভাল" বলিয়াই লীলা চুপ করিয়া গেল। তর্ক করিবার অনেক কিছু থাকিলেও কথা বলিতে আরম্ভ করিলে যে সতীশ সহসা থামিবে না—অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়াও বড় বড় কথা আওড়াইয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দিবে লীলা তাহা জানিত। কিন্তু সতীশকে কাছে পাইয়া চুপ করিয়া থাকাও তাহার অভ্যাস নয়।

খোঁচা দিয়া কথা কহিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া লীলা কহিল, "আপনার লছমিয়াটি দেখতে কিন্তু ভারী সুশ্রী। ঠিক ভদ্রঘরের মেয়েদের মতন। কেমন সুন্দর বড় বড় দুটি চোখ, না ঠাকুরপো? ঠোঁট দুখানিতে দুষ্ট হাসি বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু।"

উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় লীলা সতীশের দিকে চাহিল। সতীশ লীলাকে ভালরূপই জানিত—যে এই অযাচিত প্রশংসার অন্তরালে রহিয়াছে জব্দ করিবার গোপন অভিসন্ধি। সে কথা না কহিয়া নীরবে রহিল।

রূপের প্রসঙ্গ চাপা দিয়া লীলা কহিল, "ওরা আছে বেশ। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে মিশে কাজ করে—ভদ্রলোকের মত স্বামীর ঘাড়ে বসে খায় না। ও আপনার কাছে এসেছিল কেন? স্বামী-স্ত্রীতে বুঝি ঝগড়া হয়েছিল। আর তাই মিটিয়ে দেবার জন্য আপনাকে নিতে এসেছিল?"

লীলার বলার ভঙ্গীতে সতীশ না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া সতীশ কহিল, "স্বামীই নেই ওর তার আবার ঝগড়া।"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া লীলা কহিল, "স্বামী নেই, বে হয়নি আজও—না বিধবা হয়েছে?"

সতীশ কহিল, "গেল বছর ওর স্বামী কলেরায় মারা গেছে।"

"আহা ছেলেমানুষ, এই কাঁচ বয়সে বিধবা। তা ওদের ত বিধবাদের বে হয়, দিন না একটা জুটিয়ে।"

"জুটিয়ে ওদের দিতে হয় না বৌদি, আপনি এসে জোটে।"

সকৌতুকে লীলা কহিল, "না জোটাই ত অস্বাভাবিক। অমন রূপ থাকলে স্বামীর অভাব হয় না। ওর যা রূপ—নিতান্ত অস্পৃশ্যা না হলে"—

কথা শেষ না করিয়া লীলা থামিয়া গেল। সতীশ কহিল, "পরমাশ্চর্য্যের বিষয় বৌদি যে, ও বে করতে চায় না। বলে মেয়ে মানুষের আবার কবার বে হয়। ও ভদ্রলোকের মেয়েদের মত থাকতে চায়।"

"ভদ্রলোকের সংস্পর্শে যখন এসেছে নজর একটু উঁচু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।"

বলিয়াই লীলা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কথার প্রচ্ছন্ন আঘাতটা সতীশের বুকে একটু বেশী বাজিল। অসহ্য হওয়ায় বলিল, "বৌদি আমায় কি মনে করেন, বলুন ত?"

লীলা স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "আমাদের বন্ধু, প্রগতি কবি, প্রগতি সাহিত্যিক—আর"।—

"তার মানে?"

"কবি, সাহিত্যিকের মানে আপনি জানেন না; আমায় বলে দিতে হবে? বলে যদি দিতেই হয়, অসুখ আগে ভাল হোক তারপর লছমিয়াকে একদিন ডেকে এনে তার সামনেই বলে দেব।"

সতীশ আর কথা কহিল না। কতক অসুখে কতক উত্তেজনায় মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। পশ্চাদ্দিকে মাথা ঈষৎ হেলাইয়া চোখ বুজিয়া বাম হাতে কপাল রগড়াইতেছে দেখিয়া লীলা সস্নেহে সতীশের কপালে হাত দিয়া কহিল, "মাথা ব্যথা করছে বুঝি। অত বকলে করবে না।"

অতি সন্তর্পণে পরম স্নেহে লীলা সতীশের কপাল টিপিয়া দিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া লীলা নিজের ঘরেই স্বতন্ত্র পালঙ্কে সতীশের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। নরেন্দ্রের জননী আসিয়া সতীশকে দেখিয়া গেলেন। বধূকে সতীশের সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, সে তাহাদের ঘরের ছেলে, ছেলেও যা ছেলের বন্ধুও তাই। সুতরাং সে যেন নিজের মা বোনের কাছে আছে বলিয়াই মনে করে।

সতীশের জ্বর তখন সামান্যই ছিল। নরেন্দ্র দেহতাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ক'বছর আগে ভ্যাকসিন নিয়েছিলি রে?"

সতীশ জানাইল গত বৎসরেও সে ভ্যাকসিন লইয়াছে। শুনিয়া নরেন্দ্র কহিল, "তবে বেশী কিছু হবে না। সামান্য দু'চারটে উঠলেও উঠতে পারে। জ্বর ত এখন বেশী নেই।"

লীলা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "জ্বর থাকবে কিগো আমার স্পর্শেই নাকি ওঁর অর্ধেক অসুখ কমে গেছে।"

শুনিয়া নরেন্দ্র হাসিতে লাগিল। পরে বলিল, "ও যে তোমার সব চেয়ে বড় ভক্ত। তোমার গায়ে নাকি ও সাবিত্রী বেহুলার গন্ধ পেয়েছে। সবখানিই যে ওর কমে যাওয়া উচিত ছিল।"

লীলা সে কথায় কান না দিয়া কহিল, "তোমার বন্ধুটি কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ।—কবি হ'লেই একটু ছেলেমি থাকে, না? হ্যাঁগো, একটা নূতন খবর ত জান না!"

বলিয়াই লীলা বক্রদৃষ্টি দিয়া সতীশের শয্যাপানে চাহিল।

সতীশ বুঝিতে পারিয়া পাশ ফিরিয়া বিপরীত দিকে মুখ রাখিল। লীলা বলিল, "আজ থাক, ঠাকুরপোর অসুখ ভাল হ'লেই শুনবেখন।"

নরেন্দ্রের কৌতূহল বাড়িল। বলিল, "বলই না শুনি।"

লীলা বলিল, "সে এক ভারী মজার কথা। জানই ত ঠাকুরপো দেশের সেবায় মেতে উঠেছেন। প্রথমেই নজর দিয়েছেন, ধাঙড়-মেথর এদের মানুষ করে তুলতে। —কি ঠাকুরপো, বলব?"

বলা অসমাপ্ত রাখিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশ

মায়া

(৬০৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিদিন প্রভাত হয়, আবার সারাটি দিনের শেষে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। এই সুদীর্ঘ দিন তার কাটে যে [illegible] কেমন করিয়া কাটে তাহা সেই জানে।

[illegible] নামার উপর হইতে পড়িয়া যায়, সেই [illegible] আহার জোটে না, এখনকার সমস্ত যোগাড় করিয়াও রাঁধিয়া খাওয়া হয় না। সুতরাং সে সবের জন্য আর বিশেষ তাড়া নাই—কোন দিন একবেলা জোটে কোন দিন নাও জোটে। কিন্তু শরীর তো? কাঁহাতক আর এমন করিয়া বহিবে! দুই একদিন পরে আর কেহ সন্ন্যাসীকে বাহিরে আসিতে দেখিল না।

একটি লোক খবর লইয়া গোবিন্দপুরে গেল।—সন্ন্যাসীর বড় অসুখ,—বিকারের ঘোরে শুধু দাদু, দাদু করে ডাকছে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়েটি আবার ছেলে কোলে লইয়া আত্মীয়ের বাড়ী হইতে বিদায় লইল।

প্রভাত অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে—সোনালি সূর্যের আলোয় সারা মাঠ ঘাট রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ন্যাসী আজ একটু ভাল আছে। জানালা দিয়া বাহিরের দূরের আকাশের দিকে একদৃষ্টে উদাসভাবে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। দূর হইতে যেন কিসের অস্পষ্ট শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, সন্ন্যাসী উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া বেহারাদের ধ্বনি ভাসিয়া উঠিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য—পাল্কীখানি যে একেবারে সোজা সন্ন্যাসীর আশ্রমের প্রাঙ্গণে আসিয়া ঢুকিল!

সন্ন্যাসী কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাইল না। হঠাৎ বাহির হইতে ডাক আসিল—"দাদু! দাদুরে!"

সন্ন্যাসী গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত হঠাৎ সোজা হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। ততক্ষণ দাদু আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে।

—দাদুরে—দাদু!

—কি দাদু!

সন্ন্যাসীর দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইতেছিল—একহাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া অন্য হাত দিয়া দাদুকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

মাস দুই পরে গুরুদেব ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"এ দেখছি তা হলে বিফলেই গেল সদানন্দ?"

সদানন্দ কিছুই না বলিয়া, গুরুর পায়ের তলায় ছেলেটিকে বসাইয়া দিয়া বলিল—"আমার দাদুকে আপনি আশীর্বাদ করুন প্রভু!"

ভুলি কেন?

শ্রীসুবিমল চৌধুরী

মানুষের জীবন বিস্মৃতির লীলাভূমি। প্রাতে জাগিয়া ওঠা হইতে আরম্ভ করিয়া রাতে ঘুমান পর্যান্ত প্রতিদিন কত ভুলই না আমরা করিয়া বসি। মুখ ধুইতে যাইবার সময় হয়ত টুথ-ব্রাশখানা বাথরুমে নিতে ভুলিয়া গেলাম। পরদিন ডাকে দিব ভাবিয়া রাত্রে পোষ্টকার্ড লিখিয়া রাখিলাম, তাড়াতাড়ি খাইয়া অফিসে যাইবার ব্যস্ততায় তাহার কথা মনেই রহিল না। সময় সংক্ষেপের খাতিরে 'বাসে' উঠিয়া বসিলাম; কণ্ডাক্টার আসিয়া ভাড়া চাহিল; পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, ঘরের বাহির হইবার সময় থলির শূন্যতা খর্ব্ব করিবার দরকার হইলেও তাহা করা হয় নাই। ব্যস্ত ছাত্র দেরী করিবার ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া স্কুলে যায়; ক্লাশে বসিয়া আবিষ্কার করে অঙ্কের খাতা আনা হয় নাই। রাত্রে পড়িতে বসিলে কেমিষ্ট্রির নোট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কামরা জুড়িয়া সতর্ক সন্ধান আরম্ভ হয়, শেলফ ড্রয়ার অনেকবার নড়ে, ভারী ভারী কেতাব ওলট-পালট করা হয়, তবু সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। শেষে অন্য কেউ আসিয়া টেবিলের উপর সযত্ন রক্ষিত টেনিস র‍্যাকেটের তলে হারানো নিধি ফিরিয়া পান। মস্ত কারবারী লোক মাল কিনিয়া পয়সা না দিয়াই ফিরিয়া চলিয়াছেন -যদিও প্রতারণার ইচ্ছা আদৌ নাই। বিক্রেতা স্মরণ করাইয়া দিলে মনে হইল। তাড়াতাড়ি গাড়ী ধরিতে হইবে। টিকিট কিনিয়া বাকী পয়সা ফেরৎ না লইয়াই যাত্রী চলিলেন, পেছন ডাকে হুঁস হইল। পকেটের গহ্বর নিম্নে পয়সা রহিয়াছে। কাহাকেও দিতে হইবে, রুমাল চিঠি ইত্যাদি স্থানান্তর করত পাশে কোথাও রাখিয়া পয়সা বাহির করা গেল। লেন-দেনের পর্ব্ব শেষ হইলে স্বস্থানচ্যুত সাথীদের ফিরিয়া গ্রহণ করিবার কথা মনেই রহিল না। হয়ত চিরবিচ্ছেদ ঘটিত; কাছাকাছি কাহারও দয়ায় রক্ষা পাওয়া গেল। এগারটার মধ্যে কলেজে পৌঁছিতে হইবে; সুট পরিয়া মোটরে চড়িয়া ষ্টার্ট দিতে গিয়া চিন্তামগ্ন অধ্যাপক দেখেন এক পা মোজা বিহীন। বন্ধুর সহিত সাহিত্য-চর্চা চলিতেছে; কথায় কথায় কোন কবিতার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল, কবির নাম করিতে গিয়া সাহিত্যানুরাগী হঠাৎ তাহা ভুলিয়া বসিলেন; বন্ধুর কথায় স্মরণ হইল। আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখিতেছি, তারিখ ভুল করিয়া ফেলিলাম। দূরদেশ হইতে প্রিয়জনের চিঠি আসিয়াছে; অতি আনন্দে খাম খুলিয়া দেখি, পত্র অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে লেখা -যদিও খামে আমার ঠিকানা। শুধু কি তাই? কথা বলিতে, বই পড়িতে, লিখিতে পর্য্যন্ত আমাদের কত ভুল হয়। আমি অবশ্য বুড়াদের ভুলের কথা বলিতেছি, পাঠরত শিশুদের নয়। সেদিন এক বন্ধু হাসপাতালে কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। বলিতে হইবে, "কাল অমুককে হাসপাতালে গিয়ে দেখে এস", বলিলেন, "কাল গিয়ে হাসপাতালে দেখে এস"। কয়জনে মিলিয়া ক্রস-ওয়ার্ড সমাধান করিতেছিলাম, একজন উপর হইতে নীচে ঘর-সন্ধানীগুলি (clues) জোর গলায় পড়িয়া চলিয়াছি, আর সবাই শুনিতেছেন। এক জায়গায় পড়িতে হইবে, "ছলে হবে না হবে বলে", পড়িলাম, "মলে হবে না হবে বলে।"

কমবেশী প্রত্যেকের এ-সব ভুল হয়। সাধারণত ইহাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, কিঞ্চিৎ বিরক্তি উৎপাদন কিম্বা সময় নষ্ট হয় মাত্র। বরঞ্চ এ-সব ছোট-খাট ভুলের সুযোগ নিয়া মাঝে মাঝে বেশ আমোদ উপভোগ করা যায়। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল প্রসব করে আত্মীয়-স্বজনের সুদৃঢ় সম্বন্ধের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাঙন, পরস্পরের মধ্যে ঘোর অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণা—বন্ধুত্বের পাকা ভিতে হিংসা, ঈর্ষা, অনাস্থার ঘুণ এবং আরও বহুবিধ অনভিপ্রেত মনোবৃত্তিকে আবাহন করিয়া আনে, এ-সব ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি। Tragedy of errors-এর আঘাত সময়ে বড় মর্ম্মান্তিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা, খাম-খেয়াল, অমনোযোগ বা কোন বিষয়ে অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত থাকার ফল। কিন্তু সামান্য চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণেই দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ দোষ-ত্রুটির মূলে ইহাদের কোনটিই নাই। চলায়, ফেরায়, লেখায়, পড়ায়, কথাবার্ত্তায়, দৈনন্দিন আচরণে মানুষের এই যে ছোট ছোট ভুল ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে রহিয়াছে নিগূঢ় অথচ সুনির্দ্দিষ্ট কোন রহস্য। নির্দ্ধারিত কোন নিয়মের তোয়াক্কা না রাখিয়া, আপনা আপনি, গভীর হেতু ছাড়া কোন ভুল ত্রুটির উদ্ভব হইতে পারে না। সুচিন্তিত বিশ্লেষণে যদি মানুষ এ-সব বিস্মৃতির মূল কারণ আবিষ্কারে সমর্থ হয় তবে মনের অন্তর্নিহিত বহু অজ্ঞাত তথ্য তাহার বুদ্ধির গোচর হয় এবং প্রয়োজন হইলে সে সময় থাকিতে সাবধান হইতে পারে। ভুলের সংখ্যা সীমাহীন। উৎপত্তির প্রণালী ভেদে তাহার প্রকার ভেদ আছে। ব্যাপকভাবে সর্ব্বদা সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে এরূপ কয়েকটি ভুলের আলোচনা করা যাক্।

(১)

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন আলোচনা বা অন্যবিধ বাক্যালাপে প্রসঙ্গক্রমে কোন স্থান বা ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ করিতে গিয়া বলিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। সে নামটি যে অন্য কোন নামের চেয়ে আমাদের কাছে কম পরিচিত তাহা নয়। আমরা নিশ্চিত জানি যে মন হইতে তাহা চিরতরে মুছিয়া যায় নাই। কেহ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য দু'তিনটি নাম করেন এবং যদি ওগুলির কোনটিই আসল নাম না হয় তবে তখনই ধরিতে পারি যে, এগুলি ঠিক নাম নয়; তবুও প্রকৃত নাম মনে আসে না, মস্তিষ্কের শক্তি অনেক খরচ করিয়া কিছুক্ষণ পরে হয়ত স্মরণ করিতে পারি। কিম্বা কেউ যদি ঠিক নাম বলিয়া দেন, তৎক্ষণাৎ তাহা যথার্থ বলিয়া ধরিতে পারি। অধিকন্তু বিস্মৃত নামটির পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে অপর কয়েকটি নাম দ্রুত চেতন মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতি তৎপরতার সহিত আসিলেও আসল নাম যে এগুলি নয়, তাহা বুঝিতে আমাদের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। এই তথ্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডাঃ ফ্রয়েড কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নামের এই বিস্মৃতি তাঁহার মতে আকস্মিক ও অর্থহীন ব্যাপার নয়, সুনিয়ন্ত্রিত যুক্তিসঙ্গত প্রণালী অনুযায়ী এই ভুলিয়া যাওয়া-রূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। তিনি আরও বলেন যে, যে-সব নাম প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে মনে উদিত হয়; তাঁহাদের সহিত বিস্মৃত নামের নিকট সম্পর্ক থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার চিন্তাসূত্রে আসিয়া পরবর্ত্তী আলোচনার যে চিন্তাসূত্রে বিস্মৃত

নামটি গাঁথা তাহাতে বাধা জন্মায়। ইহার ফলস্বরূপ বিস্মৃতির উৎপত্তি। যে সকল ঘটনা-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ-সব তথ্য আবিষ্কারে ফ্রয়েড সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নমুনাস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত ডাঃ ফ্রয়েড ট্রেনে কোথাও যাইতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা 'বসনিয়া' (Bosnia) ও 'হারজিগোভাইনা' (Herzegovina) নামীয় প্রদেশ দুইটি জনপদের তুর্ক অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। ফ্রয়েড অপর ভদ্রলোকের নিকট উল্লেখ করেন যে, এ সকল তুর্ক চিকিৎসক ও নিয়তির প্রতি পূর্ণ আস্থাবান। ডাক্তারের যদি বাধ্য হইয়া বলিতে হয় রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই, উহারা উত্তর দেয়, "কি বলিব মহাশয় বাঁচা তাহার ভাগ্যে নাই। থাকিলে ত আপনিই তাহাকে বাঁচাইতে পারিতেন।" এ কথাটি বলিবার পর ফ্রয়েডের মনে তুর্ক চরিত্রের আর একটি বিশেষত্বের কথা উদিত হয়। তাহা এই যে তুর্করা যৌন আকাঙ্ক্ষাকে সব চেয়ে উচু স্থান দেয়। ইহা বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহারা হতাশায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বলিয়া থাকে, "মহাশয় (হার), উহা (যৌনাকাঙ্ক্ষা) না থাকিলে জীবনের যে কোন আকর্ষণই থাকে না।" এই কথাটি তাঁহার মনে আসিলেও অপরিচিত সহযাত্রীর সহিত যৌন ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতে চান না বলিয়া তিনি তাহা অপরকে শোনাইতে বিরত রহিলেন ও কথার ধারা অন্যদিকে ফিরাইয়া নিলেন। এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তখন ফ্রয়েডের মন এক দুঃসংবাদের দরুন দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল। কয়েকদিন আগে তিনি শুনিয়াছিলেন, 'ট্রাফয়' (Trafoi) নামে এক জায়গায় তাঁহার কোন রোগী দুরারোগ্য যৌন ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই ব্যক্তির রোগ-মুক্তির জন্য ফ্রয়েড অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তুর্ক আচার ব্যবহার ইত্যাদি আলোচনার পর মৃত্যু ও যৌনধর্ম্ম সম্পর্কীয় এই যে চিন্তাগুলি তাঁহার মনে উদিত হইল, তাহার সবটাই তিনি জোর করিয়া অবচেতন মনে পাঠাইয়া দিলেন। দেখা যাক্ এই repression বা অবদমনের ফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা এখন ইটালী ভ্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ফ্রয়েড অপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি অর্ভিয়েতোর (ইটালীর অন্তর্গত) প্রসিদ্ধ প্রাচীর চিত্রগুলি দেখিয়াছেন কিনা, যাহার চিত্রকর হইলেন... এখানে তিনি হঠাৎ চিত্রকরের নামটি ভুলিয়া গেলেন। আসল নাম 'সিনরেলি'র পরিবর্ত্তে তাহার মনে অন্য দুইটি নামের উদয় হয়—'বট্টিসেলি' ও 'বলট্রাফিও'। বিস্মৃত নামটি শেষোক্ত নামগুলির অপেক্ষা তাঁহার কাছে কম পরিচিত ছিল না, বরঞ্চ বেশীই।

এই ঘটনার মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন যৌন তথ্যটি ভুলিবার। চিত্রকরের নাম ভুলিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাহাই তিনি ভুলিলেন। চেতন মনে যে তথ্যটি তিনি ভুলিতে চাহিয়াছেন, অবদমিত তথ্যের সঙ্গে আমরা তাহার নিবিড় সম্পর্ক দেখিতে পাই। যৌন-তথ্যের মধ্যে যে 'হার' কথাটি আছে 'সিনরেলির' সিনরের সাথে তাহার অর্থগত সম্পর্ক। প্রথমটিকে যখন জোর করিয়া অবচেতনে পাঠান হইল, তখন সে তাহার সম্পর্কিত শেষেরটিকেও সঙ্গে নিয়া চলিল। এদিকে আবার 'ট্রাফয়' এবং 'সিনরেলি'র 'এলি'—ইহাদের প্রত্যেকের সাথে 'বসনিয়া'র সংযোগ যথাক্রমে 'বলট্রাফিও' এবং 'বট্টিসেলি'র উদয় হইল। ইচ্ছাক্রমে তিনি একটি ভুলিতে চাহেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যটি ভোলেন। চিত্রকরের নাম ভোলা কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। যেহেতু উহার এক অংশ 'এলি' 'বট্টিসেলি' রূপে চেতনে উপস্থিত হইল। এদিকে চেষ্টা সত্ত্বেও যৌন তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই; যেহেতু 'ট্রাফয়' 'বলট্রাফিও'র মধ্য দিয়া মনে উদিত হইল। সুতরাং চিত্রকরের নাম স্মরণ করার প্রচেষ্টা যেরূপ আংশিক সফল হইয়াছে, যৌন তথ্য অবদমনের চেষ্টাও সেরূপ অংশত কার্য্যকরী হইয়াছে। পূর্ণ সফলতা কিম্বা পূর্ণ বিফলতা কোনটির ভাগ্যে ঘটে নাই।

সুতরাং এক্ষেত্রে আসল নামের বিস্মৃতি এবং নকল নামের উৎপত্তির মূলে আমরা তিনটি কারণ দেখিতে পাই। (১) অবদমন, (২) চিত্রকরের নাম এবং যে চিন্তা মনে আসিবার কথা কিন্তু আসিতে বাধা পাইল তাহার সাথে অবদমিত চিন্তার সম্বন্ধ এবং (৩) পূর্ববর্তী কথোপকথনের কোন শব্দের ('বসনিয়া'র) সাথে অবদমিত চিন্তার শব্দ ('ট্রাফয়') এবং বিস্মৃত চিন্তার শব্দাংশের ('এলি') সংযোগ। অবশ্য নাম ভুলিবার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে এরূপ জটিল প্রণালী অবলম্বন করা হয়, তাহা নয়। কোন কোন নাম বা অন্যান্য শব্দের বিস্মৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। নিম্নে তাহা আলোচনা করা গেল।

(২)

নাম, শব্দ বা শব্দ-সমষ্টির বিস্মৃতির মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই কারণ দৃষ্ট হয়। কোন কবিতা বা অঙ্কের ফর্মুলা মুখস্থ করিয়া অনেক সময় দেখি যে কিছুক্ষণ পরে উহা আংশিক ভুলিয়া গিয়াছি। অথবা কবিতাটি যদি চিত্তাকর্ষক হয়, তবে অনেকদিন হয়ত মনে রাখিতে পারি। বারবার উহা আবৃত্তি করিয়া বেড়াই। কিন্তু একদিন দেখি কাহাকেও বলিতে গিয়া কবিতাটির কোন অংশ শেষে ভুলিয়া গিয়াছি, পংক্তি মধ্যে শব্দগুলির অবস্থান ওলট-পালট করিয়া বসিয়াছি। কেউ স্মরণ করাইয়া না দিলেও কিছুক্ষণ বা কয়দিন পরে তাহা আবার সঠিক মনে আসে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাহা শিখি, সাধারণত তাহার সবটাই ভুলি না, বিশেষ কোন অংশের উপর বিস্মৃতির যবনিকা পড়ে। অনেকে বলিবেন, ইহা স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতাপ্রসূত। তাহা আংশিক সত্য হইতে পারে। কিন্তু স্মৃতি-ক্ষীণতা ক্ষেত্র ভেদে বেশী বা কম কার্য্যকরী হয় কেন, তাহা ভাবিয়া দেখিয়া মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ কয়েকটি অজ্ঞাত তথ্যের রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে যে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দুঃখ, অপ্রীতি, বিরূপ-ভাব কিম্বা তাহার সমজাতীয় অন্য কোন ভাবের কারণ হয়, অথবা যে সকল শব্দ স্মরণে এমন কোন পূর্ব্ব স্মৃতি বা চিন্তার উদয় হয়, যাহা পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলির উদ্রেক করে। সে শব্দ বা শব্দ-নিচয়ের আমাদের মন হইতে ছুটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য ইহাও ঠিক যে সময়ে

এ জাতীয় শব্দই বিশেষ করিয়া আমাদের মনে গাঁথা থাকে। শোক, দুঃখ, বিবেক-দংশনজনিত মনস্তাপ ভুলিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাহা ভুলিয়া গিয়াছি তাহা কোন অপ্রিয় প্রসংগ কিম্বা মনে আনন্দ বা আকর্ষণ আনে না, বরঞ্চ বিরক্তি উৎপাদন করে, এরূপ কোন ভাবের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্ট। আমাদের মনোযন্ত্রের প্রধান অথচ প্রায়শ ঘটিত ত্রুটি হইল এই ধরণের বিস্মৃতি। যখনই কোন দুঃখ, অসন্তুষ্টি কিম্বা অপ্রীতি-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তখনই যে তৎসম্পর্কিত কোন চিন্তা বা শব্দ ভুলিয়া যাইব, তাহা ঠিক নয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যাহা একবার ভুলিয়াছি, তাহার পেছনে সুখ বা আনন্দদায়ক কোন ভাবের অস্তিত্ব নাই। অন্যতম প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক Dr. Jung একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

"A Pine-tree stands alone" শীর্ষক একটি কবিতা কোন ব্যক্তি আবৃত্তি করিতে চাহেন। কোন পংক্তির এক বিশেষ অংশে আসিয়া তিনি ঠেকিয়া যান। সেখানে বলিবার ছিল— "with the white sheet" বা 'শাদা কাপড় দিয়া' (ঢাকা)। এই কবিতাটি প্রায় সর্বজনবিদিত ছিল। তাই উহা ভুলিয়া যাওয়া Jung-এর কাছে একটু অসাধারণ বোধ হইল। সেজন্য ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ কথাটিতে তাঁহার মনে কি কি ভাবনার উদয় হয়। তিনি বলিলেন, যথাক্রমে তাঁহার মনে এ-সব চিন্তার উদয় হইতেছে, "শাদা কাপড় কথাটিতে মৃত-দেহের আচ্ছাদক শাদা কাপড়ের কথা মনে হয়—(কিছুক্ষণ নীরবতা)—এখন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা মনে পড়িতেছে—তাঁহার ভাই সম্প্রতি মারা গিয়াছেন—হৃদরোগে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস—মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত মোটা ছিলেন—আমার বন্ধুও খুব মোটা—আমার মনে হইত, তাঁহারও এ কারণে মৃত্যু ঘটিতে পারে—আমার হঠাৎ ভয় হয় এ দুর্ভাগ্য আমার কপালেও ঘটিতে পারে—আমাদের পরিবারের লোক সাধারণতঃ খুব মোটা হয়—আমার ঠাকুর্দা হৃদরোগে মারা গিয়াছিলেন—আমিও একটু বেশী রকম মোটা—সেইজন্য কিছুদিন হইতে চর্বি কমাইবার এক পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছি।" Jung বলেন, এ ভদ্রলোকটি চেতন-মনের অজ্ঞাতে নিজেকে শাদা কাপড় ঢাকা পাইন গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভুলিয়া যাওয়া এই ভয় ও বিষাদের ফল।

Ferenczi নামে একজন মনস্তাত্ত্বিক আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। কোন মহিলা আলোচনা প্রসংগে Dr. Young (Jung) এর নাম স্মরণে অসমর্থ হন। আসল নামের বদলে এ নামগুলি তাঁহার মনে উদিত হয়- Kl (এক ব্যক্তির নাম), ওয়াইল্ড, নীটশে ও হপ্‌ট্‌ম্যান। Kl-এর নামে তাঁহার মনে Mrs. Kl-এর কথা আসে। তাঁহার মতে এই শেষোক্ত ভদ্র-মহিলাটির শরীর বয়সের তুলনায় অনেক ভাল। ওয়াইল্ড ও নীটশের নামে তাঁহার মনে মানসিক ব্যাধির কথা উদিত হয়। ইঁহাদের মতবাদ তিনি বোঝেন না। তিনি শুনিয়াছেন যে, উভয়েই মেয়েলী স্বভাবের পুরুষ ছিলেন। ওয়াইল্ড সর্বদা তরুণের (young) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। এখানে 'young' কথাটি উচ্চারণ করিলেও আসল নাম তাঁহার মনে আসিল না। হপ্‌ট্‌ম্যান কথাটিতে দুটি শব্দ [illegible] —'হাফ্' (আধা) এবং 'ইয়ুথ' (যৌবন) অ[illegible] কথাটির প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা হ[illegible] নাম মনে আসে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যৌবন-বাচ[illegible] তাঁহার অপ্রিয় এবং Jung-এর নাম ভুলিবার ইহাই মূল কা[illegible] মহিলাটি ৩৯ বছর বয়সে স্বামী হারান—সুতরাং দ্বিতী-বার বিবাহ করিবার কোন আশা ছিল না। তাই যৌবন ও জরা সম্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তা সযত্নে এড়াইয়া চলিতেন।

Jung আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। ক খ-কে ভাল-বাসেন। খ বিবাহ করিলেন গ-কে। ক ও গ বহুদিনের পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায়গত সম্পর্ক আছে। বিবাহের পর দেখা গেল ক গ-য়ের নাম বার বার ভুলিয়া যান এবং স্মরণ করাইয়া দিতে অন্য লোকের দরকার হয়। এ বিস্মৃতির মূলে আছে গ-য়ের প্রতি বিদ্বেষ।

ফ্রয়েড একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। কোন ভদ্রলোক বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক ভেনিসে যান। উভয়ে একদিন বেড়াইবার সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। ইঁহার সহিত বিবাহিত ভদ্র-লোকটির সামান্য পরিচয় ছিল। কিন্তু স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া দেখেন যে, তিনি লোকটির নাম ভুলিয়া গিয়াছেন। তথাপি অস্পষ্টভাবে কিছু সম্বোধন করিয়া কৌশলে সে কাজ সারিয়া নিলেন। পরে আর একদিন একা বেড়াইবার সময় লোকটির সঙ্গে দেখা হইলে নাম ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং স্মরণ করাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে লোকটি উত্তর দেন, "আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে, আপনি আমার নাম ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনার ও আমার নাম এক—Lederer." ফ্রয়েডের মতে নিজের নাম ও পরের নামের সাদৃশ্য দেখিলে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তির উদয় হয়। এই বিরক্তি হইতে বিস্মৃতির উৎপত্তি হয়।

কিন্তু দেখা গিয়াছে অনেকের অভিজ্ঞতা ইহার ঠিক বিপরীত। নামের সাদৃশ্যে অনেকেই অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং যে লোকের সঙ্গে এই মিল তাহার নাম জীবনে ভোলেন না। ইহা বিশেষরূপে সত্য হইয়া দাঁড়ায় যখন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামের সঙ্গে নিজ নামের মিল দেখিতে পাই। অবশ্য কু-কার্যের জন্য বিখ্যাত লোকের সঙ্গে নামের সাদৃশ্যে মনে বির-ক্তিরই উদয় হয়। উপন্যাস বা চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা কিম্বা অন্য কোন প্রধান চরিত্রের সঙ্গে নামের মিল হইলেও মনে আনন্দের সৃষ্টি হয়। বাস্তব জীবনে আমরা যে সকল সহজাত প্রবৃত্তির দাবী মিটাইতে পারি না, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার তাঁহার বইয়ের চরিত্রগুলিকে সে দাবী মিটাইবার পূর্ণ সুযোগ দেন। আমরা যখন উপন্যাস পড়ি বা সিনেমা দেখি, তখন তন্ময় নায়ক-নায়িকার সঙ্গে নিজেদের একীভূত করিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তির দাবী পূরণ করিবার দুর্লভ আনন্দ উপভোগ করি। সে আনন্দ দানা বাঁধিয়া ওঠে যখন ঐ চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজের নামগত সাদৃশ্য থাকে, তবে নামের মিলে অনেকে যে বিরক্ত হন ইহাও ঠিক। আত্মমোহে স্বাতন্ত্র্য বায়ুগ্রস্ত যিনি—যে সফলতা বা উন্নতিলাভে নিজে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা যিনি অন্যের মধ্যে দেখিতে চান না—নিজ জীবনের ছোট বড় যে প্রত্যেকটি পাওয়া ও অধিকার তাহার অনুরূপ কিছু অন্যের

মধ্যে দেখিলে যিনি সন্তুষ্ট হন না—জীবনে তীর্থে প্রতিটি মুসাফিরখানায় আগমন ও গমনকে যিনি একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চান, সে-সব পান্থশালায় অন্যের প্রবেশ যাঁহার অভিপ্রেত নয়, জীবনকে বিকশিত করিবার প্রত্যেক ধাপে যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম' হইতে চান, নিজ জীবনের যা কিছু, তাহা অন্যের জীবনে যিনি দেখিতে চান না—পরের মধ্যে নিজের নাম দেখিলে তাঁহার মনে যে বিরক্তি আসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আমরা এ ভুলের রাজত্ব দেখিতে পাই। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, সে-সব বিষয় পড়িতে ভাল লাগে, যাহা আমাদের আনন্দ দান করে, তাহা একবার শিখিলে সহজে ভুলি না। বহুদিন পর্যন্ত উহা মনে থাকে। কিন্তু যাহা পড়িতে আমাদের মনে কৌতূহল, আনন্দ বা তৃপ্তির উদয় হয় না, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যাহা শিখিতে হয়, শিখাটা যেখানে নিজের উপর অত্যাচার এবং অন্য কোন প্রধান চরিত্রের সঙ্গে নামের মিল হইলেও মনে থাকে না। প্রয়োজন (অর্থাৎ পরীক্ষা) ফুরাইলে এবং উহার সহিত একেবারে সংস্রবশূন্য হইলে, তাহা শীঘ্রই বিস্মৃতির ক্রোড়ে বিলীন হয়। ভুলিয়া যাওয়াটা এখানে বিতৃষ্ণা প্রসূত।

কোন লোককে কাহারও বাসস্থানে পাঠান হইল। যাহার কাছে যাইতে হইবে তাহার সহিত হয়ত এ লোকটির সদ্ভাবের কিছু অভাব রহিয়াছে। অথবা যাওয়ার কষ্টটা স্বীকার করিতে সে অনিচ্ছুক। তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইল। কতদূর গিয়া আবিষ্কার করে যে, গলি কিম্বা ঘরের নাম ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ সেখানে যদি তাহার বিশেষ কোন বন্ধু কিম্বা অন্যবিধ আকর্ষণ থাকে, তবে সে কখনই তাহা ভোলে না।

বাজারের নোংরামির প্রতি কাহারও কাহারও অত্যন্ত বিতৃষ্ণা থাকে। এরূপ কোন লোককে যদি জোর করিয়া মাল কিনিতে পাঠান হয় তবে দেখা যায় যে, ভুলে কোন জিনিষ না কিনিয়াই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কাহাকেও দোকান হইতে ঔষধ আনিতে বলা হইল। যিনি আনিতে বলিলেন তাঁহার প্রতি কিম্বা ঔষধ মাত্রের প্রতি হয়ত তাঁহার বিরক্তি। যথাসময়ে দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে ঔষধের নাম ভুলিয়া গিয়াছেন।

কোন বক্তৃতা শোনার কিছুক্ষণ পরে উহার সবটা পুনরাবৃত্তি করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মুখরোচক সমদীর্ঘ কোন গল্প হুবহু না হোক তাহার অনেকটা মনে রাখিতে পারে। পদার্থ বিদ্যায় যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম মুখস্থ করিয়াও মনে রাখা দুষ্কর। কিন্তু হলিউডের নটের তালিকা মুখস্থ না করিয়াও অনেকের নখদর্পণে থাকে। কোন খাদ্যে কোন ভিটামিন কি পরিমাণ তাহা স্মরণ রাখা কঠিন, কিন্তু মহামেডান স্পোর্টিং কোন দিন কাদের সঙ্গে কত গোলে হারিল বা জিতিল তাহা মনে রাখা অনেকের পক্ষে সোজা। প্লেগের বীজাণু আবিষ্কারকের নাম অনেকবার শুনিয়াও মনে থাকে না। কিন্তু উদয়শংকর বা আনা প্যাভলোভার নাম দু' একবার শুনিলেই স্মৃতিতে তাজা থাকে। ইহাদের স্মরণ রাখিতে একটির বেলা যে অন্যটির অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে হয় তাহা মোটেই নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাহা ভুলিয়াছি তাহার পিছনে সুখদায়ক কোন ভাবের অস্তিত্ব নাই, পরন্তু যাহা মনে থাকে তাহা আনন্দদায়ক স্মৃতি বা ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট।

(৩)

মানুষের আর একটি প্রধান অভিজ্ঞতা—কথা বলিতে মাঝে মাঝে ভুল করা। অনেকক্ষণ ধরিয়া বলিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ এক সময় এক শব্দ বলিতে অন্য শব্দ বলিয়া বসিলাম বা আসল শব্দটিকে বিকৃত করিয়া বলিলাম। অথবা কতকগুলি শব্দ বলিতে গিয়া ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি না বলিয়া হয়ত যাহা শেষে আসিবার তাহা আগে এবং যাহা আগে আসিবার তাহা শেষে বলিয়া ফেলিলাম। কথা বলিতে এই যে ছোটখাট ভুল, ইহারও উৎপত্তির মূলে পূর্ব্ববর্ণিত ভুলগুলির মতই সুনির্দ্দিষ্ট কারণ বর্ত্তমান। লোক বিশেষে যে এ ভুল সীমাবদ্ধ তাহা নয়। মুখচোরা লোক যেমন এসব ভুল করেন, অত্যন্ত বাচাল কিম্বা কথাবার্ত্তায় চটপটে লোকও ইহাদের হাত হইতে রেহাই পান না। বড় বড় বাগ্মীদেরও দেখা যায় হঠাৎ মাঝখানে একটি কথা ভুল করিয়া ফেলেন এবং পর মুহূর্ত্তে আবার শোধরাইয়া নেন। মনে যে প্রতিক্রিয়ার দরুন কথার ভুল হয় ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহার মূলে দুটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে চিন্তাটিকে ভাষায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া ভুল করিয়া বসি তাহার আগে যে চিন্তাটি আসিয়া গিয়াছে কিম্বা পশ্চাৎ যে চিন্তাটি আসিবে—এ দুটির একটি পূর্ব্বোক্ত চিন্তাটির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অথবা ঐ বাক্য বা সমগ্র কথোপকথনটির কোন অংশ যদি পরে যাহা বলিতে চাই তাহার বিরোধী-ভাবাপন্ন হয় তবে আমরা শেষেরটির বেলায় ভুল করিয়া বসি।* আবার স্থল বিশেষে যে চিন্তার সঙ্গে আমাদের কথোপকথনের কোন সম্বন্ধই নাই এবং যাহা প্রকাশ করিতে আমরা অনিচ্ছুক এরূপ কোন চিন্তা আসিয়া বাধা দেওয়ার দরুন একই ফল প্রসূত হইতে পারে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

অষ্ট্রিয়ার কোন পরিষদের নূতন সেসন আরম্ভ হইলে উহার প্রেসিডেণ্ট সেসন আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষণা করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, সেসন শেষ হইল। ফলে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে কিঞ্চিৎ আমোদের সঞ্চার হয় এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পর নিজেকে সংশোধন করেন। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়, সেসন বন্ধ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টের মনে গোপন ইচ্ছা ছিল। এই পরিষদ হইতে তিনি বিশেষ কোন সুফলের আশা করিতেন না। বক্তৃতার মধ্য দিয়া লুকান চিন্তাটি তাঁহার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

কোন চিকিৎসক এক ব্যক্তির রক্তের চাপ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, "আপনার বয়স কত?" অথচ বলিলেন, "আপনার ব্লাডপ্রেশার কত?" ইতি-

---

*Freud—Psychopathology of every-day life (P. 51).

পূর্বে উভয়ের আলোচনার মধ্যে ব্লাডপ্রেসার কথাটি বহুবার আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বয়স সম্বন্ধীয় চিন্তার আগে মনে যে ব্লাডপ্রেসার সম্বন্ধীয় চিন্তার উদয় হয় তাহাই পূর্বোক্ত চিন্তাটিকে ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃতির কক্ষে ঠেলিয়া দিয়া নিজে সে স্থান গ্রহণ করে।

ফ্রয়েড একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। ভিয়েনায় এনাটমির কোন অধ্যাপক নাসিকার গঠন সম্বন্ধে ছাত্রদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বুঝিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রেরা হাঁ বাচক উত্তর দেয়। ইহাতে অধ্যাপকটি (ইনি আত্মচেতনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন) বলেন, "আমার তাহা মোটেই বিশ্বাস হয় না। কারণ ভিয়েনার মত লক্ষাধিক জনপূর্ণ শহরে নাসিকার গঠন বুঝিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা এক আঙুলে গণনা করা যায়।" শেষে আবার বললেন, "ক্ষমা করিবেন, আমি এক হাতের পাঁচ আঙুল বলিতে চাহিয়াছিলাম।" ইহাতে দেখা যায় প্রথম তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার আসল মনোভাবের পরিচায়ক। নিজের অগোচরে পরোক্ষে তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে, ধরিতে গেলে একমাত্র তিনিই নাসিকার গঠন বোঝেন।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন লোককে সম্বোধন করিতে গিয়া আমরা তাহাদের নাম ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিকৃত করিয়া ফেলি। ইহার অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, আমরা তাহাদের সম্বন্ধে মনে তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করি, কেহ যদি আমাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন, তবে তাহার নাম কখনও ভুলি না কিংবা ভুল উচ্চারণ করি না। আমরা নিশ্চিত করিয়া জানি যে, এই বিকৃতি ইচ্ছাকৃত নয় এবং আমাদের বিরুদ্ধে যদি অন্য পক্ষ হইতে তাহাদিগকে তুচ্ছ করিবার অভিযোগ আনীত হয় তবে উহা জোর গলায় অস্বীকার করি। কিন্তু ওপক্ষ বেশ বোঝেন এবং ঠিকই ধরিতে পারেন যে তাঁহাদের নামের সঠিক উচ্চারণে শৈথিল্য অপর পক্ষের তাঁহাকে তুচ্ছ করার লক্ষণ। নাম ভুলিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেও এই কারণই বর্তমান এবং ইহারই ফলে দুই পক্ষের মধ্যে সদ্ভাবের অবসান হয়।

(৪)

লিখিতে ও পড়িতে আমাদের যে মাঝে মাঝে ভুল হয়, তাহার পশ্চাতে বলিবার ভুলের অনুরূপ কারণই রহিয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে ক্রস-ওয়ার্ড নিয়া একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে 'চলে হবে না, মলে বলে' এই বাক্যে 'চলের' বদলে 'মলে' পড়া হয়। ইহাতে মনে হয় মৃত্যু সম্বন্ধীয় কোন চিন্তা আমিরা বাধা দেওয়াতে পড়িবার এরূপ ভ্রান্তি জন্মে। বস্তুত সেদিনের কথাবার্তার মধ্যে একবার মরণ কিংবা তৎসম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

Bleuler নামে একজন মনস্তাত্ত্বিক বলিতেছেন, "একবার পড়িবার সময় কেমন যেন মনে হয় যে, দুলাইন নীচে যেন আমার নাম দেখিতেছি। ঐ জায়গায় দৃষ্টিপাত করিতে আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম যে, তথায় লেখা রহিয়াছে ব্লাড-করপাসল্ (রক্ত-কণিকা)।......যাহা হউক এক্ষেত্রে ভ্রমের কারণ আমি সহজেই বুঝিতে পারি। আমি তখন যাহা পড়িতে-ছিলাম। তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষকদিগের খারাপ ফাইল সম্পর্কে কোন বিবৃতির শেষাংশ। এই দোষ হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত নহি।' ঐ বিবৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার প্রতিও প্রয়োগ করা হইতেছে—এই চিন্তা মনে সর্বক্ষণ থাকাতে ওখানে তাঁহার নাম দেখিতেছেন বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

লিখিবার বেলাও একই কারণে ভুল হয়। ফ্রয়েডের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। একবার কোন ছুটি উপভোগ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। তখন তিনি যে-কোন পরিমাণ ব্যবসায়গত কাজের জন্য নিজেকে সক্ষম বোধ করিতেছিলেন। এমন সময় কোন রোগিণী হইতে তিনি একখানা চিঠি পান। উহাতে অক্টোবর কুড়ি তারিখে ঐ রোগিণীর ফ্রয়েডের নিকট আসিবার কথা ছিল এবং তিনি উহা একখানি ছোট কাগজে টুকিয়া রাখেন। কিন্তু আর একদিন কাগজখানি পড়িতে গিয়া তিনি দেখেন যে, মাসের কোঠায় তিনি অক্টোবরের জায়গায় সেপ্টেম্বর লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় একমাস দেরী না করিয়া মহিলাটি তখনই চিকিৎসার জন্য আসেন, ফ্রয়েডের মনে এরূপ একটা ইচ্ছা ছিল। বস্তুত এরূপ উদ্যম নিয়া বিনা কাজে একমাস কাটাইতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তাই নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি তারিখ একমাস আগাইয়া দিলেন।

জনৈক ছাত্র কোন জানুয়ারী মাসে খাতায় তারিখ দিতে গিয়া সে সালের বদলে তাহার পূর্ববর্তী সাল লিখেন, ঐ ছাত্রের মতে উহার কারণ এই যে, তখনও আগের বছরে আছেন বলিয়া তাঁহার যেন মনে হইতেছিল। নূতন একাডেমিক বৎসর আরম্ভ না হইলে, পরীক্ষা হইয়া না গেলে তাঁহার মনে একটি অনুভূতি থাকিত যে, নূতন বৎসর এখনও আসে নাই। এই অনুভূতিই চেতন মনের অগোচরে তাঁহার লিখিবার ভুল ঘটাইল।

(৫)

এযাবৎ যত ভুলের বর্ণনা করা হইল তাহাদের অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় ঘটে এরূপ দুই শ্রেণীর ভুলের আলোচনা করা যাক। কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে বা অভিজ্ঞতা জন্মে, ক্ষেত্র বিশেষে তাহা স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিতে আমরা অসমর্থ হই। কোন সময় যদি কিছু করিব বলিয়া স্থির করি তাহাও মাঝে মাঝে ভুলিয়া বসি। শুধু তাহাই নয়। প্রতিদিন যাহা করিতে হয় কোন কোন দিন তাহারও কিছু কিছু বাদ পড়িয়া যায়। সংকল্প এবং অভিজ্ঞতার এই যে বিস্মৃতি, ইহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রে একই কারণ নির্ণীত হইয়াছে। অসন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া এই ভুলের উৎপত্তি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

অনেকক্ষণ বসিয়া লিখিতেছি। একবার গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া দু-চার পা হাঁটিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি কলম পাওয়া যাইতেছে না। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সাত আট হাত দূরে বারান্দার রেলিংএর উপর পাওয়া গেল। নিজের হাতে কলমটি রাখিয়া আসিলেও মনে নাই। বেশীক্ষণ লিখিতে লিখিতে যে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে এ ভুল তাহারই অভিব্যক্তি।

কোন হোষ্টেলে একজন ছাত্র কলেজে যাইবার উদ্দেশ্যে

সাজগোজ করিয়া খাতা-বই নিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে উদ্যত হন। এমন সময় নিকটবর্ত্তী অন্য একজন ছাত্রের কামরায় সমবেত কয়েকটি কণ্ঠের সোৎসাহ কাকলী শুনিতে পান। তখনও প্রচুর সময় ছিল বলিয়া তিনিও সেখানে গিয়া অতি রুচিকর এক তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া নির্দ্ধারিত ঘটিকার আর দুয়েক মিনিট মাত্র অবশিষ্ট থাকে। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ায় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সাইকেলে কলেজের দিকে ছোটেন। লেকচার রুমের কাছে আসিয়া দেখেন যে সাইকেলে চড়িবার সময় তর্কস্থলে টেবিলের উপর হইতে বইপত্র আনা হয় নাই। কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন কাজে যাইতে হইলে মনে বিরক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই বিরক্তিই ভুলের জনক।

বিলাতের Dr. Brill একটি দৃষ্টান্ত দেন। কোন ভদ্রলোক এক সামাজিক অনুষ্ঠানে যাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন। ঐ অনুষ্ঠানটির প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সম্মত হইয়া তিনি ট্রাঙ্ক খুলিয়া সুট বাহির করিতে গিয়া হঠাৎ ভাবিলেন যে তাঁহার কামাইতে হইবে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া তিনি সুটটা আনিতে গিয়া দেখেন যে ট্রাঙ্ক তালা বন্ধ। অনেকক্ষণ সাবধানে তালাস করিয়াও চাবি পাওয়া গেল না। সেদিন রবিবার থাকায় তালা-চাবি ইত্যাদি মেরামত করিবার কোন লোকও পাওয়া গেল না। সুতরাং দুঃখের সহিত তাঁহাদের যাওয়া বন্ধ করিতে হইল। পরদিন প্রাতে ট্রাঙ্ক খোলা হইলে দেখা গেল চাবিটি ভিতরে পড়িয়া আছে। ভদ্রলোকটি চাবি ভিতরে ফেলিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, এ ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং তাঁহার চেতনার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অনুষ্ঠানে যাইবার অনিচ্ছাই তাঁহার চাবি হারাইবার মূলে।

একবার কোন ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয়ের কাছে টাকা পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখেন। কিন্তু খামের উপর ঠিকানা না লিখিয়াই তিনি উহা ডাকে দেন। চিঠিতে তাঁহার নিজের ঠিকানা থাকায় দুদিন পরে উহা ফিরিয়া আসে। পরে বুঝা গেল টাকার জন্য চিঠি লেখা তাঁহার পক্ষে অপ্রীতিকর কাজ। উক্ত আত্মীয়ের অবস্থা স্বচ্ছল নহে বলিয়া তিনি প্রতিবারই যথাসম্ভব কম টাকার জন্য লিখিতেন এবং যখনই লিখিতেন তখনই একটি চিন্তা তাঁহার মন অধিকার করিয়া থাকিত যে টাকার জন্য লিখিয়া ঐ আত্মীয়কে তিনি অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বাধ্য করিতেছেন। এই চিন্তাই ঠিকানাহীন চিঠি পোষ্ট করার মূলে।

একজন ছাত্র সব সময় চাবি হারাইয়া ফেলিতেন। হারাইলে ছাত্রাবাসে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরা খোলা মুস্কিল হইয়া পড়িত। ইহাতে বোঝা যায় সেখানে থাকার প্রতি তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। সেজন্য নিজের অগোচরে প্রায়ই চাবি হারান রূপ এমন একটি কাজ করিয়া বসিতেন যাহাতে তাঁহার ওখানে ঢোকা না হয়। বস্তুতঃ তিনি নিজেই স্বীকার করিতেন যে, হোষ্টেল জীবনের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে।

অনেক সময় আমরা কোন জিনিষ কিনিয়া পয়সা না দিয়াই ফিরিতে পা বাড়াই। লাইব্রেরী কিংবা অন্য কাহারও নিকট হইতে বই ধার করিয়া ফেরৎ দিতে বার বার ভুলিয়া যাই। Brill বলেন, "নিজেদের চেক অপেক্ষা দোকানের বিল হারাইবার সম্ভাবনাই আমাদের বেশী।" কোন জিনিষ নিজের হাতছাড়া না করিবার যে মনোবৃত্তি, ফ্রয়েডের মতে তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মধ্যে সামনের প্রত্যেক জিনিষ (মুখে পুরিবার উদ্দেশ্যে) দখল করিবার যে আদিম প্রবৃত্তি তাহারই অবশিষ্ট অংশ। অত্যন্ত সভ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যেও ইহার রেশ থাকিয়া যায়। অন্যকে দিবার এই যে অনিচ্ছা, ইহাই পরোক্ষে উক্ত বিস্মৃতির সৃষ্টি করে।

পূর্ব্ববর্ণিত ভুলগুলি অপেক্ষা এই দুই প্রকারের ভুলই আমাদের বাস্তব জীবনে অধিকতর ক্ষতিকর। সঙ্কল্পের বিস্মৃতি জীবনে সফলতার পরিপন্থী। যাহা করিব বলিয়া নিজে স্থির করি কিম্বা পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করি, ইচ্ছা থাকিলেও এই ভুলের আধিপত্যে তাহা আমাদের মনে যথাসময়ে চাপা থাকে। ইহার ফলে আমরা নিজের উপরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি এবং পরের কাছে আমাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করি। সেরূপ অভিজ্ঞতার বিস্মৃতিতেও অনুরূপ ফল প্রসূত হয়। কোন কিছু শুনিয়া, দেখিয়া বা পড়িয়া মনে যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা অন্যকে বলিতে গিয়া ভুলিয়া বসি এবং পরের নিকট অপ্রতিভ হই। অথবা সে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া যদি কোন কাজের সঙ্কল্প করি তবে উপযুক্ত মুহূর্ত্তে সে অভিজ্ঞতার কথা হয়ত মনেই থাকে না এবং সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যায়। এই ভুলের দৌলতে আমরা অপরের নিকট হইতে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন', 'অকর্ম্মণ্য', 'জড়-বুদ্ধি' এবং তদ্রূপ আরও বহু আখ্যা লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা নিশ্চিতই জানি যে, এই দোষগুলির কোনটিই আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। ইহার জন্য স্মৃতিশক্তিকে যত দায়ী করা হয় ততটা দোষারোপও তাহার প্রাপ্য নয়। প্রতিবারই যখন বিফল হই তখন মস্তকে করাঘাত করিয়া স্মৃতিশক্তির অপটুতাকে অভিশাপ দেই এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে, আগামীবার বিস্মৃতিরূপ এই ব্যাধিকে গায়ের কাছে ঘেঁসিতেই দিব না। কিন্তু তার পরের বার যখন সে কাজের সময় আসে তখন নির্ব্বিকার চিত্তে অন্য কাজ কিংবা চিন্তা নিয়া মগ্ন থাকি এবং উপযুক্ত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তারপর স্মরণ হয়। এমনও দেখা যায় যে, দুপুরে কোন কাজ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। সকালে উহা মনে রাখিবার উদ্দেশ্যে বহুবার জপ-মন্ত্রের মত স্মরণ করিলাম। দুপুরে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া চেতন মন হইতে বিদায় লইল। আসলে নিজ মনের উপর কর্ত্তৃত্ব যত ভাবি ঠিক ততটা আমাদের হাতে নাই। চেতনার অজ্ঞাতসারে আমরা এমন বহু কাজ করি যাহার প্রতি শেষে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে বিরক্তিতে এবং লজ্জায় অভিভূত হই। মনে রাখিতে চেষ্টা করিলেই এ ব্যাধির উপশম হয় না। মনোবিজ্ঞানবিদদের মতে অবচেতনের অন্তরালে যে অসন্তুষ্টি, বিরাগ বা বিষাদের বহিঃপ্রকাশরূপে এ সকল ভুলের উৎপত্তি, সে মনোভাবের অপসারণের চেষ্টাই আমাদিগকে বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

জাপানের অভিযান

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

চীন-জাপান যুদ্ধের বাইশ মাস গত হইয়াছে। জাপানই প্রথমে গিয়া চীনকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের অসীম ক্ষুধা লইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল; সুতরাং গত বাইশ মাসের মধ্যে তাহাদের ক্ষুধা কতটা মিটিয়াছে এবং অন্য দিকেও তাহাদের সাম্রাজ্য লিপ্সা বাড়িয়াছে কিনা তাহা দেখিবার এখন সময় হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই রুশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জাপান নিজ শক্তির সম্যক পরিচয় পাইয়াছিল। শক্তি চায় বিস্তার, সে নিজের সীমার মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে চায় না। তাই তখন হইতেই সাম্রাজ্যলাভের ইচ্ছা তাহার বলবতী হইল। ইচ্ছাকে সফল করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, জাপান তখন সেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ইহার জন্য প্রথমেই আবশ্যক অর্থের। অর্থাভাব দূর করিবার জন্য সে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিল। জাপান গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক বহু টাকা বৃত্তি দিয়া যুবকগণকে ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা শিল্প শিক্ষা করিতে পাঠাইল। বস্ত্র, কাগজ, দেশলাই, সূচ, সূতা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ ও প্রসাধন সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কলকব্জা মেশিনারী পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় বিভিন্ন দেশ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া তাহারা দলে দলে দেশে ফিরিতে লাগিল। এই বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে জাপানী ধনিকেরা বিভিন্ন যৌথ কারবার খুলিয়া বাণিজ্য প্রসারে সচেষ্ট হইল এবং জাপান গবর্ণমেণ্টও নানা-ভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া জাপানী পণ্যদ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহাতে বাজার দখল করিতে পারে, তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিল। পৃথিবীর বাজার দখল করিবার প্রধান উপায় অন্যান্য দেশজাত পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা সস্তায় জাপানী পণ্য বিক্রয় করা। সস্তায় বিক্রয় করিবার উপায়— অল্প ব্যয়ে যাহাতে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং মালিকরা যাহাতে বেশী লাভ না লয়। জাপানী মজুর যেমন পরিশ্রমী, তেমনি দক্ষ এবং তাহাদের পারিশ্রমিকও খুব অল্প। সুতরাং জাপানী পণ্য অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই অল্প খরচে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই দিক দিয়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশই জাপানের সমকক্ষ হইতে পারিল না। জাপান গবর্ণমেণ্টও বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যবসায়ী মালিকদের পণ্যদ্রব্যের লাভের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়া দিল। এইরূপে সস্তা জাপানী মালে পৃথিবী ছাইয়া গেল; বিশেষত চীন, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বাজারে তাহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এমন কি বাণিজ্য-প্রধান ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও আমেরিকাতেও জাপানী পণ্যের চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল। তাহার কারণ, ঐ সব দেশে শ্রমিকদের বেতন এত বেশী এবং তজ্জন্য শিল্প-পণ্য উৎপন্ন করিতে এত অধিক খরচ পড়ে যে, অনেক জাপানী পণ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। অন্য পক্ষে জাপানী পণ্য এত কম খরচে উৎপন্ন হয় যে, বাণিজ্য-শুল্ক দিয়াও সেই সব দেশে তাহা সস্তা দরে বিক্রীত হইতে পারে। এইভাবে বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা জাপান অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত ধনী হইয়া উঠিল এবং স্থায়ীভাবে তাহার অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া লইল। [illegible] তাহারা সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ কা[illegible]-সংখ্যা বাড়াইল, আধুনিক সমরোপকরণ প্রচুর পরিমাণে প্র[illegible]রিতে লাগিল এবং বিশেষ করিয়া নৌ-শক্তি বৃদ্ধির দিকে [illegible]হারা অধিক মনোনিবেশ করিল। বৃটেনের মত জাপানও সমুদ্র পরিবেষ্টিত দ্বীপ। সুতরাং আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের জন্য নৌ-শক্তিই তাহার প্রধান সহায়। সেজন্য বিবিধ প্রকারের অসংখ্য যুদ্ধপোত নির্ম্মাণ করিয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে তাহা সুসজ্জিত করিল। যুদ্ধ-বিমানপোত নির্ম্মাণের দিকেও সে নজর দিল এবং তাহাতেও ইউরোপের অন্যান্য অগ্রণী রাষ্ট্র-সমূহের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিল। এইরূপে জাপান যখন ধনসম্পদে ও সামরিক শক্তিতে এশিয়ার মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপের শক্তিশালী দেশসমূহের সহিত নিজেকে সমকক্ষ মনে করিল, তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সে সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথম হইতেই তাহার দৃষ্টি ছিল চীনের উপর। বিরাট দেশ, অপর্য্যাপ্ত ধন-সম্পত্তি, প্রচুর খনিজ-দ্রব্য, দূরত্বও অল্প—সুতরাং চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। চীন অধিকার করিলে সেখানে সে উপনিবেশ স্থাপন এবং বাণিজ্যের বাজারও একচেটিয়া করিতে পারে। তাহা ছাড়া, চীনের সাম-রিক দুর্ব্বলতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরস্পর বিরো-ধিতা জাপানকে চীন অধিকারে আগ্রহান্বিত করিল। ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে সে মাঞ্চুরিয়ার সহিত নানা অছিলায় একটি কলহের সৃষ্টি করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠাইল এবং অল্পায়াসে ও অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিয়া লইল। মাঞ্চুরিয়া পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধি-শালী দেশ, তাহার শস্যক্ষেত্রও অতিশয় উর্ব্বর, সেখানে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়া সোয়াবীন নামে অন্য এক প্রকার শস্যও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মাঞ্চুরিয়ায় প্রস্তুত সাবান, এনামেল, বার্ণিস, ছাপার কালি প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের পৃথিবীর বাজারে চাহিদা আছে। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তাহার বিরাট শস্যক্ষেত্র ও বাণিজ্য-সম্পদ জাপানের হাতে আসিল। মাঞ্চুরিয়াকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মুঠার মধ্যে রাখিয়া জাপান তাহার মাঞ্চুকুও নাম দিয়া সেখানে একটা নামেমাত্র স্বরাষ্ট্র-শাসনের প্রবর্ত্তন করিল। ইহার তিন চার বৎসর পরই মূল চীনের উপর সে হানা দিল। তাহার কারণ জাপানকে এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইলে চীনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট বন্দর, গম, যব, ভুট্টা, ধান্য, কার্পাস, চা, আফিং প্রভৃতি উৎপাদক শস্য-ক্ষেত্র এবং কয়লা, লৌহ ও তাম্রের খনিগুলি তাহার একান্ত আবশ্যক। জাপান ভাবিয়াছিল কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র চীন তাহার অধিকারে আসিবে। চীন তখন বিশেষ প্রস্তুত না থাকিলেও সাহসিকতার সহিত তাহার স্বাধীনতা রক্ষার্থে অগ্রসর হইল, কিন্তু অসংখ্য জীবন বলি দিয়াও জাপানের অগ্রগমনে বাধা দিতে পারিল না, বন্দর ও নগরগুলি একে একে সে ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাপানের প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ড গতিতে বাধা দিতে অসমর্থ হইবার কারণ এই যে, তখন আধুনিক সমরোপ-

করণ চীনের বিশেষ কিছুই ছিল না। চীনা সৈন্যরাও আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী বিশেষ কিছুই জানিত না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চীন জাপানের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামিয়াছিল। ফলে—প্রায় প্রত্যেক সমর-ক্ষেত্র হইতেই চীন পিছু হটিতে থাকিল এবং তাহাদের সহস্র সহস্র হতাহত সৈন্যের উপর দিয়া জাপান দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে চীনের সমুদ্র বন্দরগুলি, রাজধানীর সহিত কতিপয় বাণিজ্যপ্রধান নগর, তাহার বিরাট শস্যক্ষেত্রের অনেকখানি অংশ এবং কতকগুলি কয়লা ও লৌহের খনি জাপানের হাতে আসিয়া পড়িল। ইহাতে জাপান যথেষ্ট লাভবান হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু চীনকে ভীত ও সম্পূর্ণ পরাস্ত করিতে পারিল না। চীন গবর্ণমেণ্ট তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া আরও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে সরিয়া গেল। সেখানে সরিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া চীন গবর্ণমেণ্ট ভাবিবার সময় পাইল এবং চীনের যে অংশ জাপানের হাতে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য অবিলম্বে তাহার যুদ্ধনীতি ও রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিল। সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা জাপানী সৈন্যকে খণ্ড খণ্ডভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের যে কিছু কিছু মনোমালিন্য ছিল, তাহা মিটাইয়া ফেলিল। তাহাতে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া গেল। সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য নানারূপ সাহায্য পাইয়া, অতর্কিত আক্রমণে জাপানী সৈন্যকে তাহারা বিপর্য্যস্ত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল এবং তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া জাপানী সৈন্য ক্রমেই পিছু হটিতে লাগিল। এইরূপে গত কয়েক মাসের মধ্যে চীনা গরিলা সৈন্য আনহুয়েই-এর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং হুপেই-এর উত্তর দিকে প্রায় দুই শত মাইল ভূমি জাপানী সৈন্যের হাত হইতে পুনরায় কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। চীনের যুদ্ধ-বিমানপোতের অত্যন্ত অভাব ছিল, সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে কিছু আনাইয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার নিকট হইতে কয়েক শত ক্রয় করিয়া সে অভাবও অনেকটা সে পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বন্দরগুলি জাপান অধিকার করিয়া লওয়ায় অস্ত্র আমদানির পক্ষে চীনের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। তাই তাহারা রুশিয়া হইতে সমুদ্র-পথে রেঙ্গুনের মধ্য দিয়া চীনের ইউনান প্রদেশে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাইতেছে। চীনকে এইভাবে সাহায্য করিবার রুশিয়া ও বৃটেনের উভয়েরই নিজ নিজ স্বার্থ আছে। সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ—চীন তাহার হাতে থাকিলে এশিয়ার দিক হইতে জাপান তাহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং বৃটেনের স্বার্থ—চীন শক্তিশালী হইলে ও স্থলভাগে জাপানকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিলে জলপথে জাপান হইতে ভারত সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন ভয় বা আশংকার কারণ থাকিবে না।

বৃটেনের আশংকা নিতান্ত অমূলকও নহে, কারণ কিছুদিন হইতে সমুদ্র-পথে জাপানের চাল-চলন বড়ই সন্দেহপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৩৯) দক্ষিণ চীন সমুদ্রে হাইনান দ্বীপ ও প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ এবং মার্চ্চ মাসে স্প্র্যাট্‌লে ও আম্বোইনা দ্বীপপুঞ্জ সে অধিকার করিয়াছে। ফর্মোসা তো তাহার আছেই। ফর্মোসা সিঙ্গাপুরের নিরাপত্তার পক্ষে একেই আশঙ্কাজনক ছিল, তাহার উপর জাপান হাইনান অধিকার করায় হানোয় হইতে সায়গান পর্য্যন্ত সমগ্র ইন্দো-চীন উপকূলে ভয়ের কারণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ইহা যেমন এক দিকের কথা, অন্য দিকে হাইনানের সহিত প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জও জাপানের হস্তগত হওয়ায় সিঙ্গাপুর, হংকং সমুদ্র-পথ এবং স্প্র্যাট্‌লে ও আম্বোইনা অধিকৃত হওয়ায় সিঙ্গাপুর, ম্যানিলা জলপথ অতীব বিপজ্জনক হইল। যে কোন সময়ে জাপান এই সব পথে বৃটেনের বাণিজ্য-পোতের গতি রোধ করিয়া দিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া, এই দ্বীপগুলি অধিকার করায় চীনসমুদ্রে জাপানের নৌ-শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহাতে ভারত সম্বন্ধে বৃটেনের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। স্প্র্যাট্‌লে ও প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জে জাপান সাবমেরিন্ ও যুদ্ধ-বিমানপোতের ঘাঁটি তৈয়ার করিতেছে এবং হাইনান দ্বীপেও বিরাট জলযুদ্ধ ও আকাশ-যুদ্ধের উপকরণ সন্নিবেশিত হইতেছে। কলিকাতা হইতে করাচী যত দূর আকাশ-পথে হাইনান হইতে কলিকাতা প্রায় ততদূর, রেঙ্গুন—হাইনান ও কলিকাতার প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থান। সুতরাং আকাশ-পথে জাপান হইতে ব্রহ্ম ও বঙ্গদেশের যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে। জলপথেও সে আশংকা নিতান্ত কম নহে। ভারতীয় নৌ-বহরে আঠারখানি মামুলি যুদ্ধ-জাহাজ আছে, কিন্তু একখানিও ক্রুজার বা সাবমেরিন্ নাই। ভারতীয় আকাশ-বাহিনীও নগণ্য, ইহার শক্তি মাত্র দুইশত এরোপ্লেন। যদি বৃটেনের সহিত জার্ম্মানী ও ইটালীর যুদ্ধ বাধে এবং জাপান যদি তাহাদের পক্ষে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগর পার হইয়া বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার্থ যুদ্ধ-জাহাজ পাঠান বৃটেনের পক্ষে অসম্ভব। লিবিয়া ও আবিসিনিয়ার ইটালীয় বিমানপোতের ঘাঁটি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বৃটিশ বিমানপোতের ভারতের সাহায্যার্থে আসাও সুদূরপরাহত। সুতরাং ১৯৩৯ সালের প্রথমভাগে চীনসমুদ্রে জাপান কর্ত্তৃক জলযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঐ কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করায় চীনের যত না ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে বৃটেনের। চীনসমুদ্র-পথে তাহার বাণিজ্য ও ভারত সাম্রাজ্য উভয়েরই নিরাপত্তার জন্য বৃটেনের মন শংকাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চীনসমুদ্রে জাপানের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার দৌরাত্ম্যও বাড়িয়াছে, সে যখন তখন যে কোন শক্তির জাহাজের উপর গোলা ছুড়িতেছে। এই উপদ্রব বন্ধ করিবার জন্য এবং প্রধানত জাপানের মনোভাব বুঝিবার জন্য বৃটেন—ফ্রান্স ও আমেরিকাকে দলে লইয়া জাপান নৌ-বিভাগের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল, আরম্ভের প্রায় সংগে সংগেই তাহা ভঙ্গ হইয়াছে। জাপানের নৌ-সৈন্যকে কুলাংশু অবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তাহারা যে সর্ত্ত দিয়াছিল, জাপান তাহাতে রাজী হয় নাই (২৫শে মে)। সুতরাং দেখা যাইতেছে চীনসমুদ্রে জাপান এতটা শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে যে ত্রি-শক্তির আদেশ অগ্রাহ্য করিবারও সে সাহস রাখে। অন্যান্য

বিষয়েও বৃটেনের সহিত জাপানের মনোমালিন্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১১ই জুনের সংবাদে প্রকাশ—বৃটেনের সহিত সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র ছিন্ন করিবার জন্য ইয়াকোহামা স্পেসী ব্যাঙ্ক ও চাইনিজ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকএর ব্রাঞ্চ অফিস তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা হইতে জাপ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং শুল্ক বিভাগের অফিসও স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জাপ-অধিবাসীরাও তাহাদের কারবার অনুরূপভাবে বৃটিশ অঞ্চল হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হইলেই সাধারণত এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। অচিরেই জাপানের সহিত বৃটেনের যুদ্ধ বাধিবে কিনা, তাহা বলা যায় না। তাহাদের উভয়ের সংঘর্ষ অনেকটা ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিতেছে। ইউরোপে যদি রণদামামা বাজিয়া উঠে তবে এশিয়ায় জাপানও তাহার একাংশ গ্রহণ করিবে এবং অবিলম্বে ইন্দো-চীন ও ভারতবর্ষের উপর হানা দিবে।

তখন ভারতবর্ষের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইবে, তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী এবং বড় বড় নদীর মোহানায় ও নদীতীরে যে সমস্ত বন্দর ও বাণিজ্য-প্রধান নগর আছে, তাহা যুদ্ধ-জাহাজ হইতে অনলবর্ষী কামানের গোলা ও যুদ্ধ-বিমানপোত হইতে বোমার আঘাতে প্রথমেই ধ্বংস হইবে। ভারতবর্ষে বৃটেন তাহার আঠারখানি পুরাতন যুদ্ধ-জাহাজ ও দুইশত এরোপ্লেন লইয়া কখনই জাপানকে বাধা দিতে পারিবে না। তারপর, আবিসিনিয়া হইতে ইটালীয় বিমানবাহিনী যদি ভারতের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করে, যাহা করিবেই, তবে তো কথাই নাই। পল্লী-অঞ্চলগুলি হয়ত রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের প্রধান প্রধান জনপদসমূহের অধিকাংশই বিনষ্ট হইবে,—নিঃসন্দেহ। আজ জাপান কর্ত্তৃক চীনের যে অবস্থা, ভারতের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় হইবে। চীনের সৈন্য-সংখ্যা যথেষ্ট; এ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণই দিয়াছে এবং সাড়ে তের লক্ষ আহত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য একত্র করিয়া মোট সংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ বাট হাজার। চীনের যত এরোপ্লেন ও যে পরিমাণ সমরোপকরণ আছে, ভারতবর্ষে বৃটেনের তাহা নাই। ভারবাসীরাও নিরস্ত্র। সুতরাং জাপানের আক্রমণ অত্যাচার হইতে দেশ ও আত্মীয়-পরিজন রক্ষা করিবার তাহাদের কোন উপায়ই নাই। একটা বিজিত জাতি যখন কোন অধিকৃত দেশে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন নগর ও পল্লীবাসী নর-নারীর উপর তাহারা কিরূপ বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করে, তাহা জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত চীনের কোন কোন অঞ্চলের প্রকাশিত সংবাদ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার জন্যও ভারতীয়দের প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ তাহারা নিরুপায়।

জাপান হইতে যে ভারতবর্ষের ভয় আছে, তাহা কিছুকাল হইতেই শোনা যাইতেছে, কোন কোন খ্যাতনামা বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ ও রণনীতিজ্ঞ এই ভয় করিয়াছেন। তথাপি বৃটেন কেন যে এতদিন ভারত রক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করে নাই, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। বোধ হয় ভারত রক্ষার জন্য যে প্রভূত সৈন্যবল আবশ্যক শুধু বৃটেনের নিজস্ব সৈন্য দিয়া তাহা পূরণ হয় না এবং সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতীয় সৈন্যকেও তাহারা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে বৃটিশ ভারতের সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য ছিল দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার, বিদ্রোহের পর হইতে ক্রমে হ্রাস করিয়া এখন ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা মাত্র এক লক্ষ তিরানব্বই হাজারে দাঁড় করান হইয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি অবিশ্বাসই ইহার কারণ। এইরূপ অবিশ্বাস করিয়া বৃটেন নিজেই দুর্ব্বল হইয়াছে এবং এখন ইহার ফলভোগ করিবার তাহার সময় আসিয়াছে। শুধু যে তাহারাই ফল ভোগ করিবে তাহা নহে, তাহাদের ভুলের জন্য ভারতীয়দেরও অনেক দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে—তাই আমাদের মন আজ শংকাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, জাপানের অভিযান একমাত্র চীনের বিরুদ্ধে বলিয়াই প্রথমে সকলের মনে হইয়াছিল, কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সমুদ্র-পথে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে সহজেই সন্দেহ হয়, ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধেও জাপান-অভিযানের সম্ভাবনা আছে। ইহা শুধু রাজনৈতিক কল্পনা-বিলাস বা প্রবন্ধ লিখিবার বিষয় নহে, ইহাতে ভারতবাসীর জীবন-মরণের প্রশ্ন রহিয়াছে। বোধ হয় সে প্রশ্ন এখনও ভারতবাসীর মনে তেমন করিয়া উঠে নাই। উঠিলেও তাহা সমাধানের উপায়—যদিও ভারতীয়দের নিজের হাতে নাই তথাপি এ প্রশ্ন উঠা আবশ্যক, তাহা হইলে ইহার সমাধানও হয়ত একদিন হইতে পারে। অবশ্য সক্রিয় সমাধানের কথাই বলিতেছি, নিষ্ক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ নহে।

কয়েকটি অতি আধুনিক আবিষ্কার

(১)

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্য-নূতন আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানভাণ্ডারকে কম সমৃদ্ধ করিতেছে না! পদার্থ-বিদ্‌গণ পদার্থের পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিত্য নূতন বস্তুকণা আবিষ্কার করিতেছেন। রসায়ন তত্ত্ববিদ্‌ নিত্য নূতন কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত করিয়া সাধারণের চাহিদা মিটাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। গণিতজ্ঞগণ নূতন সূত্রের সাহায্যে নানাবিধ জটিল প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। মনোবিশ্লেষণের নব নব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া মনস্তত্ত্ববিদ ও মানব মনের দুজ্ঞেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য কম প্রয়াস পাইতেছেন না চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যাধি নিরাময়ের নিত্য নূতন ব্যবহার প্রবর্তন হইতেছে। জলযান, স্থলযান, বিমানপোত প্রত্যেকটিতে নিরা-পত্তার নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। শিল্পী ও পূর্ত্ত-বিদ্যাবিশারদগণও নানারূপ অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মানুষের শ্রম লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্রের রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্তও কম চেষ্টা করিতেছেন না। বিংশ শতাব্দীতে বাণীর দেউলে দেউলে বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে এইভাবে যে সাধনা চলিয়াছে, তাহার হিসাব রাখা আজ বড় সহজ কথা নহে। বিজ্ঞানের প্রতি বিভাগেই এত তথ্য আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে, এই অগ্রগতির সম্যক আলোচনা সামান্য নিবন্ধে সম্ভবপর নহে। বর্তমান প্রবন্ধে তাই শুধু গত এক বৎসরে (১৯৩৮) বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা বা আবিষ্কার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই শুধু সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

পদার্থ বিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞানের কথাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বিজ্ঞানের এই বিভাগে পরমাণ-বিক রহস্যের প্রতি পদার্থবিদ্‌গণের দৃষ্টি যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গত বৎসর কালি-ফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ডাঃ কার্ল ডেভিড এণ্ডারসন ও তাঁহার সহকর্মী ডাঃ সেট্‌ এইচ নেডার-মিয়ার তাঁহাদের অপূর্ব আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানের এই বিভাগে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কার্ল ডি এণ্ডারসন ইতিপূর্বে (১৯৩২ সালে) 'পজিটিভ্ ইলেকট্রন' বা 'পজিট্রন' আবিষ্কার করিয়া নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই কারণেও তাঁহার এই নূতন গবেষণা সভ্য জগতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

'ব্যোমরশ্মি' নামে একপ্রকার রশ্মি বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় ইহার প্রকৃতি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কার্ল এণ্ডারসনও ইদানীং কিছুকাল যাবৎ এই রশ্মি সম্পর্কে নানাপ্রকার গবেষণা করিতেছিলেন। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে ব্যোমরশ্মির অবস্থা কিরূপ থাকে, তাহা পরীক্ষা করিতে করিতে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে ব্যোমরশ্মির ব্যবহারে তিনি এক বিস্ময়কর অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। ইহার কারণ সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ধারণা হয় যে, বায়ুর উচ্চস্তরে নিশ্চয়ই এরূপ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক তড়িত-কণার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে, যাহা 'প্রোটনের' চেয়ে হাল্কা অথচ ইলেকট্রনের চেয়ে অধিকতর ভারী হইবে। হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড কার্ল ষ্টীভেন্‌সন্ প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকগণের মনেও কিছুকাল পূর্বে এইরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু পরমাণবিক বিশ্লেষণে এপর্যন্ত ঐ ধরণের কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই বলিয়া কেহই এসম্বন্ধে এতাবৎকাল বিশেষ জোর করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। যাহা হউক অধ্যাপক ডাঃ এণ্ডারসন ও নেডারমিয়ার এইবার এবিষয়ে সকলের সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যোমরশ্মির এরূপ একটি কণাকে বস্তুতই 'ক্যামেরায়' ধরিতে

কার্ল ডি য়্যাণ্ডার্সন

পারিয়াছেন। ব্যোমরশ্মিকে আটক করিবার জন্য উক্ত বৈজ্ঞানিক-দ্বয় যে যন্ত্র স্থাপিত করেন, তাহাতেই উপরোক্ত রশ্মিকণা আসিয়া ধরা পড়ে। এই রশ্মিকণার ওজন সাধারণ 'ইলেকট্রন' হইতে প্রায় ২৪০ গুণ ভারী। প্রথমে ইহাকে 'এক্স' (অজানা) বস্তুকণা নামে অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু পরে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে 'ডাইনেট্রন', 'পেনিট্রন', 'বেরিট্রন', 'ভারী ইলেকট্রন' বা 'য়ুকন' (yukon) নাম রাখিবার ব্যবস্থা হয়। 'বেরিট্রন' নামটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে প্রচলিত। ইউরোপের অনেক স্থানে বর্তমানে ইহার 'য়ুকন' নামটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নামের পশ্চাতে যে ইতিহাস রহিয়াছে, এই স্থানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরমাণু মধ্যস্থিত 'নিউক্লিয়সের' মধ্যে শক্তি পরিমাণের অদল-বদল কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্বে জাপানী বৈজ্ঞানিক য়ুকাওয়া (Yukawa) এরূপ একটি বস্তুকণার কল্পনা করেন। এই কারণে ইহার অস্তিত্ব ঘোষিত হইলে পর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের য়ুকাওয়ার

নামানুসারে ইহাকে 'য়ুকেন' বলিয়া অভিহিত করিবার ঝোঁক দেখা যায়। বর্তমানে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই নবাবিষ্কৃত ব্যোমকণার মধ্যে 'ইলেকট্রন' বা 'প্রোটনের' সমান তড়িৎযুক্ত থাকিলেও ইহার ওজন ইহাদের কাহারও সমান নহে, বরং এতদুভয়ের ওজনের মাঝামাঝি হইবে। এই কারণে আবিষ্কর্তাগণ ইহার 'মেসোট্রন' (mesotron) এই নূতন নাম রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

ব্যোমরশ্মি সম্পর্কে এই বৎসর আর একটি নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই রশ্মি দূরদিগন্ত হইতে বিচ্ছুরিত হইলেও উহার সর্বত্র অবাধ গতি পরিলক্ষিত হয় এবং যে কোন পদার্থ ভেদ করিয়া উহা অগ্রসর হইতে পারে। এরূপ বিস্ময়কর শক্তি ইহার কোথা হইতে আসিল, বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। গত বৎসর সমুদ্র সমতল হইতে ১৪,২০০ ফুট উর্দ্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া কয়েক-জন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্যোমরশ্মির অপূর্ব ভেদ শক্তির মূলে রহিয়াছে একরূপ পরমাণবিক শক্তিকণা। ইহার নাম 'নিউট্রেটো' (Neutretto)। ব্যোমরশ্মির বিকিরণে এই বস্তুকণার প্রভাবই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

'বেরিট্রনে'র ন্যায় এই বস্তুকণার আবিষ্কারেও দেখা যায় কোন কোন বৈজ্ঞানিক কিছুকাল পূর্ব হইতেই ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এরূপ গুণসম্পন্ন বস্তুকণার সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ওয়ালথার হেইটলার নামে একজন বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বায়বীয় পদার্থের নির্বাচনমূলক শোষণ নীতি সম্পর্কে ওয়ালথার হেইটলারের গবেষণা বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। ওজনে বেরিট্রনের অনুরূপ অথচ কোন তড়িৎযুক্ত থাকিবে না - এ ধরণের বস্তুকণার কল্পনা করিয়া লইয়া ওয়ালথার হেইটলার নিজেই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেহ মনে করিতে পারেন নাই যে, প্রকৃতির রাজ্যে যথার্থই এরূপ বস্তুকণা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু গত বৎসর সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রান্সিস্ আর শোঙ্কা বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে ব্যোমরশ্মি সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা করিতে করিতে ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে প্রমাণ লাভ করেন, তাহাতে হেইট-লারের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, 'নিউট্রেটো' নামক বস্তুকণার ভেদশক্তি অসীম। ওজনে ইহা 'বেরিট্রনে'র সমান বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কোন তড়িৎশক্তিরই সন্ধান পাওয়া যায় না!

গত বৎসরের উপরোক্ত আবিষ্কার দুইটি দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইবার বিশেষ কারণ এই যে, ইহা দ্বারা পরমাণুর সংগঠন সম্পর্কেও নূতন আলোকপাত সম্ভবপর হইয়াছে। মাত্র আট বৎসর পূর্বে পদার্থবিদগণ পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জগতের যাবতীয় পদার্থের পরমাণু 'প্রোটন' ও 'ইলেকট্রন' লইয়া গঠিত। তারপর দেখিতে দেখিতে 'নিউট্রন' ও 'পজিট্রন' নামে আর দুইটি সূক্ষ্ম বস্তুকণার সন্ধানও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার মধ্যে লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত 'নিগেটিভ বা ঋণাত্মক প্রোটন' এবং 'নিউট্রিনো' নামক আর দুইটি বস্তুকণার অস্তিত্বেও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে থাকেন। উপরোক্ত বস্তুকণার কোনটি বা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত, কোনটি বা আবার ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত, কোনটিতে আবার তড়িতের চিহ্নমাত্র নাই। কোনটি ওজনে হালকা, কোনটি বা তুলনায় অত্যন্ত 'ভারী'। এইভাবে পদার্থ-বিদগণ বিবিধ বস্তুকণার যে তালিকা গ্রহণ করেন, তাহা সেই সময় অনেকটা এই রকমের ছিলঃ

	ধনাত্মক	ঋণাত্মক	তড়িৎশক্তিবর্জিত
ভারী—	প্রোটন	(নিগেটিভ প্রোটন)	নিউট্রন
হালকা—	পজিট্রন্	ইলেকট্রন্	(নিউট্রিনো)

কিন্তু গত বৎসরের উপরোক্ত দুইটি নূতন বস্তুকণার আবিষ্কারের মূলে পদার্থবিদ্‌গণের পূর্বোক্ত তালিকায় যে পরিবর্ধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ মৌলিক পদার্থকণাগুলির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তালিকাটি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ—

	ধনাত্মক	ঋণাত্মক	তড়িৎশক্তিবর্জিত
ভারী -	প্রোটন	(নিগেটিভ প্রোটন)	নিউট্রন্
মধ্য -	পজিটিভ বেরিট্রন্	নিগেটিভ বেরিট্রন্	(নিউট্রেটো)
হালকা—	পজিট্রন্	ইলেকট্রন	(নিউট্রিনো)

প্রগতিশীল বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে নিত্য নূতন তথ্য সঞ্চিত হইতেছে। গত এক বৎসরে বিজ্ঞানের একটিমাত্র বিভাগে যে যুগান্তকারী গবেষণা হইয়াছে, তাহাতেই ইহার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বস্তুত পদার্থ-বিজ্ঞানে আজ এত দ্রুত পট্পরিবর্তন হইতেছে যে, ইহার পরে কি আছে, বলা বড় সহজ নহে!

শিম্পাঞ্জী ফটোগ্রাফার

শিম্পাঞ্জীদের খাদ্য পাইবার আশায় কাজ করিতে ও স্লট মেশিনে উপযুক্ত চাকতি প্রবেশ করাইয়া দিয়া খাদ্য-বস্তু আহরণ প্রভৃতি শিক্ষা করিবার ব্যাপার বিগত এক সংখ্যা দেশ-এ বর্ণনা

ক্যামেরা হস্তে শিক্ষিত শিম্পাঞ্জী কি করিয়া ক্যামেরা সাহায্যে ফটো তুলিতে হয়, সে কৌশল এই নিপুণ সেয়ানা জীবটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে

করা হইয়াছে। নকল চাকতি প্রদান করা হইলে, তাহাদ্বারা যে কোনও খাদ্য-বস্তু পাওয়া যাইবে না, তাহাও ধরিয়া ফেলিতে শিম্পাঞ্জীদের বেশী সময় লাগে নাই। তদুপরি প্রয়োজন মত চাকতি বিনিময় করিতেও উহারা শিখিয়াছে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও চমকপ্রদ শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে বার্লিন চিড়িয়াখানার এক শিম্পাঞ্জীকে। ক্যামেরা দ্বারা কি ভাবে ফটো তোলা যাইতে পারে, এই কৌশল অতি অল্প সময়ে এই শিম্পাঞ্জীটি ভাল করিয়াই শিখিয়া লইয়াছে। এখানে বলা দরকার যে ক্যামেরা সাহায্যে কি প্রকারে ফটো তোলা হয় ফিল্মে—সেই কৌশলই এই জানোয়ারটি শিখিয়াছে—ফিল্ম ডেভেলপ্ করিতে পারে না নিজে নিজে। ক্যামেরা ব্যবহার যখন উহা নিখুঁতভাবে শিখিয়া ফেলিল, তখন উহার হাতে একটি ক্যামেরা দেওয়া হইল ফিল্ম পুরিয়া এবং সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করিয়া। শিম্পাঞ্জী তখন তাহার সেরা শিক্ষাটি কাজে লাগাইল উৎসাহের সহিত। ফলে যে ফটো সে তুলিতে পারিয়াছে, তাহার প্রতিকৃতিও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। সে তাহার খাঁচার ভিতর হইতে ক্যামেরা দ্বারা দর্শকদের ফটো তোলায় ঐ ফটোতে খাঁচার লোহার গরাদের ছাপ পড়িয়াছে। বার্লিন চিড়িয়াখানা এই অদ্ভুত শিক্ষাদান করিয়া শিম্পাঞ্জীর

খাঁচার ভিতরে ক্যামেরা হস্তে বসিয়া বাহিরের দর্শকদের ফটো তুলিয়াছে শিম্পাঞ্জী—গরাদের পশ্চাতে দর্শকদের ভীড়ের দৃশ্য যাহা দেখা যাইতেছে, এই ছবিখানিই শিম্পাঞ্জীর তোলা ফটোর অনুলিপি

নিপুণতার আরও প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আশা করা যায়, এই নিপুণ জানোয়ারটি শীঘ্রই কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকেই তোলা ছবির ফিল্মগুলি ডেভেলপ্ করিতে সমর্থ হইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, শিম্পাঞ্জীটি ছবিতে দেখা যাইতেছে ডান হাতেই ব্যবহার করে বেশী। অন্য মর্কট জাতীয়ের সহিত উহার ইহাই প্রধান পার্থক্য।

দাড়ির ব্যবহার

দাড়ি যে শুধু দর্শকদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই লোকে পোষণ করে—সময়ে অসাধারণ দৈর্ঘ্যে পর্য্যবসিত করে, এমন নয়। দাড়ির দ্বারা অনেক সময় প্রকৃত কাজও হয়, আবার অকাজ বা কার্য্যহানিও ঘটে কম নয়।

কথিত আছে প্রাচীন কালে পারশ্যে ভারতবর্ষের আম্রফলের খ্যাতি বিস্তার লাভ করে; কিন্তু সেদেশে তখন জন্মাইত না বলিয়া এত নামডাক সত্ত্বেও পারশ্যবাসী আম্রফলের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই। পারশ্যের শাহ এজন্য তাঁহার উজির সাহেবকে ভারতে পাঠান—উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে এবং সত্য হইলে উহার কিছু নিদর্শন সঙ্গে লইয়া আসিতে। উজির সাহেব ভারতে আসিয়া প্রচুর স্বাদ গ্রহণ করিলেন আমের এবং দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জাতীয় আম কতকগুলি সঙ্গে লইয়া গেলেন। কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে পথের অপরিসীম তাপ ফলগুলিকে একেবারে পচাইয়া ফেলিল। উজির সাহেব যখন শাহের দরবারে যাইয়া আমের ঝুড়ি খুলিলেন, তখন দেখা গেল সবগুলি আমই পচিয়া গিয়াছে, একটিও স্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত নাই। শাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উজিরকে অকর্মণ্য সাব্যস্ত করিয়া আদেশ দিলেন তাঁহাকে আমের স্বাদ গ্রহণ করাইতে না পারিলে উজিরকে কোতল করা হইবে। উজিরের ত মস্তকে বজ্রাঘাত। কি যে করিবে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বলিতে ভুলিয়াছি উজির সাহেবের ছিল অতি দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশি—শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার মাথায় প্রাণ বাঁচাইবার এক ফন্দী-ফিকির খেলিয়া গেল। জীবনে প্রথম সেইবার ভারতে আম খাইয়া উহার স্বাদ সে ভুলিয়া যায় নাই। এইবার সেই স্বাদের স্মৃতি সে কাজে লাগাইল। কতকগুলি তেঁতুল-গোলাতে উপযুক্ত পরিমাণ মিষ্টি দিয়া এবং তাহাতে আম আদার গন্ধযুক্ত করিয়া সে দাড়িতে মাখাইল। প্রচুর পরিমাণে ঐ গাঢ় মণ্ড দাড়িতে জড়াইয়া আমের আকারে শুকাইয়া লইল। তৎপর শাহের দরবারে যাইয়া শাহকে তাহার দাড়ি চুষিতে বলিল। শাহও সেই দাড়ির টক টক মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ আম-আদা গন্ধ মাখা আমের স্বাদ পাইল—উপরন্তু আমের আঁশও। উজির মাহমুদ হইল পুরোপুরি।

দাড়ি অবশ্য এই প্রকার সুকাজ করিবার অধিকার খুব বেশী পায় না। কিন্তু অকাজ করিবার যেন তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। বিগত দেওয়ালীর সময় রিক্সা-আরূঢ় এক লম্বা দাড়ীর মালিক নাকাল হইল, পার্শ্ব-পার্শ্বস্থ কোনও শিশুর হস্ত হইতে ছুঁচোবাজি পলাতক হইয়া আসিয়া ভদ্রলোকের দাড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ পাইলতে—বাবাজের ফের লম্ফে ঝম্পে আবার বিভ্রাটি যেন উঠিইয়া। সেদিন ময়মনসিংহ-ঢাকা লাইনের কোনও স্টেশনে আবার লম্বা দাড়ি অকাজ করিয়া ফেলিল—কোনও কামরার দ্বারের সঙ্গে বেমালুম বাঁধিয়া গিয়া এবং মালিককে ট্রেনের গতির সঙ্গে টানিয়া হেঁচড়াইয়া কিছু দূর লইয়া গিয়া। দাড়ির অকাজের যেন আর শেষ নাই।

বৃষ্টি রাণীর ডালি

পপুয়া রাজ্যে পোর্ট মোরসবি নামক স্থানে একটি মেয়ে আছে। তাহাকে স্থানীয় লোক "বৃষ্টি রাণী" আখ্যা দিয়াছে। সে স্নান করিলেই না কি বৃষ্টি হয়।

স্থানীয় লোকের বাগানের জন্য সম্প্রতি রৌদ্রের আবশ্যক হয়। তাহারা "বৃষ্টি রাণীকে" বলে যে, সে যেন কয়েকদিন স্নান না করে। সে যদি স্নান না করে, তাহা হইলেই বৃষ্টি বন্ধ থাকিবে। সে জন্য তাহাকে যথেষ্ট ডালি দেওয়ার প্রতি-শ্রুতিও দেওয়া হয়। কিন্তু বৃষ্টি হইতে থাকে। তখন গ্রামবাসীরা ফৌজদারের নিকট নালিশ করে যে, নিষেধ সত্ত্বেও "বৃষ্টিরাণী" স্নান করিয়া বৃষ্টি নামাইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে। "বৃষ্টি রাণী" জবাব দিয়াছে যে, স্নান সে করে নাই, প্রতিশ্রুত ডালি না দেওয়াতেই গ্রামবাসীদের উপর দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া অতিবৃষ্টি দিয়াছেন।

বিলাসিতা নিষেধ

শ্যাম রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সম্প্রতি এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, বিদ্যার্থিনী কোনও ছাত্রী চুল কোঁকড়াইতে পারিবে না, নখ রংগাইতে পারিবে না, ভ্রূতে কাজল দিতে পারিবে না।

ছাত্রদের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, চুল খুব ছোট করিয়া কাটিতে হইবে।

শ্রমিকের রেল ভ্রমণ

মাণ্ডুকুও রাজ্যের দাইরেন-হার্বিন ট্রেনে এক টিকেট চেকার দেখিতে পায় যে, এক কুলি পরম নিশ্চিন্ত মনে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে বসিয়া আছে। চেকার মনে করিলেন যে, লোকটা নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে। তিনি হাকিমী মেজাজে তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী দেখাইয়া দিলেন। লোকটা একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকেট বাহির করিল। চেকার তাহাকে নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, উত্তরে সে বলিল যে, এসময় এত লোক উত্তরাঞ্চলে যায় যে, তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইতে হইলে সাত আট দিন অপেক্ষা করিতে হয়। তাই সে পয়সা জমাইয়া প্রথম শ্রেণীতেই যাইতেছে। যে কয়দিন স্টেশনে পড়িয়া থাকিবে, সে কয়দিন আগে গেলে তাহারও কাজের সুবিধা হইবে, আরামপ্রদ প্রথম শ্রেণীর ভাড়াটাও আদায় হইয়া যাইবে।

পাজামা-নারীর জেদ

বার্কশায়ারের নামজাদা নদীতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান মেইডেনহেডে তরুণেরা স্থির করিয়াছে, তাহারা স্কার্ট পরিয়া ব্লাউজ গায়ে আঁটিয়া রাস্তায় বাহির হইবে, যদি স্থানীয় নারীগণ ফ্লানেল পাজামা পরিয়া প্রকাশ্যে বাহির হইবার ফ্যাশান ত্যাগ না করে।

ঐস্থানে যে সকল নারী ঐ প্রকার পাজামা পরিবার ফ্যাশান চালু করিয়াছে, তাহাদের ভিতর ধনিক বিবাহিতা রমণী রহিয়াছে বহু। তরুণেরা মনে করে নারীদের এই প্রকার পুরুষোচিত পরিচ্ছদ পরিধান পুরুষ জাতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেশ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মী মনে করেন, তরুণীদের এই প্রকার পাজামা ও আঁটাসাঁটা জাম্পার গায়ে প্রকাশ্যে বাহির হওয়াতে তাহাদের নারীত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়া আরও বেশী করিয়া নজরে পড়ে তরুণদের—উহার ফল সমাজের পক্ষে হিতকর নয়।

যদিও তরুণীদিগকে জানান হইয়াছে যে, তাহারা স্কার্ট পরিয়া রাস্তায় বেড়াইলে, তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইবে, তথাপি তাহারা পাজামা-নারীর বিসদৃশ ফ্যাশান বিদূরিত করিতে বদ্ধপরিকর এবং প্রয়োজন হইলে এই জন্য কারাবরণ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না।

কোন কোন তরুণ বলে, এই নারীদের বিবেক বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, কেবল হুজুগে মাতিয়া চলে।

পুস্তক পরিচয়

বাঙ্গালীর বল—বাঙালী জাতির সামরিক ইতিহাস। শ্রীনগেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত। মূল্য তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)। প্রাপ্তি-স্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা প্রভৃতি।

১৩২৮ সালে 'বাঙ্গালীর বল' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণেই পুস্তকখানার বিশেষ নাম হইয়াছিল। মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ অধিকারের আধুনিক কাল—ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙালীর বীরত্ব পর্য্যন্ত বাঙালী জাতির বাহুবলের ও বীরত্বের ইতিহাস এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্যবান চিত্র-সূচী এবং পরিশিষ্ট সম্বলিত ৬৭৩ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, বেশ বড় বই। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, সবই সুন্দর। বাঙলার ঘরে ঘরে হিন্দু পঞ্জীর মত বইখানা রাখিবার যোগ্য। আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির মধ্যে এই পুস্তকের সমাদরে সুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইবে।

কাল্পনিকতার প্রসার বা ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস দ্বারা চোখ ধাঁধাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। সেই প্রাচীন যুগে দুর্দ্ধর্ষ বাঙালী জাতির সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সকল তথ্যই যথাসম্ভব বিবিধ প্রামাণিক গ্রন্থোদ্ধৃত বাক্য দ্বারা সমর্থিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেরও যাবতীয় বৃত্তান্তই সুপরিচিত গবেষকদিগের উক্তি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত ঐতিহাসিক উপাদানগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক অন্তরায় বিদূরিত করিবে।

যুগ-পরিণীতা—শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স; ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২০০। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তকখানি উপন্যাস। দূর্বা নামে একটি আই এ পাশ মেয়ের বিবাহ হইল হুগলীর একটি পল্লীগ্রামস্থ যুবক উচ্চ-শিক্ষিত অরূপের সঙ্গে। দূর্বা ব্যারিষ্টারের কন্যা; কলিকাতায় লালিত-পালিত। পল্লীর পরিবেষ্টন, হাল চাল, আচার-ব্যবহার কিছুরই সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। পল্লীবাসীদের দৌরাত্ম্যে অরূপ বাধ্য হইয়া দূর্বাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া গেল। উভয়ের ভিতর অতঃপর একরূপ ছাড়াছাড়ি হইল। দূর্বার পিতামাতার ক্রোধ অরূপের উপরই বেশী মাত্রা পতিত হইল। অরূপ কিন্তু কখনও দূর্বাকে ভুলিতে পারে নাই। কিছু দিন পরে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। দূর্বার কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিলে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। পিতার সঙ্গে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরূপ ক্রমে সারিয়া উঠিল। এইখানেই কাহিনীর পরি-সমাপ্তি। লেখক সমাজের একটি সমস্যাকে গল্পে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার লেখার গতি সহজ ও সাবলীল। এক টানা পড়িয়া যাইতে পাঠককে বেগ পাইতে হয় না। মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছুর মধ্যে পড়িল।

প্যাগোডার দেশে দিন পনেরো—লেখক শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়; প্রকাশক শ্রীরেবতীরঞ্জন রায়; আদালত, ঢাকা। মূল্য আট আনা।

লেখকের প্রকাশভঙ্গী এমনই মনোহারী যে, পড়িতে পড়িতে প্যাগোডার দেশ, তাহার সুন্দরী নারী আর শস্যশ্যামল প্রান্তর, সুন্দর হ্রদ এবং প্রশান্ত বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। বর্ণনা একদিকে যেমন নিখুঁত, আর একদিকে তেমনি মনোহর। এই বইখানি আকারে বিপুল না হইলেও ইহার আগাগোড়া সাহিত্যরসে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দুরন্ত যৌবন—শ্রীআশালতা দেবী। মূল্য দেড় টাকা। ৬০।এ, কেশব সেন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীননীগোপাল সিংহ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকা যশস্বিনী। সরল রেখাপাতের উপর ত্যাগের যে অনবদ্য মহিমা নারী-হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য, তিনি আলোচ্য উপন্যাসখানায় তাহা সূক্ষ্ম কারি-গরির সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, নারী কোন্ শক্তিতে মহীয়সী, এই কথাটি ব্যক্ত করিতে গিয়া অনেকে আজকাল যেরূপ পাঠককে দুরূহ মানসিক কসরতের মধ্যে ফেলিয়া পরিশ্রান্ত করিয়া থাকেন, লেখিকাকে তাহা করিতে হয় নাই। তিনি সহজ, সরল রস-ধারার যোগে সেই সত্যটিকে মাধুর্য্যময় রূপ দান করিয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—
মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদ—বিশেষ সংখ্যা।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং বাঙলার যে সব মনীষীগণ এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া পৌর-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টার বিবরণ এই বিশেষ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদে কলিকাতার নাগরিকদের পক্ষ হইতে যে আন্দোলন চালান হয়, তৎসম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য এই বিশেষ সংখ্যাতে আছে। সুরেন্দ্রনাথের সাধনায় কর্পোরেশন কি কি অধিকার পাইয়াছে এবং মিউনিসিপ্যাল বিলের দ্বারা সেই-সব অধিকারকে বিলুপ্ত করিবার যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কিরূপ মারাত্মক, বিশেষ সংখ্যাটিতে তাহা বিশদ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাঙলার পৌর-আন্দোলনের সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট মিউনিসিপ্যাল বিলের সম্বন্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধাদিতে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল বিলের ভিতর দিয়া কলিকাতার পৌরজনদের সমক্ষে যে সংকট ঘনাইয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান সংখ্যাটি দেশের লোকের মনে তাহার গুরুত্বকে জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিবে এবং সেইভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার প্রেরণা সঞ্চার করিবে। মিউনিসিপ্যাল বিলের যাঁহারা প্রতিরোধ করিতে চাহেন, বিশেষ সংখ্যাটি তাঁহাদের নিকট অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় সময়োচিতভাবে এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদন করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রকৃতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করা এখন একটা বড় কাজ, আমরা একথা বলিবই; কারণ এই বিলের অনিষ্টকারিতাকে রুদ্ধ করিবার উপর; ইহাকে ব্যর্থ করিবার উপর—শুধু কলিকাতার পৌর-স্বার্থ নয়, সমগ্র বাঙলার স্বার্থ নির্ভর করিতেছে; নির্ভর করিতেছে গণতান্ত্রিক নীতির মর্য্যাদা, জাতীয়তার আদর্শের সমাজে স্থান। আমরা এজন্য হোম মহাশয়কে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

আরামবাগ সাহিত্য চক্র

গত ১৭ই জুন, শনিবার আরামবাগ হাই স্কুল হলে কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বেগম ফারুকে শাকিনা মোয়েদজাদা এম-এ, বি-এল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত ফলাফল সভায় ঘোষিত হয়ঃ—

(১) ছোট গল্প—কমলাকান্ত রায়। (২) সুভাষ-চন্দ্রের "অগ্রগামী দল" স্বাধীনতা সম্মেলনের পরিপন্থী কিনা?—গোপালকৃষ্ণ রায়, (৩) সুভাষচন্দ্রের জীবনী—গোপালকৃষ্ণ রায়।

আবৃত্তি

(১) নারী—সুধাংশুশেখর মজুমদার, (২) এবার ফিরাও মোরে—গোপালকৃষ্ণ রায়, (৩) নির্ঝরের কুমারী বেলা পাল ও গায়ত্রী পাল। "সহশিক্ষা" নামক প্রবন্ধ ও "দেশকথা" নামক আবৃত্তিতে কোন প্রতিযোগী না থাকায় কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আনন্দমোহন বসু, সম্পাদক, আরামবাগ সাহিত্যচক্র।

ঝরণা সাহিত্য-চক্র

মেঘদূত উৎসব

গত ১লা আষাঢ় সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় ঝরণা সাহিত্য চক্রের উদ্যোগে ৭৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাসভবনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মেঘদূত উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের স্বাদেশিকতা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার পর শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত শিশির সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞান সেন, শ্রীযুক্ত বিমল সেন ও কুমারী দীপালী দাশগুপ্তা প্রভৃতি মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে স্ব স্ব রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতা

আগামী ৩০শে আষাঢ় প্রোগ্রেস ম্যাজেটিক ইউথ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ ও একটি গল্প প্রতি-যোগিতা হইবে। প্রবন্ধের বিষয়—"উলুবেড়িয়ার গঙ্গা আসলে কি নদী?" 'গল্প' যে-কোন মৌলিক বিষয়ের হইলেই হইবে। প্রবন্ধে প্রথম পুরস্কার একটি সুবর্ণ পদক ও দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক। গল্পে একটি রৌপ্যপদক। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিয়া ২৫শে আষাঢ়ের মধ্যে হিমাংশুকুমার সাবুদ, উলুবেড়িয়া, এইচ ই স্কুল, পোঃ—উলুবেড়িয়া, হাওড়া। এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— ...

—খামের উপর "প্রতিযোগিতা" শব্দটি লেখা থাকা চাই, নচেৎ লেখা বাতিল হইবে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

বাঁশবেড়িয়া রবি-বাসরিক সমিতি

১৮ই জুন, রবিবার সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন স্থানীয় পাঠাগার ভবনে মহাসমারোহে সমাপ্ত হয়।

প্রতিযোগিতার বিষয়

(১) "ভারতীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রকৃষ্টতম পন্থা" প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

(২) "এক লক্ষ টাকা পাইলে কি উপায়ে বাঙলার যে-কোন অর্দ্ধ মৃত পল্লীগ্রামকে একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত করা যায়।" (মাত্র বাঁশবাড়িয়ার স্কুলের ছাত্রদের জন্য) প্রথম—শ্রীঅনাথকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দশম শ্রেণীর ছাত্র।

(৩) "বন্দী ভগবান" (বড়দের জন্য) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী (হুগলী কলেজ)

(৪) "দীনদান" (ছোটদের জন্য) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন—শ্রীশ্যামাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বাবুগঞ্জ, হুগলী।

(৫) বিতর্ক প্রতিযোগিতা—"ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হওয়াই উচিত।" প্রথম শ্রীসুধীরচন্দ্র নন্দী, হুগলী ষ্টুডেন্টস ফেডারেশনের পক্ষ হইতে।

রচনার ফলাফল

নিখিল ভারত সংঘ পরিচালিত "শরৎ সাহিত্যে শিশু" শীর্ষক নিখিল ভারত বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফলঃ—প্রথম কুমারী শান্তিলতা দেবী (পাবনা)। দ্বিতীয়—শ্রীসন্তোষকুমার পাল (হাওড়া)।

শ্রীদেবেশচন্দ্র বসাক, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক।

তারিখ পরিবর্তন

গত ৩রা জুন ২৯শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় জৈন যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে যে গল্প ও প্রবন্ধ (বেকার সমস্যা ও তাহার প্রতিকার) প্রতিযোগিতা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ পরিবর্তন করিয়া ১০ই জুলাই ধার্য্য করা হইল। সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। নিম্ন ঠিকানায় গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

স্বাঃ সন্দীপ কোঠারী, সম্পাদক, জৈন যুব সঙ্ঘ। পোঃ জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

তারিখ পরিবর্তন

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে দেশ পত্রিকায় যে গল্প ও কবিতার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে মে স্থলে ২৮শে জুন ধার্য্য করা হইল। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীসুশান্তকুমার পাঠক, সাধনপাড়া; পোঃ বহিরগাছি, নদীয়া।

৬ষ্ঠ বর্ষ দেশ পত্রিকার ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত "দরিদ্রের দেশে ডাকব্যয়" প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম এস সি গুহ মুদ্রিত হয় নাই। ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রে গুহ মহাশয়ের মূল প্রবন্ধের উহা মর্ম্মানুবাদ।

সম্পাদক দেশ।

আমেরিকাস্থ ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের সহ-সভাপতি মিঃ হরিগোবিন্দ গোভিন নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"নিউইয়র্ক হইতে এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে, হলিউডে 'গঙ্গাদীন' শ্রেণীর আর একখানি ভারতবিদ্বেষী ছবি তোলার ব্যবস্থা চলিতেছে।

"সমগ্র আমেরিকায় 'গঙ্গাদীন' ছবিখানি যে বিপুল সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারই জন্য এই ছবিখানি তোলার ব্যবস্থা হইতেছে। হলিউডের চিত্র প্রযোজকদের একটা রীতি এই যে, একই ধরণের ছবি তুলিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা তাহার শেষ না করিয়া ছাড়েন না। এক সময় যুদ্ধের ছবি তোলা হইত; তারপর আসিল হত্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক ছবি তোলার হিড়িক; তারপর আসিল দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ছবি এবং এই রকম আরও অনেক ছবি। এখন ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া ছবি তোলা আরম্ভ হইয়াছে।

"নিউইয়র্ক হইতে একজন আমেরিকান বন্ধু লিখিয়াছেন—'ড্রাম', 'ষ্টর্ম ওভার বেঙ্গল', 'গঙ্গাদীন' প্রভৃতি ছবির ন্যায় ভারতের কলঙ্ক প্রচারক ছবি আর দেখা যায় নাই এবং ইহাদের কতকগুলির মধ্যে ভারত সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা ও বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছে।"

"লেখক আরও বলিয়াছেন—'উদাহরণস্বরূপ গঙ্গাদীন ছবির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ছবিতে দুর্দ্দান্ত বর্গী সর্দ্দারকে প্রধান পুরোহিত করা হইয়াছে এবং এই পুরোহিতের রূপসজ্জা ও মুখের চেহারা অবিকল মহাত্মা গান্ধীর মত করা হইয়াছে।'

"ইহা ভারতের পক্ষে নিতান্ত বিদ্বেষমূলক এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার উচিত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা এবং আবশ্যক হইলে সমস্ত আমেরিকান ছবি বয়কট করার ব্যবস্থা করা। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়দের পক্ষে এখন কিছু একটা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন প্রকারে হউক এখানে (আমেরিকায়) ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতামূলক ছবি দেখানো প্রয়োজন। ভারতের বিরুদ্ধে যে বিষ ছড়ানো হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে ইহাই সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা হইবে।

"এই ব্যাপার লইয়া ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যথেষ্ট আলোচনা চালানো হইয়াছে। কিন্তু সহযোগিতার অভাবে আশানুরূপ ফল তাহার দ্বারা হয় নাই। ভারতের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী শোষণকারীগণের ভারতের সুনাম কলঙ্কিত করার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ব্যবস্থা করেন নাই; ভারত গবর্ণমেণ্টও ভারতকে বিকৃত করার এই অপচেষ্টা বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

"আজ পর্য্যন্ত আমরা ইহার কেবলমাত্র প্রতিবাদ করিয়াছি এবং কয়েকক্ষেত্রে এই সমস্ত ছবি ভারতের কয়েকটি প্রদেশে প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ভারতে এই সমস্ত ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করা হইলেই চলিবে না। ইহাতে কি ফল হইবে? বাহিরের জগতে ভারতের কুৎসা প্রচার ত পূর্ব্বের মত অপ্রতিহতভাবেই চলিবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে এই সমস্ত ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করা হইলে প্রযোজকগণ সেই খবর ভাঙ্গাইয়া আরও বহু দর্শককে এই ভারতবিদ্বেষী ছবি দেখাইতে প্রলুব্ধ করিবেন।

"ভারতের যে সমস্ত চিত্রগৃহে বিদেশী ছবি দেখানো হয়, তাহার সংখ্যা তিনশতের বেশী হইবে না; অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ২০,০০০ চিত্রগৃহে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ৭০,০০০ চিত্রগৃহে আমেরিকান ছবি দেখানো হইয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে এই সমস্ত ভারত-বিদ্বেষী ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করিলে এই সমস্ত চিত্রের প্রদর্শকদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না।

"সুতরাং এই সমস্ত দোষী প্রযোজকদের শাস্তি দিবার জন্য আরও কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, যদি কোন ভারত-বিদ্বেষী চিত্রের প্রযোজক সেই ছবিখানি সর্ব্বত্র চালাইতে চাহে তাহা হইলে আমাদের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মারফৎ এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে সেই প্রযোজকদের সমস্ত ছবির ভারতবর্ষে প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়।

"ভারতীয় নেতাদের, ব্যবসা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের, বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের স্বাক্ষরযুক্ত একটি জাতীয় প্রতিবাদ আমেরিকার চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি মিঃ উইলহেজের নিকট পাঠানো উচিত। সেই প্রতিবাদপত্রে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, যদি ভারতের বিরুদ্ধে এই সমস্ত বিদ্বেষপূর্ণ, কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা আক্রমণ বন্ধ করা না হয় তাহা হইলে ভারতবাসিগণ আমেরিকান ছবি বয়কটের জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলন চালাইয়া এবং আবশ্যক হইলে ভারতে আমেরিকার প্রস্তুত দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে এই জঘন্য প্রচারকার্য্য বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প।"

* * * * *

রাধা ফিল্মের পৌরাণিক ছবি 'নরনারায়ণ' গত ৩০শে জুন হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে। শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রচিত কাহিনী অবলম্বনে। শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন। চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত যতীন দাস ও শব্দগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সত্যভামা—শীলা হালদার; জাম্ববতী—রেণুকা; জয়ন্তী—রাণীবালা; সত্রাজিৎ—অহীন্দ্র চৌধুরী; শ্রীকৃষ্ণ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য; অক্রূর—জহর গাঙ্গুলী; প্রসেন—রবি রায়; শতধন্বা—ভূমেন রায়; উদ্ধব—মৃণাল ঘোষ; জরাসন্ধ—মোহন ঘোষাল; জাম্ববান—তুলসী চক্রবর্ত্তী; কৃতবর্ম্মা—জয়নারায়ণ মুখো-

(শেষাংশ ৬৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা ক্রীড়ামোদিগণের বিশেষ উত্তেজনার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে এই গবেষণা ত্যাগ করিয়া প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হইবে কি না এই চিন্তাই বিশেষভাবে চঞ্চল করিয়াছে। আই এফ-এর সভাপতির নিকট মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, কালীঘাট ও এরিয়ান্স এই চারিটি বিশিষ্ট ভারতীয় দল সম্মিলিতভাবে পত্র প্রেরণ করিয়াছে, তাহার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই পত্রে উক্ত ক্লাবসমূহের সম্পাদকগণ সভাপতি মহাশয়কে এরূপ স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে, লীগ প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যদি দলের সুবিধা অনুযায়ী না করা হয় এবং খেলা পরিচালনায় রেফারীদের দোষ-ত্রুটি দূর করিবার যদি ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তাঁহারা প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট খেলাগুলিতে যোগদান করিতে পারিবেন না। কারণ খেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের অনেক সময়েই বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে এবং রেফারীর ত্রুটির জন্য খেলার ফলাফলও বিপরীত হইতেছে। লীগ প্রতিযোগিতা একরূপ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ দলেরই পাঁচটির অধিক খেলা বাকী নাই। এই সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইবে। এইরূপ সময় হঠাৎ প্রতিযোগিতা পণ্ড হইবার মত অবস্থার সৃষ্টি করার সার্থকতা যে কি তাহা অনেকেরই কল্পনাতীত। খেলার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিষয়ে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিলে আই এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। দলসমূহের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহারা পরবর্তী খেলার তালিকা প্রস্তুত না করিয়া থাকিলেও খুব মারাত্মক ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শীল্ড প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। লীগ প্রতিযোগিতার জন্য তাঁহারা খেলার যেরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথভাবে পালিত হইলে কোন দলেরই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে খেলা স্থগিত হওয়ার ফলেই কালীঘাট দলকে এইরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী ইচ্ছা করিয়া কালীঘাট দলের জন্য এই অবস্থা সৃষ্টি করেন নাই। ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা বর্তমান অবস্থায় স্থগিত রাখার কোনই যুক্তি পাওয়া যায় না—দলের খেলোয়াড়দের বিশ্রাম লাভের সুবিধা দান করা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কারণ পরিচালকগণ যখন প্রদর্শন করিতে পারেন না। রেফারীদের খেলা পরিচালনার ত্রুটি লীগ খেলার প্রথম হইতে প্রত্যেক খেলাতেই পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে এমন একটি দিনের কথা আমাদের স্মরণে আসে না যেদিন রেফারীর খেলা পরিচালনায় ত্রুটি দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রত্যেক দলকেই ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছে। রেফারীর খেলা পরিচালনার ত্রুটি দূর করিবার ইচ্ছা যখন উক্ত দলসমূহের মনে জাগ্রত হইয়াছিল, তখন প্রতিযোগিতার প্রথমেই যদি তাঁহারা প্রতিবাদ স্বরূপ সরিয়া দাঁড়াইতেন, তবে খুবই ভাল করিতেন। অন্য কাহারও সমর্থনের কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে আমাদের যে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। প্রতিযোগিতার সূচনায় এইরূপ সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানাইলে কাজের মত কাজ করিতেন। বর্তমান ক্ষেত্রে এই-রূপ প্রতিবাদের বিশেষ কোনই ফল হইবে না। রেফারীদের পরিচালনার দোষে, তাঁহাদিগকে যে অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, তাহার পরিবর্তন হইবে না। যে সকল খেলা হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনর্বার খেলিবার সুযোগ উক্ত ক্লাবসমূহের হইবে না। খেলাগুলি পুনর্বার অনুষ্ঠিত না হওয়ায় খেলার ফলাফলেরও কোন পরিবর্তন হইবে না। লীগ তালিকায় যে যে স্থানে আছেন বর্তমান প্রতিবাদের দ্বারায় তাহা অপেক্ষা উন্নততর স্থানলাভ করাও ভাগ্যে জুটিবে না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রতিবাদের দ্বারা প্রতিযোগিতা পণ্ড করা ছাড়া অন্য কোনই ফল হইবে না। পণ্ড করিয়াও দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে।

আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এ ব্যাপারে সকলগুলি দেশীয় দলও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন নাই। যতদূর দেখা যাইতেছে, প্রতিবাদস্বরূপ প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া না দাঁড়াইয়া শেষ পর্যন্ত নীরবে খেলায় যোগদান করিলে প্রকৃত খেলোয়াড় মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেওয়া হইবে।

নিম্নে লীগের খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ-

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

প্রথম ডিভিসন

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	পক্ষে	বিঃ	পয়েণ্ট
মোহনবাগান ...	১৯	১২	৬	১	২৬	৫	৩০
রেঞ্জার্স	১৯	১২	২	৫	৩৩	১৪	২৬
মহমেডান স্পোর্টিং ...	১৯	১০	৫	৪	৩১	১৫	২৫
ইষ্টবেঙ্গল ...	১৯	৮	৮	৩	২৩	১০	২৪
কালীঘাট ...	১৮	৯	৫	৪	৩১	১৯	২৩
কাষ্টমস্	২০	৮	৭	৫	২১	১৭	২৩
ই বি আর ...	২০	৮	৫	৭	২৮	২৬	২১
পুলিশ ...	২১	৭	৪	১০	২০	৩৪	১৮
ভবানীপুর ...	২০	৬	৪	১০	২০	৩২	১৬
ক্যামেরোনিয়ান্স ...	২০	৪	৭	৯	১২	২৫	১৫
এরিয়ান্স ...	২০	৫	৪	১১	১৮	৩২	১৪
বর্ডার রেজিমেণ্ট ...	২১	৪	৩	১৪	১৭	৩৬	১১
ক্যালকাটা ...	২০	১	৮	১১	২২	৩৫	১০

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৭শে জুন—

ই আই রেলপথে আবার ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়াছে। অদ্য শেষ রাত্রি ২টা ৩০ মিনিটের সময় মোরাদাবাদের নিকট দিল্লী দেরাদুন মিক্সড এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ায় ১০জন নিহত ও ২১জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, একটি কালভার্ট ধ্বসিয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

পুণাতে নিখিল ভারত কংগ্রেস র‍্যাডিক্যাল লীগের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জাপানীরা বৈদেশিক কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে যে, তাহারা ফুচাও ও ওয়েনচাও আক্রমণ করিতেছে; ২৯শে জুন মধ্যাহ্ন হইতে ঐ উভয় বন্দরই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; সুতরাং এই সময়ের মধ্যে সমস্ত বিদেশী জাহাজ ও লোক যেন স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জাপানীদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ডানজিগের ঝটিকাবাহিনী, কালকোর্ত্তা বাহিনী এবং হিটলার যুবসঙ্ঘকে লইয়া "ফ্রাইকর্পস" গঠনের প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সুদেতেনল্যান্ড দখলের পূর্ব্বে তথায় যে ধরণের, "ফ্রাইকর্পস" গঠন করা হইয়াছিল, ডানজিগেও ঠিক সেই ধরণের "ফ্রাইকর্পস" গঠিত হইবে।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত প্রস্তাব অন্ধ্রকে পৃথক প্রদেশরূপে গঠন করিবার জন্য দাবী করিয়া একটি বে-সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, যে, আসাম অয়েল কোম্পানী যদি আপোষ আলোচনায় রাজী না হন, তাহা হইলে কোম্পানীকে সালিশ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য করার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবেন এবং তাহাতেও যদি কোম্পানীর চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে আসাম গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর বর্ত্তমান ইজারা শেষ হইলে তাঁহাদিগকে পুনরায় ইজারা না দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

২৮শে জুন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল পাশ হয়। ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক সংশোধিত এই বিলটি পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হইয়াছে। আগামী ৬ই জুলাই পরিষদে বিলটির আলোচনা হইবে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ৮ হইতে ৪ করিবার জন্য কোয়ালিশন দলের সদস্য খাঁ সাহেব আব্দুল হামিদ চৌধুরী ব্যবস্থাপক সভায় যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হইবার ফলে বিলটির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হইবে।

মহারাষ্ট্র হিন্দুসভার নেতা মিঃ এল বি ভোপৎকার হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ করার অপরাধে এক বৎসর নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আর্য্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহের প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপনের জন্য শ্রীযুক্ত আণেকে বিলাত পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

টোকিও সংবাদে প্রকাশ যে, ফুচাও ও ওয়েনচাও বন্দর অধিকারের উদ্দেশ্যে জাপ নৌ-সৈন্যদল অদূরবর্ত্তী দ্বীপ-পুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে। ফলে চীনের উপকূলভাগস্থিত সমস্ত প্রধান প্রধান বন্দর জাপ কর্তৃত্বাধীনে আসিবে এবং সমুদ্র পথে মার্শাল চিয়াং কাইশেককে রণ-সম্ভার সরবরাহ করার সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র ছিন্ন হইবে।

কমন্সসভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, জাপ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মত বিনিময়ের ফলে স্থির হইয়াছে যে, তিয়েনৎসিন সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে টোকিওতে একটি বৈঠক আহূত হইবে। তিয়েনৎসিনের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, বৃটিশ এলাকার বেষ্টনী অতিক্রমকারী বৃটিশ প্রজাদের মধ্যে ১৫জনকে উলঙ্গ হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিল।

২৯শে জুন—

পাঁচদিন বৈঠক বসিবার পর বোম্বাইয়ে বামপন্থী সংগঠন কমিটির অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। নিম্নোক্ত সদস্যগণকে লইয়া বামপন্থী সংগঠন কমিটি গঠিত হইয়াছে:— শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু (উদ্যোক্তা ও দলপতি), শ্রীযুক্ত জয়-প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, মিঃ এম এন রায়, মিঃ মেহের আলী, স্বামী সহজানন্দ, প্রফেসার রঙ্গ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র সান্যাল, মিঃ পি সি যোশী, মিঃ ভরদ্বাজ, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী, মিঃ বি ডি ত্রিপাঠি, শ্রীযুক্ত সোমনাথ লাহিড়ী ও মিঃ কার্ণিক।

ডানজিগে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চার হাজার জার্ম্মান অফিসার এবং সৈন্য ডানজিগ নগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী গঠনে সাহায্য করিবে। আরও প্রকাশ যে, পূর্ব্ব প্রুসিয়া হইতে আগত জার্ম্মানগণ এবং ডানজিগের পুলিশ-দিগকে গ্যাসমুখোস সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স চ্যাটহাম হাউসে এক জোর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"আবার পররাজ্য আক্রমণের পুনরাভিনয় হইলে, উহা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আমরা যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা প্রতিপালনের জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব।"

লণ্ডনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ চার্চ্চিল সতর্ক বাণী করেন যে, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এই তিনটি মাস ইউরোপের পক্ষে বিশেষ সঙ্কটজনক হইবে।

৩০শে জুন—

লেঃ কর্ণেল জন আর্থার হার্বার্ট বাঙলার নূতন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। অস্থায়ী লাট স্যার জন উডহেডের কার্য্য-কাল আগামী নবেম্বর মাসের প্রথমভাগে শেষ হইলে জন আর্থার হার্বার্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তিনি পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দলের সদস্য। পূর্ব্বে, তিনি ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইনের এডিকং ছিলেন।

হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বিচারাধীন বন্দী মহাশয় কিরচাঁদের উপর ঔরঙ্গাবাদ সিভিল হাসপাতালে এপেণ্ডি-

সাইটিসের জন্য অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। তিনি অদ্য তথায় মারা গিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া হায়দরাবাদ জেলে ১২জন আর্য্য সত্যাগ্রহীর মৃত্যু হইল।

কুমারী সুজাতা সরকারের মৃত্যু সম্পর্কিত মামলায় জুরীরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। জুরীরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামী ডাঃ এস এন চ্যাটার্জ্জিকে দণ্ডবিধির ৩১৪।৩৪ ও ১২০(খ)।৩১২(১) ধারা অনুযায়ী, শ্রীমতী ঊষানলিনী ঘোষকে দণ্ডবিধির ১২০(খ)।৩১২(১) ধারা অনুযায়ী ও বারীন মুখার্জ্জিকে ৩১৪।৩৪ ধারা অনুযায়ী দোষী ও মণি ভট্টাচার্য্যকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন। গর্ভপাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে [১২০(খ)।৩১২(১)] ধারা সম্বন্ধে জজ এসেসর হিসাবে জুরীদের পৃথক পৃথক অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ডাঃ এস এন চ্যাটার্জ্জি ও ঊষানলিনী ঘোষকে দোষী এবং অপর আসামীদ্বয়কে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। আগামী বুধবার জজ রায় দিবেন।

বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুক্ত এস বাটলীওয়ালা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ৫ই এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত বাটলীওয়ালা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে "ভারত ও আসন্ন সংগ্রাম" সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন এবং ঐ বক্তৃতা সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়।

ইউনিভার্সিটি হলের উক্ত সভায় "ভারত ও আসন্ন সংগ্রাম" সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করায় ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার বিরুদ্ধেও রাজদ্রোহের অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আর একটি মামলা দায়ের করা হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ধর্ম্মের প্রফেসর স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইংলণ্ড হইতে গতকল্য বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, "সুদূর প্রাচ্য, ডানজিগ ও অন্যান্য স্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িতেছে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে।" আন্তর্জ্জাতিক জটিলতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতির আশংকাই যুদ্ধ আরম্ভে বাধা দিতেছে। শান্তির জন্য আগ্রহ নহে, যুদ্ধ ভীতিই আসল কথা। রণসজ্জার প্রতিযোগিতা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

পাটনায় বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বাদ দিয়া কার্য্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার পর ৯৬-১১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়নে আপত্তি জানাইবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কতিপয় সদস্য উক্ত অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সংশোধিত সর্ত্তাবলী সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করা হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য পুণায় দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের এক সম্মেলন হয়। প্রকাশ যে, রাজন্যবর্গের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা সেকথা পৃথক পৃথকভাবে সম্রাট-প্রতিনিধিকে জানাইবেন।

বাল্টিক সাগরে সোভিয়েট নৌবহরের মহড়া আরম্ভ হইয়াছে।

অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন (কংগ্রেস) ঢাকা পল্লী সাধারণ কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জে সি ঘোষ বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

১লা জুলাই—

লণ্ডনে ও প্যারিসে জোর গুজব যে, ডানজিগকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নাৎসী সরকার এক নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরিকল্পিত ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে পোল্যাণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। আগামী ২০শে জুলাই হের হিটলার কর্ত্তৃক স্বাধীন নগরী ডানজিগ পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আরম্ভ সূচিত হইবে।

আচার্য্য নরেন্দ্র দেব রোটকে পাঞ্জাব প্রাদেশিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য দিল্লী পৌঁছিলে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর এক নোটিশ জারী করিয়া তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া আচার্য্য দেব রোটক গমন করেন। রোটকে যখন তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে পুলিশ পাহারায় দিল্লী লইয়া আসিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার হরিজন পত্রিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন যে, কোন জনসভায় বা সাধারণ অনুষ্ঠানে যদি একজন লোকও আপত্তি করে, তবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা উচিত নহে। কেন-না উহার ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে পারে। "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত সম্বন্ধেও গান্ধীজী অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তৎ-সম্পর্কে অদ্যকার 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-দের প্রতি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

২রা জুলাই—

লণ্ডনে রাজনীতিক মহলের খবরে প্রকাশ যে, ডানজিগের নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলে সামরিক তোড়জোড় চলিতেছে, পোলিশ গবর্ণমেণ্ট ডানজিগ সেনেটের নিকট তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবেন। সকলের বিশ্বাস, জার্মানী হঠাৎ আক্রমণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে ডানজিগে পোল্যাণ্ডকে কোনঠাসা করিতে করিতে হটাইয়া দিবার পথ ধরিয়াছে। তবে পোলিশ গবর্ণমেণ্ট ডানজিগে তাঁহাদের অধিকার ছাড়িবেন না বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাইয়ে "ফরোয়ার্ড ব্লক" অফিসের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বসুকে ১০ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। শ্রীযুত বসু আজ মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করেন।

তামিলনাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সভায় স্থির হয় যে, তামিলনাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কে এস মাথুস্বামীকে ৫ বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বহিস্কৃত করা হইবে।

কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে যে, খিদিরপুরের আর্য-সমাজের ভূতপূর্ব চীফ্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সভাপতি রায় ওয়ারেংগল সেণ্ট্রাল জেলে গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায়ের নেতৃত্বে গত ১৯শে মার্চ বাঙলা হইতে প্রথম আর্য সত্যাগ্রহী দল হায়দরাবাদ যাত্রা করেন। তথায় সদলে গ্রেপ্তার হওয়ার পর হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ করার অপরাধে তাঁহারা ২৫ মাস কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

দ্বারভাঙ্গা জেলা কংগ্রেস কমিটির পরিচালকমণ্ডলী কতিপয় ব্যক্তির উপর কংগ্রেসের সদস্য হওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তিগণ গত জেলা বোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহারা পরে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

কটকে ভারতীয় খৃষ্টানদের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ এইচ, সি মুখার্জ্জি খৃষ্টানগণকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন।

আসাম তৈল কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়নের কয়েকজন শ্রমিক গতকল্য রাত্রে ডিগবয়ে কোম্পানীর সাধারণ অফিসের নিকটে রাস্তার উপর টহল দিতেছিল। ঐ সময় কতকগুলি গুণ্ডা মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে, তাহারা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগৎ-মোহন বর্ম্মণ ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পরে তাঁহাকে এক হাজার টাকার জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

৩রা জুলাই—

বোম্বাইয়ে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় স্যার আব্দুল হালিম গজনবীকে চারি বৎসরের জন্য লীগ হইতে বহিস্কৃত করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্ত উত্তর কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুত মণিবিষ্ণু-চৌধুরীকে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করার অভিযোগে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মাদ্রাজে 'দিনমণি' পত্রিকা কার্যালয়ে কর্মিগণ ধর্মঘট করে। উক্ত কার্যালয়ের সম্মুখে পিকেটিং করার অভিযোগে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্য মিঃ বি শ্রীনিবাসরাও এবং অপর ৯জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাহোর হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। ইহার ফলে দুইজন নিহত ও দুইজন গুরুতর আহত হইয়াছেন। আহতদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব পরিষদের সদস্য।

কমন্স সভায় ডানজিগ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়া মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ডানজিগের পরিস্থিতি সম্পর্কে পোলিশ ও ফরাসী সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। তিনি আরও জানান যে, জার্মান গবর্ণমেণ্ট পোলিশ সরকারের নিকট এক নোটিশ দিয়া জানাইয়াছেন যে, ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৮শে আগষ্টের মধ্যে জার্মান রণতরী কনিংসবুর্গ হইতে ডানজিগে পৌঁছিবে।

ডানজিগে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের জন্য একটি জরুরী আইন জারী করা হইয়াছে।

ডানজিগের নাৎসী নেতা হের ফুর্ষ্টার বৃটেন এবং তাহার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "আমরা জার্মানীতে ফিরিয়া যাইতে চাই। আমাদের নিকট হের হিটলারের একটি কথার দাম পৃথিবীর যুদ্ধাত্মক এবং মিথ্যা প্ররোচনা হইতে দশ হাজার গুণ বেশী।"

রঙ্গ-জগৎ

(৬২৬ পৃষ্ঠার পর)

পাধ্যায়; বলরাম—সন্তোষ মিত্র; [illegible]—শ্যামনারায়ণ; সূচীমুখ—কুমার মিত্র ও সংবাদী—[illegible] পাত্র।

* * * * *

আগামী শনিবার হইতে নিউ সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের নূতন হিন্দী ছবি "বড়দিদি" আরম্ভ হইবে। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিখ্যাত উপন্যাস "বড়দিদি" অবলম্বনে এই ছবিখানা তোলা হইয়াছে। শ্রীযুত অমর মল্লিক মহাশয় ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, জগদীশ, মেনকা, চন্দ্রাবতী, নিমো, কেদার, বিনয় গোস্বামী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। বড়দিদির বাঙলা সংস্করণ ছবিখানি দর্শকগণ কর্তৃক বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। হিন্দী সংস্করণও তদনুরূপ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৬ষ্ঠ বর্ষ। শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৬, Saturday, 1st July, 1939 [৩৩ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কঃ পন্থা—

বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আছে সবই, স্বদেশের সমস্যা আছে, বিদেশের সমস্যা আছে, যুদ্ধের সমস্যা আছে, শান্তির সমস্যা আছে; কিন্তু সমস্যার সমাধান কি, পথটা কি, সেই সম্বন্ধেই কোন কথা নাই। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন, দুই বৎসরের অধিক কাল হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধোঁকার টাটি খাড়া করা হইয়াছে, কিন্তু বিটিশ সরকারের মূলনীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহারা ভারতের জনমতকে দলিত করিয়াই চলিতেছেন এবং বিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য ভারতের কৃষকের ও ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থের অপহ্নব ঘটাইতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে মূল শক্তি রহিয়াছে। সে শক্তির ব্যত্যয় ঘটান যাইতেছে না এবং সেজন্য কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কর্ম্মতালিকা কোন কাজে আসিতেছে না। দেশের অবস্থা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমরা যদি দ্রুতপদে সম্মুখে না অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে অধঃপতন অনিবার্য্য। বিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র শাসন-প্রণালী ভারতের ঘাড়ে যখন চাপাইবেন তখন আমরা লড়াইতে নামিব, এমন ধারণা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জগতের অবস্থা যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ দেশের লোকের স্বার্থ এবং জগতের শান্তি ও স্বাধীনতার দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতাকে আজ বড় করিয়া দেখিতে হইবে এবং সেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সমস্যার বিশ্লেষণে কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ভারতের এই যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, তজ্জন্য উপায়টা অবলম্বন করিতে হইবে কি? রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলেন নাই। তিনি কেবল কংগ্রেসের ভিতরকার ঐক্যের উপরই জোর দিয়াছেন এবং কংগ্রেসের ভিতরে যে ভেদ-বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে তজ্জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের কথা এই যে, এই ভেদ-বিরোধ যদি সত্যই তেমন গুরুতর রকমে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিয়া থাকে তবে দক্ষিণ-পন্থীদের দ্বিধাজড়িত নীতির জন্যই উহা আসিয়াছে এবং তাঁহারা সাহসের সঙ্গে বৃহত্তর আদর্শের ভিত্তিতে একটা সংগ্রামমূলক কর্ম্মপন্থা দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করিতেছেন না বলিয়াই সেই সব তুচ্ছ জিনিষগুলো বড় হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণায় মানুষ তুচ্ছ স্বার্থের বিচার ভুলিয়া যায়—মানবতার একটা মহান উচ্ছ্বাস তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলোকে উপরের স্তরে তুলিয়া লয়। দক্ষিণ-পন্থীর দল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মোহজালকে ছিন্ন করিয়া যদি পূর্ণ স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রেরণাকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের ভিতরের খুটিনাটি লইয়া এই যে সব বিবাদ বিতর্ক—সেই মুহূর্ত্তে সে সবের নিরসন হইয়া যাইবে। এ সব আপদ অবীর্য্যেরই ফল; বৃহত্তর সাধনার বীর্য্যবত্তার স্পর্শে এই সব অবীর্য্য এবং অবসাদ নষ্ট হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পুতুলীর দিকে নজর রাখিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সত্যকার যে শক্তি তাহা জাগান সম্ভব হইতে পারে না। দক্ষিণপন্থীরা যদি সাহসের সঙ্গে আগাইয়া আসিতে পারেন, তবে দেশের নব জাগ্রত শক্তির সঙ্গে তাঁহারা যোগ রাখিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন; নহিলে নিজেদের জোটবাঁধা দলের হাতের মুঠার মধ্যে কংগ্রেসকে রাখিয়া মন্ত্রিগিরির মধুর টানে যদি তাঁহারা মশগুল থাকেন, কংগ্রেসকে তাঁহারা ধ্বংসের দিকেই লইয়া যাইবেন। বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের পক্ষে বাঙলার

অন্তরের কথা হইল ইহাই। দুই নৌকায় পা দিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না।

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সিদ্ধান্ত—

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। সমিতি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির যে সব প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হয়, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সে সব সংশোধন, প্রস্তাবই সমর্থন করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দক্ষিণপন্থী দলেরই জোর, সুতরাং মনস্কামনা তাঁহাদেরই সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, কোন কংগ্রেস সদস্যের নাম তিন মাস তালিকাভুক্ত থাকিলেই তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন, এই নিয়ম বদলাইয়া তিন মাসের বদলে ১ বৎসর করা হইয়াছে। বামপন্থিগণ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন, কিন্তু বিরুদ্ধতা টিকে নাই। আর একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেটি আরও গুরুতর রকমের। প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিলেন সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং। প্রস্তাবটি এই যে, শাসনকার্য্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রীদের মধ্যে কোন মতভেদ ঘটিলে পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নীতি-নিয়ন্ত্রণে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এ পর্যন্ত যে অধিকারটুকু ছিল, তাহাও নষ্ট করা হইল। বামপন্থীরা এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেন। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত এইরূপ ধারণা করিয়া লওয়া ভুল। সিমলায় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিবের মোড়লীতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা দরবার করিবার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পরিচালিত বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া নানা রকম আদেশ জারী করা হইতেছে। ১৪৪ ধারা, ১০৭ ধারা এবং ১০৮ ধারা জারীর ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছে। এ দ্রব্যের যে এই ফল আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বলিয়া বুঝাইবার পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল। ক্ষমতা হাতে পাইলেই সে ক্ষমতা সংযত করিবার শক্তি যদি জনসাধারণের হাতে না থাকে, তবে শাসনাধিকারী-দের দ্বারা তাহার অপপ্রয়োগ ঘটেই। কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া দেশসেবার জনাই কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব লইয়াছিলেন; কিন্তু এখন মন্ত্রিপদের ক্ষমতার মোহে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল নিজেদের স্বাঙ্গোপাঙ্গ ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের লইয়া এক একটা দল গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং কংগ্রেস কমিটির ক্ষমতা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ চালানই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রভাবিত কংগ্রেসীদের প্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে এবং আইন সভার বাহিরে কংগ্রেসের কাজ লোপ পাইয়াছে। বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিকে পিষ্ট করা হইতেছে। নিয়মতান্ত্রিকতার অনুকূল আবহাওয়া দেশের উপর আনিয়া ফেলা হইতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামের ভাব দমাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রস্তাবে মন্ত্রীদের সেই মনোভীষ্ট পরিপূর্ণ হইবার পক্ষে সকল বাধা দূর হইবে। জনগণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নীতির উপর একটুও থাকিবে না; জনমতের বিরুদ্ধতার ভয় হইতে তাঁহারা বিমুক্ত হইয়া নিয়মতান্ত্রিকতা-ঘেঁসা নীতি অবাধে চালাইবেন—ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নালিশের ভয়, সে ভয় তো নাই-ই—। ওয়ার্কিং কমিটি তো নিজেদের নীতিরই অনুমোদক। এই সব প্রস্তাব হইতেই বুঝা যায় যে, দক্ষিণী দলের কর্ত্তারা কংগ্রেসকে ষোল আনা নিজেদের জোটবাঁধা দলের হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া যাইবারই চেষ্টা করিতেছেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানস্বরূপে কংগ্রেসের শক্তি ইহাতে কতটা ক্ষুন্ন হইল তাঁহারা সে বিবেচনা করিতেছেন না। তাঁহারা কড়া হুকুম দিতেছেন কংগ্রেসের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইহা দরকার। যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, তোমরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাও। ডিক্টেটরী এই মনোবৃত্তি ক্রমেই দক্ষিণী দলের মধ্যে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। সুখের বিষয় এই-যে, এই ডিক্টেটরী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যের ভাব ক্রমেই প্রসার হইতেছে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বামপন্থীদের এই সংহতি শক্তি বৃদ্ধির সূচনার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বামপন্থীদের এই সংহতি শক্তিই—নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইবে, আমরা এই আশা করিতেছি।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট—

নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী—আসামের ডিগবয়ের তেলের খনির সাহেব মালিকরা হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে যে ৬৩জন শ্রমিক—তাহাদের আমরা কিছুতেই পুনরায় কাজে বহাল করিব না; শুধু তাহাই নয়, যে-সব নূতন লোককে আমরা কাজে নিযুক্ত করিয়াছি, ধর্ম্মঘটকারীদের কাজ দিবার জন্য আমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বরখাস্ত করিব না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্র-প্রসাদ আপোষের যে প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, কোম্পানীর বড় সাহেবেরা তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা যখন সাহেব লোক, তখন কালা আদমীদের কংগ্রেসকে ত মানেনেই না, আসাম সরকারকেও তাঁহারা থোড়াই কেয়ার করেন, এই তাঁহাদের মনের ভাব। সাহেব লোকদের চটাইয়া যাহারা ধর্ম্মঘট করিবার সাহস পায়, অভাব অভিযোগের কারণ তাহাদের যতই থাকুক না কেন, সেই সব কালা কুলীদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবেন, ইহাই তাঁহাদের সংকল্প। কিন্তু এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য এবং কংগ্রেস নীতি-প্রভাবিত আসাম সরকারেরই-বা কর্ত্তব্য কি? কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া এই নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন যে,—কোন ব্যবসায়ী কোম্পানী যত বৃহৎ এবং ক্ষমতাশালী হউক না কেন, জনমতের প্রভাব অথবা সরকারী কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই। কোম্পানী যদি কংগ্রেস সভাপতির প্রদত্ত প্রস্তাব মানিতে

অসম্মত হন, তাহা হইলে আসাম সরকারের কর্ত্তব্য হইবে সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্ত কোম্পানীকে মানিতে বাধ্য করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা এবং কোম্পানীকে সোজাসুজি এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, বর্ত্তমান ইজারা মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে তাহাদিগকে পুনরায় ইজারা না দিতে, তাঁহাদের বর্ত্তমান মতিগতিতে আসাম সরকারকে বাধ্য করিবে।' আমরা জানি না, ওয়ার্কিং কমিটির এই নির্দ্দেশ দানের পরও কোম্পানীর সাহেবদের চৈতন্য হইবে কি না এবং তাঁহারা দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন আপোষ-নিষ্পত্তিতে রাজী হইবেন কি না। যদি এখনও তাঁহারা রাজী না হন, এবং নিজেদের গাত্রচর্ম্মের কৌলিন্যের জোরে গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসাম সরকারের কর্ত্তব্য হইবে দৃঢ় নীতিতে অগ্রসর হওয়া—আইন করিয়া শ্রমিকদের বেতন, খাটুনীর সময় এবং কাজের সর্ত্ত সব বাঁধিয়া দেওয়া। সে ক্ষেত্রে আসাম সরকারের কর্ত্তব্য হইবে শ্রমিকদের উপর কোম্পানী যে-সব অবিচার করিয়াছে, আইন করিয়া সে-সব অবিচারের নিরসন করা এবং কোম্পানীর সাহেব লোকদিগকে সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাইয়া দেওয়া যে, আসাম সরকারের সেই সব সর্ত্ত এবং ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে তাঁহাদের যদি মর্জ্জি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত হইবে মানে মানে অন্যত্র নিজেদের পথ দেখা। বিদেশী পুঁজিপন্থীদের শোষণ-ভূমিস্বরূপে ভারতবর্ষ চিরকাল পড়িয়া থাকিবে না। দেশের লোকের স্বার্থ এখানে আগে, দেশের নিরন্ন দরিদ্র বুভুক্ষুর স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে আগে। সাহেব লোকদের তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যদি গোসা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া কিছু বেশী পরিমাণ গোস্ত গিলিতে পারেন।

সিংহলে ভারত বিদ্বেষ—

ব্রহ্ম হইতে ভারতের সম্পর্ক দিন দিন বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, ব্রহ্মীদের কাছে আজ ভারতবাসীরা পর। ব্রহ্মে ইংরেজের বসবাসের সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক বিধান নাই, কিন্তু বৈষম্য খাড়া করা হইয়াছে ভারতবাসীদের বেলায়। ইংরেজ যে সুবিধা ব্রহ্মে পাইবে, ভারতবাসীরা তাহা পাইবে না। সাত সমুদ্র তের নদী পারের ইংরেজ ব্রহ্মবাসীদের কাছে আপন; কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে যে ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিগত সম্পর্ক, সেই ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে অবাঞ্ছিত—তাহাদের বিরুদ্ধে বিতাড়ন-ব্যবস্থা। সিংহলেও সমান সমস্যা দেখা দিয়াছে। মহাবংশ, দীপ-বংশের নজীর তুলিয়া ঐতিহাসিকেরা দেখাইবেন সিংহলীদের সঙ্গে ভারতবাসীদের সম্পর্ক কেমন সুনিবিড়। সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার যোগ এখনও আছে, সেই বিজয়সিংহ-সঙ্ঘমিত্রার যুগ হইতে; কিন্তু এ সব কথা বলিলে হইবে কি? সিংহল সরকার দিন-মজুরীতে নিযুক্ত ভারতীয়দিগকে সিংহল হইতে বিতাড়নের প্রস্তাব করিয়াছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ-ক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বিষয়ের সম্পর্কে সিংহল কলম্বো যাত্রা করিতেছেন। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স জয়তিলক পণ্ডিত জওহরলালকে ইতিমধ্যে আমন্ত্রণও করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই আলোচনা সুফলপ্রসূ হইবে। কাঁচামাল ও অন্নবস্ত্রের জন্য সিংহলকে ভারতের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদের অন্তরে একটা বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করা সিংহল সরকারের নিজেদের স্বার্থের পক্ষেও যে সুবিধাজনক হইবে না, এই সত্যটি তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং একথাও বুঝাইয়া দিত হইবে, সিংহল সরকার যদি ভারতীয় বিতাড়ন নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতবাসী-দিগকে প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—পড়িয়া পড়িয়া যাহার যখন মর্জ্জি হইবে তাহার লাথি খাইবার জন্যই ভারতবাসীদের জন্ম হয় নাই।

কংগ্রেস ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন—

মহাত্মা গান্ধী "হরিজন" পত্রে বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—'তারপর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা ধরুন। আমার এখনও এই বিশ্বাস যে, কংগ্রেস এই সম্পর্কে যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আমরা তৎপ্রতি সুবিচার করিতে পারি নাই। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গবর্ণরেরা মোটের উপর ভালভাবেই চলিয়াছেন। মন্ত্রীদের কাজে তাঁহাদের দিক হইতে বাধা খুব কমই আসিয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীদের কাজে কখনও কখনও উদ্বেগজনক বাধা আসিয়াছে কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতেই। কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখন মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত তখন সেক্ষেত্রে জনসাধারণের হিংসাত্মক বিক্ষোভ না ঘটা উচিত ছিল। মন্ত্রীদের উৎসাহ উদ্যমের অনেকখানিই বিরোধী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের দাবীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই কাটিয়া গিয়াছে। মন্ত্রীরা যদি অপ্রিয় হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করা যাইতে পারে; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে কাজ চালাইতে দেওয়া হইয়াছে, অথচ কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে তাঁহারা কার্য্যকরভাবে সহযোগিতা লাভ করেন নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রতি এই যে দরদ গান্ধীজী এবং তাঁহাদের দলের পক্ষে তাহা নূতন নহে এবং এক্ষেত্রে যত দোষ দেশের লোকদেরই যে, একথাও আমরা নূতন শুনিতেছি না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রীরা কংগ্রেসের নীতির দিক হইতে এই দায়িত্ব যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেভাবে তাঁহারা দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন কতটুকু। গবর্ণরের নিকট হইতে বাধা আসিবার কথাটা বড় নহে; কারণ সে বাধা আসা না আসা মন্ত্রীদের কাজের উপর নির্ভর করে। মন্ত্রীরা যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করার সেই মূল নীতি আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যই যদি তাঁহারা অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে বাধা কেমন আসিত না আসিত, তখন তাহা বুঝা যাইত। মন্ত্রীরা সে পথে যান নাই; তাঁহারা কার্য্যত আমলাতান্ত্রিক নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। শান্তির নামে, আইন রক্ষার নামে গণ-আন্দোলনকে দাবাইতে কসুর তাঁহারা করেন নাই। জনগণের অধিকারকে সঙ্কোচ তাঁহারা করিয়াছেন,

কৃষক, শ্রমিকদিগকে যথারীতি দমন পীড়নও করিয়াছেন এবং তাহাদের আন্দোলন দমাইতে গুলী পর্য্যন্তও চালাইয়াছেন। এই মনোবৃত্তির ফলেই জনগণের তরফ হইতে বাধা আসিয়াছে —জনসাধারণ চায় ব্যাপক অধিকার, বৃহত্তর স্বাধীনতা—মন্ত্রীরা সেই দাবী মিটাইতে অক্ষম হইয়াছেন এবং আমলাতন্ত্রের নীতির সংগে আপোষ করিবার মতি-গতিতেই প্রভাবিত হইয়াছেন। কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফ হইতে কংগ্রেসী মন্ত্রী-দের কাজে কেন বাধা আসিয়াছে, তাহার কারণ এই দিক হইতে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় মন্ত্রীদের হাতে যে অধিকার আছে, সেই অধিকারকেই বড় করিয়া দেখিতে হইলে এই যে সংকট ইহা দেখা দিবেই ; কারণ দেশের লোক ঐ সব অধিকারের গন্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়িতে প্রস্তুত নয়। তাহারা ঐগুলি তুচ্ছ মনে করে। মন্ত্রিত্বের মোহ মন্ত্রিত্বগত অধিকারের এই তুচ্ছতাকে যখন বিস্মৃত করাইয়াছে তখনই মন্ত্রীরা দেশের অন্তরের যোগসূত্র হইতে ছিন্ন হইয়াছেন; ইহাই স্বাভাবিক। দোষ দেশের লোকের নয়—দোষ হইল মন্ত্রীগিরির মোহের। দেশের জনগণের শক্তিতে কংগ্রেসকে বলবত্তর করিতে হইলে কংগ্রেসের এই মন্ত্রিত্ব-সম্পর্কিত নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। মন্ত্রীগিরি লইয়া পুতু পুতু করা চলিবে না। সোজা কথা হইল ইহাই।

স্যার আশুতোষের জন্ম-বার্ষিকী—

২৯শে জুন, বৃহস্পতিবার স্যার আশুতোষের জন্ম-বার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, ৪ঠা জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলিবে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে বাঙলার সর্ব্বত্র এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করি। স্যার আশুতোষ ছিলেন পুরুষ সিংহ। বাঙালী জাতির জন্য, বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙলা ভাষার জন্য তাঁহার যে অবদান—তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সাধনা এবং বঙ্গ ভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার মহান্ ব্রতের উদ্‌যাপনেই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। মহদাদর্শের একনিষ্ঠ সাধনায় আত্মদাতার অমরত্বের তিনি অধিকারী। বাঙলায় আজ সংকটের যুগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পবিত্র অংগনেও আজ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উপ-দ্রবের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্যার আশুতোষ সিংহ-বিক্রমে সংগ্রাম করিয়া জীবন-পাত করিয়াছেন,—আজ উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করিতে এবং বাণীর বরপুত্রদিগকে বিদ্যা-নিকেতন হইতে বিতাড়িত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার মধ্যযুগীয় অনাচার সেখানে সম্প্রসারিত করিতে। এই সংকটে স্যার আশুতোষের স্মৃতি জাতির শুভ সংকল্প-শক্তিকে দৃঢ় করিয়া তুলুক। অনাচারের বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে সংগ্রাম করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করুক দেশবাসী স্যার আশুতোষের শক্তিময় জীবন-সাধনা হইতে। আমরা বাঙলার এই বিজয়ী বঙ্গ সন্তানের স্মৃতিতে আজ আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সিরাজদ্দৌল্লা স্মৃতি-দিবস—

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি-দিবস প্রতিপালনের আয়োজন হইয়াছে। সিরাজদ্দৌল্লা যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই আদর্শটি যদি এতদ্দ্বারা দেশের লোকের নিকট উদ্দীপ্ত হয়, তবে খুবই আশার কথা। কিন্তু আসল কথা হইতেছে সেই আদর্শের উপলব্ধি। সিরাজদ্দৌল্লার আদর্শ কি ছিল? তাঁহার আদর্শ ছিল বাঙলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন তখনই সত্য হইবে, যখন আমাদের আন্তরিকতা থাকিবে স্বদেশের সেই বৃহত্তর স্বার্থের দিকে এবং একথাও সত্য যে, সেই আদর্শের অনুভূতি যতটা তীব্র হইবে আমাদের মধ্যে ততটা দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া যাহারা বিদেশীর স্বার্থেরই সেবা করিতেছে, তাহাদের কার্য্যে আমাদের অন্তরে বিক্ষোভ। সিরাজদ্দৌল্লার যে আদর্শ—সে আদর্শের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই—হিন্দুর বিচার, মুসলমানের বিচার নাই, আছে বাঙালীর বৃহত্তর অধিকারেরই বিচার। হিন্দুর বিচার, মুসলমানের বিচার—সাম্প্রদায়িকতার এই দৃষ্টি যেখানে, সেখানেই বিদেশীর বৃহত্তর স্বার্থের পরিপুষ্টি। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতির পূজা করিবার অধিকারী শুধু তাঁহারাই, যাঁহাদের অন্তরে দেশের স্বার্থের এই বৃহত্তর অনুভূতিটি আছে এবং আছে বিদেশীয় প্রভুত্বকে প্রতিহত করিবার জন্য সত্যকার প্রেরণা। নিজেদের পদ এবং মান ও মর্য্যাদার সুবিধায় যাঁহারা দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া সাম্প্রদায়িক বুজরুকী চালাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মীরজাফর এবং উমিচাঁদেরই উত্তর-সাধক। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে—আছে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের, কিন্তু নাই মীরজাফর-উমিচাঁদের নীতির অনুসরণ-কারী সেই সব ভণ্ডদের। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি-পূজা যেন এই সব ভণ্ড স্বার্থসন্ধী এবং স্বার্থসেবীদের সংস্পর্শে কলঙ্কিত না হয়, দেশবাসীকে আমরা এই দিকে অবহিত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা সতর্ক থাকিতে বলি-তেছি,—যাঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য সিরাজদ্দৌল্লার মহিমার কথা আওড়ায় অথচ সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্রের উপর বিদেশীরা যে গ্লানি আরোপ করিয়া রাখিয়াছে—গড়িয়া রাখিয়াছে সিরাজদ্দৌল্লার মিথ্যা গ্লানির মর্ম্মর রূপ—সেই অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভকে অপসারিত করিবার কথা তুলিলেই কাঁচুমাচু করিয়া— এখন নয় এখন নয়, এই ধরণের কথা বলে—তাহাদেরই সম্বন্ধে। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি-পূজার পবিত্র প্রাঙ্গণে এই সব ভণ্ড এবং দুর্ব্বলচেতা পরভাগ্যোপ-জীবীদের প্রবেশাধিকার যেন না থাকে। সাম্প্রদায়িকতার দোহাই তুলিয়া যাহারা দেশের স্বাধীনতার অন্তরায় ঘটাইতেছে

—বাঙলার যে শেষ নবাব স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ত ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি পূজার অধিকার তাহাদের নাই, মীরজাফর বা উমিচাঁদই তাহাদের আরাধ্য দেবতা।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ—

গত ২৭শে জুন পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রয়াণ-শত-বার্ষিকী পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজা রণজিৎ সিংহের জীবন প্রকৃত বীরের জীবন এবং উৎসাহসমন্বিত কর্ম্মীর জীবন। অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন মহারাজা রণজিৎ সিংহ। ভারতের ইতিহাসে যাঁহারা ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার রাজনীতিক চাতুর্য্য এবং রণনীতিজ্ঞতা একদিন ভারতে প্রতিষ্ঠাপর ব্রিটিশ জাতিকেও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবাসীদের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম রণনীতি-কুশল পুরুষের উদ্ভব অসম্ভব নয়; ইংরেজ তখনই প্রথম সশঙ্ক অন্তরে এই সত্যকে উপলব্ধি করে। মহারাজা রণজিৎ সিংহের যখন আবির্ভাব ঘটে, তখন ভারত-ভূমির বুকের উপর দিয়া একটা অরাজকতার ঝঞ্চা যেন বহিয়া যাইতেছিল সর্ব্বত্র অব্যবস্থিত অবস্থা। একের পতন, অপরের অভ্যুত্থান। মোগল শক্তির পতনে দেশের বুকে বড় রকমের একটা পরি-বর্ত্তনের সম্ভাবনা সন্ধুক্ষিত হইতেছিল। জ্যোতিষ্কের মত ভারতের আকাশে জাগিয়া উঠিলেন মহারাজা রণজিৎ সিং। ৪০ বৎসরের মধ্যে তিনি পাঞ্জাবে একটি সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজত্ব গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বাহুবীর্য্যে পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপদ্রবকারী দলও শান্ত হইল। আফগানিস্থান পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য সীমা বিস্তৃত হইল। ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া পাঞ্জাবে একদিন এই যে সৃষ্টি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, সুব্যবস্থিত কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তাহা স্থায়ী আকার ধরিতে পারে নাই, ইহা সত্য। এবং ইহাও ঠিক যে, ভারতে এই বস্তুটিরও অভাব স্মরণাতীতকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এখানে ব্যক্তি জাগিয়াছে; কিন্তু জাতি জাগে নাই। এখানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হইয়াছে—না হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতি সে সংগ্রামের পশ্চাতে ব্যাপক রকম অনুপ্রেরণা জাগায় নাই। মহারাজা রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে যে বীরত্ব, যে প্রতিভা এবং যে দেশানুরাগের একদিন বিকাশ ঘটিয়াছিল, আজ তাহাকে জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিতে হইবে; জাগাইতে হইবে সমষ্টি-চেতনা। বীরের স্মৃতি-পূজা করিতে গিয়া যদি এই সত্যটি আমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই সে পূজা সার্থক হইবে। সাধকের সাধনা সার্থক হইয়া উঠিবে শত বর্ষ পরে।

বঙ্গে মোস্লেম রাজত্ব—

খোলাখুলি মনের ভাব প্রকাশ করা আমরা ভাল মনে করি, সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোয়ালিশন দলের নেতা খান বাহাদুর আব্দুল করীম এইরূপ খোলাখুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—বাঙলা দেশে মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হইল আমাদের লক্ষ্য। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও আমাদের হাতেই প্রভুত্ব ছিল, ঐ বৎসর ইংরেজেরা মুসলমানদের নিকট হইতে বাঙলা দেশের শাসনভার 'দেওয়ানী' লয়। শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহারা সেই অধিকার দেশের লোকের হাতে ফিরাইয়া দিতেছেন। মুসলমানদের ইহা ন্যায্য প্রাপ্য, এবং তখন যেমন অবস্থা ছিল, সেই অবস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করাই স্বাভাবিক।" খুব সুন্দর কথা; কিন্তু ইংরেজেরা কেন এই অধিকার ফিরাইয়া দিতেছে খান বাহাদুর তাহা তলাইয়া দেখিয়াছেন কি, যাহারা সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে দেশের অধিকারের বিচার করিয়াছেন, তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, ইংরেজদের এই অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার মূলে অপর সম্প্রদায়ের অবদান কতখানি এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ভিতর দিয়া যে সাম্প্রদায়িকতার পত্তন করা হইতেছে, তাহাতে কলিকাতার অধিবাসীদের অধিকারের ন্যায্যতা কতটা রক্ষিত হইতেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়া-পুত্তলিকারূপে দেশের স্বাধীনতার মূলীভূত সংহতি শক্তিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে দেশের লোকের অধিকারের কথা শোভা পায় না। তাঁহারা এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থমূলক ভেদনীতির দ্বারা বিদেশীর প্রভুত্বকেই কায়েম করিতেছেন। মীরজাফর এবং উমিচাঁদ প্রকৃতপক্ষে ইহাই করিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের যাঁহারা জিগীর তুলিতেছেন, খোঁজ লইলে দেখা যাইবে সেখানে কাজ করিতেছে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত হীন স্বার্থই, অন্য কিছু নয়।

ভবিষ্য-সংগ্রাম—

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিতেছেন, স্বাধীনতা যাহাতে লাভ হয়, অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে; ওদিকে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কংগ্রেসকর্ম্মী এবং কংগ্রেস পন্থীদের সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন,—"আমরা যখন শাসনযন্ত্র হাতে পাইয়াছি, এখন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই আমাদের উচিত। কোন মডারেট নেতা একথা বলিলে শোভা পাইত, একথা মডারেট ধরণেরই কথা; কিন্তু যে কংগ্রেস শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে, এমন সঙ্কল্পই গ্রহণ করিয়াছে, সেই কংগ্রেসী নেতার মুখে কংগ্রেসের বৈঠকে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের সরকারীভাবে এমন কথা বলিতে এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই; কিন্তু দক্ষিণ-পন্থী দলের যে নীতি এতদিন সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিতেছিল, আজ অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মহাত্মা গান্ধী দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ ভারতেও সত্যাগ্রহ করিবার নীতি এখন ক্রমেই তিনি যেরূপ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক স্তরে

তুলিয়েছেন, তাহাতে মর্ত্যদেহধারীর পক্ষে এই মরজগতে সত্যাগ্রহ করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। দেহাতীত অবস্থায় উঠিয়া ত্রৈগুণ্যের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অনাবিল অহিংস জ্যোতির বিকাশে অপরের অন্তরের বৈষম্য-বিরোধের ভাবকে দূর করিয়া তাহাকে নিজের সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা—সত্যাগ্রহের এই যে সাধনা, এমন সাধনার ব্যবহারিক রাজনীতিক দিক হইতে সিদ্ধি মহাত্মাজীর নিজের পরিচালনাতে ভারতে কোন দিনই হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীনতার উপাসনা হইবে কোন পথে—কোন্ নীতি ধরিয়া দেশের লোকেরা অগ্রসর হইবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্তুষ্টি সাধনের নীতিই কি সেই নীতি, তাহাদের সঙ্গে আপোষের নীতিই একমাত্র নীতি, নিজেদের অসহায়ত্বকে একান্ত করিয়া তুলিয়া পরমুখাপেক্ষিতা [illegible] তার পরেই কি দেশ [illegible] সাম্প্রদায়িকতার নামে [illegible] দেশকে ছাইয়া ফেলিবে, প্রশ্ন হইতেছে ইহাই। কোন পথে গতি, দেশকে তাহা ঠিক করিতে হইবে। বাগ্মিত্বের মোহে ভুলিলে চলিবে না।

আইন রক্ষায় আগ্রহ—

রাজদ্রোহ আইনের প্রয়োগে সংবাদপত্রের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং তাহার ফলে আইনের কি ভাবে অপ-প্রয়োগ ঘটিতেছে, পর পর কয়েকটি মামলায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন বিধিটি শাসকদের হাতে একটি জবর হাতিয়ার। জনআন্দোলনকে দলন দমন করিবার পক্ষে এমন জোরাল হাতিয়ার খুব কমই আছে। এই অস্ত্রের অপ-প্রয়োগ কি আন্দাজ উদ্ভট রকমে হইতেছে—একটি মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ধর্ম্মদাস চৌধুরী বর্দ্ধমানের একজন কর্ম্মী। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হয় যে, তিনি ভয় দেখাইয়া সরকারী খাজনা না দিতে বাধ্য করিয়াছেন। অনেকেই জানেন, বর্দ্ধমানের ক্যানাল করের হার কমাইবার জন্য প্রজাদের পক্ষ হইতে একটি আন্দোলন চলিতেছে। ৫৲ টাকা হইতে ঐ কর কমাইয়া দেড় টাকা করা হউক, প্রজা পক্ষের এই দাবী। বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে এই মামলায় ধর্ম্মদাসবাবু ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, বর্দ্ধমানের দায়রা আদালতে আপীলের ফলেও ঐ দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। হাইকোর্টে এই মামলার আপীলে বিচারপতিগণ তাঁহাকে বেকসুর মুক্তি দান করিয়াছেন। বিচারপতি মিঃ হেণ্ডারসন এবং খোন্দকার তাঁহাদের রায়ে বলেন যে, আসামীর পক্ষে প্রজাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করার কোন কারণ ছিল না, সরকারী হারে খাজনা দিবার ইচ্ছা যে কোন প্রজারই ছিল না, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আসামীর যে উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া মামলা আনা হয় তাহা এই যে, তিনি প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যদি খাজনা দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সে কাজের ফল ভাল হইবে না। এই কথায় এমন কিছু প্রতিপন্ন হয় না যে, আসামী লোককে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করিবার যেখানে অভিযোগ সেখানে কথা এবং কাজের ভাষ্য করিতে আটকায় না। দুই দফা আপীলেও দণ্ড বহাল থাকায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শান্তি ও আইন রক্ষার এই অতিরিক্ত আগ্রহে এক ভদ্রলোকের অদৃষ্টে এই যে অযথা বিড়ম্বনা ঘটিল, ইহার জন্য দায়ী কে? বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? ক্ষমতায় মদান্ধ হইয়া তাঁহারা এমন ব্যাপারকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের তেমন কার্য্যে জনগণের অন্তরের প্রতিক্রিয়ার আঘাত একদিন তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িবেই।

তামাক (TOBACCO)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(১)

ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার খুব বেশীদিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই লোকের নেশা ধরিয়াছে, অর্থাৎ ভারতে যত তামাক চাষ হয়, তাহার অধিকাংশই ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া ফেলে; বাজার ধরিয়াছে, অর্থাৎ ইহার প্রচুর রপ্তানি আছে, এবং চেষ্টা করিলে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

ব্যবহারের ইতিহাস

কতকাল হইতে আমেরিকার জঙ্গলে তামাক জন্মিত এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাহা ব্যবহার করিত, আজ আর তাহা বলা সম্ভব নহে; তবে অধুনা সভ্য জগতের পরিচয় ১৪৯২ সালে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে। কলম্বসের সঙ্গীরা আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তামাকের ব্যবহার দেখিতে পায় এবং তথা হইতে ইউরোপে তামাক আনীত হয়। আন্দাজ ১৫১৮ সালে Oviedo স্পেনে তামাকের পাতা লইয়া আসেন; পরে ১৫৩৯ সালে Hernandez ইউরোপে তামাকের বীজ লইয়া আসেন। Jean Nicot পর্তুগালে ফরাসী রাজদূত ছিলেন এবং ১৫৬০ সাল নাগাদ তিনি সেখানে তামাকের চাষ দেখিতে পান এবং স্বদেশে বীজ পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নাম হইতে তামাকের নাম "নিকোটিন" হইয়াছে।

হ্যারিয়ট (Thomas Hariot) ইংলণ্ডে প্রথম তামাক আমদানী করেন; কিন্তু ড্রেক (Sir Francis Drake) ফিরিয়া আসিবার পর, ড্রেক, র‍্যালে (Sir Walter Raleigh) প্রভৃতি কর্তৃক তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে নূতন কর, পাদ্রীদের আপত্তি, নানারূপে আন্দোলন দ্বারা তামাকের প্রসার রোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হয় না, ক্রমে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে তামাকের ব্যবহার অতি দ্রুতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ভারতে আমদানী

পর্তুগীজদের কৃপায় ভারতে এই বিষের প্রথম আমদানী হইয়াছিল। আন্দাজ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তামাকের চাষ সুরু হয়; ক্রমে তাহা ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তামাক সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভাল না হওয়ায় উত্তর ভারত পর্যন্ত তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইতে প্রায় একশত বৎসর লাগিয়া যায়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে তামাক চাষ আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য স্থানেও চাষের নানারূপ পরীক্ষা চলিতে থাকে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে গুর্জরের চাষ সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ভারতবর্ষে তামাক চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া সম্ভব।

বলা বাহুল্য এ দেশেও তামাকের বিপক্ষতা করিবার লোকের অভাব ছিল না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া তামাকের ব্যবহার প্রসারলাভ করে। আকবর বাদসাহের জন্য যখন "ছিলিম" প্রস্তুত হইয়া আসে তখন তাঁহার বৈদ্য বন্ধুরা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। পরে জাহাঙ্গীর ১৬১৭ সালে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও নানারূপে তামাক ব্যবহার কি ভাবে ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

পরিচয়

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ৪১ রকম তামাকের গাছের সন্ধান মিলিয়াছে, অবশ্য চাষের জন্য সকলগুলি কাজে লাগে না। ইহার মধ্যে অধিকাংশগুলিই আমেরিকায় জন্মিয়াছে; ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন জাতির তামাক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যোপযোগী তামাকের কথা ধরিতে গেলে তিন চার রকমের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তামাকের আবার বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় চুরুট, চুরুটের নানা অংশ, সিগারেটের মশলা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল, হাওয়া, মাটি প্রভৃতি নানা কারণের জন্য তামাকের নানা গুণের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

তামাকে একপ্রকার বায়ী তৈল এবং নিকোটিন নামে উত্তেজক পদার্থ থাকে। এই দুইটি কারণে তামাকের আদর। সাধারণত সকল পাতাতেই এই দুই বস্তু কম বেশী পরিমাণে থাকে এবং তাহা হইতেই তামাকের নিজস্ব গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ছাড়া বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এই গুণ এবং গন্ধ হ্রাস বৃদ্ধি এবং মৃদু উগ্র করিতে পারা যায়, এবং যাহারা এই কার্যে দক্ষ তাহাদের তামাক অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চাষ

ভারতবর্ষে প্রধানত শ্রাবণ ভাদ্র এমন কি আশ্বিন মাস পর্যন্ত তামাকের "বীজতলা" প্রস্তুত করিয়া প্রায় একমাসকাল গাছগুলিকে বড় হইতে দেওয়া হয়। তামাকের বীজ আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ইহার আবরণ অত্যন্ত কঠিন। অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধার জন্য দানাগুলি কোনও খসখসে স্থানে কিম্বা বালি বা গুঁড়া পাথরের সহিত ঘষিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। গাছগুলি স্থানান্তরে রোপণ করিবার উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ, তিন হইতে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হইলে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আন্দাজ দুই হাত অন্তর পুঁতিয়া দেয়। গাছের মূলে মাটি দিয়া আইল করিয়া জল দিবার সুযোগ করিয়া দেয়। গাছগুলি বড় হইলে এবং "ফুল আসিবার" উপযুক্ত হইলে উপর হইতে কুঁড়ি এবং নিম্নভাগের পুরাতন পাতাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। যাহাতে ডাল পাতা ভাঙ্গার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় গাছের রস বাহির হইয়া না যায়, সে কারণে চাষীরা ভাঙ্গা স্থানগুলিকে মিহি চূর্ণ মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। যখন পাতাগুলি স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে এবং স্পর্শে সামান্য আঠালভাব পাওয়া যায়, তখন

উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া কেহ কেহ সমস্ত গাছটি কাটিয়া ফেলে, কেহ কেহ বা পাতাগুলি বৃক্ষকাণ্ড হইতে তুলিয়া লয়।

তামাক প্রস্তুত প্রণালী

তামাক পাতা তুলিয়া লইলেই সকলপ্রকার ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না; নানা প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার সুগন্ধ ও ধুমের স্বাদ লাভ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে curing বলে এবং তামাক ব্যবসায়ীর পক্ষে এই জ্ঞান সম্যক্ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

তামাক পাতা বা গাছ উঠাইয়া আনিয়া একটি প্রশস্ত ঘরে বাঁশ প্রভৃতি কোনও কাঠের আলনার মধ্যে ঝুলাইয়া শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। প্রথম দুই তিন দিন আলনার মধ্যে ব্যবহৃত কাঠগুলি আন্দাজ তিন ফুট অন্তর রাখিয়া দেয় এবং যতদিন না মধ্যের ডাঁটা এবং শিরগুলি শুষ্ক হইয়া উঠে, ততদিন ঐভাবে রাখে। পারিপার্শ্বিক বায়ুর তাপের উপর এই কাল ১৫ দিন হইতে আরও অধিক সময় লাগিয়া যায়। শীঘ্র শুকাইয়া না গেলে পাতার রঙ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

তখন এই পাতাগুলি স্থানে স্থানে স্তূপাকারে জমাইয়া গাঁজাইতে বা মাতাইতে (fermentation) দেওয়া হয়। এই সময় পাতাগুলি পাশাপাশিভাবে চেপ্টান করিয়া সোজা হয়, যাহাতে খুলিলে পাতাগুলি সমানভাবেই পাওয়া যায়।

পাতাগুলির মধ্যে রস গাঁজিয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন; কেবল তামাক পাতার গন্ধ অত্যন্ত কটু; সুতরাং এই প্রক্রিয়া দ্বারা তামাক 'প্রস্তুত' করিতে না পারিলে, কোনই কাজে লাগার সম্ভাবনা নাই। অনেকে মনে করেন, তামাকপাতা স্তূপাকারে থাকার ফলে যে অত্যধিক তাপ সৃষ্টি হয়, তাহাতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া পাতার মধ্যে যে নূতন রস সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই তামাকের নূতন গন্ধের কারণ। এই ক্রিয়া অনেকে মনে করেন বিশেষ জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ তামাকপাতার স্বতন্ত্র জীবাণু আছে।

কোনও কোনও স্থানে আগুনের তাপ দ্বারা পাতা শুষ্ক করিবার পদ্ধতি আছে। কয়েকদিন ঘরে থাকিবার পর পাতাগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে ঐ ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার উপরে ধীরে ধীরে পাতাগুলি শুকাইয়া লইবার চেষ্টা করে। এইভাবে শুষ্ক করিতে কয়দিন কাটিয়া যায়। কেহ কেহ কয়দিন বাদে পুনরায় আগুনের তাপে শুষ্ক করিয়া লয়। তাহার পর ইহাকে গুণানুযায়ী নানা ভাগে বিভক্ত করে। এই অবস্থায় গাদা বা ঢিপিগুলি বাতাস চলাচলের সুযোগপূর্ণ এবং তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও আর্দ্রতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী ঘরে আরও কয়দিন থাকিবার পর ব্যবহারের উপযোগী গুণ ও গন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। কোনও কোনও তামাকপাতা দুই তিন বৎসর পর্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিবার পর, বিশেষ সমাদরের সহিত বিক্রীত ও ক্রীত হইয়া থাকে।

ব্যবহারের উপযোগী তামাক প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী দেওয়া হইল, প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা ভেদে তাহার নানা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এ বিষয়েতে পারদর্শী, তাঁহাদের পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ তত বেশী।

ভারতের চাষ

তামাক এখন ভারতের এক প্রয়োজনীয় পণ্য, এখন রপ্তানির পরিমাণ তিন কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। জগতে যত দেশে তামাক জন্মায় কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতের স্থান প্রথম ছিল। এখন আমেরিকা প্রথম; ভারতের স্থান তৃতীয়।

করদরাজ্য লইয়া ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে; ফলনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১১ হাজার টন।

করদরাজ্যের জমির পরিমাণ আন্দাজ দেড় লক্ষ একর, মোট জমির শতকরা ১০·৯ আর ফলনের বেলায় ২৯ হাজার টন, বা শতকরা ৫·৬ ভাগ। জমির তুলনায় বৃটিশ ভারতে ফলনের পরিমাণ খুব বেশী, অর্থাৎ শতকরা ৮৯·১ ভাগ জমিতে (মোট পরিমাণ ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার একর) ৯৪·৪% (মোট পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টন) তামাক পাতা পাওয়া যায়। পরিশিষ্ট (ক) হইতে সমস্ত অংক স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী তামাক চাষ হয়; অর্থাৎ মোট জমির সিকির সামান্য কম এবং মোট ফলনের সিকির বেশী। ফলনের পরিমাণ হিসাবে, বাঙলার পরে মদ্র, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, পঞ্চনদ প্রভৃতি স্থান। করদরাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ প্রধান, বরদা এবং মহীশূরের স্থান তাহার পরে।

বাঙলাদেশের মধ্যে জেলা হিসাবে রংপুরের স্থান সর্বপ্রধান; এমন কি সমস্ত তামাক চাষের জমির তিন ভাগের দুই ভাগ একা রংপুরে আছে; অর্থাৎ তিন লক্ষ তেরো হাজার একরের মধ্যে রংপুরের অংশ দুই লক্ষ একরের বেশী। পরে পরে জলপাইগুড়ি (মাত্র ২১ হাজার একর), ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী, ত্রিপুরা প্রভৃতির স্থান।

মদ্রের ২ লক্ষ ৯৭ হাজার একরের মধ্যে গণ্টুর জেলাতেই আন্দাজ অর্ধেক জমি পড়ে, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর। পরেই ভিজাগপটম (মাত্র ৫০ হাজার একর); তাহার পর কইম্বাটুর, পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, ত্রিচিনপল্লী, সালেম, অনন্তপুর, কৃষ্ণা, কর্নুল প্রভৃতি জেলার স্থান.

মদ্র ছাড়িয়া দিলে জমির পরিমাণ হিসাবে বিহারের এবং ফলনের অনুপাত হিসাবে যুক্তপ্রদেশের স্থান পড়ে। বিহারে তিনটি জেলা, যথা পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর ও দ্বারবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

যুক্তপ্রদেশে ফরাক্কাবাদ, এটা মৈনপুরী, বুলন্দসহর, মীরাট, বুলন্দসহর প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য চাষ হয়।

বোম্বাই প্রদেশে কয়রা, বেলগাঁ, সেতারা, আহম্মদাবাদ, সোলাপুর, বিজাপুর এবং পঞ্চনদে সিয়ালকোট, জলন্দর, লায়ালপুর, গুজরাট, ঝণ্ণ জেলায় কম বেশ চাষ হইয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যান্য সকল প্রদেশের আরও প্রায় সকল জেলায় কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা ব্যতীত অন্য লাভ নাই।

পৃথিবীর তামাক চাষ

পূর্বেই বলিয়াছি, আমেরিকায় চাষ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক; তাহার পরই চীনের স্থান। সারা পৃথিবীতে আন্দাজ ২৭ লক্ষ টন তামাক জন্মে; তন্মধ্যে আমেরিকায় প্রায় সাত লক্ষ টন হয়। তাহার পর চীন, এবং তাহার পর ভারতবর্ষের স্থান। রুশ, ব্রেজিল, গ্রীস, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশেও তামাক চাষ হয়, অবশ্য ইহার মধ্যে রুশের স্থান প্রধান; (পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য)।

আমেরিকার মধ্যে মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, কেন্টকী, উত্তর ক্যারোলিনা, উইসকনসিন, ওহিও প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চাষ হয়; কিউবার হাভানা ও সান্টাক্লারা, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, জাভা এবং ফিলিপাইনের মধ্যে কাগেয়ান পাতা প্রসিদ্ধ।

পরিশিষ্ট (ক)

মোট জমি	১২,৮৮,০০০ একর		
বৃটিশ ভারত	১১,৪৭,০০০	„	৮৯·১%
করদ রাজ্য	১,৪১,০০০	„	১০·৯%
মোটফলন	৫,১১,০০০ টন		
বৃটিশ ভারত	৪,৮২,০০০	„	৯৪·৪%
করদ রাজ্য	২৯,০০০	„	৫·৪%

ব্রিটিশ ভারত—

	জমি হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
বাঙলা	৩১৩	২৪·৩	১৩০	২৫·৪
মদ্র	২৯৪	২২·৮	১২৫	২৪·৪
যুক্তপ্রদেশ	৮৮	৬·৯	৬৩	১২·৩
বিহার	১২৫	৯·৭	৫২	১০·১
বোম্বাই	১৭০	১৩·২	৪৪	৮·৬
পঞ্চনদ	৭১	৫·৫	২৯	৫·৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৬	২·০১	১৬	৩·১
উড়িষ্যা	৩৮	২·৫	১১	২·১
আসাম	১২	—	৬	১·১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১:	—	৪	—
সিন্ধু	৫	-	২	—
করদ রাজ্য—				
হায়দরাবাদ	৬৩	৪·৮	১৭	৩ ৫
বরদা	৫৩	৪·১	৯	১ ৭
মহীশূর	২৪	২·০	৩	·৬
খয়েরপুর	১	—	—	—

পরিশিষ্ট (খ)

পৃথিবীর চাষ ও দেশ হিসাবে ফলন
ও প্রত্যেকের শতকরা অংশ
মোট ফলন—২৭,০০,০০০ টন

	হাজার টন	শতকরা অংশ
আমেরিকা	৬,৭৬	২৪·৯
চীন	৬,২৮	২৩·১
ভারতবর্ষ	৫,১১	১৫·১
রুশ গণতন্ত্র	২,৭৩	১০·০
ব্রেজিল	৯২	৩·৩
জাপান	৬৪	২·৩
গ্রীস	৬৩	২·৩
তুরস্ক	৬২	২·২
নেদারল্যান্ড	৫৩	১·৯
ব্রহ্ম	৪৬	১·৭
ফ্রান্স	৩৬	১·৩
কানাডা	৩২	১·১
কিউবা	৩২	১·১
ফিলিপাইন	৩১·৮	১·১
বুলগেরিয়া	৩১	১·১
কোরিয়া	২৬	·৯

ইটালী, পোল্যান্ড, যুগশ্লাভিয়া, জার্মানী ইত্যাদি

ঠাকুমার চিঠি

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

ঠাকুমা লিখেছে চিঠি কাশীধাম হ'তে
সেখানে লাগে না ভাল এতদিন থেকে
বাড়ীঘর ছেলেপুলে সব ফেলে রেখে
এত দূরে থাকা নাহি যায় কোন মতে।

রায়েদের মামলার লিখো ফলাফল
আমরা পেয়েছি কিনা পুবের বাগান
না অযথা টাকাগুলো শুধু হ'ল জল?

মণ্টু কি হাঁটিতে পারে? সোনা কথা কয়।
মালতীর ছেলেটির সেরেছে ত জ্বর?
মাঘেই মিনুর বিয়ে? লিখো তার বর
কোথায় কি কাজ করে। পাল মহাশয়
সুদের টাকার কথা কি করিতে চান?

দাঁড়াইয়া জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়
ঠাকুমার মন তবু গৃহ পানে ধায়;
গৃহের দেবতাগুলি ভিড় করে মনে
বিশ্বের দেবতা রন তারি এক কোণে।

কথা ও কাজ

আজ চারিদিকে অশান্তির ঘনঘটা। ইউরোপ ও এশিয়া উভয়ত্রই শক্তির খেলা চলিয়াছে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া। কিন্তু ইদানীং শান্তির নামে যে সব খেলা চলিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আক্ষেপভরে বলিয়াছেন, গত এক বৎসরের মধ্যে তিনি মোটেই সোয়াস্তি পান নাই, বিশ্রাম পাওয়া ত দূরের কথা! ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী যে নীতির পোষকতা করিতেছেন, তাহাতে এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হইয়াই পারে না। গত মার্চ্চ মাসে জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে ব্রিটেন কতকটা বিচলিত হইয়া উঠে, আর জার্ম্মানীকে বাধা দিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে জোট বাঁধিবার চেষ্টা করে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন মিত্রতা স্থাপিত হয়। রুমানিয়া, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি বলকান রাষ্ট্রগুলিকে বিপৎকালে রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক হালচাল যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইহাতে খুশী হইতে পারেন নাই। জার্ম্মানী-ইটালীকে সার্থকভাবে বাধা দিতে হইলে রুশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সকলের আগে আপোষ-চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। বিলাতে জনমতের ঝড় উঠিল। রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইবার প্রতিশ্রুতি চাহিল সরকারের নিকট হইতে। ঝানু লয়েড জর্জ্জ ও চার্চ্চিলও পার্লামেণ্ট কক্ষে জনমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ সরকার জনমত উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাইতে সুরু করিলেন।

আজ তিন মাসেও এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিল না। আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বে-সরকারী মুখপত্র "টাইমস্" পত্রিকা ইতিমধ্যে রুশিয়ার প্রতি খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার অন্যায় আবদার নাকি ব্রিটিশরা মানিয়া চলিবে না। ব্রিটিশ-সোভিয়েট আলোচনা যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, বিরুদ্ধ পক্ষও সে সম্বন্ধে নাকি খুবই আশান্বিত। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বক্তৃতাদি হইতেও বুঝা গিয়াছে যে, এই আলোচনা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত নিচাল হইয়া যাইবে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ও পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের দুইটি বক্তৃতার কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি মিঃ চেম্বারলেন কার্ডিফে আর একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই সব কয়টি বক্তৃতা একত্র করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, ইঁহাদের ভিতরে জার্ম্মানীকে সন্তুষ্ট করিবার ও কোলে টানিয়া লইবার একটা সুপ্ত বাসনা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছি, যাহার প্রতিরোধের জন্য আটঘাট বাঁধিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছি তাহাকে তোয়াজ করা কেন, তাহার প্রতি উদারতা বা সৌজন্য প্রকাশের ভণ্ডামি কেন? আদতে কিন্তু ইহাকে ভণ্ডামি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে তিনমাস যাবৎ আলোচনা চালাইয়া হয়ত কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত ইহা ফলপ্রদ নাও হইতে পারে। কাজেই নূতন বন্ধু যখন মিলিল না তখন পুরাতন শত্রুকে (না বন্ধু?) আর ক্ষেপাইয়া লাভ কি? সম্প্রতি আর একটি কথা প্রকাশ পাইয়াছে। জাপানী দূত নাকি মস্কো হইতে টোকিওতে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ সোভিয়েট সর্ত্ত করিতে চাহিতেছে যে, প্রাচ্যিক প্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের সঙ্গে তাহাদের লড়িতে হইবে, কিন্তু সে সর্ত্তে ব্রিটিশরা রাজী হইবে না! ভাল কথা বটে! চীনে জাপানের হাতে এতটা নাজেহাল হইয়াও কি তাহার জাপান-প্রীতি ঘুচে নাই? একথা তো সহসা বিশ্বাস করা যায় না। তবে পূর্ব্ব ইতিহাস কিন্তু আমাদিগকে যেন ইহাই বলিয়া দিতে চায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ এক পক্ষ যখন কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ও পূর্ণ করিয়া লইতেছে, তখন অন্য পক্ষে কেবল কথারই খেলা লক্ষ্য করিতেছি। তথাকথিত ডিমোক্রাসিগুলি আজ কথার ছলনায় সকলকে ভুলাইতে চাহিতেছে। বেশী পুরাতন কথা বলিব না। গত এক বৎসরের ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই আপনারা ইহা সম্যক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কথায় বলে, "শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভিজে না!" যত শক্তিমানই হও না কেন, মূলে যদি কর্ম্মৈষণা না থাকে তাহা হইলে যত রকম ফন্দি আঁটিতেই চেষ্টা কর সবই বেফাঁস হইয়া যাইবে। ব্রিটিশেরও হইয়াছে আজ তাহাই। সেই মিউনিক চুক্তি হইতে সুরু করিয়া ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা পর্য্যন্ত একই ইতিহাসের পুনরুক্তি লক্ষ্য করিতেছি। শুধু কথা, আর কথা। চেকোশ্লোভাকিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া অকালে আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে, অন্যেরা—যথা, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, গ্রীস, তুরস্ক তাহার কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে সে কতটা অগ্রসর হইবে, সে সম্বন্ধে তাহাদের মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে। বিশেষত যখন সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে কোন একটা সার্থক চুক্তি করিতে ব্রিটেন গড়িমসি করিতেছে। সে অপরকে রক্ষা করিবে তাহাই-বা বুঝা যায় কি করিয়া? প্রাচ্যিক প্রাচ্যে আজ ব্রিটিশদের দুর্গতির একশেষ হইতেছে। তিয়েনসিন নামক ক্ষুদ্র শহরটি জাপানীরা শুধু অবরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা রসদাদি প্রেরণে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। ইংরেজরা শহরের চৌহদ্দীর বাহিরে যাইবার বা ভিতরে আসিবার সময় জাপানী সান্ত্রীদের হস্তে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহাদিগকে না কি উলঙ্গ করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে! জাপানীরা যখন এইরূপ করিতে থাকে, তখন চীনাদের ইহা দেখাইবার জন্য সারিবন্দিভাবে দাঁড় করাইয়া রাখে! এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, এমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ, জাপানীদের নিকট তাহারাও নিতান্ত "ভিজা বিড়াল"; কাজেই চীনারা যেন তাহাদের (জাপানীদের) সমঝাইয়া চলে। ইংরেজদিগকে বাহিরে গেলে জাপানীদের নিকট হইতে চিরকুট (Identification Card) লইয়াও যাইতে হয়! শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় ইহা দেখাইতে হয়! আজ দুই সপ্তাহ হইল, রোজই এইরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু ব্রিটিশ সিংহ কি করিতেছেন? ইংলণ্ডের লোকেরা খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের যেন ভীমরতি উপস্থিত। পার্লামেণ্ট কক্ষে কখনও নরম কখনও গরম বিবৃতি

ব্যঙ্গ চিত্র। হিটলার মুসোলিনী প্রমুখ ডিক্টেটরগণ নিজেদের মধ্যে একরূপ কথা বলেন। 'শান্তিপ্রিয়' চেম্বারলেনের সঙ্গে যখন আলোচনা করেন তখন অন্য কথা বলেন। মুখে কিন্তু সকলেই 'শান্তি', 'শান্তি' বলিয়া থাকেন

দিয়া সদস্যগণকে তথা জনমতকে ঠাণ্ডা রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, আর জাপানী সরকারকে অনবরত তাহাদের মতামত, প্রতিবাদ ইত্যাদি জানান হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। আজ যে শুধু তিয়েনসিনে ব্রিটিশরা অপদস্থ হইতেছে ও ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে তাহা নয়, প্রকাশ, জাপানের এবম্বিধ কার্য্যে ব্রিটিশের প্রাচ্য-নীতির মূলেও কুঠারাঘাত করা হইতেছে! কিন্তু ইহার প্রতীকার পন্থা কি বাৎলানো হইতেছে? জাপান সম্প্রতি দক্ষিণ চীনের সোয়াতো বন্দর দখল করিয়াছে। সেখান হইতেও ইংরেজ-ফরাসীদের নাকি বিতাড়িত হইবার আশঙ্কা। এবার যেন ইহাদের কতকটা চেতনা হইয়াছে। প্রকাশ, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রাচ্য নৌবাহিনীর বড়কর্ত্তাদের মধ্যে আপৎকালে কি ভাবে প্রাচ্যের স্বার্থ সামরিকভাবে বজায় রাখিতে হইবে সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাও তো আলোচনা! কাজেই, যখন নিজ স্বার্থ হানির বিশেষ সম্ভাবনায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কোন সার্থক পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না তখন অপরকে রক্ষা করিবেন কিরূপে?

এক পক্ষে যখন এই প্রকার কথার কচায়ন তখন অন্য পক্ষে কি দেখিতে পাই? হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিবার পরই দুই তিন দিনের মধ্যে মেমেলও দখল করিয়া লইলেন! ডানজিগও যে তাঁহার কাম্য একথা প্রকাশ করিতেও তিনি কসুর করিলেন না। পোল্যাণ্ড কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। ব্রিটিশ দেখিল, জার্ম্মানী আরও যদি কিছু দখল করিয়া বসে, তাহা পোল্যাণ্ডের সহযোগেই হউক বা বিপক্ষতায়ই হউক, তাহা হইলে ইউরোপে শক্তিসাম্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। কাজেই তখন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধিবন্ধ হইল। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি না করিলে খাস ইউরোপে ব্রিটেনের শক্তি প্রকাশের কোনও উপায় থাকিবে না। জনমত এই মর্ম্মে দাবী জানাইবার ফলে যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইংগ-সোভিয়েট আলোচনা সুরু করিয়াছে, কিছু আগে তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এই আলোচনা সুরু হইতে না হইতে মুসোলিনী আলবানিয়া দখল করিয়া লইলেন। অর্থাৎ দক্ষিণ ইউরোপে ব্রিটিশের প্রবেশ-পথ এইরূপে আগলাইয়া রাখা হইল। তাহার পর যুগোশ্লোভিয়া ও ইটালী-জার্ম্মানীর মধ্যে নানারকম চুক্তির ফলে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। হাঙ্গেরিয়াও ইদানীং হিটলার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু দিন আগে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই পত্রে প্রসঙ্গত তাহার উল্লেখও করিয়াছিলাম যে, জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র-সচিব ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক বলিয়া কহিয়া হিটলারকে সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হইতে রাজী করাইয়াছেন! ইহার বিষয় পরে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে বুঝা যায়, হয়ত বা তলে তলে এইরূপ চেষ্টাও চলিতেছে। গত সপ্তাহে বলিয়াছি, ক্রিভিস্কি নামে একজন ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট সেনাপতি ষ্টালিনের জার্ম্মান-প্রীতির কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ক্রিভিস্কির পরিচয় বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি, বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ষ্টালিন কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেকার অংশ বিশেষ, রিবেনট্রপের উক্তরূপ চেষ্টার সংবাদ এবং ক্রিভিস্কি বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির বর্ণনা প্রভৃতি একসঙ্গে পাঠ করিলে ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে একেবারেই যে অসদ্ভাব বিদ্যমান বা সদ্ভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এমন কথাও তো বলা যায় না।

যাহা হউক, হিটলার বা মুসোলিনী বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। ইংরেজরা যতই না কেন তাঁহাদের তোয়াজ করুক, উভয়েই উভয়কে ভাবী শত্রু বলিয়াই মনে করে। যদি ষ্টালিনের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হইয়াই যায় তাহা হইলে তাঁহারা কি পন্থা অবলম্বন করিবেন আগে হইতেই তাহাও যেন স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে! আপনারা সকলেই জানেন, জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান কিছুকাল যাবৎ সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া চলিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন, আজ যে তিয়েনসিনে জাপানীরা ইংরেজদের এমনভাবে নাজেহাল করিতেছে তাহা এই ত্রয়ীর পরামর্শ অনুসারেই করা হইতেছে। ব্রিটিশ ও ফরাসীরা প্রাচ্যে ব্যাপৃত থাকিলে ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনী তাঁহাদের উদ্দেশ্য সহজে চরিতার্থ করিবেন। কিছুকাল যাবৎ ডানজিগ সম্বন্ধে কথা শোনা যায় নাই। ইদানীং কিন্তু জার্ম্মানীতে আবার ডানজিগ-ভুক্তি আন্দোলন জোর সুরু হইয়াছে। ডক্টর গোয়েবলস্ ডানজিগে গিয়া তথাকার অধিবাসীদের আশ্বাসবাণী দিয়া আসিয়াছেন। মুসোলিনীর নৌবহর ভূমধ্যসাগরে টহল দিতেছে। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের বর্ত্তমানের কার্য্যাবলীর মধ্যে দুই রকম উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যাইতেছে—সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধি হইয়া গেলে তাহারা কি পন্থা অবলম্বন করিবে, এবং যাহাতে ইহাদের মধ্যে কোনরকম সন্ধি না হইতে পারে তাহারও চেষ্টা।

আজ বিশ্ববাসী দেখিতেছে এক পক্ষে শুধু কথা আর কথা এবং অন্য পক্ষে বাস্তবিকই কাজ। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কার্ডিফে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার বিদ্রূপ করিয়া ডাঃ গোয়েবলস্ বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশগণ বড় কথার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কাজ চাই তাঁহাদের তরফে কার্য্যকর কোন উক্তি না পাইলে শুধু শুধু এরূপ কথার কচায়ন করিয়া লাভ কি? আজ সকলেই বলিতেছে, ব্রিটিশ সিংহের এ কি হইল? 'শক্তের ভক্ত নরমের যম''—এই সনাতন কথা সত্য সত্যই কি সে প্রমাণ করিতে থাকিবে? দুর্ব্বল, নিরস্ত্র, পরাধীন লোকদের সায়েস্তা করিতে ব্রিটিশ সিংহ বড়ই কর্ম্মতৎপরতা দেখায়, আর সমানে সমানে যুঝিবার কালে কি সে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকিবে? কিছুকাল আগেও হয়ত একথা বিশ্বাস হইত না, কিন্তু এখন যেন ইহা আর বিশ্বাস না করিয়া পারা যাইতেছে না। ব্রিটিশরা আজ গর্ব্ব করিতেছে, তাহারা জগতে সকলের চেয়ে বিক্রমশালী। কিন্তু তাহাদের বিক্রম সময়কালে কি কথার কচায়নেই পর্য্যবসিত হইবে?

২৭শে জুন, ১৯৩৯।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ও রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষা ও বিরহ

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যে এবং বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা বর্ষার যে রূপের দেখা পাই, সে রূপের তুলনা আর কোথাও মেলে না। ক্রমবিকাশকে এত মনোহারীভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে, যা শুধু দুর্লভ নয় সুদুর্লভ। শুধু ক্রমবিকাশ কেন? ক্রমবিকাশের সঙ্গে মিলন-লিপ্সু অন্তরের রূপটিকে অপূর্বভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। বর্ষায় অন্তর সাধারণতই প্রিয় কিংবা প্রিয়ার সান্নিধ্য প্রার্থনা করে—অন্তরের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার রূপটি বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধিকার অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করা হইয়াছে—রবীন্দ্র-কাব্যে এই অন্তর্বেদনা মধুরতরভাবে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। এই অন্তরের রূপের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কাব্য ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া ছুটিয়াছে।

আষাঢ়ে পৃথিবীর রং পরিবর্তিত হইয়া যায়। আকাশ ঘন কালো হইয়া আসে পাতায় পাতায়, গাছে গাছে নূতনের স্পর্শ লাগে। পৃথিবী আর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না, আষাঢ়ের জটার তলায় সূর্য ঢাকা পড়িয়া যায়। পৃথিবীতে আর রৌদ্র থাকে না—ছায়া-শ্যামল হইয়া যায়। এই রূপকে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ দিয়া—কবি ফুটাইয়া তুলিলেন—

"জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁকো এ কোন ছবিরে,
মেঘ-মল্লারে কী বল আমারে
কেমনে কব?

আর ঃ

সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো
শ্বেত-উত্তরী আজ কেন কালো
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়

—কী বৈভব॥

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে ফুটাইয়া তোলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব—বাস্তবের মধ্যে তিনি অবাস্তবের দেখা পান। তাই যখন তিনি বাস্তবকে ফুটাইয়া তুলিতে চান, কোনখান দিয়া তখন তাঁর সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়া যায়। বিদ্যাপতির কাব্যে আমরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শ পাই না। তাঁহার কবিতা শুধু প্রাণের আবেগে, ভাষা-লালিত্যে, শব্দ-সঞ্চয়নের মনোহারিত্বে ভাবাবেগে, মধুর হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে বাস্তবের সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টার দেখা মেলে না।

আকাশ কালো হইয়াছে। পৃথিবী ছায়া-শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে—আকাশ ও বাতাস আজ একই সুরে বাঁধা। সেই একই সুরে বাঁধা মহামিলনের নিমন্ত্রণের সুর কবির চিত্তবীণায় আসিয়া ঘা দিল। কবি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জানালা খুলিয়া বিশ্বের দিকে তাকাইলেন কে আসিতেছে, যে তার তরে আগমনীর সুর বাজিতেছে। দেখিলেন নীল অরণ্যে উতলা কলাপীর প্রাণে কেকার অন্তরে নিখিলের চিত্তে যেন কার আগমনীতে আনন্দের শিহরণ লাগিয়াছে। আকাশ বাতাস যা'র আগমনী গাহিতেছে, কবি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলেন—ঐ সে আসিতেছে—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম-গম্ভীর সরসা
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

বরষা আসিয়া পড়িল—মেঘে ভরা আকাশ ডাকিয়া উঠিল গুরু করিয়া। 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে—'। বৈষ্ণব কবি মেঘের ডাককে শব্দায়িত করিবার চেষ্টা না করিয়া লিখিলেন 'গগন গরজি ঘন ঘোর'—

মেঘ গর্জনের পরেই জল-বর্ষণ। টুপটুপ করিয়া দু'চার ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল পাতার উপর। যে বরষাকে দূর হইতে কবি দেখিয়াছিলেন, কবি এবার তার নূপুরের শিঞ্জন শুনিতে পাইলেন। যে আসিতেছিল, সে আসিয়া পড়িয়াছে—কি চমৎকার—

"পাতার উপর টুপুর টুপুর নূপুর বাজে কার?"

ক্রমশ ঝম ঝম করিয়া অবিরাম বারিপাত সুরু হইল। এখন শুধু আর পাতায় শব্দ উঠিতেছে না—সমস্ত বিশ্ব জানিয়াছে বরষা আসিয়াছে। এখন পূবে হাওয়া বহিতেছে, পিচ্ছিল নদীর ধার পরিত্যক্ত—ঢেউ উঠিয়া দুকূল ভাঙিয়া পড়িতেছে—নদীর জলের উপর অবিরাম বারিপাত। খেয়া পারাবার আজ বন্ধ—

"পূবে হাওয়া বয় কূলে নেই কেউ
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ
দর দর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠি বাজিরে
খেয়া পারাবার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।"

নূতন নূতন মেঘ আসিতে লাগিল। ঘন ঘন মেঘ গর্জন সুরু হইল।

নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসত মোর
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।

অর্থাৎ নূতন জলধর চারিদিকে ঝাঁপিয়া আসিল দেখিয়া শ্রীরাধার ভয় করিতেছে, মেঘের ঘন গর্জন শুনিয়া তাঁহার অন্তরে কাঁপন উঠিতেছে।

বর্ষা আসিয়াছে। চারিদিকে সমারোহের মত্ততা। দামিনীর তীব্র ঝলক আকাশের বুক চিরিয়া ঘনগর্জনে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। ঝিল্লী একতারা বাজাইতেছে—ভেক-ধ্বনির অবিশ্রান্ত মেঘমল্লারের সঙ্গে ডাহুকীর ডাক ও কেকার উচ্ছ্বসিত নৃত্য চলিতেছে—আর সমানে চলিতেছে

অবিশ্রান্ত জলবর্ষণ। সেই জলবর্ষণের সীমা নাই, পৃথিবী ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতি এ ছবি অতি মনোহরভাবে আঁকিয়াছেন, কিন্তু এ কবিতার মধ্যেও কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিচয় নাই—কল্পনা-বিলাসের কিছু নাই। শুধু নিছক বাস্তবকে অপরূপ দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

উল্লিখিত দুইটি কবিতায় মর্মবিকাশের ধারা বজায় রাখিয়া অন্তরের বিরহের ভাবকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীরাধা-হৃদয় বিরহ-কাতর হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই এমন দিনে বিরহ অসহ্য হইয়া উঠে—প্রকৃতির সংগে হৃদয়েরও রঙ্ ফিরিয়া যায়। এমন ঝড়-বাদলের কোলাকুলি—আকাশ-বাতাসের মিলন-মত্ততা, ম্লান আলোয় ব্যপ্তদিগন্ত বিরহীকে আরও ব্যথিত করিয়া তুলে। অন্তরের এই রূপ চিরন্তন—শাশ্বত.....

রাধা-হৃদয়ে বর্ষার আগমনীতে বিরহের বান ডাকিয়াছে; সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"গগন গরজি ঘন ঘোর, হে সখি কখন আওব প্রভু মোর"। আবার দেখা যায়—"ঈ-ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" এবং "কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া" বলিয়া তিনি খেদ প্রকাশ করিতেছেন।

ঝিঁঝির ঝিম্ ঝিম্ শব্দ বিরহীর হৃদয়-বীণায় ব্যথার ঝঙ্কার তোলে—'আয় তোর অভিসারিকা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। এ শুধু, ভাব-প্রবণ কবি চিত্তের কথা নহে, অ-ভাব প্রবণ অকবি চিত্তও গুমরাইয়া উঠে। মনে হয় প্রিয়া যদি আজ পাশে থাকিত তাহা হইলে এই ঝড়-বাতাসের মাতামাতি, এই সোঁদা-মাটির গন্ধে ভরা সুমিষ্ট আবহাওয়া, এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সার্থকতায় পর্যবসিত হইত না! প্রিয়া পাশে থাকিলে সমাজ, সংসার—এ জীবনের কলরব সব মিথ্যা হইয়া যায়, শুধু থাকে :-

"দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার—"

বস্তুত বরষার সংগে মিলনের নিবিড় সম্বন্ধ। একটি আসিলে অন্যটি আসিয়া পড়ে। বর্ষা আসিলে হৃদয়ের মিলন-লিপ্সু ভাবটি আরও জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাপতি উভয়েই এই অন্তরের মিলন-লিপ্সু ভাবটিকে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—একজনের উদ্দেশ্য বরষাকে অবলম্বন করিয়া বিরহকে রূপ দেওয়া আর একজনের উদ্দেশ্য বিরহকে অবলম্বন করিয়া বরষাকে রূপ দেওয়া। একজনের মধ্যে অফুরন্ত কল্পনা-বিলাস আর একজনের মধ্যে বাস্তবের পূর্ণাংগ বিকাশ। একজনের বাস্তবকে অনুভব করা যায়, একজনের বাস্তবকে হাত দিয়া ছুঁইতে পারা যায়।

"গগনে অবঘন মেঘ দারুণ সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর
শ্যাম-নাগর একলে কৈসনে পন্থ হেরই মোর।"

এইখানেও দেখুন বাস্তবকে অতিমাত্রায় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আকাশে দারুণ মেঘ-বিদ্যুৎ চমকাইতেছে......ঘন ঘন বজ্র-পতনের শব্দ—হাওয়া আরও জোরে বহিতেছে—অবিশ্রাম বারিবর্ষণ চলিতেছে, শ্রীরাধার অন্তর শ্যামের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছে—"শ্যাম কি আজ পথ খুঁজিয়া আসিতে পারিবে?" রাধিকার অন্তরের শঙ্কিত ভাবটি ফুটাইয়া তোলা হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃতিকে background করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীরাধার ব্যথার ভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখানেও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কিছুই নাই! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনই লিখিলেন—

"বৈশাখী ঝড়ে সে-দিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।"

তখন আমরা সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আভাষ পাই। মনে হয় প্রকৃতি ও কবির মধ্যে যেন মিলনের কোনও দৃঢ় রজ্জু আছে—মনে হয় কবি যেন প্রকৃতির অংগ। মনে হয়—ওই ঝড়ে দোলায়মান গাছের মত—সোঁদামাটির গন্ধে সৃষ্ট আবহাওয়ার মত—উল্লাসে নাচিয়া ওঠা কেকার মনের মত—কবির মনেও প্রকৃতির ছোঁয়া লাগে। কিন্তু যখন বিদ্যাপতি পড়ি, তখন মনে হয় প্রকৃতি শুধু দেখিবার ও বুঝিবার, অনুভব করিবার নয়। রবীন্দ্র কাব্য পড়িতে বসিয়া মনে হয়—কবির মনের মধ্যে বরষা আছে, বিদ্যাপতি পড়িলে মনে হয় কবির বরষার মধ্যে জল আছে। একজন প্রকৃতির সন্তান, একজন প্রকৃতির চিত্র-শিল্পী।

সিরাজদ্দৌলা

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অজানার অঙ্গুলিসংকেতে ক্রমাগত পটপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পরমুহূর্ত্তে ঘটনাস্রোত কোন্ পথ ধরিয়া চলিবে—তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নেপোলিয়ানের জীবন আমাদিগকে কি শেখায়? শেখায়—ইতিহাসকে শাসন করিতেছে অজানার রাজদণ্ড। কর্সিকার পিতৃহীন বালককে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মূর্ত্তিতে আমরা কোনদিন দেখিতে পাইব—ইহা কে ভাবিয়াছিল? আবার ইহাই বা কে ভাবিয়াছিল—সম্রাট নেপোলিয়ান ওয়াটারলুর যুদ্ধে হারিয়া সেণ্ট হেলেনায় বন্দীর অভিশপ্ত জীবন যাপন করিবে? জীবন সত্য সত্যই পাগলের প্রলাপের মতো অর্থহীন কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি। ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে—একটার সঙ্গে আর একটার কোন সামঞ্জস্য নাই।

সিরাজদ্দৌলার জীবনকাহিনীও কি পাগলের অর্থহীন প্রলাপের মতই শোনায় না? সেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রথম অঙ্কের যখন অভিনয় চলিতেছে তখন কি দেখিতে পাই? বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের রাজ-সিংহাসনে সমাসীন। নবাবের বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। যুবকের রাজ-কোষে অর্থের প্রাচুর্য্য—পদতলে সোনার বাঙলা। গর্ব্বিত নবাব কাহারও পরোয়া করে না। সিংহাসনে আরোহণের পনেরো মাস পরে নবাবের জীবন-রঙ্গভূমিতে শেষবারের জন্য যখন যবনিকা পড়িল তখন কোথায় বা রাজমুকুট আর কোথায় বা স্বর্ণসিংহাসন! মুর্শিদাবাদের রাজপথ লোকে লোকারণ্য, আর সেই জনাকীর্ণ রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে এক বিশালকায় হস্তী। হস্তীপৃষ্ঠে বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলার রক্তাক্ত মৃতদেহ। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মহম্মদ বেগ কৃপাণের আঘাতে সিরাজকে হত্যা করিয়াছে। সিরাজ-দ্দৌলা যখন নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর। মাত্র পনেরো মাস তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন আর এই পনেরো মাসের মধ্যেই তাঁহার তরুণ জীবনে কত বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। পনেরো মাস পূর্ব্বে যিনি ছিলেন বাঙলার একচ্ছত্র অধিপতি—পনেরো মাস পরে তাঁহারই মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে বাহিত হইয়া মুর্শিদাবাদের পথে পথে ফিরিতেছে। মানুষের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহারা কি আরব্যোপন্যাসের কাহিনীগুলির অপেক্ষাও বিস্ময়কর নহে?

সিরাজদ্দৌলার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ইংরেজ-ক্লাইবের নির্দ্দেশে ঘাতকের হস্তে অপমৃত্যু নয়। ইংরেজ-ঐতিহাসিকদের হস্তে তিনি যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাহার তুলনায় মহম্মদী বেগের দেওয়া আঘাত অকিঞ্চিৎকর। এই নীচমনা ঐতিহাসিকের দল মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সিরাজের জীবনকে কালিমালিপ্ত করিয়া গিয়াছে। জন্মগ্রহণ করিলে মরিতেই হইবে আর সে মৃত্যু যদি কখনো কখনো অপমৃত্যু হয়—আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এব্রাহাম লিঙ্কনের মত ঋষিপ্রতিম মানুষকেও আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছে। কিন্ত আততায়ীর দল যখন কেবল জীবন লইয়াই খুসী থাকে না—সেই জীবনকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া ইতিহাস লিখিতে বসে তখন ট্র্যাজেডির আর অন্ত থাকে না। সিরাজের জীবন এই অন্তহীন ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার জীবন যে প্রভাতের অনাঘ্রাত পুষ্পের মত নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন কথা আমরা বলিতেছি না—কোন ঐতিহাসিকই বলে না। কিন্তু তখনকার দিনে এদেশে যে সব শ্বেতকায় পুরুষ অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই বা কয়জনের জীবন পুণ্যের ছটায় আলোকিত ছিল? জালিয়াৎ ক্লাইব কি মহাপুরুষ ছিলেন? একথা কেহ তো বলিতে পারিবে না যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মাতৃভূমিকে বিকাইয়া দিয়াছিলেন। ক্লাইবের মত প্রতারকও তিনি কোনদিন ছিলেন না। মীরজাফর, উমীচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, ক্লাইব—এ সবের মধ্যে সিরাজই একমাত্র মানুষ যিনি কাহারও সঙ্গে প্রতারণা করেন নাই।

ইংরেজেরা প্রথম হইতেই সিরাজের সঙ্গে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করে। এই যে শত্রুতা—এই শত্রুতার পিছনে ছিল ইংরেজ বণিকদের দুর্দ্দমনীয় অর্থলোভ। ধন-কুবের বলিয়া সিরাজদ্দৌলার খ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজকোষ ধন-দৌলতে পরিপূর্ণ—এই কথা দিগ্দিগন্তে রটিয়া গিয়াছিল। দোকান-দারের জাত আর কিছু চিনুক আর না চিনুক—টাকা চেনে খুব ভাল করিয়া। তাহাদের লুব্ধদৃষ্টি গিয়া পড়িল হতভাগ্য নবাবের রাজকোষের উপরে। কেমন করিয়া এই বিপুল অর্থ হস্তগত করা যায়? সুরু হইল চক্রান্তের পালা। রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ, দুর্লভরাম—এই সকল দেশদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতকদের সঙ্গে বিদেশী বণিকের দল আরম্ভ করিল গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র। সিরাজের পতন এই হীন ষড়যন্ত্রের ফল। মেজর বি ডি বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Shiraj was reputed to be a very rich prince and his treasury not only full but overflowing. So there can be no doubt that Clive and his friends tried to effect that in Bengal which Cortez and Pizzaro had done in Mexico and Peru. This alone can satisfactorily explain the treacherous conduct of the English towards Shiraj."

"অতিশয় ধনবান নরপতি বলিয়া সিরাজের খ্যাতি ছিল। অর্থের প্রাচুর্য্যে তাঁহার ধনাগার ছিল পূর্ণ। কর্ট্তেজ আর পিজারো মেক্সিকোতে আর পেরুতে যাহা করিয়াছে ক্লাইব এবং তাহার বন্ধুরা বাঙলাতে তাহাই করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সিরাজের প্রতি ইংরেজদের যে বিশ্বাস-ঘাতকতা—এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয়।"

সিরাজের ইংরেজ-চরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। ইংরেজের নিকট হইতে কলিকাতা ছিনাইয়া লইবার পর সিরাজ মনে করিয়াছিলেন—

বিদ্রোহীরা আর তাঁহাকে উত্যক্ত করিবে না। রাজা মাণিকচাঁদের হস্তে কলিকাতার শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ইংরেজদের অতিশয় কৃপার চক্ষে তিনি দেখিতেন। উহাদের দ্বারা তাঁহার কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরেজেরা প্রচার করিয়া দিল, বাতাস অনুকূল হইলেই তাহারা মাদ্রাজ চলিয়া যাইবে—আর বাঙলা-মুখো হইবে না। সরলমনা সিরাজ ইংরেজের এই মিথ্যা উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবিলেন, দোকানদারের জাত যখন দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে তখন আর উহাদিগকে পীড়ন করিয়া লাভ নাই। ইংরেজেরা যাহাতে বাজার হইতে খাবার-দাবার পায় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিলেন। কিন্তু সিরাজের এই সদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ইংরেজ কি করিল? তাহারা সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বাঙলার কুলাঙ্গারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। তাহাদের নিকট গোপনে গোপনে চিঠিপত্র চালাইতে লাগিল! সিরাজের অপরিণত বুদ্ধির কাছে পাশ্চাত্যের নোংরামি ধরা পড়ে নাই। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই—যাহাদিগকে তিনি দয়া করিলেন, তাহারাই তাঁহাকে ছোবল মারিবে। আমাদের বিশ্বাস—সিরাজ যদি পাশ্চাত্যকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি কলিকাতা হইতে ইংরেজদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দিতেন সেই দেশে—যেখান হইতে কোন মানুষই পৃথিবীতে আর ফিরিয়া আসে না। এরূপ করিলে সিরাজের কোন অপরাধ হইত—ইহা মনে করিবার কারণ নাই। রাজার বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ করে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধি রাজ-ধর্ম্মে আছে। ইংরেজেরা নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। মেজর বি ডি বসু মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,—So no blame could have attached to Siraj-ud-daula had he executed the English who fell into his hands at the capture of Calcutta. কিন্তু হত্যা করার প্রবৃত্তি এশিয়াবাসিগণের প্রকৃতিগত নহে। বুদ্ধ, খৃষ্ট আর মহম্মদের দেশের মানুষ হইয়া সিরাজ বন্দী-শত্রুকে হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন। বিজয়ী নবাব ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন।

অন্ধকূপ হত্যার কালিমায় সিরাজের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা হইয়াছে। ইহার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই দায়ী। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক *অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন—অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েল সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত একটা আজগুবি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেজর বি ডি বসু মহাশয় প্রমুখ আরও বহু ঐতিহাসিক অক্ষয়বাবুর মতই পোষণ করিয়া থাকেন। কেমন করিয়া কালোকে সাদা এবং সাদাকে কালো করিতে হয়—তাহা ম্যাকিয়াভেলি আর মুসোলিনীর ইউরোপ যেমন করিয়া জানে—আমরা তেমন করিয়া জানি না। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার বিদ্যায় পাশ্চাত্য আমাদিগকে হার মানাইয়াছে—একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

বহুকাল পরে সিরাজের স্মৃতিকে মিথ্যা অপবাদের কালিমা হইতে মুক্ত করিয়া সত্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশময় আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের তৈরী ইতিহাস পড়িয়া আমরা বাঙলার শেষ স্বাধীন নরপতির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছি। অন্ধকূপ-হত্যার বিরুদ্ধে যাঁহাদের লেখনী বিষ উদ্গীরণ করিয়াছে, সিরাজকে যাহারা হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ হস্তী-পৃষ্ঠে ঘুরাইল—তাহাদের পৈশাচিক আচরণ সম্পর্কে তাঁহারা কি কোন কিছু লিখিতে পারিতেন না? ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-গণ সিরাজের চরিত্র সম্পর্কে যাহাই লিখুন না কেন—তিনি যে একজন তেজস্বী এবং কার্য্যক্ষম নরপতি ছিলেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি পৌরুষে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরেজের ঔদ্ধত্যকে স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে এত অল্প বয়সে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইত না। তিনি দোকানদারের জাতকে দোকানদারের যাহা প্রাপ্য তাহাই দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অসংযত লোভের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়াকে তিনি রাজধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ মানুষ রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিলে অর্থোপার্জ্জনের কাজে বিশেষ সুবিধা হইবে না—চতুর বণিকজাতি ইহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেইজন্যই তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাহারা চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। মেজর বি ডি বসু মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,—

"Shiraj was a spirited youth and notwithstanding all that the European writers have said, he was an able man. It may have been, therefore, considered politically expedient to destroy him, for otherwise he might have given some trouble to the English."

ইহার বাঙলা অনুবাদ—

"সিরাজ ছিলেন তেজস্বী যুবক; ইউরোপীয় লেখকেরা যাহাই বলুন না—শাসনকার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবিধা করিবার জন্য তাই, বোধ হয়, তাঁহার ধ্বংস প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি হয়তো ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন।"

কলেজের মেয়ে

(গল্প)

শ্রীসাতকড়ি চট্টরাজ

সন্ধ্যার পর মিত্র বাবুদের বাড়ী খেঁদীর মা গিয়া যখন উপস্থিত হইল, গিন্নীমা তখন বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া নাতি-পুতি লইয়া কেবলমাত্র রূপকথার ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন। খেঁদীর মা নিকটে বসিলে গিন্নী মা বলিলেন, কি খেঁদীর মা এলি, বস।

ভারী মুস্কিলে পড়েছি মা, তাই একবার তোমার কাছে এলাম।

কি হয়েছে কি ?

খেঁদীর মা বলিল, আর হয়েছে কি ? মাগী মরে গেল আর যত ঝঞ্ঝাট কি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে গেল মা! এই দেখ মা, রায়েদের বাড়ীতে আমি যে আজন্ম ঝিগিরি করি, তা ত তোমরা সবাই জান ? কর্ত্তা মল গিন্নী মল, সবাই গেল, ঐ চৌদ্দ বছরের এক রত্তিকে ধর্‌তে গেলে এক রকম আমিই মানুষ ক'রেছি, বলিয়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছিতে লাগিল।

গিন্নী মা বলিলেন, সে কথা ত সত্যিই বটে খেঁদীর মা তা কি হয়েছে কি ?

ঐ অনাথটা তারপর বড় হ'ল, কলকেতা গেল, লেখাপড়া শিখ্‌লে তারপর কোত্থেকে একটা বিয়ে ক'রে আন্‌লে, গাঁয়ের লোকের ত আমোদ ধরে না; তা সবই ত তোমরা জান মা!

তা ত জানি, তারপর তোর কি হয়েছে বল্‌না ?

তাই ত বল্‌ছি মা, শোন না—তা যাই করুক না বাছা, একা এক শ' হয়ে সেই বউকে নিয়েই ত বেশ মিলে মিশে ঘরকন্না কর্‌ছিল! আহা তাতে আমার মনে কত সুখ হয়েছিল. এমন পোড়া অদেষ্ট মা তা সে পোড়ার মুখীকেও কি মর্‌তে হয় ? বাছাকে আমার একেবারে ধনে প্রাণে মেরে গেল! সবই সেই হতভাগার কপাল!

গিন্নী মাও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না, খেঁদীর মা চোখ্ মুছিতে মুছিতে আবার বলিতে লাগিল,—

তা মা সে সবই এই পাষাণ বুকে সয়েছে, কিছুতেই আমার কিছু কর্‌তে পারেনি। কিন্তু এই হতভাগাটা আমার বুকে যে শেল মার্‌তে লেগেছে মা, এ যে আমার কিছুতেই সইছে না! এই বলিয়া খেঁদীর মা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গিন্নী মা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, খেঁদীর মা তোর কি হয়েছে বল্‌বি না ?

কেন বল্‌ব না মা, তাই বল্‌তেই ত এয়েছি, শোন না—সে হতভাগীর বেটীর মরার দু'চার দিন পরেই অনাথ আমাকে কাজে জবাব দিয়েছে মা—বলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গিন্নী মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কারণ অনাথের উপর মাতৃত্বের দাবী তার কতটা এবং সেই অনাথের যৎসামান্য অনাদরও তার পক্ষে যে কি ভীষণ শল্য তাহা তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

এই বেদনায় সহানুভূতির স্পর্শ লাগিয়া তাহাকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। খেঁদীর মা অধিকতর বিচলিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—আমি বেঁচে থাক্‌তে আমারই চোখের সাম্‌নে আমারই সেই অনাথ কি নিজে জল তুল্‌বে, বাসন মাজ্‌বে, ঘর ঝাঁট দেবে ? এ যে আমার পাঁজরার হাড় ছিঁড়ে ফেল্‌লে মা!

তাতে তোর আর হ'ল কি ? সে যদি তোকে না চায় ত তোর দোষ কি ?

খেঁদীর মা গিন্নী মার এই সান্ত্বনায় যেমন আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তেম্‌নি আবার মধ্যে মধ্যে মনেও কর্‌ছিল যে, এমন মানুষ না হ'লে গরিবের দুঃখের কথা আর কে বুঝবে ?

সুরমা নিকটে বসিয়াই ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। খেঁদীর মা এতক্ষণ তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই। লক্ষ্য করিলে দেখিত, তাহার এই দুঃখের সুতীক্ষ্ম শায়ক এই বনবিহারিণী হরিণীকেও বিদ্ধ করিয়াছে। বর্ষার ভরা নদীর মত তারও দুচোখ জলে টলমল করিতেছিল। কখন কি জানি কিসের স্বল্পাঘাতেই হয়ত কূল উপচাইয়া দুকূল ভাসাইয়া ফেলিবে।

সুরমা ব্যস্ত হইয়া আরও নিকটে আসিয়া বসিল। ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ খেঁদীর মা, অনাথবাবু কি নিজেই রান্না ক'রে খান ?

হ্যাঁ মা, সে ত আর এখন বাড়ী থেকে বার হয় না। তা না হ'লে দেখ্‌তে পেতে সে কি চেহারা হয়েছে! সেই রাজপুত্তুর কার্ত্তিকের মত চেহারা এখন যেন পোড়া কাকের মত হয়েছে! আমাকে কত কথা বলে, কত অপমান করে, আমি ত সে সব কানে নিই না মা; মাঝে মাঝে তাই যাই, চার দণ্ড ব'সে থাকি, কি করে তাই দেখি। আমাকে কিছু বলেওনা, আপন মনেই থাকে। শেষে চোখ্ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ফিরে আসি।

সুরমা শুধাইল,—কি বলে তোমাকে খেঁদীর মা, কি অপমান করে তোমাকে ?

মা বলে কি, তুমি আর কি কর্‌তে এখানে এস ? তোমাকে দেখ্‌লে আমার এত কান্না আসে, তা কি তুমি বোঝ না খেঁদীর মা ? আমাকে কষ্ট দেওয়া কি তোমার ভাল ? আমি এখন একলা থাক্‌লেই ভাল থাকি। তুমি আর এস না! তোমার পায়ে পড়ি খেঁদীর মা, আমাকে কিছু দিন একলা থাক্‌তে দাও

তাতে তুমি কি বল অনাথবাবুকে ?

আমি আর কি বল্‌ব মা, তার মুখ দেখ্‌লে আমার আর মুখে কিছু আসে না। কেবল বলি, আমি যে তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারিনা, অনাথ!

খেঁদীর মা এমনি মাঝে মাঝে গিন্নী মার কাছে আসে, এটা সেটা কত কি বলে। এ একরূপে তাহাদের প্রাত্যহিক ঘটনা। কাজেই গিন্নী মার আর বিশেষ কিছু বলিবার ছিল

না। তবুও এই মাতৃস্নেহাতুরার ব্যথা কোন স্থানে ছিল এবং তাহার অমোঘ প্রলেপটিই বা কি তাহা তিনি যেমন জানিতেন, বোধ হয় তেমনটি আর কেহই বুঝিত না। তাই গিন্নী মা বলিলেন, দেখ খেঁদীর মা, অনাথ যে তোকে বাড়ী যেতে মানা করে, কাজে জবাব দিয়েছে সে কেবল তাদিকে ভুলবার জন্যে; তোকে চায় না ব'লে নয়। তার মায়ের সঙ্গে, বউ-এর সঙ্গে তোর যে চিরজীবনটা মাখা মা, তাই তোকে দেখলে তার মাকে, বউকে মনে পড়ে ব'লেই তোকে এখন সে দেখতে চায় না। তার শোক দুঃখটা একটু কমে গেলেই, আবার তোকে ডেকে নেবে। তোকে যে সে মায়ের মতই ভক্তি করে ভাল-বাসে, তা ত আমরা জানি, কেন তুই আর দুঃখ করিস্ না।

খেঁদীর মা বলিল, শুধু দুঃখ বলে নয় মা, তার যে এই দুদিন হ'তে জ্বর হয়েছে, তা সেই বাইরে ঠাণ্ডায় শুয়ে থাকবে, কিছুতেই ঘরের ভিতর যাবে না। বউটা ঐ জায়গায় শুয়ে মরেছিল কি না তাই সে ঐ জায়গাটা কিছুতেই ছাড়বে না! যখন তখন ওখানে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাই যদি আজ বলতে গেলাম তাতে আমার উপর রাগ কত? কি ঠাণ্ডা, কি বর্ষা ঐ জায়গাটায় ও-যে শুয়ে থাকে, তা মা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। বললাম, এই দেখ অনাথ, ভাল শরীরে ওখানে শুয়ে থাকিস্ তাতে আমি তোকে কিছু বলি না। সে দিন ওখানে একজন মল, আর আজ কিনা জ্বর নিয়ে তুই ওখানে শুবি? ওঠ ঘরে চল, মা সে কি বলব, যে করে আমাকে খেঁকিয়ে উঠল। আজ যদি ওর মা থাকত, আর সে যদি ওকে ও-কথা বলত তাহলে কি না শুয়ে থাকতে পারত? আমার ভারী দুঃখ হল; সরে এসে একটু দূরে বসলাম; বলে কি মা ওখানে কে বসে? সোনাকে একবার ডেকে দিতে পার? সে যে অনেকক্ষণ গিয়েছে! জ্বরের ঘোরে বাছা আমার ভুল বকছে না বউটার শোকে পাগল হল কিছু বুঝতে না পেরে তোমার কাছে এলাম মা, আমার কপালে আর যে কি আছে কিছু বুঝতে পারছি না, বলে খেঁদীর মা কাঁদিতে লাগিল।

গিন্নী মা কাঁদিলেন। সুরমার চক্ষু দুটিতে জল ত টলমল করিতেই ছিল, হঠাৎ এই কান্নার ভীষণ আঘাতে জল গড়াইয়া ছুটিতে লাগিল।

খেঁদীর মা বলিল, হাঁ মা ওটা কি জ্বরের ঘোর? কোন ভয় নাই ত?

(২)

গিন্নী মা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিছু বলিলেন না। সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলে, গিন্নী মা বলিলেন, চল্ খেঁদীর মা একবার দেখেই আসি।

তাই চল মা, আমি ত কিছু বুঝি না। তোমাকে যেতে বলতে সাহস হয় নাই মা। চল একবার দেখবে।

গিন্নী মা উঠিলে, পিসিমা আমিও যাই তোমার সঙ্গে, বলিয়া সুরমাও উঠিল।

গিন্নী মা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন—অনাথ!

অনাথ গিন্নী মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কে জেঠাইমা? তুমি, তুমি কেন এলে জেঠাইমা?

কেনরে অনাথ, আমার আসা কি অন্যায় হয়েছে?

'না, অন্যায় বলছি না, লোকে ত তোমায় নিন্দে করবে?'

সে আমাকে করবে, তোকে ত করবে না, কেমন করছে শরীর?

অনাথ বলিল, ঠিক বুঝতে পারছিনা জেঠাইমা। মনে হচ্ছে জ্বরটা যেন কিছু বেশী, আর বুকটায় কিছু বেদনা।

গিন্নী মা সুরমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সুরমা অনাথের দক্ষিণ হস্ত হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে।

কেমন দেখছিস্ সুরমা? জ্বর কত হবে?

১০৪° হবে, বোধ হয় কিছু বেশীও হতে পারে।

গিন্নী মা যেন কিছু চঞ্চল হইয়া খেঁদীর মাকে বলিলেন, খেঁদীর মা, গোবিন্দকে একবার ডেকে আন।

তারাই ত আমার অনাথকে একঘরে করেছে, সে কি আসবে?

তুই যা না, আমার নাম ক'রে ডেকে আন্।

খেঁদীর মা গোবিন্দকে ডাকিতে চলিয়া গেল।

গিন্নী মা সুরমাকে বলিলেন, ঘরে একটা বিছানা কর্ ত। অনাথ যেন চমকাইয়া উঠিল।

গিন্নী মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল বাবা অনাথ, চমকিয়ে উঠলি কেন?

অনাথ বলিল, না, কিছুই হয় নাই।

'তবে অমন করে চাইছিস্ কেন?'

'না ত কিছু নয়।'

এদিক-ওদিক দেখিয়া অসহায় শিশুর মত অনাথ বলিল, হাঁ জেঠাইমা সোনা কি এখন আসবে না?

গিন্নী মা মুখখানি অপরদিকে ফিরাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সোনা যে কে, সুরমার বুঝিতে বাকী ছিলনা। সে তাড়া-তাড়ি চোখে কাপড় দিয়া ঘরের মধ্যে বিছানা করিতে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ আসিয়া রোগী দেখিল, ঔষধের বাক্স সঙ্গেই ছিল, তাহার ব্যবস্থা করিল।

গিন্নী মা শুধালেন, কেমন দেখলি গোবিন্দ?

গোবিন্দ বলিল, এখন ত নিমুনিয়ারই অবস্থা বলে মনে হচ্ছে, তবে উপসর্গ আরও কিছু বাড়লে বোধ হয় বড় ডাক্তারেরই দরকার হবে, যাই হোক, রাত্রি খুব সাবধানে থাকুন, বুকে সর্বদা এই মালিশটা দিয়ে সেঁক দিতে হবে, আর রোগীকে ঘরে নিয়ে চলুন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে তাঁহারা জোর করিয়া রোগীকে ঘরে নিয়া গেলেন। রোগীর পরিচর্যা, তদ্বির যা কিছু সুরমাই যেন দশভুজা হইয়া করিতে লাগিয়া গেল।

অনেক রাত্রিতে রোগী একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। সুরমা গিন্নী মাকে ও খেঁদীর মাকে বলিল, তোমরা একটু ঘুমোবে শোও না? আমি ত জেগে আছি। আর এ-কাজটাও আমি খুব ভাল পারি বুঝলে পিসিমা,

আমরা কলেজের মেয়ে কিনা তাই মধ্যে মধ্যে নার্সিংটা করতেই হয়।

গিন্নী মা রোগীর মাথার নিকটেই অঞ্চল বিছাইয়া শুলেন। খেঁদীর মা বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

শেষ রাত্রিতে রোগী বড় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সুরমা সেই একভাবেই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেঁক দিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল—কি হল অনাথ দা, অমন করছেন কেন?

'কি করছি?'

কোন অস্বস্তি হচ্ছে কি?

'না, কিছুই করেনি, তুমি এখনও শোওনি সুরমা? ঐ একভাবেই কি বসে আছ?'

হাঁ, আপনি স্থির হয়ে ঘুমান দেখি!

আচ্ছা!

সুরমা মাথায় কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া খুসী হইলেন। গিন্নী মাকে বলিলেন, জ্বর অনেক কম; বুকের অবস্থাও ভাল। একটু ভালরকম তদ্বির হইলেই শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

কয়েক দিন গত হইলে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গিন্নী মা যখন নাতি-পুতি লইয়া বসিয়াছিলেন, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা পিসিমা, অনাথদা এখন বেশ সেরে উঠেছেন ত?

হাঁ, তবে এখনও রান্না করতে দিইনি। আমাদের ঠাকুরই এ-বাড়ী হ'তে পথ্য দিয়ে আসে।

'আচ্ছা পিসিমা, অনাথদাকে এ গাঁয়ের লোক একঘরে করেছে কেন?'

এ গাঁয়ের লোককে না জানিয়ে কলকাতা থেকে বিয়ে ক'রে এনেছিল বলে।

সুরমা বলিল, গাঁয়ের সকলেরই হুকুম না হ'লে বিয়ে করতে নাই বুঝি?

গিন্নী মা একটু হাসিলেন; বলিলেন, গাঁয়ের লোকে ত বলে মেয়েটা কায়েতের ছিল।

সুরমা বলিল, মেয়েটা যে বামুনের হতেই পারে না, এটা নিশ্চয় করে তাঁরা জেনেছিলেন?

গিন্নী মা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, কে জানে মা গাঁয়ের লোকের কথাত?

সুরমা বলিল, আচ্ছা পিসিমা, বউকে তোমরা কোন দিন কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে?

করেছিলাম বই কি। সে বলত,—তারা যে বাড়ীতে নীচের তলায় বাসা নিয়েছিল, অনাথ না কি সেই বাড়ীরই উপরের তলায় একখানি কুঠরী ভাড়া করে থাকত আর পড়া-শুনা করত। তার বাবা মারা গেলে তার মা পাশেরই এক বড় বাড়ীতে ঠাকুরদের ভোগ রাঁধত। তারা বড় গরিব। মেয়েটা নাকি অনাথের খুব যত্ন করত, চা তৈয়ারী করা, রান্না করে দেওয়া, বিছানা করা এই সবই সে করে দিত। তাই বোধ হয় অনাথের সুনজরে পড়েছিল

মেয়েটা দেখতেও মন্দ ছিল না। লেখাপড়াও জানত কথাবার্তা তার খুবই ভাল ছিল। আহা বাছা, আমাকে যেন ঠিক নিজের মায়েরই মত মনে করত, অল্প ভোগী! গিন্নি মা চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহারা নীরব হইয়া থাকিলে সুরমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

অনাথদা বউকে বোধ হয় খুবই ভালবাসত নয় পিসিমা? গিন্নী মা বলিলেন, এমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি সুরমা। তারা দুটি যেন এ জগতের মানুষই নয়। হতভাগাটার কপাল নিতান্তই মন্দ, নইলে কারও কি এমন বউ মরে? নামেও সোনা কাজেও সোনা ছিল। গিন্নী মা চক্ষু মুছিলেন।

সুরমা প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। সে সবই বুঝিল, কেবল বুঝিতে পারিল না— সোনা কি আগে হইতেই সোনা ছিল, না স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া লোহা সোনা হইল।

(৩)

বিপুল অর্থের মালিক বিজয়বাবু কলিকাতার একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ উকিল, হাইকোর্টে ওকালতি করেন। তিনখানি বাড়ী, রাধাবাজারের উপর একখানি বড় রেশমী ও গরদের কাপড়ের দোকান আছে এবং কিছু জমিদারীও কিনিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। একমাত্র শিশুকন্যা সুরমাকে বুকে করিয়া আর এই দুর্ব্বহ অর্থের বোঝা মাথায় লইয়া তিনি এই জনবহুল সংসার মহানগরীর রাজপথের যাত্রী হইয়াছিলেন। কন্যাটি যাহাতে সুশিক্ষিত হয় এবং যাহাতে একটি সুপাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া এই অর্থের বোঝা তাহাদের নিকট নামাইয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাহার চেষ্টাই এ পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চিরপোষিত বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার শেষ বিদায় লইবার সময় আসিল।

বিজয়বাবু সুরমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, মা-বাপ ত কারও চিরদিন থাকে না, আর তুমিও ত এখন আর নির্বোধটি নও, স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শোন।

সুরমা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয়বাবু বলিলেন, মা এখন আর আমার অন্য কোন চিন্তা নাই, তোমাকে যখন আমি যোগ্য করিতে পারিয়াছি তখন তোমার মঙ্গলের পথ এখন তুমিই দেখিয়া লইতে পারিবে। তবে কিছুদিনের জন্য একজন সুযোগ্য অভিভাবকের হাতে তোমাকে অর্পণ করিয়া যাইতে পারিলেই আমি সুখে মরিতে পারিতাম। আমার সংসারে এখন তেমন কেহই নাই, যাহার হাতে এই গুরুভার দিয়ে যেতে পারি। এই কথা বলিয়া বিজয়বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুরমার হাতখানি নিজের বুকের উপর লইলেন।

সুরমা পিতার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল বাবা অনাথদাকে জানেন?

কে? কল্যাণপুরের সেই অনাথ রায়?

হাঁ, তাঁকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

বিজয়বাবু গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন কল্যাণপুরের মধ্যে মানুষ বলতে ত ঐ একটা লোকই আছে। সেবার গোবিন্দ ডাক্তার তার নামে যে মিথ্যা একটা কেস করে

ছিল, তার নিষ্পত্তির জন্য জজ সাহেব আমাকেই কল্যাণপুরে পাঠিয়েছিলেন, সেই সূত্রে আরও ভাল করেই আমি জানি অনাথ কত বড় এবং কত মহান।

সুরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পিতার দৃষ্টিপথ হইতে মুখখানিকে সরাইয়া লইয়া একটি চাপা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বিজয়বাবু বলিলেন, এ-কি বলছিলি সুরমা অনাথের কথা? সুরমা বলিল—না এঁকেই ডেকে আমাদের ষ্টেটের ভার ওঁরই হাতে দেন না কেন বাবা! আমিও ওঁকে খুব বিশ্বাস করি।

সে কি আসবে মা?

কেন আসবেন না বাবা? চাকরী করতে আর কে না চায়? আমি ওঁকে টেলিগ্রাম করেছি।

মুমূর্ষু পিতা [illegible] মনেও যেন একটু আশার সঞ্চার হইল, [illegible] একবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন।

ঐ কন্যাই কিছুদিন পূর্বে যখন বাপের মুখের উপর সাফ জবাব দিয়াছিল যে পড়া-শুনা শেষ না করিয়া সে কিছুতেই বিবাহে রাজী হইতে পারে না, তখন অপত্যস্নেহান্ধ পিতা কেবলমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন—তাঁহার জীবনে বোধ হয় কন্যাকে তিনি সুখিনী দেখিতে পাইবেন না। উক্ত জবাবের অর্থ তিনি যাহাই বুঝুন না কেন কন্যার অধিকার প্রস্তাবে জীবনকে অনেকটা হাল্কা করিয়া আনিতে পারিলেন।

রাত্রি এগারটার সময় অনাথ টেলিগ্রাম পাইল। সুরমার সঙ্গে তাহার বিশেষ কিছু পরিচয় ছিল না, না থাকবারই কথা। তাহাদের গ্রামে সুরমার পিসিমার বাড়ী। তাঁহারা অগাধ ঐশ্বর্যশালী কায়স্থ জমিদার, আর অনাথ সামান্য মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। সুরমার পিতাও জমিদার অপেক্ষা কিছু কম ছিলেন না। তাঁহারই একমাত্র আদরের কন্যা সুরমা মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত-হৃদয় লইয়া তাহারই [illegible] মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে পিসিমার নিকট কল্যাণপুরে আসিত। অনাথ হয়ত কখন তাহাকে এক আধবার দেখিয়াছে, আবার কোনবার হয়ত একেবারেই দেখে নাই। সেই সুরমা তাহাকে তাহার বিপদকালে যাইবার নিমিত্ত এরূপভাবে টেলিগ্রাম করিল কেন? অনাথ প্রথমত যেন একটু ধাঁধায় পড়িল।

দুই বৎসর পূর্বে যে সময় অনাথ কঠিন জ্বর ও নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়াছিল, তখন যে সুরমা [illegible] সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সুরমা তাহারও নিরাশ্রয়ের কাল উপস্থিত হইলে, তাহার সেই পূর্বাশ্রিতকে সাহায্য করিবার [illegible] কিনা, অনাথ তাহাই ভাবিতে লাগিল। [illegible] মিলিল না, তর্কের যখন [illegible] বাহির করিতে পারিতেছিল না [illegible] কালবিলম্ব না করিয়া [illegible]।

[illegible] সুরমা [illegible] আসিয়া দাঁড়াইল। সে অনাথেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অনাথকে দেখিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয়বাবু দুইমাস হইতে বহুমূত্র রোগে শয্যাগত হইয়াছিলেন; ক্রমশই দুর্বল হইতে হইতে এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন যে-কোন মুহূর্তেই হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

অনাথ শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন।

কল্যাণপুরের পিসীমা সংবাদ পাইয়াই এ বাড়ী আসিয়াছেন। বিজয়বাবুর নিকট বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন, অনাথকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, অনাথ এসেছিস্, বিজয়কে বুঝি আর বাঁচাতে পারি না বাবা!

অনাথ বিজয়বাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল, তাহাকে দেখিয়া বিজয়বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনাথের হাতখানি লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিলেন এবং তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—চোখের জল দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল।

অনাথ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিস্ফুট মূর্তি এখানে যেন সর্বত্রই ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। ভাবিল, আমি ইহাদের কি করিতে পারি? এই শোকসন্তপ্ত বিপন্ন পরিবারের জন্য আমি কতটুকু সান্ত্বনা আনয়ন করিবার উপযুক্ত? অনাথ কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বিজয়বাবু বলিলেন, অনাথ, আমার এই শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে কি?

অনাথ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বলিল, যোগ্য বুঝিলে নির্বিচারে আপনি আমাকে আজ্ঞা করিতে পারেন।

বিজয়বাবু অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, অনাথ, আমার ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা কিছু আমি রাখিয়া গেলাম, তাহার সবই আজ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, অনাথ! বল, তুমি ইহার ভার লইলে কি-না? বল অনাথ, এই আমার শেষ মুহূর্তে, আমার সুরমা সৎপাত্রস্থ হইয়াছে এবং আমারই পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহারা নির্বিবাদে ভোগ-দখল করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া আমি পরলোকে আনন্দিত হইতে পারিব কি-না?

নির্বাণোন্মুখ দীপকলিকা যেমন শেষ মুহূর্তে একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, বৃদ্ধও তেমনি নিতান্ত শেষ সময়ে একবার উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অনাথের মুখের দিকে চাহিলেন।

অনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, আমার যতটুকু শক্তি আছে, আপনার পরিবারের হিতার্থে তাহা নিয়োগ করিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে স্মরণ করুন।

বৃদ্ধের মলিন ওষ্ঠাধরে অপরিসীম আনন্দের একটা হাসির জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হইয়া গেল। সুরমা আছাড় খাইয়া লুটাইতে লাগিল—পিসীমা সহোদরের শেষ আলিঙ্গন করিবার জন্য বুকের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

(৪)

অনাথ দোকান হইতে যখন ফিরিল, রাত্রি তখন সবে মাত্র আটটা বাজিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর-খানি চাবিবন্ধ। লোকজন কাহাকেও দেখিল না। মনটা তাহার একটু যেন বিরক্ত হইয়া উঠিল। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর এবং এতটা রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া স্বভাবতই মানুষ একটু শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার তাহার থাকিবার এবং বসিবার ঘরখানিও ঐরূপ বন্ধ দেখিয়া সে যেন বাস্তবিকই নিজেকে অনেকটা পরাধীন বিবেচনা করিতে লাগিল। তাহার উপর সেই শ্রান্ত ব্যক্তিটির ভারাক্রান্ত জীবনের এই অবসাদের অংশ [illegible] সাহায্যদ্বারাও যদি কেহ না লইতে আসে, তাহা হইলে [illegible] সত্যই তাহার মন যে অনেকটা অসহায় হইয়া উঠিবে, ইহা অস্বীকার করিবে কে? জামা ও জুতা খুলিয়া সেই বারান্দারেই একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া একটি অর্দ্ধভগ্ন টুলের উপর বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। অনাথের মনে হইল, আজ আমার ক্ষণিক বিশ্রামের ঘরখানি বন্ধ দেখিয়া মন এতটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যেদিন আমার জীবনের সমস্ত বিশ্রামের ঘরখানি বন্ধ করিয়া সোনা চলিয়া গিয়াছিল, সেদিন ত কই এতটা ভাবনা হয় নাই? চিরনিদ্রামগ্ন সোনার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বেশ ত একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; কেন মানুষের মন এমন দুর্ব্বল হইয়া উঠে?

ভুঁদিরাম তামাক লইয়া আসিল, অনাথের হাতে হুঁকাটা দিয়া নিকটে বসিল। ঝি এক গাড়ু জল আনিয়া দিয়া বলিল, বাবু বোধ হয় অনেকক্ষণ এসেছেন, আমি জানতে পারি নি।

অনাথ বলিল, না, অনেকক্ষণ হয় নাই, এই কতক্ষণ এসেছি। তোমার কাছে কি এ ঘরের চাবি আছে?

না বাবু, আমাকে ত চাবি দিয়ে যান্ নি।

ঝি রান্নাঘরে ঠাকুরকে রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, সে বুঝিতে পারে নাই, অনাথ কতক্ষণ আসিয়াছে।

সুরমার মাসীমা আজ কয়েকদিন হইল আসিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে এবাড়ী বড় একটা আসিতেন না। সুরমার পিতৃবিয়োগের পর হইতে এখন মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আসিয়া থাকেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে বোধ হয় দশবার তিনি আসিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নিঃসন্তান, বড় ভাসুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে সন্তানবৎ লালন-পালন করিয়াছেন। যখন আসেন, তাহাকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন।

ছেলেটির নাম মনোহর। আজ দুই বৎসর হইল বি-এস-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে—বাড়ী ভবানীপুরে। সুরমার সঙ্গে ইহার বিবাহ সম্বন্ধ করাই মাসীমার উদ্দেশ্য।

মনোহর, সুরমা এবং সুরমার মাসীমা এই কয়দিন যাবৎ তিনটার সময় সিনেমা দেখিতে গমন করেন এবং সন্ধ্যার পরই প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। অনাথ তাহা জানিতেন; কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

অনাথ হাত-মুখ ধুইয়া বলিল, ভুঁদিরাম, ঝিকে একবার ডাকত! ঝি আসিলে সে বলিল, শরীরটা আমার তত ভাল নাই, জ্বর জ্বর মত হয়েছে, একটু জল দাও খাব, আর ঠাকুরকে বলে দাও, রাত্রে কিছু খাব না।

ভুঁদিরাম তামাক দিয়া বলিল, বাবু, মা'রা ত আজ আরও কোথায় কোথায় যাবেন। ফিরতে বোধ হয়, অনেকটা রাতও হতে পারে। নীচে কাছাড়ী ঘরে কি একটু আরাম করবার জায়গা ক'রে দিব?

আচ্ছা, তাই চল বলিয়া ভুঁদিরামের সঙ্গেই অনাথ নীচে নামিয়া আসিল।

মনোহরবাবুদের গাড়ী যখন দুয়ারে আসিয়া লাগিল, রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। ভুঁদিরাম দরজা খুলিয়া দিল।

সুরমা উপরে উঠিয়াই অনাথের ঘরখানি চাবি-বন্ধ দেখিল, একটু বিভ্রান্তের মত হইয়া নিজের ঘরের চাবি খুলিয়া আলো টিপিয়াই দেখিতে পাইল, অনাথের ঘরের চাবি তাহার শয়ন-কক্ষের মেঝেতেই পড়িয়া রহিয়াছে; যাবার সময় তাড়া-তাড়িতে ঝিকে দিয়া যাইতে ভুল হইয়াছিল। সুরমা কাহাকেও কিছু বলিল না; হাত-মুখও ধুইল না, ঘরের মেঝেতে নীরবে হতবুদ্ধির মত বসিয়া থাকিল।

ঝি আসিয়া বলিল, মা খাবারের জায়গা করব কি? 'না!' ঝি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরমা শুধাইলেন, মনোহরদা' কি খেয়েছেন?

ঝি বলিল, হাঁ মা, তাঁর খাওয়া হয়েছে। মাসীমারও খাবার তাঁর ঘরে ঠাকুর দিয়ে এসেছে।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও পারিল না, অনাথদা' খাইয়াছেন কি না?

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন ঝি, খেয়ে নে গে যা।' বলিয়া সুরমা হাত-মুখ ধুইবার জন্য উঠিল। ভুঁদিরাম আসিয়া বলিল বাবুর জ্বর হয়েছে, কাছারী ঘরে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়ে-ছেন। উপরে আসবার জন্য ডাকব কি?

'জ্বর হয়েছে'—বলিয়া সুরমা স্থির হইয়া ভুঁদিরামের মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

কোন্ সময়ে জ্বরটা হয়েছে ভুঁদিরাম?

ভুঁদিরাম খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল, তা ত ঠিক জানি না মা, আজ দোকান থেকে অনেকটা সকালেই এসেছেন। তারপর তামাক খেয়ে হাত-মুখ ধুলেন। ঝিকে বল্লেন একটু জল দাও, আর ঠাকুরকে বল রাত্তিরে কিছু খাব না, জ্বর হয়েছে।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, কাছারী ঘরে গেলেন কেন? ভুঁদিরাম একটু থতমত করিয়া বলিল, আমিই বল্লাম যে তাঁদের আসতে আজ একটু রাতও হতে পারে, আরাম করবার জন্যে নীচে চলুন না কেন?

'যা ডেকে নিয়ে আয়' বলিয়া সুরমা কলের দিকে চলিয়া গেল।

ভুঁদিরাম ডাকিল, বাবু উপরে চলুন।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা সব এসেছেন?

হাঁ এসেছেন, মা উপরে গিয়ে শুতে বল্লেন।

(শেষাংশ ৫৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেপ-টাউন

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

(২)

জাহাজে করে অথবা রেল গাড়ীতে করে এলে কোন শহরের অথবা নগরীর সহজে কোনরূপ কূলকিনারা করা যায় না। খাওয়া-দাওয়া করে একটু ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে, পোষাক পরে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকের যাতায়াত দেখছি; ছোট ছোট ছেলেদের ল্যাটিম খেলা দেখছি, আর দেখছি এত প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসেও ছেলেরা একটুও শীতে কাঁপছে না। কাফের টুপি মাথায় দিয়ে মালয় ছেলেরা, ইংরেজী টুপি মাথায় দিয়ে খৃষ্টান ছেলেরা, তাদের মাতৃভাষায় কথা বলছে আর দিয়ে খৃষ্টান ছেলেরা, তাদের মাতৃভাষায় কথা বলছে আর মনের আনন্দে খেলছে। কেপ টাউনের ভাষা হল "আফ্রিকানেনার" বান্তু, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। শুনতে বেশ লাগে। তারপর এদের যখন গান হয়, তখন আমাদের মতই অনেকটা বলে মনে হয়।

এখানে কাফের টুপি এবং কাফের ভাষা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছি। তার পুরা তথ্য বলা দরকার মনে করি। আফ্রিকার কালো লোকদের আরবগণ কাফের বলত এবং তাদের যে ভাষা তাকে বলা হত কাফের ভাষা, এমন কি যে ভুট্টা নিগ্রোরা উৎপাদন করে, তাকে বলা হয় "কাফের কর্ণ"। এখন কাফেরেরা কোন্ টুপি মাথায় দেয়? সেই শিখাওয়ালা লাল তুর্কি টুপি। এই টুপি মাথায় দেওয়াও আরবদের কাছ হতেই নিগ্রোরা শিখেছিল। কিন্তু যদিও আরবগণ আর সেই টুপি ব্যবহার করে না, কিন্তু অবুঝ নিগ্রো এখনও সেই লাল টুপি ছাড়ে নাই। এজন্যই এই টুপির নাম হয়েছে কাফের টুপি। কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, পর্তুগীজ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ন্যাসাল্যাণ্ড, উত্তর এবং টাঙ্গানিকা, পর্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা, ন্যাসাল্যাণ্ড, উত্তর এবং অশিক্ষিত নিগ্রো খালি গায়ে থাকতে রাজি, কিন্তু একটা লালটুপি তার থাকা চাইই, অথচ সে মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বী নয়। এখন মিশনারীদের অনুগ্রহে সেই লালটুপি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাদের আপন লোক বড় ব্যবহার করে না। যারাই কাফের শব্দের অর্থ বুঝেছে তারাই সেই লালটুপি পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু মালয়রা তার সংবাদ নেয়ও না, তাই লালটুপি পরেই তারা সন্তুষ্ট।

আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নাই, মিঃ কেশব এসে বললেন, যদি বেড়াতে যেতে চাই তবে তিনি তাঁর মোটর গাড়ীতে করে নিয়ে যাবেন এবং যেখানে আজ সভা হচ্ছে সেই স্থানটাও দেখাবেন। আজকে এক বিরাট সভা। এই সভার উদ্দেশ্য হল, যে সিগ্রিগেসন বিল পাস হবে তার প্রতিবাদ করা। শ্বেতকায় ছাড়া সকল জাতই তথায় উপস্থিত থাকবে। সভাপতি হবেন মিসেস গুল। এঁর নাম আমি পূর্ব্বে শুনেছি, আজ তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হল। কিন্তু আজ তাঁর সংগে সাক্ষাৎ আলাপ কোন মতেই হতে পারে না, কুড়ি হাজার লোক আজ তাঁর কথা শুনবে। আমরা গাড়ীতে করে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গেলাম। সেই প্যারেড গ্রাউণ্ড শ্রদ্ধানন্দ পার্কের তিনগুণ হবে। এতবড় স্থানটা লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আমরা যেমন কোন সভাতে ভীড় করে দাঁড়াই, এখানকার লোক সেরূপ করে না। একটু দূরে দূরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর কান পেতে শোনে। কখন কখন আনন্দসূচক, কখনও অপমানসূচক ধ্বনি করে মাত্র, এর বেশী নয়।

মিঃ কেশব আমাকে কতকগুলি যুবকের দিকে দৃষ্টি

আধুনিক দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিতা নারী—যাহাদের সাধারণত 'কালার্ড লেডী' বলা হয়

রাখতে বললেন। এরা হল স্কোলী বয় (Scholi Boys), স্কুলের ছেলে নয়, এরা স্কুলের মুখও দেখে নাই বললে দোষ হয় না,কারণ এরা বেকার। বেকার কি স্কুলে যায় না? যায় তারা স্কুলে, তারাও লেখাপড়া শিখেছে, অনেকে J. C. পাশ করেছে। 'জে সি' মানে স্কুল মাষ্টার হবার উপযুক্ত, যেমন আমাদের দেশের মেট্রিক। তবে ওরা স্কুলের মুখও কেন দেখে নাই, এই কথাটা মিঃ কেশবকে জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ কেশব বললেন, আপন চোখে দেখে নেন—এরা স্কুলে গিয়ে কি শিখেছে। ভদ্রলোককে আর বিরক্ত করলাম না, মনে মনে ভেবে নিলাম, আগামীকল্যই দেখে নেব এরা কিরূপ লোক। কেশব যদিও শিক্ষিত লোক, তবুও তার ঐ সভাতে থাকতে ইচ্ছা হল না। তিনি তাঁর সংগে আমাকেও হেনোভার ষ্ট্রীটের বড় সিনেমা গৃহে সিনেমা দেখতে নিয়ে গেলেন। এখন একটু সিনেমার কথা বলি, তারপরই সময় বুঝে স্কোলী বয়দের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বলব।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে দুই রকমের সিনেমা আছে। এক রকম হল শ্বেতকায়দের জন্য। তাতে শ্বেতকায় অর্থাৎ ইউরোপীয়ান না হলে প্রবেশ করা যায় না। দ্বিতীয় রকম হল এশিয়াটিক

এবং আফ্রিকানদের জন্য। আগে বলেছি, একটা শব্দ আফ্রিকানেনার আর এখন বললাম আফ্রিকান। আফ্রিকানেনার মানে শ্বেতকায়গণ যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করেন অথবা যাঁরা তাঁদের বংশধর। আফ্রিকান মানে নন্-ইউরোপীয়ান, সে নিগ্রোই হউক আর আরবই হউক। এই দ্বিতীয় রকমের সিনেমা গৃহে, একঘেয়ে 'কাউবয়দের' সিনেমাই বেশী দেখান হয়। মাঝে মাঝে টারজান এবং অন্যান্য এডভেঞ্চারপূর্ণ চিত্রাবলী দেখান হয়। আজও কাউবয়-দের চিত্রই ছিল। যদিও আমার মন সেদিকে ছিল না, তবুও দেখছিলাম। মাঝে মাঝে বড় ঘরটার দিকেও তাকাচ্ছিলাম। ঘরটা আজ খালি বলেই মনে

বন্য বান্তু জাতি—কেপটাউন হইতে অনতিদূরেই ইহাদের বাসস্থান

হল। ভাবলাম শহরের লোক আজ সভায় গেছে তাই লোক সমাগম হয় নাই। পরে দেখলাম আমি যা ভেবেছিলাম তাই সত্য।

সিনেমা সমাপ্ত হবার পর প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিক থেকে লোক চলে আসছিল......অনেকেই সভার সম্বন্ধে বলছিল আপন আপন মতামত। কেউ বলছিল যেরূপভাবে স্কোলী-বয়রা আজ নীরবে বক্তৃতা শুনেছে এমনটি আর কখনও দেখা যায় নাই। কেউ বলছিল একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই, তাড়াতাড়ি চল ঘরে যাই। বেশী কিছু আর শুনতে পারি নাই, নিজ ঘরে গেলাম। তথায় এক সভার মত লোক বসেছিল। তাদের সংগে কথা বলতে বলতে রাত বেশী হয়ে গেল। তার-পর তারা চলে গেল। আমি শীতের রাত্রে চারখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সাইকেল নিয়ে বের হলাম নগর পর্য্যটনে। ইউরোপীয়ানরা যেদিকে থাকে তা দেখবার মত স্থান। উঁচু পাহাড়ের উপর সারি দিয়ে পাইন বৃক্ষ, তারই ঝোপে ছোট বড় গৃহমালা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মাঝে লোক আছে কিন্তু তাদের কথা শুনা যায় না। তারা হাসে, কাঁদে, কথা কয়, কিন্তু এর মাঝেও শৃংখলা আছে, বাস্তবতা আছে। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। সাইকেল চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে এবং সাইকেল টেনে। যদিও মুখ দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস বইছে তবুও দেখতে ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে আটলান্টিক মহাসাগরের শীতল বায়ু এসে নাকে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে বেশ আরাম লাগছে। মাঝে মাঝে দু'একজন নিগ্রো চোখ উঁচু করে চেয়ে নীচে নেমে চলছে। তাদের আমাকে দেখে আনন্দ আর আমার তাদের দেখে আনন্দ। ইউরোপীয়ানরা আমার কালো মুখ দেখে ঘৃণার চোখে একবার দেখেই, এ ভীষণ দৃশ্য যেন আর না দেখতে হয়, সেজন্য মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যাদের আমি ঘৃণা করি আমার অন্তর থেকে, তারা আমাকে কি করে ভালবাসতে পারে? যারা গভীর মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অন্বেষণে মত্ত, তাদের বলে দিতে পারি, মনের তরঙ্গ সাগরের তরঙ্গ হতে ভীষণ এবং অনেক হাল্কা। প্রত্যেক পলকে তার ঢেউ-এর প্রতিধ্বনি হচ্ছে, আর সেই প্রতিধ্বনির আঘাতের ফল অমনি বেশ সুন্দর দাগ কাটছে।

ঘুরে ঘুরে উঠলাম গিয়ে টেবিল পর্ব্বতের কাছে। তথায় বাস যায় এবং বসবার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা বেঞ্চের মাঝে লেখা রয়েছে "Only for Europeans" আমার বসার স্থান নাই। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবীতে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা আমার নাই। ইউরোপীয়ান যুবক যুবতীগণ ধুলার উপর পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিয়ার খাচ্ছে, ফল-মূল এবং রুটি খাচ্ছে, কেউ বেঞ্চের ওপর বসে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। এদের মনে কতই আনন্দ। কিন্তু আমার কালো এবং কঠিন মুখ দেখে এদের তাক লেগে গেল। একটি যুবক সাহসে ভর করে আমার কাছে এসে বলল, Are you tired, boy? আমি কি জবাব দিব? পরিশ্রান্ত হয়েছি শরীরের দিক দিয়ে নয়, মনের দিক দিয়ে। তারপর আবার ঐ কথা। 'বয়' মানে ছেলে। আমি যুবককে বললাম, Can't you see me a grown-up man, how can you call me a 'boy'? যুবকের তাতে আরও তাক লাগল। আর কথা বলল না, চলে গেল। আমি একটু দূরে গিয়ে একটা ঝোপের মাঝে বসে ভাবতে লাগলাম, আমি এখনও ছেলে? আর কতদিন ছেলে হয়ে থাকতে হবে? জীবন চলেছে ধু ধু করে বিয়োগের দিকে আর আমি 'বয়'ই রয়ে গেলাম!

আফ্রিকার কালো লোক সরল, সহজ এবং নির্ব্বোধ বলেই ইউরোপীয়ানরা এদের 'বয়' বলে ডেকে থাকে। আর আমিও তাদের সংগে 'বয়' হয়েছি। আমি কেন, ভারতের প্রায় লোকই দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'বয়' রূপে পরিচিত।—ক্রমশঃ

উপযুক্ত আমরা। আমাদের দেশ, আমাদের জাত, আমাদের ধর্ম্ম ইংরেজ পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌ছে। আমাদের দেশের রাজা মহারাজা হতে আই-সি-এস পাশ করা লোকের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছি, সবাই নাবালক 'বয়', কারণ তারা অপরের দ্বারা চালিত হয়ে হয়ে তাদের মনের গতি এমন হয়েছে যে, যদি তারা তাদের কর্ম্মের তালিকা তাদের মনিবের কাছে না পেশ করে, তবে তাদের কার্য্যের সমাপন হল না বলেই মনে করে। আমাকে 'বয়' বলেছে বলে আমি দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু দেশের কথা ভাবলে নিজেকে 'বয়' বল্‌লে রাগ করবার কিছু আছে বলে মনে করি না।

পাহাড় বেয়ে উপরে উঠেছি। একটু বিশ্রাম করেই সাইকেলে চড়লাম এবং একচোটে হেনোভার ষ্ট্রীটে চলে এলাম। এসেই একটা চায়ের দোকানে বসলাম। চায়ের দোকানে স্কোলী বয়রা বসেছিল। তারা আমার সাইকেল বাইরে দাঁড়ান দেখে, আমি সেই সাইকেলের মালিক কি না জিজ্ঞাসা করল। আমি বল্‌লাম, 'হাঁ' এবং আমিই সেই পর্য্যটক। অনেক কথা হবার পর একটি যুবক আমাকে একটি ঠিকানা দিয়ে বল্‌ল, যদি বিকালে তথায় যাই, তবে সে বাধিত হবে। যুবকের মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, যদিও খাদ্যাভাবে শরীর তার ভেঙ্গে যেতে বসেছে, তবুও তার চোখের তারায় এমন তেজ রয়েছে যে, সেই তেজ অনেকের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তার আশে পাশে যারা বসেছে, তাদের দেখলেই মনে হয়, ওদের একটি মাত্র পয়সাও নাই, অনেকদিন হয়ত পেট ভরে খায় নাই, তবে তাদের দেখ্‌লেই মনে হয় তারা স্বাধীন এবং সাহসী। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম। যে দোকানটাতে বসেছিলাম, সেই দোকানের মালিক ভারতীয় পাঠান। পাঠান বাইরে এসে আমাকে হিন্দুস্থানীতে বল্‌লেন, "পথিক যাদের সঙ্গে কথা বল্‌লে, তারা প্রত্যেকটি এক একটি যমরাজা। কখন তোমাকে ছুরি বসাবে তার ঠিক নাই। নির্দ্ধারিত ঠিকানায় যেয়ো না; সেটি হল একটি আড্ডা গৃহ। যদিও পুলিশের দৃষ্টি সে গৃহের উপর আছে, তবুও আজ যেয়ো না। গতকল্যের ঘটনা, কল্যাণজীর কাছ থেকে শুনে তারপর তথায় যেয়ো।" অনর্থক কথা না বাড়িয়া কল্যাণজীর বাড়ী গেলাম। বাড়ী ত নয়, নাপিতের দোকান। এই কল্যাণজী হলেন এখানকার হিন্দু সভার পৃষ্ঠপোষক।

আমি ঘরে যাবার পরই নমস্কার এবং প্রতি নমস্কার হল। তথায় এক বৃদ্ধ বাঙ্গালীও বসে ছিলেন। বাড়ী তার চুচুঁড়া। কল্যাণজীর ধারণা ছিল না, আমি বাঙালী। আমি বাঙালী কিনা জানার জন্য আমাকে মিঃ কাদেরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মিঃ কাদের আমার সঙ্গে কথা বলে, বলে দিলেন আমি ঠিকই বাঙালী। এই ঠিক বাঙালী এবং অঠিক বাঙালী জানবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? তার কারণ আমি জানি। এক তেলুগু ভদ্রলোক বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে প্রথম প্রথম বেশ নাম অর্জ্জন করেছিলেন, তারপর ধরা পড়ে যান। তাই দক্ষিণ আফ্রিকাতে আজকাল বাঙালীকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হলে পরীক্ষার পাশ করতে হয়। মিঃ কাদের বঙ্গদেশ ছেড়ে এসেছেন অনেকদিন হয়, তারপর দেশের কোন সমাচারই রাখেন না। সে যা হোক, বঙ্গভাষার প্রতি তার একটা টান রয়েছে, তাই দেশ থেকে মোল্লা আনিয়ে একদিকে বাঙলা এবং অন্যদিকে তাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাবার বন্দোবস্ত করছেন। আমার থাকা কালীনই শুন্‌লাম, বাঙালী মোল্লা দারবানে এসে পৌঁছেছেন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই!

মিঃ কল্যাণজীকে বল্‌লাম, আমার সঙ্গে অনেক স্কোলী-

[illegible] হইতে অনতিদূরেই ইহাদের বাসস্থান [illegible] দর্শনীয় [illegible] প্রধান—আকার যে প্রকার ইহার আহারও সেই প্রকার।

বয়দের দেখা হয়েছে, তারা আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চায়, যাব কি? হাঁ আপনি যেতে পারেন, আপনি বাঙালী বলে আমার ধারণা ছিল না; কিন্তু মিঃ কাদের বল্‌লেন, আপনি বাঙালী। আপনার আবার ভয় কিসের, তবে হুঁসিয়ার থাকবেন, অন্ততঃ একখানা ছুরি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তারপর [illegible] রাজের কথা উঠল; যেমনটি শুন্‌লাম তাই এখানে লিখ্‌লাম।

গতরাত্রের কথা

মিসেস্ গুলের পিতা ডাক্তার রহমান জনতাকে বলে দিয়েছিলেন, জনতা যেন নীরবে আপন ঘরে চলে যায়। স্কোলী বয়রা যেন পথে লুটপাট না করে। স্কচ কন্যা কিন্তু সে কথাতে সায় দেন নাই। স্কচ কন্যা মিসেস্ গুল জনতাকে পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীটের দিকে যেতে নীরবে ইঙ্গিত করলেন। পিতা-পুত্রীতে ঝগড়া—তা কেপ টাউনে কে না জানে। জনতা পুত্রীর পেছন পেছন চলতে লাগল। মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলছিল Down with colour bar, Down with Imperialist. পুলিশের সে-ধ্বনি ভাল লাগছিল না; তারপর জনতা চলেছে পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীটে, যথায় পার্লিয়ামেণ্ট চলছে। আমাদের এজেণ্ট জেনারেলও তথায় কোথাও নিশ্চয়ই বসেছিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীটে শাদা লোকের প্রশেসন যেতে পারে, কিন্তু অন্য লোকের নয়। মিসেস্ গুলের ইচ্ছা সেদিকে যান এবং একটু আইন-অমান্য করেন। তাঁর গাড়ী পুলিশ থামাল। যেমনি গাড়ী থামান, আর ঐ স্কোলীবয়রা পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে পুলিশকে ধরাশায়ী করতে লাগল। বেশ একটু আমোদ হল স্কোলীবয়দের। এদিকে পুলিশকে নাস্তানাবুদ করা, অন্যদিকে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে পেট ভর্তি করে খাওয়া। তারপর তারা উধাও। পুলিশের সাহায্য এল। মিসেস্ গুল তখনও তথায় দাঁড়িয়ে। পুলিশ স্কোলীবয়দের পাত্তাও পেল না, পেলে বেচারা জনতাকে। তারপর ঐ জনতাকে একটু শাসন করল, যার ফলে অনেকে হাসপাতালে গেল। মিসেস গুল সজল নয়নে আপন গৃহে প্রস্থান করলেন।

যারা চিকিৎসার্থ হাসপাতালে গিয়েছে, তারা গোবেচারী, তাই আজ অনেককেই পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে, তারপর নূতন লোকের খোঁজ করছে। সেই নূতন লোকদের খোঁজ করা বড়ই কষ্টকর কাজ। সকলেই জানে, তারা কে। কিন্তু এমন কোন আইন এই দক্ষিণ আফ্রিকাতে নাই যাতে সন্দেহ করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। যদিও বা এরূপ গ্রেপ্তার কখন কখন হয়, কিন্তু তার সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করে, যেন লোকটাকে ধরার পরই কাঠগড়ায় উঠিয়ে তার বিচার করা চলে।

আমি থাকতাম ৫নং লেসার ষ্ট্রীটে। এই ষ্ট্রীটটি পার হলেই, একটা বড় পথ আছে, সেই পথটা পার হয়ে ছোট ছোট অনেক পথ, তারপর একটা একতলা বাড়ী, তারই সামনে কতকগুলি যুবক দাঁড়িয়ে। এক এক আনার পয়সা দিয়ে তারা জুয়া খেলছিল। আমাকে দেখে তাদের জুয়া বন্ধ হল না, শুধু একজনা লোক এদের সঙ্গ ছেড়ে আমাকে নেবার জন্য বাইরে এল এবং আমাকে নিয়ে ঘরের মাঝে প্রবেশ করল। ঘরের মাঝে অন্য দুজন লোক বসে ঢাহা (Dhaha) মানে গাঁজা খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই গাঁজার সিগেরটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তা নিলাম না দেখে একজন গুপ্ত পঞ্জর নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এল, কিন্তু সঙ্গের যুবক ইঙ্গিত করতেই লোকটা বসে পড়ল এবং আমার কাছে ক্ষমা চাইল।

লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি ভেবে আমাকে আক্রমণ করেছিল। সে তৎক্ষণাৎ বললে, ইণ্ডিয়ান সি আই ডি ভেবেছিল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে বলল—ইণ্ডিয়ান সি আই ডি না করতে পারে এমন কাজ নাই। এই সি আই ডি-দের মাঝে নানা দোষ আছে। মিত্র সেজে এসে গাঁজা রেখে ধরিয়ে দেয়। নির্দ্দোষ লোককে ধরে, ধরিয়ে দেয় আনাড়ী অগাঁজাখোরদেরে। লোকটা বলল,—"কি করে মহাত্মা গান্ধী এরূপ লোকদেরে সৎপথে আনতে পেরেছেন? ডাচ পুলিশের সঙ্গে লড়াই হয়েছে গতকল্য রাত্রে, কিন্তু তারাও এত হীন কাজ করবে না—নির্দ্দোষ লোককে ফাঁসিয়ে দিবার জন্য।" লোকটি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় যে যুবক আমাকে আসতে বলেছিল, সে এসে আমার করমর্দ্দন করল এবং একটু বসতে বলল। সে আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে শুধু এক প্যাকেট ডামুরিয়া আমার হাতে দিয়ে চলে গেল।

দুজনেই আমরা ঘরে ছিলাম। তাকে—গাঁজা কেন খায়, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। সে কেন গাঁজা খায়—তাই বলতে লাগল আর আমি তাই শুনতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমার কাছ হতে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাতে লাগল। আমি তাতে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিতেছিলাম। তার চোখ কখন কখন রক্তবর্ণ, কখন কখন জলে ভর্ত্তি হতেছিল। আমি তার মুখ এবং তার কথা কান পেতে শুনছিলাম। তার গল্প শেষ করার পূর্ব্বেই পরিচিত যুবকটি এসে বললে "এরূপ গল্প দিয়ে আমাদের জীবন গঠন হয়েছে, আরও কত শুনবেন, চলুন এখন অন্যত্র যাব।" যেখানে এখন আমি যাচ্ছি তার নাম লিখব না, সেই স্থানের নাম দিব "আঁধারে আলো"। কিন্তু ঐ যুবকের গল্প না শুনে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু কি করা যায়, আমরা চললাম "আঁধারে আলোর" দিকে। ৫নং লেসার ষ্ট্রীট হতে সেই স্থান বেশী দূরে নয়।

(ক্রমশ)

প্রলয়ের পথে

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(১৮)

মূর্ছাভঙ্গের পর লীলাকে ভয়ানক দুর্বল দেখাইতে লাগিল। ক্রমাগত দুই-তিনদিন রোগী শুশ্রূষার ভার সম্পূর্ণ-রূপে নিজের উপর লইয়া সতীশ লীলাকে বিশ্রামের অবকাশ দিল। পরদিন হইতেই নরেন্দ্রের অবস্থাও উত্তরোত্তর ভালর দিকে যাইতেছিল—লীলাও যেন অনেকখানি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—স্বামীর ভার সতীশের উপর সঁপিয়া দিয়া সেও যেন একটু বাঁচিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রের দেহের ক্ষতগুলি শুকাইয়া উঠিল। নরেন্দ্র বিছানায় উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। এ-কয়দিনে লীলার দুর্বলতাও কাটিয়া গিয়াছিল অন্তরে গভীর পরিতৃপ্তি চক্ষে আনন্দের উজ্জ্বলতা লইয়া নিরুদ্বেগ প্রশান্তি লইয়া লীলা আবার স্বামীর শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

সতীশ কহিল, "আজকে বৌদিকে কিন্তু বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কি করেই যে এ কদিন কেটেছে। আজ কিন্তু আমিও বেশ আরাম পাচ্ছি বৌদি বুকের ভেতর যেন একটা পাথর চাপান ছিল। অত বড় বিপদে না পড়লে কিন্তু আজকের এই আনন্দটা পাওয়া যেত না! দুঃখের মাধুর্যই ঐ খানটায়!"

লীলা প্রফুল্ল মুখে মাথা নাড়িয়া সতীশের কথায় সায় দিল।

সতীশ বলিল, "আজ বুঝেছি বিপদও ভগবানের এক অনুগ্রহ। সে আসে বলেই ভগবানকে ডাকি—তাঁকে বিশ্বাস করি—আবার তাঁরই কৃপায় মুক্তি পেয়ে এত আনন্দ পাই। তাঁর অনুভূতিতে হৃদয়-মন ভরে ওঠে।"

সতীশের কণ্ঠে কৃত্রিমতা ছিল না। শুনিয়া লীলা সুখী হইল।

আরও একদিন কাটিল। লীলা ও নরেন্দ্র বসিয়াছিল। সতীশ আসিয়া বলিল, "এবার আমার ছুটি নবেন, আমি আজ বাড়ী যাব।"

তারপর একটু থামিয়া বলিল, "আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, এই কলিযুগেও সীতা সাবিত্রীরা বেঁচে আছে। পাশ্চাত্যের আবহাওয়া তাঁদেরে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি।"

বলিয়াই সতীশ সহাস্য দৃষ্টি দিয়া লীলার পানে চাহিল। কথাটা আর বেশী দূরে অগ্রসর হওয়া লীলার ইচ্ছা নয়। পরের মুখে নিজের প্রশংসা শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু পাছে তাহাতে তাহার এই গোপন সাধনার কথা তাহার স্বামীর কর্ণগোচর হয়, এই ভাবিয়া লীলা হাসিমুখে বলিল, "সত্যি হোক মিথ্যে হোক নিজের স্ত্রীকে সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করতে দেখলে কোন পুরুষই অসন্তুষ্ট হবেন না, যদিও নিতান্ত আপনার দুচারজন ছাড়া এমন লোকও আছেন, বেশী সতী দেখলে তাঁরা খুসী হ'তে পারেন না।"

উভয় শ্রোতাই অপার বিস্ময়ে লীলার দিকে চাহিল। লীলা তেমনই মৃদু-মধুর দৃপ্ত হাসি হাসিয়া বলিল, "ভাবছেন,—পুরুষের এ মনোবৃত্তি আমি জানি কি করে। কথাটা নূতনও নয়, আমার নিজস্ব নয়, ওদেশের কারুর কাছ থেকে ধার করা।"

সতীশ কথাটি জানিত। তাদের ইউনিভারসিটি কলেজের কোন এক বিলাত ফেরত প্রফেসার ছেলেদের পড়ানর চেয়ে তাদের সঙ্গে বাজে গল্প করিতেই ভালবাসিতেন এবং তিনিই একদিন ঠিক ঐ জাতীয় একটি কথাই ইংরেজীতে বলিয়া-ছিলেন। লীলা ইহা কি করিয়া জানিল, এই ভাবিয়াই সতীশ আশ্চর্য হইয়া গেল। এই সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদ না করিয়া সতীশ কহিল, "আমি এখন বিদায় চাই বৌদিদি, এখুনিই আমি বাড়ী যেতে চাই।"

লীলা কহিল, "কেন, এখানে কি বিশ্রাম নেওয়া চলবে না?"

সতীশ মিনতিপূর্ণস্বরে কহিল, "বিশ্রামের জন্য নয়, বিশ্রাম আমি চাইনে। কাজই আমার ভাল লাগে—কাজ না পেলে কোন কিছুতেই আনন্দ পাইনে। সরকার গোমস্তার হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে বাইরে থাকা যদিও আমার অনভ্যাস নয় তবুও খোঁজ খবর না রাখলে চলে কি করে। মেথর বস্তিতে একটা নাইট পাঠশালা করে দিয়েছিলাম, তারও কোন খোঁজ নিতে পারিনি কতদিন। ব্যায়াম সমিতিতে মাঝে মাঝে না গেলেই চলে না। দেশেও একবার যেতে হচ্ছে আমাকে। গেল বছর বন্যায় গিয়েছিল দেশটা ডুবে। আমাদের ইষ্ট বেঙ্গল ত দেখেন নি কোন দিন, একটু বেশী জল হলে সারা দেশটা ডুবে যায়। প্রজারা শস্য পায়নি খাজনা দিতে পারছে না—সাবেক দেনা শুধতে না পারায় নূতন ঋণ পাচ্ছে না, বীজ ধান পর্যন্ত কারুর ঘরে নেই। দেখি একবার দেশে যেয়ে ওদের যদি কিছু উপকার করা যায়!"

স্থিরভাবে বসিয়া লীলা সতীশের কথা শুনিল। পরে বলিল, "ভেবে ভেবে এই কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন, কবিতা লেখা হয় কখন?"

হাসিয়া সতীশ বলিল, "আপনার খোঁচা খেয়ে খেয়ে সে বদ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি বৌদি। কি হবে আর ওসব ছাই-ভস্ম লিখে যদি তাতে দেশের কোন উপকার না হয়। প্রেমের সংগীতে পরাধীনতার গ্লানি বেড়েই যাচ্ছে। ওই পড়ে পড়ে দেশের জনসাধারণ ভাববিলাসী হয়ে পড়েছে। দেশের সঙ্গীতে-সাহিত্যে জাতি গড়ে ওঠে—। সেই সাহিত্যই যদি হয় মেয়েলী ধাঁজে গড়া—জাত তা হ'লে মেয়েলী হবে যাবে না! যে গানে কর্মশক্তির প্রেরণা দেয় না—শুধু ভাবপ্রবণ সমাজের সৃষ্টি করে—এই জীবন মরণ সমস্যার দিনে সে সব ভুলে যাওয়াই ভাল।"

লীলা নীরবে শুধু একটু হাসিল।

সতীশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, "হাসছেন বৌদি। ভাবছেন এ খেয়াল আমার কবে থেকে হল! খেয়াল ছিল বরাবরই—আপনার চোখে পড়েনি! সব দেশেই জাতীয় সংগীত আছে—আমাদের এই দেশে জাতীয় সংগীতই হচ্ছে প্রেম সংগীত। প্রেম আমাদের অস্থি মজ্জায় মিশে গেছে।

আমরা এক গালে চড় খেয়ে আর এক গাল পেতে দি। এমনি আমাদের বিশ্বপ্রেম—। তরুর চেয়ে সহিষ্ণু—তৃণের চেয়ে নীচু হ'তে আমাদের ধর্ম—আমাদের জাতীয় সাহিত্য উপদেশ দিয়েছে। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে—ধর্ম এসে পড়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। ধর্মই হয়ে পড়েছে আমাদের পলিটিকস্ আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রার চালক। আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে এই জীবনের অনিত্যতা—এর অপ্রয়োজনীয়তা। অজানিত পরকালে সুবিচারের আশায় আমরা ইহকালকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছি। Ethical life—যাকে বলে নৈতিক জীবন—তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ঠাকুরের পুজোয় বসেছি—দুদিন অনাহারে থেকে দরিদ্র-নারায়ণ এসে কাতর কণ্ঠে খাদ্য মাগছে—তার চেঁচামেচিতে পুজোর মন্ত্র ভুল হচ্ছে বলে রেগে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—। মালার থলে হাতে হরিনাম জপতে জপতে যাচ্ছি—পথের ধারে নিরাশ্রয় কলেরার রোগী পড়ে এক ফোঁটা জলের জন্য চেঁচিয়ে মরছে ফিরেও চেয়ে দেখছি না, পাছে তার স্পর্শে আমি অশুচি হয়ে পড়ি। গঙ্গার স্রোতে একজন ডুবে মরছে—আমি হা ভগবান বলে আহা উহু করছি সাঁতার জেনেও জলে নাবছি না। কর্ম ফলের দোহাই দিয়ে ভগবানের লীলা স্মরণ করে নিজের মনকে আঁখি ঠারছি! এই ত আমাদের নৈতিক জীবন—! এর গোড়ায় রয়েছে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা এবং তারই জন্য আমরা হয়ে পড়েছি এমন পরাধীন!"

লীলা পূর্ববৎ মৃদু হাসিয়া বলিল, "সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার অভ্যাসও তাহলে আছে, না ঠাকুর পো!"

সতীশের মনে একটু উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। তারপর লীলার এই পরিহাসে কোথায় যেন একটু ঘা লাগিয়া তাহাকে আরও উত্তেজিত করিয়াছিল। সতীশ কহিল, "পরাধীন দেশে পরাধীন জাতির মেয়েদের কাছ থেকে এর চেয়ে আর বেশী কি আশা করতে পারি বলুন! অথচ এই ভারতের মাটিতে—কুন্তী, দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল। বীর পুত্রের জননী—বীর স্বামীর সহধর্মিণী ছিলেন তাঁরা। স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধের জন্য—উত্তেজনা দিতেন তাঁরাই। ভারত ছিল সেদিন স্বাধীন, নৈতিক জীবন ছিল উন্নত, স্বাধীনতা ছিল তাঁদের জীবনের কাম্য। আজকালকার সস্তা প্রেমে তাদের প্রাণ হা-হুতাশ কর্‌তনা।"

কথাটায় বুঝি লীলারও একটু খোঁচা লাগিল। লীলাও সামান্য কঠিন কণ্ঠে কহিল "ভীমার্জুনের মত স্বামী-পুত্র পেলে দ্রৌপদী-কুন্তীর অভাব হয় না আজও। তালপাতার সেপাইয়েরা বাতাসে পড়েন হে'লে, কুন্তী-দ্রৌপদী জুটবে কোথা থেকে! দ্রৌপদীর মত বীরপত্নী পেতে হ'লে অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করবার সংযমও থাকা চাই।"

তারপর সুর একটু নরম করিয়া লীলা কহিল, "মেয়েদের ওপর দোষ চাপালে ত চল্‌বে না ঠাকুর-পো! পুরুষেরা হচ্ছেন সমাজ গঠনের কর্তা। তারা চলেন আগে আগে, নারী যায় তার পেছনে। দুর্বল নারী তার অস্তিত্ব—তার আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে পুরুষের মনস্তুষ্টি করেই ফেরে। সস্তা প্রেম তারা চায়—নারীও তাই দিয়ে নিজের মান রাখে। কি করবে সে যে দুর্বল আরও পরাধীন। তার সাজসজ্জা—স্নো পাউডার মাখা—রং বেরংএর কাপড় পরা, সবই যে পুরুষকে আয়ত্তের মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে। নইলে তার নিজের প্রয়োজন কতটুকু। পুরুষের রুচির খোরাক যোগাতেই ত নারীর দিন যায়। আজ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কোন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে, অমনি সে বীর স্বামী ভেবে বসবেন—একটুও ভালবাসে না তাকে তার স্ত্রী!"

কথটা হয়ত খানিক সত্য। সতীশ তর্ক না করিয়া বলিল—"সেই জন্যই বলছি বৌদি, ওসব দুর্বলতার প্রশ্রয় দিলে আর চলছে না। আজও যাদের চোখ ফোটেনি, সোনার খাঁচায় বসে ভাবছে বেশ আছে সেই কমলবিলাসী দলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে! শুধু মনের দুর্বলতা নয়—তার শারীরিক শক্তিকেও বাড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করে দেশের যুব-শক্তিকে সবল ক'রে তুলতে হবে! আমার জমিদারীতে প্রায় প্রত্যেক ভদ্র-প্রধান গ্রামে এক একটি করে ব্যায়াম সমিতি গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করছি—।"

সতীশের কথাগুলি লীলা এবার হাল্কাভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল, "ঐ সব সমিতির নাম শুনলেই যে ভয় হয় ঠাকুরপো! কর্তাদের নেক নজর যে ওর পর লেগেই আছে। কোন দিন বিপ্লবী বলে ধ'রে নিয়ে না যায়।

সতীশ যেন একটু উৎসাহ পাইয়া বলিল, "সে ভয় ত আছেই। পরাধীন দেশে চিরকাল তা থাকবে। ওরা ত চায়ই জাতটাকে অকর্মণ্য ভীরু কাপুরুষ ক'রে তুলতে। আমাদের দুর্বলতার ওপরেই যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই টেররিষ্টদের সঙ্গে আমার সমিতিগুলির কোন সম্পর্কও নেই। টেররিজমের ওপর আমার কোন সহানুভূতি নেই। বরং ঐ সন্ত্রাসবাদকে মনে মনে আমি ঘৃণা করি। ওতে ত দেশের ইষ্ট হচ্ছে না এতটুকুও। অহিংস নীতির পথে দেশ যতটুকু এগিয়ে চলছিল—তাকে ওরা ঠেলে পিছিয়ে দিচ্ছে! জানি বিনাদোষে নির্যাতন আমাদের সইতে হ'তে পারে। তাই ব'লে ত পিছিয়ে থাকতে পারিনে বৌদি! এই ক্ষীণ দুর্বল মানুষগুলোকে সবল কর্মক্ষম ক'রে তুলতে হ'লে তাদের দেহকেই আগে গড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে নিতে হবে। গায়ে জোর না থাকলে কি মনে বল আসে! দুর্বলকে কেউ খাতির করে না। জাত সৃষ্টি করার গোড়ার মন্ত্রই হচ্ছে জাতের ভবিষ্যৎ মানুষগুলোকে সুস্থ সবল ক'রে তোলা এবং তার জন্য নিয়মিত ব্যায়ামই হচ্ছে শরীরকে গড়ে তোলবার একমাত্র উপায়। লাথি-ঘুসিতে পিলেগুলো আমাদের ফেটেই গেল! গায়ে বল থাকলে পিলেও ফাটে না, কেউ ফাটিয়ে দেবার সাহস, রাখে না।"

তারপর একটু থামিয়া সতীশ কহিল, "এ নিয়ে তর্ক যদি কিছু থাকে অন্য দিন এসে করব। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি বৌদি!"

লীলা বলিল, "তবে আর আপনাকে আটকে রাখব না,

ঠাকুরপো। দেহের ওপর এ কয়দিন নানা অত্যাচার গিয়েছে। বাড়ী গিয়ে দু'চার দিন বিশ্রাম নিয়ে যেন ওসব কাজে হাত দেবেন। এইটি আমার অনুরোধ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনার বন্ধুত্বকে হাল্কা করব না—আপনিও খুশী হবেন না নিশ্চয়! রোজ বিকেলের দিকে একবার করে আসবেন যেন।"

হাসিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আসি ভাই নরেন। আর কোন ভয় নেই—সাবিত্রী ঘরে থাকলে মরা সত্যবানের পরমায়ুও পাঁচশো বছর বেড়ে যায়।"

বলিয়াই সতীশ লীলার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর একটি ছোট নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে সতীশের ইচ্ছা হইল একবার মেথর বস্তীটা ঘুরিয়া যায়। ধাঙড় পল্লীতেও কয়েকজনের অসুখ করিয়াছিল তাহাও একবার দেখিয়া যাইতে হইবে।

ধাঙড় পল্লীর নিকটে আসিয়া সতীশ ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিয়া নোংরা পাড়ার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এক জনের অসুখ, অন্য জনের অভাব-অভিযোগ, আর এক জনের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়াছে, রামু কাল মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল, কেষ্ট দুই দিন রাত্রিতে পাঠশালায় যায় নাই, রামখেলাওন মেয়ের বিয়েতে কিছু সাহায্য করিতে হইবে। এই সব আবেদন নিবেদন শুনিতে শুনিতে বেলা অনেকখানি কাটিয়া গেল। সতীশ সেখানকার কাজ সারিয়া মেথর বস্তীর দিকে চলিল। সেখানেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সদর রাস্তার দিকে পা বাড়াইবে, বস্তীর শেষ সীমায় সহসা একটি ঘরের পানে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সতীশ একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল তেইশ চব্বিশ বৎসরের একটি যুবক সতর-আঠার বছরের একটি তরুণীর মুখে মদের গ্লাস ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তরুণী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছে, 'আমি মদ খাবেক নাই—বাবু মানা করিয়েছে!'

তরুণীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই সতীশ তরুণীর গৃহদ্বারে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, "সেদিন না তুই আমায় ছুঁয়ে দিব্যি করলি লছমিয়া—আর মদ ছুঁবিনি।"

লছমিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর তার সুন্দর কাজল আনত চক্ষু দুটি ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া সতীশের দিকে চাহিতে লাগিল।

"আর মণ্টু তুই এখানে কি করেত এসেছিস, বে করবি লছমিয়াকে?"

মণ্টু সতীশের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "এবারটি মাফ করবে বাবু—আর মদ ছোঁবেক নি। আমি লছমিয়াকে বলে বাবু 'আমি সাদি করবে, তা উ শুনেক নি। বোলে ভদ্দর আদমী মাফিক থাকবে, এক সোয়ামী মর্ গেল ফিন সাদি করবেক নি।"

শুনিয়া সতীশ একটু বিস্মিত হইল। পরে লছমীর দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁরে লছমিয়া, মণ্টু বলছে ওকে সাদি করবি না। এক স্বামী মরে গেলে তোদের মধ্যে যখন আবার বে' হয়! তারপর তোর এই কাঁচ বয়স, তোর কি সাজে"—

সতীশ আরও কি বলিতে যাইয়া সহসা থামিয়া গেল। লছমিয়া ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত গর্জিয়া উঠিল। অপরূপ রোষ-দৃপ্ত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া মণ্টুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তু চলা যা মণ্টু আমার ঘর থেকে। ফিন্ আস্বেক ত ঝাঁটা মার্বেক।"

দুঃখিতচিত্তে মণ্টু চলিয়া গেল। অনিঃশেষিত মদের বোতল সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

লছমিয়া করুণ নয়নে সতীশের দিকে কতকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারপর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল 'বাবু'!

কি বলিতে যাইয়া লছমিয়া বলিতে পারিল না। তার চোখে জল আসিয়াছিল। অশ্রু লুকাইতে যাইয়া মুখ নত করিল।

সতীশ চমকিত হইয়া কহিল, "কিরে লছমিয়া?"

লছমিয়া নিজকে একটু সামলাইয়া লইয়াছিল। বলিল 'তু আর হেথা আসিস্‌নি বাবু।"

লছমিয়ার কথার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া সতীশ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, লছমিয়ার চোখের কোণে অশ্রুরাশি জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

সতীশ কহিল, "আমি এলে তোদের মদ খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, না লছমিয়া! তা কাঁদছিস কেন?"

লছমিয়া কথা কহিল না। কেবল তার চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে চোখের জল মুছিয়া লছমিয়া বলিল, "আমি তুহার পা ছুঁয়ে বলেছে বাবু, মদ আর খাবেক নি। তু আর আসিস্‌নি তুকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

বলিয়াই লছমিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সতীশ কতকক্ষণ হতভম্বের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—মুখে তাহার কথা ফুটিল না। মস্তকের শিরা-উপ-শিরা টন টন করিয়া উঠিল—লছমিয়া বলে কি? অবশেষে কি এই অস্পৃশ্যা তরুণী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! অথবা এ তাহার যৌবনের অস্থির উন্মত্ততা! এও কি সম্ভব লছমিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারে। কেনই বা অসম্ভব তাহার দৈহিক রূপ লাবণ্য ত ভদ্রঘরের মেয়েদের চেয়ে কম নহে, বরং অমন সুশ্রী-সুঠাম পরিপুষ্ট দেহ—সুগোল লীলায়িত বাহু, অপূর্ব মাধুরীময় যৌবনশ্রী, টানাটানা, ভাসা-ভাসা কালো চোখ অনেক ভদ্রঘরেও যে দুর্লভ। হৃদয়-ধর্মেই বা সে ভদ্রনারীর চেয়ে হীন হবে কেন?

ভারাক্রান্ত মন লইয়া সতীশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। দুপ্রহর পর্যন্ত রোদে রোদে ঘুরিয়া তাহার মাথা ধরিয়াছিল। এক একবার মনে হইতেছিল, বুঝি জ্বর হইবে।

স্নানাহার শেষ করিয়া সতীশ একবার বিশ্রামের আশায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শুইয়া শুইয়া কেবল তার লছমিয়ার কথাই মনে হইতে লাগিল। হায়রে মানুষের মন, কেউ যদি রহস্য করিয়াও বলে, ওগো তোমায় আমি ভালবাসি, অমনি

মাথায় আসিয়া চাপে ভূত—রক্তে লাগে দোল—চোখে জমিয়া উঠে নেশা! ঘুরিয়া ফিরিয়া তারই কথা মনে হয়, তাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, আবার ঐ কথা শুনিতে ইচ্ছা জাগে। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে সে অযোগ্য যোগ্য হইয়া উঠে—অসুন্দর সুন্দরে পরিণত হয়।

সতীশের মনে হইতেছিল—তরুণী বান্ধবীর সংখ্যা তার বেশী না থাকিলেও নরেন্দ্রের সংগে মিশিয়া নানা বয়সের নানা চরিত্রের মেয়েদের সংগে মিশিবার সুযোগ সে পাইয়াছে। অনেক শিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না আধুনিকার আকুতি-ভরা দৃষ্টির সম্মুখেও সে পড়িয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে কেহই ত তাহাকে বলে নাই। কেহই ত চোখের জল মুছিয়া বলে নাই "ওগো তুমি আর আমার কাছে এস না, তোমায় দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই!"

সতীশের চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। এ অনুরাগের ভাবী ফল শুধুই ব্যর্থতা! দূরে ভবিষ্যকে ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়াই সতীশ ঘুমাইতে চেষ্টা করিল—। কিন্তু কোথায় যেন কি একটা চিন্তা অদেখা কাঁটার মত মনের কোণে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। (ক্রমশ)

মহাসমরের পটভূমি—ইউরোপ

(৫৪০ পৃষ্ঠার পর)

করিতে চাহে। অথবা এইরূপ দৃষ্টিভংগীও তাহাদের রহিয়াছে বলিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা হইতেই এই সংঘর্ষ উত্থিত—ইউরোপ ও জাপানে জন-সংখ্যা অতিরিক্ত বর্ধিত হইয়া, সমগ্র বিশ্বের জনবিরল অংশে বিস্তৃত হইয়া পড়িবার অভিলাষের যে বিঘ্ন তাহাই বিদূরিত করিতে চেষ্টিত, সেই চেষ্টার পরিণামেই বর্তমান আন্তর্জাতিক বিরোধ। অথবা তাহাদের মতে এই সংঘর্ষকে সেই সমস্যা-মূলকও বলা চলে, যাহার মূলে সমরসজ্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতা; সকলগুলি শক্তিই যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাজি জিতিয়া লইতে অগ্রসর—যে দৌড়ের উদ্দেশ্য ব্যাপক মৃত্যু আনয়ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। পণ্ডিত-গণ যেভাবেই ইহাকে বর্ণনা করুন, তাঁহাদের মতবাদ, বিশ্লেষণ, ভবিষ্যদ্বাণী এবং সংখ্যান সকল দৃষ্টিভংগীতে মত একই দাঁড়ায় এবং তাহা হইল—সমর অনিবার্য। বর্তমান ঘটনাস্রোতও তাহাই নির্দেশ করে।

কিন্ত বর্তমান যুগ এবং যুদ্ধ-পূর্বযুগের ভিতর রহিয়াছে একটা বিরাট পার্থক্য। মহাসমরের পূর্বেকার যুগের বিশ্ববাসী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ যে ঐতিহাসিক মৃত্যুচিত্রের দিকে তাহারা আগাইয়া চলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না, এমন কি যে রাজনীতিক দল মহাসমরকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারাও ধারণা করিতে পারে নাই উহার বাস্তব প্রভাব ও বিষময় ফল।

১৯১৪ সনের ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যায় যখন গ্রেট-ব্রিটেন যুদ্ধই নিশ্চিত করিল, তখন স্যার এডোয়ার্ড গ্রে ফরেন অফিসের বাতায়ন হইতে চারিদিকে আলোক প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"সমগ্র ইউরোপ হইতে আলোকমালা নির্বাপিত হইয়া যাইতেছে, আমরা আমাদের জীবিতকালে আর উহা পুনঃ প্রজ্বলিত দেখিব কি না সন্দেহ।" কিন্তু যাহারা আশা করিতেছে আর একটি সমর আসন্ন, তাহাদের নিকট ঐ বাক্য তবু কতকটা আশাপ্রদ; কিন্তু এমন আশাহত লোক রহিয়াছে অগণিত যাহারা বলে—ইউরোপের আলোক-মালা আর প্রজ্বলিত হইবে না।

কে এলরে পথ ভুলিয়া

শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী

কাননে আমার কে এল রে আজি, কে এল রে পথ ভুলিয়া?
ফুল করবীরা চাহিল ঘোমটা খুলিয়া।
আজি বনতল গন্ধে পাগল,
চাঁপা ফুলদল খুলেছে আগল,
মলয়-পরশ পেয়ে বনবীথি সহসা উঠেছে দুলিয়া।
কে এলরে পথ ভুলিয়া॥

রবির কিরণ মরীচিকা জাল বুনিয়াছে, দেখ চাহিয়া!
এল কি দেবতা আলোর ঝরণা বাহিয়া!
পরাগের রেণু মাখিবার ছলে
কে এল আমার কাননের তলে,
আমার স্বপন সফল করিয়া কে এল শিশিরে নাহিয়া?
কে এল রে দেখ চাহিয়া॥

রাখাল অদূরে বাজায় বেণুকা আকাশ আকুল করিয়া:—
মৃদু শিহরিয়া টগর পড়িছে ঝরিয়া।
অর্ঘ্য রচিয়া আমের মুকুলে
পেতেছি আসন ঝরে-পড়া ফুলে,
না জানি, কাহারে দিতে হবে বরি; না জানি কাহারে স্মরিয়া
টগর পড়িছে ঝরিয়া॥

মেঘের ওপারে নবীন উলাসে কে যেন বাজায় বাঁশরী।
পরাণ উতল, সবারে যাই গো পাশরি।
শুধু অকারণে জাগিছে হৃদয়,
সকল বেদনা বিলাপের স্মৃতি! মন হতে আজি যা সরি।
কে যেন বাজায় বাঁশরী॥

কাননে আমার লতায় পাতায় শতদল যেন ফুটিয়া।
অন্তরযামী, এস লহ শোভা লুটিয়া।
মর্মরি আজি উঠেছে কানন,
কুন্দকলিরা খুলেছে আনন,
দিশি দিশি হ'তে শত মধুকর প্রভাতে এসেছে জুটিয়া।
এস, লহ শোভা লুটিয়া॥

মহাসমরের পটভূমি—ইউরোপ

(২)

রূঢ় অধিকার—১৯২৩ সালের ১১ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট পোয়েনকেয়ার রূঢ় অঞ্চলে ফরাসী সেনা পাঠাইয়া দিলেন কয়লা, লোহা প্রভৃতির উৎস হইতে ৮০ পারসেণ্ট অধিকার করিবার জন্য। গ্রেট্-ব্রিটেনের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ৬০০ দিবস ব্যাপিয়া ফরাসী সেনা রূঢ় অঞ্চলে সতর্ক প্রহরা দিতে থাকে। ইতিহাসের চরম উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের সেই কাল ফরাসীদের তরফ হইতে।

১ লক্ষ ৪৭ হাজার জার্মান অধিবাসীকে এই অঞ্চল হইতে ১১ মাসের ভিতর বিতাড়িত করা হইল। ৪০ লক্ষ লোকের বাস এই রূঢ় অঞ্চলে—ইহার প্রত্যেকটি প্রধান শহরের বার্গোমাস্টার হয় বহিষ্কৃত নতুবা বন্দী হইল।

সকল কারখানার খাতাপত্র, টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপিস-গৃহ প্রভৃতি অধিকার করা হইল। সামান্য বিক্ষোভ যে না হইয়াছিল এমন নয়—ন্যূনপক্ষে ১০০ লোক সে সকল সঙ্ঘর্ষে প্রাণ হারায়। সংবাদপত্রগুলিকে দমন করিয়া প্রকাশ বন্ধ করা হইল। ফরাসী-অধিগীরিতে পরিচালিত প্যালাটিনেট্ স্বায়ত্তশাসনমূলক গবর্ণমেণ্টের এলাকা হইতে ১৯০০০ অফিসিয়াল নির্বাসিত হইল।

মিউনিকে লুডেনডর্ফ এবং হিটলার ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল প্রয়াস আরম্ভ করিল। রূঢ় অঞ্চলে জার্মান গবর্ণমেণ্টের সমর্থনে সকল জার্মান শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিল—উহাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য অর্থপ্রদানে জার্মান সরকারকে অতিরিক্ত নোট তৈরী করিতে হইল।

জার্মানীর সীমান্তের চারিদিকে যে ফরাসী কারসাজিতে মৈত্রী-প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাকে ভেদ করিতে যে ঝটিকার উদ্ভব হইল, একরূপ ইউরোপের মাথার উপর দিয়া, তাহাতে জার্মানীর অর্থনৈতিক কার্পণ্য ও সঙ্কেম হিসাবেও উত্থিত হইল ঝটিকা। ডিসেম্বরে অর্থাৎ ফরাসীদের রূঢ় অধিকারের অল্পকাল পরে মার্কিনের এক ডলারে ৭০০০ জার্মান মার্ক ক্রয় করা যাইত। এমনই একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব দেখা দিল জার্মানীতে যে, একমাস পরে ঐ দর একেবারে ৫০,০০০ মার্কে পৌঁছিল। জুন মাসে আরও নামিয়া ১ লক্ষ মার্কে দাঁড়াইল। প্রতি ঘণ্টায় আবার এই দরের অদল-বদল সুরু হইল। মজুরীদিগের বেতন প্রতিদিন পরিশোধ করা হইতে লাগিল। সঞ্চয় বলিয়া কাহারও কিছু রহিল না সমগ্র জার্মানীতে। হাতে টাকা থাকিলে দিন শেষের পূর্বেই সকল গৃহিণী উহার বিনিময়ে যে-কোনও জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আগ্রহে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত—কি জানি যদি রাত্রি প্রভাতে মার্কের মূল্য আরও নামিয়া যায়। আগষ্ট মাসে মার্কিন ডলার ৫০ লক্ষ মার্কের সমতুল্য হইয়া পড়িল। নবেম্বরের মধ্যভাগে একেবারেই নগণ্য বলিয়া ধার্য হইল—বার্লিনে এক মার্কিন ডলারে ২,৫০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক এবং তিনশত মাইল দূরে কলোনে এক মার্কিন ডলারে ৪,০০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক পাওয়া যাইতে লাগিল।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় জার্মানীকে একেবারে বিপ্লবের মুখে ঠেলিয়া দিল। ফরাসী সরকার রূঢ় অধিকার অটুট রাখিতে যে ব্যয় করিতে বাধ্য হইল—অনুপাতে আয় করিতে পারিল না তাহার সমানও। জার্মানীর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যে ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হইল—তাহা তো আর বিরাট বিরাট কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া যায় না—উড়োজাহাজ হইতে বোমা বৃষ্টি করিয়াও মার্কের মূল্যের নিম্ন পতনকে প্রতিরোধ করা যায় না। এই মূল্য তালিকা লইয়া কূট-রাজনীতিকগণও সন্ধির প্রস্তাবে কাহাকেও স্বীকৃত করাইতে পারে না। ১৯২৪ সালের আরম্ভ হইলে শক্তিশালী ফ্রান্সও দেখিতে পাইল তাহার অর্থনৈতিক অবস্থাও কিছুটা আক্রান্ত হইয়াছে—চলতি কারেন্সি অপ্রচুর হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। যুদ্ধোত্তর নীতির প্রথম পর্যায় এখানেই সমাপ্ত হইল। ফরাসীরা এবার পশ্চাতের দিকে তাকাইল—অপসরণের তোড়জোড়ে।

বেড়াজালের ভিতর জার্মানী ঘূর্ণিবাত্যায় লাটিমের মত ঘুরপাক খাইতে লাগিল—পুরাতন সন্ধি-চুক্তি বিদূরিত করিয়া; পুরাতন অর্থনৈতিক পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়া; পুরাতন শুল্কনীতিকে খণ্ডিত করিয়া; রীতিনীতির পুরাতন ধারায় মূলগত উলট-পালট আনিয়া—ফলে দাঁড়াইল এমন অবস্থা যে, জার্মান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ষ্টেট্সগুলি বুঝি বিচ্ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। রাষ্ট্রশক্তি যেন পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। একটা জ্বলন্ত লৌহতারের মত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল বিষম আতঙ্কের বস্তু—যে উহাকে করায়ত্ত করিতে যায়, সেই পুড়িয়া মরে। ইউরোপের নূতন নূতন রাষ্ট্রগুলি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূতের মতই দূরে হইতে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল জার্মানীর উপর। তাহারা ভাবিল—ইহাই যদি যুদ্ধোত্তর গণতন্ত্রের স্বরূপ ও পরিণতি হয়, তাহা হইলে ডিক্টেটরশিপই তাহাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

জার্মানীর বাহিরে ক্রমে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠতা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। চেকোশ্লোভাকিয়া শান্তি-সমৃদ্ধির ভিতর দিয়া অটলভাবেই অগ্রসর হইল। পোল্যান্ড এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সন্ধি-স্থাপন করিল। মুসোলিনী তখনও সাময়িক নির্বাচিত ডেপুটিদের লইয়াই কাজ চালাইতেছেন; স্বাধীন মত প্রচার দমন করিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের দুর্বল করিয়া কৌশলে দেশে শান্তি স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু জার্মানীর অভ্যন্তরে মহা সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। জার্মানীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা—রূঢ় অঞ্চলে ফরাসী অধিকারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় চরম তাণ্ডবে পরিণত হইয়াছে।

লোকার্ণো—ইউরোপে আশার আলো দেখিতে পাওয়া গেল এইসময়—ব্রায়াণ্ড, ষ্ট্রেসম্যান, স্যার অষ্টিন চেম্বারলেন ও আরও চারিটি দেশের প্রতিনিধি এক বৈঠকে মিলিত হইল লোকার্ণো শহরে। আজ অবশ্য লোকার্ণো চুক্তি মৃত; কিন্তু ১৯২৫ সালে উহাই ইউরোপকে আশান্বিত করিয়াছিল—সমরাস্ত্রের খর্বকরণের চুক্তি, সমর-ঋণের মীমাংসা, ইউরোপ হইতে সমর-দূরীকরণের নব স্বপ্ন এবং এমন কি সমগ্র ইউরোপকে লইয়া একটা ফিডারেশন অফ ষ্টেট্স গঠন—লোকার্ণো চুক্তি ইহাই সম্পন্ন করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সারা বিশ্বে অগ্রগতির জয়যাত্রা ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত।

লোকার্ণোতে এগার দিন ব্যাপিয়া চলিল বৈঠক, কিন্তু বৈঠক অপেক্ষা মজলিশ, সখের ভ্রমণই দেখা গেল জোরাল। পরিশেষে পাঁচটি সর্তে পৌঁছা গেল। উহার চারিটিতে সালিশ নিষ্পত্তিতে জার্মানী সম্মতি দিল—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ড সহ বিবাদের। জার্মানীকে ঘেরাও করিয়া যে বেড়াজাল—তাহাতে মৈত্রীবন্ধ এই চারিটি ষ্টেট। ফরাসী-জার্মান ও ফরাসী-বেলজিয়ান সীমান্তের অপলঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টি প্রদানের পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, গ্রেট ব্রিটেন এই লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করিল ১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায়। যুদ্ধোত্তর নীতিতে ফ্রান্সের যে জার্মান-আতঙ্ক তাহা যেন এই সময়ে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রায়াণ্ড বলিলেন—সব শেষ হইল - আমাদের ভিতর যে সুদীর্ঘকালের যুদ্ধ তাহা এতদিনে সমাপ্ত হইল। অপরিশোধনীয় যে ব্যথা-বেদনা তাহারও উপর যবনিকাপাত হইল। এখন হইতে রাইফেল, মেশিনগান, বড় কামান সব তুলিয়া রাখ। মৈত্রী-সালিশ—শান্তি আমাদের সম্মুখে।

যুদ্ধোত্তর বিশ্ব এখন হইতে যেন প্রকৃতই যুদ্ধবিহীন বলিয়া প্রতিভাত হইল। প্রগতি—প্রগতি—চারিদিকেই প্রগতি আর সমৃদ্ধি। জার্মান-জাতির ঋণ গ্রহণ—নব ব্রিমেনের নির্মাণ—গ্রাফ্ জেপেলিনের নব মূর্তি দেশে দেশে পুনর্গঠন—টাকা খাটানর ছড়াছড়ি আর অর্থনীতিক প্রভাবে মার্কিনের উচ্চস্থান - ইহাই হইল এই যুগের সচল অবস্থা—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের পণ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইল। সমর-ঋণ পরিশোধের সম্ভাব্যতায় উহার আখ্যা দেওয়া হইল—ভাড়াটে অর্থ।

আর এই কয় বৎসরেই জার্মানীর ইস্পাত-ভাণ্ডার যুদ্ধ পূর্বযুগের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। জার্মান বাণিজ্য-তরী ঠিক পূর্বের আকার প্রাপ্ত না হইলেও, উহার কাছাকাছি যাইয়া দাঁড়াইল ৩৭ লক্ষ টনে। ফরাসী দেশে রূঢ় অধিকারের পরবর্তী তরঙ্গের প্রতিঘাতে পনর মাসে যে ৬টি মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে, সেই ধাক্কা সামলাইয়া এই কয় বৎসরে ফ্রান্স তাহার অর্থনীতিক সঙ্কট দূরীভূত করিল। এই কয় বৎসরেই দেখা গেল এডোয়ার্ড, প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ সমগ্র সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। যদিও ইংলণ্ড তখন বেকার-সমস্যা দ্বারা বিক্ষুব্ধ এবং চীন অন্তর্দ্রোহে সমাচ্ছন্ন, তথাপি আন্তর্জাতিক করপোরেশনের সমর্থক দলের জয়জয়কার ইউরোপের সকল রাজধানী ব্যাপিয়া—বাণিজ্য-বর্ধিত, উৎপন্ন দ্রব্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

১৯২৯ সালের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া সর্বত্র শান্তিময় পটভূমি—যে অগণিত ট্রেঞ্চের খাত ইউরোপের অঙ্গকে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া দাবার ছকে পরিণত করিয়াছিল—সে সকল খাত ভরাট হইয়া গেল। যুদ্ধোত্তর যুগ যে সকল প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিক ও দেশনেতার উত্থানকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিয়াছিল, সেই সকল নেতৃবৃন্দ রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি বর্জন করিয়া আভ্যন্তরিক উন্নয়নের তালিকা গ্রহণ করিল 'পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা' অভিধা প্রদান করিয়া। মার্কিন পর্যটক ১৯২০ হইতে ১৯২৮ সালের ভিতর ইউরোপে পরিভ্রমণ করিয়া ঋণদান ব্যবসায় ৩৫০ পারসেণ্ট পর্যন্ত লাভ আয়ত্ত করিল। এমন একটা প্রগতির যুগ—এমন একটা ব্যাপক পুনর্গঠনের যুগ ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। মানবের জীবনধারা উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইল—অবাধ কল্পনা যে উচ্চতম জীবনধারার স্বপ্ন দেখিতে পারে, তাহাও যেন আর মানবের নাগালের বাহিরে রহিল না। দীর্ঘকালব্যাপী শান্তির-স্বরূপই যেন উদ্ঘাটিত হইল বিশ্ববাসীর চক্ষুসমীপে—সমগ্র বিশ্ব যেন বিগত মহাসমরের স্বপ্নাশ্রিত আতঙ্কও বিস্মৃত হইল—যুদ্ধদ্বারা অনুপদ্রুত কোনও আদর্শ জাতি-সমাজ কি প্রকার শান্তির আস্বাদ পাইতে পারে, তাহাই যেন ইউরোপ উপভোগ করিতে লাগিল—বিগত যুদ্ধের স্মৃতির লেশ নাই—নাই ভাবী-সংগ্রামের সন্ত্রাসের আভাসও।

সঙ্কট—১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর নিউইয়র্কের বাজার দর ভাঙ্গিয়া পড়িল; গমের দর ১ ডলার ৩০ সেণ্ট হইতে নামিয়া আসিল ৫৩ সেণ্টে প্রতি বুশেলে; কার্পাস প্রতি পাউণ্ড ১৫ সেণ্ট হইতে ৬ সেণ্টে পৌঁছিল (১৯৩১ সাল পর্যন্ত); আর ১৯২৯ সালে বেকার সংখ্যা তিন কোটিতে পরিণত হইল।

১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে জার্মানীতে বেকার ছিল ৭ লক্ষ ২০ হাজার; সেই বৎসরেই শীতে সংখ্যা বাড়িয়া ২০ লক্ষে পরিণত হইল। আর, ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ এক চক্রে উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্কের মত প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল ৪০ বৎসর বয়স্ক বিগত মহাসমরের এক করপোর্যাল, নাম তাহার য়্যাডল্ফ্ হিটলার। বিগত নয় বৎসরে হিটলার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্টি জার্মানীর শাসক সম্প্রদায়ের এক প্রবল প্রতিপক্ষে পর্যবসিত হইয়াছে—যে প্রতিপক্ষকে আর উপেক্ষা করা চলে না।

নয় বৎসর পূর্বে সে যখন দলে যোগদান করে, তখন তাহার সহকর্মী সাতজন মাত্র এবং পার্টির তহবিলে মূলধন সাড়ে সাত মার্ক মাত্র। এই সহকর্মীদের লইয়াই সে ২৫ দফা সর্ত-সম্বলিত এক কার্যতালিকা গঠন করে, পতাকার পরিকল্পনা করে, দলের প্রতীক-পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করে, একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করে; সঙ্গে সঙ্গে দলের প্রথম উদ্যোক্তাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিয়া দলকে নিজের মুঠার মধ্যে আনয়ন করে। তখন পার্টিতে ১ লক্ষ চাঁদা প্রদানকারী সদস্য। রাইখষ্ট্যাগের একুন ৪৯০ জন সদস্যের ভিতর ১২টি সদস্য ছিল এই দলের অন্তর্ভুক্ত। বার্লিন সিটি কাউন্সিলে তেরটি ডেপুটি স্থান পাইয়াছিল, যাহারা এই দলের সদস্য। ইহার পর থুরিঙ্গিয়ার এক নির্বাচনে, এই দল ১১ পারসেণ্টেরও অধিক ভোট-প্রাপ্ত হয়। তখন এই দলের গুরুত্ব এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, শক্তিশালী জাতীয় দলের নেতা হিউজেনবার্গ পর্যন্ত এই দলের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে।

যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান—হিটলারের চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠান (১৯৩৩ সাল, ৩০শে জানুয়ারী)।

যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান সমর্থন—জাপানের শাংহাই অভিযান (১৯৩২-৩৩), পরে অপসারণ; পুনরায় ১৯৩৭ সালে চীনে অভিযান, বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত।

অস্ট্রিয়ার অন্তর্দ্রোহ (১৯৩৪, ফেব্রুয়ারী)—পরে 'পকেট চ্যান্সেলর' ডলফাস নাজিদের হস্তে নিহত।

ইটালির আবিসিনিয়া অভিযান।

রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার (১৯৩৬, মার্চ)

স্পেনের বিপ্লব—সাধারণতন্ত্রী ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সংঘর্ষ আরম্ভ (১৯৩৬)।

হিটলারের অস্ট্রিয়া অধিকার (১৯৩৬, মার্চ)

চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার (১৯৩৮, অক্টোবর)।

মহাসমর সমাপ্ত হইবার পর এই সময়ে সর্বপ্রথম জার্মানীর ইতিহাসের পরিমাপ আরম্ভ হইল দিনের মাপ-কাঠিতে, কারণ রাষ্ট্রের অদল-বদল অতি দ্রুতগতিতে আসিতে লাগিল। সোসিয়ালিষ্ট মূলার গবর্ণমেণ্ট—যাহার লক্ষ্য ছিল **সকলের সহিতই মৈত্রীভাবাপন্ন** থাকা—অতি অল্পকাল মধ্যেই **ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইল** এবং ব্রুনিং গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থান **গ্রহণ করিল।** রাইখষ্ট্যাগ নির্বাচনে নাজিগণ ১০৭টি আসন **অধিকার করিল**—একুন তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ভোটের ভিতর **চৌষট্টি লক্ষ** এক হাজার দুইশত ভোট নাজিগণ প্রাপ্ত হইল। **কাজেই** হিটলার আর ফন্ প্যাপেন্, ফন্ শ্লেইচর, ব্রুনিং—**ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী** রহিল না, তাঁহার স্থান হইল আরও উচ্চে **এবং** স্বয়ং হিণ্ডেনবার্গের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হিটলার **প্রতিপন্ন হইল** এই সময়ে। ফন প্যাপেন গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল **মাত্র ১৭০** দিবস স্থায়ী হইল। ইহার পর গঠিত হইল ফন **শ্লেইচার** মন্ত্রিমণ্ডল—উহাও ৫৬ দিবসের বেশী স্থায়ী হইতে পারিল না। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলারের পদ অধিকার করিলেন।

পুনরায় সমর—এই সময়ে ইউরোপ ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশেও বিদেশী সংবাদের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্ট হইল—তিন বৎসরের মন্দা সারা বিশ্বকেই কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত করিল। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক সংবাদ সারা বিশ্বে পৌঁছিল—তাহা প্রথমত ছিল অতিশয় বিশৃঙ্খল; তাহার পর কেবল সংবাদ আসিতে লাগিল—নির্মম ঘটনার, মধ্যযুগীয় বর্বরতাপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের আধুনিক উপায়, জার্মানীর গ্রন্থ-ভস্মসাৎ করণ, সেমিটিক বিরোধী বিপ্লব, [illegible] নির্বাসন প্রভৃতির। রাজনীতিকগণের চালবাজির যে নিদর্শন পাওয়া গেল, তাহাতে মনে হইল তাহারা নির্যাতন ও নিপীড়নেই সিদ্ধহস্ত। যে দেশের নেতবর্গ প্রচারকার্য ভিন্ন আর কিছুতে বিশ্বাসী নয়, সে সকল হইতে আর কি আশা করা যাইতে পারে। মন্ত্রী গোবেল্‌স্ এই সময়ে বলেন,—**আগ্নেয়-গিরির মত অগ্নিস্রোত** নির্গমন, দেশময় ভীতির প্রচার, একদলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দান, সন্দেহ, ঘৃণা প্রভৃতির উদ্ভবের জন্য সেয়ানা কৌশল অবলম্বন—ইহাই হইল রাজনীতিকগণের অন্তরের নীতি।

আন্তর্জাতিক **এই** মতিগতির অন্তরালে এই বিশৃঙ্খলার **আবরণে** ঢাকা সংবাদের অভ্যন্তরে তখন চলিয়াছিল বৃহত্তর **শক্তির** গতিবিধি। হিটলারের জার্মানী ঘোষণা করিল যে, যুদ্ধোত্তর যুগ শেষ **হইয়াছে**—এখন হইতে নূতন এক যুগের সূচনা হইল। ১৯৩২ সালে জাপান তাহার সাংহাই **অভিযানে** বিরাট বিরাট কামানের গর্জনে পুনরায় ঘোষণা **করিল** যে, যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান **হইয়াছে নিতান্তই!** **সমস্যার পর** সমস্যা, বিপ্লবের আসন্নতা **এমনই** দ্রুততার **সহিত প্রবাহিত হইল** এবং তাহা **এমনই** খুঁটি-নাটি সহ সারা **বিশ্বে প্রচারিত** হইতে লাগিল যে, উহার আতঙ্ক, উহার **ভীষণতা সারা** বিশ্বেরই উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয় **হইয়া পড়িল।**

জাপানের **মাঞ্চুকুও** অধিকারের **জন্য লীগ অফ** নেশনস্-**কর্তৃক** নিন্দা ও উহাকে গর্হিত বলিয়া নির্দেশ; উহারই ফলে যে **সমস্যার** উদয়; উহার পরেই অষ্ট্রিয়ার অন্তর্বিপ্লবের ক্ষণস্থায়ী বিশৃঙ্খলা, ডলফাস হত্যা, যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারের হত্যা, এথিওপিয়া অভিযান সম্পর্কে মত-ভেদ ও মনোমালিন্য, রাইনল্যাণ্ড পুনরায় সশস্ত্রীকরণ, স্পেনের অন্তর্বিপ্লব, জার্মানীর অষ্ট্রিয়া অধিকার, সোভিয়েট ও জাপানে সুদূর প্রাচ্যে সংঘর্ষ, চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর হিটলারের হুমকি—অবশেষে মিউনিক চুক্তি। এই চুক্তির পূর্বে কয় সপ্তাহে ধাপ্পাবাজি, ভয় প্রদর্শন, বিদ্যুৎবেগে সৈন্য-পরিচালনা, শক্তি-প্রয়োগ ও শক্তি-প্রয়োগের হুমকি—কত যে ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা আধুনিক সংবাদপত্র পাঠক-পাঠিকাদের অবিদিত নাই। এই ২০ বৎসরের ভিতর এই কয় সপ্তাহে গিয়াছে ইউরোপের চরম আতঙ্ক—এই বুঝি আগুনে জ্বলিয়া উঠে।

ইউরোপ আসন্ন সমরের বিভীষিকা হইতে কিছুটা মুক্তি পাইয়াছে বটে, কিন্তু সমর-সম্ভাবনা দূরে হয় নাই। ইটালীর আলবানিয়া অধিকার এবং জার্মানীর পোল্যাণ্ড-করিডর লইয়া টানাটানি। চীনে তিয়েনসিন ব্রিটিশ কনসেশন জাপান কর্তৃক অবরোধ। অপরদিকে ইংরেজ ফরাসীর, সোভিয়েটের সহিত মৈত্রীর তিক্ত-বটিকা গলাধঃকরণ প্রক্রিয়া চলিয়াছে। সারা বিশ্ব উৎকণ্ঠিত দর্শকরূপে ইউরোপ-নাট্যের পট পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক ঘটনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয় যখনই উহাতে ভীষণতার স্পর্শ লাগে—আর চরম আতঙ্কময় হইয়া পড়ে সেই সময়ে; যেমন হইল পূর্বোক্ত কয়েক সপ্তাহে ইউরোপের পরিস্থিতিতে। বিশেষ করিয়া শাংহাই এবং গার্ণিকায় বোমা-বর্ষণে গৃহহারা—বার্সিলোনা এবং প্রাগ হইতে পলাতক—ইহারা বিপদ ও দুর্দশার যে বিবরণ প্রদান করে, তাহাতে যাহারা সমরের হেতু জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের অন্তরে আনয়ন করে নিরতিশয় ভীতি এবং অপরিসীম উপায়হীনতার ভাব। দার্শনিক, অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক—সকলেই চেষ্টা করে ঘটনার অন্তর্নিহিত স্রোতটি উদ্ঘাটিত করিতে—চেষ্টা করে বিরোধী শক্তিসমূহের প্রবাহ-উৎস আবিষ্কার করিতে; কিন্তু পরিণতিতে যে বাস্তব সজীবতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার সহিত তুলনায় ঐ সকল ধুরন্ধরদিগের যৌক্তিকতা ও সংখ্যাতত্ত্ব নিতান্তই জড় বলিয়া প্রতিভাত হয়। আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও বিরোধের তাহারা নানাবিধ স্বতন্ত্র হেতুর উল্লেখ করে—(১) যাহাদের আছে ও যাহাদের নাই, এই দুই দলের প্রতিযোগিতা; (২) অথবা বিভিন্ন দেশের যাহা রহিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য নিজ রাজ্যের প্রসারবৃদ্ধি প্রয়াসীদের সহিত বিরোধিতা। (৩) বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী অথবা বিভিন্ন আদর্শবাদীদের পরস্পর রেষা-রেষি; আরও উল্লেখের বিষয় এই যে, সারা-বিশ্বের একটা মোটা অংশই আশা করে—গ্রেট-ব্রিটেন উহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের সহিত সকল বিরোধ মিটাইয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে সারা-বিশ্বের একাংশ আবার ব্রিটেনের সেই প্রয়াসের পথে অন্তরায় সৃষ্টি **করিয়া** বৃটেন ও উহার অনুসরণকারী বিশ্বাংশের সহিত **সকল যোগাযোগ অবরুদ্ধ**

(শেষাংশ ৫৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরাজয়

(গল্প)

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য

কলেজের ছুটি হলে রেবা মিত্র লাইব্রেরীতে গিয়ে উঠল। কাল থেকে গরমের ছুটী সুরু হবে। আজ তাই ম্যাগাজিনটা সে নিতে এসেছে।

ম্যাগাজিনটা নিয়েই সে প্রথমে পড়ল প্রশান্ত কি লিখেছে। প্রশান্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী। পড়া-শুনায় প্রশান্ত প্রায় তার সমান নম্বর পায়। আর ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে সে প্রত্যেকবারই রেবাকে ছাড়িয়ে যায়। সকলেই প্রশান্তর প্রবন্ধের প্রশংসা করে। রেবা সেটা সহ্য করতে পারে না। সে চায় প্রশান্তর চেয়ে ভাল প্রবন্ধ এবং কবিতা লিখে নাম কিনতে। সেই-জন্য এবার সে অনেক বই ঘেঁটে পড়া-শুনার ক্ষতি করে রাত জেগে একটা ভাল প্রবন্ধ লিখেছে। ভেবেছিল প্রশান্তর চেয়ে তার লেখা এবার নিশ্চয়ই ভাল হবে। কিন্তু হায়! ম্যাগাজিন পেয়ে তাকে হতাশ হতে হ'ল। এবারও প্রশান্ত তার চেয়ে অনেক ভাল একটা প্রবন্ধ দিয়েছে। প্রবন্ধটা পড়ে তার মুখ গেল শুকিয়ে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল লাইব্রেরী থেকে। একটা রিক্সা করে হোষ্টেলে পৌঁছে নিজের ছোট্ট রুমটিতে গিয়ে ঢুকল।

রেবা মিত্র স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে পড়ে। এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠল। কলেজে সে প্রত্যেকবারই ভাল রেজাল্ট করে। বাপ একজন নামজাদা ডাক্তার বাহিরে থাকেন, তাই মেয়েকে হোষ্টেলে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। পড়াশুনায় ভাল বলে সমস্ত ছেলেমেয়ে তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, প্রফেসাররাও তাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। বড়লোকের মেয়ের মত তার চালচলন আদপেই ছিল না, সকলের সঙ্গে সে হেসে কথা বলত।

সেদিন কলেজ থেকে এসে সে নিজের ঘরে ঢুকল আর কারও সঙ্গে দেখা করল না। গরমের ছুটিতে বাড়ী যাবার জন্য অন্যান্য মেয়েরা নিজেদের বই পত্তর গুছাতে ব্যস্ত। তারা মনে করলে রেবাও বোধ হয় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সন্ধ্যার পর সবিতা, গীতা, ঊষা এসে ডাক্‌ল,—"রেবা আছ নাকি?"

ভিতর হতে কোন উত্তর এল না। রেবা তখনও প্রশান্তর লেখা প্রবন্ধটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল। পড়ছিল কিনা বোঝা যায় না। রেবাকে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখে তারা একসঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গীতা বললে—তোমার ভাই রাত-দিন পড়া। কাল-পরশু সব চলে যাব, কোথায় একটু গল্প করবে তা নয় একটা বই খুলে ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে আছে।

রেবা আস্তে আস্তে বললে—আজ শরীরটা তেমন ভাল নয়, তাই বেড়াতে বের হই নি।

—বই পড়লে বুঝি তোমার শরীর ভাল থাকে। বলি কি বই পড়া হচ্ছে?

—আজ ম্যাগাজিনটা পেলাম। তাই একটু দেখছি।

—প্রশান্তবাবুর লেখাটা এবার বেশ সুন্দর হয়েছে নয়?

রেবা কোনও উত্তর দিল না। তার মনে হতে লাগল প্রশান্ত তাকে অপমান করবার জন্যই এবার ম্যাগাজিনে এত সুন্দর একটা প্রবন্ধ দিয়েছে। হয়ত প্রশান্ত তার মনের সমস্ত কথা জানতে পেরেছে—তাই সে প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিশোধ নিলে। মেয়েরা রেবাকে আর বিরক্ত না করে নিজেদের ঘরে চলে গেল।

সেই রাত্রে রেবা ঘুমাতে পারল না। সারারাত সে প্রশান্তর কথা ভাবতে লাগল। অপমানে ও অভিমানে সে বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করতে লাগল। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু তন্দ্রার মধ্যেও সে দেখতে পেলে প্রশান্ত যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলছে—মিস মিত্র এবারও আপনাকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল।......

আজ কলেজের ছুটি হবে। লম্বা দুমাস ছুটি তাই সকলেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্যই ব্যস্ত। প্রশান্তও তার বন্ধুদের নিয়ে কমন-রুমের এক পাশে মজলিশ বসিয়েছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ম্যাগাজিন কমিটির সভ্য। প্রশান্তর লেখা সম্বন্ধে তারা আলোচনা করছিল। একজন বললে—এবার মিস মিত্রও কিন্তু মন্দ লেখেনি।

প্রশান্ত বললে—সত্য, মিস মিত্রের লেখার মধ্যে এবার যেন একটু নূতনত্ব আছে।

রবীন—অনেক বই ঘাটে। হবে না কেন বল?

সমীর—যা বলেছ রবি—দিন-রাত বই নিয়ে বসে থাকলে আমরাও ও রকম অনেক লিখতে পারতাম

প্রশান্ত—তা নয় সমীর। লেখাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম সকলেরই লিখতে গেলেই অনেক আকাশ-পাতাল ভাবতে হয়। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে আর বেশী ভাববার কিছু থাকে না.

রেবা কি দরকারে কমনরুমের দিকে আসছিল। প্রশান্তদের আড্ডা দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনছিল। প্রশান্ত তাকে দেখেই বলে উঠল—এই যে মিস্ মিত্র, আপনার লেখাটা পড়ে দেখলাম বেশ সুন্দর হয়েছে। আশা করি, আসছে বার আরও ভাল হবে। আপনি ত' বাড়ী যাবেন ছুটিতে?

—হাঁ। রেবা আর সেখানে দাঁড়াল না।

প্রশান্ত রেবার এই অশিষ্ট আচরণে আহত হয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গেল।

প্রশান্তর পিতা হরেন্দ্রলাল বসু কলিকাতার একজন বিখ্যাত এটর্নী। খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিছুদিন তিনি কোন একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রশান্তর ছোটবেলা থেকেই গল্প লেখার দিকে একটু ঝোঁক বেশী। তাহার উপর মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করবারও যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে অল্প বয়সেই সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কলেজের প্রত্যেক ম্যাগাজিনে সে একটি করে প্রবন্ধ দেয়ই উপরন্তু কোন কোন মাসিক পত্রিকায়ও নাকি প্রায় গল্প এবং কবিতা প্রকাশ হয়। প্রশান্ত তার পিতার ন্যায় নিরীহ ও সরল প্রকৃতির মানুষ। ঐ গল্প লেখা ছাড়া তার আর কোনও নেশা ছিল না। উকিল ব্যারিষ্টার হবার

তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বরং সাহিত্যিক হতে পারলেই যেন সে একটু বেশী আনন্দিত হয়।

রেবা মিত্রের ব্যবহারে সে সত্যই একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল। সে ত' কোনও অন্যায় আচরণ করে নাই, যাহার জন্য সে ঐভাবে চলে যাবে। আবার ভাবতে লাগল হয়ত বা সে কিছু অন্যায় ব্যবহার করেছে যদি অন্যায়ই করে থাকে তা হলে পত্র লিখে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই ত' হয়। রেবার কাছে ক্ষমা চাইতে তার সঙ্কোচ করবার কিছু নাই। প্যাড ও কাগজ নিয়ে বসল চিঠি লিখতে। হায় কিভাবে সে পত্র আরম্ভ করবে। বাড়ীর সকলেই প্রশান্তকে দিয়ে পত্রাদি লিখিয়ে নেয়। প্রশান্তও পত্র লিখতে একজন ওস্তাদ। কিন্তু আজ মিস্ মিত্রকে চিঠি লিখতে বসে তার কলম সরতে চাইছে না।

প্রশান্তর আর চিঠি লেখা হল না। সে ঠিক করলে কাল সকালেই মিস্ মিত্রের সঙ্গে হোষ্টেলে দেখা করে জিজ্ঞাসা করবে যে সে কিছু অন্যায় ব্যবহার করেছে কিনা আর যদি করে থাকে ত' ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

সকালে রেবা ঘুম থেকে উঠেই শুনলে একজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেয়ারাকে বললে বাবুর নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে আসতে।

বেয়ারা একটা স্লিপ দিল। তাতে লেখা—"প্রশান্তকুমার বসু, ৩৬নং বেচু চ্যাটার্জ্জি লেন।" রেবা কাগজটা পড়েই ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললে। আর বেয়ারাকে বললে—বলগে দিদিমণি এখন কাজ করছে।

— কিন্তু উনি যে বললেন বিশেষ দরকার।

—না, দেখা হবে না—সময় নাই।

অগত্যা বেয়ারাকে পুরস্কারের আশা ছেড়ে দিয়ে বলতে হল দিদিমণি এখন দেখা করতে পারবেন না, বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করছেন।

সকাল বেলায় রেবার ঐরূপ রুক্ষগলা শুনিয়া পাশের ঘর হতে আরতি ঘোষ জিজ্ঞাসা করল—হাঁ ভাই সকাল বেলায় এত চাঁচায় মাথা গরম হল কেন? বলতে বলতে রেবার ঘরে এসে ঢুকল। আরতি বেথুনে পড়ে রেবার সঙ্গে তার খুব মেশামেশী। তাদের অতি গোপনীয় কথাও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। প্রশান্তর উপর প্রতিশোধ নেবার যে তার কেন যে এমন ইচ্ছা একথা কিন্তু সে কাহাকে বলে নাই, এমন কি আরতিকেও না। আর রেবা সেকথা চেপে রাখতে পারল না। বলল—প্রশান্তবাবু আজ একটু আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

—কে প্রশান্তবাবু?

আমাদের সঙ্গে পড়ে প্রশান্তকুমার বসু—হরেনবাবুর ছেলে।

—ওঃ বুঝেছি। আরতি একটু মুচকিয়া হাসিল। রেবা ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিল ছাই বুঝেছ।

আরতি বলিল—কি হয়েছে বল, এত রাগ কিসের?

—প্রশান্তবাবু আমাকে প্রতিবারই অপমান করে। কাল সকলের সামনে কমনরুমে আমাকে অপমান করেছে। আবার আজ সকালেই ছুটে এসেছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি।

—প্রশান্তবাবু ত' ও প্রকৃতির লোক নয়। তুমি ভাই দেখা না করে ভাল কাজ করনি। তোমার লেখা ভাল হয়েছে বলাতে তোমার অপমান হল কোথায়? বরং তুমিই ত' তাকে অপমান করেছ তার সঙ্গে দেখা না করে।

—তুমি প্রশান্তবাবুকে চেন নাকি? কবে থেকে আলাপ হল?

—হাঁ। অনেক দিন আমি তাদের বাড়ী গিয়েছি। তার বাপ-মা আমাকে খুব ভালবাসেন। ওনারাও প্রায় আমাদের বাড়ী যান। প্রশান্তবাবু খুব ভাল লোক। এই বয়সেই এত সুন্দর প্রবন্ধ লেখে—

—থাক আর প্রশান্তবাবুর গুণগান করতে হবে না। আজ বাড়ী যাব। জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে নিতে হবে এখুনি।

—কটার গাড়ীতে যাবে বলে ঠিক করেছ?

—১২॥টার সময় এখান থেকে রওনা হতে হবে। তুমি কখন যাবে?

—আজ সন্ধ্যায়। ৮টার ট্রেনে।

বৈকালে আরতি ঠিক করলে প্রশান্তদের বাড়ী একটু দেখা করে আসবে। হোষ্টেলের সমস্ত মেয়েই বাড়ী চলে গেছে। রেবাও দুপুরের ট্রেনে চলে গেছে, একলা একলা তার ভাল লাগছিল না। তাই সে বেরিয়ে পড়ল খানিকটা ঘুরে আসতে। বেচু চাটুর্য্যে লেনে ঢুকেই দেখলে প্রশান্ত বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে একটু ব্যস্তভাবে।

সে জিজ্ঞাসা করলে—কি প্রশান্তদা কোথায় চলেছ এত ব্যস্তভাবে?

—তোমাদের হোষ্টেলে মিস্ রেবা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে।

—সে ত' দুপুরের ট্রেনেই চলে গেছে। চল, তোমার সঙ্গে একটু দরকারী কথা আছে।

আরতি প্রশান্তর দূর সম্পর্কের মাসতুত বোন। রেবা সেকথা জানত না, তাই প্রশান্তর প্রতি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় সমস্তই তাকে খুলে বলেছিল। আরতি প্রশান্তর মা ও ছোট বোনের সঙ্গে দেখা করে প্রশান্তর পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রশান্তও সেই ঘরে বসে বসে কি ভাবছিল। আরতি প্রশান্তকে রেবার সমস্ত কথাই অকপটে বলল। শুনে প্রশান্ত হাসতে হাসতে বলল—আঃ! বাঁচলুম। আমি ভেবেছিলাম না জানি কি এমন অন্যায় কাজ করে ফেলেছি যার জন্য মিস্ মিত্র আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে ঘৃণা বোধ করলেন।.....

আবার কলেজের ম্যাগাজিন বাহির হবার সময় হল। এবার রেবা ভাবল প্রশান্ত আরও ভাল একটা প্রবন্ধ লিখবে। রেবা তাকে পরাজিত করবার জন্য লাইব্রেরী থেকে অনেক ভাল ভাল লেখকের বই আনিয়ে পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে কোটেশন তুলে নেয় তার প্রবন্ধের মধ্যে চালাবার জন্য। এবার তার প্রবন্ধ নিশ্চয় প্রশান্তর চেয়ে ভাল হবে। এবার সে প্রশান্তকে

উপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। যথাসময়ে ম্যাগাজিন বাহির হল। সকলে দেখল প্রশান্তর লেখা কোনও প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হয় নাই। রেবা ইহাতে একটু বেশী আশ্চর্য্য হল। এমন কি কারণ থাকতে পারে প্রশান্তর ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ প্রকাশ না করবার। প্রতিদ্বন্দ্বীই যদি না থাকল, তবে কেমন করে রেবা নিজের প্রবন্ধের তুলনা করবে। তবে কি প্রশান্ত জানতে পেরেছে রেবার মনের অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ। তাহাই বা কি করে সম্ভব।

আজ রেবা কিছুতেই স্বস্তি পায় না। ভাবে, ছুটে যাবে সে প্রশান্তদের বাড়ী। কিন্তু যে অপমান তাহাকে করা হয়েছে......না, রেবার পা ওঠে না। কিন্তু গেলেই হত ভাল।

কিছুক্ষণ কক্ষ মধ্যে পায়চারি করেও রেবার চাঞ্চল্য বাড়ে ছাড়া কমে না। কি করবে সে এখন। একটা কিছু তাহাকে করতেই হবে। অজানিতেই এক সময় সে পোষাক বদল করে ছাতাটি হাতে বাহির হয়ে পড়ে।

কোথায় কেন চলেছে রেবা, তাহা তাহার খেয়াল নাই। হেদুয়ার ধারে পৌঁছিয়া হুঁস হল পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে— রেবা যে, কোথায় যাচ্ছিস্? আরতির কণ্ঠস্বর।

রেবা তাকিয়ে দেখে আরতির সঙ্গীটি আর কেহ নয়— সেই প্রশান্ত! সহসা রেবার মুখে কোন জবাব জোগাল না।

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বলল—নমস্কার মিস্ মিত্র, আপনার এবারকার প্রবন্ধটা চমৎকার—কি খেটে...

রেবা উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়ে বলল—এবার আপনি ম্যাগাজিনে কিছু লেখেন নি যে?

– না, আর কলেজের ম্যাগাজিনে কিছু লিখ্‌বনা ঠিক করেছি।

প্রশান্তর এই কথা কয়টি রেবাকে চাবুকের মত আঘাত করল। পরাজয়ের শিহরণে রেবা সেইখানেই পড়ে যেত – হেদুয়া স্কোয়ারের রেলিং ঠেস দিয়ে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল।

কলেজের মেয়ে

(৫২৭ পৃষ্ঠার পর)

'আচ্ছা চল' বলিয়া অনাথ ধীরে ধীরে উপরে গিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুরমা তাহার বিছানা গুছাইয়া মশারি ফেলিয়া বিছানার পার্শ্বে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে। অনাথ একটু হাসি-হাসি মুখে বলিল, আজ আমার একটু জ্বর হয়েছে; সেইজন্য রাত্রিতে কিছু খেলাম না। বোধ হয় সর্দ্দি জ্বর হবে।

সুরমা বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, শুয়ে পড়ুন।

দরজাটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েই শুয়ে পড়বো।

না, বন্ধ করতে হবে না, ভুঁদিরাম থাকবে এই ঘরেই শোবে, আপনি শোন।

অনাথ বিছানায় বসিতেই সুরমা অনাথের কপালে এবং বুকে হাত দিয়া দেখিল জ্বর কতটা। সুরমা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না—তাপ আছে কি না!

নিজের হয়ত ভুল হইতে পারে মনে করিয়া ভুঁদিরামকে বলিল মনোহরকে ডাকিয়া দিতে।

মনোহর থার্মোমিটার দিয়া তাপ পাইলেন না। একটু তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন,—ও কিছুই নয়, বোধ হয় পরিশ্রম কিছু বেশী হয়েছে, কাল নাগাদ সেরে যাবে। তোমার খাওয়া হয়েছে সুরমা?

সুরমা হাঁ কি না কিছুই বলিল না।

মনোহর বলিল যাও উঠে যাও, রাত্রি অনেক হয়েছে যে? খেয়ে নাওগে। ও কিছুই নয়, সবারই এমন হয়।

সুরমা তথাপি উঠিল না। ভুঁদিরামকে বলিল, তামাক দে।

মনোহর একটু বিরক্তভাবেই চলিয়া গেল। অপর কক্ষে খুড়ীমাকে একটু উচ্চস্বরেই বলিল, আচ্ছা, বাড়ীর চাকর-বাকরের একটু কিছু হোক না হোক সুরমা অমন করে মরে কেন? খুড়ীমা উত্তরে কি বলিলেন, তাহা যদিও এ-ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা গেল না, তথাপি মনোহর যাহা বলিলেন তাহা বজ্রাঘাতের ন্যায়ই অনাথের হৃদয় বিদ্ধ করিল। সুরমা চমকিত হইয়া অনাথের মুখের দিকে চাহিল।

অনাথ হুঁকাটি ভুঁদিরামের হাতে দিয়া শয়ন করিলে সুরমা বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, অসুখটা এখন আপনার কি,

বিশেষ কিছু নয় দিদি!

সুরমার মলিন মুখখানি আরও একটু যেন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, শুধাইল, রাত্রে কিছুই খাবেন না?

না, রাত্রিতে একটু টান দিলে কাল নাগাদ বোধ হয় সেরে যেতে পারে।

সুরমা মাথায় হাত দিয়া বলিল, মাথায় বেদনা কিছু আছে কি?

'না' বলিয়া পার্শ্বপরিবর্তন করিতেই সুরমা দেখিতে পাইল অনাথের চোখের কোণ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ঝি রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া বলিল, মা, চল্লুম।

সুরমা বলিল, যা।

ভুঁদিরাম অনাথের ঘরে বিছানা করিতে আরম্ভ করিল। অদৃষ্টের কি যে ভীষণ অভিসম্পাত, এই নিরাশ্রয় যুবকটির হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থিটিকে শিথিল এবং নিষ্পেষিত করিয়া ঝটিকাবর্তের মত মর্ম্মপথে ছুটিতেছিল, মনোহর তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সুরমা বুঝিয়াছিল বলিয়াই ভাবিতে লাগিল,—এই পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীটিকে এমনভাবে ধূলায় অব-লুণ্ঠিত করিল কিসে? আমার ধর্ব্বতাপূর্ণ উপেক্ষা, না মনোহরের নিদারুণ শাস্তিশেল?

সুরমা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কাঠের পুতুলের মত শুষ্কনেত্রে আপনার গৃহে চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

দুর্ঘটনায় বিষে বিষক্ষয়

ফ্লানাগান অঞ্চলের মিয়ামি শহর। ২১ বৎসর বয়স্ক এম্ ভি সোয়েইন্ তাহার মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে। রাস্তার একটা মোড় ঘুরিয়া আসিতে পথচারীদের এড়াইতে তাহার মোটর যাইয়া ধাক্কা খায় এক টেলিগ্রাফ থামের সঙ্গে। এখন এই থামটিতে সংযুক্ত ছিল ফায়ার এলার্মের বাক্স। ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া গাড়ীখানা উল্টাইয়া যায়, আর সোয়েইন্ পড়ে তাহারই নীচে চাপা। এদিকে টেলিগ্রাফ থামে ঝুলান ফায়ার এলার্ম বাক্সটি সংঘর্ষের ফলে আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং এলার্ম বাজিতে থাকে সবেগে—ফায়ার ব্রিগেডের অফিসেও সেই এলার্ম সংশ্লিষ্ট সঙ্কেতধ্বনি হইতে থাকে। অগোণে ফায়ার ব্রিগেড দলের লোকেরা আসিয়া সোয়েইন্‌কে মোটরের নীচ হইতে উদ্ধার করে। দুর্ঘটনা আপনিই আপনার প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তবু সোয়েইন্ বেকসুর খালাস পায় না—কারণ সে উদ্ধারপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র, কোথা হইতে পুলিশ আসিয়া হাজির হয় এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করে বেপরোয়া মোটর হাঁকাইবার অপরাধে।

অন্তর ধৌত-করণ

আমেরিকার টেনেসি অঞ্চলের ন্যাশভিল শহরের প্রেস্‌বিটারিয়ান গীর্জায় প্যাস্টর ডাঃ বার বক্তৃতা করিতেছিলেন—ইষ্টার উপলক্ষে সমগ্র শহর পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে, বাড়ীগুলি নূতন করিয়া রং করা চলিতেছে, আমাদের মনুষ্যসমাজেরও অন্তর পরিষ্কার করা উচিত। তিনি আবেগভরে দরাজ গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের অন্তর, আমাদের হৃদয়, আমাদের চিত্ত—ইহারও পরিষ্কার করা উচিত; কিন্তু কোন্ জিনিষ আমরা আমাদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিলে আমাদের অন্তর পরিস্কৃত অমলিন হইবে?

একটি চারি বৎসরের বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া ফেলিল—দুধ! দুধ!

অদ্ভুত যোগাযোগ

মধ্য জার্মানীর এশ্লের্সলেবেন ষ্টেশন হইতে এক ব্যক্তি রেলে চাপে। সে যাইবে দক্ষিণ জার্মানীতে বেড়াইতে। ট্রেনে চাপিয়া টের পায় সে যে তাহার চশমা সে ফেলিয়া আসিয়াছে। ট্রেনখানি আবার যাইবে তাহার বাড়ী ঘেঁসিয়া। কাজেই সে জানালায় মুখ বাড়াইয়া রহিল—ইসারায় বাড়ীর লোকেদের জানাইবে, তাহার চশমা ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতে। ট্রেনখানি যেমন তাহার বাড়ীর পাশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অমনি কি কারণে হঠাৎ থামিয়া যায়। বিদায় জানাইতে লোকটির কন্যা একেবারে রেল লাইনের পাশে বাড়ীর বাগানের বেড়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে অমনি কন্যাকে চশমা জোড়া আনিতে বলিল। কন্যা দৌড়াইয়া চশমা আনিয়া দিল। আর সেই মুহূর্তেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

পরবর্তী ষ্টেশনে সন্ধান লইয়া জানা গেল—ঐ স্থানে আসিয়া ইঞ্জিনের কি একটা অংশ বিগড়াইয়া যায়। ড্রাইভার সোজা কাজ বলিয়া নিজেই তাহা সারিয়া লয়।

পুতুলকে পোষ্য গ্রহণের সুযোগ

লস্ এঞ্জেলস্‌য়ের যে কোন ছোট মেয়ে যে এত দরিদ্র যে পুতুল একটিও পায় না খেলা করিতে, তাহাকে পোষ্যরূপে পুতুল গ্রহণের সুবিধা দেওয়া হয় ঠিক যেমন বয়স্করা অনাথ বালকবালিকাকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

লস্ এঞ্জেলস্ কাউণ্টিতে এই চমৎকার ব্যবস্থাটি করা হইয়াছে গরীব মেয়েদের জন্য; ৩৬টি পুতুল বর্তমানে পোষ্য দিবার পদ্ধতিতে সারা কাউণ্টিতে বহন করা হইতেছে। ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী হইতে যেমন পুস্তক দেওয়া হয় পাঠ করিতে এবং পাঠান্তে নির্দিষ্ট দিনে ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার থাকে; এস্থলেও পুতুল পোষ্য দিবার দোকান সকল রহিয়াছে, উহারা ছোট ছোট মেয়েদিগকে পুতুল ধার দেয় ৭ হইতে ১৪ দিনের জন্য। ঐ ৭ বা ১৪ দিন পরে পুতুলটি ফিরাইয়া দিতে হয়, তখন ঐটি আবার অন্য এক মেয়েকে পোষ্য দেওয়া হয় অনুরূপ ৭ হইতে ১৪ দিনের জন্য।

এই প্রকার পুতুল পোষ্য পাইবার জন্য 'পুতুল পোষ্য দান' দোকান-লাইব্রেরীর মেম্বর হইতে হয়। তজ্জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র স্বাক্ষর করিবে পিতামাতা বা অভিভাবক। তখন মেয়েটির নামে কার্ড ইস্যু করা হয়। ঐ কার্ড দ্বারা সে নিকটস্থ পুতুল-দোকান-লাইব্রেরী হইতে পুতুল পোষ্য পাইবে। ২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মেয়ে পর্যন্ত এইরূপ মেম্বর হইতে অধিকারিণী।

শুধু ৭ হইতে ১৪ দিনের জন্য ধার দেওয়াই কিন্তু এই পুতুল-লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য নয়। পুনঃপুনঃ ধার দিয়া যখন দেখা যায় কোন মেয়ে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত পুতুলটি (একাধিকবারে) অতি যত্নের সহিত রাখিয়াছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে লাইব্রেরীতে ফেরৎ দিয়াছে—পুতুলের কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই, নিয়মও ভঙ্গ করা হয় নাই, তখন সেই মেয়েকে পুতুল স্থায়ী পোষ্য গ্রহণের ন্যায্য অধিকারিণী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ জানেন, কোনও পুতুল ছোট মেয়েদের হাতে পড়িলে উহাদের মমতা জন্মে, সেই পুতুলকে সে আর হাতছাড়া করিতে চাহে না। এইজন্য গরীব মেয়েদের এই অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থায়ী পোষ্য প্রদানের ব্যবস্থা।

পুতুল পোষ্য স্থায়ীভাবে গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া যখন মেয়ে স্থির হয়, তখন পোষ্য গ্রহণের দলিল লেখাপড়া হয়' তাহাতে অভিভাবক স্বাক্ষর করে, পুতুলটি মেয়েকে পোষ্য দেওয়া হয় চিরদিনের জন্য।

ছেলেমেয়েদের অভাব পরিপূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত কাউন্সিল শুধু পুতুলই পোষ্য প্রদান করে না, পোষাক-পরিচ্ছদ পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় অভাবই পূরণ করিয়া থাকে লস্ এঞ্জেলস্‌য়ের কাউণ্টির সকল অভাবগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের।

ব্রিটেনের সুখশান্তিপূর্ণ বিবাহ সংখ্যা

ব্রিটেনে কোন্ দম্পতি বিবাহদ্বারা সর্বাপেক্ষা সুখী ইহা নির্ধারণের জন্য 'ডেলি-এক্সপ্রেস' পত্রিকা সমগ্র দেশের বিবাহিতের নিকট হইতে ৩২টি প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করিয়াছে এবং কেন তাহাদের বিবাহ সর্বাপেক্ষা সফল তাহারা মনে করে, তাহার বিবরণ সহ একটি করিয়া রচনাও প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সকল রচনা ও উত্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত সারমর্ম প্রস্তুত করা হইয়াছেঃ—

২০ হইতে ৯২ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ৮০০০ এবং অধিক দম্পতি দাবী করে যে, তাহাদের বিবাহই সর্বাপেক্ষা সুখ-শান্তিপূর্ণ।

শ্রেণী-বিভাগের ফলে মনে হয়, একটি দম্পতিই সর্বাপেক্ষা সুখী- স্বামী ৩৬, আফিসে চাকুরিয়া, ৩০ বৎসর বয়স্কা নারীর সহিত বিবাহিত।

তাহারা পাঁচ বৎসর যাবৎ বিবাহিত (বহু সুখী দম্পতি মাত্র দুই বৎসর বিবাহিত) এবং তাহাদের একটি সন্তান জন্মিয়াছে। তাহাদের এন্‌গেজমেণ্ট ছিল এক বৎসর স্থায়ী, তাহারও এক বৎসর পূর্ব হইতে তাহাদের পরিচয়। তাহাদের উভয়েরই বন্ধু-চক্র ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু পরিচয়ের পর একই রকমের বন্ধু-সমাজে তাহারা চলাফেরা করিতে থাকে।

তাহারা নিরাপত্তার জন্য বিবাহ করে নাই (২৬০ দম্পতি ঐ কারণে করিলেও), সংগীহীন নিরালা জীবনের জন্যও নয় (এ কারণে বিবাহ করিয়াছে ২৩০টি দম্পতি) অথবা নিজ পরিবারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্যও নয়, (এ কারণে ৭৪ দম্পতি বিবাহিত)—তাহারা বিবাহ করিয়াছে অনুরাগ হইতে। (৭১৬০ দম্পতি প্রেমের জন্যই বিবাহিত)।

বিস্ময়ের বিষয়ঃ—পত্নীদের তিনভাগের একভাগ বিবাহের পর চাকুরী লইয়াছে।

আরও আশ্চর্যঃ—পত্নীদের এক-পঞ্চম এখনও চাকুরী করিতেছে।

কিন্তু অধিকাংশই ঘরকন্নার কাজে স্থায়ী হইয়া আছে (যদিও প্রতি ৫জনে ২জন উহা পছন্দ করে না)।

সমগ্র ৮০০০ দম্পতির ভিতর ৬৪০০ দম্পতি অন্যের সহিত সংস্রবহীন গৃহে বাস করে, বাকি ১৬০০ বাস করে ফ্ল্যাটে, অন্য দম্পতি বা যে কোন লোকের সংস্রবে। যাহারা ঐ প্রকার নিরালায় গৃহে বাস করে—তাহাদের বাসগৃহ আবার এমন শহরে, যাহার লোক-সংখ্যা ৫০,০০০-এর কম হইবে না। তাহারা পিতামাতা বা শ্বশুরশাশুড়ীর ধারে কাছেও বাস করে না।

একই বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মিশিতে উভয়েই ভালবাসে, কিন্তু একই আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে না; ফলে দম্পতিদের সিকি অংশ পৃথক্ পৃথক্ আমোদ-প্রমোদ স্থানে গমন করে।

তাহা হইলেও প্রতি তিন দম্পতিতে দুই-জোড়া ভাবে উভয়ের আরও বেশী সময় একসঙ্গে কাটান উচিত।

অর্ধেকের বেশী বলিয়া থাকে তাহাদের বিবাহিত-জীবনে কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি হয় নাই। যাহাদের কলহ হয়, তাহারা কেহ বলে সপ্তাহ আগে, কেহ বলে মাসখানেক আগে, কেহ বলে এক বছর আগে ঝগড়া হইয়াছিল।

টাকা-পয়সা, ছেলে-মেয়ে ও বন্ধু-বান্ধবী লইয়াই মনান্তর হয় এবং তাহাতে উভয়েই সমান সংখ্যায় দায়ী। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা কাহারও মনে স্থান পায় নাই।

পত্নীকে উপহার দিবার বেলা দেখা যায়, প্রতি চারজনের মধ্যে একজন স্বামী সপ্তাহে একবার উপহার দেয়; অনুরূপ-সংখ্যক স্বামী দেয় মাসে একবার; সমান-সংখ্যকই দেয় বৎসরে একবার; বাকি সকল স্বামী দেয় কদাচিৎ।

সমগ্র সংখ্যার আটভাগের একভাগ দম্পতি সন্তানহীন। পরিবারে এক হইতে বাইশটি পর্যন্ত সংখ্যায় দেখা যায়। একটি সন্তান হওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে যাহারা ছোট সংসার চাহে, তাহাদের ভিতর; কিন্তু যাহারা বেশী সন্তান চাহে, তাহাদের নিকট আটটি জনপ্রিয়।

৬৪৯টি দম্পতির সন্তান-সংখ্যা আট; ৪টি দম্পতির কেবল ৯টি সন্তান; ৬৪৮টি দম্পতির দশটি করিয়া সন্তান; এবং তিন দম্পতির দেখা যায় এগারটি করিয়া।

স্বামীদের বেশীর ভাগই বলে তাহাদের বেশ চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের ভিতর চাকুরিয়াই অধিকাংশ। তথাপি ২৩৯৫ জন পুরুষ বলে যে, কাজ-কর্ম ভাল চলিতেছে না। ১৩৮টি পত্নী পুনরায় চাকুরীতে প্রবেশ করিতে চাহে এবং ৫১৪টি নিরালা জীবনের জন্য আক্ষেপ করে।

অর্ধেকের বেশী দম্পতিই মনে করে, আরও বেশী টাকা হইলেই তাহারা বেশী সুখী হইতে পারিত। কিন্তু অনেকেই সঠিক বলিতে পারে না, আর কত টাকা তাহাদের প্রয়োজন। অধিকাংশেরাই বলে আর বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড হইলে সুখী হয়। ২৭০ জন চাহে সপ্তাহে এক পাউণ্ড করিয়া বেশী; কেবল দুইজনের অতি উচ্চাশা—তাহারা চাহে বার্ষিক আরও ১,০০০ পাউণ্ড।

আশ্চর্যের বিষয়ঃ—স্কটল্যাণ্ডের অর্ধেকের কম লোক চায় আরও বেশী টাকা, ইংলণ্ডে চায় অর্ধেকের বেশী লোক; ইহাদের সকলের আশার চরম সীমা হইল—বার্ষিক ৫০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত।

বেশীর ভাগ পরিবারেই দেখা যায়, এই ব্যবস্থা—স্বামী সকল টাকাই পত্নীর হাতে দেয়, কেবল হাতখরচার জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া। ইহার পর যাহা জনপ্রিয়, তাহা হইল ঘরকন্নার জন্য পত্নীকে নির্দিষ্ট একটা অঙ্ক প্রদান করা। কেবল ২৭০টি স্বামী স্ত্রীর হাতে টাকা না দিয়া স্ত্রীর ব্যয়ের বিলগুলি স্বতন্ত্র পরিশোধ করে।

তিনভাগের দুইভাগ দম্পতি স্বামী স্ত্রী আলাদা আলাদা নিজ নিজ পোষাক খরিদ করে। বাকি একভাগের ভিতর স্ত্রীই উভয়ের পরিচ্ছদ ক্রয় করে

প্রাথমিক বিশ্লেষণে ইহাই পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা সুখী দম্পতি কোন্‌টি, তাহা নির্ধারণের জন্য পুনরায় পর্যবেক্ষণ চলিতেছে। নির্ধারিত হইলে ঐ দম্পতিকে ২৫

পাউন্ড পুনেরায় দেওয়া হইবে এবং সাতদিন লন্ডনে ডেলি এক্সপ্রেসের অতিথিরূপে বাস করিতে আহ্বান করা হইবে। (A. C.)

টেলিফোন্ ব্যবহার

টেলিফোনের উপরই নিউইয়র্কের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। প্রত্যেকটি টেলিফোনে বৎসরে গড়পড়তা এক কোটি ডাক হয়। এই টেলিফোন বিভাগ চালাইবার জন্য ৩০,৯০৮ জন কর্মচারী আছে।

বিবাহ-আবাহনে মেলা

প্রতি বৎসর ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরে হুইটমানডেতে এক মেলা বসে। উহার উদ্দেশ্য বিবাহের সুযোগ আনয়ন করা। ৩৬ বৎসর পূর্বে এই মেলা প্রথম আরম্ভ করা হয়। সেইবার (আনুমানিক ১৯০৩ সাল) ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরের ৬০টি অবিবাহিত তরুণী এই মর্মে আমন্ত্রণ প্রেরণ করে নিকটবর্তী অঞ্চলে—

যেহেতু স্থানীয় তরুণেরা বিবাহে উদাসীন, আমরা আশা করি, আশপাশের অঞ্চলের তরুণেরা 'হুইটমানডে'তে এখানে আসিয়া আমাদের সহিত কেক্ ও কাফি গ্রহণ করিবে, পরিণামে যাহাতে আমাদের ভিতর কতকগুলি বিবাহ-উৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

বর্তমানে বিবাহার্থিনী তরুণী ও আবেদনকারী তরুণের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তরুণীদের তরফ হইতে সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। এবং তরুণদের ভিতর প্রতারণাকারীদের সন্ধানের জন্য মেয়র স্বয়ং মেলার দিনে উপস্থিত থাকেন ও আবেদনপত্র পূর্বেও পর্যবেক্ষণ করেন। এই বৎসর ৩০০০ তরুণ আবেদনপত্র দাখিল করে মেলার ঐতিহ্য অনুসারে পত্নী মনোনয়ন করিবার জন্য। মেয়র উহার ভিতর হইতে ২০জনকে দেখিবামাত্রই ধরিয়া ফেলেন যে, উহারা পূর্বেই বিবাহিত।

বিবাহেচ্ছু তরুণীদের সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ম্যাডাময়সেল্ আইরিন্ টাসিগনন—নিজ সোসাইটি সদস্য ও মেয়রের সাহায্যে ঐ ৩০০০ আবেদনের ভিতর ৬০০খানি মনোনয়ন করেন। প্রেসিডেণ্টকে ঐ ৬০০ আবেদনকারীর প্রত্যেককে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে হয়। প্রেসিডেন্ট ও মেয়র কর্তৃক মনোনয়ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইলে বিবাহ-মেলা আরম্ভ হয়।

শহরের বাজারে প্রকাণ্ড বড় একটি টেবিল স্থাপন করা হইয়াছিল। বিবাহেচ্ছু তরুণীগণ সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, মনোনীত তরুণগণ ঐ স্থানে দলে দলে যাইয়া উপস্থিত হয়। তরুণীরা তাহাদের কেক্ দেয়, কাফি পান করিতে দেয়। কথাবার্তা হাস্য-কৌতুক চলিতে থাকে।

তরুণীগণ এই ৬০০ তরুণের ভিতর হইতে আপন মনোমতটিকে বাছিয়া লয়। প্রথম সাক্ষাতে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় যথাযোগ্য এনগেজমেণ্টের পথ প্রশস্ত করে এবং পরিণামে বিবাহ-বন্ধনে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা

বাথ্ শহরে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট্ কন্‌ফারেন্স ১লা জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রদর্শনী বিভাগে কটন্, উল, সিল্ক এবং লিনেন্ এই সকলের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপাদানে তৈরী ঐ সকলের নকল তন্তু ও উহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। টেনেসি হইতে সমাগত ডাঃ হ্যারাল্ড ডি উইট্ স্মিথ্ গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—স্বাভাবিক গ্যাস হইতে বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত মোজা সিল্কের তৈরী মোজা হইতে অনেক বেশী টেক্‌সই।

এই প্রদর্শনীতে আরও অনেক কৃত্রিম বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—ইটালী হইতে প্রেরিত 'হেম্প' দ্বারা প্রস্তুত লিনেন্ চমৎকার জিনিষ হইয়াছে। মাখন তোলা দুধ হইতে নির্মিত নানা প্রকার বস্ত্রও সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে'

স্বামীর নিষ্ঠুরতার তালিকা

হাইগেট ডোমেষ্টিক্ কোর্টে মিসিস পেপিস তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আনয়ন করে। প্রমাণস্বরূপ সে তাহার ডায়েরী আদালতে দাখিল করে। সে বলে—"আমাদের বিবাহের পর হইতেই আমি এই ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বামী আমার প্রতি যতবার নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, তাহার সকল ব্যাপারেরই ইহাতে উল্লেখ আছে।"

তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ডায়েরীতে স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন অন্য কিছু সে লিখিয়া রাখিয়াছে কি না। উত্তরে সে বলে—"উহা ছাড়া আর লিখিবার মত কোনও আচরণই ছিল না। কারণ সাক্ষাৎ হইলে স্বামী নিষ্ঠুরতা ভিন্ন অন্য কোন আচরণ করে নাই।"

(৬)

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পরের কথা। 'খোকন, ও খোকন' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে হলধর প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁর মনে হইল কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো অন্তত দু'মণ ওজনের একটা পদার্থ তীর বেগে তাঁর মাথার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মস্তক রক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই রায় বাহাদুর মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল উট্রাম।

হলধরের প্রবেশ, মেজেয় উপবেশন এবং উট্রামকে ডাকা এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল নিমেষের মধ্যে।

একে'ত ঘর অন্ধকার, তার উপর প্রকাশ দোল খাইতেছিল সাধকের তীব্র একাগ্রতার সহিত তাই মাতামহের উপস্থিতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই। সে ভাবিতেছিল, সিনেমার সেই সুন্দরীর কথা। মেয়েরা অতিরিক্ত মেদক্রান্ত লোক পছন্দ করে না, তাই প্রকাশের এই উদগ্র প্রয়াস। প্রেমে পড়ার দিন হইতেই সে দোল খাইতেছে এবং ব্যায়াম চর্চা করিতেছে নানাপ্রকার।

রায় বাহাদুর আবার ডাকিলেন, উট্রাম।

প্রকাশ বলিল, কে? দাদু?

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া হলধর বলিলেন, অল বস্— বলতে হয় যে তুমিই ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলছ।

গতি বেগ কমাইতে কমাইতে প্রকাশ বলিল, ব্রেক কষ্‌ছি।

হঠাৎ ব্যায়াম আরম্ভ ক'রেছ, ব্যাপার কি?

প্রকাশ পাকা তালের মতন ঝুপ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সুইচ্‌টা টিপিয়া দিলে, হলধর বলিলেন, একেবারে যে ঘর্মাক্ত কলেবর!

মেয়েরা fat পছন্দ করে না।

নারীর মতানুযায়ী চলতে আরম্ভ করলে কবে থেকে! তুমি ত ছিলে নারীদ্বেষী।

She is divine (সে একেবারে দেবী)।

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, পটীয়সীটি কে যে তোমার মনে দাগ কেটেছে। কলেজের কোন ছাত্রী বুঝি?

আমি তাকে চিনি না।

অল্ বস্, না চিনেই প্রেম, একেবারে আরব্যোপন্যাস।

একটু পরে রায় বাহাদুর কহিলেন, যাক এতদিনে আমার উপযুক্ত নাতি হ'তে পেরেছ?

তার মানে, দাদু?

শোননি? আমিও লভে পড়েছিলাম, ভাই। তোমার দিদিমাকে দেখে ডিপ্ লভ্ হ'ল। তার স্কুলের গাড়ী যে রাস্তা দিয়ে যেত আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

চিনতে না তাঁকে?

আলাপ ছিল না, তবে পরিচয় জানতাম।

তাহলে অবস্থা আমার চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল। আমি ত পরিচয়ও জানি না।

এটা আরও বেশী রোম্যাণ্টিক। যত কৃচ্ছ্রসাধন, ফল ততই মিষ্টি।

তোমার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল?

নিশ্চয়, বাবা বললেন ওরা কুলে খাটো, ওখানে তোমার বিয়ে হবে না। আর তোমার দিদিমার বাবা বললেন, এম-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেলে মেয়েকে তোমার হাতে দিতে পারি।

বলে কি, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস! পিতার অমত এবং ভাবী-শ্বশুরের সর্ত আমাকে অকূল-পাথারে ফেলে দিলে। জীবনে ফার্ষ্ট ক্লাস নম্বর কখনও পাইনি, তাতে আবার এম-এ পরীক্ষা। পরীক্ষারও মাত্র পাঁচ মাস বাকী, ভাবলাম পরের বার দেব কিন্তু বিলম্বও সহ্য হয় না।

প্রেম শেষটায় অসাধ্য সাধন করল, চিরকালের আড্ডাধারী আমি ষোল ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষায় হ'লাম ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড।

জয়ী হ'লে দুটোতেই?

অল্ ফর লভ। জীবনের ধারাই গেল বদলে। ডেপুটি-সিপ্ পরীক্ষায়ও ভাল ফল করলাম। কেউ আশা করতে পারেনি হলধর এতটা করবে। উট্রাম।

উট্রাম আসিলে হলধর কহিলেন, আজ রাত্রে খোকনবাবু আমার সঙ্গে খাবেন।

রাত্রে ডিনারের টেবিলে হলধর দৌহিত্রকে কহিলেন, বেশেরও পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।

প্রকাশ একটু হাসিল।

চুল ছেঁটেছ কোথায়?

সেলুনে—

টিকিটা আছেত?

হ্যাঁ দাদু।

খুব ভাল করেছ। একটু থামিয়া রায় বাহাদুর আবার বলিলেন, আজ আমি তোমার সেই অজানার স্বাস্থ্য পান করব।

আশীর্বাদ করলেই যথেষ্ট হবে।

ও সব সেকেলে কথা।

জ্যোতিষী বলেছেন—

অল্ রট্। আবার জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মাত্রকেই বোগাস মনে করি। ওদের কাউকে আসামীর ডকে পেলেই আমি জেলে পাঠাতাম।

কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেছেন, তার সন্ধান পাব।

মেয়েটির ঠিকানা বলে দিলেন না কেন?

তিনি বলেন, রাস্তার ইংরেজী নামের সঙ্গে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের -

বোগাস্। তুমি মোটরের নম্বরটা ত টুকে নিলে পারতে।

নিয়েছিলাম, ভুল নম্বর।

উউ আর এ ফুল।

প্রকাশ নীরব।

রায় বাহাদুর বলিলেন, খোঁজ কর, যত টাকা লাগে আমার চেক বই সই করে তোমায় দিয়ে দেব। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। রক্তের ধারা তুমি বজায় রেখেছ। যেনাস্য পিতরো যাতাঃ —

পাউন্ড পুনরায় দেওয়া হইবে এবং সাতদিন লন্ডনে ডেলি এক্সপ্রেসের অতিথিরূপে বাস করিতে আহ্বান করা হইবে। (A. C.)

টেলিফোন্ ব্যবহার

টেলিফোনের উপরই নিউইয়র্কের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। প্রত্যেকটি টেলিফোনে বৎসরে গড়পড়তা এক কোটি ডাক হয়। এই টেলিফোন বিভাগ চালাইবার জন্য ৩০,৯০৮ জন কর্মচারী আছে।

বিবাহ-আবাহনে মেলা

প্রতি বৎসর ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরে হুইট-মানডেতে এক মেলা বসে। উহার উদ্দেশ্য বিবাহের সুযোগ আনয়ন করা। ৩৬ বৎসর পূর্বে এই মেলা প্রথম আরম্ভ করা হয়। সেইবার (আনুমানিক ১৯০৩ সাল) ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরের ৬০টি অবিবাহিত তরুণী এই মর্মে আমন্ত্রণ প্রেরণ করে নিকটবর্তী অঞ্চলে—

যেহেতু স্থানীয় তরুণেরা বিবাহে উদাসীন, আমরা আশা করি, আশপাশের অঞ্চলের তরুণেরা 'হুইটমানডে'তে এখানে আসিয়া আমাদের সহিত কেক্ ও কাফি গ্রহণ করিবে, পরিণামে যাহাতে আমাদের ভিতর কতকগুলি বিবাহ-উৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

বর্তমানে বিবাহার্থিনী তরুণী ও আবেদনকারী তরুণের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তরুণীদের তরফ হইতে সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। এবং তরুণদের ভিতর প্রতারণা-কারীদের সন্ধানের জন্য মেয়র স্বয়ং মেলার দিনে উপস্থিত থাকেন ও আবেদনপত্র পূর্বেও পর্যবেক্ষণ করেন। এই বৎসর ৩০০০ তরুণ আবেদনপত্র দাখিল করে মেলার ঐতিহ্য অনুসারে পত্নী মনোনয়ন করিবার জন্য। মেয়র উহার ভিতর হইতে ২০জনকে দেখিবামাত্রই ধরিয়া ফেলেন যে, উহারা পূর্বেই বিবাহিত।

বিবাহেচ্ছু তরুণীদের সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ম্যাডা-ময়সেল্ আইরিন্ ট্যাসিগনন—নিজ সোসাইটি সদস্য ও মেয়রের সাহায্যে ঐ ৩০০০ আবেদনের ভিতর ৬০০খানি মনোনয়ন করেন। প্রেসিডেন্টকে ঐ ৬০০ আবেদনকারীর প্রত্যেককে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে হয়। প্রেসিডেন্ট ও মেয়র কর্তৃক মনোনয়ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইলে বিবাহ-মেলা আরম্ভ হয়।

শহরের বাজারে প্রকাণ্ড বড় একটি টেবিল স্থাপন করা হইয়াছিল। বিবাহেচ্ছু তরুণীগণ সেখানে অপেক্ষা করিতে-ছিল, মনোনীত তরুণগণ ঐ স্থানে দলে দলে যাইয়া উপস্থিত হয়। তরুণীরা তাহাদের কেক্ দেয়, কাফি পান করিতে দেয়। কথাবার্তা হাস্য-কৌতুক চলিতে থাকে।

তরুণীগণ এই ৬০০ তরুণের ভিতর হইতে আপন মনোমতটিকে বাছিয়া লয়। প্রথম সাক্ষাতে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় যথাযোগ্য এনগেজমেন্টের পথ প্রশস্ত করে এবং পরিণামে বিবাহ-বন্ধনে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা

বাথ্ শহরে টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট্ কন্ফারেন্স ১লা জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রদর্শনী বিভাগে কটন্, উল, সিল্ক এবং লিনেন্ এই সকলের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপাদানে তৈরী ঐ সকলের নকল তন্তু ও উহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। টেনেসি হইতে সমাগত ডাঃ হ্যারাল্ড ডি উইট্ স্মিথ্ গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—স্বাভাবিক গ্যাস্ হইতে বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত মোজা সিল্কের তৈরী মোজা হইতে অনেক বেশী টেঁক্সই।

এই প্রদর্শনীতে আরও অনেক কৃত্রিম বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—ইটালী হইতে প্রেরিত 'হেম্প' দ্বারা প্রস্তুত লিনেন্ চমৎকার জিনিষ হইয়াছে। মাখন তোলা দুধ হইতে নির্মিত নানা প্রকার বস্ত্রও সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে'

স্বামীর নিষ্ঠুরতার তালিকা

হাইগেট ডোমেষ্টিক্ কোর্টে মিসিস পেপিস তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আনয়ন করে। প্রমাণস্বরূপ সে তাহার ডায়েরী আদালতে দাখিল করে। সে বলে—"আমাদের বিবাহের পর হইতেই আমি এই ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বামী আমার প্রতি যতবার নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, তাহার সকল ব্যাপারেরই ইহাতে উল্লেখ আছে।"

তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ডায়েরীতে স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন অন্য কিছু সে লিখিয়া রাখিয়াছে কি না। উত্তরে সে বলে—"উহা ছাড়া আর লিখিবার মত কোনও আচরণই ছিল না। কারণ সাক্ষাৎ হইলে স্বামী নিষ্ঠুরতা ভিন্ন অন্য কোন আচরণ করে নাই।"

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(৬)

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পরের কথা। 'খোকন, ও খোকন' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে হলধর প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁর মনে হইল কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো অন্তত দুমণ ওজনের একটা পদার্থ তীর বেগে তাঁর মাথার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মস্তক রক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই রায় বাহাদুর মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল, উট্রাম।

হলধরের প্রবেশ, মেজেয় উপবেশন এবং উট্রামকে ডাকা এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল নিমেষের মধ্যে।

একে'ত ঘর অন্ধকার, তার উপর প্রকাশ দোল খাইতেছিল সাধকের তীব্র একগ্রতার সহিত তাই মাতামহের উপস্থিতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই। সে ভাবিতেছিল, সিনেমার সেই সুন্দরীর কথা। মেয়েরা অতিরিক্ত মেদক্রান্ত লোক পছন্দ করে না, তাই প্রকাশের এই উদগ্র প্রয়াস। প্রেমে পড়ার দিন হইতেই সে দোল খাইতেছে এবং ব্যায়াম চর্চা করিতেছে নানাপ্রকার।

রায় বাহাদুর আবার ডাকিলেন, উট্রাম।

প্রকাশ বলিল, কে? দাদু?

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া হলধর বলিলেন, অল বস্— বলতে হয় যে তুমিই ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলছ।

গতি বেগ কমাইতে কমাইতে প্রকাশ বলিল, ব্রেক কষ্‌ছি।

হঠাৎ ব্যায়াম আরম্ভ ক'রেছ, ব্যাপার কি?

প্রকাশ পাকা তালের মতন ঝুপ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সুইচ্‌টা টিপিয়া দিলে, হলধর বলিলেন, একেবারে যে ঘর্মাক্ত কলেবর!

মেয়েরা fat পছন্দ করে না।

নারীর মতানুযায়ী চলতে আরম্ভ করলে কবে থেকে। তুমি ত ছিলে নারীদ্বেষী।

She is divine (সে একেবারে দেবী)।

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, পটীয়সীটি কে যে তোমার মনে দাগ কেটেছে। কলেজের কোন ছাত্রী বুঝি?

আমি তাকে চিনি না।

অল্ বস্, না চিনেই প্রেম, একেবারে আরব্যোপন্যাস।

একটু পরে রায় বাহাদুর কহিলেন, যাক্ এতদিনে আমার উপযুক্ত নাতি হ'তে পেরেছ?

তার মানে, দাদু?

শোননি? আমিও লভে পড়েছিলাম, ভাই। তোমার দিদিমাকে দেখে ডিপ্ লভ্ হ'ল। তার স্কুলের গাড়ী যে রাস্তা দিয়ে যেত আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

চিনতে না তাঁকে?

আলাপ ছিল না, তবে পরিচয় জানতাম।

তা'হলে অবস্থা আমার চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল। আমি ত' পরিচয়ও জানি না।

এটা আরও বেশী রোম্যাণ্টিক। যত কৃচ্ছ্রসাধন, ফল ততই মিষ্টি।

তোমার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল?

নিশ্চয়, বাবা বললেন ওরা কুলে খাটো, ওখানে তোমার বিয়ে হবে না। আর তোমার দিদিমার বাবা বললেন, এম-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেলে মেয়েকে তোমার হাতে দিতে পারি।

বলে কি, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস! পিতার অমত এবং ভাবী-শ্বশুরের সর্ত আমাকে অকূল-পাথারে ফেলে দিলে। জীবনে ফার্ষ্ট ক্লাস নম্বর কখনও পাইনি, তাতে আবার এম-এ পরীক্ষা। পরীক্ষারও মাত্র পাঁচ মাস বাকী, ভাবলাম পরের বার দেব কিন্তু বিলম্বও সহ্য হয় না।

প্রেম শেষটায় অসাধ্য সাধন করল, চিরকালের আড্ডাধারী আমি ষোল ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষায় হ'লাম ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড।

জয়ী হ'লে দুটোতেই?

অল্ ফর লভ। জীবনের ধারাই গেল বদলে। ডেপুটি-শিপ্ পরীক্ষায়ও ভাল ফল করলাম। কেউ আশা করতে পারেনি হলধর এতটা করবে। উট্রাম।

উট্রাম আসিলে হলধর কহিলেন, আজ রাত্রে খোকনবাবু আমার সঙ্গে খাবেন।

রাত্রে ডিনারের টেবিলে হলধর দৌহিত্রকে কহিলেন, বেশেরও পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।

প্রকাশ একটু হাসিল।

চুল ছেঁটেছ কোথায়?

সেলুনে–

টিকিটা আছেত?

হ্যাঁ দাদু।

খুব ভাল করেছ। একটু থামিয়া রায় বাহাদুর আবার বলিলেন, আজ আমি তোমার সেই অজানার স্বাস্থ্য পান করব।

আশীর্বাদ করলেই যথেষ্ট হবে।

ও সব সেকেলে কথা।

জ্যোতিষী বলেছেন—

অল্ রট্। আবার জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মাত্রকেই বোগাস মনে করি। ওদের কাউকে আসামীর ডকে পেলেই আমি জেলে পাঠাতাম।

কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেছেন, তার সন্ধান পাব।

মেয়েটির ঠিকানা বলে দিলেন না কেন?

তিনি বলেন, রাস্তার ইংরেজী নামের সঙ্গে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের—

বোগাস। তুমি মোটরের নম্বরটা ত টুকে নিলে পারতে।

নিয়েছিলাম, ভুল নম্বর।

ইউ আর এ ফুল।

প্রকাশ নীরব।

রায় বাহাদুর বলিলেন, খোঁজ কর, যত টাকা লাগে আমার চেক বই সই করে তোমায় দিয়ে দেব। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। রক্তের ধারা তুমি বজায় রেখেছ। যেনাস্য পিতরো যাতাঃ—

রায় বাহাদুরের মাথাটা একটু একটু টলিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, কিন্তু ভুলে যেওনা তুমি একজন গোয়েন্দা।

ভুলিনি, আজই গিয়েছিলাম তরুণ চৌধুরীর বাড়ীতে।

কিছু খোঁজ পেলে?

এই সময় ট্রের উপর একখানা কার্ড লইয়া উট্রাম আসিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল। প্রকাশ কার্ডখানা তুলিয়া লইয়া পড়িল,—

তরুণ চৌধুরী—

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সম্পাদক, জ্বলদর্চি, সহ-সম্পাদক, মঙ্গল ভেরী, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক—কিশোর চন্দ্রিকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

রায় বাহাদুর কহিলেন, ভিতরে নিয়ে এস, উট্রাম।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলে এসেছি রায় বাহাদুর, বলিয়া স্মিতমুখে তরুণ ঘরে প্রবেশ করিল।

তার মুখের মাঝখানটায় অর্ধ-দগ্ধ বর্মা, গায়ে নতুন ধরণের কলার তোলা ইস্ত্রি করা সার্ট।

তরুণের প্রকাশের দিকে চোখ পড়ায় সে বলিল, নমস্কার, আপনি এখানে?

প্রকাশ প্রতিনমস্কার করিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন, উনি আমার দৌহিত্র প্রকাশ মুখোপাধ্যায়।

তরুণ বলিল, আমি এসেছি একখানা চিঠি দেখাতে। রুশ সাহিত্যিক নিকিটিন লিখেছেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন, ভাল কথা, কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়, অল্ রট্—

তরুণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াই চলিল, আজকাল বাঙালীরা রুশ-রাজনীতি, রুশ-সমাজ এই সব নিয়েই পাগল। তাই স্থির করেছি নিকিটিনের তর্জমা করব। তিনি অনুমতি পাঠিয়েছেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, নিকিটিনের নাম শুনেছি বলেত' মনে পড়ে না।

তরুণ কহিল, মস্ত বড় লেখক। অবশ্য বড় না হইলেও ক্ষতি ছিল না। রুশ নামেরই মোহ আছে, শুনুন তবে একটা ঘটনা।

কোন বিখ্যাত কাগজ সম্পাদক আমার নাম করা গল্প 'লণ্ঠন' ফিরিয়ে দেন। অবার সেই কাগজেই লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম তার্সিককের তর্জমা বলে। গল্পটা পরের মাসেই বেরুল। দক্ষিণাও পেলাম।

রায় বাহাদুর কহিলেন, অল্ বস্, ভাগ্যবিপর্যয় কার তরুণ, আমার না জমিদারের?

তার মানে?

মাত্র একশত কুড়ি পাতার বই পেয়েছি।

তরুণ বলিল, আমি ইন্সিওর করে তিনশত পঁচাশ পাতার পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। সাড়ে তিনশ' পাতার ও একশ' কুড়ি পাতার বইর ইন্সিওরের খরচারও তফাৎ আছে।

রায় বাহাদুর বলিলেন, তাহলেত দেখছি অল্ বস্, এখান থেকেই চুরি হয়েছে।

তরুণ প্রশ্ন করিল, কবে টের পেলেন?

যে দিন এসেছে তার পরদিন। পার্শেলটা কে খুলেছিল তাও আমার মনে নাই। সম্ভবত উট্রামই খুলে থাকবে। সে মাতাল হ'লেও বিশ্বাসী লোক। পরের দিন ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

তরুণ কহিল, এত ম্যাজিক রায় বাহাদুর।

ম্যাজিক নয়, অল্ রট্। নিশ্চয়ই কোন গবেষকের কাজ। I shall send them to Jail (আমি তাদের জেলে দেব) যাক্, তোমার কি চাই, বিয়ার না হুইস্কি?

বিয়ারই ভাল।

একটু পরে উট্রাম গেলাসে বিয়ার ঢালিতে আরম্ভ করিলে তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, চাবী?

হ্যাঁ।

চাবী মার্কা বিয়ারই আমার পছন্দ। কিং অব বিয়ারস্। আপনি কি পছন্দ করেন, প্রকাশ বাবু?

রায় বাহাদুর কহিলেন, উনি টিটোটেলর।

খুব আনন্দের বিষয়। কেন না, ঐ জিনিষটা বাজারে দুর্লভ।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের কথা বলছ?

টিটোটেলরের কথা।

একটু পরে ফাউল রোষ্ট আসিলে তরুণ পরম আনন্দে তার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, তোমাকে এই বইর অনুসন্ধান করতে হবে, তরুণ, প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকদের কাউকে আমি চিনি না।

তরুণ বলিল, আপনার কোন আদেশ পালন ক'রতে পারা ত' সৌভাগ্যের বিষয়।

খরচা যা লাগে নিসেক্রেটারীর কাছে চেয়ে নিও।

না, না সে কি কথা? আপনি আমার পরম উপকারী পৃষ্ঠপোষক।

ততক্ষণ বিয়ারের বোতলটা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাকিলেন, উট্রাম।

উট্রাম আরও দুইদিন তরুণকে দেখিয়াছে। সে একেবারে দুইটা বোতল লইয়া আসিল। তরুণের গেলাসে বিয়ার ঢালিতে ঢালিতে বলিল, আইস্‌ড্ বিয়ার।

আইস্‌ড্ বিয়ারই আমার পছন্দ।

উট্রাম একটু মুচকি হাসিল।

খাওয়া শেষ হইলে প্রকাশ উঠিয়া গেল।

রায় বাহাদুর ও তরুণ গল্প করিতে লাগিলেন। দু'জনে এক একবার গেলাসে চুমুক দেন আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কি করিয়া ভূস্বামীর ভাগ্য বিপর্যয়ের অপহৃত অংশ উদ্ধার করা যায়, সে সম্বন্ধেই আলোচনা হইল অনেকক্ষণ। উভয়েরই ধারণা এই চুরির পিছনে কোন মাথা-ওয়ালা লোক আছে।

তরুণ কহিল, সাহিত্য বাতিকগ্রস্তদেরই এই কাজ।

বাতিকগ্রস্ত বল না তরুণ, আমরাও যে ঐ পর্যায়ে পড়ে যাই।

তা বটে, ক্ষমা করবেন, রায় বাহাদুর।

কথায় কথায় তরুণ কহিল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনার বৌমা বলছিলেন, তোমার দাদার জন্য কিছু রসকলি নিয়ে যাও।

রসকলি?

আমাদের পরিবারের একটা বিশিষ্ট খাবার। ফ্যামিলিটা পুরানো কি না, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই একটা বিশেষত্ব আছে।

ভাল কথা, একদিন তোমার রসকলি নিয়ে এস। মেয়েদের তৈরী খাবার অনেক কাল খাই না।

একদিন সুসঙ্গের মহারাজাকে রসকলি দেই। তারপর তিনি প্রায়ই বলতেন, কই আর রসকলি খাওয়ালে না? যেমন তোমার লেখা, তেমনি রসকলি—দুটোই পরম উপাদেয়।

রায় বাহাদুর কহিলেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। একটু পরেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহিত্যিক বলে আমার কিছু খ্যাতি হয়েছে?

ক্রমশ হচ্ছে।

আমার 'জ্ঞান দাস' পড়ে বোধ হয় লোকে মুগ্ধ হয়েছে।

ঠিক বলেছেন।

প্রকাশ বলছিল, 'মোশেলেম বৈষ্ণব কবি'টা নাকি খুব উঁচু দরের লেখা।

হ্যাঁ। উনি আপনার উপযুক্ত দৌহিত্র।

রায় বাহাদুর বলিলেন, ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট এম-এ।

তরুণ বলিল, তাছাড়া সাহিত্য-রসিক।

ইংরেজীর প্রফেসার বটে কিন্তু সাহিত্য-রসিক বলা চলে না।

তরুণের মনে হইল, তবে কি রায় বাহাদুর তাকে সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধানের জন্য প্রকাশকে তার বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন? সে একবার ভাবিল যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা না বলাই ভাল। কিন্তু টাকারও ত দরকার।

রায় বাহাদুর বলিলেন, কি ভাবছ তরুণ? Out with it

ডাক্তার বলেছেন, আপনার বৌমাকে টনিক খাওয়াতে।

টনিক খাওয়ান ভাল।

দাম বড্ড বেশী।

তার জন্য ভেব না।

তা' জানি, আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম।

টনিকের দাম কত?

সাড়ে ন'টাকা বোতল।

তরুণ।

আজ্ঞে।

তুমি গোয়েন্দা।

তরুণ রায় বাহাদুরের দিকে চাহিল।

আমি তোমায় নিযুক্ত করছি।

আমার সৌভাগ্য।

ভূস্বামীর ভাগ্য-বিপর্যয় সম্বন্ধে।

তরুণ দেখিল, তার অনুমান মিথ্যা। সন্দেহ করিলে হলধর বার বার তাকে অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করিতেন না। সে কহিল, নিশ্চয় করব। ও-তে আমারও স্বার্থ আছে। আমার পূর্ব পুরুষের রচনা। তিনি ছিলেন একটা জিনিয়াস। আজ দেড়শ' বছর পরে আর একজন জিনিয়সের উপর পড়েছে তার তত্ত্ববিশ্লেষণের ভার।

রায় বাহাদুর ডাকিলেন, তরুণবাবুর জন্য বিয়ার। আচ্ছা তরুণ, আমি কি একটি জিনিয়স?

নিশ্চয়।

হাকিম হিসাবে নয়, সাহিত্যে?

লোকে ত তাই বলে।

টনিকের দাম কত?

সাড়ে ন'টাকা বোতল।

রায় বাহাদুর ডাকিলেন, উট্রাম।

উট্রাম মুখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে আসিল।

হলধর হুকুম করিলেন, তরুণবাবুকে কুড়িটে টাকা দিয়ে দাও। তরুণবাবুকে।

আজ্ঞে।

বৌমাকে রীতিমত টনিক খাওয়াবে।

আপনার অনুগ্রহে।

অলু রট্। অনুগ্রহ আবার কি? সাহিত্য বল, হাকিমী বল, ঘরে স্ত্রী না থাকলে—অরণ্যং তেন গন্তব্যং।

(ক্রমশ)

কাক ও শিমুল

শ্রীশশধর বিশ্বাস

ওরে কাক! তোর ডাক
বিষ হানে নিখিলের কানে।
তোরে দেখে ভালোবেসে
কেহ নাহি চাহে তোর পানে।
আমি ফুল এ শিমুল
তোর মত অভাগা ধরায়।

একা হাসি একা কাঁদি
নিশি দিন দুপুর সন্ধ্যায়।
কাছে আয় এ শাখায়
বসে তুই প্রাণ খুলে ডাক।
তোর ডাকে এ বুকের
সব ব্যথা ধুয়ে মুছে যাক।

আঁধার মরু

(বিদেশী চিত্র)

শ্রীঅমলা গুপ্তা

ভাইশ্নি ভলোচকের গা ঘেঁসে চলে গিয়েছে রাস্তাটি—মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড্ অবধি। আর এ মুলুক যখন দুনিয়া ছাড়া নয়, সেই রাস্তাই যে আবার বিপরীত দিকে চলে যাবে লেনিনগ্রাড্ থেকে মস্কো অবধি এটা অবশ্য আশ্চর্য নয়।

ছবির মত সুন্দর সভ্য-ভব্য শহর ভাইশ্নি ভলোচক্; গড়ে ওঠা এখনও পরিসমাপ্তি পায় নি। এর রেলওয়ে স্টেশনে—পথে পথে কলরব আর কর্মব্যস্ততা একটা সজীবতার দৃশ্যই তুলে ধরে। এক কথায় শহরটি যে প্রশস্ত ঐ রাজপথের স্পর্শ পেয়েছে এ উপলব্ধি ভাল করেই অন্তঃপ্রবিষ্ট করে দেয়।

শহরের বাইরে ডানদিকে প্রসারিত রয়েছে জনহীন অঞ্চল—মরুময় প্রান্তর, গম্ভীর নিবিড় কানন, বিষম দুর্গম জলা। সেকালে, যাকে লোকে বলে থাকে—those good old times (সেই অতীত সোনার কাল), এ তল্লাটে আনাগোনা করত স্থানীয় লুণ্ঠনকারীর দল। সারা অঞ্চলটা জুড়িয়ে কু-খ্যাতি প্রসার লাভ করেছিল দিকে দিকে।

* * * * *

এ বেয়াড়া অঞ্চলটারই মাঝে রয়েছে প্রাচীন একটি পল্লী নাম ওর্বাসন্তকা। এই যে মরুময় কান্তার, এই যে তিমিরাচ্ছন্ন কাননের ঘুমন্ত রাজত্ব, এই যে অনতিক্রমণীয় রাক্ষসী জলাভূমি—এখানেও আবার জীবন্ত প্রাণী দেখ্তে পাওয়া যাবে, এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কি হতে পারে?

সব চেয়ে নিকটে যে শহর আর স্টেশন, তা-ও ৩০ মাইলের কম নয় গাঁখানি থেকে। তার ওপর সে-শহরে পৌঁছাও বড় সোজা কথা নয়, বিশেষ করে বসন্ত আর শরৎকালে, যখন এক হাঁটু জলকাদা ভেঙে যেতে হবে প্রায় সারাটা পথ, আর প্রতিপদেই জলে ঢাকা চোরাগর্তে ডুবোন্ যাবার আশঙ্কা থাকবে পুরোপুরি।

এমনই পরম লোভনীয় মুলুকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আহ্বান এল আমাদের—সেই পল্লী-সোভিয়েটের চেয়ারম্যান ইলায়া সুখানভের তরফ থেকে।

পল্লী-সোভিয়েটের নতুন মোটর গাড়ীতে চেপে যখন আমরা বের হলাম, তখন সুখানভ অভিযোগের সুরেই বল্লে—

"আমরা থাকি একটা শ্মশানপারা ঠাঁইতে। গর্ব করবার মত এমন কিছুই নেই। বিকট বিরাট বিষাদমগ্ন বন-বনানী। বাস্তব সভ্যতা-সংস্কৃতি এখনও বহু-বহু দূরে। সত্যিকথা বল্তে কি—চোখে পড়বে শুধু আঁধার, শুধু মরুমায়া, শুধু বন বনানী—আর কিছু না।"

এমন অনেক লোক দেখ্তে পাওয়া যায় হামেশা যাদের স্বভাবই হ'ল খিঁচকাঁদুনে—সব কিছুতেই তাদের অভিযোগ আর আক্ষেপ। এখন এই যে চেয়ারম্যান তুলনায় একে তরুণই বল্তে হবে, আর ও ত অল্প দিন আগেই রেড্ আর্মির দল থেকে ফিরে এসেছে। কাজেই আমার মনে হতে লাগ্ল—নিরালা এ পল্লীতে নতুন জীবনের আমেজ না ফুটিয়ে, এ তরুণ কিনা ঝিমিয়ে গুমরিয়ে ফিরছে অষ্টপর;—এ নিতান্ত অবাঞ্ছিত—নেহাৎই খারাপ বল্তে হবে।

"আঁধার মরু—উৎসন্নতা আর অন্ধকার" সুখানভ বলে চলে।—"আমরা আর কি দিতে পারি? প্রকৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের কাছ থেকে এখনও বহু দূরে সরে আছে।"

"নিরক্ষরতা দূরে করবার জন্যে তোমাদের পল্লী-সোভিয়েটে সংঘ প্রতিষ্ঠিত নেই?"

"যা আমাদের নেই, তা নেই-ই। দু'বছর আগে আমাদের এমনি একটা সংঘ ছিল। কিন্তু আজ আর তা নেই।"

"এ তো বড় ভাল কথা নয়, কমরেড সুখানভ। কেমন করে এ দশা হ'ল?"

"সে তো অতি সাদা কথা। বুড়কালা ঠাক্'মা আগাফিয়া ছাড়া আজ আর আমাদের ভিতর দ্বিতীয় লোক নেই যে লিখতে পড়তে জানে; আর নিকট ভবিষ্যতে যে এক-আধটি ঠাউরে উঠবে, এমন ভরসাও তো কিছু দেখ্তে পাচ্ছিনে। তা হলে কার জন্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সংঘ একটা প্রতিষ্ঠা কর্তে হবে, শুনি? তবু তো এ ব্যাপার নিয়ে যা হোক একটা কিছু প্রয়াস চলেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে—ব্যাপকভাবে কোন দিকে কিছুই তো করা হয় নি কেবল জনহীন প্রান্তর, অন্ধকার আর আকাঠ বন।....."

গ্রামে এসে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই আমার নজরে পড়ল—যে বাড়ী যখন পেরোই, সে ছোট্ট বাড়ীর গায়েই রয়েছে একটি করে বাক্স—আর তার গায়ে লেখা আছে—

For Letters and Newspapers.

(চিঠি এবং খবরের কাগজের জন্য)

আমার জিজ্ঞাসু নেত্রের অভিব্যক্তি বোধহয় চেয়ারম্যানকে বিব্রত করে তুলেছিল। তাই সে অজুহাত প্রদানের সুরে বল্লে—"এ তো সবে গেল বছর এনে বসান হয়েছে বাড়ী বাড়ী। এতে করে ডাক পিয়নের কাজটা যে হালকা হয়ে যায় কত, তা তো বল্তেই হবে।"

"এখানে কি তা হলে অনেকেই খবরের কাগজ নেয় নাকি?"

"আমার মনে হয়, এখানে এমন পরিবার নেই একটিও যেখানে খবরের কাগজ আর সাময়িকপত্র অন্তত একখানি করে না আসে। এদিক দিয়ে আমরা কিছু করেত পেরেছি বলে মনে হয়। কিন্তু মোটের ওপর কিছুই না......"

"তোমাদের স্কুল নেই?"

"আছে বটে স্কুল আমাদের, কিন্তু তার জন্যে গর্বিত হবার মত কোন কারণ নেই। কোন্ গাঁয়ে আবার স্কুল থাকে না আজকেকার দিনে।"

"কি ধরণের স্কুলটি তোমাদের প্রাথমিক না অন্য কিছু?"

"তা যদি বলেন ত আমাদের রয়েছে প্রাথমিক দুটি আর মাধ্যমিক একটি। এই হল আমাদের......"

* * *

আমাদের দৃষ্টি ঘুরাতে হ'ল ডানদিকে—যে দিকে

আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড ও অতি সুন্দর একটি অট্টালিকা—তখনও তার নির্মাণকার্য শেষ হয়নি।

"আর এই যে দেখ্‌ছেন তৈরী হচ্ছে বাড়ীটি, এটি হ'ল আমাদের নতুন হাই স্কুল—দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন প্রায় সারা হয়ে এসেছে এর কাজ। এদিক দিয়ে অবশ্য বলা যেতে পারে, আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। তাহলেও কিন্তু মোটের ওপর......"

"আর ওটা কি, স্কুলগৃহের ওপাশেই যে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে?"

ও আর তেমন একটা কি? সামান্য একটা যাকে বলে লাইব্রেরী। নতুন বই যে এর জন্যে নিতান্তই দরকার, একথা আর বেশী করে বল্‌তে হবে না, আপনারা তা বেশ বুঝতে পারছেন। এ ব্যাপারে আমরা পিছিয়েই পড়ে আছি, এতে ভুল নেই। লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন হ'ল ডাক্তারী বই।"

"কোন্ শ্রেণীর বই? ডাক্তারী? ডাক্তারী বই আবার কিসের জন্য?"

সংগীটি আমাদের কোন জবাব দিলে না। আমরা এগিয়ে গিয়ে ওবসিদ্‌কেরা প্রধান রাজপথে পড়লাম। এটি নতুন, বেশ চওড়া রাস্তাটির খাত কাটা হয়েছে পাইন বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে। বাঁ দিকে একটা পার্কের মত ঘেরাও করা উন্মুক্ত মাঠের ওপাশে খুঁটি দিয়ে রাখা হয়েছে মস্ত বড় একটা জমি। তার মাঝে মাঝে কোথাও একতলা কোথাও দোতলা অট্টালিকা উঠে গিয়েছে কতকগুলো।

সুখানভের ওষ্ঠেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো যখন সে বল্‌লে—এটা হ'ল আমাদের হাসপাতাল—৪০টি রোগীর শয্যাস্থানের ব্যবস্থা আপাততঃ করা গিয়েছে। ওরই সঙ্গে লাগাও হ'ল 'মেটার্নিটি হোম' (প্রসূতি হাসপাতাল) গৃহ। ওরই ভিতরে আবার ড্রাগ ষ্টোর (ঔষধালয়) একটি স্থাপন করা হয়েছে আর কোণের দিকে ঐ যে নজরে পড়ছে গম্বুজওলা বাড়ীটি, ওটা হ'ল ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস (বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের কারখানা বাড়ী)। হাসপাতালের ডাক্তার, অধ্যাপক, নার্স আর অন্যান্য কর্মচারী মিলে ৪০ জন হবে সংখ্যায়।

সাঁঝের আঁধার তখন ঘনিয়ে এসেছে। গ্রামের 'স্বাস্থ্য প্রচার কেন্দ্র" (Health giving Centre) গৃহটির বাতায়ন পথে উজ্জ্বল আলোক বহির্গত হয়ে আশার আলোকে গ্রামবসীকে উৎফুল্ল করে তুলছে। বাইরে পথিপার্শ্বের আলোক-স্তম্ভ হতে বিস্তৃত প্রখর রশ্মি-সম্পাতে ফুলের বাগানগুলি হাস্যমুখর হয়ে উঠেছে—এপাশের বাগানে লাল বেগোনিয়া—ওপাশের বাগানে উচ্ছল পেটুনিয়া—রক্তাভ গুল্মলতার আল দিয়ে ঘেরা। আলোকে আর রঙের বাহারে সে যেন এক রহস্যলোক।

এ সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করতে আমাদের দরকার হ'ল না সংগীটির কুণ্ঠামলিন ভূমিকা। এক সময় যেন সে অপরূপ নীরবতা ভঙ্গ করবার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সুরে সুখানভ আমাদের জানালে—

"এ সব ছাড়াও আমাদের একটা ভেটারিনারি (পশুচিকিৎসা) বিভাগ আছে—একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও তার সহকারী এই দুইজন মিলে সে বিভাগটি পরিচালিত করে। তাহলেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তবু যাহোক একটা ডাক্তারী ব্যবস্থা এ গাঁয়ে রয়েছে শাদাসিধে রকমের। এখন বলুন দেখি আমাদের লাইব্রেরীতে যদি ডাক্তারী বিভাগের বইয়ের একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয়, তা হলে কি করে চল্‌তে পারে? এই যে এতগুলো চিকিৎসক—ডাক্তারী ম্যাগাজিন, প্রামাণ্য ডাক্তারী বই, সারা দুনিয়ার চিকিৎসা জগতের নতুন কথা—এ সব তাদের হাতের কাছে তুলে না দিতে পারলে তাদের দিয়ে কেমন করে আশা করতে পারি আমরা ভাল ফল। হাঁ, চিকিৎসার ব্যাপারে গ্রামদেশে তবু অমনি কিছুটা আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু মোটের ওপর......"

আমি আর নির্বাক থাকতে পারলাম না। সুখানভের সুরে যোগদান করে তার অসমাপ্ত বাক্য-স্রোতের জের টেনে চললাম—"কিন্তু মোটের ওপর কিছুই না, কেবল শ্মশান, কেবল আঁধার, কেবল আকাঠ বন।"

চেয়ারম্যান বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরলো আমার দিকে—চোখে চোখ পড়তেই দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলাম; কিন্তু তখনও সুখানভ যেন আমার হাসির মর্ম বুঝতে পারে নি। হাসির ছোঁয়াচেই হাস্যে যোগদান করেছে। কৌতুকের বশেই বলে উঠলাম তাই—

"কমরেড সুখানভ, তোমার আকাঠ বন আরও কিছু দেখাও আমাদের।"

"আর দেখবার মত কি আছে? যা কিছু আছে সবই তো দেখা হ'ল। বলুন এতে আমার গর্ব করবার কি থাক্‌তে পারে!"

"আরে, এটা আবার কি?"—আমি দেখিয়ে দিলাম সদ্য তৈরী একটি বাড়ী—যার চারদিকে এখনও দেখা যাচ্ছে কর্তিত পাইন গাছের ঠুটো গোড়াগুলি।

"ও এটা! এ আর এমন কি সেরা বাহাদুরী! চলুন ভিতরে যেয়েই দেখা যাক্।'

ফটকে ঢুকে দুপাশের উদ্যান-শোভা ভেদ করে যে রাস্তাটি—তাই আমাদের 'স্বাগতম্' জানিয়ে বড় হলঘরটির দ্বারে পৌঁছে দিল। আলো-ঝলমল সে কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম। ছোট ছোট অগণিত টেবিল শাদা ধবধবে টেবিল-ক্লথে ঢাকা—তার চারপাশে নিপুণ হস্তের মনোরম সুচীচারুতা। স্তবকে স্তবকে ফুল—সর্বত্র। টেবিল সারির পশ্চাতে বৃহৎ কাউণ্টার'। কাচের ডিশ গ্লাসে আলোক-রশ্মির চটুল নৃত্য। কাউণ্টারে কিনতে পাওয়া যাবে—বীয়ার, চা, কাফি আর নানা রকম খাদ্য। আর কাউণ্টারের পশ্চাৎ থেকে নবাগতের প্রতি স্নিগ্ধ আহ্বান দৃষ্টি বুলাচ্ছে এক তরুণী—যার পরিধানের নিখুঁত শ্বেতবসন অপেক্ষাও শুচিশুভ্র মুখ-চ্ছবিখানি।

পল্লী-সমবায় সমিতির সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলা এ রেস্তোরাঁ, যাকে ওরা বলে থাকে—Collective Farm Restaurant (কলেকটিভ ফার্ম রেস্তোরাঁ)।

(শেষাংশ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। নামিয়াছেও সেই সন্ধ্যা হইতে, থামিবার কিন্তু নামটিও নাই। এমন জল-ঝড়ে শহরেই মানুষ চলাচল বন্ধ করিয়া আরামে জামা গায়ে দিয়া চুপ করিয়া থাকে আর এ ত একেবারে পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা হইতেই এমনিই যে যার ঘুমাইয়া পড়ে......

মনেই কি কারও শান্তি আছে নাকি! অজন্মা, জমিদারের খাজনা—এ সব ত আছেই; তার উপর রোগ শোক যেন আর ছাড়েই না? এদিকে নূতন ঋণসালিশীর ঠেলায় মানুষ মরিয়া গেলেও সিকি পয়সাটির মুখ দেখিবার উপায় নাই।

স্বামী এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। বিন্দু মাঝে মাঝে কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করে। মনে হয় ঐ বুঝি আসিল, কিন্তু না। ঝপ্ ঝপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—তর তর করিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। ঘরের ছাউনির ভাঙ্গা ফাঁক দিয়া জলের ঝাপটা আসিয়া ঘর-দোর ভিজিয়া তিতিয়া একাকার। তা হোক। বিন্দু তার জন্যে ভাবে না। কিন্তু অসুস্থ ছেলেটাকে যে একটু শুকনা ঠাঁইয়ে কোথাও রাখিবে—সমস্ত ঘরে ততটুকুও স্থান যেন বিধাতার দৃষ্টি হইতে উত্তরের মেঘের মত উড়িয়া গিয়াছে।

ঘরে ঘড়ির বালাই নাই। কাছে-পিঠে রূপকথার সেই দেউড়ীও নাই যে, ঘণ্টার শব্দে সময় জানা যাইবে। আর দরকারই বা কি! অসুখ হইলেই অষুধ খাওয়ান ত দস্তুরমত 'মানুষী' কাণ্ড। মোটে ত দু-সপ্তাহ ছাড়াইয়া আজ পনের দিনে পড়িয়াছে।

বিন্দু ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকাইল।

হাসিও আসে দুঃখও আসে। পৌষে বুঝি এক বছর পুরা বয়স হইবে খোকার। কেমন সুন্দর একতাল সোনার মত ঝক ঝকে তাজা খোকা দেখিতে দেখিতে কেমন লিকলিকে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—প্যাকাটির মত ক্ষীণ চেহারায় নিবিড় কাল বর্ণের ডাগর ডাগর দুটি আঁখিতারার সুস্পষ্ট পরিবেশ মাত্র মূলধন।

বিন্দু হাসে।

প্রথম সন্তানটিও ঠিক এমনিই হইয়াছিল।

কান্না কিন্তু বিন্দুর কিছুতেই আসে না। আরে এ কি সত্যিই অসুখ নাকি যে, কি হয় কি হয় ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিবে। খাইতে না পাইলে বয়স্ক মানুষই আর কদিন বাঁচিতে পারে! বুকে এক ফোঁটা দুধ নাই—তাই টানিয়া চোষে। না পাইলে কাঁদে। ব্যস। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই চুপ করিয়া থাকে। এমনি একদিন হয়ত কচি সরু পা দুখানি একবার মাত্র সোজা টান করিয়া একেবারে চুপ করিয়া যাইবে।

এতে কাঁদিবারই বা আছে কি! বিন্দুর হাসি পায়। কবে এক তারা ভরা আকাশের সুরে তাহার নিজের মনেও বসন্ত গাহিয়া উঠিয়াছিল—সেও কল্পনা করিয়াছিল রূপ আর ঐশ্বর্যের মহিমময় বিকাশ; কিন্তু আজ মৃত্যুর নর্তনের মাঝে মুখোমুখি বসিয়া কি হইবে সেই কল্পনা-লোকের আকাশ-কুসুম দিয়া ব্যর্থ মালা গাঁথিয়া।

বিন্দু সত্যিই এবারে হাসিয়া ফেলে। দুটি কালো চোখ টান হইয়া সজল হইয়া উঠে শুধু। আজ বলিতে গেলে মাসখানেক স্বামী পুত্রের মুখে দুবেলা কবে আর এক মুষ্টিও দিতে পারিয়াছে সে?

কিন্তু রাতের বৃষ্টিধারায় যেন নেশা লাগিয়াছে। নিকটে দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় কালো আকাশ কালো মেঘে একেবারে ঢাকা—আর সেই আবরণ খসিয়া খসিয়া পৃথিবী যেন শীতার্ত এক নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে নির্জীব হইয়া উঠিয়াছে।

তা উঠুক।

কিন্তু স্বামী এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। বিন্দু চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে মাটির রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। জলের ঝাপটায় মৃত্তিকা ভিজিয়া যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রোয়াকের বাঁশটা ধরিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের গায়ে গায়ে মেঘের প্রচণ্ড গর্জনে লক্ষ কোটি বিদ্যুৎশিখার ঢেউ আঁকিয়া বাঁকিয়া আকাশেই মিশিয়া যাইতেছে। শুপারী বাগানের গাছগুলি বুঝি পড়িয়াই যাইবে এমনিই দুলিতেছে। ইস্ কি জলই [illegible]য়াছে চারদিকে!

কে যেন আসিতেছে। হ্যাঁ, জল চিরিয়া কাহারও আসিবার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরেই নিকটবর্তী হইয়া উঠিতেছে।

এমন করিয়া তাহার স্বামীই চলে।

বিন্দু গাঢ় দৃষ্টিতে দক্ষিণের নারিকেল গাছের দিকে তাকাইল। তাহার স্বামী মধুই আসিতেছে তাহা হইলে।

বিন্দু একটু খুশী হইল।

সত্যিই তাই। মধুই আসিয়াছে ভিজিয়া ভিজিয়া। হাঁটুর অনেক ওপরে কাপড় ওঠান—খালি গা একেবারে। মাথায় কি সব লটবহর।

বিন্দু কি ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মধু একটা রাজ্য লইয়া আসিয়াছে যেন। অন্ধকারের মধ্যেই সে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল। মাথার উপর হইতে গাঁঠরীটা নামাইয়া কপালের জলগুলি মুছিতে মুছিতে লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—হাঁ করে দেখছিস কি বৌ! শুকনা কাপড় দে দিকিন একটা আগে......রাতেই

বিন্দু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ভিতরে গিয়া একখানা ছেঁড়া শুকনা কাপড় লইয়া আসিয়া দিল স্বামীর হাতে।

মধু হাত বাড়াইয়া কাপড় লইল।

বিন্দু কিন্তু কি ভাবিতেছে। বলিবে কি বলিবে না ভাবিয়া বলিয়াই ফেলিল: আবারও তুমি?......

মধু জবাব দিল না। ঘরে গিয়া ঘুমন্ত শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল একটু। না জ্বর আসে নাই এ-বেলা, ঘুমাইতেছে।

মধু বাহিরে আসিল।

চুপ করিয়া সম্ভবত বিন্দুর কথাটাই ভাবিয়া দেখিল একবার। মধু গম্ভীর হইয়া উঠিল: আরে এমনিই কি কেউ দেয় বৌ?......এই যে মাস খানেক খেতে পাওনি......

দিল কেউ কিছু? যাদের অনেক আছে তারা কবে তাকায় আমাদের দিকে শুনি?

বিন্দু কি বলিতে যাইতেছিল মধু বাধা দিল। বলিল, থাম তুই বৌ! খোল দেখি গাঁঠরীটে। চাল আর ডাল এনেছি—আঙ্গুরের প্যাকেটটা খুলে খোকাকে খাইয়ে দে কয়েকটা.....

বিন্দু কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

মধু ম্লান হাসি হাসিল: ওদের অনেক আছেরে—দুটো চাল ডাল আর আঙ্গুরে ওরা মরবে না বৌ!

মধু কি যেন ভাবিতেছে। এ বৃত্তি ভাল নয় সে জানে। সে বোঝে। ইচ্ছা করিয়া করে তাও নয়—উপায় নাই। দিনের পর দিন মৃত্যুর সাথে এমন করিয়া আর সে পারে না—

মধু অন্যমনস্ক হইয়া উঠে। একদিন সেও ত ভাবিয়াছিল গ্রামের দশজনের মধ্যে একজন হইবে! সর্বস্ব পণেও আজও সে ত স্ত্রী-পুত্রের এক মুঠি আহারের বিনিময়ে সমস্ত দেহ-মন দিয়া অপরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে রাজী—তবু কেন বিধাতা......

না বিধাতার নাম মধু আর মুখে আনিবে না! মধু গম্ভীর হইয়া উঠিল! হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিসনে বৌ! তিনদিন ধরে পেটে একটা কণাও জোটেনি। পারিস ত দু-মুঠো চড়িয়ে দে চালে আর ডালে—আর না পারিস সরে যা

বিন্দু কথা কহিল না।

ধীরে ধীরে গাঁঠরী খুলিয়া চাল ডাল বাহির করিল সের দশেক চাল, কিছু ডাল আর রান্নার কিছু মসলাপাতি আনিয়াছে মাত্র। অভুক্ত স্বামী-পুত্রকে অনাহারে রাখিয়া আর সে কিছু ভাবিবে না। অপরাধ যদি কিছু হইয়া থাকে; বিন্দু মনে মনে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে: হে বিধাতা—এর শাস্তি তুমি আমায় দিও—স্বামীকে নয়...

রান্না শেষ হইতে মধুর কিন্তু সবুর সহিতেছে না। কাঁঠালের তক্তাটা পাতিয়া বসিয়া গেছে। এনামেলের বাসনে করিয়া বিন্দু খিচুড়ি সাজাইয়া দিল। কি যে রান্না হইয়াছে কে জানে.....তেল ছিল না। সম্বরা পর্যন্তও হয় নাই।

মধু কিন্তু প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ: বৌ একি রেঁধেছিস তুই! এ যে অমৃত একেবারে...

বিন্দু লজ্জিত হইয়া উঠে—

কথাটা ঠাট্টার মত শোনাইলেও মধু কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলে নাই। খুশীর প্রাবল্যে মধু হাতে খানিকটা খিচুড়ি লইয়া বিন্দুর মুখের কাছে আগাইয়া ধরিয়া বলিল: সত্য ভাল হয়েছে বৌ! বিশ্বেস না হয় নিজেই চেকে দেখ জিভ দিয়ে।

জিভ দিয়া অবশ্য বিন্দু চাখিয়া দেখিল না। মনে মনে আরও লজ্জিত আরও খুশী হইয়া উঠিল। সৎপথের মধ্য দিয়া এই স্বামীকেই যদি সে নূতন করিয়া পাইত! বিন্দু ভাবে—তার দেবতার মত স্বামী, উদার, পরোপকারী—তবু সমাজে তার স্থান হইল না কেন? কি অপরাধে তার নীচতার মাঝেই নীড় বাঁধিতে হইয়াছে?

মধু যেন কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে।

বলিল: এবার হতে এ-সব ছেড়ে দেব। আরে ছেড়েই ত দিয়েছিলাম—মাসখানেক এদিকে যে তোদের এক ফোঁটা জল পড়েনি মুখে?

মধু চুপ করিয়া আবার বলিতে থাকে—এ পথ ত সবারই ঘৃণা। ইচ্ছা করে কি আর কেউ করে রে? সমাজ আমাদের দিকে তাকায় না বলেই ত!

মধু রীতিমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে আর কি!

থামিয়া আবার বলিয়া উঠিল: নূতন একটা জিনিস ভেবেছি এবারে বৌ!

বিন্দু তাকায়—কি?

মধু চুপ করিয়া থাকে মুহূর্তের জন্য।

তারপর বলিল: খাবার ভাবনা যখন কয়েক দিনের জন্য মিটল তখন ভাবছি এবারে ভিটেটা বিক্রি করে মুদী দোকান করব একটা—দু-চার আনা পয়সা থাকবেই রোজ। কি বলিস্?

বিন্দু বলিল: বিক্রি না করলে চলে না?

মধু বলিল: তা কি করে হয় আর বৌ! কবলা-ফবলাতে আর কেউ টাকা দেয় না এখন। বিক্রি করে যা পাই তাই দিয়েই দোকান খুলব। রাজী আছিস্ ত—?

বিন্দু মাথা দোলাইয়া বলিল: রাজী।

মধুর আহার হইয়া গিয়াছে: বস তুই এবার—খেয়ে নে। মধু উঠিল।

মধুর মাথায় কথাটা একেবারে চাপিয়া বসিয়াছে। দোকান সে করিবেই।

শুইয়াও তাহারই আলোচনা চলিতে থাকে—

বুঝলি বৌ: মধু বলে: খোকাটাও বড় হল—ব্যবসাটাবসা একটা কিছু না শিখলেই বা চলে কি করে!

বিন্দু হাসে: তা দশ মাসও হয়নি খোকার এখন গো!

তা না হোক—মধু ভারিক্কি চালে বলে, হতে আর কদিনইবা বাকী শুনি, এর পরেই ত হাতে খড়ি দিতে হবে।

মধু একটু চুপ করিয়া থাকে।

তারপর বলে: ওকে মানুষ করতেই হবে বৌ—চিন্তায় মাথা তাহার মসগুল হইয়া উঠে......তারপরেই বুঝলি বৌ..... তুই আর আমি.....দুজনায় তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ব দুর্গা দুর্গা করে—

বিন্দু হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে—হাসিয়া আর বাঁচে না। বলে: বিয়ে দেবে না খোকার?

মধুর ভুল হইয়া গিয়াছিল। বলে: সে ত দেবই ড্যাং ড্যাং করতে করতে ছেলের বৌ নিয়ে আসব—দেখিস্ তখন। কিরে বৌ ঘুমিয়ে পড়লি নাকি---

বিন্দু পাশ ফিরিয়া খোকাকে জড়াইয়া শুইয়াছে।

বলিল: উহুঁ—

মধু বলিল: শোন তারপর—

বিন্দু বলিল: কি?

মধু বলিল: তারপরে বুঝলি বৌ—টাকা-কড়ি কিছু

জমিয়ে; মধু থামিল একটু: টাকা-কড়ি কিছু জমিয়ে গোপনে গোপনে সবাইকে সাহায্য করব—কি বলিস—

তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে বিন্দু বলিল: কিসের?

মধু মনে মনে সাত সমুদ্র তের নদী সেচা মাণিক পাইয়া গিয়াছে—রাজ্যের যেন সেই মালিক; ঐশ্বর্য যেন তাহার চারিদিকে ভীড় করিয়া আসিয়াছে; বলিল: যারা গরীব, কাজকর্ম পায় না—তাদের দোষ; কিরে ঘুমালি নাকি—

বিন্দু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থতন্ত্রের কোন কথাই মধু জানে না—তবু শুইয়া শুইয়া আজ তাহার মনে হইতে লাগিল যে, জাতীয় অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়া সমাজের একটা অংশের উপরই স্ফীত হইয়া আছে বলিয়াই ত তাহারা অনাহারে থাকে।

ভোর হইতে না হইতেই মধুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। নিজের ইচ্ছায় ঘুম ভাঙে নাই। হাঁকডাকে ঘুম বহু দূরে পলাইয়া গিয়াছে।

পুলিশ নয় চৌকিদার।

এসব নিতান্তই পেটী কেসে—পুলিশের লোক এই জল-ঝড় মাথায় করিয়া আসিবে ইহা প্রত্যাশাও কেহ করে না, আসেও না।

সনাতন চৌকিদার একেবারে ঘরেই ঢুকিয়া গিয়াছে—বলি ও কত্তা ওঠ দেখি—

পিট পিট করিয়া মধু তাকাইল। সমাজতন্ত্রের ধোঁয়া বহু আগেই কাটিয়া সাফ হইয়া গিয়াছিল—

উঠিয়া বসিল।

বলিল: ব্যাপার কি কত্তা?

সনাতন পাকা চৌকিদার। কারও গৃহে আসিয়া অভদ্রতা করে না—সে সব ঝামেলা থানায়ই হয় ভাল। বিনীতকণ্ঠে মধুর ও স্মিতহাস্যে বলিল: বিশেষ কিছু নয় ভায়া—গোবিন্দ মুদীওয়ালা বলে কিনা কাল রাতে তুমিই ঢুকেছিলে ওর ঘরে—তা দেখছি ওর দোকানের থলেটাও হেঁটে হেঁটে তোমার ঘরেই এসে গেছে—একবার কত্তা দয়া করে থানায় যদি চল।

এমন করিয়া আগেও একবার মধু থানায় গিয়াছে এবং সেখানে গিয়া কি হয় তাহাও জানে। বিন্দুও জানে—বিন্দু ছুটিয়া আসিয়া সনাতনের পায়ের উপর পড়িল।

কিন্তু সনাতন উদার মানুষ। বলিল: আমি গ্য হুজুরের চাকর আমার ত কিছু করার নেই—

করার ক্ষমতা থানারও রহিল না—হাকিমেরও না। দ্বিতীয় অপরাধ। দাগী অপরাধী। কঠিন শাস্তি—ইত্যাদি বক্তব্য বলিয়া অনেক টাকা বেতনওয়ালা রাসভারী পাবলিক প্রসিকিউটর সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন।

নূতন কিছু নয়। জেল হইয়া গেল। ইহাও নূতন নয়। কেহ অবাকও হইল না।

ইহাও এখানকার নিয়ম—প্রত্যেই এমন দুরন্ত অপরাধীদের শাস্তি দিয়াই না সমাজ টিকিয়া আছে। না হইলে হয়ত সমাজের ভিৎ ভাঙিয়া চুরমারই-বা কবে হইয়া যাইত। বিন্দু আর খোকা নিশ্চয়ই সমাজের কেহ নহে।

বিন্দুর জমাটবাঁধা চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য শুধু চকচক করিয়া উঠিল—এবার সে হাসিয়া ফেলিয়াছে।

আঁধার মরু

(৫৫১ পৃষ্ঠার পর)

"এ জায়গাটাকে এখনও তেমন চোখ-জুড়ানো রূপায়নে শোভিত করা যায় নি। আরও ফুল—আরও কারুকার্য—আরও আলো—এই সব ব্যবস্থা ক্রমে আমরা করবো, জানলেন। তবু কিন্তু মোটের ওপর......" সুখানভ গম্ভীরভাবেই বলে ফেললো তার অভ্যস্ত কুণ্ঠার প্রলেপ মাখিয়ে।

এর পাল্টা জবাবে আমাদের মন্তব্য তার কানেই প্রবেশ করলো না। সে তার নিজের মনেই বলে চললো—"এ ছাড়া এখানে আমাদের তৈরী করতে হবে আরও কয়েকটা কক্ষ ভ্রমণকারীদের বসবাসের উপযুক্ত। আমাদের এই ঠাঁইটা মস্কো-লেনিনগ্রাড রাস্তার ওপরেই কিনা, তাই অনেক লোক চলতি পথে এখানে আসে রাতের মত মাথা গুঁজতে। কাজেই আমাদের পল্লীর হিসাবে 'গ্রাণ্ড হোটেল' একটা তৈরী করে না ফেললে কি করে চলে।"

*　　　*　　　*

এর পরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল আমাদের বাসস্থানে —কি সুন্দর ছবির মত সে বাড়ীখানি—সম্পূর্ণ আধুনিক রুচিতে তৈরী। প্রাণঢালা দরদ দিয়ে তার সবকিছু গড়ে তোলা—সুদৃশ্য স্তম্ভ, জাঁকাল বাতায়ন, পরিপাটি কাঠামো, বিচিত্র দ্বার, নিরুপম প্রশস্ত সোপানাবলী—কারিগরীর চমকপ্রদ একটা আভিজাত্য ঘিরে আছে অট্টালিকাটি ও পটভূমিকে।

এটি হ'ল ক্লাব-গৃহ—এর উদ্বোধন হবে অল্পদিনেরই ভিতর। দোতলার বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে একটি হাল-ফ্যাশানের উচ্চ অট্টালিকা, বহিরঙ্গে ফুলের মত ফুটে উঠেছে হাজার হাজার রঙীন আলো—সে যেন রঙ আর জেল্লার লুকোচুরির খেলা। সিনেমা গৃহ হ'লেই ওটিকে মানায়।

সুখানভ বললে—"ওটা 'মুভি-হাউস' অর্থাৎ সিনেমা গৃহই। এই সবে তৈরী শেষ হয়েছে। আলোর ব্যবস্থার মহড়া চলেছে আজ, ২।১ দিন মধ্যে 'শো' আরম্ভ করা হবে। এ রকম কিছু কিছু আমরা করতে পেরেছি, নইলে মোটের ওপর......"

প্রচুর ভোজের পর সে রাতে সুখানভের কাছ থেকে বিদায় নিলাম—শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে শেষ বারের মত প্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিদায় নিলাম ওবুসিন্ত্কা গ্রামখানি থেকে—কমরেড সুখানভের ভাষায়—যা নাকি শ্মশানপারা সেকেলে-পল্লী—যা নাকি সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন—অকাঠ বন আর দুর্গম জলার মাঝে নিরালা ঘুমন্ত পুরী।......*

---

* G Ryklin প্রণীত Desolation and Darkness নামক ছোট গল্পের অনুবাদ।

স্যার অলিভার লজ

বিগত ১২ই জন তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত স্যালসবারির নিকটস্থ 'নরম্যানটন হাউসে' সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজের অষ্টাশীতিতম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কয়জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবে বিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়, স্যার অলিভার লজ তাঁহাদের অন্যতম। সুবিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস কর্তৃক তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব ঘোষিত হইলে পর তাহার সাহায্যে বেতারে সংবাদ প্রেরণের জন্য যে কয়জন বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে স্যার অলিভার লজ, ইটালীতে মার্কোনি এবং ভারতবর্ষে স্যার জগদীশচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত এই তিন জন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ফলেই আজ 'বেতার-যুগের' উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মার্কোনি বেতারের আবিষ্কর্তা বলিয়া সাধারণভাবে পরিচিত হইলেও, এ বিষয়ে স্যার জগদীশ ও স্যার অলিভার লজের গবেষণাও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। স্যার জগদীশ ও মার্কোনী উভয়েই অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে স্যার অলিভার লজ এখনও জীবিত থাকিয়া নবীন বৈজ্ঞানিকদের অন্তরে প্রেরণা যোগাইতেছেন। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই প্রবীণ মনীষী চিন্তানায়কের অষ্টাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের সঙ্গে তাই আমরাও তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্যার অলিভার লজ
(অষ্টাশীতিতম জন্ম-দিবস উপলক্ষে গৃহীত)

স্যার অলিভার জোসেফ লজ ইংলণ্ডের ষ্ট্যাফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত পেঙ্কহালে ১৮৫১ সালের ১২ই জন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য কুম্ভকারের কাজ করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অলিভার লজ স্কুলে পড়া-শুনা করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিজের কাজের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করেন। তরুণ অলিভারের জীবনের সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল কাদামাটি ঘাঁটিয়াই কাটিয়া যায়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা তখনও তাঁহার ছিল না। কিন্তু এই সময় 'ইংলিশ মেকানিক' নামে একখানা পত্রিকার কয়েকটি পুরাতন সংখ্যা তাঁহার হস্তগত হয়। যুবক অলিভার উহা পড়িয়া কি অনুপ্রেরণা লাভ করেন বলা শক্ত; কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্য পথে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইতে থাকে। কুম্ভকার হইলেও তাঁহার পিতা পুত্রের প্রতিভা সহজেই উপলব্ধি করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া

তাঁহাকে লণ্ডনের য়ুনিভারসিটি কলেজে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিয়া অলিভার লজের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। শীঘ্রই তিনি বি-এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই ডি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রথমত তিনি বেডফোর্ড মহিলা কলেজে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 'রিডার' পদে নিযুক্ত হন। পরে এই স্থান হইতে ১৮৭৯ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত শাখার একজন সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদ খালি হইলে, অলিভার লজকে ঐ পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি এই স্থানে প্রায় দশ বৎসর কাল কাজ করেন। পরে ১৯০০ সালে বার্মিংহাম বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। একাদিক্রমে সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পরে ১৯১৯ সালে উক্ত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যার অলিভার লজ তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক মহলে এক নূতন প্রেরণা আনয়ন করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গবেষণা জ্ঞানের ভাণ্ডারকে কম সমৃদ্ধ করে নাই। জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস আবিষ্কৃত তড়িৎ-চুম্বক-তরঙ্গের প্রকৃতি ও তাহার সাহায্যে বেতারবার্তা প্রেরণের সম্ভাবনাকে তিনিই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত করেন। পরবর্তীকালে মার্কোনি যে আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, স্যার অলিভার লজের গবেষণা তাহারই অগ্রদূত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সর্বপ্রথম তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; হার্ৎস কর্তৃক তাহা আবিষ্কৃত হয় আর বৈজ্ঞানিক লজ সেই তরঙ্গের ব্যবহার কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই নির্দেশ করেন। লজের এই গবেষণা সেই সময় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯১৯ সালে 'রয়েল সোসাইটি অব আর্টস' এজন্য তাঁহাকে আলবার্ট পদক দানে পুরস্কৃত করেন।

স্যার অলিভার লজের উপরোক্ত গবেষণা ব্যতীত তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা তরলপদার্থের বিশ্লেষণ, তড়িৎকণা বা 'আয়নের' গতিবিধি ও ইথরের প্রকৃতি এবং নৈসর্গিক বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে কুয়াশা দূর করিবার ও বৃষ্টি আনয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি যে সমস্ত পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেন তাহাতেও এক-সময় বিজ্ঞান মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লজ শুধু গবেষণা নিয়াই তন্ময় হইয়া থাকিতেন না, নানারূপ প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় বিজ্ঞানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও সহজভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সাধনেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে 'দি মেকিং অব ম্যান' (১৯২৪), 'ইথর এণ্ড রিয়েলিটি', 'রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতত্ত্ব এবং 'টকস্ এবাউট ওয়্যারলেস্' (১৯২৫) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার অশেষবিধ দান তাহার জন্য কম সম্মান বহন করিয়া আনে নাই। ১৯০২ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে ঐ বৎসর 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বহুবৎসর ইংলণ্ডের পদার্থবিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯১৩ সালে তিনি ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ভাবে স্যার অলিভার ইংলণ্ডের বিদ্বৎসমাজে নিজ সাধনার বলে যে স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হন, তাঁহার জীবনের সেই গৌরবজনক অধ্যায় আজও জগদ্বাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী বলিয়া বহু বিজ্ঞানী মনে করিয়া থাকেন। স্যার অলিভার লজ বিজ্ঞানের অনু-শীলনে বহু বৎসর অতিবাহিত করিলেও, তাঁহার পরিণত বয়সে এক বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হয়। তিনি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। আধ্যাত্ম ও মানসিক জীবনের নূতন এক আলোক তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে। মৃত্যুর পরেও প্রিয়-জনের সহিত সম্বন্ধ রাখা সম্ভবপর এমন কি, তাহার সহিত ভাবের আদান-প্রদান পর্যন্ত করা যাইতে পারে এই ধরণের ভাব তাঁহার মনে বিশেষভাবে উদিত হয় এবং এ সম্পর্কে বিবিধ গবেষণায় নিরত হন। এই সম্পর্কে তিনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে 'রেমণ্ড' নামে তাঁহার এক পুত্র মহাযুদ্ধে নিহত হন। তিনি 'রেমণ্ড, অর লাইফ এণ্ড ডেথ' নামে যে পুস্তকখানি লেখেন, তাহাতে পুত্রের মৃত্যুর পরেও তাহার নিকট হইতে তিনি যে সাড়া পাইয়াছেন তাহা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্যার অলিভার লজের পরবর্তী জীবনের এই সমস্ত অভিমতের সহিত বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মিল না হইলেও তিনি তাঁহার এই নব লব্ধ তথ্যকে জোরের সহিত প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯২০ সালে তিনি এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিভিন্ন গবেষণা ও অভিমত সম্পর্কেও তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'দি সারভাইভ্যাল অব ম্যান' (১৯০৯), 'রিজন এণ্ড বিলিফ' (১৯১১), 'দি ওয়ার এণ্ড আফটার' (১৯১৫) প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকের নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সীমা রেখার ভেদাভেদ ঘুচাইয়া আধ্যাত্ম জীবনের যে নূতন আলোক তাঁহার শেষ জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এই সাধক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দানকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না "He was an inter-

preter when the science was a congeries of nebulous theories and unapplied discoveries, বিজ্ঞানের পুঞ্জীভূত, নানা তথ্যকে সাজাইয়া গুছাইয়া যিনি বিজ্ঞানের চলার পথ নির্দেশ করিয়াছেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল আশা পোষণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। জীবন সায়াহ্নে তিনি আজও তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হন নাই। তাঁহার এই জন্মদিন উপলক্ষে তিনি যে বাণী দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও সেই আশার কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকের মতই তিনি বলিয়াছেন:—"I feel I have done my work here, and can now enjoy leisure and watching others while I am waiting to go on to the next life, where I am confident all our affections and love will be as on this earth, with freedom from material restrictions and scope to advance from whatever stage in development we had reached here."

বৈজ্ঞানিক হইয়াও পারলৌকিক জীবনে তাঁহার যে বিশ্বাস দেখিতে পাই, তাহা সচরাচর বড় দেখা যায় না। ইহা তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রস্তব

(ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল: ৬ষ্ঠ সূক্ত)

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

সূর্য্যরূপে জাগো সুনীল অম্বরে,
বহ্নিরূপে সদা দীপ্তি কর দান;
ভুবন ব্যাপি' রহ মরুৎ-রূপে, দেব,
সর্ব্বলোকে করে তোমারি স্তুতিগান!
আকাশ ভরি' শোভে উজল গ্রহ-তারা,
তোমারি রূপ-ধরি' তোমারি রূপে হারা,
নিখিল পান করে তোমারি রূপধারা,
অপরূপ তুমি, তবু নিখিলে রূপবান॥ ১॥

তোমার রথ বহে ধৃষ্ণু হরিযুগ,
কাম্য জগতের, রম্য, তেজীয়ান
রুদ্ররবে তারা চমকে অরিকুল,
ঘর্ঘরিত পথ চমকে দিনমান।
হে দেব, দেবরাজ! জ্যোতির্ম্ময় তুমি,
অন্ধ-তমসাবৃত এ চিত্তভূমি,
জ্ঞানের জ্যোতিঃ হানো,—তোমার রূপশিখা
প্রকৃতি ভরি' হোক্ মূর্ত্তিমান্॥ ২॥

তোমার জ্যোতিঃ লভি' অন্ধ পায় দিঠি,
চিত্ত হ'তে যায় গভীর আঁধিয়ার,
ব্রহ্মে করি' ধ্যান, মন্ত্র উচ্চারি'
লভিছে যাজ্ঞিক, নবীন তেজোভার:
মুক্ত পুরুষ হে মুক্ত কর তায়,
অঙ্গে তার তব জ্যোতিঃ যে উছলায়,
জীর্ণ বাস সম জীবন পুরাতন
ছাড়ি সে পায় যেন নবীন প্রাণসার॥ ৩॥

গিরির গুহা সম দৃঢ় এ অন্তর,
দস্যু রিপু ঘিরি রহিছে নিতি তার,
ইন্দ্র!—জ্ঞান-বাজ হানো হে, কর দূর,
বজ্র-অনলের সে রূপ-প্রতিভায়!
দিব্য জ্যোতি আনো সত্য-জ্ঞান-দীপে,
রাজুক জ্যোতিঃ তব উজল ভাল-টীপে,
সে জ্যোতিঃ পশি চিতে করুক্ তমঃ দূর
ভরুক অন্তর তোমারি করুণায়॥ ৪॥

হে দেব! বায়ুদেব! তোমারে চিনি, চিনি,
ব্রহ্ম-সাথে তব অটুট সংযোগ,
ইন্দ্র-সাথে তব সুচির-সঙ্গতি
তাই তো সুমধুর শান্তি কর ভোগ।
তাই তো দিকে দিকে বিলাও প্রাণরাশি,
অসীম দীপ্তির স্ফূর্ত্তি পরকাশি',
ইন্দ্র-জয় সাথে তোমারও গাহি জয়,
হে চির-সুখময়, মরুৎ, হে অশোক॥ ৫॥

সকল দেব-সাথে এস হে দেবরাজ,
পিয়া এ সোমসুধা বসুধা রাখো ধরি',
নিখিল-ক্ষুধা তব পরশে হোক্ দূর,
শান্তি কায়া ধরি কান্তি দিক্ ভরি'!
আকাশ মধু হোক্, মধু বসুন্ধরা,
জলদ-ধারা হোক্ চির-মধুক্ষরা,
মধুর তুমি দেব, জাগো মধুরতর,
মধুর হোক্ মন তোমারে ধ্যান করি'॥ ৬॥

গোধূলি

(কাথিকা)

শ্রীগোপাল বাগচী

অনেকদিন থেকে সোকল এমনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। অসুখ হবার পর থেকে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন কাজ আর একে দিয়ে করান যায় না দেখে মনিব তাকে একটি অকেজো মৃতদেহের মতই ঘৃণায় দূরে ফেলে রেখে দিয়েছে। তথাকথিত 'ভাল মানুষেরা' কিন্তু মৌখিক দয়া দেখাতে ছাড়েনি; বলাবলি করত—ওর চামড়া দিয়ে অনেক কাজ করা যাবে, এভাবে ওকে পচে মরতে দেখা উচিত হবে না। হ্যাঁ—ঐ ভাল মানুষেরা—শুধু মরতে দিত তিল তিল করে, বিস্মৃতির আড়ালে। সোকলকে অত তাড়াতাড়ি মরতে দেখে ওরাই ত মাঝে মাঝে ওকে লাথি মেরে আদর দেখাত। এর আগে তার গায়ে যথেষ্ট শক্তি ছিল, মনে আনন্দও ছিল। সে সময় ওর শিকারী কুকুরদের সঙ্গে দৌড়ন, লাফান আর পাল্লা দেওয়ার অভ্যেস ছিল। সোকলের এমন অবস্থায় সেই কুকুরগুলো মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত—কিন্তু তবুও বলতে হয়, কুকুরদের স্বভাব অত্যন্ত কদর্য (বোধ হয় সব সময় মানুষের আদেশ পালন করে আর সঙ্গে থেকে থেকে)......তাই মনিবের ডাক শুনলেই ওরা সোকলকে ছেড়ে চলে যেত। বেশীক্ষণ ওর কাছে বসে থাকত লাপা নামে একটি সাইবেরিয়ান কুকুর, ওর বন্ধু—বসে থাকত, পাশে খাবার পাত্রের কাছে দুঃখে কাতর হয়ে—বন্ধুর মিনতিভরা, জলভরা, বড় বড় দুটো চোখের দিকে সে চাইতে পারত না।

তাই বৃদ্ধ ঘোড়াটিকে একলা ফেলে রাখা হয়েছিল তার নিভৃত দুঃখের বোঝা বইবার জন্যে। মনে পড়ছে, আজ তার রঙীন-পুরোনো আরামের দিনগুলো। পরক্ষণেই চোখে ফুটে উঠছে এই কঠিন দুঃখের দিন—যেগুলো সমস্ত ঘরখানাকে বেদনায় ছেয়ে ফেলেছে।......পুরোনো দিন তার মুছে যাওয়া আনন্দ নিয়ে আবছা ছায়াছবির মত ওর চোখে ভেসে এল, আবার তক্ষুণি তাড়াতাড়ি যেন ভয় পেয়ে সরে গেল। এমন কি সুখের চিন্তাও সে করতে পারে না—ওর সয় না।......

সোকল ভয় করত গুমোট গরমের নিস্তব্ধ রাত্রিকে—মনে হত এমনি এক রাতেই বুঝি ওর সব শেষ হয়ে যাবে। আর সবার সুখের ঘুমের আড়ালে বোধ হয় ভোরের দেরী আর সইতে না!......সে ভয় বে-পরোয়া হয়ে ওঠে—ছিঁড়তে চেষ্টা করে শক্ত দড়ির বাঁধন—দেয়ালে লাথি মারে পালিয়ে যাবার জন্যে ছুটে ছুটে পালাতে।

সোকল তার ছোট, অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে শুয়ে ছিল। তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। দেয়ালের ফাটলের ভেতর দিয়ে ঘরের মেঝেয় এসে পড়ছিল ডুবে যাওয়া সূর্যের এক ফালি ক্ষীণ আলোর রেশ; সোকল শোকার্ত চীৎকার করতে থাকে তাই দেখে। বিগত দিনের ঘন নীরবতার মাঝখান থেকে, কেউ তাকে উত্তর দেয় না। চড়ুই পাখীর দল শব্দ করে পাশ দিয়ে উড়ে গেল—কেউ বা আবার কাছাকাছি বাসায় বসে কিচির-মিচির করতে লাগল। আবার কেউ অস্ত[illegible] রবি তার কিরণজাল গুটিয়ে নেবার সময়, গুঞ্জনরত পতঙ্গদলের ভেতর দিয়ে পালক লাগান তীরের মত ছুটে যাচ্ছিল। দূরে মাঠ থেকে ব্যস্ত কাস্তের হুস্-হুস্, খস্-খস্ শব্দ ছুটে আসছিল।

কিন্তু সোকলের চারদিকে নিরেট, ভীতিপ্রদ, নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। বিষণ্ণ ভয়ে ওর, মন ছেয়ে গেছে। সবই যেন আজ ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে—অন্যরূপে দেখা দিচ্ছে—আর সে পারে না—ক্ষিপ্ত হয়ে দড়ির ফাঁস টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করল—দড়ি ছিঁড়ে গেল......দরজা ঠেলে ফেলে ও দৌড়তে লাগল খোলা উঠানের দিকে।

বাইরের আলোর ধাঁধা লাগে সোকলের চোখ—অসহ্য যাতনায় পেটের নাড়ী পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। উপায় না দেখে সে স্থির, অভিভূতের মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাহোক, একটু একটু করে সে আশ্বস্ত হতে থাকে; নিজেকে নিজের কাছে ফিরে পায়। শস্যভরা মাঠের, বনের ক্ষীণ স্মৃতি তার মনের কোণে ভেসে ওঠে ছুটে পালাবার জন্যে এক দুরন্ত বাসনা......দূরদেশ জয় করবার, সম্পূর্ণরূপে বাঁচবার দুর্দমনীয় আশা। সে উৎসুক হয়ে আঙিনা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খোঁজে। আঙিনাটি আবার চৌকোণ, তিন-দিকে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা আর একদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া; তাই সে বৃথাই খুঁজতে লাগল বেরিয়ে যাবার পথ—কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। পায়ে ভর করে উঠে সে দাঁড়াতে পারছিল না মোটেই—একটু নড়তে গিয়েই পাচ্ছিল অসহ্য ব্যথা—ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল পুরান ক্ষত থেকে।......

শেষে সোকল কাঠের বেড়ার কাছে গেল, চোখে পড়ল তার মনিবের বাড়ী। বাড়ীর সামনে ফুলের বাগানে রোদ পোয়াচ্ছে কুকুরগুলো—সারা বাড়ী সোনালী রোদে চিক্‌চিক্ করছে। সোকল মিনতিমাখা করুণ স্বরে ডাকতে থাকে।......

এমন সময় যদি কেউ ওর সঙ্গে হাসিমুখে দুটো কথা কয় বা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, তাহলে বোধহয় নিজের ইচ্ছায়ই ও শুয়ে পড়ে মরতে আর একটুও কষ্ট হয় না। ওর চারদিকে কিন্তু সব চুপচাপ, আলস্যে আচ্ছন্ন।......

কোন উপায় না দেখে সোকল বেড়ার লোহা কামড়াতে থাকে আর শরীরের কমে যাওয়া শক্তি ঢেলে দেয় দরজা ঠেলে ফেলতে। অনেক চেষ্টার পর হঠাৎ দরজা খুলে যায়—সে বাগানে ঢুকে পড়ে—বাড়ীর বারান্দার কাছে গিয়ে শোকার্ত চীৎকার করে। কিন্তু কেউ তা শোনে না। একবার সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে দেখল, সব জানালায় পর্দা লাগান—কেউ ওকে ডাকছে না, শুনছেও না। নিরুপায় হয়ে সে বাড়ীময় বার কয়েক ঘুরে বেড়াল।

এমনি অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটবার পর সোকলের মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল তার আগেকার দুঃখের কথা। সে স্বপ্ন দেখে দূরে, অতি দূরে দিক্‌চক্রবালের সাথে মিশে যাওয়া সাগরের মত অসীম প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের। নিজের খেয়ালে, কল্পনায় প্রলোভিত হয়ে আছাড় খেয়ে

পড়েও সে অনেক কষ্টে তার ক্ষীণ শক্তি নিয়ে সামনে এগিয়ে চল্‌ল।......

সোকল কাঁপে, বেদনায় তার চোখ ছল্‌-ছল্‌ করছে। সে জোরে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে থাকে আর ভিজে ঘাসের কাছে নাক নিয়ে আসে তার জ্বলে যাওয়া নাক ঠাণ্ডা কর্‌তে।.. তার অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে......ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সে অনবরত চেষ্টা করে সামনে এগিয়ে যাবার--ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্য। সে যায়, আর ক্ষেতে গমের চারায় পা আটকে আছাড় খেয়ে পড়ে—পা তার ভারী হয়ে আস্‌তে থাকে। চষা উঁচু-নীচু মাঠকে মনে হয় দুরভিসন্ধিভরা বিরাট গভীর গর্ত তাকে ঠকাবার জন্যে ঢাকা রয়েছে। ঘাসগুলো আবার পায়ে জড়িয়ে যায় আর ও আছাড় খেয়ে পড়ে। ছোট ছোট ঝোপ ওর পথ আটকে দেয়, ও দাঁড়িয়ে পড়ে, টল্‌তে থাকে, ঘুরে চলে যাবার সাহস মনে আনতে পারে না। মাটী যেন কেবলই তাকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে আস্‌ছে—কখনও বা ছোট চারাগুলো স্বপ্নময় দিক্‌চক্রবালকে ঢেকে রাখ্‌ছিল ওর চোখের সামনে থেকে।

তার অসহায় মূক প্রাণ ভয়ের অন্ধকারের সাথে মিশে যাচ্ছিল। কিছু বুঝতে না পেরে সে কুয়াশা-ছাওয়া হেঁয়ালীর ভিতর হাতড়ে এগিয়ে চলে। একটি ছোট পাখী তার ডানাগুলো নিয়ে উড়ে এসে ওর পায়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায় ওকে করে দিয়ে ভয়ে নিশ্চল—এগোতে আর ওর সাহস হয় না। কাকের দল বেশ নিশ্চিন্ত মনে মাঠের ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু সোকলকে অমনি অবস্থায় দেখে তারা পাশে এক গাছের ওপর বসে 'কুডাক' ডাক্‌তে থাকে।

সোকল নিজেকে কোন রকমে টান্‌তে টান্‌তে মাঠের একধারে নিয়ে এল—কিন্তু আর সে পারে না, তাই শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল মাটীর ওপর। সে পা ছড়িয়ে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাকে ময়দানের দিকে। কাকের দল সুবিধে পেয়ে গাছ থেকে মাটীতে নামে আর মাটীর ওপর লাফাতে লাফাতে তার খুব কাছে চলে আসে। গমের চারাগুলো নুয়ে পড়ে আর তাদের ছোট্ট লাল চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে তার চোখের ভেতর। কাক আরও কাছে চলে আসে মাঠের শুকনা ঘাসের ওপর ঠোঁট ধারাল করে নিয়ে। কেউ আবার বিশ্রী ডাক্‌তে ডাক্‌তে ওর উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় আর পাক খেয়ে ঘুরে ক্রমশ নীচে নামে। সোকল দেখে ওদের লোভী হাঁ করা ঠোঁট আর গোল চোখ। কিন্তু তবুও সে নড়ে পালাতে পারে না। তার পা মাটীর ওপর আছড়ে শরীরটা সামনে ঠেলতে থাকে, ভাবে সে উঠে পড়েছে......। শিকারী কুকুরের দল বাতাসের বেগে ছুটে আস্‌ছে ডাক্‌তে ডাক্‌তে......।

তার ভয় ক্রমশ বাড়তে লাগল—বে-পরোয়া হয়ে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কাকের দল শব্দ করে উড়ে যায়........

সোকল কিছুই চোখে দেখ্‌তে পার্‌ছে না, বুঝ্‌ছে না কিছু......সবই যেন ওর কাছে ঘুর্‌ছে আর দোল খাচ্ছে—জড়িয়ে আস্‌ছে আর ধাক্কা খাচ্ছে। তার মনে হয় যেন সে গভীর আঁধারের তলায় ডুবে যাচ্ছে। শরীরে শীতের কাঁপন লাগে—সে চুপ করে থাকে।

সূর্য ডুবে গেল। ধূসর গোধূলি হেঁয়ালীমাখা কলরব-ক্লান্ত মলিন আবরণে পৃথিবী ঢেকে ফেল্‌লে—দূরে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

লাপা খবর পেয়ে দৌড়ে আসে তার বন্ধুর কাছে—কিন্তু সোকল আর তাকে চিন্‌তে পারে না। বুড়ো কুকুরটা ওর গা চেটে দেয়, হতভম্ব হয়ে থাবা পেতে বসে, আবার মাঝে মাঝে মাঠের এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি ক'রে সবাইকে ডাকে সাহায্যের জন্যে, কিন্তু কোথায়—কেউ ত আসে না......

ঘাসগুলো সোকলের খোলা বড় বড় চোখের ভেতর চেয়ে থাকে......। গাছেরা কাছে চলে আসে ওদের হাতের মত ছোট ডাল বাড়িয়ে দিয়ে। পাখীরা সব চুপ হয়ে গেছে। হাজারে হাজারে ছোট ছোট প্রাণী সোকলের শীর্ণ মৃত দেহখানির ওপর নেমে আসে খুঁচিয়ে ছিঁড়ে তার মাংস খেতে......কাক বিশ্রী ডাকতে থাকে।

লাপা ভয়ে শিউরে ওঠে—করুণ আর্তনাদ করে হতাশ হয়ে পড়ে। *

---

* পোল গল্প থেকে।

পুস্তক পরিচয়

পরাগতি—লেখক শ্রীপ্রমোদকুমার বসু। প্রকাশক শ্রীপ্রণয়-কুমার বসু এ্যান্ড ব্রাদার্স। বাবুগঞ্জ, হুগলি।

ইহা একখানি উপন্যাস। সাহিত্যের বাজারে যে সব বস্তা-পচা মাল চালানোর চেষ্টা চলিতেছে—পরাগতি তাহাদেরই পর্যায়ে পড়ে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি কদর্য ছবি আঁকিয়া লেখক সনাতন আদর্শের জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আদর্শ প্রচারের কাজ হইয়াছে কিন্তু সাহিত্য হয় নাই।

রূপ-শিল্প—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বারখানা চিত্র সম্বলিত। মূল্য দেড় টাকা।

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সহকারে নিগূঢ় রসতত্ত্ব বিশ্লেষণে অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের ক্ষমতা অসামান্য। আলোচ্য পুস্তকখানার প্রতি পত্রে তাঁহার সেই অসামান্য গূঢ়প্রবেশের প্রতিভা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের যে রস-রাজ্য দুর্বিগ্রাহ্য, যেখানে অনুমান নাই, আছে সত্যকার অনুভব, সেই রাজ্যের খবর দিবার—সেই অনুভবের সাহায্যে অপরকে অনুভাবিত করিবার মত ভাষাকে অভিব্যক্তি দিবার ঐকান্তিকতা অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের আয়ত্ত আছে। ভাবের এমন গাঢ়তা, এমন ঠাসা বাঁধুনির মধ্যেও ভাষার প্রাঞ্জলতা, বিশ্লেষণ-ভঙ্গীর এমন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় বাঙলা ভাষায় সত্যই দুর্লভ। অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের পুস্তকখানা বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার এই পুস্তকখানাতে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে রসতত্ত্বের দুরূহ দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পাঠকেরা অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের পুস্তকখানা পাঠ করিয়া নিজেরাই তাহা আস্বাদ করুন। "অধ্যাত্ম-জগতে, জীব-জগতে, ঊর্দ্ধে অশরীরী-জগতে, কথা যেখানে পৌঁছতে পারে না, সুর অনেকটা দূর আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কথাকে বাহন করে, অধ্যাত্ম-সমুদ্রে আমরা খুব কম দূরই পাড়ি দিতে পারি—লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে, কথা পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে। সুর পরপারের তীরের অনেকটা নিকটে আমাদের নিয়ে যায়—অন্ততঃ, যতটা নিকটে নিয়ে যায়, সাহিত্যের কাব্যের বা দর্শনের নৌকা ততদূর পারে না। সুর অধ্যাত্ম-জগতের মহাযানী পন্থা। অর্থাৎ আপামর সাধারণ সকলেই এই গানের পথে, অধ্যাত্ম-জগতে বিশুদ্ধ আনন্দের জগতে, পরমানন্দের জগতে সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারে।" অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের এই উক্তির সঙ্গে আমাদের বিশেষ কিছু মতভেদ নাই। আমরা শুধু, গমনও যাহাতে নটন-লীলা হইয়া উঠে, বচনও সঙ্গীত কলায় দাঁড়ায়, রস-শক্তির এমন সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করি।

কালীপূজার চিত্রাবলী—শ্রীচৈতন্য দেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

শিল্পী শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি প্রথিতযশা। চিত্রাবলীতে ৩৪ খানা ছবি আছে। কিন্তু শুধু ছবি নাই, ছন্দও আছে, কথার সঙ্গে সঙ্গে রূপ আছে এবং কথা ও রূপের ভিতর ছন্দ কাব্যের রসে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। কথার প্রশংসা করিব না রূপের প্রশংসা করিব, দুইয়ের মধ্যে এমন সঙ্গতি রহিয়াছে যে, একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে বেশী প্রশংসা করিবার উপায় নাই। ভাবে ভাষায় এবং রূপে যেন একটানা বাঁধা সুর আগাগোড়া, এইখানেই শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম, সুদৃশ্য আর্ট পেপারে ছাপা। এই বহির সর্ব্বত্র আদর হইবে।

নব-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী—লেখক শ্রীরমাপতি বিশ্বাস; রাঁচী হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহা তেরটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধের বিষয়গুলি জটিল হইলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিমার এবং প্রকাশভঙ্গিমার গুণে বেশ সরস হইয়াছে। স্বাধীন সবল মন লইয়া লেখক জীবনের বহু সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছেন। এই বইখানি আমাদের যুবকদের চিন্তারাজ্যে নূতনত্বের সঞ্চার করিবে—ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। যে দৃষ্টি থাকিলে মানুষ বিরোধকে সমন্বয়ের মধ্যে সার্থক করিতে পারে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়—সে দৃষ্টি লেখকের আছে।

স্বপ্ন কামনা—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কর্তৃক রচিত এবং শঙ্কর-নিবাস, রমনা, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

কবিতার বই। অন্তরের গোপন কামনাগুলি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটিলেও পড়িতে ভালই লাগে। কিন্তু কবিতায় আদিরস সংযমের সীমা ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে নোংরামিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কবির কামনার উদ্দামতা—সেই কদর্য নগ্নতা সাহিত্যে প্রকাশ না করিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ থাকিয়া যায় ?

আধুনিক সমাজ—শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত; প্রফুল্ল লাইব্রেরী ৭১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৫; মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙলা উপন্যাস। লেখকের ভাষার উপর দখল আছে। ভাব-ভাষা-ভঙ্গিমা-রচনা ও চরিত্র চিত্রণে শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক উপন্যাসখানিতে বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্য সমস্যার সমাধানে ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

এলডোর্যাডোর বন্দী—শ্রীহিমাংশু রায় প্রণীত। ৭১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতার প্রফুল্ল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এ্যাডভেঞ্চারের বই—আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতে হয়—শেষ না করিয়া উঠা যায় না। এই বইখানি ছেলেদের চাহিদা মিটাইবে এবং ছেলেদের মহলে ইহার আদর হইবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল, চিত্রকয়টিও সুন্দর।

রাঙ্গা মামার ভাঙ্গা আসর—শিশু-সাহিত্যিক শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত। প্রফুল্ল লাইব্রেরী, ৭১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দশ আনা।

বইখানিতে ১২টি গল্প আছে; গল্পকয়টিই ভাল; বাস্তবতার সহিত যোগ আছে; ছোটদের উপযুক্ত করিয়াই লেখা। ছোটদের আসরে বইখানির চাহিদা হইবে। ছাপা, বাঁধাই, চিত্র ভাল।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

বান্ধব সম্মিলনী পরিচালিত নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা আগামী ৯ই জুন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় সমগ্র বঙ্গের যে কোন স্কুলের ছাত্র যোগদান করিতে পারিবেন। দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে—

(১) অধ্যবসায় সম্বন্ধে একটি বাঙলা প্রবন্ধ, (২) একটি বাঙলা গল্প দুঃখবিবর্জিত (ছোট এবং স্কুল বালকের উপযুক্ত)। প্রত্যেক বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়কে পুরস্কার দেওয়া হইবে। যে কেহ একের অধিক নাম দিতে পারিবেন। বিচারকের বিচারের পর কোনরূপ আপত্তি চলিবে না। লেখকগণ তাহাদের স্কুলের নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা দয়া করিয়া দিয়া দিবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

(১) শ্রীমলয় হালদার—৬৫নং চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট। (২) শ্রীঅজিত নিয়োগী—৩৪নং বেথুন রো। (৩) শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জ্জি—ফ্রেন্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব, গিরীশ পার্ক।

গল্প প্রতিযোগিতা

হাতে লেখা "প্রভাতী" পত্রিকায় একটি গল্প প্রতিযোগিতা হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখককে একটি সুদৃশ্য রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে। যে কোন বিষয় লইয়া গল্প লেখা যাইবে। মনোনীত লেখাসকল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখাটি "প্রভাতীতে" প্রকাশিত হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্তই চরম। ফলাফল যথাসময়ে এই কাগজে প্রকাশিত হইবে। আষাঢ় মাসের মধ্যেই লেখা পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে বা চিঠির জবাব পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন,
৩১, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিযোগিতা

(আলোক-চক্র)

আগামী ১৬ই জুলাই আলোক-চক্রের প্রথম বাৎসরিক উৎসবে রচনা, আবৃত্তি, ব্যঙ্গ কৌতুক প্রভৃতির আয়োজন হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিষয়ঃ—রচনা—১। ছোট গল্প। ২। কবিতা। ৩। প্রবন্ধ—সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব। আবৃত্তি—১। রবীন্দ্রনাথের—পতিতা। ২। নজরুলের—নারী। ৩। বুদ্ধদেবের শাপভ্রষ্ট। ব্যঙ্গ কৌতুক—যে কোন বিষয়ে।

প্রতিযোগিগণ ৪ঠা জুলাইয়ের মধ্যে ১৫১ডি, রসা রোড, ভবানীপুর আলোক-চক্র কার্য্যালয়ে নিজ নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন। রচনাগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া বাঙলায় লিখিয়া পাঠাইবেন যাহাতে উহা ৯ই জুলাই উক্ত ঠিকানায় পৌঁছে। ৯ই জুলাই অপরাহ্ণে উপরোক্ত ঠিকানায় আবৃত্তি ও ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিগণ যেন ঐ সময় উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য অনুসন্ধানও উক্ত ঠিকানায় করণীয়। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কার্য্যালয় সম্পাদক।

রচনা প্রতিযোগিতা

লিপিকার বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

(১) উচ্চাঙ্গের একটি প্রবন্ধের জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০৲ টাকা; (২) উচ্চাঙ্গের একটি গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০৲ টাকা; (৩) উচ্চাঙ্গের একটি কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫৲ টাকা; (৪) উচ্চাঙ্গের একটি চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫৲ টাকা।

প্রত্যেক বিষয়েই যথাযোগ্য আনুষঙ্গিক পুরস্কার বিতরিত হইবে। রচনাগুলি ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। শিল্পী ও সাহিত্যিক মাত্রেই এই প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশ মূল্য না দিয়া যোগ দিতে পারিবেন। ছদ্মনাম ব্যবহারে কোন বাধা থাকিবে না। উপযুক্ত টিকিট সঙ্গে থাকিলে যে কোন অনুসন্ধানের জবাব দেওয়া হইবে এবং অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে। পুরস্কৃত রচনাগুলি আমাদের "যুগধর্ম্মী" মাসিক পত্র লিপিকায় প্রকাশিত হইবে। রচনাগুলি ১০ই শ্রাবণের মধ্যে আমাদের কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। ফলাফল লিপিকায় ও অন্যান্য সাময়িকীতে বিজ্ঞাপিত হইবে। খামের উপরে "প্রতিযোগিতা" এই কথাটি লিখিয়া দিতে হইবে। প্রতিযোগিতা সম্পাদক, লিপিকা ঃ ৩৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় রচনাদি পাঠাইতে হইবে। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, লিপিকা।

প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা

"আবর্ত্ত সঙ্ঘের" ধুনট শাখার পরিচালনাধীনে প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা হইবে। সমস্ত রচনা ও চিত্র ১৫ই জুলাই (১৯৩৯)-এর ভিতর পাঠাইতে হইবে। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

প্রবন্ধ ঃ—বিষয় "বাঙলার পল্লী-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।" ১ম ও ২য় দুইটি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

চিত্র ঃ—যে কোন "প্রাকৃতিক দৃশ্য।" বাঙলার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য একটি অত্যুৎকৃষ্ট রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধ ও চিত্র পাঠাইতে হইবে। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সরকার, জেনারেল সেক্রেটারী, "আবর্ত্ত সঙ্ঘ", পোঃ ধুনট, জেলা বগুড়া।

তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ১৫ই বৈশাখ ২৪শ সংখ্যা "দেশ" পত্রিকায় হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্মৃতি সঙ্ঘ পরিচালিত রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে মে '৩৯-এর স্থলে ৩১শে জুলাই '৩৯ ধার্য্য করা হইল।

শ্রীসুবিমল দে সরকার,
সম্পাদক, রচনা বিভাগ।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কঙ্কাবতী **গত ২১শে জুন মৃত্যুমুখে** পতিত হইয়াছেন এ সংবাদ আমরা **গত সপ্তাহে জানাইয়াছি।**

শ্রীমতী কঙ্কাবতী গত ১৫ বৎসর **ধরিয়া বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের** সহিত সংশ্লিষ্ট **ছিলেন।** নাট্যজগতে শ্রীমতী কঙ্কাবতীই **একমাত্র গ্রাজুয়েট** অভিনেত্রী। ইনিই **প্রথম শিক্ষিতা** মহিলারূপে নাট্যজগতে **যোগদান করেন** এবং বিখ্যাত নাট্যশিল্পী **শ্রীযুত** শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নিকট নাট্যকলা শিক্ষা করেন।

বি-এ পাশ করিয়া শ্রীমতী কঙ্কাবতী **কলিকাতা** বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ার **সময়** পড়া ছাড়িয়া দেন। তাহার পরে নাট্যশিল্পী শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শিক্ষাধীনে নাট্যজগতে যোগদান করেন। নাট্যমন্দিরে 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে ভারত নারীর ভূমিকায় তিনি **প্রথম** রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন। পাঠ্যাবস্থায় **সংগীতে** তাঁহার **খুব** নাম ছিল। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে তাঁহার 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটি সকলকে মুগ্ধ করে। ১৯২৪ সালে তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' নাটকের নির্ব্বাক চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর 'আলমগীরে' উদিপুরীর ভূমিকায়; 'বিজয়ায়' বিজয়ার ভূমিকায়; 'বিরাজবৌ-এ বিরাজবৌ-এর ভূমিকায়; 'অচলায়' অচলার ভূমিকায়; যোগাযোগে নায়িকার ভূমিকায়; 'রমা'য় জ্যাঠাইমার ভূমিকায়; 'রীতিমত নাটকে' নায়িকার **ভূমিকায় ও অন্যান্য অনেক চরিত্রে অভিনয় করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন।** শিশিরকুমার ভাদুড়ী **যখন তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া আমেরিকা যান** তখন তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে গিয়াছিলেন। 'সীতা' **চিত্রে** তিনি সীতার ভূমিকায় এবং 'দস্তুরমত টকি' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। মৃত্যুকালে শ্রীমতী **কঙ্কাবতী** কালী ফিল্মসের 'চাণক্য' **ছবিতে** মুরার ভূমিকায় **অভিনয় করিতেছিলেন।** ছবিখানি এখনও **শেষ হয়** নাই। **রবিবার অসুখের পূর্ব্বেও** তিনি **ছবি তোলার** সময় উপস্থিত **ছিলেন**

১৯০৩ সালে কলিকাতায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীর জন্ম হয়। **মৃত্যুকালে তাঁহার** বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর **হইয়াছিল;**

ফিল্ম করপোরেশনের **"রিক্তা"** চিত্রে শ্রীমতী ছায়া। শ্রীযুত **সুশীল মজুমদার** পরিচালনা করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, **শ্রীমতী কঙ্কাবতী** কালী ফিল্মসের 'চাণক্য' ছবিতে মুরার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। ছবিখানি এখনও **শেষ হয় নাই এবং আমরা** জানিতে পারিলাম যে, মুরার কয়েকটি দৃশ্য **এখনও তোলা** হয় নাই। এ বিষয়ে কালী ফিল্মসের নিকট আমাদের **একটি** প্রস্তাব আছে। আমরা মনে করি যে, **শ্রীমতী কঙ্কাবতী** মুরার যে কয়টি দৃশ্যে অভিনয় **করিয়াছেন; শ্রীমতী কঙ্কা-বতীর'** শেষ অভিনয় হিসাবে তাহা **নষ্ট না করিয়া জন-**সাধারণকে দেখিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। মুরার **অবশিষ্ট** দৃশ্যসমূহে যে অভিনেত্রী অভিনয় **করিবেন** তিনি **শ্রীমতী** কঙ্কাবতী অপেক্ষা ভাল অভিনয় **করিবেন কি মন্দ অভিনয়** করিবেন সে প্রশ্ন এখানে আসে না এবং সেই সম্বন্ধে **কোন** প্রশ্ন বা সমালোচনার কথা উঠিতে পারে বলিয়া **আমরা মনে**

করি না। যিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করিবেন তাঁহার মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নামের জন্য, টাকার জন্য অভিনয় করিবেন না; শ্রীমতী কঙ্কাবতীর অভিনয়ের শেষ স্মৃতিটুকু যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্যই তিনি অভিনয় করিবেন। শ্রীমতী কঙ্কাবতীর ভগ্নী চন্দ্রাবতীকে এই ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

* * * * *

৩০শে জুন, শুক্রবার হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে রাধা ফিল্মসের নূতন ছবি "নরনারায়ণ" আরম্ভ হইবে। ছবিখানি পৌরাণিক। স্যমন্তক মণি উপাখ্যান অবলম্বনে ছবিখানি তোলা হইয়াছে। শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায়—শীলা হালদার, রাণীবালা, রবি রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মৃণাল ঘোষ, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মোহন ঘোষাল, কুমার মিত্র, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি দেখিয়া আসিয়া পরে আমরা এই ছবি সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাইব।

* * *

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "পরশমণি" ছবি-তোলা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন ছবির বিভিন্ন ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না রবি রায়, রাণীবালা, তুলসী লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বীণা বাগচি, অরুণা, প্রভা, সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি আগষ্ট মাসে কলিকাতায় দেখান হইবে।

* * *

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি "কপালকুণ্ডলা" তোলা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুত ফণী মজুমদার ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। নাজাম, জগদীশ, লীলা দেশাই, কমলেশকুমারী, পান্না প্রভৃতি ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তোলা "রজত-জয়ন্তী" ছবি শীঘ্রই কলিকাতায় দেখান হইবে।

শ্রীযুত নীতীন বসুর বাঙলা ছবি "জীবন মরণ"-এর কাজ বেশ ভাল ভাবেই অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমতী লীলা দেশাই এই চিত্রের নায়িকা।

* * * *

শ্রীযুত হেমচন্দ্র একখানি বাঙলা ছবি তুলিতেছেন। শ্রীমতী কাননবালা সেই চিত্রের নায়িকা।

* * *

কমলা টকিজ লিমিটেডের হইয়া শ্রীযুত সতু সেন, শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "স্বামী-স্ত্রী" ছবি পরিচালনা করিবেন। রঙ্গমঞ্চে এই নাটিকাখানি সাফল্যমণ্ডিতভাবে অভিনীত হইয়াছে। ফিল্ম প্রডিউসার্স ষ্টুডিওতে এই ছবিখানি তোলা হইবে। ছবিখানির চরিত্রলিপি এইরূপঃ—ললিত—ছবি বিশ্বাস; লিলি—ছায়া; মোহন—প্রভাত মুখার্জ্জি; মিনতি—চন্দ্রাবতী; মিঃ দাস—সন্তোষ সিংহ; মিসেস দাস—সুপ্রভা মুখার্জ্জি।

কমলা টকিজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" ছবিখানিও এই ষ্টুডিওতে তোলা হইবে। শ্রীযুত সুকুমার দাশগুপ্ত ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন। নায়িকার ভূমিকায়—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী অভিনয় করিবেন।

রাধা ফিল্ম সম্প্রতি আর একখানি পৌরাণিক ছবি তোলা আরম্ভ করিয়াছেন। ছবিখানির নাম "বামনাবতার।" শ্রীযুত হরি ভঞ্জ ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন। চরিত্র-লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বলি অহীন্দ্র চৌধুরী; শুক্র—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; ইন্দ্র—প্রফুল্ল মুখার্জ্জি; বাণ—পঞ্চানন ব্যানার্জ্জি; কশ্যপ—তুলসী চক্রবর্ত্তী; অনুরোধ—শীতল পাল; নারায়ণ—মাণিক ব্যানার্জ্জি; নারদ—মৃণাল ঘোষ; লক্ষ্মী—রেণুকা; অদিতি—নিভাননী; বিন্ধ্যাবলী—রাণীবালা।

* * *

রঙ্গমঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত নাটক—শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "তটিনীর বিচারের" চিত্ররূপ দিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। ফিল্ম কর্পোরেশনে এই ছবি তোলা হইবে। শ্রীযুত সুশীল মজুমদার পরিচালনা করিবেন। ডাঃ ভোসের ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী; তটিনীর ভূমিকায়—রাণীবালা ও ললিতার ভূমিকায়—মীরা সান্যাল অভিনয় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

* * *

সাগর মুভিটোনে শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় যে ছবিখানি বাঙলা ও হিন্দী সংস্করণে তোলা হইতেছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "কুঙ্কুম।" 'কুঙ্কুম' চিত্রে অভিনয় করিতেছেন সাধনা বসু, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, নবদ্বীপ হালদার, ভুজঙ্গ, পদ্মা প্রভৃতি। বাঙলা দেশে এই ছবিখানির বাঙলা ও হিন্দী সংস্করণের পরিবেশন ভার লইয়াছেন প্রাইমা ফিল্মস

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকল দলই নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে এখনও পর্য্যন্ত সঠিকভাবে বলা চলে না। মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল, রেঞ্জার্স, মহমেডান স্পোর্টিং ও কালীঘাট এই পাঁচটি দলেরই চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে ইহাদের মধ্যে মোহন-বাগান দলেরই আশা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এখনও পর্যন্ত এই দল লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে আছে—১৭টি ম্যাচ খেলিয়া ২৭ পয়েন্ট লাভ করিয়াছে। ইহার পরেই ১৮টি ম্যাচ খেলিয়া ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ২৩ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পরেই রেঞ্জার্স ক্লাব ২২ পয়েন্ট পাইয়া তৃতীয় ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২১ পয়েন্ট পাইয়া চতুর্থ স্থানে আছে। কালীঘাট দল ১৫টি ম্যাচ খেলিয়া ২০ পয়েন্ট পাইয়া পঞ্চম স্থানে বর্ত্তমান। সুতরাং প্রথম চারিটি দলের কথা বিবেচনা করিলে মোহনবাগান দল যদি ভাগ্য-বিড়ম্বনায় পরবর্ত্তী সকল খেলাতেই পরাজিত না হয় তবে লীগ চ্যাম্পিয়ান্ হইবে এইরূপে ধারণা করা খুবই অন্যায় হইবে না।

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইষ্ট বেঙ্গল দল সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় অনেকেই আশা করিতেছেন যে, অবশিষ্ট ছয়টি খেলাতেই এই দল বিজয়ী হইবে। কিন্তু আমরা এইরূপ সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। বিশেষ করিয়া অবশিষ্ট খেলার মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও কালীঘাট দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া ইষ্টবেঙ্গল যে সহজে বিজয়ী হইতে পারিবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মোহন বাগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা যখন আছে তখন ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করিবার জন্য এই দল প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তবে এই দুইটি দলের খেলা লীগের একরূপ শেষভাগে হইবে। তখন এই খেলার ফলাফলের উপর চ্যাম্পিয়ানসিপ বিশেষ নির্ভর নাও করিতে পারে।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ঐ একই রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অঘটন না ঘটিলে এই দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। গত চারিটি ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়গণের ব্যর্থতা দেখিয়া ইহাই ধারণা হইয়াছে যে মহ-মেডান স্পোর্টিং দলের ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, এই দল শত চেষ্টা করিয়াও ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া এই দল যে সম্মান লাভ করিয়াছিল এই বৎসর তাহা লাভ করা ভাগ্যে নাই। এই জন্য বলিতে হইতেছে অঘটন ছাড়া এই দল চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে না।

ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের অবস্থা যদি এই-রূপ, তবে মোহনবাগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার পথে বাধা দিতে পারে এইরূপ দল আর নাই, ইহা অনেকের মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি কালীঘাট ও রেঞ্জার্স দলের বিষয় আলোচনা করেন তখন বুঝিতে পারিবেন মোহনবাগান দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের পথ এখনও সুগম নহে। কালীঘাট দলের এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাধা দিবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি কালীঘাট পুলিশ দলের নিকট পরাজিত হওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণ অনেকেই এই দল সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেও এই দল মোহনবাগান অপেক্ষা দুইটি ম্যাচ কম খেলিয়া ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই দলের আক্রমণ-ভাগের খেলোয়াড়গণ অপর সকল দলের খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা গোল করিতে বিশেষ পটু ইহা যাঁহারা এই দলের খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহার পর লীগের অবশিষ্ট খেলার সকল গুলিতেই যে এই দল বিজয়ী হইবে না ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং এই দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপে মোহনবাগান দলকে যে বিশেষ বাধা দিবে ইহা কল্পনা করা অন্যায় হইবে না।

তাহা ছাড়া মোহনবাগান দল অবশিষ্ট খেলাগুলিতে নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে না ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না। ১৯২৫ সালের লীগ খেলার কথা স্মরণ করিয়াই আমাদিগকে এইরূপ উক্তি করিতে হইতেছে। সেই বৎসর বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ সকলেই আশা করিয়াছিলেন মোহন-বাগান দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। অল্প কয়েকটি খেলা বাকী, মোহনবাগান লীগ তালিকার শীর্ষে অবস্থান করিতেছে। কালকাটার সহিত মোহনবাগানের পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধান। এইরূপ অবস্থায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ পাইবে ইহা ধারণা করা কোন অন্যায় হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ লীগ খেলা শেষ হইলে দেখা গেল মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান না হইয়া কালকাটা চ্যাম্পিয়ান হইল। সুতরাং এই বৎসরেও সেইরূপ কোন ঘটনার পুনরাভিনয় দেখিতে হইবে না ইহা কে বলিতে পারে? তবে অধিকাংশ বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত এই মোহনবাগান ক্লাব এইবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইলে বাঙালী খেলো-য়াড়গণের কৃতিত্ব যে অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে ইহাই প্রমাণিত হইবে। বাঙলার বিশিষ্ট ক্লাবসমূহ অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণকে বাঙলার মাঠে প্রাধান্য দান করিয়া বাঙালী উৎসাহী খেলোয়াড়গণের মনে যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার দূরীকরণ এই মোহনবাগান দলের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ৩৩নং আইন জারী করিয়া যে ব্যাধি বাঙলা দেশ

হইতে দূরে করিতে পারিতেছে না, মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হইলে তাহা সম্ভব হইবে। তখন অ-বাঙালী খেলোয়াড় আমদানী করিবার পক্ষে যাঁহারা আছেন তাঁহারাই লজ্জা অনুভব করিবেন। দেশের উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে সুবিধা দিলে ও নিয়মিত শিক্ষা দিলে, তাঁহারা যে অন্যান্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা কোন অংশেই খারাপ খেলিবে না, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় মোহনবাগানের সাফল্যের উপর বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। মোহনবাগান ক্লাবের পরিচালকগণ কি এই গুরু-দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করিবেন না?

নিম্নে লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:-

প্রথম ডিভিসন

		খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
মোহনবাগান	..	১৭	১১	৫	১	২৫	৫	২৭
ইষ্টবেঙ্গল	..	১৮	৮	৭	৩	২২	৯	২৩
রেঞ্জার্স	...	১৭	১০	২	৫	২৭	১৪	২২
মহমেডান স্পোর্টিং	...	১৭	৮	৫	৪	২১	১৪	২১
কালীঘাট	...	১৫	৮	৪	৩	২৭	১২	২০
কাষ্টমস্	...	১৭	৭	৫	৫	২১	১৬	১৯
ই বি আর	...	১৭	৮	৩	৬	২৭	২৪	১৯
ভবানীপুর	...	১৭	৬	৩	৮	১৮	২১	১৫
পুলিশ	...	১৮	৫	৪	৯	১১	৩০	১৪
ক্যামেরোনিয়ান্স	...	১৭	৪	৫	৮	১২	২৪	১৩
এরিয়ান্স	...	১৮	৫	৩	১০	১৭	৩০	১৩
ক্যালকাটা	...	১৮	১	৭	১০	২০	৩৩	৯
বর্ডার রেজিমেণ্ট	...	১৮	৩	৩	১২	১৬	৩৪	৯

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এইবার ইংল্যাণ্ডে খেলিতে গিয়াছে। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে, তাহাতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। বোলিং ও ফিল্ডিং বিষয়ে এই দলের শক্তি খুবই কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা হইয়া গিয়াছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এই খেলাতেও আট উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। উক্ত দলের বিখ্যাত ব্যাটস্ম্যান 'কালা ব্রাডম্যান' হেডলী টেষ্ট খেলার পর পর দুইটি ইনিংসে দুইবার শতাধিক রাণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে তিনি এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "কালা ব্রাডম্যান" নাম তাঁহার কেহ এখনও যে কাড়িয়া লইতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ তিনি দিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ওয়ালী হ্যামণ্ড এই টেষ্ট খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তরুণ খেলোয়াড় হাটন ও কম্পটন ব্যাটিংয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, হাটন ১১৬ রাণ ও কম্পটন ১২০ রাণ করিয়াছেন। টেষ্ট খেলায় নবাগত বোলার কপসন বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দুই ইনিংসে তিনি ৯টি উইকেট পাইয়াছেন। ইহার পরেই রাইটের নাম উল্লেখযোগ্য। ভেরিটী সুবিধা করিতে পারেন নাই। প্রবীণ খেলোয়াড় পেণ্টার তাঁহার খ্যাতি অনুযায়ী ব্যাটিং করিয়াছেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস—২৭৭ রাণ

(গ্রান্ট ২৩, হেডলী ১০৭, সিলী ২৯, বাওয়েস ৪৪ রাণে ৩টি, কপসন ৮৫ রাণে ৫টি ও রাইট ৫৭ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস (৫ উই) ৪০৪ রাণ

(হাটন ১১৬, পেণ্টার ৩৪, কম্পটন ১২০, ক্যামেরন ৬৬ রাণে ৩টি, ক্লার্ক ২৮ রাণে ১টি ও হিলটন ৯৮ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস ২২৫ রাণ

(গ্রান্ট ২৩, হেডলী ১০৭, সিলী ২৯, বাওয়েস ৪৪ রাণে ১টি, কপসন ৬৭ রাণে ৪টি, রাইট ৭৫ রাণে ৩টি, ভেরিটী ২০ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস (২ উই:) ১০০ রাণ

(পেণ্টার ৩২ নট আউট, হ্যামণ্ড ৩০ নট আউট।)

(ইংল্যাণ্ড দল আট উইকেটে বিজয়ী।)

সাপ্তাহিক সংবাদ

২০শে জুন—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি সদস্য পদ পূরণের জন্য পূর্ব্ব-বঙ্গ শহর সাধারণ কেন্দ্রে যে উপ-নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত প্রতুল-চন্দ্র গাঙ্গুলী বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

"এডভান্স" পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা এবং উক্ত পত্রিকার একাউণ্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-কুমার দের বিরুদ্ধে হিসাবপত্র জালের যে মামলা চলিতেছিল, কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে কে বিশ্বাস তাহার রায় দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালাকে হিসাবপত্র জালের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এক শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী মণীন্দ্রকুমার দে-কে সন্দেহের অবকাশে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব চেকোশ্লাভাক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজনীতিক অপরাধে সুদেতেন অঞ্চলের যে সকল অধিবাসী দণ্ডিত হইয়াছিল, হের হিটলার উহাদের সকলের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

লোহিত সাগরের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল হইতে তৈল সরবরাহ সম্পর্কে সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে হের হিটলার রাজা ইবনসৌদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

তিয়েনৎসিনের বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধের আজ সপ্তম দিবস। বৃটিশ রাজদূত জাপ-পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতার সহিত দেখা করিয়া তিয়েনৎসিনে জাপানী অবরোধ প্রাকারের নিকট ইংরেজদের উপর দুর্ব্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি টোকিওতে পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়া কুলাংসু অবরোধের তীব্র প্রতিবাদ-জ্ঞাপক এক লিপি দাখিল করিয়াছেন।

মিসেস কিরণ বসু সমাজ সম্পর্কিত রাষ্ট্র সঙ্ঘের পরা-মর্শদাতা কমিটির রিপোর্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদে নিযুক্ত হইলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ জানান যে, ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ সাহেব মৈজু-দ্দিন খাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণ যে অভি-যোগ আনিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট জন-স্বার্থের খাতিরে প্রকাশিত হইবে না। খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

নিঃ ভাঃ সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জয়-নারায়ণের সহিত মতানৈক্যের দরুণ মেসার্স এম আর মাসানী, অশোক মেটা, অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন, ইউসুফ মেহেরআলী এবং ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া উক্ত দলের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর সদস্য-পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

২১শে জুন—

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এই সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমন্ত্রিত হইয়া বৈঠকে যোগদান করেন। কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাবকমিটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ঐ রিপোর্টের আলোচনা হয়।

হক মন্ত্রিমণ্ডলী কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বিতীয় দফা সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন বিভাগ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিলের যে খসড়া রচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসার করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন নিম্নলিখিত মর্ম্মে সংশোধন করা হইবে:—আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলার ও অল্ডার-ম্যানদের পদ বাতিল করিতে পারিবেন এবং কোন বিভাগের পরিচালনা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কর্পোরেশনের কার্য্যে ত্রুটি দেখা দিলেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কর্পোরেশনের যে কোন প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন-বোধে বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। বাঙ্গলা সরকার কর্পোরে-শনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিবেন এবং কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইবে। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে-সব চুক্তি হইবে, তাহা মেয়র বা ডেপুটি মেয়র না করিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা করিবেন এবং যে কোন বিষয়ে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিবেন। তাঁহার কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে।

২২শে জুন—

কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ধারার যে সংশোধন করিয়াছেন, বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনরধিবেশনে পুনরায় ঐ বিতর্কমূলক বিষয়টি লইয়া আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত উক্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নের বিবেচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ধারা এইভাবে সংশোধনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপন্থার বিরোধী অপর কোন প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারা কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চুয়াডাঙ্গার মহকুমা হাকিম মিঃ এম ইসলামের এজলাসে, সম্প্রতি মাজদিয়া ষ্টেশনে যে শোচনীয় ট্রেন সংঘর্ষ হয়, তৎসংক্রান্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কতিপয়

বামপন্থী নেতার ঘরোয়া বৈঠকে বামপন্থীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেবল সমস্ত কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্যগণ ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হইতে পারিবেন। শ্রমিক ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন সমিতির বেলায় উহাদের কর্ত্তাদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা (কো-অপ্ট) হইবে। আপাতত কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যদিগকে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য করা হইবে না। সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী, রায়পন্থী প্রভৃতি যে সমস্ত বামপন্থী দল লইয়া ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হইবে, সেই সমস্ত দলকে উহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে দেওয়া হইবে অর্থাৎ এই সমুদয় দলের অস্তিত্ব ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে বিলীন হইবে না। ফরোয়ার্ড ব্লকে সমস্ত দলের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। মতৈক্য দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইবে। প্রথমে জিলা কমিটিসমূহ ব্লকের সর্ব্বনিম্ন শাখা হইবে।

ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে ক্রেমলিনে পুনরায় আলোচনা হয়। প্রকাশ, সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভ বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সংশোধিত ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব এখনও গ্রহণযোগ্য হয় নাই। বে-সরকারী মহলের ধারণা, বাল্টিক রাজ্যগুলি সম্পর্কে সোভিয়েট যে পাকা প্রতিশ্রুতি চাহিতেছে, নূতন ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব সে সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

জাপানী নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ সোয়াটাও-এ (এময় ও হংকং-এর মধ্যবর্ত্তী আন্তর্জ্জাতিক বন্দর) অবস্থিত বিদেশী যুদ্ধ জাহাজসমূহকে অবিলম্বে সোয়াটাও ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বৃটিশ ও মার্কিন নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ জাপানের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে মনস্থ করিয়াছে।

২৩শে জুন—

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবটির খসড়া তৈয়ার করেন মহাত্মা গান্ধী, উহা দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা সম্পর্কে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের স্বতন্ত্রকরণের জন্য যে সমস্ত আইন পাশ করিতেছেন, ঐ প্রস্তাবে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে সমর্থন করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সিংহলের ভারতীয়দের সম্পর্কে। সিংহল গবর্ণমেণ্ট বিশ সহস্র ভারতীয় বাসিন্দাকে উৎখাত করার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রস্তাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানান হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটি সিংহলে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঐ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি বেলজিয়ান কঙ্গোর ভারতীয়দের সম্পর্কে। ঐ প্রস্তাবে আশা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তথাকার ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়। ওয়ার্কিং কমিটি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ করিতে বা তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত নহে। তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিবেন, তাহা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে জানান আবশ্যক। তাহা ছাড়া উভয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ ঘটিলে সমুদয় ব্যাপার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির সুপারিশগুলি সংশোধনান্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা সুপারিশ করা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কথাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পৃথক দল বা উপদল গঠন নিষিদ্ধ হইবে না।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনের অধিবেশনে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মসূচী উত্থাপিত এবং যথারীতি গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ফরোয়ার্ড ব্লক উক্ত কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং কংগ্রেসও যাহাতে উহা গ্রহণ করে, তজ্জন্য প্রচারকার্য্য চালান হইবে।

গত দুই দিন ধরিয়া বোম্বাইয়ে নেতাদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনার ফলে বামপন্থী দলসমূহ এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য মাত্রেই ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হইতে পারিবে। নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির যে সকল সদস্য ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মসূচী সমর্থন করিবেন, তাহাদিগকে লইয়া একটি নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক কাউন্সিল গঠিত হইবে। তাহা ছাড়া, কর্ম্মকর্ত্তা ও ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদও গঠিত হইবে।

বাঙলার কম্যুনিষ্ট সাপ্তাহিক "আগে চলো" পত্রিকার নিকট বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা জামানত দাবী করিয়াছেন।

ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স তুরস্ককে আলেকজান্দ্রেতা প্রদেশ অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

আয়ার গবর্ণমেণ্ট আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্মিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন।

২৪শে জুন—

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া এক বিবৃতি দেন। কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতির পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রবাসী ভারতীয়গণ সম্পর্কিত দুইটি প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ

৫ম। সিংহলের প্রবাসী ভারতীয়গণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সিংহল সরকারের চেষ্টার নিন্দা করিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট তথাকার প্রবাসী ভারতীয়গণকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়; অতঃপর কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে। এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকে। আজ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কংগ্রেস সদস্যদের ভোট দানের যোগ্যতা সম্পর্কে এই মর্ম্মে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, অন্ততঃ এক বৎসর কাল কেহ কংগ্রেসের সদস্য না থাকিলে ভোট দানের অধিকারী হইবে না।

তিয়েনৎসিনে জাপানী সান্ত্রীরা এখন বৈদেশিকদের সম্মুখে ইংরেজদিগকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করিতেছে। অদ্য দুইজন ইংরেজকে প্রখর রৌদ্র-কিরণে ৭০ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হয় এবং উলঙ্গ করা হয়।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য প্রাতে ৬০টি সোভিয়েট বিমানপোত আবার মাঞ্চুকুও সীমান্ত পার হয়। জাপ বিমান-বহর তাহাদের ১২টি গুলী করিয়া ভূপাতিত করে।

২৫শে জুন—

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, অদ্যকার নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশনে তাহার সবগুলিই পাশ হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১১ সংখ্যক ধারায় যে সংশোধন করা হইয়াছে, সদস্যদিগকে তৎসম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে তাহার আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে। সমস্ত বামপন্থীরা তীব্র প্রতিবাদ করায় ওয়ার্কিং কমিটি নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির নির্ব্বাচন প্রণালী পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল সদস্য অন্ততঃ তিন বৎসরকাল ধরিয়া কংগ্রেসের সদস্য, কেবল তাঁহারাই প্রতিনিধি অথবা প্রাদেশিক কিম্বা জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন। এই ধারাটির আলোচনার সময় তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রীযুক্ত নরীম্যান মন্ত্রী, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী এবং আইন সভার সদস্যদের সম্পর্কেও অনুরূপ বিধান করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইলেকশন ট্রাইবুন্যাল নিযুক্ত করিবেন, এই প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। লালা দুনিচাঁদ, শ্রীযুক্ত আণে, শ্রীযুক্ত নরীম্যান প্রভৃতি কয়েকজন ইহার উপর সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদ সম্পর্কিত সভা সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া যে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে, তাহা অমান্য করার জন্য সত্যাগ্রহের আয়োজন চলিতেছে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ সি ই গিবন ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আসাম সরকারের কার্য্যের

২৬শে জুন—

কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন তিয়েনৎসিন পরিস্থিতি সম্পর্কে আর এক দফা বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তিয়েনৎসিনের সাধারণ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মিঃ চেম্বারলেন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বৃটিশ প্রজাদিগকে এখনও অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে। উপসংহারে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, টোকিওস্থিত বৃটিশ রাজদূত স্যার রবার্ট ক্রাগী ও জাপ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতার মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে তিয়েনৎসিন সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া তিনি আশা করেন।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হাজারিবাগ জেলে পুনরায় অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদে ৫০০০ সত্যাগ্রহী বন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত সচিব বলেন যে, হায়দরাবাদের রেসিডেণ্টের নিকট হইতে তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে ঐ সব বন্দীদের প্রতি হায়দরাবাদ কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার সমালোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না।

তিন দিন ধরিয়া আলোচনার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনুমতি না লইয়া কোন প্রদেশের কোন কংগ্রেসকর্ম্মী সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন না, সর্দ্দার প্যাটেল কর্ত্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা ১৩০-৬০ ভোটে পাশ হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য্য নরেন্দ্র প্রভৃতি প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিবর্গ ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে বিরূপ সম্পর্ক সম্বন্ধে, সর্দ্দার প্যাটেল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহাও গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের উপর বহু সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই কর্ত্তৃক উত্থাপিত গঠনতন্ত্রের একাদশ ধারার পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিতর্কে যোগ দেন এবং সংখ্যাগুরু দলের আধিপত্য কায়েম করিবার চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

গতকল্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নৈশ অধিবেশনে ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটি আসামের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আসাম অয়েল কোম্পানী যুক্তিসংগত দাবী মানিয়া লইয়া বর্ত্তমান সঙ্কটের অবসান করিতে সম্মত না হইলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আসাম গবর্ণমেণ্টের সহিত অয়েল কোম্পানীর চুক্তির ফলে অয়েল কোম্পানী যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে, ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত প্রস্তাবে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাহা রদ করিবার

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৩৪৬, Saturday, 24th June, 1939 [৩২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ—

আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'কন্‌গ্রেস' শীর্ষক একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি এবং তৎসংস্রবে কংগ্রেসের গতি এবং নীতি সম্বন্ধে কবির মনে যে সব চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়াছে, এই চিঠিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'কন্‌গ্রেস' যতদিন আপন-পরিণতির আরম্ভযুগে ছিল, ততদিন ভিতরের দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অস্পষ্ট ছিল। এখন সে প্রভূত শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। সেকালের কন্‌গ্রেস যে রাজদরবারের রুদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরত আজ সেই দরবারে তার সম্মান অবারিত, এমন কি সেই দরবার কন্‌গ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু মনু বলেছেন, সম্মানকে বিষের মতো জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে, সেইখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্ভাবিত করে।"

কংগ্রেস আজ যে মান, যশ এবং প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, যাহার জন্য রাজদরবার হইতে তাহার সঙ্গে আপোষ করিবার আহ্বান আসিবার অবস্থা হইয়াছে, সেই মান-মোহে কংগ্রেস আদর্শচ্যুত না হয়, রাজদরবারের এই যে মান মর্য্যাদা ইহাকে বড় করিয়া দেখিয়া কংগ্রেস লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়, কবির মনে এ সম্বন্ধে উদ্বেগ জন্মিয়াছে, উদ্ধৃত অংশে তাহারই আভাষ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দলের নিয়ম-তান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কবির ঐ কয়েকটি কথার ভিতর রহিয়াছে। মানমোহ যেখানে বড় হইয়া উঠে সেখানেই সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয় এবং সঙ্কীর্ণতার ফলে আসে তামসিকতা। বৃহৎ ত্যাগের মূলে যে দৃপ্তি এবং উৎসাহ থাকে তখন সে জিনিষটা নষ্ট হইয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

"মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন, তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত ক'রে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই যে উত্তাপ শক্তি-গর্ব্ব এবং শক্তি-লোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তি-পূজার বেদী গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্দ্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ ব'লে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন।"

'ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত' করিয়া তুলিবার মূলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে যে অনিষ্ট রহিয়াছে, কবি তাহা আত্যন্তিকভাবে উপলব্ধি করিয়া তৎসম্বন্ধে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। দরবারের সম্মানের মোহে আদর্শের অপহ্নবকে মৈত্রী বলিয়া বুঝিবার মধ্যে যে কৃপণতা আছে, আছে নৈতিক দিক হইতে যে হীনতা এবং দীনতা সেই দীনতা হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত রাখিতে হইবে, জাগাইয়া রাখিতে হইবে মুক্তির সাধনার যে ত্যাগমূলক তপস্যা সেই তপঃজ্যোতিটিকে।

বাঙলা দেশ ও কংগ্রেস—

বাঙলা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং তৎসম্পর্কে কংগ্রেসের বর্ত্তমান দক্ষিণীদলের কর্ত্তৃত্ব যে সমস্যাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে, কবি তাঁহার এই পত্রে সে বিষয়েও আলোক সম্পাত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর আবশ্যকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মনশ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাংলা দেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।"

কবি বলেন:—

"আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড় করবো, সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। বাংলা-দেশের সার্থকতা গ্রহণ করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে,

সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়।"

বাঙলা দেশের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধনে একটা টান পড়িয়াছে, কবির সঙ্গে এ বিষয়ে আমরাও একমত; কিন্তু এই টান যে ছিঁড়িবার মুখে আমরা ইহা মনে করি না। আমরা এইটানের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি বাঙলার একনিষ্ঠ অনুরাগের অনুভাব বা শক্তি পরিচয় পাই। যে মান-মোহ অন্য প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে তামসিকতার প্রমাদ এবং অবসাদের দিকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে, বাঙলা সেই মান-মোহ হইতে ঊর্দ্ধে আছে; ঊর্দ্ধে আছে এই জন্য যে, এই মান-মোহ এখানে কোন ইতর রাগকে আশ্রয় করিয়া দানা বাঁধিবার সুযোগ পাইতেছে না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করিবার মধ্যে ছিটেফোঁটা অধিকারের যে আকর্ষণ অন্য প্রদেশের দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা পাইয়াছেন, বাঙলায় সে ইতর আসক্তির আকর্ষণ নাই। বাঙলা শাসন-সংস্কারের মোহময় প্রভাব হইতে মুক্ত আছে, এবং আছে বলিয়াই কংগ্রেসের আদর্শকে সত্যভাবে দেখিতেছে। কবির নিজের কথায়—বাংলা আজ ভিক্ষা তরে আতুর অঞ্জলি বাড়াইতে প্রস্তুত নহে, আপোষের নামে। সে পরিপূর্ণতার তরে জাগিয়া আছে। সে কবির কথায় উপলব্ধি করিতেছে এই সত্যটিকে যে—"দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তি-লাভ করে।" জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্বোধিত করিয়া স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করিবার যে আদর্শ কংগ্রেসের আদর্শ, বাঙালী কংগ্রেসের প্রতি ঐকান্তিক এবং আন্তরিক নিষ্ঠাবান বলিয়াই সেই আদর্শকে সজীব করিয়া তুলিবার জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে।

বাঙলায় দমন-নীতি—

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব ম্যাক্সওয়েল সাহেবকে বরাসনে বসাইয়া বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীরা যেদিন সিমলা শহরে বার দিয়াছিলেন, সেই দিনই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, আইন ও শান্তিরক্ষার নামে দমন-নীতির নব পর্য্যায় সুরু হইতেছে। অন্যান্য প্রদেশে এখনও দমন-নীতির এই নব পর্য্যায় আকার ধারিয়া উঠে নাই; কিন্তু বাঙলার কর্ত্তারা এ বিষয়ে অধিকতর ধৃষ্টতাসম্পন্ন; সুতরাং এখানে পুরো-দস্তুর কাজ আরম্ভই হইয়া গিয়াছে। 'চলার পথে'র নিকট হাজার টাকা জামীন দাবী ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'কলরব', 'ইনকেলাব', 'যুগের দাবী', 'গণ শক্তি', 'স্বাধীন ভারত', 'রোজানা হিন্দ' এই ছয়খানা সাময়িক পত্রের নিকটও প্রেস আইন অনুসারে জামীন তলব করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাঙলা সরকার তিনখানা পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং বোম্বাইয়ের 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে'র ২১শে মের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বাঙলাদেশে রাজদ্রোহের বীজ গজাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই কয়েক দিনের মধ্যেই ২০ জন শ্রমিক ও কিষাণ নেতার ও কর্ম্মীর বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছে। বাঙলা সরকার বহুবার এই প্রতি-শ্রুতি দিয়াছিলেন যে, মুক্ত রাজবন্দী এবং রাজনীতিক বন্দীরা যাহাতে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন তাঁহাদিগকে সকল রকমে তেমন সুবিধা দান করা হইবে এবং তাঁহাদের স্বাধীনতার উপর অন্যায় রকমে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি প্রতি পদে কত যে শূন্যগর্ভ তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পুলিশের গোয়েন্দাদের উৎপাতে ইহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত অনুকূল চট্টোপাধ্যায় একজন আন্দামান-প্রত্যাগত। ইনি সংবাদপত্রে একখানা চিঠি লিখিয়া তাঁহার দুর্ব্বহ জীবনের ব্যথা জানাইয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে দেখা যায়, থানার কর্ম্মচারীদের ঘোরা-ফেরা তাঁহার বাড়ীতে অনবরত চলিতেছে। গ্রামের চৌকিদার একদিনের মধ্যে আট বার তাঁহার বাড়ীতে হানা দেয়। পুলিশ গভীর রাত্রিতে হামেসাই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলে এবং নানারূপ প্রশ্নের দ্বারা বাড়ীর লোকজনকে উত্যক্ত করিয়া থাকে। মনুকুলবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগকে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রতিবাদে বিশেষ যে সুফল ফলিবে ইহা আমাদের মনে হয় না। একদিকে পুলিশ এবং অপর দিকে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, এই দুই পক্ষের উপর ভর করিয়া বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডলকে চলিতে হইয়াছে। পুলিশকে চটাইলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়েরও চটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় চটিয়া গেলে নিজেদের মন্ত্রিগিরি খসিবার আতঙ্ক রহিয়াছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্তুষ্টি সাধন করাই বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সকল নীতির হইয়াছে সার নীতি; কারণ আত্মানং সততং রক্ষেৎ—আগে নিজেদের মন্ত্রিগিরি কিসে বজায় থাকে দেখিতে হইবে তাহাই, দেশের স্বার্থ, জন-সাধারণের অধিকার, জনমতের অনুবর্ত্তন, এ সব কোন কিছুরই প্রয়োজন হইবে না, যত দিন বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে আছে দুইটি সম্বল,—একটি সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জিগীর, অপরটি শ্বেতাঙ্গ সমর্থকদের মনস্তুষ্টি। যে আবহাওয়া ধীরে ধীরে দেশময় মন্ত্রীদের এই মনোবৃত্তির ফলে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে সন্দেহ বাঙলাদেশে এমন বিভীষিকার যুগ আরম্ভ হইবে, আমলাতন্ত্রের আমলেও যে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হয় নাই। বাঙলাদেশকে এই সংকট হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিকে ধ্বংস করা—সোজা কথায় এই মন্ত্রীর দলকে বিদায় করিয়া দেওয়া। বাঙলার অদৃষ্টাকাশে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল দুষ্ট গ্রহস্বরূপ।

বাঙালীর বিরুদ্ধে অভিযান—

বিহারী এসোসিয়েশনের ঝরিয়া শাখা বিহার গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্প্রতি একটি নালিশ রুজু করিয়াছেন; নালিশ হইল এই—(১) ধানবাদ সাবরেজেষ্ট্রী অফিসে বাঙলা ভাষায় দলিলপত্র লেখা হয়, তৎপরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষায় লিখিতে আজ্ঞা প্রদান করা হউক; (২) ধানবাদে হিন্দী ভাষী লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু বিহারী সরকারী কর্ম্মচারী ও দারোগার সংখ্যা কম, বাঙালী কর্ম্মচারী ও দারোগার সংখ্যাই বেশী।

সেই কারণে বাঙলা ভাষারই প্রাবল্য রহিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অধিক সংখ্যায় বিহারী দারোগা ও বিহারী অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী ধানবাদে নিযুক্ত করা হউক।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গত জানুয়োরী মাসে বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিলেন। বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন, আমরা ভাবিলাম, এবার অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার দায়েও বিহারী কংগ্রেস সরকারকে মন মুখ এক করিয়া কার্য্যত বাঙালী দলনের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু মাসের পর মাস কাটিয়া গেল। অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথাই রহিয়াছে। বিহার সরকার বাঙালীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি তো ছাড়েনই নাই, বরং উত্তরোত্তর সেই দিকেই আগাইয়া যাইতেছেন। মানভূমের কুর্ম্মী-মাহাতোরা বাঙলা ভাষা-ভাষী এবং বাঙালী। বাঙলা ভাষার সাহায্যেই ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখন এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দী ভাষা জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। সাঁওতাল পরগণার বাঙলা ভাষা-ভাষী বাঙালী সাঁওতালদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা চালাইবার আয়োজন হইতেছে। হিন্দীওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ আমাদের নাই; কিন্তু জোর করিয়া অপরের মাতৃভাষাকে দাবাইয়া দিয়া এই যে অন্যায় জুলুমবাজী ইহার আমরা বিরোধী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে কংগ্রেসের নীতি হইল সর্ব্বভারতের জাতীয়তা; বিহারের সেই কংগ্রেসীরাই এই ধরণের জুলুমবাজী প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই আবার একবারে খাঁটি অহিংসাবাদী এবং প্রেমপন্থী বলিয়াও নাম আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—'দেশে মিলন-কেন্দ্ররূপে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।" কেন প্রকাশ পায়, ইহার খোঁজ লইতে হইবে এবং জাতীয়তার মিলন-কেন্দ্রস্বরূপ এই কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের দোহাই দিয়া বিহারের কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট বাঙালীদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন কেন, কেন এ মনোবৃত্তি তাঁহাদের বদলায় না, এ সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। বিহার সরকারকে শুধু আমরা এই কথাটাই বলিয়া দিতেছি যে, এইরূপ নীতি অবলম্বনের ফলে তাঁহাদের প্রাদেশিকতার দিক হইতেও বড় বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না। ইহার প্রতিক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকেও ভোগ করিতে হইবে; অধিকন্তু এরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রাদেশিকতার দিক হইতে, কি ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে কোন দিক হইতেই ইহাতে সুবিধা নাই। বাঙলা ভাষার মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, বিহার সরকারের সাধ্য নাই যে কৃত্রিম সেই শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন, হিন্দীকে সে ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইলে এখনও অনেক জন্ম সাধনা করিতে হইবে।

হক সাহেবের যুক্তি—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেবকে আমরা যুক্তিবুদ্ধির অতীত বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যার সরকারী ইস্তাহার পত্র ওরফে 'বেঙ্গল উইকলী' পত্রে তিনি সরকারী চাকুরী বাটোয়ারার পক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্তের যুক্তি জাহীর করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হক সাহেব বাছিয়া বাছিয়া সরকারী দপ্তরখানার কর্ম্মচারীদের ভিতর হইতে হিন্দু-মুসলমানের যোগ্যতার নিরিখ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, এই বিভাগে সর্ব্বোত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন অ-মুসলমান কর্ম্মচারীদের সংখ্যানুপাত শতকরা ৩৩ জন; কিন্তু ঐরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন। এতো গেল উচ্চতম যোগ্যতার দিকে, আর নিম্নতম যোগ্যতার হিসাবেও হক সাহেবের মতে অ-মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ২৪ জন, কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১৬ জন মাত্র। হক সাহেব সরকারের অন্যান্য বিভাগ ছাড়িয়া কেবল-মাত্র লালদিঘীর দপ্তরখানাটাই বাছিয়া লইলেন কেন, সে বিচার আমরা করিতে চাহি না, এবং সেই যে শুধু এক সরকারী দপ্তরখানা, সেই দপ্তরখানারও বিভাগীয় কর্ত্তাদের আপিসের তালিকাটি তিনি বাছিয়া লইলেন কেন, আমরা সেই কথাও তুলিতে চাহি না। আমাদের কথা এই যে, হক সাহেব গর্ব্বভরে যে দাবী করিতেছেন সেই দাবীই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ দপ্তরখানায় সরকারী কর্ম্ম-চারীদের মধ্যে যদি শতকরা ৪৬ জন হয় হিন্দু গ্রাজুয়েট এবং ৪৮ জনই হয় মুসলমান, তাহা হইলে তো ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মুসলমানদের মধ্যেই যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সংখ্যাই বেশী এবং তাহা হইলে হক সাহেব যে দাবী করিতেছেন, অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষা এড়াইয়া মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, সেই দাবীর মূলেই যুক্তি থাকে না। মুসলমানদের মধ্যেই যদি যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক থাকে এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষার মুসলমান প্রার্থীদেরই জয় হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের অন্য কোন যুক্তিই তো টিকে না। সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালাইবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। কিন্তু হক সাহেব সে পথে যাইবেন না, প্রতিযোগিতা পরীক্ষার যুক্তি তাঁহার যুক্তি নয়, তাঁহার যুক্তি হইল যোগ্যতার নয়, সাম্প্রদায়িকতার। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, সেজন্য মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের পরি-পন্থিতা সাম্প্রদায়িক দিক হইতে যদি কেহ করে, আমরা তাহার সমর্থক নহি বরং তাহার বিরোধী, কারণ সেখানে সাম্প্র-দায়িকতাকেই জাগান হইবে এবং সাম্প্রদায়িকতাই দেশের স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। এই সাম্প্র-দায়িকতাগত নিয়োগ-নীতির যে আমাদিগকে বিরুদ্ধতা করিতে হইতেছে তাহাও দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিক হইতেই। রবীন্দ্রনাথ চাকুরীর বাটোয়ারার মূলগত নীতির এই অনিষ্টকারিতার দিকটা দেখিয়াই বলিয়াছেন—"দুই পক্ষের মধ্যে দুই অসমান বাটখারায় অন্নবিভাগের শোচনীয় পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে

কথায় কথায় তীব্র করে তোলা। তাকে শান্ত করবার অবকাশ থাকবে না।........হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারত-ভাগ্যের সরিক, অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের মধ্যে যদি গভীর করে কাটা বিঁধিয়ে দেয় তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না।"

জাপান ও ইংরেজ—

চীনের তিয়েনসিনে ব্রিটিশ সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন, সে দৃশ্য দেখিলে নেহাৎ যে শত্রু তাহার চোখেও অশ্রু উথলিয়া উঠিবে। জাপশক্তি ইংরেজকে তোয়াক্কার মধ্যেই আনিতেছে না। জাপানীরা ইংরেজ মেয়ে পুরুষ সকলকে আটকাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করিতেছে। নদীপথ দিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, যে ইংরেজ রমণীর অবমাননার প্রতিশোধের নৈতিক মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগে একদিন বৃটিশের বীরদর্প নিরীহ এবং নিরস্ত্র নরনারী ও শিশুর রক্তের নদীধারায় দেখা গিয়াছিল, সেই ব্রিটিশ নারীর মর্য্যাদা পর্য্যন্ত জাপানীদের হাতে আজ নিরাপদ নয়। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, একজন চীনা পুলিশ জাপানী রক্ষীর অনুমোদনক্রমে একটি ইংরেজ রমণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে এবং তাহাকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে। জাপানী সামরিক গোয়েন্দারা ব্রিটিশ মিউনিসিপ্যালিটির চীনা পুলিশদের মধ্যে এই ইস্তাহার বিলি করিতেছে যে, যদি তাহারা ইংরেজের চাকুরীতে জবাব না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা তাহারা অবলম্বন করিবে। ইংরেজের এখন উপায় কি? যুদ্ধ করা? ইংরেজ এমন মুস্কিলের মধ্যে পড়িয়াছে যে, সেই কথাটি মুখ দিয়া বাহির করিলে বিপদ, কারণ জাপানীর দোস্ত মুসোলিনী এবং তস্য বন্ধু হিটলার ইউরোপে ভূমধ্যসাগরের ঘাটি আগুলাইয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং ইংরেজ এখনও নিতান্ত সুবোধ শিশুটির মত শান্তির কথাই আওড়াইতেছে। বড় জোর কাহারও কাহারও মুখে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা শুনা যাইতেছে; কিন্তু জাপান এ হুমকীতে ডরাইবার বান্দা নয়। আবিসিনিয়ার সম্পর্কে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকী কেমন ফাঁকা হইয়া পড়ে, সে তত্ত্ব তাহার জানা আছে। অধিকন্তু ইংরেজের হুমকীর জবাবে তাহারাও বলিতেছে যে, ইংরেজ যদি তাহাদের পণ্য দ্রব্য বয়কট করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের তুলা এবং অষ্ট্রেলিয়ার পশমও তাহারা বয়কট করিবে। ইংরেজের এখন উপায় আছে রুশিয়া এবং আমেরিকাকে নিজেদের দলে ভিড়ান; কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিয়েনসিনের ব্যাপারে রুশিয়ার কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ নাই—এক আছে আমেরিকার। কিন্তু জাপানীরা আমেরিকাকে খোঁচাইতেছে না বরং তাহাদিগকে সমীহ করিয়া বেশীরকম সুবিধা দিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সিংহের পক্ষে উপায় দেখা যাইতেছে আছে, দুইটি—হয় লেজ গুটাইয়া চীন হইতে পলায়ন, না হয় যুদ্ধ। আমেরিকা এবং রুশিয়ার নিকট হইতে সাহস না পাইলে ইংরেজ যুদ্ধে আগাইবে না। সুতরাং পরিশেষে হয়ত 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই সমীচীন পন্থাই তাহাকে অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরেজ চিরকালই শক্তের ভক্ত এবং নরমের যম, সুতরাং এই পন্থার সমীচীনতা উপলব্ধি করিতে তাহার যে বেশী দিন দরকার হইবে জগতের অবস্থা দেখিয়া তেমন মনে হয় না।

রাণী গুইদালো—

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের যৌক্তিকতা যাহাতে রাণী গুইদালোর সম্বন্ধে না খাটিতে পারে মণিপুর দরবারের প্রেসিডেণ্ট ম্যাকডোনাল্ড তদর্থে এক বিজ্ঞপ্তি বাহির করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, রাণী গুইদালো প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং সেজন্য তাঁহার জেলও হয় নাই। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের নেত্রী নহেন, তিনি এক জন নরমুণ্ড-শিকারী কুসংস্কারান্ধ নাগাদের সর্দ্দারণী। বলা বাহুল্য এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন কথা আমরা একদিনও শুনি নাই। রাণী গুইদালো নাগা পাহাড়ের 'মেয়ে গান্ধী' কাগজপত্রে এমন আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। 'দেশ' পত্রে রাণী গুইদালোর সম্বন্ধে যে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আসাম সরকারের শাসন বিভাগীয় রিপোর্ট এবং আসাম পুলিশের সরকারী রিপোর্টেরও কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া গুই-দালোর কার্য্যকলাপের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সব সরকারী কাগজপত্রে কোথায়ও যে রাণী গুইদালোকে ডাইনী, যাদুকরী বা নরবলিদাতাদের সর্দ্দারণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন আমাদের মনে পড়ে না। রাণী গুইদালো কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ বা জন-আন্দোলন জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন এবং তেমন কাজ যে রাজনীতিক কাজের মধ্যেই গণ্য ম্যাকডোনাল্ড সাহেব একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ব্রহ্ম বিদ্রোহের সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা যে হিসাবে রাজনীতিক বন্দী ছিল, রাণী গুইদালোর কার্য্যে ততটা ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়ত হয় নাই। ইহা বলা চলে না যে, ব্রহ্ম বিদ্রোহীরা যদি রাজনীতিক হিসাবে মুক্তি পাইতে পারে তবে রাণী গুইদালোই বা কেন পাইবেন না? তিনি নারী এই বলিয়াই কি? মণিপুর দরবারের প্রেসিডেণ্ট সাহেব এতদিন পরে যে অভিনব যুক্তি লইয়া রাণী গুইদালোর মুক্তির বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়াইয়াছেন, আসাম সরকারের দলিলপত্রই তাঁহার সে উক্তির ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিবে। তিনি একথা দেশের লোককে বুঝাইতেই পারিবেন না যে, রাণী গুইদালো প্রকৃতি হইতে দুর্ব্বৃত্তপরায়ণা, কুসংস্কারান্ধ, হিংস্র এবং সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতি-বিশিষ্টা। এই সাঙ্ঘাতিক এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক যে সে কখনই সরল প্রকৃতির পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে পারে না। রাণী গুইদালোর কার্য্য অবিবেচিত হইতে পারে, আধুনিকতার দিক হইতে আনাড়ী রকমের হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা

সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং তিনি যে 'রাজনৈতিক বন্দিনী এবিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। রাজনীতিক বন্দী-দিগকে মুক্তিদানের আন্দোলন চালান কংগ্রেসের যখন কর্ত্তব্যের মধ্যে তখন রাণী গুইদালোর মুক্তির জন্যও কংগ্রেস আন্দোলন চালাইবে এবং তাঁহাকে মুক্ত করিতে হইলে ভারত সরকারের উপর যেমনভাবে চাপ দেওয়া দরকার, তাহা করিতেও কংগ্রেস কুণ্ঠিত হইবে না। এক্ষেত্রে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষার অনুকূল হইবে না একথা আমরা স্পষ্টভাবেই বলিব। ম্যাক-ডোনাল্ড সাহেবের এই বিবৃতি এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে কর্ত্তব্য পালনে অধিকতর দৃঢ়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক আমরা ইহাই দেখিতে চাই। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের এমন ধরণের ফতোয়াকে বাতিল করিয়া দিবার শক্তি আছে গণ-আন্দোলনের। এবং গণ-আন্দোলনের চাপ পড়িলে যে সব কর্ত্তাদের মুখে আজ 'না' শুনিতেছি তাঁহাদের মুখেই 'হাঁ' শুনিতে যে বেশী দেরী হয় না, দেশবাসীরা যেন এই সত্যটি বিস্মৃত না হন।

নাগা বিদ্রোহের নেত্রী—

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীযুত বীরেশচন্দ্র মিশ্র রাণী গুইদালোর সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে রাণী গুইদালো কর্ত্তৃক কর বন্ধের আন্দোলন পরিচালনা এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলে নাগা রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে সব কথা আসাম সরকারের রিপোর্টে তখন বলা হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। আসাম গবর্ণমেণ্ট রাণী গুইদালোর সেই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই সব ব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ ভয়াবহ ছিল, আমরা এখন আর সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না। বিদ্রোহ দমন করিবার বেলায় কোন গবর্ণমেণ্টই কোন রকম কঠোরতা অবলম্বন করিতে কসুর করে না, তৎকালীন আসাম সরকারও তাহা করেন নাই। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, আজ মণিপুর দরবারের প্রেসিডেণ্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেব রাণী গুইদালোকে যাদুকরী বা ডাইনী বলিয়া যে বোকা বুঝ দিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কোনক্রমেই যুক্তিসহ নয়। আসাম পুলিশের রিপোর্টে গুইদালোকে 'নাগা পাহাড়ের বিদ্রোহীদের নারী-নেত্রী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; সুতরাং রাজ-নৈতিক বন্দীর যে সম্মান তাহা তাঁহার সর্ব্বাংশেই প্রাপ্য এবং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদারতার দিকটাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া জন-মতানুকূলতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদিগকে যেভাবে মুক্তি দিয়া থাকেন—সেই দৃষ্টির দিক হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেও তেমন রাজ-নৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে, তখন রাণী গুইদালোকেও মুক্তিদান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে মুক্তি দিলে মণিপুর দরবার কিংবা ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি কিছুই হইবে না, পক্ষান্তরে তেমন উদার নীতি অনুসরণের দ্বারা তাঁহারা বিজ্ঞতারই পরিচয় দিবেন।

পৌর অধিকারের বিলোপ—

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনের সাধনাকে মূর্ত্ত করিয়াছিলেন কলিকাতার পৌরজনগণকে পৌর-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া। বাঙলার হক মন্ত্রিমণ্ডল সে কর্ত্তৃত্বকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়িবেন না, তাঁহারা জিদ ধরিয়া বসিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসি-প্যাল বিলের দ্বারা কর্পোরেশন হইতে গণতান্ত্রিকতার উচ্ছেদের আয়োজন হইয়াছে; কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল সেইখানেই সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব একেবারে সরকারের মুঠার মধ্যে লইয়া ছাড়িবেন। মিউনিসিপ্যাল বিলের দ্বিতীয় দফা সংশোধনের যে খসড়া মন্ত্রীরা করিয়াছেন সম্প্রতি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে কর্পোরেশন আর স্বায়ত্ত-শাসনমূলক কোন প্রতিষ্ঠান থাকিবে না, বাঙলা সরকারেরই খাস মহলে পরিণত হইবে। সরকার ইচ্ছা করিলে কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে যাহা খুসী করিতে পারিবেন। কাউন্সিলারেরা বা অল্ডারম্যানেরা যদি সরকারের বিরাগভাজন হন, তাহা হইলে, কর্ত্তব্য ব্যত্যয়ের অজুহাতে সরকার তাঁহাদের সদস্যপদ বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। যে কোন বিভাগকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। কর্পোরেশনে গৃহীত প্রস্তাব-প্রস্তাবনা বাতিল করিয়া দিবার অধিকারও সরকারের হাতে থাকিবে। ইহা ছাড়া কর্পো-রেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিবেন গবর্ণমেণ্ট। মাসিক পঞ্চাশ টাকার অনধিক মাহিনার চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষমতা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার থাকিবে, কিন্তু উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে তাহার হাত থাকিবে না। বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক ষ্ট্যাটুটরি কমিশনের সুপারিশ অনুসারেই ঐ সব ক্ষেত্রে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন।

বুঝিতে আর বাকী কিছু থাকে না, কর্পোরেশন হইতে পৌরজনের সকল অধিকার খতম করার উদ্দেশ্য লইয়াই এই আইন। মন্ত্রীরা হইয়াছেন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা —কলিকাতা শহরটিকেও তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বন্ধক দিতে বসিয়াছেন; উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি। হাতে যখন ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছে, তখন ঠেকায় কে? কিন্তু এই মদান্ধ মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বাঙালী জাতি এখনও মরে নাই, তাহারা বাঁচিয়া আছে। নিজেদের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহারা তাহা জানে। বাঙলার মন্ত্রীদের স্বেচ্ছাচারিতা হইতে যাহারা নিজেদের অধিকারকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে স্বদেশবাসীদের বৃহত্তর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও বাতুলতামাত্র। কলিকাতার পৌরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার সংকল্পশীলতার ভিতর দিয়াই বাঙালী দেশের বৃহত্তর মুক্তি এবং মঙ্গল প্রেরণা তাহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটা দৃঢ় হইয়াছে, আজ তাহার পরীক্ষা দিবে এবং সেই পরীক্ষা হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর নূতন আলোক-সম্পাত হইবে, সাম্রাজ্যবাদীর দল নূতন শিক্ষা লাভ করিবে। বাঙলার মন্ত্রীদের দুর্ম্মতির ভিতর দিয়া বাঙালীর আত্মশক্তি পরীক্ষার অমোঘ আহ্বানই আজ বিধাতার নিকট হইতে আসিয়াছে।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস নেতৃ-বৈঠক—

গত ২১শে তারিখ বুধবার হইতে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ৬ দিন চলিবে, ২৪শে তারিখ হইতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সুরু হইবে। ইহার পর প্রগতিপন্থী কংগ্রেসীদের বৈঠকও বোম্বাই শহরে হইতেছে। বোম্বাই শহরে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্ত দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির দিক হইতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বের প্রথম কারণ এই যে, ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা হইবে। এই সম্পর্কে সাব কমিটির সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। কংগ্রেসের শুদ্ধির নামে কংগ্রেস যাহাতে জোটবন্দী দলের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, কংগ্রেসকে যাঁহারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানস্বরূপে শক্তিশালী রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারপর কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যেভাবে কাজ করিতেছেন—তাঁহাদের সে কাজ কংগ্রেসের আদর্শের কতটা অনুযায়ী হইতেছে, ইহাও খতাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে এবং ইহার উপরই প্রগতিবাদীদের মতানুকূলতার শক্তিতে কংগ্রেস কতটা দৃঢ় থাকিবে তাহা নির্ভর করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তির উপর এই সব কর্ম্মপন্থার প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; কারণ দক্ষিণপন্থী দলের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠ আত্মচৈতন্য ফিরাইতে এবং তাঁহাদের নিয়মতন্ত্রানুরক্ত মনোবৃত্তির মোড় ঘুরাইতে শুধু সেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই সমর্থ।

মেঘ-স্তুতি

(ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল, ৮৩ সূক্ত)

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী

উচ্চরবে গাহ রয়েছে আজি তাঁর পুণ্যে নিরমল
স্তোক গান,
সম্মুখপানে তাঁর নয়ন দুটি রাখি' করহে কর তাঁরে
প্রণতি দান।
বৃষভ সম হাঁকিয়া অবিরল, ছুটিয়া যান বেগে
বরষি' ধারা জল,
সে জল তাঁহারি যে আধার শকতির, ওষধি দল
তাহে লভে গো প্রাণ॥

নিঠুররূপে নাশ করিয়া রাক্ষসে উপাড়ি' তরুদল
করেন লয়,
হেরিয়া জলদের নবীন উল্লাস নিখিল বিশ্বের
লাগে যে ভয়।
তীক্ষ্ণ আপনার বজ্রমহাবাণ পাতকী আছে যারা
তাদের হানি' যান,
কলুষহীন যারা তারাও সন্ত্রাসে পলায় লয়ে
প্রাণ-শঙ্কাময়॥

যেমন রথিগণ সবেগে অশ্বেরে চালায়ে যায় ল'য়ে
কশার ঘায়,
সলিলদায়ী দূতে এ-নভোমণ্ডল তেমনি ল'য়ে চলে
উতলা বায়।
বাদল তমসায় যখন অবিরল ঢাকিয়া দেন তিনি
গগনমণ্ডল
তখন ক্ষণে ক্ষণে সিংহনাদ-ঘন কেবল চৌদিকে
উঠে যে হায়॥

পবন উঠে মাতি' বিজলি জ্বলি' উঠে গগন গলি'
যেন সলিল হয়
ওষধি যত আছে জাগিয়া তোলে মাথা, সারাটি ধরা
পরিতৃপ্ত রয়!
ওষধি লভে প্রাণ যাহার পেয়ে জল, বিবিধ রূপে তিনি
ধরেন অবিরল:
হে নভোবর আজি সলিল-স্তূপরাজি খুলিয়া দিন
সারা জগৎময়॥

হে নভোবাস! আজি দ্যুলোক হ'তে শুধু সঘনে কর
কর সলিল দান!
অশ্ব বায়ু তব, প্রবল জলধারে প্লাবনে দাও ভরে
এ-ধরাখান্!
সঘনে গরজিয়া অট্টহাসি হাসি', মোদের আঁখি পরে
এসো হে এসো ভাসি'
জীবনদাতা ওহে! সলিল সিঞ্চনে মিটাও আশা,
চাহে তৃষিত প্রাণ॥

* *

হে জলধর! আজি অনেক বর্ষলে করহে নিবারণ
—নহেক আর,
মরুর বুকে পথ সুগম করি দিলে, ভিজায়ে দিয়া
বুক এ-বসুধার!
ধরার যত তাপ আজিকে অপগত, ভক্ষ্য হ'ল আজ
ওষধি ছিল যত,
হেরিয়া তব কাজ নিখিল জন তাই তোমারে করে
আজি নমস্কার॥

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

মানবজাতির সম্মিলিত প্রগতি

অতএব মানবজাতির সম্মিলিত প্রগতি সিদ্ধ হইবে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, আবার ব্যক্তির সহিত সমাজের, সমাজের সহিত সমাজের, আবার ক্ষুদ্রতর সমাজের সহিত সমগ্র মানবজাতির, মানবজাতির সাধারণ জীবনও চেতনার সহিত তাহার অন্তর্গত, অবাধ বিকাশশীল সমষ্টি ও ব্যষ্টি সকলের আদান-প্রদান ও সমীকরণের সাধারণ নীতির দ্বারা। কিন্তু যদিও প্রকৃতি এখনই এই আদান-প্রদান কোনরকমে কতকটা ঘটাইতেছে, প্রকৃতিপক্ষে জীবন এখনও এইরূপ অবাধ ও সুসংগত অন্যোন্যতার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার বহু দূরে। সেখানে চলিয়াছে একটা দ্বন্দ্ব, আদর্শ, প্রবৃত্তি ও স্বার্থের সংঘর্ষ, মুক্ত ও সমৃদ্ধ আদান-প্রদানের দ্বারা লাভবান হইবার চেষ্টা না করিয়া প্রত্যেকেই অন্যের উপর নানাপ্রকার যুদ্ধের দ্বারা, একরকম বুদ্ধিগত, প্রাণগত, শরীরগত ডাকাতি ও চুরির দ্বারা, এমন কি সহযোগিগণকে দমন করিয়া গ্রাস করিয়া হজম করিয়াই লাভবান হইতে চাহিতেছে। জীবনের এই দিকটাকে যে ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে, মানবজাতি তাহার শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা ও অভীপ্সায় তাহা জানে, কিন্তু সে এ পর্যন্ত ইহার ঠিক উপায়টি আবিষ্কার করিতে পারে নাই অথবা সেইটি প্রয়োগ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি তাহার নাই। এখন সে ব্যক্তির জীবনকে সমষ্টি জীবনের তীব্র অধীনতা ও দাসত্বে পরিণত করিয়া দ্বন্দ্ব এড়াইতে, বিকাশের আনুষঙ্গিক বিশৃঙ্খলাসমূহ এড়াইতে প্রয়াস করিতেছে এবং ইহার যথাস্থানে পরিণতি হইবে এই যে, সে সমষ্টির সহিত সমষ্টির দ্বন্দ্বকে এড়াইতেও সমষ্টির জীবনকে মানবজাতির সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের তীব্র অধীনতা ও দাসত্বে পরিণত করিবে। বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব ও অপচয় নিবারণের জন্য স্বাধীনতাকে অপসারিত করা সম্বন্ধচ্ছেদপ্রবৃত্তি এবং পরস্পরের মধ্যে ঠেকাঠেকি নিবারণের জন্য বৈচিত্র্যকে অপসারিত করা—ইহাই হইতেছে শৃঙ্খলা ও প্রণালীবদ্ধতার প্রবৃত্তি, ইহার দ্বারাই যুক্তিমূলক বুদ্ধির স্বৈর অনমনীয়তা প্রকৃতির প্রণালীর দুরূহ বক্ররেখাসমূহের পরিবর্তে নিজ সরল রেখাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

জীবনের পক্ষে স্বাধীনতার আবশ্যকতা

কিন্তু জীবনের জন্য যেমন নিয়ম ও প্রণালী আবশ্যক, স্বাধীনতাও তেমনি আবশ্যক, আমাদের পূর্ণতার জন্য যেমন ঐক্য আবশ্যক, তেমনিই বৈচিত্র্যও আবশ্যক। জীবন কেবল তাহার মূলতত্ত্ব এবং সমগ্রতাতেই এক, তাহার খেলায়, তাহা স্বভাবতই বহুমুখী। সম্পূর্ণ সমরূপতার অর্থ হইবে জীবনের অবসান, অন্য পক্ষে সে যে সব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তাহাদের সমৃদ্ধিই হইতেছে জীবনের স্পন্দন-শক্তির পরিচায়ক। সেই সঙ্গেই জীবনের শক্তি ও উর্বরতার জন্য যেমন বৈচিত্র্যের প্রয়োজন তাহার শৃঙ্খলা বিন্যাস ও দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যেরও তেমনিই প্রয়োজন। ঐক্য আমাদিগকে সৃষ্টি করিতেই হইবে কিন্তু সেজন্য যে সমরূপতা সৃষ্টি করিতেই হইবে তাহা নহে। মানুষ যদি পূর্ণতম আধ্যাত্মিক ঐক্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে কোনরূপ সমরূপতাই আবশ্যক হইত না। কারণ ঐ ভিত্তির উপর বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধতম খেলা নির্বিঘ্নে সম্ভব হইত। আবার যদি সে নীতিতে একটা নিশ্চিত, সুস্পষ্ট, দৃঢ়বদ্ধ ঐক্য সিদ্ধ করিতে পারিত, তাহা হইলে উহার প্রয়োগে সমৃদ্ধ এমন কি অসীম বৈচিত্র্য সম্ভব হইত এবং তাহাতে বিশৃঙ্খলা, গোলমাল বা দ্বন্দ্বের কোন ভয় থাকিত না। যেহেতু সে এই দুইটির কোনটিই করিতে সক্ষম নহে, সেজন্য সে প্রকৃত ঐক্যের পরিবর্তে সর্বদা সমরূপতা স্থাপন করিতে প্রলুব্ধ হয়। একদিকে মানুষের মধ্যে প্রাণ-শক্তি বৈচিত্র্যের দাবী করিতেছে, অন্যদিকে তাহার বুদ্ধি চাহিতেছে সমরূপতা। বুদ্ধি ইহা চায়, কারণ সমরূপতা তাহাকে প্রকৃত ঐক্যের স্থলে ঐক্যের একটা প্রবল ও সহজসিদ্ধ আভাস দেয়, প্রকৃত ঐক্যে উপনীত হওয়া বড়ই দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি এইটিকে চায়, কারণ অন্যথা যে আইন, শৃঙ্খলা, প্রণালীবদ্ধতা দুঃসাধ্য হইত, ইহার দ্বারা সেইটি তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। আরও সে এইটি চায়, কারণ মানুষের মধ্যে মনের প্রেরণা হইতেছে প্রত্যেক গণনীয় বৈচিত্র্যকেই দ্বন্দ্ব ও সম্বন্ধচ্ছেদের অজুহাতে পরিণত করা এবং সেইজন্যই তাহার মনে হয় যে, সমরূপতাই হইতেছে ঐক্য সাধনের নিরাপদ ও সহজ পন্থা। তাহা ছাড়া জীবনের যে কোন দিক বা বিভাগে সমরূপতা তাহার শক্তির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া তাহাকে অন্যান্য দিকের বিকাশে সহায়তা করে; যদি সে তাহার অর্থনৈতিক জীবনকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থিত করিতে পারে এবং ইহার সমস্যাগুলি এড়াইতে পারে, তাহা হইলে সে তাহার মানসিক ও সাংস্কৃতিক অভিবিকাশের দিকে মনোযোগ দিবার অধিকতর অবকাশ ও সুযোগ পাইতে পারে। অথবা যদি সে তাহার সমগ্র সামাজিক জীবনকে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থিত করিতে পারে এবং তাহার অন্তরের সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে আমল না দেয়, তাহা হইলে সে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে অধিকতর উৎসাহের সহিত মনোযোগ দিবার জন্য শান্তি এবং নিশ্চিন্ত মন পাইতে পারে। তবে এখানেও জীবনের বহুমুখীন ঐক্য নিজ সত্যকে প্রকট করে; পরিশেষে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ অর্থনৈতিক জীবনের গতিহীনতা ও দারিদ্র্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর মানবজাতির অধ্যাত্ম জীবন যদি সুদূর উচ্চ শিখরে উঠে, তাহাকে অতিমাত্রায় বিধিবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ সমাজের উপর নির্ভর করিতে হইলে পরিশেষে তাহার সমৃদ্ধি ও নিরবচ্ছিন্ন সজীবতার উৎসে দুর্বল হইয়া পড়ে, নিম্ন হইতে জড়তা উঠিতে থাকে এবং উচ্চ শিখরগুলিকেও স্পর্শ করে।

সমরূপতা ও বৈচিত্র্য

আমাদের মনস্তত্ত্বের অপূর্ণতা ও ত্রুটির জন্য কতকটা সমরূপতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়, খুঁজিতে হয় তথাপি প্রকৃতির প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে সত্য ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য। তাহার রহস্যটি স্পষ্ট বুঝা যায় এই তথ্য হইতে যে, যদিও সে এক সাধারণ প্ল্যান অনুযায়ী গঠন করিয়া চলে তথাপি সকল সময়েই সে অনন্ত প্রকারভেদের উপর জোর দেয়। মানবীয় রূপের প্ল্যান এক, তথাপি এমন দুইটি মানুষ নাই যাহারা তাহাদের দৈহিক লক্ষণে সম্পূর্ণভাবে একপ্রকার। মানবীয় প্রকৃতি তাহার উপাদান ও মুখ্য ধারাগুলিতে এক; কিন্তু এমন দুইটি মানুষ নাই

যাহারা তাহাদের ধাত, চরিত্র ও মানসিক সত্তায় ঠিক একরকম। সকল প্রাণ তাহার মূল প্ল্যান ও তত্ত্বে এক, এমনকি উদ্ভিদকেও জন্তুর ভ্রাতা বলিয়া চেনা যায়; কিন্তু প্রাণের ঐক্য অনন্ত প্রকারভেদকে স্থান দেয়, প্রশ্রয় দেয়। মানব-সমাজগুলির পরস্পরের সহিত যে স্বাভাবিক বিভিন্নতা তাহা ব্যক্তি সকলের বিভিন্নতার প্ল্যানেরই অনুযায়ী; প্রত্যেকেই তাহার নিজস্ব চরিত্র, বিশিষ্ট নীতি, স্বাভাবিক ধর্ম বিকাশ করে। এই বিভিন্নতা এবং মূলতঃ নিজ স্বতন্ত্র ধারার অনুসরণ তাহার জীবনের পক্ষে আবশ্যকীয়, কিন্তু ইহা মানব জাতির সুস্থ সমগ্র জীবনের পক্ষেও সমানভাবেই আবশ্যকীয়। কারণ, এই বিভিন্নতার নীতি অবাধ আদান-প্রদান রুদ্ধ করে না, এক সাধারণ ভাণ্ডার হইতে সকলের সমৃদ্ধ হওয়া এবং সকলের দ্বারা এক সাধারণ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধ হওয়াতে বাধা প্রদান করে না, আর আমরা দেখিয়াছি যে, এইটিই হইতেছে জীবনের আদর্শ নীতি; অন্যপক্ষে, বিভিন্নতা প্রাপ্তির সুযোগ না থাকিলে এইরূপ আদান-প্রদান ও অন্যান্য সমীকরণ আদৌ সম্ভব হইত না। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের ঐক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এই সুসঙ্গতিতেই রহিয়াছে জীবনের রহস্য; প্রকৃতি তাহার সকল কর্ম ঐক্য এবং বিভিন্নতা এই দুইয়েরই উপর সমানভাবে জোর দেয়। আমরা দেখিতে পাইব যে, সত্য আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য অবাধ বৈচিত্রকে স্থান দিতে পারে এবং যে ন্যূনতম সমরূপতা প্রকৃতি এবং মূলনীতির সাম্যের জন্য যথেষ্ট তাহার অধিক আর সব কিছুকেই বর্জন করিতে পারে। যতক্ষণ না আমরা সেই সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতেছি ততক্ষণ সমরূপতার পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু আমরা যেন অতিমাত্রায় ইহা প্রয়োগ না করি, নতুবা আমরা জীবনকে তাহার শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্থ স্বাভাবিক আত্মবিকাশের একেবারে মূলেই বিপর্যস্ত করিয়া তুলিব।

নিয়ম এবং স্বাধীনতার মধ্যে বিবাদ

নিয়ম এবং স্বাধীনতার মধ্যে যে বিবাদ তাহারও ভিত্তি হইতেছে এইরূপ এবং তাহার সমাধানও এইরূপ। বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা প্রাপ্তি যেন হয় মুক্ত, অবাধ। প্রকৃতি কৃত্রিমভাবে নির্মাণ করে না, বাহির হইতে কোন ছাঁচ বা বিধান চাপাইয়া দেয় না, সে জীবনকে প্রবৃত্ত করে ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতে এবং তাহার স্বাভাবিক ধর্ম ও অভিবিকাশের প্রতিষ্ঠা করিতে, কেবল তাহার পরিবেষ্টনের সহিত আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই আবশ্যক মত পরিবর্তিত হইতে। আমাদের জীবনের এই মূল প্রবৃত্তিই হইতেছে ব্যক্তিগত, জাতিগত, ধর্মগত, সামাজিক, নৈতিক, সকল প্রকার স্বাধীনতারই ভিত্তি। স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি আমাদের সত্তার ধর্ম অনুসরণ করিবার, আমাদের স্বাভাবিক আত্ম-সিদ্ধিতে গড়িয়া উঠিবার, আমাদের পরিবেষ্টনের সহিত স্বাভাবিকভাবে, মুক্তভাবে আমাদের সুসঙ্গত ঐক্য আবিষ্কার করিবার অবাধ অধিকার। স্বাধীনতায় বিপদ ও অসুবিধাগুলি, তাহার অপব্যবহারে যে বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব, অপচয় ও গোলমাল সৃষ্ট হয়—সে-সব সুস্পষ্ট। কিন্তু সেগুলি উদ্ভূত হয় ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সমাজের সহিত সমাজের ঐক্যবোধের অভাব বা ত্রুটি হইতে, তাহার ফলে তাহারা পরস্পরের সাহায্য ও আদান-প্রদানের দ্বারা বর্ধিত না হইয়া পরস্পরের ক্ষতি করিয়াই নিজেদের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করে এবং তাহারা যে কাজে তাহাদের সহচরদের মুক্ত অভিবিকাশকে আক্রমণ করে, ঠিক সেই কাজেই নিজেদের জন্য স্বাধীনতার দাবী করে। যদি বাস্তব আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য সংসিদ্ধ হয় তাহা হইলে আর স্বাধীনতায় কোন বিপদ, কোন অসুবিধা থাকিবে না; কারণ, স্বাধীন ব্যক্তি সকল ঐক্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজেদের দ্বারা, নিজেদেরই প্রয়োজনের দ্বারা তাহাদের সহচরদের বিকাশের সহিত নিজেদের বিকাশের সামঞ্জস্য করিতে বাধ্য হইবে, এবং অন্যের অবাধ বিকাশ না হইলে নিজদিগকে পূর্ণ বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে না। আমাদের বর্তমান অপূর্ণতা ও ত্রুটির জন্য এবং আমাদের মন ও ইচ্ছার অজ্ঞানের জন্য আমাদিগকে বাহির হইতে সংযত ও বাধ্য করিতে আইন ও প্রণালীবদ্ধতা ডাকিয়া আনিতে হয়। কড়া আইন ও বলপ্রয়োগে বাধ্য করার সহজ-সাধ্য সুবিধাগুলি খুবই সুস্পষ্ট, কিন্তু ইহার অসুবিধাগুলিও কম গুরুতর নহে। ইহা যে উৎকর্ষ সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য হয় তাহা যন্ত্রবৎ হইয়া উঠে, এমন কি ইহা যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে তাহাও কৃত্রিম হইয়া পড়ে এবং জোরালোটি আলগা করিয়া দিলে অথবা দুর্বলটি সরাইয়া লইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহাকে অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিলে, যে স্বভাবসিদ্ধ বিকাশ হইতেছে জীবনের যথার্থ পদ্ধতি তাহাকে ইহা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয়, এমন কি ইহা প্রকৃত বিকাশের সামর্থ্যকেই একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। আমরা যদি জীবনকে দমিত করি, অতিমাত্রায় নিয়মবদ্ধ করিয়া তুলি, তাহাতে আমাদেরই বিপদের আশঙ্কা; অতি-মাত্রায় প্রণালীবদ্ধতার দ্বারা আমরা প্রকৃতির উপক্রমশক্তি এবং অন্তর্বোধ অনুযায়ী নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিবার শক্তি নষ্ট করিয়া দিই। প্রসারশীলতায় ক্ষুণ্ণ বা বঞ্চিত হইয়া নির্জীব ব্যষ্টিসত্তা বাহিরে সুন্দর ও সুডৌল দেখাইলেও ভিতর হইতে ধ্বংস হইয়া যায়। যে বিধি-বিধান আমাদের নিজস্ব নহে অথবা যেটিকে আমাদের সত্য প্রকৃতি নিজের করিয়া লইতে পারে নাই তাহার সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব অপেক্ষা বিপ্লব শ্রেয়। আর সকল দমনমূলক বা নিবারণমূলক নিয়ম হইতেছে কেবল একটা সাময়িক ব্যবস্থা, সত্য নিয়মের একটা অনুকল্প,—সত্য নিয়ম বিকাশ হওয়া চাই ভিতর হইতে, তাহা যেন স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক না হয় পরন্তু তাহার বাহ্য প্রতীক এবং দৃশ্য অভিব্যক্তি হয়। মানব সমাজ উন্নতির পথে প্রকৃতভাবে, জীবন্তভাবে অগ্রসর হয় সেই অনুপাতে যে অনুপাতে নিয়ম হয় স্বাধীনতার সন্তান; সমাজ তার সিদ্ধরূপ লাভ করিবে যখন মানুষ তাহার সহচর মানুষকে জানিতে, আধ্যাত্মভাবে তাহার সহিত এক হইতে শিক্ষা করায় তাহার সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম থাকিবে কেবল তাহার স্ব-নিয়ন্ত্রিত আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার বাহ্য অবয়বরূপে।*

(ক্রমশ)

*The Ideal of Human Unity হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক অনূদিত।

দোটানায়

(সচিত্র)

ব্রিটেন আজ দোটানায় পড়িয়াছে। ইউরোপে একদিকে জার্মানী ও ইটালী ও অন্য দিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিশিষ্ট দলে আবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমোক্ত দলে জাপান যুক্ত, দ্বিতীয় দলে আরও এমন একটি শক্তি প্রয়োজন যাহা পশ্চিমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আপৎকালে সাহায্য করিতে পারিবে, আবার পূর্বে জাপানের প্রভাব ব্যাহত করা যাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়ার দিকেই ব্রিটেনের নজর পড়িল। গত তিন মাস যাবৎ তাই সোভিয়েট রুশিয়াকে দলে ভিড়াইবার জন্য নানারকম চেষ্টা চলিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স, বিশেষভাবে ব্রিটেনের যেমন আগ্রহ দেখা গিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল, এতকালের শত্রু সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেনের বোধ হয় আবার নিজ প্রয়োজনের তাগিদে মিতালী হইয়া যাইবে। এই পত্রে এই মর্মে লেখাও হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, উভয়ের মধ্যে মতভেদ ক্রমশ যেন দুর্লঙ্ঘ্য হইয়াই উঠিতেছে। ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি কয়েক বৎসর আগে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা কিছুতেই তাহার কাজে আসিবে না, যদি-না ব্রিটেন রুশিয়ার সঙ্গে অনুরূপ কোন চুক্তিতে অবিলম্বে আবদ্ধ হইয়া যায়। নিজ কর্মবশে ফ্রান্স আজ একান্তভাবেই ব্রিটেনের হইয়া গিয়াছে! তথাকথিত 'ডিমোক্রাসী' ও তথাকথিত 'ডিক্টেটর' রাষ্ট্রগুলি এমনভাবে দুইটি সুনির্দিষ্ট বিরোধী দলে পরিণত হইতে চলিয়াছে যে, সকলেই আশা করিয়াছিল—সোভিয়েট রুশিয়াকে তথাকথিত 'ডিমোক্রাসী'গুলি নিজ দলে অবিলম্বে টানিয়া লইবে। কিরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থায় পরস্পর মিলিত হইতে পারে তাহা নির্ধারণের জন্য পরস্পরের মধ্যে পত্র বিনিময় ও তাহার নিরিখে আলাপ-আলোচনা খুবই হইয়াছে, এখনও ব্রিটিশ তরফে মিঃ উইলিয়ম ষ্ট্র্যাং মস্কোতে রুশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু ইহার ফলাফল সম্বন্ধে রুশিয়ায় যেমন ঘোর সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের কথায় তাহা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির নিরাপত্তা সম্পর্কেই যে শুধু উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে তাহা নয়, অন্যান্য বিষয়েও বাধা উপস্থিত হইয়াছে। এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের যে তিনটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে কথা উঠিয়াছে তাহাদের নাম লিথুনিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া। পাঠক ইউরোপের মানচিত্র আর একবার স্মরণ করুন। এই তিনটি ছোট রাষ্ট্র বলটিক সাগরতীরে অবস্থিত। একারণ ইহাদিগকে এক কথায় বলটিক রাষ্ট্রনিচয়ও বলা হয়। রুশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে কোনরকমে যুক্ত হইতে গররাজী হওয়া ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অথচ রুশিয়ার পক্ষে তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ ইহারা যদি বিরুদ্ধ পক্ষে যোগদান করে তাহা হইলে সোভিয়েটের নিরাপত্তার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিবে। এস্তোনিয়া হইতে লেনিনগ্রাড অতি নিকটে। তবে রুশিয়া যে ইহাদের একেবারে স্বপক্ষে রাখিতে চায় তাহাও নহে, যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষে যোগদান না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে, ইহাই তাহার কামনা। কিন্তু ঐসব রাষ্ট্রের একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত জার্মানী ও অন্যদিকে বিরাট রুশ-শক্তি। একের সঙ্গে মিলিলে অন্যে চটিবে ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। আবার তাহারা রুশিয়ার সঙ্গে যে যোগরক্ষা করিয়া চলিতে নিতান্তই নারাজ, তাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই যখন সোভিয়েট রুশিয়া ব্রিটিশ-ফরাসী নোটের এই ত্রুটি দেখাইয়া প্রত্যাখ্যান করিল যে, ইহাতে ঐ তিনটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথার উল্লেখ করা হয় নাই, তখন তাহারা খুবই খাপ্পা হইয়া উঠিল। তাহারা বলিল যে, তাহারা সোভিয়েট রুশিয়ার বা অন্য কাহারও নিকট হইতে এমন কোন প্রতিশ্রুতি চাহে না। তথাপি যদি কেহ দায়ে পড়িয়া এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে আসে, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে অভিযান বা আক্রমণকারীর সামিল বলিয়াই গণ্য করিবে। এই রাষ্ট্রত্রয় কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে ইত্যবসরে একটা নিরপেক্ষতামূলক চুক্তি ফাঁদিয়া বসিয়াছে! জার্মানীর দিকেই যে ইহাদের বেশী ঝোঁক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেহ কেহ ইহাদের এই কার্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীকে খুশী না করিয়া ইহারা থাকিতে পারে না, নহিলে ইহাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হইতে পারে। এই তিনটি রাজ্যের লোকসংখ্যা মাত্র আশী লক্ষ, আর্থিক শক্তি ও সামরিক আয়োজনও খুবই সামান্য। কাজেই ঐরূপ বিরাট শক্তির উষ্মার কারণ ইহারা কিছুতেই হইতে পারে না। একথার মধ্যে যে সত্য একেবারে নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এমন আর একটি কথাও শুনা যাইতেছে, যাহাও একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। তাহা এই যে, এই রাষ্ট্রত্রয় তাহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া রুশ-সৈন্য চলাচল করিতে দিতে নারাজ। তাহাদের বিশ্বাস, একবার উহারা ঐ দেশে ঢুকিলে তাহাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, সমুদ্রপথে বাহির হইবার ঘাঁটি একবার আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহা আর ত্যাগ করিতে চাহিবে না। এইরূপ আশঙ্কা অমূলক হইতে পারে, কিন্তু কথা এই যে, তাহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে রুশিয়ার জিদ রুশো-ব্রিটিশ বন্ধুত্বের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে। এই কারণ কি, সাধারণ্যে তেমন ব্যক্ত নাই; আমরা শুধু আন্দাজ করিতে পারিব মাত্র। তবে এই কারণ যে নিতান্তই গুরুতর, তাহাতেও কোনই সন্দেহ নাই। এই কারণের কথা আমরা না জানিতে পারি, বিরুদ্ধ-পক্ষীয়েরা অর্থাৎ ইটালী, জার্মানী ও জাপান খুবই বিশ্বাস জানিতে পারিয়াছে। তাহাদের বর্তমান কার্য-কলাপ ও গতিবিধিতে ইহাই যেন সবিশেষ প্রতীত হইতেছে। ইটালীর রণপোত স্পেন ও আফ্রিকার উপকূলে জিব্রাল্টারের সম্মুখে আনাগোনা করিতেছে, মহড়াও নাকি দিতেছে। জার্মানী উত্তরে নরওয়ে সুইডেনের দিকে যুদ্ধ জাহাজ জড় করিতে সুরু করিয়াছে। আবার শ্লোভাকিয়ার দিকে পোল-সীমান্তেও নাকি বিস্তর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়াগাড়ী ও কামান বন্দুকও প্রেরিত

হিটলার

ষ্টালিন

হইয়াছে। ডক্টর গোয়েবল্‌স্‌ এই বলিয়া ডানজিগ্‌বাসীদের অভয় দিয়াছে যে, শীঘ্রই জার্মানী তাহাদের সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইবে! পূর্বদিকে জাপানের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কতিপয় চীনা আততায়ীকে আশ্রয় দানের ওজুহাতে টিয়েনসিনের ব্রিটিশ ও ফরাসী এলাকা জাপানীরা অবরোধ করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য প্রেরণও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপে প্রকাশ। ইংরেজদের লাঞ্ছনার নাকি অবধি নাই। জাপানীরা মিটমাটের যে সব সর্ত দিয়াছে তাহাও ইংরেজকে ভা[illegible]ইয়া তুলিয়াছে। সর্তগুলির একটি হইল এইরূপ যে, চিয়াংকাইসেককে সাহায্য দানে বিরত থাকিয়া ব্রিটিশকে চীন পুনর্গঠনে জাপানীদের সহযোগিতা করিতে হইবে! ব্রিটিশ এই তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছে না। লণ্ডনে মন্ত্রি-সভার বৈঠক হইতেছে, জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদনেরও কথা উঠিয়াছে। জাপানীদের মনোভাবের কিন্তু কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। তাহারা অবরোধ-কার্য পূর্ণোদ্যমে চালাইয়াছে। এত কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, পূর্ব জানিত তিনটি বিরুদ্ধ শক্তি যখন নানা-ভাবে তাহাদের শক্তির মহড়া দিয়া ব্রিটিশবিরোধী কার্য করিতে লাগিয়া গিয়াছে তখনও এমন কি গুরুতর কারণ থাকিতে পারে যাহার জন্য ব্রিটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে মিলনের বিঘ্ন ঘটা সম্ভব? মিঃ চেম্বারলেনও বলিয়া-ছেন, আগে বলিয়াছি, রুশিয়ার সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। কি বিষয় লইয়া এতাদৃশ গুরুতর মতবিরোধ হইতে পারে?

ব্রিটেন (তথা ফ্রান্স) ও সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহাতো আমরা বহুদিন আগে হইতেই জানি। একে অন্যের গলা টিপিয়া মারিতেও যে একদা কুণ্ঠিত হয় নাই তাহাও আপনারা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। আজ ফাসিজম্‌, নাৎসিজম্‌ এতটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে ও জগতে শান্তি স্বাধীনতার মূলে সজোরে অহরহ আঘাত করিতেছে ব্রিটেন প্রমুখ ধনিক-শাসিত রাষ্ট্রের কম্যুনিজম্‌ তথা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব ও মতবাদকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য ইহাকে আস্‌কারা দিবারই ফলে। যতই দিন যাইতেছে ততই ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। এতাদৃশ প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও নিছক আত্মরক্ষার প্রেরণাবশেই ব্রিটেন সোভিয়েট রুশিয়ার দিকে হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াছে। কিন্তু এই সম্প্রসারিত হস্ত রুশিয়া যেন ধরিয়াও ধরিতেছে না, ছুঁইয়াও ছুঁইতেছে না। ব্রিটেন ত বলিয়াছেই যে, তাহার রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে ঘোর পার্থক্য থাকিলেও বিপৎকালে তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতে কোন আপত্তি নাই, এই সময় কেহ কাহারও রাষ্ট্রব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে না। তবে গুরুতর মতভেদ কোথায় ঘটা সম্ভব? পূর্ব পূর্ব বারে বলিয়াছি, যতই না কেন বিলম্ব হউক, শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও কোনরকম সন্ধি হইয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত এইরূপই হয়ত হইবে। কিন্তু আজ উভয়ের মধ্যে এমন কি মতভেদ উপস্থিত হতে পারে যাহার জন্য বহুজনঈপ্সিত এই সন্ধিসূত্র সম্বন্ধে নৈরাশ্যের উদ্রেক হইতে পারে?

সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকায় (১৮ই জুন, ১৯৩৮) ডবলিউ জি ক্রিভিস্কি নামে রুশিয়ার লাল ফৌজের একজন ভূতপূর্ব সেনাপতির একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ক্রিভিস্কি একদা ষ্টালিনের অন্তরঙ্গ ছিলেন, বর্তমানে তাঁহার কুনজরে পড়িয়াছেন এবং রুশিয়া হইতে পলাইয়া জীবন বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার লেখায় ষ্টালিনের প্রতি যে খানিকটা বিদ্বিষ্টভাব প্রকাশ পাইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব অতিশয়োক্তি বাদ দিয়া আমরা যদি তাঁহার লেখা বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারি। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়ের পূর্বে জার্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে নানা বিষয় সহযোগিতা চলিয়াছিল। হিটলার রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া ক্রমশ সোভিয়েট রুশিয়া হইতে জার্মানীকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ষ্টালিন কিন্তু জার্মান-প্রীতি কখনও ভুলিতে পারেন নাই। হিটলার যতই সোভিয়েটের উপরে 'কায়েন মনসা বাচা' বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিলেন ষ্টালিন ততই তাঁহার তোয়াজ করিয়া জার্মানীর সঙ্গে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইতেছিলেন। সোভিয়েট রুশিয়া যে পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ করে ও জার্মানীর আপাতবিরোধী নানা কার্যে লিপ্ত হয় তাহাও তাহাকে স্বমতে ও স্বপক্ষে আনিবার জন্যই করিয়াছে। ক্রিভিস্কি বলেন, চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া আপৎকালে তাহার সাহায্যে না আসার মূলেও রহিয়াছে ষ্টালিনের একান্তভাবে জার্মানীকে খুসী রাখিবার চেষ্টা। এইজন্য তিনি বলেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ধ্বংসের জন্য অনেকে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনকে দোষেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ষ্টালিনও এইরূপ দোষে দুষ্ট! ক্রিভিস্কির এই কথা পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত বিচলিত হইবেন। কিন্তু তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। রুশিয়ার গুপ্ত বিভাগ ও হালচাল সম্পর্কে তিনি সবিশেষ ওয়াকিবহাল। কাজেই তাঁহার কথা উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেণ্টে যে গুরুতর বাধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ষ্টালিনের এই অতিরিক্ত জার্মান প্রীতি। জার্মানী যখন ব্রিটেনের প্রকৃত শত্রু বলিয়া প্রতীত হইয়াছে সেই সময় এইরূপ দোমনা রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইয়া গুপ্ত কথা ফাঁস করিয়া দেওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নয়। ষ্টালিন সুবিধা পাইয়া হয়ত নানারূপ দর কষাকষিও করিতেছেন। ব্রিটেন তাই ভাবী শত্রুদের সঙ্গেও মিলিতে পারিতেছে না, আবার যাহাকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে তাহার মধ্যেও গলদ দেখিতেছে প্রচুর। সত্যই ব্রিটেন আজ দোটানায় পড়িয়াছে।

২০শে জুন, ১৯৩৯।

দ্রষ্টার চোখে

গান্ধীজীর সম্পর্কে একটা মন্তব্য আজ-কাল যেখানে সেখানে শুনতে পাওয়া যায়। মন্তব্যটি হচ্ছে—গান্ধী অতিশয় একাধিপত্য-প্রিয়। সবাইকে দাবিয়ে রেখে কংগ্রেসে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে থাকতে চান। এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজীর কি বক্তব্য আছে তা জানা ভালো। না জানলে গান্ধীজীর সম্পর্কে আমাদের ধারণায় ভুল থেকে যাবে। বিগত ১০ই জুন তারিখের হরিজনে গান্ধীর Leaders Must Lead শীর্ষক একটা দামী প্রবন্ধ বার হয়েছে। এই প্রবন্ধে গান্ধী লিখেছেন,

"We should never develop the requisite qualities of leadership, unless leaders shoulder responsibility and even dare to commit mistakes in acting contrary to the advice of persons like me."

"নেতৃত্ব করতে হ'লে যে সব গুণ থাকার দরকার—তার বিকাশ অসম্ভব যদি নেতারা দায়িত্ব নিতে কুণ্ঠাবোধ করে—যদি আমাদের মতো লোকের পরামর্শকে উপেক্ষা ক'রে কাজ করতে গিয়ে তাদের ভুল করবার সাহস না থাকে।"

যাকে বলে শৃঙ্খলা, তার প্রয়োজনকে গান্ধী অস্বীকার করেন না। নেতার হুকুমকে নির্বিচারে মানবার মতো সৈনিকের মনোভাব নেই যেখানে সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটতে বাধ্য আর বিশৃঙ্খলা হচ্ছে জয়লাভের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। সব দেশের সেনাপতিরাই এই কথাটা ভালো ক'রে জানেন আর সেই জন্যই নিয়মানুবর্ত্তিতার উপরে এত বেশী তাঁরা জোর দিয়ে থাকেন। গান্ধীজীর বেলাতেও আমরা দেখতে পাই শৃঙ্খলা রক্ষার উপরে তিনি বারম্বার জোর দিয়েছেন। গত ১০ই জুনের হরিজনে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আছে,

"But both in Satyagraha and military warfare the position of the soldier is very nearly the same. He knows no rest, no certainty of movement, the only certainty for him is to face heavy odds and even death. His promise to be under discipline and to obey the general's command applies even during the period of suspension of hostilities.

"সত্যাগ্রহ এবং সশস্ত্র যুদ্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই সৈনিকের কর্ত্তব্য প্রায় একই। বিশ্রাম সে জানে না, কখন কোথায় যেতে হবে—সে কথাও তার কাছে অজ্ঞাত। তার কাছে নিশ্চিত শুধু বিপুল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। যুদ্ধের বিরতির সময়েও সেনাপতির আজ্ঞাধীনে থাকতে সে বাধ্য।"

আমরা জানি, এই নিয়মানুবর্ত্তিতা ভিন্ন লড়ায়ে জয়লাভ করা অসম্ভব। সেনাপতি যিনি—তাঁকে ক্ষেত্র বুঝে মাঝে মাঝে পরিকল্পনার অদল-বদল করতে হয়। একটা হুকুম তিনি দিয়েছেন—শেষ মুহূর্ত্তে সেই হুকুমের পরিবর্ত্তন করা যুদ্ধের সময় কখনো কখনো অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে। সেনাপতি কখন কোন্ দিকে সৈন্য পরিচালনা করবেন—কখন আক্রমণের হুকুম দেবেন—সে কথা জানা থাকে কেবল সেনাপতির। সাধারণ সৈনিক তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। তার কাজ হ'চ্ছে হুকুম মেনে চলা। সেনাপতি কেন এরকম হুকুম দিলেন, কেন অন্যরকম হুকুম দিলেন না—এরকম প্রশ্ন করবার কোনো অধিকার নেই সৈনিকের। সৈনিকের কর্ত্তব্য সম্পর্কে টেনিসন যে কথা লিখেছেন—সে কথা আজও সত্য—সত্যাগ্রহের বেলাতে যেমন সত্য—সশস্ত্র যুদ্ধের বেলাতেও তেমনি সত্য।

'Theirs not to reason why, theirs not to make reply, theirs but to do and die.'

টেনিসনের এই লাইন ক'টি গান্ধীর অতিশয় প্রিয়। কিন্তু পুতুলনাচের পুতুলের মতো একটা জাত তাঁকে না বুঝে তাঁর অনুসরণ করবে—এটাও তিনি চান না।

"But I have not asked for this kind of discipline. I have always tried to carry conviction to my co-workers, to carry their hearts and their reasons with me."

"কিন্তু আমি ঠিক এই রকমের শৃঙ্খলার দাবী করিনি। আমি সব সময়ে চেয়েছি আমার সহকর্ম্মী-দিগকে যুক্তির দ্বারা বোঝাতে, তাদের হৃদয় এবং মগজকে আমার দিকে আনতে।"

কিন্তু যুক্তি যেখানে হার মানে সেখানে সৈনিকেরা কি করবে? সেখানে সৈনিককে সেনাপতির উপরে বিশ্বাস রেখে চলতে হবে। যা কিছু তর্ক-বিতর্ক তা আগেই সেরে নাও। পথের মাঝে বার বার সেনাপতির যোগ্যতা সম্পর্কে যদি সৈনিকের মনে প্রশ্ন জাগে—তবে সেটা জয়ের পথে কেবল অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন উঠেছে দিকে দিকে, চৈতন্যের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম যেমন দেশময় ন্যাড়া-নেড়ীর সৃষ্টি ক'রে জাতির মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল ক'রে দিয়েছে তেমনি গান্ধী-আন্দোলনও অহিংসার উপরে অত্যন্ত বেশী জোর দিতে গিয়ে জাতটাকে ক্লৈব্যের পথে নিয়ে চলেছে। এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী কি বলছেন তা আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। গত ৩১শে মে রাজকোটে কাটিহারের কর্ম্মীদের লক্ষ্য ক'রে যা তিনি বলেছিলেন তার সারমর্ম্ম গত ১৭ই জুনের হরিজনে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীর উক্তির মধ্যে আছেঃ—

"Let no one say when I am gone that I taught the people to be cowards. If you think my ahimsa amounts to that, or leads you to that, you would reject it without hesitation. I would far rather that you died bravely dealing a blow and receiving a blow than died in abject terror. If the ahimsa of my dream is impossible, you can reject the creed rather than carry on the pretence of non-violence."

"আমি যখন চলে যাবো তখন একথা কেউ যেন না বলে, জাতটাকে আমি শিখিয়েছি ভীরু হতে।

তোমরা যদি মনে কর আমার অহিংসা ক্লৈব্যের নামান্তর অথবা জাতটাকে ক'রে তুলবে ভেড়ার জাত, তবে কোনো রকম দ্বিধা না ক'রে অহিংসাকে বর্জ্জন করাই তোমাদের উচিত। কাপুরুষের মতো মরো না। তার চেয়ে ঘুষি দিয়ে এবং ঘুষি খেয়ে যদি মরতে পারো—সে মৃত্যু দেখে আমি খুসী হবো। যে অহিংসার স্বপ্ন দেখছি আমি—অসম্ভব হ'লে তাকে ত্যাগ করা ভালো তবুও অহিংসার মুখোস প'রে থাকা ভালো নয়।"

এই উক্তি থেকে আমরা গান্ধীজীর দুটো মনোভাবের পরিচয় পাই। প্রথমত তিনি কোনোক্রমেই চান না আমাদিগকে তাঁর ছায়ার অথবা প্রতিধ্বনির পর্য্যায়ে ফেলতে। আমরা তাঁর নীতির অনুসরণ করি—এটা অবশ্যই তিনি কামনা করেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন অহিংসা ভিন্ন ভারতের কল্যাণ নেই। কিন্তু অহিংসায় যার বিশ্বাস নেই তাকে কখনোই তিনি বলেন না তাঁর পথের পথিক হ'তে। তাকে তিনি বলেন,

"But if you cannot go with me, do go your own way. If you can reach your goal in any other way, do so by all means. You will deserve my congratulations. For I cannot in any case stand cowardice."

"কিন্তু তোমরা যদি আমার সহযাত্রী হ'তে না পারো, নিজের পথে নিশ্চয়ই তোমরা চলবে। আর কোনো পথে লক্ষ্যস্থলে যদি তোমরা উপনীত হ'তে পারো—সর্ব্বপ্রকারে তা ক'রবে। তোমরা পাবে আমার অভিনন্দন। কারণ কোনো ক্ষেত্রেই ভীরুতাকে আমি সহ্য করতে পারিনে।"

গান্ধীজীর এইসব উক্তি থেকে একটা সিদ্ধান্তে আমরা নিঃসন্দেহে উপনীত হ'তে পারি। কোনো মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়ে অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করুক—এটা তিনি একেবারেই কামনা করেন না। যেখানে আমরা নিজের চোখ দিয়ে দেখিনে, নিজের কান দিয়ে শুনিনে, নিজের মন দিয়ে ভাবিনে সেখানে আমরা মানুষের পর্য্যায় থেকে নেমে গিয়ে বস্তুর পর্য্যায়ভুক্ত হই। গান্ধীজী চান না মানুষ তাঁর ভক্ত হতে গিয়ে ক্রীতদাস হোক। নিরহঙ্কার হওয়া, নম্র হওয়া অবশ্যই ভালো—ক্রীতদাস হওয়া কোন ক্ষেত্রেই তা বলে বাঞ্ছনীয় নয়। গান্ধীজীর কথা থেকে আমরা আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। তিনি চান বীরের ভারতবর্ষ। অহিংসা যদি ভারতবর্ষকে শৌর্য্যের পথে আগিয়ে না দিয়ে তাকে ভীরু ক'রে তোলে—তবে তেমন অহিংসা তাঁর কাছে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। হিংসাকে তিনি পছন্দ করেন না—কিন্তু হিংসার চেয়ে তিনি ঢের বেশী অপছন্দ করেন ভীরুতাকে। In no case do I want to see our people turn into cowards এই হোলো গান্ধীজীর কথা।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ কায়মনবাক্যে অহিংস হবে—এরকম কল্পনা বাস্তবে কখনো মূর্ত্ত হবে কিনা—এমন সন্দেহ করবার অধিকার অবশ্যই আমাদের আছে। হিংসা সর্ব্বক্ষেত্রেই পরিত্যজ্য, সর্ব্বক্ষেত্রেই উহা বর্ব্বরতার লক্ষণ, ধর্ম্মের সহিত উহার চির-বিরোধ হিংসার এইরূপ ব্যাখ্যা কতখানি গ্রহণযোগ্য তাও ভেবে দেখবার কথা। গান্ধীজী অহিংসার যে ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন, তাকে যদি কেউ গোঁড়ামির আখ্যায় আখ্যায়িত করে—চমকে উঠবার কিছু নেই। কিন্তু তাই ব'লে একথা ঠিক নয়, গান্ধীজীর গোঁড়ামির ছায়ায় ভীরুতার কোনো স্থান আছে। ভীরুতা সকল ক্ষেত্রেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ। হিংসার মধ্যে পৌরুষের দীপ্তি থাকতে পারে—ভীরুতার মধ্যে মানব-চরিত্রের অধোগতির পরিচয় ছাড়া আর কিছু নেই।

গান্ধীর বিরুদ্ধে আর একটা প্রচণ্ড অভিযোগ হচ্ছে, তিনি জাতির বৈপ্লবিক উন্মাদনাকে ঠাণ্ডা করে দিতে চান। সুতো আর গুড়, ঢেঁকি-ছাটা চাল আর মরা গরুর চামড়া, ঘানির তেল আর জাঁতাভাঙা ময়দা—এ নিয়ে দেশে কখনো বিপ্লব ঘটানো যায়? গান্ধী দেশীয় রাজ্যগুলিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে জনসাধারণের ক্ষাত্রশক্তিকে ম্লান ক'রে দিয়েছেন। এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজীর বক্তব্য কি —তা জানবার কৌতূহল নিতান্তই স্বাভাবিক। গান্ধীজী বলছেন, দেশীয় রাজ্যে লোকগুলি স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াতে এখনও প্রস্তুত নয়। যুদ্ধের আগুনের মধ্যে অকালে এখন তাদের ঠেলে দিতে গেলে স্বাধীনতার যজ্ঞ পণ্ড হবে। ভালো সওয়ার যে—সে কখনো ক্লান্ত ঘোড়াকে বেশী দূর ছোটায় না। লোকেরা ক্লান্ত। তাদের বিশ্রাম দিতে হবে—গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য তৈরী করতে হবে। যেই তারা তৈরী হবে অধিকতর ত্যাগের জন্য—অমনি বেজে উঠবে রণতূর্য। কিন্তু যেখানে মানুষ মুক্তির চরণতলে সর্ব্বস্ব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে সেখানে তারা কি করবে? গঠনমূলক কাজ নিয়ে থাকবে না মহামরণের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবে? গান্ধী বলছেন,—

"Then I would say to them—Be reduced to ashes.........I would be the last person to cool the zeal and ardour of the people."

"স্বাধীনতার জন্য যদি সর্ব্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত হ'য়ে থাকো—অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে ভস্মীভূত হয়ে যাও। মুক্তির জন্য যেখানে জনসাধারণের চিত্তে উন্মাদনা জেগেছে সেখানে আমি কখনো তাদের নিরুৎসাহ করবো না।"

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের হাতে কংগ্রেসের হাল ছেড়ে দিতে গান্ধীজীর এত কুণ্ঠা কেন—যদি তাঁর মধ্যে একাধিপত্য প্রিয়তার প্রবৃত্তিই না থাকবে? এই অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকাতে 'কংগ্রেস' শীর্ষক প্রবন্ধে যা লিখেছেন এখানে তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই লাইন ক'টি আছে:—

"বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীর মনে একটা বিশেষ সঙ্কল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোনো বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সঙ্কল্পকে ক্ষুণ্ণ করে—এ আশঙ্কা তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এত দিন এত দূর

পর্য্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা ক'রে এনেছেন; সেই চালনার ব্যবস্থাকে শিথিল হ'তে দিতে যদি তিনি শঙ্কিত হন, তা হ'লে বলব না যে সেই আশঙ্কা একাধিপত্য-প্রিয়তার লোভে। প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ মাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকলে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়।"

স্বদেশকে স্বাতন্ত্র্যদানের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী মনে মনে তাঁর পথের যে ম্যাপ এ'কে রেখেছেন—সে পথেই যে স্বরাজ আসবে—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু নিজের জ্ঞান মতো বুদ্ধি মতো কাজের ছক আঁকবার অধিকার সকলেরই আছে। কোন্ পথে অভীষ্ট সিদ্ধি হবে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কিসের পর কি করার প্রয়োজন—এ যার জানা নেই, তার পক্ষে নেতৃত্ব করার আকাঙ্ক্ষা ধৃষ্টতা মাত্র। খুব কম লোকই আছে যাদের মনে লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকে। অধিকাংশ লোক এই জন্যই অপরের পিছনে চলতে পারে—চালক হ'য়ে অন্যদের চালাতে পারে না। গান্ধীজীর জীবনে যত ভুল-ভ্রান্তিই ঘটুক তিনি দিশাহারা হ'য়ে বর্ত্তমানের চূড়ায় চূড়ায় কখনো ভেসে চলেন না। কি তাঁর লক্ষ্য—সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কি কি করা কর্ত্তব্য—তার সম্পর্কে তাঁর মনে একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে দেশটাকে তাঁর পরিকল্পিত পথে তিনি চালিয়ে আসছেন। তাঁর পরিকল্পিত পথ ভিন্ন অন্য পথে স্বরাজ আসবে—এ তিনি বিশ্বাস করেন না। সুতরাং অন্য কেউ যখন এমন পথের নির্দ্দেশ দেন, যার সঙ্গে গান্ধীজীর পথের মিল নেই তখন তিনি স্বভাবতই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন—তাঁর ভয় হয় পাছে ভুল পথে গিয়ে দেশ লক্ষ্য থেকে দূরে চলে যায়। এমন অবস্থায় যাদের পথের সঙ্গে তাঁর পথের মিল নেই তাদের হাতে কংগ্রেসের সারথ্য করবার অধিকার ছেড়ে দিতে তিনি যদি কুণ্ঠিত হন—তবে তাঁকে একাধিপত্য-প্রিয় বলবার কি অধিকার আছে আমাদের? যাদের কর্ম্মপন্থা ও নীতিকে ভুল বলে আমি বিশ্বাস করি—তাদের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব যদি ছেড়ে দিই—তবে আমার ঔদার্য্য কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কালিমায় কলঙ্কিত হবে না? আমার কি অধিকার নেই তাদের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাতে না যায় তার জন্য চেষ্টা করবার? সেই চেষ্টা আমার একাধিপত্য-প্রিয়তার পরিচয় হবে কেন?

কিন্তু কংগ্রেস কি তা হ'লে একজনের ইঙ্গিতে চলবে? যতদিন আর কোনো লোক এসে নূতন কর্ম্মপন্থা দিয়ে দেশের লোককে নিজের দলে টেনে নিতে না পারে ততদিন উপায় কি? গান্ধীতো এমন কথা বলেন নি, আমার কর্ম্মপন্থা ছাড়া আর কোনো কর্ম্মপন্থা নেই। দেশের লোক যদি মনে করে—তিনি ভুল পথে জাতিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন, বেশ তো, কেন তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটবে? নূতন কর্ম্মপন্থা এবং নূতন নীতি তারা আবিষ্কার করুক; কংগ্রেস কারও মৌরশী সম্পত্তি নয়। কংগ্রেসের হালকে হাতে নিয়ে নিজের পথে তাকে চালাবার অধিকার সকলেরই আছে।

আমাদের বিশ্বাস কখনো কখনো গোঁড়ামিতে পর্য্যবসিত হ'য়ে ক্ষতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সে কখন? যখন আমাদের অন্তরের বিশ্বাসকে ঘিরে থাকে আমাদের নানাবিধ প্রবৃত্তি, আমাদের লোভ, আমাদের খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ক্ষমতাপ্রিয়তা। কোনো কিছুতে বিশ্বাস করবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে। আমরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি, গোরুকোটায় এবং চরকা ঘোরানোয় বিশ্বাস করিতে পারি, টিকিতে, দাড়ীতে এবং গান্ধীর ছবির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করতে পারি। এ রকম বিশ্বাস করায় কোনো অপরাধ নেই। অপরাধ হয় তখনই যখন আমার বিশ্বাসের সঙ্গে যাদের বিশ্বাসের মিল নেই—তাদের আমরা ঘৃণা করি—নির্য্যাতন করি। এই ঘৃণার দ্বারা প্রতিবেশীদের মঙ্গলকে আমরা আঘাত করি। যাদের বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র—কেন তাদের আমরা আঘাত দিয়ে থাকি? কারণ রয়েছে চিন্তাধারার অনৈক্যের মধ্যে নয়, আমাদের ভয়ের মধ্যে—পাছে বিপক্ষের দল প্রবল হ'য়ে আমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট ক'রে দেয়।

গান্ধীজীকে আমরা ক্ষমতাপ্রিয় মুসোলিনীর এবং হিটলারের কোঠায় ফেলতে পারতাম, যদি তিনি বিপক্ষ দলকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে রাখবার জন্য দমননীতির আশ্রয় নিতেন—যাদের সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য নেই তাদের ঘৃণা করতেন। সুভাষবাবুর সঙ্গে গান্ধীজীর যে সব পত্রবিনিময় হয়েছে তার মধ্যে সুভাষবাবুর প্রতি তাঁর কি কোনো বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে?

রাজনীতির ক্ষেত্র নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গন নয় যে সেখানে কেবল নাচন-কোঁদন, চোখের জল আর কোলা-কুলির পালা চলবে। তোমার যদি সেই প্রভাব থাকে দেশবাসীর উপরে—কংগ্রেসকে অধিকার কর। তোমার নীতি এবং কর্ম্মপন্থা দিয়ে, তোমার চরিত্রবল এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দেশের হৃদয়কে জয় করবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কিন্তু আমি যদি বুঝি আমার নীতি ও কর্ম্মপন্থা দেশকে কল্যাণের পথে এগিয়ে দেবে এবং তোমার কর্ম্মপন্থা ও নীতিকে অনুসরণ করলে দেশ পিছিয়ে যাবে—কেন রাজনৈতিক তরণীর হাল তোমার হাতে আমি দিতে যাব? তুমি যদি আমার নিকটতম আত্মীয়ও হও—তবুও তোমাকে আমি নেতৃত্ব করতে দেবো না—কারণ তোমার চেয়ে দেশের মঙ্গল আমার অনেক বেশী প্রিয়। না, রাজনীতির জগতে হৃদয় নিয়ে বিলাসিতা করবার কোনো অধিকার নেই। মান-অভিমানের পালা চলবে বাসরঘরে—রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। সেখানে আদর্শের সঙ্গে আদর্শের নিষ্ঠুর সংঘাত। সে আদর্শের কাছে অতি প্রিয়জনের অশ্রুজলও নিতান্তই তুচ্ছ। এতো দাম্পত্য-কলহ নয়, যে চোখের জলের মধ্যে তার অবসান হবে। কোন্ আদর্শ জয়ী হবে—আজকের দিনে তারই চলেছে পরীক্ষা। নিজেকে নত করা যায়, ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আদর্শের জয়ধ্বজাকে তো অবনমিত করা চলে না—তাহ'লে দেশের কল্যাণকে বলি দেওয়া হবে। শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাকে উড্ডীন রাখতে হবে। উদারতার স্থান সামাজিক মেলা-মেশার ক্ষেত্রে—রাজনীতির ক্ষেত্রে উদারতার স্থান নেই। সেখানে মানুষ নিষ্করুণ আদর্শের কাছে আপনাকে বিকিয়ে দিয়েছে।

চাকরীর সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

চাকরী সমস্যায় সুবিচার ও যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, শাসনকার্য্যের সৌকার্য্যের জন্যই চাকরীর সৃষ্টি। সুতরাং যোগ্যতার প্রশ্ন পরিহার করিয়া সুবিচারের দোহাই দিয়া চাকরী বণ্টন করিলে সু-শাসন ত হইবেই না, বরং পদে পদে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার প্রকাশ পাইবে। সুবিচার কথাটা যাঁহারা গালভরা ভাষায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকটা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। কাজের যেখানে বিঘ্ন হইতে পারে, লোকের যেখানে অসুবিধা হইতে পারে, সেখানে সুবিচার কথার কোন অর্থ হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতেছে, কাহার প্রতি সুবিচার করিতে হইবে? সুবিচারের নামে একজন অযোগ্য লোককে উচ্চপদ দিয়া শত শত, সহস্র সহস্র লোকের অসুবিধা সৃষ্টি করা,—সেইটাই ন্যায়সঙ্গত কাজ, না, যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একজন অযোগ্য লোকের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র লোকের সুবিচার ব্যবস্থা করা—সেইটাই সুবিচার ও ন্যায় নীতি? একথা প্রত্যেককে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাতে বহুলোকের সুবিধা হয়, বহু লোকের শান্তি-সুখের ব্যবস্থা হয়, তাহাই সুবিচার, তাহাই ন্যায় নীতি ও তাহাই করণীয় কর্ত্তব্য। এইভাবে চাকরী সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মৌঃ ফজলুল হক সাহেব যাহাকে সুবিচার বলেন, তাহা সুবিচারই নহে, তাহা সুবিচারের নামে ব্যভিচার।

কিন্তু এসব যুক্তি হকপন্থিগণ শুনিবেন না, তাঁহারা চাকরীর একটা সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা চান। ইঁহারা চাকরীর অংশ চান সুবিচারের নামে। ধরিয়া লইলাম তাঁহাদের দাবী যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসম্মত। যোগ্যতা তাঁহাদের কাছে বড় কথা নয়,—সুবিচারই বড় কথা। আমাদের এই বাঙলা দেশে যে সকল সম্প্রদায় বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য চাকরীর সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে,—ইহাই হইল হক্-পন্থীদের নিকট সুবিচারের মানদণ্ড! বেশ ভাল কথা, কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সুবিচার যে চায়, তাহাকে অপরের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে নিজের জন্য সুবিচার চায়, কিন্তু অপরের প্রতি সুবিচার করিতে প্রস্তুত নহে, সে কোনওরূপে সুবিচার পাইবার অধিকারী নহে। সুবিচারের কথা যখন উঠিয়াছে, তখন সকলের প্রতি সমভাবে সুবিচার করিবার কথাই ভাবিতে হইবে। তাহা না হইলে ন্যায়-নীতি ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করা হইবে। এখন দেখা যাক, সুবিচারের আদর্শকে হক সাহেব কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কোয়ালিশন দলের সদস্য মিয়া আব্দুল হাফিজ চাকরী সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, অতঃপর সমুদয় সরকারী চাকরী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হারে বণ্টিত করিতে হইবে। তদনুসারে মুসলমান পাইবে শতকরা ৬০টি তপশীলীজাতি পাইবে শতকরা ২০টি এবং অবশিষ্ট ২০টি চাকরী পাইবে অন্য সম্প্রদায়। যথা—বর্ণ হিন্দু, ভারতীয় খৃষ্টান, এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান, জৈন, বৌদ্ধ। এই প্রস্তাব সরকারের তরফ হইতে উত্থাপিত হয় নাই। হইয়াছে একজন বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক। নিজের নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটার-দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সদস্যগণ যে কোন প্রস্তাব আনিতে পারেন; তাহা বিশেষ আপত্তিকর নহে। কিন্তু এই ধরণের ব্যক্তিগত প্রস্তাবকে সরকার যখন সাগ্রহে লুফিয়া লন, তখনই বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন উঠে। তখনই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সরকার পক্ষ কি সুবিচারের আদর্শে স্থির থাকিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন? এই প্রস্তাব পাশ হইবার পূর্ব্বে সরকারী বণ্টনের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা হঠাৎ পরি-বর্ত্তন করিতে হইলে দেশের চারিদিকে যে একটা হৈ হৈ উপস্থিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। চাকরী বণ্টনে মুসলমান সুবিচার পায় না, অথবা তাহারা যথোপযুক্তভাবে চাকুরী পায় না, এই অজুহাতেই ত মুসলমানের জন্য শতকরা ৬০টি চাকরীর দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু একজনের সুবিচার করিতে গেলে ইহাও দেখিতে হইবে, অপরের প্রতি কোন অবিচার হইতেছে কি না। যদি অবিচার হয়, তবে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে সেরূপ অবিচার ও অন্যায় না হইতে পায়। আর এক কথা, মুসলমানের জন্য কোন্‌টা সুবিচার, আর কোনটা অবিচার, সে মীমাংসার ভার যদি মুসলমানই গ্রহণ করে, তবে ন্যায়-নীতির মানদণ্ড অনুসারে অ-মুসলমানদের বিষয় মীমাংসার ভার সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপরই ছাড়িয়া দিতে হইবে। সত্য বটে, অধিকাংশ মুসলমান শতকরা ৬০টি দাবী সমর্থন করিতেছেন, সেইরূপ অধিকাংশ অ-মুসলমান এই দাবীকে অন্যায়, অসঙ্গত ও অবিচারমূলক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের ভাগে যাহা পড়িয়াছে, তাহাকে অত্যন্ত সামান্য বলিয়া ক্ষোভ করিতেছেন। আইন সভায়, জনসভায়, সংবাদপত্রে ও ব্যক্তিগত-ভাবে বহু লোকের বিবৃতিতেও এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। সুতরাং মিয়া হাফিজ সাহেবের প্রস্তাবে যে অ-মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার প্রস্তাব সুবিচারের নমুনা নহে। মন্ত্রি-মণ্ডল সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ঘোরতর অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুবিচার বলিতে কি বুঝায় সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনই ধারণা নাই।

মুসলমানদিগের জন্য শতকরা ৬০টি চাকরীর দাবী তুলিয়া লীগপন্থিগণ এমন একটি আন্দোলনের মধ্যে দেশ-বাসীকে নিমজ্জিত করিয়াছেন, যাহার পরিণাম মুসলমানের জন্য ভাল হইবে না। দেশের সর্ব্বসাধারণের জন্যও ভাল হইবে না। এই প্রকার দাবী তুলিয়া তাঁহারা যদি কংগ্রেসের শক্তিকে হ্রাস করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে হয়ত তাঁহাদের সে মনস্কামনা কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যদি এরূপ মনে করেন যে, ইহাতে মুসলমানের ভাল হইবে, তবে বলিব তাঁহারা শুধু ভুল করেন নাই, নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছেন।

এইরূপ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থায় মুসলমানের বিশেষ উপকার হইবে না এবং এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপ দেশে এমন এক অশান্তি সৃষ্টি হইবে, যাহার জন্য গাছের ফল হাতের কাছে পাইয়াও তাহার স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই ব্যবস্থা অ-মুসলমানগণ, বিশেষতঃ হিন্দুগণ সহজে মানিয়া লইবেন না এবং ইহার প্রতিক্রিয়া এমনভাবে ফলিতে থাকিবে যে, তাহাতে মুসলমানের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যে হক সাহেবের দাবী ৬০ হইতে ৫০তে নামিয়াছে। হয়ত আরও কিছু নামিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেশের চারিদিকে যে হলাহল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কে এমন নীলকণ্ঠ আছেন যিনি তাহা নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিয়া লইবেন? বস্তুত, শতকরা ৬০-এর দাবী চতুর্দ্দিকে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তৃত করিয়াছে, মুসলমানকে হিন্দু-বিদ্বেষী এবং হিন্দুকে মুসলমান-বিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছে। স্বরাজ, স্বাধীনতা, দেশের মুক্তি, কৃষকের কল্যাণ, প্রজার মঙ্গল; সব আদর্শকে আজ চাকুরীর যুপকাষ্ঠে বলিদান করা হইতেছে।

লীগপন্থীরা অনেকে হয়ত বলিবেন, মুসলমান হিসাবে শতকরা ৬০টি দাবীতে আমার সায় দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একথা আমি দৃঢ়ভাবে বলিব যে, এরূপ অবিচারমূলক দাবী সমর্থন করিতে পারি না। অবিচারের পালটা জবাব অবিচার নহে। সুবিচার দ্বারাই অবিচারের প্রতিকার করিতে হইবে। শতকরা ৬০টি চাকরীর ব্যবস্থা করিলে সেই সুবিচার করা হয় না। নেপোটিজম অর্থাৎ স্বজন-প্রীতি, তোষামোদ ও ঘুষ এই তিনটি দুর্নীতিমূলক নীতির দ্বারা এতাবৎ অধিকাংশ চাকরী বণ্টিত হইয়া আসিতেছে। এই দুর্নীতি দূর হইলে সুবিচার আপনা হইতে আসিবে, অথচ মজার কথা এই যে, এই শ্রেণীর দুর্নীতি দূর করিবার কোনরূপ প্রয়াস না পাইয়া লীগ-পন্থিগণ মনে করিতেছেন যে, সাম্প্রদায়িক হার নির্ণীত হইলেই সকলের প্রতি সুবিচার হইবে। কিন্তু দুর্নীতি বিদ্যমান থাকিতে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় কাহারও প্রতি সুবিচার হইবে না। চাকুরীর অংশ লইবার জন্য আজ যে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, বরাবরই তাহাই উঠিতে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া আমরা সাম্প্রদায়িক হার নির্ণয় নীতি সমর্থন করিব?

এই মাত্র সংবাদপত্রে দেখিলাম, বাঙলা সরকার চাকুরীর হারের আর একদফা সংশোধিত দাবী প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা পঞ্চাশ—পঞ্চাশে সম্মত হইয়াছেন। অর্থাৎ মুসলমান পাইবে পঞ্চাশ আর অ-মুসলমান পাইবে পঞ্চাশ। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বি সি চাটার্জ্জি যে ফরমূলা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এক্ষণে হক সরকার তাহাই গ্রহণ করিলেন। অনেকে হয়ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু আমরা চাকুরীতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা একেবারে পছন্দ করি না। চাকুরীর মধ্যে যে-সব দুর্নীতির প্রাবল্য আছে, ইহাতে তাহা বিদূরিত হইবে না। বরং সেই দুর্নীতি আরও মারাত্মকভাবে প্রকাশ পাইবে। এই ব্যবস্থায়ও যাহাদের চাকরী পাওয়া উচিত, তাহারা হয়ত পাইবে না এবং যাহাদের পাওয়া অনুচিত, তাহারাই পাইবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই হইতেছে চাকুরীর শ্রেষ্ঠতম মানদণ্ড। ইহাতে প্রতিভাবান প্রার্থিগণ বংশ গৌরব না থাকিলেও যথেষ্ট সংখ্যক চাকুরী পাইতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে মনোনয়ন প্রথা অব্যাহত থাকিলে নিম্ন শ্রেণীর লোকের (হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের) চাকুরী পাইবার আশা সুদূরপরাহত হইবে। অথচ প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষাকে হক সরকার কৌশলে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা বলিয়াছেন যে, প্রতিযোগিতা নীতিকে তাঁহারা ক্রমশ গ্রহণ করিবেন, তবুও আমাদের বিশ্বাস হয় না যে, তাহা অচিরে অবলম্বিত হইবে। হাতের মুঠার মধ্যে যে-সব লোক আছে, তাহাদের সন্তান ও আত্মীয়বর্গকে সুবিধাদানের জন্যই কি এই ক্রমশ প্রতিযোগিতার নীতি গৃহীত হইয়াছে? অবিলম্বেই প্রতিযোগিতার নীতি কেন গ্রহণ করা হইল না? যদি তাঁহারা আজ হইতে প্রতিযোগি-তার নীতি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক প্রকার দুর্নীতির অবসান হইয়া যাইবে; কিন্তু সে-দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই!

পঞ্চাশ—পঞ্চাশ নীতিও যে আমরা সমর্থন করি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চাকুরী ব্যাপারে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় ও নীতি বিগর্হিত বলিয়া মনে করি। ইহাতে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা অস্বীকৃত হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার আছে। উহার সুবিধাগুলিকে পাইবার অধিকার সকলের একইভাবে ও সমভাবে থাকা উচিত। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন লোককে ভাগ করিলে জাতীয় সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন এই ভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশের লোকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিলে পরিশেষে দেশেরই ক্ষতি হইবে। যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংখ্যা সবচেয়ে কম তাহারা যদি এই আক্ষেপ করে যে, যোগ্যতা থাকিতেও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ব্যতিরেকে রাজ দরবারে তাহা-দের কোনওরূপ কদর হইবে না, অথচ তাহাদেরই সম্মুখে তাহাদের অপেক্ষা অযোগ্য লোক সংখ্যাধিক্যের দাবীতে রাষ্ট্রীয় সুবিধাগুলি পাইতে থাকিবে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে মানসিক দৈন্য উপস্থিত হইবে। আবার অন্যদিকে অল্প-যোগ্যতার লোকগুলি বিনা আয়াসে সুবিধাগুলি পাইতে থাকিলে তাহাদের মধ্যেও এই প্রকার দীনতার ভাব জাগিবে, তাহারা অধিকতর যোগ্য হইবার চেষ্টা করিবে না। কঠোর পরীক্ষার মধ্যে তাহাদের প্রতিভার বিকাশ হইবে না। এই সব দিক বিবেচনা করিলে প্রত্যেককে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কোন সুবিধা বণ্টন করিলে দেশের ক্ষতি ভিন্ন উপকার হইবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই চাকুরী বণ্টনের একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। ইহাতে নেপোটিজম্, তোষামোদ ও ঘুষ এই তিনপ্রকার দুর্নীতি চিরতরে বিদূরিত হইবে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেদের ইহাতেই বেশী সুবিধা হইবে। আর যোগ্যতম লোকের সহায়তা পাইয়া রাষ্ট্রের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে। স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা এই ভাবেই রক্ষিত হইবে এবং এই ভাবেই দেশ প্রস্তুত হইতে থাকিবে।

অবিচার

(গল্প—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনিলরঞ্জন দত্ত

বিপিনের ঔষধে কোন ফল ফলিল না হারাণের ছেলে মরিল; কিন্তু মরিয়া নিস্তার দিয়া গেল না; হারাণের ভেদ-বমি আরম্ভ হইল। ভুলুয়া কহিল—বাবু, এবার কি হবে? বিপিনও মহা বিপদে পড়িল।

এদিকে দেখিতে দেখিতে আরও দুই চারি ঘরে কলেরা গিয়া প্রবেশ করিল। একে ইহাদের দারিদ্র্য, তাহার উপর এই মহামারী রোগ! সমস্ত পাড়ায় যেন একটা বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। যে যাহার দরজা বন্ধ করিল—ভয়ে কেহই ঘরের বাহির হইতে চায় না। এদিকে বিপিনের প্রতি বিশ্বাসও সকলে হারাইয়া ফেলিতে লাগিল। সবার ধারণা হইল—বিপিন সত্যই দোষী, তাই তাহাকে তাহারা স্থান দেওয়ায় তাহাদের ঘরে এই মহামারী রোগ দেখা দিয়াছে, তদুপরি বিপিনের ঔষধেই হারাণের ছেলে মারা গিয়াছে। পুরুষদের তবু বিপিনের প্রতি যা একটু বিশ্বাস ছিল, মেয়েদের তাহার একটুও রহিল না, বরং যে বাড়ীতে কলেরা প্রবেশ করিয়াছে সে বাড়ীর সংস্কারাবদ্ধ মেয়েরা বিপিনকে দেখিলেই চীৎকার করিয়া কাঁদে, ভয়ে এতটুকু হইয়া যায়।

ক্রমে বিপিনের কানে এসব গিয়া পৌঁছিল—সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিল বেশ, তাহলে আমি আর যাব না। তোদের বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে চাই না—তোরা তোদের বিশ্বাস মত কাজ কর।

শ্রীমন্ত জোড়হস্তে কহিল—আমার এ বিশ্বাস হয় না বাবু, কিন্তু......

বিপিন কষ্টে হাসিয়া কহিল—আমি জানি শ্রীমন্ত, কিন্তু যারা বিশ্বেস করে তাদের বিশ্বাসকে ত অবহেলা করা যায় না।

শ্রীমন্ত কহিল ওদের ভুল বিশ্বাস ভেঙে দিতে হবে বাবু।

বিপিন হাসিল, কহিল—শ্রীমন্ত, ওদের বিশ্বাস যদি ভুলই হয়, তাহলে একদিন ওরা তা' বুঝবেই। আমায় আর বুঝিয়ে দিতে হবে না।

বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল, আকাশ ভরিয়া ঘনঘটা করিয়া আষাঢ় নামিয়া আসিল। ধুলোবালি উড়াইয়া, গাছপালা দুলাইয়া ঝড় বহিল; শুষ্ক, উত্তপ্ত, তৃষ্ণার্ত্ত মাটিতে শীতল বৃষ্টিধারা নামিয়া মাঠে মাঠে আবার সবুজ ঘাস ছাইয়া গেল, গাছে গাছে নূতন কচি পাতা জন্মিল। আবর্জ্জনা ধুইয়া, রোগ বীজাণু দূর হইয়া পৃথিবী এক নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। কিন্তু মহামারী কলেরা প্রতি ঘরে একটা বিয়োগ-ব্যথার যে ছায়া রাখিয়া গেল, ছোটলোকদের মনটাকে ক্ষুব্ধ এবং শোকার্ত্ত করিয়া দিয়া গেল, তাহা আর মুছিল না। বিপিন ছোটলোকদের কাছে আর তেমন সম্মান পাইল না।

শ্রীমন্ত কিন্তু তেমনি আছে, বিপিনকে তেমনি শ্রদ্ধা করে, ব্রজেন ভট্টাচার্য্যকে লাঠি লইয়া মারিতে চায়। বলে—আমরা মরেছি, ওদের জন্যই। কেন ওরা টিউব ওয়েলের জল আমাদের দিলে না? ও জল পেলে আমাদের কখনও এ রোগ হত না।

কিন্তু ভুলুয়া অনেকখানি বদলাইয়াছে, সে বিপিনকে আর শ্রদ্ধা করিতে চায় না, সে বলে—ভট্টাচার্য্য দেবতা, তার কথার অবহেলা করেই আমাদের এ দশা হ'ল। শ্রীমন্ত চল, আমরা তার পা ধরে ক্ষমা চাই গিয়ে।

শ্রীমন্ত রাগিয়া উঠে, বলে—তোদের সখ হয় তোরা যা, কিন্তু আমি পারব না। যারা আমাদের ঘৃণা করে, আমাদের জন্য এতটুকু দয়া মায়া যাদের নেই, তারাই হবে আমাদের দেবতা; তাদেরই পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে? এর চেয়ে মরাও যেন ভাল।

ভুলুয়া শ্রীমন্তকে বুঝাইয়া বলে—ভুল বুঝিস্‌নে, আমরা ত কোন কিছুতে নেই, তবে আমাদের বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ? শ্রীমন্ত এই কথায় বিস্মিত হইয়া ভুলুয়ার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল, ভুলুয়া তুই এতদূর নীচ হয়ে গেছিস্? বিপিনবাবু আমাদের জন্য কি না করেছেন, আর আমরা তার জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পারব না? ভুলুয়া কহিল—তিনি আমাদের কি করেছেন? আমরা যা ছিলাম এখনও ত তাই আছি। বরং...........শ্রীমন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিল—ভুলুয়া। ভুলুয়া কোমলকণ্ঠে কহিল—শ্রীমন্ত, রাগ করিস নে। সমস্ত পাড়া বিপিনবাবুর উপর বিরূপ হয়ে গেছে। সবাই যে স্থির করেছে আজ ভট্টাচার্য্যের কাছে যাবে, তার কাছে ক্ষমা চাইবে। আমরা কেন তবে চুপ করে থাকব? শ্রীমন্ত বিস্মিত হইল, কহিল—সবাই যাবে? কে বললে? ভুলুয়া জানাইল—ভজুয়া, মোহন ওরা সবাই তা বলেছে। চল্‌ আমরাও যাই। শ্রীমন্ত রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—সবাই বলেছে যাবে? ভুলুয়া জবাব দিল—হ্যাঁ। শ্রীমন্ত নিজের ঠোঁটটা কামড়াইয়া ধরিল, কহিল—বেশ, যাক যেতে দে। কিন্তু আমি যাব না, কিছুতেই যাব না—দেখি কি হয়? ভুলুয়া কহিল—কেন তুই যাবিনে, তোর কি না গেলে চলবে? শ্রীমন্ত রাগিয়া কহিল—কারও চলুক বা নাই চলুক, তাতে আমার কি? আমি যাব না।

শ্রীমন্ত গেল না; কিন্তু পাড়ার সমস্ত নরনারী মিলিয়া ভট্টাচার্য্যের কাছে গেল; ব্রজেনের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। ভট্টাচার্য্যের মুখে একটা গর্ব্বের হাসি খেলিয়া গেল, সে কহিল—দেখলি ত হাতে হাতে কেমন ফল পেলি? আমাদের কথা যদি অবহেলা না করতিস্‌ তাহলে কখনও তোদের এ দশা হ'ত না। সবাই এক বাক্যে ভট্টাচার্য্যের কথা সমর্থন করিল, কহিল—আর আমাদের ভুল হবে না বাবুরা। আমরা মূর্খ ছোটলোক না বুঝে ভুল করেছিলাম—আমাদের মাপ করে দিন্‌। ব্রজেন কহিল—মাপ আমরা করেছি—তোদের ওপর কি আমাদের রাগ থাকতে পারে? এবার তাহলে তোরা আর বিপিনের সঙ্গে মেলামেশা করিসনে। সবাই একবাক্যে জানাইল যে, তাহারা আর বিপিনকে আমল দিবে না।

ব্যাপারটা এমনি করিয়া একপ্রকার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ ভট্টাচার্য্য এক সময় জিজ্ঞাসা করিল—আরে শ্রীমন্ত কোথা? ওকে যে দেখছি না? সবার মুখ বিষণ্ণ হইল, ভুলুয়া কহিল—ও আসল না বাবু। ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল—কেন? ভুলুয়া কহিল—ও আসবে না। ভট্টাচার্য্য

বিস্মিত হইয়া কহিল—কেন আসবে না? সবাই আসতে পারল ওর আসতে দোষ কি? ভুলুয়া জানাইল, শ্রীমন্ত বিপিনবে ছাড়বে না। ভট্টাচার্য্য ক্রুর হাসিয়া কহিল—এখনও এত তেজ! তোরা ওকে কিছু বললি না? বিপিনের সংগে মিশতে দিবি? ভুলুয়া অসহায়ের মত কহিল—আমরা কি করব বাবু, ও কি আমাদের কথা শুনবে? ব্রজেন উত্তেজিত হইয়া কহিল,—শুনবে না? কেন শুনবে না? ও একলা কি করবে, তোরা সবাই মিলে জোর করে শোনাবি। যদি না শোনে তাহলে ওকে তোদের সমাজ থেকে দূর করে দিবি। ভুলুয়া কহিল—সে কি করে হয় বাবু? ভট্টাচার্য্য রাগিয়া কহিল—সে কি করে হয় মানে? সবাই যা পারল, ও তা পারবে না কেন—ওর এত তেজ কেন? ব্রজেন দৃঢ়স্বরে কহিল ওকে তোদের শাস্তি দিতে হবে। সবাই অধোবদনে নীরব রহিল।

ভট্টাচার্য্য কহিল—আচ্ছা যা তাহলে—মনে থাকে যেন। ভুলুয়া তুই একটু পরে যাস্।

সবাই চলিয়া গেল, ভুলুয়া কহিল—কিছু করতে হবে কি বাবু? ভট্টাচার্য্য হাসিল, কহিল,—হ্যাঁ, করতে হবে, কিন্তু পারবি ত? ভুলুয়া বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি কাজ বাবু? আমরা ছোটলোক, আমরা করতে পারব না এমন কাজ কি আছে? ব্রজেন হাসিল, ভট্টাচার্য্য কহিল,—পারবি ত দেখিস্? ভুলুয়া কহিল, বলুন না বাবু, ইতস্তত করছেন কেন?

ব্রজেন চুপি চুপি কহিল—বিপ্‌নেকে শাস্তি দিতে হবে শিক্ষা দিতে হবে—পারবি না? ভট্টাচার্য্য কহিল,—তোদের যে ক্ষতি ও করেছে, যে ব্যথা দিয়েছে, তার শোধ তোরা নিবি নে এমনি এমনি ছেড়ে দিবি? লোকে যে তাহলে তোদের কাপুরুষ বলবে। ভুলুয়া কহিল—কেমন করে শাস্তি দেব বাবু, শাস্তি কি আমরা দিতে পারি? তিনি যদি অন্যায় করে থাকেন তাহলে আপনিই তার শাস্তি ভোগ করবেন। ভট্টাচার্য্য হাসিল কহিল—ওসব কথা বুঝি বিপ্‌নে বলত। ওটা একটা কাপুরুষ। ওকি একটা কথার কথা হ'ল? চোর আমার ঘর থেকে সব চুরি করে নিচ্ছে, আর আমি বুঝি তাকে ধরে জেলে পুরব না? এই বলে বুঝি নিশ্চিন্ত থাকব যে, চুরি করে চোর একদিন শাস্তি পাবেই—আমি কেন ওকে ধরে জেলে পুরি? ব্রজেন কহিল, যারা কাপুরুষ তারাই চোরকে ভয় করে, শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে না। ভুলুয়া স্বীকার করিয়া কহিল—তা' সত্যি বাবু। ভট্টাচার্য্য খুশী হইয়া কহিল—তাহলে বিপ্‌নেকে শাস্তি দেয়া কি তোদের উচিত নয়? ভুলুয়া কহিল—ত উচিত বৈ কি! ব্রজেন উৎসাহিত হইয়া কহিল—তাহলে সব বুঝে চুপ করে বসে আছিস্ কেন? কাজে লেগে যা। ভট্টাচার্য্য অথবা ব্রজেন যত সহজে কথাগুলি বলিল, ভুলুয়া কিন্তু তত সহজে গ্রহণ করিতে পারিল না, তাই সে চিন্তিত হইয়া কহিল—ও সব ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বাবু? তার চাইতে এবার থেকে না হয় আমরা সাবধান হ'ব। ভট্টাচার্য্য গম্ভীর হইয়া কহিল—শেষে এই বুঝলি? ভুলুয়া কাতর কণ্ঠে কহিল—বাবু, অপরাধ নেবেন না। ব্রজেন রাগিয়া উঠিল কহিল—না, রাগ করব না। তোদের ভালর জন্যই বলেছিলাম মুখে শুধু বড়াই করতেই জানিস্। কোন কাজের সময় অষ্টরম্ভা। ভুলুয়া কহিল—বাবু, রাগ করবেন না। ভট্টাচার্য্য কহিল—না, রাগ করবে না। তোদের ভালর জন্যই বলেছিলাম, তা আমাদের কথা ত শুনবি নে। শেষে একটা বিপদ ঘটলে ত আবার ছুটে আসিস্ আমাদের কাছে। বিপদের কথায় ভুলুয়ার সংস্কারাবদ্ধ মন টলিয়া উঠিল, সে ভীত হইয়া কহিল—না, না বাবু, আপনার কথাই শুনব হুকুম করুন। ব্রজেন-ভট্টাচার্য্য মিলিয়া ভুলুয়াকে কি করিতে হইবে তাহারই পরামর্শ দিল। ভুলুয়া ভট্টাচার্য্যের পরামর্শ শুনিয়া প্রথমত ভীত এবং বিস্মিত হইল, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের রাগে এবং উত্তেজনা-পূর্ণ বাক্যে তাঁহার পরামর্শ মত কাজ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়া চিন্তিতমুখে বাড়ী ফিরিল।

রাত্রি গভীর। সমস্ত গ্রাম নিদ্রায় সুপ্ত; কোথায়ও টুঁ শব্দটি নাই। রাত্রি অন্ধকারময়, শান্ত। ভুলুয়া সেই নিস্তব্ধ, সুপ্ত গ্রামের নির্জ্জন পথে একা নিদ্রাহীন। তাহার চোখে মুখে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া। গ্রামের নির্জ্জন রাস্তা দিয়া সে অতি সন্তর্পণে হাঁটিতেছে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে মনে হইতেছে; তাহার মন অস্থির, সেখানে যেন কিসের একটা বিক্ষোভ জাগিয়াছে। ভুলুয়া আসিয়া বিপিনের বাড়ীর কাছে দাঁড়াইল, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলি সেই নিস্তব্ধতাময় অন্ধকার রাত্রিতে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে, বিপিনের ছোট্ট কুঁড়ে তাহাদেরই ভয়ে যেন সঙ্কুচিত। ভুলুয়া সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্সটা বাহির করিতে যে শব্দ হইল, তাহাতেই চমকাইয়া উঠিল—ভয়ে বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে ভুলুয়া একটা কাঠি জ্বালাইল; তারপর হঠাৎ জ্বলন্ত কাঠিটা বিপিনের খড়ো ঘরের চালে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মুহূর্ত্তেই শুষ্ক খড় জ্বলিয়া উঠিল; দাউ দাউ করিয়া অগ্নির লেলিহান শিখা যেন তাহার ক্ষুধার্ত্ত জিহ্বা বাহির করিয়া সমস্ত ঘর গ্রাস করিতে লাগিল। রাত্রির সেই নির্জ্জন অন্ধকারে অগ্নির সেই ভয়ংকর মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলুয়া চোখ বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর হঠাৎ দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, ছুটিয়া বিপিনের ঘরে ঢুকিল; সবাইকে টানিয়া ডাকিয়া উঠাইতে লাগিল, কহিল—বাবু, ঘরে আগুন লেগেছে উঠুন, শীগ্‌গির বাইরে যান। আমি সব রক্ষা করে আনছি।

সবাই ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু ভুলুয়াকে আর দেখা গেল না। ঘর পুড়িয়া শেষ হইল, আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিল, কিন্তু ভুলুয়া কিছু বাহির করিয়া আনিল না, নিজেও বাহির হইয়া আসিল না,—ভুলুয়া পুড়িয়া মরিল।

পরদিন সমস্ত গ্রামের লোক আসিয়া জড় হইল—বিপিন, কল্যাণী, বিপ্লব, ও অগ্নি একটা গাছের গোড়ায় চিন্তিত এবং বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছে—বিপিনের চোখ দুইটা ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে।

ভট্টাচার্য্য ব্রজেন প্রভৃতি আসিল; দূর হইতে দেখিয়া বিপিনকে বিদ্রূপ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিল—কিহে বিপিন ঘর পুড়ল কেমন করে? ব্রজেন কহিল—আরে ধর্ম্মের ঢাক যে বেজে উঠেছে, ঘর পুড়বে না? ভট্টাচার্য্য হাসিয়া কহিল—এবার কি করবে শুনি?

শ্রীমন্ত খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল, কহিল, বাবু, কে আপনার এ দশা করল আমায় একবার বলুন আমি তাকে দেখে নেব। বিপিন ম্লান হাসিয়া কহিল—শ্রীমন্ত, উত্তেজিত হ'য়ো না। দোষ যে করেছে সে কি শাস্তি না পেয়েই নিস্তার পাবে? ভুলুয়া আগুনে পুড়ে মরেছে। শ্রীমন্ত বিস্মিত হইল, কহিল—ভুলুয়া আগুনে পুড়ে মরেছে? কি বলছেন বাবু, এত রাত্রে ও এখানে এসেছিল কি করতে, আর আগুনে পুড়ে ও মরতে যাবে কেন? বিপিন কহিল—এও বুঝলে না শ্রীমন্ত? পাপের শাস্তি চিরদিন এমনি করেই হয়ে থাকে। ভুলুয়া একটা মস্ত ভুলকে সত্য বলে ধরতে গিয়েই না এমনি করে পুড়ে মরল। শ্রীমন্ত আরও বিস্মিত হইয়া কহিল—ভুলুয়া এ কাজ করেছে? কি বলছেন বাবু, ভুলুয়ার এতদূর অবনতি হ'য়েছিল? বিপিন ম্লান হাসিয়া অন্য কথা পাড়িল, কহিল—শ্রীমন্ত, আমি না হয় এখানে থাকতে পারি; কিন্তু ওরাও কি গৃহস্থের কুলবধূ হয়ে দিনের বেলা এমনি গাছের তলে বসে থাকবে? বাবুরা ত আমাদের স্থান দেবে না? তুমিও কি শুধু এমনি দেখেই চলে যাবে? শ্রীমন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল—ছি ছি বাবু সে কি কথা? আপনি আমার দেবতা, আপনার জন্য আমি কি না করতে পারি? বিপিন ম্লান হাসিয়া কহিল—না, না আমায় অতবড় করে দেখ না—তাহলে ভুল হবে। আমি দেবতা নই, আমি মানুষ, তোমাদেরই মত। শ্রীমন্ত কহিল—বাবু, আপনাদের আমার ঘরে নিতে পারব এ কি আমার কম সৌভাগ্য! আমার ঘর শূন্য, আজ আপনাদের জন্য আবার হেসে উঠবে।

কল্যাণী প্রভৃতিকে নিয়া শ্রীমন্ত গ্রামের দিকে যাইতেছে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিল,—ওরা যায় কোথা? ব্রজেন ব্যস্ত হইয়া কহিল—আবার আমাদের বাড়ী নিয়ে না যায়; যাই দেখি গে। ভট্টাচার্য্য কহিল—সাবধান ব্রজেন, ও কাজও ক'র না। ব্রজেন ফিরিয়া চাহিয়া হাসিল, কহিল—ব্রজেনকে কি এতই কাঁচা মনে করেন ভট্টাচার্য্য মশাই। ভট্টাচার্য্য মাথা নাড়িয়া হাসিল। ব্রজেন ফিরিয়া আসিয়া গর্ব্ব-ভরে কহিল—ব্রজেন ঘোষের বাড়ী যাবার সাহস কি আছে যে যাবে? ভট্টাচার্য্য বিস্মিত চোখে কহিল—তবে গেল কোথা? ব্রজেন তাচ্ছিল্যভরে কহিল—যাবে আবার কোথা? যেমন মানুষ তেমন ঘরে ত স্ত্রীকে পাঠাবে? গেছে শ্রীমন্তর বাড়ী। ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিল—বল কি! শ্রীমন্তর বাড়ী? ব্রজেন মাথা নাড়িয়া হাসিল, ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত হইয়া কহিল—এ ত ভাল কথা নয়। চল ত দেখি গিয়ে কিছু করা যায় কি না! ব্রজেন ভট্টাচার্য্যের কথায় বিস্মিত হইল, কহিল—কি করবেন, ওদের ঘরে তুলে আনবেন? ভট্টাচার্য্য হাসিয়া ব্রজেনের দিকে চাহিল, কহিল—দেখি কি করা যায়!

অনেক বেলায় যখন বিপিন শ্রীমন্তের বাড়ী ফিরিল তখন শ্রীমন্তের বাড়ীর অঙ্গনে আসিয়া পাড়ার সমস্ত লোক জমা হইয়াছে। তাহারা উত্তেজিত হইয়া শ্রীমন্তকে কি সব বলিতেছে। বিপিন বিস্মিত হইয়া সম্মুখে আগাইয়া গেল, কহিল—ব্যাপার কি? কি হয়েছে এখানে? ভিড়ের মধ্য হইতে একজন কহিল—হয়েছে তোমার মুণ্ডু। আর একজন কহিল—এই ত বিপনে এসেছে। বিপিন সে সকল শুনিল, কহিল—তোমরা আমায় মারতে চাও? একরাশ কণ্ঠস্বর চীৎকার করিয়া উঠিল—শ্রীমন্তর বাড়ী ছেড়ে দাও, নইলে ভাল হবে না। বিপিন দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—শ্রীমন্তর বাড়ীর উপর শ্রীমন্তর চাইতে তোমাদের অধিকার বেশী না কি যে তোমরা এ হুকুম করছ? ভিড়ের মধ্য হইতে মোহন আগাইয়া আসিল, কহিল—তুমি বেরিয়ে যাবে কি না তাই আমরা জানতে চাই। বিপিন মোহনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, কহিল—মোহন! কিন্তু বিপিন কিছু বলিবার আগেই শ্রীমন্ত ছুটিয়া আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল, দৃঢ়স্বরে কহিল—না, যাবে না, তোরা কি করবি শুনি? মোহন শ্রীমন্তর আকস্মিক এই জবাবে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তাই সে একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। শেষে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ভজুয়ার দিকে চাহিল, ভজুয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল—তোকে কিছু বলছি না শ্রীমন্ত, তুই চুপ কর। শ্রীমন্ত হাসিল, কহিল—আমায় বলিস নি, কিন্তু বলেছিস্ আমার দেবতাকে। মোহন কহিল—এখনও তোর ভুল ভাঙল না শ্রীমন্ত? ওকে বাঁচাতে গিয়ে ভুলুয়া মরল, আমরা মরতে বসেছি, তবু আমাদের শিক্ষা হ'ল না? শ্রীমন্ত হাসিল, কহিল—ভুলুয়া বাঁচাতে গিয়ে মরেনি, মারতে গিয়ে মরেছে। আজ তোরাও মারতে এসেছিস, কিন্তু আমি থাকতে যে কেউ মারতে গেছিস সেই মরবি। ভজুয়া দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—অর্থাৎ তুই আমাদের কথা রাখবিনে। শ্রীমন্ত কহিল, না রাখব না। যদি তোদের ক্ষমতা থাকে, তবে আমার বাধা দিস্। বাবু, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, ভেতরে চলুন। শ্রীমন্ত বিপিনকে ডাকিয়া ভিতরে নিতে গেল, কিন্তু সবাই মিলিয়া শ্রীমন্তকে ঘিরিয়া ধরিল, মোহন তাহার হাতটা ধরিয়া কহিল—শ্রীমন্ত এখনও সময় আছে, আমাদের কথা শোন্। শ্রীমন্ত হাতটা ছিটকাইয়া ছাড়াইয়া নিয়া কহিল—হাত ছাড় মোহন। ভজুয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল—শ্রীমন্ত, অত তেজ ভাল নয়। শ্রীমন্ত রাগিয়া উঠিল, কহিল—তোমাদেরও অত সাহস ভাল নয়। শ্রীমন্ত দাসকে ভুলে গেছিস্? বিপিন বাধা দিয়া কহিল—ছি, শ্রীমন্ত, নিজেদের মধ্যে এমনভাবে মারামারি করাটা কি ভাল? আমি না হয়..... শ্রীমন্তের চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, সে দৃঢ়স্বরে কহিল—না, বাবু আমি এদের শিক্ষা দিতে চাই, পাপীকে ক্ষমা করলে কখনও মঙ্গল হয় না। মোহন বিদ্রূপ করিয়া কহিল শিক্ষা দিবি? কাকে? কি শিক্ষা? এই বিদ্রূপে শ্রীমন্তের বিশাল অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, সে কহিল, দেখবি কি শিক্ষা? বেশ, তাই দেখ। বলিয়া শ্রীমন্ত মোহনকে এক চপেটাঘাতে মাটিতে ফেলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, সমস্ত জনতা মিলিয়া শ্রীমন্তকে একসঙ্গে আক্রমণ করিল। বিপিন দেখিল, শ্রীমন্ত এই বিরাট জনব্যূহের মধ্যে সম্পূর্ণ একা, তাহার হাতে একটা লাঠি পর্য্যন্ত নাই। অনেকদিন পর বিপিন আজ আবার ঘর হইতে লাঠি হাতে লইয়া ছুটিয়া আসিল, কহিল—শ্রীমন্ত তোর ভয় নেই, আমি আছি। বিপিন লাঠি হস্তে সেই বিরাট

(শেষাংশ ৪৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাঠশালায় শিক্ষাদান

(আলোচনা)

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'দেশের' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৬ সাল) শনিবারের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস লিখিত "পাঠশালায় শিক্ষাদান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

পূর্ব্বে পাঠশালায় শিক্ষাদানের যে ধারা বা পদ্ধতি ছিল, বর্ত্তমানে তাহার খুব বেশী পরিবর্তন না হইলেও, কিছুটা পরিবর্ত্তন হয় নাই একথা বলা চলে না। উপযুক্ত শিক্ষক গড়িয়া তোলার জন্য নর্ম্যাল ও গুরু-ট্রেনিং স্কুলে যথেষ্ট অর্থব্যয় হয় সত্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তদনুযায়ী ফললাভ হয় না, বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রত্যেক প্রকার শিক্ষারই এক একটি সার্থকতা আছে।

ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকেরাও কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষালব্ধ সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে পারেন না সত্য এবং তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। ট্রেনিংএ থাকিতে একজন শিক্ষককে একসঙ্গে মাত্র একটি বা দুইটি শ্রেণীতে শিক্ষাদান করিতে হয়; শিক্ষাদানের উপকরণের কোন অভাব হয় না; অধিকন্তু একদিনে হয়ত মাত্র একটি পাঠ-দান করিতে হয়, কাজেই তাঁহারা আদর্শ পাঠ-দানের জন্য নোট লিখিয়া আনিতে পারেন এবং তদনুযায়ী পাঠ-দানও করিতে পারেন। পাঠশালায় শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাদিগকে যে "কিণ্ডার-গার্টেন" পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করাও তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হয় না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া একজন শিক্ষককে হয়ত একসঙ্গে চারিটি শ্রেণীর পড়া লইতে হয় এবং ছাত্র-সংখ্যাও থাকে ৭০।৮০; তদুপরি নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণও তাঁহারা সংস্থান করিতে পারেন না। ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষকের বিশ্রাম থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীতে হয়ত বা বিভিন্ন প্রকৃতির শতাধিক চঞ্চলমতি ছাত্রকে পড়াইয়া যাইতে হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, একজন শিক্ষক একদিনে চারিটি শ্রেণীতে পাঁচটি করিয়া বিষয় শিক্ষা দিয়া মোট ২০টি পাঠ দান করেন। বৎসরের পর বৎসর তাঁহার এইরূপেই কাটিয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন শিক্ষকের পক্ষে ২০টি করিয়া নোট লিখিয়া আনা কিংবা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইতে পারে না। অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও কোন কর্ম্মঠ ব্যক্তির পক্ষেই এত সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাল্পনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কার্য্যত প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। Theoritical method-গুলি Practically প্রয়োগ করা হইতেছে না বলিয়া শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মী নাই একথা বলা চলে না। উপযুক্ত ও উর্ব্বর ক্ষেত্র না হইলে কেবলমাত্র সুপুষ্ট ও সুপক্ক বীজ দ্বারা কি আশানুরূপ সুফল লাভ হয়? শিক্ষাবিভাগে বা পাঠশালার গুরুমহাশয়দের মধ্যে অকর্ম্মা নাই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মঠ ব্যক্তির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষালব্ধ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর না হইলেও এই শিক্ষার সার্থকতা আছে। নর্ম্যাল স্কুল হইতে শিক্ষাদান ব্যাপারে যে সাধারণ জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানই প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট মহামূল্যবান এবং শিক্ষাদান ব্যাপারে ইহা অপরিহার্য্য।

বিশ্বেশ্বরবাবু যে রূপ দিয়া বিদ্যালয়ের ও গুরুমহাশয়ের ছবি আঁকিয়াছেন, বর্ত্তমানকালের সঙ্গে তাহার বিশেষ সামঞ্জস্য নাই; আজকাল বেত্রাঘাত অবৈধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেতের সাহায্যে জোর-জুলুম করিয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। হয়ত বা বিশ্বেশ্বরবাবু অঙ্কিত শিক্ষক বা বিদ্যালয় দুই-একটি এখনও আছে; কিন্তু এইগুলির উপর নির্ভর করিয়া সমষ্টিগত ভাবে কিছু বলা চলে না।

লেখক দরিদ্র গুরুমহাশয়গণকে যে সকল যুক্তি দ্বারা দোষী স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সমস্তগুলির আলোচনা করা প্রবন্ধের দীর্ঘতার ভয়ে ত্যাগ করিয়া গেলেও উপসংহারে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন—"যদি দরিদ্র গুরুমহাশয়ের আর্থিক চিন্তা হেতু শিক্ষাদান কার্য্যে তত মন না বসে, তবে চিন্তার মধ্য দিয়ে তন্দ্রার ভাব আসে কি করে? যদি বাস্তবিক সেই রকম কোনও চিন্তার কারণ থাকত, তবে নিশ্চয়ই তন্দ্রা বা বসন্তের মাদকতায় তাঁকে আক্রমণ করতে পারত না।"

তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—শিক্ষকদের কোন অভাব নাই, চিন্তা নাই, তাই তাঁহারা প্রায়ই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়েন এবং এইজন্যই তাঁহাদের মধ্যে বসন্তের মাদকতা পরিলক্ষিত হয়। বসন্তের মাদকতা কি জানি না; চিন্তা ও অভাব থাকিলেই কি মানুষের পক্ষে তন্দ্রাভিভূত হওয়া অসম্ভব? আত্মীয় বিয়োগ, কন্যার বিবাহ-সমস্যা কিংবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুশ্চিন্তা লইয়াও কি মানুষকে ঘুমাইতে দেখা যায় না? নিদ্রা, ক্ষুধা প্রভৃতি স্বাভাবিক জিনিষের প্রভাব হইতে সাধারণ মানুষ অব্যাহতি পায় কি? বরং চিন্তা ও অবসন্নতা হইতেই তন্দ্রার ভাব আসে। দেহতত্ত্বানুসারে হয়ত আরও অনেক কারণ আছে, কাজেই যে ঘুমায় তাহার কোন চিন্তা নাই, অভাব নাই একনিশ্বাসে তাহা বলা যায় কিরূপে!

"বার টাকায় পৃথিবী ঘুরে না" বলিয়া তিনি যে কৌতুকময় গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সুদূর প্রবাস হইতে আমরা শুনিয়াছি, আমাদের প্রপিতামহেরাও শুনিয়াছিলেন; ইহার কি কোন যৌক্তিকতা আছে? আজকালকার সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় এইরূপ কত কাল্পনিক 'চুট্‌কি" গল্প দেখা যায়, পাঠকবর্গকে আনন্দদান ব্যতীত এইগুলির অন্য কোন সার্থকতা আছে কি?

মোটের উপর বিশ্বেশ্বরবাবুর লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে, পাঠশালার শিক্ষকদের উপর একটি অবজ্ঞার ভাব পরিস্ফুট হয়। তাঁহার প্রবন্ধে কোন নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির উল্লেখ দেখিলাম

পাঠশালার শিক্ষকগণের ইউরোপীয় শিক্ষা বিজ্ঞানানুসারে যত ত্রুটিই থাকুক না কেন—সমাজের জন্য, দেশের জন্য, তাঁহাদের দান অতুলনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা দেশবাসীর নিকট হইতে কি অর্থ, কি সম্মান কিছুই পান না।

দেশের সুশিক্ষার উন্নতি, তথা জাতির মঙ্গল কামনায় কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। শিক্ষা-বিভ্রাটের এই সন্ধিক্ষণে Theoritical যুক্তির কোন সার্থকতা নাই, Practically যাহা সম্ভব তাহারই আবিষ্কার করিতে হইবে।

না। তিনি যেগুলি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সবগুলিই ট্রেনিং স্কুল ও নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার তিনিই প্রবন্ধের প্রথমাংশে লিখিয়াছেন, ট্রেনিং স্কুলগুলির বিশেষ সার্থকতা নাই

আমাদের দেশে শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইতেছে না সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কি কেবল শিক্ষকেরাই দায়ী? অভিভাবক, সমাজ, শিক্ষা বিভাগ এবং দেশের বর্তমান আবহাওয়া কি তজ্জন্য মোটেই দায়ী নয়?

অবিচার

(৪৬৫ পৃষ্ঠার পর)

জনব্যূহের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। তাহার বলিষ্ঠ হস্তে লাঠি যেন তীরের মত বিদ্যুৎগতিতে ঘুরিতে লাগিল। কেহই সেই তেজোময় ঘূর্ণিচক্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, সেই বিরাট জনব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা পলাইল, তাহারা বাঁচিল, যাহারা পলাইবার সময় পাইল না, তাহারা আহত হইল। শ্রীমন্তর একটা হাত ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীমন্ত তাহাতে দুঃখিত নয়, সে তৃপ্তির সঙ্গে কহিল—বাবু, আপনি সত্যি একজন বড় লাঠিয়াল। বিপিন ম্লানমুখে কহিল—মারামারি করাটা উচিত হয় নি শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত কহিল—কেন উচিত হয়নি বাবু, আপনাদের এমনি এমনি ওদের কথায় ঘরের বার করে দেব? আপনি আমার ঘরে এসেছেন—এ আমার কত সৌভাগ্য—তাকে আমি দূরে করে দেব কোন্ অধিকারে? বিপিন ম্লানমুখে অনেকক্ষণ নীরব রহিল, তারপর আস্তে আস্তে কহিল—এবার আমায় বিদায় দাও শ্রীমন্ত, আমি ত আর এখানে থাকতে পারি না। শ্রীমন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন? এখন আবার যাবেন কেন? এখন ত সব চুকে গেছে। বিপিন শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, এক গ্রামে দলাদলি থাকাটা কি ভাল? শ্রীমন্ত আমায় নিয়েই ত তোমাদের দলাদলি, আমি চলে যাই দেখবে তোমরা আবার এক হয়ে যাবে, কিন্তু আমি থাকলে যে আর তা হবে না। শ্রীমন্ত দৃঢ়স্বরে কহিল—আমি ওদের সঙ্গে মিশতে চাই না বাবু, আমি আপনাকে চাই, আপনি যেতে পারবেন না। বিপিন কহিল—শ্রীমন্ত, তুমি শুধু আমায় চাও, কিন্তু আর ত কেউ চায় না। আমি চেয়েছিলাম শান্তির ভেতর দিয়ে তোমাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে, কিন্তু আমার সে আশা সফল হ'ল কৈ? আমায় ত সবাই ভুল বুঝলে। শ্রীমন্ত কহিল—আমি ত চাই, আপনি আমার কাছেই থাকবেন, ওদের সঙ্গে আমাদের না মিশলে কি হবে; আমরা ওদের চাই নে। বিপিন ম্লান হাসিয়া কহিল—শ্রীমন্ত, ও ত নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা হ'ল। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে পরের উপকারই যদি না করতে পারলে, নিজের স্বার্থটাকেই যদি বড় করে দেখলে তাহলে মানুষ হলে কোথা? হঠাৎ বিপিনের এই কথার কোন জবাবই শ্রীমন্ত খুঁজিয়া পাইল না, তাহার চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, তারপর এক সময় সে উত্তেজিত হইয়া কহিল—আমি মানুষ হ'তে চাই না বাবু। আপনি আমায় ছেড়ে যাবেন না। আমি ছোটলোক, ছোটলোকই থাকব।

বিপিন সান্ত্বনা দিয়া কহিল—ছি শ্রীমন্ত, তোমার অমন অধীর হওয়া শোভা পায় না। তুমি কর্ম্মবীর, তুমি কাজ করবে। শ্রীমন্ত চোখের জল মুছিল, কহিল—বাবু, তাহলে আপনি সত্যি চলে যাবেন? বিপিন কহিল—হ্যাঁ, শ্রীমন্ত, আমায় যেতেই হবে। তোমায় রেখে গেলাম—তুমি এদের যা শিক্ষা দিতে পারবে, আমি তা' পারব না। আমি এদের, বাহিরে থেকে দেখেছি, তাই আজ আমায় বিদায় নিতে হ'ল।

—শেষ—

মিথ্যার জের

(গল্প)

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার

'তুমি কি কিছু দেখতে পাও না?'

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে উত্তর দেয়—'কি সুরো, কি দেখতে পাইনে?' সুরমা বালিশের সঙ্গে মুখ গুঁজে বলে—'আমাদের নিয়ে সংসারে যে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে।' শশাঙ্কের কাছে সমস্তই যায় জলের মত পরিষ্কার হয়ে। সে সবই জানে। তবু সুরমার প্রাণে আঘাত লাগবে বলে সে মুখ ফুটে সংসারের কোন কথা সুরমাকে বলে না। সে বুঝতে পারে যে, তাকে নিয়ে সংসারে একটা ছোট্ট মেঘের সৃষ্টি হয়েছে। না জানি কখন জল নেমে পড়ে সেই আশঙ্কায় শশাঙ্ক চুপ করে থাকে। মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে শশাঙ্ক একটা ছোট্ট উত্তর দেয়,—'ও।' কিছুক্ষণ চুপ করে শশাঙ্ক আবার বলে—'কি করব। কিছু ত উপায় নেই।' সুরমা মুখ তুলে অবাক্ হয়ে বলে—'উপায় নেই কি রকম। তুমি ত আর একেবারে মুখ্যু নও। দুটো ত পাশ করেছ।' শশাঙ্ক স্ত্রীর মনের ভাব বুঝতে পারে। বলে—'এ পাশে কেউ ত চাকরী দেয় না।' 'তবু ত একবার চেষ্টা করে দেখা দরকার। যাও না একবার কলকাতায় ঘুরে এস।' শশাঙ্কেরও অনেক-দিন মনে হয় একবার ঘুরে আসলে হয়—যদি একটা কিছু জুটে যায়। তাই সেও সুরমার কথার সমর্থন ক'রে বলে—'তাই যাব ভাবছি একবার।' কথা বলতে বলতে শশাঙ্ক একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। সুরমার আর ঘুম আসে না। গত জীবনের স্মৃতিগুলো তার মাথার মধ্যে কেবলই আনাগোনা করতে থাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে সে বর্ত্তমান জীবনের সাথে সেইগুলো মিলিয়ে দেখে। মিলিয়ে দেখবার সময় তার কেবলই মনে হয় কোনখানে যেন কি একটা মস্ত ছেদ পড়ে গেছে। ভাল করে ভেবে দেখে। সত্যিই ত তার আদর পাবার জায়গাটা আজ ফাঁকা হয়ে গেছে, বাবার, তার স্নেহময় বাবার স্থান ত সত্যই আজ ফাঁকা, বাবার কত আদরের সন্তান সে। স্নেহশীল পিতা কন্যাকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না বলে শশাঙ্কের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে নিজের কাছে রেখে জামাইকে পড়াতেন। সে আজ দু'বছরের কথা। কালের স্রোত এসে সমস্তই ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে গেল। শশাঙ্ক ও সুরমা চোখে আঁধার দেখলে। স্নেহশীল পিতা পরলোকের পারে চলে গেলেন। শশাঙ্ক সুরমার সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীই রয়ে গেল। পড়া ত হলই না উপরন্তু সুরমার দাদা ও বৌদির ঠাট্টা বিদ্রূপে শশাঙ্ক একেবারে নিথর হয়ে গেল।

শশাঙ্ক কলকাতায় যেয়ে চিঠি লেখে—

'সুরমা,

এখনও কিছু জোগাড় করে উঠতে পারিনি। তবে চেষ্টা করছি। হয়ত একটা শীগ্‌গির জুটে যেতে পারে।'

সুরমা রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত আকাশ-কুসুমই না ভাবে। শশাঙ্ক একটা চাকরী পাবে—নিশ্চয়ই একটা বড় মত। তারপর সুরমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে আসবে। তখন সুরমার মনে কি আনন্দ হবে—স্বামীকে সে কি বলে সম্বোধন করবে ইত্যাদি কত রকম কথাই না সে নিজের মনে গড়ে আর ভাঙে। একসময় কিন্তু চিন্তা যায় ছুটে। নিদ্রা এসে তার চোখ দুটিকে দেয় বুজিয়ে।

মাস দুই চলে গেছে।

সুরমার বড় ভাবনা। শশাঙ্ক চিঠি-পত্তর আর দেয় না। একদিন উপযাচক হয়ে শশাঙ্কের একটা খোঁজ নিতে বলে দাদাকে। তার দাদা উত্তর দেয়—'দু'একদিনের মধ্যেই খবর এসে পড়বে। সারাদিন চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে হয়ত সময় পায় না।' সুরমা আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। সুরমা প্রতীক্ষায় থাকে। পিওন এসে দরজার পাশে দাঁড়ায়। সুরমা শশাঙ্কের চিঠি আনতে যায় ছুটে, নিরাশ হয়ে আসে ফিরে। এ ত শশাঙ্কের চিঠি নয়। ভাবতে ভাবতে সুরমার শরীর হয়ে আসে ক্ষীণ। নিজের মনের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করে না। আর প্রকাশ করেই বা কার কাছে?.........

সুরমার শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। তাই দুপুর বেলাই সে খেয়ে শুয়েছিল। পাশের ঘরে সোমেন যেন কি পড়ছে না? সুরমার কানে আসে ভেসে। কৌতূহলবশত যায় ওঘরে ছুটে।

'সুরমা যেন একথা ঘুণাক্ষরেও না শুনতে পায়।'

'কি দাদা, সুরমাকে কি শুনতে বারণ করছ বৌদিকে।' হাসতে হাসতে সুরমা যেয়ে পড়ে তার দাদা বৌদির মাঝ-খানে। সোমেনের উত্তর দেবার আগেই একখানা লালখামে তার নজর পড়ে। সে লেখা দেখে বুঝে—এ শশাঙ্কের চিঠি।.........

বর্ষার রাত্রি। মেঘ ডাকে আর ঝিম্ ঝিম্ করে বাইরে অনবরত বৃষ্টি পড়ে। সুরমার মনের কোণেও আজ একখানা মেঘ উঠেছে। কিন্তু তাতে বাদল নামে না। প্রতিকূল অভিমান বায়ু এসে শোঁ শোঁ করে মেঘখানা দেয় সরিয়ে। শশাঙ্কের চিঠির উপরিভাগ দেখেই সুরমার অভিমান। এতদিন পরে যদিও সে চিঠি দিল, কিন্তু এ ত সুরমার চিঠি নয়। এযে তার দাদার, সোমেনের। তবু সুরমা চিঠি খুলতে থাকে। যা' হোক্, ভাল খবরটা পেলে হয়। 'দূর, দূর হ' একটা বাদলা পোকা এসে সুরমার নাকে মুখে ভন্ ভন্ করে যেন চিঠি খুলতে তাকে নিষেধ করে।

সুরমা চিঠি পড়ে—

'সোমেনবাবু, আনপাদের ওখান থেকে চলে আসাটা আমার পক্ষে ভালই হয়েছে বলতে হবে। ভাল কেন বলছি শুনবেন?

'চলে না এলে হয়ত এত বড় একটা ম্যানেজারগিরি পেতাম না। হা, হা, আমার বড় হাসি পাচ্ছে। হ্যাঁ, কার দৌলতে সেটা হ'ল জানেন।.........

এই পর্য্যন্ত পড়ে সুরমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এল। সে উর্দ্ধে হাত তুলে বলে—'ভগবান্ আর যেন ওর অবনতি না হয়। দিন দিন যেন উন্নতির পথেই যায়।' তারপর

অশ্রুর বেগ খানিকটা থেমে এলে গর্ব্বে খানিকটা স্ফীত হয়ে সে আবার চিঠি পড়তে সুরু করে।

........'কার দৌলতে সেটা হল জানেন? সে এক বন্ধু—সম্প্রতি যিনি আমার এক নিকট আত্মীয় হতে চলেছেন।'

বাইরে সারা দুনিয়াটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন একটা প্রলয় কাণ্ডের অনুষ্ঠান হবে শীগ্‌গির। বাইরের দুনিয়া তা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। সুরমার মনেও আজ একটা খট্‌কা লাগে। পড়তে পড়তে সে থমকে দাঁড়ায়। 'নিকট আত্মীয় হতে চলেছেন' এর মানে সে খুঁজে পায় না। সে জানে না হয়ত এক্ষুণি কি একটা অঘটন ঘটে যাবে!

সে আবার পড়তে সুরু করে,

'নিকট আত্মীয় কেন বল্‌লাম জানেন? বন্ধুর অনুরোধ—হ্যাঁ বুঝলেন কি না যে বন্ধুর দৌলতে আমার চাকরীটা হয়েছে—সেই বন্ধুর অনুরোধে আজ তার ভগ্নীর পাণি গ্রহণ করতে চলেছি।'

চড় চড় চড়াং বাইরে একটা বজ্রপাত হয়ে গেল না? দুনিয়া বুঝতে পারে ক্ষণিক আগে কেন সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষণিক আগে যে কটা কথার মানে বুঝতে সুরমা পারছিল না তাই এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ভিতর এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে মূর্চ্ছিত হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

আঘাত পেয়ে সেদিন যে সুরমা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল তিন দিন পরে তবে তার জ্ঞান ফিরে আসে। তার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন সে গায়ে একটা প্রকাণ্ড জ্বালা ও উত্তাপ অনুভব করায় ডাক্তার এসে বলে গেলেন—'Inflamatory fever, বাঁচা খুবই কঠিন।'

সাতদিন কেটে গেল। সুরমা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে চলেছে। প্রায় সময়েই অজ্ঞান হয়ে থাকে। যখন চেতনা ফিরে আসে চারিদিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে। ব্যর্থ নয়ন ফিরে এসে আবার ঝিমিয়ে পড়ে।

সোমেন বুঝতে পারে সুরমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। ডাক্তার বলেছেন ওষুধে আর কিছু হবে না। শশাঙ্ক আস্‌লে হয়ত রোগীর মনে একটা বল আস্‌তে পারে—গড়িয়ে গড়িয়ে বেঁচেও যেতে পারে।

আশা পেয়ে তাই সোমেন সেদিন তার করে দেয় শশাঙ্কের কাছে যদি ইচ্ছে হয় একবার যেন আসে।........

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। সহসা ঝড় উঠ্‌ল, বাইরের দরজায় একটা জোর মত ধাক্কা লাগ্‌ল। সারাদিন রাত্তিরের মধ্যে সুরমার এখন একটু জ্ঞান ফিরে এল। তবু গায়ে কে যেন একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দিয়েছে। ধীরে ধীরে বলে—'একটু জল।' 'এই নাও সুরো।' মিনিটখানেকের মধ্যে একটা ছোট্ট গ্লাসে করে এক অলক্ষ্য হস্ত জল নিয়ে তার মুখের কাছে ধরে। সুরমা বোধ হয় শুনতে পায় না, অথবা অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌ছিল এ কার কণ্ঠস্বর। স্বপ্নাবিষ্টের মত শশাঙ্কের দিকে সুরমা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তার ভয় হয় এ বুঝি স্বপ্ন। তাই সে কথা বলতে সাহস পায় না।

'এই নাও সুরো। কি দেখ্‌ছ!' সুরমার মোহ গেল টুটে। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা এসে তার স্থান অধিকার করে নিল। 'থাক্‌, থাক্‌ আমায় দেখে এখন আর ঘোম্‌টা দিতে হবে না।' বলে শশাঙ্ক সুরমার মাথার কাছে পড়ে বসে।

ঘণ্টাখানেক নীরবে থাকার পর সুরমা ঘোর প্রলাপ বকতে সুরু করল অথবা তার জীবনে যে দারুণ ক্ষতি হয়ে গেছে সেইটিই আবার তোলাপাড়া করছিল।

'ওগো, তুমি এত নিষ্ঠুর তা আমি আগে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তুমি যে আমার জীবন-দেবতা। এমন হলে তুমি কেমন করে? আমি কি সত্যই তোমার কেউ নই? আমি কি তোমায় ভালবাসতে পারি নি? আমার শেষ সময় আবার কেন তবে ছল করতে এলে? কেন আবার জ্বালাতন করতে এলে? যাও, সেইখানেই যাও। খুব সুখে থাকবে! আমি ত তোমার কেউ নই।'

শশাঙ্কের মনে পড়ল তার কল্‌কাতা যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। সুরমা যে কেমন ক'রে তার দাদার সংসারে গঞ্জনা সহ্য করে তা সে ভাল করেই জানে। তবু সে যদি তার কাছে থাক্‌ত সুরমা সবই হাসিমুখে সহ্য করতে পারত। কেন সে কল্‌কাতায় গিয়েছিল?

সুরমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শশাঙ্ক আবেগে বলে—'সুরো শান্ত হয়ে একটু ঘুমাও লক্ষ্মীটি। আর আমি কল্‌কাতায় যাব না। তোমায় ছেড়ে আর আমি কোথাও যাব না।'

সুরমা আজ উন্মাদ। স্বামীর সঙ্গে সে আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া করবে। সে বলে—'কেন যাবে না? আমাকে না হয় ফাঁকি দিয়েছ কিন্তু আর একজনকে ত ফাঁকি দিতে পার না। সে যে আমার চেয়ে তোমায় ভালবাসে, ওগো তাকেও যেন ফাঁকি দিও না। আমার অন্তিমে একটা অনুরোধ রেখ তাকে যেন ফাঁকি দিও না। তা'হলে পাপের বোঝা যে সইতে পারবে না। অতল-তলে যে তুমি তলিয়ে যাবে। তা আমি কিছুতেই সইতে পারব না।'

শশাঙ্ক বুঝিল, এ ঘোর ডিলিরিয়াম্‌। এক ঘণ্টা আগে একটু জল চাইতে যার কষ্ট হচ্ছিল সে এখন এত এত কথা বলতেও কষ্ট পাচ্ছে না। এই যে এত বড় একটা উত্তেজনা ইহার পিছনে যে কি আছে কে বলতে পারে? শশাঙ্ক অনেক কাকুতি মিনতি করল একটু চুপ করাবার জন্য। কিন্তু সকলই বৃথা হ'ল। একটু গম্ভীরভাবে সে বলে—'একটু ঠাণ্ডা হয়েও ঘুমোও সুরমা। এ তুমি হেঁয়ালীর মত কি বলে যাচ্ছ সুরো। অত পাগ্‌লামী কর না।' 'হ্যাঁ, আমি পাগল' আমি পাগ্‌লামি করছি। আমাকে পাগল না বানালে আর একজনকে হৃদয়ে স্থান দিবে কি করে? সবাইকে বলে বেড়িও যে সুরমা তোমার পাগল হয়েছে তাই নূতন করে সংসার পেতেছ। হাঃ, হাঃ, হাঃ—এ হেঁয়ালি—আমি পাগল।' খানিক চুপ করে থেকে আবার বলে—'নিশ্চয়ই আমি পাগল, স্বামী আমায় যখন পাগল বলে ঠাউরেছে। আমি পাগল না হলে তোমাদের সুখ হবে কি করে?' 'সুরমা, লক্ষ্মীটি সব খুলে বল। তোমার প্রাণে যে কি জ্বালা তা এখনও আমি

(শেষাংশ ৪৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গোপন সন্ধানের চা-দোকান

(গুপ্তচর নিরোধে ব্রিটেন)

শ্রীগুণময় আচার্য্য

মহাসমরের সময় গুপ্তচর সমস্যা চরমে উঠিয়াছিল। মহাসমরের বিরতির সঙ্গে সঙ্গে গোপন সন্ধানীদের কাজও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। জনসাধারণের ধারণা ছিল, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ না হইলে, আর শীঘ্র গুপ্তচরের উপদ্রবের প্রতি-বিধান করিতে হইবে না। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে লড়াই বাধিবার সামান্য আশঙ্কাতেই গুপ্তচরের কারসাজি চলিয়াছে পুরাদমে। তাই ইউরোপের সকল প্রধান শক্তিকেই শান্তির সময়ও গোপন-সন্ধানীদের প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য নানা তোড়জোড় করিতে হইতেছে।

"কে এম ১৭" ছদ্মনামে একজন ওয়াকিবহাল সন্ধান-ধুরন্ধর লিখিয়াছেন—আমরা এখনও শান্তির মধ্যেই অবস্থান করিতেছি, কিন্তু অন্তরালে স্পাইসকল কাজ করিতেছে একেবারে লড়াইয়ের কালের তীব্র বেগে এবং যখনই সুযোগ পাইতেছে, তখনই বিরাট রকমের ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছে।

এই সকল কারণেই কিছুকাল পূর্ব্বে যখন দৃশ্যত নির্দ্দোষ ও গোবেচারী জার্ম্মান মহিলা—যাহার নাম মিসিস জেসি জর্ডন বলিয়া প্রচারিত—তাহাকে চারি বৎসরের কারা-দন্ড প্রদান করা হইল, তখন ইংলন্ডবাসী সকলে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু যখন জানা গেল যে, অফিসিয়েল সিক্রেটস্ এ্যাক্ট-প্রভাবে এই শাস্তি বিধান করা হইয়াছে, সকলেই তখন একে-বারে স্তব্ধ হইয়া গেল। ফলে হইল এই যে, ডান্ডি নগরস্থ মিসিস জর্ডনের "হেয়ার-ড্রেসারস্ শপ" যাদুঘর অপেক্ষাও এক চমকপ্রদ প্রদর্শনীতে পরিণত হইল। আশে-পাশের লোক নূতন দৃষ্টিতে, নূতন আকর্ষণে ইহার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিন্তু সকলেই জানে না যে, এই প্রকার "গলির কোণের দোকান" আরও বহু রহিয়াছে এবং এমন দোকানও রহিয়াছে, যাহা "কোণে" নয় একেবারেই। শেষোক্ত দোকানগুলি অধি-কাংশ ক্ষেত্রে বড় বড় নামজাদা দোকানগুলির মাঝখানে যেন চাপ খাইয়া 'স্যান্ডউইচ' হইয়া আছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সারভিস নানা জাতীয় ও বিভিন্ন আকারের দোকান নিজ নিয়ন্ত্রণে চালাইতেছে। উহাদের ভিতর যেমন রহিয়াছে বাণিজ্যিক মহলের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান, তেমন আবার রহিয়াছে অতি নগণ্য রেস্তোরাঁ, অথবা টি-শপ্। কল-কব্জার দোকান, কাপড়-জামার দোকান, বিবিধ এজেন্সী, বিদেশে চালানী কারবার, তামাক অর্থাৎ সিগার-সিগারেট প্রভৃতির দোকান, শেয়ার-দালাল, চুল ছাঁটাই সেলুন, বিবাহ-ব্যবস্থা অথবা চাকুরী-ব্যবস্থার সমিতি—প্রভৃতি কত জাতীয় দোকান যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালনায় রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হয়ত কোনও 'বার' বা রেস্তোরাঁয় যাইয়া আপনি মদ্য চাহিলেন, হয়ত যে ব্যক্তি আপনার গ্লাসে মদ্য ঢালিয়া দিল সে-ই একজন চতুর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন গোয়েন্দা, যে আপনার হাবভাব ত লক্ষ্য করিলই আপনার অন্তরের খবরও কিছুটা মালুম করিয়া লইল। আদেশ দেওয়া মাত্র যে হাস্যময়ী তরুণী আপনাকে চায়ের পেয়ালা পূর্ণ করিয়া দিল, সে আপাতদৃষ্টিতে চায়ের দোকানের পরিচারিকা হইলেও হয়ত সে গোপন স্পাইদের উপর নজর রাখিবার নিমিত্তই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আপনার ধূমে পান উপাদান ফুরাইয়া গেল, আপনি পথিপার্শ্বের দোকানে ঢুকিয়া কাউন্টারে চাহিদা জানাইলেন, কাউন্টারের উপর দিয়া আপনার মনো-নীত ধূমপান সামগ্রী সরবরাহ করা হইল। কিন্তু আপনি হয়ত লক্ষ্য করিলেন না, একটি ক্রেতা দাম দিবার এবং ক্যাশ-মেমো গ্রহণ করিবার অছিলায় একখানি কাগজের চিরকূট বিক্রেতার হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই চিরকূটে হয়ত অতিশয় গোপনীয় কোনও আদেশ রহিয়াছে উচ্চ দরবারের অথবা রহস্যজনক কোনও সংবাদ রহিয়াছে অগোণে প্রতি-পালন করিবার। উহা যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রকৃত আদেশ তাহার কোড-চিহ্ন এমন সতর্কতার সহিত ইসারায় জ্ঞাপন করা হয়, অথবা চিরকুটে লিখিত হয় যে, অজানা লোকেরা তাহা হইতে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। যেমন চিরকূট এক হাতে আগাইয়া দেওয়া হইল, অপর হাতে নিজ কোর্ত্তার তৃতীয় বোতাম স্পর্শ করা হইল। গ্রহণকারী যে ইঙ্গিত বুঝিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ সে তাহার বাম হস্তের তৃতীয় অঙ্গুলি টেবিলের উপর দুইবার প্রদর্শন করিল। এমনই কত সাধারণ ইঙ্গিত স্থান বিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। আর লেখা যাহা থাকে, তাহা অধিকাংশ সাঙ্কেতিক বাণীতে অথবা সংখ্যায়।

হয়ত ইহা কাল্পনিক ডিটেকটিভ্ উপন্যাসের মত শোনায়, কিন্তু ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে ইহা যে বাস্তব সত্য একটু যাহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে তিনিই অন্তত আভাস পাইবেন।

ইংলণ্ডের মধ্য অঞ্চলে, উত্তরের বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে, লণ্ডন শহরে উপরোক্ত প্রকারের দোকান রহিয়াছে অগণিত যাহা শুধু ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালনায় চলে—চতুর গোয়েন্দা ভিন্ন যে সকল প্রতিষ্ঠানের অতি হীন কার্য্যেও অন্য লোক নিযুক্ত করা হয় না। শুধু ইংলণ্ডেই নহে পৃথিবীর সকল দেশেই এই জাতীয় গোপন গোয়েন্দাগিরির চতুরতাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে শত শত—যাহাতে ব্রিটিশের গোয়েন্দাগণ পর্য্যন্ত সময়ে প্রেরিত হন।

গোপন-সন্ধানে নিযুক্ত স্পাইগণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে "পোষ্ট অফিস" বলিয়া নিজেদের ভিতর নির্দ্দেশ দান করে, কারণ সাধারণ স্পাইদের এই সকল প্রতিষ্ঠানেই আদান-প্রদান করিতে হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মারফতই স্পাইগণ সিক্রেট সার্ভিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে। প্রতিদিন হেড কোয়ার্টার হইতে প্রেরিত লোক এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে সকল বিভাগীয় লোক এই সকল দোকানে পদার্পণ করে, তাহারা ক্রেতারূপেই দেখা দেয় এবং কিছু না কিছু সওদা হাতে না লইয়া ফিরিয়া যায় না। অনেক সময় পূর্ব্বে ক্রীত জিনিষ বদলাইতেও কেহ কেহ আসে। প্রতিষ্ঠান-

গুলির উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার জন্য অতিশয় ব্যবসাদারী নিপুণতার সহিত কারবার চালান হয়। দোকানের 'মালিক' বা 'ম্যানেজার' ব্যবসা সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ অতি দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করে এবং কাহারও সন্দেহ-দৃষ্টি নিপতিত না হয়, এজন্য অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান, যাহা এক জাতীয় মাল বিক্রয় করে, তাহার সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ করে। আধ পেনি হইলেও দাম কমাইয়া নিজেদের সাধুতা ও সদিচ্ছার পরিচয় দিতে প্রয়াস পায়। অন্যান্য সাধারণ দোকানের ন্যায় ইহারাও ধারে বিক্রয় করে। মনোনয়নের জন্য বাড়ী বাড়ী মাল পাঠাইয়া দেয়—বড় অর্ডার সংগ্রহ করিতে প্রতিনিধি বা দালাল নিযুক্ত করে। প্রতি বৎসর হিসাব-নিকাশ করিয়া সাধারণে প্রচার করে এবং ইনকাম ট্যাক্স দিবার বেলা নানা অজুহাতে সময় লইয়া পরিশেষে এমনভাবে পরিশোধ করে, যেন উহার বিশিষ্টতার জন্য সংবাদটা দৈনিক পত্রাদিতে মুদ্রিত হয় এবং সকলের চোখে পড়ে। সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা-দিবসের বার্ষিকী অতি ঘটা করিয়া সম্পন্ন করে এবং সকল পরিচিত ক্রেতাদের ভোজে আহ্বান করে।

কয়েকটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আবার এমন রহিয়াছে যে, তাহাতে ম্যানেজার বা মালিক ভিন্ন অন্য কেহ সিক্রেট সার্ভিসের লোক নাই। বড় প্রতিষ্ঠানগুলির সকল কর্ম্মচারীই শুধু বিভাগীয় লোক নয়—মফঃস্বলের প্রধান প্রধান পাইকারী ক্রেতাগণও সিক্রেট সার্ভিসের কর্ম্মচারী। এই উপায়ে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় যেমন গোপন থাকে, অন্য উপায়ে তাহা সহজ নয়

এই সকল সিক্রেট সার্ভিসের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের ভ্রমণকারী ক্যানভাসার এবং বিদেশীয় কাঁচা মাল ক্রেতা হিসাবে দেশ-বিদেশে রহিয়াছে সিক্রেট সার্ভিসের স্পাই। ইহাদের দ্বারা সুবিধা এই যে, কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া ইহারা পৃথিবীর যে কোন দেশে যাইতে ও তথাকার ব্যবসায়ীদের সহিত মিশিতে পারে। ধরা যাউক, পাবলিশিং ব্যবসা। বড় বড় তিনটি কি চারিটি প্রতিষ্ঠান এক ব্যক্তিকে পুস্তকের অর্ডার সংগ্রহ করিবার ভার দিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইল। ভাগে এক এক কোম্পানী বহন করিল সিকি খরচ—সেই লোকটি ঐ চারি প্রকাশকের সকলেরই বইগুলির অর্ডার যথাসাধ্য সংগ্রহ করিল। অবসর সময়ে বিভাগীয় গোয়েন্দার কার্য্য করিল। ইহাতে সহসা সন্দেহের সৃষ্টি হইবে না। এই ব্যক্তি দেশীয় পুস্তক-ব্যবসায়ীদের সহিত মিশিয়া দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারে। এই প্রকারে যে ব্যক্তি সমরাস্ত্র প্রতিষ্ঠানের ভ্রমণকারী প্রতিনিধি—সে স্বভাবতই যে কোন দেশের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। অথচ, কেহ তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করিবে না। কাগজের কলের প্রতিনিধি, কাপড়-কলের প্রতিনিধি, কাচের জিনিষ তৈরীর কারখানার প্রতিনিধি, লোহার জিনিষ বিশেষ করিয়া ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি তৈরীর কারখানার প্রতিনিধি খেলনা সরবরাহকের দালাল,—এই প্রকার বহু জাতীয় দালালী বা প্রতিনিধিত্বের ছদ্মবেশে ব্রিটিশের স্পাই সারা দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দেশ-বিদেশে, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যে, মোটর গাড়ী ও উড়োজাহাজ বিক্রয়ের দালালের ছদ্ম-পদবী গ্রহণ নিরাপদ বলিয়া এই অজুহাতে অনেক স্পাই নিষিদ্ধ রাজ্যেও প্রবেশ লাভ করে।

শুধু ব্রিটেনের স্পাই-ই যে এইভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন নয়, আমেরিকার এবং ইউরোপের ফরাসী, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের স্পাইও এইভাবে দালাল সাজিয়া দেশে দেশে যায়। তাহাদের সংগৃহীত সংবাদ, সোজা নিজের দেশে প্রেরিত হয় না। তাহাদের সকলেরই হেড অফিস রহিয়াছে লণ্ডনে। কাজেই লণ্ডন হইয়া হোয়াইট হলে বা প্যারিসে অথবা অন্য যে কোন দেশে প্রেরিত হয়। এই সকল ভ্রমণকারী স্পাই কখনও নিজ দেশের ঠিকানা দেয় না। লণ্ডনের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাই প্রচার করে, যেন কোন প্রকার অনুসন্ধান চলিলে, তাহার যে ব্যবসাগত সম্পর্ক তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ব্রিটেনের স্পাইদের সুবিধা বেশী, তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব্ব বর্ণিত "পোষ্ট অফিস" মারফতে সংবাদ আদান-প্রদান করে বেশী। আমেরিকাও এই উদ্দেশ্যে সারা ইউরোপ ব্যাপিয়া ছোট ছোট দোকান গড়িয়া তুলিয়াছে, বিশেষ করিয়া তামাকের দোকান। তবে অনেকের ধারণা এই জাতীয় দোকান জার্ম্মানদের হইবে সংখ্যায় বেশী। তাহা হইলেও দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে জার্ম্মান স্পাইগণ গোয়েন্দাগিরির উদ্যমের আতিশয্যে দোকানের ব্যবসার দিকটা অবহেলা করিয়াছে। তাহারা বাহ্যিক ঠাট বজায় রাখিয়াছে সাইনবোর্ড, ছাপান চিঠির কাগজ প্রভৃতি সরঞ্জাম দিয়া ধাপ্পা দিয়া। কিন্তু অনুসন্ধানের কাজেই তাহাদের সময় জুড়িয়া রহিয়াছে। এইজন্য প্রায়শ তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণের গোচর হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মানদের এই ত্রুটির জন্যই মহাসমরের কালে অতি সহজে তাহাদের "পোষ্ট অফিস" আবিষ্কার করা ও সেইগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা-গোয়েন্দাগিরি প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছে।

মহাসমরের কালে কতকগুলি লোক ওলন্দাজ ব্যবসাদারদের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরসমূহে ভ্রমণ করিতে থাকে। সেনসর বিভাগ হইতে আবিষ্কার করা হয় যে, এই সকল তথাকথিত প্রতিনিধি বা অর্ডার সংগ্রাহকগণ অবিরাম বিপুল পরিমাণ সিগারেট সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহ করিয়া হল্যাণ্ডের রটারড্যাম্-য়ে প্রেরণ করে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই মাল আর আসিয়া পৌঁছায় না—অথচ মোটা অঙ্কের টাকা প্রায়ই আসে ঐ প্রতিনিধিদের নিকট রটারড্যাম্ হইতে। কোম্পানীটির নাম ছিল—ডাইয়াকর্স্ এণ্ড কোং, রটারড্যাম্।

তিনজন সেয়ানা গোয়েন্দা প্রেরিত হয় হল্যাণ্ডে। তাহারা দেখিতে পায়, "ডাইয়াকর্স্ এণ্ড কোং" সাইনবোর্ডওয়ালা একটি ছোট কক্ষ মাত্র আছে। তাহা সর্ব্বদাই তালাবন্ধ থাকে। কেবল দিনে দুইবার খোলা হয়, ডাকের চিঠি-পত্র লইবার জন্য। অনুসন্ধানে গোয়েন্দারা জানিতে পায়, একটি জার্ম্মান গুপ্তচরই ডাক লইয়া যায় এবং কোনপ্রকার ব্যবসা চালান হয় না এই প্রতিষ্ঠানে। সেনসর বিভাগ অতঃপর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত "ডাইয়াকর্স্ এণ্ড কোং"র নামীয় চিঠি ও টেলিগ্রাম্

সমুদয় হল্যাণ্ডে প্রেরণ বন্ধ করিয়া সিক্রেট সারভিসের হাতে অর্পণ করে।

এদিকে আবার পত্রপ্রেরকদের সন্ধান করা হয়। ফলে অনেকগুলি জার্ম্মান স্পাই ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উহারা সকলেই কিছুকাল যাবৎ ইংলণ্ডে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল। এই দণ্ডিত স্পাইদের ভিতর ছিল কার্ল লডি, কার্ল ফ্রিড্রিক্ মুলার, উইলহেল্‌ম্ জে রুনি এবং হেইক জ্যান্‌সেন।

এই অনুসন্ধানের কালে দুইটি দোকান আবিষ্কৃত হয়, যাহা জার্ম্মান স্পাইগণ 'পোষ্ট আফিস' হিসাবে ব্যবহার করিত। একটি হইল ডেপ্‌টফোর্ডের হাই স্ট্রীটের বিস্কুট-পাউডারটির দোকান; অপরটি হইল টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের তামাকের দোকান। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে জার্ম্মান সিক্রেট সারভিসের কার্য্যনির্ব্বাহক আফিস।

সাধারণের ধারণায় যে "সিক্রেট সারভিস বিভাগ" অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট অট্টালিকায়, নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজিরা, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অফিসার কার্য্যরত থাকিবার যে কল্পনা, তাহা অবশ্য কোন দেশেই বাস্তবে নাই। গবর্ণমেন্টের যখন যে বিভাগের গোপন সন্ধানের প্রয়োজন হয়, তখন তাহারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যুরো পরিচালিত করে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইলে, অন্য বিভাগের হাতে তাহার পরিচালনা ন্যস্ত করে। পররাষ্ট্র বিভাগের নিজস্ব স্পাই থাকে, "মিনিষ্ট্রি অফ্ ওয়ার", এ্যাড্‌মিরালটি, এয়ার মিনিষ্ট্রি—সকলেরই স্বতন্ত্র সিক্রেট ব্যুরো রহিয়াছে।

বিদেশীয় স্পাইদের প্রতিরোধ বা প্রতিবিধান কার্য্য ইংলণ্ডে পরিচালিত হয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ কর্ত্তৃক। উহাদের সহযোগিতায় "মিলিটারী ইণ্টেলিজেন্স, ডিপার্টমেণ্ট ফাইভ" সর্ব্বদা বিদেশী স্পাইদের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। যদি কোনপ্রকার দুর্ঘটনা সাধিত হয় বৈদেশিক গুপ্তচর দ্বারা সেক্ষেত্রে সকল তদন্ত করিবার ভার থাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের উপর।

১৯২৫ সালে ক্যাপটেন সিড্‌নী জর্জ্জ রেইলি বলশেভিকদের গুলীতে প্রাণ হারায়—এই সংবাদ হয়ত অনেকেই জানেন না। সে অক্‌স্‌ফোর্ডের লোক এবং ১৯০৭ সালে গুপ্তচর-স্কুলে ভর্ত্তি হয়। ১৯১০ সালে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া সে রাশিয়ায় চলিয়া যায় তথাকার সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যথাযথ উপলব্ধি করিতে। তাহার মত সুনিপুণ ও অশেষ প্রকারে কৃতকার্য্য গোয়েন্দা ইংলণ্ডে তখন আর ছিল না। সুদীর্ঘকাল সে যে নিরাপদে ও সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া রাশিয়ায় আনাগোনা করিতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, সে কোনও উড়ো-জাহাজ নির্ম্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে তথায় গিয়াছিল। উড়োজাহাজ নির্ম্মাণের অর্ডার সংগ্রহ এবং সময়ে উড়ো-জাহাজের কোন পার্ট রাশিয়া হইতে তৈরী করিয়া আনিবার অর্ডার দেওয়া—এই দুইপ্রকার ছিল তাহার প্রকাশ্য কারবার। তাহার সকল সংবাদ ঐ উড়োজাহাজ প্রতিষ্ঠানের মারফতে পৌঁছিত। এই প্রকারে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিল।

ব্রিটেনের বিখ্যাত একটি তথাকথিত পোষ্ট আফিস হইল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট "ওয়াইন্ শপ"। ১৯১৭ সালে লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে এইটি খোলা হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, এক অতি সেয়ানা ব্যক্তি ইংলণ্ডে যাইয়া "Peace-at-any-price" (যে-কোন-মূল্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা) আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। সেই ব্যক্তিকে পাকড়াও করিবার উদ্দেশ্যে এই মদের দোকানের সৃষ্টি।

কিন্তু ব্যক্তিটির পরিচয় বা চেহারা সম্বন্ধে তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট আভাস পাওয়া যায় নাই। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত নাম লইয়া নাড়াচাড়া করা হইল, কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হইল না। একটি মাত্র ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল ফরাসী সরকার হইতে—তাহা হইল এই যে, লোকটির ফ্যাশানেবল্ মদের দোকানে যাতায়াত করিবার ঝোঁক বেশী রকম।

এই স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ একজন প্রতিনিধি পাঠাইল মিনসিং লেনের এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে মদ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে। এই শিক্ষা লাভ করিয়া সে উচ্চশ্রেণীর একটি মদের দোকান খুলিল ওয়েষ্টএণ্ডে।

খোলার দিন হইতেই এই দোকানে প্রচুর মদ্যপায়ীর আনাগোনা হইতে লাগিল এবং ব্যবসাও ভালভাবেই চলিল। কিন্তু যে লোকটির সন্ধানের জন্য এত কাণ্ডকারখানা—সেই "বোলো ২"-কে বাছিয়া বাহির করা গেল না। ঐ ব্যক্তির নাম Bolo 2 রাখা হইয়াছিল বিভাগীয় তদন্তের সুবিধার জন্য। ক্রমে দুইটি গোপন-সন্ধানের এজেণ্টের সনাক্ত করা সম্ভব হয়—যাহারা জার্ম্মানীর হইয়া কাজ করিতেছে। ঐ মদের দোকান এখন কে চালায় জানি না; হয়ত কোন ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করা হইয়া থাকিবে।

এ্যাড্‌মিরালটি ক্রিপ্‌টোগ্রাফিক ব্যুরো (40C.B) হইতে ষ্ট্রাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত টি-শপটির কথা হয়ত অনেকেই জানেন। এ্যাড্‌মিরালটির পরিচালনে চলিলেও অন্য বহু সরকারী বিভাগ এইটি হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছে। পরে দোকান-টিকে বিক্রয় করা হয় ঐ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ কোনও চলতি প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট।

40 C. B'র প্রকৃত আফিস খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক-গুলি বিদেশীয় স্পাই একযোগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। তাই ঐ আফিসের সন্ধান পাইলেও যাহাতে বিদেশী গুপ্ত-চরেরা বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারে, এজন্য ষ্ট্রাণ্ডের উক্ত টি-শপ্ হইতে 40 C. B'র অধিকাংশ কার্য্য পরিচালনা করা হইত। ঐ গুপ্তচরদের এইভাবে প্রকৃত 40 C. B হইতে ভুয়া-খবর কৌশলে দেওয়া হইত; তাহারা খাঁটি খবর বলিয়া তাহা নিজ দেশে প্রেরণ করিত এবং নিজেদের বাহাদুর মনে করিত।

এক এক অঞ্চলের কোন কোন লোক হয়ত সেই সেই অঞ্চলের দুই একটি এই জাতীয় পোষ্ট আফিসের খোঁজ রাখে; কিন্তু সকলগুলি ঘাঁটির খবর কোন এক ব্যক্তি

(শেষাংশ ৪৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

১০

পরদিন সকালবেলায় সতীশ নরেন্দ্রের শয্যাগৃহের দ্বারে পা বাড়াইতেই লীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সতীশের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ভেতরে আসবেন না ঠাকুর-পো, ওঁর স্মলপক্স হ'য়েছে।"

"স্মল-পক্স হয়েছে—বলেন কি!" বলিয়াই সতীশ হতভম্বের মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল, "না, না চিকেন বোধ হয় ?"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "চিকেন নয়, স্মল-পক্স। রোগীর ঘরে আপনার এসে আর কাজ নেই। উনি ভাল না হওয়া অবধি আপনি এ বাড়ীতে আর নাই এলেন।"

সতীশ খানিক চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল, "আমি আসব না ত কে আসবে বৌদি, নিঃসম্পর্কীয় লোকের কলেরা-বসন্ত হ'লে নার্স করা যাদের অভ্যাস, তারাই যাবে নিজের বন্ধুর অসুখ দেখে পালিয়ে। সেই কি হবে আমার সত্যিকারের পরিচয়! আমি আপনাদের কি বন্ধু—আপদের কষ্টিপাথরে যদি তার দর যাচাই না হ'ল।"

"যাচাই আমাদের করাই আছে ঠাকুর-পো!"

শয্যা হইতেই নরেন্দ্র সতীশকে ডাকিয়া বলিল, "তোর আর এসে কাজ নেই সতীশ, যা কণ্টেজিয়াস! মিছেমিছি রিস্ক নিয়ে লাভ কি? তোর বৌদি একাই সব পারবে। এই-জন্য আমি হাসপাতালে যেতে চেয়েছিলাম, কি বলিস, তাই ভাল ছিল না!"

"খেয়ালী মানুষের অদ্ভুত খেয়াল। উনি যাবেন হাসপাতালে! কোন দুঃখে তাই শুনি। বৌদির হাতের সেবার চেয়ে কি নার্সদের সেবা বেশী মিষ্টি লাগবে? বলিস ত দুটো মাইনেকরা নার্স নিয়ে আসছি! সেই ভাল, বৌদির তোর কাছে থেকে কাজ নেই—নার্সেরা সেবা করবে, আর আমি কাছে থাকব।"

নরেন্দ্র কহিল, "সেই ভাল, দু'জন নার্সই নিয়ে আয়—ওরাই সব করতে পারবে, পাশের বৈঠকখানার ভেতরের দরজা খুলে দিলে ওরা ওখানে থাকতে পারবে—প্রয়োজনে সেবাও করবে।"

লীলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই বন্ধুর বাক্যালাপ শুনিতেছিল। সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাদের দুই বন্ধুরই ভয়, পাছে ছোঁয়াচ আমাকেও ধরে। আপনারা ভয় করবেন না, ওঁর সেবা আমি নিজেই করব।"

"তবে আপনিও জেনে রাখুন বৌদি, আমিও ওর কাছ থেকে সরে থাকতে পারব না। আমি এখন যাচ্ছি নরেন, বাড়ীতে বলে আসিগে যে, এ ক'দিন আমি এখানেই থাকব।"

বলিয়াই সতীশ বিদায় লইল। সারাদিন আর সে ফিরিল না।

সন্ধ্যায় লীলা নরেন্দ্রকে ঔষধ খাওয়াইতে ছিল; নগ্নপদে ঘরে ঢুকিয়া সতীশ বলিল, "গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হয়ে এসেছি বৌদি, অশুচি দেহ-মন নিয়ে নাকি এ সব রোগীর ঘরে আসতে নেই।"

লীলা কতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সতীশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "মানা না শুনে এসে ভাল কাজ করলেন না ঠাকুরপো। জানি আপনার বন্ধুপ্রীতি মৌখিক নয়, বিপদকে অগ্রাহ্য করবার সাহসও আপনার আছে। যৌবনের অশান্ত উচ্ছলতা দেখাবার স্থান ত এ নয়? সাহস দেখাবার প্রয়োজন যেখানে নেই, সেখানে অনর্থক বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পৌরুষ দেখানর চেষ্টাকে দুঃসাহস বললে অন্যায় হবে না। ওতে পরের উপকার না হলেও, নিজের অপকারকে কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।"

সতীশ নিরুত্তর রহিল। লীলা আবার বলিল, "রোগীর ঘরে ঢুকলে আর বাইরে যাওয়া চলবে না তা জানেন?"

সতীশ নীরবে মস্তক হেলাইয়া স্বীকার করিল, সে জানে। লীলা নরেন্দ্রকে বলিল, "ঠাকুরপোকে বৈঠকখানার ঘরে থাকবার জায়গা করে দেব?"

নরেন্দ্রের যাতনা ক্রমে বাড়িতেছিল। মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাই দাওগে। ভিতরকার দরজা খুলে দিলেই এ ঘরে আসা যাবে।"

শীতলাতলার কবিরাজ-ঠাকুর মুখে যাহাই বলুন না কেন, গুটিকার পর গুটিকা উঠিয়া নরেন্দ্রের সারা দেহ-মুখ আবৃত করিয়া ফেলিল। ক্রমে গুটিকাগুলি বড় হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কয়দিন পরেই নরেন্দ্রের সুন্দর দেহ কদাকার বীভৎস হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বেদনায় নরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অস্থির হইল। তারপর আরও কয়দিন কাটিল। গুটিকাগুলিতে পুঁজ দেখা দিল। বেদনাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছু গলাধঃকরণের শক্তি প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। স্বামীর শিয়রে বসিয়া লীলা কেবল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। স্বামীর যন্ত্রণার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। তখন তার অন্তর হইতে শুধু এই প্রার্থনায়ই বাহির হইতেছিল—ঐ রোগযন্ত্রণা আমাকে দিয়ে আমার স্বামীকে মুক্তি দাও ঠাকুর। ওঁর কষ্ট যে আমি আর সইতে পারছিনে দয়াময়। তোমার অভয় হস্ত বাড়িয়ে ওগো চৈতন্যময় আমার অন্তরে এসে বল, আমার কোন ভয় নেই—আমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবেন।

নয়ন মুদিয়া লীলা এইরূপেই ভগবানের চরণে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করিতেছিল। সতীশ ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "আপনার চিঠি আছে বৌদি, আমি ততক্ষণ নরেনের কাছে বসে থাকি—চিঠি পড়ে জবাব দেবার হ'লে এরই মধ্যে লিখে ফেলুন।

লীলা সুপ্তোত্থিতের মত চোখ মেলিয়া চাহিল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া কার্বলিক লোশনে হাত ধুইয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিল। চিঠি লিখিয়াছে অমরনাথ। সকলের নিরাপদ পৌঁছ সংবাদ দিয়া নরেন্দ্রের অসুখের অবস্থা জানিতে চাহিয়াছে।

অমরকে কিছু লিখিবার প্রয়োজন লীলারও ছিল।

অবসর বুঝিয়া তখনই লিখিতে বসিয়া গেল। অন্যান্য কথা লেখার পর স্বামীর অসুখ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া লীলা লিখিল তুমি আশীর্বাদ করে গেছ অমরদা, তাই আমার দৃঢ়-বিশ্বাস আছে, উনি ভাল হবেন। নইলে জীবনের আশা করা যায় না। কি কষ্ট যে পাচ্ছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কি-যে চেহারা হয়েছে, তুমি দেখলে চিনতে পারবে না। অমন চাঁপা-ফুলের মত গায়ের রং লোহার মত কালো হয়ে গেছে, গুটিকা পেকে ক্ষত হয়েছে সারা গা-ময়,—তা থেকে পুঁজ পড়ছে। পাশ ফিরতে পারছেন না। কচি কলাপাতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কিছুটি খেতে পারছেন না, কথাও কইতে পারছেন না। তাঁর যন্ত্রণায় কেবল কাতরোক্তি করছেন। এত কষ্ট কি সয়। ওঁর বন্ধু সতীশবাবুও ওঁর শুশ্রূষার আংশিক ভার নিয়েছেন। নইলে একা সামলান আমার কঠিন হ'ত। যার নাম শুনলে বাড়ীতে কেউ পা দেয় না, শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে সেই রোগের সেবা—আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি! এমন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ আমি দেখিনি। নিজের হাতে দুর্গন্ধ-ক্লেদ পরিষ্কার করছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, ক্লান্তি নেই! এত করেও কিন্তু রোগীকে আরাম দিতে পারছিনে। মা-বাবা (আমার শ্বশুর-শাশুড়ী) দিনরাত কেবল কাঁদছেন। তাঁরা ওঁর আশা একরূপ ছেড়েই দিয়েছেন, আমি ছাড়তে পারিনি। কারণ তুমি আশীর্বাদ করে গেছ! এর মধ্যে বাবা এসে ওঁকে দেখে গেছেন, দু-একদিনের ভেতর মাকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন, আমি মানা করে দিয়েছি। এত ভগবানকে ডাকছি অমরদা, ঠাকুর সাড়া দেন না। কেন দেন না বলতে পার। আমার ডাক কি ডাকার মত হয় না—না ঠাকুর-দেবতা সব মিথ্যে! নাকি তাঁর কোন শক্তি নেই!"

তারপর আরও দুটি দুই কথা লিখিয়া লীলা লেখা শেষ করিল। চাকর ডাকিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

আরও দিন চারেক কাটিল—ক্ষতের পুঁজরক্ত কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু এই রোগের যে সঙ্কটজনক মুহূর্ত তাহাই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ থাকিয়া থাকিয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। লীলার নয়ন-জলের বিরাম নাই। মনেও ভয় আসিল—বুঝিবা স্বামী আর বাঁচিবেন না।

বিকালের দিকে চিকিৎসক আসিয়া বলিয়া গেলেন—আজিকার রাত্রিই দারুণ আশঙ্কাজনক, যে কোন মুহূর্তে রোগীর প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। অনেক উপসর্গ আসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয় এবং আজিকার রাত্রি কাটিলেই ভয় কাটিয়া যাইবে। কোন্ উপসর্গে কোন্ ঔষধ—ইত্যাদি উপদেশ দিয়া কবিরাজ বিদায় লইলেন এবং বলিয়া গেলেন—প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে যেন জানান হয়।

কবিরাজ চলিয়া গেলে লীলা আকুলভাবে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। সতীশ নিকটেই বসিয়াছিল, লীলাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,"আপনি অত কাঁদবেন না। রোগী আপনার কান্না বুঝতে পারলে নিজেও হতাশ হয়ে পড়বে। ভগবানকে ডাকুন। তিনি ছাড়া উপায় কি!"

"কতই ত ডাকছি ঠাকুরপো, তিনি শুনছেন না যে, ওঁর এত কষ্ট যে আমি দেখতে পারছিনে ভাই! কবরেজ ঠাকুরের কাছ থেকে একটা অষুধ চেয়ে খেয়েছিলাম ঠাকুরপো, যাতে আমার ওই অসুখ না হয়। কেন খেয়েছিলাম ভাই, কেন ওঁর অসুখ নিজের দেহে নিয়ে ওঁর মুক্তি চাইনি। অষুধ খাওয়ার ভালর দিকটাই তখন চোখে পড়েছিল, মন্দটা ত চোখে পড়েনি। আমার কি হবে ঠাকুরপো!"

কান্নার আবেগে লীলা বলিয়া যাইতে লাগিল। অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া সতীশ অশ্রু গোপন করিল।

"গর্ব করতাম সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে আমার আসন নীচু হতে দেব না। সীঁথির সিঁদুর হাতের নো' আমার অক্ষয় থাকবে—ওঁর পায়ে মাথা রেখে আমি যেতে পারব। আমার সে দর্প কি ভেঙে দেবার জন্যই দর্পহারীর এই আয়োজন! জীবনে আর কত পরীক্ষা দেব ঠাকুরপো। এ জন্মে জ্ঞানত ত কোন পাপ করিনি ঠাকুরপো!"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া বলিল, "কে জানে বৌদি—কেন কোন্ কাজ হয়। কোন্ বৃহতের মঙ্গলের জন্য যে ক্ষুদ্রের বুকে শেল এসে পড়ে ক্ষুদ্র মানুষ তার কি বুঝবে বলুন!"

পরে দেওয়ালের গায়ে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "এই ত অষুধ খাওয়ার সময় হ'ল, আপনি খাইয়ে দিন, আমি ততক্ষণ নীচে দেখে আসি ডাকে যদি কিছু থাকে।"

ঔষধ খাওয়াইয়া লীলা নরেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। বাহ্যজ্ঞান শূন্যের মত নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সতীশ ফিরিয়া আসিয়া লীলার এই উদাসীন, নির্লিপ্ত, অর্থ-শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ডাকিল, "বৌদি!"

লীলা শুনিতে পাইল না। সতীশ নিকটে যাইয়া বলিল, "অমরবাবুর চিঠি নিন।"

লীলা যেন এ জগতে ছিল না—কোন্ স্বপ্ন রাজ্যে তার মুক্ত প্রাণ উড়িয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি কি ঠাকুরপো!"

সতীশ লীলার হাতে চিঠি দিলে লীলা সেখানে বসিয়াই অমরের পত্র পড়িতে লাগিল। লীলাকে বহু আশ্বাস বহু সান্ত্বনা দিয়া অমর এক পত্র লিখিয়াছে। শেষের দিকে লিখিয়াছে। "ঠাকুর দেবতা সত্যি মিথ্যে দুইই। বিরাট বিশ্ব বিশ্বনাথের বাঁধা নিয়মে চলছে। আমরা আস্তিক যাকে ঈশ্বরের বিধান বলে বলছি—নাস্তিকেরা তাকেই প্রকৃতির নিয়ম বলে মেনে নিচ্ছেন। দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানাতীত ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তার কথা ভাবলে তাঁকে জড় ব্রহ্ম বলেই মনে হয়। তাঁর থাকা না থাকার কোন মূল্যই আমরা দিতে পারিনে। তবু আমি বিশ্বাস করি, তিনি আছেন,—ডাকলে তিনি সাড়া দেন। সাধক তার আরাধ্য দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় নিজের চৈতন্য শক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম দেবতাকে নিবেদন করে দিয়ে বলে, আমার মন, বুদ্ধি, চৈতন্য সমুদয় ইন্দ্রিয় নিয়ে হে দেবতা, তুমি প্রাণময় হয়ে ওঠ। তাই ত দেবতা জাগেন। মূর্তি ধরে ভক্তের সম্মুখে এসে দাঁড়ান তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য। নইলে কোথায় তাঁর শক্তি—কোথায় তাঁর অস্তিত্ব। জগৎ বাঁধা

নিয়মেই চলছে. তার ব্যতিক্রম যদি সম্ভব হয়, তবে তা মানুষের বিপুল প্রাণশক্তির জাগরণে—তার কঠোর তপস্যায়। ইংরেজীতে যাকে বলে উইল ফোর্স—আমরা বলি ইচ্ছাশক্তি—তপস্বীর করায়ত্ত হলে তার ইচ্ছায় অন্ধ নিয়তি হার মানে। এই তপস্যার মাটি ভারতে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সুখে দুঃখে আমার প্রাণের ঠাকুর হাসছেন কাঁদছেন, আত্মশক্তিতে ঘুমন্ত ঠাকুরকে জাগিয়ে বল্‌না, আমার স্বামীকে ভাল করে দাও ঠাকুর। তাতেও যদি ঠাকুর না জাগে—নিজেই জেগে ওঠ্‌। নিজের ভেতরকার মহাশক্তিকে জাগিয়ে তুলে বল, আমিই সেই—আমার ইচ্ছাই সব।"

পত্র পড়িয়া লীলা বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দৃঢ় সংকল্পের উজ্জ্বল নীরব হাসি অধরের কোণে খেলিয়া গেল।

পত্রখানি অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়া লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল,"আজকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে ঠাকুরপো।"

সতীশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলে লীলা কহিল, "আমি আজ একাই ওঁর কাছে থাকব। আপনি বৈঠকখানায় যেয়ে শোবেন।"

সতীশ লীলার কথার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। এমন কি অসংগত অশোভন ব্যবহার সে করিয়াছে যার জন্য পরম সঙ্কট মুহূর্তে বৌদি তাহাকে দাদার শয্যাগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন? এতদিনের আচরণ পর্যালোচনা করিয়া সে এমন কোন ত্রুটি দেখিতে পাইল না, যাহাতে তাহার কোন ব্যবহার সন্দেহজনক কুরুচিপূর্ণ বা অভদ্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে বেহায়াপনাটুকু তাহার আছে তা'ত সহ্যের সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে। সশঙ্ক, নির্বাক দৃষ্টিতে সতীশ লীলার পানে চাহিয়া রহিল।

লীলা মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পেয়ে গেছেন ঠাকুরপো, কোন্ অপরাধে তাড়িয়ে দিচ্ছি। অপরাধে নয়, অমনি, দিচ্ছি. ওঁকে নিয়ে আজ আমি একা জেগে থাকব।"

সতীশ লীলার একা থাকিবার হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল. "আপনার প্রয়োজন আমি বুঝতে পারছিনে বৌদি, এই ভয়ের রাত্রিতে মুমূর্ষু স্বামীর পাশ থেকে তার শুশ্রূষাকারী বন্ধুকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজন আপনার যত বড়ই হোক্—সে প্রয়োজন আমি স্থির মস্তিষ্কের ধারণা বলে ভাবতে পারছিনে।'

লীলা কাতর হইয়া বলিল, "সত্যি আমার প্রয়োজন আছে ঠাকুরপো। আজকের রাতটায় আমায় একলা থাকতে দিন ভাই। কাল থেকে ওঁর সম্পূর্ণ সেবার ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব।"

কথাটা লীলা যে অর্থেই বলিয়া থাকুক সতীশ তাহা না বুঝিয়া অন্য অর্থে বুঝিয়া লইল। ভাবিল চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন, আজই বিপজ্জনক রাত্রি—তাই কি পতিব্রতা যখন দেখিবেন স্বামীর প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে অমনি যে কোন উপায়ে নিজের জীবন বিসর্জন করিয়া স্বামীর অনুগমন করিবেন এবং এই জন্যই একা থাকিবার জন্য এই কাতর অনুনয়। মধ্যাহ্ন না হইতেই এই স্বর্ণকমল ঢলিয়া পড়িবে।

সতীশের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বলিল, "স্বামীর জীবন সম্বন্ধে কি একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন বৌদি?"

লীলা খুব শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এতটুকু না। বরং আপনি যা ভাবছেন ঠিক তার উল্টো। আমি বিধবা হব না।"

তারপর খানিক থামিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনার সংগে বলিয়া উঠিল, "আমাকে বিধবা করবার সামর্থ্য কারুর নেই।"

সতীশ লীলার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমাকে সরিয়ে দিচ্ছেন?"

লীলা এইবার সতীশের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ওঃ এই জন্য। আপনি দেখছি একটা বদ্ধ পাগল। আত্মহত্যা করব না ঠাকুরপো, ওঁকে সামনে রেখেই বলছি।"

ইহার পর সতীশ আর বাক্য ব্যয় করা সংগত মনে করিল না। নরেন্দ্রের রোগশয্যার পার্শ্বে সতীশ আরও কয়েকবার লীলার আত্মস্থ সমাধিভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। তার সেই নির্লিপ্ত তপস্বিনী মূর্তি শুধু তার বিস্ময়ের বস্তুই হয় নাই—তার গভীর শ্রদ্ধার বিষয়ও হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাহার মনে হইয়াছে,—লীলা যেন রক্ত-মাংসের গড়া এই পৃথিবীর মানুষই নয়। শুধু একটা তেজঃপুঞ্জ—শুধু যেন একটা বিদ্যুচ্ছটা। সেদিকে চাহিলে চোখ ঝলসিয়া যায়—বুক কাঁপিয়া উঠে। লীলা হিস্টিরিয়ার রোগী। সতীশ শুনিয়াছিল, কোন কোন হিস্টিরিয়ার রোগীর দেহের ঔজ্জ্বল্য কখনও কখনও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, মূর্ছাবস্থায় দুই একটি ভূত ভবিষ্যতের কথাও ঠিক ঠিক বলিয়া বসে। প্রথমে দুই একদিন সতীশ লীলার ভাবকে রোগের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধারণা বজায় রাখিতে পারে নাই।

সূর্য ডুবিয়া গেল—চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাত্রি আসিল রাত্রি বৃদ্ধির সংগে সংগে নরেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়িতে লাগিল। কোন্ সময় ঔষধ খাওয়াইতে হইবে উপদেশ দিয়া সতীশ নরেন্দ্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "আমি বৈঠকখানায় থাকছি, বৌদি তোমার কাছে একা রইলেন।"

শ্রবণশক্তিও প্রায় লোপ পাইয়াছিল। উচ্চকণ্ঠে বলায় সতীশের কথা নরেনের কানে পৌঁছিল। অতিকষ্টে মুদ্রিত আঁখি-পল্লব মেলিয়া নরেন্দ্র সতীশের দিকে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল "যাও।"

সতীশ চলিয়া গেলে লীলা বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া ঘরময় গংগাজল ছিটাইয়া দিল, নিজের মাথায়ও দিল। তারপর স্বামীর শয্যায় আসিয়া বসিল। নরেন্দ্রের মুখে একটু গংগা-জল ঢালিয়া দিয়া বলিল, "গিলতে খুব কষ্ট হচ্ছে না?"

নরেন্দ্র অতিকষ্টে গংগাবারি গলাধঃকরণ করিয়া সাঁই সাঁই করিয়া বলিল,—"খুবই কষ্ট—আমি আর বাঁচব না, নিশ্বাস ফেলতে পারছিনে।"

নরেন্দ্রের চক্ষে জলধারা বহিল। অতি সন্তর্পণে স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া লীলা বলিল, "তুমি কষ্ট পাচ্ছ—অসহায় আমি তাই চেয়ে দেখছি, কিন্তু—"

লীলার কণ্ঠ অতিমাত্রায় কঠিন হইয়া উঠিল। "তোমায়

আমি মরতে দেব না। এ আমার ইচ্ছা—আমার সংকল্প—আমার সাধনা। আর তুমিও শোন—তুমি মরতে চেওনা, তোমার সমস্ত শক্তি—সমস্ত চেতনাকে একত্র করে বেঁচে উঠবার দৃঢ় ইচ্ছাকেই জাগিয়ে রাখ। তুমি না আত্মা—তুমি অমৃত—তুমি না শিব।"

দৈববাণীর মত সেই দৃঢ়স্বর নরেন্দ্রের কানে গেল। নিমীলিত আঁখিযুগল যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া লীলার দিকে চাহিয়া রহিল। লীলাও স্থির দৃষ্টি দিয়া স্বামীর চোখে চোখে চাহিয়া রহিল। যেন লীলার চক্ষু হইতে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বাহির হইয়া নরেন্দ্রের চক্ষুকে আহত করিল। নরেন্দ্র চক্ষু মুদিল। তড়িৎপ্রবাহ চক্ষুকে আহত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তা যেন নয়নপথে সর্ব দেহে সঞ্চারিত হইয়া তার নির্জীব প্রাণশক্তিকে ক্ষণিকের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল—যেন নির্বাণোন্মুখ দীপের নিঃশেষপ্রায় সলিতাটুকু উস্কাইয়া দেওয়া হইল।

তারপর লীলা আর কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সম্মুখে মুমূর্ষু স্বামী—অন্তরে স্বামীর জীবন রক্ষার সংকল্প। বসিয়া বসিয়া লীলা কি ভাবিতেছিল সেই জানে, বাহিরে তাহার চক্ষু ক্রমে নিমীলিত হইয়া আসিল—শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে লাগিল। পলে পলে রাত্রি বাড়িয়া চলিল—থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্র কাতরোক্তি করিয়া উঠিতেছিল—লীলার কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে যেন আত্মসমাহিতা মহাযোগিনী। ক্রমে লীলা বাহ্য-জগৎ—স্বামীর অসুখের কথা ভুলিয়া গেল—স্বামীকে ভুলিল—নিজকে ভুলিল—নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিল। জগৎ-সংসার স্বামী নিজে সমস্ত মিলিয়া একাকার হইয়া গেল।

মুমূর্ষু স্বামীকে লইয়া সে রাত্রিতে বৌদিদি একা কি করেন, ইহা জানিবার কৌতূহল সতীশের বড় কম ছিল না। সে মনে করিয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অলক্ষ্যে সে এই রহস্যময়ী নারীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া যাইবে। নরেন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে সেও কম সংশয়াপন্ন ছিল না। এই খেয়ালী নারীর খেয়াল চরিতার্থ করিতে যাইয়া সে বন্ধুর নিকট হইতে সরিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু চিত্তে তাহার প্রত্যয় মানিতেছিল না। অলৌকিক অসম্ভব কিছুতে বিশ্বাস করিবার মত সু বা কুশিক্ষা তাহার ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী সতীশ পাশ্চাত্যের চশমা দিয়াই জগৎকে দেখিতে শিখিয়াছিল; সুতরাং জড়-বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণে যার অস্তিত্ব ধরা যায় না সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু বা শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে কোনদিনই নিঃসন্দেহ ছিল না। নিজের ভাবপ্রবণ কবি-চিত্তে লীলার সাময়িক আত্মসমাহিত ভাব বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছেন সত্য, তার পাশ্চাত্য সংশয়কে দূর করিয়া দিতে পারে নাই।

নরেন্দ্রের কাছে লীলাকে রাখিয়া আসিয়া সতীশ শয়ন করিল বটে—ঘুমাইতে পারিল না। শ্রম-ক্লান্ত দেহ বিশ্রামই চাহিতেছিল, তবু সতীশ জোর করিয়াই জাগিয়া রহিল। দুই একবার দরজার ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিল, রুগ্ন স্বামীকে সম্মুখে লইয়া বৌদিদি প্রশান্ত নির্বিকারচিত্তে নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছে। তারপর নিজের অলক্ষ্যেই সতীশ কখন ঘুমাইয়া পড়িল। কোথা দিয়া কেমন করিয়া রাত্রি কাটিল সে কিছুই জানিতে পারিল না।

শেষ রাত্রির দিকে লীলার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনিয়া সতীশের ঘুম ভাঙিয়া গেল। লীলা যেন বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া যাইতেছে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সতীশ উঁকি দিয়া দেখিল, লীলা ঠিক তেমনিই ভাবে বসিয়া আছে যেন সংজ্ঞাহীন, অচেতন অবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিয়া কার সঙ্গে কি কথা কহিতেছে। খানিক পরে লীলা নিজে নিজেই থামিয়া গেল। সতীশ কৌতূহল দমন করিতে পারিল না—অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া রোগীর দিকে চাহিল। দেখিল, নরেন্দ্র স্থিরভাবে শুইয়া আছে। কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহ নড়িতেছে মাত্র। আশ্বস্ত হইয়া সতীশ আবার নিজের শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

বাকী রাত্রিটুকু সতীশের আর ঘুম হইল না। ঊষার আলোকচ্ছটা মুক্ত বাতায়ন পথে দেখা যাইতেই সে নরেন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল—লীলা ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া রহিয়াছে। সেদিকে বেশী মনোযোগ না দিয়া সতীশ নরেন্দ্রের হাতখানি একটু নাড়া দিয়া ডাকিল "নরেন!"

নরেন্দ্রও যেন জাগিয়া ছিল না। প্রাণও বুঝি তাহার দেহ ছাড়িয়া কোন্ দূর প্রদেশের উন্মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল। সতীশের ডাকে তাহার দেহ যেন আচমকা আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে চোখ মেলিয়া সতীশকে দেখিতে লাগিল যেন সহসা চিনিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। গভীর নিদ্রা অসময়ে ভাঙিয়া গেলে মানুষ যেমন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে—নরেনের অবস্থাও তাহাই।

সতীশ আবার ডাকিল, "নরেন, এখন কেমন আছিস ভাই?"

নরেন্দ্রের চেতনা ফিরিয়া আসিল। অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "অনেকটা ভাল লাগছে! খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

সতীশ এইবার লীলার নিকটে সরিয়া ডাকিল "বৌদি!"

বৌদি শুনিতে পাইল কিনা কে জানে কোন উত্তর করিল না। সতীশ আবার ডাকিল, সাড়া পাইল না। এইবার সতীশের একটু ভয় হইল। আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল। লীলা কথা কহিল না। লীলাকে স্পর্শ করিতেও সতীশের সাহস হইল না। নরেন্দ্র তখন অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল। কষ্টে পাশ ফিরিয়া নরেন্দ্র লীলার দেহ স্পর্শ করিল, একটু নাড়াও বুঝি দিল। লীলা উঃ বলিয়া একটা অনুচ্চ চীৎকার করিল তারপর মূর্চ্ছিত হইয়া নরেন্দ্রের পার্শ্বেই এলাইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

মহাসমরের পটভূমি—ইউরোপ

নয় বৎসর ধরিয়া সারা বিশ্ব (লোকসংখ্যা ২১৩,৪০,০০,০০০) একটা বিষাদ-যবনিকায় আবৃত হইয়াছে—এখানে ওখানে ক্ষণস্থায়ী বিপরীত অবস্থা ব্যতীত। এই আতঙ্কময় কালের ভিতর এক-এক সময় এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব বুঝি পরিণত হয় পুনরায় যুদ্ধপূর্ব বিশ্বে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সমরের আসন্নতা বুঝি নিক্ষিপ্ত হয় নূতন করিয়া। সমগ্র পৃথিবীর কোটি কোটি তরুণ তাহাদের দেওয়াল-পঞ্জীতে শঙ্কান্বিত-চিত্তে সমরাভিযান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

সমরের তোড়জোড়ে যখন মহলার পর মহলা সুরু হইল জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিশ্ববাসীর সচকিত সংক্ষুব্ধ দৃষ্টি পড়িল আধুনিক ইউরোপীয় ঘটনা পরম্পরার উপর। তাহাদের তেমন নিবিড় পরিচয় নাই সেই ইতিহাসের সহিত, যাহাকে বর্তমান ইউরোপীয় ঘটনা সমারোহের অব্যবহিত পূর্বযুগীয় বলা যায়—অর্থাৎ আর্মিষ্টিস স্বাক্ষরিত হইলে পরে আরম্ভ হয় যে যুদ্ধোত্তর মীমাংসা-সূত্র, যে কনফারেন্স-সমূহ, যে সন্ধি চুক্তির পর্ব তাহার সহিত। নমিত-ওষ্ঠ ও অপরিপাটী মস্তকশোভিত ব্রায়াণ্ড, দৈরথ সমরের অস্ত্র-লেখা-চিহ্নিত বীর ষ্ট্রেসম্যান, একাক্ষী চশমার আবরণে অপলক দৃষ্টিসঞ্চারী স্যার অষ্টিন চেম্বারলেন পরিচ্ছদা-ভিজাত্যসহ—এইগুলি ছিল সেদিনের ঐতিহাসিক নাম, যাহার সহিত পরিচয় করিতে হইত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আর অভিভাবকদের করিতে হইত আবছা স্মরণশক্তির পুনঃসংস্কার।

যুদ্ধোত্তর কূটনীতি পদে পদে অনুসরণ করিতে হইলে—যুদ্ধোত্তর মহা জটিলতা পরতে পরতে উদ্ঘাটিত করিতে হইলে বিরাট বিপুলকায় ইতিবৃত্ত গ্রন্থ প্রণয়ন আবশ্যক হয়। কিন্তু আর্মিষ্টিসের পর হইতে প্রধান প্রধান ঘটনা দ্বারা সূত্র সংযোগ রক্ষা করিলে বিগত সপ্তাহের সমর-সংবাদও আর অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন মনে হইবে না—ফলে যুদ্ধোত্তর পারি-পার্শ্বিকের আসন্ন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বাবস্থায় পর্যবসিত হওয়াও চমকপ্রদ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না। ইতিহাসের প্রশস্ত প্রবাহের নিকট এই যুগ সংক্ষিপ্তই বলিতে হইবে—কেবল ২৪৬ মাস অর্থাৎ ১০৬৩ সপ্তাহ অথবা ৭৪৫৩ দিন—বার্ষিক ফসলের কুড়িটি মরশুমকাল—গ্র্যাজুয়েট হইবার কুড়িটি বার্ষিক শ্রেণীর সময়।

মহাসমরের অবসান—ইতিহাসে যে যুগে বিদ্যুৎবেগে পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে, তখন ইতিহাসের মাপকাঠি হয় দিবস দণ্ড পল—বৎসর নয়। মহাসমরের অন্তিম সপ্তাহ-সমূহে অতি ক্ষিপ্রগতিতেই ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হয়—ঘটনার ধারা তখন এমনই দ্রুত আবর্তিত যে, স্বয়ং জেনারেল ফচও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—সমরের অবসান সমীপ-বর্তী। সমরাবসানের মাত্র এক মাস পূর্বে তিনি যখন তাঁহার নব-পরিচালন-ক্রম লইয়া ব্যস্ত—যাহাকে তিনি বলিয়া-ছিলেন, 'বৃহত্তম অভিযান', উহার বাস্তব চালনার অন্তর্ভুক্ত ছিল ভাবী বর্ষের অভিযান পরিকল্পনা। ইহার পর ৩০০ ঘণ্টার ভিতরই তুরস্ক আর্মিষ্টিসের জন্য আবেদন করিল; বেলগ্রেড, ত্রিস্তে—মিত্রশক্তির অধিকারভুক্ত হইল; অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী আর্মিষ্টিসে স্বাক্ষর করিল; জার্মান গ্রাণ্ড নৌ-বাহিনীর নাবিকদের সমুদ্র যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দান করা হইলে, চরম আশা শূন্যতায় বিদ্রোহী হইল সকল প্রচণ্ড বিপদ উপেক্ষা করিয়া। মিউনিচে এক বিপুল বিক্ষোভ-কারী জনতা সোস্যালিষ্ট ইসনার কর্তৃক পরিচালিত হইল, যাহার ফলে ৮ই নবেম্বর বেভেরিয়ান সোস্যালিষ্ট সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হইল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান সোস্যা-লিষ্টগণ কেইজারকে সিংহাসন বর্জন করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে এক চরম পত্র প্রেরণ করিল। বিপ্লব প্রসার লাভ করিল—ফ্রাঙ্কফোর্ট, কলোন, ডাসেলডর্ফ, লাইপজিগ, ষ্টুটগার্ট, মাগডিবুর্গ, ব্রুনসউইক বিপ্লবের কলরোলে মুখরিত হইল; পরিণামে ব্রুনসউইক, বেভেরিয়া ও মেকলেনবুর্গ-সোয়েরিন—এই তিনটি অঞ্চলের শাসনকর্তা সিংহাসনচ্যুত হইল; কেইজার হইলেন পলাতক; সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সাধারণতন্ত্র বিঘোষিত হইল। স্যাগ্রেবে ক্রোইশীয় স্বাধীনতা ঘোষণা-প্রাপ্ত হইল। বুদাপেস্তে প্রকাশ্য খণ্ড-বিদ্রোহের ফলে উদারনীতিক কাউণ্ট ক্যারোলিয়াই সর্বোচ্চ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে জার্মান সেনা ১০০ মাইল পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল—তাহাদের ৩,৯০,০০০ সেনা বন্দী হইল এবং ৬৬০০ কামান মিত্রশক্তির হস্তে পতিত হইল; ইতিহাসে ইহাই সর্ব-বৃহৎ সামরিক অভিযান। এই পশ্চাদপসরণে জার্মান সেনা বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া এবং রাইন নদী অতিক্রম করিয়া অতি দ্রুত পলাতক হইয়াছিল; এই প্রত্যা-বর্তন এত ক্ষিপ্র ও নিপুণভাবে নিষ্পন্ন করিতে জার্মান-গণ সমর্থ হইয়াছিল যে, লিডেল হার্ট ইহাকে [illegible]ভঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন নাই বরং কৌশলপূর্ণ সামরিক প্রস্থান-পরিচালন বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

মিত্রশক্তির অনুসরণ সুরু হইল—বেলজিয়াম, লাকসেম-বুর্গ, য়্যালসাস লরেন ভেদ করিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের রাইন নদীর বাম তীর পর্যন্ত—মেঞ্জ, কোব্লেন্তজ ও কলোনের সেতু-কেন্দ্র পার হইয়া ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত। আর্মি-ষ্টিসের সর্ত অনুসারে জার্মানী মিত্রশক্তিকে ৫০০০ ট্রাক্ (Trucks) প্রদান করিল।

অবশেষে সমরের সমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু সেই পরি-সমাপ্তি আসিল নিবিড় অন্ধকার আকাশে—মার্কিন জেনারেল ব্লিস বলিয়াছেন, সমর-বিরতির উল্লাস-আনন্দ সকলই হইল অন্ধকারাবৃত। ইউরোপের পুরাতন রাজ্যগুলি, পুরাতন জীবন-ধারা, পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ—সকলই চূর্ণিত বিচূর্ণিত; প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিহত এবং আহত হইয়া মৃতের একুন সংখ্যা দাঁড়াইল—৯০ লক্ষ; দুই কোটি কুড়ি লক্ষ আহত। ইহা ছাড়া সমরাভিযানের ফলে বে-সামরিক নর-নারী কত যে হতাহত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা অজ্ঞাত। জেনারেল ব্লিস্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"বিশ্বে পুনরায় আগেকার সুখ-শান্তিময় জীবন ফিরিয়া আসিতে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণের সময়েও সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ। আর সেই ক্ষেত্রেই উহা ফিরিয়া আসা সম্ভব,
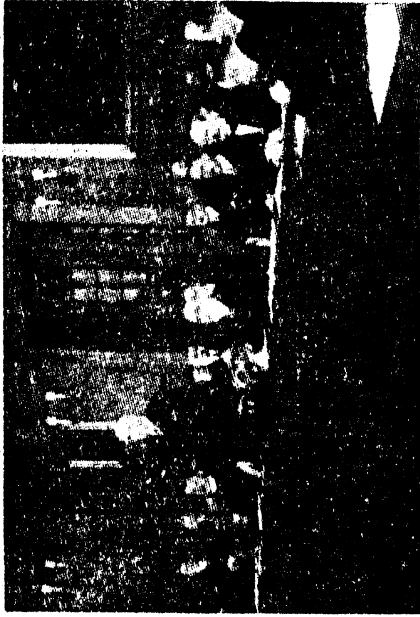
কালোকোর্ত্তা দল লইয়া মুসোলিনীর রোম-অভিযান—১৯২২, ৩০শে অক্টোবর; ফাসিস্ত আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন।

লীগ অফ্ নেশন্‌স্-য়ের প্রথম সভা—১৯২০ সালের নবেম্বর; ভাবী সমর-নিরোধে ইউরোপের তখন উচ্চাশা।

ফরাসীদের রূঢ় (Ruhr) অঞ্চল অধিকার—১৯২৩ সাল।

১৯২২ সালের জুন—সিন্ ফিন্ বিদ্রোহ ও নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
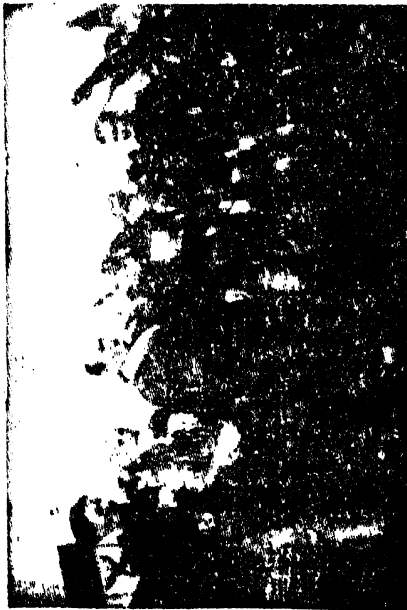
যদি আমাদের প্রতিবিধান প্রয়াস এমনতর একটা মহাসমর আপতিত হওয়াকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে।

সমর শেষ হইয়াছে; কিন্তু—

রাশিয়ায় বোলশেভিকগণ যুদ্ধরত রহিয়াছে আর্কেঞ্জেল হইতে ভলাডিভষ্টক পর্যন্ত এক শতবক্র সমর রেখায়, বিরুদ্ধ পক্ষ হইল হোইটস্ আর মিত্রশক্তি।

বল্কান অঞ্চলে—গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করিল, আনাতোলিয়া অধিকার করিল—তৎপর এক বৎসরেরও অধিক কালের সংগ্রামের পরে বিতাড়িত হইল। রুমানীয়, চেক ও যুগোশ্লাব মিলিত সেনা হাঙ্গেরীর উপর চড়াও হইল—লুঠিয়া লইল গো-অশ্বাদি, বাষ্পীয় যানাদি, বেলাকুনের কমিউনিষ্ট সরকারকে বিব্রত করিয়া তুলিল অভিযানের তীব্রতায়।

পোল্যান্ড অধিকার করিল ভিল্না; লিথুয়ানিয়া হস্তগত করিল মেমেল; যুগোশ্লাভিয়া ছিনাইয়া লইল—মন্টেনিগ্রো।

ডাবলিন শহরে—ভিয়েনায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার দুইমাস মধ্যে সিনফিন্ গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। তিন বৎসর চলিল ইংলিশে আইরিশে হানাহানি।

ঠিক এই সময়েই মরক্কোতে রিফ্ বিদ্রোহীরা স্পেনীয়দের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

নির্মম, বর্বর ও ব্যয়বহুল হইলেও এই সকল সংঘর্ষকে, যে অতিকায় সংঘর্ষ সদ্য সমাপ্ত হইল তাহার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্রই বলিতে হইবে, ইহা যেন মহাসমরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব মুহূর্তের মরণ কামড়—নতুবা ইহা মহাসমরের সজীব অবস্থা নয়। তদুপরি রাজনীতিক কূটচক্র ও তাহার দ্রুত আবর্তন বিবর্তনে এই সকল সংঘর্ষের জ্বালামালা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছিল ক্ষণে ক্ষণে একেবারে দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মাইয়া।

এই দ্রুত আবর্তনের আভাস পাওয়া যাইবে শান্তিস্থাপিত হইবার প্রথম ৫০০ দিবসের ইতিহাস অনুসরণ করিলে:—

৩৫টি নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল ইউরোপে, তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষায় চলিল বিক্ষোভ এবং পাল্টা বিক্ষোভ!

ভার্সাই চুক্তি গঠিত করিল—পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, লেটভিয়া, এস্থোনিয়া, ফিনল্যান্ড; ইউরোপের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল—মন্টেনিগ্রো, ক্রোইশিয়া, বোহেমিয়া, ট্রান্সিলভানিয়া, গেলিসিয়া, লিভোনিয়া, কুরল্যান্ড এবং শ্লেজউইগ্; গঠিত হইল লিগ অফ্ নেশনস্—যাহাতে ৪২টি শক্তি যোগদান করিল।

জার্মান সাম্রাজ্য, রুশ-সাম্রাজ্য, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য—যাহাদের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতায় অধিকাংশ ইউরোপবাসী জীবন-যাপন করিত—অন্ধকার রসাতল সেই সাম্রাজ্যগুলিকে গ্রাস করিল। হিসাব-নিকাশের জন্য নিযুক্ত অষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডল বাস্তবে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বেই দেখিতে পাইল রাজ্যটি উধাও হইয়াছে। শুধু সাম্রাজ্যই বিলীন হয় নাই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে—অভিজাত সম্প্রদায় কায়েমী শাসনাধিকার প্রাপ্ত, কূটনীতিক, রাজনীতিক নেতাগণ, সামরিক জাতি, পুলিশ গোয়েন্দা, রাজকর্মচারী দল, কূটনীতিক প্রধানগণ এবং শাসকবংশের আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষক সমর্থকগণ।

এই সকল বিলুপ্ত দলের স্থান নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিল—নব নব রাজনীতিক সম্প্রদায় যাহাদের নব নব সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বাস্তব প্রয়োগে নূতন নূতন প্রণালীর ব্যবস্থা হইল। রাশিয়ায় লেনিন প্রবর্তিত মতবাদের পরিপোষক ও সমর্থক এক অদ্ভুতকর্মা মনস্বীর দল প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন মতাবলম্বীদের সহিত প্রবলভাবেই বিরোধে লিপ্ত হইল; রাষ্ট্র অধিকার করিবার জন্য জারের সমর্থক সেনানায়কগণ ও মিত্রশক্তির হস্তক্ষেপ—এই দুইয়ের সঙ্গেও লেনিনপন্থীগণের যুঝিতে হইল। কিন্তু ইউরোপের সর্বত্রই তখন চলিয়াছে নব মতবাদ লইয়া পরীক্ষা—ভাল হউক মন্দ হউক, র‍্যাডিকেল হউক আর প্রতিক্রিয়াশীল হউক—একটা নূতন কিছু লইয়া ঝুঁকিয়া পড়া যেন ইউরোপে তখনকার দিনে ব্যাপক রেওয়াজে পরিণত। আবার নূতন ধরণের রাজনীতিক ধুরন্ধরও দেখা দিয়াছে এই সকল পরীক্ষার নিয়ন্তারূপে,—মাজারিকের মত অধ্যাপক, প্যাডারেস্কির মত চিত্রশিল্পী, ইস্নার বা ডি' এনানজিওর মত সাহিত্যরথী, পিলসুডস্কির মত ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট—এই জাতীয় মনীষীই অগ্রণী হইল এবং তাহারা প্রতিযোগিতায় সফলকাম হইয়া শক্তিপ্রতিষ্ঠাই করুক অথবা পরাস্ত হইয়া ভূপাতিত হউক, তাহাদিগকে ইউরোপের এমন নবরূপদানেই সাহায্য করিতে হইল—যে ইউরোপের সর্বাগ্রগণ্য দাবী হইল শান্তি, অন্য সব কিছুই যাহার নিকট নগণ্য।

জার্মানী—পরাস্ত, অবসন্ন, অবরুদ্ধ জার্মানী দোদুল্যমান অবস্থায় কাল যাপন করিতে বাধ্য হইল; বৈপ্লবিক এবং প্রতি-প্লবিক সংঘর্ষ, অর্থনীতিক জটিল সমস্যা, গবর্ণমেণ্টের উত্থান-পতন, দলগত বিদ্রোহ-বিপ্লব—জার্মানীর অবস্থা যেন উপায়হীনতার সীমায় পৌঁছিল। তাহার স্থলসেনা নিরস্ত্রীকৃত, নৌবহর জলনিমজ্জিত, বাণিজ্যতরীসমূহ বাজেয়াপ্ত—তদুপরি ৬ কোটি ২০ লক্ষ জার্মানীবাসীকে খোরাক-পোষাক দিয়া বাসগৃহ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, রাজনীতিক মতবাদে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে, জাতির অস্তিত্ব রক্ষায়, জাতির ভাবী কল্যাণে। জার্মানীর বাহিরে ইউরোপে নূতন নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইতেছে ধীরে ধীরে—তাহারা সুযোগ বুঝিয়া বুক ফুলাইয়া সীমানা বাড়াইয়া লইতেছে, পরস্পরে মিতালীবদ্ধ হইয়া জার্মানীর গণ্ডীর ভিতর সুবিধামত থাবা মারিতেছে। তখনও জার্মানী রহিয়াছে ইউরোপের প্রধান সমস্যা—অপরদিকে রাশিয়া তখনও অন্তর্বিপ্লবে বিব্রত।

শান্তির প্রথম পাঁচ বৎসরে সেই আর্মিষ্টিস্ হইতে 'সার' ব্যবস্থা পর্যন্ত—রাশিয়ার বাহিরে ইউরোপের যে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তাহার মূলে রহিয়াছে জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখিবার ফরাসী-নীতি।

দুর্বল, জার্মানী নিশ্চয়ই হইয়া পড়িয়াছিল। সময়ান্তে ভার্সাই চুক্তিতে সে হারাইল:—

১৭ লক্ষ সমরে হত, ৪২ লক্ষ আহত, ১১ লক্ষ ৫০ হাজার নিরুদ্দেশ।

য়্যালসাস লরেন্, পোসেনের অধিক অংশ, পশ্চিম প্রুশিয়া কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সমস্তগুলি উপনিবেশ এবং নানা স্থানের কনসেশন্ তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছে।

সমুদয়ে ১ কোটি ৮০ লক্ষ জনসংখ্যা হইতে সে বঞ্চিত, ১০ লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক রাজ্যভাগ তাহার অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৪৫ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ, চাষী জমির শতকরা ১৫ ভাগ, কল-কারখানার শতকরা ১০ ভাগ এবং বাণিজ্য বহরের ৫১ লক্ষ টনবাহী জাহাজগুলি হইতে সে বঞ্চিত।

ইহা ছাড়া ফ্রান্সকে তাহার প্রদান করিতে স্বীকার করিতে হইয়াছে—

১ লক্ষ ৫ হাজার টন বেনজোল, ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন আলকাতরা, ৯০ হাজার টন সালফেট অফ্ য়্যামোনিয়া, ৫০০০ অশ্ব, ৩০,০০০ ঘোটকী, ২০০০ ষাঁড়, ৯০,০০০ গাভী, ১ লক্ষ ভেড়া, ১০,০০০ ছাগ। নগদ দিবার কথা ছিল ক্ষতি-পূরণস্বরূপ ১৯২১ সালের মে মাসের পূর্বে ৫০০ কোটি ডলার। ইহার আংশিক মাত্র সে পরিশোধ করিয়াছে।

এই প্রকারে শক্তিহীন ৬ কোটি ২০ লক্ষ জার্মানীবাসী হতাশার চরমে পৌঁছিয়া বিশ্বের নিকট যেমন এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, যুদ্ধোত্তর যুগের ফ্রান্সের নিকট তেমনই নিশ্চিন্ততার তৃপ্তি আনিয়াছিল। জার্মানীর অভ্যন্তরে রাজনীতিক তাণ্ডব স্থায়ী হইয়া স্বাভাবিকে পরিণত হইল; বেভেরিয়ায় ক্ষণস্থায়ী সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হইল; দেশ জুড়িয়া একটা অরাজকতা—কমিউনিষ্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব চলিতে লাগিল; ইহার উপর আবার দেখা দিল অভিযান যাহাকে বলা হইত পুশ (putsche)—ক্যাপ, হিটলার এবং লুডেনডর্ফ পরিচালিত। ওয়াল্থার র‍্যাথানো বিখ্যাত অর্থনীতিক ও শিল্প-বাণিজ্য-তত্ত্ব-বিশারদ ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব—তিনি নিহত হইলেন দুইজন তরুণ ন্যাশনালিষ্টের হাতে। পররাষ্ট্র-সচিবের মোটর যখন ফরেন অফিসে যাইতেছিল, সেই সময় ঐ দুটি তরুণ উক্ত মোটরের পাশাপাশি যাইয়া হাত-বোমা ছুড়িয়া দেয় গাড়ীতে; ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া বোমা-হত বিকৃত দেহের উপর লিউইস্ গান হইতে গুলী বৃষ্টি করিয়া একেবারে ঝাঁজরা করিয়া ফেলে; তৎপর থুরিঙ্গিয়ার এক প্রাসাদের চোরা কুঠরীতে যাইয়া তরুণ দুইটি আত্মহত্যা করে। কিন্তু ইহাই একমাত্র হত্যা নয়; উদারনীতিক ম্যাথিয়েস এর্জবার্গার এবং সোসিয়া-লিষ্ট ইস্নারও আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারায়। বিপ্লবী রোজা লুকসেমবার্গ এবং কার্ল লাইব্‌ক্রেক্‌ট উভয়ই সহসা নিরুদ্দেশ হয়, পরে শোনা যায় তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে।

জার্মানীর বাহিরে ভার্সাই সন্ধি ও তৎপরবর্তী সন্ধি-চুক্তিসমূহের ফলে যে সকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের পরস্পরে ও ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীচুক্তির একটা শৃঙ্খল গড়িয়া তোলা হইল। ১৯২১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এক চুক্তি বলে পোল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পরকে সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইল যদি উহাদের কাহারও উপর জার্মান অভিযান পরিচালিত হয়। ইহার পর বেলজিয়াম এবং চেকো-শ্লোভাকিয়া ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষর করিল; কাজেই জার্মানীকে ঘিরিয়া মৈত্রী-শৃঙ্খলের বেড়ী পরান হইল। ইহার পর যখন চেকো-শ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমেনিয়া মিলিয়া হাঙ্গেরীকে ঘিরিয়া অনুরূপ মৈত্রী-বন্ধনের বেড়াজালের সৃষ্টি করিল, তখন জার্মান অভিযানের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তা দৃঢ় হইল বলিয়াই ধরা হইল—অন্তত কূটনীতিক চাল, সামরিক শক্তি ও অর্থনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি যতটা নিরাপত্তা বিধান করিতে পারে, তাহার কোনই ত্রুটি রহিল না।

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সামরিক শক্তি কর্তৃক সমর্থিত জাতিগত প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। ভার্সাই-চুক্তির লাঞ্ছনা, রাজ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের সর্তে চরম লাঞ্ছনায় পরিণত হইল, যদিও অজুহাত দাঁড় করান হইয়াছিল ভবিষ্যৎ সমর প্রতিরোধের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই এই ব্যবস্থা, তথাপি দুঃখের বিষয় ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি এই আদর্শের নিতান্তই বিরোধী। ১৯২১ সাল উপস্থিত হইলে যদিও মার্কিন লীগ অফ্ নেশনস্ বর্জন করিয়াছিল, তথাপি সে-ই অগ্রণী হইল নৌ-শক্তি খর্ব রাখিবার প্রস্তাব পেশ করিতে। ওয়াশিংটন কনফারেন্সে স্থির হইল—মার্কিন, ব্রিটেন ও জাপান প্রত্যেকে ১৮৭৬০০০ টনের প্রতীক সমরতরী বাতিল করিয়া দিবে। ফলে নৌ-বিভাগের দৌড়াদৌড় কমাইয়া ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর রাখার কাজ সুরু হইল।

১৯২২ সালে যখন জার্মানী ক্ষতিপূরণ পরিশোধ তিন বৎসর স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জানাইল, ব্রিটেন উহার পক্ষে ছিল, কিন্তু ফ্রান্স অসম্মতি জানাইল। জার্মানীর চারিদিকে মৈত্রীবন্ধনের যে বেড়াজাল ফ্রান্স সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই অঞ্চল হইতে পরাস্ত জার্মানীর প্রতি নানা শত্রুতা সাধন চলিতে লাগিল। আবার ১৯২২ সালে যখন রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্মানী কর্তৃক স্বীকৃত হইল, তখন সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রীর ভয়ে ঐ শত্রুতা আরও প্রবল আকার ধারণ করিল। ১৯২৩ সালের ১১ই জানুয়ারী ফরাসী সেনা রুঢ় (Ruhr) অঞ্চলে হানা দিয়া জার্মান কয়লা, লোহা ও ইস্পাতের ৮০ পারসেণ্ট আয়ত্ত করিতে চাহিল। ব্রিটেন উহার বিরূপ সমালোচনা করিল, তাহার সহানুভূতি তখন বিপরীত দিকে। ব্রিটেন বলিল, "ইহাতে মধ্যইউরোপের দুর্দশা আনয়ন করা হইল এবং যুদ্ধোত্তর পুনরুজ্জীবন কার্য সারা বিশ্বেই পিছাইয়া গেল, বিশেষ করিয়া জার্মানী হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় ব্যাপার ব্যর্থ হইল।"

(ক্রমশ)

অস্ত-উদয়ের মাঝে

(গল্প)

শ্রীসুকুমারী চৌধুরী

সারাদিন গুমোট গরমের পর সাঁঝের আমেজে একখানি ছোট্ট কালো মেঘ পূর্বদিগন্ত হতে ধাপে ধাপে উঠে সমগ্র আকাশখানিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। বৈশাখের শেষ। পিপাসার্ত ধরিত্রীর পোকামাকড়টি পর্যন্ত এক ফোঁটা জল—এক পশলা বৃষ্টির জন্য লালায়িত। কাঠফাটা রোদের ফাঁকে ফাঁকে চির-আকাঙ্ক্ষিত এ স্নিগ্ধ বর্ষণ না হলে ফলে-ফুলে-শস্যসম্ভারে মাটির ধরাকে ভূস্বর্গে পরিণত করবে আর কে!

সুমিত্রা একাজ ওকাজ নিয়ে দিনভর ছিল ব্যস্ত। কিন্তু তারই মাঝে 'আনন্দবাজার' থেকে পড়া অনেক কথার মধ্যে একটা 'যৎকিঞ্চিৎ' পলে পলে উঁকি দিচ্ছিল তার মনের কোণে।—'শীতকালে যদি গরম হত, আর গরমের কালে শীত'—। সত্যি যদি এক দিন বিশেষ করে না হয় আজকের দিনটাই যদি হত আজব অদলবদলের প্রভাবে দারুণ গ্রীষ্ম-মরুর মাঝে ওয়েসিস্—একেবারে কুয়াসা-ঝিলমিলি-ঢাকা কনকনে শীত! আঃ এ কল্পনায়ও যেন হিম-শীতল পরশ অলক্ষ্যে সুমিত্রার অন্তর জুড়িয়ে দেয়।

সে নিমেষ মাত্র। পরক্ষণেই কঠোর বাস্তব তার দম-বন্ধ-করা বয়লারের তাপ নিয়ে এসে সুমিত্রার অঙ্গে আগুন বর্ষণ করে। বুড়ীদের কাছে অহরহ শোনা যায়—মানুষের শরীরকে দিয়ে সব কিছুই নাকি সওয়ান যায়। কিন্তু কই? সুমিত্রার শরীর তবে আজ এ বিষম গরম সইতে একান্তই নারাজ কেন!

বাঁ হাতে পাখা আর ডান হাতে কাজ— পাখা হাতেই কাটছে তার সারাটা দিন। তাই গ্রহণের রাহুগ্রাসের সূচনার মত ছোট্ট মেঘখানি যখন পূবের আকাশের সবে আঁচল-প্রান্ত ছুঁয়েছিল, তখন তার প্রাণে আশা-আনন্দের ছোঁয়াচ লাগে নি। কিন্তু সে সূচনাই যখন 'সর্বগ্রাসে' উদ্যত হল, তখন ময়ূরীর মতই পেখম-ধরা পক্ষসারি মেলে সে চেয়েছিল নৃত্য করতে। কেননা, বৃষ্টির ওপর প্রীতি তার চিরকালের। নেহাৎ যখন এতটুকু ছিল, সে সময় থেকেই মেঘ দেখলে সে গান ধরত—'পরাণ আমার নাচেরে ময়ূরের মত নাচেরে।' হয়ত আনন্দের আতিশয্যে নাচতও। যদিও সে অভিনব অঙ্গ সঞ্চালন নৃত্য-শাস্ত্রের জানিত কোনও শ্রেণীর ভিতর পড়ত না, তথাপি সুমিত্রা নাচত—তার একান্ত নিজস্ব নাচ।...আজও কি তেমন ক'রে নাচা যায় না?

স্বামী তার পশ্চিম অঞ্চলের এ ছোট্ট শহরটিতে চাকরি করে, তাই সুমিত্রাকে আসতে হয়েছে এখানে তাদের সুখের নীড়টি বাঁধতে। একমাত্র সন্তান শিশু-কন্যাটি নিয়ে সে যে এসেছে এখানে, তাও দু বছর আগেকার কথা। কি করে পশ্চিমের অধিবাসী বনে যেতে হয়—এ শিক্ষাটা এই দু বছরেও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। মন তাই তার সুযোগ পেলেই বাঙলা মায়ের শ্যামল শোভার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতে চায়। তবু একদিন স্বামী যখন তাকে বলেছিল—কি সু, আর যে বড় দেশে যাবার কথা পাড় না, হ'ল কি বল ত।

কথাটা কৌতুক কিনা তা নিয়ে সুমিত্রা সেদিন মাথাও ঘামায় নি। সে জানে তাদের অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে, মুখের কথা বার করলেই স্বামী তাকে নিয়ে যেতে পারে হাওয়া-বদলের সফরে। অতশত বোঝে বলেই সেদিন সুমিত্রা নির্বাকে জানালা দিয়ে দিয়েছিল তার দৃষ্টি প্রসারিত করে—তৃপ্ত হয়েছিল বেহারের এই ফুটিফাটা মাটির বুকে পা দিয়ে বাঙলার শ্যামলিমার আবাহন করে মনে মনে।

সে আবেশ কাটিয়ে সুমিত্রা যখন ফিরে এল বেহারের শুষ্ক নীরস পারিপার্শ্বিকে, তখন তার মনে পড়ল স্বামীর কথার কোন জবাব দেওয়া হয় নি। তাই নেহাৎ কুণ্ঠিত সুরেই বললে—

কি আর হবে বল, মা যদি ঠাঁই না দিয়ে তাড়িয়ে দেন, আর সৎমাই যদি আদরে কোলে তুলে নেন, তবে ত সত্যিকারের মা যে কে, তা ঠাওরান মুস্কিল বই কি!

সত্যব্রত সেদিন পত্নীর সুরে কি যেন এক স্পন্দন অনুভব করেছিল, তাই আর কথা না বাড়িয়ে বাক্‌হত সম্মতি জানিয়ে সমস্ত কথাটার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল।

অফিস থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে সত্যব্রত এসে ঢুকল কক্ষে। সুমিত্রার তখন মেয়েটিকে সাজান-গোজান সবে সারা হয়েছে—সে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে এক নজরে যেন কোথায় কি খুঁত রইল তা-ই আবিষ্কার করতে; কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যব্রত জানে সুমিত্রার ওরকম টানাটানা চোখ মেলে ধরার মর্মকথাটি। সে নীরবেই মা ও মেয়ের কাণ্ড দেখতে থাকে।

সুমিত্রা ডাকে—ধনিয়া, ধনিয়া!

ধনিয়া তাদের ছোকরা চাকর—সে এসে দেখা দেয় মিশকালো মুখে শাদা ধবধবে দাঁতকটা বিকশিত করে।

—খুকী, যাও ত ধনিয়ার সঙ্গে, একটু খেলা করে এস বাইরে থেকে।

খুকী 'খেলা করা' মানে কি তা বেশ জানে, সে খুশী মনেই বেরিয়ে যায়, ধনিয়ার হাত ধরে!

সত্যব্রত এদিকে কক্ষমধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে—অফিস সুট ছেড়ে ধুতি পরবে, কিন্তু কই ধুতি? আলনায় মাছিটি অবধি বসে নেই—একেবারে নগ্ন। মেঝেয় স্তূপাকার ধুতি, শাড়ী, বিছানার চাদর আরো কত কি!

আরে টেবিলের উপরকার বইগুলো কোথা গেল? সত্যব্রতের বেড়াবার ছড়িগাছার মাথায় একটা লাল ন্যাকড়া বাঁধা—রয়েছে খাটের কার্নিশে ঝুলান। 'সেলিম' জোড়া পাল তোলা নৌকার মত মেঝের সায়রে যেন পাড়ি দিচ্ছে। সদ্য কাচা সফ্ট কলার আর নেকটাই জোড়া জানালার গরাদেতে আবদ্ধ অবস্থায় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

—তোমায় যত বলি, তুমি কিছুতে জিনিষপত্তরগুলো একটু গুছিয়ে রাখবে না। বল দেখি এখন কোথা হাতড়ে ফিরি?—সত্যব্রত অভিমানের সুরে বলে।

হাসিমুখে সুমিত্রা জবাব দেয়—কেন, কি হ'ল আবার?

—কি হ'ল! তুমিই বোঝ ত, যেখানকার জিনিষ সেখানে রাখা না থাকলে লোকে পায় কি ক'রে?

—ঐ তোমাদের এক বাই। আচ্ছা বলত রোজ রোজ একটি জিনিষ একই জায়গায় দেখতে চোখ জ্বালা করে না।

না হয় একদিন জিনিষপত্তর না-ই হ'ল গুছান, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।

—তা অশুদ্ধ না হোক, আপিস-খাটা প্রাণটি যে পালাই পালাই রব ছাড়ে। এলোমেলো মেঝেয় ছড়ান যত রাজ্যের জিনিষ, লোকে দেখলেই বা ভাবে কি বলত। আর নিজেরও ত চোখ আছে, চোখে বাধে না এতটুকু?

—তোমাদের এই গুছান-গুছান-গুছান! বারো মাস তিরিশ দিন ঠিক জায়গামত জিনিস গুছান! কেনরে বাপু এত একঘেয়েমির দরকার কি শুনি? এদিকে ত বাবুর পর পর দু'দিন 'ঝিঙে' (চিংড়ি) মাছের কারি খেতে মুখে রোচে না, বল—'কি একঘেয়ে সব!' আর ঘর গুছানর বেলা হাজার একঘেয়েমি নইলে যেন ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেল!

—ওঃ বুঝেছি, আজ আবার উল্টো হাওয়া বইছে বুঝি আমাদের বাড়ীতে। আচ্ছা থেকে থেকে একটা দিন অমন পাগলাম কর কেন বল দেখি। কি হয়েছে ঘরখানার দিকে একবার চোখ বুলোও ত।

—চোখের মাথা এখনো খাইনি। চোখ বুলাচ্ছি ঠিক, কই চোখ ত কানা হ'ল না। তোমরাই আবার দেশের তরুণ—নূতন, প্রগতি কত কথাই না বল। কি হয়েছে এমন। না হয় মনে কর এটা যেন দেওঘরের পাহাড় তীর্থ...

—হয়েছে আর কি! দেওঘরের পাহাড় না ভূতের কাণ্ড! এমন আগোছাল মানুষ...

এবারে সুমিত্রা আর নিজেকে সামলে যেতে পারে না। চোখের কোণে তরল অভিমান টলটল করতে থাকে। জানই ত আমি চিরটাকাল এমনি আগোছাল এমনি জংলী—এমনি ভূত...বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আর জংলীত্ব অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করতে সে ছুটে বেরোয় রান্নাঘর উদ্দেশ করে—

—মা, দেখুন খোকী কি করলোন্, কিচ্চড়ু দিয়ে জামা, বদন সমুচ্চা-

আর বলতে হ'ল না। ধুলোকাদা মাখা খুকী ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মা, মা, খেলা করে এলাম।

হাসিমুখে সুমিত্রা ধুলোকাদা শুদ্ধ মেয়েকে কোলে তুলে নেয় আর চলে যায় কলতলার দিকে স্বামীর চোখের বাইরে।

সত্যব্রত চেঁচামেচি সুরু করে—যেমন নিজে, মেয়েটাকেও শেখান হচ্ছে তেমনি নোংরাপনা। কি হবে বল ত, সন্ধ্যেবেলা গা-ধোয়া অতটুকু শিশুর কি সইবে? একটা কিছু গোলমাল না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

সুমিত্রা শোনে সব। একটি কথাও বলে না। স্বামীর এ বকুনি যেন প্রকৃতই সে উপভোগ করে মনপ্রাণ দিয়ে। মেয়েকে ধোয়ায় আর এক একবার চোখ মেলে ধরে দেখে কতটা ধুলোকাদা মাখিয়েছে এবং কেমন করে। যেন এটা একটা মস্ত বড় বাহাদুরীর কাজ। কিন্তু এমন করে একঘেয়েমি ভেঙে না চললে সুমিত্রা যে পাগল হ'য়ে যাবে।

ভূতের কাণ্ড! বেচারা সত্যব্রত! সুমিত্রা মনে মনে হাসে। জানেনা ত সত্যব্রত যে তার কক্ষে সাজান-গোছানর কি চমৎকার অভিনয় চলে সারাটি দুপুর—মা আর মেয়ে মিলে। সুমিত্রা খেয়ে এসে দুপুরে এ নিদারুণ গরমে ঘুমুতে পারে না। সে প্রথমেই সব ঝেড়ে পুঁছে তকতকে করে। তারপর সেই একঘেয়েমি তার চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাই সব মেঝেয় নামিয়ে ছড়িয়ে বিপ্লবের চরম সমাধা করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয়। তারপরে ত সে আবার নূতন করে সাজাবে! এর ভিতর যে কি অপরূপ রহস্য—কি চার্ম, সত্যব্রত তা বুঝবে না।

এতক্ষণে মেয়েকে সাফ-সুতরো করা হয়ে যায়। আদরে গালে [illegible] খেতে খেতে সুমিত্রা কলতলা থেকে বেরোয়, উঠানে এসে বলে—খুকী রোজ এমনি খেলবে আর আমি ধুয়ে মুছে দেব, কেমন লক্ষ্মী?

—হাঁ, আমি খেলব, মাটি খেলব।

—লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার।

সত্যব্রত এবার আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না, ঝাঁজাল সুরে বলে—কি হচ্ছে দিন দিন, মেয়েটার মাথা না খেলেই নয়।

—মাথা খাওয়া বই কি! যা বুঝবে না, তা নিয়ে এত হাঁকডাক কেন। তোমার মতে ঘড়ির কাঁটা না বনে গেলে মানুষের রেহাই নেই, যেমন দেখে এসেছ তোমার বন্ধুর বাড়ী। তাই দাও পিঠে একটা খবরের কাগজ বেঁধে তাতে ১ থেকে ১২ নম্বর লিখে দাও, আর হাত দুটো দিয়ে আমি ঘড়ির কাঁটার মত ১টার সময় ১টা বাজাই, ১২টার সময় ১২টা বাজাই।

সত্যব্রত হাসি রাখতে পারে না—হো হো করে হেসে ওঠে। সুমিত্রার মুখেও হাসি। নিমেষে আবার সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে যায়—সুইস ছেলেমেয়েরা নেংটি পরে তুষারপাতের ভিতর খালি গায়ে বাইরে স্কুল করে। ইউরোপের বুড়োধাড়ীরা অবধি সানবাথ করে। সে সব কেন শুনি?—ছোট ছেলেমেয়ে তারা ধুলোকাদা মাখবেই— সে-ই হল তাদের স্বরাজ। আর আমার মতে বড়দের স্বরাজ হ'ল—মানুষ কেন নিয়মের দাস হবে, সময়মত খাওয়া, নাওয়া, চলাফেরা— সে ত একঘেয়ে বন্দী জীবন। তা নয়, জীবন হবে মুক্ত—কোন বাধা বন্ধন থাকবে না 'এ কাজটা করতেই হবে এখন'। যখন খুশী আমি করব, তবে না আমি স্বাধীন।

সত্যব্রত নিম্নস্বরে বলে—কেবল ঘুমটা ছাড়া, তার বেলা সাতখুন মাফ।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই হেসে ওঠে, কেননা, সুমিত্রার ঘুমটা একটু মাত্রা ছাড়া।

হাসির রেশ টেনেই সত্যব্রত বলে চলে—আর যা-ই বল কতকগুলো জিনিষে গতানুগতিক ধারা চাই। একঘেয়ে বলে শার্টটা পাজামা করে পরা চলে না—কিম্বা ওয়াড়ের বদলে পাশবালিশে পেণ্টুলান পরান হ'তে পারে না, বুঝলে পণ্ডিত মশাই!

—আমি পণ্ডিত হব কেন, আমি ত জংলী, আমি বর্বর, আমি গাড়োল...

—থাম, থাম লক্ষ্মীটি!

থামব কেন, আমার সব কিছুতেই ত দোষ...অশ্রু লুকাইতে সুমিত্রা রান্নাঘরে যায় দ্রুতপদে। সেখানে হলুদের বাটিতে নুন, নুনের মাঝে তেলের শিশি, চায়ের অপর্ণে

কৌটায় চিনি, তেজপাতার ঠোঙ্গা ডালের হাঁড়িতে—এমনি করে খানিকক্ষণ কুরুক্ষেত্র রচনা করে, তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে! সুমিত্রার প্রাণ চায় ফিরে আবার কৈশোরে চলে যায়—আর কাদামাটি ঘেঁটে রান্নাবান্না করে।

এমনি একটা সজীব অভিনয় চলে তাদের সুখের নীড়ে প্রতিদিন।

সেদিন দুপুরে সুমিত্রা মেঝেতে আধশোয়া হয়ে কি একটা মাসিকপত্র নিয়ে পড়তে সুরু করেছে। আজ থেকে থেকে তার কানে স্বামীর মুখের বাণী একটি ভেসে আসে—মেয়েটা একেই কালো, অতগুলো করে কাজল দিয়ে মুখখানি আরো কালো করে দিও না—তোমারই ত মেয়ে ভুলে যাও কেন!

কালো হওয়াটা কি অপরাধ! যদিই তা হয়, তা হলেও এর জন্যে দায়ী সে নয়। সে না হয় কালো, সত্যব্রত ত ফর্সা, তবে মেয়েটা তাদের এ রং পেল কেন! কালো—কালো—কালো! কেন কালো কি মানুষ নয়। আজ অবশ্য সুমিত্রার আর আঘাত লাগে না কালো বল্লে। কিন্তু সেই একদিন সে প্রথম জান্‌তে পেরেছিল যে, সে কালো!

সেদিনের কথা সে ভুলবে না জীবনে। সে ছিল যেন সোনালী যুগ। বাড়ী গম্‌গম্ করত। বাপ, মা, দাদা—কত না আদর করত তাকে। সুমিত্রা তখনও ছোট্টটি। তার দাদার হ'ল বিয়ে। বাবা অনেক দেখাশোনা বাছ-কোছের পর পরমাসুন্দরী গৌরবর্ণা বধূ ঘরে নিয়ে এলেন। যে বউ দেখে সে-ই বলে যেন দুর্গা প্রতিমা। এমন রূপ আর হয় না!

চিরকাল সুমিত্রার ফর্সা রংয়ের প্রতি বিদ্বেষ। সে জানে শ্যামল বনানী সুন্দর—শ্যামল নরনারী সুন্দর—ততোধিক সুন্দর তাদের স্নিগ্ধ হাসি। নইলে গৌরবর্ণা নারী—সে কখনও সুন্দর হতে পারে না, তার হাসিটিও বেমানান।

সেই গৌরবর্ণের বৌদি এল ঘরে—সুমিত্রার ভাল ঠেক্‌ল না মনে। অথচ বাড়ীর সবাই, পড়শীরা সবাই কেবল তারিফ করে সেই রংয়ের। তাই সেদিন দাদা যখন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে শুয়েছে, সুমিত্রা সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। নিজের সংস্কারমত নানা কথার পর বলে ফেল্‌লে—বৌদি বড্ড ফর্সা, নয় দাদা?

মনের ভাব ফর্সা হওয়াটা যখন তার পক্ষে ঠিক নয়, তখন ফর্সা বউ কেন বিয়ে করে নিয়ে এল দাদা।

দাদা বলেছিল একটু গর্বের সঙ্গেই—হাঁ ফর্সা বই কি! এমন দুধে-আল্‌তা রং বাঙলা দেশে মেলা ভার।

দাদার মুখে অপরূপ হাসি।

সুমিত্রার সহ্য হ'ল না, সে তার রায় দিলে—শ্যামবর্ণ হ'ত তো খুব সুন্দর হত, না দাদা?

—সে কিরে, তোর মত কালো নয় বলে তোর হিংসে হচ্ছে বুঝি!

দাদা হেসে উঠলো, কিন্তু কালিয়া বরণের এমন হতাদর—এমন অপমান সুমিত্রার পক্ষে অসহ্য! সে সেই যে ছুটে পালাল আর দুদিন দাদাকে মুখ দেখায় নি।

আজ সে পুরোতন ক্ষত নূতন করে জ্বালা করে উঠেছে সত্যব্রতের কথার খোঁচায়। সত্যব্রত অবশ্য ইচ্ছা করে সে আঘাত দান করে নি। কিন্তু কালো রংয়ের নিন্দা, তা আবার স্বামীর মুখে—এ অসহ্য।

সুমিত্রার আজ উঠে স্বামীর খাবার তৈরী করতেও প্রাণ চায় না। সে শুয়েই থাকে। খুকী একখানা বই নিয়ে তাতে পেনসিল দিয়ে দাগ কাট্‌ছিল। কি মনে করে সুমিত্রা তাকে বল্‌লে—রান্নাঘর থেকে আমার চাবি নিয়ে এস ত খুকী।

খুকী রান্নাঘরে গিয়ে চাবি খুঁজল, কিন্তু পেল না। চিনির কৌটা দেখে তার চাবির কথা মন থেকে মুছে গেল। সে কৌটা আর হাঁড়ীকুড়ি নিয়ে বেশ খেলা জুড়ে দিল। ময়দার হাঁড়ি থেকে মুঠো মুঠো নিয়ে সে সারা গায়ে মাখ্‌ল পাউডারের মত। তারপর চেঁচিয়ে বেরুল রান্নাঘর থেকে—

দেখ মা কেমন আমি ছুন্দর হয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত এসে ঢুক্‌ল উঠানে—অফিসের ফিরতি।

আর যাবে কোথা! এতগুলো পয়সায় কেনা ময়দা নষ্ট! সুমিত্রা কিছু খেয়াল করবে না। বেশ দু কথা শুনিয়ে দিলে। শেষে আবার বলা হ'ল—তা বেশ, কালো মেয়ে তোমার ফর্সা হয়েছে খুব।

কালো—কালো—কালো!

সুমিত্রার চোখ ফেটে জল এল। সে বিকৃত সুরে বল্‌লে—কালো কুৎসিতকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তারপর গোরা ফর্সা দেখে একটা বিয়ে কর। সব ল্যাঠা চুকে যাক্।

সত্যব্রত যত নরম সুরে ঘাট স্বীকার করে—সুমিত্রার অভিমান আরো যায় বেড়ে। শেষে উপায়ান্তর না দেখে সত্যব্রত কথার মোড় ঘুরাতে বল্‌লে—

হাঁ দেখ, একটা চিঠি এসেছে, বেণুর বিয়ে!

—বেণুর বিয়ে!

সুমিত্রা যেন অগাধ সলিলে কূল পেলে। সেই পল্লীর মায়া তাকে নূতন করে পেয়ে বস্‌ল। সে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—দেখি চিঠি।

পকেট থেকে বার করে চিঠিখানা দিয়ে সত্যব্রত নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

একবার—দুবার—তিনবার চিঠিখানা পড়েও সুমিত্রার আশ মেটে না। মেজ দেওর লিখেছে চিঠি। সব শেষ লেখা ও-বাড়ীর বেণুর বিয়ে ২৩শে আষাঢ়।

বেণু সত্যব্রতের খুড়তুত বোনের মেয়ে। বেণুর মা দীপু আর সুমিত্রা একসঙ্গে পড়েছে গাঁয়ের স্কুলে। ভাবও ছিল তাদের দুজনের খুব। সে সময়ে দীপুর মত সুন্দরী আর কেউ ছিল না তাদের ভিতর।

কত কথাই না আজ সুমিত্রার মনে পড়ে—সেই রায়েদের দীঘি, শিউলিতলা, বাঘ-খেঁায়াড়ের ভিটে, কানামাছি খেলা, সাঁতার কাটা—শাওনের অবিরাম বর্ষণ ধারায় উঠানে উঠে আসা কই মাছ ধরা—দীপু, সেনু, নেপু.........আঃ!

গাঁয়ের সরকারী ডাক্তারখানায় ডাক্তার হয়ে আসে দীপুর বাপ। সে সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র রায় বাড়ীর সন্তোষ

(শেষাংশ ৪৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'বঙ্গ' 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

বাঙ্গলা আমাদের জন্মভূমি এবং আমরা বাঙ্গালী নামে জগতে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা বা বাঙ্গালী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমরা অনেকেই জানি না। বঙ্গ, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী শব্দত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুতরাং আলোচনার খুবই প্রয়োজন আছে।

এই শব্দ তিনটির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বঙ্গভূমির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইহা অদ্যাপি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, নিনেভা, বাবিলন, চীন বা মিশর হইতেও বঙ্গভূমি প্রাচীন অথবা পরবর্ত্তী। যখন আর্য্যেরা মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চনদ বা সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে বাঙলা সেই সময়েও সভ্য দেশ ছিল। পরবর্ত্তীকালে আর্য্যেরা যখন ক্রমবর্দ্ধমান জাতিরূপে কৌশাম্বী বা এলাহাবাদে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহারা বাঙলার সভ্যতা ও শিক্ষা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দকে 'পক্ষী' নামে আখ্যা দিয়াছিলেন। যখন ভারতের অপরাপর দেশে নৌকার ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তখন বাঙ্গালীরা বেতে বাঁধা নৌকায় দেশান্তরে ধান্য চাউল লইয়া ব্যবসা করিতে যাইত। বাঙ্গালীরা সেই নৌকার নাম দিয়াছিল "বালাম"। রাজা অশোকের সময়, এমন কি, বুদ্ধদেবের সময়ও বাঙ্গলার তমলোক বা তাম্রলিপ্ত বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রধান বন্দর বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহাদিগের নামের মধ্যে পুণ্ড্রগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাচীন বাঙলার রাজধানী এবং বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। সুতরাং বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের নাম আর্যগণের নিকট সুপরিচিত ছিল। আনাম সম্বন্ধীয় চৈনিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে বা তাহারও পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় লোক আনামে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের অধিনেতার নাম ছিল লাফলং। ইহারা নাগ বা সর্পের পূজা করিত এবং ইহাদের বিশেষ চিহ্ন (totem) ছিল সর্প। জিরিনি প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই অভিমত সমর্থন করেন। বঙ্গদেশীয় রাজপুত্র বিজয়সিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (সিংহলে) উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—ইহা সিংহলের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই বাঙলাদেশ সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক পাইয়াছিল।

'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে—"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরঃ" (ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১)। রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। মনুসংহিতায় বঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তের অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এই তিনটি প্রদেশের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গ বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চল, বঙ্গ বাঙ্গালা এবং কলিঙ্গ সাধারণত উৎকল প্রদেশকে বুঝাইত। পুরাণে কথিত আছে যে, কোনও রাজার পুত্রদের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামানুসারে তিনটি প্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে (৫ম শতাব্দী) বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে—"বঙ্গান্ উৎখায় তরসা বলেন।" খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলালিপিতে 'বঙ্গাল' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তিব্বতীয় 'বঙস্' শব্দ হইতে বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করেন নাই।

বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিতে গিয়া শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন, বাঙ্গালা শব্দের 'লা' আদৌ বাঙ্গলা ভাষার প্রত্যয় নহে, ইহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। তিনি মনে করেন, 'বাঙ্গলা' কথাটি 'বংলং' হইতেই আসিয়াছে এবং ইহার অর্থ বঙ্গের অধিবাসী। তাঁহার মতে বাঙ্গলা আনামী শব্দ। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে বাঙ্গলা শব্দের একটি নিরুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বহু 'আল' বাঁধা হইত এবং এইরূপে 'আল'যুক্ত বঙ্গদেশ 'বাঙ্গলা' নামে অভিহিত হয়। আমরা সংস্কৃত সংগীত বিজ্ঞানে গৌড়ী ও 'বাঙ্গালী' সুরের নাম পাইয়াছি। বাঙলা ভাষার নামকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নদীয়া গৌড় দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বঙ্গদেশ বা পূর্ব্ব বঙ্গ ও বঙ্গভাষা গৌড়দেশ ও গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনামূলক ছিল। সেই সময়েই বাঙ্গলা ভাষার দেশীয় নাম ছিল গৌড়ভাষা এবং এই নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপর 'বঙ্গভাষা' ও 'বাঙ্গলা ভাষা' কথার সৃষ্টি হয়। গত শতাব্দীর মাঝামাঝিকালেও কবি মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে বঙ্গালীদিগকে গৌড়জন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষার পারসী নাম জবান-ই-বাঙ্গলা এবং হিন্দুস্থানী নাম 'বাঙ্গালী জবান'। এমন কি, হিন্দুস্থানী ভাষা বঙ্গভাষার নিকট হইতে 'বংগলা' শব্দ ধার করিয়াছে। শ্রীরামপুর সংস্করণের কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, 'কৃত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল' কথাটি লিখিত রহিয়াছে। হুতোম প্যাঁচার নক্সায় বাঙলা ভাষার নাম 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বাঙলা ভাষা', 'বাংলা ভাষা' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

'বাঙ্গলা' শব্দ

এখন বাঙ্গলা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে 'বাঙ্গলা' শব্দের 'লা' আদৌ বাঙ্গলা ভাষার প্রত্যয় নহে, ইহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখাইতে

চেষ্টা করিব যে, এই 'লা' প্রত্যয় বাঙলা ভাষার নিজস্ব প্রত্যয় এবং 'বাঙ্গালা' শব্দ বাঙলা দেশেরই নিজস্ব শব্দ।

বাঙলা ভাষার শব্দগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, 'লা' প্রত্যয়ান্ত বহু শব্দ বাঙলা ভাষায় প্রচলিত আছে এবং এই 'লা' প্রত্যয় 'ব্যাপ্তার্থে' ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে কতকগুলি শব্দের ব্যবহার পরীক্ষা করা যাউক।

বনলা—বন+লা; বনলা জন্তু। অসভ্য লোক অর্থে 'বনলা মানুষ' কথাটি উত্তর বঙ্গে প্রচলিত আছে।

গোপলা—গোপ+লা; গোপলা বালক।

রঙ্গলা বা রংলা—রঙ্গ+লা; রঙ্গলা মাঝি।

কাজলা—কাজ+লা; কাজলা (কর্ম্মী) গাভী বা লোক। কর্ম্মী অর্থে 'কাজলা' কথা অদ্যাপি উত্তর বঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

শ্যামলা—শ্যামলা গাভী।

আগেলা—আগে+লা; আগেলা নৌকা।

মেঝলা—মেঝ+লা; মেঝলা বৌ।

নমলা—নম্+লা; নমলা বন্যা।

মেঘলা—মেঘ+লা; মেঘলা আকাশ

বাঙ্গালা—বঙ্গ+লা, বঙ্গলা। পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালা, বাঙ্গলা বাঙলা, বাংলা প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। 'বাঙ্গালা অর্থে বঙ্গের ব্যাপ্তিকে বা 'বৃহত্তর বঙ্গকে বুঝায়।

'বাঙ্গালী শব্দ'

আমরা দেখিয়াছি যে, 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যুৎপত্তি আবিষ্কার করিবার জন্য কতকটা প্রচেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু 'বাঙ্গালী' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও চেষ্টা হয় নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালী শব্দে বাঙ্গালার অধিবাসীকে বুঝায়। বাঙ্গালা ভাষার শব্দগুলির ভিতর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষায় 'আলি' বা 'আলী' প্রত্যয়ের ব্যবহার রহিয়াছে এবং 'আলি' বা 'আলী' প্রত্যয় 'জাতার্থে' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—

মিতালি—মিত+আলি; মিতালি সূত্রে। মিত্রতার অপভ্রংশ শব্দ মিতা।

চৈতালি—চৈত+আলি; চৈতালি ফসল। চৈত্রের অপভ্রংশ চৈত।

শীতালি—শীত+আলি; শীতালি ঘা।

সাঁজালি—সাঁজ+আলি; সাঁজালি কাজ। সন্ধ্যাবেলায় কৃত্য কাজকর্ম্মকে উত্তর বঙ্গের লোক সাঁজালি কাজ বলিয়া থাকে।

ধামালী—ধামালী কীর্ত্তন।

রাখালী—রাখালী গান।

দীপালি—দীপালি রাত্রি।

মাঠালি—মাঠালি ধান।

ক্ষেতালি—ক্ষেত+আলি; ক্ষেতালি মাছ। 'ক্ষেতালি' শব্দের বহুল প্রচলন উত্তর বঙ্গে বর্ত্তমান। আশ্বিন মাসে যখন আমন ধানের ক্ষেতে জল শুকাইয়া যায়, তখন ক্ষেতের পাঁকে একপ্রকার ক্ষুদ্র মাছ পাওয়া যায়। ক্ষেতে প্রাপ্ত বলিয়া 'ক্ষেতালি' আখ্যা দেওয়া হয়।

বাঙ্গালী—বঙ্গ+আলী; বঙ্গের অধিবাসী। 'বঙ্গালী শব্দ পরবর্ত্তীকালে 'বাঙ্গালী' রূপে প্রচলিত হইয়াছে।

অস্ত-উদয়ের মাঝে

(৪৮৩ পৃষ্ঠার পর)

ছুটিতে বাড়ী এসে দীপুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। মুখরা দীপুও মনে মনে হয়ত সন্তোষের নীরব চোখের আকুতি বুক পেতে নিয়েছিল। তাই আর দীপুকে তেমন হুটোপাটি করতে দেখা যেত না সেদিনের পর। কোথায় কোন্ বাগানের কোণে দাঁড়িয়ে রইলে দুজনার চোখাচোখি হয় সেজন্য থাকত দীপু আকুল। তারপর সন্তোষের বিয়ের প্রস্তাব। কত দুর্ভাবনায় কেটেছিল তাদের দিন। শেষ যে দিন দীপুরও বিয়ের কথা হ'ল বি-এ পাশ করা এক কলকাতার ছেলের সঙ্গে—সে দিন দুজনেই মনে মনে ঠাউরে নিলে, এ প্রাণ তারা রাখবে না। দীপু চোখের জলে ভেসে এ কথা একদিন বলে ফেলে সুমিত্রাকে। তাই না সুমিত্রার দাদার চেষ্টায় মিলন হ'ল দীপু আর সন্তোষে।

সেই দীপুর মেয়ের বিয়ে—আর সুমিত্রা রইল সুদূর প্রবাসে। ম্লান মুখে চিঠিখানা রেখে সুমিত্রা একটা তপ্ত শ্বাস ছাড়লো।

হঠাৎ সত্যব্রত বলে উঠলো—জান সু, এবার আমরা দেশে যাব—আষাঢ় মাসের ৭ই।

—নাও ঠাট্টা রাখ। আমার ভাল লাগে না।

—ভাল লাগবে রাণী, শোনই না, কাল বোনাস পাব ৪০, টাকা আর ৭ই থেকে ছুটি একমাস।

—সত্যি?

সে কথার জবাব সুমিত্রা কানে শোনেনি.........শুনেছিল প্রাণে প্রাণে।

সুমিত্রার প্রাণের তাণ্ডব সেদিন দিগন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল। সে ছুটে খুকীকে চুমায় চুমায় অস্থির করে তুলেছিল।

বুঝি সুমিত্রার অন্তরের ছোঁয়াচে বেহারের আকাশে-বাতাসে লেগেছিল রং—তাই মুষলধারে বর্ষণ, বজ্রপাত আর বাতাসের দাপাদাপি সুমিত্রার সুখের নীড়কে করেছিল মুখরিত।

টিকি বনাম প্রেম :

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

৫)

মস্ত বড় খোলার বাড়া।

বাহিরের দেওয়ালের গায়ে ঘুটের চাপড়া শুকাইতেছে, ভিতরে উঠানে ভাগে ভাগে কয়লার গুল, ডালের বড়ি, ভিজা আতপ চাল।

একখানা ঘরের বারান্দায় বসিয়া জনৈক বৃদ্ধ তামাকু সেবন করিতেছেন। চুলের গোছা পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া উঠানে বসিয়া আছেন একটি মহিলা।

প্রকাশ দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, তরুণবাবু আছেন, তরুণবাবু।

সে দুই-তিনবার ডাকার পর তামাকুসেবী উঁচু গলায় ডাকিলেন, তরুণ, তোমাকে কে ডাকছেন। তারপরই প্রকাশকে বলিলেন, আপনি ভিতরে আসুন।

উঠানে স্ত্রীলোক বসিয়া থাকায় প্রকাশ ইতস্তত করিতেছিল, কিন্তু যাঁর জন্য এই সঙ্কোচ, সেই মহিলা তাকে মোটে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না।

তামাকুসেবী আবার ডাকিলেন, আপনি আসুন।

তখন প্রকাশকেই অগত্যা সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে হইল। বৃদ্ধ তাকে বসিবার জন্য একখানা জলচৌকী দিলেন।

বারান্দার উত্তরে রান্নার জায়গা, দক্ষিণে অভ্যাগতদের বসিবার স্থান, মাঝখানটায় দেড় হাত উঁচু মাটীর দেওয়াল। প্রকাশের পিছনেই একখানা বড় থালায় ভুক্তাবশেষ পড়িয়া আছে। এই অবশিষ্টাংশের পরিমাণ ও পূর্ণ পাম্পকরা পলহীন ফুটবলের মতন বৃদ্ধের ভুঁড়ি, এই উভয়ের সঙ্গে প্রকাশ একটা সম্বন্ধের কল্পনা করিয়া লইল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, মশাই, তরুণের নিকট এসেছেন শ্রাদ্ধ ক্রিয়া না সাহিত্য ক্রিয়ার জন্য?

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, উনি দুটোই ক'রে থাকেন বুঝি?

তরুণ বহুক্রিয়ান্বিত।

আমারও ঐ রকম লোকেরই দরকার।

সাধু, সাধু। আপনার উদ্বাহ সমাধা হ'য়েছে?

পাত্রী খুঁজেছি

বলেন কি! আপনার মতন রূপবান, গুণবান, লোকের পাত্রী খুঁজতে হয়?

খুঁজতে হচ্ছেই এবং দুর্ভাগ্যক্রমে জুটছেও না।

হেঃ হেঃ এযুগে এটা রূপকথার মতনই শোনায়। আপনি কি—?

ব্রাহ্মণ, রাঢ়িশ্রেণী।

গোত্র?

ভরদ্বাজ।

তামাকুসেবী এবার উঁচু গলায় ডাকিলেন, খাতাটা নিয়ে আয়ত বাটুল, খেরুয়ায় বাঁধানো প্রজাপতির দপ্তর।

প্রকাশ বলিল, পাত্র-পাত্রীর তালিকা বুঝি? প্রয়োজন নেই।

সে কি মশাই, উদ্বাহ একটা বেদোক্ত ক্রিয়া, উৎ পূর্ব্বক বহ ধাতু—

বেদের খবর আমরা বহুদিন রাখি না।

নিশ্চয় রাখি, গায়ত্রী, বেদ, প্রত্যহ আমরা উহা জপ করি। আমাদের গীতা-বেদ, চণ্ডী-বেদ, ক্রিয়াদি সমস্তই বেদোক্ত, অপৌরুষের।

প্রকাশ হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তা' বটে।

এই সময় স্থূলোদর খর্ব্বাকৃতি একটা মানবক (বোধ হয় বাটুলই হইবে) একখানা খাতা রাখিয়া গেল।

বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন, আমিও ক্রিয়াবান্ পুরুষ, যজন-যাজন, উপনয়ন, উদ্বাহ এবং (এই সময় হাতখানা দুলাইতে দুলাইতে) সেতুত্ব—সবই আমার অধিগত।

সেতুত্ব জিনিষটা কি, প্রকাশ বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যুবক-যুবতীর মিলনের সেতু—প্রণয়ের এবং পরিণয়ের।

ওঃ ঘটক?

ঠিক ধরেছেন। আমি আপনার জন্য একটি পাত্রীর সন্ধান সত্বরই করে দিচ্ছি। এর মধ্যে কোন শ্রাদ্ধ-উদ্বাহাদি হ'লে দয়া করে—

জানা রইল, দরকার হ'লেই খবর দেব। আপনি অনুগ্রহ করে তরুণবাবুকে ডেকে দিন।

বৃদ্ধ ডাকিলেন, তরুণ, অ-তরুণ, তারপর প্রকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্মরণ থাকবে রাঢ়িশ্রেণী, ভরদ্বাজ। আপনারা নিকষ?

এই সময় নেপথ্যে কে একজন বলিয়া উঠিল, সেলিব্রিটি হওয়া এক বিষম বিপদ, খ্যাতির অভিসম্পাত, গ্রীষ্মের দুপুরেও একটু ঘুমোবার জো নেই।

পরিণয়ের সেতু এই খ্যাতি-মানের উদ্দেশে বলিলেন, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আসছি, শব্দ-শাস্ত্রী কাকা।

বৃদ্ধ প্রকাশের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আমিই শব্দ-শাস্ত্রী।

আপনি যে সুপণ্ডিত, তা' আলাপেই বুঝেছি।

বুঝবেন বৈকি, আপনি সুবোধ। ব্যাকরণ, তুদাদি, হ্বাদি, ভন্দিত, পৌরোহিত্য, চণ্ডীপাঠ সকল বিষয়েই আমার অধিকার। আমি হচ্ছি যাকে বলে দশকর্ম্মান্বিত।

এই সময় রং-বেরংয়ের লুঙি পরিহিত একটি লোক শব্দ-শাস্ত্রীর ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তার গোঁফ ও দাড়ি পরিষ্কার কামানো, কানে একটা পোড়া চুরুট, চোখে সদ্য নিদ্রোত্থিতের জড়তা, বয়স অনুমান করা মুস্কিল, তবে পঁয়ত্রিশ ও পঞ্চাশের মধ্যে হইবে।

প্রকাশ বুঝিল এই সেই খ্যাতিমান্ ব্যক্তি। সে কহিল, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গালাম, মাফ করবেন।

লুঙি পরিহিত লোকটি বলিলেন, নেভার মাইণ্ড ওটা আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক। এসেছি আজ তিন দিন, কাল

পরিষদ থেকে খবর এল, পরশু বীরবল ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপরই একটু হাসিয়া, আমিই আপনাদের তরুণ চৌধুরী, ব্রাদার।

প্রকাশ বলিল, আমি প্রাচীন বাঙলা পুঁথির সন্ধানে আপনার কাছে এসেছি।

তা অনেকেই এসে থাকেন। যাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁদেরই তরুণ চৌধুরীকে দরকার হয়। দেখলেন, শব্দ-শাস্ত্রী কাকা?

শব্দ-শাস্ত্রী কহিলেন, সেত' প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করছি, ত্রিভঙ্গ।

তরুণ প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, কি বইর দরকার আপনার?

পুরান বাঙলা উপন্যাস, হংসেশ্বর তর্কবাগীশের কোন রচনা।

ওঃ আমার বৃদ্ধ প্র-পিতামহের বই? তিনি ছিলেন দিগগজ্ সাহিত্যিক। জ্বলদর্চিতে নিশ্চয়ই আমার প্রবন্ধ পড়েছেন, হংসেশ্বরের সাহিত্য। পড়েন নি?

এইবার পড়ব।

ডাঃ খাসনবিশ বলেছেন, গবেষণা করে থাকে অনেকেই, কিন্তু তাতে বুদ্ধির দীপ্তির পরিচয় পাই না। তরুণ চৌধুরীর প্রবন্ধ হ'চ্ছে এর ব্যতিক্রম।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, বায়োকেমিক্ ডাক্তার খাসনবিশের কথা বলছেন?

হ্যাঁ, তিনি মস্ত বড় সাহিত্য-রসিক।

শব্দ-শাস্ত্রী বলিলেন, তরুণ হ'চ্ছে জাত-কেউটের বংশ হংসেশ্বরের পুত্র নৈয়ায়িক জল্পেশ্বর, তাঁর পুত্র রাজেশ্বর, তিনি ছিলেন মস্ত বড় চালানী ব্যবসার মালিক। তারপর ব্রজেশ্বর, ব্রজদা ছিলেন স্বভাব কবি, কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। তাঁর পুত্র ত্রিভঙ্গেশ্বর সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ খর্ব হ'লেও মাতৃভাষা চর্চা দ্বারা বংশের গৌরব অম্লান রেখেছে।

তরুণ বলিল, সংস্কৃতেও নস্যাৎ নই। তবে বাঙলা ও ইংরেজীতে বেশী মনঃসংযোগ করার ফলে সংস্কৃত ভাষাটা suffer করেছে।

শব্দ-শাস্ত্রী বলিলেন, তা বটে।

তরুণ প্রকাশকে কহিল, চলুন আমার ঘরে।

বৃদ্ধ ইতিমধ্যে আর এক কলিকা তামাক সাজিয়া টানিতেছিলেন। প্রকাশ উঠিলে কহিলেন, মনে রাখবেন, কোন ক্রিয়াদিতে—

প্রকাশ কহিল, 'নিশ্চয়।'

সাধু, সাধু, ত্রিভঙ্গকে খবর দিলেই চলবে। দয়া করে আমার নাম মনে রাখবেন, পাতিরাম শব্দ-শাস্ত্রী।

প্রকাশকে লইয়া ঘরের দিকে যাইতে যাইতে তরুণ বলিল, বাজে বকা লোকটার অভ্যাস। দেখুন না, বার বার ত্রিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ বলে ডাকবে। কেন বাবা, তরুণ বলে ডাকতে পার না?

আপনার নাম তা'হলে দু'টা?

হ্যাঁ, একটা পিতৃদত্ত, তরুণ নিজের রাখা।

পশ্চিমে আর একটা উঠানের দক্ষিণ সারিতে তরুণের ঘর, ঘরের সামনে জলচৌকীর উপর আলপিন দিয়ে আঁটা কতকগুলি তুলট কাগজ শুকাইতেছে।

তরুণ বলিল, এইগুলি হ'চ্ছে প্রাচীন পুঁথির নকল। তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি একটু অন্য ঘরে যাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি মহিলা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তরুণ বলিল, বুঝতে পাচ্ছেন বোধ হয়, ইনিই হচ্ছেন আমার হেঃ হেঃ, গৃহিণী, সচিবঃ, সখী, মিথঃ—ইনি উৎসাহ না দিলে সাহিত্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'ত। অভাবের সংসার কি না'

তরুণের ঘরের চালার নীচে সবুজ একখানা কাপড় টাঙান, একপাশে একখানা খাট, তার উপর পরিষ্কার বিছানা, বেঞ্চির উপর রক্ষিত পাড়ের চাদরে ঢাকা দুইটি ট্রাঙ্ক, তার উপর হাত-বাক্স, আলনায় কয়েকখানি কাপড় ও শাড়ী ঝুলিতেছে। পূবদিকে একটা আলমারীতে কতকগুলি বই, পুতুল ও কাপড়-চোপড়, দেওয়ালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছবি।

তরুণ প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব চুরুট না সিগ্রেট?

কিছুরই দরকার নেই।

তরুণ পোড়া চুরুটটা ধরাইতে ধরাইতে বলিল, এটা সাক্ষাৎ বিষ, পোড়া চুরুট কখনও খাবেন না। তবে আমি চুরুটটাকে নিজে নিজে নিভতে দি, তাতে নেকোটিনের তীব্রতা অনেকটা কমে যায়। এ-সব খবর ত' কেউ একটু রাখে না।

প্রকাশ কহিল, আমি বইর সন্ধানে আরও একদিন এসেছিলাম।

আমি কলকাতায় পৌঁছেছি পরশু সকালে, যদিও দেশ থেকে বেরিয়েছি দু'হপ্তা হ'ল। পথে নাপাড়ায় সাহিত্য-সভায় বক্তৃতা করি, সেখান থেকে যেতে হয় ভুগিলহাটের তরুণ-সঙ্ঘে সভাপতিত্ব করতে। লোকে টেনে নেয় মশাই। সেলিব্রিটি হওয়ার ঝামেলা ঢের। স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর বলতেন, আর যাই হও, সেলিব্রিটি হ'য়ো না তরুণ, ওতে শান্তি নেই

প্রকাশ বলিল, সে ত দেখছি।

দেখছেন? আপনিও বুঝি সেলিব্রিটি, আপনার লাইন?

সেলিব্রিটি আমি মোটেই নই।

সে আপনার সৌভাগ্য। আমার বাধ্য হ'য়ে হ'তে হয়েছে। জ্বলদর্চির সম্পাদক, মহাকালের লেখক, বিভিন্ন কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা, একজন পুরাতাত্ত্বিকের আর সেলিব্রিটি না হ'য়ে উপায় কি?

নিশ্চয়, আপনি সাহিত্য-সেবা করছেন কতদিন?

তরুণ বিস্মিতভাবে কহিল, জানেন না? মাই গড্! 'মানসী', 'মর্ম্মবাণী' ও 'সবুজ পত্রের' যুগ থেকে সাহিত্য কার্যালয়ে যাতায়াত ক'রতাম। সমাজপতি বড় স্নেহ করতেন, আর শরৎদা উনি ত' আমাদের হাতে গড়া।

বাঃ আপনার রেকর্ড ত খুব উজ্জ্বল।

যমুনার যুগের লোক মশাই, যে যমুনার মারফৎ শরৎ প্রতিভার জ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে। আমি ছিলাম যমুনা

গোষ্ঠীর প্যাটেল, কংগ্রেসের ঐ সর্দারের মতন। যাক সে কথা তার আগেও দাঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় বর্মায়—সেখানে শরৎচন্দ্রকে সবাই দাঠাকর বলে ডাকত।

আপনার বয়স ?

অনুমান করুন।

এই ধরুন চল্লিশ।

চল্লিশ কি মশাই ? ফর্টি এইট!

প্রকাশ আবার বলিল, হংসেশ্বরের কোন উপন্যাস আপনার কাছে আছে ?

Sold, brother, sold, নাটক, প্রহসন, চম্পূকাব্য, এসব এখন কিছু কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসগুলো সবই বিক্রী হ'য়ে গেছে। রিটায়ার্ড কলেক্টর রায় বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত লোকেরাই কিনেছেন। হাই সার্কেলে মুভ্ করাই আমার বিশেষত্ব কি না।

প্রকাশ বলিল, আমার দুর্ভাগ্য যে, বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরতে হ'ল।

তরুণ বলিল, হংসেশ্বর ভিন্ন অন্য লেখকদের বই হাতে আছে।

আমি চাই তর্কবাগীশের রচনা।

চাইবেন ত', ঐটেই স্বাভাবিক। তাঁর উপরই গবেষণাকারীদের Craze, ওঁর রচনা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবান একখানা দলিল যাকে বলে, valuable Histro-Socio-Psyciological document.

একটু পরে প্রকাশ উঠিতে চাহিলে তরুণ কহিল, বসুন, আপনাকে একটা জিনিষ দেখাচ্ছি বলিয়াই সে ফ্রেমে বাঁধান একখানা কাগজ প্রকাশের হাতে দিয়া বলিল, রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে লিখেছেন। এটা তাঁর স্বহস্ত লিখিত কবিতা।

প্রকাশ কবিতাটি পড়িতে লাগিল।

তরুণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াই চলিল, রবীন্দ্র-প্রতিভার আমি একজন শ্রেষ্ঠ পূজারি। লোকে বলে কবি-মণ্ডলের জ্যোতিষ্ক। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আমার সন্দর্ভ আছে। পড়েন নি? জনসদর্চিতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। কবিগুরু যা' পড়ে লিখেছেন—

বলিয়াই তরুণ আলমারী হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

শ্রীমতী মৃদুলিকা দেবী, কল্যাণীয়াষু—

প্রকাশ বলিল, মৃদুলিকাটি কে ?

ঐটা আমার সাহিত্যিক উপনাম, যাকে বলে Pen name ? ঐ নামেই প্রবন্ধগুলো বেরোয়।

সাহিত্যিক হিসাবে তাহ'লে আপনি শ্রীমতী মৃদুলিকা ?

আপাতত ঐ একটা নামই জেনে রাখুন। এ নামেরও ইতিহাস আছে।

তখন আমি আসানসোলে থাকি। সেখান থেকে কলকাতার কোন কাগজে একটা গল্প পাঠাই। গল্পটা ফেরৎ যায়। মাসখানেক পরে সেই গল্প আবার পাঠালাম মৃদুলিকা দেবী নাম দিয়ে। পরের মাসেই গল্প ছাপা হ'ল। সম্পাদক দশ টাকার দু'খানা নোট পাঠিয়ে দিলেন।

বড় মজার ব্যাপার ত !

রহু ধৈর্যং, শেষ হয়নি ব্রাদার, আরও আছে। দু'বছর পরে কলকাতায় সেই সম্পাদকের সঙ্গে হ'ল পরিচয়। প্রথম দিনই তিনি বললেন, আপনি আসানসোলের সাহিত্যিক ? ওখানে আমাদের একজন মহিলা কন্ট্রিবিউটার আছেন, মৃদুলিকা দেবী, চেনেন তাঁকে ?

সম্পাদকের খুব ইচ্ছা ছিল মৃদুলিকার সঙ্গে পরিচিত হ'বার। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর যখন শুনলেন আমিই মৃদুলিকা দেবী, তখনও বললেন, —You are a rogue.

তরুণ প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, কে রোগ (Rogue) মশাই, আমি না, সেই সম্পাদক ?

প্রকাশের বলিবার ইচ্ছা ছিল, আপনারা দু'জনেই।

এইরূপ নানা কথাবার্তার মধ্যে তরুণ প্রকাশকে সেইদিনই একখানা বই গছাইবার চেষ্টা করিল।

প্রকাশ কহিল, আমি পরে একদিন আসব।

(ক্রমশ)

দাশু রায়ের পাঁচালী

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম-এ

পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অন্নদামঙ্গলের কবি এই যুগের শেষ কবি। মুর্শিদাবাদের গঙ্গায় সেদিন শুধু বাঙলার রাজনৈতিক সূর্য্যই ডুবে নাই, সাহিত্য, ধর্ম্ম, বাণিজ্য সবই একসঙ্গে ভাগীরথীর অতল তলে ডুবিয়াছিল। সার্দ্ধ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সার্দ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ কাব্যনিকুঞ্জ নীরব। বাঙলার রাজনৈতিক গগন তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়ী হইলেও তখনও রাজদণ্ড দ্বিধা বিভক্ত। প্রজার রক্ষণের চেয়ে শোষণের দিকেই ইংরেজ ও নবাব উভয়েরই দৃষ্টি প্রখর। এরপরে ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের দেওয়ানী নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে অত্যাচার আরম্ভ হইল, তাহাতে জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কোন অঞ্চলে ইংরেজ কর্ম্মচারী দেখিবামাত্রই অধিবাসিগণ আপন আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিত। এরূপ ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখেই একবার ঘটিয়াছিল।

অমাবস্যার অন্ধকারে যখন চাঁদের কিরণ অদৃশ্য হইয়া যায়; তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্ররাজিই আপন আপন শক্তি অনুসারে এই অন্ধকার বিদূরিত করিবার প্রয়াস পায়। তাহারা ক্ষুদ্র, বৃহতের কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম না হইলেও পথহারা পথিকের তাহারা ধন্যবাদের পাত্র। বাঙলার এই ঝটিকান্দোলিত কাব্য-নিকুঞ্জে যখন কবিকঙ্কণ কিম্বা ভারতচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন না, তখন দাশরথি রামনিধি, রামনৃসিংহ, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতিই তাঁহাদের গ্রাম্য সংগীতে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে-ছিলেন। কবি কালিদাস রায় ইঁহাদের অন্যতম দাশরথি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বাগ্দেবী সাজিল যবে বিজাতীয় বসন ভূষায়
"বৈঠকে বিকাতেছিল" বিদেশীর সুরা কুম্ভ হায়
পবিত্র গোরস ভাণ্ড পল্লী বক্ষে করিয়া দোহন,
গলি গলি কে ফিরিল ভারতীর সেবার কারণ?"

যমুনা—কার্ত্তিক ১৩২১

এই গ্রাম্য কবিগণের গীত সত্যই গো-দুগ্ধ। রাজসভায় ইহার আদর না হইতে পারে, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ ইহাকে এক সময়ে তাহাদের একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। এই সকল কবি জানিতেন—তাহাদের রচনা নির্দ্দোষ নয়; তাহারা কখন নিজদিগকে কৃত্তিবাস কিম্বা কাশীরাম, সেক্সপিয়ার কি বাইরন, হোমার কিম্বা ভার্জিল মনে করেন নাই। তাই দাশরথি নিজেই গাহিয়াছেন—

থাকে গ্রন্থ দোষযুক্ত ত্যজে দোষ তোষযুক্ত
স্বগুণে হবেন যত গুণী।
যে দুগ্ধে মিশ্রিত নীর নীরাংশ ত্যজিয়া ক্ষীর
হংসবংশে পান করে শুনি।

সুখের বিষয়, এই দোষ-গুণযুক্ত পাঁচালী কবিকে আজও লোক ভুলে নাই। "দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" বলিতে বলিতে আজও লোকের "নয়ন ঝুরে।"

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলার বাঁদমুড়া গ্রামে দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন। বাঁদমুড়া কাটোয়ার নিকটে। দাশরথির পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়, পিতামহের নাম জগন্নাথ রায়, মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। ভ্রাতার মধ্যে দাশরথি দ্বিতীয়। কনিষ্ঠ রামধন বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় ভ্রাতা তিনকড়ি দাশরথির পাঁচালীর দলে গান করিতেন এবং দাশরথির মৃত্যুর পরে নিজেই দল করিয়াছিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে কবি মাতুলালয়ে নীত হন এবং সেখানে সযত্নে লালিত পালিত হইতে থাকেন। দাশরথির মাতুলের নাম রামজীবন চক্রবর্ত্তী। কবি আর আপন পিতৃভূমিতে গিয়া কখনও বাস করেন নাই। পরিচয় সম্বন্ধে দাশরথি লিখিয়াছেন—

গ্রাম নাম বাঁদমুড়া তন্মধ্যে ব্রাহ্মণচূড়া
দেবীপ্রসাদ দেব শর্ম্মা নাম।।
অহং দীন তত্তনয় পীলায় মাতুলালয়
ইদানী মাতুল ধামে ধাম।

এই পীলা গ্রামের পাঠশালায়ই কবির প্রথম বিদ্যা শিক্ষা। বঙ্গবাসীর সহ-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—দাশরথি নীলকুঠির কর্ম্মচারিবর্গের নিকট ও বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকট কিছু ইংরেজী ভাষাও শিখিয়া-ছিলেন। হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় কবির পারদর্শিতা সম্বন্ধে কাব্যই প্রধান প্রমাণ।

মোর নাম মজনু ফকির, মোকাম মেরী মটিয়ারী
ঝট ভিখ্ দে মুঝে, এৎনে কাহেকো দেকদারী?

নলিনী ভ্রমরের বিরহ

পীলা গ্রামে অকাবাই বা অক্ষয় পাটনীর একটি কবির দল ছিল। দাশরথি এই দলে গান ও ছড়া বাঁধিয়া দিতেন। মাতুল রামজীবন বাবু ইহা জানিতে পারিয়া দাশরথিকে ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু ইহাতে দাশরথির কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তিনি অকাবাই-এর সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তখন রাম-জীবনবাবু তাহাকে সাঁকাই নীলকুঠিতে (হরিমোহনবাবুর মতে কাঠশালী কুঠি) মাসিক ৩ টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত করিয়া দেন। এই নীলকুঠিতে থাকার সময়েই কবির মাতৃবিয়োগ হয়। দাশরথির মন কবি-গানে এতদূরে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, নীলকুঠির কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিত না। প্রতি রাত্রে গোপনে তিনি অকাবাই-এর সঙ্গে কবির দলে যোগ দিতেন। এই জন্য কুঠির ম্যানেজার তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দেন। দাশরথি ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিলেন। অনন্যকর্ম্ম হইয়া কবি এখন অকাবাই-এর দলে প্রবিষ্ট হইলেন।

কবি গান করিতে গিয়া দাশরথি প্রায়ই বিপক্ষ দলের নিকট গালাগালি খাইতেন। যদিও কবি ইহার প্রত্যুত্তর চোখা চোখা শব্দ যোজনা করিয়া বিপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিতে ছাড়িতেন না, তবু, পিতা দেবীপ্রসাদ ও মাতুল রামজীবনবাবু ইহাকে বংশের অগৌরব ভিন্ন কিছুই মনে করিতেন না। একদিন তাহারা উভয়ে বিশেষ দুঃখিত হইয়া দাশরথির নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কবির মৃতা মাতৃদেবীর নাম করিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। হরি-মোহনবাবু লিখিয়াছেন—কবি মাতার নাম শুনিয়া, না জানি কেন, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও কবির দলে যাইবেন না। দাশরথি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দাশরথি কবির দল ত্যাগ করেন।

কবির বয়স তখন ৩০ বৎসর। দাশরথি এই সময়ে পাঁচালী রচনা আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি পাঁচালীর একটি দল সৃষ্টি করেন। পাঁলার শচী বিশ্বাস, নীলু বিশ্বাস, অদ্বৈত বৈরাগী, ভগবান বৈরাগী, আখড়া-বিষ্ণুপুরের মদন সেন, রাধামোহন সেন প্রভৃতি দাশরথির দলে গান করিত। প্রথমত দাশরথির দল তেমন জনপ্রিয় ছিল না। কবিকে অনেক সময়ে ঘরের খাইয়াই পরের বাড়ী গান করিতে হইত। কিছু দিন পরে কিন্তু দাশু রায়ের পাঁচালীর নাম দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে কবির দলের দাশরথিকে লোকে ভুলিয়া গেল; কিন্তু পাঁচালীর দাশুর সুর হাটে ঘাটে সর্ব্বত্র, রাজপ্রাসাদ হইতে পল্লী-কুটীরে পর্যন্ত গীত হইত। বর্দ্ধমানের মহারাজ ও কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দাশরথির গান শুনিয়া তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। দাশরথি এই সময়ে শিবিকায় যাতায়াত করিতেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন "এক সময়ে ঐ পাঁচালী লোকের দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি দাশু রায়ের ২।১টি গীত না জানে এরূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কি ইতর কি ভদ্র, কি স্ত্রী কি পুরুষ সর্ব্বসাধারণেই ঐ গানের পক্ষপাতী। এরূপ সৌভাগ্য সকল লোকের ভাগ্যে ঘটে না।"

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

১৮৩৭ সনে ৩২ বৎসর বয়সে কবি বিবাহ করেন। দাশরথির পত্নীর নাম প্রসন্নময়ী। ইনি মঙ্গলকোটের নিকট-বর্ত্তী সিঙ্গতু গ্রাম নিবাসী হরিপ্রসাদ রায়ের কন্যা। দাশরথির কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। একমাত্র কন্যা কালিকাসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল নবদ্বীপে। ১৮৫৭ সালে দাশরথির মৃত্যু হয়। তাহার পর বৎসর কার্ত্তিক মাসে কালিকাসুন্দরীও ইহ-লোক ত্যাগ করেন। প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয় ১৮৯৯ সনে।

দাশরথির পাঁচালী—পাঁচালী কথাটি দাশরথির নিজস্ব নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙলা ভাষা এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত।

শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত ও শূন্য-পুরাণ
(দীনেশবাবুর মতে একাদশ শতাব্দী)

কাম্য করি যে শুনিল ভারত পাঁচালী
সকল আপদ তরে বাড়ে ঠাকুরালী
—নিত্যানন্দ ঘোষ—মহাভারত

ভগবত-অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া
লোক নিস্তারিত যাই পাঁচালী রচিয়া
—শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজখান (১৩৯৫—১৪০২)

শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান
—কবীন্দ্র পরমেশ্বর-মহাভারত

সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী
নারায়ণি কথা শুন একটি লাচাড়ি
নারায়ণ দেব—পদ্মা-পুরাণ

বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল
দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল
—পাকুড়ের রাজা পৃথিচন্দ্র—গৌরী-মঙ্গল

ইহা ভিন্ন ১৬৮৯ অব্দে রামজীবন কবি তাঁহার সূর্য্যের পাঁচালী রচনা করেন। কিন্তু এই পাঁচালী শব্দের উৎপত্তি কোথায় এবং কি প্রকারে তাহা আজও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"পাঞ্চালী নামক গীত পঞ্চালেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। এই পঞ্চালী গীতের আদর্শ লইয়া বঙ্গ ভাষায় প্রথম গীত রচিত হইয়াছিল।"—বঙ্গ ভাষাও সাহিত্য। কেহ কেহ বলেন, পাঁচজনে মিলিয়া গান করিত বলিয়াই ইহার নাম পাঁচালী অথবা সাজ বাজানো, ছড়া কাটানো প্রভৃতি গানের পাঁচটি অঙ্গ আছে বলিয়াই ইহার পাঁচালী নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন ব্যাখ্যাই যুক্তি-সংগত মনে হয় না। আমার মনে হয় বাঙলা পাঞ্চালী বা পাঁচালী শব্দের মূলে সংস্কৃত "পাঞ্চালিকী।" সংস্কৃত পাঞ্চালিকী শব্দের অর্থ পুতুল নাচ (History of Sanskrit literature—Jahnabi Charan Bhaumic)। এই পুতুল নাচ একদিকে যেমন সংস্কৃত নাটের সৃষ্টি করিয়াছে, অন্যদিকে পাঁচালী গানের সৃষ্টিও ইহা দ্বারা অসম্ভব নয়। পুতুল নাচের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধারের কার্য্য শেষ হইলেও পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে তাহার গতিবিধি অপ্রতিহতই ছিল। তেমনি বোধহয় পুতুল নাচের ঘটনাটি ছন্দে বর্ণন করিয়া কোন ব্যক্তি বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করাইয়া দিত। ইহাই পরবর্ত্তীকালে পাঞ্চালী ছন্দে পরিণত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত পাঞ্চালি কী শব্দ প্রাকৃত পাঞ্চালি নঈ—পাঞ্চালী পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বাঙলা পাঁচালীতে পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব। সাহিত্য দর্পণের মতে সংস্কৃত ভাষায় যত প্রকার রীতি বা style হইতে পারে পাঞ্চালী তাহার অন্যতম। ইহা সমাস ও যুক্তাবহুল গৌড়ী-রীতি এবং স্বল্প সমাস, কোমল বর্ণভূয়িষ্ঠ বৈদর্ভী রীতির মধ্য পথবর্ত্তী। বাঙলা পাঁচালী এই সংস্কৃত পাঞ্চালী রীতি হইতেও উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। অবশ্য এই পাঞ্চালিকী পুতুল-নাচ বা সংস্কৃত পাঞ্চালী ছন্দের আদি ভূমি পাঞ্চাল হইতে পারে, কারণ আর্য্য সভ্যতা বহু দিন পর্যন্ত এই পাঞ্চাল বা ব্রহ্মর্ষি দেশ হইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। (মনু কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেনকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলিয়াছেন)। প্রথমত পাঁচালী দেবমন্দিরের সম্মুখেই গীত হইত। সেই অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে দেবমাহাত্ম্যসূচক সমস্ত গীতের নাম পাঁচালী হইয়াছে—মনসার পাঁচালী, চণ্ডীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী এবং সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী।

দাশরথির পাঁচালী কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বের এই পাঁচালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং পাঁচালী বলিতে আজ দাশরথির গীতই পরিচিত। কবিগানের ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সঙ্গীত সংগ্রাম চলিত। তবে কবিগানে যেমন আসরে বসিয়াই গান ও ছড়া বাঁধিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে পাঁচালীতে সেরূপ নহে। এখানে পূর্ব্বাভ্যস্ত গান ও ছড়াতে যে দল বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে সেই দলেরই জয়। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে দাশরথি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। রাবণ-বধ, লব-কুশের যুদ্ধ, প্রহ্লাদ-চরিত, দক্ষযজ্ঞ, শিব-বিবাহ, মহিষাসুরের যুদ্ধ

প্রভৃতি পালা ইহার নিদর্শন। তাহা ছাড়া, সেই সময়ের সামাজিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও কবি উদাসীন ছিলেন না। যেমন—শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি। শিব-বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, রাবণ-বধ প্রভৃতি পালায় দাশরথির রচনার উচ্চভাব প্রশংসনীয়। চণ্ডাল গুহক সম্বন্ধে রামচন্দ্র বলিতেছেন—

"ভক্তিশূন্যে আমি ব্রাহ্মণের নই
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই।"

ভট্টপল্লীর রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"দাশরথি রায় ভক্তিপ্রীতি রসে ভাবুক মাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঁচালী-কবি সর্ব্বত্র এই উচ্চভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভাবের উচ্চ বিমানে ভ্রমণ করিতে করিতে কবি পরক্ষণেই গ্রাম্য আবিলতাময় হাস্যরসের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তবে বোধ হয় এজন্য কবিকে দোষ দেওয়া চলে না; দোষ সেই সময়ের সমাজের। কবি নিজেই লিখিয়াছেন—

শ্রবণেতে জীবমুক্ত ভারতী ভারত উক্ত
শ্রীগোবিন্দ গুণানুকীর্ত্তন।
অপরে করিবে রাগ ঘুচাইতে সে বিরাগ
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।

স্পষ্টই বুঝা যায় "অপর প্রসঙ্গ"গুলি সমাজের মনরক্ষার জন্য। কবি মিথ্যা বলেন নাই। জীবনে তাঁহাকে বহুবার পাঁচালী গাহিতে গিয়া বিরহগানের আগেদে বিরত হইতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে হরিমোহনবাবু গোয়াড়ির একটি উদাহরণও দিয়াছেন।

গ্রাম্য আসরে গীত হইলেও পাঁচালীর স্থানে স্থানে কবির রচনানৈপুণ্য সুন্দর ফুটিয়াছে।

"কি শোভারে! রামরূপ—রূপসাগর তরঙ্গ
রত্নাসনে সীতাসনে রাজভূষণে ভূষিতাঙ্গ
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র দুখী পায় আতঙ্গ
মরি হরির অঙ্গ হেরি অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ।"

কিন্তু বাঙালী-প্রাণের প্রকৃত সুরটি দেখি কবির "আগমনী গানে"। মা ও মেয়ের বিচ্ছেদ মিলনের যে মধুর চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

দীর্ঘ অদর্শনান্তে মা মেনকা গৌরীকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—।

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্য রূপিণী কোথা লুকালো।

জাগরণের পর মা আত্মহারা, তার শরীর ধূলায় লুণ্ঠিত। তার পরে সেই স্নেহের কন্যা বহুদিন পরে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাই—

"গৌরী এল শুনি, এলোথেলো পাগলিনী,
এলোকেশী হয়ে রাণী, ধরাশয়ন ত্যজি অমনি উঠিল।"

আবার—

বহুদিন পরে মাকে দেখিয়া গৌরীর হৃদয়-ভরা অভিমান উথলিয়া উঠিল।

তুমি গো আমার তত্ত্ব কর কই জননি!
জনক পাষাণ—তেমনি মা! তুমিও পাষাণী।

তারপরে শেষদিন বিদায়ের দিন। স্থির হইয়াছে প্রভাতে গৌরী বিদায়।

তখন—

"ভাসিছে নয়ন নীরে রাণী বলিছে রজনীরে
রজনি! আজি মোরে রাখতে হবে।
আমারে নিদয় হইওনা।
দোহাই শিবের পোহাইওনা
রজনীরে! বলিযে পায়ে ধরি
আজ তুমি পোহালে নিশি হবে আমার দিনে নিশি
প্রাণ কুমারী বিনে প্রাণে মরি।"

মাতৃস্নেহের ইহা হইতে সুন্দর ছবি কোন শ্রেষ্ঠতর কবির তুলিকায়ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দীনেশ-বাবু বলিয়াছেন—"এই সকল গানের রঙ্গভূমি কৈলাস বা হিমালয়-পুরী নহে—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহার অনুভূতি ক্ষেত্র।" দীনেশবাবু কবির শ্যামা বিষয়ক, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতগুলিরও প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

দাশরথির কবিত্ব নির্দ্দোষ নহে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন—"দাশরথির রচনায় মিত্রাক্ষরতা এত অবিশুদ্ধ যে, তাহা দেখিয়া স্থানে স্থানে কবির প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। তাছাড়া খেউড় নামক উপাখ্যান সকল এত জঘন্য ও এত অশ্লীল যে, তাহা দেখিলে দাশু রায়কে ভদ্রসভায় বসিতে দিতে ইচ্ছা হয় না"—বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থ গৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং, মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

দাশরথির উপমা কিন্তু কালিদাস কিম্বা মাঘ সকলের সীমারেখাকেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। দীনেশবাবু বলেন—কবি যখন উপমা দিতেছেন তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন। লেখনীর মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই—কবিকে "থাম থাম" বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে প্রবাহ স্থগিত হওয়ার নহে। দাশরথি গাহিলেন—"মায়ের মন কাঁদে কেন তবে পার মা জানতে।" বলিলেন—সন্তানের তুল্য মায়া নাই, সে কেমন—

শশীর তুল্য রূপ নাই, কাশীর তুল্য ধাম।
প্রেমের তুল্য সুখ নাই রামের তুল্য নাম।
ইত্যাদি

ইহার পর দীর্ঘ দুই পৃষ্ঠাব্যাপী কবির তুল্যাতুল্য নির্দ্ধারণ। আজ আমরা ইহার যেরূপ সমালোচনা করি না কেন সেদিন ইহার আদর ছিল। কবির দিগন্তব্যাপী যশই ইহার প্রমাণ। এক কথায় দাশু রাজসভার কবি ছিলেন না। তিনি ধূলিমাটির পথেই ভ্রমণ করিতেন। সোনা-রূপা নিয়া তাঁহার কারবার ছিল না, সেজন্য কবিকে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু মাটির রাজ্যে তিনি লোকশিক্ষার যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহা সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া পরবর্ত্তী সাহিত্যিক বাঙালী জীবনকে ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়াছিল।

আমার মোরদ

(গল্প)

শ্রীনিখিল সেন

সারাটা প্রাতঃকাল ছোট্ট লালপানা সূর্যটা আকাশ বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে বুঝি পদস্খলিত হয়ে পড়ে যায়—নইলে বেশী দূর উঠতে পারেনি কেন? রংটা কিন্তু হালকা হয়নি তার দেহের—তেমনি কমলালেবুর মতই রয়েছে।

কি শীত! চা-বাগানের এ কোণে আজ কাজ চলেছে তবু। যে চৌদ্দটি একেবারে ধারের ফালিটায় কাজে লেগেছে তাদের তিনটি ছাড়া আর সবাই মজুরণী অর্থাৎ মেয়ে। এত শীতেও তাদের হাত—তাদের হাঁটু থেকে পা অবধি উন্মুক্ত। শীতের কামড়ে মিশকালো দেহত্বক কেমন অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে—মাঝে মাঝে ছড়ে যাবার মত ফাটা ফাটা দাগের রেখাঙ্কন।

নির্বাকে তারা কাজ করে যাচ্ছে—মাথার সঙ্গে পিঠের দিকে বাঁধা ঝুড়ি ভর্তি করছে। ওটি হ'ল তাদের কাজের মাপকাঠি। বেছে বেছে চা-গাছ থেকে পাতা তুলে তারা নিচ্ছে বি চট্ পট্।

ভোর সকালে এসে যখন ওরা কাজ সুরু করেছিল তখন ওদের মুখে ছিল কত হাসি—কত গান, কিন্তু বাইরের কনকনে হাওয়া এতক্ষণে তাদের ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে হাসি—একবারে নীলপানা বানিয়ে। আঙুলগুলো ক্রমশ যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। গান উবে গেছে তাদের অন্তর থেকে।

'একটা আগুন করা যাক' বললে কাজলী সহসা কাজ বন্ধ করে; পর মুহূর্তেই শুকনো পাতা একগোছা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে ছুটে গেল ঘাসে-ঢাকা ঠাঁইটায়—মস্ত বড় একটা গাছের নীচে।

অপরেরাও তাকে অনুসরণ করলে তবে তেমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নয়—সবারই হাতে শুকনো পাতা বা সরু ডাল। তাদের সকাল বেলার 'হড়ক' অর্থাৎ বিশ্রামের সময় এসে গেছে। কয়েক মিনিটের ভিতরই আগুন বেশ জমকে উঠেছে। চারপাশ ঘিরে বসে পড়েছে কুলী-মেয়ে-মোরদ। আগুনের কুণ্ড থেকে ধোঁয়া একেবার মরে যাচ্ছে না—তাতে ওদের খক্ খক্ করে কেশে সারা হতে হচ্ছে।

ভৈরো এসে বসলো কাজলীর পাশে, সেও নিয়ে এসেছে এক পাঁজা পাতা আর সরু ডালপালা। কাজলী বসে আছে—নিজের হাঁটু দুটি দু'হাতে পাঁজাকোলা করে আঁকড়ে ধরে। আগুন কুণ্ডটার এত কাছে ঘেঁসে বসেছে সে যে, কপালের পাশের এক গোছা চুলের ডগা ফর্‌ফর্ করে জ্বলে উঠলো। মিশকালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলোর ডগা হাতে চেপে নিবিয়ে দিলে—চুলপোড়া গন্ধে ভৈরো কেশে উঠলো।

কাজলী আবার কতকগুলো পাতা গুঁজে দিলে আগুনে।

"নাঃ কি দশাই বানিয়েছে শীতে—মানুষের শরীরই ত, কত আর বরদাস্ত হয়!" বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, তারপরে আবার বলে,—"কেন আমি বড়লোকের ঘরে জন্মাতে পারলাম না, খাসা একটি ভদ্দর 'বর' থাকতো সাথে সাথে; শীত মালুম হ'লেই বলতো সে—'এক বটুয়া তাড়ি পিইবি? এনে দি?' না হয় বলতো আমায় খুশী করতে—'হীরে জহরৎ কিনে দেব জানী তোকে।'

হাসতে হাসতে অবাধ্য [illegible]গুলো দু'হাতে পাট করে পিছনে সরিয়া সে আবার ভাল হয়ে বসলো। গড়ন তার বেঁটে হলেও মজবুত প্রায় সাধারণ স্বাস্থ্যবান পুরুষের মত। মুখে তার হাসি লেগেই আছে—উজ্জ্বল কালো মুখখানির মাঝে শাদা ধবধবে দাঁতগুলো যেন বিজলীর মত চক্‌মক করে।

আগুন-কুণ্ডের ছোঁয়া পেয়ে কাজলীর স্বপন-ঘোর আরও রঙীন হয়ে ওঠে। আবার বলতে শোনে ভৈরো—

"সেই সেকালে হারিয়ে যাওয়া বাবা আমার হয়ত একদিন গড়্ গড়্ করে হাওয়া-গাড়ী হাঁকিয়ে এসে ঢুকবে এ চা-বাগানে। দূরে থেকে আমায় দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে নিশ্চয়—'পেয়েছি, পেয়েছি, এতদিনে পেয়েছি আমার মেয়েটিকে—আমার কাজলীকে।' তারপরে আমায় সে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবে দোতলা পাকা বাড়ীটায় তার। তারপরে নোকর-লোকেরা নিয়ে আসবে কাচের গেলাসে করে চা—মিছরি আর ক্ষীর দিয়ে তৈরী। আঃ" বলে আর কাজলী জিভ্ দিয়ে 'টক্' করে এক রকম আওয়াজ করে।

এবারে ভৈরো আর হাসি চাপতে পারে না।—বিদ্রূপ করে বলে,—

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোর বাবা কিন্তু একখানি গাড়ীই নিজ চোখে দেখেছে, আর সেখানা হ'ল কালো, চারদিক বন্ধ, ওপরে জালতি দেওয়া—যে গাড়ীখানায় করে তাকে জেল-খানায় পোঁছে দেওয়া হয়।"

কাজলী সে কথায় কান দেয় না। ঘাড় কাৎ করে, আগুন কুণ্ডটার ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে স্বপ্নাতুর চোখ রেখে তার কল্পনার আলপনা এঁকে চলে—কতকটা কৌতুকের সুরে, কতকটা বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষায়ঃ—

"সব চেয়ে ভাল হয়, এই আমরা বসে আছি, আচমকা একখানি দামী হাওয়া-গাড়ী এসে ভোঁ করে থামে মোদের পিছনের রাস্তায়। হুট্ করে দোর খুলে যায়, একটি খুপসুরৎ ছোক্‌রাবাবু নেমে আসে—বাবুটি জজ না হয় দারোগা—আর না হয় পরছায়া-ছবিতে পর্দায় যেমন রাজা-জমিদারবাবু দেখা যায় ঠিক তেমনি একটি বাবু। আমায় দেখতে পায়..."

'হাঁরে, খুব যে আমিরি করছিস কাজলী" বলতে বলতে আর একটি মেয়ে নাম তার জোখিয়া ঘুনিয়ে আসে কাছে।

কাজলী কোন জবাব দেয় না—কল্পনার খেই ধরে চলে—

'বাবুটি আমায় দেখতে পেয়েই বলে—'এই যে যাকে আমি খুঁজছি সে-মেয়েটিই ত এখানে।' বলেই এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়..."

"তোর সম্মুখে!" জোখিয়া বলে উঠে চীৎকার করে, "তোর সম্মুখে আসবে কি করতে রে, যখন পাশেই আমি বসে আছি ফোটা ফুলটির মত ঘাসের ওপর।"

কাজলী এত সহজে দমে যাবে কেন—সেও ত কম উতলা নয়—

"নিশ্চয়ই আমার সম্মুখে, সে হ'ল আমার মোরদ—আমার খসম" বলেই হেসে সে গড়িয়ে পড়লো। পর মুহূর্তেই দুষ্টুমির ভাবে মুখ বাঁকা করে সান্ত্বনা দেয় জোখিয়াকে—"তুই ঘাবড়াসনি জোখী, আমার মোরদটার সে দৌলতখানায় পোঁছে তোকে আমি ভুলে থাকবো না। তোকেও না হয় নিয়ে যাব

সাথে করে, তুই হবি আমার খাশ বাঁদী, আমার চুল বেঁধে দিবি, গা ঘষে দিবি আর দিবি চা-টা তৈরী করে, যখন সব বাবু-লোক আসবে আমার ঘরের কাছে।"

এ কথায় জোখিয়া সান্ত্বনা পেল না এতটুকু বরং গোঁসা হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তর্জনী হেলিয়ে বললে—

'ইস্, রাণীর আমার সখ কত। আমি হব বাঁদী—বাঁদী! কেনরে, তুই কিসে এত ভদ্দর হলি আমার চেয়ে শুনি?'

ভৈরো এতক্ষণ চুপ করে মজা দেখছিল—এখন পুরুষোচিত মর্যাদার সঙ্গে বললে—"ঠিক বলেছিস জোখী, তুই কিসে কম!"

জোখিয়া উৎসাহ পেয়ে মুখ ছুটিয়ে দেয়—'ইস্, আমি হ'লাম বাঁদী আর বেগমসাহেব হ'ল কাজলী—ঝোপ জঙ্গলে যার জনম।'

কাজলী নিজের দেশের বদনাম সইতে পারে না, সে কোমরে আঁচলের খুঁট জড়িয়ে পিঠ সটান করে নাক আকাশে তুলে খেঁকিয়ে ওঠে—

"তা জানিস, মানভূমের ঝোপঝাড়ও ঢের উমদা—তোর মতিহারীর শুয়োরের গোয়ালের চেয়ে।"

মেয়ে দুটিই লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে যায় মুখোমুখী।

'তুই আমায় শুয়োর বললি, আরে আমার নবাবজাদী রে! তা আবার আমার মোরদটিকে চুরি করে নিয়ে' একেবারে রণচণ্ডী হয়ে জোখিয়া তার দাবী পেশ করে উত্তেজনার আতিশয্যে বিকৃত স্বরে।

"তোর মোরদ! তোর বই কি! বটেই ত! তোকে শুয়োর বলার কথা বলছিস! আমি এত আহাম্মোক নই যে শুয়োরের মত নির্দোষী এক জীবকে তোর মত একটা হতভাগীর সমান করে বসাব এক ঠাঁই। শুয়োর হ'লে ত তুই বর্তে যাস্।"

যেমন কথা কটা শোনা, অমনি জোখিয়া ছুটে এল দু'হাত বাড়িয়ে লড়ায়ের কায়দায়। কাজলীও প্রস্তুত ছিল—দুজনে দুজনার হাত আঁকড়ে ধরে ঝটকা দিতে লাগলো। তাদের দাপাদাপিতে জ্বলন্ত পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়লো এদিকে ওদিকে। এক তাল শুকনো পাতায় পা হড়কে জোখিয়া একেবারে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে—কাজলী পড়লো তার ওপর। তারপর চললো জড়াজড়ি, খিমচি আর কনুইয়ের ঘা।

ভৈরো ভেবেছিল কুপোকাৎ হয়েই মেয়ে দুটার দ্বন্দ্বযুদ্ধ খতম হবে, কিন্তু থামবার তাদের নাম নেই। তখন ভৈরো ছুটে গিয়ে কাজলীকে তুলে খাড়া করে দিলে। জোখিয়া ছাড়ান পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আবার রুখে এল। ভৈরো একা কিছুতে বাগ মানাতে পারে না—দু দুটো মেয়েকে।

এমন সময় সর্দার এসে হাজির—তার পেছনে ঝুড়ি নেবার ঠেলাগাড়ী সহ দুজন মজুর। একবার নজর দিয়েই সর্দার বুঝলে ব্যাপার কি। এ সর্দারটি ছিল বুড়া ঝানু—সে কখনও ঝাঁজাল কথা মুখ দিয়ে বার করতো না। ব্যাপার সঙিন দেখে মজুরদের বললে মেয়ে দুটাকে ছাড়িয়ে দিতে।

ভৈরো কাজলীকে ধরে রাখলে অপর একজন জোখিয়াকে দূরে সরিয়ে নিলে। মজুরদের সবার মুখে হাসি। মেয়েদুটাকে তখনও ধরেই রাখতে হল। নইলে তারা আবার তেড়ে যেতে যায়।

সর্দার এবার জিজ্ঞেস করলে—'কি নিয়ে তোরা লড়াই করছিস রে?' এ রকম ঝগড়া-কোঁদল মিটিয়ে দিতে সে নাকি ওস্তাদ, অন্ততঃ তার নিজের মনের ভাবটা ওরকম।

কাজলী চোখের ওপর থেকে দুগাছা চুল সরিয়ে কানের পিঠে টিপে টিপে রাখে। নাকের একপাশ জ্বলছে—সেখানে ছড়ে গেছে জোখিয়ার নখে। হাঁটুর ছাল উঠে গেছে খানিকটা—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জোখিয়ার দিকে। দেখে জোখিয়ার কপালে গোল আলুর মত উঁচু হয়ে উঠেছে এক জায়গায়। কাজলী খুশী হয় মনে মনে—নাকের আঁচড়ের জ্বালা কমে যায়!

সর্দারের প্রশ্নের জবাবে তখন কাজলী বলে ওঠে—"ও ছুঁড়ি কিনা আমার মোরদটিকে কেড়ে নিতে চায়।"

জোখিয়ার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোয়।—'এক বারেই নয়, আমি আদপেই করিনি তা। ও ছুঁড়িই ত আমার মোরদটিকে চুরি করে নিলে।"

নিরুপায় সর্দার মাথা চুলকাতে সুরু করে।—'কে রে, কে-রে সে লোকটা?'

"যে ছোকরাটি এসে উ বেড়াটির ওপর দিয়ে তাকাচ্ছিল।" অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কাজলী জবাব দেয়।

জোখিয়া এগিয়ে আসে—"না, না। শোন, ছোকরা এসে বেড়ার ওপর দিয়ে তাকাতেই আমায় দেখে মোহিত হয়ে গেল, বললে—'পেয়েছি যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।' বলেই বেড়া টপ্‌কে আসছিল আমার দিকে—'

'মিথ্যে কথা! ওর কথা শুনো না সর্দার। সে ছোকরা জোখিয়ার কথা ভাবেওনি এতটুকু। আমি বলছি তোমায় সে আসছিল আমার দিকে।'

সর্দার তখন অপর মজুর-মজুরণীদের দিকে তাকিয়ে বললে—'তোরা কেউ দেখেছিস রে ছোকরাকে আসতে?'

তারা সবাই মাথা নেড়ে জানাল—না।

জোখিয়াকে যে ধরে ছিল, সে লোকটা বললে—'কেউ আসেনি সর্দার এদিক পানে।'

তখন সহসা কাজলী হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগলো—"আসবে আবার কে, আসেনি সত্যিকার কেউ।" বলেই হাসতে হাসতে বসে পড়লো—একেবারে পা ছড়িয়ে।

জোখিয়া এক ঝটকায় নিজের বন্দিত্ব মোচন করে, কপালের আবটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে মিহিসুরে বলে ফেললে—'তা যদি বল সর্দার, আসেনি এখানে সত্যি করে কেউ!'

হতভম্ব বুদ্ধ সর্দার—আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—'ভগবান! ভগবান! তবে তোরা কিসের জন্যে এমন খাওয়া-খাওয়ি করছিলি শুনি?'

'আসেনি বটে, তবু আসতে ত পারতো, তখন ও ছুঁড়ি ত চুরি করে নিত আমার মোরদটিকে!' জোখিয়া বলে ফেললো গর্বের সঙ্গে যেন কতই না বাহাদুরী সে করে ফেলেছে কথার প্যাঁচে।

নইলে আর বলে মেয়েমানুষ!' বলতে বলতে সর্দার ঠেলাগাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

জোখিয়া আর কাজলী পরস্পরের দিকে তাকায়—হয়ত কে কতটা বেশী ঘাল করতে পেরেছে তারই তৌল করে দেখতে। তারপর দুই উরুর পর দু'হাত দিয়ে ভর করে কাজলী গম্ভীর সুরে বলে জোখিয়াকে—

"তা হলেও এটা জেনে রাখিস, যদি কোনদিন ওরকম কেউ এসে দেখা দেয় বেড়ার পাশে, তাহলে আমার তরেই সে এগিয়ে আসবে বেড়া ডিঙিয়ে।"

'ইস, সখ দেখ না! তোর দিকে আসবে! বলি সে যদি এমনি কাণাই হবে যে আমি পাশে থাকতে আমায় দেখতে পায় না, সে রকম কাণা মানিষ্যি আবার বেড়া ডিঙোতে পারে নাকি!'

বলেই একটা তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ বিনিময় করে কাজলী আর জোখিয়া ঠেলাগাড়ীর দিকে চললো।

একা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ভৈরো। সে ভাবছে—ভাবছে—ভাবছে। এতদিন ধরে কত চেষ্টা করেও সে কাজলীর মন পায় নি। সে বড় মুখচোরা। আজ সে যেন তার সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। আর সে মুখে কিছু বলবে না কাজলীকে। টাকা জড়ো ত সে করছেই, একদিন সে একটা ঘোড়া ভাড়া করে বেড়ার পাশে দাঁড়াবে, নইলে মোটরগাড়ী সে কোথা পাবে! ব্যস—কেল্লা-ফতে!

গোপন সন্ধানের চা-দোকান

(৪৭২ পৃষ্ঠার পর)

কিছুতেই জানিতে পারে না। এমন কি, স্পাইদের নিজেদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

কিন্তু যে ভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক যখন এই জাতীয় দোকান একটি তুলিয়া দিবার সময় আসে, তখন মুস্কিল হয় সিক্রেট 'সার্ভিস বিভাগের এই যে, এতগুলি টাকা কি নূতন প্রয়াসে খাটান যায়। সাধারণত সাজ-সরঞ্জামে কিছুটা খরচ করা হয়। এই উপায়েই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রচুর ব্যয়ে এমন মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছে, যাহার মত দ্রুতগতি মোটর সারা ইংলণ্ডে নাই।

বিদেশী স্পাই গ্রেপ্তার ও দণ্ডদান এতটা গোপন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল ব্রিটেন যে, যখন জার্ম্মান স্পাই—কার্ল ফ্রিডরিক মূলারকে বন্দী করা হয়, তখন একজন ইংলিশ গুপ্তচর মূলারের নাম গ্রহণ করিয়া নানা বাজে সংবাদ বার্লিনে পাঠাইতে থাকে। এই চতুর কৌশলে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট হইতে মাহিয়ানা ও বোনাসে ৪০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত আদায় করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার পর জার্ম্মান সরকার চতুরতা ধরিয়া ফেলে এবং তাহা বন্ধ করিয়া দেয়।

এই ৪০০ পাউণ্ড দ্বারা একখানি মোটরগাড়ী কেনা হয় এবং উহার নামকরণ করা হয় "মূলার।" এই মোটরের সাহায্যেও কয়েকটি জার্ম্মান স্পাইকে বন্দী করা হইয়াছে। ব্রিটেনের এই সকল প্রতিবিধান ব্যবস্থা ছাড়াও সাহিত্যিক-সমিতি, নৃত্য-শিক্ষাদানের স্কুল রহিয়াছে—যাহা কোনও বৈদেশিক সাহিত্যিক বা মহিলা নৃত্য-শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। বৈদেশিক বলিয়া প্রকাশ্যে পরিচিত হইলেও উহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডবাসী ও ব্রিটেনের সিক্রেট সার্ভিসের এক শ্রেষ্ঠ সহায়।

মিথ্যার জের

(৪৬৯ পৃষ্ঠার পর)

বুঝতে পারিনি। আমি জ্ঞানত ত কোন অন্যায় করিনি সুরমা। দ্যাখ তোমার জন্যে আমার মনে মোটে শান্তি নেই। আমার চেহারা দেখেও কি তোমার বিশ্বাস হয় না সুরো?' স্বামীর দিকে সুরো একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। সত্যই ত সেখানে কোন কালিমার চিহ্ন নাই। তার স্বামী যে তারই। কেউ ত তার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। ছিঃ ছিঃ সত্য সুন্দর স্বামী, তাকে সে কি-নাই বলেছে। আস্তে আস্তে একসময় সুরমার চোখ আপনিই ঝিমিয়ে আসে। কথা বলবারও তার আর শক্তি থাকে না। অনুমান করে স্বামীর পদতলে হাত রেখে মিনতি-ভরা-সুরে সে বলে 'আজ আমার একটা প্রার্থনা রাখবে। যা জিজ্ঞেস করি তার সত্য উত্তর দেবে!' 'কোন দিন ত তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিনি সুরমা। বল কি বলবে।' সুরমা হাতড়ে হাতড়ে বালিশের নীচে থেকে একখানা চিঠি আনিয়া শশাঙ্কের সম্মুখে ধরিল। অতিকষ্টে একটা ছোট্ট কথা বলে—'পড়।' চিঠি পড়িয়া শশাঙ্ক লাফাইয়া উঠে বলে—'এ যে নিছক মিথ্যা সুরো।' সুরমার চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসে। শশাঙ্ক আবার বলে—'চাকরী খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হয়েছিলাম, অথচ তোমাকে দেখতেও বড় ইচ্ছে হচ্ছিল তখন মিথ্যা করে এক চিঠি লিখলাম যদি ভয়ে পড়ে তারা আমায় ডাকে, মনে করেছিলাম তারা নিশ্চয়ই আমায় ডাকবে। কিন্তু ওঃ কি অন্যায় করেছি সুরমা মিথ্যা মিথ্যায় আজ তোমায় হারাতে বসেছি। সুরমা আজ আমায় ক্ষমা করতে পারবে ত?'

সুরমার আর বাক্-স্ফূরণ হয় না। উত্তরে শুধু সে শশাঙ্কের পদতল হ'তে হাত দু'খানি অতিকষ্টে তুলে মাথায় ঠেকাল। এক একবার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর যেন সারা ঘরময় ঘুরতে শোনা গেল—"স্বামী বড় অন্যায় করেছি। তোমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

গুপ্তচরের কৌশল

আমরা ইতিপূর্ব্বে গুপ্তচরদিগের কতক কতক কৌশলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কত প্রকারে যে উহারা বিপক্ষীয় গোয়েন্দাদের ধোঁকা দিয়া মূল্যবান সংবাদ লইয়া পলায়নপর হয়, অথবা চাতুরী বিস্তার করিয়া সংবাদ প্রেরণ করে নিজের দেশে, তাহার শেষ নাই। মহাসমরের সময় মিত্রশক্তির গুপ্তচরেরা বড় আকারের চাবির ছিদ্রে সাঙ্কেতিক সংবাদ লিখিত কাগজ পুরিয়া উহা লইয়া জার্মান সীমান্ত পার হইয়া আসিয়াছে। দুই তিনটি লোকের নিকট ঐ প্রকার বৃহৎ আকারের চাবি কিছুদিন অন্তর লক্ষ্য করিয়া জার্মান গোয়েন্দাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন বিশেষ অনুসন্ধানে চাবির ভিতর হইতে যে কাগজ বাহির হয়, তাহাতে কোনও জার্মান কেল্লার নক্সা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সেই গুপ্তচরটিকে জার্মানগণ গুলী করিয়া মারে।

মহাসমরের মধ্যভাগে একবার জার্মান ও মিত্রশক্তির ঘাঁটি এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়ায় যে স্কার্পে নদীর উজানে থাকে মিত্রশক্তির ফ্রন্ট লাইন আর জার্মান লাইন থাকে ভাটিতে। ঐ সময়ে জার্মান গোপন সন্ধানীরা শত্রুপক্ষের লাইনের পশ্চাতে যাইয়া নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উহার সাঙ্কেতিক বিবরণ মরা মাছের পেটে পুরিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। একবার ঐ প্রকারে প্রেরিত সংবাদ ইংরেজ-ফরাসীদের হস্তে পড়ায়, ঐ কৌশল বন্ধ করা হয়।
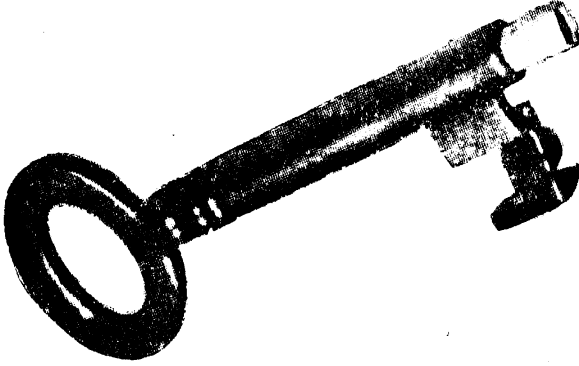
চিরুণী—চিরুণীর গায়ে যে বিন্দু বিন্দু কালো দাগ দেখা যাইতেছে, উহা ধূলামাটি নয়—বিন্দুর সাহায্যে লিখিত সাঙ্কেতিক বাণী।

চাবি—চাবির ফাঁপা নলের ভিতরে পুরিয়া লওয়া হইয়াছে গোপন সংবাদ, সামরিক নক্সা প্রভৃতি।

আলু—আলুগুলির ভিতরটা কুরিয়া ফেলিয়া তাহাতে প্রাইট করা হইয়াছে গোপন তথ্যাদির কাগজ; কৃষক রমণীর বেশে এই প্রকার আলু অন্যান্য প্রকৃত আলুর সহিত মিশাইয়া ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া মহিলা-গোয়েন্দাগণ সীমান্ত অতিক্রম করে।

মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে আবার সংবাদ আদান-প্রদানের 'ডাকঘর' করা হইত সেই সকল ট্রামগাড়ী—যাহা বেলজিয়াম-হল্যাণ্ড সীমান্ত পারাপার হইয়া যাতায়াত করিত।

বিগত মহাসমরের সময় মার্কিন যুক্তরাজ্যে মাত্র একটি জার্মান গুপ্তচরকে সানএণ্টোনিও সামরিক আদালতে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়। উহার নাম—লেথার উইৎনিক। মেক্সিকো হইতে মার্কিনে প্রবেশ করামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে প্রাণদণ্ডের প্রতীক দীর্ঘ কারাদণ্ড ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় লিভেনওয়ার্থ জেলখানায় থাকাকালীন কোনও 'বয়লার' দুর্ঘটনার সময় নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কয়েকটি কয়েদীর জীবন বাঁচাইবার জন্য তাহার দণ্ডকাল হ্রাস করা হয় এবং সমরাবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি প্রদান করা হয়।

মহাসমরের সময় আর একটি কৌশল দেখা গিয়াছে, গোল আলুর ভিতরটা ফাঁপা করিয়া তাহাতে সাঙ্কেতিক সংবাদ পুরিয়া দেওয়া। একটি মহিলা গুপ্তচর কৃষকরমণীর বেশে এক ঝুড়ি গোল আলু লইয়া জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সে চলিয়া আসিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সন্দেহ বশে আটক হয়। তখন সাঙ্কেতিক সংবাদ ধরা পড়ে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত ঐ 'কোড' উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। পরে জার্মানগণ জানিতে পারে যে, উহাতে নানা স্থানের দ্রুত সৈন্য-প্রেরণ সংবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

বিগত মহাসমরের পূর্বে ১৯০৯ সালে এক কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। একটি ইটালিয়ান অফিসার অষ্ট্রিয়ায় ধরা পড়ে—তাহার সহিত একখানি চিরুণী ও টুথ-ব্রাশ ছিল। চিরুণীর দাঁতগুলিতে কতকগুলি কালো দাগ ছিল, যাহা হঠাৎ দেখিলে ধুলো-মাটি বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কালির বিন্দু এবং এক অভিনব সঙ্কেতে লিখিত সংবাদ।

মহাসমরের সময় একজন জার্মান নারী গুপ্তচর ফরাসীদেশ হইতে সামরিক নক্সা কয়েকখানা অতি ক্ষুদ্র আকারে তৈরী করিয়া হাতের এবং পায়ের নখের উপরে আঠা দিয়া জুড়িয়া লয়। যাহাতে নক্সা কাহারও নজরে না পড়ে সেইজন্য নখে আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইলে পরে উহার উপর ঘন একটা 'পালিশ' মাখাইয়া লয়। এত সাবধানতা সত্ত্বেও মহিলাটি ধরা পড়ে এবং প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকারে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যে কত শত প্রকারের চোখে ধূলি দিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয় গোপন সন্ধানীদের দ্বারা—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সোনালী মাছের হ্রদ

আমেরিকার কলোরেডোর পার্শ্ববর্তী এবং গ্রীলির পূর্ব-দিকে স্থিত নেব্রাস্কার 'লেক্ এলিস'কে সোনালী মাছের হ্রদ (Gold Fish Lake) বলা হয়। কিছুকাল অতীতেও এই হ্রদে অগণিত সোনালী মাছ পাওয়া যাইত এবং তাহা দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হইত। কিন্তু এই হ্রদের সোনালী মাছ বর্তমানে প্রতি বর্ষেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। সেইজন্য এই মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। গত বৎসর বেড়াজালে ঘেরাও করিয়া গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে মাত্র ৭০০ সোনালী মাছ ছিল। এই বৎসর তাহা অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে—এই বৎসরের গণনায় দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১০০ মাছ। এই মাছের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

নিজের মৃত্যু-সংবাদ পাঠ

ছুটি উপভোগ করিয়া ওয়েলিংটনের (নিউজিল্যাণ্ড) মিঃ টি এ এণ্ড্রিয়েসেন পুনরায় ওয়েলিংটনে পদার্পণ করিলে তাহার নিজের মৃত্যু-সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হন।

সংবাদপত্রে লেখা আছে—গতকল্য হাসপাতালে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে—সে মিঃ টি এ এণ্ড্রিয়েসেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

তৎক্ষণাৎ তিনি পুলিশের নিকট টেলিফোন করেন এবং উত্তর পান যে, এক ব্যক্তি ঐ মৃতদেহ সনাক্ত করিয়াছে।

কাজেই মর্গে ছুটিতে হইল—সেখানে যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার এক বন্ধুর শব সেইটি—যে বন্ধুকে তিনি আপন পুরাতন পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই পরিচ্ছদেই যত গোল বাধাইয়াছে।

সাপের চামড়ার জুতা

সাপের চামড়ার জুতা পরিধানকারিণীদের অজ্ঞাতসারেই ইহার উত্তরোত্তর বর্ধিত চাহিদা মানবের নিকট আশিসে পরিণত হইয়াছে। আজ তরুণীরা সাপের চামড়ার জুতো পরিয়া গর্ব বোধ করে—বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিল বলিয়া আত্মপ্রসাদও লাভ করে কম নয়। কিন্তু তাহারা জানে না উহাতে কি আশ্চর্য মানব কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো অঞ্চলের খানা ডোবা হইতে ঢোঁড়া সাপ ধরিয়া, উহার চামড়ায়ই বেশীর ভাগ জুতো তৈরী হয়। এখন ঐ সকল ডোবা-খানায় এক জাতীয় মাছ আছে, তাহাই সাপের প্রধান খাদ্য। কিন্তু এই মাছগুলি আবার মশার ডিম ছাড়া আর কিছুই খায় না।

চামড়ার জন্য প্রচুর সংখ্যায় ঢোঁড়া সাপ শিকার করায় মাছেরা রেহাই পাইয়াছে দুষমন সাপের আক্রোশ হইতে। ফলে উহাদের বৃদ্ধি সুরু হইয়াছে পর্যন্ত—ঐ মাছেরা এখন মশার ডিম খাইয়া মশককুল ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। আর মশককুল নির্মূল হইবার পরিণামে বর্তমানে কঙ্গো অঞ্চলের নিদারুণ ম্যালেরিয়া তিরোহিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া দূরীকরণের ফলে শত সহস্র কঙ্গোবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়াছে; এখন তাহারা বাস্তব আনন্দের সহিত সাপের চামড়ার জুতা কিনিতেছে, পরিতেছে। কিন্তু চতুর জুতো ব্যবসায়ীরা ম্যালেরিয়া লোপের কারণ টের পাইয়া এই জুতার মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

ইহার সহিত পূর্ববঙ্গের গোসাপ-চর্মের জুতার ব্যাপার তুলনীয় বিপরীতভাবে। কেন না, গোসাপের চামড়া সংগ্রহে উহাদের খাদ্য সাধারণ সর্প সে অঞ্চলে বাড়িয়া যায় অশেষ এখন আবার আইন করিয়া গোসাপ শিকার বন্ধ করিতে হইয়াছে—তবে সাপের সংখ্যা সংযত হইতে পারিয়াছে।

'সেই মামুলী চিত্র'

শ্রীঅমলা গুপ্তা

নিতাই মিস্ত্রী যখন ফিরে এল বস্তিতে, তখন রীতিমত রাত হয়ে গেছে। ফতুয়াটা খুলে দাওয়ার বাঁশে রেখে দিলে, গামছাখানি টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলতে ফেলতে সে বললে—এবার থেকে সাঁঝের পরও কারখানায় বেগার দিতে হবে এক ঘণ্টা করে, অথচ মজুরি তার জন্যে মিলবে না এক পয়সা। আর পারা যায় না মানু।

মিস্ত্রীর পত্নী মানদা সবে রান্না শেষ করে ঘর নিকিয়ে বেরোচ্ছিল, সে বলে উঠল—বাপ্‌রে বাপ্, এই হাড়ভাঙা খাটুনি, তার ওপর আবার বেগার, তুমি বললে না কিছু? ভয়? জবাব দেবে?........দশ দশটা বছর ওখানে কাজ করছ, তার ভেতর ত সেই কবে একবার দুটাকা মাইনে বাড়িয়েছে, আর বাড়তি চুলোয় যাক্, এখন বলে কি না—বেগার দিতে হবে! বলতে পারলে না?

—কি করে আর বলতে পারি মানু! শেষ কি চাকরীটি খোয়াব। বলতে বলতে বিরক্তির সঙ্গেই নিতাই কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দেয়—যেন সকল দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চায় আপন কাঁধ থেকে নিশ্চিন্তে। তার পর কুয়োটার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়—'এ ত সেই পুরাতন কথা। ভেবে দেখ মানু, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট যতই থাক, চলে ত আমাদের যাচ্ছে একরকম মন্দ নয়, তাছাড়া আমরা অসুখী নই; কি দরকার একটা হাঙ্গামা-হুজ্জত করে, আমাদের এটুকু সোয়াস্তিও নষ্ট করে।'

* * * *

প্রায় এক বছর পরের কথা। কারখানা-মালিকের আপিস-ঘরে ডাক পড়ল নিতাইয়ের। নিতাই যেয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মালিক বললে—নিতাই, কি বলব, তোমার মত ওস্তাদ মিস্ত্রী, অমন বিশ্বাসী, আমি আর পাই নি, কিন্তু এমনই বরাতের ফের তোমাকেও ছাড়িয়ে দিতে হচ্ছে, আমার প্রাণে যে কি কষ্ট হচ্ছে তা ভগবানই জানে। দেখছ ত ব্যাপার, মন্দা লেগেই আছে, কি করে আর কি করি বল।

'কিন্তু বাবু'........নিতাই ক্ষীণ কণ্ঠে কোন রকমে বলে ওঠে, যখন প্রথম আঘাতের চমক থেকে কিছুটা সামলে নিতে পারল।

'ভেব না নিতাই, তোমায়ই আমি আর সবার আগে ডেকে এনে বহাল করব, যখন একটু সুবিধে বুঝব। আমি কি তোমার কদর বুঝি নে, নিতাইয়ের মত মিস্ত্রীকে ছাড়িয়ে দেওয়ার থেকে যে আমার ডান হাতটা কেটে ফেলাও ভাল ব্যবসার দিক থেকে, সে কথা কি আমার মালুম নেই, নিতাই! কিন্তু এদিকে দেখতে পাচ্ছ ত সব........সেই পুরাতন কথা।'

কিন্তু নিতাই যখন তার পাওনা বুঝে পেয়ে কারখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন সদা এসে কানে কানে বললে—বুঝলে নিতুদা মন্দা-টন্দা সব মিছে। ওরা তোমার আদ্দেক মাইনেতে একটা ছোকরাকে এনে ঢুকিয়েছে তোমার জায়গায়।

সদা, সুধারাম হ'ল নিতাইয়ের সাকরেদ—তারা দল জুটিয়ে ধর্মঘট করবার ফিকিরে রইল। কিন্তু নিতাই সেকথা শুনে ছুটে গেল তাদের ঠাণ্ডা করতে—কেন মিছামিছি তোরা বিপদ ডেকে আনবি ঘাড়ে? ভগবান আছেন, সংসারে তাছাড়া একটু রয়ে সয়ে নেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। বাড়াবাড়ি করে কোন লাভ নেই। যা-ই কর শেষটায় দেখতে পাবে—যতকিছু ঝড়-ঝাপটা তা বইবে গরীবের মাথার ওপর দিয়ে। তা দিয়ে কোন লাভ নেই ভাই, তোরা মাথা ঠাণ্ডা করে যে যার কাজ করে যা ভাই। আমার জন্যে ভাবিস নে। এ ত সেই নিত্যকার মামুলী ব্যাপার!

কিছুদিন কাটল। নিতাইয়ের কথায় ধর্মঘটের বাতিক জল হয়ে গেল। এদিকে নিতাইয়ের সংসারও চলে গেল নির্ভাবনায়। হাতে ত সে পেয়েছে একসঙ্গে থোক টাকা, তা ছাড়া জমাতেও পেরেছিল আগে কিছু। যা হোক, তার চলে যাচ্ছিল। তার ওপর নিতাই আর মানদা—এমন করে দিন-রাত পরিপূর্ণভাবে উভয়কে আর কখনও পায় নি মুখোমুখী—খোসমেজাজে তারা কিছুদিন চলল তাদের পুরাতন ঘর-কন্নায় নতুন একটা সুরের স্বপ্নঘেরা আমেজে।

নির্ভয়ে তারা দিন পার করছিল বটে, কিন্তু বিপদের ছায়া ঘুরছিল অষ্টপর তাদের মাথার ওপর। সময়ে সে ভাবনা নিবিড় হয়ে এসে নিতাইয়ের কপালে কুঞ্চিত রেখা এঁকে দিত। এক-একদিন কোন কারখানায় যেত কাজের আশায়, আশাহত হয়ে ফিরে এসে ভীতির স্বরূপটা মালুম করে নিতাই শিউরে উঠত। এমনি করে শহরতলীর সব মিল ঘুরে ছোট্ট শহরের বুকে ঘুরে বেড়াল সব কটা 'কলে'—সব কটা কারখানায়। প্রথমত সে মিস্ত্রীর কাজের জন্যই আবেদন জানাত, তাতে বিফল হয়ে আকুতি জানাত যে-কোন একটা কাজের জন্য—এমন কি সামান্য শ্রমিকের একটা কাজ পর্যন্ত।

শ্রমিকের কাজ মাঝে মাঝে জুটত বটে—কিন্তু তার কোনটাই এক সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয় নি। সকল কোম্পানীই যেন লোকজন কমাতে উঠে পড়ে লেগে গেছে।

শেষ একটা কারখানায় নেহাৎই কম মাইনায় মিস্ত্রী-গিরির পদ একটা পেল বটে। কিন্তু তিন দিন কাজ করবার পর চার দিনের দিন কাজে গিয়ে দেখে কারখানা তালাবন্ধ—আদালতের নোটিশ টাঙান। মানদাকে এসে বললে—জানিস্ মানু, যেমন আমার বরাতের ফের—সেই পুরাতন ব্যাপার—কারখানাটা গেল ফেল্ মেরে।

হাতের পুঁজি ক্রমে ফুরিয়ে এল। দুটি কামরাওলা সে খোলার চালার এক কামরা দিতে হ'ল ছেড়ে। রান্নাঘরও আর রইল না। তোলা উনানে রোয়াকে বসে রাঁধতে হয়ত মানদাকে। একখানা চট বা দরমা দিয়ে যে ঘেরাও করে নেবে সে পয়সাও নেই। বৃষ্টির ছাট আর দারুণ গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ পিঠ পেতে নিয়ে রান্নার কাজ সারতে হয় মানদাকে। তাতেও তার দুঃখ নেই এতটুকু, যদি স্বামীর তবু একটা কাজ মিলে যেমন তেমন।

কাজ আর জুটল না। নিতাই হয়ে পড়েছে হতাশ। আজ তিন দিন এক বেলা করে চাল সিদ্ধ করে নিয়েছে চারটি। মন্দটা ভাল মানুষ—কিন্তু তাকে দোষ দেওয়া যায় না—তার ছোট কলিজায় কত সয়? সে জবাব দিয়েছে—আর সে চালাতে

পারবে না। এতদিন যে মুখ বুজে রয়েছে তাও কেবল নিতাইয়ের আগেকার কড়ার মত ঠিক ঠিক চুকিয়ে দেবার সাধু তার জন্যে।

তারপরে পাড়া-পড়শী? তাদেরই বা জান্ কতটুকু? সদা, সুধা নিজেদের দুবেলা হাঁড়ী চালাতেই হিমসিম খেয়ে যায়—তারা হ'ল সব ছা-পোষা লোক—তারা আর ক'দিন পারে নিজের মুখের গ্রাস থেকে দুটি করে দানা তুলে দিতে।

এবারে সত্যি নিতাই নিরুপায়। তবু সে পারে না বেকার-বান্ধব সমিতির কাছে হাত পাততে। মানদা জেদ করে—নিতাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে........সারা জীবন তারা সৎপথে থেকে কঠোর শ্রমে করেছে রোজগার........তাই বলে, দিন খারাপ পড়েছে বলে এখন কি তারা উপোস করে মরবে না কি! নিতান্তই বেঘোরে পড়েছে তারা, এখন দিন কতক যেখানেই হোক চেয়ে চিন্তে আনতে হবে, নইলে আর উপায় কি?

একদিন নেহাৎ নিরুপায় হয়েই নিতাই মাথা হেঁট করে হাজির হ'ল বেকার-বান্ধব সমিতির দ্বারে। সেখানকার বাবুটি একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে ভাল করেই বুঝিয়ে দিলে—তুমি ত একটানা বেকার নও ছ'মাস—মাঝে মাঝে যা হোক একটা কিছু জুটিয়েছ কাজ। আমাদের চাই প্রমাণ যে তুমি প্রকৃতই বেকার রয়েছ একটানা।

শত ভাঙা বিকৃত সুরে নিতাই আপ্রাণ চেষ্টায় বলে ওঠে—দেখুন বাবু, আমরা এ অঞ্চলে আছি আজ দশ বছর ধরে। কোনদিন কারু কাছে, ভগবানের দয়ায়, হাত পাততে হয় নি। আমি কি ধোঁকা দিতে এসেছি আপনার মনে হয়!

বাবুটি মিষ্টি সুরেই বলে—ধোঁকা দেবার কথা হচ্ছে না। তুমিও মিছে কথা বলছ না এ ত বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের আইন-কানুন রয়েছে যে। প্রমাণ দেখাও, আমাদের বুঝিয়ে দাও তুমি বেকার রয়েছ একটানা, নইলে আমরা কি করতে পারি? দেশে ত কতশত বেকারই রয়েছে, সবাইকে কিছু আমরা চোখ বুজে খয়রাৎ করে যেতে পারি-নে। তুমি ত সবই বোঝ—এ যে সেই পুরাতন ব্যাপার!

নিতাই অবুঝ নয়। সে বোঝে—'সে কথা ত ঠিকই। এ ত সেই পুরাতন নিত্যকার মামুলী ব্যাপার।' ক্ষোভে অপমানে নিতাইয়ের বুকটা ফেটে যেতে চায়। শত চেষ্টায়ও আর সে একটি কথাও বলতে পারে না। হেঁট মুখেই সমিতির আপিসঘর হতে বেরিয়ে আসে। নিতাই আজ পাগল-পারা, গরীব হলেও সে ত একদিন মানুষই ছিল, আজই না হয় সে অকেজো........শুধু তার বুকে আর কত সয়!........স্বপ্নেও সে ভাবতে পারে নি কোনদিন—অনাহারে অর্ধাহারে যার দিন কাটে, সে না কি ভিক্ষুকের মত সমিতির দুয়ারে আকুতি জানিয়েও কোন কালে বিমুখ হতে পারে। বেকারদের মুখে অন্ন দেবার জন্য যে সমিতি—তার আবার আইন-কানুন কি—ক্ষুধিতকে অন্নদান ছাড়া।

মানদা স্বামীর মুখে সব শুনে আর্তনাদ করে ওঠে—দুচোখে তার ধারা বয়ে যায়।—'তা হলে আমাদের করতে হবে কি শুনি? বাবুরা বুঝি চান, আমরা এখানে পেট কোলে করে বসে থাকি আর একটু একটু করে শুকিয়ে মরি! সমিতি, না সব ধাপ্পাবাজী। তবে যে বলে বেড়ান হয়, 'আর তোদের ভয় নেই—রোগে ভুগে বেহাল বেকার হলে আমরাই তোদের বাঁচিয়ে তুলব'—সব বাবুদের চালাকী!—যাক্, মজুরদের না একটা সভা আছে, কালই তুমি সেখানে গিয়ে শেষ দেখা দেখে এস।'

—আরে না, মানু তুমি বুঝছ না, সেখানে গেলেই তারা বলবে ধর্মঘট করতে—আর সত্যাগ্রহ করতে—ধন্না দিতে যেন অপর কেউ না ঢুকতে পারে কারখানায়......সে সব আমার বরদাস্ত হয় না, জানই ত।

—তা পারবে না, তবে করবে কি? উপোস করতে পারবে খুব!

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে আসে। দুবার ঢোক গিলে উদ্গত তপ্ত শ্বাসটাকে দাবিয়ে আবার নিতাই বলতে থাকে ধীরে ধীরে—

আমি যে ধর্মঘট করতে পারি নে—ধন্না দিতে পারি নে, এ ত নতুন কথা নয়। তুমি ত জান মানু ওসব আমার মেজাজে খাপ খায় না। কেন জানি নে আমার উপায় নেই ওপথে পা বাড়াবার।........এও সেই মামুলী পুরাতন কথা।

মানদার নারীপ্রাণে কোথায় যেন কোন্ কোমল তন্ত্রীতে আঘাত লাগে। সে দ্রুতপদে এগিয়ে আসে, তারপর প্রসারিত দুই বাহুর বন্ধনে স্বামীকে নিবিড় করে চেপে ধরে বুকে—মাতা যেমন আপন সন্তানকে আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বসিত দরদের টানে। সান্ত্বনার সুরে মানদা ফুঁপিয়ে ওঠে—"আমি কি জানি নে, সবই জানি, সবই বুঝি—নিরীহ গোবেচারী স্বামী আমার তুচ্ছ একটা পিঁপড়েকে অবধি ঘা দিতে পারে না....... সে কথা আমার চেয়ে বেশী আবার জানে কে!........কিন্তু এ কঠোর দুনিয়ায় গোবেচারীর কোন স্থান নেই—কদর নেই। আচ্ছা আচ্ছা, কাল আমি নিজেই যাব।

—তুমি যাবে মানু! নিতাইয়ের বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না।

—যাব না ত কি! এখন কি আর লজ্জা-সরম করলে চলে। এ দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই—আমি পারব—তোমার এ কাজ নয়।

পত্নীর যুক্তির কাছে তাকে বাক্‌হত হয়েই থাকতে হয়। পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর শ্রদ্ধায় নিতাইয়ের চিত্ত পূর্ণ হয়ে যায়। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—মানদার হাতে উপায়হীনের মত নিজেকে সঁপে দিয়ে।

কিন্তু প্রকৃতই যখন শ্রমিক সঙ্ঘের লোকেরা নিতাই আর মানদাকে নিয়ে সমিতিতে সমিতিতে ঘুরে শেষটায় সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে দিলে, নিতাইয়ের মনের ভিতর তখনও খচ্ খচ্ করতে লাগল।

সে সাহায্যও প্রচুর নয় আদপেই—দু'বেলা দূরে থাক, তাতে এক বেলারও ভরপেট আহার জুটে উঠতে চাইত না। তার ওপর তৃপ্তির অভাব ত জড়িত ছিল তার অষ্ট-পৃষ্ঠে।

মানদা যেন তিন দিনেই বুড়িয়ে গেল একেবারে মুখে-চোখে; নিটোল দেহে তার রুক্ষতা জুড়ে বসল সর্বক্ষণ—হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গে শিথিল চর্মের ভাঁজ দেখা দিল—পাঁজরাগুলো, কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়ে এল। মানদার সে শীর্ণ মূর্তির দিকে আর নিতাই

তাকাতে পারে না। সকাল থেকে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত নিতাই মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে একটা কাজের জন্য—যে রকমেরই হোক একটা কাজ তার নিতান্তই পেতে হবে।

শত তালি দেওয়া ফতুয়াটিতে গা ঢেকে—ছেঁড়া ময়লা উড়ুনিখানা কাঁধে ফেলে নিতাই হাঁটে—হাঁটে—হাঁটে—শহরের রাস্তা ধরে। এক পয়সার—তুচ্ছ একটি পয়সার সোডা কি সাবানের অভাবে ধুতিখানি কাচা হয় নি—সে আজ মাস পেরুতে চল্‌ল। স্বপ্নাবিষ্টের মত—যেন অনুভূতিহীন অশরীরীর মত নিতাই চলে—চলে। একটা কাজ তাকে পেতে হবে।

তবু এতদিন সে চলেছে মাথা উঁচু করে—কিন্তু আর পারে না। ভিক্ষার অন্ন তার পেটে প্রবেশ করে যেন মগজটাকেও করে ফেলেছে হীন—এখন তার নিজেরই সন্দেহ হয়, নিতাই মিস্ত্রী বলে কোন একটা লোক ছিল কি না দুনিয়ায়। যে কারিগরী এই হাত দিয়ে রূপ দিত নিপুণতার সঙ্গে নগণ্য লোহার অঙ্গে—সে যেন স্বপ্নের মায়া। নিতাইয়ের আর বিশ্বাসই হয় না—সে-ই সেই মিস্ত্রী যাকে একদিন কারখানা-মালিক দক্ষিণ হস্ত বলে' দিত সম্মান—দিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

নাই—সে নিতাই নাই। তার দেহটা অধিকার করে বসে আছে নেহাৎই অকর্মণ্য একটা পিশাচ, যার শ্বাসে শ্বাসে অম্লান কুসুম মানদাও শুকিয়ে যাচ্ছে অকালে। নিতাই আক্ষেপে ফেটে পড়ে—কি অধিকার আছে তার মানদার জীবনটাকে নিয়ে এমন করে ছিনিমিনি খেল্‌বার। যে পারে না পত্নীকে জোগাতে দুটি ক্ষুধার অন্ন......যে পারে না চরম ধৈর্যশীলা প্রশান্ত দেবী মূর্তি মানদার ওষ্ঠপ্রান্তে তৃপ্তির ক্ষীণ রেখাটুকু ফুটাতে ....নিতাই আর ভাবতে পারে না।

শহরতলীর ছোট্ট খালটার সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে নীল জলের দিকে অপলকে। কি আশ্চর্য সেখানেও মানদার ম্লান মুখখানি যেন বিষাদের কালিমা ছড়ায়ে আঁখির ইঙ্গিতে কি বলে! কি পরিতাপ! বেচারী মানদা—তারই মানদা—তার সংসারে এসে শুধু নীলকন্ঠের মত বিষপাত্রই দু হাতে ধরে চুমুক দিলে! এর জন্যে দায়ী ত সে—নিতাই! নিশ্চয়ই নিতাই দায়ী এর জন্য। নিতাই তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে—নিষ্ঠুর নিতাই, অপদার্থ নিতাই—তার বাঁচবার আবার কি অধিকার থাক্‌তে পারে? কিছু না—কিছুমাত্র না।

রেলিং-য়ের গরাদে ধৃত তার মুষ্টি শিথিল হয়ে আসে—সারা দুনিয়া যেন তান্ডবে নৃত্য করে ফেরে আবর্তের পর আবর্ত তুলে—নিতাইয়ের পদতল থেকে ধরা-পৃষ্ঠ ক্রমশ রসাতলে ডুবে যায়—সেতুবক্ষ যেন কম্পমান তৃণের মত আর ভর সয় না নিতাইয়ের........

গেল, গেল, গেল—চীৎকার ওঠে চারি পাশ হতে। কে যেন বলে—হতভাগা ইচ্ছে করেই লাফিয়ে পড়েছে সেতুর উপর থেকে!

যখন ধরাধরি করে কর্দমাক্ত হাঁটু জল থেকে শবটি তুলে আনা হ'ল, পাহারাওলা বললে—ছেলে ছোকরা ত নয়, রীতিমত আধা বয়সী! না, খারাপ লোক বলে ত মনে হয় না। তবে এ কাজ কেন কর্‌লে কে জানে!

বৃদ্ধ একটি বল্‌লে—জান্‌তে হবে আবার কি—সেই পুরাতন ব্যাপার!

কিন্তু মানদা যদি জান্‌তে পেত নিতাইয়ের মুখের বিদায়-বার্তা, তা হলে তার ডুক্‌রে কান্না ছেড়ে সে হাহাকার করে উঠ্‌ত বুকফাটা আর্তনাদে।

"তুমি-আমি থেকে—সারা বিশ্ব থেকে সে আলাদা নয়, আমাদেরই একজন সে—আর এ ত নিত্যকার মূল্যহীন মৃত্যু-চিত্র। না—না, এ ঠিক তেমনই একটা মামুলী চিত্র নয়।"*

---

*Tom Dean রচিত ছোট গল্প—'One of these things'-য়ের ছায়া।

প্রত্যাবর্তন

শ্রীশশধর বিশ্বাস

দূর শহরের ধূম ও ধূলোয়
প্রাণ যে আমার ঝালাপালা,
তোর বুকে মা এলাম ফিরে
জুড়াতে মোর বুকের জ্বালা।
দোয়েল শ্যামার মধুর গানে
শান্তি দে আজ আমার প্রাণে,
মন যে আমার শ্রান্ত বড়
পরিয়ে দে বনফুলের মালা॥

গাঁয়ের শেষে সবুজ মাঠে
রাখাল ছেলে বাজায় বেণু।
তার সাথে আজ ফিরব আমি
লয়ে আমার শ্যামলী ধেনু
দীঘির জলে কমল দলে
মা তোর রাঙা চরণ দোলে,
কপালে মোর টিপ এঁকে দে
দিয়ে তোর ওই পায়ের রেণু॥

আপন ভোলা ওই যে যারা
খেল্‌ছে মা তোর ছেলের দলে,
ওদের সাথে খেল্‌তে দে মা
সুখে দুখে চোখের জলে।
ঘরের ধনে দু'পায় দলি'
গিয়েছিলাম তফাৎ চলি',
এবার আমার ভুল ভেঙেছে
ঠাঁই দে মা তোর পায়ের তলে॥

পুস্তক পরিচয়

রূপ রেখা—শ্রীবিনায়ক সান্যাল। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক। বাঙালী বুক ডিপো। ১৬নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা।

বিনায়কবাবু বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত নহেন। সুলেখক বলিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'রূপ রেখা' পড়িয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। নকল নবিশী, মক্স করা কবিত্ব নয়, তাঁহার লেখার সত্যকার কবিত্ব-রস আছে। ভাবের যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিলে ছন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৌন্দর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সুন্দরের লহর তুলিয়া এ লেখায় রসোপলব্ধির সে স্তরের অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়।

বিবি রহিমা (নারী সাহিত্য)—সেখ ফজলুল করিম প্রণীত। প্রকাশক মঈন উদ্দীন হোসেয়ন বি-এ, নূর লাইব্রেরী; ১২।১ সারপেণ্ট লেন, তালতলা, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

স্বর্গীয় গ্রন্থকার শেখ ফজলুল করিম সাহেব সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি একজন সুপণ্ডিত এবং সুলেখক। 'বিবি রহিমা'র বর্তমান সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ। সুতরাং পুস্তকখানা যে সমাজে সমাদৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিতেই পারা যায়। আমরা আগ্রহ সহকারে বইখানা পড়িয়াছি এবং প্রকৃতপক্ষেই পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। ওল্ড টেষ্টামেন্টের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানা লিখিত। পবিত্র দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র গ্রন্থকার সুনিপুণ লেখনীর সাহায্যে আঁকিয়াছেন, তাহা পাঠে চিত্ত উন্নত হয় এবং পবিত্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়। এমন জীবনকেই বলা হইয়াছে ভাগবত জীবন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, শৈব্যা এবং বিশেষভাবে শ্রীবৎস ও চিন্তার আলোচনার ভিতর দিয়া যে রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, হজরত আইউব এবং বিবি রহিমার মধ্যেও উদ্দীপ্ত হইয়াছে সেই আদর্শ; ভগবানে নিষ্ঠার ভাব এখানে যেন আরও তীব্র। সহজ সরল মনোজ্ঞ ভাষা। সাধারণ একটু লেখাপড়া যাঁহারা জানেন, এমন মেয়েরা সকলেই এই বই পড়িয়া তৃপ্তি বোধ করিবেন এবং একটা উজ্জ্বল আদর্শের ছাপ মনে পাইবেন। হিন্দু মুসলমান সকল পরিবারের মেয়েদেরই উপহারস্বরূপে দিবার যোগ্য বই। ছাপা এবং বাঁধাইও তদুপযোগী। সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধা এবং সোনার জলে মলাট লেখা বইখানা দেখিতে সুন্দর।

শেষ উত্তর—শ্রীশশধর দত্ত। মূল্য আড়াই টাকা। বাণীপীঠ, ৩৫।১নং বিবেকানন্দ রোড হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের মত—'নারীত্বের প্রথম উন্নয়ন সতীত্ব। অনন্তর চরম বা পরম উন্নয়নই হচ্ছে মাতৃত্ব'। গ্রন্থকার এই উপন্যাসখানির ভিতর দিয়া তাঁহার এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের মন শুধু কতকগুলি নীতির সূত্র নয়। সে মনের অনন্ত ব্যাপ্তিকে কোন দিনই ষোল আনা রকমে লোক-বিধির দ্বারা বাঁধিয়া ফেলা যায় না। বাঁধা পড়িয়াও অনেকখানি থাকে, এবং সেই যেটুকু থাকে—সেই রাগানুমার্গকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ বড় হয়। কবির ভাষায় তাঁহার হৃদয়-পদ্ম যুগে যুগে বিকশিত হইয়া উঠে। লেখক বিধির দিকটা দেখিয়াছেন; কিন্তু মানব মনের এই ব্যাপ্তির দিকে যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতাকে রস-রূপ দিতে পারেন নাই। ভাবের ব্যাপকতার দিক হইতে তাঁহার লেখার এই ত্রুটি থাকিলেও সে লেখার মধ্যে সরল সহজ একটা গতি আছে এবং সেই দিক হইতে উপন্যাসখানি আস্বাদ্য হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই ভাল। ৩৬৮ পৃষ্ঠায় উপন্যাসখানি সমাপ্ত হইয়াছে।

বঙ্কিম রত্ন—শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ প্রণীত। মূল্যে চারি আনা। ৬০নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত। এই পুস্তিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধ্য ও সাধনা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—দেশকেও ভক্তি করিতে হয়,—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

মাটির পুতুল—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত এবং নিউ বুক ষ্টল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই বইখানি কতকগুলি গল্পের সমষ্টি। লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গত দেড় বৎসরের মধ্যে যতগুলি গল্প লিখিয়াছি—নির্বিচারে সকলগুলিকেই এই পুস্তকে স্থান দিয়াছি।" গল্পগুলিকে পুস্তকে স্থান দিবার সময় বিচার-বুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া লেখক ভাল কাজ করেন নাই। দু'একটি গল্প ভাল লাগিয়াছে।

বাণীর দেউলে—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। ৪০|ডি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১১০। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানি কয়েকটি নিবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে বঙ্গ-বাণীর দশজন উৎকৃষ্ট পূজারীর অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। নিবন্ধগুলির নাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী মধুসূদন, দেশপ্রেমিক হেমচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, ছন্দোবিৎ সত্যেন্দ্রনাথ, কবিকুললক্ষ্মী মানকুমারী, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। সাহিত্য-রস ও কাব্য-সুধা পানেচ্ছু প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিবন্ধগুলি উপযোগী ও উপাদেয় হইবে। ছাপা, বাঁধাই উত্তম।

নরহরি চম্পূ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ পুরাণ বেদান্ত সাংখ্যতীর্থ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ৩১ চৌরিনিম, কাশীধাম। মূল্য ॥০ আট আনা।

গ্রন্থকার প্রহ্লাদ ও নৃসিংহ ভগবানের চরিত্র অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যময় কাব্য রচনা করিয়াছেন। বর্তমানে সংস্কৃত-সেবী পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ টীকা-টিপ্পনী ছাড়া সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিবার প্রয়াস প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু নরহরি চম্পূ রচয়িতার সে প্রয়াস সফল হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা যেমন সহজ ও সাবলীল তেমনি অলঙ্কার পূর্ণ, ইহা কাব্যামোদী শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতের মনোরম গ্রন্থ সন্দেহ নাই। গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজনীয়। মূলে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ সমন্বিত গ্রন্থখানি ভক্তজনেরও আদরণীয় হইবে।

বাঙ্গালীর সার্কাস—(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের মুখপত্র ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। লেখক—শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু। প্রকাশক—পাবলিসিটি ষ্টুডিও, ৩৬৭, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। পৃঃ ২৬০। মূল্য সাত সিকা।

কাব্য ও উপন্যাস ব্যতীতও আজকাল শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমাদের বাঙলা সাহিত্যের অনিবার্য গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। বর্তমান সমালোচ্য পুস্তকখানি তাহার একটি নিদর্শন। "বাঙ্গালীর সার্কাস" বইখানি সম্পূর্ণ অভিনব প্রকরণে বিরচিত। ইহার বিষয়-বস্তুও যেমন উপভোগ্য, ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীও তদ্রূপ মনোহারী। ইহা একাধারে ইতিহাস, জীবন-কথা, ভ্রমণ, এড্ভেঞ্চার, গল্প ও ব্যায়াম-শিক্ষা। বর্তমান সংস্করণ পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে পরিবর্ধিত।

অনেকের ধারণা যে, বঙ্গ-বিভাগের সময় হইতেই বুঝি আমাদের দেশে স্বদেশী সাধনার সূত্রপাত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বহু বৎসর পূর্ব হইতে আমাদের দেশে কিরূপে দেশাত্মবোধের প্রথম বিকাশ হয় ও তাহা উপলক্ষ করিয়া অন্যান্য নানা শুভানুষ্ঠানের সঙ্গে পাশ্চাত্য ব্যায়াম-চর্চাও কিরূপে আমাদের দেশে প্রসারলাভ করে ও তাহারই পরিণতি-স্বরূপ কিরূপে দেশে সার্কাস সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ব্যায়ামবীরগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বাঙালীর সাহস ও বীর্যের পরিচায়ক নানা ঘটনাবলী এবং চীন, জাপান, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের যে সকল বিচিত্র কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং স্থানে স্থানে উপন্যাস অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর।

বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সোহং স্বামী) সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অভ্রান্ত নহে; অনেক দিন হইতেই তাঁহার একটি নির্ভরযোগ্য জীবন-কথার একান্ত অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে। "বাঙ্গালীর সার্কাস-এর গ্রন্থকার শ্যামাকান্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে সে অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। বাঙালীমাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। পুস্তকখানিতে সর্বসমেত ৩১খানি সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে; ছাপা ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট। বইখানি যেমন বয়স্কদিগের তেমনি ছাত্রদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলন

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের প্রচার-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস এম-এ জানাইতেছেন:—

আগামী ৩০শে জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট কলিকাতার এলবার্ট হলে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। স্থির হইয়াছে যে, এই সম্মেলন গতানুগতিকতার পথে অনুষ্ঠিত না হইয়া নিজ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিবে। চারি দিন চারিটি অধিবেশনে যথাক্রমে কাব্য, গল্প ও সংবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং প্রস্তাবাবলী গঠিত বা উপস্থাপিত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বাঙলার লেখকগণের নিকট উচ্চাঙ্গের কবিতা ও গল্পের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছি। প্রথম দিনের অধিবেশনে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সাদর-সম্ভাষণ ও কাব্য শাখার সভাপতির অভিভাষণের পর উৎকৃষ্ট কবিতা এবং কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এতদ্দ্বারা বাঙলার কবি ও গল্প লেখকগণকে তাঁহাদের স্বরচিত অপ্রকাশিত পূর্ব্ব কবিতা ও গল্প এবং কবিতা বা গল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও উহার সারনিষ্কর্ষ অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নামে সমিতির কার্য্যালয়ে (৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা) পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা যাইতেছে। কবিতা ও গল্পের পরীক্ষক সঙ্ঘের নাম ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, ইঁহাদের বিচার ফল চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। যাঁহারা কবিতা ও গল্প পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক নিজ নিজ লেখা খামে উহা পাঠাইবেন এবং ঐ খাম বন্ধ করিয়া খামের বাম উপর্দুকোণে এই বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন:—(১) কবিতা বা গল্প প্রতিযোগিতা, (২) প্রেরিত কবিতা বা গল্পের সংখ্যা, (৩) প্রেরকের নাম, (৪) ঠিকানা, (৫) কবিতা বা গল্প অপ্রকাশিতপূর্ব্ব ও মৌলিক বলিয়া অঙ্গীকার।

কবিতা ও গল্পের আলোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—

যদি বাঙলার কবিতা বা গল্প আলোচিত হয়, তাহা হইলে উহার ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয়ের জন্য লেখক একটা সময় (অমুক খৃষ্টাব্দ হইতে অমুক খৃষ্টাব্দ) বাছিয়া লইবেন; ইউরোপ ও আমেরিকার কবিতা ও গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হইবে। অতিশয় দীর্ঘ প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না। গতানুগতিক মামুলি প্রবন্ধ অগ্রাহ্য হইবে। যে সকল প্রবন্ধে গবেষণা বা নূতন আলোচনা থাকিবে সেগুলিই বিবেচিত হইবে। আমরা শুধু ভাল কবিতা ও গল্পের জন্যই আবেদন করিতেছি না; কবিতা ও গল্পবিষয়ক আলোচনাও প্রার্থনা করিতেছি।

ইহা ছাড়া চতুর্থ দিনের অধিবেশনের জন্য আমরা বঙ্গ-ভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট হইতে প্রস্তাবাবলী আহ্বান করিতেছি। এই সকল প্রস্তাব বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারমূলক হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাব প্রতিনিধি বা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ভিন্ন অন্য কেহ পাঠাইতে পারিবেন না।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নূতন নাটক "সোনার বাংলা" অভিনীত হইতেছে। প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়।

সোনার বাংলা ঐতিহাসিক নাটক। নোয়াখালির অন্তর্গত ভুলুয়ার ভুইঞা লক্ষ্মণ মাণিক্যের হৃতরাজ্য উদ্ধারের কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। মহারাজা লক্ষ্মণমাণিক্য সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পাওয়া যায় তাহা যৎসামান্য। নাট্যকার এই যৎসামান্য তথ্যটুকু অবলম্বন করিয়া একটি সুন্দর নাটক রচনা করিয়াছেন। রাজা হইবার পূর্বে লক্ষ্মণমাণিক্যের নাম ছিল চন্দন। দেওয়ানের চক্রান্তে তিনি রাজ্যচ্যুত হন এবং দেওয়ান চন্দনের জ্ঞাতি-ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইয়া অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহার কিছুদিন পরে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চন্দন যখন রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য নাম লইয়া রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই সময় তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য দেওয়ান আরাকান রাজের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। এদিকে ভুলুয়ার পথে রঘুনাথ ভুল করিয়া চন্দনের মাথায় লাঠি মারে এবং চন্দন অজ্ঞান হইয়া নদীর জলে পড়িয়া যায়। অনুরাধা তাহাকে নদীর জল হইতে তুলিয়া সুস্থ করে, কিন্তু আঘাতের ফলে চন্দনের পূর্ব স্মৃতি লোপ পায়। অনুরাধা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। তারপর কি করিয়া চন্দনের পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসে, কি করিয়া সে হৃতরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হয় এবং তাহার প্রণয়িনী কুঙ্কুমের সহিত মিলিত হয় তাহা এই নাটকে দেখান হইয়াছে।

নাটকখানি এবং অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। ভূতপূর্ব মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতির একটি নিজস্ব ধারা আছে এবং সহস্র সহস্র দর্শক আছেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আলোচ্য নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সেই ধারা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ইহার মধ্য দিয়া উচ্চতর ও রুচিসম্মত রস পরিবেশনের চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রযোজক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের এই প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

চন্দনের ভূমিকায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিনয়ে ভূতপূর্ব মিনার্ভা থিয়েটারের ধারা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছেন। শক্তিশালী নট জীবন গাঙ্গুলী রঘুনাথের ভূমিকায় অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার রূপসজ্জা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। হাস্য-রসিক অভিনেতা শ্রীযুত রণজিৎ রায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-নৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। দেওয়ান কীর্তিধরের ভূমিকায় প্রফুল্ল দাস, মোসং-এর ভূমিকায় জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও রামানুজের ভূমিকায় বঙ্কিম দত্ত ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

স্ত্রী ভূমিকার মধ্যে কুঙ্কুমের ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি মিনার্ভা সম্প্রদায়ের অভিনয়ের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন। অনুরাধার ভূমিকায় শ্রীমতী লাইটের অভিনয় মন্দ হয় নাই। সাকিনার ভূমিকায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর অভিনয় সম্বন্ধেও সে কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীমতী লাইট অনেকগুলি গান গাহিয়াছেন। রণজিৎ রায়ের কবিগানটি আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি। দৃশ্যপট পরিকল্পনায় শ্রীযুত পরেশ বসু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

* * * * *

আগামী ৩০শে জুন রূপবাণী চিত্রগৃহে রাধা ফিল্মের নূতন ভক্তিমূলক ছবি, "নর-নারায়ণ" আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত যতীন দাস। বিভিন্ন ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, মৃণাল ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, রেণুকা, রাণীবালা, শীলা হালদার প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় কালী ফিল্মসের "চাণক্য" ছবির কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আর এক মাসের ছবিখানি সম্পূর্ণ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অবলম্বনে এই ছবি তোলা হইতেছে। শ্রীযুত শিশিরকুমার চাণক্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকায় নরেশ মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অহীন্দ্র চৌধুরী, কঙ্কাবতী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী, বীণা, শুক্তিধারা, সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী, গঙ্গা ঘোষাল প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

* * *

পরলোকে শ্রীমতী কঙ্কাবতী

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কঙ্কাবতী 'মেনিনজাইটিস' রোগে আক্রান্ত হইয়া গত বুধবার সকালে

কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ওয়াটার-পোলো লীগ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত বঙ্গীয় ওয়াটার পোলো লীগের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। এই বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় দুই বিভাগের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট সন্তরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এই দুই বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। কলিকাতার বিভিন্ন পার্ক-মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতিদিন এই সমস্ত খেলা দেখিবার জন্য দর্শকের ভীড়ের অভাব হইতেছে না। ওয়াটার পোলো খেলার জনপ্রিয়তা বাঙলা দেশে যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ এই সকল অবস্থা হইতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপিও আমরা বাঙলার ওয়াটার-পোলো খেলার ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। ক্রীড়া-কৌশলের উন্নতি অপেক্ষা নিয়মবিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন বিষয়ে খেলোয়াড়গণের কৃতিত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। নূতন খেলোয়াড়ের অভাব ও প্রবীণ খেলোয়াড়-গণের দ্বারা দল গঠন করার জন্যই খেলার পরিণাম এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। সন্তরণ মরসুমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে নিয়মিত শিক্ষাধীনে রাখিয়া প্রথম বিভাগীয় লীগে খেলিবার উপযুক্ত করিবার যে কোনই চেষ্টা হয় নাই, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমরা এই বিষয়ে সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কোনই ফল হয় নাই। পরিচালকগণ প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের এখনও পর্য্যন্ত বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, বাঙলার ওয়াটার-পোলো খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই উচ্চস্তরের এবং সেই স্তরে পৌঁছিতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাঁতারুগণের অনেক দেরী আছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাঁতারুগণ ওয়াটার-পোলো বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে, তাহা জানিবার মতও তাঁহাদের অবসর হয় নাই। কবে যে তাঁহাদের অবসর হইবে, তাহাও আমরা ভাবিয়া পাই না।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা ক্রীড়া-মোদিগণকে বিশেষভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে, ইহা দেখিবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতিদিনের লীগ খেলার ফলাফল এইজন্যই তাঁহাদের নিকট ভীষণ গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় আফিস হইতে আরম্ভ করিয়া চায়ের দোকান, বিঁড়ির দোকানে পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা কাহার আছে, ইহা লইয়া গভীর আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু আর দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই অস্থিরতা, এই মানসিক অশান্তি ক্রীড়ামোদিগণের মন হইতে অপসারিত হইবে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপেরও মীমাংসা হইয়া যাইবে।

খেলার ফলাফল সকল সময়ই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। সুতরাং লীগ খেলার শেষ ফলাফল কি হইবে, বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তবে বর্ত্তমান লীগ তালিকার ফলাফল দেখিয়া এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, মোহনবাগান দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলা দরকার যে, কালীঘাট ও মহমেডান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা আছে। ইষ্টবেঙ্গল ও রেঞ্জার্স দলের আশা একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। যেটুকুও সম্ভাবনা আছে, এই সপ্তাহের মধ্যেই তাহা বিলুপ্ত হইবে। এই দুইটি দলই রক্ষণভাগের দুর্বলতার অভাবের জন্য এইরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কালীঘাট দলের খেলার অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতি খেলাতেই এই দল প্রতিপক্ষ দলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতেছে। পর পর কয়েকটি খেলায় এইরূপ উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করায় অনেকেই এই দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু এই দলেরও ইষ্টবেঙ্গল, রেঞ্জার্স দলের ন্যায় রক্ষণভাগের শক্তি আক্রমণ-ভাগের তুলনায় অনেক কম। এই দলের পরিচালকগণ যদি এই বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি না করেন, তবে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ইহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

এরিয়ান্স ক্লাব খেলায় অনেক উন্নতি করিয়াছে। ক্যাল-কাটা দলেরও যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। সুতরাং এরিয়ান্স দল লীগতালিকার সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার যে করিবে না, তাহা একরূপ নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারা যায়।

নিম্নে এই পর্য্যন্ত লীগ খেলায় বিভিন্ন দল যেরূপ ফলাফল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

প্রথম ডিভিশন

		খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	পক্ষে	বি	পঃ
মোহনবাগান	...	১৬	১১	৪	১	২৫	৫	২৬
কালীঘাট	...	১৪	৮	৪	২	২৭	১১	২০
মহমেডান স্পোর্টিং	...	১৫	৮	৪	৩	২৬	১৩	২০
রেঞ্জার্স	...	১৫	৯	১	৫	২৪	১৩	১৯
ইষ্টবেঙ্গল	...	১৫	৬	৬	৩	১৭	৮	১৮
কাষ্টমস্	...	১৫	৫	৫	৫	১৫	১৬	১৫
ই বি আর	...	১৪	৬	৩	৫	১৯	১৮	১৫
ভবানীপুর	...	১৫	৫	৩	৭	১৫	২১	১৩
ক্যামেরোনিয়ান্স	...	১৬	৪	৫	৭	১১	২২	১৩
এরিয়ান্স	...	১৫	৫	২	৮	১৫	২৩	১২
পুলিশ	...	১৬	৩	৪	৯	১২	২৯	১০
বর্ডার রেজিমেণ্ট	...	১৬	৩	৩	১০	১৬	৩১	৯
ক্যালকাটা	...	১৬	১	৬	৯	১৭	২৯	[illegible]

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৩ই জুন—

বেঙ্গল লেবার পার্টির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জি এম-এল-এ, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ মুজফ্ফর আমেদ এবং অন্যান্য বহু সদস্য রাজনৈতিক মতানৈক্যের দরুণ বেঙ্গল লেবার পার্টির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

গত ৮ই জুন হইতে বর্ধমান ক্যানেল আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ৯ জন রাজনৈতিক বন্দী বর্ধমান জেলে পুনরায় অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দাবী নিম্নরূপঃ— (১) রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে গণ্য হওয়া, (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সুবিধা লাভ।

বর্ধমানের কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুত ধনঞ্জয় চৌধুরী এবং মহাদেব ভট্টাচার্য দামোদর ক্যানেল অঞ্চলে প্রচারকার্য করিতে গিয়া গত মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হন। নিম্ন আদালতের বিচারে ধনঞ্জয়বাবুর তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা জরিমানা এবং মহাদেববাবুর একশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীলের বিচারে উভয়েই মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গয়া জেলে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত লইয়া যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে ৪ জন ছাত্রকে সাসপেণ্ড করিয়া রাখা হইয়াছে এবং ১৫০ জন ছাত্রকে জরিমানা করা হইয়াছে।

হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর ও তেলিনীপাড়ার জুট মিলের ধর্মঘটকারী শ্রমিকরা তাহাদের দাবী মঞ্জুর হওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশে পণপ্রথা-নিরোধ আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে বিবাহে কোনরূপ অর্থের আদান-প্রদান চলিবে না। যদি কোন পিতামাতা তাহার কন্যাকে কিছু অর্থ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিবাহের ৬ মাস পূর্বে বা বিবাহের দুই বৎসর পরে তাহা দিতে পারিবেন। যদি পঞ্চায়েৎ কর্তৃক বিবাহের ফর্দ করা হয়, তাহা হইলে বিবাহের অলঙ্কার, উপহার, বস্ত্রাদি লইয়া দেয় ৫০০, টাকার উপরে যাইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ফর্দ রচিত হইলে তাহা ২০০, টাকা মধ্যে ঢুকাইবার আদেশ দেওয়া হইবে। এই আইন অনুসারে যাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইবে, তাহারা একমাস কারাদণ্ডে বা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। এই বিল পাশ হওয়ায় সিন্ধুর জনসাধারণ আনন্দিত হইয়াছে।

সক্করে সিন্ধু প্রাদেশিক অরহর সম্মেলনের তিন দিন ব্যাপী প্রথম অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ আতাউল্লা খাঁ বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলিম লীগওয়ালাদের বৃটিশ সরকারের মুখাপেক্ষী অনুচর বলিয়া অভিহিত করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের সহিত যোগ দিতে অনুরোধ করেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে একটিতে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিলে, আগামী যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে কোনরূপ সাহায্য না করিতে মুসলমানদের অনুরোধ করা হইয়াছে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত টি জে কেদার নাগপুরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে "ফরোয়ার্ড ব্লক" গঠনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন।

১৪ই জুন—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, গান্ধীজী উক্ত পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ দিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে গান্ধীজী বলিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ললিত দাস বন্দীদের মুক্তির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার বেশী কিছু করা অসম্ভব হওয়ায় এবং সহকর্মিগণ ও গবর্ণমেণ্টের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তাঁহারা যে বন্দিমুক্তি পরামর্শদাতা সমিতির সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা আক্ষেপের বিষয়। বস্তুত পদত্যাগ ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না।" গান্ধীজীর মতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়াই উচিত ছিল। যে সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে দেশের শান্তি ও শৃংখলা বিপন্ন হয় নাই। বন্দীরা যখন অহিংসায় আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন উহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সমস্ত বন্দীর মুক্তি দান গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য ছিল।

গান্ধীজী আশা করেন যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাসকে পুনরায় উক্ত কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করিবার আহ্বান করিয়া বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন।

বাঙলা সরকার শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সিংহ প্রণীত "ইন আণ্ডামানস দি ইণ্ডিয়ান বেষ্টাইল" নামক পুস্তক এবং গত ২১শে মে তারিখের বোম্বাইয়ের "ন্যাশনাল ফ্রণ্ট" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ১৫শ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টার মিডিয়েট ও ফাইন্যাল ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তিদান সম্পর্কে বাঙলা সরকার এক নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই নূতন পরিকল্পনায় বৃত্তির টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং বৃত্তিভোগী কোন ছাত্রকে কোন কলেজেই বেতন দিতে হইবে না।

জাপানীরা তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা অবরোধ করিয়াছে। বৃটিশ এলাকায় যাইবার দুইটি রাস্তা ব্যতীত অন্য সমস্ত রাস্তা অবরোধ করিয়া সমগ্র জাপানী সৈন্য পাহারা দিতেছে। যে দুইটি রাস্তা অবরোধ করা হয় নাই, তাহার একটি রাস্তা শুধু ঐ এলাকায় যাওয়ার জন্য এবং অপরটি ঐ এলাকার বাহিরে আসার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। জাপান কর্তৃপক্ষ হাই নদীর (তিয়েনৎসিন এই নদীর তীরে অবস্থিত) এলাকায় সামরিক আইন জারী করিয়া সর্বপ্রকার নৌযান চলাচল সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

১৫ই জুন—

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস শাসিত আটটি প্রদেশকেই ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশ ডোমিনিয়ন এবং উপনিবেশসমূহে বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিংহলে যেরূপ আচরণ করা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

কমন্স সভায় মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিদেশে প্রচারকার্যের জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের

অধীনে একটি প্রচার বিভাগ খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। লর্ড পার্থের নির্দেশানুযায়ী এই প্রচার বিভাগ পরিচালিত হইবে।

'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানী উত্তর শ্লোভাকিয়ার পোলিশ সীমান্তে আড়াই লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছে। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নাৎসীরা এক্ষণে শ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইবে বলিয়া চেকরা আশঙ্কা করিতেছে।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, তিয়েনৎসিনে বৃটিশ এলাকা অবরোধ সম্পর্কে জাপ সরকার আরও অধিকতর কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টোকিওর আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তর চীনের জাপ কর্তৃপক্ষ চিয়াং-কাই-সেকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও জাপ বিরোধী মনোভাব বৃটেন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন না করা পর্যন্ত তিয়েনৎসিনের বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধ করিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৬ই জুন—

দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্ত-নামার সংশোধিত খসড়া অগ্রাহ্য করা সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেন,—"ঘটনাসমূহ যেরূপ আছে, সেইরূপ থাকিতে দিলে যুক্তরাষ্ট্র মৃত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"

লাহোরে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। ছাত্রগণের ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে মানপত্র দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বসু নিখিল ভারত র‍্যাডিক্যাল যুব সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

ময়মনসিংহের একটি ছাপাখানার নিকট হইতে জামীন তলব করা হইয়াছে।

মণিপুর রাজ্যের স্বর্গীয় মহারাজা কুলচন্দ্রধ্বজ বাহাদুরের পুত্র মহারাজকুমার টিকেন্দ্রধ্বজ সিংহ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন।

ইটালী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইটালীর নৌবাহিনী শীঘ্রই স্পেন, পর্ত্তুগাল ও মরক্কোর দরিয়ায় মহড়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান সরকারও ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুর্গাদি-সুরক্ষিত পশ্চিম সীমান্তে শীঘ্রই জার্ম্মান সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হইবে।

হের হিটলার রাইখ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন

জাপানীরা তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা অবরোধে অধিকতর কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। অবরুদ্ধ অঞ্চলে চীনা শ্রমিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যারিকেডের নিকট গুলী বর্ষণের ফলে দুইজন চীনা নিহত হইয়াছে।

"ফেনিক্স" নামক একটি ফরাসী সাবমেরিন গতকল্য সমুদ্রে ডুব দিয়াছিল; কিন্তু এ পর্যন্ত আর উহা উপরে ভাসিয়া উঠে নাই। কয়েকটি ফরাসী ক্রুজার ও "সী প্লেন" কর্ত্তৃক উক্ত সাবমেরিনের অনুসন্ধান ব্যর্থ হইয়াছে। "ফেনিক্স" সাবমেরিনে ৪ জন অফিসার এবং ৬৭ জন লোক ছিল।

১৭ই জুন—

মেটিয়াবুরুজ থানার অন্তর্গত বদরতলায় 'কালীপূজা' উপলক্ষে একদল মুসলমান ও ধাঙ্গড়দের মধ্যে এক ছোট-খাট দাঙ্গার ফলে একজন মেথর সর্দ্দার নিহত হইয়াছে এবং একটি ঝাড়ুদার স্ত্রীলোক জখম হইয়াছে।

গতকল্য ও অদ্য গৌহাটিতে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। এই সভায় 'লাইন-প্রথা' সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি 'লাইন-প্রথা' তদন্তের জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটির রিপোর্ট সামান্য অদল-বদল করিয়া, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ব্রহ্মে ভারতীয় শ্রমিক আমদানীর অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এক কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষিত হইয়াছে।

তিয়েনৎসিনের ব্যাপারে জার্ম্মানী জাপানকে সমর্থন করিয়াছে।

জাপান কি সর্ত্তে বৃটিশ এলাকার অবরোধ উঠাইয়া লইতে পারে, ডোমেই এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রেরিত তিয়েনৎসিনের এক খবরে তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। সর্ত্তগুলি হইতেছে এই,—(১) বৃটিশ এলাকায় জাপ বিরোধী সন্ত্রাসবাদ দমনের নিমিত্ত ইঙ্গ-জাপানী তদন্ত; (২) উত্তর চীনে বৃটেনের 'অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপে'র বিরতি; (৩) বৃটিশ এলাকায় চীনা ব্যাঙ্কে যে ৫ কোটি ডলার মূল্যের রৌপ্য আছে, তাহা জাপানের হাতে অর্পণ। প্রকাশ, যতদিন না বৃটেন জাপানের এই সর্ত্ত মানিয়া লইতেছে, ততদিন পর্যন্ত জাপ কর্তৃপক্ষ তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকার অবরোধ উঠাইয়া লইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

তিয়েনৎসিনের জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বৃটিশ এলাকার কর্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সাক্ষাতের সর্বপ্রকার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারতস্থ আফগান কনসাল জেনারেল সর্দার সালাউদ্দীন খাঁ পেশোয়ারে সং[illegible] প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ভারত [illegible] [illegible]নিস্থান অতি নিকট প্রতিবাসী। উভয় জাতিরই একই সং[illegible] [illegible]ত্রে একই রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ এবং একই আর্য জাতি হ[illegible] উদ্ভূত। উভয় জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য এই বুঝাপড়ার আবশ্যক আছে।

১৮ই জুন

ঝাঁসির নিকটবর্ত্তী রাধাপুর হইতে এক সশস্ত্র ডাকাতি ও ডাকাতদলের নৃশংস অত্যাচারের খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ একদল সশস্ত্র ডাকাত এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দিয়া ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া চম্পট দেয়। বাড়ীর লোকজন ডাকাতদলকে বাধা দিলে তাহারা গুলী চালায় এবং তাহার ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। অতঃপর তাহারা এক বৃদ্ধার শরীরে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। প্রকাশ, বৃদ্ধা বাক্সের চাবি দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ইন্দোরের একটি যুবক পত্নীর ভালবাসা ফিরিয়া পাইবার জন্য আমরণ অনশন অবলম্বন করিয়াছে। যুবকটি তাহার শাশুড়ীর বাড়ীর দরজার সম্মুখে শায়িত আছে।

দামোদর ক্যানেল-কর সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দণ্ডিত ৯জন বন্দী বর্ধমান জেলে রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া গণ্য হইবার দাবী করিয়া অনশন অবলম্বন করেন। গতকল্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট জেলের মধ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত জেল-বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিচার শেষ করিয়াছেন। ছয়জন অনশন ত্যাগ করিয়া জেল-বিধি পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনজনকে ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্বের মেয়াদ শেষ হইলে এই নূতন দণ্ডাদেশ ভোগ করিতে হইবে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট এক সার্কুলার-পত্র প্রেরণ করিয়া এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, মতদ্বৈধ ঘটিলে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয়সমূহে যেন "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি আবৃত্তি করা বাধ্যতামূলক করা না হয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পেশোয়ারে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেবের ২৬ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ জন খাঁ সাহেব টাইফয়েড রোগে মারা গিয়াছেন। মিঃ জন খাঁ সাহেবের শ্বেতাঙ্গিনীর পুত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি'র একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পরীক্ষা করার জন্য ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার ও স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ ডব্লিউ এস আরকুহার্টকে পারিশ্রমিক স্বরূপ ৫ পাউণ্ড ৮ শিলিং ও ১১ পেন্সের যে ড্রাফট [illegible] পাঠাইয়া, তাহা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে [illegible] দিয়াছেন এবং আসামে যেসব দর্শন বিষ [illegible] বা বন্যা বিষয়ে অর্থসাহায্যকারী সমিতিসমূহকে [illegible] দেওয়ায় উক্ত অর্থ দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ আরকুহার্টের বদান্যতার [illegible] করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[illegible]-বিরোধী রাশিয়ানরা চিয়েনশিনস্থিত সোভিয়েট [illegible] বলিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট জাপানের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

১৯শে জুন

কমন্স সভায় সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি দিতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলেন যে, তিয়েনসিন গোলযোগের মীমাংসা সম্ভবপর হইবে বলিয়া তিনি এখনও আশা করেন। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়-বিশ্বাস এই যে, বর্তমান সমস্যার জটিলতা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাট মতভেদের সৃষ্টি করা জাপ-সরকারও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন না।

তিয়েনসিনে জাপ অবরোধ আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। হাই-নদীপথে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাপানীদের হস্তে ইংরেজ নরনারীরা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। দুইজন ইংরেজ জাপ কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে রেস দেখিতে গিয়া অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়। প্রথমক্ষেত্রে এক ইংরেজ ভদ্রলোককে উলঙ্গ করিয়া তল্লাস করা হয় এবং অপরক্ষেত্রে এক চীনা পুলিশ জাপানী রক্ষীর উপস্থিতিতে এক ইংরেজ মেয়ের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে এবং তাহাকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ দেয়।

কানপুরে রথযাত্রা উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে এক ভীষণ দাঙ্গার ফলে তিনজন লোক মারা গিয়াছে এবং ৩৬জন আহত হইয়াছে।

গঙ্গায় স্নান করিবার কালে জলে ডুবিয়া দুইটি বালকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। বালক দুইটি সহোদর ভাই। প্রকাশ যে, দুইটি ভাই রাঁচি হইতে কলিকাতায় মামার বাড়ীতে বেড়াইতে আসে। উহাদের পিতা শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র পাটাদার, রাঁচির বিশিষ্ট উকিল।

কলিকাতায় এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মিউনিকের সিকিম হিমালয় অভিযাত্রীদল এই সর্বপ্রথম "টেণ্টশুংগো" আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার উচ্চতা ২৩ হাজার ফুট। সুবিখ্যাত তিনজন পর্বত অভিযাত্রী হের আর্ণেষ্ট গ্রোব, হের লাডউইগ স্ক্যামাভারার ও হের হুবার্ট পট্টাবাকে লইয়া এই অভিযাত্রী দল গঠিত।

করাচীতে কুমারী দেবী চাঁদমল ভাটিয়া নাম্নী ষষ্ঠমানের একটি ছাত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, আগামীকল্য তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু বর বৃদ্ধ এবং পূর্বে আরও তিনবার বিবাহ করিয়াছে, সেজন্য সে তাহাকে বিবাহ করিতে আপত্তি করে এবং এই অনভিপ্রেত বিবাহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করে।

কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ রামগড় কংগ্রেসের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর বিহার সফর সমাপ্ত করিয়া পাটনা প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশবাসীকে দুই মুঠা অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, ইহা সত্য; কিন্তু পাকা পথ বাহির করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলায় মোসলেম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মোহে যাঁহারা মশগুল হইয়া আছেন, বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষকদের জন্য বেদনা তাঁহাদের বুকে কি পরিমাণ বাজিতেছে, এই সংকটে দেশের লোকের মধ্যে সে সম্বন্ধে চেতনা জাগুক।

আমরা কি প্রস্তুত ?—

সহযোগী 'রাষ্ট্রবাণী' নৈষ্ঠিক গান্ধী-পন্থী। ২৯শে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় সহযোগী লিখিয়াছেন—"গত আইন অমান্যের সময় আমরা ব্রিটিশের শাস্তি দেওয়ার শক্তির নিকট হার মানিয়াছি। গান্ধীজীকে আইন অমান্য ক্ষান্ত দিতে হয়, কেননা, লোকের দুর্ব্বলতার জন্য আর লড়াই করা চলে না। এখন যদি ব্রিটিশ শক্তিকে বাগে পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ আরম্ভ করা যায়, তবে ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার উত্তর দ্রুত, নির্ম্মম ও চূড়ান্তভাবে আসিবে। লোকে কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? তাহার পরিচয় কোথায়? যাঁহারা আজ সাক্ষাৎ সংঘর্ষের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা কংগ্রেসের বহুনিন্দিত হাইকমাণ্ডের আইনানুগ মনোবৃত্তির দোষ দেখেন, তাঁহারাই বলুন যে কি পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে চান যে, লোকে প্রস্তুত আছে? সেই পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখুন এবং বলুন যে, লোকে প্রস্তুত। সশস্ত্র যুদ্ধে এক এক দেশ তাহাদের অস্ত্র-সজ্জার বিরাট বহর দেখাইয়া পরিচয় দেয় যে, তাহারা প্রস্তুত। আমাদের ত অহিংস যুদ্ধ-সজ্জার পরিচয় দিতে হইবে। কংগ্রেসী নির্দ্দেশ অনুসারে বারডোলী একবার তৈয়ার করা হইয়াছিল, তবুও দেশের সুর তাহার সহিত মিলে নাই। যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। আজ ত সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিদ্বেষে আমরা যে প্রস্তুত নই, তাহারই পরিচয় দেয়।"

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সাধনা করিবেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়াই লইতে হয় যে, প্রতিপক্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সব সময়ই চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে। কোন সময়ই কসুর করিবে না, সুতরাং এখন যদি ব্রিটিশ শক্তিকে বাগে পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ আরম্ভ করা যায়, তবে শুধু এই ক্ষেত্রেই উত্তরটা দ্রুত, নির্ম্মম ও চূড়ান্তভাবে আসিবে,—এমন ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিবার মূলে স্বাধীনতার সত্যকার উপাসকদের দিক হইতে কোন যুক্তি নাই। পুরাপুরি একটা জাতি আত্মাহুতির জন্য কোন দেশে এবং কোন সময়েই প্রস্তুত থাকে না। এক দল লোকই আগাইয়া যায় এবং তাহাদের সংখ্যা যতই সামান্য হউক না কেন, আদর্শ-নিষ্ঠার উগ্রতার শক্তির দ্বারা, ত্যাগের শক্তির দ্বারা তাহারা জাতির মুক্তির পথকে প্রশস্ত করিয়া চলে। প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শ-নিষ্ঠার মধ্যে যে তৃপ্তি, আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবার মধ্যে যে আনন্দ, এ ক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান অবলম্বন সেই জিনিষই; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সিদ্ধি সেখানে অবলম্বন থাকে না। এই আদর্শ-নিষ্ঠাই হইল প্রধান কথা। আইনানুগ নীতির মারাত্মকতা পরাধীন জাতির পক্ষে এই যে, ইহা আদর্শকে বিমলিন করে, লোকে উদার আদর্শের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণাকে হারাইয়া ক্রমেই কার্পণ্যদুষ্ট দৃষ্টি হইয়া পড়ে; দাঁড়ায় সুবিধাবাদী। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির চেয়ে এই নীতি দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে অধিক মারাত্মক। কারণ, সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি যতই দ্রুত, নির্ম্মম এবং চূড়ান্ত হউক না কেন, তাহার আঘাত বাহিরে; আর দেশবাসীর পক্ষ হইতে নিয়মতান্ত্রিকতার অনুরাগের আঘাত কাজ করে দেশের অন্তরে—দেশের আত্মায়।

গান্ধীজীর শক্তি—

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সম্প্রতি লণ্ডন শহরে গান্ধীজীর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি মহাত্মাজীর চরিত্র এবং তাঁহার নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি এই বক্তৃতার উপসংহার ভাগে বলেন,—"বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার লইয়া কাজ করিবার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সব চেয়ে বড় চেষ্টা যদি কেহ করিয়া থাকেন—করিয়াছেন গান্ধীজী। আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠায় অধীর এবং ব্যগ্র ভারত এবং একগুঁয়ে ব্রিটিশ জাতির ভিতর মধ্যস্থ স্বরূপে তিনি কার্য্য করিয়াছেন।" স্যার সর্ব্বপল্লীর উক্তি ষোল আনা সত্য এবং এই যে মধ্যস্থতার নীতি যাহার মূলে রহিয়াছে সদা সর্ব্বদা একটা আপোষের ভাব; গান্ধীজীর নীতির বাহ্যরূপ যতই রুদ্র হউক না কেন, এইভাবটি সব সময়ই তাঁহার ভিতর ছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণা করেন নাই, তাহাদের মনের গতি ফিরাইবার চেষ্টাই করিয়াছেন; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি? পরিবর্ত্তিত হয় নাই—তাহার জন্য হয়ত আরও বেশী মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতা পাইতে হইলেই তাহার মূল্য দিতে হয় এবং সে মূল্য হইল উগ্র রকমের আদর্শনিষ্ঠা, অন্য কথায় প্রাণপাতী সঙ্কল্পশীলতা। কংগ্রেস যে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার মূলে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ প্রভাব অবশ্যই যে আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু একথাও সত্য যে, শাসন-সংস্কার লইয়া কাজ করার যে দিকটা স্যার সর্ব্বপল্লী দেখিয়াছেন, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ স্বীকার করেন নাই সে দিক হইতে। শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার সুস্পষ্ট এবং স্বীকৃত উদ্দেশ্য লইয়া গান্ধীপ্রভাবিত কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এবং দেশ এই আশা করে যে, গান্ধীজী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সেই মূলীভূত উদ্দেশ্যটিকে সিদ্ধ করিবার সাধনায় দেশকে পরিচালিত করিবেন। বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মূল নীতির সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটিবে, কংগ্রেসের আদর্শ যে ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ, সেই আদর্শ শাসনতন্ত্র পরিচালনারূপ মেকী কর্ত্তৃত্বের মোহে যাহাতে বিমলিন না হয় সেদিকে দৃঢ়তা একান্তই আবশ্যক। হয় মডারেটী নীতিতে পতন নতুবা আদর্শ সাধনার জন্য জীবন-মরণ সঙ্কল্প লইয়া সংগ্রাম; দেশ

আজ এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজিকার ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা দেশের সুদীর্ঘ দাসত্বকে দৃঢ় করিবে ইহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমানের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করিবার নীতিটির বাহ্যরূপ যতই শান্তিপূর্ণ এবং নির্ব্বিবাদ হউক না কেন, তাহার ভিতর যে নিস্তেজতা রহিয়াছে—রহিয়াছে যে আদর্শহীনতা, রহিয়াছে যে মিথ্যাচার, জাগ্রত মনে-প্রাণে তাহাকে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না। গান্ধীজীর আনুগত্যের দোহাই দিয়া দক্ষিণপন্থী দল দেশের মনোবুদ্ধির বিকার ঘটাইয়া এইটিই মানাইতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের হিসাবী বুদ্ধি শান্তির যে রূপটি দেখিতেছে তাহার মূলে নাই সেই অকুতোভয়তা, যে অকুতোভয়তা গান্ধীজীর রাজনীতিক ও অধ্যাত্ম সাধনার মূলে শক্তি স্বরূপেই।

— —

কংগ্রেস শুদ্ধির কায়দা—

কংগ্রেস হইতে দুর্নীতি দূর করিবার যে সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই সাব-কমিটির সব সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি গত সপ্তাহে কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং আমাদের মতের কথাটিও জানাইয়া দিয়াছি। দুর্নীতি যদি বাস্তবিকই দূর করা হয় বা করিতে চেষ্টা হয়, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু দুর্নীতি দূর করিবার নামে কংগ্রেসকে একটা জোটবাঁধা দল বিশেষের কব্জার মধ্যে লইবার চক্রান্ত আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না এবং আমরা এ কথাটাও খুলিয়া বলিয়াছি যে, দুর্নীতি দূর করিবার নামে তেমন একটা মতলব লইয়া কাজ যে চলিতেছে এ ধারণা দেশের লোকের বিশেষ রকমেই হইয়াছে। সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং আচার্য্য নরেন্দ্র দেব সাব-কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই ধারণা আরও সুদৃঢ় হইবে। সাব-কমিটি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে,—"যাহারা কোন সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাঁহারা কোন কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন,—"এই ধারণার আশ্রয়ে অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে।" অর্থাৎ এই ব্যবস্থা খাটাইয়া কিষাণ সভা, সমাজতন্ত্রী দল, শ্রমিক সমিতি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যকেই কংগ্রেস হইতে বিতাড়ন করা চলিতে পারে। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বলেন,—"ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটির হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা নিজেদের মর্জ্জিমত কংগ্রেসের ভিতরে শ্রেণীগত ও রাজনীতিক দল গঠন অবৈধ ঘোষণা করিতে পারিবেন। এই সংশোধিত ধারা অনুসারে যদি শ্রেণীগত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তবে তাহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। ইহাতে যে কেবল কংগ্রেসের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, ইহার ফলে কংগ্রেস অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানেরও সহানুভূতি হারাইবে।" কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয় নাই, অর্থাৎ মতের স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে; ওয়ার্কিং কমিটির এই যে নীতি বলা বাহুল্য, উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে সে নীতির প্রকৃত মর্য্যাদা থাকে না এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের মতানুগভাবে কংগ্রেসের শক্তির অভিব্যক্তিকেও অস্বীকার করা হয়। কংগ্রেস হইয়া পড়ে একটা দলেরই জোট এবং দক্ষিণীপন্থী বল্লভাচারী দলের মতলব হইল তাহাই। অনেক দিন হইতেই তাঁহারা এই মতলব লইয়া চলিতেছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের এই মূর্ত্তি প্রকট হইয়া ক্রমেই অকৃত্রিম অহিংস নিষ্ঠার নামে কংগ্রেসী নীতিকে মডারেটী রাজনীতির খাতে নামাইয়া ফেলিতেছে। রাষ্ট্রীয় সাধনায় উন্মুখ নব জাগ্রত শক্তি এই নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিবে না—ফলে কংগ্রেস শক্তির উৎস হইতে ছিন্ন হইবে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিকে এই সত্যটিকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে—ভাবিতে হইবে অন্ধ-ভক্তি সংস্কারাচ্ছন্ন মনস্তত্ত্বের উদ্ধে উঠিয়া নতুবা কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যার পথই প্রশস্ত হইবে।

— —

দ্বিতীয় মিউনিক—

রুশিয়ার সঙ্গে ইংরেজের আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। রুশিয়ার বিটিশ রাজদূত স্যার এরিক সিডসকে পরামর্শ দিবার জন্য বিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে মিঃ উইলিয়াম ষ্ট্রাং মস্কোতে গিয়াছেন। এই আলোচনার ফল যে বিশেষ কিছু হইবে, এরূপ মনে হয় না; কারণ, কি ইংরেজ, কি রুশিয়া, কোন পক্ষেরই কাহারও উপর আস্থা নাই; শুধু কে কতটা সেয়ানা, ইহার পরীক্ষা চলিতেছে; সুতরাং ঐ দিক হইতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, আছে অন্য দিকে। জেম্মান রাইখ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাক্তার সাখ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে কলম্বিয়া শহরে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমরা আমাদের উপনিবেশগুলি ফিরিয়া পাইবই।" গত ১২ই জুন পার্লামেণ্টে লর্ড সভায় উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল; কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ হইতে সুস্পষ্টভাবে কোন কথা উত্তরে বলা হয় নাই। কিন্তু বার্মিংহামের বক্তৃতাতে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানী যদি শান্তিপূর্ণভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে গ্রেট ব্রিটেন তাহার সহযোগিতা করিতে সব সময়ই প্রস্তুত আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, রুশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় সাফল্য যতটা হউক না হউক—মিউনিকের চুক্তিতে যেমন জার্ম্মানীর দাবী ইংরেজ মানিয়া লইয়াছে, উপনিবেশ সম্পর্কেও জার্ম্মানীর দাবী হয়তো তাহাকে সেইভাবেই মানিয়া লইতে হইবে। লর্ড হ্যামস্ওয়ার্থ লর্ড সভায় জার্ম্মানীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "জার্ম্মানেরা বড়ই ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোক বড়ই হিটলার। জার্ম্মানেরা এ পর্য্যন্ত কোথায়ও কোন রকমে ইংরেজের স্বার্থে হাত দেয় নাই।" আপাতত বাহিরের লোককে এইভাবে বুঝ দেওয়া ছাড়া ইংরেজের আর কোন উপায় নাই। জার্ম্মানী যেভাবে চলিয়াছে, তাহাতে ইংরেজের স্বার্থে আঘাত দেওয়া তাহার নিজের স্বার্থের

জন্য যখন দরকার হইবে, তখন সে যে তাহা ছাড়িবে না এবং সে ক্ষমতা সে অর্জ্জন করিয়া লইতেছে, এই চিন্তায়ই ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদের মনের কোণে আতঙ্ক জমিয়া উঠিতেছে দস্তুরমতই; কিন্তু কিল খাইয়া কিল চুরি করাও সময় বিশেষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইয়া থাকে।

সরাকরী চাকুরীর বাঁটোয়ারা—

সরকারী চাকুরীর বাঁটোয়ারার সম্বন্ধে বাঙলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে এই যে, যে সব বিভাগের কাজ সাহেবদের জন্য—সেগুলিতে হাত না দিয়া অন্যান্য সরকারী কার্য্যের শতকরা ৫০ ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, ১৫ ভাগ থাকিবে তপশীলীদের জন্য, ৫ ভাগ থাকিবে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দেশীয় খৃষ্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য, অবশিষ্ট শতকরা ৩০ ভাগ থাকিবে তথাকথিত বর্ণ হিন্দুদের জন্য। বাঙলা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়া অর্থসচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার যে ওকালতি করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, হিন্দু মন্ত্রীরা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে এইটি করিবেন, ইহা আমাদের জানাই ছিল। দেশের স্বার্থ, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতি তাঁহাদের নাই। কয়েকটি সরকারী চাকুরী পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থের কথা এইজন্য আমাদিগকে তুলিতে হইতেছে যে, আমরা এই কয়েকটি চাকুরী বা চাকুরীয়াদের লভ্য বেতনকেই বড় করিয়া দেখিতেছি না। ইহার মূলে সাম্প্রদায়িকদৃষ্টির যে নীতি রহিয়াছে, সেই নীতির অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়াই এই চেষ্টায় আমাদের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা এই চেষ্টার বিরোধী যে এতটা, তাহার কারণ হইল এইখানে। যোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া নিয়োগের প্রশ্নে এই সাম্প্রদায়িকতা আসে না এবং সেই যোগ্যতা শাসনকার্য্য পরিচালনে প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সকল দিক হইতে সাম্প্রদায়িক ভেদ দৃষ্টিকেই বাঙলা দেশে জাগাইয়া তুলিতেছেন। এই সাম্প্রদায়িকতাই যেখানে যোগ্যতার নিরিখ, সেইখানে শাসন-ব্যাপারের ভিতর দিয়াও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছড়াইয়া না গিয়া পারে না। অনিষ্টকারিতা হইল এইখানে। ম্যাকডোনাল্ডী সিদ্ধান্তের মূলে বাঙলা দেশের জাতীয়তাকে ধ্বংস করিবার যে কূট নীতি ছিল, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সেই কূট নীতির কাল কূট—এই ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের শিরায় শিরায় ঢুকাইয়া দিবার পথ করিলেন এবং দুঃখের বিষয়, এমন জাতীয়তা বিরোধী মারাত্মক সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন, বাঙলায় হিন্দু সমাজের আদর্শের যাঁহারা দোহাই দেন, হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার কথা মুখে বলেন, সেই সব মন্ত্রীরা। অন্য সব মন্ত্রীদের উচ্চবাচ্য কিছু শুনা যাইতেছে না; কিন্তু মিঃ নলিনী সরকারের নির্লজ্জতার পরিমাণ দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়াছি। সাহেবদের জন্য যে সব চাকুরী, সে চাকুরীগুলিতে এই বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা খাটাইবার সাহস মন্ত্রীদের কেন হইল না! দেশের লোকেরা সব ক্ষেত্রে যোগ্য হইবে, কেবল অযোগ্য থাকিয়া যাইবে সাহেবদের উপভোগ্য চাকুরীগুলির বেলায়? কারণ বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; কারণ হইল এই যে, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে হাত করিয়া না রাখিলে হক মন্ত্রিমণ্ডলের সুখী পরিবারের সুখে ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং বাঙলার যে হিন্দু সমাজ নিজেদের বুকের রক্ত ঢালিয়া দেশবাসীর হাতে অধিকার আনিয়া দিয়াছে, মন্ত্রীদের যত কুদরত যে হিন্দু সমাজেব সাধ্য-সাধনারই ফলে—সাম্প্রদায়িকতার কসরৎ খাটাইয়া জব্দ করিতে হইবে সেই হিন্দুদিগকে। সাহেবদের বেলায়—সে বড় কঠিন ঠাঁই। সেখানে হাত দিতে গেলে স্বার্থে ঘা পড়িবে। ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কথাটা খুলিয়া বলিয়াছেন, তিনি এ সম্বন্ধে 'মারহাট্টা' পত্রে লিখিয়াছেন—'মন্ত্রীদের এই নীতির সমালোচকেরা কেহ কেহ এই অনুমান করেন যে, মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ এবং মন্ত্রি-পক্ষপাতী দলের কয়েকজন নিজেদের পক্ষের জোর বাড়াইবার উদ্দেশ্যে,—অন্য কথায় নিজেদের পক্ষে ভোটের জোর স্থায়ী করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের সমর্থকদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদিগকে চাকুরী যোগাইবেন। এই উদ্যম সেই প্রতিশ্রুতি প্রদানেরই প্রাথমিক স্তর।' আসল কথা হইল এই যে, চাকুরীর ক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িকতাকে টানিয়া আনিবার মূলে দেশের বৃহত্তর কোন স্বার্থই থাকিতে পারে না। অযোগ্য লোকদের শাসন-বিভাগে প্রাধান্য ঘটিলে কিম্বা শাসন-ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব যাঁহাদের থাকিবে, তাঁহাদের মনের অবচেতন স্তরে সাম্প্রদায়িক ভাব যদি কাজ করে, সেক্ষেত্রে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। দেশে অশান্তিই বাড়ে। কিন্তু সে বিচার হক মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে বড় নয়, আজ বাঙলা দেশটাকে সাম্প্রদায়িকতার লীলাভূমিতে পরিণত করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দারুণ ঘৃণা এবং লজ্জার কথা এই যে, বাঙলা দেশের হিন্দু সমাজে এমন লোক এখনও রহিয়াছে, যাহারা এমন দুর্নীতির পক্ষেও সাফাই গাহিতে আসিতেছেন!

শাসন-বিভাগের পরিণতি—

হিন্দুরা সরকারী চাকুরীতে বেশী সংখ্যায় আছে। হিন্দুদের কত বড় দুষ্টামিরই যেন এই ফল। সাহেবদিগকে তুষ্ট রাখিতে হইবে; কিন্তু সাজা দিতে হইবে হিন্দুদিগকে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের চাকুরী বাঁটোয়ারার ব্যবস্থার মূলে আগাগোড়া এইরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে। সাজা পাইবে হিন্দুরা, কারণ তাহারাই হক মন্ত্রিমণ্ডল আজ যে ক্ষমতা খাটাইতেছেন, সেই ক্ষমতাকে তাঁহাদের হাতে আনিয়া দিয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের শাসন-বিভাগের অবস্থা দাঁড়াইবে কি? বর্ত্তমান বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজের শতকরা ২৬ জন মাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, পক্ষান্তরে বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৬৮ জন ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের শতকরা ৮৫ জনই হিন্দু এবং

১৪ জন মুসলমান। যদি শতকরা ৫০টি চাকুরী মুসলমানেরা পায়, তাহা হইলে শতকরা ১৪জন মুসলমান গ্র্যাজুয়েট শতকরা ৫০টি চাকুরী পাইবে এবং শতকরা ৮৫ জন হিন্দু গ্র্যাজুয়েটের জন্য থাকিবে—অহিন্দু বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, তাহাদের সকলকে লইয়া শতকরা অবশিষ্ট ৫০টি চাকুরী। নিরিখ বাঁধা সাম্প্রদায়িক সংখ্যা বজায় রাখিবার জন্য, যাহারা অযোগ্য, তাহাদিগকেও চাকুরীতে টানিয়া লইতে হইবে। তাহার ফলে মুড়ি-মিছরির দর হইবে সমান, মর্য্যাদা হইবে সমতুল্য। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিটা বাড়িয়া উঠিবার অধিক সুযোগ পাইবে এবং দেশের জনসাধারণ মোশ্লেম রাজত্বের মহিমাটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবে। বাঙলা দেশের সেই দুর্দ্দিনের বিভীষিকা আমাদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়েছে।

রূপের সাধনা—

কলারসিক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় সেদিন শ্যামবাজারে চারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন—"রূপ ও রসের পথ যে জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট পথ, অক্ষর ছেড়ে দিয়েও নিরক্ষরের পথেও যে জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়,—আমাদের দেশে যুগে যুগে তাহার প্রমাণ, ইতিহাসে গাঁথা আছে। এদেশের নিরক্ষর জনসাধারণের চিত্তের উপর জ্ঞানের সরস সুধাবৃষ্টি অবিরত ধারায় নেমে এসে চিরকালই তাকে সিক্ত করেছে, উর্ব্বর করেছে, উজ্জ্বল করেছে। এই যে পণ্ডিত ও অপণ্ডিতদের মধ্যে আদান-প্রদান এ সম্ভব হয়েছিল অনেকটা নিরক্ষরের পথে, সুরের পথে, স্বরের পথে, চিত্রের পথে,—লিপির পথে নহে। আপনারা জানেন যে, আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৯২ জন নিরক্ষর। আমাদের বড় বড় লাইব্রেরীর কাচের আধারে তাকে তাকে সাজান, সোনার জলে বাঁধান, কেতাবের সাহায্যে নিরক্ষরদের অজ্ঞানতা বিনষ্ট করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। আমরা দাবী করছি যে, আমাদের শিল্পীদের ভাষায় ঐ শতকরা ৯২ জন নিরক্ষরদের জ্ঞান দেবার, শিক্ষা দেবার, ধর্ম্ম-জীবনের পথ নির্দ্দেশ করবার সহজ, সুলভ ও শক্তিশালী উপকরণ আছে। এই অদ্ভুত শক্তিশালী ভাষার যাঁরা উত্তরাধিকারী, যাঁরা সেবক, যাঁরা সাধক, মনুষ্যত্ব চর্চ্চার ক্ষেত্রে, কৃষ্টির রাজ্যে, তাঁরা সাহিত্য-সেবীদের, পণ্ডিত মহাশয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন,—তাঁরা সহ-কর্ম্মী। এই দুই যমজ ভ্রাতার সম্মিলিত সাধনায় সারস্বত আয়তনের পূজা সার্থক হয়ে উঠবে। এই দুই ভাইয়ের কাহাকেও ত্যাগ করবার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু কথার মালা গেঁথে, শব্দের নৈবেদ্য নিয়ে রূপ-দেবতার পূজা হয় না। শব্দ না স্তব্ধ হ'লে রূপের জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয় না, আসুন আমরা কথার 'কথা' বন্ধ করে রূপের কেতাবে কি 'কথা' লেখা আছে, একবার পড়ে দেখি।"

রসের শিল্পী এবং সাহিত্যিক এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পাণ্ডিত্যের কথা স্বতন্ত্র। পাণ্ডিত্য জাতির অন্তরকে স্পর্শ করে না, জাতির অন্তর স্পর্শ করা যায় মাধুর্য্যের সূত্রে। এই মাধুর্য্য জিনিষটি লাভ করা যায় অনুচিন্তায়। দেশের চিন্তায়, জাতির চিন্তায় যদি আমরা নিজদিগকে তন্ময় করিয়া তুলিতে পারি, তবেই প্রেমের দৃষ্টিতে দেশের সত্যকার স্বরূপটি আমাদের কাছে জাগিবে এবং সেই উপলব্ধির সূত্রে দেশের অন্তরের সঙ্গে হইবে আমাদের পরিচয়। এ সাধনা যেমন অধ্যাত্ম সাধনা, যেমন রস-সাধনা, তেমনই রাজনীতিক সাধনা।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গ—

বোম্বাইয়ে সমবেত হইয়া দেশীয় সামন্ত রাজারা এবং তাঁহাদের মন্ত্রীরা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তসমূহকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে, সর্ত্তনামায় তাঁহাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যথোচিতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই; সুতরাং উহা অসন্তোষজনক এবং তাঁহাদের পক্ষে গ্রহণ করিবার অযোগ্য। রাজা-রাজড়াদের কথা লইয়া আমরা আদার ব্যাপারী অযথা মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। দেশের জনমত যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী, রাজা রাজড়াদের মনস্তুষ্টি করিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করিতে গেলে এই বিরোধের তীব্রতা আরও বাড়িবে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দেশীয় স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদিগকে এই যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী শাসনতন্ত্রের ভিতরে ঢুকাইয়া, মধ্য যুগীয় স্বৈরাচারের সঙ্গে গণতান্ত্রিকতার একটা গোঁজা মিল দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইবার যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, দেশের জাগ্রত জনমত সে ষড়যন্ত্রকে বিচূর্ণ করিবার জন্যই সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল সেদিন বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী জন্মের পূর্ব্বে মৃত হইয়া গিয়াছে। এই মৃত শিশুর শবদেহ লইয়া টানাটানি হয়ত আরও কিছুদিন চলিবে; কিন্তু রাজন্যবর্গের এই সিদ্ধান্ত মৃত শিশুর পুনরুজ্জীবনের কোন সাহায্য করিবে না, আমাদের তরফ হইতে এইটুকু হইতেছে সুসংবাদ।

নীল (INDIGO)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য যত প্রকার বৃক্ষলতাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা এই স্থানে দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ প্রকৃতপক্ষে এ হিসাব রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক নীল জাতীয় বৃক্ষলতা তিন শত প্রকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্য ভারতবর্ষে আন্দাজ চল্লিশ রকমের নীলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে এই জাতীয় বৃক্ষকে Woad (ওয়াড) বলে এবং নীল আমদানী হইবার পূর্ব্বে তাহারা ইহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিত। ভারতীয় নীল আমদানী হইলেও তাহারা অনেক সময় আমদানী করা নীলের সহিত তাহাদের ওয়াড মিশ্রিত করিয়া লইত।

নীলের চাষ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা বড় কঠিন। স্থান ও ঋতু বিভেদে ইহার চাষের সময় এবং বৃক্ষের অবস্থান-কাল বিভিন্ন। কোনও কোনও গাছ তিন মাসের মধ্যে পুষ্ট হইয়া উঠে, আবার কেহ বা দেড় বৎসরকাল সময় লয়। কোনও কোনও গাছ প্রতি বৎসরই নষ্ট করিয়া দিতে হয়; আবার কাহাকেও বা তিন বৎসর ধরিয়া ছেদন করিয়া লওয়া হয়। মোটামুটি, এখন আর এই প্রথা পালিত হয় না, প্রতি বৎসরই নূতন গাছ জন্মাইয়া তাহার ডাল-পালা কাটিয়া লওয়া হয়।

নানা প্রদেশে নীল চাষের বিভিন্ন সময় অবলম্বন করা হয়; কিন্তু প্রধানত আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে জমি পাট করিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র বৈশাখে বীজ রোপণ করা হয়; এই সময়ের সামান্য তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোথাও বা আশ্বিনে বীজ রোপণ করিতেও দেখা যায়।

নীল গাছ হইতে কি ভাবে নীল পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে অনেকেরই হয়ত কোনও ধারণা নাই; সে কারণে এই স্থানে এ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

ক্ষেত হইতে নীল গাছের ডাল-পালা কাটিয়া আনিয়া প্রকাণ্ড এক চৌবাচ্চায় ভিজাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে ১২ হইতে ১৫ ঘণ্টা ভিজিয়া সমস্ত জিনিষটা পচিয়া গাঁজিয়া উঠে। তখন সমস্ত জল অপর এক পাত্রে আনা হয়। প্রথম পাত্র (fermenting vat) অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে অবস্থিত হয়, এবং দ্বিতীয় পাত্র (beating vat) তাহারই সন্নিকটে নিম্ন-স্থানে অবস্থিত হওয়ায়, প্রথম পাত্রের সমস্ত জল আপনা হইতেই দ্বিতীয় পাত্রে আসিয়া জমিতে পারে। নীল ডাঁটা পাতা কয়েক ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিবার পর জলের উপর বৃহদাকার বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। যতক্ষণ বুদ্বুদের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক থাকে, তখন পর্য্যন্ত ঐ জলকে স্থিরভাবে থাকিতে দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা বুঝিতে পারেন, কতক্ষণ গাঁজাইতে দেওয়া চলিতে পারে; কারণ এই কাল প্রয়োজনা-তিরিক্ত হইলে নীলের গুণ হ্রাস পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পাত্রে (beating vats) জল আসিবার পর লোকে কাঠ দিয়া জলে "বাড়ি" মারিতে থাকে। জল ঘন ঘন আন্দোলিত হইলে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং মিশ্র আকার ধারণ করিয়া নীল জল পাত্রের তলদেশে জমিতে থাকে। সাধারণতঃ এক ঘণ্টা হইতে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া লোকে জল আন্দোলিত করে। কালের গতির সহিত লোকে যন্ত্রের সাহায্যে কাষ্ঠের চাকা দিয়া জল তোলপাড় করিয়া লয়। কোথাও বা বাষ্প বা আমোনিয়া নলের সাহায্যে জলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা খুব বেশী নহে।

জল থিতাইয়া গেলে পাত্রের নীচে নীল আসিয়া জমে; তখন উপর হইতে ধীরে ধীরে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন ঝাঁট দিয়া সমস্ত নীলকে চৌবাচ্চার এক কোণে জমা করে। উহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত পাতলা অংশকে ভিন্ন পাত্রে গড়াইয়া লইতে দেয় এবং তথায় ছাঁকিয়া লইয়া তাপাধারে (boiler) দিয়া অনেক পরিমাণে জলহীন করিয়া লওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত বুদ্বুদ লোপ পায় এবং এক প্রকার তৈলাকার পদার্থ উপরে জমিতে থাকে; ইহাতে কেবল যে রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, সমস্ত বস্তুর ওজনও কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন তাপাধার হইতে সমস্ত নীলকে নিকটস্থ আর এক পাত্রে (dripping vat) লইয়া যাওয়া হয়। এই পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকায় বাকী জল চুয়াইয়া যাইবার সুবিধা হইয়া থাকে। যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে ততক্ষণ তাহাকে বারে বারে সংগ্রহ করিয়া এক আধারে দেওয়া হয়। এই আধারের তলদেশে পশমী বা অন্য জাতীয় বহুল ছিদ্রযুক্ত কাপড় পাতা থাকে এবং তাহাই ফিল্টারের কাজ করে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন একখানি ক্যাম্বিসের উপর সমস্ত নীল ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চাপ দেওয়া হয় এবং সমস্ত জল চুয়াইয়া বাহির হইয়া যায়। সাধারণত এই নীলই বাজারে চলে। কেহ কেহ বা বহুছিদ্র-যুক্ত বাক্সের মধ্যে পাতলা কাপড় পাতিয়া সমস্ত নীলকে ৮ বা ৯ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালে এবং উপরের আবরণী বা ঢাকনী বন্ধ করিয়া চাপ দিতে থাকে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা অন্তর উপর হইতে পুনঃ পুন চাপ দিবার ফলে সমস্ত জল নিঃশেষে চলিয়া যায় এবং তিন হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ পুরু নীলের "বরফি" (cake) পাওয়া যায়। তখন এই বাক্সের ধারের কাঠগুলি খুলিয়া নীল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখা হয় এবং সূতা বা তার দিয়া তিন ইঞ্চি পরিমাণ ঘন চাকতি (cube) কাটিয়া রৌদ্রহীন স্থানে শুকাইতে দেওয়া হয়। রৌদ্রে শুকাইলে চাকতিগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ছায়ায় শুকাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

এই প্রক্রিয়া ছাড়া শুষ্ক পত্রাদি হইতে নীল বাহির করিবার আর এক পন্থা আছে। ইহাতে লতাপাতা একেবারে ভিজাইতে না দিয়া ডাঁটা প্রভৃতি সমস্ত রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। তাহার পর কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া পাতাগুলি পৃথক করিয়া এই পাতার পরিমাণের ছয়গুণ জল ঢালিয়া দেয় এবং যতক্ষণ না সমস্ত পাতাগুলি জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়, ততক্ষণ জল আন্দোলিত করা হয়। এই অবস্থায় দুই ঘণ্টাকাল থাকিলেই জলের রং পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার পর ইহা দ্বিতীয় পাত্রে যাইতে দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে প্রথম পন্থানুযায়ী সকল প্রক্রিয়া পালন করিয়া নীল উদ্ধার করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নীলের আর সেই কদর নাই। আজ তাহার স্থান অপরে দখল করিয়াছে। সুতরাং আগে যত আবাদ হইত, এখন আর তত হয় না, এমন কি তাহার শতকরা তিন

ছাগ জমিতে চাষ হয় না। তাহা ছাড়া এখন নীলের আবাদ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে বাঙলা ও বিহারে (বিশেষত চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ ও সারণ) অধিক মাত্রায় চাষ হইত, বর্ত্তমানে মদ্রে এবং পঞ্চনদে হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশে সামান্য চাষ হয়। পরিশিষ্ট (ক) ও (খ) দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমানে বাঙলায় উল্লেখযোগ্য চাষ নাই; বিহারে এখনও দ্বারবঙ্গ ও চম্পারণে নীলের আবাদ বাঁচিয়া আছে; প্রত্যেকের অংশে ছয়শত একর পড়ে। যুক্তপ্রদেশে আলিগড়, বুলন্দসর, মীরাট (১৫০ একর), পঞ্চনদে মজঃফরগড় ও মুলতানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ওখানে যথাক্রমে সাত হাজার ও দুই হাজার একরের অধিক জমিতে নীলের আবাদ হয়; তৎপরে ডেরা গাজি খাঁর নাম করা দরকার। মদ্রে চাষই বেশী—নীলের, দক্ষিণ-আর্কট (৬ হাজার একরের অধিক জমি), কর্নুল, কদ্দাপা, চিত্তুর, চিংলপুট, অনন্তপুর প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাষ হয়। কিন্তু এই আবাদের পরিমাণের কোনও স্থিরতা নাই; হঠাৎ সামান্য কারণেও ইহার তারতম্য হইয়া পড়ে। অন্যান্য অনেক প্রদেশে একেবারেই চাষ হয় না।

করদ রাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ এবং সিন্ধু প্রদেশের খয়েরপুর রাজ্যে নীলের চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে হায়দরাবাদেই বেশী।

বর্ত্তমানে যবদ্বীপ এবং নাটাল ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সকল স্থান হইতে নীল রপ্তানি হওয়ায় ভারতের রপ্তানির আর কোনও স্থিরতা নাই। এক সময়ে জাভা প্রভৃতি স্থানে নীল আবাদের কেন্দ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিয়াছিল এবং সে চেষ্টার মূলে ওলন্দাজ প্রভৃতির অর্থ ও বাণিজ্য প্রবৃত্তি বলবান ছিল; কিন্তু কালের গতিতে সে পথ ক্রমশ রুদ্ধ হইয়া যায়।

এক সময় নীল ভারতে বহু টাকা আনিয়াছে; আজ তাহার রপ্তানী একপ্রকার নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯৫-৯৬ সালে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৩৭ হন্দর মাল ৫ কোটি বাধিলে নীল আবার কিছু আয় করিতে পারে। ১৯১৩-১৪ ৩৭২ হন্দর মাল মাত্র ৪১ হাজার টাকায় গিয়াছে। এই অঙ্ক দেখিয়া নীলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। কিন্তু একথাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পৃথিবীতে গোলযোগ বাধিলে নীল আবার কিছু আয় করিতে পারে। ১৯১৩-১৪ সালে ১০,৯৩৯ হন্দর নীল ২১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকায় রপ্তানি হইয়াছিল। পর বৎসর (১৯১৪-১৫) ১৭১,৪২ হন্দর নীল ৯০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯১৫-১৬ এবং ১৯১৬-১৭ সালে প্রতি বৎসরেই দুই কোটী টাকা ছাড়াইয়া যায়; তাহার পর ১৯১৯-২০ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই প্রায় দেড় কোটী টাকা মূল্যের নীল রপ্তানি হইয়াছে। পরিশিষ্ট (গ) সমস্ত অঙ্ক দেখানো হইল।

সাধারণের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে নীলের এ দুর্দ্দশার কারণ কি? রায়তদের দুঃখে নীলকুঠীর সাহেবেরা দয়া করিয়া কি নীলের আবাদ বন্ধ করায় নীলের বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে? এরূপ ধারণা করিবার কোনও কারণ নাই। একপ্রকার প্রজা-বিদ্রোহ হইয়া আবাদের হানি হয় এবং রায়তরা তখন সরকারী সহায়তা পাইয়া কতকটা বলশালী হইয়াছিল। কিন্তু আসল বিপদ হইল রসায়ন শাস্ত্রের উপদ্রবে। ১৮৫৬ সালে মার্কিন আবিষ্কার করে যে আলকাতরা হইতে বহু প্রকার রঙ পাওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৯ সালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক যৌগিক নীল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় উদ্ভিজ নীলের প্রকৃত বিপদ দেখা দেয়। দশ বৎসরের মধ্যেই রপ্তানিতে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। ১৮৯৫-৯৬ সালে সাড়ে পাঁচ কোটী টাকার নীল যায়; আর ১৯০৬-৭ সালে তাহা ৭০ হাজার টাকায় নামে এবং ১৯১৩-১৪ সালে মাত্র ২১ হাজার টাকায় দাঁড়ায়।

বরাবরই ইংরেজ ভারতীয় নীলের প্রধান খরিদ্দার ছিল; এখনও যাহা যায়, তাহা ইংলণ্ডেই বেশী যায়; অপরাপর যাহারা লয়, তাহা উপেক্ষা করা চলে। গত বৎসর হইতে এ বৎসরে রপ্তানি আরও কমিয়াছে; অর্থাৎ ৭২ হাজার টাকার স্থলে ৪১ হাজার টাকা। সে স্থলে নীলের আমদানী হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকা; অবশ্য এই রঙ আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত।

নীলের ব্যবহার রঞ্জন কার্য্যের জন্য এবং সেই কারণেই ইহার আদর। এখন সমস্তই যৌগিক নীল দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই যৌগিক নীলের মধ্যে কেবল অবিমিশ্র ইণ্ডিগোটিন আছে এবং উদ্ভিজ্জ নীলের মধ্যে যে "indigo red" এবং "indigo brown" পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত যৌগিক নীলের মধ্যে নাই। রঞ্জনকার্য্যে "indigo red ও indigo brown" উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে কারণে উদ্ভিজ্জ নীল অপর প্রকার নীল হইতে গুণে শ্রেষ্ঠ। উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারা রঞ্জিত পশমী বস্ত্রাদি জলীয় বাষ্পের উপর ধরিলে একটি সুগন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু যৌগিক নীল দ্বারা রঞ্জিত পশমী বস্ত্রাদি হইতে আলকাতরার একটা তীব্র গন্ধ নির্গত হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পশমী বস্ত্রাদি কিরূপ নীলে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহা ধরা যাইতে পারে। রেশমী বস্ত্রাদি উদ্ভিজ্জ নীল দ্বারা রঞ্জিত হইলে আরও বেশী সুফল পাওয়া যায়, কাপড় শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং রঙও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই সকল কারণে মূল্যবান বস্ত্রাদির জন্য এখনও উদ্ভিজ্জ নীলের প্রয়োজন আছে; কিন্তু আর কত দিন?

নীলের গাছ জমির ভাল সার, সুতরাং তাহা হইতে নীল বাহির করিয়া লইবার পর তাহা মাটীতে মিশাইয়া দেওয়া হয়।

(ক)

প্রদেশ হিসাবে চাষ ও ফসল

(১৯৩৭-৩৮)

মোট জমি	৪০,০০০	একর	
ব্রিটিশ ভারত	৩৮,৫০০	"	৯৬·২%
করদ রাজ্য	১,৫০০	"	৩·৮%
মোট ফলন	৬,৭০০	হন্দর	
ব্রিটিশ ভারত	৬,৬০০	"	৯৮·৩%
করদ রাজ্য	১০০	"	১·৪%

(শেষ, ৩৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ কি বাধিবে?

আজ অনেক প্রশ্ন করিতেছেন, যুদ্ধ কি বাধিবে? প্রশ্নকর্ত্তারা যে যুদ্ধই চান এ প্রশ্নে তাহা বুঝা যায় না। তবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিরা এ যাবৎ যেরূপ হল্লা ও হম্বিতম্বি করিয়া আসিতেছিলেন ইদানীং যেন তাহা কতকটা থামিয়া গিয়াছে। ঝড়ের পূর্ব্বে যেমন সব নিস্তব্ধ হইয়া যায়, বর্ত্তমান নীরবতা তদ্রূপ কি-না বলা কঠিন। কোন কোন রাষ্ট্রধুরন্ধর কিন্তু প্রচার করিতেছেন, যুদ্ধ বাধিবে না। তাঁহাদের এরূপ কথা অভিসন্ধিমূলক বলিয়াই মনে হয়। শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করা রাজনীতির একটা কূট কৌশল। এইরূপ প্রচারের হয়ত তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ বোধ হয় এ-কথায় কেহ ভুলিবে না। তাই ছোট বড় সকল দেশই দেশ-রক্ষাবাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক অবস্থা ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্পেনের কেডিজ বন্দর হইতে হাজার হাজার ইটালীয় সৈন্য স্বদেশাভিমুখে রওনা হইতেছে

যুদ্ধ বাধিবে কি-না যখন কেহ প্রশ্ন করেন, তখন তাঁহার লক্ষ্য একটা সুবৃহৎ মহাসমর। কেন না ছোটখাট যুদ্ধ তো আজ কয়েক বৎসর যাবৎ পূর্ব্বে পশ্চিমে চলিতেছেই। চীন আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। তাহার সঙ্গে জাপানের সঙ্ঘর্ষ আজ দুই বৎসর হইল সুরু হইয়াছে। ভারত-সীমান্ত হইতে জাপান অধিকৃত অঞ্চল এখন আর বেশী দূরে নয়। ইচ্ছা করিলে দ্রুতগামী জাপানী বিমানপোত বোমাবর্ষণ দ্বারা ভারত-সীমান্ত বিধ্বস্ত করিয়া স্বল্প সময়ে নিজ ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইতে পারে। তথাপি এ-হেন চীন-জাপান সংগ্রামও এখানকার জনসাধারণের নিকট যুদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে না! ব্রিটেন ইহার আবর্ত্তে গা ঢালিয়া দেয় নাই বলিয়াই হয়ত এইরূপ মনে হইয়া থাকে। আবিসিনিয়া, স্পেন বা চেকোশ্লোভাকিয়ার ন্যায় কিঞ্চিৎ দুরবস্থা দেশের কথা এ প্রসঙ্গে না হয় না-ই বলিলাম। এমন সমর কবে বাধিবে যখন জগতের বড় বড় শক্তিগুলি ইহাতে লিপ্ত হইয়া যাইবে, আর নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন ছোট-বড় স্বাধীন-পরাধীন দেশসমূহ পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে? রাষ্ট্রনেতাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়—এখনও মহাসমর ঘটিবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। এখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শক্তি সংহত করিবার জন্য উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিয়ত একে অন্যের শক্তি পরখ করিয়া দেখিতেছে। আজকাল কোথাও যুদ্ধের কথা উঠিলেই ইটালী, জার্ম্মানী, জাপানের কথা আসিয়া পড়ে। এরূপ হয় কেন? এই তিনটি রাষ্ট্র ছাড়া আর সকলেই কি এযাবৎ নিষ্কাম 'চান্দ্রায়ণ' ব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে? বস্তুত আদতে ইহা কোন কারণই নহে। ঐ তিনটি দেশের নেতৃবর্গ ইদানীং যুদ্ধের মহিমা এমনভাবে প্রকাশ ও প্রচার করিতেছে যে, লোকে পূর্ব্ব ইতিহাস সহজেই ভুলিয়া যাইতেছে। 'সংগ্রামই জীবনের লক্ষণ' ইহা ত অতি পুরাতন কথা। কিন্তু সংগ্রামই সব নয়, লক্ষ্যে পৌঁছিবার ইহা উপায় মাত্র। মুসোলিনী, হিটলার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কিন্তু যুদ্ধ বা সংগ্রামকেই একটা পরম বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের অত্যধিক মাতামাতি বেশী করিয়া লোককে প্রতীত করাইতেছে যে, তাঁহারা উহাই চান—সংগ্রাম—চির সংগ্রামই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা এইভাবে নিজ নিজ জাতির ভিতরে একটা যুদ্ধ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যদিও মাঝে মাঝে শুনা যায়, 'ইটালী বা জার্ম্মানীর সাধারণ লোকেরা যুদ্ধ চাহে না,' তথাপি যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে তাহারা তাহাতে যোগদান না করিয়া পারিবে না, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা একথাও বলিয়া থাকেন।
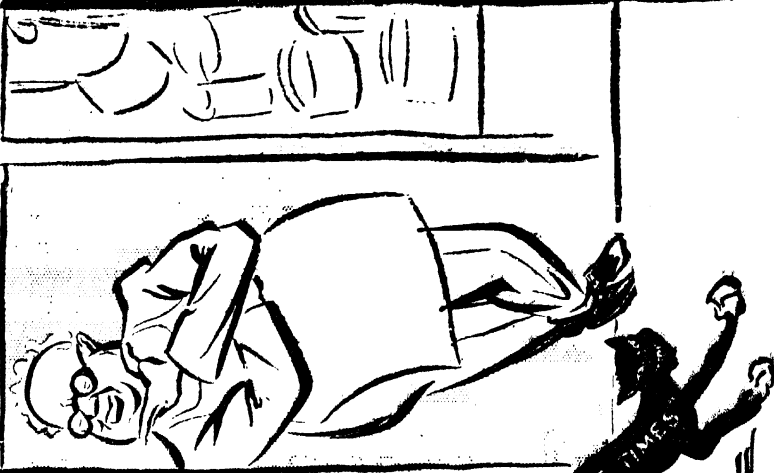
ব্যঙ্গচিত্র। ইউরোপে শক্তি-সমতা রক্ষায় ব্রিটেন সবিশেষ তৎপর। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছে। সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করিতেই যত বিলম্ব। অথচ সোভিয়েটকে হাত না করিতে পারিলে সবই পণ্ডশ্রম!

কাজেই কার্য্যতঃ যুদ্ধ মনোবৃত্তিই প্রবল করিয়া রাখা হইয়াছে। যুদ্ধবাদী হইয়াও হিটলার-মুসোলিনীর মুখে আজকাল শান্তির কথা শুনা যায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহা নিতান্তই কথার কথা, প্রতিপক্ষকে ধোকা দিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন, আসলে কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি বাড়াইতে ব্যস্ত।

আজ যাহারা হিটলার, মুসোলিনী বা জাপ-সম্রাটের লক্ষ্য তাহারাও যে নিতান্ত সাধু সাজিয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। তবে একটি বিষয়ে তাহারা ডিক্টেটরদের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী চালাক বলিতে হইবে। তাহারাও বরাবর যুদ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধ-জয়ই তাহাদের শক্তি জোগাইয়াছে। শত্রু নিধন তাহাদের শক্তির মূল উৎস। তাহারা যুদ্ধকে ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান ও যুদ্ধকে পরমার্থ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। কাজেই তাহারা যে এজন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। জাপানের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ অন্য সকল দেশকে হার মানাইয়াছে। তাহার আয় ব্রিটেনের আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ, কিন্তু তাহার সামরিক ব্যয় ব্রিটেনের সামরিক ব্যয়ের নাকি প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে! অন্য সকল বিভাগে জাপানীরা যাহা ব্যয় করে তাহার মোট পরিমাণের চেয়ে বেশী ব্যয় করে এই যুদ্ধ ব্যয়খাতে! আজ জাপান প্রাচ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমগ্র জগতে একটি প্রবল শক্তি। তাহার স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী আশাতীত রকম বাড়ান হইয়াছে। প্রকাশ, চীন সংগ্রামে তাহার নৌবহর মোটেই প্রয়োজন হয় নাই।
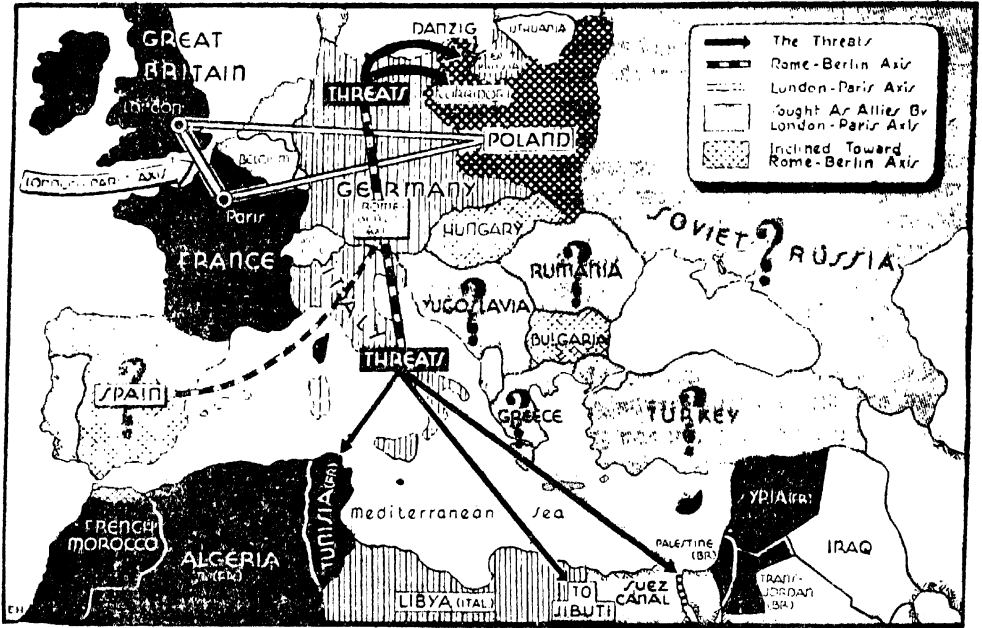
ইউরোপের মানচিত্র। ভাবী সময়ে কে কোন পক্ষ লইতে পারে মানচিত্রে তাহা দেখান হইতেছে

সিদ্ধিলাভের প্রধান সোপানরূপে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কখনও উহার মহিমা কীর্ত্তনে লাগিয়া যায় নাই। এজন্য জগতে শান্তিকামী বা শান্তিপ্রিয় বলিয়াও ইহাদের খ্যাতি হইয়াছে। অথচ মূলে সকলেই রণদেবতারই পূজারী, ষোড়শোপচারে তাহারই পূজা করিতেছে প্রতিনিয়ত। বিপৎকালে লোকে এইসব বিষয় লইয়া বেশী ভাবিবার অবসর পায় না। যাহাকে শান্তিপ্রিয় বলিয়া মনে করে তাহার দিকেই ছুটিয়া যায়। আজ যে ছোট বড় বহু রাষ্ট্র তাহাদের দিকে ছুটিয়াছে, অন্য যে কারণই থাকুক না কেন, ইহা তাহার মধ্যে অন্যতম।

যুদ্ধের জন্য আজ কিন্তু প্রস্তুত হইতেছে সবাই। এখন পর্য্যন্ত ইহা ভাবী মহাসমরের জন্য ষোল আনা অটুটই রহিয়াছে। আমেরিকার একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভাবী মহাসমরে যোগদান করিবার পূর্ব্বে দশবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কারণ গত মহাযুদ্ধে তাহার নৌবহরকে শুধু আটলান্তিক মহাসাগরের উপরই খবরদারি করিতে হইয়াছে, তখন জাপান ছিল মিত্র-শক্তিদের বন্ধু। এখন কিন্তু তাহাকে অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর উভয় সমুদ্রের উপরই শক্তি বিস্তার করিতে হইবে, কারণ এখন আর জাপান তাহাদের বা ভাবী মিত্র শক্তিবর্গের বন্ধু থাকিবে না, প্রতিপক্ষ ইটালী জার্ম্মানীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্বে

বন্ধুদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিবে! চীনের সমগ্রটা দখল করিতে পারুক আর না পারুক, প্রাচ্যে যে সে অবিরত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সোভিয়েট রুশিয়ার দুই দিকেই প্রতিপক্ষ রহিয়াছে। পূর্ব্বে দিকে জাপান ও পশ্চিম দিকে জার্ম্মানী। তাহার স্থল-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী মূলত ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সংগঠন করা হইয়াছে। সোভিয়েট কংগ্রেসে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চলতি বৎসরে সামরিক খাতে ব্যয় করা হইবে একশত বাইশ কোটি টাকা! সোভিয়েট রুশিয়াকে প্রথম হইতেই তাহার সৈন্যসামন্ত বাড়াইয়া লইতে হইয়াছে। আজ এক দল তাহার মিত্রতা কামনা করিতেছে। এমন একদিন ছিল, যখন তাহারা তাহার শত্রু মধ্যে গণ্য ছিল। চারিদিক হইতে পশুশক্তি বলে তাহাকে পিষিয়া মারিবারও চেষ্টা হইয়াছিল। আজ যতই দিন যাইতেছে ততই স্বার্থনিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে রেষারেষি দ্বন্দ্ব কলহ প্রকট হইয়া উঠিতেছে ও ইহারা দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট বিপক্ষ দলে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। উভয় পক্ষই আজ সোভিয়েট রুশিয়ার মিত্রতা লাভে সচেষ্ট। ব্রিটেন, ফ্রান্স রুশিয়ার সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক ও অনাক্রমণাত্মক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রায় তিন মাস যাবৎ আলোচনায় রত আছে। মাঝে মাঝে দায়িত্বপূর্ণ বিবৃতিও প্রকাশিত হইতেছে এই মর্ম্মে যে, আলোচনা ক্রমশ সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে শীঘ্রই আলোচনার সুফলপ্রদ পরিসমাপ্তি ঘটে সেজন্য ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে মিঃ উইলিয়ম ষ্ট্রাং নামক একজন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীকেও গতকল্য ১২ই জুন মস্কো প্রেরণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু প্রকাশ পাইয়াছে, জার্ম্মানীর তরফে তাহার পররাষ্ট্র-সচিব ফন রিবেন্ট্রপ ও সমর বিভাগের প্রধানগণ রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে হিটলারকে রাজি করাইয়াছেন। এখন রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর আলোচনা কোন্ সূত্র ধরিয়া আরম্ভ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। হয়ত আলোচনা আদৌ না-ও হইতে পারে। কারণ মিঃ ষ্ট্র্যাংয়ের মস্কো গমন ব্রিটিশ-রুশ চুক্তিকে দ্রুত পরিসমাপ্তির দিকে হয়ত আগাইয়া দিবে। তথাপি উপরোক্ত সংবাদে জার্ম্মান নেতৃবর্গের মনোভাব অনেকটা বুঝা যায়। তাঁহারাও বুঝিতেছেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সমভাবে যুঝিতে হইলে সোভিয়েট রুশিয়াকেও দলে ভিড়াইতে হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপানের শক্তি তাহার সমতুল্য হইতে পারিবে না। উপরন্তু জার্ম্মানীর ব্যবহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট নিতান্তই বিস্মিত হইয়া আছেন। যদি জার্ম্মানী ব্রিটেন প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে লড়িতে সুরু করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার বিপক্ষে আমেরিকা নিশ্চয়ই যাইবে। সোভিয়েট রুশিয়ার বিশাল স্থল-বাহিনী (বিশেষজ্ঞদের মতে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ) ও বিমান-বাহিনী তাই বিরুদ্ধ পক্ষগুলির লোভের কারণ হইয়াছে। জার্ম্মানী ভাবিতেছে, রুশিয়াকে স্বপক্ষে পাওয়া গেলে প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে তাহার বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, জাপান পূর্ব্ববৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বীই থাকিবে। ব্রিটেন ফ্রান্স উভয়কেই পূর্ব্বে-পশ্চিমে দুই দিকে ঘায়েল করা সুবিধা হইবে।

ব্রিটেন কি রুশিয়া সম্বন্ধে মন স্থির করিতে পারিতেছে? রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের মনোভাবে বুঝা যায় তাঁহারা যেন এখনও ফ্যাসিজম্-এর মোহ ভুলিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা আবার বাস্তব রাজনীতিরও ভক্ত! বাস্তব রাজনীতি বলিতেছে, ফ্যাসিজমকে এখন প্রতিরোধ করিতে না পারিলে তাহাদের সবই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তাই তাঁহারা মস্কৌর সব আবদার শিরোধার্য্য করিয়া তাহারই পিছু ছুটিয়াছেন, দূত পাঠাইয়া যত সত্বর সম্ভব কাজ হাসিল করিতে নিরতিশয় তৎপর হইয়াছেন! তাঁহারা এতদিন যে দোটানায় পড়িয়াছিলেন, ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় এখন তাহা অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন। ইংরেজ স্থূলচর্ম্মবিশিষ্ট। তথাপি মিউনিকের অপমান এখন যেন তাহার গণ্ডারের চর্ম্ম ভেদ করিয়া মরমে পশিয়াছে। না-হইলে পার্লামেণ্টে মিঃ ডালটনের প্রশ্নে মিঃ চেম্বারলেন অত উষ্মা প্রকাশ করিবেন কেন?

সম্প্রতি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হালিফাক্স হাউস অব্ লর্ডসে এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বার্ম্মিংহামে পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপে মিঃ ডালটন পার্লামেণ্টে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন। বিলাতী কাগজে এই বক্তৃতা দুইটি সম্পর্কে অনুকূল-প্রতিকূল নানারূপ মন্তব্যও হইয়াছে। মন্ত্রীদ্বয় তাঁহাদের বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোনরূপে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিতে তাঁহারা রাজী আছেন, তবে কি না জার্ম্মানী ইহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে এইরূপে মনোভাব তাহার দেখান চাই! এই সময় যখন ইউরোপের শক্তিসমতা বা ballance of power রক্ষার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং বিশেষ করিয়া ব্রিটেন সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হইতে চাহিতেছে তখন রাষ্ট্রধুরন্ধরদের মুখে আবার এ সব বাণী শুনা যাইতেছে কেন? যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্দিগ্ধচেতা তাঁহারা দেখিতেছেন, ওদিকে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইতে অযথা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করা হইতেছে। তবে কি তলে তলে আবার জার্ম্মানীর সঙ্গে চুক্তি করিবারই কোনরূপ চেষ্টা চলিতেছে? কিন্তু সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ মনে করিবার কারণ হয়ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কোনরূপে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে রাষ্ট্রনেতাদের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

১৩ই জুন'৩৯।

টান

(গল্প)

শ্রীসুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আজ অঞ্জলির যাইবার দিন। তাহার কাকা তাহাকে লইতে আসিয়াছে। হরেন্দ্রনাথের মন ভাল নাই, তবু হাসিয়া হাসিয়া অঞ্জলির সহিত কথা বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে সময় হইল। এইবার অঞ্জলি যাইবে।

কিন্তু অঞ্জলি কোথা হইতে আসিল আর কোথাই বা যাইবে সে-কথা আপনাদের না বলিলে চলিবে কেন! কিন্তু বলিব আর কি! হরেন্দ্রনাথ নিজেই সেই কথা ভাবিতেছিল।

একটা স্মরণীয় স্বপ্নের মত সে-দিনটা আজও হরেন্দ্রনাথের মনে পড়ে যে-দিন তাহার এক দূরসম্পর্কের মাসীর মৃত্যুর খবর আসিল। আরও খবর আসিল যে সেই মাসীর একটি মেয়ে আছে, তাহার আর তিনকুলে কেউ নাই, হরেন্দ্রনাথ যদি তার ভার লয় তাহা হইলে মেয়েটিরই মঙ্গল।

হরেন্দ্রনাথ লাফাইয়া উঠিল। তাহার স্বভাবই ঐ রকম আর তার ছেলেমেয়ে যে একটিও নাই। আনন্দের সহিত সে মেয়েটিকে আনিতে রাজী হইল।

কিন্তু স্ত্রী অনুপমা বাধা দিল, বলিল, 'না, তুমি যেতে পাবে না।'

আশ্চর্য হইয়া হরেন্দ্রনাথ বলিল, 'কেন?'

কি হবে এনে? বেশ আছি আমরা দুজন।'

'না না, আসুক,' হরেন্দ্রনাথ বলিল, 'ছোট ছেলে-মেয়ে না থাকলে বড় বিশ্রী লাগে, তোমার যে আবার একটিও–'

'থাম থাম,' অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'তোমার যা খুশী তাই কর, কান্না চাপিবার জন্য সে আড়ালে গেল।

হরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। কিন্তু অনুপমার বুকে সেই যে একটা অভিমানের কাঁটা বিঁধিয়া রহিল তার জ্বালা শীঘ্র যাইবে বলিয়া মনে হইল না।

তারপর একদিন পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে অঞ্জলি এ বাড়ীতে আসিল।

অঞ্জলির কিছুই অনুপমার ভাল লাগে না। তাহার কথা শুনিলে রাগ হয়, চেহারা দেখিলে গা জ্বালা করে। এই লইয়া স্বামীর সহিত তাহার প্রায়ই ঝগড়া হয়।

হরেন্দ্রনাথ বলে, 'আচ্ছা ওইটুকু মেয়ে তোমার কি করেছে, কেন ওর ওপর রাগ কর?'

অনুপমা উত্তর দেয়, 'রাগ ত কারুর ওপর আমি করি না, তবে ওকে আমার ভাল লাগে না।'

'কেন?'

'জানি না।'

হরেন্দ্রনাথ অঞ্জলিকে কোলে লইয়া আদর করিতে থাকে। অনুপমার সারা অঙ্গ যেন বিষাক্ত হইয়া উঠে।

অঞ্জলি দিনরাত বাজে কথা বলে। অনুপমার কাছে আব্দার করিতে যায়—অনুপমা যতই তাহাকে অবহেলা করে ততই সে তাহার কাছ ঘেঁসিয়া থাকিতে চায়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিতে থাকে।

একদিন হঠাৎ অঞ্জলি অনুপমার একটি সাধের ফুলদানী ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল অনুপমা, 'কেন ভেঙ্গেছিস বল?'

হাসিয়া অঞ্জলি বলিল, 'এমনি, আরও ভাঙ্গব।'

অনুপমা অঞ্জলির গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিল। ছোট মেয়ে সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, পড়িয়া গেল পরমুহূর্তেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় সে-ঘরে হরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিল।

অনুপমা বলিল, 'দেখ ত আমার সেই ফুলদানীটা তোমার আদরের মেয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে—'

'তাই ওইটুকু মেয়েকে তুমি মারবে, কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?'

'হাঁ, বেশ করব মারব, একশোবার মারব, আমার খুশী আমি মারব, তোমার কি তাতে?'

'আমি চাই না যে ওর সঙ্গে তুমি অমন খারাপ ব্যবহার কর।'

'আর আমিও চাই না যে ওকে তুমি এ বাড়ীতে রাখ।'

হরেন্দ্রনাথ অঞ্জলিকে কোলে তুলিয়া লইল, 'একে না দেখে আমি থাকব কেমন করে?'

'সোহাগ দেখে আর বাঁচি না, দু'দিন আগে কোথায় ছিল ও?'

'আর তারও আগে তুমি কোথায় ছিলে অনুপমা?

'আমার সঙ্গে তুমি সকলের তুলনা করেতে পাবে না—'

'ও', অঞ্জলিকে লইয়া হরেন্দ্রনাথ সে-ঘর হইতে বাহির হইল।

হরেন্দ্রনাথ সবই বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, অনুপমা অঞ্জলিকে দু'চোখে দেখিতে পারে না, আর কোনদিন দেখিতে পারিবে বলিয়া আশাও নাই, কিন্তু কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। কেন যে অনুপমা অঞ্জলিকে দেখিতে পারে না, কেন তাহার উপর রাগ করে, সে কথা কিছুতেই হরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারে না।

কিন্তু আস্তে আস্তে অনুপমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা অনুপমা তোমার চেহারা দিন দিন এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন?'

অনুপমা ম্লান হাসিল, 'আজ বুঝি চোখে পড়ল?'

'হাঁ', সোজা কথা বলিল হরেন্দ্রনাথ।

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়িল।

অনুপমা প্রায়ই বলে, 'ওগো ও-মেয়েটাকে বিদায় করে দাও।'

একদিন হরেন্দ্রনাথ রাগিয়া বলিল, 'আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু তোমার এই অন্যায় অনুরোধের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

হরেন্দ্রনাথ ও অনুপমার যখন এই রকম মনের অবস্থা

তখন অকস্মাৎ একদিন একটি চিঠি আসিল। লিখিয়াছে হরিবাবু, অঞ্জলির দূরে সম্পর্কের কাকা, অঞ্জলিকে সে লইয়া যাইতে চায়।

সেই অঞ্জলি আজ যাইবে। হরিহর গাড়ী লইয়া আসিয়াছে। হরেন্দ্রনাথ অঞ্জলিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, নতুন কাপড় পরাইয়া তাহাকে সাজান হইয়াছে। অনুপমা আড়াল হইতে সব লক্ষ্য করিতেছিল।

হরিহর বলিল, 'আচ্ছা, দিন এবার অঞ্জলিকে—

হরেন্দ্রনাথ অঞ্জলিকে তুলিয়া দিল। তাহাকে কোলে লইয়া হরিহর উঠিয়া দাঁড়াইল।

'ওগো', আড়াল হইতে অনুপমা বলিল, 'অঞ্জলিকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

আজ প্রথমবার অনুপমা অঞ্জলিকে আদর করিতে লাগিল।।

হরিহর তাড়া দিল, 'বড় দেরী হয়ে গেল হরেনবাবু।'

দাও', হরেন্দ্রনাথ হাত বাড়াইল।

স্বামীর আর অঞ্জলির মুখের দিকে অনুপমা একবার তাকাইল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'হরিবাবুকে ফিরিয়ে দাও, অঞ্জলিকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।'

মনের কোন্ গোপন কোণে অঞ্জলির প্রতি অনুপমার মমতা হয়ত সঞ্চার হইতেছিল;

নীল

(৩৯০ পৃষ্ঠার পর)

প্রদেশ	জমির পরিমাণ একর	শতকরা অংশ	ফলনের পরিমাণ হন্দর	শতকরা অংশ
মদ্র	২৩,২০০	৫৮০০	৩,৯০০	৫৮০২
পঞ্চনদ	১১,৩০০	২৮০২	২,০০০	২৯০৮
যুক্তপ্রদেশ	২,৬০০	৬·৫	৩০০	৪·৪
বিহার	১,৪০০	৩·৫	৪০০	৫·৯
করদরাজ্য—				
হায়দরাবাদ	১,৩০০	৩·২	১০০	১·৪
খয়েরপুর	২০০	·৫	১০০	১·৪

উপরোক্ত অঙ্কে শুষ্ক নীলের ওজন দেওয়া হইল।

(খ)

যৌগিক নীল আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে ভারতে জমি ও ফলনের পরিমাণঃ—

হাজার	হন্দর	একর
১৮৯২-৯৩	১২,১৯	১,৭৯,০৫৬
১৮৯৪-৯৫	১৬,৮৯	২,৩৭,৪৯৪
১৮৯৬-৯৭	১৬,০৯	১,৬৮,৬৭৩
১৮৯৮-৯৯	১০,১০	১,৩৯,৩২০
১৯০০-০১	৯,১০	১,৪৮,০২৯
১৯০২-০৩	৬,৪৬	৭৯,২০৭
১৯০৪-০৫	৪,৭৪	৫৬,২০০
১৯০৫-০৬	৫,৮৪	৪৬,৫০০

গত তিন বৎসরের ফলনের পরিমাণঃ—

	একর	হন্দর
১৯৩৫-৩৬	৪০,৪০০	৬,৮০০
১৯৩৬-৩৭	৪৪,৩০০	৭,২০০
১৯৩৭-৩৮	৪০,০০০	৬,৭০০

গত তিন বৎসরের রপ্তানির পরিমাণঃ—

	হন্দর	টাকা
১৯৩৬-৩৭	৪৭৮	৭৬,৫৭৭
১৯৩৭-৩৮	৪২৫	৭২,৩৬০
১৯৩৮-৩৯	৩৪১	৪১,০৩৬

(গ)

নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে নীলের রপ্তানির হ্রাসের পরিমাণ লক্ষিত হইবেঃ—

সাল	হন্দর	হাজার টাকা
১৮৯৪-৯৫	১,৬৬,৩০৮	৪,৭৪,৫৯
১৮৯৫-৯৬	১,৮৭,৩৩৭	৫,৩৫,৪৫
১৯০৬-০৭	৩৫,১০২	৭০,০৫
১৯১৩-১৪	১০,৯০৯	২১,২৯
১৯১৪-১৫	১৭,১৪২	৮৯,৯৫
১৯১৫-১৬	৪১,৯৩২	২,০৭,৮৭
১৯১৬-১৭	৩৪,২৩০	২,১১,২৬
১৯১৭-১৮	৩১,০৬২	১,৫২,৮১
১৯১৯-২০	৩২,৬৮৭	১,৩২,৭৬
১৯২০-২১	১০,২৫০	৪১,২১
১৯২৫-২৬	২,০১৭	৫,৫৯
১৯৩০-৩১	৯৩৪	২,৪৫
১৯৩৫-৩৬	৩৪০	৬৬

স্বাধীনতার জয়যাত্রা

মানুষের ইতিহাস হ'চ্ছে তার আদর্শের জয়যাত্রার ইতিহাস। একদিন ছিলো যখন মানুষ দাসত্ব-প্রথায় বিশ্বাস করতো। প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল সভ্যতার একটা প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দাসত্ব-প্রথায় অখণ্ড বিশ্বাস। রোমকেরা এবং গ্রীকেরা বিশ্বাস করতো, সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য হাজারে হাজারে ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীর প্রয়োজন। পেরিক্লিস আর ক্লিওন, প্লেটো আর আলেকজান্ডার, সিসারো আর সিজার—এঁদের মধ্যে মতের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও একটা জায়গায় তাঁদের মধ্যে কোনোই অমিল ছিলো না। তাঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন, এমন অনেক কাজ আছে যা করা সভ্য মানুষের সাজে না। সেই সব কাজ করবার জন্য ক্রীতদাসের দরকার। অবশ্য তখনকার দিনেও নিশ্চয়ই এমন লোক ছিলেন যাঁদের হৃদয় দাসত্ব-প্রথার সঙ্গে পুরোপুরি সায় দিতে কুণ্ঠা বোধ করতো। কিন্তু ক্রীতদাস একেবারে থাকবে না—সে-কালে এমন চিন্তার ঠাঁই ছিলো না কারও মনে।

প্লেটোর আর সিজারের সেই প্রাচীন যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে আজিকার হুইটম্যান আর বার্ণার্ড শ'র বর্তমান যুগের চিন্তাধারার সব চেয়ে বড়ো পার্থক্য কোনখানে? সেদিনের চিন্তাবীরেরা বিশ্বাস করতেন, হাজার হাজার মানুষকে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখায় দোষ নেই কোনো। দাসত্ব-প্রথাকে তাঁরা অপরাধের ব'লে মনে করতেন না। আজকের দিনে মানুষের মনকে অধিকার করেছে মুক্তির স্বপ্ন। স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে মানুষ রাজনীতির কথা আজ চিন্তা করতে পারে না। সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই—এই মহাগান উৎসারিত হচ্ছে বর্তমান যুগের কণ্ঠ থেকে।

যাকে ক্ল্যাসিক্যাল যুগ বলা হ'য়ে থাকে তার একদিকের বৈশিষ্ট্য যেমন দাসত্ব-প্রথায় বিশ্বাস আর একদিকে তার বিশিষ্টতাকে দেখতে পাই বিচারবুদ্ধির প্রকাশে। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে আরম্ভ করেছে। দাসত্ব-প্রথার নিষ্ঠুরতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এথেন্সের অধিবাসীরা ক্রীত-দাসদের সঙ্গে ব্যবহারে করুণার পরিচয় দিচ্ছে। প্লেটো ছিলেন অভিজাত বংশের। অভিজাতো তিনি বিশ্বাস করতেন—ক্রীতদাসদের মালিকও ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যেও মানুষকে জোর ক'রে হীন ক'রে রাখবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর বেজে উঠেছে। দুঃখের বিষয় প্লেটো অথবা তখনকার দিনে আর কেউ দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন নি। দাসত্ব-প্রথাকে তখনকার লোকেরা মনে করতো সমাজ ব্যবস্থার একটা প্রকাণ্ড অঙ্গ ব'লে। তাকে উঠিয়ে দেবার প্রশ্ন কারও মনে জাগে নি।

কিন্তু সব মানুষেরই আত্মা আছে—প্লেটোর এই আইডিয়া সে যুগের বুকে একটা আলোড়ন যে জাগিয়ে দিলো—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের আত্মার গরিমায় মানুষ বিশ্বাস করতে লাগলো। কিন্তু তবুও কেন দাসত্ব-প্রথা ভেঙে গেলে না? কারণ সমাজে তখনও এমন অবস্থা আসে নি যখন একটা বড়ো আদর্শকে আশ্রয় ক'রে বিপ্লব সম্ভব ছিলো। মানুষের নৈতিক ধারণায় পরিবর্তন ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বিপ্লব অনিবার্য—একথা ঠিক নয়। সমাজ একটা বিশেষ অবস্থায় না পৌঁছুলে বিপ্লব ঘটে না। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে নব-জীবনের স্পন্দন আরম্ভ হয়েছে মাত্র। মুক্তির প্রভাত তখনও দূরে। প্রথম প্রত্যুষের অতি ক্ষীণ আলোর আভাস তখন সবে মাত্র দেখা দিয়েছে। মানুষের আত্মার জানবার শক্তি অসীম—তার ভালোবাসার ক্ষমতা বিরাট—এই আদর্শ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে নরনারীর অন্তরে অন্তরে দীর্ঘ ছয় শত বৎসর ধ'রে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এরই মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়। প্লেটোর বাণীর মধ্যে মানবাত্মার যে জয়গান—খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যেও তাই। প্লেটোর প্রচারিত আত্মার তত্ত্বকে খৃষ্টধর্ম্ম দ্রুত আত্মসাৎ ক'রে নিলো। যীহুদার কৃষকদের দিনগুলি কেটে যেতো নিরুদ্বেগে। রোমসাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ ছিলো তাদের জীবন। দেশরক্ষার কোনই দায়িত্ব ছিল না তাদের। রোম থেকে শাসনকর্তারা আসতো—তাদের কেউ ছিলো একটু ভালো, কেউ বা ছিলো একটু মন্দ। এই শাসনকর্তারা কোথা থেকে আসে—রোমসাম্রাজ্যের রূপ কেমন কি ক'রে শাসনকার্য পরিচালিত হয়—যীহুদার কৃষকদের সে সব কথা জানবার কোনোই আগ্রহ ছিল না।

এইরকম একটা শান্ত আবহাওয়া খৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে ছিলো অত্যন্ত অনুকূল। মারামারি কাটাকাটির হাঙ্গামা নেই, রণদামামার গর্জ্জন নেই। মানুষ শান্ত আকাশতলে চাষ ক'রে চলেছে—হ্রদের জলে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছে—মানুষগুলি যেমন সরল, তেমনি শান্তিপ্রিয়। প্রেমধর্ম্ম প্রচার করবার এমন জায়গা কোথায়? এই আদর্শ-জগতে ক্ষমার ধর্ম্ম অনায়াসে প্রচার করা যেতে পারে। রোমের বাস্তব জগতে খৃষ্ট যদি প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করতে যেতেন—কেউ তাঁর কথা শুনতো না। সেখানে সৈনিকের রণ-হুঙ্কার আর বণিকের ধন-ঝঙ্কারের মধ্যে এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরিয়ে দাও—এ ক্ষমার বাণী কোথায় তলিয়ে যেতো।

বাস্তব জগতে খৃষ্টের বাণী কতখানি সুফল প্রসব করতে পারতো সেটা হোলো তর্কের বিষয়। খুব সম্ভব রোমের লোকেরা পাগল ব'লে তাঁকে পাগলা-গারদে পুরে রেখে দিতো। যীহুদার কৃষকদের সরল জীবনের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে খৃষ্টের প্রেমধর্ম্ম শক্তিসঞ্চয় ক'রে নিলো। এতদিন পরে মানুষ শুনলো একটা নূতন আদর্শের কথা—কোনো রকমের হেঁয়ালি নেই যার মধ্যে। প্রেমের, ক্ষমার, সাম্যের আদর্শ। মানব-সমাজকে বিচার করবার একটা আদর্শ পাওয়া গেল হাতে। খৃষ্টধর্ম্ম নীতির জগতে নূতন নূতন আদর্শের অবতারণা ক'রে জগতের উন্নতির পথ প্রশস্ত ক'রে দিলো। মানুষের আত্মার গৌরবময় রূপের কথা আমরা পড়েছিলাম প্লেটোর মধ্যে। খৃষ্টের বাণীর মধ্যেও আমরা শুনলাম মানবাত্মার অভ্রভেদী গরিমার বাণী।

খৃষ্টের কণ্ঠে মানবাত্মার যে জয়ধ্বনি আমরা শুনেলাম—সেই জয়ধ্বনিই নতুন ক'রে আমরা শুনেলাম ভলটেয়ারের আর রুসোর কণ্ঠে। স্বাধীনতার যে আদর্শ—সেই আদর্শের প্রেরণা ফ্রান্স পেয়েছিলো ইংরেজ দার্শনিকদের কাছ থেকে। কিন্তু ইংরেজ দার্শনিকদের প্রকাশ-ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন একটা আড়ষ্টতা আছে যার জন্য তাঁদের আইডিয়া বিশ্বকে সহজে আকর্ষণ করে না। এ বিষয়ে ফরাসীরা ওস্তাদ। ইংরেজ বেকন, ইংরেজ লক্ যে আইডিয়াকে জন্ম দিলে,—ফরাসী রুসো আর ফরাসী ভলটেয়ার তাকে বিশ্বময় দিলো ছাড়িয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গণতন্ত্রের জন্ম। তার প্রথম রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম আমেরিকায় আর ফরাসী দেশে। এই গণতন্ত্রের অভিযানই পরিশেষে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের মুক্ত করলো দাসত্ব-শৃংখল থেকে। অবশ্য খৃষ্টধর্মে গণতন্ত্রের যে মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই—আজিকার গণতন্ত্রের মূর্ত্তি তার চেয়ে পূর্ণাবয়ব হ'য়েছে। সে-দিনের সাম্যের আদর্শ আধ্যাত্মিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ভগবানের চোখে সবাই সমান—সকলের মধ্যে একই আত্মা—অতএব সবাই সমান—এই ছিলো একদিন গণতন্ত্রের বাণী। সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মার অস্তিত্ব সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে মানুষের বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকতে পারে এবং এই রকম বৈষম্য কোনমতেই থাকা উচিত নয়, একথা পরবর্ত্তী যুগের দার্শনিকেরা প্রচার করতে লাগলেন। স্বাধীনতার মূর্ত্তি ছিলো মেঘলোকে। সে মূর্ত্তি ক্রমশ মাটির দিকে অবতরণ করতে লাগলো। গণতন্ত্রের আদর্শ ছিলো আধ্যাত্মিক জগতে সীমাবদ্ধ। সে আদর্শকে রাজনীতির জগতে সত্য ক'রে তুলবার কল্পনা বহু মানুষকে পেয়ে বসলো। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে গণতন্ত্রের যে রূপ আমরা দেখলাম—তা অনেকটা স্পষ্ট। মানুষ রাষ্ট্রের শৃংখলকে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে—রাজনৈতিক জগতে অধিকারের দাবী করছে।

মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রাখবার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়েছে সেই কত শতাব্দী আগে—প্লেটোর যুগ থেকে। খৃষ্টের বাণীর মধ্যেও সাম্যের বাণী। রুসো-ভলটেয়ারের কণ্ঠেও বাঁধন-ছেঁড়ার বাণী। যুগের পর যুগকে অতিক্রম ক'রে মহাকালের পথ বেয়ে চলে আসছে মুক্তির জয়যাত্রা। আজও সে জয়যাত্রা ফুরিয়ে যায় নি। মানুষ আজও শৃংখলিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে সে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। ভোট দেবার অধিকার সকলের সমান। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে? জমির উপরে, খনির উপরে, কল-কারখানার উপরেও কি সকলের অধিকার সমান? লক্ষ লক্ষ চাষীর আর মজুরদের জীবনকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ঘর্ঘর শব্দে দিকে দিকে ধেয়ে চলেছে ধনকুবেরদের উদ্ধত জয়রথ। হাজার হাজার মানুষ আজও শৃংখলিত—দারিদ্র্যের শৃংখলে শৃংখলিত। এ শৃংখল যতদিন চূর্ণ না হচ্ছে ততদিন মুক্তির জয়যাত্রা থামবার নয়।

কিন্তু যে মুক্ত-জগতের কল্পনা প্লেটো থেকে আরম্ভ ক'রে গান্ধী পর্যন্ত সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে তার আবির্ভাব ঘটতে এত বিলম্ব কেন? কারণ ভাবী সমাজের যত সুন্দর পরিকল্পনাই কাগজে-কলমে আমরা করি না কেন—মানুষের চরিত্রের জটিলতার পাহাড়ে লেগে সে কল্পনা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাই রাষ্ট্রনীতির জগতে ভূয়ো দর্শনের অভিজ্ঞতা আছে যাঁদের তাঁরা কাগজে-লেখা ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে অল্পই মূল্য দেন—তা সে পরিকল্পনা যতই অনিন্দ্যসুন্দর হোক না কেন। বাদ্দোলি সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা—চৌরীচরার অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল। লোকগুলো উত্তেজনার মুখে পুলিশ ভেজে ফেলবে—এ কথা গান্ধীর মনে উদয় হয় নি। স্বরাজের পরিকল্পনা তো খুবই সুন্দর। কিন্তু মানুষের চরিত্র কি জটিল! জিন্না আর হক্ আর আম্বেদকর—এদের চরিত্রকে বুঝতে পারা দেবাদিদেব মহাদেবেরও অসাধ্য। এদের চালবাজি—এদের চরিত্রের জটিলতা স্বরাজের আবির্ভাবের পথে পদে পদে অন্তরায়ের সৃষ্টি করছে। রাজনীতির জগতে পাখীর মতো উড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। পদে পদে প্রবল থেকে প্রবলতর বাধাকে অতিক্রম ক'রে ঘাঁটির পর ঘাঁটি দখল করতে হবে। একটা আদর্শ বাস্তবে রূপ নেবার জন্য কেবল কতকগুলি ভালো লোকের সহযোগিতার অপেক্ষা করে, যেই উপযুক্ত লোকগুলি আসে অমনি আদর্শ বাস্তবে সত্য হয়ে উঠে—এ রকম মনে করা ছেলেমানুষী। আদর্শের বাস্তবমূর্ত্তিকে বহন করবার মতো নূতন সমাজের শক্তি চাই। একটা বড়ো আদর্শ পিছনে থেকে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলে মানুষের মনকে তৈরী করে। সমাজের কাঠামো জরাজীর্ণ হ'য়ে আছে—মানুষগুলি পুরানো সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বাঁধা—এরকম অবস্থায় হঠাৎ কতকগুলি ভালো লোকের আবির্ভাব কি সমাজ-ব্যবস্থার আমূল কোনো পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে? জোর ক'রে কি ফুল ফোটানো যায়—না কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো চলে? আদর্শ আমরা পেয়েছি—সাম্যের এবং স্বাধীনতার জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ। যুগের পর যুগান্তরের মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ দলে দলে রূপ নিয়ে ইতিহাসের বুকে শতদলের মতো জেগে উঠছে। প্লেটো আর খৃষ্ট, ভলটেয়ার আর রুসো—লেনিন আর গান্ধী—এঁদের বাণীকে আশ্রয় ক'রে মুক্তির রক্তপদ্ম পাঁপড়ির পর পাঁপড়িকে মেলে ধরছে মহাকালের পায়ে।

ভাঙা দেউল

(গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনরেন্দ্রকুমার পাল

.....শৈশবের কোন্ এক অখ্যাত আনম্র দিনে কত সমারোহ ও কোলাহলের মাঝে, কত আবরণ ও আভরণের বৈচিত্র্যে জড়িত হয়ে, অপরিচিত একটি ছেলের ছোট্ট মুঠির মধ্যে রেখেছিল অঞ্জনা আপনার ছোট্ট হাতখানি। সহস্র কৌতুক ও কৌতূহলের মধ্যে ছিল মৌন। কাকলী ও কবিতা ওঠেনি ফেনায়িত হ'য়ে। চন্দন-চর্চ্চিত ললাট শুধু শুভ্রই ছিল—কুংকুমের রক্তাঙ্ক পায়নি প্রকাশ। কয়েকটি মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন ক'রে সমস্ত জীবন ছিল সঙ্কুচিত—সে-কথাও ছিল তা'র ধারণার একান্ত বাইরে। শুধু বিস্ময়ে—দৃষ্টি-প্রতিহতকারী গাঢ় অন্ধকারের মত নিছক বিস্ময়ে ছিল নিস্তব্ধ, আর হাতের মধ্যে ও হাতের গোড়ায় যা কিছু পেয়েছিল, সব কিছুকেই খেলার সরঞ্জাম ও সাথী হিসাবে নিয়েছিল মেনে।

তারপর জীবনে এল বেশ একটা প্রাচুর্য্য ও সম্ভাবের পরিবেশ। মাঝে মাঝে কখন ছেলেটি এসে থাকত তাদের বাড়ীতে। তা'র সলজ্জ ও ভীত আননে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের চেষ্টায় অঞ্জনা দিত তাকে কত লজেন্স ও বিস্কুট ঘুষ। খেলাঘরে বসে দু'জনে মিলে পরণের কাপড় ও গায়ের জামা খুলে খেলার পুতুলগুলিকে সাজাবার জন্যে করত কত ব্যর্থ চেষ্টা। দুপুরবেলা ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি ক'রে আনত আম ও কুলের আচার। ভাগাভাগি করতে গিয়ে উষ্ণ বাগ্‌বিতণ্ডায় মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে পড়ত ধরা। সাথীটি আবার চলে গেল—কিছুদিন পরে। অঞ্জনা এখন একলা। এখন শুধু খেলাঘর আর গাছের দোলনার মধ্যেই থাকত সে সীমাবদ্ধ। ভাঁড়ারের দিকে এখন বড় একটা লোভ যেত না। শুধু কোন সময়ে ফাঁক পেলে মায়ের সিঁদুরের কৌটা থেকে খানিক বেশী ক'রে সিঁদুর নিয়ে কপালে লেবড়ে, দু'পায়ে খানিক আলতা ঢেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনেই পরম কৌতুকে হাসিতে ভেঙে পড়ত।

তারপর একদিন—যেদিন আবার সকলে মিলে তাকে আগেকার মত শাদা ও সাধারণ ক'রে তুলল—কপালের সিঁদুর দিল মুছে, হাতের লোহা নিল খুলে, সেদিনও সে সমস্তকে সে নিতান্ত ছেলেমানুষীর মধ্যে দিয়েই গ্রহণ করেছিল। হয়ত মায়ের আর্ত্তনাদ ও পিতার চোখের জল দেখে ক্ষণিকের জন্যে তারও ঠোঁট দুটি উঠেছিল ফুলে—কিন্তু শৈশবের অসংখ্য চঞ্চল মুহূর্ত্তের মধ্যে তার স্থান কতটুকু? সেই সঙ্গে শুধু একটা জিনিষ সে আবিষ্কার করল—তার নতুন সাথীটি অনেক দিন হ'ল তাদের বাড়ীতে ত আর আসেনি? তবে কি আসবে না? অবশ্য দিনের বেলার নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে বিশেষ ক'রে পড়ত না মনে। রাতের বেলা ঘুমোবার আগে মনে পড়ত—মনে পড়ত খেলাঘরের আসবাবপত্রের হিসাব করতে করতে সেই ভীরু মুখখানি। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? পর মুহূর্ত্তেই এসেছে ঘুম—স্নিগ্ধ শান্ত ঘুম। ঘুমের তলায় সে ভুলে গেছে সব—ভুলে গেছে তার খেলাঘর, ভুলে গেছে তার সাথী।

শৈশব গেল—এল কৈশোর। পূবে আকাশে উঠল প্রভাতী তারা। চেতনার মূলে বিচ্ছুরিত হ'ল আলো ও আঁধার জড়ান একটা পাংশুটে ছায়া—একটা প্রেতায়িত ছায়া। বুদ্ধি দিয়ে ঠিক ধরতে পারে না, প্রকাশ করতে পারে না। শুধু একটা সন্দেহ জাগে। শৈশবের গোটাকতক অর্থহীন দিনের মধ্যে যে সমস্ত জীবন সমাধিস্থ হয়ে গেছে, একথা সে কেমন করে বিশ্বাস করে?

কিন্তু প্রভাতী তারা, সেও সূর্য্যোদয়েরই বার্ত্তাবাহক। সে ত শুধু বলে যায়—আর দেরী নয়, প্রস্তুত হও রৌদ্র-দগ্ধ নগ্ন-জীবনের জন্যে। দেখতে দেখতে অঞ্জনারও এল যৌবন—দিক থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ল বাণী। আর আলোকের সেই দীপ্ত প্রভায় অঞ্জনা চিনল নিজেকে। বুঝল নেপথ্যেই শেষ হ'য়ে গেছে অভিনয়। তাই পর্দ্দা যখন উঠল, তখন অভিনেতা নেই, অভিনেত্রী নেই, অনুভূতির খেলা নেই—আছে শুধু আলো আর আলো, পাদপ্রদীপের উলঙ্গ আলোয় ঔজ্জ্বল্যের ব্যঙ্গ-অট্টহাস্য। আর সেই সঙ্গে এসে মিশছে নেপথ্যে অভিনীত নাটকের শেষ মর্ম্মান্তিক সুরের রেশ—সে সুর যেন পাদপ্রদীপের আলোর সামনে মাথা কুটে বলছে—ওগো নিভিয়ে দাও আলো, ফেলে দাও পর্দ্দা।

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার সাথে সাথেই যাকে প্রার্থনা জানাতে হয় মৃত্যু-দেবতার পায়ে, সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথেই যার আসে সূর্য্যাস্ত, আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে যাকে পড়ে থাকতে হবে সমুদ্রতীরে, সে কেমন করে না বলে পারে—ওগো নিভিয়ে দাও আলো, ফেলে দাও পর্দ্দা।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এমন দুঃসহ ব্যর্থতার মধ্যে হঠাৎ নিজকে আবিষ্কার ক'রেও অঞ্জনা চোখের জল ফেলেনি, দীর্ঘশ্বাসেও ফুলে ওঠেনি। শুধু অভিমান, জীবনের বিরুদ্ধে দারুণ অভিমানে উঠেছিল ফেনিয়ে—পর্ব্বত-দুহিতা যেমন ফেনিয়ে ওঠে সম্মুখের নিশ্ছিদ্র পাহাড়ে প্রতিহত হ'য়ে। রক্তোচ্ছ্বসিত যৌবন, ব্যর্থ যৌবন যেন নিজেকেই নিজে হত্যা করতে চাইত—ইচ্ছা হ'ত প্রাণপণে চেপে ধরে আপনার টুঁটি। কি প্রয়োজন, কোন্ সার্থকতা এ জীবনে? পথে পথে যে জীবন শুধু হাহাকার করে বেড়াবে—কি-বা তার মূল্য? ভাবত—কত ভুল, কত অসংখ্য ভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই না চলে জীবন—তবেই না সে সুন্দর? কত ভাঙা-গড়া, কত ওঠা-পড়া—কত কিছু স্বীকার করে, কত কিছু অস্বীকার করে, তবেই তো সে সার্থক। তবেই ত কত সম্ভাবনা, কত নব-নব সম্ভাবনা নেবে রূপ, কত অভিনবতা থেকে আরও অভিনবতার মধ্যে হবে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, জীবনের কত স্বপ্ন ধরার ধূলায় এসে রাখবে পা। কিন্তু অঞ্জনার সে উপায় কই?

আস্তে আস্তে অঞ্জনা সবদিক থেকে নিজেকে নিয়ে এল গুটিয়ে। স্কুল অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সেলাইয়ের সরঞ্জাম রাখল তুলে, ফুলদানি আর আয়নাগুলো ফেলল সরিয়ে, গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা দিল ছেড়ে—হঠাৎ যেন কয়েক দিনে অনেকখানি বুড়িয়ে গেল। আকাশ—হ্যাঁ যে-আকাশ

একদিন ছিল সাত ভাই চম্পা ও ছোট্ট বোন পারুলের খেলাঘর, আজ যেন তা' বেদনার নিঃসীম পারাবার। অন্ধকারে আজ সংকেত নেই, আছে শুধু বিভীষিকা। আলোর প্রাচুর্য্য, বাতাসের সাবলীলতা, নদীর কলোচ্ছ্বাস, সব কিছুই যেন কুটিল ও কদর্য্য। প্রকৃতির কাছ থেকে, বাইরে মানুষের কাছ থেকে অঞ্জনা তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এল আপনার ছোট্ট ঘরের নিবিড় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, আপনার বেদনা-ঘন ভাঙা পক্ষপুটের নীচে।

কিন্তু নিঝুম রাতে নিরালা পৃথিবীর সাথে যখন একান্তে হয় কানাকানি—শিরায় শিরায় যখন আসে রক্তের সাপিল গতি, অন্তর যখন মুখর হ'য়ে ওঠে অসংখ্য প্রশ্নে, ঠোঁটের ডগা আর হাতের আঙুল যখন উগ্র হ'য়ে ওঠে তীক্ষ্ন উন্মুখতায়—তখন অঞ্জনার শুধু ভয় হ'ত, দারুণ ভয়ে সে ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠত। সে কি পাগল হ'য়ে যাবে? আত্মহত্যা করবে?

বর্ষা আসে বিরহ-বিধুরা যক্ষবালার নিভৃত বেদনার গোপন লিপি নিয়ে—এলোকেশ আর চোখের জলে ছেয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবী। অঞ্জনা শুধু আড়ালে বসে কাঁদে, আর মৌন প্রার্থনা জানায়—ওগো আমাকেও কি ঢেকে নিতে পার না তোমার নিতল কালো বুকের মধ্যে?

আসে শরৎ রূপালি শিশির, টলটলে নদী, পাখীর গান আর সোনালী রোদ নিয়ে। অঞ্জনাকে কে যেন জোর করে টেনে নিয়ে আসে বাইরে। শিউলিতলায় ঝরা ফুলের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে—যাবার বেলায় নিদারুণ বেদনায় কে যেন কেঁদে কেঁদে চলে গেছে ঘাসের ওপর দিয়ে, আর পরম অভিমানে শিউলিতলায় ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে তার কত আদরের মালা। অঞ্জনা দু'একটা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে নাকের কাছে ধরে—বুঝি বা সেই অভিমানিনীর হাতের গন্ধ লুকিয়ে আছে এর মধ্যে?

এল শীত—উদাসী সন্ন্যাসী এল তার নিষ্ঠুর নিস্পৃহতা নিয়ে। চারিদিকে শুধু সব হারানো সব ঝরানোর পালা। দয়া নেই, মায়া নেই—খালি ফেলে দেওয়া, আর ফেলে যাওয়া—শুধু বিদায়ের সুর। অঞ্জনা বলে—ওগো নির্দ্দয় আমাকেও কেন দাও না ঝরিয়ে পৃথিবী থেকে। কোন ক্ষতি নেই ত তাতে।

ঝরে যাওয়ায় ক্ষতি নেই, কিন্তু ভরে ওঠাতেই লাভ। তাই বসন্ত আসে রূপ ও রসের বন্যায় ভেসে—উর্বশী ওঠে সমুদ্রের তলদেশ থেকে। গাছের শাখায় শাখায় রূপায়িত হ'য়ে ওঠে মানুষের নিভৃত বাসনা, কোকিলের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে আদিম সুর নদীর জলে আসে জীবনের অকৃত্রিম স্পন্দন। মৌমাছির গুঞ্জনে আসে তন্দ্রা, প্রজাপতির ডানায় জড়িমা। রক্তে ভাসে সপ্তশ্ব বাঁধন, শিরায় শিরায় তৃষ্ণা। অঞ্জনাও জাগল—ঠিক জাগল নয় কে যে জোর করে জাগিয়ে দিল—বেদনার জড়তা ও ঔদাস্যের নিষ্প্রভতা ছেড়ে জাগল মদালস মায়ার মধ্যে। জীবনের ওপর এল মায়া—আঁধারে এল জোয়ার। সে জোয়ারে সে ভাসতে চায় প্রতিটি তরঙ্গ তার নেচে নেচে আগিয়ে যেতে চায়। চায় শুভ্র ফেনপুঞ্জের মাথামাখি করে মাতাল হ'য়ে উঠতে। কিন্তু—

কিন্তু যখনই আবার সচেতন হয়ে ওঠে আপনার নিজ্জিত শক্তির অসহায়তায়, যখনই মনে পড়ে অন্ধকার কারাগৃহের মধ্যে উপায়হীনতার কথা—তখনই কেমন যেন সে মৃতপ্রায় হ'য়ে ওঠে। শত শত বর্ষের অচলায়তনকে ভাঙবার শক্তি ত তার নেই। তাই আবার দাখিনের জানলা দেয় বন্ধ করে—দখিনা-বাতাস সে চায় না। রজনীগন্ধা—হ্যাঁ, নির্লজ্জ রজনীগন্ধার ঝোপগুলি তুলে ফেলে তুলসী-চারায় ভরিয়ে দেয় সমস্ত উঠান। সকালে উঠে শিউলিতলায় গিয়ে কি লাভ? বৈশিষ্ট্য-হীন কতকগুলি শাদা ঝরা-ফুল ছাড়া ও আর কিছুই নয়। বিছানা ছেড়ে প্রভাত-সূর্য্যকে করে প্রণাম, কিন্তু প্রাপ্তির প্রার্থনায় নয়—রিক্ততার মাঝে যেন বিত্তের দুরাশা না জাগে, এই আশায়।

অঞ্জনার এই ব্যর্থ জীবনের রুদ্ধ বহিঃপ্রকাশকে সেদিন স্নেহ-মমতার প্রলেপ দিয়ে শান্ত দেবার মত এক বাবা ছাড় আর কেউ ছিলেন না। মা অনেক দিন আগেই চলে গেছেন তাই সবকিছু বাবাকেই সহ্য করতে হয় নীরবে। কিন্তু কি ব বলবেন তিনি? কি সান্ত্বনাই বা দেবেন? নিতান্ত সখের বশে যে ভুল তিনি একদিন করেছেন, তার বিরুদ্ধে কি বা বলবার থাকতে পারে? তাই শুধু নির্ব্বাক বেদনায় সব কিছু সহ্য করেন, আর নিরালায় বসে দিন গুনেন সেই শেষের দিনটির আর কত দেরী।

কিন্তু অঞ্জনা যে দিন বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে বসল, অর্থাৎ যে দিন হাতের সোনার চুড়ি দু'গাছি খুলে ফেলে দিয়ে, শাড়ী ছেড়ে তাঁরই একখানা ধুতি পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল—পিঠে এক মাথা রুক্ষ এলো চুল ছড়িয়ে গঙ্গাজলের ঘটি হাতে করে তাঁর আহ্নিকের জায়গা করে দিতে এল—সে দিন তিনি শুধু প্রার্থনা করেছিলেন হে ঈশ্বর এই মুহূর্ত্তে কি তুমি আমায় অনুভূতিহীন করে দিতে পার না? এমন কি কোন প্রলয় আসতে পারে না, যাতে তাঁর অস্তিত্বটুকু টুকরো টুকরো হয়ে মিশে যায় ধুলো-বালির সঙ্গে?

বালকের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে তিনি শুধু অঞ্জনার হাত দু'টি চেপে ধরেছিলেন। আর কি জানি কেন, অঞ্জনাও সেই প্রথম তার বাবার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল অঝোর ধারে—হয়ত তার রুদ্ধ বাষ্প প্রথম পেল প্রকাশের উন্মুক্ত অবকাশ।

বাষ্পাকুল কণ্ঠে বাবা বললেন—স্বপ্নেও তা মা কোনদিন ভাবতে পারি নি যে, এমন দুর্ব্বিষহ অভিশাপ আমি নিজে হাতে এনে দিয়ে যাব তোর জীবনে।

ছিঃ কি যে তুমি বল বাবা—নিজেকে সামলে নিয়ে অঞ্জনা বললে—বাঙালীর ঘরে বিধবা মেয়েরা কি বেঁচে থাকে না?

—থাকে কিন্তু সে বাঁচা যে মৃত্যুর চেয়েও করুণ।

অঞ্জনা আর কোন উত্তর দেয় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে বিষের পেয়ালাকে আরও ফেনিয়ে তোলা। তাই এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে বলে—আচ্ছা বাবা, চল না কেন কোথা থেকে কিছুদিন ঘুরে আসা যাক। দেহ ও মন দুই ভাল হ'বে। কিন্তু কোন শহর বা নগরে নয়—কোন পাহাড়ী জঙ্গলের দেশে। ধর্ম্ম ও সমাজের শৃঙ্খলভারে জীবন যেখানে জীবন্মৃত নয়। শুধু সবুজ আর ধূসরের দেশ, নগ্নতা আর

বিশৃঙ্খলার দেশ—সবকিছু যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। সকালে উঠে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে দেখব সূর্যোদয়। সূর্য্যাস্তের সময় ঘুরে বেড়াব বনের আঁকা-বাঁকা পথে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিমিকি করতে থাকবে দিনের শেষ আলো—ভীরু কাঠবিড়ালীর দলকে চমকে দিয়ে। হয়ত কোন সময়—কোন ভাবপ্রবণ মুহূর্ত্তে গহন বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভাবব—ছেলেবেলাকার গল্পের সেই বনদেবী বুঝি এই বনের মাঝেই আছে লুকিয়ে। পাহাড়ের গর্ব্বোন্নত স্থির গাম্ভীর্য্যের দিকে তাকিয়ে মনে হবে—যে জীবন নিয়ে মানুষের এত সমারোহ, হীনচিত্ততায়, স্বার্থপরতায়, আবিলতায় তা কতদূর ক্লেদাক্ত। আর সেই সঙ্গে দেখব প্রকৃতির এই পরিপূর্ণ সম্ভারের মাঝে মিশে আছে যে অসভ্য জংলী ছেলে-মেয়ে কাঁটি—হেসে-খেলে, নেচে-গেয়ে ব'য়ে চলেছে যা'রা তাদেরই প্রিয় সাথী ছোট্ট ঝরণাটির মত। তাদের কাছ থেকেই শিখে আসব মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, জেনে নেব জীবনকে উপভোগ করবার সহজ পথটি।

অঞ্জনা যে কেন আজ বন আর জংগলে ছুটে যেতে চায়, লোকালয় ছেড়ে কেন যে সে আজ নির্জ্জনতা চায়, এ ত কোন অভিনব প্রশ্ন নয়। মানুষের কাছে সে আজ লজ্জা পায়, মানুষকে সে আজ ঘৃণা করে, তাই চায় নির্জ্জনতা। তা ছাড়া বাঁচারও যার প্রয়োজন নেই, মরেও যার লাভ নেই—কি হ'বে তার মানুষের সংস্পর্শে থেকে? দীর্ঘ মরুভূমি শুধু পড়ে আছে—উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন, অর্থহীন। মাটির কুসুম সেখানে কোন দিনই ফুটবে না, কোন পথিকের পদচিহ্ন সেখানে পড়বে না কোন দিনই। তবু বাঁচতে হ'বে, তবু বৃক্ষ-লতা, নদী-সমুদ্র সকলকে ডেকে বলতে হ'বে—ওগো আমি আছি, আমি আছি। আর সে আহ্বান বালির বুকেই শুধু আছাড় খেয়ে মরবে—কোন প্রতিধ্বনি জাগাবে না, কোন পথিক আসবে না। অসীম আকাশের নীচে আপনার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বালুকারাশিতে জাগাবে শুধু ঘূর্ণি, তপ্ত হাওয়া শুধু ঘুরে মরবে কেঁদে কেঁদে।

সহসা বাবা কোন উত্তর খুঁজে পান না। একটু পরে মেয়ের মাথায় রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন—পাহাড় ও জঙ্গলের ওপর আমারও লোভ বড় কম নয় মা, তবু আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই যেতে পারলাম না। বহুদিন আগে আরও একজন ঠিক এই প্রস্তাবই করেছিল। নীল আকাশ আর ধূসর পাহাড়ের চুম্বনচিত্র, গহন বন আর গভীর অন্ধকারের মিলন-রহস্য তারও কল্পদোলায় দুলে দুলে উঠেছিল। জানিস মা, সে কে? সে তোর মা। প্রথম যেদিন সে আমার ঘরে এসেছিল, সেদিন, যৌবনের সেই প্রথম টলটলে দিনগুলিতে সে চেয়েছিল প্রকৃতির একান্ত নিভৃত বিপিনে নিঃসঙ্কুচিত ও নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে। মানুষের শাসন নেই, সমাজের বাঁধন নেই, শুধু মুক্তি—অপার অফুরন্ত মুক্তি। আজ আবার তোর মুখেও সেই প্রস্তাব? শুধু পার্থক্য এই—একজন চেয়েছিল প্রাপ্তির রোমাঞ্চে রঙীন হ'য়ে উঠতে, আর একজন চাচ্ছে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে লজ্জা ও গ্লানি ঢাকতে।

গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার বলতে থাকেন—বহুদিন আগে পিছে-ফেলে-আসা সেই দিনগুলি—স্বপ্নের মত মায়াময়, মহুয়ার মত আবিষ্ট সেই দিনগুলি, যেদিন শুধু সাধনা চলেছে তোকে পাবার জন্যে পৃথিবীতে আলো বাতাসের মাঝে, দ্বৈত জীবনের মিলিত প্রার্থনা যেদিন কেঁপে কেঁপে চলেছে দেবতার সিংহাসন পানে, তারপর যেদিন দেবতা দিলেন বর—তোকে পেলাম বুকের ওপর, মর্ম্মের ছন্দোময়ীকে পেলাম বাস্তবের শব্দময়ীরূপে, জানিস্ মা, সার্থকতার কি উজ্জ্বল সূর্য্য সেদিন ফেটে পড়েছিল আমাদের ওপর। কিন্তু জানিনে—বাবা একবার দীর্ঘ নিশ্বাসে কেঁপে উঠলেন—কার অভিশাপে যে আবার নিজের ছন্দকেই নিজ হাতে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলাম—

ও-যাঃ তোমার মাথার দিককার জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি, কি ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ—অঞ্জনা চোখের জল চাপবার জন্যে ছুটে চলে যায় জানলার কাছে।

জানলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে গরাদের ধারে বাইরের দিকে চেয়ে বলে—না বাবা, না, তোমার ছন্দ ঠিক ছন্দোবদ্ধই আছে, একটুও নষ্ট হয় নি।

মুখে বললেই কি হয় মা—বাবা কান্নার মত করুণ হাসির সংগে বলেন—সমস্ত কবিতাটাই যে আজ কতকগুলো অর্থহীন বিকৃত শব্দের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়, একথা কি আজও আমার বুঝতে বাকি আছে মা? তোর ওই ঊষর ললাট, মৃত হাসি, আকুতিভরা দৃষ্টি—এসব দেখেও কি স্বীকার করতে হবে যে, আমার কবিতার ছন্দ নাকি ঠিকই আছে, একটুও গরমিল হয় নি।

বাবা—অঞ্জনা চীৎকার ক'রে ওঠে ভীত পক্ষীশাবকের মত দুর্ব্বল গলায়।

ভয় কি মা, কিচ্ছু ভয় নেই—বাবা অঞ্জনাকে কাছে ডাকেন—জানালাটা বন্ধ করিস্‌নে, খুলেই রাখ। কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। তুই শুধু আমার কাছে এসে বস্।

অঞ্জনা কাছে এসে বসলে তিনি আবার বলতে থাকেন—আগ্নেয়গিরির মুখ যখন আজ খুলেছে, তখন ভেতরকার ছাই-ভস্ম, কাদামাটি যা' কিছু আছে সব বেরিয়ে যাক্—একটু হাল্‌কা হই, ভাল ক'রে নিশ্বাস ফেলে একটু শান্তি পাই। আজ শুধু সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে চাই, কোন লজ্জাই আজ নেই যে, প্রথম যেদিন তোকে খেলাঘর থেকে ধরে এনে জীবনের রাজ্যপাটে রাজরাণী ক'রে দিয়েছিলাম, সেদিন স্বপ্নেও তো ভাবতে পারিনি যে, আমার সেদিনকার অভিষেক-বারি আজ তোর জীবনে কি দুর্ব্বিষহ অভিশাপ বহন ক'রে নিয়ে আসবে। তাই সব কিছুর আগে আজকের এই জ্যোৎস্নাময়ী শর্ব্বরীকে সাক্ষী রেখে তোর হাত দুটি ধরে খালি বলতে ইচ্ছা করে—ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্ অঞ্জনা তোর এই বুড়ো বাপকে।

চুপ কর বাবা, চুপ কর—অঞ্জনা বাবার বুকের মধ্যে মুখ চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ে—তোমার পায়ে পড়ি চুপ কর।

বাবা চুপ করেন। চুপ ক'রে মেয়ের মাথায় হাত রেখে খোলা জানলা দিয়ে চেয়ে থাকেন বাইরের দিকে। বাইরে তখন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় প্রকৃতির নগ্ন মূর্ত্তি। কিন্তু সে-নগ্নতার মধ্যে আজ কোন উষ্ণতা নেই, কোন সংকেত নেই—নিতান্ত

মৃত, নিতান্ত শুভ্রায়িত। শুভ্র বৈধব্যের হিম-শীতল দীন মূর্ত্তি। শুধু ঝরে পড়া—আশাহীন ঔদাস্যে ঝরে পড়া।

অস্থির হ'য়ে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। মেয়ের মাথাটা তুলে ধরে বলেন—দে মা জানলাটা বন্ধ ক'রে দে। আর ভাল লাগছে না।

চোখ মুছে অঞ্জনা জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বাইরের দরজাটাও দিয়ে যায় ভেজিয়ে। তরল অন্ধকারে ভ'রে ওঠে সমস্ত ঘরটি। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা শুয়ে পড়েন বিছানার ওপর—আঃ—এই ভাল, খাসা নরম অন্ধকার। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। একটুখানি ঘুম, অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে একটুখানি ঘুম নিতান্তই প্রয়োজন। কেমন যেন একটা বেদনাদায়ক যন্ত্রণায় টন্ টন্ করছে সমস্ত দেহ মন মস্তিষ্ক। এ অবস্থায় ঘুম ছাড়া অন্য উপায় নেই। ঘুম, ঘুম—গাঢ় উত্তপ্ত ঘুম। বাবা ঘুমিয়ে পড়েন।

অঞ্জনা নিজের ঘরে এসে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে জানলার পাশে। বাইরে জ্যোৎস্নার বন্যা ভেঙে পড়েছে ফেনায় ফেনায়। কিন্তু ওরই মাঝে কে যেন কাঁদছে, না?—অঞ্জনা উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে—চাপা কান্নায় কে যেন ফুলে ফুলে উঠছে? হ্যাঁ বাইরের জ্যোৎস্না কাঁদছে শুধু উত্তরীয়ের অন্তরালে শূন্যতার বেদনায়, ভরা জ্যোৎস্না কাঁদছে তার দ্বারে মাথা রেখে—খুলে দাও দ্বার, প্রবেশের দাও অধিকার।

বাইরের জ্যোৎস্না কাঁদছে শূন্যের বুকে—অঞ্জনা ভাবল—কাঁদুক। সব ব্যথা সে ভুলে যাবে আলোর মোহনায় মিলিত হ'য়ে। কিন্তু অঞ্জনার মাঝে যে জ্যোৎস্না কাঁদছে, দিনে রাতে প্রতি মুহূর্তে যে মাথা কুটে বলছে—ওগো খুলে দাও দ্বার, ব্যর্থ জীবনের সে সকরুণ ক্রন্দন সার্থক হবে কোন্ বহ্নসমুদ্রের অতলে? তবে অঞ্জনার জীবনে আলোর বাণী কি চিরদিনই থাকবে অনুচ্চারিত? পুলকিত কৌমুদীরাশিতে কোনদিনই কি সে হিল্লোলিত ও কল্লোলিত হ'য়ে উঠতে পারবে না? আলোর জোয়ার শুধু রুদ্ধ দ্বারে আছড়ে আছড়ে পড়বে?

অন্যান্য রাতেও ঠিক এইভাবে জানলার ধারে নিশ্চল হ'য়ে বসে অঞ্জনা ভাবে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, না?... ওই যে তারাগুলো, সব যেন চেয়ে আছে তারই দিকে করুণ মিনতিভরা দৃষ্টিতে। কেন তারা এমন ঠাণ্ডা নিরীহ করে তোলে তার নিভৃত অবসরটুকু, আর নিরালা... অসীম আকাশ সে পাবে না, পাবে না পক্ষ মেলে ... সূর্যের সোনালী রোদ, ফাগুনের গোলাপী বাতাস। নীল সমুদ্রের বিস্তৃত সৈকতে দাঁড়িয়ে জানবে না জীবনের উদ্দাম ... ফেনিল পরিচয়। বিশ্বপ্রকৃতি থাকবে অবরুদ্ধ। কি দোষ ... কেন এ কঠিন প্রায়শ্চিত্ত?

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অঞ্জনা শুধু বিব্রত হ'য়ে ওঠে নানারূপ অসংলগ্ন ... চিন্তায় ... তারই মাঝখান দিয়ে হু হু ক'রে ... চলে ... বেদনা ও ব্যর্থতার নব নব রূপ নিয়ে।

বাবা কিন্তু ... ক্রন্দন প্রলাপে কেমন যেন দৃঢ় হয়ে ওঠেন এক অশরীরী সংকল্পে। ভাবেন—একটা কিছু—হ্যাঁ যা' হোক একটা কিছু করতে হবে অঞ্জনার জন্যে। নব জীবনের প্রার্থনাকে তিনি থাকতে দেবেন না অপরিপূর্ণ। আলোর সমারোহ কাঁদবে না শুধু ব্যর্থ যাচ্ঞা নিয়ে। সমাজ ধর্ম্ম সবকিছুতে ঘৃণাভরে উপেক্ষা ক'রে যা' হোক একটা কিছু করতে হ'বে অঞ্জনার জন্যে। অঞ্জনাই তাঁর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। রুদ্ধ উৎস উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে উদ্বুদ্ধ ও উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে অতীত তার ছিল না, সে শুধু বর্ত্তমানের—ঠিক আজকের এই মুহূর্ত্তের। স্মৃতি তার নেই, শৈশব তার ছিল না। উর্ব্বশীর মতই আজকের এই একটি মুহূর্ত্তে সে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপুষ্ট। তাই তার জীবনে আবার আসবে চেলী ও চন্দন, সানাই ও সম্ভাষণ। কোন লজ্জা, কোন সঙ্কোচ নেই, কোন ভয় নেই—সে যে আজকের, এই মুহূর্ত্তের। নারী জীবনের সার্থকতা উদ্‌যাপনে নয়, উদ্‌ঘাটনে।

আপনার আবিষ্কারে আপনিই উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন—হ্যাঁ অঞ্জনার জীবনে আবার আসবে চেলী ও চন্দন, হুলুধ্বনি ও শঙ্খরব, সানাই ও সম্ভাষণ।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার শিথিল অসহায়তা জাগে—কিন্তু অঞ্জনা রাজী হবে ত?

অঞ্জনা রাজী হবে ত?—বাস্তবিক এও এক মহা সমস্যা। রক্তে রক্তে যার ছড়িয়ে আছে সংস্কারের অন্ধকার, আপনাকে অস্বীকার করাতেই যার ধর্ম্ম—সে কি পারবে এত সহজে মুক্ত হতে?—আত্মহত্যা সে অনায়াসে করতে পারে, আত্মোপলব্ধি তার কাছে অধর্ম্ম। এত শীঘ্র কি সে কখনও পারে শুধু আপন বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রে নির্ভীক আত্মনির্ভরশীলতায় দীপ্ত ও দৃপ্ত হয়ে উঠতে?

কতদিন কতভাবেই বাবা চেষ্টা করেন কথাটা অঞ্জনার সামনে পাড়বার জন্যে, কিন্তু কি রকম এক দুর্ব্বলতায় আবার চেপে যান। ভাবেন—আচ্ছা, এখন থাক্, পরে অন্য সময় দেখা যাবে, এখনি বলে ফেললে অঞ্জনা হয়ত কি মনে করবে। কিন্তু চোখে মুখে তাঁর যে ব্যগ্র ঔৎসুক্য ছড়িয়ে পড়ে অঞ্জনার সামনে নিজেকে প্রকাশ ক'রে সহজ করবার জন্যে, তাই দেখে অঞ্জনা হয়ত বলে—কি বাবা, কিছু বলতে যাচ্ছিলে? বল। চেপে গেলে কেন? কোন ভয় নেই তোমার। নির্ভীক হাসির ঔজ্জ্বল্যে চোখ দুটি তার চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে—তোমার মেয়েকে তুমি নিজেই চিনতে পারলে না বাবা!

না মা, কিছু বলতে যাচ্ছিলাম না—আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বাবা বলেন—শুধু ভাবছিলাম মানুষের প্রবল পরিচয় নিয়ে কেন মানুষের মাঝেই থাকতে হবে একেবারে পরিচয়হীন হয়ে? অধিকারের শক্তি নিয়েও কোন কিছুতে থাকবে না অধিকার?—এ-বিচার ঈশ্বরের, না ঈশ্বরকে যারা সৃষ্টি করেছে তাদের?

ছি বাবা—ছোট্ট মেয়ের মত মাথার চুলগুলি দুলিয়ে অঞ্জনা বলে—তুমি বড্ড যা' তা' ভাব। কি দুঃখ আমার বল ত? তোমারই বা দোষ কিসের? বিয়ে দিয়েছিলে, বরাতে আমার সইল না—ব্যাস, আর কি? বরং এখন কত নিশ্চিন্ত—কোন ঝঞ্ঝাট নেই, কোন উপদ্রব নেই। বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলবার ঝক্কি... অভ্যাস নেই। এখন কত ব্যাপ্ত আমার আকাশ ও পৃথিবী।

জানি মা এখন কতদূর ব্যাপ্ত তোর আকাশ ও পৃথিবী—বাবার দৃষ্টিতে দূরের বেদনা—কিন্তু শুধু এমনি করেই কি পারবি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে আমার কাছ থেকে? শুধু উচ্চারিত 'না' দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখবি? তা কি কখনও হয় মা, তুই যে আমার মেয়ে।

বেশ বেশ—কৃত্রিম অভিমানে অঞ্জনার ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে—এখন চুপ কর ত দেখি। খালি দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস। একটা কাজের কথা কইবার যদি উপায় আছে।

কাজের কথা? —বাবার মুখে একটু ক্ষীণ হাসি জাগে—বল্ কি তোর কাজের কথা।

কি আবার? —গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে অঞ্জনা বলে—এই ত কটা দিন পরেই মায়ের বার্ষিকী, তার কি বন্দোবস্ত করলে?

—কি আর করব বল? স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজা যে বিস্মৃতির দানে।

রাখ ত তোমার যত সব আজগুবি কথা—অঞ্জনা আবহাওয়াটাকে তরল করবার চেষ্টা করে—এবার কিন্তু মায়ের বার্ষিকী স্মৃতি-দিবসটিকে আমি রীতিমত জাঁকাল না ক'রে ছাড়ব না।

—বেশ মা, এবারকার সবকিছু ভার তোর ওপর। এবার আমি নৈর্ব্যক্তিক। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে আশীর্ব্বাদ করব মৃতের পূজা ক'রে মৃত্তিকার বুকে যেন সার্থকতার কাঁপন জাগাতে পারিস্।

হ্যাঁ মৃত্তিকার বুকে কাঁপন জাগাতে হবে—যে মৃত্তিকার বুকে মূর্চ্ছিত হ'য়ে থাকে কত যুগযুগান্তের আশা ও বেদনা। কিন্তু মরু-প্রবাহের আকস্মিক ঝাপটায় যদি তা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়?

অঞ্জনা আর সেখানে দাঁড়াল না। ছুটে চলে আসে আপনার ঘরে। নূতন এক অস্থিরতা জাগে শিরা-উপশিরায়। মায়ের পূজা—মায়ের স্মৃতিকে ভিত্তি ক'রে নূতন শক্তির উদ্বোধন করা। হ্যাঁ অঞ্জনা তা পারবে—অঞ্জনা তাই চায়। সে আজ শক্তিহীনা, শক্তির কেন্দ্রকে সে আরও পরিপুষ্ট করতে চায়। মায়ের ওই পটে আঁকা মূক মূর্ত্তির পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলবে—মা তোমার অঞ্জনাকে শক্তি দাও, ব্যর্থতা ও রিক্ততাকে ভয় না করার শক্তি।

বেশ একটা সহজ পরিবেশের মধ্যে অঞ্জনার গোটাকতক দিন কেটে গেল—দুঃসহ পৌনঃপুনিকতা থেকে মুক্ত হ'য়ে বেশ একটা লঘু আবহাওয়ার মধ্যে কেটে গেল দিন কটা। তারপর এল তার ঈপ্সিত দিন—মায়ের স্মৃতি-উৎসবের দিন। সকাল থেকেই অঞ্জনা ভেঙে পড়ে ব্যস্ততায়। কত কাজে-অকাজে, কত খুঁটিনাটির মধ্যে পড়ে ছড়িয়ে। ছোট বড়, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, সবকিছুকেই আজ অঞ্জনার পরশ পেতে হবে। অনেককিছু আবার একবার শেষ ক'রেও সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে—আবার নূতন ক'রে সব আরম্ভ হয়। মায়ের ছবিখানি ঘরের মধ্যে রেখে একবার সাজায় যুঁই, বকুল আর রজনীগন্ধায়। খানিক পরে ভাবে—না, ঠিক হ'ল না, উগ্রতার আজ স্থান নেই। আবার সবকিছু ফেলে দিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করে সন্ধ্যামণি, নয়নতারা আর অতসীতে। কিন্তু তাই বলে কষ্ট—না মোটেই কষ্ট নেই তার। আজ সে শক্তির উৎস পাবে নূতন করে।

তারপর এক সময় বাবাকে হাত ধরে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেয় মায়ের ছবির সামনে। হাতে একগাছি শাদা যুঁইফুলের মালা দিয়ে বলে—দাও, পরিয়ে দাও। চোখের কোণে ভেসে ওঠে হাসি—মেঘ ও রৌদ্রের মেশামিশি।

মালাটি হাতে নিয়ে বাবা একবার চেয়ে দেখেন চারিদিকে—ধূপের ধোঁয়া, চন্দনের আলপনা আর ফুলের ছড়াছড়ি—কেমন যেন একটা পেলব ও পবিত্র সৌরভ।

জোর করে একবার নিশ্বাস নিয়ে মালাটি এগিয়ে দিতে যান ছবির গলায়, কিন্তু কি মনে ক'রে হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে চেয়ে থাকেন অঞ্জনার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। অঞ্জনার ওই শুভ্র সিঁথি, আর প্রাণহীন দৃষ্টি যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গে চাবুক কষিয়ে দেয়। বুকটা দুলে ওঠে ঘনতর হ'য়ে, ঠোঁট দুটিও কাঁপতে থাকে, যেন অনেককিছু বলতে গিয়ে কিছু বলতে না পারায় রুদ্ধ উচ্ছ্বাস উঠছে ফেনিয়ে।

ওকি, কি হ'ল? —অঞ্জনা চায় জিজ্ঞাসুনেত্রে।

অঞ্জনার হাত দুটির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বাবা কেঁদে ফেলেন ঝরঝর্ ক'রে এত বড় শাস্তি আমায় দিসনে অঞ্জনা, আমায় ক্ষমা কর। বঞ্চিতা তুই, হৃতসর্ব্বস্বা তুই, তোর অপমৃত্যুর জন্যে যে আমিই দায়ী—ওরে, আমায় ক্ষমা কর্।

অঞ্জনা সবকিছু বুঝতে পেরেও প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে রাখে—শুধু মুখে বলে—কেঁদে কি হবে বল? ভাগ্যলিপি ত আর খণ্ডান যাবে না। কিন্তু তাই বলে আমার এ আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিও না, তোমার পায়ে পড়ি বাবা। দাও, পরিয়ে দাও মালাটা।

মেয়ের হাতের মধ্যে মুখ রেখে বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাবা বলেন,—আমার সারা জীবনের আয়োজন যে আমারই চোখের সামনে প্রতি পলে পলে ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে তার কি করি বল্?

—কি আর করবে বল? উপায় ত নেই।

—জানিনে মা উপায় না থাকার মধ্যে কোন সত্য আছে কি না? সত্যিই কি উপায় নেই? তবে তোর মায়ের ওই চোখের দিকে সহজভাবে তাকাতে পারছিনে কেন? কেবলি মনে হচ্ছে—কি ভীষণ তীব্র তিরস্কার প্রচ্ছন্ন রয়েছে ওই চোখের অন্তরালে। কিসের যে সে তিরস্কার, কি যে তার হেতু সবই জানি। তাই সবকিছু জেনে শুনেও কেমন করে এই মালা পরাই।

—তবে—

—তবে আমার এই মালা দেবার আগে তুই যদি স্বীকার করিস্—মেয়ের হাত দুটি সজোরে চেপে ধরে বাবা মরিয়া হ'য়ে ওঠেন—তুই যদি স্বীকার করিস্ তোর মায়ের গলায় আমার এই মালা দেওয়ার সাথে সাথে তোরও জীবনে আবার সম্পূর্ণ নূতন হয়ে আসবে মালাদানের মুহূর্ত্ত, তা হলে—

(শেষাংশ ৪২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রী৺নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মভূমি

শ্রীগৌরীহর মিত্র

বীরভূম জেলার মল্লারপুর ই আই আর লুপ লাইনের অন্যতম ষ্টেশন। এখান হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মভূমি একচক্রা নগরী সাত মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। রাস্তা তত সুবিধাজনক নহে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় গো-যান বা পদব্রজে গমন করিতে হয়। উত্তরে দ্বারকা ও দক্ষিণে ময়ূরাক্ষী নদী এবং পূর্ব্বে মৌরপুর। বীরচন্দ্রপুর, ডাবুক, সন্ধিগড়া, মৌড়েশ্বর, কোটাসুর ও গুণুটিয়া পর্য্যন্ত একচক্রা নগরীর সীমানা ছিল।

কেহ কেহ মহাভারত বর্ণিত একচক্রানগর 'আরা' জেলার নিকট অবস্থিত বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য দেখিয়া বীরভূমের একচক্রাই যে মহাভারত বর্ণিত একচক্রানগর তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। বীরভূমেই পঞ্চ পাণ্ডব প্রতিষ্ঠিত পঞ্চ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। পঞ্চ পাণ্ডবের নামানুসারেই অদূরস্থিত পঞ্চ গ্রামের (পাণ্ডবতলা) নামকরণ হইয়াছে। বীরভূমেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব কিয়ৎকাল অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। কোটাসুর (অসুরের কোষ্ঠ বা কোঠা বা রাজধানী) ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হেরম্ব বকাসুরের আবাস-ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

বীরচন্দ্রপুর গ্রামের হরিসভায় বাঙলা ১২৯৯ সালে রথযাত্রার দিন "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ লীলামৃত" নামক যে হস্ত-লিপি প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে একচক্রার মাহাত্ম্য-কথাও বর্ণিত দেখা যায়। এইস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

রাঢ়দেশে 'একচক্রা' গ্রাম মনোহর।
ভারতের উচ্চভূমি অতি মনোহর॥

*   *   *

একচক্রের শিব অনাদি পাষাণ।
আশুতোষ বরদাতা করুণা নিদান॥
অজ্ঞাতবাসেতে বাস করিল পাণ্ডব।
তদবধি সর্ব্বলোক পরম বৈষ্ণব॥
খলৎপুরেতে (১) বাস করিত যবন।
কালের প্রভাবে এবে হইল নিধন॥
শ্রীযুক্ত সুন্দরামল্ল ভট্ট নারায়ণ।
পরিপাটি বন্দাঘাটি শ্রোত্রিয় ভূষণ॥
ব্রাহ্মণ যাজন ক্রিয়া কেবল তাহার।
ভূমিশয্যা একবার হবিষ্য আহার॥
সাবিত্রী নামে ভার্য্যা সন্তান বিহীন।
শিবের সেবায় মন নিষ্ঠা প্রতিদিন॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন শঙ্কর।
"হাড়াই নামেতে তব হইবে কোঙর॥"

ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ, বৃহস্পতিবারে।
হাড়াই জনম নিল সাবিত্রী উদরে॥
আয়ুর্ব্বেদ, অলঙ্কার, দর্শন, পুরাণ।
হাড়াই পণ্ডিত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বিদ্বান॥
সকল দেশের লোক তাঁর গুণ গায়।
অশিক্ষিত জন কহে 'ওঝা' মহাশয়॥
দ্বাপরে রোহিণী দেবী এবে পদ্মাবতী।
হাড়াই পণ্ডিত তাঁর হইলেন পতি॥
উভয়ে করেন সদা বৈষ্ণব সেবন।
বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব তাঁর, বৈষ্ণব জীবন॥
সাধুসঙ্গ হরিকথা, নাম-সংকীর্ত্তন।
নিত্যানন্দময় হয় তাঁহার ভবন॥
তেরশত প'চানব্বই শকে মাঘ মাস।
শুক্লাত্রয়োদশী তিথে প্রভুর প্রকাশ॥
নিত্যানন্দ জন্মিলেন পদ্মার উদরে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥ (২)

উল্লিখিত একচক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে উহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া থাকিবে।

মল্লারপুর হইতে একচক্রা যাইবার কালীন পথে উত্তর-বাহিনী দ্বারকা নদী (এই নদীর পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠাশ্রম এবং তারা মা'র দেশ-বিখ্যাত বিগ্রহ ও মন্দির অবস্থিত) অতিক্রম করিতে হয়। নদীর পরপারে কিছুদূর গমন করিয়াই ডাবুক (৩) গ্রামের 'ডাবেশ্বর' বা 'ডাবুকেশ্বর' (৪) নামক অনাদিলিঙ্গ শিব ঠাকুরের অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়। অল্প দিন হইল ইঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণ এক বৃহৎ ব্যাপার। শুনিলে অবাক হইতে হয়। একমাত্র ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কৈলাসপতি গোস্বামী অনুমান লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের সম্মুখে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বে ভোগমন্দির এবং ভোগমন্দিরের পশ্চাতে সুবিস্তৃত দীঘি। প্রাঙ্গণের তিন পার্শ্বে একত্র সংলগ্ন তিনটি চত্বরে ভক্তবৃন্দের বাসোপযোগী শতাধিক প্রকোষ্ঠ। একক ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া অধ্যবসায়গুণে যে কি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন দেখিলে

---

(১) পাঠান শাসনের শেষে একচক্রার কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে খলৎ খাঁ নামক এক মুসলমান জায়গীর বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ পল্লী খলৎপুর নামে পরিচিত হয়। সাধারণে ইহাকে একচক্রা খলৎপুর নামে অভিহিত করিত। কথিত আছে যে, খলৎ খাঁ দৈববাণী শুনিয়া শ্যামবাটি বা দাসপুরে গিয়া বাস করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মের পর এখানে যবনের প্রভাব সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হয়।

(২) একচক্রাতীর্থের ইতিবৃত্ত—ভুজঙ্গভূষণ রায়।

(৩) ডবাক রাজ্যের ডবাক নামই এখনও বর্ত্তমান আছে। বীরভূম জেলা গর্ভবাস (বীরচন্দ্রপুর) ও তারাপীঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডবাক বা ডাবুক নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে ডাবুকেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ডাবুক গ্রামই সমুদ্রগুপ্তের বলিয়া অনুমান হয়। ডবাক নামে আর কোন স্থান নাই। 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা ডবাক বলেন, (বাঙলার ইতিহাস ২য় সং ৫০ পৃষ্ঠা) এবং অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাছাড়ের পূর্ব্বদিকে ডবাক বলিয়াছেন ইহা ঠিক নহে। ঢাকা সমতটে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপির ২২ পংক্তিতে সমতট ও ডবাক উভয় নামই আছে। কাছাড়ের নিকটও ডবাক নামে কোন স্থান নাই। সুতরাং বীরভূম ডবাক নামে স্থান থাকায় অন্যত্র ডবাকের কল্পনা করার আবশ্যকতা দেখা যায় না—বিনোদবিহারী রায় প্রবাসী ২৪শ ভাগ ১ম খণ্ড আশ্বিন ১৩৩১, ৭৯১ পৃঃ

(৪) অনেকেই ইঁহাকে 'একচক্রেশ্বর' নামেও অভিহিত করেন। পূর্ব্বে এখানে শিবলিঙ্গ অনাচ্ছাদিতই থাকিতেন।

স্তম্ভিত হইতে হয়। কথিত আছে যে এই ডাবুকেশ্বর তীর্থে পান্ডবগণ উপবাসী থাকিয়া দিবারাত্র এই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়াছেন। পরে মহাদেব অর্জ্জুনের পূজায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন যে কলিযুগেও তুমি আমার পূজা অর্চ্চনাদি করিবে।

কৈলাসপতির অনুগ্রহে অধুনা শিবের প্রত্যহ পূজান্তে অতিথি ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কৈলাসপতির শিষ্য কাশ্মীর-রাজ এই শিবের অনুগ্রহ লাভ করায় তিনি মাসিক ৫০ টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ডাবুকের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই মুসলমান। কয়েক-ঘর মাত্র তন্তুবায় আছে—তাহারা পলুর ব্যবসা করে।

ডাবুক হইতে একচক্রা বীরচন্দ্রপুর ন্যূনাধিক দুই মাইল। বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান বীরভদ্র গোস্বামীর নামানুসারেই পরিচিত হইয়া থাকে। বীরচন্দ্রপুরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেব বা শ্রীশ্রীবাঁকারায় বিরাজমান। এখানে প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন হইতে মাসাধিক কাল একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া সংকীর্ত্তন ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। এই সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। সময় সময় এত জনতা হয় যে মানবের বাসোপযোগী সামান্য স্থান পাওয়া অতি দুষ্কর হয়। বঙ্কিমদেবের নাট-মন্দিরে এই সময় অহরহ সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

একচক্রাধামের একাংশের নাম—'গর্ভবাস।' এইস্থানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেন বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই স্থান পরম রমণীয়। দর্শন মাত্রই যুগপৎ মন ও নয়ন জুড়াইয়া যায়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা-নিকেতন 'ভান্ডীশ্বর', 'কদমখন্ডী', 'যমুনাঘাট', 'বিশ্রামতলা', 'সিদ্ধবকুলতলা', 'অমলীতলা' (অম্বলীতলা), 'মালাতলা', 'পদ্মাতলা' ও 'রাসতলা'গুলি দর্শকবৃন্দের নয়ন মনের পরমানন্দ বিধান করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর জন্মস্থান বীরচন্দ্রপুরের সংলগ্ন একচক্রা গ্রাম। মধ্যে ক্ষীণকায়া যমুনা নামক একটি কন্দর, ইহা পার হইয়াই একচক্রা। এই স্থানের অপর অংশটি 'গর্ভবাস' নামে খ্যাত। এই স্থানের আশ্রমের চতুর্দ্দিক বিবিধ ফলপুষ্পে পরিশোভিত। বিচিত্র ঘন তরুলতা সকল আশ্রমের পরম সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু চৈতন্য-লীলার কেন্দ্রস্থল। ১৩৯৫ শকাব্দে একচক্রা গ্রামে হাড়াই পন্ডিতের ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পত্নীদ্বয় কালনা নিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের কন্যা বসু ও জাহ্নবা। এই বসুধা দেবীর গর্ভে বীরভদ্র বা বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। জাহ্নবা দেবী অপুত্রা ছিলেন। তিনি রামচন্দ্র গোস্বামীকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও জাহ্নবা দেবীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা জনসাধারণে প্রচলিত আছে; কিন্তু তৎসমুদয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র স্থান নির্দ্দেশ উপলক্ষে যতটুকু আবশ্যক তাহাই বলিতেছি—

একচক্রা মধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলার স্থল নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই স্থানগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী।

(১) **বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর**—এখানে নিত্যানন্দ আরাধিত শ্রীশ্রীবঙ্কিম রায়ের (বাঁকা রায়) শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে বসু ও জাহ্নবা দেবী অবস্থান করিতেছেন। ভক্তগণ এতদ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্কিম দেবের আরাধনা করিতে করিতে তাহাতে লীন হন। এই নিমিত্ত বঙ্কিমদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুতে অভিন্ন কল্পনা করিয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নীদ্বয়ের মূর্ত্তি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের সিংহাসন পার্শ্বে একাসনে হাড়াই পন্ডিত ও পদ্মাবতী মূর্ত্তি, যোগমায়া, রাধা-মাধব ও রাধিকা, দ্বাদশ গোপাল এবং বহুতর শালগ্রাম শিলা অবস্থিত রহিয়াছেন। বঙ্কিম দেবের কৃষ্ণ মন্ত্রে এবং বসু ও জাহ্নবার রাধা মন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে। এখানে যথারীতি সেবাদির ব্যবস্থা আছে। বঙ্কিম দেবের বিষয় সম্পত্তি ও জমিদারীর আয় যথেষ্ট; কিন্তু ব্যবস্থা থাকিলেও অধুনা অতিথি অভ্যাগতদের তাদৃশ সমাদর পরিলক্ষিত হয় না। খনাৎ খাঁ নিত্যানন্দ প্রভুকে বীরভদ্রপুরের জমিদারী স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে খনাৎ খাঁ নিজ কনিষ্ঠ পুত্র নিয়াজ খাঁর খনিত, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তস্থিত, নিয়াজ খাঁ নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাহাড়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহত্ত্ব দেখিয়া জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ হন।

বঙ্কিমদেবের আয় সামান্য নহে; কিন্তু শ্রীমন্দিরের অভাবে ভোগমন্দিরাভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র গৃহে কয়েক বৎসরাবধি বঙ্কিমদেব অধিষ্ঠিত আছেন। ভোগমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর এবং প্রবেশদ্বার একেবারে ভগ্ন ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে শ্রীনিতাই-গৌর বিরাজমান করিতেছেন। আর একটি মন্দিরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী মাত্র। এইটি সূতিকাগৃহ। এইস্থানেই নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। সূতিকা মন্দিরের সম্মুখেই নাট-মন্দির। ইহার ছাদ ভগ্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্তম্ভ ও প্রাচীর আপন দুর্দ্দশা দর্শকবৃন্দকে যেন করুণস্বরে জ্ঞাপন করিতেছে। মধ্যস্থলে স্তূপাকার ইষ্টকখন্ড, ইহার পরেই একটি বাঁধাঘাট বিশিষ্ট কুন্ড। সূতিকা মন্দিরের পার্শ্বেই এক অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ বর্ত্তমান। ইহা ষষ্ঠীতলারূপে পরিচিত। এই বৃক্ষতলে প্রভুর ষষ্ঠীপূজা হইয়াছিল।

বঙ্কিমদেবের মন্দিরের উত্তরাংশে ভান্ডীশ্বর শিব এবং জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি বিরাজমান। কথিত আছে যে নিত্যানন্দের জননী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনের ইচ্ছা করিলে তিনি এই স্থলে জগন্নাথ দেবের দর্শন করেন। স্থলে সুবৃহৎ মাধবীলতা পরিবেষ্টিত একটি প্রাচীন তলে বঙ্কিমদেবের গোষ্ঠ বিহার হইয়া থাকে। লোকে এই স্থানকে ভান্ডীর বন নামে অভিহিত ক

বীরভদ্রের বার শত চেলার খন্তী দ্বারা শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণী খননের কথা শুনা যায়। কেহ কেহ এই পুষ্করিণী জাহ্নবা দেবীর আদেশে নেড়া বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক খনিত হইবার কথা বলিয়া থাকেন। এই শ্বেতগঙ্গার পূর্ব্বে অমলীতলা (অম্বলীতলা—একটি অতি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ)। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

(২) **কদমখণ্ডী**—একটি অতি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী। প্রবাদ এই কদমখণ্ডীর ঘাটে বঙ্কিমদেবের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী দারুখণ্ড উজানে ভাসিয়া আসিয়াছিল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহা প্রাপ্ত হন। কন্দরের এই স্থলে একটি বাধা ঘাট আছে। ঘাটের উপর বৈষ্ণবগণের সমাধি এবং নিতাই দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ভক্তগণের স্বাগত প্রতীক্ষা করিতেছেন। গৌরাঙ্গ প্রভু উদ্দাম নৃত্যশীল।

(৩) **বিশ্রাম তলা**–এই অদূরস্থিত স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলরামের বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

(৪) **পদ্মাবতী পুষ্করিণী**–এখানে নিত্যানন্দ প্রভুর জননী প্রসবের একবিংশতি দিবস গত হইলে স্নান করিয়াছিলেন।

(৫) **গর্ভবাস**–শ্রীমন্দিরের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মালা রাখিয়াছিলেন। এই বৃক্ষটি 'মালাতোলা' নামে খ্যাত। মূল বৃক্ষকাণ্ডের একাংশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। বাকী কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পার্শ্বপার্শ্বে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সূতিকাগার এই স্থানে একটি মন্দির অধুনা কোন ভক্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। অপর পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বিগ্রহ মূর্ত্তি। একজন বৈষ্ণব মোহান্ত কর্ত্তৃক সেবাদি পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহার নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি আছে। গর্ভবাসের ভিতর "নিতাই কুণ্ড" নামে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল পবিত্র বোধে ভক্তগণ এই জল মস্তকে স্পর্শ করে।

(৬) **সিদ্ধ বকুলতলা**—এই প্রাচীন বকুল বৃক্ষ একটি সমগ্র বৃহৎ প্রাঙ্গণ জুড়িয়া শাখা-প্রশাখায় ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই বকুলতলে উপবেশন করিলে মন-প্রাণ শীতল হয় এবং অন্তরে স্বভাবত এক অপূর্ব্ব অমিয়ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই বকুলতলায় নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যলীলা করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই বৃক্ষগাত্রে তাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শের চিহ্ন দেখিতে পান। এই বৃক্ষে সর্প-ফণাকার শাখা-প্রশাখা অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থানে শ্রীরাধাকান্তদেবের বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। সেবা পরিচালন বিষয়ের অভাব নাই। এখানে একজন নির্দ্দিষ্ট মোহান্ত বর্ত্তমান আছেন।

(৭) **হাঁটুগাড়া**—এক চতুঃসীমান্তর্গত বার বিঘা ভূমির মধ্যস্থলে এই গর্ত্তটি অবস্থিত। এই কুণ্ড গর্ভে জলবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকময় মন্দির আছে। কথিত আছে যে, ভূমি নিড়াইবার ছলে শ্রীবঙ্কিমদেব এই স্থলে হাঁটু পাতিয়াছিলেন এবং তদবধি এইস্থান গর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। বঙ্কিমদেব পরে, হঠাৎ অদর্শন হইয়া দারুমূর্ত্তি পরিগ্রহণান্তর উজান বাহিয়া কদমখণ্ডীর ঘাটে প্রকটিত হন। এই গর্ত্ত বা কুণ্ডটি জাহ্নবী কুণ্ড নামে খ্যাত। এখানে ভক্তগণ গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভু দাঁতন করিয়া যে নিম্ব-শাখা প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মূল হইতে অপর একটি নিম্ব বৃক্ষ জন্মিয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকে নির্দ্দেশিত করে।

(৮) পাণ্ডবতলা—এইস্থানে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব কতিপয় দিবস অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। সাধারণে এইস্থানটিকে পঞ্চ-পাণ্ডবের গুপ্তবাসের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এখানে দুই তিনটি অতি প্রাচীন নিম্ব বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। কালক্রমে এই সমস্ত স্থানের অনেক বন-জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া লোকে কেনো জমি তৈয়ারী করিয়াছে।

(৯) **শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের অন্তর্ধানলীলাস্থলী**—মাঠের মধ্যে একটি ছোট পুকুরের মধ্যে একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে, এইস্থানেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু অন্তর্ধান হন। প্রকাশ যে, তিনি এই ভূগর্ভের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেবের মন্দিরে উঠিয়া শ্রীশ্রীবিগ্রহে লীন হন। এই হেতু এইস্থান হইতে শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেবের মন্দির পর্য্যন্ত, প্রায় অর্দ্ধ মাইলব্যাপী একটি সুড়ঙ্গ আছে।

চোঙ্গধারী বাবাজী নামক এক ব্যক্তি এখানে নিত্যানন্দের কৃপালাভ করেন এবং এইস্থলে তিনি দেহরক্ষা করিলে, তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাবাজীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে।

এই সকল স্থানে আসিয়া মানব মনে অপূর্ব্ব আনন্দ পায়। এই সমস্ত স্থান নানারূপ বৃক্ষ-লতা-গুল্মে দ্বারা পরিশোভিত। প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতন বাস্তবিকই এক অপরূপ জিনিষ।

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(১৬)

প্রভার জীবন প্রদীপ নিবু নিবু করিয়াও নিভিলনা। নিভিলনা সত্য কিন্তু জ্বলার মতও জ্বলিতে পারিল না। মিট মিট করিয়া কোন রকমে টিঁকিয়া রহিল মাত্র। সদ্যপ্রসূত অচেতন শিশু পুত্রকে যখন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সচেতন করিয়া তুলিয়া আত্মপ্রসাদোৎফুল্লমুখে বাহিরে আসিলেন, সূতিকা গৃহের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা লীলার দিকে অবসন্ন দৃষ্টি দিয়া প্রভা তখন ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়াছিল, "তোমার একটু পায়ের ধূলো ওর মাথায় দাও ঠাকুরঝি, তোমারই আশীর্বাদে যেমন মরা ছেলে বেঁচে উঠেছে তেমনি ওর পরমায়ু অক্ষয় হোক্—এখন আর আমার মরতে দুঃখ নেই!"

লীলা সেদিন সর্বান্তঃকরণে শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তাকে আশীর্বাদ করিয়াছিল। প্রভা যদিও বলিয়াছিল মরিতে তার দুঃখ নাই, তবু সহসা মরা তাহার হইয়া উঠিল না। প্রসবের পর জ্বর ছাড়িল, একটু ভালও বোধ করিল যেন—কিন্তু দিন কয়েক পরেই পেটের অসুখ আরম্ভ হইল। প্রভা ক্রমে বেশী রকম দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অমরের পুণ্য বলেই হউক আর লীলার আন্তরিক আশীর্বাদেই হউক শিশু কিন্তু সুস্থ দেহে বাঁচিয়া উঠিল। প্রায় মাস তিনেক কাটিল, বহু চিকিৎসায়ও প্রভার শারীরিক অবস্থার কোনই উন্নতি হইল না। ঔষধ, পথ্য, ইনজেকশন—সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করিয়া চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন বায়ুপরিবর্তনের। সুতরাং চেঞ্জে যাওয়াই স্থির হইল। প্রভাকে লইয়া অমর নিজেই যাইবে—প্রথমে দেওঘর কি বৈদ্যনাথ, সেখানে সুবিধা না হইলে নাইনিতাল, শিমলা, দার্জিলিং।

প্রভা বায়না ধরিল, চারুকেও সংগে লইয়া যাইবে। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া চারু প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু ভগ্নীর আগ্রহাতিশয্যে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

অমর মনে মনে হাসিয়া প্রভাকে কহিল, "ওকে নেবার এমন কি দরকার? এগ্‌জামিন আসছে ওর সামনে!"

প্রভা ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিল, "মেয়েদের আবার এগজামিন; ও ত আর জজ ম্যাজিস্ট্রেট হ'তে যাচ্ছে না, যে এগজামিন না দিলেই নয়! যে পড়ায় অসুস্থ বোনকে সেবা করতে বারণ করে সে পড়ার ক্ষতি হ'লে দোষ নেই! লীলা ঠাকুরঝিও ত স্কুলে না পড়ে ম্যাট্রিক দিয়েছে—আবার শুনেছি নাকি আই-এ দেবে। তার শিক্ষার গুরু তুমি, তোমার পায়ের কাছে বসে জীবনের দরকারী পড়া কিছু শিখে নিক, ডিগ্রীর চেয়ে তাই ওর বেশী কাজে লাগবে। হয়ত মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে।"

অমর খানিক হাসিল। তারপর বলিল, "মানুষ কি শিক্ষায় গড়ে! মানুষ তৈরী হয় আগে, শিক্ষা তাকে মার্জিত করে মাত্র। মানুষের স্বভাব কি আর শিক্ষায় বদ্‌লায় প্রভা! মানুষ হবার শিক্ষা যদি চারু নিজের ভেতর থেকে না পেয়ে থাকে—আমার গুরুগিরিতে সিদ্ধি ওর হবে না!"

"হবে গো, হবে। আমি জানি। পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হবে না!" অনমনীয় জোরের সহিত প্রভা কহিল।

অমর হাসিয়া কহিল, "লোহাই সোনা হয়; রূপো কিন্তু হয় না!"

প্রভাও হাসিতে যোগ দিয়া কহিল, "রূপাই যদি ও থেকে থাকে; সোনা না হ'লেও একটু চক্‌চকে করতে পারলেই ওর ঢের হবে। ওকে যে নিতেই হবে আমার সংগে, নইলে তোমায় দেখবে কে!"

"স্বামী-সেবাটা বুঝি এখন থেকেই বোনের প্রতিনিধিতে সারতে চাও?"

প্রভা হাসিয়া কহিল, "তবুও ত অর্দ্ধেক ফল পাব!"

অমর পূর্ববৎ সহাস্যে কহিল, "ফল পেতে হলে প্রতিনিধির নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এ সব থাকা চাই, নইলে পূজা কিন্তু শুদ্ধ হয় না। পুরোহিত নিয়োগ করবার আগে পুরোহিতের সম্মতি নেবার প্রয়োজন আছে কিন্তু। অনিচ্ছুক পুরোহিতকে পূজার আসনে বসিয়ে দিলে দেবতার পূজো কিন্তু হয় না। দেবতার ওপর শ্রদ্ধা হ'লে তবে ত পূজো! তারপর অনধিকারীকে বসিয়ে দিলে দেবতা তুষ্ট হবেন কেন। বৈষ্ণবের দ্বারা কি কালী পূজা চলে!"

"দেবতার দেবত্ব থাকলে শ্রদ্ধা কি না এসে পারে!"

"ভক্তের ধ্যানে দেবতার জন্ম। ভক্ত নইলে যে ভগবানই টেঁকে না! এক্ষেত্রে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়—পূজাস্পদের চেয়ে পূজারীর শক্তি বেশী।"

প্রভা কহিল, 'দেখ তর্ক করবার মত শক্তি বল আমার শরীরে নেই। পূজারীর যদি শ্রদ্ধা থাকে প্রতিনিধির অযোগ্যতায় অশ্রদ্ধায় পূজো নিষ্ফল হবে না। দেবতা ত অন্তর্যামী।"

হাসিয়া অমর নীরব হইল। এ কয়দিন লীলা এদিকে আসে নাই। রওনা হওয়ার দিন সকাল বেলায় প্রভা লীলাকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছিল। ৩।৪ দিন হয় নরেন্দ্রনাথ জ্বরে শয্যাগত। লীলা আসিতে পারে নাই। শুনিয়া প্রভা ও অমর চিন্তিত হইয়া পড়িল। অমর নিজেই যাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিয়া আসিল। কিন্তু সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর যাওয়া স্থগিত রাখা চলে না।

ষ্টেশনে যাওয়ার পথে অমর প্রভা আর চারুকে লইয়া নরেন্দ্রের শোবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। লীলা চারুর বুক হইতে অমরের শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "ওঁর অসুখ না হ'লে খোকাকে আমি নিজের কাছেই রাখতেম। যখন যেমন থাক লিখে জানিও বৌদি!"

তারপর লীলা প্রভার পায়ে মাথা নোয়াইয়া বলিল, "আশীর্বাদ করে যাও বৌদি, ওঁর অসুখ যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাল হয়!"

প্রভা দুর্বল অধরে হাসি আনিয়া বলিল, "তোমার স্বামীর অসুখ সারাতে আমার আশীর্বাদের প্রয়োজন হবে না ভাই!"

আর দুটি একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াই প্রভা ও চারু লীলার নিকট হইতে বিদায় লইল। লীলাও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। অমর তখনও নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতেছিল। প্রভা ও চারুকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া লীলা ফিরিতেছিল সিঁড়ির মুখে অমরকে নামিতে দেখিয়া ডাকিল, "অমরদা!"

লীলার স্বর ভারী। অমরনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল! লীলা উপুড় হইয়া অমরের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেই অমরনাথ যেন চমকে লীলার পানে চাহিল। ব্যথায় বেদনায় সারা মন টন টন করিয়া উঠিল। কাতর দৃষ্টিতে অপার স্নেহ মিলাইয়া অমর কহিল, "তুই কাঁদছিস্ লীলা!"

লীলা নত মস্তকে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি আশীর্বাদ করে যাও অমরদা, যেন আমার সিঁথির সিঁদুর—হাতের নোয়া বজায় থাকে!"

নির্বাক বিস্ময়ে অমর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লীলা আবার বলিল, "আমার মন বলছে ওঁর খুব শক্ত অসুখ হয়েছে, এ সঙ্কট সময়ে তুমি কাছে থাকবে না অমরদা, তুমি আশীর্বাদ করে যাও,—শুধু মুখ দিয়ে বলে যাও উনি ভাল হবেন!"

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যেন অমর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল। পরে প্রসন্ন স্নেহে লীলার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, "আমি আশীর্বাদ করছি বোন্, উনি ভাল হবেন। মিথ্যে কথা জীবনে একটিও বলিনি—ভগবান আমার মুখ রাখবেন; তুই ভাবিস্ নে লীলা! তোকে আশীর্বাদ করব না ত কাকে করব বোন্! তোকে আশীর্বাদ করতে যেয়ে যদি আমার সমস্ত পুণ্যফল ক্ষয় হয় হোক্, তবুও তোকে আশীর্বাদ করছি! কিন্তু এত ভয় পেয়েছিস সকাল বেলা বল্লিনি কেন, আমি যাওয়া বন্ধ করতাম!"

লীলার অন্তর স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, "তোমার আমার আর কোন প্রয়োজন নেই অমরদা! নামীর চেয়ে নাম যদি বড় হয়—তোমার চেয়ে তোমার কথা ছোট হবে না!"

"নরেনবাবু কেমন থাকেন চিঠি দিস্" বলিয়া অমর নীচে নামিয়া গেল। লীলা আসিয়া স্বামীর শিয়রের কাছে বসিল। তারপর কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—যেন অমরের পায়ের ধূলো কুড়াইয়া আনিয়াছিল তাহাই পরম বিশ্বাসে স্বামীর সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়া গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল।

সেই দিন রাত্রিতেই নরেন্দ্রের জ্বর ছাড়িয়া গেল কিন্তু সারা মুখে বুকের স্থানে স্থানে দুই চারিটি গুটিকা দেখা যাইতে লাগিল। লীলা ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় শাশুড়ীর গৃহ-দ্বারে ডাকিল "মা!"

নরেন্দ্রের মাতা অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণা বধূর হাতে রুগ্ন পুত্রের সেবার ভার দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। বধূ ত আছেই তারপর ছেলের বন্ধু সতীশ দিবসের অধিকাংশ সময়ই রোগীর কাছে কাছেই আছে। সুতরাং সময়ে খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া বাপ মায়ের আর বড় বেশী কিছু করিবার ছিল না।

কর্তাগৃহিণী শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন বধূর ব্যাকুলকণ্ঠে ভীত হইয়া গৃহিণী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে বৌমা, নরেন কেমন আছে?"

"জ্বর একটু কমেছে" তারপর খানিক থামিয়া লীলা বলিল, "একবার ও ঘরে চলুন মা, মুখে যেন লাল লাল সব কি উঠেছে মনে হচ্ছে!"

"ও মা, সে কি" এক অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া গৃহিণী একরূপ দৌড়াইয়াই নরেন্দ্রের ঘরে আসিলেন। শুনিয়া কর্তাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

মা ছেলের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখের গুটিকাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কর্তাকে বলিলেন, "তুমি দেখ ত ভাল করে!"

নরেন্দ্র তখন অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল। বলিল "তোমরা আর হাত দয়ে দেখোনা মা, আমার স্মল পক্স হয়েছে। আমার ঘরে আর তোমরা এস না। কাল সকালে য়্যাম্বুলেন্স ডেকে আমাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও!"

লীলার মুখে কি কথা আসিতেছিল দাঁতে দাঁত চাপিয়া কোন রকমে চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন, "হাসপাতালে পাঠাব কিরে, আমি মা আজও বেঁচে আছি—অমন সতী-লক্ষ্মী বৌ রয়েছে! কি যে তুই বলিস!"

নরেন্দ্রনাথ মাতার কথার প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তাই আমি বলি মা। এই ছোঁয়াচে রোগ বাড়ীতে রাখতে নেই। একের জন্য সবাই মারা যাবে। তা হবে না—আমি হাস-পাতালেই যাব!"

মুহূর্তের জন্য লীলার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। স্থান-কাল-পাত্রাপাত্র সব ভুলিয়া যাইয়া লীলা বলিয়া উঠিল "আমি বেঁচে থাকতে ওঁকে হাসপাতাল যেতে দেব না মা!"

বলিয়াই লীলা অপরিসীম লজ্জায় জিব কাটিল, শ্বশুর শাশুড়ীর সম্মুখে সে যে এমন করিয়া কথা বলিতে পারে এ ধারণা তার নিজেরও ছিল না। তবুও যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এ স্থলে কোন কথা বলা যে তার শোভন নয়—উচিতও নয়, লীলা একরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। মায়ের স্নেহ যে স্ত্রীর স্নেহের চেয়ে আদপেই খাটো নয়, নিজের বুকের রক্ত দিয়া যে মা ছেলেকে মানুষ করে, তাহার নাড়ীর টান যে স্ত্রীর হৃদয়ের টানের চেয়ে এতটুকু কম নয়, বিশেষত এক সন্তানের মায়ের,—একথা ভাবিবার অবসর বুঝি লীলার ছিল না। যখন লীলা বুঝিল দুর্নিবার লজ্জায় নতমুখে দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দুঃখের মধ্যেও জননীর হাসি পাইল। কি একটা কথা মুখে আসিতেছিল, না বলিয়া থামিয়া গেলেন। লীলার দিকে

চাহিয়া মা বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ বৌমা, তোমার মত লক্ষ্মী মা আমার ঘরে থাকতে, আমিই না হয় বুড়া হয়েছি, ছেলে আমি হাসপাতালে পাঠাব!"

নরেন্দ্র যেন একটু রাগতভাবেই বলিল, "সে কাল যা হয় দেখা যাবে। তোমরা এখন ঘরে যাও মা, কার্বলিক লোসনে হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় সব ছেড়ে ফেলগে।'

"তা যাচ্ছি—তুই চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ দিকিন" পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি শীতলা-তলার ঠাকুরকে নিয়ে আসতে লোক পাঠিয়ে দাও!"

নরেন্দ্র বলিল, "কি জ্বালাতন করবে আবার,--ওদের অষুধ আমি খাব কিনা!"

কর্তা ততক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিলেন। পুত্রের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে কার অষুধ খাবে শুনি! তোমাদের কোন্ বিলিতী ফার্মাকোপিয়াতে এর ভাল অষুধ আছে? তোমরা ডাক্তাররা ত নাম শুনেই আঁতকে ওঠ—আর ওরা নিজের হাতে রোগীর সেবাও করে।"

নরেন্দ্র পিতার কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। গৃহিণী বলিলেন, "মা শীতলার নামে একটি টাকা তুলে রাখ বৌমা, দেখি ঠাকুরকে আনতে গাড়ীই পাঠিয়ে দিই। একটু রাত হয়েছে,—তা হোক্ খবর পেলে আসবে ঠিক।"

কর্তা-গৃহিণী বাহিরে আসিলেন। লীলা আসিয়া নরেন্দ্রের কাছে বসিল। দুই একগাছি চুল নরেন্দ্রের কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। লীলা সেগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "হাসপাতালে যেতে চাইছিলে কেন? আমার এমন অসুখ হলে—আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে পার?"

নরেন্দ্র নিরুত্তর রহিল। লীলা বলিতে লাগিল, "তবু তোমরা যা পার মেয়েরা তা পারে না। তোমরাই যা পার না তাই মেয়েরা পারবে!"

তারপর খানিক থামিয়া লীলা আবার বলিল, "জ্বর এখন ত খানিকটা কমেছে। আমি বসে বসে হাওয়া করছি তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। খুব কি যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার?"

নরেন্দ্র কহিল, "তেমন বেশী কিছু নয়। গলার ভেতর একটু লাগছে। প্রাথমিক অবস্থায় যখন উঠতে থাকে তখন তেমন কষ্ট কিছু হয় না। কষ্ট আর বিপদ এর শেষ দিকটায়। যা বিশ্রী ব্যারাম—একটু সতর্ক থেকে শুশ্রূষা না করলে তোমারও হ'তে পারে। তোমায় নিয়েই ত আমার ভাবনা। মুখশ্রী যে কি খারাপ হয়ে যায় এতে!"

"ওঃ সেজন্য! আচ্ছা আমার যাতে না হয়, তাই আমি করব।" বলিয়া লীলা একটু মৃদু হাসিল।

শীতলাতলার কবিরাজ ঠাকুর রাত্রিতেই আসিয়া পৌঁছিলেন—অবশ্য চতুর্গুণ দর্শনীর লোভে। প্রথমে অবশ্য ভয় দেখাইলেন যে সাংঘাতিক শ্রেণীর বসন্ত হইবে এবং আশ্বাসও দিলেন যেহেতু যথাসময়ে তাঁহাকে দেখান হইয়াছে সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যেরূপ ধরণের গুটিকা উঠিতেছে তাহাতে সবগুলি উঠিতে দিলে রোগীর প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে। এবং এমন ঔষধ তিনি প্রয়োগ করিবেন যাহাতে সমস্ত না উঠিয়া ভিতরে কতক বসিয়া যাইবে। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দর্শনী লইয়া কবিরাজ বিদায় লইতেছিলেন, লীলা কবিরাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "এমন কি প্রতিষেধক ঔষধ নেই যা খেলে সত্যি সত্যি আর বসন্ত হবে না, রোগী ঘাঁটা-ঘাঁটি করলেও না।

হাসিয়া কবিরাজ কহিলেন, "আছে বৈকি মা. শীতলা-মায়ের আদেশ না হ'লে তেমন অষুধ দেবার নিয়ম নেই। মার অনুমতি হ'লে কাল এনে দেব।"

কবিরাজের ভাবটা এইরূপ যে তিনি শীতলা মায়ের সেবক এবং মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্তা হয়। শুনিয়া নরেন্দ্রের রাগ হইল, কিন্তু কোনরকমে মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

কবিরাজ চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "হ্যা রোজ উচ্ছে পাতার রস সকাল বেলায় একটু একটু সবাই খাবেন। মাছ-মাংস এবাড়ীতে আনা নিষেধ—পান খাওয়া চলবে না। হরীতকী খেতে হবে। হরীতকীর আঁটি প্রত্যেকের কোমরে বেঁধে রাখতে হবে। কণ্টিকারী ক্বাথ তাও দু'একদিন পর পর সবাই খাবেন। জুতা পায়ে কেউ রোগীর ঘরে ঢুকবেন না। বাইরের কোন লোক আসতে পাবে না—যারা রোগীর সেবা করবেন তারাও বাইরে যেতে পারবেন না।"

কবিরাজ চলিয়া গেলে লীলাকে লক্ষ্য করিয়া নরেন্দ্র কহিল, "লোক ঠকাবার কত ফন্দী—এযুগেও মেয়েদের কাছে চলে! মায়ের আদেশ হবে—তবে অষুধ দেবেন। কি অন্ধ-বিশ্বাস এই হিন্দু জাতের—এক একটি ব্যারাম—তার এক একটি দেবী। ওলা দেবী, মা শীতলা আরও কত কি—এই করেই জাতটা গেল।"

লীলা যেন সহসা ভয় পাইয়া গেল। ডান হাতে স্বামীর মুখ ছাপাইয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঃ মাকে অবিশ্বাস করতে নেই: শীতলা মা যে জাগ্রত দেবতা।"

(ক্রমশ)

ইউরোপে নাজি-লক্ষ্য

জার্মানীর ভূতপূর্ব বৃটিশ রেসিডেন্টের বিবৃতিঃ—

১। **নাজি-লক্ষ্য**—আমার একান্ত বিশ্বাসভাজন সংবাদদাতার বন্ধু সুহুংসাচেন্ড্ উপদেশমূলক পরামর্শ সভায় উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হয়। বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া অধিকারের দুই-একদিন মাত্র পরে এক সন্ধ্যায় এই বৈঠক হয়। সভা নেতা বলিতে থাকেনঃ—

"আমাদের ফুরহার জার্মান জাতির দেশ-সীমা বর্ধিত করিয়া উহাকে আরও প্রশস্ততর করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—এই সীমান্ত ইউরোপকে অন্তর্ভুক্ত করিবে। ইউরোপকে নূতন আকার দানের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। এবং একদিন সমগ্র ইউরোপবাসী, হয়ত সমগ্র বিশ্বের লোক, এই সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার নিকট, জার্মানীর পরিত্রাতার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।"

আমার কার্যকালে জার্মানীতে আমি দেখিয়াছি নাজিদের অভিমত এই—"সমগ্র ইউরোপের প্রধান ও মহৎ জাতি হইল জার্মানগণ, সুতরাং তাহারা বৃহত্তম বাসভূমি ও প্রবলতম প্রভাব-প্রতিপত্তি দাবী করিতে পারে।"

হিটলারের বাণীরও তাৎপর্য ইহাই। আমাদের মত যাহারা হিটলারের অধীনে বাস করিয়াছে, তাহারা সকলেই জানে হিটলারের অন্তরের আশা অক্ষরে অক্ষরে এই প্রকার। এমন একটি লোককে শান্ত করিতে চেষ্টা করা, প্রার্থিত দেশটি বলিস্বরূপ প্রদান করা, তাহার সহিত সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হওয়া—সকলই ছেলেখেলা, অদূরদর্শিতা বলিলেও অন্যায় হইবে না।

২। **নাজি-পদ্ধতি**—সুইজারল্যাণ্ডে নাজিদের প্রচেষ্টা এখন আর গোপন নাই। স্কুল এটলাস পরিবর্তনের ঘটনা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের সেকেণ্ডারি স্কুলসমূহের জন্য এটলাস জার্মানী হইতে আমদানী করা হয়—উহার মূল্য ধার্য করা হইল পৌনে পাঁচ ফ্রাঙ্ক। সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত যে এটলাস প্রচলিত ছিল তাহার মূল্য ১১ ফ্রাঙ্ক। জার্মান এটলাসের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে—পনর পৃষ্ঠা জুড়িয়া জার্মান সাম্রাজ্যের নক্সা আর সুইজারল্যাণ্ডের মানচিত্র আট পৃষ্ঠায় মাত্র। বার্নিজ ওবারল্যাণ্ড (বার্ন অঞ্চলের পর্বত) জার্মান পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সুইজারল্যাণ্ডের যে সকল অঞ্চলে মিশ্র জার্মান কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়—সে সকল অঞ্চলের অধিবাসী সুইস্ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জার্মান বলা হইয়াছে। পরিশেষে অন্য সকল দেশের পতাকার ছবি থাকিলেও সুইজারল্যাণ্ডের পতাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। আমার সুইস্ সংবাদদাতা তাঁহার নিজ ক্যাণ্টনে* এই এটলাস নিষিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। নিষেধ-বিধি অন্য ক্যাণ্টনেও বিস্তারলাভ করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল—সুইজারল্যাণ্ডের বালক-বালিকাদিগকে জার্মানী নিজেদের দেশ বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া। নাজিগণ সর্বত্রই এই প্রকার সূক্ষ্ম চতুরতাপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ করিয়া থাকে—কোনও অঞ্চলের জার্মান ভাষাভাষী লোককে অজ্ঞাতে নিজেদের জার্মান বলিয়া অভ্যস্ত করাইবার ইহা যে যোগ্য সূচনা একথা অস্বীকার করা যায় না। একবার সুইজারল্যাণ্ডের বালক-বালিকারা জার্মানীকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিবার মনোভাবাপন্ন হইলে জার্মানীর পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিবে না—ইহাই নাজিদের বিশ্বাস। হ্যানস্ ফন্ ওয়াইল যখন নাজিদের পক্ষে কার্য করিতে থাকে, তখন তাহাকে নাজিদের এই লক্ষ্যের কথা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

সুইস্‌গণ নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া প্রচার করিলেও, জার্মানদের প্রচেষ্টায় সুইজারল্যাণ্ডে নাজি-মনোবৃত্তি সজীব রাখিবার উদ্যম চলিতেছে। সমগ্র সুইজারল্যাণ্ডের অবশ্য চেকোশ্লোভাকিয়ার ন্যায় বলি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আজিকার দিনে 'গ্যারাণ্টির' কোন মূল্যই নাই; প্রতিরোধের হুমকিতেও বিশেষ কোন ফল আশা করা যায় না। আমার ঐ সুইস বন্ধুটি মার্চ মাসের শেষভাগে লিখিয়াছিলেন—

—"৪০ হইতে ৪৮ বৎসর বয়সের লোকও যাহারা সামান্য কিছুদিনও সামরিক কার্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকেও আহ্বান করা হইয়াছে এই বর্ষে নূতন করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে। সপ্তাহ অতীত হইল সুইজারল্যাণ্ডের সকল সীমান্তের প্রবল রক্ষীসেনা দ্বারা সুরক্ষিত এবং সীমান্তের সকল জলপথে 'মাইন' বসান ও স্থলপথে অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

বন্ধুটি নিশ্চিতরূপেই বলিতেছেন যে, কোনও সুইস মিনিষ্টার আর বন্ধুত্ব বা পরামর্শের জন্য বার্চটেস্‌গ্যাডেনে যাইবে না। তাহারা কোনও প্রবল শক্তির গ্যারাণ্টির প্রতীক্ষায় বসিয়া নাই—তাহারা নির্ভর করিতেছে নিজেদের শক্তি ও সম্বলের উপর।

সুইজারল্যাণ্ডবাসী জানে—নাজিরা বহুপূর্ব হইতেই প্ল্যান করিয়া রাখে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করে পুরোপুরি সুযোগ মত। প্রাগ্ ভিয়েনার বেলা তাহারা পূর্ব হইতেই রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারের সকল অদলবদল ও খুঁটিনাটির খসড়া করিয়া রাখিয়াছিল। আবার গেষ্টাপো বহুদিন পর্যবেক্ষণের ফলে দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল নামের—স্বপক্ষের ও বিপক্ষের। কিন্তু সুইসদিগের বিশ্বাস তাহাদের গবর্ণমেণ্ট এমন সুষুপ্তিমগ্ন যে, তাহারা প্রকৃতই স্বেচ্ছায় এই বিষয়ে উদাসীন এবং যখনই অন্য কোন জাগ্রত দেশ নাজি-সক্রিয়তার সংবাদ দেয়, তাহা যেন তাহাদের নিকট বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহের মত বরণীয় হয়।

৩। **জার্মান জাতি**—আমাদের মত যাহারা জার্মান জাতির সহিত প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারা জানে নাজি অত্যাচারের স্বরূপ কি; সুতরাং জার্মান জাতির মর্যাদা—তাহাদের দায়িত্ব বোধ—এই সকল বাণী তাহাদের দোলা না দিয়া পারে না। মিত্রশক্তি জার্মানদিগেক প্রচুর আঘাত দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা কিন্তু অন্তরের সহিত হিটলারকে মনোনয়ন করে নাই। সম্প্রতি একজন নির্বাসিত ইহুদী আমাকে বলিয়াছেঃ—"জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি সমর্থন করি না।" জার্মানীর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সে অন্তত আমাদের অপেক্ষা

ওয়াকিবহাল। সর্বত্রই দেখা যায় বালকবালিকারাই সকলের আগে ও অতি সহজে নাজি ভাবাপন্ন হয়। আমার এক সুইস বান্ধবী গত বৎসর আমেরিকা যাইবার পথে একটি জার্মান আমেরিকান মহিলার সহিত পরিচিত হয়। সে মহিলাটি তাহার ষোল বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ছুটি উপভোগ করিতে নিউ ইয়র্কে লইয়া যাইতেছিল। ভিয়েনাবাসী কোনও ইহুদী ডাক্তার তাঁহার পত্নীসহ ঐ জাহাজে আরোহী ছিলেন। ঐ যুবক একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল যখন সে দেখিল তাহার মাতা পর্যন্ত ঐ ইহুদী ডাক্তার ও তাহার পত্নীর সহিত আলাপ করিতেছে।

এখন পরিণত বয়সে আমরা যতই উদার হই না কেন—কৈশোরের সঙ্কীর্ণতা হইতে যতই মুক্তি পাই না কেন—আমরা জানি যে কৈশোরে এবং যৌবনে আমরা আমাদের শিক্ষাদাতাদের দ্বারা বিপথে চালিত ও বিসদৃশ ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থ-পরতার মর্ম তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং সেইজন্যই আমরা আশা করিতে পারি না যে জার্মান যুবকগণ এ বিষয়ে আমাদের যুবাকালের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী হইবে। অপর পক্ষে অনেক সময়ই দেখা যায় তাহারা তাহাদের দেশের প্রচারকার্যের প্রতি অসহিষ্ণু ও বিরূপ হইয়া পড়ে। এই প্রকার সংবাদ এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় বার বার।

একটি জার্মান নির্বাসিত জাতিতে যে ইহুদী নয়, সে বলে শ্রমিক-শ্রেণী নবেম্বর অভিযানের ধ্বংসকার্যের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। এই ব্যক্তিকে এখন আমি ভাল করিয়াই জানিবার সুযোগ পাইয়াছি; সে বলিল,—এক ধনাঢ্য বৃদ্ধ ইহুদী দম্পতির আবাসে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পরিচ্ছদ, আসবাব, দরজা-জানালা, স্নানের টব, বাল্‌তি প্রভৃতি বিধ্বস্ত করা হয়; তৎপর ভাঁড়ার ঘরে রক্ষিত ফল, সব্জী প্রভৃতির কাচের জার চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইল; ডিম যাহা সঞ্চিত ছিল সব ভাঙিয়া ফেলা হইল—সেই বিনষ্ট ভাণ্ডারের তরল পদার্থ ঝাঁট দিয়া গোল আলুর স্তূপের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইল।

বৃদ্ধ নিজে সাত দিনের চেষ্টায়ও ভাণ্ডারটি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না সম্পূর্ণ। এই ধ্বংসকার্য করা হয় বৃহস্পতিবার রাত্রিতে এবং পরদিনই আদেশ দেওয়া হয়—তাহাদের আবাসকে এমনভাবে বাহিরের দিক হইতে মেরামত করিতে হইবে রবিবারের ভিতর যেন বাহির হইতে কিছুতেই বুঝিতে পারা না যায় যে—ভিতরে এমন নিদারুণ ধ্বংস অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

যে বন্ধুটি এই ঘটনা আমাকে বলিয়াছে সে বেশী দিন পূর্বে নয়, একবার উত্তর জার্মানীর এক সাগর তীরের শহরে অবস্থান করিতেছিল। কাফেতে বসিয়া আহারকালে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি তাহার নিকট বর্তমান জার্মান গবর্ণ-মেণ্টের নানা কুকার্যের নিন্দা করিতে থাকে জোরের সহিত। তখন বন্ধুটি ঐ ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি কি মনে কর না যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ব্যক্তিকে এ সব কথা বলা সঙ্গত নয়?' সে ব্যক্তি দমিয়া না যাইয়া জবাব দিল—'আমি [illegible] লইতে পারি যে, ২০ পারসেণ্ট লোক গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করে, তুমি তাহাদের একজন নও।'

অন্য একটি বন্ধু যিনি ভিতরের সংবাদ রাখেন, তিনি বলেন, এখন যদি একটা প্রকৃত প্রস্তাবে অপক্ষপাত নির্বাচন হয় এবং তাহাতে কোনও প্রকার কারচুপি করা সম্ভব না হয়—' তবে তেমন ফ্রি ইলেকশনের ফলে নাজিগণ বিতাড়িত হইবে নিশ্চিত। ফ্রি ইলেকশন হইবে কিনা জানি না, তবে এইটুকু আমি জানি যে, নাজি-বিরোধী মনোবৃত্তি ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে এবং এক এক সময়ে উহা মাত্রায় একেবারে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। তাহারা সময়ে অদ্ভুত সাহসও প্রদর্শন করে।

একটি যুবক শত ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও নাজিদলে যোগদান করিল না—তাহার পদ, পদবী কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট হইল, জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইল। তথাপি সে আমায় লিখিয়া জানাইল—'কোন না কোন স্থানে সীমারেখা টানিতেই হয়।' সে কথা সত্য, তথাপি নাজি কন্‌সেন্‌ট্রেশন-ক্যাম্পের যে পরিচয় আমার জ্ঞাত, তাহাতে ঐ যুবকের মত অসম সাহস আমার কোনদিনই হইবে না। এই প্রকারে নাজিদের বিরোধিতা করিতে কতখানি সাহসের প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীর কোন ধারণাই নাই।

যে সকল লোক জার্মানীতে আমোদ-প্রমোদ বিধান করে, তাহাদের ভিতর হইতেও এক একজন অতি সাহসিকে পরিণত হয়। হায়! জার্মানীর একজন শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসিক ও কৌতুক-স্রষ্টা সহসা একদিন 'নিরুদ্দেশ' হইল।

বর্তমান জার্মানীর অন্তরে অন্তরে কি প্রকার ফল্গু ধারার মত একটা আতঙ্ক প্রবাহিত—নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে তাহা সুপরিস্ফুট হইবে। দ্বিতীয় উইলিয়ামের ভূমিকায় অভিনেতা অবতীর্ণ হইল—চারিদিক হইতে হাততালি ও বাহবা। সে প্রস্থান করিল এবং কার্টেনের কোণ হইতে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আবার আসিব কি?'—পূর্ববৎ হাততালি ও বাহবা।

অভিনেতা পর্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—'ভদ্র-মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! অনুগ্রহপূর্বক দণ্ডায়মান হউন। অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা আমি প্রচার করিব।'

সকলেই হাসিতে থাকে, ভাবে এইবার অভিনেতাটি একটি কিছু হাস্য-কৌতুকের অবতারণা করিবে।

পরক্ষণেই অভিনেতা বলিয়া উঠে—'ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে আমি বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা যদি দণ্ডায়মান না হন তবে আপনাদিগকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। নাৎসীরা [illegible] সঙ্গীন!'

নিতান্ত গম্ভীর ও ভীতিপ্রদ বাণী ও অভিনেতার রহস্য-জনক আচরণ সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে একটা আতঙ্ক-শিহরণ জাগাইয়া তোলে। কেহ বিনা দ্বিধায়, কেহ কুণ্ঠার সহিত দাঁড়াইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা বলিয়া ফেলে—'আপনাদের ধন্যবাদ, আপনাদের [illegible] জন্য ধন্যবাদ।'

ইহাই আজিকার জার্মানীর [illegible]। (M. G. 10. 5. 39)

আমাদের ভালবাসা

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

আমরা বেসেছি ভালো পৃথিবীরে, তার হাসি, অশ্রু আর সুখ, দুঃখ, শোক,
আমরা বেসেছি ভালো; শ্রান্ত দিগন্তের ধীর, ম্রিয়মান আসন্ন সন্ধ্যায়
অস্তোন্মুখ ভাস্করের আরক্তিম ম্লানালোকে—উদাসীন হয়েছি রঙীন;
জ্বলন্ত রৌদ্রের তেজে—মর্ম্মরিয়া উঠিয়াছে আমাদের মর্ম্মে আরণ্যক,
বিচিত্র তাহার রূপ—অপরূপ রূপান্তরে—অনুক্ষণ অপূর্ব্ব সজ্জায়
দেখিয়াছি—উদ্ভাসিয়া উঠিয়াছে; দৃষ্টি তবু রূপস্বপ্নে হইয়াছে লীন;
মদালসা তমস্বিনী—জ্যোৎস্নালোর রহস্যেতে আনিয়াছে আলস্যের সুর,
বাহুর সিথানে শুয়ে—প্রেয়সী'র আলিঙ্গনে, আত্মা তবু বিরহ-বিধুর!

আমরা বেসেছি ভালো পৃথিবীরে; উর্ব্বর প্রান্তরে তার হাল ও লাঙলে
ফলানু ফসল তাই; দুকূল-প্লাবিনী নদী তরঙ্গেতে দুর্দ্দম, দুর্ব্বার,
স্রোতের উচ্ছ্বাসে তার—সুকঠিন মাটি হ'ল সুকোমল স্নিগ্ধ ও শ্যামল;
আমরা বাঁধিনু ঘর! আমাদের ভালো লাগে নীড় বাঁধিতে যে তার কোলে;
নীড় বাঁধি—ঘুম আর জাগরণে, মিলনে বিরহে কণ্ঠে তুলিতে ঝংকার।
আমাদের ভালো লাগে—প্রাত্যহিক দিন রাত্রি—অসংকোচ স্পষ্ট ও সরল;
সীমাহীন মহাশূন্যে—অবারিত যে আকাশ মৃত্তিকারে করেছে চুম্বন
আমরা বেসেছি ভালো তার প্রতি পরমাণু, বোধহীন স্তব্ধ শিহরণ

আমরা বেসেছি ভালো পৃথিবীরে—জাগে যেথা আকাশের অজস্র আশ্রয়
সমুদ্র-মন্থনে যেথা—নিত্যকাল দ্বন্দ্ব করে অমৃতের তরে দেবাসুর,
আমরা বেসেছি ভালো ঘর আর ঘরণীরে, বৈরাগ্যের করেছি সন্ধান
কোন এক গোধূলিতে, আমাদের অন্তরেতে ঈর্ষা বিষ পেয়েছে প্রশ্রয়;
আমাদের কণ্ঠে আছে বীণা আর বজ্র দুই, পায়ে বাঁধা বেড়ী ও নূপুর
আমাদের শরীরেতে ভরে আছে—দেহাতীত বেদনার ব্যথাময় গান।
আমাদের ভালো লাগে— আসিতে ও চলে যেতে পৃথিবীরে করিয়া নির্ভর,
আমরা বেসেছি ভালো—দিন রাত্রি, জন্ম মৃত্যু, দেহ আত্মা, বাহির ভিতর।

আমরা বেসেছি ভালো পৃথিবীরে; তাই মোরা পাশাপাশি সেথা করি বাস;
লোভে আর অবিশ্বাসে—পরস্পর হানাহানি করি' হই উল্লসিত মোরা,
আমাদের ভালো লাগে ভূমি ও রমণী লয়ে এ জীবনে করিতে জটিল,
আরো কত কিছু আছে—যা' মোদের ভালো লাগে—সিন্ধু আর অরণ্য, আকাশ
মরুভূ, নির্ঝর আর তটিনী, প্রান্তর; যাহা লয়ে হ'ল সম্পূর্ণ এ ধরা!
যার ঘন আবরণে—সূক্ষ্মতম মুহূর্ত্তের অন্তকাল চলিছে মিছিল।
কালের কুটিল বুকে—যাহার প্রতিভূ রূপে মূর্ত্ত হ'ল মৃত্যুর ভ্রূকুটী।
আমাদের ভালোবাসা—মৃন্ময় জন্মের পরে চিন্ময়ের পায়ে পড়ে লুটি।

—

ক্যানভাসার

(গল্প)

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

ট্রাম হইতে নামিয়া লতার কিন্তু একটু একটু লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাহার পিতা কেবল কবিরাজ হিসাবে নহে, একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াও শহরে খ্যাত ছিলেন। তাহারা বিশেষ ধনী না হইলেও এই দুই বৎসর পূর্ব্বেও লতা স্কুলের সকল ব্যাপারেই নেতৃত্ব করিয়া কত স্বর্ণময় স্বপ্নময় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। আর সেই লতা সেই স্কুলেই আজ চলিয়াছে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে! লতা একবার ভাবিল, ফিরিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সংসারের কথা মনে পড়িল। ভাবিল দিনের পর দিন সূর্য্য উঠিবে রাত্রি হইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিলে চার-চারিটি প্রাণীর উদরের সংস্থান হইবে কি করিয়া? ছোট ভাই দুইটি স্কুল হইতে আসিয়া যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিদি বলিয়া আবদার ধরে, লতা তখন অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। একা দাদার টিউশনির কুড়িটা টাকায় কি আর সংসার চলে?...হোক্ না সে মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ বলিয়া কি তাহার বাঁচিবার অধিকার নাই? নিজে পরিশ্রম করিয়া যদি সে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, কেন করিবে না? লতা লাজ-মন্থর পদে আসিয়া স্কুলে প্রবেশ করিল।

হেড মিস্ট্রেস মিস্ বোস-এর ঘরে ঢুকিয়া লতা তাঁহাকে নমস্কার করিল। মিস্ বোস তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—আরে লতা যে! তারপর, কি মনে করে? বড় দুঃখের কথা, শুনেলাম তোমার বাবা মারা গেছেন।

লতা বিষাদ-মলিন মুখে বসিয়া রহিল।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে মিস্ বোস কহিলেন—তারপর, কি দরকার বল।

মুখখানি তুলিয়া লতা হাতের ক্যান্ভাস ব্যাগটা দেখাইয়া কহিল—একটা দেশী নিটিং কোম্পানীর এজেন্সী নিয়েছি। বাবা ত কিছু রেখে যান-নি।—বলিয়াই লতা চোখ দুটি নামাইয়া লইল, সলজ্জ রক্তের ছোপ তাহার কপোল দুইটিতে।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মিস্ বোস কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার বাবা দান করেই সব খুইয়ে গেছেন। কত গরীবের ছেলেকে যে পড়িয়েছেন, সাহায্য করেছেন, তার ঠিক নেই।...... তা বেশ বেশ, মেয়েদের এই আত্মনির্ভরতা আমি খুব পছন্দ করি। বস', এক্ষুণি টিফিন হবে।

—হ্যাঁ, পুরান বড় বড় মেয়েরা প্রায় সকলেই আমায় চেনে। দেখি যদি তাদের থেকে কিছু অর্ডার নিতে পারি।

—তা পড়া-লেখার খবর কি?

—এই ত, আই-এস-সি পড়ছিলুম, টেস্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা মারা গেলেন। তাই ভাবছি, কি করব। তাও বা মা থাকলেও যদি কিছু হত।—বলিতে বলিতে লতার বক্ষ ভেদিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

—কেন, মার আবার কি হল?

—মা ত আমি ম্যাট্রিক পাশ করবার পরেই মারা যান।

—তাহলে ত তুমি বড় মুস্কিলে পড়েছ লতা, তোমার ঘাড়েই ত সংসার এখন?

লতা নতমুখে বসিয়া রহিল।

এমন সময় টিফিনের ঘণ্টা বাজিল। লতা মিস্ বোসকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কমন রুম-এ আসিতেই পুরোনো মেয়েরা লতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নানারূপ প্রশ্নোত্তরের পর লতা তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইল। নানাপ্রকার নমুনা দেখাইয়া সে একটু বক্তৃতার ভঙ্গীতে কহিল যে, দেশের এই জাগরণের দিনে কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্র যুবকের দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষিত নর-নারী মাত্রেরই সাহায্য করা উচিত। নমুনা দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল, সম্পূর্ণ দেশী এই শিশু প্রতিষ্ঠানটিতে যে এত সুন্দর সুন্দর সিল্ক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া কেহ কেহ বিস্ময়ও প্রকাশ করিল। অনেকেই অর্ডার দিল। একদিনেই প্রায় ৩০।৪০ টাকার অর্ডার পাইয়া লতা হাসিমুখে বাহির হইয়া পড়িল।

স্কুলের গেট পার হইয়া রাস্তায় পড়িতে যাইবে, এমন সময় লতা শুনিল কে যেন তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল। মুখ ফিরাইতেই দেখিল হাসি ছুটিয়া আসিতেছে। লতা যখন স্কুলে পড়িত তখন বিশেষ করিয়া এই মেয়েটির সহিত তাহার যেন কিরূপ একটা স্নেহের আকর্ষণ জন্মিয়া গিয়াছিল। লতার অপেক্ষা মেয়েটি ২।৩ বৎসরের ছোট এবং যথেষ্ট অবস্থাসম্পন্ন হইলেও সব সময় দিদি দিদি বলিয়া লতার পিছনে পিছনে ঘুরিত। স্কুলের মেয়েরা ইহা লইয়া অনেক ঠাট্টা করিয়াছে তাহাদের দুইজনকে।

প্রায় দুই বৎসর পরে আজ আবার এই প্রথম দেখা। হাসি আসিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে লতার একটি হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—কমন রুমে যেতেই—

—কোথায় ছিলি বল ত? তোর কথা জিজ্ঞেস করলুম কেউ বলতে পারলে না।

—আমি একটা রেডিও শাড়ী কিনব ভাবছি অনেকদিন থেকে, কাল আমাদের—

—মিথ্যে কথা বলিস-নি হাসি।

—না সত্যি, কাল আমাদের বাড়ী যাবে বল। ঠিকানা দাও, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দোব।—বলিয়া হাসি লতার হাতখানিতে একটু চাপ দিয়া ধরিয়া রহিল।

—আঃ, ছাড় বলছি আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—'যাব' না বললে কিছুতেই ছাড়ব না।

অগত্যা লতাকে রাজী হইতে হইল। স্কুল হইতে বাহির হইয়া আরও দু-এক স্থানে ঘুরিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা তিনটা।

লতার দাদা দীপেন বাহিরের ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল। ব্যাগটা আড়াল করিয়া লতা যখন দরজাটা পার হইতে যাইবে, তখন দীপেন ডাকিল—লতি শুনে যা ত।

—আসছি দাদা,—বলিয়া লতা ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল।

দীপেন আবার ডাকিল—না আগে শুনে যা।

অগত্যা লতা আসিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, অপরাধীর ভাব তাহার ভঙ্গীতে।

—দেখি ওটা কি।—ব্যাগটা চাহিল দীপেন।

—ও কিছু না।—লতা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

—দেখিই না,—বলিয়া দীপেন হাত বাড়াইয়া ব্যাগটা লইয়া

খুলিয়া ফেলিল। তারপর ভিতরের কাগজ-পত্র নমুনাগুলি বাহির করিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—ও মুখপুড়ী, এই জন্যই তোমায় আমি দু-তিন দিন ধরে দুপুর-বেলায় দেখতে পাই না। সংসার ত এখন আমার ঘাড়ে পড়েছে, তোর অত ভাবনা কিসের? ওসব ছেড়ে দাও।

—কেন, মেয়েমানুষ বলে কি—

—দিদিটি যে আমার নাম করা তর্ক-বাগীশ, তা সবাই জানে। তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। আমি বলছি, তোকে ছাড়তে হবে এই পুরুষপনা।

—কেন, আমি ত আর রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে বেড়াচ্ছি না। জানাশোনা বন্ধুদের কাছেই যাওয়া-আসা করছি। এ রকমভাবে যদি কিছু রোজগার করতে পারি, কেন, করব না? যখন যে রকম অবস্থা, তা যদি মানিয়েই না চললুম, তাহলে আমায় লেখাপড়া শেখালে কেন? তুমি যে এত সেকেলে দাদা, তা জানতুম না।

সেকেলে অর্থাৎ সনাতনপন্থী—এই একটি মাত্র কথা দীপেন সহ্য করিতে পারে না। লতাও তাহার দাদার এই দুর্ব্বলতা জানিত। তাই সময় বুঝিয়া সে ঔষধ প্রয়োগ করিল, ফলও ফলিল।

দীপেন কহিল—না না, বলছিলুম কি জানিস, আমি আর একটা টিউশনি যোগাড় করে ফেলেছি। তাই এখন ও আর তত টানাটানি চলবে না। তা তুই যখন বলছিস...আচ্ছা...তবে মান বাঁচিয়ে চলিস বোন্।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর আমায় বলতে হবে না। আমার ত কিছু করতে হবে না। যারা কিনবে, আমি শুধু তাদের নাম-ঠিকানা কোম্পানীতে পাঠিয়ে দোব, তারপর কোম্পানীই তাদের মাল পাঠিয়ে দেবে।

স্কুল হইতে ছোট ভাই দুইটি আসিয়া পড়িল। লতা পূর্ব্বাহ্নেই তাহাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের লইয়া সে চলিয়া গেল। আর দীপেন তাহার স্নেহ-ময়ী মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধচক্ষে তাকাইয়া রহিল।

পরদিন সকালে লতা হাসিদের বাড়ীতে আসিতেই, হাসি তাহাকে একেবারে উপরে ধরিয়া লইয়া গেল। স্কুলে পড়িবার সময় লতা কখনো কখনো হাসিদের বাড়ীতে আসিত। তাই নূতন করিয়া আর পরিচয় করিতে হইল না। নানারূপ গল্প-সল্পের পর হাসির মা কহিলেন—তাহলে মা তুমি হাসির পছন্দের কাপড়টা যাতে একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসে, সেই ব্যবস্থা ক'র। হাসি বড্ড ধরেছে আমায়। আমি নমুনা দেখেছি, বেশ কাপড়।

'আচ্ছা', বলিয়া লতা উঠিলে হাসি তাহাকে লইয়া দাদার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল,—দাদা, এ'কে চেন? সেই যে লতুদি আসত?

টেবিলের উপর পা দুইটা তুলিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া সুনীল তখন খবরের কাগজ পড়িতেছিল। ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া সে কহিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয় চিনি বৈ কি।

—তুমি [illegible] জমা করাও না দাদা। লতুদি [illegible] কাপড় এনেছে দেখ।

—কোম্পানীটা কি তোমা...আপনার নাকি?—হাসিয়া সুনীল লতাকে জিজ্ঞাসা করিল।

চোখ দুটি নামাইয়া মৃদুস্বরে লতা কহিল, আপনি ত আমায় 'তুমি'ই বলতেন।

—না-না, লতুদি এজেন্সী নিয়েছে।—হাসি বলিল।

—নারে, আমি এখন নেব না। তোর কাপড়টা ত আগে আসুক। দুজনে এক সঙ্গে নিলে লতা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েই খালাস হবে। আর আসবে না। আমাদের ভুলে যাবে। —বলিয়া সুনীল হাসিতে লাগিল। হাসি আর লতাও সে হাসিতে যোগদান করিল।

বিদায়ের সময় হাসি কহিল—লতুদি, আবার আসবে কবে?

—আসব'খন একদিন। বলিয়া লতা হাসিদের মোটরে গিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। লতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যেখানে স্নেহের সম্বন্ধ, সেখানে কি ব্যবসাদারী চলে। হাতের ব্যাগটা যেন এতক্ষণ বিছার মত কামড়াইতে-ছিল।

দিন পনের বাদে কি ভাবিয়া যেন লতা হাসিদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অপরাহ্ন। নীচে কেহ ছিল না। লতা সোজা উপরে উঠিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল, এমন সময় শুনিতে পাইল, উপরে হাসির মা বলিতেছেন—ও সুনীল, হাসি কি বলছে শোন। ওর বড় ইচ্ছে তোর সঙ্গে লতার বিয়ে হয়।

লতার বুকের ভিতরটা যেন কি রকম করিয়া উঠিল। সে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, সুনীল বলিতেছে—কিন্তু তুমি যে দত্তদের কথা দিয়েছ।

—কথা দিই নি বটে, তবে ইচ্ছেটা ইঙ্গিতে জানিয়েছিলুম।

—কিন্তু বাবার যে বড় টাকার 'খাঁই', বাবা কি দত্তদের ছেড়ে—

তা বললে কি হবে। তোর যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে লতাকেই না হয়—

—কিন্তু মা,—একটু থামিল সুনীল—লতা, লতা যে ক্যান-ভাসার!

লতা আর দাঁড়াইতে পারিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল। ভয়ে ভয়ে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দোতলার জানালায় সুনীলের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

ব্যাপারটা একটু বিস্ময়করই বটে। বৈশাখের মাঝামাঝি কেন যেন সহসা সেদিন একটু মলয় বাতাস বহিতেছিল। বোধ করি সেই জন্যই সুনীল তাহাদের গাড়ীটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দত্তদের বাড়ী হইতে রেণুকেও সঙ্গে লইল। এই রেণুর সহিত তাহার মধু-মিলনের একটা চাপা গুজব বহুদিন হইতেই দুই পরিবারে চলিতেছিল। যাহা হউক, লেক্-এ আসিয়া একধারে গাড়ীটাকে থামাইয়া রাখিয়া তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। একমনে গল্প করিতে করিতে তাহারা একটু অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে দুইটা ভীষণাকৃতি লোক আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আর্ত্তনাদ করিয়া রেণু পলাইতে যাইবে,—একটা

লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অপরটার সহিত সুনীল তখন ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা হইতে একখণ্ড পাথর আসিয়া সুনীলের প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। লোকটা চীৎকার করিয়া উঠিয়া মাথায় হাত চাপিয়া পলাইয়া গেল। তৎক্ষণে অন্য লোকটাও রেণুকে ছাড়িয়া দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। রেণু ও সুনীলের ভয়ের ঘোর তখনো কাটে নাই, এমন সময় একটি যুবতী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ভাল করিয়া দেখিয়া সুনীল কহিল—একি, লতা?

—না, ক্যান্‌ভাসার।—মৃদু হাসিল লতা।

লজ্জায় সুনীলের মুখ আপনা-আপনি নত হইয়া পড়িল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে কহিল—তুমি এদিকে এলে কি করে? পাথর ছুড়েছিলে তুমিই?

—ভায়েদের নিয়ে দাদার সঙ্গে আজ হঠাৎ বেড়াতে এসেছিলাম। ওরা কিছু দূরে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে; আমি আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে দেখি এই কাণ্ড।

—ক্যান্‌ভাসার!—সুনীলের চোখে অর্থপূর্ণ হাসি। লতা রাঙা হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল পর লতা কহিল—তা সত্যি, ভাগ্যিস পাথরটা আপনার গায়ে লাগে-নি। আমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না।

লতার ভাইরা আসিয়া পড়িল। উদ্বিগ্নভাবে দীপেন জিজ্ঞাসা করিল—এদিকে এত গোলমাল হচ্ছিল কিসের?

—আরে, দীপেনবাবু যে? আপনার বোন লতা? এ কথাটা এদ্দিন জানতুম না!

পরিচয়-পর্ব্ব শেষ হইল। দীপেন জানিল, সুনীল লতার বন্ধু হাসির দাদা। আর লতা জানিল, আই-এ ক্লাশের সেই বন্ধুত্ব পুনর্জীবন পাইয়াছে। তারপর লতা তাহার দাদাকে আজিকার ঘটনা খুলিয়া বলিল।

রেণু এতক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিল। তাহার দিকে নজর পড়িতেই সুনীল বলিয়া উঠিল—লতা, তুমি এঁকে চেন না? ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী রেণু দত্ত। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকেন। এঁদের সঙ্গে আমাদের—

—জানি। কিন্তু লুচিটা যেন ফাঁক না যায়। লতা হাসিল। সুনীলের মুখে কথা জোগাইল না।

অতঃপর দুই দলে দুই দিকের পথ ধরিল।

ব্যাপার সব শুনিয়া হাসি বলিল,—দেখ দাদা, লতুদি ক্যান্‌ভাসার মেয়ে বলেই তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারলে। আমাদের মত মেয়েরা ত পালিয়েই যাচ্ছিল।

হাসির কথায় সুনীল যেন মনে মনে কি একটা ব্যথা অনুভব করিল। ভাবিল, বলে—শাস্তি আমি খুব পাইয়াছি হাসি, সুতরাং ও জিনিষটা আর দিস না।

হাসির মা বলিলেন—হাঁরে রেণুকে ঠিকমত পৌঁছে দিয়ে এসেছিস ত? কি জানি বাবা, পরের মেয়ে, ভাগ্যিস গয়না-গাটি কিছু খোয়া যায়-নি।

সুনীল তখন কেমন যেন অন্যমনস্ক ছিল, মায়ের কথার জবাব দিল না

...খাইতে বসিয়া সুনীল যখন দেখিল, নিকটে কেহ কোথাও নাই, তখন একফাঁকে মাকে বলিল—তাহলে মা হাসির যখন ইচ্ছে—

—কি রে?—মাতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

—তাহলে...তাহলে ওই লতার সঙ্গেই—

—ও—মনে মনে হাসিয়া মাতা কহিলেন—তাহলে কাল হাসিকে দিয়ে লতাকে ডেকে পাঠাই। তারপর লতাকে বলি, যেন ওর দাদাকে কালই উনির সঙ্গে দেখা করতে বলে।—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। সুনীলও খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

পরদিন হাসি গিয়া জোর করিয়া লতাকে ধরিয়া আনিল।

হাসির মা কহিলেন—ভাগ্যিস তুই ছিলি মা, তাই সুনীল আমার বাঁচল। সবই ভগবানের চক্রান্ত আর কি। তা যাক্, বড় জরুরী দরকারে তোকে আজ ডেকেছি। তোর দাদাকে বলিস দিকিন, আজ-কালের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে।

—কেন মা, হাসিকে নিয়ে যাবার জন্যে?

লতার চোখে অর্থপূর্ণ হাসি।

লতাকে 'দুষ্টু', 'পাজি' ইত্যাদি বলিয়া হাসি পলাইয়া গেল।

মা বলিলেন—হাঁ-হাঁ, তাও হোক্। আমাদের কোন আপত্তি নেই তাতে।...তাহলে মা তোমার দাদাকে ব'ল কিন্তু।

সলজ্জ সম্মতি জানাইয়া লতা উঠিয়া পড়িল।

হাসি গিয়াছিল ড্রাইভারকে ডাকিতে, এমন সময় সুনীল আসিয়া বলিল—তুমি ত আর আমাদের বাড়ী একেবারেই আস না লতা?

—কিন্তু আমি যে ক্যান্—

—ধোৎ,—বলিয়া সুনীল অদৃশ্য হইয়া গেল। হাসিয়া লতা গিয়া গাড়ীতে উঠিল।

হাসির বিবাহ। লতা অনেক কষ্টে 'হাসির বিবাহটা আগে হউক' বলিয়া হাসির পিতা-মাতাকে সম্মত করাইয়া লইয়াছিল।

বিবাহ-বাটী কোলাহল মুখরিত। ত্রিতলের একটি গৃহে সুসজ্জিতা হাসি সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমের ন্যায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছিল। অন্যান্য কয়েকটি তরুণী তাহাকে ঘিরিয়া ছিল। দুই চোখে দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু লইয়া সে লতাকে বলিতেছিল—দুষ্টু, পাজি কোথাকার! তুমি না বলতে, 'প্রয়োজন পড়লে অসি ধরতে' আবার সময়ে কুলবধূ হয়ে থাকতে যদি নাই পারলাম, তাহলে আর লেখা-পড়া শিখলুম কি?' ওকথা যে বলে, সে এখন আমাকে ফাঁসিয়ে নিচ্ছে—

—ওরে হাসি,—বলিয়া কি একটা কাজে সুনীল হন্তদন্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহাকে দেখিয়াই হাসিকে উদ্দেশ করিয়া লতা বলিয়া উঠিল—কিন্তু ভাই, আমি যে ক্যান্‌ভাসার।

কথাটা শুনিয়াই সুনীল লতার দিকে একটা কৃত্রিম কোপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

লতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জয়পুর

(ভ্রমণ-কাহিনী)

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

কয় বছর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়ে গোবিন্দজীর কারুকার্যময় ধ্বংসপ্রায় ভগ্ন মন্দিরটি দেখে এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচার ভয়ে পূজারী ব্রাহ্মণগণ যে গোবিন্দজীকে লুকিয়ে নিরাপদে জয়পুর নিয়ে গিয়েছিলেন—একথা শুনে তখনি মনে হয়েছিল, জয়পুরে গিয়ে গোবিন্দজীকে দেখে ধন্য হয়ে আসি। কিন্তু সেবার আমার সে সৌভাগ্য হয় নাই। শুধু ব্যর্থ কল্পনায়ই পর্য্যবসিত হয়েছে। বৃন্দাবনের নূতন প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীকে দেখেই তৃপ্ত হয়ে ফিরে এসেছি।

তারপর অনেক দিন চলে গেছে জয়পুরে যাওয়ার সময় বা সুযোগ আর হয় নাই। কিন্তু এবার আজমীর হতে ফেরবার পথে জয়পুর দেখে যাব এটা পূর্ব্বে হতেই স্থির করেছিলাম। তাই সেদিন বোধ হয় ইং ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসের শেষের দিকে একখানি ট্রেনে আজমীর হতে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় জয়পুরে এসে পৌঁছলাম, অনেক দিনের গোপন বাসনা আমার আজ সফল হতে চলেছে ভেবে মন আপনি আনন্দে ভরে গেল। ষ্টেশন হতেই একখানা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে শহরের ভিতর এগিয়ে চললাম, পথের ধারে গাছের ডালে এখানে ওখানে দেখলাম, ময়ূর-ময়ূরীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং পাখা বিস্তার করে পেখম তুলে ঘুরে ঘুরে অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গিমা। প্রশস্ত পথে এগিয়ে চলেছি—পথের পুলিশ প্রহরী আমাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, একটু এগুতেই কাষ্টম পুলিশবাহিনী আমাদের গাড়ীখানা থামিয়ে অনুসন্ধান করে ছেড়ে দিল। শহরে আগত সব গাড়ীকেই এমনি বেধে দেয়।

জয়পুর বৃটিশ ভারতের একটি হিন্দু করদ রাজ্য, তাই জয়পুরের শাসন সংরক্ষণ যা কিছু সবই জয়পুর রাজ্যের, অবশ্য সর্ব্বদাই একজন বৃটিশ প্রতিনিধি রয়েছেন। আমরা প্রহরীবেষ্টিত শহরের পথে এগিয়ে চলেছি; উভয় দিকে বড় বড় সুন্দর বাড়ী, ঘর, অফিস, ধর্ম্মশালা পুলিশ অফিস ইত্যাদি। এখানে অনেক ধর্ম্মশালা থাকতেও একটি হিন্দু হোটেলেই গিয়ে উঠলাম—তারা বেশ আদর আপ্যায়ন করে আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিল, শুধু আহার বিশ্রাম নয়, এখানকার যা কিছু বিশেষ দেখবার আছে সে সব দেখাবার জন্য একজন সঙ্গীও জুটিয়ে দিল। হোটেলের বাড়ীটিও নেহাত মন্দ নয়, সবুজ লতা কুঞ্জে সুসজ্জিত ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার, পাথরের সুন্দর দোতলা বাড়ী; আমরা উপরে একটি ঘরেই স্থান পেয়েছি।

যশোরেশ্বরী মন্দির—অম্বর

খানিক বেলায় সঙ্গী সহ আমরা শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম, বেশ বড় রকমের লম্বা শহরটি সোজা চলে গেছে—তার মাঝ দিয়ে চলেছে একটি প্রশস্ত পরিষ্কার বাঁকা পথ—খুব চওড়া চার, পাঁচখানা গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। পথের ধারে দুদিকেই কারুকার্যময় সুন্দর বড় এবং ছোট ছোট বাড়ীগুলি এ শহরের বিশেষ শোভা বর্দ্ধন করেছে। অধিকাংশ বাড়ীই জয়পুরী পাথরে তৈরী, ভাস্কর্য্য শিল্পের জন্য জয়পুর বিখ্যাত, এখানকার প্রত্যেকখানি বাড়ীই তার সুস্পষ্ট পরিচয় দিচ্ছে। আবার দেওয়ালের গায় বিচিত্র চিত্র শোভিত। শহরটির একটি পথই প্রধান, তবে পাশে পাশে কয়টি গলি-পথও আছে। জয়পুর শহরে সর্ব্বত্রই কিন্তু বাড়ীগুলো শিল্প সৌন্দর্য্যে এবং চিত্ররেখায় উৎকীর্ণ। পথের মাঝে মাঝে

প্রহরী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে—পাশেই বিদ্যুৎ আলোক-স্তম্ভ-গুলিও দিনের বেলা পরিশ্রান্তের মত চোখ বুজে নীরবে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। পথের মোড়ে যেখানে দুই তিনটি পথ ভিন্ন দিক হতে এসে মিলেছে, সে সব স্থানে দেখলাম মাঝখানে সুন্দর গোলাকার সুসজ্জিত বিশ্রাম উদ্যান, এখানে শহরের সকল লোকই বেড়াতে আসেন—বিশ্রাম আসনগুলোতে শুয়ে বসে আরাম করেন। এর এক ধারে একটি রাজকীয় বিজ্ঞাপন বোর্ড আছে, রাজ সরকার হতে সর্ব্বসাধারণকে কিছু জানাতে হলে ঐসব স্থানে টাঙিয়ে দেয়। পথের ধারেই বাজার ও দোকানগুলো দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ। জয়পুরের বিখ্যাত পাথরের জিনিষ খেলনা পুতুল মূর্ত্তি, থালা, বাটী, গ্লাস অনেক কিছুই সাজান আছে, সব রকম জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। আমাদের পথ-প্রদর্শক চলার পথে—রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়, ছেলেমেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মধ্য ইংরেজী স্কুল, চিত্র বিদ্যালয়, এসবগুলো দেখিয়ে দিল, আমরা কিন্তু এসব শিল্পচাতুর্য্যময় উচ্চ গম্বুজ শোভিত বড় বড় সুন্দর বাড়ীগুলো দূর হতে দেখে প্রথমে কোন দেব-দেবীর মন্দিরই ভেবেছিলাম—পরে সংগীর

গোবিন্দজী বিগ্রহ—জয়পুর

নির্দ্দেশে বাড়ীর সামনের লেখাগুলো দেখে বুঝতে পারলাম—ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পথে চলেছে দলে দলে এ দেশের নর-নারী পুরুষদের পরিধানে পাজামা অথবা কাপড়, মাথায় টুপি, গায়ে মানানসই জামা হাতে বড় লাঠি—মেয়েদের রংবেরংয়ের ঘাগরা পরা এবং দেশীয় নানারূপ অলঙ্কারে সজ্জিত অবশ্য সাধারণ লোকদের পোষাক পারিপাট্য অতি সাধারণই। ছোট ছেলেদের বিচিত্র পোষাকের সাথে এমন সুন্দর করে মাথায় পাগড়ি আঁটা দেখে ঠিক বাঙলাদেশের যাত্রাওয়ালাদের বালক শ্রীকৃষ্ণটি ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। এদিকে লম্বা কাপড়ের সুন্দর পাগড়ি বাঁধার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

এবার প্রধান রাজপথ হতে আমাদের গাড়ীখানা অপর একটি পথে একটু বাঁক ঘুরে এগিয়ে রাজার হাতীশালার ধার দিয়ে জয়পুরের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর মন্দির দুয়ারে উপনীত হ'ল—অজানিত উল্লাসে আমার প্রাণ-মন নৃত্য করে উঠল। গাড়ী হতে নেমে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম—ধারেই ফুল ফলের দোকান, এগিয়ে যেতে একটু দূরে হতেই দেবদর্শনে পুলকিত সমবেত ভক্ত দলের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর বাতাসের সাথে আমাদের কানে ভেসে আসতে লাগল। আমরাও উৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হলাম, দেব-বিগ্রহ গোবিন্দজীর দিকে চেয়ে, তাঁর অপূর্ব্ব রূপ মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য-শ্রীতে মুগ্ধ হয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম—প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়ে গেল—আহা কি সুন্দর নিকষ কাল পাথরের মূর্ত্তি, তাঁর রূপ যেন শতধারে উপচে পড়ছে। একান্ত মনে দেবতার পায় লুটিয়ে পড়ে ভক্তি প্রেমের অশ্রু ধারায় প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করলাম। দূর দেশাগত শত শত ভক্ত ও দর্শকগণ দেব দর্শনে অপার আনন্দে মন্দিরের এখানে ওখানে দূরে সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে একান্ত মুগ্ধ ভক্তের ন্যায় সরবে অথবা নীরবে নামগান স্তব-স্তুতিতে দেবায়তন মুখরিত করে তুলছে, তাদের সাথে পরম আনন্দে দেবতাকে স্মরণ করতে লাগলাম। একটু বাদেই সবার আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মন্দির দুয়োর বন্ধ হয়ে গেল, উচ্চরবে ভক্তগণ গোবিন্দজীর জয়ধ্বনি করে অর্গলবদ্ধ মন্দির দুয়োরে লুটিয়ে পড়ে প্রণামের সাথে নিবেদন করল প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধার অঞ্জলী। আমিও তন্ময় চিত্তে সবার সাথে আবার প্রণাম প্রদক্ষিণ ও চরণামৃত গ্রহণ করে পূত পবিত্র হয়ে বেরিয়ে এলাম। অদূরেই রাজপ্রাসাদ—এ বিগ্রহও রাজবাড়ীরই কুল-দেবতা—মন্দিরের পূজারী বাঙালী ব্রাহ্মণ—তাদের সাথে বাঙলা ভাষায় আলাপও হল, বহু পূর্ব্বে জয়পুর রাজ এদের আনিয়েছিলেন—যাই হউক, এরা বহুকাল এদেশবাসী, দেখলাম মন্দির প্রাঙ্গণে এবং রাজবাটীর উদ্যানে ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যমুখর অবাধ বিচরণ

এ মন্দির সকাল ৮টায় খোলা হয় আবার দুই ঘণ্টার ভিতরেই বন্ধ হয়ে যায়, আবার খানিক বাদে খোলে এই হল এখানকার নিয়ম। দলে দলে দর্শক অবিরত এসে সমাবেশ হচ্ছে। গোবিন্দজীর আকর্ষণেই দেশ বিদেশের বিস্তর লোক এই জয়পুরে আসেন। মন্দির হতে ফিরে আসবার পথে মনে হ'ল এই সেই গোবিন্দজী যাঁকে ঔরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হতে পুরোহিতগণ লুকিয়ে এই জয়পুরে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখান হতে একটা গভীর ভাবের প্রেরণা নিয়ে সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত রাজবাড়ীর দু'তিনটা ফটক পার হয়ে শোভাময় সুন্দর উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট প্রধান ফটকের সামনে দিয়ে চললাম। ভিতরেও উদ্যান-শোভিত গম্বুজওয়ালা কারুকার্য্যময় রাজবাড়ীর সুন্দর প্রাসাদগুলি মন্দিরের মত দেখাচ্ছে। আরও এগিয়ে গিয়ে আমরা এখানকার আর একটি বিখ্যাত দেবতা "গোপীনাথজীর" শোভনীয় সুন্দর মন্দির দুয়ারে উপস্থিত হ'লাম। গাড়ী হতে নেমেই এই পুরাতন মন্দিরের প্রথম দুয়ারে প্রবেশ করলাম। দেওয়ালের গায়ে দেব দেবীর ও অন্যান্য অনেক রকম চিত্র শোভিত আছে।

ভিতরে গিয়ে দেব-বিগ্রহ গোপীনাথজীর সম্মুখে ভক্তি-নত চিত্তে প্রণত হ'লাম—দেবতাকে ব্যাকুল অন্তরে করজোড়ে ভক্তি নিবেদন করে তন্ময় হ'য়ে চেয়ে রইলাম—নীরবে ধীরে ধীরে দেবতার সকাশে প্রাণের প্রার্থনা জানালাম। পুষ্প-মাল্য শোভিত গোপীনাথজীর সুঠাম সুন্দর শ্রী-বিগ্রহের রূপ-গরিমা সত্যি মানুষের মনে ভক্তিভাব না জাগিয়ে পারে না। রূপের আলো শ্রীমতী রাধারাণী সঙ্গেই আছেন, শত শত ভক্ত নর-নারী দেব দর্শনে পরম আনন্দে প্রণাম প্রার্থনা করে মিলিত কণ্ঠে দেবতার ভজন গাইছে। ভক্ত দলের সঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করে, সুমধুর ভজন গান শুনতে শুনতে গোপীনাথজীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পরম পুলকিত অন্তরে বাহিরে এলাম। এ মন্দিরেও বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালী পুরোহিতই সেবা-পূজা করেন, এখানে মন্দির দুয়ারের

অম্বর দুর্গ—জয়পুর

দু'ধারে জয়পুরের পূর্ব্বেকার রাজা এবং বর্ত্তমান রাজার দু'খানা বৃহৎ তৈল-চিত্র দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান আছে—দেখে মনে হয়, করজোড়ে যেন তাঁহারা দেবতার দুয়ারে প্রার্থনা করছেন। ভাবলাম তা' হলে দেখছি রাজদর্শনও হয়ে গেল। এ মন্দিরও খানিকবাদে বন্ধ হবে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার খুলবে।

এবার সঙ্গী আমাদের নিয়ে এখান হ'তে শহরের অপর একটি পথে রাজার 'বন-উদ্যানে' উপস্থিত হ'ল। এখানে নানাবিধ নিবিড় ঘন ছোট বড় বন-বীথির সারি, তাদের পুষ্পিত সবুজ শাখায় ছেয়ে আছে সব দিকটা।

অনেকটা জায়গা নিয়ে এ বন-বীথি। সরু পথ এ'কে বেঁকে গাছের তলা দিয়ে, ঝোপের ধার দিয়ে, সবুজ ঘাসের বুকের উপর দিয়ে, বেতস বনের মাঝ দিয়ে বাইরে চলে গেছে—এখানে আর কিছুই নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, শুধু নীরব মৌন বনলতার গভীর গহন কানন, তবে কখনও নির্ব্বাক বনানীর মৌনতা ভঙ্গ করে গাছের ডালে পাখীর কাকলী, ময়ূরের কেকা এবং বনান্তরাল হ'তে ঝিঁ ঝিঁ পোকার তীব্র ডাক শুনতে পাওয়া যায়। সযত্ন রক্ষিত কাননটি বড়ই নীরব ও গভীর শান্তিদায়ক বলে মনে হ'ল।

এর পরই নিকটে চিড়িয়াখানা দেখতে গেলাম, এটি কলিকাতা বা লক্ষ্ণৌর মত বিখ্যাত না হ'লেও এখানে দু'চারটি নূতন জন্তু-জানোয়ার আছে, যা অন্যত্র নাই। সুরক্ষিত ঘরে হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা, জেবরা, বাঘ, ভাল্লুক, বানর, সিংহ, শেয়াল, সাপ, পাখী, হাঁস নানা দেশের বিভিন্ন রকমের এ সব জীব-জন্তু রাখা হয়েছে—মনে হয় এখানে ময়ূরই অনেক রকম দেখেছিলাম। খুবই উৎসাহে সব দিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিলাম। এখান হ'তে বেরিয়ে অদূরেই সুন্দর একটি মন্দিরের প্রশস্ত দোতলা বাড়ীতে বিখ্যাত যাদুঘরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ দুয়ারে দ্বারীর কাছে ছাতাটা রেখে প্রথমেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে শ্রেণী-বদ্ধভাবে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত নানা দেশে প্রাপ্ত অনেক কিছু জিনিষ দেখে অবাক হ'লাম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক তাদের চেহারা, পোষাক, গহনা, অস্ত্র-শস্ত্র, ইত্যাদি বিভিন্ন যুগের মুদ্রার সংগ্রহ—পোকা, মাকড়, সাপ, ব্যাঙ মাছ, ঘোড়া, পাখী, হরিণ এ সব মৃত জীব-জন্তু সংগ্রহ, গাছ, পাথর ধাতু দ্রব্য, অনেক কিছু রয়েছে। নীচতলায় দেখলাম ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন বা পুরাতন যুগের প্রাপ্ত সব পাথরে তৈরী দেব-দেবীর মূর্ত্তি, সব চেয়ে এ দেশের বিখ্যাত জিনিষ-গুলোর সন্ধান এখানে পাওয়া যায়—কোথায় কি উৎপন্ন বা তৈরী হয়, তারও নিদর্শন আছে—এ দেশের বিখ্যাত শিল্পী-দের বিভিন্ন শিল্প-চাতুর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ একটির পর

একটি দেখে আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হ'তে লাগলাম—প্রস্তরের সূক্ষ্ম শিল্প সৌন্দর্য্য যার জন্য এ দেশ বিখ্যাত। তারপর পুতুল, খেলনা, বাসন, শতরঞ্চ, কাপড়, কার্পেট, গালিচা, আরও কত কি। এখানে পাঁচ-সাত রকমের পাথর পাওয়া যায়, দু'একটি খুবই মূল্যবান। কুম্ভমেলার বিরাট দৃশ্যটি শিল্পী মাটির পুতুলে তৈরী করে কি অসামান্য প্রতিভারই না পরিচয় দিয়েছে—দেখলেই কুম্ভমেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। মোটের উপর দেখবার ও শিখবার পক্ষে সংগ্রহ বেশ ভালই আছে। এর পরই এখানকার বিখ্যাত চিত্রশালাটির অপূর্ব্ব সুন্দর চিত্র-পরিচয় দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'লাম এবং অনেক সময়ব্যাপী অবাক হ'য়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দলে দলে দর্শক আসছে যাদুঘর দেখতে, নীচুতে রাজ দরবারের হলটিও দেখে এলাম, এখানকার প্রহরীগণ দর্শকদের খুবই যত্ন ক'রে সব বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দেয়।

সকালে যাওয়ার পথেই জয়পুরের সৈনিক নিবাস ও দুর্গ দূর হতেই দেখেছিলাম। বেলা অনেক বেড়ে উঠেছে তাই এবেলা ফিরে চললাম—পথে যেতে দেখলাম বড় বড় গরুর গাড়ী বোঝাই পাথর চলেছে, অত বড় গরু বাঙলায় দেখি নাই, হাট-বাজার হ'তে কুব্জ-পৃষ্ঠ উট গাড়ী টেনে অথবা পিঠে ঝুলিয়ে বস্তা বস্তা মাল নিয়ে যাচ্ছে, গাধার দলও তাদের সামর্থ্যানুযায়ী শাক-সব্জী, বাসন ও ছোট-খাট ফেরিওয়ালার জিনিষ নিয়ে মালিকের সাথে পথ চলেছে, এদেশে এ সবই প্রচলিত। আমরা সঙ্গীর সাথে অনেকটা বেলায় হোটেলে ফিরে এলাম—এবার বিশ্রাম ও আহারের পালা। তাকে বৈকালে আসতে বলে বিদায় দিলাম।

বৈকালের দিকে আমরা অম্বরাধিপতি মানসিংহের রাজধানী দেখতে রওনা হ'লাম, বর্ত্তমান জয়পুর শহর হ'তে ছয় মাইল দূরে উঁচু পাহাড়ের উপর সুরক্ষিত রাজবাড়ী, বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশও মানসিংহের বংশসম্ভূত এবং অম্বরের যা কিছু আজও অতীতের স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে—সবই জয়পুর রাজের। অম্বর রাজপ্রাসাদ দেখতে হ'লে জয়পুর রাজঅফিস হ'তে অনুমতি পত্র নিয়ে যেতে হয়, আমাদের সঙ্গী পূর্ব্বেই সেটি সংগ্রহ করে এনেছেন, তাই নিশ্চিন্ত মনে রওনা হয়েছি। আমাদের ঘোড়ার গাড়ীখানা জয়পুর শহরের সীমা পার হ'য়ে একটি প্রাচীন ফটকের ভিতর দিয়ে পাহাড়ী পথে চলেছে, দূরে কাছে সব পাহাড় আর জংলা, একটু এগিয়ে যেতেই আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলাম—অম্বরের সুদৃঢ় প্রাচীর দেখা যাচ্ছে—এক পাহাড় হ'তে অপর পাহাড়ের উপর দিয়ে কি কৌশলে, কত যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে এ উচ্চ প্রাচীর তৈরী করিয়েছিল—যা এতদিন পরে আজও কালপ্রবাহে সবটা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি। আমরা যে পথে চলেছি, সেটি এ যুগের তৈরী তা দেখেই বুঝতে পারছি, পাহাড় কেটে সোজা প্রশস্ত পথ তৈরী হয়েছে, মোটর গাড়ী সহজেই যাতে যেতে আসতে পারে। তা হলেও এঁকে বেঁকে উঁচু পাহাড়ে উঠতে হ'চ্ছে। অদূরেই দেখতে পাচ্ছি, অম্বরের প্রাচীন পথের রেখাটি পাহাড়ের গা বেয়ে জংলার মাঝ দিয়ে চলে গিয়ে রাজবাড়ীর কোন অজানিত গুপ্ত দুয়ারে থেমে গেছে। এখনও সেটি চিহ্নিত রয়েছে। ঐ দুর্ভেদ্য পথে অপরিচিত লোক সহজে আসতেই পারত না।

এবার আমরা এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে গিয়ে কয়টি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পাশ কেটে উপরে একটি নীরব নির্জ্জন পাহাড়ী সমতলে এসে উপস্থিত হলাম। চারদিকে সারি সারি উঁচু কালো পাহাড় মেঘ-মালার মত ঘিরে আছে—এরি মাঝখানে খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় স্বরূপ—অম্বর রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ স্থাপিত। মানসিংহ যে খুবই বুদ্ধিমানের মত এ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তাতে আর সন্দেহ নাই। চার ধারের পাহাড়ে ছিল তার অভেদ্য দুর্গ, আর তাদের ঘিরে সুদৃঢ় উচ্চ প্রাকার গর্ব্বোন্নত পাহাড় শির হতে নীচু খাত পর্য্যন্ত চলে গেছে। উপরে মাঝখানে চেয়ে দেখলাম, অম্বর রাজধানী আজও যেন তার জাগ্রত স্মৃতি নিয়ে লোক চক্ষে নিস্তেজের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী হ'তে নেমে উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে রাজধানী দেখতে উপরে গেলাম। মনে হ'ল রাজপুতবীর মানসিংহের কথা, চিরকাল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে—তারই প্রধান সেনাপতির কাজে জীবন কাটিয়ে গেছেন—ভাবতেই যেন প্রাণমন এক বিক্ষুদ্ধ বেদনায় সঙ্কুচিত হয়ে এল—পরাধীনতার চেয়ে বেদনা জাগাতে কি আর আছে? অমনিই আবার মনের সামনে ভেসে উঠল উজ্জ্বল ভাস্করের মত রাজপুতবীর প্রতাপসিংহের বীরত্ব ও মহত্বপূর্ণ জীবন।

এ পথে ও পথে একটু চড়াই উৎরাই করে দুটি ফটক পেরিয়ে গিয়ে প্রথমেই রাজবাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পার হয়ে—মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত মা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে হাজির হলাম—রত্নাভরণে ভূষিতা জগৎজননী ভুবনমোহিনী মায়ের অষ্টভুজামূর্ত্তির অপরূপ সৌন্দর্য্যে সবাইকে এখানে মুগ্ধ তৃপ্ত ও শান্ত করে দেয়। পাষাণময়ী মায়ের করুণা ও মাধুর্য্য মণ্ডিত রূপের পানে চেয়ে প্রাণে পরম আনন্দ ও শান্তি পেলাম। এখানে একটি চকমকি পাথরের বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁর উজ্জ্বল আলোক রশ্মিতে দিনের বেলাও খানিকটা জায়গা জ্যোৎস্নার মত আলোকিত হয়ে আছে। এ মন্দিরেও বাঙালী ব্রাহ্মণই পূজকরূপে আছেন। পূজারীর সাথে আলাপপরিচয় হ'ল—তার পূর্ব্ব পুরুষ বহুকাল হতেই এ দেবীর সেবায় নিযুক্ত আছেন—বর্ত্তমান বাঙলার সাথে তাদের আর তেমন সম্বন্ধ নাই। তিনি আমাদের বাঙালী পেয়ে মনের আনন্দে বাঙলা কথায় আলাপ করে তৃপ্ত হ'লেন। মন্দিরে নিত্য পূজা, বলি এবং ভোগ হয়।

প্রবাদ, মানসিংহ যশোর হ'তে এই পাষাণ প্রতিমা যশোরেশ্বরীকে নিয়ে এসে আপন রাজধানী জয়পুরে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জাগ্রত দেবীমূর্ত্তির পূজায় মানসিংহ অনেক সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে স্বপ্নাদিষ্ট হ'তেন। আজও এ দেবী খুবই জাগ্রত ও প্রসিদ্ধ; প্রতি বৎসর অগণিত লোক দেবী দর্শনে আসেন।

(শেষাংশ ৪২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টিকি বনাম প্রেম

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(৩)

ডক্টর সুশনীগের সঙ্গে বেৎসগাদেনে সাক্ষাতের সময় হিটলারের তর্জন গর্জনই এ যুগের মানসিক উত্তেজনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বোধ হয় তারপরই স্থান পাইবার যোগ্য অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর রায় বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায়ের অদ্যকার মানসিক উত্তেজনা।

হলের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে হলধর এক একবার টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করেন, ঝনঝন্ শব্দে দোয়াতদানি ও গেলাস কাঁপিয়া উঠে, রায় বাহাদুর গর্জন করেন, অল্ রট্।

কখনও বা টেবিলের উপর হইতে গেলাস তুলিয়া চুমুক দেন।

তাঁর মনে হয় এইরূপে মিথ্যাচারী বলিয়া জাতিটা যুগ যুগ ধরিয়া পর পদানত রহিয়াছে। সত্যের পথে চলিতে না শিখিলে কংগ্রেস, ট্রেড্ ইউনিয়ন, কিষাণ সভা সবই বিফল হইতে বাধ্য।

"ভূস্বামীর ভাগ্য বিপর্যয়ের" জন্য তিনি দিলেন সাড়ে সাত শত টাকা। অথচ বিপর্যয়ের অধিকাংশই পাওয়া গেল না।

এ চুরি করিল কে? তরুণ চৌধুরী, না অন্য কোনও সাহিত্য তস্কর?

কাল বইখানা পার্শেলে আসিয়াছে, তখন তিনি পার্শেল খুলেন নাই। বাহিরের লোকও কাল হইতে কেহ আসে নাই।

ব্যাপার রহস্যময়।

হলধর টেবিলে কলিং বেল টিপিলেন।

যথারীতি একটি লোক ঘরে ঢুকিল, লোকটির চোখ দুটো উজ্জ্বল, উদর ঈষৎ স্থূল, বয়স পঞ্চাশের পর।

হলধর তাকে সম্ভাষণ করিলেন, উট্রাম।

উট্রাম হলধরের দিকে চাহিল।

উট্রাম অল্ রট্।

উট্রাম সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া হলধর আবার বলিলেন, ইউ আর এ ফুল, উট্রাম।

উট্রাম ভাবিল বোকা সে নিশ্চয়ই নতুবা জীবনে একদিনের জন্যও হাকিম হইতে পারিল না?

হলধর বলিলেন, উট্রাম এই পুঁথিখানার অর্ধেকটার উপর খোয়া গেছে।

হ্যাঁ, একটু আগেই আপনি বলেছেন।

কে করলে বল দেখি?

উট্রাম সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে না পারায় হলধর কহিলেন, যাও, কক্‌টেইল।

উট্রাম এতক্ষণ এই আদেশেরই অপেক্ষায় ছিল। কক্‌টেইল শুনিয়া সে আর মুহূর্তও বিলম্ব করিল না।

সে মদ দিয়া গেলে রায় বাহাদুর বলিলেন, খোকন বাবু।

একটু পরে প্রকাশ ঘরে ঢুকিল। রায় বাহাদুর তাকে দেখিয়াই কহিলেন, বাঙালী জাতিটা বড় ডিগ্রেডেড (অধঃপতিত)

আর কেহ এই কথা বলিলে প্রকাশ তাঁর প্রতিবাদ করিত।

ভেরী মাচ্ ডিগ্রেডেড বলিয়া রায় বাহাদুর গেলাসে আর একটা গভীর চুমুক দিলেন।

প্রকাশ নীরব।

কি হয়েছে জান, প্রকাশ?

না।

৩৮০ ধারা, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্।

প্রকাশ মাতামহের দিকে চাহিয়া রহিল।

হলধর বলিলেন, ফৌজদারী আইনে যাকে বলে ৩৮০ ধারা।

প্রকাশ আইন পড়ে নাই, ধারার মর্ম বুঝিল না।

তার মাতামহ বলিলেন, এখন থেকে তুমি নিজেকে ডিটেক্‌টিভ মনে করবে। অবশ্য প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ।

প্রস্তাবটায় প্রকাশ প্রসন্ন হইতে পারিল না, সকালের গোয়েন্দাগিরির স্মৃতি তখনও তাজা ছিল।

হলধর টেবিলের উপরের একখানা পুঁথি তার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, এইটে দেখ, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের একখানা অমূল্য রত্ন, যা নিয়ে আমি রিসার্চ করছি।

প্রকাশ দেখিল বইখানা উপরে ও নীচে দুই টুকরা কাঠ দিয়া বাঁধা। কাঠের পর প্রথম পাতায় বড় বড় হরপে বইর নাম,—"ভূস্বামীর ভাগ্যবিপর্যয়"।

নীচে লেখা, তারাসুন্দরীর পাতিব্রত্য, কাত্যায়নীর কর্মনৈপুণ্য, রমাপ্রসন্ন ভট্টার বন্ধু প্রীতি, রঘুরামের দস্যুতার কাহিনী সম্বলিত অনবদ্য গ্রন্থ। বঙ্গ ভাষায় গ্রথিত, রচনার সন ১১৭৬, লেখক বংশচন্দ্র তর্কবাগীশাত্মজ হংসেশ্বর তর্কবাগীশ দেবশর্মা। বাস্তব্য কোঙোয়ালীপাড়া। পূর্ববঙ্গ ভূক্তি।

হলধর বলিলেন,—ঐ ব্যাপার নিয়েই গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

কি রকম?

শোন তবে, খুব সহজ ও সরল, পুঁথি চুরি

এই বইর খানিকটা অংশ তরুণ চৌধুরী নামে একজন ছোকরা সাহিত্যিক আমাকে শুনিয়ে যায়। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অমন একখানা অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করতে আমার যে অত্যন্ত আগ্রহ হয় তা তুমি সহজেই বুঝতে পার।

তরুণ বলে, বইর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তার দেশে আছে। কিছুদিন পরে সে বাড়ী গেলে আমি ডাকে টাকা পাঠিয়ে দেই, বইর পুরা দাম, সাড়ে সাত শ' টাকা।

তরুণ বইও পাঠিয়েছে, কিন্তু আজ খুলে দেখছি বইখানা অসম্পূর্ণ। সে বলেছিল পুঁথিতে সাড়ে তিনশ' পাতা আছে, আমি পাচ্ছি সওয়া শ'রও কম।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, এই তরুণকে আপনি চিনলেন কি করে?

কেন তুমি তাকে দেখনি? আরও দু'দিন এসেছিল।

না।

প্রথম তার সঙ্গে এক সাহিত্যিকের বাড়ীতে দেখা হয়,

তারপর আলাপ হইয়াছে সাহিত্য-সেবক সমিতিতে। যাক এই নিয়ে তোমায় এন্‌কোয়ারী করতে হবে, দরকার হলে যেতে হবে কোতোয়ালীপাড়ায়।

তাকে একখানা চিঠি লিখে দিলে হয় না?

কথাটা প্রাইভেট্ ডিকেট্‌টিভের মতন হল না, প্রকাশ। সেত লিখবেই যে পুরো বই পাঠিয়েছে।

যদি তাই সত্য প্রমাণিত হয়?

তাহলে গোপনে তোমাকে গবেষকদের বাড়ী বাড়ী সন্ধান করতে হবে। এই শহরে হাজারো বইচোর ও সাহিত্য তস্কর আছে। পরের লেখা পরের পরিশ্রমলব্ধ তথ্য চুরি করে নিজের নামে চালানই তাদের ব্যবসা।

প্রকাশ বলিল, হাঁ শুনেছি বটে একদলের কাজই ঐ।

হলধর বলিলেন, এদের আমি পুলিশে দেব।

পরক্ষণেই তাঁর চিন্তার ধারা বদলাইয়া গেল, তিনি বলিলেন, অল্ বস্। আমিই কি চোর নই? ধর আমিই যদি একখানা পুরানো পুঁথি পাই যেটা সাহিত্যের সম্পদ্ বলে গণ্য হতে পারে তাহলে কি সেখানা সবাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি? হে হে তুমি বোধ হয় ততটা বোকা আমায় মনে কর না।

প্রকাশ কোন মতামত প্রকাশ করিল না।

রায় বাহাদুর বলিয়াই চলিলেন, অথচ দশ বছর আগে আমিই এইরূপ একজন চোরকে অন্তত ছয় মাসের জেল দিতাম।

প্রকাশ বলিল,—সেই কাজ এখন নিজে তুমি করতে পার?

হলধর বলিলেন,—ফ্রেল্‌টি অফ হিউম্যান নেচার (মানব প্রকৃতির দুর্বলতা) প্রকাশ, অল বস। অথচ আমি অসাধু নই, তস্করও নই, তবে কি না রিসার্চের ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম দুদেশেই ওটা হয়ে থাকে।

রায় বাহাদুরের চিন্তাধারার আবার পরিবর্তন হইল, তিনি দৌহিত্রকে প্রশ্ন করিলেন, গবেষক হিসাবে আমার কিছু নাম হচ্ছে?

প্রকাশ উত্তর করিল, তোমার মোস্লেম বৈষ্ণব কবি প্রবন্ধটা উঁচুদরের।

তুমি নিজে পড়েছ?

হ্যাঁ।

বেশ, বেশ। ভূস্বামীর ভাগ্য বিপর্যয়ের রহস্য তুমিই উদ্ঘাটন করতে পারবে, তরুণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হংসেশ্বরের রচিত। তিনি ছিলেন দিক্‌পাল পণ্ডিত। প্রতিপক্ষদের তর্কে পরাজিত করে মাথায় ধুলো ঝেড়ে দিতেন।

প্রকাশ মন্তব্য করিল,—বড় অসহিষ্ণু লোক ছিলেন ত'।

হলধর কহিলেন, পণ্ডিতরা ওরূপ হয়েই থাকেন, উট্রাম।

সঙ্গে সঙ্গে উট্রাম ঘরে ঢুকিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, গেলাস খালি হয়েছে।

উট্রাম দাঁড়াইয়া রহিল।

হলধর বলিলেন, ও, আমি বুঝি বলিনি কি আনতে হবে? শেরি, উট্রাম। বুড়ো বয়সে কী ভুলই না হয়েছে, স্যাম্পেন বলতে বলি শেরি। অল রট্।

উট্রাম চলিয়া যাইতেছিল, প্রকাশ বলিল, একটু দাঁড়াও, উদয়দা। দাদু, আজ আর তুমি মদ খেতে পাবে না।

রায় বাহাদুর বলিলেন, কেন?

আমার অনুরোধ।

তোমার মা ঠিক এমনি করে বল্‌ত, আর বলতেন তোমার দিদিমা। উট্রাম।

আজ্ঞে।

রায় বাহাদুর বলিলেন, তুমি একটা—

তাঁর কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রকাশ কহিল, তুমি এখন যাও উদয়দা।

সে চলিয়া গেলে হলধর কহিলেন, মদের হুকুম করলে ওর ভারী ফুর্ত্তি হয়, ভাগ বসাতে পারে কিনা।

প্রকাশ জানিত ইহার জন্য—তার মাতামহই দায়ী। সে তাই কোন উত্তর করিল না।

হলধর কহিলেন উট্রামের নেশা হয় না, মদ খেয়ে যার নেশা না হয় সে একটা ভিলেইন, প্রকাশ।

একটু পরে বাহিরে যাইবার সময় প্রকাশ উট্রামকে ডাকিয়া বলিল, দাদুকে আজ আর মদ দিওনা, উদয়দা।

দিন কয়েক পরের কথা, তরুণ চৌধুরী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে এই খবর পাইয়া তার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রকাশ বাগবাজার যাইতেছিল।

পথে ট্রাম হইতে দেখিতে পাইল হেদুয়ার দীঘির পশ্চিমের রেলিংয়ে ঝুলানো একখানা সাইনবোর্ড। গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিলে প্রকাশ নামিয়া পড়িল। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল,—

> তিব্বতী মতে ভাগ্য গণনা করি। মামলার ও
> প্রেমের ফলাফল এবং চোরাই মালের সন্ধান
> বলিয়া দিতে পারি। বশীকরণ মন্ত্র জানি,
> গন্ধর্বসিদ্ধির কবচ দেই। সকলই সুলভ।
> রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন।

বিজ্ঞাপনের নীচেই গৌরবর্ণ একটি লোক বসিয়া, কালো কুচকুচে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, তার দু'টা ভুজ লাল ও একটা শাদা, গায়ে ভৃগু নামাবলীর ফতুয়া।

ভৃগুলাঞ্ছনের সামনে জলচৌকিতে পিতলের চারটি ছক। কয়েকখানা পুঁথি এবং খেরুয়ার বাঁধা খাতা ও দোয়াত কলম।

প্রকাশ নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলে ভৃগুলাঞ্ছন পিছন হইতে একখানা ছোট মাদুর বাহির করিয়া বলিলেন, বসুন।

বেলা তখন দু'টা, রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, পথে লোক চলাচল কম। তবুও প্রকাশ এদিক ওদিক চাহিয়া আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাঙালী?

হাঁ, বাঙালী ব্রাহ্মণ

প্রণাম।

জয়োস্তু, আপনি?

"ব্রাহ্মণ" বলিয়া প্রকাশ জ্যোতিষীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলে তিনি তাকে একখানা কাগজ দিয়া বলিলেন, পড়ুন।

কাগজখানি হাতের লেখা মূল্য তালিকা—

সাধারণ হাত দেখা—/৫ পয়সা।

চাকুরী গণনা—/৫ পয়সা।

প্রেমগণনা—।/৫ আনা।

চুরিগণনা—।/৫ আনা।

প্রশ্নগণনা (প্রতি প্রশ্ন)—/৫ পয়সা।

কবচ (গ্রহানুযায়ী)—।/৫ আনা হইতে ঊর্ধ্বে।

নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার—১৲ হইতে ঊর্ধ্বে।

রাশিগণনা—।/৫ আনা।

তালিকা পড়িয়া প্রকাশ কহিল, মূল্যের জন্য আটকাবে না, দয়া করে হাত দেখুন।

ভৃগুলাঞ্ছন প্রথমে প্রকাশের ডান হাত দেখিলেন পরে বাঁ হাত, শেষে দুখানা হাত পাশাপাশি রাখিয়া আঙুলের ডগা টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষান্তে কহিলেন, মহাশয় ভাগ্যবান পুরুষ হবে বর্তমানে সময়টা মন্দ।

প্রকাশ চুপ করিয়া রহিল, জ্যোতিষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

প্রকাশের মুখের ভাবের একটু পরিবর্তন হইল।

ভৃগুলাঞ্ছন পিতলের ছক চারটি ডান হাতের মধ্যে নাড়িয়া পাশার ঘুঁটির মতন মাদুরের উপর ছড়াইয়া দিলেন। তারপর ছকের অঙ্ক দেখিয়া একখানা কাগজে লিখিলেন—

চং ৩×৭=২১।

মং ৪×৫=২০।

সং ৮।

মোট ৪৯।

তারপর বলিলেন, ইহাই তিব্বতীয় গণনা, নেপালে কপিলাশ্রমে শিখেছি।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছে আপনার তিব্বতীয় মত?

সংখ্যা পাচ্ছি ৪৯, অতএব আপনি প্রেমার্ত হয়েছেন, ৪৯ প্রেমের সংখ্যা।

প্রকাশের চোখে এবার বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইল।

ভৃগুলাঞ্ছন কহিলেন, কি বলেন, গণনা ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ।

তিব্বতীয় চক্রপাতন মিথ্যা হয় না, কিন্তু—

প্রকাশ বলিয়া উঠিল কিন্তু কি, সফল হওয়ার আশা কম এই ত'।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, আপাততঃ তদ্রূপই প্রতিভাত হচ্ছে।

প্রতিদান ত' দূরের কথা, সে জানে না যে আমি তাকে ভালবেসেছি। আমিও তার নাম ঠিকানা পর্যন্ত জানি না।

ভৃগুলাঞ্ছন ধীরে ধীরে বলিলেন, অপরিচিতের প্রতি প্রেম প্রগাঢ়ই হয়ে থাকে।

খুবই প্রগাঢ়, ঠাকুর মশাই।

একটা ফলের নাম করুন।

শশা।

না, একটা শক্ত ফল।

কাঁঠাল।

জ্যোতিষী বলিলেন, ফলটা কণ্টকাকীর্ণ। আপনার প্রেমে বাধা বিঘ্ন আছে।

তা ত' দেখছি।

আপনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রেমে পড়ে থাকেন। প্রেমে পড়া আপনার একটা ব্যাধি।

প্রকাশ বলিয়া উঠিল, নন্‌সেন্স, এর আগে প্রেমে পড়াকে আমি ঘৃণা করতাম। এই আমার প্রথম প্রেম, এই শেষ।

ভৃগু কখনও মিথ্যে হয় না, বারাণসীতে আমি ভৃগু অধ্যয়ন করেছি। স্বামী বিহুলানন্দ আমাকে ভৃগুলাঞ্ছন উপাধি দিয়েছেন বলিয়াই জ্যোতিষী স্বামীজীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

প্রকাশ বলিল, তা' হ'লে ভৃগুর এক্ষেত্রে পরাজয় হল।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, অসম্ভব। ভুলচুক বরং আমার হতে পারে। আচ্ছা আপনার বয়স?

আটাশ।

রাশি?

মেষ।

কোথায় প্রথম সাক্ষাত লাভ করলেন?

সিনেমায়।

কোথায়?

বায়স্কোপে।

আপনি কোন দিকে মুখ করে বসেছিলেন?

উত্তর।

সেই মহিলা?

মহিলা নয়, তরুণী।

বেশ, সেই যুবতী?

প্রকাশ বলিল, যুবতী শব্দে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। সেও আমার পাশে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছিল।

ভৃগুলাঞ্ছন এবার চোখ বুজিয়া দুইবার নিজের নাকের অগ্রভাগ টিপিয়া আপন মনেই আওড়াইতে লাগিলেন—

অন্ত্যাত্তরসাং—

বাকীটা প্রকাশ শুনিতে পাইল না।

ভৃগুলাঞ্ছন বলিলেন, তিনমাস পরে বৃহস্পতিতে মেষের সংক্রমণ হবে তখন ফল শুভ।

তি—ন মাস, বড় দীর্ঘ সময়।

বর্তমানে ভারত রাহুগ্রস্ত, আপনিও রাহুগ্রস্ত, অতএব সম্প্রতি সুফল লাভের আশা করা যায় না, বিশেষতঃ এটা যখন আপনার একমাত্র প্রেম।

ঠিক বলেছেন, জীবনে আর কখনও প্রেমে পড়ব না। যে তাকে একবার দেখেছে, লাঞ্ছনা ঠাকুর।

লাঞ্ছনা নই, আমি ভৃগুলাঞ্ছন।

ক্ষমা করবেন, তার ঠিকানাটা কি আপনি গণনা করে

বার করতে পারেন? তিন চারজন জ্যোতিষীর কাছে গিছলুম, কেউ পারেন নি।

আপনাকে অপেক্ষাই করতে হবে। কলকাতার অনেক রাস্তার নাম ইংরেজী। ঐসব নামের সংগে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত তিথি নক্ষত্রের সংস্থান করা অসম্ভব। তবে কৈতবাচারী জোতির্বিগণ ঐরূপ করে থাকে; কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছনের পক্ষে—

অন্ততঃ তার পরিচয়টা, কি জাত সে?

তাহ'লে আপনার লগ্ন বিচার করতে হবে।

আমার কি লগ্ন জানি না, আপনি গুণে দেখুন।

লগ্ন গণনা মূল্য তালিকায় নেই অথচ গোচরে চন্দ্রশুদ্ধি বিচার করতে হলে—

প্রকাশ পকেট হইতে একখানা নোট বাহির করিয়া বলিল, এই নিন আপনার যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। লগ্নটা গুণে দয়া করে বলুন কতদিনে চন্দ্রশুদ্ধি হবে।

জ্যোতিষী প্রকাশকে ভ্রূ কুঁচকাইতে বলিলেন। সে ভ্রূ কুঁচকাইলে কপালের রেখাগুলি গুণিয়া রামবাঞ্ছা আর একবার তার হাত দেখিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে কহিলেন, আপনি বৃষই বটেন—অর্থাৎ বৃষ রাশি।

প্রকাশ বলিল, একেবারে রাজযোগ, মেষ, বৃষ মাইক এর ফল?

চন্দ্রের অন্তর্দশায় শুভফল।

কতদিনের মধ্যে?

সূচনা হয়ত মাসখানেকের মধ্যেই হবে।

কি শুভ?

আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

Right O' you are an astronomical genius বলিয়া প্রকাশ জীর্ণ জলচৌকির উপর একটা ঘুসি বসাইয়া দিল।

ভৃগুলাঞ্ছন কহিলেন, বাঙলায় বলুন। আমি রাজভাষায় অনভিজ্ঞ।

ও কিছু নয়।

বুঝেছি, একটা উচ্ছ্বাস মাত্র। আপনার মুষ্ট্যাঘাতের প্রমাণ দেখে' মহাকবির কথা মনে পড়ল, প্রকৃতি কৃপণা চেতনা চেতনেষু। যাক্ এই শুভফলের সম্ভাবনা দৃঢ়তর করবার জন্য গোমেধ ধারণ করলে ভাল হয়।

তার খরচা কত?

রাহুর পূজা, দ্রব্য মূল্য, গোমেধের মূল্য, ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণা ইত্যাদিতে অবস্থা ভেদে ৫৷৵ আনা হইতে ১৩৷৵ আনা।

তা হ'লে ফল সুনিশ্চিত?

নিশ্চয়।

কাল এই সময় আরও পনের টাকা নয় আনা পাবেন। আপনি নিজেই পূজো করুন বলিয়া প্রকাশ মাথা খুব নোয়াইয়া জোতিষীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তিনি তার মাথায় হাত রাখিয়া শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন।

প্রকাশ চলিয়া গেলে একটি কনেষ্টবল্ জ্যোতিষীকে বলিল, ঠাকুর জি আজ তিন রোজ—

জমাদার সাব, টাকাটা ভাঙিয়ে বিকেলে একবারে পাঁচ দিনের গ্রহশান্তি করব।

ঠিক হ্যায়, ছয় বাজেকে আগারী—

কনেষ্টবলের কথা আর শেষ হইল না, অদূরে সার্জেন্টের মোটর বাইক দেখা গেল।

(ক্রমশ)

জয়পুর

(৪১৯ পৃষ্ঠার পর)

বর্ত্তমান জয়পুর রাজবংশেরই কুলদেবী মা যশোরেশ্বরী। গোবিন্দজীর, গোপীনাথের এবং এ মন্দিরেও বাঙালী পুরোহিত রয়েছে, দেখেই মনে হ'ল হয়ত রাজা মানসিংহই বাঙলা হ'তে এদের সংগে করে নিয়ে এসেছিলেন।

দেবী মন্দির হ'তে বেরিয়ে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করে বিখ্যাত শিল্পীদের অপূর্ব্ব শিল্প-সম্ভারে উৎকীর্ণ রাজপ্রাসাদের ঘরগুলো একটির পর একটি দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'তে লাগলাম। আজকের শিল্প-জগতে এর তুলনা হয় না। নীরস প্রস্তর গাত্রে এমন সরস সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখে অবাক হতে হয়—কি সুন্দর, কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। অন্দর মহল, বাহিরের দরবার, ভিতরে পূর্ণিমা সম্মিলনের স্থান—সবই ঘুরে দেখলাম, উদ্যান, বিশ্রাম-কানন, স্নানাগার, নিজেদের এবং দাস-দাসীদের, কর্ম্মচারীদের বাস-গৃহ সবই দেখা হ'ল। আজ সব পড়ে আছে, যেন নীরব প্রাণহীন দেহ, অতীতের স্মৃতি বোঝা স্বরূপ হ'য়েই পড়ে রয়েছে।

রাজপ্রাসাদ হ'তে বাইরে এসে চারিদিক ভাল করে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম—অদূরেই পাহাড়ে পাহাড়ে ভগ্নপ্রায় দুর্গ প্রাচীর বন-জংগলার ভিতর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ পাহাড়ী রাজধানীতে যেন আর কোথাও কেউ নাই। খুবই সুরক্ষিত ছিল এ রাজবাড়ী, এর উচ্চ প্রাকার হ'তে দেখতে পাওয়া যেত—দূরাগত শত্রু বা মিত্রের গতিবিধি; একটি গুপ্ত পথও ছিল, উপর হতে শীঘ্র নীচুতে আসবার ও যাবার জন্য। সংগী আমাদের সাথেই ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখিয়ে দিল। এবার ধীরে ধীরে নেমে ফিরে চললাম জয়পুরে—পড়ন্ত বেলায় পথের ধারে দলে দলে ময়ূর ও হরিণের স্বাধীন বিচরণ দেখে প্রাণে বড়ই আনন্দ হ'ল। জয়পুর সীমায় রাজ আজ্ঞায় হরিণ বা ময়ূর শিকার নিষেধ। কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই অম্বর রাজধানী হ'তে—আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করে—আমাদের ঘোড়ার গাড়ী এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে আলোমালা সজ্জিত জয়পুর শহরে নামিয়ে দিল। সে দিনের জয়পুরে স্মৃতির সাথে—গোবিন্দজী—গোপীনাথ—এবং অম্বরের মা যশোরেশ্বরীর স্মৃতি মনের ভিতর চিরদিন উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে।

শিম্পাঞ্জীর শিক্ষায় নিপুণতা

মিশিশিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক **ডক্টর উলফ্** শিম্পাঞ্জীদের লইয়া বহু পরীক্ষা চালাইয়াছেন, তাহাতে উহারা আশ্চর্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে যে কোনও প্রকার শিক্ষা গ্রহণের।

প্রথমত ডাঃ উলফ্ শিম্পাঞ্জীদের শিক্ষা দেন জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করিতে। উহাদের কয়েক ঘণ্টা উপবাসী রাখিয়া ইঙ্গিত করিয়া জানান হয় উপস্থিত কাজটি সম্পন্ন না করিলে খাবার দেওয়া হইবে না। এই প্রকারে কয়েক দিনের ভিতরেই উহারা এতটা অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, সেই কাজটি কতক্ষণে করিতে দেওয়া হইবে সেই জন্য অস্থির হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে থাকে।

লণ্ডন জুয়ের 'বু-বু' নামক শিম্পাঞ্জীটি উহার কন্যা 'জুবিলি'কে উপহার প্রাপ্ত মগ্ (mug) হইতে দুধ খাওয়াইতেছে। মগের উপরকার বোতাম টিপিলে নীচেকার ছিদ্রপথে দুধ বাহির হয়—এ কৌশলটি শিখিতে উহার কয়েক মিনিট মাত্র লাগিয়াছিল।

এই শিক্ষা শেষ হইলে শ্লট মেশিন (Slot machine) হইতে নির্দিষ্ট ওজনের চাকতি দিয়া খাদ্য গ্রহণ কাজটি শিখান হয়। সকলেই জানেন শ্লট মেশিনের সরু গর্তটিতে উপযুক্ত ওজনের পয়সা (অথবা আনি, দুয়ানি, পেনি) না দিলে অভ্যন্তরস্থ জিনিষ বাহির করিয়া নেওয়া যায় না। উহারা প্রদত্ত চাকতি মেশিনে ঢুকাইয়া দিয়া খাদ্য, জল প্রভৃতি বাহির করিয়া লইতে শিখিয়া ফেলিল।

তখন ঐ চাকতিগুলি পাইবার জন্য উহাদের কাজ করিবার ব্যবস্থা হইল। তখন খাদ্য পাইবার জন্য যে প্রকার কাজ করিতে উহারা উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, এইবার চাকতি অর্জন করিবার জন্যও সেই প্রকার উৎসাহ-উদ্যম প্রদর্শন করিল। চাকতি সাহায্যে যে খাদ্য জল প্রভৃতি লাভ করা যায় এই কথা উহারা ভাল করিয়াই বুঝিয়া ফেলিল। শুধু তাহাই নয়, কোন্ ওজনের চাকতিতে জল, কোন্ ওজনের চাকতিতে খাদ্য, কোন্ ওজনের চাকতিতে এক দুই কি তিনবারের খাদ্য পাওয়া যায়, তাহাও উহারা মালুম করিয়া লইল।

ইহার পর ডাঃ উলফ্ উহাদের ধাপ্পা দিবার এক চতুর ব্যবস্থা করিলেন। পিতল, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর চাকতির বদলে উহাদের দেওয়া হইল স্ট্রবোর্ডের চাকতি, যাহা ওজনে হালকা এবং যাহা দ্বারা শ্লট মেশিন হইতে কিছুই পাওয়া যাইবার কথা নয়। দুই-তিনবার বৃথা চেষ্টা করিয়াই উহারা ডাঃ উলফের চালাকি ধরিয়া ফেলিল। ইহার পর ঐ চাকতি উহাদের দেওয়া হইলেই উহারা ফেলিয়া দিত।

ইহার পর উহাদের শিখান হয় পরস্পরে বিনিময়ের প্রথা। ডাঃ উলফ একদিন একটা শিম্পাঞ্জীকে জল না দিয়া রাখিলেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। এটি জলের জন্য নানাপ্রকার আকুতি জানাইতে লাগিল। ঠিক ঐ সময়ের জন্য অন্য একটি শিম্পাঞ্জীকে রাখা হইল অনাহারে। যখন ডাঃ উলফ্ বুঝিলেন উহারা পিপাসা ও ক্ষুধায় বিশেষ কিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তখন অনাহারে কাতর শিম্পাঞ্জীকে দেওয়া হইল জল পাইবার চাকতি, আর পিপাসার্তটিকে দেওয়া হইল খাদ্য পাইবার চাকতি।

উহারা উভয়েই চাকতি পাইয়া কিছুক্ষণ চাকতিটির দিকে তাকাইয়া রহিল, পরে হাত নাচাইয়া ওজন করিয়া দেখিল। পরে একে অন্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অপরের হাতের চাকতিটি দেখিয়া উভয়ে তখন ডাঃ উলফের সে ধোঁকাও ধরিয়া ফেলিল, হাত বাড়াইয়া চাকতি বিনিময় করিয়া লইল এবং তাড়াতাড়ি শ্লট মেশিনের কাছে চলিয়া গেল।

গ্রামোফোন রেকর্ডে 'উইল'

পাশ্চাত্যে ধনীদের ভিতরে নানাপ্রকার অদ্ভুত খোশ-খেয়ালের প্রচলন দেখা যায়। যাহা গতানুগতিক, যাহা অপর দশজনকে করিতে দেখা যায়—তাহা বর্জন করিয়া নূতন একটা কিছু করিতে না পারিলে যেন তাহাদের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে।

এই প্রকার খাম-খেয়ালের কাণ্ডই হইল কাগজে-পত্রে মোশাবেদা করাইয়া 'উইল' স্বাক্ষর না করিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে নিজ মুখের বাণী বন্দী করিয়া রাখা। উইলের রেকর্ড করিয়া রাখা এখন পাশ্চাত্যের অভিজাতমহলে হাল-ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। এই রেওয়াজের আবিষ্কর্ত্রী হইলেন প্রবীণা মিসিস এডিথ আর্ল। তাঁহার এই নূতন প্রথা ক্রমশ উচ্চ সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ইহাতে সুবিধা অনেক, প্রথমত উকিলের ফী দিতে হয় না, দ্বিতীয়ত মাত্র ছয় পেনি ব্যয়ে এক-একখানি রেকর্ড প্রস্তুত করান যায়।

মিসিস আর্ল বার্কশায়ারের মেইডেনহেডে এক রেকর্ড

প্রস্তুতের কারখানায় রেকর্ডিং বক্সে বসিয়া দশখানা গ্রামোফোন রেকর্ড প্রতীক তোলাইয়াছেন এল্যুমিনিয়াম চাকতিতে—ব্যয় পড়িয়াছে সর্বশুদ্ধ পাঁচ শিলিং। ইহার প্রত্যেক খানিতে রহিয়াছে তাঁহার কথিত 'উইল'।

পাঁচ শিলিং মাত্র ব্যয়ে নির্মিত হইলেও, উহার মূল্য এখন হাজার হাজার পাউণ্ড—কারণ 'উইল' দ্বারা বিতরিত সম্পত্তির মূল্য অসামান্য।

এই রেকর্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়। এবং উইলকারী বা উইলকারিণীর মৃত্যুর পর বিরক্তিকর দীর্ঘ উইল-পত্র পাঠ করা অথবা অন্য দ্বারা পঠিত হইলে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না বিলি-ব্যবস্থার প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করিতে। রেকর্ডে যে উইল করা হয়, তাহা যেমন সংক্ষেপ, তেমনি সরল—কোনও আইনের খুঁটিনাটি, মারপ্যাঁচ নাই—আইনের বিশেষ বিশেষ শব্দে কণ্টকিত গোলকধাঁধাও নয়!

নয় বৎসর বয়স্কা মাতৃত্বে গৌরবান্বিতা বালিকা আপন শিশুসন্তানসহ—ইহার বাস যবদ্বীপে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকার বিবাহ কোনও সভ্য দেশেই প্রচলিত নাই, তথাপি এই প্রকার ঘটনা যে আজিও বিরল হইলেও আদৌ ঘটিয়া থাকে, বিশ্বে ইহাই আশ্চর্যের বিষয়!

মিসিস আর্ল বলেন—লেখা অপেক্ষা মুখের কথায় কত বেশী বুঝান যায়...। লেখার ভিতর কত ফাঁক থাকে—কত জিনিষ ঝাপ্‌সা হইয়া যায়, কিন্তু মুখের কথায় সব পরিষ্কার হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া কথায় যেমন নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, এমন কিছুতেই হইতে পারে না লেখা দ্বারা।

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণীরা বিশেষ সৌভাগ্যবানই বলিতে হইবে—কারণ তাহারা তাহাদের পরলোকগত আত্মীয়ের মুখের কথাই শুনিতে পাইবে স্বকর্ণে যেন তিনি কবরের ভিতর হইতে তাহাদের নির্দেশ দিতেছেন। ইহার সহিত একটা আজব রহস্য বিজড়িত থাকিবে। অপরের মুখে শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে তৃপ্ত থাকিতে হইবে না।

গ্রামোফোন রেকর্ডে 'উইলের' প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মিসিস এডিথ আর্লের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

সন্তরণে 'ডাক' বহন

প্রশান্ত মহাসাগরে নিউয়াফো (Niuafo'ou) নামে একটি দ্বীপ আছে, তথায় জাহাজ তীরে ভিড়িতে পারে না—থাকে অর্ধ মাইল দূরে। বছরের ভিতর ছয় মাস অবিরাম ঝড়-ঝঞ্ঝার দরুন জাহাজ হইতে ডাক তীরে নেওয়া সম্ভব হয় না। দ্বীপবাসী ছয় মাস ডাক পায় কি করিয়া? প্রথমত, ব্যবস্থা হয়, হাউই বাজির সাহায্যে ডাকের থলিয়া তীরে নিক্ষেপ। কিন্তু একবার হাউইয়ের আগুনে ডাক পুড়িয়া গেল, উপরন্তু প্রতিবারেই হাউই ঝোপঝাড়ে পড়িয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

অতঃপর ব্যবস্থা হইল, কোনও সন্তরণপটু লোক টিনের কৌটায় আবদ্ধ 'ডাক' লইয়া যাইবে জাহাজে এবং অনুরূপ টিনে পোরা 'ডাক' জাহাজ হইতে লইয়া আসিবে।

সি এস রেমজে নামক ইংলণ্ডে জন্মপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি এই দশ বৎসর যাবৎ নিযুক্ত। সে শুধু ছয় মাস কাজ করে না—কাজ করে বার মাস। আর 'টিন-ক্যান' ডাকে দ্বীপবাসীর অশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম জয়ঢাক

সাসেক্সের গ্লাইডবোর্ন অপেরা হাউসের জন্য বিশেষ করিয়া প্রস্তুত 'ড্রাম'টি পৃথিবীর ভিতর সর্ববৃহৎ। ইহার ব্যাস ছয় ফুট। ইংলণ্ডে বিগত ১৫৫ বৎসরের ভিতর যত ড্রাম তৈরী হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই বৃহত্তম।

যদিও ইহা অপেরা হাউসের অর্কেষ্ট্রার জন্যই নির্মিত, তথাপি উহা প্রথম ব্যবহৃত হইবে, গ্লাইডবোর্ন ফেষ্টিভ্যালে। ঐ উপলক্ষে যে 'ম্যাকবেথ' অভিনয় হইবে, তাহাতে বজ্রপাতের শব্দ উৎপাদন করিবার জন্য উহাকে ব্যবহার করা হইবে। রাণী মেরী এই বৎসরের অভিনয়ে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

মিঃ ক্রিষ্টি, ঐ উৎসবের নিয়ন্তা; তিনি বলেন—আমরা যে পৃথিবীর সকল ড্রাম অপেক্ষা বড় একটা তৈরী করিয়া নাম কিনিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা নয়। বজ্রের শব্দ অনুকরণের জন্য যে গম্ভীর নিনাদ আবশ্যক, তাহার জন্যই আকার বড় করিতে হইয়াছে।

নির্মাতা কোম্পানীকে জয়ঢাকটির ছাউনির চামড়া যোগাড় করিতে কম বেগ পাইতে হয় নাই। দুইখানা নিখুঁত চামড়া এত বড় আকারের পাইতে বারটি মাস অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

৫০ বৎসর অবচেতন

মলি ফ্যাঞ্চার ৫০ বৎসর বেহুঁস অবস্থায় থাকে—ডাক্তারগণ বলে, এমন রোগী তাঁহারা চিকিৎসা-ইতিহাসে দেখা দূরে থাক; কোন বইতে লেখা আছে এমনও জানে না। সম্প্রতি ৯৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহার একমাত্র আত্মীয় খুড়ী এলিস ফ্যাঞ্চার এখনও জীবিত, সেই সমুদয় ঘটনা প্রকাশ করিয়াছে।

এই পঞ্চাশ বৎসরের সংজ্ঞালুপ্ত দশায় সে ৬০০০-এরও অধিক চিঠি লিখিয়াছে। কবিতা রচনা করিয়াছে কতকগুলি। পোষাক তৈরী করিয়াছে, তাহাতে সুনিপুণ সূচীকার্য করিয়াছে।

তাহার ঐ চিঠিগুলি নিউ ইয়র্কের কোনও মনোবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট যাদুঘরে সংরক্ষিত।

শিশুকালে অনাথা হইয়া সে নিউ ইয়র্কে খুড়ীর কাছে যায় বাস করিতে।

১৮৬৬ সালের কোনও একদিন সে ও তাহার খুড়ী মোটরে বেড়াইতে যায়—মলি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মোটরের মেঝেয় পড়িয়া যায়। তাহাকে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে নেওয়া হয়। সেবারে সে ছয় বৎসর অবচেতন অবস্থায় থাকে। ডাক্তারগণ দেখে নাড়ী অতি ক্ষীণভাবে চলে—নতুবা অন্য-প্রকারে সে মৃতবৎ নিশ্চল।

২৪ বৎসরে পদার্পণ করিয়া সেই জন্মতিথিতে সে বেহুঁস থাকলেও বিছানায় উঠিয়া বসে এবং বেহালা একটা আনিতে বলে। যদিও জীবনে কখনও সে বেহালা স্পর্শ করে নাই, তথাপি সে অতি সুন্দররূপে বেহালা বাজাইতে থাকে পাকা ওস্তাদের মত।

সেই অবস্থায় ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়াও দেখে—মলি তখনও অবচেতন অবস্থায় রহিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় তাহার চোখ দুইটি চিরকালের মত অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ছয় বৎসর চোখ বুজিয়া থাকায় এই অবস্থা হইয়াছে।

বার্নাম সার্কাসের মালিক মলির এই আশ্চর্য্য অবস্থার কথা শুনিয়া তাহাকে এক লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিতে চাহিল, যদি সে সার্কাস কোম্পানীতে যোগদান করে। সার্কাস-মঞ্চে সোনালী শয্যায় শায়িত থাকিয়া সে শুধু দর্শকদের দেখা দিবে আর কিছু করিতে হইবে না। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯০৬ সালে যখন তাহার ৪০ বৎসর অবচেতন অবস্থা পার হইয়াছে, তখন সে সুন্দর চিকণ সূচীকার্য করিতে থাকে—যাহা সুদক্ষ শিল্পী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে অসম্ভব। একটি দৃশ্যে উড়োজাহাজ হইতে বোমা বর্ষণের নিখুঁত ছিব ছিল। অন্য একটিতে ছিল আকাশ-চুম্বী একটি অট্টালিকা—যাহার পাদদেশে একটি নারী রহিয়াছে শয্যায় মৃত। উহাতে তারিখ দেওয়া ছিল মলির হাতে ১৯১৬—১১ই-ফেব্রুয়ারী।

১৯১৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তাহার সুপ্তির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়। সেদিন সে হুঁস ফিরিয়া পায় এবং সাত দিন পরে ১১ই ফেব্রুয়ারী তাহার মৃত্যু ঘটে।

ভাঙা দেউল

(৪০৩ পৃষ্ঠার পর)

বাবা—অঞ্জনা যেন পাহাড়ের গুহার মধ্যে থেকে ডুকরে উঠে চীৎকার করে ওঠে।

—না না, আজ কোন কথা নয়, কোন নিষেধ নয়। আজ তোকে স্বীকার করতেই হবে। কোন অপরাধ নেই, কোন অধর্ম্ম নেই। নিজেকে স্বীকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—অধর্ম্ম আত্মনিগ্রহে। আর সেই সাথে তোর আজকের আয়োজনও হবে সম্পূর্ণ সার্থক। শুধু মনে কর—তোর অতীত নেই, স্মৃতি নেই, শুধু তুই আজকের এই মুহূর্ত্তের—এই নিষ্ঠুর ও মধুর মুহূর্ত্তের। অঞ্জনা—স্বর তাঁর আবার রুদ্ধ হয়ে আসে—ক্ষমা কর আমায়, আমায় বাঁচতে দে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে অঞ্জনার মাথার ওপর টপ্ টপ্ করে।

অঞ্জনাও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কেমন যেন আত্মহারা হয়ে যায়—কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। চেতন, অবচেতন, সমস্ত সত্তা যেন তার বাবার পক্ষ গ্রহণ করে তার নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদায় নেবে। চতুর্দ্দিকের প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে—তাই হোক, বাবা, তাই হোক, তুমি শুধু বেঁচে ওঠ। অঞ্জনা ছিটকে পড়ে বাবার বুকের ওপর—বাত্যাহত পাখী যেমন ছিটকে পড়ে পাহাড়ের আড়ালে।

হঠাৎ বাইরের এক কলরবে অঞ্জনার চমক ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বাইরে কতকগুলো লোক, আর জন দুয়েক পুলিশে ঠেলা করছে। জানালার গোড়ায় তাকে দেখতে পেয়ে একজন বলে উঠল—তাকে লক্ষ্য করে তার স্বামীর নাম নিয়ে বলল—মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে সে রাস্তায় পড়েছিল, আর তার পকেটে চোরাই মাল স্বরূপ পাওয়া গেছে একটুকরা সোনার ভাঙা বালা। ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ হাজতে আটকে রাখা হয়েছে। ইচ্ছা করলে সকালে গিয়ে সে দেখা করতে পারে।

সহসা অঞ্জনার পায়ের নীচে মাটি যেন দুলে উঠল প্রবলভাবে, আর চোখের স্নায়ু-শিরা কে যেন নির্ম্মমভাবে দিল কেটে। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। কোন রকমে দু' হাত দিয়ে হাতড়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। মুঠি করে সজোরে চেপে ধরল মাথার চুল, আর দাঁত দিয়ে চেপে ধরল নীচেকার ঠোঁট। চাইল আকাশের দিকে—শুক্লপক্ষের প্রাথমিক চাঁদ ডুবে গেছে বহুক্ষণ। প্রাণপণে কি যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করল—আকাশে কি আজ সত্যিই চাঁদ ছিল? আর—উঃ—দম যে বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস কি হঠাৎ আজ পৃথিবী থেকে বন্ধ হয়ে গেল? একটুও কি আর অবশিষ্ট নেই?

অঞ্জনা আর দাঁড়াতে পারল না। রাস্তার ওপরই বসে পড়ল ধপ্ করে।

খবরদার, ছোটলোক বলবেন না বাবু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্তের রক্তবর্ণ চোখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিল, কহিল—ওরে বাবা, এ দেখি কেউটে সাপ, ফোঁস করে ওঠে। ব্রজেন সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—ছোটলোক বলব না তো বলব কি? বিপিনের শিক্ষে পেয়ে ভদ্র হতে চাস্ না কি? ভুলুয়া কহিল—বাবু, আমাদের রাগাবেন না, রাগালে কিন্তু কাউকে মানব না। ব্রজেন তবু ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—আহা কথা শোন! তোদের বড় ভয় করি না কি যে, তোদের কথা শুনে চলব? তোরা মানুষ না কি, আমরা করুণা করে রাখছি বলে তবু বেঁচে আছিস্।

শ্রীমন্তর গম্ভীর কণ্ঠ এইবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—সে কহিল—আমার লাঠিটা দে তো ভুলুয়া। ভুলুয়া বাধা দিয়া কহিল—ওরা বাবু, ওদের সঙ্গে লাগা কেন, তুই বাড়ী চল্। শ্রীমন্ত ভুলুয়ার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার হাত হইতে লাঠিটা টানিয়া লইয়া কহিল—বাবু আছে তা আমার কি? এতবড় অপবাদ! আমাদের ওরা করুণা করে, তাই আমরা বেঁচে আছি? ভট্টাচার্য্য দেখিল মহাবিপদ! শেষকালে এই ছোটলোকদের হাতে প্রাণ দিতে না হয়! ব্রজেনও একটু ভীত হইল, তবু সে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, ভুলুয়া শ্রীমন্তকে সাবধান করে দে, নইলে কিন্তু...........

শ্রীমন্ত লাঠিটা দৃঢ়মুষ্ঠিতে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজেনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল, কহিল—নইলে কি? কি করতে পারেন আপনি, আপনার কি শক্তি আছে? আমরা ছোটলোক-আমাদের হাত শক্ত, আমরা প্রাণ দিতে ভয় করি না। শ্রীমন্তর দিকে চাহিয়া ভট্টাচার্য্য ভয়ে আমতা আমতা করিয়া কহিল—হাঁ বাবা তোমরা খুব ভাল। শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্যের কথায় হাসিল, কহিল—না ভাল নয় বাবু খারাপ। কিন্তু বাবুরা, আমরা জানতে চাই, এই সাহসেই কি আমাদের চোখ রাঙান? আমরা যদি এমনি লাঠি নিয়ে এসে দাঁড়াই তাহলে আপনাদের ভদ্রতা কেমন করে রক্ষা পাবে, মান কোথা থাকবে?

ভট্টাচার্য্য কহিল—না বাবা, আমাদের মান দিয়ে কাজ নেই। তোমরা যাও, তোমাদের পাড়ায় গিয়ে যা খুশী তাই কর, আমরা কিছু বলব না। ব্রজেনও শ্রীমন্তের ব্যবহারে সত্যই ভয় পাইয়াছিল—কে জানে! ছোটলোক, ইহাদের তো বুদ্ধি বিবেচনা নাই। মাথায় লাঠি মারিয়াই বা বসে। কাজেই ভট্টাচার্য্য এমন কাপুরুষের মত ঝগড়ার মীমাংসা করিতেছে দেখিয়া সেও কিছু বলিল না—ভাবিল—মানের চেয়ে মাথা বাঁচলেই এখন বাঁচি। পরে না হয় সুযোগ পাইলে বেশ করিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

ভুলুয়া কহিল—বেশ, তাই চল শ্রীমন্ত—মারামারি করাটা কি ভাল? বিপিনবাবু না তোকে যখন তখন মারামারি করতে নিষেধ করেছেন? বিপিনের কথায় এবার শ্রীমন্ত ক্ষান্ত হইল, কহিল, ও হাঁ, সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর ব্রজেনের দিকে চাহিয়া কহিল,—বাবু, আজকে আপনার ভাগ্য ভাল। নইলে শ্রীমন্ত দাসের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারতেন না।

শ্রীমন্ত, ভুলুয়া প্রভৃতি চলিয়া গেল বটে, মাথাও রক্ষা পাইল, কিন্তু ভট্টাচার্য্য ব্রজেন প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। বিপিনকে সমাজচ্যুত করিয়া তাহাদের প্রতিপত্তি, মান, সম্ভ্রম—সবই নষ্ট হইতে চলিল। ব্রজেন চিন্তিত মুখে কহিল—এখন উপায়? ওরা ছোটলোক, ওদের ঘাটানও বিপদ, নাই দেওয়াও বিপদ! ভট্টাচার্য্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আমাদের সব বুঝি গেল। হিন্দুধর্ম্ম আর রইল না। পণ্ডিত তর্কবিশারদ কহিল—ঘোর কলিকাল! এইরূপে সবাই মিলিয়া নানা মন্তব্য করিয়া বিরস বদনে যে যাহার বাড়ীর দিকে রওনা হইল; কোন কিছু স্থির হইল না।

সবার দিন সমান যায় না—ভগবান একদিন ইহাদের প্রতিও মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

চৈত্র শেষ হইয়া বৈশাখও শেষ হইতে চলিল, তবু এক ফোঁটা বৃষ্টি নামিল না—শ্রীমন্ত, ভুলুয়া প্রভৃতি মহা ভাবনায় পড়িল। আকাশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া তাহারা হতাশ হয়, ভগবানকে তাহাদের প্রার্থনা জানায়—বিপিনকে জিজ্ঞাসা করে—বাবু, এ বছর কি জল হবে না? বিপিন তাহাদের সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু বৃষ্টি নামিবার সত্যই কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রৌদ্রের প্রখর তাপে সারা মাঠ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, গাছে পাতা নাই, মাঠে ঘাস পর্যন্ত শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে। এ বৎসর বুঝি আর ফসল হইবার আশা নাই, কিন্তু ফসল না হইলে ইহাদের কি অবস্থা হইবে! ইহারা বাঁচিবে কিরূপে? বাঁধ কাটিয়া জল আনাও সোজা কথা নয়, নদী অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, এখন আবার সে সময়ও নাই। এদিকে সমস্ত গ্রামে মাত্র একটা পুষ্করিণী। গ্রীষ্মের তাপে এই পুষ্করিণী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, সামান্য যে জল আছে, তাহা পানীয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অথচ এই পুষ্করিণী ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। এই জলেই স্নান করা, কাপড় কাচা, সমস্ত প্রকার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করিতে হয়। বাবুদের পাড়ায় একটা টিউবওয়েল আছে, এতদিন ইহা একপ্রকার সবাই ব্যবহার করিত, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার পর প্রতিশোধপরায়ণ বাবুর দল স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে, এই টিউবওয়েল যেন ছোট জাতেরা না ধরে।

শ্রীমন্ত বিপিনকে হাতজোড় করিয়া কহিল—বাবু, আমাদের উপায় কি হবে? আমরা যে মরতে বসেছি।

বিপিন কিছু বলিবার আগেই ভুলুয়া ম্লানমুখে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—বাবু, হারাণের ছেলের ভেদবমি হয়েছে। বিপিন এই সংবাদে চমকাইয়া উঠিল, কহিল—বলিস্ কি! চল্ ত দেখে আসি।

বিপিন, শ্রীমন্ত, ভুলুয়া প্রভৃতি ছুটিয়া হারাণের বাড়ী গেল। বিপিন দেখিল—হারাণের ছেলে সত্যই একটা ময়লা ছেঁড়া বিছানায় অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় শুইয়া আছে। তাহার সুস্থ, সবল দেহ এই সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তে কি বিশ্রী হইয়া গিয়াছে! দুই চোখ নিষ্প্রভ, ম্লান, দেহ জীর্ণ, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মত। তাহার মাথার কাছে বসিয়া হারাণের স্ত্রী কাঁদিতেছে। বিপিন এক মুহূর্ত্ত ঘরের এই বীভৎসতার দিকে তাকাইয়া ছিল, তারপর হারাণের পার্শ্বে বসিয়া কহিল—হারাণ

তোর ভয় নেই ভাই। ভুলুয়াকে কহিল, —যা ত ভুলুয়া, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

ভুলুয়া তখনই ছুটিয়া ডাক্তার ভবেশ মুখার্জ্জির বাড়ী পৌছিল। ভবেশ ডাক্তার বাড়ীই ছিল, ভুলুয়া কহিল—ডাক্তারবাবু, একবার হারাণের বাড়ী চলুন, ওর ছেলের......

ডাক্তার হাসিল, কহিল—ভেদবমি হয়েছে, না? বিপিনে কোথায়? ভুলুয়া কিছু না বুঝিয়াই কহিল—তিনি ত ওখানেই আছেন। ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—ওখানেই আছেন! বলিস কি! আমি ত মনে করেছিলাম, সে বুঝি ও নাম শুনে পালিয়েছে। ডাক্তার উচ্চস্বরে কুৎসিৎভাবে হাসিয়া উঠিল।

ভুলুয়া ডাক্তারের এই কুৎসিৎ ইঙ্গিতে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু অনেক কষ্টে রাগ চাপিয়া কহিল—তাড়াতাড়ি একবার চলুন ডাক্তারবাবু, দেরী করলে হয়ত—

ডাক্তার তেমনি হাসিয়া কহিল—মরে যাবে—নারে? তা মরুক না—আমাদের কি?

ভুলুয়া ডাক্তারের এই পৈশাচিক জবাবে বিস্মিত হইল, বলিল—আপনি তাহলে যাবেন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার হাসিল, কহিল—যাব না কেন? কিন্তু তোরা নাকি খুব তেজ করে ব্রজেনবাবুকে মারতে গিয়েছিলি, আমাদের নাকি তোরা কেয়ারই করিস না? তাহলে আবার এসেছিস কেন? ভুলুয়া কহিল—সে সব পুরানো কথার সময় এখন নয়, আপনি যাবেন ত চলুন। ডাক্তার কহিল—না গেলে কি করবি, মারবি না কি? ভুলুয়া কহিল—যাবেন না তাহলে, বেশ চললাম। ভুলুয়া সত্যই রাগ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া ডাক্তার তাহাকে ডাকিল, কহিল—আমার যেতে কোন আপত্তি নেই বাপু, কিন্তু ভট্টাচার্য্য না বললে আমি কি করে যাই? ভট্টাচার্য্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়। ভুলুয়া আশা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল—আচ্ছা, আপনি চলুন ডাক্তারবাবু, আমরা না হয় পরে ভট্টাচার্য্যের কাছে যাব। ডাক্তার কহিল—না, তা হয় না। ভুলুয়া আর একবার মিনতি করিল—ডাক্তারবাবু, ভট্টাচার্য্যের কাছে জিজ্ঞেস করে যেতে যেতে যে দেরী হয়ে যাবে—আপনি চলুন, আমায় বিশ্বাস করুন। আমি নিজে ভট্টাচার্য্যের পা ধরে আপনার জন্যে ক্ষমা চাইব।

ডাক্তার মনে মনে বিচলিত হইল বটে, কিন্তু এমন দিনে ভট্টাচার্য্য অথবা এ পাড়ার কাহাকেও রাগাইলে যে তাহার রক্ষা নাই, তাহা সে জানে। কাজেই কহিল,—না, তা হয় না ভুলুয়া। ভুলুয়া ব্যর্থ হইয়া কহিল—আচ্ছা, তাই হবে।

রাস্তায় যাইতে যাইতে ভুলুয়া ভট্টাচার্য্যের কাছে যাওয়াই স্থির করিল; তবু যদি ডাক্তারবাবু যায়—হারাণের ছেলে বাঁচে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য ভুলুয়াকে দেখিয়াই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল—দূরে হয়ে যা, আমার বাড়ীর দরজা ছুঁসনে। ভুলুয়া তবু কাতরস্বরে কহিল—ঠাকুরমশাই, দয়া করুন। ভট্টাচার্য্য তেমনি করিয়া কহিল—দয়া! ছোটলোকদের আবার দয়া কিসের—সেদিন মনে ছিল না। যা বেরিয়ে যা। কি সব রোগের বীজাণু নিয়ে এসেছিস কে জানে? যা যা।

ভুলুয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিল, কহিল—ডাক্তারবাবু আসবেন না বাবু? বিস্মিত হইয়া বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

ভুলুয়া অপরাধীর মত নতমস্তকে কহিল—আমরা ছোটলোক বলে। কথাটা শুনিয়াই শ্রীমন্তের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সে বজ্রকঠিনস্বরে কহিল—কি বললি? কেন আসবেন না? ভুলুয়া অসহায়ের মত শ্রীমন্তের দিকে চাহিল—তাহার মুখে ভাষা যোগাইল না। বিপিন আস্তে হারাণের ছেলের মাথা কোল হইতে নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—বাইরে আয়।

শ্রীমন্ত, ভুলুয়া, বিপিন, হারাণ প্রভৃতি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমন্ত উত্তেজিত স্বরে কহিল—বাবু, একবার হুকুম করুন, আমি যাই। দেখি কোন্ ব্যাটা না আসে—আমি ঝুঁটি ধরে নিয়ে আসব আমাদের ছোটলোক বলে?

বিপিন শান্তস্বরে শ্রীমন্তকে চুপ করিতে কহিল, বলিল—শ্রীমন্ত, মারামারি করে কি হবে? জানি তুমি যদি লাঠি নিয়ে যাও, তাহলে কারও সাধ্য নেই না এসে পারে? কিন্তু ওতে আর কি ফল হবে? যারা এতদূর অমানুষ, তাদের নিয়ে কি মানুষের কাজ হবে? তার চাইতে তুই যা, আমার বাড়ী থেকে হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে আয়। দেখি ভগবান মুখ তুলে চান কিনা?

শ্রীমন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল, কহিল—কিন্তু বাবু, ওদের যদি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কি ভাল হবে, আমি চাই ওদের শিক্ষা দিতে। বিপিন কহিল—শ্রীমন্ত, রাগের মাথায় একটা যা ইচ্ছে তাই করে ফেলা উচিত নয়। পরের অনিষ্ট করে কি কখনও কারও মঙ্গল হয়েছে? আর আমরা শাস্তি দেবার কে? শাস্তি যদি দেবার হয় তাহলে যিনি দেবার তিনিই দেবেন। তার চাইতে তুমি যাও, আমার ঔষধের বাক্সটা নিয়ে এস।

শ্রীমন্ত আর কথা কহিল না, নীরবে চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

কয়লা-খনি দুর্ঘটনা

শ্রীবিরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার ভীষণ সে সংবাদ গ্রামের মাঝে।

আনচে-কানাচে ছোট ছোট দলে মেয়ে-পুরুষ—মুখ তাদের গম্ভীর, কালো মেঘে ঢাকা যেন।

মুখে আর রা নেই মেয়েদের—সামান্য উষ্মা-ঝংকারেও যে নথ্ তাদের নাকটিকে কেন্দ্র করে নৃত্যপর হয়, সার্থক সে অলংকারখানির মুখরতা পর্যন্ত আজ স্তব্ধ—মলিন। আতংককর দুঃসংবাদের প্রতিক্রিয়া শুধু প্রত্যক্ষ হচ্ছে তাদের কম্পিত হস্তে আপন আপন সন্তানগুলোকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধর্‌বার শংকাচকিত নিবিড় প্রয়াসে।

আর মেয়েদের মাথার উপর দিয়ে পটভূমি সৃষ্টি করেছে দণ্ডায়মান পুরুষগুলোর বদনমণ্ডল—বদনে বদনে কঠোরতা-ব্যঞ্জক সুস্পষ্ট রেখা। অপলক দৃষ্টি মেলে ধরেছে তারা রহস্যজটিল এমন এক আবেশে, যাকে অনুভব করা যেতে পারে, কিন্তু লিখে বুঝান দায়।

হতভাগা শ্রমিক একটি প্রাণ হারিয়েছে ১নং রা পিটের মাঝে।

দুর্বহ শ্রমশিল্পের নির্মম হস্তের নিষ্পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তাদেরই একজন শ্রমিক-ভাই বিলীন হয়েছে মহাশূন্যতায়। এবং সেই যে সংবাদটার প্রথম প্রচারে চারিদিক হতে অর্ধস্ফুট রব উঠেছিল—'আহা! আহা!' আর রুদ্ধপ্রায় ভগবানের দোহাই, কোন কোন বেপরোয়া তরুণের ক্ষুব্ধ মুখ হতে মুক্তি পেয়েছিল নিতান্তই সংক্ষিপ্ত বিষ-জর্জর শপথ-বাণী—বল্‌তে গেলে উহাই একমাত্র স্মৃতি-তর্পণ যা পল্লীবাসী নর-নারী অর্পণ করতে পেরেছিল সদ্যোমৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনে।

এ রাজ্যের লোকদের দরকার হয় না আদপেই মৃত্যুর কথা নিয়ে বলাবলি করতে, কারণ এতটা সুদূর অতীত হতেই তার কণ্টকিত সাহচর্য দিয়ে এদের কৃতার্থ করে রেখেছে মহাকাল যে, তার নামের উল্লেখ মাত্রও আজ এদের ভিতর শুধু নিরর্থকই নয়, নিছক বাহুল্যও।

একদিন হয়ত সে মুখোমুখী দেখা দিল চুটির এক আত্মীয়াকে, যে বাস করে ওদের বস্তির দূর কোণে। পরের দিন হয়ত সে হানা দিল চুটির প্রতিবেশীর গৃহে। তার পরের দিন.........

অসাড় প্রাণেই চুটি আশার উপর আশা করে—'তার পরের দিন'.........আর যেন না হাজির হয়। কিন্তু অন্তরের অন্তরে চুটি জানে 'তার পরের দিন'.........ত আসবেই, তাও কি শুধু একবার? কখনই না, আস্‌বে ফিরে ফিরে বহু—বহুবার। আর কেবল চুটিই কি বোঝে একথা, চুটির মত এ বস্তিবাসী সবাই—পল্লীবাসী সবাই হাড়ে হাড়ে মালুম করে নিয়েছে এ সত্য। এ যে এক-তরফা ব্যাপার—নিরুপায় শ্রমিকদের জীবনের জন্য এ সংগ্রাম।

শ্রমিকের রিক্ত জীবনে কে না জানে যে, তাদের এ অসম-সংগ্রামে মৃত্যু আর দৈন্যই অহরহ তাদের পক্ষের যোদ্ধা—তারাই তাদের আশ্রয়—তারাই তাদের সম্বল।

কাল হয়ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এরই একটা বিবরণ। মারাত্মক দুর্ঘটনাটির ভূমিকাহীন নগ্ন উল্লেখ মাত্র। খুব বেশী যদি হয়, কয়েক লাইন সংক্ষেপে বর্ণনা—মৃত্যুর কারণ নির্দেশে।

অভ্যস্ত উদাসীনতার সহিতই এ সংবাদ গ্রহণ করবে সারা দুনিয়া—নিতান্তই গুরুত্বহীন সংবাদ—কোথাকার একটা নগণ্য শ্রমিকের মৃত্যু।

মৃতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সামান্য কয়জন ভিন্ন অপরে দ্বিতীয় বার আর চোখ বুলাবে না এ কয়টা লাইনের উপর।

প্রবাদ আছে—অন্তরংগতাই বিদ্বেষের জন্ম দান করে তাই যদি সত্য হয়, তা হলে দুনিয়ার তো ন্যায্য অধিকারই রয়েছে বল্‌তে হবে এ রকম সংবাদের প্রতি ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা প্রকাশ কর্‌বার।

কেন না 'খনি দুর্ঘটনা' আজকাল হয়ে পড়েছে নিত্যকার ব্যাপার অতি পরিচিত বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে। হতাহতের সংখ্যাই বা কি নিদারুণ! শোনা যায় পাশ্চাত্যে তা দাঁড়িয়েছে—দিন প্রতি ২টি মৃত, আর আহত প্রায় মিনিটে একটি। ভারতের সংখ্যা সঠিক পাওয়া সোজা নয়। সে সংখ্যাও যে অনুপাতে খুব বেশী পিছিয়ে নেই, একথা মনে করা অসংগত হবে না।

ঝুমরো বসেছিল তার কুটীরের দাওয়ায়—আঘাতপ্রাপ্ত চোখটিতে দিচ্ছিল গরম জলের সেঁক। ঝুমরোর স্ত্রী মনোগী কাঁকালে এক ঝুড়ি ভর্তি কুড়ান গোবর নিয়ে এসে হাজির। এ গোবর দিয়ে যে ঘুঁটে দেওয়া হবে, তা বিক্রী করে আর কিছু না হোক, শনিবারের তাড়ির দামটা ত হবে। পত্নীর মলের ঠুন্ ঠুন্ আর পদক্ষেপের সঙ্গে বাঁ পায়ের বুড়ো-আঙুলের মোটা রগচটার টিক্ টিক্ শব্দ ঝুমরোকে জানিয়ে দিল অর্ধাঙ্গিনীর আবির্ভাব। ঝুমরো কিন্তু মাথা তোলে না, সে জানে, তাকে বিনিকাজে বসা দেখ্‌লেই গিন্নিটির যত রাজ্যের জরুরী ফরমাসের হুকুম দেবার উৎস-মুখ খুলে যায়।

চোখের আঘাতটা ঝুমরোর খুব বেশী নয়। কিন্তু জ্বালা, যাতনা অসম্ভব রকমের; ভুক্তভোগী ছাড়া সে অস্বস্তির স্বরূপ জানা থাকবার কথা নয়। কাজেই বলা ত যায় না—নিপুণ গিন্নিটি যদি.........

কিন্তু কাল রাতে চোখের পাথর-কণাটা বার করে ফেল্‌বার আগে ঝুমরো ত ভেবেছিল চোখটি তার জন্মের মত কাণা হয়ে গেছে। শেষটায় দেখ্‌লে কাণা হয় নি বটে, তবু যা কর্‌কর্ কর্‌ছে, ব্যথা সুরু হয়েছে, তা অসহ্যই মনে হচ্ছে।

তা যত করকরানি আর যন্ত্রণাই থাক্ রাতটা কাটলেই যখন পিটের ভেঁপু বেজে উঠবে—ভোঁ-ও-ও, তখন কাজে যেতেই হবে পিটের ভিতর। এ হপ্তায় আবার মুদীর পাওনা চুকাতে হবে। এ সময় কামাই করলেই হয়েছে আর কি!

ঝুমরো বসে বসে চোখের সেবা করছে মন-মেজাজ দুই তার খোশ নয়।

ধুপ্ করে গোবরের ঝুড়িটা উঠানে সশব্দে ফেলে ভাঙা কাঁসরের চৌচির কণ্ঠস্বরে মনোগী আর্তনাদ করে উঠ্‌ল—'ও গো শুনেছ, চুট্টি মারা গেল আজ সকালে।'

সহধর্মিণীর কণ্ঠস্বরের চেয়েও তীক্ষ্ণ সংবাদের ফলাটা ঝুমরোর চিন্তাক্লিষ্ট মনের মাঝে আমূলে বিদ্ধ হয়ে গেল।

'ভগবান!' বিস্ময়-চকিত ঝুমরো তাকায় স্ত্রীর দিকে 'বলিস্ কি! না!'

'হ্যাঁ গো, খাঁটি সাচ্চা কথা। কচি বউটা একেবারে পাগলপারা। আহা বেচারি!'

বেচারি আবার বল্‌তে! কি সর্বনাশটাই না হ'ল কচি বউটার! তাতে আবার সন্তান-সম্ভাবনা, আজ বাদে কাল হয়ত তাকে ঢুকতে হবে আতুড়ে।

আর চুট্টি? সে ছিল ঝুমরোর একমাত্র অন্তরঙ্গ দোস্ত। এমনিতেই কারু নিবিড় বন্ধু মৃত—একথা বিশ্বাস করাই বিষম কঠিন ব্যাপার, তার উপর যদি সে মারা যায় এমন একটা দুর্ঘটনায়—না, সে ধারণার অতীত, রক্ত-মাংসের সহনশীলতার অতীত।

প্রিয়বন্ধুর অন্তিম-শয়নের সে করুণ দৃশ্য ঝুমরো কল্পনার চোখে আবিষ্কার করতে চায়—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাপ্লুত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! শিউরে কেঁপে ওঠে ঝুমরোর পা থেকে মাথা অবধি। কিন্তু ঘুরে ফিরে মনটা আবার ফিরে আসে সেই একই বিষাদ-ময় চিত্রপটে:—একদা সজীব চুট্টির বলিষ্ঠ বক্ষ আজ চিরতরে স্পন্দনহীন। জীবনব্যাপী কঠোর শ্রমের এই কি পুরস্কার?

তবু এই দ্বিগুণ সর্বনাশের পাল্লায় তার দিকটাই হয়ত একটু হাল্‌কা। সে ত এখন সকল দৈন্য সকল দুঃখদ্বন্দ্বের অতীত। কিন্তু তার স্ত্রী? তার যে সর্বনাশের আর ওর নেই! তার দুঃখকষ্টের যে আর শেষ নেই!

নিষ্ঠুর এক আঘাতে সে বঞ্চিত হল তার জীবনসঙ্গী হতে তার অন্নদাতা হতে, তার ভাবী সন্তানের রক্ষাকর্তা হতে—কেড়ে নেওয়া হল তার জীবন নিঙড়ে যেটুকু আনন্দ-রস অবশিষ্ট ছিল কঠোর শ্রমের নিষ্পেষণের পরেও।

বজ্রপাতের মত তার মস্তকেই পতিত হ'ল—মৃত-স্বামীর শব সনাক্তকরণ, তার সমাধির ব্যবস্থা; আর যতদিন সে বেঁচে থাক্‌বে তাকেই সান্ত্বনা দিতে হবে ভাবী সন্তানকে, যখন সে বাবা! বাবা! বলে বায়না ধর্‌বে। ইতিমধ্যে তাকে জীবন বহন কর্‌তে হবে মাতৃত্বের সার্থকতায়—যে আশাহত জীবন থেকে সকল জোছনা গেছে মুছে।

ঝুমরো আর ভাবতে পারে না। সম্মুখে প্রসারিত নিষ্করুণ এ দৃশ্য তার শিরায় শিরায় তরল আগুন প্রবাহিত করে—তার বুক ঠেলে হাহাকার মুক্তি পেতে চায়—অজ্ঞাতেই খনি আর খনি-ব্যবসায়ীর উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে নির্মম ভাষায়।

সমাজে এমন নরনারী রয়েছে ঢের, যারা ঝুমরোর এ বীভৎস অভিশাপ-বাণী শুনে কানে আঙুল দেবে—বর্বর বলে আখ্যা দেবে ঝুমরোকে। এ বর্বরতার জন্য দায়ী কে—ঝুমরো, না—সমাজ? শ্রমিককে পশু-জীবনযাপন কর্‌তে ঘাড় চেপে ধরে কে? আর্থিক ও দৈহিক দণ্ডের ভয় দেখিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত রেখেছে কে? তাদের কর্মষ্ঠ দিনের অর্ধেরও বেশী কাল বিশ্বের যতকিছু প্রেয় ও শ্রেয় থেকে দূরে রেখে, বাকি সময়টুকুর জন্য চাওয়া হবে তারা যেন নিরীহ ধর্মভীরু ভদ্রলোকের জীবনযাপন করে! তা কি করে সম্ভব? —তুমি সমাজ কি সাহায্য করেছ তার ভদ্র হবার পথে? তার বর্বরতা বর্জন করতে কোন্ শিক্ষা দিয়েছ—আর কোন্ ভদ্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছ তার সমুখে? আজ তার বর্বরতা তোমার চক্ষুশূল!

খনি ও খনি-ব্যবসায়ীর মস্তকে নির্বাধ অভিশাপই আহ্বান কর্‌ল ঝুমরো। হয়ত তার চোখের যাতনা তাকে ভীত করে তুলেছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে; তাই শাপ-মন্যি তার সীমা অতিক্রম করে গেল। কিন্তু স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত উত্তেজনার আতিশয্যেই সে শাপ দিয়েছিল—হয়ত অন্তরের অবচেতন আতংকও ক্রিয়া করেছিল কিছুটা—হয়ত যুগ-যুগ সঞ্চিত সমাজের অবহেলাও তার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

খনি-দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্র হয়ত প্রকাশ করে—বিবেকানুমোদিত ন্যায্য বিবরণ—সত্য ঘটনার কঙ্কাল।

অথবা যখন একাধিক মৃত্যু ঘটে সেই পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশেও কার্পণ্য করে না—আবার হয়ত পাণ্ডুলিপিতেই দূরেই রাখে।

কিন্তু সংবাদপত্র যা প্রকাশ করে না বা প্রকাশ করতে পারে না, তা হ'ল—দুর্ঘটনা, ছোটই হোক আর বড়ই হোক,—খনি-শ্রমিকদের অন্তরে তা কোন্ প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত করে—শ্রমিক-দের অন্তর তা কিভাবে গ্রহণ করে! সংবাদপত্রকে সে সংবাদ দিবে কে!

অভিশাপ করবে না ঝুমরো! এই ত আগের সপ্তাহে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা হয়ে গেছে ৩নং পিটে। আহা বেচারী মেঘুয়া!—প্রকাণ্ড একটা চাংড়া বিদ্যুৎবেগে এসে ঘা মেরেছিল মুখে। একটা চোখ সদ্য সদ্য গলে বেরিয়ে যায়—অন্য চোখটারও প্রায় সম্পূর্ণই বিনষ্ট হয়েছিল! কান-দুটোর সামান্য একটু অংশ ছাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মাথা থেকে; বিষম সে আঘাতে মুখখানির দশা যা হয়ে পড়েছে, যদি সে বেঁচে ওঠে, তার মূর্তি হবে সজীব বিকৃতির একটা বীভৎসতা-পুঞ্জ।

সে রাতে ঝুমরো ঘুমাতে পারেনি এক নিমেষ—শুধু ঝুমরো কেন—ঝুমরো-চুট্টির চেনা-জানা যত সব মজুর-মজুরণী আছে এ পাড়ায় ও-পাড়ায়, তাদের কেউ ঘুমাতে পারেনি সে রাতে! মেঘুয়ার রক্তাক্ত বীভৎস মূর্তি ফুটে উঠেছে তাদের চোখের সমুখে, যখনই তারা চোখের পাতা দুটি এক করেছে,—আর মুখ ফুটে কেউ না বল্‌লেও, কোন্‌দিন না জানি তাদেরও ঐ দশা হয়, এ শঙ্কায় যে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, খনির মজুর হয়ে কে সে-কথা অস্বীকার করতে পারে।

সে মুহূর্তে প্রিয়বন্ধু চুট্টির কথা কোন্ ইন্দ্রজালে ঝুমরোর মনে থেকে আবছা হয়ে যায়। মেঘুয়ার ক্লিষ্ট বিকট মুখটা যেন পৈশাচিক বীভৎসতায় ঝুমরোকে আতঙ্কিত

করে। পর মুহূর্তেই তার মন উড়ে যায় বার বছর আগেকার আর এক দুর্ঘটনার পারিপার্শ্বিককে।

উঃ কি শোচনীয় দুর্বিপাক সে। লোকটার নাম ছিল ভজুয়া। কাজ করত ২নং পিটে। তারও মুখে-মাথায় লাগে আঘাত। কিন্তু কান দুটো তার ছিল অক্ষত। তা হলে হবে কি—দশটা বছর ধরে অমানুষিক যাতনায় নিস্তব্ধ হতে হয়েছিল তাকে।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—ক্ষত তার আরোগ্য হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অসাড়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে অঙ্গ থেকে অঙ্গে। প্রথম লোপ পেল তার দৃষ্টিশক্তি, তারপর হ'ল সে বধির। ক্রমে জিহ্বা অসাড় হয়ে বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হ'ল সম্পূর্ণ। তারপর স্তব্ধতা এল বাহুতে, সেই নিঃসাড়তা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে সারা অঙ্গ ছেয়ে গেল। অবশেষে সে একদিন চিরতরে চোখ বুজলো।

খনি-মালিকরা আবার গর্ব করে যোগ্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা নিয়ে। ঝুমরো বুঝতে পারে না, কি করে মালিকরা সামান্য কটা টাকা দিয়েই বিশ্বাস করতে পারে যে, তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সেই যে দিনের পর দিন করে দশটা বছর ভুগে ভজুয়া মারা গেল, আর ভজুয়ার বউ পলে পলে রুগ্ন স্বামীর পাশে বসে প্রত্যক্ষ করল সে রক্তজমাট-করা যাতনা—প্রত্যক্ষ করল তার বলিষ্ঠ পূর্ণস্বাস্থ্য স্বামীকে একটু একটু করে শক্তি হারাতে হারাতে জড়ত্বে পরিণত হতে, তার ক্ষতিপূরণ কি টাকায় হয়? ভজুয়ার স্ত্রীর সে অপরিসীম ক্ষতি কি পূরণ হ'ল সে টাকায় শুনি?

ঝুমরো বুঝতে পারে না—আর তার ভাবতেও ইচ্ছা হয় না, হয়ত আর ভাববার শক্তিও তার নাই। মালিকদের বিশ্বাসই সে মাথা পেতে নেয়—নইলে ভেবে ভেবে শেষটা সে কি পাগল হয়ে যাবে!

তথাপি ঝুমরো এটা বুঝতে পারে যে, মালিকদের প্রধান লক্ষ্য হ'ল যত বেশী কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হয় প্রতি সপ্তাহে। যেহেতু ঝুমরোকে বেঁচে থাকতে হবে শ্রমিকের কাজ করে খনিতে, তাই এ কয়লা উত্তোলন তারও প্রধান লক্ষ্য।

আর সেইজন্যেই যখন মনোগী (ঝুমরোর স্ত্রী) তাকে জিজ্ঞাসা করল প্রতিটি কথায় ব্যথাতুর দরদ মাখিয়ে—'কাল সকাল থেকেই কাজে যেতে পারবে মনে হচ্ছে তোমার?' ঝুমরো তখন নির্বাকে চোখের ব্যথার কথা ভুলতে চেষ্টা করল—ভবিষ্যতের প্রতি আতঙ্ক, মনের অবচেতন শঙ্কা—সবই ঝেড়ে ফেলতে তৎপর হ'ল।

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঝুমরো আর মনোগী সে রাতে ঘুমোতে পারল না এক মুহূর্ত। শেষ যখন ভোর রাতে পিটের সিটি বেজে উঠল, তখন ধড়মড় করে উঠে পড়ে ঝুমরো কোঁচড়ে নিল কিছুটা ছোলা ভাজা, দুটো লঙ্কা আর নুন; তারপর মনে মনেই মৃত শ্রমিক-ভাই চুট্টির প্রতি বিদায় জ্ঞাপন করে খনির পথে পা বাড়াল—অদৃশ্য নিয়তির নির্দেশই মাথা পেতে নিতে।*

*James Bennett's Coal Mine Accident অবলম্বনে।

বৈশাখ

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আজ ঝক্‌ঝকে সূর্যের আলোক লেগে
দেখো আলোঘেরা প্রান্তর উঠেছে জেগে,
ওই দূরে দূরে মাঠে ঘাটে পথের পাশে,
সব দীর্ঘ তালের শ্রেণী কি হাসি হাসে
তারি মাঠে মাঠে ঘাটে ঘাটে প'ড়েছে সাড়া,
হায়! এমন সোনালী রোদে ঘুমায় কারা?
ওরে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ এসেছে কে সে,
আজ বৈশাখী ভোর বেলা নূতন বেশে!

২

দূরে ঘুমায় পাহাড় শ্রেণী মেঘের নীচে
তার তলে তলে ছোট নদী সর্পিরিছে,
তারি আশে পাশে ঘেরা ছিলো গভীর রাতি
আজ চেয়ে দেখি চারিদিকে আলোর ভাতি!
যতো আঁধারের বন্যায় আলোক লেগে,
যেন নূতন জীবন-স্রোতে উঠেছি জেগে।
তাই তোমারে বরণ করি ওগো বৈশাখ,
শুনি অংগনে বাজে তব মঙ্গল শাঁখ।

৩

পথে বিপদ জড়ানো ঘন আঁধার রাতে,
জানো আমাদের যাওয়া সুরু তোমারি সাথে,
কতো ঝঞ্ঝায় ভেঙে-যাওয়া মলিন দিনে,
দূরে যেতে হবে আমাদের পথটী চিনে;
কতে বন্ধুর বর্বর উপত্যকা
কবে সহসাই বিপদের মেলিবে পাখা,
তবু মিনতি তোমার কাছে ওগো বৈশাখ
যেন অংগনে বাজে তব মঙ্গল-শাঁখ!

পৃথিবীর তাপ কি ক্রমে বাড়িতেছে?

কলিকাতায় গ্রীষ্মের আধিক্য বৎসরের পর বৎসর যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। শুধু কলিকাতায় কেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতেও দেখা যায়, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এ সকল স্থানেও গ্রীষ্মের আধিক্য অধিকতর বেশী অনুভূত হইয়া থাকে। শুধু ভারতবর্ষেই নহে, ভারতের বাহিরের অনেক প্রধান প্রধান স্থানেরও গ্রীষ্মকালীন তাপাঙ্কে এরূপ বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অনেকে মনে করেন, পৃথিবীর আবহাওয়ায় এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং উহা ক্রমেই উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে। এরূপ মনে করার কারণও সম্প্রতি একদল বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েট-রাশিয়ার অন্তর্গত মেরু প্রদেশব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূভাগ চিরতুষারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া রাশিয়া তাহার 'বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা' হইতে এ অঞ্চলকে বাদ দেয় নাই। এস্থানে বরফের অন্তরালে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে, তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। মেরুপ্রদেশের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক দল গবেষককে প্রথম হইতেই ঐ সকল স্থানে নিযুক্ত করা হয়। সাইবেরিয়ার সুদূর উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫৮টি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত গবেষণাগারে আবহতত্ত্ববিদগণ বিগত ১৮ বৎসর যাবৎ বিবিধ বিষয়ে পরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন। নানারূপ পরীক্ষার ফলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, মেরু অঞ্চলে শীতের তীব্রতা যেন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে! তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, সুমেরু-অঞ্চলের বিরাট তুষারস্তূপগুলির প্রান্তভাগ যেন গত পঁচিশ বৎসরে ক্রমে অধিকতর উত্তরদিকে বেরেণ্টস্ সাগরে গিয়া ঠেকিতেছে। শুধু তাহাই নহে! মেরু অঞ্চল ঘিরিয়া যে বিরাট তুষারক্ষেত্র বিরাজ করে, তাহার উপরিভাগের বিস্তৃতিও যেন ১৯০০ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ত্রিশভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন অভিযাত্রী দল সামুদ্রিক জীবজন্তুদের সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সমস্ত মৎস্য অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর জলে থাকিতেই ভালবাসে, বর্তমানে পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর উত্তর অক্ষাংশে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর মেরুতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়া বহু দুঃসাহসিক নাবিকের দল এই বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রের মধ্য দিয়া জাহাজ পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্বে তাঁহারা তুষারভেদ করিয়া যতটা অগ্রসর হইতে না পারিতেন, বর্তমানের পর্যটকগণ তাহার চেয়েও অধিক দূর পর্যন্ত জাহাজে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তাপ এই অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলেই যে উপরোক্ত ঘটনা সম্ভবপর হইতেছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথম প্রথম এইরূপ তাপ সঞ্চালনের মূলে উপসাগরীয় উষ্ণ জলস্রোতের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। ভূগোলের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই জলস্রোত, মেক্সিকো উপসাগর হইতে বহির্গত হইয়া আতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া বিষুবরেখা অঞ্চলের উষ্ণতর জলরাশি বহন করিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে সুদূর উত্তর অক্ষাংশস্থিত নরওয়ের পশ্চিম পার্শ্বের বহু বন্দর পর্যন্ত সারা বৎসর বরফ-মুক্ত থাকে, অথচ সম অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর-আমেরিকার উপকূলবর্তী স্থানে উষ্ণ জলস্রোতের প্রভাব বিদ্যমান না থাকায় ঐ স্থান সম্বৎসরব্যাপী তুষারাবৃত থাকিয়া যায়। এই সকল বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, উপসাগরীয় উষ্ণ জলস্রোতের গতিপথের খানিকটা পরিবর্তন হইয়াছে। সেই কারণেই হয়ত উহার প্রভাব আরও উত্তরে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। এভাবে মেরুপ্রদেশে অধিকতর উষ্ণ জলরাশি প্রবেশ করিতে পারিতেছে বলিয়াই মেরু অঞ্চলে পূর্বাপেক্ষা ঈষৎ উষ্ণতর আবহাওয়া সূচিত হইতেছে। কিন্তু মেরু অঞ্চলে থাকিয়া রাশিয়ার যে সমস্ত বিশিষ্ট আবহতত্ত্ববিদ্ গবেষণায় নিরত রহিয়াছেন, তাঁহারা এ-মত সমর্থন করিতেছেন না। তাঁহাদের অভিমত এই যে, পৃথিবী নিজেই ক্রমে উষ্ণতর হইতেছে। উপসাগরীয় উষ্ণ জলস্রোত দ্বারা বেরিং প্রণালীর জলরাশির উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কারণ উপরোক্ত জলস্রোত ঐ অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হয় না। উত্তর সাইবেরিয়ার বহু নদ-নদী পর্যবেক্ষণ করিয়াও দেখা গিয়াছে, বিগত ২৫ বৎসরের তুলনায় উহা ক্রমেই অধিকতর বিলম্বে বরফাচ্ছন্ন হয়। উহাদের বরফও আবার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আগে গলিতে আরম্ভ করে। ইহাও উপসাগরীয় উষ্ণ জলস্রোতের প্রভাবে হওয়া সম্ভবপর নহে। আদিম তুষারযুগ (Glacial age) হইতে সাইবেরিয়ার যে বিস্তীর্ণ ভূমিস্তর এতাবৎকাল তুষার মণ্ডিত থাকিত তাহার তুষারপ্রান্তও ক্রমশ যেন উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। ফলে ঐ অঞ্চলের বহুস্থান ক্রমে তুষারের দারুণ আবহাওয়া হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। সাইবেরিয়ার অন্তর্গত 'মেজিনা' শহর সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৩৯ সালে এই শহর হইতে চিরতুষারের বলয় যতদূর অবস্থিত ছিল, আজ উহা আরও প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে পিছাইয়া গিয়াছে।

শুধু উত্তর গোলার্ধেই যে এইরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে, তাহা নহে। দক্ষিণ গোলার্ধের বহুস্থানের তাপও যেন গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ্-টাউন, দক্ষিণ-আমেরিকার ভালপারাইসো, বুয়েনোস্-আয়ার্স প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মের আধিক্যে ও তাপ পরিমাণে সম্প্রতি বিশেষ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

গত কয়েক বৎসরের তুলনায় কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের তাপও যে বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবীর নিজস্ব তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত ইতস্তত বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহে এরূপ তাপ বৃদ্ধির অপর কোন

কারণ আন্দাজ করাও কঠিন। সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যাপক এল বার্গ্ তাই লিখিয়াছেন, "আমরা এরূপ এক যুগে বাস করিতেছি, যখন পৃথিবীর সর্বত্র এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিতেছে।—পৃথিবীর ইতস্তত বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহের তাপ শুধু উপসাগরীয় জলস্রোতের প্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর নিজস্ব তাপ বৃদ্ধিই ইহার কারণ। উপসাগরীয় জলস্রোত এই তাপের অংশ স্বভাবতই লাভ করিয়া থাকে।"

মেরু অঞ্চলে তাপ বৃদ্ধির প্রভাব ক্রমে অন্যভাবেও

৮২ ডিগ্রি ৪২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। 'ইয়ারমাক' নামক আর একটি জাহাজ ইতিপূর্বে দক্ষিণ কারা সাগরে প্রবেশ করিতে গিয়া কারা সাগরের মুখে সুদৃঢ়ভাবে তুষার স্তূপে বাধা পায়। কিন্তু মেরু অঞ্চলের অবস্থায় অল্প কয়েক বৎসরে এরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে যে, উক্ত জাহাজখানিই ১৯৩৭ সালে কারা সাগরের বরফ কাটিয়া আরও উত্তরে ল্যাপটেভ্ সাগর পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হয়। এমন কি উহা 'স্যাড্কো' জাহাজখানি যে পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আরও বিশ মাইল পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া ৮২ ডিগ্রি ৬ মিনিট অক্ষাংশে ফিরিয়া আসে। বলা বাহুল্য
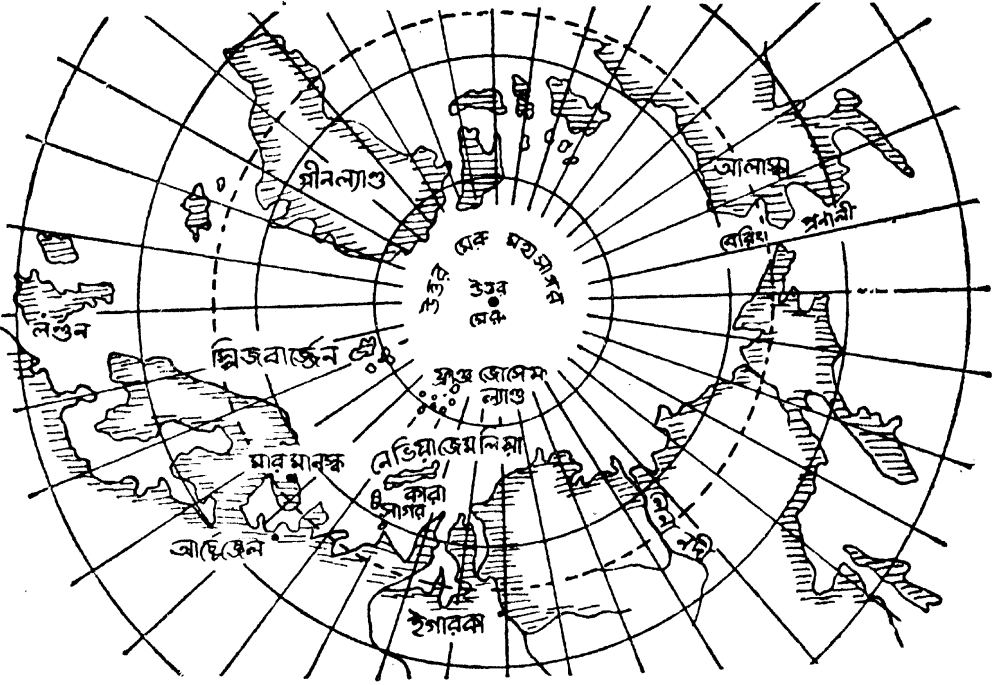
তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চল—রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ এ অঞ্চলে অভিযান করিয়া এ স্থানের আবহাওয়ায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন

উপলব্ধি হইতেছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অভিযানে কম দুঃসাহসিক নাবিক বিভিন্ন সময়ে অগ্রসর হয় নাই! তুষারের মধ্যে আটক পড়িয়া বহু দুঃসাহসী নাবিককে মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যটকদের জাহাজ তুষার ভেদ করিয়া যতদূরে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার রেকর্ড হইতেও মেরু অঞ্চলের তুষার তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ নমনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তুষার কাটিয়া চলিতে পারে এরূপ কয়েকটি সুদৃঢ় জাহাজ (Ice-breaker) নির্মাণ করিয়া সম্প্রতিমেরু অঞ্চল অভিযানে প্রেরণ করেন। এই সমস্ত জাহাজের মধ্যে 'স্যাড্কো' নামক জলযানটি ১৯৩৫ সালে উত্তর কারাসাগরের মধ্যে দিয়া প্রায়

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তাপের প্রভাবে তুষার স্তূপ অনেকটা নমনীয় হইয়াছে বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিরাট বরফ স্তূপও আসল তুষার ক্ষেত্র হইতে অনেক স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং মেরু অঞ্চলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দুঃসাহসিক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ ভাসমান তুষার স্তূপে থাকিয়াও তাঁহাদের গবেষণা কার্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং ইহার উপরেই রীতিমত গবেষণাগার স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। প্যাপেনিয়ান ভাসমান তুষার স্তূপ অভিযানে (Papanian Ice-Floe Expedition) যে চারিজন সাহসী রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও লক্ষ্য করিয়াছেন

কয়েক বৎসর পূর্বে যেরূপ শম্বুকগতিতে তাহাদের স্তূপটি মেরু প্রদেশ হইতে গ্রীনল্যাণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, শেষ অবস্থায় তাহাতে এক পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং উহার গতিবেগ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। মেরু অঞ্চলের সাগরাদিতে গ্রীনল্যাণ্ড এবং আয়র্ল্যাণ্ডের অভিমুখে স্রোতের গতি গত পঁচিশ বৎসরে দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ন্যানসেন যখন মেরু-অভিযানে বহির্গত হন, তখন তাঁহার জাহাজ 'ফ্রামের' গ্রীনল্যাণ্ডের দিকে ফিরিয়া আসিতে প্রায় তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইস্ বলেন যে, আধুনিক কালের অভিযাত্রী দল আরও অল্প সময়ের মধ্যেই উপরোক্ত স্রোতের বেগে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইবেন। মেরু প্রদেশের অচলায়তনে এইভাবে যে নূতন চেতনার সঞ্চার হইতেছে, পৃথিবীর নিজস্ব উষ্ণতার ক্রম বৃদ্ধিই যে তাহার কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সে বিষয়ে ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইতেছেন। গত কয় বৎসরের বিভিন্ন স্থানের তাপ পরিমাণের রেকর্ড হইতেও এই পরিবর্তন উপলব্ধি হয়। গ্রীনউইচের রেকর্ড হইতে জানা যায়, গত বৎসর মার্চ মাসে ইংলণ্ডে যে গরম পড়ে, সেরূপ তাপ ঐ দেশে বিগত দুই এক শতাব্দীতে দেখা যায় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার মস্কোতে যখন সময় সময় তাপমানযন্ত্রের পারদ শূন্য তাপাঙ্কেরও ৫৯·৮ ডিগ্রি নিম্নে নামিয়া যাইত, সেই সময় উত্তর মেরু হইতে ৫৬০ মাইল মাত্র দূরবর্তী রুডলফ্ দ্বীপে অবস্থিত মানমন্দির হইতে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ যে রিপোর্ট পাঠাইতেন, তাহা হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে ঐস্থানের তাপ কিন্তু কখনও শূন্যাঙ্কের নীচে নামিত না। পৃথিবীর তাপে যে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হইতেছে, ইহা হয়ত তাহার পূর্বাভাষ মাত্র।

মুক্তির ডাক

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কবিভূষণ

সেদিন ফাল্গুন রাতে
রাজার প্রাসাদে হাজারো প্রদীপ উঠলিয়া একসাথে;
কুমারের বিয়ে, কলকোলাহলে ভরিল আঙিনাখানি,
জোছনা মাখানো রাতের আকাশ ঢালিছে আশীর্বাণী,
আত্মস্বজনে পারিষদগণে ভরিয়া গিয়াছে গেহ,
কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, নৃত্য করিছে কেহ।
সহসা করুণ সুরে,
রাজার কুমার লভিল বেদনা গোপন হৃদয়পুরে;
পথের ওপাশে কে যেন কাঁদিছে বুকফাটা হাহাকারে,
সুখের মাঝারে দুখের কাহিনী জাগাইয়া বারে বারে।
কুমার ভাবিল, 'আমার প্রাসাদে এত আনন্দরাজি
কিসের করুণ বেদনাতে, কেবা বিনাইয়া কাঁদে আজি'।
ভোগ বিলাসের মাঝে,
রাজার দুলাল বাড়িয়া উঠেছে, বেদনারে জানে না যে,
মনে করে, আহা সকলেই বুঝি তাহার মতন সুখী,
অভাবের ব্যথা জানে না ত কভু, নাহি জানে কেবা দুখী।
পারিষদগণে শুধালো কুমার, 'কে কাঁদে অমন করে,
উৎসব রাতে করুণ কাঁদন কাহার নয়নে ঝরে?'
পারিষদগণ বলে,
রাত ভিখারীরা আসিয়াছে বুঝি রাজ-প্রাসাদের তলে;
মিছামিছি সব করে কলরব, যত দাও তত চায়,
ভিখারীর ক্ষুধা মেটে নাকো কভু, যত পেট ভরে খায়,
ভাবিল কুমার, 'এমন মানুষ জগতে তাহলে আছে?
স্বকর্ণে আজ দুখের কাহিনী শুনিব তাদের কাছে।'
এই বলে ধীরে ধীরে,
প্রাসাদ তেয়াগি চলিল কুমার সবহারাদের নীড়ে।
পরিধানে তার মলিন বসন, অন্তরে ব্যথাভার
অবহেলিতের জীবনযাত্রা দেখিতে বাসনা তার।
ব্যথার সুরের রেশটি ধরিয়া কুমার চলিল পথে,
এই পথে হায় কতবার গেছে চড়িয়া স্বর্ণরথে'
একটি কুটির মাঝে,
সর্ব্বহারার করুণ রোদন সকরুণ হ'য়ে বাজে।
শুধালো কুমার, "কেন কাঁদ ভাই, কিসের দুঃখ তোর
সাধ্য থাকিলে মুছাইয়া দেব ব্যথার অশ্রুলোর।"
শীর্ণ ভিখারী ম্লান মুখ তুলে চাহিল তাহার পানে,
তাহার মাঝারে সে যেন পেয়েছে মানুষের ভগবানে।

কহিল সভয়ে, "কে তুমি জানিনা, তবু শোন মোর কথা,
পুত্রটি মোর রোগ যাতনায় ছট্‌ফট্ করে হেথা,
দরিদ্র আমি,— তবু সম্বল যা কিছু আমার ছিল,
কুমারের বিয়ে,— রাজার মন্ত্রী সব কেড়ে ছিঁড়ে নিল;
ক্ষুধার জ্বালায় রোগযন্ত্রণা বাড়িয়া চলেছে ক্রমে,
চোখের সমুখে সন্তানে মোর কেড়ে নিয়ে যাবে যমে।"

রাজার দুলাল ভাবে ক্ষণকাল কপালেতে হাত দিয়ে,
'এদেরই শোণিতে গড়া সম্পদে, আজি হবে মোর বিয়ে?
প্রজার কুটিরে এত হাহাকার আমার প্রাসাদে সুখ,
ইহাদের চোখে বেদনার ছায়া বিদ্রোহ ভরা বুক;
কেন সমারোহ, কিসের আমোদ অন্যেরে ব্যথা দিয়ে,
সবহারাদের দুখের অন্ন মুখ হ'তে কেড়ে নিয়ে?
মানুষের অবিচারে
হৃদয় তাহার কাঁদিয়া উঠিল গুমরিয়া বারে বারে;
শুক্লা তিথির জ্যোছনার রেখা ক্ষীণ হ'য়ে আসে ধীরে
রাতের নিশুতি স্বপন মায়ায় নামিছে ধরণী ঘিরে:
রাজার কুমার বেদনা-ব্যাকুল দাঁড়ালো পথের বাঁকে,
সব মানুষের ভগবান তারে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

চাকরী সমস্যায় যোগ্যতা ও সুবিচার

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

চাকুরী সমস্যা লইয়া এ পর্যন্ত যে-সব আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে ফুটিয় উঠিতেছে যে, একদল লোকের চাকুরীই হইতেছে জীবন-মরণের একমাত্র সমস্যা। চাকুরীর সুব্যবস্থা চাই—দেশ চুলোয় যাক, স্বাধীনতা রসাতলে যাক, জনকল্যাণ, গণমুক্তি গোল্লায় যাক, কিন্তু চাই চাকুরী, মোটা বেতনের হোক, অথবা অল্প বেতনের হোক, সরকারী বিভাগের যে কোন একটা চাকুরী চাই। "যেমন তেমন চাকুরী ঘি-ভাত"—এই চাকুরী লইয়া তাঁহারা ঘি-ভাত খাইতে চান। সম্প্রতি বাঙলা সরকার চাকুরী সমস্যাকে সব সমস্যার শীর্ষস্থানে রাখিয়া দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। দেশে যখন এই লইয়া আন্দোলন হইতেছে এবং এই আন্দোলন হইতে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষির ভাব দেখা দিয়াছে তখন এ সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ আলোচনা করা দরকার। চাকুরী লইয়া আমরা যেরূপ কামড়াকামড়ি আরম্ভ করিয়াছি তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আমাদের মুক্তি বুঝি কোন দিনই হইবে না। সমস্ত শক্তি যদি এই সামান্য ব্যাপারে নিয়োজিত হয়, মনের জঘন্যতম প্রবৃত্তিকে যদি আমরা এই বিষয় লইয়া জাগাইয়া দিতে থাকি তবে বৃহত্তর ব্রত, মহত্তর সাধনার সম্মুখে আমরা যে পদে পদে পরাজিত, প্রতিহত ও বিধ্বস্ত হইব তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।. ইহা কি কেহই বিবেচনা করিয়া দেখিবে না যে, চাকুরী সমস্যা মোটেই কোন সমস্যা নহে? ইহা আমাদের দারিদ্র্য নিরসন করিতে পারিবে না, দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে না, কোটি কোটি কৃষক মজুরের অন্ন-সংস্থান করিবে না, দেশজোড়া বেকার সমস্যার সমাধান করিবে না, দেশের অধিবাসীর শতাংশের একাংশও উপকার করিবে না। তখন ইহা লইয়া এত মাথা ঘামাইবার কি দরকার? কি উপকার হইতে পারে ইহা দ্বারা দেশের সর্ব্বসাধারণের ও সর্ব্বহারা দলের? হিন্দু-মুসলমান যদি প্রত্যেকে এইভাবে সমস্যাটাকে দেখে তবে এই অকিঞ্চিৎকর বিষয়টা কোনওরূপ গুরুত্ব পাইবে না। আমাদের মূল সমস্যাও ধামাচাপা পড়িবে না।

চাকুরী সমস্যার মূল ও আদি কথা এই যে, চাকুরীর জন্য গবর্ণমেণ্টের সৃষ্টি হয় না,—গবর্ণমেণ্টের প্রতিটি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্যই চাকুরীর সৃষ্টি হইয়াছে। শাসনকার্য্যের সৌকর্য্য বিধানের জন্য কতকগুলি লোকের দরকার হয়। একজনের দ্বারা সমস্ত শাসন বিভাগ পরিচালন করা সম্ভব হয় না। আমলাতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক—যে কোন শাসন পদ্ধতি দেশে প্রচলিত থাকুক না কেন, সুচারুরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য একযোগে বহু লোকের দরকার। এই সব লোক এমন ধরণের হইবে যেন তাহারা সমস্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে পারে। যদি কেহ যথাযথভাবে কাজ করিতে না পারে, প্রতি পদে নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেয়, তবে তাহাকে লইয়া শাসনকার্য্য চালান অসম্ভব। একজনের পেটের ভাতের ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেশশুদ্ধ লোকের অসুবিধা সৃষ্টি করা উচিত নহে। বিশ্বের কোথাও সেরূপ নিয়ম নাই। সেরূপ করিলে দেশের শাসনকার্য্য একদম অচল হইয়া পড়িবে। শাসন বিভাগের কোন স্থানে অযোগ্য ও অপদার্থ লোক থাকিলে জনসাধারণের পক্ষ হইতেই তাহার প্রতিবাদ হয়, তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, কত লেখালেখি হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। একজন লোকের দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থাই যদি চাকুরীর মূল-কথা হয়, তবে অযোগ্য লোকের প্রতি কেন এইপ্রকার অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা দেখান হয়? আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেখানে নিজেরাই লোক নিযুক্ত করি, সেখানে কেন আমরা সকলের আগে যোগ্য লোককেই বাছিয়া লই? অযোগ্যকে কেন প্রশ্রয় দিতে চাহি না? ইহার একমাত্র উত্তর ভালভাবে কাজ পাইবার জন্য লোক নিয়োগ করি, কেবল চাকুরী দিবার উদ্দেশ্যে লোক নিয়োগ করি না। ব্যক্তির বেলায় যাহা খাটে রাষ্ট্রের বেলায়ও তাহাই খাটিবে। যে কোন লোককে চাকুরী দেওয়াই রাষ্ট্রের কাজ নহে। ভাল কাজ করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র ভাল ও কর্ম্মক্ষম লোক নিয়োগ করে, রাষ্ট্রেরই স্বার্থে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। কেবলমাত্র বেকার সমস্যার সমাধানের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া লোক নিযুক্ত করিলে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, যোগ্যতম লোকের পরিবর্ত্তে অযোগ্য লোক ভর্ত্তি হইয়া যাইবে, সমস্ত শাসন ব্যবস্থার ওলট পালট হইয়া যাইবে, নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে, দেশে অরাজকতার আবির্ভাব হইবে। তখন দেশেরই লোক এইপ্রকার লোক নিয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবে। সুতরাং যোগ্যতাকে বাদ দিয়া চাকুরী সমস্যার অন্য কোন কথাই উঠিতে পারে না।

একটা কথা উঠিয়াছে, যোগ্যতাই যদি চাকুরীর একমাত্র মানদণ্ড হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে সুবিচার হইতে পারে না। সুবিচার অর্থে তাঁহারা বুঝেন, চাকুরীতে যেন দেশের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকই কিছু কিছু অংশ পায়। যোগ্যতাকে মানদণ্ড করিলে হয়ত এক সম্প্রদায়ের লোকই সব চাকুরী পাইয়া বসিবে, চাকুরী তাহাদেরই একচেটিয়া হইয়া যাইবে, অন্য কোন লোক চাকুরী পাইবে না। সুতরাং তাহাদের প্রতি ঘোর অবিচার হইবে। এই অবিচারের প্রতিকার হইতেছে যে, যোগ্যতাকে মানদণ্ড না করিয়া সুবিচারকেই মানদণ্ড করা। তাঁহাদের এইপ্রকার যুক্তি হইতে চাকুরী বণ্টনে সাম্প্রদায়িক হারের দাবী করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন, চাকুরীটা যেন সরকারের হাতে একটা দাতব্য বস্তু। সরকারকে ইহা সকলকেই সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কেহই যেন ক্ষোভ করিতে না পায়, আমার ভাগ্যে কিছুই জুটিল না। তাঁহারা সরকারী অন্নসত্রের কিছু কিছু অংশ চাকুরীর আকারে সকলকেই ভাগ করিয়া দিতে চান। ইহাই হইল তাঁহাদের বিবেচনায় সুবিচার, এই সুবিচার ব্যতিরেকে কিছুতেই তাঁহারা শান্ত হইবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যোগ্যতা ও সুবিচারের মধ্যে একটা মস্ত বড় বিরোধ বাধিয়া

যাইতেছে। কেবলমাত্র যোগ্যতাকে দেখিতে গেলে সুবিচার হয় না, আবার সুবিচার করিতে গেলে যোগ্যতার কদর হয় না। যোগ্য লোক অভিযোগ করিবে, কোন্ অপরাধে আমার যোগ্যতাকে পদদলিত করা হইবে? যোগ্যতার যদি কদর না হইবে, তবে যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রতি দেশের লোক কেন আকৃষ্ট হইবে? সুবিচারের দোহাই-এ অযোগ্য লোক সুযোগ্য লোককে ডিঙ্গাইয়া গেলে বুদ্ধি ও জ্ঞান বিষয়ে দেশ দেউলিয়া হইয়া যাইবে। আবার অন্য পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য লোক চীৎকার করিবে, রাষ্ট্রের কাজে তাহাদেরকে অংশ গ্রহণ করিতে না দিলে তাহাদের যোগ্যতা বাড়িবে কেমন করিয়া? বুদ্ধির জোরে একই শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রের সকল অধিকার হস্তগত করিলে অন্যেরা দাঁড়াইবে কোথায়? এই দুই পরস্পর-বিরোধী দাবীর মধ্যে কি কোনওরূপ সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না?

একথা আমরা জোর গলায় বলিব যে, রাষ্ট্র অন্নসত্র নহে, অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান নহে, যে, তথাকথিত সুবিচারের নামে যোগ্যতাকে পদদলিত করিয়া অযোগ্য লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে যাইবে। শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। এমন কোন কাজই রাষ্ট্রের পক্ষে করা উচিত নহে, অথবা আশ্রয় দেওয়া উচিত নহে যাহাতে এই সৌকর্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। চাকুরী বণ্টনে যেখানে শাসনকার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা চলিতে দেওয়া উচিত হইবে না। সেখানে যোগ্যতাই একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। গালভরা ভাষায় সুবিচারের কথা বলা হয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হার নির্ণীত হইলেই কি সুবিচার হইয়া যাইবে? তখনও নানারূপ সমস্যা দেখা দিবে, নানা লোক নানারূপ দাবী করিয়া সুবিচার প্রার্থনা করিবে। এইভাবে প্রত্যেকের সুবিচার করিতে গিয়া রাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব চিরতরে বিনষ্ট হইবে, শুধু তাই নহে, রাষ্ট্রের সুনামও কলঙ্কযুক্ত হইয়া পড়িবে। সুবিচারের মানদণ্ড এরূপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে যে, শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যর্থকাম প্রার্থীই মনে মনে পীড়া অনুভব করিবে এই ভাবিয়া যে, তাহার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হারাহারি-ভাবে চাকুরী বণ্টন হইয়া গেলেই জেলায় জেলায় চাকুরীর জন্য দাবী আরম্ভ হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বাদানুবাদ হইবে, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রেষারেষি জাগিতে থাকিবে। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, শেখ, সৈয়দ, মোমিন, আনসার প্রভৃতিদের মধ্যে যে চাকুরী পাইবে না, সেই সুবিচারের দাবী করিবে। এইভাবে কাহাকেও সন্তুষ্ট করা যাইবে না। সুবিচারের যূপকাষ্ঠে যোগ্যতাকে বলিদান করিয়াও কাহাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে না, চাকুরী সমস্যা অমীমাংসিত হইয়া রহিবে।

যোগ্যতাকে চাকুরী বণ্টনের মানদণ্ড করিলে এই সমস্ত উপসমস্যার উদ্ভব হইবে না। সকলেই নিশ্চিতরূপে জানিবে যে, যোগ্যতাই চাকুরী পাইবার একমাত্র উপায়। সুতরাং চাকুরী প্রার্থীরা সেই যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইবে। ইহাতে দুইটি প্রধান উপকার হইবে। প্রথমত রাষ্ট্র যোগ্যতম লোকের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং সেইজন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে। দ্বিতীয়ত দেশের লোকের যোগ্য হইবার জন্য চেষ্টা বাড়িবে। প্রতিযোগিতার অনল পরীক্ষায় অনেকের প্রতিভার স্ফুরণ হইবে। সত্য বটে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার চেষ্টা করার জন্য তাহাদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, সেই শক্তি অন্যদিকে নিয়োজিত হইলে দেশেরই উপকার হইবে। আর যাহারা প্রথম হইতে প্রতিযোগিতায় নামিতে সাহস করিবে না তাহারা বৃথা পরিশ্রম না করিয়া যথা সময়ে অন্যভাবে জীবিকার্জ্জনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। এইপ্রকারে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হইবে, স্বাবলম্বী লোকে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে সহায়তা করিবে। মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এইভাবে যদি মুসলমানকে প্রতিযোগিতার আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাহাতেই তাহাদের বেশী উপকার হইবে। আজ বিশেষ সুবিধার মোহে মুসলমান যোগ্যতাকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যোগ্যতার কদর নাই, আত্মীয়-প্রীতির কারণে খাজাই দলের কেহ কেহ চাকুরী পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে গোটা সমাজের কিছু উপকার হইবে না। এই সব কারণে আমরা মৌলবী ফজলুল হকের চাকুরী-নীতি সমর্থন করি না। চাকুরীর ব্যবস্থা হইলে মুসলমান মনে করিতেছে, তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইবে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে দেখিবে, তাহাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা হইয়াছে, মিথ্যা আশা দেওয়া হইয়াছে। সমাজের মধ্যে নিস্তেজীবিতা দেখা যাইতেছে, চাকুরীর নিশ্চয়তা পাইলে তাহ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করিবে। সমাজকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টানিয়া আন, দেখিবে তাহার প্রতিভার এমন বিকাশ হইবে যাহা চাকুরীর তুলনায় অনেক মূল্যবান।

পুস্তক পরিচয়

শুভদৃষ্টি—লেখিকা শ্রীমমতা ঘোষ—বিশ্বভারতী গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ কর্ত্তৃক ২১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রিয়জনের আবির্ভাব লেখিকার অন্তরে আনিয়াছে আনন্দের বন্যা। সেই আনন্দের অনুভূতি হইতে 'শুভদৃষ্টি'র অধিকাংশ কবিতার সৃষ্টি। যে অনুভূতির তীব্রতা হইতে উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম হয়—লেখিকার কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার উৎকর্ষ শব্দের যাদুর উপরেও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই মহিলা-কবির গ্রন্থখানি শব্দসম্পদেও ধনী। বাংলা সাহিত্যে 'শুভদৃষ্টি'র আবির্ভাব উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য আনয়ন করিয়াছে। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সবই মনোহর।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) লেখক শ্রীঅনিল-বরণ রায়। ১০৮।১১, মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে বারো আনা এবং এক টাকা দুই আনা।

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই দুই খণ্ড পড়িয়া আমরা খুসী হইলাম। গীতার আধুনিক যতগুলি ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে—শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। একাধারে গভীর পাণ্ডিত্য এবং কবির অন্তর্দৃষ্টির যে অপূর্ব্ব সমাবেশ শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় অন্যত্র তাহা দুর্লভ। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত গীতার ব্যাখ্যা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়া দিবে সন্দেহ নাই।

গল্প শোন—লেখক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোনারপুর, ২৪-পরগণা হইতে প্রকাশিত। দাম চার আনা।

ছোটদের গল্পের বই। এতে তিনটী গল্প আছে। গল্পগুলি খুব জমিয়া উঠিয়াছে—এমন কথা বলিতে পারি না—চলন সই। তবে উদ্যম প্রশংসনীয়।

মাতৃবাণী—অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীরাধাকান্ত নাগ, আর্ট পাবলিশিং হাউস, ৬৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার আনা। প্রত্যেকটি বাণী অন্তরের গভীর অধ্যাত্ম ধ্যানরস কেন্দ্র হইতে উচ্ছ্বসিত, এই জন্য মধুর এবং প্রজ্ঞানঘন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি অধ্যাত্মরস পিপাসু ব্যক্তিদের পরিতৃপ্তি বিধান করিবে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীভারতী—জ্যৈষ্ঠ মাসিক পত্র। সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ১৭০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রত্যেক প্রবন্ধই সুচিন্তিত, সুলিখিত এবং সারগর্ভ। 'নালন্দা', 'ভারত যুদ্ধ কাল নির্ণয়', 'বৈদিক সংস্কৃতি' এই কয়েকটি প্রবন্ধে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং তথ্যানুসন্ধানশীলতায় সমৃদ্ধ।

আঙ্কর পার্ক—(ইংরেজী) স্বামী সদানন্দ প্রণীত। ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ক্যালকাটা ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। স্বামী সদানন্দ বৃহত্তর ভারতের সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বৃহত্তর ভারতের 'পূজা-পার্ব্বণ', 'কম্বোজ', 'সুবর্ণ দ্বীপ', 'চম্পা' গ্রন্থগুলি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সে যশ বৃদ্ধি করিবে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বর্ত্তমান ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল পাঠকেরা তাহার কিছু পরিচয় পাইবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প প্রতিযোগিতা

কাচড়াপাড়া কিশোর সমিতির উদ্যোগে একটি গল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিতায় যে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করিতে পারিবেন। লেখক-লেখিকার নাম, ঠিকানা, বয়স, শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের নাম সম্বলিত এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর নাম স্বাক্ষরিত একটি ট্রাজিক গল্প অথবা ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প (ফুলস্কেপ কাগজের ১২ পৃষ্ঠার বেশী না হয়) নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় ২৮শে জুনের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একটি রৌপ্য পদক দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে।

ঠিকানাঃ—পশুপতি বিশ্বাস (সম্পাদক), কিশোর সমিতি ব্লক নং ৩০৯, রুম নং "সি", পোঃ আঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা অথবা শকুর আহাম্মদ (সহঃ সম্পাদক), কিশোর সমিতি, ব্লক নং ৩২৫, রুম নং "ই" পোঃ আঃ কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা।

বেহালা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ২৮শে মে, রবিবার বেহালা টাউন হলে শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উক্ত প্রতিযোগিতার ৩য় বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট মান্যবর ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় কে কোন স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রতিযোগিগণ প্রত্যেকে একটি করিয়া রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছে।

১। কাজি নজরুলের "দাড়ি-বিলাপ"ঃ—১ম—নির্মলকুমার ঘোষ, ২য়—মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের "একা"ঃ—১ম—অনিলকুমার চন্দ্র।

৩। Stan's First Speech (Milton)ঃ—১ম—অনিলকুমার ঘোষাল।

৪। রবীন্দ্রনাথের "অভিসার"ঃ—১ম—শঙ্কর ঘটক, ২য়—শ্যামধন বসু মল্লিক, ৩য়—চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫। কালিদাস রায়ের "কৃষ্ণানীর ব্যথা"ঃ—১ম—জয়াবতী মিত্র, ২য়—সবিতা রায়।

৬। রবীন্দ্রনাথের "পূজারিণী"ঃ—১ম—ইন্দিরা রায়, ২য় কনকলতা মুখার্জ্জি।

৭। সুকুমার রায়ের "সাবধান"ঃ—১ম—যোগেশ মুখোপাধ্যায়, ২য়—অমলকুমার ঘোষ, ৩য়—রতিকান্ত রায় চৌধুরী, ৪র্থ—শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ৫ম—কানাই রায়।

৮। সঙ্গীত (বিশেষ পুরস্কার)ঃ—নিশারাণী গুপ্তা।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মণ্ডল এম-এ, বি-এল; শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায় বি-এ, সম্পাদক।

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

আমাদের 'বৈশাখী' পত্রিকা মারফৎ একটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—'চলচ্চিত্রের সহিত হালবাংলার তরুণের সম্বন্ধ, গল্প যে-কোন বিষয়ে লিখিলেই চলিবে। প্রবন্ধাদি ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। কোন বিষয়ই আট পাতার অধিক যেন না হয়। প্রথম পুরস্কার প্রত্যেক বিষয়ে এক একটি রৌপ্যপদক। প্রবন্ধাদি পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৬ সাল। নিম্নলিখিত যে-কোন ঠিকানায় রচনাদি প্রেরিতব্য।

(১) শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—'বৈশাখী', তেলমাড়ুই রোড, বর্দ্ধমান। অথবা (২) শ্রীশঙ্করদাস সরকার, সহ-সম্পাদক, ১নং পাকুমারা লেন, বর্দ্ধমান।

তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ২৭ সংখ্যা "দেশ" পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' পত্রিকার উদ্যোগে যে গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল, উহাতে গল্প ও কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে মে স্থলে ২০শে জুন ধার্য্য করা হইল।

গল্প ও কবিতা পাঠাইবার ঠিকানাঃ—

শ্রীসুশান্তকুমার পাঠক, সাধনপাড়া, পোঃ—বহিরগাছি, নদীয়া।

তারিখ পরিবর্ত্তন

ধীপুর (ইদিলপুর) দেশবন্ধু গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ও তাহার মীমাংসা" বিষয়ে "দেশ" পত্রিকায় যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলাম, উহাতে প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ কোন অনিবার্য্য কারণবশত ৩১শে শ্রাবণ (১৩৪৬ সন) পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।

পুরস্কার দাতা—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, ধীপুর প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি।

সুহৃদ সঙ্ঘ (হাওড়া)

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় ২৭নং কালী ব্যানার্জ্জি লেনে সঙ্ঘের চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সুপরিচিতা কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী আবৃত্তি ও সমালোচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়িগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। জগদীশচন্দ্র সাহা প্রধান অতিথি হইয়া সমাগত ব্যক্তি ও মহিলাগণকে অভ্যর্থনা করেন। আবৃত্তি ও সমালোচনা প্রতিযোগিতায় নরেন্দ্র দেব, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিভাস রায় চৌধুরী, চরণদাস ঘোষ, এড্‌ভোকেট অমূল্যচরণ ভাদুড়ী বিচারক হইয়া নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতায় বিচার করেন।

(ক) বিভাগ—আবৃত্তি

সুবর্ণ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ ও সুবর্ণ স্মৃতিপদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—"ব্যর্থ বোধন" শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী (শ্রীরামপুর)

(খ) বিভাগ—আবৃত্তি

কৃষ্ণপ্রসাদ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ ও রৌপ্য পদক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"পণরক্ষা," শ্রীযুত অসিৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(সালিকা)।

(গ) বিভাগ—সমালোচনা

কৃষ্ণচন্দ্র সাহা চ্যালেঞ্জ কাপ ও জগদীশ সাহা পারিতোষিক কাপ। 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"শেষ প্রশ্ন", মৃণাল ঘোষ এম-এ, (চন্দননগর)।

রঙমহলে মাকড়সার জাল

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে "মাকড়সার জাল" নাটক অভিনীত হইতেছে। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী নাটকখানি রচনা করিয়াছেন; শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করিয়াছেন এবং শ্রীযুত প্রভাত সিংহ প্রযোজনা করিয়াছেন।

"মাকড়সার জাল" নাটকাভিনয় আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। সর্ব্বদিক দিয়া নাটকখানি প্রশংসার যোগ্য। প্রথম নাটকের কথা ধরা যাক। নাটকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এই ধরণের নাটক ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। যে ধরণের নাটককে ইংরেজীতে "ক্রাইম ড্রামা" বলা হয়—সেই ধরণের একটি কাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু।

নিউ থিয়েটার্সের "রজত-জয়ন্তী" চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়া, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালনা করিয়াছেন।

এই ধরণের নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃত অপরাধী কে, তাহা নাটকের শেষ দৃশ্যের পূর্ব্বে বুঝিতে পারা যায় না এবং ইহার ফলে দর্শকদের মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগে যে, কে প্রকৃত অপরাধী এবং এই রহস্যের মূল কোথায়। আলোচ্য নাটকখানির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় আছে। নাটকখানি ভাল লাগার ইহা প্রথম কারণ।

তারপর অভিনয়ের কথা। প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী ভাল অভিনয় করিয়াছেন। নায়ক স্মরজিতের ভূমিকায় শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা এবং প্রকাশভঙ্গী নির্ভীক, জড়িমাবর্জ্জিত এবং সুষ্ঠু। তিনি যে অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব।

ইহার পরই সুরেন্দ্রনারায়ণের ভূমিকায় শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নাম করা যাইতে পারে। এই যশস্বী নটের অভিময় আমায় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে বহুদিন বহু চরিত্রে দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। আলোচ্য নাটকে তিনি যে অভিনয় নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা অসঙ্কোচে সেই পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিতে পারি। ভূধর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রটি খুবই জটিল। শ্রীযুত প্রভাত সিংহ এই জটিল চরিত্রটির অতি চমৎকার রূপ দিয়াছেন। কলেজে-পড়া নব্য-প্রেমিক ও খামখেয়ালী যুবকের ভূমিকাটিকে শ্রীযুত ভূমেন রায় সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ক্ষুদ্র দুইটি ভূমিকায় শ্রীযুত আশু বসু ও হীরালাল চট্টোপাধ্যায় বেশ উপভোগ্য অভিনয় করিয়াছেন।

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে সুনীতির ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তির অভিনয়ের কথা সর্ব্বপ্রথম বলা যাইতে পারে। রহস্যময়ী সুনীতির কঠিন চরিত্রকে রূপ দেওয়া খুব সহজ নহে। যে সংযম, যে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় এই ভূমিকার প্রধান অঙ্গ তাহা শ্রীমতী শান্তি সুষ্ঠুরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কুসুমকামিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মাবতী বিশেষ ভাল অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমতী ঊষা ও শ্রীমতী গিরিবালার অভিনয়ও আমাদের ভাল লাগিয়াছে.

পরিচালনা বেশ সুষ্ঠু এবং ইহার মধ্যে পরিচালকের নাটকীয়ত্ব বোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যটিই প্রধান এবং এই দৃশ্যটির অতি চমৎকার রূপ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় হইতে নাটকখানি বেশ জমিয়া উঠে। প্রথম অধ্যায়ে যে কাহিনীর সূচনা করা হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়েও সেই সূচনার জের চলিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়টি

(শেষাংশ ৪৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলিকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ **হইয়াছে। বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে।** প্রত্যহই খেলার পূর্ব্বে **বা পরে প্রবল বারিপাত হইতেছে।** খেলার সমস্ত মাঠই **সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত। এই সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত** মাঠে প্রতিদিন বিভিন্ন **খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল** পরিলক্ষিত হইতেছে। কালী-ঘাট, এরিয়ান্স, ভবানীপুর প্রভৃতি দলসমূহ এইরূপ মাঠেই **অতি উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য** প্রদর্শন করিতেছে। রেঞ্জার্স, **ক্যামারোনিয়ান্স**, বর্ডার রেজিমেন্ট প্রভৃতি দল যাহারা এইরূপ **সিক্ত মাঠে** অপর দলসমূহের ভীতির কারণ হইবে বলিয়া আশা **করা গিয়াছিল**, তাহারাই নিম্নস্তরের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন **করিয়া** বিভিন্ন খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতেছে। **সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত** কোন্ দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা **এখনও** পর্য্যন্ত সঠিকভাবে বলা যায় না।

তবে মোহনবাগান দল এখনও পর্য্যন্ত লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে অবস্থান করিয়া আছে। ইহার পরেই লীগ তালিকায় রেঞ্জার্স তিন পয়েন্ট পশ্চাতে থাকিয়া দ্বিতীয়, ইষ্ট বেঙ্গল চারি পয়েন্টে থাকিয়া তৃতীয় ও মহমেডান পাঁচ পয়েন্টে থাকিয়া চতুর্থ স্থানে অধিকার করিয়া আছে। এই সকল দল সহজেই যে মোহনবাগান দলকে এই সম্মানজনক স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে না। মোহন বাগান দলের খেলোয়াড়গণের খেলায় এখনও পর্য্যন্ত দৃঢ়তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমার্দ্ধের শেষ খেলায় ভবানীপুর দলের নিকট হঠাৎ পরাজিত হইয়া মোহনবাগান দলের সমর্থন-কারীদের মনে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল, রেঞ্জার্স দলকে পরা-জিত করায় তাহা বিদূরিত হইয়াছে। এই দিনে মোহনবাগান দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই অপূর্ব্ব দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। মোহনবাগান দলের এখনও লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলায়াড়গণের খেলায় হঠাৎ নিরুৎসাহ দেখা দিয়াছে। রহমতের যোগদানের পর আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়গণ যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিলেন আলোচ্য সপ্তাহের খেলায় তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। আক্রমণ ভাগ, রক্ষণ ভাগ সকল বিভাগেই বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। ভবানীপুর দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয় এবং ইহাই এই দলের পরাজয়ের কারণ। এই দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার যেটুকু সম্ভাবনাও ছিল, তাহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এখনও যে ক্ষীণ আশা আছে, তাহাও বর্ত্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিতেছে।

ইষ্টবেঙ্গল দলের অবস্থাও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ কার্য্যোপলক্ষে দেশে গমন করায় এই দলের আক্রমণভাগের সমস্ত শক্তিই যেন বিনষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই শক্তিহীন দলসমূহের বিরুদ্ধে খেলিয়াও এই দল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়া কোনরূপে দলের সম্মান রক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই যদি এই অবস্থার পরি-বর্ত্তন না হয়, তবে ইষ্টবেঙ্গল দলকে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

রেঞ্জার্স দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার এখনও আশা আছে। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়গণের খেলার পরিবর্ত্তনের উপর এই দলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

কালীঘাট ও ভবানীপুর খেলায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। নব নব খেলোয়াড়গণের আগমনই ইহার প্রধান কারণ। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন খেলায় এই দুইটি দল যেরূপ কৃতিত্বপূর্ণ খেলা প্রদর্শন করিয়াছে, পরবর্ত্তী খেলাগুলিতে তাহা বজায় রাখিতে পারিলে লীগ তালিকায় ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারিবে। বিশেষ করিয়া ভবানীপুর দলের লীগ তালিকার নিম্ন স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা দূর হইয়াছে।

এরিয়ান্স দলের খেলোয়াড়গণ উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। পরবর্ত্তী তিন চারিটি খেলাতে এইরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিলে এরিয়ান্স দলের দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইতে হইবে না। খেলোয়াড়গণ দলের অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রথম ডিভিসনে সম্মানের সহিত খেলিয়া হঠাৎ দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাওয়া খুবই দুঃখের।

বাহিরের খেলোয়াড়গণ

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন দলে বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দল পুষ্ট করিবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি দিন মাঠে খেলা দেখিতে গিয়া নব নব খেলোয়াড়গণের মুখ দেখিতে হইতেছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় উহারা সকলেই বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড়। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের ৩৩নং আইন জারী হইবার পর অনেকেই ভাবিয়াছিলেন বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দল পুষ্ট করি-বার প্রচেষ্টা বাঙলাদেশে কমিয়া যাইবে। কিন্তু এই সপ্তাহে বিভিন্ন দলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া-ছেন। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "আইন হইয়া বে-আইনী কার্য্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইতিপূর্ব্বে বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করিতে ক্লাবের পরিচালক-গণ ইতস্ততঃ করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপে তাঁহা-দের চক্ষু লজ্জা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পরিচালকগণ বেপরোয়া হইয়া পড়িয়াছেন। ৩৩নং আইনের মূল্য কোথায় থাকিল?" ৩৩নং আইনের এইরূপ যে অবস্থা হইবে, তাহার কিছু আভাষ আমরা ইতি-পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে আইনের কোনই মূল্য থাকে না ইহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমানে বাহিরের খেলো-য়াড়গণকে দলভুক্ত করিবার হিড়িক দেখিয়া আমরা কোনরূপ আশ্চর্য্য হইতেছি না। অনেকে বলিবেন সম্প্রতি যে সমস্ত খেলোয়াড় বিভিন্ন দলে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কি-

রূপে কলিকাতার বাসিন্দা বলিয়া প্রমাণ করা হইবে?" মোহনবাগান রহমতের খেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে, আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী রহমতের নিকট হইতে যেরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন ঐ সমস্ত খেলোয়াড়গণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিলে ঐ একই উত্তর পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই কলিকাতায় বিভিন্ন কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া থাকেন। পরিচালকগণ এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াই বাহিরের খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করিতেছেন। সুতরাং আইনের দ্বারা বাহিরের খেলোয়াড়গণের আগমন বন্ধ হওয়া অনেকের মতে সম্ভব বলিয়া মনে হইলেও আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ আমরা জানি, যে সমস্ত ধুরন্ধর এই সমস্ত বাহিরের খেলোয়াড়গণকে বাঙলায় আমদানী করিয়া থাকেন তাঁহারা আইনের ফাঁক দিয়া কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়, তাহা ভাল করিয়াই জানেন। এইজন্যই ৩৩নং আইন সম্বন্ধে আলোচনা চলা সত্ত্বেও তাঁহারা দলে দলে বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া নিজ নিজ দল পুষ্ট করিতেছেন। সুতরাং বাঙলার জনমত যতক্ষণ না এই কার্য্যের ভীষণ প্রতিবাদ করিতেছেন ততক্ষণ শত শত আইন দ্বারাও এই প্রথা রোধ করা যাইবে না।

নিম্নে লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

লীগ খেলায় কাহার কিরূপ স্থান

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিপ	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১৩	৯	৩	১	১৯	৫	২১
রেঞ্জার্স	১৩	৯	০	৪	২৩	১১	১৮
ইষ্টবেংগল	১৩	৬	৫	২	১৬	৬	১৭
মহমেডান	১৩	৬	৪	৩	১৯	১১	১৬
কালীঘাট	১১	৫	৪	২	১৮	৮	১৪
কাষ্টমস	১৩	৫	৪	৪	১৫	১৩	১৪
ই বি আর	১১	৫	২	৪	১৪	১৩	১২
ভবানীপুর	১২	৪	৩	৫	১১	১৭	১১
এরিয়ান্স	১৩	৪	২	৭	১৩	২১	১০
পুলিশ	১৩	৩	৩	৭	১২	২০	৯
ক্যামেরোনিয়ান্স	১৩	৩	৩	৭	৮	২০	৯
ক্যালকাটা	১৩	১	৫	৭	১৪	২৩	৭
বর্ডার রেজিঃ	১৩	২	২	৯	১৩	২৭	৬

রঙ্গজগৎ

(৫৪১ পৃষ্ঠার পর)

একটু একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। নাটকের কথাবার্তা বেশ সরস ও বিশেষভাবে উপভোগ্য। দৃশ্যপট অতি সুন্দর এবং তাহার মধ্যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুত মণীন্দ্র দাস দৃশ্যপট পরিকল্পনা করিয়াছেন। সুকবি শৈলেন রায়ের গানগুলি সুরচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় সবগুলি সুগীত হয় নাই। শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ীর সঙ্গীত পরিচালনা ভালই হইয়াছে। শ্রীযুত ব্রজ পালের নৃত্য পরিকল্পনা প্রশংসা করা যাইতে পারে।

* * *

নিউ থিয়েটার্সের হইয়া পরিচালক নীতীন বসু যে ছবিখানি এখন তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বে তোলা হিন্দী ছবি 'দুষমনের' বাঙলা চিত্রকথা। ছবিখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "জীবন মরণ"। লীলা দেশাই, সায়গল, ভানু, ইন্দু, দেববালা, মনোরমা প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

পরিচালক হেমচন্দ্র নিউ থিয়েটার্সের হইয়া আর একখানি ছবির কাজে হাত দিয়াছেন। বাঙলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণেই ছবি তোলা হইবে। বাঙলা সংস্করণে কাননবালা, ভানু বন্দোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী ও জীবন গাঙ্গুলী এবং হিন্দী সংস্করণে কাননবালা, নাজাম, বিক্রম কাপুর, রাজলক্ষ্মী ও নন্দকিশোর অভিনয় করিতেছেন।

* * *

গত ৩০শে মে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে 'কল্পতরু মিলন বীথি' শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'চলতি পথে' অভিনয় করেন। প্রথমে বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েশনের শিল্পিগণ শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। নাটকাভিনয়ও বেশ সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। সুশীলকুমার সেনের 'মিঃ বসু', রাধাকান্ত ব্যানার্জ্জির 'শশাঙ্ক', সুধীরকুমার সেন চৌধুরীর 'ঘোষ', রামচন্দ্র চৌধুরীর 'রণজিৎ', তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পূরবী' ও লক্ষ্মীনারায়ণ চ্যাটার্জ্জির 'কাদম্বিনী' উল্লেখযোগ্য। ৪ বৎসরের বালক মিনু চৌধুরীর অভিনয় বেশ ভাল হইয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্র দাস ও কেশবচন্দ্র মুখার্জ্জির গানগুলিও উপভোগ্য।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৬ই জুন—

বাঙলা সরকার ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত সম্পাদিত বাঙলা মাসিক পত্র "চলার পথের" উপর ১ হাজার টাকা জামীন তলব করিয়াছেন।

মণিপুরে দরবারের বন্দিনী নাগারাণী গুইদালোর মুক্তির দাবীর উত্তরে মণিপুর ষ্টেট দরবারের সভাপতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড নিখিল মণিপুরী মহাসভার নিকট লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন যে, যতই আন্দোলন হউক না কেন গুইদালোকে কোনমতেই মুক্তি দেওয়া হইবে না।

হায়দরাবাদ রাজ্যে আর্য সত্যাগ্রহের ৬ষ্ঠ ডিক্টেটর মহাশয় সুদ্ধ ৭৬৩ জন সত্যাগ্রহী সহ ধৃত হইয়াছেন।

শ্রীহট্টের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দে বালাগঞ্জ জালিয়াতী মামলার রায় দিয়াছেন। জুরিগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দায়রা জজ সাব-রেজিষ্ট্রার আবদুল আলী, আরাদপুরের জমিদার ইয়ার বকত চৌধুরী ও তাঁহার কর্ম্মচারী ত্রৈলোক্য দত্ত এই তিনজনের প্রত্যেককে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই মামলা আরম্ভ হইবার পর সাদুল্লা মন্ত্রিসভা কর্তৃক ইহা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সাব-কমিটি ভুয়া সদস্য সংগ্রহের প্রতিকারার্থে সাত দফা সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সাব-কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কংগ্রেস সদস্যদের নামের স্থায়ী তালিকা রাখিতে হইবে। কংগ্রেসী প্রদেশ তালিকা হইতে ব্রহ্মদেশ বাদ যাইবে। একাদিক্রমে তিন বৎসর সদস্য তালিকায় নাম না থাকিলে কেহ ডেলিগেট হইতে পারিবে না। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য স্থায়ী নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ন্যূনতম সভ্যসংখ্যা নির্দ্ধারিত থাকিবে। জেলা ও প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের বিরোধসমূহের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র জেলা ও প্রাদেশিক বিচারমণ্ডলী নিযুক্ত হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ব্বাচনের জন্য বৃহত্তর প্রদেশসমূহে স্থানীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইবে, বার আনা সদস্য এইভাবেই নির্ব্বাচিত হইবে এবং মাত্র সিকি ভাগ প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকা হইতে মুন্সীগঞ্জে গমন করেন। মুন্সীগঞ্জে এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বসু ঐ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের আবশ্যকতা বিশদভাবে বিবৃত করেন।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে, ডাচেস অব কেণ্ট ও লেডী গোর্ট আলিংটন যখন রাত্রিতে সিনেমা দেখিতে যাইতেছিলেন, তখন একটি গুলীর আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কেহই আহত হন নাই। ডাচেসের বাড়ীর সন্নিকটে একটি বন্দুকও কুড়াইয়া পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে একজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

জাপানীরা লিউলিনচান শহর অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে।

নেটালের বিদ্যালয়সমূহে শ্বেত জাতির ছেলে মেয়ে হইতে অশ্বেত জাতির ছেলে-মেয়েকে পৃথক রাখার জন্য নূতন আইনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

৭ই জুন—

গত ২রা জুন সিরাজগঞ্জ শহরের বালিয়া পট্টীর কালী বাড়ীতে গরুর হাড় নিক্ষেপ করিয়া মন্দির অপবিত্র করা হয়। স্থানীয় হিন্দুগণের এক সভায় এই গর্হিত কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে।

বাঙলা সরকার মিঃ মুজাফর আহম্মদের প্রণীত "কৃষকের কথা" নামক পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

নেপালের মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন জে এম ঘোষের কন্যা কুমারী বাণী ঘোষ মাত্র ১০ বৎসর ৭ মাস বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিঃ নাসিম আলী ও বিচারপতি মিঃ রাওকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চ বসুমতী মামলা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বিচারপতিগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বলিতে মন্ত্রিমণ্ডলীকে বুঝায় নাই। সেইহেতু মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের সমালোচনা করিলে উহা রাজদ্রোহজনক অপরাধ হয় না। স্মরণ থাকিতে পারে যে, দৈনিক বসুমতীর ১২ই নবেম্বর ও ১৮ই ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে "কালীপূজা ও রমজান" এবং নান্যপন্থা শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের তীব্র সমালোচনা থাকায় "দৈনিক বসুমতীর" সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে দুইটি রাজদ্রোহ মামলা আনীত হয়। একটি মামলার বিচার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অপরটি অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে চলিতে থাকে এবং মন্ত্রীদের কার্য্যের নিন্দা রাজদ্রোহ হয় কি না—এই প্রশ্ন সম্পর্কে উভয় বিচারকই হাইকোর্টের অভিমত প্রার্থনা করেন।

সম্প্রতি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে 'নোট' প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সোভিয়েট সরকারের মুখপত্র "প্রভদা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সোভিয়েট সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সকে "পারস্পরিক সহযোগিতায় কার্যকরী চুক্তি সম্পাদনার" কথা এবং লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ইস্থোনিয়া এই তিনটি ক্ষুদ্র বাল্টিক রাষ্ট্রকে প্রতিশ্রুতি দানের কথা জানাইয়াছেন। "প্রভদায়" উল্লিখিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট সরকারের এই প্রস্তাব ইউরোপের আত্মরক্ষার জন্য সংগঠন কার্য্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় "ন্যূনতম সর্ত্ত।"

কমন্স সভায় রাশিয়া সম্পর্কে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, পররাষ্ট্রীয় দপ্তরের জনৈক প্রতিনিধি রাশিয়া যাইতেছেন।

৮ই জুন—

ঢাকা পল্লী মুসলিম কেন্দ্রে খাঁ বাহাদুর আবদুল হাফিজের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে আসন শূন্য

হইয়াছে, তাহাতে উপনির্ব্বাচন সম্পর্কে গতকল্য রাত্রিতে টঙ্গী ফেরি ঘাটে লীগ প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের ফলে আবদুল জব্বার নামক জনৈক মুসলমান রিভলবারের গুলীতে নিহত হইয়াছে।

ডিগবয়ে আসাম অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কলিকাতায় শ্রীযুত মানবেন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়।

ডিগবয় ধর্ম্মঘটি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এবং এই সঙ্কট সময়ে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে জনসাধারণকে আহবান করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সালিশ বোর্ড স্বীকার করিয়া লইতে রাজী না হওয়ায় সভায় আসাম অয়েল কোম্পানীর আচরণের নিন্দা করা হয় এবং শ্রমিকদের উপর গুলী চালনার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

শ্রমিক নেতা শ্রীযুত দয়ারাম রাজদ্রোহকর বক্তৃতা করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্দ্ধায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বাঙলার অষ্টম আর্য্য সত্যাগ্রহী দল কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদ যাত্রা করিয়াছে।

রাজসাহীর দায়রা জজের বিচারে সন্তোষ প্রামাণিক নামক জনৈক মুসলমান মাতৃহত্যার অভিযোগ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৯ই জুন—

সীমান্তের মুণ্ডিয়াবাদে প্রজা উৎখাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অপরাধে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেবের পুত্র মিঃ ওবেদুল্লা খাঁ ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, সীমান্তের প্রধান মন্ত্রীর আদেশ অনুসারেই তাঁহার পুত্র মিঃ ওবেদুল্লাকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ও আসামের প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতির মধ্যে যে আলোচনা গত ১লা জুন স্থগিত থাকে, অদ্য কলিকাতায় তাহা পুনরায় আরম্ভ হয়। কিন্তু এই দিনকার আলোচনায়ও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডিগবয়ের শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে আসাম অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার, শ্রমিক প্রতিনিধির বক্তব্য ও আসামের প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ-সচিবের মতামত শ্রবণ করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ছাপড়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতি এই বিষয়ে উভয় পক্ষকে আরও বিবেচনা করিতে সময় দিয়াছেন।

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট যে নূতন ডিক্রী জারী করিয়াছেন, তদনুযায়ী ফরাসী ভারতে এক নূতন আদেশ জারী করা হইয়াছে, অতঃপর ফ্রান্সের বিধান অনুযায়ী, ফরাসী উপনিবেশ গুলিতে বৈদেশিক সঙ্ঘাদি গঠন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষ হইবে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র-সচিবের এবং উপনিবেশসমূহে উপনিবেশ বিভাগের বড়কর্ত্তার অনুমতি না লইয়া কোন সঙ্ঘাদি গঠন করা চলিবে না।

১০ই জুন—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলীর প্রথম সভার অধিবেশন হয়। সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি কর্ম্ম-পরিষদ গঠিত হয়। মেদিনীপুর ও অন্যান্য সমুদ্রোপকূল স্থানসমূহে গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিজেদের ব্যবহার্থ লবণ প্রস্তুত করাতে গবর্ণমেণ্ট বাধা দেওয়ায় সভায় উহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্ম্মঘটের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী শঙ্কা প্রকাশ করিয়া এই সম্পর্কে আসাম অয়েল কোম্পানীর অনমনীয় আচরণের নিন্দা করেন এবং ন্যায়সঙ্গত ও সন্তোষজনক সর্ত্তে উক্ত বিরোধের অবসান ঘটাইতে কোম্পানীর উপর চাপ দিবার জন্য কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করেন। সভায় বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি গঠনের দিনগুলি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়।

"এডভ্যান্স"এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা এবং একাউণ্ট্যাণ্ট মণীন্দ্রকুমার দের বিরুদ্ধে হিসাব জাল করিবার অভিযোগে যে মামলা রুজু হইয়াছিল, অদ্য এডিশন্যাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে কে বিশ্বাসের এজলাসে উহার উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ২০শে জুন পর্য্যন্ত রায় দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কংগ্রেসী চেয়ারম্যান মিঃ আর এন বসু চেয়ারম্যানের পদত্যাগ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কংগ্রেস দল বোর্ডের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়া যাওয়ায় তিনি মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে কংগ্রেস কর্ম্ম তালিকাকে কার্যকরী করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১১ই জুন—

বোম্বাইয়ে নরেন্দ্রমণ্ডলের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের নূতন সর্ত্তাবলীর খসড়া ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের নূতন সর্ত্তাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের অধিপতিদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবে মন্ত্রীদের পৃথক বৈঠক হইতেছে। অধিপতিগণ ও তাঁহাদের মন্ত্রীদের মিলিত বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে।

মহীশূরে পুনরায় সত্যাগ্রহ সুরু হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট কংগ্রেসের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহার সর্ত্তাবলী লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছে এবং সম্প্রতি তাঁহারা উক্ত চুক্তি একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। উহার ফলে ষ্টেট কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহীশূরে পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

কোলাপুর রাজ্যের প্রজা পরিষদের প্রতিনিধি বোম্বাইয়ে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোলাপুরের প্রজা আন্দোলনের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং জানান যে, কর্তৃপক্ষ সেখানে দমননীতি অনুসরণ করিতেছেন। প্রকাশ, পণ্ডিতজী তাহাদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন যে, গান্ধীজীর নীতির ফলে দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন সাময়িকভাবে দুর্ব্বল হইতেছে। পণ্ডিতজী না কি ইহাতে বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর অভিমত অনুযায়ী প্রজাদের দাবী ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত হইবে না।

মিঃ ডি ভ্যালেরা ডাবলিনে অবস্থানকারী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দূতকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। প্রকাশ, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক মেজর ফ্রাঙ্ক রায়ানকে মুক্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত মিঃ ডিভ্যালেরা ফ্রাঙ্কোর দূতকে মানিয়া লইবেন না।

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিগানে জাপ-কর্তৃপক্ষ গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে লেফটেন্যাণ্ট কুপারকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দিয়াছেন। উক্ত অভিযোগে ধৃত কর্ণেল সিনায়ারকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। অপর এক সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ-কর্তৃপক্ষ টিয়েনৎসিনের বৃটিশ ও ফরাসী এলাকার সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র ছিন্ন করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১২ই জুন—

নেটাল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ভবানী দয়াল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার আইনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন।
বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ডিব্রুগড়ে এক ভীষণ মোটরবাস দুর্ঘটনার ফলে ৬ ব্যক্তি

গতকল্য হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হয়। সভায় "ফরোয়ার্ড ব্লক" সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার হার সম্পর্কে বাঙলার মন্ত্রিসভা এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য বাঙলা সরকারের এক ইস্তাহারে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। বাঙলা সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এই প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করিয়া মুসলমান ও অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ করা হইবে। সরাসরি নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের শতকরা ৫০টি চাকুরী সংরক্ষিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট আরও স্থির করিয়াছেন যে, যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়, তাহা হইলে সরাসরি নিয়োগের শতকরা ১৫টি চাকুরী তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত হইবে। তবে এইরূপ নিয়োগের সংখ্যা অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সরাসরি নিয়োগের শতকরা ৩০এর অধিক হইতে পারিবে না।

বোম্বাইয়ে দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিবৃন্দ ও মন্ত্রিগণের যুক্ত সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের নূতন সর্ত্তাবলী (যাহা কয়েক মাস পূর্ব্বে রাজন্যবর্গের নিকট বিবেচনার জন্য দেওয়া হইয়াছিল) প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী স্যার আকবর হায়দারির সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে যে কমিটি বসিয়াছিল, তাহাতে সাব্যস্ত হয় যে, সন্ধি, আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য ও অর্থ সম্পর্কিত ক্ষমতাবলী বিষয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তনামা সন্তোষজনক নহে। সুতরাং এই তিনটি বিষয়ে খসড়া সংস্কার করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছিল। হায়দারি কমিটির এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া রাজন্যবর্গ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

খাঁ বাহাদুর আবদুল হাফীজের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ঢাকা কেন্দ্রীয় পল্লী নির্ব্বাচন মণ্ডলীতে যে আসন শূন্য হইয়াছিল, উক্ত শূন্য আসনে মুসলিম লীগ মনোনীত নির্ব্বাচন-প্রার্থী সৈয়দ সাহেব আলম গতকল্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রেঙ্গুন হইতে আগত ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের "সেঞ্চুরিয়ান" নামক পশ্চিমগামী একখানি উড়োজাহাজ অদ্য অপরাহ্নে বালী ব্রীজের নিকটে গঙ্গায় অবতরণ করিবার সময় এক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। উড়োজাহাজটি জলে নামিবার সময় উহার সম্মুখের দিক জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়; কেবলমাত্র উহার পশ্চাৎ দিকের কিছুটা জলের উপর ভাসমান ছিল। উহাতে ৯ জন যাত্রী ও ৫ জন কর্ম্মচারী ছিল এবং উহা ডাক বহন করিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রাণহানি হয় নাই। একখানি মোটর লঞ্চের সাহায্যে উহাদিগকে বালী ব্রীজের নিকটস্থ বিমান পোর্টে লইয়া আসা হয় এবং তথা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুইজন ব্যতীত ইহাদের সকলের (৭ জন) আঘাত সামান্য।
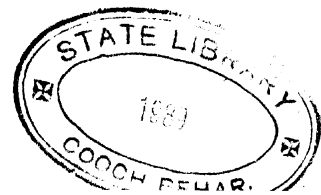
৬ষ্ঠ বর্ষ। শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৬, Saturday, 1st July, 1939 [৩৩ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কঃ পন্থা—

বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আছে সবই, স্বদেশের সমস্যা আছে, বিদেশের সমস্যা আছে, যুদ্ধের সমস্যা আছে, শান্তির সমস্যা আছে; কিন্তু সমস্যার সমাধান কি, পথটা কি, সেই সম্বন্ধেই কোন কথা নাই। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন, দুই বৎসরের অধিক কাল হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধোঁকার টাটি খাড়া করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের মূলনীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাঁহারা ভারতের জনমতকে দলিত করিয়াই চলিতেছেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য ভারতের কৃষকের ও ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থের অপহ্নব ঘটাইতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে মূল শক্তি রহিয়াছে। সে শক্তির ব্যত্যয় ঘটান যাইতেছে না এবং সেজন্য কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কর্ম্মতালিকা কোন কাজে আসিতেছে না। দেশের অবস্থা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমরা যদি দ্রুতপদে সম্মুখে না অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে অধঃপতন অনিবার্য্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র শাসন-প্রণালী ভারতের ঘাড়ে যখন চাপাইবেন তখন আমরা লড়াইতে নামিব, এমন ধারণা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জগতের অবস্থা যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ দেশের লোকের স্বার্থ এবং জগতের শান্তি ও স্বাধীনতার দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতাকে আজ বড় করিয়া দেখিতে হইবে এবং সেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সমস্যার বিশ্লেষণে কোন ত্রুটি নাই, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ভারতের এই যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, তজ্জন্য উপায়টা অবলম্বন করিতে হইবে কি? রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলেন নাই। তিনি কেবল কংগ্রেসের ভিতরকার ঐক্যের উপরই জোর দিয়াছেন এবং কংগ্রেসের ভিতরে যে ভেদ-বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে তজ্জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের কথা এই যে, এই ভেদ-বিরোধ যদি সত্যই তেমন গুরুতর রকমে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিয়া থাকে তবে দক্ষিণ-পন্থীদের দ্বিধাজড়িত নীতির জন্যই উহা আসিয়াছে এবং তাঁহারা সাহসের সঙ্গে বৃহত্তর আদর্শের ভিত্তিতে একটা সংগ্রামমূলক কর্ম্মপন্থা দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করিতেছেন না বলিয়াই সেই সব তুচ্ছ জিনিষগুলো বড় হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণায় মানুষ তুচ্ছ স্বার্থের বিচার ভুলিয়া যায়—মানবতার একটা মহান উচ্ছ্বাস তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলোকে উপরের স্তরে তুলিয়া লয়। দক্ষিণ-পন্থীর দল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মোহজালকে ছিন্ন করিয়া যদি পূর্ণ স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রেরণাকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের ভিতরের খুঁটিনাটি লইয়া এই যে সব বিবাদ বিতর্ক—সেই মুহূর্ত্তে সে সবের নিরসন হইয়া যাইবে। এ সব আপদ অবীর্য্যেরই ফল; বৃহত্তর সাধনার বীর্য্যবত্তার স্পর্শে এই সব অবীর্য্য এবং অবসাদ নষ্ট হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পুঁটুলীর দিকে নজর রাখিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সত্যকার যে শক্তি তাহা জাগান সম্ভব হইতে পারে না। দক্ষিণপন্থীরা যদি সাহসের সঙ্গে আগাইয়া আসিতে পারেন, তবে দেশের নব জাগ্রত শক্তির সঙ্গে তাঁহারা যোগ রাখিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন; নহিলে নিজেদের জোটবাঁধা দলের হাতের মুঠার মধ্যে কংগ্রেসকে রাখিয়া মন্ত্রিগিরির মধুর টানে যদি তাঁহারা মশগুল থাকেন, কংগ্রেসকে তাঁহারা ধ্বংসের দিকেই লইয়া যাইবেন। বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের পক্ষে বাঙলার

অন্তরের কথা হইল ইহাই। দুই নৌকায় পা দিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না।

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সিদ্ধান্ত—

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। সমিতি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির যে সব প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হয়, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সে সব সংশোধন, প্রস্তাবই সমর্থন করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দক্ষিণপন্থী দলেরই জোর, সুতরাং মনস্কামনা তাঁহাদেরই সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, কোন কংগ্রেস সদস্যের নাম তিন মাস তালিকাভুক্ত থাকিলেই তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন, এই নিয়ম বদলাইয়া তিন মাসের বদলে ১ বৎসর করা হইয়াছে। বামপন্থিগণ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন, কিন্তু বিরুদ্ধতা টিকে নাই। আর একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেটি আরও গুরুতর রকমের। প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিলেন সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং। প্রস্তাবটি এই যে, শাসনকার্য্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও মন্ত্রীদের মধ্যে কোন মতভেদ ঘটিলে পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নীতি-নিয়ন্ত্রণে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এ পর্য্যন্ত যে অধিকারটুকু ছিল, তাহাও নষ্ট করা হইল। বামপন্থীরা এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেন। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত এইরূপ ধারণা করিয়া লওয়া ভুল। সিমলায় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিবের মোড়লীতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা দরবার করিবার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পরিচালিত বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া নানা রকম আদেশ জারী করা হইতেছে। ১৪৪ ধারা, ১০৭ ধারা এবং ১০৮ ধারা জারীর ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছে। এ দুর্ব্বোর যে এই ফল আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বলিয়া বুঝাইবার পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল। ক্ষমতা হাতে পাইলেই সে ক্ষমতা সংযত করিবার শক্তি যদি জনসাধারণের হাতে না থাকে, তবে শাসনাধিকারী-দের দ্বারা তাহার অপপ্রয়োগ ঘটেই। কংগ্রেসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া দেশসেবার জন্যই কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব লইয়াছিলেন; কিন্তু এখন মন্ত্রিপদের ক্ষমতার মোহে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল নিজেদের স্বাঙ্গোপাঙ্গ ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের লইয়া এক একটা দল গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং কংগ্রেস কমিটির ক্ষমতা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ চালানই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রভাবিত কংগ্রেসীদের প্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে এবং আইন সভার বাহিরে কংগ্রেসের কাজ লোপ পাইয়াছে। বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিকে পিষ্ট করা হইতেছে। নিয়মতান্ত্রিকতার অনুকূল আবহাওয়া দেশের উপর আনিয়া ফেলা হইতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামের ভাব দমাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রস্তাবে মন্ত্রীদের সেই মনোভীষ্ট পরিপূর্ণ হইবার পক্ষে সকল বাধা দূর হইবে। জনগণের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্ব কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নীতির উপর একটুও থাকিবে না; জনমতের বিরুদ্ধতার ভয় হইতে তাঁহারা বিমুক্ত হইয়া নিয়মতান্ত্রিকতা-ঘেঁসা নীতি অবাধে চালাইবেন—ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নালিশের ভয়, সে ভয় তো নাই-ই—। ওয়ার্কিং কমিটি তো নিজেদের নীতিরই অনুমোদক। এই সব প্রস্তাব হইতেই বুঝা যায় যে, দক্ষিণী দলের কর্ত্তারা কংগ্রেসকে ষোল আনা নিজেদের জোটবাঁধা দলের হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া যাইবারই চেষ্টা করিতেছেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানস্বরূপে কংগ্রেসের শক্তি ইহাতে কতটা ক্ষুণ্ণ হইল তাঁহারা সে বিবেচনা করিতেছেন না। তাঁহারা কড়া হুকুম দিতেছেন কংগ্রেসের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইহা দরকার। যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, তোমরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাও। ডিক্টেটরী এই মনোবৃত্তি ক্রমেই দক্ষিণী দলের মধ্যে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। সুখের বিষয় এই-যে, এই ডিক্টেটরী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যের ভাব ক্রমেই প্রসার হইতেছে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বামপন্থীদের এই সংহতি শক্তি বৃদ্ধির সূচনার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বামপন্থীদের এই সংহতি শক্তিই—নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইবে, আমরা এই আশা করিতেছি।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট—

নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী—আসামের ডিগবয়ের তেলের খনির সাহেব মালিকরা হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে যে ৬৩জন শ্রমিক—তাহাদের আমরা কিছুতেই পুনরায় কাজে বহাল করিব না; শুধু তাহাই নয়, যে-সব নূতন লোককে আমরা কাজে নিযুক্ত করিয়াছি, ধর্ম্মঘটকারীদের কাজ দিবার জন্য আমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বরখাস্ত করিব না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্র-প্রসাদ আপোষের যে প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, কোম্পানীর বড় সাহেবেরা তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা যখন সাহেব লোক, তখন কালা আদমীদের কংগ্রেসকে ত মানেনেই না, আসাম সরকারকেও তাঁহারা থোড়াই কেয়ার করেন, এই তাঁহাদের মনের ভাব। সাহেব লোকদের চটাইয়া যাহারা ধর্ম্মঘট করিবার সাহস পায়, অভাব অভিযোগের কারণ তাহাদের যতই থাকুক না কেন, সেই সব কালা কুলীদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবেন, ইহাই তাঁহাদের সংকল্প। কিন্তু এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য এবং কংগ্রেস নীতি-প্রভাবিত আসাম সরকারেরই-বা কর্ত্তব্য কি? কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া এই নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন যে,—কোন ব্যবসায়ী কোম্পানী যত বৃহৎ এবং ক্ষমতাশালী হউক না কেন, জনমতের প্রভাব অথবা সরকারী কর্ত্তৃত্বকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই। কোম্পানী যদি কংগ্রেস সভাপতির প্রদত্ত প্রস্তাব মানিতে

অসম্মত হন, তাহা হইলে আসাম সরকারের কর্ত্তব্য হইবে সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্ত কোম্পানীকে মানিতে বাধ্য করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা এবং কোম্পানীকে সোজাসুজি এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, বর্ত্তমান ইজারা মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে তাহাদিগকে পুনরায় ইজারা না দিতে, তাঁহাদের বর্ত্তমান মতিগতিতে আসাম সরকারকে বাধ্য করিবে।' আমরা জানি না, ওয়ার্কিং কমিটির এই নির্দ্দেশ দানের পরও কোম্পানীর সাহেবদের চৈতন্য হইবে কি না এবং তাঁহারা দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন আপোষ-নিষ্পত্তিতে রাজী হইবেন কি না। যদি এখনও তাঁহারা রাজী না হন, এবং নিজেদের গাত্রচর্ম্মের কৌলিন্যের জোরে গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আসাম সরকারের কর্ত্তব্য হইবে দৃঢ় নীতিতে অগ্রসর হওয়া—আইন করিয়া শ্রমিকদের বেতন, খাটুনীর সময় এবং কাজের সর্ত্ত সব বাঁধিয়া দেওয়া। সে ক্ষেত্রে আসাম সরকারের কর্ত্তব্য হইবে শ্রমিকদের উপর কোম্পানী যে-সব অবিচার করিয়াছে, আইন করিয়া সে-সব অবিচারের নিরসন করা এবং কোম্পানীর সাহেব লোকদিগকে সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাইয়া দেওয়া যে, আসাম সরকারের সেই সব সর্ত্ত এবং ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে তাঁহাদের যদি মর্জ্জি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত হইবে মানে মানে অন্যত্র নিজেদের পথ দেখা। বিদেশী পুঁজিপন্থীদের শোষণ-ভূমিস্বরূপে ভারতবর্ষ চিরকাল পড়িয়া থাকিবে না। দেশের লোকের স্বার্থ এখানে আগে, দেশের নিরন্ন দরিদ্র বুভুক্ষুর স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে আগে। সাহেব লোকদের তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যদি গোসা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া কিছু বেশী পরিমাণ গোস্ত গিলিতে পারেন।

সিংহলে ভারত বিদ্বেষ—

ব্রহ্ম হইতে ভারতের সম্পর্ক দিন দিন বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, ব্রহ্মীদের কাছে আজ ভারতবাসীরা পর। ব্রহ্মে ইংরেজের বসবাসের সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক বিধান নাই, কিন্তু বৈষম্য খাড়া করা হইয়াছে ভারতবাসীদের বেলায়। ইংরেজ যে সুবিধা ব্রহ্মে পাইবে, ভারতবাসীরা তাহা পাইবে না। সাত সমুদ্র তের নদী পারের ইংরেজ ব্রহ্মবাসীদের কাছে আপন; কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে যে ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিগত সম্পর্ক, সেই ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে অবাঞ্ছিত—তাহাদের বিরুদ্ধে বিতাড়ন-ব্যবস্থা। সিংহলেও সমান সমস্যা দেখা দিয়াছে। মহাবংশ, দীপ-বংশের নজীর তুলিয়া ঐতিহাসিকেরা দেখাইবেন সিংহলীদের সঙ্গে ভারতবাসীদের সম্পর্ক কেমন সুনিবিড়। সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার যোগ এখনও আছে, সেই বিজয়সিংহ-সঙ্ঘমিত্রার যুগ হইতে; কিন্তু এ সব কথা বলিলে হইবে কি? সিংহল সরকার দিন-মজুরীতে নিযুক্ত ভারতীয়দিগকে সিংহল হইতে বিতাড়নের প্রস্তাব করিয়াছেন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ-ক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বিষয়ের সম্পর্কে সিংহল কলম্বো যাত্রা করিতেছেন। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স জয়তিলক পণ্ডিত জওহরলালকে ইতিমধ্যে আমন্ত্রণও করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই আলোচনা সুফলপ্রসূ হইবে। কাঁচামাল ও অন্নবস্ত্রের জন্য সিংহলকে ভারতের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদের অন্তরে একটা বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করা সিংহল সরকারের নিজেদের স্বার্থের পক্ষেও যে সুবিধাজনক হইবে না, এই সত্যটি তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং একথাও বুঝাইয়া দিত হইবে, সিংহল সরকার যদি ভারতীয় বিতাড়ন নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতবাসী-দিগকে প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—পড়িয়া পড়িয়া যাহার যখন মর্জ্জি হইবে তাহার লাথি খাইবার জন্যই ভারতবাসীদের জন্ম হয় নাই।

কংগ্রেস ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন—

মহাত্মা গান্ধী "হরিজন" পত্রে বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—'তারপর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা ধরুন। আমার এখনও এই বিশ্বাস যে, কংগ্রেস এই সম্পর্কে যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আমরা তৎপ্রতি সুবিচার করিতে পারি নাই। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গবর্ণরেরা মোটের উপর ভালভাবেই চলিয়াছেন। মন্ত্রীদের কাজে তাঁহাদের দিক হইতে বাধা খুব কমই আসিয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীদের কাজে কখনও কখনও উদ্বেগজনক বাধা আসিয়াছে কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতেই। কংগ্রেসকর্ম্মীরা যখন মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত তখন সেক্ষেত্রে জনসাধারণের হিংসাত্মক বিক্ষোভ না ঘটা উচিত ছিল। মন্ত্রীদের উৎসাহ উদ্যমের অনেকখানিই বিরোধী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের দাবীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই কাটিয়া গিয়াছে। মন্ত্রীরা যদি অপ্রিয় হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করা যাইতে পারে; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে কাজ চালাইতে দেওয়া হইয়াছে, অথচ কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে তাঁহারা কার্য্যকরভাবে সহযোগিতা লাভ করেন নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রতি এই যে দরদ গান্ধীজী এবং তাঁহাদের দলের পক্ষে তাহা নূতন নহে এবং এক্ষেত্রে যত দোষ দেশের লোকদেরই যে, একথাও আমরা নূতন শুনিতেছি না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রীরা কংগ্রেসের নীতির দিক হইতে এই দায়িত্ব যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেভাবে তাঁহারা দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন কতটুকু। গবর্ণরের নিকট হইতে বাধা আসিবার কথাটা বড় নহে; কারণ সে বাধা আসা না আসা মন্ত্রীদের কাজের উপর নির্ভর করে। মন্ত্রীরা যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করার সেই মূল নীতি আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যই যদি তাঁহারা অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে বাধা কেমন আসিত না আসিত, তখন তাহা বুঝা যাইত। মন্ত্রীরা সে পথে যান নাই; তাঁহারা কার্য্যত আমলাতান্ত্রিক নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। শান্তির নামে, আইন রক্ষার নামে গণ-আন্দোলনকে দাবাইতে কসুর তাঁহারা করেন নাই। জনগণের অধিকারকে সঙ্কোচ তাঁহারা করিয়াছেন,

কৃষক, শ্রমিকদিগকে যথারীতি দমন পীড়নও করিয়াছেন এবং তাহাদের আন্দোলন দমাইতে গুলী পর্য্যন্তও চালাইয়াছেন। এই মনোবৃত্তির ফলেই জনগণের তরফ হইতে বাধা আসিয়াছে—জনসাধারণ চায় ব্যাপক অধিকার, বৃহত্তর স্বাধীনতা—মন্ত্রীরা সেই দাবী মিটাইতে অক্ষম হইয়াছেন এবং আমলাতন্ত্রের নীতির সঙ্গে আপোষ করিবার মতি-গতিতেই প্রভাবিত হইয়াছেন। কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট হইতে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফ হইতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাজে কেন বাধা আসিয়াছে, তাহার কারণ এই দিক হইতে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় মন্ত্রীদের হাতে যে অধিকার আছে, সেই অধিকারকেই বড় করিয়া দেখিতে হইলে এই যে সংকট ইহা দেখা দিবেই; কারণ দেশের লোক ঐ সব অধিকারের গন্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়িতে প্রস্তুত নয়। তাহারা ঐগুলি তুচ্ছ মনে করে। মন্ত্রিত্বের মোহ মন্ত্রিত্বগত অধিকারের এই তুচ্ছতাকে যখন বিস্মৃত করাইয়াছে তখনই মন্ত্রীরা দেশের অন্তরের যোগসূত্র হইতে ছিন্ন হইয়াছেন; ইহাই স্বাভাবিক। দোষ দেশের লোকের নয়—দোষ হইল মন্ত্রীগিরির মোহের। দেশের জনগণের শক্তিতে কংগ্রেসকে বলবত্তর করিতে হইলে কংগ্রেসের এই মন্ত্রিত্ব-সম্পর্কিত নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। মন্ত্রীগিরি লইয়া পুতু পুতু করা চলিবে না। সোজা কথা হইল ইহাই।

স্যার আশুতোষের জন্ম-বার্ষিকী—

২৯শে জুন, বৃহস্পতিবার স্যার আশুতোষের জন্ম-বার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, ৪ঠা জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলিবে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে বাঙলার সর্ব্বত্র এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করি। স্যার আশুতোষ ছিলেন পুরুষ সিংহ। বাঙ্গালী জাতির জন্য, বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙলা ভাষার জন্য তাঁহার যে অবদান—তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সাধনা এবং বঙ্গ ভাষার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার মহান্ ব্রতের উদ্‌যাপনেই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। মহদাদর্শের একনিষ্ঠ সাধনায় আত্মদাতার অমরত্বের তিনি অধিকারী। বাঙলায় আজ সংকটের যুগ ঘনাইয়া আসিয়াছে, বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পবিত্র অঙ্গনেও আজ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উপদ্রবের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্যার আশুতোষ সিংহ-বিক্রমে সংগ্রাম করিয়া জীবনপাত করিয়াছেন,—আজ উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে এবং বাণীর বরপুত্রদিগকে বিদ্যা-নিকেতন হইতে বিতাড়িত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার মধ্যযুগীয় অনাচার সেখানে সম্প্রসারিত করিতে। এই সংকটে স্যার আশুতোষের স্মৃতি জাতির শুভ সংকল্প-শক্তিকে দৃঢ় করিয়া তুলুক। অনাচারের বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে সংগ্রাম করিবার অনুপ্রেরণা লাভ করুক দেশবাসী স্যার আশুতোষের শক্তিময় জীবন-সাধনা হইতে। আমরা বাঙলার এই বিজয়ী বঙ্গ সন্তানের স্মৃতিতে আজ আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সিরাজদ্দৌল্লা স্মৃতি-দিবস—

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি-দিবস প্রতিপালনের আয়োজন হইয়াছে। সিরাজদ্দৌল্লা যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই আদর্শটি যদি এতদ্দ্বারা দেশের লোকের নিকট উদ্দীপ্ত হয়, তবে খুবই আশার কথা। কিন্তু আসল কথা হইতেছে সেই আদর্শের উপলব্ধি। সিরাজদ্দৌল্লার আদর্শ কি ছিল? তাঁহার আদর্শ ছিল বাঙলা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন তখনই সত্য হইবে, যখন আমাদের আন্তরিকতা থাকিবে স্বদেশের সেই বৃহত্তর স্বার্থের দিকে এবং একথাও সত্য যে, সেই আদর্শের অনুভূতি যতটা তীব্র হইবে আমাদের মধ্যে ততটা দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া যাঁহারা বিদেশীর স্বার্থেরই সেবা করিতেছে, তাঁহাদের কার্য্যে আমাদের জাগিবে বিক্ষোভ। সিরাজদ্দৌল্লার যে আদর্শ—সে আদর্শের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই—হিন্দুর বিচার, মুসলমানের বিচার নাই, আছে বাঙালীর বৃহত্তর অধিকারেরই বিচার। হিন্দুর বিচার, মুসলমানের বিচার—সাম্প্রদায়িকতার এই দৃষ্টি যেখানে, সেখানেই বিদেশীর বৃহত্তর স্বার্থের পরিপুষ্টি। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতির পূজা করিবার অধিকারী শুধু তাঁহারাই, যাঁহাদের অন্তরে দেশের স্বার্থের এই বৃহত্তর অনুভূতিটি আছে এবং আছে বিদেশীয় প্রভুত্বকে প্রতিহত করিবার জন্য সত্যকার প্রেরণা। নিজেদের পদ এবং মান ও মর্য্যাদার সুবিধায় যাঁহারা দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া সাম্প্রদায়িক বুজরুকী চালাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা মীরজাফর এবং উমিচাঁদেরই উত্তর-সাধক। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে—আছে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের, কিন্তু নাই মীরজাফর-উমিচাঁদের নীতির অনুসরণকারী সেই সব ভণ্ডদের। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি-পূজা যেন এই সব ভণ্ড স্বার্থসন্ধী এবং স্বার্থসেবীদের সংস্পর্শে কলঙ্কিত না হয়, দেশবাসীকে আমরা এই দিকে অবহিত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা সতর্ক থাকিতে বলিতেছি,—যাঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য সিরাজদ্দৌল্লার মহিমার কথা আওড়ায় অথচ সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্রের উপর বিদেশীরা যে গ্লানি আরোপ করিয়া রাখিয়াছে—গড়িয়া রাখিয়াছে সিরাজদ্দৌল্লার মিথ্যা গ্লানির মর্ম্মর রূপ—সেই অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভকে অপসারিত করিবার কথা তুলিলেই কাঁচুমাচু করিয়া— এখন নয় এখন নয়, এই ধরণের কথা বলে— তাহাদেরই সম্বন্ধে। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতি-পূজার পবিত্র প্রাঙ্গণে এই সব ভণ্ড এবং দুর্ব্বলচেতা পরভাগ্যোপজীবীদের প্রবেশাধিকার যেন না থাকে। সাম্প্রদায়িকতার দোহাই তুলিয়া যাহারা দেশের স্বাধীনতার অন্তরায় ঘটাইতেছে

—বাঙলার যে শেষ নবাব স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ত ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি পূজার অধিকার তাহাদের নাই, মীরজাফর বা উমিচাঁদই তাহাদের আরাধ্য দেবতা।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ—

গত ২৭শে জুন পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রয়াণ-শত-বার্ষিকী পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজা রণজিৎ সিংহের জীবন প্রকৃত বীরের জীবন এবং উৎসাহসমন্বিত কর্ম্মীর জীবন। অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন মহারাজা রণজিৎ সিংহ। ভারতের ইতিহাসে যাঁহারা ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার রাজনীতিক চাতুর্য্য এবং রণনীতিজ্ঞতা একদিন ভারতে প্রতিষ্ঠাপর ব্রিটিশ জাতিকেও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবাসীদের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম রণনীতি-কুশল পুরুষের উদ্ভব অসম্ভব নয়; ইংরেজ তখনই প্রথম সশঙ্ক অন্তরে এই সত্যকে উপলব্ধি করে। মহারাজা রণজিৎ সিংহের যখন আবির্ভাব ঘটে, তখন ভারত-ভূমির বুকের উপর দিয়া একটা অরাজকতার ঝঞ্ঝা যেন বহিয়া যাইতেছিল সর্ব্বত্র অব্যবস্থিত অবস্থা। একের পতন, অপরের অভ্যুত্থান। মোগল শক্তির পতনে দেশের বুকে বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সন্ধুক্ষিত হইতেছিল। জ্যোতিষ্কের মত ভারতের আকাশে জাগিয়া উঠিলেন মহারাজা রণজিৎ সিং। ৪০ বৎসরের মধ্যে তিনি পাঞ্জাবে একটি সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজত্ব গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বাহুবীর্য্যে পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপদ্রবকারী দলও শান্ত হইল। আফগানিস্থান পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য সীমা বিস্তৃত হইল। ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া পাঞ্জাবে একদিন এই যে সৃষ্টি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, সুব্যবস্থিত কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে তাহা স্থায়ী আকার ধরিতে পারে নাই, ইহা সত্য। এবং ইহাও ঠিক যে, ভারতে এই বস্তুটিরও অভাব স্মরণাতীতকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এখানে ব্যক্তি জাগিয়াছে; কিন্তু জাতি জাগে নাই। এখানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হইয়াছে—না হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতি সে সংগ্রামের পশ্চাতে ব্যাপক রকম অনুপ্রেরণা জাগায় নাই। মহারাজা রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে যে বীরত্ব, যে প্রতিভা এবং যে দেশানুরাগের একদিন বিকাশ ঘটিয়াছিল, আজ তাহাকে জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত করিতে হইবে; জাগাইতে হইবে সমষ্টি-চেতনা। বীরের স্মৃতি-পূজা করিতে গিয়া যদি এই সত্যটি আমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই সে পূজা সার্থক হইবে। সাধকের সাধনা সার্থক হইয়া উঠিবে শত বর্ষ পরে।

বঙ্গে মোস্লেম রাজত্ব—

খোলাখুলি মনের ভাব প্রকাশ করা আমরা ভাল মনে করি, সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোয়ালিশন দলের নেতা খান বাহাদুর আব্দুল করীম এইরূপ খোলাখুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—বাঙলা দেশে মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হইল আমাদের লক্ষ্য। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও আমাদের হাতেই প্রভুত্ব ছিল, ঐ বৎসর ইংরেজেরা মুসলমানদের নিকট হইতে বাঙলা দেশের শাসনভার 'দেওয়ানী' লয়। শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহারা সেই অধিকার দেশের লোকের হাতে ফিরাইয়া দিতেছেন। মুসলমানদের ইহা ন্যায্য প্রাপ্য, এবং তখন যেমন অবস্থা ছিল, সেই অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই স্বাভাবিক।" খুব সুন্দর কথা; কিন্তু ইংরেজেরা কেন এই অধিকার ফিরাইয়া দিতেছে—খান বাহাদুর তাহা তলাইয়া দেখিয়াছেন কি, যাহারা সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে দেশের অধিকারের বিচার করিয়াছেন, তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, ইংরেজদের এই অধিকার ফিরাইয়া দেওয়ার মূলে অপর সম্প্রদায়ের অবদান কতখানি এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ভিতর দিয়া যে সাম্প্রদায়িকতার পত্তন করা হইতেছে, তাহাতে কলিকাতার অধিবাসীদের অধিকারের ন্যায্যতা কতটা রক্ষিত হইতেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়া-পুত্তলিকারূপে দেশের স্বাধীনতার মূলীভূত সংহতি শক্তিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে দেশের লোকের অধিকারের কথা শোভা পায় না। তাঁহারা এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থমূলক ভেদনীতির দ্বারা বিদেশীর প্রভুত্বকেই কায়েম করিতেছেন। মীরজাফর এবং উমিচাঁদ প্রকৃতপক্ষে ইহাই করিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের যাঁহারা জিগীর তুলিতেছেন, খোঁজ লইলে দেখা যাইবে সেখানে কাজ করিতেছে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত হীন স্বার্থই, অন্য কিছু নয়।

ভবিষ্য-সংগ্রাম—

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিতেছেন, স্বাধীনতা যাহাতে লাভ হয়, অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে; ওদিকে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কংগ্রেসকর্ম্মী এবং কংগ্রেস পন্থীদের সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন,—"আমরা যখন শাসনযন্ত্র হাতে পাইয়াছি, এখন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই আমাদের উচিত। কোন মডারেট নেতা একথা বলিলে শোভা পাইত, একথা মডারেট ধরণেরই কথা; কিন্তু যে কংগ্রেস শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করিবে, এমন সংকল্পই গ্রহণ করিয়াছে, সেই কংগ্রেসী নেতার মুখে কংগ্রেসের বৈঠকে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের সরকারীভাবে এমন কথা বলিতে এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই; কিন্তু দক্ষিণ-পন্থী দলের যে নীতি এতদিন সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিতেছিল, আজ অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মহাত্মা গান্ধী দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ ভারতেও সত্যাগ্রহ করিবার নীতি এখন ক্রমেই তিনি যেরূপ অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক স্তরে

তুলিয়েছেন, তাহাতে মর্ত্যদেহধারীর পক্ষে এই মরজগতে সত্যাগ্রহ করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি। দেহাতীত অবস্থায় উঠিয়া ত্রৈগুণ্যের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অনাবিল অহিংস জ্যোতির বিকাশে অপরের অন্তরের বৈষম্য-বিরোধের ভাবকে দূর করিয়া তাহাকে নিজের সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা—সত্যাগ্রহের এই যে সাধনা, এমন সাধনার ব্যবহারিক রাজনীতিক দিক হইতে সিদ্ধি মহাত্মাজীর নিজের পরিচালনাতে ভারতে কোন দিনই হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীনতার উপাসনা হইবে কোন পথে—কোন্ নীতি ধরিয়া দেশের লোকেরা অগ্রসর হইবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্তুষ্টি সাধনের নীতিই কি সেই নীতি, তাহাদের সঙ্গে আপোষের নীতিই একমাত্র নীতি, নিজেদের অসহায়ত্বকে একান্ত করিয়া তুলিয়া পরমুখাপেক্ষী [illegible] তার পরেই কি দেশ [illegible] [illegible] আনুকূল্যের নামে সর্বসাধারণের অধিকারহীন দেশকে ছাড়িয়া ফেলিবে, প্রশ্ন হইতেছে ইহাই। কোন পথে গতি, দেশকে তাহা ঠিক করিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের মোহে ভুলিলে চলিবে না।

আইন রক্ষায় আগ্রহ—

রাজদ্রোহ আইনের প্রয়োগে সংবাদপত্রের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং তাহার ফলে আইনের কি ভাবে অপ-প্রয়োগ ঘটিতেছে, পর পর কয়েকটি মামলায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন বিধিটি শাসকদের হাতে একটি জবর হাতিয়ার। জনআন্দোলনকে দলন দমন করিবার পক্ষে এমন চোস্ত হাতিয়ার খুব কমই আছে। এই অস্ত্রের অপ-প্রয়োগ কি আন্দাজ উদ্ভট রকমে হইতেছে—একটি মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ধর্ম্মদাস চৌধুরী বর্দ্ধমানের একজন কর্ম্মী। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হয় যে, তিনি ভয় দেখাইয়া সরকারী খাজনা না দিতে বাধ্য করিয়াছেন। অনেকেই জানেন, বর্দ্ধমানের ক্যানাল করের হার কমাইবার জন্য প্রজাদের পক্ষ হইতে একটি আন্দোলন চলিতেছে। ৫৲ টাকা হইতে ঐ কর কমাইয়া দেড় টাকা করা হউক, প্রজা পক্ষের এই দাবী। বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে এই মামলায় ধর্ম্মদাসবাবু ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, বর্দ্ধমানের দায়রা আদালতে আপীলের ফলেও ঐ দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। হাইকোর্টে এই মামলার আপীলে বিচারপতিগণ তাঁহাকে বেকসুর মুক্তি দান করিয়াছেন। বিচারপতি মিঃ হেণ্ডারসন এবং খোন্দকার তাঁহাদের রায়ে বলেন যে, আসামীর পক্ষে প্রজাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করার কোন কারণ ছিল না, সরকারী হারে খাজনা দিবার ইচ্ছা যে কোন প্রজারই ছিল না, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আসামীর যে উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া মামলা আনা হয় তাহা এই যে, তিনি প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যদি খাজনা দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সে কাজের ফল ভাল হইবে না। এই কথায় এমন কিছু প্রতিপন্ন হয় না যে, আসামী লোককে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করিবার যেখানে অভিযোগ সেখানে কথা এবং কাজের ভাষ্য করিতে আটকায় না। দুই দফা আপীলেও দণ্ড বহাল থাকায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শান্তি ও আইন রক্ষার এই অতিরিক্ত আগ্রহে এক ভদ্রলোকের অদৃষ্টে এই যে অযথা বিড়ম্বনা ঘটিল, ইহার জন্য দায়ী কে? বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? ক্ষমতায় মদান্ধ হইয়া তাঁহারা এমন ব্যাপারকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের তেমন কার্য্যে জনগণের অন্তরের প্রতিক্রিয়ার আঘাত একদিন তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িবেই।

দেশের কথা—ভারতের পণ্য

তামাক (TOBACCO)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(১)

ভারতবর্ষে তামাকের ব্যবহার খুব বেশীদিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই লোকের নেশা ধরিয়াছে, অর্থাৎ ভারতে যত তামাক চাষ হয়, তাহার অধিকাংশই ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া ফেলে; বাজার ধরিয়াছে, অর্থাৎ ইহার প্রচুর রপ্তানি আছে, এবং চেষ্টা করিলে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

ব্যবহারের ইতিহাস

কতকাল হইতে আমেরিকার জঙ্গলে তামাক জন্মিত এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা তাহা ব্যবহার করিত, আজ আর তাহা বলা সম্ভব নহে; তবে অধুনা সভ্য জগতের পরিচয় ১৪৯২ সালে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে। কলম্বসের সঙ্গীরা আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তামাকের ব্যবহার দেখিতে পায় এবং তথা হইতে ইউরোপে তামাক আনীত হয়। আন্দাজ ১৫১৮ সালে Oviedo স্পেনে তামাকের পাতা লইয়া আসেন; পরে ১৫৩৯ সালে Hernandez ইউরোপে তামাকের বীজ লইয়া আসেন। Jean Nicot পর্তুগালে ফরাসী রাজদূত ছিলেন এবং ১৫৬০ সাল নাগাদ তিনি সেখানে তামাকের চাষ দেখিতে পান এবং স্বদেশে বীজ পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নাম হইতে তামাকের নাম "নিকোটিন" হইয়াছে।

হারিয়ট (Thomas Hariot) ইংলণ্ডে প্রথম তামাক আমদানী করেন; কিন্তু ড্রেক (Sir Francis Drake) ফিরিয়া আসিবার পর, ড্রেক, র‍্যালে (Sir Walter Raleigh) প্রভৃতি কর্তৃক তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে নূতন কর, পাদ্রীদের আপত্তি, নানারূপে আন্দোলন দ্বারা তামাকের প্রসার রোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হয় না, ক্রমে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে তামাকের ব্যবহার অতি দ্রুতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ভারতে আমদানী

পর্তুগীজদের কৃপায় ভারতে এই বিষের প্রথম আমদানী হইয়াছিল। আন্দাজ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তামাকের চাষ সুরু হয়; ক্রমে তাহা ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তামাক সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভাল না হওয়ায় উত্তর ভারত পর্যন্ত তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হইতে প্রায় একশত বৎসর লাগিয়া যায়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে তামাক চাষ আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য স্থানেও চাষের নানারূপ পরীক্ষা চলিতে থাকে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে গুর্জরের চাষ সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ভারতবর্ষে তামাক চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া সম্ভব।

বলা বাহুল্য এ দেশেও তামাকের বিপক্ষতা করিবার লোকের অভাব ছিল না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া তামাকের ব্যবহার প্রসারলাভ করে। আকবর বাদসাহের জন্য যখন "ছিলিম" প্রস্তুত হইয়া আসে তখন তাঁহার বৈদ্য বন্ধুরা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। পরে জাহাঙ্গীর ১৬১৭ সালে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও নানারূপে তামাক ব্যবহার কি ভাবে ছাইয়া পড়িয়াছে, তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

পরিচয়

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ৪১ রকম তামাকের গাছের সন্ধান মিলিয়াছে, অবশ্য চাষের জন্য সকলগুলি কাজে লাগে না। ইহার মধ্যে অধিকাংশগুলিই আমেরিকায় জন্মিয়াছে; ফিলিপাইন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন জাতির তামাক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যোপযোগী তামাকের কথা ধরিতে গেলে তিন চার রকমের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তামাকের আবার বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় চুরুট, চুরুটের নানা অংশ, সিগারেটের মশলা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল, হাওয়া, মাটি প্রভৃতি নানা কারণের জন্য তামাকের নানা গুণের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

তামাকে একপ্রকার বায়বী তৈল এবং নিকোটিন নামে উত্তেজক পদার্থ থাকে। এই দুইটি কারণে তামাকের আদর। সাধারণত সকল পাতাতেই এই দুই বস্তু কম বেশী পরিমাণে থাকে এবং তাহা হইতেই তামাকের নিজস্ব গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ছাড়া বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এই গুণ এবং গন্ধ হ্রাস বৃদ্ধি এবং মৃদু উগ্র করিতে পারা যায়, এবং যাহারা এই কার্যে দক্ষ তাহাদের তামাক অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চাষ

ভারতবর্ষে প্রধানত শ্রাবণ ভাদ্র এমন কি আশ্বিন মাস পর্যন্ত তামাকের "বীজতলা" প্রস্তুত করিয়া প্রায় একমাসকাল গাছগুলিকে বড় হইতে দেওয়া হয়। তামাকের বীজ আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ইহার আবরণ অত্যন্ত কঠিন। অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধার জন্য দানাগুলি কোনওখসখসে স্থানে কিম্বা বালি বা গুঁড়া পাথরের সহিত ঘষিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। গাছগুলি স্থানান্তরে রোপণ করিবার উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ, তিন হইতে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হইলে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আন্দাজ দুই হাত অন্তর পুঁতিয়া দেয়। গাছের মূলে মাটি দিয়া আইল করিয়া জল দিবার সুযোগ করিয়া দেয়। গাছগুলি বড় হইলে এবং "ফুল আসিবার" উপযুক্ত হইলে উপর হইতে কুঁড়ি এবং নিম্নভাগের পুরাতন পাতাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। যাহাতে ডাল পাতা ভাঙ্গার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় গাছের রস বাহির হইয়া না যায়, সে কারণে চাষীরা ভাঙ্গা স্থানগুলিকে মিহি চূর্ণ মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেয়। যখন পাতাগুলি স্বল্প হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে এবং স্পর্শে সামান্য আঠালভাব পাওয়া যায়, তখন

উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া কেহ কেহ সমস্ত গাছটি কাটিয়া ফেলে, কেহ কেহ বা পাতাগুলি বৃক্ষকাণ্ড হইতে তুলিয়া লয়।

তামাক প্রস্তুত প্রণালী

তামাক পাতা তুলিয়া লইলেই সকলপ্রকার ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না; নানা প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার সুগন্ধ ও ধূমের স্বাদ লাভ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে curing বলে এবং তামাক ব্যবসায়ীর পক্ষে এই জ্ঞান সম্যক্ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

তামাক পাতা বা গাছ উঠাইয়া আনিয়া একটি প্রশস্ত ঘরে বাঁশ প্রভৃতি কোনও কাঠের আলনার মত ঝুলাইয়া শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। প্রথম দুই তিন দিন আলনার ন্যায় ব্যবহৃত কাঠগুলি আন্দাজ তিন ফুট অন্তর রাখিয়া দেয় এবং যতদিন না মধ্যের ডাঁটা এবং শিরগুলি শুষ্ক হইয়া উঠে, ততদিন ঐভাবে রাখে। পারিপার্শ্বিক বায়ুর তাপের উপর এই কাল ১৫ দিন হইতে আরও অধিক সময় লাগিয়া যায়। শীঘ্র শুকাইয়া না গেলে পাতার রঙ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

তখন এই পাতাগুলি স্থানে স্থানে স্তূপাকারে জমাইয়া গাঁজাইতে বা মাতাইতে (fermentation) দেওয়া হয়। এই সময় পাতাগুলি পুরোপুরিভাবে চেপ্টান করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে খুলিলে পাতাগুলি সমানভাবেই পাওয়া যায়।

পাতাগুলির মধ্যে রস গাঁজিয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন; কেবল তামাক পাতার গন্ধ অত্যন্ত কটু; সুতরাং এই প্রক্রিয়া দ্বারা তামাক 'প্রস্তুত' করিতে না পারিলে, কোনই কাজে লাগার সম্ভাবনা নাই। অনেকে মনে করেন, তামাকপাতা স্তূপাকারে থাকার ফলে যে অত্যধিক তাপ সৃষ্টি হয়, তাহাতে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া পাতার মধ্যে যে নূতন রস সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাই তামাকের নূতন গন্ধের কারণ। এই ক্রিয়া অনেকে মনে করেন বিশেষ জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ তামাকপাতার স্বতন্ত্র জীবাণু আছে।

কোনও কোনও স্থানে আগুনের তাপ দ্বারা পাতা শুষ্ক করিবার পদ্ধতি আছে। কয়েকদিন ঘরে থাকিবার পর পাতাগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে ঐ ঘরে আগুন প্রজ্বলিত করিয়া তাহার উপরে ধীরে ধীরে পাতাগুলি শুকাইয়া লইবার চেষ্টা করে। এইভাবে শুষ্ক করিতে কয়দিন কাটিয়া যায়। কেহ কেহ কয়দিন বাদে পুনরায় আগুনের তাপে শুষ্ক করিয়া লয়। তাহার পর ইহাকে গুণানুযায়ী নানা ভাগে বিভক্ত করে। এই অবস্থায় গাদা বা ঢিপিগুলি বাতাস চলাচলের সুযোগপূর্ণ এবং তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও আর্দ্রতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী ঘরে আরও কয়দিন থাকিবার পর ব্যবহারের উপযোগী গুণ ও গন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। কোনও কোনও তামাকপাতা দুই তিন বৎসর পর্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিবার পর, বিশেষ সমাদরের সহিত বিক্রীত ও ক্রীত হইয়া থাকে।

ব্যবহারের উপযোগী তামাক প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী দেওয়া হইল, প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা ভেদে তাহার নানা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এ বিষয়েতে পারদর্শী, তাঁহাদের পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ তত বেশী।

ভারতের চাষ

তামাক এখন ভারতের এক প্রয়োজনীয় পণ্য, এখন রপ্তানির পরিমাণ তিন কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। জগতে যত দেশে তামাক জন্মায় কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতের স্থান প্রথম ছিল। এখন আমেরিকা প্রথম; ভারতের স্থান তৃতীয়।

করদরাজ্য লইয়া ভারতবর্ষে ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে; ফলনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১১ হাজার টন।

করদরাজ্যের জমির পরিমাণ আন্দাজ দেড় লক্ষ একর, মোট জমির শতকরা ১০·৯ আর ফলনের বেলায় ২৯ হাজার টন, বা শতকরা ৫·৬ ভাগ। জমির তুলনায় বৃটিশ ভারতে ফলনের পরিমাণ খুব বেশী, অর্থাৎ শতকরা ৮৯·১ ভাগ জমিতে (মোট পরিমাণ ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার একর) ৯৪·৪% (মোট পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮২ হাজার টন) তামাক পাতা পাওয়া যায়। পরিশিষ্ট (ক) হইতে সমস্ত অংক স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী তামাক চাষ হয়; অর্থাৎ মোট জমির সিকির সামান্য কম এবং মোট ফলনের সিকির বেশী। ফলনের পরিমাণ হিসাবে, বাঙলার পরে মদ্র, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, পঞ্চনদ প্রভৃতি স্থান। করদরাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ প্রধান, বরদা এবং মহীশূরের স্থান তাহার পরে।

বাঙলাদেশের মধ্যে জেলা হিসাবে রংপুরের স্থান সর্বপ্রধান; এমন কি সমস্ত তামাক চাষের জমির তিন ভাগের দুই ভাগ একা রংপুরে আছে; অর্থাৎ তিন লক্ষ তেরো হাজার একরের মধ্যে রংপুরের অংশ দুই লক্ষ একরের বেশী। পরে পরে জলপাইগুড়ি (মোট ২৯ হাজার একর), ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রাজসাহী, ত্রিপুরা প্রভৃতির স্থান।

মদ্রের ২ লক্ষ ৯৭ হাজার একরের মধ্যে গণ্টুর জেলাতেই আন্দাজ অর্ধেক জমি পড়ে, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর। পরেই ভিজাগপটম (মাত্র ৫০ হাজার একর); তাহার পর কইম্বাটুর, পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, ত্রিচিনপল্লী, সালেম, অনন্তপুর, কৃষ্ণা, কর্নুল প্রভৃতি জেলার স্থান.

মদ্র ছাড়িয়া দিলে জমির পরিমাণ হিসাবে বিহারের এবং ফলনের অনুপাত হিসাবে যুক্তপ্রদেশের স্থান পড়ে। বিহারে তিনটি জেলা, যথা পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর ও দ্বারবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

যুক্তপ্রদেশে ফরাক্কাবাদ, এটা মণিপুরী, বুলন্দসহর, মীরাট, বুলন্দসহর প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য চাষ হয়।

বোম্বাই প্রদেশে কয়রা, বেলগাঁ, সেতারা, আহম্মদাবাদ, সোলাপুর, বিজাপুর এবং পঞ্চনদে সিয়ালকোট, জলন্দর, লায়ালপুর, গুজরাট, ঝঙ্গ জেলায় কম বেশ চাষ হইয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যান্য সকল প্রদেশের আরও প্রায় সকল জেলায় কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা ব্যতীত অন্য লাভ নাই।

পৃথিবীর তামাক চাষ

পূর্বেই বলিয়াছি, আমেরিকায় চাষ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক; তাহার পরই চীনের স্থান। সারা পৃথিবীতে আন্দাজ ২৭ লক্ষ টন তামাক জন্মে; তন্মধ্যে আমেরিকায় প্রায় সাত লক্ষ টন হয়। তাহার পর চীন, এবং তাহার পর ভারতবর্ষের স্থান। রুশ, ব্রেজিল, গ্রীস, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশেও তামাক চাষ হয়, অবশ্য ইহার মধ্যে রুশের স্থান প্রধান; (পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য)।

আমেরিকার মধ্যে মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, কেণ্টকী, উত্তর ক্যারোলিনা, উইসকনসিন, ওহিও প্রভৃতি স্থানে প্রচুর চাষ হয়; কিউবার হাভানা ও সাণ্টাক্লারা, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, জাভা এবং ফিলিপাইনের মধ্যে কাগেয়ান পাতা প্রসিদ্ধ।

পরিশিষ্ট (ক)

মোট জমি	১২,৮৮,০০০	একর	
বৃটিশ ভারত	১১,৪৭,০০০	„	৮৯·১%
করদ রাজ্য	১,৪১,০০০	„	১০·৯%
মোটফলন	৫,১১,০০০	টন	
বৃটিশ ভারত	৪,৮২,০০০	„	৯৪·৪%
করদ রাজ্য	২৯,০০০	„	৫·৪%

ব্রিটিশ ভারত—

	জমি হাজার একর	শতকরা অংশ	ফলন হাজার টন	শতকরা অংশ
বাঙলা	৩১৩	২৪·৩	১৩০	২৫·৪
মদ্র	২৯৪	২২·৮	১২৫	২৪·৪
যুক্তপ্রদেশ	৮৮	৬·৯	৬৩	১২·৩
বিহার	১২৫	৯·৭	৫২	১০·১
বোম্বাই	১৭০	১৩·২	৪৪	৮·৬
পঞ্চনদ	৭১	৫·৫	২৯	৫·৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৬	২·০১	১৬	৩·১
উড়িষ্যা	৩৮	২·৫	১১	২·১
আসাম	১২	—	৬	১.১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১:	—	৪	—
সিন্ধু	৫	-	২	—
করদ রাজ্য—				
হায়দরাবাদ	৬৩	৪·৮	১৭	৩ ৫
বরদা	৫৩	৪·১	৯	১ ৭
মহীশূর	২৪	২·০	৩	·৬
খয়েরপুর	১	—	—	—

পরিশিষ্ট (খ)

পৃথিবীর চাষ ও দেশ হিসাবে ফলন
ও প্রত্যেকের শতকরা অংশ

মোট ফলন—২৭,০০,০০০ টন

	হাজার টন	শতকরা অংশ
আমেরিকা	৬,৭৬	২৪·৯
চীন	৬,২৮	২৩·১
ভারতবর্ষ	৫,১১	১৫·১
রুশ গণতন্ত্র	২,৭৩	১০·০
ব্রেজিল	৯২	৩·৩
জাপান	৬৪	২·৩
গ্রীস	৬৩	২·৩
তুরস্ক	৬২	২·২
নেদারল্যান্ড	৫৩	১·৯
ব্রহ্ম	৪৬	১·৭
ফ্রান্স	৩৬	১·৩
কানাডা	৩২	১·১
কিউবা	৩২	১·১
ফিলিপাইন	৩১·৮	১·১
বুলগেরিয়া	৩১	১·১
কোরিয়া	২৬	·৯

ইটালী, পোল্যান্ড. যুগশ্লাভিয়া, জার্মানী ইত্যাদি

ঠাকুমার চিঠি

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

ঠাকুমা লিখেছে চিঠি কাশীধাম হ'তে
সেখানে লাগে না ভাল এতদিন থেকে
বাড়ীঘর ছেলেপুলে সব ফেলে রেখে
এত দূরে থাকা নাহি যায় কোন মতে।

মণ্টু কি হাঁটিতে পারে? সোনা কথা কয়।
মালতীর ছেলেটির সেরেছে ত জ্বর?
মাঘেই মিনুর বিয়ে? লিখো তার বর
কোথায় কি কাজ করে। পাল মহাশয়
সুদের টাকার কথা কি করিতে চান?

রায়েদের মামলার লিখো ফলাফল
আমরা পেয়েছি কিনা পুবের বাগান
না অযথা টাকাগুলো শুধু হ'ল জল?

দাঁড়াইয়া জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়
ঠাকুমার মন তবু গৃহ পানে ধায়;
গৃহের দেবতাগুলি ভিড় করে মনে
বিশ্বের দেবতা রন তারি এক কোণে।

কথা ও কাজ

আজ চারিদিকে অশান্তির ঘনঘটা। ইউরোপ ও এশিয়া উভয়ত্রই শান্তির খেলা চলিয়াছে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া। কিন্তু ইদানীং শান্তির নামে যে সব খেলা চলিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আক্ষেপভরে বলিয়াছেন, গত এক বৎসরের মধ্যে তিনি মোটেই সোয়াস্তি পান নাই, বিশ্রাম পাওয়া ত দূরের কথা! ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী যে নীতির পোষকতা করিতেছেন, তাহাতে এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হইয়াই পারে না। গত মার্চ্চ মাসে জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে ব্রিটেন কতকটা বিচলিত হইয়া উঠে, আর জার্ম্মানীকে বাধা দিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে জোট বাঁধিবার চেষ্টা করে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন মিত্রতা স্থাপিত হয়। রুমানিয়া, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি বলকান রাষ্ট্রগুলিকে বিপৎকালে রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক হালচাল যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইহাতে খুশী হইতে পারেন নাই। জার্ম্মানী-ইটালীকে সার্থকভাবে বাধা দিতে হইলে রুশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন-ফ্রান্সের সকলের আগে আপোষ চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। বিলাতে জনমতের ঝড় উঠিল। রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিবন্ধ হইবার প্রতিশ্রুতি চাহিল সরকারের নিকট হইতে। ঝানু লয়েড জর্জ্জ ও চার্চ্চিলও পার্লামেণ্ট কক্ষে জনমত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ সরকার জনমত উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে অলোচনা চালাইতে সুরু করিলেন।

আজ তিন মাসেও এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিল না। আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বে-সরকারী মুখপত্র "টাইমস্" পত্রিকা ইতিমধ্যে রুশিয়ার প্রতি খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার অন্যায় আবদার নাকি ব্রিটিশরা মানিয়া চলিবে না। ব্রিটিশ-সোভিয়েট আলোচনা যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, বিরুদ্ধ পক্ষও সে সম্বন্ধে নাকি খুবই আশান্বিত। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বক্তৃতাদি হইতেও বুঝা গিয়াছে যে, এই আলোচনা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত নিচাল হইয়া যাইবে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ও পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হালিফাক্সের দুইটি বক্তৃতার কথা অগে উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি মিঃ চেম্বারলেন কার্ডিফে আর একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই সব কয়টি বক্তৃতা একত্র করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, ইহাদের ভিতরে জার্ম্মানীকে সন্তুষ্ট করিবার ও কোলে টানিয়া লইবার একটা [illegible] বাসনা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছি, যাহার প্রতিরোধের জন্য আটঘাট বাঁধিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছি তাহাকে তোয়াজ করা কেন, তাহার প্রতি উদারতা বা সৌজন্য প্রকাশের ভণ্ডামি কেন? আদতে কিন্তু ইহাকে ভণ্ডামি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে তিনমাস যাবৎ আলোচনা চালাইয়া হয়ত কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত ইহা ফলপ্রদ নাও হইতে পারে। কাজেই নূতন বন্ধু যখন মিলিল না তখন পুরাতন শত্রুকে (না বন্ধু?) আর ক্ষেপাইয়া লাভ কি? সম্প্রতি আর একটি কথা প্রকাশ পাইয়াছে। জপানী দূত নাকি মস্কো হইতে টোকিওতে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ সোভিয়েট সর্ত্ত করিতে চাহিতেছে যে, প্রান্তিক প্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের সঙ্গে তাহাদের লড়িতে হইবে, কিন্তু সে সর্ত্তে ব্রিটিশরা রাজী হইবে না! ভাল কথা বটে! চীনে জাপেনর হাতে এতটা নাজেহাল হইয়াও কি তাহার জাপান-প্রীতি ঘুচে নাই? একথা তো সহসা বিশ্বাস করা যায় না। তবে পূর্ব্ব ইতিহাস কিন্তু আমাদিগকে যেন ইহাই বলিয়া দিতে চায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ এক পক্ষ যখন কার্য্য দ্বারা প্রতিনিয়ত তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ও পূর্ণ করিয়া লইতেছে, তখন অন্য পক্ষে কেবল কথারই খেলা লক্ষ্য করিতেছি। তথাকথিত ডিমোক্রাসিগুলি আজ কথার ছলনায় সকলকে ভুলাইতে চাহিতেছে। বেশী পুরাতন কথা বলিব না। গত এক বৎসরের ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই আপনারা ইহা সম্যক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কথায় বলে, "শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভিজে না!" যত শক্তিমানই হও না কেন, মূলে যদি কর্ম্মৈষণা না থাকে তাহা হইলে যত রকম ফন্দি আঁটিতেই চেষ্টা কর সবই বেফাঁস হইয়া যাইবে। ব্রিটিশেরও হইয়াছে আজ তাহাই। সেই মিউনিক চুক্তি হইতে সুরু করিয়া ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা পর্য্যন্ত একই ইতিহাসের পুনরুক্তি লক্ষ্য করিতেছি। শুধু কথা, আর কথা। চেকোশ্লোভাকিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া অকালে আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে, অন্যেরা যথা, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, গ্রীস, তুরস্ক তাহার কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে সে কতটা অগ্রসর হইবে, সে সম্বন্ধে তাহাদের মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে। বিশেষত যখন সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে কোন একটা সার্থক চুক্তি করিতে ব্রিটেন গাফিলতি করিতেছে। সে অপরকে রক্ষা করিবে তাহাই-বা বুঝা যায় কি করিয়া? প্রান্তিক প্রাচ্যে আজ ব্রিটিশদের দুর্গতির একশেষ হইতেছে। তিয়েনসিন নামক ক্ষুদ্র শহরটি জাপানীরা শুধু অবরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা রসদাদি প্রেরণে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। ইংরেজরা শহরের চৌহদ্দীর বাহিরে যাইবার বা ভিতরে আসিবার সময় জাপানী সান্ত্রীদের হস্তে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহাদিগকে না কি উলঙ্গ করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে! জাপানীরা যখন এইরূপ করিতে থাকে, তখন চীনাদের ইহা দেখাইবার জন্য সারিবন্দিভাবে দাঁড় করাইয়া রাখে! এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, এমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ, জাপানীদের নিকট তাহারাও নিতান্ত "ভিজা বিড়াল"; কাজেই চীনারা যেন তাহাদের (জাপানীদের) সমঝাইয়া চলে। ইংরেজদিগকে বাহিরে গেলে জাপানীদের নিকট হইতে চিরকুট (Identification Card) লইয়াও যাইতে হয়! শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় ইহা দেখাইতে হয়! আজ দুই সপ্তাহ হইল, রোজই এইরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু ব্রিটিশ সিংহ কি করিতেছেন? ইংলণ্ডের লোকেরা খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের যেন ভীমরতি উপস্থিত। পার্লামেণ্ট কক্ষে কখনও নরম কখনও গরম বিবৃতি

ব্যঙ্গ চিত্র। হিটলার মুসোলিনী প্রমুখ ডিক্টেটরগণ নিজেদের মধ্যে একরূপ কথা বলেন। 'শান্তিপ্রিয়' চেম্বারলেনের সঙ্গে যখন আলোচনা করেন তখন অন্য কথা বলেন। মুখে কিন্তু সকলেই 'শান্তি', 'শান্তি' বলিয়া থাকেন

দিয়া সদস্যগণকে তথা জনমতকে ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, আর জাপানী সরকারকে অনবরত তাহাদের মতামত, প্রতিবাদ ইত্যাদি জানান হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। আজ যে শুধু তিয়েনসিনে ব্রিটিশরা অপদস্থ হইতেছে ও ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে তাহা নয়, প্রকাশ, জাপানের এবম্বিধ কার্য্যে ব্রিটিশের প্রাচ্য-নীতির মূলেও কুঠারাঘাত করা হইতেছে! কিন্তু ইহার প্রতীকার পন্থা কি বাৎলানো হইতেছে? জাপান সম্প্রতি দক্ষিণ চীনের সোয়াতো বন্দর দখল করিয়াছে। সেখান হইতেও ইংরেজ-ফরাসীদের নাকি বিতাড়িত হইবার আশঙ্কা। এবার যেন ইহাদের কতকটা চেতনা হইয়াছে। প্রকাশ, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রাচ্য নৌবাহিনীর বড়কর্ত্তাদের মধ্যে আপৎ-কালে কি ভাবে প্রাচ্যের স্বার্থ সামরিকভাবে বজায় রাখিতে হইবে সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাও তো আলোচনা! কাজেই, যখন নিজ স্বার্থ হানির বিশেষ সম্ভাবনায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কোন সার্থক পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না তখন অপরকে রক্ষা করিবেন কিরূপে?

এক পক্ষে যখন এই প্রকার কথার কচায়ন তখন অন্য পক্ষে কি দেখিতে পাই? হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিবার পরই দুই তিন দিনের মধ্যে মেমেলও দখল করিয়া লইলেন! ডানজিগও যে তাঁহার কাম্য একথা প্রকাশ করিতেও তিনি কসুর করিলেন না। পোল্যান্ড কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে রাজী হইল না। ব্রিটিশ দেখিল, জার্ম্মানী আরও যদি কিছু দখল করিয়া বসে, তাহা পোল্যান্ডের সহযোগেই হউক বা বিপক্ষতায়ই হউক, তাহা হইলে ইউরোপে শক্তিসাম্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। কাজেই তখন পোল্যান্ডের সঙ্গে সন্ধিবন্ধ হইল। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি না করিলে খাস ইউরোপে ব্রিটেনের শক্তি প্রকাশের কোনও উপায় থাকিবে না। জনমত এই মর্ম্মে দাবী জানাইবার ফলে যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা সুরু করিয়াছে, কিছু আগে তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এই আলোচনা সুরু হইতে না হইতে মুসোলিনী আলবানিয়া দখল করিয়া লইলেন। অর্থাৎ দক্ষিণ ইউরোপে ব্রিটিশের প্রবেশ-পথ এইরূপে আগলাইয়া রাখা হইল। তাহার পর যুগোশ্লোভিয়া ও ইটালী-জার্ম্মানীর মধ্যে নানারকম চুক্তির ফলে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। হুঙ্গেরিয়াও ইদানীং হিটলার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু দিন আগে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এই পত্রে প্রসঙ্গত তাহার উল্লেখও করিয়াছিলাম যে, জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র-সচিব ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক বলিয়া কহিয়া হিটলারকে সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হইতে রাজী করাইয়াছেন! ইহার বিষয় পরে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে কতকগুলি পরিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে বুঝা যায়, হয়ত বা তলে তলে এইরূপ চেষ্টাও চলিতেছে। গত সপ্তাহে বলিয়াছি, ক্রিভিস্কি নামে একজন ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট সেনাপতি ষ্টালিনের জার্ম্মান-প্রীতির কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ক্রিভিস্কির পরিচয় বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি, বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ষ্টালিন কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেকার অংশ বিশেষ, রিবেনট্রপের উক্তরূপ চেষ্টার সংবাদ এবং ক্রিভিস্কি বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির বর্ণনা প্রভৃতি একসঙ্গে পাঠ করিলে ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে একেবারেই যে অসদ্ভাব বিদ্যমান বা সদ্ভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এমন কথাও তো বলা যায় না।

যাহা হউক, হিটলার বা মুসোলিনী বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। ইংরেজরা যতই না কেন তাঁহাদের তোয়াজ করুক, উভয়েই উভয়কে ভাবী শত্রু বলিয়াই মনে করে। যদি ষ্টালিনের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হইয়াই যায় তাহা হইলে তাঁহারা কি পন্থা অবলম্বন করিবেন আগে হইতেই তাহাও যেন স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে! আপনারা সকলেই জানেন, জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান কিছুকাল যাবৎ সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া চলিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন, আজ যে তিয়েনসিনে জাপানীরা ইংরেজদের এমনভাবে নাজেহাল করিতেছে তাহা এই ত্রয়ীর পরামর্শ অনুসারেই করা হইতেছে। ব্রিটিশ ও ফরাসীরা প্রাচ্যে ব্যাপৃত থাকিলে ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনী তাঁহাদের উদ্দেশ্য সহজে চরিতার্থ করিবেন। কিছুকাল যাবৎ ডানজিগ সম্বন্ধে কথা শোনা যায় নাই। ইদানীং কিন্তু জার্ম্মানীতে আবার ডানজিগ-ভুক্তি আন্দোলন জোর সুরু হইয়াছে। ডক্টর গোয়েবলস্ ডানজিগে গিয়া তথাকার অধিবাসীদের আশ্বাসবাণী দিয়া আসিয়াছেন। মুসোলিনীর নৌবহর ভূমধ্যসাগরে টহল দিতেছে। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের বর্ত্তমানের কার্য্যাবলীর মধ্যে দুই রকম উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যাইতেছে—সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধি হইয়া গেলে তাহারা কি পন্থা অবলম্বন করিবে, এবং যাহাতে ইহাদের মধ্যে কোনরকম সন্ধি না হইতে পারে তাহারও চেষ্টা।

আজ বিশ্ববাসী দেখিতেছে এক পক্ষে শুধু কথা আর কথা এবং অন্য পক্ষে বাস্তবিকই কাজ। সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কার্ডিফে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার বিদ্রূপ করিয়া ডাঃ গোয়েবলস্ বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশগণ বড় কথার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কাজ চাই তাঁহাদের তরফে কার্য্যকর কোন উক্তি না পাইলে শুধু শুধু এরূপ কথার কচায়ন করিয়া লাভ কি? আজ সকলেই বলিতেছে, ব্রিটিশ সিংহের এ কি হইল? "শক্তের ভক্ত নরমের যম"—এই সনাতন কথা সত্য সত্যই কি সে প্রমাণ করিতে থাকিবে? দুর্ব্বল, নিরস্ত্র, পরাধীন লোকদের সায়েস্তা করিতে ব্রিটিশ সিংহ বড়ই কর্ম্মতৎপরতা দেখায়, আর সমানে সমানে যুঝিবার কালে কি সে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকিবে? কিছুকাল আগেও হয়ত একথা বিশ্বাস হইত না, কিন্তু এখন যেন ইহা আর বিশ্বাস না করিয়া পারা যাইতেছে না। ব্রিটিশরা আজ গর্ব্ব করিতেছে, তাহারা জগতে সকলের চেয়ে বিক্রমশালী। কিন্তু তাহাদের বিক্রম সময়কালে কি কথার কচায়নেই পর্য্যবসিত হইবে?

২৭শে জুন, ১৯৩৯।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ও রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষা ও বিরহ

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-কাব্যে এবং বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা বর্ষার যে রূপের দেখা পাই, সে রূপের তুলনা আর কোথাও মেলে না। ক্রমবিকাশকে এত মনোহারীভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে, যা শুধু দুর্লভ নয় সুদুর্লভ। শুধু ক্রমবিকাশ কেন? ক্রমবিকাশের সঙ্গে মিলন-লিপ্সু অন্তরের রূপটিকে অপূর্বভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। বর্ষায় অন্তর সাধারণতই প্রিয় কিংবা প্রিয়ার সান্নিধ্য প্রার্থনা করে—অন্তরের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার রূপটি বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধিকার অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করা হইয়াছে—রবীন্দ্র-কাব্যে এই অন্তর্বেদনা মধুরতরভাবে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। এই অন্তরের রূপের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কাব্য ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া ছুটিয়াছে।

আষাঢ়ে পৃথিবীর রং পরিবর্তিত হইয়া যায়। আকাশ ঘন কালো হইয়া আসে পাতায় পাতায়, গাছে গাছে নূতনের স্পর্শ লাগে। পৃথিবী আর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না, আষাঢ়ের জটার তলায় সূর্য ঢাকা পড়িয়া যায়। পৃথিবীতে আর রৌদ্র থাকে না—ছায়া-শ্যামল হইয়া যায়। এই রূপকে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ দিয়া—কবি ফুটাইয়া তুলিলেন—

"জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁকো এ কোন ছবিরে,
মেঘ-মল্লারে কী বল আমারে
কেমনে কব?

আর ঃ

সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো
শ্বেত-উত্তরী আজ কেন কালো
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়

—গী বৈভা ॥

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে ফুটাইয়া তোলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব—বাস্তবের মধ্যে তিনি অবাস্তবের দেখা পান। তাই যখন তিনি বাস্তবকে ফুটাইয়া তুলিতে চান, কোনখান দিয়া তখন তাঁর সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়া যায়। বিদ্যাপতির কাব্যে আমরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শ পাই না। তাঁহার কবিতা শুধু প্রাণের আবেগে, ভাষা-লালিত্যে, শব্দ-সঞ্চয়নের মনোহারিত্বে ভাবাবেগে, মধুর হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে বাস্তবের সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টার দেখা মেলে না।

আকাশ কালো হইয়াছে। পৃথিবী ছায়া-শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে—আকাশ ও বাতাস আজ একই সুরে বাঁধা। সেই একই সুরে বাঁধা মহামিলনের নিমন্ত্রণের সুর কবির চিত্ত-বীণায় আসিয়া ঘা দিল। কবি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জানালা খুলিয়া বিশ্বের দিকে তাকাইলেন কে আসিতেছে, যে তার তরে আগমনীর সুর বাজিতেছে। দেখিলেন নীল অরণ্যে উতলা কলাপীর প্রাণে কেকার অন্তরে নিখিলের চিত্তে যেন কার আগমনীতে আনন্দের শিহরণ লাগিয়াছে। আকাশ বাতাস যা'র আগমনী গাহিতেছে, কবি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলেন—ঐ সে আসিতেছে—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম-গম্ভীর সরসা
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

বরষা আসিয়া পড়িল—মেঘে ভরা আকাশ ডাকিয়া উঠিল গুরু করিয়া। 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে—'। বৈষ্ণব কবি মেঘের ডাককে শব্দায়িত করিবার চেষ্টা না করিয়া লিখিলেন 'গগন গরজি ঘন ঘোর'—

মেঘ গর্জনের পরেই জল-বর্ষণ। টুপটুপ করিয়া দু'চার ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল পাতার উপর। যে বরষাকে দূর হইতে কবি দেখিয়াছিলেন, কবি এবার তার নূপুরের শিঞ্জন শুনিতে পাইলেন। যে আসিতেছিল, সে আসিয়া পড়িয়াছে—কি চমৎকার—

"পাতার ওপর টুপুর টুপুর নূপুর বাজে কার?"

ক্রমশ ঝম ঝম করিয়া অবিরাম বারিপাত সুরু হইল। এখন শুধু আর পাতায় শব্দ উঠিতেছে না—সমস্ত বিশ্ব জানিয়াছে বরষা আসিয়াছে। এখন পূবে হাওয়া বহিতেছে, পিচ্ছিল নদীর ধার পরিত্যক্ত—ঢেউ উঠিয়া দুকূল ভাঙিয়া পড়িতেছে—নদীর জলের উপর অবিরাম বারিপাত। খেয়া পারাবার আজ বন্ধ—

"পূবে হাওয়া বয় কূলে নেই কেউ
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ
দর দর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠি বাজিরে
খেয়া পারাবার বন্ধ হয়েছে
আজিরে।"

নূতন নূতন মেঘ আসিতে লাগিল। ঘন ঘন মেঘ গর্জন সুরু হইল।

নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
ভৌরি জীউ নিকসত মোর
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।

অর্থাৎ নূতন জলধর চারিদিকে ঝাঁপিয়া আসিল দেখিয়া শ্রীরাধার ভয় করিতেছে, মেঘের ঘন গর্জন শুনিয়া তাঁহার অন্তরে কাঁপন উঠিতেছে।

বর্ষা আসিয়াছে। চারিদিকে সমারোহের মত্ততা। দামিনীর তীব্র ঝলক আকাশের বুক চিরিয়া ঘনগর্জনে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। ঝিল্লী একতারা বাজাইতেছে—ভেক-ধ্বনির অবিশ্রান্ত মেঘমল্লারের সঙ্গে ডাহুকীর ডাক ও কেকার উচ্ছ্বসিত নৃত্য চলিতেছে—আর সমানে চলিতেছে

অবিশ্রান্ত জলবর্ষণ। সেই জলবর্ষণের সীমা নাই, পৃথিবী ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতি এ ছবি অতি মনোহরভাবে আঁকিয়াছেন, কিন্তু এ কবিতার মধ্যেও কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিচয় নাই—কল্পনা-বিলাসের কিছু নাই। শুধু নিছক বাস্তবকে অপরূপ দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

উল্লিখিত দুইটি কবিতায় মর্মবিকাশের ধারা বজায় রাখিয়া অন্তরের বিরহের ভাবকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীরাধা-হৃদয় বিরহ-কাতর হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই এমন দিনে বিরহ অসহ্য হইয়া উঠে—প্রকৃতির সংগে হৃদয়েরও রঙ্ ফিরিয়া যায়। এমন ঝড়-বাদলের কোলাকুলি—আকাশ-বাতাসের মিলন-মত্ততা, ম্লান আলোয় ব্যপ্তদিগন্ত বিরহীকে আরও ব্যথিত করিয়া তুলে। অন্তরের এই রূপ চিরন্তন—শাশ্বত……

রাধা-হৃদয়ে বর্ষার আগমনীতে বিরহের বান ডাকিয়াছে; সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"গগন গরজি ঘন ঘোর, হে সখি কখন আওব প্রভু মোর"। আবার দেখা যায়—"ঈ-ভরা বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" এবং "কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া" বলিয়া তিনি খেদ প্রকাশ করিতেছেন।

ঝিঁঝির ঝিম্ ঝিম্ শব্দ বিরহীর হৃদয়-বীণায় ব্যথার ঝঙ্কার তোলে—'আয় তোর অভিসারিকা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। এ শুধু, জ্ঞান-প্রবণ কবি চিত্তের কথা নহে, অ-জ্ঞান প্রবণ অকবি চিত্তও গুমরাইয়া উঠে। মনে হয় প্রিয়া যদি আজ পাশে থাকিত তাহা হইলে এই ঝড়-বাতাসের মাতামাতি, এই সোঁদা-মাটির গন্ধে ভরা সুমিষ্ট আবহাওয়া, এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি পূর্ণতায় পর্যবসিত হইত না! প্রিয়া পাশে থাকিলে সমাজ, সংসার—এ জীবনের কলরব সব মিথ্যা হইয়া যায়, শুধু থাকে :-

"দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার—"

বস্তুত বরষার সংগে মিলনের নিবিড় সম্বন্ধ। একটি আসিলে অন্যটি আসিয়া পড়ে। বর্ষা আসিলে হৃদয়ের মিলন-লিপ্সু ভাবটি আরও জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাপতি উভয়েই এই অন্তরের মিলন-লিপ্সু ভাবটিকে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—একজনের উদ্দেশ্য বরষাকে অবলম্বন করিয়া বিরহকে রূপ দেওয়া আর একজনের উদ্দেশ্য বিরহকে অবলম্বন করিয়া বরষাকে রূপ দেওয়া। একজনের মধ্যে অফুরন্ত কল্পনা-বিলাস আর একজনের মধ্যে বাস্তবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। একজনের বাস্তবকে অনুভব করা যায়, একজনের বাস্তবকে হাত দিয়া ছুঁইতে পারা যায়।

"গগনে অবঘন মেঘ দারুণ সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর
শ্যাম-নাগর একলে কৈসনে পন্থ হেরই মোর।"

এইখানেও দেখুন বাস্তবকে অতিমাত্রায় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আকাশে দারুণ মেঘ-বিদ্যুৎ চমকাইতেছে……ঘন ঘন বজ্র-পতনের শব্দ—হাওয়া আরও জোরে বহিতেছে—অবিশ্রাম বারিবর্ষণ চলিতেছে, শ্রীরাধার অন্তর শ্যামের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছে—"শ্যাম কি আজ পথ খুঁজিয়া আসিতে পারিবে?" রাধিকার অন্তরের শঙ্কিত ভাবটি ফুটাইয়া তোলা হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃতিকে background করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীরাধার ব্যথার ভাবটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখানেও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কিছুই নাই! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনই লিখিলেন—

"বৈশাখী ঝড়ে সে-দিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।"

তখন আমরা সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আভাষ পাই। মনে হয় প্রকৃতি ও কবির মধ্যে যেন মিলনের কোনও দৃঢ় রজ্জু আছে—মনে হয় কবি যেন প্রকৃতির অঙ্গ। মনে হয়—ওই ঝড়ে দোলায়মান গাছের মত—সোঁদামাটির গন্ধে সৃষ্ট আবহাওয়ার মত—উল্লাসে নাচিয়া ওঠা কেকার মনের মত—কবির মনেও প্রকৃতির ছোঁয়া লাগে। কিন্তু যখন বিদ্যাপতি পড়ি, তখন মনে হয় প্রকৃতি শুধু দেখিবার ও বুঝিবার, অনুভব করিবার নয়। রবীন্দ্র কাব্য পড়িতে বসিয়া মনে হয়—কবির মনের মধ্যে বরষা আছে, বিদ্যাপতি পড়িলে মনে হয় কবির বরষার মধ্যে জল আছে। একজন প্রকৃতির সন্তান, একজন প্রকৃতির চিত্র-শিল্পী।

সিরাজদ্দৌলা

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অজানার অঙ্গুলিসংকেতে ক্রমাগত পটপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পরমুহূর্ত্তে ঘটনাস্রোত কোন্ পথ ধরিয়া চলিবে—তাহা বলিবার সাধ্য কাহারও নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নেপোলিয়ানের জীবন আমাদিগকে কি শেখায়? শেখায়—ইতিহাসকে শাসন করিতেছে অজানার রাজদন্ড। কর্সিকার পিতৃহীন বালককে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মূর্ত্তিতে আমরা কোনদিন দেখিতে পাইব—ইহা কে ভাবিয়াছিল? আবার ইহাই বা কে ভাবিয়াছিল—সম্রাট নেপোলিয়ান ওয়াটারলুর যুদ্ধে হারিয়া সেণ্ট হেলেনায় বন্দীর অভিশপ্ত জীবন যাপন করিবে? জীবন সত্য সত্যই পাগলের প্রলাপের মতো অর্থহীন কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি। ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে—একটার সঙ্গে আর একটার কোন সামঞ্জস্য নাই।

সিরাজদ্দৌলার জীবনকাহিনীও কি পাগলের অর্থহীন প্রলাপের মতই শোনায় না? সেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রথম অঙ্কের যখন অভিনয় চলিতেছে তখন কি দেখিতে পাই? বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের রাজ-সিংহাসনে সমাসীন। নবাবের বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। যুবকের রাজ-কোষে অর্থের প্রাচুর্য—পদতলে সোনার বাঙলা। গর্ব্বিত নবাব কাহারও পরোয়া করে না। সিংহাসনে আরোহণের পনেরো মাস পরে নবাবের জীবন-রঙ্গভূমিতে শেষবারের জন্য যখন যবনিকা পড়িল তখন কোথায় বা রাজমুকুট আর কোথায় বা স্বর্ণসিংহাসন! মুর্শিদাবাদের রাজপথ লোকে লোকারণ্য, আর সেই জনাকীর্ণ রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে এক বিশালকায় হস্তী। হস্তীপৃষ্ঠে বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলার রক্তাক্ত মৃতদেহ। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মহম্মদ বেগ কৃপাণের আঘাতে সিরাজকে হত্যা করিয়াছে। সিরাজ-দ্দৌলা যখন নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র পঁচিশ বৎসর। মাত্র পনেরো মাস তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন আর এই পনেরো মাসের মধ্যেই তাঁহার তরুণ জীবনে কত বড় একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। পনেরো মাস পূর্ব্বে যিনি ছিলেন বাঙলার একচ্ছত্র অধিপতি—পনেরো মাস পরে তাঁহারই মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে বাহিত হইয়া মুর্শিদাবাদের পথে পথে ফিরিতেছে! মানুষের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহারা কি আরব্যোপন্যাসের কাহিনীগুলির অপেক্ষাও বিস্ময়কর নহে?

সিরাজদ্দৌলার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি ইংরেজ-ক্লাইবের নির্দ্দেশে ঘাতকের হস্তে অপমৃত্যু নয়। ইংরেজ-ঐতিহাসিকদের হস্তে তিনি যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাহার তুলনায় মহম্মদী বেগের দেওয়া আঘাত অকিঞ্চিৎকর। এই নীচমনা ঐতিহাসিকের দল মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সিরাজের জীবনকে কালিমালিপ্ত করিয়া গিয়াছে। জন্মগ্রহণ করিলে মরিতেই হইবে আর সে মৃত্যু যদি কখনো-কখনো অপমৃত্যু হয়—আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এব্রাহাম লিঙ্কনের মত ঋষিপ্রতিম মানুষকেও আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছে। কিন্ত আততায়ীর দল যখন কেবল জীবন লইয়াই খুসী থাকে না—সেই জীবনকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া ইতিহাস লিখিতে বসে তখন ট্রাজেডির আর অন্ত থাকে না। সিরাজের জীবন এই অন্তহীন ট্রাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার জীবন যে প্রভাতের অনাঘ্রাত পুষ্পের মত নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন কথা আমরা বলিতেছি না—কোন ঐতিহাসিকই বলে না। কিন্তু তখনকার দিনে এদেশে যে সব শ্বেতকায় পুরুষ অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই বা কয়জনের জীবন পুণ্যের ছটায় আলোকিত ছিল? জালিয়াৎ ক্লাইব কি মহাপুরুষ ছিলেন? একথা কেহ তো বলিতে পারিবে না যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মাতৃভূমিকে বিকাইয়া দিয়াছিলেন। ক্লাইবের মত প্রতারকও তিনি কোনদিন ছিলেন না। মীরজাফর, উমীচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, ক্লাইব—এ সবের মধ্যে সিরাজই একমাত্র মানুষ যিনি কাহারও সঙ্গে প্রতারণা করেন নাই।

ইংরেজেরা প্রথম হইতেই সিরাজের সঙ্গে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করে। এই যে শত্রুতা—এই শত্রুতার পিছনে ছিল ইংরেজ বণিকদের দুর্দ্দমনীয় অর্থলোভ। ধন-কুবের বলিয়া সিরাজদ্দৌলার খ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজকোষ ধন-দৌলতে পরিপূর্ণ—এই কথা দিগ্‌দিগন্তে রটিয়া গিয়াছিল। দোকান-দারের জাত আর কিছু চিনুক আর না চিনুক—টাকা চেনে খুব ভাল করিয়া। তাহাদের লুব্ধদৃষ্টি গিয়া পড়িল হতভাগ্য নবাবের রাজকোষের উপরে। কেমন করিয়া এই বিপুল অর্থ হস্তগত করা যায়? সুরু হইল চক্রান্তের পালা। রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ, দুর্লভরাম—এই সকল দেশদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতকদের সঙ্গে বিদেশী বণিকের দল আরম্ভ করিল গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র। সিরাজের পতন এই হীন ষড়যন্ত্রের ফল। মেজর বি ডি বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Shiraj was reputed to be a very rich prince and his treasury not only full but overflowing. So there can be no doubt that Clive and his friends tried to effect that in Bengal which Cortez and Pizzaro had done in Mexico and Peru. This alone can satisfactorily explain the treacherous conduct of the English towards Shiraj."

"অতিশয় ধনবান নরপতি বলিয়া সিরাজের খ্যাতি ছিল। অর্থের প্রাচুর্য্যে তাঁহার ধনাগার ছিল পূর্ণ। কর্টেজ আর পিজারো মেক্সিকোতে আর পেরুতে যাহা করিয়াছে ক্লাইব এবং তাহার বন্ধুরা বাঙলাতে তাহাই করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সিরাজের প্রতি ইংরেজদের যে বিশ্বাস-ঘাতকতা—এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয়।"

সিরাজের ইংরেজ-চরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। ইংরেজের নিকট হইতে কলিকাতা ছিনাইয়া লইবার পর সিরাজ মনে করিয়াছিলেন—

বিদ্রোহীরা আর তাঁহাকে উত্যক্ত করিবে না। রাজা মাণিকচাঁদের হস্তে কলিকাতার শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ইংরেজদের অতিশয় কৃপার চক্ষে তিনি দেখিতেন। উহাদের দ্বারা তাঁহার কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরেজেরা প্রচার করিয়া দিল, বাতাস অনুকূল হইলেই তাহারা মাদ্রাজ চলিয়া যাইবে—আর বাঙলা-মুখো হইবে না। সরলমনা সিরাজ ইংরেজের এই মিথ্যা উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবিলেন, দোকানদারের জাত যখন দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে তখন আর উহাদিগকে পীড়ন করিয়া লাভ নাই। ইংরেজেরা যাহাতে বাজার হইতে খাবার-দাবার পায় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিলেন। কিন্তু সিরাজের এই সদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ইংরেজ কি করিল? তাহারা সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বাঙলার কুলাঙ্গারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। তাহাদের নিকট গোপনে গোপনে চিঠিপত্র চালাইতে লাগিল! সিরাজের অপরিণত বুদ্ধির কাছে পাশ্চাত্যের নোংরামি ধরা পড়ে নাই। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই—যাহাদিগকে তিনি দয়া করিলেন, তাহারাই তাঁহাকে ছোবল মারিবে। আমাদের বিশ্বাস—সিরাজ যদি পাশ্চাত্যকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি কলিকাতা হইতে ইংরেজদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দিতেন সেই দেশে—যেখান হইতে কোন মানুষই পৃথিবীতে আর ফিরিয়া আসে না। এরূপ করিলে সিরাজের কোন অপরাধ হইত—ইহা মনে করিবার কারণ নাই। রাজার বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ করে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধি রাজ-ধর্ম্মে আছে। ইংরেজেরা নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। মেজর বি ডি বসু মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,—So no blame could have attached to Siraj-ud-daula had he executed the English who fell into his hands at the capture of Calcutta. কিন্তু হত্যা করার প্রবৃত্তি এশিয়াবাসিগণের প্রকৃতিগত নহে। বুদ্ধ, খৃষ্ট আর মহম্মদের দেশের মানুষ হইয়া সিরাজ বন্দী-শত্রুকে হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন। বিজয়ী নবাব ইংরেজদের ছাড়িয়া দিলেন।

অন্ধকূপ হত্যার কালিমায় সিরাজের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা হইয়াছে। ইহার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই দায়ী। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক *অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন—অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইংরেজ ঐতিহাসিক হলওয়েল সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত একটা আজগুবি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেজর বি ডি বসু মহাশয় প্রমুখ আরও বহু ঐতিহাসিক অক্ষয়বাবুর মতই পোষণ করিয়া থাকেন। কেমন করিয়া কালোকে সাদা এবং সাদাকে কালো করিতে হয়—তাহা ম্যাকিয়াভেলি আর মুসোলিনীর ইউরোপ যেমন করিয়া জানে—আমরা তেমন করিয়া জানি না। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার বিদ্যায় পাশ্চাত্য আমাদিগকে হার মানাইয়াছে—একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

বহুকাল পরে সিরাজের স্মৃতিকে মিথ্যা অপবাদের কালিমা হইতে মুক্ত করিয়া সত্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশময় আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের তৈরী ইতিহাস পড়িয়া আমরা বাঙলার শেষ স্বাধীন নরপতির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছি। অন্ধকূপ-হত্যার বিরুদ্ধে যাঁহাদের লেখনী বিষ উদ্গীরণ করিয়াছে, সিরাজকে যাহারা হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ হস্তী-পৃষ্ঠে ঘুরাইল—তাহাদের পৈশাচিক আচরণ সম্পর্কে তাঁহারা কি কোন কিছু লিখিতে পারিতেন না? ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-গণ সিরাজের চরিত্র সম্পর্কে যাহাই লিখুন না কেন—তিনি যে একজন তেজস্বী এবং কার্য্যক্ষম নরপতি ছিলেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি পৌরুষে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরেজের ঔদ্ধত্যকে স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে এত অল্প বয়সে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইত না। তিনি দোকানদারের জাতিকে দোকানদারের যাহা প্রাপ্য তাহাই দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অসংযত লোভের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়াকে তিনি রাজধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ মানুষ রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিলে অর্থোপার্জ্জনের কাজে বিশেষ সুবিধা হইবে না—চতুর বণিকজাতি ইহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেইজন্যই তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাহারা চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। মেজর বি ডি বসু মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,—

"Shiraj was a spirited youth and notwithstanding all that the European writers have said, he was an able man. It may have been, therefore, considered politically expedient to destroy him, for otherwise he might have given some trouble to the English."

ইহার বাঙলা অনুবাদ—

"সিরাজ ছিলেন তেজস্বী যুবক; ইউরোপীয় লেখকেরা যাহাই বলুন না—শাসনকার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবিধা করিবার জন্য তাই, বোধ হয়, তাঁহার ধ্বংস প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি হয়তো ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন।"

কলেজের মেয়ে

(গল্প)

শ্রীসাতকড়ি চট্টরাজ

সন্ধ্যার পর মিত্র বাবুদের বাড়ী খেঁদীর, মা গিয়া যখন উপস্থিত হইল, গিন্নীমা তখন বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া নাতি-পুতি লইয়া কেবলমাত্র রূপকথার ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন। খেঁদীর মা নিকটে বসিলে গিন্নী মা বলিলেন, কি খেঁদীর মা এলি, বস।

ভারী মুস্কিলে পড়েছি মা, তাই একবার তোমার কাছে এলাম।

কি হয়েছে কি ?

খেঁদীর মা বলিল, আর হয়েছে কি ? মাগী মরে গেল আর যত ঝঞ্ঝাট কি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে গেল মা! এই দেখ মা, রায়েদের বাড়ীতে আমি যে আজন্ম কাজ করি, তা ত তোমরা সবাই জান ? কর্ত্তা মল গিন্নী মল, সবাই গেল, ঐ চৌদ্দ বছরের এক রত্তিকে ধর্‌তে গেলে এক রকম আমিই মানুষ ক'রেছি, বলিয়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছিতে লাগিল।

গিন্নী মা বলিলেন, সে কথা ত সত্যিই বটে খেঁদীর মা তা কি হয়েছে কি ?

ঐ অনাথটা তারপর বড় হ'ল, কলকেতা গেল, লেখাপড়া শিখ্‌লে তারপর কোত্থেকে একটা বিয়ে ক'রে আন্‌লে, গাঁয়ের লোকের ত আমোদ ধরে না; তা সবই ত তোমরা জান মা!

তা ত জানি, তারপর তোর কি হয়েছে বল্‌না ?

তাই ত বল্‌ছি মা, শোন না—তা যাই বলুক না বাছা, একা এক শ' হয়ে সেই বউকে নিয়েই ত বেশ মিলে মিশে ঘরকন্না কর্‌ছিল! আহা তাতে আমার মনে কত সুখ হয়েছিল. এমন পোড়া অদেষ্ট মা তা সে পোড়ার মুখীকেও কি মর্‌তে হয়? বাছাকে আমার একেবারে ধনে প্রাণে মেরে গেল! সবই সেই হতভাগার কপাল!

গিন্নী মাও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না, খেঁদীর মা চোখ্ মুছিতে মুছিতে আবার বলিতে লাগিল,—

তা মা সে সবই এই পাষাণ বুকে সয়েছে, কিছুতেই আমার কিছু কর্‌তে পারেনি। কিন্তু এই হতভাগাটা আমার বুকে যে শেল মার্‌তে লেগেছে মা, তা যে আমার কিছুতেই সইছে না! এই বলিয়া খেঁদীর মা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গিন্নী মা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, খেঁদীর মা তোর কি হয়েছে বল্‌বি না ?

কেন বল্‌ব না মা, তাই বল্‌তেই ত এয়েছি, শোন না—সে হতভাগীর বেটীর মরার দু'চার দিন পরেই অনাথ আমাকে কাজে জবাব দিয়েছে মা—বলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গিন্নী মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কারণ অনাথের উপর মাতৃত্বের দাবী তার কতটা এবং সেই অনাথের যৎসামান্য অনাদরও তার পক্ষে যে কি ভীষণ শল্য তাহা তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

এই বেদনায় সহানুভূতির স্পর্শ লাগিয়া তাহাকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। খেঁদীর মা অধিকতর বিচলিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—আমি বেঁচে থাক্‌তে আমারই চোখের সাম্‌নে আমারই সেই অনাথ কি নিজে জল তুল্‌বে, বাসন মাজ্‌বে, ঘর ঝাঁট দেবে? এ যে আমার পাঁজরার হাড় ছিঁড়ে ফেল্‌লে মা!

তাতে তোর আর হ'ল কি? সে যদি তোকে না চায় ত তোর দোষ কি ?

খেঁদীর মা গিন্নী মার এই সান্ত্বনায় যেমন আত্মহারা হয়ে উঠ্‌ছিল, তেম্‌নি আবার মধ্যে মধ্যে মনেও কর্‌ছিল যে, এমন মানুষ না হ'লে গরিবের দুঃখের কথা আর কে বুঝবে ?

সুরমা নিকটে বসিয়াই ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। খেঁদীর মা এতক্ষণ তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই। লক্ষ্য করিলে দেখিত, তাহার এই দুঃখের সুতীক্ষ্ন শায়ক এই বনবিহারিণী হরিণীকেও বিদ্ধ করিয়াছে। বর্ষার ভরা নদীর মত তারও দুচোখ জলে টলমল করিতেছিল। কখন কি জানি কিসের সংঘাতেই হয়ত কূল উপচাইয়া দুকূল ভাসাইয়া ফেলিবে।

সুরমা ব্যস্ত হইয়া আরও নিকটে আসিয়া বসিল। ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ খেঁদীর মা, অনাথবাবু কি নিজেই রান্না ক'রে খান ?

হাঁ মা; সে ত আর এখন বাড়ী থেকে বার হয় না। তা না হ'লে দেখ্‌তে পেতে সে কি চেহারা হয়েছে! সেই রাজপুত্তুর কার্ত্তিকের মত চেহারা এখন যেন পোড়া কাকের মত হয়েছে! আমাকে কত কথা বলে, কত অপমান করে, আমি ত সে সব কানে নিই না মা; মাঝে মাঝে তাই যাই, চার দণ্ড ব'সে থাকি, কি করে তাই দেখি। আমাকে কিছু বলেওনা, আপন মনেই থাকে। শেষে চোখ্ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ফিরে আসি।

সুরমা শুধাইল,—কি বলে তোমাকে খেঁদীর মা, কি অপমান করে তোমাকে ?

মা বলে কি, তুমি আর কি কর্‌তে এখানে এস ? তোমাকে দেখ্‌লে আমার যত কান্না আসে, তা কি তুমি বোঝ না খেঁদীর মা ? আমাকে কষ্ট দেওয়া কি তোমার ভাল ? আমি এখন একলা থাক্‌লেই ভাল থাকি। তুমি আর এস না! তোমার পায়ে পড়ি খেঁদীর মা, আমাকে কিছু দিন একলা থাক্‌তে দাও

তাতে তুমি কি বল অনাথবাবুকে ?

আমি আর কি বল্‌ব মা, তার মুখ দেখ্‌লে আমার আর মুখে কিছু আসে না। কেবল বলি, আমি যে তোমাকে না দেখে থাকতে পারিনা, অনাথ!

খেঁদীর মা এমনি মাঝে মাঝে গিন্নী মার কাছে আসে, এটা সেটা কত কি বলে। এ একরূপ তাহাদের প্রাত্যহিক ঘটনা। কাজেই গিন্নী মার আর বিশেষ কিছু বলিবার ছিল

না। তবুও এই মাতৃস্নেহাতুরার ব্যথা কোন স্থানে ছিল এবং তাহার অমোঘ প্রলেপটিই বা কি তাহা তিনি যেমন জানিতেন, বোধ হয় তেমনটি আর কেহই বুঝিত না। তাই গিন্নী মা বলিলেন, দেখ খেঁদীর মা, অনাথ যে তোকে বাড়ী যেতে মানা করে, কাজে জবাব দিয়েছে সে কেবল তাদিকে ভুলবার জন্যে; তোকে চায় না ব'লে নয়। তার মায়ের সঙ্গে, বউ-এর সঙ্গে তোর যে চিরজীবনটা মাখা মা, তাই তোকে দেখলে তার মাকে, বউকে মনে পড়ে ব'লেই তোকে এখন সে দেখতে চায় না। তার শোক দুঃখটা একটু কমে গেলেই, আবার তোকে ডেকে নেবে। তোকে যে সে মায়ের মতই ভক্তি করে ভাল-বাসে, তা ত আমরা জানি, অতে তুই আর দুঃখ করিস্ না।

খেঁদীর মা বলিল, শুধু দুঃখ বলে নয় মা, তার যে এই দুদিন হ'তে জ্বর হয়েছে, তা সেই বাইরে ঠাণ্ডায় শুয়ে থাকবে, কিছুতেই ঘরের ভিতর যাবে না। বউটা ঐ জায়গায় শুয়ে মরেছিল কি না তাই সে ঐ জায়গাটা কিছুতেই ছাড়বে না! যখন তখন ওখানে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাই যদি আজ বলতে গেলাম তাতে আমার উপর রাগ করে? কি ঠাণ্ডা, কি বর্ষা ও জায়গাটায় ও-যে শুয়ে থাকে, তা মা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। বললাম, এই দেখ অনাথ, ভাল শরীরে ওখানে শুয়ে থাকিস্ তাতে আমি তোকে কিছু বলি না। সে দিন ওখানে একজন মল, আর আজ কিনা জ্বর নিয়ে তুই ওখানে শুবি? ওঠ ঘরে চল, মা সে কি বলব, যে করে আমাকে তেড়ে উঠল। আজ যদি ওর মা থাকত, আর সে যদি ওকে ওকথা বলত তাইলে কি না শুনে থাকতে পারত? আমার ভারী দুঃখ হল; সরে এসে একটু দূরে বসলাম; বলে কি মা ওখানে কে বসে? সোনাকে একবার ডেকে দিতে পার? সে যে অনেকক্ষণ গিয়েছে! জ্বরের ঘোরে বাছা আমার ভুল বকছে না বউটার শোকে পাগল হল কিছু বুঝতে না পেরে তোমার কাছে এলাম মা, আমার কপালে আর যে কি আছে কিছু বুঝতে পারছি না, বলে খেঁদীর মা কাঁদিতে লাগিল।

গিন্নী মা কাঁদিলেন। সুরমার চক্ষু দুটিতে জল ত টলমল করিতেই ছিল, হঠাৎ এই কাতর ভীষণ আঘাতে জল ভাসাইয়া ছুটিতে লাগিল।

খেঁদীর মা বলিল, হাঁ মা ওটা কি জ্বরের ঘোর? কোন ভয় নাই ত?

(২)

গিন্নী মা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিছু বলিলেন না। সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলে, গিন্নী মা বলিলেন, চল্ খেঁদীর মা একবার দেখেই আসি।

তাই চল মা, আমি ত কিছু বুঝি না। তোমাকে যেতে বলতে সাহস হয় নাই মা। চল একবার দেখবে।

গিন্নী মা উঠিলে, পিসিমা আমিও যাই তোমার সঙ্গে, বলিয়া সুরমাও উঠিল।

গিন্নী মা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন—অনাথ!

অনাথ গিন্নী মার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কে জেঠাইমা? তুমি, তুমি কেন এলে জেঠাইমা?

কেনরে অনাথ, আমার আসা কি অন্যায় হয়েছে?

'না, অন্যায় বলছি না, লোকে ত তোমায় নিন্দে করবে?'

সে আমাকে করবে, তোকে ত করবে না, কেমন করছে শরীর?

অনাথ বলিল, ঠিক বুঝতে পারছিনা জেঠাইমা। মনে হচ্ছে জ্বরটা যেন কিছু বেশী, আর বুকটায় কিছু বেদনা।

গিন্নী মা সুরমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সুরমা অনাথের দক্ষিণ হস্ত হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে।

কেমন দেখ্ছিস্ সুরমা? জ্বর কত হবে?

১০৪° হবে, বোধ হয় কিছু বেশীও হতে পারে।

গিন্নী মা যেন কিছু চঞ্চল হইয়া খেঁদীর মাকে বলিলেন, খেঁদীর মা, গোবিন্দকে একবার ডেকে আন।

তারাই ত আমার অনাথকে একঘরে করেছে, সে কি আসবে?

তুই যা না, আমার নাম ক'রে ডেকে আন্।

খেঁদীর মা গোবিন্দকে ডাকিতে চলিয়া গেল।

গিন্নী মা সুরমাকে বলিলেন, ঘরে একটা বিছানা কর্ত।

অনাথ যেন চম্কাইয়া উঠিল।

গিন্নী মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল বাবা অনাথ, চম্কিয়ে উঠলি কেন?

অনাথ বলিল, না, কিছুই হয় নাই।

'তবে অমন ক'রে চাইছিস্ কেন?'

'না ও কিছু নয়।'

এদিক-ওদিক দেখিয়া অসহায় শিশুর মত অনাথ বলিল, হাঁ জেঠাইমা সোনা কি এখন আসবে না?

গিন্নী মা মুখখানি অপরদিকে ফিরাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সোনা সে কে, সুরমার বুঝিতে বাকী ছিলনা। সে তাড়া-তাড়ি চোখে কাপড় দিয়া ঘরের মধ্যে বিছানা করিতে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ আসিয়া রোগী দেখিল, ঔষধের বাক্স সঙ্গেই ছিল, তাহার ব্যবস্থা করিল।

গিন্নী মা শুধালেন, কেমন দেখলি গোবিন্দ?

গোবিন্দ বলিল, এখন ত নিমুনিয়ারই অবস্থা বলে মনে হচ্ছে, তবে উপসর্গ আরও কিছু বাড়লে বোধ হয় বড় ডাক্তারেরই দরকার হবে, যাই হোক, রাত্রি খুব সাবধানে থাকুন, বুকে সর্বদা এই মালিশটা দিয়ে সেঁক দিতে হবে, আর রোগীকে ঘরে নিয়ে চলুন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে তাঁহারা জোর করিয়া রোগীকে ঘরে নিয়া গেলেন। রোগীর পরিচর্যা, তদ্বির যা কিছু সুরমাই যেন দশভুজা হইয়া করিতে লাগিয়া গেল।

অনেক রাত্রিতে রোগী একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইতে লাগিল। সুরমা গিন্নী মাকে ও খেঁদীর মাকে বলিল, তোমরা একটু ঘুমোবে শোও না? আমি ত জেগে আছি। আর এ-কাজটাও আমি খুব ভাল পারি বুঝলে পিসিমা,

আমরা কলেজের মেয়ে কিনা তাই মধ্যে মধ্যে নার্সিংটা করতেই হয়।

গিন্নী মা রোগীর মাথার নিকটেই অঞ্চল বিছাইয়া শুলেন। খেঁদীর মা বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

শেষ রাত্রিতে রোগী বড় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সুরমা সেই একভাবেই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেঁক দিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল—কি হল অনাথ দা, অমন করছেন কেন?

'কি করছি?'

কোন অস্বস্তি হচ্ছে কি?

'না, কিছুই করেনি, তুমি এখনও শোওনি সুরমা? ঐ একভাবেই কি বসে আছ?'

হাঁ, আপনি স্থির হয়ে ঘুমান দেখি!

আচ্ছা!

সুরমা মাথায় কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সকালে ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া খুসী হইলেন। গিন্নী মাকে বলিলেন, জ্বর অনেক কম; বুকের অবস্থাও ভাল। একটু ভালরকম তদ্বির হইলেই শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

কয়েক দিন গত হইলে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গিন্নী মা যখন নাতি-পুতি লইয়া বসিয়াছিলেন, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা পিসিমা, অনাথদা এখন বেশ সেরে উঠেছেন ত?

হাঁ, তবে এখনও রান্না করতে দিইনি। আমাদের ঠাকুরই এ-বাড়ী হ'তে পথ্য দিয়ে আসে।

'আচ্ছা পিসিমা, অনাথদাকে এ গাঁয়ের লোক একঘরে করেছে কেন?'

এ গাঁয়ের লোককে না জানিয়ে কলকাতা থেকে বিয়ে ক'রে এনেছিল বলে।

সুরমা বলিল, গাঁয়ের সকলেরই হুকুম না হ'লে বিয়ে করতে নাই বুঝি?

গিন্নী মা একটু হাসিলেন; বলিলেন, গাঁয়ের লোকে ত বলে মেয়েটা কায়েতের ছিল।

সুরমা বলিল, মেয়েটা যে বামুনের হতেই পারে না, এটা নিশ্চয় করে তাঁরা জেনেছিলেন?

গিন্নী মা একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, কে জানে মা গাঁয়ের লোকের কথাত?

সুরমা বলিল, আচ্ছা পিসিমা, বউকে তোমরা কোন দিন কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে?

করেছিলাম বই কি। সে বলত,—তারা যে বাড়ীতে নীচের তলায় বাসা নিয়েছিল, অনাথ না কি সেই বাড়ীরই উপরের তলায় একখানি কুঠরী ভাড়া করে থাকত আর পড়া-শুনা করত। তার বাবা মারা গেলে তার মা পাশেরই এক বড় বাড়ীতে ঠাকুরদের ভোগ রাঁধত। তারা বড় গরিব। মেয়েটা নাকি অনাথের খুব যত্ন করত, চা তৈয়ারী করা, রান্না করে দেওয়া, বিছানা করা এই সবই সে করে দিত। তাই বোধ হয় অনাথের সুনজরে পড়েছিল

মেয়েটা দেখতেও মন্দ ছিল না। লেখাপড়াও জানত কথাবার্তা তার খুবই ভাল ছিল। আহা বাছা, আমাকে যেন ঠিক নিজের মায়েরই মত মনে করত, অল্প ভোগী! গিন্নি মা চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহারা নীরব হইয়া থাকিলে সুরমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

অনাথদা বউকে বোধ হয় খুবই ভালবাসত নয় পিসিমা? গিন্নী মা বলিলেন, এমনটি আমি আর কোথাও দেখিনি সুরমা। তারা দুটি যেন এ জগতের মানুষই নয়। হতভাগাটার কপাল নিতান্তই মন্দ, নইলে কারও কি এমন বউ মরে? নামেও সোনা কাজেও সোনা ছিল। গিন্নী মা চক্ষু মুছিলেন।

সুরমা প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। সে সবই বুঝিল, কেবল বুঝিতে পারিল না— সোনা কি আগে হইতেই সোনা ছিল, না স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া লোহা সোনা হইল।

(৩)

বিপুল অর্থের মালিক বিজয়বাবু কলিকাতার একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ উকিল, হাইকোর্টে ওকালতি করেন। তিনখানি বাড়ী, রাধাবাজারের উপর একখানি বড় রেশমী ও গরদের কাপড়ের দোকান আছে এবং কিছু জমিদারীও কিনিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। একমাত্র শিশুকন্যা সুরমাকে বুকে করিয়া আর এই দুর্ব্বহ অর্থের বোঝা মাথায় লইয়া তিনি এই জনবহুল সংসার মহানগরীর রাজপথের যাত্রী হইয়াছিলেন। কন্যাটি যাহাতে সুশিক্ষিত হয় এবং যাহাতে একটি সুপাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া এই অর্থের বোঝা তাহাদের নিকট নামাইয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাহার চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চিরপোষিত বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার শেষ বিদায় লইবার সময় আসিল।

বিজয়বাবু সুরমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, মা-বাপ ত কারও চিরদিন থাকে না, আর তুমিও ত এখন আর নির্বোধটি নও, স্থির হয়ে আমার কথাগুলি শোন।

সুরমা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয়বাবু বলিলেন, মা এখন আর আমার অন্য কোন চিন্তা নাই, তোমাকে যখন আমি যোগ্য করিতে পারিয়াছি তখন তোমার মঙ্গলের পথ এখন তুমিই দেখিয়া লইতে পারিবে। তবে কিছুদিনের জন্য একজন সুযোগ্য অভিভাবকের হাতে তোমাকে অর্পণ করিয়া যাইতে পারিলেই আমি সুখে মরিতে পারিতাম। আমার সংসারে এখন তেমন কেহই নাই, যাহার হাতে এই গুরুভার দিয়ে যেতে পারি। এই কথা বলিয়া বিজয়-বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুরমার হাতখানি নিজের বুকের উপর লইলেন।

সুরমা পিতার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল বাবা অনাথদাকে জানেন?

কে? কল্যাণপুরের সেই অনাথ রায়?

হাঁ, তাঁকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

বিজয়বাবু গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন কল্যাণপুরের মধ্যে মানুষ বলতে ত ঐ একটা লোকই আছে। সেবার গোবিন্দ ডাক্তার তার নামে যে মিথ্যা একটা কেস করে

ছিল, তার নিষ্পত্তির জন্য জজ সাহেব আমাকেই কল্যাণপুরে পাঠিয়েছিলেন, সেই সূত্রে আরও ভাল করেই আমি জানি অনাথ কত বড় এবং কত মহান।

সুরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পিতার দৃষ্টিপথ হইতে মুখখানিকে সরাইয়া লইয়া একটি চাপা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বিজয়বাবু বলিলেন, এ-কি বলছিলি সুরমা অনাথের কথা? সুরমা বলিল—ওঁকেই ডেকে আমাদের স্টেটের ভার ওঁরই হাতে দেন না কেন বাবা! আমিও ওঁকে খুব বিশ্বাস করি।

সে কি আসবে না?

কেন আসবেন না বাবা? চাকরী করতে আর কে না চায়? আমি ওঁকে টেলিগ্রাম করেছি।

মুমূর্ষু পিতা [illegible] ভাবিলেন, মনেও যেন একটু আশার সঞ্চার হইল, কষ্টেসৃষ্টে একবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন।

ঐ কন্যাই কিছুদিন পূর্বে যখন বাপের মুখের উপর সাফ জবাব দিয়াছিল যে পড়া-শুনা শেষ না করিয়া সে কিছুতেই বিবাহে রাজী হইতে পারে না, তখন অপত্যস্নেহান্ধ পিতা কেবলমাত্র মুচকি হাসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে বোধ হয় কন্যাকে তিনি সুখিনী দেখিতে পাইবেন না। উক্ত জবাবের অর্থ তিনি যাহাই বুঝুন না কেন কন্যার আবদারের প্রশ্রয়ে জীবনকে অনেকটা হাল্কা করিয়া আনিতে পারিলেন।

রাত্রি এগারোটার সময় অনাথ টেলিগ্রাম পাইল। সুরমার সঙ্গে তাহার বিশেষ কিছু পরিচয় ছিল না, না থাকিবারই কথা। তাহাদের গ্রামে সুরমার পিসিমার বাড়ী। তাঁহারা অগাধ ধনশালী কায়স্থ জমিদার, আর অনাথ সামান্য মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। সুরমার পিতাও জমিদার অপেক্ষা কিছু কম ছিলেন না। তাঁহারই একমাত্র আদরের কন্যা সুরমা মাতৃস্নেহ-পীড়িত-হৃদয়া লইয়া তাহারই কিঞ্চিৎ স্বাদ নিতেই মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে পিসিমার নিকট কল্যাণপুরে আসিত। অনাথ হয়ত কখন তাহাকে এক আধবার দেখিয়াছে, আবার কোনবার হয়ত একেবারেই দেখে নাই। সেই সুরমা তাহাকে তাহার বিপদকালে যাইবার নিমিত্ত এরূপভাবে টেলিগ্রাম করিল কেন? অনাথ প্রথমত যেন একটু ধাঁধায় পড়িল।

দুই বৎসর পূর্বে যে সময় অনাথ কঠিন জ্বর ও নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়াছিল, তখন যে সুরমা অনিদ্রায় অনাথের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সুরমা তাহারও নিরাশ্রয়ের কাল উপস্থিত হইলে, তাহার সেই পূর্বাশ্রিতকে সাহায্য করিবার জন্য ডাকিতে পারে কিনা, অনাথ তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেক [illegible] মিলিল না, তর্কের যখন কোন [illegible] বাহির করিতে পারিতেছিল না [illegible] কালবিলম্ব না করিয়া [illegible] চলিল সে।

[illegible] টেশনে ট্রেন থামিতেই সুরমা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে অনাথেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনাথকে দেখিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয়বাবু দুইমাস হইতে বহুমূত্র রোগে শয্যাগত হইয়াছিলেন; ক্রমশঃই দুর্বল হইতে হইতে এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন যে-কোন মুহূর্তেই হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

অনাথ শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন।

কল্যাণপুরের পিসীমা মাসখানেক পূর্বেই এ বাড়ী আসিয়াছেন। বিজয়বাবুর নিকট বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন, অনাথকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, অনাথ এসেছিস্, বিজয়কে বুঝি আর বাঁচাতে পারি না বাবা!

অনাথ বিজয়বাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল, তাহাকে দেখিয়া বিজয়বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনাথের হাতখানি লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিলেন এবং তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, চোখের জল দুই গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে লাগিল।

অনাথ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিস্ফুট মূর্তি এখানে যেন সর্বত্রই ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। ভাবিল, আমি ইহাদের কি করিতে পারি? এই শোকসন্তপ্ত বিপন্ন পরিবারের জন্য আমি কতটুকু সান্ত্বনা আনয়ন করিবার উপযুক্ত? অনাথ কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বিজয়বাবু বলিলেন, অনাথ, আমার এই শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে কি?

অনাথ কিঞ্চিৎ ব্যাকুল হইয়া বলিল, যোগ্য বুঝিলে নির্বিচারে আপনি আমাকে আজ্ঞা করিতে পারেন।

বিজয়বাবু অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, অনাথ, আমার ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা কিছু আমি রাখিয়া গেলাম, তাহার সবই আজ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, অনাথ! বল, তুমি ইহার ভার লইলে কিনা? বল অনাথ, এই আমার শেষ মুহূর্তে, আমার সুরমা সৎপাত্রস্থ হইয়াছে এবং আমারই পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহারা নির্বিবাদে ভোগ-দখল করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া আমি পরলোকে আনন্দিত হইতে পারিব কি-না?

নির্বাণোন্মুখ দীপকলিকা যেমন শেষ মুহূর্তে একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, বৃদ্ধও তেমনি নিতান্ত শেষ সময়ে একবার উদ্গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অনাথের মুখের দিকে চাহিলেন।

অনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, আমার যতটুকু শক্তি আছে, আপনার পরিবারের হিতার্থে তাহা নিয়োগ করিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে স্মরণ করুন।

বৃদ্ধের মলিন ওষ্ঠাধরে অপরিসীম আনন্দের একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হইয়া গেল। সুরমা আছাড় খাইয়া লুটাইতে লাগিল—পিসীমা সহোদরের শেষ আলিঙ্গন করিবার জন্য বুকের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

(৪)

অনাথ দোকান হইতে যখন ফিরিল, রাত্রি তখন সবে মাত্র আটটা বাজিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর--খানি চাবিবন্ধ। লোকজন কাহাকেও দেখিল না। মনটা তাহার একটু যেন বিরক্ত হইয়া উঠিল। সারাদিন খাটা-খাটুনির পর এবং এতটা রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া স্বভাবতই মানুষ একটু শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার তাহার থাকিবার এবং বসিবার ঘরখানিও ঐরূপ বন্ধ দেখিয়া সে যেন বাস্তবিকই নিজেকে অনেকটা পরাধীন বিবেচনা করিতে লাগিল। তাহার উপর সেই শ্রান্ত ব্যক্তিটীর ভারাক্রান্ত জীবনের এই অবসাদের অংশ [illegible] বাক্যদ্বারাও যদি কেহ না লইতে আসে, তাহা হইলে [illegible] সত্যই তাহার মন যে অনেকটা অসহায় হইয়া উঠিবে, ই[illegible] অস্বীকার করিবে কে? জামা ও জুতা খুলিয়া সেই বারান্দারেই একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া একটি অর্ধভগ্ন টুলের উপর বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। অনাথের মনে হইল, আজ আমার ক্ষণিক বিশ্রামের ঘরখানি বন্ধ দেখিয়া মন এতটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যেদিন আমার জীবনের সমস্ত বিশ্রামের ঘরখানি বন্ধ করিয়া সোনা চলিয়া গিয়াছিল, সেদিন ত কই এতটা ভাবনা হয় নাই? চিরনিদ্রামগ্ন সোনার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বেশ ত একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; কেন মানুষের মন এমন দুর্বল হইয়া উঠে?

ভুঁদিরাম তামাক লইয়া আসিল, অনাথের হাতে হুঁকাটা দিয়া নিকটে বসিল। ঝি এক গাড়ু জল আনিয়া দিয়া বলিল, বাবু বোধ হয় অনেকক্ষণ এসেছেন, আমি জান্‌তে পারি নি।

অনাথ বলিল, না, অনেকক্ষণ হয় নাই, এই কতক্ষণ এসেছি। তোমার কাছে কি এ ঘরের চাবি আছে?

না বাবু আমাকে ত চাবি দিয়ে জান্‌নি।

ঝি রান্নাঘরে ঠাকুরকে রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, সে বুঝিতে পারে নাই, অনাথ কতক্ষণ আসিয়াছে।

সুরমার মাসীমা আজ কয়েকদিন হইল আসিয়াছেন। তিনি পূর্বে এবাড়ী বড় একটা আসিতেন না। সুরমার পিতৃবিয়োগের পর হইতে এখন মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আসিয়া থাকেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে বোধ হয় দশবার তিনি আসিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নিঃসন্তান, বড় ভাসুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে সন্তানবৎ লালন-পালন করিয়াছেন। যখন আসেন, তাহাকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন।

ছেলেটির নাম মনোহর। আজ দুই বৎসর হইল বি-এস-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়াছে—বাড়ী ভবানীপুরে। সুরমার সঙ্গে ইহার বিবাহ সম্বন্ধ করাই মাসীমার উদ্দেশ্য।

মনোহর, সুরমা এবং সুরমার মাসীমা এই কয়দিন যাবৎ তিনটার সময় সিনেমা দেখিতে গমন করেন এবং সন্ধ্যার পরই প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। অনাথ তাহা জানিতেন; কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

অনাথ হাত-মুখ ধুইয়া বলিল, ভুঁদিরাম, ঝিকে একবার ডাকত! ঝি আসিলে সে বলিল, শরীরটা আমার তত ভাল নাই, জ্বর জ্বর মত হয়েছে, একটু জল দাও খাব, আর ঠাকুরকে বলে দাও, রাত্রে কিছু খাব না।

ভুঁদিরাম তামাক দিয়া বলিল, বাবু, মা'রা ত আজ আরও কোথায় কোথায় যাবেন। ফিরতে বোধ হয়, অনেকটা রাতও হতে পারে। নীচে কাছাড়ী ঘরে কি একটু আরাম করবার জায়গা ক'রে দিব?

আচ্ছা, তাই চল বলিয়া ভুঁদিরামের সঙ্গেই অনাথ নীচে নামিয়া আসিল।

মনোহরবাবুদের গাড়ী যখন দুয়ারে আসিয়া লাগিল, রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। ভুঁদিরাম দরজা খুলিয়া দিল।

সুরমা উপরে উঠিয়াই অনাথের ঘরখানি চাবি-বন্ধ দেখিল, একটু বিভ্রান্তের মত হইয়া নিজের ঘরের চাবি খুলিয়া আলো টিপিয়াই দেখিতে পাইল, অনাথের ঘরের চাবি তাহার শয়ন-কক্ষের মেঝেতেই পড়িয়া রহিয়াছে; যাবার সময় তাড়া-তাড়িতে ঝিকে দিয়া যাইতে ভুল হইয়াছিল। সুরমা কাহাকেও কিছু বলিল না; হাত-মুখও ধুইল না, ঘরের মেঝেতে নীরবে হতবুদ্ধির মত বসিয়া থাকিল।

ঝি আসিয়া বলিল, মা খাবারের জায়গা করব কি? 'না!' ঝি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরমা শুধাইলেন, মনোহরদা' কি খেয়েছেন?

ঝি বলিল, হাঁ মা, তাঁর খাওয়া হয়েছে। মাসীমারও খাবার তাঁর ঘরে ঠাকুর দিয়ে এসেছে।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও পারিল না, অনাথদা' খাইয়াছেন কি না?

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন ঝি, খেয়ে নে গে যা।' বলিয়া সুরমা হাত-মুখ ধুইবার জন্য উঠিল। ভুঁদিরাম আসিয়া বলিল বাবুর জ্বর হয়েছে, কাছারী ঘরে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়েছেন। উপরে আসবার জন্য ডাকব কি?

'জ্বর হয়েছে'—বলিয়া সুরমা স্থির হইয়া ভুঁদিরামের মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

কোন্ সময়ে জ্বরটা হয়েছে ভুঁদিরাম?

ভুঁদিরাম খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল, তা ত ঠিক জানি না মা, আজ দোকান থেকে অনেকটা সকালেই এসেছেন। তারপর তামাক খেয়ে হাত-মুখ ধুলেন। ঝিকে বল্‌লেন একটু জল দাও, আর ঠাকুরকে বল রাত্তিরে কিছু খাব না, জ্বর হয়েছে।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, কাছারী ঘরে গেলেন কেন? ভুঁদিরাম একটু থতমত করিয়া বলিল, আমিই বল্‌লাম যে তাঁদের আসতে আজ একটু রাতও হতে পারে, আরাম করবার জন্যে নীচে চলুন না কেন?

'যা ডেকে নিয়ে আয়' বলিয়া সুরমা কলের দিকে চলিয়া গেল।

ভুঁদিরাম ডাকিল, বাবু উপরে চলুন।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা সব এসেছেন?

হাঁ এসেছেন, মা উপরে গিয়ে শুতে বললেন।

(শেষাংশ ৫৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেপ-টাউন

(ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

(২)

জাহাজে করে অথবা রেল গাড়ীতে করে এলে কোন শহরের অথবা নগরীর সহজে কোনরূপ কূলকিনারা করা যায় না। খাওয়া-দাওয়া করে একটু ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে, পোষাক পরে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকের যাতায়াত দেখছি; ছোট ছোট ছেলেদের লাটিম খেলা দেখছি, আর দেখছি এত প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসেও ছেলেরা একটুও শীতে কাঁপছে না। কাফের টুপি মাথায় দিয়ে মালয় ছেলেরা, ইংরেজী টুপি মাথায় দিয়ে খৃষ্টান ছেলেরা, তাদের মাতৃভাষায় কথা বলছে আর দিয়ে খৃষ্টান ছেলেরা, তাদের মাতৃভাষায় কথা বলছে আর মনের আনন্দে খেলছে। কেপ টাউনের ভাষা হল "আফ্রিকানেনার" বান্তু, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। শুনতে বেশ লাগে। তারপর এদের যখন গান হয়, তখন আমাদের মতই অনেকটা বলে মনে হয়।

এখানে কাফের টুপি এবং কাফের ভাষা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছি। তার পুরা তথ্য বলা দরকার মনে করি। আফ্রিকার কালো লোকদের আরবগণ কাফের বলত এবং তাদের যে ভাষা তাকে বলা হত কাফের ভাষা, এমন কি যে ভুট্টা নিগ্রোরা উৎপাদন করে, তাকে বলা হয় "কাফের কণ"। এখন কাফেররা কোন্ টুপি মাথায় দেয়? সেই শিখাওয়ালা লাল তুর্কি টুপি। এই টুপি মাথায় দেওয়াও আরবদের কাছ হতেই নিগ্রোরা শিখেছিল। কিন্তু যদিও আরবগণ আর সেই টুপি ব্যবহার করে না, কিন্তু অবুঝ নিগ্রো এখনও সেই লাল টুপি ছাড়ে নাই। এজন্যই এই টুপির নাম হয়েছে কাফের টুপি। কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাংগানিকা, পর্তুগীজ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ন্যাসাল্যাণ্ড, উত্তর এবং টাংগানিকা, পর্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা, ন্যাসাল্যাণ্ড, উত্তর এবং অশিক্ষিত নিগ্রো খালি গায়ে থাকতে রাজি, কিন্তু একটা লালটুপি তার থাকা চাইই, অথচ সে মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বী নয়। এখন মিশনারীদের অনুগ্রহে সেই লালটুপি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাদের আপন লোক বড় ব্যবহার করে না। যারাই কাফের শব্দের অর্থ বুঝেছে তারাই সেই লালটুপি পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু মালয়রা তার সংবাদ নেয়ও না, তাই লালটুপি পরেই তারা সন্তুষ্ট।

আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নাই, মিঃ কেশব এসে বললেন, যদি বেড়াতে যেতে চাই তবে তিনি তাঁর মোটর গাড়ীতে করে নিয়ে যাবেন এবং যেখানে আজ সভা হচ্ছে সেই স্থানটাও দেখাবেন। আজকে এক বিরাট সভা। এই সভার উদ্দেশ্য হল, যে সিগ্রিগেসন বিল পাস হবে তার প্রতিবাদ করা। শ্বেতকায় ছাড়া সকল জাতই তথায় উপস্থিত থাকবে। সভাপতি হবেন মিসেস গুল। এ'র নাম আমি পূর্ব্বে শুনেছি, আজ তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হল। কিন্তু আজ তাঁর সংগে সাক্ষাৎ আলাপ কোন মতেই হতে পারে না, কুড়ি হাজার লোক আজ তাঁর কথা শুনবে। আমরা গাড়ীতে করে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গেলাম। সেই প্যারেড গ্রাউণ্ড শ্রদ্ধানন্দ পার্কের তিনগুণ হবে। এতবড় স্থানটা লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আমরা যেমন কোন সভাতে ভীড় করে দাঁড়াই, এখানকার লোক সেরূপ করে না। একটু দূরে দূরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর কান পেতে শোনে। কখন কখন আনন্দসূচক, কখনও অপমানসূচক ধ্বনি করে মাত্র, এর বেশী নয়।

মিঃ কেশব আমাকে কতকগুলি যুবকের দিকে দৃষ্টি

আধুনিক দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিতা নারী—যাহাদের সাধারণত 'কালার্ড লেডী' বলা হয়

রাখতে বললেন। এরা হল স্কোলী বয় (Scholi Boys), স্কুলের ছেলে নয়, এরা স্কুলের মুখও দেখে নাই বললে দোষ হয় না,কারণ এরা বেকার। বেকার কি স্কুলে যায় না? যায় তারা স্কুলে, তারাও লেখাপড়া শিখেছে, অনেকে J. C. পাশ করেছে। 'জে সি' মানে স্কুল মাষ্টার হবার উপযুক্ত, যেমন আমাদের দেশের মেট্রিক। তবে ওরা স্কুলের মুখও কেন দেখে নাই, এই কথাটা মিঃ কেশবকে জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ কেশব বললেন, আপন চোখে দেখে নেন—এরা স্কুলে গিয়ে কি শিখেছে। ভদ্রলোককে আর বিরক্ত করলাম না, মনে মনে ভেবে নিলাম, আগামীকল্যই দেখে নেব এরা কিরূপ লোক। কেশব যদিও শিক্ষিত লোক, তবুও তার ঐ সভাতে থাকতে ইচ্ছা হল না। তিনি তাঁর সংগে আমাকেও হেনোভার ষ্ট্রীটের বড় সিনেমা গৃহে সিনেমা দেখতে নিয়ে গেলেন। এখন একটু সিনেমার কথা বলি, তারপরই সময় বুঝে স্কোলী বয়দের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বলব।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে দুই রকমের সিনেমা আছে। এক রকম হল শ্বেতকায়দের জন্য। তাতে শ্বেতকায় অর্থাৎ ইউরোপীয়ান না হলে প্রবেশ করা যায় না। দ্বিতীয় রকম হল এশিয়াটিক

এবং আফ্রিকানদের জন্য। আগে বলেছি, একটা শব্দ আফ্রিকানেনার আর এখন বল্‌লাম আফ্রিকান। আফ্রিকানেনার মানে শ্বেতকায়গণ যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করেন অথবা যাঁরা তাঁদের বংশধর। আফ্রিকান মানে নন্‌-ইউরোপীয়ান, সে নিগ্রোই হউক আর আরবই হউক। এই দ্বিতীয় রকমের সিনেমা গৃহে, একঘেয়ে 'কাউবয়দের' সিনেমাই বেশী দেখান হয়। মাঝে মাঝে টারজান এবং অন্যান্য এডভেঞ্চারপূর্ণ চিত্রাবলী দেখান হয়। আজও কাউবয়-দের চিত্রই ছিল। যদিও আমার মন সেদিকে ছিল না, তবুও দেখ্‌ছিলাম। মাঝে মাঝে বড় ঘরটার দিকেও তাকাচ্ছিলাম। ঘরটা আজ খালি বলেই মনে

বন্য বান্তু জাতি—কেপ্‌টাউন হইতে অনতিদূরেই ইহাদের বাসস্থান

হল। ভাবলাম শহরের লোক আজ সভায় গেছে তাই লোক সমাগম হয় নাই। পরে দেখ্‌লাম আমি যা ভেবেছিলাম তাই সত্য।

সিনেমা সমাপ্ত হবার পর প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিক থেকে লোক চলে আস্‌ছিল......অনেকেই সভার সম্বন্ধে বল্‌ছিল আপন আপন মতামত। কেউ বল্‌ছিল যেরূপভাবে স্কোলী-বয়রা আজ নীরবে বক্তৃতা শুনেছে এমনটি আর কখনও দেখা যায় নাই। কেউ বল্‌ছিল একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই, তাড়াতাড়ি চল ঘরে যাই। বেশী কিছু আর শুনতে পারি নাই, নিজ ঘরে গেলাম। তথায় এক সভার মত লোক বসেছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত বেশী হয়ে গেল। তার-পর তারা চলে গেল। আমি শীতের রাত্রে চারখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সাইকেল নিয়ে বের হলাম নগর পর্যটনে। ইউরোপীয়ানরা যেদিকে থাকে তা দেখবার মত স্থান। উঁচু পাহাড়ের উপর সারি দিয়ে পাইন বৃক্ষ, তারই ঝোপে ছোট বড় গৃহমালা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মাঝে লোক আছে কিন্তু তাদের কথা শুনা যায় না। তারা হাসে, কাঁদে, কথা কয়, কিন্তু এর মাঝেও শৃঙ্খলা আছে, বাস্তবতা আছে। দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। সাইকেল চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে এবং সাইকেল টেনে। যদিও মুখ দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস বইছে তবুও দেখতে ভাল লাগ্‌ছে। মাঝে মাঝে আটলান্‌টিক মহাসাগরের শীতল বায়ু এসে নাকে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে বেশ আরাম লাগ্‌ছে। মাঝে মাঝে দু'একজন নিগ্রো চোখ উঁচু করে চেয়ে নীচে নেমে চল্‌ছে। তাদের আমাকে দেখে আনন্দ আর আমার তাদের দেখে আনন্দ। ইউরোপীয়ানরা আমার কালো মুখ দেখে ঘৃণার চোখে একবার দেখেই, এ ভীষণ দৃশ্য যেন আর না দেখ্‌তে হয়, সেজন্য মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যাদের আমি ঘৃণা করি আমার অন্তর থেকে, তারা আমাকে কি করে ভালবাসতে পারে? যারা গভীর মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অন্বেষণে মত্ত, তাদের বলে দিতে পারি, মনের তরঙ্গ সাগরের তরঙ্গ হতে ভীষণ এবং অনেক হাল্‌কা। প্রত্যেক পলকে তার ঢেউ-এর প্রতিধ্বনি হচ্ছে, আর সেই প্রতিধ্বনির আঘাতের ফল অমনি বেশ সুন্দর দাগ কাটছে।

ঘুরে ঘুরে উঠলাম গিয়ে টেবিল পর্ব্বতের কাছে। তথায় বাস যায় এবং বস্‌বার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা বেঞ্চের মাঝে লেখা রয়েছে "Only for Europeans" আমার বসার স্থান নাই। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই পৃথিবীতে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা আমার নাই। ইউরোপীয়ান যুবক-যুবতীগণ ধূলার উপর পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, বিয়ার খাচ্ছে, ফল-মূল এবং রুটি খাচ্ছে, কেউ বেঞ্চের ওপর বসে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। এদের মনে কতই আনন্দ। কিন্তু আমার কালো এবং কঠিন মুখ দেখে এদের তাক লেগে গেল। একটি যুবক সাহসে ভর করে আমার কাছে এসে বল্‌ল, Are you tired, boy? আমি কি জবাব দিব? পরিশ্রান্ত হয়েছি শরীরের দিক দিয়ে নয়, মনের দিক দিয়ে। তারপর আবার ঐ কথা। 'বয়' মানে ছেলে। আমি যুবককে বল্‌লাম, Can't you see me a grown-up man, how can you call me a 'boy'? যুবকের তাতে আরও তাক লাগল। আর কথা বল্‌ল না, চলে গেল। আমি একটু দূরে গিয়ে একটা ঝোপের মাঝে বসে ভাবতে লাগ্‌লাম, আমি এখনও ছেলে? আর কতদিন ছেলে হয়ে থাকতে হবে? জীবন চলেছে ধু ধু করে বিয়োগের দিকে আর আমি 'বয়'ই রয়ে গেলাম!

আফ্রিকার কালো লোক সরল, সহজ এবং নির্ব্বোধ বলেই ইউরোপীয়ানরা এদের 'বয়' বলে ডেকে থাকে। আর আমিও তাদের সঙ্গে 'বয়' হয়েছি। আমি কেন, ভারতের প্রায় লোকই দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'বয়' রূপে পরিচিত।—ক্রমশঃ

উপযুক্ত আমরা। আমাদের দেশ, আমাদের জাত, আমাদের ধর্ম্ম ইংরেজ পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌ছে। আমাদের দেশের রাজা মহারাজা হতে আই-সি-এস পাশ করা লোকের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছি, সবাই নাবালক 'বয়', কারণ তারা অপরের দ্বারা চালিত হয়ে হয়ে তাদের মনের গতি এমন হয়েছে যে, যদি তারা তাদের কর্ম্মের তালিকা তাদের মনিবের কাছে না পেশ করে, তবে তাদের কার্য্যের সমাপন হল না বলেই মনে করে। আমাকে 'বয়' বলেছে বলে আমি দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু দেশের কথা ভাবলে নিজেকে 'বয়' বল্‌লে রাগ করবার কিছু আছে বলে মনে করি না।

পাহাড় বেয়ে উপরে উঠেছি। একটু বিশ্রাম করেই সাইকেলে চড়লাম এবং একচোটে হেনোভার ষ্ট্রীটে চলে এলাম। এসেই একটা চায়ের দোকানে বসলাম। চায়ের দোকানে স্কোলী বয়রা বসেছিল। তারা আমার সাইকেল বাইরে দাঁড়ান দেখে, আমি সেই সাইকেলের মালিক কি না জিজ্ঞাসা করল। আমি বল্‌লাম, 'হাঁ' এবং আমিই সেই পর্য্যটক। অনেক কথা হবার পর একটি যুবক আমাকে একটি ঠিকানা দিয়ে বল্‌ল, যদি বিকালে তথায় যাই, তবে সে বাধিত হবে। যুবকের মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, যদিও খাদ্যাভাবে শরীর তার ভেঙ্গে যেতে বসেছে, তবুও তার চোখের তারায় এমন তেজ রয়েছে যে, সেই তেজ অনেকের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তার আশে পাশে যারা বসেছে, তাদের দেখলেই মনে হয়, ওদের একটি মাত্র পয়সাও নাই, অনেকদিন হয়ত পেট ভরে খায় নাই, তবে তাদের দেখ্‌লেই মনে হয় তারা স্বাধীন এবং সাহসী। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম। যে দোকানটাতে বসেছিলাম, সেই দোকানের মালিক ভারতীয় পাঠান। পাঠান বাইরে এসে আমাকে হিন্দুস্থানীতে বল্‌লেন, "পথিক যাদের সঙ্গে কথা বল্‌লে, তারা প্রত্যেকটি এক একটি যমরাজা। কখন তোমাকে ছুরি বসাবে তার ঠিক নাই। নির্দ্ধারিত ঠিকানায় যেয়ো না; সেটি হল একটি আড্ডা গৃহ। যদিও পুলিশের দৃষ্টি সে গৃহের উপর আছে, তবুও আজ যেয়ো না। গতকল্যের ঘটনা, কল্যাণজীর কাছ থেকে শুনে তারপর তথায় যেয়ো।" অনর্থক কথা না বাড়িয়া কল্যাণজীর বাড়ী গেলাম। বাড়ী ত নয়, নাপিতের দোকান। এই কল্যাণজী হলেন এখানকার হিন্দু সভার পৃষ্ঠপোষক।

আমি ঘরে যাবার পরই নমস্কার এবং প্রতি নমস্কার হল। তথায় এক বৃদ্ধ বাঙ্গালীও বসে ছিলেন। বাড়ী তার চুচুঁড়া। কল্যাণজীর ধারণা ছিল না,আমি বাঙালী। আমি বাঙালী কিনা জানার জন্য আমাকে মিঃ কাদেরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মিঃ কাদের আমার সঙ্গে কথা বলে, বলে দিলেন আমি ঠিকই বাঙালী। এই ঠিক বাঙালী এবং অঠিক বাঙালী জানবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? তার কারণ আমি জানি। এক তেলুগু ভদ্রলোক বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে প্রথম প্রথম বেশ নাম অর্জ্জন করেছিলেন, তারপর ধরা পড়ে যান। তাই দক্ষিণ আফ্রিকাতে আজকাল বাঙালীকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হলে পরীক্ষার পাশ করতে হয়। মিঃ কাদের বংগদেশ ছেড়ে এসেছেন অনেকদিন হয়, তারপর দেশের কোন সমাচারই রাখেন না। সে যা হোক, বঙ্গভাষার প্রতি তার একটা টান রয়েছে, তাই দেশ থেকে মোল্লা আনিয়ে একদিকে বাঙলা এবং অন্যদিকে তাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাবার বন্দোবস্ত করছেন। আমার থাকা কালীনই শুনলাম, বাঙালী মোল্লা দারবানে এসে পৌঁছেছেন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই!

মিঃ কল্যাণজীকে বল্‌লাম, আমার সঙ্গে অনেক স্কোলী-

কলা বাগং জাতি—বেল টাউন হইতে অনতিদূরেই ইহাদের বাসস্থান বন্যজাতীয় দর্শনীয়দের প্রধান—আকার যে প্রকার ইহার আহারও সেই প্রকার।

বয়দের দেখা হয়েছে, তারা আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চায়, যাব কি? হাঁ আপনি যেতে পারেন, আপনি বাঙালী বলে আমার ধারণা ছিল না; কিন্তু মিঃ কাদের বল্‌লেন, আপনি বাঙালী। আপনার আবার ভয় কিসের, তবে হুঁসিয়ার থাকবেন, অন্ততঃ একখানা ছুরি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তারপর গত রাত্রের কথা উঠল; যেমনটি শুনলাম তাই এখানে লিখ্‌লাম।

গতরাত্রের কথা

মিসেস্ গুলের পিতা ডাক্তার রহমান জনতাকে বলে দিয়েছিলেন, জনতা যেন নীরবে আপন ঘরে চলে যায়। স্কোলী বয়রা যেন পথে লুটপাট না করে। স্কচ কন্যা কিন্তু সে কথাতে সায় দেন নাই। স্কচ কন্যা মিসেস্ গুল জনতাকে পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীটের দিকে যেতে নীরবে ইঙ্গিত করলেন। পিতা-পুত্রীতে ঝগড়া—তা কেপ টাউনে কে না জানে। জনতা পুত্রীর পেছন পেছন চলতে লাগল। মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলছিল Down with colour bar, Down with Imperialist. পুলিশের সে-ধ্বনি ভাল লাগছিল না; তারপর জনতা চলেছে পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীটে, যথায় পার্লিয়ামেণ্ট চলছে। আমাদের এজেণ্ট জেনারেলও তথায় কোথাও নিশ্চয়ই বসেছিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীটে শাদা লোকের প্রসেসন যেতে পারে, কিন্তু অন্য লোকের নয়। মিসেস্ গুলের ইচ্ছা সেদিকে যান এবং একটু আইন-অমান্য করেন। তাঁর গাড়ী পুলিশ থামাল। যেমনি গাড়ী থামান, আর ঐ স্কোলীবয়রা পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে পুলিশকে ধরাশায়ী করতে লাগল। বেশ একটু আমোদ হল স্কোলীবয়দের। এদিকে পুলিশকে নাস্তানাবুদ করা, অন্যদিকে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে পেট ভর্ত্তি করে খাওয়া। তারপর তারা উধাও। পুলিশের সাহায্য এল। মিসেস্ গুল তখনও তথায় দাঁড়িয়ে। পুলিশ স্কোলীবয়দের পাত্তাও পেল না, পেলে বেচারা জনতাকে। তারপর ঐ জনতাকে একটু শাসন করল, যার ফলে অনেকে হাসপাতালে গেল। মিসেস গুল সজল নয়নে আপন গৃহে প্রস্থান করলেন।

যারা চিকিৎসার্থ হাসপাতালে গিয়েছে, তারা গোবেচারী, তাই আজ অনেককেই পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে, তারপর নূতন লোকের খোঁজ করছে। সেই নূতন লোকদের খোঁজ করা বড়ই কষ্টকর কাজ। সকলেই জানে, তারা কে। কিন্তু এমন কোন আইন এই দক্ষিণ আফ্রিকাতে নাই যাতে সন্দেহ করে কাউকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। যদিও বা এরূপ গ্রেপ্তার কখন কখন হয়, কিন্তু তার সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করে, যেন লোকটাকে ধরার পরই কাঠগড়ায় উঠিয়ে তার বিচার করা চলে।

আমি থাকতাম ৫নং লেসার ষ্ট্রীটে। এই ষ্ট্রীটটি পার হলেই, একটা বড় পথ আছে, সেই পথটা পার হয়ে ছোট ছোট অনেক পথ, তারপর একটা একতলা বাড়ী, তারই সামনে কতকগুলি যুবক দাঁড়িয়ে। এক এক আনার পয়সা দিয়ে তারা জুয়া খেলছিল। আমাকে দেখে তাদের জুয়া বন্ধ হল না, শুধু একজনা লোক এদের সঙ্গ ছেড়ে আমাকে নেবার জন্য বাইরে এল এবং আমাকে নিয়ে ঘরের মাঝে প্রবেশ করল। ঘরের মাঝে অন্য দুজন লোক বসে ঢাহা (Dhaha) মানে গাঁজা খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই গাঁজার সিগেরটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তা নিলাম না দেখে একজন গুপ্ত পঞ্জর নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এল, কিন্তু সঙ্গের যুবক ইঙ্গিত করতেই লোকটা বসে পড়ল এবং আমার কাছে ক্ষমা চাইল।

লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি ভেবে আমাকে আক্রমণ করেছিল। সে তৎক্ষণাৎ বললে, ইণ্ডিয়ান সি আই ডি ভেবেছিল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে বলল—ইণ্ডিয়ান সি আই ডি না করতে পারে এমন কাজ নাই। এই সি আই ডি-দের মাঝে নানা দোষ আছে। মিত্র সেজে এসে গাঁজা রেখে ধরিয়ে দেয়। নির্দ্দোষ লোককে ধরে, ধরিয়ে দেয় আনাড়ী অগাঁজাখোরদেরে। লোকটা বলল,—"কি করে মহাত্মা গান্ধী এরূপ লোকদেরে সৎপথে আনতে পেরেছেন? ডাচ পুলিশের সঙ্গে লড়াই হয়েছে গতকল্য রাত্রে, কিন্তু তারাও এত হীন কাজ করবে না—নির্দ্দোষ লোককে ফাঁসিয়ে দিবার জন্য।" লোকটি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় যে যুবক আমাকে আসতে বলেছিল, সে এসে আমার করমর্দ্দন করল এবং একটু বসতে বলল। সে আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে শুধু এক প্যাকেট ডামুরিয়া আমার হাতে দিয়ে চলে গেল।

দুজনেই আমরা ঘরে ছিলাম। তাকে—গাঁজা কেন খায়, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। সে কেন গাঁজা খায়—তাই বলতে লাগল আর আমি তাই শুনতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমার কাছ হতে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাতে লাগল। আমি তাতে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিতেছিলাম। তার চোখ কখন কখন রক্তবর্ণ, কখন কখন জলে ভর্ত্তি হতেছিল। আমি তার মুখ এবং তার কথা কান পেতে শুনছিলাম। তার গল্প শেষ করার পূর্ব্বেই পরিচিত যুবকটি এসে বললে "এরূপ গল্প দিয়ে আমাদের জীবন গঠন হয়েছে, আরও কত শুনবেন, চলুন এখন অন্যত্র যাব।" যেখানে এখন আমি যাচ্ছি তার নাম লিখব না, সেই স্থানের নাম দিব "আঁধারে আলো"। কিন্তু ঐ যুবকের গল্প না শুনে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু কি করা যায়, আমরা চললাম "আঁধারে আলোর" দিকে। ৫নং লেসার ষ্ট্রীট হতে সেই স্থান বেশী দূরে নয়।

(ক্রমশ)

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(১৮)

মূর্ছাভঙ্গের পর লীলাকে ভয়ানক দুর্বল দেখাইতে লাগিল। ক্রমাগত দুই-তিনদিন রোগী শুশ্রূষার ভার সম্পূর্ণরূপে নিজের উপর লইয়া সতীশ লীলাকে বিশ্রামের অবকাশ দিল। পরদিন হইতেই নরেন্দ্রের অবস্থাও উত্তরোত্তর ভালর দিকে যাইতেছিল—লীলাও যেন অনেকখানি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—স্বামীর ভার সতীশের উপর সঁপিয়া দিয়া সেও যেন একটু বাঁচিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রের দেহের ক্ষতগুলি শুকাইয়া উঠিল। নরেন্দ্র বিছানায় উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। এ-কয়দিনে লীলার দুর্বলতাও কাটিয়া গিয়াছিল অন্তরে গভীর পরিতৃপ্তি চক্ষে আনন্দের উজ্জ্বলতা লইয়া নিরুদ্বেগ প্রশান্তি লইয়া লীলা আবার স্বামীর শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

সতীশ কহিল, "আজকে বৌদিকে কিন্তু বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কি করেই যে এ কদিন কেটেছে। আজ কিন্তু আমিও বেশ আরাম পাচ্ছি বৌদি বুকের ভেতর যেন একটা পাথর চাপান ছিল। অত বড় বিপদে না পড়লে কিন্তু আজকের এই আনন্দটা পাওয়া যেত না! দুঃখের মাধুর্যই ঐ খানটায়!"

লীলা প্রফুল্ল মুখে মাথা নাড়িয়া সতীশের কথায় সায় দিল।

সতীশ বলিল, "আজ বুঝেছি বিপদও ভগবানের এক অনুগ্রহ। সে আসে বলেই ভগবানকে ডাকি—তাঁকে বিশ্বাস করি—আবার তাঁরই কৃপায় মুক্তি পেয়ে এত আনন্দ পাই। তাঁর অনুভূতিতে হৃদয়-মন ভরে ওঠে।"

সতীশের কণ্ঠে কৃত্রিমতা ছিল না। শুনিয়া লীলা সুখী হইল।

আরও একদিন কাটিল। লীলা ও নরেন্দ্র বসিয়াছিল। সতীশ আসিয়া বলিল, "এবার আমার ছুটি নরেন, আমি আজ বাড়ী যাব।"

তারপর একটু থামিয়া বলিল, "আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, এই কলিযুগেও সীতা সাবিত্রীরা বেঁচে আছে। পাশ্চাত্যের আবহাওয়া তাঁদেরে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলতে পারেনি।"

বলিয়াই সতীশ সহাস্য দৃষ্টি দিয়া লীলার পানে চাহিল। কথাটা আর বেশী দূরে অগ্রসর হওয়া লীলার ইচ্ছা নয়। পরের মুখে নিজের প্রশংসা শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু পাছে তাহাতে তাহার এই গোপন সাধনার কথা তাহার স্বামীর কর্ণগোচর হয়, এই ভাবিয়া লীলা হাসিমুখে বলিল, "সত্যি হোক মিথ্যে হোক নিজের স্ত্রীকে সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করতে দেখলে কোন পুরুষই অসন্তুষ্ট হবেন না, যদিও নিতান্ত আপনার দুচারজন ছাড়া এমন লোকও আছেন, বেশী সতী দেখলে তাঁরা খুসী হ'তে পারেন না।"

উভয় শ্রোতাই অপার বিস্ময়ে লীলার দিকে চাহিল। লীলা তেমনই মন্দমধুরে দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল, "ভাবছেন,—পুরুষের এ মনোবৃত্তি আমি জানি কি করে। কথাটা নূতনও নয়, আমার নিজস্ব নয়, ওদেশের কারুর কাছ থেকে ধার করা।"

সতীশ কথাটি জানিত। তাদের ইউনিভারসিটি কলেজের কোন এক বিলাত ফেরত প্রফেসার ছেলেদের পড়ানর চেয়ে তাদের সঙ্গে বাজে গল্প করিতেই ভালবাসিতেন এবং তিনিই একদিন ঠিক ঐ জাতীয় একটি কথাই ইংরেজীতে বলিয়াছিলেন। লীলা ইহা কি করিয়া জানিল, এই ভাবিয়াই সতীশ আশ্চর্য হইয়া গেল। এই সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদ না করিয়া সতীশ কহিল, "আমি এখন বিদায় চাই বৌদিদি, এখুনিই আমি বাড়ী যেতে চাই।"

লীলা কহিল, "কেন, এখানে কি বিশ্রাম নেওয়া চলবে না?"

সতীশ মিনতিপূর্ণস্বরে কহিল, "বিশ্রামের জন্য নয়, বিশ্রাম আমি চাইনে। কাজই আমার ভাল লাগে—কাজ না পেলে কোন কিছুতেই আনন্দ পাইনে। সরকার গোমস্তার হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে বাইরে থাকা যদিও আমার অনভ্যাস নয় তবুও খোঁজ খবর না রাখলে চলে কি করে। মেথর বস্তিতে একটা নাইট পাঠশালা করে দিয়েছিলাম, তারও কোন খোঁজ নিতে পারিনি কতদিন। বাগান সমিতিতে মাঝে মাঝে না গেলেই চলে না। দেশেও একবার যেতে হচ্ছে আমাকে। গেল বছর বন্যায় গিয়েছিল দেশটা ডুবে। আমাদের ইষ্ট বেঙ্গল ত দেখেন নি কোন দিন, একটু বেশী জল হলে সারা দেশটা ডুবে যায়। প্রজারা শস্য পায়নি খাজনা দিতে পারছে না—সাবেক দেনা শুধতে না পারায় নূতন ঋণ পাচ্ছে না, বীজ ধান পর্যন্ত কারুর ঘরে নেই দেখি একবার দেশে যেয়ে ওদের যদি কিছু উপকার করা যায়।"

স্থিরভাবে বসিয়া লীলা সতীশের কথা শুনিল। পরে বলিল, "তেমনি তেমনি এই কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন, কবিতা লেখা হয় কখন?"

হাসিয়া সতীশ বলিল, "আপনার খোঁচা খেয়ে খেয়ে সে বদ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি বৌদি। কি হবে আর ওসব ছাই-ভস্ম লিখে যদি তাতে দেশের কোন উপকার না হয়। প্রেমের সংগীতে পরাধীনতার গ্লানি বেড়েই যাচ্ছে। ওই পড়ে পড়ে দেশের জনসাধারণ ভাববিলাসী হয়ে পড়েছে। দেশের সঙ্গীতে-সাহিত্যে জাতি গড়ে ওঠে—। সেই সাহিত্যই যদি হয় মেয়েলী ধাঁচে গড়া—জাত তা হ'লে মেয়েলী হয়ে যাবে না! যে গানে কর্মশক্তির প্রেরণা দেয় না—শুধু ভাবপ্রবণ সমাজের সৃষ্টি করে—এই জীবন মরণ সমস্যার দিনে সে সব ভুলে যাওয়াই ভাল।"

লীলা নীরবে শুধু একটু হাসিল।

সতীশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, "হাসছেন বৌদি। ভাবছেন এ খেয়াল আমার কবে থেকে হল! খেয়াল ছিল বরাবরই—আপনার চোখে পড়েনি! সব দেশেই জাতীয় সঙ্গীত আছে—আমাদের এই দেশে জাতীয় সঙ্গীতই হচ্ছে প্রেম সঙ্গীত। প্রেম আমাদের অস্থি মজ্জায় মিশে গেছে।

আমরা এক গালে চড় খেয়ে আর এক গাল পেতে দি। এমনি আমাদের বিশ্বপ্রেম—। তরুর চেয়ে সহিষ্ণু—তৃণের চেয়ে নীচু হ'তে আমাদের ধর্ম—আমাদের জাতীয় সাহিত্য উপদেশ দিয়েছে। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে—ধর্ম এসে পড়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। ধর্মই হয়ে পড়েছে আমাদের পলিটিক্স্ আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রার চালক। আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে এই জীবনের অনিত্যতা—এর অপ্রয়োজনীয়তা। অজানিত পরকালে সুবিচারের আশায় আমরা ইহকালকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছি। Ethical life—যাকে বলে নৈতিক জীবন—তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ঠাকুরের পুজোয় বসেছি—দুদিন অনাহারে থেকে দরিদ্র-নারায়ণ এসে কাতর কণ্ঠে খাদ্য মাগছে—তার চেঁচামেচিতে পুজোর মন্ত্র ভুল হচ্ছে বলে রেগে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—। মালার থলে হাতে হরিনাম জপতে জপতে যাচ্ছি—পথের ধারে নিরাশ্রয় কলেরার রোগী পড়ে এক ফোঁটা জলের জন্য চেঁচিয়ে মরছে ফিরেও চেয়ে দেখছি না, পাছে তার স্পর্শে আমি অশুচি হয়ে পড়ি। গঙ্গার স্রোতে একজন ডুবে মরছে—আমি হা ভগবান বলে আহা উহু করছি সাঁতার জেনেও জলে নাব্‌ছি না। কর্মফলের দোহাই দিয়ে ভগবানের লীলা স্মরণ করে নিজের মনকে আঁখি ঠারছি! এই ত আমাদের নৈতিক জীবন—! এর গোড়ায় রয়েছে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা এবং তারই জন্য আমরা হয়ে পড়েছি এমন পরাধীন!"

লীলা পূর্ববৎ মৃদু হাসিয়া বলিল, "সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার অভ্যাসও তাহলে আছে, না ঠাকুর পো!"

সতীশের মনে একটু উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। তারপর লীলার এই পরিহাসে কোথায় যেন একটু ঘা লাগিয়া তাহাকে আরও উত্তেজিত করিয়াছিল। সতীশ কহিল, "পরাধীন দেশে পরাধীন জাতির মেয়েদের কাছ থেকে এর চেয়ে আর বেশী কি আশা করতে পারি বলুন! অথচ এই ভারতের মাটিতে—কুন্তী, দৌপদীর জন্ম হয়েছিল। বীর পুত্রের জননী—বীর স্বামীর সহধর্মিণী ছিলেন তাঁরা। স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধের জন্য—উত্তেজনা দিতেন তাঁরাই। ভারত ছিল সেদিন স্বাধীন, নৈতিক জীবন ছিল উন্নত, স্বাধীনতা ছিল তাঁদের জীবনের কাম্য। আজকালকার সস্তা প্রেমে তাদের প্রাণ হা-হুতাশ করত না।"

কথাটায় বুঝি লীলারও একটু খোঁচা লাগিল। লীলাও সামান্য কঠিন কণ্ঠে কহিল "ভীমার্জুনের মত স্বামী-পুত্র পেলে দৌপদী-কুন্তীর অভাব হয় না আজও। তালপাতার সেপাইয়েরা বাতাসে পড়েন হেলে, কুন্তী-দ্রৌপদী জুটবে কোথা থেকে! দৌপদীর মত বীরপত্নী পেতে হ'লে অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করবার সংযমও থাকা চাই।"

তারপর সুর একটু নরম করিয়া লীলা কহিল, "মেয়েদের ওপর দোষ চাপালে ত চলবে না ঠাকুর-পো! পুরুষেরা হচ্ছেন সমাজ গঠনের কর্তা। তারা চলেন আগে আগে, নারী যায় তার পেছনে। দুর্বল নারী তার অস্তিত্ব—তার আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে পুরুষের মনস্তুষ্টি করেই ফেরে। সস্তা প্রেম তারা চায়—নারীও তাই দিয়ে নিজের মান রাখে। কি করবে সে যে দুর্বল আরও পরাধীন। তার সাজসজ্জা—স্নো পাউডার মাখা—রং বেরংএর কাপড় পরা, সবই যে পুরুষকে আয়ত্তের মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে। নইলে তার নিজের প্রয়োজন কতটুকু। পুরুষের রুচির খোরাক যোগাতেই ত নারীর দিন যায়। আজ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কোন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে, অমনি সে বীর স্বামী ভেবে বসবেন—একটুও ভালবাসে না তাকে তার স্ত্রী!"

কথাটা হয়ত খানিক সত্য। সতীশ তর্ক না করিয়া বলিল—"সেই জন্যই বলছি বৌদি, ওসব দুর্বলতার প্রশ্রয় দিলে আর চলছে না। আজও যাদের চোখ ফোটেনি, সোনার খাঁচায় বসে ভাবছে বেশ আছে সেই কমলবিলাসী দলের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হবে! শুধু মনের দুর্বলতা নয়—তার শারীরিক শক্তিকেও বাড়াতে হবে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করে দেশের যুব-শক্তিকে সবল ক'রে তুলতে হবে! আমার জমিদারীতে প্রায় প্রত্যেক ভদ্র-প্রধান গ্রামে এক একটি করে ব্যায়াম সমিতি গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করছি—।"

সতীশের কথাগুলি লীলা এবার হাল্কাভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল, "ঐ সব সমিতির নাম শুনলেই যে ভয় হয় ঠাকুরপো! কর্তাদের নেক নজর যে ওর পর লেগেই আছে। কোন দিন বিপ্লবী বলে ধ'রে নিয়ে না যায়।"

সতীশ যেন একটু উৎসাহ পাইয়া বলিল, "সে ভয় ত আছেই। পরাধীন দেশে চিরকাল তা থাকবে। ওরা ত চায়ই জাতটাকে অকর্মণ্য ভীরু, কাপুরুষ ক'রে তুলতে। আমাদের দুর্বলতার ওপরেই যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই টেররিষ্টদের সঙ্গে আমার সমিতিগুলির কোন সম্পর্কও নেই। টেররিজমের ওপর আমার কোন সহানুভূতি নেই। বরং ঐ সন্ত্রাসবাদকে মনে মনে আমি ঘৃণা করি। ওতে ত দেশের ইষ্ট হচ্ছে না এতটুকুও। অহিংস নীতির পথে দেশ যতটুকু এগিয়ে চলছিল—তাকে ওরা ঠেলে পিছিয়ে দিচ্ছে! জানি বিনাদোষে নির্যাতন আমাদের সইতে হ'তে পারে। তাই ব'লে ত পিছিয়ে থাকতে পারিনে বৌদি! এই ক্ষীণ দুর্বল মানুষগুলোকে সবল কর্মক্ষম ক'রে তুলতে হ'লে তাদের দেহকেই আগে গড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে নিতে হবে। গায়ে জোর না থাকলে কি মনে বল আসে! দুর্বলকে কেউ খাতির করে না। জাত সৃষ্টি করার গোড়ার মন্ত্রই হচ্ছে জাতের ভবিষ্যৎ মানুষগুলোকে সুস্থ সবল ক'রে তোলা এবং তার জন্য নিয়মিত ব্যায়ামই হচ্ছে শরীরকে গড়ে তোলবার একমাত্র উপায়। লাথি-ঘুসিতে পিলেগুলো আমাদের ফেটেই গেল! গায়ে বল থাকলে পিলেও ফাটে না, কেউ ফাটিয়ে দেবার সাহস রাখে না।"

তারপর একটু থামিয়া সতীশ কহিল, "এ নিয়ে তর্ক যদি কিছু থাকে অন্য দিন এসে করব। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি বৌদি!"

লীলা বলিল, "তবে আর আপনাকে আটকে রাখব না,

ঠাকুরপো। দেহের ওপর এ কয়দিন নানা অত্যাচার গিয়েছে। বাড়ী গিয়ে দু'চার দিন বিশ্রাম নিয়ে যেন ওসব কাজে হাত দেবেন। এইটি আমার অনুরোধ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনার বন্ধুত্বকে হাল্কা করব না—আপনিও খুশী হবেন না নিশ্চয়! রোজ বিকেলের দিকে একবার করে আসবেন যেন।"

হাসিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আসি ভাই নরেন। আর কোন ভয় নেই—সাবিত্রী ঘরে থাকতে মরা মানুষেরও পরমায়ুও পাঁচশো বছর বেড়ে যায়।"

বলিয়াই সতীশ লীলার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর একটি ছোট নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে সতীশের ইচ্ছা হইল একবার মেথর বস্তীটা ঘুরিয়া যায়। ধাঙড় পল্লীতেও কয়েকজনের অসুখ করিয়াছিল তাহাও একবার দেখিয়া যাইতে হইবে।

ধাঙড় পল্লীর নিকটে আসিয়া সতীশ ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিয়া নোংরা পাড়ার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এক জনের অসুখ, অন্য জনের অভাব-অভিযোগ, আর এক জনের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়াছে, রামু কাল মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল, ছেলেটা দুই দিন রাত্রিতে পাঠশালায় যায় নাই, রামদীনের মেয়ের বিয়েতে কিছু সাহায্য করিতে হইবে। এই সব আবেদন নিবেদন শুনিতে শুনিতে বেলা অনেকখানি কাটিয়া গেল। সতীশ সেখানকার কাজ সারিয়া মেথর বস্তীর দিকে চলিল। সেখানেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সদর রাস্তার দিকে পা বাড়াইবে, বস্তীর শেষ সীমায় সহসা একটি ঘরের পানে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সতীশ একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল তেইশ চব্বিশ বৎসরের একটি যুবক সতের-আঠার বছরের একটি তরুণীর মুখে মদের গ্লাস চাপিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তরুণী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছে, 'আমি মদ খাবেক নাই—বাবু মানা করিয়েছে!'

তরুণীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই সতীশ তরুণীর গৃহদ্বারে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, "সেদিন না তুই আমায় ছুঁয়ে দিব্যি করলি লছমিয়া—আর মদ ছুঁবিনি।"

লছমিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর তার সুন্দর কালো আনত চক্ষু দুটি ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া সতীশের দিকে চাহিতে লাগিল।

"আর মণ্টু তুই এখানে কি করতে এসেছিস, বে করবি লছমিয়াকে?"

মণ্টু সতীশের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "একবারটি মাফ্ করেন বাবু—আর মদ ছোঁবেক নি। আমি লছমিয়াকে বলে বাবু, আমি সাদি করবে, তা উ শুনেক নি। বোলে ভদ্দর আদমী মাফিক থাকবে, এক সোয়ামী মর্ গেল ফিন সাদি করবেক নি।"

শুনিয়া সতীশ একটু বিস্মিত হইল। পরে লছমীর দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁরে লছমিয়া, মণ্টু বলছে ওকে সাদি করবি না। এক স্বামী মরে গেলে তোদের মধ্যে যখন আবার বে' হয়! তারপর তোর এই কাঁচা বয়স, তোর কি সাজে"—

সতীশ আরও কি বলিতে যাইয়া সহসা থামিয়া গেল। লছমিয়া ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত গর্জিয়া উঠিল। অপরূপ রোষ-দৃপ্ত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া মণ্টুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তু চলা যা মণ্টু আমার ঘর থেকে। ফিন্ আসবেক ত ঝাঁটা মারবেক।"

দুঃখিতচিত্তে মণ্টু চলিয়া গেল। অনিঃশেষিত মদের বোতল সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

লছমিয়া করুণ নয়নে সতীশের দিকে কতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারপর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল 'বাবু!'

কি বলিতে যাইয়া লছমিয়া বলিতে পারিল না। তার চোখে জল আসিয়াছিল। অশ্রু লুকাইতে যাইয়া মুখ নত করিল।

সতীশ চমকিত হইয়া কহিল, "কিরে লছমিয়া?"

লছমিয়া নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়াছিল। বলিল 'তু আর হেথা আসিস্‌নি বাবু।"

লছমিয়ার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া সতীশ তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। দেখিল, লছমিয়ার চোখের কোণে অশ্রুরাশি জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

সতীশ কহিল, "আমি এলে তোদের মদ খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, না লছমিয়া! তা কাঁদিছিস কেন?"

লছমিয়া কথা কহিল না। কেবল তার চোখ দিয়া টস্-টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে চোখের জল মুছিয়া লছমিয়া বলিল, "আমি তুহার পা ছুঁয়ে বলেছে বাবু, মদ আর খাবেক নি। তু আর আসিসনি—তুকে দেখলে আমি পাগল হয়ে যায়।"

বলিয়াই লছমিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সতীশ কতক্ষণ হতভম্বের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—মুখে তাহার কথা ফুটিল না। মস্তকের শিরা-উপ-শিরা টন টন করিয়া উঠিল—লছমিয়া বলে কি? অবশেষে কি এই অস্পৃশ্যা তরুণী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! অথবা এ তাহার যৌবনের অস্থির উন্মত্ততা! এও কি সম্ভব লছমিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারে। কেনই বা অসম্ভব তাহার দৈহিক রূপ লাবণ্য ত ভদ্রঘরের মেয়েদের চেয়ে কম নহে, বরং অমন সুশ্রী-সুঠাম পরিপুষ্ট দেহ—সুগোল সুললিত বাহু, অপূর্ব্ব মাধুরীময় যৌবনশ্রী, টানাটানা, ভাসা ভাসা কালো চোখ অনেক ভদ্রঘরেও যে দুর্লভ। হৃদয়-ধর্ম্মেই বা সে ভদ্রনারীর চেয়ে হীন হবে কেন?

ভারাক্রান্ত মন লইয়া সতীশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। দুপ্রহর পর্য্যন্ত রোদ্রে রোদ্রে ঘুরিয়া তাহার মাথা ধরিয়াছিল। এক একবার মনে হইতেছিল, বুঝি জ্বর হইবে।

স্নানাহার শেষ করিয়া সতীশ একবার বিশ্রামের আশায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শুইয়া শুইয়া কেবল তার লছমিয়ার কথাই মনে হইতে লাগিল। হায়রে মানুষের মন, কেউ যদি রহস্য করিয়াও বলে, ওগো তোমায় আমি ভালবাসি, অমনি

মাথায় আসিয়া চাপে ভূত—রক্তে লাগে দোল—চোখে জমিয়া উঠে নেশা! ঘুরিয়া ফিরিয়া তারই কথা মনে হয়, তাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, আবার ঐ কথা শুনিতে ইচ্ছা জাগে। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে সে অযোগ্য যোগ্য হইয়া উঠে—অসুন্দর সুন্দরে পরিণত হয়।

সতীশের মনে হইতেছিল—তরুণী বান্ধবীর সংখ্যা তার বেশী না থাকিলেও নরেন্দ্রের সংগে মিশিয়া নানা বয়সের নানা চরিত্রের মেয়েদের সংগে মিশিবার সুযোগ সে পাইয়াছে। অনেক শিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না আধুনিকার আকুতি-ভরা দৃষ্টির সম্মুখেও সে পড়িয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে কেহই ত তাহাকে বলে নাই। কেহই ত চোখের জল মুছিয়া বলে নাই "ওগো তুমি আর আমার কাছে এস না, তোমায় দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই!"

সতীশের চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। এ অনুরাগের ভাবী ফল শুধুই ব্যর্থতা। দূরে ভবিষ্যকে ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়াই সতীশ ঘুমাইতে চেষ্টা করিল—। কিন্তু কোথায় যেন কি একটা চিন্তা অদেখা কাঁটার মত মনের কোণে খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল।

(ক্রমশ)

মহাসমরের পটভূমি—ইউরোপ

(৫৪০ পৃষ্ঠার পর)

করিতে চাহে। অথবা এইরূপ দৃষ্টিভংগীও তাহাদের রহিয়াছে বলিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা হইতেই এই সংঘর্ষ উদ্ভূত—ইউরোপ ও জাপানে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বর্ধিত হইয়া, সমগ্র বিশ্বের জনবিরল অংশে বিস্তৃত হইয়া পড়িবার অভিলাষের যে বিঘ্ন তাহাই বিদূরিত করিতে চেষ্টিত, সেই চেষ্টার পরিণামেই বর্তমান আন্তর্জাতিক বিরোধ। অথবা তাহাদের মতে এই সংঘর্ষকে সেই সমস্যামূলকও বলা চলে, যাহার মূলে সমরসজ্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতা; সকলগুলি শক্তিই যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাজি জিতিয়া লইতে অগ্রসর—যে দৌড়ের উদ্দেশ্য ব্যাপক মৃত্যু আনয়ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। পণ্ডিতগণ যেভাবেই ইহাকে বর্ণনা করুন, তাঁহাদের মতবাদ, বিশ্লেষণ, ভবিষ্যদ্বাণী এবং সংখ্যান সকল দৃষ্টিভংগীতে মত একই দাঁড়ায় এবং তাহা হইল—সমর অনিবার্য। বর্তমান ঘটনাস্রোতও তাহাই নির্দেশ করে।

কিন্ত বর্তমান যুগ এবং যুদ্ধ-পূর্বযুগের ভিতর রহিয়াছে একটা বিরাট পার্থক্য। মহাসমরের পূর্বেকার যুগের বিশ্ববাসী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ যে ঐতিহাসিক মৃত্যুচক্রের দিকে তাহারা আগাইয়া চলিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না, এমন কি যে রাজনীতিক দল মহাসমরকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারাও ধারণা করিতে পারে নাই উহার বাস্তব প্রভাব ও বিষময় ফল।

১৯১৪ সনের ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যায় যখন গ্রেট-ব্রিটেন যুদ্ধই নিশ্চিত করিল, তখন স্যার এডোয়ার্ড গ্রে ফরেন অফিসের বাতায়ন হইতে চারিদিকে আলোক প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"সমগ্র ইউরোপ হইতে আলোকমালা নির্বাপিত হইয়া যাইতেছে, আমরা আমাদের জীবিতকালে আর উহা পুনঃ প্রজ্বলিত দেখিব কি না সন্দেহ।" কিন্তু যাহারা আশা করিতেছে আর একটি সমর আসন্ন, তাহাদের নিকট ঐ বাক্য তবু কতকটা আশাপ্রদ; কিন্তু এমন আশাহত লোক রহিয়াছে অগণিত যাহারা বলে—ইউরোপের আলোকমালা আর প্রজ্বলিত হইবে না।

কে এলরে পথ ভুলিয়া

শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী

কাননে আমার কে এল রে আজি, কে এল রে পথ ভুলিয়া?
ফুল করবীরা চাহিল ঘোমটা খুলিয়া।
আজি বনতল গন্ধে পাগল,
চাঁপা ফুলদল খুলেছে আগল,
মলয়-পরশ পেয়ে বনবীথি সহসা উঠেছে দুলিয়া।
কে এলরে পথ ভুলিয়া॥

রবির কিরণ মরীচিকা জাল বুনিয়াছে, দেখ চাহিয়া!
এল কি দেবতা আলোর ঝরণা বাহিয়া!
পরাগের রেণু মাখিবার ছলে
কে এল আমার কাননের তলে,
আমার স্বপন সফল করিয়া কে এল শিশিরে নাহিয়া?
কে এল রে দেখ চাহিয়া॥

রাখাল অদূরে বাজায় বেণুকা আকাশ আকুল করিয়া:—
মৃদু শিহরিয়া টগর পড়িছে ঝরিয়া।
অর্ঘ্য রচিয়া আমের মুকুলে
পেতেছি আসন ঝরে-পড়া ফুলে,
না জানি, কাহারে দিতে হবে বরি; না জানি কাহারে স্মরিয়া
টগর পড়িছে ঝরিয়া॥

মেঘের ওপারে নবীন উল্লাসে কে যেন বাজায় বাঁশরী।
পরাণ উতল, সবারে যাই গো পাশরি।
শুধু অকারণে জাগিছে হরষ,
সকল বেদনা বিলাপের স্মৃতি! মন হতে আজি যা সরি।
কে যেন বাজায় বাঁশরী॥

কাননে আমার লতার পাতার শতদল যেন ফুটিয়া।
অন্তরযামী, এস লহ শোভা লুটিয়া।
মর্মরি আজি উঠেছে কানন,
কুসুমকলিরা খুলেছে আনন,
দিশি দিশি হতে শত মধুকর প্রভাতে এসেছে জুটিয়া।
এস, লহ শোভা লুটিয়া॥

মহাসমরের পটভূমি—ইউরোপ

(২)

রুঢ় অধিকার—১৯২৩ সালের ১১ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট পোয়েনকেয়ার রুঢ় অঞ্চলে ফরাসী সেনা পাঠাইয়া দিলেন কয়লা, লোহা প্রভৃতির উৎস হইতে ৮০ পারসেণ্ট অধিকার করিবার জন্য। গ্রেট্-ব্রিটেনের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ৬০০ দিবস ব্যাপিয়া ফরাসী সেনা রুঢ় অঞ্চলে সতর্ক প্রহরা দিতে থাকে। ইতিহাসের চরম উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের সেই কাল ফরাসীদের তরফ হইতে।

১ লক্ষ ৪৭ হাজার জার্মান অধিবাসীকে এই অঞ্চল হইতে ১১ মাসের ভিতর বিতাড়িত করা হইল। ৪০ লক্ষ লোকের বাস এই রুঢ় অঞ্চলে—ইহার প্রত্যেকটি প্রধান শহরের বার্গোমাস্টার হয় বহিষ্কৃত নতুবা বন্দী হইল।

সকল কারখানার খাতাপত্র, টাকাকড়ি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপিস-গৃহ প্রভৃতি অধিকার করা হইল। সামান্য বিক্ষোভ যে না হইয়াছিল এমন নয়—ন্যূনপক্ষে ১০০ লোক সে সকল সঙ্ঘর্ষে প্রাণ হারায়। সংবাদপত্রগুলিকে দমন করিয়া প্রকাশ বন্ধ করা হইল। ফরাসী-অছিগিরিতে পরিচালিত প্যালাটিনেট্ স্বায়ত্তশাসনমূলক গবর্ণমেণ্টের এলাকা হইতে ১৯০০০ অফিসিয়াল নির্বাসিত হইল।

মিউনিকে লুডেনডর্ফ এবং হিটলার ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল প্রয়াস আরম্ভ করিল। রুঢ় অঞ্চলে জার্মান গবর্ণমেণ্টের সমর্থনে সকল জার্মান শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিল—উহাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য অর্থপ্রদানে জার্মান সরকারকে অতিরিক্ত নোট তৈরী করিতে হইল।

জার্মানীর সীমান্তের চারিদিকে যে ফরাসী কারসাজিতে মৈত্রী-প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাকে ভেদ করিতে যে ঝটিকার উদ্ভব হইল, একরূপ ইউরোপের মাথার উপর দিয়া, তাহাতে জার্মানীর অর্থনীতিক কার্পণ্য ও সঙ্কেম হিসাবেও উত্থিত হইল ঝটিকা। ডিসেম্বরে অর্থাৎ ফরাসীদের রুঢ় অধিকারের অল্পকাল পরে মার্কিনের এক ডলারে ৭০০০ জার্মান মার্ক ক্রয় করা যাইত। এমনই একটা অর্থনীতিক বিপ্লব দেখা দিল জার্মানীতে যে, একমাস পরে ঐ দর একেবারে ৫০,০০০ মার্কে পৌঁছিল। জুন মাসে আরও নামিয়া ১ লক্ষ মার্কে দাঁড়াইল। প্রতি ঘণ্টায় আবার এই দরের অদলবদল সুরু হইল। মজুরদিগের বেতন প্রতিদিন পরিশোধ করা হইতে লাগিল। সঞ্চয় বলিয়া কাহারও কিছু রহিল না সমগ্র জার্মানীতে। হাতে টাকা থাকিলে দিন শেষের পূর্বেই সকল গৃহিণী উহার বিনিময়ে যে-কোনও জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আগ্রহে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত—কি জানি যদি রাত্রি প্রভাতে মার্কের মূল্য আরও নামিয়া যায়। আগষ্ট মাসে মার্কিন ডলার ৫০ লক্ষ মার্কের সমতুল্য হইয়া পড়িল। নবেম্বরের মধ্যভাগে একেবারেই নগণ্য বলিয়া ধার্য হইল—বার্লিনে এক মার্কিন ডলারে ২,৫০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক এবং তিনশত মাইল দূরে কলোনে এক মার্কিন ডলারে ৪,০০০,০০০,০০০,০০০ মার্ক পাওয়া যাইতে লাগিল।

অর্থনীতিক বিপর্যয় জার্মানীকে একেবারে বিপ্লবের মুখে ঠেলিয়া দিল। ফরাসী সরকার রুঢ় অধিকার অটুট রাখিতে যে ব্যয় করিতে বাধ্য হইল—অনুপাতে আয় করিতে পারিল না তাহার সমানও। জার্মানীর অর্থনীতিক বিপর্যয়ে যে ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি হইল—তাহা তো আর বিরাট বিরাট কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া যায় না—উড়োজাহাজ হইতে বোমা বৃষ্টি করিয়াও মার্কের মূল্যের নিম্ন পতনকে প্রতিরোধ করা যায় না। এই মূল্য তালিকা লইয়া কূট-রাজনীতিকগণও সন্ধির প্রস্তাবে কাহাকেও স্বীকৃত করাইতে পারে না। ১৯২৪ সালের আরম্ভ হইলে শক্তিশালী ফ্রান্সও দেখিতে পাইল তাহার অর্থনীতিক অবস্থাও কিছুটা আক্রান্ত হইয়াছে—চলতি কারেন্সি অপ্রচুর হইয়া পড়িতেছে দিন দিন। যুদ্ধোত্তর নীতির প্রথম পর্যায় এখানেই সমাপ্ত হইল। ফরাসীরা এবার পশ্চাতের দিকে তাকাইল—অপসরণের তোড়জোড়ে।

বেড়াজালের ভিতর জার্মানী ঘূর্ণিবাত্যায় লাটিমের মত ঘুরপাক খাইতে লাগিল—পুরাতন সন্ধি-চুক্তি বিদূরিত করিয়া; পুরাতন অর্থনীতিক পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়া; পুরাতন শুল্কনীতিকে খণ্ডিত করিয়া; রীতিনীতির পুরাতন ধারায় মূলগত উলট-পালট আনিয়া—ফলে দাঁড়াইল এমন অবস্থা যে, জার্মান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ষ্টেট্সগুলি বুঝি বিচ্ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। রাষ্ট্রশক্তি যেন পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। একটা জ্বলন্ত লৌহতারের মত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল বিষম আতঙ্কের বস্তু—যে উহাকে করায়ত্ত করিতে যায়, সেই পুড়িয়া মরে। ইউরোপের নূতন নূতন রাষ্ট্রগুলি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূতের মতই দূর হইতে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল জার্মানীর উপর। তাহারা ভাবিল—ইহাই যদি যুদ্ধোত্তর গণতন্ত্রের স্বরূপ ও পরিণতি হয়, তাহা হইলে ডিক্টেটরশিপই তাহাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

জার্মানীর বাহিরে ক্রমে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠতা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। চেকোশ্লোভাকিয়া শান্তি-সমৃদ্ধির ভিতর দিয়া অটলভাবেই অগ্রসর হইল। পোল্যাণ্ড এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সন্ধি-স্থাপন করিল। মুসোলিনী তখনও সাময়িক নির্বাচিত ডেপুটিদের লইয়াই কাজ চালাইতেছেন; স্বাধীন মত প্রচার দমন করিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের দুর্বল করিয়া কৌশলে দেশে শান্তি স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু জার্মানীর অভ্যন্তরে মহা সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল। জার্মানীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা—রুঢ় অঞ্চলে ফরাসী অধিকারে অর্থনীতিক বিপর্যয় চরম তাণ্ডবে পরিণত হইয়াছে।

লোকার্ণো—ইউরোপে আশার আলো দেখিতে পাওয়া গেল এইসময়—ব্রায়াণ্ড, ষ্ট্রেসম্যান, স্যার অষ্টিন চেম্বারলেন ও আরও চারিটি দেশের প্রতিনিধি এক বৈঠকে মিলিত হইল লোকার্ণো শহরে। আজ অবশ্য লোকার্ণো চুক্তি মৃত; কিন্তু ১৯২৫ সালে উহাই ইউরোপকে আশান্বিত করিয়াছিল—সমরাস্ত্রের খর্বকরণের চুক্তি, সমর-ঋণের মীমাংসা, ইউরোপ হইতে সমর-দূরীকরণের নব স্বপ্ন এবং এমন কি সমগ্র ইউরোপকে লইয়া একটা ফিডারেশন অফ ষ্টেট্স গঠন—লোকার্ণো চুক্তি ইহাই সম্পন্ন করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সারা বিশ্বে অগ্রগতির জয়যাত্রা ১৯২৫ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত।

লোকার্ণোতে এগার দিন ব্যাপিয়া চলিল বৈঠক, কিন্তু বৈঠক অপেক্ষা মজলিশ, সখের ভ্রমণই দেখা গেল জোরাল। পরিশেষে পাঁচটি সর্তে পৌঁছা গেল। উহার চারটিতে সালিশ নিষ্পত্তিতে জার্মানী সম্মতি দিল—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড সহ বিবাদের। জার্মানীকে ঘেরাও করিয়া যে বেড়াজাল—তাহাতে মৈত্রীবন্ধ এই চারিটি ষ্টেট। ফরাসী-জার্মান ও ফরাসী-বেলজিয়াম সীমান্তের অপলঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গ্যারাণ্টি প্রদানের পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, গ্রেট ব্রিটেন এই লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করিল ১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায়। যুদ্ধোত্তর নীতিতে ফ্রান্সের যে জার্মান-আতঙ্ক তাহা যেন এই সময়ে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রায়াণ্ড বলিলেন—সব শেষ হইল - আমাদের ভিতর যে সুদীর্ঘকালের যুদ্ধ তাহা এতদিনে সমাপ্ত হইল। অপরিশোধনীয় যে ব্যথা-বেদনা তাহারও উপর যবনিকাপাত হইল। এখন হইতে রাইফেল, মেশিনগান, বড় কামান সব তুলিয়া রাখ। মৈত্রী-সালিশ—শান্তি আমাদের সম্মুখে।

যুদ্ধোত্তর বিশ্ব এখন হইতে যেন প্রকৃতই যুদ্ধবিহীন বলিয়া প্রতিভাত হইল। প্রগতি—প্রগতি—চারিদিকেই প্রগতি আর সমৃদ্ধি। জার্মান-জাতির ঋণ গ্রহণ—নব ব্রিমেনের নির্মাণ—গ্রাফ্ জেপেলিনের নব মূর্তি দেশে দেশে পুনর্গঠন—টাকা খাটানর ছড়াছড়ি আর অর্থনীতিক প্রভাবে মার্কিনের উচ্চস্থান - ইহাই হইল এই যুগের সচল অবস্থা—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের পণ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইল। সমর-ঋণ পরিশোধের সম্ভাব্যতায় উহার আখ্যা দেওয়া হইল—ভাড়াটে অর্থ।

আর এই কয় বৎসরেই জার্মানীর ইস্পাত-ভাণ্ডার যুদ্ধ পূর্বযুগের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। জার্মান বাণিজ্য-তরী ঠিক পূর্বের আকার প্রাপ্ত না হইলেও, উহার কাছাকাছি যাইয়া দাঁড়াইল ৩৭ লক্ষ টনে। ফরাসী দেশে রূঢ় অধিকারের পরবর্তী তরঙ্গের প্রতিঘাতে পনর মাসে যে ৬টি মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে, সেই ধাক্কা সামলাইয়া এই কয় বৎসরে ফ্রান্স তাহার অর্থনীতিক সঙ্কট দূরীভূত করিল। এই কয় বৎসরেই দেখা গেল এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ সমগ্র সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। যদিও ইংলণ্ড তখন বেকার-সমস্যা দ্বারা বিক্ষুব্ধ এবং চীন অন্তর্দ্রোহে সমাচ্ছন্ন, তথাপি আন্তর্জাতিক করপোরেশনের সমর্থক দলের জয়জয়কার ইউরোপের সকল রাজধানী ব্যাপিয়া—বাণিজ্য-বর্ধিত, উৎপন্ন দ্রব্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

১৯২৯ সালের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া সর্বত্র শান্তিময় পটভূমি—যে অগণিত ট্রেঞ্চের খাত ইউরোপের অঙ্গকে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া দাবার ছকে পরিণত করিয়াছিল—সে সকল খাত ভরাট হইয়া গেল। যুদ্ধোত্তর যুগে যে সকল প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিক ও দেশনেতার উত্থানকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিয়াছিল, সেই সকল নেতৃবৃন্দ রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কর্মপন্ধতি বর্জন করিয়া আভ্যন্তরিক উন্নয়নের তালিকা গ্রহণ করিল 'পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা' অভিধা প্রদান করিয়া। মার্কিন পর্যটক ১৯২০ হইতে ১৯২৮ সালের ভিতর ইউরোপে পরিভ্রমণ করিয়া ঋণদান ব্যবসায় ৩৫০ পারসেণ্ট পর্যন্ত লাভ আয়ত্ত করিল। এমন একটা প্রগতির যুগ—এমন একটা ব্যাপক পুনর্গঠনের যুগ ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। মানবের জীবনধারা উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইল—অবাধ কল্পনা যে উচ্চতম জীবনধারার স্বপ্ন দেখিতে পারে, তাহাও যেন আর মানবের নাগালের বাহিরে রহিল না। দীর্ঘকালব্যাপী শান্তির-স্বরূপই যেন উদ্ঘাটিত হইল বিশ্ববাসীর চক্ষুসমীপে—সমগ্র বিশ্ব যেন বিগত মহাসমরের স্বপ্নাশ্রিত আতঙ্কও বিস্মৃত হইল—যুদ্ধদ্বারা অনুপদ্রুত কোনও আদর্শ জাতি-সমাজ কি প্রকার শান্তির আস্বাদ পাইতে পারে, তাহাই যেন ইউরোপ উপভোগ করিতে লাগিল—বিগত যুদ্ধের স্মৃতির লেশ নাই—নাই ভাবী-সংগ্রামের সন্ত্রাসের আভাসও।

সঙ্কট—১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর নিউইয়র্কের বাজার দর ভাঙ্গিয়া পড়িল; গমের দর ১ ডলার ৩০ সেণ্ট হইতে নামিয়া আসিল ৫৩ সেণ্টে প্রতি বুশেল; কার্পাস প্রতি পাউণ্ড ১৫ সেণ্ট হইতে ৬ সেণ্টে পৌঁছিল (১৯৩১ সাল পর্যন্ত); আর ১৯২৯ সালে বেকার সংখ্যা তিন কোটিতে পরিণত হইল।

১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে জার্মানীতে বেকার ছিল ৭ লক্ষ ২০ হাজার; সেই বৎসরেই শীতে সংখ্যা বাড়িয়া ২০ লক্ষে পরিণত হইল। আর, ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ এক চক্রে উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্কের মত প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল ৪০ বৎসর বয়স্ক বিগত মহাসমরের এক করপোরাল, নাম তাহার য়্যাডল্ফ্ হিটলার। বিগত নয় বৎসরে হিটলার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্টি জার্মানীর শাসক সম্প্রদায়ের এক প্রবল প্রতিপক্ষে পর্যবসিত হইয়াছে—যে প্রতিপক্ষকে আর উপেক্ষা করা চলে না।

নয় বৎসর পূর্বে সে যখন দলে যোগদান করে, তখন তাহার সহকর্মী সাতজন মাত্র এবং পার্টির তহবিলে মূলধন সাড়ে সাত মার্ক মাত্র। এই সহকর্মীদের লইয়াই সে ২৫ দফা সর্ত-সম্বলিত এক কার্যতালিকা গঠন করে, পতাকার পরিকল্পনা করে, দলের প্রতীক-পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করে, একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করে; সঙ্গে সঙ্গে দলের প্রথম উদ্যোক্তাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিয়া দলকে নিজের মুঠার মধ্যে আনয়ন করে। তখন পার্টিতে ১ লক্ষ চাঁদা প্রদানকারী সদস্য। রাইখষ্ট্যাগের একুন ৪৯০ জন সদস্যের ভিতর ১২টি সদস্য ছিল এই দলের অন্তর্ভুক্ত। বার্লিন সিটি কাউন্সিলে তেরটি ডেপুটি স্থান পাইয়াছিল, যাহারা এই দলের সদস্য। ইহার পর থুরিঙ্গিয়ার এক নির্বাচনে, এই দল ১১ পারসেণ্টেরও অধিক ভোট-প্রাপ্ত হয়। তখন এই দলের গুরুত্ব এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, শক্তিশালী জাতীয় দলের নেতা হিউজেনবার্গ পর্যন্ত এই দলের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে।

যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান—হিটলারের চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠান (১৯৩৩ সাল, ৩০শে জানুয়ারী)।

যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান সমর্থন—জাপানের শাংহাই অভিযান (১৯৩২-৩৩), পরে অপসারণ। পুনরায় ১৯৩৭ সালে চীনে অভিযান, বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত।

অষ্ট্রিয়ার অন্তর্দ্রোহ (১৯৩৪, ফেব্রুয়ারী)—পরে 'পকেট চ্যান্সেলর' ডলফাস নাৎসিদের হস্তে নিহত।

ইটালির আবিসিনিয়া অভিযান।

রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার (১৯৩৬, মার্চ)

স্পেনের বিপ্লব—সাধারণতন্ত্রী ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সংঘর্ষ আরম্ভ (১৯৩৬)।

হিটলারের অস্ট্রিয়া অধিকার (১৯৩৬, মার্চ)

চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার (১৯৩৮, অক্টোবর)।

মহাসমর সমাপ্ত হইবার পর এই সময়ে সর্বপ্রথম জার্মানীর ইতিহাসের পরিমাপ আরম্ভ হইল দিনের মাপ-কাঠিতে, কারণ রাষ্ট্রের অদল-বদল অতি দ্রুতগতিতে আসিতে লাগিল। সোসিয়ালিষ্ট মুলার গবর্ণমেণ্ট—যাহার লক্ষ্য ছিল **সকলের সহিতই মৈত্রী**ভাবাপন্ন থাকা—অতি অল্পকাল মধ্যেই **ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইল** এবং ব্রুনিং গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থান **গ্রহণ করিল।** রাইখষ্ট্যাগ নির্বাচনে নাজিগণ ১০৭টি আসন **অধিকার করিল**—একুন তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ভোটের ভিতর **চৌষট্টি লক্ষ** এক হাজার দুইশত ভোট নাজিগণ প্রাপ্ত হইল। **কাজেই** হিটলার আর ফন্ প্যাপেন্, ফন্ শ্লেইচর, ব্রুনিং—**ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী** রহিল না, তাঁহার স্থান হইল আরও উচ্চে **এবং স্বয়ং** হিণ্ডেন্‌বার্গের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হিটলার **প্রতিপন্ন হইল** এই সময়ে। ফন প্যাপেন গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল **মাত্র ১৭০** দিবস স্থায়ী হইল। ইহার পর গঠিত হইল ফন **শ্লেইচার** মন্ত্রিমণ্ডল—উহাও ৫৬ দিবসের বেশী স্থায়ী হইতে পারিল না। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলারের পদ অধিকার করিলেন।

পুনরায় সমর—এই সময়ে ইউরোপ ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশেও বিদেশী সংবাদের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্ট হইল—তিন বৎসরের মন্দা সারা বিশ্বকেই কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত করিল। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক সংবাদ সারা বিশ্বে পৌঁছিল—তাহা প্রথমত ছিল অতিশয় বিশৃংখল; তাহার পর কেবল সংবাদ আসিতে লাগিল—নির্মম ঘটনার, মধ্যযুগীয় বর্বরতাপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের আধুনিক উপায়, জার্মানীর গ্রন্থ-ভস্মসাৎ করণ, সেমিটিক বিরোধী বিপ্লব, **ইহুদি** নির্বাসন প্রভৃতির। রাজনীতিকগণের চালবাজির যে নিদর্শন পাওয়া গেল, তাহাতে মনে হইল তাহারা নির্যাতন ও নিপীড়নেই সিদ্ধহস্ত। যে দেশের নেতৃবর্গ প্রচারকার্য ভিন্ন **আর কিছুতে বিশ্বাসী নয়,** সে সকল হইতে আর কি আশা **করা যাইতে পারে।** মন্ত্রী গোবেল্‌স্ এই সময়ে বলেন,—**আগ্নেয়-গিরির মত অগ্নিস্রোত** নির্গমন, দেশময় ভীতির **প্রচার,** একদলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দান, সন্দেহ, ঘৃণা প্রভৃতির উদ্ভবের জন্য সেয়ানা কৌশল অবলম্বন—ইহাই **হইল** রাজনীতিকগণের অন্তরের নীতি।

আন্তর্জাতিক **এই** মতিগতির অন্তরালে এই বিশৃংখলার **আবরণে** ঢাকা সংবাদের অভ্যন্তরে তখন চলিয়াছিল বৃহত্তর **শক্তির** গতিবিধি। হিটলারের জার্মানী ঘোষণা করিল যে, **যুদ্ধোত্তর** যুগ শেষ হইয়াছে—এখন হইতে নূতন এক যুগের **সূচনা** হইল। ১৯৩২ সালে জাপান তাহার সাংহাই **অভিযানে** বিরাট বিরাট কামানের গর্জনে পুনরায় ঘোষণা **করিল** যে, যুদ্ধোত্তর যুগের অবসান হইয়াছে নিতান্তই। **সমস্যার পর** সমস্যা, বিপ্লবের আসন্নতা **এমনই** দ্রুততার **সহিত প্রবাহিত হইল** এবং তাহা **এমনই** খুঁটি-নাটি সহ সারা **বিশ্বে প্রচারিত** হইতে লাগিল যে, উহার আতঙ্ক, উহার **ভীষণতা সারা** বিশ্বেরই উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয় **হইয়া পড়িল।**

জাপানের **মাঞ্চুকুও** অধিকারের **জন্য লীগ অফ** নেশনস্-কর্তৃক নিন্দা ও উহাকে গর্হিত বলিয়া নির্দেশ; উহারই ফলে **যে** সমস্যার উদয়; উহার পরেই অষ্ট্রিয়ার অন্তর্বিপ্লবের ক্ষণ-স্থায়ী বিশৃংখলা, ডলফাস হত্যা, যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারের হত্যা, এবিসিনিয়া অভিযান সম্পর্কে মত-ভেদ ও মনোমালিন্য, রাইনল্যাণ্ড পুনরায় সশস্ত্রীকরণ, স্পেনের অন্তর্বিপ্লব, জার্মানীর অষ্ট্রিয়া অধিকার, সোভিয়েট ও জাপানে সুদূর প্রাচ্যে সংঘর্ষ, চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর হিটলারের হুমকি—অবশেষে মিউনিক চুক্তি। এই চুক্তির পূর্বে কয় সপ্তাহে ধাপ্পাবাজি, ভয় প্রদর্শন, বিদ্যুৎবেগে সৈন্য-পরিচালনা, শক্তি-প্রয়োগ ও শক্তি-প্রয়োগের হুমকি—কত যে ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা আধুনিক সংবাদপত্র পাঠক-পাঠিকাদের অবিদিত নাই। এই ২০ বৎসরের ভিতর এই কয় সপ্তাহে গিয়াছে ইউরোপের চরম আতঙ্ক—এই বুঝি আগুন জ্বলিয়া উঠে।

ইউরোপ আসন্ন সমরের বিভীষিকা হইতে কিছুটা মুক্তি পাইয়াছে বটে, কিন্তু সমর-সম্ভাব্যতা দূর হয় নাই। ইটালীর আলবানিয়া অধিকার এবং জার্মানীর পোল্যাণ্ড-করিডর লইয়া টানাটানি। চীনে তিয়েনসিন ব্রিটিশ কনসেশন জাপান কর্তৃক অবরোধ। অপরদিকে ইংরেজ ফরাসীর, সোভিয়েটের সহিত মৈত্রীর তিক্ত-বটিকা গলাধঃকরণ প্রক্রিয়া চলিয়াছে। সারা বিশ্ব উৎকণ্ঠিত দর্শকরূপে ইউরোপ-নাট্যের পট পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক ঘটনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয় যখনই উহাতে ভীষণতার স্পর্শ লাগে—আর চরম আতঙ্কময় হইয়া পড়ে সেই সময়ে; যেমন হইল পূর্বোক্ত কয়েক সপ্তাহে ইউরোপের পরিস্থিতিতে। বিশেষ করিয়া শ্যাংহাই এবং গার্ণিকায় বোমা-বর্ষণে গৃহহারা—বার্সিলোনা এবং প্রাগ হইতে পলাতক—ইহারা বিপদ ও দুর্দশার যে বিবরণ প্রদান করে, তাহাতে যাহারা সমরের হেতু জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের অন্তরে আনয়ন করে নিরতিশয় ভীতি এবং অপরিসীম উপায়হীনতার ভাব। দার্শনিক, অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক—সকলেই চেষ্টা করে ঘটনার অন্তর্নিহিত স্রোতটি উদ্ঘাটিত করিতে—চেষ্টা করে বিরোধী শক্তিসমূহের প্রবাহ-উৎস আবিষ্কার করিতে; কিন্তু পরিণতিতে যে বাস্তব সজীবতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার সহিত তুলনায় ঐ সকল ধুরন্ধরদিগের যৌক্তিকতা ও সংখ্যাতত্ত্ব নিতান্তই জড় বলিয়া প্রতিভাত হয়। আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও বিরোধের তাহারা নানাবিধ স্বতন্ত্র হেতুর উল্লেখ করে—(১) যাহাদের আছে ও যাহাদের নাই, এই দুই দলের প্রতিযোগিতা; (২) অথবা বিভিন্ন দেশের যাহা রহিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য নিজ রাজ্যের প্রসারবৃদ্ধি প্রয়াসীদের সহিত বিরোধিতা। (৩) বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী অথবা বিভিন্ন আদর্শবাদীদের পরস্পর রেষা-রেষি; আরও উল্লেখের বিষয় এই যে, সারা-বিশ্বের একটা মোটা অংশই আশা করে—গ্রেট-ব্রিটেন উহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের সহিত সকল বিরোধ মিটাইয়া শৃংখলা স্থাপন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে সারা-বিশ্বের একাংশ আবার ব্রিটেনের সেই প্রয়াসের পথে অন্তরায় সৃষ্টি **করিয়া বৃটেন ও উহার অনুসরণকারী বিশ্বাংশের সহিত সকল যোগাযোগ অবরুদ্ধ**

(শেষাংশ ৫৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরাজয়

(গল্প)

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য

কলেজের ছুটি হলে রেবা মিত্র লাইব্রেরীতে গিয়ে উঠল। কাল থেকে গরমের ছুটী সুরু হবে। আজ তাই ম্যাগাজিনটা সে নিতে এসেছে।

ম্যাগাজিনটা নিয়েই সে প্রথমে পড়ল প্রশান্ত কি লিখেছে। প্রশান্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী। পড়া-শুনায় প্রশান্ত প্রায় তার সমান নম্বর পায়। আর ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে সে প্রত্যেকবারই রেবাকে ছাড়িয়ে যায়। সকলেই প্রশান্তর প্রবন্ধের প্রশংসা করে। রেবা সেটা সহ্য করতে পারে না। সে চায় প্রশান্তর চেয়ে ভাল প্রবন্ধ এবং কবিতা লিখে নাম কিনতে। সেই-জন্য এবার সে অনেক বই ঘেঁটে পড়া-শুনার ক্ষতি করে রাত জেগে একটা ভাল প্রবন্ধ লিখেছে। ভেবেছিল প্রশান্তর চেয়ে তার লেখা এবার নিশ্চয়ই ভাল হবে। কিন্তু হায়! ম্যাগাজিন পেয়ে তাকে হতাশ হতে হ'ল। এবারও প্রশান্ত তার চেয়ে অনেক ভাল একটা প্রবন্ধ দিয়েছে। প্রবন্ধটা পড়ে তার মুখ গেল শুকিয়ে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল লাইব্রেরী থেকে। একটা রিক্সা করে হোষ্টেলে পেঁাছে নিজের ছোট্ট রুমটিতে গিয়ে ঢুকল।

রেবা মিত্র স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে পড়ে। এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠল। কলেজে সে প্রত্যেকবারই ভাল রেজাল্ট করে। বাপ একজন নামজাদা ডাক্তার বাহিরে থাকেন, তাই মেয়েকে হোষ্টেলে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। পড়াশুনায় ভাল বলে সমস্ত ছেলেমেয়ে তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, প্রফেসাররাও তাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। বড়লোকের মেয়ের মত তার চালচলন আদপেই ছিল না, সকলের সঙ্গে সে হেসে কথা বলত।

সেদিন কলেজ থেকে এসে সে নিজের ঘরে ঢুকল আর কারও সঙ্গে দেখা করল না। গরমের ছুটিতে বাড়ী যাবার জন্য অন্যান্য মেয়েরা নিজেদের বই পত্তর গুছাতে ব্যস্ত। তারা মনে করলে রেবাও বোধ হয় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সন্ধ্যার পর সবিতা, গীতা, ঊষা এসে ডাকল,—"রেবা আছ নাকি?"

ভিতর হতে কোন উত্তর এল না। রেবা তখনও প্রশান্তর লেখা প্রবন্ধটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল। পড়ছিল কিনা বোঝা যায় না। রেবাকে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখে তারা একসঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গীতা বললে—তোমার ভাই রাত-দিন পড়া। কাল-পরশু সব চলে যাব, কোথায় একটু গল্প করবে তা নয় একটা বই খুলে ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে আছে।

রেবা আস্তে আস্তে বললে—আজ শরীরটা তেমন ভাল নয়, তাই বেড়াতে বের হই নি।

—বই পড়লে বুঝি তোমার শরীর ভাল থাকে। বলি কি বই পড়া হচ্ছে?

—আজ ম্যাগাজিনটা পেলাম। তাই একটু দেখছি।

—প্রশান্তবাবুর লেখাটা এবার বেশ সুন্দর হয়েছে নয়?

রেবা কোনও উত্তর দিল না। তার মনে হতে লাগল প্রশান্ত তাকে অপমান করবার জন্যই এবার ম্যাগাজিনে এত সুন্দর একটা প্রবন্ধ দিয়েছে। হয়ত প্রশান্ত তার মনের সমস্ত কথা জানতে পেরেছে—তাই সে প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিশোধ নিলে। মেয়েরা রেবাকে আর বিরক্ত না করে নিজেদের ঘরে চলে গেল।

সেই রাত্রে রেবা ঘুমাতে পারল না। সারারাত সে প্রশান্তর কথা ভাবতে লাগল। অপমানে ও অভিমানে সে বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করতে লাগল। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু তন্দ্রার মধ্যেও সে দেখতে পেলে প্রশান্ত যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলছে—মিস মিত্র এবারও আপনাকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল।......

আজ কলেজের ছুটি হবে। লম্বা দুমাস ছুটি তাই সকলেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্যই ব্যস্ত। প্রশান্তও তার বন্ধুদের নিয়ে কমন-রুমের এক পাশে মজলিশ বসিয়েছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ম্যাগাজিন কমিটির সভ্য। প্রশান্তর লেখা সম্বন্ধে তারা আলোচনা করছিল। একজন বললে—এবার মিস মিত্রও কিন্তু মন্দ লেখেনি।

প্রশান্ত বললে—সত্য, মিস মিত্রের লেখার মধ্যে এবার যেন একটু নূতনত্ব আছে।

রবীন—অনেক বই ঘাঁটে। হবে না কেন বল?

সমীর—যা বলেছ রবি—দিন-রাত বই নিয়ে বসে থাকলে আমরাও ও রকম অনেক লিখতে পারতাম

প্রশান্ত—তা নয় সমীর। লেখাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম সকলেরই লিখতে গেলেই অনেক আকাশ-পাতাল ভাবতে হয়। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে আর বেশী ভাববার কিছু থাকে না.

রেবা কি দরকারে কমনরুমের দিকে আসছিল। প্রশান্তদের আড্ডা দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনছিল। প্রশান্ত তাকে দেখেই বলে উঠল—এই যে মিস্ মিত্র, আপনার লেখাটা পড়ে দেখলাম বেশ সুন্দর হয়েছে। আশা করি, আসছে বার আরও ভাল হবে। আপনি ত' বাড়ী যাবেন ছুটিতে?

—হাঁ। রেবা আর সেখানে দাঁড়াল না।

প্রশান্ত রেবার এই অশিষ্ট আচরণে আহত হয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গেল।

প্রশান্তর পিতা হরেন্দ্রলাল বসু কলিকাতার একজন বিখ্যাত এটর্নী। খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক। কিছুদিন তিনি কোন একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রশান্তর ছোটবেলা থেকেই গল্প লেখার দিকে একটু ঝোঁক বেশী। তাহার উপর মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করবারও যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে অল্প বয়সেই সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কলেজের প্রত্যেক ম্যাগাজিনে সে একটি করে প্রবন্ধ দেয়ই উপরন্তু কোন কোন মাসিক পত্রিকায়ও নাকি প্রায় গল্প এবং কবিতা প্রকাশ হয়। প্রশান্ত তার পিতার ন্যায় নিরীহ ও সরল প্রকৃতির মানুষ। ঐ গল্প লেখা ছাড়া তার আর কোনও নেশা ছিল না। উকিল ব্যারিষ্টার হবার

তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বরং সাহিত্যিক হতে পারলেই যেন সে একটু বেশী আনন্দিত হয়।

রেবা মিত্রের ব্যবহারে সে সত্যই একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল। সে ত' কোনও অন্যায় আচরণ করে নাই, যাহার জন্য সে ঐভাবে চলে যাবে। আবার ভাবতে লাগল হয়ত বা সে কিছু অন্যায় ব্যবহার করেছে যদি অন্যায়ই করে থাকে তা হলে পত্র লিখে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই ত' হয়। রেবার কাছে ক্ষমা চাইতে তার সঙ্কোচ করবার কিছু নাই। প্যাড ও কাগজ নিয়ে বসল চিঠি লিখতে। হায় কিভাবে সে পত্র আরম্ভ করবে। বাড়ীর সকলেই প্রশান্তকে দিয়ে পত্রাদি লিখিয়ে নেয়। প্রশান্তও পত্র লিখতে একজন ওস্তাদ। কিন্তু আজ মিস্ মিত্রকে চিঠি লিখতে বসে তার কলম সরতে চাইছে না।

প্রশান্তর আর চিঠি লেখা হল না। সে ঠিক করলে কাল সকালেই মিস্ মিত্রের সঙ্গে হোষ্টেলে দেখা করে জিজ্ঞাসা করবে যে সে কিছু অন্যায় ব্যবহার করেছে কিনা আর যদি করে থাকে ত' ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

সকালে রেবা ঘুম থেকে উঠেই শুনলে একজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেয়ারাকে বললে বাবুর নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে আসতে।

বেয়ারা একটা স্লিপ দিল। তাতে লেখা—"প্রশান্তকুমার বসু, ৩৬০২ বেচু চাটার্জি' লেন।" রেবা কাগজটা পড়েই ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললে। আর বেয়ারাকে বললে—বলগে দিদিমণি এখন কাজ করছে।

—কিন্তু উনি যে বললেন বিশেষ দরকার।

—না, দেখা হবে না—সময় নাই।

অগত্যা বেয়ারাকে পুরস্কারের আশা ছেড়ে দিয়ে বলতে হল দিদিমণি এখন দেখা করতে পারবেন না, বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করছেন।

সকাল বেলায় রেবার ঐরূপ রুক্ষগলা শুনিয়া পাশের ঘর হতে আরতি ঘোষ জিজ্ঞাসা করল—হাঁ ভাই সকাল বেলায় এত ঠাণ্ডায় মাথা গরম হল কেন? বলতে বলতে রেবার ঘরে এসে ঢুকল। আরতি বেথুনে পড়ে রেবার সঙ্গে তার খুব মেশামেশী। তাদের অতি গোপনীয় কথাও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। প্রশান্তর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য রেবার যে একমাত্র ইচ্ছা একথা কিন্তু সে কাহাকে বলে নাই, এমন কি আরতিকেও না। আর রেবা সেকথা চেপে রাখতে পারল না। বলল—প্রশান্তবাবু আজ একটু আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

—কে প্রশান্তবাবু?

আমাদের সঙ্গে পড়ে প্রশান্তকুমার বসু—হরেনবাবুর ছেলে।

—ওঃ বুঝেছি। বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিল। রেবা ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিল—ছাই বুঝেছ।

আরতি বলিল—কি হয়েছে বল, এত রাগ কিসের?

—প্রশান্তবাবু আমাকে প্রতিবারই অপমান করে। কাল সকলের সামনে কমনরুমে আমাকে অপমান করেছে। আবার আজ সকালেই ছুটে এসেছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি।

—প্রশান্তবাবু ত' ও প্রকৃতির লোক নয়। তুমি ভাই দেখা না করে ভাল কাজ করনি। তোমার লেখা ভাল হয়েছে বলাতে তোমার অপমান হল কোথায়? বরং তুমিই ত' তাকে অপমান করেছ তার সঙ্গে দেখা না করে।

—তুমি প্রশান্তবাবুকে চেন নাকি? কবে থেকে আলাপ হল?

—হাঁ। অনেক দিন আমি তাদের বাড়ী গিয়েছি। তার বাপ-মা আমাকে খুব ভালবাসেন। ওনারাও প্রায় আমাদের বাড়ী যান। প্রশান্তবাবু খুব ভাল লোক। এই বয়সেই এত সুন্দর প্রবন্ধ লেখে—

—থাক আর প্রশান্তবাবুর গুণগান করতে হবে না। আজ বাড়ী যাব। জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে নিতে হবে এখুনি।

—কটার গাড়ীতে যাবে বলে ঠিক করেছ?

—১২॥টার সময় এখান থেকে রওনা হতে হবে। তুমি কখন যাবে?

—আজ সন্ধ্যায়। ৮টার ট্রেনে।

বৈকালে আরতি ঠিক করলে প্রশান্তদের বাড়ী একটু দেখা করে আসবে। হোষ্টেলের সমস্ত মেয়েই বাড়ী চলে গেছে। রেবাও দুপুরের ট্রেনে চলে গেছে, একলা একলা তার ভাল লাগছিল না। তাই সে বেরিয়ে পড়ল খানিকটা ঘুরে আসতে। বেচু চাটার্জি লেনে ঢুকেই দেখলে প্রশান্ত বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে একটু ব্যস্তভাবে।

সে জিজ্ঞাসা করলে—কি প্রশান্তদা কোথায় চলেছ এত ব্যস্তভাবে?

—তোমাদের হোষ্টেলে মিস্ রেবা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে।

—সে ত' দুপুরের ট্রেনেই চলে গেছে। চল, তোমার সঙ্গে একটু দরকারী কথা আছে।

আরতি প্রশান্তর দূর সম্পর্কের মাসতুত বোন। রেবা সেকথা জানত না, তাই প্রশান্তর প্রতি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় সমস্তই তাকে খুলে বলেছিল। আরতি প্রশান্তর মা ও ছোট বোনের সঙ্গে দেখা করে প্রশান্তর পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রশান্তও সেই ঘরে বসে বসে কি ভাবছিল। আরতি প্রশান্তকে রেবার সমস্ত কথাই অকপটে বলল। শুনে প্রশান্ত হাসতে হাসতে বলল—আঃ! বাঁচলুম। আমি ভেবেছিলাম না জানি কি এমন অন্যায় কাজ করে ফেলেছি যার জন্য মিস্ মিত্র আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে ঘৃণা বোধ করলেন।.....

আবার কলেজের ম্যাগাজিন বাহির হবার সময় হল। এবার রেবা ভাবল প্রশান্ত আরও ভাল একটা প্রবন্ধ লিখবে। রেবা তাকে পরাজিত করবার জন্য লাইব্রেরী থেকে অনেক ভাল ভাল লেখকের বই আনিয়ে পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে কোটেশন তুলে নেয় তার প্রবন্ধের মধ্যে চালাবার জন্য। এবার তার প্রবন্ধ নিশ্চয় প্রশান্তর চেয়ে ভাল হবে। এবার সে প্রশান্তকে

উপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। যথাসময়ে ম্যাগাজিন বাহির হল। সকলে দেখল প্রশান্তর লেখা কোনও প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হয় নাই। রেবা ইহাতে একটু বেশী আশ্চর্য্য হল। এমন কি কারণ থাকতে পারে প্রশান্তর ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ প্রকাশ না করবার। প্রতিদ্বন্দ্বীই যদি না থাকল, তবে কেমন করে রেবা নিজের প্রবন্ধের তুলনা করবে। তবে কি প্রশান্ত জানতে পেরেছে রেবার মনের অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ। তাহাই বা কি করে সম্ভব।

আজ রেবা কিছুতেই স্বস্তি পায় না। ভাবে, ছুটে যাবে সে প্রশান্তদের বাড়ী। কিন্তু যে অপমান তাহাকে করা হয়েছে......না, রেবার পা ওঠে না। কিন্তু গেলেই হত ভাল।

কিছুক্ষণ কক্ষ মধ্যে পায়চারি করেও রেবার চাঞ্চল্য বাড়ে ছাড়া কমে না। কি করবে সে এখন। একটা কিছু তাহাকে করতেই হবে। অজানিতেই এক সময় সে পোষাক বদল করে ছাতাটি হাতে বাহির হয়ে পড়ে।

কোথায় কেন চলেছে রেবা, তাহা তাহার খেয়াল নাই। হেদুয়ার ধারে পৌঁছিয়া হুঁস হল পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে—রেবা যে, কোথায় যাচ্ছিস্? আরতির কণ্ঠস্বর।

রেবা তাকিয়ে দেখে আরতির সঙ্গীটি আর কেহ নয়—সেই প্রশান্ত! সহসা রেবার মুখে কোন জবাব জোগাল না।

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বলল—নমস্কার মিস্ মিত্র, আপনার এবারকার প্রবন্ধটা চমৎকার—কি থেটে...

রেবা উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়ে বলল—এবার আপনি ম্যাগাজিনে কিছু লেখেন নি যে?

—না, আর কলেজের ম্যাগাজিনে কিছু লিখ্‌বনা ঠিক করেছি।

প্রশান্তর এই কথা কয়টি রেবাকে চাবুকের মত আঘাত করল। পরাজয়ের শিহরণে রেবা সেইখানেই পড়ে যেত—হেদুয়া স্কোয়ারের রেলিং ঠেস দিয়ে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল।

কলেজের মেয়ে

(৫২৭ পৃষ্ঠার পর)

'আচ্ছা চল' বলিয়া অনাথ ধীরে ধীরে উপরে গিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুরমা তাহার বিছানা গুছাইয়া মশারি ফেলিয়া বিছানার পার্শ্বে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে। অনাথ একটু হাসি-হাসি-মুখে বলিল, আজ আবার একটু জ্বর হয়েছে; সেইজন্য রাত্রিতে কিছু খেলাম না। বোধ হয় সর্দ্দি জ্বর হবে।

সুরমা বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, শুয়ে পড়ুন।

দরজাটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েই শুয়ে পড়বো।

না, বন্ধ করতে হবে না, ভুঁদিরাম আজকে এই ঘরেই শোবে, আপনি শোন।

অনাথ বিছানায় বসিতেই সুরমা অনাথের কপালে এবং বুকে হাত দিয়া দেখিল জ্বর কতটা। সুরমা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না—তাপ আছে কি না!

নিজের হয়ত ভুল হইতে পারে মনে করিয়া ভুঁদিরামকে বলিল মনোহরকে ডাকিয়া দিতে।

মনোহর থার্মোমিটার দিয়া তাপ পাইলেন না। একটু তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন,—ও কিছুই নয়, বোধ হয় পরিশ্রম কিছু বেশী হয়েছে, কাল নাগাদ সেরে যাবে। তোমার খাওয়া হয়েছে সুরমা?

সুরমা হাঁ কি না কিছুই বলিল না।

মনোহর বলিল যাও উঠে যাও, রাত্রি অনেক হয়েছে যে! খেয়ে নাওগে। ও কিছুই নয়, সবারই এমন হয়।

সুরমা তথাপি উঠিল না। ভুঁদিরামকে বলিল, তামাক দে।

মনোহর একটু বিরক্তভাবেই চলিয়া গেল। অপর কক্ষে খুড়ীমাকে একটু উচ্চস্বরেই বলিল, আচ্ছা, বাড়ীর চাকর-বাকরের একটু কিছু হোক না হোক সুরমা অমন ক'রে মরে কেন? খুড়ীমা উত্তরে কি বলিলেন, তাহা যদিও এ-ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা গেল না, তথাপি মনোহর যাহা বলিলেন তাহা বজ্রাঘাতের ন্যায়ই অনাথের হৃদয় বিদ্ধ করিল। সুরমা চমকিত হইয়া অনাথের মুখের দিকে চাহিল।

অনাথ হুঁকাটি ভুঁদিরামের হাতে দিয়া শয়ন করিলে সুরমা বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, অসুখটা এখন আপনার কি.

বিশেষ কিছু নয় দিদি!

সুরমার মলিন মুখখানি আরও একটু যেন বিষন্ন হইয়া উঠিল, শুধাইল, রাত্রে কিছুই খাবেন না?

না, রাত্রিতে একটু টান দিলে কাল নাগাদ বোধ হয় সেরে যেতে পারে।

সুরমা মাথায় হাত দিয়া বলিল, মাথায় বেদনা কিছু আছে কি?

'না' বলিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেই সুরমা দেখিতে পাইল অনাথের চোখের কোণ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ঝি রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া বলিল, মা, চল্লাম।

সুরমা বলিল, যা।

ভুঁদিরাম অনাথের ঘরে বিছানা করিতে আরম্ভ করিল। অদৃষ্টের কি যে ভীষণ অভিসম্পাত, এই নিরাশ্রয় যুবকটির হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থিটিকে শিথিল এবং নিষ্পেষিত করিয়া ঝটিকাবর্ত্তের মত মর্ম্মপথে ছুটিতেছিল, মনোহর তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সুরমা বুঝিয়াছিল বলিয়াই ভাবিতে লাগিল,—এই পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীটিকে এমনভাবে জ্বালায় অব-লুণ্ঠিত করিল কিসে? আমার অর্ব্বাচীনতা? উপেক্ষা, না মনোহরের নিদারুণ শাস্তিশেল?

সুরমা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কাঠের পুতুলের মত শুষ্কনেত্রে আপনার গৃহে চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

দুর্ঘটনায় বিষে বিষক্ষয়

ফ্লোরিডা অঞ্চলের মিয়ামি শহর। ২১ বৎসর বয়স্ক এম্ ভি সোয়েইন্ তাহার মোটর হাঁকাইয়া চলিয়াছে। রাস্তার একটা মোড় ঘুরিয়া আসিতে পথচারীদের এড়াইতে তাহার মোটর যাইয়া ধাক্কা খায় এক টেলিগ্রাফ থামের সঙ্গে। এখন এই থামটিতে সংযুক্ত ছিল ফায়ার এলার্মের বাক্স। ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া গাড়ীখানা উল্টাইয়া যায়, আর সোয়েইন্ পড়ে তাহারই নীচে চাপা। এদিকে টেলিগ্রাফ থামে ঝুলান ফায়ার এলার্ম বাক্সটি সংঘর্ষের ফলে আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং এলার্ম বাজিতে থাকে সবেগে—ফায়ার ব্রিগেডের অফিসেও সেই এলার্ম সংশ্লিষ্ট সঙ্কেতধ্বনি হইতে থাকে। অগোণে ফায়ার ব্রিগেড দলের লোকেরা আসিয়া সোয়েইন্‌কে মোটরের নীচ হইতে উদ্ধার করে। দুর্ঘটনা আপনিই আপনার প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তবু সোয়েইন্ বেকসুর খালাস পায় না—কারণ সে উদ্ধারপ্রাপ্ত হওয়া মাত্র, কোথা হইতে পুলিশ আসিয়া হাজির হয় এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করে বেপরোয়া মোটর হাঁকাইবার অপরাধে।

অন্তর ধৌত-করণ

আমেরিকার টেনেসি অঞ্চলের ন্যাশভিল শহরের প্রেস্‌বিটারিয়ান গীর্জায় প্যাস্টর ডাঃ বার বক্তৃতা করিতেছিলেন—ইষ্টার উপলক্ষে সমগ্র শহর পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে, বাড়ীগুলি নূতন করিয়া রং করা চলিতেছে, আমাদের মনুষ্যসমাজেরও অন্তর পরিষ্কার করা উচিত। তিনি আবেগভরে দরাজ গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের অন্তর, আমাদের হৃদয়, আমাদের চিত্ত—ইহারও পরিষ্কার করা উচিত; কিন্তু কোন্ জিনিষ আমরা আমাদের অভ্যান্তরে প্রবিষ্ট করিলে আমাদের অন্তর পরিস্কৃত অমলিন হইবে?

একটি চারি বৎসরের বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া ফেলিল—দুধ! দুধ!

অদ্ভুত যোগাযোগ

মধ্য জার্মানীর এশ্লের্সলেবেন ষ্টেশন হইতে এক ব্যক্তি রেলে চাপে। সে যাইবে দক্ষিণ জার্মানীতে বেড়াইতে। ট্রেনে চাপিয়া টের পায় সে যে তাহার চশমা সে ফেলিয়া আসিয়াছে। ট্রেনখানি আবার যাইবে তাহার বাড়ী ঘেঁসিয়া। কাজেই সে জানালায় মুখ বাড়াইয়া রহিল—ইসারায় বাড়ীর লোকেদের জানাইবে, তাহার চশমা ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতে। ট্রেনখানি যেমন তাহার বাড়ীর পাশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অমনি কি কারণে হঠাৎ থামিয়া যায়। বিদায় জানাইতে লোকটির কন্যা একেবারে রেল লাইনের পাশে বাড়ীর বাগানের বেড়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে অমনি কন্যাকে চশমা জোড়া আনিতে বলিল। কন্যা দৌড়াইয়া চশমা আনিয়া দিল। আর সেই মুহূর্তেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

পরবর্তী ষ্টেশনে সন্ধান লইয়া জানা গেল—ঐ স্থানে আসিয়া ইঞ্জিনের কি একটা অংশ বিগড়াইয়া যায়। ড্রাইভার সোজা কাজ বলিয়া নিজেই তাহা সারিয়া লয়।

পুতুলকে পোষ্য গ্রহণের সুযোগ

লস্ এঞ্জেলস্‌য়ের যে কোন ছোট মেয়ে যে এত দরিদ্র যে পুতুল একটিও পায় না খেলা করিতে, তাহাকে পোষ্যরূপে পুতুল গ্রহণের সুবিধা দেওয়া হয় ঠিক যেমন বয়স্করা অনাথ বালকবালিকাকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

লস্ এঞ্জেলস্ কাউণ্টিতে এই চমৎকার ব্যবস্থাটি করা হইয়াছে গরীব মেয়েদের জন্য; ৩৬টি পুতুল বর্তমানে পোষ্য দিবার পদ্ধতিতে সারা কাউণ্টিতে বহন করা হইতেছে। ভ্রাম্যমান লইব্রেরী হইতে যেমন পুস্তক দেওয়া হয় পাঠ করিতে এবং পাঠান্তে নির্দিষ্ট দিনে ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার থাকে; এস্থলেও পুতুল পোষ্য দিবার দোকান সকল রহিয়াছে, উহারা ছোট ছোট মেয়েদিগকে পুতুল ধার দেয় ৭ হইতে ১৪ দিনের জন্য। ঐ ৭ বা ১৪ দিন পরে পুতুলটি ফিরাইয়া দিতে হয়, তখন ঐটি আবার অন্য এক মেয়েকে পোষ্য দেওয়া হয় অনুরূপ ৭ হইতে ১৪ দিনের জন্য।

এই প্রকার পুতুল পোষ্য পাইবার জন্য 'পুতুল পোষ্য দান' দোকান-লাইব্রেরীর মেম্বর হইতে হয়। তজ্জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র স্বাক্ষর করিবে পিতামাতা বা অভিভাবক। তখন মেয়েটির নামে কার্ড ইস্যু করা হয়। ঐ কার্ড দ্বারা সে নিকটস্থ পুতুল-দোকান-লাইব্রেরী হইতে পুতুল পোষ্য পাইবে। ২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মেয়ে পর্যন্ত এইরূপ মেম্বর হইতে অধিকারিণী।

শুধু ৭ হইতে ১৪ দিনের জন্য ধার দেওয়াই কিন্তু এই পুতুল-লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য নয়। পুনঃপুনঃ ধার দিয়া যখন দেখা যায় কোন মেয়ে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত পুতুলটি (একাধিকবারে) অতি যত্নের সহিত রাখিয়াছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে লাইব্রেরীতে ফেরৎ দিয়াছে—পুতুলের কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই, নিয়মও ভঙ্গ করা হয় নাই, তখন সেই মেয়েকে পুতুল স্থায়ী পোষ্য গ্রহণের ন্যায্য অধিকারিণী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ জানেন, কোনও পুতুল ছোট মেয়েদের হাতে পড়িলে উহাদের মমতা জন্মে, সেই পুতুলকে সে আর হাতছাড়া করিতে চাহে না। এইজন্য গরীব মেয়েদের এই অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থায়ী পোষ্য প্রদানের ব্যবস্থা।

পুতুল পোষ্য স্থায়ীভাবে গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া যখন মেয়ে স্থির হয়, তখন পোষ্য গ্রহণের দলিল লেখাপড়া হয়, তাহাতে অভিভাবক স্বাক্ষর করে, পুতুলটি মেয়েকে পোষ্য দেওয়া হয় চিরদিনের জন্য।

ছেলেমেয়েদের অভাব পরিপূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত কাউন্সিল শুধু পুতুলই পোষ্য প্রদান করে না, পোষাক-পরিচ্ছদ পুস্তক প্রভৃতি যাবতীয় অভাবই পূরণ করিয়া থাকে লস্ এঞ্জেলস্‌য়ের কাউণ্টির সকল অভাবগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের।

ব্রিটেনের সুখশান্তিপূর্ণ বিবাহ সংখ্যা

ব্রিটেনে কোন্ দম্পতি বিবাহদ্বারা সর্বাপেক্ষা সুখী ইহা নির্ধারণের জন্য 'ডেলি-এক্সপ্রেস' পত্রিকা সমগ্র দেশের বিবাহিতের নিকট হইতে ৩২টি প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করিয়াছে এবং কেন তাহাদের বিবাহ সর্বাপেক্ষা সফল তাহারা মনে করে, তাহার বিবরণ সহ একটি করিয়া রচনাও প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সকল রচনা ও উত্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত সারমর্ম প্রস্তুত করা হইয়াছে :—

২০ হইতে ৯২ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ৮০০০ এবং অধিক দম্পতি দাবী করে যে, তাহাদের বিবাহই সর্বাপেক্ষা সুখ-শান্তিপূর্ণ।

শ্রেণী-বিভাগের ফলে মনে হয়, একটি দম্পতিই সর্বাপেক্ষা সুখী- স্বামী ৩৬, আফিসে চাকুরিয়া, ৩০ বৎসর বয়স্কা নারীর সহিত বিবাহিত।

তাহারা পাঁচ বৎসর যাবৎ বিবাহিত (বহু সুখী দম্পতি মাত্র দুই বৎসর বিবাহিত) এবং তাহাদের একটি সন্তান জন্মিয়াছে। তাহাদের এনগেজমেণ্ট ছিল এক বৎসর স্থায়ী, তাহারও এক বৎসর পূর্ব হইতে তাহাদের পরিচয়। তাহাদের উভয়েরই বন্ধু-চক্র ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু পরিচয়ের পর একই রকমের বন্ধু-সমাজে তাহারা চলাফেরা করিতে থাকে।

তাহারা নিরাপত্তার জন্য বিবাহ করে নাই (২৬০ দম্পতি ঐ কারণে করিলেও), সঙ্গীহীন নিরালা জীবনের জন্যও নয় (এ কারণে বিবাহ করিয়াছে ২৩০টি দম্পতি) অথবা নিজ পরিবারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্যও নয়, (এ কারণে ৭৪ দম্পতি বিবাহিত)—তাহারা বিবাহ করিয়াছে অনুরাগ হইতে। (৭১৬০ দম্পতি প্রেমের জন্যই বিবাহিত)।

বিস্ময়ের বিষয় :—পত্নীদের তিনভাগের একভাগ বিবাহের পর চাকুরী লইয়াছে।

আরও আশ্চর্য :—পত্নীদের এক-পঞ্চম এখনও চাকুরী করিতেছে।

কিন্তু অধিকাংশই ঘরকন্নার কাজে স্থায়ী হইয়া আছে (যদিও প্রতি ৫জনে ২জন উহা পছন্দ করে না)।

সমগ্র ৮০০০ দম্পতির ভিতর ৬৪০০ দম্পতি অন্যের সহিত সংস্রবহীন গৃহে বাস করে, বাকি ১৬০০ বাস করে ফ্ল্যাটে, অন্য দম্পতি বা যে কোন লোকের সংস্রবে। যাহারা ঐ প্রকার নিরালায় গৃহে বাস করে—তাহাদের বাসগৃহ আবার এমন শহরে, যাহার লোক-সংখ্যা ৫০,০০০-এর কম হইবে না। তাহারা পিতামাতা বা শ্বশুরশাশুড়ীর ধারে কাছেও বাস করে না।

একই বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মিশিতে উভয়েই ভালবাসে, কিন্তু একই আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে না; ফলে দম্পতিদের সিকি অংশ পৃথক্ পৃথক্ আমোদ-প্রমোদ স্থানে গমন করে।

তাহা হইলেও প্রতি তিন দম্পতিতে দুই-জোড়া ভাবে উভয়ের আরও বেশী সময় একসঙ্গে কাটান উচিত।

অর্ধেকের বেশী বলিয়া থাকে তাহাদের বিবাহিত-জীবনে কোনও ঝগড়া-ঝাটি হয় নাই। যাহাদের কলহ হয়, তাহারা কেহ বলে সপ্তাহ আগে, কেহ বলে মাসখানেক আগে, কেহ বলে এক বছর আগে ঝগড়া হইয়াছিল।

টাকা-পয়সা, ছেলে-মেয়ে ও বন্ধু-বান্ধবী লইয়াই মনান্তর হয় এবং তাহাতে উভয়েই সমান সংখ্যায় দায়ী। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা কাহারও মনে স্থান পায় নাই।

পত্নীকে উপহার দিবার বেলা দেখা যায়, প্রতি চারজনের মধ্যে একজন স্বামী সপ্তাহে একবার উপহার দেয়; অনুরূপ-সংখ্যক স্বামী দেয় মাসে একবার; সমান-সংখ্যকই দেয় বৎসরে একবার; বাকি সকল স্বামী দেয় কদাচিৎ।

সমগ্র সংখ্যার আটভাগের একভাগ দম্পতি সন্তানহীন। পরিবারে এক হইতে বাইশটি পর্যন্ত সংখ্যায় দেখা যায়। একটি সন্তান হওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে যাহারা ছোট সংসার চাহে, তাহাদের ভিতর; কিন্তু যাহারা বেশী সন্তান চাহে, তাহাদের নিকট আটটি জনপ্রিয়।

৬৪৯টি দম্পতির সন্তান-সংখ্যা আট; ৪টি দম্পতির কেবল ৯টি সন্তান; ৬৪৮টি দম্পতির দশটি করিয়া সন্তান; এবং তিন দম্পতির দেখা যায় এগারটি করিয়া।

স্বামীদের বেশীর ভাগই বলে তাহাদের বেশ চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের ভিতর চাকুরিয়াই অধিকাংশ। তথাপি ২০১৫ জন পুরুষ বলে যে, কাজ-কর্ম ভাল চলিতেছে না। ১০৮টি পত্নী পুনরায় চাকুরীতে প্রবেশ করিতে চাহে এবং ৫১৪টি নিরালা জীবনের জন্য আক্ষেপ করে।

অর্ধেকের বেশী দম্পতিই মনে করে, আরও বেশী টাকা হইলেই তাহারা বেশী সুখী হইতে পারিত। কিন্তু অনেকেই সঠিক বলিতে পারে না, আর কত টাকা তাহাদের প্রয়োজন। অধিকাংশেরাই বলে আর বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড হইলে সুখী হয়। ২৭০ জন চাহে সপ্তাহে এক পাউণ্ড করিয়া বেশী; কেবল দুইজনের অতি উচ্চাশা—তাহারা চাহে বার্ষিক আরও ১,০০০ পাউণ্ড।

আশ্চর্যের বিষয় :—স্কটল্যাণ্ডের অর্ধেকের কম লোক চায় আরও বেশী টাকা, ইংলণ্ডে চায় অর্ধেকের বেশী লোক; ইহাদের সকলের আশার চরম সীমা হইল—বার্ষিক ৫০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত।

বেশীর ভাগ পরিবারেই দেখা যায়, এই ব্যবস্থা—স্বামী সকল টাকাই পত্নীর হাতে দেয়, কেবল হাতখরচার জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া। ইহার পর যাহা জনপ্রিয়, তাহা হইল ঘরকন্নার জন্য পত্নীকে নির্দিষ্ট একটা অঙ্ক প্রদান করা। কেবল ২৭০টি স্বামী স্ত্রীর হাতে টাকা না দিয়া স্ত্রীর ব্যয়ের বিলগুলি স্বতন্ত্র পরিশোধ করে।

তিনভাগের দুইভাগ দম্পতি স্বামী স্ত্রী আলাদা আলাদা নিজ নিজ পোষাক খরিদ করে। বাকি একভাগের ভিতর স্ত্রীই উভয়ের পরিচ্ছদ ক্রয় করে।

প্রাথমিক বিশ্লেষণে ইহাই পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা সুখী দম্পতি কোনটি, তাহা নির্ধারণের জন্য পুনরায় পর্যবেক্ষণ চলিতেছে। নির্ধারিত হইলে ঐ দম্পতিকে ২৫

পাউন্ড পুনরায় দেওয়া হইবে এবং সাতদিন লণ্ডনে ডেলি এক্সপ্রেসের অতিথিরূপে বাস করিতে আহ্বান করা হইবে। (A. C.)

টেলিফোন্ ব্যবহার

টেলিফোনের উপরই নিউইয়র্কের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। প্রত্যেকটি টেলিফোনে বৎসরে গড়পড়তা এক কোটি ডাক হয়। এই টেলিফোন বিভাগ চালাইবার জন্য ৩০,৯০৮ জন কর্মচারী আছে।

বিবাহ-আবাহনে মেলা

প্রতি বৎসর ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরে হুইটমানডেতে এক মেলা বসে। উহার উদ্দেশ্য বিবাহের সুযোগ আনয়ন করা। ৩৬ বৎসর পূর্বে এই মেলা প্রথম আরম্ভ করা হয়। সেইবার (আনুমানিক ১৯০৩ সাল) ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরের ৬০টি অবিবাহিত তরুণী এই মর্মে আমন্ত্রণ প্রেরণ করে নিকটবর্তী অঞ্চলে—

যেহেতু স্থানীয় তরুণেরা বিবাহে উদাসীন, আমরা আশা করি, আশপাশের অঞ্চলের তরুণেরা 'হুইটমানডেতে এখানে আসিয়া আমাদের সহিত কেক্ ও কাফি গ্রহণ করিবে, পরিণামে যাহাতে আমাদের ভিতর কতকগুলি বিবাহ-উৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

বর্তমানে বিবাহার্থিনী তরুণী ও আবেদনকারী তরুণের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তরুণীদের তরফ হইতে সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। এবং তরুণদের ভিতর প্রতারণাকারীদের সন্ধানের জন্য মেয়র স্বয়ং মেলার দিনে উপস্থিত থাকেন ও আবেদনপত্র পূর্বেও পর্যবেক্ষণ করেন। এই বৎসর ৩০০০ তরুণ আবেদনপত্র দাখিল করে মেলার ঐতিহ্য অনুসারে পত্নী মনোনয়ন করিবার জন্য। মেয়র উহার ভিতর হইতে ২০জনকে দেখিবামাত্রই ধরিয়া ফেলেন যে, উহারা পূর্বেই বিবাহিত।

বিবাহেচ্ছু তরুণীদের সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ম্যাডাময়সেল্ আইরিন্ টাসিগনন—নিজ সোসাইটি সদস্য ও মেয়রের সাহায্যে ঐ ৩০০০ আবেদনের ভিতর ৬০০খানি মনোনয়ন করেন। প্রেসিডেণ্টকে ঐ ৬০০ আবেদনকারীর প্রত্যেককে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে হয়। প্রেসিডেণ্ট ও মেয়র কর্তৃক মনোনয়ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইলে বিবাহ-মেলা আরম্ভ হয়।

শহরের বাজারে প্রকাণ্ড বড় একটি টেবিল স্থাপন করা হইয়াছিল। বিবাহেচ্ছু তরুণীগণ সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, মনোনীত তরুণগণ ঐ স্থানে দলে দলে যাইয়া উপস্থিত হয়। তরুণীরা তাহাদের কেক্ দেয়, কাফি পান করিতে দেয়। কথাবার্তা হাস্য-কৌতুক চলিতে থাকে।

তরুণীগণ এই ৬০০ তরুণের ভিতর হইতে আপন মনোমতটিকে বাছিয়া লয়। প্রথম সাক্ষাতে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় যথাযোগ্য এন্‌গেজমেণ্টের পথ প্রশস্ত করে এবং পরিণামে বিবাহ-বন্ধনে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা

বাথ্ শহরে টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট্ কন্‌ফারেন্স ১লা জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রদর্শনী বিভাগে কটন্, উল, সিল্ক এবং লিনেন্ এই সকলের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপাদানে তৈরী ঐ সকলের নকল তন্তু ও উহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। টেনেসি হইতে সমাগত ডাঃ হ্যারাল্ড ডি উইট্ স্মিথ্ গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—স্বাভাবিক গ্যাস হইতে বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত মোজা সিল্কের তৈরী মোজা হইতে অনেক বেশী টেঁক্সই।

এই প্রদর্শনীতে আরও অনেক কৃত্রিম বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—ইটালী হইতে প্রেরিত 'হেম্প' দ্বারা প্রস্তুত লিনেন্ চমৎকার জিনিষ হইয়াছে। মাখন তোলা দুধ হইতে নির্মিত নানা প্রকার বস্ত্রও সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে'

স্বামীর নিষ্ঠুরতার তালিকা

হাইগেট ডোমেষ্টিক্ কোর্টে মিসিস পেপিস তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আনয়ন করে। প্রমাণস্বরূপ সে তাহার ডায়েরী আদালতে দাখিল করে। সে বলে—"আমাদের বিবাহের পর হইতেই আমি এই ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বামী আমার প্রতি যতবার নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, তাহার সকল ব্যাপারেরই ইহাতে উল্লেখ আছে।"

তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ডায়েরীতে স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন অন্য কিছু সে লিখিয়া রাখিয়াছে কি না। উত্তরে সে বলে—"উহা ছাড়া আর লিখিবার মত কোনও আচরণই ছিল না। কারণ সাক্ষাৎ হইলে স্বামী নিষ্ঠুরতা ভিন্ন অন্য কোন আচরণ করে নাই।"

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(৬)

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পরের কথা। 'খোকন, ও খোকন' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে হলধর প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁর মনে হইল কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো অন্তত দু'মণ ওজনের একটা পদার্থ তীর বেগে তাঁর মাথার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মস্তক রক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই রায় বাহাদুর মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল, উট্টাম।

হলধরের প্রবেশ, মেজেয় উপবেশন এবং উট্টামকে ডাকা এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল নিমেষের মধ্যে।

একে'ত ঘর অন্ধকার, তার উপর প্রকাশ দোল খাইতেছিল সাধকের তীব্র একাগ্রতার সহিত তাই মাতামহের উপস্থিতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই। সে ভাবিতেছিল, সিনেমার সেই সুন্দরীর কথা। মেয়েরা অতিরিক্ত মেদক্রান্ত লোক পছন্দ করে না, তাই প্রকাশের এই উদগ্র প্রয়াস। প্রেমে পড়ার দিন হইতেই সে দোল খাইতেছে এবং ব্যায়াম চর্চা করিতেছে নানাপ্রকার।

রায় বাহাদুর আবার ডাকিলেন, উট্টাম।

প্রকাশ বলিল, কে? দাদু?

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া হলধর বলিলেন, অল বস্—বলতে হয় যে তুমিই ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলছ।

গতি বেগ কমাইতে কমাইতে প্রকাশ বলিল, ব্রেক কষ্‌ছি।

হঠাৎ ব্যায়াম আরম্ভ ক'রেছ, ব্যাপার কি?

প্রকাশ পাকা তালের মতন ঝুপ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সুইচ্‌টা টিপিয়া দিলে, হলধর বলিলেন, একেবারে যে ঘর্মাক্ত কলেবর!

মেয়েরা fat পছন্দ করে না।

নারীর মতানুযায়ী চলতে আরম্ভ করলে কবে থেকে! তুমি ত ছিলে নারীদ্বেষী।

She is divine (সে একেবারে দেবী)।

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, পটীয়সীটি কে যে তোমার মনে দাগ কেটেছে। কলেজের কোন ছাত্রী বুঝি?

আমি তাকে চিনি না।

অল্ বস্, না চিনেই প্রেম, একেবারে আরব্যোপন্যাস।

একটু পরে রায় বাহাদুর কহিলেন, যাক এতদিনে আমার উপযুক্ত নাতি হ'তে পেরেছ?

তার মানে, দাদু?

শোননি? আমিও লভে পড়েছিলাম, ভাই। তোমার দিদিমাকে দেখে ডিপ্ লভ্ হ'ল। তার স্কুলের গাড়ী যে রাস্তা দিয়ে যেত আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

চিনতে না তাঁকে?

আলাপ ছিল না, তবে পরিচয় জানতাম।

তাহলে অবস্থা আমার চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল। আমি ত' পরিচয়ও জানি না।

এটা আরও বেশী রোম্যান্টিক। যত কৃচ্ছ্রসাধন, ফল ততই মিষ্টি।

তোমার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল?

নিশ্চয়, বাবা বললেন ওরা কুলে খাটো, ওখানে তোমার বিয়ে হবে না। আর তোমার দিদিমার বাবা বললেন, এম-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেলে মেয়েকে তোমার হাতে দিতে পারি।

বলে কি, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস! পিতার অমত এবং ভাবী-শ্বশুরের সর্ত্ত আমাকে অকূল-পাথারে ফেলে দিলে। জীবনে ফার্ষ্ট ক্লাস নম্বর কখনও পাইনি, তাতে আবার এম-এ পরীক্ষা। পরীক্ষারও মাত্র পাঁচ মাস বাকী, ভাবলাম পরের বার দেব কিন্তু বিলম্বও সহ্য হয় না।

প্রেম শেষটায় অসাধ্য সাধন করল, চিরকালের আড্ডাধারী আমি ষোল ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষায় হ'লাম ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড।

জয়ী হ'লে দুটোতেই?

অল্ ফর লভ। জীবনের ধারাই গেল বদলে। ডেপুটি-সিপ্ পরীক্ষায়ও ভাল ফল করলাম। কেউ আশা করতে পারেনি হলধর এতটা করবে। উট্টাম।

উট্টাম আসিলে হলধর কহিলেন, আজ রাত্রে খোকনবাবু আমার সঙ্গে খাবেন।

রাত্রে ডিনারের টেবিলে হলধর দৌহিত্রকে কহিলেন, বেশেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখছি।

প্রকাশ একটু হাসিল।

চুল ছেঁটেছ কোথায়?

সেলুনে—

টিকিটা আছে'ত?

হ্যাঁ দাদু।

খুব ভাল করেছ। একটু থামিয়া রায় বাহাদুর আবার বলিলেন, আজ আমি তোমার সেই অজানার স্বাস্থ্য পান করব।

আশীর্বাদ করলেই যথেষ্ট হবে।

ও সব সেকেলে কথা।

জ্যোতিষী বলেছেন—

অল্ রট্। আবার জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মাত্রকেই বোগাস মনে করি। ওদের কাউকে আসামীর ডকে পেলেই আমি জেলে পাঠাতাম।

কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেছেন, তার সন্ধান পাব।

মেয়েটির ঠিকানা বলে দিলেন না কেন?

তিনি বলেন, রাস্তার ইংরেজী নামের সঙ্গে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের —

বোগাস্। তুমি মোটরের নম্বরটা ত টুকে নিলে পারতে।

নিয়েছিলাম, ভুল নম্বর।

উঁউ আর এ ফুল।

প্রকাশ নীরব।

রায় বাহাদুর বলিলেন, খোঁজ কর, যত টাকা লাগে আমার চেক বই সই করে তোমায় দিয়ে দেব। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। রক্তের ধারা তুমি বজায় রেখেছ। যেনাস্য পিতরো যাতাঃ —

পাউণ্ড পুনরায় দেওয়া হইবে এবং সাতদিন লণ্ডনে ডেলি এক্সপ্রেসের অতিথিরূপে বাস করিতে আহ্বান করা হইবে। (A. C.)

টেলিফোন্ ব্যবহার

টেলিফোনের উপরই নিউইয়র্কের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। প্রত্যেকটি টেলিফোনে বৎসরে গড়পড়তা এক কোটি ডাক হয়। এই টেলিফোন বিভাগ চালাইবার জন্য ৩০,৯০৮ জন কর্মচারী আছে।

বিবাহ-আবাহনে মেলা

প্রতি বৎসর ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরে হুইটমানডেতে এক মেলা বসে। উহার উদ্দেশ্য বিবাহের সুযোগ আনয়ন করা। ৩৬ বৎসর পূর্বে এই মেলা প্রথম আরম্ভ করা হয়। সেইবার (আনুমানিক ১৯০৩ সাল) ইউসিনস্ লেলেইংস্ শহরের ৬০টি অবিবাহিত তরুণী এই মর্মে আমন্ত্রণ প্রেরণ করে নিকটবর্তী অঞ্চলে—

যেহেতু স্থানীয় তরুণেরা বিবাহে উদাসীন, আমরা আশা করি, আশপাশের অঞ্চলের তরুণেরা 'হুইটমানডে'তে এখানে আসিয়া আমাদের সহিত কেক্ ও কাফি গ্রহণ করিবে, পরিণামে যাহাতে আমাদের ভিতর কতকগুলি বিবাহ-উৎসব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

বর্তমানে বিবাহার্থিনী তরুণী ও আবেদনকারী তরুণের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তরুণীদের তরফ হইতে সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। এবং তরুণদের ভিতর প্রতারণাকারীদের সন্ধানের জন্য মেয়র স্বয়ং মেলার দিনে উপস্থিত থাকেন ও আবেদনপত্র পূর্বেও পর্যবেক্ষণ করেন। এই বৎসর ৩০০০ তরুণ আবেদনপত্র দাখিল করে মেলার ঐতিহ্য অনুসারে পত্নী মনোনয়ন করিবার জন্য। মেয়র উহার ভিতর হইতে ২০জনকে দেখিবামাত্রই ধরিয়া ফেলেন যে, উহারা পূর্বেই বিবাহিত।

বিবাহেচ্ছু তরুণীদের সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ম্যাডাময়সেল্ আইরিন্ ট্যাসিগনন—নিজ সোসাইটি সদস্য ও মেয়রের সাহায্যে ঐ ৩০০০ আবেদনের ভিতর ৬০০খানি মনোনয়ন করেন। প্রেসিডেণ্টকে ঐ ৬০০ আবেদনকারীর প্রত্যেককে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে হয়। প্রেসিডেণ্ট ও মেয়র কর্তৃক মনোনয়ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইলে বিবাহ-মেলা আরম্ভ হয়।

শহরের বাজারে প্রকাণ্ড বড় একটি টেবিল স্থাপন করা হইয়াছিল। বিবাহেচ্ছু তরুণীগণ সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, মনোনীত তরুণগণ ঐ স্থানে দলে দলে যাইয়া উপস্থিত হয়। তরুণীরা তাহাদের কেক্ দেয়, কাফি পান করিতে দেয়। কথাবার্তা হাস্য-কৌতুক চলিতে থাকে।

তরুণীগণ এই ৬০০ তরুণের ভিতর হইতে আপন মনোমতটিকে বাছিয়া লয়। প্রথম সাক্ষাতে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় যথাযোগ্য এন্‌গেজমেণ্টের পথ প্রশস্ত করে এবং পরিণামে বিবাহ-বন্ধনে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা

বাথ্ শহরে টেক্‌স্‌টাইল ইন্‌স্টিটিউট্ কন্‌ফারেন্স ১লা জুন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রদর্শনী বিভাগে কটন্, উল, সিল্ক এবং লিনেন্ এই সকলের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য কৃত্রিম উপাদানে তৈরী ঐ সকলের নকল তন্তু ও উহা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। টেনেসি হইতে সমাগত ডাঃ হ্যারাল্ড ডি উইট্ স্মিথ্ গ্যাস্ হইতে প্রস্তুত মোজা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—স্বাভাবিক গ্যাস্ হইতে বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত মোজা সিল্কের তৈরী মোজা হইতে অনেক বেশী টেঁক্‌সই।

এই প্রদর্শনীতে আরও অনেক কৃত্রিম বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—ইটালী হইতে প্রেরিত 'হেম্প' দ্বারা প্রস্তুত লিনেন্ চমৎকার জিনিষ হইয়াছে। মাখন তোলা দুধ হইতে নির্মিত নানা প্রকার বস্ত্রও সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে'

স্বামীর নিষ্ঠুরতার তালিকা

হাইগেট ডোমেষ্টিক্ কোর্টে মিসিস পেপিস তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আনয়ন করে। প্রমাণস্বরূপ সে তাহার ডায়েরী আদালতে দাখিল করে। সে বলে—"আমাদের বিবাহের পর হইতেই আমি এই ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বামী আমার প্রতি যতবার নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, তাহার সকল ব্যাপারেরই ইহাতে উল্লেখ আছে।"

তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ডায়েরীতে স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন অন্য কিছু সে লিখিয়া রাখিয়াছে কি না। উত্তরে সে বলে—"উহা ছাড়া আর লিখিবার মত কোনও আচরণই ছিল না। কারণ সাক্ষাৎ হইলে স্বামী নিষ্ঠুরতা ভিন্ন অন্য কোন আচরণ করে নাই।"

(উপন্যাস পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

(৬)

সেই দিনই সন্ধ্যার একটু পরের কথা। 'খোকন, ও খোকন' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে হলধর প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁর মনে হইল কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো অন্তত দুমণ ওজনের একটা পদার্থ তীর বেগে তাঁর মাথার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মস্তক রক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই রায় বাহাদুর মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল, উট্রাম।

হলধরের প্রবেশ, মেজেয় উপবেশন এবং উট্রামকে ডাকা এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল নিমেষের মধ্যে।

একে'ত ঘর অন্ধকার, তার উপর প্রকাশ দোল খাইতেছিল সাধকের তীব্র একগ্রতার সহিত তাই মাতামহের উপস্থিতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই। সে ভাবিতেছিল, সিনেমার সেই সুন্দরীর কথা। মেয়েরা অতিরিক্ত মেদক্রান্ত লোক পছন্দ করে না, তাই প্রকাশের এই উদগ্র প্রয়াস। প্রেমে পড়ার দিন হইতেই সে দোল খাইতেছে এবং ব্যায়াম চর্চা করিতেছে নানাপ্রকার।

রায় বাহাদুর আবার ডাকিলেন, উট্রাম।

প্রকাশ বলিল, কে? দাদু?

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া হলধর বলিলেন, অল বস্— বলতে হয় যে তুমিই ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত দুলছ।

গতি বেগ কমাইতে কমাইতে প্রকাশ বলিল, ব্রেক কষ্‌ছি।

হঠাৎ ব্যায়াম আরম্ভ ক'রেছ, ব্যাপার কি?

প্রকাশ পাকা তালের মতন ঝুপ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সুইচ্‌টা টিপিয়া দিলে, হলধর বলিলেন, একেবারে যে ঘর্মাক্ত কলেবর!

মেয়েরা fat পছন্দ করে না।

নারীর মতানুযায়ী চলতে আরম্ভ করলে কবে থেকে? তুমি ত ছিলে নারীদ্বেষী।

She is divine (সে একেবারে দেবী)।

হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, পটীয়সীটি কে যে তোমার মনে দাগ কেটেছে। কলেজের কোন ছাত্রী বুঝি?

আমি তাকে চিনি না।

অল্ বস্, না চিনেই প্রেম, একেবারে আরব্যোপন্যাস।

একটু পরে রায় বাহাদুর কহিলেন, যাক্ এতদিনে আমার উপযুক্ত নাতি হ'তে পেরেছ?

তার মানে, দাদু?

শোননি? আমিও লভে পড়েছিলাম, ভাই। তোমার দিদিমাকে দেখে ডিপ্ লভ্ হ'ল। তার স্কুলের গাড়ী যে রাস্তা দিয়ে যেত আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

চিনতে না তাঁকে?

আলাপ ছিল না, তবে পরিচয় জানতাম।

তা'হলে অবস্থা আমার চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল। আমি ত' পরিচয়ও জানি না।

এটা আরও বেশী রোম্যাণ্টিক। যত কৃচ্ছ্রসাধন, ফল ততই মিষ্টি।

তোমার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল?

নিশ্চয়, বাবা বললেন ওরা কুলে খাটো, ওখানে তোমার বিয়ে হবে না। আর তোমার দিদিমার বাবা বললেন, এম-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেলে মেয়েকে তোমার হাতে দিতে পারি।

বলে কি, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস! পিতার অমত এবং ভাবী-শ্বশুরের সর্ত আমাকে অকুল-পাথারে ফেলে দিলে। জীবনে ফার্ষ্ট ক্লাস নম্বর কখনও পাইনি, তাতে আবার এম-এ পরীক্ষা। পরীক্ষারও মাত্র পাঁচ মাস বাকী, ভাবলাম পরের বার দেব কিন্তু বিলম্বও সহ্য হয় না।

প্রেম শেষটায় অসাধ্য সাধন করল, চিরকালের আড্ডাধারী আমি ষোল ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষায় হ'লাম ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড।

জয়ী হ'লে দুটোতেই?

অল্ ফর লভ। জীবনের ধারাই গেল বদলে। ডেপুটি-সিপ্ পরীক্ষায়ও ভাল ফল করলাম। কেউ আশা করতে পারেনি হলধর এতটা করবে। উট্রাম।

উট্রাম আসিলে হলধর কহিলেন, আজ রাত্রে খোকনবাবু আমার সঙ্গে খাবেন।

রাত্রে ডিনারের টেবিলে হলধর দৌহিত্রকে কহিলেন, বেশেরও পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।

প্রকাশ একটু হাসিল।

চুল ছেঁটেছ কোথায়?

সেলুনে—

টিকিটা আছেত?

হ্যাঁ দাদু।

খুব ভাল করেছ। একটু থামিয়া রায় বাহাদুর আবার বলিলেন, আজ আমি তোমার সেই অজানার স্বাস্থ্য পান করব।

আশীর্বাদ করলেই যথেষ্ট হবে।

ও সব সেকেলে কথা।

জ্যোতিষী বলেছেন—

অল্ রট্। আবার জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মাত্রকেই বোগাস মনে করি। ওদের কাউকে আসামীর ডকে পেলেই আমি জেলে পাঠাতাম।

কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেছেন, তার সন্ধান পাব।

মেয়েটির ঠিকানা বলে দিলেন না কেন?

তিনি বলেন, রাস্তার ইংরেজী নামের সঙ্গে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের—

বোগাস। তুমি মোটরের নম্বরটা ত টুকে নিলে পারতে।

নিয়েছিলাম, ভুল নম্বর।

ইউ আর এ ফুল।

প্রকাশ নীরব।

রায় বাহাদুর বলিলেন, খোঁজ কর, যত টাকা লাগে আমার চেক বই সই করে তোমায় দিয়ে দেব। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। রক্তের ধারা তুমি বজায় রেখেছ। যেনাস্য পিতরো যাতাঃ—

রায় বাহাদুরের মাথাটা একটু একটু টলিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, কিন্তু ভুলে যেওনা তুমি একজন গোয়েন্দা।

ভুলিনি, আজই গিয়েছিলাম তরুণ চৌধুরীর বাড়ীতে।

কিছু খোঁজ পেলে?

এই সময় ট্রের উপর একখানা কার্ড লইয়া উট্রাম আসিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল। প্রকাশ কার্ডখানা তুলিয়া লইয়া পড়িল,—

তরুণ চৌধুরী—

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সম্পাদক, জহুলদর্চি, সহ-সম্পাদক, মঙ্গল ভেরী, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক—কিশোর চন্দ্রিকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

রায় বাহাদুর কহিলেন, ভিতরে নিয়ে এস, উট্রাম।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলে এসেছি রায় বাহাদুর, বলিয়া স্মিতমুখে তরুণ ঘরে প্রবেশ করিল।

তার মুখের মাঝখানটায় অর্ধ-দগ্ধ বর্মা, গায়ে নতুন ধরণের কলার তোলা ইস্ত্রি করা সার্ট।

তরুণের প্রকাশের দিকে চোখ পড়ায় সে বলিল, নমস্কার, আপনি এখানে?

প্রকাশ প্রতিনমস্কার করিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন, উনি আমার দৌহিত্র প্রকাশ মুখোপাধ্যায়।

তরুণ বলিল, আমি এসেছি একখানা চিঠি দেখাতে। রুশ সাহিত্যিক নিকিটিন লিখেছেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন, ভাল কথা, কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়, অল্ রট্—

তরুণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াই চলিল, আজকাল বাঙালীরা রুশ-রাজনীতি, রুশ-সমাজ এই সব নিয়েই পাগল। তাই স্থির করেছি নিকিটিনের তর্জমা করব। তিনি অনুমতি পাঠিয়েছেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, নিকিটিনের নাম শুনেছি বলে ত' মনে পড়ে না।

তরুণ কহিল, মস্ত বড় লেখক। অবশ্য বড় না হইলেও ক্ষতি ছিল না। রুশ নামেরই মোহ আছে, শুনুন তবে একটা ঘটনা।

কোন বিখ্যাত কাগজ সম্পাদক আমার নাম করা গল্প 'লণ্ঠন' ফিরিয়ে দেন। আবার সেই কাগজেই লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম ভসিকভের তর্জমা বলে। গল্পটা পরের মাসেই বেরুল। দক্ষিণাও পেলাম।

রায় বাহাদুর কহিলেন, অল্ বস্, ভাগ্যবিপর্যয় কই তরুণ, আমার না জমিদারের?

তার মানে?

মাত্র একশত কুড়ি পাতার বই পেয়েছি।

তরুণ বলিল, আমি ইন্‌সিওর করে তিনশত পঞ্চাশ পাতার পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি। সাড়ে তিনশ' পাতার ও একশ' কুড়ি পাতার বইর ইন্‌সিওরের খরচারও তফাৎ আছে।

রায় বাহাদুর বলিলেন, তাহলেত দেখছি অল্ বস্, এখান থেকেই চুরি হয়েছে।

তরুণ প্রশ্ন করিল, কবে টের পেলেন?

যে দিন এসেছে তার পরদিন। পার্শেলটা কে খুলেছিল তাও আমার মনে নাই। সম্ভবত উট্রামই খুলে থাকবে। সে মাতাল হলেও বিশ্বাসী লোক। পরের দিন ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

তরুণ কহিল, এত ম্যাজিক রায় বাহাদুর।

ম্যাজিক নয়, অল্ রট্। নিশ্চয়ই কোন গবেষকের কাজ। I shall send them to Jail (আমি তাদের জেলে দেব) যাক্, তোমার কি চাই, বিয়ার না হুইস্কি?

বিয়ারই ভাল।

একটু পরে উট্রাম গেলাসে বিয়ার ঢালিতে আরম্ভ করিলে তরুণ জিজ্ঞাসা করিল, চাবী?

হ্যাঁ।

চাবী মার্কা বিয়ারই আমার পছন্দ। কিং অব বিয়ারস্। আপনি কি পছন্দ করেন, প্রকাশ বাবু?

রায় বাহাদুর কহিলেন, উনি টিটোটেলর।

খুব আনন্দের বিষয়। কেন না। ঐ জিনিষটা বাজারে দুর্লভ।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের কথা বলছ?

টিটোটেলরের কথা।

একটু পরে ফাউল রোষ্ট আসিলে তরুণ পরম আনন্দে তার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, তোমাকে এই বইর অনুসন্ধান করতে হবে, তরুণ, প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকদের কাউকে আমি চিনি না।

তরুণ বলিল, আপনার কোন আদেশ পালন ক'রতে পারা ত' সৌভাগ্যের বিষয়।

খরচা যা লাগে নিসেক্রেটারী চেয়ে নিও।

না, না সে কি কথা? আপনি আমার পরম উপকারী পৃষ্ঠপোষক।

ততক্ষণ বিয়ারের বোতলটা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাকিলেন, উট্রাম।

উট্রাম আরও দুইদিন তরুণকে দেখিয়াছে। সে একেবারে দুইটা বোতল লইয়া আসিল। তরুণের গেলাসে বিয়ার ঢালিতে ঢালিতে বলিল, আইস্‌ড্ বিয়ার।

আইস্‌ড্ বিয়ারই আমার পছন্দ।

উট্রাম একটু মুচকি হাসিল।

খাওয়া শেষ হইলে প্রকাশ উঠিয়া গেল।

রায় বাহাদুর ও তরুণ গল্প করিতে লাগিলেন। দুজনে এক একবার গেলাসে চুমুক দেন আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কি করিয়া ভূস্বামীর ভাগ্য বিপর্যয়ের অপহৃত অংশ উদ্ধার করা যায়, সে সম্বন্ধেই আলোচনা হইল অনেকক্ষণ। উভয়েরই ধারণা এই চুরির পিছনে কোন মাথাওয়ালা লোক আছে।

তরুণ কহিল, সাহিত্য বাতিকগ্রস্তদেরই এই কাজ।

বাতিকগ্রস্ত বল না তরুণ, আমরাও যে ঐ পর্যায়ে পড়ে যাই।

তা বটে, ক্ষমা করবেন, রায় বাহাদুর।

কথায় কথায় তরুণ কহিল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আপনার বৌমা বলছিলেন, তোমার দাদার জন্য কিছু রসকলি নিয়ে যাও।

রসকলি?

আমাদের পরিবারের একটা বিশিষ্ট খাবার। ফ্যামিলিটা পুরানো কি না, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই একটা বিশেষত্ব আছে।

ভাল কথা, একদিন তোমার রসকলি নিয়ে এস। মেয়েদের তৈরী খাবার অনেক কাল খাই না।

একদিন সুসঙ্গের মহারাজাকে রসকলি দেই। তারপর তিনি প্রায়ই বলতেন, কই আর রসকলি খাওয়ালে না? যেমন তোমার লেখা, তেমনি রসকলি—দুটোই পরম উপাদেয়।

রায় বাহাদুর কহিলেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। একটু পরেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহিত্যিক বলে আমার কিছু খ্যাতি হয়েছে?

ক্রমশ হচ্ছে।

আমার 'জ্ঞান দাস' পড়ে বোধ হয় লোকে মুগ্ধ হয়েছে।

ঠিক বলেছেন।

প্রকাশ বলছিল, 'মোশ্লেম বৈষ্ণব কবি'টা নাকি খুব উঁচু দরের লেখা।

হ্যাঁ। উনি আপনার উপযুক্ত দৌহিত্র।

রায় বাহাদুর বলিলেন, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এম-এ।

তরুণ বলিল, তাছাড়া সাহিত্য-রসিক।

ইংরেজীর প্রফেসার বটে কিন্তু সাহিত্য-রসিক বলা চলে না।

তরুণের মনে হইল, তবে কি রায় বাহাদুর তাকে সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধানের জন্য প্রকাশকে তার বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন? সে একবার ভাবিল যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা না বলাই ভাল। কিন্তু টাকারও ত দরকার।

রায় বাহাদুর বলিলেন, কি ভাবছ তরুণ? Out with it

ডাক্তার বলেছেন, আপনার বৌমাকে টনিক খাওয়াতে।

টনিক খাওয়ান ভাল।

দাম বড্ড বেশী।

তার জন্য ভেব না।

তা' জানি, আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম।

টনিকের দাম কত?

সাড়ে ন'টাকা বোতল।

তরুণ।

আজ্ঞে।

তুমি গোয়েন্দা।

তরুণ রায় বাহাদুরের দিকে চাহিল।

আমি তোমায় নিযুক্ত করছি।

আমার সৌভাগ্য।

ভূস্বামীর ভাগ্য-বিপর্যয় সম্বন্ধে।

তরুণ দেখিল, তার অনুমান মিথ্যা। সন্দেহ করিলে হলধর বার বার তাকে অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করিতেন না। সে কহিল, নিশ্চয় করব। ও-তে আমারও স্বার্থ আছে। আমার পূর্ব পুরুষের রচনা। তিনি ছিলেন একটা জিনিয়াস। আজ দেড়শ' বছর পরে আর একজন জিনিয়সের উপর পড়েছে তার তত্ত্ববিশ্লেষণের ভার।

রায় বাহাদুর ডাকিলেন, তরুণবাবুর জন্য বিয়ার। আচ্ছা তরুণ, আমি কি একটি জিনিয়স?

নিশ্চয়।

হাকিম হিসাবে নয়, সাহিত্যে?

লোকে ত তাই বলে।

টনিকের দাম কত?

সাড়ে ন'টাকা বোতল।

রায় বাহাদুর ডাকিলেন, উট্রাম।

উট্রাম মুখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে আসিল।

হলধর হুকুম করিলেন, তরুণবাবুকে কুড়িটে টাকা দিয়ে দাও। তরুণবাবুকে।

আজ্ঞে।

বৌমাকে রীতিমত টনিক খাওয়াবে।

আপনার অনুগ্রহে।

অল্ রাইট্। অনুগ্রহ আবার কি? সাহিত্য বল, হাকিমী বল, ঘরে স্ত্রী না থাকলে—অরণ্যং তেন গন্তব্যং।

(ক্রমশ)

কাক ও শিমুল

শ্রীশশধর বিশ্বাস

ওরে কাক! তোর ডাক
বিষ হানে নিখিলের কানে।
তোরে দেখে ভালোবেসে
কেহ নাহি চাহে তোর পানে।
আমি ফুল এ শিমুল
তোর মত অভাগা ধরায়।

একা হাসি একা কাঁদি
নিশি দিন দুপুরে সন্ধ্যায়।
কাছে আয় এ শাখায়
বসে তুই প্রাণ খুলে ডাক।
তোর ডাকে এ বুকের
সব ব্যথা ধুয়ে মুছে যাক।

আধার মরু

(বিদেশী চিত্র)

শ্রীঅমলা গুপ্ত

ভাইশ্নি ভলোচকের গা ঘেঁসে চলে গিয়েছে রাস্তাটি—মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড্ অবধি। আর এ মুল্লুক যখন দুনিয়া ছাড়া নয়, সেই রাস্তাই যে আবার বিপরীত দিকে চলে যাবে লেনিনগ্রাড্ থেকে মস্কো অবধি এটা অবশ্য আশ্চর্য নয়।

ছবির মত সুন্দর সভ্য-ভব্য শহর ভাইশ্নি ভলোচক্; গড়ে ওঠা এখনও পরিসমাপ্তি পায় নি। এর রেলওয়ে স্টেশনে—পথে পথে কলরব আর কর্মব্যস্ততা একটা সজীবতার দৃশ্যই তুলে ধরে। এক কথায় শহরটি যে প্রশস্ত ঐ রাজপথের স্পর্শ পেয়েছে এ উপলব্ধি ভাল করেই অন্তঃপ্রবিষ্ট করে দেয়।

শহরের বাইরে ডানদিকে প্রসারিত রয়েছে জনহীন অঞ্চল—মরুময় প্রান্তর, গম্ভীর নিবিড় কানন, বিষম দুর্গম জলা। সেকালে, যাকে লোকে বলে থাকে—those good old times (সেই অতীত সোনার কাল), এ তল্লাটে আনাগোনা করত স্থানীয় লুণ্ঠনকারীর দল। সারা অঞ্চলটা জুড়িয়ে কু-খ্যাতি প্রসার লাভ করেছিল দিকে দিকে।

* * * * *

এ বেয়াড়া অঞ্চলটারই মাঝে রয়েছে প্রাচীন একটি পল্লী—নাম ভর্বাসন্তকা। এই যে মরুময় কান্তার, এই যে তিমিরাচ্ছন্ন কাননের ঘুমন্ত রাজত্ব, এই যে অনতিক্রমণীয় রাক্ষসী জলাভূমি—এখানেও আবার জীবন্ত প্রাণী দেখ্তে পাওয়া যাবে, এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কি হতে পারে?

সব চেয়ে নিকটে যে শহর আর স্টেশন, তা-ও ৩০ মাইলের কম নয় গাঁখানি থেকে। তার ওপর সে-শহরে পৌঁছাও বড় সোজা কথা নয়, বিশেষ করে বসন্ত আর শরৎকালে, যখন এক হাঁটু জলকাদা ভেঙে যেতে হবে প্রায় সারাটা পথ, আর প্রতি-পদেই জলে ঢাকা চোরাগর্তে ডুবোনু যাবার আশঙ্কা থাকবে পুরোপুরি।

এমনই পরম লোভনীয় মুল্লুকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আহ্বান এল আমাদের—সেই পল্লী-সোভিয়েটের চেয়ারম্যান ইলায়া সুখানভের তরফ থেকে।

পল্লী-সোভিয়েটের নতুন মোটর গাড়ীতে চেপে যখন আমরা বের হলাম, তখন সুখানভ অভিযোগের সুরেই বললে—

"আমরা থাকি একটা শ্মশানপারা ঠাঁইতে। গর্ব করবার মত এমন কিছুই নেই। বিকট বিরাট বিষাদমগ্ন বন-বনানী। বাস্তব সভ্যতা-সংস্কৃতি এখনও বহু-বহু দূরে। সত্যিকথা বল্তে কি—চোখে পড়বে শুধু আঁধার, শুধু মরুমায়া, শুধু বন বনানী—আর কিছু না।"

এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় হামেশা যাদের স্বভাবই হ'ল খিঁচকাঁদুনে—সব কিছুতেই তাদের অভিযোগ আর আক্ষেপ। এমন এই যে চেয়ারম্যান তুলনায় একে তরুণই বলতে হবে, আর ও ত অল্প দিন আগেই রেড্ আর্মির দল থেকে ফিরে এসেছে। কাজেই আমার মনে হতে লাগ্ল—নিরালা এ পল্লীতে নতুন জীবনের আমেজ না ফুটিয়ে, এ তরুণ কিনা ঝিমিয়ে গুমরিয়ে ফিরছে অষ্টপর;—এ নিতান্ত অবাঞ্ছিত—নেহাৎই খারাপ বল্তে হবে।

"আঁধার মরু—উৎসন্নতা আর অন্ধকার" সুখানভ বলে চলে।—"আমরা আর কি দিতে পারি? প্রকৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদের কাছ থেকে এখনও বহু দূরে সরে আছে।"

"নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে তোমাদের পল্লী-সোভিয়েটে সংঘ প্রতিষ্ঠিত নেই?"

"যা আমাদের নেই, তা নেই-ই। দু'বছর আগে আমাদের এমনি একটা সংঘ ছিল। কিন্তু আজ আর তা নেই।"

"এ তো বড় ভাল কথা নয়, কমরেড সুখানভ। কেমন করে এ দশা হ'ল?"

"সে তো অতি সাদা কথা। বুড়কালা ঠাকমা আগাফিয়া ছাড়া আজ আর আমাদের ভিতর দ্বিতীয় লোক নেই যে লিখতে পড়তে জানে; আর নিকট ভবিষ্যতে যে এক-আধটি ঠাউরে উঠবে, এমন ভরসাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। তা হলে কার জন্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সংঘ একটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শুনি? তবু তো এ ব্যাপার নিয়ে যা হোক একটা কিছু প্রয়াস চলেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে—ব্যাপকভাবে কোন দিকে কিছুই তো করা হয় নি। কেবল জনহীন প্রান্তর, অন্ধকার আর আকাঠ বন।......"

গ্রামে এসে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই আমার নজরে পড়ল—যে বাড়ী যখন পেরোই, সে ছোট্ট বাড়ীর গায়েই রয়েছে একটি করে বাক্স—আর তার গায়ে লেখা আছে—

For Letters and Newspapers.

(চিঠি এবং খবরের কাগজের জন্য)

আমার জিজ্ঞাসু নেত্রের অভিব্যক্তি বোধহয় চেয়ারম্যানকে বিব্রত করে তুলেছিল। তাই সে অজুহাত প্রদানের সুরে বললে—"এ তো সবে গেল বছর এনে বসান হয়েছে বাড়ী বাড়ী। এতে করে ডাক পিয়নের কাজটা যে হালকা হয়ে যায় কত, তা তো বল্তেই হবে।"

"এখানে কি তা হলে অনেকেই খবরের কাগজ নেয় নাকি?"

"আমার মনে হয়, এখানে এমন পরিবার নেই একটিও যেখানে খবরের কাগজ আর সাময়িকপত্র অন্তত একখানি করে না আসে। এদিক দিয়ে আমরা কিছু করেত পেরেছি বলে মনে হয়। কিন্তু মোটের ওপর কিছুই না......"

"তোমাদের স্কুল নেই?"

"আছে বটে স্কুল আমাদের, কিন্তু তার জন্যে গর্বিত হবার মত কোন কারণ নেই। কোন্ গাঁয়ে আবার স্কুল থাকে না আজকেকার দিনে।"

"কি ধরণের স্কুলটি তোমাদের প্রাথমিক না অন্য কিছু?"

"তা যদি বলেন ত আমাদের রয়েছে প্রাথমিক দুটি আর মাধ্যমিক একটি। এই হল আমাদের......"

* * *

আমাদের দৃষ্টি ঘুরাতে হ'ল ডানদিকে—যে দিকে

আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড ও অতি সুন্দর একটি অট্টালিকা—তখনও তার নির্মাণকার্য শেষ হয়নি।

"আর এই যে দেখছেন তৈরী হচ্ছে বাড়ীটি, এটি হ'ল আমাদের নতুন হাই স্কুল—দেখতেই তো পাচ্ছেন প্রায় সারা হয়ে এসেছে এর কাজ। এদিক দিয়ে অবশ্য বলা যেতে পারে, আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। তাহলেও কিন্তু মোটের ওপর......"

"আর ওটা কি, স্কুলগৃহের ওপাশেই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?"

ও আর তেমন একটা কি? সামান্য একটা যাকে বলে লাইব্রেরী। নতুন বই যে এর জন্যে নিতান্তই দরকার, একথা আর বেশী করে বলতে হবে না, আপনারা তা বেশ বুঝতে পারছেন। এ ব্যাপারে আমরা পিছিয়েই পড়ে আছি, এতে ভুল নেই। লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন হ'ল ডাক্তারী বই।"

"কোন্ শ্রেণীর বই? ডাক্তারী? ডাক্তারী বই আবার কিসের জন্য?"

সঙ্গীটি আমাদের কোন জবাব দিলে না। আমরা এগিয়ে গিয়ে গুবাসিদত্তনের প্রধান রাজপথে পড়লাম। এটি নতুন, বেশ চওড়া রাস্তাটির খাত কাটা হয়েছে পাইন বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে। বাঁ দিকে একটা পার্কের মত ঘেরাও করা উন্মুক্ত মাঠের ওপাশে এক্বেণী দিয়ে রাখা হয়েছে মস্ত বড় একটা জমি। তার মাঝে মাঝে কোথাও একতলা কোথাও দোতলা অট্টালিকা উঠে গিয়েছে কতকগুলো।

সুখানভের ওষ্ঠেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো যখন সে বললে—এটা হ'ল আমাদের হাসপাতাল—৪০টি রোগীর শয্যাস্থানের ব্যবস্থা আপাততঃ করা গিয়েছে। ওরই সঙ্গে লাগাও হ'ল 'মেটার্নিটি হোম' (প্রসূতি হাসপাতাল) গৃহ। ওরই ভিতরে আবার ড্রাগ ষ্টোর (ঔষধালয়) একটি স্থাপন করা হয়েছে আর কোণের দিকে ঐ যে নজরে পড়ছে গম্বুজওলা বাড়ীটে, ওটা হ'ল ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস (বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের কারখানা বাড়ী)। হাসপাতালের ডাক্তার, অধ্যাপক, নার্স আর অন্যান্য কর্মচারী মিলে ৪০ জন হবে সংখ্যায়।

সাঁঝের আঁধার তখন ঘনিয়ে এসেছে। গ্রামের 'স্বাস্থ্য প্রচার কেন্দ্র' (Health giving Centre) গৃহটির বাতায়ন পথে উজ্জ্বল আলোক বহির্গত হয়ে আশার আলোকে গ্রামবসীকে উৎফুল্ল করে তুলছে। বাইরে পথিপার্শ্বের আলোকস্তম্ভ হতে বিস্তৃত প্রখর রশ্মি-সম্পাতে ফুলের বাগানগুলি হাস্যমুখর হয়ে উঠেছে—এপাশের বাগানে লাল বেগোনিয়া—ওপাশের বাগানে উচ্ছল পেটুনিয়া—রক্তাভ গুল্মলতার আল দিয়ে ঘেরা। আলোকে আর রঙের বাহারে সে যেন এক রহস্যলোক।

এ সৌন্দর্যটুক উপভোগ করতে আমাদের দরকার হ'ল না সঙ্গীটির কুণ্ঠামাখান ভূমিকা। এক সময় যেন সে অপরূপ নীরবতা ভঙ্গ করবার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সুরে সুখানভ আমাদের জানালে—

"এ সব ছাড়াও আমাদের একটা ভেটারিনারি (পশু-চিকিৎসা) বিভাগ আছে—একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও তার সহকারী এই দুইজন মিলে সে বিভাগটি পরিচালিত করে। তাহলেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তবু যাহোক একটা ডাক্তারী ব্যবস্থা এ গাঁয়ে রয়েছে শাদাসিধে রকমের এখন বলুন দেখি আমাদের লাইব্রেরীতে যদি ডাক্তারী বিভাগের বইয়ের একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয়, তা হলে কি করে চলতে পারে? এই যে এতগুলো চিকিৎসক—ডাক্তারী ম্যাগাজিন, প্রামাণ্য ডাক্তারী বই, সারা দুনিয়ার চিকিৎসা জগতের নতুন কথা—এ সব তাদের হাতের কাছে তুলে না দিতে পারলে তাদের দিয়ে কেমন করে আশা করতে পারি আমরা ভাল ফল। হাঁ, চিকিৎসার ব্যাপারে গ্রামদেশে তবু অমনি কিছুটা আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু মোটের ওপর......"

আমি আর নির্বাক থাকতে পারলাম না। সুখানভের সুরে যোগদান করে তার অসমাপ্ত বাক্য-স্রোতের জের টেনে চললাম—"কিন্তু মোটের ওপর কিছুই না, কেবল শ্মশান, কেবল আঁধার, কেবল আকাঠ বন।"

চেয়ারম্যান বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরলো আমার দিকে—চোখে চোখ পড়তেই দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলাম; কিন্তু তখনও সুখানভ যেন আমার হাসির মর্ম বুঝতে পারে নি। হাসির ছোঁয়াচেই হাস্যে যোগদান করেছে। কৌতুকের বশেই বলে উঠলাম তাই—

"কমরেড সুখানভ, তোমার আকাঠ বন আরও কিছু দেখাও আমাদের।"

"আর দেখবার মত কি আছে? যা কিছু আছে সবই তো দেখা হ'ল। বলুন এতে আমার গর্ব করবার কি থাকতে পারে!"

"আরে, এটা আবার কি?"—আমি দেখিয়ে দিলাম সদ্য তৈরী একটি বাড়ী—যার চারদিকে এখনও দেখা যাচ্ছে কর্তিত পাইন গাছের ঠুটো গোড়াগুলি।

"ও এটা! এ আর এমন কি সেরা বারাদরী! চলুন ভিতরে যেয়েই দেখা যাক্।'

ফটকে ঢুকে দুপাশের উদ্যান-শোভা ভেদ করে যে রাস্তাটি—তাই আমাদের 'স্বাগতম্' জানিয়ে বড় হলঘরটির দ্বারে পৌঁছে দিল। আলো-ঝলমল সে কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম। ছোট ছোট অগণিত টেবিল শাদা ধবধবে টেবিল-ক্লথে ঢাকা—তার চারপাশে নিপুণ হস্তের মনোরম সুচীচারুতা। স্তবকে স্তবকে ফুল—সর্বত্র। টেবিল সারির পশ্চাতে বৃহৎ কাউণ্টার। কাচের ডিশ প্লাসে আলোক-রশ্মির চটুল নৃত্য। কাউণ্টারে কিনতে পাওয়া যাবে—বীয়ার, চা, কফি আর নানা রকম খাদ্য। আর কাউণ্টারের পশ্চাৎ থেকে নবাগতের প্রতি স্নিগ্ধ আহ্বান দৃষ্টি বুলাচ্ছে এক তরুণী—যার পরিধানের নিখুঁত শ্বেতবসন অপেক্ষাও শুচিশুভ্র মুখচ্ছবিখানি।

পল্লী-সমবায় সমিতির সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলা রেস্তোরাঁ, যাকে ওরা বলে থাকে—Collective Farm Restaurant (কলেকটিভ ফার্ম রেস্তোরাঁ)।

(শেষাংশ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(গল্প)

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। নামিয়াছেও সেই সন্ধ্যা হইতে, থামিবার কিন্তু নামটিও নাই। এমন জল-ঝড়ে শহরেই মানুষ চলাচল বন্ধ করিয়া আরামে জামা গায়ে দিয়া চুপ করিয়া থাকে আর এ ত একেবারে পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা হইতেই এমনিই যে যার ঘুমাইয়া পড়ে......

মনেই কি কারও শান্তি আছে নাকি! অজন্মা, জমিদারের খাজনা—এ সব ত আছেই; তার উপর রোগ শোক যেন আর ছাড়েই না? এদিকে নূতন ঋণসালিশীর ঠেলায় মানুষ মরিয়া গেলেও সিকি পয়সাটির মুখ দেখিবার উপায় নাই।

স্বামী এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। বিন্দু মাঝে মাঝে কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করে। মনে হয় ঐ বুঝি আসিল, কিন্তু না। ঝপ্ ঝপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—তর তর করিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। ঘরের ছাউনির ভাঙা ফাঁক দিয়া জলের ঝাপটা আসিয়া ঘর-দোর ভিজিয়া ভিতিয়া একাকার। তা হোক। বিন্দু তার জন্যে ভাবে না। কিন্তু অসুস্থ ছেলেটাকে যে একটু শুকনা ঠাঁইয়ে কোথাও রাখিবে—সমস্ত ঘরে ততটুকুও স্থান যেন বিধাতার দৃষ্টি হইতে উত্তরের মেঘের মত উড়িয়া গিয়াছে।

ঘরে ঘড়ির বালাই নাই। কাছে-পিঠে রূপকথার সেই দেউড়ীও নাই যে, ঘণ্টার শব্দে সময় জানা যাইবে। আর দরকারই বা কি! অসুখ হইলেই অষুধ খাওয়ান ত দস্তুরমত 'মানুষী' কাণ্ড। মোটে ত দু-সপ্তাহ ছাড়াইয়া আজ পনের দিনে পড়িয়াছে।

বিন্দু ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকাইল।

হাসিও আসে দুঃখও আসে। পৌষে বুঝি এক বছর পুরা বয়স হইবে খোকার। কেমন সুন্দর একতাল সোনার মত ঝক ঝকে তাজা খোকা দেখিতে দেখিতে কেমন লিকলিকে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—প্যাকাটির মত ক্ষীণ চেহারায় নিবিড় কাল বর্ণের ডাগর ডাগর দুটি আঁখিতারার সুস্পষ্ট পরিবেশ মাত্র মূলধন।

বিন্দু হাসে।

প্রথম সন্তানটিও ঠিক এমনিই হইয়াছিল।

কান্না কিন্তু বিন্দুর কিছুতেই আসে না। আরে একি সত্যিই অসুখ নাকি যে, কি হয় কি হয় ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিবে। খাইতে না পাইলে বয়স্ক মানুষই আর কদিন বাঁচিতে পারে! বুকে এক ফোঁটা দুধ নাই—তাই টানিয়া চোষে। না পাইলে কাঁদে। ব্যস। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনিই চুপ করিয়া থাকে। এমনি একদিন হয়ত কচি সরু পা দুখানি একবার মাত্র সোজা টান করিয়া একেবারে চুপ করিয়া যাইবে।

এতে কাঁদিবারই বা আছে কি! বিন্দুর হাসি পায়। কবে এক তারা ভরা আকাশের সুরে তাহার নিজের মনেও বসন্ত গাহিয়া উঠিয়াছিল—সেও কল্পনা করিয়াছিল রূপ আর ঐশ্বর্যের মহিমময় বিকাশ; কিন্তু আজ মৃত্যুর নর্তনের মাঝে মুখোমুখি বসিয়া কি হইবে সেই কল্পনা-লোকের আকাশ-কুসুম দিয়া ব্যর্থ মালা গাঁথিয়া।

বিন্দু সত্যিই এবারে হাসিয়া ফেলে। দুটি কালো চোখ টান হইয়া সজল হইয়া উঠে শুধু। আজ বলিতে গেলে মাসখানেক স্বামী পুত্রের মুখে দুবেলা কবে আর এক মুষ্টিও দিতে পারিয়াছে সে?

কিন্তু রাতের বৃষ্টিধারায় যেন নেশা লাগিয়াছে। নিকটে দূরে যতদূর দৃষ্টি যায় কালো আকাশ কালো মেঘে একেবারে ঢাকা—আর সেই আবরণ খসিয়া খসিয়া পৃথিবী যেন শীতার্ত এক নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে নির্জীব হইয়া উঠিয়াছে।

তা উঠুক।

কিন্তু স্বামী এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। বিন্দু চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে মাটির রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। জলের ঝাপটায় মৃত্তিকা ভিজিয়া যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রোয়াকের বাঁশটা ধরিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের গায়ে গায়ে মেঘের প্রচণ্ড গর্জনে লক্ষ কোটি বিদ্যুৎশিখার ঢেউ আঁকিয়া বাঁকিয়া আকাশেই মিশিয়া যাইতেছে। শুপারী বাগানের গাছগুলি বুঝি পড়িয়াই যাইবে এমনিই দুলিতেছে। ইস্ কি জলই [illegible]য়াছে চারদিকে!

কে যেন আসিতেছে। হ্যাঁ, জল চিরিয়া কাহারও আসিবার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরেই নিকটবর্তী হইয়া উঠিতেছে।

এমন করিয়া তাহার স্বামীই চলে।

বিন্দু গাঢ় দৃষ্টিতে দক্ষিণের নারিকেল গাছের দিকে তাকাইল। তাহার স্বামী মধুই আসিতেছে তাহা হইলে।

বিন্দু একটু খুশী হইল।

সত্যিই তাই। মধুই আসিয়াছে ভিজিয়া ভিজিয়া। হাঁটুর অনেক ওপরে কাপড় ওঠান—খালি গা একেবারে। মাথায় কি সব লটবহর।

বিন্দু কি ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মধু একটা রাজ্য লইয়া আসিয়াছে যেন। অন্ধকারের মধ্যেই সে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল। মাথার উপর হইতে গাঁঠরীটা নামাইয়া কপালের জলগুলি মুছিতে মুছিতে লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—হাঁ করে দেখছিস কি বৌ! শুকনা কাপড় দে দিকিন একটা আগে......রাতেই

বিন্দু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ভিতরে গিয়া একখানা ছেঁড়া শুকনা কাপড় লইয়া আসিয়া দিল স্বামীর হাতে।

মধু হাত বাড়াইয়া কাপড় লইল।

বিন্দু কিন্তু কি ভাবিতেছে। বলিবে কি বলিবে না ভাবিয়া বলিয়াই ফেলিল: আবারও তুমি?......

মধু জবাব দিল না। ঘরে গিয়া ঘুমন্ত শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল একটু। না জ্বর আসে নাই এ-বেলা, ঘুমাইতেছে।

মধু বাহিরে আসিল।

চুপ করিয়া সম্ভবত বিন্দুর কথাটাই ভাবিয়া দেখিল একবার। মধু গম্ভীর হইয়া উঠিল: আরে এমনিই কি কেউ দেয় বৌ?......এই যে মাস খানেক খেতে পাওনি......

দিল কেউ কিছু? যাদের অনেক আছে তারা কবে তাকায় আমাদের দিকে শুনি?

বিন্দু কি বলিতে যাইতেছিল মধু বাধা দিল। বলিল, থাম তুই বৌ! খোল দেখি গাঠরীটে। চাল আর ডাল এনেছি—আঙ্গুরের প্যাকেটটা খুলে খোকাকে খাইয়ে দে কয়েকটা.....

বিন্দু কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

মধু ম্লান হাসি হাসিল: ওদের অনেক আছেরে—দুটো চাল ডাল আর আঙ্গুরে ওরা মরবে না বৌ!

মধু কি যেন ভাবিতেছে। এ বৃত্তি ভাল নয় সে জানে। সে বোঝে। ইচ্ছা করিয়া করে তাও নয়—উপায় নাই। দিনের পর দিন মৃত্যুর সাথে এমন করিয়া আর সে পারে না—

মধু অন্যমনস্ক হইয়া উঠে। একদিন সেও ত ভাবিয়াছিল গ্রামের দশজনের মধ্যে একজন হইবে! সর্বস্ব পণেও আজও সে ত স্ত্রী-পুত্রের এক মুঠি আহারের বিনিময়ে সমস্ত দেহ-মন দিয়া অপরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে রাজী—তবু কেন বিধাতা......

না বিধাতার নাম মধু আর মুখে আনিবে না! মধু গম্ভীর হইয়া উঠিল! হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিসনে বৌ! তিনদিন ধরে পেটে একটা কণাও জোটেনি। পারিস ত দু-মুঠো চড়িয়ে দে চালে আর ডালে—আর না পারিস সরে যা

বিন্দু কথা কহিল না।

ধীরে ধীরে গাঠরী খুলিয়া চাল ডাল বাহির করিল—সের দশেক চাল, কিছু ডাল আর রান্নার কিছু মসলাপাতি আনিয়াছে মাত্র। অভুক্ত স্বামী-পুত্রকে অনাহারে রাখিয়া আর সে কিছু ভাবিবে না। অপরাধ যদি কিছু হইয়া থাকে; বিন্দু মনে মনে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে: হে বিধাতা—এর শাস্তি তুমি আমায় দিও—স্বামীকে নয়...

রান্না শেষ হইতে মধুর কিন্তু সবুর সহিতেছে না। কাঁঠালের তক্তাটা পাতিয়া বসিয়া গেছে। এনামেলের বাসনে করিয়া বিন্দু খিচুড়ি সাজাইয়া দিল। কি যে রান্না হইয়াছে কে জানে.....তেল ছিল না। সম্বরা পর্যন্তও হয় নাই।

মধু কিন্তু প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ: বৌ একি রেঁধেছিস তুই! এ যে অমৃত একেবারে...

বিন্দু লজ্জিত হইয়া উঠে—

কথাটা ঠাট্টার মত শোনাইলেও মধু কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলে নাই। খুশীর প্রাবল্যে মধু হাতে খানিকটা খিচুড়ি লইয়া বিন্দুর মুখের কাছে আগাইয়া ধরিয়া বলিল: সত্যি ভাল হয়েছে বৌ! বিশ্বেস না হয় নিজেই চেকে দেখ জিভ দিয়ে।

জিভ দিয়া অবশ্য বিন্দু চাখিয়া দেখিল না। মনে মনে আরও লজ্জিত আরও খুশী হইয়া উঠিল। সৎপথের মধ্য দিয়া এই স্বামীকেই যদি সে নূতন করিয়া পাইত! বিন্দু ভাবে—তার দেবতার মত স্বামী, উদার, পরোপকারী—তবু সমাজে তার স্থান হইল না কেন? কি অপরাধে তার নীচতার মাঝেই নীড় বাঁধিতে হইয়াছে?

মধু যেন কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে।

বলিল: এবার হতে এ-সব ছেড়ে দেব। আরে ছেড়েই ত দিয়েছিলাম—মাসখানেক এদিকে যে তোদের এক ফোঁটা জল পড়েনি মুখে?

মধু চুপ করিয়া আবার বলিতে থাকে—এ পথ ত সবারই ঘৃণা। ইচ্ছা করে কি আর কেউ করে রে? সমাজ আমাদের দিকে তাকায় না বলেই ত!

মধু রীতিমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে আর কি!

থামিয়া আবার বলিয়া উঠিল: নূতন একটা জিনিষ ভেবেছি এবারে বৌ!

বিন্দু তাকায়—কি?

মধু চুপ করিয়া থাকে মুহূর্তের জন্য।

তারপর বলিল: খাবার ভাবনা যখন কয়েক দিনের জন্য মিটল তখন ভাবছি এবারে ভিটেটা বিক্রি করে মুদী দোকান করব একটা—দু-চার আনা পয়সা থাকবেই রোজ। কি বলিস্?

বিন্দু বলিল: বিক্রি না করলে চলে না?

মধু বলিল: তা কি করে হয় আর বৌ! কবলা-ফবলাতে আর কেউ টাকা দেয় না এখন। বিক্রি করে যা পাই তাই দিয়েই দোকান খুলব। রাজী আছিস্ ত—?

বিন্দু মাথা দোলাইয়া বলিল: রাজী।

মধুর আহার হইয়া গিয়াছে: বস তুই এবার—খেয়ে নে। মধু উঠিল।

মধুর মাথায় কথাটা একেবারে চাপিয়া বসিয়াছে। দোকান সে করিবেই।

শুইয়াও তাহারই আলোচনা চলিতে থাকে—

বুঝলি বৌ: মধু বলে: খোকাটাও বড় হল—ব্যবসা-ট্যাবসা একটা কিছু না শিখলেই বা চলে কি করে!

বিন্দু হাসে: তা দশ মাসও হয়নি খোকার এখন গো!

তা না হোক—মধু ভারিক্কি চালে বলে, হতে আর কদিনইবা বাকী শুনি, এর পরেই ত হাতে খড়ি দিতে হবে।

মধু একটু চুপ করিয়া থাকে।

তারপর বলে: ওকে মানুষ করতেই হবে বৌ—চিন্তায় মাথা তাহার মসগুল হইয়া উঠে......তারপরেই বুঝলি বৌ..... তুই আর আমি......দুজনায় তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ব দুর্গা দুর্গা করে—

বিন্দু হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে—হাসিয়া আর বাঁচে না। বলে: বিয়ে দেবে না খোকার?

মধুর ভুল হইয়া গিয়াছিল। বলে: সে ত দেবই তার আগে করতে করতে ছেলের বৌ নিয়ে আসব—দেখিস্ তখন। কিরে বৌ ঘুমিয়ে পড়লি নাকি—

বিন্দু পাশ ফিরিয়া খোকাকে জড়াইয়া শুইয়াছে।

বলিল: উহুঁ—

মধু বলিল: শোন তারপর—

বিন্দু বলিল: কি?

মধু বলিল: তারপরে বুঝলি বৌ—টাকা-কড়ি কিছু

জমিয়ে; মধু থামিল একটু: টাকা-কড়ি কিছু জমিয়ে গোপনে গোপনে সবাইকে সাহায্য করব—কি বলিস—

তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে বিন্দু বলিল: কিসের?

মধু মনে মনে সাত সমুদ্র তের নদী সেচা মাণিক পাইয়া গিয়াছে—রাজ্যের যেন সেই মালিক; ঐশ্বর্য যেন তাহার চারিদিকে ভীড় করিয়া আসিয়াছে; বলিল: যারা গরীব, কাজকর্ম পায় না—তাদের দোষ; কিরে ঘুমালি নাকি—

বিন্দু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থতন্ত্রের কোন কথাই মধু জানে না—তবু শুইয়া শুইয়া আজ তাহার মনে হইতে লাগিল যে, জাতীয় অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়া সমাজের একটা অংশের উপরই স্ফীত হইয়া আছে বলিয়াই ত তাহারা অনাহারে থাকে।

ভোর হইতে না হইতেই মধুর ঘুম ভাঙিগয়া গেল। নিজের ইচ্ছায় ঘুম ভাঙেগ নাই। হাঁকডাকে ঘুম বহু দূরে পলাইয়া গিয়াছে।

পুলিশ নয় চৌকিদার!

এসব নিতান্তই পেটী কেসে—পুলিশের লোক এই জল-ঝড় মাথায় করিয়া আসিবে ইহা প্রত্যাশাও কেহ করে না, আসেও না।

সনাতন চৌকিদার একেবারে ঘরেই ঢুকিয়া গিয়াছে—বলি ও কত্তা ওঠ দেখি—

পিট পিট করিয়া মধু তাকাইল। সমাজতন্ত্রের ধোঁয়া বহু আগেই কাটিয়া সাফ হইয়া গিয়াছিল—

উঠিয়া বসিল।

বলিল: ব্যাপার কি কত্তা!

সনাতন পাকা চৌকিদার। কারও গৃহে আসিয়া অভদ্রতা করে না—সে সব ঝামেলা থানায়ই হয় ভাল। বিনীতকণ্ঠে মধুর ও স্মিতহাস্যে বলিল: বিশেষ কিছু নয় ভায়া—গোবিন্দ মুদীওয়ালা বলে কিনা কাল রাতে তুমিই ঢুকেছিলে ওর ঘরে—তা দেখছি ওর দোকানের থলেটাও হেঁটে হেঁটে তোমার ঘরেই এসে গেছে—একবার কষ্ট দয়া করে থানায় যদি চল।

এমন করিয়া আগেও একবার মধু থানায় গিয়াছে এবং সেখানে গিয়া কি হয় তাহাও জানে। বিন্দুও জানে—বিন্দু ছুটিয়া আসিয়া সনাতনের পায়ের উপর পড়িল।

কিন্তু সনাতন উদার মানুষ। বলিল: আমি ম্যা হুজুরের চাকর আমার ত কিছু করার নেই—

করার ক্ষমতা থানারও রহিল না—হাকিমেরও না। দ্বিতীয় অপরাধ। দাগী অপরাধী। কঠিন শাস্তি—ইত্যাদি বক্তব্য বলিয়া অনেক টাকা বেতনওয়ালা রাসভারী পাবলিক প্রসিকিউটর সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন।

নূতন কিছু নয়। জেল হইয়া গেল। ইহাও নূতন নয়। কেহ অবাকও হইল না।

ইহাও এখানকার নিয়ম—প্রত্যেই এমন দুরন্ত অপরাধীদের শাস্তি দিয়াই না সমাজ টিকিয়া আছে। না হইলে হয়ত সমাজের ভিৎ ভাঙিগয়া চুরমারই-বা কবে হইয়া যাইত। বিন্দু আর খোকা নিশ্চয়ই সমাজের কেহ নহে।

বিন্দুর জমাটবাঁধা চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য শুধু চকচক্ করিয়া উঠিল—এবারে সে হাসিয়া ফেলিয়াছে।

আঁধার মরু

(৫৫১ পৃষ্ঠার পর)

"এ জায়গাটাকে এখনও তেমন চোখ-জুড়োন রূপায়নে শোভিত করা যায় নি। আরও ফুল—আরও কারুকার্য—আরও আলো—এই সব ব্যবস্থা ক্রমে আমরা করবো, জানলেন। তবু কিন্তু মোটের ওপর......" সুখানভ গম্ভীরভাবেই বলে ফেল্‌লো তার অভ্যস্ত কুণ্ঠার প্রলেপ মাখিয়ে।

এর পাল্টা জবাবে আমাদের মন্তব্য তার কানেই প্রবেশ করলো না। সে তার নিজের মনেই বলে চললো—"তা ছাড়া এখানে আমাদের তৈরী করতে হবে আরও কয়েকটা কক্ষ ভ্রমণকারীদের বসবাসের উপযুক্ত। আমাদের এই ঠাইটা মস্কো-লেনিনগ্রাড রাস্তার ওপরেই কিনা, তাই অনেক লোক চল্‌তি পথে এখানে আসে রাতের মত মাথা গুঁজতে। কাজেই আমাদের পল্লীর হিসাবে 'গ্রাণ্ড হোটেল' একটা তৈরী করে না ফেললে কি করে চলে।"

* * *

এর পরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল আমাদের বাসস্থানে—কি সুন্দর ছবির মত সে বাড়ীখানি—সম্পূর্ণ আধুনিক রুচিতে তৈরী। প্রাণঢালা দরদ দিয়ে তার সবকিছু গড়ে তোলা—সুদৃশ্য স্তম্ভ, জাঁকাল বাতায়ন, পরিপাটি কাঠামো, বিচিত্র দ্বার, নিরুপম প্রশস্ত সোপানাবলী—কারিগরীর চমকপ্রদ একটা আভিজাত্য ঘিরে আছে অট্টালিকাটি ও পটভূমিকে।

এটি হ'ল ক্লাব-গৃহ—এর উদ্বোধন হবে অল্পদিনেরই ভিতর। দোতলার বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে একটি হাল-ফ্যাশানের উচ্চ অট্টালিকা, বহিরঙেগ ফুলের মত ফুটে উঠেছে হাজার হাজার রঙীন আলো—সে যেন রঙ আর জেল্লার লুকোচুরি খেলা। সিনেমা গৃহ হ'লেই ওটিকে মানায়।

সুখানভ বললে—"ওটা 'মুভি-হাউস' অর্থাৎ সিনেমা গৃহই। এই সবে তৈরী শেষ হয়েছে। আলোর ব্যবস্থার মহলা চলেছে আজ, ২।১ দিন মধ্যে 'শো' আরম্ভ করা হবে। এ রকম কিছু কিছু আমরা করতে পেরেছি, নইলে মোটের ওপর......"

প্রচুর ভোজের পর সে রাতে সুখানভের কাছ থেকে বিদায় নিলাম—শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে শেষ বারের মত প্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিদায় নিলাম ওবুসিস্তৃকা গ্রামখানি থেকে—কমরেড সুখানভের ভাষায়—যা নাকি শ্মশানপারা সেকেলে-পল্লী—যা নাকি সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন—অকাঠ বন আর দুর্গম জলার মাঝে নিরালা ঘুমন্ত পুরী।......*

---

* G Ryklin প্রণীত Desolation and Darkness নামক ছোট গল্পের অনুবাদ।

স্যার অলিভার লজ

বিগত ১২ই জুন তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত স্যালসবারির নিকটস্থ 'নরম্যানটন হাউসে' সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজের অষ্টাশীতিতম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কয়জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাবে বিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়, স্যার অলিভার লজ তাঁহাদের অন্যতম। সুবিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস কর্তৃক তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব ঘোষিত হইলে পর তাহার সাহায্যে বেতারে সংবাদ প্রেরণের জন্য যে কয়জন বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে স্যার অলিভার লজ, ইটালীতে মার্কোনি এবং ভারতবর্ষে স্যার জগদীশচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত এই তিন জন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ফলেই আজ 'বেতার-যুগের' উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক মার্কোনি বেতারের আবিষ্কর্তা বলিয়া সাধারণভাবে পরিচিত হইলেও, এ বিষয়ে স্যার জগদীশ ও স্যার অলিভার লজের গবেষণাও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। স্যার জগদীশ ও মার্কোনী উভয়েই অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে স্যার অলিভার লজ এখনও জীবিত থাকিয়া নবীন বৈজ্ঞানিকদের অন্তরে প্রেরণা যোগাইতেছেন। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই প্রবীণ মনীষী চিন্তানায়কের অষ্টাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের সঙ্গে তাই আমরাও তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্যার অলিভার জোসেফ লজ ইংলণ্ডের ষ্ট্যাফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত পেঙ্কহালে ১৮৫১ সালের ১২ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য কুম্ভকারের কাজ করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অলিভার লজ স্কুলে পড়া-শুনা করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিজের কাজের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করেন। তরুণ অলিভারের জীবনের সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল কাদামাটি ঘাঁটিয়াই কাটিয়া যায়। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা তখনও তাঁহার ছিল না। কিন্তু এই সময় 'ইংলিশ মেকানিক্' নামে একখানা পত্রিকার কয়েকটি পুরাতন সংখ্যা তাঁহার হস্তগত হয়। যুবক অলিভার উহা পড়িয়া কি অনুপ্রেরণা লাভ করেন

স্যার অলিভার লজ
(অষ্টাশীতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে গৃহীত)

বলা শক্ত; কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্য পথে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইতে থাকে। কুম্ভকার হইলেও তাঁহার পিতা পুত্রের প্রতিভা সহজেই উপলব্ধি করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া

তাঁহাকে লণ্ডনের য়ুনিভারসিটি কলেজে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিয়া অলিভার লজের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। শীঘ্রই তিনি বি-এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই ডি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রথমত তিনি বেডফোর্ড মহিলা কলেজে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 'রিডার' পদে নিযুক্ত হন। পরে এই স্থান হইতে ১৮৭৯ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত শাখার একজন সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকপদ খালি হইলে, অলিভার লজকে ঐ পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি এই স্থানে প্রায় দশ বৎসর কাল কাজ করেন। পরে ১৯০০ সালে বার্মিংহাম বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার প্রথম অধ্যক্ষ নির্বা-চিত হন। একাদিক্রমে সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পরে ১৯১৯ সালে উক্ত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যার অলিভার লজ তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক মহলে এক নূতন প্রেরণা আনয়ন করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গবেষণা জ্ঞানের ভাণ্ডারকে কম সমৃদ্ধ করে নাই। জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস আবিষ্কৃত তড়িৎ-চুম্বক-তরঙ্গের প্রকৃতি ও তাহার সাহায্যে বেতারবার্তা প্রেরণের সম্ভাবনাকে তিনিই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত করেন। পরবর্তীকালে মার্কোনি যে আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, স্যার অলিভার লজের গবেষণা তাহারই অগ্রদূত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সর্বপ্রথম তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; হার্ৎস কর্তৃক তাহা আবিষ্কৃত হয় আর বৈজ্ঞানিক লজ সেই তরঙ্গের ব্যবহার কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই নির্দেশ করেন। লজের এই গবেষণা সেই সময় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯১৯ সালে 'রয়েল সোসাইটি অব আর্টস' এজন্য তাঁহাকে আলবার্ট পদক দানে পুরস্কৃত করেন।

স্যার অলিভার লজের উপরোক্ত গবেষণা ব্যতীত তাড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা তরলপদার্থের বিশ্লেষণ, তড়িৎকণা বা 'আয়নের' গতিবিধি ও ইথরের প্রকৃতি এবং নৈসর্গিক বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে কুয়াশা দূর করিবার ও বৃষ্টি আনয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি যে সমস্ত পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেন তাহাতেও এক-সময় বিজ্ঞান মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লজ শুধু গবেষণা নিয়াই তন্ময় হইয়া থাকিতেন না, নানারূপ প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় বিজ্ঞানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও সহজভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সাধনেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে 'দি মেকিং অব ম্যান" (১৯২৪), 'ইথর এণ্ড রিয়েলিটি', 'রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতত্ত্ব এবং 'টকস্ এবাউট ওয়েয়ারলেস্' (১৯২৫) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার অশেষবিধ দান তাহার জন্য কম সম্মান বহন করিয়া আনে নাই। ১৯০২ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে ঐ বৎসর 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বহুবৎসর ইংলণ্ডের পদার্থবিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯১৩ সালে তিনি বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ভাবে স্যার অলিভার ইংলণ্ডের বিদ্বৎসমাজে নিজ সাধনার বলে যে স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হন, তাঁহার জীবনের সেই গৌরবজনক অধ্যায় আজও জগদ্বাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী বলিয়া বহু বিজ্ঞানী মনে করিয়া থাকেন। স্যার অলিভার লজ বিজ্ঞানের অনু-শীলনে বহু বৎসর অতিবাহিত করিলেও, তাঁহার পরিণত বয়সে এক বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হয়। তিনি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। আধ্যাত্ম ও মানসিক জীবনের নূতন এক আলোক তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে। মৃত্যুর পরেও প্রিয়-জনের সহিত সম্বন্ধ রাখা সম্ভবপর এমন কি, তাহার সহিত ভাবের আদান-প্রদান পর্যন্ত করা যাইতে পারে এই ধরণের ভাব তাঁহার মনে বিশেষভাবে উদিত হয় এবং এ সম্পর্কে বিবিধ গবেষণায় নিরত হন। এই সম্পর্কে তিনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে 'রেমণ্ড' নামে তাঁহার এক পুত্র মহাযুদ্ধে নিহত হন। তিনি 'রেমণ্ড, অর লাইফ এণ্ড ডেথ' নামে যে পুস্তকখানি লেখেন, তাহাতে পুত্রের মৃত্যুর পরেও তাহার নিকট হইতে তিনি যে সাড়া পাইয়াছেন তাহা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্যার অলিভার লজের পরবর্তী জীবনের এই সমস্ত অভিমতের সহিত বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মিল না হইলেও তিনি তাঁহার এই নব লব্ধ তথ্যকে জোরের সহিত প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯২০ সালে তিনি এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিভিন্ন গবেষণা ও অভিমত সম্পর্কেও তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'দি সারভাইভাল অব ম্যান' (১৯০৯), 'রিজন এণ্ড বিলিফ' (১৯১১), 'দি ওয়ার এণ্ড আফটার' (১৯১৫) প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকের নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সীমা রেখার ভেদাভেদ ঘুচাইয়া আধ্যাত্ম জীবনের যে নূতন আলোক তাঁহার শেষ জীবনে উদ্ভা-সিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এই সাধক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের দানকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না "He was an inter-

preter when the science was a congeries of nebulous theories and unapplied discoveries. বিজ্ঞানের পুঞ্জীভূত, নানা তথ্যকে সাজাইয়া গুছাইয়া যিনি বিজ্ঞানের চলার পথ নির্দেশ করিয়াছেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল আশা পোষণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। জীবন সায়াহ্নে তিনি আজও তাই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হন নাই। তাঁহার এই জন্মদিন উপলক্ষে তিনি যে বাণী দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও সেই আশার কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকের মতই তিনি বলিয়াছেন:—"I feel I have done my work here, and can now enjoy leisure and watching others while I am waiting to go on to the next life, where I am confident all our affections and love will be as on this earth, with freedom from material restrictions and scope to advance from whatever stage in development we had reached here."

বৈজ্ঞানিক হইয়াও পারলৌকিক জীবনে তাঁহার যে বিশ্বাস দেখিতে পাই, তাহা সচরাচর বড় দেখা যায় না। ইহা তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রস্তব

(ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল: ৬ষ্ঠ সূক্ত)

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

সূর্য্যরূপে জাগো সুনীল অম্বরে,
বহ্নিরূপে সদা দীপ্তি কর দান;
ভুবন ব্যাপি' রহ মরুৎ-রূপে, দেব,
সর্ব্বলোকে করে তোমারি স্তুতিগান!
আকাশ ভরি' শোভে উজল গ্রহ-তারা,
তোমারি রূপ-ধরি' তোমারি রূপে হারা,
নিখিল পান করে তোমারি রূপধারা,
অপরূপ তুমি, তবু নিখিলে রূপবান॥১॥

তোমার রথ বহে ধৃষ্ণু হরিযুগ,
কাম্য জগতের, রম্য, তেজীয়ান
রুদ্ররবে তারা চমকে অরিকুল,
ঘর্ঘরিত পথ চমকে দিনমান।
হে দেব, দেবরাজ! জ্যোতির্ম্ময় তুমি,
অন্ধ-তমসাবৃত এ চিত্তভূমি,
জ্ঞানের জ্যোতিঃ হানো,—তোমার রূপশিখা
প্রকৃতি ভরি' হোক্ মূর্ত্তিমান্॥২॥

তোমার জ্যোতিঃ লভি' অন্ধ পায় দিঠি,
চিত্ত হ'তে যায় গভীর আঁধিয়ার,
ব্রহ্মে করি' ধ্যান, মন্ত্র উচ্চারি'
লভিছে যাজ্ঞিক, নবীন তেজোভার:
মুক্ত পুরুখ হে মুক্ত কর তায়,
অঙ্গে তার তব জ্যোতিঃ যে উছলায়,
জীর্ণ বাস সম জীবন পুরাতন
ছাড়ি সে পায় যেন নবীন প্রাণসার॥৩॥

গিরির গুহা সম দৃঢ় এ অন্তর,
দস্যু রিপু ঘিরি রহিছে মিতি তার,
ইন্দ্র!—জ্ঞান-বাজ হানো হে, কর দূর,
বজ্র-অনলের সে রূপ-প্রতিভায়!
দিব্য জ্যোতি আনো সত্য-জ্ঞান-দীপে,
রাজুক জ্যোতিঃ তব উজল ভাল-টীপে,
সে জ্যোতিঃ পশি চিতে করুক্ তমঃ দূর
ভরুক অন্তর তোমারি করুণায়॥৪॥

হে দেব! বায়ুদেব! তোমারে চিনি, চিনি,
ব্রহ্ম-সাথে তব অটুট সংযোগ,
ইন্দ্র-সাথে তব সুচির-সঙ্গতি
তাই তো সুমধুর শান্তি কর ভোগ।
তাই তো দিকে দিকে বিলাও প্রাণরাশি,
অসীম দীপ্তির স্ফূর্ত্তি পরকাশি',
ইন্দ্র-জয় সাথে তোমারও গাহি জয়,
হে চির-সুখময়, মরুৎ, হে অশোক॥৫॥

সকল দেব-সাথে এস হে দেবরাজ,
পিয়া এ সোমসুধা বসুধা রাখো ধার',
নিখিল-ক্ষুধা তব পরশে হোক্ দূর,
শান্তি কায়া ধরি কান্তি দিক্ ভরি'!
আকাশ মধু হোক্, মধু বসুন্ধরা,
জলদ-ধারা হোক্ চির-মধুক্ষরা,
মধুর তুমি দেব, জাগো মধুরতর,
মধুর হোক্ মন তোমারে ধ্যান করি'॥৬॥

গোধূলি

(কথিকা)

শ্রীগোপাল বাগচী

অনেকদিন থেকে সোকল এমনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। অসুখ হবার পর থেকে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন কাজ আর ওকে দিয়ে করান যায় না দেখে মনিব তাকে একটি অকেজো মৃতদেহের মতই ঘৃণায় দূরে ফেলে রেখে দিয়েছে। তথাকথিত 'ভাল মানুষেরা' কিন্তু মৌখিক দয়া দেখাতে ছাড়েনি; বলাবলি করত—ওর চামড়া দিয়ে অনেক কাজ করা যাবে, এভাবে ওকে পচে মরতে দেখা উচিত হবে না। হ্যাঁ—ঐ ভাল মানুষেরা—শুধু মরতে দিত তিল তিল করে, বিস্মৃতির আড়ালে। সোকলকে অত তাড়াতাড়ি মরতে দেখে ওরাই ত মাঝে মাঝে ওকে লাথি মেরে আদর দেখাত। এর আগে তার গায়ে যথেষ্ট শক্তি ছিল, মনে আনন্দও ছিল। সে সময় ওর শিকারী কুকুরদের সঙ্গে দৌড়ন, লাফান আর পাল্লা দেওয়ার অভ্যাস ছিল। সোকলের এমন অবস্থায় সেই কুকুরগুলো মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত—কিন্তু তবুও বলতে হয়, কুকুরদের স্বভাব অত্যন্ত কদর্য (বোধ হয় সব সময় মানুষের আদেশ পালন করে আর সঙ্গে থেকে থেকে)......তাই মনিবের ডাক শুনলেই ওরা সোকলকে ছেড়ে চলে যেত। বেশীক্ষণ ওর কাছে বসে থাকত লাপা নামে একটি সাইবেরিয়ার কুকুর, ওর বন্ধু—বসে থাকত, পাশে খাবার পাত্রের কাছে দুঃখে কাতর হয়ে—বন্ধুর মিনতিভরা, জলভরা, বড় বড় দুটো চোখের দিকে সে চাইতে পারত না।

তাই বৃদ্ধ ঘোড়াটিকে একলা ফেলে রাখা হয়েছিল তার নিভৃত দুঃখের বোঝা বইবার জন্যে। মনে পড়ছে, আজ তার রঙীন-পুরানো আরামের দিনগুলো। পরক্ষণেই চোখে ফুটে উঠছে এই কঠিন দুঃখের দিন—যেগুলো সমস্ত ঘরখানাকে বেদনায় ছেয়ে ফেলেছে।......পুরানো দিন তার মুছে যাওয়া আনন্দ নিয়ে আবছা ছায়াছবির মত ওর চোখে ভেসে এল, আবার তক্ষুণি তাড়াতাড়ি যেন ভয় পেয়ে সরে গেল। এমন কি সুখের চিন্তাও সে করতে পারে না—ওর সয় না।......

সোকল ভয় করত গুমোট গরমের নিস্তব্ধ রাত্রিকে—মনে হত এমনি এক রাতেই বুঝি ওর সব শেষ হয়ে যাবে। আর সবার সুখের ঘুমের আড়ালে বোধ হয় ভোরের দেরী আর সইত না!.....সে ভয় বে-পরোয়া হয়ে ওঠে—ছিঁড়তে চেষ্টা করে শক্ত দড়ির বাঁধন—দেয়ালে লাথি মারে পালিয়ে যাবার জন্যে ছুটে ছুটে পালাতে।

সোকল তার ছোট, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে শুয়ে ছিল। তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। দেয়ালের ফাটলের ভেতর দিয়ে ঘরের মেঝেয় এসে পড়ছিল ডুবে যাওয়া সূর্যের এক ফালি ক্ষীণ আলোর রেশ। সোকল শোকার্ত চীৎকার করতে থাকে তাই দেখে। বিগত দিনের ঘন নীরবতার মাঝখান থেকে, কেউ তাকে উত্তর দেয় না। চড়ুই পাখীর দল শব্দ করে পাশ দিয়ে উড়ে গেল—কেউ বা আবার কাছাকাছি বাসায় বসে কিচির-মিচির করতে লাগল। আবার কেউ অন্তরীক্ষে তার কিরণজাল গুটিয়ে নেবার সময়, গুঞ্জনরত পতঙ্গদলের ভেতর দিয়ে পালক লাগান তীরের মত ছুটে যাচ্ছিল। দূরে মাঠ থেকে ব্যস্ত কাস্তের হুস্-হুস্, খস্-খস্ শব্দ ছুটে আসছিল।

কিন্তু সোকলের চারদিকে নিরেট, ভীতিপ্রদ, নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। বিষণ্ণ ভয়ে ওর, মন ছেয়ে গেছে। সবই যেন আজ ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে—অন্যরূপে দেখা দিচ্ছে—আর সে পারে না—ক্ষিপ্ত হয়ে দড়ির ফাঁস টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করল—দড়ি ছিঁড়ে গেল......দরজা ঠেলে ফেলে ও দৌড়তে লাগল খোলা উঠানের দিকে।

বাইরের আলোর ধাঁধা লাগে সোকলের চোখ—অসহ্য যাতনায় পেটের নাড়ী পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। উপায় না দেখে সে স্থির, অভিভূতের মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাহোক, একটু একটু করে সে আশ্বস্ত হতে থাকে; নিজেকে নিজের কাছে ফিরে পায়। শস্যভরা মাঠের, বনের ক্ষীণ স্মৃতি তার মনের কোণে ভেসে ওঠে ছুটে পালাবার জন্যে এক দুরন্ত বাসনা......দূরদেশ জয় করবার, সম্পূর্ণরূপে বাঁচবার দুর্দমনীয় আশা। সে উৎসুক হয়ে আঙিনা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খোঁজে। আঙিনাটি আবার চৌকোণ, তিন-দিকে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা আর একদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া; তাই সে বৃথাই খুঁজতে লাগল বেরিয়ে যাবার পথ—কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। পায়ে ভর করে উঠে সে দাঁড়াতে পারছিল না মোটেই—একটু নড়তে গিয়েই পাচ্ছিল অসহ্য ব্যথা—ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল পুরান ক্ষত থেকে।.....

শেষে সোকল কাঠের বেড়ার কাছে গেল, চোখে পড়ল তার মনিবের বাড়ী। বাড়ীর সামনে ফুলের বাগানে রোদ পোয়াচ্ছে কুকুরগুলো—সারা বাড়ী সোনালী রোদে চিক্‌চিক্ করছে। সোকল মিনতিমাখা করুণ স্বরে ডাকতে থাকে।......

এমন সময় যদি কেউ ওর সঙ্গে হাসিমুখে দুটো কথা কয় বা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, তাহলে বোধহয় নিজের ইচ্ছায়ই ও শুয়ে পড়ে মরতে আর একটুও কষ্ট হয় না। ওর চারদিকে কিন্তু সব চুপচাপ, আলস্যে আচ্ছন্ন।......

কোন উপায় না দেখে সোকল বেড়ার লোহা কামড়াতে থাকে আর শরীরের কমে যাওয়া শক্তি ঢেলে দেয় দরজা ঠেলে ফেলতে। অনেক চেষ্টার পর হঠাৎ দরজা খুলে যায়—সে বাগানে ঢুকে পড়ে—বাড়ীর বারান্দার কাছে গিয়ে শোকার্ত চীৎকার করে। কিন্তু কেউ তা শোনে না। একবার সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে দেখল, সব জানালায় পর্দা লাগান—কেউ ওকে ডাকছে না, শুনছেও না। নিরুপায় হয়ে সে বাড়ীময় বার কয়েক ঘুরে বেড়াল।

এমনি অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটবার পর সোকলের মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল তার আগেকার দুঃখের কথা। সে স্বপ্ন দেখে দূরে, অতি দূরে দিক্‌চক্রবালের সাথে মিশে যাওয়া সাগরের মত অসীম প্রশস্ত শস্যক্ষেত্রের। নিজের খেয়ালে, কল্পনায় প্রলোভিত হয়ে আছাড় খেয়ে

পড়েও সে অনেক কষ্টে তার ক্ষীণ শক্তি নিয়ে সামনে এগিয়ে চল্‌ল।......

সোকল কাঁপে, বেদনায় তার চোখ ছল্‌-ছল্‌ করছে। সে জোরে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে থাকে আর ভিজে ঘাসের কাছে নাক নিয়ে আসে তার জ্বলে যাওয়া নাক ঠাণ্ডা করতে।.. তার অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে......ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সে অনবরত চেষ্টা করে সামনে এগিয়ে যাবার--ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্য। সে যায়, আর ক্ষেতে গমের চারায় পা আটকে আছাড় খেয়ে পড়ে—পা তার ভারী হয়ে আস্‌তে থাকে। চষা উঁচু-নীচু মাঠকে মনে হয় দুরভিসন্ধিভরা বিরাট গভীর গর্ত তাকে ঠকাবার জন্যে ঢাকা রয়েছে। ঘাসগুলো আবার পায়ে জড়িয়ে যায় আর ও আছাড় খেয়ে পড়ে। ছোট ছোট ঝোপ ওর পথ আটকে দেয়, ও দাঁড়িয়ে পড়ে, টল্‌তে থাকে, ঘুরে চলে যাবার সাহস মনে আনতে পারে না। মাটী যেন কেবলই তাকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে আস্‌ছে—কখনও বা ছোট চারাগুলো স্বপ্নময় দিক্‌চক্রবালকে ঢেকে রাখ্‌ছিল ওর চোখের সামনে থেকে।

তার অসহায় মূক প্রাণ ভয়ের অন্ধকারের সাথে মিশে যাচ্ছিল। কিছু বুঝতে না পেরে সে কুয়াশা-ছাওয়া হেঁয়ালীর ভিতর হাতড়ে এগিয়ে চলে। একটি ছোট পাখী তার ডানা-গুলো নিয়ে উড়ে এসে ওর পায়ের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায় ওকে করে দিয়ে ভয়ে নিশ্চল—এগোতে আর ওর সাহস হয় না। কাকের দল বেশ নিশ্চিন্ত মনে মাঠের ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু সোকলকে অমনি অবস্থায় দেখে তারা পাশে এক গাছের ওপর বসে 'কুডাক' ডাক্‌তে থাকে।

সোকল নিজেকে কোন রকমে টান্‌তে টান্‌তে মাঠের একধারে নিয়ে এল—কিন্তু আর সে পারে না, তাই শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল মাটীর ওপর। সে পা ছড়িয়ে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাকে ময়দানের দিকে। কাকের দল সুবিধে পেয়ে গাছ থেকে মাটীতে নামে আর মাটীর ওপর লাফাতে লাফাতে তার খুব কাছে চলে আসে। গমের চারাগুলো নুয়ে পড়ে আর তাদের ছোট্ট লাল চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে তার চোখের ভেতর। কাক আরও কাছে চলে আসে মাঠের শুকনা ঘাসের ওপর ঠোঁট ধারাল করে নিয়ে। কেউ আবার বিশ্রী ডাক্‌তে ডাক্‌তে ওর উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় আর পাক খেয়ে ঘুরে ক্রমশ নীচে নামে। সোকল দেখে ওদের লোভী হাঁ করা ঠোঁট আর গোল চোখ। কিন্তু তবুও সে নড়ে পালাতে পারে না। তার পা মাটীর ওপর আছড়ে শরীরটা সামনে ঠেলতে থাকে, ভাবে সে উঠে পড়েছে......। শিকারী কুকুরের দল বাতাসের বেগে ছুটে আস্‌ছে ডাক্‌তে ডাক্‌তে......।

তার ভয় ক্রমশ বাড়তে লাগল—বে-পরোয়া হয়ে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কাকের দল শব্দ করে উড়ে যায়........

সোকল কিছুই চোখে দেখ্‌তে পার্‌ছে না, বুঝ্‌ছে না কিছু......সবই যেন ওর কাছে ঘুর্‌ছে আর দোল খাচ্ছে—জড়িয়ে আস্‌ছে আর ধাক্কা খাচ্ছে। তার মনে হয় যেন সে গভীর আঁধারের তলায় ডুবে যাচ্ছে। শরীরে শীতের কাঁপন লাগে—সে চুপ করে থাকে।

সূর্য ডুবে গেল। ধূসর গোধূলি হেঁয়ালীমাখা কলরব-ক্লান্ত মলিন আবরণে পৃথিবী ঢেকে ফেল্‌লে—দূরে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

লাপা খবর পেয়ে দৌড়ে আসে তার বন্ধুর কাছে—কিন্তু সোকল আর তাকে চিন্‌তে পারে না। বুড়ো কুকুরটা ওর গা চেটে দেয়, হতভম্ব হয়ে থাবা পেতে বসে, আবার মাঝে মাঝে মাঠের এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি ক'রে সবাইকে ডাকে সাহায্যের জন্যে, কিন্তু কোথায়—কেউ ত আসে না......

ঘাসগুলো সোকলের খোলা বড় বড় চোখের ভেতর চেয়ে থাকে......। গাছেরা কাছে চলে আসে ওদের হাতের মত ছোট ডাল বাড়িয়ে দিয়ে। পাখীরা সব চুপ হয়ে গেছে। হাজারে হাজারে ছোট ছোট প্রাণী সোকলের শীর্ণ মৃত দেহখানির ওপর নেমে আসে খুঁচিয়ে ছিঁড়ে তার মাংস খেতে......কাক বিশ্রী ডাকতে থাকে।

লাপা ভয়ে শিউরে ওঠে—করুণ আর্তনাদ করে হতাশ হয়ে পড়ে। *

---

* পোল গল্প থেকে।

পুস্তক পরিচয়

পরাগতি—লেখক শ্রীপ্রমোদকুমার বসু। প্রকাশক শ্রীপ্রণয়-কুমার বসু এ্যাণ্ড ব্রাদার্স। বাবুগঞ্জ, হুগলি।

ইহা একখানি উপন্যাস। সাহিত্যের বাজারে যে সব বস্তা-পচা মাল চালানোর চেষ্টা চলিতেছে—পরাগতি তাহাদেরই পর্য্যায়ে পড়ে। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি কদর্য ছবি আঁকিয়া লেখক সনাতন আদর্শের জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আদর্শ প্রচারের কাজ হইয়াছে কিন্তু সাহিত্য হয় নাই।

রূপ-শিল্প—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বারখানা চিত্র সম্বলিত। মূল্য দেড় টাকা।

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সহকারে নিগূঢ় রসতত্ত্ব বিশ্লেষণে অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের ক্ষমতা অসামান্য। আলোচ্য পুস্তকখানার প্রতি পত্রে তাঁহার সেই অসামান্য গূঢ়প্রবেশের প্রতিভা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের যে রস-রাজ্য দুর্ব্বিগ্রাহ্য, যেখানে অনুমান নাই, আছে সত্যকার অনুভব, সেই রাজ্যের খবর দিবার—সেই অনুভবের সাহায্যে অপরকে অনুভাবিত করিবার মত ভাষাকে অভিব্যক্তি দিবার ঐকান্তিকতা অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের আয়ত্ত আছে। ভাবের এমন গাঢ়তা, এমন ঠাসা বাঁধুনির মধ্যেও ভাষার প্রাঞ্জলতা, বিশ্লেষণ-ভঙ্গীর এমন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় বাঙলা ভাষায় সত্যই দুর্ল্লভ। অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের পুস্তকখানা বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার এই পুস্তকখানাতে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে রসতত্ত্বের দুরূহ দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পাঠকেরা অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের পুস্তকখানা পাঠ করিয়া নিজেরাই তাহা আস্বাদ করুন। "অধ্যাত্ম-জগতে, জীব-জগতে, ঊর্দ্ধে অশরীরী-জগতে, কথা যেখানে পৌঁছতে পারে না, সুর অনেকটা দূর আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কথাকে বাহন করে, অধ্যাত্ম-সমুদ্রে আমরা খুব কম দূরই পাড়ী দিতে পারি—লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে, কথা পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে। সুর পরপারের তীরের অনেকটা নিকটে আমাদের নিয়ে যায়—অন্ততঃ, যতটা নিকটে নিয়ে যায়, সাহিত্যের কাব্যের বা দর্শনের নৌকা ততদূর পারে না। সুর অধ্যাত্ম-জগতের মহাযানী পন্থা। অর্থাৎ আপামর সাধারণ সকলেই এই গানের পথে, অধ্যাত্ম-জগতে বিশুদ্ধ আনন্দের জগতে, পরমানন্দের জগতে সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারে।" অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের এই উক্তির সঙ্গে আমাদের বিশেষ কিছু মতভেদ নাই। আমরা শুধু, গমনও যাহাতে নটন-লীলা হইয়া উঠে, বচনও সঙ্গীত কলায় দাঁড়ায়, রস-শক্তির এমন সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করি।

কালীপূজার চিত্রাবলী—শ্রীচৈতন্য দেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বরূপ বসু চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শিল্পী শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি প্রথিতযশা। চিত্রাবলীতে ৩৪ খানা ছবি আছে। কিন্তু শুধু ছবি নাই, ছন্দও আছে, কথার সঙ্গে সঙ্গে রূপ আছে এবং কথা ও রূপের ভিতর ছন্দ কাব্যের রসে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। কথার প্রশংসা করিব না রূপের প্রশংসা করিব, দুইয়ের মধ্যে এমন সঙ্গতি রহিয়াছে যে, একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে বেশী প্রশংসা করিবার উপায় নাই। ভাবে ভাষায় এবং রূপে যেন একটানা বাঁধা সুর আগাগোড়া, এইখানেই শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম, সুদৃশ্য আর্ট পেপারে ছাপা। এই বহির সর্ব্বত্র আদর হইবে।

নব-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী—লেখক শ্রীরমাপতি বিশ্বাস; রাঁচী হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহা তেরটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধের বিষয়গুলি জটিল হইলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিমার এবং প্রকাশভঙ্গিমার গুণে বেশ সরস হইয়াছে। স্বাধীন সবল মন লইয়া লেখক জীবনের বহু সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছেন। এই বইখানি আমাদের যুবকদের চিন্তারাজ্যে নূতনত্বের সঞ্চার করিবে—ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। যে দৃষ্টি থাকিলে মানুষ বিরোধকে সমন্বয়ের মধ্যে সার্থক করিতে পারে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়—সে দৃষ্টি লেখকের আছে।

স্বপ্ন কামনা—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত এবং শঙ্কর-নিবাস, রমনা, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

কবিতার বই। অন্তরের গোপন কামনাগুলি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটিলেও পড়িতে ভালই লাগে। কিন্তু কবিতায় আদিরস সংযমের সীমা ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে নোংরামিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কবির কামনার উদ্দামতা—সেই কদর্য নগ্নতা সাহিত্যে প্রকাশ না করিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ থাকিয়া যায়?

আধুনিক সমাজ—শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত; প্রফুল্ল লাইব্রেরী ৭১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৫; মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙলা উপন্যাস। লেখকের ভাষার উপর দখল আছে। ভাব-ভাষা-ভঙ্গিমা-রচনা ও চরিত্র চিত্রণে শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক উপন্যাসখানিতে বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্য সমস্যার সমাধানে ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

এলডোর‍্যাডোর বন্দী—শ্রীহিমাংশু রায় প্রণীত। ৭১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতার প্রফুল্ল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এ্যাডভেঞ্চারের বই—আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতে হয়—শেষ না করিয়া উঠা যায় না। এই বইখানি ছেলেদের চাহিদা মিটাইবে এবং ছেলেদের মহলে ইহার আদর হইবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল, চিত্রকয়টিও সুন্দর।

রাঙ্গা মামার ভাঙ্গা আসর—শিশু-সাহিত্যিক শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত। প্রফুল্ল লাইব্রেরী, ৭১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম দশ আনা।

বইখানিতে ১২টি গল্প আছে; গল্পকয়টিই ভাল; বাস্তবতার সহিত যোগ আছে; ছোটদের উপযুক্ত করিয়াই লেখা। ছোটদের আসরে বইখানির চাহিদা হইবে। ছাপা, বাঁধাই, চিত্র ভাল।

সাহিত্য-সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

বান্ধব সম্মিলনী পরিচালিত নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা আগামী ৯ই জুন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় সমগ্র বঙ্গের যে কোন স্কুলের ছাত্র যোগদান করিতে পারিবেন। দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে—

(১) অধ্যবসায় সম্বন্ধে একটি বাঙলা প্রবন্ধ, (২) একটি বাঙলা গল্প দুঃখবর্জিত (ছোট এবং স্কুল বালকের উপযুক্ত)। প্রত্যেক বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়কে পুরস্কার দেওয়া হইবে। যে কেহ একের অধিক নাম দিতে পারিবেন। বিচারকের বিচারের পর কোনরূপ আপত্তি চলিবে না। লেখকগণ তাহাদের স্কুলের নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা দয়া করিয়া দিয়া দিবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

(১) শ্রীমলয় হালদার—৬৫নং চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট। (২) শ্রীঅজিত নিয়োগী—৩৪নং বেথুন রো। (৩) শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জ্জি—ফ্রেন্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব, গিরীশ পার্ক।

গল্প প্রতিযোগিতা

হাতে লেখা "প্রভাতী" পত্রিকায় একটি গল্প প্রতিযোগিতা হইবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখককে একটি সুদৃশ্য রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে। যে কোন বিষয় লইয়া গল্প লেখা যাইবে। মনোনীত লেখাসকল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখাটি "প্রভাতীতে" প্রকাশিত হইবে। সর্ব্ববিষয়ে এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্তই চরম। ফলাফল যথাসময়ে এই কাগজে প্রকাশিত হইবে। আষাঢ় মাসের মধ্যেই লেখা পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে বা চিঠির জবাব পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন।

শ্রীঋচিরঞ্জন সেন,
৩১, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিযোগিতা

(আলোক-চক্র)

আগামী ১৬ই জুলাই আলোক-চক্রের প্রথম বাৎসরিক উৎসবে রচনা, আবৃত্তি, ব্যঙ্গ কৌতুক প্রভৃতির আয়োজন হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিষয়ঃ—রচনা—১। ছোট গল্প। ২। কবিতা। ৩। প্রবন্ধ—সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব। আবৃত্তি—১। রবীন্দ্রনাথের—পতিতা। ২। নজরুলের—নারী। ৩। বুদ্ধদেবের শাপভ্রষ্ট। ব্যঙ্গ কৌতুক—যে কোন বিষয়ে।

প্রতিযোগিগণ ৪ঠা জুলাইয়ের মধ্যে ১৫১ডি, রসা রোড, ভবানীপুর আলোক-চক্র কার্য্যালয়ে নিজ নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন। রচনাগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া বাঙলায় লিখিয়া পাঠাইবেন যাহাতে উহা ৯ই জুলাই উক্ত ঠিকানায় পৌঁছে। ৯ই জুলাই অপরাহ্নে উপরোক্ত ঠিকানায় আবৃত্তি ও ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিগণ যেন ঐ সময় উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য অনুসন্ধানও উক্ত ঠিকানায় করণীয়। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কার্য্যালয় সম্পাদক।

রচনা প্রতিযোগিতা

লিপিকার বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি ঘোষিত হইয়াছে ঃ—

(১) উচ্চাঙ্গের একটি প্রবন্ধের জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০, টাকা; (২) উচ্চাঙ্গের একটি গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার ৫০, টাকা; (৩) উচ্চাঙ্গের একটি কবিতার জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫, টাকা; (৪) উচ্চাঙ্গের একটি চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫, টাকা।

প্রত্যেক বিষয়েই যথাযোগ্য আনুষঙ্গিক পুরস্কার বিতরিত হইবে। রচনাগুলি ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। শিল্পী ও সাহিত্যিক মাত্রেই এই প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশ মূল্য না দিয়া যোগ দিতে পারিবেন। ছদ্মনাম ব্যবহারে কোন বাধা থাকিবে না। উপযুক্ত টিকিট সঙ্গে থাকিলে যে কোন অনুসন্ধানের জবাব দেওয়া হইবে এবং অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে। পুরস্কৃত রচনাগুলি আমাদের "যুগধর্ম্মী" মাসিক পত্র লিপিকায় প্রকাশিত হইবে। রচনাগুলি ১০ই শ্রাবণের মধ্যে আমাদের কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। ফলাফল লিপিকায় ও অন্যান্য সাময়িকীতে বিজ্ঞাপিত হইবে। খামের উপরে "প্রতিযোগিতা" এই কথাটি লিখিয়া দিতে হইবে। প্রতিযোগিতা সম্পাদক, লিপিকা ঃ ৩৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় রচনাদি পাঠাইতে হইবে। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, লিপিকা।

প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা

"আবর্ত্ত সঙ্ঘের" ধুনট শাখার পরিচালনাধীনে প্রবন্ধ ও চিত্র প্রতিযোগিতা হইবে। সমস্ত রচনা ও চিত্র ১৫ই জুলাই (১৯৩৯)-এর ভিতর পাঠাইতে হইবে। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

প্রবন্ধ ঃ—বিষয় "বাঙলার পল্লী-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।" ১ম ও ২য় দুইটি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

চিত্র ঃ—যে কোন "প্রাকৃতিক দৃশ্য।" বাঙলার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য একটি অত্যুৎকৃষ্ট রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধ ও চিত্র পাঠাইতে হইবে। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সরকার, জেনারেল সেক্রেটারী, "আবর্ত্ত সঙ্ঘ", পোঃ ধুনট, জেলা বগুড়া।

তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ১৫ই বৈশাখ ২৪শ সংখ্যা "দেশ" পত্রিকায় হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্মৃতি সঙ্ঘ পরিচালিত রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে মে '৩৯-এর স্থলে ৩১শে জুলাই '৩৯ ধার্য্য করা হইল।

শ্রীসুবিমল দে সরকার,
সম্পাদক, রচনা বিভাগ।

রঙ্গজগৎ

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কঙ্কাবতী গত ২১শে জুন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এ সংবাদ আমরা গত সপ্তাহে জানাইয়াছি।

শ্রীমতী কঙ্কাবতী গত ১৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নাট্যজগতে শ্রীমতী কঙ্কাবতীই একমাত্র গ্রাজুয়েট অভিনেত্রী। ইনিই প্রথম শিক্ষিতা মহিলারূপে নাট্যজগতে যোগদান করেন এবং বিখ্যাত নাট্যশিল্পী শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নিকট নাট্যকলা শিক্ষা করেন।

বি-এ পাশ করিয়া শ্রীমতী কঙ্কাবতী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ার সময় পড়া ছাড়িয়া দেন। তাহার পরে নাট্যশিল্পী শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শিক্ষাধীনে নাট্যজগতে যোগদান করেন। নাট্যমন্দিরে 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে ভারত নারীর ভূমিকায় তিনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন। পাঠ্যাবস্থায় সংগীতে তাঁহার খুব নাম ছিল। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে তাঁহার 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটি সকলকে মুগ্ধ করে। ১৯২৪ সালে তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' নাটকের নির্ব্বাক চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর 'আলমগীরে' উদিপুরীর ভূমিকায়; 'বিজয়ায়' বিজয়ার ভূমিকায়; 'বিরাজবৌ-এ বিরাজবৌ-এর ভূমিকায়; 'অচলায়' অচলার ভূমিকায়; যোগাযোগে নায়িকার ভূমিকায়; 'রমা'য় জ্যাঠাইমার ভূমিকায়; 'রীতিমত নাটকে' নায়িকার ভূমিকায় ও অন্যান্য অনেক চরিত্রে অভিনয় করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া আমেরিকা যান তখন তিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে গিয়াছিলেন। 'সীতা' চিত্রে তিনি সীতার ভূমিকায় এবং 'দস্তুরমত টকি' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। মৃত্যুকালে শ্রীমতী কঙ্কাবতী কালী ফিল্মসের 'চাণক্য' ছবিতে মুরার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। ছবিখানি এখনও শেষ হয় নাই। রবিবার অসুখের পূর্ব্বেও তিনি ছবি তোলার সময় উপস্থিত ছিলেন

১৯০৩ সালে কলিকাতায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীর জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীমতী কঙ্কাবতী কালী ফিল্মসের 'চাণক্য' ছবিতে মুরার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। ছবিখানি এখনও শেষ হয় নাই এবং আমরা

ফিল্ম করপোরেশনের **"রিক্তা"** চিত্রে শ্রীমতী ছায়া। শ্রীযুত সুশীল মজুমদার পরিচালনা করিতেছেন।

জানিতে পারিলাম যে, মুরার কয়েকটি দৃশ্য এখনও তোলা হয় নাই। এ বিষয়ে কালী ফিল্মসের নিকট আমাদের একটি প্রস্তাব আছে। আমরা মনে করি যে, শ্রীমতী কঙ্কাবতী মুরার যে কয়টি দৃশ্যে অভিনয় করিয়াছেন; শ্রীমতী কঙ্কাবতীর শেষ অভিনয় হিসাবে তাহা নষ্ট না করিয়া জনসাধারণকে দেখিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। মুরার অবশিষ্ট দৃশ্যসমূহে যে অভিনেত্রী অভিনয় করিবেন তিনি শ্রীমতী কঙ্কাবতী অপেক্ষা ভাল অভিনয় করিবেন কি মন্দ অভিনয় করিবেন সে প্রশ্ন এখানে আসে না এবং সেই সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা সমালোচনার কথা উঠিতে পারে বলিয়া আমরা মনে

করি না। যিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করিবেন তাঁহার মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নামের জন্য, টাকার জন্য অভিনয় করিবেন না; শ্রীমতী কঙ্কাবতীর অভিনয়ের শেষ স্মৃতিটুকু যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্যই তিনি অভিনয় করিবেন। শ্রীমতী কঙ্কাবতীর ভগ্নী চন্দ্রাবতীকে এই ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

*   *   *   *   *

৩০শে জুন, শুক্রবার হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে রাধা ফিল্মসের নূতন ছবি "নরনারায়ণ" আরম্ভ হইবে। ছবিখানি পৌরাণিক। স্যমন্তক মণি উপাখ্যান অবলম্বনে ছবিখানি তোলা হইয়াছে। শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায়—শীলা হালদার, রাণীবালা, রবি রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মৃণাল ঘোষ, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মোহন ঘোষাল, কুমার মিত্র, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি দেখিয়া আসিয়া পরে আমরা এই ছবি সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাইব।

*   *   *

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "পরশমণি" ছবি তোলা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন ছবির বিভিন্ন ভূমিকায়—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না রবি রায়, রাণীবালা, তুলসী লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বীণা বাগচি, অরুণা, প্রভা, সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি আগষ্ট মাসে কলিকাতায় দেখান হইবে।

*   *   *

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি "কপালকুণ্ডলা" তোলা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুত ফণী মজুমদার ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। নাজাম, জগদীশ, লীলা দেশাই, কমলেশকুমারী, পান্না প্রভৃতি ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তোলা "রজত-জয়ন্তী" ছবি শীঘ্রই কলিকাতায় দেখান হইবে।

শ্রীযুত নীতীন বসুর বাঙলা ছবি "জীবন মরণ"-এর কাজ বেশ ভাল ভাবেই অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমতী লীলা দেশাই এই চিত্রের নায়িকা।

*   *   *   *

শ্রীযুত হেমচন্দ্র একখানি বাঙলা ছবি তুলিতেছেন। শ্রীমতী কাননবালা সেই চিত্রের নায়িকা।

*   *   *

কমলা টকিজ লিমিটেডের হইয়া শ্রীযুত সতু সেন, শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "স্বামী-স্ত্রী" ছবি পরিচালনা করিবেন। রংগমঞ্চে এই নাটিকাখানি সাফল্যমণ্ডিতভাবে অভিনীত হইয়াছে। ফিল্ম প্রডিউসার্স ষ্টুডিওতে এই ছবিখানি তোলা হইবে। ছবিখানির চরিত্রলিপি এইরূপঃ—ললিত—ছবি বিশ্বাস; লিলি—ছায়া; মোহন—প্রভাত মুখার্জ্জি; মিনতি—চন্দ্রাবতী; মিঃ দাস—সন্তোষ সিংহ; মিসেস দাস—সুপ্রভা মুখার্জ্জি।

কমলা টকিজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" ছবিখানিও এই ষ্টুডিওতে তোলা হইবে। শ্রীযুত সুকুমার দাশগুপ্ত ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন। নায়িকার ভূমিকায়—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী অভিনয় করিবেন।

রাধা ফিল্ম সম্প্রতি আর একখানি পৌরাণিক ছবি তোলা আরম্ভ করিয়াছেন। ছবিখানির নাম "বামনাবতার।" শ্রীযুত হরি ভঞ্জ ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন। চরিত্র-লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বলি অহীন্দ্র চৌধুরী; শুক্র—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; ইন্দ্র—প্রফুল্ল মুখার্জ্জি; বাণ—পঞ্চানন ব্যানার্জ্জি; কশ্যপ—তুলসী চক্রবর্ত্তী; অনুরথ—শীতল পাল; নারায়ণ—মাণিক ব্যানার্জ্জি; নারদ—মৃণাল ঘোষ; লক্ষ্মী—রেণুকা; অদিতি—নিভাননী; বিন্ধ্যাবলী—রাণীবালা।

*   *   *

রংগমঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত নাটক—শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "তটিনীর বিচারের" চিত্ররূপ দিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। ফিল্ম কর্পোরেশনে এই ছবি তোলা হইবে। শ্রীযুত সুশীল মজুমদার পরিচালনা করিবেন। ডাঃ ভোসের ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী; তটিনীর ভূমিকায়—রাণীবালা ও ললিতার ভূমিকায়—মীরা সান্যাল অভিনয় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

*   *   *

সাগর মুভিটোনে শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় যে ছবিখানি বাঙলা ও হিন্দী সংস্করণে তোলা হইতেছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "কুম্কুম।" 'কুম্কুম' চিত্রে অভিনয় করিতেছেন সাধনা বসু, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, নবদ্বীপ হালদার, ভুজঙ্গ, পদ্মা প্রভৃতি। বাঙলা দেশে এই ছবিখানির বাঙলা ও হিন্দী সংস্করণের পরিবেশন ভার লইয়াছেন প্রাইমা ফিল্মস

কালকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকল দলই নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কোন্ দল চ্যাম্পিয়ান হইবে এখনও পর্য্যন্ত সঠিকভাবে বলা চলে না। মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল, রেঞ্জার্স, মহমেডান স্পোর্টিং ও কালীঘাট এই পাঁচটি দলেরই চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে ইহাদের মধ্যে মোহন-বাগান দলেরই আশা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এখনও পর্য্যন্ত এই দল লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে আছে—১৭টি ম্যাচ খেলিয়া ২৭ পয়েণ্ট লাভ করিয়াছে। ইহার পরেই ১৮টি ম্যাচ খেলিয়া ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ২৩ পয়েণ্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পরেই রেঞ্জার্স ক্লাব ২২ পয়েণ্ট পাইয়া তৃতীয় ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২১ পয়েণ্ট পাইয়া চতুর্থ স্থানে আছে। কালীঘাট দল ১৫টি ম্যাচ খেলিয়া ২০ পয়েণ্ট পাইয়া পঞ্চম স্থানে বর্ত্তমান। সুতরাং প্রথম চারিটি দলের কথা বিবেচনা করিলে মোহনবাগান দল যদি ভাগ্য-বিড়ম্বনায় পরবর্ত্তী সকল খেলাতেই পরাজিত না হয় তবে লীগ চ্যাম্পিয়ান্ হইবে এইরূপে ধারণা করা খুবই অন্যায় হইবে না।

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইষ্ট বেঙ্গল দল সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় অনেকেই আশা করিতেছেন যে, অবশিষ্ট ছয়টি খেলাতেই এই দল বিজয়ী হইবে। কিন্তু আমরা এইরূপ সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। বিশেষ করিয়া অবশিষ্ট খেলার মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও কালীঘাট দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া ইষ্টবেঙ্গল যে সহজে বিজয়ী হইতে পারিবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মোহন বাগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা যখন আছে তখন ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করিবার জন্য এই দল প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তবে এই দুইটি দলের খেলা লীগের একরূপ শেষভাগে হইবে। তখন এই খেলার ফলাফলের উপর চ্যাম্পিয়ানসিপ বিশেষ নির্ভর নাও করিতে পারে।

মহমেডান স্পোর্টিং দলের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ঐ একই রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অঘটন না ঘটিলে এই দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। গত চারিটি ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়গণের ব্যর্থতা দেখিয়া ইহাই ধারণা হইয়াছে যে মহ-মেডান স্পোর্টিং দলের ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, এই দল শত চেষ্টা করিয়াও ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া এই দল যে সম্মান লাভ করিয়াছিল এই বৎসর তাহা লাভ করা ভাগ্যে নাই। এই জন্য বলিতে হইতেছে অঘটন ছাড়া এই দল চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে না।

ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের অবস্থা যদি এই-রূপ, তবে মোহনবাগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার পথে বাধা দিতে পারে এইরূপ দল আর নাই, ইহা অনেকের মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি কালীঘাট ও রেঞ্জার্স দলের বিষয় আলোচনা করেন তখন বুঝিতে পারিবেন মোহনবাগান দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের পথ এখনও সুগম নহে। কালীঘাট দলের এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাধা দিবার সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি কালীঘাট পুলিশ দলের নিকট পরাজিত হওয়ায় ক্রীড়ামোদিগণ অনেকেই এই দল সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেও এই দল মোহনবাগান অপেক্ষা দুইটি ম্যাচ কম খেলিয়া ২০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়াছে ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই দলের আক্রমণ-ভাগের খেলোয়াড়গণ অপর সকল দলের খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা গোল করিতে বিশেষ পটু ইহা যাঁহারা এই দলের খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহার পর লীগের অবশিষ্ট খেলার সকল গুলিতেই যে এই দল বিজয়ী হইবে না ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং এই দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপে মোহনবাগান দলকে যে বিশেষ বাধা দিবে ইহা কল্পনা করা অন্যায় হইবে না।

তাহা ছাড়া মোহনবাগান দল অবশিষ্ট খেলাগুলিতে নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে না ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না। ১৯২৫ সালের লীগ খেলার কথা স্মরণ করিয়াই আমাদিগকে এইরূপ উক্তি করিতে হইতেছে। সেই বৎসর বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ সকলেই আশা করিয়াছিলেন মোহন-বাগান দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। অল্প কয়েকটি খেলা বাকী, মোহনবাগান লীগ তালিকার শীর্ষে অবস্থান করিতেছে। কালকাটার সহিত মোহনবাগানের পাঁচ পয়েণ্টের ব্যবধান। এইরূপে অবস্থায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ পাইবে ইহা ধারণা করা কোন অন্যায় হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ লীগ খেলা শেষ হইলে দেখা গেল মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান না হইয়া কালকাটা চ্যাম্পিয়ান হইল। সুতরাং এই বৎসরেও সেইরূপ কোন ঘটনার পুনরাভিনয় দেখিতে হইবে না ইহা কে বলিতে পারে? তবে অধিকাংশ বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত এই মোহনবাগান ক্লাব এইবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইলে বাঙালী খেলো-য়াড়গণের কৃতিত্ব যে অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে ইহাই প্রমাণিত হইবে। বাঙলার বিশিষ্ট ক্লাবসমূহ অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণকে বাঙলার মাঠে প্রাধান্য দান করিয়া বাঙালী উৎসাহী খেলোয়াড়গণের মনে যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার দূরীকরণ এই মোহনবাগান দলের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ৩৩নং আইন জারী করিয়া যে ব্যাধি বাঙলা দেশ

হইতে দূরে করিতে পারিতেছে না, মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হইলে তাহা সম্ভব হইবে। তখন অ-বাঙালী খেলোয়াড় আমদানী করিবার পক্ষে যাঁহারা আছেন তাঁহারাই লজ্জা অনুভব করিবেন। দেশের উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে সুবিধা দিলে ও নিয়মিত শিক্ষা দিলে, তাঁহারা যে অন্যান্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ অপেক্ষা কোন অংশেই খারাপ খেলিবে না, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় মোহনবাগানের সাফল্যের উপর বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। মোহনবাগান ক্লাবের পরিচালকগণ কি এই গুরু-দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করিবেন না?

নিম্নে লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:-

প্রথম ডিভিসন

		খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
মোহনবাগান	..	১৭	১১	৫	১	২৫	৫	২৭
ইষ্টবেঙ্গল	..	১৮	৮	৭	৩	২২	৯	২৩
রেঞ্জার্স	...	১৭	১০	২	৫	২৭	১৪	২২
মহমেডান স্পোর্টিং	...	১৭	৮	৫	৪	২০	১৪	২১
কালীঘাট	...	১৫	৮	৪	৩	২৭	১৯	২০
কাস্টমস্	...	১৭	৭	৫	৫	২৯	১৬	১৯
ই বি আর	...	১৭	৮	৩	৬	২৭	২৪	১৯
ভবানীপুর	...	১৭	৬	৩	৮	১৮	২০	১৫
পুলিশ	...	১৮	৫	৪	৯	১১	৩০	১৪
ক্যামেরোনিয়ান্স	...	১৭	৪	৫	৮	১২	২৪	১৩
এরিয়ান্স	...	১৮	৫	৩	১০	১৭	৩০	১৩
ক্যালকাটা	...	১৮	১	৭	১০	২০	৩৩	৯
বর্ডার রেজিমেণ্ট	...	১৮	৩	৩	১২	১৬	৩৪	৯

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এইবার ইংল্যাণ্ডে খেলিতে গিয়াছে। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে, তাহাতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। বোলিং ও ফিল্ডিং বিষয়ে এই দলের শক্তি খুবই কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সম্প্রতি লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা হইয়া গিয়াছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এই খেলাতেও আট উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। উক্ত দলের বিখ্যাত ব্যাটস্ম্যান 'কালা ব্রাডম্যান' হেডলী টেষ্ট খেলার পর পর দুইটি ইনিংসে দুইবার শতাধিক রাণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে তিনি এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "কালা ব্রাডম্যান" নাম তাঁহার কেহ এখনও যে কাড়িয়া লইতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ তিনি দিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ওয়ালী হ্যামণ্ড এই টেষ্ট খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তরুণ খেলোয়াড় হাটন ও কম্পটন ব্যাটিংয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, হাটন ১৯৬ রাণ ও কম্পটন ১২০ রাণ করিয়াছেন। টেষ্ট খেলায় নবাগত বোলার কপসন বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দুই ইনিংসে তিনি ৯টি উইকেট পাইয়াছেন। ইহার পক্ষে এইটো নিঃ উল্লেখযোগ্য। ভেরিটী সুবিধা করিতে পারেন নাই। প্রবীণ খেলোয়াড় পেণ্টার তাঁহার খ্যাতি অনুযায়ী ব্যাটিং করিয়াছেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস--২৭৭ রাণ

(গ্রাণ্ট ২২, হেডলী ১০৭, সিলী ২৯, বাওয়েস ৪৪ রাণে ৩টি, কপসন ৮৫ রাণে ৫টি ও রাইট ৫৭ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস (৫ উই) ৪০৪ রাণ

(হাটন ১৯৬, পেণ্টার ৩৪, কম্পটন ১২০, ক্যামেরন ৬৬ রাণে ৩টি, ক্লার্ক ২৮ রাণে ১টি ও হিলটন ৯৮ রাণে ১টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস ২২৫ রাণ

(গ্রাণ্ট ২৩, হেডলী ১০৭, সিলী ২৯, বাওয়েস ৪৪ রাণে ১টি, কপসন ৬৭ রাণে ৪টি, রাইট ৭৫ রাণে ৩টি, ভেরিটী ২০ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন।)

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস (২ উই) ১০০ রাণ

(পেণ্টার ৩২ নট আউট, হ্যামণ্ড ৩০ নট আউট।)

(ইংল্যাণ্ড দল আট উইকেটে বিজয়ী।)

সাপ্তাহিক সংবাদ

২০শে জুন—

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের একটি সদস্য পদ পূরণের জন্য পূর্ব্ব-বঙ্গ শহর সাধারণ কেন্দ্রে যে উপ-নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

"এডভান্স" পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা এবং উক্ত পত্রিকার একাউন্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দের বিরুদ্ধে হিসাবপত্র জালের যে মামলা চলিতেছিল, কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে কে বিশ্বাস তাহার রায় দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালাকে হিসাবপত্র জালের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এক শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী মণীন্দ্রকুমার দে-কে সন্দেহের অবকাশে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব চেকোশ্লাভাক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজনীতিক অপরাধে সুদেতেন অঞ্চলের যে সকল অধিবাসী দণ্ডিত হইয়াছিল, হের হিটলার উঁহাদের সকলের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

লোহিত সাগরের উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল হইতে তৈল সরবরাহ সম্পর্কে সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে হের হিটলার রাজা ইবনসৌদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

তিয়েনসিনের বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধের আজ সপ্তম দিবস। বৃটিশ রাজদূত জাপ-পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতার সহিত দেখা করিয়া তিয়েনৎসিনে জাপানী অবরোধ প্রাকারের নিকট ইংরেজদের উপর দুর্ব্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকার স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি টোকিওতে পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়া কুলাংসু অবরোধের তীব্র প্রতিবাদ-জ্ঞাপক এক লিপি দাখিল করিয়াছেন।

মিসেস কিরণ বসু সমাজ সম্পর্কিত রাষ্ট্রে সঙ্ঘের পরামর্শদাতা কমিটির রিপোর্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদে নিযুক্ত হইলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ জানান যে, ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ সাহেব মৈজুদ্দিন খাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীগণ যে অভিযোগ আনিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশিত হইবে না। খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

নিঃ ভাঃ সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জয়নারায়ণের সহিত মতানৈক্যের দরুণ মেসার্স এম আর মাসানী, অশোক মেটা, অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন, ইউসুফ মেহেরআলী এবং ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া উক্ত দলের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর সদস্য-পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

২১শে জুন—

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাপ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—এই সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমন্ত্রিত হইয়া বৈঠকে যোগদান করেন। কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাব কমিটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ঐ রিপোর্টের আলোচনা হয়।

হক মন্ত্রিমণ্ডলী কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বিতীয় দফা সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বায়ত্তশাসন বিভাগ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিলের যে খসড়া রচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রসার করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন নিম্নলিখিত মর্ম্মে সংশোধন করা হইবে:—আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানদের পদ বাতিল করিতে পারিবেন এবং কোন বিভাগের পরিচালনা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কর্পোরেশনের কার্য্যে ত্রুটি দেখা দিলেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কর্পোরেশনের যে কোন প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন-বোধে বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। বাঙ্গলা সরকার কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিবেন এবং কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইবে। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে-সব চুক্তি হইবে, তাহা মেয়র বা ডেপুটি মেয়র না করিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা করিবেন এবং যে কোন বিষয়ে ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিবেন। তাঁহার কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে।

২২শে জুন—

কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ধারার যে সংশোধন করিয়াছেন, বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনরধিবেশনে পুনরায় ঐ বিতর্কমূলক বিষয়টি লইয়া আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত উক্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নের বিবেচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ৫(গ) ধারা এইভাবে সংশোধনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপন্থার বিরোধী অপর কোন প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারা কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চুয়াডাঙ্গার মহকুমা হাকিম মিঃ এম ইসলামের এজলাসে, সম্প্রতি মাজদিয়া ষ্টেশনে যে শোচনীয় ট্রেন সংঘর্ষ হয়, তৎসংক্রান্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কতিপয়

বামপন্থী নেতার ঘরোয়া বৈঠকে বামপন্থীদিগকে সঙ্ঘবন্ধ করা এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেবল সমস্ত কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্যগণ ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হইতে পারিবেন। শ্রমিক ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন সমিতির বেলায় উহাদের কর্ত্তাদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা (কো-অপ্ট) হইবে। আপাতত কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যদিগকে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য করা হইবে না। সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী, রায়পন্থী প্রভৃতি যে সমস্ত বামপন্থী দল লইয়া ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হইবে, সেই সমস্ত দলকে উহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে দেওয়া হইবে অর্থাৎ এই সমুদয় দলের অস্তিত্ব ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে বিলীন হইবে না। ফরোয়ার্ড ব্লকে সমস্ত দলের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে। মতৈক্য দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইবে। প্রথমে জিলা কমিটিসমূহ ব্লকের সর্ব্বনিম্ন শাখা হইবে।

ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে ক্রেমলিনে পুনরায় আলোচনা হয়। প্রকাশ, সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভ বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সংশোধিত ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব এখনও গ্রহণ-যোগ্য হয় নাই। বে-সরকারী মহলের ধারণা, বাল্টিক রাজ্যগুলি সম্পর্কে সোভিয়েট যে পাকা প্রতিশ্রুতি চাহিতেছে, নূতন ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব সে সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

জাপানী নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ সোয়াটাও-এ (এময় ও হংকং-এর মধ্যবর্ত্তী আন্তর্জ্জাতিক বন্দর) অবস্থিত বিদেশী যুদ্ধ জাহাজসমূহকে অবিলম্বে সোয়াটাও ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বৃটিশ ও মার্কিন নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ জাপানের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে মনস্থ করিয়াছে।

২৩শে জুন—

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবটির খসড়া তৈয়ার করেন মহাত্মা গান্ধী, উহা দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা সম্পর্কে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের স্বতন্ত্রকরণের জন্য যে সমস্ত আইন পাশ করিতেছেন, ঐ প্রস্তাবে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে সমর্থন করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সিংহলের ভারতীয়দের সম্পর্কে। সিংহল গবর্ণমেণ্ট বিশ সহস্র ভারতীয় বাসিন্দাকে উৎখাত করার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রস্তাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানান হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটি সিংহলে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঐ প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি বেলজিয়ান কঙ্গোর ভারতীয়দের সম্পর্কে। ঐ প্রস্তাবে আশা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তথাকার ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত তৎ-সম্পর্কে আলোচনা হয়। ওয়ার্কিং কমিটি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ করিতে বা তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত নহে। তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত যোগা-যোগ রক্ষা করা এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিবেন, তাহা প্রাদে-শিক কংগ্রেস কমিটিকে জানান আবশ্যক। তাহা ছাড়া উভয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ ঘটিলে সমুদয় ব্যাপার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির সুপারিশগুলি সংশোধনান্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বা অন্যান্য প্রতি-ষ্ঠান সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা সুপারিশ করা হইয়াছিল, তৎ-সম্পর্কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কথাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পৃথক দল বা উপদল গঠন নিষিদ্ধ হইবে না।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনের অধি-বেশনে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মসূচী উত্থাপিত এবং যথারীতি গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ফরোয়ার্ড ব্লক উক্ত কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং কংগ্রেসও যাহাতে উহা গ্রহণ করে, তজ্জন্য প্রচার-কার্য্য চালান হইবে।

গত দুই দিন ধরিয়া বোম্বাইয়ে নেতাদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনার ফলে বামপন্থী দলসমূহ এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হই-য়াছে। স্থির হইয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য মাত্রেই ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হইতে পারিবে। নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির যে সকল সদস্য ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মসূচী সমর্থন করিবেন, তাহাদিগকে লইয়া একটি নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক কাউন্সিল গঠিত হইবে। তাহা ছাড়া, কর্ম্মকর্ত্তা ও ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদও গঠিত হইবে।

বাঙলার কম্যুনিষ্ট সাপ্তাহিক "আগে চলো" পত্রিকার নিকট বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা জামানত দাবী করিয়াছেন।

ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স তুরস্ককে আলেকজান্দ্রেত্তা প্রদেশ অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

আয়ার গবর্ণমেণ্ট আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্মিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন।

২৪শে জুন—

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া এক বিবৃতি দেন। কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতির পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রবাসী ভারতীয়গণ সম্পর্কিত দুইটি প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ

হয়। সিংহলের প্রবাসী ভারতীয়গণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সিংহল সরকারের চেষ্টার নিন্দা করিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট তথাকার প্রবাসী ভারতীয়গণকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়; অতঃপর কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে। এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকে। আজ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কংগ্রেস সদস্যদের ভোট দানের যোগ্যতা সম্পর্কে এই মর্ম্মে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, অন্ততঃ এক বৎসর কাল কেহ কংগ্রেসের সদস্য না থাকিলে ভোট দানের অধিকারী হইবে না।

তিয়েনৎসিনে জাপানী সান্ত্রীরা এখন বৈদেশিকদের সম্মুখে ইংরেজদিগকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করিতেছে। অদ্য দুইজন ইংরেজকে প্রখর রৌদ্র-কিরণে ৭০ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হয় এবং উলঙ্গ করা হয়।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য প্রাতে ৬০টি সোভিয়েট বিমানপোত আবার মাঞ্চুকুও সীমান্ত পার হয়। জাপ বিমান-বহর তাহাদের ১২টি গুলী করিয়া ভূপাতিত করে।

২৫শে জুন—

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, অদ্যকার নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশনে তাহার সবগুলিই পাশ হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১১ সংখ্যক ধারায় যে সংশোধন করা হইয়াছে, সদস্যদিগকে তৎসম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে তাহার আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে। সমস্ত বামপন্থীরা তীব্র প্রতিবাদ করায় ওয়ার্কিং কমিটি নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির নির্ব্বাচন প্রণালী পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল সদস্য অন্ততঃ তিন বৎসরকাল ধরিয়া কংগ্রেসের সদস্য, কেবল তাঁহারাই প্রতিনিধি অথবা প্রাদেশিক কিম্বা জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন। এই ধারাটির আলোচনার সময় তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রীযুক্ত নরীমান মন্ত্রী, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী এবং আইন সভার সদস্যদের সম্পর্কেও অনুরূপ বিধান করিতে বলেন। কিন্তু তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইলেকশন ট্রাইবুনাল নিযুক্ত করিবেন, এই প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। লালা দুনীচাঁদ, শ্রীযুক্ত আণে, শ্রীযুক্ত নরীমান প্রভৃতি কয়েকজন ইহার উপর সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদ সম্পর্কিত সভা সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া যে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে, তাহা অমান্য করার জন্য সত্যাগ্রহের আয়োজন চলিতেছে।

এংলো ইণ্ডিয়ান রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ সি ই গিবন ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আসাম সরকারের কার্য্যের

২৬শে জুন—

কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন তিয়েনৎসিন পরিস্থিতি সম্পর্কে আর এক দফা বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তিয়েনৎসিনের সাধারণ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মিঃ চেম্বারলেন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বৃটিশ প্রজাদিগকে এখনও অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে। উপসংহারে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, টোকিওস্থিত বৃটিশ রাজদূত স্যার রবার্ট ক্রাগী ও জাপ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতার মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে তিয়েনৎসিন সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া তিনি আশা করেন।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হাজারিবাগ জেলে পুনরায় অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদে ৫০০০ সত্যাগ্রহী বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত সচিব বলেন যে, হায়দরাবাদের রেসিডেণ্টের নিকট হইতে তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে ঐ সব বন্দীর প্রতি হায়দরাবাদ কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার সমালোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না।

তিন দিন ধরিয়া আলোচনার পর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটির সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনুমতি না লইয়া কোন প্রদেশের কোন কংগ্রেসকর্ম্মী সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন না, সর্দ্দার প্যাটেল কর্ত্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা ১৩০-৬০ ভোটে পাশ হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য্য নরেন্দ্র প্রভৃতি প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিবর্গ ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রাখিতে, শ্রীযুক্ত সর্দ্দার প্যাটেল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহাও গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের উপর বহু সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই কর্ত্তৃক উত্থাপিত গঠনতন্ত্রের একাদশ ধারার পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিতর্কে যোগ দেন এবং সংখ্যাগুরু দলের আধিপত্য কায়েম করিবার চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

গতকল্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নৈশ অধিবেশনে ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ওয়ার্কিং কমিটি আসামের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আসাম অয়েল কোম্পানী যুক্তিসঙ্গত দাবী মানিয়া লইয়া বর্ত্তমান সঙ্কটের অবসান করিতে সম্মত না হইলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আসাম গবর্ণমেণ্টের সহিত অয়েল কোম্পানীর চুক্তির ফলে অয়েল কোম্পানী যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেছে, ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত প্রস্তাবে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাহা রদ করিবার

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, Saturday, 3rd June, 1939 [২৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গবর্ণরের নিকট দরবার—

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে অগ্রণী করিয়া একদল হিন্দু চাকুরীর বটোয়ারার সম্বন্ধে দার্জিলিংয়ে গিয়া গবর্ণরের কাছে দরবার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, এই সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ নীতির ফলে উদ্ভূত বড় বড় সমস্যাগুলির সম্বন্ধে একটি কমিশনের দ্বারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্ত এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মনে পূর্ণ আস্থা জন্মে। জনসাধারণ যে সকল বিষয় জানিতে চাহে, তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছে বর্তমান নীতিতে সরকারী চাকুরীর যোগ্যতা ও প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর ইহার ফল কিরূপ হইয়াছে? ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই নীতির জন্য যাঁহারা দায়ী, তাঁহাদের অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই বিষয়টি কোন একটি সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, ইহা সমগ্র প্রদেশের মঙ্গলের সহিত জড়িত। বিশেষত জনসাধারণ সুস্পষ্টভাবে জানিতে চাহে, আজ যে সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণ চাহিতেছে, সেই সম্প্রদায় যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের অনুকূলে আরও নীতি পরিবর্তন ত দূরের কথা, বর্তমান নীতি অক্ষুণ্ণ রাখারও সংগত কারণ আছে কিনা!

এই কয়েকজন হিন্দু নেতা যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার জোর আছে। তাঁহারা কোন বিশেষ সুবিধা চাহেন নাই, চাহিয়াছেন ন্যায্য বিচার। চাকুরী সম্বন্ধে ইঁহারা প্রকাশ্য এবং অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যুক্তি নূতন কিছু নয় এবং দুরধিগম্যও নয়; এবং বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এ সব যুক্তি না বুঝেন তাহাও নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রকাশ্যভাবেই এ সব যুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এবং প্রতিযোগিতার পথে যোগ্যতাকে মূল্য না দিয়া অযোগ্য লোকদের কর্তৃত্ব দেশের লোকের ঘাড়ে চাপাইবার জিদ ধরিয়াছেন। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে, আমরা আবেদন-নিবেদনে বিশ্বাসী নহি। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় করিয়াছে যে, তেমন আবেদন-নিবেদনে একটা জাতির সমস্যার কোন সমাধান হয় না বা হইতে পারে না। তবু গবর্ণর এ সম্বন্ধে কি কর্তব্য নির্ধারণ করেন, তাহা জানিবার জন্য দেশের সর্বত্র একটা আগ্রহ দেখা দিয়াছে এবং ইহা স্বাভাবিক।

আবেদন-নিবেদনে এই সমস্যার সন্তোষজনকভাবে সমাধান হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা করি না; করি না কয়েকটি কারণে। প্রথম কারণ এই যে, আজ যে অন্যায় আকার ধরিয়া উঠিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরাই ইহার বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুর ন্যায্য স্বার্থকে তাঁহারা বিদলিত করিয়াছেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মূলীভূত অন্যায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাঁহাদেরই মানসক্ষেত্র হইতে। তখন তাঁহাদের সেই মনোভিপ্রেতেক অনিষ্ট উপলব্ধি যে সহজে তাঁহাদেরই সৃষ্ট স্বার্থানুকূল আবহাওয়ার মধ্যে হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া উঠা কঠিন। সাম্প্রদায়িকতার যে ভাব এই ন্যায়হীন নীতির নিদানভূত, সেই সাম্প্রদায়িকতা যে শাসনতন্ত্রের পরম দান বলা যায়, সেই দানের পুরাপুরি ফল আস্বাদ হইতে এত সত্বরই বাঙলাদেশকে বঞ্চিত করিবার কর্তব্য বুদ্ধি যে কর্তৃত্বাধিকারীদের মধ্যে কাজ করিবে, ইহাও মনে হয় না। বরং অধিকারতত্ত্বকেই তাঁহারা ফলাও করিয়া বুঝাইবেন। আর একটি কথা এই যে, গবর্ণর যদি এই বিশেষ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপও করেন, তাহাতেও সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে না। ব্যাধির বীজ থাকিয়াই যাইবে এবং অন্য আকারে তাহা প্রকাশ পাইবে। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মূলীভূত অবিচারকে উৎখাত করিতে হইবে; এবং সে পথ আবেদন-নিবেদনের পথ নয়। সে পথ সংগ্রামের পথ, সে পথ ত্যাগের পথ। ত্যাগের পথেই এ জগতে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, ত্যাগের দ্বারাই এ জগতে সত্যকার বস্তু প্রাপ্তি ঘটে। শুধু কূট যুক্তিতর্কে কোন

অধিকার কেহ লাভ করে নাই। অধিকার চাওয়ার মত চাওয়ার মূলে যে ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা এবং বীর্যবত্তা প্রকাশ পায়, তাহাই অধিকারীর যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি।

মন্ত্রীদের চাঞ্চল্য—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল এবং চাকুরীর বাঁটোয়ারার ব্যাপার লইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন যে, সরকারী চাকুরীর বাঁটোয়ারার সম্পর্কে মন্ত্রি-মণ্ডলের অনুসৃত নীতিতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা গবর্ণরের নাই; পক্ষান্তরে বাঙলার অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার আর এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা গবর্ণরের সম্পূর্ণই আছে। মতের ফারাক একেবারে আকাশ-পাতাল। এ যেন কতকটা আড়াআড়িভাবেরই মত। নলিনীবাবুর অনেক ঢং দেশের লোক দেখিয়াছে, দেশের লোক ভাবিতেছে এ আবার কোন্ ঢং! তবে কি নলিনীবাবু দেশের স্বার্থের টানে মন্ত্রিগিরির মোহ কাটাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন ফাঁকরী লইতেছেন? নলিনীরঞ্জন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া জানাইতেছেন—না, চাকুরী ছাড়িবার মত অবস্থায় এখনও তিনি পড়েন নাই। চাকুরী তিনি করিবেন। হক মন্ত্রিমণ্ডলের সুখী পরিবারের সুখাস্বাদনে বিতৃষ্ণা তাঁহার জন্মে নাই; তবে এই লীলার নিগূঢ় রহস্য কি? রহস্য হইল গাছেরও খাইব তলারই বা কুড়াইতে ছাড়িব কেন—বুদ্ধির সূক্ষ্মতারই এটা একটা দিক মাত্র। চাকুরী তিনি ছাড়িবেন না, কাজের বেলায় হক সাহেব যাহা করিবেন তাহাতেই সহযোগিতা করিবেন, কথার বেলাই হিন্দু স্বার্থরক্ষা এবং দেশের স্বার্থের জন্য দরদ। লীলার দুই রূপ, একটি বহিরঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ। সুতরাং পদত্যাগ করিবার মত অবস্থা আসে নাই। আমরা একথা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি, পদত্যাগ করিতে হইলে যে আদর্শনিষ্ঠা থাকা দরকার, সেই আদর্শনিষ্ঠার বালাই যে নলিনীবাবুর নাই, ইহা কি বলিয়া দিতে হয়, যদি তেমন বালাই-ই থাকিবে তাহা হইলে তিনি মন্ত্রিগিরি লইতে যাইবেন কেন? সে বস্তুকে উপলব্ধি করিবার মত বিবেকের তীক্ষ্ণ অনুভূতি যাঁহার আছে, তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব নয়!

স্যার নাজিমুদ্দিন গভীর জলের মাছ, তিনি কাণসাড়া নাড়েন বটে কিন্তু ঘাই দেন কম; কিন্তু এ ব্যাপারে তিনিও ঘাই মারিয়া জল ঘোলা করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলিতে-ছেন,—"সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।" কলিকাতা শহরে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক ট্যাক্সও দেয় বেশী, সুতরাং সেখানে মুসলমানদের জন্য তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে, কিংবা চাকুরী বাঁটোয়ারার বেলায়—সে প্রশ্ন তুলিও না। তখন ঐ সংখ্যার কথাই বড়। যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ—সংখ্যানুপাতেই তাঁহাদিগকে চাকুরী দিতে হইবে। ইহাই তো গণতান্ত্রিকতা! সুতরাং যেখানে যেমন সুবিধা। সাম্প্রদায়িকতার প্রসার করাই হইল বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের প্রধান যুক্তি, এ যুক্তি আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

প্রধান মন্ত্রীর চিত্ত-বিক্ষোভ—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর বীর এবং রৌদ্র রস আপনা[illegible] অনেকে উপভোগ করিয়াছেন এবং মুসলিম লীগের সিংহ ব্যাঘ্রদের পক্ষে সেই রসই স্বাভাবিক বলা যায়। কুম্ভীরে[illegible] অশ্রুবর্ষণের কথা শুনা যায়; কিন্তু সিংহ-ব্যাঘ্রের অশ্রুবর্ষ[ণ] প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য কাহারও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই অথচ মুসলিম লীগের সিংহ-ব্যাঘ্রমণ্ডলীর মাতব্বর স্বরূপ যে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী তিনিও সেদিন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন এই অশ্রুবর্ষণের কারণ হইল এই যে, বাঙলার কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা হক সাহেবের নীতির বিরুদ্ধে গবর্ণরে[র] নিকট দরবার করিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। হক সাহেব বলিতেছেন—"হিন্দুদের অধিকা[র] ক্রমিকভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে এবং হিন্দুদিগকে রাজনীতি[,] সংস্কৃতি এবং আর্থিক দিকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্ট[া] হইয়াছে এমন প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারেন কি?" বাঙলা[র] যে প্রধান মন্ত্রী লক্ষ্ণৌতে গিয়া বাঙলার হিন্দুদিগকে সা[ব]ধান করিবার জন্য শাসাইয়াছেন, যিনি করাচীতে গিয়া মোসলে[ম] রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সিংহ-গর্জন শুনাইয়াছেন, যিনি সেদি[ন] বাঙলার মুসলিম লীগের সভায় বাঙলা মুল্লুকে নিপট মুসল[-] মান রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন, তিনি যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যেরই অবতারস্বরূপ এ বিষয়ে কোন মূর্খ সন্দেহ করিবে? এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মহ[ৎ] উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের অবতারণ[া] চাকুরীতে বাঁটোয়ারা বন্দেজ সেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রকটরূপ। হক সাহেবের এতকাল বিশ্বাস ছিল যে বাঙল[া] দেশের হিন্দু খবরের কাগজগুলোই যত অনিষ্টের গোড়া কিন্তু যাঁহারা তাঁহার বন্ধু, তাঁহারাও করিতেছেন হক সাহেবে[র] বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ—এ দুঃখ রাখিবার জায়গা আর আ[ছে] কোথায়? সুতরাং এই অশ্রুবর্ষণ এবং উচ্ছ্বাসে হৃদয় বিদার[ণ।] কিন্তু এইখানেই শেষ নহে, বড় বিবৃতি পরে আরও আসি[-] তেছে; সুতরাং আর এক দফা সিংহ-ব্যাঘ্র গর্জন শুনিবা[র] জন্য সকলে প্রস্তুত থাকুন।

ভেদ নীতির বিষক্রিয়া—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গী[য়] ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ব[সু] মহাশয়ের নিকট চাকুরীর বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গে একটা লম্[বা] চিঠি লিখিয়াছেন। আক্ষরিক হিসাবে ইহাতে কথা অনে[ক] আছে নিজের যুক্তির সমর্থনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের চেলাদে[র] উক্তি যুক্তিরও নজীর আছে। কিন্তু আগাগোড়া সুর একই হক সাহেবের সুর অবশ্য দেশের লোকের জানা আছে, [illegible] সাম্প্রদায়িকতার সিদ্ধ মন্ত্রটি হক সাহেবের সুবিধা[-] অন্তরে কতটা উগ্র হইয়া কাজ করিতেছে তাহা বুঝাইবা[র] [illegible] কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল। হক সাহেব লিখিয়াছেন,

শের শাসনভার ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের শ্বেতাংগদের হাতে ল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের থা গ্রাজুয়েট এবং তাঁহাদের কেতাবী জ্ঞান বর্ত্তমানকালের ত্রীদের অনেকের চেয়েই অনেক রকমে উন্নত। অধিকন্তু সব রাজপুরুষের একটা বিশেষ সুবিধা এই ছিল যে, ম্প্রদায়িক বিতর্কের গণ্ডীর বাহিরে থাকাতে নিরপেক্ষভাবে বিষয় বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল। তথাপি, টিশ গ্রাজুয়েটগণ, আমাদের মন্ত্রীদের চেয়ে কেতাবী বিদ্যার গী বড়াই করিলেও আমরা আমাদের দেশবাসীদের দ্বারা সত হওয়াই শ্রেয় মনে করি। এই মনোভাবের জন্যই রা সব সময় এই মত পোষণ করি যে, সুশাসনের চেয়ে ত্ত শাসনই ভাল। এদেশের বিপুল মুসলমান জনসাধারণ ং তপশীলী হিন্দুর মধ্যে যদি বিদেশীদের চেয়ে তাঁহাদের জেদের সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা শাসিত হইবার জন্য ভাবিক ইচ্ছা দেখা যায়, তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না; দের পক্ষে যে-সব সম্প্রদায় পর তাহাদের ইংরেজী কবিতা সেক্সপীয়র অথবা মিলটনের সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নুভূতি বেশী থাকিতে পারে তথাপি নিজের সম্প্রদায়ের নই তাঁহারা ভাল মনে করে।"

হক সাহেবের ঘর-ভাঙ্গানী বুদ্ধির দৌড় কেমন দেখুন। বাসীর নিকট ইংরেজ যেমন পর, অর্থাৎ বিদেশী, হক হব বুঝাইতে চাহেন যে, বাঙালী হিন্দুরাও বাঙালা মুসলদের নিকট তেমনই বিদেশী। নিতান্ত মধ্যযুগীয় অসংস্কৃত ভাব হইতেই এমন যুক্তি উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। এমন নীতি যে নীতির মূলে তাহা শাসন বিভাগে বিস্তৃত হইয়া দার যে সর্বনাশ সাধিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে কি? সম্প্রদায় কয়টা চাকুরী পাইল না পাইল বাঙলার তীয়তাবাদীরা সেজন্য বিশেষ মাথা ঘামায় না; কিন্তু জী হিসাবে বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে সম-সূত্র কে ছিন্ন করিয়া বাঙলা দেশে বিদেশীর প্রভুত্বকে পাকা বার এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি র স্তরে স্তরে ঢুকাইয়া অশান্তির বীজকে এইভাবে যে করা হইতেছে, ইহা হইতে বাঙলা দেশকে রক্ষা করিবে বাঙালীর স্বদেশ প্রেম এবং স্বাজাত্যবোধের আজ বিষম ক্ষাকাল সমাগত। যে বাঙলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি ব্যর্থ করিয়াছিল, আজ সেই সাম্রাজ্যবাদীদের মন্ত্রদের কাছে সে মাথা নোয়াইবে না। হক সাহেব ইহা য়া রাখুন।

নিসিপ্যাল বিলে প্রতিবন্ধক—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি নির্বিবাদে বাঙলা দেশের বড় উভয় আইন সভায় পাশ হইয়া যাইবে—হক বের অনুগত দল এমন আস্পর্ধা লইয়াই চলিতেছিলেন; গত সোমবার হঠাৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটা বন্ধক আসিয়া জুটিয়াছে। প্রস্তাবিত বিলে ছিল যে, ন সরকারী মনোনীত সদস্য কর্পোরেশনে থাকিবেন। াপক সভায় এই মর্মে একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া ৮ জন হইতে ৪ জন করা হইবে এবং এই ৮ জনের মধ্যে তিনজন হইবেন তপশিলী আর ৩ জন হইবেন হিন্দু। এই সংশোধন প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে বিলটি সংশোধিত আকারে বিবেচনার জন্য পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পাঠাইতে হইবে। ব্যবস্থা-পরিষদে সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে, কিংবা বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য আবার ব্যবস্থাপক সভায়ও যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভা যদি পুনর্বিবেচনা করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে বিলটির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কিন্তু এক বৎসরের পূর্বে ঐরূপ যুক্ত অধিবেশন যে সম্ভব হইবে এমন মনে হয় না। মৌলবী আব্দুল হামিদ চৌধুরী সংশোধন প্রস্তাবটি আনেন। হক মন্ত্রিমণ্ডলের অনুসৃত নীতিতে তিনি আঘাত করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুরে সুর মিলাইয়া কর্তাভজাগিরি দেখান নাই, এদিক হইতে তাঁহার কার্য প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে, আমরা মনোনীত সদস্যের ব্যবস্থা একেবারে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। যখন তপশিলীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিলে রহিয়াছে, তখন স্বতন্ত্রভাবে মনোনীত সদস্যের ব্যবস্থাটা এরূপ ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলক ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সংশোধন প্রস্তাবের দ্বারাও বিলের মূলীভূত ভেদ-বৈষম্যগত বিচারের অনিষ্টকারিতা কিছুই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। লোকসংখ্যার অনুপাতে সাধারণ সদস্যদের আসনসংখ্যার সম্প্রসারণ এবং হিন্দুদের মধ্যে ভেদমূলক স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিত হইলেই—দোষ ত্রুটি কিছু কমিতে পারে। বিলের মূলীভূত যে দুর্নীতি আমরা তাহাকেই উৎখাত করিতে চাই, আসন-সংখ্যার দুই একটা উনিশ-বিশ আমাদের কাছে বড় নয়। মোট কথা হইল এই যে, এই বাঙলাদেশে অ-বাঙালীর কর্তৃত্ব স্থাপনের যে কায়দা সেই কায়দা দেশের লোক বরদাস্ত করিবে না এবং হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য অধিকারকে ক্ষুণ্ণ, এবং সুবিধাবাদীদের মর্জিমাফিক বাঁধাবাঁধিতে বিকৃত করিতে দিতেও দেশের লোক প্রস্তুত নয়। কলিকাতার পৌরজন, যাহারা, যাহারা ট্যাক্স দেয়, কর্পোরেশনে কর্তৃত্ব করিবে কাহারা, ঠিক করিবার অধিকার আছে তাহাদেরই। গবর্ণমেণ্ট কায়দা করিয়া অন্যের কর্তৃত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস-বিদ্বেষী হইতে পারেন, কিন্তু কলিকাতার পৌরজনদের অধিকারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা নিজেদের অধিকার বিকাইতে প্রস্তুত নয়—মতলববাজদের কারসাজীর কাছে। অধিকার রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সংগ্রাম করিতেই প্রস্তুত; গাঁটের পয়সা দিবার বেলায় কলিকাতার পৌরজনেরা, আর কর্তৃত্ব করিবে অপরে—মন্ত্রীরা কংগ্রেসকে পছন্দ করেন না, কংগ্রেস এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মন্ত্রীদের নীতির বিরোধী এই অপরাধে, দেশের লোক এমন স্বেচ্ছাচারকে বরদাস্ত কিছুতেই করিবে না। ভুকভোগের কার্য নয়—এই যে মিউনিসিপ্যাল বিল ইহাকে একেবারে ধ্বংস

করিতে হইবে এবং সেজন্য কলিকাতাবাসী যে কোন ত্যাগ স্বীকারেই পরাঙ্মুখ হইবে না।

বিপন্ন ইসলামের জিগীর—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের গতি হক মন্ত্রি-মণ্ডলের প্রত্যাশানুরূপ হয় নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলে সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী কর্তাভজাদের মধ্যে আর্তনাদ উঠিয়াছে। ত্রিশ হাজারী সরকারী বৃত্তিভোগী 'আজাদ' আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছেন—"মোসলেম বঙ্গের গত অর্ধ যুগের সাধনা উচ্চ পরিষদে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।" এই আর্তনাদের উত্তর সোজা ভাষায় দিয়াছেন খান সাহেব আব্দুল হামিদ চৌধুরী। তিনি বলিয়াছেন, "আমার প্রস্তাবে মনোনীত ৮টি আসন হইতে ৪টি কমাইয়া উহা নির্বাচিত আসনে পরিণত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং এই কয়টির মধ্যেও তিনটি তপশীলভুক্তদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া সাধারণ নির্বাচন-কেন্দ্রে যোগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অবশিষ্ট একটি আসন মুসলমানদিগকে দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তপশীলী সমাজের আসন-সংখ্যা হ্রাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে, যে তিনটি তাঁহারা মনোনয়নের দ্বারা পাইতেন, তাহা তাঁহারা নির্বাচনের মারফতে পাইবেনই। দ্বিতীয়ত মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ব ব্যবস্থা মত আসনসংখ্যার উপর আরও একটি বেশী প্রতিনিধি লাভ করিবেন। বাইশ জনের স্থলে ২৩ জন প্রতিনিধি লাভ করিলে মুসলমান সমাজের স্বার্থের সর্বনাশ বা মোসলেম বঙ্গের অর্ধ যুগের সাধনা ও সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়া যায় কি না, তাহা বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ই বিচার করিয়া দেখিবেন।" আসল কথা হইল এই যে, আতে ঘা লাগিয়াছে, সরকারী মনোনীত সদস্যের সংখ্যা কমাইতে। কারণ, এই মনোনীত সদস্য চররূপী কয়েকজন ক্রীতদাসের মারফতেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মন্ত্রীরা কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রাধান্য চিরতরে ক্ষুণ্ণ করিবেন এবং সেই পথে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ সমাজকে পুষ্ট রাখিয়া নিজেদের মন্ত্রী-গিরি কায়েম করিবেন—ছিলেন এই মতলবে। সেই যে বাড়া ভাত তাহাতে ছাই পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়াই এহেন হৃদয়বিদারী আর্তনাদ। নতুবা এই সংশোধন প্রস্তাবে তপশীলী সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হয় নাই; কারণ মনোনীত সদস্যদের মধ্যে তিনটি আসন তাহা-দিগকে দেওয়ার কথা ছিল, এখনও সে হিসাবই ঠিক আছে, আর মুসলমানদের দিক দিয়া তো লাভই হইয়াছে; কারণ মুসলমানদের নির্বাচিত সদস্য-সংখ্যা ইহাতে একজন বাড়িবে। ক্ষতি মুসলমান সমাজের নহে, কিংবা তপশীলীদেরও নয়— যাঁহারা দেশের লোকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া মনোনীত সদস্যদের মারফতে বিদেশী প্রভুদের মনস্তুষ্টির মতলবে ছিলেন, তাহাদের সেই সদুদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। তাহাদের বিপন্ন ইসলামের জিগীরে যে দেশের সকল লোককে ভুলান যায় না, সকলে আত্মবিক্রয় করে না, হক সাহেবের চেলা-চামুণ্ডার দল ইহাতে অন্তত এ সত্যটি উপলব্ধি করিলেন।

স্বরাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন—

সম্প্রতি শিমলা শহরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণ-মেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিবদের এক সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল। সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে দেখা গেল যে, স্বরাষ্ট্র-সচিবেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের সকল প্রদেশেই হিংসা-মূলক প্রচারকার্য—সংবাদপত্রে এবং সভা-সমিতিতে বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য আইন কড়া করিতে হইবে। এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতামূলক প্রচারকার্য এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বিদ্বেষ প্রচার যাহাতে বন্ধ হয় সেজন্য সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোরতর বিধি প্রয়োগ করিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যাহাতে কোন সংবাদপত্র কিংবা কোন কারণে অযথা নিন্দা না করিতে পারে, সেজন্য দণ্ড-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি স্বরাষ্ট্র-সচিবদের এই সম্মেলনে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবগুলি দেখিয়া সেগুলির ভিতর আমলাতন্ত্রী গন্ধই ষোল আনা পাওয়া গেল, কংগ্রেসী বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা দেশের লোকের অধিকার সংকোচ করিবার জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। দেশের লোকের অধিকার সম্প্রসারিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হইল তদর্থে শাসন-সংস্কারের ধ্বংস সাধন। কিন্তু গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে দেশবাসীর অধিকার সম্প্রসারণমূলক কিছুরই আভাষ পাওয়া গেল না। শান্তি এবং আইন রক্ষার জন্য আমলাতান্ত্রিক কঠোর মনোবৃত্তির ঝোঁকের পরিচয়ই সেগুলিতে পাওয়া গেল। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ক্রমেই নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঘেঁসিয়া যাইতেছেন ইহা তাহার পরিচয় নয় কি? তাহা না হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের মাতব্বরীতে এবং বাঙলার প্রগতিবিরোধী মোসলীম লীগওয়ালা স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমউদ্দীন এবং পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানের সঙ্গে গলাগলি ধরিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিবের 'কমন ফ্রণ্ট' বা সখ্য সঙ্ঘ গঠনের পালা গাহিবার পাছ দোহারী করিতে তাঁহাদিগকে দেখা যাইত কি?

দেশের সম্মুখে সমস্যা—

সাভার গ্রামে এবার ঢাকা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু ঠাকুর মহাশয়। বসু ঠাকুর মহাশয় একজন প্রবীণ দেশ-কর্ম্মী। সে রাজনীতি শুধু বাক-সর্ব্বস্ব নর—

অন্তরের আগুনের স্পর্শ আছে যে রাজনীতির সঙ্গে বসু মহাশয় সেই শ্রেণীর রাজনীতিক। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সংক্ষিপ্তভাবে সমগ্র দেশের, বিশেষভাবে বাঙলার বর্ত্তমান সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান দক্ষিণপন্থী কর্ত্তাদের নীতি কি-ভাবে ক্রমেই নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে চলিয়াছে এবং আত্ম-সমর্পণের নীতিই অহিংস আধ্যাত্মিকতায় পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বসু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই সময় অলীক কল্পনাপ্রসূত আশঙ্কায় জাতিকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিলে হয়তো অনন্তকাল পর্য্যন্ত শুভ অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে। কংগ্রেস ঠিক এই ধরণের ভুল একাধিকবার করিয়াছে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বিলাতে যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র ফলা ভারতের বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-রেখা টানিয়া দিলেন, কংগ্রেস 'না গ্রহণ, না বর্জ্জন' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দায়িত্ব শেষ করিল। ব্রিটিশ সগর্ব্বে ঘোষণা করিল—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ না করিয়া মানিয়া লইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজ তাহার বিষময় ফল ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালী উপলব্ধি করিতেছে। এই প্রদেশে বিষাক্ত হাওয়ায় সবাকার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডল কায়েম রাখিয়াছে, তাহাদের জাতীয়তা-বিরোধী কাজের নমুনা আজ দুই বৎসর বাঙালী যথেষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছে।"

বসু ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টভাষায় শোনাইয়া দিয়াছেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির মূলীভূত দুর্ব্বলতার দিকটা। তিনি বলেন,—"পার্লামেন্টারী কার্য্যপদ্ধতিতে কংগ্রেসের শক্তি ও মর্য্যাদার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করিয়াছিল—শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া উহাকে অচল করিবার মানসে। আজ তাহার প্রতিক্রিয়া বিশিষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। অচল শাসনতন্ত্র বরং কংগ্রেস-যন্ত্রকে বিকল করিয়া তুলিয়াছে।"

পথ কি? বসু ঠাকুর মহাশয় বলেন,—'প্রগতিপন্থী যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-সংযোগে যে বিরাট শক্তির অভ্যুদয় হইবে, তাহাকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। দেশের বিপ্লবাত্মক শক্তির সংহত সাধনা সফল হইবে তখনই—যখন শ্রমিক, কৃষক, যুবক, ছাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোবৃত্তি দেখিয়া প্রাণে নব চেতনার উদ্ভব করিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করিবে।'

বাঙলা দেশের আন্দোলনে ঢাকা জেলা বাহু শক্তির কাজ করিয়াছে। শক্তি-পূজার পীঠস্থান বলা যায় ঢাকা জেলাকে; আমরা আশা করি, আজ এই জাতীয় অবসাদের অন্ধকারময় যুগে আবার স্বদেশ-প্রেমের বহ্নিজ্বালার বিকাশে নব-জীবনের উদ্বোধন করিবে।

রাণী গুইদাল্লোর অবস্থা—

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেব, শিলং জেলে গিয়া রাণী গুইদালোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, রাণী গুইদালো ধর্মানুষ্ঠানের অংগস্বরূপে শুধু দুধ ও ফল খাইতেন, এখন তিনি রুটি এবং ভাত গ্রহণ করিতেছেন। রাণী গুইদালোকে জেলে নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে হইতেছে। তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীস্বরূপে রাখা হইয়াছে। আমরা জানিতাম যে, রাণী গুইদালো আসাম সরকারের বন্দিনী নহেন, এবং তাঁহার মুক্তি ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আসাম সরকারের কর্তৃত্বাধীনস্থ কারাগারে তিনি যখন আছেন, তখন কারা-ব্যবস্থার দিক হইতে প্রথম শ্রেণীর বন্দীর সুবিধা দান করিবার পক্ষে আসামের বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে কোন অন্তরায় ছিল না; অথচ তাঁহাকে এখনও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মত রাখা হইয়াছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার একটু সুবিধা করা হইয়াছে মাত্র, এই কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। রাণী গুইদালো নাগা বালিকা হইলেও তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মর্যাদার স্থান তাঁহার পাইবার অধিকার আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কি সে মর্যাদাটুকু দেওয়া সংগত মনে করেন না! নির্জন কারা-ক্লেশ হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়ার মত ব্যবস্থা করাও কি তাঁহাদের ক্ষমতার মধ্যে নয়? আমরা আশা করি, আসাম গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টি, রাণী যাহাতে মুক্তিলাভ করেন, সেদিকে আকৃষ্ট হইবে। আসামের মন্ত্রিমণ্ডল রাণীর মুক্তির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ পাঠাইয়াছিলেন ইহা আমরা জানি; কিন্তু তাহার ফল কি হইল দেশের লোককে জানান হয় নাই! এবং কিসে আসাম গবর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছা সফল হয়, তেমন ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয় নাই। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এ বিষয়ে উদাসীন থাকা চলে না।

চারিদিকে হাহাকার—

বাঙলার সমস্ত অঞ্চলে আজ হাহাকার উঠিয়াছে। দুই দিন, তিন দিন অন্তরও অনেকের এক মুষ্টি অন্ন জুটিতেছে না। দিনমজুরী খাটিবারও ক্ষেত্র নাই। কেহ মজুর খাটাইতে চাহিতেছে না। এদিকে এক পয়সাও ঋণ পাইবার উপায় নাই। ঋণ-সালিশী বোর্ডের ঝঞ্ঝাটের ভয়ে যাহার হাতে পয়সা আছে, সে ছাড়িতেছে না। তিন চার মাস কাল অনাবৃষ্টিতে ফসলের সম্ভাবনাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শাকসব্জী পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। অনেক স্থানেই জলাভাব, তারপর অগ্নিকাণ্ডের উপদ্রব। পেটের ক্ষুধায় মানুষ কি না করে। সুতরাং চুরি ডাকাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্যজীবন একেবারে [illegible]হ্য হইয়া

উঠিয়াছে। শহরে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন না দেশের এই অবস্থাটা। আর বুঝিতেছেন না, আমাদের প্রজার দরদের দরদী মন্ত্রীরা। কারণ তাঁহারা বাঙলা দেশে মোসলেম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর ব্যাপারে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু সেই যে স্বর্গ রাজ্য, যাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল, চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রভৃতির ভিতর দিয়া সেই স্বর্গরাজ্যের সুখ ভোগ করিয়া যাইতে পারিবে যে কয়জন ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। আপাতত দেখা যাইতেছে যে, মোটা মাহিয়ানা এবং আরাম-আয়াস লভ্য হইতেছে গরীবের দরদের দরদী মন্ত্রীদেরই—গরীবের নছিবে 'সানকীধোওয়া পানিই' জুটিতেছে। এমন নির্ম্মম লীলা সম্ভব হয় শুধু এই দেশেই যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব একান্ত।

দেশীয় রাজ্যে অধ্যাত্ম প্রভাব—

ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের অবস্থা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—মহাত্মা গান্ধী দেশীয় রাজ্যসমূহে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার উপদেশ দিয়া প্রীতির ভাব প্রদর্শন করেন; জনসাধারণ তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করে; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করেন নাই; অধিকন্তু তাঁহারা সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর প্রীতিপূর্ণ হাব-ভাবকে দুর্বলতা বলিয়া মনে করিয়া দমননীতি আরও জোরে চালাইয়াছেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট ও রেসিডেন্টগণ এরূপ আয়াসের ভাব লইয়া কাজ করিতেছেন যে, বহু সহস্র আশ্রয়প্রার্থীর অনশনে কাল যাপন এবং অপর বহু লোকের উপর জুলুমে যেন আর কিছু আসে যায় না। তাঁহারা অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন এবং নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী উহার ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের দুঃখ ও দুর্দশার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। যাহারা মনে করেন অবস্থা অপরিবর্তনীয়, তাঁহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিমূলক একটি প্রস্তাব কলিকাতায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; অথচ তদনুযায়ী কাজ আমরা কিছুই দেখিতেছি না। পণ্ডিতজী বলিতেছেন—'কেহই ইহা বলিতে সাহসী হইবেন না যে, আমরা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা অপেক্ষা করিতে পারে। যে পর্যন্ত উদ্ধত এবং দায়িত্বহীন শক্তি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগকে পিষ্ট করিবে সে পর্যন্ত ভারতে কাহারও স্বাধীনতা নাই।' কিন্তু সমস্যা হইতেছে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ছেঁদো মন্ত্রীগিরির মোহকে বড় করিয়া দেখিলে স্বাধীনতার সে বৃহত্তর প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে। সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে দক্ষিণপন্থী দল পুরাপুরি রকমে নারাজ, ইহার ফলে যে অবসাদ আসিয়াছে দেশের সর্বত্র তাহাতে উদ্ধত শক্তি অধিকতর প্রশ্রয়ই পাইতেছে। অহিংসা আধ্যাত্মিকতায় সেখানে উদারভাব বিকাশ হইতেছে না বরং প্রতিকূল নৈতিক শক্তির নৈষ্কর্ম্ম্যের আস্বস্তিতে সেখানে অত্যাচারই প্রশ্রয় পাইতেছে। এ পথ দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারত এতদুভয়ের সমস্যা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ব্রহ্ম ও ভারতে বাণিজ্য সখ্য—

ব্রহ্মদেশের সংবাদপত্রসমূহে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তির সম্বন্ধে খুব লেখালেখি হইতেছে। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে ২৫ কোটি টাকার মাল ক্রয় করে। এই ব্যবসা বাণিজ্য অধিকাংশই ভারতবাসীদের হাতে। এই দিক হইতে এ ব্যাপারে ভারতবাসীদের লাভ। সুতরাং প্রীতি বন্ধন ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে স্বার্থের দিকেও থাকিবার কথা। কিন্তু নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পর হইতে ব্রহ্মের এক দল লোক ভারতবাসীদিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার মতলবে লাগিয়া গিয়াছে। এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। ইহার ফলে কিছুদিন হইতে ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীদের ধন প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসীদের সহিত সহযোগিতার সঙ্গে ব্রহ্মের স্বার্থ কতটা নির্ভর করিতেছে, এই ভাবটি না বাড়াইলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মের স্বার্থের দিক হইতে জাতীয়তার ধূয়া ধরিয়া ব্রহ্মদেশে যাহারা ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে, তাহাদের মনোবৃত্তিকে সংযত করা আগে কর্তব্য। ব্রহ্মদেশের সম্পর্কে যে কথা সিংহলের সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। সিংহল হইতে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্যও কিছুদিন হইতে চেষ্টা চলিতেছে এবং সে চেষ্টায় সিংহলের বর্তমান সরকারই হইয়াছে উদ্যোগী। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্র স্বরূপ ভারতবাসীরা আজ আর চলিতে প্রস্তুত নয়। জাতীয় অবমাননার বিনিময়ে বিদেশী পদসেবার যুগ ভারতে অতীত হইয়াছে।

দেশের কথা—ভারতের পণ্য

নীল (INDIGO)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতের পণ্যের তালিকায় নীল আজ এক নগণ্য বস্তু। কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য আজও লোক সমাজে ইহার পরিচয় আছে মাত্র, কিন্তু এ অবস্থাও আর বেশী দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

নীলের দিন ঠিক এইরূপ ছিল না। যে কারণেই হউক, ভারতে নীল প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং বিদেশে রপ্তানী হইত; সারা সভ্য জগৎ ভারতের নীল পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত।

ইতিহাস

কতকাল পূর্ব্বে নীলের সন্ধান লোকে পাইয়াছিল তাহা বলা কঠিন, ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার বহুদিন প্রচলিত ছিল। ৮০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদের তীরে কোনও শহর হইতে নীল রপ্তানী হইত বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। ১২৯৮ সালে কুইলন শহরে নীল সংক্রান্ত শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে বহু পুস্তকাদিতে, বিশেষত বিদেশীদের ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ভারতীয় পণ্যের তালিকায় নীলের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানি হইয়া যাইত এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে, হয়ত ভারতবর্ষীয় বস্তু বলিয়া নীলের প্রথম নাম "ইণ্ডিকম (Indicum)" হইয়াছিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশীদের বাণিজ্যে ইহা একটি বিশেষ লাভের পণ্য ছিল। পর্ত্তুগালের বণিকেরা সুরাট হইতে লিসবনে চালান দিলে সেখান হইতে হল্যাণ্ড-এর রঙ ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিত। যাহাতে নীল নিয়মিত পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে ১৬৩১ সালে Dutch East India Company (ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে পোর্ত্তুগীজদের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া আসে।

ইউরোপীয় বণিকদিগের মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিতে থাকে এবং স্থানীয় রঙ ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারতীয় নীলের আমদানী রোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এ সময় তাহারা wood হইতে প্রাপ্ত রঙ ব্যবহার করিত। তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে প্রায় সকল দেশেই নীলের ব্যবহার আইনের চক্ষে অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করাইতে সমর্থ হয়। ১৬০৮ সালে ইংলণ্ডে নীলের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু বিদেশী বলিয়া আমদানী ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম হইতে লোক আনিয়া পুনরায় নূতন করিয়া ইংলণ্ডের বস্ত্ররঞ্জনকারীদের নীলের রঙ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভারতের নীলের আদর হওয়ায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বা তাহাদের উপনিবেশসমূহে নীল চাষ আরম্ভ করে; এবং ইহার ফলে পশ্চিম ভারতীয় (আমেরিকা) দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) নীল জন্মিতে থাকে। তখন ভারতীয় নীল চাষের এক পরীক্ষার কাল উপস্থিত হয়। এই সময় ইংরাজ ভারতীয় নীল বেশী মাত্রায় লইয়া যাইত; কিন্তু তাহারাও স্বদেশবাসী ও উপনিবেশবাসীদের উৎসাহ দিবার জন্য ওয়েষ্ট

ার ফিট উপর থেকে ;

ইণ্ডিজের নীল ক্রয় করিতে থাকে এবং ভারতীয় নীলের দারুণ সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। কিছুকালের মধ্যেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ইউরোপীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক গোলমাল, উচ্চশৃঙ্ক এবং ইক্ষু প্রভৃতি অন্যান্য লাভজনক আবাদের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ক্রমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নীল ব্যবসায় লোপ পাইল।

ভারতের চাষ

ভারতের নীল চাষের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইল। নীল বাণিজ্যের ইতিহাসে বাঙলা ও বিহারের, বিশেষত বাঙলার ইহা এক অতি দুর্দ্দিনের স্মরণীয় কাহিনী।

আশ্চর্য্যের বিষয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নীল চাষ বাঙলায় স্থানান্তরিত হইল। ১৭৭৯ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ হস্তে নীলের বাণিজ্য রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের খাতাপত্রের হিসাবে দেখা গেল আন্দাজ ৮০ হাজার পাউণ্ড বা ১২ লক্ষ টাকা লোকসান গিয়াছে। তখন তাহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের হাতে ব্যবসা ছাড়িয়া দেন। যাহাতে তাহাদের কাজের কোনও অসুবিধা না হয় সে কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আরও দেড় কোটি টাকা এই কর্ম্মচারীদের অগ্রিম দিয়াছিল। এই টাকার ছড়াছড়ি এবং আবাদের নূতন সাহেবদের বা মালিকদের কর্তৃত্ব বাঙলার নীলকে জগতের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করে।

নীল হইতে যাহাতে লাভ হইতে পারে তাহার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে থাকে; ইহার অনেকগুলিই আইন-সঙ্গত এবং তাহার অধিক বে-আইনী। লোককে দাদন দিয়া বংশানুক্রমে দায়ী করিয়া রাখা হইত, প্রাপ্যের অধিক আদায় করা হইত, অনিচ্ছায় লোককে জোর করিয়া দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত।

যেখানে মাত্র দাওয়ানী আইনের দ্বারা প্রতিকার সম্ভব সেখানে দাওয়ানী ছাড়া ফৌজদারী আইনের আশ্রয় লইয়া কুঠীওয়ালারা দাদনের সর্ত্ত অনুযায়ী নীল ও অর্থ আদায় করা হইত। এই সকল নীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দরিদ্র, সহায়হীন রায়ত প্রজাদের যে দারুণ আর্ত্তনাদ উঠে, তাহাতে বাঙলা সরকারের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া উঠে। ১৮১০ সালের পূর্ব্বে নীল চাষ সংক্রান্ত যে অমানুষিক অত্যাচার সংসাধিত হয় সার এস্কালী ইডেন Indigo Commission-এর সমক্ষে সাক্ষ্য দানকালে বিবৃত করেন। সার জন পিটার গ্রাণ্ট (Sir John Peter Grant) কুঠীওয়ালাদের অত্যাচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

নীলকরদের অত্যাচার নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে:

"1st,—Acts of violence, which, although they amount not in the legal sense of the word to murder, have occasioned the death of natives

2nd,—The illegal detention of natives in confinement, especially in stocks with a view to re-

covery in balances alleged to be due to them or for other causes.

3rd---Assembling in a tumulturay manner, the people attacked to their respective factories, and others, and engaging in violent affrays with other indigo-planters.

4th,---Illicit infliction of punishment, by means of a 'rattan' or otherwise, on the cultivators or other natives."

এ সময়ে অন্যান্য ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট Mr. E. De-Latour বলেন যে, নররক্তে রঞ্জিত না হইয়া এক বস্তা নীলও ইংলণ্ডে পৌঁছায় নাই। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে

"There is one thing more I wish to state; that considerable odium has been thrown on the missionaries for saying that---"not a chest of indigo reached England without being stained with human blood." That has been stated to be an anecdote. That expression is mine, and I adopt it in the fullest and broadest sense of its meaning, as a result of my experience as Magistrate in the Furridpore district, I have seen several ryots sent to me as a Magistrate, who have been speared through the body. I have had ryots before me who have been shot down by Mr. Forde (a planter). I have put on record, how others have been first speared and then kidnapped, and such a system of carrying on indigo, I consider it to be a system of bloodshed."

সামান্য ব্যবসা সম্পর্কে লোককে বর্শাবিদ্ধ করা হইয়াছে। আইনের চক্ষু এড়াইবার জন্য আহতকে নিরুদ্দেশ করা হইয়াছে এবং শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় গুলী করিয়া মারা হইয়াছে।

একদিকে যেমন বিদেশী নীলকরদের অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে, অপর দিকে সদাশয় হৃদয়বান ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী বিড়ম্বিতের পক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বহু মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু এক মেকলে সাহেবের কথা কয়টি তুলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

"That great evils exist, that great injustice is frequently committed, that many ryots have been brought, partly by the operation of the law, and partly by acts committed in defiance of the law, into a state not far removed from the predial slavery, is I fear, too certain."

ইডেন, গ্রাণ্ট, মেকলে প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের লেখার ফলে Indigo Commission বসে এবং ১৮ই মে ১৮৬০ সালে কার্য্যারম্ভ করে। এই কমিশনের সমক্ষে ইডেন সাহেবের সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে নির্য্যাতিতের পক্ষে যায় এবং লোক সমক্ষে সমস্ত অবস্থা প্রকট হইয়া পড়ে। তৎপূর্ব্বে কুঠীওয়ালা সাহেবদের ভয়ে বাঙালীরা সামান্য প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত। ১৮৬০ সালে আগষ্ট মাসের শেষভাগে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং নীলকরদের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ১৮৮৫ সালে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট R. L. Mangles প্রথম রব তোলেন, "নীল চাষ করিবার জন্য অগ্রিম লইতে কোনরূপে বাধ্য করা যায় না।" রায়তরা এই সংবাদ পাওয়া মাত্রেই নীলের দাদন লওয়া ত্যাগ করিবার উপক্রম হয় এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের রায় লইয়া সরকার এবং নীলকরমহলে বিতণ্ডা বাধিয়া যায়; এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত Mangles-এর মত একপ্রকার চাপা পড়িয়া যায়।

১৮৬০ সালের কমিশনের রিপোর্টে ম্যাঙ্গল্‌সের মত সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ইডেন এবং গ্রাণ্টও ম্যাঙ্গল্‌সের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ্যভাবেই বলা হয় যে, এই চাষ চাষীর পক্ষে কোনও রকমে লাভজনক নয়। উপরন্তু তাহার পক্ষে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইবার বহু আশঙ্কা রহিয়াছে। চুক্তির উপর যে আদান-প্রদান নির্ভর করে, তাহাতে এক পক্ষের অসম্মতি থাকিলে, কখনও সে চুক্তি কার্য্যকরী নহে।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, প্রজাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কোনও কোনও ইংরেজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া রায়তের অত্যাচার দমন করিতে চেষ্টান্বিত হন। এ কথা আংশিক সত্য মাত্র। রায়তরা এবং রায়তের পক্ষে বহু সহৃদয় ব্যক্তি বিরাট আন্দোলন করে এবং স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৮৫৯ সালের এপ্রিল ও নবেম্বরে এবং ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারী প্রজা ও নীলকরের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময় প্রজা এবং তাহাদের সমব্যথী সাধারণ বাঙালী ত্যাগ, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, সৎসাহসের যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহার ইতিহাস জগতে অতুলনীয়; কিন্তু সে কথা আজ আর কেহ স্মরণ করে না। তাহা না হইলে আজ বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের কথা লোকে ভুলিয়া যাইত না। আদি বাস নদীয়ার চৌগাছায়, নীলকুঠীর দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিয়া তাঁহারা অর্থে, সামর্থ্যে, শৌর্য্যে, ত্যাগে রায়তদের পক্ষে জীবনপণ করিয়া লাগিয়া যান। বাঙলার স্থানে স্থানে বিদ্রোহ বিকটরূপ ধারণ করে এবং নীলকর সাহেবেরা বুঝিতে পারে যে, লোকের সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন না হইলে অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিত। নীলকরেরা যখন ফৌজদারী কোর্টের আশ্রয় লইয়া দাওয়ানী চুক্তির প্রতিকার চাহিল, তখন বাঙলা সরকার তাহা বাতিল করিয়া দেন।

প্রজাদের নিজ চেষ্টার সহিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের মতন তেজস্বী ও চিন্তাশীল লোকের রচনা এইকালে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার কোনও ছাপাখানা হইতে দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" প্রকাশিত হয়। "নীল দর্পণ" সত্য সত্যই নীলকর ও নীলচাষের দর্পণস্বরূপ—সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিচ্ছবি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তক পাঠ করিবার পর লোকের মনে যে [illegible] তুলিয়াছিল তাহার আরও এক অধ্যায় প্র[illegible] ...

(শেষাংশ ২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সত্য সমন্বয়ে

মানুষের জীবন বড়ো জটিল—সেজন্য দ্বন্দ্ব জীবনে লেগেই আছে। ঘর আমাদিগকে একদিকে টানে, বাহির টানে আর একদিকে। আমাদের জীবনে প্রবৃত্তির আধিপত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে কিন্তু প্রবৃত্তিই আমাদের জীবনের সবখানি নয়। আমরা জানতে চাই—এই বিশ্বভুবনের বিশাল রহস্যকে আমরা তন্ন তন্ন ক'রে জানতে চাই। আমরা ভালোবাসতে চাই—কেবল ঘরের মানুষগুলিকে নয়—ঘরের বাইরে যারা আছে তাদেরও। আমাদের জীবনের এই যে জটিলতা—এই জটিলতা একদিকে যেমন আমাদিগকে মনুষ্যত্বের গৌরব দান করেছে আর একদিকে তেমনি দুঃখও দিয়েছে বিস্তর। পশুর জীবন বড়ো সরল—প্রবৃত্তির তাড়না ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। সে জীবনে দ্বন্দ্ব নেই ব'লে দুঃখও নেই, গৌরবও নেই।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পর সন্দেহ—তারা জাগে শুধু আমাদের জীবনে। আমরা উত্তর পাইনে—অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শিশু যেমন আলোর জন্য কাঁদে, তেমনি ক'রে আমাদের অন্তর হাহাকার ক'রে কাঁদে পথের সন্ধান পাবার জন্য। কিন্তু পথের সন্ধান কোথায়? প্রবৃত্তির দাবীকে মেনে, না তাকে অস্বীকার ক'রে? ঘরকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যে, না পথের বুকে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে? সাকার দেবতার পূজায়—না, নিরাকার দেবতার পূজায়? জড়বাদে না অধ্যাত্মবাদে? বিবাহ করায় না বিবাহ না করায়?

এই যে দ্বন্দ্ব—এ দ্বন্দ্বের প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। ঘরের সঙ্গে বাহিরের, প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এই যে টানাটানি—এ টানাটানির একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। সব দ্বন্দ্বকে মিলিয়ে যে ঐকতানকে আমরা সৃষ্টি করি তার দ্বারা আমাদের জীবন ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে ওঠে। হ্যাভেলক এলিস একটা কথা বড়ো ভালো বলেছেন, Opposition is not a hindrance to life it is the necessary condition for the becoming of life

জীবনের বিচিত্র দিকগুলিকে মেলাতে পেরেছে যারা—জয়ের মুকুট মাথায় পরেছে তারাই। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমকে মিলাতে পারলো না ব'লেই তো পাশ্চাত্য সভ্যতার আজ নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। ইউরোপ প্রেমের দিকটাকে কোনো আমলই দেয় নি। ঠুলি-পরা ঘোড়ার মতো ডাইনে-বাঁয়ে না চেয়ে জ্ঞানকে লক্ষ্য ক'রে সে এতকাল ছুটে এসেছে। বিজ্ঞানের সাধনা তাকে প্রকৃতির উপরে দিয়েছে আধিপত্য, জড়-জগতকে এনে দিয়েছে তার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে বানিয়েছে রেলগাড়ী, জলযান, এরোপ্লেন, বারুদ, বোমা, বিষ-বাষ্প। বারুদের জোরে ইউরোপ হ'য়েছে দিগ্বিজয়ী। কিন্তু দিগ্বিজয়ের গৌরব নিয়েও ইউরোপ আজ মরতে বসেছে। যুদ্ধ আসন্ন-প্রায়। যুদ্ধ হবে আকাশ থেকে। হাজার হাজার ফিট উপর থেকে সর্ব্বনেশে বোমা পড়বে নগরগুলির উপরে—ভেঙে পড়বে সভ্যতার যত কিছু নিদর্শন। যুদ্ধ যে বাধবেই, এমন কথা নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়—কারণ ইতিহাসের বুকে উড়ছে অজানার জয়ধ্বজা। আমাদের সমস্ত থিয়োরী আর প্রোগ্রামকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ বেগে ধেয়ে চলেছে মহাকালের জয়রথ। তবে উদ্যোগ-পর্ব্বের ঘটা দেখে মনে হয়—বিংশ শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষযজ্ঞের পালা অনিবার্য্য। কেন ইউরোপ তার বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও রক্তের সাগরে আজ ডুবে যেতে বসেছে? কারণ সে মেলাতে পারেনি জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমকে। ইউরোপ ভালোবাসলে কি মানুষের জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারতো? তার অন্তরে প্রেম থাকলে আকাশ থেকে বোমা ফেলে কখনই সে এমন ক'রে নারীহত্যা আর শিশুহত্যা করতে পারতো না। ইউরোপ আত্মহত্যা করতে বসেছে প্রেমকে অস্বীকার ক'রে, আমরা আত্মহত্যার পথে এগিয়ে গিয়েছি জ্ঞানকে উপেক্ষা করতে গিয়ে। আঁতুড়-ঘরে ছেলে মরেছে প্রসূতিকে স্যাঁতসেঁতে অপরিচ্ছন্ন ঘরে রাখবার জন্য—আর পেঁচোকে শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী ক'রে আমরা নিশ্চিন্ত থেকেছি। মানুষকে রোগ থেকে মুক্ত করবার জন্য ইউরোপের পণ্ডিতেরা যখন গবেষণার মধ্যে নিমগ্ন থেকেছে—আমরা তখন বাবা তারকেশ্বরের দুয়ারে দিয়েছি ধন্না, রোগীকে খাইয়েছি জলপড়া আর দেবতার ক্রোধের উপশম করবার জন্য একটা নয়—মেনেছি জোড়া পাঁঠা। আমরা ভালোবেসেছি—কিন্তু জানবার চেষ্টা করিনি—তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা। ইউরোপ জানবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভালোবাসেনি—তাই তারও শিয়রে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যৌনক্ষুধার যেমন একটা প্রচণ্ডতা আছে—সুন্দরের প্রতিও কি তেমনি একটা অনুরাগ নেই? sex আর culture—এ দু'য়ের মধ্যে বিরোধ আছে। যৌনক্ষুধা বাসরঘরের উত্তপ্ত কোটরের মধ্যে আমাদের প্রাণশক্তিকে পঙ্গু ক'রে রাখে। নারীর সুকোমল বাহুদুটির মধ্যে বন্দী হ'য়ে আমরা ভুলে থাকি বৃহৎ জগতের জীবন-প্রবাহকে। মানুষের জীবন তখনই কালচারের অরুণালোকে আলোকিত হ'য়ে উঠেছে যখন সে আপনার দুর্জ্জয়-শক্তিকে প্রবৃত্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। নারীর আলিঙ্গনপাশে যতক্ষণ সে বাঁধা থেকেছে ততক্ষণ বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষের জয়যাত্রা আরম্ভ হয় নি। ঘরের প্রিয়া থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ মেরু-প্রদেশের রহস্যকে জানবার জন্য বাহির হয়েছে মুক্ত পথের বুকে। মানুষ যেখানে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতো অপরূপ দেবালয় বানিয়েছে, ম্যাডোনার মতো ছবি এঁকেছে, বিঠোফেনের মতো সুরের ইন্দ্রলোক তৈরী করেছে, জাঁ ক্রিস্তফের মতো উপন্যাস লিখেছে—সেখানে তার শক্তি যৌনক্ষুধার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে অন্তর-লোকের দিকে প্রসারিত হয়েছে। মানুষের শক্তি বহির্লক্ষ্য ছেড়ে যেখানে অন্তরের দিকে প্রধাবিত হয়েছে সেখানেই

তার সংস্কৃতির প্রকাশ—সেখানে সে কবি, চিত্রকর, সুরশিল্পী —স্রষ্টা। কিন্তু এ তো হোলো একদিকের কথা। প্রবৃত্তির দিকটারও যে একটা প্রয়োজন আছে সে কথাই বা অস্বীকার করি কেমন ক'রে? নারীমায়াকে জয় করবো বললেই কি তাকে জয় করা যায়? জোর ক'রে প্রবৃত্তির টুঁটি চেপে মারতে গিয়ে তার বেগকে আরও প্রবল ক'রে তুলি। ফলে অন্তরের গভীরে আমরা যে ফেনিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করি—সেই আবর্ত্তের মধ্যে কালচার কোথায় তলিয়ে যায়। তবে উপায়? উপায় প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি—এই উভয়ের সমন্বয়ে। সমন্বয় ছাড়া কোনো উপায় নেই। Sexএর সঙ্গে cultureএর সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষমতা যার নেই—সে অতি দুর্ভাগা। হয় সে sexকে উপেক্ষা করতে গিয়ে আপনার চিত্তকে ক'রে তুলবে একটা কুরুক্ষেত্র—নয়তো cultureকে উপেক্ষা করতে গিয়ে পরিণত হবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ একটা দ্বিপদ জানোয়ারে। যৌনক্ষুধা আর সংস্কৃতি—এ দুটো পরস্পরবিরোধী হ'লেও একটা জায়গায় এ দুয়ের মিল আছে। সেই মিলন-ভূমিটীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারলে জীবন-বীণাকে ঠিক সুরে বাজানো সম্ভব নয়। Sex and culture are perfectly balanced. To desire freedom from this balance is to desire annihilation.

মানুষ আর্টের ক্ষেত্রে বিরোধের সমন্বয় ক'রেই স্রষ্টার গৌরবের অধিকারী হয়েছে। স্থাপত্যশিল্পে আর্চের (arch) উদ্ভাবন—এর মধ্যে কি বিরোধ সমন্বয়ের মধ্যে সুন্দর হ'য়ে প্রকাশ পায় নি? দুটো শক্তি পরস্পরকে বাধা দিচ্ছে আর বাধার মধ্য দিয়ে একে অন্যকে খাড়া রেখেছে। বিরুদ্ধতা যদি না থাকতো খিলান ভেঙে গিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোতো। নৃত্যশিল্পের মধ্যেও আমরা পদে পদে দেখি, বিরোধ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে করতে চলেছে। দেহকে কতরকম ভঙ্গীতেই যে রাখতে হয় আর সেই অঙ্গভঙ্গীর নিশ্চলতার মধ্যে চলার বেগ সংহত হ'য়েই রূপকে বারে বারে জাগিয়ে তোলে।

কবিতার মধ্যেও আমরা কি দেখতে পাইনে বিরোধ সুন্দর হয়ে উঠেছে সমন্বয়ের মধ্যে? একদিকে ভাব পাখা-মেলা পাখীর মতো অবাধে ছুটেছে আর একদিকে ছন্দ সেই ভাবের উদ্দাম প্রকাশকে শৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে। একদিকে ভাবের মুক্তি—আর একদিকে ছন্দের বন্ধন—এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য যেখানে সেখানেই কবিতার উৎকর্ষ। ভাব যেখানে মুক্তির উপরে বেশী জোর দিতে গিয়ে ছন্দের বন্ধনকে ভালো ক'রে মেনে নিতে পারে নি—সেখানে কবিতার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে কানকে মুগ্ধ করবার মোহিনী শক্তি। আবার কবি যেখানে ভাবকে মুক্তি দেবার দিকে জোর না দিয়ে ভাষাকে শ্রুতিমধুর করবার জন্য ছন্দের মাধুর্য্যের উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়েছে—সেখানেও কাব্যের অপকর্ষ সুনিশ্চিত।

আর্টের ক্ষেত্রে যে কথা সত্য জীবনের ক্ষেত্রে সে কথা মিথ্যা নয়। জীবন-বীণার তারে তারে যে বিচিত্র সুর ঘুমিয়ে আছে—তাদের প্রত্যেকটীকে জাগাতে হবে। সে জাগরণ থেকে যে ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়—সেই ঐক্যতানই আমাদের জীবনকে ক'রে তোলে ঐশ্বর্যশালী। যেখানে অন্যান্য তার-গুলিকে আঘাত না ক'রে আমাদের ছড় একটী মাত্র তারকে আঘাত করে সেখানে একতারার একটি মাত্র সুরের মধ্যে জীবনের দৈন্যই প্রকাশ পায়।

বর্জ্জনের পথ গোঁড়ামির পথ। প্রাচ্যকে আঁকড়ে থাকবো—পাশ্চাত্যকে নেবো না—এ হোলো একরকমের গোঁড়ামি। পাশ্চাত্যকে নেবো প্রাচ্যকে বর্জ্জন ক'রে—এ হোলো আর একরকমের গোঁড়ামি। ভাটপাড়ার গোঁড়ামি আর লেক অঞ্চলের গোঁড়ামি—এ দুই গোঁড়ামির কোনটাকেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। মেলাতে হবে। প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে, প্রেমকে জ্ঞানের সঙ্গে, ডিমোক্র্যাসিকে ডিক্টেটরশিপের সঙ্গে, বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের সঙ্গে, sexকে cultureএর সঙ্গে, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির সঙ্গে, জাতি-প্রেমকে সার্ব্বলৌকিক প্রীতির সঙ্গে, ঘরকে পথের সঙ্গে, শক্তিকে নম্রতার সঙ্গে। মেলাতে গিয়ে জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করবার অবশ্যই আশঙ্কা আছে। কিন্তু সমন্বয়ের পথ ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। শেষ প্রশ্নের উত্তর সামঞ্জস্যের মধ্যে।

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে একটি গভীর সত্যের প্রতি। সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে সেনাপতির প্রতিভা যথেষ্ট নয়। সেনাপতির অধীনে যে সব সামরিক কর্ম্মচারী থাকে—তাদের উপরেও সংগ্রামের জয়-পরাজয় বহুলে পরিমাণে নির্ভর করে। সেণ্ট-হেলেনায় নেপোলিয়ান স্বীকার করেছিলেন, তাঁর অনুচর-বাহিনীর যোগ্যতার অভাবই ওয়াটার্লুতে তাঁর পরাজয়ের কারণ। সাধারণ সৈনিক যারা তাদের সাহস, শৃঙ্খলা, শিক্ষা-দীক্ষা সবই নির্ভর করে তাদের উদ্ধর্তন কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা অযোগ্যতার উপরে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করবার অধিকারী তাঁরাই, যাঁদের অনুচরগণের যোগ্যতা আছে—সত্যনিষ্ঠা আছে—দলপতির আদেশকে শিরোধার্য্য করে চলবার মত নিষ্ঠা আছে। লেনিন একা কি করতে পারতেন যদি ষ্টালিনের মতো, ট্রট্স্কির মতো তাঁর অনুচর না থাকতো?

ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করা অসম্ভব যদি নেতৃত্বকামী ব্যক্তির যোগ্য কতকগুলি অনুচর না থাকে। সে অনুচর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হ'লে চলবে না। তার অনেকগুলি গুণ থাকা চাই—তার মধ্যে loyalty, honour, self-discipline প্রধান। এই অনুচরগুলি ভুঁই-ফোঁড় নেতা হ'লে চলবে না। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের যোগ এবং জনসাধারণকে তাঁদের চালাবার ক্ষমতা থাকা চাই। ত্রিপুরীতে গান্ধীর জয়ের পিছনে তাঁর অনুচরবৃন্দ। সেই অনুচরগণ গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে চলেন। একযোগে কাজ করবার ক্ষমতা আছে তাঁদের। আপন আপন প্রদেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর যোগও উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসকে সৃষ্টি করে জনসাধারণ নয়—ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন এক একজন মানুষ জন্মায়; তাঁর শ্যেন-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় যুগের প্রধান প্রধান ঘটনা স্রোতের গতিপথ। জনসাধারণ তাঁদের আজ্ঞাবহ দাস। কুমোরের হাতে যেমন কাদার তাল—নেতার হাতে জনসাধারণ তাই—ইতিহাস-সৃষ্টির উপাদান মাত্র। নূতন জার্ম্মানী বিসমার্কের সৃষ্টি, নূতন রাসিয়ার ইতিহাস লেনিনের হাতে গড়া, নূতন ইটালিকে তৈরী করেছে মুসোলিনী, নূতন ভারতবর্ষের স্রষ্টা গান্ধী। It is the great individuals who make history, and whatever presents itself 'en masee' can only be its **object.** ইতিহাস মানুষের যুক্তি-তর্কের কোনো ধার ধারে না। তার ঘটনাগুলি ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের মতো তারা চমকে দেয়। পাণ্ডিত্যাভিমানী মানুষ ঘটনা-স্রোত পর্য্যবেক্ষণ ক'রে কত রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—কত কার্য্যপদ্ধতি রচনা করে। ইতিহাসের আকস্মিক ঘটনাগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেই সব কার্য্যপদ্ধতি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। গান্ধীজীর বার্দ্দোলি সত্যাগ্রহের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে দেয় চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ড। আরবের একজন সামান্য উষ্ট্র-চালককে আশ্রয় করে ইসলামের জয়যাত্রা একদিন দিগন্তব্যাপী হ'য়ে উঠবে—একথা কে ভেবেছিলো? কে ভেবেছিলো কর্সিকার এক পিতৃহীন বালক ইউরোপের রাজন্যবর্গের সিংহাসন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে? সেণ্ট-হেলেনায় তার শোচনীয় পরিণতির কথাই বা কে ভাবতে পেরেছিলো? ১৯২০ সালে গান্ধী এসে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে হঠাৎ আবির্ভূত হবেন—অসহযোগ আন্দোলনের স্রষ্টা হ'য়ে ভারতকে নবজীবনের পথে পরিচালিত করবেন—এ কথাই বা কার জানা ছিলো? আমরা যা ভাবিনে—ইতিহাসে তাই ঘটে—আমরা যা ভাবি—বাস্তব তাকে উল্টে দেয়। ব্যক্তির জীবনের কি দাম আছে ইতিহাসের চোখে? তার রথ-চক্র চলেছে ঘর্ঘর-শব্দে নির্দ্দিষ্ট পথের উপর দিয়ে। মানুষের হাসি—মানুষের কান্না—সাম্রাজ্যের উত্থান, সাম্রাজ্যের পতনকে তুচ্ছ ক'রে ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে চলছে আপনার পথে। সেই পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করে এমন সাধ্য মানুষের নেই।

দেশের বই—[illegible]

(২৬২ পৃষ্ঠার পর)

সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে। সারা বাঙলাদেশ বিক্ষুব্ধ আলোড়িত হইয়া পড়িল, লোকের মুখে মুখে আলোচনা চলিতে লাগিল, প্রতিকারের জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

এই অঙ্কের ইহাই শেষ নয়। বাঙলার পাদ্রীরা রায়তদের দুঃখে ম্রিয়মাণ ছিল; তাহাদের স্বদেশবাসীর আচরণে লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল। নীল দর্পণ প্রকাশিত হইবার পর পাদ্রী জেমস্ লঙ (Rev. James Long) উহার এক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহার দ্বারা তিনি সরকার এবং তাঁহার দেশবাসীর চেতনা আনিতে পারিবেন। ১৮৬১ সালে লঙ সাহেবের পক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই অনুবাদকার্য্যের ভার লন। পুস্তক ছাপা হইবার পরও সরকারী মহলে ইহার কোনই প্রতিবাদ হয় নাই, উপরন্তু সরকারপক্ষ লঙ সাহেবের সুখ্যাতি করিয়া রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু, মধ্যে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পাওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হয় এবং এক মামলা রুজু করে। ৬ই জুন ১৮৬১ সালে মুদ্রাকরের নামে সমন বাহির হয়, তখনও গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত হয় নাই। ১১ই জুন তারিখে লঙের অনুরোধে মুদ্রাকর তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া দশ টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পান এবং লঙের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা স্থানান্তরিত করা হয়—"for libelling the Editor of the Englishman and libelling the Indigo Planters of Lower Bengal in Nil Darpan." ১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই মামলা আরম্ভ হইয়া চারদিন বিচার চলে এবং লঙ সাহেবের হাজার টাকার জরিমানা ও এক মাসের কারাবাসের আদেশ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই মামলায় উপস্থিত ছিলেন এবং রায় বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই টাকা জমা দিয়া দেন। বলা বাহুল্য, লঙের পক্ষে ও বিপক্ষে লোক মিলিয়া বাঙলায় এক প্রচণ্ড আন্দোলন চলিতে থাকে এবং বিচারপতির রায় সম্বন্ধে [illegible] সমালোচনা

প্রচলিত জাতি বিভাগ

শ্রীপ্রভাস ঘোষ

(২)

বিগত প্রবন্ধে ব্রিটেনের তিনটি স্বতন্ত্র ভাষা-কেন্দ্র ও নর-নারীর মস্তকগঠন লইয়া আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে বিজ্ঞানসম্মত জাতি বিভাগে ব্রিটিশ জাতি—প্রকৃত প্রস্তাবে কয়েকটি জাতির সমষ্টি। আমাদের প্রচলিত জাতি বিভাগ একেবারেই যুক্তিসংগত বা সর্ব্বাতিপূর্ণ নয়। ইউরোপের অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।

সাধারণ একটা বাহ্যিক সাম্যের প্রভাবেই বর্তমানের জাতীয়তা গঠিত। ব্রিটেনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে উহার আংশিক সমর্থন আমরা পাইয়াছি। এইবার আমরা ফরাসী দেশের তুলনা করিব—বিগত যুগের অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের সহিত। ফ্রান্সে দেখিতে পাওয়া যায় উহার চারিটি পৃথক জাতির ভিতর তিনটি বেশ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বসবাস করিতেছে, শুধু একটি ভাষা সকলেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে বলিয়া। এই জাতিগুলির ভিতর নজরে পড়ে ডরডোনের আদিম আইবেরিয়ানগণ, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নর্ডিক ফ্রাঙ্কগণ; ঘোর রঙিন ব্রেটনগণ (উত্তর এবং কেভেন্নেস অঞ্চলের) এবং পরিশেষে পূর্ব অঞ্চলের স্যাভয়ার্ডগণ (Savoyard) যাহাদের মস্তক হইল সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশস্ত। যদিও আজ ইহারা একত্র শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করিতেছে, পরস্পর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, তথাপি ইহাদের সংস্কৃতি, ইহাদের ভাষা যে সুদূর অতীতে নিতান্তই পরস্পর বৈষম্যপূর্ণ ছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করে।

১৯১৪ সালের পূর্বে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে পাঁচটি বিভিন্ন জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল; যদিও একই রাষ্ট্রের অধীন তথাপি ইহাদের ভিতর সত্যিকার মিলন সম্ভব হয় নাই, কেবল সংস্কৃতির আদান-প্রদানে কিছুটা সমকক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিদৃষ্ট হইত। নিতান্ত অসন্তোষজনক ব্যবস্থায়ই উহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছিল এবং পশ্চিম ভাগের জার্মানভাষাভাষীদের সহিত মধ্যভাগের ম্যাগিয়ারগণের এক চুক্তিমূলক সংযোগ দ্বারা এই বাহ্যিক একতা বা সাম্য সংরক্ষিত হইত। অনুরূপ ব্যবস্থায়ই উত্তর ভাগে বাস করিত—বোহেমিয়া, মোরেভিয়া ও সাইলিসিয়ার পাশ্চাত্য স্লাব (Western Slav) জাতিগণ। দক্ষিণে ছিল বসনিয়া ও সারভিয়ার দক্ষিণ স্লাব (Southern Slav) জাতিগণ—ইহারা পাশ্চাত্য স্লাব অপেক্ষা পৃথক ভাষা ব্যবহার করিত এবং পৃথক্ ধর্ম অনুসরণ করত। পূর্বভাগে ছিল রুমানিয়ানগণ; ইহারা রোমান্স-স্লাব (Romance-Slav) মিশ্র ভাষায় কথোপকথন করিত। ম্যাগিয়ারগণ (অর্থাৎ হাঙ্গেরিয়ান) এশিয়াটিক এক ভাষা ব্যবহার করিত, যাহা প্রকৃতিতে ছিল কিরঘিজ ও মাঞ্চু ভাষার নিকটবর্তী। কিন্তু প্রধান যে অষ্ট্রিয়ান জাতি যাহা নিজেকে সকল প্রকারে অন্য অষ্ট্রিয়ানগণের অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে করিত, তাহারা বাস করিত ভিয়েনা ও টাইরোলে এবং জার্মান ভাষা বলিত; আজিও উহারা দক্ষিণ জার্মানগণের সমতুল্য ভাষায়ও সংস্কৃতিতেও।

এমন যে বিমিশ্র একটা জাতি—যদি নৃতত্ত্বের মস্তক-পরিমাপ পদ্ধতি দ্বারা ইহাদের বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত পাঁচটি আলাদা জাতিতে কিন্তু কোন প্রভেদ নাই; উহাদেরও মস্তক-শীর্ষের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত সমানই বলিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়—উহাদের দেহ-বর্ণ, উহাদের কেশের প্রকৃতি ও বর্ণ একেবারে সমজাতীয়। এমন কি, কেশের যে কুঞ্চিত তরঙ্গায়িত আকার—তাহাও পাঁচটি জাতিতে একই রূপ। দেহের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও ব্যতিক্রম কিছুই দেখা যায় না—অন্য সকল জাতিই দৈর্ঘ্যে সমান, কেবল দক্ষিণ স্লাবগণ সাধারণত একটু বেশী লম্বা। অন্যান্য দেহগঠন অনুপাতেও বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যাইবে না উল্লেখ করিবার মত।

কাজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া আমাদের উপায় নাই যে, নৃতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণের নিরিখে এই জাতিগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে একই গোষ্ঠীর জ্ঞাতিভ্রাতা, যদিও সংস্কৃতির দিক হইতে ইহারা বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। শুধু সংস্কৃতির বিভেদ নয়, ধর্মের বৈষম্য, শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, লেখ্য ভাষার পার্থক্য (অর্থাৎ রোমান এবং রাশিয়ান হরফ ব্যবহারের প্রভেদ) এবং সর্বোপরি কথ্যভাষার বৈষম্য—ইহাদেরকে একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং স্ব স্ব শাখাজাতির প্রতি অনুরাগাতিশয্য অপর শাখা জাতির প্রতি ঈর্ষা ও বিরোধ উস্কাইয়া দিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে নৃতত্ত্ব-মতে বিগত যুগের অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের পাঁচটি জাতির ভিতর জাতিগত কোন বৈষম্য ছিল না, তথাপি তাহারা সত্যকার সাম্যের স্বাদ পায় নাই—একটা বাহ্যিক সাদৃশ্যদ্বারা কৃত্রিমভাবে সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

অনেক পণ্ডিতগণ গম্ভীরভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষার আদিম অভ্যুদয়-স্থান লিথুয়ানিয়া। কিন্তু ইহা সকল প্রকার জাতিগত ও ভাষাগত পরিস্থিতির একেবারে বিরুদ্ধ মত। সেকাল হইতে ভাষা-পরিবেষণের যেটুকু হেরফের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রয়াসে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা এইটুকু বলিতে পারি—সুদূর অতীতেই সংস্কৃত ভাষা লিথুয়ানিয়ায় আনীত হইয়াছিল এবং বহির্জগতের সহিত সংশ্রব হারাইয়া উহা ঐ স্থানে শতাব্দীর পর শতাব্দী সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ঠিক অনুরূপভাবে আমরা দেখিতে পাই—আইসল্যাণ্ডিক সাগা (Saga) এবং আদিম মূল নরওয়েজিয়ান সাগা সমতুল্য অর্থাৎ মূল নরওয়েজিয়ান ভাষা আইসল্যাণ্ডে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এইখানে আমরা দেখিতে পাই কেন্দ্রীয় বিবর্তনের আইন (Law of Zonal Evolution):—মূল দেশের আদিম সংস্কৃতি অন্য দেশে সংরক্ষিত হইলে, ঠিক যে সময়ে উহা প্রথম স্থানান্তরিত হয়, সেই সময়োপযোগী সংস্কৃতির বিকাশই নূতন দেশে থাকিয়া যায়, উহার আর বিবর্তন হয় না। অথচ মূল দেশে বিবর্তনের প্রভাব তীব্রতম থাকায় তাহার সংস্কৃতি আগাইয়া আসিয়াছে আধুনিকতম আকারে। আবার ইহাও দেখা যায়

যে, নূতন দেশে মূল দেশ হইতে সংস্কৃতির বন্যা প্রবল শক্তিতে আসিয়া পড়িলে সেখানে বিবর্তন নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। আবার যেখানে পর্যায়ক্রমে দুই সংস্কৃতির প্রভাব পড়িয়াছে কিম্বা ক্রমাগত সংঘর্ষ চলিয়াছে প্রতিবেশী দুই সংস্কৃতিতে সেখানে বিবর্তনের প্রভাব হইয়া পড়ে ক্ষীণতম।

এইজন্য দেখা যায় মেসোপটেমিয়া—যেখানে আর্য ও সেমিটিক দুই সংস্কৃতির সংস্পর্শ হইয়াছে, সেখানে যে ভাষা আজ প্রচলিত, তাহাতে ঐ দুই ভাষার কোনটিরই যোগাযোগ বা পরম্পরা পাওয়া যাইবে না; অথচ স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস আর আবিসিনিয়ায় তাহা পাওয়া যাইবে—কারণ সেখানে এমন আদিম জাতীয় নরনারী পাওয়া যাইবে, যাহাদের পূর্বপুরুষের ভাষায় ঐ দুই সংস্কৃতির প্রবল বন্যা এককালে প্রবাহিত হইয়াছিল।

আর একটি নৃতত্ত্বের উদ্ঘাটিত সত্য উল্লেখযোগ্য। স্যার আর্থার কিথ্ দেখাইয়াছেন যে, যে সকল মাপকাঠি দ্বারা নৃতত্ত্ববিদ বাস্তবে জাতিবিভাগের নির্দেশ দেন, তাহা সমর্থিত হয় দেহ গঠনের তুলনায় গ্রন্থি (gland) সাদৃশ্য দ্বারা। গ্রন্থিবিশেষের অস্বাভাবিক বিবর্ধন দ্বারা লম্বা থুতুনী, নাক আর ভ্রূর উদ্ভব সম্ভব হয়। এই বিশিষ্টতা পাওয়া যাইবে যে সকল লোককে Neanderthal বলা হয়, তাহাদের ভিতর। ইউরোপীয় নরনারীতে সাধারণভাবে নাক আর থুতুনী লম্বিত হয় ঐ বিশেষ গ্রন্থির বিবর্ধনের ফলে। য়্যাড্রিনেলস্ দ্বারা ত্বকবর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়, কাজেই ইহা খুবই সম্ভব যে আদিম জাতির কৃষ্ণবর্ণ য়্যাড্রিনেলের বিকাশের হেরফেরে শ্বেত ও অ-শ্বেতের মাঝামাঝি নানা বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে।

সাধারণভাবে ইহা অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, আবহাওয়া প্রভাবে মানবদেহের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি বর্ধিত হয় ও অন্যান্য গ্রন্থি ক্ষীণভাবে উন্মেষ প্রাপ্ত হয়।

আদিম মানবের উদ্ভবের স্থানে আবহাওয়া আর্দ্র ও উষ্ণ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। সুতরাং সেই আবহাওয়াই তাহার স্বাভাবিক উন্মেষের পক্ষে ছিল যোগ্য। তাই যে দল সেই কেন্দ্রস্থল হইতে শীতলতর আবহাওয়ার দেশে প্রয়াণ করে, সেখানে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি অতিরিক্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মুখাবয়ব, ত্বকবর্ণ প্রভৃতির পরিবর্তন সাধন করে। কাজেই মূল একই জাতি হইতে উদ্ভূত হইলেও মধ্য-এশিয়া, ভূমধ্যসাগর, মধ্য-আফ্রিকা—এই তিন অঞ্চলের লোক তিন প্রকার দেহগঠনাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্যই মধ্য-এশিয়ার সহিত দেহগঠনে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের নরনারীর যতটা প্রভেদ, ভূমধ্যসাগরের সহিত নিগ্রোদেরও তেমনই বৈষম্য। ইহা ছাড়া একই অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল অবস্থানকারী নরনারীতেও দেহ-গঠনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহার কারণ খুব সম্ভবত আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অভাব। বিবর্তনের ফলে ক্রমশ পৃথিবীপৃষ্ঠ আর্দ্রতা হারাইয়াছে এবং তাহার ফলে মানবের গ্রন্থিবিশেষে বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই একই দেশের লোকের দেহগঠনে ক্রমে নানা পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। আহারের পরিবর্তনও এইরূপ পরিবর্তনের সাহায্য করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল পরিবর্তনের ফলে ইউরোপে নাক থুতুনীর প্রাধান্যের ন্যায়, গোলাকার মুখ, চেপ্টা মুখমণ্ডল, সোজা সরল রেখার ন্যায় কেশ, বিরল দাড়ী-গোঁফ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। মঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি যে পরবর্তী সৃষ্টি, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—প্রচলিত যে জাতিবিভাগ, তাহা বিজ্ঞানসম্মত নয় কোনক্রমেই। আর দেহগঠন লইয়া যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহাতে এমন প্রমাদ করা হইয়াছে যে, তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় অসন্তোষজনক হইয়া উঠিয়াছে।

নবীনের রামধনু

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

পেট রোগা এক 'নবীনের' হ'ল
বক্ষে বেজায় বেদনা।
'পুরাতন' কোনো কবিরাজ এসে
কহিলেন—"বাছা কেঁদনা।
কিছু পুরাতন তণ্ডুল খাও
অতি পুরাতন ঘৃত যদি পাও
হাতে মাখাইয়া বক্ষে বুলাও—
সেরে যাবে—আমি বলছি।"
"ছিছি মহাশয়!" কহিল নবীন
"এ যে আমাদের প্রগতির দিন
নৃত্যের তালে বাজাইয়া বীণ্
'পুরাতন' পায়ে দলছি।"

"তাই নাকি?" হেসে কহে কবিরাজ
"হে তরুণ অভিমানী

আমরা তো সব সুখে ভাত খাই
নাকে নিশ্বাস টানি—
তোমরা কি করো? রীতি-পদ্ধতি-
বেঁচে থাকিবার—পুরাতন অতি—
হবে নাকি তাও ত্যাগের কুমতি?

ওগো সুন্দর তনু
চন্দ্র সূর্য অতি পুরাতন
নবীনের রামধনু।'

তিমির মুখগহ্বরে

প্রথম দৃষ্টিতে যাহা একটি পোর্টেবল তাঁবু বলিয়া মনে হয়—অভ্যন্তরে আসীনা তরুণী সমেত, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কিন্তু তেমন নিরাপদ আশ্রয় নয় আদপেই। ব্রিটিশ কলম্বিয়া অঞ্চলে কুইন শার্লোট দ্বীপের অপর তীরে একটি বাচ্চা তিমি ধরা পড়ে। সেই মৃত তিমি বাচ্চাটির মুখ হাঁ করাইয়া তাহার ভিতরে এই তরুণীটি আরামের আসন স্থাপন করিয়াছে।
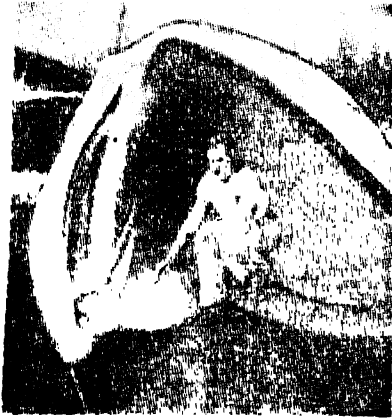
তিমির মুখে তরুণী

বাচ্চা হইলেও এই তিমিটির আকার কত বড় তরুণীটির আকারের তুলনায় সহজেই কিছুটা ধারণা করা যাইবে। দৈর্ঘ্য অনুমান করা না গেলেও তিমিশিশুর মুখগহ্বরের আভাস পাওয়া যাইবে। শিশুটির বিরাট মুখে যে ঐ তরুণীর ন্যায় সাতটি অনায়াসে স্থান পাইতে পারে, একথা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

টেনিসের প্রতি বিদ্বেষ

উত্তর লন্ডনের শহরতলীতে একটি লোক আছে যে 'টেনিস' কথাটাই সহ্য করিতে পারে না এবং তাহার কারণ আর কিছু নয়—ঐ ব্যক্তির নাম ফ্রেড্ পেরি। আর ফ্রেড্ পেরি নামে রহিয়াছে বিখ্যাত টেনিস্ খেলোয়াড়।

যদিও ঐ ব্যক্তিটির টেনিস্ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই কিছুমাত্র, কিন্তু এমন দিন যায় না, যেদিন না দুই-তিনবার টেলিফোনে তাহাকে ডাকা হয় আর জিজ্ঞাসা করা হয়—টেনিস্ খেলা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি। কত লোক ছুটিয়া আসে তাহার কাছে—অটোগ্রাফ্ সংগ্রহ করিবার জন্য; কত লোক টেনিস্ সম্বন্ধীয় রচিত পুস্তক উপহার প্রদান করে; কেহ বা তাহার টেনিস্ খেলার তারিফ করিয়া চিঠি লিখে। এই লইয়া প্রতিবেশীরা তাহাকে বিদ্রূপ করে, কৌতুক করে।

তিন বৎসর ধরিয়া এই প্রকার নামের মিলে অশেষ বিরক্তি ভোগ করিয়া এখন সে স্থির করিয়াছে—নামটাই সে বদল করিয়া ফেলিবে।

আধুনিক বামন

ক্রয়ডনের আপার ব্রেটনপ্লেসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তিন বৎসর বয়স্ক টমাস্ উইলিয়াম্‌স্‌কে নাম দিয়াছে—"টম্ থাম্ব্ টমি"। তাহারা অনেক সময়ই টমিকে তুলিয়া লইয়া বগল-দাবা করিয়া বহন করিয়া চলে, ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না, বিশেষ করিয়া যখন ছুটোছুটি করিয়া কোথাও যাইতে হয়।

কি করিয়া ছোটদের পক্ষে এমন কাজ সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারা যায় টমির দৈর্ঘ্য হইতে। টমি ২৫ ইঞ্চি লম্বা। ওজনে কেবল ১৪ পাউন্ড। দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত টমি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে। দুই বৎসরে পৌঁছিবার পর আর সে বাড়ে নাই—দৈর্ঘ্যেও নয়, ওজনেও নয়। চিকিৎসকগণের অভিমত যে, সে আর বোধ হয় বাড়িবে না জীবনে।

টমির জন্ম হইতে পিটুয়ারি গ্ল্যান্ডে খুঁত থাকায় তাহার বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়াছে। পিতামাতা তাহাকে সুখী করিতে সর্বদা চেষ্টা করে। টমি আকারে ছোট হইলেও অঙ্গহীন নয়—সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে। তাহাকে 'টম থাম্ব' ডাকিলেও সে রাগ করে না।

আজব বাজি রাখা

লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে এক রবিবারে শহরের সদর রাস্তা দিয়া গ্র্যান্ড্ বল 'হিট' করিয়া লইয়া গিয়া কেহ একটা মোটা টাকার বাজি জিতিয়া লইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া জনসাধারণের ভিতর যথেষ্টই উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

সমর বিভাগের অফিসার প্রভৃতিদের ভিতর নানা প্রকার অদ্ভুত বাজি রাখিয়া অবাক কান্ড করিবার বিষয় জানিতে পারা যায়। সিফোর্থ হাইল্যান্ডার্স (৭৮নং)-য়ের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের বেটিং বুক' হইতে আর একটি বাজি রাখিবার বিষয় জানা যায়। ঘোড়ার লেজের দিকে লাগাম দিয়া যে ব্যক্তি পনর মিনিট ঘোড়ার পিঠে থাকিতে পারিবে একবারও আসনচ্যুত না হইয়া—তাহাকে দুই বোতল মদ দেওয়া হইবে পুরস্কার। কিন্তু এই বাজি কেহ জিতিতে পারে নাই!

আর একটা বাজি রাখিবার ব্যাপার শোনা যায় এই যে, কোনও সৈনিক বাজি রাখিয়া এক আজব ব্যাপার করিয়া ফেলে। মদ্যপানের গ্লাস একটিকে জলপূর্ণ করিয়া উহার ভিতর দশ শিলিং মুদ্রা এমনভাবে রাখিল যে এক ফোঁটা জলও উপচাইয়া পড়িল না। কিন্তু কি প্রকারে সে এই কাজটি করিল, তাহা অবশ্য বেটিং বুকে লেখা নাই।

আজব শিল-নোড়া

দক্ষিণ তুরস্কের মার্সিন শহরের নিকট পার্বত্য অঞ্চলে এমন এক সভ্যতার প্রতীক অবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা মিশর, বেবিলোনিয়া অথবা ক্রীটের সভ্যতারও আগেকার বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিমত প্রদান করিয়াছেন। প্রোফেসর গার্স্ট্যাং এই আবিষ্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট। আবিষ্কৃত পার্বত্য শহরটির

অন্দরমহলের প্রাঙ্গণে শিল-নোড়া

সামনা প্রচারের একটি মস্ত গবাক্ষ পার্শ্বে রহিয়াছে ৩০০০ বৎসরের পুরাতন একখণ্ড প্রস্তর যাহা পেষণ কার্যের জন্য শিলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। উন্মুক্ত বায়ুতে রন্ধন ব্যবস্থা ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় আয়োজন আদিম জীবনযাত্রারই আভাস প্রদান করে। ছবিতে দেখা যাইতেছে তুরস্কের জনৈকা পল্লী-নারী এই বিরাট শিলটি ব্যবহার করিতেছে সেই প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিয়া।

নাবিক ও নারী

ভাইস-অ্যাডমিরাল গর্ডন ক্যাম্পবেল্-এর মতে নাবিক ও নারীর ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে—সেই নারী আধুনিকা হউন বা না হউন—সেই নারী 'সদ্য-ভাসমান'ই হউন আর 'পুনঃসংস্কৃত'ই হউন।

'নাবিক এবং নারী উভয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং বেশীর ভাগ ব্যাপারে অযৌক্তিকতাপূর্ণ।' আধুনিক নারীর এক সভায় লণ্ডন শহরে অ্যাডমিরাল ক্যাম্পবেল্ এই কথা বলেন।

'আবার নারীর সহিত সাগরেরও একটা সাধারণ মিল রহিয়াছে। কারণ উভয়েই সতত পরিবর্তনশীল। এক নিমেষ হয়ত তাহারা শান্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় তখন তাহারা প্রকৃতই আনন্দদায়ক; পর মুহূর্তেই আবার সাগরের মত তাহারা বিক্ষুব্ধতর হইতে হইতে নিখিলপ্লাবী ঝঞ্ঝাঝটিকা উৎপন্ন করিয়া বসে।'

অ্যাডমিরাল আরও বলেন, তিনি রেল-ট্রাম-বাসে চলিবার সময় আসন সিট্ ছাড়িয়া দেন শুধু অতিবৃদ্ধা নারীকে অথবা সুন্দরী তরুণীকে। অনেক সময় আসন ছাড়িয়া দিয়া অপদস্থ হইতে হয়—কারণ কোন কোন আধুনিকা বলেন,—'আপনার চেয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমরা কম পটু নই।'

আধুনিকারা মনে করেন এইভাবে আসন ছাড়িয়া দিয়া নারীদের অপটুতা অথবা অসমকক্ষতা প্রমাণ করিতেই চাহে পুরুষগণ—সুতরাং সেই সুযোগ পুরুষদের দেওয়া উচিত নয়।

*　　*　　*

কম্যাণ্ডার আর টি বাওয়ার (ইয়র্কশায়ার, ক্লিভল্যাণ্ড-য়ের পার্লামেণ্ট সদস্য) আধুনিক তরুণীদের রাজনীতি ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। সভায় বলেন—আধুনিকাদের দ্বারা শোভাযাত্রা করিয়া জার্মান রাজদূতাবাসের সম্মুখে পাঠান হউক। তাহারা গিয়া চীৎকার করিতে থাকুক—'আমরা হ্যানোভার চাই।' আমাদেরও অন্তত কিছু একটা চাহিবার সময় আসিয়াছে।

এ বিষয়ে নজির পাওয়া গিয়াছে ফরাসী দেশ হইতে। ওখানকার ছাত্র-ছাত্রী পতাকা প্রভৃতি লইয়া প্যারিসে শোভাযাত্রা করিয়াছে—তাহাদের দাবী ছিল—আমরা জিব্রাল্টার চাই—আমরা ভেনিস্ চাই।

পরস্পর সাহায্যের প্রস্তাব

দুইটি পুষ্করিণীর মালিক এক ভদ্রলোক নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছে হার্টফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত ব্রাফিং পল্লী জেলা কাউন্সিলে ঃ—

আমার দুইটি পুকুরের একটির জল অন্যটিতে আনয়ন করিতে চাহি, কিন্তু উহার জন্য কোনও ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহি। যদি আপনাদের 'ফায়ার ব্রিগেড' মহলা দিবার সুযোগের জন্য এই কার্যটি করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহাদের পানের জন্য যে 'বীয়ার' আবশ্যক তাহা 'ফ্রি' দিব। প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নারীর বিরুদ্ধে ফুসলাইবার অভিযোগ

চল্লিশ বৎসর বয়স্কা কোনও অভিজাত মহিলার বিরুদ্ধে একটি কৃষক এই মর্মে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে আদালতে যে, কৃষকের ১৫ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নাকি ঐ মহিলা ফুসলাইয়া লইয়া গিয়াছে। তুরস্ক রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্-বুলে এই মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, ঐ মহিলাটি একদিন খেলা দেখিতে যায়—তখন উক্ত যুবককে খেলিতে দেখে এবং শোনা যায় সেই মুহূর্তেই মহিলাটি যুবকের প্রেমে মুগ্ধ হয়। যুবক একজন নিপুণ 'এথলীট' এবং তাহার দেহ সুগঠিত ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত। কৃষক বলে, ঐ দিবস হইতে মহিলাটি সকাল দুপুর সন্ধ্যা—প্রতিদিন এই তিন বেলা তাহার পুত্রের পিছনে লাগিয়াই থাকে। এবং মহিলাটির সহিত পলাতক হইয়া ইস্তানবুলে যাইতে অনুরোধ করে। অবশেষে একদিন যুবকটি মহিলার পরামর্শে রাজি হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ ঐ যুবক ও মহিলাটিকে ইস্তানবুলে একত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

পহেলা নম্বর ডানপিটে যুবক

সারাবিশ্বের পহেলা নম্বর 'গেট-ক্র্যাশার' অর্থাৎ ডানপিটে বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কালিফোর্ণিয়া হইতে সমাগত তরুণ—নাম তাহার ডেভিড্ ওয়াইন্।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পুত্র সে। অধ্যাপক প্রাণ হারাইয়াছিল য়্যামাজন নদীর উজান বাহিয়া অভিযান করিবার কালে। পিতার বিপদসঙ্কুল অভিযান-স্পৃহা পুত্রে বর্তিয়াছে। সে পণ করিয়াছে দুনিয়ার সকল দেশেই সে ঢু' মারিবে অভিনব পন্থায়। অন্য সকলে যেভাবে দেশভ্রমণ করে, সেই গতানুগতিক প্রথা সে সযত্নে পরিহার করিবে। এবং অদ্যাবধি সে তাহার পণ রক্ষা করিয়াছে।

বার বৎসর বয়সে সে কাহাকেও না জানাইয়া গৃহ ত্যাগ করে। ইউরোপগামী এক জাহাজে সে মালপত্রের সঙ্গে লুকাইয়া প্রবেশ লাভ করে। বিনা পাস্‌পোর্টে এবং বিনা টিকিটে সে জার্মানীতে ঢুকিয়া পড়ে। তথা হইতে চতুর কৌশলে মস্কো পর্যন্ত পেঁৗছায়। আন্তর্জাতিক রেলপথের ট্রেনসমূহে সে 'ব্যাগেজ'স্বরূপে বাহির হইয়াছে। মস্কো হইতে পারস্য, আফ্‌গানিস্থান, ভারতবর্ষ—সকল দেশেই সে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ করিয়াছে। এমন কি মহাত্মা গান্ধীর সহিতও সে আলাপ পরিচয় করিয়াছে।

এখন সে তাহার রহস্যজনক অভিযানের ইতিহাস লিখিতেছে। একদল বে-আইনী মাল রপ্তানিকারক পদব্রজে ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী দলের সহিত সে রহিয়াছে। এই দল য়্যাম্‌স্‌ডাম হইতে কতকগুলি বোরখা-আবৃত নারীকে হুর্কী-তে আনয়ন করিয়াছে। ইংলণ্ডে কোনও ব্রিটিশ মন্ত্রীর আত্মীয়ের নিকট অনেক কথা সে বলিয়াছে।

"আমি সকল সময়েই অপরের অনুসৃত পন্থা বর্জন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। মন্ত্রীর ঐ আত্মীয়ের সহিত টোকিওতে আমার দেখা হয়। তাহার সাহায্যে চেল্‌সিতে একটি অস্থায়ী চাকুরী পাই। পরে আমি ভ্রমণে বাহির হই—এইবার পদব্রজে। আমার বিশ্বাস আমি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালের পদব্রজে পর্যটক।"

বার্নার্ড শ'-য়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই যুবক নিতান্তই ডানপিটেপনার সাহায্য লয়। সে বলে—

'আমি দেখা করিতে গেলাম। মিঃ শ'য়ের মহিলা সেক্রেটারী ভদ্রভাবেই আমায় ফিরাইয়া দিল। কিন্তু আমি সহসা তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মিঃ শ'য়ের সম্মুখে এক চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া সেই মনীষীর কাছে বিদায় লইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি মিঃ শ আমার হাতে একখানি পাঁচ পাউণ্ডের নোট্ গুঁজিয়া দিয়াছেন।'

ওয়াইন্ এখন সাহারা মরুভূমি পরিদর্শন করিতে বদ্ধ-পরিকর। ইহার পর, সকল পর্যটক যেখানে যায়—সেই টিম্‌বাকটু পর্যন্ত সে যাইবে। তৎপর সে 'গোল্ড কোষ্ট' তীর ধরিয়া আফ্রিকা ভ্রমণ সমাধা করিবে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি তাহার হইল বিনামাশুলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জাহাজ 'কুইন মেরী'তে চড়িয়া দীর্ঘ জলপথ ভ্রমণ।

অভিযান

সমর ঘোষ

রক্তিম আলো আকাশ ঘেরিয়া জাগে
শীতের ধূসর কুয়াশা ধোঁয়ার বুকে;
শহরের বুকে হাসির ঝলক লাগে
ঘুম-ভাঙ্গা ছোট মেয়েদের কৌতুকে!

কাদা ধুলো আর কয়লার অভিযান,
মানুষের ভীড়, আর্থিক চপলতা,
সহসা পেয়েছে এ আলোকে নব-প্রাণ
—ভাঙ্গা দেয়ালেতে ফুটেছে আলোক-লতা!

গান গায় মন চঞ্চল ফুটপাতে,
পাথরের ফাঁকে ফুটেছে সবুজ ঘাস:
আজকের ভোরে আলোকের সংঘাতে
শহরের বুকে জেগেছে প্রাণোচ্ছ্বাস!

ধনিকের যতো মেশিনের জয় গেয়ে,
ভীরু মন আজ কাটাবে না সারাদিন;
মেশিনের মতো দুর্দম বেগ পেয়ে
শক্তিমান সে রবে না, অন্তরীণ!

প্রান্তরে পথে পথিকের পাদক্ষেপ
রাখে তার লাল পতাকায় অভিযোগ
সত্যের নামে মিথ্যার অনুলেপ
বিয়োগ এনেছে বাতিল করে সে যোগ।

শতাব্দী আজ মুক্তির কামনায়,
ঘরের দেয়ালে ফেলেছে মাটির'পর;
নব আলোকের প্রচণ্ড বন্যায়
প্রান্তর, ঘর মিলেছে পরস্পর!

মানুষের তাই অভিযান সুরু হ'ল:
ধাতু মানুষের—মানুষ ধাতুর নয়—
বণিক বুদ্ধি—ধাতুতে মানুষ ম'ল—
ধাতুরা আজকে গাবে মানুষের জয়।

রক্তিম আলো—রক্তিমতর হোক্,
সবুজ ঘাসের সজীবতা দিয়ে আজ;
মানুষের মন রক্তপতাকা হোক্,
নব শহরের হোক না সুরু সে কাজ!

বিদ্রোহী রামলাল

(গল্প)

শ্রীসুকৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নারায়ণীর সংসারের এখন কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অর্থাৎ সেই বার তের বছরের মাতৃহীন দেবর রামলাল এখন আর তেমন ছোটটি নাই। শৈশবেও সে রামলালকে 'রাম' বলিয়া ডাকিতে নারায়ণীর লজ্জা করে বলিয়া আজ ক'বছর হইতে ঠাকুর-পো বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে। ছোট বেলায় যে রামলালের দৌরাত্ম্যের ভয়ে প্রতিবেশীরা সদা সর্বদা তটস্থ থাকিত, আজ তাহাদের সে উৎকণ্ঠা আর ততটা নাই। কাজেরও তার অন্ত নাই। দিনান্তে তাহার একবার সাক্ষাৎ পাওয়াও কঠিন দেখিয়া নারায়ণীর মা দীগম্বরী মনে মনে চিন্তা করেন,—যে ছেলেকে নারায়ণীর চোখের আড়াল হইতে কোন দিন তিনি দেখেন নাই, আজ সেই রামলাল সারাদিন কোথায় থাকে, কি করে, খায় কি না খায়—নারায়ণী তার কোন খোঁজই রাখে না। যদিও দীগম্বরী পূর্বাপেক্ষা এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জামাতা শ্যামলালের মাথার সামনের চুলে পাক ধরিতে সুরু করিয়াছে। সেই পরিমাণে কিছুটা গম্ভীরও হইয়া পড়িয়াছে। কাছারির চাকুরী বজায় রাখিয়া জমি-জমার তদারক করিয়া ফিরিতে প্রত্যহই তার সারাদিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া যাইত, সে কথা নিজেও বুঝিতে পারিত না। কাজেই, সংসারের কোথায় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার প্রয়োজন মনে করিত না। সবাই নিশ্চিন্ত থাকিলেও এই দীগম্বরী কখনও নির্ভাবনায় পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। নাতি যদুলালের বাপ্পাত ভাবী ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া নিজে শিহরিয়া উঠিতেন এবং রামলালের প্রতি নারায়ণীর মাতৃ-সুলভ-স্নেহ-মমতাকে 'আদিখ্যেতার' পর্যায়ে ফেলিয়া অন্তত একবার করিয়াও জামাই ও মেয়েকে সাবধান করিয়া দিতেন।........

সেই অনেকদিন আগেকার নীলমণি সরকার সেদিন পুনরায় দোর গোড়ায় আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, বৌমা!

বেলা তখন অপরাহ্ন। দীগম্বরীর দাঁতের গোড়াটা অমাবস্যার রাত্রি হইতে সেই যে কন্ কন্ করিতে সুরু করিয়াছে, তার যাতনায় দীগম্বরী কাল হইতে শয্যা লইয়াছেন। নীলমণি সরকারকে ডাকিয়া দিবার জন্য নারায়ণী রামলালকে রাজী করিয়াছিলেন।

নারায়ণী সবেমাত্র রান্নাঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া ফিরিতেছিল, সম্মুখে ডাক্তারকে দেখিয়া মাথার আঁচল কিঞ্চিৎ টানিয়া নিয়া নেত্য ঝিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, নেত্য বটঠাকুরকে বসতে মাদুর পেতে দে।

নেত্য মাদুর পাতিয়া দিলে নীলমণি উঠিয়া বসিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নারায়ণীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দেওরটি কোথা গেল,মা? নারায়ণী সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিলেন, কি জানি। সকালে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। নীলমণি পিতলের চশমা মুছিতে মুছিতে কহিলেন, আজকাল তোমার দেওরের কাজের অন্ত নেই। না, মা? তার কত কাজ! পুকুর-ডোবা পরিষ্কার করা। কোথায় কার কলেরা হয়েছে তার সেবা করা।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দরদ ভরে কহিলেন, ও সব অসুখ বিসুখ ঘাটাঘাটি করা কি ভাল?

অবশ্য ও সব করা ভাল। তবে কি জান মা, মুচি মেথর, ডোম এরা ছোটলোক, এদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করাটা ঠিক নয়। তাতে নিজেদের মান সম্মান থাকে না। তারপর শুনছি, আমি ভাল ওষুধ দিতে পারিনে বলে, গ্রাম থেকে চাঁদা উঠিয়ে মস্ত বড় ডিস্‌পেন্‌সারি করাচ্ছে। কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবে। শুনছ মা তোমার দেওরের কথা।

নারায়ণী তেমনি মৌনই রহিল।

নীলমণি কহিলেন, তাছাড়া একটা কথা শুনেছি, মুচি মেথর এদের নিয়ে জমিদারের বিপক্ষে সভা-সমিতি করছে। সমাজে যখন বাস করতে হবে, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস করা চলে মা? তুমি একটু বুঝিয়ে বল বৌমা।

নারায়ণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,'বলব। কারু কথা ত শোনে না।

নীলমণি সোৎসাহে কহিলেন, এই জন্যেই ত তোমায় বলা। সেদিন হঠাৎ একটি ছেলেকে এনে হাজির দু'টাকা চাঁদা দিতে হবে। বললাম, দু'টাকা কোথা পাব? জানই ত মা, আমরা হলাম হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। মুখে আমরা যত বড়াই করিনে কেন আমাদের ওজন খুবই কম। পয়সা দিয়ে কজনই বা আমাদের ওষুধ খায়! বললাম পারব না। তাতে কি উত্তর দিল জান বৌমা? বললে তবে আপনার দক্ষিণের খাতে যা বাঁশ আছে বেচে নেব। শোন কথা। না দিয়ে কি করি বল মা! যমকে নীলমণি সরকার ভয় করে না। কিন্তু তোমার দেওরকে যে না ভয় করে পারা যায় না। যা তার স্যাঙ্গোপাঙ্গ ওদের মুখেও যা কাজেই তাই।

লজ্জায় নারায়ণী এতটুকু হইয়া গেল। যথাসম্ভব সসঙ্কোচে বলিল, মার দাঁতের গোড়াটা.—

নীলমণি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কহিলেন, তবে যে তোমার দেওর বললে তোমার!—

নারায়ণী হাসিয়া কহিলেন, আমার নাম না করলে আবার যেত বুঝি?

নীলমণি কাগজে মোড়ক বাঁধিতে বাঁধিতে কহিলেন, তাই ত বলি মা, তোমার অসুখ, অথচ, তোমার দেওর বলে কি জান? বলে, এমন ওষুধ দেবেন যাতে রুগী সন্ধ্যের আগেই মারা যায়। শুনেছ কথা বৌমা, আমরা গরীব মানুষ—তাই বলে একটা মানুষকে মেরে ফেলি কি করে বলত? ডাক্তারী করতে এসে কি ফাঁসি কাঠে চড়ব!

বলিয়াই নীলমণি নারায়ণীর পানে চাহিলেন। দীগম্বরী পাশের ঘরে শুইয়াছিলেন। বোধ করি কথাটা তার কানে পৌঁছিয়াছিল। দীগম্বরী শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন, আমি তোদের পথের কণ্টক হয়েছি নারায়ণী! হুঁ! এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়াই কড়িকাঠের পানে চাহিয়া নিজের মনে

মনেই আবৃত্তি করিলেন, জম জমাই ভাগনা—তিন নয়কো আপনা!

ওষুধের মোড়কটি নারায়ণীর হাতে দিয়া নীলমণি উঠিলেন। যাইতে যাইতে বড় সত্য কথাটা আজ যেন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কহিলেন, এটাও ঠিক বৌমা যে, তোমার দেওর মানুষের যথার্থ উপকারেই লাগবে। যাদের সহজে কেউ চিনতে পারে না—ঘৃণা কুড়িয়ে মরে, একদিন দেখা যায় আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের মূলে ছিল তাদেরই প্রাণ। তোমার দেওরটি সোজা নয় মা!

অভিযোগ আর নালিশ শুনিয়া শুনিয়া নারায়ণীর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সহসা নীলমণির মুখে এই একটি কথা শুনিয়াই তার হৃদয় যেন কি এক অজানিত আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

পরদিন অনেকখানি বেলা গড়াইয়া গেল। তখনও রামলালকে ফিরিতে না দেখিয়া নারায়ণী নেত্য ঝিকে ডাকিয়া কহিলেন, নেত্য রান্নাঘরের দোরে শিকল টেনে দে। আমি আর উঠতে পারছিনে। মাথার শির ভয়ানক দপ্‌দপ্‌ করছে।

বলিয়া নারায়ণী উপবাসী দেওরের পথ চাহিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর শিরঃপীড়ার যাতনায় ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই রামলাল কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে কহিল, বৌদি, চট্‌ করে দু'খানা লুচি ভেজে দাও ত। সত্যেন না খেয়ে এসেছে।

এবং নেত্যর পানে চাহিয়া কহিল, নেত্য, উনুনে আগুন দে।

নারায়ণী কোন জবাব দিবার আগে দীগম্বরী আড়াল হইতে সুর করিয়া কহিলেন, বাবা, বাড়ীর ঝি চাকরের উপরেও মানুষের মায়া দয়া থাকে, এদের তাও নেই। নারাণী আবার আদিখ্যেতা করে বলে, 'রাম আমার বৌদি বলতে পাগল!'

এই বলিয়া দীগম্বরী ঘরের বাহিরে আসিয়া একবার সত্যেনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলেন, বয়স বোধ করি বাইশ তেইশ। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। উন্নত ললাট। পরণে খদ্দরের জামা কাপড়। নেত্য উনুন ধরাইতেছিল। দীগম্বরী নেত্যকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গুরু-ঠাকুরটি আবার কোথা থেকে জুটলরে নেত্য?

নেত্য জিব কাটিয়া বলিল, অমন কথা বলবেন না দিদিমা। দাদাবাবুর বন্ধু হন্। দেখেন না বাবা ওঁকে কত ভালবাসেন। বাবুর কলকাতায় বাড়ী। মস্ত বড় লোকের ছেলে। আপনাদের বাড়ীতে এসেছেন এ কত ভাগ্যের কথা জানেন।

দীগম্বরী কহিলেন, থাম্ বাপু। তোর আদিখ্যেতা আবার সবার চেয়ে বেশী। বড় লোকের ছেলে হলে বুঝি ঐ চটের মত মোটা কাপড় পরে ঘুরে, না, আমরা বড় লোক দেখিনি? কোথাকার কে জানে।

নেত্য কহিল, লেখা পড়া শেখা মানুষ একালে আর জামা কাপড় পরে সভ্য হয় না দিদিমা। চুপ করুন না, দাদাবাবুর কানে যেন না যায়, হুলুস্থূল বাধিয়ে দেবে।

আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়িলে যেমন হয় ঠিক তেমনি দীগম্বরী দপ্‌ করিয়া উঠিলেন। গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিলেন, দেখিস্‌লো! বাপ্‌রে—তোর দাদাবাবুই বুঝি সব—আমরা যদু বুঝি কেউ-ই নয়। অত ভয় কাকে করব লা?

নেত্য সম্মুখে রামলালকে দেখিয়া বিপদ আসন্ন বুঝিয়া থামিয়া গেল। নেত্যকে উদ্দেশ করিয়া রামলাল কহিল, মাউই মাকে বলে দে নেত্য 'তার বক্তৃতা দিতে হয় অন্য সময় দেন যেন। আপাতত চুপ করুন।

দীগম্বরী গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে বাহিরের সদর দরজার নিকট আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পিছন ফিরিয়া ডাকিলেন সুরো,—

ডাকিবামাত্র সুরধনী উঠিয়া আসিল। দীগম্বরী কহিলেন এই চললাম নেত্য। শ্যাম এলে বলিস্‌ আমি রায়েদের বাড়ী চললাম। যতক্ষণ আমার এ অপমানের বিচার না হয় ততক্ষণ আমি এ বাড়ীর জল স্পর্শ করছি নে।

বলিয়াই কন্যা সুরধনীর হাত ধরিয়া বাঁশবনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলেন। নারায়ণী বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া অন্তরের সমস্ত গ্লানি বিসর্জন দিয়া উনুনের ধারে আসিয়া বসিলেন দেখিয়া সত্যেন সসম্ভ্রমে কহিল, আপনি আবার কেন কষ্ট করে এলেন বৌদি! আপনার নেত্যকে দিয়েই আজ আমাদের কাজ চলত।

নারায়ণী লজ্জিত কণ্ঠে কহিলেন, ছি তা কি হয়। বামুনের ছেলে ভাই! সত্যেন হাসিয়া কহিল, বামুনের ছেলে বলে কি আমার গায়ে লেখা আছে বৌদি? না কারু হাতে খাওয়াটা দোষের? আমাদের কাছে আজ জাতের বিচার নেই। সে অন্ধ সংস্কার মুক্ত এতদিনে হয়েছি। কিন্তু একটা জিনিষকে আজও শ্রদ্ধা করি—সেটা ভালবাসা। কি বলিস রাম?

রামলাল কহিল বামুনের ঘরের সধবা যদি অশ্রদ্ধা করে দেন আর মুচি-মেথরের মেয়ে যদি আদর যত্ন করে দেয়, বোধ হয় বামুনের মেয়ের চেয়ে সইটেই আমাদের আদরের। আমরা প্রেমের কাঙাল। যেখানে ভালবাসা পাব সেখানেই ছুটে যাব। সীমা নেই আমাদের। বুঝেছ বৌদি?

নারায়ণী মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, অনেকের কাছেই তাই শুনেছি বটে যে, তোমরা আজকাল মুচি-মেথরদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করছ। তাদের নিয়ে দিনরাত ওঠা বসা। যা না তাই রোগ ঘাটাঘাটি। যার না তার হাতে খাওয়া—এ সব কি ভাল? জমিদার অন্নদাতা তার সঙ্গে তোমরা না কি জোট পাকিয়ে বিবাদ করছ। তার খামার থেকে সমস্ত ধান তুলে না কি সেদিন ঐ মোছলমান বাগ্দীগুলোকে দিয়ে দিলে। এ সব কি ভাল কথা সত্যেন ঠাকুর-পো?

রামলাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে এত খবর কে দেয় শুনি!

নারায়ণী কহিলেন, শুনছ সত্যেন ঠাকুরপো তোমার বন্ধুর কথা। গাঁয়ে বাস করে গাঁয়ের খবর রাখ্‌বে না—সবাই ত আসে আর বলে—তোমরা এটা করছ—ওটা করছ।

রাম কহিল, তুমি না বললেও আমি বুঝেছি কে বলেছে।

সেই নীলমণি সরকারের কাজ। মানুষের কাছে আবার জাতের বিচার। পাঁচজনের কেড়ে নিয়েই ত জমিদারী। তাকে আবার ভয় কিসের? আমাদের নিয়ে আমাদের উপরেই জুলুম করবেন কেন? আমরা কি পশু? পশু যারা বৌদি তারা নিজেদের অধিকার ভুলে পরের অনুগ্রহের ভরসা করে, মানুষের কাজ তা নয়।

নারায়ণী কহিলেন, রাজা জমিদার, এদের সমস্ত অন্যায়কেও ন্যায় বলেই মাথা পেতে নিতে হয়। সমাজে বাস করতে হলে জাতের বিচার করতে হয়।

রাম কহিল, সে অন্য কেউ পারে। মানুষের অন্যায় অবিচারকে প্রশ্রয় দেবার মত শিক্ষা ত তুমি কোন দিন দেওনি বৌদি যে আজ আমি নতুন পারব।

সতোন তৃপ্ত কণ্ঠে নারায়ণীর পানে চাহিয়া কহিল, আর জাতের কথা যদি বলেন বৌদি তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি। সজ্ঞানে নিজের অহংকারে যে দ্বন্দ্ব নিয়ে মাতি, মরবার পর যখন কাপাসডাঙ্গার বাবলাতলার শ্মশানে আমাকে রাখা হবে, তখন আমাতে আর আপনার ভোলা চাকরটাতে কতখানি পার্থক্য থাকবে বলতে পারেন? জাতের বিচার করেই ত আজ আমরা পঙ্গু। ধর্ম ধর্ম করেই আমরা পুরুষত্ব হারিয়েছি।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিলেন, কি বলছ ঠাকুরপো।

রাম কহিল, সতোন কিছু বাড়িয়ে বলেনি বৌদি। মানুষের ধর্ম মানুষকে বঞ্চনা করে কোন দিন বড় হয়নি। নিজের দেশ, নিজের জাতের সম্মান রাখতে গেলে শুধু অহিংসা কথাটাই মনে রাখলে চলবে না। পাষাণ, অত্যাচারী অহঙ্কারী দস্যুদের মার্জনা করবার মত উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণও ত দেখান নি।

নারায়ণী উনুন হইতে কড়া নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনেছি তোমরা না কি নতুন ডাক্তার কোথা থেকে আনছ। দেশের ডাক্তাররা যে তা হলে না খেয়ে মারা পড়বে।

রাম তাচ্ছিল্য ভরে কহিল, পড়ুক গে। তাতে আমাদের কি! জল মিশিয়ে ওষুধ বেচবার বেলায় নীলমণি সরকার সে কথাটা মনে রাখে না কেন যে, যেমন তার হাতে আমরা তেমনি সেও আমাদের হাতে।

নারায়ণী কহিলেন, তাঁকে বরং বলে ক'য়ে ভাল করে নাও। কেন ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত কুড়ুতে যাবে!

রাম কহিল, সেই ভয় বুঝি তোমাকে দেখিয়ে গেছে। আমি কারু অভিসম্পাতের ভয় করিনে। আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র নই। কি বলিস্ যদু?

যদু এক পাশে বসিয়া আম কাটিতেছিল। জবাব দিল, পাগল হয়েছ কাকা! আমরা কি মেয়েমানুষ না কি যে যা বলবে শুনে যাব।

নারায়ণী ছেলেকে ধমকে দিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিবার পর প্রশ্ন করিল, কিন্তু কারু মৃত্যু কামনা করাও পাপ তা স্বীকার কর ত?

রাম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জবাব দিল, মোটেই না। যারা সংসারের কোন কাজে আসে না অশান্তি বাড়ায়, গোলযোগ ভেদাভেদের সৃষ্টি করে তাদের মরা উচিত।

কিন্তু ধর যদি আমার মা মারা যায় আমি কাকে মা বলে ডাকব?

রাম কহিল, অনেক আছে। কতগুলি তুমি চাও! তুমি মনে কর যাদের মা-বাপ নেই তাদের বুঝি সব গেছে। তা হলে আমার বুঝি কেউ-ই নেই? আমি একা!

নারায়ণীর চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কহিল, তা না হয় হল। কিন্তু নীলমণি ডাক্তারের উপর তোমাদের এ অত্যাচার কেন?

রামলাল বিস্ময়ে নারায়ণীর পানে চাহিল। নারায়ণী গম্ভীর ভাবে কহিল,—অত্যাচার নয় ত কি? তার কাছ থেকে দু' দুটো টাকা জোর করে ভয় দেখিয়ে কেন নিয়েছ? কোথায় সে পাবে?

রামলাল কহিল, দেশের দশজনের ঘরের চালেতে খড় নেই। তার কোঠা বাড়ীর উপরে চারখানা ঘর উঠল কি করে? গরীব কে, গরীব তারাই বৌদি যারা নিতে জানে না। পরের রক্ত শোষণ করতে জানে না তারাই গরীব। নীলমণি সরকার যদি গরীব হত তবে সামান্য ওষুধের দামের জন্য মুজোরুদ্দিনের সব আম টেনে আনত না। গরীবের উপর গরীবের সহানুভূতি থাকে। তার তা নেই।

বলিয়াই দু'জনে উঠিয়া পড়িল।

দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, [illegible] দেয়ে এই ভর দুপুরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

বাহির হইতেই রাম কহিল, আজ আমাদের মিটিং আছে তিনটের সময়। খাজনা না দিতে পারায় জমিদার প্রজাদের বাড়ী-ঘর-দোর কেড়ে নিয়েছেন। ভালয় ভালয় যাতে ফিরিয়ে দেন তার জন্য অনুরোধ করব। তাতেও না হয় অন্য উপায় দেখতে হবে। এই গরমের দিনে তারা কোথায় ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে বলত?

এই অন্য উপায়টি যে কি তাহাও নারায়ণীর অগোচর ছিল না। ভয়ে ভাবনায় তার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, রাম, লক্ষ্মী দাদাটি আমার বটঠাকুরকে যেন কিছু বলিস্ নে ভাই।

সে ভয় তুমি কর না বৌদি। কিছু তাকে বলব না। শুধু এইটুকু তাকে জিজ্ঞেস করব যে, আমরা ত চোরের মত কি জমিদারের মত কেড়ে নিইনি, আমাদেরই গ্রামের ভালমন্দর জন্য হাত পেতে নিয়েছি। তার জন্য আমাদের ভুল বুঝেছেন কেন? তার ভুল ভাঙ্গাতেই হবে। চল্ সতোন তিনটে বাজেরে,—

বলিয়াই রাম হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইলে, নারায়ণী গলায় আঁচল জড়াইয়া গৃহ দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইল, মা ভালয় ভালয় রামকে ফিরিয়ে এন মা, একটু সুমতি হোক ওর।

ইতিমধ্যে দীগম্বরী অবসর মত আসিয়া দোরে খিল দিয়া কখন যে শুইয়া পড়িয়াছেন সে সংবাদ কারু জানা ছিল না।

অন্য দিনকার মত আজিকার বেলাটাও কোথা দিয়া গড়াইয়া শেষ হইল নারায়ণী কাজের ভিড়ে বুঝিতে পারিল না।

মনটা তার পথের উপরেই পড়িয়াছিল। কিছুতেই ঘরে মন তার বসিতেছিল না। নেত্যকে কহিল, নেত্য আমার ডান চোখটা কেন নাচ্ছে বল্ তে নেত্য? নেত্য কহিল, কি জানি মা!

শ্যামলাল যে জমিদারের নিকট কাজ করিতেন, সেই জমিদারের পূর্বপুরুষদের অর্থ সঞ্চয়ের ইতিহাস এমন কলঙ্কজনক যে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই জিহ্বায় আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এতদিনে মানসম্ভ্রম তাদের এক প্রকার চাপা ছিল। আজ ক'দিন ধরিয়া তাঁহাদের অত্যাচারে প্রজারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে। খাজনা বাকী। প্রজারা বলে, ধান হয়নি দেব কি করে?

তারা বলেন, জানিনে। যে করে পার দিতে হবে। আজ তাহাদের মত প্রপীড়িত প্রজাদের লইয়া উদাসীর মাঠে সভা বসিবে। কলকাতা হইতে যে ছেলেটি আসিয়াছে—সত্যেন, সে-ই সভার নেতৃত্ব করিবে। অত বড় মাঠটায় একটি তিল ধারণের জায়গাও ছিল না। চারিপার্শ্বে জমিদারের বরকন্দাজ সিপাহী সত্যেনকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে, কারণ, এই দুইটি ছেলের গায়ে আঁচড় না লাগে। জমিদারের নিষেধ আছে। যে অসামান্য হীনতা মানুষের ভদ্র আচরণের নীচে ঢাকা থাকে, আজ সত্যেন যেটুকু পারিল না, রামলাল সেই শতছিদ্র আবরণ টানিয়া ছিঁড়িয়া সবার সম্মুখে তাহাদের মানব-চরিত্রের সঙ্কীর্ণতাকে বহু বিশেষণ যোগ করিয়া তুলিয়া ধরিল।

জমিদার লজ্জায় অপমানে মরিয়া হইয়া উঠিলেন। শ্যামলালকে ডাকিয়া বিষম অপমান করিয়া চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিয়া দিলেন। আসিবার সময় ঐ উদাসীর মাঠে তার লাঞ্ছিত ভায়ের কথা একবারও ভাবেন নাই। সন্ধ্যার আগেই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, আর যদি সে লক্ষ্মীছাড়াটাকে ঘরে ঢুকতে দাও নারায়ণী, তাহলে তোমাকেও দূর করে দেব।

নারায়ণী বিস্ময়ে যেন কাঠ হইয়া গেল। স্বামীর এমন মূর্তি সে কখনও এতকালের ভিতর দেখে নাই। কহিল, কেন, কি হয়েছে?

তেমনি রুক্ষস্বরেই শ্যামলাল বলিলেন, তার জন্যে বুড়ো বয়সে চাকরি হারাতে হল। আবার জেল-আদালত না করতে হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভোলা চাকরটা আসিয়া খবর দিল, মা, আমি মাঠে গিয়েছিলাম। দাদাবাবুকে আর তার বন্ধুকে পুলিশে মারতে মারতে শহরের দিকে নিয়ে গেল।

এতক্ষণে শ্যামলালের এই আকস্মিক পরিবর্তনের হেতু নারায়ণীর নিকট স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িল। নারায়ণী বুঝিল, স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেখানে প্রবল, প্রাণের টানের সেখানে কোন মূল্যই নাই। সেই মুহূর্তেই তার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। শ্যামলালের পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো রামকে ফিরিয়ে আন। নইলে আমি আর বাঁচব না। এখুনি যাও, যাও,—

দীগম্বরী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিলেন, তোর আদিখ্যেতে দেখে বাঁচিনে নারাণী। দেখছিস কি কেলেঙ্কারীই না করল! না-না তোর গুণের দেওর! তাকে আবার ঘরে আনে, হুঃ!

দূরে বনের পথ অন্ধকারে ঝাপসা হইয়া উঠিতেছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নারায়ণী মা মরা আজন্ম স্নেহে প্রতিপালিত প্রিয়তম দেবরের জন্য ছুটিয়া যেন তাহারই খোঁজে যাইতে চাহিতেছিল। কিন্তু পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সেইখানেই পড়িয়া গেল। কেবল মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে বাহির হইয়া আসিল, রাম ভাই! এমন যে কঠিন শ্যামলাল, তারও দু'চোখ বাহিয়া সেই নিরুদ্দেশ, হতভাগা ছেলে দুটির জন্য অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কালো

শ্রী-শঙ্কর বিশ্বাস

কালো তুমি যতই মোরে বলো,
কালো বলে যতই দূরে ঠেলো,
আমায় তুমি ঠেলতে পার কই?
তোমার চারুকেশের থরে থরে,
তোমার চারুকেশের থরে থরে,
তাহার মাঝে লুকিয়ে আমি রই।

বাঁকা তোমার ভুরু দুটির তলে
কালো দুটি নয়ন যেথা জ্বলে,
আমি সেথায় লুকিয়ে থেকে হাসি।
দিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে এলে,
কালো আমার আঁধার পাখা মেলে,
আমি তোমার মনের মাঝে আসি।

গোয়েন্দার দৃষ্টি

শ্রীবরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী

টিপসহি

অতিপ্রাচীনকাল হইতেই টিপসহি প্রচলিত এবং অপরাধীর সনাক্ত করণে উহা এক মহা অস্ত্র বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমানে উহা যে সনাক্ত করণে সাহায্য করে না কিছুমাত্র এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। তবে সাধারণত অপরাধী আজকাল এতটা সেয়ানা হইয়া পড়িয়াছে যে, কেবল টিপসহি (অর্থাৎ আঙুলের ছাপ) দ্বারা নিঃসংশয় হওয়া যায় না।

খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে চীনে টিপসহি অর্থাৎ আঙুলের ছাপ ব্যবহৃত হইত গুরুত্বপূর্ণ সকল দলিলে। ব্যক্তিবিশেষের মোহরাংকন হিসাবেই ঐ প্রকার আঙুলের ছাপ চলিত ছিল বেশী। আমাদের দেশে যাহারা লিখিতে জানে না—নিজের নামও স্বাক্ষর করিতে পারে না, তাহাদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় এবং অন্য কোনও ব্যক্তি সেই টিপসহিকে সনাক্ত করিয়া স্বাক্ষীরূপে অথবা বকলম নিজ নাম সহি করে। সকল প্রকার দলিলাদিতে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

অতীতে যে আঙুলের ছাপ দেওয়া হইত লিপি বা দলিলাদিতে তাহার সহিত বর্ত্তমান টিপসহির প্রভেদ বিস্তর। পরবর্ত্তী কালে যে দেখা যায় রাজা কর্ত্তৃক কোনও গুরুত্বপূর্ণ দলিলে মোহরাঙ্কন—তাহা কোন মোহরের ছাপই হউক আর অংগুরীয়ের ছাপই হউক শাদা কথায় তাহাকে রাজকীয় মোহর বা পাঞ্জা বলা হইত। এই পাঞ্জা শব্দ হইতেই বুঝিতে পারা যায় সুদূর অতীতে যে ছাপ গ্রহণ করা হইত অথবা ছাপ দেওয়া হইত তাহা শুধু একটি অংগুলির নহে—সমগ্র পাঞ্জা অর্থাৎ হাতের চেটোর। আঙুলগুলির ছাপ ত উঠিতই তৎসহ হাতের চেটোর (কব্জি অবধি) ছাপ তোলা হইত। অন্ততঃ ভারতে ও চীনদেশে যে এককালে এইভাবে পাঞ্জার ছাপ অঙ্কিত হইত ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বুড়ো আঙুলের ছাপ গ্রহণ প্রথা আবিষ্কৃত হয় দুইটি ইংরেজ কর্ত্তৃক ঠিক এক সময়েই; একজন বঙ্গদেশে বাসকালে এই প্রথা প্রথম আবিষ্কার করেন, অপর ব্যক্তি ঠিক সেই সময়েই জাপানের টোকিও শহরে এ[illegible] কাজে লাগাইতে আরম্ভ করেন।

লক্ষ লক্ষ টিপসহি গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু হুবহু একটির অনুরূপ ছাপ অন্য কোনটির হয় নাই। এক ব্যক্তির আঙুলের ছাপের সহিত অন্য ব্যক্তির আঙুলের ছাপ কিছুটা সাদৃশ্য বহন করিলেও একেবারে সর্ব্বপ্রকারে সমতুল্য কখনই হয় না। তবে একটি কথা টিপসহি-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন—তাহা এই যে, সমগ্র পৃথিবীতে ৬৪০০ কোটি প্রকার টিপসহি ছাপের নমুনা হইবার সম্ভাবনা; কারণ তাঁহাদের অভিমত এই যে প্রতিটি বুড়ো আঙুলের ছাপ চারি বিভিন্ন রকমে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাজেই সারা দুনিয়ায় বুড়ো আঙুলের সংখ্যা যত, তাহার চতুর্গুণ হইবে তাহার ছাপের স্বতন্ত্র নমুনা। বিশেষজ্ঞগণ আরও নিরূপণ করিয়াছেন যে, প্রতি ৪৬,৬০,৩৩,৭০০তমটির পর একটি টিপসহি নমুনা পাওয়া যাইবে যাহা পূর্ব্বের অন্য কোনওটির সহিত হুবহু মিলিয়া যাইবে।

আঙুলের ছাপ একেবারে নিখুঁতভাবে তুলিতে পারা যায় কোনও শক্ত অথচ মসৃণ উপাদান-পৃষ্ঠে, যেমন পালিশকরা হাতের কিম্বা পায়ের নখ। ইহা ছাড়া আঙুলের ছাপের সকল সূক্ষ্ম অংশ পরিষ্কাররূপে লক্ষ্য করা যায় বস্ত্রে, ধুলোবালির উপর কিম্বা আঠাবৎ কোনও নরম পদার্থে। অপরাধী সনাক্ত করিবার সহায়করূপে আঙুলের ছাপ নিখুঁতভাবে পোড়া-সিগারেটের পরিত্যক্ত অংশে কদাচিৎ পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় ছাপ কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন প্রকারে ধরিবার হেতু অসংখ্য ছাপ পড়িয়া উহা একেবারে সনাক্ত করিবার সম্ভাবনার অতীতে যাইয়া পৌঁছে।

বিভিন্ন উচ্চতা হইতে পতিত রক্তবিন্দু

অনেক দেশেই অপরাধীর সনাক্ত করিবার ব্যাপারে টিপসহি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। জানালায়, টেবিলে, চেয়ারে হস্ত স্থাপন করিলে যে ছাপ পড়ে, তাহা আজ বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে উদ্ধার করা শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি একই স্থানে বারবার আঙুলের ছাপ পড়ে, তাহা হইতে কোনও একটি সুস্পষ্ট নমুনা পাওয়া সম্ভব নয়। ছোরা, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্রের বাঁটে; গেলাস বাটি প্রভৃতির কানায় (যে ক্ষেত্রে বিষাক্ত পানীয় দ্বারা হত্যা করা হয়); চাবি, কলম, পেনসিলের গায়ে; মৃতের পরিচ্ছদের কোনও অংশে—যে সকল আঙুল-ছাপ পাওয়া যায়, তাহাও উদ্ধার করা সম্ভব। এবং ঐ সকল ছাপ যে মৃতের আঙুলের নহে, তাহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃতের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ; তখন সেই মুষ্টিবদ্ধ হস্ত খোলা দরকার হয়। বেশীর ভাগ স্থলেই মৃতের বদ্ধমুষ্টি এতই দৃঢ় হয় যে, কিছু সময় পর্যন্ত উহা গরম জলে ডুবাইয়া না রাখিলে আঙুলগুলি সোজা করা যায় না বা ছাপ গ্রহণ করা যায় না। আবার কখন কখন এমন দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ থাকে মৃতের হস্ত যে, আঙুলের গোড়ার দিকে অস্ত্রোপচার করিয়া তবে আঙুল সোজা করিতে হয়, গরম জলে শুধু ডুবাইয়া ছাপ গ্রহণের যোগ্য অবস্থায় আনা যায় না।

বর্ত্তমানে অপরাধীরা এমনই সেয়ানা হইয়া পড়িয়াছে যে, উপরোক্ত যে সকল আসবাব বা অস্ত্রশস্ত্রে ছাপের কথা বলা হইল, তাহা তাহারা সতর্কতার সহিতই পরিহার করিয়া চলে। এককালে ইউরোপে লম্বা হেয়ারপিন্ অথবা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ সাহায্যে হত্যার প্রাদুর্ভাব হয় অতিরিক্ত মাত্রায়। সেই সকল স্থলেও আততায়ীর আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা অসম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রকার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করিবার মত সুযোগ অপরাধীরা আর সহজে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যায় না। তাই বিভিন্ন প্রকার চতুর কৌশল গোয়েন্দা বা অনুসন্ধানকারীদের কাজে লাগাইতে হয়। নিম্নে অনুসন্ধানকারীদের লক্ষ্য করিবার কয়েকটি বিষয় বলা হইল, যাহা হইতে অপরাধীর সন্ধানে খেই (clue) পাওয়া যাইতে পারেঃ—

দন্ত-চিহ্ন—অর্দ্ধভুক্ত খাদ্যসামগ্রী যাহা চোরেরা অকুস্থলে অনেক সময় ফেলিয়া যায়, তাহাতে যে কামড়ের দাগ থাকে, বিশেষ করিয়া দাঁতে কাটিবার চিহ্ন যাহা থাকে তাহা হইতে অনেক অপরাধীকে সনাক্ত করা সহজ হইয়াছে। এই জাতীয় অপরাধীদের ভিতর দেখা যায়, তাহাদের দাঁতের ডগা এবড়ো-খেবড়ো; কাজেই সেই প্রকার দাঁতের বিশিষ্ট দাগ অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যায়। রুটি, কেক প্রভৃতিতে ঐ প্রকার কামড়ের দাগ বেশ স্পষ্টভাবেই থাকিয়া যায়।

চুলের অংশ—অনেক সময় দেখা যায় সেয়ানা চোরের কারচুপির কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই—কেবল ছেঁড়া এক গোছা বা কয়েকগাছি চুল ছাড়া। উহা গোঁফ, দাড়ি কিম্বা মাথার চুলের অংশ তাহাও বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিতে পারেন। মেয়েদের চুল কিম্বা বালক-বালিকাদের চুলও নিরূপণ করা যায় উহার সমুস্থ হইতে। মাথার ছাটা চুলের অগ্রভাগ হইলে, তাহা বেশ বুঝা যায় অগ্রভাগের কর্ত্তিত আকার হইতে, স্বাভাবিক দীর্ঘ কেশের অগ্রভাগ থাকে ক্রমশ ছুঁচোলো এবং গোলায়মান—যাহা ছাটা চুলে কখনও থাকিবে না।

পদচিহ্ন, রক্ত-চিহ্ন, যানাদির চক্রচিহ্ন—মাঝে মাঝে অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় তাহার পদচিহ্ন, জুতার চিহ্ন, রক্ত-বিন্দু কিম্বা শকটাদির চাকার চিহ্ন দ্বারা। সেইরূপ স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নানা প্রকার সাফাই প্রমাণের অজুহাত উপস্থিত করে নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য। কিন্তু সেই প্রকার আরোপিত সাফাই অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই টিকে না, কারণ তাহাদের পরিচ্ছদে যে ধূলিকণা লাগিয়া থাকে, তাহার প্রকৃতি অনেক সময় তাহাদের অকুস্থলে উপস্থিতি সপ্রমাণ করিয়া দেয়; আবার অনেক সময় তাহাদের কানে যে ধূলিকণা লাগিয়া থাকে, তাহা হইতেও সনাক্তকরণে সাহায্য পাওয়া যায়।

রুদ্ধদ্বারের কৌশল—অপরাধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সাধারণ জনগণ কখনও কল্পনা করিতে পারে না যে, কোনও কক্ষদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ থাকিলে তাহা হইতে কোনও ব্যক্তির পলায়ন সম্ভব ঐ দ্বার দিয়া। কিন্তু অনুসন্ধানকারী পুলিশ কর্ম্মচারী ইহার বিপরীতই ধারণা করিয়া থাকেন। যে সকল হত্যাকারী সন্দেহ এড়াইবার জন্য মৃতের উপর আত্মহত্যার দায় আরোপ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহারা দুই প্রকারে কক্ষদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া থাকে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যে দোরে যে গা-তালা বা আল্‌তারাব ব্যবহার করা হয়—সেই কৌশলের তালাতেই এই কারসাজি সম্ভব। চাবিটির হাতলে যে ছ্যাঁদা থাকে তাহার ভিতর দিয়া একটা পেনসিল ঢুকাইয়া দেওয়া হয় এবং পেনসিলটির সহিত লম্বা একটা সরু দড়ি বা তার বাঁধা হয়। আস্তে আস্তে দোরের পাল্লা ভেজাইয়া দুই পাল্লার ফাঁক দিয়া দড়ি বা তারটির অসংলগ্ন মাথা বাহিরে আনা হয়। তখন দড়ি ধরিয়া টানিলে পেনসিল সহ চাবিটি ঘুরিয়া যায়; পেনসিলটি মেঝেয় পড়িয়া যায়, জোরে টান দিয়া দড়ি বা তারটি পেনসিল হইতে ছাড়াইয়া আনা যায়, কিন্তু পেনসিলটি মেঝেতে দোর গোড়ায় থাকিয়া যায়। দ্বিতীয় উপায় হইল, ছোট চিম্‌টা বা শন্ ব্যবহার করা, যাহাকে ফরাসী দেশজ কথায় বলে oustili; উহা দ্বারা চাবির যে অগ্রভাগ তালা ভেদ করিয়া বাহিরে সামান্য মাত্র মাথা জাগাইয়া থাকে, সেই অগ্রভাগটিকে ঘুরাইয়া তালাটি বন্ধ করা হয়। এই চিম্‌টা ব্যবহার করিলে চাবিটির অগ্রভাগে দাগ থাকে, সেই দাগ পরীক্ষা করিয়া ডিটেকটিভগণ বলিতে পারে oustili দ্বারা চাবি বাহির হইতে ঘুরান হইয়াছে কিনা।

এই প্রকারে দেখা যায় যদিও আজ ৩৫।৩৬ বৎসর যাবৎ আঙুলের ছাপের সাহায্যেই বহু বহু অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভবিষ্যতেও হইবে, তথাপি দিন দিন অপরাধী ব্যক্তিগণ এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে এবং সকল প্রকার অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে, যাহাতে টিপসহি প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। যখনই উহাদের সন্দেহ হয় যে পদার্থবিশেষে হয়ত আঙুলের ছাপ পড়িয়াছে, তখন সন্দেহ এবং প্রমাণ এড়াইবার জন্য সেই আঙুলে এমন ক্ষতাদি সৃষ্টির কৌশল কাজে লাগায় যে, আঙুলের ছাপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ডিটেক্‌টিভগণ আবার এমনই চতুরতায় নানাপ্রকার অনুসন্ধানের উদ্ভব করে যে, কানের এঁটোলি পর্যন্ত অপরাধীদের সন্ধান করিতে এক অভিনব সহায় হইয়া দাঁড়ায়।

আত্মহত্যার প্রমাণ—যখনই এমন কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, যাহার পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া গুলী দেহপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, তখনই মনে করিতে হইবে উহা আত্মহত্যা নয়—নিশ্চয়ই অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত। আত্মহত্যাকারী সাধারণত কখনই পোষাকাবৃত স্থানে গুলী করে না। তবে কোন কোন স্থলে নারীদের দেখা যায় পরিহিত ফার্ (fur) ভেদ করিয়া গুলী করিতে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে। আর একটি সাধারণ নিয়ম এই, আত্মহত্যাকারী আগে বেশ আরামের অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করিয়া তবে গুলী চালায়। যে পরিস্থিতিতে দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া থাকা নিতান্তই কষ্টকর বা শ্রমসাধ্য তেমন অবস্থায় আত্মহত্যার প্রয়াস খুব কচিৎই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মৃতদেহে কতকগুলি গুলীর চিহ্ন হত্যার দিকেই নির্দ্দেশ দান করে। কিন্তু ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ একটি লোকের আত্মহত্যার রেকর্ড রাখিয়াছে যে পর পর পাঁচবার গুলী করিয়াছিল নিজদেহে।

আত্মহত্যার অতি সাধারণ ও ব্যাপক পন্থা হইয়াছে ফাঁসি দ্বারা। অনেকে মনে করেন আত্মহত্যাকারীর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা

উচ্চতর স্থান হইতে ঝুলিতে না পারিলে অর্থাৎ ঝুলিয়া পড়িলে পা দুইখানি মাটি না স্পর্শ করে, এমন অবস্থা না হইলে ফাঁসি-দ্বারা আত্মবিনাশ করা যায় না। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভুল। পুলিশ জানে সাধারণ খাটের পায়ার সঙ্গেও ফাঁসি দিয়া মরণ অসম্ভব নয় এবং সেই উপায়েও বহু নর-নারী আত্মহত্যা করিয়াছে।

চিকিৎসকের অনুসন্ধান—চিকিৎসকগণ প্রথমত নির্ণয় করেন মৃত্যু সময়। (১) মৃতদেহের তাপমাত্র দ্বারা; (২) Rigor Mortis অর্থাৎ মৃত্যুর পরে মাংসপেশীসমূহের আকুঞ্চনে যে বিশিষ্ট আড়ষ্টতা সম্পাদিত হয়; (৩) মৃত্যুর পরবর্তী শবের বিবর্ণতা; (৪) শবের গলিত অবস্থার তারতম্য বা মাত্রা। ছয় হইতে আট ঘণ্টা মধ্যে শবটি তাহার পারিপার্শ্বিকের তাপে আনীত হয় ক্রমশ নিম্নতর তাপে নামিতে নামিতে। কদাচিৎ এমনও দেখা যায় যে, জ্বর-রোগীর মৃত্যুর পরও দুই কি তিন ঘণ্টা পর্যান্ত রোগের অভ্যন্ত বেগে তাপ বাড়িতে থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল।

মৃত্যুর পরবর্তী যে মাংসপেশীর আকুঞ্চন জনিত আড়ষ্টতা তাহা দুই হইতে ছয় ঘণ্টায় পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই আড়ষ্টতা প্রথমে আরম্ভ হয় মস্তকে, পরে তাহা ক্রমশ নিম্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তার লাভ করে। এই আড়ষ্টতার স্থায়িত্বেরও একটা সীমা আছে; সাধারণত দুই কিম্বা তিন দিন পরে আবার শিথিলতা আসিয়া পড়ে, আড়ষ্টতা বিদূরিত হয়। কখন কখন এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই আড়ষ্টতা পাঁচ দিন পর্যান্ত স্থায়ী হয়। যে সকল ব্যক্তির দেহ বলিষ্ঠ নয় এবং স্বাস্থ্যও জীর্ণ—তাহাদের মৃতদেহে আড়ষ্টতা অতি ক্ষীণই উৎপন্ন হয়।

শবের বিবর্ণতা উৎপাদিত হয় মাধ্যাকর্ষণ-ক্রিয়ায়, কারণ শরীরের সকল অংশের রক্ত নিম্নতম লেভেলে চলিয়া যায়। আবার সেই অবস্থায় শবটির পার্শ্ব পরিবর্তন কিম্বা অন্য প্রকারে নাড়াচাড়া করিলে তাহা টের পাওয়া যায় নূতন অবস্থায় রক্তহীন স্থানের কতকটা অংশ জুড়িয়া যে পুনরায় রক্ত আসিয়া ঠাঁই লয় তাহাতে, যেহেতু বিবর্ণতা দূর হয় না কৃত্রিম প্রবাহের জন্য।

পাকস্থলী হইতে আবার মৃত্যুর সময়ের আভাস মাত্র পাওয়া যায় কারণ খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবার পর ২৪ ঘণ্টা পর্যান্ত জীর্ণ হইবার ক্রিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু শূন্য পাকস্থলী হইতে সাধারণত ইহাই বুঝা যায় যে, শেষ খাদ্য গ্রহণের তিন হইতে ছয় ঘণ্টা পরে মৃত্যু ঘটিয়াছে, যেহেতু কোনও জীবন্ত ব্যক্তি ঐ সময় মধ্যে পাকস্থলী শূন্য করিয়া থাকে।

ডাকে চুরি—ডাকের খামে পোরা চিঠি, নোট দলিলাদি সাধারণত চুরি করা হয় বাষ্পের সাহায্যে খামের ফ্ল্যাপ সিক্ত করিয়া খুলিয়া এবং অভ্যন্তরস্থ জিনিষ সরাইয়া সমান ওজনের অন্য কাগজ পুরিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া। কখনও ভিজান ব্লটিং কাগজ সাহায্যে ফ্ল্যাপ সিক্ত করিয়া খোলা হয়। নেহাৎ যাহারা আনাড়ী তাহারা খোলে পেনসিল অথবা পেন-হোলডারের অগ্রভাগ ফ্ল্যাপের আলগা কোণে ঢুকাইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া। আফিস্-কেরাণী যদি এ কার্যে ব্রতী হয়, তাহারা সাধারণত সেফটি রেজার ব্লেড দ্বারা খোলে এবং পুনরায় গঁদ দিয়া আঁটিয়া দেয়। সে স্থলে চতুর এক ফাঁদ পাতা হয়। যে কেরাণীকে সন্দেহ করা হয়, তাহার আঠার পট্-এ এমন এক জিনিষ মিশ্রিত করা হয়, যাহার ফলে ঐ গঁদে আঁটা চিঠি বলিয়া সনাক্ত করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ডাকের খাম হইতে চুরি সচরাচর বাহিরের লোক দ্বারা বড় একটা হয় না। তাই উহার অনুসন্ধানে গোপনতা বিশেষ প্রয়োজন।

রক্তবিন্দু—রক্তবিন্দুর প্রকৃতি হইতে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়—যেমন, উহা কত উচ্চ হইতে পতিত হইয়াছে, ঠিক খাড়াভাবে পতিত কি হেলানভাবে, কোনদিক হইতে পতিত (যেমন দেওয়ালের গায়ে বিন্দু); আরও অনেক পরিস্থিতি আছে যাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। এখানে সূক্ষ্ম পর্যাবেক্ষণ এবং রক্তবিন্দুর পতনের সহিত যুক্তি দ্বারা প্রকৃত ব্যাপারের সমন্বয় সাধন—নির্ভর করে অনুসন্ধানকারীর অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার উপর।

অগ্নিকান্ড সমস্যা—অনুসন্ধানকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইল অগ্নি প্রদানকারী অপরাধীর সন্ধান এবং দৈবাৎ অগ্নিকান্ড ও অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নিসংযোগের প্রভেদ নিরূপণ। স্বেচ্ছায় অগ্নি প্রদান করা হইলে তাহার হেতু নির্ণয় এক বিষম ব্যাপার। কত কারণেই ত আগুন লাগাইবার প্রয়াস চলিতে পারে—(১) প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, (২) পূর্ব্বকৃত কোনও অপরাধ লুকাইবার চেষ্টা, (৩) সন্দেহজনক হিসাব বই বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্য, (৪) অচলতি মাল পোড়াইয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়, (৫) ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে, (৬) আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া আপন আয়ত্তে আনিবার জন্য।

স্বহস্তে আগুন লাগাইয়া তাহা নিভাইবার জন্য উদ্যম ও উৎসাহের আতিশয্য প্রদর্শন অতি সাংঘাতিক ব্যাপার—এই সকল ক্ষেত্রে অপরাধীকে সন্ধান করিয়া বাহির করা বড়ই শক্ত কাজ। অনেক সময় দেখা গিয়াছে উন্মাদেরা আগুন লাগায় শুধু মজা দেখিবার জন্য—আগুনের শিখা কেমন সুন্দর লক্ লক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ করে, এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই অর্দ্ধ-উন্মাদেরা আগুন লাগায়।

হিসাবের খাতা পোড়াইবার জন্য যে আগুন লাগান হয়, তাহা ধরিয়া ফেলা কঠিন নয়। কারণ বন্ধ করা মোটা একটা বাঁধান খাতায় সহজে আগুন ধরে না এবং আগুন ধরিলেও একেবারে ভস্মসাৎ প্রায়ই হয় না। অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় হিসাবের খাতার যে পাতা আপত্তিজনক অর্থাৎ যে পাতা কয়টা বিশেষ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে, খাতা খুলিয়া সেই পাতায় আগুন দিবার চেষ্টা হয়। সেই সকল স্থলে উদ্দেশ্য সহজেই ধরা পড়ে।

অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সকল সংবাদ জানা যেমন দরকার কোনও অপরাধীর সন্ধান করিবার বেলা তেমনই দরকার, কোন দৈব-দুর্ঘটনার সহিত স্বেচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় পার্থক্য নির্ণয়ের যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা।

বুড়ো ও বুড়ী

(গল্প)

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

বুড়ো আর বুড়ী, দু'জনের বয়েস যোগ করলে হয়ত দেড় শতাব্দী পার হয়ে যাবে। ভিন্ন ভাবে নিজের নিজের বয়েস জিজ্ঞেস করলে তারা বলতে পারবে না। কোনদিন যে তারা পৃথক্ ছিল, তা আর তাদের মনে পড়ে না। মনে হয় জন্মের পূর্ব্বে থেকেই ওরা একসূত্রে গাঁথা।

স্বামী-স্ত্রী ওদের বলা ভুল, বন্ধু বান্ধবী সম্পর্কটাই তাদের ভেতর ফুটে ওঠে বেশী। তার চেয়েও ভালভাবে বলা যেতে পারে যে ওদের ভেতর কোন সম্পর্কই নেই। ওরা অভিন্ন, পৃথক্ সত্তা তাদের লুপ্ত হয়ে গেছে।

সেদিন সকালের কথা। বৃদ্ধ বসে আছে বারান্দায়। ক'দিন থেকে দৃষ্টি তার ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। দূরের জিনিস আর নজরে পড়ে না। দেয়ালে গা এলিয়ে বৃদ্ধ তাই চোখটা বন্ধ করে আছে।

ছাগলটাকে পাহাড়ের নীচে ওই সমতল জায়গাটায় রেখে আসতে হবে। বৃদ্ধা তাই ছাগলের দড়িটা হাতে করে ধীরে ধীরে নামতে সুরু করে। অকস্মাৎ মাঝপথে বুড়ী থমকে দাঁড়ায়, সমস্ত দেহটা সামান্য একটু কেঁপে ওঠে। পরক্ষণেই নিঃশব্দে বুড়ীর দেহটা লুটিয়ে পড়ে।

বাঁশী বাজিয়ে সে পথে আসছিল বড়ুয়া। বুড়ীকে দেখে বাঁশী গেল থেমে। এগিয়ে বুড়ী কাছে যেতেই শিউরে উঠল।

বুড়ীর মৃতদেহটাকে ঘিরে জটলার অন্ত নেই। কেউ বলে বুড়োকে খবর দেওয়া উচিত। পরক্ষণেই আর একজন তাকে থামিয়ে দেয়, বলে, বুড়ো শুনলে আর বাঁচবে না।

বুড়োর পক্ষে যে এ ধাক্কা সামলান মোটেই সম্ভব নয়, তা জানত সবাই।

দূরে দেখা যায় আসছে সুমুরী। সবাই যেন অকূলে কূল খুঁজে পায়। বুড়ীর বোনের মেয়ে, সুমুরী।

সুমুরী এগিয়ে আসার সাথে সাথেই ভীড়টা খানিক সরে পথ ছেড়ে দেয়। আলোচনা কথাবার্ত্তা থামিয়ে সবাই তাকায় ওর মুখের দিকে।

বুড়ীর নিশ্চল দেহটার পানে তাকিয়ে সুমুরী অকস্মাৎ একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে, বুড়ো আর বাঁচবে না। খবর শুনলেই ও মরে যাবে।

বুড়ীর দেহটা ওরা সৎকারের জন্য নিয়ে গেল। সুমুরীর ওপর ভার পড়ল, বুড়োকে দেখার আর সুযোগ মত কথাটা বলার।

বুড়ো তখন নিঃশব্দে চোখ বুজে বসেছিল। সুমুরীর পায়ের শব্দে ঈষৎ চমকে ওঠে জিজ্ঞাসা করলে ঃ কে ?

গলাটা যতদূর সম্ভব সহজ করে সুমুরী জবাব দিলে ঃ আমি, সুমুরী।

—ও, বুড়ো চোখ না খুলেই বললে।

আহার্য্যের বন্দোবস্ত সুমুরীকেই করতে হবে। ধীর পদক্ষেপে সে ঘরের ভেতরটা ঘুরে এল। বাইরে আসতেই অকস্মাৎ ধরা গলায় বুড়ো ডাকলে ঃ সুমুরী, শোন।

সুমুরীর সারা দেহে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি বুড়ো জানতে পেরেছে ? অপরাধীর মত ধীরে ধীরে সে বুড়োর পাশে এসে দাঁড়াল।

বুড়ো প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে বোস্, এই আমার পাশে। হাত দিয়ে সে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলে।

একটু থেমে গলা নামিয়ে বুড়ো বললে আজ সকাল থেকে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সুমুরী। চোখ দুটো আমার একেবারে গেছে। বুড়ী যদি শোনে ত' দুঃখেই মরে যাবে।

বুড়ো চুপ করলে। সুমুরীর সারা দেহে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে এল।

—একটা কাজ করবি ? উত্তরের প্রতীক্ষা না করে বুড়ো বললে ঃ তোর মাসীকে যদি তোদের ওখানে দিন কয়েকের জন্য নিয়ে যাস্! বেচারী তা হলে আর বুড়ো বয়সে এ দুঃখটা পায় না। আমার জন্য তোর ভাবতে হবে না।

শোবার আগে বুড়ো ডাকে, সুমুরী, শোন্। হ্যাঁরে, বুড়ী কিছু বলে নি ? আসতে চাইল না ?

বুড়ীকে তারা কতটা কষ্ট করে বুঝিয়ে পাঠিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সুমুরী তারই একটা কাল্পনিক গল্প বলে। বুড়ো শুধু বলে ঃ বাহাদুর মেয়ে—

পরের দিন সকালে বুড়ো ঃ সুমুরী, স্বরটা কঠোর।

অজ্ঞাতে সুমুরী চমকে ওঠে।

—কালকে তুই আমাকে মিছে কথা বলেছিস ? বুড়ী নিশ্চয়ই এ বাড়ীতে আছে। রাত্রে আমার ঘরে স্পষ্ট আমি ওর পায়ের শব্দ শুনেছি। আমার গায়ের ওপর কাঁথাটাই বা কে দিছল ?

বিস্ময়াহত সুমুরীর মুখে কথা জোগায় না। পরক্ষণেই চমকে উঠে বলে ঃ না, না, ও তোমার মনের ভুল। বুড়ী নেই, নেই। সে ত' আমাদের ওখানে। থাকলে তার গলার আওয়াজ পেতে না ?

বুড়ো কিছু বলে না। অবসন্নভাবে মাথাটা শুধু এলিয়ে দেয়।

সন্ধ্যায় অকস্মাৎ বুড়ো চঞ্চল হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাকতে সুরু করে, সুমুরী, সুমুরী।

সুমুরী দৌড়ে এগিয়ে আসে। বুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ওরে শীগ্গির বুড়ীকে ডেকে নিয়ে আয়। বুকের ভেতরটা কেমন করছে। যা, শীগ্গির যা।

সুমুরী নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পরক্ষণেই বুড়ো আবার চেঁচিয়ে ওঠে ঃ সুমুরী সুমুরী......

মৃদুস্বরে সুমুরী জবাব দেয় ঃ এই যে আমি।

—হাঁ, যাস নি ত ? ভালই করেছিস। বুড়ীকে খবর দিতে হবে না। শুনতে পেলে মরে যাবে। মরে যাবে......

পাখাটা নিয়ে সুমুরী মাথায় হাওয়া করে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। খানিক পরেই বুড়োর মাথাটা বুকের পরে নেবে আসে। অস্ফুটস্বরে বুড়ীকে উদ্দেশ করে কি বলার চেষ্টা করেই সে নীরব হয়ে গেল। *

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

লেনিনের স্মৃতিমন্দিরে

শ্রীমতী কমলা মুখার্জ্জী, নিউ ইয়র্ক

১৯২১ সালের ৩০শে আগষ্ট। সময় সন্ধ্যা। নবীন রুশিয়ার রাজনৈতিক নেতা বিপ্লবী বীর, লেনিন মস্কো শহরের একটি কারখানার শ্রমজীবী সঙ্ঘে বক্তৃতা দিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ তিনটি গুলীর আঘাতে আহত হ'য়ে পড়েন। আততায়ী একটি যুবতী। নাম ফ্যানিয়া কাপ্‌লান। ইনি সাম্রাজ্যবাদী। লেনিনের বিপ্লবের কাজ তার পক্ষে অসহ্য। তাই লেনিনের প্রাণনাশের প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু নবীন রুশিয়ার পরম সৌভাগ্য যে, তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনটি গুলীর আঘাতেও লেনিনের প্রাণ নষ্ট হল না বটে, কিন্তু তাঁর অনেকটা শক্তি হানি হয়ে গেল। বিদ্রোহের পর বিপ্লব, বিপ্লবের পর দেশ গঠনের গুরুত্ব ভার ও তিনটি গুলীর আঘাত লেনিনের দৈহিক-শক্তিকে অনেকটা শক্তিহীন করে দেয়। এইজন্য এর পর থেকে লেনিন মাঝে মাঝে কাজ করতেন ও মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে গোর্কি নামক একটি ছোট গ্রামে বিশ্রাম করতে যেতেন। শেষে ঐ ছোট গ্রামেই একেবারে চিরদিনের মত বিশ্রাম নিলেন। সে আজ ১৫ বৎসর পূর্বের কথা। ১৯২৪ সালে সকল চিন্তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের হাত থেকে চির-দিনের মত নিজেকে মুক্ত করে বিদায় নিলেন। মস্কোর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গোর্কি গ্রামেই বীর নেতার শেষ-নিশ্বাস পড়ল।

এই শোক-সংবাদ যখন রুশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে গেল, তখন সোভিয়েট কংগ্রেসের সভা বসেছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্যালিনিন্ উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন এবং এই শোক-সংবাদ মুখে বলবার আগেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্‌লেন। পুরাতন ও প্রিয়তম বন্ধু ও দেশের নেতা কমরেড লেনিন আর ইহজগতে নাই, এই হৃদয়বিদারক সংবাদ যেন এই বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে একটা বিরাট শোকের ঢেউ তুলে দিল। নেতারা ও ডেলিগেটেরা ক্ষুদ্র শিশুর মতই প্রাণখুলে মৃতাত্মা কমরেডের জন্য কাঁদিলেন। তাঁদের সমবেত ক্রন্দন একটি বিরাট হাহাকারে পরিণত হল। এই শোক-সংবাদ যখন সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, তখন রুশিয়ার নরনারী সকল শ্রেণীর নেতা ও কর্মী, পণ্ডিত ও মূর্খ গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। রুশিয়ার ইতিহাসে তাই ২১শে জানুয়ারীকে জাতীয় শোক-দিবসে পরিণত করা হয়েছে।

লেনিনের শবদেহ রাজধানী মস্কো নগরে আনা হল। রেলওয়ে ষ্টেসনে ট্রেন থাম্‌লে প্রেসিডেণ্ট ক্যালিনিন এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কমরেড নেতারা কফিনে সুশায়িত শবদেহ কাঁধে ব'য়ে দীর্ঘ ৪ মাইল ব্যাপী মস্কো নগরে শোক-যাত্রা করেন। প্রতি বছরের এ সময়ে রুশিয়াতে বরাবরই বড় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। সে সময়ে মস্কোতে অত্যধিক শীত। থার্মোমিটারের পারদ নামতে নামেত শূন্য ডিগ্রীর নীচেও ৩৫ ডিগ্রীতে নেমেছে। তাছাড়া উত্তর মেরুর ঘূর্ণিবায়ুর দুরন্ত প্রকোপ [illegible] লোকে এমন নিদারুণ শীতেও তাদের অতি প্রিয় নেতা লেনিনকে শেষ-শ্রদ্ধা দেখাতে একটুও বিচলিত হয় নাই। এই শোক শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন, লেনিনের শোকাতুরা সদ্য-বিধবা সহধর্ম্মিণী—যিনি লেনিনের মতই সকল রকম বিপদ-আপদের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিতে ভোলেন নাই। স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও কমরেড হয়ে উনি বহু দুঃখ-কষ্ট ও নির্বাসন দণ্ড বরণ করে নিয়েছিলেন।

সবার চেয়ে শোকাচ্ছন্ন অথচ সবার চেয়ে দৃঢ় এই নারী এই দারুণ শীতে ৪ মাইল পদব্রজে যেয়ে তাঁর প্রিয়তমের শেষ-কাজ সম্পন্ন করলেন। দেশের লোক ও দর্শকগণ তাঁর মনের এই রকম দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হল—শ্রদ্ধা ভক্তিতে মাথা নত করল। বীর-নেতা লেনিনের প্রতি জাতির এই যে গভীর প্রেম ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ইহা সচরাচর দেখা যায় না। লক্ষ লক্ষ নরনারী মস্কো নগরের বরফে আচ্ছাদিত পিচ্ছিল রাস্তার উপর দিয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে ক্ষণকালের জন্য একবার চোখের দেখা দেখে ও আর্দ্র চোখে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। তারপর সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কেটে গেছে—কিন্তু বীর-নেতা লেনিনের প্রতি জাতির যে গভীর প্রেম, তা আজও কমেনি। তাই লেনিনের স্মৃতি-মন্দিরে রুশিয়ার নরনারী কি শীতে, কি গ্রীষ্মে সর্বদাই ভক্তি নিবেদন করতে সার দিয়ে দাঁড়ায়।

লেনিনের শবদেহ প্রতীচ্যের সাধারণ নিয়মে মাটিতে পুঁতে কবর দেওয়া হয় নাই। তার কারণ রুশিয়ার লোক যতদিন পর্যন্ত লেনিনকে রাখতে পারা সম্ভব, তার চেষ্টা করেছে। যদিও দেহে প্রাণ নাই, তবু ঐ দেহের মায়া তারা একেবারে ত্যাগ করতে চায় নাই। তাই একটি কাচের 'কফিনে' অতি সুন্দর সজ্জায় সুসজ্জিত মৃত দেহটিকে রক্ষা করা হয়েছে। পাথর বা মার্বেল, রূপা বা সোনার প্রতি-মূর্ত্তি করা অসম্ভব হত না কিন্তু রুশিয়ানেরা বলে যে, প্রতি-মূর্ত্তি বাস্তব হবে না। তার চেয়ে বেশী বাস্তব ঐ প্রাণহীন দেহ। এই প্রাণহীন দেহটিকে রক্ষার জন্য যে স্মৃতি-মন্দির তৈরী হয়েছে, তা [illegible]। মন্দিরটি কালো ও লাল গ্রেনাইট পাথরে তৈরী, অতি আধুনিক এবং অতি সুন্দর। দিন রাত্রি, রুশিয়ার দুইটি লাল সৈনিক এখানে সর্বদাই পাহারায় থাকে। সমস্ত দিন যতক্ষণ না আঁধার হয়ে আসে, দর্শকের ভীড় লেগেই আছে। তারা চায়, একবার দর্শন করতে ও নিঃশব্দে অন্তরের ভালবাসা জানাতে।

মানুষ তার অতীত অনেকটা মনে রাখতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। যে কজন কমরেড নেতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু লেনিনের শবদেহ কাঁধে ব'য়ে শোকসভায় ও পরে স্মৃতি-মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, বর্তমানে তাঁদের [illegible] আর সকলেই ইহলীলা শেষ করেছেন। ইঁহাদের [illegible] স্বাভাবিক নিয়মে হয় নাই। [illegible] অনেকে

দোষী সাব্যস্ত হয় ও পরে গুলীর আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়!

রুশিয়ার নরনারী লেনিনকে অতি উচ্চে আসন দিয়ে থাকে। ইহাদের ধারণা যে, লেনিন জীবিত থাকলে এই সব মেধাবী লোকগুলি কখনই এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারত না। পৃথিবীর ইতিহাসে লেনিনকে সর্ব-যুগের সর্ব-শ্রেষ্ঠ অবতার প্রমাণ করা হবে, কি জগতের একটি মহাভুলের জন্য দায়ী করা হবে, তা কেবল সময় ও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক বলতে পারবে।

বর্তমানে রুশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি, লেনিনিষ্ট বা ষ্ট্যালিনিষ্ট পার্টি বা লেনিন-ষ্ট্যালিন পার্টি নামেই পরিচিত। কারণ, বিগত কয়েক বৎসরে কমিউনিষ্ট পার্টির অনেকগুলি নেতা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গোপনে যে প্ররোচনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, তাতে কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরব-হানি অনেকখানিই হয়েছে। বর্তমানে রুশিয়াতে কমিউনিষ্ট মতবাদকে "Marxism Leninism" বলা হয় এবং ষ্ট্যালিনকেই ইহারা এই "ধর্মের" যোগ্য পুরোহিত বলে মনে করে। বর্তমানে ষ্ট্যালিনই রুশিয়ার একমাত্র যোগ্য নেতা, যিনি মার্কস-এর বিশাল স্বপ্নকে যোগ্যতার সঙ্গে কার্যে পরিণত করতে পারেন। "Creative Marxism" মানেই লেনিন ও ষ্ট্যালিন। রুশিয়ার বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি এর জলন্ত আদর্শ।

ঋতু রঙ্গ

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ বি-টি

ছয় ঋতু মানুষের মনে।
—মন নিয়ে ঋতুর সে রঙ্গ মনোহর
চলে নিরন্তর।
প্রথম কৈশোর যবে মনে আসে নামি,
পুষ্পিত হিয়ার ভারে, উচ্ছ্বসিত মন,
নব কিসলয়-শোভা, নবীন গৌরবে
সর্বাঙ্গে উল্লাস উঠে:
কণ্ঠে ফুটে ভ্রমর-গুঞ্জন!—
—মধু-ঋতু তখনি মনের।
যৌবন ঘনায়ে আসে। যৌবন মিলায়ে যায় ক্রমে,
নামে শিরে গুরুভার: সংসারের নিদাঘ ঝটিকা
শিরে বহে রাত্রি দিন;
ধূসর কঙ্কর-পথে পিপাসিত ছুটি দিশাহারা
অবসন্ন শ্রান্ততনু:
ছিন্ন আশা, শতছিন্ন কৈশোর কল্পনা,—
—তখনি মনের গ্রীষ্ম-ঋতু।
নিবিড় কুন্তল সম দেখা দেয় মেঘ
দিক্ চক্রবালে।
বর্ষণের আয়োজন ঘন হ'য়ে আসে।
ঝর ঝর নামে ধারা,
দর দর আঁখি ধারা বহে,
বিরহ-ব্যথার ভারে অবনত মন,
বেদনা সে অনির্বচনীয়।
অতীত স্মৃতিরে টানি নির্জনে জাল বুনে চলা,
—মনের বরষা অশ্রুজলে।
ক্ষুদ্র গৃহখানি ভরে পুত্র-পরিজনে।
শান্ত গৃহশ্রীর শোভা গৃহের অঙ্গনে।

বরষণ-ক্লান্ত মেঘ লঘুপক্ষে ভাসি যায় নভে।
দীপ্ত রৌদ্রে চাহি' রহে মন
নিশ্চিন্ত পুলকে।
—মনের শরৎ ঋতু।
শ্রমের মর্যাদা রহে
শ্রম যবে পায় পুরস্কার।
কাটি লয় ফল তার শ্রমিক মানুষ।
আশা-বৃক্ষে ধরে ফল,
অকালে ঝরিয়া পড়ে কতগুলি তার।
বাকিগুলি কাটি ল'য়ে গর্বিত মানুষ।
—হেমন্তের আয়োজন মনে।
জরা নামে: জর্জরিত দেহ।
জরা নামে মনে।

রূপের মাধুরী নাই, লোলচর্ম করে উপহাস।
ঝ'রে পড়ে একে একে
আত্মীয় স্বজন বন্ধুদল
শীতাগমে শুষ্ক-পত্র সম।
শ্মশানের তীরে বসি মৃত্যুর অমোঘ মন্ত্র
জপ করি' চলা।
মনে নামে কালান্তক শীত।
—মনের চরম মৃত্যু।

চির স্বপনের মায়া

(গল্প)

শ্রীরাধিকা গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট শহরটি, সাগর-তীরে।

গ্রীষ্মে যে জনসমাগমে শহরটি গম্‌গম্‌ কর্‌ত, আজ এই শেষ বর্ষার হৈমন্তিক হাওয়ায় যেন বর্জিত পরিত্যক্ত বুক নিয়ে আকাশ-বাতাসকে পর্যন্ত রিক্ত করে তুলেছে।

এখানে বাস করা যেন পূর্ণ জীবন্ত জীবনের ছোঁয়া থেকে দূরে সরে থাকা। আর ছবি এখানে বেড়াতে এসে গ্রীষ্ম বর্ষা পার করেও এখনও খাপ খাওয়াতে পারে নি নিজেকে এর নিরালা বৈচিত্র্যের সঙ্গে—সে শিখতে পারে নি কি করে এখানকার অধিবাসী বলে বনে যেতে হয়।

তার শান্ত ধীর চিত্তকে সহজে কোন কিছুই অতিষ্ঠ করে তুল্‌তে পারে না; কিন্তু পিসিমার অভিভাবকত্বের অধীনে সে কোন দিন স্বস্তি পায় না, তাই এখানেও তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌তে চায়।

যে কুটীরে তারা বাস করে—পিসিমা ও ছবি, তারই অপরাংশে বাস করে এক দম্পতি তাদের ছোট্ট রুগ্ন মেয়েটিকে নিয়ে। কিন্তু যে সিঁড়ি দিয়ে উভয় পরিবার দোতলায় ওঠে, ছবি যেন তাতে দিনরাত কেবলই ওঠা-নামা করে।.........তার যেন স্বস্তি নেই.........তার যেন অবসন্ন দেহে বিশ্রাম নেবার —পূর্ণ বিরাম নেবার অবকাশ অতি কম, অন্তত এমনই ছবির মনে হয়।

ছবির মা-বাপ তার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছে সেবার ই বি আর ঢাকা মেল-এ আসবার সময় যে 'কলিশন' হয়, আর ছবির মাথায় চোট লাগে, তারপর থেকে। তার জন্যেই এ-সাগরতীরের শহরে তাকে পাঠান হ'ল পিসি-মার সঙ্গে। কিন্তু ছবি জানে, তার ত কিছুই হয় নি, তার মনে যে স্বপন-বাসরের ছোঁয়া তা কেউ বোঝে না—কি বোকা পৃথিবীর লোক-গুলো! বল্‌লেও শুন্‌বে না, মান্‌বে না—দেখালেও দেখ্‌তে চাইবে না। আত্মজনেরাই ছবিকে অস্বস্তি দেয় বেশী অবিশ্বাসের হাসি হেসে।

বুধবারের প্রাতঃকাল পেরিয়ে যাচ্ছে দুপুরের গর্ভে বিলীন হতে। এগারটা বাজল। ছবি তিনটে কেমিসোল আর একটা শেমিজ কেচে ধব্‌ধবে করেছে, তারপর পিসি-মার ব্লাউজটার বোতাম দুটো সেলাই করে দিয়েছে, তারপর লিখেছে চিঠি মা'র কাছে, ছোট ভাইটির নামে পাঠিয়েছে একটা ছবিওল পোষ্টকার্ড.........তারপর কাকে যেন চিঠির জবাব দিতে হবে সে কথা..........অর্থাৎ তার নামটি কিছুতে মাথায় আন্‌তে পারছে না, অথচ সে জবাবের কথা মনে হতেই ছবি লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়—বুকটা তার ঢিব্‌ ঢিব্‌ কর্‌তে থাকে, কেউ বুঝি জেনে ফেল্‌লো সে বুকে আঁকড়ে ধরা মরম-কথাটি! নাঃ—নামটা যখন মনে আসে না,—না!—আর তার করবার কিছু নেই।

লিখ্‌বার প্যাড্‌টা তুলে গুছিয়ে ঠিক জায়গামত রেখে ছবি জানালার ধারে গেল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বাইরে—বৃষ্টি ত থামে নি, কুয়াশার ঝিল্‌মিলির মত অতি হাল্‌কা ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি। পিসি-মার বেয়াড়া বেরালটা আবার এয়েছে। দিলে আস্তে করে তার লেজটা মাড়িয়ে, বেরালটা করুণ ক্রন্দনে পালালো।

নিমেষে, বৃষ্টি না থামলেও, কুয়াশার ভাব কেটে কেমন একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠ্‌লো চারপাশে—সিক্ত ঝোপগুলোতে তার রঙিন পরশ—বাগানের রাস্তায় রাস্তায় তার উজলকরা চমক। ঘরে বসে থাক্‌তে ছবির মন চাইলে না, এখনি হয়ত পিসি-মা এসে আবার 'এটা কর' 'ওটা কর' বলে রাজ্যের যত কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। ছবি ত জানে না ডাক্তারের ও-আদেশ, খালি খালি তাকে বসে থাক্‌তে দেওয়া হবে না এক নিমেষ। না, ছবি ঘরে পচে মর্‌বে না—বাইরে যখন এমন আলো—মধুর প্রাণ-উদাস করা ঘোলাটে আলো।

দীর্ঘশ্বাস একটা আপনি বেরিয়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে ছবি জানালার ধার থেকে এসে রেন্‌কোটটা পাড়লে আলনার উপর হতে—তারপর গায়ে দিয়ে সব কটা বোতাম এঁটে দিলে একে-বারে থুতুনী অবধি—ছাতাটা নিলে হাতে। বাস, ছবি বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে পড়লো কোন রকম উদ্দেশ্য নিয়ে আদপেই নয়।

তাদের কুটীরের সমুখের রাস্তাটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে সাগরের গায়। দুপাশে বাগানওয়ালা বাড়ীগুলোর সারি, পরিপাটী শাদা ফটকগুলোর পশ্চাতে ফুলবাগানের রামধনু রঙ বাহারের আড়ালে ভিলাগুলি যেন নিদ্রামগ্ন। বাড়ীগুলোর সমগ্র অধিবাসী নিদ্রাবেশে মৃত হয়ে আছে হয়ত; ছবি মাথাও ঘামায় না লোকগুলো সত্য সত্যই মরে আছে কি না! জেলের ছেলেটা একটা শূন্য-ঝুড়ি মাথায় করে হন্‌ হন্‌ করে ছবির পাশ কাটিয়ে চলে যায়, আপন খেয়ালে কি একটা খাদের সুর টেনে। সে একবার তাকালো ছবির পানে, কিন্তু ছবি তাকে দেখ্‌তে পেলে না। ছাতাটার নীচে দিয়ে সিক্ত লবণাক্ত হাওয়া তার কপালে চুলের গুচ্ছে পরশ বুলাতে লাগলো। মিষ্ট স্নিগ্ধ মুখখানি—টিকলো নাক, কুঞ্চিত সংশয়াকুল ঠোঁট দুটি —একটু ঝুঁকেপড়া মোলকুঁজা কণ্ঠভঙ্গীটি—সব মিলিয়ে যেন সৃষ্টি করেছে ভীরু একটি সোনালী ফুল; শির উন্নত করে সূর্যকে মুখোমুখী দেখ্‌তে ভরসা না পেয়ে যেন নত হয়ে আছে।

.........ছবি ভাবে কি সুন্দর। প্রিয় তার আস্‌বে হয়ত পরের মাসেই.........তখন হবে বিয়ে। কিন্তু এরা—বাড়ীর লোকেরা সে কথায় হাসে কেন! অবশ্য প্রিয়কে ছবি চোখে দেখে নি কখনও। তা হোক, চিঠি লিখেছে ত। আর সে হ'ল একান্ত তারই প্রিয়—সে ত তার অন্তরে রয়েছে দিবা-নিশি। বাইরের দেখা না-ই মিল্‌লো, তাতে কি এসে যায়। ছবি কলকাতা আসবার সময় সিল্ক কিনে এনেছে তা দিয়ে নিজের ব্লাউজ করেছে, সুন্দর পাড় জুড়ে একখানা শাড়ী বানিয়েছে। বাকি যা কাপড় ছিল তা দিয়ে তৈরী করে রেখেছে একটা পাঞ্জাবী—বিয়ের সময় সেটি উপহার দেবে স্বামীকে।

পিসি-মাও মাঝে মাঝে বলে, বিয়ে না হলে ছবি শুধরে উঠতে পারবে না।........শুধরে ওঠবার আবার আছে কি এতে। বিশেষ করে বিয়েটা যখন ছবির মতে স্থির হয়েই আছে, তখন সে ত চুকে যাবার সামিল : তাতে আবার কি অদলবদল আনতে পারে কারু মনে-মেজাজে। না, ছবি চায় না কোন পরিবর্তন; প্রিয়র দেখা সে পায় মানস চোখে; না, কোন বিচ্যুতি এ থেকে তার অসহ্য!

আজ আর সাগরতীরে এ সময়ে জন-মানব নেই। গ্রীষ্মের মরশুমের কালে কত লোক থাকতে এ দুপুর বেলাও। ভাটা পড়েছে, জল চলে গেছে দূরে—পেছনে রেখে গেছে মৃত পরাস্ত বালিরাশি একেবারে আর্দ্র! বসবার বেঞ্চিগুলি ভেজা—তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। ছবির কেমন যেন একটা ক্লান্তি আসে। প্রতিদিন সাগরতীরে এলেই একবার সে সমস্তটা বাঁধান চত্বর টহল না দিয়ে যায় না—আর ঐ জাঁকাল প্যারাডাইস্ হোটেলটার দিকেও তাকাতে ভোলে না। ছবির মতে এ হোটেলটাই এ নিরালা শহরটার স্বর্গ কেমন সুন্দর মর্মরের সিঁড়ি, এখানে ওখানে রঙিন ফুলগাছ, চকচক্ করে কাচের বাসন-কোসন, বারান্দায় কৌচগুলি কি আমিরি চালের, জানালায় ঝুলান কেমন দামী দামী পর্দা ঝালর।

এ বর্ষার শেষের অসময়েও এ হোটেলে কত লোক রয়েছে —বড়লোক সব রোগী—রাজারাজড়া, যাদের খেলান আর বেড়ান ছাড়া কজ নেই। কেমন খাসা তকমা আঁটা বেয়ারা-গুলো আনাগোনা করে। বিকেলে-সাঁঝে আবার কি সুন্দর কনসার্ট বাজে নীচেকার ও-ঘরটায়। ...... সত্যই একটা রহস্যে ঢাকা অমরাবতী এ হোটেলটা, অন্তত ছবি তাই ভাবে। আর এমন অমরাবতীর ধার ছুঁয়ে পায়চারি করলেও রহস্যের হাওয়া মুখে ঝাপটা দেয়।

অজ্ঞাতেই ছবির ডান হাত রেনকোটের পকেটে চলে যায়; তারপরে কোলকুঁজো ভাব ঝেড়ে ফেলে মাথা ঠিক সোজা করে, সে তাকায় ও-ঘরটার জানালায়, যেখানে মাঝে মাঝে কনসার্ট বাজে;—অপূর্ব্ব স্বপ্নচারিণীর দৃষ্টি তার চোখে। ডিশ-প্লেট-গ্লাস আরও কত কি ছবির নজরকে ভিড় করে দাঁড়ায়।

সুশোভন, তার খঞ্জ জীবনের একমাত্র আশ্রয় ইজি চেয়ারটার হাতল ধরে একটু উঁচু হ'য়ে তাকায় জানালায়—"সেই তরুণী—সেই কোলকুঁজো তরুণী! এ জলেও।"

"যাচ্ছে না-কি?" জিজ্ঞেস করে অনিমেষ, তার খুড়তুতো ভাই। নিজের চেয়ার ছেড়ে নড়বার কোন লক্ষণ তার দেখা যায় না। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মনে পড়ে, সুশোভনের দেখা শোনা করবার জন্য তাকে এখানে পাঠান হয়েছে। সুশোভনের খোশ-খেয়াল মেনে চলাই তার কর্তব্য। তার হাতের ম্যাগাজিনখানা নামিয়ে রেখে সে তাকায়। হোটেলের কামরায় আবদ্ধ জীবন অনিমেষকে রুদ্ধশ্বাস করে। তার উপর এরি মধ্যে দু-দুবার রীতিমত রাজভোগ তার উদরস্থ, যার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশী দিন নয়। তারপর বৃষ্টির দরুন রুদ্ধ কক্ষ—কেবল সুশোভনের ইজি চেয়ারের পাশের জানালাটি ছাড়া। বিজলী পাখা চলছে, তবু যেন অনিমেষ হাঁফ ফেলতে পারে না।

—হাঁ, শুধু যাচ্ছে নয়, আমাদের এ ঘরটির পানে তাকালো। কি আশ্চর্য, এ জলে-বৃষ্টিতে কোথা যাচ্ছে মেয়েটা?—সুশোভনের কপালের রেখা স্পষ্ট ফুটে ওঠে তিন থাক।

—তাড়াতাড়ি যাচ্ছে না। তা ছাড়া, এক ফোঁটা শহরটায় আবার মেয়েদের যাবার মত জায়গা কোথায়।

সুশোভনের কান দুটি রাঙা হয়ে ওঠে, কেমন একটা সলজ্জ কুণ্ঠা তার কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করে—উদাসীন ভাবেই বলে,—বেশত, শহরটা না হয় নেহাৎই ছোট্ট। কিছু মনে করিস্ নি ভাই, যদি তোর ঘরের ভেতর আটকা থাকতে ভাল না লাগে, যা না একবার বাইরে ঘুরে আয়। আর তোর এখন কলকাতায় ফিরে গেলেই হয়। আমার জন্যে কেউ বন্দীর মত থেকে সজীবতায় বঞ্চিত হয়, এ আমি চাই না।

—আরে থাক। আমি সে রকম ভেবে ও কথা বলিনি।

মনে মনে অনিমেষ বলে, সব চেয়ে অসহ্য সুশোভনের এ সন্দেহের ভাব। সব কথাতেই ও ভাবে ওর জন্যে যে আমার বেগ পেতে হয়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠছি বুঝি।

সুশোভনের বাপ মস্ত বড়লোক। ছেলেকে সে কলকাতার বড় কলেজে পড়াত। ছুটিতে পাঠাত দেশ দেখতে। পয়সার অভাব তার নেই—মস্ত বড় কন্ট্রাক্টর। কিন্তু আজ দু'বছর আগে সিমলা থেকে হাওয়া বদলের শফর সেরে কলকাতা ফিরবার মুখে রেল দুর্ঘটনায় সুশোভনের পা দু'খানি, হাঁটু অবধি যায় কাটা। তারপর থেকে সুশোভনের জীবনে আর স্বস্তি মেলে নি। মা নেই। শিশু বয়সে সে মা হারিয়েছে। বাপের আদরের দুলাল। কিন্তু দুর্ঘটনায় বাপের সকল আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে।

সুশোভন আর অনিমেষ প্রায় একই বয়সের। অনিমেষ সুশোভনের খুড়ার ছেলে। খুড়া এক সময়ে সুশোভনের বাপের ব্যবসারই নিযুক্ত ছিল মাসিক মোটা মাহিনায়। তার মৃত্যুর পর অনিমেষকে সে কাজে বহাল করা হয়েছে, সেও দু'বছরের বেশী হবে না। সুশোভনের বাপের আদেশে তিন মাসের জন্য সে এসেছে এখানে সুশোভনের খঞ্জ জীবনের সঙ্গী হতে। প্রথমটা দেশ ভ্রমণের পুলকে প্রথম সাতটা দিন মোহের মায়ায় কাটলেও এখন সে দেখছে, খঞ্জের সাহচর্যে সেও না খঞ্জ হয়ে যায়। সত্য কথা বলতে কি, সুশোভনই প্রথম দিন বলেছিল, এ শহরটা বেয়াড়া—একটা খোন্দল বই আর কিছু নয়......তখন সে কথায় অনিমেষ সায় দিয়ে ভাল কাজ করে নি, এখন বেশ বুঝতে পারছে।

বৃষ্টি না হলে তারা অবশ্য বেড়াতে যায় সাগরতীরে—সুশোভন তার চাকাওয়ালা চেয়ারে হাত দিয়ে চালিয়ে, অনিমেষ চলে পাশে পাশে। আজ প্রাতঃকালে তা সম্ভব হয় নি, তখন ছিল অবিরাম বৃষ্টি।

যে কথা অজ্ঞাতসারে বলে ফেলে সুশি-দার মনে আঘাত দিয়েছে, তারই দোষ কাটাতে অনিমেষ উঠে এল বই পড়া বন্ধ

করে। তারপরে জানালা দিয়ে তাকাল সুশি-দার ইজি চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে। —"যা-ই বল এমন মেয়ে কিন্তু আমার ভাল লাগে না।" কথা কয়টিতে হীন প্রতিপন্ন করবার কোন রকম সুর নেই। তারপরে আবার বলে —"কেবে কি না মেয়েদের অমন রেনকোটে জড়ান অবস্থায় ঠিক বোঝাও যায় না।"

—জানলে অনি, মেয়েটাকে যেদিনই এ রাস্তায় দেখতে পাই, সেদিনই লক্ষ করি, ও একবার আমাদের ঘরের জানালার দিকে, নয় আমাদের দিকে তাকাবেই। এমন লাজুক, এমন বিস্ময়ে ভরা সে চাহনী, আমার ভারী ভাল লাগে। আমার মনে হয় সে নিখুঁত সুন্দরী।

—তা হলে ত ব্যাপার সুবিধের নয়। এমন খাপছাড়া কাজে কিছু করা যাবে না। তুমিই বলছ লাজুক, চোখে তার বিস্ময়......না, না, এমন মেয়ের সংগে পথে-ঘাটে কেউ পরিচয় করতে পারে না।

সুশোভন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। নিষ্করুণ এক শ্লেষের হাসি হেসে সে বলে তবে না তুমি বল, যে-কোন লোকের সংগে ভাব করতে তুমি পার.....

—কিন্তু সে ত লোকের কথা বলেছি। মেয়ে হল মেয়ে, তাকে.....

—আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে থাক। ওকথা নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। আমি কথাটা বলে ফেলে অন্যায় করেছি। আমার জন্যে লোককে খাটাতে আমার কেমন আঘাত লাগে।

অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সুশোভন ইজি চেয়ারের হাতলে ভর করে অনিমেষের টেবিলের ম্যাগাজিনখানা তুলে আনে। অনিমেষ জানে এ বই আর দুনিয়ার কারও নজরে পড়বে না ভবিষ্যতে।

অনিমেষের মহা বিপদ, প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না, মনে মনে বলে—সব ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকা উচিত। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে সে টের পেয়েছে যে, এখনকার মত সুশোভন মুখ বন্ধ করলেও, সুশোভন একবার যাতে মন দেয়, তা ভুলে যায় না কোন কালে। খোঁড়া হবার পর থেকে সে একেবারে নতুন ধাঁজের ছেলে হয়ে পড়েছে। অবশ্য নিদারুণ কষ্টেই তার সময় কাটে, তাকেও বেশী দোষ দেওয়া যায় না। অনিমেষ বেশ জানে সুশোভন তার কাছে মুখ ফুটে কোনদিন কোন জিনিষ করতে বলে নি—বা পেতে চায় নি। এই প্রথম সে জানালো তার মনের ভাব—এই মেয়েটির বিষয়ে। এখন তবে অনিমেষ করে কি—কেমন করে সে মেয়েটির সংগে পরিচয় করতে পারে সুশি-দাকে খুশী করতে

দেখতে দেখতে অনিমেষের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল মেয়েটি। অনিমেষের একটা কিছু করা উচিত। আহা বেচারি, সুশোভন।

খুব জোর বৃষ্টির পর আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তা হোক এতে ছবি দোষের কিছু দেখতে পায় না। স্বভাবতই কথাটা ছবি পিসিমার কানে আনতে চায় না। ঝড়ের মত নিমন্ত্রণ টি-পার্টিতে, তাছাড়া প্যারাডাইস হোটেলের ভিতরটা দেখবার কৌতূহল ছবির মনেও কম নেই।

কারণ, পরের দিন প্রাতে কিছুটা বৃষ্টি থাকলেও অনিমেষ ছবির দেখা পেয়েছিল পোস্টাফিসের বারান্দায়। ছবি তেমনি রেনকোট পরে ছাতা হাতে দাঁড়িয়েছিল জল একটু ধরে কিনা তারই অপেক্ষায়। রাস্তার অপর পারের একটা গ্রামোফোন দোকান থেকে ভেসে আসছিল রেডিওর গান। কি মিষ্টি! ছবি তার স্বপ্ন-বাসরে ডুবে ভেবে রাখছিল—এমনই একখানা গান সে গাইবে বাসরে, অবশ্য বর একখানি গান গাইবার পর। তার এত সাধের বাসর—মা অবধি তাতে কান দেয় না—মা ত আর সব ব্যাপারেই ছবির মন বোঝে, তবে এটা বোঝে না কেন? কি বরাত তার—মা অবধি......

—আপনি কি কলমটা হারিয়ে ফেলেছেন নাকি?

—কেন, আপনি একটা পেয়েছেন বুঝি?

—না, আজকের প্রাতে নয়। বলেই এমন মধুর হাসি হাসলে, যাতে মরা মানুষও রাগ করতে পারে না। তারপরেই ঢোক গিলে বলে ফেললো 'কথাটা হচ্ছে কি, একটা খবর আছে আপনাকে জানাবার!'

—তাই নাকি, কার কাছ থেকে?

ছবির দু-চোখে উৎফুল্লতা নৃত্য করতে থাকে।

—এমন একজনের কাছ থেকে, যাকে আপনি চিনেন না। হয়ত দেখে থাকবেন চোখের দেখা, নইলে......নয়। সেও মনে করে, সে আপনাকে চোখেই দেখেছে।......আমার জেঠতুতো ভাই, সে খোঁড়া। বুঝতেই ত পারছেন তার জীবন কি দুঃখের — কি রকম বিচিত্রতাহীন। দয়া করে আপনি যদি চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তা হলে তার বন্দি-জীবনে সে যে কি শান্তি পায় বলে শেষ করা যায় না।

তাই ত ঠিক সাড়ে চারটের সময় বৃহস্পতিবারের বারবেলায় প্যারাডাইস হোটেলের ফটকে হাজির। ফটক থেকেই অনিমেষ এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল তাদের ঘরে —একতলায়। ছবির বড় আফশোষ হল, সে ঘুরে দেখতে পেলে না চারপাশে। এক ছোকরার ঘরে বসে চা-খাওয়া— সে কি তেমন দোষের?— আর ত দুমাস গেলেই সে রীতিমত গিন্নী বনে যাবে, তার আবার দোষের কি থাকতে পারে। না —ছবি একথাটা গ্রাহ্যির মধ্যে আনে না।

ঘরে ঢুকেই ছবি দেখতে পায় —জানালা দিয়ে নজরে পড়ে সাগরের অনেকটা নীল জল। মনটা তার চাঙা হয়ে ওঠে। সুশোভন তার চাকাওয়ালা চেয়ারখানা ঠেলে এগিয়ে আসে— 'আমায় ক্ষমা করবেন আমি উঠে দাঁড়াতে পারি নে।' তারপর অনিমেষের দিকে চেয়ে বললে—আমার এ ভাইটির সংগে ত আপনার পরিচয় হয়েছে।

কি সব দামী আসবাব—কৌচ, টেবিল, চেয়ার; টেবিলে রূপার ফুলদানীতে কত সব ফুল। ছবির তাক লেগে যায়। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে একখানা লাল মখমলে মোড়া কৌচে বসে পড়ে—সিটটা যেন তাকে নিয়ে রসাতলে নেমে যেতে চায়। কোন রকমে পা দুটি শক্ত করে ছবি টাল সামলায়। সুশোভন আবার চেয়ারখানা ঠেলে ছবির মুখোমুখী হয়ে বসে। ছবি তাকায়—কুড়ি বছরের এক যুবকের নেহাৎ ছেলে-

মানুষী চাহনি তার নজরে পড়ে। অসহায় শিশু যেন। লজ্জায় কুণ্ঠায় একেবারে বিব্রত। কচি মুখখানির আন্দাজে বলিষ্ঠ হাত দু'খানি কি বেমানান। তারপরে ছবি মুখখানি নত করে কক্ষের চারিদিকে চোরা-চাহনিতে তাকায়। 'কি সুন্দর ফুলগুলো!'

—এর চেয়ে ভাল ফুল পাওয়া গেল না। এখানে কোন জিনিষই তেমন ভাল পাওয়া যায় না একটা পচা শহর। বলেই কি ভেবে সে কুণ্ঠিত হয়, আবার বলে—'আমায় মাপ করবেন, আপনি এ শহরেই মানুষ.....'

—না। দু'মাস হ'ল বেড়াতে এসেছি।

—তা হ'লে ত জানেন এটা কেমন বাজে শহর। ভাল হয়ে বসুন। ছাতাটা ওখানে রাখুন। আচ্ছা, আপনি এত গয়না পরেন কেন?

—এত মানে গলায় দুটো হার কেন, এই ত? চুনী-বসান এ হারটা সে আমার পাকা দেখার। আমার বিয়ে কি না ও-মাসে।

ছবির ধারণা মা যে আসবার সময় হারছড়া দিয়েছে, এটা তার ভাবী শ্বশুরের দেওয়া। আর বিয়ে তার হবেই একমাস বাদে।

'আমার বিয়ে' এ কথাটা যেন সুশোভনের কান থেকে ঠিকরে বেরিয়ে সারা কক্ষের অবিবাহিত নীরবতাকে বিদ্ধ করে ফিরতে লাগলো।

এমনি সময়ে হোটেল-বয় চা নিয়ে এল।

সাঁঝের ছোঁয়া লেগে কক্ষের ভিতর যেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি। সুশোভন তার চেয়ারের হাতলে ভর করে সুইচ্ টিপে দিলে—গোলাপী আভায় ঝল্‌মল্ করে উঠলো—ডিশগুলো।

অনিমেষ আর দূরে সরে রইল না। সুশোভন ছবিকে আহ্বান করলে, চা ঢেলে দিতে। এমন টি-সেট্, এমন সব লোভনীয় খাবার ছবি জীবনে চোখে দেখে নি।

বেশ তিনজনে জমিয়ে তুললে চায়ের আসরটি। এমন সময় সুশোভন জিজ্ঞেস করে, —বিয়ের পর কোথায় আপনি বাস করবেন ঠিক করেছেন?

—কেন, ঢাকায়—ভারী আজব কাণ্ড মনে হয়, না?

—না। আপনার সেখানে ভাল লাগবে না। ভারী নোংরা শহর শুনেছি, আর বাস নেই, ট্রাম নেই—তেমন বড় রাস্তাও নাকি নেই বললেই হয়।

ছবির মুখের বিমর্ষভাব লক্ষ্য করে অনিমেষ বলে—তা হলেও, নদীর ধারটা নাকি বিউটিফুল শুনেছি। আমার কথা বলতে পারি—আমি ত পারলে এক্ষুণি যাই সেখানে।

সুশোভন চট্ করে জবাব দেয়—সে ত আর হচ্ছে না। তুমি সেখানে কি করে যাবে?

ছবি দুটি আঙুর মুখে পুরে ভীরু দৃষ্টি মেলে ধরে অনিমেষের দিকে।

অনিমেষ বে-পরোয়া হয়েই বলে চলে,—সুশি-দা অন্যের প্ল্যান পছন্দ করে না কোন দিন। নিজের মনের মত হয় না কি না!

সুশোভন হেসে ফেলে,—আমার কোন প্ল্যানেরই দরকার হয় না। আমি—আমি করি বসে বসে ষড়যন্ত্র। প্ল্যান করে কি হবে!

মাথার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেমন জড়িতকণ্ঠে সে বলে ছবিকে —আপনিও করেন না, কেমন?

কথাটা শুনে ছবি সুশোভনের দিকে নয়—অনিমেষের পানে বিস্ময়ের দৃষ্টিপাত করে।

সুশোভন বলে—ঢাকায় যাবার জন্য নিশ্চয়ই আপনার মোহ নেই......

—নিশ্চয়ই আছে।

সোনালী স্বপনের মায়া ফুটে ওঠে ছবির অন্তরে। সে স্পষ্ট দেখতে পায়—ঢাকায় তাদের সুখের নীড়টি।

—হয়ত আপনার যাওয়া হবেই না সেখানে। সুশোভন এ-কথায় ছবিকে কি বোঝাতে চায়, ছবি ভেবে পায় না।

—সুশি-দা তুমি থাম। যেভাবে ভয় দেখাচ্ছ, তাতে উনি মনে মনে ভাববেন এ চায়ের নিমন্ত্রণে এসে ভাল করেন নি।

—সত্যি বিরক্ত হচ্ছেন আপনি?

সুশোভনের এ কথায় কি বলবে ছবি। বলবার কিছু পায় না, হাসি দিয়ে ঢেকে ফেলে সব রুক্ষ আবহাওয়া। কাষ্ঠ হাসি নয়, ম্লান হাসি নয়, ঠিক অনিমেষের মত স্নিগ্ধ মধুর হাসি।

খাওয়া শেষ করে ডিশগুলো ঠেলে দিয়ে ছবি হাসতে হাসতেই বলে—আপনি যেন সব সময়েই কৌতুক করতে ভালবাসেন। আপনি বুঝি ভাবছেন, আজ এই টী-পার্টিতে এসেছি বলে সব সময়েই আমি খামখেয়ালী। আমার ঢাকা যাওয়াও একটা খেয়াল। তা নয়, তিনটে জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছে—সবার মুখে সেই এক কথা—মস্ত বড় একটা নদী পেরিয়ে পূর্বরাজ্যের একটা শহরে আমি থাকবো। তার মানে ঢাকা ছাড়া আর কি!

—পূর্বরাজ্যে ত আরো শহর আছে! আপনি ত ফরিদপুর টাউনের একখানি বাগান বাড়ীতেও থাকতে পারেন।

—কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, সেখানকার কাউকে আমি ত জানি নে।

-আমি যাচ্ছি সেখানে আমাদের বাগান বাড়ীটায় বাস করতে।

-কিন্তু আপনি যে বললেন আপনি কোন দিন প্ল্যান করেন না।

তারপরেই সে তাকাতে লাগলো চমৎকার আলোগুলোর দিকে, আবার ফুলগুলোর দিকে, দামী পর্দাগুলোর দিকে। হঠাৎ আবার বলে উঠলো,—'তা হলে আপনার কথা অবশ্য আলাদা।'

—হাঁ, আমার কাছে সবই স্বতন্ত্র। যাচ্ছেন না কি? এ ফুল কটা নিন, আপনার জন্যেই আনা হয়েছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সমর-পদ্ধতি ও বর্তমান সংগঠন

শ্রীগুণময় আচার্য্য

একেবারে সাদা কথায় সংগ্রাম বা যুদ্ধবিগ্রহকে প্রকাশ করিতে হইলে বলা যায়—ইহা সংঘাত-নীতির (Theory of Impact) বাস্তবে প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

সংঘাতের বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা ইহাই মাত্র বুঝাইবে যে, একটি কঠিন পদার্থকে (solid body) এমনভাবে প্রত্যক্ষ বলবৎ সংঘর্ষে আনা হইবে যাহাকে বলে বিপক্ষের সৈনিকগণ—তাহাদের দেহের সংগে, যেন তাহাদের দেহ মাংস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাহাদের দেহাস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তাহারা যেন দৈহিক অপটুতায় ক্লিষ্ট হয়; যেন তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়, অথচ সংগে সংগে যেন স্বপক্ষের সেনা প্রভৃতির উপর অনুরূপে সংঘাত আপতিত হওয়াকে প্রতিরোধ করা যাইতে পারে।

সুদূর অতীতের সময়ে প্রস্তর ব্যবহার করা হইত; প্রথমত অবশ্য হস্ত দ্বারাই নিক্ষিপ্ত হইত; তৎপর প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য অতি মামুলী যন্ত্র-কৌশল আবিষ্কৃত হয়, যাহাকে বলে ফিঙা-কল বা catapult; আমাদের দেশে যে গুলতি বাটুল ব্যবহার করিতে দেখা যায়, কতকটা তাহারই নিকৃষ্ট রূপান্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু মানব-জাতির এই বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা গণ্ডীবদ্ধ রহিল না দীর্ঘকাল—ফলে ক্রমশ আবিষ্কার হইল—বর্শা, বল্লম, ধনু, আর্কুইবাস বন্দুক প্রভৃতি। বহুকাল পর্যন্ত এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রই সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হইতে থাকে। ইহার পর আবিষ্কৃত হইল বারুদ এবং বারুদের আবির্ভাবে পূর্বকথিত সংঘাত বা impact-এর শক্তিও বর্ধিত হইল। ইহার পর হইতে এই সংঘাতকে প্রবলতর ও ক্ষিপ্রতর করিবার প্রয়াসে উত্তরোত্তর অগ্রগতি চলিতেই থাকিল এবং উহারই চরম অবস্থা দেখিতে পাই অতি-আধুনিক দূরপাল্লার কামানে।

নিম্নতম শক্তি (energy) ব্যয়ে বিপক্ষের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ (এমন কি বর্তমানকালে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হইতে প্রক্ষেপণী (projectile)ও এই নিয়মের অধীন এবং যদি সম্ভব হয় ঐ প্রকার প্রস্তর নিক্ষেপের পর নিজেকে এমনভাবে লুক্কায়িত করেন যে, বিপক্ষ হইতে অনুরূপ প্রথায় প্রক্ষিপ্ত প্রস্তর যেন নিজ অংগে আঘাত দান করিতে না পারে—ইহাই হইল সংগ্রামের আদর্শ—প্রাচীনই হউক আর আধুনিকই হউক। ইহাই আবার সরলতম তাৎপর্যে পরিণত করিলে আমরা পাই—যাহাকে বলা হয় সমর-কৌশল বা চতুরতা প্রয়োগ।

উপরোক্ত আদিম কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধপদ্ধতি হইতে নিম্নলিখিত যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:—

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র—বোমাবর্ষী বিমান—হ্যাংগার সহ

(১) অপর সকল অবস্থা সমান হইলে ২০টি সৈনিক সর্বকালেই ১০টি সৈনিককে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান, নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, সকল সময়েই বৃহত্তর সেনা দলের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।

(২) অন্য সকল অবস্থা সমান হইলে, ১০টি সৈনিক যাহারা অধিকতর প্রবল বেগে ও সংঘর্ষে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারে নিম্নতম শক্তিব্যয়ে তাহারা বিপক্ষীয় নিকৃষ্টতর ১০টি সৈনিককে সকল সময়েই পরাভূত করিবে, কারণ পূর্বোক্ত ১০টি পরিশ্রান্ত হইবে কম।

ইহা হইতে ২টি সত্য উদ্ভূত হয়—(ক) অস্ত্রশস্ত্রের

উৎকৃষ্টতা জয়ী হইবে; (খ) প্রভাবান্বিত ঘাঁটি দখল করিয়া অবস্থান জয়ের পথে প্রধান সহায়ক।

(৩) অন্য সকল পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক সমান হইলে ১০টি সৈনিক—যাহারা অধিকতর উদামশীল, সাহসিক অথবা শক্তিসম্পন্ন কিম্বা বিপক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের লক্ষ্যীভূত না হইয়া সাফল্যের সহিত এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদেরই জয় হইবে সর্বদা; যেহেতু তাহারা কম আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, না হয় অধিক ভীষণতার সহিত, সাহসিকতার সহিত আঘাত প্রদান করিতে পারিবে।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হয় যে—যে সৈনিকগণ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে যে, তাহারা ন্যায় ও সত্যের পক্ষ

(৪) অন্য সকল প্রকার তোড়জোড়ে সমান অবস্থা হইলেও যদি ১০টি সৈনিক এক স্থান হইতে অপর স্থানে অধিকতর ক্ষিপ্রগতিতে যাতায়াত করিতে পারে এবং সংগ্রাম চলিতে থাকা অবস্থায় যদি তাহারা স্বস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কোনও দৃঢ়তর গুরুত্বপূর্ণ নূতন স্থান অধিকার করিয়া বসিতে পারে; যদি তাহাদের অধিক প্রস্তর থাকে নিক্ষেপযোগ্য অপর পক্ষ অপেক্ষা তাহা হইলে ঐ ১০টি সৈনিক অপর পক্ষের উপর জয়লাভ করিবে নিশ্চিত।

এই সিদ্ধান্ত এবং ইহার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তাংশ হইতে আমরা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি যে, সমর্থক অর্থাৎ জনগণের আচরণ, সাহায্য ও সহানুভূতি যুদ্ধরত সৈনিক-

বিমানধ্বংসী কামান
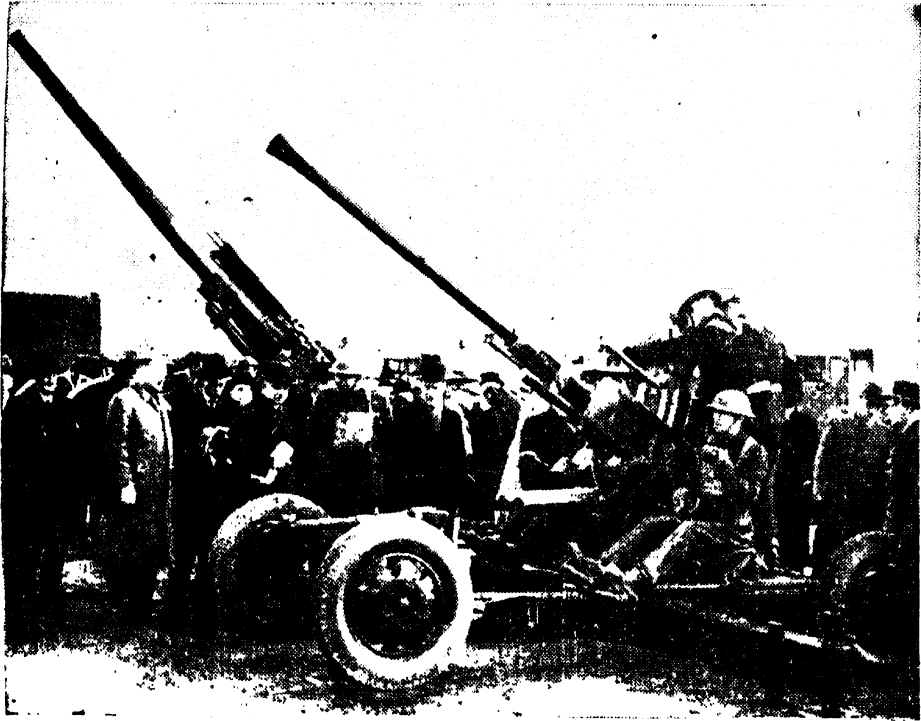
রক্ষাকর্তা এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রাণদানও তাহাদের কর্ত্তব্য; যে সৈনিকগণ উৎকৃষ্টতর খাদ্য, পরিচ্ছদ ও সেবাযত্ন প্রাপ্ত হয়, তাহাদেরই জয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে বেশী; কারণ ভগ্নহৃদয়, ক্ষুধাপীড়িত কিম্বা পরিশ্রান্ত সৈনিক অপেক্ষা তাহাদের পণ থাকে দৃঢ়তর।

ইহা ছাড়া, যে সকল সৈনিক সুদৃঢ় ঘাঁটি আগলাইয়া থাকে (যাহা সমরকুশলতার চাতুরী) বিজয়লক্ষ্মী তাহাদেরই সহজলভ্য হইয়া থাকে, কারণ যে সকল সৈনিক স্থানে তাহারা নিকৃষ্টতর পরিস্থিতিতে অবস্থিত, স্বভাবতই তাহাদের মনে জয়াশা সম্বন্ধে বিষম সন্দেহ থাকে। সম্মিলিত উদ্যমে এই মনের বল একটি প্রধান সহায়।

গণের উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ রাখায় অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এই ৪নং প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের নীতি অনুসরণ করিয়াই আধুনিক সেনাদল বোমাবর্ষণ করে এবং প্রয়োজন মত বিষবাষ্প প্রবাহিত করে জনগণের উপর—উদ্দেশ্য যাহাতে ঐ সমর্থকগণ আশানুরূপ সাহায্য প্রদান করিতে না পারে—শারীরিক, মানসিক ও অন্য যে কোনও প্রকার।

এই কার্য নিতান্তই দুর্নীতিমূলক; তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমরের সকল কার্যকলাপই দুর্নীতিক। কারণ সকল সমর পদ্ধতিরই চরম লক্ষ্য হইল মানবদেহ আঘাতে আহত করা—ধ্বংস করা।

মানবের অন্যান্য ব্যাপারের বেলা যেমন, ঠিক তেমনই

পরিশেষে সমস্যাটি এই আকারে রূপ পরিগ্রহ করে যে—এই সকল অভিসন্ধিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড সমষ্টিগতভাবে কি কাহারও সমর্থন পাইবার যোগ্য?—বিশেষ করিয়া যখন এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের জন্য সমগ্র শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়ের উপর সংগ্রাম বিঘোষিত হয় অথবা যখন এই প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়, সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের অপরিহার্য কোনও কিছুর সংরক্ষণের নিমিত্ত।

এইখানেই রহিয়াছে চরম শান্তিবাদীর সহিত সেই সকল লোকের বৈষম্য—যাহারা মৃত্যুভয়েরও উপরে বড় করিয়া ধরে প্রয়োজন, আশা আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির পিপাসা, স্বাধীনতা প্রভৃতিকে; যাহারা অনুকূল পরিস্থিতিতে স্বার্থপর শান্তি উপভোগকে হেয় জ্ঞান করে; এই মনোবৃত্তি হইতেই তাহারা রহিয়াছে, তথাপি ফ্যাসিজম্ আত্ম-স্বীকৃতি অনুসারেই সমর ও দেশজয়ের পক্ষপাতী; সমষ্টিগত নিরাপত্তার পরিহারের সমর্থক, অর্থাৎ কমিশিয়া অফ নেশন্স্-য়ের কোনও এক অবাধ্য সদস্য-জাতির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ নীতিবিশ্বাসী (যদিও সমষ্টিগত নিরাপত্তার সংরক্ষণেও হয়ত যুদ্ধোদ্যমের কিছুটা আশঙ্কা থাকে নিয়মভঙ্গকারীর শাসনকল্পে); সুতরাং ফ্যাসিস্ত মতবাদ বিরাট একটা ভয়ানক ভুল, যাহা সমরের আশঙ্কাকে প্রশস্ততর ও নিকটতর করিয়াছে; তাহার কারণ আর কিছুই নয়—এই নীতি শান্তিপ্রিয় আইনানুগ সম্প্রদায়গুলির আত্মরক্ষা ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে এবং কোনরূমেই অবাধ্য সদস্য-জাতির দুষ্টাভিসন্ধিমূলক মতিগতিকে ক্ষীণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মেসিন কামানের লক্ষ্য নির্ণয়

সাঁজোয়া-শকট

নিকট প্রেরণা লাভ করে (এবং ইহা হইতেই উৎসারিত হয় দুর্বল ও নিপীড়িতকে রক্ষার অভিলাষ) যাহা তাহাদের নিকট একেবারে আদর্শের আসনে উন্নীত হয়—যাহা তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সকল ক্রিয়া-অপক্রিয়ার ন্যায্যতা প্রমাণের প্রবল হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

এই দুই বিরোধী মতবাদেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু তাহা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

এই দুই মতবাদের সহিত আমাদের যেটুকু সংস্রব, তাহা হইল যদি এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ভিতরে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত অজটিল ও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির নিরিখে, সেই সংঘর্ষের সম্ভাব্যতার স্বরূপ কি, তাহা নির্ণয় করা।

ইহার বিচার-বিবেচনা নানা দিক হইতেই করা যায়, কিন্তু একটি দিক রহিয়াছে, যাহা সকল প্রকারেই সর্বোপরি স্থান পাইবার যোগ্য।

যদি একথা স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, ইউরোপের সমাজদেহে একটা অশান্তিমূলক উপাদানের অস্তিত্ব

এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় অধুনা সেই সকল সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা দ্বারা, যাহারা কিছুকাল পূর্বেও সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতির বিরুদ্ধেই মত প্রচার করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক কয়েকটি সংঘটনের পর, এখন আংশিকভাবে মৈত্রীচুক্তি দ্বারা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রবল প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছে।

যাহারা সমষ্টিগত নিরাপত্তার বিরোধী ছিল, খুব কম পক্ষেও তাহাদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহা হইল এই যে, তাহাদের নিতান্তই দূরদর্শিতার অভাব, আদর্শবাদের প্রতি কোন নিষ্ঠা নাই, তাহারা অন্ধ সংস্কার ও স্বার্থ সংকীর্ণতার প্রতি দাস-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন; যদিও স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ-প্রবণতা বলিলেই তাহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়।

সমষ্টিগত নিরাপত্তার যে যুক্তিযুক্ত বিপরীত অবস্থা, তাহা হইল প্রতিটি সদস্য-জাতির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা অপর কাহারও সহিত যোগাযোগ-বিহীনতার পরিস্থিতি। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে, এই স্বাতন্ত্র্যের পরিস্থিতি আমাদের পূর্বপ্রতিপন্ন ১ নং সিদ্ধান্তের অপহ্নবকারী।

বর্তমান যে আংশিক মৈত্রীর পদ্ধতি, তাহা কিন্তু সাধিত

হইতেছে আমাদের উক্ত ১নং সিদ্ধান্তের নির্দেশ অনুসরণ করিয়াই।

সঙ্কটকালে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবার যে গ্যারাণ্টি এবং অনুরূপ ব্যবস্থায় গ্রীসকে যে সাহায্য দানের অঙ্গীকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে রীতিমত সঙ্গত মৈত্রী-চুক্তির মূল্যে পর্যন্ত নাই; সঙ্গত মৈত্রী-চুক্তি তাহাকেই বলিব যাহা কার্যকর, গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক প্রভাব সমন্বিত।

পোল্যাণ্ডকে যে গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা হইবেই, এমন ধরিয়া লইলেও, যদিও এই রক্ষা করা ব্যাপারে সন্দেহ বিশেষভাবেই আরোপ ও পোষণ করা যায়, তথাপি ইহার একপক্ষাত্মক অঙ্গীকারের ফলে গণতান্ত্রিক গুচ্ছের শক্তি

হয়—সুদেতেনদের অধ্যুষিত চেকোস্লোভাকিয়ার অংশ লইয়া যে দাবী অগ্রসর করা হইয়াছিল, তাহার সহিত।

একটি সামরিক জাতির প্রতি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত এবং চুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যাকিত অঙ্গীকার আগাইয়া দিবার পর কি ব্রিটিশ জাতি এই পোলিশ কোরিডরকে কেন্দ্র করিয়া সমরে লিপ্ত হইবে?

আর গ্রীসের প্রতি অনুরূপ বাগ্‌দান—বংশগত স্বার্থ-প্রণোদিতই হউক আর না হউক—পোলিশ কোরিডরের সংশ্লিষ্ট যুক্তিসমূহের দ্বারা উহাও যে কণ্টকিত, একথা অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু গ্রীসের বেলা আবার অতিরিক্ত একটি কারণও রহিয়াছে—এই প্রকার অঙ্গীকার বাস্তবে পরিণত করিতে যে
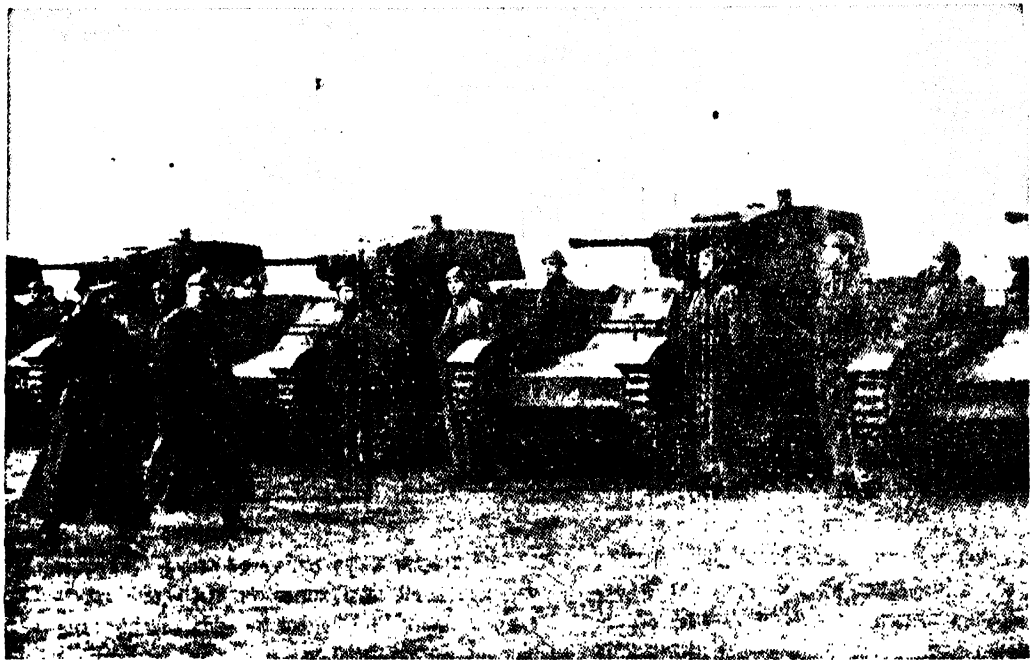
সমর-ট্যাঙ্ক

সকলের সামরিক প্রতিরোধের মূল্যের দিক হইতে ইহা নিতান্তই দূরবর্তী ও অনিশ্চিত। স্পেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার বেলা যে নীতি অনুসরণ করিয়া উহাদিগকে নেকড়ের মুখে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার কম বা বেশী প্রায়শ্চিত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রকাশ্য প্রচার এইটুকুই শুধু বলা যায়।

টোটেলিটারিয়ান ষ্টেটগুলির যুক্তিপূর্ণ হেতু রহিয়াছে—পোল্যাণ্ডের প্রতি সহায়তা প্রদানের গ্যারাণ্টিকে বিরোধাত্মক কার্য বলিয়া ধরিয়া লইবার—যদিও তাহারা তাহাদের অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করে যে এই গ্যারাণ্টি নূতন এক 'স্ক্র্যাপ অফ পেপার'-যেরই সমতুল্য; এবং নিতান্তই অকেজো, পলকা।

পোলিশ কোরিডরের জন্য জার্মানদিগের দাবী—যাহা শীঘ্রই উপস্থিত করা হইবে, তাহার অন্তত সমানই সমর্থনের হেতু রহিয়াছে -যদিও অধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া না-ও ধরা

দায়িত্ব ও সংকট তাহা বাদ দিলেও, ব্রিটিশের সহকারিতা কেবল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে একটিকে মাত্র উপকৃত করিবে বিশেষ করিয়া—ব্রিটেনের নিজের নিকট উহার মূল্য কিছু মাত্র নাই; আবার ফ্রান্সের পক্ষে উহা হইবে একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব—যে ফরাসী দেশ প্রধানত এবং অব্যবহিতভাবে নিজ দেশের তিন উন্মুক্ত সীমান্ত লইয়া ব্যাপৃত ও ভারাক্রান্ত।

ইটালী কর্তৃক আলবেনিয়া অধিকার আমাদের ২নং সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুমোদনেই অনুষ্ঠিত বলিতে পারা যায়' অদ্রিয়াটিক উপসাগর, অদূর ভবিষ্যতে জেতব্য দালমাশিয়ান তীর সহ, অথবা ঐ তীর ছাড়াও, একটি বদ্ধ হ্রদ মাত্র—যেখানে 'এর্কাশিয়াল' চুক্তির বলে প্রাচীন কিন্তু অধুনা দুর্বলতার ফ্যাসি জমের নৌ-বাহিনী ... সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে—অর্বাচীন কিন্তু অধুনা প্রবলতর পক্ষ হইতে।

ছিদ্রান্বেষী কোনও এটর্নি ছলযুক্তি উপস্থিত করিতে পারে যে, এই অভিযান দ্বারা য়্যাংলো-ইটালিয়ান চুক্তি ভংগ করা হয় নাই, কিন্তু যাহার সামান্য ও সাধারণ জ্ঞান রহিয়াছে, সে ব্যক্তি একথা স্বীকার করিতে পারে না।

ইহা অবশ্য সত্য নহে যে, আদ্রিয়াটিকের জলপূর্ণ অংগে ব্রিটিশের নৌ-বাহিনীর কোনও ইউনিটকেই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—কিন্তু অসমসাহসিক একটি ডুবোজাহাজ (যাহার সংখ্যা আজিকার দুনিয়ায় অগণিত) কোন প্রকারে নিরাপদে ঐ স্থানে ঠাঁই পাইলে প্রতিপত্তিশালী শক্তি ইটালিয়ান নৌ-

গ্যাস-মুখোস

বিভাগের সাহায্যে আশ্রয় পাইতে পারিবে, পুনঃ সমরসজ্জা করিতে পারিবে, মেরামতাদি করিতে সমর্থ হইবে।

এই প্রকারের একটি সুরক্ষিত প্রবাহিকার সৃষ্টি—যেখানে অতি সংগোপনে ও নিরালায় আধুনিক পোতাশ্রয় একটি অতি সত্বর গড়িয়া উঠিতে পারে—এই পরিস্থিতি সমগ্র ভূমধ্যসাগরের আভিজাত্যকে বর্তমানে এমনি ম্লান করিয়া দিয়াছে যে, মালটা দ্বীপ অধিকারের অবস্থা হইতেই মাত্র ইহাকে মন্দের ভাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ভূমধ্যসাগরে বর্তমান বিশিষ্টতা আরও সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে য়্যাংলো-ইটালিয়ান চুক্তি স্বাক্ষর হইবার পর লিবিয়ায় সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করায় উহাকে দৃঢ়তর প্রতিপন্ন করিবার জন্য। সেনা-জাহাজ 'পায়েমাণ্ট' এই সম্প্রতি কয়েকবার যাতায়াত করিয়া এই সমরসজ্জা সম্পূর্ণ করিয়াছে। ডোডেকানিজের লেরোস দ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপে এবং প্যান্টেলেরিয়ায় দৃঢ়তর অবরোধ নির্ম্মাণ করিয়া এবং বিভিন্ন নৌ ও বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভূমধ্যসাগরকে আরও বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে।

এখনও বহু মাস অতীত হইয়া যাইবে তাহার পর যদি মিঃ চেম্বারলেন সত্যের অপলাপ না করিয়া ঘোষণা করিতে পারেন যে, ইটালিয়ানগণ বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ হইতে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি উত্তোলন করিয়া উহা বর্জন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এবং সেই সময় সমাগত হইবার পূর্বেই হয়ত তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

মিঃ চেম্বারলেনের এই প্রকার অন্যের মন জোগাইয়া শান্ত করিবার নীতি অনুসরণ করিবার পরিণামে ভারতবর্ষে গমনাগমনের পথটি অতি মারাত্মকভাবেই চাতুরীপূর্ণ সংকটে পতিত হইয়াছে; বিশেষ করিয়া যখন ক্যানারিজ দ্বীপ রহিয়াছে ফরাসীদের হস্তে এবং যদি সংঘর্ষ বাঁধে তখন ফরাসীরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিবে।

পাঠক-পাঠিকাগণ উপরোক্ত চারিটি সিদ্ধান্ত মনোযোগের সহিত বিচার-বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মিঃ চেম্বারলেনের কার্যকালে ইউরোপের মানচিত্রে কি প্রকার পরিবর্তন ইতিমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে এবং উহার প্রকৃত মর্ম ও স্বরূপ কি গুরুতর আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথমত মিঃ চেম্বারলেন ব্রিটেনকে সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়া কতখানি দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন; দ্বিতীয়ত, ভাবী সমরের ক্ষেত্র কতদূর তিনি প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছেন; উহার ফলে যে ব্রিটিশ পক্ষের সমরে হতাহতের সংখ্যা কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে তাহার সঠিক পরিমাণ করা এখনও অসম্ভব, কিন্তু সমর যখন অপরিহার্য, তখন উহা প্রত্যক্ষ করিতে বেশী প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।

শ্বেত জাতি যাহাকে অসভ্য বর্বর বলা হয়, তাহাদের ঘোরতম গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট কোনও এক ব্যক্তির পক্ষেই ব্রিটিশের সাম্রাজ্যের এই প্রকার অধিকার-ও-পদচ্যুতি সাধন করা এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন কালে সম্ভব হইত কি-না—এই কথা ভাবিয়া বস্তুতই চমৎকৃত হইতে হয়।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী অমিয়া সেন

(১৫)

মৈনাক গ্রাম্য বেকার যুবক। কুটিলতা আর পরচর্চ্চা তার মজ্জাগত স্বভাব। অরুণার ব্যাপারটা সে যথাসাধ্য অতিরঞ্জিত করিয়া মহালক্ষ্মীর কাছে প্রকাশ করিল। শুনিয়া মহালক্ষ্মীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অরুণার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এসব কি শুনেছি বৌমা?

নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অরুণা সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা খসড়া তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে। নতমুখে কহিল, আপনার কি বিশ্বাস হয় মা?

মহালক্ষ্মী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, —আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসই ত সব নয় মা, সংসারে আরও ত লোক আছে।

অরুণার চোখে জল আসিল, প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিয়া কহিল, বেশ, তা হলে আমি অপরাধী, যে শাস্তি আমাকে দেবেন—

অরুণার গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহালক্ষ্মী কহিলেন,—আমি মিহিরকে জানাই সব কথা, সে যদি তোমাকে পারে তার কাছে নিয়ে যেতে। নইলে যে কি ব্যবস্থা হবে, আমার বুদ্ধিতে কুলাচ্ছে না।

নেপথ্য হইতে বড় ননদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—এই বয়সে শাসন ছাড়া থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। যেমন দাদা, তেমন তোমরা। কোনদিন ত কিছু বলবে না।

মহালক্ষ্মী বাহির হইয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে মিহিরের চিঠি আসিল। অরুণার কাছে লিখিয়াছে,—"এইরকম একটা অপবাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে আমার কাছে পালিয়ে আসতে হবে, এ কোনদিন ভাবিনি। তোমার বুদ্ধির উপর চিরদিন খুব বিশ্বাস করে এসেছি, তার ফল এই। যত সত্বর পার চলে এস।

অরুণার চোখের জলে চিঠির অক্ষর ঝাপসা হইয়া গেল। মনে মনে শুধু ভাবিল, তুমিও—

অরুণার চার বৎসরের বড় এক ভাই ছিল। কাশীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিত। অরুণারা শিশু বয়সে পিতৃমাতৃহারা হইয়াছিল। তিন বোন আর এক ভাই এই চারিটি প্রাণী সেই শিশুকাল হইতেই এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়ে। মামারা ছিল বড়লোক, তারা এক এক জনে এক এক জনের ভার নেয়।

বড় হইয়া বোন তিন জনের বিবাহ হইয়া গেল। ভাই শ্যামল কাশীতে ছোট মামার নিকট থাকিত। সে সেইখান হইতেই ডবল এম-এ পাশ করিয়া সেইখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা সুরু করিল।

শ্যামল শুধু অরুণারই বড় ভাই, আর দু'বোনের ছোট, তাই একমাত্র ছোট বোন হিসাবে সে অরুণাকে বোধ হয় সম্ভবেরও অতিরিক্ত ভালবাসিত। আজ জীবনের এই চরম দুর্দিনে নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়িয়া অরুণার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। এই বয়সেই তার মা বাবা কিছুই নাই। জগতে সব অপরাধ নির্বিচারে ক্ষমা করিয়া লইতে এক মা ছাড়া কেহ পারে না। অরুণা সেদিক দিয়াও বড় দুর্ভাগিনী।

জোর করিয়া আশ্রয় চাহিবার স্থান আজ তার কোথায়? কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণার মনে পড়িল শ্যামলের কথা। সেও পুরুষ তবুও সে অরুণাকে ভালবাসিত, সে কথা কি সে আজ এই অল্প দিনের ব্যবধানেই ভুলিয়া গিয়াছে? ছোট বোনের এই দুঃসময়ে ভাই কি আজ আসিয়া পাশে দাঁড়াইবে না? আশায় বুক বাঁধিয়া অরুণা শ্যামলের কাছেই চিঠি লিখিল।

অরুণার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সত্য সত্যই একদিন শ্যামল আসিয়া পৌঁছিল। অরুণার শুষ্ক বিবর্ণ চোখ মুখের দিকে চাহিয়া বেদনাপ্লুত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল,— ব্যাপার কিরে অরু?

অরুণা ধীরে ধীরে সব কথা খুলিয়া বলিল। বলিতে বলিতে তার দুই চোখ দিয়া অঝোরে জল ঝরিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল। শেষে রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি বল দাদা, কি অন্যায় আমি করেছি। সংসারে কারুর কাছ থেকে কোনদিন কিছু পাইনি, অনুযোগও তা নিয়ে করিনি কোনদিন। আমি শুধু প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, সবার প্রতি আমার কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে। কিন্তু তবুও ত কাউকেই আমি সুখী করতে পারলাম না দাদা। আমার এত কিছু ত্যাগ আর সহিষ্ণুতার বিনিময়েও সংসারে আমাকে চায়, এমন একটি লোক খুঁজে পেলাম না।

শ্যামল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে কহিল, সংসার এইরকমই, কিন্তু এ নিয়ে তুই দুঃখ করিস নে, সমস্ত জগতেও যদি তোর স্থান না জোটে, আমার কাছে জুটবে। আমার শাকান্নের ওপর তোর দাবী চিরকালই সমান থাকবে। আর দেরী করিসনে, চটপট গুছিয়ে নে, তোকে আমি এমনভাবে তৈরী করে দেব, যাতে তোকে সংসারে কারুরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়। এমন কি, যদি আমার কোন অমঙ্গলও সহসা কোনদিন ঘটে যায়, সেদিনও যাতে তুই নিরাশ্রয় হয়ে না পড়িস, তাও আমি করে দেব।

অরুণা চোখ মুছিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া আসিল। গুছাইতে বসিয়া সে পা ছড়াইয়া নির্জীবের মত দেওয়ালের একপাশে মাথা হেলাইয়া দিয়া উদাস দৃষ্টিতে ঘরটার চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল।

এই ঘর, তার প্রিয় ঘর। মিহিরের স্মৃতি-সুরভিত ঘর। তার ও মিহিরের প্রত্যেকটি মিলন-রজনীর ইতিহাস এই ঘরের গোপন মর্ম্মপুরে সোনার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে।

আজ অরুণার মনে পড়িতে লাগিল, সংসারে কেহই তাহাকে কিছু দিল না। তাহাদের উপর অরুণার দাবীই বা কতটুকু। কিন্তু যার উপর দাবী আছে, সেই মিহির তাহাকে কি দিল?

দিল না—দিল না, মিহিরও তাহাকে কিছু দিল না, না দিল মাতার সম্মান, না দিল স্ত্রীর গৌরব। সর্বোপরি আজ দিল অবিশ্বাস, অসম্মান। অরুণার বুকের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু শুষ্ক চোখ ফাটিয়া জলও যেন বাহির হইতে চায় না। আজ এই ব্যথাই তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। এই এক ব্যথার আঘাতে তার মন হইতে দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু বস্তুই নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল।

খানিকক্ষণ আগে ডাকে দুইখানা চিঠি আসিয়াছিল। একখানা দীপক লিখিয়াছে, আর একখানা জ্যোতি। দীপক লিখিয়াছে, সহযোগ সাহিত্যে তার খুব মত আছে। অরুণা যেন তার অসমাপ্ত রচনাগুলি দীপকের কাছে সত্বর পাঠাইয়া দেয়। পূর্বে যে সে অমত প্রকাশ করিয়াছিল, এজন্য সে লজ্জিত। অরুণা যেন তাহাকে ক্ষমা করে।

জ্যোতি লিখিয়াছে, মঞ্জরী অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে তার দিদি তার কাছে আসিয়া বিবাহের কথা বলিয়া গিয়াছে। সেই সব কথা শুনিয়া অবধি মঞ্জরী অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছে। অসুখ যেটুকু কমিয়াছিল, তা আবার যথাপূর্ব অবস্থা হইয়াছে। মঞ্জরীর দিদির অর্থবল এবং লোকবল দুই-ই আছে। ইচ্ছা হইলে তিনি মঞ্জরীকে জোর করিয়াও লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তা হইলে মঞ্জরীর প্রাণ-প্রদীপ হয়ত একেবারেই নির্বাপিত হইয়া যাইবে।

জ্যোতি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। অরুণা যেন এ বিষয়ে কী তার কর্তব্য সত্বর তাকে জানায়। পুনশ্চ দিয়া আরও লিখিয়াছে, এই সময়ে যদি অরুণা ঐখানে থাকিত, জ্যোতি অকূলে কূল পাইত। চিন্তা করিয়া করিয়াও সে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। আশা-আনন্দহীন জীবনের ভারে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এ চিঠি পড়িয়া খানিক আগে অরুণার চোখে জল ঝরিয়াছে, এখন আর তার চিহ্ন নাই। যাবার মুহূর্তে যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, জীবনের সর্ব ঠাঁই ব্যাপিয়া যাঁর আধিপত্য, সেই একটি মানুষের প্রেম ঘৃণা ক্ষমা অকরুণা, তার সমগ্র হৃদয়টিকে যেন টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ব্যথার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াইতেছিল।

দীপকের খোলা চিঠিটা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া অরুণার পায়ের ধার হইতে সরিয়া গিয়া ওধারের দেওয়ালে ঠেকিয়া রহিয়াছে। ও চিঠি আজ আর তার মনে এতটুকু আনন্দও দিতে পারিল না। সমস্ত জীবনটাই যার একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা তার কাছে যশ, অর্থ, খ্যাতি, গৌরবের মূল্য কতটুকু?

দিদি'

অতি পরিচিত অতি আদরের একটি ব্যগ্র আহবানে সহসা নিদারুণ বিস্ময়ে চম্‌কিয়া উঠিয়া, অরুণা দ্বারের দিকে চাহিল।

ধীরে ধীরে ভেজান দ্বার ঠেলিয়া নতমুখে ঘরে প্রবেশ করিল কমল।

—কমল ভাই! মুহূর্তের জন্য অরুণা জীবনের সব দুঃখ ভুলিয়া গেল। ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে কমলের মুখপানে চাহিয়া কহিল,—কমল, ভাই!

কমল ধীর পায়ে আসিয়া তার কাছে মাথা নত করিয়া বসিল। মৃদু-কুণ্ঠিতস্বরে ডাকিল,—দিদি!

অরুণা ছল ছল চোখে চাহিয়া কহিল, এত দেরী করে এলি ভাই? আমি যে আজই চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছ?

কমল ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে মৃদুস্বরে কহিল, আজই চলে যাচ্ছ? তাহলে ত ঠিক সময়েই এসেছি!

অরুণা লক্ষ্য করিল, এই কয়েক মাসের মধ্যেই কমলের অন্তরে বাহিরে যেন কিসের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সেই কমল, আর এই কমল, কত তফাৎ! কমল এত শান্ত, এত সংযত কি করিয়া হইল? ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, কমল,

কমলের মাথাটা আর একটু নত হইয়া আসিল। বেদনার্ত-স্বরে কহিল,—আমার জন্য তুমি এত লাঞ্ছনা সহ্য করেছ, এ আমি জানতুম না দিদি, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

অরুণার উদাস চোখে অশ্রুর কুহেলী ঘনাইয়া আসিল। দুই হাতে কমলের একখানা হাত জড়াইয়া ধরিয়া সিক্তকণ্ঠে শুধু কহিল, কমল!

কমল তেমনি স্বরে মুখখানা ঈষৎ উন্নত করিয়া কহিল, তখন যদি তুমি আমায় বলতে! আমি কি করে বুঝব, মানুষে এমন অমানুষ হয়। জানলে আমি তখনই—

কমল চুপ করিল, অরুণা কহিল, তুমি ছেলেমানুষ কমল, অত বড় আঘাত কি তোমার সয়? একা আমিই তাই বুকে পেতে সে আঘাত নিয়েছি চোখের জলে ভেসে। কিন্তু এ পুরান কথা আজ কেন?

কমলের ম্লান মুখ ম্লানতর হইয়া আসিল। কহিল,—আমি বৌদির কাছে চলে যাচ্ছি।

অরুণা স্তব্ধ হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া রহিল, কি বলিবে আর কি বলিবে না, তাই ভাবিতেই অনেকক্ষণ সময় লাগিল। কিশোর ছেলে, অবোধ ছেলে, এই বয়সেই এত বড় একটা ঘৃণিত অপবাদের গ্লানি মনে লইয়া এখান হইতে বিদায় লইতেছে, একথা মনে হইতেও অরুণার বুকটা হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল,—আজ আর কেন যাচ্ছ ভাই, আজ ত আমিই চলে যাচ্ছি।

—তুমি যাবে? কোথায় যাবে দিদি?

—দাদার কাছে, কাশীতে।

—কেন, মিহিরদার কাছে যাবে না?

অরুণা কথা বলিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কমল বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি!

অরুণা কথা কহিল না।

কমল ব্যগ্র হইয়া কহিল, না-না, দিদি, একি করছ তুমি?

অরুণা দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিল, হাতের আড়াল হইতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রুদ্ধস্বরে কহিল, বাধা দিস্‌নি, আজ যেতে দে আমায়। সে যদি সত্যিই আমাকে চায়, ফিরে আমাকে আস্‌তেই হবে। কিন্তু আজ ত এভাবে যেতে পারিনে।

কমল অনেকক্ষণ নির্ণিমেষে তার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। তারপর এক সময় সহসা সচকিত হইয়া কহিল,—আমি যাই, আমার ষ্টীমারের সময় হয়ে এল।

অরুণা দুইহাতে তার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া শুধু কহিল, কমল।

চিন্তাকুল মনে কমল কহিল, আচ্ছা, আজ না হয় দেরীই করে যাই। তোমাকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে আসি, কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্তেও আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না দিদি।

অরুণা আর একবার শেষবারের মত চোখ বুজিয়া নিজের গত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।..........

........কত আসিল, কত গেল। ....জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই কি বিরাট বিপর্যয়ই না ঘটিয়া গেল। ....অথচ যাহাদের লইয়া এই বিপর্যয়, সেই কমল, জ্যোতি বা দীপক, কেহই কোনদিন তার মনের দেওয়ালে দাগ কাটিয়া বসে নাই বা আজও এতটুকু চিন্তা জুড়িয়া ঠাঁই লয় নাই। একটা প্রবল কালবৈশাখী ঝড়ের মত তার ভাগ্যাকাশ হঠাৎ অন্ধকার করিয়া এরা এক একজন আচম্‌কা সকলকে চমকিত করিয়া যেমন আবির্ভূত হইয়াছিল, আজ আবার তেমনি আচম্‌কাই সব মিলাইয়া গেল। বিশ্ব-নিয়ন্তার কি অপরূপ খেলা এ?

বহু আরোহীর মধ্যে অরুণাকেও বুকে লইয়া নদীর বিশাল বক্ষে একটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ষ্টীমারখানা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সেই ক্রম-অপসয়মান যন্ত্র-দানবের গতিশীল দেহের দিকে কমল বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। যখন ষ্টীমারখানা দৃষ্টিশক্তির সীমা একেবারেই অতিক্রম করিয়া গেল, তখন তার চোখের পলক পড়িল। দুই ফোঁটা জলও সেই সময়ে চোখের কোণ হইতে ঝরিয়া পড়িল। চোখ মুছিয়া সে চতুর্দিকে একবার চাহিল। প্লাটফর্মে জন-কোলাহল কিছুক্ষণের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল। একটা মেল ষ্টীমারের আগমন সংবাদে তাহা আবার উদ্দাম হইয়া উঠিল।

কমলের মনটা উদাস হইয়া গেল। চারিদিকে এত লোক, তবু তার মনে হইতেছিল, তার চারিপাশে জনমানবের কোন সাড়া নেই। সে একেবারে একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। যে একজনের স্নেহে ও ভালবাসায় সে এতদিন একা থাকিয়াও চারিপাশে অগণ্য আত্মজনের স্নেহ অনুভব করিয়াছে, সেই একজনের অভাবে আজ তার কাছে সহস্র বান্ধবের স্নেহ-বন্ধনও অর্থহীন। গভীর ব্যথাহত মন লইয়া সে হেঁট মুখে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করিতে লাগিল। মেল-ষ্টীমারও ততক্ষণে আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে।

যাত্রীদের ওঠা-নামার হট্টগোলে প্ল্যাটফর্ম মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সহসা কে একজন আসিয়া পিছন হইতে কমলের কাঁধে হাত দিল।

চমকিয়া কমল পিছন ফিরিয়া চাহিয়াই বিস্ময় ও আনন্দ-বেদনায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

মিহির কহিল, তুমি ষ্টেশনে এসেছিলে কেন কমল?

স্বর কানে যাইতে কমল চেতনা ফিরিয়া পাইল। উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, দিদি চলে গেল আজ কাশী।

মিহির বিস্ময়-ব্যাকুল স্বরে কহিল, কাশী চলে গেল অরুণা? কিন্তু কেন গেল?

তার থাকবার জায়গা নেই বলে।

অসহ্য বেদনা আর অভিমানে কমলের গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

ব্যাকুল মিহির কহিল, আমি ত লিখেছিলাম—

ও রকম লিখলে দিদি যায় না।

ভুল হয়েছে আমার, যে মুহূর্তে সে ভুল আমি বুঝতে পেরেছি, সেই মুহূর্তেই তাই ছুটে এসেছি। জানি, বড় অভিমান ওর। কিন্তু এরি মধ্যে চলে গেল?

হ্যাঁ, গেল। কিন্তু দিদি বলেছে, কেউ যদি তাকে সত্যিই চায়, ফিরে তাকে আসতেই হবে। আমিও তখনই বুঝেছি, ফিরে তাকে আসতেই হবে। আপনি যান মিহিরদা, দেরী করবেন না। কালই আপনি রওনা হয়ে যান। দিদি নির্দোষ, দিদি শিশুর মত সরল আর পবিত্র।

গম্ভীরস্বরে মিহির কহিল, যাব, আমি কালই যাব। জানি আমি ও সরল, ও পবিত্র। আমার চেয়ে কেউ ত ওকে বেশী চেনে না। তবু ত আমারও মাঝে মাঝে ভুল হয়। এজন্য সে কি আমাকে ক্ষমা করবে না? নিশ্চয় করবে। আমি ত কালই যাচ্ছি।

নদীর প্রশান্ত বক্ষে শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ চিক-চিক করিতেছিল। ব্যথাহত উদাসী মিহিরের দৃষ্টি সেইখানেই স্তব্ধভাবে থামিয়া রহিল। সেই মধুর আলোর মধ্য হইতে অরুণার দুই বিশাল ও করুণ চোখের আলো যেন দেখা যাইতেছিল।

—শেষ—

শাঁখবোল

শ্রীনলিনেশ মৌলিক

১৩৪৫ সালের ২১শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ মহাশয় লিখিত 'উত্তর বঙ্গের শাঁখবোল' সম্বন্ধে পুনরালোচনা পাঠ করিলাম।

আমি আমার পূর্ব প্রবন্ধে সুরেনবাবু কর্তৃক প্রদত্ত "অরাজকতার" প্রমাণ ছাড়া যে ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিয়াছিলাম, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সুরেনবাবু তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। ইতিহাসের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেই বোধ করি ছড়াগুলি সম্বন্ধে সত্য অবিসম্বাদিতভাবে স্থিরীকৃত হইত। তাহা না করিয়া তিনি "আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক ক্রমধারা ও ছড়াগুলির উপরই ভিত্তি করিয়া শাঁখবোলে ঐতিহাসিকতাও নিরূপণ করিতে চেষ্টা" করিয়াছেন। ইতিহাস দুর্জ্ঞেয় হইলে বিষয়বস্তুর মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিকতা নিরূপণ অনেক সময় করিতে হয় বটে, কিন্তু ছড়াগুলির রচনাকাল বলিয়া সুরেনবাবু তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে যে সময়টির নির্দেশ করিয়াছেন তাহা খুব বেশী দিনের কথা নয় এবং চেষ্টা করিলে সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করাও দুর্ঘট ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় ছড়াগুলির ভিতর হইতে তাহাদের রচনাকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকতা নিরূপণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা কেবল যে অনাবশ্যক তাহাই নয়, বিপজ্জনকও। সুরেনবাবুর অভিজ্ঞতা কিরূপ তাহা আমার জানা নাই, কিন্তু আমি ছড়া সংগ্রহ ব্যাপারে অনেক সময় প্রতারিত হইয়াছি কারণ প্রাচীন মনে করিয়া অনেক সময় যে ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি, একটু অনুসন্ধানের পরই জানা গিয়াছে, তাহার বয়স ৮।১০ বৎসরের বেশী নয়,—কোনটির বা তাহার চেয়েও কম। পরবর্তীকালের অনেক রচনা ছড়ার সংসারে পোষ্যপুত্র হইয়া তাহাদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, অশিক্ষিত এবং অমার্জিত রুচিসম্পন্ন কবির মানসপুত্র বলিয়া ভাব ও ভাষা দেখিয়াও প্রাচীন ছড়ার সহিত তাহাদের রক্ত-সম্পর্কহীনতা ধরিবার কোন উপায়ই নাই। যাহা হউক এতৎসত্ত্বেও যখন সুরেনবাবু সে চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাঁহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

কিন্তু শাঁখবোলের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সামান্য চেষ্টায় আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বা অবান্তর মনে করি না। দুইটি প্রবন্ধে একই ঐতিহাসিক অসংগতি দেখিয়া মনে হইতেছে, সুরেনবাবু বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক বোধ করেন নাই। প্রথম কথা গৌড় এবং বরেন্দ্র সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতার জন্য তাঁহার শাঁখবোলের জন্মস্থান সম্পর্কীয় যুক্তি দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বরেন্দ্র বলিতে আমরা হিন্দুরাজত্বের বিভাগ বিশেষ (যথা, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ইত্যাদি) এবং গৌড় বলিতে মুসলমান রাজত্বের বিভাগ বিশেষকে বুঝি। বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত করেন। তিনি বঙ্গদেশকে রাঢ় (বর্দ্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্র (রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), বাগড়ী (প্রেসিডেন্সী বিভাগ),—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এই সমস্ত বিভাগের সীমা নির্দেশে দেখা যায়,—

বরেন্দ্র—এই দেশের পশ্চিমে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে করতোয়া, উত্তরে অন্যান্য রাজাদের অধিকার।

বঙ্গ—এই দেশ করতোয়া নদীর পূর্বে হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। সুবর্ণগ্রাম এই দেশের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

বাগড়ী—এই দেশ ত্রিকোণ, সমন্তাৎ জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে দ্বীপও বলিত। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র।

মিথিলা—মহানন্দা ও গৌড়নগর (মালদহ জেলার অন্তর্গত বর্তমান গৌড়) এই দেশের পূর্বে। ইহার দক্ষিণে ভাগীরথী, উত্তরে ও পশ্চিমে অন্যান্য রাজাদের অধিকার। (১)

রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে যাহা লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত ছিল, বখ্‌তিয়ারের আমল হইতে তাহা লক্ষ্ণৌতি নামে পরিচিত হইল। "বখ্‌তিয়ার আপনার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ীর কিয়দংশ ও বরেন্দ্র লইয়া একভাগ; দিনাজপুর জেলার দেবকোট ইহার রাজধানী। ......রাঢ় ও মিথিলার কিয়দংশ লইয়া অপর ভাগ,—লক্ষ্মণাবতী বা লক্ষ্ণৌতি ইহার রাজধানী হইয়াছিল।" (২) এই লক্ষ্মণাবতীই পরে গৌড় নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয় এবং কালক্রমে সমস্ত বাঙলা দেশটিই এই গৌড়ের সীমার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। মুসলমান রাজত্বেই মুর্শিদাবাদও এই গৌড়ের মধ্যে ছিল। (৩) গৌড়ের এই শেষোক্ত বিস্তৃতির কথা স্মরণ করিয়াই মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছিলেন,—"রচিব এমন মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" সুতরাং গৌড় এবং বরেন্দ্র যে এক নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বরেন্দ্র বাদসাহী-আমলের গৌড়েরই অংশ বিশেষ। বরেন্দ্র বলিলে উত্তর বঙ্গকে বুঝায় বটে, কিন্তু গৌড় বলিলে তদপেক্ষা বৃহত্তর প্রদেশকে বুঝায়। অতএব "গৌড় দেশে ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল" এবং "তৎকালীন গৌড় বা বরেন্দ্রের দুরবস্থা",—এরূপ বলিলে স্পষ্টভাবে অরাজকতা বা দুরবস্থার স্থান নির্দেশ করা হয় না।

দ্বিতীয় কথা, "বাঙলায় মুসলমান রাজত্বের অধঃপতন এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ" এই সময় মধ্যে বাঙলার কোন কোন স্থানে দস্যুভীতির ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকিলেও

---

(১) বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

(২) গৌড়ের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী,

(৩) এই কারণেই মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর প্রভৃতি সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত পল্লী-অঞ্চলে শাঁখবোলের প্রচলন আছে। বর্তমানে কলিকাতার তুচ্ছ ক্যাসানটিও যখন সুদূরতম পল্লীতে আসিয়া উঠে তখন রাজধানী গৌড়ের শাঁখবোল গান যে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্র গীত হইবে তাহা স্বাভাবিক।

গৌড়ে অরাজকতার প্রসঙ্গ অবান্তর বলিয়াই মনে হয়; কারণ গৌড় তাহার বহু পূর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বর্তমান গৌড়ের "গ্রামগুলিতে বিরাট জঙ্গলের সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামগুলি ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইবার" একটি ইতিহাস আছে বটে; কিন্তু তাহা সুরেনবাবু কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাস নয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রও "তৎকালীন গৌড় বা বরেন্দ্রের দূরবস্থার কথা" দেবী চৌধুরাণীতে লিপিবন্ধ করেন নাই। দেবীচৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ তাহার অনেক পরবর্তীকালের সামাজিক চিত্র। আমরা জানি, দায়ূদ খাঁই গৌড়ের তথা বাঙলার * শেষ পাঠান বাদশাহ্। দায়ূদ খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়ের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। সম্রাট আকবরের জৌনপুরস্থ সেনাপতি মুনিম খাঁ, দায়ূদ খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তাহার পরই গৌড় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইল। বাঙলার ইতিহাসে দেখিতেছি,—

"Monaim Khan, having heard much of the ancient and desolate city of Gour, went to view it; and was so much delighted with the situation and its many princely edifices, that he resolved again to render it the seat of government. To effect this plan, although it was the season of rains, he ordered the troops and all the public officers to remove from Tanda to Gour (সোলেমান কররাণীর সময়ে রাজধানী গৌড় হইতে টাণ্ডায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।) Whether owing to the dampness of the soil, the badness of the water, or the corrupted state of the air, a pestilence very shortly broke out amongst the troops and inhabitants. Thousands died every day and the living, tired with burying the dead, threw them into the river without distinction of Hindoo or Mahammedan. The Governor became sensible of his error, but it was too late." (4) মুসলমান ঐতিহাসিকও এই মহামারীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"By degrees the pestilence reached to such a pitch that men were unable to bury the deads, and cast the corpses into the river." (5)

এই মহামারীই যে গৌড় নগরের ধ্বংসের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ ইতিহাসে দেখিতেছি,—"লোকে প্রাণভয়ে গৌড় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। লোকে চিরসঞ্চিত অর্থরাশিও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। ভূ-গর্ভে বহু অর্থ প্রোথিত ছিল। লুণ্ঠনের ভয়ে সেকালের লোকে ভূ-গর্ভে অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিত; তৎসমস্ত ভূ-গর্ভেই থাকিয়া গেল। ইহার পর আর গৌড়ে রাজধানী হয় নাই। অতি অল্প লোকই গৌড়ে থাকিল। ব্যাঘ্র, মহিষ, শূকরাদি জন্তু গৌড়ের হর্ম্ম্যাবলী অধিকার করিল। লোকের মনে ভূতের ভয় হইল। লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল, গৌড়ের ময়দানে রাত্রিকালে মৃত সেনাগণ শ্রেণীবন্ধ হইয়া রণক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। ......কেহ কেহ বলেন, মুনিম খাঁর সেনাগণ উড়িষ্যা হইতে যে রোগ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই গৌড় ধ্বংস পায়।" (৬) কিন্তু গৌড় যাহাতে বিধ্বস্ত হয়, তাহা যে ম্যালেরিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়াকে উপরোক্ত মহামারীর কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। গৌড়ের পূর্বদিকে যে জলাভূমি (বিল) ছিল, তাহাতে নগরের জল যাইয়া পড়িত। "গৌড়ের পূর্বদিকে যে সুন্দরগড় বিরাজিত, তাহার পূর্বদিকে বহু দ্বীপবেষ্টিত একটি জলাশয় দেখা যায়। বর্ষাকালে জল বৃদ্ধিতে জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া গেলে নগর জলমগ্ন হইয়া যায়।" (৭) ইহাতে নগরের উপকার ব্যতীত অপকার হইত না। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাদির শাহ্ জলপ্লাবন হইতে নগর রক্ষার জন্য নগরের চারিদিকে উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করেন। ইহাতে জল নির্গমের পথ থাকাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই; কিন্তু পরবর্তীকালে আর একজন রাজা আর একটি উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করেন। ইহার ফলে, শহরের জল নির্গম বন্ধ হওয়ায় নগরের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় ও নগর বিশেষ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই জন্যই সোলেমান কররাণী রাজধানী গৌড় হইতে টাণ্ডায় (টাঁড়া) স্থানান্তরিত করেন। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে, গৌড় নগর ধ্বংসের কারণ "অরাজকতা" নয়। সুরেনবাবু আলোচ্য ছড়াগুলিকে 'উত্তরবঙ্গের শাঁখবোল' নামে অভিহিত করিয়া ইহাদের জন্মস্থান এবং জন্মকাল সম্বন্ধে যে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইতিহাস আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। এই ছড়াগুলির জন্মস্থান যে গৌড়, তাহা আমিও বিশ্বাস করি; তবে আমার মতে সে গৌড় ইতিহাসোক্ত গৌড় দেশ নয়, মালদহ জেলার অন্তর্গত যে ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড বর্তমানেও গৌড় নামে পরিচিত তাহাই। এ ক্ষেত্রে ছড়াগুলির নাম 'উত্তরবঙ্গের শাঁখবোল' না হইয়া 'মালদহের শাঁখবোল' হওয়াই বোধ করি সমীচীন।

কিন্তু শাঁখবোলের "আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক ক্রমধারা (ancient cultural tradition)" বলিতে সুরেনবাবু কি বুঝিয়াছেন, তাহা সত্যই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি ইঙ্গিত করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার "ক্রমধারার" দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলেও শাঁখবোলের সত্য-নির্ধারণে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। শাঁখবোলের প্রতি অন্ধ অনুরাগ বর্জন করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অতি সহজেই এ সত্যের উপলব্ধি হইবে যে, "অতীত শিক্ষা, অতীত সভ্যতা ও অতীত গৌরবকাহিনীর" কোন প্রমাণ এই ছড়াগুলির মধ্যে বাস্তবিকই নাই। সেকালের অনুন্নত পল্লী-সমাজের একটা অস্পষ্ট ছবি এই ছড়াগুলির মধ্যে লুকাইয়া আছে সত্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সে ছবিতে গৌরব করিবার মত কিছু নাই। যাহা আছে, তাহা অশিক্ষা এবং অনেক ক্ষেত্রে অসভ্যতা বলিলেই বোধ করি সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। একটি গৃহস্থবাড়ী,

* পাঠান রাজত্বকালেই বিহার ব্যতীত অধীন সমুদয় রাজ্যের 'বাঙ্গলা' নাম হয়। —গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)।

(4) Stewart's History of Bengal.

(5) Tabkat-i-Akbari.

(৬) গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)।

(7) Ain-i-Akbari.

শস্যক্ষেত্র, লাঙগল, একটি চোর এবং তাহার পরই কোলাহল,—এই কয়টি কথায় যদি একটি জাপানী কবিতা রচিত হইত, তবে আমরা স্বচ্ছন্দ মনে মুদ্রিত নেত্রে ভাবিতে পারিতাম,—সহজ সরল ধর্মপ্রাণ গৃহস্থের আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচায়ক সোনার লাঙগল সুশোভিত গোময়লিপ্ত প্রাঙগণে অকস্মাৎ অরাজকতাপুষ্ট রক্তলোলুপ দস্যুদলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং শান্তিপ্রিয় নিরীহ গ্রামবাসিগণ প্রাণভয়ে যুক্তপাণি হইয়া 'ন হন্তব্যম, ন হন্তব্যম' রব তুলিয়াছে; কিন্তু মুস্কিল এই যে, ইহাতে কল্পনার অবকাশ থাকিলেও ঐতিহাসিকতা কি পরিমাণে থাকিত, তাহা বিচার্য। প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন বলিয়া যদি কেহ এই ছড়াগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তবে নিঃসন্দেহেই তিনি ভুল করিবেন। শাঁখবোলের এমন অনেক প্রাচীন ছড়া আছে, অশ্লীলতার দোষে যাহা ভদ্রসমাজে অচল। সংস্কৃতি তো অনেক বড় কথা, কোনরূপ শিক্ষার পরিচয়ই ইহার মধ্যে নাই। সুরেনবাবু অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জিত সুসম্বন্ধ প্রাচীন এমন কোন ছড়ারই উল্লেখ করিতে পারিবেন না, "জাতির অতীত শিক্ষা, অতীত সভ্যতা ও অতীত গৌরব কাহিনী" যাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে থাকিয়াও "সাংস্কৃতিক ক্রমধারা" অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না যে, এই সমস্ত ছড়া অশিক্ষিত এবং অমার্জিতরুচির পল্লী-কবিরাই রচনা করিতেন। এরূপক্ষেত্রে সংস্কৃতির পরিচয় যদি এই ছড়াগুলির মধ্যে স্থান না পাইয়া থাকে তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। প্রাচীন হইলেই যে তাহার মধ্যে প্রাচীনকালের একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ থাকিতেই হইবে, এরূপ কোন কথা নাই এবং শাঁখবোল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখা যাইবে, সে ধরণের কিছু ইহার মধ্যে নাইও। অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছড়ার কথা বাদ দিলাম, কিন্তু নির্দোষ ছড়ার মধ্যেও যাহা আছে, সুরেনবাবু রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা, "অজস্র-ভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ।" প্রাচীন সংস্কৃতির কথা রবীন্দ্রনাথও বলেন নাই। "সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য প্রকাশের উপকরণ আছে" কবিগুরু তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। রসবোধ যাহার সত্য-সত্যই আছে, উপকরণের প্রাচীনত্ব হেতু সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার জন্য তাহাকে অতীতের নিকট নেত্র-ভিক্ষা করিতে হইবে না।

> " * * * সরসীর
> প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
> শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
> বসিয়া সুন্দরী, * * *
> * * * * *
> * * * তৃণাঞ্চিত তীরে
> জল কলকল স্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে
> সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
> ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
> ধূসর ডানার মাঝে, * * * "

(বিজয়িনী—রবীন্দ্রনাথ)

বলিলে প্রাণের যে আনন্দ প্রকাশ পায়,

> "ও পারেতে বগলা গো চ'রে
> খায় কুসুমের ফুল।
> জগতরাণী সিয়ান গো করে
> পাঁজা পাঁজা চুল॥"

(শাঁখবোল)

বলিলেও সেই একই আনন্দ প্রকাশ পায়। পার্থক্য কেবলমাত্র ভাষার। প্রাণের আনন্দ 'বর্দ্ধমানের সীতাভোগ' নয়, সুতরাং স্থান কাল ভেদে তাহার আস্বাদনের তারতম্য ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

পল্লী-কবিতার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া সুরেনবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই যে, শাঁখবোলের বিষয়বস্তু গুরুতর। গুরুতর ব্যাপারকেই পল্লী-কবি সহজ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ "পল্লী-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভাষার স্বাধীনতায় এবং ভাবের মাধুর্যে।" পল্লী-কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এ সত্য আমাদেরও অবিদিত নয়, কিন্তু মনে হইতেছে সুরেনবাবু 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' ভাণ্ডারের মণি-মুক্তা দেখিয়া তাহারই লোভে 'উত্তরবঙ্গের শাঁখবোলের' ভাণ্ডার খুঁজিতে বসিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে এ প্রচেষ্টা যে পণ্ডশ্রম মাত্র, উভয় শ্রেণীর গীতিকার গতি-প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। 'ছেলে ভুলানো ছড়া' জাতীয় দুই একটি ছড়া পরবর্তীকালে শাঁখবোলের ছড়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই, শাঁখবোলের সব ছড়াতেই এই 'ছেলে ভুলানো ছড়ার' বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সামান্য কয়েক ছত্রে অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর বিষয়ের প্রতি দ্রুত ইঙ্গিত করিয়াই শাঁখবোলের কবি কাব্য-রচনা সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন; পূর্ববঙ্গ গীতিকার কবির ন্যায় করুণ রসাত্মক বিষয়বস্তু লইয়া নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি করিয়া কাহিনী (ballads) রচনার দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। কবির কথায়, "সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য প্রকাশের উপকরণ আছে," শাঁখবোলের কবির কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতায় সেগুলি বায়োস্কোপের ছবির মত একটির পর একটি করিয়া মানস-পটে একবারমাত্র আবির্ভূত হইয়া পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হইয়া যায়। কবি যেন কল্পনার মায়া-কাননে প্রবেশ করিয়া ফুল লইয়া, পাখী লইয়া ইহার কান মলিয়া দিয়া, উহার চুল টানিয়া দিয়া ছেলেখেলা সুরু করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকতাকে তিনি গ্রাহ্যও করেন না; সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহার এতটুকুও দায়িত্ববোধ নাই। যে লাঙগলটা, চোরটা, বুড়ো-বুড়িটা, রামা-শ্যামটাকে লইয়া তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী, তাহাদেরই উপর রং চড়াইয়া কবি তাঁহার মনের মত এক সৌন্দর্য লোকের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। সেখানে গৃহস্থ-বাড়ীর তাড়া খাইয়া পলাইতে পলাইতে চোর নিমগাছের সীম তুলিয়া খাইলেও রসের জগতে কবির পদস্খলন হয় না। শাঁখবোলের ছড়াগুলি এই কারণেই আমার নিকট লোভনীয় এবং কবির এই একান্ত শিশুসুলভ সৌন্দর্যবোধের উপর ভিত্তি

করিয়াই আমি ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

এইবার সোনা রায় দক্ষিণ রায় ও ইহাদের সহিত এই ছড়াগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সুরেনবাবু ব্যাঘ্র-দেবতা সোনাপীরের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। একটু অনুসন্ধান করিলেই তিনি জানিতে পারিবেন যে, এই সোনাপীর এবং সোনা রায় এক এবং অভিন্ন। সোনা রায় নামে বৈদিক, পৌরাণিক অথবা লৌকিক কোন শস্য-দেবতা কোন-দিন ছিলেন না এবং বর্তমানেও নাই। একই দেবতাকে মুসলমানেরা সোনা পীর এবং হিন্দুরা সোনা রায় বলিয়া থাকেন। বাঘপূজা, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লৌকিক আচার। সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণের ন্যায় সোনাপীর এবং সোনারায়ও একই দেবতার নামান্তর মাত্র। সোনারায় ব্যাঘ্র-দেবতা বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত। বর্তমান গৌড়ে এই দেবতার নামে যে গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা সোনারায়ের গড় নামে পরিচিত। ইতিহাসের 'পাথরে প্রমাণ' এই দেবতার অস্তিত্বের নিদর্শন। সোনারায়ের গড় 'রামকেলি যাইতে বামদিকে পড়ে। গৌড় নষ্ট হইলে তথায় বাঘের বড় উৎপাত হয়। সোনারায় বাঘের দেবতা; তাঁহার বেদী এই গড়ের উপর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উহার 'সোনা-রায়ের গড়' নাম হয়।" (৮) এই প্রমাণের পরও সোনারায়কে "শস্য-দেবতা" মনে করিবার বোধ হয় কোন কারণ নাই।

সোনারায় ও দক্ষিণরায় যে একই দেবতা, উপরোক্ত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রাচীন পাঁচালী-সাহিত্যে দেখিতে পাই, এই সোনারায় বা দক্ষিণরায়ের ফকিরের বেশ। এই কারণেই মুসলমানগণের নিকট ইনি "পীর" নামে পরিচিত। দক্ষিণরায় সুন্দরবনের দেবতা। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার প্রদেশে প্রভাকর রায় নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। প্রভাকর সদাশিবের উপাসক ছিলেন; তিনি বিশ্বাস করিতেন, দক্ষিণ রায়কে তিনি সদাশিবের বরে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন।*

(৮) গৌড়ের ইতিহাস (২য় খণ্ড)।

* রায়-মঙ্গল।

এই সদাশিবের সহিত শাঁখবোলের সম্পর্ক আছে বলিয়াই মনে হয়। শাঁখবোলের ছড়া গাহিবার সময় বালকগণ গানের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে 'শিব'-ধ্বনি করিয়া থাকে। এই শিব রাজা প্রভাকর রায়ের উপাস্য-দেবতা সদাশিব হওয়াই সম্ভব। আমরা অবশ্য জানি, বৈদিক রুদ্র যখন লৌকিক শিবরূপে রূপান্তরিত হইলেন, তখন ত্রিশূলের পরিবর্তে তাঁহার হাতে লাঙ্গল তুলিয়া দেওয়া হইল এবং লৌকিক শিব কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রের নিকটে শিব ভূমি ভিক্ষা করিতেছেন—

"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ॥"[1]

সুতরাং ধান্যক্ষেত্র এবং লাঙ্গলের প্রসঙ্গে 'শিব'-ধ্বনি হয়ত স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা হইলে বাঘের প্রসঙ্গেও 'শিব'-ধ্বনি করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্যই মনে হয়, শাঁখবোলের শিব, শূন্য-পুরাণ বা শিবায়ন বর্ণিত কৃষিজীবী শিব নহেন, তিনি দক্ষিণরায় সম্পর্কিত সদাশিব।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। সুরেনবাবু শাঁখবোল এবং বাঘপূজা সম্পর্কে যে কৃত্যানুষ্ঠানের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রথমটির কলা-গাছের পরিবর্তে দ্বিতীয়টির ব্যাঘ্র-মূর্তি ব্যতীত উভয়বিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্য কোনরূপ পার্থক্য তিনিও উল্লেখ করেন নাই, অথচ বলিতেছেন, শাঁখবোল এবং বাঘপূজা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কলাগাছ ব্যাঘ্র-মূর্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। মালদহ জেলার কোন কোন অঞ্চলে শাঁখবোল উপলক্ষে বনে যাইয়া সোনাপীরের নামে খিচুড়ী সিন্নী দিয়া বালকগণের বনভোজন করিবার রীতি আছে। বনভোজন এবং পৌষ-পার্বণের সহিত শাঁখবোলের সম্পর্ক থাকিতে পারে; পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। (২৪।৪।৩৯)

[1] রামেশ্বরের শিবায়ন।

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(১৩)

অমরের পশ্চাতে সম্পূর্ণ অপরিচিতা একটি পরমা সুন্দরী নারীকে প্রভার শয্যাপ্রান্তে আসিতে দেখিয়া শুশ্রূষারতা চারু সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে জিজ্ঞাসুনেত্রে অমরের দিকে চাহিলে অমর কহিল, "এ লীলা, আমার একটি বোন! বাড়ী থেকে এক সংগেই এসেছি! সংগে ওর স্বামী নরেনবাবু আর বন্ধু সতীশবাবুও আছেন। তাঁরা সব নীচে রয়েছেন। তোমার মেজদির অসুখের কথা শুনে ও দেখতে এসেছে।"

চারু স্মিতমুখে লীলাকে নমস্কার করিয়া হাত ধরিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। পরে বলিল, "মেজদির কাছে আপনার নাম শুনেছি, তা ওঁরা নীচে রইলেন, উপরে এলেন না?"

অমর কহিল,—"যেচে ত আর আসতে পারেন না।"

চারু প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইল। কুণ্ঠিত লজ্জায় ঈষৎ আরক্ত হইয়া পরে কহিল,—"আপনার লোকেরা অভ্যর্থনার অপেক্ষা করেনা।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চারু বাহিরে আসিয়া বাড়ীর ভৃত্যকে ডাকিয়া নীচের বাবু দুটিকে উপরে আনিয়া বসাইতে বলিল।

চারু চলিয়া গেলে লীলা বলিল,—"বৌদির বোন?"

অমর বলিল,—"হাঁ বেথুন কলেজে পড়ে; নাম চারু।"

"বেশ মেয়েটি কিন্তু"—বলিয়াই লীলা একটু হাসিল।

চারু ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রিতা রোগিণীকে একটু নাড়া দিয়া ডাকিল,—"দেখ মেজদি, কারা এসেছেন।"

প্রভা চোখ মেলিয়া চাহিল। লীলা অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "বৌদি!"

বিস্ফারিত চোখে প্রভা লীলার পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "আজ কদিন অসুখে প'ড়ে তোমার কথাই ভাবছি ঠাকুরঝি! এত শীগ্গির যে তোমায় কাছে পাব তা কিন্তু ভাবতে পারিনি! তুমি কোত্থেকে এলে ভাই?"

লীলা তার পিত্রালয়ে যাওয়া এক সাথে এক গাড়ীতে অমরের সঙ্গে আসা এবং তাহার অসুখের কথা শুনিয়া বাড়ী না যাইয়া বরাবর এখানেই চলিয়া আসা প্রভৃতি সব কথাই সংক্ষেপে প্রভাকে বলিল।

শুনিয়া প্রভা কহিল, "তুমি এসেছ তবু দেখা হ'ল। আমি আর বাঁচবনা ভাই,—যাবার বেলায়—!"

প্রভার কথা শেষ করিতে না দিয়াই লীলা বলিল, "কি যে তুমি বলছ বৌদি, অসুখ বুঝি আর কারুর হয় না! আমি নিশ্চয় বলছি তুমি ভাল হ'য়ে যাবে।"

প্রভা কহিল, "বাঁচা মরা ত মানুষের হাতে নেই ভাই! যদি আর নাই বাঁচি! আমি মরব তার জন্য আমার দুঃখ নেই ঠাকুরঝি, কিন্তু আমার যে শিশু অতিথি পৃথিবীর আলোতে মুক্তি পেতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, এই দারুণ রোগ যাতনায় সে কি ক'রে বাঁচবে ভাই!"

লীলা এ সংবাদ জানিত না। বলিল, "তুমি ভেবনা বৌদি, অমরদা আমার আজ পর্য্যন্ত এমন কোন পাপই করেন নি যার জন্যে এ কুসুম কলিটি অকালে ঝরে পড়বে।"

প্রভা তাহার দুর্ব্বল ডান হাতখানি লীলার কোলের উপর রাখিয়া বলিল, "এই দেখ, দেহে এক ফোঁটা রক্ত নেই, রোজই জ্বর হচ্ছে। এত জ্বর এ দেহে কি ক'রে সইবে!"

"শিশুর পিতার পুণ্যের বলে সে সবই সইতে পারবে বৌদি! আজও তুমি এই মানুষটিকে চেনোনি—তাই তোমার এত ভয় হচ্ছে!"

এইবার প্রভা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল,—"এতদিন সত্যি চিনতে পারিনি ভাই! সবে চিনতে যাচ্ছিলাম। তাইত ভয় পাচ্ছি ঠাকুরঝি যে, এমন পাপ তাঁর কি আছে, যে আমার মত কুরূপা হৃদয়হীনাকে নিয়েই তাঁর সারাজীবন কাটাতে হবে।"

কথা কয়টি বলিয়াই প্রভা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অমর অগ্রসর হইয়া কহিল, "খানিক চুপ ক'রে থাক না,—অত কথা কইলে অসুখ বাড়বে যে!"

পরে লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "নরেনবাবুরা অনেকক্ষণ ব'সে আছেন লীলা।"

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এখন তবে আসি বৌদি,—তুমি ভেবনা, কাল আবার আসব।"

চারু লীলার সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করিল। অমরের পানে ফিরিয়া বলিল, "বেশ ত, তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! আপনার বোনকে তাড়ালেও আমাদের কুটুম আমরা ছাড়ছিনে!"

লীলা হাসিল। বলিল, "এখনও আমাদের বাড়ী যাওয়া হয়নি ভাই, কাল আবার আমরা সবাই আসব।"

তবু চারু সহসা ছাড়িতে চাহিল না। বারবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া লীলা চারুর হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল।

চারু অমরের ব্যবহারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "ওকে তাড়িয়ে দিলেন কেন?"

অমর হাসিল। সে হাসি উজ্জ্বল নয়, ম্লান। কহিল, "তাড়িয়ে দিলাম কেন! তোমার মেজদি যে বেশী বকছিলেন। রোগীর পক্ষে বেশী কথা বলা কি ভাল!"

অমর একটু থামিয়া বলিল, "অসুখের সময় মানুষ হ'য়ে পড়ে একটু বেশী ইমোশনাল। ঝোঁকের মাথায় কি ব'লে বসবে—তাতে অতিথির অমর্য্যাদাও ত হ'তে পারে।"

চারু একবার প্রভার মুখ পানে চাহিয়া কি ভাবিতে চেষ্টা করিল। প্রভা অমরের দিকে তাকাইয়া মলিন মুখে বলিল, "দেখ, মানুষের সবদিন কিন্তু সমান যায় না। একবার ভুল করলে কি চিরকাল সেই একই ভুলের বোঝা ব'য়ে বেড়াবে?"

একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া একটু থামিয়া প্রভা বলিল, "তুমি এখন জামা-কাপড় ছেড়ে, জলটল কিছু খেয়ে আমার কাছে এসে বস। মরেই যদি যাই—আর ত তোমায় বিরক্ত করতে আসবনা!"

অমর ঈষৎ-হাস্যে বলিল, "তোমার বিরক্তি থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনা কিন্তু ভগবানের চরণে কোনদিনই করিনি!"

"সে তোমার দয়া,—কিন্তু করাই যে তোমার সব চেয়ে বেশী উচিত ছিল।"

অমরনাথ প্রভার কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া চলিয়া আসিল। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি বাড়ীর অপরাপর

সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া অমর প্রভার শয্যাগৃহে আবার ফিরিয়া আসিল।

প্রভার উত্তপ্ত ললাটে নিজের শীতল দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া অমর কহিল, "খুব কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

প্রভা বলিল, "হচ্ছে কষ্ট—খুব নয়। এখন যেন একটু আরাম পাচ্ছি! দেশে বাবা-মা সব ভাল আছেন? তুমি না বম্বে গিয়েছিলে, কবে ফিরেছ?"

অমর কহিল, "বাড়ীতে সবাই ভাল আছেন। এইত ৪।৫ দিন ফিরেছি। খুব ভয় পেয়েছ তুমি?"

প্রভা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় একটু পেয়েছিলাম বইকি। নিজের জন্য ততটা নয়, যতটা যে দেবশিশু আস্‌ছে তার জন্য!"

"ভগবান রয়েছেন, ভয় কি! মঙ্গলময় তিনি- তোমার আমার মঙ্গলের জন্য—তাঁর কাজ তিনি করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর কর!"

"ভগবান—তাঁকে ত দেখিনি। শাস্ত্রে বলে স্বামীই নারায়ণ! লীলা ঠাকুরঝি যে বল্‌লে, তোমার পুণ্যের বলে তোমার ছেলে বাঁচ্‌বে! কি বিশ্বাস তাঁর তোমার ওপর! এবার এলে তাকে বল্‌ব, তোমার ঐ অটল বিশ্বাসের একটু কণা আমায় দিয়ে যাও ভাই, আমার নারী জন্ম সার্থক হোক! লীলার মত বড় ভক্ত তোমার আর কেউ নেই। এবার যদি বাঁচি, সত্যি করে বলছি, শিখে নেব তার কাছ থেকে, কি করে তোমার ভক্ত হওয়া যায়। কোন্ নামে ডাক্‌লে তুমি ধরা দাও বাঁধা পড়!"

অমর প্রভার রুক্ষ কেশে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে কহিল, "বাঁধা কি আজও পড়িনি—বল্‌তে চাও?"

"এ ত তোমার সত্যিকারের বন্ধন নয়! এ যে তোমার দয়া! আমার সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা ক'রে আমাকে দয়া করেছ! আমি যে তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্য নই, এ-কথা আমি কোন দিনই ভুলব না। তুমি সুন্দর আমি যে কুৎসিত!"

"বাইরের রূপই ত একমাত্র ভালবাসার বস্তু নয়, প্রভা!"

"গুণই বা আমার কি আছে! হৃদয়হীনা দাম্ভিকা আমি,—ঈর্ষায় আমার সারা বুক ভরা। কোন্ গুণে তুমি আমায় ভালবাস্‌বে! আমার কি মনে হয় জান, মনে হয়, আমি শীগ্‌গির মরে যাই, তুমি দেখে শুনে আবার বে কর!"

"আমি যদি বলি, তোমাকে আমি ভালবাসি—তুমি মরে গেলে আমি আর বে করবনা। বিশ্বাস কর্‌বে না তুমি আমার কথা?"

"সত্যি তুমি আমায় ভালবাস? একটুও কৃত্রিমতা নেই—এতটুকু দয়া নেই এতে? সত্যি ক'রে বল তুমি, আমার যে আবার বাঁচতে সাধ হচ্ছে!"

"আমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছনা প্রভা?"

"অবিশ্বাসও ত করতে পারছিনে। মিথ্যা ত কোনদিনই বলনি! যেদিন নূতন অতিথি আসবে বলে সাড়া জেগেছে দেহে সেইদিন থেকে আমি কি ভাবছি জান, ভাবছি—বঞ্চিত হয়ত তুমি আমায় করনি; নিজের কর্মদোষে নিজেই বঞ্চিত হয়েছি। লীলা ঠাকুরঝিকে নিয়ে কতনা ঈর্ষার গরলই আমি তোমার ওপর ঢেলে দিয়েছি, আর তুমি নীলকণ্ঠ হয়ে সে বিষ নিঃশেষে পান ক'রে হাসি মুখে স্বামীর কর্তব্য করে এসেছ। এতটুকু আঘাতও তোমার লাগেনি! কি নির্বিকার মানুষ তুমি! চিরটা কাল তোমার ওপর অবিচার ক'রে এসেছি অথচ সুবিচারের দাবী কোন দিনই ছাড়্‌তে পারিনি। তোমাকে আঘাত দিয়েছি, তার প্রতিঘাত আমার বুকেই এসে বেজেছে। লীলাকে ডেকে এনে অপমান করেছি, সেও নীরবে সয়ে গেছে। তোমাদের ভাই বোনের গায়ে কি গণ্ডারের চামড়া! তুমি ত জান না, কত কথায়, কত ছলে—তুমি যখন থাক্‌তে না, লীলাকে ডেকে এনে কত অকথ্য ভাষায় গায়ের বিষ ঝেড়েছি! জান তুমি সে সব কথা—কোন নালিশ করেনি তোমার কাছে?

কথায় কথায় প্রভা অনেক কথা কহিতেছে দেখিয়া অমর কহিল, "অত কথা কয়োনা প্রভা, অসুখ বাড়্‌বে!"

প্রভাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অনিচ্ছায়ই চুপ করিতে বাধ্য হইল।

সেদিন সেইভাবেই কাটিল। সকালে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন—এখনও শিশু জীবিত আছে। কিন্তু জ্বর না কমিলে কি হইবে বলা যায় না!

অমরনাথ স্বহস্তেই প্রভার শুশ্রূষা করিতেছিল; প্রভাও অমরের হাতের সেবাই চাহিতেছিল। সারারাত্রি অমর প্রভার শয্যাপ্রান্তে জাগিয়া কাটাইয়াছে, প্রভাও ঘুমাইতে পারে নাই। কথার দেবতা তার কণ্ঠে আসিয়া ভর করিয়াছিল। কথা আর ফুরাইতেছিল না। এত আবেগ, এত উন্মাদনা, স্বামীর প্রতি এত অনুরাগ এত দিন কোন্ পাষাণ-কারায় আবদ্ধ হইয়া গুমরিয়া ফিরিতেছিল যে, আজ এই রুগ্নাবস্থার ছিদ্র পথে বাঁধভাঙা বন্যার মত উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছে?

অমর বাধা দিল, প্রতিরোধ করিতে পারিল না। দেখিল হৃদয়াবেগ কোন নারীরই কম নহে। অভ্যাস যদি বাধা দেয়, প্রকৃতি যদি তার গলা টিপিয়া ধরে, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যদি তার মুখ বন্ধ করিয়া রাখে এবং সে মরে না। সুবিধা সুযোগ পাইলে সে একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই!

রাত্রিতেই কথায় কথায় প্রভা অমরকে বলিয়াছিল, "দেখ, সব চেয়ে আমার মনে কিসে বেশী ব্যথা দিচ্ছে জান, তোমার ওপর আমার অপ্রিয় বাক্য, রূঢ় আচরণ। মেয়েদের একটা বড় মাধুর্য যে বিনয়-নম্রতা তা তুমি আমার কাছে কোন দিনই পাওনি! কত রূক্ষ কথায়ই না তোমার মন বিষিয়ে তুলেছি! আজ আমার সে ব্যবহার মনে ক'রে কি যে দুঃখ পাচ্ছি—তা তোমায় বোঝাতে পারব না।"

অমর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, প্রভা বলিয়া যাইতেছিল,—"সেদিনকার সেই কাজটি মনে ক'রে যে ক্লেশ পাচ্ছি—এ রোগ-যন্ত্রণা তার শতাংশের একাংশের তুল্যও নয়। যেদিন লীলার ফিরিয়ে দেওয়া সেই নীল সাড়ী পরে দাঁড়িয়েছিলাম! তোমার মুখে সেই সেদিনকার অসহ্য ব্যথার করুণ ছাপ আমি জীবন থাক্‌তে ভুলতে পারব না। অত ব্যথাক্লিষ্ট মুখ তোমার আর কোনদিন দেখিনি। তোমার হৃদপিণ্ড যেন আমি টেনে ছিঁড়ে মুচড়ে দিয়েছিলাম। সেদিনকার দেওয়া সে ব্যথা আজ নিজের বুকেই ফিরে পাচ্ছি। হাহাকারে সারা বুক ভরে উঠেছে আমার—!

প্রভার নীরক্ত আঁখি-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

অমর নীরবে শুনিতে লাগিল। প্রভা কহিল, "আমায় তুমি ক্ষমা কর! ইচ্ছায় ত আমি করিনি! যেদিন আমি শুনলাম, আমি তোমার কেউ নই, লীলাই তোমার সব, নিজের প্রাণের এতটুকু অবশিষ্ট তুমি রাখনি, শুধু তোমার প্রাণহীন সন্দেশ দেহটি আমার জন্য রেখেছ, তখন ঈর্ষায় আমার সারা বুক ভরে উঠ্ল। দক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ভাবলাম কেন তুমি আমায় আন্‌লে! ভালই যদি বাসতে পারবে না এ অভিনয়ের তবে কি প্রয়োজন ছিল! কি অধিকার ছিল তোমার আমার তরুণ জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবার!"

তারপর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রভা বলিয়াছিল, "মানুষে মানুষের ভাল দেখ্‌তে পারে না। কি প্রয়োজন ছিল তাদের আমার কাছে লীলার কাহিনী বল্‌বার। আমি ত জানতে চাইনি। মানুষ নাকি মানুষের এত মিথ্যেও বলতে পারে! আজ আমি বুঝতে পারছি, যারা অযাচিত আত্মীয়তা দেখিয়ে আমার এমন সর্বনাশ ক'রে ভেবেছিল আমার পরম উপকার করছে, তারা কত বড় হৃদয়হীন! তুমি জান না ঈর্ষার কি জ্বালা! সে জ্বালায় মানুষ কত নীচে নেমে যেতে পারে!"

এইবার অমর বলিয়াছিল, "এ তোমার পক্ষে স্বাভাবিক,—তোমায় আমি দোষ দিইনে প্রভা!"

"স্বাভাবিক! হয়ত হতে পারে। কিন্তু ত্রুটিও ত আমার নিতান্ত কম ছিল না। অনুসন্ধান না ক'রেই তোমার ওপর অবিশ্বাস করা যে আমার কত বড় অন্যায় হয়েছিল তা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবনা! কি অপরাধ করেছিল লীলা আমার কাছে! আমি আসবার পূর্বে সে ত জানতে পারেনি তারই প্রাপ্য আসনে আর কেউ এসে বসবে' আমি যখন এসে পড়লাম তখন কোন দাবী নিয়েই ত সে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়নি। তবু কেন আমার এত হিংসে হল! কেন তাকে ক্ষমা করতে পারলাম না জান! সে সুন্দর তাই! মনে হ'ত আমি রিক্ত—আমি নিঃস্ব, আমি কেমন করে তোমায় পেতে আশা করতে পারি। দেহের দৈন্য ঢেকে রাখবার মত মনের ঐশ্বর্য যদি আমার থাকত, হয়ত আমি অতটা মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌তাম না। বাধা ত জীবনে কোনদিন পাইনি। বঞ্চিত জীবনের ব্যর্থতার বেদনা কি ক'রে বুঝব বল। সুখ ঐশ্বর্যের কোলে বড় হয়ে উঠেছি, চিরদিন নিজের ভালমন্দ ছাড়া ত অন্য কিছু চোখে পড়েনি! নিজের দোষ-ত্রুটি কোথায় কেউ কোনদিন দেখিয়ে দেয়নি। তুমিও দাওনি! বে'র পর মনে হয়েছিল এই কুরূপাকে বুঝি পাশে ঠাঁই দেবে না! কিন্তু তোমার অনাদর না পেয়ে অহংকার আমার বেড়েই চলল!"

অমরনাথ প্রভার বাক্যস্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিয়াছিল, "কেন এই অসুস্থ শরীরে অত বকে বকে অসুখ বাড়াচ্ছ! পেছনে ফেলে আসা দিনের কথা মনে ক'রে পুরাতন ক্ষতকে নূতন ক'রে বাড়িয়ে তোলার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই প্রভা!"

প্রভা প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, "আছে। আঁধারের মানুষ আলোতে এসে, পেরিয়ে আসা অন্ধকারের পানে চেয়ে তার দুঃখের চেয়ে সুখই হয় বেশী। এতে আমার অসুখ বাড়বে না। বুকের বোঝা ক্রমে হাল্কা হয়ে আসছে আমার, বেশ আরাম পাচ্ছি আমি! কৃত্রিমতা দিয়ে তোমায় বাঁধবার আশা যে আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল তা আমি অল্প দিনেই টের পেলাম। বুঝলাম যা একটু ধরা ছোঁয়া দিয়েছ বিয়ের ঐ কটা মন্ত্রের বাঁধনে! আমি তৃপ্তি পেলাম না। অতৃপ্তি নিয়ে আমার ত্রুটি কোথায় খুঁজতে ইচ্ছে হল। তারপর এক দেবশিশু চোখে তার মায়াকাজল, এসে হাতছানি দিলে সে ভাবী সন্তান। আসন্ন মাতৃত্বের আনন্দে গর্বে মন আমার ভরে উঠ্‌ল। এইবারে তোমায় বুঝতে চেষ্টা করলাম! তুমি কাছে নাই প্রাণ আমার তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমারই ঐ বোন্ চারু আমায় বুঝিয়ে দিলে ত্রুটি আমার কোথায়! লীলার কথাও তাকে সব বললাম। সব কথা শুনে চারু বল্‌লে, লীলার সঙ্গে তার পরিচয় নেই—দেখা হ'লে তার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নেবে! আমি তাকে কি বলেছি জান, বলেছি আমি যদি তোর বে'র আগে মরি তোর দাদাবাবুকে বে' করিস! শুনে সে হেসে বল্‌লে, 'আমি যদি তোমার বড় হয়ে জন্মাতাম—আর আমার সঙ্গেই দাদাবাবুর বে' হ'ত—লীলাকে ডেকে এনে,—যখন জানতাম সেই তাকে আগে ভালবেসেছে—বলতাম—তোমায় ভালবাসি ভাই! যদি তুমি চাও—যার ভাগ কেউ দিতে পারে না সেই স্বামীর ভাগও তোমায় দিচ্ছি তুমি নাও! সে নিশ্চয়ই নিত না। আমার বস্তু আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে আমার কাছে পূজনীয় দেবী হ'য়ে থাকতো!' আমি এখন তাই ভাবি সত্যি কি কেউ স্বামীর ভাগ দিতে পারে?"

অমরনাথ বলিয়াছিল, "চারু ছেলেমানুষ এখনও তার তরুণ প্রাণ কোমল! স্বপ্নের চোখ দিয়ে সংসারকে দেখ্‌ছে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার প্রেমের ব্যর্থতায় যে পাঠক-পাঠিকার মন গলে যায়, চারুও তেমনি হয়ত ও-কথা বলে থাক্‌বে! কিন্তু কেউ তা পারে কিনা আমি জানি না। নারীত্বের মাঝে যার দেবীত্ব পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, নিজের পাওয়াকেই যে সবটুকু না ভেবে পরকে দেওয়ার মধ্যে মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছে সে হয়ত পারে প্রভা! নেওয়াই তার তখন চরমলাভ নয়, দেওয়াই তার পরম তৃপ্তি! দেওয়ার আনন্দে সে ভেসে চলে যায়,—লোকে ভাবে পাগল!

তারপরই প্রভা চুপ করিয়া গিয়াছিল। অমর এবার নিজে নিজেই বলিয়াছিল, "কতটুকুই বা জানলে চারু, লীলাকে যে এরই মধ্যে সে তার ভক্ত হয়ে উঠল!"

অমর আর প্রভাকে কথা বলিতে দেয় নাই। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অমর প্রভার সেবা করিয়াছিল। সকালবেলায় ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলে প্রভা বলিল, "সারারাত তুমি ঘুমাওনি, মুখ তোমার শুকিয়ে গিয়েছে! একটু বিশ্রাম ত তোমার চাই! চারু ততক্ষণ আমার কাছে থাক্ তুমি একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে এসগে!"

অমর বলিল, "এক রাত্রি জেগে মুষড়ে পড়ার মত দুর্বল দেহ ভগবান আমায় দেননি প্রভা! আমার জন্য তুমি ভেব না। তুমি আগে ভাল হও তারপর আমি বিশ্রাম নেব।"

প্রভার পাণ্ডুর অধরে ক্ষীণহাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "ভাল যদি আর নাই হই!"

অমর প্রভার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, "ভাল

(শেষাংশ ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রিটেনের সঙ্কট

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এতই দ্রুত ঘটিয়া যাইতেছে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অদূর ভবিষ্যতের কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে 'রয়টার' যে সকল সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন, তাহা কোন কোন সময় পরস্পরবিরোধী, সেই স্ববিরোধী সংবাদ-সমূহ হইতে মোটামুটি সার সংগ্রহ করিয়া, কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। তবে ইহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধ অনিবার্য। তাহা কখন কোথায় কি উপলক্ষ্য করিয়া যে জ্বলিয়া উঠিবে—ইহাই শুধু অনিশ্চিত।

এই অনিশ্চিত অথচ অনিবার্য সম্ভাবনার সম্মুখীন হইয়া সমগ্র ইউরোপে এখন অশান্তি, আশঙ্কা ও উদ্বেগের অন্ত নাই। আশঙ্কা শুধু বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপ্রিয় অধিবাসী-দেরই নহে, যে সমস্ত রাজনীতিজ্ঞ তাহাদের ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে—তাহাদেরও, তাহারাও অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কোন সিদ্ধান্তেই যেন আসিতে পারিতেছে না। এইরূপ দ্বিধাজড়িত মনোভাব বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের মধ্যেই অধিক পরিস্ফুট। মিউনিক চুক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে ইঙ্গ-সোভিয়েট-চুক্তির আলোচনাকাল পর্যন্ত তাঁহার ও তাঁহার দলের দ্বিধা ও সঙ্কোচ পদে পদে সূচিত হইতেছে, তাঁহাদের এই বিলম্বিত নীতির জন্য একদিকে যেরূপ যুদ্ধ পিছাইয়া যাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। এবং বৈদেশিক নীতির দিক দিয়া যে কোন সিদ্ধান্তে আসিতে, অথবা অন্য কথায় ছোট বড় কতকগুলি রাষ্ট্রকে দলে টানিয়া তাহাদের লইয়া একত্রে যুদ্ধে নামিতে বৃটেনের যতই বিলম্ব হইতেছে, জার্মানও ইটালীর ততই সুবিধা হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়াও বিলম্ব না করিয়া বৃটেনের উপায় নাই। কারণ সে একা যুদ্ধ করিতে পারে না। তাহার ফ্রান্সকে চাই, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাকে চাই, বলকান ষ্টেটসমূহকে চাই, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক ও সোভিয়েট রাশিয়াকে চাই, তবেই বৃটেন নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে নামিতে পারে। তাহা না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ নিজের নিরাপত্তার দিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বৃটেন কিছুতেই যুদ্ধে নামিবে না, তাহাতে অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যাক্ আর থাক্ তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যায় না। জার্মানী ও ইতালী বৃটেনের এই মনোভাব বা এইরূপ দুর্বলতা জানে এবং ইহাও জানে যে এতগুলি রাষ্ট্রকে একমত করিয়া সামরিক চুক্তিতে আনাও সহজসাধ্য নহে, তাই এই অনুকূল অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া ক্ষিপ্র গতিতে তাহারা অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মেমেল ও আলবেনিয়া অধিকার করিয়া লইল। আলবেনিয়া অধিকার করায়, যুগোশ্লাভিয়া তাহাদের দলে আসায় ও স্পেনে ফ্রাঙ্কো-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরে ইটালীর শক্তি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার পরিমাণ এতই বেশী যে বৃটেনকে জিব্রাল্টার ছাড়িয়া আসিবার কথাও ভাবিতে হইতেছে। ভূমধ্যসাগর বৃটেনের হাত ছাড়া হইয়া যাওয়া মানে—বৃটিশ-সাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষ খসিয়া যাওয়া। এশিয়া হইতে জল-পথে বাণিজ্যের পথ ত বন্ধ হইয়া যাইবেই তাহা ছাড়া ভারত-বর্ষ রক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকা ঘুরিয়া রণতরী ও মিশর হইতে বিমানপোত আসিতে না আসিতেই আবিসিনিয়ার ঘাঁটি হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইটালীর বিমানপোত আসিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চল ধ্বংস করিয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য বজায় রাখিতে হইলে ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের শক্তি অব্যাহত রাখা একান্ত আবশ্যক, তাই ইটালী কর্তৃক আলবেনিয়া অধিকারের পরই গ্রীসের সম্মুখে বিপদ দেখাইয়া তাহাকে ভয় খাওয়াইয়া পরে তাহাকে রক্ষা করিবার ভরসা দিয়া বৃটেন তাহাকে দলে আনিতে পারিয়াছে এবং তুরস্কের সহিতও একটা সামরিক চুক্তি করিয়াছে। ইহাতে ভূমধ্যসাগরে সে কতকটা নিরাপদ হইয়াছে এবং আরও হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াকে দলে আনিতে না পারিলে এই নিরাপত্তার বিশেষ কোন মূল্যই নাই। কারণ —যুদ্ধ বাধিলে রাশিয়া যদি বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত যোগ না দেয় এবং পূর্ব সীমান্তে জার্মানীকে যুদ্ধে ব্যাপৃত না রাখে তবে পশ্চিম সীমান্তে বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তিও যে জার্মান বাহিনীর অগ্রগমনে বিশেষ বাধা দিতে পারিবে—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে সময় বৃটেন নিজের ঘরে নিজেই যদি আক্রান্ত হয়, তখন ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা লইয়া সে কি করিবে? অতএব সোভিয়েট রাশিয়াকে সে যদি কোন-রূপে সামরিক চুক্তিতে আনিতে পারে, তবেই গ্রীস ও তুরস্কের সহিত তাহার চুক্তির সার্থকতা আছে, নচেৎ উহার বিশেষ কোন সামরিক মূল্য নাই। কিন্তু রাশিয়াকে দলে আনা বৃটেনের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। তাহার কূট রাজনীতিও প্রায় ফাঁসিয়া গিয়াছে। রাশিয়া যেন দূরে সরিয়াই দাঁড়াইয়াছে।

বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন যেমন কূট রাজ-নীতিজ্ঞ, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ষ্টেলিনও তেমনি রাজনীতিক্ষেত্রে শিশু নহেন। তিনি পূর্বেই তাঁহার স্বদেশ-বাসীদের সাবধান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বৃটেন চির-কালই পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে ওস্তাদ, সে আমাদের কখনও ভয় দেখাইয়া, কখনও স্তোকবাক্য দিয়া ভুলাইয়া কোন-রূপে আমাদিগকে জার্মানীর সহিত যুদ্ধে নামাইতে চায়, আমরা যখন পরস্পর যুদ্ধ করিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িব, তখন সে মাঝে পড়িয়া মধ্যস্থতা করিতে আসিবে এবং আমাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উভয় দেশেই নিজের সামরিক ও বাণিজ্য-বিষয়ক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহাই যখন বৃটেনের মনোগত অভিপ্রায়, এবং জার্মানীর সহিতও যখন রাশিয়ার সাক্ষাৎ কোন সংঘর্ষের কারণ উপস্থিত হয় নাই, তখন কেন তাহারা অকারণে যুদ্ধের ফাঁদে পা দিতে যাইবে! ষ্টেলিনের এই কথা শুনিয়া মিঃ চেম্বারলেন আরও ভাল মানুষটি সাজিয়া পরোক্ষে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, বৃটেনের অভিলাষ সত্যই অত্যন্ত উচ্চ, তাহার নিজের কোনই স্বার্থ নাই, দুইটি ডিক্টেটরী রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়াই সে তাহাদের ভরসা দিয়াছে এবং রাশিয়াও তাহার মত তাহাদিগকে ভরসা দিক—ইহাই সে চাহিতেছে।

রাশিয়া বলিল—তাহা দিতে পারি, কিন্তু কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে গিয়া সে নিজেই যদি আক্রান্ত হয়, তবে বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাকে সামরিক সহায়তা করিবে কি? কথাটা উঠিয়াছে পোলাণ্ডকে লইয়া। বৃটেন তাহাকে ভরসা দিয়াছে, বলিয়াছে—পররাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সে যদি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায়, তবে তাহার সাহায্য পাইবে। তাহাকে এইরূপে ভরসা দিয়াই বৃটেন রাশিয়াকে বলিতেছে—পোলাণ্ড তোমারই পড়শী, সুতরাং তাহাকে রক্ষা করা তোমারও কর্তব্য। বৃটেন ভালরূপেই জানে পোলাণ্ডকে তাহার ভরসা দিবার কোনই মূল্য নাই, কারণ ডান্‌জিগ লইয়া জার্মানীর সহিত যদি পোলাণ্ডের যুদ্ধ বাধে, তবে এতদূর হইতে যাইতে যাইতেই সব শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু রাশিয়ার নিকট হইতে পোলাণ্ডকে সামরিক সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি যদি সে আদায় করিয়া লইতে পারে, তবে তাহার যাইবার বহু পূর্বেই রাশিয়া তথায় গিয়া পড়িবে এবং তাহারই সহিত জার্মানীর যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। যুদ্ধ কোনরূপে একবার বাধাইয়া দিয়া সে তখন সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে এবং যদি সে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে নাও পারে তথাপি পূর্ব সীমান্তে পোলাণ্ড ও রাশিয়াকে লইয়া জার্মানী বিব্রত থাকিলেও তাহার পক্ষে অনেক সুবিধা। রাশিয়াও মূর্খ নহে, তাহারও ঐ এক কথা; পোলাণ্ড বা অন্য কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি সে নিজেই আক্রান্ত হয়—বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক সহায়তা সে পাইবে কি না। মিঃ চেম্বারলেন এই সুস্পষ্ট কথাটার সোজা উত্তর না দিয়া ঘুরাইয়া বলিলেন—পশ্চিম সীমান্তে কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া যদি আমরা অর্থাৎ ফ্রান্স ও বৃটেন আক্রান্ত হই, তবে সেক্ষেত্রে আমরাও যেমন রাশিয়ার নিকট হইতে কোনরূপ সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি চাই না, তেমনি সমকারণে সেও আমাদের নিকট হইতে ঐরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দাবী করিতে পারে না। এই উত্তরে রাশিয়া মোটেই খুশী নহে, রুশ-পররাষ্ট্র-সচিব মিস্কী একরূপ বলিয়াই দিয়াছেন, বর্তমান অবস্থায় বৃটেনের সহিত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চুক্তি সফল হইবার কোনই আশা নাই। ইহা বৃটেনের পক্ষে আশার কথা নহে। তাই চেম্বারলিনী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদীরা বৃটেনের এইরূপ দরকষাকষিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, মিঃ লয়েড্ জর্জ ত চেম্বারলিনী নীতির বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলনই সুরু করিয়া দিয়াছেন, এমন কি ষ্টেটস্‌ম্যানের লোকেরাও ইহাতে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। ২১শে মে তারিখের (কলিকাতা সংস্করণ) সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন—

It is no use for Mr. Chamberlain to say to the House of Commons "It may be the view that the (British) suggestion did not cover the case of certain States other than Poland or Rumania which are neighbouring of Russia through which she might be attacked, but I say that, on the other hand, it did not apply equally to certain Western States which, if attacked, must ultimately involve us in war." This is irrelevant. The Soviet has taken the reasonable attitude that, if it is going to start handing out guarantees, the job must be done thoroughly: if Britain cares to leave loopholes in the West, that is her affair.

ইহা হইতেই বৃটিশ জনসাধারণের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। রাশিয়ার সহিত যে-কোন উপায়ে যত শীঘ্র সম্ভব সামরিক চুক্তি পাকা করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে চায়। চেম্বারলিনী গবর্ণমেণ্টের বিলম্বিত নীতি তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ভারতবর্ষস্থ মুখপত্রও বলিতেছেন—

The dilatory character of the present negotiations and the ambiguous verbiage employed by spokesmen of the British Cabinet, are regrettable. (21-5-39).

২০শে মে জার্ম্মানীর সহিত লিথুয়ানিয়ার বাণিজ্য-চুক্তি এবং ২২শে মে জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া যাওয়াতে বৃটিশ জনসাধারণের আরও ধৈর্যচ্যুতি হইবারই কথা। সেই ধৈর্যচ্যুতি বৃদ্ধি পাইলে বর্তমান বৃটিশ কেবিনেটের পতন ঘটিবারও সম্ভাবনা। ইহার পর জাপানও যদি আবার ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত অনুরূপ সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় (যে বিষয়ে আন্দোলন জাপানের রাজনৈতিক মহলে সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে), তবে ত কথাই নাই। ইহাতে বৃটেনের ভারতসাম্রাজ্য রক্ষার যে বিশেষ অসুবিধা হইবে, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া বৃটিশ জনসাধারণের মরিয়া হইয়া উঠিবারই কথা। তাহারা তখন যে-কোন উপায়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে দলে আনিবার জন্য বর্তমান বৃটিশ কেবিনেটের কাছে দাবী করিবে। সেই দাবী পূর্ণ করিতে না পারিলে মন্ত্রিসভার পতন সুদূরপরাহত নহে। কারণ রাশিয়া যদি তাহাদের দলে যোগ না দেয়, অথচ জাপান যদি ইটালী ও জার্মানীর সহিত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় (যাহার সম্ভাবনা খুবই বেশী), তাহা হইলে উহার ফলাফল কি ভীষণ হইবে—ইহা উপলব্ধি করা বৃটিশ জনসাধারণের পক্ষে খুবই সহজ। এশিয়ায় জাপানকে একমাত্র রাশিয়াই বিব্রত করিতে পারে। সে যদি তাহাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে তবেই জাপান ভারত আক্রমণে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবে না, কিন্তু রাশিয়া হইতে তাহার আক্রমণের ভয় যদি না থাকে, তবে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের সমুদ্র উপকূলে সৈন্য নামাইতে তাহাকে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। তাহা ছাড়া পূর্বেই বলিয়াছি ইউরোপেও যদি রাশিয়া জার্মানীকে পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধে নিযুক্ত না রাখে, তবে পশ্চিম সীমান্তে তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে কে? ইহার উপর আছে বিমানপোত, যে-বিমান-আক্রমণের ভয়েই না কি মিঃ চেম্বারলেন মিউনিকে জার্মানীর সহিত অপমানজনক আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতএব, কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নহে, তাহার নিজের রক্ষার জন্যই রাশিয়ার সহিত বৃটেনের সামরিক চুক্তি অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য। তাই সুযোগ পাইয়া রাশিয়াও এখন বাঁকিয়া বসিয়াছে, সে ক্রমেই চুক্তির দর বাড়াইতেছে। এত চড়াদরে নিজেদের নিরাপত্তা কিনিতে বর্তমান বৃটিশ মন্ত্রিসভার একান্তই অনিচ্ছা, কিন্তু উপায়ই বা কি? যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে এত কাল সে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিল আজ দায়ে পড়িয়া তাহাকে তাহারই দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে।

ইহাকেই বলে নিয়তির পরিহাস! তাহার অদৃষ্ট যদি ভাল হয় তবেই রাশিয়া তৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, নচেৎ তাহার কি যে হইবে তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

এই সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে পরিত্রাণের বৃটেনের অন্য উপায় ছিল না, এখনও নাই। ভার্সাই সন্ধিসর্তে সে জার্মানীকে তিল তিল করিয়া মারিতে চাহিয়াছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে জার্মানী মৃত্যুপাশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, অতি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে বজ্র উদ্যত করিল। বৃটেন একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল, এত দ্রুত যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তাই আচম্বিতে জার্মানীর রুদ্রমূর্তি দেখিয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। তোড়জোড় করিতে করিতেই জার্মানী ও ইতালী কতকগুলি রাষ্ট্র অধিকার করিয়া এবং কতকগুলিকে ভয় দেখাইয়া বশে আনিয়া অধিকতর বলশালী হইয়া উঠিল। এখন শত্রুকে পরাজিত করা বৃটেনের একার পক্ষে দুঃসাধ্য ত বটেই, এমন কি ফ্রান্সের সহায়তা পাইলেও তাহা একরূপ অসম্ভব। সে প্রথমে হয়ত ভাবিয়াছিল ideology বা আদর্শবাদের দিক হইতে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের প্রবল শত্রু রাশিয়াকে স্বপক্ষে আনা সহজ-সাধ্যই হইবে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সাফ বলিয়া দিল যদি জার্মানী তাহাকে আক্রমণ না করে তবে শুধু শুধু সে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে যাইবে কেন! রাশিয়ার এই মনোভাবে বৃটেন সঙ্কটে পড়িল, তাহার হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, কিন্তু এখনও তাহার মন পাইল না। ভাবপ্রবণতাবিহীন অতি চতুর সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এত শীঘ্র মন পাওয়া যাইবে বলিয়াও মনে হয় না। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃটেনের কাছ হইতে সে একটা মোটা রকমের কিছু সর্ত আদায় করিতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুখ ফিরাইয়াই থাকিবে এবং দর চড়াইবে। শেষ পর্যন্ত অতি চড়া দরেই বৃটেনকে চুক্তি কিনিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে এই জটিল অবস্থা হইতে, এই আত্মঘাতী প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা করিতে পারে জগতে এমন কোন শক্তি নাই। টলষ্টয়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যাহা গান্ধীজী অহিংস সংগ্রাম নাম দিয়া ভারতে মাঝে মাঝে প্রয়োগ করেন এবং ইউ-রোপ ও এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী বা ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধেও মাঝে মাঝে প্রয়োগ করিতে বলেন, তাহা মানব সমাজের বর্তমান অবস্থায় ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই বেশী। অহিংস সংগ্রাম বা সত্যাগ্রহ করিয়া যেমন ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পায় না, তেমনি ব্যক্তির সমষ্টি জাতি বা রাষ্ট্রকেও তাহার বা আমাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। তফাৎ বিশেষ কিছু নাই, শুধু মৃত্যুর রকম ফের মাত্র। আমরা পরাধীন জাতি হইলেও এবং বৃটেন ছাড়া অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত আমাদের কোন সাক্ষাৎ বৈরীভাব না থাকিলেও হয়ত বৃটেনের পক্ষে নিতান্ত পরাধীনভাবেই এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবশিষ্ট যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা হয়ত লাভবান হইবে, কিন্তু আমরা কি পাইব! গত মহাযুদ্ধের পর আমরা কিই বা পাই-য়াছি? এই আন্তর্জাতিক আসন্ন মহাসমরের সম্মুখীন হইয়া শঙ্কাকুল ভারতবাসীর এইরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রলয়ের পরে

(২৯৯ পৃষ্ঠার পর)

হবে বোক, এমন কি পাপ করেছি যার জন্য অকালে তোমায় হারাব!"

"অমূল্য রত্ন ভাগ্যে জুটেছে তোমার কোন্ পাপে তা হারাবে, এমন সুন্দর ত আর মিলবে না!"

"স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে রূপের প্রশ্ন আসে না প্রভা! সুরূপা হোক্ আর কুরূপাই হোক্ প্রত্যেক স্বামীই জানে,—অন্তত ভাবে স্ত্রী তার অতি আপনার। নিজের যা তা অসুন্দর হলেও অন্যের সুন্দরের চেয়ে সে বেশী ভালবাসে। এই আত্মবোধ জীবজগতের স্বাভাবিক ধর্ম। নিজের স্ত্রী সুন্দরী নয় বলে স্ত্রী-বিয়োগে শোক না করতে ত কাউকে দেখিনি। হিন্দুর সংস্কারে শাস্ত্রে এই বিবাহ-বন্ধনকে শুধু দেহের সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ করেনি প্রভা। এর একটা পারলৌকিক দিকও আছে।"

প্রভা কহিল, "দেখ, মরা বাঁচা ত মানুষের নিজের হাতে নয়। মরিই যদি চারুকে তুমি নিও। সে তোমায় যতটা বুঝতে পেরেছে, এত দীর্ঘ দিন তোমার কাছে থেকেও ততটা আমি বুঝতে পারিনি। স্বামীকে না বোঝার যে কি ব্যথা সেই জ্ঞান আমার ফিরে এল বটে, কিন্তু বড় অসময়ে। চারু তোমায় সুখী করতে পারবে।"

প্রভার কথা শেষ না হইতেই চারু গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তুমি আগে মরই না মেজদি তারপর আমার বৌর সম্বন্ধ হবেখন।"

তারপর অমরের দিকে ফিরিয়া বলিল, "জানেন ত দাদাবাবু, আজকালকার কলেজের মেয়েদের ত লাভ-ম্যারেজ ছাড়া মন ওঠে না—আপনারা বলেন ত আজই স্বয়ংবরা হই! দুদিক বজায় থাকবে। বড়দের এঁটোপাতে ছোটদের খাওয়ার ব্যবস্থা চাই! আপনাদের সমাজপতিদের স্যাংশনও বহাল থাকবে।"

চারুর আকস্মিক আগমনে অমর ও প্রভা উভয়েই কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর চারুর এই নির্লজ্জ প্রগল্ভ বাক্যের কি উত্তর দিবে অমর ও প্রভা সহসা কিছু খুঁজিয়া পাইল না। অমর হাসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, প্রভা তাহাকে বলিবার অবসর না দিয়াই কহিল, "মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না চারু।"

পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, আমাদের দুবোনের ঝগড়ায় তোমার থেকে কাজ নেই। তুমি এইবার একটু বাইরে বেরিয়ে এসগে। **(ক্রমশ)**

র‍্যাডভেঞ্চার

(গল্প)

শ্রীদেবপ্রসন্ন ঘোষ

ভাই সুপ্রিয়,

কাল এসে শিলং পৌঁচেছি। স্নোভিউ হোটেলে উঠেছি। আজকে শৈত্য বড্ড বেশী অনুভব করছি। বোধ হয় কলকাতা থেকে নূতন এসেছি বলে। লেপটা কাঁধ পর্যন্ত দিয়েছি। তাতেও যেন পুরোপুরি আরাম উপভোগ করতে পারছি না।

বি-এ পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশ। প্রথমে ইচ্ছা ছিল—দার্জিলিং যাব কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিলং-এই এলাম কারণ দার্জিলিঙ্ যাবার সুযোগ আরও দু'একবার হয়েছে। শিলং সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বাড়াবার প্রয়াস আমি বারান্তরে করব। ট্রেনে আসতে এবার একটা ছোট-খাট য়্যাডভেঞ্চার হয়েছে। পরে সেটা তোমার গোচর করছি। শুনলে তুমিও প্রচুর আনন্দ পাবে। তোমার থার্ড ইয়ার-এর পরীক্ষা সামনে। জানি না ধৈর্য ধরে তুমি আমার চিঠি পড়বে কি না।

শিয়ালদা' থেকে বেলা তিনটেয় আসাম মেল ছাড়ল। বসে মনে হচ্ছিল তোমাদের কথা। ভাবছিলাম একা রওনা হয়ে ভাল করিনি। কয়েকটা দিন পরে হুগলি হয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লে ভাল করতাম। এ সময়ে ভিড় হবার কথা নয়, কিন্তু তবু বেশ লোক হয়েছিল। ইণ্টারে বেড়াবার অনেক অসুবিধা। দুকাঠির একখানা টিকিট না হলে বেড়িয়ে আনন্দ নেই।

পার্বতীপুরে এসে পেঁছুলাম রাত সাড়ে আটটায়। এখানে ব্রড গেজের গাড়ী বদলে মিটার গেজের গাড়ীতে যেতে হয়। গাড়ীতে ডাইনিং সেলুন থাকা সত্ত্বেও খেতে পারলাম না। লোয়ার ক্লাশের যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের চোখে হরিজন ছাড়া আর কিছুই নয়। আপার ক্লাশের টিকেট না থাকলে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। পার্বতীপুরে সোরাবজীর রিফ্রেশ্-মেণ্ট রুমে ডিনার খেয়ে মিটার গেজের গাড়ীর সন্ধানে বেরুলাম। ব্রড গেজের বৃহৎ বপুর ইণ্টারের প্যাসেঞ্জারেরা এসে আগে থাকতেই ছোট গাড়ীতে গুছিয়ে নিয়েছেন। দেখলাম, ঠেলে ঠুকে একটু জায়গা করে নিতে পারলেও রাত্রে ঘুমের আশা ছেড়ে কাঁথায় শুয়ে লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখাই হবে। পাশের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঁকি মেরে দেখি সেখানে চারজন যাত্রী হয়ে গিয়েছে। আমার প্রবেশ সেখানে ট্রেস্‌পাসের মতই হয়ে পড়বে। তার পাশেরটা দেখলাম খালি। বাইরে লট্‌কান রিজার্ভ লেবেলে পড়ে দেখলাম তিনটে বার্থ রিজার্ভড্ হয়েছে। যাক্ একটা আপার বার্থ এখনও খালি। ইতস্তত করছিলাম খরচ করব কি না! শেষ পর্যন্ত টাকার থেকেও সুখের আকাঙ্ক্ষাটাই জয়ী হল। গার্ডকে ইনফর্ম করে কামরায় এসে দেখি একজন ইংরেজ একটা বাঙ্ক অধিকার করেছেন। আমিও সুট্‌কেশ আর বিছানাটা কুলির সাহায্যে তুলে অন্যদিকের লোয়ার বার্থটায় বসে দম নিচ্ছি। ট্রেন ছাড়তে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী আছে। এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এক বৃদ্ধ পার্শি ভদ্রলোক একটি তরুণীর হাত ধরে সেই কামরায় উঠলেন। বৃদ্ধের মুখে আভিজাত্যের একটা স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তরুণীকে বৃদ্ধের কন্যা বলেই মনে হল। কানে হীরের দুল, হাতে প্ল্যাটিনামের চুড়ী, গলায় সোনার হার দেখে, জহুরী না হয়েও আমার বুঝতে দেরী হল না যে জিনিষগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। রূপের দিক দিয়েও ভগবান তরুণীকে বঞ্চিত করেন নি। বর্ষার প্লাবনের মত সারা অঙ্গের রূপ উছলে উঠছে। সূর্যের কিরণের মত উগ্র নয়, চন্দ্রের আলোর মত স্নিগ্ধ। সচরাচর এ রকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। যাক্ তরুণীর রূপ বর্ণনা করা আমার চিঠির উদ্দেশ্য নয়। মানে মানে আমি তাঁদের আসন ছেড়ে দিয়ে উপরের বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লাম।

তুমি এখন কি ভাবছ তা আমার পক্ষে কল্পনা করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি মুখ টিপে হাসছ আর ভাবছ, বন্ধুবর এবার একটি চমৎকার প্রেমের গল্পের অবতারণা করবে। সম্পূর্ণ ভুল করেছ বন্ধু—তা নয়। অতটা কাব্যিক ভাবাপন্ন এখনও হয়ে উঠতে পারি নি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি কামরাতে আলো জ্বলছে। ঘড়িটা কোটের পকেটে রয়ে গেছে। সময় আন্দাজ করতে পারলাম না। চোখটা ভাল করে রগড়ে তাকালাম। দেখলাম পার্শি ভদ্রলোক ও তরুণী অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। ট্রেনের গতি ক্রমশই কমে আসছে। বোধ হয় নিকটেই ষ্টেশন। হ্যাঁ, তাই বটে, ইংরেজটি জিনিষপত্র বেঁধে প্রস্তুত হয়েছেন। এই ষ্টেশনেই নামবেন। ট্রেন থামা মাত্রই তিনি কুলি ডেকে মালপত্র নামালেন। নেমে যাবার সময় আলোটা নেভাবার কথা ভুললেন না।

মিনিট তিনেক কেটে গিয়েছে। ট্রেন ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম কে যেন আমাদের কামরায় জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। শেষ ঘণ্টা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কামরায় উঠে পড়ল। গাড়ী তখন প্রচণ্ড অন্ধকার ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটি গিয়ে তরুণীর সীটের নীচে বসে রইল। আমার সন্দেহ হল। একি ব্যাপার, লোকটা গিয়ে সীটের তলায় বসল কেন? খুব সম্ভব চোর। আচ্ছা চুপ করেই বসে থাকি না কেন? দেখ লোকটা কি করে! আমি নির্জীবের মত শুয়ে রইলাম। শুধু চোখ দিয়ে মিটমিট করে দেখছি লোকটা কি করে। কিছুক্ষণ পরে লোকটা সীটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। সে আমার কাছে এসে দেখল আমি ঘুমুচ্ছি না জেগে আছি। নিঃসন্দেহ হবার জন্য সরু কাঠি বার করে আমার নাকের ভেতরে সুর সুরি দিতে আরম্ভ করল। ভগবান বাঁচিয়ে-ছিলেন। কোন রকমে হাঁচি আটকে রেখেছিলাম। তারপর সে বৃদ্ধ ও তরুণীকে একই উপায়ে পরীক্ষা করল। তারা অকাতরে নিদ্রিত ছিল। লোকটি তরুণীর হাত থেকে সাবধানে

হাতঘড়িটা কেটে নিল। ঘড়িটি একটি ফিতার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা ছিল। সেটা ফেলে দিয়ে সে ঘড়িটা পকেটে রেখে দিল। তারপর পুনর্মূষিক হয়ে সীটের নীচে আশ্রয় নিল।

মিনিট দশেক পরে কৃত্রিম ঘুম থেকে উঠলাম। বাঙ্ক থেকে নেমে ল্যাভাটরীতে গেলাম। ল্যাভাটরী থেকে বের হয়ে আলো জ্বালিয়ে বিছানাটা বাঁধতে আরম্ভ করলাম। সতর্ক ছিলাম কেন না এদের সঙ্গে ছোরা থাকা অসম্ভব নয়। হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু প্রকাশ্যে আমি ভাবটা দেখালাম যেন আমি পরের ষ্টেশনে নেমে যাব বলে বিছানা বাঁধছি। বিছানা বাঁধা শেষ করে কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলাম রাত তখন তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। সাড়ে তিনটার সময় সোনাহাটা পেঁছুবার কথা। জানি না গাড়ী লেট্ হয়ে পড়েছে কি না। না লেট্ হয়নি—এই যে গাড়ীর গতি কমতে সুরু করেছে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই আমি 'কুলি, কুলি' করে চেঁচাতে লাগলাম। তিনটে কুলি ঠিক করলাম। তাদের ইসারায় বুঝিয়ে দিলাম ব্যাপারটা। কুলি তিনটে লোকটার দিকে তাকাতেই সে একটা কুলিকে আক্রমণ করল— হাতে একটা ছোরা। আমি তার উপরে লাফিয়ে পড়লাম। একটা হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরলাম, আরেকটা হাত দিয়ে তার ছোরা শুদ্ধ হাতটাকে ধরলাম। ইতিমধ্যে আর দুজন কুলি এসে তাকে পেছন থেকে সাপটে ধরল। আমি তার হাত থেকে ছোরাটা ছিনিয়ে নিলাম। কেড়ে নেবার সময় সে প্রাণপণ করে ছাড়িয়ে নেবার শেষ চেষ্টা করল, যার ফলে আমার হাতটায় জখম হল। আমি যন্ত্রণায় আমার অজ্ঞাতে একটা আর্তনাদ করে উঠলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি তরুণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন আর বৃদ্ধ পার্শে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। কামরার সামনে লোক জড় হতে আরম্ভ করেছে। রেলওয়ে কনেষ্টবল কামরায় এসে উঠল। লোকটার সারা দেহ খানাতল্লাসি করা হল কিন্তু ঘড়িটা কোথাও পাওয়া গেল না। কনেষ্টবলরা লোকটাকে একাধিক প্রশ্ন করল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। হয়ত লোকটা বোবা। এমন সময় একজন কনেষ্টবল তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। কি আশ্চর্য! লোকটার মুখ থেকে লেডিস্ রিষ্ট ওয়াচটা বেরিয়ে পড়ল। ওঃ এই জন্য বোধ হয় লোকটা কোন কথা বলছিল না। আমি ঘড়িটা নিয়ে বৃদ্ধকে ফিরিয়ে দিলাম। তরুণীর দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। চোখে অসীম কৃতজ্ঞতা। বৃদ্ধ আমাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ জানালেন। তাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে লোকটা হয়ত সমস্ত গয়নার জন্য তরুণীকেও হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করত না। আমি দেখতে পেয়েছিলাম বলে সে শুধু ঘড়িটা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। যখন তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম যে, লোকটা ঘড়িটাই শুধু চুরি করেছিল, খুন করবার সঙ্কল্প তার ছিল না— অন্ততঃ তা থাকলেও আমি বুঝতে পারিনি, তখন বৃদ্ধ বললেন, সাধারণ একটা ঘড়ির জন্য আমার জীবন এভাবে বিপন্ন করা উচিত হয় নি। ঘড়িটার দাম কতই আর হবে, কিন্তু তার জন্য...........ইত্যাদি। তোমাকে বলা বোধ হয় নিষ্প্রোয়জন তরুণী নিজেই আমার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা গৌহাটীতে থাকেন। একবার গৌহাটী যাবার জন্য বৃদ্ধ বিশেষ অনুরোধ করলেন। তরুণীও নীরব ভাষায় বৃদ্ধের কথার অনুমোদন করলেন। যাওয়া উচিত? তোমার মত কি?

জানি না লোকটাকে ধরে অন্যায় করেছি কি না। লে মিজারেব্‌ল পড়েছ নিশ্চয়। কে জানে লোকটা কতখানি অভাবের তাড়নায় এ দুষ্কার্যে হাত দিয়েছে।

একটুস্ ছোট খাট য়্যাডভেঞ্চার, কি বল? পার ত ঘটনাটা নিয়ে গল্প রচনা কর।

সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। বাজারে কিনতে যেতে হবে। হোটেলে প্যাকেট পিছু দু' পয়সা করে বেশী নেয়। আচ্ছা আজ তাহলে এখানেই আমার পত্র সমাপ্ত হল।

ইতি—

শুভার্থী, নীলোৎপল।

চাক্‌রী সমস্যায় হকসাহেব

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

আজ বাঙলার রাজনৈতিক দেহে সাম্প্রদায়িকতার জীবাণু প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে মরণের পথে আগাইয়া দিয়াছে। দেশে শান্তি নাই, মানুষে মানুষে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি নাই, একের উপর অপরের বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই, ঈর্ষা, বিদ্বেষ জঘন্য জিঘাংসা প্রবৃত্তি দেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বৈষম্য, দলাদলি ও হিংসার ভাব জাগাইয়া দিতেছে। কি শহরে কি পল্লীগ্রামে কোথাও প্রীতি ভালবাসা ও আন্তরিকতার নাম-গন্ধমাত্র নাই। আছে শুধু অপরকে জব্দ করিবার অভিসন্ধি, আর আছে ঝগড়া বিবাদ ও দাঙ্গা বাধাইবার ফিকির-ফন্দী। দেশের শাসনের ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহারা এ-সব বিষয় দেখিয়াও দেখেন না। এ অবস্থার প্রতীকারের পথ নাই তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা নিজেদের যোগ্যতার অভাবে ভেদ-নীতিকে অবলম্বন করিয়া মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়া আছেন, তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা করেন না। যাহাতে অবিশ্বাসের স্থলে বিশ্বাস জাগিতে পারে, বিদ্বেষ ও হিংসার স্থানে প্রেম ও ভালবাসার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন কোনও পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন না। পল্লীগ্রামের নিরীহ যুবকদের মধ্যে তাঁহারা বিপ্লবের আগুন দেখিতে পারেন, পুলিশ, গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া কোথায় কোথায় রাজনৈতিক আন্দোলন কিভাবে প্রসারলাভ করিতেছে তাহার সঠিক ও নিখুঁত হিসাব তাঁহারা রাখিতে পারেন এবং তাহা দমন করিবার জন্য পন্থা অবলম্বনে কাতরতার ভাব দেখান না; কিন্তু তাঁহাদের চোখের উপর এই যে দিনরাত সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। দেখিতেই যদি পাইতেন, তবে যে সব পত্রিকা নির্লজ্জভাবে সাম্প্রদায়িকতার অনলে ইন্ধন যোগাইতেছে তাহাদেরকে সাহায্য করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেন। অন্য পরে কা কথা বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব স্বয়ং আসরে নামিয়া রাম-শ্যাম তাবেদ, নাসেরের মত লম্বা লম্বা কথায় যেভাবে দিনরাত সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়াইতেছেন তাহাতে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বর্তমান হক সরকার সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়ই দিতেছেন—উহা বিনাশ করিবার কিছুই করিতেছেন না।

বস্তুত বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় এমন কোন কাজ করা উচিত নহে বা এমন কোন কথা বলা উচিত নহে যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরও প্রসারলাভ করিতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি কি? যে সময়ে দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধটা শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, একজনের সামান্য কথাতে অপরে রাগান্বিত হইয়া উঠিতেছে, উদারভাবে কোন বিষয় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে ঠিক সেই সময় আমাদের "লোকপ্রিয়" (?) হক সাহেব লোকের সেই মনোভাবকে আরও উস্কাইয়া দিবার জন্য পর পর এমন কয়েকটি বিল আনয়ন করিলেন যাহার ভিতরের মর্ম ভালরূপে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার দলের কাহারও নাই। প্রতিবাদ, অনিচ্ছা ও অসন্তোষের মধ্যে এই সব বিল আনয়ন করিলে দেশের শান্তি-সুখের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। যাহা বিতর্কমূলক বিষয়, একটা গোটা সম্প্রদায় যাহা চাহে না, তাহাদের অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহা চালাইতে গেলে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। হক মন্ত্রিত্বের অনুসৃত নীতির কারণে যদি দেশে কোন গণ্ডগোল হয়, তবে তাহার জন্য তাঁহারাই সর্বতোভাবে দায়ী। যে সব বিতর্কমূলক বিষয় এক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আঘাত করে সে সকল বিষয় সেই সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মত না লইয়া চালাইতে গেলেই বিপদ উপস্থিত হইবে এবং যে গবর্ণমেণ্ট সেরূপ করিতে যান সে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের প্রতিনিধিত্বের দাবী করা অন্যায়। সকলের সহযোগিতায় আপোষ-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন বিতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নহে। যাবৎ আপোষ-নিষ্পত্তি না হইবে তাবৎ বর্তমান অবস্থাকেই (status quo) বলবৎ রাখিতে হইবে, ইহাই রাজনীতির নিয়ম।

প্রসঙ্গত, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের কথাই ধরা যাউক। কলিকাতা কর্পোরেশনে যে যুক্তনির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা সকলের সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তন করিবার কোন অধিকার হক সাহেবের নাই। অথচ হক সাহেব গায়ের জোরে তথা মেজরিটির ভোটের জোরে তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। হক সাহেব মুসলিম লীগের সমর্থক, সুতরাং হিন্দুদের সম্বন্ধে কোন কিছু করিতে হইলে লীগের মাইনরিটি সংক্রান্ত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য। সেই নীতি অনুসারে হিন্দুদের ব্যাপারে তাহাদের অধিকাংশ লোকের সম্মতি লইতে হইবে। কর্পোরেশনে হিন্দুদের সংখ্যা আনুপাতিক হিসাবে কমাইয়া দিতে তিনি কি অধিকাংশ হিন্দুর মত লইয়াছেন? আইনসভার ভোটাভুটির তালিকা হইতে আমরা দেখিতেছি অধিকাংশ হিন্দু সদস্য উহাতে সম্মতি দেন নাই। মুসলিম লীগের নীতিই হইতেছে যে, যে সমস্ত ব্যাপার কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে আঘাত করিতে পারে সে সমস্ত ব্যাপারে সেই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ $\frac{3}{4}$ অংশ লোকের সম্মতি লইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি কর্পোরেশনের ব্যাপারে তাহা লওয়া হইয়াছিল? যদি তাহা লওয়া না হয়, তবে কোন শক্তিবলে মুসলিম ও ইউরোপীয়ানদের সাহায্যে তিনি হিন্দুদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন? মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফার নীতি অনুসারে হক সাহেব কর্পোরেশনে বর্তমান ভোটাধিকার সম্বন্ধে কোনো আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। যদি সেরূপ করিতে যান, তবে বলিব তিনি দেশের প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন সেইরূপ লীগের নীতিও পদদলিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কর্পোরেশনের স্বাধীনতা লোপের আশঙ্কা দেখিয়া চারিদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের

অসন্তোষ পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহাতে গায়ের জোরে কিছু করিতে যাওয়া দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

শুধু কর্পোরেশনেই নহে, চাকুরী ব্যাপারেও বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে আচরণ দেখাইলেন তাহা ন্যায়নীতি ও সুবিচারসম্মত নহে। আজ কয়েক বৎসর হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারার জন্য একটা আন্দোলন হইতেছে। মুসলমান জনসংখ্যানুপাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকুরীর দাবী করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নানা অজুহাত দেখাইয়া হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরী বণ্টনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মিঃ বি সি চ্যাটার্জি মহাশয় এই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ-পঞ্চাশের একটা ফরমুলাও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই ফরমুলাও সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। চাকুরীর ব্যাপারটা এমনি জটিল যে সহজেই উহার সমাধান হইতে পারে না। কিন্তু কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিয়া উহার সমাধান করিতে যাওয়াই গুরুতর অন্যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত বিষয়গুলির মধ্যে চাকুরী সমস্যাও অন্যতম। এখানে ভেদনীতিমূলক ব্যবস্থা কোনও মতেই সুবিচারসঙ্গত নহে। আর এই সমস্যা এমন গুরুতর যে কেবল আইনসভার সদস্যদের দ্বারাই ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। ইহার জন্য দেশের সর্বসাধারণের মতামত অবগত হওয়া কর্তব্য। এই মতামত যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তবে দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটা পরামর্শ করা কর্তব্য। ভোটাভোট দ্বারা ইহা মীমাংসা হইতে পারে না। আপোষ-আলোচনাই মীমাংসার একমাত্র উপায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে হক সাহেব সেরূপ কিছুই করেন নাই। আইনসভায় তাঁহার দলভারী আছে, এই গর্বে তিনি এই গুরুতর বিষয়টাকে গায়ের জোরে আইনে পরিণত করিতে চাহিলেন। একটা বিরাট সম্প্রদায়ের আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ, অসম্মতির প্রতি তিনি কোনওরূপ কর্ণপাত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ন্যায়নীতির এমন ব্যভিচার খুব অল্পই দেখা যায়।

'জনপ্রিয়' মন্ত্রী বলিয়া তিনি দাবী করেন। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন না করিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে পক্ষপাতমূলক আচরণ আরম্ভ করিলেন। সম্প্রতি তিনি চাকুরী ব্যাপারে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই নির্লজ্জ বিবৃতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বাঙলা দেশের প্রধান মন্ত্রীর নামে এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত নাই, সমগ্র দেশের ভার তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে এক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া ওকালতি করিতে গেলেই অপরে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিবে, তখন তাঁহার কোন নিষ্কৃতি নাই! মুসলমান অথবা হিন্দু তাহার নিজ নিজ সভায় যে কোন দাবী উপস্থিত করিতে পারে, যে কোন প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইতে পারে। এই সব দাবী অথবা প্রস্তাব যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তবে শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহার কোনটিও গ্রহণ করিতে পারে না, যাবৎ উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ-রফা না হয়। স্বীকার করি যে মুসলিম লীগ শতকরা ষাটটি চাকুরী দাবী করিয়াছে এবং অধিকাংশ মুসলমান তাহাতে সায় দিয়াছে। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটাও ত দেখিতে হইবে। হিন্দুদের কেহই এই দাবী স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। যদি তাহারা অম্লানবদনে এই দাবী গ্রহণ করিত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যখন তাহারা ইহাতে বাধাদান করিতে প্রস্তুত, তখন মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে একমাত্র পথ ছিল নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করা। কিন্তু হক মন্ত্রিগোষ্ঠি কি করিলেন? আইন-সভায় যখন এই প্রস্তাব উপস্থিত হইল তখন তাঁহারা ন্যায়-নীতি ও মন্ত্রিত্বের আদর্শের মুখে পদাঘাত করিয়া তাহা সমর্থন করিলেন। তারপর সেই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ওকালতি করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি প্রচারেও লজ্জাবোধ করিলেন না। এই যে অন্যায় আচরণ, ইহা দেশের মধ্যে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। এই অশান্তির মধ্যে হক সাহেব নিজেও সুখ পাবেন না, যাহাদের সুখের জন্য তিনি পক্ষপাতমূলক আচরণ করিতে গেলেন, তাহাদেরও বিশেষ সুবিধা হইবে না। বস্তুত বিশেষ এক সম্প্রদায়ের চাকুরীর জন্য সাফাই গাহিয়া হক সাহেব যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মহান্ দায়িত্বের অনুরূপ নহে। চাকুরী সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় সকলের সম্মতিক্রমে একটা ফরমুলা স্থির করা। আশা করি হক সাহেব সেইরূপই করিবেন। তাঁহার বিবৃতির অন্যান্য অংশের উত্তর আগামী বারে দিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক পরিচয়

আকাশ প্রদীপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত এবং ২১০নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

কবির বয়স হইয়াছে—কে বলিবে? বয়সের গণ্ডী পার হইয়া কবির চির-নবীন প্রাণ ছন্দগুলির মধ্যে শুকতারার মত জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। লাইনের পর লাইনের কাছে আসিয়া চিত্ত নির্বাক বিস্ময়ে বারম্বার থামিয়া যায়। জীবনের গভীর সত্যগুলিকে রামধনুর বিচিত্র রঙে রাঙাইয়া এমন অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন —ধন্য তাঁর সৃজনী-শক্তি। কখনো হাসি, কখনো অশ্রু, কখনো বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ—রসের বৈচিত্র্য আকাশ প্রদীপ সত্য সত্যই অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। অতীত জীবনের ছবিগুলি বর্তমানের সঙ্গে মিশিয়া কাব্যের অঙ্গনে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা জমাইয়া তুলিয়াছে। কালের কঠিন স্পর্শ কবির সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতাকে যে ম্লান করিতে পারে নাই—হেমন্তের পরিণত জীবনের সৌন্দর্যের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম মনোহর নয়—আকাশ প্রদীপের সোনালী শিখায় তারই পরিচয়!

বক্তৃতা বিজ্ঞান—লেখক শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থানঃ—ষ্টুডেন্টস্ এম্পোরিয়াম লিঃ; ২০৪নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

একখানা পড়িবার মত বই। লেখক নিজে একজন খ্যাতনামা বাগ্মী এবং সুসাহিত্যিক। অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া অসংখ্য শ্রোতার প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে বক্তৃতার মধ্য দিয়া জনতাকে নিবিড়ভাবে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই এমন পুস্তক লিখিতে পারেন। বাঙলা ভাষায় ইহা বক্তৃতা বিষয়ক প্রথম পুস্তক। ভাষা যেমন জোরালো তেমনি শ্রুতিমধুর। গভীর সত্যকে এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারা প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

জয়যাত্রা—শ্রীরবিদাস সাহা রায় প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বিশটি কবিতা লইয়া পুস্তকটি রচিত। লেখক রবিদাস বাঙলা সাহিত্য জগতে একেবারে অপরিচিত নন। পুস্তকটির কবিতাগুলি ইতিপূর্বেই বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছাপ থাকিলেও, তাঁহার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। আর বর্তমানে বাঙলা কবিতায় যে হেঁয়ালী, কুহেলিকা আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতে কবিতাগুলি মুক্ত। কবিতার ভাষা ও বক্তব্য স্পষ্ট কোন হেঁয়ালী নাই। কবিতাগুলি আমাদের বেশ আনন্দই দিয়াছে। রসপিপাসু পাঠকবর্গের নিকট এই পুস্তকটির সমাদর হইবে।

আলো—ষাণ্মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য। নারায়ণগঞ্জ, কালীরবাজার (ঢাকা) হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

এই ষাণ্মাসিক পত্রিকাখানি প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। পত্রিকাখানি আবদুল ওদুদ মহম্মদ শহীদুল্লা মোহিত লাল, সুরেন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখকগণের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে পত্রিকাখানি প্রশংসার যোগ্য। আমরা পত্রিকাখানির আগামী সংখ্যার আরও সাফল্য কামনা করি।

ভোরের পাখী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

গীতিকবি হিসাবে নির্ম্মলবাবু বাঙলা দেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'ভোরের পাখী'র জনপ্রিয়তাই ইহার প্রমাণ। সহজ এবং সরল অনাড়ম্বর ভাষার ভিতর দিয়া ইহার সুরটি একেবারে অন্তরে গিয়া স্পর্শ করে এবং মন মাধুর্যরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। দ্বিতীয় সংস্করণে সাত আটটি নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে দেখিলাম। 'হে প্রিয় দরশন দাও' 'সাঁঝ প্রতিম লাগে আঁখে জাগে' 'আঘাত তাঁহার বলছে আমায় জাগো' প্রভৃতি গানগুলির সুরের মাধুর্য্য এবং ভাবের গভীরতা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। স্বরলিপি সঙ্গে দেওয়া থাকাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে গানগুলি শিক্ষা করা সহজ হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

বিবিধ প্রতিযোগিতা

আগামী ইং ১৯৩৯ খৃঃ ১৮ই জুন, রবিবার সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার গৃহে সমিতি কর্তৃক কতকগুলি প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

রচনা—(ক) সাধারণের জন্য—"ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রকৃষ্টতম পন্থা।" (খ) বাঁশবেড়িয়া স্কুলের ছাত্রদের জন্য—"এক লক্ষ টাকা পেলে কি উপায়ে বাঙলার যে কোন অর্ধমৃত পল্লীকে একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত করা যায়।" আবৃত্তি—(ক) সাধারণের জন্য—"বন্দী ভগবান"—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (অগ্নিহোত্রী), (খ) ১৪ বৎসর অনূর্ধ্ব বয়স্ক বালকবালিকাদিগের জন্য—"দীননাথ"—রবীন্দ্রনাথ (কথা ও কাহিনী); **বিতর্ক প্রতিযোগিতা**—সাধারণের জন্য—পাঁচ মিনিট বক্তৃতা "ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হওয়াই উচিত";

নিয়মাবলীঃ—আগামী ১৯৩৯ খৃঃ ৭ই জুন তারিখের মধ্যে প্রতিযোগিগণকে নিজ নিজ নাম ঠিকানা এবং রচনাদি সহ সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় কোনও প্রবেশ মূল্য নাই। সকল বিষয়ে সমিতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আশানুরূপ প্রতিযোগী না পাইলে সমিতি যে কোনও প্রতিযোগিতা বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন। রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। রচনা (ক) ১২ পৃষ্ঠার অনধিক হইবে এবং রচনা (খ) ৫ পৃষ্ঠার অনধিক হইবে। প্রয়োজন হইলে আবৃত্তি প্রতিযোগিগণকে একটি প্রাথমিক মনোনয়ন পরীক্ষা (Heat) দিতে হইতে। পত্রাদির উত্তর পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাক-টিকেট পাঠাইবেন নচেৎ উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকের নিকট লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন। প্রবন্ধাদি সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম পুরস্কার একটি করিয়া রৌপ্যপদক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক; শ্রীহিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ-সম্পাদক, রবি-বাসরিক সমিতি। পোঃ—বাঁশবেড়িয়া, (হুগলী)ঃ

রচনা প্রতিযোগিতা

(বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতি সাহিত্য শাখার উদ্যোগে)

(১) বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের জন্য। রচনার বিষয়বস্তু 'ফেরীওয়ালা।' শ্রেষ্ঠ দুইজন লেখককে দুইখানি রৌপ্যপদক দান করা হইবে। রচনা অনধিক ২০০ শত লাইনের হইবে এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) সর্বসাধারণের জন্য। রচনার বিষয়বস্তু 'শিল্প'। প্রথম দুইজন লেখককে দুইখানি রৌপ্যপদক দান করা হইবে। রচনা অনধিক ৩০০ শত লাইন হইবে

কোনও প্রবেশ মূল্য নাই। সমস্ত রচনা বাংলা ভাষায় এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৩০শে জুনের মধ্যে রচনা পাঠাইতে হইবে।

'সাহিত্য-সম্পাদক'—বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতি,
৫৫, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

১৯৩৮-৩৯ সালে নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি প্রদত্ত হইবে—

(১) উইলসন মেমোরিয়েল প্রাইজ (ইংরেজীতে)—শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েটগণই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। বিষয়ঃ—'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাঙলার ব্যবসায়-বাণিজ্য দলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।'

অথবা

'প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশের সঙ্গে সমুদ্র-পারবর্তী দেশসমূহের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক।'

(২) মজুমদার মেমোরিয়াল প্রাইজ (বাঙলা ভাষায়)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব গ্রাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েট দুই বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে পাশ করিয়াছেন শুধু তাঁহারাই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। বিষয়—'বঙ্গে দুর্গাপূজা।' ১৬৲ টাকা মূল্যের দুইটি পুরস্কার বর্তমান বৎসরে প্রদত্ত হইবে।

(৩) কে সি ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ (ইংরেজীতে)।

যাঁহারা দুই বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট হইয়াছেন শুধু তাঁহাদের জন্য। বিষয়ঃ—'ভারতের প্রদেশসমূহে ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনের কার্য।' কুড়ি টাকা মূল্যের দুইটি পুরস্কার বর্তমান বৎসরে প্রদত্ত হইতে পারে।

প্রবন্ধগুলি ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন বা তৎপূর্বে সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছা আবশ্যক;

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি
ইনষ্টিটিউট,
৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস এন ভট্টাচার্য
অনারারী সেক্রেটারী

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বালুচর জৈন যুব-সঙ্ঘের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নে যথাযথ বিবরণ দেওয়া হ'ল।

১। রচনা—বেকার সমস্যা—ইহার উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকারের উপায়। সর্বসাধারণ যোগ দিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের ৮ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে।

২। গল্প—ছোট গল্প—ফুলস্ক্যাপ কাগজের [illegible]

বেশী হইলে নেওয়া হইবে না। প্রত্যেককে কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে।

রচনা ও গল্পে প্রথম স্থান অধিকারীকে একটি করিয়া রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

ঠিকানা—সন্দীপ সেঠিয়া, সম্পাদক, জৈন যুব-সঙ্ঘ, পোঃ জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

মনোরঞ্জন স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার ছাত্র বিভাগের উদ্যোগে বাঙলার সুপরিচিত শিশু-সাহিত্যিক, "রামধনু" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তদীয় স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছে। বাঙলার যে কোন ছাত্র-ছাত্রীই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। প্রবন্ধের বিষয়ঃ "বাঙলা শিশু-সাহিত্যে মনোরঞ্জনবাবুর দান।" প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে মনোরঞ্জনবাবুর এক-সেট পুস্তক উপহার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পরিচয় পত্রসহ প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আগামী ৩২শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারের মধ্যে পাঠাইবেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, ভারপ্রাপ্ত সভ্য। হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার, ১৯নং নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া।

আরামবাগ সাহিত্য-চক্র
গল্প, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী ১৭ই জুন শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় আরামবাগ শহরে একটি গল্প, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। বাঙলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ এই সভায় যোগদান করিবেন। সমস্ত প্রবন্ধ ও গল্প ১৪ই জুন তারিখে নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীদের যে-কোন একজনের নিকট পৌঁছান চাই। ১৬ই তারিখের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগীদের নাম পৌঁছান চাই। যাঁহারা দূর হইতে প্রবন্ধ গল্পাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা—মনোরঞ্জন রায় C/o Dr Nandalal Ghose, Standard Homeo Pharmacy, P. O. Arambagh এই ঠিকানায় সমস্ত জিনিস পাঠাইবেন।

—গল্প—

১। যে-কোন একটা ছোট গল্প ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজের ১০ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। সর্বসাধারণের জন্য। প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্য-কাপ।

—প্রবন্ধ—

২। সুভাষচন্দ্রের "অগ্রগামী দল" স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপন্থী কি না? সর্বসাধারণের জন্য। প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্য পদক।

৩। সহশিক্ষা (Co-Education) আমাদের সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না? হুগলী জিলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্যপদক।

৪। সুভাষচন্দ্রের জীবনী—আরামবাগ মহকুমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্য-কাপ। কোন প্রবন্ধই ১২ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না।

—আবৃত্তি—

৫। 'নারী' কাজী নজরুল ইসলাম (সঞ্চিতা বা সাম্যবাদী দেখুন) হুগলী জিলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।

৬। 'এবার ফিরাও মোরে'—রবীন্দ্রনাথ (চয়নিকা বা সঞ্চয়িতা দেখুন) (প্রথম ৬৮ লাইন) আরামবাগ মহকুমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্যপদক।

৭। জন্মকথা—রবীন্দ্রনাথ (চয়নিকা, সঞ্চয়িতা বা শিশু দেখুন) আরামবাগ মহকুমার ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য। প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্যপদক।

৮। বিদ্রোহী—কাজী নজরুল ইসলাম (সঞ্চিতা বা ঝিঙেফুল দেখুন), প্রথম পুরস্কার একটা রৌপ্যপদক।

নিবেদকঃ—ডাঃ প্রভাকর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মাণিক পাকড়াশি, ডাঃ নির্মল পাল, ডাঃ নন্দ ঘোষ, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, ডাঃ গোপালগোবিন্দ দত্ত, ডাঃ জীবনহরি সামন্ত, বলাইকৃষ্ণ রায়, কেশবচন্দ্র মণ্ডল, ধীরেন মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী রায়, মনোরঞ্জন রায়, হরগোবিন্দ দত্ত ও রামকৃষ্ণ মণ্ডল। আরামবাগ সাহিত্য-চক্র।

গল্প ও রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

নবজাগ্রত লিটারারী বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত গল্প ও রচনার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ আমরা ফলাফল প্রকাশ করিতে পারি নাই। আশা করি, প্রতিযোগিগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। শীর্ষস্থান অধিকারিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুষ্ঠানের দিন ১৮ই জুন ১৯৩৯) স্বয়ং আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইতে পারেন।

রচনা (সর্বসাধারণের জন্য) ১ম—শ্রীপ্রাণবেশচন্দ্র ঘোষ।
রচনা (ছাত্রদের জন্য) ১ম—শ্রীফটিকচন্দ্র দত্ত।
গল্প (সর্বসাধারণের জন্য) ১ম—শ্রীনারাণ চ্যাটার্জি।

পানামা-প্রণালী রজত বার্ষিকী

পানামা প্রণালী প্রবর্তনের ২৫তম বার্ষিকী আগামী ...ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত হইবে। যে পঁচিশ বৎসর ঐ তারিখে পূর্ণ হইবে তাহার সাফল্যমণ্ডিত ইতিহাস লক্ষ্য করিবার ...য়।

বাণিজ্যিক মালপত্রের যাতায়াত এই কেনাল পথে ক্রমশই ...দ্ধি পাইতেছে। বিগত কয়েক মাসে আবার এই চালান ...টা বাড়িয়া গিয়াছে যে, জাহাজগুলির যাত্রাসংখ্যা এবং যে ...নের মাল ঐগুলি বহন করিয়াছে তাহা চলতি বৎসরে ...াইবে সর্বোচ্চ; কতকটা ১৯২৯ সালের মত—যে বৎসরে ...প্রকারেই এই প্রকার বাণিজ্যিক মালপত্রের চালান ছিল ...নালের ইতিহাসে একেবারে সর্বাধিক।

৩০০ টনের ঊর্ধ্বে বহনক্ষম সাগরগামী জাহাজসমূহের ...ন-সংখ্যা হইয়াছে ৪,৪৩২, এই বৎসরের প্রথম নয় মাসে। ...২৯ সালের অনুরূপ নয় মাসে ছিল ৪,৭৪৮। একুনে ...কোটি টনের ঊর্ধ্বের ওজনের মাল এই বৎসরের ঐ নয় মাসে ...ন করা হইয়াছে।

এই বৎসরের মালপত্র চালান এত বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রধানত ...ন দশটি বাণিজ্যিক পথের ভিতর দুইটিতে চালান বৃদ্ধির ...। বিগত সেপ্টেম্বর হইতে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ... হইতে ইউরোপীয় বন্দরসমূহে মালের রপ্তানি ...ধারণ রকম বেশী হইতেছে। যদিও বিগত মাসে যে ...্যায় জাহাজ এই বাণিজ্যিক পথে গিয়াছে তাহা উহার পূর্ব ... মাসের অনুপাতে কম, তথাপি আমেরিকার বিশেষ করিয়া ...নের এক তীর হইতে অপর তীরে মালপত্রের আমদানী ...ানি তাহার পূরণ করিয়াছে। এই দুই পথে মার্চ মাসে ... চালানের এক-তৃতীয় বহন করা হইয়াছে।

বিগত কয়েক মাস ধরিয়া যে জাতীয় পণ্য উত্তর আমে...ার পশ্চিম তীর ইউরোপে চালান দিয়াছে, তাহার ভিতর ...ীর ভাগই ছিল গম এবং এই শ্রেণীর ফসল টিনে পোরা ...াদি এবং শুষ্ক ফল। আমেরিকার পূর্ব তীর হইতে ...চম তীরে যে সকল মাল প্রেরণ করা হইয়াছে এই পথে, ...ার প্রায় সমুদায়ই কারখানা-প্রস্তুত পণ্য; কিন্তু পশ্চিম ... হইতে পূর্ব তীরে পাঠান হইয়াছে—পেট্রোলিয়াম, টিনে ...া খাদ্যাদি, গম, টাটকা ফল, শুষ্কীকৃত ফল।

পানামা কেনালের এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে ...মান বৎসর বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অভূতপূর্ব ...র জন্য। উহার ভিতর আবার সর্বাপেক্ষা প্রধান যে ...ার, তাহা হইল কংগ্রেসের মঞ্জুর সাপক্ষে কেনালের ...মের সময় এই প্রকার সুদৃঢ় লকের উপযোগিতা হইবে ...তৃতীয় সেট লক (জলাবরোধ ব্যবস্থা) স্থাপন, এই তৃতীয় ...টে যেমন আকারে হইবে বৃহত্তর, তেমনই সকল প্রকারে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে হইবে একেবারে অনাধিক্রম্য। সংগ্রামের সময় এই প্রকার সুদৃঢ় লোকের উপযোগিতা হইবে সকল প্রকারেই অশেষ সহায়ক। কংগ্রেসের বিশেষ অনুমতি অনুসারে পানামা কেনালের স্পেশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন এই নূতন লক ব্যবস্থার নক্সা ও খসড়ার পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করিয়াছে দুই বৎসর যাবৎ। এখন ঐ সেকশনের গবেষণা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, কংগ্রেসের পূর্ণ অনুমোদন পাওয়া মাত্র কার্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

বিগত অকটোবর মাসে কেনালের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে যখন এক লক্ষ জাহাজ যাতায়াত সম্পূর্ণ হয়, কেনাল প্রবর্তনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষতম জাহাজটির যাত্রার সূচনা হয়; এই জাহাজটির নাম এস্ এস্ ষ্টীল এক্সপোর্টার—আমেরিকার পতাকা ইহার শিরে উড্ডীন ছিল। ইহার আকার ছিল অতি বৃহৎ—প্রায় ৫০০০ টন বহনক্ষম এবং ইহাতে মাল ছিল টিনে পোরা খাদ্য এবং শুষ্কীকৃত ফল—ক্যালিফোর্নিয়া হইতে পূর্ব তীরে প্রেরিত।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যাহা কেনাল ইতিহাসের ২৫তম বর্ষ দর্শন করিয়াছে, তাহা হইল, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বলিয়া পরিচিত যে সকল জাহাজ তাহার তৃতীয়টি—নর্থ জার্মান লয়েড লাইনের 'ব্রিমেন্' বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে এই কেনাল-পথে গমন করিয়াছে। ৫০,০০০ টনের উচ্চ বহন-ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের ভিতর একমাত্র ব্রিমেন এই কেনালে গমন করিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এত বড় জাহাজ এই কেনালে পরিচালনে কোনও অসুবিধা হয় নাই—দুর্ঘটনা ত হয়ই নাই, কোন কারণেই গতি হ্রাস বা থামাইতেও হয় নাই।

ফেব্রুয়ারী মাসের তিন দিনের ভিতর পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ জাহাজের তিনটি আসিয়া কেনালের জলে নোঙর করে। এই জাহাজগুলি উত্তর আতলান্তিক বাণিজ্যের এবং উহারা শুধু আকারেই বড় নয়, এমন সাজ-সরঞ্জাম ও ভিতরের অপূর্ব আসবাব ব্যবস্থা এবং অলঙ্করণ সমন্বিত জাহাজ সারা বিশ্বে অতি অল্পই রহিয়াছে। ব্রিমেন ব্যতীত নব হল্যাণ্ড আমেরিকা লাইনের 'নিউ য়্যামস্টারডাম' দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরিয়া যাইবার পথে এই কেনালে প্রবেশ করে। ইহা ছাড়া সমগ্র আমেরিকার সর্ববৃহৎ জাহাজ এবং মার্কিন লাইনের ফ্ল্যাগশিপ এস এস ওয়াশিংটন জাহাজ-ভর্তি দেশ ভ্রমণকারী লইয়া এই পথে সান ফ্রান্সিসকো বিশ্ব মেলায় (World fair) গিয়াছিল।

এই বৎসরে কেনাল-পথে গমনাগমনের যে বর্ধিত হিসাব পাওয়া যায়, তাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এইজন্য যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে মার্কিন যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনী এই পথে গমন করে। এই বাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে সমগ্র কেনালের ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে বলিয়া উহা

'রেকর্ড' টাইম' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ সময়ে আতলান্তিক সাগর মুখে কেনালের লক্‌গুলি মধ্যে এক জোড়া সেট মেরামত হইতেছিল এবং উহা জাহাজ যাতায়াতে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই, তথাপি বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের ভিতর কোনটিকেই অযথা অপেক্ষা করিতে হয় নাই, অন্য কোন প্রকার অসুবিধাও উহাদের ভোগ করিতে হয় নাই।

বর্তমান বাণিজ্যিক বর্ষের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত একুন ২০,২৭৬,৯২৮ টন মালপত্রসহ জাহাজ কেনাল পথে গিয়াছে। মার্চ মাসে যে টোল বা মাশুল আদায় হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইল ২,২৫২,১৫৬ ডলার প্রায়। সমগ্র বর্ষে যে মাশুল আদায় হইয়াছে, তাহা ১৯২৯ সালের তুলনায় শতকরা ১৩ পারসেণ্ট কম। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হইল এক বৎসর পূর্বে যে নূতন মাশুল-হার এবং নূতন পরিমাপ প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা। আবার এই বর্ষের প্রথম নয় মাসের জাহাজ গমন-সংখ্যা পরবর্তী তিন মাসের সংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৭ ভাগ বেশী হইলেও বর্তমান যুগে বৃহৎ আকারের জাহাজই বেশীর ভাগ তৈরী হইতেছে বলিয়া মালপত্রের ওজন তুলনা করিলে দেখা যায় উহা আড়াই পারসেণ্টের বেশী অধিক হইবে না।

আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, যাহা এই বর্ষে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা হইল ২৪ ঘণ্টা কেনাল-পথ বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের গমনাগমনের জন্য প্রস্তুত রাখা। ১লা জানুয়ারী (১৯৩৯) হইতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পানামা কেনালের সকল বিভাগের কর্মচারীই--লক্ অপারেটর, পাইলট, টাগবোট ক্রু, কাষ্টমস্ কর্মচারী এবং কোয়ারাণ্টাইন অফিসারস্ প্রভৃতি সকলেই এখন দিনরাত ২৪ ঘণ্টা হাজির থাকে, অথচ এই ব্যবস্থার দরুন কোন জাহাজকেই অতিরিক্ত মাশুল কিছুই দিতে হয় না।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

লিজার ক্লাব--নাটোর

নাটোর "লিজার ক্লাবের" গ্রীষ্মকালীন সাহিত্য-বিষয়ক অনুষ্ঠান বিরাট জাঁকজমকের সহিত গত ২৫শে মে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইবার সাহিত্য-অনুষ্ঠানে উক্ত ক্লাবের সাহিত্য সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্যাল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাইয়াছেন।

(১) বিতর্ক প্রতিযোগিতা--"বর্তমান পরীক্ষাপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক।" প্রস্তাবের পক্ষে বিজয়ী দল--শ্রীহীরেন্দ্র সান্যাল ও তাঁহার দল। প্রথম--শ্রীমতী রেণু চৌধুরী।

(২) আবৃত্তি--(ছেলেদের) "বিদ্রোহী" by কাজী নজরুল ইস্‌লাম। প্রথম--শ্রীসুনীল সিন্ধান্ত। দ্বিতীয়--শ্রীসতোশ সান্যাল। (মেয়েদের) জসীমুদ্দিনের "কবর"। প্রথম--শ্রীমতী রাণী বসাক। দ্বিতীয়--শ্রীমতী মায়া দেবী।

(৩) সাধারণ কবিতা--প্রথম--শ্রীসুরেশ মৈত্র। ব্যঙ্গ কবিতা--প্রথম শ্রীসত্যেশ সান্যাল।

(৪) প্রবন্ধ--"পল্লী-উন্নয়ন (পুরুষদের) প্রথম--শ্রীসত্যেশ সান্যাল। দ্বিতীয়--মোঃ আব্দুর রেজ্জাক। "স্ত্রী শিক্ষা" (মেয়েদের) প্রথম--শ্রীমতী রেণু চৌধুরী। দ্বিতীয়--শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ফণী।

(৫) সংগীত--"খেয়াল"--প্রথম--শ্রীমতী ছাবরাণী অধিকারী। দ্বিতীয়--শ্রীমতী আরতী সিংহ। "ঠুংরী"--প্রথম--শ্রীমতী ছবিরাণী অধিকারী। দ্বিতীয়--শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী প্রামাণিক। "আধুনিক"--প্রথম--শ্রীমতী শেফালী সরকার। দ্বিতীয়--দুর্গেশনন্দিনী প্রামাণিক।

ইহা ছাড়াও, সুনীল সিন্ধান্ত, রাণী বসাক, বেবী সান্যাল, রেবা সাহা, খাদিজা খাতুন, বাসন্তী চক্রবর্তী, অন্নপূর্ণা ঠাকুর, মহামায়া বসাক, তারাসুন্দরী প্রামাণিক, অরুণা বিশ্বাস, গায়ত্রী আগস্তি ও মস্তফেকর রহমান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

শরৎচন্দ্রের **"পথের দাবী"** সম্প্রতি নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়াছেন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নাটক পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সতু সেন। প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ। প্রধান ভূমিকাগুলির রূপ দিয়াছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, শ্রীমতী প্রভা, সেফালিকা, চারুবালা ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের **"পথের দাবী"** বহুদিন বাজেয়াপ্ত থাকিবার পর কিছুদিন পূর্ব্বে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। যাহারা শরৎচন্দ্রের **"পথের দাবী"** পড়িয়াছেন তাঁহারা একবাক্যেই স্বীকার করিবেন যে, **"পথের দাবী"** উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে দার্শনিক তথ্যালোচনামূলক এক সুবৃহৎ প্রবন্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং সেই দিক দিয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, **"পথের দাবী"** উপন্যাসে নাটকীয় বিষয়বস্তু অতিশয় অল্পই আছে।

'পথের দাবী'র ডাক্তারের ভূমিকায় গিরিশ মহাপাত্রবেশী অহীন্দ্র চৌধুরী। নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইতেছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির পথে নিত্য নূতন ভাবধারার প্রচলন হইতেছে। শরৎচন্দ্রের **"পথের দাবী"** যে রাজনৈতিক মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহাও একদিন বাঙলা দেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই স্বভাবতঃই অনেকে সেই মতবাদকে বুঝিতে গিয়া নাটক **"পথের দাবী"**র উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবেন। কিন্তু যাঁহারা **"পথের দাবী"**তে বর্ণিত মতবাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত তাঁহারা নাটক দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন যে নাটকে সেই মতবাদের এবং সেই মতবাদের সমর্থক যাহারা তাহাদের উপর সুবিচার করা হয় নাই।

মতবাদের সমর্থক যাঁহারা তাঁহাদের উপর সুবিচার করা হয় ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টি করিতে যাইয়া তাঁহাকে উপন্যাসে চিত্রিত চরিত্রগুলির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। তাঁহার দাবী এবং যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও এ-কথা অবশ্যই আমরা বলিতে পারি, তিনি যেভাবে উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির রূপ দিয়াছেন তাহা কোন-

নিউ থিয়েটার্সের 'সাপুড়ে' চিত্রে শ্রীমতী কানন বালা। চিত্রা ও নিউ সিনেমায় দেখান হইতেছে।
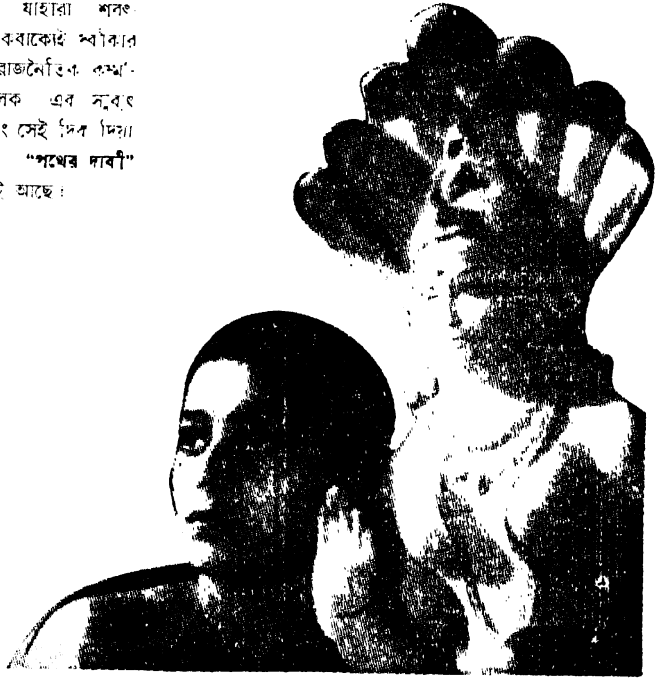
প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সব্যসাচীকে ধরা যাক। সব্যসাচী কথাপ্রসঙ্গে ভারতীকে বলিতেছেন যে, তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন একক নিঃসঙ্গভাবেই— হয়ত তাঁহাকে ঘটনাচক্রে পড়িয়া পুনরায় একক এবং অন্য একজনেরও সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে হইবে। কিন্তু নাট্যকার শচীনবাবু সব্যসাচী চরিত্রের উপর যেভাবে যবনিকাপাত করিয়াছেন তাহা সব্যসাচীর নিজের কথারই বিরোধী। সব্যসাচীর ন্যায় অশেষ ধৈর্য্যশীল এবং অসম সাহসী কর্ম্মবীর যে তাঁহার প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যর্থ

হওয়ায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন—তাহা যুক্তিবাদী মন কিছুতেই মানিয়া লইতে চায় না।

তাহার পর শশী এবং নবতারার চরিত্রগুলি যেভাবে বাড়ান হইয়াছে তাহা নাটকের আসল বিষয়বস্তুর তুলনায় বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মোটামুটি ইহাই হইল নাট্যকারের ত্রুটি এবং ভ্রান্তি। অন্য দিক দিয়া নাট্যকারের কৃতিত্বও আছে। সব্যসাচীর কথাগুলির মধ্য হইতে বিশিষ্ট অংশগুলি চয়ন করিয়া তিনি নাটকের মধ্যে সুনিপুণভাবে স্থান-নির্ব্বাচন করিয়া তাহার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। ইহাতে আমরা চলতি জগতের সামাজিক এবং রাজনীতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিচয় পাই। ইয়োরোপের খৃষ্টীয় সভ্যতার নগ্নরূপ এবং ভারতবর্ষের নরমপন্থী রাজনীতিবিদ সমাজের আসল পরিচয় সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। বিপ্লবী সব্যসাচী বিপ্লব বলিতে কি বুঝিতেন তাহাও চমৎকারভাবে নাটকে দেখান হইয়াছে। বিপ্লব বলিতে যে নিছক রক্তপাতই বুঝায় না ইহা সব্যসাচীর মুখ দিয়া বলাইয়া নাট্যকার ভাল কাজই করিয়াছেন। কেন না সাধারণত দেশের লোকের সম্মুখে বিপ্লবীদিগকে রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদরূপেই দেখান হইয়া থাকে এবং যাহাদের জন্যই বিপ্লবী দল তাহাদের সুখ, শান্তি এবং জীবনও পর্য্যন্ত অম্লানবদনে দিয়া থাকে, সেই দেশের লোকই বিপ্লবীদিগকে সাধারণত ভয়ের চোখে দেখিয়া থাকে ও তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা যে অকারণ রক্তলোলুপ নর-পশু নহে তাহা নাটক দেখিয়া দেশের লোক যথেষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন। নাট্যকারের কৃতিত্ব এখানেই এবং তিনি এই কারণেই সকলের প্রশংসা দাবী করিতে পারেন।

অভিনয় প্রসঙ্গে কাহারও বিশেষ প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তবে সব্যসাচী রূপে অহীন্দ্রবাবুর রূপসজ্জা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। নাট্যকার **"পথের দাবী"**র অভিনয়ে নৃত্যগীত না দিয়া ভালই করিয়াছেন। পরিচালনায় শ্রীযুত সতু সেন আলোক সম্পাতের জন্য এবং নাটকটীকে সুষ্ঠুভাবে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। দৃশ্যপটাদি উল্লেখযোগ্য।

* * * * * *

নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি সাপুড়ে গত ২৭শে মে হইতে চিত্রা ও নিউসিনেমায় দেখান হইতেছে। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাহিনী অবলম্বনে শ্রীযুত দেবকীকুমার বসু চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন। চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন ইউসুফ মুলজী; শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন অতুল চ্যাটার্জ্জি, সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন রাইচাঁদ বড়াল সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন কাজী নজরুল ও অজয় ভট্টাচার্য এবং সম্পাদনা করিয়াছেন কালী রায়। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জহর—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিশুন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ঝুমরো—পাহাড়ী সান্যাল, চন্দন—কানন, ঘণ্টাবুড়ো—কৃষ্ণচন্দ্র দে, তেঁতুলে—শ্যাম লাহা, গুট্রে—অহি সান্যাল, ঝণ্টু—সত্য মুখোপাধ্যায়, মৌটুশী—মেনকা, বুড়োসর্দ্দার—প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় ও বিশুনের সহকারী—নরেশ বসু।

* * * * * *

শনিবার ২৭শে মে হইতে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত বিরচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক **"সোনার বাঙলা"** অভিনীত হইতেছে। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রযোজনা করিয়াছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং দৃশ্যপট পরিকল্পনা করিয়াছেন পরেশচন্দ্র বসু। বিভিন্ন ভূমিকায়—শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রণজিৎ রায়, বঙ্কিম দত্ত, সরযূবালা, লাইট, রাজলক্ষ্মী, রাধারাণী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দেখিয়া আসিয়া পরে আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাইব।

* * * * * *

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড নামে এক নূতন চিত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশে সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কোম্পানী সম্পূর্ণ বাঙালী পরিচালিত এবং কলিকাতায় ইঁহাদের হেড আফিস হইয়াছে। শ্রীযুত যতীন মিত্রের নেতৃত্বে নিউ থিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিওতে তোলা এসোসিয়েটেড প্রডাকসনের সমস্ত ছবি এই নূতন কোম্পানী পরিবেষণ করিবেন। শ্রীযুত নরেশ ঘোষ মহাশয় এই কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হইয়াছেন। চিত্র-পরিবেষণ বিভাগে শ্রীযুত ঘোষের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

* * *

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে গত ২০শে হইতে **"মাকড়সার জাল"** অভিনীত হইতেছে। শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রভাত সিংহ, শান্তি, ভূমেন রায় প্রভৃতি ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দেখিয়া আসিয়া পরে আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত জানাইব।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের প্রথমার্ধের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এই অর্ধের সকল খেলা শেষ হইবে। মোহনবাগান দল এখনও পর্যন্ত লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছে। প্রথমার্ধের খেলার শেষে উক্ত স্থানে অবস্থান করিবে কিনা সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। প্রথমার্ধের অবশিষ্ট যে তিনটি খেলায় মোহনবাগান দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে তাহার মধ্যে দুই খেলায়, ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং পয়েন্ট নষ্ট করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত দলের খেলোয়াড়গণের ক্রীড়া-নৈপুণ্যই আমাদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব সপ্তাহেও খেলোয়াড়গণের খেলায় যেরূপ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এই সপ্তাহে তাহা অপেক্ষা অনেক কম দৃষ্ট হইয়াছে। খেলোয়াড় নির্বাচনেও পরিচালকগণের সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তরুণ খেলোয়াড় এস দে পূর্বের দুইটি খেলায় নৈরাশ্যজনক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিবার পরও খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটি কিরূপে যে ই বি আর দলের বিরুদ্ধে এই খেলোয়াড়টিকে খেলিবার সুযোগ দিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নির্বাচনের পরিণাম তাঁহারা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং পুনর্বার এই ত্রুটি করিবেন না বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছিলাম তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক নহে, এই সপ্তাহের লীগ তালিকাই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। লীগের প্রথমার্ধের খেলার শেষে এই দলটি যদি লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করে তবে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। এই দলের খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকেই দলের সম্মান বৃদ্ধির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া খেলিতেছেন। মুর্গেশ আহত হইয়া পড়িয়া থাকায় আক্রমণ ভাগের শক্তি অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। নতুবা এই দল প্রত্যেক খেলাতেই বহু গোলের ব্যবধানে প্রতিপক্ষ দলকে পরাজিত করিতে পারিত। লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার এই দলের এখনও সম্ভাবনা আছে।

রেঞ্জার্স ক্লাব এই সপ্তাহে ইষ্ট বেঙ্গল দলের নিকট পরাজিত হওয়ায় অনেকেরই উক্ত দলের চ্যাম্পিয়ানসিপের আর আশা নাই বলিয়া ধারণা হইয়াছে। কিন্তু আমরা এইরূপ ধারণা করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। বর্ষা আরম্ভ হইলে এই দলের খেলোয়াড়গণ যে উন্নততর ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন ইহার প্রমাণ মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার দিনই পাওয়া গিয়াছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ বিষয় এই দলেরও মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল প্রভৃতি দলের ন্যায় আশা আছে।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা ক্রমশই নিম্ন স্তরের হইতেছে। লীগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত দলের যে টুকু উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। লীগের দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনা হইতেই এই দলের খেলোয়াড়গণ যদি উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করেন, তবে এই দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার যে ক্ষীণ আশা ছিল তাহাও আর থাকিবে না। একই পুরাতন খেলোয়াড়ের উপর বৎসরের পর বৎসর খেলার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পরিচালকগণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকার ফলেই দলের পরিণাম এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। নূরমহম্মদ, জুম্মা খাঁ, ওসমান, রহিম, মাসুম, রসিদ প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ গত পাঁচ বৎসর সমানে এই দলের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহারা পূর্বের ন্যায় উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তাহার জন্য তাঁহাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করা যায় না। কোন খেলোয়াড়েরই ক্রীড়া-শক্তি চিরস্থায়ী নহে। সকলেরই ক্রীড়াশক্তি অর্জনের সীমা শেষ হইলেই শৈথিল্য প্রকাশ পায়। উক্ত খেলোয়াড়গণেরও তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট ও প্রশংসারযোগ্য। পরিচালকগণের উচিত ছিল এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা এই সমস্ত খেলোয়াড়গণের স্থান পূরণ করিতে পারে এইরূপ খেলোয়াড়দিগকে নিয়মিত শিক্ষা

কলিকাতা ফুটবল লীগে ইষ্ট বেঙ্গল ও রেঞ্জার্স খেলার একটি দৃশ্য

দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিতেন। সুতরাং এই বৎসরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যদি লীগ চ্যাম্পিয়ান হইতে না পারে তাহার জন্য দায়ী খেলোয়াড়গণ নহে, দায়ী পরিচালকগণ।

জনের আকস্মিক মৃত্যুতে কালীঘাট ক্লাবের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। তাহা হইলেও লীগ তালিকায় তাঁহাদের স্থান খুব নিম্নে হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোনই কারণ দেখা যাইতেছে না। তালিকার মধ্যভাগেই উক্ত দল যে অবস্থান করিবে ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে। ভবানীপুর ক্লাব এই সপ্তাহে পূর্বাপেক্ষা উন্নতি করিয়াছে। এরিয়ান্স ক্লাবের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। লীগ তালিকার সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা এই দলের যথেষ্ট আছে। পুলিশ দলের খেলার উন্নতি হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইলে জলসিক্ত কর্দমাক্ত মাঠে এই দলের খেলার আরও উন্নতি হইবে। তখন এই দল লীগ তালিকার মধ্যভাগে আসিয়া স্থান লাভ করিবে। ক্যালকাটা ও কাস্টমসের খেলার কোনই উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। একই অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। লীগ খেলার শেষে এই দুইটি দলকে তালিকার নিম্ন ভাগেই যে দেখা যাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড

গত এক মাসের কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন খেলা অবলোকন করিয়া বাঙলার ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে আমরা খুবই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। গত বৎসরেও ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে স্তরে ছিল এই বৎসর তাহা অপেক্ষাও নিম্ন স্তরের হইয়াছে। দিন দিন ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অধোগামী হইবার কারণ নিয়মিত শিক্ষার অভাব। গত সাত বৎসর ধরিয়া আমরা বাঙলার ফুটবল খেলার ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করিয়া পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। এই বৎসরে এই বিষয় পুনরায় উল্লেখ করায় যে বিশেষ কল হইবে তাহাও আমরা আশা করি না। কর্তব্যজ্ঞান আমাদিগকে এই বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য করিতেছে।

বাহিরের খেলোয়াড়গণ

বাঙলার ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্ন স্তরের হইবার অন্যতম কারণ বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড়গণকে আনাইয়া দলের শক্তিবৃদ্ধি করা, ইহা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং সেই বিষয় পুনর্বার বিশদভাবে বলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। সম্প্রতি বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড়গণের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন ৩৩নং আইন জারী করিয়া এইরূপ বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দল পুষ্ট করিবার প্রচেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের অভিযোগ ক্রমেই নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এইরূপ আইন করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলা দেশের ফুটবল পরিচালকগণ শীঘ্র এই আইন মানিয়া চলিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। ফুটবল লীগ খেলার সূচনায় এই আইনের সমর্থনে ক্রীড়ামোদিগণের তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, বর্তমানে তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙলার ধুরন্ধর ফুটবল পরিচালকগণের জন্যই যে এইরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বাহিরের খেলোয়াড়গণ নিশ্চিন্ত মনে বাঙলার বিভিন্ন দলে খেলিতেছেন। এই বৎসরের ফুটবল মরসুমের শেষ পর্যন্ত যে তাঁহারা খেলিবেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অনুসন্ধান কমিটিও গঠিত হইয়াছে। আই এফ এ এই অনুসন্ধান কমিটিতে প্রতিনিধিও প্রেরণ করিয়াছেন। মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশনকে অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য প্রমাণের সমস্ত কাগজ-পত্র প্রেরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। তোড়জোড়ের মধ্য দিয়া সময় কিরূপে কাটাইয়া দিতে হয়, ধুরন্ধরগণ বেশ ভাল করিয়াই তাহা জানেন; সেইজন্য তাঁহারা এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনুসন্ধান কমিটির রায় শীঘ্র যে বাহির হইবে না ইহা সাধারণে বুঝিতে না পারিলেও আমরা পারি। এমন কি অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হইলেও "পর্বতের মূষিক প্রসবের" ন্যায় একটা কিছু যে দেখা যাইবে সেই বিষয়ও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। নিম্নে লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

		খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েঃ
মোহনবাগান	...	৯	৭	২	০	১৩	১	১৬
ইষ্টবেঙ্গল	...	৯	৫	৩	১	১০	৩	১৩
রেঞ্জার্স	...	৯	৬	০	৩	১৫	৬	১২
মহমেডান স্পোর্টিং	...	৮	৪	২	২	১২	৭	১০
কালীঘাট	...	৮	৩	৪	১	১০	৬	১০
ই বি আর	...	৮	৪	২	২	১১	৯	১০
ক্যামেরোনিয়ান্স	...	৮	৩	২	৩	৬	৯	৮
ভবানীপুর	...	৮	২	২	৪	৪	১০	৬
বর্ডার রেজিমেণ্ট	...	৮	২	১	৫	৮	১১	৫
কাষ্টমস্	...	৮	১	৩	৪	৫	১০	৫
ক্যালকাটা	...	৯	১	৩	৫	১০	১৫	৫
এরিয়ান্স	...	৮	২	১	৫	৫	১২	৫

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩শে মে—

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির ফলে য়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রবল ঝড়ে গাছ পড়িয়া রেমপুরের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের হরিচরণ মণ্ডলের ও রংপুর লার নন্দনপুর গ্রামে এক দম্পতির মৃত্যু হইয়াছে। রিদপুর জেলার জলসেন গ্রামে বজ্রপাতের ফলে দুইটি শিশু শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছে।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরের তালা ভাঙ্গিয়া বা কাহারা বিগ্রহের প্রায় ২ হাজার টাকা মূল্যের অলংকার করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর পুলিশ ন্ত চলিয়াছে।

নাগারাণী গুইদালো কিছুদিন যাবৎ শিলং জেলে শন করিতেছেন। প্রকাশ, অনশনের কারণ ধর্ম্ম বিষয়ক।

লাহোর জেলে শ্রমিক নেত্রী শ্রীমতী যোগরাজের পুত্র ১৭ই মে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার স মাত্র ৭ মাস হইয়াছিল। শ্রীমতী যোগরাজ কিষাণ গ্রহ সম্পর্কে দণ্ডিত হন। শিশুটির বয়স মাত্র সাত মাস য়া তাহাকেও মাতার সহিত যাইতে হয়। শ্রীমতী গরাজের স্বামী কমরেড যোগরাজ লাহোরের কৃষক দোলনের নেতৃত্ব করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত য়াছেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুসারে তিনি ঢাকা স্থগিত রাখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন সমর্থন য়া কিষাণ-সভা, যুব-সঙ্ঘ, ছাত্র-সঙ্ঘ, সমাজতান্ত্রিক দল দি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের নানা স্থানের বহু শত কর্ম্মীর নিকট হইতে শ্রীযুত বসু আড়াই শতেরও ক পত্র ও তার পাইয়াছেন। ঐ সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি তে বসুর নেতৃত্বে অবিচলিত আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছে।

মহারাষ্ট্রের সেনাপতি বাপাত ঘোষণা করিয়াছেন যে, য় ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য তিনি আগামী ২৩শে আগষ্ট হে নদী-সঙ্গমে ঝাঁপাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি আক্রমণ দঃ বিঃর ১২৪ (ক, র আমলে পড়ে কিনা, দৈনিক বসুমতীর বিরুদ্ধে আনীত টি রাজদ্রোহের মামলায় এই প্রশ্ন উঠিলে প্রধান প্রেসিডেন্সী জিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়েই প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্টের অভিমত প্রার্থনা করেন। কোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চে মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। স্থগিত আছে।

সুইজারল্যান্ডবাসী এক হিমালয় অভিযাত্রীদল অদ্য বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক র বিশেষ অধিবেশনে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের ট্রান্সভাল দুইটির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি াব গৃহীত হইয়াছে। বিলের স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থা র্কিত ধারার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, রা কেপটাউন চুক্তির সর্ত্ত ভংগ করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত বিল দুইটি দ্বারা ১৯১৪ সালের গান্ধী-স্মার্টস চুক্তি ভংগ করা হইয়াছে।

২৪শে—

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানার অধীন কাসতুল গ্রামে বন্দুকের গুলীতে দুই ব্যক্তি নিহত হন এবং কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কাসতুল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অন্নদাচরণ দত্ত রায় বাজিতপুর কোর্টের এক জারিকারককে লইয়া কোন জমির দখল লইতে গেলে তাহারা এক দল লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। অন্নদাবাবু আক্রমণকারীদের প্রতি গুলী বর্ষণ করেন; উহার ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়; তাহাদের মধ্যে দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সম্পর্কে পুলিশ পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শোলাপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আরও দুইজন নিহত ও ৬ জন গুরুতর আহত হইয়াছে।

কাশীতে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে কাশী মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হাজি মির্জ্জা হাসান বেগ ওরফে অচ্ছু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের আলোচনাকালে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এক হুমকী দেখাইয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে যদি আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তিনি দেখিয়া লইবেন। এই সময় বিরোধী দলের সদস্যদের প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রী উত্তেজিত হইয়া বলেন,—"আমরা কংগ্রেসকে তাড়াইয়া দিতে চাহি।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বঙ্গীয় মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিলের আলোচনা শম্বুকগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদ দিবস উপলক্ষে প্রীতিভোজ সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য, এই কথা ব্যাখ্যা করিয়া লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিগণেরই সহযোগিতায় এবং উৎসাহে ভারতীয় কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি প্রদেশের শাসন পরিচালনা করিতেছেন—ইহা আনন্দের বিষয়। উপসংহারে তিনি বলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপোষ-রক্ষার দায়িত্ব এখন ভারতীয়দের নিজেদের উপর। তাহারা আজ সেই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং এই সমস্যার উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিবে।

২৫শে মে—

রাজনন্দনগাঁও রাজ্যের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় শ্রমিক নেতা শ্রীযুত আর এস রুইকর ও তাঁহার পত্নী দুই বৎসরের শিশু সন্তানসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে পূর্ব্ববঙ্গ শহর নির্ব্বাচন কেন্দ্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে সদস্য পদ শূন্য হইয়াছে, সেই পদের জন্য শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গঙ্গুলী কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম সংশোধন প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই যে, কলিকাতা বা বাঙলা দেশের মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাড়ী ক্রয় বা নির্ম্মাণের জন্য অথবা ঐ সব অঞ্চলে জমি ক্রয় করিয়া সেই জমিতে বাড়ী নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে যদি কেহ ঋণ করে এবং সেই ঋণ যদি দশ বা ততোধিক বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋণ মহাজনী কারবার বিলের আওতায় আসিবে না। দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাবটি এইরূপ যে, বর্ত্তমান মহাজনী আইন সম্পর্কিত "মামলা" বলিতে এইরূপ মামলা বা প্রোসিডিং বুঝাইবে, যাহা ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে বা তাহার পরে রুজু করা হইয়াছে ব. হইবে বা ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে মামলা বা প্রোসিডিং বিচারাধীন রহিয়াছে। কংগ্রেস দল ২য় প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনু সুবেদার এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয়দিগকে স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে ৪ঠা জুন দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ভারতীয়-দিবস বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অনুরোধ করিয়া শ্রীযুত মোহনলাল শকসেনা এক তার পাঠাইয়াছেন।

ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির যে মূল প্রস্তাব সোভিয়েট দিয়াছিল, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা এখন ইঙ্গ-ফরাসী পরিকল্পনারূপে মস্কোতে পেশ করা হইবে।

ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি আসন্ন দেখিয়া জার্ম্মানীতে প্রবল ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। জার্ম্মানী হইতে বিদেশী সংবাদ-পত্রসমূহে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে যে, ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ উহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিবে।

সিমলায় প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল আলোচনার জন্য মন্ত্রী শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের উত্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার মিউনিসিপ্যাল বিলে হিন্দুদের জন্য আটটি আসন-সংখ্যা বাড়াইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

২৬শে মে—

বাঙলার সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার নির্ধারণ সমস্যা সম্পর্কে বাঙলার হিন্দুদের উপর যে অবিচার হইতে চলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বাঙলার গবর্ণরকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুরের নেতৃত্বে এক দল হিন্দু প্রতিনিধি কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় লেবার পার্টির ভূতপূর্ব সভাপতি ও কার্য-নির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য কমরেড ইউসুফ কলিকাতায় যক্ষ্মারোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সাভার গ্রামে ঢাকা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সিমলা হইতে এইরূপ এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ সাহেবের সাংবাদিকগণের সহিত আলোচনাকালে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ২৯শে মে তারিখের পর হায়দরাবাদ রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংক্রান্ত কোন সংবাদ পাঞ্জাবের সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত হইতে পারিবে না।

ভূপাল রাজ্যে এক ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে ৬ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং ২২ জন আহত হইয়াছে।

সিমলায় কেন্দ্রীয় আইন সভায় ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটির অধিবেশন হয়। উহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হইয়াছে। প্রকাশ যে, আলোচনার সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করা হয়; কিন্তু অবশেষে স্থির হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসনাধীন রাজ্যের সহিত বোঝাপড়া করিবার পক্ষে চিঠি দ্বারা অনুরোধ করা ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই।

১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রমিকনেতা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও অপর ৫ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল ডিসমিস হইয়াছে। শ্রীযুত দত্ত মজুমদার ও ননীগোপালকে তিন মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং শিশির ও অপর তিন ব্যক্তিকে এক শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

২৭শে মে—

গত ২০শে জানুয়ারী এক চলন্ত ট্রেনে বীরভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জিকে আক্রমণ করিয়া গুরুতর জখম করার অভিযোগে আসামী সেখ আব্দুল বীরভূমের দায়রা জজ কর্ত্তৃক দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সদস্য পদ শূন্য হইয়াছিল, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের ভোটে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুত অমূল্যধন রায় সেই পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

বাঙলার হিন্দু নেতাদের ডেপুটেশন দার্জ্জিলিং-এ গিয়া বাঙলার গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং তৎসম্পর্কে গবর্ণরের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সম্পর্কে গবর্ণরের সহিত তাঁহাদের

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। গবর্ণর বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং তাঁহাদের অভিমত সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া বলেন।

নিরপেক্ষতা রক্ষা আইন সংশোধনের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ কর্ডেল হাল ছয় দফা প্রস্তাবের আভাষ দিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত চাকুরীর হার নির্দ্ধারণ কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী তাহার উত্তর দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, শ্রীযুত বসুর আরোপিত সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বসুকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরী বণ্টন সমস্যায় তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

২৮শে—

বাঙ্গলার হিন্দু প্রতিনিধিমণ্ডলী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সরকারী চাকুরীর হার নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বাঙলার গবর্ণর স্যার রবার্ট রীডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। উক্ত স্মারকলিপিতে গবর্ণরকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিপীড়ন হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

কলিকাতা টালা পার্কে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলে অল্প দিনের মধ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তৎসমুদয়ের কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছিল উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ট্রাইবুনাল ময়ূরাপুর, শঙ্করপুর, ভাদোরা ও হাজারীবাগ ট্রেন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রেল অপসারিত করায় ঐ তিন স্থলে ট্রেন রেলচ্যুত হইয়াছিল।

২৮শে—

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দেব সম্প্রতি শিলং জেলে যাইয়া নাগারাণী গুইদালোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। রাণী গুইদালোকে এখনও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ নির্জ্জনভাবে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। ফল ও দুধ খাইয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে তিনি এক মাস উপবাস করিয়াছেন।

ব্রহ্মের বাণিজ্য-সচিব উটুন পদত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্ম মন্ত্রিসভার মন্ত্রিসঙ্কট দেখা দিয়াছে।

হিন্দোল রাজ্যে শাসন সংস্কারের জন্য কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু "নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন ও তারপর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে পণ্ডিতজী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর "ফরওয়ার্ড ব্লক" গঠন ও রাজকোটের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

২৯শে—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের দফাওয়ারী আলোচনা সুরু হয়। মনোনীত সদস্য সংখ্যা ৮ হইতে হ্রাস করিয়া ৪ করার জন্য একটি বে-সরকারী সংশোধন প্রস্তাব ২১-২০ ভোটে গৃহীত হওয়ায় সরকার পক্ষের পরাজয় হইয়াছে।

সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে হিন্দুগণের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য হিন্দু প্রতিনিধি দলের যে সমস্ত সদস্য দার্জ্জিলিং-এ গবর্ণর সকাশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত এন কে বসু ছাড়া সকলেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। চাকুরী বণ্টন সম্পর্কে গবর্ণরের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নাই।

শিয়ালদহের মেন ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের শবাগারে একটি কাঠের বাক্সের ভিতর একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইহাতে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃত ব্যক্তিকে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের পিয়ন ভুবন বেহারা বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ মেডিকাল কলেজের দারোয়ান গোরা সিং নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

হায়দরাবাদ জেলে [illegible] নামে ২২ বৎসর বয়স্ক আর একজন সত্যাগ্রহী বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিলের কয়েকটি ধারার আলোচনা হয়।

আলোয়ার শহরে বিজয়মন্দির প্রাসাদে পুলিশের এক কনেষ্টবলের সহিত এক সার্জ্জেণ্টের ঝগড়ার সময়ে প্রথমোক্ত ব্যক্তি গুলী করিয়া ঐ সার্জ্জেণ্ট ও অপর এক কনেষ্টবলকে হত্যা করে এবং তৎপর আত্মহত্যা করে।

সাম্প্রদায়িক প্রচার ও সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধাদির বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তৎসম্পর্কে সিমলায় স্বরাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ব্রহ্মের উ-পু মন্ত্রিসভা গবর্ণরের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। উহা গৃহীত হইয়াছে। আগামীকল্য নূতন মন্ত্রীদিগকে শপথ লওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।
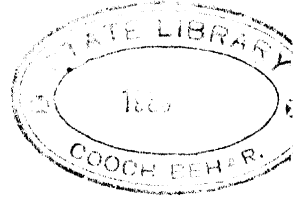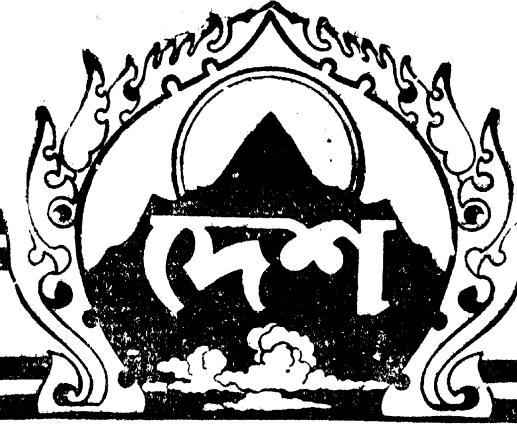
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, Saturday, 27th May, 1939 [২৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দরদের দরদী—

বাঙলার অর্থসচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার চাকুরী বাঁটোয়ারা সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। নলিনীবাবু মতলব ছাড়া কোন কাজ করেন না। তাঁহার এই বিবৃতির ভিতরে যে মতলবটি ধরা পড়িয়াছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁহাদের উত্তর-সাধক হক মন্ত্রিমণ্ডলের সমস্বার্থের স্বরূপ তাহাতে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মতলব হইল নিয়মতান্ত্রিকতার মোহজাল বিস্তার করিয়া মন্ত্রি-হিসাবে নিজেদের মর্য্যাদা বাড়ান এবং অপর মতলব হইল, সাম্প্রদায়িকতাকে খোঁচাইয়া তুলিয়া জাতীয় শক্তিকে দুর্ব্বল করা। নলিনীবাবুর বড় দুঃখ এই যে, তাঁহারা কাষ্ট-হিন্দু-মন্ত্রীরা কেবল হিন্দু সমাজের নিঃস্বার্থ সেবার ব্রত লইয়াই মন্ত্রিত্ব করিতেছেন, কিন্তু পোড়া এদেশের লোকগুলা তাঁহাদের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছে না। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই হাল ছাড়িবেন না। তিনি বলিতেছেন,—"আমরা বর্ণ-হিন্দু মন্ত্রীরা যথাসাধ্য সব বিষয়ে খতাইয়া দেখিয়া এবং যুক্তি-তর্ক ও অনুরোধ-উপরোধ দ্বারা সাধ্যমত যথাসম্ভব হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় আছি। শেষ ফল যাহাই হউক, আমরা হাল ছাড়িব না।" হাল ছাড়িবেন না, সাধু সংকল্প! আমরা জানি, নলিনীরঞ্জন সরকারের মত সুবিধাবাদী দেশ এবং জাতির স্বার্থ সম্বন্ধে নির্ব্বিবেক যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষেই হক মন্ত্রি-মণ্ডলে থাকিয়া কাড়িয়ালী করা সম্ভব। সুবিধাবাদীদের যাহা সহজ বুঝ, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক—স্থূল সেই ব্যক্তি স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই থাকিবে। বৃহত্তর স্বার্থের যে প্রেরণায় মানুষ ত্যাগ স্বীকার করে, সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি লয়, সে প্রেরণা তাঁহাদের শ্রেণীর জীবের ধাতুতে নাই। তাই নলিনীবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া পাকাইয়া পেঁচাইয়া মডারেট যুক্তি ঝাড়িয়াছেন। হক মন্ত্রিমণ্ডলের সর্ব্বগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার নীতিতে দেশের লোকের অন্তর কতটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের কানে এই সব কেঁকান-ঘেঙ্গান যুক্তি কতটা বিরক্তিকর, সরকার সাহেব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদি কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেন সে ভাবটাকে, তবে এই সব ফিকির এবং ফেরব্বাজী দেখাইতে সাহস পাইতেন না। দিন দিন অতি ঘোর সাম্প্রদায়িকতা সমস্ত দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাইয়া ঢুকিতেছে। হক মন্ত্রি-মণ্ডলের নির্ব্বিবেক নীতির ফলে, বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং দেশ-সেবার যত সাধনা সব আজ বিপন্ন। এ সব প্রত্যক্ষ এবং সত্য, ইহার মাঝে সেই হক মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া হিন্দু মন্ত্রীরা নিজেদের দুধের বাটিতে চুমুক মারিবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের দরদ যে সূক্ষ্ম ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে থাকিয়া দেখাইতেছেন—শুনিতে চাহে না তাহা জাতি! তাহারা চায় আদর্শ নিষ্ঠা, তাহারা চায় আন্তরিকতা। দেশের লোক চাহে না স্বার্থের সঙ্গে গোঁজামিল। হিন্দু স্বার্থ—দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থের সমূহ সর্ব্বনাশ হইতেছে যাঁহাদের নীতির ফলে, তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন সুবিধাবাদীদের বুদ্ধির ফেরে পড়িয়া, কার্য্যকর এবং সফল ও সম্মানজনকভাবে সে নীতির বিরুদ্ধতা করিতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে, হক মন্ত্রি-মণ্ডলীর মুসলমান অংশের সর্ব্বতোমুখী স্বার্থান্ধ কর্ম্ম-প্রণালীকে যাঁহারা সমর্থন করিতেছেন কিম্বা নিরপেক্ষ থাকিয়া তাঁহাকে প্রশ্রয় দিতেছেন, লজ্জার নাম গন্ধ সেই সব মন্ত্রীদের মধ্যে থাকিলে, মুখ বাড়াইয়া কথা বলিতে আসা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না! হিন্দু স্বার্থরক্ষার দোহাই দেন যে মুখে, সেই মুখে যাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রীদের গুণ-গান করিতে পারেন, তাঁহাদের বেহায়াপনা ঢাকা পড়ে না বিনাইয়া বিনাইয়া বাঁধা বুলি আওড়াইলে। নলিনীবাবুর এটুকু বুঝা উচিত ছিল। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল এই সত্যটা যে, বাঙলার হিন্দু সমাজ,—শুধু হিন্দু সমাজ কেন,

সমস্ত বাঙলা দেশ, মুষ্টিমেয় ইতর স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল চাহে না—চাহে এই মন্ত্রিমণ্ডলকে ভাঙ্গিতে। কোন রকম আপোষ-রফার কথা ইহাদের সঙ্গে চলিতে পারে না। সারা দেশের এই সঙ্কল্প। এই মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিকে ব্যর্থ করিবার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা যিনি না ধরিবেন, তিনিই দেশের শত্রু। নলিনীবাবু হক মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রীদের গুণগান করিয়াছেন, কিন্তু দেশের ও জাতির স্বার্থকে যে মনোভাব বিকাইয়া দেয়—মান, যশ, প্রতিপত্তি বা তেমন অন্য কিছু ইতর স্বার্থেরই মোহে—শুধু তেমন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মুখ দিয়াই ঐ ধরণের স্তুতি, গীতি বাহির হইতে পারে। নলিনীবাবুর এই ধরণের সাফাই তাঁহাদের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদের প্রতি দেশবাসীর অন্তরের তিক্ততা বৃদ্ধি করিতেই সাহায্য করিবে।

দায়ী কাহারা ?—

হক মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির ফলে, বাঙলা দেশে আজ যে সাম্প্রদায়িকতা এতটা শক্ত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং দিন দিনই উঠিতেছে, এজন্য দায়ী কাহারা ? আমরা বলিব, দায়ী অপরে যতই হউক, নলিনীবাবুর মত যাঁহারা সুবিধাবাদকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই সব হিন্দু মন্ত্রীদের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। হক মন্ত্রিমণ্ডলের যাঁহারা মুসলমান, তাঁহাদের মতিবুদ্ধি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি; কিন্তু হিন্দু স্বার্থের ভড়ং ফলাইতেছেন যে সব হিন্দু মন্ত্রী—তাঁহাদের যে চূড়ান্ত মিথ্যাচার, তাহা ক্ষমার অতীত। হক মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি এ পর্য্যন্ত দেশের কি উপকার করিয়াছে, আমরা জানি না, তবে সুস্পষ্টভাবে ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর সাধ্য এবং সাধনা প্রকাশ্যভাবে পর্য্যুদস্ত করাই হইল সে নীতির একমাত্র লক্ষ্য। এ কথা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া দরকার হয় না যে, বাঙলার হিন্দু কোন দিনই সাম্প্রদায়িকতাকে বড় বলিয়া বুঝে নাই, জাতীয়তাই বাঙালী হিন্দুর আদর্শ এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে নিজেদের রক্ত ঢালিয়া দিয়া বাঙালী হিন্দুই সেই আদর্শকে জীবন্ত রূপ দান করিয়াছে, সেই আদর্শকে ধ্বংস হইয়া যাইতে যাঁহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে, তাঁহারাই আবার বাঙালী, তাঁহাদেরই মুখে আবার হিন্দুয়ানি ! নলিনীবাবু প্রভৃতি হিন্দু মন্ত্রীরা যাঁহারা হক মন্ত্রিমণ্ডলের নীতিতে সায় জোগাইয়া চলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গদিগের সেবা করিতেছেন এবং জাতির সংহতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নষ্ট হইতে দিতেছেন, চাকুরীর মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, যাঁহাদের প্রতিবাদের মাত্রা শুধু মন্ত্রিমণ্ডল-মধ্যগত নিষ্ফল পারিবারিক মান-অভিমান; অথবা অন্য কথায় পিরীতের বিবর্ত্তবিলাসেই পর্য্যবসিত হইতেছে কবির ভাষায়,—দেশের দুর্দ্দশা লইয়াই তাঁহাদের ব্যবসায়। তাঁহাদের এই যে কৃতিত্ব এজন্য পুরস্কার অবশ্যই তাঁহাদের অদৃষ্টে মিলিবে এবং সে দিনের দেরী নাই।

ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতি—

কিছুদিন পূর্ব্বে বৈদ্যবাটীতে এক জনসভায় সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতি এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ফরোয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। অহিংস অসহযোগ ইহার কর্ম্মনীতি হইলেও ইহার লক্ষ্য স্বতন্ত্র, ইহার কর্ম্মপন্থাও স্বতন্ত্র। ফরোয়ার্ড ব্লক যুক্তি বা আপোষের মারফৎ স্বাধীনতা অর্জ্জনে বিশ্বাসী নহে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে করিব, আমরা তাহা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য উহার সহিত একটা বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা সংযোগ করিব। কংগ্রেসের নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করা হয় নাই; কেননা, কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি হারাইয়াছেন; কিন্তু রুশিয়া বা আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিতেন বা ফৈজপুরের প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। দেশকে অধিকতর অগ্রগামী মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিয়া আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই হইবে ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য।"

স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, নিজেদের ক্ষমতার বলে অর্জ্জন করিতে হয় এবং প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামের মনোবৃত্তির ভিতর দিয়াই এই ক্ষমতা গড়িয়া উঠে। সংগ্রামের পথে ফল সদ্য সদ্য হয় না হয়, ইহা বড় কথা নয়; কিন্তু আপোষের মনোবৃত্তি শক্তির মূলকেই লুপ্ত করিয়া দেয়। তেমন জিনিষের অধ্যাত্মাভাস রূপ অহিংসা বা প্রেম যাহাই হউক না কেন, এই বিশ্ব-জগতে তাহার বাস্তব রূপ পরাধীনতা, অসহায়ত্ব এবং দাস্য বৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। যাঁহারা বলিতেছেন যে, ফরোয়ার্ড ব্লকের স্বতন্ত্র কোন মতবাদ নাই, তাঁহাদের যুক্তির মূল্য আমরা বুঝি না। পণ্ডিত জওহরলালের আধুনিক যুক্তিও আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য এবং কর্ত্তাভজা মনোবৃত্তির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম চালানই ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতি। ফরোয়ার্ড ব্লকের মতবাদ হইল এই যে, সংগ্রামের ভিতর দিয়াই শক্তি বাড়ে এবং সংগ্রামের মনোবৃত্তি পরিত্যাগের দিকে ঝোঁক যখন আসে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, আদর্শ হইতে পতন ঘটিয়াছে। সঙ্কীর্ণতর স্বার্থের আবরণে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, এসবই আধ্যাত্মিকতা, সাত্ত্বিকতা এবং অহিংসার আবরণে মিথ্যাচার প্রকট করিতেছে। মিথ্যাচারই সব চেয়ে বড় পাপ। এই মিথ্যাচারের পাপ হইতে দেশকে বীর্য্যবত্তায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে; নতুবা স্বাধীনতা আসিবে না। ত্যাগ এবং আত্মবলিদানের ফলেই স্বাধীনতা আসে। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা না আসে—ত্যাগ এবং আত্মবলিদানের অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, ফরোয়ার্ড ব্লকের ইহাই হইল মতবাদ।

মুখে এক কাজে আর—

কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মিঃ নলিনী সরকারের সাফাইয়ের উত্তর দিয়াছেন, উত্তরের ভাষা রীতিমত চোস্ত। এই বিবৃতিতে শরৎবাবু বলেন—"তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্বন্ধে এবং সরকারী চাকুরীর বাঁটোয়ারার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত পোষণ করিয়াও পরোক্ষে বিলে সম্মতিই দিয়াছেন এবং নিজেরা উহা অনুমোদন করেন না বলিয়া লোক চক্ষুতে নিজেদের সুনাম বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুত সরকার একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক। মন্ত্রিসভায় থাকিয়াও সমষ্টিগত দায়িত্ব এড়াইবেন এতটা নিরীহ ভাব তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। সুষ্ঠু কথায় বলিতে গেলে—মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিয়াও তিনি নির্ভয়ে এবং অকুণ্ঠিতভাবে নিজকে বাঙলার হিন্দু জনমতের সমর্থক বলিয়া জাহির করিবেন এম। আশা করা যায় না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে হিন্দু মন্ত্রীরা যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা লোক চক্ষুতে অনেকটা নামিয়া গিয়াছেন। সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার সম্পর্কে বিরুদ্ধতা ত্যাগ করিয়া অনুরূপভাবে সায় দিয়া মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিবেন, আমরা কি ইহাই প্রত্যাশা করিব!"

শ্রীযুত বসু মহাশয় বলিতেছেন যে হিন্দু মন্ত্রীরা নিজেদের নীতি বিসর্জ্জন দিয়াও চাকুরী বজায় রাখিয়াছেন। নীতির মর্য্যাদা বোধ যাঁহাদের মধ্যে আছে এমন অভিযোগের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহাদেরই আছে। কিন্তু হিন্দু মন্ত্রীদের মধ্যে নীতি বলিতে যে বস্তু বুঝায়, তেমন কোন পদার্থ আছে কি? নীতি বলিতে তাঁহাদের একমাত্র নীতি হইল—চাকুরী বজায় রাখা। বসু মহাশয় বলিতেছেন যে, এইভাবে ভাবের ঘরে বিদ্যা ফলাইয়া তাঁহারা লোক চক্ষুতে অনেকটা নামিয়া গিয়াছেন। আমরা বলিব অনেকটা কেন, তাঁহারা নামিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছেন যদি দেখিতে চাহেন কলিকাতার কোন প্রকাশ্য জনসভায় উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন।

রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি—

গত রবিবার নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের রাজনৈতিক বন্দিরা অনেকে এখনও কারাগারে আবদ্ধ আছেন, পাঞ্জাবের রাজনীতিক বন্দিরাও অনেকে এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই। পাঞ্জাব এবং বাঙলা এই দুইটি প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট নহে, জনগণের রাষ্ট্রনীতিক অগ্রগতির চেতনার সঙ্গে এই দুই প্রদেশের সরকারের সহানুভূতি নাই; কিন্তু কংগ্রেসী প্রদেশগুলির বেলায় আছে কি কৈফিয়ৎ? যাহারা এই প্রতিশ্রুতি দেশের লোকের নিকট দিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে, মন্ত্রিত্ব লইয়া তাঁহারা রাজনীতিক বন্দিদিগকে মুক্তি দান করিবেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন কি করিয়া? অসুবিধা আছে, অন্তরায় আছে, কর্ত্তৃত্ব নাই, সবই বুঝি; কিন্তু যদি তাহা না থাকে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা তাঁহারা না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পদত্যাগ করা উচিত। বাঙলা সম্বন্ধে আমরা বুঝি ইহা যে, যত দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান প্রগতি-বিরোধী মন্ত্রিমণ্ডলের পতন না ঘটিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত রাজনীতিক বন্দিদের সকলের মুক্তি এখানে ঘটিবে না। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে এ সব কোন যুক্তিই খাটে না; এবং একথা সত্য যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি এই প্রশ্নটিকে নিখিল ভারতীয় সমস্যা করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে শুধু তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের রাজনীতিক বন্দিরাই যে মুক্তিলাভ করিতেন, এমন নহে, সেই সঙ্গে বাঙলা এবং পাঞ্জাবের রাজনীতিকবন্দিদেরও মুক্তি ঘটিত। প্রকৃত কথা হইল এই যে, মন্ত্রীগিরির মায়ামমতাকে বড় করিয়া না দেখিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি বৃহত্তর আদর্শের দিক হইতে এই প্রস্তাবটিকে দেখিতেন, তাহা হইলে বাঙলার সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরের যোগ ঘটিত এবং জাতীয়তার পথে কংগ্রেসেরও শক্তি বৃদ্ধি পাইত; কিন্তু তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহ নিয়মতান্ত্রিকতার জালে জড়াইয়া কংগ্রেসের শক্তিকে দিন দিনই ক্ষুণ্ণ করিতেছে এবং যাঁহারা শত্রুপক্ষীয় আনন্দ বাড়িতেছে তাহাদেরই। এই অবস্থা কাটাইতে হইলে দেশের জনমতকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দলের নীতির বিরুদ্ধে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—জাগাইতে হইবে কংগ্রেসের স্বার্থেরই জন্য।

রাজকোটের রস-রূপ—

মহাত্মা গান্ধী সব দাবী হইতে রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে রেহাই দিয়াছেন। মহাত্মাজীর প্রায়োবেশনের উৎকণ্ঠার মধ্যে যে পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল, সেদিন আনন্দোল্লাস ও আলোক সজ্জার মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। শাসন সংস্কার কমিটি গঠিত হইয়াছে; এই কমিটিতে প্রজা-পরিষদের একজন লোকও নাই। সব সদস্যই ঠাকুর সাহেবের মনোনীত। মহাত্মাজী এই উৎসবে যোগ দিয়া ঠাকুর সাহেবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু যে বেচারারা প্রজার অধিকার লইয়া সংগ্রাম করিল, যাহাদের জন্য মহাত্মাজী করিলেন সংগ্রাম, সেই প্রজা-পরিষদের কেহই উৎসবে যোগদানের অধিকার পান নাই। তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণও করা হয় নাই। যে বীরবল বাহাদুর প্রজা-পরিষদের আগাগোড়া বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহার কূট কৌশলের কাছে মহাত্মাজীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেই বীরবল বাহাদুরের মহিমা আজ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। শাসন সংস্কার কমিটির সভাপতি স্বয়ং তিনি। রাজকোটের রণক্ষেত্রের ভিতর দিয়া মহাত্মাজী সর্ব্বভাবে আত্মনিবেদনের এই পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সর্ব্বভাবে আত্মনিবেদনেই প্রভুদের মনস্তুষ্টি সম্ভব হয়; সমস্যা শুধু এই যে, এই মনস্তুষ্টিই কি মনের পরিবর্ত্তন? মহাত্মাজী রাজকোটে—আত্মসমর্পণের যে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার অনুগামী দক্ষিণ মার্গাবলম্বী দল সেই নীতিই অবলম্বনের ঔচিত্যকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতেছেন কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ফেডারেশনের বিরুদ্ধতা, যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এ সব কথা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না।

গোড়ায় গলদ—

মিঃ নলিনী সরকার তাঁহার বিবৃতিতে এই কথাটা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সদস্যেরা যদি তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে জোর বাড়িত। হক মন্ত্রিমণ্ডলের মুসলমান সদস্যেরা হিন্দু সদস্যদের দাবীর প্রতি উদাসীন নহেন। সরকার মহোদয়ের এই যুক্তির মূলে যে কোন যুক্তি নাই, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বলিতে গেলে বাঙলা দেশের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়ই এই বিলের বিরুদ্ধতা করিয়াছে, নলিনীবাবুও বোধ হয় বিরুদ্ধতা করিয়াছেন; কিন্তু সেই বিরুদ্ধতার ফল কি হইয়াছে?

হিন্দু সমাজের দাবী, আর হিন্দু সমাজের দাবীই বা বলিব কেন, ন্যায়, যুক্তি এবং গণতান্ত্রিকতার পক্ষে যত দাবী বা বিচার সব নির্ব্বিবেক চিত্তে বাতিল করিয়া দিয়া প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক নিজের গোঁ-ই বজায় রাখিয়াছেন। নলিনীবাবু গোঁসা করিয়াছিলেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা জানিতাম সে গোঁসার দৌড় কতটা—পরে দেখা গেল মান অভিমানের পালা শেষ হইয়াছে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়া মিশিল। কলিকাতার পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল বাঙালী। কার্য্যত যে অনিষ্ট ঘটিবার তাহা ঘটিল—মন্ত্রীদের মান অভিমান বুঝা গেল প্রেমের বৈচিত্র্য মাত্র! বুঝা গেল, সে চাল প্রকারান্তরে নিজেদের মর্য্যাদা এবং হক মন্ত্রিমণ্ডলের সমীচীনতা বা উদারতা সম্বন্ধে একটা বুদ্ধি দেশের লোকের মনে গড়িয়া তুলিবারই একটা কৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু মন্ত্রীদের সাময়িক এই যে মান-অভিমান—ইহার বাস্তব রূপের ব্যাখ্যা অন্যভাবে করা যায় না। দেশের লোক এই যে দুধও খাওয়া তামাকও খাওয়া—এক ঢিলে দুই পাখী মারা, এমন নীতিতে আর সন্তুষ্ট হইতে প্রস্তুত নয়। দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ—যিনি বুঝিবেন তাঁহাকে এক পথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং শেষ পথ হইল হক মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বর্জ্জন করা, অন্তত পক্ষে এই মন্ত্রিমণ্ডলের অনিষ্ট-কারিতার কোন দায়িত্ব কোন রকমে হিন্দু সম্প্রদায় লইতে প্রস্তুত নয়। তেমন সম্পর্কে তাঁহারা থাকিতে চাহেন না। বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের নীতি হইল বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম; অন্য কোন বিচার এক্ষেত্রে নাই; কারণ এ ক্ষেত্রে অন্য বিচার যদি কখন আসে বুঝিতে হইবে ইতর এবং সংকীর্ণ স্বার্থই সেই বিচারের কূটস্থ কারণ রূপে রহিয়াছে; রহিয়াছে সেখানে মনুষ্যত্বের অভাব, রহিয়াছে অবীর্য্য, পশুত্ব এবং প্রমাদ।

রাণী গুইদালোর অনশন—

রাণী গুইদালোর নাম অনেকেই জানেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আসাম পরিভ্রমণের পর এই বীর নারীর কথা ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত হইয়াছে। আমরাও 'দেশে' ইঁহার সম্বন্ধে কয়েক সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতে গুইদালো কারারুদ্ধ আছেন। তাঁহার মুক্তির জন্য অনেক আন্দোলন করা হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সুফল ফলে নাই। সম্প্রতি এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাণী গুইদালো দীর্ঘকাল যাবৎ শিলং জেলে অনশন অবলম্বন করিয়া আছেন। এই অনশন এখনও চলিতেছে কি না জানা যায় নাই। এই সংবাদে দেশের সর্ব্বত্র গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। অনর্থক কেন যে ইঁহাকে এখনও আটকাইয়া রাখা হইতেছে, ইহা আমরা বুঝি না। আমরা শুনিয়াছিলাম, আসাম গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ভারত সচিবের সঙ্গে লেখালেখি করিতেছেন এবং তাহার ফলে সত্বরই তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ যাবৎ সে সম্ভাবনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইতেছে, তাহাতে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। গুইদালোকে মুক্তি দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে বিপর্য্যস্ত হইবে, এমন ভয়েরও কোন কারণ দেখা যায় না। এদেশে বিদেশী কর্ত্তারা মতলববাজ রাজনীতিকদিগকে ভয় করেন; এই কথা হামেসা তাহাদের মুখে শুনি; কিন্তু রাণী গুইদালো মতলববাজ রাজনীতিক নহেন। একটা মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই এই সরলা নাগা বালিকা দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে আইনের দিক হইতে অপরাধ হয়ত তখন হইয়াছিল; কিন্তু দেশের অবস্থা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা জানি আসাম গবর্ণমেণ্টের হাতে যদি এ ব্যাপার নির্ভর করিত, তাহা হইলে গুইদালো ইতিপূর্ব্বেই মুক্তিলাভ করিতেন। মুস্কিল হইয়াছে এই যে, তিনি মণিপুর রাজ্যের প্রজা এবং মণিপুর রাজ দরবার কর্ত্তৃক দণ্ডিতা বলিয়া আসাম সরকারের কোন ব্যবস্থা তাঁহার উপর খাটে না, এই যুক্তি দেখান হইতেছে। সংবাদে প্রকাশ, আসামের গবর্ণরের সেক্রেটারী এ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা কি মুক্তির জন্যই চেষ্টা কি, সুস্পষ্ট নহে। যাহা হউক, রাণী গুইদালো যাহাতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করেন, আমরা তাহাই দেখিতে চাই। যদি তাঁহাকে মুক্তিদান না করা হয়, মণিপুর দরবার প্রতিবন্ধকতা করেন বা উপরের চাপে করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে আসাম গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে এই বিষয়টির উপর আর একটু বিশেষ রকমে, এমনভাবে জোর দেওয়া যাহাতে কর্ত্তারা গুইদালোকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

ভেদ-নীতির গুরু—

মিঃ এইচ সি এ হাণ্টার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্বেতাঙ্গ দলের নেতা। সেদিন মিউনিসিপ্যাল বিলের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে তিনি ওকালতি করিয়াছেন। ইংরেজ গণতান্ত্রিক জাতি বলিয়া গর্ব্ব করে। কিন্তু ভারত-বর্ষের বেলায় ইংরেজের বুদ্ধির বৈচিত্র্য এই যে, যে ব্যবস্থাকে তাঁহারা নিজেদের পক্ষে বিষস্বরূপ মনে করে, ভারতবাসীদের কাছে তাহাই উমদা চীজ বলিয়া বাৎলায়। ইহার কারণ কি? হাণ্টার সাহেবের মতে ইংরেজের ইহাই হইল ভারতের প্রতি নিষ্কাম প্রেমের পরিচয়। তিনি বলেন, এমন কথা কি বলা সংগত হইতে পারে যে, এদেশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত

হইবার পর হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যত সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে ,সবই ইংরেজেরই চক্রান্তে হইয়াছে! বাস্তবিকপক্ষে সত্য ইহার বিপরীত। সম্প্রদায় বিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা ইংরেজের কোন দিনই উদ্দেশ্য হয় নাই; তাহাদের লক্ষ্য হইল, দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সেই সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে অন্যায়-ভাবে লঙ্ঘিত না হয়, তাহাই করা। কথাগুলি শুনিতে ভাল। ইংরেজ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে সাম্প্রদায়িকতা ছিল কি না ছিল, ইহা বিচার্য্য নহে; বিচার্য্য হইল, ইংরেজ এদেশে আসিবার পর সাম্প্রদায়িকতা কতটা হ্রাস পাইয়াছে তাহাই। ভারতের শাসন-সংস্কারের অধ্যায়ের পর অধ্যায় লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ব্রিটিশের নীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ভাবকে তুচ্ছ না করিয়া উত্তরোত্তর তাহার উপরই জোর বেশী দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনের আদি, মধ্য এবং অন্ত সব জায়গায় অনুসৃত হইয়াছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ। সম্প্রদায় বিশেষের বাস্তব লাভ-লোকশানের বিচারকে বড় করিয়া দেখার মূলে ন্যায়ের দোহাই যেমনই দেওয়া হউক না কেন,জাতীয়তার দিক হইতে উহা যে পরমক্ষতি এবং মারাত্মক ক্ষতি, হাণ্টার সাহেব কি একথা স্বীকার না করিয়া পারেন। সাম্প্রদায়িক বিচারের এই দৃষ্টিকে বড় করিয়া তুলিবার ফল বস্তুগত্যা কি দাঁড়াইতেছে, দেখিতে হইবে তাহাই ; শুধু সূত্র আওড়াইলে চলিবে না। ইহার ফলে, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধের বুদ্ধিটা জাগিয়া উঠিতেছে এবং এ দেশের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের সর্দ্দারীটা পোক্ত হইতেছে। বাঙলার আইনসভার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এই ভেদনীতিকে সর্ব্বাংশে সার্থক করিয়া তুলিয়া হক মন্ত্রিমণ্ডল ইংরেজ স্বার্থসেবী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই, হক মন্ত্রিমণ্ডলের অন্য অনেক দোষ-ত্রুটি ইংরেজের দৃষ্টিতে পড়িলেও, সে সব দোষ-ত্রুটি গুণ হইয়াই দাঁড়াইতেছে। মিউনিসিপ্যাল বিলের ক্ষেত্রেই তাহাই। গুরুগিরির গৌরবের অধিকারী ইংরেজেরাই। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে ইংরেজেরই, এই ব্যবস্থায়---এই জন্যেই ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যে ইংরেজ, সেই ইংরেজও এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতির সমর্থন করিতেছে। ইংরেজের নিজেদের পক্ষে যাহা বিষ, ভারতবাসীদের পক্ষে সেই জিনিষই যে তাঁহারা অমৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, ইহার মূলে মনস্তত্ত্ব হইল এই জিনিষটি। এই জন্যই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে অ-সাম্প্রদায়িকতা, প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা, এই সব আজগুবি কথা ইংরেজের মুখে আমরা শুনি। এই জন্যই আমরা এই ধরণের যুক্তি শুনি যে, মিউনিসিপ্যাল বিলে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসম্মত সুবিচার-পরায়ণতার সঙ্গে কর্পোরেশনে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখা হইয়াছে। ইহার উত্তরে ইহাই বলিতে হয়, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দু-প্রাধান্যে কর্পোরেশনের কার্য্যে উদার অনুভূতি বাড়িবে বা সাম্প্রদায়িকদের দ্বারাই সাম্প্রদায়িকতা কমিবে?

এইবার ডানজিগ—

এইবার বোধ হয় ডানজিগের পালা আসিতেছে। ডানজিগের জার্ম্মানরা উত্তেজিত হইয়া পোলদের শুল্ক অফিস ভাঙিগয়া ফেলিয়াছে। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সর্ব্বশেষে আলবেনিয়ার ব্যাপারে আমরা দেখিয়াছি যে, ফ্যাসিষ্ট এবং নাৎসীরা এইভাবেই প্রথমে হাত বাড়ায়। ডানজিগে যে ফ্যাঁকড়া দেখা দিল, হের হিটলার ইহাকে ডানজিগ দখলের সুযোগ স্বরূপে গ্রহণ করিতে বেশী দেরী করিবেন বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মানী হইতেই উস্কানি পাইয়া পর পর কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপে একই রকমের ঘটনা ঘটিয়াছে এবং পররাজ্যগ্রাস-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ওদিকে জার্ম্মানীর সঙ্গে ইটালীর পাকা দোস্তী হইয়া গেল। যুদ্ধ বাধিলে এক শক্তি অপর বন্ধু শক্তিকে সাহায্য করিবে, চুক্তির প্রধান কথাই হইল ইহা। এই বন্ধুশক্তি চুক্তির ফলের অধিকারীদের মধ্যে হাঙ্গারী, জাপান এবং মাঞ্চুকুও আছে। এদিকে আমাদের কর্ত্তারা—ফরাসী, ইংরেজ এবং রুশিয়া—এই ত্রয়ী শক্তিতে চুক্তি করিবার চেষ্টায় আছেন; কিন্তু ষোলআনা মতের মিল হইতেছে না। হইবেই বা কেমন করিয়া? কমিউনিষ্ট রুশিয়ার সঙ্গে এ পক্ষের কর্ত্তাদের 'মনে-প্রাণে মিল কি সম্ভব! রুশিয়া এই সর্ত্ত দিতে বলিতেছে যে, জার্ম্মানী যদি রুশিয়ার কোন রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইংরেজকে রুশিয়ার পক্ষ হইয়া লড়াই করিতে হইবে। ইংরেজেরা হুঁসিয়ার। তাঁহারা সহজে ইহাতে রাজী হইতে চাহিতেছে না; সুতরাং কার্য্যত এদিককার কর্ত্তাদের ধড়াচূড়া বাঁধাই চলিবে, সেই অবসরে জার্ম্মানী এবং ইটালী কাজের পথেই আগাইয়া যাইবে—আজ ডানজিগ, কালই জার্ম্মানী আর ইটালী জোট বাঁধিয়া উপনিবেশগুলি পুনরুদ্ধারের দাবী উপস্থিত করিবে এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক ফরাসী-ইংরেজের সাধ্য-শক্তিতে কার্য্যত কুলাইবে না—তাহাতে বাধা দেওয়া। আবিসিনিয়ার ব্যাপারের পর হইতে রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ জাতির যে দ্রুত অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ পরিণতি কোথায় এখনও বুঝা যাইতেছে না। রাজনীতিক চাতুর্য্যের দিক হইতে ইংরেজের এমন শোচনীয় অবস্থা জগতের ইতিহাসে কোন দিন দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ।

বঙ্গীয় মহাজনী বিল—

বঙ্গীয় মহাজনী বিলের আলোচনা চলিতেছে। ইংরেজ-বণিক ধনীদের চাপে পড়িয়া মন্ত্রিমণ্ডল সিডিউল ব্যাঙ্ক-গুলিকে বিলের আওতা হইতে রেহাই দিয়াছেন। তারপর ছোট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেও কতকগুলিকে গবর্ণমেণ্ট নোটি-ফায়েড ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষিত করিতে পারিবেন, সুতরাং তখন সেগুলিও আইনের জালের মধ্যে পড়িবে না। অতঃপর ইন্সিওর কোম্পানীগুলিকেও আইনের গণ্ডীর বাহিরে ফেলা হইয়াছে। অতএব কুসীদ ব্যবসায় যে-সব প্রতিষ্ঠান চালায়, সেগুলির চৌদ্দ আনাই রেহাই পাইল। যাহারা প্রধানত সুদের কারবার চালাই[illegible] পড়িল তাহারাই:

কংগ্রেসী দল, কৃষক-প্রজা দল, স্বতন্ত্র তপশীলী দল ইহারা সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বাঙলার গরীবদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। টাকাওয়ালাদের তুষ্টি পুষ্টি করিয়া হক মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার ইতিহাসে কৃষক-প্রজা দরদের যে অপূর্ব্ব অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, বঙ্গীয় মহাজনী বিলটি তাহাতে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিবে এবং স্বার্থবাদী দলের ভোটের জোরে আইনে পরিণত হইয়া সুখী হক পরিবারের সুখ বর্দ্ধন করিবে।

আসামে শাসন-তান্ত্রিক সঙ্কট—

আসামের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অসহযোগ ঘোষণা করিয়াছেন। চা-ব্যবসায়ী সাহেবেরা জোট বাঁধিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাগানের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিলে যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকেরা কাজে ফিরিয়া না আসিবে ততদিন পর্যন্ত সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মঘটের মীমাংসা-সংশ্লিষ্ট কোন চেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন না। এবং বাণিজ্য-বিরোধ আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির কোন সিদ্ধান্ত মানা না-মানা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন থাকিবে। ডিগবয়ের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে তদন্তের জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট একটি নিরপেক্ষ ট্রাইবিউন্যাল নিয়োগের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই ঘোষণায় একেবারে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, এই ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের কতিপয় কর্ম্মচারীর আচরণ এবং আসাম অয়েল কোম্পানী কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া, বাহির হইতে শ্রমজীবী সংগ্রহ—এ-সব বিষয়ের সম্বন্ধে আসাম গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। স্বার্থে ঘা পড়িলে চটিয়া উঠে সকলেই। আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গতানুগতিক সরকারী নীতি অনুযায়ী মনিব পক্ষে মর্জ্জি যোগাইয়া চলিতেছেন না, এবং যথোচিতভাবে শ্রমিকদলন ক্রিয়া চলিতেছে না, সুতরাং শ্বেতাঙ্গ চা-ব্যবসায়ীদের চটিবার কারণ আছেই। আসাম গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যে নীতি-নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন, সমস্ত দেশ তাহার সমর্থন করিবে। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর দল যদি ধারণা করিয়া থাকেন যে, তাঁহারাই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং তাঁহাদের মর্জ্জিমতই গবর্ণমেণ্ট চলিবে, তবে সে ধারণা তাঁহাদের ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, বুঝাইয়া দিতে হইবে এই সত্য যে, বাঙলা মুল্লুকে হক মন্ত্রিমণ্ডলের শ্বেতাঙ্গ ভক্তির দৌলতে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা যে সর্দ্দারী চালাইতেছেন, আসামে তাহা চলিবে না। আসামের মন্ত্রিমণ্ডলে মর্যাদা-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে, যাহারা দেশের স্বার্থকে পরের পায়ে বিকাইয়া দিতে প্রস্তুত নয় এবং যাহারা মন্ত্রীগিরিকেই পরম পুরুষার্থ বুঝে না।

পরীক্ষার আড়ালে বসন্ত

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

এবার বসন্ত কি বসুন্ধরায় এসেছিল রংএর ফাগে,
কোকিল কি গো ডেকেছিল বকুল গাছে শাখার আগে;
গন্ধ-ছাওয়া মলয় হাওয়া এসেছিল দুয়ার খুলে,
ফুলের মণি দুলেছিল বাসন্তিকার এলোচুলে?
শীতের শেষে শিথিল বেশে
শিশির-সাজে সলাজ হেসে
এসেছিল আলোয় ভেসে স্বপন সম দুলে দুলে?
আমরা ছিলেম গলি-ভরা কলিকাতার বদ্ধ বায়ে
যেথায় আলো ব্যথায় কালো কারখানারই ধূম্রছায়ে,
যেথায় সবে দিন-দুপুরে আপিস করে আলো জেলে
হাজার মোটর হল্লা করে পেট্রোলেরই গন্ধ ঢেলে,
যেথায় পথের কোণে কোণে
ভিখারীদের ব্যথার সনে
মলয় হাওয়া ময়লা ব'য়ে পথে পথে বেড়ায় খেলে।
হেথায় বল বসন্ত হায় ময়লা-মরুর মাঝখানেতে
বসবে কোথায় ক্ষণেক তরে গন্ধ-ফুলের আসন পেতে?
আছে বটে পথের পাশে হেথায় হোথায় স্কোয়ারগুলি,
বিকেল বেলা সবাই যেথা জটলা ক'রে উড়ায় ধূলি;
কাঁচি-ছাঁটা ফুলের গাছে
গন্ধ-বিহীন পাঁপড়ি নাচে :-
ফাগুন কি গো হেথায় আসে রংএর নিশান ঊর্দ্ধে তুলি?

চাঁদের আলো রাতের বেলা হেথায় কভু যায় না দেখা,
আকাশ ঢেকে আলোক-ঝাড়ে বিজ্ঞাপনের ফলক লেখা;
কৃষ্ণ কিম্বা শুক্ল পক্ষ খুঁজে দেখ পঞ্জিকাতে,
বারো মাসই ইলেকট্রিকের চন্দ্র জ্বলে সন্ধ্যারাতে;
বিনা সুরে এমনি ক'রে
ঋতুর চাকা হেথায় ঘোরে,
আয়ু ফুরায় বেজায় জোরে স্কোয়ারগুলোর ফুলের সাথে।
আমরা ছিলেম এই শহরে ঘরের দুয়ার বন্ধ ক'রে,
কাটিয়ে ছিলেম দু'তিনটি মাস এক্‌জামিনের গ্রন্থ পড়ে;
পরীক্ষকের বক্রমুখের স্বপন ছিল শয়ন-সাথী,
রাত দুপুরে ঘড়ির সুরে জেলে নিতেম মোমের বাতি;
নাকের ডগা নোটের পাতে
প'ড়ে যেতেম দিনে রাতে,
পাল্লা দিতেম সবার সাথে পাশের পড়ার নেশায় মাতি'।
সরস্বতীর চিত্রখানি নিয়েছিলেম ময়লা ঝেড়ে
পড়ার আগে প্রণাম দিতেম যতন ক'রে নত শিরে;
সময় কভু পাইনি মোটে বাহির পানে নয়ন দিতে,
জানিনি তাই ফাগুন এবার এল কিনা গন্ধে গীতে;
দেখেছিলেম ক্ষণেক তারে
টেনিসনের ছন্দ-হারে
টির্টেনিয়ার কুঞ্জ-দ্বারে সেক্সপীয়রের কমেডিতে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(১৬)

জাতিগুলির ভিতরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ

এইরূপ না ঘটিতে পারে যদি জাতিগুলির ভিতরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব তাহার পূর্ব্ব তেজস্করতায় বলবৎ থাকে; কারণ তাহা হইলে উহা স্বাভাবিক সহানুভূতির বশে এবং নিজের স্বার্থের খাতিরে সকল সমবায়ভুক্ত জাতিরই স্বাধীনতাগুলির প্রতি সম্মান দাবী করিবে। কিন্তু এখন সকল লক্ষণ যেরূপ দেখা যাইতেছে, আমরা এমন একটা যুগে প্রবেশ করিতেছি, যখন রাষ্ট্রবাদের ছায়ায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত হইয়া যাইবে, হয়ত বা একপ্রকার সাময়িক মৃত্যু, অন্তত পক্ষে সুদীর্ঘ স্তব্ধতা, কোমা ও নিদ্রাই তাহার ভবিতব্যতা। ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় সংকোচন ও যন্ত্রবৎকরণের প্রক্রিয়া চলিবে বলিয়াই মনে হয়। অতএব দুই দিক হইতে এইরূপ প্রক্রিয়া চলিতে থাকিলে স্বাধীনতার ভাব কোথায় তাহার রক্ষাকবচ বা উপজীবিকা পাইবে? এই যুগল প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার প্রাচীন কার্য্যকরী রূপগুলি সম্ভবত লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সুস্থ প্রগতির একমাত্র আশার স্থল থাকিবে মানব মনের একটা নূতন শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট স্বাধীনতার এমন এক নূতন রূপায়ণ যাহা গোষ্ঠী-জীবনের সমষ্টিগত আদর্শের সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমন্বয় করিবে এবং মানবজাতির অধিকতর ঐক্যবদ্ধ জীবনের নবজাত প্রয়োজনের সহিত মণ্ডলীর (Group-unit) স্বাধীনতার সমন্বয় করিবে।

ইতিমধ্যে আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, বাহ্য অর্থাৎ রাজনৈতিক ও শাসনমূলক পদ্ধতি যে অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ও যন্ত্রবৎ রূপের পক্ষপাতী—সেই সবের মধ্যে ঐক্যসাধনের নীতিকে কত দূরে পর্য্যন্ত লওয়া যাইতে পারে, আর তাহাদের অপেক্ষাকৃত চরম রূপায়ণগুলিতে তাহারা মানবজাতির পূর্ণতালাভের দিকে প্রগতিকে কতখানি সাহায্য করিবে বা বাধা দিবে। আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে, জাতীয়তা নীতির উপর ইহার ফল কিরূপ হইতে পারে, ইহার সম্পূর্ণ বিলয়েরই সম্ভাবনা আছে কি না, অথবা যদি উহা বজায় থাকেই, নূতন ঐক্যবদ্ধ জীবনের মধ্যে ঐ নিম্নতম সংবিধান অধিজাতির স্থান কি হইবে। শাসন ব্যবস্থা, "মানবজাতির পার্লামেন্টের" (Parliament of man) পরিকল্পনা এবং সমষ্টিগত জীবনের বিজ্ঞানে এই নূতন বিরাট সমস্যা-সংক্রান্ত রাজনৈতিক অর্গ্যানিজেশনের অন্যান্য পরিকল্পনার প্রশ্নও এই সঙ্গে উঠিবে। তৃতীয়ত রহিয়াছে সমরূপতার (Uniformity) সমস্যা, মানবজাতির পক্ষে সমরূপতা কতখানি স্বাস্থ্যপ্রদ অথবা ঐক্যের জন্য ইহা কতখানি প্রয়োজনীয় সেই সমস্যা। ইহা সুস্পষ্ট যে, এখানে আমরা এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি, যেগুলিকে অনেক বেশী অবচ্ছিন্নভাবেই আলোচনা করিতে হইবে, আমরা এতক্ষণ যে-সব সমস্যার আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের তুলনায় এখানে বাস্তবতার বোধ অনেক কম থাকিবে। কারণ এ-সবই হইতেছে অন্ধকার ভবিষ্যতের অন্তর্গত, আমরা যতটুকু আলো পাইতে পারি, সে-সবই হইতেছে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এবং জীবন, প্রকৃতি ও সমাজতত্ত্বের সাধারণ নীতিগুলি হইতে; বর্ত্তমান আমাদিগকে সমাধান বিষয়ে কেবল একটা ক্ষীণ আলোক দেয়, তাহা কালের মধ্যে একটু বেশী অগ্রসর হইয়াই ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া যায়, সে অন্ধকারের মধ্যে অপরিমেয় সম্ভাবনাসমূহ নিহিত রহিয়াছে।

জাতীয়তা ও সমরূপতার নীতি

আমরা দেখিতে পাই যে, সকল সময়েই দুইটি চরম সম্ভাবনা থাকে এবং কতকগুলি মাঝামাঝি সমাধানের অল্পাধিক সম্ভাবনা থাকে। বর্ত্তমানে অধিজাতিই (Nation) হইতেছে মানবীয় সমুচ্চয়ের সুদৃঢ় মণ্ডলী রূপ (Group-Unit), অন্যান্য মণ্ডলী রূপের প্রবৃত্তি হইতেছে ইহার নিকটে নিজদিগকে অবনমিত করা। এমন কি এখন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যিক সমুচ্চয় হইয়াছে কেবল আধিজাতিক সমুচ্চয়েরই অভিবিকাশ, আর বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যগুলি রহিয়াছে প্রাচীন সাম্রাজ্যিক রোমক জগতের ন্যায় সজ্ঞানে একটা বৃহত্তর সমুচ্চয় গঠনের জন্য নহে, পরন্তু শক্তিমান ও সমৃদ্ধিশালী অধিজাতি সকলেরই প্রভুত্ব ও বিস্তারের প্রবৃত্তি, ভূমি-ক্ষুধা, অর্থ-ক্ষুধা, দ্রব্য-ক্ষুধা, প্রাণিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক আক্রমণশীলতার তৃপ্তির জন্য। তবে একটা বৃহত্তর সমুচ্চয়ের নীতির মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত অধিজাতি-রূপের বিলয় হওয়া ইহা দ্বারা নিবারিত হইবে না। যে-কোন মানবীয় ঐক্য, তাহা যতই অখণ্ড, অসহনশীল ও সমরূপ হউক না কেন তাহার মধ্যে সর্ব্বদা বহু মণ্ডলী (Group-Units) থাকিবেই, কারণ উহা হইতেছে শুধু মানবীয় প্রকৃতিরই নহে, পরন্তু জীবনেরই, এমন কি সমুচ্চয়েরই মূলনীতি; আমরা এখানে পাই বিশ্ব-জীবনের একটি মূলধারা, সৃষ্টির মূলগত গণিত ও পদার্থ বিদ্যা। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মূল-মণ্ডলীরূপে, অধিজাতিকে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে। উহা সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হইতে পারে; এমন কি এখনই জাতীয়তা আদর্শের বর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে, বিশ্ব-মানবতা, বিশ্ব-নাগরিকের যে বিপরীত আদর্শ তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বর্দ্ধিত হইতেছিল; আর যদিও তাহা সাময়িকভাবে অবদমিত, স্তব্ধীকৃত, নিরুৎসাহিত হইয়াছে, তথাপি তাহা আদৌ নিহত হয় নাই, এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, ভবিষ্যতে সেটি বর্দ্ধিত প্রচণ্ডতার সহিত পুনরাবির্ভূত হইবে। অন্য পক্ষে, জাতীয়তার আদর্শ (the nation-idea) পূর্ণ জীবনীশক্তি লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে অথবা যত দ্বন্দ্ব ও দৃশ্যত অধঃপতন আসুক না কেন তাহার পর শেষ পর্য্যন্ত বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে নিজের জীবন, নিজের স্বাধীনতা, নিজের সতেজ বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। শেষত, উহা হ্রাসপ্রাপ্ত ও পরবশ জীবনীশক্তি লইয়া, এমন কি প্রকৃত জীবনীশক্তি বর্জ্জিত হইয়া, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের জীবন্ত ভাব বর্জ্জিত হইয়াই টিকিয়া থাকিতে

পারে, তখন উহা ফ্রান্সের ডিপার্টমেন্ট বা ইংলণ্ডের কাউণ্টির ন্যায় কেবল একটা শাসন-নির্ব্বাহক ব্যবস্থা হইয়াই থাকিবে, প্রকৃত চৈতন্যমূলক সত্তা হইয়া নহে। তথাপি ইহা বাহিক স্বাতন্ত্র্য ঠিক এতখানি বজায় রাখিতে পারে যাহা পরে মানবীয় ঐক্য ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রক্রিয়ার আরম্ভস্থল হইতে পারিবে, কারণ মানবীয় ঐক্য ভাঙ্গিয়া যাইবেই যদি ঐ ঐক্যসাধন দৃঢ়তব অপেক্ষা যন্ত্রবৎই অধিক হয়, অর্থাৎ যদি উহা রাজনৈতিক ও শাসন-নির্ব্বাহমূলক উদ্দেশ্য লইয়াই পরিচালিত হয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা কেবল কৃষ্টিগত সুবিধা ও ঐক্যের উপলব্ধির দ্বারাই সমর্থিত হয়, পরন্তু মানবজাতির আধ্যাত্মিক ঐক্যের স্থূল ভিত্তিস্বরূপ না হইয়া উঠে।

সমরূপতার (Uniformity) আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ; কারণ অনেক মনের পক্ষে, বিশেষত যে-সকল মনের গঠন হইতেছে অনমনীয় ও যন্ত্রবৎ, যাহাদের মধ্যে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি হইতেছে কল্পনা ও মুক্ত প্রাণিক সহজবোধ অপেক্ষা বলবৎ, অথবা যাহারা একটা আদর্শের সৌন্দর্য্যে সহজেই মুগ্ধ হয় এবং তাহার ত্রুটিগুলি দেখিতে পায় না, তাহাদের পক্ষে সমরূপতা হইতেছে একটা আদর্শ, এমন কি কখনও কখনও ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ তাহারা চিন্তাও করিতে পারে না। মানবজাতির সমরূপতা একেবারে অসম্ভব কিছু নহে, যদিও বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উহা কার্য্যত সম্ভব নহে, এবং কোন কোন দিকে অতি দূর ভবিষ্যৎ ভিন্ন উহা কল্পনাও করা যায় না। কারণ জীবন-যাত্রার প্রণালীর সমরূপতা, জ্ঞানের সমরূপতা, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক সমরূপতা—এ-সবের দিকে বিরাট অভিযান হইতেছে বা হইয়াছে, আর যদি ইহাদের চূড়ান্ত পরিণতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করা যায় তাহা হইলে স্বভাবতই ইহারা একটা কৃষ্টিগত সমরূপতার দিকে লইয়া যাইবে। যদি ইহা সিদ্ধ হইয়া উঠে তাহা হইলে পূর্ণ সমরূপতার একটানা সাম্যের বিরুদ্ধে কেবল একটি বাধা বিদ্যমান থাকিবে—ভাষার পার্থক্য; কারণ ভাষা যেমন চিন্তার দ্বারা সৃষ্ট ও নিরূপিত হয়, তেমনি উহাও চিন্তাকে সৃষ্টি করে, নিরূপিত করে, এবং যতক্ষণ ভাষার পার্থক্য থাকিবে ততক্ষণ চিন্তার, জ্ঞানের ও কৃষ্টির কতকটা অবাধ বৈচিত্র্য সকল সময়েই থাকিবে। কিন্তু ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, কৃষ্টির সাধারণ সমরূপতা এবং জীবনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ একটা বিশ্ব-জনীন ভাষার জন্য যে প্রয়োজনবোধ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে, তাহাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রদান করিবে। আর একটি বিশ্ব-জনীন ভাষা একবার সৃষ্ট হইলে বা গৃহীত হইলে উহা স্থানীয় ভাষাগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে, যেমন ল্যাটিন ভাষা, গল, স্পেন ও ইতালীয় ভাষাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল অথবা যেমন ইংরেজী ভাষা কর্নিশ, গেলিক, এইজ্ ভাষাকে ধ্বংস করিয়াছে এবং ওয়েলস্ ভাষার উপরও আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। অন্য পক্ষে, মানবমনের অন্তর্মুখীনতা বর্দ্ধিত হওয়ায় অবাধ বৈচিত্র্যের নীতির পুনরাবির্ভাব হইতেছে, সমরূপতা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। যদি এই প্রবৃত্তিটিই জয়ী হয় তাহা হইলে মানবজাতির ঐক্যসাধন প্রক্রিয়াকে এমনভাবে ব্যবস্থিত হইতে হইবে যেন ইহার অন্তর্গত অংশ সকলের স্বাধীন কৃষ্টি, চিন্তা ও জীবনধারাকে সম্মান করা হয় কিন্তু আর একটি তৃতীয় সম্ভাবনা রহিয়াছে—সমরূপতাই প্রাধান্য লাভ করিবে, যে-সব ছোটখাটো বৈচিত্র্যের দ্বারা তাহার প্রাধান্যের ভিত্তিটি নষ্ট হইবার আশংকা নাই সে-সবকে সে থাকিতে দিবে, এমন কি উৎসাহিত করিবে। এখানেও আবার বৈচিত্র্যগুলি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে প্রাণময়, শক্তিশালী এবং বিচ্ছেদমুখী না হইলেও কতকটা স্বাতন্ত্র্যমুখী হইতে পারে, অথবা সেগুলি খুবই সামান্য বর্ণ ও ছায়ার বৈচিত্র্য হইতে পারে, অথচ বিচিত্র প্রগতির নূতন আবর্ত্তনের মধ্যে সমরূপতার বিলয়ের জন্য আরম্ভস্থল হইবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইতে পারে।

মানবজাতির শাসনবিধায়ক অর্গানিজেশন

আবার মানবজাতির শাসনবিধায়ক অর্গানিজেশন সম্বন্ধেও সেইরূপ। ইহা একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে কড়াকড় প্রণালীবদ্ধতা (regimentation) হইতে পারে, কোন কোন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা নীতির জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই চাহিতেছে, সে ব্যবস্থা মানবীয় শিক্ষা, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক রীতি, নৈতিকতা ও জ্ঞানের এমন কি ধর্ম্মের মানবীয় কর্ম্মের প্রত্যেক বিভাগেরই দৃঢ়বদ্ধ ও সমরূপ অর্গানিজেশনের স্বার্থে সকল ব্যক্তিগত ও স্থানীয় স্বাধীনতা লুপ্ত করিয়া দিবে। এইরূপ অভিবিকাশ অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারে, বস্তুত ইহাকে যে বিশাল জনসমূহকে লইতে হইবে, যে সকল বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, নিজেকে সম্ভব করিয়া তুলিতে যে সব বিচিত্র সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহাতে নিকট ভবিষ্যতে ইহা কার্য্যত সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এই যে ধারণা, ইহা দুইটি জিনিষকে বিবেচনা করিতেছে না। বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা বিরাট জনসমূহকে পরিচালনা করা (বর্ত্তমান যুদ্ধই ইহার দৃষ্টান্ত) এবং বৃহদাকার সমস্যা সকলের সমাধান করা সহজ হইয়া উঠিতেছে এবং সমাজতন্ত্রের অভিযান দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।* যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ—কিম্বা যে কোন ছদ্মবেশে ইহার প্রয়োগ—সকল মহাদেশে জয়ী হইবে, তাহা হইলে তাহা সম্ভবত আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের দিকে লইয়া যাইতে পারে। তাহা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক অর্গানিজেশনের দ্বারা এবং দূরত্ব ও সংখ্যার বাধা অপসারণের দ্বারা সম্ভব হইয়া উঠিবে। অন্য পক্ষে, ইহা সম্ভব যে, কড়াকড় প্রণালীবদ্ধতার আদর্শ এবং স্বাধীনতার আদর্শ—এই দুইয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের একটা যুগ অতিবাহিত হইবার পর মানবজাতির সমাজতান্ত্রিক যুগ ইউরোপে স্বৈর রাজতন্ত্রের যুগেরই ন্যায় অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী হইবে এবং তাহার পর আসিবে এমন এক ব্যবস্থা যাহা দার্শনিক অরাজকতাবাদের (Philosophical Anarchism), অর্থাৎ পূর্ণতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক অবলাৎকৃত মণ্ডলীর স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যের নীতির দ্বারাই অধিকতর অনুপ্রাণিত হইবে। একটা আপোষও হইতে পারে, তাহাতে প্রণালীবদ্ধ-

তারই প্রাধান্য থাকিবে। সেই সঙ্গে কতকটা নিম্নতন স্বাধীনতা থাকিবে, তাহা হইবে অল্পাধিক প্রাণময়। আর যদিও তাহা অধিক প্রাণবন্ত না হয়, তথাপি ঐ ব্যবস্থাটির বিলয়ের জন্য তাহা আরম্ভস্থল স্বরূপে হইতে পারিবে যখন মানবজাতি পুনরায় উপলব্ধি করিবে যে, প্রণালীবদ্ধতাই উহার চরম ভবিতব্যতা নহে, অতএব নূতন এক অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষার যুগ আবশ্যক হইয়াছে।

এই সকল সমস্যা এখানে কোনরূপে পূর্ণতার সহিত আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা কেবল এমন কতকগুলি আইডিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি যেগুলি ঐক্যসাধন সমস্যার আলোচনায় আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। সমস্যাটি হইতেছে বিরাট ও তমসাচ্ছন্ন এবং এখানে সেখানে একটা রশ্মিপাতও ইহার অন্ধকার হ্রাস করিতে সাহায্য করিতে পারে।*

(ক্রমশ)

(প্রথমখণ্ড সম্পূর্ণ)

---

* এমন কি ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসনের ন্যায় দৃশ্যতঃ প্রতিক্রিয়াগুলিও সমাজতন্ত্রের যে মূলনীতি, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ, তাহারই সম্ভাবনাগুলিকে গড়িয়া তুলিতেছে, রূপ দিতেছে।

* The Ideal of Human Unity (Agra, 1916) হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

আপনার সৃষ্টি মাঝে রহিব বাঁচিয়া

শ্রীসুষমা দে (পঞ্চখণ্ড)

আমি কবি। চিরবন্দী জীবনের ধ্যান ভরা গানে
একথা জাগিয়াছিল সেইদিন আমার পরাণে,
যেই দিন মর্ম্মতলে বেদনার পেয়েছি আভাষ।
মৃত্যুর ম্লানিমা নিয়ে জীবনেরে করি পরিহাস
সেদিনের রবি দেয় দেখা; হতাশায় ঝরে ফুল
স্তব্ধ সাঁঝে—পিপাসিত বনানীরে করি পুষ্পোকুল
যেথায় ফুটিয়াছিল অনাগত মহা প্রত্যাশায়।
সেথা মোরে শুনায়েছ কল্পনার মোহিনী মায়ায়
অনাদি অশ্রুতে গীত। শব্দহীন সমুদ্র বেলায়,
মৃত্যুর অতল হতে কামনার মদির ছায়ায়
দেখিনু জীবননদে অভিনব মর্ম্মর প্রবাহ।
সঞ্চিত বেদনারাশি অতীতের মূক অন্তর্দাহ
মুহূর্তে লুকালো কোথা উদ্বেলিত মায়াসিন্ধুনীরে
ইন্দ্রজালসম অতর্কিতে। মোর চারি পাশ ঘিরে
ছড়ায়ে রাখিয়াছিলে অপরূপ স্বপন সুষমা,
বিচিত্র আলোকপাতে বিরচিত ছায়া মনোরমা:
সেই মোর অতি প্রিয়, প্রিয়তম—বরিনু অন্তরে
সে নূতন সৃষ্টির প্রভাতে। স্থলে জলে চরাচরে
নিখিল সৌন্দর্য্য-পুষ্ট কল্পনার কমলোক জিনি
হৃদয় গোমুখী হতে ছুটে মোর কাব্য মন্দাকিনী
প্রিয়াভিসারিণী। যেই বাণী পাঠাইনু তব তরে,
জানি শুধু আজিও সে পায়নিক দীর্ঘ যুগ ধরে
তোমার সন্ধান কভু। পৃথিবীর মরুপথ পারে
তোমার সুস্নিগ্ধ ছায়া অহরহ ডাকিছে আমারে
উচ্ছ্বসিত আকর্ষণে। আপনারে রাখি অলক্ষিত
তোমার অস্তিত্ব ঘিরি যে স্বপন হইছে রচিত,
তাহারি মর্ম্মরে গড়া প্রাসাদের দ্বারে পাতি কান
শুনিয়াছি নিরাবিল বাসনার উদগ্র আহ্বান।
অ-দৃষ্ট কটাক্ষপাতে ক্ষুব্ধ হিয়া যৌবন অধীর
তোমার পশ্চাতে শুধু ছুটিয়াছি প্রেম মুসাফির।
নিঃস্বতায় সংকুচিত, সম্মুখেতে দুর্লঙ্ঘ্য শরণি,
তবু নিত্য শুনি সেথা অবিরাম তব পদধ্বনি
অন্তরের গুপ্ত অন্তঃপুরে।
জাননা কি তুমি সখি
আমার প্রণয়োচ্ছ্বাস কভুও কি উঠেনি চমকি
নিস্তব্ধ সাগরে তব? হিয়ার আকাশে যেই তারা
খসি পড়ে,—তোমার ধরণী-অঙ্কে দেয়নি কি সাড়া
মৌন নিশুতির বুকে—আলোকের জাগায়ে কম্পন?

জানি আমি ব্যর্থ যত হৃদয়ের ব্যাকুল স্পন্দন
ব্যর্থ শুধু ধন্দাতুর জীনের যত অশ্রু হাসি
তবুও তবুও প্রিয় ভালবাসি—বড় ভালবাসি।

দেহের সমুদ্রতটে যে প্রেমের বিশাল বৈভব
তারি অন্তরালে খুঁজি আনন্দের নিত্য অনুভব।
নিষ্করুণ বিধাতার ব্যর্থ সৃষ্টি ঠেলি' উপেক্ষায়
লভিব তোমারে আমি আপনার সৃষ্টি মহিমায়।

সৃজন আনন্দে সখি, কবিতার কল্প কুঞ্জবনে
অনন্ত সংগীত ছন্দে দীর্ঘদিন শুনিব শ্রবণে
তোমার জয়ন্তী গীত, তুমি আসি শুনাবে গাহিয়া;
সেথা আমি আপনার সৃষ্টি মাঝে রহিব বাঁচিয়া।

অধ্যাপক লরেন্সের আবিষ্কার

যে দিন মাদাম কুরি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনা-বলে 'রেডিয়ম' আবিষ্কার করেন, সেই দিন সভ্য-জগৎ এই ভাবিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে, এতদিনে ক্যানসার রোগের বড় একটা মারণাস্ত্র হস্তগত হইল। কারণ রেডিয়ম হইতে নির্গত রশ্মি এই মারাত্মক ব্যাধিও যে-ভাবে দূর করিতে পারে, অপর কোন পদার্থের মধ্যে সেরূপ গুণ পরিলক্ষিত হয় না। সমগ্র জগৎ তাই মাদাম কুরির এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারে নিরাশার মধ্যে আশার আলোক দেখিতে পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু রেডিয়ম ব্যবহারে শীঘ্রই বড় রকমের অসুবিধা দেখা গেল। রেডিয়মের সন্ধান পাওয়া গেলেও সোনা, প্লাটিনাম বা অন্যান্য ধাতুর ন্যায় উহা সহজলভ্য নহে। মূল্যবান স্বর্ণ হইতেও উহা বহুগুণ মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। ক্যানসার রোগ হইলে এইরূপ মূল্যবান ধাতুর সুযোগ গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এক গ্রাম (gramme) মাত্র রেডিয়মের মূল্য আজকালকার বাজার দর হিসাবে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কম হইবে না। জনসাধারণের জন্য হাস-পাতালে এরূপ ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও সব রাষ্ট্রের পক্ষে খুব সহজ কথা নহে! কিন্তু এরূপ অব্যর্থ দ্রব্যের সন্ধান পাইয়া তাহাকে কাজে না লাগাইবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ তাই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, রেডিয়মের পরিবর্ত্তে এমন কোন দ্রব্য ব্যবহার করা যায় কিনা যাহা সুলভ অথচ ক্যানসার প্রভৃতি রোগে রেডিয়মের ন্যায়ই কার্য্যকরী হইতে পারে। ক্ষেপার পরশ পাথর খুঁজিবার মত বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা-কার্য্য চলিতে লাগিল।

বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে বহু গবেষক অনেক সময় এমন সব তথ্য আবিষ্কার করেন, যাহা দ্বারা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগও বিশেষভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া লইয়া যে সকল পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে,—তাহার ফলও এ-ভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে কম সমৃদ্ধ করিতেছে না! পদার্থের রূপান্তর সাধনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে, কোনও মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইলে পদার্থগুলিকে আঘাত করিবার নিমিত্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন এরূপ রশ্মি বা বস্তুকণা সরবরাহ করা প্রয়োজন, যাহারা সংঘাতের পর সংঘাত করিয়া পদার্থের পরমাণু মধ্যস্থিত নিউক্লিয়সে বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে। 'হাইড্রোজেন' ও 'ডিউটেরিয়ম' (ভারী হাইড্রোজেন)-এর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইলে তাহার ফলে বহু সংখ্যক 'প্রোটন' ও 'ডিউটারনের' উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই তড়িৎযুক্ত কণাগুলিকে অন্য পদার্থের রূপান্তর সংঘটনে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য উহাদিগকে শক্তিশালী এক বিদ্যুৎক্ষেত্রের মধ্যে পরি-চালিত করিয়া উহাদের মধ্যে প্রচণ্ড গতিবেগের সঞ্চারণ করা প্রয়োজন। নচেৎ উহাদিগের নিকট হইতে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভবপর হয় না। কৃত্রিম উপায়ে যাহাতে এরূপ উচ্চ ধরণের বিদ্যুৎশক্তি বা ভোল্টেজ উৎপাদন করিয়া তাহার প্রভাবে উপরোক্ত তড়িৎকণার গতিবেগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ ব্যবস্থাও বর্ত্তমানে অবলম্বিত হইতেছে। এ সমস্ত অভিনব উদ্ভাবনার মধ্যে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নেষ্ট আরল্যাণ্ডো লরেন্স আবিষ্কৃত "সাইক্লোট্রোন" (Cyclotron) যন্ত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের প্রভাবে তড়িৎযুক্ত বস্তুকণার গতিবেগ উত্তরোত্তর বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক আর্নেষ্ট লরেন্স

ফলে, ইহারা এরূপ প্রচণ্ড শক্তি অর্জ্জন করে যে, স্বাভাবিক রেডিও-একটিভ্ পদার্থ হইতে নির্গত আলফা-কণা অপেক্ষাও ইহারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে। এইরূপ শক্তিশালী 'গোলার' সহায়তায় পদার্থের রূপান্তর সাধন যে অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আর্নেষ্ট লরেন্সের এই নবাবিষ্কৃত পরমাণু বিভাজন যন্ত্রটি বিজ্ঞান মহলে তাই বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার আর এক প্রধান কারণ এই যে, ইতিমধ্যেই অধ্যাপক লরেন্স তাঁহার এই অদ্ভুত যন্ত্রটির সাহায্যে এরূপ কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়া মনে হয়। দ্রুতগতি 'ডিউটারন' দ্বারা 'বিসমাথ' নামক মৌলিক পদার্থকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া তিনি তাঁহার যন্ত্র সাহায্যে এমন একটি রেডিও-একটিভ্ বিসমাথ 'আইসোটোপ' উৎপন্ন করিয়াছেন, যাহার সহিত স্বাভাবিক রেডিও-একটিভ্ পদার্থ 'রেডিয়ম-ই'র কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার উপরোক্ত যন্ত্র সাহায্যে বহু কৃত্রিম রেডিও-

একটিভ্ পদার্থেরও সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইয়াছে। সাধারণ লবণকে ডিউটারন্ দ্বারা আঘাত করিয়া তিনি সোডিয়মের এক রেডিও-একটিভ্ আইসোটোপ উৎপন্ন করিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই 'আইসোটোপ'টি পরে আবার ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে, তাহা হইতে শুধু 'বিটা'-কণাই নির্গত হয় না, পরন্তু এরূপ গামারশ্মিও উহার ভিতর হইতে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, যাহার শক্তি 'রেডিয়ম' হইতে নির্গত রশ্মির শক্তির প্রায় অনুরূপ।

অধ্যাপক লরেন্সের উপরোক্ত আবিষ্কারের প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলের দৃষ্টি এই কারণেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে—হয়তো দুষ্প্রাপ্য রেডিয়মের স্থান ইহা দ্বারা বহুলাংশে পূর্ণ হইবে এবং ক্যানসার রোগ উপশম করিতে আমাদিগকে আর মূল্যবান রেডিয়মের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। সাধারণ লবণ জাতীয় পদার্থ হইতে রেডিয়মের অনুরূপ গুণসম্পন্ন পদার্থ যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে চিন্তার আর তেমন কারণ থাকিতে পারে না। সাইক্লোট্রোন্ যন্ত্রের সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে আমরা অনায়াসেই আমাদের অভীষ্ট পদার্থ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিব। কিছুকাল পূর্বে তিনি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁহার যন্ত্র দ্বারা ইতিমধ্যেই এরূপ কৃত্রিম পদার্থ লাভ করিয়াছেন, যাহার দ্বারা চল্লিশ লক্ষ ডলার মূল্যের আসল রেডিয়মের অনুরূপ কাজ পাওয়া যাইবে।

মাত্র নয় বৎসর পূর্বে অধ্যাপক অরল্যাণ্ডো লরেন্স ৮৫ টন ওজনের একটি অব্যবহৃত তড়িৎ-চুম্বক (electro-magnet) প্রাপ্ত হন। এই চুম্বকটি বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে রেডিও প্রতিফলনের বিশেষ কাজে চীনদেশে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উহা জাহাজে করিয়া চীনদেশে প্রেরিত হইবার পূর্বেই যুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধকার্যে সহায়তার নিমিত্ত যে জিনিসের প্রথম পরিকল্পনা হয়, বৈজ্ঞানিক লরেন্স তাহাই লোকের জীবন-রক্ষার উপকরণরূপে পরিবর্তিত করিয়া লইলেন। তিনি উক্ত তড়িৎ-চুম্বকটিকে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সুবৃহৎ গৃহে আনিয়া উহা 'সাইক্লোট্রোন্' নামক যন্ত্রের উপকরণ হিসাবে কাজে লাগাইলেন। পরমাণুর ভাঙ্গাগড়া কার্যে যে সমস্ত বস্তুকণা গোলারূপে ব্যবহৃত হয়, যন্ত্রের এই বিরাট চুম্বকটি তাহাদিগের গতিবেগ উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া তোলে। ফলে ইহারা প্রচণ্ডগতিতে পদার্থের পরমাণুগুলিকে আঘাত করিতে সমর্থ হয় এবং ইহাদিগকে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। চুম্বকটিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট পরিমিত এ-সি কারেণ্টের সৃষ্টি হয় এবং উহার দুই প্রান্ত মধ্যে ভ্যাকুয়াম টিউব স্থাপিত হইলে যন্ত্র প্রভাবে বস্তুকণাসমূহ প্রচণ্ড গতিবেগ অর্জন করে। ফলে উহাদের সংঘাত-শক্তিও বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।

যেরূপ প্রবলভাবে যন্ত্রটি হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হয় এবং পদার্থের পরমাণুগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া খণ্ডিত অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে, তাহা বিশেষ মারাত্মক। পরীক্ষা কার্য চালাইবার সময় গবেষকগণের যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, এজন্য সমস্ত যন্ত্রটির চারিদিকে তিন ফুট প্রশস্ত ও ছয় ফুট উচ্চ এক জলের বাঁধ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যন্ত্রটি চলিবার সময় যাহাতে উহার সন্নিকটে কেহ না যান, তজ্জন্যই এরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যন্ত্রটি চলিতে থাকিলে সংঘাতের ফলে পরমাণুর যে সকল পরিবর্তন হয় বা উহা হইতে যে বস্তু বা তড়িৎ-কণার উদ্ভব ঘটে তাহা যাহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, তজ্জন্য ইহার সঙ্গে আর একটি যন্ত্রেরও সংযোগ রহিয়াছে। এই যন্ত্রটি কিছুকাল পূর্বেই আবিষ্কৃত হয় এবং পরমাণুর বিশ্লেষণ সম্পর্কিত পরীক্ষাকার্যে বিভিন্ন দেশে গবেষণাগারে ইহার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত। এই যন্ত্রের নাম "উইলসন ক্লাউড্ বা এক্সপান্সান্ চ্যাম্বার।" স্কচ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক চার্লস টমসন রিস উইলসন উহা আবিষ্কার করেন এবং তজ্জন্য নোবেল পুরস্কারও প্রাপ্ত হন। এই যন্ত্রের গুণ এই যে, যত প্রচণ্ড গতিতেই পরমাণু হইতে নির্গত বিভিন্ন বস্তুকণা এই চ্যাম্বারে প্রবেশ লাভ করুক না কেন, উহাদের গতিপথ নির্ণয় করিতে বৈজ্ঞানিকগণের কোনও রূপ অসুবিধা হয় না। কোন্ পদার্থ হইতে কয়টি তড়িৎ বা বস্তুকণা নির্গত হইল, তাহাও ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। চ্যাম্বারটি সাধারণত জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ থাকে। পরমাণুর বিশ্লেষণে যখন যে কণার উৎপত্তি ঘটে এই চ্যাম্বারে আসিয়া তাহা প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করা মাত্র ঐ সমস্ত গতিশীল বস্তুকণার উপরে জলীয় বাষ্প জমিয় কুয়াসার ন্যায় উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া তোলে এমন কি, ঐ অবস্থায় তখন উহাদের ফটো পর্যন্ত গ্রহণ কর যাইতে পারে। সাইক্লোট্রোন্ যন্ত্র দ্বারা যে সংঘাত-শক্তি সৃষ্টি হয়, উইলসন চ্যাম্বারে তাহার ফলাফল আসিয় ধরা পড়ে। এই উভয় যন্ত্র এইভাবে আধুনিক যুগে পরমাণবিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

লরেন্স আবিষ্কৃত সাইক্লোট্রোন্ যন্ত্রটির কার্যকারিতা আজ কাহারও মনে সন্দেহের ভাব পরিলক্ষিত হয় না কৃত্রিম উপায়ে প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করিয়া পরমাণুর নিউক্লিয়ে বিপর্যয় আনিতে যে উহা অদ্বিতীয়, বিভিন্ন দেশে পরীক্ষকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ব মৌলিক পদার্থকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া এই অভিন যন্ত্র সাহায্যে বিস্ময়কর ফল লাভ করা গিয়াছে এবং পদার্থে রূপান্তর সাধনে এই যন্ত্রের উপযোগিতা বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে উপলব্ধি করিতেছেন। ক্যানসার রোগের বিরুদ্ধে অভিয করিতে হইলে দুর্মূল্য রেডিয়মের পরিবর্তে ভবিষ্যে রেডিয়মের গুণসম্পন্ন অথচ সুলভ কৃত্রিম পদার্থের উপরে যে আমাদিগকে অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে, তাহা কাহারও সন্দেহ নাই। সেই হিসাবেও 'সাইক্লোট্রো বৈজ্ঞানিকগণের হাতে এক অমোঘ অস্ত্র আনিয়া দিয়াছে।

ছন্দ

আর্নেস্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্সের বয়স এখন ৪০ বৎসর। পারিবারিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না থাকায়, তাঁহাকে অতিকষ্টে পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। এরূপ জানা যায়, কলেজে পড়িবার সময় তিনি এলুমিনিয়মের ব্যবসায় করিতেন এবং এলুমিনিয়ম বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা হোটেলে থাকিয়া তিনি কলেজে পড়াশুনা চালাইতেন। ১৯২৯ সালে অখ্যাত অজ্ঞাত একজন জার্ম্মান রসায়নবিদের লিখিত একটি প্রবন্ধের প্রতি একদিন দৈবাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উক্ত প্রবন্ধটিতে চুম্বকক্ষেত্রে তড়িৎকণার ব্যবহার কিরূপ, তৎসম্পর্কে বিবিধ তথ্য পাঠ করিয়া লরেন্সের মনে সর্ব্বপ্রথম 'সাইক্লোট্রোন' যন্ত্রের পরিকল্পনার কথা উদিত হয়। তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পরিকল্পনার যে রূপ দান করেন, আজ তাহাই বিজ্ঞান জগতে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রসেলস্ নগরে যে নিখিল বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয়, তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া লরেন্স সেই বিদ্বজ্জন সভায় তাঁহার যন্ত্রের নীতি ও কার্য্যকারিতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। পরলোকগত বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ লর্ড রাদারফোর্ড প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ লরেন্সের এই যন্ত্রের সবিশেষ প্রশংসা করেন।

লরেন্সের 'সাইক্লোট্রোন' যন্ত্রের ব্যবহার আজ শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নহে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক নিয়েলস্ বোরও তাঁহার কোপেনহেগেনস্থিত গবেষণাগারে এইরূপ একটি যন্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লিভারপুলেও পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণা কাজের জন্য এরূপ যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণাগারেও বর্ত্তমানে প্রায় ২২টি সাইক্লোট্রোন যন্ত্র চলিতেছে। লরেন্স তাঁহার সাইক্লোট্রোন যন্ত্র দ্বারা এরূপ সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছেন যে, তিনি বর্ত্তমানে ২২০ টন ওজনের একটি তড়িৎ-চুম্বক দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী একটি যন্ত্র নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিতেছেন। পদার্থের রূপান্তর সাধনে তাঁহার এই যন্ত্র বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। লবণ জাতীয় পদার্থ হইতে রেডিয়মের গুণসম্পন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন। বিশেষ একটি পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করাও যে সম্ভব, সৃষ্টির মূলে যে একটি মাত্র উপাদান রহিয়াছে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রকট করার নেশায় তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বিজ্ঞানীদের হাতে সেই শক্তি তুলিয়া দেওয়ার জনাই তিনি যত্নবান।

অধ্যাপক লরেন্স তাঁহার আবিষ্কারের জন্য ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'আমেরিকান কমনষ্টক প্রাইজ' নামে পাঁচশত পাউণ্ডের একটি পুরস্কার প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বৈজ্ঞানিকদিগের ভিতরে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের জন্য প্রদত্ত হয়। তিনি ইতিমধ্যেই সেই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে যেভাবে তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের আদর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতেই তাঁহার প্রতিভা ও আবিষ্কারের প্রতি বৈজ্ঞানিক জগতের গভীর বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমুদ্র

শ্রীউ[illegible] বন্দ্যো[illegible]ায়

(Walt Whitman-এ[illegible] the cabin of a ship [o]n the Sea.)

দাঁড়িয়ে আছি জাহাজের ওপর
চারিদিকে নীলজল, অনন্ত বিস্তৃত, অসীম।
শন্ শন্ শব্দে হাওয়া আসে
আর নীচে বাজে অশ্রান্ত জলকল্লোল।
দূরে একখানা জাহাজ যাচ্ছে
পাল তার বকের ডানার মত শাদা,
গতি তার পাখীর মতই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অবাধ।
আমাদের পালের ওপর আছড়ে পড়ছে বাতাস
আর নীচে ভেঙে যাচ্ছে অগণিত ঢেউয়ের ফেনা।
দিনের সঙ্গী আমাদের সূর্য্য
আর রাতের সঙ্গী সমুজ্জ্বল তারকারাশি।

হে নাবিকগণ! তোমাদের কি একবার মাটির কথা স্মরণ
করিয়ে দেবো?
না—এই তরঙ্গায়িত উদ্বেল সমুদ্রের ওপর
কঠিন মাটির কথা স্মরণ করে লাভ নেই।
আকাশের নীল চন্দ্রাতপের নীচে এখন সমুদ্রের গান গাই।
আমাদের সমস্ত সত্তা গতির ছন্দে মুখর,
অনাগত রহস্যের প্রতি উন্মুখ,
লবণাম্বুর উদার ইঙ্গিতে চঞ্চল।
বাতাসে ভেসে আসে সুগন্ধ, পালে বাজে গতি ব্যঞ্জনা।
অসীম জলরাশির ওপর, অনন্ত গগনের নীচে
বেজে উঠুক সংকেতময়ী সমুদ্র সঙ্গীত।
হে সমুদ্র সঙ্গীত! মাটির দুর্ব্বার আকর্ষণ
শিথিল করে দাও,
তোমার মাঝে ধ্বনিত হোক গমনশীল অনন্ত পথের কথা।

নিউফাননল্যাণ্ডের দুর্দ্দশা

নিউফান্‌ল্যান্ড দ্বীপ ব্রিটেনের প্রাচীনতম উপনিবেশের অন্যতম। কিন্তু ইহা এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে ইহার লোক-সংখ্যার একার্দ্ধ অর্থাৎ দেড় লক্ষ লোক প্রায় উপবাস করিয়াই কাটায়। সেখানে বিদ্বেষ ও অসন্তোষ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট বিক্ষোভ ও অশান্তির আতংকগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নিউফান্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তায় অবিমিশ্র ব্রিটন। সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ জীবন ধারণ করে সরকারী দানে, যাহা হইল তিন পেনী মূল্যের খাদ্য দিন প্রতি, অথবা পাঁচ বৎসরের নিম্নস্থ বালক-বালিকাদের দেড় পেনী মূল্যের আহার্য্য প্রতিদিন। এই দান-প্রার্থীর সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে ১৮০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই যে দান, গবর্ণমেণ্টই স্বীকার করে যে, ইহা কোনও একজন ব্যক্তির প্রাণ ধারণের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নহে। ইহার পরে অন্তত ৫০,০০০ জন নরনারী যাহা অর্জ্জন করে, তাহা এই দৈনিক তিন পেনীর অনতিউর্দ্ধে। বহু নারী এবং শিশু সমগ্র শীতকাল ব্যাপিয়া ঘরের বাহির হয় না, কারণ তাহাদের পরিচ্ছদ নাই এবং প্রায় নগ্ন অবস্থায় শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রাবিশিষ্ট বাহিরের বাতাসে যাইতে ভরসা পায় না।

২০,০০০ য়ের উর্দ্ধে নরনারী বাস করে বৃক্ষলতাহীন নগ্ন পর্ব্বতে—সেই বস্তি হইতে যে কোন চিকিৎসকের গৃহ একশত মাইলের কম দূরবর্ত্তী হইবে না—যে গোরস্থানে শব সমাহিত করিতে হয়, তাহা দশ মাইল দূরবর্ত্তী এবং এই দশ মাইল পথও বরফাচ্ছাদিত পর্ব্বত-গাত্র, সুনির্দ্দিষ্ট রাস্তা সেখানে একটিও নাই।

বিদ্যাশিক্ষা বাধ্যতামূলক ত নহেই, এমন কি, প্রাথমিক শিক্ষাও বিনা বেতনে পরিচালন করা সম্ভব হয় নাই। প্রায় ১০,০০০ বালক-বালিকা কোনও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয় না—লেখাপড়ার সঙ্গে কোনও পরিচয়ই তাহাদের হইতে পারে না। যে সকল বালক-বালিকা স্কুলে যায়, তাহাদেরও পাঁচ ভাগের চারি ভাগ স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় বার বৎসর বয়সে। তাহার পর আর তাহাদের কোনও প্রকার শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না।

স্কুলসমূহের নিয়ন্ত্রণ-ভার চার্চ্চের উপর ন্যস্ত—অবশ্য গবর্ণমেণ্ট 'গ্রাণ্ট' দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে। একজন মাত্র শিক্ষক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা একশত হইবে—তাহার প্রত্যেকটি স্কুলে ৫০টির অধিক ছাত্র-ছাত্রী থাকে না। আর ৪০টি স্কুল রহিয়াছে, যাহার প্রতিটিতে দশটির বেশী ছাত্র-ছাত্রী কোন কালেই জোটে না।

শিক্ষার সুযোগের অভাবে অতি অল্প বয়সেই বালক-বালিকাগণ বিপথে পতিত হয়। এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে বয়স্কদিগের সঙ্গে একই জেলখানায় স্থান পায়। সেখানে দাগী আসামীদের সহবাসে ছোটদের চরিত্র আরও বেশী রকম দূষিত হয়।

জেলখানায় প্রথম প্রবেশে কোন প্রকার মেডিক্যাল একজামিনেশনের প্রথা প্রচলিত নাই।

বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনও প্রকার সুনির্দ্দিষ্ট আইন-কানুন সে দেশে নাই। সমগ্র দেশের রাজধানী সেণ্ট জন্‌স্‌ শহরে 'টাউন কাউন্সিল' রহিয়াছে রাজ্য-শাসন ব্যাপারের জন্য, ইহা ছাড়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (লোকাল গবর্ণমেণ্ট) বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা রাজ্য মধ্যে আর কোথাও নাই।

গত বৎসর মাত্র সর্ব্বপ্রথম সমগ্র দেশে যক্ষ্মারোগের প্রসার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ২০,০০০ রোগী রহিয়াছে, যাহারা সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি পনের জনে এক জন এই রোগের কবলে পতিত। সমগ্র দেশে একটিমাত্র যক্ষ্মা স্যানিটোরিয়াম রহিয়াছে, এখন উহার প্রসার বিস্তৃত কর[া] হইতেছে।

সমগ্র জনগণের ভিতরই পুষ্টির অভাব, উহা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

দ্বীপের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের পেশা হইল মাছ ধরা—বিশেষ করিয়া কড্ (Cod) মাছ। কিন্তু সম্প্রতি প্রতি[...] বর্ষেই এই ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতেছে, কারণ উত্তরোত্ত[র] ঐ মৎস্যের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় উচ্[চ] ওজনের মাছও আর পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই এ[ই] পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপার্জ্জন ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই ব্যবসায়কে গবর্ণমেণ্ট হইতে এই বৎসর সাহায্য ক[রা] হইবে দুই লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু তাহার অতি অল্প অংশ ধীবরদের হস্তগত হইবে, কারণ মোটা অংশ যাইবে প্রধা[ন] প্রধান মৎস্য সরবরাহক প্রতিষ্ঠানগুলির গহ্বরে। ইহা[র] পরেও প্রায় ৫০০০ টন মাছ থাকিয়া যাইবে গবর্ণমেণ্টে[র] হস্তে অবিক্রীত অবস্থায়।

দশ হাজার ধীবর এমনই নিঃস্ব যে, তাহাদের মৎ[স্য] ধরিবার সরঞ্জাম পর্য্যন্ত নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন যে প্রণালীতে এই ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহাতে অনেক ছোট [...] ব্যবসায়ীকে এই ব্যবসা হইতে বিদায় লইতে হইবে।

গ্রামাঞ্চল উন্নয়নের কোনও প্রয়াস অদ্যাবধি করা [হয়] নাই। জমির বন্দোবস্ত পাঁচটি কেন্দ্রে ব্যবস্থা করা হই[য়া]ছিল, কিন্তু কোথায়ও সেই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় না[ই]। মার্কল্যাণ্ড নামক এক সেটেলমেণ্টে এক লক্ষ পাউণ্ড [...] একেবারে নিরর্থক হইয়াছে।

দ্বীপের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাতা[য়াত] করিবার রেল লাইন রহিয়াছে, যাহা সপ্তাহে দুইবার (গ্রী[ষ্মে] তিনবার) যাতায়াত করে। খরচ পোষায় না বলিয়া উ[...] অনেক শাখা লাইনে চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছে। ই[...] পরও একাংশ বন্ধ করিবার কথা চলিতেছে।

দ্বীপের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে পর্য্যন্ত পু[রা]পুরি কোন রাস্তা নির্ম্মিত হয় নাই। যে কয়টি রাস্তা নু[তন] প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার কোনটিই ৪০ মাইলের অ[ধিক] হইবে না দৈর্ঘ্যে।

অথচ সিভিল সার্ভিসের নব-সংস্কারে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের মতে ২৫০০০ পাউণ্ড বার্ষিক। কিন্তু মৎস্য ব্যবসায় অনুসন্ধান সমিতির বিবৃতি অনুসারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দেখা যায়—এক লক্ষ পাউণ্ড।

গবর্ণমেণ্টের যে রাজস্ব আদায় হয় সমগ্র দ্বীপ হইতে, তাহা হইতে জাতীয় ঋণের সুদ বাদে যাহা থাকে, তাহার এক চতুর্থাংশ যায় ২০০০ সিভিল সার্ভেণ্টদের বেতনে। গবর্ণমেণ্ট ৩০,০০০ বেকারদের যে দান (dole) ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার দেড়া হইবে সিভিল সার্ভিসের বেতন।

ভারতের অন্নকষ্ট এবং দুর্দ্দশার তুলনায় তথাপি এই দেশের অবস্থা তবু ভালই বলিতে হইবে। ভারতের যে বিপুল সংখ্যা বেকার তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাস্তবপক্ষে কি করিয়াছে? ঐ স্থানের কড মৎস্য ব্যবসায় রক্ষার জন্য এক বৎসরেই দুই লক্ষ পাউণ্ড গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়াছে; কিন্তু ভারতের কত শিল্প লুপ্ত হইয়াছে—বাকি প্রায় সব শিল্পই ধ্বংসোন্মুখ—তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের যেন কোন গরজই নাই। ভারতের কাঁচা মালের বাজার ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে কেবল শুল্কনিয়ন্ত্রণের অভাবে—সেই দিক দিয়াও গবর্ণমেণ্ট কোনও সাহায্য করে নাই। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিবিধান হলে সম্ভবত অচিরেই হইয়া যাইবে, কিন্তু ভারতের অবস্থা বর্ষে বর্ষে আরও শোচনীয়ই হইবে। সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা বা অবকাশ গবর্ণমেণ্টের আছে, এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

বাণিজ্যে ও রাজস্বে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ক্রমশ নিম্নগামী। ১৯৩১ সালের সহিত তুলনায় বাণিজ্য এ বৎসর অন্তত ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কম হইয়াছে। রাজস্ব-আদায়ে এ বৎসর কম হইয়াছে ১৫২০০০ পাউণ্ড। বিভিন্ন কল-কারখানায় এ বৎসর ৪০০০ লোক কম নিযুক্ত হইয়াছে ১৯৩৭ অপেক্ষা।

গবর্ণমেণ্ট কমিশন—তিন জন ব্রিটিশ সিভিল সারভ্যাণ্ট, তিন জন নিউফানল্যাণ্ডবাসী এবং গবর্ণর এই লইয়া গঠিত। বর্ত্তমান গবর্ণর ভাইস-অ্যাডমিরাল হামফ্রি টি ওয়ালউইন্ যেমন জনগণের অপ্রিয়, বাকি ছয়জন কমিশনারও তদ্রূপ। তিন জন কমিশনার ত প্রকাশ্যেই জনগণের বিরাগ বরদাস্ত করেন। তাঁহাদের দ্বারা জনহিতকর সকল কার্য্যেই নাকি অন্তরায় সাধিত হয়।

কমিশন অবশ্য কোন ব্যাপক আইন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না,—এমন কি ১০০ পাউণ্ডের উপরে বেতন এমন কর্ম্মচারীও নিয়োগ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ডমিনিয়ন অফিসের অনুমোদন লইয়া তবে করিতে হয়।

জনগণ চাহে তাহাদের অভিমত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্র ব্যাপারে, কিন্তু জনমত কখনই গ্রাহ্য করা হয় না বলিতে গেলে। গণতন্ত্রের মূল নীতিই সে দেশে উপেক্ষিত।

৫০০০ বর্গ মাইল কানন যাহা দেশবাসী তাহাদের জন্মাধিকার মনে করে, তাহা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে লণ্ডনের বাউয়েটর লয়েডস্ কোং হাতে। শোনা যায়, যদি জনমত গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে এই বন্দোবস্ত কখনই দেওয়া যাইত না। কমিশনারগণের ভিতরেও ঐক্য নাই—সহযোগিতা নাই। সাম্রাজ্যের প্রতি যে আনুরক্তি, তাহাও ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। নিউফানল্যাণ্ড যেন এখনও সেই মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতায় কাল কাটাইতেছে।

দেশবাসী চাহে টাকা—অন্তত ২০ কোটি পাউণ্ড। গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল। তাহারা দেশের কল্যাণের জন্য কি করা যায়, তাহা আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কগণের অযোগ্যতা সে পথে বিষম অন্তরায়।

ফলে ২০ লক্ষ লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়িয়াই চলিয়াছে—৩ লক্ষ লোক অনশনে অর্দ্ধাহারে কোন রকমে বাঁচিয়া আছে শেয়াল-কুকুরের মত।

না দেখা প্রিয়া

শ্রীশশধর বিশ্বাস

দেখি নাই কভু তবু ভালবাসি তোমা,
কত দূরে তুমি, কোথা ওগো প্রিয়তমা?
আঁখি দুটি তব সুন্দর কত কি যে,
মনে মনে তাহা ভেবে হারা হই নিজে।

মনে হয় মোর তোমার সকলি ভালো,
এলায়িত-ঘন-কুঞ্চিত কেশ কালো।
দন্ত সুরুচি কুন্দ কুসুম সম—
অধরের হাসি মধু হতে মধুরম।

চঞ্চলা তুমি সঙ্গিনী সহ কত,
রঙ্গিণী কত রঙ্গে না রহ রত।
ছায়া ঢাকা কোন পল্লীপথের পরে
চলিতে তোমার আঁচল লুটায়ে পড়ে।

সুন্দরী তুমি সুন্দর সবই তব,
দিনে দিনে বাড়ে রূপলেখা নব নব।
হাসিতে তোমার সুধার নির্ঝর বহে,
মোর মনে তাহা কত কথা সে যে কহে।

দেখি নাই তোমা তবু দেখিয়াছি যেন,
জাগরণে কিবা স্বপনে ভাবি যে হেন।
ভাল বাসিয়াছি মোর দেহ মন দিয়া,
নামহীনা ওগো, আমার না দেখা প্রিয়া।

পাঠশালায় শিক্ষাদান

শ্রীবঙ্গেশ্বর দাস

বর্তমানে পাঠশালার শিক্ষাদানের যাহা ধারা, তাহা প্রায় সকল স্কুলেরই এক। ঐ যে মান্ধাতার আমল থেকে চলে আস্ছে পড়াবার রীতি, কায়দা তাহা আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। অবশ্য শিক্ষাদান সংস্কার চেষ্টা যে বহুদিন পূর্ব থেকে না চল্ছে তা নয়, ইহার জন্য বছর বছর নর্ম্যাল ও গুরু ট্রেনিং স্কুলে অনেক অর্থব্যয় হয়; কিন্তু কার্যত উহার ফল ফল্ছে খুব কম বলে মনে হয়। আসল কথা হল—চাই উপযুক্ত কর্মী। কাজ করবার ধারা শিখে পরীক্ষা দিয়ে না হয় পাশ করা হল। কার্যক্ষেত্রে যদি ধারা-গুলি প্রযোজ্য না হয়, তবে উহার সার্থকতা কোথায়?

গুরুমহাশয় ছেলেদিগকে বলে দিলেন, 'আগামীকল্য পাঠটি শিখে এস, নতুবা পঁচিশ ঘা করে বেত।' যে ছেলে সাধারণত পিটুনীর ব্যাপারটাকে একটু বেশী ভয় করে, সে আপ্রাণ চেষ্টা করলে মুখস্থ করতে, কিন্তু পড়ার পরিমাণটা স্মৃতির পরিমাণটার অনুপাতের সহিত যে সম্পূর্ণ বেমিল। এ ছাড়া মা সরস্বতীর কৃপায় স্মৃতির জোরটা যদি পূর্ণমাত্রায় থাকে, তবে না হয় ঠেঙ্গা-লাঠি মুখস্থ করে পরদিন স্কুলে গিয়ে করল উদ্‌গিরণ। পড়ার পরিমাণটা যে, অবোধ শিশুর পক্ষে মোটেই পরিমিত নয়। গুরুমহাশয় বছরের প্রারম্ভ কাটিয়ে দিলেন অত্যন্ত আরামে, মনে করলেন—আছে ত সারা বছর। পরে যখন বছরখানা শেষ হয়ে আসে, তখন স্কিম অব ওয়ার্কস্ দেখে চোখ যায় উল্টে। তাই পড়ার পরিমাণ হয়ে যায় অপরিমিত। আর যে ছেলে বাড়ীতে গিয়ে ঐ পিটুনীর কথাটা ভুলে কেবল খেলাধূলোতে থাকে মজে, তাকে পরদিন হাত বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে বেতের ঘা-গুলি চক্ষের জলে মুছে ফেলতে হয়। এইভাবে গুরু-শিষ্য ক্রমে ব্যাঘ্র-হরিণে পরিণত হয়। আর বছর বছর কত ছেলে পিটুনীর চোটে যে, গাধায় পরিণত হয়, তাহা অবর্ণনীয়। গুরুমহাশয় জানেন যে, ছেলেদের বাড়ীতে পড়ার সময় খুব কম। খেলাধুলো, ভাঙ্গা গড়া তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তবু কেন যে এদের কোমল স্মৃতির উপর প্রগাঢ় আঘাত দিতে চান, তাহা সকলেরই চিন্তনীয় বিষয়। যে পাঠ ছেলে বেতের ভয়ে শিখতে যায়, সেই পাঠে বালক আনন্দ পায় না মোটেই। সুতরাং পাঠে থাকে তার অনিচ্ছা, শিখতে হয়ে যায় অনেক দেরী। ভুলে যায় আরও শীগ্‌গির।

শিক্ষাদান কার্যটি যদি প্রদান ও আদানের সাহায্য নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে শাস্তির কোন আবশ্যক হবে না আশা করি। ছেলে শিখতেও পারে অতি অনায়াসে। যাঁরা শিক্ষা-পদ্ধতি একটু একটু আলোচনা করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রদান ও আদান ভাল বুঝেন। পাঠটি শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষক প্রথমে নানা উপায় ও উপকরণ সাহায্যে যাহা কিছু নূতন শিক্ষা দেন, তাহা প্রদান। অর্থাৎ ছেলে পাঠটি শিক্ষা করণার্থ শিক্ষক মহাশয়ের নিকট থেকে যাহা পায়, তাহাই প্রদান। শিক্ষক যাহা শিখালেন, তাহা যদি ছেলে ভালরূপ উত্তর করে, পুনরায় শিক্ষককে সমজাতে পারে, তবে তাহাই হল আদান। আদানে শিক্ষক বুঝতে পারেন, তাঁর পাঠদান কতদূর সফল হয়েছে। ভবিষ্যতে যাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় ভুলে না যায়, তজ্জন্য প্রদানের সময় আবশ্যকীয় বিষয়ের নোট দিতে পারেন।

পূর্বাবধি আজ পর্যন্ত পড়াবার যে একই ধারা, একই নিয়ম চলে আস্ছে তাহার মূলে বর্তমান শিক্ষক সম্প্রদায়কেই সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া সমীচীন নহে কি? পূর্বের নিয়ম আজও চলেছে, ইহাতে পরিশ্রমেরও লাঘবতা আছে। কারণ আমি এখন মাষ্টার, পূর্বে আমার দাদা মাষ্টার ছিলেন। তিনি একটা খাতাতে ভূগোল, বস্তুপাঠের ধারাবাহিক কতক নোট লিখে রেখে গেছেন। আমিও ঐ নোটখানা ছেলেদেরে নকল করতে বল্‌ছি। ছেলেরাও আরম্ভ করলে মাছিমারা নকল। গুরু-মহাশয় বলে দিলেন, যে পৃষ্ঠাখানা আজ লিখেছ, কাল উহা বাড়ী থেকে শিখে এস। ছেলে বাড়ীতে গিয়ে পড়তে সুরু করলে—'উদ্ভিদের মূল সাধারণত চারি প্রকার, যথা—লম্ব-মূল, গুচ্ছমূল, আস্থানিক-মূল, কন্দমূল।' লম্বমূলের দৃষ্টান্ত শিখলে যথা—আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদি। গুচ্ছমূল যথা—পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। কয়দিন অন্তর জিজ্ঞাসা করা গেল—বলত বাপু, বেগুন এবং সুপারি গাছের মূল কোন্ জাতীয়? ছেলে ঠেকলে। ছেলে বলল, বেগুন ও সুপারী গাছ সম্বন্ধে মাষ্টার মশাই কিছু বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, আমাদের শিক্ষার গলদ কোথায় এবং ইহার পরিমাণ কতটুকু।

ছেলে ফুলের বিভিন্ন অংশ শিখেছে। যদি বলেন—বলত হে, এই লাউ ফুলটির বৃন্ত ও কুণ্ড কোন অংশটি? ছেলে কার্যত তাহা দেখাতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শিক্ষাদান কার্যে আমাদের কতটুকু নিপুণতা আছে, আছে কতটুকু পাণ্ডিত্য। আসল কথা হল, যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা যেন সর্বদা হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল নিজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে পাঠদান শেষ করে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করলেই শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হল না। এমন অনেক শিক্ষাদাতা আছেন—যাঁরা কোন গল্প বা ইতিহাস শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজের ক্ষমতা ঝেড়ে দিলেন লম্বা এক বক্তৃতা। ছেলেরা কি বুঝলে মাথা-মুণ্ডু-ছাই, আর নিজেই যে কি বক্‌বক্ করে সময়খানা দিলেন কর্তন করে, তার দিকে গুরুমহাশয় করলেন না দ্রূক্ষেপ।

বক্তা আর শিক্ষক সম্পূর্ণ ভিন্ন। বক্তা দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলেন ইচ্ছামত তাঁর বক্তৃতা। তাঁর বলার বিষয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নাই সীমাবদ্ধতা। যখন যে পরিচ্ছেদ ইচ্ছা তাই বলতে পারেন। কিন্তু শিক্ষক শ্রেণীতে গিয়ে দেখবেন ছেলে কতটুকু জানে এবং এই জানার সাহায্যে ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে কোন পরিচ্ছেদের কি এবং কতটুকু বলা প্রয়োজন। আর ঠিক যতটুকু বলার দরকার ঠিক ততটুকু বলাই শিক্ষকের কর্তব্য। অতিরিক্ত কিছু বললেই তাঁকে বক্তা বলা যায়। শিক্ষক ছাত্রকে সর্বদা বলাবার চেষ্টা করবেন, নিজে যত কম বলতে পারবেন ততই ভাল। এজন্য শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশ্ন করবার ক্ষমতা চাই। মোটের উপর শ্রেণীতে

যথেষ্ট বক্তৃতা না করে প্রশ্নোত্তর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়াই উৎকৃষ্ট পন্থা। ইহাতে ছেলের ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ হয়। সব কিছু ছেলে নিজে বলে আনন্দ পায়। কোনও কাজই নিরানন্দের ভিতর দিয়েই ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। পাঠে যাহাতে বালকের যথেষ্ট আগ্রহ ও আনন্দ জন্মে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এজন্য পাঠের আবশ্যক বোধে ছবি, নক্সা, মানচিত্র এবং অন্যান্য উপকরণাদির সাহায্য নিয়ে পাঠদান করতে হয়।

আমাদের অনেকেই বলেন যে, 'মাত্র টাকা পাই গোটা বারটা, এর উপর আবার এত গাছ-গাছড়া, ছবি-টবি টেনে এনে ওসব দেখবার অবসর কোথায় রে বাপু ?' একবার কোন স্কুলে নাকি একজন পরিদর্শক কর্মচারী এক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল ত বাপু, পৃথিবী ঘুরে না সূর্য ঘুরে ?' ছেলে এ সম্বন্ধে কোনও কথা স্বপ্নেও শুনে নাই। সর্বদা দেখে সূর্য পূর্বদিকে উঠে এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়; সুতরাং উত্তর দিলে 'সূর্য ঘুরে।' মাণ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করা হল ? কি পণ্ডিত মশাই, গ্লোবের সাহায্যে ছেলেদেরে ইহা শিক্ষা দেন নাই ?' পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে—গোটা বার টাকায় কখনও পৃথিবী ঘুরান সম্ভব নয়। গোটা বার টাকাও পৃথিবী না ঘুরার একটি কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় ছেলেকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়াবার বা বুঝাবার পর যে এই বার টাকায় করে দিতে পারে না তা স্বীকার্য। ...। বার টাকা পরিবার প্রতিপালন পক্ষে যথেষ্ট নয়; সুতরাং ণ্টার মাত্রেরই শিক্ষকতার সংগে সংগে করতে হয় অন্য র একটার উপায় উদ্ভাবন। অভাব-অনটনের দরুন কোন টা বিষয় ভালভাবে বুঝাবার বা শিখাবার যথেষ্ট সুযোগ র উঠতে পারেন না। এই যে কারণ—ইহা হয়েছে গৌণ রণ। মুখ্য কারণ বলতে গেলে দেখা যায়, শিক্ষকের নিজের ষ রয়ে গেছে প্রচুর। প্রথমত শিক্ষকের আলস্য—গ্লোবখানা বলের উপর নিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন ত দূরের কথা, বলের উপর নিজের মস্তকখানা কাত করে অর্ধ নিমীলিত ত্র বলবেন 'বহিতে যা লিখা আছে, মুখস্থ করে ফেল।' লেরাও আরম্ভ করে দিলে তাই। বুঝলে না কিছুই। ক্ষণ পরে ছেলেদের হৈ চৈ-এ গুরুমহাশয়ের তন্দ্রা গেল ভেংগে। দুই চোখ রক্তিমাকার, গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি শিখা হয়েছে ?' ছেলেরা হাত তুললে না কেউ, বেত পড়ে গেল, ফসাফস্। আদেশ হল পরদিন শিখে আনার জন্য। এখানে শিক্ষক পাঠটি শিখাবার জন্য নিজে কি করলেন, তা যদি নিজে একটু চিন্তা করে দেখতেন, তবে নিশ্চয়ই ছাত্রদের দশা এরূপ হ'ত না।

আচ্ছা যদি দরিদ্র গুরুমহাশয়ের আর্থিক চিন্তাহেতু শিক্ষাদান কার্যে তত মন না বশে, তবে চিন্তার মধ্য দিয়ে তন্দ্রার ভাব আসে কি করে? যদি বাস্তবিক সেইরকম কোনও চিন্তার কারণ থাকত, তবে নিশ্চয়ই তন্দ্রা বা বসন্তের মাদকতায় তাঁকে আক্রমণ করতে পারত না। এ ছাড়া এগারটা থেকে বেলা চারটা পর্যন্ত যখন স্কুলের নামেই মালা-তিলক পরে, সেই কার্যে বৃত থাকতে হবে, তখন অন্য আর একটার মিছামিছি চিন্তা করে এ মালা-তিলকের অপমান করবার সাধ কেন ? অধিকতর ভাল বুঝলে, এ বেশ ত্যাগ করে অন্য বেশ ধারণ করলেই হয়। আসল কথা হল, কর্মপ্রিয়তা। যাহার এ গুণটা নাই তিনি শিক্ষক নামের অযোগ্য। শিক্ষক যদি নিজের ব্যবসাকে আপ্রাণ ভাল না বাসেন, তবে তাঁহার দ্বারা সেই কাজের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই। চাই নিজের কাজটাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসা। যদি কাজকে ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ করতে পারা যায়, তবে শিক্ষক যতই কেন অনভিজ্ঞ হন না, তাঁহার দ্বারা উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অভিজ্ঞ শিক্ষক যদি নিজ কাজকে ভাল না বাসেন, তবে তাঁহার দ্বারা উন্নতির চেয়ে অবনতির সম্ভাবনাই বেশীরভাগ। শিক্ষক যদি সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, কোমলমতি শিশুদের উপরই নির্ভর করে—নিজের, পরিবারের, সমাজের, গ্রামের, দেশের, এমন কি সারা বিশ্বের উন্নতি-অবনতি। এই শিশুরাই হবে একদিন আমাদের মুক্তি-মন্ত্রের পূজারী এবং শিক্ষক যদি মনে রাখেন যে,—

The future of mankind is in the hands of the Teacher' অর্থাৎ 'মানবের ভবিষ্যৎ শিক্ষকের হাতে' তবেই যথেষ্ট।

কাজের শেষ

(গল্প)

শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত অরিন্দম বিলেতেই চলে গেল।

যাবার সময় অনীতা অবশ্যই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কবে ফিরছ?

এর উত্তরে সে বলে দেয় তাকে একটা অবান্তর কথা—কাজ শেষ হলেই।

অনীতা আবার বলে—তবুও কতদিন হ'তে পারে, একটা আন্দাজও তো আছে!

একদিনেও হয়ে যেতে পারে' আবার সারাজীবন ধরেও হয়তো হবে না।

কিছুক্ষণ অনীতা আর পারে না কোন কথা বলতে; পরে বলে ওঠে, তুমি পুরুষ কাজের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে পারবে; কিন্তু আমি নারী, আমার সময় কাটবে কি করে?

নারীরও কাজ যথেষ্ট আছে অনীতা:—অরিন্দম উত্তর দেয়। তুমিও গ্রামে ফিরে যাও; চেষ্টা কর সেখানকার দৈন্য দূর ক'রে আবার শ্রী ফুটিয়ে তুলতে।

পারব কি?

তোমার মধ্যে প্রাণ আছে, প্রেরণা আছে, তুমি নিশ্চয় পারবে অনীতা—

আমি প্রাণ দিয়েও চেষ্টা করব তোমার কথা রাখতে; কিন্তু একটা কথার ঠিক উত্তর আজ আমায় দেবে?

বল।

তুমি আমায় সত্যি ভালবাস না এ—

অনীতা!—অরিন্দম প্রায় চীৎকারই করে ওঠে,

না বল, তোমায় বলতেই হবে; তা যদি হত তবে তুমি আমায় আজ এভাবে একলা ফেলে চলে যেতে পারতে না—অনীতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তার চোখ জলে ভরে এসেছে।

অরিন্দম অল্পক্ষণ চুপ করেই থাকে; পরে বলে,—তবে শোন অনীতা আমার কাহিনী। অরিন্দমের বলা শেষ হলে অনীতা আর পারে না সেভাবে কথা বলতে; চোখের জল চোখের কোণে রেখেই সে তার পায়ের ধূলো নিয়ে বলে, ভাগ্য আমার ভালই তাই তোমাকে পেয়েছি।

এদের দুজনের আলাপ হয়েছিল খুবই আশ্চর্য্যজনক-ভাবে। অরিন্দম তখন মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। হাসপাতালে এক রাত্রে তার ডিউটি ছিল; রাত্রে ডিউটি থাকলে অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় সে খুব কমই ঘুমোত। হঠাৎ একটা অ্যাম্বুলেন্স এল। তাতে সাত আট বছরের একটি ছেলে, মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে তার সর্বাঙ্গে রক্তাক্ত। দেখে মনে হল নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের। ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকসন দিয়ে বলে গেলেন—একে একটু ভাল করে এ্যাটেণ্ড ক'র মাষ্টার; আর সতর্ক থেক, হুঁস ফিরে এলেই আমায় খবর দেবে।

ভোরের দিকে প্রায় চারটের সময় ছেলেটি চোখ মেলে চাইলে আর সংগে সংগে একটু অস্ফুটধ্বনি "মা"। অরিন্দম তার মুখের 'পরে ঝুঁকে পড়ে বলে—ভয় কি ভাই, আমি তোমার দাদা হই, মা এখুনি আসবেন। তারপরেই সে বেয়ারাটাকে পাঠায় ডাক্তারবাবুর কাছে খবর পেঁৗছাতে। ডাক্তারবাবু এবারে এসে ছেলেটিকে ওষুধ খাওয়ান। ভাল করে' পরীক্ষা করে' বলেন—না আর তেমন গুরুতর ভয়ের কারণ নেই। ছেলেটি আবার পড়ে ঘুমিয়ে। আটটার সময় ডিউটি হয় বদল। অন্য ছাত্র আসে আর অরিন্দম পায় ছুটি।

বেলা দুটোয় আবার ক্লাশ। বাড়ী গিয়ে খাবার পর একটু বিশ্রাম করবার জন্য যেই শুয়েছে অমনি ঘুম এসে যায়। শরীরও ছিল খুব ক্লান্ত। উঠে দেখে যে চারটে বেজে গেছে। যাঃ ক্লাশটা কামাই হ'ল। মুখ-হাত ধুয়ে সে আবার হাসপাতালে যায় ছেলেটির খবর জানতে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে ছেলেটির হুঁস হয়েছে এবং তার বাপ, মা, ভাই, বোন সবাই হয়েছেন হাজির। ছেলেটি কিন্তু খুঁজছে তার সেই দাদাকে যাকে ভোরের বেলা প্রথম চোখ মেলে সে দেখেছিল তার সেবা-শুশ্রূষা করতে। ঘরে ঢুকবামাত্র বিছানা থেকেই ছেলেটি দাদা দাদা করে আনন্দের সংগে ডাকলে। অরিন্দম কাছে যেতেই সে বাবা মা সকলকে বলতে লাগল—আমার দাদা। তারপরেই বলে—দাদা তুমি আমায় একলা ফেলে চলে গেলে কেন? না, তাহলে আমি থাকব না এখানে। অরিন্দম বলে উঠল—না ভাই খোকা, আমি তোমার কাছেই ত রয়েছি তোমার আবার ভয় কি!

এবার ছেলেটির বাবা এগিয়ে আসেন; ওর হাত দুটি ধরে বলেন—আমার ছেলেকে আপনিই বাঁচিয়ে তুলেছেন, এ ঋণ আপনার আমি কোনও দিনই শোধ করতে পারব না—এর উত্তরে অরিন্দমের মুখ দিয়ে কেবল একটি মাত্র কথা বেরিয়ে আসে—আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র।

তরুণের জন্য কেবিন ভাড়া করা হ'ল; একজন নার্সও রাখা হল। আরও ঠিক হল মা থাকবেন তার কাছেই, যেন সে ভয় না পায় সেই জন্য। তরুণ কিন্তু ধরে বসেছে যে, অরিন্দমদাকে কিছুতে কাছছাড়া হতে দেবে না।

এই সূত্রে অরিন্দমের আলাপ হয়ে গেল তরুণদের বাড়ীর সকলেরই সংগে। তার ব্যবহারে তরুণের মার মন গেল গলে; তিনি তাকে নিজের ছেলের মতই মনে করলেন।

তরুণেরা খুবই ধনী। বাড়ী ওদের লেক অঞ্চলে বড়লোকের পাড়ায়। দেশে খুব বড় জমিদারী আছে—আর ব্যাংকে মোটা টাকা। তার বাবা বিনয়ভূষণবাবু হাইকোর্টের একজন নাম-জাদা ব্যারিষ্টার। তাঁর তিন ছেলে আর দুই মেয়ে। বড় ছেলেটির নাম অরুণ; সে শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে গ্লাশগোয় গেছে আরও কাজ শিখতে। বিলেত যাবার আগেই এক জজের মেয়ের সংগে তার বিয়ে হয়। মেজ বরুণ-কুমার বি-এ পাশ করে এম-এ আর 'ল' একই সংগে পড়ছে। তার বয়স ২৩ বছর। মেয়ে দুটির নাম সুনীতা আর অনীতা।

সুনীতার বিয়ে হয়ে গেছে আর অনীতা পড়ে বেথুনে থার্ড ইয়ার ক্লাশে। তরুণ সবার ছোট।

পরিবারটি এঁদের খুবই আধুনিক ও অভিজাত। ছেলে-মেয়েগুলির মধ্যে বেশ একটু চরিত্রগত বিভিন্নতা দেখা যায়; অরুণ সুনীতা আর অরুণের স্ত্রী কমলা তিনজনেই ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত ও দাম্ভিক প্রকৃতির; কিন্তু বরুণ ও অনীতা একেবারে উল্টা, খুবই সাদাসিদে, মনের মধ্যে কোথাও একটু ঢাকাঢুকি নেই, সকলের সঙ্গেই প্রাণ খুলে মেশে অবস্থাগত পার্থক্য বিচার না করেই।

য়্যাক্সিডেণ্টের রাত্রে চাকরদের কাছে তরুণকে রেখে সবাই গিয়েছিল নিমন্ত্রণে। তরুণ কিন্তু একফাঁকে চাকরদের চোখে ধুলো দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারপরেই ঘটে গেল এই অঘটন। রাত্রে সবাই বাড়ী ফিরে যখন দেখল যে তরুণের নেই কোন পাত্তা, তখনই পড়ে গেল খোঁজ খোঁজ রব। তারপর সকাল বেলায় হাসপাতালে মিলল হদিস।

এর কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন অরিন্দমের আর যেন পা সরছিল না যে সে যায় তরুণের কেবিনে। কারণ নার্স, ডাক্তার সকলেই এই ছেলেটির ওপর অসম্ভব রকমের আগ্রহ দেখায়; কি কারণে সেটা ঠিক বোঝা যায় না; হয় তা অন্তরের অনুপ্রেরণায় কর্তব্য হিসেবে বা বড়লোকের মনস্তুষ্টির জন্য।

অরিন্দমের নিজেরই মনে মনে বড় লজ্জা করে। ভাবে, আগ্রহ দেখানতে একটা অসঙ্গত বৃত্তির বিকাশই হচ্ছে। ঐ সব ধনিক পরিবারের ছেলে-মেয়েরা—তারা হয়তো মনের মধ্যে তার আচরণের কি সব মানে তৈরী করছে। তাদের কাছে জগতের রূপ তো ভিন্ন রকমের।

অরিন্দম ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে গিয়ে হাতের কাজগুলো সারতে আরম্ভ করলে। কারণ রাস্তার কুড়ান গরীব, আর্তদের ভাল ক'রে দেখাশুনো করা ডাক্তারদের তো দূরের কথা মেথর ঝাড়ুদারগুলোরও অবকাশ হয় না। অথচ মুখ্যত তাদেরই জন্যে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা। ও মনে মনে হাসল এই ভেবে যে, আজকাল আর মুরুব্বিহীন লোকের হাসপাতালে 'বেড্' একরূপে মেলেই না। কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সত্যই অদ্ভুত!

অবজারভেশন বেডের দিক থেকে অনেকক্ষণ ধরে একটা কাতরানির শব্দ আসছিল। ও সেখানে গেল। দেখে একটি বছর ন' দশের অতি গরীব মেয়ে কাতরাচ্ছে ভীষণ। জ্বরে তার সর্বাঙ্গ আগুন, চোখ চাইতে পারে না। মাথার দুপাশের রগ দুটো ফুলে করছে ওঠাপড়া, চোখে তা স্পষ্টই ধরা যাচ্ছে। বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখে যে, হার্ট চলেছে অসম্ভব রকম ক্ষিপ্র। একটু আগে একজন নার্সকে ওখানে ডিউটি দেওয়া ছিল মেয়েটিকে শুশ্রূষা করার জন্য। কিন্তু কই, সে ঘরে তো কেউই নেই।

অরিন্দম ওখান থেকে যায় একটু ঘুরে দেখতে নার্সটিকে যদি পায়। ঘুরে কোথাও পেল না তাকে। ক্ষুণ্ন মনে যখন ফিরে আসছে তখন একবার বাইরের দিকে চোখ পড়ায় দেখে সেই নার্সটি তার দু'তিনটি সঙ্গিনীর সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে। ও আর তাদের ডাক না দিয়ে সটান চলে এসে নিজেই বসল মেয়েটির মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে।

একা একা বসে অরিন্দম ভাবতে লাগল বড়লোকদের কথা, গরীবদের দশা, ওদের নিজেদের অবস্থা। এম্নি ক'রে শত শত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই ওদের জীবন এগিয়ে এসেছে। ভাবতে ভাবতে ওর চোখে ভেসে আসে একখানি অতি পুরাতন ছবি পর্দায় প্রতিফলিতের মত।

একটি গরীব স্কুল মাষ্টারের মৃত্যু ঘটেছে। তার হয়েছিল যক্ষ্মা। উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসার অভাবে তাকে নিতে হ'ল জগত থেকে চিরবিদায় এক বিধবা স্ত্রী আর তিনটি নাবালক ছেলে-মেয়েকে রেখে। ভদ্রলোকের জীবনটা ভ'রই চলেছিল দুঃখ, দুর্দশা আর অসম্ভব মনোবেদনার একচেটে রাজত্ব। জন্মেছিল সে এক বেশ বড় জমিদারেরই ঘরে, বড় ছেলে হয়েই। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে যে, কপালে না থাকলে সব থাকতেও কোন কিছুই ভোগে লাগে না। সে কথাটা তারই জীবনে প্রযুক্ত হয়েছিল বাস্তবে।

ভদ্রলোকের নাম ছিল কমল। ক'লকাতার প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এক পল্লীগ্রামে তার বাবা ছিলেন জমিদার। ছোট বেলায় তার মা মারা যাওয়াতে জমিদারবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এক অষ্টাদশীকে। বিয়ের পর জমিদারের আর একটি পুত্ররত্ন লাভ হয়। তার নাম মাণিক।

দ্বিতীয়া স্ত্রী আসার পর থেকেই জমিদারবাবুর সব স্নেহ সব যত্ন ক্রমশ কমলের দিক হতে সরে যেতে থাকে। সে ঠিক পরের ছেলের মতই ও বাড়ীর এককোণে দিন কাটাত।

কমল গ্রামের স্কুলে প'ড়ত। অসাধারণ মেধা ও বিনয়ের জন্য সকল মাষ্টারই তাকে ভালবাসতেন খুবই। তার বৈমাত্রেয় ভাই মাণিকও সেই স্কুলে তার চেয়ে তিন ক্লাশ নীচে পড়ত। কোনবারেই সে ঠিকমত প্রমোশন পেত না, তবে জমিদারবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র হওয়ার দরুন তার ক্লাশে ওঠার কোনই বাধা ছিল না। মাণিকের মা এতে ক'রে আবিষ্কার করলেন এক নূতন সত্য। নিশ্চয়ই কমল শত্রুতা করে' মাষ্টারদের কাছে লাগিয়ে ভাগিয়ে তাঁর ভাল ছেলেকে এ রকম ক'রে সবার চোখে হীন প্রতিপন্ন করছে। কমল করে না কোনই প্রতিবাদ। ক্রমে দুবছর কেটে যায়। কমল ভালভাবেই ম্যাট্রিক পাশ করে স্কলারশিপ নিয়ে এবার সে যাবে ক'লকাতায় কলেজে পড়তে। জমিদারবাবুর মন টলেছিল। তিনি কমলের খরচের জন্য বেশ একটা মোটা টাকা মাসহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়াটির গঞ্জনা ও ভর্ৎসনার বশে মাসিক কুড়িটি টাকার বেশী বরাদ্দ বজায় রাখতে পারলেন না। কমল তাই নিয়েই গেল ক'লকাতায়।

গ্রামে কমলের একজন ছিল আবাল্যসুহৃদ, তার নাম শরৎ। তাদের বাড়ী ছিল জমিদার বাড়ীর ঠিক পাশেই। শরতের বাবা কলকাতায় এক সওদাগরী অফিসে চাকুরী করতেন। তাদের সংসার তাতেই চলে যেত কোন রকমে। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়াতে শরৎকে গ্রামের স্কুলে নিতে হ'ল মাষ্টারী। তাতেই কোনরকমে জুটতে লাগল দুবেলা দুমুঠো। শরতের একটি ছোট বোন ছিল নাম অলকা, বিবাহযোগ্যা, তাকেও কোন সুপাত্রের হাতে শীগ্গিরই স'পে দেওয়া দরকার।

কিছুদিন পরের কথা। আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়ে কমল

তখন দেশে এসে কিছুদিন বাড়ীতে আছে। তখনও ফল বেরুতে কিছুদিন দেরী ছিল।

সেদিন নিত্যকার মত ঘুম ভেঙে উঠে কমল তার মায়ের ছবিখানায় মাথা ঠেকাচ্ছে। হঠাৎ বাইরে থেকে শরতের ডাক শুনল—কমল, কমল! বেশ বোঝা যায় যে তার স্বরে ফুটে উঠেছে ভীষণ উত্তেজনা। তৎক্ষণাৎ কমল দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি ব্যাপার? এর উত্তরে শরৎ যা বললে তা অতি গুরুতর। ভোরবেলা অলকা কাপড় কেচে বাগানের পথ ধরে বাড়ী ফিরছিল, এমন সময় মাণিক এসে তার একখানা হাত চেপে ধরে। কোন রকমে সে হাত ছাড়িয়ে বাড়ী পালিয়ে এসেছে। গ্রামের মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ তখন ঐ পথ দিয়েই আসছিলেন তিনিও ব্যাপারটা দেখেছেন। আর এর আগেও নাকি মাণিক আরও একবার তাকে কুৎসিত কথা বলেছে কোন্ দিন।

সব শুনে কমল চলে গেল তার বাবার কাছে। সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানিয়ে সে চাইলে প্রতিকার; বললে—বাৎসল্যবশতঃ তিনি মাণিককে কিছু নাও বলতে পারেন। কিন্তু জমিদার হিসাবে প্রজারা যাতে নির্বিঘ্নে বাস করতে পারে সে ব্যবস্থা করাও তাঁর কর্তব্য। জমিদারবাবু তাঁর অভিযোগ শুনে মাতু ঠাকরুণকে ডাকিয়ে পাঠালেন ব্যাপার কি শোনবার জন্য।

মায়ের অতিরিক্ত আদরে মাণিক হয়ে উঠেছিল সব রকমে অমানুষ। ক্রমে এখন তা নীতিহীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতার চরমে গিয়ে পৌঁছাল। প্রায়ই সে বেড়াতে যেত ক'লকাতায়, সে রাত্রেও আর বাড়ী ফিরত না। জমিদারবাবু অবশ্য এসব লক্ষ্য করলেও কিছু বলতে পারতেন না, যেহেতু পত্নী দেবী তাহলে চুল ছিঁড়ে মাথা খুঁড়ে সারা বাড়ী মাথায় করে তুলবে।

বাবার কাছে দাদা নালিশ করেছে, এই খবর মাণিকের কানে পৌঁছাতে একটুও সময় লাগল না। জমিদারবাবু অগোচরে দ্বিতীয়পক্ষ মন্দাকিনীর কাছে ব্যাপারটা সমস্তই জানিয়ে ফেলেছিলেন। স্ত্রী মন্দাকিনী তো চটেই লাল; বলেন, এ কমলের কারসাজি। এত করে মাষ্টারদের লাগিয়ে-ভাগিয়ে সে শান্তি পেল না। এখন আবার কুচ্ছো!

খানিক পরে কয়েকখানা "নোট" নিয়ে মাণিক গেল মাতু ঠাকরুণের বাড়ী। কিছুক্ষণ বাদে জমিদারের পাইকের সঙ্গে যখন মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ বেরিয়ে গেলেন জমিদার বাড়ীর উদ্দেশে, মাণিকও হাসি মুখে বাড়ী ফিরল।

ফলে জমিদারের কানে যে কথা পৌঁছাল—তা একেবারেই উল্টা। মাণিক সেখানে ছিল না আগে, বরং কমলকেই দেখা গিয়েছিল ছুটে পালাতে—আর মাণিকই তার কুকাজের জন্য হুঁসিয়ার করে দিচ্ছিল।

বলা বাহুল্য এর পরে আর শরতের পক্ষে গ্রামে বাস করা সম্ভব হয়ে উঠল না। চারিদিকে পড়ে গেল ঢি-ঢি। সকলেই তাদের উপর একহাত খেলবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। শরৎ কিন্তু গ্রামের মাতব্বরদের শাস্তির অপেক্ষা করলে না। চণ্ডীমণ্ডপের তামাকের ধোঁয়ার মতই অপদার্থ মানুষগুলোর বিধান জানবার পূর্বেই সে সপরিবারে চলে গেল ক'লকাতায়। অবশ্য ও ঘটনার পর একদিনও পারে নি সে মাষ্টারী করতে।

এবার কমল হয়ে উঠল একেবারে বিদ্রোহী। সে মুখ বুজে সহ্য করতে পারবে না এই ঘৃণ্য লোকদের নীচতার বিজয়। তাই বেশ স্পষ্ট করেই সে বাবাকে জানিয়ে দিলে যে, নিরপরাধ অলকাকে সে বিবাহ করবে। এতে করে যদি তাকে হতে হয় পথের ভিখারী তাও স্বীকার।

জমিদারবাবুর বুকের মধ্যে একটু ঘা লাগে এ কথায়, কিন্তু মন্দাকিনী দেবীর জিদে তাঁকে শেষ পর্যন্ত করতে হয় কমলকে ত্যাজ্যপুত্র। কমলও সোজা এসে উঠল ক'লকাতায় শরতের বাসায়।

তারপর চলল যাকে বলে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ জীবনের সঙ্গে। অতি কষ্টে শরৎ আর কমল জোটালে দুটি চাকরী। কমল পেলে এক স্কুলে মাষ্টারী আর শরৎ এক সওদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি।

কমল ও অলকার বিয়ে হয়ে যায়। আর শরৎও বিয়ে করে একটি গরীবের মেয়েকে। দুজনেরই চলতে থাকে একই পরিবারে বসবাস।

ক্রমে দুজনেরই গুটি কয়েক ছেলে মেয়ে জন্মায়।

অল্প আয়ে এই বৃহৎ সংসার চালান হয়ে পড়ে দুরূহ। কমল আরম্ভ করে প্রাইভেট টিউশনি। এতে করে তাকে খাটতে হত ভীষণভাবে। ক্রমে ক্রমে তার শরীর ভেঙে আসতে থাকে। রোজই বিকেলে ঘুসঘুসে জ্বর হয়। বাধ্য হয়েই তাকে নিতে হল ছুটি। কিছুদিন পরে রোগ ধরা পড়ে—যক্ষ্মা। ডাক্তার এসে প্রথমেই বলে রোগীকে স্বতন্ত্র থাকতে হবে। স্বতন্ত্র পাত্র করতে হবে তার খাবার জন্য। গয়ের, থুতু একটি লাইসোল মিশ্রিত জলপাত্রে ফেলতে হবে ইত্যাদি অনেক কিছুই। এসব হয়ত সম্ভব হল। কিন্তু যে রকম পথ্যের ব্যবস্থা তিনি দেন তাতো আর গরীবের ঘরে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

প্রায় বৎসরখানেক পরে কমলকে নিতে হল এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায়। অলকা কাঁদে আর বলে চিকিৎসার অভাবে লোকটাকে মেরে ফেলতে হ'ল। তখন বড়ছেলেটি ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ছে, মেজোটি থার্ড ক্লাশে আর ছোট অরিন্দম সিক্সথ ক্লাশে। কিছুদিনের মধ্যে শরৎ দুজনকে দুটি চাকুরী জুটিয়ে দিলে কুড়ি টাকা আর পনের টাকা মাইনেতে। পড়বার সঙ্গতি তখন আর কৈ? ছোটটি নেহাৎ ছোট বলেই পড়া ছাড়ান গেল না।

কয়েক বছর কেটে গেছে। কমলের বড় দুই ছেলের রোজগার কিছু বাড়ে। তাদের সংসারেরও এখন হয়েছে কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতি। অরিন্দম আই-এস-সি পাশ করলে। এবার কি পড়বে তাই নিয়ে জল্পনা। অলকা বলেন, "তোমার বাবা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারিয়েছেন, যক্ষ্মা রোগের হাত থেকে অন্ততঃ একটি লোককেও তোমায় বাঁচাতে হবে। তুমি ডাক্তারীতে ঢোক।"

তারপর আর বছর ঘোরে না। মা যান মারা। অরিন্দমের বুকে মার সেই শেষ কথা একেবারে গভীরভাবে এঁকে যায়—অন্ততঃ একটা লোককেও বাঁচাতে হবে কালব্যাধি যক্ষ্মার হাত থেকে.........।

অরিন্দমের মাথার ভেতর ঘূর্ণিপাক আরম্ভ হয়। ●

আর ভাবতে পারে না। হঠাৎ মেথরটা "বাবু" বলে ডাকায় ওর চমক গেল ভেঙে। চোখ মেলে দেখে যে তরুণের ছোড়দা দাঁড়িয়ে বলছেন, তাকে একবার তরুণের কাছে যেতেই হবে। সে তার অরিন্দমদাকে না দেখলে কিছুতেই স্থির হবে না। নার্সটিও ইতিমধ্যে এসে তার কাজে মন দিলে। তাকে ভাল করে বুঝিয়ে সে চলল তরুণের কেবিনের দিকে।

কেবিনে ঢুকতেই তরুণ বলে উঠল—বাঃ আপনি আর এলেন না, আমি তা'হলে কিন্তু খুব চেঁচাব।

অরিন্দম বলে—এই তো আমি এলাম, তুমিত ভালই আছ। এবারে চুপ কর দেখি লক্ষ্মীটি।

তরুণ আবার বলে—আমি সব সময়েই চুপ করে থাকব; কিন্তু রাত্রিতে আপনাকে আসতেই হবে।

সে দিন অরিন্দম কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই গিয়ে তরুণের সঙ্গে দেখা করে এল।

দুপুর রাতে সার্জিকেল ওয়ার্ডের নার্স একজন ষ্টুডেণ্টকে ডেকে পাঠালে। সে লোকটি এসে চিরপ্রচলিত প্রথা মত অরিন্দমকেই ঘুম থেকে টেনে তুললে।

ওয়ার্ডের কাজ সেরে ফেরবার মুখে হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল বাচ্চাটাকে দেখে গেলে কেমন হয়। কেবিনের দরজাটা ছিল ভেজান, কাজেই সে আস্তে টোকা দিয়ে ডাকল,—মা! টোকার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে অনীতা। অরিন্দম বেশ একটু থতমত খেয়ে যায়। এ দৃশ্যের জন্য সে একটুও প্রস্তুত ছিল না। যাই হোক, সলজ্জভাব কাটিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে—তরুণ কেমন আছে?

জ্বর সেইরকমই—অনীতা বলে।

—আপনি রয়েছেন! মা কোথায়?

—মা'র শরীর আজ একটু খারাপ তাই আমায় থাকতে হ'ল।

অরিন্দম আর কোন কথা খুঁজে পেল না। হঠাৎ একবার অনীতার মুখের দিকে চোখ পড়ায় বুঝলে যে সে এতটুকুনও ঘুমায় নি। তাই বললে আপনি ঘুমোননি দেখছি।

—ঘুম এল না।

—আচ্ছা চলি,—বলে' অরিন্দম ফিরতে যায়। কিন্তু অনীতা হঠাৎ আবার ওকে ডাকে নাম ধরেই—অরিন্দমবাবু, আচ্ছা তরুণের সারতে আর ক'দিন লাগবে?

অন্ততঃ একমাস, তারপরে হাড় জিরুতে আরও বেশ কিছুদিন।

—আপনার হাতে কি খুব কাজ আছে—অনীতা আবার শুধায়।

—না আপাততঃ নেই বটে, তবে বলা যায় না কখন আবার এসে পড়ে।

—আসুন না একটু গল্পই করা যাক্।

ওরা দু'জনে বাইরে বারান্দায় এসে বসে। কেবিনের দরজা খোলাই রইল। অনীতা বললে,—রাত আর যেন পোয়াতে চায় না। আপনারা যে কি করে এত জেগে থাকেন,—আশ্চর্য!

—এ আমাদের প্রফেশনাল অনীতা দেবী—অরিন্দমের স্বরে এবার একটু উদাসীনতার ভাব।

—কাল রাতেও কি আপনার ডিউটি থাকবে? অনীতা কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

—না আবার তিন দিন পরে, কেন বলুন তো?

—এমন কিছুই নয়, তবু আপনি রাতে এলে সময়টা একটু কাট্‌ত!

—আমায় কি আপনার সময় কাটাবার যন্ত্র বলে ঠাওরালেন; অরিন্দম একটু হেসে ওঠে। এইভাবে ওদের আলাপ নিবিড় হয়ে পড়ে।

মাস দুয়েক পরে। তরুণ ভাল হয়ে বাড়ী চলে গেল। তার মা আর অনীতা অরিন্দমকে তাদের বাড়ী যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করে গেলেন। কিন্তু অরিন্দমের যেন ওদের বাড়ীতে যেতে কি রকম সঙ্কোচ বোধ হয়। ওর অবশ্য অনীতাকে ভালই লাগে। বড়লোকের মেয়ে হলে কি হয়, তার একটুও যেন দেমাক নেই। ওর ইচ্ছেও হত খুবই অনীতাকে দিনে অন্ততঃ একবারও দেখতে পাবার।

প্রায় একমাস কেটে গেল। অরিন্দম পারলে না কিছুতেই অনীতাদের বাড়ী যেতে। হঠাৎ একদিন দেখলে যে তরুণ এসে হাজির ওদের বাড়ীতে। সঙ্গে তার মেজদা বরুণ। অরিন্দমকে এসেছে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে। ওদের বড়দা অরুণবাবু গ্লাশগো থেকে ফিরে এসেছেন, তাই একটা পার্টী হবে। অরিন্দম একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। বড়লোক মহলে জাঁকজমকের মাঝে যেতে তার বড় কষ্ট হয়। ও-রকম একটা কৃত্রিম অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মাঝে দম আট্‌কে আসবার উপক্রম হয়। এদিকে ভদ্রতার খাতিরে পারেও না সোজা অস্বীকার করতে। তাই বলে দেয় যাব। কিন্তু যাবার দিন কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। তাই ছোট বোন লীলাকে দিয়ে কলেজ থেকে অনীতাদের বাড়ীতে ফোন করাল—দাদা হঠাৎ একটা কাজে বাইরে চলে গেছে, নেমন্তন্নে যেতে পারল না এজন্য আপনারা ক্ষমা করবেন।

এর কিছুদিন পরে অরিন্দম একদিন গিয়েছিল টালীগঞ্জে। ফেরবার পথে ভাবলে যে একবার গিয়ে দেখা করে আসি তরুণদের বাড়ীতে। কতই না হয়ত রাগ হয়ে আছে। গিয়ে দেখে যে বাড়ীতে কেউই নেই, বেরিয়ে গেছে। 'বয়' জানালে যে কেবল "ছোটো মিসি বাবা বাড়ীতে আছেন। তিনি আসছেন।" এখন অরিন্দমের মনে হতে থাকে, না এলেই বুঝি ভাল হত।

অনীতা এসে ওকে ধরে নিয়ে যায় উপর-তলায়। বলে—বসুন, সকলে এসে পড়ল বলে', একটু চা খান। বলে বয়কে হুকুম দিলে চা আর খাবার আনতে। এবার অরিন্দম জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা, সবাই বেরিয়েছে, আপনি কেন বাড়ীতে?

—আমার পরীক্ষা আছে তাই পড়া করছি।

তারপর ওদের আরম্ভ হয় নানা কথা। কিছু পরেই অরিন্দম বলে—আচ্ছা, এবার উঠি, আপনার পড়ার আর ক্ষতি করব না।

উত্তরে অনীতা বলে—একটুকুও না; কিন্তু আজ আপনাকে থাকতেই হবে, দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

—না হয় পরে হবে।

—না, তা'হলেও আপনার এখন যাওয়া হবে না।

-কেন বলুন তো?

-এরি মধ্যে ভুলে গেলেন আপনি আমার সময় কাটাবার মোশন।

অরিন্দম আর কোন কথা না বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে।

এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই যে অনীতা আর অরিন্দম পরস্পরকে ভালবেসে ফেলতে পারে, এটা তাদের দু'জনের একজনও কিন্তু তখন টের পায়নি। অরিন্দম অবশ্য মেয়েদের সান্নিধ্যে এসেছে অনেকবারই, কিন্তু প্রেমে সে কখনই পড়ে নি। সে নিজে ছিল সম্পূর্ণভাবে আদর্শবাদী। কিন্তু অনীতার এই নিরহংকার ভাব আর শাদাসিধা ব্যবহারে তার যেন ওকে কি রকম বেশ একটু ভালই লেগেছিল। আর অনীতাকেও মুগ্ধ করেছে, অরিন্দমের এই কর্তব্যপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, সর্বোপরি নিজের গুণগুলোকে বেশ যত্ন করে পরের চোখের আড়াল করে রাখার চেষ্টা।

কিন্তু দু'জন অসমান অবস্থার পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রেম সাধারণত যে সব জটিলতা ও প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে, তা থেকে এরা দু'জনেও পেল না রেহাই। অরিন্দমের মনের ভেতর জেগে ওঠে নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। কি করে এই নিদারুণ যক্ষ্মা রোগের হাত থেকে লোকেদের বাঁচিয়ে তোলা যায়। বাবার মৃত্যুর কারণ স্মৃতিকে কি ভাবে দিতে পারবে হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়ে সম্মান। যে মহীয়সী নারীপ্রাণ স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচারিত অসহায় দিনগুলিকে কাটিয়ে দিয়েছিল হাসিমুখে, বিনা অপরাধে নিষ্ঠুর ধনীসমাজ যাকে করেছিল আশ্রয়হারা তারই শেষ ইচ্ছা পূরণ।

অরিন্দমের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ধিক্কার আসে। নিজের ওপর ঘৃণা হয়, কেন—কেন সে আজ ঐ ধনীর আদরে পালিতা দুলালীকে এত ভালবাসে। সেও তো সেই বিষের ঝাড়ের একটি শুয়া......। মনের কোণে ঘনিয়ে আসে অসহায়তার সন্দিক্ষণ। যার জন্য আজ সে বেছে নিয়েছে চিকিৎসকবৃত্তি, সেই আদর্শ এসে তার প্রেমকে সরিয়ে দেয়। আবার আসে প্রেম, আবার যায় সরে।

ওদিকে অনীতাদের বাড়ীতে খুবই চেষ্টা চলে তার বিয়ের জন্য। বড়লোকের রূপসী মেয়ে তায় আবার আধুনিক শিক্ষার ফ্রেমে বেশ মানানসইভাবে আঁটা, অতএব পাত্রের বাজার বেশ ভালই। চাহিদা আসে বিভিন্ন দিক থেকে। আই সি এস, ব্যারিষ্টার, বড় জমিদারের ছেলে প্রভৃতি। পরীক্ষার অজুহাতে অনীতা এর সবগুলোকেই চাপা দেয়।

অরিন্দমের ছোট বোন লীলা, অনীতাদের কলেজেই পড়ত। অনীতা ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে আলাপ করে। লীলারও কিন্তু গোড়া থেকেই দাদার মত ধনীদের প্রতি বেশই বিতৃষ্ণা ছিল। তাই অনীতার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কের মাঝে সে নিজেই একটা প্রাচীর গড়ে তোলে। তাই একদিন অনীতার নিমন্ত্রণের টেলিফোনের উত্তরে, অরিন্দমের অসুখের দিনেও বলে—দাদা ভাল আছে, কিন্তু বড়লোকের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তার জন্ম হয়নি।

এতে অনীতা হয়ে পড়ে অতিরিক্ত মর্মাহত। কিন্তু যে মুহূর্তে অনীতা জানতে পারে যে, অরিন্দমের ঘোর বিকার, তখন সব মান, অভিমান ভুলে গিয়ে এমন কি এক বাড়ী লোক, —যারা সবাই পার্টিতে ওর গান শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের উপেক্ষা করে চলে গেল অরিন্দমকে দেখতে। বাড়ীর সকলেই ঘোর আপত্তি ও প্রতিবাদ করেছিল তার এই ব্যবহারে। তার দিদি তাকে বুঝিয়ে বললেন,— এখন তোমার পার্টিতে না যাওয়া মানে বাবাকে শুধু অপমান করা। কিন্তু কিছুতেই হল না কিছু ফল।

এই অসতর্ক মুহূর্তে অনীতার হৃদয়ের কপাট সবাইয়ের কাছে বেশ স্পষ্টভাবেই খুলে গেল। বাড়ীতে এ নিয়ে বেধে ওঠে বেশ গণ্ডগোল। এতে করে অনীতা আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে অরিন্দমকে তার মনের মধ্যে।

অরিন্দম আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যায়।

দাদার অসুখের সময় লীলা চিনে ফেলে অনীতাকে। এখন থেকে তার প্রধান চিন্তা হল কি করে ঘটান যেতে পারে এদের দু'জনের মিলন। কিন্তু দাদার মনের ভাব তো সে কোনমতেই বুঝে উঠতে পারে না। মনেই হয় না তাকে অনীতার প্রতি আকৃষ্ট বলে।

আগে অরিন্দম পড়া আর নিজের কাজ ছাড়া একটু সময় পেলেই খোশ গল্পে আর ফাষ্টি নষ্টি করে বাড়ী ভরপুর করে তুলত; কিন্তু একি হয়েছে তার অসুখের পর থেকে। একটুও সময় সে বিশ্রাম করে না। হাসপাতালের কাজ আর পড়াশুনা ছাড়া এখন সময় পেলেই কেবলই কোথায় কোন স্বাস্থ্য প্রদর্শনী এই সব জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়।

যাই হোক লীলার মনের ইচ্ছা মনের কোণেই উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। তা আর বলা হয় না। ক্রমে অরিন্দমের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। সে পাশ করে প্রথম হয়েই। এবার বিলাত যাবার পালা। কিন্তু হঠাৎ অনীতা অসুখে পড়ে, কাজেই সাময়িকভাবে যাওয়া স্থগিত রাখতে হয়। দিনরাতের অনেক সময়ই তার কাটে অনীতার বিছানার পাশে। ধীরে ধীরে তার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। প্রেম অধিকার করে ফেলে সমস্ত দেহ-মনকে।

আস্তে আস্তে অনীতা নিরাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার কেবলি মনে হয়, খুব শীঘ্র সে যদি ভাল হয়, তা'হলে তো আর পাবে না অরিন্দমকে এমনি করে এত কাছে একান্ত নিবিড়-ভাবে।

অরিন্দমেরও মনের রঙ বেশ খানিকটা বদলে যায়। অনীতার অসুখের সময় কি জানি কেন এসেছিল তার এক অজ্ঞাত অনুশোচনা। সে পারছিল না আর তাকে উপেক্ষা করতে, তার প্রতি উদাসীন হতে। প্রাণপণ যত্নে সেবায় তাকে তার বাঁচাতেই হবে। সেই কর্তব্যের অনুপ্রেরণাই ধীরে ধীরে তার দুর্বল মুহূর্তকে সজাগ করে তুলেছিল। তার সুপ্ত প্রেমকে ঝংকৃত করে এনে দিয়েছিল বিকাশ।

অনীতাকে নিয়ে হাওয়া বদ্‌লাতে যাওয়া হল কার্সিয়াংএ।

অরিন্দমও সংগে গেল। আর সে অনীতার অনুরোধ ঠেলতে পারে না।

রঙের রাজ্যে, মেঘের লুকোচুরি খেলায়, ফার্ন ডালিয়ার মাতোয়ারা স্বপ্নপুরীতে ওরা দু'জনে এক নূতন সুরে বাঁধা পড়ল। এর মনের সুর গিয়ে জাগিয়ে তোলে ওর মনে একই মীড়, একই মূর্চ্ছনা। দু'জনের একজন যেন সুর, আর একজন তাল। জন্ম দিচ্ছে এক গানের—সে হচ্ছে প্রণয়। পুলক-জাগান দৃষ্টির বিহ্বলতায় দু'জনেই ধাঁধার মাঝে হারিয়ে যায়।

জুলাইয়ের গোড়ায় আবার ওরা ফেরে কলকাতা। অরিন্দম যায় মেডিকেল কলেজে। ইচ্ছে যে ঐখানেই থাকবে একটা চাকুরী নিয়ে। ছাত্রজীবনের অসাধারণ কৃতিত্ব ও প্রোফেসরদের এবং প্রিন্সিপ্যালের সহানুভূতি থাকায় চাকুরী জুটতে তার দেরী হল না। তাঁরাও জানতেন যে যক্ষ্মা চিকিৎসার সে একটা নূতন ধারা আনতে পারে, কারণ পাঠ্যাবস্থাতেই এ বিষয়ে অনেক কিছু মৌলিক গবেষণার পরিচয় সে দিয়েছিল।

অরিন্দমের কাজ হল যক্ষ্মা বিভাগে। প্রথমেই রোগী পেল একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে। বাবা তার অত্যন্ত অপরিণামদর্শী ছিল। ফলে তাঁর হয় এই মারাত্মক ব্যাধি। তারপরে তাঁর এই পুত্রসন্তানটি হয়; সে-ও এর হাত থেকে রেহাই পেল না। ঘটনা পরম্পরায় অরিন্দম জানতে পারে যে এ সেই মাণিকেরই পুত্র। অরিন্দম দ্বিগুণ উৎসাহে তার চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলে। অরিন্দমের মধ্যে আবার জেগে ওঠে সেই আদর্শবাদ। প্রাণ দিয়ে সে চেষ্টা করে ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু নিয়তি যেন তাকে উপহাস করার জন্যেই ঠিক পরের দিনই ছেলেটিকে ডেকে নেয়। অরিন্দমের মনে হয়, বিধাতা যেন তাকে পরিহাস করতে এ-খেলা খেলেছেন। ওর নিজের ওপর ঘৃণা, বলে ওঠে,—আমায় যেতে হবে এবার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বাড়াতে। বাঁচান হ'ল না আমার একটিও লোককে।

অরিন্দম এবার খুব ক্ষিপ্রভাবে বিলাত যাবার আয়োজন করে ফেললে। অনীতা এসে বলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে কর ঘৃণা, আমি হয়ত তোমার জীবনে অনেক কিছু গ্লানি, অনেক কিছু কলঙ্কের পশরা চাপিয়ে দিয়েছি।

—অনীতা—অরিন্দম চেঁচিয়ে ওঠে। মুহূর্তে নিস্তব্ধ থেকে আস্তে আস্তে আরম্ভ করে নিজের জীবনকাহিনী বলতে। তার বাবার মৃত্যুর কথা, মায়ের জীবন-কাহিনী, আর সবশেষে সেই মাণিকের পুত্রের মৃত্যুর কথা। অনীতা মুগ্ধের মত সব শোনে। তার দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে যায়। অরিন্দমের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায় আরও অনেক—অনেক গুণ। জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো তোমার কাজ পেয়েছ, কিন্তু কি নিয়ে আমি থাকব, আমায় কিছু কাজ দাও।

অরিন্দম বলে,—অনীতা যাও পল্লীগ্রামে তোমাদের দেশে গিয়ে থাকগে; পল্লীই দেশের প্রাণ, সেইখানেই লুকিয়ে আছে বাঁচবার মন্ত্র, শান্তির অবলম্বন। কিন্তু দেখ তোমার ঐ শহুরপুষ্ট মন নিয়ে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী সেই গ্রামবাসীদের মরণকে আরও তীব্র করে তুল না। চেষ্টা কর তাদে[র] বাঁচাতে।

বছর দুই চলে গেছে। অরিন্দম কোনই চিঠি দেয়নি সে বলেই গেছে কাজ শেষ না হলে জগতের সম্পর্কে সে আ[র] ফিরবে না। অতএব কেউ যেন তাকে চিঠি লিখে অযথা বির[ক্ত] না করে।

অনীতা গ্রামে ফিরে সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আপ্রাণ চে[ষ্টা] করে। সফলও হয় কতকাংশে। কিন্তু তার নিদারুণ মনে বেদনা তাকে অব্যাহতি দিল না। তিলে তিলে যেন রক্ত শু[ষে] নিতে লাগল। শেষে সুরু হ'ল মাঝে মাঝে তার জ্বর; অত্য[ন্ত] অবসাদ আসে। অনীতা সযত্নে ঢেকে রাখে সকলের চোখে[র] আড়ালে তার অসুস্থতা। অবশেষে একদিন তাকে শয্যাশা[য়ী] হতে হ'ল। রোগ ধরা পড়ে; সেই নিদারুণ যক্ষ্মা। ডাক্ত[ার] উপদেশ দিলেন কোন স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যেতে।

প্রথমটায় অনীতা এতে করে খুবই আপত্তি। গ্রাম ছে[ড়ে] সে কোথাও যেতে চায় না। কিন্তু বাড়ীর লোকের অনুরো[ধে] অবশেষে সে সম্মত হয়। অনীতাকে পাঠান হ'ল আলমো[ড়া] স্যানাটোরিয়ামে। লীলা অরিন্দমকে লিখে জানাল অনীতা[র] অসুখের খবর। কিন্তু অরিন্দম তখন চলে গেছে ফিলাডেল[ফি]ফিয়ায়। যে বন্ধুটি তার ঠিকানা জানত সে-ও ছিল না। আ[র] হোটেলের মালিকও তার ঠিকানা জানত না; কাজেই চি[ঠি] ফিরে এল।

ফিলাডেলফিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল। সেখানকা[র] অধ্যাপক মহাশয় অরিন্দমকে বললেন যে, ভারতবর্ষে আলমো[ড়া] যক্ষ্মা হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামে একজন সুদক্ষ চিকিৎস[ক] প্রয়োজন বলে তাঁর কাছে একখানি চিঠি এসেছে; অরিন্দমকে তিনি সেখানে যেতে অনুরোধ করেন। অরিন্দম তাতে সম্ম[তি] জানাল।

অরিন্দম এ সংবাদ বাড়ীতে পাঠালে না, অত্যধি[ক] অভিনন্দনের ভয়ে ভীত হয়ে। তার ইচ্ছা ছিল হঠাৎ পেঁৗছে সকলকে অবাক করে দেবে।

আলমোড়া পেঁৗছেই অরিন্দম সকল কর্মচারীকে জানি[য়ে] দিলে যে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে যেন সকল রোগীরই সমান উপযুক্তভাবে চিকিৎসা হয়। কোন রোগীর প্রতিই বিন্দুম[াত্র] অবহেলা সে সহ্য করবে না। পরে জেনারেল ওয়ার্ডটা দে[খে] সে কোয়ার্টারে গেল। বলে গেল পরের দিন কেবিনগু[লি] দেখবে।

রাত্রে অনীতা নার্সের কাছে শুনলে, ফিলাডেলফিয়া থে[কে] কে একজন ডাঃ এ ব্যানার্জি এসেছেন বড় সাহেব হয়ে। তি[নি] বড় কড়া লোক।

খবরটা শুনেই অনীতার মন অদ্ভুত রকম চঞ্চল হ[য়ে] পড়ল, কিন্তু বাড়ী থেকে কোন খবর না পাওয়ায় ধারণা হ[য়] —না, নিশ্চয়ই এ অন্য লোক। তবুও যেন কি রকম এব[টা] সন্দেহ হয়।

পরের দিন অরিন্দম গিয়ে ঢুকল কেবিন ওয়ার্ডে। [প্র]
যখন সবগুলোই দেখা হয় হয়, তখন গিয়ে ঢোকে অনী[তার]

(শেষাংশ ২১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় আরবী লরেন্স

শ্রীসরোজকুমার ঘোষ

আরবী লরেন্সের নাম পৃথিবীতে আজ সুপরিচিত। গত মহাযুদ্ধের সময় আরবদের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষায় কতখানি কার্যকরী হ'য়েছিল, তা কারও অজানা নেই। আজ তাই আগামী মহাযুদ্ধে নির্ভীক, দুর্ধর্ষ, সরল আরব জাতিকে কি ভাবে প্রচারকার্য দ্বারা নিজ আয়ত্তে এনে তাদের সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োজিত করা যেতে পারে—তারই মহাব্রত গ্রহণ করেছেন, আর একজন ইংরেজ যাঁকে দ্বিতীয় লরেন্স বলা যেতে পারে।

তাঁর নাম হ্যারল্ড ইনগ্রামস্। লরেন্সের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, লরেন্স আরবদের গঠিত ক'রেছিলেন

হ্যারল্ড ইনগ্রামস্

ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য, আর ইনগ্রামস্ এনেছেন তাদের মধ্যে শান্তি—গৃহযুদ্ধ আর লুণ্ঠন যাদের মধ্যে ছিল নিত্যকার ঘটনা।

দ্বিতীয়ত—লরেন্স ছিলেন একা—হ্যারল্ড আছেন সস্ত্রীক। হ্যারল্ড পত্নীও স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন মেয়েদের মধ্যে প্রচারকার্য দ্বারা।

বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু বেশী। ছয় ফিট লম্বা—সুকেশ। নিষ্প্রভ, শান্ত চোখ দুটি সম্বন্ধে বলা হয়—They are the honest eyes ever seen. আরবদের মত নিখুঁতভাবে তাদের পোষাক প'রতে পারেন—আর আরবী ভাষায় যখন কথা বলেন, তখন তাঁকে আরব বলেই ভুল হয়। লরেন্সের মত তিনিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভাজন হয়েছেন। তাঁর প্রচারকার্য দ্বারা দক্ষিণ আরবে নবযুগের সূচনা হ'য়েছে। তাই গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁকে লরেন্স পদক দিয়ে সম্মানিত করা হ'য়েছে।

এডেনের পূর্বে আরবের দক্ষিণ উপকূলে ঊষর মরু প্রান্তরের নাম হাড্রামট। সভ্য জগতের লুব্ধ দৃষ্টির বাইরে ওই মরুভূমি যেন এক রহস্যময় দেশ। ক'জনই বা জানে ওই দেশে কাহারা বাস করে—কে তাদের শাসনকর্তা—কি-ই বা তাদের পেশা। অথচ তিন লক্ষ আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় অজানা কাল থেকে প্রকৃতির কঠোর নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

তাদের মধ্যে কারও পেশা দস্যুবৃত্তি—কারও চাষ-বাস। মরুপ্রান্তরের মাঝে মাঝে, পাহাড়ের নিম্নভূমিতে সামান্য সামান্য কৃষির উপযোগী জমি পাওয়া যায়। আর প্রকৃতির দান খেজুর—নিরন্ন দেশের একটা সম্পদও বলা চলে।

মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা। হ্যারল্ড ইনগ্রামস্ এডেনে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ওই অজানা দেশের রহস্য দিনের পর দিন ইনগ্রামস্‌কে আকর্ষণ ক'রতে থাকে। তাই ১৯৩৪ সালে ছুটী উপভোগের জন্য একদিন সস্ত্রীক যাত্রা করলেন রহস্যপুরীর উদ্দেশ্যে। ক্রমে রহস্য উদ্ঘাটিত হ'ল তাঁর চোখে। প্রকৃতির অভিশপ্ত অনুর্বর প্রান্তর, আর অবিরাম গৃহযুদ্ধ। ইনগ্রামস্ দেখলেন, এই অঞ্চলের তিন লক্ষ অধিবাসী ১২ শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অনাদি কাল থেকে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত রেখেছে। এমন কি, দীর্ঘ বিশ বৎসর ধ'রে অনেকে নিজেদের দ্বার-সীমার বাহিরে পা দিতে সাহস করেনি।

মাত্র একটি উপত্যকায় মাসে মৃত্যুসংখ্যা গড়ে দশটি। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তাদের প্রবল। অপেক্ষাকৃত উর্বর জমিগুলি চাষের অভাবে বন্ধ্যা হ'য়ে আছে। অদৃশ্য গুলীর ভয়ে কোদাল, কাস্তে নিয়ে তারা মাঠে যেতেই সাহস করে না। বহু লোক দেশত্যাগ করে শহরের দিকে বাসা বেঁধেছে।

ছুটী শেষ হ'লেও ইনগ্রামস্ স্ত্রীকে নিয়ে দশ দিন ধ'রে চললেন দেশের ভিতর দিকে। পূর্বে কোন ইউরোপীয়ের পদ-চিহ্ন এদিকে তখনও পড়েনি। যেখানেই তাঁরা যান—সেখানেই করুণ আবেদন—"শান্তি দাও—যুদ্ধপীড়িতদের শান্তি দাও।" তিনি তাদের জানালেন যে, সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার বাইরে। কারণ কোন সরকারী পদ বা ক্ষমতা তাঁর নেই। ইনগ্রামস্ এডেনে ফিরে এলেন এবং চিন্তা ক'রে দেখলেন যে, ক'রবার উপযুক্ত কাজ তাঁর হাতে রয়েছে। তিনি উপনিবেশ অফিসকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। দু'বৎসর পরে একদিন অনুমতি-পত্র এল— তিনি হাড্রামট্-এ যেতে পারেন।

ঠিক এই সময় কোয়াইটির সুলতান (একজন ক্ষমতাশালী স্বাধীন শাসনকর্ত্তা) তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন পরামর্শ-দাতা হিসাবে। ১৯৩৬ সালের শেষ ভাগে হ্যারল্ড হাড্রামটের প্রধান বন্দর এবং সুলতানের বাসস্থান মাকেল্লায় এসে উপস্থিত হ'লেন। স্ত্রী সঙ্গে আসতে ভোলেননি।

তাঁর প্রথম কাজ হ'ল—কিরূপে এই বার শত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটান সম্ভব, তারই যোগসূত্র অনুসন্ধান করা।

হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচরণ করে, তাদের মতের পরিবর্তন করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। তাঁরা কখনও উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কখনও পদব্রজে ভ্রমণ ক'রতে লাগলেন। সঙ্গে কোন প্রকার অস্ত্র নিলেন না এবং কোনরূপেও যেন তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করেন, সে বিষয়েও সাবধান হ'লেন।

তাঁরা মদ্যপান ছেড়ে দিলেন এবং যেখানেই সম্ভব, সেইখানেই আরবদের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি ঠিক ক'রলেন যে, তাদের মধ্যে সাময়িক একটা শান্তি-চুক্তিই সবচেয়ে কার্যকরী হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে খসড়াও তৈরী হ'ল। সময় নির্ধারিত হ'ল তিন বৎসর। এই সময়ের মধ্যে একে অপরকে আক্রমণ করতে পারবে না। ছোট বড় সর্দার হ'তে আরম্ভ করে, প্রত্যেক বাড়ীর কর্তাদের পর্যন্ত তিনি সই নিতে লাগলেন। হাজার হাজার সই-কাগজের সংখ্যা রীতিমত বেড়ে গেল। লুণ্ঠনকারী দস্যু হ'তে শান্তিবাদী গৃহস্থ অনেকেই সই দিতে লাগল।

ইনগ্রামস্ কিন্তু আরবদের মধ্যে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য ক'রলেন। সভা করে—বক্তৃতা দিয়ে ওদের বোঝাবার কোন মানেই হয় না। প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে বুঝিয়ে তবে স্বমতে আনতে হয়। এদিকে ইনগ্রামস্ যখন আরবদের মধ্যে শান্তির বাণী বহন করে ঘুরে বেড়ান, অপরদিকে মিসেস্ ইনগ্রামস্ হারেমে প্রবেশ করে, মেয়েদের মধ্যে শান্তি-বার্তা প্রচার করতে থাকেন। কারণ ওই অঞ্চলে পুরুষের দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের প্রভাব বড় কম নয়।

শীঘ্রই ইনগ্রামস্ অগণিত সই যোগাড় ক'রলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষও দেখা দিল। তারা বলে—"আজ সই দিয়ে না হয় হঠাৎ শান্তিবাদী হওয়া গেল, কিন্তু কালই যদি আবার আমাদের প্রতিবেশী আক্রমণ ক'রে বসে—তখন কি ব্রিটিশ সরকার আমাদের সাহায্য করবে?" কথাটা অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং ইনগ্রামস্‌ও সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না। তবে প্রয়োজন হ'লে রাজকীয় বিমানবাহিনীর সাহায্য তিনি দিতে পারবেন—একথাটা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস তারা ক'রতে চায় না। নিজেদের এই গৃহবিবাদে কি স্বার্থে তৃতীয় পক্ষ এসে একে অপরের কবল থেকে রক্ষা করবে? প্রমাণ পেতেও দেরী হ'ল না!

১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে একজন ব্রিটিশ কর্মচারী রাস্তা জরীপের কাজে হাড্রামটে এসে উপস্থিত হ'লেন। কাজে ব্যস্ত এমন সময় তাঁদের উপর গুলী চলল। দু'জন আহত হ'ল। অনুসন্ধানে জানা গেল, 'বেন ইয়েমানী' (Ben Yeamani) সম্প্রদায়ের কাজ। দলের প্রধানদের ডেকে পাঠান হ'ল। বিচার করলেন সুলতান এবং ইনগ্রামস্ স্বয়ং। বিচারে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হল। গরীব দেশ—টাকা-কড়ির বালাই বিশেষ নেই। জরিমানা হ'ল—দশটি উট, ত্রিশটি রাইফেল এবং একশত ছাগল।

বিচার হ'ল বটে, কিন্তু সেটা 'পেনাল কোডে'র বজ্রমুষ্টি-ঘেরা ইংরেজ আদালত-নয় যে, হয় জরিমানা দাও না হয় জেলে যাও। তারা সরাসরি জরিমানা দিতে অস্বীকার করল। এদিকে সমগ্র আরব জাতি উৎসুক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ইনগ্রামসের শক্তির প্রতি। জরিমানা চেয়ে চিঠি পাঠান হ'ল কোন জবাব নেই। এবার ভীতি প্রদর্শন। জরিমানা না দিলে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলা হবে। তবুও উত্তর নেই। গ্রামবাসীদের একটা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম ত্যাগ করে যাবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। তবে ভরসা দেওয়া হ'ল যে জলের কুয়াগুলো নষ্ট করা হবে না।

নির্দিষ্ট সময়ে রাজকীয় বিমানবাহিনী এসে কতকগুলো বোমা ফেলে চলে গেল। হঠাৎ ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা জরিমানা নিয়ে হাজির। 'মাকেল্লা'তে হাজার হাজার লোক তাদের আনুগত্য-স্বীকার দেখতে এল।

জরিমানা আদায় হ'লে ইনগ্রামস্ প্রকাশ্যে তাদের নেতাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। শুধু তাই নয়, দু'একদিনের মধ্যেই তিনি সস্ত্রীক তাদের সঙ্গে বাস করতে গেলেন।

ইয়েমানী সম্প্রদায় যথেষ্ট ভদ্রতা সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা করলে এবং তাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্য ইনগ্রামস যুগলকে ধন্যবাদ দিতে ভুলল না। তারা বললে—"আপনারা ঠিকই করেছেন। কারণ আজ্ঞা প্রতিপালন করে যদি আমরা জরিমানা দিয়ে আসতাম, তবে কাপুরুষ বলে আমাদের সম্প্রদায়ের মুখে যে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হ'ত—বহু পুরুষ ধরে আমাদের বংশধরেরা তা থেকে মুক্তি পেত না।" এবং এই পরাজয়ের পরই তারা শান্তি চুক্তিতে সই করে দিলে।

এ ঘটনা ঘটল ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে। বহু শতাব্দী সঞ্চিত যে বিদ্বেষের আগুন ওদের মধ্যে রাবণের চিতার মত জ্বলছিল, ইংরেজের বাহুবল আর কূটনীতির সাফল্যে তা সাময়িকভাবে নির্বাপিত হ'ল। ইনগ্রামস্‌কে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল-"Friend of Hadramaut" (হাড্রামটের বন্ধু)।

মানুষ দেবতা নয়—হ'তে পারে না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি তাকে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে দেয়, তবে মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না। ইনগ্রামস্-এর অবস্থা তাই হ'ল। বার শত উপজাতি যখন ব্রিটিশ-রচিত শান্তি-স্বর্গে স্থান পেলে, তখন দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হ'ল বৃষ্টিধারা রূপে। এমন বহুক্ষণব্যাপী ধারাপাত ও-দেশের আবহাওয়ায় হঠাৎ দেখা যায় না। কাজেই ওই সরল অথচ অজ্ঞ জাতি বুঝতে একটুও বিলম্ব হ'ল না যে ঈশ্বরের অবতাররূপে ইনগ্রামস্-এরই আশীর্বাদে এই শান্তি-জল।

শান্তি-চুক্তির ফলে ইউরোপ থেকে চালান দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ে ভাঁটা পড়ে গেল। রাইফেল-এর দর এক চতুর্থাংশ নেমে গেল—তবু বিক্রয় নেই। আনন্দের আর সীমা নেই তাদের। শান্তি এসেছে তাদের মধ্যে। কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়েছে—যে সমস্যা সৃষ্টির আদিকাল থেকে তাদের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? ইনগ্রামস্-এর দেওয়া শান্তি তিন বৎসরের জন্য। তিন বৎ

পরে? সেকথা না হয় এখন ভবিষ্যতের গর্ভেই বিলীন থাক। কিন্তু দস্যুবৃত্তি যাদের উপজীবিকা ছিল, তারা কি করবে? মরুচারী এই বেদুইনদের সমস্যাই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ইনগ্রামস্-এর চোখে। সমাধানও তিনি একরকম করে ফেলেছেন। চাষবাসে তাদের মন দেওয়াতে সুরু করেছেন। উষ্ট্রবাহিত লাঙ্গল তাদের দিয়েছেন এবং আধুনিক প্রণালীতে কৃষিকার্য শেখাবার জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করতেও ভোলেননি। এবং এর পরও যদি আবার ওদের মধ্যে কাটাকাটি সুরু হয়, তবে বলতে হবে ভাগ্য আরবের ওই উপজাতিদের প্রতি বিরূপ।

* * * *

চিল শূন্যে বহু ঊর্ধে বিচরণ করলেও তাদের দৃষ্টি থাকে স্থান বিশেষের উপর নিবন্ধ। ওটা তাদের স্বভাব। বহুদিন ইংরেজ প্রভুর শান্তিছায়ায় বাস করে আমাদেরও স্বভাব দাঁড়িয়েছে প্রভুদের ভাল মন্দ সকল কাজের মধ্যেই ছিদ্র অনুসন্ধান করা। তাই আমরা যদি চিলের এই দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে ঈশ্বরের নবঅবতার এই ইনগ্রামস্ প্রভু তথা ইংরেজের আরবের দক্ষিণ সীমায় কার্যকলাপের বিচার করি তবে এই বিরাট গঠনমূলক কাজের অন্তর্নিহিত অভি-সন্ধি কি চোখে পড়ে না? স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ায় যারা চিরদিন বিচরণ করে এসেছে—তারা ইংরেজের শান্তি-ছায়ার স্বরূপ হয়ত আজ দেখতে পাচ্ছে না—পাবে সেইদিন যেদিন আগামী মহাসমরে প্রয়োজন মত ইংরেজের এই কল্যাণ-পরশ রাজদণ্ডরূপে তাদের চালিত করবে নিজেদেরই জাত ভাই তুরস্ক, পারশ্য, ইরাণ, সৌদী আরব আর প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামী আরবদের বিরুদ্ধে। ভগবান ওদের এই কল্যাণকামী শান্তিদাতার মোহ থেকে মুক্তি দিন।

কাজের শেষ

(২১২ পৃষ্ঠার পর)

যেটাতে আছে সেইটাতে। অনীতার নার্স তখন তাকে খাওয়াচ্ছিল। কাজেই অরিন্দম যায় পাশের কেবিনে রোগী দেখতে।

অরিন্দমের আসা আর বেরিয়ে যাওয়া এইটুকু সময়ের মধ্যেই কিন্তু অনীতা তাকে ঠিক চিনতে পেরেছে। আপন মনে সে বলে ওঠে—হ্যাঁ, এই তো ঠিক সে। নার্সকে জিজ্ঞাসা করে নূতন ডাক্তারের নাম কি? সে উত্তর দেয় যথাযথভাবে পূর্বানুরূপ।

অনীতার মুখে আর খাবার রোচে না; সে নার্শকে বলে—ওঁকে ডাক। নার্শ তার কথামত বাইরে যায়।

অরিন্দম তখন পাশের ঘরের রোগীটিকে দেখে হাত ধুতে গেছল। কাজেই নার্শকে অপেক্ষা করতে হয়।

ইতিমধ্যে অনীতার কেবিন থেকে আওয়াজ যায় "ডাক্তার-বাবু", হাত ধুতে ধুতে অরিন্দম তা শোনে। স্বরটা যেন কি-রকম চেনা চেনা লাগে। সে তার সহকারীকে ডাক দিয়ে বলে যান, ঐ রোগীটিকে দেখুন তো।

তিনি ঘরে আসতে না আসতেই, অনীতা চেঁচিয়ে ওঠে—"অরিন্দমবাবু, কাজ কি শেষ হল?"

এ কথা কয়টি বেশ স্পষ্টভাবেই অরিন্দম শুনতে পায় বাইরে থেকে। স্বর শুনে কেমন যেন প্রাণটা তার দুলে ওঠে।

আবার সেই স্বর—"ওগো কাজ কি শেষ হয়েছে?"

অরিন্দম এবার দ্রুতপদে এগোতে থাকে। নার্শকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ রোগী চেঁচাচ্ছে। সসম্ভ্রমে নার্শ পাশের কেবিন দেখিয়ে দেয়। ও ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ে তারই মধ্যে। সহকারী বলে হঠাৎ হার্ট ফেল করেছে স্যর।

অরিন্দম চেঁচিয়ে ওঠে—হার্ট ফেল ইঞ্জেকশন ইঞ্জেকশন।

মানুষের সঙ্গে ভগবানের যুদ্ধ সুরু হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিত হল। অরিন্দম রোগীর মুখের দিকে তাকায়; এ কি, কে এ রোগশীর্ণা নারী; অবিকল অনীতারই মত দেখতে। না-না, তা কি করে হয়। অরিন্দমের মাথা ঘুলিয়ে আসে।

তাড়াতাড়ি মাথার কাছে ঝুলান বেড্ হেড্ টিকিটটা পড়তেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অরিন্দম। আশে পাশের লোকেরা তার এই ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই যেন সামলিয়ে নিয়ে সে হুকুম করে ঘর দোর পরিষ্কার করতে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে সব তত্ত্বাবধান করে। ধোয়া মোছা সব শেষ করে বেয়ারারা গন্ধক জ্বালিয়ে দিলে।

ধোঁয়ায় ঘর প্রায় হয়ে ওঠে অন্ধকার; অরিন্দম তবুও সেখান থেকে নড়ে না এক পা। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে নিমেষহীন চোখে বারান্দায় রাখা দেহটার দিকে।

ধোঁয়া আরও বাড়তে থাকে। ওর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়; কেবল আবছা আবছা দেখতে পাওয়া যায় তার মুখ। অরিন্দম সেই কুণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখে বেয়ারারা দেহটাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে শবাগারে। সেখান থেকেই আত্মীয় স্বজনেরা এস নিয়ে যাবে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ অরিন্দম চেঁচিয়ে ওঠে—শোন অনীতা, কাজ শেষ হল তোমার, কিন্তু—আমার........,

ঘূর্ণাবর্ত

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী অমিয়া সেন

(১৩)

দীপক অরুণার সংগে সত্যই দেখা করিল, বলিল, আসুন, দু'জনে একটা বই লিখি।

অরুণা বলিল, বেশ। কিন্তু দু'জনে নয়, তিনজনে।

আর একজন কে?

অরুণা একটু ইতস্তত করিয়া চারিদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি বুলাইয়া নিয়া কহিল, মিহিরবাবু।

দীপক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তিনি কে? সাহিত্যিক?

অরুণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, না, সাহিত্যিক বলতে যা বুঝায়, তিনি সত্যিই তা নন। তিনি সমালোচনা-রসিক।

—তিনি লিখবেন?

—হ্যাঁ, আমি বলেছি তাঁকে। যদিও এই তাঁর প্রথম লেখা, লেখাটা খারাপ হবারই সম্ভাবনা বেশী।

দীপকের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, এ আপনার খেয়াল!

—হ্যাঁ, আমার নয় ত কার, আপনার? কিন্তু আপনি শংকিত হবেন না, নিন্দে করলে লোকে তাঁকে করবে, আপনাকে নয়। অতিরিক্ত যদি করে, আমাকে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু কিনা।

উচ্ছল হাসির স্রোত অরুণার অবরুদ্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছিল।

দীপক চুপ করিয়া রহিল। সে ছাড়া অরুণার সাহিত্যিক বন্ধু কেহ থাকে, তা যেন দীপক চায় না।

গতিমান আলাপনের স্রোত এইখানেই সহসা গতি হারাইল।

দীপক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আজ তা হলে আসি।

—আসুন।

অরুণা হাসিতেই ছিল।

দিন কয়েক পরে দীপকের এক চিঠি আসিল। কোন জরুরী কাজে আটক পড়ায় সহযোগ সাহিত্য আপাতত লেখা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

এ চিঠি পাইয়াও অরুণা তেমনি হাসিল।

ওদিকে কমল তাহাকে দেশে ফিরিবার জন্য বার বার তাড়া লাগাইয়াছে। এতদিন সে দিদিকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছে না, দিদি যেন—যত তাড়াতাড়ি পারে চলিয়া আসে।

মহালক্ষ্মীও যাইবার জন্য লিখিয়াছেন।

শুধু মিহিরই লিখিয়াছে, মা যদি এখন অরুণাকে নিতে চান, তবে যাওয়াই ভাল, অনেক দিন ত হইয়া গেল। তবে অরুণার যদি আরও কয়েক দিন ওখানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তবে যেন আর কয়েক দিন দেরী করিয়াই যায়। বাড়ীতে এমন ত কিছু ঠেকা নাই। মোট কথা, প্রকারান্তরে মিহির অরুণাকে আর কয়েক দিন কৃষ্ণনগর থাকিতেই লিখিয়াছে।

বরুণার কষ্ট হইতেছিল, প্রায় তিন মাস হইল অরুণা এখানে আসিয়াছে। এখন চলিয়া যাইবে ভাবিতেও বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠে। তাই আজ—কাল করিয়া তিনি বোনকে পাঠাইতে দেরী করিতেছিলেন।

হেমনাথ বলিলেন, আর কত দেরী করাবে? এবার মায়া ছাড়।

বরুণা নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

হেমনাথ কহিলেন, এই সামনের ছুটিতে যদি নিয়ে না যাই, তা হলে আর শীগগিরও ছুটি পাব না যে।

—তবে তাই যাও। বলিয়া বরুণা যাইয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

অরুণা আসিয়া কহিল, সামনের ছুটিতে আমাকে নিয়ে চন্দননগর বেড়াতে যেতে হবে দাদাবাবু।

হেমনাথ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, তা বেশ, বাড়ী যাবে কবে?

—ও, পরে, তাচ্ছিল্যের সহিত অরুণা কহিল, ও, পরে হবে।

হেমনাথ হাসিয়া কহিলেন, ওদিকে ভয় নেই ত?

অরুণা ঠোঁট উল্টাইয়া এমন একটি তাচ্ছিল্যসূচক ভংগী করিল যে, হেমনাথ একেবারে সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দননগর বেড়াইয়া আসিয়া অরুণা মিহিরের একখানা চিঠি পাইল, অরুণা যেন যথাসম্ভব শীঘ্র দেশে যায়। মা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এবার অরুণা সত্যই একটু সমস্যায় পড়িল। হেমনাথ আর শীঘ্রও ছুটি পাইবেন না। তবে কে অরুণাকে লইয়া যাইবে? আর যত গোল ত মিহিরই বাধাইল। পূর্বের চিঠিতে সে থাকিতেই বা লিখিল কেন?

বরুণার কাছে গিয়া কহিল, দিদি এখন কি করি?

বরুণাও চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত ভাবছি। তখন বললাম, গ্রাহ্য করলিনে। এখন বেশী দেরী হলে হয় আবার মিহির অসন্তুষ্ট হবে।

অরুণা মৃদু হাসিয়া কহিল, না, সে ভয় নেই।

বরুণা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, নেই?

—উঁহু, ভয় করি, শাশুড়ী না অসন্তুষ্ট হন।

বরুণা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে কহিলেন, না, তা বোধ হয় হবেন না। তিনি ত লোক ভাল। এখানে লোক না থাকলে কে নিয়ে যাবে, তা কি তিনি বুঝবেন না!

কি করি—কি করি, ভাবিতে ভাবিতে আরও ৮।১০ দিন কাটিয়া গেল।

এর পরে মিহিরের মায়ের আর ধৈর্য রহিল না, তিনি স্পষ্টই একটু রাগের ভাব দেখাইয়া অরুণাকে পত্র পাঠ চলিয়া যাইতে লিখিলেন।

এবার অরুণা ভয়ে ভয়ে জানাইল, এখানে লোকের বড় অভাব।

চিঠি লিখিয়া তার জবাবের প্রত্যাশায় অরুণার দিনগুলো যখন একটা অস্থির উদ্বেগের মধ্য দিয়া কাটিতেছিল, তখন আবার একদিন জ্যোতি আসিল।

আসিয়াই সকাতরে অরুণার কাছে জানাইল যে, মঞ্জরী
ড়িতা, খুব বেশী পীড়িতা, অরুণাকে সে দেখিতে চায়।

মঞ্জরী পীড়িতা, শুনিয়াই অরুণার মনটা সমবেদনায়
বারে আর্দ্র হইয়া আসিল। মঞ্জরীর কাছে যাইবার জন্য
সমস্ত অন্তর মুহূর্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু
র কথা মনে হইতেই তার জ্বলন্ত উৎকণ্ঠা স্তিমিত
। আসিল। নিষ্প্রভ মুখে কহিল, কিন্তু আমার যাওয়া
াজ সম্ভব হচ্ছে না, জ্যোতিবাবু।

—যাবেন না আপনি?

হতাশায় জ্যোতির মুখ কালো হইয়া আসিল। দেখিয়া
ণার মনও আবার দুর্বল হইয়া আসিল। কহিল, আচ্ছা,
ন আপনি। আমি আসছি।

বলিয়া উপরে নিজের ঘরে আসিয়া জানালার ধারে
ক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিয়া লইল।

একবার ভাবিল, থাক, দরকার নাই গিয়া। কাজ কি পরের
আপনজনের বিরাগ কুড়াইয়া? কিন্তু মন সে যুক্তি
তে চাহিল না, অন্তরের সহজাত কোমল প্রবৃত্তি তাহাকে
ার জন্যই উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

বিবেক কহিল, স্বার্থপরের মত তুচ্ছ আত্মসুখ লইয়া
য়া ত সবাই থাকে। অসহায় নির্বান্ধব একটী মেয়ে
বড় আশায় তার পথ চাহিয়া আছে। একবারটি তাকে
তে পাইলেই তার স্বর্গ সুখ। কিন্তু পঙ্কিল-মন সংসার
াথা সে পথে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা শুধু নিজের
র্থেরই জন্য। এতটুকু ঔদার্য,—এতটুকু করুণা নাই তার
। তবে কি দরকার এই অকরুণ নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিবার?
রের নিকট ত সে নির্দোষী থাকিবে। অরুণা উঠিল।
উঠিয়া কাপড় পরিয়া সরাসরি দ্রুতপদে নীচে নামিতে
ল।

সিঁড়ির অর্ধেক পথ নামিয়া খেয়াল হইল, বরুণার কাছে
য়া আসা হইল না।

একবার ভাবিল, বলিয়া দরকার নাই, দিদি বাধা দিবে।
কিন্তু পর মুহূর্তে ভাবিল, না, তাহা হইলে দিদি
নিতক চটিবে।

দুরু দুরু বক্ষে অরুণা আবার উপরে উঠিল।

বরুণা হেমনাথের মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলী চালনা
তে করিতে গল্প করিতেছিলেন।

অরুণা দ্বার চাপিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, দিদি!

বরুণা একটু এধারে সরিয়া বসিয়া কহিলেন, কে অরু?
রে আয়। একি, তুই কোথায় চলেছিস?

মাটির দিকে চাহিয়া কোনমতে অরুণা বলিল, একটু
মঞ্জুদির কাছে যাচ্ছি।

বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইল না, ঝড়ের বেগে
নীচে নামিতে লাগিল।

নামিতে নামিতে মনে হইল, দিদির কাছে বলিয়া আসা
হইল না, মঞ্জুদির অসুখ। যাকগে, আসিয়া বলিলেই
হইবে।

(১৪)

বাসায় ফিরিতে অরুণাদের সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল।

অরুণার পিছনে পিছনে ড্রয়িংরুমে ঢুকিয়া জ্যোতি
কহিল, আজ তা হলে আসি অরুণাদি।

অরুণা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আচ্ছা,
আসুন। কাল পরশুর মধ্যে আমাকে একবার ওদিকের খবরটা
যেন দিয়ে যান।

—আচ্ছা, সে বিষয়ে আপনি ভাববেন না। আপনার কাছে
আসা ছাড়া আমারও যে আর উপায় নেই।

বলিয়া নমস্কার করিয়া জ্যোতি বাহির হইয়া গেল।

অরুণা গম্ভীর মুখে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

সহসা ড্রয়িংরুমের ডান দিকে দৃষ্টি পড়ায় অরুণা
অভিভূতের মত সেইদিকে তাকাইয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া
পড়িল।

সেখানকার চেয়ারে যে যুবকটি বসা ছিল, সে এতক্ষণে
সাড়া দিয়া উঠিয়া আসিল।

বাঁকা হাসিয়া কহিল, এই যে বৌদি, কি খবর? কেমন
আছেন?

অস্ফুট স্বরে অরুণা কহিল, ভাল, আপনি ভাল
আছেন ত?

—হ্যাঁ, আছি একরকম, ভালই বলা চলে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়, পিসীমা পাঠালেন।

—ওঃ, বুঝতে পেরেছি, আচ্ছা বসুন।

বলিয়াই অরুণা চলিয়া যাইতেছিল, লোকটি আবার
পিছন হইতে ডাকিল, বৌদি, শুনুন।

অরুণা ফিরিল, ফিরিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তার মুখপানে
চাহিল।

মৈনাক কহিল, ঐ যে ছেলেটি গেল, ও কে?

অরুণা অন্যমনস্কের মত সহসা বলিয়া ফেলিল, ও
জ্যোতি চৌধুরী।

—হেমনাথবাবুর কেউ হন?

—না, কায়স্থ।

—কায়স্থ? তবে আপনি—

মৈনাকের বিস্ময়-ক্ষুব্ধ দৃষ্টিটা সহসা অরুণাকে চাবুকের
মত শপাং করিয়া আঘাত করিল যেন। চট্ করিয়া মনে
পড়িয়া গেল বরুণার কথা,—এখানে, কলকাতায় অলিতে
গলিতে তোমার আমার আত্মীয়-স্বজন গিস্ গিস্ করছে।
তারা যদি কোন দিন জ্যোতির সঙ্গে তোমাকে ঘুরতে দেখে
কৈফিয়ৎ তলব করে, কি বলব তখন আমি? নিমেষে অরুণার
মুখ রক্তহীন হইয়া গেল।

অসংলগ্নভাবে 'আমি আসছি' বলিয়াই তাড়াতাড়ি গিয়া
উপরে উঠিতে লাগিল। যাইতে যাইতে চোখে পড়িল বরুণার
ঘরে হেমনাথের চেয়ারের হাতল ধরিয়া বরুণা দাঁড়াইয়া
আছেন।

হেমনাথের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

বরুণা যেন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। চাপা
অথচ ক্রুদ্ধস্বরে তিনি যেন কি সব কথা অনর্গল বলিয়া
যাইতেছেন, কিন্তু হেমনাথ একটাও কথা বলিতেছেন না।

অরুণা নিশ্বাস চাপিয়া মৃদু পায়ে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল।

সব না বুঝিলেও এইটুকু সে স্পষ্টই বুঝিতেছিল, তার আজিকার এই যাওয়া লইয়াই একটা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে।

অন্ধকার ঘরে জানালার কাছে বসিয়া পড়িয়া অরুণা ললাটের ঘাম মুছিতে লাগিল। মৈনাকের মুখের বিস্ময়-স্তব্ধ ভাবটা এই অন্ধকারেও যেন অরুণার চোখের সামনে ছুরির ফলার মত চক্ চক্ করিতেছিল।

ও-ঘর হইতে হেমনাথ ও বরুণার উত্তেজিত কথাবার্তাও মধ্যে মধ্যে কানে ভাসিয়া আসিতেছিল।

অথচ সে অন্যায় কিছুই করে নাই। অরুণা অস্থির চিত্তকে সংযত করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তার অপরাধ, সে একটি দুর্ভাগিনী মেয়ের জীবনব্যাপী দুঃখ-দৈন্যে সহানুভূতিসম্পন্ন। তার বেদনা তার মনকেও স্পর্শ করিয়াছে।

মঞ্জরী—দুর্ভাগিনী মঞ্জরী, কেহ ওকে একটু ভালবাসুক, তার দুঃখে একটু আহা বলুক, এও বুঝি ভগবান চান না।

অরুণার অশ্রুহীন দুই চোখ যন্ত্রণায় যেন জ্বালা করিতে লাগিল। যে রোগে ধরিয়াছে, হতভাগিনী হয়ত বাঁচিবে না।

তাহাকে দেখিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর সে কি আনন্দ!

অরুণার চোখ সজল হইয়া আসিল। মঞ্জরীকে কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না, তাই তার উপর সকলে এত নিষ্ঠুর হইতে পারিল!

আর জ্যোতি! আহা, তারই কি কম কষ্ট! মঞ্জরীর অবস্থা দেখিয়া ভয়েতে সারা হইয়া গিয়াছে। সংসারানভিজ্ঞ তরুণ, বেচারীর মুখ দেখিলে দুঃখ হয়।

কয়দিন ধরিয়া নাওয়া নাই—খাওয়া নাই—অনবরত ডাক্তারের কাছে আর টাকার চেষ্টায় ছুটাছুটি করিতেছে।

ত্রিভুবনে কেহ নাই তার, বুকের ভাষাহীন ব্যথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। এক অরুণাকে সে জড়াইয়া ধরিয়াছে অকূল সমুদ্রে তৃণ খণ্ডের মত। একটু কিছু হইলেই ছুটিয়া আসে তার কাছে। অসহায় শিশুর মত বলে, অরুণাদি, উপায়? মাথার উপর তার সঙীন বিপদ।

মঞ্জরীর বড় বোন এতদিন সুদূর পশ্চিমে ছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পরে বাঙলায় ফিরিয়াই মঞ্জরীর অবস্থার কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের কাছে নিবার জন্য জেদ ধরিয়াছেন।

তবুও—

তিনি যদি শুধু কাছে রাখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, জ্যোতির আপত্তির বা ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি শুধু নিতেই চান না, চান, বোনের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ আনিতে।

তিনি মঞ্জরীর আবার বিবাহ দিবেন। মঞ্জরী রোগ শয্যায়, এত বড় দুঃসংবাদ জ্যোতি তাহাকে দিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু দুর্ভাবনায়, ভয়ে, নিজে সে সারা হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর বিশাল জনারণ্যে জ্যোতি বড় একা—বড় অসহায়। মঞ্জরীকে যদি রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে হয়ত বেচারী পাগল হইয়াই যাইবে। আর মঞ্জরী! মঞ্জরী যদি জানিতে পায়, তার দিদি তাহাকে আবার বিবাহ তোড়জোড় করিয়াই কলিকাতা আসিয়াছেন, তাহা হইলে সে আর বাঁচিবে? ওর স্বামী ত ওর কাছে মৃত নয়, কাছে ওর স্বামী অমৃত।

প্রিয়তম স্বামীর প্রিয় প্রেম-স্পর্শে এখনও ওর জীবনধারা সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

সেই স্বামীকে ও কি করিয়া ভুলিয়া যাইবে? কে তারা বলে ভুলিতে? এ শুধু অবিচার নয়, এ দ… অত্যাচার।

অরুণার সজল চোখ দুইটি সহসা নিরুপায় জ্বলিয়া উঠিল। এই দুর্গত তরুণ-তরুণী দুজনে ভালবাসে, এদের দুঃখে তার অন্তর কাঁদে, এই তার অ… কিন্তু মানুষ যদি নিষ্ঠুর হয়, ভগবানও কি ভুল করিবে…

কে জানে আজ এই উপলক্ষে তার অদৃষ্টে ক… লাঞ্ছনা জমা হইয়া রহিয়াছে।

মৈনাক তার দূর সম্পর্কের দেবর, মহালক্ষ্মীর সম… ভ্রাতুষ্পুত্র। বোধ হয় লোকাভাবে অগত্যা মহালক্ষ্মী … পাঠাইয়াছেন, অরুণাকে লইয়া যাইবার জন্য।

মৈনাক কি ভাবে জ্যোতির সঙ্গে তার আগমনটাকে … করিয়াছে, তা ত তখনই যেন তার চোখে-মুখে মূর্ত… উঠিয়াছিল।

অরুণার চোখের জল শুকাইয়া উঠিল, ভবিষ্য… দুর্গতির আশঙ্কায় বিবর্ণ মুখে সে অন্ধকারের প্রসারিত নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

খট্ করিয়া দ্বারটা খুলিয়া গেল, নিমেষে … তীব্র আলোর ঝলকে হাসিয়া উঠিল।

অরুণা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

বরুণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, পিছনে হেম…

বরুণা ডাকিলেন অরুণা, অরুণা!

স্বরে রাগ আর বিরক্তি যেন উপছিয়া পড়িতে… *অরুণা ভীত দৃষ্টিতে চাহিল।*

বরুণা কহিলেন, তোকে না জ্যোতির সঙ্গে যেতে বা… করেছিলাম!

—মঞ্জুদির অসুখ দিদি।

অসহায় ম্লানমুখে অরুণা কহিল।

—অসুখ ত তাতে তোর কি, রাগে বরুণা একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন।—ওরে, তুই কি এতটা বয়স বাতাসে বেড়ে উঠেছিলি? নিজের লজ্জা-সম্ভ্রম-জ্ঞানও কি ভগবান তোকে দেন নি?

এতক্ষণে অরুণা নিজের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দীপ্তমুখে কহিল আমার সব জ্ঞানই হয়েছে, সেজন্য আর কারুর মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। বলিয়াই ছিট্কাইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তাহার গমনশীল দেহলতার দিকে চাহিয়া বরুণা কহিলেন, বড় ভুল করেছিলাম তোকে এনে, তোর শ্বশুর বংশের কাছে তুই-ই শুধু সম্মান হারালি নি, আমারও মাথা একেবারে নীচু করে দিলি। আর এমন ভুল জীবনে কোনদিন করব না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

প্রচলিত জাতিবিভাগ

শ্রীপ্রভাস ঘোষ

আদিম জাতির যাযাবর জীবনে উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্বাত এবং প্রচলিত জাতি বিভাগের সহিত উহার সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে—"জাতিগত পারিপার্শ্বিক" প্রবন্ধটিতে। ত্বকবর্ণ, চক্ষু ও কেশের হেরফেরেও কি প্রকারে সংগত ও সন্তোষজনক জাতি বিভাগ করা সম্ভব তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত জাতি বিভাগে এই প্রকার কোনও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই। বিগত প্রবন্ধে আরও দেখান হইয়াছে যে বর্তমান জাতি বিভাগ (শ্বেত ও অশ্বেত) একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়—অনেক স্থলে জাতি নির্দ্দেশক নামটি পর্যন্ত অযোগ্য বা সংগতিহীন।

জাতি বিভাগে দেহ-দৈর্ঘ্য বা খর্ব্বতা কোন প্রকারেই মাপকাঠি হইবার যোগ্য নয়। কারণ দেহ-দৈর্ঘ্যের বৈষম্য একই জাতিতে কিম্বা পরস্পর নিবিড় সংশ্লিষ্ট জাতির ভিতরও অতিশয় সুস্পষ্ট। দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে সমগ্র দুনিয়ার নরনারীর গড় লইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে শতকরা প্রায় ৯৯টির দৈর্ঘ্যের গড় হইবে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি হইতে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত। ইহাতেও কতকগুলি অদ্ভুত ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে। মধ্য আফ্রিকার শাখা-নিগ্রো জাতি 'আক্কা' (Akka) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ উহাদের ভিতর ৪ ফুট ৬ ইঞ্চির অধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যেমন ভারতের নেপাল রাজ্যে ৫ ফুট দৈর্ঘ্যের লোকই পাওয়া যাইবে শতকরা ৭৫টি। জাপান এবং কতকটা চীনেও খর্ব্বকায় লোকের সংখ্যাই বেশী। উহার সহিত তুলনায় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লোক, শিখগণ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নরনারী দৈর্ঘ্যে দানব আখ্যা পাইবার যোগ্য। ঠিক ইহাদের সহিত কতকটা সমপর্যায়ে যায় গালোওয়ে স্কটিশগণ যাহাদের গড়ে দৈর্ঘ্য হইবে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি। নিগ্রোজাতি সাধারণত খর্ব্বকায় দেখা যায়, কিন্তু সুদান অঞ্চলের নিগ্রো প্রায় গালোওয়ে স্কটিশদের অনুরূপ হইবে দীর্ঘদেহে। সাধারণত মুর জাতি, কোন কোন অঞ্চলের আরব দৈর্ঘ্যে কাবুলীদের মত। ফিলিপাইন দ্বীপের এক আদিম জাতীয়েরা সম্প্রদায় হিসাবেই বামন, কারণ তাহাদের ভিতর সাড়ে চারি ফুটের বেশী দৈর্ঘ্যের লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

কাজেই দেখা যাইতেছে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে আশু পরিবর্ত্তনশীল নিদর্শন যদি কিছু থাকে, তাহা হইল মানবের দৈর্ঘ্য। অনেক সময়ই দেখা যায় মূল জাতির স্বদেশে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের দৈর্ঘ্য হয় কম; আর সেই জাতির লোক যখন কোনও নূতন জনবিরল দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন সেই উপনিবেশে জন্ম-প্রাপ্ত সেই জাতিরই সন্তান-সন্ততি হয় অপেক্ষাকৃত বেশী লম্বা।

কাজেই যদি যুক্তিসংগতরূপে জাতি বিভাগ করিতে হয় দেহ গঠন হইতে, তবে মাপকাঠি হওয়া উচিত মানুষের মস্তক (skull)। বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অবশ্য মস্তক গঠনের তারতম্য অন্যের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কাজেই নির্ব্বাচনে কৃত্রিমতা অথবা বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে নির্ভর করিয়া প্রমাদ ঘটাইবার কথা নয়। আমরা জানি ফ্যাশানের পরিবর্ত্তনে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নরনারীর ত্বকবর্ণ, চক্ষুবর্ণ এবং মুখমণ্ডলের ডৌল বদলাইয়া গিয়াছে কিছু কিছু।

এমন একদিন ছিল যখন ইউরোপে বলিষ্ঠ চেহারারই তারিফ ছিল, লোকে ইচ্ছা করিয়া মোটাসোটা হইবার জন্য চেষ্টা করিত। বর্ত্তমানে সে স্থলে ইংলণ্ডে দেখা যায় হৃষ্ট-পুষ্ট হইবার ঝোঁক আর নাই—সকলেই অতিরিক্ত চর্ব্বি বা মেদ হ্রাস করিতে অর্থাৎ দেহ reduce করিতে তৎপর। এখনও দক্ষিণ ইউরোপে হৃষ্টপুষ্ট চেহারারই অধিক সমাদর। আবার নিগ্রোজাতির ভিতর অতিরিক্ত মোটা নারী এক অদ্ভুত আকর্ষণের বস্তু।

এক যুগ ছিল দাড়ীর আভিজাত্যের কাল—আজ কোন কোন ইসলামীয় সম্প্রদায়ে ভিন্ন দাড়ীর আদর যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। যে দাড়ী ছিল পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতার নিদর্শন, তাহা এখন বিরূপ সমালোচনার সামগ্রী। Blonds, brunetsয়ের আদর এক এক দেশে এক এক প্রকার। এই সকল ফ্যাশান তখনই শীঘ্র লুপ্ত হয়, যখন উহা হইয়া দাঁড়ায় বিবাহের পক্ষে অন্তরায়। ভারতের অন্যান্য দেশে হিন্দুদের ভিতর 'শিখা' জনপ্রিয় হইলেও বঙ্গদেশে উহা প্রায় বিলুপ্ত—ইহার ভিতর যে কিছুটা 'বিবাহে বাধা' রূপে অন্তরায়ের প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। এই প্রকারে বিবাহের অধিকতর সুযোগের জন্য অপ্রিয় ফ্যাশান সকল দেশেই লোপ পায়।

মস্তক গঠনের যে আদর্শ লইয়া জাতি বিভাগের প্রস্তাব করা হইতেছে, তাহাতে এই প্রকার ফ্যাশানের প্রভাব আপতিত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ মস্তকের যে অংশ লইয়া বিচার করিবার কথা বলা হইতেছে—তাহা হইল কেশ-পাশ বাদ দিয়া কপালের ঊর্দ্ধ হইতে মস্তকের শীর্ষভাগ মাত্র। অর্থাৎ শূন্যে উড্ডীন উড়োজাহাজ হইতে নিম্নস্থ মানবের মস্তকের যে অংশ দৃষ্টিতে পড়ে।

মস্তকের এই শীর্ষ অংশের দৈর্ঘ্যের সহিত প্রস্থের যে অনুপাত, তাহাই হইল পরিমাপে ধর্ত্তব্য ব্যাপার। ইহাতে নৃতত্ত্বের দুইটি প্রধান গুচ্ছের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। যদি মস্তকের ঐ অংশের পরিমাপে প্রস্থ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম হয় শতকরা ৮০ পারসেন্ট অনুপাতের নিম্নে তাহা হইলে ঐ মস্তকের নাম দেওয়া হয়—Dolichocephalic; আবার যদি প্রস্থ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ৮০ পারসেন্ট অনুপাতের কম না হইয়া বেশী হয়, তাহা হইলে ঐ মস্তকের নাম দেওয়া হয় Brachycephalic; ইহার সাংকেতিক প্রকাশে যত বেশী উচ্চ সংখ্যা পাওয়া যাইবে, বুঝিতে হইবে মস্তকটি তত বেশী প্রশস্ততর আর যত নিম্ন

সংখ্যা পাওয়া যাইবে, বুঝিতে হইবে. মস্তকটি তত বেশী অপ্রশস্ত অর্থাৎ লম্বিত আকারের (সম্মুখ হইতে পশ্চাতের দিকে):

নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রশস্ত মস্তকের উদ্ভব হইয়াছে পরবর্ত্তী কালে, লম্বিত মস্তক (পূর্ব্বে যাহা বলা হইল) তাহাই ছিল আদিকালের নিদর্শন। এ পর্যন্ত যত আদিম যুগের মস্তক-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে (যেমন যবদ্বীপ, রোডেশিয়া, পিল্টডাউন প্রভৃতি দেশে) তাহার সকলগুলিই পূর্ব্বোক্ত লম্বিত আকারের। আরও বিশেষত্ব এই যে, এই সকল লম্বিত মস্তকের মগজধারণ-স্থান সংকীর্ণতর।

এই মগজধারণের স্থানের ক্রম উন্নতি লক্ষ্য করা যায় আজিকার জীবন্ত জাতি সকলেও, যেহেতু একেবারে সংকীর্ণতম দেখিতে পাওয়া যায় নিগ্রোজাতির মস্তকে, মাঝামাঝি পাওয়া যাইবে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের জাতিগুলির মস্তকে আর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মগজ-স্থান পাওয়া যাইবে ইউরোপীয় ভারতীয় ও চীনাদের মস্তকে। এমন কি প্রোঃ ক্র্যাকাম বলেন— ইউরোপীয়দের অপেক্ষা কোন কোন চীনা বা প্রাচ্যের কোন কোন লোকের মগজধারণ স্থান আরও বেশী বৃহৎ।

পিরিনিজ পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তে অদ্ভুত এক জাতি বাস করে—উহাদের বাস্ক্ (Basque) বলা হয়। উহারা উহাদের বিভিন্ন শাখার সহিত এক আশ্চর্য সাধারণ ভাষার বন্ধনে সম্বন্ধ। এই বাস্ক্ ভাষা ইউরোপের অন্য যে কোনও ভাষার সহিত সংস্রববিহীন একেবারে। এই ভাষা সম্বন্ধে ইহাও বলা হয় যে, ইউরোপে আর্য্য ভাষা ভাষীদের আগমনের পূর্ব্বে যে আদিম ভাষা সকল প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত বাস্ক্ ভাষার কিছুটা সাদৃশ্য রহিয়াছে অর্থাৎ সেই সকল আদিম ভাষার মিশ্রণে ও বিবর্ত্তনে বাস্ক্ ভাষা গঠিত হইয়াছিল। প্রোঃ রিপলির মতে বলিতে গেলে, বাস্ক্ ভাষার বিশেষত্ব এই যে, এমন জটিল মিশ্রণ অন্য কোনও ভাষায় আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। আবার ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়াও এই ভাষা নিতান্তই স্বতন্ত্র এই কারণে যে, একটি ক্ষুদ্র শব্দের সঙ্গে পর পর অভিনব শব্দাংশ যোগ করিয়া এমন একটি বিরাট আকারের শব্দ গঠিত হয়, যাহা সম্পূর্ণ একটি বাক্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করে। সংস্কৃত ভাষায় সমাসবদ্ধ পদেরও একটা সীমা আছে, কিন্তু বাস্ক্ ভাষার শব্দের দৈর্ঘ্যের কোনও সীমা নাই। এই ভাষার একটি এই প্রকার শব্দের নমুনা নিম্নলিখিতরূপঃ—

Azpicuelagaraycosaroyarenberecolarrea.

এই শব্দ বা বাক্যটির মর্ম্ম হইল—যাজাপিকুয়েল্টা উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নস্থ প্রান্তর।

এই প্রকারে একটি মাত্র শব্দে অগণিত স্বতন্ত্র শব্দ যোগ করিয়া সমগ্র বাক্যের তাৎপর্য্য সন্নিবেশ করা।

আর দেখা যাইবে দুই অঞ্চলের আদিম জাতির ভাষায়। আমেরিকার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের আমেরাইণ্ডগণের ভাষায় এবং ককেসাস অঞ্চলের আবকাশিয়ানগণের ভাষায়।

কিন্তু মস্তক গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে আশ্চর্য্য এই যে, বাস্ক্ অঞ্চলের উত্তরে ফরাসী মুলুকের আলপাইন জাতির ভিতর যাহাদের মস্তক পূর্ব্বোক্ত হিসাবে প্রশস্ততর, তাহারা যেমন বাস্ক্ ভাষা ব্যবহার করে, তেমনি স্পেনের বিলবাও অঞ্চলে লম্বিত মস্তক বিশিষ্ট যে আদিম জাতি রহিয়াছে তাহারাও ব্যবহার করে। সম্ভবত ইহাদের কেহই বাস্ক্ ভাষার স্রষ্টা নয়, ইহারা অন্য জাতীয়ের নিকট হইতে এই ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। হুবহু এই প্রকারে বলা যায়—আদিম যে জাতি স্কটল্যাণ্ডে গেলিক ভাষা ব্যবহার করিত, বর্ত্তমান হাইল্যাণ্ডারগণ সেই জাতীয় নয়।

ব্রিটেনে এমনও লক্ষ্য করা যায় - তিনটি পৃথক ভাষা কথিত হয়, তিন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোক কর্ত্তৃক। সুদূর পশ্চিমে আয়র্ল্যাণ্ডের এক ফালিতে এবং স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে আর্স (Erse) এবং গেলিক ভাষায় কথা বলা হয়। প্রাচীন আর্স ভাষাকে গেলিক ভাষার জন্মদাতা মূল উৎস বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়—মধ্য কেন্দ্রে কর্নিশ-ওয়েলশ্-ম্যানক্স্ গ্রুপ বলা যায় যাহার ভিতর কর্নিশ্ অধুনা লুপ্ত। তৃতীয়—পূর্ব্ব অঞ্চলে অ্যাংলো-স্যাক্সন্ গ্রুপ—যাহা দক্ষিণে আধুনিক 'ইংলিশ' নামে প্রচলিত এবং উত্তরে 'রড স্কটিশ' নামে পরিচিত।

এই তিন কেন্দ্রের অবস্থান হইতেই বুঝা যায় পূর্ব্বদিক হইতে অভিযানের ফলে আদিম ভাষা ক্রমশ পশ্চিমে অপসারিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে আয়র্ল্যাণ্ডের এক ফালিতে যাইয়া ঠেকিয়াছে। এখানেও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মস্তক গঠনের বিশেষত্বে যাহারা আদিম যুগীয় নর-নারী সদৃশ তাহারাই যে আদিম ভাষা বলে এমন কিন্তু নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাতি বিভাগ করা হইলে, এক ব্রিটিশ জাতির ভিতর তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জাতি পাওয়া যাইবে এবং মস্তক-গঠনের দিক হইতে বিচার করিলেও অন্তত তিন প্রধান শ্রেণীর নর-নারী পাওয়া যাইবে। কাজেই নৃতত্ত্ববিদগণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবে ব্রিটিশ একটি জাতি হইতে পারে না—কয়েকটি জাতির সমষ্টি মাত্র।

এইভাবে আমরা যদি প্রত্যেকটি দেশের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিতে পাইব কোন আধুনিক "জাতি"ই বাস্তবে একটি জাতি নহে—একাধিক জাতির মিলন-মিশ্রণ বা স্বার্থ-বন্ধনের সূত্রে একত্রগ্রথিত গ্রুপ মাত্র।

বারান্তরে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় জাতির সূক্ষ্ম বিচারে উহাদের গঠন-বৈশিষ্ট্য বা মিশ্র জাতীয়ত্ব দেখাইবার প্রয়াস করা যাইবে।

খুড়োর বিরোধী ভাইপো

হের হিটলারের ভ্রাতার পুত্র প্যাট্রিক্ একটি আইরিশ মহিলাকে বিবাহ করে। যখন সে বার্লিনে উপস্থিত হের হিটলারকে নির্দ্দিষ্ট "হেইল" দ্বারা অভিনন্দন করিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর হইতে খুড়া হিটলার তাহাকে নির্দ্ধারিত আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, সে যতদিন জার্ম্মানীতে থাকিবে, ততদিন সে কিছুতেই হের হিটলারের সহিত তাহার যে সম্পর্ক রহিয়াছে সেকথা প্রকাশ করিতে পারিবে না। যদি কেহ তাহাকে সেই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তবে তাহা তাহার অস্বীকার করিতে হইবে। ইহা ছাড়া হের হিটলার চাহেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এমন আচরণ করিবে যাহাতে ফুরহার পরিবারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

তৎসত্ত্বেও প্যাট্রিক্ নানাভাবে হিটলার শাসনের এরূপ বিরূপ সমালোচনা করিতে থাকে যে, রাষ্ট্রের কল্যাণে প্যাট্রিককে পুনঃপুন সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পরিশেষে বেগতিক দেখিয়া এবং জার্ম্মানীতে আপন নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া প্যাট্রিক পলাতক হইয়াছে। গোপনে সে আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে সে অবিলম্বে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করিবে মনস্থ করিয়াছে। সে এখন প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করিতেছে—আমি আমার খুড়োকে ঘৃণা করি। সে আমাদের ফুরহার পরিবারের কলঙ্ক।

হস্তীপৃষ্ঠে আল্‌প্‌স্ আতক্রম

রিচার্ড হ্যালিবার্টন—বয়স ৩৯ বৎসর—গ্রন্থকার, পর্য্যটক ও দেশ-সন্ধানী, জাতিতে সে আমেরিকান। সে হস্তীপৃষ্ঠে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছে এবং পানামা কেনেল সাঁতরাইয়া পার হইয়াছে। সম্প্রতি নূতন এক দুঃসাহসিক অভিযানের পর নিরুদ্দেশ।

অপর দশজনের সহিত মিঃ হ্যালিবার্টন মোটর-চালিত এক চীনা জাংক (নৌকা) সাহায্যে সাগরে ভাসিয়া পড়ে—উদ্দেশ্য হংকং হইতে সানফ্রান্সিস্‌কোতে যাইবে ঐ নৌকায়। নৌকাটির নাম 'সি ড্রাগন'।

কিছুদিন পূর্ব্বে রেডিওযোগে এক সংবাদ পাওয়া যায় যে, হ্যালিবার্টন হংকং হইতে ২৪০০ মাইল দূরে পেঁৗছিয়াছে। ইহাই শেষ সংবাদ, ইহার পর তাহার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই অথবা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন কোনও খবরও প্রচারিত হয় নাই।

যে স্থান হইতে রেডিও-সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে অনুমিত হয়, সংবাদ প্রাপ্তির পরে ঐ স্থানে তুফান উঠিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এবং আশংকা করা হইতেছে যে, সেই ঝঞ্জায় নৌকাখানি হয়ত ডুবিয়া গিয়াছে এবং আরোহীরাও প্রাণ হারাইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে যায় মেক্সিকোতে ঠিক যে পথে কোর্টেজ যাইয়া ঐ দেশ জয় করে। ইউরোপে এট্‌না পর্ব্বত, ওলিম্পাস পর্ব্বত সবই সে আরোহণ করিয়াছে। জাপানে যাইয়া সেখানকার পবিত্র তীর্থ ফুজিয়ামা পর্ব্বতে আরোহণ করে। ইহার পরে নূতন অভিযানের জন্য উৎসুক হইয়া পড়ে।

ফরাসীদের বন্দী-নির্ব্বাসনের ডেভিল দ্বীপে সে বন্দী-রূপে বাস করিতে অভিলাষ করে। কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শে এক উড়ো জাহাজযোগে সেখানে যায় এবং 'দৈবাৎ' সেখানে পরিত্যক্ত হয়। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বন্দী নং ৪৯,৭৬৬ বলিয়া পরিচিত করা হয়। যাহাতে সে বন্দী-জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে এজন্য তাহাকে অন্যান্য ৪৯টি হত্যাকারীর সহিত এক ব্যারাকে স্থান দেওয়া হয়।

ডেভিল দ্বীপের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সে স্থির করে—যুকাতানের মায়াজাতির যে মৃত্যু-কূপ রহিয়াছে বলিয়া জন-শ্রুতি, তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবে। সেই অনুসারে সে উহা খুঁজিয়া বাহির করে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী মায়াজাতি এই অতল কূপে বলি-স্বরূপ অগণিত নরনারী নিক্ষেপ করিয়াছে সত্তর ফুট উচ্চ মঞ্চের উপর হইতে। হ্যালিবার্টন সেই মঞ্চ হইতে নগ্নদেহে লম্ফ প্রদান করিল। যখন সে ভাসিয়া উঠিল, কোনও রাক্ষস তাহাকে গ্রাস করিল না জলমধ্যে, তখন দেশীয়গণ তৎপর হইয়া তাহাকে উপরে উঠাইল। সেই দিন হইতে দেশীয়দের অন্ধ-বিশ্বাস দূর হইল—ক্ষুধিত দেবতা বলি গ্রহণের জন্য আর কূপমধ্যে নাই। সুতরাং বলি প্রদান না করিলে যে নির্দ্দিষ্ট দিনে রাক্ষস-দেবতা উঠিয়া আসিয়া দেশশুদ্ধ লোককে গ্রাস করিবে সেই আতঙ্ক আর রহিল না।

পানামা কেনেলের ৫০ মাইল সে সন্তরণ করিতে চায়—যাহার ফলে আটলাণ্টিক হইতে সে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িতে পারিবে। কর্তৃপক্ষের আদেশ মিলিল, তবে ফি দিতে হইল ১ শিলিং ৬ পেনি। কেনেলের গেট খোলা হইল, ৯০ লক্ষ গ্যালন অবরুদ্ধ জল মুক্তি পাইল—সে মাত্র এক টনের এক-ত্রয়োদশ ভাগ ওজনের জলের প্রতিভূ, তাই ফি ঐ দেড় শিলিং।

১৯৩৫ সালে ডিক্ নামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের উপর ২০০ মাইল অতিক্রম করে। ইহার পরে হস্তী আর চলিতে পারে না—পায়ে ঘা হওয়ায়। সুদূর অতীতে হ্যানিবল যে পথে হস্তীসহ আল্‌প্‌স্ পার হইয়াছিল, সেই পথেই হ্যালিবার্টন গিয়াছিল।

কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের দুরাকাঙ্ক্ষা শেষ তাহাকে ধরাপৃষ্ঠে হইতে নিশ্চিহ্ন করিল হয়ত।

গুপ্তচরদের অবধারিত পরিণাম

বিগত মহাসমরের সময় হাজার হাজার নরনারী গুপ্তচররূপে ধৃত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। রাত্রি প্রভাতে মৃত্যু (Death at Dawn) ইহা ছিল সে সময়ের গুপ্তচরদের পরিণাম (ছবি দেখুন)। ইহাদের কেহ অর্থলোভে, কেহ স্বদেশপ্রেমে, কেহ শুধু বিপদ বরণের উত্তেজনা উপভোগে—এই নিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়াইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই নিজ নিজ সরকার প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা বিদ্যালয়ে জালিয়াতি, নকসা অঙ্কন, সাঙ্কেতিক ভাষা ও অন্যান্য সাঙ্কেতিক নিদর্শন-প্রয়োগ-প্রথা শিক্ষা করিয়াছে। ইহাদের ভিতর নারীর সংখ্যাও কম ছিল না। নর্ত্তকী মাতা হরি, নার্স এডিথ ক্যাভেল প্রভৃতির নাম ত চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ১৯১৫ সালের ১২ই অক্টোবর নার্স ক্যাভেলকে জার্ম্মানী-অধিকৃত বেলজিয়ামে জার্ম্মানদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। সে ছিল জাতিতে ইংরেজ এবং বেলজিয়ামের সে সময়কার কোনও হাসপাতালের ডিরেক্টর। সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করে যে-সে বহু বন্দীকে (জার্ম্মানদিগের হস্তে গৃহীত বন্দী) পলায়নে সাহায্য করিয়াছে। জার্ম্মানগণ মহিলা বলিয়া তাহাকে রেহাই দেয় নাই।

গুপ্তচরদের অবধারিত পরিণাম—রাত্রি প্রভাতে রাইফেলের গুলীতে মৃত্যু Death at Down

মাতা হরি জন্মাধিকারে ওলন্দাজ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু যবদ্বীপবাসিনী বলিয়াই নিজেকে প্রচারিত করিত। সে ছিল নর্ত্তকী। তাহার কুহকে পড়িয়া অন্যূন ৫০ হাজার মিত্রশক্তির সেনাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সৈনিকদের চিত্ত হরণ করিয়া তাহাদের সকল গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিত। মাতা হরি তাহার নৃত্য-ব্যবসার নাম—প্রকৃত নাম ছিল মার্গারেট গার্টরুড্ জেলি ম্যাকলিয়ড। ১৯১৭ সালে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মাতা হরি এমন চতুরতার সহিত তাহার কার্য্য উদ্ধার করিত এবং এমনই পরম রূপবতী ছিল ও এমন ধনবতীর ন্যায় বিচরণ করিত যে, দীর্ঘকাল তাহাকে কেহ সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। পূর্ণ তিন বৎসরকাল ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস বিভাগের

ক্লড্ ফ্রান্স—চলচ্চিত্র অভিনেত্রী—ইহারই সাহায্যে মাতা হরির অপরাধ প্রমাণিত হয়

গোয়েন্দাগণ মাতা হরিকে সন্দেহ করিলেও কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া এত সকল ক্লোরপতি ও সরকারী কার্য্যে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী উচ্চ অফিসার-

নার্স অথবা গোয়েন্দা—এডিথ্ ক্যাভেল্

গণ মাতা হরির প্রণয়ী অথবা বন্ধু ছিল যে ফরাসী গোয়েন্দাগণ তাহার অপরাধ প্রমাণ করিতে অসমর্থ হয়। পরিশেষে ফরাসী গোয়েন্দারা ক্লড্ ফ্রান্স নামে এক চলচ্চিত্র অভিনেত্রীকে

হস্তগত করে। তাহার সাহায্যে মাতা হরির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগৃহীত হয়। রুড্ ফ্রান্স ছিল মাতা হরির বান্ধবী—তাহার পক্ষে ঐ নর্ত্তকীটির গোপন কার্য্যাবলী উদ্ঘাটিত করিতে অবশ্য বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু মাতা হরির

প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী গোয়েন্দা মাতা হরি ওলন্দাজ জাতীয়া যবদ্বীপবাসিনী বলিয়া পরিচিতা

মৃত্যুদণ্ডের পর রুডের মনে এমনই অনুশোচনার উদয় হয় যে, সে আর কিছুতেই স্বস্তি শান্তি পায় না; অবশেষে অন্য উপায় না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল অনুতাপ-জ্বালা জুড়ায়। গুপ্ত সংবাদের কারবার এমনই সংকট আনয়নকারী যে নিতান্ত সরলপ্রকৃতির অভিনেত্রী রুড্ ফ্রান্সকে বান্ধবীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে হয় এবং তাহার পরিণামে নিজহস্তে আত্ম-সংহার করিতে হয়।

শব্দ প্রতি হাজার ডলার

কালিফোর্নিয়ায় কোনও গৃহিণী ৫০টি শব্দ দ্বারা একটি রচনা লিখিয়া ৫০,০০০ ডলার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যে শব্দ প্রতি হাজার ডলার হারে পারিতোষিক পাইয়াছে এবং এরূপ সৌভাগ্য যে আজ পর্য্যন্ত কোনও লেখক-লেখিকার হয় নাই—একথা বোধ হয় উক্ত গৃহিণীটি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমেরিকার বিখ্যাত লেখিকা, যাহার 'Gone with the wind' নামক গ্রন্থ প্রচুর বিক্রয় হইয়াছে—সেই মার্গারেট মিচেলও এই হারে টাকা পাইবার কল্পনাও করিতে পারে না। 'মুভি কুইস্ কণ্টেষ্ট'-এ এই পুরস্কারের ব্যবস্থা; সুতরাং যাহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু, তাহারা ঐ গৃহিণীটির রচনা প্রকাশিত হইলে তাহার ষ্টাইল, তাহার টেকনিক্ সকলই অনুকরণ করিবে অতি উৎসাহে এবং আশান্বিত হৃদয়ে। অনেক গ্রন্থ-প্রণেতাও যে গ্রন্থ প্রণয়ন বর্জ্জন করিয়া এই পরম লোভনীয় প্রতিযোগিতায় হাত দিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অভিনব শবাধার

পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র শব সমাহিত করা হয়, সেইজন্য কফিন্ বা শবাধার নির্ম্মাণের ব্যবসা কম লাভজনক নয়। ব্রিটেনের মিনিষ্ট্রি অফ সাপ্লাই সম্প্রতি ৫০,০০০ কফিনের এক অর্ডার দিয়াছে। কফিনগুলি সাধারণ ফ্যাশানের হইবে না। উহা যাহাতে গুটাইয়া ষ্ট্র্যাপ দ্বারা পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া অনায়াসে বহিয়া বেড়ান যায়, সেই কায়দার হইবে। গুটান অবস্থায় উহাকে কফিন বলিয়া আদপেই চিনিতে পারা যাইবে না। অথচ প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে একেবারে এক নিমিষে কাজে লাগান যাইবে।

অতি কৃশকায়

ভানশ বৎসর বয়স্কা মিসিস্ রিটা উসালিক্ চিকাগো শহরের আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা করে। বিচারপতি বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়াছেন। সে বলে বিবাহের চারি মাস পরে তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, এই বলিয়া যে, মিসিস্ রিটা অতিশয় কৃশকায়—একেবারে হাড়-জিরজিরে। স্বামী আরও বলিয়াছে যে, সে হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীই পছন্দ করে—অমন শীর্ণকায়াকে সে আর ভালবাসিতে পারে না।

সম্পদের দায়ে

(গল্প—শেষার্ধ)

শ্রীদিনেশ মুখার্জ্জি

থাম বন্ধু থাম। বল্‌ছি সব। ফের কাগজ পেন্সিল নিয়ে বস্‌তে হ'ল। যে ৪ লক্ষ ক্রাউন আলাদা রেখেছি আমার বাকি জীবনের সম্বল বলে, তা ছাড়াও আমার হাতে রয়েছে ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার ক্রাউন—যা বিলি করতে হবে। এ কাজটি এখন আমায় সমাধা করতে হবে যে উপায়েই হোক। আবার হিসেব কসে ফেললাম—আমার ব্যবস্থায় বছরে বিলি করা দরকার ৫৪,০০০ অর্থাৎ প্রতি মাসে ৪,৫০০, তা হলেই প্রতিটি দিনে পড়ল ১৫০।

তুমি জিজ্ঞেস করছ কিভাবে আমি সুরু করলাম? সুরুতে আমায় বেগ পেতে হয়নি কিছু—ব্যাপার সোজাই ছিল। সে সময়টায় আমার মেজাজও ছিল খাসা—আঃ সে দিনের কথা মনে করলে প্রাণটা খুশীতে ভরে যায়।

বিকেল বেলা আমার দৈনিক কাজ সারা হল—বসে বসে মনি অর্ডারের ফর্ম লিখে ফেলতাম; লিখে ফেলা মানে হ'ল টাইপরাইটিং মেশিনে টাইপ করা। নইলে যদি কোন রকমে হাতের লেখায় ধরা পড়ে যাই। এমনি করে ১৫০ ক্রাউন মনি অর্ডার করতাম—সব অজানা অচেনা লোকের নামে। তাদের নাম আর ঠিকানা নিতাম ডিরেক্টরী থেকে—উদ্দেশ্যবিহীনভাবে যে কোন পাতা খুলে। আমি যার নামে টাকা পাঠাচ্ছি সে লোকটা গরীব কি ধনী, তা ঠাওরাবার কোন চেষ্টাই করতাম না, এক রকম চোখ বুজে আন্দাজে আঙুলে ফেলতাম পাতায়, যে নামে পড়ত, তাকেই পাঠাতাম কিছু টাকা। এমনি করে একদিন হ'ল কি টাকা পাঠালাম খুড়ো 'জান্‌পার য্যাকোনজ'-য়ের নামেই—সে যে কত বড় ধনিক তা আর তোমার জানতে বাকি নেই।

যারা অমন করে মনি অর্ডারে পাঠান টাকা পেত, তারা নিশ্চয়ই বিস্ময় বোধ করত প্রথম। মাথা ঘামিয়ে ঠাওরাতে চেষ্টা করত—এমন রহস্যাবৃত লোকটা কে, যে সকল পরিচয় গোপন রেখে টাকা পাঠাচ্ছে। পর মুহূর্ত্তে হয়ত সহসা তাদের মনে পড়ত কোন আত্মীয়-স্বজনের কথা, যে ওরকম খয়রাত করতে একেবারে সিদ্ধহস্ত অথবা হঠাৎ তাদের স্মরণ হত কোন দেনাদারের নাম, যার কাছ থেকে টাকাটা পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিল অনেক দিন আগেই। আবার কারু কারু কাছে আমি হয়ত একটা অদৃশ্য শক্তির মতই হয়ে পড়েছিলাম—যেন কোন দুষ্টু পরী অথবা এক রকমের আশাপূর্ণা দেবী—যার দৃষ্টি সর্ব্বত্র, যে অদৃশ্য হয়েও সর্ব্বত্র বিরাজমান—এবং যে তার অফুরন্ত থলে হতে অদৃশ্য হস্তে অমন বাস্তব আশিস বর্ষণ করে বেড়ায়। কিন্তু বরাতের ফের, বছর না ঘুরতে ঘুরতেই তারা আমার সন্ধান করে ফেলল।

—"কোথায়? পোষ্ট অফিসে?"

না, না। পোষ্টাফিসে নয়, আমি সে ব্যাপারে ছিলাম জবর হুঁসিয়ার। আমি নিত্য নূতন ছোকরা ভাড়া করতাম, না হয় বোবা কালা মেয়েমানুষ। আবার কোন কোন দিন আমি চলে যেতাম গাঁয়ে, সেখান থেকে মনি অর্ডার করতাম।

শোন তা হলে কি করে ধরা পড়বার উপক্রম হ'ল। এক দিন, আমায় বরাত খারাপই বলতে হবে, টাকা পাঠিয়ে দিলাম একটা লোকের নামে—সে ছিল কোন দৈনিক কাগজের রিপোর্টার। এখন লোকটা ত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায়। সে হয়ত দু'চার জনের মুখে শুনে থাকবে আগেই যে—একটা আজব লোক এমনধারা উপহার দিয়ে দিচ্ছে মনি অর্ডারে কিছুকাল থেকে—অথচ তার পাত্তা কেউ পায় না। সে উঠে পড়ে লেগে গেল—সে সাংবাদিক এ ধাঁধের একটা রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলে, তার নাম হবে, মাইনে বাড়বে, মালিকের কাছেও আদর বাড়বে। যারা ওরকম বেনামী মনি অর্ডার পেয়েছে অথবা পাওয়ার খবর রাখে, খুঁজে খুঁজে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, খবরের কাগজে ছেপে দিলে। খবরের কাগজে ও জিনিষ ছাপার পর চারদিক থেকে আরও সব চিঠি এল অমন মনি অর্ডার পাবার—তাও দৈনিকটিতে বের হ'ল ছাপার অক্ষরে। কিন্তু ধড়িবাজ রিপোর্টার করলো কি—

তার কাছে প্রেরিত মনি অর্ডার ফর্মটির টাইপ-করা অংশের ব্লক করে ছেপে দিলে খবরের কাগজে এক আজব নিরিটে প্রবন্ধের অবতারণা করে। প্রবন্ধের নাম দিলে—"স্বর্ণ বৃষ্টি"। আরও বাহাদুরি ফলাতে চাইলে কি বলে জান—এক গল্প ফেঁদে বসল যে, ভারতীয় মহারাজা একটি ছদ্মবেশে বুদাপেস্তে এসে এ রকম অঘটন ঘটাচ্ছে।

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ তারা আমায় সন্ধান করে ফেললে অর্থাৎ আমার কর্ম্মপন্থার—নইলে আমার স্বরূপ তারা উদ্ঘাটন করতে পারেনি—আমার ঠিকানাও না। আমি ত ভয়ে ডরে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। কাজেই স্থির করে ফেললাম মনে মনে আর মনি অর্ডারে টাকা বিলি করা হতেই পারে না। অবস্থা সঙিন্—ফল যা দাঁড়িয়েছে, সন্তোষজনক নয় আদপেই। অন্য পথ দেখতে হবে। এবার এমন নূতন ফন্দি-ফিকির চাই, যা এত সহজে ফেঁসে যাবে না। সেয়ানা কৌশল একটা বার করতেই হবে মাথা থেকে—নইলে টাকা বিলি ত আর বন্ধ করা চলে না।

—"এত ভাবাভাবি কেন, তা ত আমি সত্যি বুঝতে পারছি নে। আর কিসের জন্যেই বা তুমি মনি অর্ডার করা বন্ধ করে দেবে, তাও ঠাউরে উঠতে পারি নে। অত শত ভাবনা কেন, একেবারে একটা লোককে সব টাকাটা ধরে পাঠিয়ে দিলেইত ল্যাঠা চুকে যেত।"

তুমি ঠিক বললে না ভাই। ও-রকম করে একজনকে সব টাকা দিলে আমার সন্ধান করা আরও সোজা হয়ে যেত।

—"তা হলে একটি প্রণয়িনী খুঁজে নিয়ে তাকে দিলেই ত জটিল সমস্যার হিল্লে হয়ে যেত, তোমারও খাতির হত তার কাছে।"

তা যদি করতাম, তা হলে যে আমার আদর্শের মস্তকে পদাঘাত করা হত। আমি চাই কি, যতকাল অবধি সম্ভব—এ বিশ্বাসে একনিষ্ঠ থাকা—অন্তত বিশ্বাসের ভান করা যে, আমার প্রণয়িনী আমায় ভালবাসে টাকার জন্য নয়—আমার রূপ-গুণের জন্যই।........হয়ত কথাটা তুমি বুঝে উঠছ না,

নয় ত আমার মনের ভাব তোমার ভাল লাগে না।.........সত্যি কথা কি জান, আমার অন্তর হতে কে যেন বল্‌ছিল—টাকাটা দিয়ে ফেল্‌বে, বেশ দাও; কিন্তু হুঁসিয়ার, বিলিয়ে দেবার বেলা কোন রকম সুবিচারের চেষ্টা করবে না মানুষের প্রতি। দয়া, দরদ, যোগ্য পাত্র—এ সব ছাই-পাশের বাছ-কোচ্ করতে পারবে না।

আমি কিছুতে এ নির্দ্দেশ ভুলতে পারিনে—এর বিরুদ্ধ আচরণও করতে মন সরে না। বাধ্য হয়ে আমায় সাড়া দিতে হয় অন্তরের এ অনুজ্ঞায়। তাই আমি পণ করলাম—যত আজগুবি আর অসম্ভব উপায়, তা-ই হ'ল আমার পথ। আমার খেয়ালের বশে, অথবা তোমার যদি পছন্দ না হয় বলতে পার—প্রকৃতির আইন-কানুন অনুসরণ করে, কেন না, মানুষের নিয়ম-কানুনের চেয়ে সেগুলো হ'ল আরো রহস্যাবৃত,—এ পথেই আমি চলব।

আমার মনে হয় আমাদের জীবন কখনই যুক্তিমূলক অর্থাৎ লজিক্যাল নয়; কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই এমন জীবন বরণ করে নিতে পারে না। যা হোক, ব্যাপারটা এখন দুঃস্বপ্নের রূপ ধরে আমায় শাসাতে লাগল। আমার ভারী রাগ হতে লাগল যে—এমন বিপুল অর্থরাশি জঞ্জালের মত পড়ে থাকবে আমার দেরাজে—আমার কাছে, সারা বিশ্বের কাছে অকেজো হয়ে, কারো কোন রকম ব্যবহারে না লেগে।

যদি কোন দিন আমার এই দৈনিক টাকা বিলির কাজ কোন কারণে করে উঠতে না পারতাম, বিষম একটা অনুশোচনা আমায় পুড়িয়ে খাঁক করে ফেলত; আর তখন মনি অর্ডার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিন দিন আমার কাজটা ক্রমশ শক্ত হয়েই দেখা দিতে লাগল। মাঝে মাঝে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত এই যে, চার পাঁচ দিনের বিলির বরাদ্দ করা টাকা জড়ো হয়ে যেত দেরাজে। সে রকম বেগতিক দেখলেই ভিখারীর তুলে ধরা টুপীতে আমায় ৬০০ ক্রাউন ছুড়ে দিয়ে চম্পট দিতে হ'ত হয়ে হয়ে। তবে তেমন সঙিন দশা বেশী দিন হয়নি।

—"মনি অর্ডার বন্ধ করে দিয়ে কেমন করে যে টাকা বিলি করতে, সে ব্যাপারটা ত সঠিক বুঝতে পারলাম না। কি করে বিলি করতে?"

সে করতাম নানা উপায়ে ভাই! আমার মনে হয়, ও টাকাটা রোজগার করতে না যতটা বেগ পেতে হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ঝকি পোয়াতে হয়েছিল আমায় সেগুলোর বিলির ব্যবস্থায়। আমি অবশ্য রঙ ফলিয়ে বলছি না—অতিরঞ্জিত করা আমার পছন্দও নয়—কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে, বিলির ব্যবস্থায় আমায় অসাধারণ কৌশল আর অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করতে হয়েছিল।

এখন অবশ্য তুমি বেশ বুঝতে পারছ যে, আমি আমার ইচ্ছামত সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারিনি কবিতা রচনায়। আমার ক্ষমতা যে কমে গিয়েছিল—ষ্টাইল যে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল—তা নিতান্তই স্বাভাবিক। একদিন ট্রেনে চড়ে বসেছি, কোথায় যাব কোন স্থির উদ্দেশ্য নেই। বড় গোছের একটা ষ্টেশনে নেবে, ফল-ফিরিওলার কাছ থেকে একটা আপেল কিনে খেলাম। খাচ্ছি আর কথা বলছি ফল-ভেণ্ডারের সঙ্গে। সে তার ঠেলাগাড়ী নিয়ে চলেছে আস্তে আস্তে। কথা বলেই যাচ্ছি—মতলব টাকাটা গোপনে তাকে দেব শেষ মুহূর্ত্তে। যেই ট্রেনে সিটি দিলে, অমনি চটপট একটা মোটা টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে, তিন লাফে গিয়ে আমার কামরায় উঠলাম। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে আড়ালে রাখলাম অপর লোকদের পেছনে—যেন ফলওলা প্লাটফরম থেকে তাকিয়ে আমায় না দেখতে পায়।

অন্য একদিন বড় একটা কাফেতে খেয়ে চলে আসবার সময় প্লেটের তলায় একখানি নোট রেখে এলাম—যেন নেহাৎ ভুলে। তারপর আর সে কাফের আশেপাশেও যেতে ভরসা পাইনি। কয়েকটা লাইব্রেরীর মেম্বার হলাম, বই এনে পড়ে ফিরিয়ে দেবার বেলা ভেতরে নোট গুঁজে দিতাম। রিডিং রুমে ঢুকতাম—একখানা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়বার ভান করতাম, তারপর সুযোগ বুঝে নোট পুরে ম্যাগাজিনখানা বন্ধ করে রেখে দিতাম ছুট।

এমনি করে আর কত নিত্য নূতন ফিকির-ফন্দী আবিষ্কার করা যায়। রাস্তায় চলতাম আর নোট ফেলে দিতাম ছোট বড় সব রকম। যেমন নোট ফেলা হ'ত অমনি যেভাবে সে স্থান ত্যাগ করতাম—হয়ত লোকে দেখলে মনে ভাবত আমি হত্যা অথবা তেমনি কোন হীনকার্য্য করে পালাচ্ছি।

অনেক সময়েই আমার প্রয়াস হ'ত জয়যুক্ত, কিন্তু দুই তিন দিন লোক ছুটে এল আমার পিছু। একবার একটি তরুণী শোক-প্রতীক পরিচ্ছদে ছুটে এসে কুড়ান নোটগুলো আমায় ফিরিয়ে দিলে। লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম, কি যে বললাম মাথামুণ্ডু তার কোন মানে হয় না—নিতে হ'ল নোটগুলো হাত পেতে। কিন্তু যে কুড়িয়ে এনে দিল এমন সরল মনে তার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের পুরস্কারটা দিতেও ভুলে গেলাম।

মজা দেখ না, ধরা না পড়ে টাকা পয়সা বেমালুম রেখে দেবার স্থানের নিতান্তই অভাব এ দুনিয়ায়। সত্যি যখন তুমি বর্জ্জন করতে চাইবে টাকা, দেখবে তা ফেলে দেবারও ঠাঁই অতি অল্পই আছে। যতটা আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাতে বুঝেছি—লোকগুলো 'হা টাকা হা টাকা' করলেও, তারা সত্যি টাকা চায় না—ফেলে দেওয়া টাকাও না।

কিছুদিন এমনি করে আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। রাগে টং হয়ে স্থির করলাম—যা, নোটগুলো সব পুড়িয়েই ফেলব। কিন্তু সহসা মনে হ'ল, তাতে ত কাপুরুষের কাজ হবে—কর্ত্তব্যের কঠোরতায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হবে। আর উপায় কি! বিলিয়ে দেবার কাজ চালাতেই হ'ল। আমায় একেবারে চরম দ্বন্দ্বশাগ্রস্ত করে ফেলল। বিলি করবার টাকা যেন আর ফুরাতে চায় না। দেরাজের ভেতর মনে হয় নোটগুলো যেন বেড়েই চলেছে।

অবশেষে একদিন, বিলি সুরু করবার আট মাস পরে ভাগ্যলক্ষ্মী যেন আমার উপর সুপ্রসন্ন হ'ল। আমার দাঁত-ব্যথা হ'ল, গেলাম বুদা-শহরের এক তরুণ ডেন্টিষ্টের কাছে, যার ফি তেমন বেশী নয়। তার হলঘরে দেখলাম আগত রোগীদের ৪।৫টা ওভারকোট ঝুলানো। এখানেই

ত আমার সুযোগ ! যখন বুঝলাম কেউ তাকিয়ে নেই সেই ফাঁকে ওগুলোর পকেটে গুঁজে দিলাম কতকগুলো করে নোট। পরের দিনও তেমনি করলাম, আর তার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত চালালাম সে ব্যাপার। সে সপ্তাহটায় আমার মনে হ'ল এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, মন মেজাজ দু-ই আমার বেশ খুশী হ'ল।

আমার কিন্তু ভারী মজা লাগ্‌ত দেখ্‌তে—রোগীগুলো ওভারকোট হলঘরে ঝুলিয়ে ওয়েটিং রুমে যেত। মাঝে দুয়েক বার চুপি চুপি এসে দেখে যেত পকেট ভারী হয়েছে কিনা। যদি দেখ্‌ত হয়েছে, তখন নোটগুলো বার করে অধিকতর নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ফেল্‌ত। তারপর রুমাল বার করে মুখ ঢাকা দিত—দাঁত ব্যথার জন্য নয়—টাকা পাওয়ার আনন্দ চাপা দিতে।

কতকগুলো লোক আবার লোভী—একবার টাকা পেয়ে সেদিনে আবার পাবার জন্যে ওভারকোট ঝুলিয়ে পকেটটা হাঁ করিয়ে রাখত। আবার মনে কেউ পাছে নোটগুলো হাতড়ায় সে ভয়ে কিছুক্ষণ বাদে বাদে উঠে এসে পকেট পরখ করত। আমি খাড়চোখে তাদের দিকে তাকাতাম আর সেয়ানার মত হাসি হাসতাম। কিন্তু আমার সে হাসি—সে স্বস্তি বেশীদিন টিঁকল না। অন্যান্য ফিকির আমার যেমন বাতিল হয়েছে, এটাও তেমনি হ'ল।

—"কেন ? সেই রিপোর্টার তোমায় আবার ধরে ফেল্‌লে নাকি ?"

না। লোকের মুখে বেনামী ডেন্টিস্টের তারিফ—এমন ডাক্তার হয় না। কাজেই ডেন্টিস্টের এমন খদ্দের বেড়ে গেল যে, তাদের সারকরে দাঁড় করান হ'ত নম্বর দিয়ে। নির্দিষ্ট নম্বর পার হলে পরের দিন ধার্য্য হ'ত। এমনি করে আমি পেলাম ৬২৮ নম্বর, আমায় বলা হ'ল সাতদিন পর প্রাতঃকাল ৯টা ১৮ মিনিটে হাজির হতে। এমন কি, হলঘরে ঢোকবার অনুমতি অবধি পেলাম না। সেক্রেটারী মেয়েটি আমায় উঁকি মারতেও দিলে না হলঘরের দিকে। কাজেই সেখান থেকে বিদায় হতে হল।

অন্য ডেন্টিষ্টের কাছে গেলাম। বেশী ত ছিল না বুদাপেস্তে—একে একে সব কয়টা শেষ করতে হ'ল। আর আমারও ক্রমশ বেশী রকম হুঁসিয়ার হয়ে কাজ চালাতে হয়, মুখোস খসে পড়বার ভয়ে।

এমনি করে চতুর্থ বর্ষ যখন এল তখন একটা অভিনব ফন্দী আবিষ্কার করলাম। আর আমার মনে হ'ল এভাবেই বুঝি বাকি টাকাটার যা হোক হিল্লে হয়ে যাবে।

একটি ছেলের দেখা পেয়েছিলাম—খাসা ছোকরা—পাঁচ বছর জেল খেটেছে 'পকেট পিক্‌' করবার জন্যে। তার কাছ থেকে পাঠ নিলাম। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠত সময় সময়—আঘাত পেতাম অশেষ—আর কষ্টকরও ছিল কম নয়। দুহাতের তর্জ্জনী দুটিকে লম্বা করতে হয়েছিল মাঝের আঙুলটার সমান—তা ছাড়া সবগুলো গ্রন্থি করতে হয়েছিল শিথিল। ঝানু পিক-পকেট শুধু ও দুটি আঙুল ব্যবহার করে বেমালুম পকেট হাতড়াবার সময়। তারপর হাত সাফাই শেখা হয়ে গেলে কাজে মন দিলাম। তখন ত সে কারসাজি ছিল একেবারে সোজা।

আমিও পাকা হয়ে গেছি—কোন ডরভয় নেই—বেপরোয়া হয়েই কাজ সারি। সেদিন ছিল 'সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্‌ ডে' রাজ্যের যত বড় বড় মাথা যোগ দিয়েছে শোভাযাত্রায় —কি তাদের জাঁকাল পোষাক—বুদার সে পবিত্র শোভাযাত্রা বিখ্যাত। আমি বিনা বাধায় আঙুলের কৌশলে প্রধান মন্ত্রীর 'রোব'-য়ের পকেটে ১৫০ ক্রাউন্‌ বেমালুম ঢুকিয়ে দিলাম। তার মাথায় যে ছিল জাঁদরেল টুপি, তার ভিতরে দিলাম আরো ৫০ ক্রাউন।

তারপর একদিন এল 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের' একজন ডিরেক্টর। তার অভ্যর্থনা মজলিশে আমি স্থান করে নিলাম। তারপর ডিনার হয়ে গেলে, সুযোগ পেয়ে তাকে ১০০ ক্রাউনের মালিক করে দিলাম আজব কায়দায়। কেউ দেখতে পায় নি, সেও টের পায় নি।

তবু বল্‌তে হবে এমন সুবর্ণ সুযোগ নিতান্তই ছিল বিরল। আমার এ হাত-সাফাই ফলাবার সুবিধের জন্য আমি যেখানে জনতা পেতাম সেখানেই যেতাম ফুটবল ম্যাচ, সার্কাস, খেলা, যে কোন আমোদপ্রমোদের পার্ক, শনিবারে নদীতীর, রবিবারে চার্চ্চ অর্থাৎ যেখানে লোকে পিঁপড়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে যায়, যে পথে ট্রাম-বাসে অসম্ভব ভিড়, এমন সব যোগাযোগই বেছে নিতাম।

একদিন সন্ধ্যেবেলা এক পার্কে—সে হ'ল আমার অসামান্য সৌভাগ্য—কে যেন আমার পকেট থেকে প্রায় হাজার ক্রাউন তুলে নিলে, টের পেলাম না কিছু। পরে দেখি পকেট হাল্‌কা। ব্যস্‌ সেদিনকার ক্লেশকর কাজ আমার বিনাশ্রমে সারা। সেদিন আর কর্তব্যের বোঝা নেই—বিশ্রাম নিলাম বেজায় আরামে।

যা হোক, এতেও হাওয়া বদলের মতই একটা ছেদ এল গতানুগতিকতায়। একদিকে যেমন আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করতাম না স্বেচ্ছায় কোনদিন, তেমনি কেমন যেন আতঙ্ক গুমরিয়ে ফিরত যে গোয়েন্দারা আমার পিছু নিতে সুরু করেছে। কিছুদিন আর কোন কাজ করতে পারলাম না এদিক দিয়ে।

তারপরই এল চরম ফ্যাসাদ ! একদিন—সে হ'ল মে মাসে—হাঁ আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—ট্রামে এক বুড়োর পাশে বসে আছি। শাদা ধব্‌ধবে দাড়ী—শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার মত চেহারা। মনে হ'ল, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিসের অফিসার হবে। অভ্যাস মত দু আঙুলে একখানি নোট দিতে যাব বুড়োর পকেটে, বুড়ো ফস্‌ করে আমার হাত বগল দাবা করে চেঁচাতে লাগ্‌ল—চোর ! পুলিশ !

ট্রামের কণ্ডাক্টর পুলিশ ডাকল। তখন আর নিজের সাফাই গেয়ে কোন ফল নেই...হাতে নাতে ধরা পড়েছি...এবং সে-ই হ'ল খতম্‌। *

---

* D. Kusztolanyi প্রণীত 'Eembarras de Richesse' নামক হাঙ্গেরিয়ান গল্পের অনুবাদ।

ছাত্র আন্দোলন

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি বহু মত ব্যক্ত করেছেন। ছাত্র-আন্দোলনে কত ডিগ্রী রাজনীতির ছাপ থাকবে; ছাত্ররা আদৌ রাজনীতিতে যোগ দিবে কিনা; ছাত্র-আন্দোলনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—এ সম্বন্ধে বহু পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ছাত্র-আন্দোলন আজ গড়ে উঠেছে। রাজনীতি তাতে অনেকটা আছে। এসব মতবাদ সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে তাই আমি এখানে আলোচনা করব না।

পরাধীন ও গণতন্ত্র বর্জিত দেশে সব কিছুতেই প্রয়োজন হয় একটা আন্দোলনের এবং সব কিছুতেই থেকে যায় একটা রাজনৈতিক ছাপ। ইহা স্বাভাবিক। যেখানে কর্তৃস্থানীয়ের লক্ষ্য জাতীয় কল্যাণ নয়, তার শোষণ,—সেখানে জনকল্যাণকর ও জাতীয় কল্যাণপ্রদ কোন কিছু পেতে গেলেই প্রয়োজন হয় একটি তুমুল আন্দোলনের—নইলে কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হয় না। আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের উদ্দেশ্য হল শিক্ষায়তনগুলিকে শুধু তাদের প্রয়োজনীয় কেরাণী ও সিভিলিয়ান তৈরীর উপযোগী করে রাখা। তাদের শিক্ষা বিস্তারের মূল উদ্দেশ্যও তাহাই। জাতিকে শিক্ষিত ও অজ্ঞান-তিমির মুক্ত করা তাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরকারী কর্তৃত্ব পুরোপুরি। সুতরাং তার ভিতর দিয়া সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদী নের ক্রিয়ার ফলে প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ হয় না।

আজ জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে শিক্ষায়তনে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব বিসদৃশ ও বিপজ্জনক মনে হচ্ছে জাতীয় কল্যাণের পক্ষে। ছাত্রদের ভিতর কোন জাতীয়তার উন্মেষ ও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হতে দেখলেই শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষরা কঠোর হস্তে তার দমনে তৎপর হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে ছাত্ররা স্বাভাবিক অধিকার খাটাতে পারে না। তার জন্য তাদের শাস্তি পেতে হয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল ব্যাপারসমূহে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে ছাত্রদের বাধ্য করা হয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। অন্যান্য দেশে যেখানে জাতীয়তাকে ছাত্রদের শিশু-মনে লালিত ও পুষ্ট করার জন্য চেষ্টা হয়, আমাদের দেশে হয় সেখানে দাসসুলভ মনের সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে পরাধীনতাকে কায়েম করার চেষ্টা। তাই আমাদের শিক্ষায়তনগুলি আমাদের জাতীয়তা-বিরোধী ভাবাপন্ন। আজ জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে তার প্রবাহ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অচলায়তনকেও প্রকম্পিত করে তুলেছে। ছাত্ররা আজ জাতীয়তার অনুকূল শিক্ষার দাবী করছে, তাদের ছাত্র-জীবনকে তারা জাতীয় আন্দোলনের সহায়কভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। তাই বিরোধ ও সংঘর্ষ হচ্ছে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে। সাম্রাজ্যবাদ-দুষ্ট—শিক্ষা—কর্তৃপক্ষের এই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের বিরুদ্ধে তাই ছাত্রদের প্রয়োজন হচ্ছে একটি ব্যাপক ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। ইহা অবশ্যম্ভাবী ও কল্যাণ-দ্যোতক।

শিক্ষায়তনের অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেশে যে কোন জাতীয়তা সহায়ক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও রাজনৈতিক আকার পরিগ্রহ করতে বাধ্য। আমাদের ছাত্র-আন্দোলনও তাই পুরাপুরি রাজনীতি মুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। ঐরূপ চেষ্টা করাও অন্যায় ও জাতীয় সংস্কৃতি-বিরোধী। সুতরাং আমাদের দেশে ছাত্র-আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও রাজনৈতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ আর কোন প্রশ্ন হতে পারে না। প্রশ্নকে ছাপিয়ে উহা দাঁড়িয়ে গেছে। উহা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

একথা অবশ্য আমি বলছি না যে, ছাত্র-আন্দোলন মূলত কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ অনুসরণ করে চলবে। মূলত ছাত্র-আন্দোলন হবে সাংস্কৃতিক (cultural) এবং ঐ সংস্কৃতি হতে হবে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার পরিপোষক। জাতীয়তা ও স্বাধীনতার পরিপোষক করে আমাদের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে পদে পদে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের সহিত যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হবে ততটুকু রাজনীতিই থাকবে ছাত্র-আন্দোলনে। বিভিন্ন মতবাদকে কেন্দ্র করে দলগত রাজনীতির আবর্তে ছাত্র-আন্দোলনকে অবনমিত করা অন্যায় হবে এবং তাতে ছাত্র-আন্দোলনের সীমা লঙ্ঘন হবে। ছাত্র-আন্দোলন মূলত অধ্যয়ন ও অনুশীলনমূলক হবে, বাস্তব রাজনৈতিক কর্মমূলক নহে। বাস্তব রাজনৈতিক কর্ম-মূলকভাবে ছাত্র-আন্দোলনকে গড়ে তুললে এর প্রকৃত সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। ছাত্রদের অধ্যয়ন ও মনন কার্যে অবিরত বাধা সৃষ্টি হয়ে তাদের প্রতিভামূলক উন্নতি ক্ষুণ্ণ হবে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে জাতীয় সংকটের দিনে নিত্য নৈমিত্তিক ও গতানুগতিক কার্য বাতিল করতে হয় অনেকখানি। দলে দলে তখন জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা বা অর্জনকামী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। জাতীয়তা ও স্বাধীনতার পরিপোষক সংস্কৃতির ছন্দে যদি ছাত্র-আন্দোলন সুসংহত হয়ে গড়ে ওঠে তবে জাতির ঐ সংকট মুহূর্তে হাজার হাজার ছাত্র গতানুগতিক পাঠ কার্য গুটিয়ে রেখে জাতিকে সঙ্কট হইতে ত্রাণ করতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। উহাই হবে ছাত্র-আন্দোলনের চরম পরিণতি (culmination)। স্বাধীনতাকামী অন্যান্য শক্তির সহিত তাদেরও শক্তি মিলিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হবে তাতেই সাফল্যমণ্ডিত হবে তাদের আন্দোলন। শিক্ষায়তনের উপর হতে তখন সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গণতান্ত্রিক জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক খাতে প্রগতিপন্থী হয়ে উঠবে স্বাভাবিকভাবে ও নির্বাধে। রাষ্ট্র তখন প্রগতি-বিরোধী না হয়ে প্রগতি সহায়ক হবে। তখন আন্দোলনের পরিবর্তে মৌলিক প্রয়োজন হবে গঠনের। আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে না। জাতীয় রাষ্ট্র তখন আত্ম-সচেতন হয়ে প্রগতিকে সহায়তা করবে বিনা আন্দোলনে।

কিন্তু আজকের দিনে ক্রমবর্ধমান ছাত্র-আন্দোলনকে সুসংহত করার জন্য ছাত্র-আন্দোলনকে কিরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত করা সঙ্গত তাহার সুস্পষ্ট ধারণা সকল আন্দোলন-কারীরই থাকা উচিত। ছাত্র-আন্দোলন চালাতে গেলেই ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধ কিরূপে হবে এই প্রশ্নটা আসে। বর্তমানে ছাত্র-আন্দোলন যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে ছাত্র ও

ক্ষকের কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষকগণ ছাত্র-আন্দোলনকে বুঝতে প্রয়াসী নন এবং বস্তুত বিরোধিতা করে থাকেন। ছাত্রগণও শিক্ষকদের আচরণে ন্দহান হয়ে তাদের এড়িয়ে চলেছে। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। ফলে আন্দোলনের প্রসারের ঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক সহজ না হয়ে বরং আরও টিল হয়ে উঠছে। শিক্ষকসঙ্ঘ ও ছাত্রসঙ্ঘ যেন পরস্পর-রোধী হয়ে গড়ে উঠছে। এর ফলে ছাত্র-আন্দোলনের মুখ্য দ্দেশ্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটা ন দিন দিন শ্রমিক ও মিলমালিকের যান্ত্রিক সম্পর্কের রূপ হয়ে উঠছে। ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক পদে পদে ত হচ্ছে। সংস্কৃতির মাধুর্যরসে যেন তাদের পারস্পরিক পর্ক স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হয়ে উঠছে না!

পরস্পরকে দোষারোপ করে কোন লাভ নাই। এর কৃত অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে তার প্রতিকারের উপায় বিধান রার সময় উপস্থিত হয়েছে।

আমাদের ছাত্র-আন্দোলন সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে সংহত নিশ্চিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি হিসাবে গড়ে উঠছে। ধীনতা ও জাতীয়তাপ্রিয় আমাদের ছাত্র-আন্দোলন সাম্রাজ্য-দী শাসকের রক্ত চক্ষুর ভয়ে ভীত নহে।

কিন্তু আমাদের শিক্ষকগণ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ে ভীত। মাদের শিক্ষায়তনগুলির কিছু অংশ সরকারী, কতকগুলি র্ধ সরকারী এবং বাদ বাকী সব বে-সরকারী। সরকারী দ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ সরকারী কর্মচারী। সুতরাং দেরকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ওয়ার আশা বৃথা। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত অর্ধ-সরকারী দ্যালয়গুলিরও একই সমস্যা। কিন্তু শিক্ষায়তনের সরকারী হায্যের পরিমাণ এত নগণ্য যে আমরা অনায়াসে তা উপেক্ষা রলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তাছাড়া বে-সরকারী শিক্ষা-রের সংখ্যাই অধিক। এদের বাদ দিলে আমাদের বিশ্ব-দ্যালয়গুলিই পঙ্গু হয়ে পড়বে। সুতরাং অর্ধ-সরকারী ও কারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও রুত্ব অধিক। আজ জাগ্রত গণ-আন্দোলনের ও জাতীয়তার নে শুধু জাতীয়তাবাদী বলে এদেরকে লাঞ্ছনা করা এত জ হবে না, যদি গণ-আন্দোলনের তালে তালে শিক্ষা তিষ্ঠানগুলি চলতে পারে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সার ফলে শিক্ষা ব্যাপারে যে মন্ত্রীদের কর্তৃত্ব বহুলাংশে দ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলে বিশ্ববিদ্যা-য়কেও আজ সরাসরিভাবে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের মুখা-ক্ষী না হয়ে থাকলেও চলে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তীয়তা ও স্বাধীনতার পরিপোষক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জেদের শক্তি নিয়োজিত করতে অনেকটা সক্ষম। সুতরাং ক্ষাব্রতিগণকে আজ এতটা ভয়ে ভয়ে তাদের জাতীয়তার নোভাবকে আর চেপে না গেলেও চলে। তবু যে শিক্ষক-ণের একটা ভীতিবিহ্বল মনোভাব, তার প্রকৃত কারণ তাদের তর স্বাধীনতা ও জাতীয়তার প্রেরণা ও চেতনার অভাব। দি এই প্রেরণা ও চেতনাকে তাদের ভিতর লালিত করে তোলা যায় এবং সুসংহত করা যায়, তবে তাদের এই ভীতি কেটে যাবে। যেখানে শিক্ষকগণকে চাকুরীর মায়ায়—সামান্য কেরাণীর মত মনোভাব নিয়ে চলতে হয় সেখানে শিক্ষার দুর্দশা ও শোচনীয়তা যে কতখানি তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

ছাত্র-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থি-গণের ভিতর থেকে এই অবনৈতিকতাকে দূরীভূত করে প্রকৃত জাতীয় মন সৃষ্টি করতে সহায়তা করা। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলন যদি শিক্ষকগণের সম্পর্ক ও সাহচর্য বর্জিত হয়ে চলে, তবে তার উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধ হবে কি না সন্দেহ। ছাত্র-আন্দোলনকে প্রকৃত শক্তিশালী ও দৃঢ়মূল করবার জন্য এই সমস্যা সম্বন্ধে আজ ভাববার সময় এসেছে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের সমাবেশে যদি ছাত্র-আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে তবে এর শক্তি হবে দুর্জয়। ইহা সম্ভব হতে পারে যদি ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই নিখুঁত জাতীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে পরস্পরের সহযোগিতায়।

ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যবধান আজ বেড়ে চলেছে কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনার ভিতর দিয়ে। ছাত্ররা প্রায় সর্বত্রই চায় স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসগুলিতে জাতির অন্যান্য অংশের সাথে তাদের ঐক্য ঘোষণা করতে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা তাতে বাধা দেন। ফলে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের বাহিরে যেতে বাধ্য হয় এবং শিক্ষকগণের সাথে তাদের সম্পর্ক মলিন হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ সনে ইউনিভার্সিটি ফাউণ্ডেশন ডে-তে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিয়ে ধর্মঘট, ১৯৩৮ সনে সুভাষ সম্বর্দ্ধনা নিয়ে স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ছাত্রগণের ধর্ম্মঘট, ১৯৩৮ সনে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রগণের ধর্মঘট, হুগলী কলেজ ধর্ম্মঘট—এ সবই উক্ত বিদ্যায়তনসমূহের কর্তৃপক্ষের সাম্রাজ্যবাদের শাসন ভয়ে ভীত মনোভাবপ্রসূত। ছাত্র-আন্দোলনগুলিকে তারা এমনিভাবে বিদ্যালয়ের বাহিরে ঠেলে দিয়ে এর গতিকে ছন্দহারা বেসুরা ক'রে তুলতে সহায়তা ক'রছেন এবং তারপর তারাই আবার তাতে তিক্ততা অনুভব করে বিজ্ঞোচিত উপদেশ দানে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

শিক্ষকগণ যদি প্রগতিপন্থী মনোভাব নিয়ে অবহিত হন, তবে অনেক ছোটখাট ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধানকে খাটো করে আনতে পারেন।

আরও স্থায়ী ও দৃঢ় যোগ সৃষ্টির জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। ছাত্র-ফেডারেশনের গঠনবিধি অনুসারে প্রত্যেক বিদ্যায়তনে একটি করে প্রাথমিক সমিতি গঠন করা যেতে পারে। যে সমস্ত স্কুল ও কলেজে পূর্ব থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন আছে ছাত্র-ফেডারেশনের প্রাথমিক সমিতিগুলি গত বছর থেকে ঐগুলিকে ছাত্র-আন্দোলনের স্বপক্ষে ব্যবহারের পন্থা গ্রহণ করেছে। তার ফলে, বিদ্যায়তনের অভ্যন্তরে ছাত্র-আন্দোলনের মূলে প্রসারিত ও দৃঢ়ীভূত হচ্ছে। একে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ভীতির চক্ষে দেখে এর আসল জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে ছাত্র-আন্দোলনকে কদর্য করে তুলতে

(শেষাংশ ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঘরেতে মোর প্রজাপতি এল

(গল্প)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

সহসা পাপিয়ার কলতান কানে ভেসে আসে কেন? বসন্তের হাওয়া বুঝি বইতে সুরু করেছে?

ও তাইতেই বুঝি গাছে গাছে আজ নূতন পাতার সাড়া। শিশির খোলা বাতায়ন পথে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেহ ও মন দিয়ে ঝির ঝিরে হাওয়াটা উপভোগ করতে লাগল! উঃ আকাশটা কি নীল? সারা বিশ্বের বসন্ত উৎসব বুঝি আজ ওরই বুকখানি জুড়ে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

উঃ দেখেছ নীচের বাগানে থোকা থোকা সিজন ফ্লাওয়ার কোনটা নীল, কোনটা পীত, কোনটা শাদার বুকে লালচে ছিট্। পরীক্ষার চাপে দু'দুটো মাস যে তার কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেছে তা ও টেরই পায়নি।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন, শিশির!

মা? শিশির ফিরে চাইল।

মার শান্ত মুখখানি জুড়ে একটুকরা স্নিগ্ধ হাসি!

হাঁরে, এখন কি তুই বেরুবি?

মার মুখের দিকে চেয়ে শিশির শুধাল, কেন মা?

না এমনি; চোখে তখনও সেই স্নিগ্ধ চাপা হাসির আভাস!

কি হয়েছে মা?

দেখত খোকা এই ছবির মেয়েটি কেমন দেখতে? মা আঁচলের তল হইতে কাগজের ফ্রেমে আঁটা একখানি ফটো বের করে শিশিরের সামনে তুলে ধরলেন।

কার ফটো মা?

তা যারই হ'ক না কেন? বল না মেয়েটি দেখতে কেমন?

বেশ ত, মন্দ কি?

আচ্ছা ততক্ষণ তুই এই ফটোটা দেখ, আমি ঠাকুরকে রান্নার জোগাড়টা করে দিয়ে আসি।

মা চলে গেলেন!

বেশ মেয়েটি! সাধারণ একখানি শাড়ী ততোধিক শাদা সিধেভাবে পরা হয়েছে, মাথার চুলগুলি খোলা! খানিকটা এ'কে বে'কে ডানদিককার কাঁধের 'পর দিয়ে এসে লতিয়ে পড়েছে! হাতে খান দুই বই ও দু' আঙুলের মাঝে ধরা একখানি পেনসিল! মুখখানি জুড়ে অতি সুন্দর একটা শান্তভাব যেন উঁকি দিচ্ছে! না, মেয়েটি বেশ!......

ছোট বোন নীলা এর মধ্যে কখন এসে ঘরে ঢুকেছে শিশির তা মোটে টেরই পায়নি। কি অত মনোযোগ দিয়ে দেখছ দাদা?......

শিশির চমকে মুখ তুলে চাইল! কে ওঃ নীলা?

বাঃ বাঃ কি সুন্দর একটা প্রজাপতি তোমার বইটার উপর এসে বসেছে দেখ দাদা!......

সত্যি ভারী সুন্দর প্রজাপতিটি ত?...... শাদা দুধের মত, ছোট্ট ছোট্ট দুটি ডানার উপরে নীলের ছোপ, প্রজাপতিটা বইখানির উপর বসে থর্ থর্ করে ডানা কাঁপাচ্ছে, হাঁ, প্রজাপতিটা সুন্দর!

নীলা খিল্ খিল্ করে সহসা হেসে উঠ্‌ল!

তা হলে সত্যি এবারে দাদা এতদিন পরে তোমার বিয়ের প্রজাপতি ঘরে এল!......তারপর হাসতে হাসতে ঘর হতে পালিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, মেয়েটির নাম কি জান দাদা?

'রমা'।

এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মতই শিশিরের চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল!

রমা! রমা! রমা!

আমার স্মৃতির ঘুমে সাগর মন্থন করে ওগো আমার জীবনের রমা সত্যই কি তুমি আজ আমার চোখের সামনে এসে আবির্ভূত হয়েছ?.....

শিশিরের সমগ্র মনখানি জুড়ে যেন একটা গভীর প্রশান্তি শির্ শির্ করে স্পন্দন তুলে গেল।

দুপুরের দিকে মা বললেন, ওই মেয়ের সঙ্গেই উনি তোর সম্বন্ধ একেবারে স্থির করে ফেলেছেন খোকা! সামনের মাসের দোসরা বিয়ে—সামনের মাসের দোসরা, তাহলে মাঝখানে মাত্র আর দশটা দিন!

আজ বাদে কাল পরশু বিয়ে! উঃ এ'কটা দিন শিশির যেন নিশ্বাস নেবারও সময় পায়নি! নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপান, বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিলি করা, আসন্ন বিবাহোৎসবের জন্য আবশ্যকীয় জামা কাপড় তৈয়ারী করান— বাবাঃ যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে!

বাড়ীটা এর মধ্যেই সমাগত আত্মীয় স্বজনে একেবারে ভরে গেছে। দিবারাত্র গোলমাল চেঁচামেচি, হৈ, চৈ, হট্টগোল।

এই সবে সন্ধ্যা হয়েছে! শিশির আস্তে আস্তে তেতলার ছাতের উপর এসে উঠ্‌ল! সামনেই একটা খোলা মাঠ! রুক্ষ খট্ খটে! ওই দূরে এক পাশে গোটা দুই উন্নতশীর্ষ তাল গাছ! তার কোল ঘেঁসে এক ফালি চাঁদ দেখা যায়। শিশির পাঞ্জাবীর পকেট হতে একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

রমা! রমা!

নামটি বেশ! চিরকালই শিশির দু' অক্ষরের নামের বড় পক্ষপাতী! রমা! রমা হবে তার স্ত্রী! হবে একান্ত তার নিজেরই, সে যা বলবে তাই শুনবে, তার ইচ্ছায় সে হবে ইচ্ছাময়ী! দু'জনে তারা এক হয়ে মিলে যাবে—কি স্বপন-রঙীন! অবসর সময়টুকু তার তাকে নিয়েই ত কেটে যাবে!

সন্ধ্যাবেলা কলেজ হতে ফিরে তার শোবার ঘরটিতে আবছা আলো আঁধারে সোফার উপর শিশির হয়ত বসে থাকবে, চাপা রংয়ের একখানি শাড়ী পরে পাশে সোফার হাতলের উপর এসে বসবে রমা! তার দেহের সঙ্গে দেহ নিবিড় করে একটা গান গাইবে। শিশির ওর সরু সরু নরম আঙুলগুলি হাতের ভিতর টেনে নিয়ে নাড়া চাড়া করবে। বিকালে হয়ত সদ্যস্নাতার সিক্ত কেশপাশের গন্ধ নাকে এসে লাগবে।......

গভীর রাত্রে বাইরে যখন ঝর ঝর করে বর্ষা ঝরে পড়বে, অন্ধকার শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে দু'জনে হয়ত শুনবে সেই বিরহী যক্ষের অনন্ত বিরহ-বিলাপ।

দাদা তুমি এখানে? আর সারাটা বাড়ী তোমায় আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান। ছোট বোন কমলীর গলা শুনে শিশির চমকে ফিরে চাইল!

: কে কমলি? কি রে?.....

চল, মা তোমাকে ডাকছে!

শিশির ছোট বোন্ কমলীর হাত ধরে নীচের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

নাঃ, ঘুম আসে না কেন?......

গভীর রাত্রি! খোলা জানালা পথে একটুক্‌রা চাঁদের আলো পড়বার টেবিলের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে!

শিশির শয্যা হতে উঠে, কুঁজো থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে খায়। আঃ কি ঠাণ্ডা!

কি করা যায়, ঘুম ত আসবে না! সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে সেলফ্ হতে একটা গল্পের বই টেনে নিয়ে শিশির চেয়ারের উপর এসে বসে। অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পাতা খুলতেই ও চমকে উঠ্‌ল! বইয়ের মধ্যে সতীর ফটো! ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে!

সতী!......

রেবা, মলি, দুলু কত মেয়েই ত ওর চব্বিশ বছরের জীবনটার পথে এসে একে একে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং একে একে তারা বিস্মৃতির মসীপটে মিলিয়ে গেছে! সতীও এসেছিল ওদের মত একজন একদিন!

বিয়ের সমস্তই ত ওর সঙ্গে ঠিক একপ্রকার হয়েই গেছল! কিন্তু হ'ল না! কঠিন মৃত্যু বিচ্ছেদ ঘটাল। মৃত্যুর সময় টেলি পেয়েও শিশির সতীকে শেষ-দেখাটা দিয়ে আসতে পারে নি!

সহসা অনেকদিন আগেকার একটা কথা শিশিরের মনে পড়ে গেল। —আমি ছাড়া তোমাকে আর কোন মেয়েই পাবে না!

: তোমার এত গর্ব! জবাবে বলেছিল শিশির।

: গর্ব! না তা ত নয়; ভালবাসা!

: এ তোমার নিছক ফাঁকা কথা, নিজের ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস।

: এ আমার প্রেমের কষ্টিপাথর!

শিশির সেদিন হেসেছিল!

অতীতের ভুলে-যাওয়া স্মৃতির বেদনা মনকে বড় উতলা করে দেয়। শিশির ধীরে ধীরে এসে খাটের ওপর বসল!......

...কে? দরজায় কে ঘা দিচ্ছে না?... হাঁ, আবার দরজার গায়ে মৃদু আঘাতের শব্দই ত!

কে?

: আমি—

: কে তুমি?

: আগে দরজাটা খোলই না!

তাড়াতাড়ি উঠে শিশির দরজাটা খুলে দিল!

ঝড়ের মতই একটি তরুণী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল! সমস্ত চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো! কতকাল যেন তেল পড়ে নি! সমগ্র মুখখানি জুড়ে একটা ক্লান্ত অবসন্নতা!

তরুণী ধীরে ধীরে এসে চেয়ারটার উপর বসে পড়ল! টেবিল ল্যাম্পের আলো বেরিয়ে বাঁকা হয়ে ডান দিককার মুখের উপর এসে পড়েছে সন্ধানী আলোর কায়দায়!

কোথায়? কবে যেন এ'কে দেখেছি?......কোথায়? কবে? শিশিরের মনের মধ্যে অতীত স্মৃতি তোলপাড় করে ফিরতে লাগল।

: শিশির!

কে? এ কার গলা! এ গলা যেন ওর চেনা!

তরুণী আবার ডাকল, শিশির, তোমার নাকি বিয়ে?

: কে? কে তুমি? শিশির একপ্রকার চীৎকার করে উঠ্‌ল।

: আমি! কেন আজ কি আমায় চিনতেও চাও না? কিন্তু একদিন ছিল......সহসা তরুণীর গলার স্বর যেন কেমন রুদ্ধ হয়ে এল। তরুণী মাথাটা নীচু করল! রুক্ষ বিস্রস্ত চুলের রাশ মুখের দু' পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। শাড়ীর আঁচলটা গায়ের উপর হতে খসে নীচে এসে লুটিয়ে পড়েছে! সমগ্র শিথিল দেহখানি ব্যেপে কি করুণ মৃত্যু-রিক্ততা!......

শিশির অন্যমনস্কের মত চিন্তা করতে লাগল!

সহসা এক সময় তরুণী মুখ তুললে, চোখের জলে সমস্ত মুখখানি ভেসে যাচ্ছে!

: কে? সতী?......শিশির চীৎকার করে বললে।

: চিনতে পেরেছ?

: কিন্তু তুমি, তবে যে শুনেছিলাম টাইফয়েডে তুমি মারা গেছ—সেই কবে।

: ওগো মিথ্যে! সব মিথ্যে!......

: মিথ্যে! তবে তুমি সত্যিই মর নি!......

: না! না! না! আমি মরি নি! আমি মরি নি!...... সতী দু'হাত বাড়িয়ে শিশিরের বুকের উপর এসে আকুল-ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শিশির ভাবলে . সতী?......

শিশির!

সহসা দরজার বাইরে প্রবল ধাক্কা—দুম্‌দাম্—শিশিরের ঘুম ভেঙে গেল।

—অ-খোকা! দরজা খোল, কি কুম্ভকর্ণের মত ঘুম ছেলের, বাবা!

—দাদা, দাদা..

শিশির তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠে পড়ে চোখ দুটো রগড়াতে রগড়াতে দরজাটা গিয়ে খুলে দিল।

দরজার সমুখে দাঁড়িয়ে মা, বোনেরা, আরও যেন কোন কোন আত্মীয়া—

দধিমঙ্গলের সময় হ'ল যে, চল, শীগগির চল।

ফুলশয্যার রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এল! শয্যার ফুলগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে—দেহের স্পর্শে স্পর্শে ওগুলোর সুগন্ধ যেন তিক্ততায় পরিণত।

শিশিরের আজও যেন তেমন ভাল ঘুম হচ্ছে না। শিশির পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পাশে শুয়ে তার নবপরিণীতা স্ত্রী রমা—অকাতরে সে ঘুমোচ্ছে।

কখন যেন সকল নীরবতা ভঙ্গ করে ঘরের বাইরে থেকে বন্ধ দুয়ারের গায়ে সুরু হয়েছে অবিরাম উত্তেজিত করাঘাত। মাঝে মাঝে সে আঘাতের সঙ্গে চুড়ীর ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ স্পষ্ট ভেসে আসে শিশিরের কানে। উঃ কি আকুতিভরা নারীকণ্ঠ সারা কক্ষে গুমুরিয়ে ফেরে—এ মিথ্যে! এ মিথ্যে! আমি মরি নি! তোমায় ছেড়ে আমার মরবারও অধিকার নেই!

শিশির কোন দিকে তাকায় না, ধড়মড়িয়ে উঠে দোরের খিল খুলে টান্‌তে থাকে—কিন্তু আজ শত চেষ্টায়ও কিছুতেই খুলতে পারে না একটি পাল্লাও। টানাটানি করে হাত তার অসাড় হয়ে যায়......দোর খোলা হয় না। ইস্ দরজাটা এত কড়া হয়ে এঁটে গেল কি করে সহসা!......শিশিরের যেন বুক চিরে একটা তপ্ত শ্বাস মুক্তি পেতে চায়।......

কার চোখের সন্ধানী দৃষ্টি যেন রঞ্জন-রশ্মির মত দেহ ভেদ করে শিশিরের প্রাণের গোপন কবাট খুলে ফেল্‌তে চায়। না, সে অসহ্য, সে তীব্র রশ্মির বিজলীচমক শিশিরের চোখের সুপ্তি কাজল মুছে নেয় নিঃশেষে—নিশ্চিহ্নে.

ঘুমটা ভেঙে যেতেই শিশির চোখ বুলোতে থাকে কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে......তারপর দোয়ের দিকে......কি একটা শব্দে পাশে শোয়া পত্নীর দিকে তাকাতেই দেখে—টানা টানা চোখ দুটি মেলে ধরে রমা যেন তার স্বপ্নাতুর দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর মুখ থেকে কি এক অজানা ভাষা ছিনিয়ে নিতে চায়!

চার চোখের মিলন নির্বাকে কেটে যায় নিমেষের পর নিমেষ—সে যেন যুগ যুগ!

সহসা রমার যেন হুঁস্ ফিরে আসে—ঠোঁট দুটি তার অপরূপ স্পন্দনে কেঁপে ওঠে—কি হয়েছে বল ত, ঘুমের ভিতর অমন করে ককাচ্ছিলে কেন?

ঃ কই, না ত।

মধুর হাসি হেসে রমা এবার স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে—ককানর শব্দ শুনেই না আমার ঘুমটা ভেঙে গেল!

ঃ তা হলে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম হয়ত।

বলতে বলতে সহসা শিশির কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তখনও যেন তার কানে বহু দূর হতে এক ব্যথাতুরা নারীর আকুল মিনতি ভেসে আসছে—এ মিথ্যে!—এ মিথ্যে—মরি নি, আমি মরি নি।......

ছাত্র আন্দোলন

(২২৮ পৃষ্ঠার পর)

সহায়তা করছেন। এর পরিবর্তে তারা যদি সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি নিয়ে একে পুষ্ট করে তোলেন, তবে ছাত্রদের ভিতর থেকে অনেক অনৈতিকতা দূরীভূত হয়ে সর্বতোভাবে স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত যুবক সৃষ্টি হতে পারে। তার ফলে আমাদের জাতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

তাছাড়া ছাত্র-ফেডারেশনের ভিতরেও ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক জাতীয়তার আদর্শে ভালভাবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণকে ছাত্র-ফেডারেশনে Extra legal advisory position দেওয়া যেতে পারে। তেমনিভাবে শিক্ষক সমিতিতেও advanced student দেরে Extra legal consulting position দেওয়া যেতে পারে। এমনিভাবে ছাত্র ও শিক্ষক সমিতি পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং নানা কর্মধারার ভিতর দিয়ে সেই সব সম্পর্ককে জীবন্ত করতে পারে।

আজ আমাদের জাতীয় সমস্যা যেমন জটিল, জাতীয় শক্তিকেন্দ্রগুলিকে চারিদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করার যেরূপ উন্মত্ত প্রয়াস চলেছে—এ অবস্থায় প্রকৃত সংহতি স্থাপিত না করতে পারলে, সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সমস্ত শক্তিগুলিকে পুঞ্জীভূত করে তুলতে হবে একই ভিত্তিতে এবং একই কেন্দ্রে। ছাত্র-আন্দোলন যারা পরিচালিত করছেন এবং ছাত্র-আন্দোলনের যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাদের সবাইকে আজ এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। ছাত্র-আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও ছাত্র-শিক্ষক বিরোধ এ সবই দূরীভূত করে একে সুসংযত করতে হবে। ছাত্র-আন্দোলন আজ যে পর্যন্ত এগিয়েছে, এর পর আরও সুচারুরূপে এগোতে হলে শিক্ষকগণের সহায়তা অনিবার্য এবং দেশের অন্যান্য মনীষীবৃন্দের সহায়তাও প্রয়োজন। কিন্তু তারা যদি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও প্রগতি-মূলক মনোভাব নিয়ে আসেন, তবেই উহা সম্ভব। যাহা গড়ে উঠেছে সমস্ত বাধা ঠেলে আপনশক্তি বলে তার ভিতর যে potentiality রয়েছে, তা অস্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং একে দাবান যাবে না। এর বিরোধিতা করা নিষ্ফল। পরন্তু, বর্ধিষ্ণু ছাত্র-অভিযান যেন দিকহারা হয়ে নিজের শক্তিকে নিষ্ফল করে না দেয় সেদিকে আজকে আমাদের অবহিত হওয়ার দিন এসেছে। ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে মতবাদমূলক আলোচনার দিন গত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-আন্দোলন যেমন আজকে আর আলোচ্য বিষয় নয়, স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্য কর্তব্য, তেমনি ছাত্র-আন্দোলনও আজ আলোচ্য বিষয় নয়, গঠনযোগ্য। সুতরাং প্রকৃত জাতীয়তাবাদী গঠন-কারী মনকে এর নিয়ন্ত্রণও পরিচালনা ভার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে।

মুসলিম স্বার্থ ও যুক্ত নির্ব্বাচন

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

পৃথক্ নির্ব্বাচন ও যুক্ত-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে পাঠকবর্গ যুক্ত-নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তার দিকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বস্তুত দেশের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কোলাহলের দিনে যুক্ত-নির্ব্বাচন পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। পৃথক্ নির্ব্বাচন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইবে না, বরং আরও বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক বিষয় মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে আলোচনা না করিলে লীগপন্থীরা সন্তুষ্ট হইবেন না। সেই জন্য এবার মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে আলোচনা করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইব কোনটা তাহাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রদ। মুসলিম লীগ এইজন্য পৃথক নির্ব্বাচনকেই পছন্দ করিয়া থাকিবে যে উহাতে মুসলমানদের নিজেদের মনোনীত লোক আইন সভায় প্রেরিত হইতে পারিবে। আর সেই নির্ব্বাচনে কোন অ-মুসলমান কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। মুসলিম নেতারা তাঁহাদের সমাজের স্বার্থ রক্ষার ভার কেবলমাত্র মুসলিম সমাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ছাড়িয়া দিতে চান। এমন কোন মুসলমানকে তাঁহারা প্রেরণ করিতে চান না, যাঁহাদেরকে ভোটের জন্য অ-মুসলমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। অথবা যাঁহারা অ-মুসলমানদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে চায়। তাঁহাদের এই দাবী ব্রিটিশ সরকার আগ্রহের সহিত পূর্ণ করিয়াছেন। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় পৃথক্ নির্ব্বাচনই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদীদের শত চেষ্টাতেও যুক্ত-নির্ব্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হয় নাই। বহুদিন পর্যন্ত যে এই পৃথক্ নির্ব্বাচন পদ্ধতি অব্যাহত থাকিবে তাহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, মুসলমানদের প্রার্থিত দাবী তাহারা পাইয়াছে। ইহার পরেও যদি তাঁহারা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা হইল না বলিয়া চীৎকার করেন, তবে তাহা অন্যায় আব্দার হইবে, অথবা বুঝিতে হইবে যে, পৃথক্ নির্ব্বাচনও তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না। পৃথক্ নির্ব্বাচন পাইয়াও যদি মুসলিম স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত না হয়, তবে সে দোষ কাহার? আমরা বলিব এই দোষ পৃথক্ নির্ব্বাচনের, এ দোষ আমাদের নেতাদের অদূরদর্শিতার। যুক্ত-নির্ব্বাচন গ্রহণ করিলে তাঁহাদেরকে এইরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইত না।

ভারতবর্ষের একাদশ প্রদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই মুসলমান বসবাস করিয়া থাকে। তন্মধ্যে চারিটি প্রদেশে যথা, সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, অন্য সম্প্রদায়ের সাহায্য না লইয়াই আইন সভায় তাহারা কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। কিন্তু বাঙলা ও পাঞ্জাবে তাহা সম্ভব হইবে না। তৎসত্ত্বেও ধরিয়া লইলাম যে, এই চারিটি প্রদেশে মুসলমানের কোনই অসুবিধা হইবে না। এই প্রদেশ চতুষ্টয়ে তাঁহারাই কর্ত্তৃত্ব করিবেন, তাঁহারাই শাসনকার্য্য চালাইবেন। কিন্তু বাকী সাতটা প্রদেশে তাঁহাদের অবস্থা কি হইবে, বা হইতে পারে, তাহা কি লীগ নেতাগণ একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এই সাতটি প্রদেশের আইন সভায় ওয়েটেজ সহ মুসলমানদের জন্য কতগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট আছে তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে বলি:—

	সাধারণ	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
আসাম	৪৪	৩৪	৩০	১০৮
মাদ্রাজ	১৩৪	২৯	৫২	২১৫
মধ্য প্রদেশ	৭৭	১৪	২১	১১২
বোম্বাই	১০৯	৩০	৩৬	১৭৫
যুক্ত-প্রদেশ	১৩২	৬৬	৩০	২২৭

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মোট আসনের তুলনায় মুসলমানের আসন অতি নগণ্য। এই সাতটি প্রদেশে তাহারা চিরকালই সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিবে। ভবিষ্যতে লীগ-কংগ্রেস আলোচনার পর আরও কতিপয় আসন বাড়াইয়া লইলেও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার কোনই সম্ভাবনা হইবে না। বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সরকার যে প্রাদেশিক অটোনমী দিয়াছেন ভবিষ্যতে যদি তাহার ক্ষমতা ও অধিকার আরও প্রসারিত করিয়া দেন তবুও মুসলমানের আসন সংখ্যা বাড়িবার উপায় থাকিবে না। পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই মুসলমান সদস্য প্রেরিত হইবে। সুতরাং মুসলমানের সহিত হিন্দু সদস্যদের কোনওরূপ বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। হিন্দুরাও ত পৃথক্ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে। সুতরাং তাহারাও মুসলমানের অনুভূতি ও সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য থাকিবে না। এবং মুসলমানের সাহায্য ও সহযোগিতার কোনই দরকার হইবে না। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রচারের ফলে যদি কংগ্রেস দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মহাসভাই প্রবল হয়, তবে মুসলমান উক্ত সাতটি প্রদেশে দাঁড়াইবে কোথায়? মুসলিম লীগ যেমন মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকেই নির্ব্বাচন ইস্তাহারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করিবে, হিন্দু মহাসভাও ত সেইভাবে হিন্দু স্বার্থকেই বড় করিয়া ধরিবে। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মহাসভাই ত ক্যাবিনেট গঠন করিবে। সেরূপ অবস্থায় পৃথক্ নির্ব্বাচন মুসলমানের কি কাজে আসিবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাসভার ক্যাবিনেট গঠনে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া গবর্ণর অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে চাইবেন না। তাঁহাকে মহাসভার মনোনীত ক্যাবিনেটকেই স্বীকার করিতেই হইবে। কতকগুলি সঙ্গীন অবস্থা উপস্থিত হইলে লাট সাহেবের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু তিনি সহজে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না। সেরূপ বিশেষ ক্ষেত্র সহজে উপস্থিত হইবে না। ভারত আইনের বিধি লঙ্ঘন না করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানকে দমন করিতে উদ্যত হইলে, লীগ-পন্থীদের হাতে কোনই প্রতিকার নাই। পৃথক্ নির্ব্বাচনের কারণে, হিন্দুরা ইচ্ছা করিলে সাতটা প্রদেশের একটাতেও কোন মুসলমানকে মন্ত্রিমণ্ডলে না লইতে পারে। বা কোন সুবিধা না দিতে পারে। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ, অথবা বিভেদমূলক আইন পাশ প্রভৃতি বিষয়ে না হয় মন্ত্রীদের হাত পা বাঁধা আছে। কিন্তু এমন বহু বিষয় আছে যাহাতে মুসলমানেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, অথচ কি লাট-দরবারে, কি আইন সভায় তাহার কোনই প্রতীকার হইতে পারে না। ভারত আইনের আক্ষরিক বিধি ভঙ্গ না করিলেই হইল, কৌশলে তাহার Spirit অনুসারে না

চলিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান কি করিতে পারে? হয়ত জিন্নাপন্থিগণ বলিবেন, আমরা মুসলিম প্রধান প্রদেশে উহার প্রতিশোধ লইব। কিন্তু তাহা মাত্র দুইটিতে সম্ভব হইবে। বাঙলা ও পাঞ্জাবে তাহা সম্ভব হইবে না। তাছাড়া প্রতিশোধ লইলেই কি সাতটি প্রদেশের মুসলমানের অসুবিধা দূরীকরণ হইবে? প্রতিশোধ গ্রহণের পাল্টা জবাবে মুসলমানই যে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পৃথক্ নির্ব্বাচনের কারণে সাতটা প্রদেশে মুসলমান কোণঠাসা হইয়া রহিবে। অথচ যেখানে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে নিজেদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। এই দিক দিয়া পৃথক্ নির্ব্বাচন মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য মোটেই উপযোগী নহে। ইহা মুসলমানের ক্ষতিরই কারণ হইবে, এবং ইহা যদি আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে, তবে মুসলমানের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিবে।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল সে বিষয়ে দু'একটা কথা বলিব। প্রত্যেক কংগ্রেস-সেবী মনে করে যে, কংগ্রেস সমগ্র জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। কয়জন মুসলমান, অথবা কয়জন হিন্দু কংগ্রেসী ক্যাবিনেটে স্থান পাইল, ইহা লইয়া কংগ্রেস মাথা ঘামায় না। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে হিন্দু কংগ্রেসী যেমন মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিবে, মুসলমান কংগ্রেসীও সেইরূপ হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করিবে। বিগত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস একটা জাতীয় পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া নির্ব্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাহাতে জয়লাভ করে এবং সেই ভিত্তিতেই কংগ্রেস ক্যাবিনেট গঠন করিয়াছে। লীগপন্থীদের মিথ্যা প্রচারের ফলে অধিক মাত্রায় কংগ্রেসী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই। কিন্তু যুক্ত-নির্ব্বাচন অব্যাহত থাকিলে বহু কংগ্রেসী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন। পার্টি গবর্ণমেণ্টের নিয়মই হইতেছে আপনার পার্টি ব্যতীত অন্য পার্টির লোক লইয়া মন্ত্রিত্ব গঠন করা চলে না। সেরূপ করিতে গেলে কার্যক্ষেত্রে নানা গণ্ডগোল আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কংগ্রেস অন্য পার্টির কোন লোককে তাহার ক্যাবিনেটে স্থান দেয় নাই। ন্যায়-নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের দিক হইতে ইহা একটুও অন্যায় নহে। অ-কংগ্রেসী হিন্দু অথবা অ-কংগ্রেসী মুসলমান কাহাকেও মন্ত্রিমণ্ডলে লওয়া হয় নাই। ইহাতে ক্ষোভের কারণ নাই, লজ্জার কারণ নাই বা সংস্কৃতিনাশের আশংকা নাই। কংগ্রেসের টিকিটে উপযুক্ত পরিমাণে মুসলমান নির্ব্বাচিত হইলে তাহারাই হয়ত কর্তৃত্ব করিত। কংগ্রেস কতকগুলি মুসলমানকে খাড়া করিয়াছিল, কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচনের কারণে তাহারা সুবিধা করিতে পারে নাই। এ দোষ কাহার? এ দোষ পৃথক নির্ব্বাচনের, এ দোষ লীগপন্থী নেতাদের। তাঁহারা নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসী মুসলমানকে ভোট দিতে নিষেধ করিলেন। আবার নির্ব্বাচনের পর মুসলমানকে অধিক সংখ্যায় ক্যাবিনেটে লওয়া হইল না বলিয়া কংগ্রেসকে নিন্দা করিতে কসুর করিলেন না। এইরূপ পার্টি প্রথায় যে আইনসভার নির্ব্বাচন হইবে, তাহা পূর্ব্বেই লীগওয়ালাদের জানা উচিত ছিল। আজ তাঁহাদের নীতির ব্যর্থতা স্পষ্ট হইয়া প্রকট হইয়াছে। আজ কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে কর্তৃত্ব করিতেছে, কিন্তু সেখানে যদি হিন্ মহাসভা কর্তৃত্ব করিত তবে বুঝি খুবই ভাল হইত? এ সাতটি প্রদেশে হিন্দুর উপর মুসলমানের কোন দাবী বাধাবাধকতা নাই। মুসলমানকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে হিন্দুর উপর, হিন্দুদের দয়ার উপর। হিন্দুরা ইচ্ছ করিলে তাহাদের প্রত্যেক দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। এ অবস্থার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে হিন্দুকে মুসলমানে উপর নির্ভর করিতে বাধ্য করা। যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রবর্তি না হইলে হিন্দু কোনও দিনই মুসলমানের উপর নি করিবে না। এই বাধ্যবাধকতা ও নির্ভরশীলতা হইতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব জাগিবে। এবং যেখানে মুসল মান সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে ম্যাজরিটির চাপে মুসলমান পি হইবে না, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার অবসান হইবে। মুসলমা বলিয়া কোন দল থাকিবে না, হিন্দু বলিয়া কোন দল থাকিবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ অনুসারে বিভিন্ন দ গঠিত হইবে।

জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের ইচ্ছা অনুসারে ভারত-আইনে যদি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যুক্ত নির্ব্বাচন প্র বিধিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে দেশের কিরূপ অবস্থা হইত তা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। লীগপন্থিগণ প্রায় বলিয়া থাকেন যে, কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানদের উপ অত্যাচার হইতেছে। যদিও এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা তর্কস্থলে ধরিয়া লইলাম এগুলি সবই সত্য। দেখিতে হইবে কেন এরূপ হইতেছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথক-নির্ব্বাচ হিন্দুকে মুসলমানের নিকট কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় আব করিতে পারে নাই। অত্যাচার হইলে কোনই প্রতীকার নাই কিছু হৈ চৈ হইবে, হয়ত ইহার ফলে কংগ্রেসের শক্তি কিছু কমিবে। কিন্তু অবিচারের প্রতীকার হইবে না। মুসলমা যদি মুসলিম স্বার্থের অজুহাতে নির্ব্বাচন যুদ্ধ করে, হিন্দু ত সেইরূপ করিবে। আর যেখানে উভয়ের মধ্যে স্বার্থসংঘা আছে সেখানে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ দেখিতে বাধ্য নহে হিন্দু ভোটারদের 'ম্যাণ্ডেট' অগ্রাহ্য করিয়া কোন্ যুক্তিতে হিন্দু সদস্য হিন্দুর স্বার্থ পদদলিত করিয়া মুসলিম স্বার্থ দেখিতে যাইবে? পৃথক নির্ব্বাচনের ইহা অপরিহার্য পরিণতি। কিন্তু যুক্ত নির্ব্বাচন এই অবস্থা হইতে দিবে না। তখন সর্ব্বজনীন আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া দল গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক দলেই মুসলমান থাকিবে। যে কোনও দল জয়লাভ করুক না কেন, সেই দলের মধ্যে কতিপয় মুসলমা প্রাধান্য লাভ করিবে। ক্যাবিনেট গঠন করিবার সময় কো দলেই মুসলমানের অভাব হইবে না। এবং হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানই আপনার ত্যাগ ও যোগ্যতা বলে প্রাধান্য লাভ করিবে। এই ত গেল একদিকের কথা, অন্যদিকে যুক্ত নির্ব্বাচন সাধারণ লোকের উপর অপূর্ব্ব প্রভা বিস্তার করিবে। আজ দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতার অজুহাতে মুসলিম নেতারা নিজেদের মানসিক দৈন্যের পরিচয় দিতেছেন

(শেষাংশ ২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

১২

নিবিড়ভাবে অমরের পরিচয় পাইবার নরেন্দ্রের সুযোগ ঘটিল গাড়ীতে। লীলার কাছে অমরের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বরাবরই অমরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল। পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, নরেন্দ্র ততই বুঝিল অমরনাথ শুধু শ্রদ্ধার পাত্রই নহে তাহার ঐ ধীর গম্ভীর মূর্ত্তির অন্তরালে যে একটি স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয় রহিয়াছে, তাহার কাছে অনিচ্ছায়ও আপনা আপনি মাথা নত হইয়া পড়ে।

নরেন্দ্রনাথ, লীলা ও সতীশকে লইয়া একটি সেকেণ্ড ক্লাস আমরা রিজার্ভ করিয়া কলিকাতা ফিরিতেছিল, ষ্টেশনেই অমরের সহিত দেখা হইয়া গেল। অমর তৃতীয় শ্রেণীর একখানি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে দেখিয়া লীলা হাতছানি দিয়া অমরকে নিকটে ডাকিল। বলিল, তুমিও কলকাতা যাচ্ছ অমরদা? এসনা তবে সকলে এক গাড়ীতেই যাই।

অমরনাথ লীলার নিকটস্থ হইয়া বলিল, আমার জিনিষ-পত্র সব অন্য গাড়ীতে উঠেছে। তারপর আমার থার্ড ক্লাসের টিকেট।

হোকনা বদলে নিলেই হবে। আমাদের রিজার্ভ গাড়ী।

পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল একটা কুলী ডেকে দাওনা, অমরদার জিনিষপত্তর নাবিয়ে নিয়ে আসুক।

বাধ্য হইয়া অমরকে লীলাদের গাড়ীতেই যাইতে হইল। গাড়ীতে উঠিলে লীলা কহিল, তুমি যে এরই মধ্যে চ'লে আসবে তা ত বলনি অমরদা! আর আমিও হঠাৎই চ'লে এলাম, তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে পারিনি। রাগ করনি ত?

রাগ আবার করিনি, বেজায় রেগে গেছি, এই মহা অপরাধের জন্য!

লীলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কি মানুষ তুমি অমরদা, সেদিন এত ক'রে অপমান করে দিলাম, এতটুকুও তোমার লাগলে না। গা নয়, যেন গণ্ডারের চামড়া। অনুভূতি তোমার ম'রে গেছে?

কোন্ কালেই বা ছিল যে, তাই ম'রে যাবে! ওসব ইমোশন সেণ্টিমেণ্ট কবিদের জন্য—কি বলেন সতীশ বাবু?

সতীশের পানে চাহিয়া অমরনাথ মৃদু হাসিল। কবি বলিয়া খোঁচা খাওয়া সতীশের একরূপ গা সহা হইয়া গিয়াছিল। তবুও অমরের হাসিবার ভঙ্গীতে সতীশ যেন কেমন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। হাসিটুকু এমনই যে তাকে ঠাট্টাও বলা চলে না, অথচ স্বাভাবিক বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায় না। খোঁচাও ওতে লাগে, কিন্তু রাগ করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই লোকটীর কাছে এলে সতীশের সমস্ত কবিত্ব নিঃশেষে ফুরাইয়া যায়।

নরেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এইবার কহিল,—ইমোশন সেণ্টিমেণ্টের সমালোচনা না হয় পরেই হবে- কিন্তু আজই যে কলকাতা যাচ্ছেন?

অমর বলিল, সকালে তার পেয়েছি আমার স্ত্রীর অসুখ।

বৌদির অসুখ; কি অসুখ অমরদা?

কি অসুখ তা ত লিখেনি। শুধু তার শক্ত অসুখ খুব শীগ্‌গির এস।

তবে ত খুব ভাবনার কথা! তুমি খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ, না অমরদা?

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, বিশেষ ব্যস্ত আমি কিছুতেই হইনে বোন্, তবে তার অসুখ একটু চিন্তার কারণ হয় বই কি!

প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন হাসি দেখিয়া লীলা চমকিত হইল। সঙ্কোচহীন স্বাভাবিক মমতা-মাখান বোন সম্বোধনে তাহার অন্তরাত্মা জুড়াইয়া গেল। কত আত্মীয়তা—কত ভ্রাতৃত্ব যেন ঐ বোন সম্বোধনের ভিতর হইতে রূপ ধরিয়া লীলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তার চিত্তের এত দিনকার গোপন বিদ্রোহ সে স্নেহের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

মমতা-মাখা করুণ দৃষ্টি দিয়া অমরের পানে চাহিয়া লীলা বলিল,—কোন শক্ত অসুখ নয়ত অমরদা?

পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—আমরা কিন্তু বৌদিকে আগে দে'খে তবে বাড়ী যাব।

অমরনাথ নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, বোন্‌টির আমার বড়ই কোমল মন, জানেন নরেনবাবু! আমাকে ও খুব ভালবাসে। মায়ের পেটের বোন হলেও ওর চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারত না। ছেলেবেলায় কত আব্দারই ও আমার কাছে করেছে। আবার সামান্যতেই খুব খুশী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বড় সেণ্টিমেণ্টাল। তবে ওর দোষ কিছু বলবেন ত অমনি কেঁদে ফেলবে। আবার পরক্ষণেই দিব্যি হাসবে। এই সব মেয়েদেরই ত হিষ্টিরিয়া হয়। ওর ওই স্বভাবের জন্য আমি ওকে পাগলী বলে ডাকতাম।

লীলা নরেন্দ্রকে ছোট একটি ঠেলা দিয়া বলিল, তুমি শুননা অমরদার কথা, মিছিমিছি আমার নিন্দে হচ্চে।

নরেন্দ্র হাসিল। অমর বলিতে লাগিল,—মিছিমিছিরে পাগলী, জানেন নরেন বাবু, এতটা বড় হয়েছে, তবু বুদ্ধি ওর ছেলে বেলাকার মতনই আছে। সেদিন কিনা ব'লে ফেললে অমরদা ওর সত্যিকারের দাদা নয়।

এইবার লীলা লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। গাড়ীর মুক্ত বাতায়নে মুখ রাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিল। অমর বলিতে লাগিল,—অথচ ও জানে আমি ওর সত্যিকারের দাদা! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একটা কথা, সেখানেই থেমে গেলে বুঝতাম না হয় পাগল নয়। তাকেই আবার রক্ষা করতে যেয়ে অস্বাভাবিক কথা ব'লে ফেললে লোকে পাগল বলবে না! ভায়ের পরামর্শ নইলে যে বোনের আজও কোন কাজ চলে না, সেই বোন ভাইকে অস্বীকার করলে তাকে পাগল ছাড়া কি ভাবব বলুন!

বাতায়ন হইতে মুখ ফিরাইয়া লীলা ক্রুদ্ধ অভিমানে কহিল,—মিথ্যে কথা বলতে তুমিও জান অমরদা! যাও

তুমি সামনের ষ্টেশনেই নেবে অন্য গাড়ীতে।

অমরনাথ হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র আর সতীশও হাসিয়া উঠিল। হাসিয়াই অমর কহিল, এবার বাড়ী যেয়ে মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিবেন। শুধু কি পাগলামি,—অভিমানও দিদিটির আমার কম নয়।

নরেন্দ্র কহিল, আপনার বোনের পাগলামী হয়ত কিছু আছে, অভিমানের পরিচয় কিন্তু আমি বড় পাইনি অমর বাবু।

পান্নি? বিস্মিত হইয়া অমর নরেন্দ্রের পানে চাহিল।

নরেন্দ্র কহিল,—না পাইনি। আমি পেয়েছি মান-অভিমান-বোধশূন্যা এক নারী—স্বামীর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে ডুবিয়ে দিয়ে যে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে। অন্তত এইটুকুই আমি বুঝেছি!

অমরনাথ কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে কহিল,—সেই আশীর্বাদই আমি ওকে করি নরেন বাবু। ও নিজের সত্তা ভুলে গিয়ে স্বামীর সত্তায় মিলিয়ে যাক্। তা যদি ও পেরে থাকে, তবে বুঝবে আপনি ভাগ্যবান। আর আমার শিক্ষাও ওর বেলা সার্থক হয়েছে।

তারপর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অমর সুগম্ভীর স্বরে ডাকিল, "লীলা!"

সে স্বর শুনিয়া লীলা চমকিয়া উঠিল। ভীতিবিহ্বল কাতর চক্ষু তুলিয়া অমরের পানে চাহিল। অমর বলিল, নরেনবাবু যা বল্লেন তা সত্য লীলা?

কাতর কণ্ঠে লীলা কহিল,—কি অমর দা?

এই যে মান অভিমান কিছুই তোমার নেই!

লীলা সহসা হাসিয়া উঠিল, বলিল,—শোন কথা, রক্ত মাংসের দেহের আবার মান অভিমান থাকে না! মানুষ দেবতা কি না—বল্লেই অমনি হল! তবে ছেলে বেলাকার অভিমান কি চিরকালই সমান থাকে অমরদা!

নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস করবেন না অমরবাবু, এ মিথ্যা, এ ফাঁকি, অভিমান ওর কোন কালেই নেই!

লীলা নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া অমরকে কহিল, মহা-পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করত মেয়েদের মান-অভিমান বোঝবার শক্তি ওঁর আছে কি না। উনি ত সবে ওঁর কবি বন্ধুর সাক্রেদি কর্ছেন!

বলিয়াই লীলা স্বামীর দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল।

সতীশ কহিল,—সব কিছুতেই আমাকে জড়ান বৌদির চাই-ই! বৌদি যা বলেছেন তা সত্যি। বন্ধুর আমার যত বুদ্ধিই থাক্ বৌদিকে বোঝবার মত তীক্ষ্ন বুদ্ধি ওর ঘটে নেই!

অমরনাথের তরফ হইতে কোন জবাব আসিল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমর কতক্ষণ লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে গাড়ীর বাতায়নপথে মুখ রাখিয়া লীলার কথাই ভাবিতে লাগিল। তবে কি আজও লীলা তাহাকে ভুলিতে পারে নাই? আজও কি সারা দেহ, মন, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না জীবনের যা কিছু সব দিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে পারে নাই! তার স্বামীর সঙ্গে এতদিনকার ব্যবহার তবে কি অভিনয়? এই যে নিঃশেষে আত্মনিবেদন—আদর্শ হিসাবে যত বড়ই হউক—স্বামীর ইচ্ছায় নিজের সুখ দুঃখ বিলাইয়া দেওয়া স্বামীভক্তির দরবারে যত উচ্চ আসনই পা'ক্, প্রকৃত প্রণয়ের মাপকাঠিতে এই প্রাণহীন অভিনয়কে অমর খুব বড় বলিয়া ভাবিতে পারিল না। অমরের ধারণা মানুষের স্বভাব বদ্লায় তখনই যখন মানুষ নিজকে লুকাইয়া দশজনের সম্মুখে অভিনয় করে, না হয় দুঃখের প্রাচুর্য্যে হৃদয় যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে।

অমরকে নীরব দেখিয়া লীলা কহিল, চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখছ, অমরদা?

অমরনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল,—তোর কথাই ভাব্ছি লীলা, এত শীগ্গির তুই কত বদ্লে গেছিস্! মানুষের জীবনের যা স্বাভাবিক ধারা তা যখন বদলায় তখন সে মরে যায়—না হয় বুড়ো হয়!

অমরকে শেষ করিতে না দিয়াই সতীশ বলিয়া উঠিল,—এ অতি সত্যি কথা, অমরবাবু! সবুজ মনের তরুণ প্রাণের স্বাভাবিক তারুণ্য যে হারিয়ে ফেলে সে হয় মরা না হয় বুড়ো। বেঁচে থাকার কোনই সার্থকতা নেই তার।

লীলা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—শুনছ, তোমার বন্ধু বল্ছেন, আমি বুড়োই হয়েছি না হয় মরেই গিয়েছি!

পরে অমরের দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি নিশ্চিন্ত থাক অমরদা, আমি মরেও যাইনি, বুড়োও হইনি! ম'রে গেলে ওঁর দুঃখ থাকত না। বুড়ো হলেই যা মুস্কিল। রাখাও যেত না, ফেলাও চলত না।

শেষ কথাটি লীলা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল। পরে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সতীশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—কবিদের নূতনত্বেই আনন্দ, না ঠাকুরপো? কত স্তুতি—কত পূজো ঐ নূতনের পায়ে! চাই কি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত কবিতার জন্ম হ'তে পারে। আমার কিন্তু ভারী লজ্জা করে যখন আপনারা লালসার নগ্ন রূপকে কথার পর্দায় ঢেকে প্রেমের কবিতা লেখেন। বাহাদুরী আছে আপনাদের। আপনারা ভাবেন—বেশ ত, লোকেও বলে চমৎকার। কিন্তু শুধুই না তার ঐ বাইরের রূপ। খোলস ফেলে দিলে আসল জিনিষই বেরিয়ে পড়ে। আমার চোখ জ্বালা করে। এ শুধু প্রতারণা—একা পরকেই নয়—নিজকেও। বল্বেন—এ শুধু মানুষের মনে আনন্দ দেবার জন্য। দ্বারে দ্বারে পরের জন্য ভিক্ষাকে পরোপকারে সাহায্য প্রার্থনা বলা চলে, কিন্তু তাতে নিজের দৈন্য ঢাকে না। প্রশংসা অনেকে করে। কেউ কেউ ভিক্ষুক বলে উপহাস করতেও ছাড়ে না।

সতীশ কহিল,—আপনার হেঁয়ালী বোঝবার মত বড় কবি আমি নই, বৌদি। সৌন্দর্য্যের বন্দনাগীতি ও চির-সুন্দরের স্তুতি-গান। তাতে দৈন্য লজ্জার কি আছে? যুগে যুগে এই গীতি এই প্রেম-সঙ্গীতে বিশ্বমানবের মন মুগ্ধ হয়েছে। কবি বিশ্বকে আনন্দ দিয়েছে দিচ্ছে, দেবে। তারা যে ভক্ত। বিশ্বের বেদনা আনন্দ সুখ দুঃখ নিজের প্রাণেই তারা খুঁজে পায়।

লীলা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল,—রক্ষে করুন ঠাকুরপো, আমি কবিও নই, কবির মর্মকথা বুঝতেও পারব না। আমি একথা কোথাও বলিনি কবির অবদান আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দ ত দেবেই। নিজের মনের মত কথাটি—যা প্রকাশ করবার ভাষা তার নেই, সেইটিই পাচ্ছে সে কবিতার ভিতর—আরও সুন্দররূপে। সৌন্দর্যের নামে যারা লালসা প্রচার করে, তারাই ত আপনাদের কাছে কবি। অন্তরের সৌন্দর্য দেখবার দৃষ্টি নেই, শুধু খোলস নিয়ে আস্ফালন।

সতীশ কহিল,—তাই বলে দেহের ওপরই কবির দৃষ্টি এ আমি মেনে নিতে পারছিনে বৌদি! দেহ ছেড়ে বিদেহী মনের অস্তিত্ব, তার স্বরূপ, দার্শনিকের চিন্তার বিষয় হয়ত হ'তে পারে। কবিরা দেহ ছেড়ে শুদ্ধ মন নিয়ে চলতে পারে না। দেহের ওপরই প্রকাশ পায় মনের ক্রিয়া। তাই বলে কবির রূপ-স্তুতিকে শুধু দেহের পূজা বলে ভাবলে আপনার অন্যায়ই হবে বৌদি! দেহকে একরূপ অস্বীকার করেই না সত্যকার কত কবির লেখনীতে প্রেমের অমর-সঙ্গীত ফুটে উঠেছে।

সতীশের কথা শেষ হইতে না হইতেই একটি বড় ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। উভয়ের আলোচনা-স্রোত বন্ধ হইল একটি ভদ্রলোকের আকস্মিক আগমনে। ভদ্রলোকটি সতীশদের কামরায় উঠিতে যাইতেছিলেন, সতীশ মুখ বাড়াইয়া বলিল,—দেখছেন না এটা রিজার্ভ গাড়ী- সেকেণ্ড ক্লাস!

কিন্তু ভদ্রলোকটির পশ্চাতে একটি সুতন্বী তরুণীকে দেখিয়া সতীশের অসমাপ্ত বাক্য আর বলা হইল না। ভদ্রলোকটি সিঁড়ি হইতে পা নামাইয়া বলিলেন,—ও, সেকেণ্ড ক্লাস—আমার ইণ্টারের টিকেট! মেয়েটিকে নিয়ে কোথাও একটু ঠাঁই পেলাম না মশায়, মেয়েদের গাড়ীতেও পা দেবার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই।

ক্ষুণ্ণ মনে ভদ্রলোকটি অন্যদিকে চলিলেন। লীলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, নিটোল স্বাস্থ্যের ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা একটি সুশ্রী মেয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। মেয়েটি রূপসী। রূপ যেন তার পরিপূর্ণ দেহ হইতে উপছিয়া পড়িতেছে।

লীলা নরেন্দ্রকে বলিল,—ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন মেয়েটিকে নিয়ে, অতিরিক্ত ভাড়াটা না হয় তুমিই দিতে!

নরেন্দ্র রূপসী মেয়েটির স্বচ্ছন্দ অথচ সলজ্জ গতিলীলা চাহিয়া দেখিতেছিল। বলিল,—তোমাদের কাব্যচর্চা কিন্তু আর জমবে না তা হ'লে।

—তা নাই জমুক, তুমি ডেকে ফেরাও।

নরেন্দ্র ডাকিল,—ও মশায়, শুনছেন, ও মশায়।

ভদ্রলোকটি তখন অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রের ডাক শুনিতে পাইলেন না। সতীশের মনে হইল অপরাধ তারই বেশী, কারণ সে-ই ভদ্রলোকটিকে উঠিতে নিষেধ করিয়াছে। লীলার দিকে চাহিয়া সতীশ কহিল,—ডেকে আনব বৌদি, বিপদের সময় ভদ্রলোকটিকে গাড়ীতে উঠতে না দেওয়া সত্যিই আমাদের উচিত হয়নি!

বলিয়াই সতীশ নীচে নামিতেছিল। লীলা নিষেধ করিয়া বলিল,—আর নেমে কাজ নেই। গাড়ী এখুনি ছেড়ে দেবে! আপনাকে অত ব্যস্ত হ'তে হবে না ঠাকুরপো, অমন সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে থাকলে গাড়ীতে স্থানের অভাব হবে না ওঁর। প্রথমে কেউ আপত্তি করলেও পেছনের এই মেয়েটিকে দেখলে আপনার মত মত বদলাতেও কারুর বেশী সময় লাগবে না। কবি ত আর আপনি একা নন, ঘাটে-পথে কবি চরিত্রের মানুষ অনেক মেলে, ঠাকুরপো!

সতীশের জবাব দিবার কিছুই রহিল না। কথা কয়টি বলিয়া লীলা সতীশের পানে এমন দৃষ্টিতে চাহিল যে তেমন দৃষ্টি সতীশ লীলার চোখে আর কোন দিন দেখে নাই। তাতে ভর্ৎসনা ছিল, স্নেহের শাসন ছিল, তীব্রতা ছিল—নারীত্বের মহিমাও ছিল। আরও কিছু ছিল কিনা সতীশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অন্যায় কাজ করিয়া ধরা পড়িলে দুষ্ট ছেলে যেমন মায়ের কাছে এতটুকু হইয়া যায় সতীশও লীলার দৃষ্টির সম্মুখে তেমনই এতটুকু হইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

কায়া ও ছায়া

শ্রীঅমলা গুপ্তা

ভারতের যুগ-যুগাগত ঐতিহ্য স্ত্রীকে স্বামীর ছায়ায় পরিণত করিয়াছে। এই আনুগত্য ও সর্ব্বথা আত্ম-সত্তা অস্বীকার সকল দেশেই প্রাচীনকালের প্রচলিত নিয়ম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যে স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক সত্তা—পৃথক ব্যক্তিত্ব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইজন্য বহুপ্রকার প্রয়াস চলিয়াছে।

আমাদের দেশেও আমরা দেখিতে পাই—স্বামী যদি স্ত্রীর উপর দুর্ব্ব্যবহার করে, এমন কি, প্রহারও করে, তথাপি স্ত্রী তাহা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবে না, উপরন্তু তাহা যাহাতে গোপন থাকে, তেমন আত্মজনও জানিতে না পায়, সেই জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় না।

আবার এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুখরা স্ত্রীর বাক্য-জ্বালায় জর্জ্জরিত কিম্বা স্ত্রীর আদেশ অমান্য করিবার সাহসহীন ভীরু স্বামী সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে, যাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি না জানিতে পারে তাহাদের বিবাহিত জীবনের প্রকৃত অবস্থা।

অবশ্য চরম দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা হইতেছে; তাহা বলিয়া যে দেশশুদ্ধ আধুনিক-আধুনিকাই এই প্রকার অথবা কাল-মাহাত্ম্যে এই রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে এমন কথা নয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে অবস্থা একটু স্বতন্ত্র রকমের। সে দেশে কি নারী কি পুরুষ—সকলেই যেন একটা ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত আপন আপন তারুণ্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত। কাজেই তাহাদের কাছে আপন আপন ব্যক্তিত্ব রক্ষা—সমাজের চোখে আপন বিশিষ্টতা, এমন কি, জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনী অপেক্ষা অধিকতর ব্যক্তিত্ব-গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যেন রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে তারুণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বা মর্য্যাদার সম্পর্ক কোথায়?—প্রত্যক্ষ না থাকিলেও পরোক্ষ যে আছে এবং পাশ্চাত্য মনোবৃত্তিতে যে তাহা অমোঘ এ কথা কল্পনা-বিলাস নয়। তারুণ্য বলিলে কি একটা মুক্তি ও স্বাধীনতার ভাব ফুটিয়া উঠে না সকল বন্ধন সকল নিয়ম, সকল গতানুগতিকতা ছাপাইয়া? সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্য কিছুকালের জন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনীসহ, যুগলে যুগলে সম্পন্ন করিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন এই যুগলত্ব তাহার মনে যেন বয়োবৃদ্ধির একটা ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সেই সকল কাজ একক করিয়া যাইত, তবে কোন বন্ধন বা নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া যথেচ্ছ আচরণের স্বাধীন-চিন্ততায় প্রতিষ্ঠিত থাকিত, বে-পরোয়া তারুণ্যের সবুজতায় সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিতে পারিত। শুধু সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাহচর্য্য তাহাকে করিয়াছে নিগড়বদ্ধ—বিশ্ব ছাপাইয়া যে মুক্তির স্বাদ, তাহা তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতার অভাবে (তাহা যে মাত্রারই হউক) তাহার তারুণ্য যেন অতীতের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্যে তাই ভারতের ন্যায় স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আচরণ যেমন লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা চলে, তেমনই চলে একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অমানুষিক প্রয়াস। যদিও দর্শকের চক্ষে তাহাদের শ্যাম-যমজের মত দৈহিক না হইলেও অত্যাগসহ সাহচর্য্যের বন্ধনে কোন শিথিলতা আবিষ্কৃত হয় না। এই বন্ধন তাহাদের সামাজিক, কৃত্রিমতা থাকিলেও অপরের দ্বারা উহার সাময়িক বিচ্ছেদ চেষ্টা ভয়াবহ। সেই জন্যই কেহ বিবাহিত যুগলের একককে কখনও নিমন্ত্রণ করে না।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিত্ব-লোপের আতঙ্ক অনেক স্ত্রীকেই অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। এইজন্য অনেকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক। নারী-আন্দোলনের ফলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার লাভে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা বর্দ্ধিত ভিন্ন তৃপ্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য-নারীর তাই বিবাহ-বন্ধন হইয়া পড়িয়াছে গুরুতর সমস্যা। যখন কোনও দম্পতি নিবিড় সুখ-শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর সাহচর্য্য হয় অপরিহার্য্য, তখনই স্ত্রী মনে করে তাহার ব্যক্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বেই নিমজ্জিত হইল। শুধু নামে নয়—নামে ত তাহাকে মিসিস 'ক' ভিন্ন কেহ ডাকিবে না—সকল প্রকারেই যেন তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। মিসিস 'ক' ভিন্ন যেন তাহার আর কোন সার্থকতাই নাই, এই ধারণা তাহার ব্যক্তিত্বকে তাহার অ-পুরুষত্বকে আঘাত করিতে থাকে। সে যদি অতিরিক্ত মাত্রায় সকল ব্যাপারে অভিনয়ের মত বিশিষ্টতা প্রদর্শন না করে, আপন ব্যক্তিত্বকে সকল প্রকারে অভিনব করিয়া সমাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ না হয়, তবে সে থাকে ব্যবসাদার দোকানগুলির নামে "এণ্ড কোং" অংশের মত নির্ব্যক্তিক।

তেমন জ্ঞানী-গুণীর যে স্ত্রী, তাহারও একই অবস্থা, বরং সে পার্থক্য আরও বেশী চক্ষু-জ্বালাকর; কারণ যখন কোনও গৃহিণী নিমন্ত্রণ করেন, ঐ প্রকার কোনও মনীষীর আগমন উপলক্ষ্যে ভোজে, তিনি বলেন,—"আমাদের এখানে এস; লর্ড অমুক বা কবি অমুক আসছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।" কিন্তু যখন লর্ড-পত্নী বা কবি-পত্নীর কথা উল্লেখ করেন, তখন সুর অন্য প্রকার হইয়া যায়, বলেন,—"কবি অমুক আসছেন আর তাঁর স্ত্রী, আহা বেচারা!"

পাশ্চাত্য নারীর জীবনের বারো আনা হইল সামাজিক—সিকি হইল পারিবারিক। কাজেই সামাজিকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ তাহার প্রধান কাম্য; আর স্বামী যদি তাহার অন্তরায় হয় সকল প্রতিষ্ঠা গ্রাস করিয়া, তখন স্ত্রীর পক্ষে নিতান্তই সমস্যা উপস্থিত হয় আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে।

সমাজে মর্য্যাদা-লাভ, সমাজে কৃতিত্বলাভের আশায় কত নারী কত প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনও দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে কোনপ্রকার অমিল নাই। অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত বিবাহিত জীবন তাহাদের। কিন্তু যখনই কোনও নিমন্ত্রণ আসে কোনও পার্টিতে অথবা যে কোনও সম্মিলিত উৎসবাদিতে যোগদানের তখনই স্ত্রীর মন হয় ভারাক্রান্ত। সে কেবলই উপায় আবিষ্কারে মাথা ঘামাইতে থাকে কি প্রকারে স্বামীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাটাইয়া সে সমাগত নিমন্ত্রিতদের ভিতর আপন ব্যক্তিত্বের সার্থক মহিমা প্রচার করিতে পারে। সে তখন স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া মতলব স্থির করে। স্বামী একক চলিয়া যায় নিমন্ত্রণ স্থানে। একক দেখিয়া সকলে,

চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে—"তুমি একা যে? তোমার স্ত্রী কোথায়? তবে কি তার অসুখ করেছে নাকি?"

স্বামী শিখান মত জবাব দেয়—"কেন, 'লরা' কি এখনও এসে পৌঁছায় নি? একটু কাজে বেরিয়েছে, আমার আগেই ত আসবার কথা!" অথচ সে ভালরকমই জানে তাহার স্ত্রী দুই মোড় আগে একটা পোষ্টাফিসের বারান্দায় প্রতীক্ষা করিতেছে, সেখান হইতে স্ত্রীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে আগে।

হয়ত দশ কি পনর মিনিট পরে স্ত্রীটি আসিয়া উদয় হয়। এমতাবস্থায় সে একটু অতিরিক্ত আগ্রহে অভ্যর্থিত হয়, নানা প্রশ্ন বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহার উত্তরদানে নানা অলীকতার আবির্ভাব করিতে হইলেও স্ত্রী তৃপ্ত হয় এইজন্য যে তাহার ব্যক্তিত্বকে সকলে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একযোগে উপস্থিত হইলে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে, স্বামীকেই অভ্যর্থনা করিত, তাহার ভাগ্যে জুটিত একটু হাসি একটু মাথা নাড়া, তাহার নামও কেহ মুখে আনিত না। কিন্তু পৃথক আসিয়া পড়ায় সে অভ্যর্থিত হইল, জিজ্ঞাসিত হইল, নিজ নামে আহূত হইল—তাহার মনের কোণে ফুটিয়া উঠিল বিবাহের পূর্ব্বেকার তারুণ্যের স্মৃতি, মুক্তির আস্বাদ, স্বাধীনতার আত্মপ্রসাদ।

আর একটি চেষ্টা দেখা যায় পাশ্চাত্য সমাজে স্বামী-স্ত্রীর নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে, তাহাতেও কৃত্রিমতা কম নয়। স্বামী স্ত্রীর অথবা স্ত্রী স্বামীর সকল গোপন-কথাটি যে জানে একথা কিছুতেই স্বীকার করা হইবে না—(অবশ্য এখানে স্বামী-স্ত্রীর কোনও অসংগত কার্য্যের ইংগিত করা হইতেছে না)। লোকে আর বিস্ময়চকিত হয় না তেমন অন্য কিছুতে যেমন হয় স্বামী কিম্বা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মনের মত উত্তর না পাইয়া। ধরুন একটি মহিলা একটি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বামী কি তোমায় সে কথা বলেছে, 'লরা' যে তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মোকদ্দমা করবে বলে বলছে, সেকথা তোমার স্বামীকে আমি কাল বলেছিলাম—বলেছে তোমায়?"

স্ত্রী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—"কৈ, না ত! সে ত আমায় কিছু বলে নি!"

প্রশ্নকারিণীর মুখে যে বিস্ময় যে অর্থপূর্ণ গুরুত্ব প্রভৃতির স্পর্শ বিকাশলাভ করিবে—যে সংশয়ের সৃষ্টি হইবে প্রশ্নকারিণীর মনে, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝিয়া লওয়া যাইবে যে, এই স্বামী-স্ত্রীর চির-মিলনের ভাণ একেবারেই ভুয়া—'দুই দেহ—দুই আত্মা—কিন্তু চিন্তা এক' একথা এই দম্পতি সম্বন্ধে বলা যায় না। প্রশ্নকারিণীর এই যে অভিব্যক্তি—ইহা কিন্তু স্ত্রীটির নিকট হইবে অতিশয় মুখরোচক, এইজন্য নয় যে সে সার্থকরূপেই প্রতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু এইজন্য যে স্ত্রীটির তারুণ্যের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে অর্ঘ্য এবং তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ প্রকৃত-প্রস্তাবে কিন্তু স্ত্রীটি স্বামীর অতিশয় বিশ্বাস-ভাজন এবং সকল গোপন বার্ত্তার অংশভাগিনী। তবুও এইটুকু কৃত্রিমতা দ্বারা—অসত্য প্রত্যুত্তর দ্বারা সে চাহিয়াছে তাহার তারুণ্যের আভিজাত্য-গর্ব্ব ফিরিয়া পাইতে, অসীম মুক্তি ও অবাধ স্বাধীনতার প্রতীক যে তারুণ্য তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে।

মুসলিম স্বার্থ ও যুক্ত নির্ব্বাচন

(২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

সেদিন আর তাহা চলিবে না। মুসলমানের সহযোগিতার কথা হিন্দুরা ভাবিতে শিখিবে বলিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়ার কথা তাহারা বিবেচনা করিবে এবং সহানুভূতির সহিত মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। এইভাবে ধীরে ধীরে সাধারণ হিন্দুর মন হইতে মুসলিম-বিরোধী ভাব ও মুসলমানের মন হইতে হিন্দু-বিরোধী ভাব অপসারিত হইবে। মোটের উপর যুক্ত নির্ব্বাচনে মুসলমানের উপকার ব্যতীত অপকার হইবে না। অনেক দিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব যুক্ত নির্ব্বাচনের সমর্থনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। আজ আমরা মুসলমান সমাজের ও মৌলানা সাহেবের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি। হায়, কোয়ালিশনের খপ্পরে পড়িয়া কি মৌলানা সাহেবের সেদিনকার সব যুক্তি তর্ক ভাসিয়া গেল? মোটের উপর যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে বাঙলা দেশের মুসলমানের সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। হয়ত তখন তাহারা দেড় শত আসন অধিকার করিয়া বসিবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন তাহা প্রমাণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রগতি-বিরোধী আদর্শ ও ধর্ম্মান্ধতা যেভাবে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুসলমানকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহার মধ্যে সত্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা সঞ্চার করিতে হইলে যুক্ত নির্ব্বাচন যেরূপ কার্য্যকরী হইবে, পৃথক ব্যবস্থা সেরূপ হইবে না। ধর্ম্মান্ধ নেতারা পৃথক নির্ব্বাচনের সুবিধায় মুসলমানের অজ্ঞতা আরও বাড়াইয়া দিতেছেন। সমাজ সকল প্রকার ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিতেছে না, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছে। যুক্ত নির্ব্বাচন তাহাকে অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া তাহার জড়ত্ব ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া তাহাকে সত্যকার ভাবে জাগাইয়া দিবে।

বন্দিনী

(গল্প)

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

াবকাল পাঁচটায় পূবমুখে একখানা গাড়ী ছাড়ে। ক্ষুদ্র নির্জন এই ষ্টেশনের পরিপার্শ্বে গৃহস্থের বাড়ী নাই, অর্ধমাইল দূরে গৃহস্থ বাড়ী ও তৎসংলগ্ন বাজার। এই সময়টায় আশে পাশের গ্রাম হইতে যাত্রীরা আসিয়া লাল কাঁকর-তোলা প্ল্যাটফর্মে ভিড়িতে থাকে। কোন বেপারী দুই ডালা ডিম, বৃদ্ধা শীর্ণা কোন মহিলা পাখা ও ঘটি হাতে, লুঙিপরিহিত কোনও মুসলমান তার ছোট নথ-নাকে একটি ময়েকে লইয়া ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। এক সময়ে াকযোগে সকলে টিকিট ঘরের জানালার অপরিসর গহ্বরের ভতর হাত ঢুকাইতে চায়। টিকিট বাবু হাঁকিয়া বলেন, তামার কোথার টিকিট হে?

একজন বলিয়া উঠে, আজ্ঞে বাবু নছরৎপুরে।

পার্শ্ববর্ত্তী একজনে ব্যস্ত হইয়া বলে—রূপদীঘির কট্ কত গো?

টিকিট বাবুর বিরক্তি দেখা যায়, রাগিয়া জবাব দেন, যত া হাবা-খোঁড়ার দল। সোয়া তিন আনা, বুঝলে সবার না?

প্রতিদিন বৈকালের এই অবসরে ট্রেনের জনসমাগম খতে ষ্টেশনে আসা আমার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেছে। জই লক্ষ্য করি টিকিট ঘরে একটি বাবু শীতের সরকারী ট গায়ে টিকিট দেন ও নবাগত যাত্রীদের সঙ্গে বচন বিন্যাস ন। একই আলাপ, একই সম্ভাষণ। 'মোড়লের পো', ঞা ভাই', 'বাপধন', 'নবাব পুত্তুর' 'ঠাকুর মশাই' ইত্যাকার চত্র সম্ভাষণে অত্যল্প মুষ্টিমেয় ট্রেন-যাত্রীদের আপ্যায়িত য়া টিকিট বাবু টিকিট বেচেন, পরে ট্রেন ছাড়িয়া গেলে : কুঠুরীটি তালাবন্ধ করিয়া চাবির গোছা ঝন্ ঝন্ তে করিতে অদূরে নিজ কোয়ার্টার ভবনে মরালগমনে য়া যান। এমনিভাবে সেদিন বৈকালে টিকিট বাবু চট দিতেছিলেন, আমি নিকটে দাঁড়াইয়া একাগ্র মনোযোগে তেছিলাম। আমাকে তিনি বলিলেন, কি চাই মশাই, াকার টিকিট?

সলজ্জে ঘাড় নাড়াইয়া কহিলাম, না মশাই, মাপ করবেন, াও যাচ্ছি না।

বোধ হইল টিকিট বাবু লজ্জা পাইয়াছেন। যাত্রীরা য়া গেলে তিনি তাঁহার কুঠুরী বন্ধ করিয়া আমার নিকট লেন, অতঃপর ভদ্রভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। াকের নাম গণেশ বাবু। দূর হইতে যাত্রীদের প্রতি ন ইতর ভদ্র সম্ভাষণ প্রয়োগে মনে মনে ভাবিয়াছিলাম টা বুঝি কুণো বেড়ালের মত একঘেয়ে টিকিটই বেচিতে য়াছে। আলাপ করিয়া আমার সে ভ্রম কাটিল। দেখিলাম, বাবুর মধ্যে রসবোধ আছে, দিলদরিয়া মেজাজ, তাম্বূল ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা সর্বদাই ফুটিয়া আছে। কথায় বুঝিতে পারিলাম, গণেশ বাবুর মত উদারমনা সঙ্গ-একজন লোক বান্ধব অভাবে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া-, আমাকে পাইয়া তিনি বর্তে গেলেন এবং আমাকে মনেও ধরিয়াছে। গণেশ বাবু হড় হড় করিয়া কতদিনের পুঞ্জীভূত রুদ্ধ কথাগুলি উদ্গীর্ণ করিয়া চলিয়াছেন, আমি কান পাতিয়া পরম তৃপ্তিতে শুনিতেছি। কথার মাঝে তিনি সচেতন হইয়া সহসা কহিলেন, আমার রকমটাই এমনি, লোক পেলে সব ভুলে যাই। দেখুন দিকি আপনাকে দাঁড় করিয়ে গল্পই করে চলেছি, চা খাবার কথা বলতে ছাই মনে ছিল না। চলুন, চলুন গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন।

আমিও সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, জানা শোনা যখন হ'লই থাক্ না আজ। অন্য একদিন খাওয়া যাবে।

গণেশ বাবু শুনিবার পাত্র নহেন, আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন। ষ্টেশনের ঠিক সামনে পাশাপাশি দুইটি ক্ষুদ্র কোয়ার্টার। একটি ষ্টেশন মাষ্টারের, অপরটি গণেশ বাবুর। এই দুইজনই ষ্টেশনের সর্বময় কর্তা, জন-তিনেক মিনিয়েল দূরে পৃথক একটা ব্যারাকে সপরিবারে বাস করে। সন্ধ্যার ধূমায়মান অন্ধকারে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম পিছনে বেড়া দিয়া ছোটমত একখানি উদ্যানে ঝাল, ডাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া একপাশে কয়েকটা গাঁদা ও বেলির ঝাড় পর্যন্ত বাদ যায় নাই। কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার বাগান করবারও সখ আছে দেখছি। গণেশ বাবু এমনি স্তুতিবাদ আশা করিতে-ছিলেন, প্রত্যুত্তরে মুখে হাসির লহর তুলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে কহিলেন, আরে মশাই, দেখুন না তোফা বাগান বানিয়েছি। যেখানেই থাকি না, বাগানে বসে খুরপি না ঘুরালে আমার স্বস্তিই হয় না। সবই নিজের হাতে করা, কাঁহাতক বাজারে দৌড়ব, দরকার হ'ল দুটো লঙ্কা ছিঁড়ে রান্না চড়িয়ে দিলাম।

অদূরে চোখ পড়িতে দেখিলাম কয়েকটা পাঁতিহাস ড্রেনের পচা গলা ভাত খাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁক প্যাঁক করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। গণেশ বাবু আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, দেখছেন কি মশাই, বাগান নেহাৎ আমার যত্নে হয়েছে, কিন্তু হাঁস আমার মোটেও আদরের নয়। গিন্নীর নাকে কাঁদুনি দেখে তালতলা হাট থেকে সেদিন এনেছি। এতেই কিন্তু শেষ হয় নি, ঘরে চলুন দেখবেন গিনিপিগ পর্যন্ত রয়েছে।

ঠাট্টা করিতে ইচ্ছা হইল, তাই কহিলাম, বিড়াল পোষাও বোধ হয় বাদ যায় নি? গণেশ বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, বাস্ এই পর্যন্তই খতম মশাই। এতগুলো জানোয়ারের রসদ যোগান সোজা কথা মশাই? পায়ের কাছে বিলিটা ঘোঙর ঘোঙর না করলে গিন্নীর ঘুমই হয় না কিনা, তাই ও আপদও বাদ যায় নি।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম পাশাপাশি দুইখান ছোট ঘর। ষ্টেশনের দিকে দুইটি ঘরেরই দুইটি বাতায়ন শতচ্ছিন্ন আধময়লা কাপড়ের পর্দায় ঢাকা। গণেশবাবু পার্শ্বস্থিত পুরাতন একটি বেতের চেয়ার টানিয়া আমার দিকে হাসিয়া কহিলেন, আপনি বসুন। তিনি স্বয়ং খাটের উপর বসিতে বসিতে পূর্ব পরিচিত টিকিট বিক্রয়ের বিচিত্র কণ্ঠে হাঁক ছাড়িলেন, ওরে ও ফেঁদি, দু'কাপ চা করে নিয়ে আয় ত।

আহবান আসিল মৃদুকণ্ঠে, আনছি।

ভাবিলাম, এ কণ্ঠস্বর গণেশ বাবুর স্ত্রীর হইতেই পারে না। ইহাই ভাবিতেছি, গণেশ বাবু তাঁহার সবল পুষ্ট পদদ্বয় বিছাইয়া উদর-সম্পৃক্ত বসন শিথিল করিয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, পরে আমার দিকে বাম চক্ষুতারকা ঘুরাইয়া বলিলেন, বেশ আছি মশাই। ফেঁদি আমি আর স্ত্রী তিনটি মানুষ সংসারে। স্ত্রীর আবার ফিটের ব্যামো, কখন কেমন থাকেন কিছুই ত নিশ্চিত থাকে না, তাই ভাগনীকে আনালাম। ভারি শান্ত মেয়েটি মশাই, সারাদিন ভূতের মত খাটছে, মুখে কথাটি নেই।

সায় দিয়া কহিলাম, বেশত।

এবার আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। নিবিড় নিস্তব্ধতা অসহ্য হইল। রান্নাঘর হইতে ফিস্ ফিস্ আওয়াজ আর মাঝে মাঝে চামচের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ বাজিতেছিল।

ফেঁদি দুই হাতে চা লইয়া আসিল। গণেশ বাবু শুধু বলিয়াছেন, মেয়েটি ভূতের মত খাটিতে পারে, আমি দেখিলাম মেয়েটি দেখিতেও ভূতের মত কালো। কালো মিশমিশে চুল সযত্নে বেণী পাকাইয়া বাঁধা, বস্ত্র সাধারণভাবে পরা। একটি জিনিষ ফেঁদির মধ্যে ছিল, সে তাহার শান্ত অচপল দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু। মুখের উপর একটা নিবিড় শ্যামাভা তাহার নিষ্কলঙ্ক মনের সমস্ত গোপন তথ্য পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। তাহাকে সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু সে শান্ত, মৌন, পূত। গণেশ বাবু বিলম্বিত পদযুগল গুটাইয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া চা লইলেন, আমার কাপ টেবিলের উপর স্থাপিত হইল। গমনোদ্যতা ফেঁদিকে গণেশ বাবু কহিলেন, দুখিলি পানও আনিস্ মা। ফেঁদি চলিয়া গেল।

চা পানান্তে পান চিবাইতেছি। গণেশ বাবু এতক্ষণে সোজা হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিলেন, দেখুন আপনাকে দেখেই নিজের লোক বলে মনে হয়েছিল। বোধ হয়, আপনি পূর্বজন্মে আমাদের কেউ ছিলেন, নইলে এমন মিলনই বা হবে কেন। বেঁচে গেলাম মশাই, এ মঘের মুলুকে একটা লোক পাই নে।

আমি সহানুভূতির সুরে কহিলাম, সত্যিই এধারে ত বাড়ী ঘর নেই। তবে আপনাদের মাষ্টার মশাই আছেন, তাদের সংগে......

মাঝখানে গণেশবাবু আচমকা লাফাইয়া উঠিলেন: চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, বলবেন না মশাই মাষ্টার মশাইর কথা। আর একটু স্বর নিম্ন করিয়া গণেশ বাবু কানের কাছে মুখ রাখিয়া কহিলেন, বেটা একেবারে নেমক-হারাম। এই যে আমি বাগান করছি এ তার সহ্য হয় না। আমি তার চক্ষুঃশূল হয়েছি কিনা। শুনুবেন ব্যাপারটা। মাষ্টার মশাইর বাড়ী কেরোসিনের ইয়া ভর্তি সে টিন যাচ্ছে, স্লিপার কাঠ যাচ্ছে উনুনে। আঃ মর, নিবি ত আমাকে আর বাদ রাখিস্ কেন? বুঝলেন মশাই না পেরে একদিন বললাম, মাষ্টার মশাই এ মাসে আমার বাড়ীতে আধ টিন তেল পাঠিয়ে দেবেন। শুনে তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, বললেন, নিতে চাচ্ছেন যে বড়, সর্ট পড়লে তারপর? আমি আর এমনতরো ইনজাস্টিস্ দেখতে পারলাম না। ইনস্পেক্টরের ... চুপটি করে রিপোর্ট করলাম মাষ্টার মশাইর কাণ্ডকারখ... উপরওয়ালা সেদিন ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে। যাই বলেন ম... ইনজাস্টিস আমাদের চৌদ্দপুরুষে সহ্য করলে না, আমি হজম করতে?

মাষ্টার মশাইর উপর গণেশ বাবুর আক্রোশ বু... আমার দেরী হইল না। গণেশ বাবুর ঔচিত্য জ্ঞানে ... না দিয়া কহিলাম, তবে ত আপনার এঁর হাতে প্রমো... কোন আশাই নেই? গণেশ বাবু হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—প্রমোশন দূরের কথা মশাই, আমাকে ত... পারলেই শালা বাঁচে। কিন্তু ও যতই চেষ্টা করুক না,অ... কখনও জয় হয় না। তবে সত্যিই ভয় হয়, যদি আমার ... হয় তবে বাগানটার যে কি হবে! দেখিলাম ধর্মের ... গণেশ বাবু সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার প্রতি... বিশাল সংসার লইয়া বসবাস করিতে একেবারে নি... হইতে পারিতেছেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার ভয় হইতে... বুঝি বা তাঁহাকে স্বহস্ত নির্মিত এই সাধের উদ্যান ফেলি... পাতিহাস, গিনিপিগ ও মার্জার লইয়া কোথায়ও চলি... যাইতে হইবে।

পরের দিন বৈকালে ষ্টেশনে নিয়মিত আসিল... দেখিলাম অদূরে গণেশ বাবু মাষ্টার মশাইকে অনুনয় করি... ছেন, আপনি ওসব কিছু ভাববেন না মাষ্টার মশাই, রাত্রি... আমিই না হয় আপনার ডিউটি করব'খন।

মাষ্টার মশায় নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপন... শুধুই কষ্ট দেওয়া। শরীরটাও ছাই এমনি ভেংগে পড়... কিছুতেই আর কুলুতে পাচ্ছি না।

গণেশ বাবু জিব বাহির করিয়া লজ্জায় মরিয়া কহিলেন, তাতে আর কি হয়েছে? গণেশ বাবু ত... কহিলেন, মাষ্টার মশাই একটা কথা, রামদীন্ ব্যাটাকে এ... ডেকে বলবেন ত, বাসায় দুবাঁক জল দিতে। ব্যাটা চিন্তে তরকারীটা, ভাতটা অনবরত নিচ্ছে, এর ওপর খিনা মাসে এক টাকা করে দিতে। আরে বাব্বা! পয়ে... ম্যান এটা ওটা ত এমনিই করে দেয়। ব্যাটা ছোট কোথাকার।

মাষ্টার মশায়ের বোধ হয় পেট কামড়াইতেছিল—... যাইতে বিকৃত সুরে কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা দেখব।

আমি গণেশ বাবুর নিকটে আসিয়া কহিলাম, ম... বাবুর সংগে বুঝি ভাব হয়ে গেল? গণেশ বাবু পটল নাচাইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন, হাসির বেগ প্র... হইলে কহিলেন, আপনিও যেমন মশাই। আমাকে ... লোক পেয়েছেন কিনা? আরে স—ব চাল, কারসাজি বুঝ... বলিয়া আবার অট্টহাসিতে গণেশ বাবু ফাটিয়া ... লাগিলেন, তাঁহার পটল চক্ষুদ্বয়ও সংগে সংগে আঁ... বিনর্তিত হইতে লাগিল।

আমাকে টানিতে টানিতে আবার তিনি তাঁহার কো... আসিলেন। একদিনের মধ্যে গণেশ বাবুর সংগে বিশেষ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সংকোচ না

ছনে পিছনে স্বচ্ছন্দে ঘরে ঢুকিলাম। একটা গিনিপিগ শব্দে দৌড়াইয়া ছুটিল। আমাকে ঘরে বসাইয়া গণেশ অন্দরে গিয়া কি বলিলেন বুঝিলাম না, কিন্তু তাঁহার ফিস্ অনুনয়ের উত্তর শোনা গেল স্পষ্ট। শুনিলাম র দিয়া গিন্নী বলিতেছেন, কি রোজ রোজ ভদ্দর লোক আসছ? আমি বাপু চা-টা করতে পারব না। গণেশ চাপা গলায় দারুণ উৎকণ্ঠায় বলিতেছেন, চুপ কর টি, ভদ্রলোক শুনলে কি মনে করবে ভেবে দেখত? আবার অগ্নিশর্মার মূর্তি ধরিয়া ঝঙ্কার তুলিলেন, আজই শেষ, বুঝলে গা? যদি দেখি কাল আবার......

গণেশ বাবু কাঁচু মাচু হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, কের মনে ত রেহাই দাও। আবার বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত তেছিল, গণেশ বাবু ইত্যবসরে আমার ঘরে আসিয়া বাস্ত য়া কহিলেন, আপনি আসবেন ভেবে গিন্নী আগেই চা করে বসেছিল, সব ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট ন, বাস, ফ্রেস চা আসছে বলে। বলিয়া গণেশ বাবু কে বসিয়া পড়িলেন।

চা খাইবার আগ্রহ আমার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল। তবুও শ বাবুর সাদর আতিথ্য ঠেলিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ফেঁদি গতকল্যের মত চা লইয়া আসিল। চা খাইয়া তে পারিলাম গিন্নী কেবল স্বামীর উপর গলাবাজি য়া ক্ষান্ত হন নাই; নূতন অতিথির উপরও গায়ের ঝাল ড়িয়াছেন। গণেশ বাবু সেই দুগ্ধহীন কটা ধোঁয়াটে গন্ধের র কাপে চুমুক দিয়াই কিন্তু পরম তৃপ্তিসূচক অর্থহীন এক কারিয়া চোখ মুদ্রিত করিয়া আবার এক চুমুক দিলেন।

রামদীন বাহিরে তারস্বরে চীৎকার করিয়া কহিতে গল, কেওয়াড়ি খুল্ দেনা বাবু, পানি লেয়ায়া।

গণেশ বাবু চা'র কাপ শূন্য করিয়া আমার দিকে চাহিলেন চক্ষুতারকা ঘুরাইতে লাগিলেন। অর্থ এই, দেখলেন ত জায়গায় ঘা দিয়েছি। মাষ্টার মশাইকে বাগে না ফেললে রামদীনের টিকির খোঁজ পাওয়া যায়? দেখ বেটা—জল দিস না তোর বাপে এসে দেয়। অল্প দুই চারিটা কথা-'র পর সেদিন বিদায় নিলাম।

মাঝখানে আমার জ্বর হইয়া ১৪।১৫ দিন শয্যাগত ছিলাম। ই অন্নপথ্য করিয়া ষ্টেশনের দিকে লঘুপদে অগ্রসর হইলাম। টিকিট ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলাম, গণেশ বাবুর নে নূতন একজন লোক কর্ম করিতেছে। নির্বাক য়ে বিমূঢ় হইয়া গেলাম, রামদীন দূরে ঘণ্টা বাজাইতে-। নিকটে আসিয়া গণেশ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে ল, বাবু বদল্ হো গিয়া। রামদীনের মুখের উপরও ন্দর হাসি দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম গণেশ বাবু বারে চলে গেলেন নাকি?

ইহার উত্তরে রামদীন যাহা বিবৃত করিল তাহার অর্থ যে, গণেশ বাবুর বদলীর সংবাদ আসিয়াছে, দুই-এক-র মধ্যেই চলিয়া যাইবেন।

ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপে গণেশ বাবুর কোয়ার্টারের সম্মুখে লাম। গণেশ বাবু বাগানে কি যেন করিতেছিলেন, দেখিয়া তাঁহার সুপ্ত বেদনা ক্রন্দনরোলে ভাঙ্গিয়া পড়িল,—শালা তলে তলে আমায় বদলী করে দিলে মশাই। বুঝতেও পারি নি ব্যাটার বজ্জাতি। উঃ হু-হু, কি যে করি মশাই, এমন সব ঝালগাছগুলো ডাগর (বড়) হয়েছে। বেলি গাছটা কুঁড়িতে ভরে গেছে। ফেঁদি জল দিয়ে দিয়ে লাউ গাছটাকে এত বড় করলে গো।

আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম, কহিলাম, সত্যিই ত বাগানটা একেবারে ভেঙ্গে গেল। আপনাকেও আমায় ছাড়তে হ'ল, বেশ কাটছিল দিনগুলি।

গণেশ বাবু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, আপনার কথা হচ্ছে না মশাই, আমার এমন সখের বাগানটা চুরমার হয়ে গেল গো। শালার ভাল হবে না, ওকে আমি শাপ দিতে ভুলবো ভেবেছেন? আঙ্গুল ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওকে অভি-সম্পাত করব। শালাঃ......এই প্রাণভেদী বেদনার উচ্ছ্বাসে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনিতে আমি পারিতেছিলাম না, নমস্কার করিয়া ছুটে দিলাম। চলিতে চলিতে শুনিতে পাইলাম ফেঁদি বলিতেছে, মামা, বললে না ওঁকে চা খেতে। চলে গেল এমনি মুখে।

ফেঁদির কর্তব্য জ্ঞানে কিন্তু গণেশ বাবুর চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি তাঁহার সাধের উদ্যান দেখিতে লাগিলেন।

দ্রুতপদে চলিয়াছিলাম, সব কথা কানে আসিল না। শুনিতে পাইলাম গণেশ বাবুর গিন্নী বলিতেছেন, তোমার ঐ ভদ্দর লোকটাই অলক্ষণে, বললাম আমি গায়ে ত মাখালে না। ও'র আসার পরেই ত আমাদের বদলী হ'ল।

আর শুনিতে পাইলাম না।

দিন তিনেক পরে আবার অপরাহ্ণে ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। ফিরিবার মুখে গণেশ বাবুর বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, একটি গাছও জীবিত নাই। সমস্ত বেড়া ভাঙ্গা ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

রামদীনের নিকট সংবাদ পাইলাম, গণেশ বাবু গতকল্য চলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। ষ্টেশনে তবু একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, তাহাকেও হারাইতে হইল। ত্বরিতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে অদূরে গণেশ বাবুর কোয়া-র্টারের দিকে চাহিয়া চোখে জল আসিল। শেষ পর্যন্ত পাতান সংসার ফেলিয়া তাঁহাকেও অন্যত্র যাত্রা করিতে হইল। ভাবিতে ভাবিতে গণেশ বাবুর কোয়ার্টারের পাশ দিয়া চলিয়াছি। শূন্য ঘরগুলি খাঁ খাঁ করিতেছে। চতুর্দিকে ছন্নছাড়া ভাব। সে পরিপাটি সংসার ভাঙ্গিয়া গেছে, গণেশ বাবুর বর্তুল চক্ষু তারকার তির্যক বিবর্তন আর দেখিতে হইবে না।

সন্ধ্যার ঝাপসা আঁধারে ঝিল্লীর অবিশ্রাম নিনাদ উঠিতেছে। একলা ত্বরিতপদে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছি, থাকিয়া থাকিয়া যেন শুনিতে পাইলাম, উন্মুক্ত বাতায়ন পথ হইতে কাহাদের মর্মবেদনা ফেনিল উচ্ছ্বাসে আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। থমকাইয়া দাঁড়াইয়া একবার যেন শুনিতেও পাইলাম, কাহার যেন চা-খাইবার জন্য আকুল আহ্বান কতদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

ততক্ষণে গণেশ বাবুর কোয়ার্টার ছাড়াইয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি

আমাদের আত্মপ্রকাশের পথ নানা বাধায় কণ্টকাকীর্ণ। দারিদ্র্য, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, শিক্ষার অভাব, অতিরিক্ত খাটুনি, মুখ ফুটে মনের কথা বলবার অক্ষমতা—অনেক শৃঙ্খলে আমরা শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খলগুলিকে অপসারিত করতে না পারলে আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। স্বাধীনতাকে আমরা এমন প্রাণমন দিয়ে কামনা করি কেন? কারণ স্বাধীনতা আমাদিগকে সেই সব অধিকার দান করে যাদের আশ্রয় ক'রে বন্ধনের পর বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হই।

মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণার দাস। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, মাথা গুঁজবার ঠাঁই—এগুলি তার সকলের আগে চাই। না পেলে সে মরে যাবে। তাই অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের উপরে মানুষকে অধিকার দিতে হবে সর্ব্বাগ্রে। ক্ষুধায় যে মানুষ কাতর—তার কাছে ধর্ম্ম, সাহিত্য ইত্যাদির কোনো মূল্য নেই। মুক্তির প্রথম কথা হচ্ছে ক্ষুধার দাসত্ব থেকে মুক্তি। শীতে যে মানুষ কাঁপছে তার কাছে র‍্যাফেলের ম্যাডোনা আর বিঠোফেনের সোনাটার চেয়ে এক খণ্ড শীতবস্ত্র অনেক বেশী মূল্যবান। আর্থিক অনটনের হাত থেকে মানুষকে যতক্ষণ মুক্ত করতে না পারছি, ততক্ষণ তার কাছ থেকে বড়ো কিছুর আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। কাল কি খাবো—এই দুশ্চিন্তা যার দিবারাত্রির সাথী—তার সমস্ত শক্তি খাওয়ার চিন্তা করতে করতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতাকে আমরা কামনা করবো কেন? কারণ স্বাধীনতা আমাদিগকে দেবে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের উপরে অধিকার আর এই অধিকারের জোরে আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার দায় থেকে মুক্তি পাবো।

কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণার বন্ধনই কি একমাত্র বন্ধন? অজ্ঞানতার বন্ধন কি কম ভয়াবহ? আপনাকে প্রকাশ করতে হ'লে কেবল ক্ষুধার দাসত্ব থেকে মুক্তি যথেষ্ট নয়, অজ্ঞানতার নাগপাশ থেকেও মুক্ত হ'তে হবে। অন্নের উপরে চাই যেমন অধিকার, জ্ঞানের উপরেও তেমনি চাই অধিকার।

কিন্তু ছুটির বাঁশি বাজে না যেখানে সেখানে জ্ঞান আসবে কোথা থেকে? হা অন্ন, হা অন্ন ক'রে যেখানে মানুষকে উদয়াস্ত ছুটোছুটি করতে হয় সেখানে মনের জমি আবাদ করবার তার অবসর কোথায়? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে তখনই যখন তার জীবনে মিলেছে অবসর। আপনাকে প্রকাশ করতে হ'লে অতিরিক্ত খাটুনির হাত থেকে মুক্তি মানুষকে দিতেই হবে।

স্বাধীনভাবে নিজের মতামতকে প্রকাশ করবার পথে যে বাধা রয়েছে—সে বাধাও কি আমাদের আত্মপ্রকাশের পথে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় নয়? মাথার উপরে যেখানে ১২৪-এর (ক) অথবা ১৪৪ ধারা ডেমোক্লিসের কৃপাণের মতো সর্ব্বদার জন্য ঝুলছে সেখানে শাসনসংযত কণ্ঠ মনের কথাকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলতে না পারার এই অক্ষমতা আমাদের চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু ক'রে দেয়। যেখানে আমরা অপরের কথা শুনবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হই—সেখানেও আমাদের চিন্তাশক্তি পঙ্গুত্ব লাভ করে।

তাই অন্নের উপরে, জ্ঞানের উপরে, অবসরের উপরে যেমন অধিকার চাই—মনের কথাকে ভাষায় ব্যক্ত করবারও তেমনি অধিকার চাই।

কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ আমাদের আত্মপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জীবনে এমন সব সমস্যা আছে যা রাজনীতি অথবা অর্থনীতি—কোনোটার কোঠাতেই পড়ে না। আমাদের প্রেমের জীবনের অথবা ধর্ম্মজীবনের সমস্যা—সেগুলি রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক? আমাদের জীবনের উপরে প্রেমের অথবা ধর্ম্মের প্রভাব কিন্তু একেবারেই উপেক্ষার বস্তু নয়। রাজনীতির অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুক্তির যেমন প্রয়োজন আছে—আমাদের ধর্ম্মজীবনে অথবা প্রেমের জীবনেও মুক্তির তেমনি প্রয়োজন আছে। আমি কোন্ ধর্ম্মবিশ্বাসকে মনের মধ্যে পোষণ করবো—তা বেছে নেবার অধিকার আমাকে পেতেই হবে। বিশেষ একটা ধর্ম্মমতকে গ্রহণ করেছে ব'লে মানুষ যেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার পায়—সেখানে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের আত্মপ্রকাশের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। শেষোক্ত ধরণের এই স্বাধীনতাকে লাস্কি বলেছেন Private liberty. লিবার্টির তাহ'লে তিনটি রূপ—প্রাইভেট লিবার্টি, পলিটিক্যাল লিবার্টি, ইকনমিক লিবার্টি।

স্বাধীনতার প্রয়োজন কেন—স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় —এতক্ষণ ধ'রে তারই আলোচনা হয়েছে। এইবার স্বাধীনতার সঙ্গে শান্তির কি সম্পর্ক—তারই আলোচনা করা যাক। স্বাধীনতার মন্দির-প্রাঙ্গণেই শান্তির অবিচলিত সিংহাসন। মুক্তি যেখানে নেই—শান্তির শুভ্র পতাকা সেখানে ধূলোবলুণ্ঠিত। মুক্তির সঙ্গে শান্তির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কেন—সে কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলা দরকার। মুক্তি যেখানে নেই সেখানে তৃপ্তি আসবে কোথা থেকে? মানুষ যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কষাঘাতে জর্জ্জরিত, ছুটির অধিকার থেকে বঞ্চিত, যেখানে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রেও তাকে শুনতে হয় ক্ষুধিত পুত্র-কন্যার রোদনধ্বনি, আইন যেখানে তার কণ্ঠকে ক'রে রেখেছে রুদ্ধ, লেখনীকে ক'রে দিয়েছে পঙ্গু, যেখানে তার অধিকার নেই সমাজের আর দশজনের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার, আর দশজনের মুখের কথা শুনবার—সেখানে তাকে শান্ত হয়ে থাকতে বলার মানে হ'চ্ছে তাকে বিদ্রূপ করা। যেখানে একদিকে মুষ্টিমেয় ধনীর অতুল ঐশ্বর্য্য এবং আর একদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অতলস্পর্শী দারিদ্র্য—সেখানে সামাজিক মঙ্গল অসম্ভব। অমঙ্গলের মধ্যে কি কখনো শান্তি সম্ভব? আমাদের এই যে বর্ত্তমান সমাজ—এসমাজে অসন্তোষ অনিবার্য্য। কেন? কারণ এ সমাজের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে, অধিকাংশ লোক জীবনের সর্ব্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত, অধিকার ভোগ করছে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের দল যারা কাজের বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকে কিন্তু নেবার পালা যখন আসে তখন রাবণের মতো অনেকগুলি হাত বাড়িয়ে দেয়। এই সমাজের আইন-কানুন তৈরী করেছে যারা তারা সবাই ধনী—ধনের ভিত্তির উপরে বর্ত্তমান সমাজের

প্রতিষ্ঠা। যদি তোমার জমিদারি অথবা ব্যাঙ্কে টাকা থাকলো—বাস্—কোনো চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। তাকিয়ায় মাথা দিয়ে দিব্যি ঘুমাও, মুখের কাছে লুচিমোণ্ডা ল্যাঙড়া আম যথাসময়ে এসে পড়বে—ছেলেমেয়েকে অক্সফোর্ডে পাঠাবার কোনোই অসুবিধা হবে না—রোজ সন্ধ্যায় সিনেমা দেখা দিব্যি চলবে—কখনো দার্জ্জিলিঙে, কখনো ওয়াল্টেয়ারে, কখনো বা সিমলায় রঙীন দিনগুলি নিশ্চিন্ত আরামে কেটে যাবে। আমাদের এই পোড়া-কপালে সমাজে অধিকার ভোগ করতে হলে সমাজের সেবা করতে হবে—এমন তো কোনো নিয়মের বালাই নেই।

The society in which we live is organised upon the basis of property. Ownership confers rights and rights are legally unrelated to the performance of service.*

এমন একটা বর্ব্বরসমাজ তো দীর্ঘকাল ধ'রে টিঁকে থাকতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে বঞ্চিতের যে ক্ষোভ দিনে দিনে সঞ্চিত হ'য়ে উঠছে সেই ক্ষোভ একদিন বিপ্লবের দাবানলের মধ্যে সহস্র শিখায় জ্ব'লে উঠে বর্ত্তমান সমাজকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। যারা খনিতে, প্রান্তরে, কারখানায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে সমাজের সমস্ত সম্পদকে সৃষ্টি করছে—তারা পুরুষপরম্পরায় মানুষের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে থাকবে আর যারা সমাজ-সেবার কোনো অংশই গ্রহণ করছে না তারা বংশপরম্পরায় বিলাসের স্রোতে গা-ভাসিয়ে চলবে—এ তো সভ্য সমাজের লক্ষণ হ'তে পারে না—এ হ'চ্ছে বর্ব্বর সমাজের লক্ষণ। এই বর্ব্বরতার রাজত্ব চলেছে যেখানে সেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্য্য—শান্তি অসম্ভব। যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের চিত্ত কখনো অবিচলিত থাকতে পারে না। সমাজের মঙ্গলের জন্য ক'ড়ে আঙুলটী পর্য্যন্ত না নাড়িয়েও যারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে নৈবেদ্যের মাথায় নাড়ুটীর মতো—তাদের দিকে সর্ব্বহারার দল বক্র নয়নে তাকায় আর তাদের শিরায় শিরায় খেলে যায় বিদ্বেষের বহ্নিতরঙ্গ। দীর্ঘকাল ধ'রে দুঃখের বোঝা পুঞ্জীভূত হ'তে হ'তে এমন একটা দিন আসে যখন সে বোঝা দুর্ব্বহ হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্যায়কে সহ্য করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সেদিন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সুরু হয় দক্ষযজ্ঞের পালা। দিকে দিকে ধৈর্য্যের বাঁধ যায় ভেঙে। গৃহকোণ ছেড়ে মুক্তপথের বুকে দলে দলে বেরিয়ে আসে অশান্ত নর-নারীর দল। জীবন যায় সেও স্বীকার—কিন্তু দাসত্ব আর নয়। মরিয়া হয়ে মানুষ ছোটে ভেঙে-চুরে সব একাকার ক'রে দেবার জন্য। চক্রান্তকারীর চক্রান্ত থেকে বিপ্লব কখনো জন্ম নেয় না; বিপ্লবের মূলে কতকগুলি সর্ব্বনেশে আইডিয়া—একথাও ঠিক নয়।

Revolution never comes from the effort of chance conspirators or malevolent ideas. It is the outcome always of wrongs that have become too intolerable to be borne; and the moral judgment it involves is decisive against the Government which has failed to see in reform the only real safeguard against it.*

বিপ্লবের জন্ম অন্যায়ের গর্ভ থেকে। অন্যায়ের পর অন্যায়কে সহ্য করতে করতে মানুষের ধৈর্য্য যখন ভেঙে যায় তখনই আরম্ভ হয় নটরাজের প্রলয়-নাচন। কোনো দেশে যখন বিপ্লব উপস্থিত হয় তখন সেই বিপ্লব গবর্ণমেণ্টের অবিমৃষ্যকারিতার নিশ্চিত প্রমাণ। বিপ্লব প্রমাণ ক'রে দেয়—রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছে, তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কিছুমাত্র নজর দেয়নি, তাদের নালিশে কর্ণপাত করেনি। হাজার হাজার মানুষের অভিযোগ যেখানে সত্য—সেখানে রাষ্ট্রশক্তির হাত থেকে অধিকারের বৃষ্টিধারার পরিবর্ত্তে যদি অত্যাচারের বজ্রাগ্নিশিখা নেমে আসে তবে রাষ্ট্র-বিপ্লব অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশকে শাসন করবার ভার নিয়েছেন যাঁরা—তাঁরা কি সত্যি সত্যি ভারতবর্ষকে শান্ত দেখতে চান? তা যদি চান তবে ভারতবাসী যা চায়—তা দিতে হবে। ভারতবাসী কি চায়? অধিকার চায়—অন্নের প্রাচুর্য্যের উপরে অধিকার চায়, জ্ঞানের অমৃতের উপরে অধিকার চায়, মনের কথাকে মুখ ফুটে বলবার অধিকার চায়, রাষ্ট্ররূপকে গঠন করবার অধিকার চায়। ভারতবাসী মুক্ত হ'তে চায়—দারিদ্র্য থেকে, রোগ থেকে, অজ্ঞতা থেকে, বিদেশের শাসন-শৃঙ্খলে বন্দী হ'য়ে থাকবার দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে চায় জ্যোতির্ম্ময় স্বাধীন জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে। স্বাধীনতার পরমান্নের কাঙাল যারা—তাদের ক্ষুধার যারা নিবৃত্তি করতে চায় ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের পাথর পরিবেষণ ক'রে—তারা কেমন ক'রে আশা করতে পারে ভারতবর্ষ বেয়নেটের ছায়ায় সেই পাথর নিয়ে খুসী হ'য়ে থাকবে?

অধিকার নেই যেখানে সেখানে শান্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মানুষ যেখানে খেতে পায় না—সেখানে হাসির রোল উঠবে কেমন ক'রে? গ্রামগুলি যেখানে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত নরকঙ্কালের বিচরণ-ক্ষেত্র হয়ে আছে—সেখানে তৃপ্তির দেখা পেতে চায় যারা তারা বদ্ধ উন্মাদ। না, মুক্তি দিতেই হবে—নইলে শান্তি অসম্ভব। লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আছে—সে সব অধিকার তাদের দিতে হবে—দিতে হবে অন্ন, দিতে হবে বস্ত্র, দিতে হবে স্বাস্থ্য, দিতে হবে শিক্ষা, দিতে হবে জীবনের আনন্দ। সমাজে এমন একজন মানুষ থাকবে না—যে মুক্ত নয়। সেই মুক্ত মানুষের আবির্ভাবকে যতদিন সম্ভব করতে না পারছি—ততদিন শান্তির স্বপ্ন স্বপ্ন হ'য়েই থাকবে। রাজনীতির আকাশে বারে বারে ঝড় উঠবে, ধর্ম্মঘটের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলবে, সমাজের বুকের মধ্যে বিদ্বেষের হলাহল সঞ্চিত হতে থাকবে। পেনাল কোডের কোনো ধারা দিয়েই ঝড়ের রাতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

কিন্তু অধিকার থেকে যারা কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে—তাঁরা কি স্বেচ্ছায় মানুষকে মুক্তি দেবে?

* Laski—Studies in Law and Politics, p. 134.

ইতিহাসে তো এমন নজির দেখা যায় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ পেট ভরে খেতে পাবে--বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কখনো এ সম্ভব নয়। জমি, খনি, কলকারখানার মালিক মুষ্টিমেয় ধনী। তাদের লক্ষ্য টাকা--সমাজের কল্যাণ নয়। অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলছে--নিজেদের বিলাসের উপকরণগুলি সংগ্রহ করবার জন্য। জমি, খনি, কল-কারখানার উপরে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হ'লে দারিদ্র্যের অবসান অসম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করতে না পারলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ তো সম্ভব নয়। যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার --তারা ধনকুবের। তারা তো জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটতে দেবে না। তাদের তৈরী আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাবার চেষ্টা করা অপরাধ। যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাদের ধারণা, তারা যা ভালো বলে মনে করে তাই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। মনে রাখতে হবে, নিজের স্বার্থের যা অনুকূল তাকে ভালো বলে প্রচার করাই মানুষের স্বভাব। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা স্বভাবতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধনের প্রয়াসকে তাই অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে থাকে। রাশিয়াতে ভালো মন্দের ধারণা কিন্তু উল্টা। সেখানকার রাষ্ট্রতরণীর হাল যাদের হাতে--তারা কমিউনিস্ট--সম্পত্তি রক্ষার বালাই নেই কোনো। তাদের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ হওয়া প্রয়োজনীয় সমাজের মঙ্গলের জন্য। আলোচনা অন্যদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনা-ভার যেখানে ধনীদের হাতে সেখানে কখনোই তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটতে দেবে না। সমাজ-ব্যবস্থায় ওলোটপালট ঘটাবার সমস্ত চেষ্টাকে তারা পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ব্যর্থ করে দেবে। এই জন্যই মানুষকে তার অধিকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে রাষ্ট্রশক্তিকে হস্তগত করবার একান্তই প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রশক্তিকে সহায় করতে না পারলে অধিকারের আশা করা একান্তই দুরাশা। কেমন ক'রে সেই শক্তিকে হস্তগত করা যাবে--গান্ধীজী তার পথ নির্দ্দেশ করেছেন। নিয়মতান্ত্রিকতার পথে নয়, সশস্ত্র বিপ্লবের পথেও নয়--সত্যাগ্রহের পথে আসবে রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করবার সাফল্য।

এইবার প্রগতির কথা। প্রগতির বিচার করবো আমরা কোন্ কষ্টিপাথরে? মুক্তির কষ্টিপাথরে। সেই দেশ প্রগতির দাবী করতে পারে যে দেশ তার প্রত্যেকটী নরনারীর দ্বারে বহন ক'রে এনেছে মুক্তির অমৃতকে। যে দেশ সভ্যতারের সভ্যতার পথে এগিয়ে গেছে, সে দেশ মানুষকে মুক্ত করেছে--মুক্ত করেছে অনাহারের দুশ্চিন্তা থেকে সম্পদের উপরে তাকে অধিকার দিয়ে, মুক্ত করেছে যে কাজের মধ্যে সে আনন্দ পায়, সেই কাজ করবার তাকে স্বাধীনতা দিয়ে, মুক্ত করেছে তাকে গান করবার আর কবিতা লিখবার, বিজ্ঞান আর সাহিত্য-চর্চ্চার অধিকারী ক'রে, মুক্ত করেছে স্বাধীনভাবে ভাববার, কথা বলবার এবং সৃষ্টি করবার সুযোগ দিয়ে। সেই দেশ অধঃপতিত যেখানে মানুষ শৃঙ্খলিত--কাল কি খাবো এই ভয়ের কারাগারে শৃঙ্খলিত, যেখানে তার স্বাধীনতা নেই মনের মতো কাজকে বেছে নেবার, অধিকার নেই প্রাণের কথাকে মুখ ফুটে বলবার, অবসর নেই বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চায় সময় কাটাবার, সুবিধা নেই কাব্যের আর সঙ্গীতের অমৃতরস আস্বাদন করবার। আনন্দ--সে তো মুক্তির মধ্যে। দেশের হাজার হাজার মানুষের আনন্দের কষ্টিপাথরে আমরা যাচাই করবো প্রগতির। ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে, তাজমহল বানিয়েছে, উপনিষদ লিখেছে, কালিদাসকে জন্ম দিয়েছে--অতএব ভারতবর্ষ খুব উন্নত দেশ এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আমরা অতীতে শঙ্করভাষ্য লিখেছি, ভুবনেশ্বরের মন্দির বানিয়েছি আর মেঘদূত রচনা করেছি--একটা জাতিকে উন্নত সপ্রমাণ করবার জন্য এইটুকু পরিচয় যথেষ্ট নয়। আমাদের এই সভ্যতা কি দেশের হাজার হাজার চাষী-মজুর, কামার-কুমোর, তাঁত-জোলার মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটাতে পেরেছে? তা যদি না পেরে থাকে--এ সভ্যতাকে নিয়ে গর্ব্ব করবার কোনোই কারণ নেই। আমাদের সাত লক্ষ গ্রামের কোটী কোটী জীবন্ত নরকঙ্কালের অস্তিত্ব তারস্বরে ঘোষণা করছে--বর্ব্বরতার অন্ধকারে আমাদের দেশ আজও আচ্ছন্ন। গোটা কতক বড়ো বড়ো সহরের টেলিফোন আর বৈদ্যুতিক আলো, ট্রাম গাড়ী আর মোটর বাস, বিশ্ববিদ্যালয় আর বন্দরের সৌন্দর্য্য দিয়ে এই সভ্যতাকে বিচার করলে তো চলবে না। রেল গাড়ী, টেলিভিসন, এরোপ্লেন গ্রামোফোন এবং রেডিও এই সভ্যতাকে বিচার করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমাদের এই জটিল সভ্যতার ভালোমন্দের বিচার করবো আমরা একটি মাত্র কষ্টিপাথরে--জনসাধারণের আনন্দের কষ্টিপাথরে। সে আনন্দের অভাব যেখানে সেখানে প্রগতির নামগন্ধও নেই।

চীনে ব্রিটিশের ভ্রান্ত নীতি

জ্যাক্ চেন

[মিষ্টার জ্যাক্ চেন চীন দেশের একটি বিখ্যাত সাংবাদিক। তিনি চীনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইউজিন চেন-য়ের পুত্র]

চীন দেশে জাপানী অভিযানের সূচনার প্রথম কয় সপ্তাহে তবু ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল যে, চীনে ব্রিটিশ স্বার্থ বিলোপকারী যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নেহাৎ দৈব-দুর্বিপাক। কিন্তু যখন ঐ প্রকার ব্রিটিশ-স্বার্থ খণ্ডন করিয়া ঘটনার পর ঘটনা দ্রুত অনুসরণ করিল এবং চীনে ব্রিটিশের খাটান মূলধন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, তখন নিতান্ত অন্ধ ভিন্ন আর কেহই অজ্ঞাত রহে নাই যে, ঐ সকল ঘটনার মালা সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশের প্রতিপত্তি খর্ব করিবার যে কূটনীতি, তাহারই আংশিক প্রকাশ মাত্র। এইভাবে কিছুদিনের ভিতরই দেখা গেল, চীনে ব্রিটিশের যে ৩০ কোটি পাউণ্ড মূলধন খাটিতেছিল, তাহা অর্ধাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ মহলে এই বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে, জাপানীগণ পর পর কয়েক স্থানে জয়লাভ করিলেই চীন গবর্ণমেণ্ট সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে এবং আপোষ নিষ্পত্তিতে যে সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইবে, তাহার ফলে, উত্তর-চীন জাপানের হাতে চলিয়া যাইবে। তখন অন্ততঃ সাময়িকভাবেও জাপানের কতকটা পিপাসা নিবৃত্তি হইবে এবং ব্রিটিশ মূলধন সেই সময় জাপান-পরিচালিত মাঞ্চুরিয়া ও চীনে সুপথে প্রবাহিত হইবার সঙ্গত স্রোতোধারা প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু আজ সেই সকল অদ্ভুত আশা মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। পূর্বোক্ত দৈবাৎ সংঘটিত ঘটনা সঙ্গতি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে জাপান সরকারের তরফ হইতে ত্রুটি স্বীকারও সংখ্যার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে; এজন্যই চীনা সমালোচক ঐ প্রকারে সেয়ানা ত্রুটি স্বীকারের নাম দিয়াছেন "Japologies!"

প্রথমতঃ সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ব্রিটিশ রাজদূতের মোটরের উপর মেশিনগান হইতে গুলী ছোড়া স্বয়ং রাজদূতকে আহত-করণ; তৎপর সাংহাই শহরস্থ ব্রিটিশ অধিকারের উপর নিদারুণ বোমাবর্ষণ—যাহার ফলে ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া ব্রিটিশের যুদ্ধ জাহাজসমূহের বোমা দ্বারা ঘায়েল করা; বহু ব্রিটিশ রেজিষ্টার্ড বাণিজ্য-জাহাজের খানাতল্লাসী ও নিমজ্জন; ব্রিটিশের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলোপ সাধন। নিতান্ত বিকৃত মস্তিষ্ক ভিন্ন কে বলিবে ইহার সবগুলি ঘটনাই অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার।

শাংহাই শহরে ব্রিটিশ কারখানাসমূহ লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং তৎপর আর পুনঃ সচল করিবার সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা তাহাদের নিজেদের মালের সুবিধাজনক নূতন টারিফ প্রচলিত করিয়া লইয়াছে এবং সাধারণভাবে যে শুল্ক আদায় হইতেছে তাহা গচ্ছিত রাখা হইতেছে ব্রিটিশ ব্যাংকসমূহে নহে—জাপানী ব্যাংকে। ব্রিটিশের অনুমোদন না থাকিলে সাংহাই হইতে কি করিয়া জাপানীরা এইভাবে কাষ্টমস্-য়ের নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়!

জাপানীরা হ্যাঙ্কাউ শহরের ব্রিটিশ সেটেলমেণ্টের কতকাংশ দখল করিয়াছে, অবশিষ্টাংশের ভার গ্রহণের তোড়-জোড় চলিতেছে।

ইয়াংসি নদী—যাহা হইল মধ্য-চীনে প্রবেশ লাভের ধমনীস্বরূপ—সেখানে কোনও ব্রিটিশ বা অন্য দেশীয় জাহাজাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ; কিন্তু জাপানী কোং 'নিশিন্ কিসেন কাইশার' সকল জাহাজের সেখানে অবারিত দ্বার।

টিয়েনসিন ব্রিটিশ কনসেশন একেবারে বিদ্যুৎশক্তি-বিশিষ্ট তারের অবরোধে বেষ্টিত। চীনে উৎপন্ন বহু জিনিষের উপর জাপানীরা একচেটিয়া অধিকার আদালতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে—উৎপন্ন দ্রব্যের ভিতর কার্পাসই রহিয়াছে প্রধান।

হংকং-দ্বীপকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে, যেন দেশের বাজারের কোনই সুবিধা গ্রহণ না করিতে পারে তথাকার ব্যবসায়ীরা। আবার পার্ল নদীতে ব্রিটিশের কোন বাণিজ্যতরী প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। হংকং সিংগাপুর সাগরপথে প্রাতস্ দ্বীপ জাপানীগণ অধিকার করিয়া ঐ স্থানে ডুবোজাহাজের ঘাঁটি বসাইয়াছে। ইহার পর হেইনান দ্বীপ এবং স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া উহাতে জাপানীদের যে তোড়জোড় চলিতেছে তাহার ফলে ব্রিটিশের (এবং ফরাসী-দেরও) ইম্পিরিয়াল ডাক ও অন্য প্রকার যাতায়াতের পক্ষে একটা বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

স্যার রবার্ট ক্যাল্ডার-মার্শাল (শাংহাই ব্রিটিশ চেম্বার অফ্ কমার্সের চেয়ারম্যান্) যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় ব্রিটিশ সম্পদের ধ্বংস, মর্যাদা হানি এবং বাণিজ্যিক জলপথের স্বেচ্ছাকৃত অবরোধ প্রভৃতির ফলেই চীনে ব্রিটিশ মূলধন পূর্বোক্ত অধিকারে পর্যবসিত।

এই সকল অর্থপূর্ণ সংঘটন সত্ত্বেও যখন ব্রিটেনের প্রাইম মিনিষ্টার বক্তৃতায় জাপান সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন যে, উহা ব্রিটেনের বন্ধু (Friend of Britain) এবং এমন আভাসও দিলেন যে উহাদের চীনে পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য (aid) করা সঙ্গত, তখন চীনবাসী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

চীনদেশবাসী যখন ব্রিটেনকে জিজ্ঞাসা করে যে, এত অভিসন্ধিমূলক প্রকাশ্য আক্রমণ সত্ত্বেও ব্রিটেন কেন প্রায়-নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে, তখন তাহারা চারি প্রকার জবাব পায়।

কূটনীতিক জবাব:—এই সময়ে জাপানীদের উত্ত্যক্ত করিতে আমরা ভরসা পাই না, উহারা তাহা হইলে উহাদের অনাচার আরও বাড়াইয়া দিবে।

প্রশ্ন:—কিন্তু তোমাদের এই প্রকারে জাপানীদের মনোভাবের প্রতি মর্যাদা দান সত্ত্বেও তাহাদের আক্রমণ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং যে সকল স্থলে ঐ প্রকার অনধিকার আক্রমণ হইতে ব্রিটিশের আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই সকল স্থলে আক্রমণকারিগণ কেন ঐ ব্যবস্থাকে বিরক্তিকর ও বিদ্বেষজনক বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে?

চতুরতাপূর্ণ জবাবঃ—আমরা ইউরোপের সমস্যা লইয়া এতটা বিব্রত যে সুদূর প্রাচ্যে আবার অশান্তি সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা আগে ইউরোপকে শান্ত করিব, তার পরে সুদূর প্রাচ্যের এই সকল স্বার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব।

প্রশ্নঃ—কিন্তু তোমরা পাশ্চাত্যেই বা এমন কি করিয়াছ যাহাতে জাপানের ফাসিস্ত মিত্রগণের আবিসিনিয়ায়, অষ্ট্রিয়ায়, স্পেনে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় অভিযানসমূহের প্রতিরোধ করিতে পারে? গণতন্ত্রগুলির সম্মিলিত অর্থনীতিক হস্তক্ষেপ দ্বারাই ত জাপানের (ফাসিস্ত য়্যাক্‌সিসের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য প্রান্ত) সামরিক অভিযানকে ধ্বংস করা সম্ভব হইত।

খতিয়ানী বুদ্ধির জবাবঃ—এখন আমরা হয়ত হারাইতে পারি অনেক কিছুই, কিন্তু একবার যুদ্ধ অবসান হইলে তখন জাপানকে পুনর্গঠনের মূলধনের জন্য আমাদের নিকট আসিতেই হইবে। সেই সুযোগে চীনের বাজারে প্রবেশ করিবার পথ আমরা করিয়া লইব। আপাতত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে।

প্রশ্নঃ—কিন্তু চীনপ্রবাসী ব্রিটেনগণও জানে যে সুদূর প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যদি না জাপানীরা এদেশ হইতে অপসরণ করে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—সমগ্র চীনেই গণতান্ত্রিক সঙ্ঘবদ্ধতা অপরিসীম প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বিশেষভাবে উত্তর-চীনে যেখানে জাপানের প্রলোভন হইল সর্বাধিক। জাপান জয়ী হইতে পারে না। কিন্তু চীন যদি আরও বাহিরের কার্যকর সাহায্য না পায় বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি হইতে, তাহা হইলে সমর আরও বহু বৎসর ব্যাপিয়া চলিতে থাকিবে এবং তাহার পরিণামে আরও বহু বৎসর ধরিয়া চীনে ব্রিটিশ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে ক্রমশ বেশী মাত্রায়।

ম্যাচিয়াভেলের অনুকারী জবাবঃ—

আমরা অবশ্য অনুমোদন করি না যাহা জাপান চীনাদের উপর করিতেছে এবং আমাদের প্রতি তাহাদের যে আচরণ তাহাও আমরা পছন্দ করি না; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা এমন কার্য করিতে পারি না (ভরসা পাই না), যাহা দ্বারা তাহাদের পরাজয় সংঘটিত হয়; যদিও লীগ অফ নেশনস্‌ নির্দেশ দিয়াছিল চীনকে সাহায্য করিবার, তথাপি আমরা প্রকাশ্যে চীনকে সাহায্য দান কিম্বা জাপানের বিরুদ্ধে স্যাঙ্কশন প্রয়োগ কিছুই করিতে পারি না, কারণ চীনে জাপানের পরাজয়ের পরিণামে তাহাদের সামরিক গবর্ণমেন্ট অপ্রিয় হইবে এবং তাহাদের পদচ্যুতি ঘটিবে। তাহাদের পদ গ্রহণ করিবে গণতন্ত্রবাদী দল। আবার চীনের গণতন্ত্র তখন প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। পরিণাম দাঁড়াইবে—সুদূর প্রাচ্যে দুইটি নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান।

ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইবে সোভিয়েটের পূর্ব সীমান্ত হইবে নিষ্কণ্টক—কোনও আক্রমণের ভয় থাকিবে না সেখানে। সেই অবস্থায় হিটলার কি পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধীয় তাহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে সাহস করিবে? নিশ্চিতই না। তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত অপর্যাপ্ত শক্তি এমন এক শক্তিশালী লীগ অফ নেশনস্‌ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে, যাহা জোরের সহিত আদেশ দিবে—"থামাও তোমাদের অনধিকার জুলুম।" নত মস্তকে তাহাই তখন মানিয়া লইতে হইবে। শান্তির তেমন দিগ্বিজয় হিটলারের পরিকল্পনার জগৎকে করিবে স্তব্ধ। তখন জার্মানীতে তাহার দলের হইবে পতন আর গণতন্ত্রবাদী জার্মান দল শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুসোলিনীও 'পুনর্মূষিকোভব' মন্ত্রের প্রভাবে প্রাচীন আকারে পরিণত হইয়া পড়িবে।

কাজেই কেমন সব অসুবিধার জটিল পরিস্থিতি সারা জগৎকে বেড়িয়া ধরিবে। তাহার চেয়ে করুক জাপান যুদ্ধ। পরে একদিন দুই পক্ষই সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িবে, তখন আমরা ভালরকম একটা সালিশী নিষ্পত্তি করিয়া দিব।

প্রশ্নঃ—কিন্তু নিষ্পত্তি কি আদৌ সম্ভব? প্রতিটি দিন গড়াইয়া যায় সমর চলিতেই থাকে আর সন্ধির সম্ভাবনাও ম্লান হইতে থাকে। ওয়াং চিং ওয়েই'র ন্যায় হতাশ ও ভীতি-বিহ্বল নেতাগণের দুর্বলতা ধরা পড়ে, অমনি তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের স্থান দখল করে অধিকতর দৃঢ়সংকল্প জাতীয়তাবাদী নেতাগণ। ইতিমধ্যে হিটলারের প্রাচ্য অংশীদার হাতুড়ী ঠুকিতে থাকে—আঘাত করিতে থাকে সাফল্যের সহিত—সে কাহার উপর?—ব্রিটিশের শক্তি—ব্রিটিশের সম্পদ সুদূর প্রাচ্যে যাহা আছে তাহার উপর।

হাঁ, নিশ্চয়ই নরম সুরে কর্নেল ক্রিম্প জাপানকে 'শান্ত' (appease) করিতে অগ্রসর। কিন্তু যদিও দেখা যায় কর্নেল ক্রিম্প সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের অফিসিয়াল মুখপাত্র, তথাপি ব্রিটিশ জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছামূলক জাপান বিরোধী বয়কট উপস্থাপিত হয়,—এই নিদর্শনে কি বুঝায় না যে, ক্রিম্পই ব্রিটেন নয়?

ব্রিটিশের এই যে শান্তকরণ নীতি, ইহার ফলে সুদূর প্রাচ্যে ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে কিরূপ? জাপান একেবারেই শান্ত-তৃপ্ত নয়, বরং তাহার জুলুম বাড়িয়াই চলিয়াছে। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। সেই কেন্দ্র এমনভাবে স্থানচ্যুত হইয়াছে যে, ব্রিটেনের এখন সকল প্রকারেই অসুবিধা। হংকং এখন জাপানী নৌবাহিনীর যথেচ্ছ খেয়ালের দাস। পরিশেষে এই নীতি শান্তি আনয়ন করিতে পারিতেছে না, বরং সমরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেই পত্তন করিতেছে......আর তাহাকেই 'ক্ষমতার ভারসাম্য' বলিয়া বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা হইতেছে।

অতি সামান্য মূলধন যাহা চীনকে ব্রিটেন দিয়াছিল, উহাই ছিল সংগত পন্থায় পদার্পণের নীতি। কিন্তু সুদূর প্রাচ্য সমস্যার যাহা একমাত্র সমাধান বলিয়া চীনারা বিশ্বাস করে, তাহা ব্রিটিশের বর্তমান নীতি হইতে বহু দূরে। সমষ্টিগত নিরাপত্তার এমন এক পদ্ধতি যাহা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাহচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে—ইহাই হইল একমাত্র সমাধান। কেবল ইহাই শান্তি নিশ্চিত করিতে পারে এবং ইহাতেই সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রকৃত নির্বিরোধের—যাহা সমভাবেই একান্ত প্রয়োজনীয় সকলের নিকট—এখন সে ব্রিটিশই হউক, চীনাই হউক জার্মানই হউক, জাপানীই হউক, কিম্বা অন্য যে কোন জাতীয়ই হউক।

পুস্তক পরিচয়

বুভুক্ষা :—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ। ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, দাম আড়াই টাকা। নুটে হামসুনের 'স্পট' বা হাঙ্গার নামক বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। পবিত্রবাবুর অনুবাদের পরিচয় দেওয়াও তেমনই অনাবশ্যক। অনুবাদে তাঁহার হাত পাকা। ১৩৩৫ সালে এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণ হয়। বাঙলাদেশে বইয়ের বাজারের অবস্থা যেমন, তাহাতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের যে চাহিদা পড়িয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় যে, অনুবাদ জনপ্রিয় হইয়াছে। পবিত্রবাবুর অনুবাদের বিশেষত্ব হইল, তাঁহার ভাষার সাবলীল গতি এবং মূলের সঙ্গে ভাব ও ভঙ্গীর সামঞ্জস্য। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা পুস্তকের ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

ভাই-বোন :—কৈশোর মাসিক। সম্পাদক, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু। দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ। বার্ষিক দুই টাকা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। জগাপিসির সতর্কতা, পাকা হাতে লেখা, সরল কবিতা। মাষ্টার মশাই বেশ জমিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধন অপহরণ—শিবরাম চক্রবর্ত্তী, ক্রমশ রস জমাইয়াই আগাইতেছে। কড়ি, ছইয়ের মূল্যে ভাল লেখা। হীরের টুকরো শিশু-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। আগ্রহোদ্দীপক রচনা। দ্বিতীয় বর্ষে ভাইবোন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ছন্দবেণু :—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মন, শ্রীমৃণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ছয় আনা। ছেলেমেয়েদের কবিতার বই। কবিতাগুলি খুব পাকা হাতের লেখা নয়, এজন্য কৃত্রিমতার সুর কানে বাজে। কল্পলোকের আনন্দ-রসের স্পর্শে সে ছন্দ স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং মাধুর্য্য বিস্তার করে, এগুলিতে তার পরিচয় কম পাওয়া গেল। কয়েকটি কবিতার নৈতিক দিক আছে; কিন্তু সে দিকটা এক্ষেত্রে বড় নয়। মোটের উপর চলনসই ধরণের লেখা; নেহাৎ মন্দ লাগিল না।

Anecdotes of Hazrat Mohammad—(হজরত মহম্মদের জীবনী, ইংরেজী) রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল প্রণীত। সচিত্র, প্রথম সংস্করণ। নূর লাইব্রেরী, ১২-১, সেরাং লেন, কলিকাতা। মূল্য ২ ...

মৌলবী রেজাউল করীম সাহেব ইংরেজী এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই সুলেখক। আলোচ্য পুস্তকখানিতে সংক্ষেপে মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই পুস্তকখানা পড়িলে মহাপুরুষ মহম্মদের পুণ্যজীবনের একটা ছাপ মনে পড়িবে। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে উপযোগী। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

'মিলন-তীর্থ'-এর সাহিত্য শাখার উদ্যোগে একটি গল্প ও প্রবন্ধের প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতাটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। প্রবন্ধের বিষয় (পুরুষদিগের জন্য)—"বাঙালীর সমাজ জীবন"। মহিলাদিগের জন্য যে কোন বিষয়ের একটি গল্প। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই জুন ১৯৩৯। ফলাফল যথাসময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। দুইটি রৌপ্য-পদক দুইটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা ও রচয়িত্রীকে প্রদান করা হইবে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি আমাদের মাসিক পত্রিকা 'মৃত্তিকায়' প্রকাশিত হইবে।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, মৃত্তিকা, গ্রাম+পোঃ দামোদর, জেলা—খুলনা। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তারাশঙ্কর ব্রহ্ম, সম্পাদক, মৃত্তিকা।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

(১)

শিবপুর এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বাহির হয়েছিল, তার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলঃ—

"বাঙলা উপন্যাসে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য" এই বিষয়ে যে সব প্রবন্ধ এসেছিল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে, রংপুরের শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামীর। মহিলাদের জন্য বিষয় ছিল—"জাতি গঠনে নারীর স্থান।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিযোগিতায় আমরা মাত্র একটি প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। সেইজন্য প্রতিযোগিতাটি আমাদের বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

সুনীতি ঘোষ, সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ।

(২)

ঝরণা সম্প্রদায়ের প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল। ঝরণা সম্প্রদায়ের উদ্যোগে "জাতি গঠনে সাহিত্যের সহায়তা" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সাহগঞ্জ, হুগলী, কানন কুটীর)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীসুনীলকুমার নন্দী (চুঁচুড়া পঞ্চাননতলা)। শ্রীনিরঞ্জন রায় এম-এ, বি-এল (গোল্ড মেডেলিষ্ট) মহাশয় প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ নন্দী (গরিফা)। সম্পাদক, শ্রীমৃণালকান্তি রায়, হুগলী মহেশতলা, হুগলী।

"পথের দাবী" গত ১৩ই মে শনিবার হইতে নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে।

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই সুবিখ্যাত উপন্যাসখানি ১৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হওয়া মাত্র বাঙলা গবর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যনিকেতন কর্ত্তৃপক্ষ এই উপন্যাসখানিকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করাইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নাট্যরূপ দিয়াছেন শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুত সুধীর গুহ এবং পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুত সতু সেন।

"পথের দাবী" নাটকাভিনয় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি এবং আমাদের অভিমত এই যে, যতই দেশবাসী এই নাটকাভিনয় দেখিবেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কারণ সাম্রাজ্যবাদ যে ধীরে ধীরে ভারতবাসীকে কি চরম অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, স্বার্থের দায়ে ইহারা মানুষকে কি ভাবে অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা এই নাটকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

* * *

নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি **"সাপুড়ে"** শনিবার হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত দেবকীকুমার বসু এই ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। কাননবালা, পাহাড়ী সান্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অহি সান্যাল প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত একটি কাহিনী অবলম্বনে শ্রীযুত দেবকীকুমার বসু ছবিখানি তুলিয়াছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন রাইচাঁদ বড়াল; চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন ইউসুফ মুলজী এবং শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন অতুল চ্যাটার্জ্জি।

* * *

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া নিউ থিয়েটার্সের হইয়া **"রজতজয়ন্তী"** ছবির কাজ শেষ করিয়াছেন। মাত্র দুই মাসের মধ্যে এই ছবিখানি তোলা শেষ করিয়া শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতের মধ্যে নূতন রেকর্ড করিলেন। আমেরিকা অথবা ইউরোপে এক একখানি ছবি তুলিতে মাত্র ১০।১২ দিন সময় লাগে, কিন্তু ভারতে অন্ততঃ চারি মাসের পূর্ব্বে কোন ছবি তোলা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য আমেরিকা ও ইউরোপে ছবি তোলার যতখানি সুবিধা ও সুযোগ পাওয়া যায়,—ভারতে তাহা পাওয়া যায় না। রজতজয়ন্তী ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখার্জ্জি, ভানু ব্যানার্জ্জি, দীনেশ দাস, সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের 'সাপুড়ে' চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও কাননবালা। শনিবার হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় দেখান হইবে।

শ্রীযুত নীতীন বসুর বাঙলা ছবির কাজ বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজয় ভট্টাচার্য্যের গান এই ছবিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

* * *

আমরা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমতী উমাশশী চিত্রজগৎ হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমতী উমা চণ্ডীদাস ছবি হইতে বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আর কোন ছবিতে দেখা দিবেন না ইহাতে সমস্ত চিত্রামোদী দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই।

* * *

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্সের সহিত সমস্ত

সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন। এখন হইতে তিনি স্বাধীনভাবে চিত্রে অভিনয় করিবেন।

*　　*　　*

পরিচালক শ্রীযুত সুশীল মজুমদার ফিল্ম কর্পোরেশনের হইয়া—"রিক্তা" নামে একখানি বাঙলা ছবি তুলিতেছেন। গত মঙ্গলবার টালিগঞ্জে ফিল্ম কর্পোরেশন ষ্টুডিওতে শ্রীযুত মজুমদার রিক্তার একটি পটদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রমোদভ্রমণের দৃশ্য। নায়িকা ছায়া রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বাগানে প্রমোদভ্রমণে আসিয়াছেন। এই ছবির ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমলা, সুশীল মজুমদার প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। জুন মাসের প্রথম দিকেই ছবিখানি তোলা শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমতী উমাশশী

পরিচালক কেদার শর্ম্মা এই কোম্পানীর হইয়া একখানি হিন্দি ছবি তুলিতেছেন। রমলা, মজামিল, গনি, রাজেন্দ্র সিং, পূর্ণ চৌধুরী, মঞ্জুলা, রামদুলারী প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিতেছেন।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের খেলায় উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন বিভিন্ন খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলই এই উৎসাহ বৃদ্ধির কারণ। যদিও প্রথমার্দ্ধের সমস্ত খেলা শেষ হইতে এখনও অনেক বাকি তথাপি লীগ চ্যাম্পিয়ান কোন্ দল হইবে ইহা বুঝিবার জন্য ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষভাবেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

মোহনবাগান ক্লাব লীগ খেলার প্রথমাবস্থায় যেরূপ অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থায় আছে। লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান বজায় আছে। আলোচ্য সপ্তাহে খেলোয়াড়গণ যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে সহজে এই স্থান হইতে উক্ত দলের নামিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা

এ নন্দী — এম ব্যানার্জ্জি — মুর্গেশ — পি চক্রবর্ত্তী — জিতেন ঘোষ — ডি সেন

যাইতেছে না। আক্রমণভাগ ও রক্ষণভাগের খেলায় দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া আক্রমণভাগে এস মিত্র ও এম ব্যানার্জ্জি খেলায় তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন। আগামী সপ্তাহে তাঁহারা আরও উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন। রক্ষণভাগে গোলরক্ষক বা ব্যাকদ্বয়ের খেলায় ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় নাই। হাফ ব্যাকত্রয়ের মধ্যে দুই দলের খেলা দলের অন্যান্য খেলোয়াড়গণের তুলনায় নিম্নস্তরের হইতেছে। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মিত অনুশীলন না করার ফলেই আশানুরূপ খেলিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। মোহনবাগান দল এই বৎসর লীগ খেলার সূচনায় যেরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে ইতিপূর্ব্বে কোন বৎসরই এরূপ করিতে পারে নাই। এইজন্যই মোহনবাগান দল এইবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কমিটির বিচক্ষণতার জন্যই মোহনবাগান ক্লাব দলের এই সাফল্য। ইহার পরবর্ত্তী খেলাগুলিতেও সাফল্য লাভ করিবেন যদি নির্ব্বাচন কমিটি সভ্যগণের মধ্যে নিজ নিজ "পেটোয়া" খেলোয়াড়কে খেলাইবার জন্য চেষ্টা না হয়।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দলের শক্তি বাঙ্গালোরের খেলোয়াড়গণ যোগদান করিলেই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে ইহা আমরা গত সপ্তাহেই বলিয়াছিলাম। আমাদের উক্তির মধ্যে সত্যতা কতখানি ছিল তাহার প্রমাণ ইষ্টবেঙ্গল বনাম লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান দলের খেলায় পাওয়া গিয়াছে। এই দিনের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকেই খুব উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দলের সম্মান বৃদ্ধি করিতেই হইবে ইহা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের খেলায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তৎপরতা, দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণাবলী একটি দলকে বিজয় গৌরব লাভে সাহায্য করে, তাহার কোনই অভাব ছিল না। আক্রমণভাগের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মুর্গেশ আহত হইয়া মাঠ ত্যাগ করা সত্ত্বেও দলের শক্তি কোনরূপে কমিয়া যায় নাই। দশজন খেলোয়াড়ই প্রতিপক্ষের এগারজন দুদ্ধর্ষ খেলোয়াড়কে বিপুল আক্রমণে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণ এই দিনের খেলায় যেরূপ দৃঢ়তা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, পরবর্ত্তী খেলাগুলিতেও যদি তাহার অর্দ্ধাংশও প্রদর্শন করিতে পারেন তবে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে কোন দলই লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

স্পোর্টিং ক্লাব দল ধীরে ধীরে খেলায় উন্নতি প্রদর্শন করিতেছে। এই সপ্তাহে গত সপ্তাহ অপেক্ষা অনেক উন্নততর ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য এই দলও যে অপরাপর দলের সহিত জোর প্রতিযোগিতা করিবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কালীঘাট ক্লাব দলের খেলোয়াড়গণের খেলায় নিরুৎসাহ দেখা দিয়াছে। মহমেডান দলের সহিত এই দলের যে খেলা হয় তাহার পর হইতেই খেলোয়াড়গণ উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে এইরূপ উৎসাহহীন হওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। এখনও বহু খেলা বাকী আছে। সুতরাং এখনও লীগ খেলায় ভাল ফল প্রদর্শন করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া যায় নাই। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়গণ পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া যদি খেলেন ভালই ফল পাইবেন।

ভবানীপুর ক্লাব দলের খেলা দিন দিন নিম্নস্তরের

হইতেছে। এইরূপ যে হইবে তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে আমরা করিয়াছি। কতকগুলি নামজাদা খেলোয়াড়কে একত্র করিয়া দিলেই দলের শক্তি বৃদ্ধি পায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন খেলোয়াড়গণকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদান করা। প্রতিপক্ষের বিভিন্ন আক্রমণ ধারা কিরূপে প্রতিরোধ করিয়া আক্রমণ সূচনা করিতে হয়, কোন্ অবস্থায় কোন্‌রূপভাবে দলের খেলোয়াড়গণকে পরিচালনা করিলে প্রতিপক্ষের বিপর্য্যয়ের কারণ হইবে, এই সমস্ত জ্ঞান এই দলের খেলোয়াড়গণের আছে বলিয়া প্রমাণ পাইবার উপায় নাই। দলের অবস্থা দেখিয়া এই দলের পরিচালকগণও যে কিরূপে

কে সেন নায়ার এন গুহ

নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। যেভাবে দল পরিচালিত হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই উক্ত দলের স্থান লীগ তালিকার নিম্নভাগে হইলে ইহা তাঁহাদের বুঝিতে না পারিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

এরিয়ান্স ক্লাবের অবস্থা লীগ খেলায় খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। লীগ তালিকার নিম্নভাগে যে স্থানে এই দল বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছেন তাহা অপেক্ষা উন্নতের স্থানলাভ এই দলের ভাগ্যে হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। দলের খেলোয়াড়গণও এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিতেছেন। যে দল গত ২০ বৎসরের উপর প্রথম বিভাগীয় লীগে খেলিতেছে সেই দলকে দ্বিতীয় বিভাগীয় লীগে খেলিতেছে দেখিতে হইবে, ইহা ভাবিতেও দুঃখ হয়। ক্লাবের পরিচালকগণের অবহেলার জন্যই দলের এইরূপ অবস্থা—এই উক্তি করায় অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সপ্তাহে ক্যালকাটা দলের খেলা উন্নততর হইয়াছে। লীগ তালিকায় সর্ব্বনিম্ন স্থান দখল করিয়া দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাইবার মত অবস্থা এই বৎসরও হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। পুলিশ দলের খেলার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। খেলোয়াড়গণ একেবারেই প্রাণহীন, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। খেলিতে হয় খেলিতেছি এই মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই এইরূপ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া যাইবার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এই দলের পরিচালকগণের উচিত বিহিত ব্যবস্থা করা। এতদিন লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান দলের খেলা ক্রমোন্নতির মুখে চলিয়াছিল। হঠাৎ অবনতির দিকে চালিত হইয়াছে। খেলোয়াড়গণও ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনে ব্যস্ত না হইয়া দৈহিক শক্তি প্রয়োগের দিকে মন দিয়াছেন। খেলোয়াড়গণের এই পরিবর্ত্তন খুব আনন্দদায়ক নহে। পাঁচ বৎসর পর পর লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বর্ত্তমানে যেভাবে খেলোয়াড়গণ খেলিতেছেন তাহা পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আছে।

খেলা পরিচালনা

প্রতি বৎসর খেলা পরিচালনার সময় রেফারীগণের মধ্যে কয়েকজনকে যে মারাত্মক ভুল, ত্রুটি করিতে দেখা গিয়াছে এই বৎসরও তাহার পুনরাবৃত্তি তাঁহারা করিতেছেন। এই সমস্ত রেফারীগণকে পরিচালনার ভার হইতে অবসর দিবার জন্য প্রতিবৎসরই আমরা বলিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। কেন যে হয় নাই বা এখনও হয় না তাহা এই রেফারী এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ জানেন। রেফারী এসোসিয়েশনের সভ্যসংখ্যা কয়েক শত। সুতরাং রেফারীর অভাবেই যে এই বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে ইহা কোনরূপেই বলা চলে না। প্রিয় রেফারীগণ খেলা পরিচালনায় অযোগ্য হইলেও খেলা পরিচালনার অধিকার পাইয়া থাকেন—এই গুজব শুনিতে পাওয়া যায়। এই গুজব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কত বৎসরে অবস্থার অবসান হইবে তাহা বলাই দুষ্কর।

নিম্নে লীগ খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

লীগ কোঠায় কাহার কিরূপ স্থান

প্রথম ডিভিশন

					গোল		
	খেলা	জয়	পরা		স্ব	বি	পয়েন্ট
মোহনবাগান	৬	৫	১	০	১০	১	১১
রেঞ্জার্স	৭	৫	০	২	১৪	৫	১০
মহমেডান স্পোর্টিং	৭	৪	২	১	১২	৬	১০
ইষ্টবেঙ্গল	৭	৩	৩	১	৭	৩	৯
কালীঘাট	৭	২	৪	১	৮	৬	৮
ক্যামেরোনিয়ান্স	৬	৩	১	২	৬	৭	৭
ই বি আর	৬	৩	১	২	৮	৯	৭
বর্ডার রেজিঃ	৬	২	১	৩	৭	৭	৫
ক্যালকাটা	৭	১	৩	৩	১০	১২	৫
ভবানীপুর	৬	১	২	৩	৩	৭	৪
কাষ্টমস	৬	১	২	৩	৪	৮	৪
এরিয়ান্স	৬	১	১	৪	৩	৯	৩
পুলিশ	৭	০	১	৬	৬	১৮	১

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৬ই মে—

পাবনা জেলার মাজাদিয়া গ্রাম হইতে এক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১১ই মে রাত্রিতে যখন একদল হিন্দু গ্রামবাসী কীর্ত্তন করিয়া এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতেছিল, তখন কতিপয় মুসলমান দুর্বৃত্ত হঠাৎ আসিয়া কীর্ত্তনীয়াদের উপর আক্রমণ করে। ফলে, ১২।১৩ জন হিন্দু আহত হয়। এই সম্পর্কে ২০ জন ধৃত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জের এক খবরে প্রকাশ যে, গত ১১ই মে আমডাঙ্গা গ্রামে কালীপূজা উপলক্ষে যখন বহু মুসলমান কবিগান শুনিতেছিল, সেই সময় স্বজাতীয় "স্বেচ্ছাসেবকেরা" হিন্দুদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে গান শুনিবার অপরাধে তাহাদিগকে প্রহার করে। এই সম্পর্কে কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সরকারী চাকুরীর সাম্প্রদায়িক হার বণ্টন সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোন সিদ্ধান্ত না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু দার্জ্জিলিংয়ে বাঙলার গবর্ণরের নিকট এক তার করিয়াছেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে কলিকাতার হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া এবং গবর্ণর যাহাতে বিলে সম্মতি না দেন, তজ্জন্য গবর্ণরকে অনুরোধ জানাইয়া কলিকাতার এক লক্ষ নাগরিকের স্বাক্ষরযুক্ত এক প্রতিবাদ-পত্র বাঙলার গবর্ণরের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনী ফরাসী সীমান্তে সুরক্ষিত দুর্গপ্রাকারাদি পরিদর্শন করেন।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে বৃটেনের পাল্টা প্রস্তাবের জবাব দিয়াছেন। প্রকাশ যে, সোভিয়েট তাহার উত্তরে বৃটেনের পাল্টা-প্রস্তাবে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি দাবী করিয়াছে।

১৭ই মে—

নোয়াখালিতে তারিণীকুমার ভৌমিক নামক একটি যুবক বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। যুবকটি এ বৎসর কুমিল্লা কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষায় ফেল হওয়াই নাকি এই আত্মহত্যার কারণ। ঢাকায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার নামক একটি যুবক এ বৎসর আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি নাকি দার্জ্জিলিং হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

ডিগবয় গুলীচালনা সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনার বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থেই গুলীচালনা করা হইয়াছিল। গুলীচালনার ফলে সাতজন লোক হতাহত হয় —তিনজন মৃত ও ৪ জন আহত।

রাজকোট শাসন ব্যাপারে ভারতের প্রধান বিচারপতির সালিশীতে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী সে সকল সুবিধা ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য মহাত্মা গান্ধী বিবৃতিতে এই বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং হিন্দুদের পক্ষ হইতে বড়লাটের নিকট যে নিবেদনপত্র প্রেরণের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহা সমর্থন করেন।

সরকারী চাকুরীর সাম্প্রদায়িক হার নির্ণয় সম্পর্কে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু বাঙলা গবর্ণরের নিকট যে তার করিয়াছিলেন, তাহার জবাবে গবর্ণর তাঁহাদের কয়েকজনের সহিত সাক্ষাতে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন সম্পর্কে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতির জবাবে ডাঃ বিধান রায় এক বিবৃতি দিয়াছেন।

স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটি হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন এবং পাঁচ বৎসরকালের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৭৫ হাজার ইহুদী আশ্রয়প্রার্থীকে প্যালেষ্টাইনে স্থান দিবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপর ইহুদী আমদানী বন্ধ করিবার পরিকল্পনা ঘোষিত হইয়াছে।

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে উপনিবেশ সচিব মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে, গ্রাণ্ড মুফতীকে প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

১৮ই মে—

ত্রিশ হাজারেরও অধিক নরনারী অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় সমবেত হইয়া হক মন্ত্রিমণ্ডলীর কুকীর্ত্তি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের তীব্র নিন্দা করেন এবং উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার শপথ গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে জাতীয়তা ও গণতন্ত্র বিরোধী এই বিল কলিকাতার পৌরশাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্যে রচিত এবং উহাতে কলিকাতার পৌর-শাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের ন্যায্য অধিকার বিনা কারণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে বলিয়া এই বিল কিছুতেই আইনে পরিণত হওয়া উচিত নহে। বাঙ্গলার হিন্দু জনসাধারণ সমস্ত শক্তি লইয়া এই বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন প্রমুখ ১৩জন বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন। এইরূপ বিরাট সভা কলিকাতায় অল্পই দেখা গিয়াছে।

সিন্ধু সরকার সং ফোঃ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে "ওনু মণ্ডলী"কে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কাণপুরে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু "ফরোয়ার্ড ব্লকে"র ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের মোটামুটি বিবরণ দেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে ভাওয়াল মামলার শুনানীকালে

কৌসুলী মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি বাদীপক্ষের সওয়াল জবাব সুরু করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি মামলার ঘটনা মোটামুটি বিবৃত করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিলের দফাওয়ারী আলোচনা আরম্ভ হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র ও বেকার সাহায্য বিল পাশ হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষিত হইলে প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। উহার প্রতিবাদে ইহুদীরা একদিন উপবাস করিবার, হরতাল পালন করিবার ও সভা-সমিতি করিয়া প্রতিবাদ জানাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইরাকী ও সৌদী আরব গবর্ণমেণ্ট গুলিও বৃটেনকে জানাইয়াছে যে, এই প্রস্তাবে আরব রাষ্ট্রগুলির দাবী প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

১৯শে মে—

তালিকাভুক্ত ও নোটিফায়েড ব্যাঙ্কগুলিকে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিলের আওতা হইতে বাদ দেওয়ার জন্য মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী গতকল্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা পাশ হয়। মিঃ সুরাবর্দ্দীর প্রস্তাবের পক্ষে ১১৬ ও বিপক্ষে ৬৮ জন ভোট দেন। কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা দল প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু অদ্য সকাল বেলায় কাণপুর হইতে কলিকাতা পৌঁছেন। অপরাহ্ণে তিনি তারকেশ্বরে শ্রীরামপুর মহকুমা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কংগ্রেসে এখন বিপ্লবী মনোভাবের অভাব ঘটেছে। গান্ধীপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী বলে যাঁহারা আখ্যাত লাভ করেছেন, তাঁহারা এগিয়ে চলতে চান না।" প্রমাণস্বরূপ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার পত্রালাপের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি "ফরোয়ার্ড ব্লকের" ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, "এই দল গঠিত হ'তে না হতেই সর্ব্বত্র ভারতের সকল প্রদেশে সাড়া পড়েছে।" অবশেষে তিনি দেশকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

২০শে মে—

রাজকোট রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ঠাকুর সাহেব দশজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে ঠাকুর সাহেবের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—

দরবার শ্রীবীরবল প্রেসিডেণ্ট, শ্রীযুত উমশঙ্কর মুরারজী পাণ্ডে, দৌলৎরায় ভকিস, কালীদাস মোতিচাঁদ পারেল, হাজী দাদা হাজী ওয়ালী মহম্মদ, মোহনলাল টঙ্ক, হিম্মতভাই আবুল আলী, হাকিমচাঁদ লক্ষ্মীচাঁদ দোশী, গোকুলদাস দয়াভাই এবং সদস্তী জীবনজী। অদ্য এক দরবারে ঠাকুর সাহেব কমিটি নিয়োগের বিষয় ঘোষণা করেন। ঠাকুর সাহেব দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও জরিমানার টাকা প্রত্যর্পণের আদেশ দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

উড়িষ্যার রণপুর রাজ্যের মেজর আর এল ব্যাজালগেটকে হত্যার অভিযোগে উক্ত রাজ্যের ২৪ জন প্রজা দায়রা জজের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। উক্ত মামলার ফরিয়াদী পক্ষের শুনানী শেষ হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ছয়খানা পুস্তকের উপর হইতে বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে ১১৩ জন সিয়াকে তাব্বারা আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত মোট ৯৪৩৭ জন সিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সরকারী চাকুরীর সাম্প্রদায়িক হার নির্ণয় সমস্যা সম্পর্কে বাঙলার অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার আর একটি বিবৃতি দিয়াছেন।

কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন সম্পর্কে ডাঃ বিধান রায়ের বিবৃতির জবাবে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

কমন্স সভায় মিঃ লয়েড জর্জ্জ ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সোলাপুরে আর্য্য সত্যাগ্রহীর উপর আক্রমণের ফলে এক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় দুইজন মারা গিয়াছে বিশ জন আহত হইয়াছে।

কুমিল্লার কৃষক-নেতা মিঃ আবদুল মালেক পুলিশ বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের অভিযোগে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হার সম্পর্কে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তদুত্তরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বৈদ্যবাটীতে এক জনসভায় বৈদ্যবাটী জনসাধারণ ও পৌরসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে "ফরোয়ার্ড ব্লক" গঠনের কারণ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেন।

সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ খান সাহেবের আদেশক্রমে সরকারী কার্য্যে বাধা দিবার অভিযোগে ডাঃ খান সাহেবের পুত্র মিঃ ওবেদুল্লাকে পুলিশ সীমান্ত প্রদেশের চরসাদ্দা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, আদালতের রায় অনুসারে কতিপয় প্রজার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের আদেশ তামিল করিবার উদ্যোগ করা হইলে মিঃ ওবেদুল্লা তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মিঃ ওবেদুল্লাকে পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হইয়াছে। ইঁহার সহিত ৮০ জন লালকোর্ত্তা স্বেচ্ছাসেবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকেও ঐ সঙ্গে পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদ ত্যাগ করায় তাঁহার শূন্য আসনে ১৮নং ওয়ার্ডের উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দত্ত বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট ব্যাপারে অর্থসচিবের প্রতি "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলৈ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং অর্থসচিবের কার্য্য সমর্থন করিয়াছেন।

শিলং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আলোচনার জন্য গবর্ণরের সভাপতিত্বে মন্ত্রিমণ্ডলের এক জরুরী বৈঠক হয়। উহার পর মন্ত্রিমণ্ডলীর এক ঘরোয়া আলোচনা বৈঠকের অধিবেশন হয়। ঐ সভায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ বি সি রায় ও আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

১লা মে হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত ১৫ দিনে হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া ১০৬১ জন স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছে।

হায়দরাবাদ আর্য্য-সত্যাগ্রহের পঞ্চম ডিক্টেটর পণ্ডিত বেদব্রত ও জলন্ধরের দয়ানন্দ কলেজের সরকারী অধ্যক্ষ লালা জ্ঞানচাঁদকে ঔরঙ্গাবাদ জেলে এবং ঠাকুর অমর সিংহকে গুলবার্গা জেলে নির্জ্জনকক্ষে আবদ্ধ রাখার প্রতিবাদ করিয়া এবং এই ব্যাপারে বড়লাটের হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানাইয়া পাঞ্জাবের আর্য্য-প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা বড়লাটের নিকট এক তার পাঠাইয়াছেন।

২১শে মে—

কংগ্রেস সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে ভারতের নানাস্থানে জনসভা হয়। ঐ সব সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে সরকারী প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং বিনা সর্ত্তে অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার সীমান্তবর্ত্তী কালথপ নামক স্থানের পোলিশ শুল্ক-বিভাগের দপ্তরখানায় উত্তেজিত জার্ম্মান জনতা হানা দেয়। ফলে, ডানজিগে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

জার্ম্মানী ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২২শে মে—

রাজসাহী শহরের নূতনপাড়ায় একজন স্বর্ণকারের বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ সাতটি রিভলবারের কার্ত্তুজ পাইয়াছে। স্বর্ণকার ও তাহার পত্নীকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্ণকারকে হাজতে আটক রাখিতে আদেশ দেন। স্বর্ণকারের স্ত্রীকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

গত১৯শে ও ২০শে মে ধুপচাঁচিয়া গ্রামে বগুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। মৌলবী আস্রাফউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে যোগদান করেন ও বক্তৃতা করেন। নবগঠিত "ফরোয়ার্ড ব্লক" সমর্থন করিয়া ও তাঁহার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গত এপ্রিল মাসে প্রদত্ত এক বক্তৃতা সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এক পরোয়ানা বলে বোম্বাইয়ের সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ এস বাটলীওয়ালাকে আজ বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কানপুরের শ্রীযুত বটুকেশ্বর দত্তের এপেণ্ডিসাইটিস হইয়াছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অস্ত্রোপচারের জন্য কলিকাতা যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বাঙলাদেশে গমনের অনুমতি চাহিয়া বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। প্রকাশ, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দরখাস্তের উত্তরে তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাকে বাঙলাদেশে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

শিলং-এর এক সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য চেরাপুঞ্জীতে মাটি ধসিয়া পাঁচজন লোক চাপা পড়িয়াছে। প্রকাশ, তাহাদিগকে উদ্ধার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইতেছে।

বার্লিনে ইতালী-জার্ম্মান সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তিনটি সর্ত্তে এই চুক্তি হইয়াছেঃ—(১) উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা সমগ্র ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট সর্ব্ববিষয়ে মতের সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে, (২) আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর আবর্ত্তে উভয় রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট স্বার্থ বিপন্ন হইলে ঐ সব স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উভয় রাষ্ট্র কালবিলম্ব না করিয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনায় ব্যাপৃত হইবে; (৩) বহিঃশত্রুর দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোন একটির নিরাপত্তা অথবা অন্য কোন মূল স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে অপর রাষ্ট্র উহাকে রাজনীতি অথবা কূটনীতির দিক হইতে পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এক রাষ্ট্র যদি অন্য কোন রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রসমূহের সহিত যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট জটিলতায় জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র উহার মিত্রকে জলে, স্থলে নভঃস্থলে সর্ব্বপ্রকার সামরিক শক্তি দ্বারা সাহায্য করিবে।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, Saturday, 20th May, 1939 [২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পথ কোথায় ?—

গত মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মে মাসের ৫ই পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রালাপ সুদীর্ঘ, ইহার সব কথা লইয়া আলোচনা চলে না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পত্রালাপ হইতে আমরা একটি সার সত্য পাইতেছি, তাহা এই যে, সুভাষচন্দ্রের সহিত মহাত্মাজীর মৌলিক মতদ্বৈধ ছিল এবং সে মতদ্বৈধ কংগ্রেসের আসন্ন কর্ম্মপন্থা লইয়া। দক্ষিণমার্গী কংগ্রেসী এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে কোন মতদ্বৈধ নাই এবং ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রসম্পর্কিত কোন প্রশ্নের সম্পর্কই ইহার মধ্যে নাই, এমন কথা আমরা শুনিতেছিলাম; কিন্তু এই পত্রালাপে প্রকাশিত হওয়াতে দেখা যাইতেছে যে, মতদ্বৈধ রহিয়াছে বড় রকমে এবং তাহাও ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত প্রশ্ন লইয়াই। মহাত্মাজী স্পষ্ট ভাষায় সুভাষচন্দ্রকে লিখেন—'অহিংসা সম্পর্কে আমি তোমা হইতে বিপরীত মত পোষণ করি। আমি চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে হিংসার গন্ধ পাইতেছি। কংগ্রেসের দুর্নীতিও শঙ্কার কথা। এই অবস্থায় আমি অহিংস গণআন্দোলনের কোন আবহাওয়া দেখিতে পাই না। পশ্চাতে যদি গণশক্তি না থাকে, তাহা হইলে চরমপত্র দেওয়া নিরর্থক অপেক্ষা শোচনীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কংগ্রেস আজ প্রয়োজনানুরূপ ত্যাগ স্বীকারে অক্ষম; কোন সার্থক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

হিংসা-অহিংসার সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া আমরা আলোচনা করিতে চাই না; কারণ আমাদের এই বিশ্বাস যে, বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা যখন মানুষকে স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা-গত ইতরতা হইতে উপরে তুলিয়া থাকে। মানবতার উচ্ছ্বাস জাতির অন্তরকে যখন আন্দোলিত করিয়া তুলে, তখন তুচ্ছ স্বার্থের বিচার-বিবেচনা সে ভুলিয়া যায়, ত্যাগের প্রচণ্ড আনন্দে সে মাতে এবং আমাদের মতে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকেই যে প্রবৃত্তি বড় বলিয়া বুঝে, তাহাই হিংসা; অহিংসা বৃহত্তর স্বার্থেরই অনুভূতি। ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসাব-নিকাশের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অহিংসার শক্তিকে উপলব্ধি করা যায় না এবং তাহার নিরিখ বাঁধাও সম্ভব হয় না। মহাত্মা গান্ধী অহিংসার শক্তিকে আকার দিয়াছিলেন দেশময় বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতিকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়া, নতুবা মুনি-ঋষিদের সমদর্শন বা অপ্রতিকারের অবস্থা দেশে যে আসিয়াছিল সর্ব্বস্তরের মধ্যে বা কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে তাহা আসিতে পারে—আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ দেখা যাইতেছে, বৃহত্তর সেই যে আদর্শ তাহাকে উদ্দীপ্ত করিবার শক্তির অভাব মহাত্মাজী নিজেই উপলব্ধি করিতেছেন। রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোন গণ-আন্দোলন যে সার্থক হইতে পারে, এমন বিশ্বাস তিনি করেন না। মহাত্মাজীর এ বিষয়ে যেমন বিশ্বাস, দক্ষিণ-মার্গী নেতাদের মনের বিশ্বাসও তাহাই। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও বেনারসে এই ধরণের কথাই বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, চরমপত্রের কথা না হয়, ছাড়িয়াই দেওয়া গেল; একটা চরমপত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট পাঠানো না পাঠানোর বিশেষ কোন মূল্য নাই। আসল কথা হইল শক্তির, প্রকৃত মূল্য হইল—কাজের। দক্ষিণপন্থী যে-সব নেতা বলিতেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কিত প্রশ্নটা একটা প্রশ্নই নয়, যুক্তরাষ্ট্র-প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আমরাও সমানভাবে তৈয়ার আছি; মহাত্মাজীর এই উক্তি হইতে তাঁহাদের মনের গোপন তত্ত্বটা পরিষ্কার হইয়া পড়িতেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনকে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সাহায্যে বাধা দেওয়ার অনৌচিত্য বোধ অন্তরে লইয়াই যে তাঁহারা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং এইখানে সুভাষচন্দ্রের সহিত এবং দেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক-দের সহিত তাঁহাদের মতের সুস্পষ্ট রকমে পার্থক্য রহিয়াছে। সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, নিয়মতান্ত্রিকতার ক্ষুদ্র স্বার্থগত গণ্ডীর মধ্যে নেতারা দিন দিন যতই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, হিংসার

ভাব ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই যে হিংসা, অপ্রীতি, বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা, এ সব অশুভকে দগ্ধ করিতে হইলে বৃহত্তর ত্যাগের অনুপ্রেরণা সর্ব্বস্তরে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা দরকার এবং এ পথ যদি আজ সাহসের সঙ্গে ধরা না যায়, ধরা না যায় কার্পণ্যদৃষ্টির হিসাব-নিকাশকে কাটাইয়া তবে দেশ আরও অপ্রেম, বা হিংসার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে। উঠিবার আর কোন উপায় থাকিবে না। ক্ষুদ্র স্বার্থের আকর্ষণ মানুষের মধ্যে এমনই বেশী। দক্ষিণী দল সে পথ ধরিবেন না—গণ-আন্দোলনের দিকে তাঁহারা যাইবেন না, সুতরাং তাঁহাদের গতি কোন দিকে, ভাঙ্গিয়া বলিবার দরকার আর থাকে না। চরমপত্র চুলায় যাউক, সোজা প্রশ্ন উঠে এই যে, কংগ্রেস আজ প্রয়োজনানুরূপ ত্যাগ স্বীকারে অক্ষম, কোন সার্থক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই, মহাত্মাজীর বিশ্বাস যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধিতার জন্য দক্ষিণী দলের মুখে যত বড় বড় কথা সবই কি শূন্যগর্ভ আস্ফালন মাত্রে পর্যবসিত হয় না? তাঁহাদের মনে মুখে সামঞ্জস্য থাকে কোথায়? আমরা দেখিতেছি, মতভেদ রহিয়াছে, মতভেদ এই যে, দক্ষিণী দল সংগ্রাম চাহেন না—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পর্যন্ত তাঁহারা চাহেন না। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের উদ্দীপনা যাঁহারা অন্তরে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা চাহেন সংগ্রাম। সে সংগ্রামে সিদ্ধি এখনই আসিবে কি না আসিবে, ফলের দিকে সে নজর তাঁহাদের নাই। সে নজর লইয়া কোন বড় কাজই হয় না—তাঁহারা চাহেন সত্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাঁহারা চাহেন আত্মত্যাগের দ্বারা আদর্শকে জীবন্ত করিতে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় তাঁহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। প্রতিকূলতার ভিতর দিয়াই সকল বড় সিদ্ধি জগতে আসিয়াছে। সকল মহৎ সিদ্ধি পরমপ্রয়াসে। আজ ভারতেও সে সত্যের ব্যতিক্রম হইবে না। আত্মাহুতির আগুনই সমস্ত দুর্ব্বলতা দগ্ধ করিবে। ক্ষুদ্র স্বার্থের বিচার-বিবেচনা ধরিয়া থাকিলে অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারের স্তরেই দিকচক্রবালকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। পথ সুস্পষ্ট। অভীষ্ট সাধনার ঐকান্তিকতাই পথের একমাত্র আলো।

শরণাগতিই সার—

"চরমপত্র দেওয়া"—ইংরেজের কাছে তাহার কোন মূল্য নাই—তবে কিসের মূল্য আছে—পথ কি? বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে দক্ষিণী দলের প্রধান নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বক্তৃতায় ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। সর্দ্দারজী বলিতেছেন—

"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট একখানা চরমপত্র দাখিল করিবার পক্ষে ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রতিকূল বলিয়া আমরা ঐ ধারণার পরিপোষক নহি।"

"আমাদের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে ভেদ বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গুরুতর রকমের, দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজা ও নৃপতিদের মধ্যে বিরোধ; এই সব কারণে আমাদের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। চরমপত্র দাখিল করার ফলে যে সংগ্রাম অনিবার্য্য, তেমন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে দেশের অবস্থা উপযুক্ত নয়।"

"ঘটনার গতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আমরা মন্ত্রিত্ব লইয়াও আমাদের শত্রুদের সঙ্গে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি নাই।"

"আমরা আমাদের শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকাইব বলিয়াই মন্ত্রিত্ব লইয়াছিলাম, কিন্তু আজ দেখিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর উপর আমাদের সে প্রভুত্ব আর নাই। নির্ব্বাচনে দাঁড়াইলে আমরা জিতিব কিনা সে সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান।"

"সুতরাং আমরা যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নীতি পরিচালনাতেই সাফল্য লাভ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের মত জটিল অস্ত্র পরিচালনা করিয়া যে আমরা সাফল্য লাভ করিব, এমন আশা থাকে কোথায়? এইরূপ অবস্থায় চরমপত্র দাখিল করার সমস্ত কল্পনা মরীচিকা-ভ্রান্তি মাত্র।"

সংগ্রামের পথে সফলতা নাই—তবে কোন পথে সফলতা? বাধা দেওয়া অবিবেচনার কাজ, তবে কাজ হইবে কোন পথে? একমাত্র পথ হইল ভিক্ষার পথ, একমাত্র পথ হইল ব্রিটিশ জাতির উদারতার দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা জানান? সর্দ্দারজী প্রত্যক্ষভাবে উত্তরটা দেন নাই; কারণ ঋষিরা পরোক্ষবাদী।

আসন্ন সংগ্রাম—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে বাঙলার জনমত কিরূপ প্রবল, গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণকালে কলিকাতায় কয়েকটি সভাতেই তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শুধু হিন্দু নহে, বাঙলা দেশের মুসলমানেরাও তীব্রভাবে এই অনিষ্টকর উদ্যমের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বাঙলার মুসলমানেরা দেখিতেছেন যে, এই বিলের সাহায্যে কলিকাতা শহরের পৌর-কর্ত্তৃত্ব হইতে তাঁহাদিগকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা হল। যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথায় কর্পোরেশনে ঢুকিবার যে সুবিধা বাঙলার মুসলমানদের ছিল, প্রস্তাবিত আইনে তাহা আর থাকিবে না। দিল্লীওয়ালা এবং পশ্চিমা মুসলমানদেরই শহরে টাকার জোর; সুতরাং মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের সুবিধায় ষোলআনা মজা লুটিবে তাহারাই। বাঙালীর বিশিষ্টতা—হিন্দু-মুসলমান বাঙলার যাহারা সকলেই বাঙালী, এই যে অনুভূতি, এই অনুভূতি উৎখাত করিয়া প্রস্তাবিত বিলে হিন্দু আর মুসলমান, এই সাম্প্রদায়িকতার বিচারকেই বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। পশ্চিমা মুসলমানদের উপর আমরা কোন ঈর্ষা বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করি না। বাঙলা দেশটা হইয়া পড়িয়াছে এখন সাত ভূতের ভোগের ক্ষেত্র, যতদিন এ সুবিধা আছে, তাহারা তাহা ভোগ করুন; কিন্তু আপত্তি শুধু এইখানে যে, ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া গণতান্ত্রিকতার নীতিকে পদদলিত করিয়া অ-বাঙালীর প্রভুত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে বাঙালীর ঘাড়ে এবং এমন উপায়ে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে

বাঙালীর একেবারে সর্ব্বনাশ হয়, জাতীয়তার একবারে মূলোচ্ছেদ হয় বাঙলা দেশ হইতে। এক দিকে এই ব্যাপার; অন্য দিকে ব্যাপার আরও বিচিত্র। এই বিলের দ্বারা শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের হাতে শহরের সর্দ্দারী সঁপিয়া দেওয়া হইল। হক সাহেব এই বিল সমর্থন করিতে গিয়া শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রশংসায় আজ পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তিনি সেদিন বলেন, "আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ কর্পোরেশনে নিঃস্বার্থভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা কর্পোরেশনে শুধু দেশের মঙ্গলের জন্যই কাজ করিতেছেন, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নহে। ইউরোপীয়ানদিগকে যে তাঁহাদের অনুপাত অপেক্ষা কিছু অধিক সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে, কর্পোরেশনের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যেই তাহা করা হইয়াছে।" হক সাহেব শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের যে নিঃস্বার্থ এবং পরহিত-ব্রতের রূপ দেখিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়েরও বোধ হয় তাহা মনোবুদ্ধির অগোচর। স্বার্থের দায়েই যে তাঁহারা এদেশে আছেন এবং স্বার্থের দায়েই এদেশের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, এ সত্যটি অস্বীকার করিবার মত মিথ্যাচার শ্বেতাঙ্গেরাও দেখাইতে সঙ্কুচিত হন; কিন্তু হক সাহেব লজ্জা-সরমের ঊর্দ্ধে। একদিন শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের চক্রান্তে নিজে মেয়র হইতে না পারিয়া তিনিই বলিয়াছিলেন যে, মীরজাফর, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠের বংশধরগণ তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছে। আজ সেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সঙ্গেই ঘটিয়াছে তাঁহার অন্তরের মণিকাঞ্চন সংযোগ। সেদিন তিনি এই ষড়যন্ত্রকারীদিগকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন—এইখানেই শেষ নয়। আজ দেশের লোককে এই বলিয়া শাসাইতেছেন যে, এইখানেই শেষ নয়, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সঙ্গে যোগসূত্র আরও তাঁহার নিবিড় হইবে এবং সাম্প্রদায়িকতার নীতি আরও প্রসারিত হইবে। তিনি আজ সমগ্র বাঙলাকে শক্তি-পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছেন। বাঙালী এ আহ্বানের সমুচিত প্রত্যুত্তর অবশ্যই দিবে। স্বজাতিদ্রোহী এবং যাঁহারা ক্রীতদাস তাঁহারাই মন্ত্রিত্ব বা পদমান-প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে এইরূপ সর্ব্বনাশকর মনোবৃত্তির সঙ্গে আপোষ করিয়া চলিতে পারে; বিবেকের খোঁচা খাইয়াও ইতর-স্বার্থের বিবেচনায় সে-সব সামলাইয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু বাঙালী মরে নাই, একথা হক সাহেব জানিয়া রাখুন। যে বাঙালীর কাছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে একদিন হার মানিতে হইয়াছিল, সেই বাঙালীর সংকল্প-শক্তির কাছে এই সব ক্ষুদে কর্ত্তাদের কেরামতি খাটিবে কত দিন?

চাকুরী বাঁটোয়ারার ব্যাপার—

শতকরা ৬০টি চাকুরী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বাঁধা রাখা চাই, এই মর্ম্মে যে প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পাশ হইয়াছে, সেই প্রস্তাবের সম্পর্কে আলোচনার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদিগকে লইয়া প্রধান মন্ত্রী আলোচনার একটি বৈঠক ডাকিয়াছিলেন, সেই বৈঠক ফাঁসিয়া গিয়াছে। কেন ফাঁসিয়া গেল, এ সম্বন্ধে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়, প্রধান মন্ত্রীর নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর একটি বিবৃতিও সরকারী প্রচার বিভাগের একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য সম্বলিত বিবৃতি সহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনা যে ফাঁসিয়া গিয়াছে, ইহাতে আমরা খুশী হইয়াছি। শ্রীযুত বসু মহাশয়, প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, হক মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িকতার যে নীতি লইয়া চলিয়াছেন, তাহাতে বাঙলা দেশের কল্যাণকামী কোন ব্যক্তির পক্ষেই তাঁহাদের সহযোগিতা করা সম্ভব হইতে পারে না; এবং প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীরা এই সহযোগিতা চাহেনও না। তাঁহারা প্রতিপদে জনমতকে দলন করিয়াই চলিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক লড়াই করা ছাড়া কথা বলেন না। সিংহত্ব ব্যাঘ্রত্বের পরিচয় বাঙলার বিপন্ন ইসলামী দলের রক্ষক এই ব্যাঘ্রপ্রবরের মধ্যে অন্য কোন দিক হইতে না থাকিলেও নখর এবং দংষ্ট্রা বিকাশ যে আছে, বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ন্যায়পরতা, সুবিচার এবং জনস্বার্থ এবং জনমতের অনুকূলতা বজায় রাখিয়া চলিবার যে সমীচীনতা—বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে এ সব কোন বিবেচনাই বড় নহে। তাঁহার কাছে বড় হইল সাম্প্রদায়িকতা, কারণ এই সাম্প্রদায়িকতার কূট কৌশলই তাঁহার মন্ত্রিগিরিকে কায়েম রাখিবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সে বিশ্বাস লইয়া তিনি থাকুন এবং তাঁহার সেই বিশ্বাসে চলিবার ফলে আজ সমগ্র বাঙলা দেশের যে সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, যাঁহারা তাঁহার অনুগত তাঁহারা বিবেককে বিকাইয়া দিয়া সে সব বরদাস্ত করুন। স্বজাতিদ্রোহিতা এবং স্বদেশদ্রোহিতায় মীরজাফর এবং উমিচাঁদকে ছাড়াইয়া যাইবার মত সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য পদমান প্রতিষ্ঠার মোহে বড় হয় কাহারও কাছে, হউক কিন্তু দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় কোন ব্যক্তিই বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর কোন কার্য্যের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। বিবেক বুদ্ধি বিন্দুমাত্র যাঁহার আছে তিনি পারিবেন না। বসু মহাশয়ের কার্য্যে দেশের সম্মুখে এই পথটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ কার্য্য বা বিশেষ নীতি আজ বড় নয়, আজ দেশের পক্ষে বড় হইল, হীন সাম্প্রদায়িকতার যে মনোবৃত্তি হক মন্ত্রিমণ্ডলকে পরিচালিত করিতেছে, সেই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বাঙলার সমস্ত স্তরে জনগণের বিক্ষোভকে উগ্র করিয়া তোলা; কারণ এই মন্ত্রিমণ্ডল বজায় থাকিতে বাঙলা দেশে শান্তি নাই, সোয়াস্তি নাই—বিরোধ এবং বিদ্বেষের আগুন বাঙলা দেশকে ছারখার করিয়া তবে ছাড়িবে, হক মন্ত্রিমণ্ডলের গতি এবং নীতি যদি আজ বাধাপ্রাপ্ত না হয়। পলাশীর রণাঙ্গনের যে বিশ্বাসঘাতকতার পাপে জাতিকে দীর্ঘ পরাধীনতার জ্বালা ভোগ করিতে হইতেছে, সে পাপের প্রভাবও বাঙলার অন্তরকে এতটা স্পর্শ করিতে পারে নাই। হক মন্ত্রিমণ্ডলের অবলম্বিত নীতির পাপময় প্রভাব পলাশীতে অনুষ্ঠিত বিশ্বাসঘাতকতার

পাপাচার অপেক্ষাও প্রবল। এই মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি নিজের ঘরে ভেদ-বিভেদকে পাকা করিয়া শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহ দলের হাতে দেশের ভাগ্যকে তুলিয়া দিতেছে। কোন ভদ্রলোকের পক্ষে এমন মন্ত্রিমন্ডলের সহযোগিতা করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

হক সাহেবের যুক্তি—

সরকারী চাকুরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমানদের জন্য রাখিতে হইবে—এই প্রস্তাবের পক্ষে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব যে-সব যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে আমরা হক সাহেবকে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত বলিয়াই মনে করি। তবু যে মনোবৃত্তি তাঁহাকে যুক্তি-বুদ্ধির অতীত স্তরে তুলিয়াছে, সেই মনোবৃত্তিটার স্বরূপ উন্মুক্ত করিবার জন্য আমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। হক সাহেব জাতি-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে চাকুরীতে লোক নিয়োগের বিরোধী। তিনি বলেন, জাতি-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার নীতিটা ভাল হইতে পারে; কিন্তু ভারতে যখন বিভিন্ন জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় রহিয়াছে, তখন গুণ বা যোগ্যতার নিরিখে বিচার এখানে চলিবে না। এখানে জাতি-ধর্ম্মের বিচারকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি এই যুক্তিকে আরও খোলসা করিয়া বলিয়াছেন, বাঙলা দেশের শতকরা ৫৫জন লোক যখন মুসলমান, তখন সরকারী চাকুরিয়ারা যদি শতকরা ৫৫ জন মুসলমান না হন, তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জনসংখ্যার ঐ শতকরা ৫৫জন কেমন করিয়া সহানুভূতি আশা করিতে পারে? একথার সোজা অর্থ কি বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। সোজা অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, জনসংখ্যার শতকরা যে ৫৫জন মুসলমান, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানই সরকারী চাকুরিয়াদের কর্ত্তব্য হইবে। হক সাহেব দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরিয়া নিয়োগের যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার মূলের যুক্তি এমনই অপূর্ব্ব। হক সাহেবের রায় এই যে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাহায্যে চাকুরিয়া নিয়োগের ফলে অভিজাত-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে চাকুরিয়া নিয়োগই গণতান্ত্রিকতার গোড়ায় দরকার। এ যুক্তি একেবারে জলের মত পরিষ্কার! আসল কথা হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলার জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের যে বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছে, হক সাহেব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই বিষেরই পুষ্টি সাধন করিতেছেন। সেই বিষ বাঙলা দেশের পরতে পরতে ভাল করিয়া ঢুকিয়া এ জাতিকে চিরতরে অভিভূত যাহাতে করিতে পারে, হক সাহেবের উদ্যম হইল তাহাই। এই মন্ত্রিমণ্ডলের কুগ্রহের প্রভাব কাটাইতে না পারিলে বাঙলার সর্ব্বনাশ অচিরে।

ইহাই কি দেশসেবা ?—

৯৩৬ সালে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রুণী সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়া কর্পোরেশনে কংগ্রেস মনোনীত অল্ডারম্যান প্রার্থীদের পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন। এবার আবার সেই ব্যাপারেরই পুনরভিনয় হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেসের কোন দায়িত্বসম্পন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না; কিন্তু এবার তিনি কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে একজন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হইয়াই তিনি সেদিন কর্পোরেশনে কমিটি নির্ব্বাচনে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যোগ দিয়া কংগ্রেসী দলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্র এই ব্যাপারে সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন,—"ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, যিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই যে স্বয়ং এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার শিলং যাইবার পূর্ব্বে শ্বেতাঙ্গ দল এবং অপরাপর কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে এই আক্রমণের আয়োজন করিবার জন্য বহু গোপন বৈঠক হইয়াছে।' সুখের বিষয়, এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—কিন্তু ব্যর্থ হইলেও অনিষ্টের বীজ রহিয়াই গিয়াছে। আমাদের ভয় হয় এই যে, কর্পোরেশনে দেশের শত্রুদের জন্য যেরূপ অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে পাকা রকমের প্রতীকার এখন না করিলে ইহারা সুবিধা পাইবে; সুতরাং সাবধান এখন হইতেই বিশেষ রকমে হওয়া দরকার। যাঁহারা এই ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির প্রতিবাদস্বরূপে তাঁহারা উহা করিয়াছিলেন। এই দলের মতাবলম্বী মাতব্বর পুরুষের মুখে আমরা আগেও ঐ ধরণের যুক্তি শুনিয়াছি। দেশের স্বার্থকে যাহারা বিদেশীর পায়ে বিকাইয়া দেয়, তাহারা এই ধরণের যুক্তিই উপস্থিত করিয়া থাকে। ঘরসন্ধী বিভীষণেরও ছিল এই নীতি।

রাজনীতিক বন্দী দিবস—

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ২১শে মে রাজনীতিক বন্দী দিবস ঘোষণা করিয়াছেন। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশনে এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেই প্রস্তাব অনুযায়ী এই ঘোষণা করা হইয়াছে। সহযোগী 'ষ্টেটসম্যান' কংগ্রেসের দক্ষিণমার্গীদের আজকাল বড় অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। দক্ষিণপন্থী দলের নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর এজন্য সহযোগীর অভিমান হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"এমন কি পণ্ডিত নেহরুকে পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, বাঙলার ব্যাপার লইয়া অবশিষ্ট ভারতকে মাথা ঘামাইবার জন্য বন্দী দিবস অনুষ্ঠান তিনি সমর্থন করিয়াছেন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত হত্যাকারীদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে না বলিয়া মিঃ ফজলুল হকের গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিতে বলিয়াছেন। নির্দ্দোষ লোককে হত্যা করাই ঐ লোকগুলির একমাত্র ভারতের সেবা।" রাজনীতিক বন্দীরা সাধারণ চোর-ডাকাতের শ্রেণীর লোক নয়। রাজনীতিক অবস্থা বিশেষের মধ্যে ঐ সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং রাজনীতিক কারণেই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। যে সব

আইরিশকে ইংরেজেরা একদিন খুনে ডাকাত মনে করিত, তাহাদের সংগে আপস্ বাড়াইয়া ইংলণ্ডেরই প্রধান মন্ত্রী কর-কম্পন করিতে গিয়াছিলেন কোন্ কারণে? শান্তি প্রতিষ্ঠার গরজেই। যে রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে রাজনীতিক হিংসা-মূলক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে অবস্থা দেশের এখন নাই এবং আজ যদি রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হয় তাহা হইলে দেশের মধ্যে সন্তোষের আবহাওয়া প্রতিষ্ঠারই তাহা সহায়ক হইবে, এই বিবেচনাতেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। উদারনীতির দিক হইতেই এমন অবস্থার রাজনীতিক সার্থকতা, ব্যক্তিবিশেষের বিচারের নীতি এজন্যই এক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ হেরল্ড লাস্কি সেই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল নীতির দিক হইতে বিষয়টি দেখিতেছেন না, ব্যক্তি-বিশেষের বিচারের অপেক্ষাকৃত অনুদার নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অকারণ দেশের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাবই জিয়াইয়া রাখিতেছেন। জনমতকে বৃথা আশ্বাসে তুষ্ট রাখিবার জন্য বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যে কমিটি করিয়াছিলেন, সে কমিটির কাজে বাঙলার এ সমস্যার আজিও সমাধান হইল না। এমন কমিটির সংগে সহযোগিতা করা চলে না বুঝিয়াই কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুত ললিতচন্দ্র দাস কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বাঙলার মন্ত্রীদের মতিগতি পরিবর্তিত হইবার নয়—জাগ্রত জনমতের শক্তিই বর্ত্তমান অবস্থায় সমস্যার সমাধান করিতে পারে। গোড়াতেই আমরা সেই কথাই বলিয়াছি, এখনও আমাদের সেই কথা। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এখন এই ব্যাপারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা দেখিতে চাই তাঁহারা এদিকে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

আসামের সমস্যা—

ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এ দেশে আমলাতান্ত্রিক ধারায় একটা দস্তুরই হইয়া দাঁড়াইয়াছে শ্রমিক সম্পর্কিত কোন বিরোধ দেখা দিলেই সরকার পক্ষ হইতে মনিব পক্ষকে সমর্থন করা হয়, এবং যত দোষ পড়ে গিয়া যে বেচারারা পেটের দায়ে ধর্ম্মঘট করে তাহাদেরই উপর। আসামের বড়দলই মন্ত্রিমণ্ডল এই সনাতনী নীতির ব্যতিক্রম সাধন করিতেছেন; এই জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে শেবতাংগ সম্প্রদায়ের উত্তেজনার অবধি নাই। আসামের সিভিলিয়ান দলও যে সরকারের এইরূপ নিরপেক্ষ নীতিতে অসন্তুষ্ট এবং শ্রমিক দলনের ত্রুটির জন্য ক্ষুব্ধ, এ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শেবতাংগ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি আসামের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে নানা রকমের কথা ছড়াইয়াছে। আসামের প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থসচিব সেদিন আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে এই দলের উত্তেজনার সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্বার্থ-প্রণোদিত মিথ্যা প্রচারে তাহাদের পটুতা কতখানি। আসাম গবর্ণমেণ্ট ডিগবয়ের এই ধর্ম্মঘটের সমস্যার যাহাতে উভয় পক্ষের সন্তোষজনকভাবে সমাধান হয়, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু শেবতাংগ কোম্পানীর জিদের ফলে তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ডিগবয় অয়েল কোম্পানী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সালিশের সিদ্ধান্ত মানিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যাপার আরও কিছু দূর গড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আসাম সরকার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবেন এই সিদ্ধান্তেই দৃঢ় আছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই নীতির বিরুদ্ধে শেবতাংগদের বিক্ষোভ ক্রমেই উগ্র আকার ধারণ করিবে, এবং চক্রান্ত চলিবে নানারকমে, ইহা বুঝা যাইতেছে। দেশদ্রোহীর দলও অবশ্য নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, নীলবর্ণ শৃগালের অভিনয় তাহারা করিবে। এ সব সত্ত্বেও আমাদের আশা আছে যে, আসাম সরকার সমগ্র দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবেন। কংগ্রেসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না, এবং তেমন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইলে যদি দরকার হয়, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের শক্তিও প্রয়োগ করা হইবে।

কারণ কি?—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'রাষ্ট্রবাণী' পত্রের ১লা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়াছেনঃ—

'যাঁহারা গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধালু তাঁহাদের নিকট নানা ক্লেশকর প্রশ্ন উপস্থিত হয়। কেন তিনি এমন বলিলেন বা কেন তিনি এ কথা সাফ করিলেন না—এই ধরণের প্রশ্ন নিয়তই উঠিতে থাকে। ইহার উত্তর গান্ধীজী নিজে না দিলে বাহির হইতে আর কাহারও যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। শ্রীযুত সুভাষবাবুর নির্ব্বাচন-সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন ইহা লইয়া সম্প্রতি এই ধরণের প্রশ্ন নানা দিক হইতে উঠিতেছিল। গান্ধীজিকেও জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি তাহার উত্তরে বলেন যে, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব লইয়াছে তাহার পক্ষে সকল কথাই বুঝাইয়া বলিয়া প্রকাশ করা সকল সময় সম্ভব হয় না।"

মন্ত্রগুপ্তি রাজনীতির একটা বড় কথা; ওদিক হইতে মহাত্মাজীর এই যে উক্তি আমরা ইহার মূল্য বুঝি; কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয় রাজনীতির দিকটা বড় করিয়া দেখেন নাই। ইহার একটা আধ্যাত্মিক দিকও তিনি দেখাইতেছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—"যাঁহার মনে হয় যে, গান্ধীজী খারাপ কাজ করিয়াছেন—তিনি সেইরূপই বিশ্বাস করিবেন ও তদনুযায়ী আচরণ করিবেন, গান্ধীজীকে মন্দ বলিবেন, তাঁহাকে বা তাঁহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিবেন। ইহাতে হয়ত গান্ধীজীর কার্য্যের ক্ষতি হইবে, কিন্তু ক্ষতি সহ্য করিয়াও তাঁহাকে কোনও কোনও বিষয়ে মৌন থাকিতে হইবে। তিনি বলেন, অহিংসার ধর্ম্ম এই।"

মহাত্মাজী আধ্যাত্মিক মহান্ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। নিন্দাস্তুতি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা আমরা বুঝি। কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার মৌন থাকা এবং কোন বিষয়ে না থাকা বুদ্ধিতত্ত্বের এই যে নিগূঢ় রহস্য সাধারণের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করাই কঠিন হইয়া পড়ে। সুভাষ-চন্দ্রের নির্ব্বাচন গান্ধীজী দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এ বিশ্বাসের সম্বন্ধে,

আমরা কোন প্রশ্ন তুলিতেছি না, এবং মৌনতা ভঙ্গ করিয়া সে বিশ্বাস দেশের নিকট ব্যক্ত করাই হয়ত তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইরূপেই তিনি নিশ্চয়ই দেশের স্বার্থের দিক হইতেই এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিয়াছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের কাজে বাধা না দেওয়াই ঠিক হইবে। অথচ তাঁহারই দোহাই দিয়া বিরাট আড়ম্বর সহকারে তাঁহার অনুগত দল যখন প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহারই বিশ্বাস মত যে কাজ দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে তাহাই করিলেন এবং তৎসম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁহার ঘাড়ে চাপাইলেন তখনও তাঁহার উচিত ছিল দেশেরই স্বার্থের দিক হইতে, অন্ততঃ তাঁহার বিবেকবুদ্ধি এবং বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য মৌনতা ভঙ্গ করিয়া তেমন কার্য্যের প্রতিবাদ করা; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি মৌনতা রক্ষা করাই সংগত বোধ করিলেন এবং দেশময় দলাদলির ভাব তাহার ফলে বাড়িয়া উঠিল, অশ্রদ্ধা, অপ্রীতি ধূমায়িত হইল। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ত্রিপুরীর ব্যাপারের পর গান্ধীজী যদি দক্ষিণী দলের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আবহাওয়া এতটা বিষাক্ত হইয়া উঠিত না। রাজনীতিক অভিসন্ধির দিক হইতে এক্ষেত্রে মহাত্মাজীর মৌনতার মর্ম্ম বুঝা যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে অন্ততঃ আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দাশগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন—"যদি গান্ধী অনুগামী সংস্থা বা ব্যক্তি অহিংসা ও সত্যাশ্রয়ী হইত তবে বাঙলায় গান্ধীজীর প্রতি এই পরিমাণ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার বন্যা বহিতে পারিত না।" তাঁহার এই উক্তির যৌক্তিকতা আমরাও স্বীকার করি। শুধু বাঙলার কথা কেন, নিখিল ভারতের দিক হইতেও উহা সত্য। দেশের স্বার্থের দিক হইতে কংগ্রেসের মধ্যে বিশুদ্ধ আবহাওয়া বজায় রাখিবার জন্য, অনাচার দূর করিবার জন্য যেমন ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে, গান্ধী অনুগামী ব্যক্তিদের অন্তর হইতে অনাচার এবং ব্যভিচার দূর করার দিকে তেমন ব্যগ্রতা দেখা যায় না কেন—ইহার কারণ আধ্যাত্মিক না রাজনীতিক?

ভিক্ষায়াং নৈবচ—

রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে হক মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যায় এবং অবিচারমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণরের নিকট তার করিয়াছেন। এই তারে তাঁহারা গবর্ণরকে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যায়ের প্রতিরোধমূলক আন্দোলনের উদ্বোধক হিসাবে এই কার্য্যের কিছু মূল্য থাকিতে পারে, তাহা ছাড়া ইহার যে বিশেষ কিছু মূল্য আছে আমরা তাহা মনে করি না এবং এই প্রতিবাদমূলক আন্দোলনের দিক হইতে এই কার্য্যে যে মূল্য একটু আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে সাহায্যকরভাবে যে অবলম্বিত হইল, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কারণ, আমরা জানি, হক মন্ত্রিমণ্ডল আজ যে-সব সাম্প্রদায়িকতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহার মূল শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই যোগাইয়াছে এবং এখনও যোগাইতেছে। এ সত্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, শাসনযন্ত্রের পদাধিকারী যিনি, তিনি ব্যক্তিগতভাবে যতই বিচারপরায়ণ হউন না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রস্বরূপেই তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। একদিন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর খোলাখুলি একথা বলিয়াছেন যে, শাসন-সংস্কার আইনে বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের আসন বণ্টন এমনভাবে করা হইল যাহাতে কংগ্রেসী দল সেখানে কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিবেন না এবং কংগ্রেসী দল বলিতে যে, দেশের নবজাগ্রত আত্মপ্রতিষ্ঠতার শক্তি একথা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলার জাতীয়তার শক্তিকে এই কৌশলে নির্জ্জিত করিয়া এদেশে তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম করিবার ফিকিরে আছে। এই ফন্দী যদি ভাঙিতে হয়—আগাইয়া যাইতে হইবে বীর্য্যের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে পৌরুষসহকারে, হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ইহা নয়, এ প্রশ্ন হইল সকল সম্প্রদায়ের। বিদেশীয় শোষণনীতিকে বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত রাখিবারই এই কৌশল। প্রতীকার করিতে হইলে আবেদন-নিবেদনের পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। একমাত্র উপায় হইল দেশের সমস্ত শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা। সকল টান কাটাইয়া এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সকল দ্বিধা দূর করিয়া দিতে হইবে মন হইতে এবং অতিক্রম করিতে হইবে সব অবীর্য্যকে। যাঁহারা বাঙলাকে বাঁচাইতে চান, ইহা ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে অন্য পথ নাই।

সময়ের অভাব—

সেদিন বিহার ব্যবস্থা পরিষদে রায় বাহাদুর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সিংহের প্রশ্নের উত্তরে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ জানাইয়াছেন যে, বাঙালী-বিহারী সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মন্ত্রিমণ্ডল এখনও সেগুলি অনুমোদন করেন নাই, সুতরাং তদনুযায়ী কাজও আরম্ভ হয় নাই—অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্যবস্থাগুলিই বহাল রহিয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সমস্যার মীমাংসা করিবার ভার লইবার পর নানা টাল-বাহানায় কাটিয়াছে বৎসরাধিক কাল, তারপর ওয়ার্কিং কমিটি যদিও একটা সিদ্ধান্ত করিলেন, এ সিদ্ধান্তও নির্ব্বিবাদে বিহারী মন্ত্রীদের দপ্তরখানার কবুতর-কক্ষে পচিতেছে, বোধ হয় মন্ত্রিত্বের বাকী কালটাও এইভাবে কাটিবে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি, বিহারী মন্ত্রিমণ্ডলের বর্ত্তমান মতিগতির উপর তাঁহার এই নবদায়িত্বলাভ কিভাবে কাজ করে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত থাকিলাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে অহিংস প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া এখন অসম্ভব, দক্ষিণ দল এই রায় দিয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু বাঙালী-বিহারীদের মধ্যে অহিংসা এবং প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথে অবলম্বন করিবার পক্ষে উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই, তাঁহাদের ইহাও কি বিশ্বাস? নহিলে এদিকে তাঁহারা এমন উদাসীন কেন?

দেশের কথা—ভারতের পণ্য

১৯৩৮ সালের বাণিজ্যের হিসাব—রপ্তানি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

নূতন হিসাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইবার কথা। গত সাল হইতে এই সালে রপ্তানি কমিয়াছে সাড়ে চল্লিশ কোটি টাকার। সুতরাং ভারতের বাণিজ্যে আমরা অন্তত উক্ত পরিমাণ টাকা কম পাইয়াছি। সকল সময়েই রপ্তানির অংক কম হওয়া দুর্লক্ষণ নহে, বিশেষত যদি কম পড়ে কাঁচা মালের রপ্তানিতে; তবে উহার মধ্যে একটি কথা ভুলিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে, ঐ মাল নিজের দেশে শিল্পক্ষেত্রে লাগিয়াছে, কি, পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য রপ্তানি কমিয়াছে এবং কমিয়াছে কাঁচা মাল সম্পর্কে এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আমরা উহার উপযুক্ত ব্যবহার করি নাই বা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। মোট সাড়ে চল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে এক তুলার রপ্তানি কমিয়াছে সাড়ে ষোল কোটি টাকার। ইহার প্রধান কারণ জাপানীরা যুদ্ধ করিতেছে চীনাদের সাথে; তাহাদের কাপড়ের ব্যবসায়ে মন দিবার ফুরসুৎ ছিল না। পরের প্রশ্ন, আমরা কি ঐ তুলো কাজে লাগাইয়াছি? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আমরা বিদেশ হইতে যে তুলা পূর্ব্ব বৎসর আমদানী করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা কম আমদানী করি নাই; বরং বেশীই হইয়াছে। সুতরাং তুলার বাজারে আমাদের বড়ই বিপর্য্যয় গিয়াছে।

তাহার পর দেখি কাঁচা পাট, ইহার রপ্তানি এক বৎসরের মধ্যেই কমিল চার কোটি টাকার। বাঙলার পাট কম বিক্রয় হইলে, সমাজের যত পরগাছা আছে সব অনাহারে মরে। চাষী পয়সা না দিলে অনেকেরই "হাঁড়ি চড়া" বন্ধ হয় আর এই চার কোটি আয় কম লইয়া চাষী হাহাকার করিতেছে, সমাজে অভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহা ছাড়া এখন আর সে দামও নাই। উপরন্তু চাষের খরচ বাড়িয়াছে, ফসল কমিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে কমিয়াছে পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি। এই রপ্তানি কম হওয়ায় মিল মালিকেরা পাট কম কিনিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চাষী যে কেবল বিদেশে কম পরিমাণে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা নয়, দেশে যতটা বিক্রয় করিতে পারিত তাহাও পারে নাই। এই সকল কারণে বাঙলার চাষী ভীষণ মার খাইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, দালাল, আড়তদার, কুঠীওয়ালা, পাটের অফিস, কেরাণী, দোকানী, পসারী ইত্যাদি ইত্যাদি সব কর্ম্মহীন, বিপন্ন, নিরন্ন।

চাষীদের মৃত্যুর আর এক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তণ্ডুল ও দ্বিদলের (Grain, Pulse & Flour) রপ্তানিতে। এক বৎসরে পৌনে পাঁচ কোটি টাকার রপ্তানি পড়িয়া গিয়াছে। এক একবার মনে হয়, "তবু ভাল, দেশে অনেক ধান, কড়াই রহিয়া গেল, লোকে দুমুঠা খাইয়া বাঁচিবে।" কিন্তু মনে প্রশ্ন উঠে নানা রকম: সত্যই কি এই ধানচাল অনাহারীর নিকট পৌঁছিবে? প্রথম কথা যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা ইহার ধারে আসিতে পারিবে না; কেবলমাত্র হঠাৎ সস্তা হইয়া গেলে কেহ কেহ হয়ত খাইতে পাইবে। কিন্তু যাহারা চাষ করিয়াছে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? এমন মজার দেশ, এমন দুর্ভাগা দেশ যেখানে প্রচুর ফসলও আতংকের কারণ। আমাদের এই সমস্ত রপ্তানির বাজার ব্রহ্ম দখল করিবে; লোকে ধান কড়াইয়ের যথাযথ মূল্য পায় না, অথচ আর একদিকে অর্থ না থাকায় লোকে কিনিয়া খাইতে পারে না। গত বৎসর (১৯৩৭) হইতে এ বৎসর ভারতের চাউল কম কিনিয়াছে ইংরেজ (২২ লক্ষ টাকার স্থলে ৬ লক্ষ টাকা), পোলণ্ড (১৯৩৬ সালে লইয়াছিল ২৯ লক্ষ টাকার মাল, ১৯৩৭ সালে ১৬ লক্ষ, আর এ বৎসর বন্ধ!), নেদরলণ্ড (৫৩ লক্ষ টাকার স্থলে সাড়ে ৭ লক্ষ), জাপান (২৬ লক্ষ স্থলে ২ হাজার টাকা!) জার্ম্মানী (১৯৩৬ সালে ৪০ লক্ষ টাকার মাল, ১৯৩৭ সালে ১৩ লক্ষ ৬৫ হাজার, আর ১৯৩৮ সালে ২৫১!), আমেরিকা, ফিনলণ্ড, পোর্টুগাল (১৯৩৬—১০ লক্ষ ১৯৩৭—০; ১৯৩৮—০); ইটালী, ষ্ট্রেটস সেট্‌লমেণ্টস্ (১৯৩৬—১ কোটি, ১৯৩৭—৪৭,৪০,৪১৮; ১৯৩৮—১২,২৩,০০০,) ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের চাউলের সমস্ত খরিদ্দার কমিয়া গিয়াছে; ব্রহ্মের চাউল এখন আর না খাইলে ইহাদের উপায় নাই।

গম কমিল ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার স্থলে ২ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা; বার্লি বা যব ২১ লক্ষ স্থলে সাড়ে ৭ লক্ষ প্রভৃতি এই কয়টী হইতেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

চামড়া, কাঁচা (Hides or, raw or undressed) আর "পাট করা" (tanned or dressed and Leather) লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই, রপ্তানি কমিয়াছে, যথাক্রমে ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা এবং ২ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা, মোট পৌনে ৫ কোটী টাকার। অর্থাৎ এক বৎসরে রপ্তানি কমিল শতকরা ৩৪·৬। দেশে হঠাৎ এত চামড়া জমিয়া গেলে এই সংক্রান্ত যত লোক উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের দশা কি হইতেছে, তাহা ভুক্তভোগী বুঝিতেছে। এত চামড়া উদ্বৃত্ত হইয়া পড়ায় দামও নিশ্চয়ই কমিয়াছে; কিন্তু দেশের মধ্যে ইহার ব্যবহারের কোনও ব্যবস্থা হইতেছে কি? যাঁহারা খাজনা ট্যাক্স আদায় করিয়া নিশ্চিন্ত, যাঁহাদের বাঁধা মাহিনা পাইতে একদিন বিলম্ব হইলে "credit" নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহাদের এই বিপন্ন লোকদের প্রতি কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? ১৯৩৮ সালে যাহা হইয়াছে, যুদ্ধ না বাধিলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং হয় এই চামড়ার নূতন বাজার দেখিতে হইবে, নচেৎ দেশের মধ্যে ইহার ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে, এ রপ্তানি কেন পড়িল, তাহার অনুসন্ধান এবং সরকারী বা সমবায় সমিতির টাকায় কম মূল্যে উদ্বৃত্ত চামড়া কিনিয়া রাখা;

যাই কোথায়? যেদিকেই দেখি, কেবল রপ্তানির হ্রাস। খনিজ (অসংস্কৃত) ধাতু এবং রদ্দি লোহা বা পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ইস্পাত (metallic ores and scrap iron or steel for re-manufacture) ইহাতে রপ্তানি কমিয়াছে এক কোটি সাড়ে ৩৯ লক্ষ টাকার (মোট তিন কোটি টাকার মধ্যে) আর "লোহা ইস্পাত ব্যতীত অন্য ধাতু বা তজ্জাত দ্রব্যাদি" (Metals other than Iron and Steel and manufactures there-of) ইহাতে এক কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মধ্যে কমিল ৯৯ লক্ষ ৩২ হাজার বা মোটামুটি এক কোটি টাকার।

ইহার মধ্যে ম্যানগানিস একেবারে হাওয়াই বাজী দেখাইতেছে। এই দেখা যায় রপ্তানি নাই বলিলেই হয়, আবার দেখি খনি হইতে যত পরিমাণ উঠিল, তাহাতে ভারতের স্থান প্রথম, রুশ গণতন্ত্রেরও উপরে। গত বৎসর গিয়াছিল ২ কোটি টাকার, এবার গেল এক কোটি! লোহার ও ইস্পাতের কারবার যত চলে, ততই ম্যানগানিসের চলিবার কথা। প্রকৃতপক্ষে রুশ ছাড়া কাহারই প্রয়োজনের মত ম্যানগানিস নিজ দেশে নাই। সুতরাং এই হ্রাস এক সমস্যার কথা। ভারতবর্ষ অবশ্য কতকটা ম্যানগানিস নিজেই ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাহার মানে এই নয় যে, রপ্তানির প্রয়োজন ছিল না। Wolfram ore ৩৫ লক্ষ টাকা হইতে ১৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। ঢালাই সীসা ১৯৩৭ সালে যায় ৮৫ লাখ টাকার আর এ বৎসর দেড় লাখ টাকা মাত্র।

৪০ লাখ টাকার ওপর দাম যে সকল পণ্যের, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়টির নাম দেওয়া গেল :—

চা—৪০ লক্ষ টাকা;

বীজ—৫০ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে সরিষা (৫৮ লক্ষ স্থলে সাড়ে ২৮ লক্ষ টাকা), তিল (৩৩ লক্ষ স্থলে ১৬ লক্ষ টাকা)।

পশম (কাঁচা)—৬৩ লক্ষ টাকা (৩ কোটি ২৯ লক্ষ স্থলে ২ কোটি সাড়ে ৬৬ লক্ষ টাকা); ইহার সহিত পশমী বস্ত্র তাহাও কমিয়াছে ২০ লক্ষ টাকা।

কাঠ—৫৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা,

তুলার সুতা ও বস্ত্রাদি—৬২ লক্ষ ৫৬ হাজার (৮ কোটি ২৩ লক্ষ স্থলে ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মাল)

মোটামুটি মশলা, চিনি, খনিজ পদার্থ, রবার ইত্যাদি সকল দ্রব্যেরই রপ্তানি কমবেশ কমিয়াছে। আমরা প্রধানত কাঁচা মাল পাঠাইয়া বিদেশ হইতে অর্থ আনি; সুতরাং এই রপ্তানি পড়িয়া যাওয়ার অর্থ ভারতবাসীর পক্ষে অতি দুরূহতর।

ইহা লইয়া আলাপ আলোচনা অনেক হইতেছে, কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান। দেশ বিদেশ কাঁচা মাল পাইবার জন্য মারামারি করে, আমাদের দেশে আছে, অথচ আমরা যথার্থ ব্যবহার করিতে পারি না।

পর প্রবন্ধে আমদানী মাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

অরণ্যে ও নগরে

(Evelyn Underhill)

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ বি-টি

হিম মৌলি গিরি-গাত্রে হেরিলাম তারে,
স্রস্ত কেশ, নগ্ন পদ, রিক্ত সে ভাণ্ডারে;
গোপন মহিমা শুধু ছাড়ি' দুনয়ান,
যদিও একাকী পথে, সাথে ভগবান।

মুখর নগরী-পথে তারে হেরিলাম
চিনিতে নারিনু তবু করিনু প্রণাম।
ছিন্ন বেশ, রুক্ষ কেশ, ক্লান্ত দেহ ঢাকি',
সাথে নর-নারী, তবু চলিছে একাকী।

কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক-এর মে দিবস উপলক্ষে ইস্তাহার

গত মে দিবস উপলক্ষে "কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক"এর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি মস্কো হইতে নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করেনঃ—

হে শ্রমজীবী জনগণ! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১লা মে তারিখ আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংহতির সংগ্রাম-দিবসে পরিণত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সেই প্রথম "কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার"এর 'সর্ব্ব দেশের শ্রমিকগণ, এক হও', এই অমর রণ হুঙ্কার অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন সহরে শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক শান্তিরূপে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই পঞ্চাশ বৎসরে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি বাড়িয়াছে। একাধিকবার সে তাহার ঘোর শত্রু বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছে; একাধিকবার সে বুর্জ্জোয়াশ্রেণীকে পরাস্ত করিয়াছে; সে নিজেও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু শত্রুকে দ্বিগুণতর শক্তিতে আঘাত করিবার জন্য আবার দণ্ডায়মান হইয়াছে।

১৯১৭ সালে আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা শ্রেণীর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী সোভিয়েট শ্রমিক শ্রেণী পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ ভূভাগের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারা শ্রেণীর পক্ষে ইহা এক যুগান্তকারী জয়; ইহার পরিণাম হইতে সর্ব্বহারার শ্রেণী-শত্রু কখনও উদ্ধার পাইবে না।

সোস্যালিজ্‌মের জয়

সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিদীর্ণ করিয়াছে, এবং বিশ্বব্যাপী শ্রমিক বিপ্লবের যুগ প্রবর্ত্তণ করিয়াছে। সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণী তাহার জয় দ্বারা সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির দৃঢ় ঘাঁটি প্রস্তুত করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্বহারার অভেদ্য দুর্গ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী সমাজতন্ত্রবাদের অস্ত্র ও উপকরণে সজ্জিত করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের নক্ষত্র ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আজিকার মত উজ্জ্বল দেখা যায় নাই। অষ্টাদশ বলশেভিক কংগ্রেসে মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মানুসারী, সমস্ত দেশের শ্রমজীবী জনগণের নেতা ও শিক্ষিত কমরেড ষ্টালিন মনুষ্যজাতির ইতিহাসের এক নূতন পৃষ্ঠা উন্মোচন করেন—সে হইতেছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এক শ্রেণীহীন সমাজ-গঠন এবং সোস্যালিজ্‌ম্‌ হইতে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এ ক্রম পরিবর্ত্তনের ভিত্তি স্থাপন।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে দাসত্ব, ফ্যাসিষ্ট, অত্যাচার ও যুদ্ধ-পীড়িত জনসাধারণ প্রতি বৎসর সোশ্যালিজমের বিজয়েতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর অজেয় শক্তির জীবন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহাদের বর্ত্তমান অদৃষ্টকে তাহারা ধিক্কার দিতেছে এবং কম্যুনিজমেই তাহাদের ভবিষ্যৎ মুক্তি উপলব্ধি করিতেছে। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি আজ একযোগে কম্যুনিজমের উচ্চ সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে—এ সৌধ-আলোকও সূর্য্য কিরণে, মানুষের সুখ ও আনন্দে মণ্ডিত। তাহাদের মহৎ অভিজ্ঞতাই আজ তূর্য্য-নিনাদে সারা পৃথিবীর অত্যাচারিত ও বঞ্চিত জনসাধারণকে শ্রমজীবিগণের মুক্তির একমাত্র পথ লেনিন-ষ্টালিনের পথ, সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের পথ অবলম্বনের জন্য আহ্বান করিতেছে।

ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শ্রমজীবী জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট সীমাহীন। বর্ত্তমান তাহাদের গৃহে লইয়া আসে অর্থ-সঙ্কট, বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্য—ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারিদের নিকট হইতে আনে বিদ্রূপ, কারাবাস ও বন্দীদশা। বর্ত্তমান লইয়া আসে জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টদের অনুষ্ঠিত পুঞ্জীভূত অন্যায়—আনে সাম্রাজ্যবাদী রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড।

স্পেনের সংগ্রাম

প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া স্পেনের জনসাধারণ বীরের মত আক্রমণকারী ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ ও ফরাসী বুর্জ্জোয়াশ্রেণী "নিরপেক্ষতা"র ফাঁস লাগাইয়া স্পেনীয় জাতের শ্বাসরোধ করিতেছিল। "দ্বিতীয় অর্থাৎ সোস্যালিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আত্মসমর্পন-পন্থীদের সমর্থনে পৃথিবীর প্রগতি-বিরোধিগণ স্পেনীয় জাতির পরাজয়ের ব্যবস্থা করে। যে জাতি তাহার জীবন দিয়া শুধু নিজের নয় অন্যান্য জাতির স্বাধীনতার জন্যও লড়িতেছিল সেই জাতির হস্ত হইতে ঐ প্রগতি বিরোধিগণ জয়-তরবারি ছিনাইয়া লয়।

স্পেনীয় জাতি ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারিগণকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই জাতিকে হত্যা করিয়া প্রতিক্রিয়ার শকুনী-দল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। এখন তাহারা স্পেনকে জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফ্যাসিজমের দস্যু-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার এক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করিতেছে। তাহারা ফ্যাসিজমের হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার লুন্ঠনের যুপকাষ্ঠে ইউরোপের সমস্ত জাতিকে বলি দিবে।

চীন-জাপান

সুদূর প্রাচ্যে জাপানীর সমর-কর্ত্তাগণ চীনের ৪০ কোটি অধিবাসীকে পদানত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। চীনা জনসাধারণ সিংহ-বিক্রমে জাপানীদের সহিত লড়িতেছে। তাহারা শত্রুব্যূহের পশ্চাতে শত্রুকে বিব্রত করিতেছে। জাপানীদের অধিকৃত সহরগুলির চারিদিকে তাহারা কঠিন সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহারা দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের দ্বারা শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে।

চীনাদের সাহসিক ও আত্মোৎসর্গী-সংগ্রাম ক্রমশঃ জাপানের শ্রমজীবী জনগণের মনোবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটাইতেছে এবং জাপ-সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তা নষ্ট করিতেছে। জাপ-আক্রমণকারিগণ দ্রুত যুদ্ধ সমাপণে ব্যর্থকাম হইয়াছে; তাহাদের ঈপ্সিত "সন্ধি" নিষ্পন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। মরিয়া হইয়া তাহারা বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধেই সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে; জাপানীরা ক্রমশঃই এই দুই শক্তির অধিকৃত উপনিবেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

ইউরোপে ফ্যাসিজ্‌ম্‌

মত্ত পশুর মত ফ্যাসিজম আজ ইউরোপে বিচরণ করিতেছে; সে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছে, মেমেল দখল করিয়াছে, আলবানিয়া পদানত করিয়াছে। সে পোল্যাণ্ডকে তাহার নাগপাশে জড়াইতেছে; বল্কান হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সে সঙ্গোপণে সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রবেশ করিতেছে। সে উপনিবেশ পুনর্বণ্টন দাবী করিতেছে এবং ল্যাটিন আমেরিকার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ফ্যাসিজম আজ সমস্ত আপোষ বিসর্জ্জন দিয়াছে; অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর যোগসাজসে সে সুবিধাজনক "পরিস্থিতি" সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে ফ্যাসিজমের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর সে চাপ দিতেছে, তাহাদিগকে

হুমকী দিতেছে এবং প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিক্রিয়া-পন্থিগণের বিশ্বাসঘাতকতার উপর নির্ভর করিয়া আছে। ফ্যাসিজম উদ্ধ্বশ্বাসে কাজ করিতেছে; কারণ সে জনসাধারণের বর্ত্তমান বিরুদ্ধতায় সন্ত্রস্ত।

ফ্যাসিজম আজ ভাড়াটিয়া ট্রটস্কিপন্থী চর ও প্ররোচনাদাতার দলকে লেলাইয়া দিয়াছে; তাহারা ফ্যাসিষ্ট গোয়েন্দা বিভাগের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিতেছে। শত্রু যখন সম্মুখে আসিয়া পড়িবে তখন শ্রমিকেরা যাহাতে পঙ্গু হইয়া পড়ে সে জন্য তাহারা শ্রমিক সংগঠনকে ভিতর হইতে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

ফ্রান্স-বৃটেনের ভূমিকা

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দেওয়ার নীতির মূল্য এখন বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিক্রিয়া-পন্থিগণের দিতে হইতেছে। ফ্যাসিজম যাহাতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হয় সে জন্য তাহারাই তো অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার দ্বার ফ্যাসিজমের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহারাই তো ফ্যাসিজমের হাতে স্পেনের খনি, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মজুদ সোনা এবং স্কোডা কারখানা তুলিয়া দেয়। সোভিয়েট ভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীরা যাহাতে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহারাই তো হাঙ্গারীর গম এবং রুমানিয়ার পেট্রল ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে দিয়া দিবার আয়োজন করে। তাহারাই তো ফ্যাসিষ্ট দস্যুগণকে যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দিয়া স্পেন জয়ের সুবিধা করিয়া দেয়।

কিন্তু তাহারা এমন শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে যাহা এখন তাহাদের বিরুদ্ধেই খাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধেই ফ্যাসিষ্ট দস্যুগণকে অস্ত্রসজ্জিত করিয়াছে। তাহাদের নীতি দ্বারা তাহারা নিজেদের জাতির উপরেই ফ্যাসিষ্ট শক্তির আক্রমণের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। জনগণ ক্রমশঃই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছে যে, শান্তি রক্ষার পরিবর্ত্তে মিউনিক নীতি ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের পথ আরও সুগম করিয়াছে এবং সেই আক্রমণকে আরও আগাইয়া আনিয়াছে।

মিউনিক নীতির বিরুদ্ধে এবং যাহারা শান্তি রক্ষার ভণ্ডামির আবরণে সমস্ত জাতিকে যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। মিউনিক ষড়যন্ত্রের জন্য যাহারা দায়ী সেই রাষ্ট্রনীতিকগণকে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য জনগণের দাবী ক্রমশঃই প্রবল হইতেছে। ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধকামীদের প্রতিশ্রুতিতে অথবা তাহাদের সাহায্যকারীদের ঘোষণায় জনসাধারণের কোন বিশ্বাস নাই। জনসাধারণ কথা নয় কাজ চায়। তাহারা দাবী করে যে, ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়ান হোক।

প্রকৃত পথ

হে শ্রমিক ভাইগণ! আমরা, কম্যুনিষ্টরা, বরাবরই তোমাদের কাছে সত্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, সে সত্য যতই তিক্ত হোক না কেন। ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রকৃত পথ কম্যুনিষ্টরাই তোমাদের দেখাইয়াছে। তাহারা তোমাদের বলে নাই কি যে, "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক"-এর নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতি সোশ্যালিজমে পৌঁছিবে না, পৌঁছিবে ফ্যাসিজমে, পৌঁছিবে যুদ্ধে?

জার্ম্মানীতে ফ্যাসিজম যখন সবে মাত্র ক্ষমতা অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে তখন কম্যুনিষ্টরাই কি তোমাদের বলে নাই যে, বুর্জ্জোয়াশ্রেণীকে ক্রমাগত সুবিধাদান, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভেদসৃষ্টি, কম্যুনিষ্টগণের কুৎসা রটনা—সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের এই নীতি শ্রমিক শ্রেণীরই পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিতেছে?

যে সময়ে ফ্যাসিজমকে মারাত্মকভাবে আঘাত করা অনেকটা সহজ ছিল সেই সময়ে কম্যুনিষ্টরাই কি "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক" এবং "ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জ্জাতিক"-এর নিকট এই প্রস্তাব করে নাই যে, শ্রমিকদের যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা হোক? যুদ্ধ পরিহারের জন্য কম্যুনিষ্টরাই কি অবিলম্বে শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ করিতে পীড়াপীড়ি করে নাই? শান্তি ও সকল জাতির নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলিয়া মিউনিক চুক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন কি কম্যুনিষ্টরাই করে নাই?

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদে লাভবান হইয়াছে কে? ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীরা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জ্জোয়াশ্রেণী শ্রমজীবিগণের ঐক্যকে মহামারী অপেক্ষাও বেশী ভয় করে; কারণ তাহারা খুব ভাল করিয়াই জানে যে, কোটি কোটি শ্রমিক তাহাদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যমদ্বারা ফ্যাসিজমের টুঁটি চাপিয়া ধরিতে পারে, তাহারা দস্যুতামূলক সংগ্রামকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে এবং ফ্যাসিষ্ট শাসনের দ্রুত অবসান ঘটাইতে পারে।

যুদ্ধ প্রতিরোধ সম্ভব

হে সর্ব্বহারাগণ! যাহারা বলে ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধ-প্ররোচকগণকে সংযত করা অসম্ভব, তাহাদের বিশ্বাস করিও না। ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা যে অন্য জাতিকে আক্রমণ করিতেছে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহারা শক্তিশালী; তাহারা যুদ্ধ বাধাইতেছে এই কারণে যে, তাহাদের নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য তাহাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরী রাষ্ট্রের আসন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। কূটনৈতিক ও সামরিক "জয়" লইয়া হৈচৈ করিয়া তাহারা স্বদেশের জনসাধারণের বিক্ষোভকে চাপিয়া দিতে চায়। কিন্তু যতই তাহারা অপরের রাজ্য দখল করিতেছে ততই তাহারা ভিতরে ভিতরে নিজেদের দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে।

হিংসার আশ্রয় লইয়া তাহারা এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের প্রচলিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা তাহারা সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনকে তীব্রতর করিয়াছে। ফ্যাসিজম যতই অপর জাতিকে পদানত করিতেছে ততই যুদ্ধকালে তাহার এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর আভ্যন্তরীণ বিপদ বাড়িয়া যাইতেছে। ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরীর আচ্ছাদনের নীচে অভূতপূর্ব্ব শক্তিশালী বৈপ্লবিক রূপান্তর গোপনে প্রসারলাভ করিতেছে।

ফ্যাসিজমের পতন

কিন্তু শ্রমজীবী জনগণ যদি পতন না ঘটায় তাহা হইলে ফ্যাসিজম আপনা হইতেই একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে না। তাহাদের সংগ্রাম-মুখী সঙ্কল্প, তাহাদের সাহস, তাহাদের আত্মোৎসর্গের স্পৃহা—ইহারই উপর ফ্যাসিজম ও ধনতন্ত্রের পতনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত্ত নির্ভর করিতেছে।

ফ্যাসিষ্ট জল্লাদেরা চেকোশ্লোভাক জনগণকে কখনও পিষিয়া ফেলিতে পারিবে না। তাহারা বিজেতাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তাহাদের শক্তি সংহত করিতেছে। অস্ত্রবলে যে ফ্যাসিষ্ট শৃঙ্খলে তাহাদের বাঁধা হইয়াছে জনসাধারণ তাহা কখনও নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইবে না।

যে কোন সামরিক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সহিত প্রথম সঙ্ঘর্ষেই ফাসিজমের জীর্ণ "মৈত্রী" ও "আশ্রিত রাজ্য" ব্যবস্থা চূর্ণ হইয়া যাইবে। ফাসিষ্ট দস্যুদের ব্যূহের পিছনে জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বৈপ্লবিক আক্রমণে ধনতন্ত্রের ঘাঁটি দখলের চিন্তা অত্যাচারিত জনগণের মনে পরিণতি লাভ করিতেছে।

স্পেনীয় জনসাধারণ বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই আত্মসম্মানগর্ব্বী শান্তিপ্রিয় জাতিকে দুর্ব্বৃত্ত ফ্রাঙ্কো কখনও আয়ত্তে আনিতে পারিবে না। স্পেনীয়রা রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে, প্রিমো দে রিভেরার ফাসিষ্ট ডিক্টেটরী চূর্ণ করে। তাহারা ইতালীর এই ঘৃণিত তাঁবেদারকেও দূরে নিক্ষেপ করিবে।

ফাসিজমের সহিত জনসাধারণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। স্পেনের শ্রমজীবী জনগণ জানে যে তাহাদের সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবীর বর্দ্ধমান ফাসিষ্টবিরোধী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফাসিষ্ট শাসকরা যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়েছে তাহাতে স্পেনীয় ফাসিজমেরও কবর হইবে। স্পেনীয় রক্তাক্ত ভূমি আবার এক ফাসিষ্টবিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত হইবে।

সর্ব্বহারার শক্তি

হে সর্ব্বহারাগণ! আমাদের শক্তি প্রচণ্ড, কারণ আমরা সংখ্যায় কোটি কোটি। আমাদের উপরই নির্ভর করে কল-কারখানা ও খনির কাজ; আমাদের উপরই নির্ভর করে ট্রেণ ও জাহাজ চলাচল; মুষ্টিমেয় পরস্বাপহারী দস্যু ভোগবিলাসে মত্ত থাকিবে কিন্তু তাহাও নির্ভর করিতেছে আমাদের উপর।

জনগণের সংগ্রামশীল অগ্রণী দল হইতেছে শ্রমিক শ্রেণী; শ্রমিক শ্রেণীই জনগণের বর্ত্তমান স্বার্থ এবং সমগ্র শ্রমজীবী মনুষ্য জাতির চূড়ান্ত স্বার্থের বাহক। কিন্তু আত্মশক্তিতে আমাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের বিশ্বাস থাকা চাই। আমাদের ঐক্য চাই, কারণ ঐক্যে শক্তি বহুগুণে বাড়িয়া যায়। জাতি ও সমগ্র বিশ্বের ভিত্তিতে আমাদের যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করা দরকার। অন্ন, জল ও বায়ুর মত উহার প্রয়োজন।

আমাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়া এবং তাহা কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াই যুক্ত ফ্রণ্টের সহায়তায় আমরা জনসাধারণের এবং সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের শক্তিনিচয়কে দৃঢ়তর করিতে পারিব। আমাদের যুক্ত ফ্রণ্ট প্রয়োজন এই কারণে যে, আমরা ফাসিজম, দস্যুতামূলক যুদ্ধ এবং ধনতান্ত্রিক দাসত্ব চিরকালের মত ধ্বংস করিতে চাই।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর কর্ম্মের ঐক্য এখন কাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে? নির্ভর করিতেছে সোশ্যালিষ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জ্জাতিক-এর উপর। যদি তাহাদের নেতারা ইচ্ছা করেন, তবে আগামীকল্যই ঐক্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঐক্যবদ্ধ কার্য্যের দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে শক্তিশালী পপুলার ফ্রণ্ট আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ইহা দ্বারা ফাসিজমের গতিরোধ হইবে, তাহার পতনের সূত্রপাত হইবে।

হে লেবার ও সোশ্যালিষ্ট পার্টির শ্রমিকগণ! তোমরা কি ইহা চাও? যদি চাও, তাহা হইলে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ কার্য্যে তোমাদের নেতৃবৃন্দ যে বাধা দিতেছেন, তাহা চূর্ণ কর এবং তোমাদের একই শ্রেণীভুক্ত কম্যুনিষ্ট ভাইদের সহিত একত্রে ঐক্যকে শক্তিশালী কর।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যস্থাপন

"কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক" সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া "সোশ্যালিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক" ও "ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জ্জাতিক"-এর প্রস্তাব করিতেছে, যুদ্ধপ্ররোচক ও যুদ্ধলিপ্সুগণের বিরুদ্ধে যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করা হোক।

"সোস্যালিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক"-এর নিকট "কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক" ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটা সাধারণ কার্য্যক্রম পেশ করিতেছে, যথা—ফাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের ভিত্তিতে শান্তি রক্ষা, সম্মিলিত নিরাপত্তা সংগঠন, প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশে যে প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণী স্বজাতির স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের সহিত মৈত্রী করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

"কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক" প্রস্তাব করিতেছে যে, স্পষ্ট একটি কর্ম্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য, সংগ্রামের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এবং যুক্ত কার্য্যকে কেন্দ্র সংহত করিবার একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির এক সম্মেলন আহ্বান করা হোক।

স্বার্থে স্বার্থে

বলের আশ্রয় নিয়ে ন্যায়ের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা—এর মতো সহজ কাজ আর নেই। অনেক দিন ধ'রে আমরা যে-সব অধিকারকে অসঙ্কোচে ভোগ ক'রে আসছি ন্যায্য মনে ক'রে—তাদের ত্যাগ করার মতো কঠিন কাজও আর নেই। এই মন্তব্যের প্রতিষ্ঠা যে সত্যের উপরে—ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে তার।

বাংলায় আর পাঞ্জাবে অনেকগুলি রাজবন্দী দীর্ঘকাল ধ'রে কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন। তাঁদের মুক্তির জন্য অনেক-রকমের চেষ্টা-চরিত্র হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী হকমন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য অনেক আবেদন করেছেন। যে সময়ের মধ্যে তিনি বন্দীদের মুক্ত দেখবার আশা করেছিলেন—সে সময় পার হয়ে গেছে। আর কোনো আশা নেই। রাজদ্রোহের অপরাধে কারাগারে বহন করছেন যাঁরা বন্দীর শৃঙ্খলিত অভিশপ্ত জীবন—তাঁদের মুক্তির দিনকে এমন ক'রে ঠেকিয়ে রাখবার কি কারণ থাকতে পারে? রাজবন্দীরা তো প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সন্ত্রাসবাদে তাঁরা আর বিশ্বাস করেন না। এর পরেও বন্দীদিগকে মুক্তি না দেওয়া কি হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নয়?

আমরা চেয়েছিলাম ক্ষুধার অন্ন, পেয়েছি পাথর—চেয়েছিলাম তৃষ্ণার বারি, পেয়েছি তীব্র কালকূট। ইংরেজের কাছ থেকে দাবী করেছিলাম স্বরাজের—যে স্বরাজ দেশের কোটী কোটী ক্ষুধার্ত্তকে দেবে অন্ন, বস্ত্রহীনকে দেবে বস্ত্র, নিরক্ষরকে দেবে জ্ঞানের আলো। না পেলাম অন্ন, না পেলাম বস্ত্র, না পেলাম জ্ঞানের অমৃত। সারাটা দেশ পূর্ণ হ'য়ে আছে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত কোটী কোটী জীবন্ত নরকঙ্কালে। দাবী যখন প্রত্যাখ্যাত হোলো—অসন্তোষ দেখা দিতে লাগলো দিকে দিকে। অশান্তিকে দূর করবার জন্য রাজশক্তি নিলো চণ্ডনীতির আশ্রয়। স্বাধীনতা চেয়েছিলো যারা তারা পেলো লাঞ্ছনা। অন্ন আর বস্ত্র আর শিক্ষার দাবী করেছিলো যারা তাদের শিরে নেমে এলো রাজরোষের অশনি। অনেক রকম নতুন নতুন মারাত্মক আইন তৈরী হ'য়ে গেল আর সেই আইনের যূপকাষ্ঠে চলতে লাগলো বলির পালা।

যা সহজতম—রাজশক্তি তারই নিলো আশ্রয়। ভারতবর্ষের কোটী কোটী চলন্ত নরকঙ্কালকে জীবনের প্রাচুর্য্যের আস্বাদন দেওয়া তো সহজ নয়—তা হ'লে যে অনেক ত্যাগ করতে হয়। লক্ষীর প্রাসাদে থেকে দিনে সাত শো টাকা ক'রে ভাতা নেওয়া হয় না, ভারতবর্ষকে বিলিতী কাপড়ের গুদাম ক'রে রাখা চলে না, শিগার, শ্যাম্পেন আর মোটরের পিছনে অজস্র-অর্থব্যয় সম্ভব হয়ে ওঠে না! তার চাইতে দমননীতির পথ অনেক সহজ। আইনের বাঘকে ছেড়ে দাও জনারণ্যের মধ্যে, বাছা বাছা লোক-গুলি ঘায়েল হ'লেই নাচন-কোঁদন সব থেমে যাবে। বিপ্লবের মেঘকে দিগন্তের পারে তাড়িয়ে দিতে হ'লে চণ্ডনীতির বায়ুবাণের মতো এমন অস্ত্র আর কোথায় আছে? এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হ'লে স্বার্থত্যাগের কোনোই বালাই নেই। পান থেকে চুনটুকু পর্যান্ত খসবে না—পাটের কলগুলি থেকে যে নোফা সংগৃহীত হ'চ্ছে তার কিছুমাত্র কমতি হবে না—জজিয়তী আর ম্যাজেস্ট্রেটী ক'রে যে টাকা কামাই করা যাচ্ছে, তাতে হাত দেবার কারও সাহস থাকবে না—অথচ বিপ্লবের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে যাবে। সব দেশের রাজশক্তি শৃঙ্খলিত জনগণের চিত্তকে অবিচলিত রাখবার জন্য যে পথকে সহজতম ব'লে গ্রহণ করেছে—ভারতবর্ষের রাজশক্তি সেই দমননীতিরই আশ্রয় নিয়েছে।

আইনের নজির দেখিয়ে যুবকদের আটক ক'রে রাখবার আসল হেতুটা, তা হ'লে, কি? হেতুটা হোলো স্বার্থ। যাকে আমরা আইন বলি তার তাৎপর্য্যটা লাস্কির ভাষাতেই বলি,—

The law, in any society, is, in the last resort, nothing so much as the body of principles which determine how the social product is to be divided among the claimants to a share in the national dividend.

সব সমাজেই আইন হ'চ্ছে কতকগুলি নীতির সমষ্টি। জাতীয় সম্পদের উপরে কোন্ মানুষের কতখানি অংশ থাকবে তার নির্দ্দেশ দেয় এই নীতিগুলি। সুতরাং আইনের চরম কাজ হচ্ছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে কে কতখানি অধিকার ভোগ করবে তার সীমা নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া। আমাদের কার আয় কত হবে—তার নির্দ্দেশ দিচ্ছে আইন। বড়োলাট মাসে বাইশ হাজার টাকা ভাতা পাবেন—জজেরা ম্যাজিস্ট্রেটেরা কেউ পাবেন দু'হাজার, কেউ পাবেন পাঁচ হাজার—এ সব আইনের নির্দ্দেশ। আইন করবার ক্ষমতা কার হাতে? রাষ্ট্রশক্তির হাতে। রাষ্ট্রশক্তি কার হাতে? ইংরেজের হাতে। রাষ্ট্রশক্তির লাগাম ইংরেজ নিজের মুঠোর মধ্যে রেখেছে কেন? ভারতবর্ষে নিজেদের ষোলো আনা স্বার্থ কায়েম রাখবার জন্য। আইনের পিছনে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি রয়েছে ব'লেই তার নির্দ্দেশের উপরে কারও হাত দেবার এতটুকু ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রশক্তি ইংরেজের হাতে না থেকে আমাদের হাতে যদি থাকতো তবে আইন তৈরী হোতো ভারতবাসীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। যে আইনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে নিরন্নের দেশে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা মাসে কেউ দু'হাজার, কেউ তিন হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করে থাকেন—রাষ্ট্রশক্তির অধিকার আমাদের হাতে এলে সে আইন আমরা কবে বাতিল ক'রে দিতাম! ইংরেজ কোনো কোনো আইন করবার অধিকার অবশ্যই আমাদের হাতে দিয়েছে কিন্তু যে আইন তৈরী করবার অধিকার পেলে তার পকেটে হাত পড়বার আশঙ্কা থাকতে পারে তেমন আইন করবার অধিকার আমাদের হাতে কোথায়? দেশের আইন কি হবে—তার নির্দ্দেশ দেবার অধিকার যদি আমাদের হাতে থাকতো তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের হবে না ন্যায়কে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠবে—তা স্থির করতাম আমরাই। কিন্তু কোন্‌টা আইনসঙ্গত হবে আর কোন্‌টা বে-আইনী হবে তা স্থির করবার ক্ষমতা আছে কেবল রাষ্ট্রশক্তির আর রাষ্ট্রশক্তিকে পরিচালনা করেন যাঁরা তাঁদের যেমন দৃষ্টি-ভঙ্গিমা—আইনের রূপও হয় তেমনি। ইংলণ্ডে অথবা আমেরিকায় যা আইন—রাসিয়াতে তাই 'বে-আইনী। কেন?

কারণ ইংলণ্ড ধনতান্ত্রিক দেশ—পক্ষান্তরে রাসিয়া কমিউনিজমে বিশ্বাসী।

ইংলণ্ডে যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তারা ধনী। তারা যত-কিছু আইন-কানুন করে তাদের সব-কিছুর লক্ষ্য থাকে ধনীদের স্বার্থ। তারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যত কিছু আইন-কানুন ক'রেছে তাদেরও লক্ষ্য হচ্ছে বিলাতের ধনীদের স্বার্থ। সেই স্বার্থকে কখনোই তারা ক্ষুন্ন করতে পারে না। ভারতবর্ষে যারা তাদের রাষ্ট্রশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত তাদের ক্ষমা করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব—কেন না রাষ্ট্রশক্তি পরহস্তগত হ'লে ভারতবর্ষে ইংরেজের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হ'তে বাধ্য। যে ডালে ইংরেজ ব'সে আছে সে ডাল কখনো সে ইচ্ছে ক'রে কাটবে না—আপন ভালো পাগলেও বোঝে

ইংরেজ কখনো কি ভারতবর্ষকে স্বায়ত্বশাসন দান করতে পারে? ভারতবর্ষে representative government-এর প্রতিষ্ঠা হোলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনায় ইংরেজের হাত থাকবে কতটুকু? কংগ্রেস তো তা হ'লে শাসন-রথের রজ্জুকে হাতের মধ্যে নিয়ে নেবে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে জনসাধারণ যাতে ক্ষমতার অধিকারী না হতে পারে—তারই জন্য শিখণ্ডী-রূপী রাজন্যগণের পশ্চাতে খেলা করছে ইংরেজের শক্তি। দেশীয় রাজাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় পরিষদে এলে আর যাই হোক প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্ট হবে না—কারণ কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যদের নীতির সংগে তাদের নীতির আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্টকে চালু করতে হলে কতকগুলি মূলবিষয়ে জাতির সকল দলের মধ্যে মতের ঐক্য থাকা প্রয়োজন। দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে এই ঐক্য না থাকলে representative government অসম্ভব। দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্যদের সংগে কংগ্রেসী সদস্যদের কখনো খাপ খেতে পারে না—এ কথা জানে বলেই ইংরেজ আমাদের গলার মধ্যে ফেডারেশনকে ঠেলে দেবার এমন চেষ্টা করছে। Representative Governmentএর নামে এত বড়ো ধাপ্পা-বাজি আর হতে পারে না। তেলে আর জলে কখনো মিশ খায়? দেশীয় রাজাদের মনোনীত সদস্যদের পরিবর্তে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের নির্ব্বাচিত সদস্যেরা যদি কেন্দ্রীয় পরিষদে আসবার অধিকার পায় তবে কিন্তু ইংরেজের চাতুরী অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বমূলক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব ক'রে তুলবার জন্য রাজাদের শক্তি যোগাচ্ছে Paramount Power. দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সংগে বৃটিশ ভারতের কংগ্রেসী সদস্যদের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার পার্থক্য অল্পই।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাও প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বকে অসম্ভব করবার জন্য। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকগুলি ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ ক'রে স্বাধীনতার গলায় দিনের পর দিন যে ছুরি চালাতে পারছে সে এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বা Communal Awardএর জন্য। ভারতীয়দের হাতে যতটুকু ক্ষমতা থাকলে ইংরেজের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে India Actএ মাত্র ততটুকু ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বাধলে যতটুকু ক্ষমতা পেয়েছে তার সুবিধা নিয়ে ভারতের লোক পাছে বৃটেনের স্বার্থকে বিপন্ন করে তার জন্য India Actএর সংশোধনের চেষ্টা চলেছে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য।

যারা আশা করে—ইংরেজ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেবে, তারা ভুল করে। স্বার্থকে কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে না। ইংলণ্ডের শাসনতরণীর হাল যাদের হাতে তারা ষ্ট্যালিনও নয়, লেনিনও নয়। তারা হচ্ছে ধনী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের কথা শুনলে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ইটালি আজ ভূমধ্যসাগরে যেভাবে উত্তরোত্তর আধিপত্য বিস্তার ক'রে চলেছে—তাতে ইংলণ্ডের পক্ষে ভীত হবার কারণ ঘটেছে। একপুরুষ আগে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড ইটালির এই ঔদ্ধত্য কখনও ক্ষমা করত না। আজ করছে—কারণ মুসোলিনী সাম্রাজ্য নিলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটাবে না। ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ডের পক্ষে সেইটাই পরম লাভ।

ফ্রাঙ্কো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেও ইংলণ্ডের কাছ থেকে পাচ্ছে বীরের সম্মান। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে চেম্বারলেন প্রমুখ রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা ধনীদের বন্ধু। যে সকল স্বার্থকে কায়েম রাখবার জন্য তারা উৎসুক—ফ্রাঙ্কো সেই সব স্বার্থের প্রতীক। ফ্রাঙ্কোর পরাজয় তাঁদের কর্তৃত্বে আঘাত হানতো।

আমরা এমন একটা যুগের মধ্যে এসে পড়েছি যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে নয়। বড় বড় আদর্শকে ঘিরে চলেছে এ যুগের সংগ্রাম। পুরাতন আদর্শকে আঁকড়ে থাকবার যুগ চ'লে গেছে। মানুষ অতীতের হাত থেকে পাওয়া আদর্শকে আজ প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে। নূতন যুগের নূতন প্রয়োজনকে সিদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই যে আদর্শের—সে আদর্শ নিয়ে আমরা কি করব? ভারত-বর্ষ সমাজকে, জাতিকে সাম্যের এবং স্বাধীনতার যে নূতন আদর্শে গ'ড়ে তুলতে চায়, সেই আদর্শের সংগে সাম্রাজ্যবাদের অহি-নকুল সম্পর্ক।

লর্ড নাফিল্ডের নূতন দান

লর্ড নাফিল্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ-সমূহের হাসপাতাল এবং এই জাতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিকে "লৌহ হৃদযন্ত্র (Iron Lungs)" বিতরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই জন্য তিনি কোনরূপ মূল্য গ্রহণ করিবেন না। যে সমস্ত হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠান এই দানের সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে শুধু অক্সফোর্ডের কাউলি হইতে এই যন্ত্র নিজেদের ব্যয়ে আনয়ন করিতে হইবে। সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় আমাদের দেশের হাস-পাতালসমূহ এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা প্রাথমিক সাহায্যদান সমিতিগুলিও ইচ্ছা করিলে লর্ড নাফিল্ডের উপরোক্ত দানের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

লর্ড নাফিল্ড ইতি-মধ্যেই তাঁহার বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবে-ষণার নিমিত্ত বিশ লক্ষ পাউন্ড দান করেন। ইহার পর ১৯৩৭ সালেও উপ-রোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আরও দশ লক্ষ পাউন্ড দান করেন বলিয়া যখন সংবাদ প্রকাশিত হয়, তখন এককালে তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সভ্য জগতের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

লর্ড নাফিল্ড ও তাঁর পত্নী

সাইকেল মেরামতি কার্য্যের সামান্য ব্যবসায়ী হিসাবে মোরিসের (ইহাই নাফিল্ডের পূর্ব্বতন নাম) কর্ম্মজীবনের সূচনা হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে তিনি ব্যাপকভাবে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণকার্য্য সুরু করেন। সুবিখ্যাত মোরিস-কাউলি ও অন্যান্য মোটর কোম্পানীর তিনিই মালিক। ১৯২৭ সালে সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যে তিনি "উলসলি মোটরস লিমিটেড" কোম্পানীর যাবতীয় কাজ কারবার কিনিয়া লন। আজ তিনি জগতের প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পরিচালিত বিভিন্ন কল কারখানায় পনের হাজারেরও অধিক কর্ম্মী কাজ করিতেছে। তাঁহার বার্ষিক আয় দুই কোটি পাউণ্ডের কম হইবে না। ব্যবসায়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মোরিস রাজদ্বারেও বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি নাইট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে 'ব্যারন' উপাধি প্রদত্ত হয়। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিলাতের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং "লর্ড নাফিল্ড" এই উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে আবার তাঁহাকে "ভাইকাউণ্টে"র মর্য্যাদায় উন্নীত করা হইয়াছে। উপরোক্ত রাজকীয় সম্মান ব্যতীত তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও ১৯৩১ সালে সম্মানসূচক "ডি-সি-এল" উপাধি লাভ করেন। শুধু তাহাই নহে, দানের মর্য্যাদায় আজ তিনি সকলের মনেও চিরস্থায়ী শ্রদ্ধার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

লর্ড নাফিল্ড প্রকৃতপক্ষেই একজন অনন্যকর্ম্মা অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ। বার্মিংহামের নিকটে তাঁহার উদ্যোগে একটি ফ্যাক্টরী দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। সেখানে সমরোপযোগী বিমানপোতসমূহ প্রস্তুত করা হইবে। এই সমস্ত বিমানপোতই রয়াল এয়ার ফোর্সের সাহায্যার্থ নির্ম্মিত হইবে। এদিকে আবার অক্সফোর্ডের নিকটে তাঁহার "কাউলি কার ফ্যাক্টরীতে" একদল কর্ম্মী কারখানার একটি কোণকে এমনিভাবে অদল বদল করিয়া গুছাইয়া লইতেছে, যাহাতে ঐ স্থানেই নাফিল্ডের অভিপ্রায় অনুযায়ী মানুষকে প্রাণে বাঁচাইবার নিমিত্ত পাঁচ হাজার লৌহ-হৃদযন্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক দিকে বিমানপোত সরবরাহ করিবার নিমিত্ত লর্ড নাফিল্ড ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড গ্রহণ করিবেন, অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলির প্রত্যেকটি হাসপাতালের জন্য তিনি উপরোক্ত "লৌহ-হৃদযন্ত্র" বিনা মূল্যে বিতরণ করিবেন। এই দানের কাহিনীই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাকার্য্যে গবেষণার নিমিত্ত লর্ড নাফিল্ড যে দান করেন, সেই তহবিলের অর্থে বেদনানুভূতি-বিলোপ-বিজ্ঞান (Anaesthetics) শিক্ষা দিবার জন্য একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অধ্যাপক রবার্ট রেনল্ডস ম্যাকিনটোস বর্ত্তমানে এই পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। 'ইনফ্যানটাইল প্যারালাইসিস' দূর করিবার নিমিত্ত শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের ব্যবহার বেশ কার্য্যকরী হইতে পারে, উপরোক্ত অধ্যাপকের এরূপ একটি মন্তব্যের প্রতি কিছুকাল পূর্ব্বে পরহিতব্রতী লর্ড নাফিল্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কৃত্রিম 'রেসপিরেটর' বা শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা শতকরা পঁচাত্তরটি ইনফ্যানটাইল প্যারালাইসিস রোগী নিরাময় করা যাইতে পারে। অথচ ইংলণ্ডে এরূপ যন্ত্রের প্রচলন নাই বলিলেই চলে। সমগ্র ব্রিটেনে যে গোটাকতক কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলির পেটেণ্টও আমেরিকায় গৃহীত এবং

লৌহ-হৃদযন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি দৃশ্য। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত ব্যাধিতে এই যন্ত্রের উপযোগিতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে

দুই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উহা কাহারও প্রস্তুত করিবার অধিকার না থাকায় তাহাও ব্যাপকভাবে বা স্বল্প-মূল্যে সরবরাহ হইতে পারে নাই। লর্ড নাফিল্ড তখনই অধ্যাপক ম্যাকিনটোসকে ফোনে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইলেও ইংলণ্ডে আজও উহাদের এত অভাব কেন? অধ্যাপক মহাশয় উত্তরে জানাইলেন যে, "উহার খরচা অত্যন্ত অধিক (They are too expensive)" সাধারণ স্বচ্ছল আয়ের লোকদের নিকটেও যিনি সুলভে মোটর গাড়ী লাভ করিবার সুযোগ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ উত্তর স্বভাবতঃই তাঁহার মনঃপূত হইল না। উপরোক্ত শিশু রোগের মড়ক লাগিলে জাতির পক্ষে তাহা কম মারাত্মক নহে। কলকারখানায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়াও তাঁহার সুবৃহৎ ফ্যাক্টরীতে বহু জিনিষ অনায়াসেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, মোটর গাড়ীর ন্যায় ব্যাপকভাবে অধিক সংখ্যায় প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইলে এরূপ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র প্রস্তুতের ব্যয়ও প্রত্যেকটির জন্য বিশ পাউণ্ডের অধিক পড়িবে না। যদি পাঁচ হাজারটি এরূপ হৃদযন্ত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে তাঁহার এক লক্ষ পাউণ্ড লাগিবে মাত্র।—এ খরচ তাঁহার ন্যায় কোটিপতির নিকট তেমন কিছুই নহে। অধ্যাপক ম্যাকিনটোসের নিকট তখনই তিনি তাঁহার নিজ সংকল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ও বিশেষ উৎসাহের সহিত বিভিন্ন ধরণের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র ও তাহাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা নাফিল্ডের নিকট নিবেদন করিলেন। আমেরিকায় যেরূপ লৌহ হৃদযন্ত্রের প্রচলন ছিল, বলিতে গেলে লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মী ডাঃ রবার্ট জি হেণ্ডারসন নামে একজন তরুণ স্কচ ডাক্তারই উহা সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তন করেন। ঐ ধরণের যন্ত্র প্রস্তুত করার কাজে কোন ব্রিটিশ ফার্ম্মই যাহাতে একচ্ছত্র পেটেণ্ট না পান, হেণ্ডারসন তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও এরূপ যন্ত্রের একটি পরিকল্পনা করেন। অধ্যাপক ম্যাকিনটোস্ ডাঃ হেণ্ডারসনের সেই পরিকল্পনার প্রতি লর্ড নাফিল্ডের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। নাফিল্ড তাঁহার কারখানায় যে লৌহ হৃদযন্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে এরূপ যে-কয়টি কৃত্রিম যন্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। প্রসঙ্গক্রমে তাই উহাদের বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

(১) ড্রিঙ্কার টাইপ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র, প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হারবার্ড নিবাসী ড্রিঙ্কার ভ্রাতৃদ্বয়ই উদ্ভাবন করেন। বস্তুত পরবর্ত্তীকালে আরও যে কয়টি কৃত্রিম 'রেস্পিরেটর' উদ্ভাবিত হয়, তাহাতে ড্রিঙ্কার ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিকল্পনার প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ড্রিঙ্কার ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন ছিলেন শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, অপরজন ছিলেন পূর্ত্তবিদ্যা বিশারদ; উভয়বিধ বিজ্ঞানের সহযোগিতায় পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া এই দুই বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করেন। যে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র তাঁহারা প্রস্তুত করেন, উহা দেখিতে অনেকটা শবাধারের মত। কোনও রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট থাকিলে, তাহাকে এই যন্ত্র মধ্যে পুরিয়া তাহারা দেখিতে পান, যন্ত্রমধ্যস্থ হাপরটি (bellows) প্রকৃতই শ্বাস-প্রশ্বাস বহাইতে সাহায্য করে। ড্রিঙ্কার-যন্ত্রে একটি বৈদ্যুতিক মোটর এরূপভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, উহা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর যন্ত্রমধ্যস্থ বায়ু নিষ্কাশন করিয়া দেয়। ফলে, রোগীর বুক ঠেলিয়া তাহার হৃদযন্ত্রে বায়ু প্রবেশ লাভ করে ও নিশ্বাস লইতে সাহায্য করে। আবার যখন যন্ত্রমধ্যস্থ বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয় না, তখনই রোগীর বুক পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে ও তাহার হৃদযন্ত্র হইতে বায়ু বহির্গত হয়। এইভাবে যন্ত্র দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সুবিধা হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক এডওয়ার্ড বোথ

২। **হেণ্ডারসন টাইপ**— ড্রিঙ্কার পরিকল্পিত লৌহ হৃদযন্ত্রের সহিত ইহার পার্থক্য খুব বেশী নহে। দুই একটি বিষয়ে সামান্য অদল-বদল করিয়া তিনি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহা দ্বারা ইংলণ্ড বিশেষভাবে উপকৃত হয়। কারণ আমেরিকা হইতে অত্যধিক অর্থ ব্যয় করিয়া কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র আনিবার হাঙ্গামা হইতে ইহাতে ইংলণ্ড অনেকটা রেহাই পায়।

৩। ব্রাগ-পল টাইপ—বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম ব্রাগ ইহার পরিকল্পনা করেন। ক্লসবি হেলাহান নামে ব্রাগের জনৈক বৃদ্ধ বন্ধুর জীবনরক্ষার্থে ব্রাগ একটি ফুটবলের ব্লাডার বন্ধুর পাকস্থলীর সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার সহিত নল দিয়া কাষ্ঠ সংলগ্ন অপর একটি ব্লাডার যোগ করিয়া দেন। ইহা অনেকটা হাপরের অনুযায়ী কাজ করিতে থাকে। ব্রাগ তাঁহার এই কিম্ভুত-কিমাকার (Crude) যন্ত্র দ্বারাই বন্ধুর শ্বাস-কষ্ট দূর করিতে সমর্থ হন। সামান্য ব্যবস্থায় এইরূপ সন্তোষজনক ফল ফলিতে দেখিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি

(শেষাংশ ১৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পনের বছর পরে

(গল্প)

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

সমাগত রোগীদের 'ব্যবস্থা' লিখিয়া দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। মজাদার খবরগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে মনও বেশ ডুবিয়া গিয়াছিল! সহসা কানে আসিল,—ডাক্তারবাবু!

চকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম,—বারান্দায় একটি বার-তের বছরের ছেলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ছেলেটির মুখের দিকে চাহিতেই দুই-এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন কেমন আবিষ্ট হইয়া গেলাম। তাহার পর প্রশ্ন করিলাম,—কি বলছ?

ছেলেটি একবার এ-দিক সে-দিক চাহিল; কিন্তু কোন জবাব দিল না। বারান্দার একপাশে আরও তিন-চার জন লোক বসিয়াছিল। ছেলেটি তাহাদের সমক্ষে নিজের বক্তব্য বলিতে ইতস্তত করিতেছে বুঝিয়া, তাহাকে ইংগিতে ভিতরে আসিতে বলিলাম।

কুণ্ঠিতভাবে ঘরের মধ্যে আসিয়া সে আমার চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইল; তারপর একটু অপেক্ষা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—ডাক্তারবাবু, আমার মায়ের ভারী অসুখ; দয়া ক'রে যদি একবার আমাদের বাড়ী যান্ ত বড় উপকার হয়!

ছেলেটির মুখে-চোখে বেশ একটু মিনতির ভাবই ফুটিয়া উঠিল; তাহার স্বরেও যেন কাতরতা ঝরিয়া পড়িল!

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার মা'র অসুখ,—তা' তোমার বাবা না এসে তোমায় পাঠালেন কেন? তিনি কি এখানে থাকেন না; না—

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ছেলেটি উত্তর দিল,—আমার বাবা ত বেঁচে নেই, ডাক্তারবাবু! মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই-ও। বাবা মারা যাবার পর হ'তে অনেক কষ্টেই আমাদের দিন কাটছে!—শেষের দিকে তাহার চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল! ক্রমশ আমার মন-ও বেদনায় ভারী হইয়া উঠিতেছিল! কিন্তু আমি জোর করিয়া নিজকে দৃঢ় ও সংযত করিয়া তুলিলাম;—এবং বেশ গম্ভীর স্বরেই বলিলাম,—তা' আমি গেলে আট টাকা 'ফী' দিতে হবে,—জানত?

'কিন্তু আমরা যে ভারী গরীব, ডাক্তারবাবু!'—ছেলেটি ভারী কণ্ঠেই জবাব দিল,—'আপনার দয়া ভিন্ন ত আমাদের কোন উপায় নেই! মা বড় ভরসা ক'রেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি অনুগ্রহ না করলে মা বোধ হয়—

অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার স্বর হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার চোখ দিয়াও ঝর্ ঝর্ করিয়া কতকটা জল ঝরিয়া পড়িল!

চিত্তের দৃঢ়তা এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে আমাকে সত্যই এবার বেশ কিছু বেগ পাইতে হইল। তাই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়াই উত্তর দিলাম,—কিন্তু খোকা, এটা যে আমার ব্যবসা; এই ক'রে আমাকে টাকা রোজগার ক'রতে হয়। বিনা-পয়সায় রোগী দেখ্‌লে আমার নিজের যে বিশেষ ক্ষতি হবে!......ঐ-ত সামনেই একটা মুদীর দোকান র'য়েছে —কই, পয়সা না দিয়ে ওখান থেকে জিনিষ নিয়ে এস দেখি! —ওদেরও ব্যবসা,—আর আমারও ব্যবসা।

নিতান্ত বিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকাইল।......কি উত্তর দিবে?—সেরূপ জ্ঞান বা বোধশক্তি থাকিলে,—একজন চিকিৎসকের ব্যবসায় এবং একজন মুদীর ব্যবসায়ের মধ্যে যে কতখানি প্রভেদ আছে,—তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমাকে হয়ত একটু লজ্জায় ফেলিতে পারিত।......কিন্তু ওইটুকু ত ছেলে,—তায় মায়ের ভাবনায় আকুল;—তায় আবার পিতৃহীন গরীব! একমাত্র কাকুতি-মিনতি ছাড়া সে আর কি করিতে পারে?—সুতরাং আবার একবার বড় করুণভাবেই আমার দিকে চাহিয়া রুদ্ধপ্রায় স্বরেই বলিল,—আমার মায়ের তাহলে কি হবে ডাক্তারবাবু?

মর্ম্মে যথেষ্ট আঘাত পাইলাম সত্য,—কিন্তু দৃঢ়তা পরিত্যাগ করিলাম না। বরঞ্চ একটু রূঢ় হইয়াই বলিলাম,—সে আমি কি জানি? তুমি যাও, আর আমায় বিরক্ত ক'র না। যদি টাকা দিতে পার, আবার এসে আমায় ডেকে নিয়ে যাবে।

ছেলেটির মুখখানি শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল! সে আর আমার কাছে দাঁড়াইতেও সাহস করিল না। চোখ দুইটি মুছিতে মুছিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

নিতান্ত নিৰ্ম্মমের মত রূঢ়ভাবে ছেলেটিকে বিদায় করিয়া দিলাম বটে,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমি বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলাম! বার বার মনে হইতে লাগিল,—না, না, বেচারাকে ও-ভাবে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। আহা, একমাত্র মা ছাড়া ওর আর কেউ নাই! মা মরিয়া গেলে,—ভাবিতে গিয়াও আমার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখে দিলাম; ভাবিলাম,—ছি, ছি, এ-কি দুর্ব্বলতা আমার! জগতে দরিদ্রের প্রাণের ব্যথা কে কবে বুঝিয়াছে? মানুষের অপর সকল দিক ছাড়িয়া দিয়া,—শুধু দরিদ্রতার জন্যই মানুষকে ছোট করিয়া দেখা,—কিম্বা মানুষকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা ত মানুষেরই স্বভাব।......তবে—তবে আমার এ চঞ্চলতা কেন?......আমার চাই অর্থ!—এবং সেই অর্থের জন্য আমাকে যদি নির্ম্মম পিশাচ হইতে হয়,—যদি ন্যায়ের বুকে পা' দিয়া অন্যায়ের জয়ঢাক বাজাইতে হয়,—তাহাও করিতে হইবে। একবার অর্থবান্ হইতে পারিলে আর আমার দোষ কোথায়?......তখন আমার নীচতা, হীনতা, কাপট্য, মূর্খতা, চৌর্য্যবৃত্তি—এমন কি হত্যাপরাধ পর্য্যন্ত আমার গুণ হইয়া দাঁড়াইবে!......সুতরাং অর্থ চাই,—চাই অর্থ!

নিরর্থক চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত করিবার [illegible] খবরের কাগজটা আবার টানিয়া লইলাম। একটু পরে [illegible] ও দূরে সরাইয়া রাখিয়া গুনগুন করিয়া একা [illegible] সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

তিন-চার দিন পরের কথা......বেলা [illegible] রোগীদের বিদায় দিয়া এবং অন[illegible]

ডিস্পেন্সারী হইতে বাহির হইতেছি,—হঠাৎ দেখি,—সেই ছেলেটি বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার উপর দৃষ্টি পড়ামাত্রই নিতান্ত অহেতুকভাবেই আমি যেন খানিকটা অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম; এবং একটু তাড়াতাড়িই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—'কি খোকা, তোমার মা কেমন আছেন?'

আমার এই আত্মীয়তা-প্রকাশ আমার নিজের কাছেই যেন বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু ছেলেটি কি ভাবিল,—জানি না;—প্রথমটা কোন উত্তর না দিয়া ব্যস্তভাবে আমার খুব নিকটে আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল,—'আমার মায়ের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে ডাক্তারবাবু! তা—সে একটা ঢোক গিলিল, একবার এদিক-সেদিক চাহিল,—পরে কাপড়ের খুঁট খুলিয়া একটি সোনার আংটি বাহির করিয়া কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিম্ন করিয়া বলিল,—'টাকা ত আমরা দিতে পারবো না ডাক্তারবাবু,—তবে—' সে আবার একটা ঢোক গিলিল,—'মায়ের হাতে অনেকদিন থেকেই এই আংটিটি ছিল; তিনি বললেন,—ডাক্তারবাবুর ফি-এর টাকার বদলে এই আংটিটি তাঁর কাছে রেখে আয়। তারপর আমি ভাল হ'লে পারিত ওটা টাকা দিয়ে ফিরিয়ে আনবো।'—বলিতে বলিতে একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে আংটিটি আমার হাতে তুলিয়া দিল।

প্রথমটা আমার আত্মসম্মানে ভারী আঘাত লাগিল! এ-কি ব্যবহার! আমি কি এখানে বন্ধকী কারবার করিতে আসিয়াছি?......একটা রূঢ় কিছু বলিবার জন্যও আমার ঠোঁট দুইটা একবার কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু পরক্ষণেই নিতান্ত হেলাভরে আংটিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেই আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল!—আঁ, এ-কি? এ-যে আমারই নামাঙ্কিত আংটি! একদিন ইহা যে আমার একান্তই নিজস্ব ছিল!.....সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন-ইতিহাসের সুদীর্ঘ পনের বৎসর পূর্ব্বের এক পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল!.....

মামা-বাড়ীতে থাকিয়া মফস্বলের একটা কলেজে 'আই-এস্-সি' পড়িতাম। মামাবাড়ীর পাশেই ধনী ভুবন মুখুয্যের দোতলা পাকা বাড়ী। তাঁহার কন্যা মণিকা প্রায়ই মামী-মা'র নিকট বেড়াইতে আসিত। সেই সূত্রেই তাহার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হয়—......দুই তরুণ-তরুণীর প্রায়শ আলাপ-পরিচয়ে এবং মেলা-মেশায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহা ঘটে,—এ-ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না।—অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে আমার ও মণিকার মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমেরই সঞ্চার হয়। শেষটা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, কেহ কাহাকেও একদিন না দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারিতাম না। মামীমা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মামাবাবুকে বলেন। মামাবাবু দুই চারি দিন ভাবিয়া-চিন্তে ভুবনবাবুর নিকট আমাদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপ[illegible] ...টা ...হন্দে ...বারেই ...র পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে ভুবন... সম্মত হন না; উপরন্তু আমাদের ...করিয়া ... ...মন কয়েকটি কথা বলেন যে,—সেখান দাবি... তুলিয়া ... ...ঠিয়া আসাও যেন মামাবাবুর পক্ষে হই... উঠে। প্র...

ভুবনবাবুর অসম্মতি এবং আচরণ শুধু আমাকেই ব্যথিত করে নাই; মণিকাও তাহাতে যথেষ্ট আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু কি করিবে সে?

অবশেষে একদিন নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়েই আমি মামাবাড়ী পরিত্যাগ করি। মণিকার নিকট যখন বিদায় লই,—তখন চোখের জলে আমাদের উভয়েরই বুক ভাসিয়া যায়।......আমি এই আংটিটি স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপে বিদায়ের সময় মণিকার আঙুলে পরাইয়া দিয়া আসি।.....

তাহার পর হইতেই আমার মনে একটা আত্মগ্লানি জাগিয়া উঠে,—উঃ, দরিদ্র বলিয়া এত ঘৃণা! কেন, দরিদ্র কি মানুষ নয়?—না, তাহার প্রাণের দাবীর কোন দামই নাই?—আত্মগ্লানির উত্তেজনায় আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি,—যেমন করিয়াই হোক্,—আমাকে অর্থবান হইতে হইবে।......

তাহার পর প্রাণপণ চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে 'বি-এস্-সি' ও 'এম-বি' পাশ করিয়া আজ পাঁচ বৎসর হইল,—আমি এই শহরে ডাক্তারী করিতেছি।.....চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আমার সুনাম হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার দামও বাড়াইয়া দিয়াছি।—এবং ইহা বলাই বাহুল্য যে,—অর্থের জন্য আমি আমার হৃদয়ের যাবতীয় কোমল প্রবৃত্তির টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছি! যেহেতু শঙ্করাচার্য্যের মোহ-মুদ্গরের নীতি এ-যুগে পালন করিতে গেলে চারিদিক হইতে লৌহ-মুদ্গরের আঘাতই সহ্য করিতে হয়।

যাই হোক্,—মামাবাড়ী ত্যাগ করিবার পর আমি মণিকাদের আর কোন খবরই লই নাই; এবং তাহাদের সম্বন্ধেও আমাকে কেহ কোনদিন কোন কথা বলে নাই।......কিন্তু যে মণিকার পিতা ধনী,—এবং যাঁহার দরিদ্রের প্রতি ঘৃণার অন্ত নাই; তিনি যে দরিদ্রের হস্তে মণিকাকে সমর্পণ করিবেন না,—ইহা ত নিঃসন্দেহ!......তাছাড়া, মণিকার স্বামীর অবস্থা যদি কোন কারণে খারাপ হইয়াই পড়ে, তবু ত সে সঙ্গতিসম্পন্ন ভুবনবাবুর কন্যা। পিতার নিকট হইতেও ত সে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারে!......তবে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় সে পড়িল কিরূপে? এ-মণিকা কি তবে সে-মণিকা নয়?—না, না, তাই-বা কিরূপে সম্ভব?......সেই মণিকাই যদি না হইবে,—তবে এ-আংটি সে পাইল কোথায়?—

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইলাম। মণিকার মুখখানি ত আজ পনের বছর ধরিয়া আমার চোখের উপরই ভাসিতেছে!—ছেলেটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই আমার মনে হইল,—তাহার মুখখানি যেন মণিকার মুখেরই একটি প্রতিচ্ছবি! প্রথম দিন হয়ত ঠিক এই কারণেই ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দুই-এক মুহূর্ত্তের জন্য আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তখন এতটা বুঝিতে পারি নাই,—আর বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার কারণও ঘটে নাই।......

আংটিটি দেখিয়া আমার মধ্যে যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে,—তাহা ছেলেটির বুঝিতে বাকী ছিল না।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেন

(১১)

সেই যে অরুণা দিদি জামাইবাবুর সম্মুখ হইতে মুখ লুকাইল, সেদিন আর শত সাধ্য-সাধনায়ও কেহ তার ঘরের দ্বার খোলাইতে পারিল না।

বরুণা শঙ্কিত হইয়া স্বামীর মুখপানে চাহিলেন, ছল ছল চোখে কহিলেন, ওগো, কি হবে? হেমনাথ হাসিয়া কহিলেন, তুমিও ত ছেলেমানুষ কম নও, ভয়ের কি হয়েছে যে তোমার অমনি চোখে জল এসে গেল!

—না—না, তুমি দেখ।

—হ্যাঁ দেখব, তুমি থাম।

পরদিন সকাল বেলা অরুণার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বরুণার চাকর ভজা তারস্বরে চীৎকার সুরু করিয়া দিল, মাসীমা, দোর খুলুন, আপনার চিঠি

অরুণা তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া চিঠি নেওয়ার জন্য হাত বাড়াইতেই ওধার হইতে হেমনাথ আসিয়া খপ্ করিয়া তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিয়া কহিলেন, এইবার ছোট গিন্নি, এবার আর পালাবে কোথা?

অরুণা প্রথমে প্রাণপণে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে তা একান্তই অসম্ভব বুঝিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, ছেড়ে দিন—

কেন গো অভিমানিনী, এত রাগ কেন? বলিতে বলিতে হেমনাথ তার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে আনিলেন।

বরুণা আসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ রে অরুণ, তুই কি কোন-দিনই বড় হবিনে? একী ছেলেমানুষী তুই আরম্ভ করেছিস বল্ ত!

অরুণা রাগিয়া কহিল, যাঁ-ও—বলিয়াই ঝর্ ঝর্ ধারে কাঁদিয়া ফেলিল।

হেমনাথ বিপদ বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, দেখ অরু, তুমি ওঁর কথায় রাগ কর না। এই এত বছর ত নিয়ে ঘর করছি, যা বুদ্ধি ওঁর তা কি আমার আর জানতে বাকী আছে! তুমি তাড়াতাড়ি নাওয়া খাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নাও, আজ আমরা কলকাতা বেড়াতে যাব।

অরুণা ক্রমাগত একখানা হাত দিয়া চোখের জল মুছিতেছিল, সিক্তকণ্ঠে কহিল, আজ থাব

—না আজই, আমার আর শীগ্‌গিরও ছুটি মিলবে না।

অনেক কষ্টে হেমনাথ অরুণাকে বশে আনিলেন। বরুণে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন। অরুণা হেমনাথের সঙ্গে দ্রুত চক্কর দিতেছিল, সহসা আকাশের দিকে চোখ পড়ায় অরুণা গতি শ্লথ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সহযে ছোট মেয়েটির মত হাত বাড়াইয়া কহিল, দাদাবাবু, দেখুন দেখুন, কী চমৎকার আকাশ! সূর্য্যাস্তের আকাশ।

নীল আকাশের বুকে থরে থরে সূর্য্য তার বিদায়-সজ্জা বিছাইয়া দিয়াছে। লাল, হলদে, গোলাপী, নীল অকৃত্রিম রঙের অপূর্ব্ব সমাবেশ। রঙে রঙে আলোকের রাজা তার বিদায় বেলার করুণ কথাটি যেন আঁকিয়া ধরিয়াছে, যাই যাই —আজ আমি যাই! বাতাস সুরভিমন্থর! চারিপাশে ঘনাইয়া আসিয়াছে আঁধারের মোহময় মায়াময় পরিবেশ।

অরুণার যেন ঘোর লাগিল। এক জায়গায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি আর ঘুরব না দাদাবাবু, আপনি ইচ্ছে হয় ঘুরুন।

হেমনাথ ঘুরিতে ঘুরিতে দূরে চলিয়া গেলেন। অরুণা গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল। জ্যোতির কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না; যদিও এখানে মঞ্জুরীই প্রধান, তাকে কেন্দ্র করিয়াই দুজনার এই সম্প্রীতি। কিন্তু যে বিশ্রী ব্যাপারটা এই দুদিনের মধ্যে ঘটিয়া গেল, সেটা শুধু জ্যোতিকে লইয়াই। প্রধান হইলেও মঞ্জুরী এখানে শুধু অ-প্রধানই নয়, অপ্রকাশ্য।

আজ এই এক জ্যোতিকে লইয়া অরুণার মনে জীবনের সমস্ত গত-ঘটনা যেন ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পদে পদে জীবনের এত লাঞ্ছনা, সুন্দর আর পবিত্রতার এত অসম্মান, অরুণা যেন আর সহিতে পারে না। আচ্ছা— অশ্রুম্লান দৃষ্টিতে গোধূলির অস্তম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া অরুণা ভাবিল, এই পৃথিবীতে এমন কোন ঠাঁই কি নাই, যেখানে মানুষের মন সমস্ত সংকীর্ণ বন্ধন-মুক্ত! মানুষ যেখানে মানুষের মনের সহজ সৌন্দর্য্যটুকু স্বীকার করিয়া লয় এমন ঠাঁই কি পৃথিবীতে বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। অরুণার বিশাল দুইটি চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

—অরু, হেমনাথের আকস্মিক আহ্বানে অরুণা ফিরিয়া চাহিল।

হেমনাথ হাসিমুখে কহিলেন, এই দেখ একজন সাহিত্যিক। আমার বন্ধুর ছেলে দীপক রায়। তুমি খুশী হবে আলাপ করে, তাই ধরে নিয়ে এসেছি।

দীপক রায়! অরুণা পরম বিস্ময়ে দীপকের মুখপানে চাহিল। দীপক নমস্কার করিল।

অরুণা প্রতি-নমস্কার করিল, দীপক মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, কোনদিন ভাবিনি।

অরুণা চুপ করিয়া রহিল। তার মনে তখন লিপির দীপক রায়ের কথা জাগিতেছিল, কী অভদ্র—কি অমার্জ্জিত রুচি—!

দীপক আবার কহিল, আপনার কাছে আজ একটি বিষয়ে মার্জ্জনা চাচ্ছি—

হেমনাথ আবার ঘুরিতে ঘুরিতে দূরে চলিয়া গিয়া-ছিলেন।

অরুণা দীপকের কথার উত্তরে অস্ফুটস্বরে কহিল, মার্জ্জনা?

-হ্যাঁ তাই। আমার চিঠির সেই অনিচ্ছাকৃত রূঢ় ভাষার জন্য।

—অনিচ্ছাকৃত রূঢ় ভাষা?

—জানি একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু যা একান্ত সত্যি তা বিশ্বাস করবার জন্য আপনার কাছে আমি নিশ্চয়ই দাবী করতে পারি।

অরুণা চুপ করিয়া রহিল।

দীপক কহিল, বলুন, ক্ষমা করলেন?

অরুণা অকস্মাৎ নেহাৎ বোকার মত হাসিয়া ফেলিল। হাসিল দীপকের বিনয়ের বহর দেখিয়া।

দীপক ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি হাসছেন!

এতক্ষণ পরে অরুণা স্পষ্ট তীক্ষ্ন কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ হাসছিই ত। আমার ক্ষমা না পেলে যেন আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—।

দীপক ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, উঃ—কী শক্ত মেয়ে আপনি!

অনুরূপ স্বরে অরুণা কহিল, উঃ—কী কোমল ছেলে আপনি!

দীপক গম্ভীর হইয়া কহিল, নমস্কার, আসি তা'হলে।

অরুণা হাসিয়া কহিল, আমাদের বাসায় একদিন যান যেন, দীপকবাবু—

দীপক চলিয়া গেলে অরুণা আজ দুই দিন পরে হেমনাথের মুখপানে চাহিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিল।

হাসিয়া হাসিয়া কহিল, আচ্ছা দাদাবাবু—

আজ্ঞে করুন রাণীজি—

দীপকবাবু কি তরুণ ছেলে নয়?

হেমনাথ আশ্চর্য্য হইয়া অরুণার মুখপানে চাহিলেন, এ কথার মানে?

—মানে, চিবাইয়া চিবাইয়া অরুণা কহিল, মানে আজ যে আপনি বড় যেচে তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, স্বামীর প্রতি বিপুল আকর্ষণের প্রাচীরে......অরুণা হাসিয়াই অস্থির হইল।

হেমনাথ মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা অনুমানে আনিয়া হাসিমুখে কহিলেন, কথা মিথ্যে নয় ছোট গিন্নি, তবে আমিও মালে ঠিক আছি।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, দীপক প্রথমত ছেলে খারাপ নয়, দ্বিতীয়ত সে ব্যাচিলার নয়। তৃতীয়ত, সে দৈহিক সৌন্দর্য্য দোষে দোষী, একথা তার অতি বড় শত্রুতেও বলবে না।

—ওঃ মাত্র এইটুকু অন্তরায়! কিন্তু আমিও ত তাহলে কুমারী নই বা সুন্দরী নই।

—তুমি যে দিদি, মেয়ে।

এবার অরুণা রাগিয়া উঠিল।—যান আপনি, খালি মেয়ে —আর মেয়ে। কারা যত্ন দিয়ে স্নেহ দিয়ে প্রেম দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এই পুরুষ জাতটাকে?

হেমনাথ কিছুই বলিলেন না। নিরুত্তরে অরুণার মুখপানে তাকাইয়া পরম নির্ব্বিকারে হাসিতে লাগিলেন।

(১২)

দীপক বাড়ী ফিরিল অনেক রাত্রে। অরুণার সঙ্গে এই আকস্মিক সাক্ষাৎ ও তার সেই স্পষ্ট অথচ মিষ্টি আলাপন তার মনটাকে বহুক্ষণ একটা বেদনা-মাখান আনন্দে ভরিয়া রাখিল।

চিত্রলেখা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দাদার ঘরে, ছোটভাই দীপ্তির ঘরে লাইট নিবিয়া গিয়াছে।

চিত্রলেখাও আলো নিবাইয়া শুইয়াছে। আলো জ্বলিতেছিল শুধু মায়ের ঘরে। দীপক সেই ঘরে গেল।

মা বসিয়া চোখে চশমা দিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পড়িতেছিলেন। ঘুমে চোখ দুটিও জড়াইয়া আসিতেছিল।

পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিলেন, কে, দীপু! এত রাত অবধি কোথায় ঘুরলি?

দীপক মায়ের পাশেই দেওয়াল হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, এমনি বারোমাস ত ঘানির খাটুনি আছেই মা, ছুটির দিনে আর তোমাদের বাঁধাবাঁধি নিয়মগুলো মেনে চলতে ইচ্ছে করে না। সময়ে খাওয়া, সময়ে শোওয়া,—কলের পুতুল হয়ে গেছি যেন।

মা অত শত বুঝিলেন না, কহিলেন, কিন্তু কাল ত আবার অফিস আছে! এত রাত করে শুবি, সকালে উঠতে কত কষ্ট হবে বল্ ত?

দীপক চোখ বুজিয়া কহিল, কিচ্ছু না।

মা কহিলেন, নে, এখন খেয়ে নে, বৌমা ঘুমিয়ে পড়বে বুঝতে পেরেই তোর খাবার আমি আমার ঘরে আনিয়ে রেখেছি।

দীপক কহিল, আজ রাতে কিছু খাব না মা।

—কেন?

—ক্ষিধে নেই।

—সে কি, কাল অফিস, না—না, যা পারিস্ একটু মুখে দে।

—না মা, একদম ক্ষিধে নেই, কি করে খাব। দীপক উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, দীপু—

দীপক এবার বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলছি ক্ষিধে নেই, তবু দীপু—

নিজের ঘরে আসিয়া দীপক লাইট ধরাইয়া অন্ধকার ঘর আলোকিত করিল। খাটের উপর চিত্রলেখা ঘুমাইতেছিল। দীপক ক্ষণকালের জন্য তার পাশে বসিয়া কাঙালের মত তার ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চাহিল। প্রতীক্ষার কোন চিহ্ন নাই মুখে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। দীপক যদি সারা-রাত্রির মধ্যেও ফিরিয়া না আসিত, চিত্রলেখার ঘুমের ব্যাঘাত হইত না। বিপুল বিতৃষ্ণায় দীপকের বুক কাঁপাইয়া একটা নিশ্বাস পড়িল।

শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া লাইট নিবাইয়া সে জানালার ধারের আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল। আকাশে দশমীর চাঁদ। দীপক নির্নিমেষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। খণ্ড-মেঘ দল বাঁধিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, জ্যোৎস্নার রাজাকে ঢাকিয়া

ফেলিতে। মুহূর্ত্তের জন্য...পরক্ষণে মেঘ সরিয়া যাইতেছে। চাঁদের বুকের আলো সহস্রধারে মাটির বুকে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

দীপকের চোখের দৃষ্টি উদাস হইয়া আসিল। চোখ ফিরাইয়া একবার চিত্রলেখার শয্যালীন অস্পষ্ট মূর্ত্তিটার দিকে চাহিল। জীবনে কোন আদর্শবাদের বালাই নাই—উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চচিন্তা কিছুই নাই। বেশ আছে এই চিত্রলেখা। বহির্জ্জগতের বিপুল ভাঙ্গা-গড়ার ঢেউ, কোন প্রবল মতবাদ, কিছুই এর মনে সাড়া জাগায় না। এই ছোট ঘরখানি, খাওয়া আর ঘুম—এই নিয়েই জীবন দিব্য কাটাইয়া দিতেছে, কিন্তু—

দীপক কি জীবনে একেই চাহিয়াছিল? মনের অন্ধ রন্ধ্র উজ্জ্বল করিয়া জাগিয়া রহিয়াছিল যে প্রিয়া মানসী, সে কি এই? যৌবনের উদ্দাম অগ্রগতিতে সে জীবনে চাহিয়াছিল যে পথ-চলার সঙ্গিনী, সে কি এই?

কৈশোরের সেই রাজকন্যার স্বপ্ন, যে সুন্দরী সাহসিকা, স্বামীর হাত হইতে অশ্বের বল্গা নিজের হাতে নিয়া স্বামীকে দিবে, অসত্য অসুন্দর আর হীন কামনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুযোগ, সে কি এই?

দীপক ইজি চেয়ারের উপরেই নিদারুণ অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। জীবন-সঙ্গিনী যদি চিরকাল শয্যা-সঙ্গিনী হইয়াই রহিবে, তবে কিসের প্রয়োজন ছিল, এই দুর্ভর বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লইবার!

ঘুমের ঘোরে চিত্রলেখা পাশ ফিরিল। দীপক একবার চাহিল, তারপর কি মনে করিয়া ডাকিল, চিত্রা! চিত্রা!

চিত্রলেখার সাড়া পাওয়া গেল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া দীপক কহিল, ঘুমাও, তুমি ঘুমোও। নক্ষত্রখচিত আকাশে গ্রহ উপগ্রহের উজ্জ্বল দীপ্তি দীপককে মনে করাইয়া দিল একটি মেয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধিদীপ্ত মুখ।

বুদ্ধির দোষে সে মেয়ে আজ দীপকের শত্রুপক্ষ। অরুণা যদি বন্ধু হইত! সে স্পষ্টবাদিনী, তীব্র ভাষায় দীপকের রচনার সমালোচনা করিত, ভুল অংশ হয়ত পড়িবার সময়ে ছিঁড়িয়াই ফেলিত।

দীপক ক্ষুব্ধ হইলে বিপদগ্রস্তের মত বলিত, আচ্ছা, আচ্ছা, এটুকুর জন্য এত রাগছেন কেন আপনি, দেব না হয় এটুকু আমি পূরণ ক'রে।

এমনি করিতে করিতেই হয়ত একদিন গড়িয়া উঠিত, দীপকের রচনার মধ্যে অরুণার খণ্ড রচনা জড়িয়া সহযোগ-সাহিত্য। কিন্তু নাঃ, তা-ও বোধ হয় সম্ভব হইত না, অরুণার রচনার সঙ্গে তার রচনার কোনদিক দিয়াই একটুকু মিল নাই। অরুণার সমস্ত রচনার মধ্যে একটা মাত্র অখণ্ড অনুভূতি ফল্গু স্রোতের মত তলে তলে বহিয়া চলিয়াছে। সে অনুভূতি সুগভীর প্রিয়-প্রীতি। অরুণার এ মত হয়ত অনুদার সুদূরপ্রসারী অন্তঃদৃষ্টির প্রতিবন্ধক; কিন্তু তবুও এ কত মধুর।

আচ্ছা,—দীপক ভাবিতে লাগিল, অরুণার এই প্রিয় ব্যক্তিটি কে? হয়ত তার স্বামী! তাহা হইলে ত অরুণা খুব সুখী। আর সে?

কিন্তু চিত্রলেখাকেও কি সে তেমনি ভালবাসিতে পারে না!

দীপক চঞ্চল পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, লাইট ধরাইয়া শয্যা-প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ চোখের উপর তীব্র আলোর ঝলক লাগিয়া চিত্রলেখা আধ-জাগ্রত চক্ষে চোখ মেলিয়া চাহিল।

দীপক তার পাশে বসিয়া পড়িয়া আদর করিয়া ডাকিল, চিত্রা! চিত্রা! লেখা আমার।

চিত্রলেখা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ মুছিয়া কহিল, কখন এলে তুমি?

—অনেকক্ষণ। চিত্রা শোন,—

—খাওয়া হয়েছে?

—না, চিত্রা—

—না মানে? খাওনি কেন তুমি?

—ইচ্ছে করল না তাই। ও-কথা এখন থাক। একটা কথা শোন চিত্রা।

—কী কথা?

—তুমি ত আজ অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুমিয়ে উঠেছ, এখন আর ঘুমিও না, এস আমরা একটু গল্প করি।

চিত্রলেখা জড়িত চক্ষে হাই তুলিয়া কহিল, কী গল্প?

—তুমি বল। দীপক অত্যন্ত আদর করিয়া চিত্রলেখার ললাটের চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে কহিল, তুমি বল, তোমার যে গল্প খুশী আজ তুমি কর। আমি শুধু শুনব।

—এত রাতে একী পাগলামী তোমার?

—না-না, চিত্রা লক্ষ্মীটি, আমার যে মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। একা রাত জাগব?

—কিন্তু কাল অফিস আছে, আমারও যে সকালে উঠতে হবে। কাজকর্ম্ম নেই?

দীপক হতাশ হইয়া কহিল, কাজ ত আমারও আছে চিত্রা, কিন্তু আমি ত তা ভাবছি না।

—এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

—মাঠে মাঠে ঘুরেছিলাম, বলিয়া বিরক্ত হইয়া দীপক যাইয়া নিজের জায়গায় শুইয়া পড়িল।

চিত্রলেখা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আলো নিবাইয়া জড়িত-চক্ষে শুইয়া পড়িল।

ঠোঁটের কোণে মৃদুহাসি জাগিয়া রহিল।

এই হাসি যদি চিত্রলেখা খানিক আগে হাসিত, দীপক ভুলেও আর রাগ করিতে পারিত না।

(ক্রমশ)

জাতিগত পারিপার্শ্বিক

শ্রীপ্রভাস ঘোষ

আজিকার লোকের উপনিবেশ স্থাপন এবং সেই আদিম-যুগের লোকের নূতন অঞ্চলে বাসস্থান প্রতিষ্ঠা—ইহার ভিতরে পার্থক্য রহিয়াছে বিরাট। বর্ত্তমানকালের কোনও অতিরিক্ত জনসংখ্যা-সম্বলিত জাতির গুচ্ছবিশেষের প্রগতি-শীল, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা লোকদের অশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে—দূরবর্ত্তী কোনও জনহীন বা জনবিরল অঞ্চলে যাইয়া বসবাস করিবার। কাজেই আজিকার উদ্যমী নূতন দেশ-সন্ধানকারীদের অধিকাংশই শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতিতে এমন উন্নততর যে, সেই গুচ্ছবিশেষের যে সকল লোক এই প্রয়াস পছন্দ না করিয়া জনাকীর্ণ নিজদেশেই থাকিয়া যায়—তাহাদের দ্বারা কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। এই হিসাবে বেপরোয়া গৃহত্যাগীরাই লক্ষ্যে ও উদ্যমে অনেকটা প্রগতিশীল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা যে বিপুল কর্ম্মী, তাহাত তাহাদের কার্য্যেই প্রকাশ পায়।

ইহার সহিত তুলনায় সেকালের আদিম জাতি ছিল নিতান্তই সংরক্ষণশীল—অজানা অপেক্ষা জানা পথে চলিতেই তাহাদের ঝোঁক ছিল বেশী। কেবল যখন তাহাদের বসবাস নিতান্ত অসুবিধাজনক হইয়া পড়িত—তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেই হউক কিম্বা পারিপার্শ্বিকের নিকৃষ্টতর পরিবর্ত্তনেই হউক—তখনই তাহারা দীর্ঘকালের স্থায়ী আবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। অজানার আকুল আহ্বান নয়—অজ্ঞাতের মণিকোঠার গোপন রত্ন আহরণ করিবার প্রেরণায় নয়, তাহারা আপন আপন নীড় বর্জ্জন করিত, অভাব অনটন অসুবিধায় কণ্টকিত হইয়া।

ফলে ঘটিয়াছিল এই যে যোগ্যতর জাতির অভ্যুদয় ও উন্নতি হইতে লাগিল সম্পদ-বিভবপূর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্রে আর অযোগ্যেরা পরিশেষে স্থান করিয়া লইল ঊষর মরুক্ষেত্রে, অস্বাস্থ্যকর বন-বনানীতে অথবা পার্ব্বত্য রুক্ষ অঞ্চলে।

সুতরাং বর্ত্তমান মতবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃতই যদি মূল আদিম জাতির দেখা আমরা পাইতে চাহি, তবে তাহা সম্ভব হইবে বর্ত্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হইতে বহুদূরে:— মানব জাতির বিবর্ত্তনের যে পুষ্পিত স্বর্গ তাহার বাহিরে বনে-বাদাড়ে কিম্বা পর্ব্বতে-কন্দরে।

সাধারণে প্রচারিত যে জাতি-বিভেদ, তাহা নির্ভর করে ত্বকবর্ণ, ভাষা এবং গুচ্ছ বৈশিষ্ট্যে। ইহার কোনটিই সন্তোষ-জনক বিভাগ নয়। বস্তুত ভাষা এবং গুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের সহিত সমাজতন্ত্র প্রকৃতির বিশেষ কোনও নির্ভরশীল সম্পর্ক নাই। জাতি-বিভাগে নিখুঁত স্বাতন্ত্র্য আমরা হামেশা যাহাকে বলি, সে জিনিষ যুক্তিসহ নহে।

প্রাণি-বিজ্ঞান অনুসরণ করিলে খাঁটি ইউরোপিয়ান বোধ হয়—কেবল সুইস্ ও চেক্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলা চলে না। অথচ সুইস্ জাতির ভিতর চারি প্রকার ভাষা প্রচলিত যাহা তাহাদের ক্ষুদ্ররাজ্যের চারি অংশে ব্যবহৃত হয়। সময় এবং যোগাযোগের সুযোগে অতিশয় বৈষম্যসম্পন্ন জাতিগুলি পর্যন্ত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে অগণিত।

রীতিমত নিখুঁত জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ ও শ্বেত এবং অ-শ্বেত জাতির সকল তথ্য সংগ্রহ হইবার পূর্ব্বেই ইহা উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে, ইউরোপের সমুদয় ভাষার ভিতর পরস্পর একটা নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে এবং এই সকল ভাষাকেই আর্য্য (Aryan) ভাষা বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরে ইহা জানিতে পারা যায় যে, এই সকল আর্য্য ভাষা ইউরোপের বাহিরেও প্রসারিত হইয়াছিল পারস্যের ভিতর দিয়া উত্তর ও মধ্য-ভারতবর্ষে।

আরও সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই পলিনেশীয় গুচ্ছ—যাহাদিগকে সাধারণত ইউরোপীয় দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করা হয়; তথাপি তাহাদের ভাষাসমূহ একেবারে স্বতন্ত্র এক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলা যায় আমেরিকার অধিকাংশ রেড্ ইণ্ডিয়ানদের, প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থে যাহাদিগকে আমেরাইণ্ড (Amerinds) বলিয়া অভিধা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের যে সকল ভাষা—তাহা কিন্তু সকল প্রকার ইউরোপীয় প্রধান ভাষা হইতে পৃথক, যদিও কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়—বাস্ক (Basque) ও আব্কাশিয়ান (Abkasian) ভাষার সহিত; সেইক্ষেত্রেও উহা যে শতধা বিশ্লেষণ ও উপ-বিশ্লেষণের ফল, একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। এই সকল ভাষায় সমগ্র একটি বাক্য অসাধারণ লম্বিত একটা শব্দে মাত্র প্রকাশিত হয়।

জাতি বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অসন্তোষজনক ও অসঙ্গত হইল ত্বক্‌বর্ণক মাপকাঠি করিয়া দেহগঠন দ্বারা শ্রেণী নির্দ্দেশ। যদি বিজ্ঞানসম্মত রীতি অনুসারে এই দেহবর্ণকেই নিদর্শন ধরিয়া বিভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে পুরোবাহুর আভ্যন্তরীন বর্ণই ব্যক্তির বর্ণ ধরিতে হয়, বদনমণ্ডলের বর্ণ নহে। যে সকল জাতি দেহ রঞ্জিত করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের সকলেরই রংয়ের উপাদান প্রায় একই প্রকার। অ-শ্বেতদের বেলায়ই এই রংয়ের ব্যবহার ব্যাপক। এবং এই রংয়ের ক্রিয়া শরীরের অন্য অংশে যে রঞ্জন-বিকার উপস্থিত করে, পুরোবাহু অর্থাৎ কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত অংশের যে পার্শ্ব অপেক্ষাকৃত কম উন্মুক্ত থাকে তথাকার অংশে বিকার সংঘটিত করে অত্যল্প। অনুরূপভাবে বলা যায় উরুর কথা, যে সব লোক ঐ অংশ আচ্ছাদিত রাখে। সুতরাং কোনও সম্প্রদায়ের গায়ের রং নির্দ্ধারণকালে ধরিতে হইবে ঐ ক্ষীণ-বিকারগ্রস্ত অংশ।

আদিম মানবের দেহবর্ণ সম্বন্ধে য়্যান্থ্রপোলজিষ্টগণ একমত নহেন। অনেক অশ্বেত জাতির লোক জন্মকালে থাকে অতি হাল্কা রং-য়ের এবং পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহবর্ণ ঘোর হইতে আরম্ভ করিলেও যে সকল অংশ উন্মুক্ত থাকে না, সেই সকল অংশ হাল্কাই থাকিয়া যায়। কাজেই অনুমান করা হয় আদিমযুগের মানুষ হয় ঘোর খয়েরি রংয়ের ছিল অথবা ছিল লালচে খয়েরি রংয়ের। খুব সম্ভব তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছিল রোমে আবৃত—আজিও মধ্য আফ্রিকায় দুই

একটি আদিম নিগ্রো জাতীয় সম্প্রদায় দেখা যায়, যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দীর্ঘ রোমে ঢাকা।

ত্বকবর্ণ ঘোর হইবার যুক্তিযুক্ত কারণ ও ব্যাখ্যা ইহাই মনে হয় যে, জন্ম হইতে আদিম নরনারী ঘোর রং পায় নাই উহার উদ্ভব হইয়াছে সূর্য্য-রশ্মি ও তাপে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকিবার অভ্যাস বা প্রয়োজনীয়তা হইতে। আবার ইহার প্রতিবাদে বলা হয় যে, উগ্র শীতের দেশেও ঘোর রং-য়ের নরনারী দেখা যায়, যেমন এস্কিমো ও টাসমানিয়ান জাতিগুলি; এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও হালকা রং-য়ের মানব বাস করে, যেমন উত্তর ভারতে এবং পশ্চিম ব্রাজিলে। ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, ত্বকবর্ণের স্থায়ী পরিবর্ত্তন সম্ভব শুধু অতি দীর্ঘকাল কোনও যোগ্য আবহাওয়ায় অবস্থানের ফলে। অথচ এই প্রমাণ সংখ্যাতীত যে, পিঙ্গলবর্ণ নরনারী গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনায়াসে বর্দ্ধিত হয় এবং সেই জন্যই অনুমান করা হয় যে, এমন একদিন আসিবে দুনিয়ায় যে দিন আর সুগৌর বা শ্বেত বর্ণের নরনারী হয়ত আর দেখিতেই পাওয়া যাইবে না। আদিম যুগের মানব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না কোনও দেশে কোনও জাতি পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে কিনা। বর্ত্তমানে যে দেশে যে জাতি অবস্থান করিতেছে, তাহাই তাহাদের আদিম বসতি কিনা কিম্বা পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ঐ সকল জাতির দেহ-বর্ণ কি প্রকার ছিল—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।

সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, জাতিতে জাতিতে দেহ-বর্ণের একটা নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে এবং উহা মস্তকের গঠনের সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য ক্রম অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে প্রকৃত শ্বেত জাতির সংখ্যা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; ঠিক তেমনি ধর্ত্তব্য নয় প্রকৃতই যাহারা কৃষ্ণকায় সেই সকল জাতির সংখ্যা।

দক্ষিণ ইউরোপীয়গণ যেমন নিশ্চিতই শ্বেত নয়, ঠিক তেমনি অধিকাংশ নিগ্রো জাতীয়েরা কৃষ্ণকায় নয়। আবার রেড-ইণ্ডিয়ান বলিয়া কথিত জাতির কোনটাই রেড অর্থাৎ লাল নয়। অপরপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার ব্ল্যাক-ফেলো (Black-fellow) রংয়ে ঘোর লাল অর্থাৎ চকোলেট। কাজেই বর্ণকে মাপকাঠি ধরিয়া জাতি বিভাগ করিলে নিম্নলিখিত ক্রম হওয়া উচিত:—ঘোর চকোলেট (কখন কখন কৃষ্ণবর্ণে পর্য্যবসিত), ঘোর খয়েরি, খয়েরি, পীত, জলপাই বর্ণ এবং শ্বেত। অতিরিক্ত ঘোর রংয়ের লোকের বাস গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং তাহাদের সকলেই লম্বিত মস্তকবিশিষ্ট (যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় নৃতত্ত্ববিদের ভাষায়—dolichocephalic)।

অধিকাংশ জাতিগুলিরই চক্ষু ঘোর খয়েরি, বোধহয় দেহ রঞ্জনের রং-য়ের প্রভাবে। কারণ যে সকল লোক রঞ্জন পদার্থ কম ব্যবহার করে অথবা আদৌ ব্যবহার করে না, তাহাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়—চক্ষুর স্বাভাবিক রং নীলাভ ধূসর বেশ ফুটিয়া উঠে চক্ষু তারার চারিদিক বেষ্টন করিয়া। ঘোর খয়েরি ও নীলাভ-ধূসর এই দুই জাতীয়ের মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন নরনারীর চক্ষুর রং হয় কতকটা সবুজপানা।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ নরনারীরই কেশের রং ঘোর। কেশের রং-য়ে যে হেরফের দেখা যায়, তাহার ক্রম হইল—ঘোর কৃষ্ণ, ঘোর খয়েরি, লালচে খয়েরি, হালকা খয়েরি, সোনালী এবং লাল; এই লালেরও তিন প্রকার পৃথক আভা দেখা যায়—হালকা, ইঁটের মত এবং কালোপানা লাল। চক্ষুর রং-য়ের বেলা যেমন দেখা গিয়াছে কেশের বেলাও তেমনি স্বাভাবিক ঘোর রং-য়ের যে প্রধান প্রধান বিপরীত বর্ণ সেইগুলি পাওয়া যাইবে ইউরোপ ও তাহার সন্নিহিত দেশসমূহে।

শুধু বর্ণেই যে কেশের একমাত্র প্রভেদ, তাহা নহে। কেশের প্রকৃতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণত মঙ্গোলিয়ানবর্গের নরনারীর কেশগুলি সঠিক গোলাকার গড়নের থাকে; কিন্তু কতকগুলি জাতির (যেমন নিগ্রো প্রভৃতিদের) কেশ থাকে চেপ্টাপানা যাহাকে বলে বাদামী (oval) আকারের। কোন কোন জাতির কেশ থাকে স্থূল এবং কর্কশ যেমন জীব-জগতে পশমের বেলা দেখা যায়, আবার কোন কোন জাতির কেশ থাকে নিতান্তই কোমল সরু। সুতরাং পৃথক শ্রেণী বিভাগে কেশও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচলিত জাতি বিভাগে কিন্তু চক্ষু কিম্বা কেশ কোনটিই বিভাগ-নিদর্শন বলিয়া গৃহীত নয়।

ইহার পরই হইল সমগ্র দেহ-গঠন বিশেষ করিয়া দেহের দৈর্ঘ্য অথবা খর্ব্বতা (Stature); বারান্তরে সেই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা যাইবে।*

---

*"Environment, Race and Migration" গ্রন্থ হইতে আংশিক উপাদান গৃহীত।

সম্পদের দায়ে

(গল্প)

শ্রীদিনেশ মুখার্জ্জি

হোটেলের হেড্ ওয়েটার যেমনি কাছাকাছি এসে হাজির অমনি কর্নেলিয়াস এস্তি (Cornelius Esti) যে আমায় ডিনারে আমন্ত্রণ করেছিল, কানে কানে বল্‌লে—

—আমায় 'কুড়ি' দাও, শীগগির।

বন্ধুকে কুড়ি পেঙ্গা দিয়ে দিলাম। বিস্মিত হলাম কম নয়। সে গম্ভীরভাবে বিল্ শোধ করে দিলে, তারপর বল্‌লে—

—ভারী আশ্চর্য্য, না?

—কি আশ্চর্য্য?

—'আর্থিক সমস্যা' কথাটা। কেউ হয়ত বলবে, টাকা থাকাটাই সমস্যা ঘটায়, না-থাকার দরুন নয়।

—ব্যাপার কি বল ত। তুমি যেন দিনের দিন সখের দার্শনিক বনে যাচ্ছ, কেমন নয়? তোমার কথা থেকে কি এই বুঝে নেব যে, সম্পদটাই কারু কারু দায় হয়ে দাঁড়ায়?

—ফরাসী ভাষায় প্রবাদ আছে—Embarras de Richesse (সম্পদটাই দায়)।

—আমাদের হাঙ্গেরীয় ভাষায় কি ও কথাটার অনুরূপ নাই?

—না।

—খাঁটি হাঙ্গেরীর রকমই এমন! আমার মনে হয় আমাদের দেশে ও-কথাটার প্রয়োজনই হয় নি আজ পর্যন্ত।

তারপর যখন রাত্রিশেষে আমরা ফিরে চল্লাম বাড়ীর দিকে, বন্ধুটি কেবল ও-বিষয় নিয়েই বল্‌তে লাগ্‌লে অবিরাম।

'হাঁ' সে বললে, 'আর্থিক সমস্যা একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্পদের দরুন দায়টা আরও ভয়ানক।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দম নিয়ে সে আবার নিজের মনেই যেন কথাটায় জোর দিলে—

'আমায় জান্‌তে হয়েছে দায়টা একেবারে হাড়ে হাড়ে।'

—'তুমি? তোমায় জান্‌তে হয়েছে?' আমি চীৎকার করে উঠলাম।

—হাঁ, নিশ্চয়ই আমি। এক সময়ে আমার হাতে এসে পড়েছিল বিস্তর—বিস্তর টাকা।

—তুমি........? কখন্........?

—সহসা যখন আমি ক্রোরপতি বনে গেলাম, বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে।

—বিপুল সম্পদ......? তুমি......?

—হাঁ, নিশ্চয়ই আমি। তবে আর বলছি কি! আমার দূরে সম্পর্কের এক পিসি মারা গেল। তার নাম ছিল মেরিয়া থেরেসা য়্যান্‌সেল্‌ম্—জার্ম্মান এক ব্যারনের পত্নী; থাকত তারা হেমবুর্গে।

—বাঃ আজব ব্যাপার ত। কই একথা ত কোনদিন আমায় বলনি!

—না, বলিনি!........আমার বয়স তখন ছিল তিরিশের কাছাকাছি। হঠাৎ একটা নোটিশ এল ডাকে যে, পিসিমা মারা গিয়েছে, আর তার যা-কিছু বিত্তবিভব, সব দিয়ে গেছে আমায়। ব্যাপারটা যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, এমন কথা অবশ্য বলতে পারি নে; কিন্তু তবু বিস্ময়চকিত হলাম কম নয়, কেননা, বরাবরই আমার জানা ছিল যে, পিসির আরেক ভাইপোও রয়েছে, কাজেই স্বভাবতই আমার ধারণা ছিল পিসির সম্পত্তি দুভাগে বাঁটোয়ারা হবে আমাদের দুজনের ভিতর। কিন্তু বেচারা জ্ঞাতি ভাই আমার নাকি সুদূর ব্রাজিলে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।........একটা সিগারেট দিতে পার ভাই?

এই যে নাও।

তারপর ত গেলাম জার্ম্মানীতে। সত্য কথা বল্‌তে কি আমার সে পিসির চেহারা কেমন, তাও আমার মনে ছিল না। যখন আমি নেহাৎ শিশু, তখন বাবা আর মা মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে যেত পিসিমার কাছে। পিসি বাস কর্‌ত চমৎকার এক প্রাসাদে (Schloss) আর তার লাগাও ছিল একটা লালবাড়ী যেমন খটখটে পরিপাটী, তেমনি সারা মুলুকে সব্‌সে-সেরা। পনের বছরের ভিতর আর পিসিমার কোন খবরই রাখিনি। যখন তার সকল সম্পদের দাম ধরা হ'ল, দেখা গেল, আমরা যা এঁচেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী দাঁড়াল সে অঙ্ক। সব বেচে ফেলা হলে, দালালী দস্তুরী দিয়ে, য়্যাটর্নি-উকিল খরচ শোধ করার পর যা আমায় হেমবুর্গের প্রধান ব্যাঙ্ক দিয়ে দিল—তা হ'ল কত জান?—দু মিলিয়ন মার্ক!

দু মিলিয়ন মার্ক! যাও, বাজে বক কেন!

—বেশ, বেশ। বাজে কথা তা হলে থাক, কাজের কথা বলা যাক, এস। তার পর তোমার ব্লাড্-প্রেশারটা কেমন?

—আরে আরে, বোকার মত চট কেন? বল, বল তোমার কথাই বল........।

—আচ্ছা তবে। আমি আর কাল বিলম্ব না করে সেই মার্ক নোটগুলিকে হাঙ্গেরীর নোটে বদল করলাম, একটা সুটকেশ কিনে তাতে রেখে দিলাম। তার পর বিদেশে থাক্‌তে মন চাইল না, সরাসরি চলে এলাম বুদাপেস্তে। এখানে এসে ঠিক আগের মতই থাক্‌তে লাগ্‌লাম; আগের মতই কবিতা লিখ্‌তে ডুবে রইলাম। তা'হলেও খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলতাম—যাতে কেউ কোনরকমে কল্পনাও কর্‌তে না পারে যে, আমি অমন বিপুল অর্থের মালিক। নইলে আমার যেটুকু নাম হয়েছে কবি বলে, তা যে নিশ্চিহ্নে লোপ পেয়ে যাবে।

—তার মানে? কবি হওয়া আর ক্রোরপতি হওয়া—দুটো একসঙ্গে কি এমনই বে-আইনী?

—বুঝছ না কেন! বল ত লোকে কি মনে কর্‌বে, যখন তারা জান্‌তে পারবে যে, লোকটা শুধু কবি নয়, আবার ক্রোরপতিও বটে? তুমি ত জান বড়লোকদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা কি!........বুদাপেস্তে ত দেখ্‌তে পাই ক্রোরপতিদের লোকে আহাম্মোক ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। বড় লোক—তার আবার কেন প্রতিভা থাক্‌বে, থাক্‌বে দরদ, থাক্‌বে কল্পনা-শক্তি? আমার মনের ভাব বুঝছ ত,

এমনি ধারা কত কথাই না লোকেরা বলে বেড়াত। এ যেন একটা প্রতিশোধ—যার মারফত গরীবরা বিত্তশালীদের ওপর মনের ঝাল ঝাড়ে। রিক্তের জগৎ চক্ষুষ্মান্, আবার তেমনি ক্ষিপ্রকারী; এই চট্‌পটে সেয়ানাগিরির জন্যেই রিক্তের দল বুদ্ধিহীন। তারা দেখ্‌তে পায় না যে প্রকৃতির দান আকস্মিক ভাবে অযাচিতেই বর্ষিত হয়, কখনো বা নির্ম্মমভাবেই সহসা দেখা দেয়—নিশ্চয়তা তার ভিতর থাকে না এতটুকু। প্রকৃতি দরদ জানে না, পরোপকার মানে না। এজন্যেই দেখ্‌তে পাও—দুনিয়ায় যার আর কিছু নাই সম্বল তাদের হাতেই পুঁজিস্বরূপ প্রকৃতি ঢেলে দেয় প্রতিভা—বিশেষ করে সাহিত্যের রাজ্যে এ ত বাঁধাধরা কানুন। যারা চির-ক্ষুধার্ত্ত, যারা আজন্ম রুগ্ন, যারা সরকার কর্ত্তৃক নিপীড়িত—তাদেরই জন্যে এ যেন সান্ত্বনা-পুরস্কার; জীবনে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যারা প্রস্থান করেছে মহাকালের আহ্বানে—তাদের জন্যেও এমনি ধারা ক্ষতিপূরণ-পারিতোষিক যেন।

না, তা বলে আমার এমন আকাঙ্ক্ষা কোন দিন হয় নি যে, মানবজাতির এ বিরাট নির্ব্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। আমি শুধু এর কাছে মাথা নতই করলাম,—লোকে যেমন বজ্রপাত, বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বিপাকের তাণ্ডবকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় নিরুপায় হয়ে, আমিও তেমনি উপায়হীনতার কশাঘাতেই একে অস্বীকার করতে পারলাম না.........। না করেই কি চারা আছে,—কি সাধ্য আমার এমন প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, আর দাঁড়ালেই বা এর একচুল হেরফের করবার কি ক্ষমতা আমার.........!

আমি ছিলাম এবং এখনও আছি বোহেমিয়ান্; আমার জাতির চিরাগত ঐতিহ্যের মর্যাদা আমি রক্ষা করলাম। কাজেই সুটকেশ ভর্ত্তি ব্যাঙ্ক-নোট নিয়ে বুদাপেস্তে ফিরে আমার সেই চির পুরাতন নোংরা ক্ষুদে কাফেটিতেই আনাগোনা করতে লাগলাম যেখানকার আমি ছিলাম একজন রীতিমত একনিষ্ঠ খদ্দের। আমি যেন সেখানকার আহারের বিল যথাসময়ে শোধ করতে অসমর্থ—এমন ভান করতাম। গলার কলারটা পাছে বেশী ধবধবে দেখায় এজন্য ইচ্ছা করেই সেগুলো ময়লা নোংরা করে তারপর পরতাম। নূতন জুতো কিনে নিজে হাতে তার তলাটা কুটা করে নিতাম ছুরি দিয়ে। আমায় কেমন হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হত, তুমি ভাবতেও পারবে না। কবুবে না—নইলে আমার কবি-যশ যে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

তা ছাড়া যে জীবনে যে পারিপার্শ্বিকে আমি অভ্যস্ত দীর্ঘকাল, তা-ই ছিল আমার কাছে বেশী আরামপ্রদ বেশী আকর্ষণযোগ্য। যদি আমার এ অর্থপ্রাপ্তির সংবাদ বাইরে প্রচার হয়ে যায়, অমনি আমার বন্ধু-বান্ধবগণ (আমার শত্রু-দুষমনেরাও তার সাথে) আমায় একেবারে ছেঁকে ধরবে, দিনরাত সাক্ষাতের পর সাক্ষাতে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলবে, কবিতা লেখার মত মনের শান্তি আর আমার মিল্‌বে না এক নিমেষ।

—"তাহলেও এত টাকাকড়ি নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তুমি কর্‌লে কি বল ত?"

......সে-ই ত হয়ে পড়্‌ল আমার মহা সমস্যা! আমি যে ফস্ করে একটা ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলব, তাও পারি নি; সেটা ত স্বাভাবিকই, কারণ তাহলে আমার এত যে গোপনতা, সব ফাঁস হয়ে যাবে। তার বদলে আমি কর্‌লাম কি জান? টেবিলের টানায় যে আমার পাণ্ডুলিপির গাদা, তারই ভিতরে গুঁজে রাখলাম নোটগুলো তালা বন্ধ করে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা একবার করে দেরাজটা খুলতাম—আর নোটগুলোর উপর নজর দিতাম, অবশ্য নোটগুলো ঠিক ঠিক আছে কিনা, তা পরখ করবার জন্যে নয়—একটা এলোমেলো মনের ভাব নিয়ে। তা বলে এটা নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণ হবে, যদি বলি দেরাজের ভিতর থেকে অতগুলো নোট উঁকি মেরে আমায় খুশী করে নি এতটুকু; খুশী আমায় করেছে, কেন না, অর্থকে আমি শ্রদ্ধা করি। অর্থ যে কি, উহার গুরুত্ব কি অশেষ, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম সম্পূর্ণ। অর্থই যে আনন্দ, অর্থই যে ক্ষমতা, অর্থ যে সংসারের সার—তাতে আমার সন্দেহ ছিল না একবিন্দু। তাহলেও এই অগুন্তি নোট—এই বিপুল অর্থরাশি আমার বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসেছিল—স্বস্তি, আরাম আমায় পরিহার করে চলে গিয়েছিল। সে সময়ে আমি বেজায় বুদ্ধিমান, বিষম সেয়ানা ছিলাম—তাই হালচাল পাল্টিয়ে নূতন মানুষটি হতে চেষ্টা করিনি।—এই ধর না, একটা মোটর কেনা, কিম্বা আমার সাধের ও-নোংরা আঁধার-পোরা ঘরটা ছেড়ে ভদ্রগোছের একখানি বাড়ী করা, এবং তারপর নিত্য নূতন দায় জুটিয়ে হিমসিম খাওয়া—এ আমার ধাতে বরদাস্ত হবার নয় আদপেই। না! অন্য কেউ না হলেও তুমি ত জান, আমি অর্থকে কি রকম অপছন্দ করি! আমার আহার শাদাশিদে; সস্তা মদই আমি পছন্দ করি; সস্তা সিগারেট; আর, আর সস্তা......সবই, তোমায় বলতে কি।

তারই জন্যে নিজের মনের সঙ্গেই তর্ক জুড়তে হ'ল নির্ম্মমভাবে আর ন্যায়শাস্ত্রকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে। আমার পেশা হ'ল—লেখা, কবিতা লেখা। এমন কি তখনকার দিনেও আমার লেখনীর সাহায্যে আমি দশজনের কাছে বলে বেড়াবার মত মর্যাদাপূর্ণ অঙ্ক-পরিমাণেরই অর্থ অর্জ্জন করতে সক্ষম হতাম। জীবন ধারণের পক্ষে তা টায়-টোয় যোগাই বলা যেতে পারে। এ রোজগারের সঙ্গে আর কিছু যোগ করলেই তোফা আরামে আমি জীবনটা কাটাতে পারব। তাই ও-নোটগুলো থেকে কিছুটা নিয়ে সে ব্যবস্থা করে ফেল্‌লাম। আমি হিসেব করে দেখলাম—আমাদের বংশে তেমন দীর্ঘায়ু কেউ হয় নি; বরাদ্দ করে নিলাম আমি ৬৫ বছর অবধি বাঁচব। কাজেই আমার বাকি জীবন ধরে নিলাম ৩০ বছর। তিরিশ বছরের জন্যে আমার উপার্জ্জনে যেটুকু যোগ করতে হবে মাসিক তার জন্যে ৪ লক্ষ ক্রাউনের বেশী দরকার হবার কথা নয়। ও-টাকাটা আলাদা করে রেখে দিয়ে আমার মনে হ'ল—বাকি সব টাকাটাই ফালতু অর্থাৎ যাকে বলে 'অপ্রয়োজনীয়' অকেজো। মনকে বল্‌লাম—

ও-টাকাটায় আমার কোন দরকার নেই; কাজেই ওতে আমার অধিকারও নেই। মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করে নি, কেমন যেন উদাসী হয়ে সায় দিয়েছিল। ব্যস, স্থির হয়ে গেল—বাকি নোটগুলো বিলিয়ে দেব সব।

—"কাদের বিলিয়ে দেবে?"

আরে সেটাই ত হ'ল আসল সমস্যা। আমার স্ত্রী নেই, পুত্র-কন্যা নেই, ভাইবোন নেই, নেই দুনিয়ায় কেউ। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে কোন আত্মীয়স্বজনও নেই জীবিত।

—'তা'হলে বন্ধুদের কথা ভাবলে না কেন?"

সে সময়ে ত দোস্ত-বন্ধু কেউ ছিল না আমার। তোমার সঙ্গেও তখন পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি বা পরিচয় হয় নি।

—ওঃ তা হলে তোমায় তারিফ্ করতে হয়, বন্ধুর কথাটাও ভেবে দেখেছিলে!

সে যা-ই হোক, মোটামুটি বলতে গেলে, আমার চেনা-জানা এমন লোক ছিল না একটি, যাকে আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী এমন ভাবতে পারি। সত্যি কথা হ'ল, আমার কাছে এ দুনিয়ার সকল লোকই হ'ল সমান, কারণ সবাই হ'ল অজানা অচেনা। তাতে রাস্তার লোক, ঘরের লোক বলে কোন তফাৎই ছিল না আমার নজরে। আমায় ভুল বুঝ না তা বলে। মানুষ আমার চক্ষুশূল নয়, মানবজাতিকে আমি ঘৃণা করি না। আবার সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিও আমার নেই—গাছ পাথর জন্তু জানোয়ারকে আমি মানবের সমকক্ষ মনে করি না। কেবল পরিচয়ের, সুযোগের অভাবে এ দুনিয়ার কেউ আমার অন্তরঙ্গ দরদী ছিল না—অপরিচয়ের ব্যবধানে সব নরনারীই ছিল আমার কাছে সমান দূরের। বিশেষত্বের সঙ্গে পক্ষপাত করবার পাত্রের আমার ছিল নিতান্তই অভাব। এ ব্যবধানের ক্ষেত্রে আমি আর কি করতে পারতাম। তুমিই বল না, আমার অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতে?

—"আমি কি করতাম জিজ্ঞেস করছ? অন্য দশজনে এ অবস্থায় যা করে থাকে, আমিও তা-ই করতাম। আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে যেমন অপর লোকেরা দান-ধ্যান করে, আমিও তাই করতাম। কোন চ্যারিটি ফান্ড্ কি ও রকম কোন কিছুতে দান করে দিতাম।"

নিশ্চয়ই। আমার মনেও সে কথাই উঠেছিল সব প্রথম। প্রথম ঠাউরে নিলাম অনাথ আশ্রমের কথা, তারপর—অপটু বৃদ্ধদের আশ্রয়স্থলের কথা, না হয়—কোন হাসপাতাল, তাছাড়া অন্ধ, বোবা কালাদের প্রতিষ্ঠান—কতইত রয়েছে সাহায্য করবার স্থল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় এল—আমি রেখে গেলাম বটে টাকাটা গরীবদের তরে, কিন্তু তা পড়ল গিয়ে এমন এক জুয়াচোরের হাতে যে, সে সব টাকা লুঠে নিয়ে বিলাসের স্রোতে ঢেলে দিলে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে মত আমি বদলে ফেললাম—না, কোন চ্যারিটি ফাণ্ডে দেওয়া হবে না।

পরক্ষণে মাথায় এল—আচ্ছা সাহিত্যের জন্যে বড়গোছের একটা পুরস্কার ঘোষণা করলে কেমন হয়! স্বীকার করতেই হয় যে, কিছু সময়ের জন্য এ মতলবটা নিখুঁতই মনে হ'ল—আর প্রাণে যেন তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু ক্রমে খট্‌কা লাগল—প্রথম প্রথম অর্থাৎ যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন না হয় একরকম চলল, তারপর?—তারপর হয়ত যে কমিটির ওপর ভার থাকবে তারা আমার উদ্দেশ্যকে এমনভাবে বিকৃত করবে যে, তাকে অসঙ্গত থাতে বইয়ে নিয়ে রাজ্যের যত উন্মাদকে বেছে বার করবে পুরস্কার দেবার জন্যে; অথচ সত্যি কথা বলতে কি সাহিত্যের অস্তিত্বের জন্য—সাহিত্যের উন্নতির জন্যে ও-সব উন্মাদকে হত্যা করাই হয়ত উচিত ছিল বহু বহুদিন পূর্ব্বে। পরিশেষে হয়ত দুনিয়াকে ধাপ্পা দিয়ে ও-পুরস্কার একচেটে করবার জন্য এক একটা সমিতি এক-একদল সাহিত্যিক পোকা-মাকড় পুষে পুষে এক-একটাকে তুলে ধরবে বছরের পর বছর, সত্যিকার সাহিত্যিকদের কোন স্থান না দিয়ে তাছাড়া মানস নয়নে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—পুরস্কারের রচনা মনোনীত হয়েছে 'হিস্টরী অফ বাটার-ফ্লাই মুস্টাশ' (প্রজাপতি গোঁফের ইতিহাস)! আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম ভেবে—এ জাতীয় আদি ও অকৃত্রিম 'ইডিয়সি' যুগ যুগ ধরে আমার দেওয়া টাকায় পরিপুষ্ট হবে! এমন ভয়ানক একটা অভিসম্পাত দুনিয়ায় সৃষ্টি করার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। কাজেই ও রকম পরিকল্পনা আমায় ত্যাগ করতে হল। এর পরে এল শিশু আর কুকুরের ব্যাপার। তুমি ত জান এ দুয়ের কোনটিকেই আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।

—"তা ত হ'ল, কিন্তু শেষ তুমি কি ব্যবস্থা করলে?"

শেষ ব্যবস্থা করে ফেললাম—আমার উচিত টাকাগুলোকে ফেলে দেওয়া, ঠিক যে ভাবে আমার হাতে এসেছে, সে পথেই এর হিল্লে করা। তখন আমার কি মনে পড়েছিল জান? সে সময় মনে পড়ে গেল সেই পাগলা রোমান্ সম্রাটের কথা যে ঘোড়ায় চেপে বেরুত, আর দু'হাতে ডানে বাঁয়ে সোনা বিলিয়ে যেত সমবেত জনতার মাঝে........।

—"তুমি কি তবে যার সঙ্গে পথে দেখা হ'ল তাকেই টাকা দিয়ে বেড়াতে লাগলে?"

না, না বন্ধু। সে ব্যাপার অত সোজা ছিল না। ও-রকম করলে ত একদিনেই আমায় চিনে ফেলত, আর আমার পেছনে ফেউয়ের মত লেগে থাকত। না গো না, তা করি নি। অমন করে টাকা পেয়ে লোকগুলো যে বত্রিশ পাটি দন্ত-বিকাশ করে আমার দিকে তাকাত—'বাধিত হলুম' 'আমি কৃতজ্ঞ' এমনিধারা শত শত কথা পাড়ত খোসামোদ করতে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। তাছাড়া, খবরের কাগজগুলো যে আমায় 'দয়ার সাগর বদান্য ধনিক' বলে বড় বড় হরপে ছেপে আমার কোষ্ঠী কাটত—ওঃ সে একেবারে অসহ্য! যে রকমেই হোক, আমার পরিচয়—আমার ব্যক্তিত্ব গোপন রাখতে হবে ত। তাই ও-পথে আমি গেলাম না।

—"তবে কেমন করে তোমার মতলব হাসিল হ'ল? শেষ পর্য্যন্ত পারলে কি নিজেকে গোপন রেখে টাকাগুলোর বিলি করতে?"

থাম বন্ধু থাম। বলছি সব। (ক্রমশ)

বর্ত্তমান ব্যায়াম আন্দোলন

শ্রী বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

বাঙালী এখন নানাদিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পাওয়ায় তাহার আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-চেতনা জাগিয়া উঠিতেছে। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সাধারণভাবে বাঙালী তখন নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত ছিল। সে যুগে বাঙালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা প্রবাদ বাক্যের ও অবাঙালীর বিদ্রূপের বিষয়-বস্তু ছিল।

বাঙালীর মন যখন এইভাবে অবসাদগ্রস্ত ও সম্মোহিত তখন যাঁহারা দৈহিক বল ও সাহস অবলম্বনে বাঙালীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তদানীন্তন অবসাদ ও জড়তা, অপবাদ ও নিন্দা দূরীকরণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। শ্যামাকান্তের সাহস ও শক্তির কাহিনী আমাদের শিশুমনকে কত বিচিত্র স্বপ্ন রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিত। কৈশোরে যখন তাঁহার সুসমঞ্জস দেহসৌষ্ঠব ও অসমসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইল, তখন আমাদের দেশের প্রবোধেই দ্বিতীয় শ্যামাকান্ত হইবার বালকোচিত বিফল প্রয়াসে কিছু-দিন অন্যান্য কাজ ভুলিয়া ব্যায়ামেই ডুবিয়া ছিলাম। অতীতের সেই কথা স্মরণ করিয়া আজ মনে হইতেছে যে, শ্যামাকান্ত স্মৃতি মন্দিরের পরিচালনাধীনে ব্যায়াম-চর্চ্চার একটি কেন্দ্র শ্যামাকান্তের স্বগ্রাম আড়িয়লে স্থাপন অতীব সুসংগত হইয়াছে।

অধুনা শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে বহুবিধ অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কোনও একটি অখণ্ড সূত্রে ইহারা গ্রথিত না হইলেও ইহাদের ফলস্বরূপ একটি ব্যাপক ব্যায়াম আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আন্দোলন সম্পর্কে দুই একটি কথা আলোচনা করিব।

ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ হয়, জীবনী শক্তি ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়—ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু পরাধীন জাতির প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা যদি সুনির্দ্দিষ্ট এক অখণ্ড আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা না করিয়া চলে তবে অতি সহজে ও অতি দ্রুত তাহা লুপ্ত হইয়া যায় অথবা তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আমরা সর্ব্বদাই এরূপ অভিযোগ করিয়া থাকি যে, জাতির কল্যাণকর কোন সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী নহে বলিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে হিতকর না হইয়া ব্যসনের মত কেবল আমাদের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। ঠিক সেই কারণেই আমাদের বর্ত্তমান সভ্যজনোচিত আমোদ-প্রমোদ শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি না করিয়া যেন কতকটা বিলাসের মোহ ও তরলতায় ধীরে ধীরে সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; ব্যায়াম-চর্চ্চা ও খেলা-ধূলার আন্দোলন ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া শুধু আত্মকলহ সৃষ্টি ও কার্পণ্য দোষানুশীলনের সুযোগ প্রদান করিতেছে। বিদ্যার্জ্জন, আমোদ উপভোগ, ব্যায়ামানুশীলন সকলের মধ্যেই বিলাসের লঘুচিত্ততা ও ব্যসনের দুর্ব্বহ নেশা আসিয়া জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে।

এখানে শুধু ব্যায়াম অনুশীলনের কথাই বলিব। হয়ত কোন বালক কুস্তি করিয়া, মুগুর ভাঁজিয়া সুপুষ্ট দেহ-কান্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তদের উপদ্রবে পীড়িত পল্লীবাসীর ধন প্রাণ রক্ষায় ব্রতী বালকদের দলে সে যোগদানে অসম্মত। অজুহাত—রাত্রি জাগরণে তাহার দেহকান্তি অযথা নষ্ট হইবে। কোন বালক রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া ফুটবল খেলায় জয়ী হইয়া আসিল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা যখন সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য বিজয়-গর্ব্বোৎফুল্ল পুত্রকে কতকক্ষণ রোদ ভোগ করিতে অনুরোধ করিল, তখন পুত্র রোদের প্রচণ্ডতার দোহাই দিয়া অক্ষমতা নিবেদন করিল।

আবার শারীরিক ও মানসিক অনুশীলনের যথাযথ সহযোগের অভাবে এরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় যে, অনেকের সামর্থ্য আছে কিন্তু সাহস নাই; শক্তি আছে কিন্তু প্রয়োগ-নৈপুণ্য অজ্ঞাত। শক্তিমান পুরুষ হইয়াও সাহসের অভাবে হাতের লাঠি আপনি খসিয়া পড়ে।

এ-সব মনগড়া কথা নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। যথোচিত ব্যায়াম-চর্চ্চা সত্ত্বেও যেখানে পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে আদর্শ বিচ্যুত হইয়া ব্যায়াম চর্চ্চা বিলাস ও ব্যসনে পরিণত হইতেছে।

সংসারক্ষেত্রে আমাদের কর্ম্মদক্ষতা ও যোগ্যতা, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইবার মত সাহস, অদম্য তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণার্জ্জন ব্যায়াম-চর্চ্চার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আধুনিক ব্যায়াম-বিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক। কর্ম্ম-কুশলতা, শ্রমে উৎসাহ, শৃঙ্খলারক্ষায় অনুরাগ, আজ্ঞাবহতা, আত্মরক্ষায় ও শত্রুর আক্রমণ নিবারণে ক্ষিপ্রহস্ততা প্রভৃতি গুণরাজি যে সকল ব্যায়ামের সাহায্যে অনুশীলিত হয় ব্যায়াম-বিজ্ঞান বিশারদগণ সেই সব ব্যায়ামেরই সমধিক পক্ষপাতী। যে পদ্ধতির কসরতের ফলে ভারতীয় কুস্তীগীরের মত বিশাল বপু লাভ করিয়াও, গ্রীবা সঞ্চালনে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ও পশ্চাদাবর্ত্তনে ক্ষিপ্রকারিতা লাভ হয় না, সে সকল ব্যায়াম তাঁহাদের মতে হেয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম ধুরন্ধরগণের মতেও ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতাই ব্যায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণের মাপকাঠি। কর্ম্মক্ষেত্রে চৌকস হইতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহাকে ভিত্তি করিয়াই ব্যায়ামের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে।

কাজেই আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যায়ামের আদর্শকে আরও ব্যাপক করা ও আদর্শ সম্বন্ধে নিয়ত সচেতন থাকা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাচীন ক্ষাত্রজনোচিত পুরুষকার ও অকুতোভয়তা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়নিষ্ঠা—যাহা আশ্রয় করিয়া আমরা আমাদের মাতৃভূমির সর্ব্ববিধ গ্লানি দূর করিতে পারি—আমাদের ব্যায়াম আন্দোলনের আদর্শ তাহাই হওয়া উচিত। নানাদিক হইতে নানাবিধ প্রচেষ্টা ও বাহ্য প্রভাব আসিয়া আমাদের মনকে এমনভাবে বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত করিয়া

(শেষাংশ ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রস্তর-চুম্বনে বক্তৃতা-শক্তি

লস এঞ্জেলস-এর ম্যানফ্রেড্ মেবার্গ কৌতুক করিয়া তাঁহার এক আইরিশ বন্ধুকে লিখিলেন, বিখ্যাত ব্লার্নি প্রস্তরটি তাহার জন্য কিনিয়া পাঠাইতে। আয়র্ল্যান্ডের ব্লার্নি প্রাসাদের এক দেওয়ালে ঐ বিখ্যাত প্রস্তরখণ্ড গ্রথিত। কথিত

আছে ঐ প্রস্তরে যে চুম্বন করিবে সেই অদ্ভুত বাগ্মিতা-সম্পন্ন হইবে। আইরিশ বন্ধুও কৌতুকে পেছ পা নহেন। তিনি ২০,০০০ পাউন্ড প্রস্তর জাহাজ যোগে পাঠাইয়া দিলেন—যে সে পাথর নয়—যে পাহাড় হইতে ব্লার্নি প্রস্তর প্রাপ্ত বলিয়া জনরব, সেই পাহাড় হইতে কাটিয়া আনা পাথর। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গের এমনই অন্ধ বিশ্বাস এই ব্লার্নি প্রস্তরের উপর যে একটি আমেরিকান অভিনেত্রী আহ্লাদে প্রেরিত প্রস্তরের একখণ্ডেই চুমা খাইতেছে।

'রাত্‌কো বাঘিনী?'

ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লসের একটা অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রার্থনা শেষ করিয়া গীর্জা হইতে বাহির হইবার সময় সভাসদদের প্রত্যেকের সহিত বন্ধুভাবে দুই একটি কথা বলিতেন। সব সময়েই তিনি এক এক জনকে ঠিক একই প্রশ্ন করিতেন—যেমন তোমার ছেলে কেমন কাজ করিতেছে, তোমার স্ত্রী কেমন আছে ইত্যাদি। তাঁহারাও একই উত্তর দিতেন। রাজার এক প্রিয় সভাসদ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মার্কুইস দা বেজকোর্ট। তিনি অবিরত সর্দি এবং বুকের বেদনায় ভুগিতেন। রাজাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন ঐ বুকের বেদনা সম্বন্ধেই। মার্কুইস একটু কানে খাট ছিলেন। রাজা একদিন ভুলক্রমে প্রশ্নটি বদল করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—তোমার স্ত্রী কেমন আছে? মার্কুইস মনে করিলেন, প্রতিদিনের মত রাজা বুঝি বুকের বেদনার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাই তিনি উত্তর দিলেন "হুজুর, দিনের বেলা একরকম সহ্য যায়, কিন্তু রাত্রিতে যে কি যন্ত্রণা দেয় সে আর কি বলিব!"

যার ধর্ম্ম তারে সাজে

প্রাগের এক সাহেব পত্নীকে লইয়া মনের সুখে বাস করিতেছিল। সাহেব রোজগার করিয়া আনিতেন, মেম রান্না-বান্না করিতেন। সাহেবের সঙ্গে মেমের চুক্তি ছিল যে, একদিন রাত্রির রান্নাটা সাহেবই করিবেন, মেম সিনেমা দেখিতে যাইবেন।

অনেক দিন এভাবে বেশ চলিতেছিল। একদিন সাহেবের সখ হইল পায়স রান্না করিবেন। তিনি কড়াতে দুধ দিলেন পরিমাণের অতিরিক্ত। দুধ উথলাইয়া পড়িল, দুধ পোড়ার গন্ধ বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়িল।

এমতাবস্থায় কি করা যায় বুঝিতে না পারিয়া সাহেব ছুটিলেন সিনেমা গৃহে। সিনেমা গৃহ নিকটেই ছিল। সাহেব সেখানে যাইয়া চীৎকার করিয়া স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সিনেমা দর্শকদের রসভঙ্গ হওয়ায় দ্বারবানেরা তাহাকে বাধা দিল। সাহেব উগ্র হইয়া উঠিলেন এবং সকলকে মারপিটের ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বেচারাকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল এবং ভবিষ্যতে যে এভাবে লোকের শান্তি যাহাতে নষ্ট না করে তজ্জন্য তাহাকে জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ করিল। সাহেব এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, কড়া হইতে দুধ পড়িয়া পোড়া গন্ধ বাহির হইলে তাহা বন্ধ করার উপায় কি এবং সেই বিপদে স্ত্রীকে ডাকিতে গেলে অপরাধ আবার হইতে পারি কি!

প্রমাণ কি?

সম্প্রতি বার্লিনের পশুশালা হইতে একটি ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়া শহরতলীতে উপদ্রব করিতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ নানাস্থানে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেন যে, যে কেহ ঐ ব্যাঘ্রকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া আনিতে পারিলে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

দুই ইহুদী ঐ বিজ্ঞাপন দেখিতে পায়। একজন অপর জনকে বলে—চল পালাই, নতুবা গুলীতে মরিতে হইবে।

দ্বিতীয় ইহুদী—কেন আমরা কি বাঘ নাকি?

প্রথম ইহুদী—বাঘ তো নই, কিন্তু সে কথা প্রমাণ করিব কি করিয়া!

আলু ক্ষেতের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

অত্যধিক আলু জন্মাইয়া যাহাতে কেহ আলুর দর সস্তা করিয়া ফেলে তাহা দেখিবার জন্য বিলাতে পটেটো মার্কেটিং বোর্ড নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। কি পরিমাণ জমীতে কত আলু জন্মাইতে হইবে এবং আলুর আকার কতদূর পর্যন্ত হইতে পারিবে তাহা এই প্রতিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা মাপ অতিক্রম করিলেই শাস্তি।

সম্প্রতি ডরসেটের এক চাষী একটা পতিত জমী লইয়া তাহাতে আলু জন্মায়। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্রাধিক আলু জন্মিয়া বসে। তাহার তিন হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। স্কটল্যান্ডের এক কৃষকের জমিতে বড় বড় আলু হয়।

একটা আলুর ওজন আধ সেরের অধিক। এই আলু বোঁচবার অপরাধে বেচারা কৃষকের জরিমানা হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে গণ-ট্রাইব্যুন্যাল

বার্লিনের বেল্‌ভিউ ষ্ট্রীটে মার্কিন রাজদূতাবাসের বিপরীত দিকে পরম সুন্দর একটি উদ্যান রহিয়াছে, যাহা এক সময়ে ছিল জিমন্যাসিয়াম—কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাই এক অতি রোমহর্ষক ব্যাপারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

থার্ড রাইখের অদ্ভুত সৃষ্টি গণ-ট্রাইব্যুন্যাল (Peoples' Tribunal) এই খানে স্থান পাইয়াছে এবং ইহাকে বস্তুত বিপ্লবী-বিচারালয় ও সামরিক বিচারালয়ের মিশ্রণ বলা চলে। বর্ত্তমান ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে হের হিটলার

বলিয়াছিলেন—ন্যাশনেল সোশিয়ালিষ্টিক শাসনে অগণিত মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইবে (heads will roll)। সেই বাক্য বর্ত্তমানে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।

এই মস্তক অবশ্য সাধারণ অপরাধীর নয়—তাহাদের জন্য ত দেশের প্রচলিত আদালতসমূহই রহিয়াছে। গণ-ট্রাইব্যুন্যাল বিশেষ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ষ্টেটের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভকারী বিদ্রোহীদের যথাযথ দণ্ডদানের জন্য। রাষ্ট্রের শত্রু এবং রাজনীতিক বিপক্ষ ও গুপ্তচরদের বিচারের জন্য জার্ম্মান সুপ্রিম কোর্ট আইনানুগে বলিয়া "রাইখষ্ট্যাগ ফায়ার" মামলার পাঁচজন কমিউনিষ্ট আসামীর চারিজনকেই অব্যাহতি দিতে হয়। সেই সময় এই গণ-ট্রাইব্যুন্যাল প্রতিষ্ঠিত হয়—সকল আইন-ব্যবস্থা ও কার্য্যবিধি হইতে মুক্ত হইয়া। গোপনেই ইহার সকল বিষয় সমাধা করা হয় এবং ইহার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল নাই। মামলার বিবরণ, দণ্ডিত আসামীদের নাম-ধাম কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না।

তবে মাঝে মাঝে বিশিষ্ট নামজাদা লোক হইলে বুলেটিন্ বোর্ডে রক্তবর্ণ বিজ্ঞাপন সাঁটা হয় এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপা হয় এই মর্ম্মে যে, আবার থার্ড রাইখের এক নূতন শত্রুর মস্তক গড়াইয়া পড়িল। নতুবা সকল বিচার নীরবে সম্পন্ন হয় উহার প্রচারও তেমনি থাকে বাক্‌হীন।

ট্রাইব্যুন্যালের পাঁচজন জজের ভিতর দুইজন স্বয়ং হিটলার মনোনয়ন করেন, বাকি তিনজন হবেন সামরিক বিভাগ, ঝটিকা বাহিনী, এলাইট গার্ডস অথবা পুলিশ, কারণ সরকারের অভিমত—ইহাদের অপেক্ষা উপযুক্ত বিচারক কেহই হইতে পারে না গুপ্তচরের পক্ষে। আর ন্যাশনাল সোশিয়ালিষ্ট পার্টির লোকেরাও জজ হইবার যোগ্য, কেন না, তাহারা তাহাদের সুদীর্ঘ আন্দোলনকালে পার্টির বিরোধীদের ভাল ভাবেই চিনিয়া রাখিয়াছে।

এই প্রকারে গঠিত ট্রাইব্যুন্যাল বলিয়া এবং রাজদ্রোহ-আইন এমনই প্রসারিত যে, যে কোন কার্য্য অথবা নিষ্ক্রিয়তাকেই রাজদ্রোহ (treason) পর্য্যায়ে ফেলা যায় আজিকার জার্ম্মানীতে। এই কারণে প্রায় প্রত্যেক জার্ম্মানীবাসীই একটা অজানিত বিপদের ছায়ায় বাস করিতেছে। ট্রাইব্যুন্যাল এই ভাবে জার্ম্মানীর জনসাধারণের মনে এক গোপন আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। এবং এই উদ্দেশ্যেই উহা গঠিত।

প্রাসাদ হইতে কুটীরে

বিখ্যাত জার্ম্মান উড়ো জাহাজ আবিষ্কর্ত্তা কাউণ্ট শেপেলিনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাউণ্ট লিভেন শেপেলিন এবং তাহার পত্নী একদা বিপুল ধনের মালিক হইলেও—অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মান অধিকারে যাইবার পরে—একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এখন ইংলণ্ডের দক্ষিণ ওয়ার্নবরোতে বেসিনষ্টোক্ হইতে ছয় মাইল দূরে এক কুটীরে বাস করিতেছে।

কাউণ্টের পত্নী জাতিতে ইংরেজ। তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর প্রথম আসে পত্নীর মাতার গৃহে। কিন্তু সেখানে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা তাহাদের সঙ্গত মনে হয় না। তাই কোনও বন্ধুর প্রদত্ত এই কুটীরে বিনা ভাড়ায় বাস করে।

অষ্ট্রিয়ার টাইরল অঞ্চলে কাউণ্টের এক প্রাসাদ ছিল—তাহাতে কক্ষ ছিল ৬০টি। জার্ম্মানীর অর্থনীতিক ধাপ্পার যুগে কাউণ্ট ২৫০০০ পাউণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অষ্ট্রিয়ার সমস্যাকালে আরও ২৫০০০ পাউণ্ড লোকসান দেয়। তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া অতি স্বল্প সময় মধ্যে ঐ প্রাসাদ এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়। এই বিক্রয় ব্যাপারেও সময়ের সংক্ষেপ জন্য উচিত মূল্য কাউণ্ট পায় নাই। এখানেও বিপুল পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

যে কুটীরে তাহারা এখন বাস করে, তাহাতে মাত্র দুইটি কক্ষ রহিয়াছে। কাউণ্টের বয়স ৪২ বৎসর, আধপাকা চুল, সদা হাস্যময়। এত বিপদেও সে মুষড়াইয়া পড়ে নাই।

সে বলে—আমরা কপর্দ্দকহীন নই। আমরা এখানে আসিয়াছি গোপনে নিরালা জীবন-যাপন করিতে। আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া শত্রু-মিত্র সকলে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে—উহু, আহা বলিবে—ইহা অসহ্য।

বর্ত্তমান দুর্দ্দশা আমাদের অবশ্য চিরদিন থাকিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত ভালভাবে বসবাস করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারি—আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত না

হয়, ততদিনই আমরা এখানে অবস্থান করিব। আমার আশা আছে, আমরা শীঘ্রই অষ্ট্রিয়ায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আমরা বর্ত্তমানের টানাটানি ও দুরবস্থার কথা একবারও ভাবি না—আমাদের লক্ষ্য রহিয়াছে ভবিষ্যতের প্রতি। ভগবানকে ধন্যবাদ, এমন বুদ্ধিমতী ও চমৎকার বিচক্ষণ পত্নী আমি পাইয়াছি। আমি একলা কখনও এই গুরুভার বহন করিতে পারিতাম না। আমি এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান।

সুন্দরী নীল-নয়না কাউণ্টেস বলে—আমাদের টাইরলের প্রাসাদের পর এই কুটীর অবশ্য একেবারে স্বর্গ আর পাতালের সমান। সেখানে ছিল অগণিত পরিচারক-পরিচারিকা, ছিল হীরা-জহরৎ; আর এখানে একাই আমায় রান্না করিতে হয়, বাসন মাজিতে হয়, কাপড় কাচিতে হয়। অতিশয় ধড়কাটের সহিত আমায় সংসার চালাইতে হয়। কিন্তু তা বলিয়া আমি হতাশ বা ভগ্ন-হৃদয় হই নাই।

বন্ধু-বান্ধব আর আত্মজনের অতিথি হইয়া দীর্ঘকাল জীবন কাটান যায় না। সুখের বিষয় বিলাসের ভিতর বাস করিলেও আমাদের প্রকৃতি একেবারে সাদাসিধা—আমাদের রুচি ব্যয়-বহুল নয়।

অনেক জিনিষেরই আমাদের অভাব—বিশেষ করিয়া ভ্রমণের অর্থ-সংগ্রহের। পরিচ্ছদের জন্য আমি দুঃখিত নই এতটুকু, হইলই বা তাহা ফ্যাসানে বিগত দিনের।

কাউণ্টেস্ হাসিমুখেই বলিয়া চলে—আমাদের ছিল একটা প্রাসাদ ধনে-জনে পূর্ণ; এখানে এখন হইয়াছে নূতন ধরণের আর এক প্রাসাদ—এইটি আমার ইংলিশ প্রাসাদ।

আমার বিবাহ হয় কাউণ্টের সঙ্গে ৯ বৎসর পূর্ব্বে। রিভিয়েরাতে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। বিবাহের পর কাউণ্টের প্রাসাদে বাস করিতে যাই। এখন ব্যয় ও বিলাসপূর্ণ জগতের বাহিরে এই নিরালা পল্লীতে বেশ সুখেই আছি আমরা।

কাউণ্টেস্ বিবাহের পূর্ব্বে ছিল মিস্ এমিথি স্মিটন—তাহার পিতা এক সময়ে ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনার ছিল। কাউণ্ট চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বলিভিয়ার অরণ্যে নূতন স্থান আবিষ্কারে যায়। দেড় বৎসর সেখানে সে বন্য-জাতির ভিতরে বাস করে। নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া এক বন্যজাতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে হয়। বন্যজাতির প্রথা অনুসারে সে পত্নীর সহিত তাহার অনুক্ষণ আনাগোনা করিতে হয়—এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাছছাড়া হইতে পারিত না। বিখ্যাত আবিষ্কারক কর্ণেল ফসেটের সাহায্যে সে উদ্ধার পায়। কিন্তু কর্ণেল ফসেট তাহার পর হইতে নিরুদ্দেশ—আর তাহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বালকের নূতন বদনমণ্ডল

বার বৎসর বয়স্ক রেমণ্ড ষ্টিভেনসন লিঙ্কনশায়ারের লিথে এক মোটর দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়। তাহার সমগ্র বদনমণ্ডল এমনভাবে আহত হইয়াছিল যে, কেহই মনে করে নাই সে হাসপাতাল পৌঁছিবার সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু হাসপাতালে সে ক্রমশ সারিয়া উঠিতে থাকে। তখনই লক্ষ্য করা হয় যে, তাহার মুখমণ্ডল যে ভাবে বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে বাঁচিয়া উঠিলেও সে হইবে অতি ভীষণ-দর্শন, তাহার জীবন হইবে দুর্ব্বহ। তাই দেড় বৎসরকাল ব্যাপিয়া চিকিৎসকগণ ১১টি অস্ত্রোপচার করিয়াছে তাহার বদনের ডৌল স্বাভাবিক করিয়া ফেলিতে। তাহার নাকটি পুনরায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহার পাঁজরের কর্ত্তিত অংশের সাহায্যে। বুক এবং উরু হইতে ত্বক্ তুলিয়া লইয়া বদনমণ্ডলে প্যাচ দেওয়া হইয়াছে বিকৃত চেহারা বদলাইতে। যে-ভাবে মুখখানিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে, উহা না প্রত্যক্ষ করিলে বিশ্বাস করা যায় না। ছেলেটি এখন আর অস্ত্রোপচারে ভীত নয়, সে নিতান্ত ধৈর্য্যশীল। সে বলে, বড় হইলে সে নার্স হইবে।

ক্ষতি

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ বিটি

রজনী বাবুর বাড়ীটা হঠাৎ আগুনে পুড়িয়া গেল,
দামী দামী সব পোষাক ভস্মসাৎ;
আল্‌না টেবিল চেয়ার ফার্ণিচার,
সব পুড়ে ছারখার।
রজনী বাবুর ছোট মেয়ে আসি শুধায় মায়ের কাছে
"মা, আমার সেই মাটির খোকাটি কই ?
মিণ্টু সেদিন আমায় দিয়েছে যেটি !"
মা কহেন, "সেটি পুড়ে বা কোথায় গেছে,
কে এখন খুঁজে দেবে ?"
—কেঁদে ফিরে যায়-মেয়ে।

নতুন প্যালেস তোলেন রজনী বাবু,
নতুন পোষাক, নতুন ফার্ণিচার
সব এসে গেল, বাড়ীতে লাগিল আবার গণ্ডগোল।
হারানো জিনিষ আবার ফিরিয়া আসে।
এই বাড়ীটিরই এক কোণে বসি' কাঁদিছে বাড়ীর মেয়ে,
খোকারে তাহার আজো পায় নাই ফিরে।

মা আসি কহেন "আর একটি গড়ে দেব।"
মেয়ে কহে "দূর, খোকা কি গড়ানো যায় ?"
গড়ালে কি হবে ? সেটি হবে কি গো মিণ্টুর দেওয়া খোকা ?

প্রণয়ের পথে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী সত্যকুমার মজুমদার

১১

লীলার শুষ্ক জীবন নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল। সে শুধু নিজের পূর্ণতায় নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না—তার চারিধারের সমস্ত বস্তু প্লাবিত করিয়া, শীতল করিয়া, সার্থক করিয়া তুলিল। বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের যে কি আনন্দ, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠার যে কি নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ, লীলা এতদিন তাহা উপভোগ করিতে পায় নাই। এমন করিয়া মাতিয়া উঠিবার সৌভাগ্য তাহার কোন দিনই হয় নাই। তাহার বুকের জগদ্দল পাষাণ কোন যাদুকরের মন্ত্রপ্রভাবে একদিনেই এমন করিয়া সরিয়া গেল, লীলা বাঁচিল। আজ সারা জগৎ তাহার কাছে মধুর,—স্বামীর বিচ্ছেদ তাহার অসহ্য—স্বামী-প্রেমে সে আজ আত্মহারা। সে যেন আজ নববধূ। তাহার প্রতীক্ষা-তপ্ত হৃদয়ের চির আকাঙ্ক্ষিত অতিথি যেন আজ সবেমাত্র আসিয়া তাহার কুঞ্জ-কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। সে যেন চিরপরিচিত—অথচ চির-নূতন। সে মুখের দিকে বারবার অকারণে চাহিতে ইচ্ছা করে, অথচ লজ্জাও হয়। দেখিয়া দেখিয়াও আশা মিটে না।

নির্নিমেষ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া লীলা বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ পত্নীর এই ভাবান্তর গত রাত্রি হইতে লক্ষ্য করিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বুঝি অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্র কহিল, "মা আরও কয়েকদিন তোমায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন, থাক্‌বে তুমি?"

লীলা বলিল, "না।"

"তাঁরা দুঃখিত হবেন না?"

"সে ভাবনা তোমার নেই, আমি তাঁদের বুঝিয়ে বল্‌বো। কতদিন ত এসেছি এখানে। আবার না হয় আস্‌বো।"

"বুঝে দেখ, জামায়ের কোন দোষ না হয়।"

দৃষ্টিতে অপরূপ সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া লীলা বলিল, "না গো না, তা হ'বে না।"

মুগ্ধ-আনন্দে সে দৃষ্টিটুকু উপভোগ করিয়া নরেন্দ্র কহিল, "তুমি কিন্তু সত্যিই আজ নূতন হ'য়ে প'ড়েছ।"

হাসিয়া লীলা বলিল, "নূতন হ'ব না! মানুষ মরে গেলে সে যদি আবার জন্মায় নূতন হ'য়ে আসে না!"

"আমার ভাগ্য ভাল, বিয়ে না ক'রেই আবার একটা নূতন বউ পাওয়া গেল।"

"আমার ভাগ্য তাহ'লে আরও ভাল। দু'জীবনে আমি একই নূতন বর পেলাম। আজ তুমি আমার চক্ষে কত সুন্দর!"

"এতদিন তবে কুৎসিত ছিলাম?"

"তা কেন, সুন্দর তুমি চিরদিনই আছ। কিন্তু আজকের চোখ দিয়ে ত তোমায় কোনদিন দেখ্‌তে পারিনি। কেন পারিনি এত কথার পর তুমি আর তা আমায় জিজ্ঞেস করবে না জানি।"

"এতকাল তবে কি আমায় ফাঁকির জালেই জড়িয়ে রেখেছিলে!"

"ফাঁকী!" দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে ত আর আমার কিছুই বল্‌বার থাকে না।"

তারপর বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া লীলা বলিল, "তুমি জান না, তুমি পুরুষ। নারীর অন্তর রহস্যের দুয়ার খুলে যদি তুমি দেখ্‌তে—কত দুঃখে তারা পায়,—কত বড় পরীক্ষায় তোমরা অসহায়া নারীকে ফেলে দিয়ে তামাসা দেখ। ভাগ্যদোষে পরীক্ষায় যদি কেউ ফেল্ হয়ে যায়—বিনা বিচারে ঈর্ষার বশে দু'পায়ে তাকে ঠেলে দাও। আমি তোমায় ফাঁকি দিয়েছি—না তুমিই আমায় এতদিন ধরা না দিয়ে—তুমি স্বামী, তুমি বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছ—আমার পানে ফিরেও চাওনি। তোমায় দোষ দিইনে—পূজারিণীর মনের জোরে দেবতাও বাঁধা পড়ে—কিন্তু সে ভাগ্য আমার এতদিন হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ সত্যি আমার কান্না পাচ্ছে—আনন্দে—না দুঃখে তা জানিনে, তবে কাঁদ্‌বো না।"

বলিতে বলিতে লীলার কাতর চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিল। এইবার নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "সত্যি সত্যি কেঁদে ফেল্‌লে। আমি যে ঠাট্টা ক'রছিলাম।"

বলিয়া নরেন্দ্রনাথ লীলার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে যাইতেছিল; এমন সময় সতীশ আসিয়া ডাকিল,— "আজই তবে যাওয়া স্থির—কি বলেন বৌদি?"

লীলা এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল; হাসিমুখে বলিল, "কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আসুন না ঘরের ভেতর।"

সতীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বৌদিকে আজ কিন্তু একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কাল যে দু'বার অমন ফিট্ হ'য়েছিল—তার চিহ্নমাত্রও চ'খে পড়ে না।"

হাসিয়া লীলা বলিল, "কবির চোখে নারীর রূপবৈচিত্র্য ত সুন্দর লাগ্‌বেই ঠাকুরপো—এটা কিছু অন্যায়ও নয়—অসম্ভবও নয়!"

তাহার পর স্বামীর দিকে হেলিয়া ঈষৎ হাস্যে বলিল, "তুমিই বল না, মিথ্যে কিছু ব'লেছি।"

সতীশের মুখে আরক্ত আভা দেখা দিল; বলিল, "বৌদি, আমায় সব সময় কবি ব'লে ঠাট্টা করেন। কবি আমি কিসে হলাম—দুদ'শখানা কবিতার বইও লিখিনি—মাসিকের পাতায় খুঁজলেও আমার নাম পাওয়া যাবে না।"

লীলা বলিল, "আপনার মত অনামা কবিতেই যে সারা সংসারটা জুড়ে রয়েছে বন্ধু! সৌন্দর্য্যের প্রগাঢ় অনুভূতি যদি কবিতার প্রাণ হয়, তবে অকবি ব'লে বাদ পড়বে খুব কম লোকই। নিতান্ত বেখাপ্পা লোক ছাড়া আপনাদের মত কুমারদের কিন্তু কবি সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।"

উৎসাহিত হইয়া সতীশ বলিল, "শুধু সৌন্দর্য্যের অনুভূতি থাকলেই চলবে না বৌদি—তাকে রূপ দিয়ে ভাষায় প্রকাশ করাও ত চাই।"

লীলা বলিল, "আপনার এ যুক্তি মেনে নিলেও আপনাকে অকবি বলা চলে না। কিন্তু একটা কথা ঠাকুরপো, কবিরা সৌন্দর্য্যের পায়ে আত্মনিবেদন করে,—নিজেকে উজাড় ক'রে সবটুকু ঢেলে দেয়। সৌন্দর্য্যের বন্দনায় তার অন্তর মুখর হ'য়ে ওঠে—কিন্তু সুন্দর হয়'ত সে প্রেম নিবেদনে আনন্দ পায় না, কারণ কবির প্রেম নিবেদনকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। হয়ত কবির সে বাক্য-মধু তাকে মুগ্ধ করে—কিন্তু তাতে তৃপ্তি পায় না। বরং পায় ভয়, পাছে সে প্রতারিত হয়। সে জানে কবির চিত্ত চঞ্চল। কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক। তারপর কবির মানসী যে কে,—কোনখানে আছে, কবি তা নিজেই জানে না। সে দেশে দেশে তারই সন্ধানে ঘোরে ফেরে, না পায় তার সন্ধান,—না পায় তার দর্শন। কবি নিজেও দুঃখে পায় অন্যকেও প্রতারিত করে।"

সতীশ বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে লীলার পানে চাহিয়া রহিল। লীলার কথার হেতু, মর্ম্ম বা তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না।

লীলা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওগো তুমিই বল না, কথাটা বাস্তবিকই সত্যি নয় কি? পূজার মধ্যে যদি একনিষ্ঠতা না থাকে, সে পূজার আড়ম্বর-আয়োজন কি নিরর্থক মিথ্যা হ'য়ে পড়ে না—তাতে না আছে তৃপ্তি না আছে আনন্দ।"

নরেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল তাহাকে বলিবার অবসর না দিয়াই সতীশ বলিয়া উঠিল, "বৌদির এ কথাটির মধ্যে কতকটা সত্য থাকলেও পূজা যে নিরর্থক মিথ্যা তা আমি মেনে নিতে পারিনে। পূজার আড়ম্বর নিছক মিথ্যা কোনদিনই নয়। সৌন্দর্য্যের পায়ে কবির আত্মনিবেদনে কৃত্রিমতা কিন্তু এতটুকুও নেই—হ'তে পারে তার আবেদন-নিবেদন সাময়িক,—ভুলে যেতে পারে সে দু'দিন পরে কিন্তু তার সাময়িক চিত্তবৃত্তিকে অন্ততঃ তখনকার জন্য মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্থায়ী নয় ব'লেই যে, তাতে সত্য নেই, একথাও সত্য নয়।"

লীলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইল, পরে বলিল, "আপনার কথা হয়ত কতকটা বুঝতে পেরেছি ঠাকুরপো। আপনার ঐ অস্থায়ী সত্যকে আমার মন মেনে নিতে চাচ্ছে না। সত্য যা চিরকাল সত্য। অনন্ত-জীবনে অনন্তরূপে বহু ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তা চিরকাল সত্য হ'য়েই ফুটে থাকবে। সত্য মিথ্যাও হ'তে পারে না,—মিথ্যা যা তা সত্য ব'লে দাবী করলে সে দাবী কোনদিন টেকে না। নারীর এই যে বাইরের রূপ—এতেই তার সত্যিকারের পরিচয় নয়, কারণ এটা অস্থায়ী। সত্যিকার রূপ তার যেখানে—সত্যিকার নারীত্ব তার যাতে সেইটিই চিরস্থায়ী। তার ভিতরকার যে ধর্ম্ম—যে স্বভাব কোন যুগেই তার পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে না। সৌন্দর্য্যের পায়ে কবির স্তব-স্তুতি সত্যিকারের ভালবাসার বাণীর মত শোনালেও তাকে সত্য ব'লে মেনে নিতে পারিনে, এই জন্য যে, তার এই মনের অবস্থাটা চির-স্থায়ী নয়। আবার যদি কবির এই ভাবকে মোহ ব'লে ধরে নিই, তা'হলে হয়ত সেটা সত্য হ'তে পারে, কারণ মোহেরও একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে। সে হিসাবে সেটা সত্য—নইলে নয়।"

সতীশ কহিল,—"একনিষ্ঠতার অভাবই যদি সত্যিকারের কবি-চরিত্র হয় তবে সে হিসাবে সেটা সত্য হ'তে পারে।"

লীলা কহিল, "হয়ত পারে—নাও পারে!"

সতীশ জিজ্ঞাসুনেত্রে লীলার পানে চাহিয়া রহিল। লীলা বলিতে লাগিল, "বিশ্ব-সংসারে সমস্ত কবিই যদি এক চরিত্রের হ'ত তবে আপনার কথা মেনে নিতে কোন আপত্তির কারণ থাকত না। তা যখন সত্য নয়, তখন এক-নিষ্ঠতার অভাবই যে সত্যিকার কবি-চরিত্র, এই বা কি করে বলা যায়। তবে বেশীর ভাগেরই তাই।"

মাঝখান হইতে নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, "আমার বন্ধুটি তা'হলে তোমার মতে 'বেশীর ভাগের' দলের কবি। আর তোমার মতে কবি না হ'লেও আমি একজন কবি। আমাকে কোন দলে ফেলতে চাও?"

লীলা মনোহর হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কোন দলে থাকতে হবে না। তুমি এ সব দলাদলির ওপরে আমার স্বামী কবিও নয়, অকবিও নয়—শুধু আমার স্বামী। যাক আমার আর ব'সে থাকা চলবে না। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিই।"

বলিয়াই লীলা উঠিয়া গেল। সতীশ নরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল, "বৌদি শুধু দেহেই সুন্দর নয় নরেন—মনেও তাঁর অপার্থিব সৌন্দর্য্য, এর মর্য্যাদা তোমায় রাখতে হবে ভাই।"

নরেন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "ওর মর্য্যাদা আমায় রাখতে হবে না সতীশ! ও নিজের মর্য্যাদা নিজেই রাখতে জানে।—ওর ভেতর যে চুম্বক রয়েছে, আমায় টেনে নেবেই। দূরে থাকতে দেবে কেন।"

(ক্রমশ)

লিটভিনভ

শ্রীঅরুণোদয় শর্ম্মা

বিগত দশ বৎসর ব্যাপিয়া সোভিয়েট কমিসার ফর্ ফরেন য়্যাফেয়ার্স (Soviet Commissar for Foreign Affairs) অর্থাৎ সোভিয়েটের পররাষ্ট্রসচিব মশিয়ে লিটভিনভ্ সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যময়—তিনি চারিবার নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—তাঁহার ইংলিশ-পত্নী নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের চমকপ্রদ জীবনী সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল কতকাংশে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নে মঃ লিটভিনফের জীবনের প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল।

ম্যাক্সিম ম্যাকসিমোভিচ্ লিটভিনফের সহিত যাঁহারা কিছুমাত্র মিলামিশা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন লিট্-

ভিনভের কি প্রকার বিদ্বেষ ছিল, অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পর্শিত হইবার বিরুদ্ধে। তাঁহার এই আচরণে অনেকে বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেও, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত নিজস্ব রুচি-অরুচি সকলেরই থাকে ; এইগুলিই হইল ব্যক্তি-বিশিষ্টতা ; স্বাভাবিক এই আচরণ বর্জ্জন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া হালচাল হাবভাবের এই খুটিনাটি হইতেই লোকটির মন-মেজাজের পরিচয় অনেকাংশে আলোকপ্রাপ্ত হয়।

এই প্রকারের বিচিত্র স্বভাববিশিষ্ট রুচিবাগীশ এ দুনিয়ায় বিরল নয়। এবং তাঁহার জীবনধারার প্রতি সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দান করিয়া বিচার-বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে—ইহা তেমন বিস্ময়জনকও নহে।

১৮৭৬ সালে রাশিয়ার কোন এক ইহুদী পরিবারে লিটভিনভের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম হইল মীর ময়সীফ্ ওয়ালাচ্ (Meer Moiseeff Wallach)।

সেকালে জারের রাশিয়া ছিল সেমিটিক বিরোধী। বস্তুত, সেই যুগে রাশিয়াতে ইহুদীদিগের উপর যে চরম নির্য্যাতন-নিপীড়ন পরিচালিত হইত, তাহার সহিত তুলনায়, হিটলারের জর্ম্মানী ত নৃশংসতায় অতি মৃদুই বলিতে হইবে। পোগ্রম (Pogrom) শব্দটি রাশিয়ারই।

যে রাষ্ট্রপদ্ধতি তাঁহার জাতিকে অপরিসীম নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত করিত—তরুণ লিট্ভিনভ তাহার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন।

১৯০১ সালে জারপন্থী গোপন পুলিশ বিভাগ একটি চোরাই ছাপাখানা চালাইবার অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এই ছাপাখানায় বিপ্লবী ইস্তাহার প্রভৃতি মুদ্রিত হইত।

কিন্তু লিটভিনভের সেয়ানা কৌশল—যাহা অধুনা আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাকে অদ্বিতীয় প্রতিপন্ন করিয়াছে—তাহাই তাঁহার মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। একদিন জানা গেল জেল-কর্ত্তৃপক্ষের চোখে ধূলি দিয়া তিনি জেলখানা হইতে বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছেন।

কারাবাস হইতে উদ্ধার পাইয়া তিনি স্থির করিলেন, শুধু ইস্তাহার ছাপাইয়া বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা যাইবে না। ১৯০৫ সালে তিনি ইংলণ্ডে 'অর্ডার' দিলেন—এক জাহাজ ভর্ত্তি অস্ত্রশস্ত্রের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমরাস্ত্র পূর্ণ সেই জাহাজখানি জলমগ্ন হইল পথিমধ্যে। তিনি পুনরায় আর এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্রের 'অর্ডার' দিলেন। সেই জাহাজও গ্রহের ফেরে জল-নিমজ্জিত হইল।

ইহার পরই তিনি রাশিয়া পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহিরে থাকিয়া বিপ্লবের রসদ জোগাইতে তৎপর হইলেন। কিছুদিন মধ্যেই সুইজারল্যাণ্ডে যাইয়া সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলে যোগদান করিলেন। কিন্তু তাহাদের মতবাদ—তাহাদের আন্দোলন—তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাঁহার মনঃপুত হইল না, কারণ তাহা অতিশয় মৃদু বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিল। পরিশেষে তিনি একজন একনিষ্ঠ বোল্‌শেভিকে পরিণত হইলেন।

এই সময়ে প্রায় দশ বৎসরকাল তিনি বাস করেন ইংলণ্ডে। সকল দেশের বিপ্লবীকেই কিছুদিন অন্তর অন্তর নাম বদল করিতে হয়, তিনিও সেই কৌশল অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন নাই। প্রথমত তিনি ওয়ালাচ বদলাইয়া ম্যাকসিমোভিচ্ করিয়া ফেলেন। পরে সেই নামেও পুরাতন সংস্রব আবিষ্কার সম্ভব হইয়া উঠিলে, তাহা বদল করিয়া গুস্তাভ্ গ্রাফ্ (Gustav Graf) নাম গ্রহণ করেন। পরিশেষে সেই নামও বর্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান লিট্ভিনভ নামেই বিচরণ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে ছদ্মবেশে বসবাস

করিবার সুবিধার জন্য কিছু সময়ের তরে হ্যারিসন (Harrison) নাম প্রচলিত করেন।

ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি হ্যাম্পষ্টেডে কোনও প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন--অবকাশ সময়ে রুশভাষা শিক্ষাদান করিয়া আরও সপ্তাহে কয়েক শিলিং করিয়া উপার্জ্জন করিতেন।

চাকুরী করিলেও বিপ্লবে সাহায্যদানের কার্য্য তিনি ছাড়িয়া দেন নাই। সদাসর্ব্বদা রাশিয়ায় অবস্থিত বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন; তাহাদের অগ্রগতি ও সকল প্রকার আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন; আন্তর্জাতিক সোশ্যালিষ্ট কনফারেন্সসমূহে উপস্থিত থাকিতেন; তাহা ছাড়া অবকাশ সময়ে সম-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ইংরেজদিগের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন।

এই সময়ে ব্রিটিশ টোরিপার্টির নেতা স্যার সিডনী লোয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্যার সিডনীর ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস আইভি লোয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং পরিশেষে উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই বিবাহের ফলে দুইটি সন্তানের জন্ম হয়--একটি ছেলে আর অন্যটি মেয়ে। ছেলেমেয়ে দুইটি বেশ চটপটে, সর্ব্বদা বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত থাকে। তাহাদের মাতা কিন্তু মস্কোতে বাস করে না। বহুদূরবর্ত্তী কোন শহরে সে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত--তাহার কার্য্য হইল 'বেসিক ইংলিশ' শিক্ষাদান। এই শহরেই তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়, কারণ, শোনা যায়, সে নাকি ইহুদী-দলনের বিরুদ্ধে অশোভন ও অভদ্র উক্তি করিয়াছিল। হয়ত সেই সময়ে তাহার স্বামীর ক্ষমতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে।

ইতিপূর্ব্বে 'হ্যারিসন' নামে যখন লিট্‌ভিনভ ইংলণ্ডে চাকুরীতে ব্যাপৃত, সেই সময়েই মহাসমর উপস্থিত হয়। সুতরাং বোলশেভিক বিপ্লব যেমনই জারকে পদচ্যুত করিল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টার হ্যারিসন রাশিয়ায় আগমন করিয়া ম্যাকসিম লিট্‌ভিনভ নাম ধারণ করিলেন। তাঁহাকে প্রথম বোলশেভিক রাজদূতের পদ দান করা হইল এবং সেণ্টজেমস্ রাজকীয় দরবারে প্রেরণ করা হইল, কিন্তু সেখানে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না।

বাস্তবে সকল রাজনীতিক মর্য্যাদার লাঘব করিয়া রাজদূতকে ব্রিক্সটন জেলে আবদ্ধ রাখা হইল। মস্কো শহরে কোনও ইংরেজ রাজনীতিকের হত্যার পাল্টা প্রতিশোধে এই কার্য্য করা হইল বলিয়া প্রকাশ পাইল।

ইতিমধ্যে বোলশেভিকগণও নিশ্চেষ্ট রহিল না। মস্কোতে প্রেরিত ব্রিটিশ এজেণ্ট ফর্ রাশিয়া--মিঃ ব্রুস-লকহার্ট বোলশেভিকদের হস্তে বন্দী হইলেন। তখন একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করা হইল। লিট্‌ভিনভের মুক্তির বিনিময়ে লকহার্ট মুক্তি পাইলেন (১৯১৮ সাল)।

ব্রিক্সটন্ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি জারপন্থী সরকারের প্রশংসা করেন, তাঁহার জীবনে চির-বিদ্বেষপূর্ণ জারতন্ত্রের প্রতি উহাই একমাত্র প্রশস্তি।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের যে অফিসার তাঁহাকে মুক্তি-দান করিতে আসিয়াছিল, তাঁহার নিকট তিনি বলেন,-"ফিয়েভ জেল হইতে অপেক্ষা আরামপ্রদ ছিল—সেখান হইতে পলায়নও ছিল সহজ।"

পুনরায় যখন তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার বৈদেশিক অভিজ্ঞতা, তাঁহার বিভিন্ন ভাষায় দখল এবং তাঁহার অদম্যশক্তিই তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া দিল উদীয়মান দেশ নেতারূপে।

প্রথমে তাঁহাকে ফরেন্ কমিসার চিচেরিনের (Tchitcherin) সহকারী করা হইল। ১৯২৯ সালে তিনি স্বয়ং ফরেন্ কমিসার পদে উন্নীত হন।

ঘোর সাংসারিকের মত তাঁহার শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহারের ফলে তাঁহার বহু বন্ধু জুটিয়াছিল এবং দেশে দেশে তাঁহার সমর্থকের দলও সামান্য ছিল না।

তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট আকার-আকৃতি সহজেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত এবং বাহ্যত অতি করুণার্দ্র নয়ন ও সদয়-মূর্ত্তি থাকিলেও শঠতা ও কূটনীতিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

বাস্তবপক্ষে তিনি সদাশয় ছিলেন না আদপেই। চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তিনি ছিলেন প্রভাময় এবং মনটি তাঁহার ছিল নিখুঁত যৌক্তিকতার আধার। বাগ্মিতায় যেমন তিনি পটু, তেমনই যাহারই সংস্পর্শে আসেন, তাহারই চিত্ত জয় করিতে পারেন অতি সহজে।

তাঁহার রহস্যও এমনি বিষকণ্টকপূর্ণ যে জেনেভা-সম্মেলনে যে সকল রাজনীতিক ধুরন্ধর তাঁহার সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সকলেই বাক্যবিদ্ধ হইয়া গ্লানিকর স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছেন।

ম্যাকসিম লিট্‌ভিনভের রাষ্ট্রপদ হইতে অবসর গ্রহণকে একটা যুগান্তর বলা যাইতে পারে। যুদ্ধোত্তর লীগ-কূটনীতি যাহার প্রভাবে অগণিত সম্মেলন ও লক্ষ লক্ষ বাক্য ব্যয় হইয়াছিল তিনি ছিলেন উহার পক্ষপাতী।

প্রতারণাকে কার্য্য নিয়ন্ত্রণের মূলমন্ত্র হিসাবেই তিনি জানিতেন খুঁটিনাটি সহ। তথাপি তিনি বুঝিতেন কি ভাবে ঐ সকল সম্মেলন হইতে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিতে হয়—কি ভাবে সম্মেলনের আলোচনাকে সেয়ানা বক্তৃতার দ্বারা অনুকূল খাতে প্রবাহিত করিতে হয়

জেনেভার 'পশ্চাৎ দ্বার' কূটনীতির অন্যতম আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন লিট্‌ভিনভ--উহার সাহায্যে হোটেলস্থ শয়ন-কক্ষের গোপন দ্বার দ্বারা প্রত্যাশিত সমর্থক বিদেশী রাজনীতিকের শয়ন-কক্ষে অপরের অপ্রত্যক্ষে গমন করিয়া হুইস্কি পান ও পরবর্ত্তী দিবসের অনুকূল কর্ম্মপন্থা যেন তেন প্রকারে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব হইয়াছিল,

বহু ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য্য বিজয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিজয় কীর্ত্তির ভিতর—আমেরিকান সরকার কর্ত্তৃক সোভিয়েট রাশিয়ার স্বীকৃতি ফ্রাঙ্কো-রাশিয়ান চুক্তি এবং রুশ-চেকোশ্লোভাক প্যাক্ট বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু যে সমস্ত আড়ম্বরপূর্ণ গঠনকে আকাশস্পর্শী

(শেষাংশ ১৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্ষান্তমণির চিঠি

(চিত্র)

শ্রীসুবোধ বসু

প্রিয় সন্তোষদা

এতদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি, হয়ত খুব আশ্চর্য্য বোধ করিবে। করিবারই ত কথা—কারণ আজ প্রায় দীর্ঘ পনর বৎসর পরে তোমার কথা মনে পড়িল। এতদিন কেন লিখি নাই তাই শোন,—

স্বামীর মৃত্যুর পরে অধিকাংশ হিন্দুনারীর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে আমার ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না—। উনি ত ঐ টাটা কোম্পানীতে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনায় একটি কেরাণীগিরি করিতেন। মাসে সেই পঁয়ত্রিশটি টাকা ছিল পাঁচটি ছয়টি প্রাণীর একপ্রকার জীবন-স্বরূপ! ঐ টাকা কটি থেকে—ছেলে মেয়েদের স্কুলের মাহিনা, ডাক্তারের ভিজিট, রোগীর পথ্য, বাড়ীওয়ালার ঘরভাড়া, তারপরে ছিল মুদীর দোকানের লম্বা ফিরিস্তি। এ ছাড়াও ছিল আবার দৈনিক বাজার খরচ। এত সমস্ত চালাইয়া জমা ত করিয়া যান নাই এক পয়সাও বরং কাবুলীওয়ালার কাছে দেনা করিয়া গিয়াছেন এক কাঁড়ি টাকা। মরিবার সময় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভিতর রাখিয়া গিয়াছেন—তিন তিনটি মূর্ত্তিমান আপদ! ভাগ্যলক্ষ্মীর এই দারুণ বিড়ম্বনার দিনে তারাও আমাকে গঞ্জনা দিতেছে কম না—মরিবার সময় যখন কোন চিহ্নই রাখিয়া গেলেন না, তবে এ আবার কেন? তুমি হয়ত বলিবে—"মা হইয়া আমি অমন কথা কেমন করিয়া বলিলাম!"

কুৎসা আজ মাথা পাতিয়া লইব বলিয়াই 'বেহায়া' সাজিয়াছি। ভাই, সে আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই—তাই, সে আমাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু বৌ—সে ত অমন কেউ নয়, চক্ষুলজ্জা করিবে কিসের জন্য? আগে এখান হইতে তাড়াইবার জন্য গুপ্ত-ষড়যন্ত্র চলিত—কিন্তু এখন প্রকাশ্যে। বৌ আমাকে এখানে একদণ্ডও থাকিতে দিতে নারাজ। আমার অনেক দোষ। অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে যার ঘরে তার ওরূপ নিশ্চিন্তে বসিয়া ভাইয়ের অন্ন গলধঃকরণ করা কোন মতেই উচিত নয়। এতদিন তিনি আমায় কিছু বলিতে পারেন নাই—ননদ বলিয়া। কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা আর কতদিন থাকিতে পারেন? আমার দিকে চাহিলে তাঁহাদের চলিবে না। গাঁয়ের আর দশজন লইয়া তাঁহাদের থাকিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি আমার এই দো-আষাঢ়া মেয়েদুটি লইয়া আর পক্ষাতীতকাল তাঁহাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করি, তাহা হইলে তাঁহারা 'একঘরে' হইবেন। এ নাকি তাঁহাদের সমাজপতিদের চূড়ান্ত মন্তব্য। কথাকটি সেদিন বেশ ঝাঁজের সহিত বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কি করি, কিছুই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছি না। মনিব ত পনরদিনের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ জারী করিয়াছেন। যদি না ছাড়ি? হয়ত শেষকালে অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্তি। কাল হইয়াছে আমার এই মেয়েদুটি। পেটের কাঁটা বড় বালাই! ইহারা যদি না থাকিত তাহা হইলে

[illegible]

তাহা হইলে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঢেঁকির মত একটা কঠিন জিনিষকেও না হয় গলাধঃকরণ করিতে পারেন।

সবই শুনিলাম, শুনিতেও বেশ লাগিল। যে আজ বাদে কাল কোথায় দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, সে মেয়ের বিবাহ দিবে তথাকথিত জাঁক-জমকের সহিত। কথা কটি যদি স্বপ্নে শুনিতাম, তাহা হইলে হয়ত কতকটা আমোদ পাওয়া যাইত। কিন্তু এ ত তাহা নয়—এ যে রূঢ় বাস্তব।

এমনি ত কত জায়গা হইতেই আসিতেছে। আগে আসিলে কতকটা আশ্বস্ত হইতাম, মনে করিতাম হয়ত ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া অভাগীর মেয়েটাকে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু সভ্য জগতের হালচাল দেখিয়া শুনিয়া আশার চেয়ে নিরাশাই আমাকে পাইয়া বসিয়াছে আষ্টে-পৃষ্ঠে।

মেয়ের আমার রূপ আছে গুণও যে নাই তাহা নহে। কিন্তু গরীবের মেয়ে লেখাপড়া শিখাইতে পারি নাই। নাচিতেও জানে না গাহিতেও পারে না। সুতরাং এমনি একটি দুর্ব্বাহ জড় সভ্য জগতে সভাই অচল।

বিধবার মুখের দিকে চাহিয়া যাহারা মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করিতে আসে, তাহারা আবার পিছাইয়া যায় নিজেদের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। অর্থাৎ তাহারা বেকার।

এইত গেল আমার মেয়েদের কথা। মেয়ের বাজার যে এত মন্দা তাহা যদি আগে জানিতাম, তাহা হইলে সূতিকাঘরেই মুখে লবণ দিয়া মারিয়া ফেলিতাম, তাহা ত আর এখন হইবার উপায় নাই। এখন আমার উপায় কি তাই বল। এখান হইতে ত আর কিছুদিনের মধ্যেই তল্পীতল্পা বাঁধিতে হইবে। শুনিয়াছি, তুমি মোটা মাহিনার চাকুরী কর, অভাগীর এ দুর্দ্দিনে কি কিছু সাহায্য করিবে—অন্তত ছেলে মেয়েকটির মুখের দিকে চাহিয়া? ভালবাসা গ্রহণ করিও। ইতি।

তোমার স্নেহের

"ক্ষান্তমণি"

বর্ত্তমান ব্যায়াম আন্দোলন

(১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

ফেলিতেছে যে, আদর্শ সম্বন্ধে আমরা অবিরাম সচেতন না থাকিলে ব্যায়াম-চর্চ্চার ফল বিষময় হইবার সম্ভাবনা'

"দৃঢ়পৃষ্ঠ, বলিষ্ঠ যুবকের সুগঠিত দেহ-সৌষ্ঠব ও বদনমণ্ডলের সম[illegible] পড়ি তাহার মূলে আমাদের অদৃঢ় মাংসপেশী এবং দুর্ব্বল হৃদপিণ্ড।

বাঙলার ব্যায়াম আন্দোলনের [illegible]

উত্তরবঙ্গের সোনা রায়ের ছড়া

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পৌষ মাসে শস্যোৎসব উপলক্ষে বাঙলার সর্ব্বত্র কৃষকেরা আনন্দ-গান করিয়া থাকে। পল্লীবাসীর সে আনন্দোৎসবে সহজতম আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সে সব উৎসবে ভাটা পড়িয়াছে, কিন্তু একেবারে অন্তঃসারশূন্যে হইয়া যায় নাই

উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বালক ও যুবকেরা পৌষ মাসের প্রথম রাত্রি হইতে সংক্রান্তির রাত্রি পর্যান্ত গৃহস্থের বাড়ী ঘুরিয়া গান করিয়া বেড়ায়। উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র তাহাকে সোনারায়ের গান বলে। উক্ত ছড়া-গান উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলা হইতে প্রসারলাভ করিয়া পাবনা, রাজসাহী, মালদহ প্রভৃতি জেলা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মালদহ ও রাজসাহীতে উহা নাকি শাঁখবোল নামে পরিচিত; তবে তাহার মধ্যে সোনারায় ঠাকুরের নামোল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় মালদহ জেলা হইতে যে শাঁখবোল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

দে দান যাই বরাতে,
সোনারায়ের পূজো দিতে।
ও সোনারায় কর কি ?
সোনার লাঙ্গল গড়েছি।
সোনার লাঙ্গল রূপোর ফাল,
ভাত ডাঙ্গায় বয়েছি হাল—ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলা হইতে আমি কয়েকটি সোনা-রায়ের ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি। তাহার সামান্য কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তৎপূর্ব্বে আমরা "সোনা-রায়ের গানে"র কিম্বদন্তী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বহুদিন পূর্ব্বে রংপুর, কুচবিহার প্রভৃতি জেলার কোন পল্লীতে নাকি তিন ভাই বাস করিতেন;—তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সোনা রায়, মাণিক রায় ও রূপা রায়। তাঁহারা তিনজনেই নাকি খুব বীর ছিলেন। তখন উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বাঘের ভয় ছিল, শীতকাল পড়িতেই পাহাড় হইতে বাঘ নামিয়া আসিয়া লোকের শস্য ক্ষেতের মধ্যে আস্তানা গাড়িত। সোনা রায় বাঘ শিকারে বিশেষ ওস্তাদ ছিলেন, এমন কি তিনি বাঘকে বশীভূত করিয়া তাহার পিঠের উপর উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাণিক রায় মহিষের পৃষ্ঠে এবং রূপা রায় হস্তী কিংবা অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিতেন। এখনও উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে গৃহস্থেরা সোনা রায়, মাণিক রায় ও রূপো রায়ের উক্ত রূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয়, সোনা রায়ের ছড়ার মধ্যে আমরা শুধু সোনা রায়, মাণিক রায়ের নাম পাই, রূপা রায়ের কোন নাম পাই না। সম্ভবত, তাহা বিশেষ কল্পনাপ্রসূত। এস্থলে আমরা সোনা রায়ের কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করিতেছি।

(১)

জন্ম খণ্ড

কৃষ্ণ বলাম দোঁহে
লইয়ে ধেনুর পাল।
বোনে বোনে চরাইনু
যতেক রাখাল॥
বলরাম বলে কৃষ্ণ শুনহ বচন
সোনা রায় মাণিক রায় হব দুইজন॥
বাঘের পিষ্ঠে চড়ি তুমি হও সোনা রায়।
ভইসের (১) পিষ্ঠে চড়ি আমি হব মাণিক রায়॥
ইহা বলে দুই ভাই করিলে গমন॥*
গরু চরায় রাখালগণ,
তাহার নাগ্য (২) পায়।
আইস আইস বলি তবে
সোনা রায় ডাকায়॥
ঘরে ঘরে কর তোমরা
সোনা রায়ের গান।
সোনা রায়ের নামে ভিক্ষা
সবাই দিবে ধান॥
এই ঠাকুর সোনা রায় গায়,
রোস্তক (৩) দিলে বর।
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি
চন্দ্র দেবোকর।

(২)

ঝেচু খণ্ড

ঝেচু করে ঝিলি মিলি,
কুকিলায় করে রাও।
শ্বেত কাকা উঠিয়া বলে
রজনী প্রভাও॥
রজনী প্রভাত কালে,
পূবে উদয় ভানু।
মা যশোদা ডেকে বলে,
উঠ রাম কানু॥
ছড়ছান দিয়া কন্যা
হরষিত মন।
সোয়ামির সাক্ষাতে যাধা
কি বলে বচন॥
সোয়ামি না বল্ল তোক্,
প্রাণের ঈশর।
আজ্ঞা কর যাই স্বামী ধন
দিগি সরবর॥
খইলা খারো নইলে কন্যা,
কস্তুরী চন্দন।

১। ভইস—মহিষ।

* রঙ্গপুর জেলার দাউদ গ্রামের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সর্ম্মা ও শিমুলবাড়ীর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বর্ম্মা আমাকে ছড়া সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

২। নাগ্য—নাগাল, সন্ধান ৩। রোস্তক—গৃহস্থকে।

সঙ্গে আছে সখীগণ
নিয়া করহ গমন॥
*   *   *   *
ইহাক্ ছাড়িয়া কন্যার
চিজ-এ গমন।
সরোবর পথ্রী যাআ
দিলে দরশন॥
*   *   *   *
জলেতে নামিয়া কন্যা
হাটু করলে সুর।
ধর্ম্মের দিকে দাগে কন্যা
দেও পুত্রবর॥
এখন ছিলান করিয়া কন্যা,
করিলেন গমন।
আপনার গৃহে আসি দিলে দরশন॥ ইত্যাদি।

(৩)
গোয়ালিনী খণ্ড

মাহষ চরায় নন্দের ছাইলা,
বেলা হইল দুপোর।
খেদেয়া তুলিলে ভইস,
বাতানের উপর॥
কাকো বান্দে কাকো ছান্দে,
কারো ছেকে দুগ।
কালো গাভীর ধবল বাছুর,
ছেক্তে বড় সুখ।
এলুয়া (৪) উকুরিয়া নন্দ,
পাকাইলে বেড়ুয়া (৫)
তাহাতে তুলিয়া দিলে
দুধের তলুয়া॥ (৬)
বাতানেতে ধুলা ধুসর,
করলে অন্ধকার।
বান্ধন ছান্দনের দাড়ি,
উবায় (৭) ভারে ভার॥
বাতানেতে যাইয়া কৃষ্ণ
বাঁশিতে দিলে সান,
যত আছে অরণ্যে মৈষ (৮)
করিলে গোঠান॥ (৯)
*   *   *   *
যেইনা ঘাটে গোয়ালের নারী,
জল আইন্তে যায়।
পশু-পক্ষী না খায় জল,
গন্ধেতে পলায়॥
যেইনা বাড়ী গোয়ালিনী,
আগুন আইন্তে যায়।

৪। এলুয়া=আইলের লাস। ৫। বেড়ুয়া=মোড়া। ৬। তলুয়া=হাঁড়ির তলা। ৭। উবায়=বহন করে। ৮। মৈষ্য= মহিষ। ৯। গোঠান=একত্র।

জলম আটকুড়া বলে,
কোয়ারি ঝাপায়॥
শ্রীখলার হাটে দধি করে বেচাকেনা।
শ্রীখলার লোকে বলে বাঞ্জি আটকুড়া।
আটকুড়া বলিয়া দধি কেহই না নেয়।
মনের গুমানে দধি ঢালিয়া ফেলায়॥
শ্রীখলার দোকানে যাইয়া দোকানে দিলে সারি।
রাধে বিকায় দধি-দুগ্ধ, কানাইয়া গণে কড়ি॥

উপরি উক্ত ছড়া-গানের মধ্যে সোনারায়, মাণিকরায়কে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অংশস্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উহার মধ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বিবরণ পাই। উক্ত ছড়াকে কৃষ্ণ-ধামালী(?) গানের অন্তর্ভুক্ত করা চলে কিনা, তাহা বিচার সাপেক্ষ। বাঙলায় পৌষ মাসের শস্যোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিষয়বস্তুর সন্ধান অনেক মিলে। দক্ষিণ বঙ্গের পল্লী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত "ধলই গানের" মধ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার নিদর্শন পাই। আমরা এস্থলে তাহার কিছু উল্লেখ করিতেছি—

ননি খালো কে রে গোপাল, ননি খালো কে?
—আমি ত খাইনি ননি, খাইছে বলাই দাদা।
—বলাই যদি খাইত ননি, থাক্ত আধা আধা
তুমি ত খাইছ রে ননি ভাণ্ড কইরা ছেঁদা॥
হাতে ছড়ি নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে।
লাফ দিয়ে উঠল রে গোপাল কদম্বিকের গাছে॥
ওলা (১০) ওলারে গোপাল পাড়ে দেব ফুল।
ডাল ভাঙ্গে পড়িবি গোপাল, মজাইবি দুই কুল॥

মধ্য বঙ্গের নদীয়া জেলা হইতে সংগৃহীত "হোলবোল" ছড়ায় আমরা শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্য-লীলার বিবরণ পাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন অনন্ত শয়ন করিলেন, তখন মানুষ, পশু-পক্ষী কাঁদিয়া আকুল। তাহা উপভোগ্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ওপারে তেরপুনি (১১) গাছটি পাতা ঝুরঝুর করে।
তার তলায় কৃষ্ট ঠাকুর সদা নৃত্য করে॥
গোপ কাঁদে, গোপিনী কাঁদে, কাঁদে তরুলতা।
সকল তলা বেড়িয়ে এল কৃষ্ট গিয়েছেন কোথা॥
কৃষ্ট গিয়েছেন বিষ্টুপুর আমায় না বলিয়ে।
কোথা থেকে এলেন কৃষ্ট পাচন হারায়ে.
ডান হাতে তেলের বাটি কানে কঙ্কের ফুল।
চান করিতে যায় গো কৃষ্ট কালীদহের কূল॥
কালীদহের কূলে কৃষ্ট এলায়ে দিলেন কেশ।
কেশের পানে চাইতে চাইতে ওনু হ'ল শেষ॥

এখন সোনারায়ের ছড়া লইয়া একটি বিতর্ক পেশ করি। আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সোনারায়ের ছড়া উত্তর বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় ১৩৪৫ সালের ১১শ সংখ্যা "দেশে", উত্তর বঙ্গের শাঁখবোল

১০। ওলা=নামা। 'দেশ' পত্রিকার ২৩শ সংখ্যায় উক্ত ছড়াটি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে "আলা আলারে গোপাল" উল্লিখিত হইয়াছে—তৎস্থলে "ওলা", "ওলা" হইবে। কারণ, খুলনা জেলায় "ওলা" অর্থে "নামা" বুঝায়।

১১। তিরপুর্ণি গাছ=তমাল গাছ।

বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন. উহা যে সোনারায়ের ছড়া তাহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। শ্রীযুক্ত নলিনেশ মৌলিক এম-এ মহাশয়. ১৬ সংখ্যা "দেশে" সুরেনবাবুর উক্তির কিছু খণ্ডন করিয়াছেন. এবং কিছু নব সংযোজনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে. মুর্শিদাবাদ জেলায়ও নাকি শাঁখবোল প্রচলিত আছে। সুরেনবাবু নাকি তাহা শোনেন নাই। অন্যপক্ষে নলিনেশবাবু বলিয়াছেন যে, উত্তরবঙ্গ বলিতে রংপুর, দিনাজপুর জেলাও বুঝায়. কিন্তু সে সব জায়গায় শাঁখবোল আছে বলিয়া তিনি শোনেন নাই। সুরেনবাবু নাকি এরকম কথা বলেন নাই। তবে উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর জেলায় সোনা পীরের গান আছে বলিয়া তিনি জানেন। উভয়ের এরূপ জানা-শোনার মধ্যে একটু গণ্ডগোল আছে বলিয়া মনে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় শাঁখবোল থাকিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না, আর দিনাজপুর জেলায় সোনা পীরের গান পাওয়া গেলে অভিনব কিছু পাওয়া গেল বলিয়া ধারণা করা অন্যায় হইবে।

পৌষমাসে রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় মুসলমান বালকেরা সোনাপীর, মাণিকপীর, রাখালপীরের গান করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। উক্ত সোনাপীর, মাণিকপীর যে সোনা রায়, মাণিক রায়ের নামান্তর মাত্র তাহা ধারণা করা চলে। পল্লী-গীতি কিম্বা ছড়ার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুর সন্ধান আমরা খুব কম পাই। হিন্দু-মুসলমান সকলেই পৌষের আনন্দোৎসবে যোগদান করে। তবে দুঃখের বিষয় অধুনা সাম্প্রদায়িকতা বিদ্বেষ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যের সে সংযোগ সূত্র ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। এখনও অনেক মুসলমানের বাড়ী হিন্দু যুবকেরা সোনা রায়ের গান করিয়া ভিক্ষা পাইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার এখন বাদ্যের পক্ষপাতী নন, তবে ভিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন।

সোনা রায়, মাণিক রায় প্রভৃতি নাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই—কিম্বদন্তীর উপর সব সময় নির্ভর করা চলে না। ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের দ্বারা কৃষকেরা সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে—তাহাই তাহাদের নিকট সোনা, রূপা, মাণিক রতন বিশেষ। "সোনার লাঙ্গল" কিম্বা "রূপার ফালের" উল্লেখ থাকিলেও তাহা কল্পনার পরিপোষক মাত্র।

মধ্য বঙ্গের নদীয়া জেলা হইতে সংগৃহীত একটি ছড়ার মধ্যে আছে।

ধান থাকতে দিল কড়ি।
তার দুয়ারে সোনার দড়ি॥
সোনার দড়ি পাক পাড়া।
তিনশ আঠার ঘোড়া॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় বুঝব।
চাল কাঠা দুই কুটব॥
চাল করে আজিগুজি।
সোনার লাঙ্গল পেড়েগুজি॥
থো থো থো লাঙ্গল থো।
গাড়ুর জলে হাত পা ধো॥
কেটে আনগে মানের পাত।
তাতে দেব অম্বল ভাত।
অম্বল ভাতে নাইকো নুন।
শত্রুর মুখে কালি চুন।

(হোল বোল) ইত্যাদি।

উক্ত ছড়ায় আমরা সোনার লাঙ্গলের কথা পাই। ধানাই যখন একমাত্র সোনার ফসল, তখন লাঙ্গলও যে সোনা বিশেষ হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। উক্ত ছড়া গানে আমরা ঘোড়-দৌড়ের সন্ধান পাই। পৌষ মাসে যখন ক্ষেতের ধান ঘরে আসে, তখন মাঠের মধ্যে ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইতে দেখা যায়। এখনও দক্ষিণ-বঙ্গ, পূর্ব-বঙ্গ, মধ্য-বঙ্গের অনেক অঞ্চলে ঘোড়-দৌড়ের প্রচলন আছে। দৌড় প্রতিযোগিতায় যাহার ঘোড়া জিতিয়া থাকে, তাহাকে সাধারণত একটি কলস উপহার দেওয়া হয়। দক্ষিণ-বঙ্গের খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত ধলইগানের মধ্যে আমরা ঘোড়-দৌড়ের সামান্য কিছু উল্লেখ পাই।

বোল বোলা বোল ছাড়ে ঘোড়া।
ঘোড়ার আগে ঘুড়ী যায়।
গিরির* শত্রুরে বাঘে খায়।
খায় আর কড়মড়ায়॥

দক্ষিণ-বঙ্গের ছড়ার উল্লেখ করিতে গিয়া বাঘের কথা আসিয়া পড়িল। ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় ২১শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায়, বাঘ পুজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাঘ পূজার সঙ্গে নাকি শাঁখবোল কিম্বা পৌষের শস্যোৎসবের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক না থাকিলেও পৌষ মাসে যে বাঘ-পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে আমরা বাঘ পূজা সম্বন্ধে ভাসা ভাসা কিছু পাইতেছি, কিন্তু যুক্তি পাইতেছি না। দক্ষিণ-বঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে কৃষক বালকেরা পৌষ মাসের প্রথম দিন হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত বাঘের মূর্ত্তি লইয়া গৃহস্থের বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। দক্ষিণ-বঙ্গের ধলই গানের মধ্যে যে বাঘের উল্লেখ আছে, সে বাঘ গৃহস্থের শত্রুকে নিধন করিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় সুরেনবাবু পৌষ মাসের শস্যোৎসবের সঙ্গে বাঘ পূজার যে যোগ আছে, তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিতেছেন।

এখন সোনা রায়ের নাম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। এই সোনা রায় ব্যাঘ্র দেবতা বিশেষ কিনা তাহা বিচার করা যাউক। আমি রংপুর জেলা হইতে যে সোনা রায়ের ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে বাঘের কথা আছে এবং তাহাতে সোনা রায়কে ব্যাঘ্র-দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গের যে স্থানেই সোনা রায়ের মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার বাহন একমাত্র ব্যাঘ্র। পল্লীবাসী সোনা রায় ঠাকুরকে ব্যাঘ্র-দেবতা বলিয়া জানে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়

* দক্ষিণ-বঙ্গের ধলই গানের মধ্যে কোথাও "গুরু সত্যকে বাঘে খায়", এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। "গিরির শত্রুকে বাঘে খায়" কথা বিচার সঙ্গত।

মালদহ জেলা হইতে যে শাঁখবোল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও বাঘের উল্লেখ আছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

পালারে ছাইলা পিলা হুম্মা এসাছে।
হুম্মার মাথায় লাল টুপি দাদা দেখাছে॥
দাদার হাতে তীর কামটা মাইরা ফেলেছে!
দুইটা চিতহল মাছ ভাইসা উঠেছে॥ ইত্যাদি।

হুম্মা অর্থে যখন বাঘ বুঝায়, তখন বাঘ পূজা যে এই শাঁখবোলের অন্তর্ভুক্ত তাহা ধারণা করিতে বাধা নাই। হুম্মাকে দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা পলাইয়া যাইতেছে। উত্তর-বঙ্গের সোনা রায়ের যে তিনটি ছড়ার আমি উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত উপরি-উক্ত ছড়াটির অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে। এস্থলে তাহার কিছু পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি—

গরু চরায় রাখালগণ
তাহার নাগ্য পায়।
বাঘ দেখিয়া রাখালগণ
পলাইয়া যায়॥
আইস আইস বলি সবে
সোনা রায় ডাকায়॥

মালদহ জেলার "শাঁখবোলে"ও "সোনা রায়ের পূজা" দিবার কথা আছে। এই সোনা রায়ই যে ব্যাঘ্র-দেবতাবিশেষ তাহা ধারণা করা চলে। যাহা হউক, পূর্ব্বে এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যখন দেশের মধ্যে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল—লোকাবাসগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য সে সব জঙ্গলে বাঘের প্রাদুর্ভাব একটু বেশী হইয়াছিল। এখন আর সে ভয় নাই, তবে ছড়াগুলি অনেকটা অবিকৃতভাবে এখনও আছে। এস্থলে আমরা ঐতিহাসিক আলোচনা করিব না। কারণ ভাসা ভাসা রূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা যায় না। তাহাতে অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন, আমাদের দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে তাহার বড় অভাব।

গান

শ্রীউমানন্দ ভাদুড়া

গাহি আমি সেথাকার গান—
অত্যাচারে, অবিচারে, মানবাত্মা যেথা নিত্য লভে অপমান
যেথায় গিয়াছে থামি সীমাহারা জীবনের বিচিত্র উচ্ছ্বাস,
মেঘাবগুণ্ঠন ম্লান যেথাকার আলোহীন সায়াহ্ন আকাশ!
ক্ষুদ্র দয়া দাক্ষিণ্যেরে বরি,
কঙ্কালের ইতিহাস গাহে যেথা যুগে যুগে কালের প্রহরী।
যেথাকার অধিবাসী জীবনের রণে নিত্য লভে পরাজয়
উপেক্ষিত, অভিশপ্ত, এই শুধু যাহাদের সত্য পরিচয়
তারা মোর আপনার জন,
আমার জীবন ধারা তাদের জীবন-স্রোতে লভেছে মিলন!

সেথাকার নহি কেহ আমি—
জীবনের আশীর্ব্বাদ যেথা নিত্য নিরন্তর আসিতেছে নামি
বক্ষে যেথা অন্তহীন উদ্দীপনা, সৌভাগ্যের আশাদীপ্ত সাধ
আনন্দ অপরিমিত ক্লান্তিহীন প্রাচুর্য্যের জয়-আশীর্ব্বাদ!
তারা মোর নহে পরিচিত—
আপনি সার্থক যারা প্রাণ-রসে, হাস্য মুখ বল-দৃপ্ত চিত!
যারা সবে ভেসে চলি নিশিদিন বন্ধহারা আনন্দের স্রোতে
নৃত্য, গীত, রস-ঘন স্বপনের অবারিত উৎসব আলোতে।
পুষ্প যেথা রহিয়াছে ফুটি—
সহজ তৃপ্তির রসে গন্ধাবেগে আপনাতে পূর্ণ হ'য়ে উঠি!

যাহাদের আয়ু ক্ষুদ্র ক্ষীণ—
সৌন্দর্য্যের সভাতলে পরিত্যক্ত যারা সবে,—প্রয়োজন হীন,
গোপন মর্ম্মের মাঝে দণ্ডে দণ্ডে সংশয়িত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব গ্লানি
চির অভিশপ্ত করি—পঙ্গু করি যাহাদের রাখে চিত্তখানি
মোর পথে তারা সবে চলে—
অক্ষমের অভিমান নতশিরে নীরবে ঢাকিয়া অশ্রুজলে
নম্র শির, ক্লান্ত পদ চোখে চোখে ঘনায়িত ব্যর্থতার ছায়া
বিগত-যৌবন-ম্লান-মূককণ্ঠ, ব্যথা-জীর্ণ ক্ষতাঙ্কিত কায়া!

তাহাদের তরে গাহি গান—
ধূলি সম বক্ষ পাতি যারা সহে যুগে যুগে আত্ম অপমান।

দৃষ্টি বিভ্রম

(গল্প)

শ্রীসরলচন্দ্র গুহ এম-এ

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, বধূ সুন্দরী কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য করিয়া বধূ এই ঘরে আসিল শুভদৃষ্টির পরমুহূর্ত্তে হইতেই সে যে বধূর দিক হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল সে' দৃষ্টি কেহ আর তাহার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। অবশ্য সে জন্য কোন অনুষ্ঠানই বাদ পড়িল না। মন্ত্রপড়া হইতে বর বিদায় পর্যান্ত সবই হইল। তবে বাসর ঘরে বর এমনভাবেই ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল যে, শালী শালাজদের সম্মোহন দৃষ্টি তাহার আঁখিপল্লবের উপর দিয়াই চলিয়া গেল, তাহার নয়ন-বিদ্ধ করিতে পারিল না। বৃদ্ধা ঠাকুরমা, যাঁহার হাত দিয়া কত নাতি-নাতনী পার হইয়া গেল তিনিও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সারা বাড়ীতে যেন কি রকম একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। ঐ অবস্থায়ই পরের দিন বর বধূসহ নিজেদের বাড়ী চলিল। একই পাল্কীতে তাহাদের সারাপথ অতিক্রম করিতে হইল। বাড়ীতে বধূবরণও খুব ধুমধামের সহিতই সম্পন্ন হইল। কিন্তু এত কাণ্ডের মধ্যেও নবারুণ একবারও নববধূর দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

বিবাহ গ্রামের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইল। তাই বলিয়া গ্রামে তো আর বসিয়া থাকা চলে না। নেহাৎ বড় ছেলের বিবাহ তাই পরমেশ বাবু নানাপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়াও দেশে আসিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া গেলেন। বিবাহের হাঙ্গামা চুকিবার পর সপরিবারে তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হইতে হইল। নবারুণও সেখানে রেলওয়েতে চাকুরী করে। কাজেই নববধূও চলিল। গ্রামের লোকের এই বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রায় পক্ষাধিককাল মন্দ কাটে নাই। গ্রামের আনন্দও যেন তাহাদের সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। ধীপুর গ্রামও আবার পাশের অজপাড়াগাঁয়ের মত পচা পল্লীতেই পরিণত হইল।

নবারুণের যে কি হইয়াছে তাহা কেহই বুঝিল না। তবে কিছু যে একটা হইয়াছে আর তাহা যে বধূ লইয়াই তাহা মা বাবা হইতে আরম্ভ করিয়া মায় চাকর বাকর এমন কি সাত বছরের মেয়ে, নবারুণেরই ছোট বোন গীতা পর্য্যন্ত বুঝিল। কিন্তু কেহই ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না। বিবাহ করিতে যাওয়ার জন্য যাহার এত গরজ শুভ-দৃষ্টির পরমুহূর্ত্তে হইতেই সে যে আর বধূর দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না তাহা কি কেহ কল্পনাও করিতে পারে? অনীতা তো কুৎসিত নয়। সুন্দরী। বেশ সুন্দরী। বড় শহরেও অনীতার মত মেয়ে খুব বেশী চোখে পড়ে না। লেকের ধারেও তাহারা দল বাঁধিয়া বেড়ায় না। নেহাৎ কপাল জোরেই তাহাদের মত মেয়ে দু'একটি মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া অনীতা শিক্ষিতা। নিশ্চয়ই শিক্ষিতা। ডিগ্রী না থাকিলে যে তাহাকে শিক্ষিতা বলা যাইবে না তা'রও তো কোন কারণ নাই। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করা মেয়েই বা বাঙ্গলাদেশে শতকরা ক'জন? গানও জানে, ক্লাসিকেল হয়ত গায় না বা গাইতে পারে না। আধুনিক গান গায়। তাহাতে রাগ-রাগিণীর হয়ত বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কিন্তু তা' ওতো কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা নাম করা কোম্পানীই রেকর্ড করিয়াছে। আর দুই একটি নয়। প্রায় দশ বারোটি। এ'রকম মেয়েকে যে কি করিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার অপছন্দ হইল তা' কে বলিবে? নিজেতো কিছুই বলিবে না। আর যদিই বা বুঝিতাম যে, অনীতার তুলনায় নবারুণ একটা ভয়ানক কিছু তা' ও না হয় কতকটা বুঝা যাইত। গুণের মধ্যে তো এম-এ পাশ। তা'ও বাঙ্লায়। গান জানে না। চেহারা মাঝারি রকমের। আর চাকুরী করে রেলওয়েতে, একটা মাঝারি গোছের। তবে বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়। চাটগাঁতে বাবা বেশ নাম করা উকিল। এককালে খুব বেশী-ই রোজগার করিতেন। আজকাল আর সে রকম পয়সা পান না। তবে কেন, কেন সে অনীতার সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করিবে? অনীতাও এসব কথা ভাবিয়া দেখিয়াছে। নবারুণের মা'তো ওকে নিজে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিতে বলিয়াছিল। তখন বাবা মার পছন্দের উপর নির্ভর না করিলেই চলিত। তা'ছাড়া মনের অসন্তোষ কিছুক্ষণের জন্য চাপিয়াই না হয় যাইত। বিবাহের আসরে এরকম একটা কদর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি না করিলে তাহার কি ক্ষতি হইত? তাহার প্রতি বিষ-নজরের প্রায়শ্চিত্ত না হয় অনীতা নিজেই জীবনভর করিয়া যাইত। একজন শিক্ষিত যুবক যে কি করিয়া এ'রকম একটা কাণ্ড করিতে পারিল অনীতা তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

নবারুণ রীতিমত অফিসে যায়। কাজ করে। কাজ করে আর ভাবে। ভাবে অনীতার কথা, অনিমেষের কথা। অনিমেষ ও সে উভয়েই কলিকাতায় থাকিয়া তখন বি-এ পড়িত। একদিন গেলোবে তাহাদের দেখা। অনিমেষের সঙ্গে অনীতা। অনিমেষ উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিল। অনীতাকে তাহার ভাবীপত্নী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে তাহার এতটুকু বাধিল না। অনীতাও মৃদু আপত্তি করিতে গিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়াই উঠিয়াছিল। সেই অনীতা। সেই অনিমেষের বাগ্‌দত্তা অনীতা সে কি-না আজ তাহারই স্ত্রী! বি-এ পরীক্ষার পর আর কোন খোঁজই সে পায় নাই। আজ যদি জানিত যে, অনিমেষ কোথায় আছে তাহা হইলে সে একবার তাহাকে দেখিয়া লইত। নবারুণ অনীতার উপর আরও চটিয়া যায়। কেন, কেন সে তাহাকে না চিনিবার ভাণ করিতেছে? নবারুণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত্তেই চিনিয়া ফেলিল। অনীতার এই ভণ্ডামি তাহার সহ্য হয় না। সে আর ভাবিতেও পারে না। অফিসের একটা নূতন ফাইলে মনোনিবেশ করিতে বৃথা চেষ্টা করে।

নবারুণকে কয়েকদিনের জন্য অফিসের কাজে মফঃস্বলে যাইতে হইয়াছিল। এই মাত্র ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, তাহাদের বাহিরের ঘরে সুটকেস, বিছানা, ট্রাঙ্ক প্রভৃতির স্তূপ পড়িয়া আছে। ছোট ভাই বলিল যে, বৌদির বড় বোন ও

ভগ্নীপতি আসিয়াছেন। তাঁহারা রেঙ্গুণ যাইবেন। বিবাহের পর নবারুণকে কিছুতেই শ্বশুর বাড়ী পাঠান যায় নাই। তাহার নিকট চিঠি লিখিয়াও শ্বশুর বাড়ীর কেহ কোনদিন উত্তরও পায় নাই। কাজেই সে সম্পর্কীয় কেহ আসায় সে মনে মনে বিরক্তই হইল। নিজের ঘরে ঢুকিয়াই দেখে যে, অনিমেষ নির্বিকার চিত্তে তাহার খাটে শুইয়া একটি দৈনিক পড়িতেছে। নবারুণের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। "শেষে চাটগাঁ অবধি ধাওয়া করতে এসেছ? অনীতাকে বিয়ে করতে পারলে না কাপুরুষ?" রাগত স্বরেই সে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

প্রথমটায় অনিমেষ যেন কি রকম হতভম্ব হইয়া গেল, পরমূহুর্ত্তেই হাসিয়া উত্তর দিল, "ক'জনকে বিয়ে করব বল? তবে আগের কালে বড় বোনকে বিয়ে করলে ছোট বোনকে যৌতুকস্বরূপে অনেক সময় পাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল তো সে আইন একেবারে অচল। কি বল অমিতা?"

"অমিতা!" নবারুণ ফিরিয়া দেখিল যে, তাহারই পিছনে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নবারুণ দেখিয়াই চিনিল। এই মেয়েটির সঙ্গেই তো গ্লোবে অনিমেষ তাহাকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। আর তাহার নাম অমিতা-ই তো বলিয়াছিল। নবারুণের বুঝিতে মোটেই বিলম্ব হইল না যে, ইনিই তাহার বড় শালী। সে শ্বশুর বাড়ী সম্পর্কীয় একজনকেও ভক্তিভরে এই প্রথম প্রণাম করিল। অমিতা বলিল, "হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে তো আমার অনেক দিন আগেরই পরিচয় আছে। তোমাদের যখন বিয়ে, তখন আমরা বিলেতে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী বিশ্বাস করে ওঁকে একলা সেখানে পাঠাতে রাজী হলেন না। কাজেই আমাকেও সঙ্গে যেতে হ'ল। তাইতে আর বিয়ের সময় তোমাদের আশীর্ব্বাদ করতে পারলাম না।"

আনন্দের আতিশয্যে নবারুণ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। তাড়াতাড়ি অনীতার ঘরে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে তাহাকে একেবারে নিবিড়ভাবে টানিয়া লইল আপন বক্ষে। অনীতা তো অবাক্। নবারুণ বলিল, "চল অনীতা, বাবা-মাকে প্রণাম করে' আসি। তাঁদের কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাবনার অন্ত নাই। আমাকে ক্ষমা কর লক্ষ্মীটি। কি ভুলই করেছিলাম। আর দু'জনের চেহারার এ'রকম মিল থাকলে আমার-ই বা কি দোষ বল!" অনীতা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নবারুণ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আর সেই দিনই অফিসে গিয়া দশদিনের ছুটি চাহিয়া এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া আসিল। শ্বশুর বাড়ী যাইবে। দরখাস্তে অন্য কোন কারণেরই উল্লেখ থাকিবে হয়ত!

লিটভিনভ

(১৬৪ পৃষ্ঠার পর)

করিয়া তুলিতে তিনি লিপ্ত ছিলেন, তাহা তাসের ঘরের মতই খসিয়া পড়িল, যখন জার্ম্মানী ও পরে ইটালী লিটভিনভের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল।

লিটভিনভ নিজ কার্য্যপরিচালন-নীতিই ব্যাখ্যা করিলেন যখন তিনি তাঁহার অধুনা বিখ্যাত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"শান্তি অবিভাজ্য।"

ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশই অপর সকল দেশের সম্বন্ধে নিরাপত্তার 'গ্যারাণ্টি' দিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা কার্য্যকরী হয় নাই।

রুশ-রাষ্ট্রে তাঁহার প্রভাব সেই অনুপাতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে, যে অনুপাতে ক্রমশ নাজি জার্ম্মানী শক্তি সঞ্চয় ও বৃদ্ধি করিতে থাকে। সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহার কোন কালেই তেমন কোন কর্তৃত্ব বর্ত্তে নাই।

যখন ক্রেমলিনকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিতে চাহে, আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতির অভিজ্ঞ প্রবীণ বিশেষজ্ঞের মত তিনি দূরে সরিয়া দাঁড়ান।

যখন বৈদেশিক রাজদূতগণ নিজ নিজ দেশীয়গণের গ্রেপ্তারের অভিযোগ করিতে লাগিল তাঁহার কাছে, তিনি মৃদু হাসিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষার সুরে শুধু বলিলেন—এ সব গ্রেপ্তারের খবরও ত আমি রাখি না। এই প্রকারেই তিনি ও জি পি ইউ (Ogpu)-য়ের সংস্রব হইতে নিরাপদ থাকেন।

একমাত্র এই কারণেই তিনি বোলশেভিক ওল্ড গার্ড দলের জীবিত মেম্বর—অবশিষ্ট মেম্বরগণের প্রায় সকলেই মৃত, স্বাভাবিক হেতুতে হউক আর অস্বাভাবিক অবস্থায়ই হোক। বোলশেভিক ওল্ড গার্ডের আর কেহ জীবিত আছে কিনা সন্দেহ—থাকিলেও অতি সামান্যই।

তিনি বিলাসের উচ্চ শিরে কোন দিনই আরোহণ করেন নাই—বরাবরই সম্ভবরকম বিলাসিতার পক্ষপাতী; একটিমাত্র ব্যাপারে তাঁহার ব্যয় বাহুল্য, তাহা হইল আহার। পর্য্যটনকালে তিনি সর্ব্বোত্তম রেস্তোরাঁয় আহার-বিহার করিতেন।

অন্তত একটি জিনিষ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার দেশবাসীদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তিনি দেউলিয় বোলশেভিক রাশিয়াকে পুনরায় মর্য্যাদার সহিত আন্তর্জ্জাতিক মানচিত্রে স্থাপন করেন। তিনি সোভিয়েটের পক্ষ হইতে এক অতি 'সম্মানিত' পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিয়াছেন।

ম্যাক্সিম লিটভিনভ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সেই কার্য্য এত উত্তম রূপে সম্পন্ন হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

বাঙলায় অন্নকষ্ট ও চাষীমজুর

স্বামী যোগীশ্বরানন্দ

দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও জলপ্লাবন বহুদিন যাবৎ বাঙলাদেশকে পেয়ে বসেছে—এ যেন গা সওয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত সব দুঃখ-কষ্ট সয়ে সয়ে বাঙলার প্রাণশক্তি ক্ষীণ দুর্বল এবং একেবারে নীরব, নিস্পন্দ, অচেতন পদার্থের মত হয়েছে। নিত্য নিত্য অভাব অভিযোগে মানুষগুলো ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আর তাদের এসব আকস্মিক বিপদ-ব্যথায় নূতন করে দুঃখ অনুভব হয় না।

এবার আবার এল বন্যা—সর্বত্রই শুনেছি বন্যা। বাঙলার কয়টি জেলা ভাসিয়ে দিল বন্যার জলে, মানুষের মুখে, খবরের কাগজে ঐ একই কথা—বন্যার ভীষণ প্লাবন। সত্যিই এবার বানের জল বাঙলার বুকে কিছুদিন ঢেউ খেয়ে বেড়ালো। দিনের পর দিন গভীর ঘোলা জল, খাল, বিল, নদী-নালা উপচে গিয়ে জমি-জমা, শহর, পল্লী সব ভাসিয়ে দিল। বাড়ী-ঘর সব জলমগ্ন হল। মানুষের বাস হল মাচার উপর এবং চলার পথ হল সর্বত্রই নৌকায়। উঠানের মাঝে নৌকা বাঁধা, ছোট ছোট শহরের বুকের উপর পথে পথে চললো নৌকার অবাধ গতি। তার সাথে বাঙলার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে উঠলো—অভাবের হাহাকার ধ্বনি।

এবার বৈশাখে অসময়ে বর্ষার দরুন প্রথমেই চাষে পড়লো বাধা। বীজ ধান বুনতে দেরী হয়ে গেল। তারপর যখন এসব বাধাবিঘ্ন পার হয়ে আউশ ধানগুলো পেকে উঠলো এবং আমন ধানের সবুজ শাখায় মাঠ ছেয়ে গেল—অমনি এল বান—সে কি জল!

ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে অথৈ কালো জল—ছেয়ে গেল ধানের মাঠে, চাষী মজুরদের একমাত্র জীবনের আশা ভরসা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পাকা আউশ ধান যা এখনই পাওয়া যেত—এবং সুন্দর সবুজ শোভায় মাঠভরা ঐ আমন ধানগুলো ভবিষ্যতে বছরের আহার্যের পরও যথেষ্ট আয়ের ব্যবস্থা ছিল—সবই ঐ বানের জলে অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে গেল—এ যেন চাষীর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া অথবা পাকা ধানে মই। তার সব পরিশ্রম ব্যর্থতায় পরিণত হল, চাষী মজুরের যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সবই বানের জলে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের একেবারে নিঃস্ব কাঙাল করে দিল। মাঠের বুকে ১০।১২ হাত গভীর জল স্ফীত বক্ষে ঢেউ খেলে ছুটে চললো।

চাষীর প্রাণ শুকিয়ে গেল। তার ভাবনা হল কেমন করে সে বাঁচবে। কোথায় দুমুঠো অন্নের সংস্থান করবে, কি করে তার পূর্ব ঋণ শোধ হবে। চারদিকে সবার কাছ হতেই সে বিফল, নিরাশ হয়ে ফিরে এল। কোথাও পেল না—কার কাছে একটু সাহায্য, সহানুভূতি বা ধার। সব দুয়ার আজ তার জন্য বন্ধ। নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে তাকে ছেয়ে ফেললো, ভাবনায় দুচোখে ধারা বইল। ধীরে ধীরে দিন দিনই তার অভাব অভিযোগ বেড়ে চলল। নিরাশ হতাশার বিষাদ সাগরে চাষী-মজুর হাবুডুবু খেতে লাগলো। চারদিক জুড়ে উঠলো অভাবের রোল। বাড়ীতে জল, ঘরে জল, মাঠে জল—ঘরের মেঝেতে মাচায় বসে আজ সর্বহারা নিঃস্ব চাষী মজুর অনাহারক্লিষ্ট বেদনায় কাতর করুণ দৃষ্টিতে ঐ নৈরাশ্যের অগাধ অসীম গভীর কালো জলের পানে তাকিয়ে প্রাণের দারুণ ব্যথার অশ্রু বিসর্জন করছে। সে কি করুণ দৃশ্য! এই সর্বস্বান্ত গ্রামবাসী দুর্গতদের ঘরে একমুঠো অন্ন বা একটি পয়সা নাই। অর্থ-সামর্থ্য সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘরে সন্ধান করলে কয়টি মাটির হাঁড়ি, লোটা, থালা, বাটী, বোতল, কারও ঘরে বা ২।১টা কাঠের বাক্স, দু'একখানা হোগলা চাটাই ব্যতীত গৃহসজ্জা আর কিছুই নাই।

তারপর চাষীর অতি আদরের এবং জীবনের প্রধান সম্বল চাষের গরুগুলো—দিনের পর দিন জলে দাঁড়িয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করছে, চোখের সামনে এমনিভাবে জীবনের সম্বল নিজ জানোয়ারগুলোকে মরতে দেখে মরম বেদনায় চাষীর বুক ফেটে যাচ্ছে। সত্যিই এ দৃশ্য বড়ই বেদনাদায়ক।

এতেই কি দুর্দশার শেষ হল!—না—তারপর পিতামাতাকে অন্নাভাবে শাক, পাতা, শালুক, তাল ইত্যাদি সিদ্ধ করে অপত্য-স্নেহে সন্তানদের কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে হল। একেবারে চরম অবস্থায় এসে দাঁড়াল।

আজ বাঙলার চাষী মজুর এমন নিঃস্ব দুর্দশাপন্ন হয়েছে—যা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। এদের এই নিদারুণ অবস্থা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে—এই সোনার বাঙলার মানুষগুলোকে আজ এমন সর্বহারা কাঙাল কে করে দিল! সত্যিই কি সাময়িক বন্যাই তাদের এমন অবস্থা বিপর্যয় করে দিয়েছে, একটি আউশখন্দ নষ্ট হয়েই কি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হা-অন্ন, হা-অন্ন, রব উঠছে? না—তাত নয়! অনুসন্ধানে দেখা গেছে—এসব চাষী-মজুর অনেক বছর পূর্বে হতেই দিনের পর দিন ক্রমে অভাব-অভিযোগের তাড়নায় প্রতি বৎসরই ধার দেনায় এমনি নিঃস্ব হয়ে আসছিল। এবার এই বন্যা উপলক্ষে তাদের সম্পূর্ণ কাঙাল নগ্নরূপটি সবার সামনে বিকাশ হয়ে পড়েছে। তাও আবার একটি বিশেষ কারণেই এমনি হয়েছে—পরে তা বলছি।

এখানে আমি পাঠক সমক্ষে বাঙলার একটি বন্যাবিধ্বস্ত মহকুমার প্রত্যক্ষ চিত্র ব্যক্ত করবো। যেখানে এই বিপদের দিনে চাষী-মজুরদের অবস্থা নিজ চোখে দেখবার ও বোঝবার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। এই মহকুমার ৫১টি ইউনিয়নে প্রায় ৬ লক্ষের মত লোকের বাস। তার ভিতর তিন ভাগের উপর লোকই বন্যাবিধ্বস্ত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য মনে হয় যে, এই সাময়িক বন্যায়ই গোটা মহকুমাটা জুড়ে অন্নাভাবে প্রতি গৃহে লক্ষ লক্ষ লোকের কিরূপ হাহাকার রব উঠেছে। ব্যাপার কি! অবাক হয়ে বসে ভাবতে হয়। সব দেশশুদ্ধ লোক কি এক সঙ্গেই এমনি গরীব হয়ে পড়লো? এর সন্ধান নিয়ে যতটা জানতে বা বুঝতে পেরেছি তা-ই এখানে আলোচনা করবো।

কিছুদিন হতেই চাষী প্রতিবৎসর চাষ করে উৎপন্ন ফসল যা পায়, তাতে তার কৃষাণ-মজুর, হাল গরুর খরচ খরচা বাদ

বিশেষ কিছু বড় লাভ থাকে না। তবে তার বিপদে-আপদে যে পূর্বের দেনা আছে তার আসল বা সুদ কতক অংশশোধ দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে—পাওনাদারও কিছু পেয়ে খুশী হয়। আবার অসময়ে হাত পাতলেই মহাজন তাকে সাহায্য করে। মজুরেরাও এদের সাথে কাজ করে কৃষাণ দিয়ে এক সঙ্গেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে চাষীর হাতে আর পয়সা জমতে পারে নাই, কোন-বার হয়ত অজন্মা হল—আবার কখন চাষীর ভাল ফসল বাজারে উঠলো—তখন তার দাম নিতান্ত কম। বাধ্য হয়ে অভাবের দরুন ঐ কম মূল্যেই তাদ ফসল বিক্রী করতে হল। তারপর হিসাব করে দেখা গেল, খরচ-খরচা বাদ কিছুই আর লাভ রইল না। কিন্তু এ অবস্থায় মনে হয় চাষী-দরদী সরকার যদি চাষীর উৎপন্ন ফসলের মূল্য নির্দ্ধারণ করে দিতেন, অথবা সরকার হতে জিনিষগুলো উপযুক্ত মূল্যে কিনে রেখে পরে বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করতেন—তা হলে চাষীকে আর এমনি দূরবস্থায় পড়তে হত না। চাষীর তৈরী ফসল সস্তা দামে কিনে বিদেশী মহাজন ধনী হল—চাষী যেই তিমিরে সেই তিমিরে—সে গরীব হয়ে পথে দাঁড়াল। কেউ বা জমি, বাড়ী বিক্রী-বাঁধাও দিল—দেনার বোঝা ক্রমে বেড়েই চললো। চাষী গরীব হবার সাথে মজুরেও সেই অবস্থা বিপর্যয়ে পড়লো। কিন্তু এ অবস্থায়ও চাষী মহাজনের কাছে চাইলেই ধার পেত। তাতেই সে সংসার চালিয়ে চলতো। মহাজনের দ্বার তার বিপদে সর্বদাই উন্মুখ ছিল।

কিন্তু তাদের প্রকৃত বিপদ এল তখন—যখন সরকারের কৃপায় চাষীদের কল্যাণে প্রত্যেক ইউনিয়নে "ঋণ-সালিশী বোর্ড" স্থাপিত হল। চাষী যেন মনে মনে আনন্দের নিঃশ্বাস ছাড়লো। উচ্চহারে অনেক দিনের দেনার দায় হতে অতি সহজেই "ঋণ-সালিশী বোর্ডের" কৃপায় ঋণমুক্ত হতে লাগলো। একখানা আবেদন করলেই বিচারে অনেক টাকা বাদ দিয়ে আসল টাকাও দীর্ঘ দিনের কড়ারে শোধ দেবার ব্যবস্থা হল—বন্ধকী জমি ছাড় পেল—অনেক টাকা মাফ হল। ইত্যাদি অনেক কিছু সুবিধা পেল। কিন্তু কোন চাষীই এর ভবিষ্যৎ বিপদ কিছুই ভাবলো না। মহাজনগণ এই ব্যাপারে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এতদিনের বিশ্বাসী দেনা-পাওনার কারবার বন্ধ করে একেবারে হাত গুটিয়ে নিল। তারা আর নূতন ঋণ দেওয়া একেবারে বন্ধ করলো। "ঋণ-সালিশী বোর্ড" চাষীদের খুবই মঙ্গলের পথে এগিয়ে দিল। কিন্তু তার বিপরীত ফল কিছুদিনের মধ্যেই বিধাতার অভিশাপের মত হাতে হাতে দেখা দিল।

এবারকার বন্যা উপলক্ষে চাষী তার মহাবিপদের অবস্থাটি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করলো—যা কখনও সে পূর্ব্বে ভাবতেই পারে নাই। আজ দরিদ্র চাষীর চাষের পাকা আউশ ধানটি বন্যায় নষ্ট হওয়ার সাথেই সে একেবারে অনাহারে মরতে বসেছে। তার ঘরেও কিছু নাই—বাইরেও এতদিন বিপদে-আপদে যে মহাজন ছিল তার জীবনের একমাত্র রক্ষক বা সহায় সেও "ঋণ-সালিশী বোর্ডের" ভয়ে ধার দেওয়া বন্ধ করেছে। তাই আজ চাষীর এ মহাবিপদ। সে যায় কোথায় কার কাছে? সবার নিকটেই সে সহানুভূতি বা বিশ্বাস হারিয়েছে। যার ১০।২০ বিঘা জমি আছে—সেও একটি পয়সা ধার পায় না। কেউ আর তাদের ঋণ দেয় না—বিশ্বাসও করে না। বিভীষিকা ঐ "ঋণ-সালিশী বোর্ড"।

এর সাথেই মজুরদের দুরবস্থা আরও বেশী হল। বন্যার দরুন তাদের কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। তারা ত খেটেই খায়—আজ সব বেকার হয়ে বসলো। এই বন্যার প্রকোপে নিরুপায় চাষী-মজুর একই অবস্থায়, একই রকম অভাবে পড়ে হাহাকার করছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই—নাই কিছুই নাই। নিঃস্ব একেবারে কাঙাল।

এসব দেখে মনে হয়, সত্যিই সোনার বাঙলার চাষীর এমন দুরবস্থা কে করে দিল। কোথায় হে আজ চাষীদরদী বন্ধুগণ! চাষী-মজুরকে আজ মৃত্যুর করাল হাত হতে কে রক্ষা করবে? কেউ কি নাই? সালিশী বোর্ডের" কৃপায় চাষী যে আজ ঋণের অভাবে অনাহারে মরতে বসেছে—বলি, এর কি কোন প্রতিকার নাই? আজ তাকে বাঁচায় কে?

বন্যাবিধ্বস্ত একটি সমগ্র মহকুমায় সরকারী কৃষি-ঋণ এল লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য অতি সামান্য টাকা, গরীব কাঙালকে দানের জন্য যা এল তা না বলাই ভাল—তাতে সরকারের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, অভাবী ক্ষুধিতের মুখে ২, হইতে ৫, টাকা করে সামান্য কতক লোককে ঋণ দেওয়া হ'ল তা আবার জমি যাদের আছে—তাদেরই। গরীব পেল দু'পয়সা, দু'আনা। সরকার নিশ্চিন্ত—রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় এসে দেখে শুনে বললেন—'এত অভাবের তুলনায় সরকারের হাতে অর্থ নাই। এ অবস্থায় চাই সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য। বেশ সুন্দর কথা! সবাই শুনলো—কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা এতে মিটলো না। আজ শুধু মনে হয় এদেশের চাষী-মজুরদের জীবন-মৃত্যু যেন একই কথা। এদের বাঁচবার কি কোনই পথ নাই? —ভেবে দেখ আজ দেশের দরদী প্রাণ! চিন্তা কর চাষী-বন্ধু! কিসে উপায় হয়—কেমন করে এরা জীবনে বাঁচে! সামনে চেয়ে দেখ ঐ দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া।

সঙ্গীত ও যোগ

শ্রীসুধাময় গোস্বামী গীতসাগর
সভাগায়ক, মণিপুর ষ্টেট

বিশ্বের সকল সৃষ্টির সম্বন্ধে মনস্বীরা যাহাই বলুন না কেন, একটু প্রণিধান করিলে মনে হইবে সমাজ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে আনন্দের উপভোগস্পৃহা। একাকী আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়াই মানবের বহুকে চাওয়া তাহার স্বাভাবিক প্রেরণা। একের এই বহুকে চাওয়া, বহুর এই এককে চাওয়া একটা নৈসর্গিক আনন্দেরই বিকাশ।

সৃষ্টির সকল অবদানের ভিতরে সংগীত একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বা মার্গ সংগীত মানবের ভিতর সকল সময়েই আনন্দের বিকাশ দেয়। তাহার গতি হইতেছে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে। মানবের জীবন প্রায় এলোমেলোভাবে পূর্ণ নানাবিধ বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশে। জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানবের এইরূপ দুর্দ্দশা লইয়া চিরকাল চলিতে পারে না। এই বেদনা বা দুর্দ্দশার উৎপত্তি প্রায়শই হইয়া থাকে, সংগতি ও সামঞ্জস্যের অভাবে। এই সংগতি ও সামঞ্জস্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে এবং সমষ্টিগত জীবনকে দিয়া থাকে সুন্দর পরিস্থিতি। সংগীতের মুখ্য কর্ম্ম হইতেছে জীবনের ভিতর এই সংগতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। ইহার ভিতরে এমনই একটি শক্তি আছে যাহা আমাদের চিত্তকে এক দিব্যচ্ছন্দে লীলায়িত করে। কেবলমাত্র তাহাই নয় সংগীতের সুর-তরংগ আমাদের চিত্ত-বৃত্তিকে সূক্ষ্মানুভূতি শক্তিসম্পন্ন করে, ব্যাপক করে, আমাদের চেতনাকে ক্রমে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানবজীবনকে সকল সুষমায় মণ্ডিত করে। সংগীতের ভিতর এমনই রনুরনি আছে যাহা ক্রমশ আমাদের চিত্তকে তাহার সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত করে বিশ্বছন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া পরিচালিত করে।

সংগীতের ইহাই হইল শ্রেষ্ঠ অবদান। দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইলে সংগীতে যতখানি সাহায্য করিতে পারে, এমন আর কিছুতে দিতে পারে না। আমাদের চিত্তের উপর সুরশক্তির অদ্ভুত প্রভাব আছে। হিন্দু ধর্ম্ম মতে সুর ব্রহ্মেরই শব্দময় বিকাশ। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, মানবের প্রাথমিক দিব্যভাবের উন্মেষ হইয়াছে সংগীতে। মানবের হৃদয়ে গভীরভাবে বিকাশ পাইয়া থাকে সংগীতের রূপ। কথা যে স্থানে পৌঁছায় না, বাক্য যেখানে পরাহত, সুরই একমাত্র সেখানকার গতি। মানবের ঈশ্বর-বিজ্ঞান প্রথম সংগীতেই প্রকাশিত হয়। বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য-সুষমাও মানবকে যে আকৃষ্ট করিয়াছে ঈশ্বরীয় সত্তার দিকে, তখনই মানবের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছে সুরে ও সংগীতে। এই উর্দ্ধগামী সংগীত আমাদের বিশ্ব-চেতনার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কেবলমাত্র একটা সাময়িক আনন্দ দান করে না, ইহা দেয় বিরাটের জ্ঞান। সংগীতের সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ সার্থকতা এইখানে। সংগীতের এ সার্থকতা অল্প সংখ্যক মানব-জীবনেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন সংগীতের আরও সার্থকতা রহিয়াছে; আমাদের জীবনে ভাবের নানা বৈচিত্র্য-সৃজনের মধ্যে। সুর চিত্তে আঘাত সৃষ্টি করিয়া ভাবের বৈপুল্য সৃষ্টি করে। সুরমূর্চ্ছনা হয় ভাব-মূর্চ্ছনার কারণ। একটি ভাবের ভিতর সংগীত কত তরংগ জাগাইয়া দেয় এবং আমাদের জীবনকে আনন্দময় করে। সংগীত শুধু এক রসই জাগায় না, বহুবিধ রসেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। সংগীত বিশেষ বিজ্ঞানালোকে, সংগীত বিশেষ প্রাণালোকে নানা উদ্দীপনা জাগায়। প্রাণশক্তি, ভাবশক্তি এবং বিজ্ঞানশক্তিকে উদ্বোধিত করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। শব্দ ও সুরের বিকাশ হয় বিরাট চেতনা হইতে। মোট কথা সুর অনুভূতির প্রাখর্য্য সৃষ্টি করে—বেদনাস্তরে, বোধস্তরে এবং আনন্দস্তরে। এইজন্য সংগীতের যেমন একদিকে উপকারিতা আছে, তেমনই অন্যদিকে অপকারিতাও আছে। সংগীত বিশেষ আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিকে প্রখর করে, কখনও কখনও স্থূলে আনন্দ ভোগের দিকে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ সম্ভাবনা সেই-স্থানেই হয় যেস্থানে সুর আমাদের অন্তঃকরণের উচ্চগ্রামগুলিকে স্পন্দিত না করিয়া নিম্নগ্রামগুলিকেই স্পর্শ করে। যেস্থানে সংগীত প্রাণের মূর্চ্ছনাকে সংহত না করিয়া উৎক্ষিপ্ত করে, সেইস্থানেই এইরূপে সম্ভাবনা আসে। এইজন্যই মনে হয় উন্মাদনাকারী সংগীত অপেক্ষা শান্ত ও সুসংযত সংগীতের স্থান উচ্চে। এইজন্যই ভাবসংগীত অপেক্ষা জ্ঞানোন্মেষক শক্তিশালী সংগীতের কার্য্যকারিতা অধিক।

উপরোক্ত জ্ঞানোন্মেষক-শক্তিশালী সংগীতের সার্থকতা মানব কিরূপে তাহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এবং উক্ত জ্ঞানোন্মেষক বিশুদ্ধ মার্গ সংগীত-সাধনার সহিত যোগ-সাধনার কিরূপ অনুরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

এক্ষণে বিশুদ্ধ মার্গসংগীত বলিতে বুঝিব ইহাই, যে সংগীত সাধনার দ্বারা দিব্যভাবের উন্মেষ হয়। মার্গ-সংগীত সম্বন্ধে এই সকল প্রমাণের উল্লেখ আছে। যথাঃ—

১। "মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্।
স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জকম্"
—'সংগীত দর্পণে'।

২। "যদুক্তং দ্রুহিণেনৈব স মার্গ ইতি প্রোচ্যতে।"
—'নারদসংহিতায়াং'।

৩। "দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং নারদেন চ
কলিনাথস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্।"
—'সংগীত ভাষ্যে'

৪। "বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি।"
—'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়াং'।

অর্থাৎ, সংগীত "মার্গ" ও "দেশী" এই বিভাগদ্বয়ে বিভক্ত। সুরলোকে মার্গাশ্রিত সংগীত ও দেশ্যাশ্রিত সংগীত এই পৃথিবীতে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। দেবাদিদেব মহাদেবের সমীপে ব্রহ্মা যাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই মুক্তি প্রদায়ক "মার্গ" সংগীত নামে অভিহিত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখা যায়—বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিং জাতি প্রভৃতিতে

বিশেষ পারদর্শী এবং তাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ অনায়াসেই মুক্তির পথ জানিয়া লইতে পারেন ইত্যাদি।

সুতরাং বেদোক্ত গান্ধর্ব্বমতসিদ্ধ বিশুদ্ধ সংগীতই চতুর্বর্গফলপ্রদায়ক। গান্ধর্ব্ববেদে উল্লেখ আছে যেঃ—

"ত্রিবর্গ ফলদাঃ সর্ব্বে দানাধ্যয় জপাদয়ঃ
একং সংগীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গ ফলপ্রদং"

অর্থাৎ দান, অধ্যয়ন, জপাদি সাধন ত্রিবর্গ ফল প্রদান করিতে সমর্থ। একমাত্র সংগীত-বিজ্ঞানই ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গ ফল প্রদায়ক।

যদি উক্ত শাস্ত্রসম্মত যথাবিহিত সংগীতাভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রকারের যোগ সাধনায় যে অপূর্ব্ব দিব্য-ভাবের উন্মেষ হয়, ইহাতেও সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। সেই-জন্য জ্ঞানী, মহাজন ও যোগিগণ সংগীতকে সকল সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা কহিয়াছেন।

"পূজা কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণং জপঃ
জপাৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি
গীতজ্ঞো যদি গীতেন চাপ্নোতি পরমং পদম্
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে
পূর্ণং চতুর্নাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ
ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সংগীতাখ্যমকল্পয়ৎ।"

—'সংগীত-সংহিতা'।

অর্থাৎ পূজা অপেক্ষা ধ্যান কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা জপ, জপ অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ গান, গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই। সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি সংগীত-সাহায্যে পরমপদ প্রাপ্ত হন, রুদ্রদেবের অনুচর হইয়া তৎসান্নিধ্যে আনন্দোপ-ভোগ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা চারিবেদের পরিপূর্ণ সাররত্ন মন্থন করিয়া "পঞ্চম বেদাখ্য" এই সংগীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে সংগীত সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন এ বিশ্বে নাই। সকল বেদ মন্থন করিয়া যে সারতত্ত্ব লাভ করা যায়, এক সংগীত শাস্ত্র বা পঞ্চমবেদে তাহারই পুঞ্জীভূত রত্ন, সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে যোগ সাধনার সহিত সংগীত সাধনার অনুরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যোগ সাধনের বিশেষ কাম্য যাহা, সংগীত সাধনেরও তাহাই—কেবল সাধন প্রক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন মাত্র। উভয় সাধনেই যাহাতে (সুরে) সূক্ষ্মানুভূতির প্রাখর্য্য সম্পাদিত হয় ও অন্তঃকরণের উচ্চ গ্রামসমূহ স্পন্দিত হয় তদনুকূল ক্রিয়ার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য এবং উভয়রূপ সাধনই সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে যথা-বিহিত ক্রিয়া সাপেক্ষ। শাস্ত্রে আছে

"গুরূপদিষ্ট মার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেৎ

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত যোগ সাধনায় চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক প্রকৃত মার্গ অর্থাৎ যথার্থ পথের সংগীত অর্থাৎ সুর না শব্দব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। সুতরাং যেখানে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ' এই বাক্যের দ্বারা সাধ্য সাধন বস্তু নিরূপণ করিতে হয় সেখানে সাধারণ ব্যক্তির কেবল চিত্তবিনোদন করিতে পারিলেই যে উদ্দেশ্য সার্থক হইল ইহা মনে করিলে শুধু যে সংগীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হইবে তাহা নহে; পরন্তু সংগীতের যথার্থ মাপকাঠিকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে। যদি ইহা সত্য হয় যে "The soul of music is the highest endowment of the Artists" তাহা হইলে বর্ত্তমানে সংগীতের কৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত উক্তির কদাচিৎ আভাস পাওয়া যায়। এইজন্য বর্ত্তমান সংগীত-পিপাসু গুণীজনের উক্ত বিষয়ে কথঞ্চিৎ সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে বিশ্বসৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে বিশ্বপ্রেমে ও কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। তবেই সংগীতের হইবে চরম সার্থকতা।

মার্গ সংগীতে প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে হইলে শুদ্ধ স্বরসমূহের সাধন অতীব আবশ্যক। এই শুদ্ধ স্বর শাস্ত্রসম্মত তম্বুরা প্রভৃতি তজ্জাতীয় ষড়জের স্বর হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র বলেন যে, "ষট্‌জায়ন্তে যস্মাদ ষড়জঃ" অর্থাৎ ছয়টি স্বর যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহা সহজে শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয়। উক্তরূপ স্বর বিশুদ্ধভাবে কেবল মাত্র তম্বুরার ন্যায় যন্ত্রাদির সাহায্যেই সম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রচলিত হারমোনিয়ম্ প্রভৃতি বিকৃত স্বর (Tempered scale) বিশিষ্ট যন্ত্র সহযোগে স্বর সাধনা একান্ত অকর্ত্তব্য। কেন না শুদ্ধ স্বর বিশিষ্ট যন্ত্রে যে অনুরণনাত্মক ধ্বনি অর্থাৎ স্বরম্ভু বা প্রতিধ্বনি "Echo" নির্গত হয়, তাহা বিকৃত স্বর বিশিষ্ট যন্ত্রের স্বরের সহিত প্রকৃতভাবে মিল হয় না। Mr. Alexander Ellis স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে—

"In point of fact as he always hears tempered tones, he never hears the exact commensurable ratios. Indeed on account of the impossibility of tuning with perfect exactness, the exact ratios are probably never heard."

"The custom has come in recently to use harmoniums for drone. This is undoubtedly convenient, but the noise is not by any means attractive, and likely to add to the appreciation of Indian music by ears trained by quality as well as to pitch."

উপরোক্ত মন্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিকৃত স্বরযুক্ত যন্ত্রাদির দ্বারা সংগতির প্রথা অর্থাৎ কোরাস (chorus) প্রভৃতিতে নিশ্চয়ই সুবিধাজনক; কিন্তু এই কোলাহল (noise) সূক্ষ্মদর্শী গুণীজনের শ্রবণযোগ্য হয় না। ইহার কারণ মনে হয় যে, দুই বা ততোধিক রঙের একত্র সংমিশ্রণে (by chemical compound) অন্য আর একটি বিশিষ্ট ভিন্ন রঙের সৃষ্টি হইলেও বিভিন্ন স্বরের সংগতি প্রথা (cord system) দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্বরের এককালীন সংযোগে স্বরের অন্য কোনও বিশিষ্ট ভিন্ন রূপের সৃষ্টি না হইয়া বিভিন্ন স্বরের পৃথকত্ব স্পষ্টত বোধগম্য হয়। সুতরাং সংগতি প্রথা দ্বারা ধ্বনির বা স্বরের সৌসাম্য বা সংধ্বনি (symphony) প্রকাশ বা পরিবর্ধন করা হয় মাত্র: কিন্তু ঐ স্বর সামঞ্জস্যে বা একতানে বস্তুত অন্য কোন বিশিষ্ট

স্বর সৃষ্ট হয় না। এই হেতু কণ্ঠে একতানকালীন কেবলমাত্র একটি প্রকৃত স্বর ভিন্ন অন্য কোন অভিনব বিশিষ্ট স্বর প্রকাশিত হয় না এবং তজ্জনিত স্বর বিকাশ অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া বিকৃত স্বরযুক্ত যন্ত্রাদি বিশুদ্ধ স্বর বিকাশে নিতান্ত অযোগ্য সহায়ক, ইহাই হইল সঙ্গীত প্রথার খুব বড় ত্রুটি বা দোষ। কিন্তু নিতান্তই পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমানে গুণী সমাজেও এই অযোগ্য সহায়কের সমধিক প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়, উপরন্তু বর্ত্তমানে ইহা কেবল সাধারণের চিত্তবিনোদনার্থই সঙ্গীতের বৈঠকে গুণীজনের স্বর শক্তির দুর্ব্বলতা বশত এবং সাধনার ন্যূনতা হেতু স্বর বিকাশের সাহায্য কল্পে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত সাধক ঐরূপ যন্ত্রের তীব্র নিন্দা বর্ত্তমানেও করিয়া থাকেন বা সঙ্গীতের বৈঠকে ব্যবহৃত হইতে দেন না। এই মতবাদে নির্ভরশীল হইলেও যাঁহারা সত্যই স্বর সম্বন্ধে কিছুমাত্রও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহারা ইহা মনে না করিলে শোভন হইবে যে প্রকৃত সাধকগণ উক্তরূপ যন্ত্র ব্যবহারে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রাচীন মতাবলম্বী বা রক্ষণশীল অর্থাৎ উত্তরোত্তর সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কারে বা শ্রীবৃদ্ধিতে পরিপন্থী। যাহা হউক প্রকৃত পক্ষে "মার্গ" সঙ্গীতে যে শুদ্ধস্বর বিকাশে উক্ত যন্ত্র কোনরূপে সাহায্য করে না ; ইহা নিঃসন্দেহ। ঐরূপ যন্ত্র সাহায্যে cord systemএ সঙ্গীতে যে কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জাতীয় সঙ্গীতে তুঙ্গ স্থানীয় বৈজ্ঞানিকাচার্য্য Mr. Helmhol সেই cord-এর বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন

এক্ষণে কি উপায়ে তম্বুরার সাহায্যে বিশুদ্ধ স্বর বিকাশের জন্য স্বর সাধন করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ক্রিয়াযোগ সাধন কালে যেমন শাস্ত্রে কতকগুলি আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রাথমিক সোপান অতিক্রমপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিবার ব্যবস্থা আছে। সেইরূপ স্বর সাধন কালে যতক্ষণ একটি স্বর স্থিরভাবে রাখিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। স্বরের স্থিরতা, হ্রাস কিম্বা কম্পন আরম্ভ হইলেই আর স্থির রাখিবার চেষ্টা না করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় স্বরোচ্চারণ আরম্ভ করিয়া সেই স্বর পুনঃপুন উক্তরূপে সাধন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বার বার কিছুকাল সাধনার ফলে স্বর শুদ্ধভাবে প্রকাশ পাইবে এবং স্থিতিস্থাপক হইয়া দীর্ঘস্থায়ী হইবে। যোগিগণ যে আয়ত স্বরে বার বার প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক নাদসাধনা করেন তাহা প্রাণায়ামের বিশেষ উপযোগী। উক্ত ক্রিয়া দ্বারা সাধক তাঁহার কাম্য ফল ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। নারদ সংহিতায় নাদ সাধনার উপর বিশেষভাবে কিরূপে জোর দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা গেলঃ—

"ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ
ন নাদেন বিনা গ্রামস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ
ন-কারঃ প্রাণবায়ুঃ স্যাদ্ দকারো হব্যবাহনঃ
তৎসমুৎপদাৎে যস্মাত্তস্মান্নাদোহয়মুচ্যতে"

অর্থাৎ নাদ ব্যতীত না সঙ্গীত, না স্বর, না স্বরগ্রাম কিছুই সম্ভব নহে। এই জন্য এই বিশ্বজগৎ নাদস্বরূপ বা নাদময়। "ন"-কার প্রাণবায়ু এবং "দ"-কার অগ্নিস্বরূপ এই প্রাণাগ্নির সংযোগে ইহা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে **'নাদ'** কহিয়া থাকে। সঙ্গীত দর্পণে আছে যেঃ—

"নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণং পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ
বচসো ব্যবহারোহয়ম্ নাদাধীনমতো জগৎ"

অর্থাৎ এই নাদ হইতে বর্ণের উদ্ভব হয়। বর্ণ হইতে পদ, পদ হইতে স্থূলবাক্য, বাক্য হইতে সমুদয় ব্যবহার সুতরাং এই জগৎই নাদাধীন।

ত্রাটক ও খেচরী প্রভৃতি যোগসাধনায় যেরূপ অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সহায়তা করে, সেইরূপ স্বর সাধনায়ও স্থূল মনোবৃত্তিনিচয়ের লয় করিয়া দেয়। যে-হেতু স্বরের বিভিন্ন সমন্বয় ও প্রকাশভঙ্গিমা দ্বারা যে সুরতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা চিত্তের উপর আঘাত করিয়া ভাবের বৈপুল্য সৃষ্টি করে। ভাবের এই বিচিত্রতা বহু রস সৃষ্টি করিয়া চিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই রসানুভূতি সংবিদ্ ও সঞ্চালনী স্নায়ুর ক্রিয়ার জন্য ঘটিয়া থাকে। ত্রাটক ও খেচরী যোগসাধনে যেরূপ চক্ষু নিমেষশূন্য করিয়া নাসিকা ও ললাটে স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ স্বরসাধনকালে চিত্ত তম্বুরার ষড়জ স্বরের দিকে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। কেবল সাধন প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা হইতেছে এই যে, যোগ-ক্রিয়া স্থূলে ভূতাবলম্বনে এবং সঙ্গীত সূক্ষ্ম ভূতাবলম্বনে সাধিত হয়।

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যোগকে একরূপে মানস-শিল্প বলা চলে, কারণ, মানস-ক্রিয়া বা মনোবৃত্তিকে নিরোধ করার নাম যোগ। এই মনোবৃত্তি মনস্তত্ত্ববিদ্ যোগিগণের মতে অসংখ্য হইলেও স্থূলত পাঁচ ভাগে ইহার বিভাগ করা হয়। যথাঃ—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনোবৃত্তি যত প্রকারেরই থাকুক না কেন, সকলগুলিই উক্তরূপ পাঁচটি বিভাগের অন্তর্গত।

প্রথম ক্ষিপ্তাবস্থায় মনস্থির থাকে না। বাহ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে। স্বর শিল্পীর ও তম্বুরার স্বরের সহিত কণ্ঠস্বর সংযোগকালীন ঐরূপ অবস্থা ঘটে। কেবলমাত্র মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর তম্বুরার স্বরের সহিত প্রকৃতভাবে সংযোগ হইলেই চমক মাত্র উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় যোগের মূঢ়াবস্থায় মন আলস্যাদি নানারূপ তমোময় বা অজ্ঞানময় বিষয়াদির অধীন থাকে। এইরূপে স্বর সাধকেরও ঐরূপ অবস্থা হয়, স্বরসাধন কোনরূপে সমাপ্ত করিয়া ভিন্ন চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

তৃতীয় বিক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্তের মূঢ়াবস্থাকালীন চাঞ্চল্যের মধ্যেও ক্ষণিক স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। তৎকালে চিত্ত কেবলমাত্র স্থিরতাজনিত সূক্ষ্মানুভূতির আস্বাদে নিমগ্ন হয়। তদ্রূপ, স্বরসাধকেরও সাধনকালীন তম্বুরার স্বরের দিকে নিজের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠ ও তম্বুরার স্বরের পরস্পর মিলনজনিত সহানুভূতির উদ্ভব হয়। পরন্তু চিত্তচাঞ্চল্যহেতু স্বরসমন্বয় হইতে স্বরের যখন বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন স্বর-মিলনে সুখানুভূতি হইতে

চিত্তে ক্লেশের উদ্ভব হয়। বস্তুত ঠিক এই সময় স্বরসমন্বয় হেতু স্বরের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়।

চতুর্থ যোগের একাগ্রতাবস্থায় চিত্ত নিশ্চল ও নিষ্কম্পাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া সাত্ত্বিকবৃত্তির উদ্ভব হয়। সেইরূপ স্বরসাধকেরও এই অবস্থায় তম্বুরা অথবা আভ্যন্তরীণ স্বরাবলম্বনে অবিকম্পিতভাবে স্বরের একতা উপলব্ধি গোচর হয়। এই স্বর ক্রমশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সাধকের রজস্তমোবৃত্তি পরাভূত হইয়া কেবল সাত্ত্বিকবৃত্তি মাত্রই প্রবল থাকে। অবশেষে এই একাগ্রতাবস্থায়ই সাধকের নিরুদ্ধাবস্থা আনয়ন করিয়া থাকে। ইহাই হইল যোগ সাধনা ও সঙ্গীত সাধনায় অবস্থার সমতা।

এক্ষণে এই একাগ্রতাবস্থায় ষড়জের স্বয়ম্ভূসমূহ অর্থাৎ অনুরণনাত্মক ধ্বনি কিরূপে শ্রবণ প্রত্যক্ষ যোগ্য হয় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমতঃ তম্বুরার চারিটি তন্ত্রী দুইটি স্বরের ষড়জ এবং পঞ্চম বা মধ্যম স্বরে বাঁধা হয়। ওই চারিটি তন্ত্রীর পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে যে ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয় গভীর মনোনিবেশ ও সাধনাবাহুল্যে সেই অনুরণনাত্মক ধ্বনি হইতে উৎপন্ন গান্ধার ও নিষাদ্ স্বর প্রথম প্রত্যক্ষানুভূতির গোচর হয়। সাধনা ক্রমে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইলে এই একাগ্রতাবস্থায় সকল শুদ্ধস্বর সমূহের শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয় এবং এই অবস্থা হইতে ক্রমশ সূক্ষ্মানুভূতির শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বরের সূক্ষ্ম বিভাগ দ্বাবিংশতি শ্রুতিসমূহেরও বোধ জন্মাইয়া থাকে। এই অবস্থা মার্গসঙ্গীত শিক্ষার প্রকৃতাবস্থা। এই অবস্থায় সুর অন্তঃকরণের সকল স্তরে অনুভূতির প্রাখর্য্য সম্পাদন করে, এবং ইহা হইতে একপ্রাণতা একভাবোন্মুখতা ও একবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া অন্তর সকল জড়তা হইতে মুক্ত হয় ও দিব্যভাবের অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়।

ইহার পরই চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা আসে। এই অবস্থায় চিত্ত আপনার কারণভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরাবলম্বনে থাকে। এই সময় আত্মার স্বরূপ অচ্যুত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং অন্যান্য সময়ে তিনি বৃত্তিস্বরূপের সহিত একীভূত থাকায় তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। স্বর সাধকেরও ঐরূপ তুর্য্যাবস্থা হয়। এই অবস্থায় সুরসমূহ এক ওঁকারে পরিণত হইয়া আত্মারাম হইয়া যায়—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী এক হইয়া মনের নিরাবলম্বন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাই অদ্বৈতাবস্থা বা মুক্তাবস্থা। এই অবস্থায় দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র বাক্য মনের অগোচর স্বরের শব্দময় বিকাশ সচ্চিদানন্দ সুরব্রহ্মই অবস্থান করেন। এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থায় যোগ ও সঙ্গীত সিদ্ধ হয়। সেইজন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ বা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ বলিয়াছেন যে, ধ্যান যদি অচ্ছেদ্য বা অনন্তবিস্তররূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং চিত্ত যদি ধ্যেয়ের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে ধ্যাতা, ধ্যেয় বস্তুর অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং সাধ্য সাধন সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় ও তৎস্বরূপে অবস্থান করেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে,

> "উচ্ছিন্ন সর্ব্ব সংকল্পো নিঃশেষাশেষ চেষ্টিতঃ
> স্বাবগম্যো লয়ঃ কোঽপি জায়তে বাগগোচরঃ"
>
> "হঠযোগ প্রদীপিকা"।

যাহার প্রকৃত লয় হইয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার সংকল্প নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ কোনরূপে অন্তঃকরণ পরিণাম থাকে না এবং অশেষ চেষ্টা নিঃশেষিত হয়। এই লয় আত্মগম্য অর্থাৎ কেবল আপনিই জানিতে পারে, বাক্যে প্রকাশিত হয় না। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সাধকের একাগ্র সাধনায় সুদীর্ঘকালাবস্থান নিবন্ধন দৃঢ়তা ও তন্ময়তার তীব্রতাহেতু বিদ্যা অবিদ্যার সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্তিতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই পরিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। ইহাই হইল যোগীজনের সাধন ক্রিয়ার চরম পরিণতি।

উপরোক্ত যোগের স্থূল প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে প্রাণায়াম একটি অন্যতম অঙ্গ। এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে,—

> "চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
> যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥"
>
> "হঠযোগ প্রদীপিকা"।

উল্লিখিত শ্লোক হইতে ইহাই বোধ হইতেছে যে, শারীরিক বায়ু চঞ্চল থাকিলে চিত্তও চঞ্চল এবং প্রাণবায়ু নিশ্চল হইলেই চিত্তও স্থিরীভূত হইয়া থাকে। অতএব মনস্থির করিতে হইলে প্রাণবায়ুর যোগকরণ সাধিত না হইলে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হওয়া সম্ভব নহে এবং মনস্থির না হইলে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হওয়া সম্ভব নহে এবং মনস্থির আসন, মুদ্রা এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি স্থূল সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা যে ফললাভ করেন, স্বরসাধক সাধনায় সেইরূপে ফলপ্রাপ্ত হয়েন। সঙ্গীত সাধনার এই আর একটি বিশেষত্ব। যোগিগণ পূরক, কুম্ভক, রেচক প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়মিতভাবে অল্পায়ত ও অল্পসংখ্যক করিয়া বায়ুর বেগ ধারণপূর্ব্বক প্রাণ-সংযম করেন। স্বরসাধকও নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বর বিকাশকালীন বায়ুর গতি স্থিরীকরণে প্রাণসংযম করিয়া থাকেন। যেমন, স্বরসাধকের "পূরক" হইতেছে স্বরের নিম্নগ্রাম হইতে উচ্চগ্রামে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া স্বর সংবন্ধপূর্ব্বক আরোহণ এবং উচ্চগ্রাম হইতে নিম্নগ্রামে ঐরূপে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক অবরোহণ হইল "রেচক"। উক্তরূপে দ্বিবিধ প্রক্রিয়াকে সঙ্গীতশাস্ত্রে "অনুলোম" ও "বিলোম" এই দুই শব্দে উক্ত আখ্যা দিয়া থাকেন। তাহার পর স্বরের "কুম্ভক" হইতেছে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিঃশ্বাস ধারণপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন গতিতে বার বার স্বরে আরোহণ ও অবরোহণ। ইহাকে শাস্ত্রে "মূর্চ্ছনা" সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা—

> "ক্রমাৎ স্বরাণাম্ সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্
> মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥"
>
> "সঙ্গীত রত্নাকর।"

উপরোক্ত বিধি অনুসারে হইল স্বরের পূরক: রেচক, কুম্ভক। ইহার দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, সংগীত শ্বাসক্রিয়ামূলক। এই শ্বাসক্রিয়া পরিশুদ্ধ ও আয়ত্ত হইলে সংগীতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। সংগীতের এই অনুপম ঐশ্বর্য্যের প্রভাবেই বহুবিধ অলৌকিক শক্তিরও অধিকার জন্মে। যেমন যোগ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধকাম, সুনিপুণ যোগিগণ বহুবিধ অলৌকিক ক্রিয়া দর্শাইতে সমর্থ হন। নারদাদি সংগীতজ্ঞ ঋষিগণের নিরাবলম্বনে শূন্যোপরি যদৃচ্ছা বিচরণ কাহিনী কল্পনা নহে।

বৈজ্ঞানিক মতে স্থির হইয়াছে যে, প্রাণায়াম বা যথাবিহিত স্বর সাধন দ্বারা দেহের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়। "পূরকের" দ্বারা যে বায়ু আমরা দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করি তাহাতে অধিক পরিমাণে অম্লজান (oxygen) থাকে, এবং 'রেচকের" দ্বারা দেহাভ্যন্তর হইতে যে বায়ু নির্গত করা যায় তাহাতে ক্ষারজান (nitrogen) থাকে। অম্লজান বিশুদ্ধতার জন্য পুষ্টিকর এবং ক্ষারজান দুষ্টতার জন্য হানিকর। "পূরকের" সময় যাহাতে ক্ষারজান শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ না করে সেইজন্য অতীব সাবধানতার সহিত "রেচক" ধীরে ধীরে নিঃসরণ করিতে হয়।

রেচয়েচ্চ ততোঽন্যেন শনৈরেব ন বেগতঃ।"

উক্ত উক্তির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অধিক বেগে বায়ু 'রেচক' করিলে বলহানি হয়। দেহাভ্যন্তরে অম্লজান ও ক্ষারজানে তারতম্য ভেদে উপকার ও অনিষ্ট সাধিত হয়। অম্লজান স্নায়বিক উত্তেজককে শান্ত করিয়া স্নায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ করে।

যাহা হউক সংগীত যখন শ্বাসক্রিয়ামূলক তখন বিহিত নিয়মে প্রাণায়াম সাধনই যে সংগীতের প্রধান সোপান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঋষিগণ যে আয়তস্বরে প্রণব উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের প্রাণায়াম সাধনের ভিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রণব বা নাদধ্বনি যদি বিধিমত ও নিয়মিতভাবে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, তবে প্রাণ সংযমের পথ প্রসারিত হয়। প্রাণায়মের দ্বারা যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, যথাবিহিত প্রণব উচ্চারণ দ্বারা তাহাই পাওয়া যায়। মার্গ সংগীতে মনঃসংযোগসহকারে যথাযথভাবে দীর্ঘস্থায়ী অপাক্ষর ঈশ্বর বাচক প্রণবাদি শব্দের উচ্চারণে যোগবৎ সমাধি আনয়ন করে। এই সমাধি হইলেই অনন্ত-মহিম, স্বপ্রকাশমান পরমজ্যোতি-স্বরূপ আনন্দময়ের দর্শন লাভ ঘটে। এইসম্বন্ধে নাদপুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ—

"একো ধ্বন্যাত্মকো জ্ঞেয়োঽপরো বর্ণাত্মকস্তথা

স নাদো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো নাদশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥

আহতো রঞ্জক প্রোক্তোঽনাহতো মুক্তিদায়কঃ।"

ইত্যাদি

অর্থাৎ নাদ ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বর্ণাত্মক অনাহত সংজ্ঞক। এই নাদ মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ—ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণাবলম্বনে উপর্যুক্ত নাদ-প্রশংসার সুদৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়। এই জন্য প্রকৃত সংগীত সাধকের পক্ষে মূল ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথমত নাদ সাধনার উপরেই নিরতিশয় শ্রম-শক্তি নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা প্রকৃত সংগীতের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সুদূরপরাহত থাকিবে। এ ক্ষেত্রে এইটুকু অবিসম্বাদিতভাবেই স্বীকার করিয়া লইবার এবং জানিবার বিষয় যে যোগ সাধনাই হউক বা সংগীত সাধনাই হউক, যে কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আত্মসংযমই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, নতুবা আপাত-মধুর বাহ্য বস্তুর প্রতি মন সহজে আকৃষ্ট হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই জন্য যোগসাধনায় যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুকূল করিয়া রাখিবার জন্য এবং নিজেকেও সাধকপদে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে কঠোর বিধি-বিধান ও সুচিন্তিত ব্যবস্থাবলীর নির্দ্দেশ আছে, সংগীত সাধনা ক্ষেত্রেও তাহা নির্ম্মমভাবেই প্রযোজ্য। সংগীত সাধনাকে তদপেক্ষা সহজসাধ্য মনে করিয়া সাধনা সহায়ক ব্যবস্থাবিধির উপেক্ষা করিলে কোন দিনই সংগীতের প্রকৃত-রূপের সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা হইবে না। এই জন্য যোগমার্গানুকূল স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা এবং গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য বস্তু প্রভৃতির গ্রহণ বিচার সংগীত মার্গেও একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

সাধন ক্ষেত্র পবিত্র, নির্জ্জন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবিত ও শীত-রৌদ্রাতিশয্যবিহীন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

"কুর্য্যাদ যোগ গৃহং ধীমান সুরম্যং সুভবর্ত্মনা।"

সুতরাং যোগক্ষেত্রকে রমণীয় প্রাকৃতিক পত্রচ্ছেদে সুশোভন করিয়া রাখিতে হইবে এবং সাধনার অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি প্রতিনিয়তই সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রে আছে—

"উৎসাহাৎ সাহসাদ্ধৈর্য্যাত্তত্ত্ব জ্ঞানাচ্চ নিশ্চয়াৎ

জন-সঙ্গ-পরিত্যাগাৎ ষড়ভির্যোগঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়ম গ্রহঃ

জনসঙ্গশ্চ লোলাঞ্চঃ ষড়ভির্যোগো বিনশ্যতি।" ইত্যাদি

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য্য, তত্ত্বজ্ঞান, নিশ্চয়তা, জনসমাগম-পরিবর্জ্জন প্রভৃতি গুণাবলী সিদ্ধিলাভের বিশেষ সহায়ক। আর অত্যাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রমজনক কার্য্য, বহুভাষণ, বহু-জন সংসর্গ, চঞ্চলতা প্রভৃতি দোষসমূহ সিদ্ধিলাভের একান্ত প্রতিকূল। সুতরাং সাধনায় সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলে প্রথমত সংযম প্রতিষ্ঠার দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ ও সুস্থ করিতে হইবে। সেই জন্য চিত্তবৃত্তির উদ্বেগজনক সমুদয় কার্য্যাবলী নির্ব্বিচারে পরিবর্জ্জনীয় এবং চিত্তবৃত্তির প্রসার পরিপোষক বিধানাবলী সর্ব্বতোভাবেই গ্রহণীয়। এই-রূপে সমুদয় অনুকূল অবস্থার পরিবেষ্টনে সাধক নিজেকে সংযত ও সংস্কৃত করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হওয়াই সিদ্ধি-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। *

---

* ১৯৩৯ সালে কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে পঠিত।

টিউনিসিয়ার তোড়জোড়

শ্রীকুসুমাকর রায়

মুসোলিনী ইস্‌লামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন—এই ঘোষণায় টিউনিসিয়া, যাহার দশভাগের নয় ভাগ লোকসংখ্যাই আরব তখনকার মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেও এবং ইটালীর কতকটা পক্ষপাতী হইলেও সম্প্রতি আলবেনিয়া বেদখলের ব্যাপারে তাহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে ইটালীর উপর। আবার এমনই আশ্চর্য ঘটনা, এক বৎসর পূর্ব্বে যে ৯ই এপ্রিল 'নিও-দেস্তুর' আন্দোলনের প্রকাশ্য বিক্ষোভকে কেন্দ্র করিয়া টিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার ও অবরোধ ব্যাপক হয়, ঠিক এক বৎসর পরে ঐ স্মরণীয় ৯ই এপ্রিলের বার্ষিকী দিবসে অন্যতম ইসলাম রাজ্য আলবেনিয়া ইটালীর গ্রাসে পতিত হইল। যদিও এখনও নিও-দেস্তুর আন্দোলনের নেতাদের ভিতর প্রায় ৬০ জন এখনও বিনা বিচারে আটক, যদিও কূট-রাজনীতির নিয়মে ইটালীর পক্ষে বর্ত্তমানই ছিল টিউনিসে নিজ পক্ষ সমর্থনকারী সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময়—তথাপি ইটালী এমন একটি কার্য্য করিয়া বসিল, যাহাতে টিউনিসিয়ার আরবদিগের বিদ্বেষই আরোপিত হইল মুসোলিনীর উপর।

পূর্ব্বদিন প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপলী হইতে রেডিওযোগে জানান হয় যে, নিও-দেস্তুর আন্দোলনের বার্ষিকী দিবসে পুনরায় প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হউক। নেতাগণ এখনও জেলে পচিতেছে।...তথাপি গোপনে নিও-দেস্তুর এখনও ৭০,০০০ সদস্যের সহযোগ প্রাপ্ত হয়। ইহার ভিতর রহিয়াছে বিপুল সংখ্যায় শিক্ষিত আরব এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী। জনগণেরও অন্তরের সহানুভূতি রহিয়াছে এই আন্দোলনের উপর।

কিন্তু তথাপি পর দিবস কোন কিছুই দেখা গেল না। ইহা অবশ্য সত্য যে টিউনিস্ শহর সরকারী সেনায় ভরপুর—লাল ফেজ টুপী পরিহিত জাউয়েভগণ এবং খাকী পাগড়ীধারী সিপাহীগণ দক্ষিণ অঞ্চলের দুর্গ ও ফৌজের ঘাটি হইতে ইষ্টার উপলক্ষে টিউনিসে আগত প্রচুর সংখ্যায়, তাহা ছাড়া স্থানীয় পুলিশ সকল প্রকার জরুরী ব্যবস্থায় একেবারে প্রস্তুত। কিন্তু শহরের কোথাও জটলা নাই, বিক্ষোভের লেশও নাই, এই নীরবতা হইতে ইহাই ধারণা জন্মে যে আরবগণ আর ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে অন্তত উপস্থিত সময়ে ইচ্ছুক নহে।

টিউনিসের রাজনীতি ক্ষেত্র অনাবাদীই রহিয়া গেল। সহসা ক্ষেত্র এই প্রকার আবাদের অতীত হইল কেন? প্যালেষ্টাইনের বিশেষ অবস্থা ছাড়িয়া দিলে আরবদিগের বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দলিল হইল সেই সমরাভিযান, যাহা গুড্ ফ্রাইডেতে সুরু হইয়া ইষ্টার মান্ডের ভিতরেই আলবেনিয়ায় 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' আনয়ন করিল। টিউনিসিয়ার প্রায় ২২,৩০,০০০ আরব মুসোলিনীর অভিসন্ধি সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। তৎসঙ্গে যে ২৩,০০০ ত্রিপলীর আরব টিউনিসিয়ায় প্রবাসী (যাহাদের অধিকাংশই রাজনীতির কারণে দেশত্যাগী)—তাহারাও "ইসলামের রক্ষকের" মতলব সম্বন্ধে আর অজ্ঞ নাই। আলবেনিয়ায় ইটালীর অভিযানের হয়ত অতিরঞ্জিত বিবৃতিই তাহারা প্রচার করিতেছে যে, নেতৃবর্গকে উড়োজাহাজ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, প্রকাশ্যে অপরাধীকে বেত্রাঘাত করা চলিয়াছে, সামান্য সন্দেহেই আবাস ও আবাদের জমি হইতে কৃষককে বেদখল করা হইতেছে। অতিরঞ্জিত হইলেও টিউনিসে এই প্রকার বিবরণের প্রচার হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশবাসী অন্তরে অন্তরে এল্ ডিউসের কি ছবি আঁকিয়া রাখিতেছে।

যদি সমর উপস্থিত হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত সমরের আতঙ্ক না ক্ষীণতর হয়, টিউনিসিয়ায় আরব-বিক্ষোভ প্রকাশ পাইবে না, সতত ফুটন্ত দক্ষিণ অঞ্চলেও নয়। সেখানকার কর্মঠ পুরুষদের লইয়া 'গোয়াম' বা মিশ্র সেনাদল গঠিত হইতেছে ফরাসী নায়কগণের অধীনে; তাহাদের স্বপ্ন হইল ত্রিপলী রাজ্যে বিজয়-গৌরবে প্রবেশ—কারণ টিউনিসিয়ার জনমত এই যে, ফরাসী বা তাহার কোন মিত্রশক্তির উপর চড়াও দ্বারা সমর সুরু হওয়া মাত্র টিউনিসিয়া আক্রমণ করিবে ত্রিপলী রাজ্যকে।

আজ অধিকাংশ টিউনিসিয়াবাসীই ইটালী অপেক্ষা ফরাসী শাসনের পক্ষপাতী। প্রতিদিন যেভাবে রেডিওযোগে নূতন নূতন কাণ্ডকারখানা প্রচারিত হয় ইটালীর সহিত ফরাসী শাসনের তুলনামূলক অবস্থার, তাহাতে দেশবাসীর অন্তর হইতে ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মনোবৃত্তি লোপ পাইয়া যাইতেছে।

ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে টিউনিসিয়ানগণ এখন বদ্ধপরিকর—সারা দেশ হইতে ইটালিয়ানগণকে বিতাড়িত করিতে। শ্রমিক মজুরগণের মুখে পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন—ফরাসী সরকার কেন টিউনিসিয়া হইতে সকল ইটালিয়ানদের তাড়াইয়া তাহাদের চাকুরীতে আমাদের বহাল করে না? তাহা হইলেও এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইটালিয়ানগণ অতিশয় পরিশ্রমী এবং তাহাদের অধিকাংশই আইনানুগ ও শান্তিপ্রিয়।

কিন্তু চাকুরীস্থলে ফরাসীদের সহিত দেশীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই বলিলেই চলে, কেবল যে দুই চারিজন শিক্ষিত আরব "fonctionnaires" হইতে চাহে তাহা ছাড়া। আরবদের প্রকৃত প্রতিযোগিতা ইটালিয়ানদের সহিত। জীবন-যাত্রার প্রণালীতে দুই-ই প্রায় সমজাতীয়। ফরাসীগণ ইহাদের অনেক উর্দ্ধে। কাজেই এই হিসাবে ফরাসীদের সুবিধা রহিয়াছে ইটালিয়ান অপেক্ষা।

টিউনিসিয়ায় যে ইটালিয়ানগণ রহিয়াছে, যুদ্ধ বাধিলে ফরাসী সরকার উহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে?

ফরাসী সরকারের আদম সুমারী সংখ্যায়—১০৮০০০ ফরাসী এবং ৯৮,০০০ ইটালিয়ান। কিন্তু টিউনিসের ইটালিয়ান কনসাল জেনারেল উহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন ইটালিয়ানের সংখ্যা ১২৭০০০ এবং উহার অতিরিক্ত রহিয়াছে ১৬,০০০ যাহারা ফরাসী নাগরিক বলিয়া 'নেচারালাইজড্' হইয়াছে। নেচারালাইজড্‌দের সংখ্যা সম্বন্ধে উভয়পক্ষই একমত। তথাপি যে সকল ব্রিটিশ অফিসিয়াল ঐ স্থানে রহিয়াছে, তাহাদের অভিমত এই যে, ফরাসী সংখ্যাই যুক্তিযুক্ত।

বিগত জানুয়ারীতে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়েরের টিউনিসে পদার্পণের পর এবং প্রাগের উপর নাজি প্রভাব বিস্তারের পর হইতে টিউনিসিয়ার উপর ইটালীর দাবীকে ফরাসীরা আর ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতেছে না অথবা টিউনিসিয়ায় ইটালীর অধিকার বৃদ্ধিকেও গ্রাহ্য করিতেছে না। আন্তর্জ্জাতিক সংঘর্ষ ঘনাইয়া আসিলে ইটালিয়ানগণ যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে এদেশে গুপ্ত বিস্ফোরণ বা অন্য কোন দুর্ঘটনা দ্বারা, ফরাসী সরকার তাহার সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া রাখিয়াছে।

তিন প্রকারে ইটালী টিউনিসিয়ায় শক্তিমান। চারিটি কেন্দ্রে—টিউনিস, গ্রোম্বালিয়া, জাঘোয়ান ও লি কেফে—ইটালিয়ানেরা ফরাসী অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রথমোক্ত তিনটির ভিতর সমগ্র ক্যাপবন উপদ্বীপের মদ্য উৎপাদক অঞ্চল রহিয়াছে এবং সমগ্র প্রোটেকটোরেটের একমাত্র বৃহৎ নগরটিও। দ্বিতীয়ত টিউনিসে শ্রমিকগণের অধিকাংশ এবং নানা জাতীয় মিস্ত্রী রহিয়াছে ইটালিয়ান—ইহার ভিতর রেলওয়ে সংক্রান্ত নিম্নস্তরের ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, পেট্রল ষ্টোরসের কর্ম্মী, বৈদ্যুতিক আলো ও শক্তির মেকানিক প্রভৃতি পদে ইটালিয়ানের সংখ্যা অধিক এবং তৃতীয়ত লি কেফ অঞ্চলে লৌহখনিতে নিযুক্ত শ্বেতাঙ্গের ভিতর ইটালিয়ানই অনুপাতে অনেক বেশী।

ফ্যাসিস্ত সিক্রেট পুলিশ এবং বাণিজ্যিক Dopolavoro দলের টিউনিসিয়ায় স্থানে স্থানে আড্ডা গাড়িবার ও গোপনে যাতায়াত করিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরাসী সরকার সুনির্দ্দিষ্ট রক্ষা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছে। প্রধান রাস্তা ও রেল লাইন যাহা মিশর হইতে লিবিয়ার ভিতর দিয়া টিউনিসিয়ার শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে সকল রাস্তা ও রেল লাইন বিরাট সেনা ঘাঁটি ম্যারেথ (লিবিয়া সীমান্তের বিপরীত) হইতে টিউনিসে আসিয়াছে ক্যাপবন উপদ্বীপ ও গ্রোম্বালিয়া হইয়া—সেই পথে যত সেতু রহিয়াছে তাহাতে দিন রাত পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে সিসিলি দ্বীপে যেমন জাহাজ হইতে সেনা রসদ অস্ত্র-শস্ত্র নামাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান করা হইয়াছিল, অনুরূপ ব্যবস্থা টিউনিসিয়ায়ও করা হইয়াছে ব্যাপক। টিউনিস উপসাগরের সমগ্র তীর ব্যাপিয়া কাঁটা তারের অবরোধ স্থাপন করা হইয়াছে এবং উহার পশ্চাতে শক্তিশালী কামান, মেশিন-গান, বিমানধ্বংসী কামান কিছু দূরে অন্তর অন্তর স্থাপিত করা হইয়াছে গুচ্ছে গুচ্ছে। হেমেমেৎ উপসাগরেও অনুরূপ অবরোধ গড়িয়া তোলা হইয়াছে

কারথেজের গিরিশির ও কন্দর—যেখান হইতে হ্যানিবল তাহার বিরাট দিগ্বিজয়ের অভিযান নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল এবং যেখানে সেণ্ট মোনিকা তাঁহার পুত্র অগাষ্টাইনকে বিদায় দানে আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন—সে স্থানে এখন সারির পশ্চাতে সারি কাঁটা তার ঝক্ ঝক করিতেছে। মনোরম হেমেমেৎ উপসাগর আর এখন গোপন ব্রিটিশ 'আড্ডা' নাই। তীরে তীরে নানা প্রকার ফুল-লতায় ঢাকা বেমালুমভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে কামান আর কামান। সেই সেকালে যেখানে শ্বেত ক্রীতদাস ব্যবসায়ী বারবারি জলদস্যুগণের পোতাশ্রয় ও জাহাজ হইতে অবতরণের ঘাট ছিল—সেখানে বন্য ফুল গাছে ঢাকা রহিয়াছে চোরা আড্ডা ফরাসী সেনাদের।

স্ফ্যাক্স্ ঘাঁটি এখন হইতেই নানা প্রকার মহলা দিয়া হাত পাকাইতেছে। প্রত্যেক দিন সূর্য্যাস্তের পর সকল আলো নির্ব্বাপিত হইয়া এ আর পি'র ক্ষীণ নীল আভা আকাশ-বাতাস নীলায়মান করিয়া ফেলে। তখন চলে বিমানের আনা-গোনা আর সঙ্কেত-জ্ঞাপন।

ফরাসীদের বর্ত্তমান শক্তি ও তোড়জোড় যেমন দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, এখানে যদি ইটালী জলপথে আসিয়া সেনা প্রভৃতি অবতরণে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে উহা গ্যালিপলি অপেক্ষাও নিদারুণ পরাজয়ে পর্য্যবসিত হইবে।

ইহা ছাড়া টিউনিস শহরের বুকের উপর যত ইটালীয় শ্রমিক রহিয়াছে, তাহাদের আয়ত্তে রাখার বিধি-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছে। সিনর স্পাডা যিনি ও ভি আর এ অর্থাৎ ফ্যাসিস্ত সিক্রেট পুলিশের সর্ব্বনিয়ন্তা—তাঁহাকে এদেশ হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রেসিডেণ্ট জেনারেল প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে (যেমন Standard Oil Co. এবং Peugeot's) আদেশ দিয়াছেন যে, যে সকল ইটালিয়ান কর্ম্মচারী তাঁহাদের মতে বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহাদিগকে অগোণে বিতাড়িত করিয়া দিতে হইবে। এবং উহাদের পদে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে ফরাসী কর্ম্মচারী। লি কেফ্ খনিসমূহেও এ কার্য্য সুরু হইয়াছে।

ফরাসী সরকারের মতে টিউনিসিয়ার ইটালিয়ান অধিবাসীদের শতকরা ২০ জন অর্থাৎ একুন ২০,০০০ জন সক্রিয় ফ্যাসিস্ত (অর্থাৎ নিজেরা গোপনে ফ্যাসিজম প্রচারে ব্যাপৃত), উহাদের ভিতর আবার ৫০০০ হইতে ৬০০০ জন ফ্যাসিস্ত পার্টির প্রত্যক্ষ গঠনকারী ধুরন্ধর। অবশিষ্ট ১৪।১৫ হাজার লোকের অধিকাংশই সিসিলিয়ান—তাহারা তিন চার পুরুষ যাবৎ এদেশে নিরীহ শান্ত জীবন যাপন করিতেছে। আবার এমনও অনেক আছে, যাহারা টিউনিস দস্যুদের জলযুদ্ধে গৃহীত বন্দী ও ক্রীতদাস প্রভৃতির বংশধর। ইহারা আরও প্রাচীন কাল হইতে এদেশের অধিবাসী বনিয়া গিয়াছে। ইহাদের খুব সম্ভবত সংঘর্ষের সময়ে স্বাধীনভাবেই বিচরণ করিতে দেওয়া হইবে, তথাপি তাহাদের কর্ম্মস্থলে তাহাদের উপর নজর রাখা হইবে ফরাসী অর্দ্ধ-গুপ্তচর অর্থাৎ 'encadrement' দ্বারা। সক্রিয় ফ্যাসিস্তদিগকে যে যুদ্ধারম্ভে আটক করা হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই বাছিয়া বাছিয়া ইটালীয়দের বহিষ্কার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং ৩০০ পরিবার ইটালীতে ফিরিয়া গিয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

"উপমা কালিদাসস্য"— শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত। সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। রসচক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে প্রকাশিত।

কবি কালিদাসের কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহার উপমার কথা আসিয়া পড়ে। 'উপমা কালিদাসস্য'—একটি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে ভাবের সৌকুমার্য্য, গভীরতা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নানা কথা বলিবার থাকিলেও কেবল উপমার কথাটিই যে প্রধান হইয়া ওঠে, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, অন্তরের উপলব্ধিতে যে রূপছবি ভাসিয়া ওঠে, তাহার অনুরূপ কতগুলি ছবিকে সে তাহার প্রবাহে টানিয়া আনে। কবি বা শিল্পী আপন অজ্ঞাতে সেই রূপস্রোতে ভাসিয়া চলেন ও সাদৃশ্যের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলগুলি ফুটিয়া উঠিয়া মানস উপলব্ধির শতদলটিকে বাহিরে নূতন রূপে বিকশিত করিয়া তোলে। উপমাই তাঁহার ভাবের প্রকৃষ্ট বাহন;—তাহার ব্যঞ্জনায় যতটুকু ব্যক্ত, তাহা দ্বারা যাহা ব্যক্ত নহে—সেই ছায়ালীন পটভূমিকেও সে ফুটাইয়া তোলে। কালিদাসের উপমাকে সেই শ্রেণীর বলা চলে, যাহার একটি রেখায় বিচিত্র চিত্রপরম্পরা প্রতিফলিত হইয়া বর্ণনীয় বিষয়টিকে অভিনব আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। যাহা বলিয়াছেন—তাহার মধ্যে যাহা বলেন নাই, সেই অব্যক্ত ভাবটিও নিগূঢ় থাকিয়া গভীরতর ভাবকে ব্যঞ্জিত করে।

কবি যেমন উপমার মধ্য দিয়া ভাবকে রূপে প্রতিফলিত করেন, তাঁহার কাব্যও তেমনি যে চিত্ত—তাহাকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে—তাহার মধ্য দিয়া আপনার সম্যক্ তাৎপর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে। কালিদাসের কাব্য ও তাঁহার উপমা সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও তাহার যথার্থ স্বরূপ বা ব্যঞ্জনা পাঠকের কাছে সকল সময়ে স্ফুট হইয়া ওঠে না। তাই তাহাকে পাঠকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার জন্য অপর শিল্পীর তুলিকার প্রয়োজন হয়। আলোচ্য পুস্তকে লেখকের নিপুণ শিল্পীচিত্তের স্পর্শ আমরা পাই। ইহাতে কাব্যের অখণ্ড সৌন্দর্য্যকে, তাহার রসস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে সম্যকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার নৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কালিদাসের উপমার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার মূল স্পন্দনটিকে তিনি বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ই মনে হইয়াছে যে, কালিদাসের উপমাগুলিকে যেন নূতন করিয়া বুঝিলাম, যাহা ভাবি নাই দেখি নাই তাহাকেই উপলব্ধি করিলাম। যাহা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ছিল তাহারই আস্বাদ তিনি কালিদাসের পাঠকদিগকে দিয়াছেন। কেবল কালিদাসের উপমা নহে—উপমার স্বরূপ কি—দৈনন্দিন জীবন ও কাব্য জগৎকে উপমা কিরূপ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে—প্রভৃতি উপমা বিষয়ক একটি ব্যাপক আলোচনাও তিনি ভূমিকা স্বরূপে করিয়াছেন এবং তাহা খুব সুসংগত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ। আলোচিত উপমাগুলির সুকুমার চারুতা ও গভীর ব্যঞ্জনা, অনুরূপ পদবিন্যাসে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। সকল কাব্যরসিক ও কালিদাসের কাব্যের গুণগ্রাহী পাঠকদিগকে পুস্তকখানি বিশেষ আনন্দ দান করিবে সন্দেহ নাই।

হিন্দুস্থানী উপকথাঃ—অনুবাদিকা—শ্রীশান্তা দেবী বি-এ, ও শ্রীসীতা দেবী, বি-এ। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী অঙ্কিত চিত্র সংবলিত, পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

"হিন্দুস্থানী উপকথার" পরিচয় বাঙালী পাঠক সমাজে অনাবশ্যক। বালক-বালিকাদের রস-সাহিত্যের এখানা একটি সম্পদস্বরূপ। ছেলেমেয়েরা এ বই হাতে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিবে না, বয়স্কেরাও আনন্দ পাইবেন।

আধুনিক বাঙলা গল্পঃ—শ্রীপ্রেমেন্দ্র বিশ্বাস, সম্পাদিত। প্রগতি সাহিত্য ভবন, ৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অচিন্ত্যকুমারের দুইটি, অন্নদাশঙ্করের একটি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি, প্রবোধকুমার সান্যালের দুইটি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুইটি, বনফুলের দুইটি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি, বুদ্ধদেব বসুর দুইটি, মণীন্দ্রলাল বসুর একটি, মনোজ বসুর দুইটি, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি, রবীন্দ্র মৈত্রের একটি, শিবরাম চক্রবর্ত্তীর একটি, শৈলজানন্দের দুইটি এবং সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর একটি গল্প আছে। সম্পাদক ভূমিকায় বলিয়াছেন—এ বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সেই সব লেখককে গ্রহণ করা যাঁরা নিছক সময়ের দিক থেকে আধুনিক। সমসাময়িক কি তরুণতর লেখকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য গল্প আর যে কেউ লেখেননি তা জোর করে বলা যায় না, তবে সংগ্রহ-সম্পাদককে এক জায়গায় এসে থামতেই হয়। মোটের ওপর, এই গ্রন্থ পড়ে আধুনিক বাঙলা গল্পে যা সারবস্তু সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা হয়তো অসংগত হবে না। বড় বই ৩৩৮পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা এবং বাঁধাই চমৎকার।

নৃত্য নাট্য চণ্ডালিকা (স্বরলিপি সহ)ঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র। সংগীত এবং নৃত্যের মধ্য দিয়া কবি এই নাটকখানির রূপ দিয়াছেন। প্রেম ও আত্মত্যাগের এক মহান্ আদর্শ এই নাট্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত শৈলজারঞ্জন মজুমদার গানগুলির যে স্বরলিপি দিয়াছেন, পুস্তকে তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই গীতিনাট্যখানি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় অভিনীত হয়। তখন রসজ্ঞগণ উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মনের গভীরেঃ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা। নবজীবন সংঘ, ৪৬।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার উইলিয়ম ষ্টেকেলের "The Depths of the soul" এই নামকরা বইখানাকে ভিত্তি করিয়া পুস্তকখানা লিখিত হইয়াছে। বইখানা পড়িলে পাঠকেরা আমাদের মনের অবচেতন স্তরের অনেক রহস্য জানিতে পারিবেন। লেখার বিশিষ্টতা হইল ইহার

প্রাঞ্জলতা, পারিভাষিক জটিলতা কাটাইয়া এসব বিষয়কে উপভোগ্য করিয়া তোলা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

রত্নপুরী—(ছোটদের জন্য), গ্রন্থকার—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম আট আনা

রত্নপুরী, মুশকিল আসান, পৃথিবীর জন্ম, অশ্রুমুক্তা, মুক্তিপাশ ও জাপানী রূপকথা—এই ছয়টি বিদেশী উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনীতে বইখানি সমৃদ্ধ। শুধু দেশের কিম্বদন্তীমূলক কাহিনীগুলি শুনিয়া ছোটরা তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাহাদের মনের চাহিদা মিটাইতে বৈদেশিক রূপকথাও তাহাদের সম্মুখে ধরা উচিত। ইহাতে বিদেশের সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারের সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কচি মনে জাগিবে। এই কৌতূহল উদ্দীপন কম কথা নহে। গ্রন্থকার শিশু-সাহিত্যে নূতন নহেন। তাঁহার লিখনভঙ্গি সরস। পুস্তকখানি ছেলে মহলে সমাদর লাভ করিবে আশা করা যায়।

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

আমাদের হস্ত-লিখিত মাসিক পত্রিকা "বিদ্রোহী"র উদ্যোগে একটি গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসাধারণ যোগদান করিতে পারিবেন। গল্প যে কোন বিষয়ে হইতে পারিবে; তবে দুঃখী জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধে রাখিতে হইবে। যে দুইজনের গল্প ও কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাঁহাদের দুই-জনকে দুইখানি রৌপ্য-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। গল্প ও কবিতা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে মে, ১৯৩৯। সড়ক-সাধনপাড়া চিত্তরঞ্জন পাঠাগারের কমিটির বিচারই চূড়ান্ত। রচনার কপি রাখিয়া পাঠাইবেন। গল্প ফুলস্কেপ কাগজের ছয় পৃষ্ঠার বেশী হইবে না।

শ্রীসুশান্তকুমার পাঠক, সাধন পাড়া, পোঃ বহিরগাছি, নদীয়া।

তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ২৫শে চৈত্র ২১শে সংখ্যা "দেশ" পত্রিকায় পূর্ব্বধলা "কিশোর সঙ্ঘ" হইতে যে প্রবন্ধ, গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল, উহাতে রচনাদি পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই বৈশাখ স্থলে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ধার্য্য করা হইল।

রচনাদি পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক "কিশোর" (কিশোর সঙ্ঘ), পূর্ব্বধলা, ময়মনসিংহ।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

১৭নং চন্দ্রনাথ সিমলাই লেনস্থিত পাইকপাড়া সাধারণ পাঠাগারে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান লাভ করিবেন, তাঁহাকে পাঠাগারের প্রতি-ষ্ঠাতা মহাশয় কর্ত্তৃক একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য পদক উপহার প্রদত্ত হইবে। বিষয়—"বর্ত্তমান বেকার সমস্যার প্রতিকার উপায়।" উক্ত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসাধারণ ও ছাত্রগণ যোগদান করিতে পারিবেন। ইহাতে কোন প্রবেশ-ফি নাই। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে, ২৫ পৃষ্ঠার অধিক না হয়। প্রবন্ধ উপযুক্ত বিচারক দ্বারা বিচার করা হইবে। কোন প্রবন্ধই ফেরত পাইবেন না। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে মে মধ্যে উক্ত পাঠাগারের সম্পাদক মহাশয়ের নাম বরাবর পাঠাইতে হইবে। ২য় প্রবন্ধ মহিলাদিগের জন্য। বিষয়—"বর্ত্তমান ভারতে নারীর কর্ত্তব্য কি?" যিনি প্রথম স্থান লাভ করিবেন, তাঁহাকে নসীপুর রাজপদক উপহার প্রদত্ত হইবে। ইহাতে মহিলাগণ ও ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারেন। কোন প্রবেশ-ফি লাগিবে না। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের ২০ পৃষ্ঠার অধিক না হয়। উপযুক্ত বিচারকগণ বিচার করিবেন ও সংবাদপত্রে বিচার ফল প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে মে মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় সম্পাদক মহাশয়ের নাম বরাবর পাঠাইবেন। ঠিকানা—পাইক-পাড়া লাইব্রেরী, ১৭নং চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা। **শ্রীকালীপ্রসাদ সিমলাই, সম্পাদক।**

বেহালা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

(তৃতীয় বর্ষ)

স্থান—বেহালা টাউন হল। তারিখ—২৮শে মে, '৩৯ **সময়—বেলা ৩॥ ঘটিকা।** (প্রতি বিষয়ে ২ খানি করিয়া রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে)।

(১) সাধারণের জন্য:—(ক) দারিদ্র্য-বিলাপ—নজরুল ইস-লাম (সন্ধ্যা)।

(২) কলেজ ছাত্রগণের জন্য:—(ক) একা (কমলাকান্তের উক্তি)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। "অর্জ্জন এবং ক্ষতি ...... সুখ চাই না।"

(খ) গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কাব্য-সঞ্চয়ন) "কল্লোল..........জয় ভাসে"।

(৩) স্কুল ছাত্রগণের জন্য:—(ক) Satan's first speech to Beelzebub From Milton's "Paradise Lost" (খ) অভিসার—রবীন্দ্রনাথ (Matric Bengali Text)।

(৪) ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য (অনূন ১২ বৎসর):—(ক) সাবধান—সুকুমার রায় (আবোল-তাবোল)। কোন প্রবেশ মূল্য নাই। নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ—২৪শে মে, '৩৯।

নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—(১) শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মণ্ডল, এম-এ, বি-এল। সত্যেন রায় রোড, বেহালা, ২৪ পরগণা। (২) শ্রীবিভূতিভূষণ ভড়, এম-এ। ৪৮, বলরাম দে ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। (৩) শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বড়িষা সাধনা মন্দির-আশ্রম, ২৪ পরগণা। (৪) শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত। ১৩৪, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানী-পুর।

রঙ্গজগৎ

সুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নূতন নাটক "মাকড়সার জাল" আগামী শনিবার হইতে নবপরিচালিত রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে। শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করিতেছেন এবং শ্রীযুত প্রভাত সিংহ প্রযোজনা করিতেছেন। সংগীত রচনা করিয়াছেন সুকবি শৈলেন রায়; সুর দিয়াছেন শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী; নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীযুত ব্রজ পাল ও দৃশ্যপট পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীযুত মণীন্দ্র দাস। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

নরেজিৎ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; সুরেন রায়—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; ভূধর মুখার্জ্জি—প্রভাত সিংহ; কুমুদ মুখার্জ্জি—ভূমেন রায়; সীতানাথ—হীরালাল চ্যাটার্জ্জি; সংগীত পরিচালক—তারাকুমার ভট্টাচার্য্য; আর্ট ডিরেক্টর—চৈতন রায়; রঞ্জন—বিনয় বসু; বিভাকর—দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; সুনীতি—শান্তি; মিসেস মুখার্জ্জি—পদ্মাবতী; চিত্রা—ঊষা; অনিলা—বেলারাণী; নির্ঝরিণী—ফিরোজা; প্রতিভা—ঝরণা ও মীনা—কিশোরী।

* * * *

কয়েক মাস পরে কালী ফিল্মস, কালী ফিল্মস্ লিমিটেড নাম দিয়া পুনরায় নূতন উদ্যমে ছবি তোলা আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের ষ্টুডিওতে 'চাণক্য' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' এই দুইখানি ছবি তোলা হইতেছে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটিকা অবলম্বনে শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় চাণক্য ছবি তুলিতেছেন। চাণক্যের চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

চাণক্য—শিশিরকুমার ভাদুড়ী; কাত্যায়ন—নরেশচন্দ্র মিত্র; সেলিউকাস—অহীন্দ্র চৌধুরী; চন্দ্রগুপ্ত—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী; নন্দ—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়; বাচাল—জহর গাঙ্গুলী; চন্দ্রকেতু—সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী; অন্ধ ভিক্ষুক—কৃষ্ণচন্দ্র দে; মুরা—কঙ্কাবতী; হেলেন—বীণা; ছায়া—রাধারাণী ও আত্রেয়ী—শক্তিধারা।

কচ ও দেবযানীর কাহিনী অবলম্বনে শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'শর্ম্মিষ্ঠা' ছবিখানি তুলিতেছেন। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শুক্রাচার্য্য—অহীন্দ্র চৌধুরী; বৃহস্পতি—নরেশচন্দ্র মিত্র; বৃষপর্ব্ব—বিজয়কার্ত্তিক দাস; যযাতি—ছবি বিশ্বাস; কচ—মঙ্গল চক্রবর্ত্তী; দুন্দুভি—জহর গাঙ্গুলী; সুর্মিল—কৃষ্ণচন্দ্র দে; শর্ম্মিষ্ঠা—রাণীবালা ও দেবযানী—চিত্র

* * *

আমেরিকার কোন একটা চলচ্চিত্র কোম্পানী চলচ্চিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য আলবানিয়ার রাণী গিরাল্ডাইনকে দুই লক্ষ পাউন্ড দিবার প্রস্তাব করে। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রাণীর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে গিয়া তাঁহার পরিবারের বুদাপেস্তস্থিত সলিসিটর বলিয়াছেন, যে, রাণী জনসাধারণের কৌতূহলের পাত্রী হইতে চাহেন না। রাজা জোগের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সুখেস্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত করার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। রাজ-পরিবারের অর্থ লণ্ডনের কোন ব্যাংকে গচ্ছিত আছে।

মণিপুরী নৃত্যের একটি দৃশ্য। শ্রীযুত হরেন্ ঘোষের উদ্যোগে এই নৃত্য সম্প্রতি কলিকাতায় দেখান হইয়াছে।

এরূপ মনে হয় যে, তাঁহারা মিশর পরিভ্রমণের পর স্থায়ীভাবে বৃটেনে বসবাস করিবেন। বুদাপেস্তের উক্ত সলিসিটর ইহাও বলিয়াছেন যে, আলবানিয়ার আদালত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী গিরাল্ডাইনের সঙ্গে একজন পরিচারিকা ও একজন নার্স থাকিবে এবং রাজা জোগের সঙ্গে তাঁহার একজন সেক্রেটারী ও একজন পরিচারক থাকিবে।

* * *

শ্রীমতী সাধনা বসু ও তাঁহার সম্প্রদায় বোম্বাই-এর সাগর ফিল্মসের হইয়া "লাইফ অব এ ড্যান্সার" ছবি তুলিতেছেন। বাঙলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ছবি তোলা হইবে। পরিচালনা মধু বসু। আখ্যানভাগ লিখিয়াছেন মন্মথ রায়। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—কুমকুম—সাধনা বসু; জগদীশপ্রসাদ—রবি রায়; চন্দন—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য; সূর্য্যশঙ্কর—ভুজঙ্গ রায়; প্রিয়তম—নবদ্বীপ হালদার। সুরশিল্পী শ্রীযুত তিমিরবরণ সংগীত পরিচালনা করিতেছেন।

* * * * *

আমরা জানিতে পারিলাম যে, 'ভেনাস পিকচার্স' নামে

একটি নূতন চিত্র-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি কলিকাতায় গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের প্রথম ছবি হইবে 'ঋণং কৃত্বা'।

* * *

শ্রীযুত হরেন ঘোষের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় মণিপুর হইতে আগত একদল নৃত্যশিল্পীর নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া গেল।

এই সম্প্রদায়ের নৃত্য আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে যে নৃত্য সম্প্রদায় মণিপুররাজ পাঠাইয়াছেন, খাঁটী মণিপুরী নৃত্যের সম্যক পরিচয় তাঁহারা যাহা দিয়াছেন মণিপুরের বাহিরে এই রকম আর দেখা যায় নাই। শ্রীযুত হরেন ঘোষ এই সম্প্রদায়কে কলিকাতায় আনাইয়া এবং চিত্তাকর্ষক ও রুচিসঙ্গতভাবে উপস্থাপিত করিয়া নৃত্যরসিকদের খাঁটী মণিপুরী নৃত্য দেখিবার যে সুযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

মণিপুরের যে সম্প্রদায় কলিকাতায় আসিয়াছেন তাঁহাদের নৃত্য দেখিলে মনে হয়, নৃত্য তাঁহাদের প্রাণের উৎস, নৃত্য তাঁহাদের সাধনা। তাঁহাদের সাবলীল ও মাধুর্য্যময় গতিভঙ্গিমা ; বিভিন্ন মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যঞ্জনা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। শ্রীমতী থাম্বাল সেনার শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যে শান্ত ও রুদ্র রূপ আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে। শ্রীমান তরুণকুমার ও শ্রীমতী ইবেম্ পিশাক যে 'নাগানৃত্য' দেখাইয়াছেন এইরূপ অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত নাগানৃত্য আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। শ্রীমতী পিশাক দেবীর বিশাখা নৃত্য ও শ্রীমতী নূপমাচার রাধা নৃত্য বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি। মণিপুরের সমস্ত নর্ত্তক-নর্ত্তকী যে লোকনৃত্য দেখাইলেন তাহার অভিনবত্বে ও মনোহারিত্বে তাহা আমাদিগকে সত্যকারের আনন্দ দিয়াছে।

মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে বাঙলা দেশের তথাকথিত কয়েকটি 'আধুনিক' নৃত্য দেখান হইয়াছে। 'আধুনিক' নৃত্য বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে আধুনিক নৃত্য নহে। ঐ নৃত্যের কোন আখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই না। মণিপুরী নৃত্যের পাশে কোন প্রকারেই এই নৃত্যের স্থান হইতে পারে না। আর্টের নামগন্ধ এই কয়েকটি নৃত্যের মধ্যে নাই ; যদি আর্ট বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইতেছে চতুর্থ শ্রেণীর দর্শক ভুলাইবার আর্ট। আমরা শ্যামসুন্দর ও অরুণার সাপুড়ে নৃত্য ও মহিষাসুর বধ নৃত্য ; মহারাজা বসু ও মণিমালার সাঁওতালী নৃত্যের কথা বলিতেছি। শ্রীমতী অরুণা ও মণিমালা নৃত্যশিল্পী নামের একেবারে অযোগ্য

লর্ড নাফিল্ডের নূতন দান

(১৪২ পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তুতকারক রবার্ট উইলিয়ম পলের সহযোগিতায় ঐ নীতিতে এক কৃত্রিম রেসপিরেটর প্রস্তুত করেন। তাই উহা ব্রাগ-পল টাইপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

৪। **ডারস্‌টল টাইপ**—একবার অষ্ট্রেলিয়ায় শিশুদিগের মধ্যে প্যারালাইসিস রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময় ডাঃ আলফ্রেড ডারসটল এই কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের উদ্ভব করেন। ইহাতে রোগীর সম্পূর্ণ শরীরটি যন্ত্র মধ্যে পুরিতে হয় না। যন্ত্রটি অনেকটা ডুবারুদের বর্ম্মের বুকপাতের মত। এই ধরণের যন্ত্রের সুবিধা এই যে, রোগীর মাথার দিকটা বাহিরেই থাকিতে পারে, তাহার পক্ষে খাওয়া-দাওয়া বা পড়াশুনার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না।

৫। বোথ (Both) টাইপ—এই যন্ত্রের উদ্ভাবক অষ্ট্রেলিয়ার একজন তরুণ পূর্ত্তবিদ্—নাম এডওয়ার্ড টমাস বোথ। ড্রিঙ্কার ভ্রাতৃদ্বয় উদ্ভাবিত রেসপিরেটরের অনুকরণেই ইহা অনেকটা গঠিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন কাউন্সিলের জনস্বাস্থ্য বিভাগ পরিদর্শন করিতে আসিলে উক্ত বিভাগের সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এনড্রু টপিং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারেন যে, কৃত্রিম রেস্‌পিরেটর বা শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। লণ্ডন কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে তিনি কাউন্সিলের কর্ম্মী ডাঃ হেণ্ডারসনের সহযোগিতায় একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হন। একশত পাউণ্ড ব্যয়ে হ্যাম্পস্টেড কারখানায় এভাবে যে যন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাঁহার পূর্ব্ব পরিকল্পিত যন্ত্র অপেক্ষা ইহা আরও উন্নত ধরণের ও সুবিধাজনক মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী এইভাবে যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্পর্কিত ব্যাধিতে তাহার উপকারিতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। অত্যধিক মূল্যবান বলিয়া সাধারণ হাসপাতালসমূহে এরূপ যন্ত্র রক্ষাকরা অনেক দেশেই এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। ফলে, বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বহু রোগাতুর ব্যক্তিকে দুঃসহ কষ্টভোগ করিতে হয়। পরহিতব্রতী দানবীর লর্ড নাফিল্ড মানুষের প্রাণ রক্ষার্থ তাই এই শুভ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার কারখানায় যে 'লৌহ হৃদযন্ত্র' প্রস্তুত করা হইতেছে, সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তিতে এইরূপ যন্ত্র পরিচালিত হইবে বটে, তবে বিশেষ প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে ইহাকে হাতে চালাইবার ব্যবস্থাও থাকিবে।

বিনামূল্যে লৌহ হৃদযন্ত্র দেশ-বিদেশের হাসপাতালগুলিকে বিতরণ করিবার যে আদর্শ নাফিল্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মহানুভব ধনকুবেরের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। উদার হৃদয় ব্রিটিশ কোটিপতির এই উদাম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। 'কারু দেশের ও দশের সেবায় দানই অর্থের চরম সার্থকতা ঘোষণা করে'

সাপ্তাহিক সংবাদ

৯ই মে

আসামে গুরুতর শাসনতান্ত্রিক সংকটের আশংকা দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে কাজ করিতেছেন, এমন অনেক কর্ম্মচারী নাকি নানা অজুহাতে মন্ত্রীদের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া শাসন কার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইতেছেন। সমস্ত বিষয় গবর্ণরকে জানান হইয়াছে। গুজব যে, গবর্ণর যদি এই সকল কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন এবং ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের কর্ম্মচারিগণ অনুগতভাবে মন্ত্রিসভার আদেশ পালন করিবেন, এই মর্ম্মে যদি গবর্ণর প্রতিশ্রুতি না দেন তাহা হইলে কোয়ালিশনী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের দফাওয়ারী আলোচনা শেষ হইয়াছে। অদ্য বিরোধী দলসমূহ সাধারণ অ-মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন-সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ১৭টি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সবগুলিই অগ্রাহ্য হয়।

মহাত্মা গান্ধী সদলবলে বৃন্দাবন হইতে কাশী গমন করেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে কম্যুনিষ্ট দলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীর শিবমন্দির আন্দোলন সম্পর্কে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইলে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালনা করে। ফলে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক গুরুতর আহত হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গার কানসা গ্রামে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ১৭ জন গুরুতররূপে আহত হয়। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান মারা গিয়াছে।

বৃটিশ চন্দন নগরে গঙ্গায় এক নৌকা-ডুবির ফলে ৫ জনের সলিল সমাধি হইয়াছে।

জাপানী নৌ-ঘাঁটি সাসেবোতে এডমিরাল কাটো এবং লেঃ জেনারেল নাকামুরার প্রাণহানির এক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। আততায়ীর আক্রমণে উভয়েই গুরুতর আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, যুদ্ধবিরোধী জাপানীরাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

১০ই মে—

সরকারী টাস এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের উত্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়াকে স্বাধীনতা রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে বৃটেন এবং ফ্রান্স যদি কোন যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের সাহায্যার্থে অবিলম্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

১১ই মে—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলটি পাশ হইলে প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক যে বক্তৃতা করেন তাহা আদৌ প্রধানমন্ত্রীর পদোচিত হয় নাই। তিনি তর্জ্জনী হেলাইয়া বলেন,—"আমিই বাঙলার তিন কোটি মু[illegible]মানের প্রতিনিধি; যখন আমি বলি যে, বা[illegible] মুসলমান[illegible] সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষপাতী, বুঝিতে [illegible]ইবে, আমার কথাই শেষ কথা।" প্রধান[illegible] কংগ্রেসীদে[illegible] শাসাইয়া আরও বলেন যে, এই বিলই শেষ [illegible] কর্পোরেশ[illegible]রি সংস্কারের জন্য দ্বিতীয় দফা [illegible] আসিতেছে[illegible]।

লণ্ড[illegible]এক মহিলা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেভিল [illegible]রিলেন ঘোষণা করেন যে, ডানজিগ আক্রমণের যদি পো[illegible]ণ্ডের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে সমগ্র ইউ[illegible] দাবানল [illegible]লিয়া উঠিবে।

'বৃ[illegible]দ জার্ম্মানীর' প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হের [illegible]লার জা[illegible]নীর যুব-সংঘ ও তরুণী সংঘের লক্ষাধিক [illegible] তরুণী[illegible]দিগকে বলেন, "আমি আশা করি আমাদে[illegible] দেশের তরুণদের চরিত্র বীরত্ব এবং তরুণীদের সততার মূর্ত্ত প্রতীক হইবে। যাহারা বীর তাহারা যে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোন কিছু লাভ করা যায় না এবং কিছু লাভ করিতে হইলে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাহা পাইতে [illegible] ও রক্ষা করিবার শক্তি না থাকিলে কোন কিছু অধিকারে [illegible] যায় না। যে সব বুলি দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি ও জাতীয় জ[illegible] বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেই সব বুলির মোহে তোমরা [illegible] বিশ্বাস হারাইও না।"

হের হিটলারের আদেশে রাইখ ব্যাঙ্কের ভাইস-প্রেসি[illegible] হের ব্রিঙ্কম্যানকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের হেতুতে অবসর গ্রহণ ক[illegible] বাধ্য করা হইয়াছে। প্রকাশ, হের ব্রিঙ্কম্যান জার্ম্মানীর [illegible] সম্ভার বৃদ্ধি ও চতুঃবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা ক[illegible] ছিলেন।

পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নকে ছাপরা সদর হাসপাত[illegible] স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। গতকল্য তাঁহাকে মুক্তি দে[illegible] হইয়াছে। গতকল্য আরও ১৯ জন বিচারাধীন কয়েদ[illegible] মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারজন অনশনব্র[illegible] আছেন।

কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বার[illegible] ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে এখনও আলে[illegible] চলিতেছে। উভয় গবর্ণমেণ্ট জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দে[illegible] পারস্পরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে একটা দীর্ঘকালস্থ[illegible] সুনির্দ্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন। এই দীর্ঘকালস্থ[illegible] চুক্তি সম্পাদনে উভয় গবর্ণমেণ্ট ইহা ঘোষণা করিতেছেন পররাজ্য আক্রমণের ফলে ভূমধ্যসাগরের এলাকায় যদি [illegible] যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে তাহারা পারস্পরিক সহযোগি[illegible] জন্য প্রস্তুত থাকিবেন এবং একে অপরকে সাহায্য করিবে

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরী হইতে কলিকাতায় [illegible] বর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও ফিটওয়েল কোম্প[illegible] মালিক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ১৪৩ ধারা অনু[illegible] কাশীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল [illegible] সংশোধন বিলটি পাশ হয়। বিলের পক্ষে ১২৮ জন ও বি[illegible]

...জন ভোট দেন। কোয়ালিশন দল, ইউরোপীয়ান দল ...লের পক্ষে ভোট দেন। কংগ্রেস, হিন্দু জাতীয় দল ও ...ন্দ্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় দল বিলের বিপক্ষে ভোট দেন। ...ষক-প্রজা দল ভোটের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন।

...ই মে—

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় কর্পো-...শনের বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি (১২টি) গঠিত হয়। এই ...পর্কে কিছুদিন হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দল, কর্পো-...শনের ইউরোপীয়ান দল, মনোনীত দল এবং কতিপয় মুসল-...ন সদস্যের সহিত একত্রে নূতন দল বাঁধিয়া কর্পোরেশনে ...গ্রেসের শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করার জন্য যে অপচেষ্টা ...রতেছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় এবং অদ্য কংগ্রেস মিউনিসি-...ল এসোসিয়েশনের নেতা অল্ডার-ম্যান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ...ু প্রণীত বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যদের তালিকা-...হেই কর্পোরেশনে অধিক সংখ্যক ভোটে গৃহীত হয়। এই ...পারে বিধানী দলের শ্রীযুক্ত নলিন পাল (ইনি কংগ্রেস মিউ-...সিপ্যাল এসোসিয়েশনের সদস্য) এই প্রতিক্রিয়াশীল দলের ...থপাত্রের কার্য্য করেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ...ীত সদস্যদের তালিকাসমূহ সমর্থন করার জন্য কংগ্রেস ...উনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন হইতে যে অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়, ...ত পাল তাহা অমান্য করিয়া শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ ...নার্জ্জি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ঐসব তালিকা গ্রহণের বিরো-...তা করেন এবং নিজেদের কল্পিত দলের পক্ষ হইতে ঐ ...লিকাসমূহের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে একটি করিয়া নূতন ...লিকা সভায় উত্থাপিত করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত পালের সমস্ত তালিকাই কর্পোরেশন অধিক সংখ্যক ভোটে ...ত্যাখ্যান করেন এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক সভায় উত্থাপিত ...লিকাসমূহ এবং প্রস্তাবগুলিই গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী সদলবলে রাজকোটে গিয়াছেন। রাজকোটে ...স্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি পরিষদ কর্ম্মীদের ...হত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা ...ঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, রাজকোট ...পারে তিনি দ্বৈত নীতির অনুসরণ করিবেন। একদিকে ...নি মিঃ ধাবর ও বীরবলের তুষ্টিসাধন এবং বীরবলের মার-...ঠাকুর সাহেবকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। অপর দিকে ...র মরিস গায়ারের রায় উদ্ভূত সমুদয় সমস্যার সমাধানে যত্ন-...হইবেন।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগামী ২১শে মে ...ভাঃ রাজনৈতিক বন্দী দিবস পালন করিবার নির্দ্দেশ ...য়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় ফাই-...স বিল পাশ হইয়াছে।

কটক জেল হইতে ১২ জন তালচের বন্দীকে মুক্তি দেওয়া ...য়াছে।

...ই মে—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এস-সি ...ক্ষার ফল বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ বৎসর ৩৬৭৭ জন ছাত্র আই-এস-সি পরীক্ষা দিবার জন্য নাম রেজিষ্টারীভুক্ত করিয়াছিল; তন্মধ্যে ৩৬২৭ জন পরীক্ষা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১০২৮ জন প্রথম বিভাগে ১২২০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৬৬·২ ভাগ উত্তীর্ণ হইয়াছে; গত বৎসর শতকরা ৫৮·৪ ভাগ উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

...১৫৫ জন ছাত্র আই-এ পরীক্ষা দিবার জন্য নাম রেজি-ষ্টারীভুক্ত করিয়াছিল; তন্মধ্যে ৭০৩২ জন পরীক্ষা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১০০২ জন প্রথম বিভাগে, ২১১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৯৫৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এ বৎসর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাশের হার শতকরা ৫৭·৯; গত বৎসর পাশের হার শতকরা ৫৬·০৬ ছিল।

"জয়শ্রী" সম্পাদিকা এবং বাঙলার খ্যাতনামা রাজনীতিক কর্ম্মী শ্রীযুক্তা লীলা নাগ এম-এর সহিত ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী ও নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল-এর শুভ বিবাহ ঢাকায় পাত্রীর পিতা রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগের গৃহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে বিবাহটি রেজেষ্টারী করা হয় এবং ...রে ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বাঙলায় সরকারী চাকুরীতে শতকরা সাম্প্রদায়িক হার নির্দ্ধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের আহ্বানে, বঙ্গীয় আইন সভার দলপতিগণের যে সম্মেলন হয়, তাহাতে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ত্রিপুরীর পর মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ১৮ই এপ্রিল ডিগবয়ে গুলী চালনা সম্পর্কে তদন্ত শেষ হইয়াছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

পাটনার নিকট ফুলোয়ারী সরিফে একটি সাইকেল তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে। ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী খোলা হইবে।

লক্ষ্ণৌয়ে সিয়া-সুন্নি বিরোধ মীমাংসার আলোচনা চলি-তেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিমণ্ডলের অপর কয়েক ব্যক্তি উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত রুদ্ধদ্বার গৃহে আলো-চনা করিতেছেন। তাব্বারা আন্দোলন সম্পর্কে আরও ৬৭ জন সিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের লইয়া ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৮ হাজার ৮ শত হইল।

বেগার খাটান, বলপূর্ব্বক কার্য্যে নিয়োগ করা ও বাধ্যতা-মূলক শ্রমিক প্রথার জন্য শাস্তি বিধান করিয়া বোম্বাই গেজেটে এক বিলের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে।

মহারাজা স্যার কিষণপ্রসাদ হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হিন্দু মহাসভার সভা-পতি বীর সাভারকর তাহার উত্তরে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

১৪ই মে—

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের হার নির্দ্ধারণের জন্য যে বৈঠক আহূত হইয়াছিল, কোনও সিদ্ধান্ত না করিয়াই যেভাবে ঐ বৈঠক শেষ হয়, এই বিবৃতিতে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের রাজস্ব সচিব মিঃ রফি আহম্মদ কিদোয়াইয়ের সেক্রেটারী মিঃ গোবিন্দপ্রসাদকে রাশিয়ায় যাইবার ছাড়পত্র দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে তারে জানান হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাশিয়া গমনের অনুমতি দিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ছাড়-পত্রে রাশিয়া গমনের অনুমতি গ্রহণ করিতে পারেন; বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, বাঙলা গবর্ণ-মেণ্টের বন্দীমুক্তি নীতির প্রতিবাদে তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন।

ত্রিপুরার মহারাজা ত্রিপুরা রাজ্যের "জনমঙ্গল" সমিতির প্রচার সম্পাদক এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাদের মুখপত্র 'প্রজার কথা' সম্পাদক কমরেড শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে এক বৎসরের জন্য রাজ্য হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন।

হিন্দুদের 'হরিবোল' শোভাযাত্রা উপলক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ আলীগড় শহরে ব্যাপকভাবে পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী ১৬ই মে পর্যন্ত বিনা লাইসেন্সে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

ভবনগর প্রজামণ্ডল সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে নির্ব্বা-চিত সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত জনসঙ্ঘের সহিত মুসলমানদের এক শোভাযাত্রার সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন নিহত ও ৪ জন গুরুতর আহত হই-য়াছে। সর্দ্দার প্যাটেল বোম্বাই হইতে ভবনগরে পৌঁছিলে তাঁহাকে লইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির হয় ও উহা এক মসজিদের নিকটে উপস্থিত হইলে মুসলমানদের এক শোভাযাত্রা উপস্থিত হয় এবং উভয়পক্ষে সঙ্ঘর্ষ ঘটে। পুলিশ শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

যুক্ত প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা হইতে উনাও যাত্রা করিয়াছেন।

সিংহলের শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ প্রিয়দর্শী কর্তৃক বোম্বাইয়ের যোগ-ইনিষ্টিটিউটে লিখিত এক পত্রে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার রাজ্যচ্যুত সম্রাট হাইলে সেলাসী সিংহলে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া যোগাভ্যাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাজ্যচ্যুত হাবসী সম্রাট নিখিল এশিয়া শান্তি সম্মেলনের কলম্বো অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন এবং কলম্বোতে স্থায়ীভাবে বাস করিবেন। তাঁহাকে যোগা-ভ্যাস শিক্ষা দিবার জন্য তিনি যোগ-ইনষ্টিটিউটকে সিংহলে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

টুরিন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া সিনর মুসোলিনী একটি বক্তৃতা করেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিনর মুসোলিনী তাঁহার বক্তৃতায় ডানজিগ, পোল্যাণ্ড কিম্বা ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তি সম্পর্কে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই, কিম্বা ফ্রান্সের নিকট হইতে কোন দাবী করেন নাই।

১৫ই মে—

বাঙলার নানাস্থান হইতে দারুণ অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রংপুর জেলার ফুলছড়ি থানায় অন্নকষ্টের ফলে অনাহারে তিন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ময়মন-সিংহ জেলার ঘাটাইল থানা হইতে একটি আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আগামী কংগ্রেসের অধি-বেশন স্থান নির্ব্বাচনের ভার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হাজারীবাগ জেলায় রামগড় এষ্টেটের নিকটবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে আগামী কংগ্রেসের অধি-বেশনের স্থান স্থির করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, জলন্ধর ডি এ ভি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল লালা জ্ঞানচাঁদ এবং ৫ম ডিক্টেটর পণ্ডিত দেবব্রত বী. নন্দর হইতে আগত ৫ শতাধিক সত্যাগ্রহীর উপর নির্ম্মমভাবে লাঠি চালনার প্রতিবাদ করায় তাঁহাদিগকে নির্জ্জন কারাগারে রাখিয়া নির্য্যাতন করা হইয়াছে। ফলে লালা জ্ঞানচাঁদ নাকি নির্জ্জন কারাকক্ষের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ডিগবয় ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি শিলংয়ে যে বৈঠক হইয়াছে, তাহাতে অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন মিটমাট সম্ভবপর হয় নাই; কেননা কোন কোন বিষয়ে কোম্পানীর নিজেদের দাবী ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয় নাই। এই বিরোধে আসাম গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকি-বেন।

দার্জ্জিলিংয়ে হক মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারী চাকুরীতে ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

উনাওয়ে যুক্ত প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। পরিষদ বোমার মামলার ভূতপূর্ব্ব বন্দী শ্রীযুক্ত বটুকেশ্বর দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বামপন্থীদলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য এক মর্ম্ম-স্পর্শী আবেদন করেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

গয়া দাঙ্গা সম্পর্কে ১৪জনের মৃত্যু হইয়াছে। হাসপাতালে এখনও অনুমান একশত জন আহত লোক আছে। এই পর্য্যন্ত মোট ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতা, শাখারীটোলা ষ্ট্রীটে দ্রৌপদী দেবী নাম্নী ২৫ বৎসর বয়স্কা একটি হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর অল্প-ক্ষণ পরে বাড়ীর ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।